দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিকপত্র

অষ্টাবিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

সম্পাদক—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স.
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

অষ্টাবিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৪৭

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অত্যাশ্চর্য্য জলের খেলা (সচিত্র)—পি, সি, সরকার ৬৭১
অনাগত (কবিতা)—শ্রীরাধারাণী দেবী ৬২৩
অনুকম (উপন্যাস)—
শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ২৫, ২৩১, ৩৯৫, ৫৩২, ৬৭৬, ৮২১
অপরাধিনী (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬৭০
অবাস্তব (নাটিকা)—বনফুল ৪৫৮
অবিচার (কবিতা)—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ৮১৫
অর্দ্ধনারীশ্বর (সচিত্র)—শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী ৪৬৮
আচার্য্য জানকীনাথ—শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য ৫৫৩
আর্থিক দুনিয়া—শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় ৫৯০
আয়ুর্ব্বেদ ইতিহাসের এক অধ্যায়—শ্রীইন্দুভূষণ সেন ৩৩১
আয়ুর্ব্বেদে জন্মান্তরবাদ—শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ৭৩৯
আরোহণ ও অবরোহণ (গল্প)—শ্রীজগদীশ গুপ্ত ৪৪৭
আষাঢ় ক্রন্দসী (কবিতা)— শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৭০
উত্তর (কবিতা)—শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার ১০২
উদারচরিতানামের বৌ (গল্প)— শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪২
উপনিষদ নির্ব্বাচন—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪১
কমলা দেবী ও দেবলা দেবী —শ্রীভূপতিনাথ দত্ত ২২৪
কবি কর্ণপূর ও তাঁহার নাটক-রচনার কাল-বিচার—
মঃ মঃ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ ৭৫১
কলির গড়ুর (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৫৯৭
কল্লান্ত (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৩৭
কালীঘাটের কালীমন্দিরে আত্মবলিদান প্রথা—
শ্রীগোপাললাল চক্রবর্ত্তী ২১০
কি পুছসি হৃদয় সম্বাদ (কবিতা)—বিদ্যাবিনোদ ২৮৩
কুচবিহারের পত্র—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ৭৯৯
কৃষি ও বেকার সমস্যা—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার ৫৩
কৃষ্ণদাস কবিরাজ (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ২৫৫
কে (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৬৫১
কোকিলের ব্যথা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৮৯
ক্ষুদ্র ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—শ্রীভবেশচন্দ্র রায় ৫১১
খদ্দর ও স্বরাজ—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ২৮
খেলা-ধূলো (সচিত্র)—
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ১৪৫, ২৯১, ৪৩৩, ৫৭০, ৭০৫, ৮৪২
গঙ্গাসাগর (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৪৮
গান্ধার-শিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি—শ্রীগুরুদাস সরকার ৮১৩
গীতায় শক্তিবাদ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু ৬০২
গুজব সম্রাট (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ১১৪
গোপন কথা (কবিতা)—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার ৭৩৮
গ্যাস দ্বারা মটরগাড়ী চালানো—শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ৬৭
চন্দ্রা (গল্প)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৪২
চম্পা ভ্রমণ (সচিত্র)—স্বামী সদানন্দ গিরি ৬০৪
চা (কবিতা)—শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫৫
চাটুয্যে-সংবাদ (গল্প)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮১৬
চাঁদসদাগর (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৯৫
চিঠি (কবিতা)—শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩৭
চোরের পুণ্য (গল্প)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮৩
জঙ্গম (উপন্যাস)—বনফুল ৮, ২৭১, ৩৪১, ৫২৬, ৫৮৩, ৭৭৪
জননীর ব্যথা (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৩৭৬
জাপান (সচিত্র)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭৩
জাপানের সমাজ বিবর্ত্তনের ইতিহাস—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৭৭, ৭৬৬
জুয়াড়ীর বৌ (গল্প)—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১৮
তব মনে গুঞ্জরিবে কথাটি আমার (কবিতা)—বন্দে আলী মিয়া ৭৭৩
তীর ও তরঙ্গ (উপন্যাস)—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ৫৮, ১৮২, ৩৮২,
৫০১, ৬৬৩, ৭৮৮
তুমি ও আমি (কবিতা)—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ ২৩৫
ত্রুটি (গল্প)—শ্রীসুধীরঞ্জন ঘোষ ৪০৪
দুধারা (কবিতা)—শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ৩৪৭
দেব-দেউলের দেশে (সচিত্র) ডাঃ সুবোধ মিত্র ৮০৪
দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা পত্র—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ৩৫৬
দ্বয়ী (কবিতা)—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯২
দ্বারকা তীর্থ (সচিত্র)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩৫
দ্বিতীয় পক্ষ আষাঢ় (কবিতা)—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ৬১৫
দ্বিপ্রহরে (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ২৩
ধ্বংসাভিমুখী (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২৩৭
নক্ষত্রের দীপ্তি ও আয়তন—শ্রীকামিনীকুমার দে ৬৩৮
নটরাজ উদয়শঙ্কর ও ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলাকেন্দ্র (সচিত্র)—
শ্রীনরেন্দ্র দেব ৭৮৪
নব কাব্য কীর্ত্তন (কবিতা)—শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী ৫১৩
নব বোধন (গল্প)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ৭১
নব সংস্করণ (নাটিকা)—বনফুল ৭২৭
নবী আক্তার মর্ গিয়া (শিকার)—শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত ৫৬৫
নহে অভিশাপ (কবিতা)—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৫৮
নিখিল প্রবাহ (সচিত্র)—হুয়েন শাঙ ১১৯, ৪০৮, ৬৫২
নিমেষের সাথী (কবিতা)—শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৪০
নীড়ের মায়া (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী ৩২৪
পঞ্চাশ বছর পরে (কবিতা)—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫
পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা—শ্রীকমলা দেবী ৬৫৯
পথ বেঁধে দিল (চিত্র-নাট্য)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৩, ৬৮০, ৭৬১
পরমহংস মাধবদাসজী (সচিত্র)—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু ৬২৪
পরিহাস বিজল্পিতম্ (নাটক)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৩৬
পাশাপাশি (কবিতা)—শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩৮
পুতুল-খেলা (গল্প)—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৬২৮
পূর্ব্বাভাষ (কবিতা)—শ্রীশান্তি মিত্র ৬৭২
পৃথিবী বিদায় (কবিতা)—শ্রীদক্ষিণা বসু ৪৭
প্রতীক্ষায় (কবিতা)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৩৩৩

প্রতীক্ষায় (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৫৬৯
প্রত্যাবর্ত্তন (গল্প)—ডঃ নবগোপাল দাস ২০০
প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন—শ্রীকমলা রায় ১৯
প্রাচীন বাঙ্গলার বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন (আলোচনা)—শ্রীশোভা সেন ৭৮১
প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কৃত শিক্ষা—কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ ৬৭৩
প্রাণের প্রবাহ কোথা (কবিতা)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৬২৫
প্রান্তিক (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক ১৮১
প্রারব্ধ—রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ৫৯৩
প্রিয়া (কবিতা)—শ্রীহৃষীকেশ বসু ৪৮৯
প্রেম ও কাল (কবিতা)—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী ৭
প্রেম বৈচিত্ত্য (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৬৬২
ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য ৭৩৬
ফ্রয়েড ও স্বপ্নতত্ত্ব—শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৮০৭
ক্লাউড কমিশনের সুপারিশ—শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় ৩১০
বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবাদ—শ্রীকমলা দেবী ১৩৬
বঙ্গ-জননী (কবিতা)—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য ৪০৬
বন্যা (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৭৫০
বধূবধূ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ২৭০
বসন্ত বন্দনা (কবিতা)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৩৯৪
বাজ ! বাজ ! রণভেরী (কবিতা)—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ৪০৮
বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলন—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী ৭১১
বার্লিনে অলিম্পিক (সচিত্র)—ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী ২৮৭, ৫৩৯
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীব্যোমকেশ কোঙার ১১৬
বিজয়া (গান)—শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী ৮১২
বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত ৩০৫
বিদ্যাপতি (কবিতা)—শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত ২১৮
বিশ্ববাণী মরুক কেঁদে (কবিতা) আবদুর রহমান ৩২৩
বেদ ও বিজ্ঞান—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার ২৪৯
বেল ফুল (কথিকা)—এস্ ওয়াজেদ আলী ২৮৩
বেলা বয়ে যায় (কবিতা)—শ্রীগীতা দেবী আচার্য্য চৌধুরী ৩১৯
বৈদিক যজ্ঞ ও উপনিষদ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪৯০
বৈদেশিকী (সচিত্র)—শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায় ১২৫
বৈষ্ণব সাহিত্যে রস—শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১
ব্যথা (কবিতা)—কাদের নওয়াজ ১১৮
ব্যর্থ অনুরাগ (কবিতা)—শ্রীবিশ্বনাথ রায় চৌধুরী ৬৮২
ব্যবহারিক পঞ্জিকা—শ্রীফণিভূষণ দত্ত ৬১৯
ভট্ট কুমারিলের পরিচয়—শ্রীপঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ৩৯৮
ভাগবতে রূপক—শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ ৩৭৭
ভারতের খনিজপণ্য—শ্রীকালীচরণ ঘোষ ৪৫৫
ভারতবর্ষের সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা—শ্রীসুশীলকুমার বসু ৩০
ভারতীয় সঙ্গীত—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ২১১
ভাষা বিজ্ঞান ও ইতিহাস—শ্রীনারায়ণ রায় ৭২৫
ভ্রম-সংশোধন—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ৪৮২
মজলিস (নাটিকা)—ভাস্কর ৬১০
মতির মালা (গল্প)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ১৫৯
মৎস্য-শীকার (সচিত্র)—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ ৪৭৭
মহাপ্রস্থান (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৫৫১
মহাসমরের পরে—শ্রীবিজনকুমার সেনগুপ্ত ১১৬
মানব দেহে ও মনে এ্যাণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডের প্রভাব (সচিত্র)—
শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত ৯৩
মায়ের অনুগ্রহ (গল্প)—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১
মিটমাট (নাটিকা)—শ্রীযামিনীমোহন কর ২৫৭, ৩৬০
মুক্তি (গল্প)—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ১০৩
মুরারির লীলা বর্ণনের ভঙ্গী—মঃ মঃ শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ ১৯৪
যৌবন (কবিতা)—শ্রীসুভদ্রা রায় ২৪১
যৌবন (কবিতা)—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮১
রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৬০১
রাঙা দিদি (গল্প)—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১১
রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক (সচিত্র)—ডঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা ১০৭
রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা (আলোচনা)—
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩০৫
রামপ্রকাশ—শ্রীজনরঞ্জন রায় ৫৩০
রেড ইণ্ডিয়ান-বন্ধু পাদ্রী লাস্ কাশাস—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত ২৩৮
লালন-প্রশস্তি (কবিতা)—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস ৪৪৬
শতবর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার বাঙালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিচয়—
ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ১৫৩
শনিবার (গল্প)—শ্রীগৌতম সেন ২১৯
শবরীর প্রতীক্ষা (কবিতা)—রজ শর্ম্মা ৪০৩
শরৎচন্দ্র (কবিতা)—শ্রীসুবোধ রায় ৭৮৩
শান্তিনিকেতন—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫৪৭
শান্তিনিকেতন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ২২৬
শিল্পী আর মহাশিল্পী (কথিকা)—এস্ ওয়াজেদ আলী ৫১৪
শেষ পৃষ্ঠা (কবিতা)—শ্রীদক্ষিণা বসু ৬৮৯
শ্রাবণ সন্ধ্যা (কবিতা)—কাদের নওয়াজ ৩৫৫
শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৫২৯
শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার—শ্রীনারদাচরণ ধর ৭৫৮
সঙ্গীত : কথা সুর ও স্বরলিপি—১৯১, ৩২৮, ৫২৩, ৬১৬, ৭৪৮
কথা : সাহানা দেবী, রাণী মৈত্র, জগৎ ঘটক, কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য
সুর ও স্বরলিপি : দিলীপকুমার রায়, দিলীপকুমার রায়, জগৎ ঘটক, কাজী নজরুল ইসলাম ও নিতাই ঘটক, শ্রীহরিপদ রায়
সনেট (কবিতা)—আশুতোষ সান্যাল ৩২৯
সমাপ্তির গান (কবিতা)—শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১২৪
সমুদ্রের প্রতি (কবিতা)—শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার ২০৯
সাবমেরিনের কথা (সচিত্র)—কাফী খাঁ ৫১৫
সাবিত্রী (কবিতা)—শ্রীমমতা ঘোষ ৭১৭
সাময়িকী (সচিত্র)— ১৩২, ২৮৪, ৪২০, ৫৫৬, ৬৯৪, ৮৩০
সাহিত্য-সংবাদ ১৫২, ৩০২, ৪৪০, ৫৭৬, ৭১২, ৮৪৮
সুন্দরী তুমি উষার আলোকসমা (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র দত্ত রায় ১৮৭
সৃষ্টি ও প্রলয়—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ১৮৮
সূর্য্যমুখী পাখী (কবিতা)—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ৭৯৮
সেই রূপ (কবিতা)—শ্রীসাহানা দেবী ৪৫৭
সোনার শরৎ (কবিতা)—কাদের নওয়াজ ৬০৯
স্তব্ধ অতীত, কথা কও (গল্প)—ইলা দেবী ৪৬৮
স্পর্শ (কবিতা)—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯৩
স্পর্শ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৬২৭
স্পেনিশ রেফুজি (সচিত্র)—শ্রীচিন্তামণি কর ৩৩৫
স্বপ্নশেষ (কবিতা)—শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮২০
স্মৃতির ব্যথা (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৬২৯
স্যার জিজিভাই ওয়াডিয়া (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৬৪০
হিন্দি ও বিলিতি সুরের মিশ্রণ—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৪৯
হিন্দু-মুসলমান (কবিতা)—শ্রীনীলতরুন দাস ৭২৩

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৪৭

া দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক চেরিটেব্‌ল্‌ ওয়ার্ড, কলিকাতা মেডিকাল কলেজ … ১০৭
া দেবেন্দ্র মল্লিক দাতব্য চিকিৎসালয়, কারমাইকেল মেডিকাল কলেজ … ১০৯
ার্সের যুদ্ধক্ষেত্র, মানচিত্র … ১১৯
ন্দাজগণের যুদ্ধ করবার ডবল এঞ্জিন-যুক্ত দ্বিমুখী সাঁজোয়া গাড়ী … ১২০
ন্স বৃটিশবাহিনী … ১২০
র : জার্মানীর হিটলার, রুমানিয়ার ক্যারল, শ্লোভাকিয়ার টিসো। মধ্যে : পোলাণ্ডের বেক, চেকোশ্লোভাকিয়ার হাচা। দক্ষিণে : রুশিয়ার ষ্টালিন, হাঙ্গারীর হর্থী, শ্লোভাকিয়ার সীডর ১২১
ওয়ের বর্ত্তমান অবস্থা … ১২১
রটি কামানবিশিষ্ট বৃটিশের বিমান পোত … ১২২
ন্স আনীত বৃটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের বোমানিক্ষেপকারী ব্রেনহিম বিমানপোত … ১২২
ান মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত একখানি দশ হাজার টন জাহাজ … ১২৩
ান সাবমেরিনের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত বৃটিশ রয়াল নেভির 'ডেপথ্‌ চার্জ' … ১২৩
ালীর বালিকাসৈন্য … ১২৫
্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গীর গিয়ার ১২৫
ানের যুবরাজ—বিদ্যালয়ে যাইবার পোষাকে … ১২৬
শক্তির সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল গ্যামলিন (বর্ত্তমানে লর্ড গর্ট) ও জেনারেল আয়রণ-সাইড … ১২৭
স্যামুয়েল হোর বিমানসৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন … ১২৭
ান আক্রমণের ভয়ে বেলজিয়াম হইতে পলায়নের দৃশ্য … ১২৭
ান আক্রমণের ভয়ে বেলজিয়াম হইতে পলায়নের দৃশ্য … ১২৮
পূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী মেরী … ১২৯
ডাচেস অফ উইণ্ডসর … ১২৯
সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ১৩০
শ্রীমান কনক সর্ব্বাধিকারী … ১৩২
বি-এন-চট্টোপাধ্যায় … ১৩৩
নবদ্বীপে পূর্ণিমা সম্মিলন ১৩৩
আর-এল-গুপ্ত … ১৩৪
রাখালদাস সিংহ … ১৩৪
কাটোয়ায় ইন্দ্রনাথ স্মৃতিসভা … ১৩৫
শিক্ষাবিভাগের সম্মিলন … ১৩৬
চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলন … ১৩৭
বাঙ্গালার গ্রাজুয়েট শিক্ষকবৃন্দ .. ১৩৮
রেশম শিল্প সম্পর্কিত সম্মিলন … ১৩৯
ডাক্তার সৈয়দ মামুদ ও আসফ আলি ১৪০
ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ … ১৪০
মাদাম চিয়াং কাইসেক ১৪১
সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল ১৪১
স্নিগ্ধা ঘোষ দস্তীদার … ১৪২
স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় … ১৪২
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় … ১৪২
ইতালীর সমুদ্র উপকূল রক্ষা ব্যবস্থা ১৪৩
জার্ম্মান ক্রুজার এমডেন ১৪৪
কাইভান কাপ ফাইনালে আগ্রা দল ১৪৫
পাঞ্জাব সাইকেল চ্যাম্পিয়ানশিপ বিজয়ী জানকী দাস … ১৪৬
অমর সিং … ১৪৬
পঞ্চাশ মাইল সাইকেল চালনায় বিজয়ী মণীন্দ্র সেন, জে-হক, কানাই দাস, রণজিত চ্যাটার্জ্জি … ১৪৭
ভারতীয় সৈন্যদল ভলিবল খেলায় যোগদান করেছে … ১৪৮
বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন ষ্টেডিয়ামে ইমাম বক্স ১৪৮
কিংসলে কেনারলে … ১৪৮
মার্চ্চেন্ট কাপ বিজয়ী লাভ লক ওলুইস দল ১৪৯
এস গুহ, নন্দ চৌধুরী কে দত্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ … ১৫০
নুরমহম্মদ (বড়), এস, মিত্র, পি, চৌধুরী, সিলস … ১৫১
রাখাল মজুমদার, রসিদ খাঁ, নুরমহম্মদ (ছোট), জে ঘোষ … ১৫২

বহুবর্ণ চিত্র

১। বুদ্ধের জন্ম
২। কুশীদজীবী
৩। রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিশেষ চিত্র

১। দিল্লীতে নিখিল-ভারত ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে অভিনন্দন দান। পণ্ডিতজী উত্তর দিতেছেন
২। বোম্বায়ে জাতীয়-উন্নতি-পরিকল্পনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন
৩। শ্যামবাজার খালের উপর নির্ম্মিত নূতন ব্যারাকপুর ব্রিজ
৪। লালদীঘি বা ডালহৌসী স্কোয়ার পুষ্করিণী : এখন ইহা বুজাইয়া ঐ স্থানে মোটর গাড়ী রাখার জায়গা করা হইবে
৫। রাধাবাজার ও পোলক ষ্ট্রীটের নূতন রাস্তা
৬। নূতন হাওড়া পুল—হাওড়ার দিকে এইভাবে নির্ম্মিত হইতেছে
৭। হল্যাণ্ডের একটি সুদৃশ্য দ্বীপ—ভলোডাম ওলন্দাজদিগের একটি কল—পূর্ব্বে ইহা জল পাম্প করার জন্য ব্যবহৃত হইত
৮। সুন্দর রটারডাম—বর্ত্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত
৯। বেলজিয়ামে জার্মানী কর্ত্তৃক ধ্বংসের দৃশ্য
১০। বেলজিয়ামে বৃটিশ সৈন্যদল : বৃটিশ সাঁজোয়া গাড়ী দেখিয়া বেলজিয়ামবাসীরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে
১১। জিব্রাল্টার বন্দরের দৃশ্য—বৃটিশ ও ইটালীয়ান রণতরীসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে

শ্রাবণ—১৩৪৭

জাপানের পারিবারিক জীবন ১৭৫
সহবৎ শিক্ষা—জাপান … ১৭৬
নাগোয়া দুর্গ—জাপান … ১৭৭
পাথরের দীপস্তম্ভ—জাপান … ১৭৭
টোকিও রাজপ্রাসাদের একাংশ … ১৭৮
মেয়েদের পুতুল-উৎসব—জাপান … ১৭৯

ভোজনরতা—জাপান ১৭৯
সেকাল ও একাল—জাপান ... ১৮০
দেশবন্ধু স্মৃতিদিবসে কেওড়াতলা শ্মশানে সমবেত দেশবাসীবৃন্দ ... ২৮৪
ইংলণ্ডে বালিকারা যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে ... ২৮৫
সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ভ্রাতা ডিউক অফ গ্লষ্টারের পত্নী যুদ্ধের কার্য্যের জন্য মহিলা সেবিকা সংগ্রহ করিতেছেন ২৮৬
প্যারিসে বোমা ফেলার পর ২৮৬
লণ্ডনে মোটর কারখানায় বালিকারা কাজ করিতেছে ... ২৮৭
বৃটেনের নূতন সমরসচিব এণ্টনী ইডেন ও স্যর জন ডিল ... ২৮৭
লাহোরের স্বর্ণ মসজিদ হইতে পুলিশ খাকসারদের গ্রেপ্তার করিতেছে ২৮৮
যুদ্ধের জন্য খাদ্যাভাব হেতু লণ্ডন টাওয়ারে সব্জীর চাষ করা হইয়াছে ... ২৮৮
মিশরে ভারতীয় সৈন্য ... ২৮৯
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য ... ২৮৯
ফ্রান্সের একটি গ্রাম . ২৯০
কারখানা হইতে মেসিনগান প্রেরিত হইতেছে ... ২৯০
কনক পুরকায়স্থ ... ২৯১
সুদক্ষিণা বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৯১
ডাঃ পি, সি, রক্ষিত ২৯২
এক বৎসরের খাকসার বালিকা ... ২৯৩
ফ্রান্সে ইংরেজ বালিকা ... ২৯৩
প্যারিসে বৃটেনের সমর-পরিষদের সভা ২৯৪
সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ... ২৯৫
কায়রোর রাজা ফারুক ... ২৯৬
মহারাজকুমার রবীন্দ্র রায় ... ২৯৭
দিল্লীতে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক ... ২৯৮
উত্তর আয়ার্লণ্ডে পার্লামেণ্টের উঠানে চাষ হইতেছে ... ২৯৮
ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান দলের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ ... ২৯৯
ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান দলের অধিনায়কদ্বয় করমর্দ্দন করছেন ... ৩০০
আর লামসডেন ... ৩০০
এস গুঁই ... ৩০০
কে দত্ত ... ৩০০
পি চক্রবর্ত্তী ... ৩০১
নূরমহম্মদ (ছোট) ... ৩০১
লসন ... ৩০১
রশিদ খাঁ. ... ৩০১
রশিদ ... ৩০১
আর ভট্টাচার্য্য ... ৩০২
এ রায়চৌধুরী ... ৩০২
কে সি সেন ... ৩০৩
আর সি খাঁ, সর্দ্দার জয়পাল সিং, এস সি গিল, বি আউন ৩০৪

বিশেষ চিত্র

১। নবাব সিরাজদ্দৌলা
২। সোনার বাঙ্গালা
৩। ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটীর পথে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল ও সর্দ্দার পেটেল
৪। ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ
৫। নূতন কোষ্টাল ডিফেন্স সৈন্যদলভুক্ত বাঙ্গালী যোদ্ধার দল
৬। বাঙ্গালী সৈন্যগণ ও তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবৃন্দ
৭। বোম্বায়ে মহিলাগণের বন্দুক পরিচালন শিক্ষা
৮। রাজকীয় বিমান বাহিনী পরিদর্শনে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ
৯। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের পত্নী এম্বুলেন্স পরিদর্শন করিতেছেন
১০। সম্রাটের ভ্রাতা ডিউক-অফ-কেণ্ট উড়ো-জাহাজের আড্ডা দেখিতেছেন

বহুবর্ণ চিত্র

১। যাত্রী
২। বেউথা নদী
৩। শেষ নিশ্বাস

ভাদ্র—১৩৪৭

সর্ব্বহারা স্প্যানিস শিশুরা ... ৩৩৫
ওবোন্-এর সর্ব্বহারা স্প্যানিস শিশুরা ৩৩৫
ভায়লেট ফুলের সাজি হাতে গানে রতা স্প্যানিস বালিকা ... ৩৩৬
দলনৃত্যের লীলায়িত লাস্য—স্পেন ... ৩৩৭
কাণ্ডানিযেতের সুরসঙ্গত—স্পেন ... ৩৩৭
জিপ্সী পোষাক প'রে মনোহর নৃত্য—স্পেন ৩৩৮
গ্রামের চাষী—স্পেন ... ৩৩৯
দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙলা দরখাস্তের প্রতিলিপি ৩৫৭
বার্লিনের নদী ... ৩৮৭
ফুটবলের টিকিট—বার্লিন ... ৩৮৭
হকির টিকিট—বার্লিন ... ৩৮৮
এথ্লেটিকের টিকিট—বার্লিন ... ৩৮৯
অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামের একটি দৃশ্য—বার্লিন ৩৮৯
অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম—বার্লিন ... ৩৯০
বিজিতদের সম্মানের জন্য জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে—বার্লিন ৩৯১
হকি ফাইনাল—জার্ম্মাণীর গোলের কাছে—ভারতবর্ষ ৮-১ গোলে জিতেছে ৩৯১
লেবার ক্যাম্পে খাল কাটা হচ্ছে ... ৩৯২
সেক্রেটারী ষ্ট্যালিন ও চেয়ারম্যান মলোটফ ৪০৯
শত্রুপক্ষের যে সব অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়েছে ৪০৯
দূরবীক্ষণযুক্ত রাশিয়ান রাইফেল ... ৪০৯
যুদ্ধক্ষেত্রে ভারী কামান গোলা ইত্যাদি বয়ে নেবার জন্যে তৈরী জার্ম্মাণীর ডায়মলের এঞ্জিন ... ৪০৯
যুদ্ধক্ষেত্রে মালবাহী ট্রাকসমূহ . ৪১০
বৃটিশ নাবিক সৈন্য ... ৪১০
জার্ম্মাণীর একটি অব্যবহার্য্য ট্যাঙ্ক ৪১০
বোমাবিশারদ মিঃ বুগিন একটি ছোট বোমা পরীক্ষা করছেন ... ৪১০
ফরাসী রাজদূত আন্দ্রে কার্বিন ... ৪১১
প্যারাস্যুটবাহিনী ৪১১
জিব্রালটারের নিকটবর্ত্তী বৃটিশ নৌবাহিনী ... ৪১১
এক দল ভারতীয় সৈনিক ... ৪১২
যুদ্ধবিরতির পর ফরাসী সৈনিকেরা মদ্যপান করছে ... ৪১২
কর্পোরাল আলেকজাণ্ডার বিকারষ্টাফ্ ৪১২
বৃটিশ সাবমেরিন ... ৪১৩
প্রেক্ষাগার ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রনের কেন্দ্র ... ৪১৩
বৃটিশ সেনাবিভাগের কোন সৈনিক-শিল্পী পরিকল্পিত 'হিটোমিস্লার' কামানের চিত্র ... ৪১৪

ত্তর-পশ্চিম ডইরোপের মানচিত্র ৪১৫
্যারিসে বেলজিয়ামের মন্ত্রীবর্গ .. ৪২৩
শরের মরুভূমির মধ্য দিয়া ভারতীয় সৈন্যগণের গমনের দৃশ্য ... ৪২৩
দ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করবার জন্যে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডবাসীরা বিলাতে আসিয়াছে—গাছ কাটিতেছে ... ৪২৪
লা দেবী ... ৪২৫
ারদাচরণ উকিল ... ৪২৫
ানকুণ্ডুর উন্মাদ আশ্রম ... ৪২৫
দ্রকালী সাহিত্য সমিতিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী ... ৪২৭
রলোকগত কাউন্সিলর নটবর দত্ত . ৪২৭
দ্ধ নিরত বৃটীশ সৈন্যগণকে নদীতে পুল নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে ৪২৯
ীপার্ব্বতীশঙ্কর সেন ... ৪৩১
াজিয়ায় কৃষক সম্মিলন ... ৪৩১
কা মেল দুর্ঘটনা ... ৪৩২
" " " ... ৪৩২
াই এফ এ শীল্ড ... ৪৩৩
রায় চৌধুরী ... ৪৩৩
র্ম্মল ঘোষ ... ৪৩৩
ার ভট্টাচার্য্য ... ৪৩৪
স গুঁই ... ৪৩৪
হাঁরাণা ক্লাব ... ৪৩৪
ল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন ... ৪৩৫
রঞ্জার্স ... ৪৩৬
ংলার মুস্‌লিম দল ... ৪৩৭
ুলিশ দল ... ৪৩৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। বন্যা
২। কংশ-কারাগার
৩। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বিশেষ চিত্র

১। দিল্লীতে মৌলানা আবুলকালাম াজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু
২। সিমলায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে।
৩। জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কানোই
৪। বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বাট হাওড়ার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্পেশাল কনেষ্টবল পরিদর্শন করিতেছে
৫। পুনা কংগ্রেস হাউস
৬। করাচীতে কেনিয়াযাত্রী ভারতীয় সৈন্যদল
৭। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে নূতন টেলিফোন লাইন সংযোগ উপলক্ষে সমবেত জনবৃন্দ
৮। ভিজাগাপত্তন বন্দর—এখানে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা খোলা হইতেছে
৯। বৃটিশ সম্রাটগণের বাসগৃহ সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে এখন যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য জিনিষপত্র রাখা হইয়াছে

আশ্বিন—১৩৪৭

অর্দ্ধনারীশ্বর (বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি) ৪৬৫
অর্দ্ধনারীশ্বর ... ৪৬৫
অর্দ্ধনারীশ্বর ... ৪৬৬
পুরীর নুলিয়ারা কাটামারান নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে ... ৪৭৭
কয়েকটা ফাঁদ ... ৪৭৭
কয়েকটা ফাঁদ ... ৪৭৮
জোয়ারে মাছধরা—কাঁথি .. ৪৭৮
পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মাছধরা ... ৪৭৯
মাছ ধরবার দরজাযুক্ত ফাঁদ ... ৪৭৯
বেতের ফাঁদ ... ৪৭৯
বেতের চাঁচীর সাহায্যে মাছ ধরা ... ৪৮০
বাঁশের কেঁচা দ্বারা মাছ ধরা ৪৮০
থাইরয়েডের প্রভাব বেশী হলে অনেক সময় গয়েটার রোগ দেখা যায় ... ৪৯৪
পিটুইটারীর প্রভাব ... ৪৯৪
" " ... ৪৯৫
এ্যাড্রিন্যাল এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড-এর বহিরাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীদেহের পরিবর্ত্তন ... ৪৯৭
ঐ হাতের অবস্থা ... ৪৯৭
সাবমেরিন সম্পর্কীয় বিভিন্ন নক্সা ১৭ খানা ... ৫১৭-২২
পট্‌স্‌ডামের উইণ্ড মিল ... ৫৩৯
ভারতীয় ও মেক্সিকোবাসিনী মেয়ের দল ৫৩৯
লেবার ক্যাম্পে ছেলেরা খাল কাটছে ৫৪০
সুইমিং পুল ... ৫৪০
" " অপর দৃশ্য ... ৫৪১
" " অন্য একটি দৃশ্য ... ৫৪১
" " আর একটা দিক ... ৫৪১
একজন ঝাঁপ দিচ্ছে ... ৫৪১
ঝাঁপ দেবার পর ... ৫৪২
সুইমিং পুলের যে ধারে রেস হয় ... ৫৪২
বার্লিন রাজপ্রাসাদের দৃশ্য ... ৫৪৩
জার্ম্মাণীর পল্লীবাসী সাধারণ লোক .. ৫৪৩
সুইমিং ষ্টেডিয়াম—ডাইভিং বোর্ড . ৫৪৩
লেবার ক্যাম্পে ছেলেরা খাল কাটছে—আর একটি দৃশ্য ... ৫৪৩
এরোপ্লেনে ওঠবার আগে সকলে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছে ... ৫৪৪
এরোপ্লেন .. ৫৪৪
বারাকপুর সাহিত্য সংসদের সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ ... ৫৬১
ইংলণ্ডের গ্রামের অবস্থা ... ৫৬১
দেশবন্ধু পার্কে বাঙ্গালার গভর্ণর ... ৫৬২
সিমুলতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমন্দির ৫৬৩
গোবরডাঙ্গায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ ... ৫৬৩
তারাপ্রসন্ন ঘোষ ... ৫৬৪
আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স ক্লাব ৫৭০
বেঙ্গল আর্টিলারী ... ৫৭১
আই এফ এ শীল্ড ও লীগের রানার্স আপ মোহনবাগান ক্লাব ... ৫৭১
ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব .. ৫৭৩
কাষ্টমস ক্লাব ... ৫৭৪
সন্তরণে গঙ্গা অতিক্রম প্রতিযোগিতায় ৫৭৯

বহুবর্ণ চিত্র

১। প্রতীক্ষা
২। হংসদূত
৩। গঙ্গাবতরণ

বিশেষ চিত্র

১। মাদ্রাজে নিখিল-ভারত মেয়র সম্মিলন

২। বাঙ্গালার গভর্নর কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ 'শেঠ সুরজমল ব্লকের' উদ্বোধন করিতেছেন

৩। বোম্বায়ে আজাদ ময়দানে জনসভায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

৪। মাদ্রাজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্তৃক নির্ম্মিত ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজের মূর্ত্তি

৫। ইংলণ্ডের গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা

৬। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ ক্যানাডার সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন

৭। রাজকীয় বিমান সৈন্যদলের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে এইরূপ 'লাইফ-বোট' দেওয়া হইয়াছে

৮। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের রণসজ্জা—হংকং-সাংহাই লাইনের পাহারায় জাপানী সৈন্য

৯। ইংলণ্ডে ভারতীয় সৈন্যদল

১০। মিশরে ভারতীয় পুলিসদল

কার্ত্তিক—১৩৪৭

থাম ... ৬০৪
অপ্সরা ... ৬০৫
স্কন্দ ... ৬০৫
নর্ত্তকী ... ৬০৫
কার্ণিস ... ৬০৬
মকর ... ৬০৬
তুরাণ যাদুঘরের অভ্যন্তর ... ৬০৭
শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দির : পাণ্ডুরঙ্গ ... ৬০৮
লিমু প্যাগোডা—লুলে .. ৬০৮
সম্রাট খাইজীনের সমাধি-মন্দির ... ৬০৮
যোগীশ্বর পরমহংস মাধবদাসজী ... ৬২৫
নর্ম্মদাতীরস্থ মালসার আশ্রমের দৃশ্য ৬২৬
যোগীশ্বর—সমাধি লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে ৬২৭
শ্রীঅরবিন্দ ... ৬৫১
ইতালি-হাঙ্গারীয় স্বার্থ-সম্মিলন, কাউণ্ট সিয়ানো ও কাউণ্ট তেলেকি, কাউণ্ট স্যাকী ও সিনর মুসোলিনী ... ৬৫২
দানিউবের তটবর্ত্তী হাঙ্গারীর রাজধানী বুদাপেস্ত ... ৬৫৩
বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার সেণ্ট আলেকজাণ্ডার নেভস্কি গীর্জার দৃশ্য ৬৫৩
যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের একাংশ ... ৬৫৩
রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট ... ৬৫৩
বেসারেবিয়া অঞ্চল পরিদর্শনে রুমানিয়ার রাজা কেরল ও পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী তাতারেস্কু ... ৬৫৪
জার্মানী ও ইতালির মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরের পর কাউণ্ট সিয়ানো ও হের ফন রিবেনট্রপ করমর্দন করিতেছেন ... ৬৫৪
বলকান-নৈতিক আলোচনায় আহূত রাজপুরুষগণ ... ৬৫৫
ইতালির নূতন রাজদূত সিনর বাস্তিয়ানির পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ ... ৬৫৫
সিনর ভার্জিনিয়ো গায়দা ও সিনর এট্টোর মুটি ... ৬৫৬
সাহারার উপান্তে সৈন্য সমাবেশ ... ৬৫৬
মিশরের রাজা ফারুক, রাণী ফরিদা ও তাঁহার ক্রোড়ে রাজকুমারী ফেরিয়াল ... ৬৫৬
লিবিয়ায় ইতালীয় সৈন্যবাহী লরিসমূহ ৬৫৭
ভূমধ্যসাগরে ইতালীর অর্ণববহর ... ৬৫৭
বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একখানি ইতালীয় জাহাজ ... ৬৫৮
প্রথম চিত্র ... ৬৭১
দ্বিতীয় চিত্র ... ৬৭১
তৃতীয় চিত্র ৬৭২
প্রথম বাঙালী নার্সের দল—এ-আর-পি ট্রেনিং নিয়েছেন .. ৬৯৭
বোম্বায়ের হংসরাজ প্রাগজি ঠাকুরসে হল ৬৯৮
কলিকাতা বড়বাজার পর্দ্দাবিরোধী সম্মিলন সম্পর্কে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী ৬৯৯
ডাঃ সুনীল মুখোপাধ্যায় ৭০০
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ বিরলাপ্রাসাদ হইতে বাহির হইতেছেন ... ৭০১
পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব ... ৭০২
যাদুকর গসেন ... ৭০৩
হৃষীকেশ সুর ৭০৩
বিপিন গাঙ্গুলী ... ৭০৪
কৃষ্ণদাস চন্দ্র ... ৭০৪
প্রেসিডেন্সি কলেজ রেগেটা টীম ... ৭০৫
ইণ্টার কলেজ লীগবিজয়ী আশুতোষ কলেজ টীম ... ৭০৫
বাঙ্গালোর মুসলীম লীগ ... ৭০৬
রসিদ ... ৭০৬
মহিলাদের ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল লীগে বিদ্যাসাগর কলেজ দল ... ৭০৭
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অফিস টীম—বেঙ্গল কেমিক্যাল ৭০৮
মহিলাদের ইণ্টার কলেজ বাস্কেটবল লীগে পোষ্ট গ্রাজুয়েট দল ... ৭০৯
পার্ক লীগবিজয়ী শ্যামবাজার ক্লাব ... ৭০৯
মহিলাদের ইণ্টার কলেজ বাস্কেট লীগে ভিক্টোরিয়া ইন্‌স ... ৭১০
হেলেন জেকব ... ৭১১
এলিন মার্ব্বেল ... ৭১১
রীগস্ ... ৭১১
ডন্ ম্যাকনীল ... ৭১১

বিশেষ চিত্র

১। বাকিংহাম প্রাসাদ ও তাহার সম্মুখে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ

২। সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন

৩। ক্যানাডিয়ান ডেষ্ট্রয়ার বৃটীশ নৌসেনায় যোগদান করিতেছে

৪। একখানি নাজি উড়োজাহাজের শেষ দশা—ইংলণ্ড আক্রমণে আসিয়া নিজে ধ্বংস হইয়াছে

৫। আক্রমণের জন্য সজ্জিত বৃটীশ কামান—লণ্ডন শহরের বাহিরে রক্ষিত

৬। উড়োজাহাজ বিধ্বংসী সার্চ্চলাইট——লণ্ডনে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে

৭। নেপল্‌সের নিকট ইটালীর ম্যাডালোনা বন্দরে বোমা ফেলার দৃশ্য

৮। ভূমধ্যসাগরে পাহারায় রত বৃটীশ ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারসমূহ

৯। প্যালেষ্টাইন রক্ষায় নিযুক্ত বৃটীশ ও ইহুদী অধিবাসীদের সমর-সজ্জা

১০। জিব্রাল্‌টার রক্ষায় নিযুক্ত বৃটীশ কামান ও রণতরী—পশ্চিমের প্রবেশ-পথের দৃশ্য

১১। উড়োজাহাজ ধ্বংসের জন্য রক্ষিত সার্চ্চলাইট

১২। বালীপূর্ণ থলিয়াবেষ্টিত স্থানে উড়োজাহাজ নষ্ট করিবার জন্য রক্ষিত কামান
১৩। কাচের মধ্য দিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হইতেছে
১৪। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি-সুলতানপুর-বহরমপুর রোডে দ্বারকা নদের উপর নূতন পুল—মহারাজা মণীন্দ্র ব্রিজের উদ্বোধন।

বহুবর্ণ-চিত্র

১। আকাশ প্রদীপ
২। দোলনচাঁপা
৩। ঋণ সালিসি বোর্ড

অগ্রহায়ণ—১৩৪৭

জামনগর—সূর্য্যকিরণ দ্বারা চিকিৎসা-গৃহ ৭৩৫
রণছোড়জীর মন্দির .. ৭৩৬
দ্বারকা শহরের দৃশ্য ... ৭৩৭
নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ... ৭৮৫
সিমতলায় প্রধান ষ্টুডিও ... ৭৮৬
ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ ... ৭৮৬
উদয়শঙ্কর, গুরুশঙ্করণ নাম্বুদ্রি প্রভৃতি ৭৮৭
রামেশ্বর মন্দিরের বিরাট চত্বর (১) ৮০৫
মাদুরা মীনাক্ষী দেবী গোপুরম ... ৮০৬
মাদুরা ... ৮০৬
শ্রীরঙ্গমের গোপুরম্ .. ৮০৭
মাদুরা টেপাকুলম ... ৮০৭
মাদুরা মীনাক্ষীদেবীর গোপুরম (২) ৮০৮
রামেশ্বর গোপুরম ... ৮০৮
রেঙ্গুনে বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসব ৮৩৩
রাওয়াল পিণ্ডির প্রতিমা ... ৮৩৩
আনার কালির প্রতিমা ... ৮৩৪
ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস নেতা সর্দ্দার প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, শেঠ বাজাজ ও কৃপালাণী ... ৮৩৪
ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায ... ৮৩৪
কোয়েটায় দুর্গোৎসব ... ৮৩৫
লাহোর ছাউনীর প্রতিমা ... ৮৩৫
শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৩৫
কুমারী মিনা সরকার ... ৮৩৬
প্রশান্তকুমার চৌধুরী ... ৮৩৬
চন্দ্রকুমার দত্ত ... ৮৩৭
আহিরীটোলার সার্ব্বজনীন লক্ষ্মীপূজা ৮৩৭
প্রিয়নাথ সরকার ... ৮৩৮
প্রেসিডেণ্ট, ডক্টর বেনেস ... ৮৩৮
রবীন্দ্রনাথ সেন ... ৮৩৯
শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৮৩৯
সাধনকুমার সেনগুপ্ত ... ৮৩৯
ফিলিপ নিম ... ৮৪০
আলামোহন ৮৪১
নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ... ৮৪১
বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ... ৮৪২
নওমল ... ৮৪৩
গোপাল দাস ... ৮৪৩
এস চ্যাটার্জি সত্যরঞ্জন ঘোষ কৃষ্ণ চৌধুরী ৮৪৩
এ মুখার্জি ... ৮৪৪
সলিমুল্লা ৮৪৪
সিল্ড বিজয়ী বঙ্গবাসী কলেজ ... ৮৪৫
কুমারী তারকবালা সাহা ... ৮৪৬
গ্রীয়ার ক্লাব ... ৮৪৬
ভবানীপুর ক্লাব ... ৮৪৭

বিশেষ চিত্র

১। সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমা
২। আহিরীটোলা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা
৩। মিশরের মরুভূমিতে পাহারার ব্যবস্থা
৪। বোম্বায়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রমিক নেতৃবৃন্দ
৫। ঠনঠনিয়া (কলিকাতা) সার্ব্বজনীন কালী প্রতিমা
৬। কলিকাতা কৈলাস বসু ষ্ট্রীট চারের পল্লী সার্ব্বজনীন পূজার কালী প্রতিমা
৭। পরলোকে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন
৮। সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী লণ্ডনে ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করিতেছেন
৯। বোম্বায়ে ঝড়ের পরের অবস্থা

বহুবর্ণ চিত্র

১। প্রিন্সিপাল জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য
২। কংগ্রেস ভবনে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য
৩। দেশের মাটী

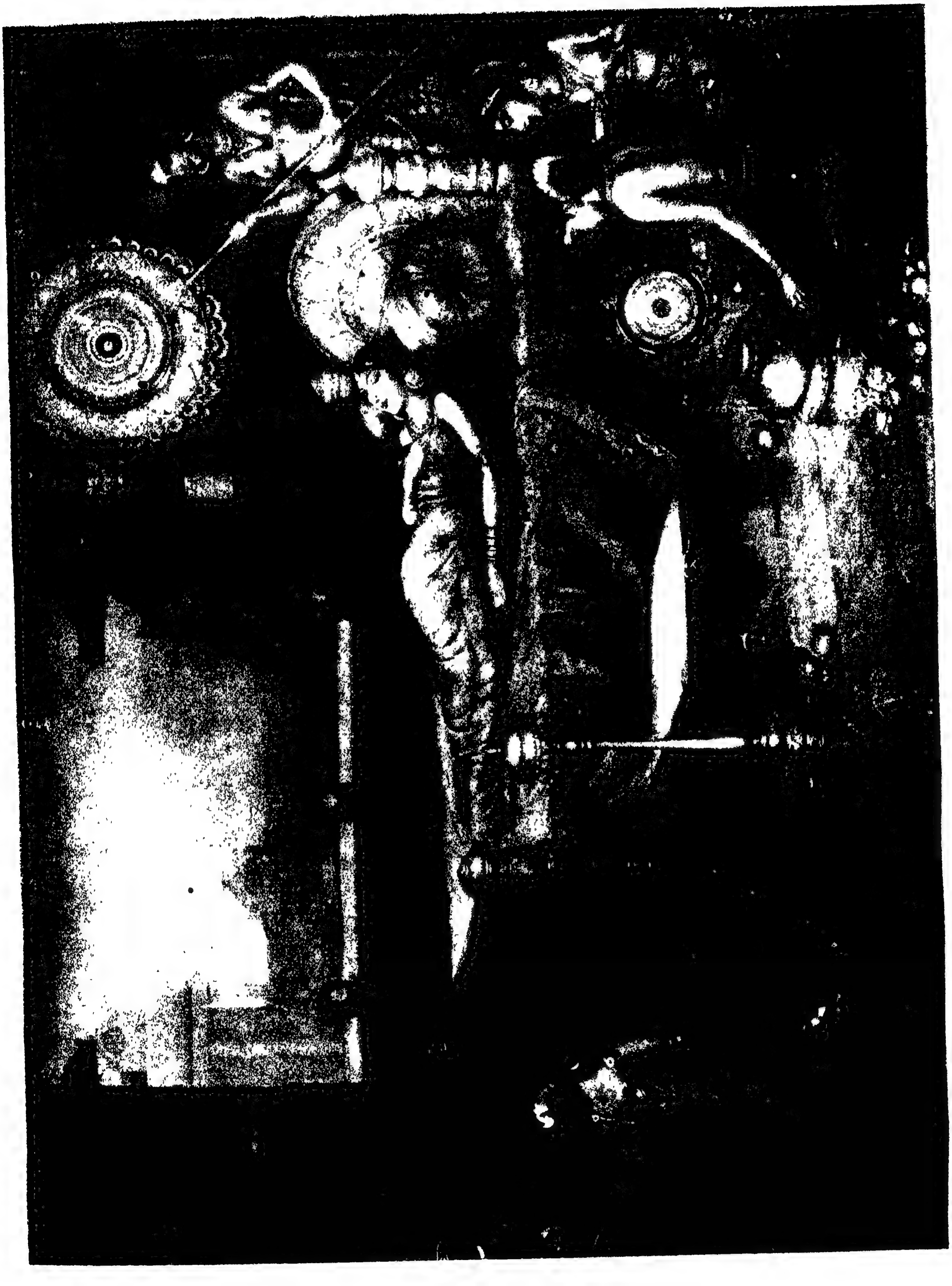

আষাঢ়—১৩৪৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ. | প্রথম সংখ্যা

বৈষ্ণব সাহিত্যে রস

শ্রীমণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, কাব্য-বেদ-পুরাণতীর্থ

বৈষ্ণবগণের কথা মনে করিলেই আপনা হইতে ভগবদ্ভক্তির কথা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। এই ভগবদ্ভক্তির কথা বাদ দিলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করা সম্ভবপর হয় না। বৈষ্ণবগণ পুরুষানুক্রমে কৃষ্ণভক্তির কথাই আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। তাই বৈষ্ণবগণ নিজকণ্ঠে হরিনাম করেন এবং গৃহপালিত পক্ষীটিকেও কৃষ্ণনাম বলিতে শিক্ষা দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি নাই তাঁহারা বৈষ্ণবগণের নিন্দার পাত্র। বৈষ্ণবগণ বলেন —সঙ্কীর্ত্তনকালে তাঁহাদের মৃদঙ্গ-ধ্বনি কেবল যে কৃষ্ণভক্তির উদ্রেক করে তাহা নহে, তাহা স্পষ্টই বলে যে যাহাদের কৃষ্ণভক্তি নাই তাহাদের জীবনে ধিক্।

যেষাং শ্রীমদ্ যশোদা-সুত-পদকমলে নাস্তি ভক্তির্নরাণাম্
যেষামাভীর-কন্যা-প্রিয়গুণ-কথনে নানুরক্তা রসজ্ঞাঃ।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিত-গুণকথা সাদরৌ নৈব কর্ণৌ
ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ কথয়তি নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ॥

এই কৃষ্ণভক্তিকেই আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবগণ বলেন— কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বরসের মূলাধার। সকল স্রোতস্বতীই যেমন মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ সকল রসই কৃষ্ণভক্তিরসে পরিণতি লাভ করিয়া সার্থক হইয়া ওঠে। কোন না কোন প্রকারে যে রস কৃষ্ণভক্তির সহায়তা না করে তাহাকে বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ রস আখ্যা দেন নাই। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন—

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্॥

অর্থাৎ মানবহৃদয়ের অনুরাগাদি স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাব দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়।

আলঙ্কারিক পণ্ডিত বিশ্বনাথ এখানে এই যে রতি বা অনুরাগের কথা বলিলেন তাহা নায়ক-নায়িকার মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল। প্রধানতঃ মানবীয় প্রেমের কথাই এখানে বলা হইল। এই প্রণয়কে অবলম্বন করিয়াই সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-নাটকাদি রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবি এবং আলঙ্কারিকগণ এই রীতি সমর্থন করিলেন না। বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া একান্তভাবে শ্রীভগবানের প্রতি যে রতি বা অনুরাগ প্রকাশ করা হয় তাহাই হইল বৈষ্ণবগণের লক্ষ্য। মানবের প্রতি মানবের ঐকান্তিক অনুরাগের প্রতি তাঁহারা দৃক্‌পাতও করিলেন না। ব্রহ্মস্বাদই তাঁহাদের লক্ষ্য হইল। নানাভাবে নানাদিক দিয়া ব্রহ্মকেই তাঁহারা উপভোগ করিতে চাহিলেন। এই ব্রহ্মস্বাদই তাঁহাদের মতে রস। তাঁহারা বলিলেন

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতিরূপ স্থায়ীভাব শ্রবণাদি কর্তৃক বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব এবং ব্যভিচারী ভাব দ্বারা ভক্তহৃদয়ে স্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরস হয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন-

প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ীভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব।
সাত্ত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে;
কৃষ্ণভক্তি রস হয় অমৃত আস্বাদনে।
--মধ্যলীলা

এই কৃষ্ণভক্তিরূপ রস 'স্নেহ' হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর কয়েকটি অবস্থায় উপনীত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং 'মহাভাবে' পরিণতি লাভ করে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামী তাঁহার 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রেম অধিকতর গাঢ় হইয়া যখন হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে তখনই তাহা 'স্নেহ' নাম ধারণ করে। আবার 'স্নেহ' গাঢ় হইয়া নব মাধুর্য্য অনুভূত করাইয়া বাহ্যতঃ যখন দাক্ষিণ্যের অভাব প্রকাশ করে তখন তাহা 'মান' নামে অভিহিত হয়। 'মান' যখন গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া বিস্রম্ভে (প্রিয়জনের সহিত অভেদ জ্ঞান) পরিণতি লাভ করে তখনই তাহা হয় 'প্রণয়'। 'প্রণয়' ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিয়া যখন এমন অবস্থা আনয়ন করে যে, কৃষ্ণসঙ্গলাভ-হেতু অত্যন্ত দুঃখও পরম সুখ বলিয়া প্রতিভাত হয় তখন তাহার নাম 'রাগ'। 'রাগ' আবার গাঢ়তর হইয়া যখন প্রিয়তম সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও তাঁহাকে নিত্যই নব নব রূপে প্রকটিত করে তখন 'অনুরাগ' সংজ্ঞা লাভ করে। 'অনুরাগ' যখন 'রাগে'র পরিমিত সীমার মধ্যে থাকিয়াও মহাভাবোন্মুখ হইয়া প্রকটিত হয় তখন তাহার নাম হয় 'ভাব'। 'মহাভাবে'ই প্রেমের চরম উৎকর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাভাবের পর প্রেমের আর স্তর নাই। একমাত্র শ্রীরাধাই এই মহাভাবের অধিকারিণী। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদিগের মধ্যেও এই ভাব দৃষ্ট হয় না।

'স্নেহ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মহাভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের এই পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিয়া দেখিলাম। ইহারা সকলেই স্থায়ীভাব। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী ভাবের সহিত মিলিত হইয়া ইহারা রসত্ব প্রাপ্ত হয়। এই যে রতি বা অনুরাগ ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় এবং প্রেমাস্পদ একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অতএব বৈষ্ণব কবি বা আলঙ্কারিক পণ্ডিতের মতে ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তিই রস। মানব-প্রেমের সহিত ইহাঁর সম্বন্ধ মাত্র নাই।

এই কৃষ্ণভক্তি রসকে বৈষ্ণবগণ প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। এই পাঁচটি বিভিন্নভাবে বৈষ্ণবগণ ভগবানকে উপভোগ করিতে চাহিলেন। এই পাঁচটি মুখ্য রস—ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। এই পাঁচটি মুখ্য রসের অন্তর্ভূত আবার সপ্ত গৌণ রস আছে। যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয়ানক।

চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন—

ভক্তিভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর।

বাৎসল্যরতি, মধুররতি এ পঞ্চ বিভেদ,
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চভেদ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস নাম ;
কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।
হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়।
পঞ্চ রস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে ;
সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে॥

—মধ্যলীলা

এখন আমরা দেখিলাম যে শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পঞ্চ মুখ্যরস স্থায়ীভাবে ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করে এবং অবশিষ্ট সপ্ত গৌণ রস কারণবিশেষে ভক্তের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণরতিকে আবার বৈষ্ণবগণ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিলেন। একটি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা, অপরটি কেবলা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিলেন—

পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত প্রকার ;
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা, কেবলা, ভেদ আর।
গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ;
পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্য প্রবীণ।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি ;
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি।

—মধ্যলীলা

ঐশ্বর্য্য বলিতে এখানে ঈশ্বরত্ব-বোধক প্রভাবকে বুঝাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সুতরাং তিনি বিবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম ; যখন এইরূপ জ্ঞান থাকে তখন ঐ কৃষ্ণরতিকে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-মিশ্রা রতি বলা হয়। কিন্তু এইরূপ কৃষ্ণরতি চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিলে চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কেবলা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যা, সুতরাং ভগবানের সহিত নিতান্ত অন্তরঙ্গভাবে সংমিশ্রণেও ইহাতে লেশমাত্রও সঙ্কোচ হয় না।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ যেভাবে রসের প্রকারভেদ করিয়াছেন আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। উপস্থিত এক একটি রসকে পৃথকভাবে লইয়া তাহার বৈশিষ্ট্যটুকু মাত্র দেখিতে চেষ্টা করিব।

শান্তরস

আলঙ্কারিক পণ্ডিত লিখিয়াছেন,

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাব শম ইত্যসৌ।
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতা গন্ধবর্জ্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তী রতিমতা॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

অর্থাৎ মন যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজানন্দে অবস্থান করে সেই ভাবের নাম শম। প্রায়ই শমপ্রধানদিগের মমতাগন্ধবর্জ্জিত এবং পরমাত্মবুদ্ধিজনিত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক রতি শান্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।

চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)

শান্ত ভক্তিরসে পরব্রহ্মাদিরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, মুক্তিপ্রয়াসী মুনিগণ আশ্রয়ালম্বন। মহোপনিষদ শ্রবণ এবং নির্জ্জন স্থান সেবন প্রভৃতি উদ্দীপন। শান্তরসের উদাহরণ স্বরূপ নরোত্তমদাসের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত হইল।

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া   ছিঁড়া কাঁথা গায় দিয়া
তেয়াগিব সকল বিষয়।
হরি-অনুরাগ হবে   ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজালয়॥
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে   খাঞা দিবা-অবসানে
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা জলে   স্নান করি কুতূহলে
প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া॥
বাহুর উপর বাহু তুলি   বৃন্দাবনের কুলি কুলি
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান   জুড়াবে তাপিত প্রাণ
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী   কাঁহা গিরিবরধারী
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥

মাধবী-কুঞ্জের পরি সুখে বসি শুক শারী
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস।
তরুমূলে বসি ইহা শুনি জুড়াইবে হিয়া
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস করয়ে দুর্লভ আশ
এমতি হইবে কতদিনে॥

দাস্যরস

রসামৃতসিন্ধুকার এই দাস্যরতিকে 'প্রীতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

স্বস্মাদ্ ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা॥
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

অর্থাৎ যাঁহারা আপনাদিগকে স্বতঃই হরি হইতে ন্যূন বলিয়া মনে করেন তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য। 'কৃষ্ণ আমাদের আরাধ্য' তাঁহাদের এই প্রকার জ্ঞানরূপ রতির নাম প্রীতি। কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি এবং অন্য বিষয়ে প্রীতির অভাবই তাহার কার্য্য। দাস্যভক্তিরসে সর্ব্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, শ্রীহরির দাসবিশেষাদি আশ্রয়ালম্বন, ভগবানের চরণধূলি, তাঁহার ভুক্তাবশিষ্টপ্রাপ্তি এবং তাঁহার ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রভুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক সেবন।
অতএব দাস্য রসে হয় দুই গুণ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)

অতএব দেখা যায় যে, শান্তরসের গুণ সমস্তই দাস্যরসে আছে, উপরন্তু সেবা এই গুণটিই দাস্যরসে অধিক। উদাহরণ-স্বরূপ নরোত্তম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত হইল।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ
গোপী-কুল-প্রিয়-দেহ হরে॥
তুয়া প্রিয় পদ-সেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম-মঙ্গল-যশ শ্রবণ-পরশ-রস
কার কিবা কাজ নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার-গতি বিষম বিষয়-মতি
তুয়া বিসরণ-শেল বুকে।
জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জিয়ন্তে মরণ ভেল দুখে॥
মো বড় অধম জনে কর কৃপা-নিরক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম পহু মোরে গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে॥

সখ্যরস

ইহাকে প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলা হয়। শ্রীমৎ রূপগোস্বামী বলেন—

স্থায়ীভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্য্যতে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

অর্থাৎ স্থায়ীভাব সখ্যরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে। সখ্য ভক্তিরসে সর্ব্বগুণাধার শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যবর্গ আশ্রয়ালম্বন; শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিক্রম প্রভৃতি উদ্দীপন এবং কেলি পরিহাসাদি অনুভাব।

সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।

* *

শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্যে দুই হয়;
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসময়।
কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ;
কৃষ্ণে সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রম-হীন,
অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন।

মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞানে ;
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান।

- চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)

সখ্যরসের এইগুলিই প্রধান লক্ষণ। উদাহরণস্বরূপ ঘনরামের একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম। কবি এখানে দ্রষ্টা মাত্র, কিন্তু দ্রষ্টা হইয়াও তিনি ক্রীড়ারত শ্রীদাম বলাই প্রভৃতির মতই সখ্যভাবে আপ্লুত হইয়াছেন।

আজি খেলায় হারিলা কানাই।
সুবলে করিয়া কান্ধে   বসন আঁটিয়া বান্ধে
বংশীবটের তলে যাই॥
শ্রীদাম বলাই লৈয়া   চলিতে না পারে ধাইয়া
শ্রমজলধারা পড়ে অঙ্গে।
এখন খেলিব যবে   হইব বলাইর দিগে
আর না খেলিব কানাইর সঙ্গে॥
কানাই না জিতে কভু   জিতিলে হারয়ে তবু
হারিলে জিতয়ে বলরাম।
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে   চড়িব কানাইর কান্ধে
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম॥
মত্ত বলাই-চান্দে   কে করিতে পারে কান্ধে
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়।
গেড়ুয়া লইয়া করে   হারিলে সভারে মাঝে
ঘনরাম দাস দেখি কয়॥

শ্রীদাম, কানাই, বলাই প্রভৃতির এই আনন্দকর শ্রমসাধ্য ক্রীড়া দেখিয়া কবি সখ্যভাবে এমনই আবিষ্ট যে তাঁহার মনে হইতেছে যেন তিনিও উহাদেরই একজন। পরাজয়ের বিড়ম্বনার ভয় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া সখ্যভাবে এই যে কৃষ্ণচিন্তা, বৈষ্ণবগণ ইহাকেই বলেন সখ্যরস। সখ্যরসে শান্ত এবং দাস্যরসের ধর্ম্মও অবস্থিতি করে।

বাৎসল্য রস

বৈষ্ণব আলঙ্কারিক বলেন—

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসলনামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ॥

— ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

অর্থাৎ স্থায়ীভাব বাৎসল্যরতি ভক্তচিত্তে বিভাবাদির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিলে তাহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বৎসল ভক্তিরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাৎসল্য ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, মাতা পিতা প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন এবং শৈশবসুলভ চাপল্য, মন্দহসিত প্রভৃতি উদ্দীপন।

বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন।

*   *

মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে পালকজ্ঞান কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান ;
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ;
কৃষ্ণভক্ত বশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে।

—চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)

বাৎসল্যরসের উদাহরণস্বরূপ বংশীবদনরচিত একটি পদ উদ্ধৃত করা হইল।

নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ বধূ মেলি   দেওই করতালি
বোলই ভালি রে ভাল॥
নন্দ সুনন্দ   যশোমতি রোহিণি
আনন্দে সুত মুখে চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল   কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশি কহে সব   ব্রজ রমণীগণ
আনন্দ সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে   লালন করইতে
স্তন ক্ষীরে ভীগল বাস॥

পুত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভাব মনোমধ্যে পোষণ করা হয়, বৈষ্ণবগণের মতে তাহারই নাম বাৎসল্যরতি। বাৎসল্যরসে শান্ত, দাস্য এবং সখ্যরসের বৈশিষ্ট্যটুকুও বিরাজ করে।

মধুর রস

বৈষ্ণবগণের মতে এই রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীমৎরূপগোস্বামী মহাশয় তৎকৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতিঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

অর্থাৎ স্থায়ীভাব মধুররতি স্বযোগ্য বিভাবাদির দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে মধুর ভক্তিরস বলে। মধুর ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন; শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ আশ্রয়ালম্বন; নব জলধর, মুরলী-ধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন; কটাক্ষ, মন্দহসিত প্রভৃতি অনুভাব। মধুররসে শান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বাৎসল্য পর্য্যন্ত সমস্ত রসের গুণগুলিও বর্ত্তমান থাকে।

মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়;
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয়।
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন;
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ।
মধুরেতে হয় সব ভাব সমাহার;
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।
— চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা)

মধুর ভক্তিরসের উদাহরণ-স্বরূপ এখানে কবি জ্ঞানদাসের একটি পদ উদ্ধৃত করা হইল।

মধুর যামিনী কাম কামিনী
বিহরে কালিন্দী-তীর।
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কত
বদত কীর সুধীর॥
রাধা-মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরি নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রস পরসঙ্গ॥
করহি বন্ধন বর্ণকে কঙ্কণ
চরণে মঞ্জীর রোল।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজয়ে কিণি কিণি
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত কতহুঁ রসভৃত
কানু কত কত গাওই।
সবহুঁ সখি মেলি রচয়ে মণ্ডলি
জ্ঞানদাস মতি ভাওই॥

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর — এই পাঁচটি মুখ্য রস লইয়া আলোচনা করিয়াছি। গৌণরসসমূহের নামোল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা এ পর্য্যন্ত কিছুই আলোচনা করি নাই। উপস্থিত তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গৌণরস সংখ্যায় সাতটি। যথা— হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস এবং ভয়ানক। ইহারা পাঁচটি মুখ্যরসেরই অন্তর্ভূত, কিন্তু ইহারা স্থায়ীভাবে ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করে না। বিভাবাদির দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া মাত্র ক্ষণকালের জন্যই ইহারা ভক্তচিত্তে আবির্ভূত হইয়া পরক্ষণে লয়প্রাপ্ত হয়। এইবার আমরা এক একটি করিয়া এই গৌণরসগুলির আলোচনা করিব। গৌণরসসমূহের মধ্যে প্রথম হাস্যরস। শ্রীমৎরূপগোস্বামী এইভাবে তাহার লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন:

হাসরতি ভক্তের হৃদয়ে যথাযোগ্য বিভাবাদির দ্বারা বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিলে তাহা হাস্যভক্তিরস সংজ্ঞা লাভ করে। হাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন; শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ চেষ্টাশালী বৃদ্ধ, শিশু প্রভৃতি আশ্রয়ালম্বন এবং হাসরতি স্থায়ীভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে অদ্ভুত রস সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণটুকু পাই তাহা এইরূপ: যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা বিস্ময়রতি অন্তরমধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া অদ্ভুত ভক্তিরস নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অদ্ভুত ভক্তিরসে বিবিধ অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন হেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন এবং বিস্ময়রতি স্থায়ীভাব। বীররস সম্বন্ধে শ্রীমৎরূপ গোস্বামী বলেন— উপযুক্ত বিভাবাদির দ্বারা উৎসাহরতি ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত এবং স্বাদ্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় বীরভক্তিরস বলিয়া অভিহিত হয়। বীরভক্তিরসে যুদ্ধবীরাদি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, তদনুরূপ বন্ধুবর্গ আশ্রয়ালম্বন এবং উৎসাহরতি স্থায়ীভাব। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে করুণরসের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়:— শোকরতি সাধুবর্গের চিত্তে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার সমাবেশ হেতু প্রভাব বিস্তার করিয়া করুণ ভক্তিরস নামে খ্যাত হইয়া থাকে। করুণ ভক্তিরসে অনিষ্টপ্রাপ্তির আস্পদরূপে বেদ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দ বিষয়ালম্বন, তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁহার ভক্তগণের অনুভবকর্ত্তা আশ্রয়ালম্বন এবং শোকরতি স্থায়ীভাব। রৌদ্ররস সম্বন্ধে শ্রীমৎরূপগোস্বামী বলেন— উপযুক্ত কারণ বিদ্যমানহেতু ভক্তগণের হৃদয়ে ক্রোধরতি উদ্বুদ্ধ এবং পরিপুষ্ট হইয়া রৌদ্রভক্তিরস বলিয়া অভিহিত হয়। রৌদ্রভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার হিত এবং অহিত— এই তিন প্রকার বিষয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সখী ও জরতী প্রভৃতি হিত ও অহিত বিষয়ে সর্ব্ববিধ ভক্ত আশ্রয়ালম্বন এবং ক্রোধরতি

স্থায়ীভাব। বীভৎসরসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—জুগুপ্সা রতি স্বযোগ্য বিভাবাদির দ্বারা ভক্তহৃদয়ে সঞ্চারিত এবং পরিপুষ্ট হওয়ায় তাহা বীভৎস ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়। বীভৎস ভক্তিরসে শ্রীভগবানের সেবানিষ্ঠ এবং শান্ত প্রভৃতি ভক্ত বিষয় এবং আশ্রয়ালম্বন এবং জুগুপ্সারতি স্থায়ীভাব। অবশিষ্ট গৌণরসের নাম ভয়ানক। ইহার লক্ষণ এইভাবে নিরূপিত হইয়াছে: উপযুক্ত কারণ সংঘটন হেতু ভয়রতি ভক্তহৃদয়ে বিশেষভাবে বদ্ধমূল হওয়ায় তাহা ভয়ানক ভক্তিরস বলিয়া অভিহিত হয়। এই ভয়ানক ভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ আলম্বন এবং ভয়রতি স্থায়ীভাব। পঞ্চ মুখ্য স্থায়ী রসের অন্তর্গত কারণবিশেষে সঞ্চরমাণ অস্থায়ী সপ্ত গৌণরসের আলোচনা এইখানে শেষ করিলাম।

প্রবন্ধবাহুল্য ভয়ে রসাভাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম। সংক্ষেপে কেবল এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, পরস্পর বৈরভাবযুক্ত রসদ্বয়ের সংযোগে রসাভাস হয়। মুখ্যরস সকলের বিষয়াশ্রয়ভেদে বৈরযোগনিবন্ধন রসাভাস হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরাধিকায় আরোপিত যে মহাভাব, তাহাতে এই প্রকার বৈরযোগ ঘটিলেও রসাভাস হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং একই সময়ে সর্ব্ববিধ-রসের বিষয় এবং আশ্রয় হন, তাহা হইলেও তাহাতে রসাভাস হয় না।

প্রত্যেকটি রস বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, যেভাবেই হউক না কেন, অন্তরের অন্তঃস্থলে শ্রীভগবানের অনুধ্যানই বৈষ্ণব-মতে রস। ইষ্টদেব, প্রভু, সখা, পুত্র, কান্ত প্রভৃতি যেভাবেই ভগবানকে দেখি না কেন, ফল সেই একই কৃষ্ণানুরাগ। এই কৃষ্ণানুরাগ ব্যতীত বৈষ্ণবগণ অপর কোন অনুভূতিকেই রস আখ্যা দেন নাই।

প্রেম ও কাল

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

(Ella Wheeler Wilcox-এর 'Time and Love' কবিতার অনুবাদ)

সময় বহিয়া যায়: দ্রুতপদে গত হয় দিন,
কালচক্র আবর্ত্তনে ঋতু আসে, ঋতু চলে যায়
অতৃপ্ত মানবচিত্ত নিত্য নব নব পথে ধায়
শুধু প্রেম জেগে রয় চিরতরে প্রসন্ন নবীন।
একদা মোদের প্রেম ছিল যাহা স্বর্গসুধাসম
আজি তাহা উঠিয়াছে অন্তহীন তিক্ততায় ভরি',
জানি না মোদের প্রাণে গেছে তাহা কি দান বিতরি'
কল্যাণ আশীষ কিম্বা অভিশাপ রুদ্র রূঢ়তম।

সময় বহিয়া যায়: বৃথা অশ্রু বৃথা অনুনয়
না পারে রুধিতে তারে গতিপথে পলকের তরে,
মহাকাল সিন্ধুপানে ধায় তাহা অন্ধবেগভরে
শুধু প্রেম জেগে রয় অমলিন, অক্ষয় অব্যয়।
দিবসের কার্য্যক্রম, নিশীথের স্বপ্নদৃশ্যরাজি
নব নব রূপ ল'য়ে পালটিয়া আসে বারে বারে,
সে নিত্য লীলার মাঝে এ বিশ্বের চিত্ত-বীণা-তারে
'যেও না, যেও না'—শুধু এই গান উঠিতেছে বাজি।

সময় বহিয়া যায়: অলক্ষিতে ল'যে যায় হরি'
মোদের ধমনী হ'তে যৌবনের তপ্ত রক্তকণা,
যায় নিষ্ঠা, নির্ভরতা, আনন্দের সর্ব্বসম্ভাবনা
শুধু প্রেম জেগে রয় তন্দ্রাহীন দিবস শর্ব্বরী।
প্রেম যবে চলে যায়—যায় তার পুলক শিহর
জীবন ব্যাপিয়া শুধু জেগে রয় ছদ্ম তার লীলা
বক্ষে চাপি' রয় তার স্মরণের গুরুভার শিলা
পলাতক ওগো প্রেম, সে সবারে তুমি আসি হর।

জঙ্গম

বনফুল

৩২

শিরিষবাবুর বাসায় বসিয়া মুকুজ্যে মশাই পত্র লিখিতেছিলেন। শিরিষবাবুর কন্যা অমিয়া আসিয়া হাজির হইল। অমিয়ার বয়স বারো বছরের বেশী নয়, বোধ হয় কমই হইবে। অথচ ইহারই বিবাহের জন্য শিরিষবাবুর আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং ইহারই জন্য পাত্র-সংগ্রহকার্য্যে মুকুজ্যে মশাই কিছুদিন যাবৎ নিযুক্ত আছেন একথা আমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। এখনও মুকুজ্যে মশাই সেই কার্য্যেই ব্যাপৃত আছেন। মুকুজ্যে মশায়ের স্বভাবের বিশেষত্ব যখন যাহাতে লাগেন তখন তাহার চরম করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং কার্য্যসিদ্ধির জন্য সহজ কঠিন সরল জটিল যত প্রকার উপায় মাথায় আসে সবগুলিই করিয়া দেখেন। এক্ষেত্রেও তাহাই করিতেছিলেন। কলিকাতার এবং মফঃস্বলের যাবতীয় কলেজ হইতে অবিবাহিত কায়স্থ যুবকগণের নাম-ধাম-পরিচয় সংগ্রহ করিয়া ও তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। ফলে, নানারকম চিঠিপত্র কুষ্ঠি জমিয়া এবং সেগুলি নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত হইয়া নানা রঙের ফাইল স্ফীত করিতেছিল। অর্থাৎ মুকুজ্যে মশাই ছোটখাটো একটি আপিস খুলিয়া বসিয়াছিলেন। এই ধরণের কার্য্যেই তিনি আনন্দ পান এবং কার্য্যটি যতই দুঃসাধ্য ও জটিল হয় ততই যেন তাহার উৎসাহ বাড়িতে থাকে। মধ্যবিত্ত বহু গৃহস্থের বহু কঠিন সমস্যার সমাধান মুকুজ্যে মশাই বহুবার নিঃস্বার্থভাবে করিয়াছেন। করিয়া আনন্দ পান এইটুকুই বোধ হয় তাহার স্বার্থ।

এই সংক্রান্ত ছয়খানি চিঠি লেখা তিনি সকাল হইতে বসিয়া শেষ করিয়াছেন, সপ্তম চিঠিখানি লিখিতেছিলেন এমন সময়ে অমিয়া আসিয়া বলিল, মা বললে, আপনি হাত পা ধুয়ে আহ্নিক ক'রে নিন, আর বসে বসে চিঠি লিখতে হবে না।

মুকুজ্যে মশাই লিখিতে লিখিতে একটু হাসিলেন।

এত চিঠি রোজ রোজ কোথায় লেখেন আপনি, এত লিখতেও পারেন!

মুকুজ্যে মশাই হাস্যস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, এই যে হয়ে গেল! এখন আর লিখব না, এইটে শেষ করে নি। আবার তিনি পত্ররচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অমিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে নিকটস্থ একটি চেয়ারে বসিল। উজ্জ্বল-শ্যাম মেয়েটির বর্ণ, স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে নাক মুখ চোখে তেমন বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু সমগ্রভাবে মেয়েটির মুখশ্রীতে সুন্দর একটি লাবণ্য আছে। অতিশয় সরল পবিত্র অনাড়ম্বর অন্তরের প্রতিচ্ছবি সমস্ত মুখখানিতে প্রতিফলিত হইয়া এমন একটি কোমল কমনীয়তার সৃষ্টি করিয়াছে যে দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া ওঠে।

অমিয়া আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এত চিঠি আপনি রোজ রোজ কাকে লেখেন দাদা মশায়!

তোর শ্বশুর-ভাসুরকে।

ধ্যেৎ।

ধ্যেৎ নয়—সত্যিই তাই।

আমার তো বিয়েই হয় নি এখনও, শ্বশুর-ভাসুর পাবেন কোথা?

আছে এক জায়গায়!

কোথায়?

তা এখন বলব কেন!

মুকুজ্যে মশাই চিঠিখানি খামে পুরিতে পুরিতে খুব রহস্যময় ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। একটি প্রশ্ন অনেক দিন হইতেই অমিয়ার অন্তর আলোড়িত করিতেছিল, নিজে সে ইহার সমাধান করিতে পারে নাই, অপর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। দাদামশায়কে জিজ্ঞাসা করা চলে বোধ হয়। একটু ইতস্তত করিয়া অমিয়া শেষে প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিল। আচ্ছা, দাদামশায় শিবপূজো করলে শিবের মত বর হয়?

নিশ্চয়।

ওই রকম!

অমিয়া দেওয়ালে টাঙানো একটি মহাদেবের ছবি আঙুল দিয়া দেখাইল। একখানি ক্যালেণ্ডারের ছবি,

জটাজুটধারী ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত ভীষণ এক মহাদেব চক্ষু কটমট করিয়া চাহিয়া রহিয়াছেন। মুকুজ্যে মশাই চকিতে একবার ছবিটার পানে তাকাইয়া ছদ্মগাম্ভীর্য্যভরে বলিলেন, অবিকল!

অমিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ছবিটির পানে চাহিল। সে তো রোজ একাগ্রচিত্তে শিবপূজা করিয়া চলিয়াছে। ওই রকম বর হইবে শেষকালে তাহার মনে আর একটি প্রশ্ন জাগিল।

আচ্ছা সবাই তো শিবপূজো করে, বিলু, শান্তি, কমলি, টগর—সব্বারই শিবের মত বর হবে?

সব্বারই।

রেণুদিও তো শিবপূজো করত, তার তো কেমন সুন্দর বর হয়েছে—ও রকম তো হয় নি।

ভাল ক'রে পূজো করতে পারে নি তোমার রেণুদি, পারলে ঠিক ওই রকম হ'ত।

দরকার নেই বাবা ভাল করে পেরে! ওই রকম বর চাই না।

মুকুজ্যে মশাই চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া বলিলেন, বলতে নেই অমন কথা!

শিব-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। বীরেন—অমিয়ার দাদা—বই খাতা লইয়া প্রবেশ করিল। সে স্কুল যাইতেছিল। অমিয়া বীরেন পিঠোপিঠি, সুতরাং অহি-নকুল সম্পর্ক। বীরেন ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এই নঞ্‌তৎপুরুষ, গপ্প করা হচ্ছে তো বসে' বসে'—মা ডাকছে।

অমিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুকুজ্যে মশাইকে বলিল, দেখুন, ফের আবার আমাকে নঞ্‌তৎপুরুষ বলছে! আচ্ছা এসো তুমি স্কুল থেকে দেখাচ্ছি তোমাকে!

বীরেন চিমটিটি কাটিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। মুকুজ্যে মশাই গম্ভীরমুখে বসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। বীরেন সম্প্রতি ব্যাকরণ পড়িতে সুরু করিয়াছে। ন মিঞা অমিয়া এই বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণ করিয়া সে অমিয়াকে নঞ্‌তৎপুরুষ আখ্যা দিয়াছে।

অমিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, ও কেন আমাকে নঞ্‌তৎপুরুষ বলবে খালি!

বীরেন বিদ্বান মানুষ, ব্যাকরণ-ট্যাকরণ কত কি পড়ছে, আমি মুখ্যুসুখ্যু লোক, ওর কথাবার্ত্তা ভাল বুঝতেই পারি না, কি বলব বল!

বিদ্বান না হাতী, এবার তো সেকেন হয়ে গেছে!

শিরিশবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। আপিস্ যাইতেছেন। পোষ্টাফিসে চাকরি করেন। ভদ্রলোকের উদার প্রশান্ত মুখচ্ছবিতে কেমন যেন একটা ভালোমানুষি মাখানো রহিয়াছে। গোঁফ-দাড়ি কামানো, ভারি মুখ। শক্তির ব্যঞ্জনা থাকিলে ভয় উদ্রিক্ত করিত। কিন্তু শিরিষবাবুকে দেখিলেই ভালোমানুষ নিরীহপ্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়। আসলেও তিনি অতিশয় মৃদু অসহায় প্রকৃতির লোক, মোটেই শক্তিমান পুরুষ নহেন। দৃঢ়হস্তে সংসারতরণীর হাল ধরিয়া থাকিবার মত সামর্থ্য তাঁহার মোটেই নাই। ঘরের মধ্যে গৃহিণী এবং বাহিরে মুকুজ্যেমশাই তাঁহার অবলম্বন।

শিরিশবাবু বলিলেন, দশটা বেজে গেছে, আপনি আর দেরি করবেন না, সুশীলা বসে আছে!

এই যে উঠি।

মুকুজ্যে মশাই উঠিয়া অমিয়ার সহিত বাড়ির ভিতরে গেলেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। স্নান করিবেন, আহ্নিক করিবেন, স্বপাক ভাতে-ভাত দুটি ফুটাইয়া লইবেন, আহারাদি করিয়া মৃন্ময়ের একবার খবর লইবেন। যদিও খবর পাইয়াছেন যে মৃন্ময় সুস্থ আছে, তথাপি একবার যাইতে হইবে, তাহা না হইলে পাগলিটা অনর্থ বাধাইবে।

শিরিশবাবু ক্যালেণ্ডারের শিব ও প্রাচীর-বিলম্বিত অন্যান্য ঠাকুর দেবতার ছবিকে প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহারও আপিসের দেরি হইয়া গিয়াছে।

৩৩

এত রূঢ় আঘাত প্রিয়বাবু জীবনে আর কখনো পান নাই। বেলাটা সত্যই সত্যই শেষে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে ইহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। কি একটা সামান্য কথা হইতে কি হইয়া দাঁড়াইল। প্রথম যেদিন বেলা চলিয়া গেল, তিনি আশা করিয়াছিলেন কিছুক্ষণ পরেই রাগটা কমিলে সে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যা হইয়া গেল—বেলা ফিরিল না। কি করিবেন ভাবিতেছিলেন,

এমন সময় বেলার গানের মাষ্টার অপূর্ব্ববাবু আসিয়া হাজির হইল। অদ্ভুত লোক এই অপূর্ব্ববাবু। বেলাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে। মিনমিন করিয়া কথা-বার্ত্তা কয়, লোকটার মধ্যে কিছুমাত্র যদি পদার্থ আছে। ইহাকেই সে এ যাবৎ মাসে মাসে পাচটা করিয়া টাকা গণিয়া দিয়াছে, অথচ এই সামান্য উপকারটি সে করিতে পারিল না! বেলা যখন তাহাকে ফোন করিয়া ডাকিল এবং সব কথা খুলিয়া বলিল—তখন সে কি হিসাবে তাহাকে অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্করের সহিত যাইতে দিল তাহা প্রিয়বাবু ভাবিয়া পাইলেন না। রাগ করিয়া মেয়েটা চলিয়া গিয়াছে, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিল না! লোকটা কেবল ছিমছাম পোষাক পরিয়া ‘অনুগ্রহ ক’রে ‘আশা করি’ ‘যদি কিছু মনে না করেন’ প্রভৃতি কতকগুলি মোলায়েম অর্থহীন বুলি অসংলগ্নভাবে আওড়াইতে পারে, আর কোন কর্ম্মের নয়। নিরীহ অপূর্ব্ববাবুর প্রতি একটা বিতৃষ্ণায় প্রিয়বাবুর সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, লোকটার পাউডার-মাখা মুখে ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাকে ইচ্ছাটি সম্বরণ করিতে হইল। কারণ, এই জাতীয় উত্তেজনাজনিত আকস্মিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনে তিনি বহুবার বিপন্ন হইয়াছেন; একবার একটা সাহেবকে মারিয়া চাকুরি গিয়াছিল, বেলাও যে বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাও এই হঠকারিতার জন্য। দ্বিতীয়ত, অপূর্ব্ববাবুকে চটাইলে বেলার নাগাল পাওয়া শক্ত হইবে। অপূর্ব্ববাবু শঙ্করবাবুকে চেনেন। তাই অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি অপূর্ব্ববাবুর সাহায্যে বেলার সন্ধান করিতে লাগিলেন।

কে এই শঙ্করবাবু? বেলার সহিত তাহার পরিচয় কবে হইতে এবং কি সূত্রে? প্রিয়বাবু কিছুই জানেন না। অপূর্ব্ববাবুও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। প্রিয়বাবু যদি বেলাকে ভাল করিয়া না চিনিতেন তাহা হইলে এই অজ্ঞাত শঙ্করবাবুর সহিত তাহাকে জড়াইয়া একটা শস্তা গোছের নাটকীয় পরিকল্পনা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু বেলাকে তিনি ভাল করিয়াই চেনেন। তাহার অসীম অহঙ্কার এবং পুরুষ জাতির প্রতি অসীম অবজ্ঞার কথা তাঁহার অপেক্ষা বেশী আর কে জানে। সুলভ উচ্ছ্বাসে হাবুডুবু খাইবার মত প্রকৃতি বেলার নয়। হালকা ফুলটির মত সে তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইবে কিন্তু সহজে ডুবিবে না। ডুবিলে এতদিন ডুবিয়া যাইত। তরঙ্গও অনেক আসিয়াছিল এবং উচ্ছ্বাসেরও অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বেলাকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেলার এই পদ্মপত্রজাতীয় অদ্ভুত প্রকৃতির জন্য প্রিয়বাবু মুখে অনেক চটাচটি করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি এই জন্যই বেলাকে শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন এবং ভয়ও করেন। বেলার দুর্দ্দমনীয় স্বভাব প্রিয়বাবুর অনেক উৎকণ্ঠার ও নানারূপ অসুবিধার কারণ হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু সেই দুর্দ্দমনীয় ব্যক্তিত্বটি যখন তাহার সমস্ত একগুঁয়েমি লইয়া সহসা সরিয়া গেল তখন প্রিয়বাবু চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি অনুভব করিলেন যে, বেলা-বিহীন তাঁহার জীবন মস্তবড় একটা নিরর্থক শূন্যতা। বেলা ব্যতীত অপর কেহই সে শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারে না। সেদিন রাগের মাথায় তিনি বলিয়াছিলেন বটে যে, বেলার জন্যই তিনি বিবাহ করিতে পারিতেছেন না—কিন্তু কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তাহা এখন তিনি মনে মনে বুঝিতেছেন। বস্তুত বিবাহ করিবার কোন কল্পনাই তাঁহার মাথায় নাই। প্রিয়বাবু বর্ত্তমান যুগের সুবিধাবাদী সেই যুবকগোষ্ঠির একজন, যাহারা নানা ওজুহাতে নিজেরা বিবাহ করে না কিন্তু যাহারা নিজেদের ভগ্নীদের বিবাহ দিবার জন্য সর্ব্বদাই সমুৎসুক অর্থাৎ নিজেরাই শুধু যে কোন দায়িত্ব লইতে চাহে না তাহা নয় নিজেদের বিবাহযোগ্যা ভগিনী অথবা অন্য কোন পোষ্যার দায়িত্বভারও ভদ্রভাবে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। বর্ত্তমান সমাজের শিথিল বিধিব্যবস্থার কল্যাণে অবিবাহিত থাকিলেও ইহাদের চলিয়া যায় এবং বর্ত্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়সাধ্য বিলাসপ্রবণতার স্রোতে কোনক্রমে ভাসিয়া থাকিবার মত সামান্য কিছু অর্থ হয়ত ইহারা উপার্জ্জন করে—কিন্তু সে উপার্জ্জন সপরিবারে বিলাসের স্রোতে ভাসিবার মতো সুপ্রচুর নহে। বিলাস বর্জ্জন করিয়া জীবনের বৃহত্তর সামাজিক আদর্শের যূপকাষ্ঠে নিজেদের বলি দিতে ইহারা অনিচ্ছুক। যতটা সম্ভব হালকাভাবে এবং ভালভাবে ভাসিয়া থাকিতে পারাটাই ইহাদের লক্ষ্য, ঝামেলা জুটাইয়া নিজেদের ভারাক্রান্ত করিতে ইহারা চাহে না, পারেও না। সুতরাং প্রিয়বাবুর বিবাহ করিবার কোনরূপ কল্পনাই ছিল

না। সেদিন শুধু রাগের মাথায় আর কোন যুক্তি না পাইয়া এই মিথ্যা কথাটাকে তিনি জোরগলায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য এখন মনে মনে তাঁহার অনুতাপের অন্ত নাই। বেলা চলিয়া যাওয়াতে আর একটা কথাও তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এতদিন ধরিয়া বেলাকে স্কন্ধ হইতে নামাইবার বহুপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন, কিন্তু এখন তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন যে—সে চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন প্রথা-অনুযায়ী। আজ বেলার অনুপস্থিতিতে তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন যে বেলাকে ছাড়িয়া তিনি একদণ্ড থাকিতে পারিবেন না। সেই মুখরা দুর্বিনীতা বোনটিকে তাঁহার চাই। সে তাঁহার জীবনের যে অংশটি জুড়িয়া বসিয়াছিল সেখানে আর কাহাকেও বসানো চলিবে না। যে তীক্ষ্ণ দন্তটি সুযোগ পাইলেই কুট করিয়া জিহ্বাকে কামড়াইয়া দিত, সেই তীক্ষ্ণ দন্তটির অন্তর্দ্ধানে জিহ্বা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেই শূন্য স্থানটায় বারম্বার ডগাটুকু বাড়াইয়া আকুল হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে।

সেদিন শঙ্করবাবু লোকটিকে ত তেমন খারাপ বলিয়া মনে হইল না। রাস্তায় অবশ্য দুই মিনিটের জন্য দেখা, কিন্তু ওই দুই মিনিটেই তাহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছে তাহা মন্দ নহে। ভদ্রলোকের চোখেমুখে কি যেন একটা ব্যঞ্জনা আছে যাহা আকৃষ্ট করে। শঙ্করবাবুর নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া প্রফেসার গুপ্তের নিকটও প্রিয়বাবু গিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তের আচার ব্যবহারেও নিছক ভদ্রতা ছাড়া আর কোন কিছু পান নাই। প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বাগবাজারের বাসার ঠিকানা ত দিলেনই, আশ্বাসও দিলেন যে তিনি মিস মল্লিককে বুঝাইয়া বলিবেন যেন তিনি এই সামান্য কলহটা মিটাইয়া ফেলেন। প্রফেসার গুপ্তের নিকট হইতে প্রিয়বাবু আরও দুইটি সংবাদ পাইয়া কিন্তু আতঙ্কিত হইলেন। প্রথম, বেলা আরও দুইটি টিউশনি জোগাড় করিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার মাসিক আয় পঞ্চাশটাকা এবং দ্বিতীয়, সে একটি বলিষ্ঠ ভোজপুরী দারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছে। সেই দারোয়ানকে অতিক্রম না করিয়া তাহার সহিত দেখা করা যাইবে না। দারোয়ান—প্রসঙ্গে প্রফেসার গুপ্ত যাহা বলিলেন তাহা সংক্ষেপে এই। দারোয়ানটি বৃদ্ধ হইলেও বলিষ্ঠ। খুব বিশ্বাসী। এককালে মিলিটারিতে ছিল, এখন পেনসন পাইতেছে। প্রফেসার গুপ্ত তাহাকে কিছুদিন পূর্ব্বে রাখিয়াছিলেন এবং প্রফেসার গুপ্তই বেলাকে দারোয়ানটি জোগাড় করিয়া দিয়াছেন। দারোয়ান বেলাকে 'বেটি' সম্বোধন করিয়াছে এবং নামমাত্র বেতন লইয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। যোগাযোগ অতি সুন্দর হইয়াছে। জনার্দ্দন সিংহের বয়স ষাটের কাছাকাছি। একটি মাত্র কন্যা ছিল, সেটিও কিছুদিন পূর্ব্বে মারা গিয়াছে। দেশে ফিরিবার আর তাহার ইচ্ছা নাই। বাকি জিন্দগীটা সে কলিকাতা শহরেই 'বিতাইয়া' দিতে অর্থাৎ অতিবাহিত করিতে চায়। সে পেনসন যাহা পায় তাহাতে তাহার খাওয়া-পরাটা বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে কিন্তু বাড়িভাড়া করিতে গেলে সঙ্কুলান হয় না। প্রফেসার গুপ্তের ওখানে সে আনন্দেই ছিল—কিন্তু মুখরা মাঈজীর অত্যাচারে সে টিকিতে পারে নাই। কোথাও মাথা গুঁজিবার একটা ঠাঁই পাইলেই তাহার চলে, সামান্য কিছু বেতন পাইলে আরো ভাল, কিন্তু স-সম্মানে সে থাকিতে চায়। 'ছোটা বাত' বলিয়া কেহ তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিলে সে সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং বেলার সহিত তাহার বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। অতবড় বাসাটায় বেলার পক্ষে একা থাকা শক্ত এবং জনার্দ্দনের পক্ষেও এমন একটা বাসা পাওয়া শক্ত। জনার্দ্দন বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, স্নেহশীল। বেলাকে সে প্রকৃতই বেটির ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সমস্ত শুনিয়া প্রিয়বাবুর অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে ভোজপুরি জনার্দ্দন হয় ত তাঁহাকে ভিতরে যাইতেই দিবে না। অবশ্য জনার্দ্দন না থাকিলেও যে প্রিয়বাবু নিঃশঙ্কচিত্তে যাইতে পারিতেন তাহা নয়, কিন্তু জনার্দ্দন থাকাতে ব্যাপারটা আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। বাড়িটার আশেপাশে আনাচে-কানাচে প্রিয়বাবু দুই-একদিন সঙ্গোপনে ঘুরিয়া বেড়াইলেন কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিবার মত সাহস সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, অপূর্ব্ববাবুকে দূত করিয়া প্রথমে প্রেরণ করিতে হইবে। বেলার জিনিষপত্র এস্রাজ সেতার কাপড়-চোপড় অপূর্ব্ববাবুর মারফৎ বেলার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বেলার মনোভাবটা প্রথমে বুঝিতে হইবে। তাহার পর দেখা যাইবে। অপূর্ব্ববাবুকে বেলা নিশ্চয়ই তাড়াইয়া দিবে না।

রবিবার সকালে গাড়ির মাথায় জিনিষপত্র লইয়া

অপূর্ব্ববাবু বেলা দেবীর বাসার দরজায় আসিয়া নামিলেন। দরজা খোলাই ছিল, ঢুকিতে যাইবেন এমন সময় জনার্দ্দন সিং বাহির হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, জেরা সে ঠহর যাইয়ে বাবুসাহেব!

জনার্দ্দন সিংহের বিশাল বলিষ্ঠ শরীর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ববাবু একটু ভড়কাইয়া গেলেন। মুখখানা সত্যই যেন সিংহের মত! মোচার মত কাঁচাপাকা একজোড়া গোফ মহিষের শিঙের মত যেন উদ্যত হইয়া রহিয়াছে! বলিষ্ঠ চোয়াল, মাংসল নাক এবং তীক্ষ্ণ চক্ষুসম্পন্ন জনার্দ্দন সিং কিন্তু যথোচিত বিনয় সহকারেই প্রশ্ন করিল।

কেয়া মাংতে হেঁ আপ হুজুর?

থতমত ভাবটা সামলাইয়া লইয়া অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, মানে মিস্ মল্লিকের জিনিষপত্রগুলো এনেছি। মাঈজী কাঁহা?

মাঈজী অন্দরমে হেঁ। আপ্ জেরিসে ঠহর যাইয়ে, হাম তুরন্ত খবর দে দেতেহেঁ। হুজুরকা নাম?

অপূর্ব্ববাবু।

অপূরববাব!

জনার্দ্দন ভিতরে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক পরেই বেলাদেবী নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন।

ও, আপনি এসেছেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন! গাড়ির মাথায় ওসব কি?

গলা খাঁকারি দিয়া অপূর্ব্ববাবু বলিলেন, মানে, আপনারই জিনিষপত্রগুলো, অর্থাৎ প্রিয়বাবুর সিচুয়েশনটা একটু, আমাকে তাই রিকোয়েস্ট করলেন—

অপূর্ব্ববাবু পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেটি মুখের সামনে ধরিয়া বার দুই কাসিলেন।

বেলার মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। চক্ষু পুনরায় হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলেন, আচ্ছা, বেশ নামাতে বলুন তা হ'লে ওগুলো।

জনার্দ্দন সিং নিকটেই ছিল, বলিল—আপ লোক ভিতর যাইয়ে, হাম কুল্ বন্দোবস্ত্ কর দেতে হেঁ!

অপূর্ব্ববাবু ও বেলা ভিতরে গেলেন।

অপূর্ব্ববাবু দেখিলেন ইহারই মধ্যে একখানি ঘর বেশ সুন্দরভাবে বেলা দেবী সাজাইয়া লইয়াছেন। পাশের একটি ঘরে ইকমিকে রান্না হইতেছে। বেলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কোনরকমে মাথা গোজবার একটা জায়গা জোগাড় করেছি। আমার সব চেয়ে দুঃখু এইটে যে, আপনাকে ছাড়তে হ'ল। আমার আর একটা টিউশনি জোগাড় হ'লেই আবার আপনাকে খবর দেব আমি! আরও শিখতে চাই।

অপূর্ব্ববাবু যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

টাকার কথা পেড়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না; মানে, আপনার যদি দরকার হয় এমনিই এসে আমি, মানে, সন্ধে বেলাটা ফ্রি-ও আছি আজকাল—

" সন্ধেবেলা আমি যে ফ্রি নেই। তাছাড়া, বিনা পয়সায় আপনাকে আমি খাটাবো কেন, বাঃ!

না, না তার জন্যে কি হয়েছে, পয়সাটাকেই সব সময়ে প্রমিনেন্স দেওয়াটা—অর্থাৎ—

অপূর্ব্ববাবু গলা খাঁকারি দিয়া নীরব হইলেন।

চা খাবেন এক কাপ?

বেশ তো, যদি আপনার অসুবিধে না হয়!

না, অসুবিধে আবার কিসের?

বেলা নূতন প্রাইমাস স্টোভটি জ্বালিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে, বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই, তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইতে লাগিল এবং উপরের দাঁত কয়টি অধরকে দংশন করিতে লাগিল। অপূর্ব্ববাবু নীরবে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিতান্ত নীরবতার মধ্যেই চা-প্রস্তুত-পর্ব্ব শেষ হইল। চা পান করিতে করিতে অপূর্ব্ববাবু ভাবিতে লাগিলেন, বেলাকে বিনা পয়সায় পড়াইলেও তিনি কিছু মাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, এই কথাটি ঠিক কি ভাবে বলিলে বেলার পক্ষে কনভিনসিং হইবে, অর্থাৎ—

আপনি যাবার সময় একখানা চিঠি নিয়ে যাবেন, দাদাকে দেব। আপনি চা খান, ততক্ষণ আমি লিখে নিয়ে আসি ওঘর থেকে।

বেলা দেবী পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। নিজের ছোট কিন্তু সুন্দর করিয়া সাজানো টেবিলটির উপর দুই কনুইএর ভর দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাহার পর লিখিলেন—

দাদা,

অপূর্ব্ববাবুর কাছে তোমাকে খাটো করবার ইচ্ছে হ'ল না ব'লেই জিনিষগুলো ফেরত দিলাম না। কিন্তু ওগুলো আমি ব্যবহার করতে পারব না, ওসব পড়ে থাকবে। নতুন বৌদিদির যদি গান-বাজনার সখ থাকে, এস্রাজটা আর

সেতারটা কাজে লাগতে পারে হয় ত। আমি ভদ্রভাবে মাথা গোজবার একটা জায়গা পেয়েছি, আমার জন্য অনর্থক ভেবে তুমি ব্যস্ত হোয়ো না। আমার একটা পেট, চলে যাবেই। ইতি—প্রণতা বেলা

খামে মুড়িয়া পত্রখানি অপূর্ব্ববাবুর হাতে আনিয়া দিতেই একটু ইতস্তত করিয়া রুমাল দিয়া বার কয়েক ঘাড় মুখ মুছিয়া অপূর্ব্ববাবু অবশেষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বসিয়া থাকিবার আর ত কোন সঙ্গত অজুহাত নাই!

মিস মল্লিক, গানেব জন্যে আমাকে যদি আপনার দরকার হয় তা হ'লে আনহেসিটেটিংলি, মানে—

আচ্ছা, দরকার হ'লে খবর দেব।

নমস্কার করিয়া অপূর্ব্ববাবু বাহির হইয়া পড়িলেন।

একটু পরেই প্রফেসার গুপ্তের মোটরখানা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসার গুপ্ত জনার্দ্দন সিং-এর পুরাতন মনিব। সুতরাং সে সেলাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। প্রফেসার গুপ্ত মোটর হইতে নামিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, মাঈজীকে একটু খবর দাও।

জনার্দ্দন ভিতরে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপ্ জেরাসে ঠহর যাইয়ে হুজুর, মাঈজী আস্নান কর্ রহি হয়।

প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটিতে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বেলার এখানে এখন আসিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিযাই আকর্ষণ বেশী। প্রয়োজনীয় কত জিনিষই ত করিবার আছে, কিন্তু করা হয় নাই। বেলার সহিত দেখা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, দেখা করাটাই প্রয়োজন। বাড়িতে ডিসপেপসিয়াগ্রস্ত খিটখিটে প্রৌঢ়া গৃহিণীর নানারূপ গঞ্জনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া পলাইয়া বেড়ানোটাই প্রফেসার গুপ্তের স্বভাব। তিনি পারতপক্ষে বাড়িতে থাকেন না। খুঁটিনাটি তুচ্ছ জিনিষ লইয়া কচকচি তাঁহার ভালই লাগে না। সুযোগ পাইলেই মোটরখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। সম্প্রতি বেলার বাসাটি তাঁহার আড্ডা দিবার স্থান হইয়াছে। বেলা মেয়েটিকে এখনও কিন্তু তিনি বেশ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেয়েটি কেমন যেন একটু রহস্যময়। কেমন যেন একটা স্বচ্ছ অথচ দুর্ভেদ্য আবরণের অন্তরালে বাস করে। তাহার লীলা-চঞ্চল সজীবতা, উচ্ছল যৌবন-ভঙ্গিমা, পরিহাস-মধুর কথাবার্ত্তা মনকে উতলা করিয়া তোলে, কিন্তু হাত বাড়াইলেই কোথায় যেন ঠেকিয়া যায়। ব্যবধানটা ঠিক যেন কাচের প্রাচীর, স্বচ্ছ অথচ শক্ত। সব দেখা যায়, কিন্তু অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সেইজন্যই বোধ হয় মনকে আরও লোলুপ করিয়া তোলে। প্রফেসার গুপ্ত অবশ্য এখনও ঠিক লোলুপ হইয়া ওঠেন নাই, কিন্তু মনে মনে অতিশয় ঔৎসুক্য-ভরে তিনি এই তরুণীটিকে লক্ষ্য করিতেছেন। বেলার শুধু যে তারুণ্য আছে তাহা নয়, বৈশিষ্ট্যও আছে।

স্নান সমাপন করিয়া বেলা আসিয়া প্রবেশ কবিলেন।

আপনি এমন সময় হঠাৎ যে আজ!

প্রফেসার গুপ্ত কয়েক সেকেণ্ড কোন উত্তরই দিলেন না, চুপ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন।

হঠাৎ? আজকের আসাটাকে 'হঠাৎ' বলে মনে হ'ল যে হঠাৎ!

এমন সময় আর কোন দিন আসেন না ত!

আজ রবিবার, ছুটি আছে! নিছক গল্প করতেই শুধু আসি নি, কাজের কথাও আছে। অচিনবাবু বলে' যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনি কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন, সেটা বন্ধ করে দিন!

কথাবার্ত্তা বিশেষ চালাইনি, একটা শুধু দরখাস্ত করেছি।

ওর সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখবেন না, খবর পেলাম লোকটা সুবিধের নয়।

তাই নাকি!

প্রশ্ন করিয়া বেলা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমাকে এখুনি একজায়গায় বেরোতে হবে।

বেশ! ও বেলা আসা যাবে, আমারও একটা কাজ আছে গড়পারের দিকে সেরে ফেলি সেটা! আপনি কোন্ দিকে যাবেন? ওই দিকে হয় ত আসুন আপনাকে একটা লিফ্‌ট্ দিয়ে যাই!

না, ওদিকে নয়, আমি যাব ভবানীপুরের দিকে! আপনি যান—

প্রফেসার গুপ্ত চলিয়া গেলেন।

বেলা কোথাও গেলেন না, কারণ তাঁহার কোথাও যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

৩৪

প্রোটোটাইপ ওরফে লক্ষ্মণবাবু অত্যন্ত উন্মনা হইয়া গড়ের মাঠে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম প্রেম যে স্বপ্ন-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা সহসা বিচূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। বেলা শুধু যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহা নয়, সে পাড়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের কারণ প্রিয়বাবুকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ হয়। ভদ্রলোক কেমন যেন এক রকম হইয়া গিয়াছেন। বেলার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন অর্থহীন ভাবে চাহিয়া থাকেন এবং শেষে অসম্ভব রকম একটা উত্তর দিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। লক্ষ্মণবাবু দুইবার প্রশ্ন করিয়া দুইরকম উত্তর পাইয়াছেন। প্রিয়বাবু প্রথমবার বলিয়াছিলেন যে, বেলা মামার বাড়ি গিয়াছে, দুই-চারি দিন পরেই ফিরিয়া আসিবে। দুই-চারি দিন পরে বেলা যখন আসিল না তখন লক্ষ্মণবাবু অতিশয় সঙ্কোচ-ভরে পুনরায় প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইয়াছেন তাহা মর্ম্মান্তিক। অত্যন্ত তিক্তকণ্ঠে প্রিয়বাবু বলিয়াছিলেন, আপনাদের পাঁচ জনের জন্যই ত সে চলে গেল! সে ঠিক করেছে চাকরি ক'রে স্বাধীনভাবে থাকবে!

আমাদের জন্যে!

প্রিয়বাবু কোন উত্তর না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন!

লক্ষ্মণবাবু কিন্তু সেই হইতে কথাটা চিন্তা করিতেছেন। তাহার নিজের মনেও ক্রমশ সন্দেহটা দৃঢ়তর হইতেছে। বেলা হয় ত উত্যক্ত হইয়াই চলিয়া গিয়াছে। একথা ত সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারে না যে, বেলাকে একবার দেখিবার জন্য, তাহার গান শুনিবার জন্য সে নানা ছুতায় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইত। কোন ওজুহাতে বেলার সান্নিধ্যলাভ করিয়া তাহার সহিত কথা বলিতে পারিলে সে ধন্য হইয়া যাইত। হয় ত তাহার এই মনোযোগ বেলার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; হয় ত তাহার এই কাঙালপনার জন্য বেলা মনে মনে তাহাকে ঘৃণা করিত। লুব্ধ ভিখারীকে এড়াইবার জন্য লোকে যেমন সরিয়া যায়, বেলাও হয় ত তেমনি তাহার পথ হইতে সরিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আলোকিত চৌরঙ্গীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য, দ্রুতগামী অসংখ্য মোটর, নানাবেশে সজ্জিত চঞ্চল জনতা, সমস্ত যেন তাঁহার নিকট নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। মনের ভাললাগা-মন্দ-লাগার মানদণ্ডটি সহসা যেন বিকল হইয়া গিয়াছে। মনে পড়িল, সেবার যখন অনার্স পান নাই তখনও মনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, সমস্ত পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে। তিনি পড়াশোনায় অবহেলা করেন নাই, দিনরাত্রি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন অথচ অনার্স পাইলেন না। কোন আশাই তো জীবনে তাঁহার পূর্ণ হয় নাই। ইচ্ছা ছিল, এম-এ-টা ভাল করিয়া পাশ করিয়া অন্তত একটা ফার্স্ট ক্লাস অর্জ্জন করিয়া অনার্স না পাওয়ার ক্ষোভটা দূর করিতে হইবে। কিন্তু বাবা তাহাতে বাদ সাধিলেন। বলিলেন, আর পড়াশোনা করিয়া কাজ নাই, দোকান দেখ গিয়া। পিতার অবাধ্য হইবার মত শিক্ষা অথবা যোগ্যতা লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। পিতার আদেশ মানিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই রূঢ় আঘাতটা কম বেদনাদায়ক হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর এম-এ হইয়া কোন কলেজের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিবার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে সহসা ভাঙা সাইকেলের দোকানের ময়লা চটের উপর বসিয়া ফাটা টিউব টায়ার মেরামত করিতে লাগিয়া যাওয়া লক্ষ্মণবাবুর পক্ষে মোটেই রুচিকর হয় নাই। কিন্তু বিপত্নীক পিতার মনে কষ্ট দিবার সাধ্য লক্ষ্মণবাবুর ছিল না। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছেন, দাদাও সেদিন মারা গেলেন, বাবার মনে একটুও শান্তি নাই। দোকান দেখিবার মত মনের অবস্থা নয়। তাঁহাকে এ অবস্থায় সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়াই লক্ষ্মণবাবু দোকানে বসিতে রাজি হইয়াছিলেন। কিন্তু কই, দোকানে বসিয়াও তিনি বাবাকে সুখী করিতে পারিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। বাবা রোজই তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া গালাগালি দেন, উপহাস করেন। শেষে নিজেই পুনরায় দোকানে আসিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্য একটা সাইকেলের দোকানের ভার লইবার মত যোগ্যতাও তাঁহার নাই! সত্যই নাই। অনর্গল মিথ্যা তিনি বলিতে পারেন না, অথচ সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইলে যে চরিত্রবল থাকা প্রয়োজন তাহারও অভাব। সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য নিজের আদর্শ খর্ব করিয়াছেন, কিন্তু পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই

জীবনের জন্ম-লগ্নে বসিয়া কোন্ দুষ্টগ্রহ যে জীবনটাকে ছারখার করিয়া দিতেছে তাহা জানিয়াও ত লাভ নাই। বকশি মহাশয়কে দিয়া গ্রহস্বস্ত্যয়ন করাইয়া কি লাভ হইয়াছে? কিছু যে হইবে না তাহা অবশ্য বকশি মহাশয় বলিয়াছিলেন। বকশি মহাশয়ের কথাগুলা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িতে লাগিল—কুড়ি-পঁচিশটা টাকা খরচ করলেই যদি রুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হ'ত, মানুষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হ'ত—তা হ'লে আর ভাবনা ছিল না! আপনারাও নাছোড়, আমারও টাকার দরকার—তাই এই সব প্রহসনের অভিনয় করতে হয়!

অদ্ভুত লোক ওই বকশি! স্বস্ত্যয়ন করিয়া কিছুই ত হয় নাই। সহসা মৃতা জননীর মুখখানা লক্ষ্মণবাবুর মনে পড়িল। তিনি সর্ব্বদাই যেন শঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। ব্রত, উপবাস, আচার, নিয়ম করিয়া তিনি আজীবন শঙ্কিত চিত্তে সকলের মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা যে আবার বিবাহ করিয়া মায়ের স্মৃতিকে লাঞ্ছিত করেন নাই এই জন্যই সে পিতার প্রতি এতকাল শ্রদ্ধাবান ছিল এবং তাঁহার গৌরবহীন আদর্শচ্যুত জীবনে পিতার পত্নী-নিষ্ঠাই একমাত্র জিনিষ ছিল যাহা গৌরব করিবার মত। কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণবাবু নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছেন, প্রতি সন্ধ্যায় পিতা তাহাকে বসাইয়া যেখানে যান তাহা ভদ্রপল্লী নহে। সেখানে তাঁহার একজন রক্ষিতা আছে! লক্ষ্মণবাবুর জীবনে গৌরব করিবার মত আর কিছুই রহিল না। সমস্ত জীবনটা একটা ভাঙা সাইকেলের দোকানে ময়লা চটের উপর বসিয়া অনুতাপ করিতে করিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার সাধ্বী মাতাকে প্রত্যহ এত বড় অপমান করিতেছে তাহারই খোসামোদ করিয়া তাহারই সঞ্চিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে নিজেকে ধন্য মনে করিতে হইবে। তাহার পর হয় ত কালক্রমে এক অপরিচিতা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া—বেলার স্মৃতি সুগোপনে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার সহিত আজীবন প্রেমের ভান করিতে হইবে। দিব্যচক্ষে লক্ষ্মণবাবু তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের এই সম্ভাব্য আলেখ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। চৌরঙ্গীর প্রতি সৌধশীর্ষে নানাবর্ণের আলো জ্বলিতেছে, নিবিতেছে—আবার জ্বলিতেছে! সম্মুখের পিচঢালা চকচকে রাস্তা দিয়া বিচিত্র আকারের কত মোটর আসিতেছে, যাইতেছে। জনতার স্রোত নির্ব্বিকার সমারোহে বহিয়া চলিয়াছে।

নির্নিমেষ নয়নে লক্ষ্মণবাবু মানব নির্ম্মিত পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আকাশের দিকে চাহিলেন না। চাহিলে দেখিতে পাইতেন অন্ধকার মহাশূন্য; কেবল অন্ধকারই নহে, সেখানে জ্যোতিষ্কও আছে।

৩৫

প্র্যাকটিকাল ক্লাসের হাড়ভাঙা খাটুনির পর শঙ্কর যখন হষ্টেলে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার সমস্ত শরীর অবসন্ন। কিন্তু সমস্ত অবসাদ মুহূর্ত্তে অপসারিত হইয়া গেল—যখন সে দেখিল মিষ্টিদিদির বালক-ভৃত্যটি তাহার জন্য একটি পত্র লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি লইয়া সে খুলিতে গিয়া থামিয়া গেল। যদি দুঃসংবাদ থাকে! যদি মিষ্টিদিদি লিখিয়া থাকেন যে বিবাহ হওয়া অসম্ভব! তখন সে কি করিবে? আর যাই করুক, প্রফেসার মিত্রের বাড়ি আর যাওয়া চলিবে না। রিণির সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতে হইবে! এই নিদারুণ পরিণতির কথা মনে হওয়া মাত্র শঙ্করের চতুর্দ্দিকে অন্ধকার নামিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল কেন সে মিষ্টিদিদিকে এসব কথা বলিতে গেল! যেমন চলিতেছিল, আরও কিছুকাল তেমনি ভাবেই না হয় চলিত। আরও কিছুকাল রিণির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহার মনের কথাটা ভাল করিয়া জানিয়া লইয়া তাহার পর কথাটা প্রকাশ করিলেই ভাল হইত। তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত জিনিষটাকে এমনভাবে আবিল করিয়া তোলা ঠিক হয় নাই। পত্রখানা হাতে করিয়া শঙ্কর স্পন্দিত-বক্ষে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কিন্তু বেশীক্ষণ বসিয়া থাকাও অসম্ভব। পত্রটি খুলিতে হইল।

শঙ্করবাবু,

সুসংবাদ আছে। আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তি উঠবে না। আপনি আপনার দিকটা সামলান। অনেক কথা আছে যা চিঠিতে লেখা ঠিক নয়। আপনি যদি আসেন আজ একবার, বড় ভাল হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা। সোনা দিল্লীতে তার স্বামীর কাছে ফিরে গেছে। আপনি যেদিন সেই দুপুরে এসেছিলেন, তার পর দিনই

সন্ধের ট্রেনে সোনা চলে গেল। অনেক অনুরোধ করলাম, কিছুতেই থাকল না। কি যে তার হ'ল জানি না। আপনি আজ সন্ধের সময় নিশ্চয় আসবেন। আমি ঘটকালি করেছি, আমার কিছু মজুরি চাই, অমনি ছাড়ছি না! আসবেন নিশ্চয়ই! মিষ্টিদি—

একবার নয়, বারবার শঙ্কর পত্রখানি পড়িল। নিজের উত্তেজনার আতিশয্যে সোনাদিদির অকস্মাৎ দিল্লী চলিয়া যাওয়ার কোন বিশেষ অর্থ সে বুঝিতে পারিল না। বরং তাহার মনে হইল, বিবাহের সময় সোনাদিদিকে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করিতে হইবে!

সন্ধ্যার পর সে প্রফেসার মিত্রের বাড়ি গিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি ছাড়া বাড়িতে আর কেহ নাই। মিষ্টিদিদিও আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন না, তিনি স্নান করিতেছিলেন। সেই বালক ভৃত্যটি আসিয়া তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল এবং বলিল যে, মাঈজী এখনি আসিতেছেন, আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। শঙ্কর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর তাহার নজরে পড়িল—টেবিলের উপর কি একখানা বই রহিয়াছে। বইখানা টানিয়া লইয়া দেখিল—জেম্‌স্ জয়েসের ইউলিসিস্। বইটার নাম শুনিয়াছিল, পাতা উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে লাগিল। পিছনে একজায়গায় পেজমার্ক দেওয়াছিল, সেখানে তাহার দৃষ্টি আটকাইয়া গেল এবং কখন যে সে উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর স্রোতে তলাইয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে চাহিয়া দেখিল—মিষ্টিদিদি সামনে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। ফিকে সবুজ রঙের অদ্ভুত পাতলা একটা শাড়ি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শঙ্কর চাহিয়া বসিয়া রহিল, তাহার কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্ত কে যেন অপহরণ করিয়াছে।

মিষ্টিদিদিই নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

খুব চটছেন ত একা বসে বসে? কি বই ওখানা দেখি, ও, ইউলিসিস্। যা-তা সব গাঁজাখুরি গল্প! অমন আবার না কি হয়! কেন যে বইখানার অত নাম আপনারাই বলতে পারবেন! আপনারা সাহিত্যিক মানুষ!

একটু হাসি গোপন করিয়া মিষ্টিদিদি সম্মুখের চেয়ারটায় উপবেশন করিলেন ও শঙ্করের হাত হইতে বইখানা লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন করিলেন, পড়েছেন বইটা?

না।

নিয়ে যান তা হ'লে! অনেক খবর পাবেন। এইবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এসব খবর জানাও দরকার এখন আপনার।

শঙ্কর একটু হাসিল।

মিষ্টিদিদি তাহা দেখিয়া ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে হাস্য-বর্ষণ করিয়া বলিলেন, হাসছেন যে বড়! অনেক কিছু শিখতে হবে এবার! নারী নিয়ে কবিত্ব করা এক জিনিষ, আর তাকে বিয়ে ক'রে সুখী করা আর এক জিনিষ!

এই বলিয়া লীলায়িত ভঙ্গীতে বইখানি মুড়িয়া সেটি শঙ্করের হাতে তুলিয়া দিলেন।

শঙ্কর বলিল, আপনিই বলুন না, মেয়েরা কিসে সুখী হয়! অত বড় বই পড়বার দরকার কি? আপনি ত পড়েছেন বইখানা, নিজের অভিজ্ঞতাও আছে কিছু—

মিষ্টিদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এসব ব্যাপারে পরের মুখে ঝাল খেলে কিছু হয় না! নিজের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার!

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল ও টেবিলের উপর সেগুলি রাখিল। সে-ই চা ছাঁকিতে যাইতেছিল; মিষ্টিদিদি বলিলেন, আমিই ছাঁকচি, তুই নীচেয় যা, সায়েব হয় ত এখুনি আসবেন।

বেয়ারা বলিয়া গেল।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, প্রফেসার মিত্র আসবেন কখন? কোথা গেছেন তিনি?

একটু বিরক্ত কণ্ঠে মিষ্টিদিদি বলিলেন, কলেজ, মিটিং, ডিনার, লেকচার, শেলী, শেক্সপীয়ার—এই সব নিয়েই আছেন উনি, আর কারো দিকে ফিরে চাইবার অবসর নেই ওঁর। একটা মানুষের চেয়ে বইয়ের আলমারিটা ওঁর কাছে বেশী দরকারী।

মিষ্টি দিদি চা ছাঁকিতে লাগিলেন।

তিনি কোথা?

শঙ্কর অবশেষে মরিয়া হইয়া প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল। এতক্ষণ সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল।

রিণি? আপনি আসবেন শুনেই সে পালিয়েছে!

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, যা লাজুক মেয়ে, দেখবেন ওর লজ্জা ভাঙাতেই এক যুগ কাটবে আপনার—

ইহার উত্তরেও শঙ্কর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

শঙ্করকে এক কাপ চা ও এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আপনি Zola পড়েছেন?

না।

মোপাসাঁ?

না।

কি পড়েছেন তা হ'লে?

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—

মিষ্টিদিদি নিজের কাপে একটা চুমুক দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ভারতচন্দ্র?

না, এখনও পড়িনি।

মিষ্টিদিদি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন, নিতান্ত শিশু আপনি! ফিডিং বট্‌লে দুধ খাবার অবস্থা পার হয়নি এখনও আপনার। আচ্ছা, রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' 'ঘরে বাইরে' পড়েছেন ত?

পড়েছি।

কেমন লেগেছে?

অতি চমৎকার!

বিমলার উপর রাগ হয়নি ত আপনার?

না।

নষ্টনীড়ের বউদিদির ওপরেও ত চটেন নি?

চটব কেন? কি যে বলেন আপনি!

মিষ্টিদিদি আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে চাটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

শঙ্কর তখনও চা পান করে নাই,খাবারগুলি খাইতেছিল। মিষ্টিদিদি বলিলেন, চা খান, চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আরও খাবার আনতে বলি! প্যাটিগুলো কেমন হয়েছে? আরও আনুক দু'খানা, কি বলেন?

আনুক।

মিষ্টিদিদি ঘণ্টা বাজাইলেন ও বলিলেন, গরম চাও একটু আনতে বলি, এ চা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোধ হয়।

হাত দিয়া শঙ্করের কাপের উত্তাপ অনুভব করিয়া মিষ্টিদিদি হাসিয়া বলিলেন, এ তো একেবারে হিম—

বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল ও আদেশ লইয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর শেষ প্যাটিখানিতে কামড় দিয়া বলিল, সুন্দর হয়েছে প্যাটিগুলো।

মাথা নাড়িয়া মিষ্টিদিদি বলিলেন, আসলে আপনার খিদে পেয়েছে খুব।

খিদে পাবে না? সেই কখন কলেজ থেকে ফিরে মাত্র খানছয়েক লুচি খেয়েছি!

বুঝেছি, আপনার খিদে একটু বেশী। চেহারা দেখলেই তা মনে হয়।

চেহারা দেখে খিদে বোঝা যায়? আপনি ফিজিওনমিও চর্চ্চা করেন না কি!

তা একটু একটু করি বই কি, আপনার পুরু পুরু ঠোঁট দুটো দেখলেই মনে হয় ভয়ানক লোভী আপনি!

মিষ্টিদিদি শঙ্করের মুখের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বেয়ারা আরও প্যাটি ও গরম চা দিয়া গেল।

শঙ্কর বলিল, এ প্যাটি কি আপনার বাবুর্চ্চি তৈরি করেছে? চমৎকার করেছে কিন্তু।

আমি করেছি, সোনার কাছে শিখেছিলাম।

হাঁ, জিগ্যেস করতে ভুলে গিয়েছি, সোনাদি হঠাৎ চলে গেলেন কেন বলুন ত?

মিষ্টিদিদি ক্ষণকাল শঙ্করের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর বলিলেন, কি ক'রে বলব বলুন, আপনিও সেদিন দুপুরে চলে গেলেন, সোনাও বাক্স গোছাতে বসল, পর-দিনই সন্ধের ট্রেনে চলে গেল! এত ক'রে থাকতে বললুম, কিছুতে রইল না।

একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, স্বামীকে ছেড়ে আছেও ত অনেকদিন, দোষও দেওয়া যায় না বেচারাকে!

মিষ্টিদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। শঙ্কর প্যাটি ও চা লইয়া ব্যস্ত ছিল, হাসিটুকু দেখিতে পাইল না। হঠাৎ মিষ্টিদিদি বলিলেন, মোপাসাঁর Une Vie পড়েননি, না?

না।

পড়ুন তা হ'লে। পড়া উচিত আপনার, আমার প্রাই-

ভেট লাইব্রেরীতে আছে বইখানা, দাঁড়ান দিচ্ছি—এই ঘরেই আছে!

ঘরের কোণে একটা আলমারি ছিল, তাহার কপাটগুলোও কাঠের, কাচ নাই। মিষ্টিদিদি উঠিয়া সেই আলমারিটা খুলিয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। শঙ্কর দেখিল আলমারিতে এক আধখানা নয়, বহু পুস্তক রহিয়াছে। বই দেখিলেই শঙ্কর কেমন যেন প্রলুব্ধ হইয়া ওঠে। পড়ুক আর না-ই পড়ুক, উলটাইয়া-পালটাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। সে চা-টু এক নিশ্বাসে পান করিয়া মিষ্টিদিদির পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টিদিদির পাতলা ফিকা সবুজ শাড়িটার উপর ইলেক্‌ট্রিক্ আলো পড়িয়া শঙ্করের মনে কেমন যেন একটা অপরূপ মোহ সৃজন করিতেছিল। মিষ্টিদিদি হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছিলেন।

এই নীচের তাকেই কোথায় যে রেখেছি, মনেও থাকে না ছাই।

শঙ্কর উপরের তাক হইতে মোটা চামড়া-দিয়া-বাঁধানো একখানা বই লইয়া খুলিয়া দেখিতে গেল বইখানা কি—খুলিয়াই কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল; সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত মুহূর্ত্তের জন্য গতিহীন হইয়া আবার উন্মাদবেগে বহিতে লাগিল। বই নয়—ফোটো য্যাল্‌বাম্! এ সব কি ফোটো! শঙ্করের সমস্ত শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। মিষ্টিদিদি আর একটু হেঁট হইয়া বই খুঁজিতে লাগিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় শঙ্কর য়্যালবামটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। তাহার সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল মিষ্টিদিদি দেখিয়া ফেলেন নাই ত! কিন্তু তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ লোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল, যেমন করিয়া হোক, ফোটোগুলি আর একবার দেখিতে হইবে। মিষ্টিদিদির পানে সে চাহিয়া দেখিল, মিষ্টিদিদি তেমনি হেঁট হইয়া বই খুঁজিতেছেন। ফিকা সবুজ পাতলা শাড়িটার উপর প্রখর বৈদ্যুতিক আলো পড়িয়াছে। স্পন্দিতবক্ষে শঙ্কর বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল।

না, এ ঘরে নেই দেখছি। দাঁড়ান, নীচে আছে বোধ হয়, দেখে আসি। একটুখানি বসুন আপনি, বেশী দেরি হবে না আমার—

মধুর হাসিয়া মিষ্টিদিদি বাহির হইয়া গেলেন। আলমারি খোলাই রহিল। সন্তর্পণে শঙ্কর চোরের মত উঠিয়া গিয়া য়্যালবামটি বাহির করিয়া ফোটোগুলি দেখিতে লাগিল, রোগী যেমন করিয়া আচার চুরি করিয়া খায়।

…হঠাৎ বাহিরে পদশব্দ! শঙ্কর তাড়াতাড়ি য়্যালবামটি যথাস্থানে রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। মিষ্টিদিদি নয়, রিণি আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। শঙ্করকে দেখিয়া একটু সলজ্জ অথচ গম্ভীর হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি সে পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টিদিদিও আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

রিণি এসেছে, দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে? কি লজ্জা মেয়ের, কিছুতে ওপরে আসবে না।

শঙ্কর বলিল, বইটা পেলেন?

না, বইটা নীচেতেও ত নেই। এই আলমারিটাতেই ত যেন রেখেছিলাম, দেখি দাঁড়ান আর একবার। ওদিককার ওই সুইচ্‌টা টিপে দিন ত, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না ভাল

শঙ্কর অবশ্য আলোর অভাব অনুভব করিতেছিল না, তবু আরও একটা আলো জ্বালিয়া দিল। মিষ্টিদিদি পুনরায় বইখানা খুঁজিতে লাগিলেন। হয় ত আলোর অভাবেই এতক্ষণ বইখানা পাওয়া যাইতেছিল না, এইবার পাওয়া গেল।

মিষ্টিদিদি বইখানা শঙ্করের হাতে দিয়া বলিলেন, আর কাউকে দেবেন না কিন্তু। বইখানা একজন আমাকে উপহার দিয়েছিল। অনেক দাম ওর—

শঙ্কর বইটা খুলিয়া দেখিল, টকটকে লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে—To sweet Ye from sweet O, নীচে প্রায় বছর পাঁচেক আগেকার একটা তারিখ।

মিষ্টিদিদি বলিলেন, বেচারি মারা গেছে। ওরই সঙ্গে প্রথমে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল।

তাই নাকি!

বইখানা পকেটে পুরিয়া শঙ্কর বলিল, যত্ন ক'রে পড়ব। এখন উঠি।

এর মধ্যেই উঠবেন কি। রিণির সঙ্গে একটু গল্প করুন। কোন কথাই হ'ল না যে!

না, অনেক রাত হয়ে গেছে, কাল আসব। আজ থাক—

বিয়ের কথা লিখেছেন বাড়িতে?

না, এখনও লিখিনি, লিখব এবার। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল ও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। তাহার মাথার মধ্যে, মনের মধ্যে, সমস্ত শরীরের মধ্যে যাহা হইতেছিল তাহা শুধু যে অবর্ণনীয় তাহা নহে, অভূতপূর্ব্ব। এমন উন্মাদনা তাহার জীবনে আর কখনও হয় নাই।

নেশায় টলিতে টলিতে সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

প্রাচীন বাঙলার বৌদ্ধবিদ্যানিকেতন

শ্রীকমলা রায় এম-এ

বর্ত্তমান বাঙলায় শিক্ষাবিস্তার মানসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। প্রাচীন বাঙলায় বিদ্যাশিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষা দিবার ও পাইবার ব্যবস্থা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা যাহাতে বিনা বিঘ্নে বিদ্যার্জ্জন ও দান করিতে পারেন, তজ্জন্য বাঙলার স্থানে স্থানে নালন্দা বিহারের ন্যায় বিহারসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল স্থানে বহুসংখ্যক ভিক্ষুর বসতি ছিল। সুদূর প্রদেশ হইতে ভিক্ষুগণ বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্ত এখানে আসিতেন।

নাগার্জ্জুনী কোণ্ডালিপি(১) হইতে জানা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙলায় বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশ থেরাবাদী ভিক্ষু আচার্য্যগণের কেন্দ্রস্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার আনুমানিক বয়স তৃতীয় বা চতুর্থ খৃষ্টাব্দ হইবে। ইহার পূর্ব্বেও যে এদেশে মৌর্য্যযুগে উত্তর বাঙলায় অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব ছিল তাহা মহাস্থানগড়লিপি(২) ভালরূপেই প্রমাণিত করিয়াছে। বন্যা, অগ্নি অথবা অন্য কোনরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে সরবড়গিক্ ভিক্ষুগণ বিপর্য্যস্ত হইলে পর সেই স্থানের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে যাহাতে তাহাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে, তজ্জন্য শস্য, তৈল, ক্ষুদ্র মুদ্রা ইত্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছিল। তৈল পুণ্ড্রনগর হইতে আনিতে হইত। পূর্ব্ববঙ্গেও যে বিহারের অভাব ছিল না তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ গুণাইঘরলিপি(৩) হইতে পাওয়া গিয়াছে। বন্যগুপ্ত ৫০৮ গুপ্তাব্দে আচার্য্য শান্তিদেব প্রতিষ্ঠিত বৈবর্ত্তক মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধবিহারে ভূমিদান করেন।

চৈনিক পরিব্রাজকগণের ভারতভ্রমণের বিবৃতি হইতে বাঙলার বিহারগুলির সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করা যায়। কার্জঙ্গল, সমতট, পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং তাম্রলিপ্তিতে(৪) বহু বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিতগণ কার্জঙ্গল বর্ত্তমান রাজমহল, পুণ্ড্রবর্দ্ধন বগুড়া জিলা ও তৎসন্নিহিত স্থান, সমতট ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জিলা, কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জিলা এবং তাম্রলিপ্তি বর্ত্তমান তমলুক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

য়ুয়ান চুয়াং (৬৩০—৬৪০ খৃঃ অঃ) বাঙলায় আসিয়া কার্জঙ্গলে(৫) ছয় কি সাতটী বৌদ্ধবিহার এবং তিনশত ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধনে(৬) বিংশতিটী বিহার এবং তিন সহস্রাধিক হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুগণের বসতি দেখিয়াছেন। উপরন্তু রাজধানীর অতিসন্নিকটে একটী বৌদ্ধ বিদ্যানিকেতনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত সভামণ্ডপ এবং উচ্চ দ্বিতল প্রকোষ্ঠসকল ছিল, তথায় সাতশত মহাযান ভিক্ষু বাস করিত। পূর্ব্ব ভারতের বহু স্থান হইতে বিদ্বান এবং যশস্বী ভিক্ষুগণ সেখানে বাস করিতেন। এই বিদ্যানিকেতনের নাম ভাসুবিহার। কর্ণসুবর্ণেও(৭) বৌদ্ধদের প্রভাব বেশ ছিল। সামাতীয় সম্প্রদায়ের দ্বিসহস্রাধিক ভিক্ষু দশটী বিহারে বাস করিত। তিনটী বিহারের ভিক্ষুগণ দেবদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল—তাঁহার মতানুসারে তথায় দুগ্ধপান নিষিদ্ধ ছিল। এইখানেও রাজধানীর নিকটে 'রক্তবীতি' বা 'রক্তমৃত্তিকা' নামে বৌদ্ধ বিদ্যানিকেতন ছিল, তথায় বহুস্থান হইতে প্রসিদ্ধ ভিক্ষুগণ আসিয়া বাস করিতেন। একটী বৌদ্ধবিহার চৈনিক ভিক্ষুগণের জন্য শ্রীগুপ্ত ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইৎসিং তাঁহার ৫৬জন বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্বন্ধীয় গ্রন্থে(৮) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নাম 'মৃগশিখাবন বিহার'। ডঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী(৯) এই বিহারের অবস্থিতি মুর্শিদাবাদ জিলায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ সমতটেও(১০) বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব

১। Ep. Ind., vol. xx, p- 23
২। I. H. Q., 1934, p, 54
৩। I. H. Q , 1930, p. 40.
৪। Watters Yuanchwang, vol. ii, p. 183—208.
৫। Ibid , p. 183
৬। Ibid , p. 184.
৭। Ibid— p. 191
৮। Beal's Introduction, p. xxxvi.
৯। I. H, Q., vol. xiv, 1938.
১০। Watters, Vol. ii p. 187

অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। য়ুয়ান্ চুয়াং তথায় ত্রিশটী বিহার এবং স্থবির সম্প্রদায়ের দুই সহস্র ভিক্ষু দেখিয়াছেন। Hwui-Lun(১১) ইহা একটী বৌদ্ধকেন্দ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Seng-chi(১২) সমতটের বৌদ্ধ নৃপতি রাজভটের কথা ধার্ম্মিক এবং ত্রিরত্নের উপাসক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

চৈনিক ভিক্ষুগণের বিবরণ হইতে বুঝা যায়, এই সকল স্থান হইতে তাম্রলিপ্তিই ব্রহ্মভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। সমুদ্রপথে চীন হইতে ভারতে আসিতে হইলে তাহাদের এইস্থানে প্রথমে অবতরণ করিতে হয় বলিয়া Hwi-Lun(১৩) উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময়েও এখানে আসিয়া জাহাজে উঠিতে হইত। ফাহিয়ান দুই বৎসর তাম্রলিপ্তি বন্দরে(১৪) বাস করেন এবং তথায় সূত্রগ্রন্থ প্রণয়ন ও বৌদ্ধ মূর্ত্তির চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁহার সময়ে দ্বাবিংশতিটী বিহার ছিল। এই সকল স্থানে বৌদ্ধভিক্ষু পরিপূর্ণ ছিল। য়ুয়ান্ চুয়াং(১৫) দশটী বিহার এবং সহস্রাধিক ভিক্ষুর বসতি দেখিয়াছেন। টাং নামক মহাযান ভিক্ষু তথায় দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। Taou Lin বা শীলপ্রভা তাম্রলিপ্তিতে তিনবৎসর ভাষা শিক্ষার জন্য ছিলেন ; Hiun-Ta এখানে এক বৎসর ব্রহ্মভাষা আয়ত্ত করেন (১৬)। Ta-ch'-teng— মহাযান প্রদীপ নামক য়ুয়ান চুয়াং-এর একটী ছাত্র এখানে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া ব্রহ্মভাষায় অসীম বুৎপত্তি লাভ করেন। ইৎসিং তথায় জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাম্রলিপ্তিতে পাঁচ মাস অবস্থান করিয়া ভাষা শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। ইৎসিং 'ভারাহা বিহারের' (Bharaha Bihar) উজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাম্রলিপ্তিতে পাঁচ অথবা ছয়টী বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছেন (১৭)।

বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে বাঙলায় নূতন নূতন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মপাল মগধে বিক্রমশীলা বিহার, বরেন্দ্র সোমপুর বিহার, বঙ্গে বিক্রমপুরী বিহার স্থাপন করেন।(১৮) পাহাড়পুরের গোয়ালভিটা এবং সত্যপীর ভিটা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ হইতে খননের ফলে এক বিরাট বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য দুই শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এই সকল কুঠরীতে মূর্ত্তি রাখিবার কুলুঙ্গীর বন্দোবস্ত আছে। এই বিহারে সহস্রাধিক ভিক্ষু বসবাস করিত বলিয়া মনে হয় ; বিহার-সংলগ্ন সত্যপীর ভিটায় বৌদ্ধ তারাদেবীর একটী মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধর্ম্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর বিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘের নামাঙ্কিত অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। বোধ্‌গয়া লিপি হইতে জানা যায় যে বীর্য্যেন্দ্রভদ্র নামক সমতট-নিবাসী সোমপুর বিহারের অধিবাসী ভিক্ষু একটী বুদ্ধমূর্ত্তি দান করিয়াছেন। ইহার দশম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। নবম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বিহারের অবস্থা সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং ইহার খ্যাতি অন্যান্য স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল (১৯)। মহাপণ্ডিত ও আচার্য্য বোধিভদ্র এই বিহারের অধিবাসী বলিয়া তিব্বতীয় সাহিত্য উল্লেখ করিয়াছে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এখানে কিছুকাল থাকিয়া অন্যান্য পণ্ডিতের সহায়তায় 'ভাব বিবেকের মাধ্যমাক রত্নপ্রদীপ'-এর অনুবাদ করেন (২০)।

তেঙ্গুর অনুসারে বিক্রমপুরী বিহার বঙ্গে ছিল। আচার্য্য কুমারচন্দ্র এখানে তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লীলাবজ্র তাহা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন (২১)। প্রাগ-সাম-জন্-জাং ত্রৈকুটক বিহার বাঙলায় অবস্থিত বলিয়া লিখিয়াছেন। এখানে আচার্য্য হরিভদ্র ধর্ম্মপালের আদেশে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার নাগার্জ্জুন এবং মৈত্রেয়নাথের মত মিলাইয়া ভাষ্য লেখেন (২২)।

---

১১ । Beal's Introduction, p. xxxvi.
১২ Ibid., p. xi.
১৩ Ibid., p. xxxvi
১৪ Legge, p. 100,.
১৫ Watter's, vol. ii, p. 189-
১৬ Beal's Introduction.
১৭ Takakusu—I'tsing, Introduction xxxi, chap x
১৮ । Ind. Culture, vol. I.
১৯ । Mem, Ar. S. R.
Paharpur excavation, 1939
২০ । Ind. Cul., vol. I.
Cordier, vol. ii and iii.
২১ । Ind. Cul. vol. I.
২২ । Mem., As. Soc., Beng., vol. iii, p. 5.

'বিক্রমশীলা বিহার' মগধে অবস্থিত হইলেও তথায় বহু বিদ্বান বাঙ্গালী ভিক্ষুপণ্ডিতগণের বাস ছিল, তাঁহারা ঐ বিহারে সম্মানজনক কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। জেতারি (৯৪০—৯৮০) বিক্রমশীলা বিহারের রাজপণ্ডিতের উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রত্নকীর্ত্তি, বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যাপক, রত্নবজ্র, জ্ঞান-শ্রী-মিত্র, রত্নাকরশান্তি, যামারী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দ্বারা বিক্রমশীলা বিহার গৌরবান্বিত ছিল (২৩)।

রামপাল জগদ্দলবিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবলোকিতেশ্বর এবং তারামূর্ত্তি স্থাপন করেন। গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমস্থলে রামাবতী নগরে এই বিহারটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষকর গুপ্ত, সুভকর গুপ্ত, ধর্ম্মকার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের এখানে বাস ছিল। তিব্বত হইতে ভিক্ষুগণ আসিয়া সংস্কৃত গ্রন্থসকল তিব্বতী ভাষায় অনূদিত করিয়া লইত (২৪)।

প্রাগ্-সাম্-জন্-জাং চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহারে তান্ত্রিক চর্চ্চা হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৈল বা তিলিপা নামক ভিক্ষুক তান্ত্রিক চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার শিষ্য নারপাদের যশঃ বহুবিস্তৃত ছিল।

পট্টী-কেরক নগরে কণকস্তূপ নামক বিহারের অস্তিত্ব তিব্বতী সাহিত্য হইতে জানা যায়। এখানে নারপাদ 'বজ্রপদসারসংগ্রহ' প্রণয়ন করেন। এ শহরটীও চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত ছিল (২৫)।

মনে স্বাভাবিক প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, এই সকল সঙ্ঘারামের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত কিরূপে ? 'মৃগশিখাবন' বিহারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ শ্রীগুপ্ত বিংশতিখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। সেই সকল জমির আয় হইতে বিহারের ব্যয় বহন করা হইত। আমরা 'কানহারি লিপি' হইতে জানিতে পারি যে, গৌড়দেশের গোমিন অবিঘ্নাকর নামক ভিক্ষু কৃষ্ণপর্ব্বতের বিহারে ভিক্ষুদের ধ্যানের জন্য বড় প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের পোষাকের জন্য একশত দ্রাম দান করিয়াছেন।(২৬) ইহা হইতে বুঝা যায়, দেশের রাজা ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সঙ্ঘারামের ব্যয় বহনের জন্য ভূসম্পত্তি দান ও অর্থ সাহায্য করিতেন।

ইৎসিং 'ভারাহাবিহার' কিরূপে চলিত, ভিক্ষুগণের জীবনযাত্রা প্রণালী ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ভিক্ষুদের জমি চাষ আবাদ করা নিষিদ্ধ, তজ্জন্য গৃহস্থ কৃষকদের জমি বিলি করিয়া দেওয়া হইত। তাহারা উৎপন্ন শস্য প্রভৃতি বিহার প্রাঙ্গণে বহন করিয়া আনিত এবং সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একাংশ 'ভারাহা বিহারে' দিয়া যাইত।(২৭) ভারতের সকল বিহারের নিজ ভূসম্পত্তি ছিল—জমি, ক্ষেত, বাগানের ফল এবং শস্যাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভিক্ষুদের মধ্যে পরিষদ-সভা সমান অংশে খাদ্য ও পোষাকের জন্য ভাগ করিয়া দিত।(২৮) বিহারের জমি চাষ করার ভার যাহাদের উপর থাকিত তাহাদের বিহারের ভৃত্য বা 'Pure men' বলা হইত।(২৯)

ভারাহাবিহারের কার্য্যপরিচালনার ভার যে ভিক্ষুর উপর ন্যস্ত থাকিত তাঁহার নাম কর্ম্মদান। তাঁহার কার্য্য হইতেছে ঘণ্টা বাজাইয়া ভিক্ষুদের কার্য্যে নিয়োজিত করা, বুদ্ধমূর্ত্তির পূজার বন্দোবস্ত করা এবং খাদ্য তৈয়ারী ও পরিবেশন করাইবার ভারও তাঁহার উপর ছিল। প্রতি-বিহারে দিনে রাত্রে আটবার ঘণ্টা বাজাইতে হইত। প্রভাত চারি ঘটিকার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কর্ম্মদানের ভিক্ষুগণকে জাগরিত হইয়া বুদ্ধচিন্তায় মনোনিবেশ করিবার জন্য সজাগ করিয়া দিতে হইত। সূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বাজাইয়া স্নানের জন্য সমবেত ভিক্ষুগণকে আহ্বান এবং পূজার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার আদেশ দেওয়া হইত। বার ঘটিকার সময় ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সকল ভিক্ষুকে খাইবার জন্য একত্র করা হইত। সূর্য্যাস্তের পর রাত্রিতে চারিবার ঘণ্টাধ্বনি করিবার ভার তাহার উপর ছিল। কিন্তু সময় নির্দ্দেশের ঘণ্টা বিহারের ভৃত্যগণ দিনের বেলা বাজাইত। প্রতিদিন প্রভাতে কূপের নিকট গিয়া জলে কোনরূপ পোকা আছে কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা তাঁহাকে করিতে হইত। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে জল বিশুদ্ধ করা হইত।(৩০)

২৩। Hist. of Indian Logic —S. C. Vidyabhusan

২৪। Mem, A. S. B vol iii.. p, 14.

২৫। Ind. Cul. vol i,

২৬। Ibid.

২৭। Ind. Ant vol. xiil, p. 135.

২৮। Taka kusu , Cha x.

২৯। Ibid , ch xxxviii

৩০। Ibid., p. 154

ভারাতাবিহার কাহারও কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল না। ইহার পরিষদ সভার অনুমতি লইয়া সকল রকম কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। এই পরিষদ-সভা বিহারের স্থবির, কর্ম্মদান, বৃদ্ধ ভিক্ষুগণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুণীগণ, শ্রমণ, উপাসক, উপাসিকা প্রভৃতিকে লইয়া গঠিত। এমন কি, কেহ যদি কোন ভিক্ষুকে শাকসব্‌জি খাইতে দেন তাহাও এই সভার অনুমতি লইয়া খাইতে হইবে। যদি কোন ভিক্ষু স্বীয় মতানুসারে চলে, সভাকে মান্য না করে, তবে তাহাকে কুলপতি অর্থাৎ গৃহস্থ বলিয়া বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার ক্ষমতা এই সভার আছে। ভিক্ষুণীগণ ভিক্ষুকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে এই সভার অনুমতি লইতে হইবে। তাহারা কখনও কোন ভিক্ষুর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে পারিবে না, বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে হইবে। পরিষদ-সভার নির্দ্দেশানুসারে দূরে যাইতে হইলে ভিক্ষুণীগণের দুইজনে যাইতে হইবে, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলে চারিজনে একত্র যাইতে হইবে।

বৃদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষুদের নিমিত্ত পরিষদ-সভা উৎকৃষ্ট কক্ষ থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত। ভৃত্যগণকে তাঁহাদের আদেশানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিত। তাঁহারা যদি প্রত্যহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিহারের নিত্য কর্ম্ম সকল করা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। গৃহস্থ ব্যক্তিগণ ভিক্ষু সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলে পরিষদ-সভার নিকট অনুমতি লইতে আসেন। প্রথমে এই সভা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে ভালরূপ সন্ধান লইয়া তাঁহাকে উপাসক করিয়া লয়। তৎপর মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত করেন। এখন হইতে তাহার নাম বিহারের খাতায় ওঠে। তাহার শাস্তিবিধান রাজার ক্ষমতার বহির্ভূত হয়। সেই ব্যক্তি যদি আইন অমান্য করে তবে তাহাকে ঘণ্টা না বাজাইয়া বিহার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণত ভিক্ষু, ভিক্ষুণীগণ পরিষদে পূর্ব্ব হইতেই দোষ স্বীকার করিয়া সাবধান মত থাকে। প্রতিমাসে চারিটী দিন সন্ধ্যাবেলা সকল বিহার হইতেই দলে দলে ভিক্ষুগণ এই বিহারে আসিয়া সমবেত হয় এবং বিহারের নিয়মাবলী শ্রবণ করে এবং তদনুসারে চলিতে চেষ্টা করে। বিদেশী অতিথি ভিক্ষুর অভ্যর্থনার ভার এই পরিষদের উপর ছিল। প্রথমত পাঁচদিন বিদেশী ভিক্ষুদের শ্রমাপনয়নের জন্য উত্তম খাদ্য দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হয়। তৎপর তাহার সহিত সাধারণ বিহারবাসী ভিক্ষুর ন্যায় ব্যবহার করা হয় এবং খাতায় তাহার নাম ভিক্ষুদের নামের তালিকাভুক্ত করা হয়। চরিত্রবান হইলে 'কর্ম্মদান' শ্রেণী অনুসারে-- বিছানার চাদর দিয়া তথায় তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করেন। ভিক্ষুটীর যদি বিদ্যাবত্তার খ্যাতি থাকে, তবে ভিক্ষুসঙ্ঘ তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করে এবং উত্তম প্রকোষ্ঠে তাহার থাকিবার স্থান নির্দ্ধারিত করে।

ত্রিরত্নের পূজা এবং বুদ্ধের উপদেশাবলীর মর্ম্মগ্রহণ করা প্রত্যেক ভিক্ষুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা ফুল ধূপ প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিদিন করিতে হয়। প্রাতঃকালে ভিক্ষুগণকে 'কর্ম্মদান' ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া মূর্ত্তিকে স্নান করাইবার ও পূজা করিবার জন্য সমবেত করিলে তাহারা মূর্ত্তিটাকে গন্ধানুলিপ্ত করিয়া সুগন্ধ জলে স্নান করান। তৎপর পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা উঁহাকে শুষ্ক করিয়া ফুল ধূপ প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করা হয়। এই কার্য্য 'কর্ম্মদানের' নির্দ্দেশানুসারে তাহাদের করিতে হয়। ইহার পর প্রত্যেকে স্বীয় প্রকোষ্ঠে গিয়া স্ব স্ব মূর্ত্তির এইরূপে পূজা করেন।

সন্ধ্যাবেলা 'কর্ম্মদানে'র ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বিহারের ভিক্ষুগণ চৈত্যপূজা এবং স্তূপ প্রদক্ষিণের নিমিত্ত একত্র হন। চৈত্যপূজার পর সকলে বিহারের বাহিরে আসিয়া স্তূপ প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে এবং গন্ধ, ধূপ, ফুল দেওয়ার পর জানু পাতিয়া বসিয়া উদাত্ত কণ্ঠে বুদ্ধের স্তুতি গান করেন। তাহার পর বড় প্রকোষ্ঠে যেস্থানে সকলে একত্র হইতে পারা যায় তথায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হন। প্রধান আচার্য্যের বসিবার স্থানের নিকট একটী সিংহাসন স্থাপিত আছে। উঁহাতে বসিয়া সূত্রপাঠকারী উচ্চৈঃস্বরে সূত্রপাঠ করেন। তৎপর অশ্বঘোষের গ্রন্থ হইতে যে স্থানে ত্রিরত্নের প্রশংসা আছে তাহা পাঠ করা হয়। ইহা শেষ হইলে পর বুদ্ধের বাণী যে ধর্ম্মপুস্তকে আছে তাহা হইতে কিছু অংশ পাঠ করিতে হয়। সর্ব্বশেষ দশটী শ্লোকে সকলের মঙ্গল এবং পুণ্যকর্ম্মের বৃদ্ধি এবং উৎসাহের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হয়। প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণ হইলে পর সমবেত ভিক্ষুগণ সুভাষিত অথবা সাধু বলিয়া প্রশংসাবাদ করেন। পাঠ সমাপ্তে সূত্রপাঠকারী অবতরণ করিলে প্রধান আচার্য্য প্রথমে সিংহাসনের নিকটে গিয়া মাথা নত করেন এবং বোধিসত্ত্ব ও অর্হৎগণের

উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান। তাহার পর দ্বিতীয় আচার্য্য সেইরূপ করেন এবং প্রধান ভিক্ষুকে প্রণাম করেন। তৎপর শ্রেণী অনুসারে সকল ভিক্ষু এক এক করিয়া সিংহাসন এবং সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীকে নতি জানাইয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। জনতা বেশী হইলে পাঁচজন মাত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উঠিয়া গিয়া নতি জানান, তৎপর সকলে একসঙ্গে প্রণাম করিয়া তথা হইতে চলিয়া যান।

প্রথম এবং চতুর্থ প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি শুনিলে পর ভিক্ষুমণ্ডলী ধ্যান, জপ, চিন্তা এবং প্রার্থনায় স্ব স্ব কক্ষে রাত্রি অতিবাহিত করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রহরে ভিক্ষুগণ বুদ্ধের চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রামগ্ন হন।

ভারতবর্ষের প্রতি বিহারে এবং ভারাহাবিহারেও ভিক্ষুগণ গৃহস্থ-পুত্রদের শিক্ষা দিবার জন্য স্থানদান করিতেন এবং ইহারা উপাধ্যায়গণের নিকট বিদ্যালাভ করিত। যাহারা ভিক্ষু হইবার মানসে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে আসিতেন তাহারা 'মানব' (children) নামে অভিহিত হইতেন। এই উপাসকগণ শ্বেত-বস্ত্র পরিধান করিতেন। যাঁহারা শুধু জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আসিতেন, ভিক্ষু হইয়া সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা থাকিত না; তাঁহাদিগকে ব্রহ্মচারী বলা হইত। এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তি বিহারে বাস করিলেও নিজ নিজ খাদ্য ও পোষাক ব্যয় তাঁহাদিগকেই বহন করিতে হইত। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাহা দিতে বাধ্য নহে, তবে তাহারা যদি সঙ্ঘের নিমিত্ত কোন শারীরিক পরিশ্রম করিত—সঙ্ঘ তাহাদের ব্যয়-বহন করিতে পারে, ইহা দোষের বলিয়া পরিগণিত হইত না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ছাত্রগণ উপাধ্যায়ের শারীরিক কুশল প্রশ্নের পর গুরুজনদের প্রণাম করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিত।

বালকগণের ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হইত, আট বৎসর হইতে পনেরো বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা সূত্র, ধাতু, বিভক্তি, পাণিনির সূত্র পাঠ করিত। চৈনিক ভিক্ষুগণ তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া প্রথমে পাণিনি পাঠ করিতেন। ছাত্রদের নিম্নলিখিত পঞ্চবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত; যথা—শব্দবিদ্যা (Grammar & Lexicography) শিল্পস্থান বিদ্যা (Arts) চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine) হেতুবিদ্যা (Logic) অধ্যাত্মবিদ্যা (Philosophy)। উপাসকদের বিনয়পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করান হইত।

এই অনুসারে বাঙলার প্রাচীন বিহারসকল পরিচালিত হইত বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি।

দ্বিপ্রহরে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বৈশাখের রৌদ্রদীপ্ত দ্বিপ্রহর ; স্তব্ধ চারিধার ;—
পঞ্চতপা গৌরী যেন রুদ্রতপে আসীন আবার !
ছিপ-হাতে বসে' আছি তরুঘেরা সরোবর তীরে
মৎস্যশিকারের সাজে !
পশ্চিমের তালী বনশিরে
রৌপ্যের পতাকাগুলি আন্দোলিত সুমন্দ বাতাসে ;
ঊর্দ্ধে নীলোজ্জ্বল শূন্যে শুধু দু'টি শঙ্খচিল ভাসে।
সম্মুখে সলিল 'পরে মৎস্য কভু করে উল্লম্ফন
বৃত্তাকার বীচিভঙ্গে বারিবক্ষে রচিয়া কম্পন।

* * * *

বন-অন্তরালে কোথা বিরহী বিহঙ্গকণ্ঠ ডাকে
সুকরুণ মূলতানে—ঘুঘু-ঘুঘু—না জানি সে কা'কে !
দীর্ঘচ্ছন্দে বিলম্বিত গুঞ্জরিত সে শোকার্ত্ত গান
স্তব্ধতার মুখে যেন খুঁজে' ফিরে বাণীর সন্ধান !
ঝিম্‌ঝিম্ করে দেহ—মনে হয়, যায় বুঝি শুনা—
তপস্যার শান্ত বক্ষে উৎসারিত বুদ্ধের করুণা !

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৫

সুউচ্চ, একেবারে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরের নীচেই চটি, নাম ভট্টিসেরা, বৈকালেই সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিযাছে যেন।

দুই দিন হইল যাত্রীদল ভাগিরথী ও অলকানন্দা সঙ্গমে স্নানদান অন্তে দেবপ্রযাগ ত্যাগ করিয়া অলকানন্দার তীরে তীরে অগ্রসর হইয়া চলিযাছিল। সম্মুখে আবার একটা ভীষণ চড়াই, নাম ছান্তি খাল; এত উচ্চ যে সেখান হইতে তুঙ্গনাথ এবং কেদারনাথ শিখর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। প্রভাতের নব উদ্যমে সে চড়াই পার হইবার আশায় যাত্রীরা সন্ধ্যায় এই ভট্টিসেরায় আশ্রয় লইতে আসিতেছে। পথে পথে পার্ব্বত্য বালকবালিকার দল ডাণ্ডিবালা 'শেঠ'দিগের হস্তচ্যুত অনুগ্রহ কুড়াইতে কুড়াইতে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

“জয় জয় কেদারনাথ দর্শন কর্‌তে!
সুনি মুনি পুনি করে পাথর সে পানি পড়ে
সুনি মুনি যোগী করে রামজীকে সেবা।”

দেবপ্রয়াগের বিখ্যাত রঘুনাথজীই সে দেশের দেশ-দেবতা। কোন' দল গাহিতেছে—

“রাজা চলে হাথি ঘোড়া পাল্কি সাজাকে
যোগী চলে নেংটি পিন্‌হা চিম্‌টা বাজাকে।”

ক্রমে তাহারা সরিয়া পড়িতেছে। চটি নিকটে দেখিয়া তাহারা আর ঘেঁসিল না। দল ক্রমে চটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ আস্তানা পাতিয়া ফেলিল। সুজনবাবুও ডাক্তারবাবুর দলের অগ্রগামী দূতেরা আসিয়া চটির মধ্যে যথাসাধ্য উত্তম স্থান অধিকার করিয়া উনান জ্বালিয়া গরম জল চড়াইয়া দিয়াছে। পাদচারী ব্যক্তিদের লবণসংযুক্ত গরম জলে পদসেবার এবং যানচারীদিগের চা সেবনের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পাচক রান্নার জন্য চটিবালার নিকট কত চাউল আটা ঘিউ কেনা হইবে তাহার হিসাব দাখিল করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই কতকগুলা খোঁসাসুদ্ধ কলাই ডাল কিনিয়া বাঁট্‌লাই ভরিয়া চড়াইয়া দিয়াছে। সঙ্গে যত ভাল দ্রব্যই থাক্ চটিওয়ালার নিকটে জনপিছু হিসাবে চাউল ডাউল বা আটা ঘিউ কিনিতেই হইবে। তাহারা ঘরের ভাড়া লইবে না, সওদা বিক্রয়েই তাঁহাদের এ ব্যবসার মুনাফা চলে।

ডাণ্ডির দল আসিয়া একে একে তাহাদের ভার নামাইয়া অর্থাৎ আরোহী এবং তাঁহার বিছানা উত্‌রাইযা নিজেদের দলের আড্ডার দিকে চলিযা গেল। কেহবা বাবুদের নিকট হইতে চানা খাইবার পয়সা এবং মাজীদিগের নিকটে মসলা তৈল ইত্যাদি প্রাপ্তির আশায় তাঁহাদের গাটরী খোলার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

চটিওলার চাটাইয়ের উপরে অনুচরগণের বিস্তৃত শয্যা বিছানো। বাবুরা উঃ আঃ শব্দ করিতে করিতে তাহাতে বসিয়া পড়িলে অনুচরেরা তাঁহাদের তোয়াজে লাগিয়া গেল। মাজীরা সব পোঁট্‌লা পুঁট্‌লি খুলিয়া জলযোগের ও রান্নার ব্যবস্থায় মন দিলেন। ললিতা ও শীলা ঘরের একেবারে সুমুখেই জলের নল দেখিয়া খুসি হইয়া খবর দিতেই বৃদ্ধা দুইজন সেইখানেই হাত মুখ ধুইবার জন্য উঠিলেন। ললিতার কাকিমা বারণ করিলেন “কেন মা কষ্ট পাবেন, সেখানে শতেক জনে জল নিচ্চে, আপনাদের জন্য বাল্‌তি করে জল আনতে গেছে ত! এইখানেই মুখ হাত ধুয়ে সন্ধ্যা করে নেন্।”

“আহা, বাবারে—কাকিমা তোমার মাটিকে একেবারে জড় পুঁটুলী করে ফেল্লে তুমি—একটু হাত পা ছাড়ুন বেচারা। চল তুমি দিদ্‌মা মেয়ের কথা শুননা, কেমন গড়্ গড়্ করে জল পড়ে ব'যে যাচ্চে। কলের মত নল লাগিয়ে দিলেও তার মুখে প্যাঁচ নেই তো বন্ধ করার—ভিড় হয়নি এখনো, তুমি চল।”

পাহাড়ের এদিকে ওদিকে কতকগুলি আম গাছে সেই বৈশাখে কেবল মুকুল ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধে বায়ুমণ্ডল ভারাক্রান্ত। ইঁহাদের বাহির হইতে দেখিয়া দুই একজন

অনুচরও অনুসরণ করিল, যদিই কোন প্রয়োজন হয় বা কিছু অসুবিধা ঘটে !

নলের পশ্চাতে কিছু দূরে একটা পাথরের উপর একটা লোক বসিয়া ছিল, তাহার বেশ ভূষা কিছু অদ্ভুত ধরণের। লম্বা পায়জামার উপরে একটী কালো রংয়ের ফতুয়া মাত্র গায়ে। সে রমণী কয়টিকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একদৃষ্টে শীলা আর ললিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। চোখের দৃষ্টি তাহার একটু অস্বাভাবিক।

শীলা বলিতেছিল “বাবা, এই তুবেলা আড্ডা কেন আর তোল’। সন্ধ্যার আগেই এমনি ক’রে কুঁড়েয় ঢোক, পোঁট্‌লা খোল, আর সকাল্ হতেই “চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠরিয়া—” সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্বাভাবিক ধরণের লোকটা উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—“বহুদূর যানা হোয়েগা, আজ্ ভি যানা কাল্ ভি যানা আখের্ যানা হোযেগা।” সকলের বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুচরেরা “আরে এ কেয়া, বাউরা হ্যায়” বলিয়া চেঁচাইতেই চটীওলা (তাহার দোকানও নিকটেই, সে) সেইখান হইতেই চেঁচাইয়া উঠিল, “হাঁ—হাঁ—হাঁকাও—হাঁকায দেও উস্কো। মারো উল্লুককো।” একসঙ্গে অনেকগুলা তাড়া হুড়ায লোকটা কোন্ দিকে যে পলাইবে তাহার ঠিক না পাইয়া পাহাড়ের দিকেই উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। বৃদ্ধা দিদ্‌মা বলিলেন, “আহা পাগল !”

“পাগল না ঢেঁকী,—পাজী ! তেওযারী—ফির্‌লে কেন, ধরে ঘা কতক দিয়ে আস্‌তে পার্‌লে না ?”

“বড়ি জোর্ ভাগ্‌লো দিদি ! আর ঘুসবে না, শালা বদ্‌মাস্।” সকলে মুখ হাত ধুইয়া একটু এদিক্ ওদিক দেখিতেছেন, সহসা কোন্ অদৃশ্যে যেন পাহাড়ের উপর হইতেই সঙ্গীতের সুরে ভাসিয়া আসিল, “পাহাড় পাহাড় ফিরি দরশ ন মিলি তুহার।”

“আরে ওহি বাউরা, কাঁহা ছিপায়কে গীত গাতা।” ইতিমধ্যে মোহন ও কুমুদ উভয়ে উপস্থিত হইয়াছে। “এ কি দিদিমা ঠাকুমা, আপনারা কি জল পাননি এতগুলো লোক থাক্‌তেও ?” “আরে নারে ভাই, আমরা তুই বুড়ী একটু বেড়াতে এসেছি, কুঁজোর কি সাধ যায় না চিং হয়ে শুতে ?” ইতিমধ্যে চটিবালা তাহার দোকান ও সওদা ফেলিয়া সেই পৰ্ব্বতের ঠিক্ নীচে তাহার চটির অঙ্গনখানিতে দাঁড়াইয়া হাঁকিতে লাগিয়াছে, “এ ভাই টুমিলাল, চৌকীদারকো খবর দেও, উও বাউরা ফিন্ আজ বদ্‌মাসি সুরু কিয়া ! উস্‌কো হিঁয়াসে পাকড়্‌লে যানা।” টুমিলালের কোন সাড়া পাওয়া গেল না কিন্তু সেই চটীতে সমাগত প্রায় সমস্ত পুরুষই উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্যাপার জানিতে একত্র সমবেত হইলেন। কুমুদ ও মোহন তো চটিবালাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্নে ও রক্ত-চক্ষে সন্ত্রস্ত করিয়া ফেলিল। পাছে এই শেঠ যাত্রীরা বিরূপ হইয়া ওঠে, এই ভয়ে জোড়হস্তে সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, বাবা, আমার কি অপরাধ ! ও পাগ্‌লা কোথা হ’তে কোন্ দিন আসে আবার কোথায় চলে যায়, কেউ ঠিক্ পায় না ! তবে ও এই রকমে এধারে আজ ক বছরই যায় আসে, গত তেসরা বচ্ছর ও আসার পর ভারি একটা সাংঘাতিক ঘটনা হযে যায়, তাই আমরা ওকে ভাগাতে চাই যাত্রীদলের কাছ থেকে।” “কি সে সাংঘাতিক ঘটনা ?” তাহাও তখনি না বলিযা চট্টিবালা রেহাই পাইল না, মোহন তো তাহাকে ধমকের উপর ধমকে একেবারে জড়সড় করিযা ফেলিয়াছিল। ডাক্তার ও সুজনবাবুও চায়ের পেয়ালা হস্তে চটির সুমুখে বা অঙ্গনে বাহির হইলে দেখিতে দেখিতে স্থানটি জাঁকাইয়া ওঠায় রমণীর দল কিছু অসুবিধায় পড়িলেন—তবু তাঁহারা এদিকে ওদিকে দাঁড়াইয়া শুনিবার চেষ্টায় কান খাড়া করিয়া রহিলেন, শীলা ও ললিতা কাকাবাবু ও ডাক্তারবাবুর একেবারে পার্শ্ব আশ্রয় করিল। বৃদ্ধা তুইজন কিন্তু এসব হাঙ্গামে না দাঁড়াইয়া চটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িযাছিলেন এবং তাঁহাদের বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও সন্ধ্যাহ্নিকের উদ্যোগে তাঁহাদের পুত্রবধূ ও কন্যাও ব্যস্ত রহিল।

চটিবালা হিন্দি ও বাংলার মিশ্রণে এক অপূৰ্ব্ব ভাষায় সগৌরবে বলিতেছিল, “তেস্‌রা বরষ বাবু ঠিক্ এমন সময়ে একদল যাত্রী বেলা দশ্ এগারো ঘড়ির সময়ে এই চটিতে পৌছে রাঁধাবাড়া সুরু করলে, আমারই যাত্রী হয়েছিল তারা। সেই দলে মেয়েলোক্ই বেশী ছিল, সধবা বিধবা বুড়া জোযান বহুত্ মায়ী। অওর সব ‘গিরস্ত’ আর গরীব ঘরের মানুষ। ও পাগলাও সেদিন এই চটীতে ছিল, সেদিন উ খালি গান গীত ক’রে তাদের ব্যস্ত করে তুল্‌লে। ভাত চেয়ে খায়, নাচে হাসে। বিকালে যেমন সব যাত্রী ও’ঠে, ওরা’ভি উঠ্‌বার জন্যে তৈরী হয়ে শেষে কিন্তু রওনা হল না ; বলে—কি নাম মেয়েটির—সর্‌যূ, সরযূর “মন খারাপ্” আছে, উ উঠ্‌তে পারছে না, কাপড় উড়ে শুতে আছে আর রোচ্চে

—'খালি কান্‌ছে। সকালে যাবে তারা—সামনে বড় চড়াই, এ মেয়েটি একটু স্বাব্যস্ত হোক্।" সন্ধ্যাবেলা ও পাগ্‌লা কোথায় কোন্ দিকে ভেগে গেল। ভোরে উঠে তারা চেঁচামেচি খোঁজাখুঁজি জুড়্‌লে—'সর্য়ূ নেই—আরে সর্য়ূ কাঁহা গেল!—বেলা হ'ল—চৌকীদার এল, সব চটিবালা ভি আমরা দিন ভর্ ঢুঁড়্‌লাম আগে ছান্তিথাল চড়াই পিছাড়ি সুক্কতা চটিতক্ খোঁজা হল—শ্রীনগরে খবর যেতে ফাঁড়িদার ভি এল সাঁঝে—তাদের জবানবন্দী নিলে। মেয়েটির বাপ মা ভাই কেউ নেই, স্বামী বিহা'র দু-চার বরষের ভিতরই নিরুদ্দেশ, এক মাসির কাছে ঘরে সে থাকৃত, মাসি ভি মারা যেতে ও গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তীর্থে এসেছিল। সেই পাগলাটাকে দেখে আর তার বাত্‌চিৎ শুনে ওর মনে কুছ্ বিকার ঘটেছিল। এক মায়ী বল্লে, ঐ ব্যাউরাটাকে তার স্বামী বলে হয়ত সোবে হয়েছিল, তাই সে দিনভর্ কেনেছে, কুছু খায়নি, রসুই করেনি। রাত্রেও সবার সঙ্গে কাপড় উড়ে শুয়েছিল,—তার ভিতর কি হ'ল কেউই জানে না। তেস্‌রা দিন সকালে যাত্রীদলকে তো ছোড়ে দিলে ফাঁড়িদার, তারা রোতে রোতে ছান্তিথাল পাহাড় পথে চলে গেল—চৌকীদার কতদিন তক্ যদি তার লাশের চিহ্ন্ ভি মেলে পঞ্চ্ ভাইয়া পাহাড়ের খড তক্ ঢুঁড়ে ফির্‌ল, কুছু না।'

শ্রোতা সব ক্ষোভে নিস্তব্ধ রহিল, কেবল আমাদের মোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ঐ বেটা পাগ্‌লা—ওকে ভাল করে চাব্‌কে দেখে ছিল ফাঁড়িদার?" "না বাবু, ও সাধুভি আছে, মাথাভি কুছু খারাপ আছে, ওকেভি কিছু হুজ্জুত কর্‌লে ফাঁড়িতে আটক রেখে, কোন ঠিকানা হ'ল না।" "কেউ হয়ত গায়েব্ করেছে তাকে—এই চটীর লোকেই।" "না বাবু, আপনি পথে পথে কি দেখ্‌ছেন না ভারি ভারি সোনার গহনা পিন্ধে কত মাইয়া মানুষ কত পথ একেলাই যাচ্চে—সাথীদের সঙ্গে মিল্‌তে পার্‌ছে না—তব্‌ভি তার এক্ কৌড়ি নুক্‌সান হয় না। পাহাড়ি আদ্‌মী চোর কি বদমাস্ না আছে। পথের বিচে মাল্ পড়ে থাক্‌লেও কেউ ছোঁয় না—ফাঁড়িতে খবর যায়—চৌকীদার উঠিয়ে ফাঁড়িতে জিম্মা লাগায়, যাত্রীরা ফিরে এসে নিয়ে যায়। সে বাঙালী মায়ি নিজের মনের দুঃক্ষে কি করেছে কেউই জান্‌ল না।"

"তার কারণ তো ঐ পাজীটা! ওকে কেন ঢুক্‌তে দাও চটিতে?"

"কি কর্ব, বাউরা আছে সাধুভি আছে, মার্‌তে পারে না কেউ—"

যাহাকে লইয়া এত আলোচনা সে ওদিকে নিঃশব্দে চটির পশ্চাতের পার্ব্বত্য পথে একেবারে বক্তা চটিবালার চটির পিছন হইতে গলির মত পার্শ্বের পথে আসিয়া অন্যের অলক্ষ্যে যেখানে সুজনবাবুর বৃদ্ধা শ্বশ্রুমাতা একমনে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিলেন সেইখানে দাওয়ার একধারে বসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাকে চোখ খুলিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "ম্যঁয়কো একঠো কাপড়া দেও।" বৃদ্ধার ভ্রূভঙ্গে প্রশ্ন বুঝিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "ম্যঁয় পূজা করুঙ্গি।"

"পিনোগে?" বলিয়া তিনি একখানা তাঁহার সাদা কাপড় ঠেলিয়া দিতেই পাগল মাথা নাড়িল, "উহ্ কাপড়া নেহি, রাধিকাজীকো কাপড়া,—ম্যঁয় পূজা করুঙ্গি।" "রাধিকাজীর কাপড় আমি কোথায় পাব রে বাপু?"

"হাঁ—হ্যায় নেই রাধিকাজী তোমারি সাথ্? ম্যয়নে দেখা।"

"ও ললিতা—আরে এদিকে আয়, দ্যাখ কি হাঙ্গাম, ছেলেগুলো তো এখনি মেরেই গুঁড়ো করে দেবে।" "আরে লল্‌তাজীভি সাথ্‌মে হ্যায়। বহুত আচ্ছা। তোমারে পর্ বদরীনাথ তো বহুত্ সদয়—বহুত্ প্রেম করেগা বুঢ়া মায়ী!" বলিতে বলিতে পাগল উঠিয়া পলাইল। বৃদ্ধা আর কাহাকেও না ডাকিয়া নিজ মনে সন্ধ্যা করিতে লাগিলেন। পাগলের প্রলাপের জন্য হাঙ্গাম বাড়াইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

সন্ধ্যা রাত্রে সকলের আহারাদি বিশ্রাম ও গল্প-গাছার মধ্যে শুনিতে পাওয়া গেল কোথায় কে গাহিতেছে, "শ্যামল বংশীবালা নন্দলালা মাতুয়ালা রে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সব্‌কোই ফুকারে—কৃষ্ণ হি জো সব্‌কে দুখ তারে—" সকলেই উত্তেজিত ভাবে বলিতেছিল "সেই পাগল!"—কিন্তু সে রাত্রে সে পথে আর হাঙ্গামা করিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইতেছিল না, মায় মোহনলাল পর্য্যন্ত স্থিরভাবে তাহার শিষের সঙ্গে সুরের তান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িল। বাবুদের আশে পাশে শ্রান্ত চাকর-দরোয়ানরাও ভোরের যাত্রার জন্য অন্যান্য মোটঘাট বাঁধিয়া ঠিক্ করিয়া রাখিয়া শুইয়া পড়িল, সকালে বাবুরা উঠিলে বিছানা মাত্র বাঁধিতে বাকি থাকিল। মেয়েরা ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে শুইয়া, দিদিমার নিকটেই ললিতা, তার কাছে শীলা। দিদিমা দেখিলেন,

ললিতা তখনো ঘুমায়নি, বাকি চারিদিকে নাসিকার মৃদু ও গভীর গর্জ্জন সমতালে চলিতেছে—দিদিমা ললিতার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "লতু, ঘুমুসনি এখনো ?"

"না দিদিমা, ঘুম আস্‌ছে না আজ !" "কেন রে ?"

"সেই মেয়েটার কথা কেবলি মনে হচ্চে—কি হ'ল তার ! আর ঐ পাগ্‌লাটার কথা"—উভয়ে চমকিত হইয়া শুনিলেন বাহিরের অন্ধকার হইতে কে যেন বলিতেছে, "রাধিকাজী, তোম্ লোট্ যাও—নিদ্ যাও, তোমার কুছ্ ডর নেহি—তোমারে নাথ যো সো তোমারা অন্তরমে। তোমারে প্রভু তোমারে সাম্‌নে খাড়া হ্যায়—তোম্ লোট্ যাও।"

ললিতা ধড়মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া টর্চ্চ লইয়া পথের দিকে আলো ফেলিতেই দেখা গেল নির্ঝরের ধারে সেই মূর্ত্তি, আলোক দেখিয়াই অদৃশ্য হইয়া গেল। ললিতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "দিদিমা, কাকুকে ডাকি ?" "না রে, না, ও পাগ্‌লা কি কর্‌বে এত লোকের ব্যূহের মধ্যে—ঘুমো।" রাত্রি প্রায় তখন দ্বিপ্রহর। সম্মুখের অন্ধকারে কৃষ্ণকায় সুউচ্চ কঠিন পর্ব্বতের অঙ্গ জমাট অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া, বুকে তার অশ্রান্ত ঝর্ঝর ঝর্ঝর ধারে নির্ঝর ধারা পতনের শব্দমাত্র চারিদিকের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। কোথায় কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে, "রাধিকাজী ! রাধিকাজী !" ললিতা দিদিমার একটু কাছ ঘেঁসিয়া আসিতেই তিনি তাহার অঙ্গে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, ঘুমো। উনি পাগল নন্, কোন্ সাধুব্যক্তি ! ছদ্মবেশে অমনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান্ ! এসব পথে এসব স্থানে অমন কত আছেন। ঘুমো।" ললিতা মৃদু গুঞ্জনে বলিল, "চোখ্ বুঁজলেই কেবল ভাগীরথী-অলকনন্দার মিলনদৃশ্য চোখে, আর কানে সেই শব্দ আস্‌ছে। তোমার হচ্চে না দিদ্‌মা ?"

"আমাদের কি তোদের মত বয়স রে ? যা দেখি শুনি, দেখে যাই শুনে যাই—ঐ পর্য্যন্ত !" "অলকনন্দা একটু বরং ঠাণ্ডা মূর্ত্তিতে নীল আভায় উজ্জ্বল ঢেউয়ে গঙ্গার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে, আর ভাগীরথী একেবারে সাদা ফেনায় ফেনায় বিষম তরঙ্গ তুলে—কি গর্জ্জনে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে অলকনন্দাকে আপনার মধ্যে পুরে নিয়ে আমাদের দেশের দিকে বয়ে চলেছেন। দুইদিকে দুই ধারা—আবার দুজনে মিলে এক হয়ে বয়ে যাওয়া—তিন ধারার দুটা কুল আর তাদের চেহারা চোখ্ থেকে যেন মুছ্‌ছে না। এর পর তো রুদ্রপ্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগ আছেন—মন্দাকিনী আছেন—না জানি তাঁদের কি মূর্ত্তি। এখেনেই তো শেকল ধরে স্নান করতে হল—ওসব প্রয়াগে বোধ হয় তাও পারা যাবে না।"

দিদিমা অর্দ্ধ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "হুঁ, আরও ভীল কেদারে ঢুণ্ডপ্রয়াগ, কোথায় না কি কর্ণপ্রয়াগ, পাঁচ প্রয়াগ পথে আছে না কি !" "এই তিনটাই বিখ্যাত বেশী দিদিমা।" 'হুঁঃ !' কাকিমা ইতিমধ্যে অর্দ্ধ-জাগরিতভাবে বলিলেন, "তোমরা এখনো গল্প কর্‌ছ মা ? ঘুমুবে কখন ?"

আবার সকলে নিঃশব্দ হইলেন। ললিতার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে মাত্র, অতি নিকটে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সচমকে সেটুকু টুটিয়া গেল। ত্রস্তে চাহিয়া দেখিল সেই নিদ্রিত মনুষ্যব্যূহ ভেদ করিয়া আসিয়া সেই মূর্ত্তি নিকটস্থ একটী খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছে আর বলিতেছে, "রাধিকাজী—নিদ্ যাও—তোমারে নাথ তোমারে সাম্‌নে খাড়া হ্যায়, তোম্ নেহি জান্‌তা—নিদ্ যাও।" একসঙ্গে অনেকেরই নিদ্রা টুটিয়া গিয়া একটা সোর্ উঠিয়া পড়িল—"চোর !" সেই ব্যাটা—সেই পাগ্‌লা ! সকলের আগে মোহন লাফাইয়া উঠিয়া লাঠি হস্তে ছুটিল, পিছনে তেওয়ারী ছোট্টা সিং প্রভৃতি। কিন্তু পাগলকে ধরিতে পারিল না। সুজনবাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে রুদ্ধরোষে গুমরাইতে গুমরাইতে তাহারা ফিরিয়া আসিল এবং "চোর বদ্‌মাইস—কি মতলব ছিল ওর কে জানে" যার যাহা খুশী মন্তব্য প্রকাশের মধ্যে শীলা চুপি চুপি ললিতার কানে কানে বলিল, "আহা সে বেচারাকে এই রকমেই মেরেছে পাগ্‌লাটা, বোঝা যাচ্ছে ! তার মনে স্বামী বলে ধারণা এসেছিল, আর ও হয়ত রাত্রে এমনি করেছে, সে পাছু পাছু ছুটে গিয়ে হয়ত কোন্ খডে পড়েই মরেছে। চটিবালারা তা চেপে গেল—যাত্রীরা কেউ এ চটিতে রাত্রে তাহলে থাকবে না ভয়ে। এদের উচিত—ও পাগলটাকে এধার থেকে একেবারে দূর করে দেওয়া। দিদিমা বুড়ী কিন্তু শুনিতে পাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি যে বলিস্—ওর সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন হয়েছে। ভাবের ঘোরে অল্প বয়সের মেয়ে দেখলেই ওর রাধিকাজীর স্ফূর্ত্তি হয়—তাই ও অমন করে।" দিদিমাকে আর বেশী বলিতে হইল না, অন্ধকার গিরিগাত্র হইতে ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ভাসিয়া উঠিল, "ম্যয়্‌কো লাট্‌ঠায়া ? পাথরসে তেরা শির তোড

জায়েগা। ম্যয়কো লাট্‌ঠসে ভাগায়া? তেরা প্রভুকো মারণে তৈয়ার্ হুয়া? আরে কম্‌বখ্‌ত, তেরা খুন মেরা গরুড় পিয়েগা, তেরা লাঠি টুক্‌রা টুক্‌রা করেগা।" মোহন ও কুমুদ আবার লাঠি লইয়া উঠিতেছিল, সুজনবাবুও ডাক্তারের একান্ত নিষেধে নিবৃত্ত হইল। তাঁহারা অনুচরদের কাহাকেও আর সে রাত্রে পাগলের অনুসরণ করিতে দিলেন না। তাহার গালি বর্ষণে সকলে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ললিতা দিদিমাকে বলিল, "কেমন দিদিমা, তোমার ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মদর্শন শুন্‌ছ তো?" দিদিমা চুপ। আবার ক্ষণপরে হাঃ হাঃ হাঃ হাসির শব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাগলের প্রলাপধ্বনি, "আরে উও তো প্রেমকো লাট্‌ঠি, উস্‌সে কেয়া? হাম্‌তো হরদম্ উহ্ সহতি হ্যায়! লাট্‌ঠি কোন্ বাত্ ম্যয়তো ভক্তকো জুতিভি বহতি! যাও বদরীনাথ দর্শন করো, আনন্দ রহো—ম্যয় তেরা সাথ্ সাথ্ রহুঙ্গি, কুছ্ ডর নেহি, যাও—হাঃ হাঃ হাঃ" !" টর্চ্চ ফেলিয়া কেহ দেখিল পাহাড়ের গায়ে অচল দীর্ঘ মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। কেহ আর উচ্চবাচ্য করিল না, গালির পর আশীর্ব্বাদ বর্ষণে সকলের মনটাও একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পরে—সকলের তখনো পুনর্ব্বার নিদ্রা আসে নাই, দেখা গেল, আঁধারের লণ্ঠন হস্তে বোধ হয় চৌকীদারই একটা দীর্ঘ পায়জামা-পরা মূর্ত্তিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। সকলে তখন আর একটু নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রার চেষ্টা দেখিল। দিদিমা কেবল একবার অস্ফুটে বলিলেন, "আহা!" (ক্রমশঃ)

খদ্দর ও স্বরাজ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

স্বরাজ লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী দুইটী সর্ত্তের উপর বিশেষ জোর দিতেছেন। অবশ্য এই দুইটী ঘনিষ্ঠভাবেই পরস্পরের সহিত জড়িত; একটী চরকা ও অপরটী খদ্দর।

সংগ্রামের এই মহাস্ত্র দুইটী ইংরেজের কি ভাবে পরাজয় সাধন করিয়া স্বাধীনতা আনিয়া দিবে, তাহা মহাত্মাজী আজও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। সাধারণ লোকে সংগ্রামক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা এখনও বুঝিতে পারে নাই। নিজেকে আমি এই সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মনে করি। তবে মনের মধ্যে যে প্রশ্নটী ওঠে, তাহার সদুত্তর পাই না বলিয়া এই বিষয়ের অবতারণা।

মহাত্মাজী মনে করেন, কেবল খাদি ব্যবহার করিলে লোকে সত্যাগ্রহের উপযুক্ত হইবে; তাহা ভিন্ন তাঁহার সৈন্য তালিকায় কাহারও নাম থাকিতে পারে না। খাদি পরিধান করার অনেক গুণ ও সুবিধা আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু খাদি পরিলে সকলেই মহাত্মার আদর্শে গঠিত খাঁটি মানুষ হইবে, তাহা মনে করা সর্ব্বৈব ভুল। উপরন্ত এখন মনে করা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ অনেক অপকর্ম্ম ঢাকিবার জন্য খদ্দরের আবরণ গ্রহণ করেন।

যাহা হউক, ঐ সকল বিষয় আলোচনা না করিয়া যদি এরূপ মনে করা যায় যে, মহাত্মাজী খদ্দর দ্বারা ইংরেজকে অর্থ-নৈতিক চাপ দিতে সক্ষম হইবেন, এবং স্বরাজ দিবার জন্য ইংরেজ ব্যস্ত হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে বোধ হয় খুব ভুল হইবে না। এই প্রশ্নটী অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ মহাত্মাজী হয়ত তাহা মনে নাও করিতে পারেন। তাহা হইলেও এই বিষয়ের আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

অনেকেই জানেন, এক সময় ভারতের কার্পাস বস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া ইংরেজ ধনী হইয়াছিল। এই কার্পাস বস্ত্রাদি বিক্রয়লব্ধ মূল্যই ইংরেজকে প্রচুর অর্থ আনিয়া দিয়া, তাহার অভাব মিটাইয়া তাহাকে অন্যান্য আবিষ্কার, অভিযান, নূতন দেশ জয়, শত্রুর সহিত সংগ্রামের রসদ জোগাইয়াছে। আজ সে জগতের বাজারে সর্ব্বপ্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বাণিজ্য বজায় রাখিবার জন্য তাহারা বহুপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার অনেকগুলিই এখনকার দিনে সভ্যজগতে সমর্থনযোগ্য নহে।

ভারতের বাজারে কিভাবে বিদেশীবস্ত্র আসিয়াছে তাহার বিবরণ জানা প্রয়োজন।

১৮৪৯-৫০ হইতে বিদেশী সুতা ও, বস্ত্রাদি আমদানির বিশিষ্ট কয়েক বৎসরের হিসাব—

	সুতা	কার্পাস দ্রব্যাদি
	(Twist and Yarn)	(other Cotton manufactures)
	হাজার টাকা	হাজার টাকা
১৮৪৯-৫০	১,৬৯,৭৪	৫,০৫,৭৪

১৮৫৯ ৬০	৩,০৭,০৭	১৪,৪৭,৭৭
১৮৬৯-৭০	৪,০৭,৩১	২০,৩৩,৩৮
১৮৮৯-৯০	২,৪৮,৪৫	২৬,৩৯,১৩
১৮৯৯-১৯০০	২,৪৫,০০	২৭,০০,২১
১৯১৩-১৪	৪,১৬,৪০	৬২,১৩,৪৫
১৯২০-২১	১৩,৫৭,৮৩	৮৮,৫৪,১৭
১৯২১-২২	১১,৫১,২০	৪৫,৪২,৪৯
১৯৩০-৩১	৩,০৭,৩৮	২২,১৭,২৩
১৯৩৮-৩৯	২,৯২,৯১	১১,২২,৩৬

উপরোক্ত তালিকা হইতে বিদেশী সূতা ও বস্ত্রাদির উত্থান-পতনের হিসাব পাওয়া যায়। বিদেশীদের বাণিজ্যের পরিমাণ যখন(১৯২০-২১) সূতা সাড়ে ১৩ কোটী এবং বস্ত্রাদি সাড়ে ৮৮ কোটী টাকা ছিল, তখনও ইংরেজ এদেশের মালিক ছিল। এবং ঐ সাড়ে ৮৮ কোটী টাকার বস্ত্রাদি আমদানির মধ্যে একা ইংরেজের অংশ ছিল ৮১ কোটী টাকা!

তাহার পর অসহযোগ আন্দোলন ও নিরুপদ্রব আইন অমান্য আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। খদ্দর পরিধানের ফলে বিদেশীবস্ত্রের আমদানি কমিল, কি, এই সকল আন্দোলনের ফলে দেশের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকে বিদেশী বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে মন দিল বলিয়া আমদানি পড়িল, সে কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। ১৯২০ সালে ভারতীয় মিল সংখ্যা ছিল ২৫৩; ১৯২৩ সালে তাহা ৩৩৬ সংখ্যায় দাঁড়ায়; ১৯৩০ সালে ৩৪৮ এবং ১৯৩৮ সালে ৩৬৫ হয়। ঐ সকল মিলে ১৯২০ সালের ৬৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকু এবং ১ লক্ষ ১৯ হাজার তাঁত ছিল। উহা ১৯৩৫ সালে ৯৮ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকু এবং ১ লক্ষ ৯৯ হাজার তাঁত হইয়া যায়। সুতরাং খাদি দেশের মধ্যে স্বদেশী বস্ত্র চালাইয়াছে, কি দেশী বস্ত্র বিদেশী বর্জ্জনে সাহায্য করিয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন নহে। তাহা ছাড়া যে মূল্যে খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে এবং হইয়া থাকে তাহা সাধারণ লোকে দাম দিয়া কিনিতে পারে না।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ইংরেজ এক বৎসরে অন্ততঃ ৮১ কোটী টাকার কাপড় প্রভৃতি এবং ১০ কোটী টাকার সূতা বিক্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ মোটামুটি তাহার আয় এক বৎসরে, কেবল কার্পাস শিল্প হইতে, একশত কোটী টাকা ছিল।

আমাদের চেষ্টা খদ্দর পরিয়া ইংরেজকে আর ভারতের বাজারে কার্পাস দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে দিব না। খদ্দর পরিয়া লোকে অহিংস হইবে, সাধু হইবে এবং দেশের মধ্যে দরিদ্রে অর্থ পাইয়া জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হইবে, সে সকল কথা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। অর্থনৈতিক বা আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভারত বাণিজ্যে সমস্ত পণ্য মিলাইয়া ইংরেজ মোট ৫০ কোটী টাকাও আর বিক্রয় করে না। আজ আর কার্পাস শিল্পজাত দ্রব্যাদির কথা লোকে মনেও করিতে পারে না। এখন ভারতবর্ষে মোট ১৪ কোটী টাকার কার্পাস সূতা ও বস্ত্রাদি আসে এবং সকল রকম বস্ত্রজাত দ্রব্য মিলিয়া ২৭ কোটী টাকা। কার্পাস দ্রব্যাদির ১৪ কোটী টাকার মধ্যে ইংরেজের অংশ কমবেশ ৫ কোটী টাকা মাত্র।

তাহা হইলে এরূপ মনে করা বোধ হয় ভুল নহে যে, যাহারা এক বৎসরে এককালে কেবল মাত্র ৯০ কোটী হইতে ১০০ কোটী টাকার কার্পাস দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে, এবং সেস্থলে এখন মাত্র ৫ কোটী টাকার বস্ত্র বিক্রয় করিয়াও ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাহাদের পলাইতে হয় নাই, তখন মাত্র ৫ কোটী টাকা বৎসরে ক্ষতি হইলে সে উহা অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, তাহা মনে করা খুব অসঙ্গত নহে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে কেবল মাত্র বিদেশী বর্জ্জনকারীই বাস করে না। ইংরেজ, তাহার জ্ঞাতিভাই অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি, ইংরেজের সম্পর্কে লাভবান এবং বিদেশীবস্ত্রে রুচিসম্পন্ন সকল রকম লোকই এখানে বাস করে। সুতরাং খদ্দর পরিলেই যে ৫ কোটী টাকার বস্ত্র বর্জ্জন করিতে পারা যাইবে তাহাও কখনও সম্ভব নহে।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয় যে, খদ্দর পরিধান করিলেই ইংরেজকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিবার সম্ভাবনা নাই। দুইটী জাতির স্বার্থের সংগ্রামে বিজিত যদি জেতাকে কোনও রকমে বিপর্য্যস্ত না করিতে পারে, তাহা হইলে শক্তিমান জেতা বা প্রভু কেন নিজের স্বার্থহানি করিবে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। বর্ত্তমান সংঘাতে খদ্দরের যে কোনও একটী বিশিষ্ট স্থান আছে তাহা কোনও রকমেই মনে হয় না।

ভারতবর্ষের সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষের বিশাল আয়তন এবং বিপুল জনসংখ্যার কথা বিবেচনা করিলে, ইহাকে দেশ অপেক্ষা একটা ক্ষুদ্র মহাদেশ বলাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। ইহার আয়তন আঠার লক্ষ বর্গ মাইল এবং '৩১ সালের গণনা অনুসারে এদেশে ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ জন লোক বাস করে। এই জনসংখ্যা সম্ভবত বর্ত্তমানে চল্লিশ কোটির কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে। রুশিয়া ছাড়া ইউরোপের জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি এবং উভয় আমেরিকার মিলিত জনসংখ্যা ছাব্বিশ কোটির অধিক হইবে না। ভারতবর্ষের ন্যায় এতবড় দেশে, এত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সংখ্যাও যে অনেক হইবে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। ছোট-বড় সকল ভাষা ধরিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ২২৫-টি ভাষা কথিত হয় বলিয়া '৩১ সালের গণনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষার সংখ্যা দেখিয়া ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যাকে বিশেষ জটিল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভারতবর্ষের গুরুতর অনৈক্যের প্রমাণ হিসাবে ইহা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবেন। অবশ্য এই ২২৫-টি ভাষার মধ্যে ১৫০-টি আসাম ও বার্ম্মার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তাহা হইলেও, ভারতের ভাষা সমস্যা প্রকৃতপক্ষে এতটা জটিল নহে এবং ইহার দ্বারা আমাদের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যও সূচিত হয় না। ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষাগুলির অত্যন্ত বেশীর ভাগ খুব অল্প লোকের দ্বারাই ব্যবহৃত হয় এবং ভারতের বেশীর ভাগ লোক বাংলা, হিন্দী, মারাঠি প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন। এক কোটির উপর লোকে যেসকল ভাষা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন তাহার প্রধান দশটিতেই প্রায় ত্রিশ কোটি লোক কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। তামিল ও তেলেগু ব্যতীত এই সকল ভাষাও আবার হিন্দী এবং বাংলাবর্গীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত। ছোট-বড় সকল ভাষা ধরিলে দেখা যাইবে যে, বাংলা অথবা হিন্দী বর্গীয় ভাষাগুলিই প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের দ্বারা মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই, ভারতের ভাষা সমস্যাকে আপাতদৃষ্টিতে যতটা জটিল বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা ততটা জটিল নহে। ভাষার ভিন্নতার দ্বারা ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সংযোগও কখন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় নাই।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অথবা সংস্কৃতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই সকল ভাষার সাহিত্যিক উপাদান সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং একই প্রকার পৌরাণিক কাহিনী ও দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদ বিভিন্ন সাহিত্য কর্ত্তৃক বিষয়বস্তু হিসাবে অবলম্বিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে চিন্তা ও ভাবধারার এই ঐক্য সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ঐক্যের মূল ধারাটিকে বরাবর অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে ফার্শী ও উর্দ্দুর ভারতব্যাপী প্রচলনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সংযোগ রক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে সংযোগসূত্র এইভাবে সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় রক্ষিত হইলেও এই সংযোগের প্রকৃতি যে কতকটা শিথিল ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার মত দৃঢ়তা এই ঐক্যের ছিল না। এক জাতি হিসাবে কাজ করিবার, সমগ্র জাতিকে সংহত করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে আমাদের হয় নাই। জাতি, ধর্ম্ম ও প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই যে এক জাতি, এই ধারণাও বোধ সম্পূর্ণ আধুনিক কালের। এই বোধের উন্মেষের সহিত আমাদের সংযোগের শিথিলতার কথা আমরা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। কিন্তু, ইহার জন্য আমাদিগকে কোন অসুবিধায় পতিত হইতে হয় নাই। সমগ্র ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা আমাদের এই ঐক্যবোধ জাগ্রত করিয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারই ইহাকে জীবন্ত ও সত্য করিয়া তুলিয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্য দিয়া যেমন আমরা ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছি, ইংরেজী ভাষার প্রসার তেমনই আমাদের সংযোগকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং এই ঐক্যকে কার্য্যক্ষেত্রে

প্রয়োগের মত শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্য দেশের সকল প্রান্তের সহিত যোগাযোগ আছে এমন কোন নিখিল-ভারতীয় কাজকর্ম্মে, আমরা কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। ইংরেজীর সাহায্যেই আমাদের সকল কাজ ভালভাবে চলিয়া আসিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে এখনও চলিতেছে। কাজেই, সমগ্র ভারতের পক্ষে সাধারণভাষার প্রশ্ন সমস্যার আকারে আমাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই। যে সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আমাদিগকে এক করিয়া দিয়াছে তাহাই নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে এই ঐক্যের উপায়ও আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। তবুও, সাধারণ ভাষার প্রশ্নটা এইরূপ গুরুতর আকারে দেখা দিবার কারণ রহিয়াছে।

দেশে জাতীয় আন্দোলন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং যতই আমরা পরাধীনতার ব্যথা ও গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম, আমাদের জাত্যভিমান-বোধ ততই তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অবস্থায় ইংরেজী ব্যবহারের অপরিহার্য্যতা স্বভাবতই আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ও অপমানজনক বোধ হইয়াছে এবং অনেকেই ইহাকে দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কাজেই, ইংরেজীর স্থলে কোন ভারতীয় ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার তাগিদ আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনের নেতৃবর্গ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইভাবে সাধারণ ভাষার প্রশ্ন আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পথে দেখা দিয়াছে এবং আমাদের জাতীয় জীবনের ভাগ্যবিধাতাগণ এই সমস্যা সমাধানের জন্য হিন্দুস্থানীকে সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু, সাধারণ ভাষা নির্ব্বাচন-ব্যাপারে দুইটি বিষয় আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমত, ভাবাবেগে পরিচালিত হইয়া আমাদের সংযোগের সূত্র হিসাবে ইংরেজীকে পরিহার করা সঙ্গত হইবে কি-না এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্য হইতে যদি কোন একটি ভাষাকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেই হয় তবে হিন্দুস্থানীর দাবীকে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে কি-না। ভারতবর্ষে প্রচলিত এতগুলি ভাষার মধ্যে হিন্দী (যাহা ক্রমে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হইতেছে) কেন এই গৌরবের অধিকারী হইল—এ প্রশ্নটা অনেকের মনেই উদিত হইতে পারে।

একথার মধ্যে কোন সংশয় নাই যে, মহাত্মাজীর প্রভাবকে পক্ষে পাইয়াই হিন্দী এতটা প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সকল প্রদেশের রাজনীতিক ও অরাজনীতিক সকল প্রকার লোকেই হিন্দী, উর্দ্দু অথবা হিন্দুস্থানীর অবিসংবাদী দাবী মানিয়া লইতেছেন। অন্য কোন ভাষার অনুরূপ দাবী বা এতদপেক্ষা বেশী দাবী আছে কি-না, তাহা তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। তথ্য ও যুক্তি অপেক্ষা, মহাত্মার উপর এবং মহাত্মার সময় কংগ্রেসের উপর, হিন্দীভাষী নেতাদের অপ্রতিহত প্রভাব যে হিন্দীকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথে অধিকতর সাহায্য করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মার নিজের মাতৃভাষা গুজরাটীর কোন দিক দিয়া ভারতের সাধারণ ভাষা হইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ হিন্দী ভারতবর্ষীয় প্রভাবশালী ভাষাগুলির অন্যতম এবং গুজরাটীর খুবই নিকট জ্ঞাতি। এই জন্য স্বভাবতই মহাত্মার দৃষ্টি হিন্দীর উপর পতিত হইয়াছে। যুক্তি হিসাবে এই কথা বলা হইল যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক হিন্দীভাষা বলিতে ও বুঝিতে পারে এবং সমগ্র দেশের লোক সহজেই ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রশ্ন হইতেছে, এই সত্য ও তথ্য-বিরোধী কথাটা লোকে সহজে মানিয়া লইল কেন ?

প্রথম কথা হইতেছে, হিন্দীভাষীর প্রকৃত সংখ্যা প্রচারিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম হইলেও হিন্দীভাষীদের চরিত্রগত গুণের ফলে একপ্রকার হিন্দী ভাষার প্রসার সর্ব্বভারতব্যাপী হইয়াছে, এবং কোন একটি বিশেষ প্রদেশের মধ্যে হিন্দীভাষা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। অনেক পূর্ব্ব হইতে হিন্দীভাষী লোকেরা বিপুল উদ্যমের সহিত তুচ্ছতম হইতে বৃহত্তম সর্ব্বপ্রকার ব্যবসাসূত্রে শ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য সাহসসাপেক্ষ নানাপ্রকার কার্য্যে, ভারতের সকল প্রদেশে বহুসংখ্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। পুলিশ ও সৈন্যবিভাগের সাহায্যেও হিন্দীভাষী লোকেরা ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন। ইঁহারা কখনও নিজ মাতৃভাষা পরিত্যাগ করেন নাই। এইভাবে অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যাতীত লোককে হিন্দীভাষার সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের লোকের মনে ক্রমে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অন্য প্রদেশবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে হইলে, হিন্দীই শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক প্রদেশের

লোকেরাই প্রধানত ভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে হিন্দীভাষীদের দেখিয়াছেন এবং নিজেদের অজ্ঞাতসারেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাঁহাদের নিজ প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা সকলেই হিন্দীভাষী। হিন্দীকে বহুলোকের ভাষা মনে করিবার আর একটা কারণ এই হইতে পারে যে, অহিন্দীভাষীরা হিন্দীভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য উত্তরভারতের সকল ভাষাকেই হিন্দী মনে করিয়া থাকেন এবং হিন্দীর সহিত অল্প সাদৃশ্য আছে এমন অন্যান্য ভাষাকেও হিন্দী মনে করিয়া থাকেন।

উর্দ্দু সারাভারতের মুসলমানদের সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া গৃহীত হয়, এবং সকল প্রদেশের মুসলমানেরাই ইহা শিখিবার চেষ্টা করেন। হিন্দীর সহিত ইহার সাদৃশ্য খুব নিকট বলিয়া, ইহাও হিন্দীর বিস্তারে সহায়তা করিয়াছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্ব্বে প্রায় সম্পূর্ণরূপে (এবং এখনও বহুল পরিমাণে) হিন্দীভাষীদের হাতে ছিল এবং এইজন্য অ-ভারতীয় বণিকদিগকে ভারতীয় ভাষা-হিসাবে হিন্দীই শিখিতে হইয়াছে। অন্য ভারতীয়দের সহিতও ইঁহারা হিন্দীতেই কারবার করিয়াছেন এবং হিন্দীর অনুকূলে জনমত গঠনে সহায়তা করিয়াছেন। যে সকল অ-ভারতীয় বণিক বা রাজকর্ম্মচারী এদেশে বাস করেন তাঁহারা এবং সকল প্রদেশের ভারতীয় ধনী লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দীভাষী লোকদের মধ্য হইতে ঝি, চাকর, দারোয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সংগ্রহ করেন। ইহার মধ্য দিয়াও হিন্দীভাষা ভারতের সকল প্রদেশে ছড়াইয়াছে এবং ভিন্ন প্রদেশীয় লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে হইলে হিন্দী ব্যবহার করিতে হইবে, লোকের মনে ক্রমে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। এই সকল উপায়ে ধীর ও দৃঢ়ভাবে হিন্দীভাষা সকল প্রদেশেই স্থান করিয়া লইয়াছে এবং তাহার সর্ব্বজনগ্রাহ্যতা সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে একথা সহসা কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

কিন্তু, কোন জিনিসেরই শক্তি ও সম্ভাব্যতা লোকের কোন ধারণার উপর নির্ভর করে না এবং ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে যাওয়া অনেক সময়ই বিপত্তি ও শক্তির অপচয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। প্রথমেই হিন্দীভাষীদের সংখ্যাধিক্যের কথা দেখা যাক। দিল্লীপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার পর্য্যন্ত ভূভাগকে মোটামুটি হিন্দী প্রদেশ বলিয়া ধরা হয় এবং বিহারী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদিগকেও হিন্দীভাষী বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিহারী হিন্দী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা; ইহাকে হিন্দীর একটি বিভাষা মনে করিবার কারণ নাই। বিহারী নিজেই মগধী, মৈথিলী এবং ভোজপুরী এই তিনটি শাখায় বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক শাখাতেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে এবং প্রায় তিন কোটি লোকের দ্বারা এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। মৈথিলীর সহিত বাংলার সম্পর্ক সর্ব্বজনবিদিত এবং মগধী বাংলা অক্ষরেই লেখা হয়। হিন্দীর সহিত বিহারীর সম্পর্ক, বাংলা অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী। তবুও সামাজিক এবং অন্যবিধ কারণে হিন্দীভাষী অঞ্চলের সহিত বিহারের সংযোগ নিবিড়তর হওয়ায় বিহারকে হিন্দীভাষী বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিহারীকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া না ধরিয়া যদি ইহাকে অন্য কোন ভাষার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে হয় তবে হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সহিত সংযুক্ত করাই অধিকতর সঙ্গত হইবে।

আবার অযোধ্যা, বাবেলখন্দ ও ছত্রিশগড়ে প্রচলিত ভাষা পূর্ব্বী হিন্দী নামে পরিচিত। এই ভাষার সমৃদ্ধ পৃথক সাহিত্য আছে। তুলসীদাসের গ্রন্থাবলী এই ভাষায় লিখিত। এই পূর্ব্বী হিন্দীও আবার আউধী, বাঘেলী এবং ছত্রিশগড়ী এই তিনশাখায় বিভক্ত।

হিন্দীবর্গীয় ভাষার মধ্যে পশ্চিমী হিন্দীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই ভাষাভাষীদের সংখ্যা '৩১ সালের গণনায় ৭,১৫,৪৭,৬৭১ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, এই সংখ্যার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আগ্রহে হিন্দীভাষীরা বিশেষভাবে সচেষ্ট ও তৎপর হইয়াছেন। ইঁহাদের এই আগ্রহ ও তৎপরতার ফলে বিহারী, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী, পূর্ব্বী হিন্দী প্রভৃতি ভাষার অনেক লোক পশ্চিমী হিন্দীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই পশ্চিমী হিন্দীকেও আবার একটি অখণ্ড ভাষা বলিয়া ধরা শক্ত। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব ও ইহার কতক উত্তরে যে ভাষা প্রচলিত তাহাকেই পশ্চিমী হিন্দী নামে অভিহিত করা হয়। দিল্লী মিরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার যে বিভাষা কথিত হয় তাহারই নাম হিন্দুস্থানী—ইহারও একাংশকে আবার উর্দ্দু বলা হয়। এই হিন্দুস্থানীকে

বা নামান্তরিত উর্দ্দূকেই ভারতের সাধারণ ভাষার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। পশ্চিমী হিন্দীও বাঙ্গরূ, ব্রজভাষা, কনৌজী ও বুন্দেলী প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত। পাঞ্জাবের পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে বঙ্গরূ এবং মথুরা ও গঙ্গা-যমুনা রচিত দ্বীপের মধ্যভাগে ব্রজভাষা কথিত হয়। পশ্চিমী হিন্দীর শাখাগুলির মধ্যে ব্রজভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ, ইহা শুনিতে খুব মিষ্ট এবং ইহাতে খুব উৎকৃষ্ট সাহিত্যও আছে। বুন্দেলীরও স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য আছে।

ভারতের সকল প্রদেশে বিক্ষিপ্ত উর্দ্দূভাষী মুসলমানদিগকেও এই সংখ্যার মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মোগলদিগের আমলেই উর্দ্দূভাষার সমধিক উন্নতি ও প্রসার হয় এবং লিখিবার জন্য ফার্সী অক্ষর ব্যবহৃত হইতে থাকে; ক্রমে বহু আরবী ও ফার্সী শব্দ ইহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বর্ত্তমানে এই সব শব্দের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, শিক্ষিত মুসলমান অথবা মুসলমানী প্রথায় শিক্ষিত হিন্দু ব্যতীত সাধারণ হিন্দীভাষীরা এই ভাষা বুঝিতে বা ব্যবহার করিতে পারেন না। উর্দ্দূর স্বতন্ত্র উৎকৃষ্ট সাহিত্য ত রহিয়াছেই। উর্দ্দূভাষী মুসলমানেরা কোনক্রমেই হিন্দীকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অথবা ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইবেন না। ইহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ ও কলহ চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং তাহার ফলে হিন্দীর স্থানে হিন্দুস্থানী নামে অল্প কিছু রূপান্তরিত উর্দ্দূকে চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

এই আলোচনা হইতে একথা বুঝা যাইবে যে, সাধারণত হিন্দীবর্গীয় ভাষাগুলিকে হিন্দী এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়া হিন্দীভাষীদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখান হইতেছে বটে, কিন্তু ইহার কোন একটি শাখায় যাঁহারা কথাবার্ত্তা বলেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব অধিক নহে এবং ইহার একশাখা যাঁহাদের মাতৃভাষা তাঁহারা যে সহজে অন্যান্য শাখাগুলি বুঝিতে পারেন ইহাও সত্য নহে। বাংলাবর্গীয় ভাষাগুলি ব্যবহারকারীদের একত্রিত সংখ্যা ধরিলেও দেখা যাইবে যে, বাংলাভাষীদের সংখ্যাও ইহার অপেক্ষা কম নহে এবং বাংলাই হিন্দীর যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী।

হিন্দী প্রচলনের পথে, এই সকল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অযোগ্যতা দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করিয়া ইহার প্রচারকদিগের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানদিগের তীব্র আপত্তির ফলে হিন্দীর পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানী চালান হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ইহার নাকি হিন্দী ও উর্দ্দূর মধ্যবর্ত্তী রূপ হইবে এবং দেবনাগরী ও ফার্সী উভয়বিধ অক্ষরে ইহা লেখা যাইবে। ইহার নির্দ্দিষ্ট রূপ যে কি হইবে তাহা লইয়া নানা বিতণ্ডা চলিতেছে। যুক্তপ্রদেশ সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী একাডেমী বলিয়াছেন—দিল্লী লক্ষ্ণৌ-এর লোকেরা যাহা ব্যবহার করেন না, এমন সব শব্দ পরিত্যক্ত হইবে। দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ-এ কথিত ভাষাই প্রকৃতপক্ষে উর্দ্দূ। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য হিন্দুস্থানী নাম দিয়া উর্দ্দূ চালান হইতেছে। ইহা সত্ত্বেও অবশ্য মুসলমানেরা ইহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অন্যদিকে হিন্দী সাহিত্য পরিষদ হিন্দুস্থানী সম্পর্কে অনুকূল মত পোষণ করেন না—বিহারেই 'হিন্দুস্থানী-বিরোধী সমিতি'র সৃষ্টি হইযাছে এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে নানাবিধ জটিলতা দেখা দিয়াছে।

নির্দ্দিষ্টরূপের অভাব, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই অসন্তুষ্টি এবং দুই প্রকার অক্ষর প্রভৃতি মিলিয়া খাস হিন্দী প্রদেশেই নূতন ভাষা সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র দেশের ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ রাষ্ট্রিক ভাষার প্রয়োজন হইয়াছিল; অথচ নিজ প্রদেশেই ইহা নূতন সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। নির্ব্বাচনের ত্রুটিই ইহার জন্য দায়ী।

অন্য দিকে যদি আমরা বাংলার কথা বিবেচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষীয় কোন ভাষাকে যদি সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে গ্রহণ করিতেই হয় তাহা হইলে সব দিক দিয়া বাংলার দাবীই সর্ব্বপ্রথম গ্রাহ্য হইবার যোগ্য। '৩১ সালের গণনা অনুসারে বাংলা-ভাষীর সংখ্যা ৫,৩৪,৬৮,৪৬৯ জন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটী। বাংলা, আসাম ও বিহার এই তিন প্রদেশের মধ্যে এই ভাষার প্রসার এবং এই সংখ্যার মধ্যে বাংলাবর্গীয় ভাষাগুলিকে ধরা হয় নাই। বাংলা-ভাষীর প্রকৃত সংখ্যা যে ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে। বিহারে ত প্রকৃত বাংলাভাষীরা যাহাতে নিজেদের মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া না লিখান তাহার জন্য হিন্দী-ভাষীদের যথেষ্ট

তৎপরতা রহিয়াছে, আসামেও যে বাঙ্গালী বিদ্বেষ এদিকে কিছু কাজ করে নাই—তাহা বলা যায় না।

কিন্তু বাংলার অনুকূলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইতেছে যে, ইহা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভাষা এবং অন্য যে কোনও ভাষাভাষী মুসলমানের তুলনায় বাংলাভাষী মুসলমানেরা সংখ্যা ভূয়িষ্ঠ। নিখিল ভারতীয় যে কোন প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনুকূল মনোভাবের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য প্রদেশে হিন্দুস্থানীর প্রতি যে বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দীভাষী প্রদেশেই মুসলমানেরা ইহার ঘোর বিরোধী এবং হিন্দুদের মধ্যেও একদল প্রভাবশালী লোক ইহার সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করেন। কিন্তু বাংলাভাষা সম্পর্কে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কাহারও আপত্তির কোন কারণ নাই। ইহা হিন্দু ও মুসলমানের সমান আদরের মাতৃভাষা—উভয় সম্প্রদায়ের কথিত ভাষার রূপের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই ইহা একই অক্ষরে লিখিয়া থাকেন এবং সমভাবে ব্যবহার করেন। হিন্দু ও মুসলমান লেখকদিগের দ্বারা বাংলা সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের পাঠকদিগের দ্বারা ইহা সমাদৃত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৩৪০ সাল) মাননীয় আখা খাঁ তৎকালীন বাংলা কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যদিগের দ্বারা প্রদত্ত জলযোগ বৈঠকে মুসলমান জগতে বাংলার অদ্বিতীয় স্থান সম্বন্ধে ও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "…সমগ্র জগতের মধ্যে বাংলা সর্ব্বপ্রধান মুস্‌লিম দেশ—বিশেষ বিবেচনা সহকারেই আমি জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুসলিম দেশ বলিয়াছি। পৃথিবীতে এমন অন্য কোন দেশ নাই, যেখানে পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় স্বল্পায়তন ভূখণ্ডের মধ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট এত বৃহৎ মুসলিম জনসংঘ দেখা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ, পারস্য, আফগানীস্থান, আরব এবং মিশর অপেক্ষাও অধিকতর সত্যরূপে মুসলমান ধর্ম্মের আশ্রয়স্থল।…… একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে আমার মনে উদিত হইয়াছে এবং সমস্যাটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বাংলা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ভাষাগুলির অন্যতম; ইহাতে মানুষের উচ্চতম ও মহত্তম ভাব এবং আকাঙ্ক্ষাসমূহের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উপযুক্ত ইস্‌লামীয় পুস্তকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিবার সবিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।… মুসলমান হিসাবে এ প্রদেশে আমাদের তিনটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাংলা ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের ধর্ম্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ।" ইহা মাননীয় আগা খাঁর উপদেশ মাত্র নহে—ইহা বাংলাভাষা সম্পর্কে আধুনিক মুসলমানদিগের মনোভাবের পরিচায়ক। ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলর মাননীয় আজিজুল হক সাহেবের বহু উক্তি এই মনোভাবের নিদর্শন স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে প্রতি ২০ জনে ৩ জন মুসলমান বাঙ্গালী এবং সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতি ৫ জনে ২ জন মুসলমান বাঙ্গালী। শুধু ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে অধিকসংখ্যক মুসলমান বাস করেন এবং অন্য যে কোন ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষা অধিকসংখ্যক মুসলমান মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করেন। কাজেই বাংলা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া মুসলমানেরা ইহার বিরুদ্ধতা করিতেন না এবং হিন্দু অথবা মুসলমান কোন দিক হইতেই বাংলাকে সাধারণ অথবা রাষ্ট্ররূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক আপত্তি উঠিতে পারিত না। হিন্দুস্থানীর ন্যায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাংলার নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া কোন প্রকার বিতণ্ডারও সৃষ্টি হইত না। ভারতবর্ষের আর কোন প্রাদেশিক ভাষার এই সুবিধা নাই। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাই সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমানের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। বাংলার অনুকূলে যদি আর কোন যুক্তি নাও থাকিত তবু, শুধু এই এক কারণেই বাংলা ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবী করিতে পারিত।

যদি সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিতে হয় তাহা হইলে যেভাবে হিন্দীভাষীদের সংখ্যা গণনা করা হয়, সেই ভাবে বাংলাভাষীদের সংখ্যার সহিত বাংলাবর্গীয় ভাষাগুলি যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদের সংখ্যা ধরিতে হইবে। বিহারী উড়িয়া এবং অসমিয়াকে বাংলার সহিত যোগ করিলে এবং হিন্দীর সংখ্যা হইতে বিহারীকে বাদ দিলে,

হিন্দীভাষীদের অপেক্ষা বাংলাভাষীরা সংখ্যান্যূন হইবেন না। অসমিয়া ত বাংলারই একটা বিভাষা মাত্র এবং বাংলা অক্ষরেই ইহা লিখিত হয়।

বিহারীর সহিত বাংলার সম্পর্কের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বাংলার প্রসিদ্ধ বিদ্যাপতির পদাবলী মৈথিলিতেই লিখিত—ইহাকে বাংলাই বলা যাইতে পারে। পূরবী-মগধী বাংলা অক্ষরে লেখা হয়। রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া বাংলার এই সকল নিকট-জ্ঞাতিকে লোকে হিন্দী-গোত্রীয় মনে করিতেছে। বাংলা ও বিহারের মধ্যে প্রাদেশিক বিদ্বেষও বিহারে বাংলা প্রচলনের অন্তরায় হইয়াছে। উড়িয়াদের পক্ষেও বাংলা শিক্ষা করা খুবই সহজ এবং শিক্ষিত উড়িয়ারা এখনও বাংলা শিখিয়া থাকেন। হিন্দীর সার্ব্বজনীনতা সম্পর্কে লোকের অস্পষ্ট ধারণার সহিত যেমন তথ্যের মিল নাই—তেমনই বাংলার প্রতি উপেক্ষা-সূচক ধারণার সহিতও তথ্যের মিল নাই।

সাধারণ অথবা রাষ্ট্রিক ভাষা নির্ব্বাচনের সময় আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার আছে। তাহা হইতেছে—নির্ব্বাচিত ভাষার সাহিত্যিক উৎকর্ষ। নিজেদের মাতৃভাষা ব্যতীত যাঁহারা অন্য একটি ভাষা পরিশ্রম করিয়া শিখিবেন তাঁহাদের শ্রম সার্থক হইবে যদি সেই ভাষার যথেষ্ট সাহিত্যিক উৎকর্ষ থাকে। যদি এই ভাষার সাহিত্য সম্পদ তেমন মূল্যবান না হয়—শ্রেষ্ঠ পুস্তকাদি ইহাতে রচিত না হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার শ্রম বহুল পরিমাণেই নষ্ট হইবে। এদিক দিয়া বিচার করিলে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার যোগ্যতাই নিঃসন্দেহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। হিন্দীর ন্যায় বাংলা যদি রাজনীতিক নেতাদের সমর্থন লাভ করিত—সমগ্র দেশে বাংলাভাষার চর্চ্চা হইত এবং বাংলা পুস্তকাদি বিক্রয়ের যদি বিস্তৃততর ক্ষেত্র প্রস্তুত হইত তবে বাংলাভাষার সাহিত্যিকসমৃদ্ধি এতদিনে আরও অনেক বাড়িয়া যাইত।

এ সকল সত্ত্বেও ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্দ্ধারণের সময় যে বাংলার গুরুত্ব কেহ উপলব্ধি করে নাই তাহার জন্য বাঙ্গালী নেতাদের ঔদাসীন্য এবং কংগ্রেসে তাঁহাদের প্রভাবহীনতাই প্রধানত দায়ী। বাংলার দাবীর কথা অন্যান্য প্রদেশ-বাসীদের স্মরণ না হইবার অন্য কারণ এই হইতে পারে যে, বাংলাভাষীদের সংখ্যা ও প্রভাব সত্ত্বেও ইঁহারা বলিতে গেলে বাংলার ভৌগলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। অন্যান্য প্রদেশ-বাসীদের বাংলা ভাষার সংস্রবে আসিবার সুযোগ খুব অধিক ঘটে নাই। যে সকল বাঙ্গালী অন্যান্য প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজী-শিক্ষিত লোক বলিয়া ইংরেজীর সাহায্যেই কাজ কর্ম্ম চালাইয়াছেন অথবা সহজেই নিজেদের কর্ম্মভূমির ভাষা শিখিয়া লইয়াছেন।

অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যেও যে বাংলা ভাষার কোন প্রসার ঘটে নাই—বাংলাভাষার প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের এতাবৎকালের ঔদাসীন্যই তাহার একমাত্র কারণ।

এই আলোচনা হইতে ইহা দেখা গেল যে, ভারতের সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা হইবার ন্যায়সঙ্গত দাবী হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর নাই এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একমাত্র বাংলাই এই যোগ্যতার অধিকারী। আমাদের যে সকল ত্রুটির জন্য বাংলা তাহার প্রাপ্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহার সংশোধনের জন্য হয়ত চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং বাঙ্গালীরা সচেষ্ট হইলে ইহার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন করাও অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু আসল কথা হইতেছে, সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ইংরেজীকে বর্জ্জন করিয়া কোন ভারতীয় ভাষাকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করা আদৌ সঙ্গত ও লাভজনক হইবে কি-না, সেই কথাটা ধীর ও নিরাসক্তভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কোন ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া যুক্তিবিরোধী কার্য্য করিলে শক্তি ও সময়ের বৃথা অপচয় ঘটিবে মাত্র।

পরিহাস বিজল্পিতম্

নাটক

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রাজনীতিক ও অধ্যাপক মল্ল-বেশে টাগ-অফ্-ওয়ার করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ; দড়ির দুই প্রান্ত দুইজনে ধরিয়া দাঁড়াইলেন—ডিরেক্টার ইঙ্গিত করিলে টান শুরু হইবে ; যে হারিবে তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার দাবীও হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইবে।

রাজনীতিক। হুকুম দিন।

অধ্যাপক। হুঃ প্রস্তুত আছি।

ডিরেক্টার। দেখুন, আমি ওয়ান, টু, থ্রি, বললেই আপনারা টানতে সুরু করবেন।

অধ্যাপক। বেবাক্ বুঝছি।

ডিরেক্টার। ওয়ান, টু

আধুনিক নারী। (সবেগে ও সা বেগে) থামুন, থামুন! এ আমি হ'তে দেব না! এ রজ্জু দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—সেই নন্দন বনের আদিম শয়তান সর্পের কথা ··

সাহিত্যিক। ইভের বংশধর না হ'লে একথা আর কে ভাবতে পারতো!

আধুনিক নারী। মনে পড়ে গেল—সেই শয়তান এসেছে আজ রজ্জুর, রূপ ধ'রে, রাষ্ট্রভাষার স্বর্ণ আপেল মুখে ক'রে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে কলহ বাধিয়ে দিতে। এতদিন আমরা সম্মিলিত জাতীয় পতাকার জ্ঞান-বৃক্ষের ছায়ায বেশ সুখে ছিলাম—শয়তান চায় আমাদের এই স্বর্গ থেকে বহিষ্কার—আনতে চায় আমাদের নামিয়ে—

সাহিত্যিক। প্রভিন্সিয়াল অটোনমির দগ্ধ পৃথিবীতে—

আধুনিকা। এতদিন আমাদের লজ্জা নিবারণ করতো বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা খাটো ডুমুরের পাতায়—এখন সে আমাদের পরাতে চায়—

ডাক্তার। বোম্বে আর আমেদাবাদের ক্যালিকো মিলের বসনের উদ্দেশ্য-ব্যর্থকারী ছায়াশরীরী বস্ত্র—

আধুনিকা। সেই শয়তান আমাদের শান্তিতে ঈর্ষিত হ'য়ে রক্তপাতহীন পৃথিবীতে বর্ষণ ক'রতে চায় ···

ডিরেক্টার। হিন্দুমুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী প্রথম রক্তস্রোত ···

আধুনিকা। সে চায় আমরা অনায়াস-লব্ধ স্বর্গত্যাগ ক'রে কোন্ দুরাশার মধ্যে—কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে—অজ্ঞাত কুলশীল—

সম্পাদক। অনিশ্চিত ফেডারেশনের স্বর্গের সিঁড়ির অগণিত সোপান ভেঙে উঠ্তে আরম্ভ করি!

ডিরেক্টার। ব্রেভো! ব্রেভো! মিস বেঙ্গল, আপনিই সেই ইভ।

সম্পাদক। এমন ইভ পেলে সকলেই আদম হ'তে চাইবে।

ডিরেক্টার। আজ আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বটে আদম আর ইভ! তাদের রক্ত আজও আমাদের ধমনীতে ছুটোছুটি করে মরছে—আর সেই সূত্রে আমরা ভাই-বোন্। কি বলেন মিস্ বেঙ্গল?

সম্পাদক। এ যে আপনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধে গিয়ে পৌছলেন।

ডিরেক্টার। এতে বিস্মিত হ'চ্ছেন কেন? বিশ্বভ্রাতৃত্ব সবচেয়ে সহজ—আর দ্রুত সেই যুগ আসছে! আমি প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি, তার আগে দুটো কথা বলে নি।—মিস বেঙ্গল, আপনার মধ্যে অলৌকিক অভিনয়-প্রতিভা নীহারিকারূপে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে, একটু চেষ্টা ক'রলেই সুসংহত হ'য়ে একটি নক্ষত্র রূপে তা ফুটে উঠবে—যাকে বাংলায় বলে ফিল্মষ্টার!

আধুনিকা। সেও কি সম্ভব?

ডিরেক্টার। সবচেয়ে যা অসম্ভব তাই যখন সম্ভব হয়েছে—

আধুনিকা। সেটা কি?

ডিরেক্টার। আপনার—সৃষ্টি।

'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে—ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী—
এ আনন্দচ্ছবি—যুগে যুগে ঢাকা ছিল
অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।"

অধ্যাপক। ওটা কি বাংলা কবিতা আওড়ালেন? তা আজকাল মন্দ কবিতা লেখা হ'চ্ছে না তো?

ডিরেক্টার। মিস্ বেঙ্গল, এই যে আপনি এখনি কথাগুলি বললেন—এতে আমার কার কথা মনে পড়ে গেল জানেন ? কুইন গ্রেটার ! গ্রেটা গার্বো ! অমন উদ্দীপনাময়ী কথা তো আর কাউকে বলতে শুনিনি।

আধুনিকা। আমি কি গ্রেটার সমকক্ষ ?

ডিরেক্টার। সমকক্ষ ! এক বৃন্তে আপনারা দু'টি ফুল ! কেবল কথার পরিমাণ কিছু কমিয়ে আনতে হবে, সিনেমাতে অত কথা মানায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন তো—এই চেয়ারটায় বসুন ; এই কাগজখানা হাতে নিন ; মনে করুন একখানা প্রেমপত্র এসেছে ; পড়লেন, কিন্তু পচ্ছন্দ হ'লো না—কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। এমন সময় শূন্য খামখানা খস্ খস্ ক'রে উঠল—তুলে দেখলেন ভিতরে একখান মোটা টাকার চেক্ ! বাস্, তখনি মনে এক অপূর্ব্ব অনুশোচনা ! আবার সেই চিঠির টুকরোগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোড়া দিতে লাগলেন। সবই পেলেন—কেবল ঠিকানাটা পেলেন না। তখন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র আবেগের সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলেন—"ঠিকানা ! ঠিকানা ! ওগো ঠিকানা কই !" করুন দেখি--

মিস্ বেঙ্গল মূকভাবে যথাসম্ভব পারদর্শিতার সঙ্গে এই ভাবটি লইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন ; ডিরেক্টার প্রয়োজন মত উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

আধুনিক। ঠিকানা ! ঠিকানা ! ওগো আমার প্রিয়তমের ঠিকানা কই !

সকলে। বাহবা ! ব্রেভো ! ওয়াণ্ডারফুল !

রাজনীতিক। খুবসুরৎ।

অধ্যাপক। মারহুস্ পাগ্‌লী !

ডিরেক্টার। সম্পাদক মশায়, এবার আপনার কথার উত্তর দিই। বিশ্বভ্রাতৃত্ব যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করতে পারে ত কেবল সিনেমা-জগৎই পারবে ?

সম্পাদক। সিনেমা ?

ডিরেক্টার। হ্যাঁ সিনেমা ! ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় অভিনেত্রীদের চেহারা দেখুন—সবই এক ছাঁদে ঢালা ; জন্ম থেকে হয়নি ; চর্চ্চার দ্বারা হ'য়েছে। আবার বড় বড় অভিনেতাদের চেহারা দেখুন—সব এক ছাঁদে ঢালা—চেষ্টার দ্বারা হ'য়েছে। অভিনেত্রীদের মূল ছাঁদ হচ্ছে—গ্রেটা গার্বো ; অভিনেতাদের—ম্যারিস বয়ার। তারপরে দেখুন সিনেমার দর্শক আর দর্শিকারাও বাড়ীতে গিয়ে আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের মুখের ছাঁচকে এই দুই ছাঁদে ঢালাই করবার চেষ্টা করছে ! ইতিমধ্যেই অসামান্য সাফল্য হ'য়েছে। যে-কোন বিলিতি মেয়ের ছবি দেখ্‌লেই গার্বোকে মনে পড়ে যায়—যে-কোন পুরুষের ছবি দেখলেই ম্যারিস বয়ারকে মনে পড়ে যায়। আর এ ঢেউ আমাদের দেশেও এসে পৌঁছেচে। আমি হিসেব ক'রে দেখেছি, পঞ্চাশ বছর এ রকম চললে পৃথিবীর দুশো কোটী অধিবাসীর চেহারা—দুটি মাত্র টাইপে এসে পরিণত হবে। তখন মনে করুন, অন্য কোন গ্রহ থেকে যদি এক জীব আসে তবে সে চেহারার এই সাম্য দেখে পৃথিবীর সব নরনারীকে ভাই-বোন মনে করবে। মনে করবে—এরা কোন আদিম দম্পতীর পুত্রকন্যা। বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর কাকে বলে ?

সাহিত্যিক। অহো মহতী ধারণা।

ডিরেক্টার। আর এই নব বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্ম ইডেন অরণ্যে নয়। পবিত্র এক অরণ্যে যার নাম হ'চ্ছে হলীউড্।

সম্পাদক। আপনি তো কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাইরের ঐক্যের কথা বললেন ! জ্ঞানের ঐক্য করবো আমরা—আমরা যারা জর্নালিষ্ট। আর পঞ্চাশ বছর খবরের কাগজ চললে দেখবেন, এই বিশ্বপরিবারে ভাই-বোনদের জ্ঞান এক লেভেলে এসে দাঁড়িয়েছে—সবাই এক কথা বলছে, সবাই এক কথা ভাবছে, সবাই এক পথে চল্‌ছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুগের কথা পড়েছেন—গোলডেন্ এজ, কপার এজ, ষ্টোন এজ, ব্রোঞ্জ এজ, আয়রণ এজ—এবারে আসছে পেপার এজ।

রাজনীতিক। আপনারা একজন দিলেন চেহারা, একজন দিলেন জ্ঞান—আর এই বিশ্বপরিবারে আমি দেবো ভাষা—আর পঞ্চাশ বছর এমন চললে সবাই রাষ্ট্রভাষা বলতে আরম্ভ করবে—নইলে পৃথিবীর উন্নতি নেই—

ডিরেক্টার। পৃথিবীর উন্নতি ভাষায় হবে ! অসম্ভব !

রাজনীতিক। তবে কিসে ?

সম্পাদক। আমি জানি—আমার জীবন-চরিত প্রচারে—

সাহিত্যিক। আমি জানি—আমার কাব্যগ্রন্থ প্রচারে—

অধ্যাপক। আমি জানি—কেতাবী ভাষার কেল্লায় গ্রাম্য শব্দের প্রবেশে—

ডাক্তার। আমি জানি—পৃথিবীর লোককে আমার ডাক্তারখানায় এনে হাজির করাতে—

সকলে। কেন ?

ডাক্তার। চিকিৎসা করে সবগুলোকে মেরে ফেলবো। আর পৃথিবী জনশূন্য হ'লেই পৃথিবী সমস্যাশূন্যও হবে।

আধুনিকা। আমি জানি—আমার পঞ্চাশ লক্ষ ছবির বিতরণে—

ডিরেক্টার। আপনারা কেউ জানেন না।

সকলে। কি রকম ?

ডিরেক্টার। কখনো ভেবে দেখেছেন কি ? ইউরোপ কেন উন্নত আর ভারতবর্ষ উন্নত নয় ? ভেবেছেন ? ইউরোপের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যা ভারতের নাই ? যা ইউরোপের প্রত্যেক নরনারীর আয়ত্ত, অথচ ভারতের নয় ? জানেন ?

আধুনিকা। জানি বই কি ? লিপষ্টিক—

সাহিত্যিক। জানি বই কি ? অভিধান—

রাজনীতিক। জানি বই কি ? লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙকা।

সম্পাদক। জানি বই কি, খবরের কাগজ—

অধ্যাপক। জানি বই কি ? গ্রাম্য ভাষা—যাকে বলে স্ল্যাং—

ডাক্তার। জানি বই কি, জন্মনিয়ন্ত্রণ—

ডিরেক্টার। কিচ্ছু জানেন না—কেউ জানেন না—

সকলে। তবে আপনিই বলুন।

ডিরেক্টার। ইউরোপের উন্নতির কারণ নাচ, নৃত্য—যাকে বাংলায় বলে ড্যান্স! ওই একটিমাত্র বস্তুর দ্বারা ইউরোপ আর ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র! নাচ, নৃত্য, ড্যান্স।

সম্পাদক। নাচ ?

ডিরেক্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার বাণী ভারতবর্ষ এখনো শুনুক, নাচতে শিখুক! পায়ের বেরি বেরি সারবে, কোমরের বাত সারবে, মনের ঘুণ দূর হবে!

সম্পাদক। সে কি মশায়!

ডিরেক্টার। বিশ্বাস তো হবেই না! আচ্ছা বলুন, ইউরোপ আমাদের চেয়ে এমন বেশী কি আর জানে ? আমার কথা এখনো শুনুন—আমি আগামী কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবো—এতে বোমা নেই, বন্দুক নেই, চরকা নেই, খদ্দর নেই; এতে শ্রমিক নেই, ধনিক নেই; এতে বুর্জোয়া নাই, কম্যুনিষ্ট নাই; যেখানে যে আছেন নাচতে সুরু করুন! আর সে নাচও এমন কিছু নয়—ওয়ালৎস, পলকা আর ফক্স ট্রট্

এই বলিয়া সে একটি গানের কলি গুন্‌গুন্ করিয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে হঠাৎ নাচিতে আরম্ভ করিল

আসুন না ? আজ এখান থেকেই আরম্ভ করা যাক্। কে আসবেন আসুন!

এই বলিয়া সে এক একজনকে ধরিতে যায়—আর সে পলাইয়া যায়—অবশেষে সে স্থূলকায় সম্পাদককে ধরিয়া ফেলিল

আসুন সম্পাদক মশায়! দেশের জন্য নাচা যাক্।

সম্পাদক। আহা ছাড়ো।

ডিরেক্টার। ছাড়বো কেন ? দেশের জন্য কত জনে কত কঠিন কাজ করেছে, জেলে গিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে—আর আপনি নাচতেও পারবেন না! ধিক্!

সম্পাদক। আহা কর কি!

কিন্তু কে-কার কথা শোনে, ডিরেকটার আড়াইমণি সম্পাদককে জড়াইয়া ধরিয়া ইউরোপীয় নৃত্যের প্যাঁচে বন্ বন্ করিয়া পাক খাইতে লাগিল

ডিরেক্টার। 'তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে নদী—এক, দুই, তিন'!

সম্পাদক। আহা লাগে যে!

ডিরেক্টার। লাগে লাগুক। মনে রাখবেন, এ নাচ সখের নাচ নয়—'তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে নদী—এক, দুই, তিন!'

সম্পাদক সশব্দে ছুটিয়া পড়িয়া গেল

ডিরেক্টার। নাঃ আপনি কোন কাজের নন! আসুন দেখি মিস বেঙ্গল!

তখন মিস বেঙ্গল ও ডিরেক্টার দ্বৈতনৃত্য আরম্ভ করিল; মিস বেঙ্গলের ধাপ ফেলা দেখিয়া বোঝা যায়—এ বিদ্যা তার অনায়ত্ত নয়; দুইজনে বন্ বন্ করিয়া ঘরময় পাক খাইতে লাগিল—অন্যান্য সকলে সম্ভ্রমে ও ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল

উভয়ের দ্বৈতনৃত্য

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া থামিল; তখন সকলে আশ্বস্ত হইল

রাজনীতিক। (উত্তেজিত ভাবে) নাচো, নাচো, খুব নাচো। এই জন্যই বাংলাদেশ আজ ভারতবর্ষের বিদূষকের

স্থান অধিকার করেছে। নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার, খেলা, খেলা আর খেলা! বাঙ্গালীর মত নাচতে আর কেউ পারে না। এখন আর থিয়েটারের নটীদের নাচ বাঙ্গালীর ভাল লাগে না; কলেজের মেয়েদের নাচ চাই! স্কুলের মেয়েদের নাচ চাই! নাচ আর গান; জোরে, আরও জোরে; অন্য দেশের কে কি বলছে সেকথা যেন কানে ঢুকতে না পায়। 'নঙ্গাশির বঙ্গালী!' 'কেরানী ঔর গোলাম বঙ্গালী!' কে কি বলছে শুনেও শুনো না। প্রবাসী বাঙ্গালীদের আবার দেশে ফিরে আসবার সময় উপস্থিত; স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর স্বদেশে জায়গা নেই! না—না—এসব দেখেও দেখো না! চোখ দিয়েছ সিনেমাতে বাঁধা; হাত দিয়েছ মাড়োয়ারীকে বাঁধা; মুখ দিয়েছ গজলে বাঁধা; কাণ দিয়েছ রেডিওতে বাঁধা; পা দুটো খালি আছে—তাই বা খালি থাকে কেন? নাচো—নাচো—খুব নাচো! হিন্দি শিখবে কেন? শিখ্‌লে যে বিদেশের গালাগালি বুঝতে পারবে—ও সব না শেখাই ভাল!

ডিরেক্টার। আর মরি তো নাচতে নাচতেই মরবো।

রাজনীতিক। শীঘ্র মরো—ভাঁড়ের নাচ বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সম্পাদকের
কাণে কাণে কি যেন বলিয়া গেল

সম্পাদক। এবার সকলে চলুন! আহারের ডাক পড়েছে। তার আগে আমি একটা কথা বলি। বাঙ্গালীর এত অপদস্থ বোধ করবার কোন কারণ নেই! ভারতবর্ষের সভ্যতায় বাঙ্গালীর দান তুচ্ছ নয়, ভারতবর্ষ যদি বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রভাষা দেয়—বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে দিয়েছে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত।

রাজনীতিক ছাড়া সকলে। হুর্‌রে!

সম্পাদক। আর যদি রাষ্ট্রভাষা অন্য প্রদেশের হাত থেকেই গ্রহণ করতে হয় বাঙ্গালী তা বিনা মূল্যে নেবে না—বাঙ্গালী দেবে ভারতের জাতীয়তার অভিযানের যুদ্ধ সঙ্গীত!

অধ্যাপক। সে তো আছেই—বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত—

সম্পাদক। কালক্রমে তাতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ও গান এখন অচল!

অধ্যাপক। তবে?

সম্পাদক। আমি বলছি—আপনারা সকলে সারবন্দি হ'য়ে দাঁড়ান—যেন যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছেন!

সকলে তথা দাঁড়াইল

সম্পাদক। উঁহুঁ হ'ল না—লেডিস্ ফার্ষ্ট!

সেই রকম ভাবেই দাঁড়াইল; সম্পাদক সারির পার্শ্বে নায়কের
স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল।

সম্পাদক। মিস বেঙ্গল, আপনার চাবির গোছাটা আমাকে দিন তো।

তথাকরণ

নিন্, এইবার সকলে আরম্ভ করুন! আমি আগে একছত্র গাইবো—আপনারা আমার অনুসরণ করবেন!

সকলে অবহিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল

সম্পাদক। দূর থেকে তারে বাসবো ভাল জানতে দেবো না!

লেফ্‌ট্, রাইট্, লেফ্‌ট্···

সকলে মার্চ্চ করিতে গাহিল

সম্পাদক। 'রাশি রাশি লিখবো চিঠি পোষ্ট করবো না' লেফট্, রাইট্, লেফট্···

সকলের মার্চ্চ ও গান

সম্পাদক। জানলা দিয়ে মারবো উঁকি দেখতে পাবে না!

লেফট্, রাইট্, লেফট্···

সকলের মার্চ্চ ও গান

সম্পাদক। 'বাসের পাশে পাশে সাইক্ল চালাবো—বুঝতে পাবে না!'

লেফট্, রাইট্, লেফট্··· *

সকলের মার্চ্চ ও গান; এইরূপে সকলে ষ্টেজটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া সম্পাদকের নির্দ্দেশে ধীরে ধীরে সারিবন্দী ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা বাহির হইয়া গেলে যবনিকা পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম অঙ্কের বর্ণিত হল-ঘর; অভিনয়ান্তে দর্শকগণ, অর্থাৎ মেয়র, ক্রিটিক, প্রকাশক, রিপোর্টার সবেগে সোল্লাসে প্রবেশ করিলেন; মুখ দেখিয়া মনে হয় এমন নাটক তাঁরা কখনো দেখেন নি

মেয়র। ওয়াণ্ডারফুল!

---

* এই গানটি আমার কোনো বন্ধুর রচনা।

ক্রিটিক। এক্‌সেলেণ্ট!

প্রকাশক। সুপার্ব!

রিপোর্টার। গ্র্যাণ্ড!

মেয়র। কি চমৎকার প্লট!

ক্রিটিক। কি তীক্ষ্ণ বাক্যভঙ্গী।

প্রকাশক। কাঁদিয়ে ফেলে এমন হাস্যরস—

রিপোর্টার। কি সুনিপুণ অভিনয়।

রিপোর্টার সকলের মতামত লিখিয়া লইতে থাকিবে

মেয়র। বাংলা নাটক বহুকাল দেখিনি—এর মধ্যে নাট্যকলা কতদূর এগিয়ে গিয়েছে—

ক্রিটিক। আপনার এ কথা আমি স্বীকার ক'রতে পারলেম না; এ নাটকখানাকে সাধারণ বাংলা নাটকের টাইপ ব'লে গ্রহণ করবেন না—এ একটা অসাধারণ কিছু।

প্রকাশক। ফর্মা-পিছু চার আনা দাম ফেললেও এ বই হু হু ক'রে বিক্রী হ'য়ে যাবে।

ক্রিটিক। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন—চিন্তার খোরাক আর হাস্যরস কেমন কৌশলে মিশিয়ে দিয়েছে।

মেয়র। ওয়াণ্ডারফুল! রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা।

প্রকাশক। আমি তো অধ্যাপকের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত; বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।

ক্রিটিক। নাট্যকার যেই হোক, সে এ কথা বুঝেছে, বাঙ্গালী দর্শককে ভাববার কথা বললেই তারা ঘুমিয়ে পড়বে—তাই হাসাতে হাসাতে অজ্ঞাতসারে ভাবিয়ে তুলেছে।

মেয়র। নাট্যকার কে তা আমি ধ'রে ফেলেছি—নিশ্চয় গিরিশ ঘোষ।

প্রকাশক। সে কি! তাঁর তো অনেকদিন তিরোধান হ'য়েছে!

মেয়র। তা হবে! আমাদের সভাতে শোকপ্রস্তাব পাশ না হ'লে কে মরল, আর কে বাঁচল ঠিক থাকে না।

ক্রিটিক। কি বলছেন! গিরিশ ঘোষ? অসম্ভব! এ নাটক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও পক্ষে লেখা অসম্ভব। দেখলেন না এতে 'চিরকুমার সভা'র বাক্‌ভঙ্গী কেমন স্পষ্ট!

প্রকাশক। 'চিরকুমার সভা'র অনুকরণ করলেও তা সম্ভব হ'তে পারে! আমার দৃঢ় ধারণা, এ রবি মৈত্রের রচনা!

মেয়র। ওয়াণ্ডারফুল! আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবো। আর যদি সত্যি হয়, তাঁর নামে একটা পার্কের নামকরণ করে দেবো!

প্রকাশক। নামকরণ করতে পারেন—কিন্তু দেখা হবে না—

মেয়র। আলবৎ হবে! মেয়র দেখা করতে গেলে দেখা করবে না এমন জীবিত মানুষ কে আছে?

প্রকাশক। ঠিক ধরেছেন। সে অনেক দিন হ'ল মারা গেছে।

ক্রিটিক। ওসব বাজে কথা! এ নাটক শচীন সেনের এবং মন্মথ রায়ের। নাটকের সমালোচনা ক'রে চুল পাকালাম—আমার চোখ এড়ানো সহজ নয়!

মেয়র। দুজনের একসঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়।

ক্রিটিক। কেন নয়? একজনে প্লট রচনা করেছে, আর একজনে কথোপকথন লিখেছে। তবে কে কোন্‌টার জন্য দায়ী তা এখন বলতে পারছি না।

মেয়র। দুজনে একসঙ্গে নাটক লিখবে কি মশায়!

প্রকাশক। আপনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন না ব'লেই বিস্মিত হচ্ছেন। আমি একখানা যুগান্তরকারী বাংলা নাটকের নাম জানি যা সাতান্ন জনে লিখেছে।

সকলে। সাতান্ন?

প্রকাশক। হ্যাঁ সাতান্ন। থিয়েটারের ম্যানেজার থেকে আরম্ভ ক'রে ষ্টেজের ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সবাই দু-চার লাইন ক'রে ভ'রে দিয়েছে!

মেয়র। শত্রুরা মিথ্যা বলে যে বাঙ্গালীরা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ ক'রতে পারে না। কিন্তু তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রন্থের উপরে যার নাম থাকবে সে গ্রন্থকার না হ'তেও পারে!

প্রকাশক। ওর উল্টোটাই সাধারণ নিয়ম ব'লে ধ'রে নেবেন! গ্রন্থের উপরে যার নাম, সাধারণত সে গ্রন্থকার নয়!

মেয়র। এমন জানলে তো আমিও বই লিখতে আরম্ভ করতে পারি।

প্রকাশক। অবশ্যই পারেন। বিশেষ স্কুল-কলেজের টেক্সট বইয়ের গ্রন্থকার-হিসাবে যার নাম, নিশ্চয় জানবেন

সে বই লেখেনি। যে সব লোক তিন-চার বছর হ'ল মারা গেছেন—প্রতিদিনই তাঁদের নূতন নূতন বই বেরোচ্ছে।

মেয়র। কিন্তু তা হ'লে নাটকের অথার কাকে ঠিক করলেন ?

রিপোর্টার। আমি একটা সাজেস্‌শন্ দিতে পারি !

সকলে। কি ? কি ?

রিপোর্টার। সেই যে একজন লেখক আছে—নামটা ঠিক মনে আসছে না—যে বার্নার্ড শ'র নকল ক'রে লেখে, আর নিজেকে···

ক্রিটিক। ঠিক নিজেকে বার্নার্ড শ'—মলিয়েরের সমকক্ষ মনে করে—কি নামটা যেন—

প্রকাশক। হাঁ, হাঁ, নামটা, তাই তো নামটা—

মেয়র। যখন নাম কারোরই মনে আস্‌ছে না—তখন নিশ্চয় নামকরা লোক নয়—

রিপোর্টার। ঠিক বলেছেন ! আমার মনে হয় তারই লেখা !

ক্রিটিক। কি যে বলছেন তার ঠিক নেই ! তার নাটক আমি পড়েছি, দেখেছি, সে কি লিখতে পারে ? না আছে পারস্‌পেক্‌টিভ জ্ঞান, না আছে চরিত্রবোধ, আর না আছে এমন বাক্‌ভঙ্গী !

রিপোর্টার। কিন্তু তার নামটা কি ?

ক্রিটিক। নাম যাই হ'ক—লোকটার Intellectual hydrecaphaulocs হয়েছে !

রিপোর্টার। কথাটা এখনি নাটক থেকে শিখলেন !

ক্রিটিক। অপমান করবেন না মশায় !

রিপোর্টার। কাকে অপমান করলাম ?

ক্রিটিক। আমাকে, বাংলা নাটককে, বাংলা দেশকে !

রিপোর্টার। সে কি মশায় ?

ক্রিটিক। তবে কেন বললেন যে, আমি বাংলা নাটক থেকে এটা শিখলাম !

রিপোর্টার। তাতে কি হয়েছে ?

ক্রিটিক। কি হয়েছে ? বাংলা নাটক থেকে কেউ কখনো কিছু শিখেছে ?

প্রকাশ। হিয়ার ! হিয়ার !

ক্রিটিক। নাটক থেকে কোন দিন কিছু শেখা যায় ! নাটক কি স্কুল নাকি ?

মেয়র। তবে নাটকের উদ্দেশ্য কি ?

ক্রিটিক। আর যাই হোক শিক্ষা দেওয়া নয়। সে জন্য স্কুল আছে, কলেজ আছে, ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আছে, ব্রাহ্ম-সমাজ আছে, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক আছে ! নাটক দেবে আনন্দ।

মেয়র। সে যে মস্ত কথা হ'ল।

ক্রিটিক। মস্ত ভেবেই সমস্ত নষ্ট করেছেন !

মেয়র। তবে আনন্দ কি ?

ক্রিটিক। আনন্দ যে কি তা একবার বাংলা থিয়েটারে গিয়ে দেখে আসুন। আনন্দ হচ্ছে—অন্ধগায়কের গান, সাধ্বী বারাঙ্গনার উৎকণ্ঠা, গৃহী বারাঙ্গনার নৃত্য, আর নারীর অশ্বারোহী বেশে আবির্ভাব। আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে ড্রেসিং গাউনে, হোস পাইপে গঙ্গার অকস্মাৎ অবতরণে ; আর সমস্যানাটকের নামে কতকগুলো অসমস্যার ভেজাল বিতরণে ! ওই যে লেখকটার নাম কারো মনে পড়লো না—আমার অবশ্য পড়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে বলবার মত মরাল কারেজ আমার নেই, সেই লোকটার প্রধান দোষ—সে নাটকে শিক্ষা দিতে চায় ! আমার বিশ্বাস, লোকটা স্কুল মাস্টার—তাই দর্শকদের উপরও মাস্টারি করতে চায়।

মেয়র। আহা রাগ করবেন না মশায়—আমরা তো ভুলভ্রান্তি করবোই—আমরা যে সাধারণ লোক। আচ্ছা, এই নাটকটাকে আপনি কোন্ শ্রেণীর মনে করেন ?

ক্রিটিক। এ তো মস্ত ট্র্যাজেডি।

মেয়র। ট্র্যাজেডি !

ক্রিটিক। ট্র্যাজেডি বই কি ? বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, তারই পূর্ব্বাভাস !

প্রকাশক। একথা আমার মনে ধরছে না। এতো নিছক রাজনৈতিক নাটক ! মহাত্মাজী আর সুভাষবাবুর দ্বন্দ্ব এর উপজীব্য।

মেয়র। আর আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন—তো বল্‌তে পারি নাটকখানা রূপক ছাড়া আর কিছুই নয় ! জীবাত্মা হচ্ছে অধ্যাপক, আর পরমাত্মা হ'চ্ছে রাজনীতিক ; আর সকলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু।

রিপোর্টার। ওসব কিছু নয় মশায় ! আমার বিশ্বাস, নাটকখানা একটা স্যাটায়ার ! আমাদের নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

ক্রিটিক। প্লিজ মাইণ্ড ইয়র অউন্ বিজ্‌নেস্! যে বিষয়ে কিছু জানেন না তা নিয়ে আলোচনা করতে আসবেন না!

রিপোর্টার। ভেরি সরি!

মিনি ও মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ ; তাদের দেখিয়া সকলে আগ্রহাতিশয্যে মুখর হইয়া উঠিল ; কে আগে অভিনন্দন জানাইবে, কে কি ভাবে অভিনন্দন জানাইবে—ভাবিয়া পাইতেছে না

মেয়র। কনগ্র্যাচুলেশনস্ মিস্ সোম!

ক্রিটিক। বহু ধন্যবাদ!

প্রকাশক। আন্তরিক অভিনন্দন!

রিপোর্টার। চমৎকার!

মেয়র। এমন নাটক আমি জীবনে দেখিনি!

ক্রিটিক। বাংলা নাট্য-জগতে যুগান্তর এনেছে!

প্রকাশক। এরকম নাটক প্রকাশিত হ'লে সাহিত্যে বিপ্লব উপস্থিত হবে।

রিপোর্টার। আমি আগাগোড়া কেবল নোট নিয়েছি।

মিনি। আপনাদের ভাল লেগেছে জেনে আশ্বস্ত হলাম।

মেয়র। ভাল ব'লে ভাল! বলুন না ক্রিটিক, কিরকম ভাল!

ক্রিটিক। আমি শুধু এই মাত্র বলতে পারি, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে বলতে হবে যে এখানে, আজ আপনার বাড়ীতে বাংলা নাটকের গোড়া পত্তন হ'ল।

মিনির প্রণয়ী। নিজেদের গুণেই আপনাদের ভাল লেগেছে। সত্যি কি আর যত ভাল বলছেন তত ভাল হয়েছে?

ক্রিটিক। কি বলছেন মশায়! পারফেক্ট পার্স্‌পেক্‌টিভ্! এমনটি কখনো দেখিনি।

মেয়র। আর মিস বেঙ্গল ও ডিরেক্টারের দ্বৈতনৃত্যকে আমি রূপক বলে মনে করি। ওটা আর কিছু নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনের নৃত্য!

মিনির প্রণয়ী। এ কথা আমাদের মনে হয়নি।

প্রকাশক। আর রাজনীতিক যে বাঙ্গালীকে এমন ক'রে গাল দিলেন—আপনি কি ভাবতে পারেন, বাঙ্গালী ছাড়া বাঙ্গালীকে আর কেউ এভাবে গাল দিতে পারত!

মিনি। ওতে কি শিখবার কিছু নেই?

ক্রিটিক। নাটক থেকে আবার শিখবেন কি? নাটক হ'চ্ছে নাটক!

মিনি। নাটক কি জীবনের ছায়া নয়?

ক্রিটিক। ও সব আপনাদের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের শেখা বুলি! শুনতে বেশ লাগে! কাজের নয়। আর বাংলা পেশাদার নাটক দেখেন নি বলেই ওকথা বলতে পারলেন! আমার কথা যদি শোনেন—তবে বলি, নাটক আর জীবন দুই সতীন। সর্ব্বদা চুলো-চুলি, ঝগড়া, একদণ্ড দুইজনের বনে না—

মিনির প্রণয়ী। সে বোধ হয় বিশেষ ক'রে বাংলা নাটক!

ক্রিটিক। বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও নাটক আছে নাকি?

মেয়র। মিস সোম, এবার বলুন নাট্যকারের নাম কি?

মিনি। নামটা এখনো বলব না। পাছে নাম শুনে আপনারা বিচার করেন এই ভয় করছি।

মেয়র। সে একটা কথা বটে। কিন্তু নামটা না শুনলে ভাল লাগাটা যে উচিত হ'য়েছে তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

ক্রিটিক। নাম বলুন আর নাই বলুন—রচনার ষ্টাইল তো লুকোতে পারেন নি—এ আমার পরিচিত ষ্টাইল।

মিনির প্রণয়ী। তা হ'লে তো দেখ্‌ছি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে—ধ'রে ফেলেছেন।

ক্রিটিক। ধ'রে না ফেললেই বিস্মিত হ'তাম।

মিনি। কিন্তু আপনাদের আর একটু কষ্ট দেবো।

মেয়র। আজকের এই আনন্দের পরে কোন কষ্টই আর কষ্ট ব'লে মনে হবে না।

মিনি। অভিনেতাদের মধ্যে যে তিন জন সব চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন, তাদের তিনটি পদক উপহার দিতে হবে।

মেয়র। এ তো নিতান্ত উচিত। অভিনেতারা কোথায়?

মিনি। আমরা তাঁদের নিয়ে আসছি। আপনারা ততক্ষণ নামগুলো নির্ব্বাচন ক'রে রাখুন।

মিনির প্রণয়ী। এই রাখুন পদক তিনটি।

মেয়রের হাতে তিনটি পদক দিল

মিনি। তা হ'লে আমরা আসি।

দুজনের প্রস্থান

মেয়র। বলুন ক্রিটিক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিন জন কে কে?

ক্রিটিক। এ তো সহজ কথা। বীররসের জন্য অধ্যাপক, করুণরসের জন্য রাজনীতিক, আর হাস্যরসের জন্য সম্পাদক! আপনাদের কি মত শুনি?

মেয়র। বাস্তবিক সম্পাদক যে এমন আশ্চর্য্য বিদূষকের অভিনয় করবে ভাবতে পারিনি।

প্রকাশক। আর অধ্যাপকের বীররসের পার্ট! উনি পেন্সন নেবার পরে যাত্রাদলের ভীমের অভিনয় করতে পারবেন!

মেয়র। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন! যে দেশের অধ্যাপকেরা এমন বীর, সে দেশের ছাত্রেরা কিন্তু সে মাপের হ'চ্ছে না!

রিপোর্টার। কি বলছেন! ফরাসীদুর্গ বাস্তিল আক্রমণের ছবি দেখেছেন?

মেয়র। না।

রিপোর্টার। তবে একদিন হরতালের সময় কলেজের দৃশ্য দেখে আসবেন।

মেয়র। আচ্ছা সম্পাদককে বেছে বেছে কেন বিদূষকের পার্ট দেওয়া হ'ল!

ক্রিটিক। এটা আর বুঝলেন না! আধুনিক ডিমোক্রেসীর গণরাজের সভায় সম্পাদক হ'চ্ছে বিদূষক। নইলে অমন প্রলাপ কি আমরা আর কারো মুখ থেকে সহ্য করতে পারতাম।

এমন সময় তথাকথিত অভিনেতাদলকে লইয়া মিনি ও
মিনির প্রণয়ী প্রবেশ করিল

মেয়র। আসুন! আসুন! ওয়াণ্ডারফুল!

ক্রিটিক। সুপার্ব! এমনটি আমি আর দেখিনি!

প্রকাশক। কি চমৎকার ডায়োলগ্!

রিপোর্টার। আমি একটি কথাও বাদ দিইনি!

সম্পাদক। কি বলছেন?

মেয়র। আপনাদের অভিনয়ের কথা।

সম্পাদক প্রভৃতি অভিনেতাগণ। অভিনয়? অভিনয় কোথায়?

ডাক্তার। বুঝেছি, আমাদের কথাবার্ত্তাগুলো—

মেয়র। ওকে আপনারা যে নামই দিন্ না কেন—গুণ সমানই থাকে!

সম্পাদক। আমরা যা করলুম সেটা কিন্তু মোটেই নাটক নয়।

মেয়র। সে তো আমরা আগেই জানি।

ক্রিটিক। মিস বেঙ্গল, আর মিঃ ডিরেক্টার! এমন সুন্দর দ্বৈতনৃত্য আর কখনও দেখিনি!

মেয়র। কনগ্র্যাচুলেশনস্ অধ্যাপক! আপনার বীররসের ভূমিকা অনবদ্য!

অধ্যাপক। জয় ১৯০৫! এতদিনে লোকে আমাকে বুঝতে পারছে!

রিপোর্টার। আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

অধ্যাপক। দেখে কি মনে হয়?

রিপোর্টার। আমি আড়াই কাঠা জমির উপরে তেতালা একখানা বাড়ী তৈরি করবো—ক'হাজার ইট লাগ্‌বে বলতে পারেন?

অধ্যাপক। আমাকে এ প্রশ্ন কেন?

রিপোর্টার। আমি তো শুনেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এ বিষয়ে সবাই বিশেষজ্ঞ।

মেয়র। বাংলাদেশ যদিও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা ব'লে গ্রহণ করবে না, কিন্তু আপনার থিওরিটা মান্‌তে রাজি আছে।

রাজনীতিক। এর চেয়ে বেশী আর কি আমি আশা করতে পারি। কংগ্রেসও এর বেশী আশা করে না--সে ইংরেজকে বলছে—স্বাধীনতা দাও আর নাই দাও—অন্তত দেবে ব'লে মুখে একবার স্বীকার কর।

মেয়র। আমি এই পদকটি বিদূষকের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে উপহার দিতেছি।

সম্পাদক। আমি বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে যাবো কেন?

ক্রিটিক। ঠিক! আপনি অভিনয় করতে যাবেন কেন? ওটাই আপনার স্বাভাবিক ভূমিকা।

সম্পাদক। দাঁড়ান ভেবে দেখি—আমাকেই বিদূষক বললেন নাকি?

ক্রিটিক। বলা আর না বলাতে কি আসে যায়!

মেয়র পিন দিয়া সম্পাদকের বুকে আঁটিয়া দিলেন

মেয়র। বীররসের জন্য অধ্যাপক মহাশয়কে এই পদক,

আর করুণরসের জন্য রাজনীতিককে এই পদক উপহার দিতেছি।

তাহাদের বুকে আঁটিয়া দিলেন

ডাক্তার। আমাদের আলাপ-আলোচনাকে কি অভিনয় ব'লে মনে হচ্ছিল?

ক্রিটিক। মোটেই হচ্ছিল না; সে-ই তো ওর বৈশিষ্ট্য। দেখুন না কেন, সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অভিনয় ব'লে মনে হয়, আর আপনাদের অভিনয়কে সাধারণ জীবনযাত্রা ব'লে মনে হচ্ছিল---

ডাক্তার। আমাকে বেশী বিরক্ত করবেন না। আমি ডাক্তার! আপনাকে খুন ক'রে ফেললেও আপনারই দোষ হবে। পোষ্ট-মর্টেম-এ প্রমাণ হবে, হয় আপনার হার্ট দুর্ব্বল ছিল, নয় তো লিভার পচে গিয়েছিল!

মিনি। (অভিনেতা-দলের প্রতি) আপনারা দয়া ক'রে আসুন—ওই ঘরে আপনাদের বস্‌বার জায়গা হয়েছে।

অভিনেতারা যাইতে আরম্ভ করিল—হঠাৎ বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সম্পাদক বলিল

সম্পাদক। মশায়রা, আমাকে ঠাট্টা করলেন কি-না বুঝতে পারছি না। বাড়ী ফিরে গৃহিণীর সঙ্গে একবার আলোচনা করব—যদি ঠাট্টা বলে মনে হয়—তবে হাঁ, দেখতে পাবেন।

মেয়র। কি দেখব?

সম্পাদক। কালকের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভটা একবার দেখবেন – একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবেন—।

প্রস্থান

মেয়র। নাঃ, সম্পাদকের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত হয়নি। সামনেই আমার ইলেকসন্—

প্রকাশক। ঠিক বলেছেন—পুস্তক-পরিচয় নাম দিয়ে আমার প্রকাশিত বইয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলো বের হয়—এর পরে হয়তো তা হবে না।

ক্রিটিক। ওহে রিপোর্টার! ওগুলো চেপে দিও।

রিপোর্টার। বলাই বাহুল্য; আমারও প্রাণের ভয় আছে।

মিনি ও মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মেয়র। মিস সোম, এইবার বলুন নাটকটার লেখক কে?

ক্রিটিক। যেই হোক, সে একজন গ্রেট ড্রামাটিস্ট্

মেয়র। গ্রেট ড্রামাটিস্ট্! সর্ব্বনাশ!

ক্রিটিক। চমকিয়ে উঠলেন কেন?

মেয়র। চমকাবো না? আমার তো আর রাস্তা নেই।

ক্রিটিক। রাস্তা? কিসের?

প্রকাশক। পালাবার?

মেয়র। না মশায়। বাংলা দেশে কেউ গ্রেট কিছু হয়েছে কি, আমার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এইবারে সবাই বলবে, তার নামে একটা রাস্তার নামকরণ ক'রে দাও! এখন বাংলা দেশে প্রতি বছরে ডজনখানেক গ্রেট ম্যান্ বেরুচ্ছে—এত রাস্তা আমি পাই কোথায়? হায়! হায়! সামনে আবার ইলেকসন্ আসছে!

অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া বসিয়া পড়িলেন

মিনির প্রণয়ী। আপনি বৃথা ভয় করছেন—এর কোন লেখক নেই।

প্রকাশক। লেখক নাই! তার মানে?

ক্রিটিক। মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। বেদ যেমন অপৌরুষেয় —এ নাটকও তেমনি অপৌরুষেয়! স্বর্গীয় প্রেরণা ব্যতীত এমন জিনিষ লেখে কার সাধ্য?

প্রকাশক। ওসব বুঝিনে! লেখক নেই তো নাটক এলো কোথা থেকে?

মিনি। এ তো মোটেই নাটক নয়।

প্রকাশক। হাঁ—নাটকের নাম তো তাই বটে।

মিনি। নাটক কোথায় দেখলেন?

মিনির প্রণয়ী। ওটা যে নাটক তা কে বল্‌লে?

প্রকাশক। তার মানে?

মিনির প্রণয়ী। ওঁরাও আপনাদের মত অতিথি। আপনারা ছিলেন উইংসের আড়ালে—ওঁরা ছিলেন ষ্টেজের উপরে—এইটুকু যা প্রভেদ!

মিনি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলছিলেন—আপনারা তাকেই নাটক ব'লে মনে করেছেন!

মিনির প্রণয়ী। আপনাদের সঙ্গে পরিহাস করেছি—সে অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

প্রকাশক। আপনাদের কোন্‌টা যে পরিহাস, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্রিটিক। ইম্‌পসিব্‌ল্‌! অমন পারস্‌-পেকটিভ্‌ জ্ঞান! আর ব'লছেন ওটা নাটক নয়!

মেয়র। (সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া) সার্টন্‌লি নাটক নয়! আঃ! বাঁচা গেল! আমার আর রাস্তা নেই।

প্রকাশক। আমাদের সকলকে বোকা বানিয়ে দিলেন!

মেয়র। তাই ব'লে আমরা কম আনন্দ অনুভব করিনি! কি বলেন ক্রিটিক?

ক্রিটিক। আনন্দ অনুভব করেছিলাম বটে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আনন্দ অনুভব করা উচিত হয়নি!

মেয়র। কেন?

ক্রিটিক। ওটা যে মোটেই নাটক নয়।

মিনির প্রণয়ী। মাফ করবেন---নাটক হ'লেই আনন্দ অনুভব করতে পারতেন না!

ক্রিটিক। কেন?

মিনির প্রণয়ী। বাংলা থিয়েটারে নাটক বলে যা দেখে থাকেন তা সার্কাস, ভোজবাজি আর যাত্রার তে-আঁশলা অপসৃষ্টি! এদেশে এতদিনে বড় জোর য়্যামেচার নাটকের যুগ উপস্থিত হয়েছে— ব্যবসায়ী নাটকের যুগ আসতে এখন অনেক বিলম্ব!

মেয়র। তাই ব'লে আমরা কম আনন্দ পাইনি।

রিপোর্টার। আঃ! সব বাংলা নাটকই যদি এমন হ'ত!

ক্রিটিক। ওহে রিপোর্টার, আমার মতামত যা প্রকাশ করেছিলাম সেগুলো চেপে দিও।

মিনি। দয়া ক'রে সকলে ওঘরে চলুন---খাবার জায়গা হ'য়েছে।

সকলে চলিতে আরম্ভ করিল

মেয়র। মিস সোম, মাঝে মাঝে এই রকম চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা আছে ব'লেই এত বড় নগরের দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়।

প্রস্থান

ক্রিটিক। (স্বগত) আমার আনন্দ অনুভব করা উচিত হয়নি।

প্রস্থান

রিপোর্টার। সব নোট ক'রে নিয়েছি। কেবল দেয়াল-গুলো ক'ইটের গাথুনি—বুঝতে পারলাম না!

প্রস্থান

বাকি সকলের প্রস্থান

পাশের দরজা দিয়া মিনির মায়ের প্রবেশ

মিনির মা। নাঃ, সব গেল কোথায়? আজ আবার সেই ব্যথাটাও বেশী ক'রে পেয়ে বসেছে। ও হরিচরণ, কোথায় গেলি বাবা? এদিকে একবার আয় না।

মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মিনির প্রণয়ী। কি হয়েছে মাসিমা?

মিনির মা। তোমাকে কি যেন একটা কথা বলবো বাবা! এখনি ভাবলাম—আর এখুনি মনে পড়ছে না!

মিনির প্রণয়ী। আর বলতে হবে না- আমি বুঝে নিয়েছি এই নিন্‌ জাম্বক।

এই বলিয়া পকেট হইতে জাম্বকের কৌটা বাহির করিয়া দিল

মিনির মা। এই দেখ! ঠিক এই জন্যই মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল- বুঝতে পারছিলাম না।

মিনির প্রণয়ী। চলুন উপরে যাওয়া যাক্‌।

মিনির মা। চল তো বাবা!

উভয়ের প্রস্থান

মিনির প্রবেশ

মিনি। কোথায় গেল?

মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

মিনির প্রণয়ী। এই যে!

মিনি। কোথায় গিয়েছিলে?

মিনির প্রণয়ী। মাসির সঙ্গে উপরে। মিনি!

মিনি। এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলে! এখন আবার কথায় ও কি রকম সুর লাগলো—

মিনির প্রণয়ী। বেসুরো তো লাগবেই! চুক্তিপত্রের আমার অংশ সুসম্পন্ন করেছি---এবার তোমার অংশের পালা কি-না!

মিনি। আমার অংশটা আবার কি?

মিনির প্রণয়ী। এরই মধ্যে ভুলে গেলে! আমার সেই কথাটা শুনবে কথা ছিল।

মিনি। কথা তো ছিল, কিন্তু আজ থাক না---রাত অনেক হ'য়েছে।

মিনির প্রণয়ী। রাতের অন্ধকারেই তো সে কথা মানায়।

মিনি। অন্ধকারে মানায়? ভূত নাকি?

মিনির প্রণয়ী। না, চাঁদ। সে-কথা চাঁদের আলোতেই বলবার মত; যে শুনবে তার মুখখানি দেখা যাবে, অথচ কানের ডগা দুটি রক্তিম হ'য়ে উঠলে দেখা যাবে না—এমন আলো তো শুধু চাঁদেরই আছে।

মিনি। এত আয়োজন চাই তোমার ওই একটি কথার জন্যে!

প্রণয়ী। চাই বই কি! আর সেই জন্যই তো অপেক্ষা করতে পারিনে! সেকালের সৌভাগ্যবান্‌দের মত যদি ষাট হাজার বছর পরমায়ু হ'ত তা হ'লে কি এত তাড়া ছিল! দশ হাজার বছরের মহাকাশে আমার সেই কথাটি অদৃশ্য নীহারিকারূপে বিছিয়ে দিতাম—আর কখন্ যে তার অলক্ষ্য উত্তরীয়ে তুমি বাঁধা পড়ে যেতে—তা নিজেই জান্‌তে না! এ যে বাঙ্গালীর পরমায়ুর সাড়ে বাইশ বছর—যার পনেরো আনাই যায় স্কুল, কলেজ, আর অফিসের মরুভূমিতে! সেই জন্য অপেক্ষা করতে পারিনে—তুমি রাগবে জেনেও পারিনে।

মিনি। এত কথা না ব'লে সেই আসল কথাটি বললেই হ'তো না—

প্রণয়ী। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ (কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া)। মিনি ··· মিনি ··· (কাশিয়া লইয়া) আমি ··· আমি ··

এমন সময় দেয়ালের ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল

দেখলে মিনি, বিশ্বশুদ্ধ সবাই আমার ওই একটা কথা বলবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। হঠাৎ ঠিক এই সময় ঘড়িটা বাজবার কি দরকার ছিল?

মিনি। ঘড়িটা মনে করিয়ে দিল তার মত সময়নিষ্ঠ হও—

প্রণয়ী। সময়নিষ্ঠা কেন? তাড়াতাড়ি বলবার জন্য?

মিনি। না, রাত হ'য়েছে বাড়ী ফিরবার জন্য।

প্রণয়ী। (হঠাৎ মনোভাবে পরিবর্তন ঘটিল) ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ধন্যবাদ মিস্ সোম, রাত হ'য়েছে, বাড়ী চল্‌লাম।

দ্রুত প্রস্থান

মিনি। (অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া) শোন, শোন, ফিরে এস, শুনে যাও!

বিমর্ষ হইয়া বসিয়া পড়িল
সে মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল!

মিনি। আজকের দিনে সবাইকে সুখী করলাম—কেবল ওকেই কষ্ট দিলাম! ··· ওকে দেখলেই আমার কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ সে গালে হাত দিতেই এক ফোটা জল তার হাতে
ঠেকল—সে চমকিয়া উঠিল

এ কি! তবে কি আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি? ···

এমন সময় পাশের দ্বার দিয়া মিনির মা প্রবেশ করিল; সে
মিনির 'ফেলেছি' শব্দটা কেবল শুনিতে পাইয়াছে

মা। এত রাত্রে আবার কি ভেঙ্গে ফেল্‌লি মা!

মিনি। কিছু না! কিছু না! একটা ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলেছি! তুমি আবার এত রাতে উঠে এলে কেন? কালকে ব্যথা বাড়বে—সে আমার ভোগান্তি—যাও শোওগে—

তাড়া খাইয়া তাহার মা প্রস্থান করিল; মিনি
দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল

মিনি। মা'কে নিয়ে মহা মুস্কিল ···

এমন সময় অন্য দ্বার দিয়া মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ

প্রণয়ী। সরি মিস্ সোম, ছড়িখানা ফেলে গিয়েছিলাম।

মিনি গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল

মিনির প্রণয়ী। ও কি?

মিনি। আমার একটা কথা বলবার আছে—শুনতে হবে।

মিনির প্রণয়ীর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাব—না জানি কি ফাঁসির হুকুম শুনিবে

প্রণয়ী। (সঙ্কোচে ও ভয়ে) কি বল?

মিনি। (দ্বিধার ভাবটা কাটাইবার জন্য দ্রুত ও উন্মাদের মত) ভালবাসি! ভালবাসি! ভালবাসি!

প্রণয়ী। (ভীষণ ভীতভাবে) কা'কে?

মিনি। তোমাকে! তোমাকে! তোমাকে! এবার তোমার কি কথা শুনি।

প্রণয়ী। আমি? আমি ··· আমার ··· মানে। ওই কথাই ···

কিন্তু ··· আচ্ছা মিনি, আমি সে কথাটা কতদিন বলতে চেষ্টা ক'রেও পারিনি—তুমি এমন সহজে তা বললে কি ক'রে?

মিনি। কারণ, তোমরা নির্বোধ! মেয়েদের ভালবাসা তীরের মত সোজা গিয়ে লক্ষ্যে বেঁধে। আর পুরুষদের ভালবাসা বুমেরাং-এর মত বাতাসে গোলকধাঁধাঁ সৃষ্টি করতে করতে এগোয়—শেষে লক্ষ্য পর্য্যন্ত গিয়ে আবার তোমাদের কাছেই ফিরে আসে! ··· অমন উদ্বিগ্ন হ'চ্ছ কেন?

মিনির প্রণয়ী। তোমার ঘড়িটার কথা মনে ক'রে। প্রতি সেকেণ্ডে মনে করিয়ে দিচ্ছে বাড়ী ফিরতে হবে—সময় নেই।

মিনি। সময় নেই—সময় নেই, একশবার সময় নেই। জীবনে আর কোন কাজেরই যথেষ্ট সময় নেই। কেবল একটুখানি ভালবাসবার সময় আছে—

প্রণয়ী। তা হ'লে?

মিনি। তা হ'লে এই নাও—দুটি ফুল, লাল আর শাদা—

এই বলিয়া খোঁপা হইতে দুটি ফুল খুলিয়া তাহার হাতে দিল

প্রণয়ী। আর কিছু দিলে না?

মিনি। মানুষে সব সময়ে সব কথা বলতে পারবে না। জেনেই ভগবান ফুলের সৃষ্টি করেছিলেন। আর যা কিছু বলবার ওরাই বলবে।

প্রণয়ী ফুল দুটি লইয়া একত্র জড়াইয়া বাঁধিতে
বাঁধিতে দু ছত্র গান গাহিল

প্রণয়ী। লালফুল সখী জীবন আমার
শাদাফুল সখী মরণ মোর,
জীবনমরণ যুগল করিয়া
রাখিলাম এই চরণে তোর।

মিনি। গানটার স্বত্ব যেন কোন প্রসিদ্ধ কবির।

প্রণয়ী। তাদের স্বত্ব লেখা পর্য্যন্ত। গানের আসল মালিক—যাদের প্রয়োজন তারা—

মিনি। চল, অনেক রাত হয়েছে; তোমাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

উভয়ের প্রস্থান

যবনিকা

পৃথিবী বিদায়!

শ্রীদক্ষিণা বসু

আজ বুঝি অমানিশা?—তাই এত জমাট আঁধার
ঘুম আর স্বপ্নে ভরা আজিকার সারাটি আকাশ।
নিশান্তে বিদ্যুৎ জাগে, অকস্মাৎ দুরন্ত বাতাস;
সহসা আমার দ্বারে কথা শুনি কোন্ বালিকার?—
—এ মুহূর্ত্তে চলো যাই ঘর ছাড়ি পৃথিবীর বা'র,
অথবা বনান্তে কোন যেথা নাই কল-কোলাহল,
নিন্দা কানাকানি নাই, জনহীন নিঃশব্দ অঞ্চল।
একান্তে প্রশান্ত চিত্তে কথা হবে তোমার আমার।

* * *

কোমল আঁখির তলে কুমারীর মনো অভিলাষ
বহুবার দে'ছে ধরা সকাতর সশঙ্ক লজ্জায়;
কলঙ্কের ভয়ে ভীতা, কোন দিন কোন অছিলায়
অন্তরের আকাঙ্ক্ষারে করে নাই কথায় প্রকাশ।
আজি সে মানে না কিছু—খুঁজি লয় এই অবকাশ;
অজানা তীর্থের পথে মোরা চলি—'পৃথিবী, বিদায়!'

গঙ্গাসাগর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিশ্বের ব্যথা ডুবিয়া রয়েছে করুণার আঁখিজলে,
জলগণ্ডীতে আটক করেছে প্রলয়ের কোলাহলে।
দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আছে জলমুষ্টির চাপে,
গলেছে লবণ-হিমাদ্রি নর-জিঘাংসা সন্তাপে।
অনির্ব্বাপিত ভীম সংগ্রাম নিতি দেবাসুর দলে
লভেছে এখানে সলিল মুক্তি কাহার তপঃফলে।

হয়েছে জলধি নীলকণ্ঠের কম কণ্ঠদ্যুতি,
অবিশ্রান্ত কলকল্লোল —এ কি ভৈরব স্তুতি!
এ কি উদ্দাম! এ কি উত্তাল! কান্ত ভয়ঙ্কর!
কোথা তাণ্ডবনৃত্য চলিছে? শান্ত পিনাকের স্বর।
নীলমণি-গলা জলেতে বিপুল ধনভাণ্ডার রাজে
রত্নাকর যে, দম্ভ দর্প তাহারেই শুধু সাজে।

হে নীলাম্বুধি, ভালবাসে নর শুনিতে গোপন কথা
কা'র লাগি এই দিগন্তপ্লাবী অনন্ত ব্যাকুলতা?
এই উদ্বেল উচ্ছ্বাসময় উদ্দণ্ড নর্ত্তন—
কাহার লাগিয়া? কারে দিতে চাও যক্ষের-রাখা-ধন?
হে চিরমুক্ত, বক্ষে তোমার রাখ না মায়ার দাগ
পাগল করেছে, ভাবুক করেছে, কার ঘন অনুরাগ?

যুগ যুগ ধরি তোমার সাধনা করে কার সন্ধান?
কার উদ্দেশে দশকুশী তালে এই কীর্ত্তন গান?
লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ-বাহু কাহারে ধরিতে ধায়?
এত বল আর, এত লাবণ্য পেলে কার গরিমায়?
তরল কপিল নেত্রার্চ্চিতে দগ্ধ করিয়া সব—
কাহার লাগিয়া পাতিয়াছ এই সৃজনের উৎসব?

প্রভুত্ব চায় তোমার উপরে দুর্ব্বল মানবক?
মহাকাশে ক্ষীণ ঘুড়ি উড়াইয়া রোধিবার মত সখ।
ভগ্ন মগ্ন করিয়া জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তার
ঘূর্ণীতে দাও চূর্ণি তাহার সকল অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র প্রবালে আশ্রয় দাও, প্রণষ্টা গর্ব্বের
পদ্মাসন যে পাতে বুকে তব হিরণ্যগর্ভের।

রুদ্রমূর্ত্তি সমুদ্র তুমি জানাও সগৌরবে—
তোমারে লভিতে অগ্রে তোমার মতন হইতে হবে।
দুকূল হারায়ে আপনা ভুলিয়া, সকল ক্ষয়ের শেষে
তব সন্নিধি লাভ করা যায় প্রবেশি তোমার দেশে।
সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী, গঙ্গা যে দ্রবময়ী –
তোমাতে মিলেছে স্বরগবিত্ত মুক্তির বাণী বহি'

গঙ্গাসাগর! গঙ্গাসাগর! তোমারে নমস্কার,
ভুবন মাঝরে বেশী বড় কিছু দেখিবার নাহি আর।
নির্ঘোষিত এ সঙ্গমভূমে অভয়ের মহাবাণী,
রোষের ভস্মে বিভূতি বিলা'তে অমৃতের আমদানি।
ক্রোধের সমাধি হ'তে শান্তির ধারা হল নিঃসৃত,
হিংসানলের উপর স্নেহের জলবাহু বিস্তৃত।

ধ্যানের মতন গম্ভীর তুমি, গভীর যোগের মত;
মনের মতন চঞ্চল তুমি, উচ্চ এবং নত।
বিনীত এবং উদ্ধত তুমি, শিষ্ট অশিষ্ট,
কখনো চণ্ডকৌশিক তুমি, কখনো বশিষ্ঠ।
মহাভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, তোমারে প্রণাম কোটী
জগৎ পিতার মাতার চরণ ধৌত করিছ লুটি'।

সকল চিতার অঙ্গার হয় ধন্য তোমারে চুমি,
অঙ্গার হতে হীরক করার মন্ত্র জানো যে তুমি।
নব বারিদের তুমিই স্রষ্টা, দয়া তব বলিহারী,
জগতের সব পুণ্য এবং পণ্যের অধিকারী।
শ্রীভগবানের সলিলশয্যা, অমৃতের পারাবার
দৃষ্টি আমার হ'ল জলময়ী, জানাই নমস্কার।

সঙ্গীত

হিন্দি ও বিলিতি সুরের মিশ্রণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সাঙ্গীতিক পত্রিকায় কিছুদিন আগেই আমি লিখেছি যে আমাদের গানে নূতনত্বের আম্‌দানি চাই —বিশেষ ক'রেই বাংলা গানে। এর একটি পথ- লিখেছি আমি— বিলিতি স্টাইল আনা। শ্রীহিমাংশু দত্ত "তোমারি পথ পানে চাহি" গানটিতে এই ঢঙ অতি চমৎকার এনেছেন (গ্রামোফোনে শ্রীমতী মাধুরী সেনগুপ্তার গাওয়া গানটি অবশ্য শ্রোতব্য)। আমি এ-ঢঙ বহুদিন থেকেই মিশিয়ে আসছি —অনেকখানি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের নানা গানের সুরভঙ্গির আদর্শে—যদিও আমি তাঁরও অনুকরণ করি নি---যেটুকু দরকার গ্রহণ করেছি বাকিটুকু চলেছি নিজেরই প্রেরণায়। গ্রামোফোনে শ্রীমতী উমা বসুর গাওয়া "শ্রীচরণে নিবেদনে" গানটিতে তিনটি স্তবকে তিনটি তালফের -- য়ুরোপীয় movement বদলের অনুপ্রেরণায়—শ্রবণীয়।

আজ আর একটি গানের স্বরলিপি দিচ্ছি নিচে— সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব চাহিদা হয়েছে ব'লেই—যে গানটিতে বিলিতি ভঙ্গি, কীর্তন আঁখর ও হিন্দুস্থানি ঠুংরি চাল মিশ্রিত হয়েছে। গানটি কাশ্মীরে লিখেছিলাম—"রূপে বর্ণে ছন্দে।" ওই গানটির একটি জুড়িও এই সঙ্গে দিলাম—"যেন তোমারে জীবনে।" "রূপে বর্ণে ছন্দে" গানটি গেয়েছেন শ্রীমতী উমা বসু গ্রামোফোনে—খ্যাতনামা গিটারবাদক ও সুরশিল্পী শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের গিটার সঙ্গতে ও অপূর্ব তবলাবাদক শ্রীপরেশ ভট্টাচার্যের তবলা সঙ্গতে। ঐ সঙ্গে "মধু মুরলী বাজে" গানটিতেও হিন্দুস্থানি ঠুংরি ও বিলিতি চাল মেশানো হ'ল—হিন্দি "মুরলীওয়ালে নন্দকে লালে" গানটির সুরে। এ-হিন্দি গানটিরও সুর আমি এই ভাবেই দিয়েছি। যারা মনে করেন হিন্দুস্থানি গানের সুর নিখুঁৎ তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া চলে না —কারণ হিন্দুস্থানি গানেও বাংলা গানেরই মতন নব প্রাণশক্তির আমদানি করবার সময় এসেছে— নৈলে হিন্দুস্থানি ঠুংরি অত্যন্ত একঘেয়ে হ'য়ে এসেছে। আরো হিন্দুস্থানি ঠুংরি জাতীয় গানেও কীর্তন আঁখর তথা বিলিতি ভঙ্গির আদর বাড়ছে। এ-প্রবণতা নিশ্চয়ই শুভ। হায়দ্রাবাদে বহু সঙ্গীতজ্ঞ উর্দু পরিবার শ্রীমতী উমা বসুর গাওয়া এ-ধরণের মিশ্রিত ভঙ্গির গান অত্যন্ত পছন্দ করেন, এ আমি দেখে এসেছি গত বৎসর হায়দ্রাবাদে গিয়ে। যেমন তাঁর "য় তো কেয়া কেয়া নজর নহি আতা" বা "আজ সখি সুন বাজত বাঁসরিয়া" গানে। সব গানেই নূতনত্ব আসবে শুধু—হিন্দুস্থানি গান চলবে ওস্তাদিপন্থী হ'য়ে একথা সুকুমারমতি শিল্পীরা মানতেই পারেন না। সব শিল্পেই "creation and not imitation is the aim" এমার্সনের এ গভীর কথাই সর্বথা স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয়। শেষে বক্তব্য নিচের গান দুটিতে কাব্যছন্দ শ্লথ রাখা হয়েছে সুরই তাকে ভরাট করবে ব'লে। বহু হিন্দুস্থানি গানে এভাবেই গান বাঁধা হ'য়ে থাকে। সুরের বিন্যাস সুষ্ঠু হ'লে এতে গানের লালিত্য যে কমে না একথা অপ্রতিবাদ্য। কাজি নজরুল ইসলামের অনেক গানের ছন্দেও এই ভাবে সুর ও তালের ফাঁক ইচ্ছে ক'রেই রাখা হয়েছে। আঁখরগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল।

মরি রূপে বর্ণে ছন্দে
আলোকে আনন্দে
এলে কে গো মেলে পাখা !
শ্যামল বসন্ত বীথি
বিছালো গন্ধগীতি
দিগন্তে শৈল আঁকা—
আকাশে হাসে রাকা !
(রাকা—রাকা—রাকা—হাসে রাকা)
দুধারে তালে তালে
সুরসুন্দরী কে ঢালে
রাগমালা ?—দোলে শাখা !
মিটালে কে পিপাসা
জাগালে ভালোবাসা
অনন্ত স্বপ্ন-মাখা—
আকাশে হাসে রাকা !
(রাকা—রাকা—রাকা—হাসে রাকা)
(এলে সুরে সুরে সুরে ফুলে ফুলে ফুলে
রূপে বর্ণে ছন্দে !
এলে তালে তালে তালে দুলে দুলে দুলে
আলোকে আনন্দে !
এলে ফুলে ফুলে ফুলে
কে গো দুলে দুলে দুলে !
এলে কে মেলে পাখা—এলে কে মেলে পাখা—
মেলে পাখা—মেলে পাখা—) রূপে বর্ণে ছন্দে

যেন তোমারে জীবনে
মোরা চাহি মা শরণে
প্রেমে এসো প্রাণ মাঝে।
তোমারি তালে তালে
নীলিমা আলো ঢালে
অসীমা বাঁশি বাজে—
ফুলে ফুলে গাছে গাছে
(বাজে—বাজে—বাজে—বাঁশি বাজে)
বসুন্ধরা-উছাসে
তব বন্দনা-বিলাসে
বলে : "ভালোবাসা আছে।"
আকাশে ইন্দ্রধনু
ধরে আনন্দতনু
তোমারি স্বর্ণ সাজে—
রূপ রঙ তরঙ্গ নাচে !
(বাজে—বাজে—বাজে—বাঁশি বাজে)
(এসো করুণ-আঁধারে অরুণ বিথারে
গানে গানে প্রাণ মাঝে !
যেন বিরহে মিলনে জীবনে মরণে
শুনি তব বাঁশি বাজে !
বাঁশি বাজে বাজে বাজে
বাজে বাজে প্রাণ মাঝে !
বাঁশি বাজে প্রাণ মাঝে—বাঁশি বাজে প্রাণ মাঝে
প্রাণ মাঝে—প্রাণ মাঝে) তোমারে জীবনে।

+ ° + ° + °
{সা রা II সন্‌া -া সা | গা -া মা | পা -া পা | া পা পা | পা -া ধা | পধা র্সা ণা
যে ন তো - মা রে - জী ব - নে - মো রা চা - হি মা - শ
ম রি রূ - পে ব - র্ণে ছ ন্ দে - - আ লো - - কে - আ

+ ° + ° + °II +
ধপা ধা পা | া মগা মা | ধা -া মা | পা -া রা | রমা জ্ঞরা সা | া } -া সা | গা -া সা
র - ণে - প্রে মে এ - সো প্রা - ণ মা - ঝে - - তো মা - রি
নন্ - দে - এ লে কে - গো মে - লে পা - খা - শ্যা ম ল - ব

° + ° + ° + °
মা -া সা | পা -া পা | া া পা | না -া পা | র্সা -া পা | র্রা -া র্সণা | ধপা -া ধা
তা - লে তা - লে - - নী লি - মা আ - লো ঢা - লে - - অ
স ন্ ত বী - থি - - বি ছা - লো গ ন্ ধ গী - তি - - দি

+ ০ + ০ + ০
পধা র্সা র্সা | র্ণা -া র্সা | ধর্সা ণধা পা | -া গা মা | ধা -া মা | পা রা রা |
সী - মা বাঁ - শি বা - জে - ফু লে ফু - লে গা - ছে
গন্ - তে শৈ - ল আঁ - কা - - আ কা - শে হা - সে

+ ০ + ০ + ০
রমা জ্ঞরা সা | -া -া র্সা | নর্সা র্গর্রা র্সনা | ধা পা গা | রর্সা -া -া | -া -া -া |
গা - ছে - - - বা - - - - - জে - - - - -
রা - কা - - - রা - - - - - কা - - - - -

+ ০ + ০ + ০
নর্সা র্রর্সা নধা | পা গা রা | ণধা -া -া | -া -া -া | হ্মাপা ধর্সা ণধা | পা হ্মা পা |
বা - - - - - জে - - - - - বা - - - - -
রা - - - - - কা - - - - - রা - - - - -

+ ০ + ০ + ০
ধা গা -া | -া -া -া | র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা | পপা পপা পপা | গগা গগা গগা | সসা সসা সসা |
জে - - - - - বাঁ - - শি - - বা - - জে - -
কা - - - - - হা - - সে - - রা - - কা - -

+
{ ণনা -া সা | গা -া মা | পা -া পধা | পপা সা রা } I া সা | গা -া মা |
তো - মা রে - জী ব - নে - নি তি - ব সু ন্ ধ
রূ - পে ব র্ ণে ছ ন্ দে - আ হা - দু ধা - রে

০ + ০ + ০ +
রগা মপা পা | পা -া পা | -া পা পা | না -া না | পধা নর্সা র্সা | র্সা -া র্সা |
রা - উ ছা - সে - ত ব ব ন্ দ না - বি লা - সে
তা - লে তা - লে - সু র সু ন্ দ রী - কে ঢা - লে

০ + ০ + ০ +
-া {র্সা র্সা | র্সর্রা র্সর্সা পা | পা -া ধা | না -া র্রর্সা | -া} -া র্সা | নর্সা র্রা র্রা |
- ব লে ভা - লো বা - সা আ - ছে - - আ কা - শে
- রা গ মা - লা দো - লে শা - খা - - মি টা - লে

০ + ০ + ০ +
র্সর্রা র্মা র্জ্ঞা | র্জ্ঞর্রা র্সর্রা র্সা | -া -া র্রা | র্সধা র্সা র্সা | ণধা -া ণা | ণধা পধা পা |
ইন্ - দ্র ধ - নু - - ধ রে - আ ন ন্ দ ত - সু
কে - পি পা - সা - - জা গা - লে ভা - লো বা - সা

০ + ০ + ০ +
-া -া পা | গপা গপা পা | ধা র্সা র্সা | র্সনা ধপা ধা | পা গা মা | ধা -া মা |
- - তো মা - রি স্ব র্ ণ সা - জে - রূ প র ঙ্ ত
- - অ নন্ - ত স্ব প্ ন মা - খা - - আ কা - শে

৩ + °
পা -া রা | রমা জ্ঞরা সা | -া -া র্সা | গাহিয়া "বাজে বাজে বাঁশি বাজে" II
র ঙ্ গ না - চে - - - (উপরের স্বরলিপি) গাহিয়া ধুয়ায় ফেরা
হা - সে রা - কা - - - রা-কা, রা-কা, হা-সে-রা-কা গেয়ে ধুয়া

+ ° + ° +
সা সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সনা | ধনা না র্সনা | ধপা পা পা | সা সা সা
এ সো ক রু ণ আঁ ধা রে অ রু ণ বি থা রে গা নে গা
যে ন বি র হে মি ল নে জী ব নে ম র ণে ধ্ব নি ত
এ লে সু রে সু রে সু রে ফু লে ফু লে ফু লে রূ - পে
এ লে তা লে তা লে তা লে দু লে দু লে দু লে আ - লো

° + ° + ° + °
গা গা মা | পা -া পা | -া পা না | না -া র্রা | র্সা -া র্রা | নর্রা র্সা না | -া না র্সা
নে প্রা ণ মা - ঝে - বা শি বা - জে বা - জে বা - জে - বা জে
ন বা শি বা - জে - এ লে ফু - লে ফু - লে ফু - লে - কে গো
ব র্ ণে ছ ন্ দে -
কে - আ ন ন্ দে -

+ ° + ° + °
নধা -া না | ধপা -া ধা | গপা গপা পা | -া পা পা | পধা না -া | -া না র্সা
বা - জে প্রা - ণ মা - ঝে - বা শি বা - জে - প্রা ণ
দু - লে দু - লে দু - লে - এ লে কে - - - মে লে

+ ° + ° + °
ধনর্সা নধা পা | -া পা পা | পধা নর্সা র্রা | -া র্রা র্রা | র্রা ঋা র্গর্রা | র্সা র্সা র্সা
মা - ঝে - বা শি বা - জে - প্রা ণ মা - ঝে - প্রা ণ
পা - খা - এ লে কে - - - মে লে পা - খা - মে লে

+ ° + ° + °
র্সা না র্রর্সা | না না র্সা | ধনর্সা নধা পা -া -া সা | { সনা -া সা | গা -া মা
মা - ঝে - প্রা ণ মা - ঝে - - - তো - মা রে - জা
পা - খা - মে লে পা - । - - রূ - পে ব র্ ণে

+ °
পা -া পধা | পপা সা রা } II
ব - নে - নি তি
ছ ন্ দে - আ হা

কৃষি ও বেকারসমস্যা

শ্রীধীরেন্দ্রমোহন মজুমদার

"India lives in her villages"—ভারতের বিপুল জনসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বইজন গ্রামে বাস করে এবং এই গ্রামের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। হিসেব করলে দেখা যায়, ভারতের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি গ্রামে বাস করে ৪০০ চারশ লোক। এ থেকে কি বোঝা যায়? এই অবস্থা থেকে একটা কথা যা স্পষ্ট হয়ে উঠেচে তা এই—৪০০ লোক নিয়ে ভারতের এই গ্রাম কোন মতেই তার অধিবাসীদের খেতে দিতে পারচে না। খাওয়ার প্রশ্নই আজ যেখানে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেচে, সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বড় বড় গালভরা কথা মোটেই খাপ খায় না। বহু প্রচারিত হলেও পল্লীর অবস্থা যে কত শোচনীয় তা আমরা কতকগুলি সংখ্যার সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করব। Black to the village—বা এই ধরণের পল্লী-প্রীতির পরিচায়ক বহু বুলি আমরা বিগত ২৫ বৎসর ধরে শুনে আসচি। যাঁরা এই ধরণের উপদেশ বর্ষণ করেন তাঁদের কাছ থেকে উপদেশ ছাড়া আমরা আর কোন ব্যবহারিক নির্দ্দেশ পাইনি। কেন পাইনি, তার প্রথম ও প্রধান কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই যে, এই ধরণের উপদেশদাতাদের বাংলার পল্লী সম্বন্ধে অজ্ঞতা মহাসাগরের মত সীমাহীন। সুতরাং বৈদ্যুতিক পাখা ও আরাম চেয়ারের আওতার মধ্য থেকে তাঁরা যে উপদেশ দিতে যান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে আন্‌প্রাক্‌টিকাল্—থিয়োরীর গণ্ডীর মধ্যে তা হয় ফেনায়িত। বহু কৃষক-দরদী নেতার বক্তৃতা আমরা শুনেচি; কৃষকের দুঃখ দুর্দ্দশায় এদের গণ্ড প্লাবিত করে নামে অশ্রুর ধারা। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, যখনই আইন সভার সাহায্যে কৃষক সম্প্রদায়ের সামান্য মাত্র সুযোগ সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা হয়েচে তখনই এদের মুখোস গেছে খুলে।

আমাদের অনেকের ধারণা বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কর্ষণযোগ্য জমির সমারোহের অন্ত নেই, শুধু একখানি ভাঙা লাঙল ও একজোড়া কঙ্কালসার বলদ নিয়ে সুরু করবার যা অপেক্ষা। আমরা কেবল কুড়েমি ক'রে গ্রামে ফিরে যাচ্চি না, নচেৎ এতদিনে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিতে সমস্ত গ্রাম সোনালী আভায় রঙীন্ হয়ে উঠতো। ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো। বর্ত্তমানে পল্লীর সবচেয়ে বড় সমস্যা কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাব। এ সম্পর্কে statistics যথেষ্ট আলোকপাত করবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষক মাথা পিছু কি হারে চাষ করে থাকে তা নীচে দেওয়া হল।—

ভারতবর্ষ	৩৩ একর
বৃটেন	২·৬ „
ক্যানাডা	৪·০ „
জাপান	৪·২ „

এই অবস্থার সঙ্গে যদি প্রত্যেক কৃষকের পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের কথা বিবেচনা করা যায়—যারা তার উপর নির্ভরশীল অথচ চাষ-আবাদে তাকে সাহায্য করে—তাহলে দেখা যাবে যে প্রতি কৃষকের মাথা পিছু ১·২ একরের বেশী জমি কিছুতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং ভারতভূমিতে আর যাই থাকুক ভূমির প্রাচুর্য্য আছে একথা কিছুতেই বলা চলে না। এর কতকগুলো কারণ অনেকে নির্দ্দেশ করে থাকেন—যেমন ভারতের প্রাচীন শিল্পসম্ভারের অপমৃত্যু, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদযোগ্য ভূমির সংস্কারের অভাব।

কৃষিকার্য্যের সাহায্যে বেকারসমস্যা সমাধানের আগে আমাদের প্রয়োজন—ব্যাপক পরিকল্পনায় বাংলার কৃষির উন্নতিসাধন। নচেৎ কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাবে বর্ত্তমানে যে সমস্যা উপস্থিত হয়েচে দলে দলে শিক্ষিত বেকারের গ্রামে আগমনে সেই সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে। সুতরাং নির্ব্বিচারে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উপদেশ যদি আজ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় তাহলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা আছে এবং এর ফলে গ্রামের বর্ত্তমান দুরবস্থা যে শোচনীয় আকার ধারণ করবে তাতে আমাদের আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত খুশী হতে পারবেন না। উপরের মন্তব্য থেকে যদি কেউ মনে করেন, কৃষির উপযুক্ত মূল্য আমরা দিচ্চি না অথবা জীবিকাসমস্যা

সমাধানে এর প্রয়োজনীয়তা আমরা ভেবে দেখেনি, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। আমাদের বক্তব্য শুধু এই, যতদিন পর্য্যন্ত দেশের শাসকবর্গ ব্যাপক পরিকল্পনায় কৃষির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করবেন ততদিন পর্য্যন্ত কৃষি দ্বারা আমাদের এই ক্রমবর্দ্ধমান বেকারসমস্যার সমাধানের আশা শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে।

বর্ত্তমানে জমির উপর জনসংখ্যার যে চাপ বৎসরের পর বৎসর ক্রমশ বেড়েই চলেচে তার ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েচে এই যে, জমির উপর একান্ত নির্ভরশীল যে সম্প্রদায়, তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার আর অন্ত নেই। ভারতে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল জনসংখ্যার একাংশ জীবিকার জন্য শিল্পের উপর নির্ভরশীল হবে—এতে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। তথাপি চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ান আজ একান্ত প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। যে পরিমাণ জমি এখনও পতিত অবস্থায় অকেজো হয়ে পড়ে রয়েচে তার হিসাব নিলে দেখা যায় যে, খাস বৃটিশ ভারতে ১৫ কোটি একরেরও অধিক জমি পতিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে রয়েচে! অথচ এই সমস্ত জমি সংস্কারের দ্বারা যদি কর্ষণযোগ্য ক'রে তোলা যায় তাহলে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের যে কি কল্যাণ হয় তা বলা যায় না। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, এই ১৫ কোটি একরেরও অধিক জমি যদি আজ সংস্কার করা হয়—তাহলে প্রত্যেক কৃষকের ভাগ্যে আরও এক একর ক'রে জমি মিলতে পারে।

সমস্যা যে শুধু জমির স্বল্পতা, তাই নয়; এই অবস্থার সঙ্গে আমাদের বিবেচনা করতে হবে জমির ক্রমশ ক্ষীয়মান উৎপাদিকা শক্তি। বর্ত্তমানে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হচ্চে। ফলে প্রত্যেক কৃষক মাথাপিছু যে পরিমাণ জমি পায়, সেই সামান্য জমিতে চাষ আবাদ ক'রে সে তার দু'বেলার আহার্য্য জোগাড় করতে পারে না। বর্ত্তমানে ভারতীয় শিল্পের অবস্থা মোটেই অগ্রসর নয়; ভারতবর্ষ এখনও ইউরোপের মত শিল্পপ্রধান দেশ হয়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষে যদি শিল্পের প্রসার আশানুরূপভাবে সম্ভব হত তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও যারা বেকার শ্রেণীর অন্তর্গত, তারা শহরের কল ও কারখানার দিকে দলে দলে অগ্রসর হচ্চে। এক্ষেত্রে বর্ত্তমান জার্মানীর অবস্থা খুব উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরে কলকারখানা প্রসারের ফলে ও মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় জার্মানীর মিল ফ্যাক্টরী প্রভৃতিতে অবিশ্রাম কর্ম্ম-চাঞ্চল্য দেখা যাচ্চে। রাইখের অর্থনৈতিক যন্ত্রের গতিবেগ এত দ্রুত হয়েচে যে, সমস্ত জার্মান কলকারখানায় শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েচে। এমন কি, স্ত্রীলোক ও বালকদের পর্য্যন্ত জোর করে কলকারখানার কাজে লাগান হয়েচে। দলে দলে কৃষকেরা পর্য্যন্ত সেখানে কলকারখানায় যোগ দিতে আরম্ভ করেচে। ফলে জার্মানীতে আজ কৃষকের অভাব গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেচে। জার্মানীর বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষের অর্থনীতিক পরিকল্পনা তথাকার কৃষিশিল্পে যে সমস্যার সৃষ্টি করেচে ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে সে সমস্যার আবির্ভাব হতে এখনও বহু যুগ কেটে যাবে। বরং ভারতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের একাংশও যদি কলকারখানায় আকৃষ্ট হয় তাহলে বর্ত্তমানে কৃষিশিল্পের উন্নতির পক্ষে এক গুরুতর সমস্যার আংশিক সমাধান হয়ে যাবে।

বর্ত্তমানে জনসংখ্যার অনুপাতে কর্ষণযোগ্য ভূমির স্বল্পতা ও জমির হীন উর্ব্বরাশক্তিই প্রধানত কৃষিশিল্পের দুরবস্থার জন্য দায়ী। কয়েকটি দেশের তুলনামূলক আলোচনা এক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোকপাত করবে। জাভায় প্রতি একর জমিতে ৪০ টন আখের চাষ হয়, অথচ ভারতবর্ষে এক একর জমিতে মাত্র ১০ টন আখ জন্মায়। আমেরিকায় প্রতি একরে ২০০ পাউণ্ড তুলা জন্মায়, ইজিপ্টে প্রতি একরে জন্মায় ৪৫০ পাউণ্ড। অথচ ভারতবর্ষে প্রতি একর জমিতে ৯৮ পাউণ্ডের বেশী তুলা উৎপন্ন হয় না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় ইজিপ্টে উৎপন্ন হয় তার চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। ভারতবর্ষে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্দ্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ভূমির উৎকর্ষের পশ্চাতে আছে সেচকার্য্যের ব্যাপক পরিকল্পনা, উন্নততর বীজ ব্যবহার, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের পরিচালনা ও সার সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণা। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ কৃষির উন্নতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য এই ক'টি বিষয়েই একেবারে সনাতনপন্থী।

কৃষির বর্ত্তমান অবস্থার জন্য রাজ-সরকারের উদাসীন

নীতি কম দায়ী নয়। আমাদের দেশে কৃষিশিল্পের প্রসারকল্পে রাজ-সরকার যেটুকু সাহায্য করেন অবস্থার প্রয়োজনে তা নিতান্তই সামান্য। ইংলণ্ডে প্রতি এক সহস্র একর জমিতে সরকার খরচ করে ১৩৮০ টাকা, ভারতবর্ষে সেই পরিমাণ জমিতে সরকার খরচ করে মাত্র ৩১ টাকা। সুতরাং দেখা যায়, ইংলণ্ডে কৃষির উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী টাকা খরচ করা হয়।

বর্ত্তমান রাজ-সরকারের রাজস্বনীতি কৃষকের দুরবস্থার আর একটি কারণ। সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতি একর জমিতে কৃষক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে কর আদায় করেন এবং প্রতি একর জমিতে যে হারে টাকা খরচ করেন তা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সম্প্রতি statistics-এর সাহায্যে দেখা গেছে, সরকার প্রত্যক্ষভাবে যে কর আদায় করে তার হার প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা দেড় টাকা ক'রে পড়ে। এই কর ছাড়াও পরোক্ষভাবে সরকার যে কর আদায় করে তার অর্দ্ধেকও যদি কৃষকের ঘাড়ে পড়ে, তাহলে প্রতি কৃষকের মাথাপ্রতি দুই টাকা হারে ট্যাক্স দিতে হয় অর্থাৎ প্রতি একর জমিতে প্রায় দুই টাকা হারে ট্যাক্স পড়ে। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতি একর জমিতে যে কর আদায় হয় তার মোট হার দাঁড়ায় সাড়ে তিন টাকা। এই হিসাবে প্রতি হাজার একর জমিতে সরকারের আয় হয় ৩৫০০ টাকা অথচ সরকার খরচ করেন মাত্র ৩১ টাকা। গবর্ণমেণ্টের আদায় ও খরচের এই বৈষম্য শুধু যে বিস্ময়কর তাই নয়, এই ব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমান কৃষির অবস্থা কত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েচে তাও চিন্তার বিষয়।

বর্ত্তমানে কৃষির সাহায্যে বেকারসমস্যা সমাধানের আগে সরকারকে ব্যাপকভাবে ও উদার পরিকল্পনায় কৃষির বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে হবে। নচেৎ অভাবগ্রস্ত বেকার যুবকদের কৃষির সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহের উপদেশ দেওয়া শুধু যে মিথ্যাচারের চরম পরিচয় হবে তাই নয়, এর ফলে তারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কৃষিশিল্পের দুর্গতির আংশিক পরিচয় দেওয়া হয়েচে এবং এই সামান্য আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিশিল্পের সাহায্যে বেকারসমস্যা সমাধানের সুযোগ ও সম্ভাবনা কতটুকু।

পঞ্চাশ বছর পরে

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিতর পানে ফিরিয়া চাই,
আজকে কেন সে মন নাই
যে মন আমার ঝঙ্কারিত
কূজন-কল-স্বরে ?
নূতন সাথীর আনাগোনা,
পুলকঝরা অশ্রুকণা
পদ্ম হ'য়ে উঠত ফুটে'
সুখের সরোবরে।
নাই প্রভাতী আলোর মায়া,
নামে সাঁঝের কাজল ছায়া,
রাতের কালো প্রজাপতি
মোর শিয়রের কাছে
সঞ্চিনু যা যতন ক'রে
হারিয়ে গেল অনাদরে—
অতীত সেই দিগন্তে আজ
নয়ন ফিরি আছে।
এ কি জীবন মরি মরি !
ফুরালো সুখ স্মরণ করি
দুখের অধিক দুঃখ ভালে
বজ্রফলা বাজে।
গাঁয়ে ফিরে' নাম করি যার
খবর শুনি সে নাহি আর—
নিরালা মোর চতুষ্পথটি
হেরি মনের মাঝে।

কই দেখিতে পাই আমার
আকাশে 'সাত-ভাই'কে আর ?
বৃষ্টিডাকা সাগর-জলে
ডুব দিয়েছে তারা।
পোড়ো বাড়ীর ফাটল-ফাঁকে
চন্দ্র-শোভা কাদের ডাকে ?—
পূর্ণিমা রূপ চূর্ণ হয়ে'
স্বপন-পথে হারা !
যে পাথরে ছিলাম বসে'
কত যুগের পুরানো সে,
আজও হেরি তেমনি নতুন
দাগ পড়েনি গায়।
জন্ম তাহার কোন্ গিরিতে ?
তুল্‌ত মাথা মেঘ-পুরীতে—
কোন্ বিলাসী খেয়াল-বশে
ছিনিয়ে নিল তায়।
আমার যারা তাদের পিছে
আকুল সুরে ডাকা মিছে,
চেনা ছিল অচিন্ হ'ল
পরশ পাসরিয়ে।
নাই সে উপহারের ডালা,
ফাগুন ফুলের গন্ধমালা,
বনের পথে বেছে বেছে
কুড়িয়ে গেঁথে নিয়ে'।
পালিয়েছে সুখ, দুঃখ দিয়া,
চলি আঁধার আলোড়িয়া—
অশান্ত সংসারের পানে
ফিরেও নাহি চাই।
যাইনে কভু কারো কাছে,
কি কথা আর কইতে আছে ?—
আশা ছিল খেলার ঘরে,
এখন কিছু নাই।
পরবাসীর বাসায় কারা
পৌছে এসে দোসর-হারা ?
বলে—'চাই গো ভালবাসা,
বন্ধ কেন দ্বার ?'
বুঝিনেকো অতশত,
বন্ধু অতিথ আসে কত—
রাস্তা সে যে বাহির থেকে
ভিতর আসিবার।
জানায় কেহ দরদ-ব্যথা,
গোপন ক্ষত কয় গো কথা,
চোখের তারা লবণ সম
দুঃখে গলে' গেছে
'আপন জনে ভালবেসে'
কি প্রতিদান পেয়েছে সে ?—
মনের খাতায় ছেঁড়া পাতায়
অনেক লেখা আছে।
কি লিখেছে যায় না বোঝা,
ছন্দটি তার নয়কো সোজা,
স্বচ্ছ খামের ভিতরে তার
নামটি দেখা যায়।
জন্মমরণ রহস্যময়,
কিসের লাগি এ অভিনয় ?—
সুর বাজানো জলে-ভরা
কাচের পেয়ালায়।
ওগো আকাশ, ওগো বাতাস,
তোমরা জানো কিছু-আভাস,
নিজের সাথে লড়াই ক'রে
হার মানিল রে !
মৃত্যু ছিল অ-বাঞ্ছিত,
চিত্ত ছিল উল্লসিত,
কর্‌ত বরণ প্রফুল্ল-মুখ
আগামী-কল্যরে।
এই দুনিয়ার বস্তি তাহার
লাগলো না রে ভাল যে আর,
বেরিয়ে প'লো অস্তাচলে
উদয়-তারা দেখে'।
কোথায় বাজে আরতি-শাঁখ,
শব্দ অমর, দেয় তারে ডাক্,
প্রতিধ্বনি দেয় গো সাড়া
গুহার ভিতর থেকে।

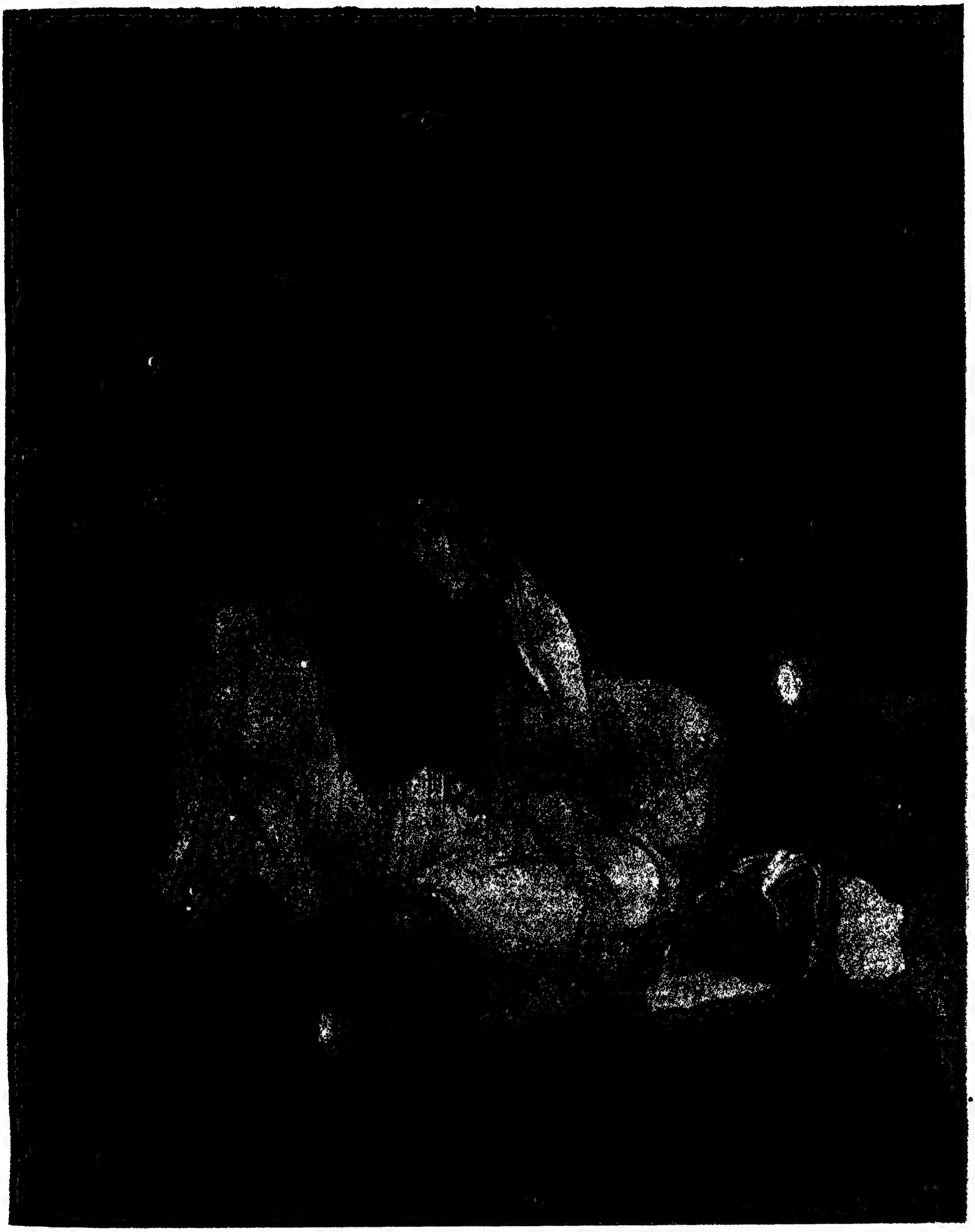

শিল্পী– শ্রীযুক্ত [illegible]

[illegible]

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কেউ বা আসে, প্রলাপ ভাষে,
ক্ষেপিয়ে গেছে কি নৈরাশে !
ধূলাবালির খেল্‌নাগুলি
ভুলিয়েছিল মন ।

বলে—আমি উড়ো পাখী
কখন্ আসি, কোথায় থাকি,
হিসাব-নিকাশ নাহি রাখি,
বেড়াই অকারণ ।

হারায় হাসি-আঁখির তারা,
কঠিন হ'ল অশ্রুধারা—
ভালো ওগো, ভোলাই ভালো
কান্না হাসির রেশ ।

মুক্ত ক'রে আলোর বেণী
স্পর্শে ঊষা তারার শ্রেণী,
সূর্য্য তারে ধ'র্‌তে গেলেই
হয় সে নিরুদ্দেশ ।

*

যেজন যাকে ভালবাসে
সেই ত তাহার জীবন নাশে—
মানুষ মরে দেহের আগেই,
জ্যান্তে ম'রে রয় ।

বিষয় লাগি' ধাক্কা সহি,
দুঃখ-জয়ী বীর ত নহি,
স'য়ে স'য়েই বুঝেছি শেষ
দুঃখ কিছুই নয় ।

পথ চেয়ে মোর সকাল বিকাল
বিফল হ'লো, এলো অকাল—
প্রাণের শিখায় মোচড় সহি
গুমরি আফ্‌শোষে ।

বরাত বড় খারাপ আমার,
কে বলিবে কেন রাজার
প্রাসাদ ভাঙে, মণির কিরীট
হঠাৎ পড়ে খ'সে !

শেষ জীবনের ঢালু পথে
যাত্রা করি ভবিষ্যতে,
আমার পথ যে আমি নিজেই
জরিপ্ করিয়াছি ।

চেয়ে দেখি সুমুখ দিয়া
ঝরা পাতা যায় উড়িয়া,
বলে—'আরো এগিয়ে চলো,
সঙ্গে তোমার আছি ।'

শুনি গো সব শেষের কথা,
ডাকে গভীর নির্জ্জনতা—
মহাপ্রলয় ! টুক্‌রা আকাশ
কোথায় চলে ভেসে ।'

কয় সে সাথী কোমল স্বরে,
'মৃতেরা ঐ আবার মরে,
তোমার মতই তাদের হৃদয়
ছিল মাটির দেশে ।

দেখি তাদের চলা-ফেরা,
শুধায় কেহ—'কোথায় ডেরা ?
মর্ত্ত্য ছেড়ে আস্‌ছো পথিক্
মৃত্যু কি গো ভালো ?'

ছোট্ট কিছু ছিল হাতে
বড় দেখায় আব্‌ছায়াতে—
মরীচিকায় জল-তরঙ্গ
সৃষ্টি করে আলো ।

দেখা আমার স্বপন দেখা,
সকল শেখাই নকল শেখা—
আধেক বলে'ই থেমে গেল
এক নিমেষের মাঝে ।

তার ছিঁড়িল একতারাতে,
কই পারি আর সুর মেলাতে ?
কানে কানে শেষের গানের
নীরব ধুয়া বাজে ।

তীর ও তরঙ্গ

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

চার

অন্ধকারের পরদাখানি ক্রমে পান্‌সে হইয়া আসে। পাতলা আলোয় চারিদিক ছায়া-ছায়া ভাসা-ভাসা। কাক ডাকে সপ্তমী উষা।

দত্ত বাড়ী ঢাক বাজে। জাগরণী বাজনা। পূজা আজ। দুর্গা পূজা! সারা বাঙ্গলায়—প্রতি গ্রামে, ঘরে ঘরে। সম্বৎসরের মরা গাঙে তিনটি দিনের ভরা জোয়ার!

সুনীল নদীর পাড়ে আসিয়া পৌছে সূর্য্য উঠিবার বহু আগে। অনেকদিন পরে আজ দু'চোখ ভরিয়া একবার বকুলতলার প্রভাতী পালাটা দেখিবে। সামনের বছর এমন দিনে বকুলতলা হয়তো পদ্মার তলায়। কীর্ত্তিনাশাকে বিশ্বাস কি?

নির্জ্জন নদী তীর। কান পাতিয়া যতদূর শোনা যায়, হাজার পাখীর ঘুম-ভাঙানো গান। দত্তবাড়ীর বাজনার সঙ্গে এবার যোগ দেয় পলাশপুরের মুখুজ্যেদের ঢাক-ঢোল। কান আর একটু সতর্ক করিলে, উমেদপুর চৌধুরী বাড়ীর বাজনাও স্পষ্ট শোনা যায়। মাঝে মাঝে কানে আসে নিকটস্থ মুসলমানপাড়া থেকে মোরগ-মুরগীর টানাটানা করুণ আবেদন।

এক রাত্রির মধ্যেই মাঠের জলে টান পড়িয়াছে। এঁটেল মাটি দেখা যায়, রাস্তার কাদা প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দু' একটি জল-ভাঙা—হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া পার হইতে হয়। দু' পায়ে কাদা মাখিয়া সুনীল নদীর পাড় ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তাহাদের গ্রামের সীমানা ছাড়াইয়া চলিয়া যায় বহুদূরের।

এবার ফিরিবার পালা। ডাহিনে মাঠের ওপারে গাছের মাথায় জ্বল জ্বল করে ভোরের সূর্য্য। বাঁ দিকে খরস্রোতা পদ্মার স্তিমিত রুদ্ররূপ। কাল ষ্টীমার হইতে নামিবার সময় সুনীল দেখিয়া গিয়াছে নদী কানায় কানায় ভরা। আজ পাড় হইতে জল বেশ খানিকটা নামিয়া আসিয়াছে।

এবার কি ভাঙা-ই না ভাঙিল! কুটিলা পদ্মার তালমাত্রার জ্ঞান নাই। তার মর্জ্জি বোঝা ভার। সরল রেখায় ভাঙে না সে। কোথাও বেশী, কোথাও কম। ছেঁড়া পাউরুটির মত এবড়োখেবড়ো নদীর পাড় মাইলের পর মাইল চলিয়া গিয়াছে। পদে পদে বাঁক। নূতন নূতন মোড়। জল আর জল। ফেনা আর ফেনা। এখানে ওখানে ঘোলাটে জলাবর্ত্ত। রুষিয়া ফুঁসিয়া ঢেউএর পর ঢেউ পাড়ে আসিয়া ভাঙ্গিয়া ওঠে—ঝপাৎ ঝপ্। নিরুপায় গাছগুলি ঝির ঝির করিয়া পাতা নাড়ে। উঁচু ডাঙায় ধরে চিড়। হুড়মুড় করিয়া ধ্বসিয়া পড়ে ছোট বড় মাটির চাপ নির্দ্দয় আক্রমণের মুখে। কাল সন্ধ্যায়ও যে বেত-ঝোঁপটা ছিল খাড়া, পরদিন সকালে তার কোন চিহ্ন নাই। পাড়ের মাটি হাঁ করিয়া তার অকালমৃত্যুর সাক্ষ্য দেয়।···পদ্মা! দুরন্ত পদ্মা! অশিষ্ট অসংযত রাক্ষুসী পদ্মা!

ঝুপ্ ঝাপ্! আবার খানিক খাড়া পাড় জলে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সম্মুখের ঐ কাত-হওয়া কানাই-লাড়ির গাছটার আর ইঞ্চি কয়েক বাকী শুধু। হিজল গাছটার শিকড়গুলি পাড় ফুঁড়িয়া নদীর দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—সুপুষ্ট কাণ্ডটা জলের দিকে হেলিয়া পড়িয়া প্রস্তুত হইয়াই আছে। তবু মাটির মায়া বড় মায়া—কিচ্ছুতেই ছাড়িতে চায় না!···

সুনীলের পথ এবার এক পরিত্যক্ত বাড়ীর উপর দিয়া। উঠানের অর্দ্ধেকই অদৃশ্য। খালি পড়িয়া আছে দু'খানি ভিটা, আর হোগলাপাতার পুরানো রান্নাঘরটা। কড়ি-বরগা, চাল-বেড়া, হাঁড়িকুড়ি—সব কিছু অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া জলধর মালাকর কোন্ কূলে কোন্ গ্রামে আবার নূতন করিয়া ঘর বাঁধিল সে খবর সুনীল এখনো জানে না। ভাঙ্গা উনানের পোড়া কালো শক্ত মাটি আর ইতস্ততঃ ছড়ানো একরাশ ছাই দিন কয়েক আগেকার এক প্রাত্যহিক জীবনের শেষ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। আজ বা কাল বা বড় জোর পরশুই ঐ পোড়া কাঠটাও সবার সঙ্গে জলে ডুবিয়া ভাসিয়া চলিবে দিগ্‌বিদিক্। আধখানা উঠানটুকুর

মাঝামাঝি মস্ত এক ফাটল। সামনের একটা হেলিয়া-পড়া সুদীর্ঘ নারিকেল গাছ কচি-ডাবের গোটা দুই পিড় লইয়া নিশ্চিত অকালমৃত্যুর মুখেও ঝির ঝির করিয়া পাতা নাড়ে অশ্রান্ত।···সুনীল ভয়ে ভয়ে একটু ঘুরিয়া গিয়া পথ ধরিল। পাড় এখানে খাড়া, ওখানে গড়ানে। ভরসা নাই কোথাও?

সুনীল এবার পৌছিল তাহাদের বাড়ী বরাবর নদীর পাড়ে। ফেলিয়া-আসা জীবনের অনেক কথা মনে পড়ে একসঙ্গে।··· খানিক দূরে ঐ যে ঘোলা জলের পাকে পাকে কচুরিপানার একটা মস্ত চাক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে অসহ্য তোড়ের টানে—ওখানেই বুঝি সেই খেলার মাঠটা? ছোট বেলায় পাকড়াশীদের বাগানের বাতাবিনেবু চুরি করিয়া সেই না প্রথম ফুটবল খেলায় হাতেখড়ি। দাড়ি-বাধা, হাডু-ডু, কানামাছি, বৌ-ছোঁওয়া, ঘর-চান-বাহির-চান—কত দিনের কত রকমের খেলা। ঐ খেলার মাঠটা পার হইয়াই উমেদপুর খালের উপর কাঠের পুল—খেলায় হারিয়া দক্ষিণহাটির হাই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সে-বার সে কি হাতাহাতি কুরুক্ষেত্র!·· ···ঐ যে দূরে পাক-খাওয়া ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঢেউগুলির উপর কাঁচা রোদ পিছলাইয়া পড়িয়া চোখ ধাধায়—সেখানে, না আর একটু সামনে, না আর একটু দূরে?—ডাইনে, না বাঁয়ে?······ঐ যে একটা দশমাল্লা নৌকা বাদাম ফুলাইয়া উজান ঠেলিয়া চলিয়াছে সেইখানেই বুঝি হালদারপাড়ার তাল-ভিটা? একবার নষ্টচন্দ্রে পোদ্দার-বাড়ীর নারকেল গাছ হইতে পিড়শুদ্ধ ডাব পাড়িয়া লইয়া বীনু আসিয়া ঘুরঘুটি অন্ধকারে সখের চোরদের কাছে তাহার অসম-সাহসিকতার লোমহর্ষক কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল একনিঃশ্বাসে।······ খানিক দূরে আর একটা বড় গোছের জলীয় আক্রোশ চক্রাকারে ঘুরিতেছে—তারই এদিকে বা ওদিকে অথবা ঠিক ওখানটায়ই জমিরুদ্দীন খাঁ না একবার হালদারদের পড়োদালানটা থেকে দুই দুইটি গোখরা ধরিয়াছিল? পাঁচনলা ট্যাটায়-ফোঁড়া বিষধর-দম্পতির মৃত্যু দেখিতে সারাগ্রামের লোক সেদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল হালদারদের উঠানে। এখনো স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু···ওখানেই তো? হয় তো বা, হয় তো না। উন্মত্ত নদীবক্ষে ডাঙার অবস্থান আজ নির্ণয় করিবে কে? তবু, শান-দেওয়া ক্ষুরের ধার পরীক্ষার মত সুনীলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুর্ব্বার পদ্মার বুকে সতর্ক হইয়া মাটির চিহ্ন খোঁজে!

নিকারীপাড়ার খানকয়েক খড়ের চালা দেখা যায়। আরো কাছে জেলে পাড়াটা। কয়েক ঘর এবার নূতন আসিয়া 'পাতনা' দিয়াছে। গ্রামের জনসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পাইল তবে।

একদল ছেলেমেয়ের ছড়াগান কানে আসে। অণিমাদের বাড়ী নয় তো?—না, কামার বাড়ী?—চালিতা গাছের তলায় আসিয়া এবার স্পষ্ট শোনা যায় নীলুর গলা। ব্যাপারটা তবে সুনীলদের বাড়ীতেই!

বৈঠকখানা ঘরের এদিকে পুকুর পাড়ে তখন এক মজার খেলা। নীলু, বাবলু, টুলু, পাচু—কামারবাড়ীর আরো জনকয়েক ছেলে মেয়ে কুলগাছের তলায় 'মিনি মিনি' খেলিতেছে। নীলুর হাতে একটা সাপলা ফুল—ডাঁট খুলিয়া ফেলিয়া ফিতার মতো লম্বা ছাল দিয়া ফুলটাকে প্যাঁচে প্যাঁচে জড়াইয়া নিয়া নীলু করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আর সকলে সমস্বরে সুর করিয়া দেয় জবাবের পর জবাব।

নীলু গায়, "আমাদের বাড়ীর 'মিনি' তোমাদের বাড়ী গেছে?"

"গেছে।"

"কী করে?"

"রাজার পাতে দুধভাত খেয়ে
আখার পিঠে আছে শুয়ে।"

"ডাক দিলে তো আসবে?"

"আসবে।"

"তবে আয় মিনি মিনি মিনি-ই-ই······" বলিতে বলিতে নীলু লাটিমের মত ছাড়িয়া দেয় সাপলা ফুলের বন্ধন। সবগুলি দল মেলিয়া সাপলা ফুলটা মিনির ডাক শুনিতে শুনিতে মাটিতে আসিয়া লুটায় নীলুর পায়ের কাছে। অপর পক্ষ একসঙ্গে হর্ষ-ধ্বনি করিয়া ওঠে।

পাড়া-বেড়ানো কোন বিড়ালের কানে সে-ডাক পৌছায় কিনা জানিবার প্রয়োজন নাই। মিনি নামক চিরদিনের এক বিড়ালকে উপলক্ষ্য করিয়া এমন খেলা সুনীলরাও কত খেলিয়াছে। আজ সে-মন আর সে বয়স-পার হইয়া আসিয়াছে বহুদূর।

নীলু আবার ডাকিল—মিনি মিনি ?—সাপলা রাণীর শুভ্র হাসি। সাদা ধবধবে দলগুলি মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিশু মনে নাচিয়া বেড়ায়-- সুনীলের শৈশব মনে !

দাদাকে দেখিয়াই ছোট ভাই বাবলু খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসে কাছে, "দাদা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?"

"নদীর পাড়ে বেড়াতে ?"

"আমায় নিয়ে যাও নি কেন ?"

সুনীল পাঁচ বছরের ছোট ভাইটিকে কোলে তুলিয়া নেয়, "তুমি তো তখন ঘুমুচ্ছিলে।"

"তুমি দুগ্‌গা দেখেছো ?"

"হ্যাঁ।"

"কলা-বৌ ?"

সুনীল ভাইকে পুকুর ঘাটে বসাইয়া পায়ের কাদা ধুইতে থাকে।

"দাদা, তোমার বিয়ে ?"

"কে বল্‌লে ?"

"হ্যাঁ, ঠাকুদ্দা বলেছে, মা বলেছে—তোমার কলা-বৌর মতো ঘোমটা-পরা বৌ হবে।"

পাড়ে দাঁড়াইয়া নীলু ও আর সব খেলার সাথীরা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

ঠাকুরদা বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। সুনীলকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলি, বাদল ?"

"নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলুম।—মালাকাররা কোথায় গেল ?"

"তারা ওপারে জাজিবার চরে চলে গেছে।"

ঠাকুরদা বসিয়া আছেন জল চৌকির উপর। সুনীল ঘর হইতে বেতের চেয়ারটা আনিয়া বাবলুকে কোলে লইয়া বসে তাঁহার মুখোমুখী।

মন্দাকিনী এক রাশ বাসন লইয়া খিড়কির পুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

"খোকা তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? অনু এসেছিল। আমি ভাবলাম, তুই বুঝি ওদের ওখানে গিয়েছিস।" বলিতে বলিতে মন্দাকিনী এ-ঘরের বারান্দার কাছে আসিয়া দাঁড়ান। তারপর মুচ্‌কি হাসিয়া শ্বশুরকে কহিলেন, "বাবা, এবার তোমার নাতির সঙ্গে কথাটা পাকা করে নাও।"

সুনীল মায়ের দিকে চাহিয়া হাসে। ব্রজনাথ দত্ত তামাক টানিতে টানিতে একটু কাশিয়া লইয়া ভূমিকা সুরু করেন, "বাদল, আমি আর বেশি দিন নেই। তোর বাবা মরার পর আমার শরীর ভেঙ্গে গেছে তা আর সারলো না—তোরা যদি না—"

"ঠাকুরদা, তুমি কী বলতে চাও তা জানি। এখন নয়। আমায় আরো দু' বছরের সময় দাও।"

"আমি কি আর অদ্দিন থাকব রে ?—আমার সেই বুকের ব্যথাটা আবার দেখা দিয়েছে।"

"পূজোটা হয়ে যাক। আমি তোমায় সব কথা বুঝিয়ে বলব।"

"সেটি হচ্ছে না। এবার তোমার কোনো আপত্তি আমরা শুনব না" বলিয়া মন্দাকিনী শ্বশুরের দিকে চাহিলেন। ব্রজনাথ পুত্রবধূর অর্থপূর্ণ ইসারা লক্ষ্য করিয়াই কহিলেন, "তুই আগে মেয়েটি দেখে আয়।—পছন্দ না হ'লে তো কোন কথা নেই।"

সুনীল জবাব দেয় না। কোলে বসিয়া বাবলুও কহে, "হ্যাঁ, দাদা! তুমি বিয়ে করবে।" নীলুও আসিয়া চেয়ারের কাছে দাদার পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়ায়।

মন্দাকিনী হাসিলেন, "উত্তর দিচ্ছিস না যে? অমন বোবা হয়ে থাকলে ছাড়ছি নে।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রজনাথও নাতিকে ঠাট্টা করিয়া কহিলেন, "বিয়ে করবি কি শেষকালে চুলদাড়ি পাকিয়ে একটা বুড়োধাড়ী মেয়েকে ?"

বাবলু দাদার কোল ছাড়িয়া এবার ঠাকুরদার কোল জুড়িয়া গিয়া বসে। দাদার পক্ষে থাকা এখন সুবিধাজনক নয়। এ-পক্ষ থেকে ঠাকুরদার রসিকতার অনুকরণ করিয়া ও-পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়োধাড়ি বিয়ে করবে ?"

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। নীলু ছোট ভাইকে শাসন করে—"দাদার সঙ্গে বুঝি ইয়ারকি দেয় ?—পাজি ছেলে কোথাকার !"

সুনীল চুপ করিয়া হাসিতেছে। মন্দাকিনী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। শ্বশুরকে দিয়া তার বড় নাতির কাছ থেকে পাকা কথাটা আদায় করিয়া লইতে চান আজই। ব্রজনাথও হুঁকায় একটা টান দিয়া আবার কথা পাড়িবেন, এমন সময় ছোট নাতি ঠাকুরদাকে প্রশ্ন করিয়া বসে, "ঠাকুরদা, তুমি কোনদিন বিয়ে করো নি ?"

“না।”

সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। উৎসাহ পাইয়া নাতি আবার প্রশ্ন করে, “তুমি কাকে বিয়ে করবে ঠাকুরদা?”

“আমার আর চিন্তা কি রে দাদু! কনে তো ঘরেই আছে—আমি না তোর দিদিকেই বিয়ে করব।” বলিয়া ব্রজনাথ নাতিনীর দিকে মুচ্‌কি হাসিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, “কি গো ঠাক্‌রুণ, পছন্দ হয়?”

নীলু মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল, “যাঃ অসভ্য।”

মন্দাকিনী রুখিয়া উঠিলেন, “দ্যাখ, পাজি মেয়ে—যা মুখে আসবে তা-ই বলবি।”

নীলু মারের ভয়ে দৌড়িয়া ঠাকুরদার পিছনে গিয়া আশ্রয় লয়। ব্রজনাথ তাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া হাসিয়া কহিলেন, “তুমি আমাদের দাদা-নাতনির কথার মধ্যে থাকো কেন বলো তো, বৌমা?”

বাবলু এদিকে নীলুকে কিছুতেই ঠাকুরদার কোলে বসিতে দিবে না। দু’জনের ঠেলাঠেলিতে ঠাকুরদা অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “আঃ ও-রকম করিস্ নে। কলকের আগুন পড়ে পুড়ে মরব।”

নীলু ঠাণ্ডা হইয়া প্রশ্ন করিল, “আগুন ধরলে কী হয় ঠাকুর্দ্দা?”

“হবে আবার কী! আমরা সব পুড়ে মরব।”

“আর কে মরবে?”

“সবাই—বাড়ী ঘর-দোর সব।”

“আমাদের নারকেল গাছটা?”

“হ্যাঁ রে”

“পুকুরটা?”

ঠাকুরদা হাসিয়া উঠিলেন, “জলে কখনো আগুন ধরে?” বাবলু এবার চুপ করিল। নীলু ছাড়িবার পাত্রী নয়, তাহার বয়স বেশি। কহিল, “ধরো না ঠাকুর্দ্দা, জলে যেন আগুন লাগে।”

“লাগে তো লাগবে।”

“মাছগুলি সব যাবে কোথায়?”

“কেন, পাঁকের মধ্যে লুকোবে।”

“পাঁকেও যদি আগুন ধরে?”

“যাবে তখন পুকুরপাড়ের বাঁশ-ঝাড়ে।”

“সেখানেও আগুন ধরে যায় যদি।”

“যাবে তোর শ্বাশুড়ীর কাছে—আর পারি নে বাবা!” বলিয়া ঠাকুরদা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। সুনীল নিশ্চিন্ত হয়। এই সুযোগে আসল প্রসঙ্গটা চাপা পড়িয়াছে।

দত্ত বাড়ী ঢাক বাজিয়া উঠিল। নীলু ও বাবলু নাচিয়া ওঠে, “চলো ঠাকুর্দ্দা, দেখব—পূজোয় বসেছে।”

“না-রে এখনো অনেক দেরী।”

“হ্যাঁ, এখনি। তুমি কিচ্ছু জানো না ঠাকুর্দ্দা। চলো!”

বাবলু ঠাকুরদার কোঁচার খুঁট ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে।

ব্রজনাথ নাতি ও নাতিনীকে লইয়া পূজা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়ান। মন্দাকিনী ডাকিলেন, “তুমি যে চলে যাচ্ছ বাবা! নাতি তো জবাবই দিলে না।”

“ভেবো না, বৌমা। বিয়ে কি ওর ইচ্ছের উপর? বি-এ এম-এ পাশ করেছে বলে কি বিয়ের কর্ত্তা ও নিজে? আমরা যা করব ওকে তা মানতেই হবে,” বলিয়া সহাস্যে সুনীলের দিকে চাহিয়া নাছোড়বান্দা নীলু ও বাবলুকে লইয়া পূজা বাড়ীর দিকে চলিলেন।

মন্দাকিনী কাজ অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইয়া হাসিমুখে গৃহকাজে চলিয়া যান।

সুনীল চেয়ারখানি একটু ঘুরাইয়া বসে বরাবর পদ্মার দিকে মুখ করিয়া। ভালো লাগে এই সর্ব্বনাশা নদীকে। জীবনের মতই অবিরত গতি—যৌবনের মতই অব্যাহত। চলে আর ভাঙ্গে। জয়ের পর জয়, তবু মাটির মায়ার ক্ষয় নাই। নূতন করিয়া চর জাগে আবার এখানে-ওখানে। লাঠালাঠি লাগে জমিদারে-জমিদারে। সাব্যস্ত হয় মালিকানা। দেখিতে দেখিতে তৃণগুল্ম লতাপাতায় বালুর চর ঢাকা পড়ে। ধীরে ধীরে দেখা দেয় ঘর-বাড়ী, লোকজন, গরু-বাছুর—আবার কূলে কূলে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। খেয়ালী নদীর হেয়ালীপনা! তবু রাক্ষুসী পদ্মা!...

নমিতা চিঠি লিখিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। শিলং মেলে তারা বেশি দূরে যায় নাই—পাবনায়। সেখান থেকে যাইবে ঢাকায়। নবমী পূজা কি দশহরার মধ্যেই তাদের ঢাকা পৌঁছিবার কথা। নমিতার মামাবাড়ী সেখানে। মা বাঁচিয়া থাকিতে একবার মামাবাড়ী গিয়াছিল ছোটবেলায়। এবার বহুকাল পরে আবার পদ্মা পাড়ি দিল।

সুনীল তাদের সব খবরই রাখে। দোষ কি! সুনীল তো আর গণৎকার নয়। নমিতা ঘরোয়া কথা সব বলে কেন অপরের কাছে?···নমিতা চিঠি দিতে বলিয়াছে ঢাকার ঠিকানায়। সুনীলের ঠিকানাও চাহিয়া রাখিয়াছে—বিজয়ার প্রীতি নমস্কার জানাইবে বুঝি? বিজয়ার আর বাকি ক'দিন?

"খোকা!" মন্দাকিনী একবাটি দুধ আর গোটা কয়েক নাড়ু মোয়া লইয়া আসিয়াছেন।

"এত খাব না মা"

"পূজো বাড়ীর নেমতন্ন—খেতে খেতে সন্ধ্যে হবে। পাতে কিছু রাখিস্ নি কিন্তু। সব খেতে হবে," বলিয়া মন্দাকিনী আবার গৃহকাজে চলিয়া যান।

সুনীল কত কি সব ভাবিতে ভাবিতে খাইতেছে। হুঁস নাই কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অণিমা।

"ওকি বাদলদা'! অঞ্জলি না দিয়েই খাচ্ছেন যে?"

"অনু এসেছিস?—মাটিতে কেন? ঐ জলচৌকির ওপর বোস্ না।—ভারী লজ্জা! চৌকিতে বসলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে?"

অণিমা মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, "অঞ্জলি না দিয়েই খেলেন!"

সুনীল অণিমার দিকে এক মুহূর্ত্ত শুধু তাকাইয়া লয়। কাল অপরাহ্নে ঘরের মধ্যে আব্ছা আলোয় অণিমাকে এতখানি স্পষ্ট করিয়া দেখে নাই। ওদের বাড়ীতেও পুরান লণ্ঠনের ঝাপসা আলোতে তার বয়সটাই বেশি ঠেকিয়াছে চোখে। আজ সকালে দিনের আলোয় অণিমা যেন আর কেহ। সত্যই ও যে কোনদিন এত সুন্দর হইতে পারে আট বছর আগে এ-কথা একবার মনেও জাগে নাই কেন?

সুনীল পাল্টা প্রশ্ন করিল, "খেয়ে অঞ্জলি দেওয়া চলবে-ই না?"

"না।"

"বেঁচে গেলাম।"

"আপনি বুঝি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করেন না?"

"ঠাকুর-দেবতার কথা ভাববার সময় কৈ?"

মুচকি হাসিয়া অণিমা কহিল, "তবে কী ভাববার সময় আছে?"

"মানুষের ভাবনার যেন অন্ত আছে!"

অণিমা ছোট্ট একটি "হুঁ" করিয়া হাসিতে থাকে।

মন্দাকিনী পুত্রের জন্য চা নিয়া আসিয়াছেন। কহিল, "বড়মা, তুমি তো বেশ! ছেলেকে অঞ্জলি দেবার আগেই খেতে দিলে? ছেলেই না হয় কিছু মানে-টানে না, তুমি দিলে কেমন করে?"

মন্দাকিনী কহিলেন, "আজ চার বছর হ'ল ওর কী যে মতিগতি হয়েছে, কোনো কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই।—ওর ঠাকুর্দ্দাই অত ক'রে বুঝিয়ে পারলে না, আর আমি।"

মন্দাকিনী চা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। অণিমা মুখে চোখে হাসি গোপন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া কহে, "বাদলদা, নমিতার বুঝি এ-সবে বিশ্বাস নেই?"

—"এর মধ্যে হঠাৎ নমিতা কেন?"

"এমনি," অণিমা আর এক ঝলক হাসি চাপিয়া যায়।

"তুই যেমনি করে 'এমনি' বললি, ওর মানেটা কিন্তু তত নয়।"

অণিমা তেমনি চুপ করিয়া হাসিতে থাকে শুধু।

"তুই যা ভাবছিস্ অনু তা নয়।"

"কী ভাবছি আমি?" অণিমা বিস্ময়ের ভাণ করে।

"তুই ভারী দুষ্টু হয়ে গেছিস অনু। কী কুক্ষণে মুখ দিয়ে কাল কথাটা বার হয়ে পড়ে এখন তোর ফাঁদে পড়ে গেছি আর কি।"

"তবে না বললেন, তুই যা ভাবছিস্ তা নয়। ঠাকুর ঘরে কে, কলা খাই নে," বলিয়া অণিমা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এলো চুল পিট ছাইয়া মাটি ছুঁইয়া পড়িয়াছে। খানিক আগেই স্নান সারিয়াছে। শিশির-ধোওয়া এক পুষ্পিত শাখার মতই অণিমা। টিনের বেড়া ঠেস দিয়া তির্য্যক ভঙ্গিতে বসিয়া আছে। গায়ের রং উজ্জ্বল-শ্যাম। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। মানানসই লম্বা। হাস্যে-লাস্যে আজিকার উজ্জ্বল প্রভাতখানির মতই স্বভাবিক। সুনীল ঐ মুখখানির উপর এক বিমুগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া নিয়া কথার জবাব দিতে যেন ভুলিয়া যায়।

এমন আপন জনের সঙ্গে এত সহজ আলাপের মাঝখানে বাদলদার অমন করিয়া চাহিয়া থাকায় অণিমার মুখে কিন্তু লজ্জার এক পাতলা পরদা কেবলি পিছলাইয়া মিলাইয়া যায়

ঘনঘন। পায়ের বুড়ো-আঙ্গুলের নখ দিয়া মাটি খুঁটিতে থাকে আনতমুখে।

"অনু!"

অণিমা মুখ তুলিল। তুলিল সেই সুন্দর চোখ দুটি। সুনীল আবার এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া লয় সমঝদারের দৃষ্টিতে।

"তুই ভুল বুঝেছিস, অনু!…"

অণিমা তেমনি নির্ব্বাক। হঠাৎ-আসা লজ্জার রেশটুকু কাটে নাই এখনো।

"সত্যি কথা বলব তোকে। শোন—ওকি লজ্জা পাচ্ছিস কেন?"

"বলুন।"

"মেয়েটিকে ভালো লাগে—কিন্তু ভালো বাসি নে।"

অণিমা মুখ ফিরাইয়া উত্তর দেয়, "একই কথা।"

"না এক কথা নয়।"

তর্কের সুযোগ পাইয়া অণিমা আবার আগের মত সহজ হইয়া ওঠে। মৃদু হাসিয়া কহিল, "প্রথমটায় তা-ই মনে হয়।"

"তুই যে অভিজ্ঞের মতো কথা বলছিস রে!" সুনীল মনে মনে বলে—বড্ড পাকা মেয়ে, মুখে কহিল, "তাই যদি হয়, তুই জানলি কী করে?"

নমিতা লজ্জা পাইয়া চুপ করিয়া যায়। সুনীল অকারণেই একটু কাশিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, "বিশ্বাস কর অনু। নমিতাকে আমি—ভালোবাসা-টাসা বলতে যা মনে করিস তা নয়।"

এ কথার জবাব অণিমার মনেই রহিল—মুখে বলিবার সীমানা পার হইয়া আসিয়াছে সুনীলদা। কি কথায় কি সব অর্থ করিয়া অণিমাকে কেবল বিব্রত করাই তার মতলব। অজানিতে সামনের দু'গাছা উড়ো-উড়ো চুল আঙ্গুলে জড়াইয়া খুলিয়া ফেলে অণিমা, আর খানিক মুখখানি তুলিয়া কখনো বা নামাইয়া বাদলদার কথাগুলির কতক শোনে, কতক নয়।

সুনীলের উচ্ছ্বসিত কৈফিয়তের মাঝখানে বাধা দিয়া আনমনা অণিমা হঠাৎ প্রশ্ন করে, "বাদলদা, নমিতা খুব সুন্দরী?"

সুনীল তার শ্রোত্রীর অমনোযোগ টের পায় এতক্ষণে। অণিমাকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া আপাদশির দেখিয়া লইয়া উত্তর দিল, "খুব কালো।"

"মিছে কথা।"

"তা হ'লে দুধে-আলতা রঙ্।"

"না-না, সত্যি করে বলুন।"

"সত্যি বল্ছি—নমিতা মার চেয়েও কালো।"

"আমার মতো?"

সুনীল হাসিয়া উঠিল, "তুই আবার কালো কৈ রে?—নিজে যে ফর্সা সে কথাটা বুঝি আমার মুখ থেকে একবার শুনে নিতে চাস্, না?"

অণিমা সহাস্য বিস্ময়ে কহিল, "ও মা! আমি নাকি ফর্সা।—বাদলদা, আপনার চোখ খারাপ হয়েছে। এবার ক'লকাতা গিয়ে চশমা নেবেন।"

সুনীল যে অণিমার দিকে চাহিয়াই আছে, অণিমার সেদিকে নজর আছে কিনা বোঝা যায় না। আবার সে জিজ্ঞাসা করিল, "নমিতা গান গাইতে জানে?"

"হ্যাঁ। বেশ গায়।—রেকর্ডেও গান দিয়েছে।"

"আপনি কখন্ পড়াতে যান?"

"সন্ধ্যের পর।—তোর অত সব প্রশ্ন কেন অনু? স্পষ্ট জবাব তো আগেই দিয়েছি। তাতেও যদি মিথ্যে বলে থাকি, বেশি জিজ্ঞাসা-বাদেই কি আর সত্য কথা বার হবে?"

অণিমা হাসিয়া ওঠে, "সে তো জানি। এ-কথাটা আগে বললেই তো ফুরিয়ে যেত।—আমি এবার যাই, বাদলদা। অনেকক্ষণ এসেছি। মা বুঝি রাগ করছে। এক রাজ্যের জামা-কাপড় কাচব বলে ফেলে রেখে' এসেছি। সে-কথা যে ভুলেই গেছি।"

"যাচ্ছিস অনু?"

"তবে কি এখানে বসে আপনার সঙ্গে খালি বক্‌বক্ করব! আমার বুঝি আর কাজ-কম্ম নেই?" বলিয়াই অণিমা সুনীলের সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জা বাঁচাইতে সরিয়া-যাওয়া আঁচলটা বুকের উপর টানিয়া লয়। কিন্তু আর একটা লজ্জা হঠাৎ সুনীলের চোখে আসিয়া যেন ধাক্কা খাইয়া পড়ে। অণিমার পুরানো সেমিজটা সস্তা ছিটের, হাতে তৈরী, ছেঁড়া—কণ্ঠা থেকে কাঁধ অবধি ভিন্ন রঙের এক টুক্‌রা কাপড়ে সরু করিয়া একটা লম্বা তালি। এই পূজার দিনে অণিমার পরণে আধময়লা পুরাণো শাড়ি! নরেশ কাকা

কি মেয়েকে তার একখানি বঙ্গলক্ষ্মীর আটপৌরে কাপড়ও কিনিয়া দিতে পারেন নাই? হতভাগা!

সুনীল পিছু ডাকে "অনু, কথা শোন।"

অণিমা ফিরিয়া দাঁড়ায়। কথাটা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। সুনীল পড়ে মহা বিপদে। একটা কিছু বলিতেই হইবে। কি-ই বা বলা যায়! উঠানের উপর ক্রীড়ারত বিড়ালের বাচ্চাটাকে দেখাইয়া কহিল, "দ্যাখ অনু, বাচ্চাটা কেমন খেলছে।"

"এরি-জন্যে আমায় ডাকা? আপনি ভা-রী দুষ্টু!"

"ও বুঝি আর দেখবার মতো নয়? কেমন আপন মনে খেল্‌ছে। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। জামাকাপড়ের বালাই নেই। টাকা কড়ির হিসেব রাখতে হয় না। ধূলোকাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে!"

"আপনার কাব্যি শুনবার সময় আমার নেই।" বলিয়া অণিমা হাসিয়া উঠিল। স্বচ্ছ সহজ হাসি। হরিদ্বারের গঙ্গার মত মনের তল অবধি যেন দেখা যায়। ওখানে তো ছেঁড়া সেমিজের প্রশ্ন নাই! সুনীল আনমনা চাহিয়া আছে শুধু। বাদলদার অমন নির্ব্বাক ভাবান্তর অণিমার কাছে কেমন-কেমন মনে হয় যেন। আবহাওয়াটা বদলানো দরকার। হাসিয়া কহিল, "বাদলদা, পুষির সাদা বাচ্চাটা আমরা নিয়েছি। হরিণ রঙের বাচ্চাটাই সব চেয়ে ভালো ছিল দেখতে। দত্তবাড়ীর ছোট হিস্যের খুড়িমা সেটা চেয়ে নিয়েছেন। ঐটুকুন তো বাচ্চা—তবু রাগ হ'লে লেজ ফোলায় কি চমৎকার!"

সহজ তুচ্ছ কথা—নমিতার মত এক প্রসঙ্গ থেকে আর এক প্রসঙ্গে সিরিয়স্ হইবার ভান করিতে জানে না। মনের সেই সম্পদ অণিমার নাই। তবু ভাল লাগে—বড় ভাল লাগে শুধু হালকভাবে শুনিয়া যাইতে।

"আমাদের পেনুর কিত্তি শুন্‌বেন, বাদলদা?"

"পেনু কে?"

"পুষির মেজো-বাচ্চা গো—আমরা যেটা নিয়েছি। সেদিন কী কাণ্ডটাই না করলে! আমি গেছি পুকুরঘাটে, মা ঢেঁকিঘরে। বলু আর টুলুও বাড়ি নেই। ঘরে ফিরে দেখি কী! আপনাদের পুষি কখন এসে রান্নাঘরে ঢুকে দুধের কড়াই থেকে—" অণিমা যেন কত বড় এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাইতেছে এমনি ভাবেই বলিয়া চলিল, "দেখি কি বাদলদা, মা-ছেলেতে দুধের ভাগ নিয়ে তুমুল ঝগড়া!"

"তারপর?"

"তারপর বাদলদা, বললে বিশ্বেস করবেন না, একরত্তি বাচ্চাটা তার মাকে খিমচে কামড়ে আর রাখলে না। পুষি কিন্তু একটিবার শুধু থাবা দেখিয়ে আস্তে আস্তে বার হয়ে গেল।"

সুনীল হাসিয়া কহিল, "পুষি কিচ্ছু বল্‌লে না?"

"শুনুন। এখনো শেষ হয় নি। তার দু'তিন দিন পরেই বাবার পাতের কাছে কাঁটা খাচ্ছিল পেনু আর কামারদের একটা কালো বাচ্চা। দুটিতে বড় ভাব। আমাদের চৌকির নিচে ওরা রাতদিন খেলা করে। পুষি চৌকাঠের মধ্যে ঘাড় গলিয়েই রেগেমেগে গা ফুলিয়ে তেড়ে এল। তারপর কামারদের বাচ্চাটাকে কামড়ে খিমচে ভাগিয়ে দিলে। নিজে কিন্তু মাছের কাঁটা ছুঁলেও না একবার। ছেলেকে নিয়ে বাইরে এসে মিউ মিউ করে চলে গেল। দেখুন তো, ছেলের জন্য মার কী দরদ!"

"কামারদের বেড়ালটা বুঝি মাদি?"

"হুঁ"

"তাই বল্।"

সুনীল ও অণিমার এই আলাপ আলোচনা আরো কতক্ষণ গড়াইয়া চলিত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ টুলু আসিয়া পিছন হইতে দিদিকে শাসাইতে থাকে, "মা তোমায় বকছে। মজা দেখাবে'খন আজ। তুমি কাপড়গুলো উঠোনে ফেলে সেই কখন এসেছ, আর বাড়ী ফিরবার নামটি নেই।"

অণিমা সুনীলের দিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে কহিল, "দেখুন দিকিনি, আপনি খালি খালি আমায় দেরি করিয়ে দিলেন।"

সুনীল হাসিয়া কহিল, "কাকীমাকে বলিস্, আমি সন্ধ্যের পর যাব।"

অণিমা চলিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। তার ছেঁড়া সেমিজটা সত্যই বড় বিশ্রী ঠেকে এখনো। অণিমাকে তার ভাল লাগে বলিয়াই কি জোড়াতালিটা এত কুশ্রী ঠেকে? বেশ তো! ইহাতে অন্যায়টা কোথায়! একটি হৃদয় আর একটিকে আস্বাদ করিতে চায় শুধু।

কিন্তু···বকুল তার মনখানি যে কলিকাতার মনের নাগাল

পায় না।···না পাক্। আপাততঃ বড় কথা—কদর্য্য কথা—সব চেয়ে কুৎসীৎ অসহ্য কথা অণিমার ঐ ছেঁড়া সেমিজ। সহসা নমিতা সেনের কতদিনের কত না ছাঁদ সুনীলের মনের চোখে জাগে। নিত্য-নতুন শাড়িব্লাউস বদলায় সে। সেই যে জন্মদিনে নমিতা একটা ফিকে-গোলাপী ব্লাউজের উপর একখানি ভাগলপুরী সিল্ক পরিয়াছিল সিগারেটের ধোঁয়া রঙের—অণিমার উজ্জলশ্যাম কণ্ঠাস্থি থেকে কাঁধ অবধি—গলা থেকে গোড়ালি পর্য্যন্ত, সেই শাড়ি আর সেই ব্লাউজ মানাইবে অণিমাকেই ভাল—আরো চমৎকার।···

অণিমার আজই একখানি নতুন শাড়ি চাই। আর চাই একটি রঙীন ব্লাউজ্ বা সাদা সেমিজ্। কি বিসদৃশ জোড়াতালি! অণিমাকে পূজায় কাপড় দিবার তার অধিকার আছে—ন'কাকীমা শুধ্ গ্রাম সম্পর্কেই কাকীমা নন, তিনি নাকি ছোটবেলায় সুনীলকে কোলে-পিঠে করিয়াছেন। অণিমাকে ব্লাউজ কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তার আছে। হঠাৎ আবার নন্দ দাস!···সুন্দর বৌদি, ছবি ও টেঁপি। তাদের সঙ্গে অণিমার কি তুলনা সাজে? অণিমা শুধু অণিমা। অণিমাকে তার ভালো লাগে। ব্যস! এখানে করুণার প্রশ্ন নাই। ঔচিত্যের কৈফিয়ৎ নাই। বিচার বিবেচনার ঝঞ্ঝাট নাই। নন্দদাস কষ্টে আছে চিরকালই, তেমনি থাকুক। তার কষ্টটা সুনীল যত মনে করে, আসলে তা নয়। কোনরকমে সহিয়া মানিয়া নির্ব্বিবাদে নন্দদাস ভালোই আছে।······

একদিন আর এক সকালের মধ্যেই নমিতা সেনের মিষ্টি চোখের কাছে ক্ষণে ক্ষণে আসিয়া অণিমার দুষ্টু হাসি মিলায়।···অণিমা যদি নমিতা হইত বা নমিতাই অণিমা—অথবা খানিক নমিতার সঙ্গে খানিক অণিমা। সুনীলের এই সংমিশ্রণের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, ছেঁড়া সেমিজটা কেবলি হাতে ঠেকে।···এমন সময় মন্দাকিনী আসিয়া ছেলের মাথায় হাত রাখিলেন।

"খোকা, আবার তো জিগগেস করতে ভয় করে আমার। ফোঁস করে উঠ্বি। খালি খালি ভাবছিস্ কী এত?"

সুনীল মার একখানি হাত কোলে টানিয়া নিয়া হাসিয়া কহিল, "পদ্মার দিকে চেয়ে এমনি বসে বসে ভাবতে আমার বড় ভালো লাগে মা।"

"নাইতে যা।—বেলা কম হয়নি।"

"যাচ্ছি," বলিয়া সুনীল মার ডান হাতখানি তুলিয়া নেয় মাথার উপর।

"মা, অনুর মার কাছে কাল অনেক কথাই শুনলাম। ওদের তো বড় কষ্টে চল্‌ছে দিন।"

"কষ্ট বলে কষ্ট! ন'ঠাকুর যদি অবুঝ না হ'ত তবে এত দুখখু পেতে হত না। অনুটার জন্যে কষ্ট হয়।—অমন লক্ষ্মী মেয়ে!"

"ওর বিয়ের কোনো চেষ্টা করছে না কেন?"

"টাকা কোথায়! সম্বলের মধ্যে তো ঐ একখানা চৌচালা ঘর। রেহান দিয়ে আর কতোই বা পাবে।—ন'ঠাকুরের গুমর দেখে গা জ্বালা করে। বলে, মেয়েকে যার তার হাতে ধ'রে দিতে পারব না। মালখানগর থেকে এক সম্বন্ধ এল। অবস্থা খুবই ভালো। দোজবর হলেও বয়েসও বেশি নয়। ন'ঠাকুরের মন উঠ্‌লো না। পয়সা যখন নেই, তখন অত বাছবিচার করলে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়।"

সুনীল ধক্ করিয়া কথাটা বলিয়া ফেলিল—"অনুর পরণে আজ পূজোর দিনে নতুন কাপড় দেখলাম না তো।"

"ছোট ছেলে-মেয়ে তিনটেকে কোন রকমে একখানা ক'রে কাপড় কিনে দিয়েছে।—টাকা কোথায়? ছাত্র পড়িয়ে ন'ঠাকুর পান সাত টাকা। সুনুও স্কুল থেকে পঁচিশ-ত্রিশ সেরের বেশি চাল পায় না।"

"মা, ন'কাকীমা কাল বলছিলেন, তিনি নাকি ছোট সময় আমায় রাতদিন কোলে-পিঠে করতেন।"

"তোকে খুব ভালো বাসত সুনু। তখনো তো ওর কোন ছেলেপেলে হয়নি কিনা।"

"আচ্ছা, তা হ'লে ন'কাকা কাকীমা আর অনুকে—তুমি যদি বলো"—

অকারণেই একটু কাশিয়া লইয়া পুত্র কহিল, "পূজোয় একখানা করে কাপড় কিনে দিলে কি সেটা খারাপ দেখাবে?"

"খারাপ আর কী দেখাবে এতে।"

"তবে তিনখানা কাপড় দিতে তুমি না পারো এমন নয়।"

"বেশ তো।—তোর ঠাকুর্দ্দা যেন টের না পান। তাঁর বয়েস হচ্ছে, আর দিনের দিন কেমন খিটখিটে হয়ে

পড়ছেন। তার সন্দেহ, আমি নাকি ওদের চাল-ডাল ধার দিই। মাসের শেষে কিছু আনতে বললেই, বলেন, এরি মধ্যে কী করে ফুরিয়ে গেল ?"

"তা হ'লে আজই ওদের কাপড় কিনে দিই ?"

"বেশ তো," মন্দাকিনী আনন্দের সহিতই ছেলের প্রস্তাবে সম্মত হন। অণিমাদের উপকার করা হইবে সে-কথাটা তার কাছে বোধ হয় খুব বড় কিছু নয়, তাঁর গর্ব্ব চাকুরে ছেলের।—দু চার জোড়া কাপড় দিয়া আত্মীয় মণ্ডলে নিজেকে জাহির করিবার একটা সুযোগ মন্দাকিনী পাইলেন।

"তবে আমি নেয়ে উঠে বাজার থেকে কাপড় নিয়ে আসি ?—দত্তবাড়ী খেতে তো এখনো তিন-চার ঘণ্টা বাকি।"

"না-না, এ দুপুর বেলা না খেয়ে অদ্দুর যেতে পারবি নে। কাল দিলেও হবে।"

"আচ্ছা, সন্ধ্যের পর উমেদপুর মনসাবাড়ীর প্রতিমা দেখতে তো যাবই, তখন আসবার পথে কিনে নিয়ে আসব'খন।"

মন্দাকিনী চলিয়া যাইতেই সুনীল উঠিয়া দাঁড়ায়। কাপড় কিনিতে সে এখনই যাইবে। সন্ধ্যার পর একটু দেরী করিয়া বাড়ী ফিরিলেই মায়ের মনে আর সন্দেহ থাকিবে না যে, কাপড় সে-দুপুর রোদে দেড় মাইল হাঁটিয়া গিয়া কিনিয়া আনে নাই।···

দেরী সয় না। অণিমার সেই তালি-দেওয়া সেমিজটা! ··সুনীল বড় ঘরে গিয়াই আধ মিনিটের মধ্যে তেল মাখে মাথায়। তাড়াতাড়ি যায় পুকুর ঘাটে। পাচ মিনিটেই স্নান সারিয়া ফিরে। কাপড়-জামা পরিতে মিনিট দুই। চুল আঁচড়াইতে কয়েক সেকেণ্ড। লেট-হওয়া ডেলি-প্যাসেঞ্জারের মত সুনীল সুটকেস খুলিয়া টাকা নিয়া বাহির হইয়া পড়ে। চিরকালের অসহিষ্ণু সুনীল! অণিমার মুখখানিকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার অনুকম্পার চক্রখানি ঘুরিতেছে এ-কথা সে অস্বীকার করে না। ক্ষতি কি? তবু অণিমার ঐ ছেঁড়া সেমিজটাই দায়ী—ওটা একেবারেই অসহ্য! মানায় না ওকে!

অণিমা বাড়ী ফিরিতেই সুলতা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "দু'টো কাঁচা লঙ্কা চেয়ে আনতে তোর এক ঘণ্টা লাগে ?"

"ও ছাই! সে-কথা যে ভুলেই গেছি!" অণিমা গালে হাত দিয়া জিব কাটিয়া অপরাধী সাজে, "রেগো না মা। ও-বেলা চেয়ে আনব'খন। টুলুরা তো সব দত্তবাড়ীই খাবে। তোমার আর আমার—সরবাটা ঘি আছে একটু, তাতেই চলে যাবে দু'জনের। এ-বেলা ডাল আর নাই বা রাঁধলে।—হিঞ্চে ভাতে দিয়ো।"

"ভাত রাঁধা যেন তোর জন্যে বাকি রয়েছে ?—বছরের দিন খাবি এখন! যেমন কপাল নিয়ে এসেছিস্ তেমনি তো হবে—"

"আঃ চটো কেন অত!" অণিমা হাসিতে থাকে, "কী এমন মন্দ কপাল নিয়ে এসেছি, তা-ও তো বুঝি নে।"

"না, রাজকন্যে তুমি!"

অণিমা হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

"আবার হাস্‌ছে মেয়ে!—লজ্জাও নেই। লঙ্কার কথা চুলোয় যাক্, কাপড়-গুলোয় সাবান মেখে ফেলে রেখে গেছিস সেই কোন্ সকালে, তাও কি আমায় কাচতে হবে ?"

"চান করবার সময় কাচব গো, তুমি অত বকবক করো না। বাদলদা এদ্দিন পরে এসেছে, কথা বল্‌ছিল—মাঝখানে হঠাৎ উঠে পড়তে পারি বুঝি!"

এবার সুলতা চুপ করেন। খানিক বাদে মেয়ের সারা দেহে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করেন, "কাল পৈ পৈ করে বারণ করেছি তোকে, ঐ ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে বেরোস্ নি কোথাও, তা যদি কাণেও তুলিস্!"

"আমি যেন বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্নে গিয়েছি—সেজে গুজে যেতে হবে!"

"ও-বাড়ীই বা অমন করে যাবি কেন!—বাদল সহুরে ছেলে, এ-সব নোংরামি দেখতে পারে না।"

"হ্যাঁ, তোমায় এসে বলেছে—দেখতে পারে না। না পারে, যাব না তাদের বাড়ী।"

"মুখপুড়ীর কথা শোন! ফরসা শাড়ীখানা পরলে তোর গতর ক্ষয়ে যায় ?"

এবার মেয়ে পাল্টা ঝঙ্কার দেয়, "কত শাড়ী ব্লাউজ কিনে দিয়েছ তোমরা, পরে পরে গা আমার ব্যথা হয়ে গেল," বলিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া যায় রাগতভাবে।

বাহিরে সুলতা মুখ বিড় বিড় করিয়া উঠান ঝাঁট দিয়া চলিয়াছেন।

অণিমা আরশীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। নিজের মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখে। ফিক্ করিয়া হাসিয়া জানিতে চায়, কেমন দেখায় তাহাতে। একবার বাঁ দিকে, আবার ডান দিকে ঘাড় ফিরাইয়া আড়চোখে দেখে আধখানা মুখ। যে-ভাবেই দেখে ভাল লাগে নিজেকে। কেবলি ভাল লাগে। বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া অণিমাকে দেখিতেছে যেন আর কেহ। হ্যাঁ, অণিমা সত্যই সুন্দরী। যার যাহা ইচ্ছা বলুক না কেন, অনিমার সঙ্গে নাকি আর কাহারো তুলনা! ফুঃ!

বাদলদা! বাদলদা যেন কেমন! মাঝে মাঝে এমন-ভাবেই তাকাইয়া থাকে যে অণিমার লজ্জা করে বড়! বাদলদার কব্জির কাছের হাড়গুলি কি মোটা! গায়ে বুঝি অসম্ভব জোর। হাফ্-সার্টে তাহাকে মানায় কি চমৎকার! লম্বা নাকটা সত্যই খাসা। ব্যাক্-ব্রাশ চুলটা শুধু ভাল লাগে না অণিমার। ইচ্ছা করে, একটা চিরণী লইয়া ঐ বড় বড় ঢেউ-খেলানো চুলগুলি আঁচড়াইয়া নিজের ইচ্ছামত বাঁ-দিক ঘেঁষিয়া একটা টেরি কাটিয়া দেয়। বাদলদা শুধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিবে চুপচাপ। মাঝে মাঝে না হয় বলিবে —উঁ! বড্ড লাগে অনু, তোর চিরুণীর কাঁটাগুলোয় কি ধার বাবা! তারপর অণিমার মুখের দিকে খানিক আগেকার মত একবার না হয় একদৃষ্টে খানিকটা চাহিয়াই লইল। অণিমাও না হয় লজ্জা পাইয়া মুখখানি নামাইয়া নিবে। বাদলদা ভারী দুষ্টু!

বাদলদা! অণিমার চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল করে চক্‌চক্। এ আবার কি! অবাক হয় অণিমা। আনন্দেও চোখে আসে জল! জীবনে এ যে সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা! —এক অদ্ভুত অনুভূতি। আয়নার মধ্যে দু'ফোঁটা জল এবার চোখ ছাড়িয়া গালে নামিয়াছে।

দুয়ারের কাছে পায়ের শব্দ পাইয়াই অণিমা তাড়াতাড়ি চোখে মুখে আঁচল চাপিয়া দেয়।

"ও কি রে অনু! কাঁদছিস কেন?" সুলতা উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে জবাব দেয় অণিমা, "কাঁদব না! রাতদিন তুমি খালি খালি বকো আমায়।"

"আ মর! তাই বলে এই বচ্ছরকার দিনে তুই চোখের জল ফেলবি?"

সুলতা কাছে আসিয়া একখানি হাত ধরে মেয়ের।

"কাঁদি নি গো," অণিমা এবার মুখের উপর হইতে আঁচল সরাইয়া হাসিয়া ওঠে, "চোখের মধ্যে একটা পোকা ঢুকেছিল, কত কষ্টে বার করেছি।"

"তাই বল্"—সুলতা নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া যান।

ক্রমশঃ

গ্যাস দ্বারা মটরগাড়ী চালানো

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

পেট্রল চালিত মটর-ইঞ্জিনের আবিষ্কারক গটনির ডেমলারও বোধ হয় জানিতেন না যে—কালে যুদ্ধ জয়পরাজয় এবং দেশের স্বাধীনতা পরাধীনতাও অনেকাংশে এই ইঞ্জিনচালিত যান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্ধারিত হইবে। বর্ত্তমান জগতে মটর যানের এই প্রাধান্যের ফলেই খনিজ তৈল যেসব দেশে নাই তথায় অন্যদ্রব্য ব্যবহার করিয়া ঐ গাড়ী চালানো সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়। এই গবেষণার ফলেই গ্যাস দ্বারা মটর গারী চালানো সম্ভব হইয়াছে। যাঁরা গ্যাসের আলো সম্বন্ধেই খবর রাখেন তাঁদের কাছে হয়ত কথাটা নূতন বলিয়াই মনে হইবে। বাস্তবিক কয়লা, কোককয়লা, কাঠ কয়লা এবং জ্বালানিকাঠ হইতে একপ্রকার গ্যাস গাড়ীর ভিতরই তৈয়ার করিয়া উহা চালানো যায়। তৈয়ারী গ্যাস সিলিণ্ডারে (Cylinder) ভর্ত্তি করিয়া নিয়াও ব্যবহার করা চলে। জার্ম্মাণীতে সিলিণ্ডার ভর্ত্তি গ্যাসের বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার মত সহরে এই ভাবে গাড়ী চালানো খুবই সম্ভব। সিলিণ্ডারপূর্ণ গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। গাড়ীতেই গ্যাস প্রস্তুত করিয়া উহা চালানোর বিষয় বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে অসংখ্য গাড়ীতে গ্যাস ব্যবহারের ফলে তথায় প্রতি বৎসর পেট্রলের বিক্রয় ৪০,৮৩,০০০ মণেরও অধিক হ্রাস হইয়া

গিয়াছে। এই বিষয়ে জার্ম্মাণীর পরই ইতালির স্থান। ঐ দেশে পেটলের কাট্‌তি প্রতিবৎসর ১০,৮৮,৮০০০ মণ কমিয়াছে। একমাত্র মিলান ও ফ্লোরেন্সের চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানে অধুনা পাঁচশতেরও অধিকসংখ্যক বাস ও লরীতে ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত গ্যাসের ব্যবহার হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে বড় বড় সহরেই গ্যাস চালিত মটর গাড়ীর প্রচলন ছিল। আজকাল কোনও কোন প্রদেশে সিলিণ্ডারে গ্যাস ভর্ত্তি করিয়া দিবার ঘন ঘন ব্যবস্থা হওয়ায় বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও গাড়ীতে গ্যাস ব্যবহার করিয়া যাতায়াত করা যায়। এই সম্বন্ধে দুইটী উদাহরণ দিতেছি। জানোদের সহর হইতে ব্রেমেন সহরের দূরত্ব বড় কম নয়। এই দুই সহরে যাতায়াত শুধু গ্যাস ব্যবহার করিয়াই করা চলে। বার্লিন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর একটীবর্ত্মের (route) একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত গ্যাসচালিত বাসে যাতায়াত করা সম্ভব হইয়াছে। এই রাস্তায় উনিশটী বাস যাতায়াত করে। হিসাব করিলে দেখা যায় যে এই বাসগুলি গ্যাস ব্যবহার করিয়া মোট আড়াই হাজার মাইল প্রত্যহ অতিক্রম করিয়া থাকে।

গ্যাস ব্যবহারের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। অঙ্গারকণা ইত্যাদি জমিবার ফলে পেট্রল চালিত গাড়ীর ইঞ্জিন প্রায়ই খারাপ হইয়া যাইতে দেখা যায়। এই কারণে অসুবিধা এবং অর্থদণ্ড যথেষ্ট হয়। রাস্তার মাঝখানে গাড়ী বিগড়াইয়া যাওয়ার ফলে বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই এইরূপ আরোহী বা চালক খুবই বিরল। গ্যাস চালিত মটর গাড়ীতে এই অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে যে এই প্রকার গাড়ীর ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে ইহাও তাহার একটি কারণ। পেট্রলচালিত গাড়ী হইতে নির্গত ধোঁয়া, চালক, আরোহী এবং পথিক সকলেরই বিরক্তিকর। এই অসুবিধার দূরীকরণ সকলেরই বাঞ্ছনীয় ছিল। গ্যাস চালিত যান ব্যবহারে ইহা সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করা যায়। ব্যয়ের দিক হইতে আরও দুইটি সুবিধার কথা উল্লেখ করিব। ইঞ্জিনে লুব্রিকেটিং তৈল (lubricating) বা পেট্রলের বাষ্পের সহিত মিলিয়া যাওয়ার ফলে ঐ তৈলের কার্য্যকারিতার কিছু অপচয় ঘটে। কিন্তু গ্যাস ব্যবহার করিলে এই ক্ষতির সম্ভাবনা মোটেই থাকে না এবং ঐ তৈলের ব্যয় অনেকটা কমিয়া যায়। পেট্রল চালিত গাড়ীর ইঞ্জিনকে প্রথম চালাইতে অনেক সময় যে বেগ পাইতে হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। গ্যাস দ্বারা ইঞ্জিন চালাইলে এই অসুবিধার আশঙ্কা মোটেই থাকে না। এই কারণে অল্পসময়ের জন্য গাড়ী থামাইতে হইলেও ইঞ্জিনের গতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে। ইহার ফলে বাৎসরিক ব্যয় বেশ কমিয়া যায়। উপরে যে সব সুবিধার কথা উল্লেখ করা হইল—ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের মূল্য মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়।

পাম্পিং ষ্টেশনের আভ্যন্তরিক দৃশ্য

গ্যাস পাম্প করিবার যন্ত্র

গ্যাস ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য যেসব সিলিণ্ডার সাধারণতঃ ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাদের ওজন অত্যন্ত বেশী। এইরূপ সিলিণ্ডার গাড়ীতে দেওয়ার ফলে তাহার মাল বহন করিবার ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। পক্ষান্তরে সিলিণ্ডার অত্যন্ত শক্তিশালী না হইলে আভ্যন্তরিক গ্যাসের প্রবল চাপে ইহা বিনষ্ট হইয়া আরোহী এবং পথিকের প্রাণহানিও ঘটাইতে পারে। এই কারণে হালকা সিলিণ্ডার ব্যবহার করাও নিরাপদ নয়। প্রধানতঃ এই অসুবিধার জন্যই মটর গাড়ীতে গ্যাস ব্যবহারের প্রচেষ্টা পূর্ব্বে বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই। কিন্তু অধুনা একপ্রকার বিশেষ শক্তিশালী ইস্পাত আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই ইস্পাত ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত লঘু এবং বিশেষ শক্তিশালী সিলিণ্ডার তৈয়ারী করা যায়। গ্যাসের ব্যবহার যে অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে এই আবিষ্কার। বহু পরীক্ষার ফলে এই হাল্‌কা সিলিণ্ডার ব্যবহারের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ইহার ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন।

কিন্তু সিলিণ্ডারে একবারে যতটা গ্যাস নেওয়া চলে তাহাতে ৬০ হইতে ৯০ মাইলের বেশী যাওয়া যায় না। সুতরাং রাস্তায় গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে বেশী দূরবর্ত্তী স্থানে শুধু গ্যাস ব্যবহার করিয়া যাওয়া চলে না। কিন্তু বড় বড় সহরে যেখানে গ্যাসের ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই খানে সহজেই ইহার দ্বারা গাড়ী চালানো সম্ভব। গ্যাস সিলিণ্ডারে পাম্প (pump) করিয়া দেওয়ার প্রথা এইরূপ উন্নত হইয়াছে যে পেট্রল দেওয়ার মত গ্যাস দিতেও বিশেষ কিছুই সময় লাগে না। সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া নিলেই সাধারণ মটর গাড়ীতেও গ্যাস

ব্যবহার করা চলে। হঠাৎ গ্যাস ফুরাইয়া গেলে তখন পেট্রলেও গাড়ী চালানো যায়। সুতরাং সঙ্গে কিছু পেট্রল থাকিলে আর কোন ভয়ই থাকে না।

হালকা সিলিণ্ডার আবিষ্কারের ফলেই গাড়ীতে গ্যাস ব্যবহার করা সম্ভব হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই প্রচেষ্টার পিছনে রহিয়াছে অন্য দেশের পেট্রল ব্যবহার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অদম্য উদ্যম। যাহাতে যুদ্ধ বাধিলে মুস্কিলে পড়িতে না হয় সেইজন্য অধিকাংশ স্বাধীন দেশই বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষগুলিকে নিজের দেশের কাঁচা মাল হইতে তৈয়ার করিতে ব্যস্ত। গত মহাযুদ্ধে বিলেতেও শেষে মটর গাড়ীতে গ্যাস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভেই সেই খানে গ্যাস ব্যবহারের কথা শুনা যাইতেছে। জার্ম্মাণী গত মহাযুদ্ধে বাতাস হইতে নাইট্রোজেন (nitrozen) আহরণ করিয়া যুদ্ধের বারুদ ও জর্মার জন্য সার তৈয়ার করিয়াছিল। জার্ম্মাণীর পক্ষে যে বহুদিন যুদ্ধ চালানো সম্ভব হইয়াছিল ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহার আয়োজন আরও অধিক এবং ক্রুটিহীন।

একটী মটরলরীতে গ্যাস দেওয়া হইতেছে

প্রবন্ধে একটী পাম্পিং ষ্টেশনের (Pumping Station) ছবি দেওয়া হইল। নল সংযোগে একটী মটর লরীর সিলিণ্ডারে গ্যাস ভরা হইতেছে। কতটা গ্যাস দেওয়া হইল তাহা মাপিবারও একটী যন্ত্র পার্শ্বে দণ্ডায়মান। ইহা দেখিতে অনেকটা পেট্রল দেওয়ার ও মাপিবার যন্ত্রেরই অনুরূপ। ষ্টেশন গৃহের আভ্যন্তরিক দৃশ্যেরও একটী ছবি দেওয়া হইল। বামপার্শ্বস্থ যন্ত্রটী দ্বারা ডান দিকের বড় বড় সিলিণ্ডারগুলিতে বহুল পরিমাণ গ্যাস পাম্প করিয়া মজুত করা হয়। এই সিলিণ্ডারগুলির সঙ্গেই নল সংযোগ করিয়া মটর গাড়ীর সিলিণ্ডারে গ্যাস দেওয়া হইয়া থাকে।

গ্যাস ব্যবহারে কিরূপ ব্যয় পড়ে সেই সম্বন্ধে দুই চারটী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে জার্ম্মাণীতে পেট্রল ব্যবহারে যেখানে উনিশ টাকা ব্যয় হয়, গ্যাস ব্যবহারে সেই যায়গায় সর্ব্বসমেত মাত্র তের টাকার প্রয়োজন। গ্যাস ব্যবহার করিতে হইলে গাড়ীর যেসব পরিবর্ত্তন দরকার হয় তজ্জন্য ২১০৲ হইতে ৩৫০৲ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ইহার উপর সিলিণ্ডার ক্রয় করিবার ব্যয়ও ধরিতে হইবে। কিন্তু ঐ দেশে গ্যাস ব্যবহার করিলে শতকরা ৫০৲ টাকা টেক্স রেহাই পাওয়া যায়। সুতরাং উপরোক্ত ব্যয় শীঘ্রই উঠিয়া যায়। এই সব কারণে গ্যাস ব্যবহারে খরচ খুব কম পড়ে, অন্য দিকে দেশীয় কয়লাও কাজে লাগানো চলে। কারণ কয়লা হইতেই এই গ্যাস সাধারণতঃ তৈয়ারী হইয়া থাকে। কয়লার মূল্য ভারতে অনেক কম, সেইজন্য এখানে খরচের মাত্রা আরও কম হইবে সন্দেহ নাই। গভর্ণমেণ্ট এবং ব্যবসায়িগণ এই বিষয়ে সচেষ্ট হইলে গ্যাস ব্যবহার বড় বড় সহরে খুবই আরম্ভ করা চলে। কয়লাকে সম্পূর্ণরূপে গ্যাস করিবার ব্যবস্থাও আজকাল হইয়াছে, সুতরাং কোক বিক্রয় করিবার বিষয় এখন আর ভাবিতে হয় না। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে কয়লা হইতে গ্যাস তৈয়ারী করার সময় যে কোক হইত তাহাও বিক্রয় করার ব্যবস্থা করিতে হইত। গ্যাসের কার্য্যকরী শক্তি বাড়াইতে পারিলে একই পরিমাণ গ্যাস ব্যবহার করিয়া আরও দূরবর্ত্তী স্থানে যাওয়া চলে। এই বিষয় বিলেতে গবেষণা হইয়া গিয়াছে। বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের উদ্ভাবিত একটী উপাদান ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের প্রস্তুত গ্যাসে যেখানে নয় পেনী ব্যয় হয়, পেট্রল ব্যবহারে সেই স্থলে এগার পেনীর দরকার। বিলাতে কয়লার মূল্য অত্যধিক। প্রতি টনের মূল্য সেখানে প্রায় সাড়ে তের টাকা, কিন্তু ভারতে এই পরিমাণ কয়লা মাত্র সাড়ে তিন টাকা ব্যয় করিলে পাওয়া যায়। এই দেশে মজুরির খরচও তুলনায় অনেক কম। অন্য দিকে বিলাতের তুলনায় ভারতবর্ষে পেট্রলের মূল্য অধিক। সুতরাং এতদ্দেশে গাড়ীতে গ্যাস ব্যবহার করিলে যে খরচ অনেক কম পড়িবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রতি বৎসর আমরা এক লক্ষ গ্যালনেরও অধিক পেট্রল বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকি। সুতরাং আশা করা অস্বাভাবিক হইবে না যে সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত ভারতেও গ্যাসের এইরূপ ব্যাপক ব্যবহার দেখিতে পাইব।

আষাঢ় ক্রন্দসী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নিবিড় কুন্তলজাল ভারাতুর আষাঢ় ক্রন্দসী
তৃষাতুর বন
আতাম্র অঞ্চলখানি এলাইয়া আছে বসি
ব্যথায় উন্মন।
সৈকতের শুষ্ক বালু বরষার প্রতীক্ষায় জাগে
কৃষকের শুষ্ক তালু পিপাসায় বিন্দু বারি মাগে
পদতলে দূর্ব্বাদল অচপল শান্ত অনুরাগে
স্পর্শে মনোরম
সুপ্ত উপ্ত অন্ধ বীজ মঞ্জরীর পরিণতি মাগে
পত্র সমুদ্গম।

ঝরিল বরষা জল নভস্তল উদার বর্ষণে
স্নিগ্ধ সুশীতল
পিপাসিত পৃথিবীর হ্রদ নদ নির্ঝরিণীগণে
পূর্ণ ঢল ঢল।
শ্যামল পিঙ্গলচ্ছায় ধরা যেন মূরছায় সুখে
থরথর কাঁপে অঙ্গ পুলকের বন্যা এল বুকে
উচ্ছ্বসিত প্লাবনের কল্লোল ফুটিল কলমুখে
রস সমুচ্ছল
প্রতিটী তরঙ্গভঙ্গে উচ্চকিত আলোক চঞ্চল
দীপ্ত ঝলমল।

ফুটিল বৃন্তের পুষ্প কুট্মলের উৎসুক প্রয়াস
অপাঙ্গে বিজলী
আঁখি বাষ্প ভারাতুর ভয়াতুর গদগদ ভাষ
অশ্রু ছলছলি।
সুগভীর মন্দ্রস্বরে ডাকে মেঘ দূরে বহুদূরে
চাতকের কাঁপে বুক তবু সুখে বক্ষ পরিপূরে
পাংশুল পথিক বধূ ঘনঘন ওষ্ঠাধর স্ফুরে
চিত্ত কৌতূহলী
সপ্তবর্ণ বিচ্ছুরিয়া ওঠে সেতু বৈজয়ন্ত পুরে
স্বর্ণ সমুজ্জ্বলি।

ঈশানের দিগঙ্গনা-নীলাঞ্জনা ধূম্র কঞ্চুলিকা
বাজাইয়া তালি
করতলে করতল খলখল হাসিয়া বালিকা
নৃত্য করে খালি।
শিখীপুচ্ছ তুলি নাচে দাদুরী পল্বল ত'লে গায়
ধরণীর বরতনু যৌবনের পরিপূর্ণতায়—
কেতকী কদম্ব রেণু প্রসাধিয়া লাবণ্য বাড়ায়
রবি রশ্মি ঢালি
রৌদ্র কর জাল বনি শ্যামশ্রীর সুষমা কুড়ায়
চপল খেয়ালী।

বিক্ষুব্ধ তটিনী আজি বেগাবিল সলিল চঞ্চল
প্রবল বর্ষণে
শৈবাল পিচ্ছল পথ উপল শিঞ্জিত টলমল
চপল চরণে।
ঋতু লক্ষ্মী বরষার বৈশাখের ঘূর্ণিনৃত্যে ভুলি
শুভ্র মরালীর মতো ঊর্দ্ধমুখে কলরোল তুলি
সানন্দ চঞ্চল করে মেঘ যবনিকা ফেলে খুলি
বেশ বিরচনে
শুচি শুভ্র বাসখানি বিনিময়ে বক্ষে লয় টানি
স্নান সমাপনে।

নববোধন

প্রবোধকুমার সান্যাল

১

কুলেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী নামটা অতি দীর্ঘ। এতই দীর্ঘ যে তাড়াতাড়ি বানান লিখতে গেলে অক্ষরের জটলায় পথ হারাতে হয়। মধ্যপদ লোপ ক'রে কুলেন চক্রবর্তী রাখা হোলো, কিন্তু তাতেও চক্রবর্তী জায়গা জুড়ে বসলেন অনেকখানি। শেষকালে নামটাকে একেবারে লোপ ক'রে দিয়ে বলা হোলো কুচক্রী। তিনটি অক্ষরের এমন সহজ ব্যবহার্য নাম যিনি রাখলেন তিনি মামাতো বোনের ছোট ননদ, নাম শর্বরী রায়। কুচক্রী শব্দটা বিপজ্জনক, ভদ্রসমাজের পক্ষে অসুবিধা। তবু অপরের কলঙ্কমাত্রই আনন্দদায়ক, সেই কারণে আত্মীয় আর বন্ধুমহলে কুলেন্দ্র ওই নামেই পরিচিত রয়ে গেল। শর্বরীও সহ্য করলো অনেক পরিহাস।

তারপর কালক্রমে যা ঘটলো সেটা সংক্ষেপে এই: শর্বরী কুমারী থেকে হোলো সধবা, সধবা থেকে বিধবা। অবশ্য বিধবা হবার পর ইতিহাসের পুনর্বৃত্তি আর ঘটেনি, অর্থাৎ শর্বরী বিধবাই রইলো। আর ওদিকে 'কুচক্রী' হাকিম হয়ে চ'লে গেল কোন্ খোট্টার মুলুকে। বিবাহ সে করেনি, কেন করেনি সে-কথা থাক্।

সংক্ষেপে বললেও সংক্ষিপ্ত করা যায় না। কারণ ওই অপরূপ নামকরণের অজুহাতে যে-সম্পর্কটুকু দাঁড়িয়েছিল সেটুকু পারিবারিক কুচক্রকে অতিক্রম ক'রেও মধুর বন্ধুতায় চিত্তগ্রাহী এবং ওর মধ্যে যদি লুব্ধতা ও চাঞ্চল্য না থাকে তবে এই নবনামের সেতুর দুই পারে মানবতার মহৎ মহিমা কীর্তিত হবে। শর্বরী তাই বিশ্বাস করতো এবং আশ্চর্য, এই বিংশ শতাব্দীর হতাশা, সন্দেহ, অশ্রদ্ধা আর নাস্তিত্ববাদের যুগে কুলেন্দ্রও এই বিশ্বাসকে সম্মান ক'রে চলতো। চিঠিপত্রের চলাচল ছিল নিয়মিত, আর সে সব চিঠি বড়ই নৈরাশ্যজনক; কারণ ব্যক্তিগত আলাপ অপেক্ষা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দের মাত্রা ছিল বেশি, বাস্তব অপেক্ষা অতিপার্থিব এবং আধিভৌতিক অপেক্ষা আধিদৈবিক! চিঠির প্রথমে থাকে, 'প্রিয় কুচক্রী', শেষের দিকে থাকে, 'ইতি—কলিকাতা।' ওদিক থেকে আসে, 'প্রিয় শর্বরী, ইতি—প্রবাসী।' অর্থাৎ নাম-সই না থাকায় উভয়ের আনন্দ এবং পরিচিত হাতের লেখার ভিতর দিয়ে উভয়কে নব নব রূপে আবিষ্কার। ছেলেমানুষী হোক, তবু নিত্য নতুন ভঙ্গীর খেলায় মনের নিদ্রালু অবস্থাটা সজাগ থাকে, এটা কম লাভের কথা নয়। সচকিত হর্ষের আগ্রহেই শর্বরীর সজাগ মন ডাক-হরকরার পথের দিকে চেয়ে থাকে। ওই চিঠিগুলিতে কিছু পাওয়া যায় না, অশোভন ও অসম্ভব প্রাপ্তির এক বিন্দু আশাও সে করে না, কিন্তু পুরুষের লেখনী-স্খলনের সুদূর দুরাশায় প্রতিপত্রের প্রতি অক্ষরে ঘুরে ফিরে তার লোলুপ দৃষ্টি উজ্জ্বল উল্লাসে যেন একটা সর্বনাশের সন্ধান ক'রে বেড়ায়। খুঁজে না পেয়ে এক সময় অবসন্ন হ'য়ে বলে, হে বিজয়ী বীর!

সম্প্রতি অরণ্যকাণ্ডের আলাপ চলছিল চিঠিপত্রে। বাঘের পিঠে কেন হোলো চাকা, কেন ডোরাকাটা, সজারুর পিঠে কাঁটা কেন, বন্য খরগোসের গায়ে কেন ধূসর লোম, আর অরণ্যের শিকড়ে পাতায় লতায় জটায় আলোয় অন্ধকারে কেন এমন ধ্যানরহস্য—কুলেন্দ্র এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। শর্বরী সন্দেহক্রমে লিখলো, তুমি কি আজকাল বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও? কুলেন্দ্র জানালো, হ্যাঁ, হাকিমী অবস্থাটা গৌণ, মুখ্য হোলো অরণ্য। জন্তুর পিছনে বন্দুক নিয়ে ছোটায় বুকের রক্ত উত্তাল তরঙ্গে মাতে। জন্তুটা উপলক্ষ্য, লক্ষ্য হোলো অনাবিষ্কৃত জীবনের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হওয়া,—সাধুভাষায় যার নাম অজানার আকর্ষণ। দুর্গম ব'লেই আনন্দদায়ক নয়, মানব-সমাজের বাইরে একটা অদ্ভুত অনৈসর্গিক প্রাণের স্বাদ—তাই এত মনোহর। শর্বরী জানতে চাইলো, কেন তোমার এই খেয়াল? উত্তর এলো অনেক বিলম্বে—মানুষের মধ্যে আর বৈচিত্র্য খুঁজে পাইনে। পলায়মান হরিণের উদ্দাম দ্রুততায়, বাঘের পদচিহ্নিত পথরেখায়, অরণ্যময় বনস্পতির

নির্জন ছায়ায় খুঁজে পাই মানবোত্তর আকর্ষণ। জন্তর রক্তের গন্ধে, বনকুকুরের পায়ের শব্দে, কাঠবিড়ালী আর গিরগিটির আওয়াজে, আরণ্যক পাখীর ডানার ঝাপটায় ভালো লাগে নিশ্বাস নিতে। বন্দুক নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই নতুন পৃথিবীতে।

শর্বরী লিখলো, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তুমি যেখানে ঘুরে বেড়াও সেটা পৃথিবীরই অংশ। পৃথিবী ওখানে তার স্বভাবের আদিম অবস্থায় রয়েছে, তাই আমাদের আদি চৈতন্যকে এত আকর্ষণ করে। তবু হৃদ্‌কম্প হয় তোমার জীবনের ক্লান্তির দিকে চেয়ে—আমি দেখতে চাই তোমার অবসাদের চেহারা কেমন। এবার তোমাকে দেখে আসার অনুমতি পাঠাবে। ইতিমধ্যে তোমার বন্দুকের গুলীতে বাঘের হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্নভিন্ন হোক, কিন্তু শার্দূলরাজের থাবায় আমার ভাঙা কপাল আবার না ভাঙে ব্যাঘ্রবাহনের দরবারে এই মিনতি জানাই।—শর্বরী মৃত্যু সইবে, অপমৃত্যু নয়।

তারিখ ও সময় সহ অনুমতিপত্র এসে হাজির হোলো।

২

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। শীতের কুয়াসায় আর রাত্রির অন্ধকারে সেই বিশেষ খোট্টার মুলুকে অর্থাৎ বিহারের একটি ক্ষুদ্র মহকুমার ক্ষুদ্রতর একটি স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। সরকারী কেরোসিনের টিমটিমে আলো ও আকাশের অস্পষ্ট নক্ষত্র ছাড়া দৃশ্যমান সৌরজগতে আর কোথাও আলো নেই। সম্প্রতি বড় একটা বন্যায় বহু গ্রামের মূল উৎপাটিত হয়েছিল সুতরাং লোকালয় বলতে যৎসামান্যই।

একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে শর্বরী গাড়ী থেকে নামলো, কুলেন্দ্র এগিয়ে এসে হাসিমুখে বললে, সুস্বাগতম্‌।

শর্বরী অল্প ঘোমটা মাথায় টেনে বললে, তোমাকে এখানে কি ব'লে ডাকবো? হাকিম, না কুচক্রী?

কুলেন্দ্র বললে, এখানকার ডাকঘরের অনুগ্রহে অনেকেই আমাকে ওই নামে জানে। তুমি ত ঠিকানা লিখতে আগে তোমার ওই নামে, নামটা ডাকঘরে রেজেষ্ট্রি করা।

যাক্‌, ওনামে আর ডাকবো না তোমাকে।—ওরে মহেন্দ্র, জিনিসপত্র দেখে শুনে নে।

হুইস্‌ল্‌ দিয়ে ট্রেনখানা ধীরে সুস্থে চ'লে গেল। তারপরেই আবার চারিদিকে অবারিত অন্ধকার প্রান্তর। এখানে শর্বরীর প্রথম আসা, কোথাও কিছু দেখা যায় না, শূন্যতা যেন দিগন্তব্যাপী থমথম করছে। তবু একবার ঠাহর ক'রে সে দেখলে, হাকিম সাহেবের নতুন অতিথির আবির্ভাবে স্টেশনে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, হুকুমের অপেক্ষায় সকলেই তটস্থ।

কুলেন্দ্র বললে, তুমি এসো, জিনিসপত্র নিয়ে মহেন্দ্র ঠিক গিয়ে পৌঁছবে, ব্যবস্থা আছে। ইস, এই ঠাণ্ডায় তোমার গায়ে অত পাৎলা চাদর? শীত করছে না?

সত্যই প্রবল শীতে শর্বরীর কাঁপুনি ধরেছিল। সে হাসিমুখে বললে, যদি বলি করছে?

কুলেন্দ্রর হাতে ওভারকোট ছিল, জামাটা নিয়ে সে শর্বরীর পিঠের দিক থেকে গায়ের উপর চাপিয়ে দিল। না সমারোহ, না সঙ্কোচ—সুতরাং বলবার আর কিছু রইলো না। শর্বরী কেবল বললে, তোমার?

আমি এখানকার হাকিম, পদমর্যাদার গরম। এসো—ব'লে কুলেন্দ্র এগিয়ে চললো।

স্টেশন পেরিয়ে এসে দেখা গেল—মোটর রয়েছে ওদের প্রতীক্ষায়। শর্বরী বললে, তোমার মন্দির কতদূরে?

এই ত কাছেই।

তবে চলো হেঁটে যাই।

অতিথিকে কষ্ট দেবো?—শর্বরী হেসে বললে, কষ্ট না দিলেই কষ্ট পাবো, কুচক্রী।

ধুলো আর কাঁকরে মেশানো পথ। কিছুদূর এসে কুলেন্দ্র বললে, তুমি আর ওই নামে আমাকে ডাকবে না কেন, শর্বরী? শর্বরী বললে, কুচক্রী তুমি নয়, তাই ডাকবো না।

হ'তে পারিনে?

না।

মাত্র এই কারণে?

দ্বিতীয় কারণ আমাদের বয়স হয়েছে। আমার তিরিশের কোঠা, তোমার তারও ওপর। নাম নিয়ে ছেলেমানুষী তামাসা অল্পবয়সে মানাতো।

কুলেন্দ্র হেসে বললে, বয়সটা যে অল্প নয় একথা মনেই থাকে না। মনে করিয়ে দিলে কষ্টও হয়।

কষ্ট কেন ?—শর্বরী প্রশ্ন করলো।

মনে হয় হাকিমীই করলুম, আর কিছু হোলো না।

শর্বরী হেসে উঠলো এবং তার অশ্রান্ত হাসির চূর্ণ আওয়াজগুলো গ্রামের পথ মুখরিত ক'রে তুললো। হাসি থামিয়ে এক সময় সে বললে, আর কিছুটা কি বলো ত ?

কুলেন্দ্র একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো তার দিকে। সেও হেসে উঠলো। এমন কাষ্ঠহাসি, এমন নিষ্প্রাণ যে নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো। অতটা ভেবে সে কথা বলেনি, অতটা অর্থ তার কথায় ছিল না; সহসা উত্তরটা তার মুখের কাছে এসেও যেন আবিল হয়ে উঠলো। বললে, আর কিছু নয়। মানে—এই আর কি। এই ধরো, মনে করেছিলুম বিলেত যাবো। কিন্তু যেতে পারলুম কই ?

শর্বরী কথা বললে না। দু'জনের দেখা অনেককাল পরে। দেখা হবার আগে অবধি মনে হয়েছিল কত কথা আছে, কত সংবাদ মনে মনে জমানো, কত সমাজদর্শন আর আধিভৌতিক আলোচনা—কিন্তু মনটা আড়ষ্ট আর অবশ হয়ে এলো। তুষারের স্তর জমে উঠেছে, এ গল্বে কি-না জানা যায় না—এর ভিতর থেকে প্রাণের ধারা ছোটানো বড় কঠিন। কিন্তু এই অবস্থা সহ্য ক'রে আতিথ্য নিয়ে ক'দিন সে থাকতে পারবে ? কেন সে এলো না বুঝে ? কেন সে একথা বুঝতে চেষ্টা করেনি যে, চিঠি লেখালেখিই সহজ, কারণ তার মধ্যে পরস্পরকে চাক্ষুষ দেখা যায় না—সেখানে মন খুলে ধরা চলে অনায়াসে, যেহেতু শারীর-সান্নিধ্য সেখানে নেই। শর্বরীর মনে হতে লাগলো, এর নাম মুক্তি কিছুতেই নয়, চারিদিকের এই অবারিত স্বাধীনতার মাঝখানে এই প্রিয় মানুষটির কাছে একটি রাত্রির বেশি থাকলে কণ্ঠরোধে তার মৃত্যু হবে, বরং তার সেই ভবানীপুরের বাড়ীর তিনতলার একখানা বিশেষ ঘরেই তার জীবনের সকলের বড় স্বাচ্ছন্দ্য। কুচক্রীর অবসাদের চেহারাটা কেমন সে দেখতে এসেছিল, এসেছিল পুরুষকে বিচার করার অভিমান আর অহমিকা নিয়ে, আসার আগে বোঝেনি যে, তার নিজের পুঁজি আরো কম—আনন্দ পাবার এবং আনন্দ দেবার যে স্নায়বিক অজস্রতা সে-বস্তু কালক্রমে তারও ফুরিয়ে গেছে। শর্বরীর মাথা হেঁট হয়ে এলো।

হাকিমের বাংলোটা অনেক বড়। আসতে আসতে অনুভব করা গেল এদিকটা সিভিল লাইন, গ্রামের ছোঁয়াচ থেকে কিছু দূরে। কাল সকালের আগে এর বেশি আর কিছু আবিষ্কার করা যাবে না। তা ছাড়া এখানকার ভৌগলিক অবস্থিতি, দৃশ্যমানতা, পল্লীজীবন অথবা দেশ-ভ্রমণ—এদের জন্যেও শর্বরী আসেনি, এসেছিল—কিন্তু থাক্ সে-কথা। ফটক পার হয়ে ওরা দুজনে বাংলোর দালানে এসে উঠলো। একজন দাই, খানসামা আর পাচক এসে নবাগতাকে দীর্ঘ সেলাম দিল। সমস্ত বাংলোটা জুড়ে তিন-চারটা পেট্রোমাক্স্ জ্বল্ছে।

কুলেন্দ্র তাকে সঙ্গে ক'রে এনে একটা ঘরে ঢুকে বললে, এই তোমার ঘর, ওই দরজা খুললেই বাথ্—যদি ইচ্ছে করো দাই থাকবে তোমার ঘরে।

শর্বরী বললে, কিন্তু এ যে রাজকীয় সম্বর্ধনা—ফুলের তোড়া থেকে নতুন বিছানার চাদর, কিছুই বাকি রাখোনি।

আলোয় উজ্জ্বল ঘর। শর্বরী মুখ তুলে দেখলো কুচক্রীকে এতক্ষণে। এবার তিন বছর পরে দেখা, আধুনিক যুগের জীবনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মধ্যে তিনটি বছর একটা দীর্ঘ সময়, এই দীর্ঘকালে পৃথিবীর মানচিত্র অবধি বদ্লে গেছে—এবং সেই পরিবর্তনের রেখাগুলি কুলেন্দ্রর কপাল আর চোখের পাতার দুই দিকে চিহ্নিত। বয়সের সঙ্গে কেবল গাম্ভীর্যই আসেনি, এসেছে অপরিচিত রুক্ষতা—চিঠিতে যার সংকেত পাওয়া যায়নি। হাকিম হবার পক্ষে এ চেহারা বেমানান, বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে কুলেন্দ্রকে বেশ মানায়।

শর্বরী বললে, চলো, তোমার ঘরে যাই।—এই ব'লে সে ওভারকোটটা খুলে ফেললো। খানসামা জামাটা নিয়ে স'রে গেল।

কুচক্রীর ঘর নতুন বটে। আছে কেবল একটা বড় বিছানা, সামান্য আসবাব। কিন্তু আর যা আছে তাই দেখে শর্বরী শিউরে উঠলো। ঘরের চার কোণে চারটি প্রকাণ্ড বাঘ রক্তিম মুখ আর হিংস্র দংষ্ট্রায় অপলক ভয়ংকর চোখে চেয়ে। মাঝখানে দণ্ডায়মান প্রকাণ্ড ভালুক—চারিটা হাত-পায়ের থাবায় ভীষণ নখর। দেয়ালে টাঙানো অসংখ্য হরিণের মুণ্ড—এ ছাড়া বানর, হায়না, শূকর—প্রকাণ্ড হলঘর অরণ্যের হিংস্রতায় যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। বিছানার ধারে এসে দাঁড়িয়ে শর্বরী দেখলো, মাথার দিকে একটা ষ্ট্যাণ্ডে আট্কানো তিন

চারটে বন্দুক আর রাইফেল, গোটা দুই বর্শা আর টাঙ্গি, ইস্পাতের ফলা বাধানো গোটা কয়েক তীর।

সে বললে, বিছানায় তোমার এত বড় ছুরি কেন?

কুলেন্দ্র বললে, ওটা বালিশের কাছে না থাকলে ঘুম হয় না।—শর্বরী বললে, কেন?

দুঃস্বপ্ন দেখি ওটা ছুঁয়ে না থাকলে।—এই ব'লে কুলেন্দ্র হেসে উঠলো। তার হাসিটা নির্ভরযোগ্য নয়, এতগুলি জানোয়ারের নিঃশব্দ সম্মিলিত আর্তনাদের মতো তার হাসিটাও যেন অমানবিক।

শর্বরী কেবল বললে, তোমাকে আর চেনা যায় না, কুচক্রী।—অর্থাৎ অনেক বদ্‌লে গেছ। তিন বছর বনে-জঙ্গলে কাটালে মানুষ তোমার মতন হয়। চলো তুমি অন্য দেশে, দরখাস্ত ক'রে বদ্‌লি হও।

ভালুকের দাঁতের ওপর হাতের আঙুলগুলো বুলিয়ে কুলেন্দ্র বললে, মানুষের দেশ আর ভালো লাগে না, সে আমি অনেক দেখেছি—বরং জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে একটা বন্য উচ্ছৃঙ্খল জীবন—আচ্ছা, বেশ, কথা হবে'খন। তুমি কি খাবে বলো।

নিশ্বাস ফেলে শর্বরী কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, হিন্দু ব্রাহ্মণঘরের বিধবা রাত্রে কি খায় তুমি জানো না?

জানি, তারা কিছুই খায় না।—এই ব'লে কুলেন্দ্র হেসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, পুনরায় মুখ ফিরিয়ে বললে, এখানে বুড়ি দাই ব্রাহ্মণের মেয়ে, মাছ-মাংস ছোঁয় না, পুজো করে—সুতরাং তোমার সঙ্গে মিলবে ভালো।

কুলেন্দ্র বেরিয়ে গেল। তার আলাপে কোনো সমারোহ নেই, কথায় উচ্ছ্বাস খুঁজে পাওয়া যায় না—অতিথির প্রতি যে একটা সামাজিক সৌজন্য সেদিকেও যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শর্বরী একবার মহেন্দ্রর নাম ধ'রে ডাকতে গেল, কিন্তু তার গলার স্বর বেরুলো না। ভিতরে কেমন একটা কাঁচা চামড়া আর রংয়ের গন্ধ, সেই ঘন গন্ধে নিশ্বাস নিতে নিতে, শর্বরীর শরীর যেন সারাদিনের শ্রান্তিতে অবশ হয়ে এলো।

ঘণ্টা দুই পরে নিজের নির্দিষ্ট ঘরে এসে সে যখন ঢুকলো তখনও কুলেন্দ্র একবার এসে দেখা দিল না। কেমন একটা নিরানন্দে ঘেরা এই বাংলোর আবহাওয়া। অবাঞ্ছিত অতিথির মতো অনাদৃত হ'য়ে সে থাকবে, এ একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে। কত জানবার, কত জানাবার, কত আত্মীয়পরিজনের কত ইতিহাস, তার অন্তরের কত অপ্রকাশিত কাহিনী—কুলেন্দ্র কিছু শুনতে চাইলো না। অথচ দাবি তার কম নয়, সাধারণ ভাষায় যার নাম প্রণয়কাণ্ড—সেটা না ঘটলেও এই যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ ছিল সুনিশ্চিত—তার পরে পারিবারিক চক্রান্তে দুই নদী ব'য়ে গেল অন্য খাতে। বিবাহ হ'তে পারেনি কিন্তু বন্ধুতাও নষ্ট হয়নি—সেই বন্ধুতাকে ভালোবাসা বলো ক্ষতি নেই, কিন্তু যৌবনান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়ে যদি আজ এই মিথ্যা প্রচার করতে হয় যে, রঙে রসে মাধুর্যে উত্তাপে দুটি প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, তবে দুজনেই অপমানিত বোধ করবে। সেটা সত্য নয়। একজন গেছে জীবন-বৈরাগ্যের দিকে, আর একজন বন্যতার পথে। শর্বরী স্পষ্ট অনুভব করলে, দুজনকে আজ শারীর-সান্নিধ্যে আনলেও একতা খুঁজে পাওয়া যাবে না, দুই গ্রহের দুই কক্ষপথ। বিচিত্র ও বিভিন্ন অভ্যাসের ভিতর দিয়ে পরস্পরের স্বভাব দীর্ঘকাল ধ'রে দৃঢ় ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে, নতুন ক'রে মাধুর্য আর তারুণ্য আনবার কোনো পথ নেই। একে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভদ্রমনের কাজ।

৩

অতি প্রত্যূষে উঠলো শর্বরী। গাছেপালায় তখনো অন্ধকার জমে রয়েছে, শূন্যলোকে শীতের কুয়াসার ভিতর দিয়ে তারার দল তখনো সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হয়নি। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে শর্বরী মহেন্দ্রকে ডাকলে। বললে, ভোরবেলা কল্‌কাতার গাড়ী আছে, না রে?

মহেন্দ্র বললে, আছে দিদিমণি।

ওই গাড়ীতেই যাবো। বাবুকে ডেকে তোল্ দেখি।

কিন্তু বাবুকে ডাকবার আগেই দাই আর আরদালি এসে হাজির হয়ে প্রাতঃকালীন সেলাম ঠুকলো। তখন আকাশ ফর্সা হয়েছে। গ্রাম্য পাখীদের প্রভাতী বন্দনা চল্‌ছে। শীতের কুহেলিজালের ভিতর দিয়ে পল্লীশ্রী সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। সূর্যোদয়ের বিলম্ব নেই।

মহেন্দ্র বিছানা ও ব্যাগ বেঁধে প্রস্তুত হোলো। শর্বরী বললে, একটা রাত বেশ কাটলো, না রে মহেন্দ্র ?

হ্যাঁ, দিদিমণি।

তুই ত একটা উজবুগ, বাংলা দেশের বাইরে কখনো আসিস নি। দেখলি ত কেমন চমৎকার জায়গা! কোথাও পচা জলও নেই, মশাও নেই। ছাতুখোরের দেশ ব'লে ঠাট্টা করিস, অথচ একটা দিনেই ত শরীর সারিয়ে নিয়ে চললি! গাড়ীর সময় হয়েছে, না রে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হোলো বৈ কি। আমি কি জিনিসপত্র নিয়ে এগোবো, দিদিমণি ?

শর্বরী দাইকে ডেকে বললে, সাহেবকে একবার ডেকে দাও ত। বাবারে, কাল সন্ধ্যে রাত থেকে কী ঘুম! বড়দিনের ছুটিটা বুঝি সাহেব ঘুমিয়েই কাটালেন, না কি বলো দাই ?

কিন্তু দাইয়ের বদলে আরদালি জবাব দিল। বললে, সাহেব নিকাল্ গিয়া, মাঈজি।

নিকাল্ গিয়া ? বেরিয়ে গেছেন নাকি ?

হাঁ জি।

কখন্ ?

আরদালি জানালো রাত দুটোয় মোটর নিয়ে সাহেব মহাদেওগঞ্জ গেছেন, এইবার ফিরবেন।

শর্বরী প্রশ্ন করলো, কোনো কাজে বুঝি ?

নেহি মাঈজি, জঙ্গলমে গিয়া শিকার খেল্নে।

শর্বরী স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো। পৌষমাসের রাত দুটোয় মানুষ যায় প্রাণীহত্যার উদ্দেশে। অদ্ভুত পুরুষের মন। কিন্তু কুলেন্দ্রর সঙ্গে দেখা না ক'রেই বা সে যাবে কি ক'রে ? অন্তত সামাজিক সৌজন্যবোধেও তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পিছনের দিকে সে চাইলো না, অতিথির সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি দিল না, নিজের প্রাণের দায়িত্ব নিল না—শর্বরী পাথরের মতো ব'সে ব'সে দূর মাঠে প্রভাতের আলোর দিকে অপলক চোখে চেয়ে ভাবতে লাগলো; কৃষ্ণপক্ষের রাত দুটোয় অরণ্যের ভিতরে গিয়ে সে আনন্দ পায়! নিজেকে অনাদৃত বোধ ক'রে অভিমান তার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো।

মহেন্দ্র প্রশ্ন করলে, ব্যাগ আর বিছানা নিয়ে কি আমি এগোবো, দিদিমণি ?

থাম্।—ব'লে শর্বরী বিরক্ত হয়ে ব'সে রইলো।

প্রায় সাতটার সময় কুলেন্দ্রর গাড়ী এসে বাংলোর ফটকে ঢুকলো। শীতের কাঁচা রোদ রাঙা হয়ে তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলোর কোর্ট-ইয়ার্ডের ঘাসগুলির উপর শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে। গাড়ী সটান্ এসে দালানের ধারে থামলো।

শর্বরী মনে করেছিল অসৌজন্যের অভিযোগে কিছু তিরস্কার সে করবেই, কিন্তু গাড়ীর ভিতর দিকে লক্ষ্য ক'রে সে বিস্মিত হোলো। গদীর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে কুলেন্দ্র গভীর গাঢ় নিদ্রায় অচেতন। গাড়ী থামলেও তার জাগার লক্ষণ নেই।

খানসামা গিয়ে মোটরের দরজা খুললে। বন্দুক দুটো নামালে, ডাইনামো সুদ্ধ স্পট্ লাইট বা'র ক'রে আনলে, টাঙ্গি আর বর্শা দুটো একজন বা'র ক'রে নিয়ে গেল। এ ছাড়া গাড়ীর মধ্যে খাবারের বাসন, শীতে শরীর গরম রাখার স্টিমুলেণ্ট, কম্বল ও বালিশ, চামড়ার কোট, মাথার টুপি—অর্থাৎ যে-পূজার যে-উপকরণ। সমস্ত ব্যাপারটা চললো যন্ত্রের মতন—সাহেবের তখনো ঘুম ভাঙেনি।

তিরস্কার করার কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না, ওদিকে ভোরের ট্রেন নিকটবর্তী স্টেশনের উপর দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে চ'লে গেল। শর্বরী উঠে এসে মোটরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলে, কুলেন্দ্র ? শুনছ ?

কুলেন্দ্র চোখ চাইলে। স্বল্পনিদ্রায় রাঙা দুটো চোখ, তার মাথায় কয়েকটা শুকনো লতাপাতার কাঠিকুটি—ভ্রূক্ষেপ নেই—হাতে কয়েকটা কাঁটাগাছের ছড়ের দাগ। শর্বরী জিজ্ঞাসা করলে, বীরপুরুষ, শিকার ত ক'রে এলে, জন্তু কই ?

মনে হোলো, শরীরটা তার অবসন্ন, জড়তা কাটিয়ে গাড়ী থেকে সে নেমে এলো। বললে, আজ শিকার জোটেনি—সম্ভর একটা পেয়েছিলুম কিন্তু নিরপরাধকে মারতে মন উঠলো না।—এই ব'লে কুলেন্দ্র একটু হাসলো।

বলো কি, কুচক্রী ?—হাসিমুখে শর্বরী বললে, এ বিবেচনাটুকু আছে নাকি তোমার ?

কুলেন্দ্র খুব একচোট হেসে উঠলো। তারপর বললে, কী নিবিড় চোখের দৃষ্টি সম্ভরের—অরণ্যের আত্মা যেন

সেই চোখে থরথর করছিল। বন্দুকটা আমার হাতে কাঁপলো, মারতে পারলুম না। অনেক মেরেছি।

মারো কেন বলো ত?

ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে মুখে পাইপ নিয়ে কুলেন্দ্র বললে, ভালো লাগে। জন্তুকে ত মারিনে, মারি অরণ্যের বুকে গুলী, বনদেবী সন্তানের মৃত্যুতে আর্তনাদ ক'রে ওঠে—ভারি আনন্দ পাই।

শর্বরী তার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর বললে, যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেলে না কেন?

খানসামা চায়ের সঙ্গে প্রাতরাশ এনে রাখলে টেব্‌লের ওপর, দাই নিয়ে এলো গরম জলের গামলা, সাবান ও তোয়ালে। কুলেন্দ্র হাত মুখ ধুয়ে খেতে ব'সে গেল। বললে, রোজই যাই, চুপি চুপি পালাই। রাত্রে বন আমাকে ডাকে, ঘুমোতে পারিনে।

কিন্তু এতে শরীর টিঁক্‌বে কুচক্রী?

টিঁকে আছে এতদিন—রাতে ঘুম হয় না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি, তারা বলে এ ইন্‌সম্‌নিয়া ছাড়ানো কঠিন।

শর্বরী মাথা নত ক'রে রইলো, কেন রইলো সে কথা আর কারো না জানলেও চলবে। যার কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার জন্য সে ব্যস্ত হয়েছিল, যাবার কথা তাকে জানাতেও আর মন সরলো না। কি জানি কেন যে-জীবন কুলেন্দ্র যাপন করছে, এর সঙ্গে শর্বরীর অপরাধী মনও যেন জড়ানো।

কুলেন্দ্র প্রশ্ন করলো, তোমাকে জানিয়ে যাইনি তাই বুঝি ফিরে আসতেই যুদ্ধ ঘোষণা করলে? জানিয়ে গেলে তোমার ঘুম ভাঙানো ছাড়া আর কি হোতো?

মুখ তুলে শর্বরী বললে, কেন, তোমার সঙ্গে গিয়ে বন্দুক ধরতুম।

যেতে তুমি?—চায়ের বাটি কুলেন্দ্র মুখের কাছে তুলে নিল।

পরীক্ষা ক'রে দেখলে না কেন?

কুলেন্দ্র সোজা হয়ে বসলো। বললে, কেউ যেতে চায় না আমার সঙ্গে, ওই চৌবে ছাড়া। ওরা কেউ বুঝতে পারে না জঙ্গল কেবল গাছপালা নয়, কেবল জন্তু-জানোয়ার নয়—আরো বিস্ময় একটা কিছু—একেবারে তার গভীরের অতল তলে না গেলে বুঝতে পারা যাবে না।

শর্বরী বললে, তুমি ত খেয়ালী, এ খেলা তোমার কতদিন চলবে?

কিন্তু এটা খেয়াল নয়, পরীক্ষা করতে পারো। এ খেলার শেষ নেই, কারণ প্রাণের এত বেশি অজস্রতা, এখানে এত অভিনবত্ব যে চিরকাল ধ'রে পুরুষের দুরন্তপনাকে জাগিয়ে রাখতে পারে। অস্ত্রের ব্যবহার না থাকলে যে নির্জীবতা আসে, স্বভাবের সেই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তারপর শক্তি আর উৎসাহের অপরিমেয়তা। স্মরণ করো—পৃথিবীর আদিম অক্ষত মাটির স্তর যার ওপর আজো হল-কর্ষণ হয়নি, গাছের শিকড় প্রাণশক্তিতে জাগ্রত, কোটরে কীট, সুড়ঙ্গে সরীসৃপ, নানাবিধ পতঙ্গের আনাগোনায় ফুল ফল লতা-পাতা সারাদিনরাত মুখরিত, ডালে ডালে শত বর্ণের পাখী, শাখাবিহারী জানোয়ার—এদের নিচে দিয়ে অজস্র হিংস্র শ্বাপদের চলাফেরা। কুলেন্দ্র প্রাতরাশ শেষ ক'রে গল্প জমিয়ে তুললে।

শর্বরী বললে, তুমি ত ওদের মাঝখানে নতুন?

হ্যাঁ—নতুন।—ব'লে কুলেন্দ্র মাঠের দিকে একবার তাকালে। সকালের মধুর রোদ পায়ের কাছে এসে পড়েছে। দূরে তাল-পিয়ালের সারির দিকে চেয়ে সে পুনরায় বললে, সম্পূর্ণ নতুন আমি সেখানে। তারা সবাই দেখতে পায় আমিও একটা বিচিত্র জানোয়ার—গিয়ে পড়েছি তাদের মাঝখানে। যদি দেখতে পায়—পালায়, কারণ আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র, অনেক বেশি বিশ্বাসঘাতক।

শর্বরী প্রশ্ন করলে, তার মানে?

কুলেন্দ্র বললে, মানুষ মানুষকে বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে, রাজ্য কেড়ে নেয়, বিষবাষ্প দিয়ে নিরপরাধ জাতিকে ধ্বংস করে, কল্যাণের সকল পথকে কণ্টকিত ক'রে তোলে। মানুষ যে কত ভীষণ, অরণ্যের সহজ সরলতার মধ্যে না গেলে জানা যায় না। জন্তুর জগতে ভালোবাসা নামক পদার্থ নেই, আছে লালসার উলঙ্গ আকর্ষণ—ভালোবাসা আছে মানব-সমাজে, তাই সে বস্তু নিয়ে এত দুঃখ, এত প্রবঞ্চনা আর ব্যথার সৃষ্টি।

একটা উচ্ছ্বাস এসে পড়েছিল শর্বরীর মুখে চোখে। সে তাড়াতাড়ি কি একটা অছিলায় উঠে চ'লে গেল। ফিরলো যখন, অনেকক্ষণ পর, দেখলো গাঢ় নিদ্রায় কুলেন্দ্র অচেতন। বিছানায় গিয়ে শুতে বললে তার ঘুম ভাঙতে

পারে, ঘুম তার মূল্যবান—শর্বরী তাকে আর ডাকলে না, কেবল একবার ঘরে গিয়ে তার নিজের শালখানা এনে তার গায়ে ধীরে ধীরে চাপা দিয়ে দিল।

কল্‌কাতার গাড়ীতে ফিরে যাবার উৎসাহ আপাতত তার আর নেই। নিজেকে অনাদৃত বোধ ক'রে সে ভুল ক'রেছিল, কারণ যার হাতে এই অনাদর—মানুষের দিকে তার আকর্ষণ স্বভাবতই কম। তার মন নেই শর্বরীর দিকে; এ তার ইচ্ছাকৃত অবহেলা নয়, কারণ তার হৃদয়ের সকল ঔৎসুক্য অরণ্যলোকের নূতনতর জীবনের মধ্যে অভিনব পৃথিবী খুঁজে বা'র করেছে। তার ওপর অভিমান রাখা ছেলেমানুষী। আজ সে স্পষ্ট জানতে পারলে, চিঠির উত্তর কেন আসতো বিলম্বে, কেন সেই বিলম্বিত চিঠির ভাষা হোতো অসংলগ্ন। হৃদয়ের যে অংশটা নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে কাজ-কারবার, কুলেন্দ্রর সেটা অসাড় ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে শিকারীজীবনে—পুরুষের নিগৃহীত বৃত্তি দুরন্তপনায় পেয়েছে নতুন প্রাণের স্বাদ। যেহেতু যৌবনান্তকালে এই অভ্যাস তার সংস্কারে পরিণত হোতে চললো, এখন তাকে মানুষের পথে ফিরিয়ে আনা আর হয়ত সম্ভব নয়। বিদায় নিয়ে শর্বরী এক সময় চ'লে যাবে সন্দেহ নেই, কোনো স্নেহের চিহ্ন কোনো অভিমানের দাগ সে রেখে যাবে না এও ঠিক—কিন্তু বিদায় নিয়ে যাবার সময় তার জীবনের শেষ অবলম্বনকে যে চিরকালের মতো হারিয়ে যেতে হবে এই কথা মনে ক'রে শর্বরীর চোখ ভারাক্রান্ত হ'য়ে এলো।

৪

শীতের অপরাহ্নে চৌবে মোটর প্রস্তুত ক'রে এনে বারান্দার নিচে দাঁড় করালে। কী উৎসাহ কুলেন্দ্রর চোখে মুখে। গরম একটা শার্টের সঙ্গে খাকি ব্রিচেজ্ পরা, হাঁটুর নিচে ঘোড়সওয়ারের মতো চামড়ার প্যাড, পায়ে কালো বুট। শর্বরীর গায়ে গলাবন্ধ ফ্লানেল্ বডিস্, পরণে শালের শাড়ি, পায়ে মোজা আর ঘুন্টিবাঁধা শ্যু, হাতে দস্তানা, গায়ে জড়ানো মোটা আর মোলায়েম কাশ্মীরী তাপতা। তাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। কিন্তু ত্রিশের গা ঘেঁষে এলে মেয়েরা নিজেদের রূপ ও যৌবন সম্বন্ধে সচেতন হ'তে ঈষৎ লজ্জা পায় এই যা।

বাংলোর গেট্ পার হয়ে গ্রামের পথের ধূলো উড়িয়ে মোটর ছুটে চললো দক্ষিণে। শীতের বেলা, গাছ-পালায় রোদ উঠেছে, দিনান্তকালের আকাশ এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে হিমধূসর। গাড়ীর মধ্যে আরামে দুজন বসলো।

কুলেন্দ্র বললে, আমি ভাবতেই পারিনি, আশাই করিনি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

শর্বরী বললে, চারিদিকে মাঠ আর গ্রাম দেখছি, এদিকে জঙ্গল কোথায়?

খুব কাছে নয়, পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। আছে সব, সন্ধ্যা হোক, হঠাৎ এক সময় আবিষ্কার করবে বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপন, তখনই জানবে এসেছ পৃথিবী ছাড়িয়ে। আগে চলো রায় সাহেবের কুঠিতে।

রায় সাহেবের কুঠি? সে কে?

যে লোকটা থাকে খুনিয়ার জঙ্গলের ধারেই পাহাড়ের নিচে। খদের ঝরণার পাশে সে বাঘের মাচা বাঁধে। আশ্চর্য, লোকটা বাঙালী। কুঠিবাড়ীটা তারই, সে জমিদার। খাবার এনেছ সঙ্গে?

শর্বরী বললে, এনেছি, খাবে এখন?

খাবো, কিন্তু তুমি?

ব্যস্ত হোয়ো না, চৌবের কাছে ব্যবস্থা আছে।—এই ব'লে শর্বরী টিফিন্ ক্যারিয়রের ঢাকা খুলে কড়াইসিদ্ধ, ডালমোট, নিম্‌কি, ডিমসিদ্ধ, চা ইত্যাদি বা'র করলে। সযত্ন আহার পেয়ে এই ছন্নছাড়া পরম পরিতৃপ্তিতে খেতে খেতে এক সময় বললে, তুমি ছুঁলে যে এইসব খাবার?

দ্রুতগতি গাড়ীর দোলায় ব'সে স্তব্ধ হ'য়ে শর্বরী কুলেন্দ্রর প্রতি তাকালে। স্নেহের তিরস্কারে সেই দৃষ্টি ক্ষুব্ধ, আহত। তবু নিজেকে সে দমন করতে পারলো না। বললে, এর আগে আমিষ আমি কখনো ছুঁইনি, তা জানো?

ও, তাই নাকি?—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—উচ্চকণ্ঠে পারাবতের পাখার ঝাপটের মতো সশব্দে কুলেন্দ্র হেসে উঠলো। বললে, গঙ্গায় গিয়ে সাতবার না ডুবলে তোমার পাপক্ষয় হবে না শর্বরী, মনে রেখো।

শর্বরী এবার হেসে বললে, সন্ন্যাসীদের আওতায় থাকলে পাপ স্পর্শ করে না।

করে না ত? আচ্ছা, বেশ—তাহলে যাবার সময় তোমাকে কিছু বক্‌শিস দেওয়া যাবে। মনে ক'রে দিয়ো।

কী বক্‌শিস শুনি ?—শর্বরী সহসা উৎসুক হয়ে উঠলো।

কুলেন্দ্র বললে, এবার যে বাঘটা মারা পড়বে তার চামড়াটা। তুমি ব্যাঘ্র চর্মাসনে ব'সে হবে ধ্যানস্থ, সেই তোমার পক্ষে মানানসই হবে।

শর্বরীর নিরুৎসাহ কণ্ঠ থেকে আর উত্তর বেরুলো না।

বহুদূর এসে পাওয়া গেল বালুময় ছোট নদী। জলধারা অতি শীর্ণ, মোটর তার উপর দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে গেল। পথের দুইধারে ধানকাটা মাঠ, মাঝে মাঝে শালুকভরা কোনো কোনো 'তালাওয়ের' জল চিকচিক ক'রে উঠছে। কখনো বা চোখে পড়ে আকাশপথে 'চাহা' আর 'বকুলা'র দল সন সন ক'রে উড়ে চলেছে।

আহারাদি শেষ ক'রে কুলেন্দ্র পাইপ ধরিয়ে বসলো বাইরের দিকে চেয়ে। দূর শূন্যে যে 'স্নাইপের' পাল তীরবেগে চলেছে সেইদিকে তার লক্ষ্য। তাদের উড়ন্ত ডানায় ঝিকমিক করছে অস্তমান সূর্যের রাঙা আলো—রাইফেলের গুলীতে উড্ডীন পাখী মারা যায় একথা সে শুনেছে। একান্ত, উদ্‌গ্রীব, উচ্চকিত দৃষ্টিতে কুলেন্দ্র সন্ধ্যায় অদৃশ্যমান পাখীর ঝাঁকের দিকে চেয়ে রইলো।

শর্বরী প্রশ্ন করলে, রায় সাহেবের কুঠিতে কি কোনো কাজ আছে তোমার ?

কিছু না, এমনি।

তবে যাচ্ছ কেন ?

ওঃ—কুলেন্দ্র মুখ ফিরিয়ে বললে, যাচ্ছি তার কারণ ভীষণ দরকার। আরে, সেই ত আসল। তার হাতেই ত যত শিকার। শিকারকে সে পালাতে দেয় না।

সে আবার কি ?

লোকটা অদ্ভুত। বাঘকে বন্দী ক'রে রাখে কেবল আলো ফেলার কৌশলে। রাত্রে সে জানোয়ারের অস্তিত্ব টের পায়, অন্ধকারেই তার চোখ খোলে। লোকটার বাড়ী আসামের দিকে কোথায় যেন, পুরনো কোন্ রাজবংশে ওর জন্ম—আজকাল চামড়ার ব্যবসা করে। যতদূর জানি; সংসারে তার কেউই নেই। বেশ লাগে লোকটাকে।

কাঁচের শার্সি সব কটাই বন্ধ, তবু শীতের একটা আড়ষ্ট ভাব রয়েছে। গাড়ীর ভিতরে কম্বল আর গরম কাপড়-চোপড়ের মধ্যে শর্বরী খুব আরামেই ব'সে ছিল। এগাড়ী থেকে আর তার নামবার ইচ্ছা নেই, এমনি ক'রে যদি দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত মোটর চলে তবে সে খুশি হয়। কল্‌কাতায় তার সম্বন্ধে নানা কৌতূহলের শাসন, নানা মানুষের নোংরা ঔৎসুক্য—তাদের মাঝখান দিয়ে আড়ষ্ট পা নিয়ে চলা-ফেরা ভারি কঠিন। কল্‌কাতায় সে দাম্ভিক, সে আত্মাভিমানী, ঐশ্বর্যের অহংকারে মাটিতে নাকি তার পা পড়ে না; তার স্নেহ আর সম্প্রীতির মধ্যেও নাকি উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষকে সে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, কারণ মানুষ নাকি তার কাছে ছোট, কৃপার বস্তু। বিত্তশালিনী বিধবার সম্বন্ধে মুখরোচক জনশ্রুতি শিক্ষিত জগতে ভারি উপাদেয়।

কিন্তু এখানে ? জনশ্রুতির কাঁটা ফুটছে না পায়ের তলায়, লোলুপ লেলিহজিহ্ব কৌতূহল নেই কোথাও—এখানে সে বেশ আছে। শর্বরী গা-এলিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গ্রন্থি খুলে দিয়ে ব'সে রইলো। কুলেন্দ্র তার প্রিয়, কিন্তু প্রিয় মানুষকেও মেয়েরা ভয় পায়—কিন্তু কুলেন্দ্র ভয়ের পাত্র নয়—চিন্তার গতি, মনের চাকা তার এমন একদিকে—যেখানে আর যাই থাক্ নারীপ্রভাব নেই।

শর্বরী প্রশ্ন করলে, তুমি ত জানতে চাইলে না কুচক্রী, আমি কেমন ক'রে এলুম ?

বন্দুকটার উপর হাতখানা রেখে কুলেন্দ্র বললে, যেমন ক'রে স্বাধীন মানুষ আসা-যাওয়া করে সেইভাবে তুমি এলে!

কিন্তু আমি যে মেয়েমানুষ ?

কুলেন্দ্র তার দিকে তাকালে। শর্বরী পুনরায় বললে, চাকর সঙ্গে নিয়ে বিধবা মানুষ বেরিয়ে পড়লুম, আমার সাহসের একটু প্রশংসা করবে না ?

এর মধ্যে সাহস কোথায় ?

বাঃ—শর্বরী একটু হাসলে এবং যেমন ক'রে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুকে খুঁচিয়ে চিড়িয়াখানার দর্শক আনন্দ পায়, তেমনি ক'রে সে বললে, বয়স না হয় হয়েছে, একেবারে বুড়ি ত হইনি! তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম এ ত' বাঘ শিকারের চেয়েও দুঃসাহস। অন্তত লোকনিন্দার কথাটা—

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে কুলেন্দ্র বললে, নিন্দার যোগ্য তারা যারা নিন্দাকে ভয় পায়।—চৌবে, চৌবে, উ কা চল্ গৈ ?—সহসা ঝনাৎ ক'রে বন্দুকটা সে তুলে ধরলে।

চৌবে বললে, কুচ্ নেহি সাব, এক শিয়ার উতর গ্যা। ইধর জান্‌বর কাঁ?

কুলেন্দ্র শান্ত হয়ে আবার বন্দুক নামিয়ে রাখলে। কিন্তু সামান্য একটা শৃগালের ছায়া দেখে রুদ্রের বিকৃত মুখের উপর দুইটা পাশব চক্ষুর যে উজ্জ্বল অগ্নিস্রাব একটি মুহূর্তে ঘ'টে গেল, তাই দেখে শর্বরীর মুখে আর কথা সরলো না, একপাশে সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলো।

প্রান্তর পার হয়ে মোটর সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করেছে। অরণ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মোটরের হেডলাইট্ জ্ব'লে উঠলো। বিপরীত দিক থেকে এক একখানা মাল বোঝাই বয়েল্ গাড়ী পার হয়ে যাচ্ছে, হেডলাইটের তীব্র আলোয় গরুর চোখগুলো দপদপ ক'রে জ্বলছিল। দূরে বনময় অন্ধকার পার্বত্যভূমির গর্ভে পথ চ'লে গিয়েছে। পথ আর বাকি নেই।

পথের দু-তিনটা বাঁক আর ক্যাল্‌ভার্ট ঘুরে এসে মোটর সহসা থামলো। চারিদিকে অপরূপ নৈঃশব্দ্য, শীতের হাওয়ায় গাছপালার সরসরানি ছাড়া আর কোথাও সাড়াশব্দ নেই। চৌবে গাড়ী থেকে নেমে দরজা খুলে দিল। কুলেন্দ্র বললে, নামো শর্বরী।

শর্বরী গাড়ী থেকে নামলো। কাঁকরের উপরে তাদের জুতোর খসখস শব্দটাও যেন সেই নিঃশব্দকে মুখরিত ক'রে তুলছে। শর্বরী ঠাহর ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে একটা দালান—তার ভিতর থেকে কেমন একটা প্রাচীন পাথুরে বুনো গন্ধ বায়ুমণ্ডলকে ঘুলিয়ে তুলছে।

সেই অন্ধকারের ভিতরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় চৌবে ডাকলে, আলীজান্?

হুজোর!—ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে তখনই যেন মানুষের এক প্রেতাত্মা বেরিয়ে এলো।

চৌবে বললে, রায় সাব্ ডেরে মে হুঁ?

জি।

ব'লো হাকিম সাব্ আয়া। বাত্তি বনাও।

চতুর্দিকে সর্বগ্রাসী অন্ধকার। শর্বরী কুলেন্দ্রর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্বস্তি বোধ করলে। সন্ত্রাসের সঙ্গে বুকের রক্ততরঙ্গ উল্লাসের একটা অদ্ভুত সংমিশ্রণে শর্বরীর পা কাঁপছে। তার অসহায় হাতখানা এখনই কেউ ধরলে ভালো হয়। গলা নামিয়ে কুলেন্দ্র বললে, শর্বরী, দুশ মাইলের মধ্যে এ অঞ্চলে কোথাও গ্রাম নেই।

কম্পিত কণ্ঠে শর্বরী বললে, কেন?

অতিকায় একটা সরীসৃপের মতো হিসফিস ক'রে কুচক্রী বললে, জানোয়ারের আনাগোনা!

অন্ধকার ভেদ ক'রে জন্তুর চোখের মতো দুটো লণ্ঠন এসে পৌঁছল। কুলেন্দ্রর পিছনে পিছনে শর্বরী ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু ভিতরে কিছুদূর গিয়ে সহসা তীব্র বীভৎস গন্ধে সে অস্থির হয়ে উঠলো। নাকে কাপড় চেপে বললে, কি বলো ত?

কুলেন্দ্র বললে, চর্বি গলানো গন্ধ। এসো এই ঘরে। চৌবে, বাতি জ্বালাও।

হিমাচ্ছন্ন একটা পুরাতন ঘর। শাল আর লোহা-কাঠের উপর আল্‌কাৎরা মাখানো যেন একটা মৃত্যুপুরী। কড়িকাঠের ভিতর ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ শোনা গেল। একপাশে প্রকাণ্ড একখানা চৌকী। কয়েদখানার মতো দেয়ালের অনেক উপরে ছোট ছোট দুটা জান্‌লা। আতঙ্কে শর্বরীর সর্বশরীর ঝিমঝিম ক'রে এলো।

কুলেন্দ্র মৃদুকণ্ঠে বললে, একটা স্মৃতি আছে এই ঘরে।

ঢোক গিলে শর্বরী বললে, কিসের?

রায়সাহেব জানে গল্পটা। অনেককাল আগে এই বাড়ীটা ছিল এক ভীল সর্দারের। সেই সময় একদিন এক ইংরেজ দম্পতি এই ঘরে এসে ওঠে। তাদের শিকারের সখ ছিল। একদিন রাত্রে স্বামী ঘুমোচ্ছে এমন সময় স্ত্রী কি একটা শিকড় শুঁকিয়ে স্বামীকে অজ্ঞান করে; তারপর এক বোতল নাইট্রিক য়্যাসিড্ তার গায়ে ঢেলে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারে।

তারপর?

সেই সময় এক নরখাদক বাঘ এই জঙ্গলে দেখা দেয়। ভীলসর্দার সেই মেয়েটিকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বাঘের আনাগোনার পথে বেঁধে রেখে আসে।—এই ব'লে কুলেন্দ্র হাসলো। পুনরায় বললে, পরদিনও সে বাঁধা অবস্থায় ছিল বটে তবে তার দেহের উপরের অংশটা ছিল না। অনেককালের কথা, তখন সিপাহী-যুদ্ধের যুগ।

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো এবং তারপরেই যাকে

দেখা গেল, সে এক দীর্ঘকায় পুরুষ। তাকে দেখে শর্বরী মনে মনে আঁৎকে উঠলো। কুলেন্দ্র গিয়ে করমর্দন ক'রে বললে, জয় শিকার।

জয় শিকার।—ঘন কর্কশ গলায় রায়সাহেব হেসে উঠলো।

কুলেন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললে, ইনি আমার আত্মীয়া মিসেস চৌধুরী, আমার অতিথি হয়ে এসেছেন।

খুব ভালো, শিকার করবেন আপনি? বন্দুক ধরতে পারেন ত?

ক্লিষ্ট হাসি হেসে শর্বরী বললে, আজ্ঞে না, এই জঙ্গল দেখতে এসেছি।

খুব ভালো, খুব ভালো। হাকিম সাহেবের হাত তৈরি হয়ে গেছে।

লোকটার কথার ভঙ্গীতে যেমন আরণ্যক টান, তেমনি দীর্ঘ চেহারায় একটা বন্য বর্বরতা। মুখখানার উপর চার পাঁচটা বড় বড় ক্ষতচিহ্ন, সামনের দুটো দাঁত নেই—সেই কারণে হাসিটা যেন নির্বোধ। চোখ দুটো যেন ভিন্ন প্রকারের, একটা অন্যটার প্রতিবাদ। শর্বরী সন্ত্রস্ত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। একটু আগে কুলেন্দ্রর ভয়ানক গল্পটা এবং এই লোকটার দানবীয় আকৃতি—দুয়ে মিলে একটা আতঙ্কময় বীভৎস রস তার মনে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো।

শিকারের আলোচনা উঠলো। রাত বারোটার পর যাত্রা করা দরকার। এটা কৃষ্ণপক্ষ, শেষ রাত্রের দিকে জ্যোৎস্না হলেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। কিন্তু তার আগে এই ঘরে থাকা শর্বরীর পক্ষে সম্ভব নয়। দু-তিন দিন অন্তত না থাকলে শিকারের খেলা জমবে না। কুঠিবাড়ীর ভিতর দিকে তাদের জন্য দুটো ভালো ঘর নির্দিষ্ট হোলো।

মোটরের সঙ্গে সকল প্রকার গৃহসরঞ্জাম ছিল, ত্রুটি কিছু নেই। নির্দিষ্ট ঘরে সকল বন্দোবস্ত ক'রে বসতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। শর্বরী হুকুম দিয়ে বললে, দুটো পেট্রোমাক্স্ সমস্ত রাতই জ্বলবে। এতক্ষণ পরে এইবার সে অনেকটা নিরাপত্তা বোধ করছে। চর্বির কটুগন্ধও এতক্ষণে অনেকটা সহ্য হয়েছে, এখন আর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে না।

এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে শর্বরীর সহসা চোখ পড়লো, ভিতর দিক থেকে পা টিপে টিপে একটি মেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। এমনই সন্তর্পণে এমনই সংশয়ে যে মনে হোলো, কিছু একটা গভীর রহস্য এই পাথরপুরীকে ঘিরে আছে।

মেয়েটি দ্রুত তার কাছে এলো এবং অকুণ্ঠ নিঃশব্দ হাসি হেসে শর্বরীর একখানা হাত ধ'রে বললে, আগেই দেখেছি—কে তুমি? হাকিমের সঙ্গে এসেছ?

শর্বরী সহসা স্তম্ভিত—এমন নাটকীয় ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে তার অনেকটা সময় গেল। কিন্তু সে ওই কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র; মেয়েটি আর দাঁড়াতে সাহস করলে না, এদিক ওদিক তাকিয়ে পাখীর মতো আবার উড়ে পালিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পরে শর্বরী আবার চকিত হয়ে ভিতর মহলের দিকে চোখ ফেরালে। গর্তের ভিতর থেকে সাপ যেমন বেরোয় তেমনি ক'রে মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে আবার দেখা দিল। বন্য হাসি, বন্য চোখ, বন্য মুখের শ্রী। মাথার চুল চারদিক থেকে টেনে উপর দিকে খোঁপা বাঁধা, হাতে দুগাছা সরু বালা, চেহারায় তরুণ যৌবনের লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে—বৈদিকযুগের ঋষিকন্যার মতো।

মেয়েটি আবার কাছে এলো, একখানা হাতে শর্বরীকে বেষ্টন ক'রে চুপি চুপি বললে, তুমি বেশ।

শর্বরী বললে, তুমি কে ভাই, নাম কি?

নাম? আমার নাম ফুলমায়া। আমি মণিপুরের মেয়ে।

দুধে আর রক্তে মেলানো তার গায়ের রং, গায়ে একটা আরণ্যক কৌমার্যের সরস সোঁদা গন্ধ, গোল-গোল চোখ দুটো সবুজ নীলাভ—নিবিড়ভাবে উচ্ছ্বসিত। মসৃণ, চিক্কণ দেহে কেমন যেন পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা—ঘন কঠিন স্বাস্থ্যের এমন পরিপুষ্ট দীপ্তি আর কোথাও শর্বরীর চোখে পড়ে নি। গায়ে একটা মোটা কাপড়ের জামা, পরণে গাছকোমর বাঁধা একখানা জংলা সূতী শাড়ি।

তার হাসিমুখ একটিবারও ম্লান হোলো না। শর্বরী সাহস পেয়ে বললে, রায় সাহেব তোমার কে হন্, ফুলমায়া?

কে হন্?—ফুলমায়া অনেকবার ঘাড় নেড়ে জানালে রায় সাহেব তার কেউ হয় না।

তবে এখানে আছ কেন তুমি?

আমাকে এনেছে।

তোমার মা বাবা ?

আবার সে হাসিমুখে বার বার মাথা নাড়লো অর্থাৎ জানালো এই দুনিয়ায় তার কেউ নেই।

তোমার বিয়ে হয়েছে, ফুলমায়া ?

বিয়ে !—ফুলমায়া একটু থমকে দাঁড়ালো, বললে, কই না—ব'লেই বাইরে কা'র পায়ের শব্দ শুনে হরিণীর মতো লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল।

চৌবে এসে ঘরে ঢুকে হাত তুলে সেলাম জানালো। দুধ, ফল ও কিছু মিষ্টান্ন এবং গরম চায়ের একটা ছোট কেট্‌লী রাখলো পরিষ্কার জায়গায়। চৌবে ব্রাহ্মণ, তার হাতেই শর্বরীর আহারের ব্যবস্থা।

খাবারগুলি সাজিয়ে দিয়ে চৌবে প্রশ্ন করলো, মাঈজি, আপনি শিকারে যাবেন, না এখানেই থাকবেন ?

শর্বরী প্রশ্ন করলো, সাহেব কোথায় ?

তিনি রায়-সাবকে নিয়ে খেতে বসেছেন।

আচ্ছা যাও। তাঁর সঙ্গেই কথা হবে।

চৌবে চ'লে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কুলেন্দ্র এসে ভিতরে ঢুকলো। শর্বরী অভ্যর্থনা জানিয়ে বললে, আসুন হাকিম সাহেব, আপনি অতিথির প্রতি এত বিরূপ কেন? সেই ব'সে আছি কখন্ থেকে। কোথায় ছিলেন মধুসন্ধানে ?

হাসিমুখে কুলেন্দ্র বললে, আমরা দুজনেই এখন তৃতীয় ব্যক্তির অতিথি। তোমার অসুবিধে হচ্ছে না ত ?

একটুও না। ষোড়শ উপচারে এখনই আহার সেরে উঠলুম। তা ছাড়া চারিদিকে দৈত্য দানবের দল, অস্ত্রশস্ত্রের পাহারা, অবাধ আনন্দের জীবন—অসুবিধে দূরের কথা, দুশ্চিন্তা অবধি নেই।—শর্বরী হাসতে লাগলো।

কুলেন্দ্র সন্দেহক্রমে তার দিকে তাকালো। সহসা শর্বরীর এত সহাস্য উচ্ছলতা বিস্ময়ের বিষয় বৈ কি। নিজের গাম্ভীর্যকে ডিঙিয়ে এমন রসিকতা করবার মেয়ে সে নয়। শর্বরীও তাকে জানালো না—ফুলমায়া নামক একটি তরুণীকে সে এখানে দেখেছে। সে হাসিমুখে কেবল বললে, আচ্ছা, এই খুনিয়ার জঙ্গল তোমার খুব প্রিয়, না কুচক্রী ?

কুচক্রী বললে, খুবই প্রিয়। আর কোনো জঙ্গলে এমন নিশ্চয়তা নেই, এমন প্রাচুর্য নেই। সব ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে করে এখানেই এসে থাকি, একটু সুযোগ পেলেই এখানে ছুটে আসি।—ও কি, তুমি অত হাসচো কেন, শর্বরী ?—সহসা যেন আঘাত খেয়ে উচ্ছ্বাসটা তার থেমে গেল।

শর্বরী বললে, এখানে তোমার শিকার ছাড়া আর কোনো আকর্ষণ নেই ?

আর কি ?

এই ধরো সাধুভাষায় যার নাম স্নেহ-মোহ-বন্ধন ?

কুলেন্দ্র এবার হেসে উঠলো। বললে, প্রচুর আছে। বাঘের চোখে, ভালুকের দাঁতে, হরিণের পায়ে—আমার জীবনমরণ বাঁধা।

শর্বরী হতাশ হোলো। এমন মানুষকে বাজিয়ে দেখা ভুল, ফুলমায়ার কোনো অস্তিত্বের সন্ধানই সে রাখে না। শর্বরী অন্য কথায় ফিরে চ'লে গেল।

অকস্মাৎ একটা বড় আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠলো। তার পরেই ঝন ঝন—ঝনাৎ শব্দে হুড়মুড় ক'রে কোথায় কি গড়িয়ে গেল। কুলেন্দ্র ছুটে বাইরে এসে ডাকলো, রায় সাহেব ?

সাড়া পাওয়া গেল না। যেন চারিদিকের নিঃশব্দ প্রেতপুরীর অতল গর্ভে তার গলার আওয়াজ ডুবে গেল। অজানা সন্ত্রাসে শর্বরী ভিতরে ব'সে কণ্টকিত হয়ে উঠলো। এ বাড়ীতে প্রায়ই জানোয়ার ঢোকে এ গল্প সে শুনেছিল।

আলীজান্ ?—কুলেন্দ্র আবার হাঁক দিল।

তারও কোনো সাড়া নেই। সে আর চৌবে কোথায় বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কুলেন্দ্রকে এক এক পা অগ্রসর হ'তে দেখে শর্বরী দ্রুতপদে বাইরে এলো। বললে, কোথা যাও অন্ধকারে ?—এই ব'লে সেও পিছনে পিছনে এলো।

প্রকাণ্ড কুঠিবাড়ী—কোথায় তার সীমানা, কোথায় পাঁচিল, কোন্ পথ কোথায় নিয়ে যায়—অন্ধকারে ঠাহর করার উপায় নেই। কুলেন্দ্র কিছুটা জানতো। সে এঁকে বেঁকে হাতড়ে হাতড়ে চললো শর্বরীর আগে আগে। শীতের তীব্র রাত ঝিল্লী রবে মুখরিত। সেই আওয়াজটার পর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আলোর একটা শীর্ণ রেখা পাওয়া গেল। কিন্তু সেই আলোর পথ প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শাল আর দেবদারুর গুঁড়ি দিয়ে আট্‌কানো। অনেক সময় বন্য জানোয়ার এই কুঠিবাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে গরু-ছাগল ইত্যাদি নিয়ে

পালায়। কয়েকদিন আগে এই বাড়ী থেকে একটা চিতাবাঘ একজন জংলীর কচি ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়েছে। তাদেরই পথ অবরোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা। ওরা দুজন এগিয়ে এসে বরগার বেড়ার পাশে দাঁড়ালো। তারই ফাঁক দিয়ে ভিতরটা স্পষ্ট দেখা যায়।

ভিতর দিকে চোখ পড়তেই কুলেন্দ্র বিস্ময়-স্তব্ধ হয়ে গেল। এই কুঠিবাড়ীতে স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব সে কল্পনাও করে নি। আগে সে বাইরের দিকে এসে থাকতো এবং সেখান থেকেই চ'লে যেতো—অন্দরমহলে আসা এই তার প্রথম। কত দিন কত রাত্রি সে কাটিয়েছে রায়সাহেবের সঙ্গে; দেখেছে অকুণ্ঠ হিংস্রতা তার স্বভাবে, আলাপে বলিষ্ঠ বর্বরতা, ব্যবহারে সহজ স্বাভাবিকতা। স্নেহ, মোহ, দাক্ষিণ্য—এসব তার কাছে হাসির কথা, স্বপ্নের অগোচর। হত্যার কাহিনীতে, রক্তপাতের কথায়, মারণাস্ত্রের আলাপে, দুরন্তপনা ও দুঃসাহসের গল্পে—কুলেন্দ্রর অপেক্ষা অনেক বেশি তার উল্লাস। কোনোদিন কোনো কারণেই একথা আবিষ্কৃত হয় নি, নারীর সান্নিধ্যে সে বাস করে।

কুলেন্দ্র সেই অন্ধকারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আশ্চর্য!

হাসিমুখে শর্বরী বললে, আশ্চর্য কেন?

ঠিক বোঝাতে পারবো না। তুমি হাসচো যে?

ভূত দেখেও মানুষ এত চমকায় না, তাই হাসচি।

তা হবে।—ব'লে কুলেন্দ্র বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে পুনরায় বললে, মেয়েটি কে তাই ভাবছি। পঞ্চাশ বছর বয়স হ'তে চললো—রায়সায়েব ত বিয়ে করে নি।

শর্বরী বললে, গল্পে শোনা যায় দস্যুসর্দারের পালিতা কন্যা—এও হয়ত তাই।

অসম্ভব, আমি তাহ'লে নিশ্চয় জানতে পারতুম।

পৃথিবীতে আরো অনেক রহস্য আছে যা তুমি আজো জানতে পারোনি, কুচক্রী।

কথাটার ভিতর দিয়ে শর্বরীর একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কুলেন্দ্র তার জবাব দিতে পারলে না।

৫

রায়সায়েব!

কে, হাকিম সায়েব নাকি? আলীজান, সাব্‌কো লাও অন্দরমে। আসুন মশায়।

আলীজান হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে বেড়ার পাশে দরজার দিকে এলো। কুলেন্দ্রর সঙ্গে শর্বরী এসে ঢুকলে রায়সাহেবের মহলে। ফুলমায়া দাঁড়িয়েছিল, এবার সে আর পালালে না—কেবল অতিথিদের দেখে তার একমুখ দুষ্ট হাসি উচ্ছলিত হয়ে উঠলো।

ভালুকের লোমযুক্ত বড় একখানা চামড়া পেতে দিয়ে রায়সাহেব দুজনকে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, মেয়েছেলের কাজ, কিন্তু দেখছেন ত, ওই পাজিটা এসব কিছুতেই করবে না। ওদিকে লোহার হাঁড়াগুলো সব ফেলে দিলে দুমদাম ক'রে।

হঠাৎ তার কাঁধের কাছটা লক্ষ্য ক'রে কুলেন্দ্র প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, আপনার ওখানে অত রক্ত পড়ছে কেন, রায়সাহেব?

শর্বরীও সেই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলো।

রায়সাহেবের কোনো ব্যস্ততা দেখা গেল না। ধীরে সুস্থে কাঁচা তামাকের পাইপ ধরিয়ে সহাস্যমুখে বললে, ওই বাঘিনীর কাণ্ড, ছুরিখানা দেখতে দেখতে বসিয়ে দিলে, একটু হাতও কাঁপলো না।

সে কি?—শর্বরী যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

ফুলমায়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, দ্রুত এসে রায়সাহেবের মাথার চুলের মুঠি দুই হাতে শক্ত ক'রে নেড়ে বললে, আর তুমি—তুমি যে বললে ছুরি বসাতে?—এই ব'লে সে পিঠের পাশে মুখ লুকিয়ে ব'সে পড়লো।

দেখলেন ত মিসেস চৌধুরী—আমি বলেছি ব'লেই—আমি যদি খুন করতে বলতুম, পোড়ারমুখী?

হরিণী যেমন গাছের গায়ে গা ঘষে, তেমনি ক'রে ফুলমায়া রায়সাহেবের পিঠে মুখ ঘ'ষে বললে, করতুম ত।

কুলেন্দ্রর এতক্ষণে চেতনা ফিরলো। বললে, একটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে ফেলুন?

রায়সাহেব অসীম উপেক্ষায় বললেন, থাকগে, দেবো একটা ওষুধ। এবার ত আমাদের যাবার সময় হোলো, হাকিম সাহেব?

কিন্তু আপনি ওই সাংঘাতিক ক্ষত নিয়ে—?

সাংঘাতিক! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! মিসেস চৌধুরী বোধ হয় জানেন না বাঘের আঁচড়ের দাগ আমার মুখে—তবু মারা পড়েছিল আমার হাতে। হাঃ হাঃ হাঃ।—রায়-

সাহেবের উচ্চ কণ্ঠের কর্কশ হাসিতে ঘর ভ'রে উঠলো। হাসি দেখলে ভয় করে।

ফুলমায়া দ্রুতপদে উঠে দাঁড়ালো, তারপর আলোটা এনে রায়সাহেবের মুখের কাছে ধ'রে বললে, আর এই দেখুন এই চোখটা—এটা কাঁচের চোখ। ভালুকের নখে এই চোখটা যায় সেবার। ইঃ, আবার হাসি হচ্ছে মিটমিট ক'রে!

শর্বরী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে রায়সাহেবের ক্ষতবিক্ষত মুখখানার দিকে তাকালো। ঘন ঠাসা সেই দৈত্যের মুখ। মনে হোলো জানোয়ারের থাবাতেও নয়, মানুষের হাতেও নয়—ঈশ্বর ভিন্ন আর কারো হাতে এর মৃত্যু হবে না।

কিন্তু ওই আলোটুকুতে এদিক থেকে কুলেন্দ্র দেখে নিল ফুলমায়াকে। বাঙালী মেয়ের মুখ সে নয়। পীত-জাতির বংশানুক্রমিক ধারায় ভেসে-আসা অনেকটা যেন বর্মামেয়ের সেই মুখ। নাকটি দাবানো, দু'দিকে দুটো গোল সবুজ চোখ। জড়তা সেই ভঙ্গীতে নেই—উদ্ধত, সহজ, সহাস্য। গায়ের রং অত্যুজ্জ্বল, নধর—সর্বশরীরে অল্প-বয়সের কাঠিন্য। এত শীত, কিন্তু তার কপাল বেয়ে নেমেছে ঘামের ফোঁটা—সে যেন তার প্রাণের উত্তপ্ত তারুণ্য নেংড়ানো রস। কুলেন্দ্র অবাক হয়ে রইলো।

সেই রাত শর্বরীর চোখে নিবিড় হ'য়ে এলো ঘন নেশার নিদ্রালুতায়। মোটর ছুটলো দক্ষিণ-পশ্চিম পথে। ভিতরে কম্বল ও গরম কাপড়ের মধ্যে ডুব দিয়ে সে ব'সে রইলো অদ্ভুত স্বস্তিতে। হিমতীব্রতায় শিথিল আড়ষ্ট, অথচ এক প্রকার মধুর আনন্দের ক্লান্তিতে তার দেহ মন সকল গ্রন্থি খুলে দিয়ে চোখ বুজে রইলো। চারিদিকের অমা-রজনীর মধ্যে চোখ খুলে থাকা আর বন্ধ ক'রে রাখায় অন্ধকারের কোনো পার্থক্য নেই। তার পাশে একটা চিরদুর্জ্ঞেয় পুরুষ, যাকে জীবন-যৌবন অপব্যয় করেও জানা গেল না। কুলেন্দ্র তার কেউ নয়—কেবল চোখে দেখা, কেবল চিঠিপত্রের সম্পর্ক। মনে পড়ে তার প্রথম তারুণ্যে চোখ মেলেছিল এই মানুষটির দিকে। ভদ্র, নম্র, সপ্রতিভ উচ্চশিক্ষিত যুবক কুলেন্দ্র—তার রূপ, তার যশ, তার স্বাস্থ্যের খ্যাতি। যতদূর মনে পড়ে কুলেন্দ্র তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারিবারিক চক্রান্তে সম্ভব হয়নি। কুলেন্দ্র নিঃশব্দে চ'লে গেল—উচ্চকণ্ঠে প্রণয় ঘোষণা করেনি, অভিমান জানায় নি, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি। পুরুষের সর্বংসহ শক্তি নিয়ে সে নিঃশব্দে চোখের আড়ালে চ'লে গেল। তারপর এই গত তিন বছর আগে অবধি বহুবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, শর্বরী তার বিয়ের এক বছর বাদে সিঁদুর মুছে ফিরে এসেছিল। স্বামীর সম্পত্তি তার নামে দানপত্র করা, ঐশ্বর্যের অভাব তার কখনো ঘটেনি। এই হোলো তাদের মোটামুটি ইতিহাস।

মোটরের গতি মন্থর হোলো। ভিতরে চারিটি মানুষ, কারো মুখে কথা নেই। অরণ্যের অন্তরলোকে মোটর প্রবেশ করেছে। অসাড় অদ্ভুত একটা পৃথিবী। প্রকৃতির নির্দেশে নিঃশব্দে একটা প্রকাণ্ড সংসার একটা বিরাট পরিবার যন্ত্রচালিতের ন্যায় জীবন নির্বাহ ক'রে চলেছে। চোখে দেখা যাচ্ছে না, কানে কোনো কলরব আসছে না—তবু পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সরীসৃপ মিলে কোটি কোটি প্রাণীর একটা একতাবদ্ধ পরিবার চলেছে সুশৃঙ্খলায়। সেই বিপুল ও বিশাল অন্ধকার জগতের অপরূপ রহস্যময়তার দিকে চেয়ে শর্বরী পাথরের মতো স্থির হয়ে রইলো।

ভিতরে কোথায় যেন গিয়ে রায়সাহেবের নিঃশব্দ সংকেতে চৌবে গাড়ী থামালো। সহসা যেন ওরা জানোয়ারের গন্ধ পেয়েছে। রুদ্ধকণ্ঠ রুদ্ধশ্বাস দুইজন শিকারী—রায়সাহেব ও কুচক্রী—দুইজনের উৎকর্ণ জ্বলন্ত চক্ষুর দিকে তাকালে ভয় করে। ওরা যেন এই অরণ্যের ভয়াবহতার প্রতীক্। না, জানোয়ার নয়, চোখের ভুল।

দ্বিতীয় সংকেতে আবার গাড়ী চললো। দুটো হেডলাইটের তীব্র রশ্মি বনস্পতিদলের ভিতরে বিদ্ধ ক'রে মোটরখানা নানা বাকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যেন এই মোটরখানাই প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো একটা অতিকায় জানোয়ারের ন্যায় এই অরণ্যে এসে ঢুকেছে—ক্ষুধার খাদ্যের আশায় জ্বলন্তচক্ষু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারিদিক সন্ধান করছে। তারই বিভীষিকায় শ্বাপদের দল উৎকণ্ঠিত আতঙ্কে আত্মগোপন করেছে।

মোটর আবার থামলো। কোথায় তারা এসে পড়েছে কিছুই জানা যায় না। একটা নীরেট, অন্ধ, ঘন আচ্ছাদনে তাদের ঘিরলো। উপরের আকাশ অরণ্যের চন্দ্রাতপে ঢাকা, দিকনির্দেশ কোথাও নেই, পথ অবলুপ্ত—চৌবে হেডলাইট বন্ধ ক'রে দিল।

অসাড় অরণ্য, ভিতরে তার অনন্ত অব্যাহত প্রাণ ধুক্‌ধুক্‌ করছে। শর্বরীর জীবনও এই—তারও এই অসাড়তার অন্তঃস্থলে কান পেতে থাকলে শোনা যায় একটা অশ্রান্ত প্রাণকল্লোল। তারও দেহের কোটি কোটি শিরা উপশিরা, অন্ত্রতন্ত্র, স্নায়ুমণ্ডলীর অরণ্যে-অরণ্যে অশুদ্ধ মনের নানা প্রবৃত্তির অগণ্য জানোয়ার অহর্নিশি চলা ফেরা করে সন্দেহ নেই—তবু তার সমস্তকে ঘিরে রয়েছে তার চিরজাগ্রত প্রাণদেবতা—ব্যর্থতায়, বিচ্ছেদে, ভগ্নবাসনায়, চির-উপবাসে সে শীর্ণ। আজ তার এই অকরুণ হিংস্র সন্ন্যাসকে মানবিক কোমলতায় রূপান্তরিত করার আর উপায় নেই। কিন্তু কেন নেই?—শর্বরীর গলার ভিতর থেকে যেন একটা প্রবল রক্তত‍রঙ্গ আর্তনাদ ক'রে উঠলো—কেন নেই? কার অপরাধে? বঞ্চনার দুঃখ স'য়ে থাকা বঞ্চিতের পক্ষে কি এত বড় গৌরব? মালিন্য-লজ্জার শঙ্কায় অধিকারকে বিসর্জন দিয়ে স্বেচ্ছা-নিবাসন নেওয়াই কি এত বড় পৌরুষ?

শর্বরীর অসহায় নিরুপায় দুই চক্ষু বেয়ে সহসা জলধারা গড়িয়ে এলো। কিন্তু সেই অশ্রু তার নিতান্তই একার, পাশে যে-পুরুষ রইলো দুস্তর দুরতিক্রম্য ব্যবধানের পারে, এদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শর্বরীর অস্তিত্ব অবধি সে বিস্মৃত। অরণ্যের দিকে একাগ্র লক্ষ্যে সে আত্মবিস্মৃত, রাইফেলটা হাতে নিয়ে উৎকর্ণ হিংস্রতায় তার দুই চোখ ধকধক ক'রে জ্বলছে।

তবু আজকের এই বিচিত্র স্বাদ অক্ষয় হয়ে রইলো তার জীবনে। ব্যথা, বিক্ষোভ, বঞ্চনা অতিক্রম ক'রেও আজকের এই আরণ্যক আদিমতা শর্বরীর পরিশ্রান্ত হৃদয়কে আনন্দিত ক'রে তুললো। এমন বন্য সৌন্দর্যের তুলনা সামাজিক জীবনে নেই। বনস্পতির প্রাচীন শিকড়ের স্তবকে স্তবকে, কোটরে গহ্বরে, মৃত্তিকার স্তরে স্তরে, কীটপতঙ্গের চলা-ফেরায়, পাখীর ডানার শব্দে, অপরিচিত অনৈসর্গিক শব্দে—প্রাণতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। সময় ও দূরত্বের চেতনা তার মনে আর নেই। প্রতিটি নিবিড় চৈতন্যময় মুহূর্তের উপর দাঁড়িয়ে অনন্তকাল যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

শর্বরী চোখ বুজে রইলো। তার জীবন-যৌবন-মরণ, তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তার ইহকাল-পরকাল-চিরকাল—সমস্তটা একাকার ও নিরাকার হয়ে সেই অন্ধকার অরণ্য-গহ্বরের মুখে সর্বনাশা দোলায় দুলতে লাগলো।

তারা ফিরলো, রাত তখন প্রায় চারটে বাজে। আজ শিকার হ'তে পারেনি, রোজ শিকার পাওয়া সম্ভব নয়। রায়সাহেবের গুলীতে একটা বড় হরিণ মারা পড়েছে, কুলেন্দ্রর গুলী খেয়ে একটা লেপার্ড পালিয়েছে এই মাত্র। কিন্তু সেই নিদারুণ উত্তেজনার পর শর্বরীর শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে।

রায়সাহেব চ'লে গেল নিজের মহলে। চৌবে কম্বল মুড়ি দিয়ে মোটরের মধ্যেই শুয়ে পড়লো। এদিকে আলীজান দুই কাম্‌রার দরজা খুলে দিয়ে নিজের ডেরার দিকে নিরুদ্দেশ হোলো। এত শীতে অতি কষ্টেই ভদ্রতা রক্ষা করা চলে।

জবাফুলের মতো কুলেন্দ্রর দুই চোখ রাঙা, ক্লান্তি ও ঘুমে তার আর দাড়াবার শক্তি নেই। টলতে টলতে এসে সে বললে, কই, শোবো কোথায়?

তা আমি কি জানি?—শর্বরী হাসিমুখে বললে।

জানো না? বেশ যা হোক—ও, এটা দেখি তোমার ঘর। আমার ঘরটা দেখিয়ে দাও ত?—দেয়াল ধ'রে ধ'রে কুলেন্দ্র অগ্রসর হোলো।

দাঁড়াও, বোকার মতন হেঁটো না, আগে আলো ধরি।—আলোটা নিয়ে শর্বরী তাকে পাশের ঘরে এনে বললে, ওই ত তোমার বিছানা, শুয়ে পড়ো। নাও, আগে দরজা বন্ধ করো। ও কি, দাঁড়ালে যে?

কুলেন্দ্র সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, তুমি যে একা ঘরে শোবে, ভয় করবে না, শর্বরী?

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শর্বরী বললে, না, ভয় কি? তুমি দরজা দাও।—এই ব'লে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কুলেন্দ্রর প্রশ্ন ও ঔৎসুক্য কিছু বিস্ময়ের কারণ বৈ কি।

ফুলমায়ার চিত্রটা জটিল হয়ে হঠাৎ কুলেন্দ্রর মস্তিষ্কে যেন পাক খেয়ে উঠলো। বয়স তার অনেক, যৌবনের প্রান্ত-সীমায় সে এসে পৌঁছেচে—তবু কি মনে হোলো, ঘুমের জড়তা কাটিয়ে সে এক এক পা ক'রে শর্বরীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালে।

শীতের তুহিন শীতল রাত, নিথর, নিস্পন্দ। সেই কুঠিবাড়ীর কোনো অংশে একটা হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও তখন আর কেউ টের পাবে না। তার মৃদু পদসঞ্চারণ দেখে শর্বরী একটু শঙ্কিত হয়ে বললে, আবার এলে যে? ঘুমে যে টলছিলে তখন?

কুলেন্দ্র বললে, আচ্ছা শর্বরী, ভূতের ভয়ও কি তোমার নেই ?

শর্বরী উঠে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। বললে, ভূতের চেয়ে শিকারীরা ভয়ঙ্কর।

কেন ?

কাল উত্তর দেবো, আজ ঘুমোওগে। যাও, রাত আর বাকি নেই।

এই যাই।—ব'লে কুলেন্দ্র তবুও দাঁড়িয়ে রইলো এবং বললে, বন্দুকগুলো তোমার ঘরে রইলো, সাবধান, গুলীভরা আছে, হাত দিয়ো না যেন।

শর্বরী বললে, যথা আজ্ঞা, এবার ঘুমোওগে দেখি !

দরজার খুঁটির উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে কুলেন্দ্র বললে, গল্প করার ইচ্ছেয় ঘুম চ'লে গেল, কিন্তু তুমি যেন আমাকে তাড়াতে পারলেই বাঁচো।

এই চেহারা কুলেন্দ্রর সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। কণ্ঠস্বর তার মাদকতায় জরজর, চোখ দুটো বিলোল, বলিষ্ঠ দেহে যেন তার বিষক্রিয়া সুরু হয়েছে এমনি শিথিল, টলটলে। শর্বরী ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে বলতে বাধ্য হোলো, ছেলেমানুষী করো না কুচক্রী, এত রাতে আর গল্প নয়।

তুমি বিরক্ত হচ্ছ ?—কুলেন্দ্র একটু থতিয়ে প্রশ্ন করলে।

না। ভীত হচ্ছি, পাছে নিজের কাছে নিজের মাথা তুমি হেঁট করো, কুচক্রী। যাও, শুয়ে পড়োগে।

কুলেন্দ্র নতমস্তকে চ'লে গেল।

শর্বরী গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল, তখনও তার হাত কাঁপছে, বুক ঢিপঢিপ করছে। এমনি একটা নাটকের অবতারণায় যেন তার সর্বশরীর কুণ্ঠায় আর অস্বস্তিতে কিলবিল করতে লাগলো। একটি মুহূর্তের চিত্তবৈলক্ষণ্য—কিন্তু সেই মুহূর্তটি এমনি অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়জনক যে, শর্বরীর চোখের সম্মুখে সারা পৃথিবী প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ওলোট পালট হয়ে গেল। মনে হোলো, কুলেন্দ্রর স্বভাবের উপরিভাগে হিমালয়োচিত মহিমা, ভিতরে একটা অনাবিষ্কৃত আগ্নেয়-গিরিগহ্বর—আজ সেটা সহসা উদ্ঘাটিত হয়ে গেল।

শর্বরীর চোখে বাকি রাতটুকুর মধ্যে আর ঘুম এলো না। ঘুমোতে তার যেন ভয় হোলো, অস্বস্তিতে কেবলই পাশ বদলাতে লাগলো। কখন রাত পুইয়ে প্রভাত হয়ে গেছে সে বুঝতে পারেনি। আলোটা তখনও জ্বলছে, সেই আলো পেরিয়ে কুণ্ঠিত প্রভাতের মলিন জ্যোতি সেই সুড়ঙ্গসদৃশ ঘরের কোনো ছিদ্র দিয়েই এসে পৌঁছয় নি।

সময় হিসাব ক'রে এক সময় শর্বরী গিয়ে অতি সন্তর্পণে দরজাটা খুললে।

বাহিরে জ্যোতির্ময় প্রভাতের রাজবেশ তার চোখে পড়লো। ধূসর হিমেল কুয়াসার স্তবক তখনও অরণ্যশীর্ষে জড়ানো—তারই উপর তরুণ সূর্যের চিক্কণ সোনার অলঙ্কার। আকাশ নীলাভ, রঙীন। পাখীর কলকাকলীতে খুনিয়ার অরণ্যে-অরণ্যে প্রভাতী বন্দনাসভা বসেছে। স্নিগ্ধ হাওয়ায় শর্বরীর জাগরণ-শ্রান্ত দুই চক্ষু মধুরের আবেশে ভ'রে উঠলো। আলোটা নিবিয়ে গায়ে শালখানা জড়িয়ে জুতোটা পায়ে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

রহস্যে, আতঙ্কে, অস্পষ্টতায় এই কুঠিবাড়ী গত রাত্রিতে তার কাছে ছিল বিভীষিকা, আজ তার কোনো চিহ্নই নেই। বাড়ীটা প্রকাণ্ড, একতলা, তিনমহলা। কত যে প্রাচীন, তার হদিস পাওয়া যায় না। কোনো কোনো ভগ্নাংশ থেকে বট ও অশ্বত্থ বিশাল হয়ে উঠে আবার ঝুরি নামিয়েছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণটা বিস্তৃত, তার বাইরে থেকেই জঙ্গলের পথ—নিকটেই সুউচ্চ পাহাড়ের আকাশস্পর্শী প্রাচীর পূব থেকে পশ্চিম দিকে চ'লে গেছে। অরণ্য নিস্তব্ধ, মানুষের চিহ্ন অবধি কোথাও নেই।

পায়চারি করতে করতে কুলেন্দ্রর ঘরের দিকে চোখ পড়তেই শর্বরী শিউরে উঠলো। ঘরের দরজা খোলা। দ্রুতপদে গিয়ে ঘরে উঁকি মেরে সে দেখলে, কুলেন্দ্র বিছানায় অগাধে নিদ্রিত। দরজা বন্ধ না ক'রেই সে কাল শুয়ে পড়েছিল। এ যে কত বড় সাংঘাতিক ভুল সেই কথা ভেবে শর্বরীর গা কেঁপে উঠলো। কুলেন্দ্রকে সে ডাকলো না, নিজের মনেই স'রে গিয়ে আবার বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো।

চারিদিকের গাছের জটলা পার হয়ে সোনাবরণ রাঙা রোদ প্রাঙ্গণে এসে নামলো। শর্বরী এক সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে উচ্চকিত হয়ে পথের দিকে তাকালে। দেখলে, —দেখে অবাক হয়ে গেল—রায়সাহেবের কাঁধে চ'ড়ে গত রাত্রির সেই রহস্যময়ী ফুলমাযা কলহাসিতে সারা বন মুখরিত ক'রে তার দিকে এগিয়ে আসছে। অত বড় মেয়ে আপন দেহের সম্বন্ধে কোনো কুণ্ঠাই মানে না। উভয়ের উচ্ছৃঙ্খল আলাপে সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

কাছে এসে রায়সাহেবের কাঁধের উপর থেকে ফুলমায়া একেবারে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে হেসে উঠলো। রায়সাহেব বললে, আপনি খুব সকাল সকাল ওঠেন ত দেখছি?

শর্বরী বললে, আপনারা ত তারো আগে।

এই পাজিটার জন্যে—রায়সাহেব বললে, ভোর রাত্তিরে উঠে পালায় জঙ্গলের দিকে। আমি টের পেয়ে ছুটি পিছু পিছু, বিপদ একটা ঘটতে পারে ত?

আপনার ফুলমায়া ত ভারি দুরন্ত দেখছি।

ফুলমায়া উভয়ের কথা মন দিয়ে শুনে ফস ক'রে বললে, আমার মতন ও কিন্তু গাছে চড়তে পারে না। একদিন প'ড়ে গেছি গাছ থেকে···মাথা ফুটে কী রক্ত!

রায়সাহেব সস্নেহে তার দিকে চেয়ে বললে, আমার পায়ের শিকল।

স্নিগ্ধ কচি কৌমার্য—পরিশ্রমে এত শীতেও ফুলমায়ার মুখখানি রাঙা টসটস্ করছে। বড় লোভ হোলো তাকে কাছে টেনে নিতে, কিন্তু রায়সাহেবের ডাকাতী চেহারা দেখে শর্বরীর যেন কিছুতেই হাত-পা আসে না, এমন একটা দীর্ঘাকার পুরুষ সে জীবনে দেখে নি।

ফুলমায়া ভিতরে চ'লে গেল। শর্বরী বললে, আপনাদের এখানে এত চামড়ার গন্ধ কেন, রায়সাহেব?

ওঃ—আপনি ভেতরে বুঝি দেখেন নি?—রায়সাহেব বললে, ও কাজটার ভার ওই মেয়েটার হাতে· চামড়া পোড়ায়, চর্বি গলায়, কাটাকুটি করে—তারপর বাইরে থেকে দু-চার জন লোক এনে ট্যানিং করাই। মেয়েটা খাটতে পারে খুব।

এটাই কি আপনার কারবার?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

শর্বরী হেসে বললে, ও মেয়েটি বুঝি আপনার—

রায়সাহেব একবার চারিদিক তাকালে। বললে, মিসেস চৌধুরী, আপনাকে ঠিক সেকথা বোঝাতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, শিশুকালে ওকে আমি কুড়িয়ে এনেছি মণিপুরের এক পাহাড়ী গাঁও থেকে, ওর মা-বাপ দিল্ আমার হাতে।

কেন?

ওর মা মণিপুরী, বাবা বাঙালী—এই কারণে। সেই থেকে রয়ে গেল আমার সঙ্গে। ওকে বড় ক'রে তুললুম বনে-জঙ্গলে। আমার সঙ্গে শিকারে যায়, গুলী যোগায়, বন্দুক ঝাড়ে মোছে। ঘরে এসে রাঁধে, চামড়া কাটে, বাকেটে ক'রে জল তোলে মাটির তলা থেকে, আলীজানের সঙ্গে লাঠি খেলা শেখে। কিন্তু এখন বড় হোলো মেয়েটা,—উনিশ বছরের।

ইতিহাসটুকু ছোট, কিন্তু বিচিত্র। রায়সাহেবের কণ্ঠের ভিতর থেকে যে স্নেহটুকু উচ্ছলিত হোলো সেটুকুও দুর্লভ। এখানে সমাজ-চৈতন্যটা হাস্যকর, জনরব মূল্যহীন। রাজবেশপরা ভালোবাসা ব'লে একে অভিহিত করলে হয়ত ভুল হবে, কিন্তু এর মধ্যে কেমন একটা আরণ্যক ও বর্বর মোহবন্ধনের অরুগ্নতা শর্বরীর মস্তিষ্কে নেশার মতো পেয়ে বসলো। তার নারীর মন নিশ্চিত নিঃসন্দেহ হ'তে পারলো না, এদের সত্য সম্পর্কটা কী। প্রকৃত ভালোবাসার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তার স্পষ্ট চেহারাটা চোখে পড়ে না। যে কোনো আকারে, গঠনে, সংযোগে ও সম্পর্কে যখনই কোনো সংবেদন ও অনুরাগের যন্ত্রণা রক্তাক্ত ও রঙীন হয়ে উঠেছে, শর্বরী তাকে ব'লে এসেছে প্রণয়। তার নিজের হৃদয়টা কেমন যেন নিরুপায়, মন বুভুক্ষিত, ব্যর্থতায় বিষাদে তার সমস্ত প্রাণ নিরাশায় ধূসর—কিন্তু আজ যদি সে মনে করে রায়সাহেব ও ফুলমায়ার সম্পর্কটা পিতামাতার বাৎসল্যে, বন্ধুর প্রীতিতে, সহোদরের কল্যাণবোধে, প্রণয়ীর অনুরাগরঞ্জনে অনির্বচনীয় মাধুর্যে মনোহর—তবে কি তার এত বড় ভুল হবে?

শর্বরী হাসিমুখে বললে, আপনার কোমরে বন্দুক কি সব সময় ঝোলানো থাকে?

ওই পাজিটার জন্যে, ভোর বেলা উঠে পালায় বনের দিকে। সেদিন শুনলুম একটা 'ম্যান্-ঈটার' এসেছে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে।—রায়সাহেব বললে, এদিকে জানোয়ারের উৎপাত বেশি, পাহাড়ী-জঙ্গল কি-না—গ্রাম এদিকে নেই।

শর্বরী বললে, আপনার কাঁধের রক্তটা কিন্তু এখনো শুকোয় নি, দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখছি বটে।—আরে, ও কি, হাকিমের দরজা খোলা কেন?

শর্বরী বললে, এতই ঘুমের নেশা যে, দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছেন। সকালে উঠে আমিও দেখলুম।

রায়সাহেব গম্ভীর ভীতকণ্ঠে বললে, এ কাজ ভালো

হয়নি। বুঝলেন মিসেস চৌধুরী, হাকিমের একটু মাথার দোষ আছে।

আপনার একথার মানে?

ওর মনে আছে একটা ভূত, ওকে স্থির থাকতে দেয় না। জানোয়ারের রক্ত না দেখলে রাতে হাকিমের ঘুম হয় না।

শর্বরী বললে, কিন্তু জানোয়ার ত সবদিন পাওয়া যায় না।

রায়সাহেব বললে, কিছু না পাওয়া গেলেও একটা ‘শিযার’ কি একটা ‘খারা’—তাই মেরেই ও এসে ঘুমোয়। বয়স কম কিনা তাই রক্তের ওপর লোভ। আপনি জানেন, ওর আপনার মানুষ কে কে আছেন?

ভাই বোনরা আছেন, পিসিরা আছেন। উনি ত আর দেশে যেতে চান না।

রায়সাহেব তার জংলী বাংলায় বললে, ইস, বড় একটা জীবন ··· ওকে যদি কেউ ফিরিয়ে নিতে পারে—মানে কি-না, জঙ্গলে নষ্ট হবার ভয়!

কেন বলুন ত?—শর্বরীর চোখের তারা দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাইলো।

রায়সাহেব চিন্তিত হয়ে বললে, আমাকে না জানিয়ে হাকিম যায় অন্য জঙ্গলে মহম্মদ ওসমানকে নিয়ে। সে মাতাল, সে কি পারবে ওকে ঠিক সামলাতে? আচ্ছা মিসেস চৌধুরী, আপনারা বলতে পারেন হাকিমের হাত মাঝে মাঝে কাঁপে কেন?

ভগ্নরুদ্ধকণ্ঠে শর্বরী বললে, আমি ত জানিনে, রায়সাহেব!

আমিও তাই ভাবি—রায়সাহেব একপ্রকার মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, ওর এই বয়সে হাত কাঁপে কেন। বিপদ ঘটতে পারে—বুঝলেন না?—বলতে বলতে লোকটা ভিতর দিকে চ'লে গেল।

স্নান সেরে শর্বরী যখন ফিরে এলো তখন বেশ বেলা হয়েছে। কুলেন্দ্র তখনো ওঠেনি। রাত্রে তার অনিদ্রার রোগ, দিনের বেলায় অঘোরে সে ঘুমোয়। পায়ে তার মোজা জুতো, গায়ে চামড়ার কোট—সেগুলি ছেড়ে শোবারও সময় তার হয়নি। মুখের ভিতর থেকে তার কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত হচ্ছে। সে তার গভীর নিদ্রার নাসিকাধ্বনি নয়, সে-যেন একটা আহত জন্তুর মরণোন্মুখ ক্ষীণ আর্তনাদ! শর্বরী সভয়ে একবার তাকে ডাকলে, কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না। কিয়ৎক্ষণ বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার বাইরে বেরিয়ে এলো। এর কোনো সমাধান নেই, কোনো প্রতিবিধান নেই—শর্বরী ভাবলো অতঃপর তার এখানে থাকা মিথ্যা, শোভন সৌজন্য রক্ষা ক'রে এখন বিদায় নিয়ে চ'লে যাওয়াই তার পক্ষে সঙ্গত।

কিন্তু বিদায় নেবার কথায় হঠাৎ একটা কান্না তার দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। এর পর চিঠিপত্র আনাগোনার আর কোনো অর্থ রইলো না। কুলেন্দ্রর জীবন ধ্বংসমুখী, আগুন নিয়ে তার খেলা, জীবরক্ত নিয়ে তার মাতামাতি—তার জীবনে আর কোনো নতুন আশার চেহারা নেই, সুতরাং চিঠিপত্র লেখালেখি তার পক্ষে উৎপীড়ন। অতএব এবার ফিরে গিয়ে দুজনের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা বিস্মৃতির যবনিকা ফেলে দেওয়াই হবে বিধিসঙ্গত, সেই হবে সর্বোত্তম বিচার। তবু শর্বরীর চোখে জল এলো এই কথা মনে ক'রে যে, কাছে থেকে যে-যন্ত্রণা সে সহ্য করছে, কলিকাতার নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্বের ভিতরে ব'সে এই যন্ত্রণাটুকুর স্মৃতিও তার মধুর লাগবে। বয়সটা তার অপরাহ্ণের দিকে গড়িয়ে গেছে, উচ্ছ্বাস এখন তার সংহত, প্রণয়ের নামে সামাজিক চৌর্যবৃত্তির খেলা এখন অনেকটা সম্ভ্রমহানিকর, কিন্তু একথা সত্য—আজ কুলেন্দ্রর কাছাকাছি থাকায় যতখানি গভীর দুঃখ-দহন, ছেড়ে যাওয়াও ঠিক ততখানি বেদনাদায়ক।

কুলেন্দ্র উঠলো অনেক বেলায়, প্রায় মধ্যাহ্ন। সময়ের হিসাবটা চৌবের জানা ছিল, সে কাছে এসে দাঁড়ালো। কুলেন্দ্রর চোখ দুটো ক্লান্ত! তার মুখের চেহারায় গতরাত্রির উত্তেজনাজনিত অবসাদ অপেক্ষা বার্ধক্যের কেমন একটা গভীর ছায়া লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় তার আত্মার উপর দিয়ে যেন একটা দীর্ঘ অনাচারের কাহিনী পার হয়ে গেছে।

উঠে ব'সে সে বললে, দাওয়াই লাও, চৌবে।

লায়া, সাব।—ব'লে চৌবে চৌকির উপর থেকে কাঁচের গ্লাস নিয়ে একটা টিনের কৌটো থেকে কি যেন ওষুধ ঢাললে।

শর্বরী এসে ভিতরে ঢুকলো। বললে, ধন্য ঘুম, তোমার ঘুমের প্রাইজ পাওয়া উচিত। ও কি খাওয়া হচ্ছে?

চৌবের হাত থেকে কাঁচের গ্লাস নিয়ে কুলেন্দ্র বললে, মৃতসঞ্জীবনী।

ভারি বিশ্রী গন্ধ। কতদিন খাচ্ছ ?

বছর খানেক।

খাও কি জন্যে ?

এক চুমুকে ওষুধটা খেয়ে কুলেন্দ্র বললে. যদি না খাই তবে সেদিন গা ছমছম করে। একবার মনে হয় সাপ কামড়াতে আসছে, কিম্বা বাঘ তাড়া করছে। মানে, কি জানি, শরীরটা যেন ··· এই দুর্বল আর কি।

শর্বরী বললে, কিন্তু ওষুধ খেয়ে ত শরীর সারে না, কুচক্রী ?

কুলেন্দ্র বললে, শরীর সারবার ত কথা নয়, টিঁকে থাকলেই হোলো।

কথাটার ভিতরে একটা নৈরাশ্যের নিশ্বাস ছিল, শর্বরীর মনটা দুলে উঠলো। বললে, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব অবশ্যই জানো। এ কথা বল্‌ছ কেন ?

কুলেন্দ্র পাইপটা ধরিয়ে নিল। তারপর দেশালাইএর কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, আমি কিছুই বিশ্বাস করিনে।

চৌবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। আহত অভিমানে উষ্ণকণ্ঠে শর্বরী বললে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার কাছে লেক্‌চার দেবো না --কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে উত্তেজনাই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে তোমার ভেতরটা জীর্ণ নোনাধরা ?

কুলেন্দ্র বললে, তার জন্যে কে পরোয়া করে ?

কেউ নয়।

তবে ?

শর্বরী বললে, মনে করেছিলুম শিকারটা তোমার সখ, তোমার খেয়াল, এখন দেখছি তা নয়। এ যেন রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা। এ আর কতদিন ?

চামড়ার কোটটা কুলেন্দ্র গা থেকে খুলে ফেললে। তারপর বাইরে এসে দেখলে তার জন্য টেব্‌লে প্রাতরাশ সাজানো হয়েছে। জলযোগ সেরে পুনরায় শিকারের আলোচনা, পুনরায় নিদ্রা। নিদ্রার পরে চায়ের মজলিশ এবং অতঃপর নৈশভোজন সেরে মারণাস্ত্র সহকারে পুনরায় সেই অরণ্যকাণ্ড। এই যেন তার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ।

শর্বরী বাইরে এলো। কুলেন্দ্র মুখ হাত ধুয়ে এসে টেব্‌লে ব'সে গেল আহার করতে। শর্বরী বললে, আজ আমি চ'লে যাবো, কুচক্রী।

মুখ তুলে কুলেন্দ্র নেহাৎ ভদ্রতা ক'রে বললে, তাই নাকি ? আবার কবে আসছো বলো।

আর হয়ত আসা হবে না। যখন তখন আসা কি আর বিধবা-মানুষের ভালো দেখায় ?

কুলেন্দ্র চুপ ক'রে চা পান করতে লাগলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে শর্বরী বললে, উত্তর দিচ্ছ না যে ?

কুলেন্দ্র বললে, ভাবছিলুম—না, থাক্‌গে।

উৎসুক হয়ে শর্বরী বললে, কি বলো না শুনি ?

হাসিমুখে কুলেন্দ্র বললে, না এমন কিছু নয়, এম্‌নি।

মেয়েমানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠলো কৌতূহলে। বললে, না, বলতেই হবে তোমাকে, কুচক্রী। কি, বলো শুনি ?

কুলেন্দ্র বললে, তোমাকে একটা বাঘছাল দেবো বলেছিলুম, কিন্তু বাঘ ত এখনো মারা পড়লো না।

শর্বরী যেন একটি ফুৎকারে নিভে গেল। আত্মসম্বরণ ক'রে সে শুধু বললে, যেদিন ভৈরবী হবো সেদিন খবর পাঠাবো তোমাকে, বাঘছাল পাঠিয়ে দিয়ো। আপাতত চলে যাচ্ছি --কই, আর দু-একদিন থাকতে বললে না ত !

থাকতে বললে কি থাকবে ?

ব'লেই দেখো না !

চায়ের বাটি মুখে তুলে একটু হেসে কুলেন্দ্র বললে, কেনই বা থাকবে ?

শর্বরী বললে, যদি বলি জোর ক'রে থাকবো ?

চায়ে চুমুক দিয়ে কুলেন্দ্র বললে, ছেলেমানুষী।

শর্বরী বললে, কাল রাতে কোন্ গল্প বলতে ঘরে ঢুকেছিলে ?

কুলেন্দ্র ক্লান্তি বোধ করছিল, বিতর্কের দিকে তার মন ছিল না। এখনই সে ঘুমোতে যাবে, এখনো তার শরীর ও মনের অর্দ্ধেকটা ঘুমে অবশ। কথার উত্তরে তাকে কথা জোগাতে হচ্ছে অনেক কষ্টে। অদূরে কুঠিবাড়ীর দরজায় চৌবে দাঁড়িয়ে রয়েছে হুকুমের অপেক্ষায়। কুলেন্দ্র প্রাতরাশ সেরে উঠে দাঁড়ালো।

আবার সেই অনাদরের আভাস। শর্বরীর মুখের উপর পলকের জন্য একটি আহত রক্তাভা ফুটে উঠলো। রাত্রির কুলেন্দ্রর সঙ্গে দিনের কুচক্রীর ঐক্য নেই। রাত্রে

সে উৎকর্ণ, দুরন্ত, সম্পূর্ণ—কিন্তু দিনে যেন তার চৈতন্য থাকে না, মাত্রা হারায়, অস্পষ্ট ও অদ্ভুত আচরণ ক'রে চলে। তবু তার উঠে যাবার সময় শর্বরী বললে, কই, গল্প বললে না ত!

কুলেন্দ্র একবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে, রাতের গল্প রাতেই বলা যায়, শর্বরী।

কিন্তু আমি যে আজ বিকেলেই চ'লে যাবো?

আজই বিকেলে?—চৌবে!

চৌবে কাছে এগিয়ে এলো। কুলেন্দ্র বললে, বিহানমে লে যাওগে মাজিকো, স্টেশন পৌঁছনা। ইন্‌কো নোকরকো ভি,—খেয়াল রাখো। হুঁশিয়ারিসে লে যাও।

বহুৎ আচ্ছা, জি।—চৌবে সেলাম জানিয়ে চ'লে গেল এবং প্রায় তারই সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত, আহত, স্তম্ভিত শর্বরীর দিকে একরূপ ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই কুলেন্দ্র নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

৭

নিজের খেয়ালেই শর্বরী একটু একটু ক'রে জঙ্গলের ভিতরে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল। লতাপাতা গাছের জটলায় সূর্যের আলো ভিতরে কোনো কালেই আসে না, চারিদিকের অরণ্যগর্ভ হিমাচ্ছন্ন। পথ অল্পই, কিন্তু রাত্রিকালে নিরস্ত্র হয়ে এতদূর আসতে কেউ সাহস করে না। লক্ষ্য ক'রে দেখলে এখানেও বাঘের পায়ের দাগ আবিষ্কার করা যায়। শর্বরীর এতক্ষণ ভয় করেনি, সহসা একটা বনমুরগীর ডানার ঝাপট শুনে সে সচকিত হয়ে ফেরবার পথ ধরলো। নিরিবিলি ঘুরে-ফিরে বাকি সময়টুকু কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই।

ফিরে এসে দেখলো কুলেন্দ্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত। পাশের টেব্‌লে তার হাত ঘড়িটায় দেখা গেল বেলা দুটো বাজে। কুলেন্দ্রর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আবার সেই অসহনীয় কাতরতা শুনে শর্বরী বেরিয়ে গেল। এবার তবে তাকে যাবার আয়োজন করতে হয়। যাবার আগে তার কাছে বিদায় না নিলেও চলবে কিন্তু রায়সাহেবের কাছে সামাজিক সৌজন্য রক্ষা না করলেই নয়। শর্বরী অন্দর মহলের দিকে চললো।

ভিতরে কিছু দূর গিয়ে বাঁক ফিরতেই পচা মাংসের কুৎসিত গন্ধ তার নাকে এলো। অসহ্য গন্ধ। যেন বন্য বর্বরতার প্রমাণ এর বেশি আর কিছু হতে পারে না। সেই গন্ধ সহ্য ক'রেও শর্বরী গতরাত্রির সেই ঘরটার কাছে এসে দাঁড়ালো।

ভিতরটা স্বল্প অন্ধকার। কোনো কালেই আলো বাতাস এসে পৌছয় না এমনি ভাবে প্রকাণ্ড ঘরখানা বড় বড় কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। মেঝে, কড়িকাঠ, দেয়াল—সমস্তই কাঠের। ওপাশে পাথরের একটা খাদ্‌রির মধ্যে কাঠের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, তারই উপর প্রকাণ্ড লোহার হাঁড়ায় কি যেন সিদ্ধ হচ্ছে। তারই দুর্গন্ধে সমস্ত বাড়ীটা ভরোভরো। শর্বরী সেই ঘর পেরিয়ে পাশের ঘরে এসে ঢুকেই একটু লজ্জিত হোলো। রায়সাহেব একদিকে খেতে বসেছেন, আর তাঁর সম্মুখে কড়িকাঠ থেকে নামা একটা লোহার শিকল ধ'রে ফুলমায়া ঝুলছে, আর সেই দোলার সঙ্গে সঙ্গে বড় একটা ঢেঁকির উপর পা ঠুকছে। দৃশ্যটা অদ্ভুত ও হাস্যকর। আরো হাস্যকর এই কারণে যে, ফুলমায়ার পরণে সেই জংলী শাড়ি আর নেই, তার বদলে ময়লা জীর্ণ আলখাল্লার মতো একটা পায়জামা ও গায়ে একটা গেঞ্জি। পোষাকটা নিতান্তই পুরুষোচিত।

আসুন, মিসেস চৌধুরী!

শর্বরী ভিতরে এসে বসলো। রায়সাহেব বললেন, এদিকে চা'ল পাওয়া কঠিন, আমরা রুটি খাই।

ওপাশে আলীজান খেতে বসেছে। প্রভু-ভৃত্যের ভোজনের কোনো ইতর-বিশেষ নেই, এক শ্রেণীরই আহার।

রায়সাহেব হাসিমুখে বললে, দেখুন, দেখুন,—বনমানুষ কেমন দুলছে! পাজিটাকে বসিয়ে রাখলেই নষ্টামি করবে। চামড়া কোটার কাজ ওরই।

ফুলমায়া দুলতে দুলতে হাসছে, কপাল বেয়ে পৌষের শীতে ঘামের ফোঁটা নামছে। শর্বরী অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো। তিন জনের মধ্যে কারো প্রতি কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েটা বিচিত্র বটে। আরো বিচিত্র, যে পরিজনের মধ্যে তার এই জীবন। কালকের শাড়ির চেয়ে আজ ময়লা পায়জামা আর গেঞ্জিতে তাকে যেন বেশি মানিয়েছে। রাত্রির গহ্বর থেকে যেমন রাঙা প্রভাত প্রকাশ পায়, তেমনি তার মলিন পরিচ্ছদের অন্তরাল থেকে

বিচ্ছুরিত সুগৌর দেহচ্ছটা দেখে শর্বরীর দুই চক্ষু মধুর রসে যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করলো, আজ আপনাদের কী রান্না হোলো, রায়সাহেব ?

রায়সাহেব সবিনয়ে বললে, রুটি, ডিম, তেঁতুল দিয়ে বাসি হরিণের মাংস, আর মালাই।

তেঁতুল দিয়ে মাংস !

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই পাজিটা রাঁধে খুব ভালো।

অদ্ভুত রান্না বটে।

আলীজানের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, উঠে যাবার সময় লোহার থালাটি সে নিজেই তুলে নিয়ে চ'লে গেল।

শর্বরী হাসিমুখে বললে, আপনি ত সংসার করেননি, এই ভাবেই কাটিয়ে দিলেন ?

রায়সাহেব বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওদিকটা আর হয়ে উঠলো না। ওই মেয়েটাই আমার পায়ে শেকল পরিয়ে দিল।

কিন্তু আপনাদের ত কোনো বন্ধন নেই ?

রায়সাহেব হাসলো। বললে, আমার যখন বত্রিশ বছর বয়স ওর তখন জন্ম হয়, প্রায় বিশ বছর হোলো। না, বন্ধন নেই বটে—কিন্তু মুস্কিল একটা—

আপনার আবার মুস্কিল কিসের ?

রায়সাহেব হাত ধুয়ে উঠে বললে, আসুন আপনি এই ঘরে।

শর্বরী তার সঙ্গে পাশের সেই বড় ঘরটায় এলো, —লোহার হাঁড়ায় যেখানে চর্বি ও চামড়া সিদ্ধ হচ্ছে। আলীজান তার তদ্বিরে ব্যস্ত।

রায়সাহেব এক জায়গায় ব'সে ধীরে সুস্থে বললে, আপনি ত থাকেন বড় শহরে, মেয়েটার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন ?

কি ব্যবস্থা বলুন ?

ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া, ওর হাতে একটা নতুন মানুষ এনে দেওয়া।

শর্বরী হেসে বললে, আমি কি এতই নিষ্ঠুর যে, ওকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নেবো ?

রায়সাহেব চিন্তামগ্ন হয়ে বললে, সেই হয়েছে মুস্কিল, মিসেস চৌধুরী,—ও যাবে না কোথাও।

ভালোবাসার কথাটা বলতে শর্বরীর মুখে আটকালো। কেবল বললে, আপনি ওর এতই প্রিয়, এতই আপন যে, আপনাকে ও ছাড়তে পারবে না।

রায়সাহেব বললে, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন ঠিক। মানে, আমি জানি সে কথাটা। কিন্তু কি জানেন ?—কথাটা শেষ করতে গিয়ে সে থতিয়ে গেল, একরাশি অস্বস্তি ফুটে উঠলো তার মুখে। বললে, ভারি অস্বাভাবিক। আপনি শুনে হাসবেন না, মিসেস চৌধুরী ?

এ ত হাসবার কথা নয়, রায়সাহেব।

রায়সাহেব বাহিরের দরজার দিকে চেয়ে বললে, দুরন্ত মেয়ের সঙ্গে চাই দুরন্ত ছেলে, রংয়ের বদলে রং, চেহারার সঙ্গে চেহারা। বছর পাঁচেক ধ'রে কথাটা ভাবছি ··· আমি ত ওর যোগ্য নই।

শর্বরী সাহসে ভর ক'রে বললে, আমার পক্ষে বলা হয় ত শোভন নয়, কিন্তু ওকে ছাড়া আপনার পক্ষেও কঠিন।

মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে রায়সাহেব বললে, না, না, অসম্ভব, আমিও ওকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

শর্বরী হেসে উঠলো। রায়সাহেব পুনরায় বললে, আমার হাতেগড়া পুতুল, ওর জন্ম-মৃত্যুর পথ আমার জানা, ছেড়ে দিতে পারবো না, মিসেস চৌধুরী।

অদ্ভুত প্রণয় সন্দেহ নেই। শর্বরীর মুখের হাসি মিলিয়ে এলো। সে বললে, কিন্তু ওর যোগ্য ছেলে কি আপনি খুঁজেছেন ?

হ্যাঁ, খুঁজেছি, পাইনি। এক আধজনকে পেয়েছিলুম—রায়সাহেব চিন্তা ক'রে বললে, কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে চ'লে যেতে চায়। সে কি সম্ভব ?

শর্বরী বললে, ধরুন পাওয়া গেল একটি ছেলে, ফুলমায়াকে নিয়ে রইলো সে আপনারই এখানে ; কিন্তু—কিন্তু, ক্ষমা করবেন আপনি,—আপনি কাছে থাকলে কি ওদের জীবন আনন্দের হবে ?

রায়সাহেবের মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, হবে না ? মিসেস চৌধুরী, আমার যা কিছু আছে সব দেবো, কাজ কারবার সব,—শুধু থাকবে চোখের সামনে, চ'লে যাবে না। ওদের সকল কাজ আমি ক'রে দেবো, ওদের ছেলেপুলে মানুষ করবো, ওদের যা কিছু—

শর্বরী বললে, কিন্তু আপনি থাকতে ও যদি স্বামীকে সুখী করতে না পারে, রায়সাহেব ?

রায়সাহেব নিশ্বাস ফেলে কেবল বললে, তাও জানি, তবুও—তবুও যদি কোনো দিন আমার আশা পূর্ণ হয়,—তাই ভাবি মিসেস চৌধুরী, আমার কাছে থাকলে চিরকাল মেয়েটা আনন্দেই থাকবে, খুশি থাকবে, কিন্তু আমার দিক থেকে ··· ধরুন, ও যা চায় হয়ত সব জোগাতে পারবো না, আমার ক্লান্তি, আমার অভাব ও বুঝতে পারবে না। আমার মনে হবে, আমি ওকে বঞ্চিত ক'রে চলেছি।

শর্বরী চুপ ক'রে রইলো। কিন্তু এই ঘটনা থেকে যে-শিক্ষাটুকু তার হোলো তা কম নয়। তার নিজের জীবনে এই মহৎ উদাহরণটা সে ঘটাতে পারতো কিন্তু লৌকিক বাধায় সেটা হয়ে ওঠেনি। কুলেন্দ্রর বিবাহ না করার গোড়ায় কোন্ কারণ নিহিত ছিল আগে সেকথা সে ভাবেনি, অনেক ছেলেই অবিবাহিত থাকে,—কিন্তু তার এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মর্মমূলে যে সত্যকারের ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী গুপ্ত ছিল, শর্বরী যেন আজ সেটি আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য, কুলেন্দ্র একটি নিশ্বাসও ফেলেনি, একটি অভিমানও কোথাও রেখে আসেনি, নিজেকে ধরা দেবার মতো কোনো চিহ্নই সে প্রকাশ পেতে দেয়নি। এবং, সত্য কথা বলতে কি, এই প্রথম কুলেন্দ্রর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। পত্রব্যবহারের মধ্যে অনেক সময় হাসি-পরিহাসের অবকাশ থাকতো,—কিন্তু এই প্রথম সে কুলেন্দ্রর কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ এমন একটা বয়স তাদের যে, নতুন ক'রে সেই আগেকার তরুণ বয়সের মতো, যেমন গল্প উপন্যাসে শোনা যায়,—তেমনি ক'রে প্রণয়পত্তন করা যেমন বেমানান তেমনি বীভৎস। দুজনার মধ্যে কেবল যে বন্ধুতার সম্পর্ক তাই নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধও কালক্রমে এসে গেছে। এ বয়সে জান্তব প্রকৃতির ছলাকুশলতা কেবল দৃষ্টিকটুই নয়, হাস্যকরও বটে।

শর্বরী উঠে দাঁড়ালো। বললে, আপনাদের এখানে খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম, খুব মনে থাকবে। এইবার আমি চ'লে যাবো, রায়সাহেব।

রায়সাহেব মুখ তুলে বললে, হাকিম ত যাবে না?

না, উনি রইলেন। আপনি দয়া ক'রে ওঁকে একটু—বলতে বলতেই শর্বরী সচেতন হয়ে উঠলো। এটা তার নিষ্প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ, এ অর্থহীন। এই ছিদ্রে রায়সাহেব যদি তার মনের চেহারাটা দেখে নেয়, তবে লজ্জা আর অপমানের একশেষ। তাকে যখন যেতেই হোলো তখন নিজের পদচিহ্ন তার মুছে নিয়ে চ'লে যাওয়াই সুদৃশ্য ও সঙ্গত।

শীতের বেলা ছোট। চারটে বাজতেই গাছে পালায় রোদ উঠে গেল। কিন্তু যাবার সময় একরাশি ক্লান্তি আর অবসাদে শর্বরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে এলো। এ ক্লান্তি তার যাবে না, তার জীবনে একটা অসাড়তা এসে গেছে।

চোবের গাড়ী প্রস্তুত ছিল, তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গাড়ী আবার রাত দশটায় এখানে ফিরবে। আজ রাতে শিকারের তোড়জোড় খুব বেশি। শর্বরী বিদায় নেবার জন্য কুলেন্দ্রর ঘরে ঢুকলো।

কুলেন্দ্র ঘুম থেকে উঠে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে বসেছিল, মুখ তুলে হাসিমুখে বললে, যাবার জন্যে বুঝি খুবই ব্যস্ত?

শর্বরী হাসলো। বললে, তাড়িয়ে দিলেও থাকবো এমন ত কোনো বাঁধাবাঁধি নেই!

ঘুমের জড়তা কুলেন্দ্রর শরীরে আর নেই। সন্ধ্যা আসন্ন; এইবার তার নিজের প্রকৃত চেহারায় ফিরে আসবার সময়, দিনের আলো ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন রাত্রির সংগ্রামের জন্য জেগে উঠছে। সে বললে, তুমি এসেছ যাবার জন্যে, এসেছিলে আমার কার্যকলাপ দেখে যেতে,—সেই দেখা ত তোমার ফুরিয়েছে, শর্বরী।

শর্বরী বললে, এ কথা হলপ ক'রে বলতে পারো?

পারি, তার কারণ আমার প্রত্যহের জীবনে এমন আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তুমি কাছে থাকবে, সুতরাং তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে।

যদি বলি থাকতে ভালোই লাগছে!

কেন?

শর্বরী বললে, বনজঙ্গল, নির্জনতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ফুলমায়া-রায়সাহেব, পুরনো একজন বন্ধু,—সমস্তটা মিলিয়ে ভালোলাগা।

কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু পুরনো বন্ধুটা যদি ফন্দ থেকে কেটে দেওয়া যায়?

শর্বরী বললে, এত নির্দয় তুমি ত নয়, কুচক্রী।

নির্দয় নয়? জীবহত্যা ছাড়া যার আর কোনোদিকে আগ্রহ নেই সে কি পরমহংস?

শর্বরী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। কঠিন কণ্ঠে বললে, আমি এখান থেকে এক পাও নড়বো না।

এক ঝলক হেসে কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু লোকনিন্দা?

লোকনিন্দার ভয় তাদের যাদের হাতে এই অভিশপ্ত সমাজের সৃষ্টি, যারা পাপপুণ্যের আদালতে হাকিমী করে। শারীরিক বলপ্রয়োগ করার আগে আমি এখান থেকে এক ইঞ্চি নড়বো না।

কাগজপত্রের দিকে চোখ মেলে কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে, পুলিশ-সাহেব জরুরী খবর পাঠিয়েছে।

শর্বরী উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। বললে, তুমি যাবে কেমন ক'রে শিকার ছেড়ে?

না গেলে পুলিশ-সাহেবের অনুরোধ অমান্য করা হয়।

শর্বরী বললে, আজ হয়ত বাঘ শিকার হতে পারতো।

পারতো বৈ কি। কিন্তু—

ধরো যদি তুমি না যাও?

কুলেন্দ্র বললে, না গেলে জেলা হাকিমের কাছে খবর যাবে, কাজ পণ্ড হবে—তারপর চাকৃরি নিয়ে টানাটানি। লাঞ্ছনার একশেষ।

শর্বরী মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো। মুখে সে কিছু বললে না; বিতর্ক তুললেই কেমন একটা ঝোঁক কুলেন্দ্রকে পেয়ে বসে, নিজের যুক্তি সে ছাড়তে চায় না। প্রতিবাদ না করলেই সে ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করতে থাকে।

কুলেন্দ্র বললে, তুমি বোধ হয় এই শিকার-টিকার খুব বেশি পছন্দ করো না, না শবরী?

না করলে তোমার ত কোনো ক্ষতি নেই?

ক্ষতি অবশ্য নেই, তবু তোমার নৈতিক সমর্থন থাকলে শিকার-অভিযানে একটু উৎসাহ থাকে বৈ কি।

শবরী বললে, নৈতিক সমথন চাও, অথচ আমার কথা শুনতে চাও না,—এটা কি তোমার হাকিমী যুক্তি?

কুলেন্দ্র বললে, কোথায় তোমার অবাধ্য বলো?

আমার বাধ্য হ'তে বলিনে, বলা বেমানান শুধু নয়, বেআইনী। কিন্তু শিকারটাই ত তোমার সব নয়। তোমার চাকরি আছে, ঘর আছে, জীবনের দায়িত্ব আছে, নানাদিকে কর্তব্য আছে,—কোনোদিকেই ত তোমার দৃষ্টি নেই, কুচক্রী!

অনেকক্ষণ অবধি কুলেন্দ্র চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, তাই বুঝি তুমি বিরক্ত হয়ে যেতে চাও?

না, হতাশ হয়ে যাচ্ছি।—শর্বরীর গলাটা একটু কাঁপলো, তবুও শেষ কথাটা বললে, তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না এই কথাই জেনে যাচ্ছি। তুমি সে-মানুষ নেই, কুচক্রী। তোমার সেই চেহারা, সেই প্রাণময় আগ্রহ, সেই সকল বিষয়ে উৎসাহ, মনের সজীবতা—সব তোমার গেছে। তুমি আছো একটা কঙ্কাল, আফিঙ খেয়ে সে ঝিমোয়, মদ খেয়ে সে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তোমার শিকারে আমার আপত্তি নেই, আপত্তি তোমার এই ভয়ানক নেশায়, রক্তের স্বাদ পেয়ে এই বেপরোয়া জীবন-যাত্রায়। তোমার বাঁচার আশা নেই, কুচক্রী—এইটিই আমাকে জেনে যেতে হবে।

ঘরের একপাশে অস্ত্রশস্ত্রগুলো রয়েছে, সেইদিকে চেয়ে কুলেন্দ্র সহসা বললে, রোগ হ'লে মানুষ কি বাঁচে? বাঁচতে আমি চাইনে।

শর্বরী বললে, কেন তোমার এই অভিমান?

অভিমান ত নয়, এই পরিণাম। রোগ আমাকে জীর্ণ করেছে।

কী রোগ তোমার?

কই, সে আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। সেই ভয়ানক রোগের একমাত্র ওষুধ হোলো বন্দুক। সময় হয়েছে, চলো এবার।

চোবের গাড়ী প্রস্তুত। রায়সাহেবের কাছেও বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। ফুলমায়া অত কিছু বিদায়-সম্ভাষণ বোঝে না—সে ভিতরেই রয়ে গেল। কুলেন্দ্র কাজ সেরে আবার এই খুনিয়ার জঙ্গলে ফিরে আসবে,—অস্ত্রশস্ত্রগুলি তার এখানেই রইলো। তাকে কিছুতেই বাধা দেওয়া যাবে না,—এ জঙ্গলে সেই নবাগত নরখাদক বাঘটি হত্যা না ক'রে সে নড়বে না। শর্বরী গাড়ীতে গিয়ে উঠলো।

অনেকক্ষণ যায়, কুলেন্দ্র আসে না। গাড়ীতে ব'সে শর্বরী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। সন্ধ্যা প্রায় আসন্ন হয়ে আসছে, এখন যাত্রা না করলে রাত্রির আগে আর অতটা পথ যাওয়া যাবে না। শর্বরী ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এক সময় সে গাড়ী থেকে নেমে কুঠিবাড়ীর অঙ্গন পার হয়ে আবার ফিরে এসে ভিতর দিকে কুলেন্দ্রর ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে সে অবাক। মুখে একটা পাইপ ধরিয়ে কুলেন্দ্র সটান বিছানায় প'ড়ে রয়েছে।

শর্বরী বললে, যাবে না তুমি ?

কুলেন্দ্র বিস্মিত হযে বললে, কই, তুমি যাওনি এখনো ? আমি ত যাবো বলিনি !

যাবে না ? এই যে বললে, যাচ্ছি, আফিসের কাজ, পুলিশ-সাহেবের অনুরোধ—সবই মিথ্যে ?

কুলেন্দ্র বললে, তুমি শুনতে ভুল করেছ। সবই সত্য, কিন্তু আমি যাবো না। রায়সাহেব খবর পাঠালো, দু-তিন মাইলের মধ্যে বাঘ আছে—আমি যাবো না শর্বরী, যতই সেখানে আমার ক্ষতি হোক।

শর্বরী বললে, সামান্য শিকারের জন্যে নিজের সর্বনাশ করতে চাও ? চলো, তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। ওঠো।

তার অস্বাভাবিক গলার আওয়াজ শুনে কুলেন্দ্র একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠে বসলো। কিন্তু যাবার চেষ্টা তার দেখা গেল না, ব'সে ব'সে দু'বার পাইপটা সে টানলো।

তীব্র দুটো রাঙা চোখ মেলে শর্বরী চীৎকার ক'রে উঠলো, সংযম হারাবার ভয় এখানে আমার নেই, আমি অনেক সহ্য করেছি, চিরজীবন সহ্য করছি। তোমাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে, আর তোমাকে অত্যাচার করতে আমি দেবো না।

কুলেন্দ্র একবার পাইপ টানলো। শর্বরীর সব শরীর কাঁপছিল উত্তেজনায়। সে দ্রুত গিয়ে কুলেন্দ্রর হাত ধ'রে টানলো। চেঁচিয়ে বললে, আত্মহত্যা করতে চাও ? অবাধ্য হয়ে আনতে চাও সর্বনাশ ? মরতে দেবো না তোমাকে এমনি ক'রে, বাঁচতে দেবো না তোমাকে অপমানিত হয়ে।

কুলেন্দ্র বললে, আমি যাবো না, শর্বরী তুমি যাও।

সহসা শর্বরীর চোখ পড়লো ঘরের কোণে। সে ছুটে গিয়ে কঠিন মুঠিতে কুলেন্দ্রর বন্দুক আর রাইফেল্ দুই হাতে তুলে নিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, এই নাও, মারো তুমি আমাকে। নিষ্ঠুর, অনেক মেরেছ তুমি, আমাকেও শেষ ক'রে দাও তোমার পায়ের তলায়।

সাবধান শর্বরী, বন্দুকে গুলীভরা আছে, সাবধান—ছেলেমানুষী ক'রো না।—কুলেন্দ্রর চোখ জ্বলে উঠলো।

পাগলের মতো শর্বরী উত্তেজিত হয়ে উঠলো—ভয় কেন তোমার এত—তিলে তিলে আমাকে মারতে চাও ? বেশ, আমি নিজেই—কোথায় টিপতে হবে ব'লে দাও—

ভীতকণ্ঠে কুলেন্দ্র চীৎকার ক'রে উঠলো, তারপর ছুটে এসে বন্দুকটা কেড়ে নিতে গেল শর্বরীর হাত থেকে। কিন্তু সেটা ছিনিয়ে নিতে গিয়ে দুজনের মধ্যে বালকোচিত ধস্তাধস্তি, কাড়াকাড়ি—এবং তারপরেই সহসা—

গুড়ুম !

বজ্রপতনের ন্যায় প্রচণ্ড ভীষণ আওয়াজে ঘর, দোর, দেয়াল, কড়িকাঠ—সমগ্র কুঠিবাড়ীর ভিত, সমস্তটা প্রবল নাড়ায় কেঁপে উঠে ঘরের দরজার পাশে দেয়ালের একটা অংশ হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো। পরমুহূর্তেই দুইজনের আর্তনাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে শর্বরীর অচেতন দেহ বীভৎস রক্তধারায় ওলোটপালট খেয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো।

রায়সাহেব, ফুলমায়া, চোবে, আলীজান সবাই ছুটে এলো। মূঢ়, স্তম্ভিত, অর্ধচেতন কুলেন্দ্র স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে এবং তারই পায়ের কাছে শর্বরীর দেহ ভূলুণ্ঠিত। দুজনের কাপড় জামা, হাত-পা, সর্বশরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রাইফেল থেকে গুলীটা ছটকে গিয়ে শর্বরীর বামবাহু ও কুলেন্দ্রর ডান হাতের তালু একত্র বিদ্ধ ক'রে বেরিয়ে ঘরের দরজা ও দেয়াল বিদীর্ণ ক'রে কোথায় যেন চ'লে গেছে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সকলে শিউরে উঠলো।

রায়সাহেব হেঁট হয়ে শর্বরীর হাত পরীক্ষা ক'রে বললেন, ওষুধ একটা দিচ্ছি, কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—রক্ত বন্ধ হওয়া কঠিন।

চোবে হাকিম সাহেবের কম্পিত রক্তাক্ত হাতটা চেপে ধরলো। অসহ্য যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত দিয়ে চেপে শর্বরীর দিকে চেয়ে শুষ্ককণ্ঠে কুলেন্দ্র বললে, কিন্তু উনি যে আমার অতিথি হয়ে এসেছিলেন !

ফুলমায়া সহসা খিল খিল ক'রে বন্য হাসি হেসে উঠলো। রায়সাহেব তাকে চোখের দৃষ্টিতে শাসন ক'রে বললে, এমন হয়েই থাকে হাকিম—আমি ওষুধ দিচ্ছি। চোবে—আলীজান—শামানকো এন্তেজাম করো, গাড়ী বানাও জল্‌দি—এই ব'লে রায়সাহেব নিজের মহলের দিকে ছুটলো।

৮

খুনিয়ার জঙ্গলের সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর একমাস অতিক্রম করেছে। এই একমাস কেবল হাসপাতালের কাহিনী। ডাক্তার, সিভিল সার্জন, ঔষধ, পথ্য, অপারেশন,

আর্তনাদ, ড্রেসিং—এ ছাড়া আর কিছু নয়। শর্বরীর বাঁ হাত অকর্মণ্য, কুলেন্দ্রর ডান হাতে আজো ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। প্রথম দিন-দুই শর্বরীর জীবনের আশা ছিল না।

দীর্ঘ একমাস কাটলো একটা অনাস্বাদিত যন্ত্রণায়। কুলেন্দ্র উঠে কাজ করেছে, গাড়ী ক'রে বাসায় গেছে, বাঁ-হাতে সরকারি কোষাগারের বইতে টিপসই দিয়েছে। কিন্তু শর্বরী হাসপাতালের শয্যা ছেড়ে একবারও ওঠেনি, রাইফেলের গুলীতে বাঁ হাতের উপর দিকের হাড় তার চূর্ণ হয়ে গেছে। অপারেশন্ ক'রে হাড়ের টুকরো বা'র করতে হয়েছিল। এযাত্রা সে বাঁচলো অনেক কষ্টে।

একমাস পরে শর্বরী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে। শরীরে আগেকার সজীবতা আসেনি, এখনো পা কাঁপে। তার আত্মহত্যার অপচেষ্টার সংবাদ কেউ জানেনি—পুলিশের খাতায় উঠেছে কেবল দৈবদুর্বিপাকের কথা। সেদিন কুলেন্দ্রই এসে তাকে বাসায় নিয়ে গেল।

শীতের শেষে মধুর বসন্তকালের অল্প অল্প আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে আকাশের নীলাভা শিউরে উঠছে। যতদূর দৃষ্টি যায় তেমনি আগেকার সেই গ্রামের আঁকা বাঁকা পথের ছবি, রেলপথের ধারে সেই শালুকে ভরা নিরিবিলি সরোবরে পানকৌড়ির অবগাহন। পরিদৃশ্যমান পৃথিবী রৌদ্রে, রঙে, ঔজ্জ্বল্যে, সুষমায় সুন্দর। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে নিবিড় আনন্দে আর অসীম ক্লান্তিতে শর্বরীর চোখ বুজে এলো।

হাকিম সাহেব এসে দাঁড়ালে তার পাশে, কাঁধে হাত রেখে ডাকলে, শর্বরী!

শর্বরী চোখ তুললে।

কুলেন্দ্র বললে, ডাক্তার কি বলেছে জানো? এক বছর আর শিকারে যেতে পাবো না।

হাসি ফুটলো শর্বরীর মুখে। বললে, তুমি কি উত্তর দিলে?

আমি বললুম শিকার করা ছেড়েই দেবো। কিন্তু একটি সর্তে—এই ব'লে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে কুলেন্দ্র শর্বরীর পাশে বসলো।

শর্বরী বললে, সর্তটা কি শুনি?

আগে বলো, তুমি আজ চ'লে যাচ্ছ—আবার কবে আসবে?

শর্বরী কতকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর বললে, তুমি না ডাকলে আসবো কেমন ক'রে?

আসবে তুমি একমাস পরে।—কুলেন্দ্র বলতে লাগলো, তোমার বিষয়পত্রের শেষ বিলি ব্যবস্থা ক'রে আসবে, শর্বরী।

কই, সর্তটা বললে না ত?

কুলেন্দ্র বললে, সেটা সামান্য। আমি যেন ভাবতে পারি আমি একা নই। তুমি আসবে এবার আমার অভিভাবক হয়ে, ধাত্রী হয়ে—আমি যেন প্রত্যেক দিনের দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিতে পারি। কোনোদিন কোনো কারণেই তোমার সম্মান যেন আমার হাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। আমাকে মানুষের মধ্যে ফিরিয়ে আনার সমস্ত দায়িত্ব তুমি নেবে। বলো তুমি পারবে কি-না?

শর্বরী উত্তর দিল না, তার স্নেহের মলিন হাসি কেবল দুটি বড় বড় অশ্রুর ফোঁটায় দু' চোখে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

চাঁদ সদাগর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দেবতা মন্দিরে ভরা   সিন্দূর চন্দনে গড়া
কাব্যতীর্থে উচ্চে তুলি শির,
তুমি দেবতারো বড়,   আমার এ অর্ঘ্য ধরো
শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর।
এ বঙ্গের সমতলে   তৃণলতা-গুল্মদলে
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,
জ্ঞানায়ুধ শাপজিৎ   হে অমর পরীক্ষিৎ,
শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।
সান্তালী পর্ব্বত পরে   হিন্তালের যষ্টি করে
চিরদীপ্ত তোমার পৌরুষ,
তোমা ঘেরি চারি পাশে   বাঁচে মরে কাঁদে হাসে
শত শত ভীরু অমানুষ।
মানুষে করিয়া খর্ব্ব   যাহারা করিল গর্ব্ব
তাদের ক্লীবতা দলি পায়,
অবিচল তুমি শৈব,   কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দৈব
মার্জ্জনা তোমার পদে চায়।
তব শিরে যমদণ্ড   হ'য়ে গেল খণ্ড খণ্ড
পণ তব প্রাণেরো অধিক,
সাত পুত্র-শব 'পরি   শিব শূলী শম্ভু স্মরি'
বামাচারী তুমি কাপালিক।
সনকার আর্ত্তনাদে   চম্পক নগর কাঁদে,
ডুবে যায় সপ্ত মধুকর,
কৌপীন করিয়া সার   তোমার পুরুষকার
পথে পথে ফিরে দিগম্বর।
অশ্রুবিন্দু নাই চোখে   দুর্বিষহ মহাশোকে
নেত্র তব উগারে অনল,
শুধু তব জগদীশ   কণ্ঠে ধরেছেন বিষ
সর্ব্ব অঙ্গ তোমার গরল।
বিষে তনু নীল রুচি   আত্মা তব শুভ্র শুচি
নীলাম্বরে পূর্ণ চন্দ্রোপম,
সহস্র ফণার মাঝে   তোমার পৌরুষ রাজে
মহাবীর্য্য গরুড়ের সম।
হরিয়া নশ্বর ধন   তোমা নিঃস্ব আকিঞ্চন
কে করিবে ? এত স্পর্দ্ধা কার ?
পুরুষার্থ শিরোমণি   শাশ্বত ধনে যে ধনী
বিশ্বে সেই নমস্য সবার।
তোমারে করিতে বন্দী   ব্যর্থ দেবতার ফন্দী
মানুষের সনে সন্ধি যাচে,
সর্ব্ব দণ্ড মৃত্যুভয়   যেজন করেছে জয়,
দণ্ডদাতা প্রার্থী তারি কাছে।
ভয়ে নিয়তির জয়   গায় সারা বিশ্বময়
তারে দাসী বানাইতে বীর,
একাই করিলে রণ   স্তম্ভিত দেবতাগণ
কম্পমান পাষাণ মন্দির।
যুগ যুগ ধরি যত   নরনারী অবিরত
দৈব দণ্ড আসিয়াছে সহি'
তোমার মাঝারে সবি   পুঞ্জীভূত রূপ লভি
দৃপ্ত তেজে হয়েছে বিদ্রোহী।
সহস্র বৎসর ধরি   ভয়ে কাঁপে থরহরি
নরনারী যূপবদ্ধ ছাগ।
বজ্রকণ্ঠে তার মাঝে   শুনাইলে দেবরাজে
"মানুষেরো চাই যজ্ঞভাগ।"
শিখাইলে এই সত্য   তুচ্ছ নহে মনুষ্যত্ব
দেব নয়, মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে   তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেবমহিমা নির্ভর।
হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী   হইতে চাহনি ভোগী
সত্যব্রহ্মে করি সঙ্কোচন,
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত   পান করি চিদমৃত
জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।
উদ্যত কনক ঘট   সহস্র মন্দির মঠ
কালদণ্ডে হ'য়ে গেছে গুঁড়া,
গরল সিন্ধুর মাঝে   তোমার মহিমা রাজে
চিরদিন মৈনাকের চূড়া।

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য এম্-এস্-সি

মানুষের মন অতি বিচিত্র। শুধু বত্তমানকে লইয়াই যদিও ইহার কারবার, তবু ইহা পিছনের দিকেই ফিরিয়া তাকায় এবং ভবিষ্যতের দিকে আগাইয়া চলে। এটা হয়তো মানুষের একটা চিরন্তন স্বভাব, যাহা অতীত, যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহাকেই আঁকড়াইয়া থাকা। এই জন্যই যে জিনিষটি অস্থায়ী, তাহাকেও স্থায়ী করিতে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে। এইরূপেই সমাট সাজাহানের প্রেমের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাজমহল। সম্রাট সাজাহান নাই, মমতাজ বেগমও নাই ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে অপূর্ব্ব ভালবাসা ছিল, তাজমহল তো তারই নিদর্শন। ঠিক এই কারণেই, মানুষ যখন কোনো জায়গায় বেড়াইতে যায়, সেই জায়গায় পেন্সিল, কয়লা, খড়িমাটি বা অন্ততপক্ষে চুণ দিয়া তাহাদের নাম ধাম, ইত্যাদি লিখিয়া রাখে।

ক্যামেরার সঙ্গে আজকাল সবাই পরিচিত। বহুদিন পূর্ব্বেও লোক-সমাজে, অন্তত বৈজ্ঞানিক মহলে, এই যন্ত্র পরিচিত ছিল। তবু যে সময় হইতে ফটো তোলা সম্ভবপর হইয়াছে, সে সময় খুব পুরাতন নয়। ক্যামেরার পর্দ্দাতে গাছপালা বা জীবজন্তুর যে সব সুন্দর ছবি দেখা যায়, তাহাদিগকে কি করিয়া স্থায়ী করা যায়—প্রাচীনকালের বৈজ্ঞানিকগণের ইহাই একটা মস্ত সমস্যা ছিল।

এই জন্যই মানুষ ফটোর জন্য এত পাগল। পৃথিবীতে কত রূপ, কত ছন্দের অপরূপ সমাবেশ—কত লোক, কত প্রাণী—অদ্ভুত সুন্দর, মনোরম কত তাদের ভঙ্গিমা—যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা তুলির সাহায্যে তাহাই আঁকিয়া রাখেন। বর্ত্তমানে যে জিনিষটি আমরা পাইতেছি, ভবিষ্যতে ইহা ঠিক এই ভাবে থাকিবে কি না কেহ জানে না—সুন্দরের সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সত্য, শিব ও সুন্দরে গড়া মানুষের মন ব্যাকুল হইয়া ওঠে। ফটোর প্রয়োজনীয়তা মানুষের নিকট এই জন্যই এত বেশী।

এটা হইল মানুষের মনের দিকের খবর। মানুষের মনের সঙ্গেই আরও একটা জিনিষ জড়িত আছে ; সেটা তার জ্ঞান বা জ্ঞানেচ্ছা। অন্ধকার রাত্রিতে মেঘহীন আকাশের দিকে তাকাইলে আমরা যে গ্রহ নক্ষত্র দেখিয়া বিশ্ব-রচয়িতার শক্তিপ্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইয়া পড়ি, সেই সব গ্রহ নক্ষত্রগুলি কি—অনেক দিন হইতেই মানুষের মনে এ প্রশ্ন জাগিয়াছে। প্রভাতে বাগানে ফুল ফোটে, গাছে পাখী ডাকে, নদীর জলে বাতাসের মৃদু স্পর্শে শিহরণ জাগে—ঠিক সেই সময়, দূর, বহুদূর হইতে অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ অগ্নিপিণ্ডের নিকট হইতে যে আলো আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে—সমস্ত দিন আমরা যে আলো দেখি—সেই আলো কি—এই সব অনেক কথা আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়। বৈজ্ঞানিকপ্রবর নিউটন্, ফ্রন্‌হফার্, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ইত্যাদি অনেকে অনেক বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন এবং মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে কি না—অন্য কোনো গ্রহে থাকা সম্ভবপর কি না—এই প্রশ্নের উত্তরেও আমরা যতটুকু জানি, তাহা এই ফটোগ্রাফির সাহায্যেই।

মানুষের কথারও আজকাল ফটো তোলা হয় এবং এই জন্যই সবাক ছবি তোলা সম্ভবপর হইয়াছে। চোর ডাকাত—এই সব ধরিবার সময়েও ফটোর প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে এবং সংসারে চলিবার পথেও ফটোর প্রয়োজন পদে পদে। আমরা এই প্রবন্ধে এই ফটোগ্রাফিরই ইতিহাস আলোচনা করিব।

বৈজ্ঞানিকগণ বহুপূর্ব্বেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ সূর্য্যের আলোর সংস্পর্শে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। একটা উদাহরণ দেই ; সিল্‌ভার নাইট্রেট্ জলে গুলিয়া যদি সাধারণ লবণ ("সাধারণ" কথাটির একটু অর্থ আছে—বৈজ্ঞানিকের ভাষাতে, আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি—উহাকেই শুধু লবণ বলে না—আরও অনেক জিনিষ লবণ শ্রেণীভুক্ত ; "সাধারণ লবণ" অর্থ আমরা যে লবণ প্রতিদিন ব্যবহার করি—ইহার বৈজ্ঞানিক নাম "সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্") —যদি সাধারণ লবণ মেশানো যায়, তবে একটা সাদা পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত (precipitated) হইবে। এই সাদা পদার্থটির নাম—সিল্‌ভার ক্লোরাইড্। এই জিনিষটি যদি সূর্য্যের আলোর সংস্পর্শে আসে—তবে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে ইহা ক্রমে ক্রমে গভীর কালো রং-এর হইয়া যাইবে। তেমনি, সিল্‌ভার ব্রোমাইড্, সিল্‌ভার আয়োডাইড্‌ও আলোক-সংস্পর্শে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে।

এই আবিষ্কারটি রসায়ন-বৈজ্ঞানিকদের এবং এই আবিষ্কার হইতেই তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, প্লেটের উপরে এই রকম আলোক-স্পর্শাতুর (light-sensitive) পদার্থ মাখাইয়া, প্লেটের উপরে একটি অনুরূপ ছবির ছাপ থাকিয়া যায়। কিন্তু কি করিয়া মানুষের বা অন্য কোনো কিছুরও ছবি প্লেটে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখা যায়—বৈজ্ঞানিকগণের মনে এই চিন্তাই প্রধান ছিল। এই চিন্তার মূলে যে যুক্তি ছিল, তাহা এই রকম—মানুষের বা যে-কোনো জিনিষের ছবি শুধু আলো বা ছায়ার সমাবেশেই প্রস্তুত এবং সিল্‌ভার ক্লোরাইড্ ইত্যাদি জিনিষের যে অংশে আলো পড়ে, শুধু সেই অংশেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে—কাজেই প্লেটে সিল্‌ভার ক্লোরাইডের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন বস্তুর উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল স্থান অনুযায়ী ঘটিবে এবং প্লেটের উপরে বস্তুর প্রতিকৃতি পরিস্ফুট হইবে। এইরূপে মানুষের বা অন্য যে-কোনো জিনিষের ছবি তোলা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে।

এটা ছিল তাহাদের চিন্তা বা যুক্তি। কিন্তু, বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই ফটো তুলিতে সক্ষম হইতেছিলেন না। সিল্‌ভার

ক্লোরাইড্ ইত্যাদিতে যেখানে বস্তু হইতে আলো আসিয়া তাহার ছাপ রাখিয়া গেল, সেই ছাপকে কি করিয়া স্থায়ী করা যায়, বস্তুত ইহাই ছিল প্রধান সমস্যা।

প্রায় প্রত্যেক দেশেই যখন বৈজ্ঞানিক মহলে ফটো তোলার উপায় উদ্ভাবন লইয়া চেষ্টা চলিতেছিল, সেই সময়ে ফরাসীদেশেও একজন রাসায়নিক তাঁহার গৃহে বসিয়া এই বিষয়েই চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার নাম—ডেগারে (M. Daguerre)। তিনি রাসায়নিক ছিলেন, কাজেই তিনি জানিতেন যে সিল্ভার্ ক্লোরাইড্ ইত্যাদি বস্তু আলোক-সংস্পর্শে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে ; (যেমন সিল্ভার ক্লোরাইড্ কালো হইয়া যায়)। ইহা হইতে তিনিও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের মত নিশ্চিত ছিলেন যে ফটো তোলা সম্ভবপর হইবেই। প্লেটে নানা ভাবে নানা রকমের রাসায়নিক পদার্থ মাখাইয়া তিনি প্লেট তৈরী করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এই পরীক্ষাকার্য্যে প্রথম হইতেই তাঁহার স্ত্রী বিরোধিতা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে, কি করিয়া প্লেটের উপরে কোনো জিনিষের স্থায়ী ছাপ উঠিতে পারে। সেই জন্য ডেগারে যে সময় তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিতেন এই বলিয়া—যে তিনি তাহার ছবি প্লেটের উপর স্থায়ীভাবে তুলিয়া দিবেন তাঁহার স্ত্রী তখন ডেগারের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন।

কিন্তু ডেগারে ইহাতেও দমিলেন না। তিনি গৃহের আসবাবপত্র, এমন কি, জানালার কাঁচ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ফটো তোলার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ডেগারের স্ত্রী অনন্যোপায় হইয়া নিতান্ত অসহায়-ভাবে কমিশনারের নিকট ডেগারের মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্বন্ধে নালিশ করিলেন। কিন্তু এই নালিশের ফল কিছুই হইল না ; কমিশনার সাহেব ডেগারেকে ডাকিয়া লইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই ; তিনি যে পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন, ইহা সফল হইবেই এবং এই পরীক্ষাকার্য্য যথেষ্ট ব্যয়-সাপেক্ষ বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহার গৃহের আসবাবপত্রও বিক্রয় করিতে হইতেছে। ডেগারের স্ত্রী সমস্তই তাঁহার অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন।

ডেগারের স্ত্রী কিছুতেই ক্যামেরার সম্মুখে বসিতে রাজী হইতেন না ; তবু ডেগারের অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে তিনি মাঝে মাঝে দশ-পনর মিনিটের জন্য ক্যামেরার সম্মুখে বসিতেন।

অবশেষে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। একটি প্লেটে ডেগারের স্ত্রীর প্রতিকৃতি সত্য সত্যই ফুটিয়া উঠিল। ডেগারের মনে সেদিন কত আনন্দ, ডেগারের স্ত্রীর চোখে সেদিন কত বিস্ময়, সে বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য নাই বটে, তবু সেদিন একটা মস্ত বড় শুভদিন, ফটোগ্রাফির ইতিহাসে প্রথম প্রভাত।

আজকাল ফটোগ্রাফি এতই সাধারণ জিনিষ যে, প্রথম আবিষ্কারের আনন্দ এবং বিস্ময় আমরা হয়তো সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব না। কিন্তু এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আজি হইতে ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ; ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ৭ই জানুয়ারী ফরাসী-বিজ্ঞান-পরিষদে ফলিত পদার্থবিদ্যা শাখার (French Academy of Sciences—Applied Physics Section) এক সভায় য়্যারাগো (M. Arago) ডেগারের এই অদ্ভুত ও চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করিলেন। এতকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদের যে চেষ্টা সফল হইতেছিল না, আজ ডেগারের চেষ্টাতে তাহা সফল হইল এবং Humboldt, Biot এবং Arago প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ ডেগারেকে তাহার আবিষ্কারের জন্য অভিনন্দন জানাইলেন। ডেগারের তোলা ছবির মধ্যে তিনটি ভালো ছবি Louvre এবং Tuileries-এর সন্নিহিত Great Gallery-তে প্রদর্শিত হইল ; ডেগারের এই কয় বৎসরে পরীক্ষাকার্য্যের জন্য যত আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণের জন্য মন্ত্রিসভার নিকট প্রার্থনাও জানানো হইল।

ফটোগ্রাফির আবিষ্কারের এই একশত বৎসর মধ্যে ইহা এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং ইহা এতই সাধারণ জিনিষ হইয়া পড়িয়াছে যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ যেরকম উৎসাহ এবং চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট বাড়াবাড়ি বলিয়াও মনে হইতে পারে। তবু ইহাও কম বড় আশ্চর্য্য নয় যে, একশত বৎসর পূর্ব্বেও বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, ফটোগ্রাফির সাহায্যেই বিজ্ঞানে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে এবং বিজ্ঞান-পরিষদের অনুরোধক্রমে ডেগারে ফটোগ্রাফির অতি শৈশবেই চন্দ্রের ফটো তুলিয়াছিলেন।

ডেগারে যে নিয়মে ফটো তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার নাম —ডেগারোটাইপ্। একটি রৌপ্য নির্ম্মিত বা রৌপ্য লেপিত (Silvered) প্লেটের উপরে সিল্ভার্ আয়োডাইড্ বা সিল্ভার্ ব্রোমাইড্ মাখাইয়া ফটোগ্রাফির প্লেট তৈরী করা হয়। ফটোগ্রাফির ভাষায় ইহাকে বেস্ (Base) বলে। (প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকগণ সিল্ভার্ ক্লোরাইড্ সাহায্যে চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন না।) এই প্লেটে ফটো তুলিতে হইলে প্রখর দিবালোকেও দশ মিনিট সময় লাগে। এই প্লেটের উপরে পরে পারদের বাষ্প (vapour) লাগাইলে, প্লেটের যে স্থানে আলো আসিয়া পড়িয়াছে সেই অংশের উপরেই শুধু এই বাষ্প ক্রিয়া করে ; এইরূপে ফটোর পজিটিভ্ পাওয়া গেল। কিন্তু এই উপায়ের সবচেয়ে অসুবিধা হইল ইহাই যে, ইহাতে একটি মাত্র ফটোর বেশী তোলা যায় না ; এই নিয়মে তোলা ফটোর "কপি" বা নকল তোলার কোনো উপায়ই নাই।

১৮০০ খৃঃ অব্দে ফক্স ট্যাবট্ (Fox Talbot) ফটো তোলার প্রক্রিয়ার আর একটু উন্নতিসাধন করিলেন ; তাঁহার চেষ্টাতেই কাগজে ফটোর নেগেটিভ তোলা সম্ভবপর হইল এবং ফটোর একাধিক "প্রিণ্ট্" তোলার উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করিলেন। কাগজে "গ্যালিক্ য়্যাসিড"-এর সাহায্যে আলোক-স্পর্শাতুর (light-sensitive) জিনিষ মাখাইয়া ফটো তোলার উপযুক্ত কাগজ তৈরী করা হয়। এই কাগজে মোম মাখাইয়া ইহাকে স্বচ্ছ করা হয় এবং ইহার পিছনে আর একটি

সিল্‌ভার্ ক্লোরাইড্ মাখানো কাগজ রাখিয়া "এক্‌স্‌পোজার" দিলে ছবির প্রিণ্ট্ পাওয়া যায়।

নিগেটিভ্ তৈরী করার ইহা একটি নূতন নিয়ম বটে; তবু এই নিয়মেও অনেকক্ষণ ধরিয়া এক্‌স্‌পোজার দিতে হইত।

ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে স্কট আর্চ ফটোগ্রাফির একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করিলেন। এই উপায়ে বেশীক্ষণ এক্‌স্‌পোজার দিতে হয় না। কিন্তু প্লেট যখন ভিজা থাকে, সেই সময়েই এক্‌স্‌পোজার দিতে হয়; কাজেই যে স্থলে এক্‌স্‌পোজার দিতে হইবে, সেই স্থানেই প্লেট তৈরী করিতে হয়। এই নিয়মেই সর্ব্বপ্রথম "colloid" (কোলয়েড্)এর সাহায্যে আলোক-স্পর্শাতুর পদার্থ প্লেটে ধরিয়া রাখা হইল। কোলয়েড্ ব্যবহার করা হয় বলিয়া এবং প্লেট্ ভিজা থাকে বলিয়া এই উপায়ের নান ওয়েট্ কোলডিন্ (Wet collodin process) উপায়। এই উপায়টি খুব ভাল এবং কলিকাতাতেই দুই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, কিছুদিন পূর্ব্বেও ফটোগ্রাফারগণ ওয়েট্ প্লেট্ তৈরী করার সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া যে স্থানে ফটো তুলিবেন, সেই স্থানে যাইতেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে ফটোগ্রাফির আর এক অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। Maddox কোলডিন্ ব্যবহার না করিয়া জিলেটিন্ ব্যবহার করা আরম্ভ করিলেন—এবং এইরূপেই সর্ব্বপ্রথম ড্রাই প্লেট্ তৈরী হইল। সর্ব্বপ্রথম ড্রাই প্লেট্ তৈরী হইল বটে, কিন্তু এই উপায়টি খুব ভালভাবে কাজ করিত না। অনেক দিন পরে রৌপ্যঘটিত লবণ (silver sa't) যাহা সিল্‌ভার্ নাইট্রেট্ ও দ্রবণীয় হ্যালাইড্ (Halide) সংযোগে প্রস্তুত হয়, তাহা দূর করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ড্রাই প্লেট্‌কে বিশেষ কার্য্যকরী করা হইল। এই উপায়েও এক্‌স্‌পোজারের সময় খুবই কম—তার উপরে, ওয়েট্ প্লেটের মত ইহাকে তন্নগদ তৈরী করিয়া ব্যবহার করিতে হয় না।

ড্রাই প্লেটের এই সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো স্থলে ওয়েট্ প্লেটের সাহায্যেই ফটো তোলা সুবিধাজনক—যেমন ফটো-এন্‌গ্রেভিং-এর বেলাতে।

ড্রাই প্লেট্ আবিষ্কার হওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফির নিয়ম-কানুনে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ফটো কত ভাল হইতে পারে, ইহা কত কম সময়ে তোলা যাইতে পারে (latitude and gradation, speed, graininess)—এই সব বিষয়েই শুধু উন্নতি হইয়াছে এবং উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে; বর্ত্তমানে ফটোগ্রাফি শুধু মানুষের বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলাতেই আবদ্ধ না থাকিয়া বিজ্ঞানে, যেমন অতি বেগনি আলো, রঞ্জন রশ্মি, গামা-রশ্মি—এই সব ক্ষেত্রেও ইহার ব্যবহার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেজন্য নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ডেগারে যখন প্রথম ফটো তোলেন, তখন যে রকম লেন্স ও আলো ব্যবহার করিয়া ১০ মিনিট কাল এক্‌স্‌পোজার দিতে হইত, বর্ত্তমানকালে অনুরূপ অবস্থায় মাত্র $\frac{১}{১০০}$ সেকেণ্ড অর্থাৎ পূর্ব্ব সময়ের ষাট হাজার ভাগের একভাগ সময় প্রয়োজন হইবে। ফটোর এক্‌স্‌পোজারের সময় ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, তবু মনে হয় যে ফটোর সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিলে এই সময়কে আর বেশী কমানো যাইবে না।

সাধারণত আমরা যে সব ফটো দেখিয়া থাকি, তাহাতে শুধু কালো বা সাদা রংই থাকে। অবশ্য এই সাদা বা কালো রং-এর গভীরতার তারতম্য যে সব সময়েই ঘটিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাগানে যে লাল গোলাপ ফুটিয়াছে, তাহা ফটোতে কালো-রংএই দেখা দিবে। ইহাতে শুধু যে শিল্পীদের মনই ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই নয়, বৈজ্ঞানিকগণও খুব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং লাল গোলাপ ফটোতেও কি করিয়া লালই থাকে, সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতেছিলেন।

অবশেষে, বৈজ্ঞানিকগণ সফল হইলেন এবং ফটোগ্রাফির আর একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। রঙ্গীন ছবি তোলা (Colour Photography) কি করিয়া সম্ভবপর হইল, আমরা এক্ষণে ইহাই বলিব; কিন্তু তার পূর্ব্বে আলো সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা আমাদের জানিতে হইবে।

সূর্য্যের আলোতে যে সাতটা রং আছে—একথা বৈজ্ঞানিকগণ বহু পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। আকাশে বৃষ্টির শেষে অনেক সময় যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রামধনু দেখা যায়, তাহাতে সূর্য্যের আলোর এই সাতটা রংই থাকে। এদের নাম ক্রমে ক্রমে বেগনি, ইণ্ডিগো, নীল, সবুজ, হলুদ, নারঙ্গ ও লাল।—কিন্তু ইহা ছাড়া, বেগনির আগে অতিবেগনি নামে আলোর আর একটি অংশ আছে; তেমনি লালের পরে আছে অবলোহিত। এই দুইটির কোনো অংশই আমরা চোখে দেখিতে পাই না—কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব অন্যভাবে প্রমাণিত হয়। অতিবেগনি আলো ফটো-ফিল্মের উপরে তাহার ছাপ রাখিয়া যায়; অবলোহিত আলোর অংশ তাহার উত্তপ্ত করার ক্ষমতা দিয়া যন্ত্রবিশেষে (বোলো-মিটার্) ইহার অস্তিত্ব প্রমাণিত করে।

বৈজ্ঞানিক জটিলতা বাদ দিয়া আমরা অন্তত এইটুকু বলিতে পারি যে, আলো এক রকম ঢেউ এবং "ইথার" নামে যে সর্ব্বব্যাপী পদার্থের কল্পনা বৈজ্ঞানিকগণ করিয়া থাকেন, সেই ইথারে ভর করিয়াই এই ঢেউ চলে। ঢেউ বলিলেই—যে-কোনো ঢেউ-ই হোক্ না কেন—জলের ঢেউ কি শব্দের ঢেউ—ঢেউ-এর সঙ্গে জড়িত থাকে ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য। আমরা যে আলো চোখে দেখি তাদের ঢেউগুলি ৪০০০ য়্যাংষ্ট্রম্ হইতে ৭০০০ য়্যাংষ্ট্রম্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। (যেমন ফিট্ গজ ইত্যাদির সাহায্যে দূরত্ব মাপে, তেমনি য়্যাংষ্ট্রম্-এর সাহায্যে ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য মাপে; পঁচিশ কোটি য়্যাংষ্ট্রমে এক ইঞ্চি—ইহা হইতেই এক য়্যাংষ্ট্রম্ যে কতটুকু এবং আলোর ঢেউ যে কত ছোট সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হইবে। প্রসঙ্গত ইহাও বলিয়া রাখি যে, ইথার-তরঙ্গগুলির মধ্যে রেডিয়াম্ হইতে নির্গত গামা-রশ্মির ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য $\frac{১}{১০}$ য়্যাংষ্ট্রম্ এবং রেডিও ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণত বেশী। সব চেয়ে ছোট রেডিও ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যও এক কোটি

য়্যাংষ্ট্রম্। কলিকাতা হইতে যে রেডিও-ঢেউ প্রেরিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ৩৭০'৪ মিটার্ অর্থাৎ সাঁয়ত্রিশ হাজার চল্লিশ কোটি য়্যাংষ্ট্রম্।)

অতি-বেগনি আলোর ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য ৪০০০ য়্যাংষ্ট্রমের কম এবং অবলোহিত আলোর ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য ৭০০০ য়্যাংষ্ট্রমের বেশী। বেগনি, ইণ্ডিগো, নীল, সবুজ, হলুদ, নারঙ্গ (Orange) ও লোহিত আলোর ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য ৪০০০ ও ৭০০০ য়্যাংষ্ট্রমের মধ্যবর্ত্তী এবং আলোর ঢেউএর দৈর্ঘ্য যতই বেশী হইবে, ততই ইহার রং বেগনি হইতে লোহিতের দিকে সরিয়া যাইবে।

সাধারণ ফটোগ্রাফিক ফিল্মে অবলোহিত আলো কোনো ছাপ রাখিয়া যায় না ; শুধু অতিবেগনি, বেগনি ও নীল অংশই ফটোগ্রাফিক ফিল্মে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত করে। সিল্ভার্ ক্লোরাইড্, সিল্ভার্ ব্রোমাইড্ বা সিল্ভার্ আয়োডাইড্ (এই লবণগুলি সিল্ভার হ্যালাইড্‌স্ নামেও পরিচিত) দৃষ্ট (visible) আলোর বেগনি ও নীল অংশেই শুধু সুগ্রাহী (sensitive)। কিন্তু ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা আবিষ্কৃত হইল যে কয়েকটা বিশেষ রং মিশাইলে দৃষ্ট আলোর লাল ও অতিলাল অংশেও ইহারা সুগ্রাহী হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বর্ত্তমানেও নানা গবেষণা চলিতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত ১১,০০০ য়্যাংষ্ট্রম্ পর্য্যন্ত (৭০০০ য়্যাংষ্ট্রমের বেশী হইলেই ইহা আলোর অবলোহিত অংশ) সিল্ভার্ হ্যালাইড্‌স্‌কে আলোক-সুগ্রাহী করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে spectral sensitiveness. ফটোগ্রাফিক্ ফিল্মের এই সুগ্রাহিতার সঙ্গে সঙ্গেই জড়িত আছে রঙ্গীন ছবি তোলার উপায়। আজকাল বিশেষভাবে প্রস্তুত প্লেটের উপর অবলোহিত আলোকরশ্মিও তাহার দাগ রাখিয়া যায় বলিয়া লাল-গোলাপের লাল রংও ফটোতে ধরিবার উপায় সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে।

রঙ্গীন ছবি তোলা প্রধানত দুইটি নিয়মে হইয়া থাকে। একটি উপায়ের নাম Additive Colour Reproduction ; আর একটি Subtractive Colour Process. দুইটি উপায়ই খুব জটিল হওয়ায় আমরা কোনো উপায়ই বিশেষভাবে বর্ণনা করিব না ; বৈজ্ঞানিক জটিলতা যথাসম্ভব বাদ দিয়া দুইটি নিয়মেরই শুধু মূল কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দেই অবশ্য প্রথম উপায়টি বৈজ্ঞানিক মনে সাড়া দিয়াছিল। কিন্তু প্যান্‌ক্রোমেটিক্ প্লেট্ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে এই উপায়টি কার্য্যকরী হয় নাই। প্যান্‌ক্রোমেটিক্ প্লেট্—অর্থ যে প্লেট্ আলোকের লোহিত অংশেও বিশেষ সুগ্রাহী। আজকাল Mosaic Screen Process-এই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রঙ্গীন ফটো তোলা হইয়া থাকে। ইহার মূলেও ফটোগ্রাফিক্ প্লেটের দ্রুতি (speed) ও আলোক-সুগ্রাহিতা (spectral sensitivity)।

রঙ্গীন ফটো তোলার যে দ্বিতীয় উপায়টির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূলে হইল ভালো ফটোগ্রাফিক্ অবদ্রব (emulsion) তৈরী করা। ফটোগ্রাফিক অবদ্রব কিন্তু আজকালও অনেকটা আন্দাজের উপরেই তৈরী করা হয়। ইহা তৈরী করিতে জিলেটিন্ প্রয়োজন হয় ; কিন্তু এই জিলেটিনের মধ্যে আরও এমন কয়েকটা জিনিষ আছে, যাহার জন্যই এই অবদ্রব এত কার্য্যকরী ; এই সব বাহিরের জিনিষগুলি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু কিছু জানা থাকিলেও ইহাদের বিষয়ে সম্যকভাবে কিছুই জানা যায় নাই। জৈব রসায়নের (Organic Chemistry) গবেষণার ফলে রঞ্জক পদার্থের (dyes) ব্যবহার ফটোগ্রাফিতে খুব কার্য্যকরী হইয়াছে। এই সব রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে কেন যে ফটোগ্রাফিক প্লেটের আলোক সুগ্রাহিতা বাড়ে—ইহা এখনও সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে ; তবু গবেষণার ফলে অনেকটা আন্দাজেই এখনও নূতন নূতন রঞ্জক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, যাহার সাহায্যে প্লেটের সুগ্রাহিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ, অবদ্রবের ভিতরের খবর না জানিলেও অবদ্রব তৈরী করার পদ্ধতি সম্যক্ উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং রঙ্গীন ছবি তোলার দ্বিতীয় উপায়টির খুবই ব্যবহার হইতেছে। একথাও বলা বাহুল্য যে রঙ্গীন ছবি তোলার যে নিয়মই প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, ইহাতে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন ফটোগ্রাফিক্ প্লেটের আলোক-সুগ্রাহিতা ; জৈব রসায়নের গবেষণার ফলে গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে এবং চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফলও হইয়াছে।

Lyons-এর Lumiereই সর্ব্বপ্রথম অটোক্রোম্ প্লেট্ আবিষ্কার করেন। এই সব প্লেটের উদ্দেশ্য স্বাভাবিক রং-এ ফটো তোলা। গ্লাস্ প্লেটে ছোট ছোট স্বচ্ছ starch grain (শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা) মাখানো হয়—এই কণাগুলির কতকগুলির রং থাকে নীলাভ বেগনি, কতকগুলি থাকে সবুজ রং-এর এবং বাকীগুলির রং নারঙ্গ (Orange)। কোন্ রং-এর শ্বেতসার কণা কতখানি থাকিবে তাহা পরীক্ষা করিয়া (by trial) নির্দ্ধারণ করিতে হয়। গ্লাস্ প্লেটের উপরে তাহার পর একটা অবদ্রব মাখানো হয়, যে অবদ্রব লাল রং-এর আলোতেও সুগ্রাহী। একটি বিশেষ আলোক সাহায্যে (special light filter ব্যবহার করিয়া) এক্সপোজার দেওয়া হয় এবং আলোকরশ্মি শ্বেতসার কণার ভিতর দিয়া প্যান্‌ক্রোমেটিক্ অবদ্রবে পৌছিবার পূর্ব্বে প্রথমে যে দিকে কোনো কিছুই মাখানো হয় নাই সেই দিকে আসিয়া পড়ে। এইরূপে রঙ্গীন শ্বেতসার কণাগুলি বিভিন্ন রং-এর স্বচ্ছ পর্দ্দার কাজ করে—এবং যে রঙ্গীন জিনিষের ফটো তোলা হইবে তাহার বিভিন্ন রং-এর আলো এই সব পর্দ্দার মধ্য দিয়া পরে আলোক-সুগ্রাহী অবদ্রবের উপরে পড়ে। কতক্ষণ এক্সপোজার দিতে হইবে তাহা আলোক ও বস্তুর উজ্জ্বলতার উপরে নির্ভর করিবে। এইরূপে যে ফটো তোলা হইল, তাহাকে ডেভেলপ্ করিলে বস্তুটি তাহার নিজের রং-এর কম্প্লিমেণ্টারী রং-এ ফুটিয়া উঠিবে। এই ছবি হইতে "পজিটিভ্" তুলিলেই ছবিটির আসল রং ধরা পড়িবে। এইখানে কম্প্লিমেণ্টারী রং কাহাকে বলে তাহা বলা ভাল। সংক্ষেপে, যে দুইটি রং মিশাইলে সাদা রং হয়, সেই দুইটি রং একে অপরের কম্প্লিমেণ্টারী ; যেমন সবুজের কম্প্লিমেণ্টারী পার্‌পল্ (নীল ও লাল মিশাইয়া পার্‌পল্) ; নীল রং-এর কম্প্লিমেণ্টারী হলুদ ; লালের কম্প্লিমেণ্টারী ময়ূর রং।

আগ্‌ফা কালার্ প্লেট্-এর মূল তথ্যও অটোক্রোম্ প্লেটের মত। কিন্তু এস্থলে রঙ্গীন শ্বেতসার কণা ব্যবহার না করিয়া গাম্ য়্যারাবিক্ অথবা "শেলাক"-এর ছোট ছোট কণা ব্যবহার করা হয়। এই উপায়ে ছবির ঈষদচ্ছতা (translucency) অনেকাংশে বাড়িয়া যায়।

ফিন্‌লে কালার প্রোসেস্—রঙ্গীন ফটোর আর একটি উপায়। লেন্স-এর সঙ্গে উপযুক্ত একটি প্রতিবিহিত (compensating) ফিল্টার (ফিল্টারের সাহায্যে শুধু বিশেষ আলোককেই বাছিয়া লওয়া হয়) ব্যবহার করিয়া প্যান্‌ক্রোমেটিক্ প্লেটের সঙ্গে একটা স্ক্রীন্ ব্যবহৃত হয়। এই ছবির পজিটিভ্‌কে যখন পলিক্রোম্ পর্দ্দার সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়া "ফিক্স্" করা হয়, তখন ছবিটির স্বাভাবিক রং ধরা পড়ে। মূল নেগেটিভ্ হইতে একাধিক পজিটিভ্ তৈরী করা এই পদ্ধতিতে সহজ।

এই তিন রকম উপায়েই যে সব ছবি পাওয়া যায়, তাহাতে ফটোগ্রাফির ভাষায় কালার্ ট্র্যান্সপেরেন্সি থাকে—অর্থাৎ এই ছবিগুলি রঙ্গীন, কিন্তু গ্লাস্ প্লেটে তোলা হয় বলিয়া এগুলি স্বচ্ছ বা ট্র্যান্সপারেণ্ট্‌ও। কাগজের উপরে রঙ্গীন ফটো তোলা আজ পর্য্যন্তও শুধু থ্রি-কালার-প্রোসেসেই সম্ভবপর। তিনটি বিভিন্ন রং-এর (লাল, নীলাভ বেগনি ও সবুজ) আলোতে (রঙ্গীন স্বচ্ছ পর্দ্দা বা filter-এর সাহায্যে) বস্তুটির তিনটি নেগেটিভ্ তোলা হয়। (লাল, নীলাভ বেগনি ও সবুজ এই তিনটি রং-এর মিশ্রণে সাদা রং হয়—এইটা লক্ষ্য করার বিষয়) এই তিনটি নিগেটিভের রঙ্গীন প্রিণ্ট্‌গুলি একই কাগজে তোলা হয়—এবং এই তিনটি রংএর সংমিশ্রণে জিনিষটির রং ছবিতে দেখা যায়।

এই সমস্ত বিভিন্ন উপায় হইতে আমরা ইহাই দেখিতে পাইলাম যে রঙ্গীন ছবি তুলিতে প্রধানত দুইটি জিনিষের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে—(১) কোন্ রং-এর কম্‌প্লিমেণ্টারী কোন্ রং এবং (২) প্লেট্‌টি অবলোহিত আলোকেও সুগ্রাহী কি-না। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে Lippmann আর একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার সাহায্যেও রঙ্গীন ফটো তোলা সম্ভবপর।

যদি আলোকরশ্মি একটি নিখুঁত প্রতিফলক (reflecting surface) হইতে লম্বভাবে (perpendicularly) প্রতিফলিত হয়, তবে আপতিত (incident) ও প্রতিফলিত আলোকের ঢেউ লইয়া স্থির তরঙ্গের (stationary waves) সৃষ্টি হইবে। Lippmann যে উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার মূল সূত্র এই স্থিরতরঙ্গ সংঘটনের উপর নির্ভরশীল।

এই স্থিরতরঙ্গের দস্তুরই এই যে এই ঢেউ-এর কোনো স্থানে বিস্তার (amplitude) একেবারে শূন্য হইয়া যায় এবং কোনো স্থানে আবার সব চেয়ে বেশী। যে স্থানে বিস্তার শূন্য এবং যে স্থানে বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাহাদের দূরত্ব ঢেউ এর দৈর্ঘ্যের চার ভাগের এক ভাগের সমান। এই ক্ষেত্রে, যে প্রতিফলকে আলোর ঢেউ প্রতিফলিত হইয়া আসিয়া স্থির-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, সেই প্রতিফলকের উপরে ঢেউ-এর বিস্তার শূন্য হইবে; কাজেই অন্য কোন্ কোন্ স্থানে ঢেউ-এর বিস্তার শূন্য বা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইবে তাহা ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য জানা থাকিলেই বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমরা আলোর ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য যে কত তাহাও জানি; কাজেই স্থিরতরঙ্গে Node (যে স্থানে ঢেউ এর বিস্তার শূন্য) এবং Loop (বা Anti-Node যে স্থানে ঢেউ-এর বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী)—ইহাদের স্থিতিও জানি।

এখন Lippmann-এর পদ্ধতির কথা বলি। ক্যামেরাতে ফটোগ্রাফিক্ প্লেট্ এমন ভাবে বসানো হয় যে প্লেটের যে দিকে আলোক-সুগ্রাহী পদার্থ নাই অর্থাৎ যে দিকটা শুধু কাচ, উহা লেন্সের দিকে থাকে এবং যে দিক্‌টাতে আলোক-সুগ্রাহী পদার্থ মাখানো থাকে তাহা থাকে পিছনে—এবং ইহার পরেই থাকে পারদের একটি স্তর (Layer)। যে বস্তুর ফটো তোলা হইবে, সেই বস্তু হইতে আলো লেন্সের ভিতর দিয়া আসিয়া প্লেটের কাঁচের উপর সর্ব্বপ্রথম পড়ে; তার পর ইহা আলোক-সুগ্রাহী পদার্থকে অতিক্রম করিয়া পারদ-স্তরে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত হওয়ার ফলে প্লেটের কাচ ও বাহিরের পারদস্তরের মধ্যে স্থিরতরঙ্গ সৃষ্ট হয়। স্থিরতরঙ্গে কোনো স্থানে বিস্তার শূন্য এবং কোনো স্থানে বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (অর্থাৎ Nodes ও Loops); কাজেই আলোক সুগ্রাহী পদার্থের স্তরের মধ্যে কোনো স্থানে আলোকের ক্রিয়া হইবে এবং কোনো স্থানে হইবে না। এই স্থানে একটা কথা বলা ভাল—আলোক-সুগ্রাহী পদার্থের স্তরের বেধ (thickness) নিশ্চয়ই খুব বেশী নয়—তবু ইহা যত সামান্যই হোক্ না কেন আলোর ঢেউ এর দৈর্ঘ্যের তুলনায় ইহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট বেশী। লোহিত আলোর ঢেউ-এর দৈর্ঘ্য ৭০০০ য়্যাংষ্ট্রমের মত—দৃষ্ট আলোর মধ্যে উহাই সব চেয়ে বড় ঢেউ—কিন্তু আমরা জানি যে এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে পঁচিশ কোটি য়্যাংষ্ট্রম্ থাকিতে পারে—কাজেই এক ইঞ্চি জায়গাতে দৃষ্ট আলোর সব চেয়ে বড় ঢেউ-ও প্রায় ছত্রিশ হাজার থাকিতে পারিবে এবং সব চেয়ে বড় ঢেউ-এর একটি ঢেউ যাহাতে থাকিতে পারে সেজন্য আলোক-সুগ্রাহী পদার্থের স্তরের বেধ যদি এক ইঞ্চির ছত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগও হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট; কারণ এই বেধের মধ্যেই তিনটি Node ও ও দুইটি Loop অন্তত পক্ষে থাকিবে। এই ফিল্ম্‌কে ডেভেলপ্ ও ফিক্স করিলে আলোক-সুগ্রাহী পদার্থের বেধটুকুতে অনেকগুলি সমদূরবর্ত্তী প্রতিফলনক্ষম সমতল পৃষ্ঠ (equidistant reflecting planes) থাকিবে—যে যে স্থানে আলোক-রশ্মি ক্রিয়া করিয়াছে, শুধু সেই সেই স্থানেই এই প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলি অবস্থিত থাকিবে—অর্থাৎ স্থিরতরঙ্গ সৃষ্টির সময়ে যে স্থানে Loop ছিল, সেই স্থানেই শুধু এই প্রতিফলনক্ষন পৃষ্ঠগুলি পাওয়া যাইবে—কাজেই এই সমস্ত পৃষ্ঠগুলির দূরত্ব আলোর ঢেউ-এর দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেকের সমান হইবে কারণ একটি Loop হইতে আর একটি Loop-এর দূরত্বই ইহা। অবশ্য প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলিতে রূপার বেধ এত সামান্য যে ইহাদের অস্বচ্ছতার কোনো প্রশ্ন উঠিবে না।

একটা বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন রং-এর আলোর জন্য বিভিন্ন প্রতিফলনক্ষম সমতল পৃষ্ঠগুলি থাকিবে; অর্থাৎ লাল রং-এর আলোর বেলায় প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলির অবস্থান যে সব

স্থানে থাকিবে নীল রং-এর আলোর সময় ইহার প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলির অবস্থান অন্য স্থানে থাকিবে। মনে করা যাক্ যে, যে ছবিটি তোলা হইয়াছে তাহার রং নীল—কাজেই আমরা যে ফটো পাইলাম তাহাতে প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলির অবস্থান এই নীল রং-এর আলোর অনুরূপ। এই ফটোকে আমরা যদি সাদা আলোয় দেখি তবে সাদা আলো যখন এই সমস্ত প্রতিফলন-ক্ষম পৃষ্ঠগুলির মধ্য দিয়া আসিবে তখন আমরা শুধু সে-ই আলোই দেখিতে পাইব—প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলির অবস্থান যে আলোর অনুরূপ; অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলির অবস্থান নীল রং-এর অনুরূপ বলিয়া সাদা আলোয় এই ছবি দেখিলে এই ছবি হইতে শুধু নীল আলোই আমাদের চোখে আসিয়া পড়িবে; কাজেই ছবিটি নীল রং-এর দেখা যাইবে। আমরা এই স্থলে একটি রং-এর বস্তু লইয়া উদাহরণ দিলেও একথা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, যে কারণে আমরা নীল রং দেখিতে পাইলাম ঠিক সেই কারণে বস্তুটি যদি বিভিন্ন রং-এরও হইত, তবে বিভিন্ন রংই দেখিতে পাইব—কারণ ফটোর ফিল্মে যে প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলি তৈয়ারী হইবে, তাহা বস্তুর রং অনুযায়ী হইবে এবং সাদা আলোতে দেখিলে যে আলোর অনুরূপ প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠগুলি যে স্থানে আছে, সেই স্থান হইতে শুধু সে-ই আলোই আমাদের চোখে আসিবে। কাজেই বস্তুটি তাহার নিজস্ব রং-এই আমাদের চোখে ধরা দিবে। এই উপায়ের ইহাই মূল তথ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা খুব জটিল—এবং রঙীন ফটো তোলার জন্য এই পদ্ধতি খুব কম স্থলেই ব্যবহৃত হয়। যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু সেই সব নিয়মের মূল তথ্য—অর্থাৎ কেন এমন হয়—এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকগণ এখনও ভালোভাবে দিতে পারেন নাই।

ক্যামেরার আবিষ্কারের প্রথম অধ্যায়ে লেন্স ব্যবহৃত হয় নাই। তখনকার দিনে যে ক্যামেরা ব্যবহার হইত, তাহার নাম পিন-হোল্ ক্যামেরা। এই সব ক্যামেরায় শুধু একটা পিন্-হোল্ থাকিত। পাতলা একটি ধাতু নির্ম্মিত প্লেটে পিন্ বা সূঁচ দিয়া একটি ছিদ্র করিয়া পিন্-হোল্ তৈয়ারী করা হইত। ছিদ্রটি মসৃণ হওয়া আবশ্যক। এই সব ক্যামেরায় "ফোকাস্" করার প্রয়োজন নাই; ক্যামেরায় ফটোগ্রাফিক্ প্লেট ও ছিদ্রটির অবস্থানের দূরত্বের উপর ছবির আকার নির্ভর করে এবং কতক্ষণ এক্সপোজার দিতে হইবে, তাহা নির্ভর করে ছিদ্রটি কত বড় বা ছোট এবং বস্তুটি কত উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল ইহার উপর। সাধারণত এই ক্যামেরায় অনেকক্ষণ ধরিয়া এক্সপোজার দিতে হয়। এই ক্যামেরায় প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ভালো তোলা যায়।

ইহার পরেই আসিল লেন্সের ব্যবহার। একটা মাত্র লেন্স ব্যবহার করিলে ছবিতে অনেক রকম দোষ ঘটে। সে সব দোষ দূর করিতে বিশেষভাবে তৈরী একাধিক লেন্স (achromatic combination of lenses) ব্যবহার করার পন্থা বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিলেন। ফটোগ্রাফিক প্লেটেরও নানা রকম গবেষণার ফলে যুগান্তর আসিল। তার পর, বৈজ্ঞানিকগণ চেষ্টা করিলেন, কি করিয়া বিশেষ বিশেষ ফটো তোলা সহজ ও সুন্দর হইতে পারে। যেমন—বাড়ী, গীর্জ্জা, মন্দির এই সব ফটো নির্দ্দোষভাবে তোলা—অর্থাৎ আর্কিটেক্চুরাল্ ফটোগ্রাফি; কিম্বা স্ন্যাপশট্ ফটোগ্রাফি; অথবা নেচার্ ফটোগ্রাফি (কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির ছবি তোলা); ষ্টেরিওস্কোপিক ফটোগ্রাফি (এই সব ফটোতে "সলিডিটি"র ধারণা জন্মে); টেলিফটোগ্রাফি (দূরের জিনিষ, যেমন চাঁদ—ইহাকে বড় করিয়া তোলা)—এই সমস্ত কার্য্যেই বিশেষভাবে তৈরী ক্যামেরা অথবা ফটো তোলার বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন হয় এবং আজকাল ইহা বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে আর কাহারও অজানা নাই।

টেলিফটোগ্রাফিতে একটি বিশেষ লেন্স (Telephoto lens) ব্যবহার করা হয়। ইহার ফলে দূরের জিনিষও বেশ বড় আকারেই ক্যামেরার প্লেটে ছবি ফেলে—ক্যামেরাকে বড় করার প্রয়োজন হয় না। একটি বড় আকারের সাধারণ লেন্সের সঙ্গে একটি কন্‌কেভ্ লেন্স জুড়িয়া দিলেই টেলিফটো লেন্স তৈরী হইল। কন্‌কেভ্ লেন্সটি যে জিনিষের ছবি তোলা হইবে, উহার ছবিকে বড় করে (magnify); ছবিটি কত বড় হইবে, তাহা নির্ভর করে কন্‌কেভ্ লেন্স ও সাধারণ লেন্স (অর্থাৎ কন্‌ভেক্স লেন্স)—ইহাদের দূরত্বের উপর। প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি যে, কন্‌ভেক্স লেন্সের (ইহারাই ফটোগ্রাফিতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় এবং ইহাদিগকে পজিটিভ্ লেন্সও বলে) মধ্যভাগটি অন্যান্য অংশ হইতে মোটা—এবং কন্‌কেভ লেন্সের (অন্য নাম নেগেটিভ্ লেন্স) মধ্যভাগ লেন্সের অন্য অংশ হইতে সরু। কোন্‌টি কন্‌কেভ্, কোন্‌টি কন্‌ভেক্স সে সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলা যায়—আমাদের মধ্যে যাহারা চোখে কম দেখেন, তাহারা কন্‌ভেক্স লেন্সের সাহায্যে বই পড়িয়া থাকেন। দূরের জিনিষ যিনি অস্পষ্ট দেখেন তিনি কন্‌কেভ্ লেন্স ব্যবহার করেন এবং নিকটের জিনিষ যিনি অস্পষ্ট দেখেন, তিনি কন্‌ভেক্স লেন্স ব্যবহার করেন; সেইজন্য বৃদ্ধদের চোখে প্রায়ই কন্‌ভেক্স লেন্স এবং যুবকদের চোখে প্রায়ই কন্‌কেভ্ লেন্স থাকে—ইহা হইতেই হয়তো বুঝিতে পারিবেন, কাহার চোখের "পাওয়ার্" নেগেটিভ্ এবং কাহার চোখের "পাওয়ার্" পজিটিভ্;—এবং নেগেটিভ্ ও পজিটিভ্ পাওয়ার্-এর অর্থ কি—তাহাও বুঝিতে পারিবেন। এই সব কথার অবশ্য আমাদের মূল আখ্যানের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই, আমরা ইহা প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া লইলাম মাত্র।

ষ্টেরিওস্কোপিক্ ফটোগ্রাফিতে বস্তুটির (যদি তাহা চলমান হয়) দুইটি ফটো একই সঙ্গে এবং একই এক্সপোজারে লইতে হয়। এই উদ্দেশ্যে যে ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় তাহাতে দুইটি লেন্স পাশাপাশি ভাবে থাকে; এবং ইহাদের দূরত্ব মানুষের দুইটি চোখের দূরত্বের সমান। এই ভাবে তোলা ছবি দুইটিকে যন্ত্র সাহায্যে (stereoscope) দেখিলে বস্তুটির ফটোকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উচ্চতা-সম্বলিত অর্থাৎ "সলিড্" বলিয়া মনে হইবে। সাধারণ ছবিতে যে "flatness" থাকে, এই সব ছবি তেমন নয়। এই ভাবে তোলা ঘরের ছবিকে সত্যিকারের ঘর বলিয়াই মনে হইবে। স্ন্যাপ্-শট্ ফটোগ্রাফি আজকাল আর কাহারও অজানা নাই;

ইহার ব্যবহারও খুব বেশী, কারণ অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য এই পৃথিবীতে শুধু অল্পক্ষণের জন্যই থাকে। চলন্ত জিনিষের ছবি তুলিতেও ইহার প্রয়োজন খুব বেশী। ইন্‌ষ্ট্যান্‌টেনিয়াস্ শাটারের সাহায্যে এই ফটো তোলা হইয়া থাকে। বস্তুটির গতি, স্থিতি, আলোকের অবস্থা, ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরে এই ফটোগ্রাফির ভাল মন্দ নির্ভর করে।

নেচার ফটোগ্রাফি অর্থাৎ কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির ফটো তোলার জন্য সাধারণত একটি বিশেষ ক্যামেরা (রিফ্লেক্স ক্যামেরা) ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইঞ্জিনিয়ার ও আর্‌কিটেক্ট তাঁদের প্ল্যান্, ট্রেনিং ইত্যাদি "কপি" করার জন্য একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন ; ইহার নাম ব্লু প্রিণ্ট্ প্রোসেস্। ইহা বাস্তবিক পক্ষে যদিও ক্যামেরার ফটো তোলা নয়, তবু এই উপায়ে ফটোগ্রাফির মত "প্রিণ্ট" করিতে হয়। ইহাতে পটাশিয়াম্ ফেরি-সায়ানাইড্ও য্যামোনিয়ো সাইট্রেট্ অফ্ আয়রন দুইটি বিশেষ লবণ) প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমানে ফটোগ্রাফিক্ প্লেট্ ডেভেলপ্ ও ফিক্স করারও অনেক নূতন নূতন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। ছবির টোন্ও (অর্থাৎ রং) নানাভাবে পরিবর্ত্তন করার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ফটোগ্রাফির সাহায্যে কত অসম্ভবকেও যে সম্ভব বলিয়া দেখানো যাইতে পারে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। (যাঁহারা বোরিশ্ কার্লফের ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইন্ ইত্যাদি সিনেমা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।)

আজকাল শব্দ বা কথারও ফটো তোলার বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং এইরূপেই ১৯২৭ খৃঃ অব্দ হইতে নির্ব্বাক ছবি সবাক্ ছবি হইতে পারিয়াছে ; কিন্তু কি করিয়া শব্দের ছবি তোলে তাহা আমরা এই প্রবন্ধে বলিব না। ইহা ছাড়াও যে ফটোগ্রাফির কত ব্যবহার, কত প্রয়োজন তাহা না বলিলেও চলে। চাঁদের দেশের খবর বা মঙ্গলগ্রহের খবরও আমরা ফটোগ্রাফির সাহায্যেই জানি। (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সার্ উইলিয়াম্ ফক্স্ও চন্দ্রের ফটো তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ডেগারে যে চন্দ্রের ফটোও তুলিয়াছিলেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।) বৈজ্ঞানিকদের নিকট ফটোগ্রাফি যে কত প্রয়োজন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না এবং তাঁহাদের নিকট ইহা এত প্রয়োজনীয় বলিয়াই আমরা তাঁহাদের গবেষণার ফলস্বরূপ বহু নূতন নূতন বিষয় শিখিতে পারিতেছি। প্রত্যেক পদার্থ যে পরমাণু (atoms) দিয়া গঠিত, আমরা সেই অণু সম্বন্ধেও আজকাল অনেক কথা জানি। এই ফটোগ্রাফি হইতেই আমরা জানিয়াছি যে প্রত্যেক পরমাণু ইলেক্‌ট্রন্ ও প্রোটন্ দিয়া গঠিত ; এবং একটি পদার্থ যে অন্য আর একটি পদার্থ হইতে ভিন্ন, তাহা এই ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যার উপরই মূলত নির্ভর করে।

এ সব কথা যাহাই হোক্ না কেন—মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে এই ফটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হইয়াছিল—এবং অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ও অনেক বাধা বিঘ্নের মাঝে—এইটাই পরম আশ্চর্য্য। ডেগারের সঙ্গে অবশ্য আর একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক—নিপেরও নাম ফটোগ্রাফির আবিষ্কারক হিসাবে আমরা শুনিয়া থাকি—প্রবন্ধের শেষে ইহা স্বীকার না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে।

ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্রের জন্মের ইহাই ইতিহাস ; এই একশত বৎসরে ফটোগ্রাফির বিষয়ে এই পর্য্যন্তই আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমরা আশা করি, ফটোগ্রাফি ভবিষ্যতে আমাদিগকে আরও বহুদূরে লইয়া যাইতে পারিবে ; এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন আধুনিক ও ভবিষ্যৎ কালের বৈজ্ঞানিকগণ এবং মণীষীগণ।

উত্তর *

শ্রীনিরঞ্জন মজুমদার

যাহারে যোগ্য কেহই বলিতে নারে
তাহারেই তুমি ভূষিত করেছো শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ;
আবার যেজন তোমার আশীষ লাগি'
রহিল রাত্রি জাগি'
তারে বর দিলে লাঞ্ছনা, অভিশাপ
হোক্ না সে নিষ্পাপ ॥

মঞ্চে দাঁড়ায়ে গণতন্ত্রের মন্ত্র প্রচারে যেবা
বলিয়া বেড়ায় করিছে দেশের সেবা,
উচ্চ ভাষণে আকাশ যেজন ব্যেপে
কিছু খন বাদে সে-ই তো ধরিল বিরোধী কণ্ঠ চেপে ॥

মুক্তির লাগি পরাণ সঁপিল যারা
তাদেরি তরে তো সৃষ্টি করেছো কারা।
কণ্ঠ যাহার ভেঙে গেল শুধু তোমার বাণীরে বন্দি
তারেই করেছো বন্দী ॥

পুণ্যের গীতি যাহার কণ্ঠে ওঠে
তোমার বিচারে তাহারি শোণিতে
প্রবল বন্যা ছোটে।
অঙ্গ যাহার ব্যস্ত মন্দে, অন্তরে যার পাপ
তারি তরে তব মাপ্ ॥

---

* রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" কবিতাটির উত্তরে লিখিত। কবিতাটির আরম্ভ "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছো বারেবারে।"

মুক্তি

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

কলে বাঁশি বাজে—

তখনও রাত থাকে, পূবের আকাশ সবেমাত্র ফরসা হতে সুরু করে। গাছের শাখায় রচিত নীড়ে ঘুমন্ত পাখী বাঁশির শব্দে জেগে উঠে ডানা ঝটপট করে ঝাড়ে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বাঁশি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত বস্তী সজাগ হয়ে ওঠে। বস্তীবাসিদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে, তাড়াহুড়া পড়ে যায়। মাত্র একঘণ্টা সময়, এর মধ্যে যার যা কাজ সেরে দ্বিতীয় বাঁশি বাজবার আগেই কলে গিয়ে হাজির হতে হবে।

শ্যামলাল আড়ামোড়া ছাড়ে, হাই তোলে, আলস্যবিজড়িত কণ্ঠে বলে—"আঃ, রোজ যদি রোববার হতো, কি মজাটাই হতো। এই শেষ রাতে কোথায় আরাম করে ঘুমুব, তা না হয়ে--ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে ওঠ, দৌড়াদৌড়ি করে ছোট—ভারি মুস্কিল—"

যাই হোক—শেষকালে তাকে উঠতেই হয়, শুয়ে থাকবার যো নেই।

বারাণ্ডার ওধারে চন্দনা ততক্ষণ তোলা উনানে চায়ের জল বসায়, তার আবার চা খাওয়ার রোগ আছে। শ্যামলাল রোজই চা পায় তার কাছ হতে, তবু রোজই মনে করিয়ে দেয়—"একটু চা দিস চন্ননা—যেন ভুলিস নে—"

চন্দনা হাসে, রোজই বলে—"আজ চা নেই—" আবার একটু পরেই কলাইকরা বাটিতে করে গরম আগুনের মত চা এনে দেয় ; শ্যামলাল তাড়াতাড়ি চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলে—"বেঁচে থাক চন্ননা—আমি বলে রাখছি তোর খুব ভালো হবে—তোর দয়াল চন্দর নির্ঘাত ফিরে আসবে। তুই ঘাবড়াস নে চন্ননা, চোখের জল ফেলিসনে যেন, কথাটা মনে রাখিস।

চন্দনা নিঃশ্বাস ফেলে, নিজের চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে সে বলে—"হ্যাঁ, সে আর ফিরেছে। যে মানুষ দ্বীপান্তরে গেছে সে আবার নাকি ফিরতে পারে? এক আধ দিনের জন্যে নয়, আর তাকে ফিরতে দেওয়া হবে বলেও নিয়ে যায় নি—"

এই কলেই কাজ করতো দয়াল, হঠাৎ একদিন মদ খেয়ে কার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে হাতের দা এমন ভাবে প্রতিপক্ষের মাথায় বসিয়েছিল--যাতে সে বেচারী তখনই মারা গিয়েছিল। সেই কাজের জন্য দয়াল গেছে দ্বীপান্তরে—চন্দনা একাই বস্তীতে পড়ে আছে। সারাদিন সে ভূতের মত খাটে এবং সকলের চেয়ে অতিরিক্ত রকমই খাটে—এই অতিরিক্ত খাটুনীর ফলে তার সর্ব্বাঙ্গে শিরা বার হয়ে পড়েছে, দেহের লাবণ্য যে কোনদিন ছিল তা বোঝা যায় না। সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার সময় সে যখন তার নিজের ঘরটীতে ফিরে আসে, তখন তার শ্রান্ত চরণ ক্লান্ত দেহভার বইতে পারে না। সন্ধ্যার পর তাকে প্রকৃতিস্থ দেখতে পাওয়া যায় না, পুরাদস্তুর মাতাল অবস্থায় তাকে দেখতে পাওয়া যায়। দিনের ক্লান্তি সে এই ভাবে দূর করে।

ফল্গুর অভ্যন্তরে জলধারা রিণিঝিনি করে বয়ে যায়—চন্দনার মধ্যেও দয়ালের প্রতি গভীর ভালোবাসা তেমনি রয়ে গেছে ; অথচ বাইরের দিক হতে কেউ দেখে তা বুঝতে পারবে না। বাইরের দিক হতে লোকে দেখে তার কর্কশ ব্যবহার, তার শীর্ণ আকৃতি। তবু লোকে তাকে ভালোবাসে কারণ সময় অসময়ে বস্তীর সবাই তার কাছে উপকৃত হয়।

শ্যামলাল চেনে তার অন্তর, তাই সে কেবল বাইরের দিক দেখেই তার বিচার করে না। এই কর্কশ প্রকৃতির মেয়েটী সকলের আপনার হলেও সে যে কতখানি একা, তা শ্যামলাল জানে।

বস্তীর যেখানে যারই কিছু হোক, চন্দনা সেখানে অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়। শ্যামলালের যখন বসন্ত হয়েছিল, তার স্ত্রী তাকে একা ফেলে কোথায় পালিয়েছিল, কেউ তা জানে না। পঙ্গু রুগ্ন শ্যামলাল, বস্তীর কেউ তাকে সেদিন দেখে নি, চন্দনাই তখন প্রাণপাত সেবাযত্ন করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। সে কৃতজ্ঞতা শ্যামলাল ভুলতে

পারে না, তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই চন্দনাকে চিরদিন তার কাছে বাঁচিয়ে রাখবে।

কালুর ছেলের ভয়ানক ব্যারাম হয়েছিল, সেবা করেছিল চন্দনা এবং প্রাণপাত পরিশ্রমে ছেলেটীকে যমের মুখ হতে ফিরিয়ে এনেছিল। রমণ তার স্ত্রীকে দারুণ নির্য্যাতন করতো, চন্দনা দুর্ভাগিনী মেয়েটীর পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে রমণকে জব্দ করে ছেড়েছে, মেয়েটাও স্বামীর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করছে।

তাকে সকলেই একটু সঙ্কোচ করে চলতো, তাকে "ঝগড়াটী" নাম আড়ালে দিলেও তার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল সবাই।

শুধু এখানেই নয়—কলেও সে সকলের কাজ স্বেচ্ছায় করে দিতো। যে মেয়ে যখন যে কাজ পারতো না, সে কাজ সে করে দিতো এবং করতো বলেই সে দিনের শেষে অত্যন্ত বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়তো।

ঘরে বাইরে অপর্য্যাপ্ত খাটুনী দিন দিন তাকে রুক্ষ হতে রুক্ষতর এবং আকৃতিও তার শীর্ণ হতে শীর্ণতর করে ফেলেছিল। কেউ কেউ বলতো—"এত খাটারই বা' দরকার কি, এই শরীর নিয়ে কাজ না করাই ভালো—"

কাজ ছাড়বার কথা বললেই চন্দনা যেন চমকে ওঠে—তারপরেই বড় মলিন হাসি হাসে।

জীবনের অবলম্বন এই কাজটী ছেড়ে দিয়ে সে বাঁচবে কি নিয়ে? কাজ ছাড়বার কথা মনে হতেই তার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটে যায়, সে একেবারে অথই জলের মধ্যে পড়ে যাওয়ার কল্পনা করে। সব কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনটাও যেন শেষ হয়ে যায়—সে এই কামনাই করে।

শ্যামলাল কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে ভগবানকে ডাকে, চন্দনা মুখ বাঁকায়, ঘৃণার হাসি হাসে, ভগবান? হ্যাঁ, ভগবান নামে কেউ আবার আছে নাকি? ভগবান যদি থাকতো, সে যখন অত ডেকেছিল, কই তখন তো কান দিয়ে শোনে নি। তার ছেলেটা যখন মারা যায়, তার স্বামী যখন আণ্ডামানে যায়, কোথায় ছিল তখন ভগবান?

সব দিকেই সে ভালো—কেবল ভগবানের নাম শুনলেই সে মাথা ঠিক রাখতে পারে না; সেই অদৃশ্য দেবতার অস্তিত্ব সে মোটেই স্বীকার করে না, অতি কদর্য গালাগালি দিয়ে মনের সাধ মিটায়।

প্রতিদিন সে নিয়মিত সময়ে উঠে চায়ের জল বসায়—উনানের ধারে বসে খানিক ঝিমিয়ে নেয়, তারপর চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে কাজে যায়।

কলের কাজ নিয়মিত চলে, নিয়মিত ভাবে কুলিরা কাজ করে।

মান নাই, অপমান নাই—এরা কাজ করে যায়। সর্দারেরা গালাগালি দেয়, মাঝে মাঝে চড়চাপড়টাও পুরস্কার পাওয়া যায়, পদাঘাতও কদাচিত মেলে, তবু এরা কাজ ছাড়ে না—ছাড়তে পারে না। এরা জানে কাজ গেলে কাল এদের অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে- চোখের সামনে ছেলেমেয়েরা শুকিয়ে মারা যাবে- কোন পিতা তা সহ্য করতে পারবে?

শ্যামলালের সংসার নামে কোন বালাই নাই, একা মানুষ, কাজ করে, অবকাশ সময় লম্বা ঘুম দেয়। কথায় কথায় লম্বা লেকচার ঝাড়ে—"আমার আর কি, যেদিন কেউ একটা কথা বলবে, সেদিন টেনে এক চড় বসিয়ে দিয়ে চলে আসব।"

এই শ্যামলালই সেদিন বিনা কারণে প্রহৃত হয়ে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলে—আবার কাজ করতে লাগলো।

চন্দনা রুষ্টকণ্ঠে বললে, "বড় যে সহ্য করলে লালজি, চড় কিল খেয়ে সব মারটা বেমালুম হজম করলে?"

শ্যামলাল হেসে উত্তর দিলে, "কি করব বল চন্দনা, মনিব, ওরা যখন খেতে দিয়ে বাঁচায়, দুটো চড় কিল মারবে না? এই যে ছেলেপুলেরা যখন দুষ্টুমী করে—আমরা তাদের মেরে তবে না শাসন করি।"

চন্দনা কিন্তু সহ্য করতে পারে না। পুরুষ মানুষের এতটা সহ্যগুণ ভালো নয়, ওকে কি পুরুষত্ব বলে? শ্যামলাল যে জাঁকজমক করে, বীরত্ব জানায়, সেগুলো চন্দনার কাছে দারুণ অসহ্য বলেই মনে হয়। সে স্পষ্টই মুখের উপর বলে—"থাক থাক লালজি, বীরত্বের কথাগুলো বলো বাইরের লোকের কাছে, আমাদের কাছে আর জারিজুরি করতে এসো না—তোমার বিক্রম আমরা জেনেছি।"

শ্যামলালের কালো মুখ গভীর কালো হয়ে যায়, সে মুখে

কিছু না বললেও মনে মনে গজরায়। তবু শেষ রাত্রে চায়ের নেশা ছাড়তে পারে না—আর কানা চোখটাও তাকে কৃতঘ্ন হতে দেয় না।

দারুণ অবজ্ঞা—বিশেষ করে চন্দনার অবজ্ঞা শ্যামলাল সইতে পারে না; একদিন সে স্পষ্টই বলে বসলো—সে এ বস্তী ছেড়ে দিয়ে নূতন বস্তীতে চলে যাওয়া ঠিক করেছে।

চন্দনা মুখ বক্র করে বললে—"ভালো—"

কলে কাজ কর্‌তে গিয়ে শ্যামলাল খুব গম্ভীর হয়ে থাকে, চন্দনা যেদিকে থাকে—সেদিকেও যায় না।

সেদিনে ঝুড়ি করে জিনিস বইতে যেতে চন্দনা দেখতে পেলে বড়বাবু শ্যামলালকে খুব তিরস্কার কর্‌ছেন। কৌতূহলের বশে কান পেতে শুনতে পেলে—শ্যামলাল আজ কাজ করতে পারে নি। বড়বাবু কারণ জানতে চাওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলেছে—তার অসুখ হয়েছে।

সেদিন শ্যামলাল কাঁপতে কাঁপতে যখন নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো, তার অনেক আগে চন্দনা ঘরে ফিরেছে। শ্যামলালের খোঁজ নিয়ে জেনেছে—সে আসে নি, তাই উন্মুখ আগ্রহে তারই প্রতীক্ষা করছে। বস্তীর রামলোচন জানালে—আজ বড়বাবু শ্যামলালকে যা মার দিয়েছে—শ্যামলালের অস্থিপঞ্জর একেবারে চুরিয়ে দিয়েছে।

উৎসুক হয়ে চন্দনা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"হঠাৎ মারবার কারণটা কি।"

কারণ যা জানা গেল তা এই—

শ্যামলালের কাজে ত্রুটি হয়েছিল, তা নিয়ে বড়বাবু যখন তাকে ধমক দিয়েছিলেন, তখন যদি সে চুপ করে সয়ে যেতো, তাহলে তাকে এতটা প্রহার সহ্য কর্‌তে হতো না, কাজটাও এক কথায় যেত না।

শ্যামলালের কাজ গেছে—

বেচারা শ্যামলাল—

চন্দনা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো, তারপর আস্তে আস্তে শ্যামলালের ঘরে প্রবেশ করলে। শ্যামলাল একখানা কাঁথা দিয়ে আগাগোড়া ঢেকে শুয়েছিল। চন্দনা সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলে—"লালজি—"

শ্যামলাল উত্তর দিলে না।

চন্দনা তার জরতপ্ত ললাটে হাত বুলাতে বুলাতে ব্যথিত-কণ্ঠে বললে, "আজ যখন শরীর খারাপ হয়েছিল কাজে না গেলেই পারতে লালজি, তা হলে এ কাণ্ডটা হতো না, এতটা মারও খেতে হতো না।"

শ্যামলাল মুখের কাপড় সরালে—তার বেদনার্ত্ত মুখে মলিন একটু হাসির রেখা ফুটে উঠলো মাত্র।

সে বলতে পারলে না—হয় তো সে উত্তর করতো না—তিরস্কার সয়েও নিঃশব্দে কাজ করতো, কিন্তু পারেনি কেবল চন্দনার উপস্থিতিতে। চন্দনা তাকে কাপুরুষ বলে, ভীরু বলে, সেই অপবাদ দূর করবার জন্যই সে বড়বাবুর মুখের উপর উত্তর করেছে। মেয়ে হয়ে চন্দনা পুরুষ শ্যামলালকে ঘৃণা করবে এ শ্যামলালের অসহ্য।

রাতটা কোনখান দিয়ে কেটে গেল—বেহুঁস শ্যামলাল কিছুই জানতে পারলে না। সমস্ত রাত কে তার শিয়রে বিনিদ্র চোখে বসেছিল তাও রইলো তার অজ্ঞাত। শেষ রাতে কলের বাঁশির তীব্র আর্ত্তনাদে তার চৈতন্য ফিরে এলো, অভ্যাসবশেই ডাকলে—"আমার জন্যে একটু জল নিস চন্দনা—একটু চা দিস—"

তারপর আবার কখন ঘুমিয়ে পড়লো।

চন্দনা কাজে গেল না। সঙ্গিণীরা ডাকলে—"কাজ করতে যাবিনে চন্ননা—?"

একান্ত উদাসভাবে চন্দনা বললে, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না, থাক আজ—"

কাউকে বললে, "কি করে যাই? রোগীটা সারাদিন একা ঘরে পড়ে থাকবে, একটু জল চাইলে দেওয়ার লোকটী নেই। গা গতরের ব্যথায় মোটে নড়তে পারছে না, উঠে খাবেই বা কি করে?"

দুপুরে শ্যামলালকে দুধ সাগু জ্বাল দিয়ে খাওয়াতে গিয়ে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল—

"তুই কাজে যাস নি চন্ননা—?"

চন্দনা বললে, "আজ ছুটি নিয়েছি, কাল যাব লালজি।"

শ্যামলাল মুহূর্ত্ত মাত্র তার পানে চেয়ে রইলো, তারপর তার হাত হতে দুধ সাগু নিয়ে নিঃশব্দে খেয়ে পাশ ফিরে মৃদুকণ্ঠে বললে, "কাজটা ভালো করছিস নে চন্ননা। একে সর্দ্দারের রাগ রয়েছে তোর পরে, তাতে এই যে কাজে যাস নি—সে রেগে হয় তো—"

মুখ বিকৃত করে চন্দনা বললে, "এঃ, রেগে তো আমার সবই করবে। বেশী বাড়াবাড়ি করে তো তার কথা সব

বড়বাবুকে বলে দেব। লোকটা ভারি পাজি লালজি, আমায় যা না তাই বলেছে। আমি ওর কোন কথায় কান দেই নে বলে মনে করেছে—এর কারণ তুমি ; সেইজন্যে পাকে প্রকারে তোমায় এখান হতে তাড়ানোর চেষ্টা করছে।"

শ্যামলাল দুই কনুয়ে ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠে বসলো—"আমায় একথা আগে জানাস্‌নি কেন চন্না, সর্দ্দারকে একবার দেখে নিতুম—"

চন্দনা জোর করে তাকে শুইয়ে দিয়ে বললে, "কি তুমি তাকে দেখতে লালজি—মারামারি করতে তো ? তাতে তোমার অবস্থা হতো আমার স্বামীরই মতো—হয় তো রাগের মাথায় তাকে খুন করে ফেলে চলে যেতে দ্বীপান্তরে। থাক না, অতটা বীরত্ব আর নাই বা দেখালে।"

শ্যামলাল নিস্তব্ধে পড়ে থাকে।

দুদিন না যেতে সর্দ্দার কারণ জানতে এলো—ভয় দেখালে—এরকম ভাবে চন্দনা যদি শুধু শুধু কাজ কামাই করে, তাকে কলের কাজে জবাব দেওয়া হবে।

শান্তমুখে চন্দনা কেবলমাত্র বললে—"বেশ—"

রুদ্ধকণ্ঠে সর্দ্দার বললে, "তারপর কি করবি ?"

চন্দনা শান্তকণ্ঠে বললে, "কেন, কলে কাজ না করলে মানুষ খেতে পায় না নাকি ? পথ তো রয়েছে, ভিক্ষা করে খাব।

রুদ্ধ রোষে ফুলতে ফুলতে সর্দ্দার বললে, "এটা কুলি বস্তী, ভিখিরীদের এখানে জায়গা হবে না।"

অবহেলার ভাবে চন্দনা উত্তর দিলে, জানি, "পথ আছে, পথের ধারে গাছতলা আছে—থাকার জায়গার অভাব ভিখিরীর হয় না—কথাটা মনে রেখো সর্দ্দার।"

সর্দ্দার চলে গেল।

বস্তির সবাই জানতে পারলে—চন্দনার কাজ গেছে। বড়বাবু তবু অনেক দয়া করে নন্দলাল মিস্ত্রিকে দিয়ে বলে পাঠালেন—যদি চন্দনা এখনও এসে তাঁর হাতে পায়ে ধরে, তিনি তাকে কাজ দিতে পারবেন।

এর মধ্যে শ্যামলাল অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছে, তার সেবা-শুশ্রূষা আর না করলেও চলে।

কাজের নেশা চন্দনাকে পেয়ে বসেছে, ঘর তাকে বাঁধতে পারছিল না ; তাই সেদিন শেষ রাত্রে উনানে চায়ের জল বসিয়ে সে শ্যামলালকে জানালে—"আজ আবার কাজে যাচ্ছি লালজি—।"

শ্যামলালের মুখখানা কালো হয়ে উঠলো—মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললে, "অত অপমানের পরেও আবার ওখানে কাজ করবি চন্না—?"

চন্দনা বললে, "কিন্তু আমি তো একা নই লালজি—তোমার যে কাজ গেছে—"

"কেবল আমার জন্যে—?"

শ্যামলালের কথায় চন্দনা বললে, "তাই।"

তাড়াতাড়ি সে বার হয়ে গেল।

দুপুরে এক ঘণ্টার জন্য ফিরে এসে পান্তা ভাত চারটী গলাধঃ করে যাওয়ার সময় শ্যামলালের সঙ্গে একটীও কথা হতে পারলে না।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখলে শ্যামলাল পোঁটলা-পুঁটলী বেঁধে যেন কোথাও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

বিস্মিতভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে, "একি লালজি, তুমি যাচ্ছো কোথায় ?"

ম্লান হেসে শ্যামলাল উত্তর দিলে—"চলে যাচ্ছি চন্না। তোকে বলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছি, নচেৎ এতক্ষণ চলে যেতুম।"

চন্দনা জিজ্ঞাসা করলে, "হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে ?"

শ্যামলাল বললে, "তোকে মুক্তি দিচ্ছি। আমার ভরণ-পোষণের জন্যে তোকে যে ওদের লাঞ্ছনা সয়ে কলে কাজ করতেই হবে—এ আমার বড় অসহ্য, সেই জন্যে আমি তোর পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালুম—আর তো আমায় দোষী করতে পারবি নে।"

একটা লাঠির দুইদিকে দুইটী পুঁটুলি বেঁধে লাঠিটাকে ঘাড়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো।

চন্দনা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার তো থাকবার কোন জায়গা নেই—জানি, কোথায় যাবে ?"

শ্যামলাল উদাসকণ্ঠে উত্তর দিলে—"দেখি—ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন—।"

ধীরপদে সে বার হয়ে গেল।

নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ভগবান—

আজও সেই ভগবান। যে ভগবান চন্দনার সব কেড়ে নিয়েছে, চন্দনার সাজানো সংসার পুড়িয়ে ছারখার করেছে, —শ্মশান করেছে, আজও সেই ভগবানের নাম -"

শ্যামলাল যদি ফিরে চাইতো, দেখতে পেতো—অসহ্য শোকাবেগে চন্দনা মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে।

এ মুক্তি তার অসহ্য।

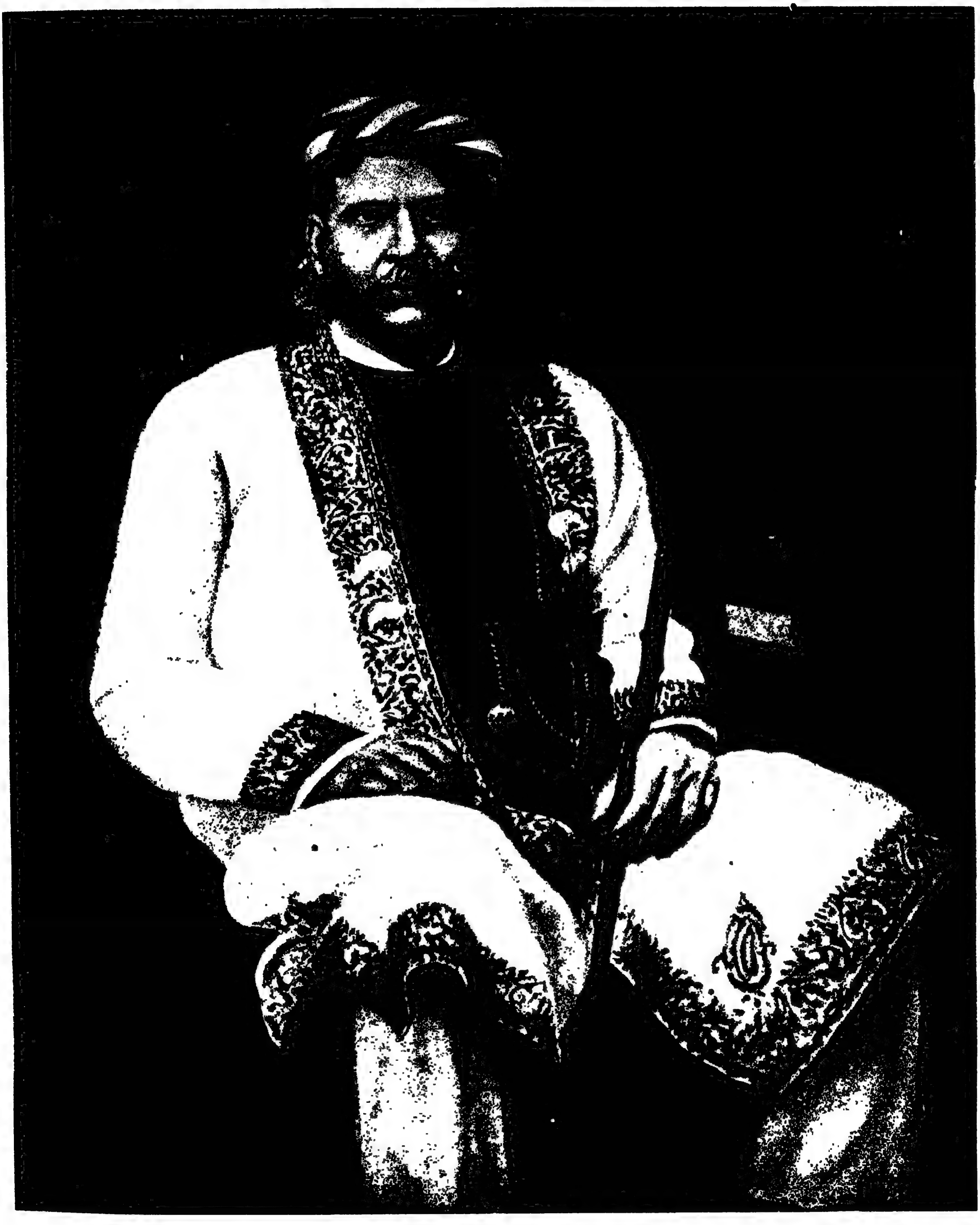

রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

মৃত্যু—২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ

রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

ডক্টর কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এ, বি-এল, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

দানবীর রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কলুটোলা পল্লীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতামহ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় মতিলাল শীল।

তাঁহার ভিতরে দানের যে একটা সহজাত প্রবৃত্তি ছিল, তাহা তাঁহার পিতৃ ও মাতৃকুলেরই বৈশিষ্ট্য। তাঁহার পিতৃকুলে স্বনামধন্য দাতা নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয় মৃত্যুর পূর্ব্বে জনহিতকর কার্য্যে বত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। শ্রীরামপুরের সন্নিকটস্থ মাহেশ-বল্লভপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয় এবং কাঁচড়াপাড়ার দেব-মন্দির আজও তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কলিকাতায় গঙ্গাতীরে স্নানার্থীদের জন্য নির্ম্মিত ঘাটও তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

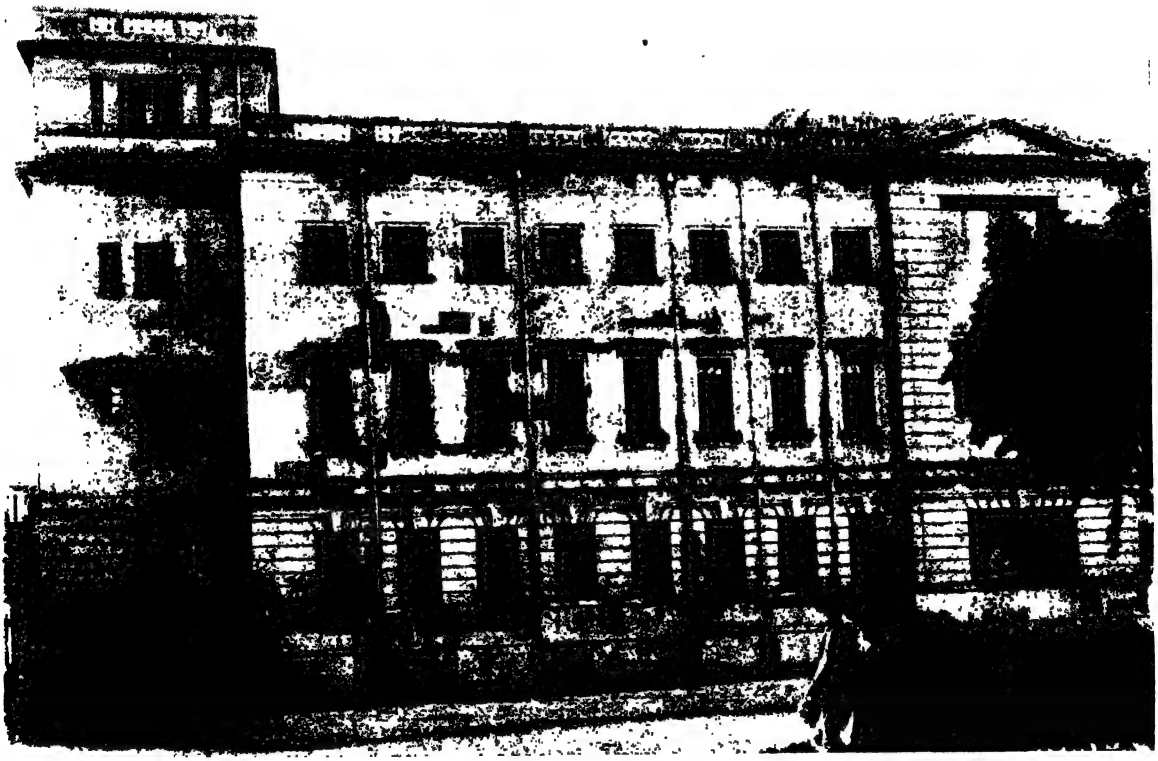

রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক চেরিটেবল ওয়ার্ড, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ

দেবেন্দ্রনাথের পিতা অদ্বৈতচরণ মল্লিক মহাশয়ও দুঃখীর দুঃখমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি মতিলাল শীল মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যাকে বিবাহ করেন। পিতৃকুলের এই দানশীলতার সহিত মাতৃকুলের ধারা সম্মিলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে দানের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে।

তাঁহার মাতামহ মতিলাল শীল মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বেলঘরিয়া ও দুর্গাপুরের দেবায়তন এবং অতিথিশালা, গঙ্গার ঘাট, শীলস্ ফ্রি কলেজ প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই সমস্ত দানের জন্য তিনি বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

দেবেন্দ্রনাথ বাল্যে হিন্দু স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেন। উনিশ

বৎসর বয়সে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরের হরনাথ মল্লিকের পৌত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বৈশ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি—ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে তিনি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, হাতে-কলমে কাজ না শিখিলে ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করা যায় না। সেই উদ্দেশ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুবিখ্যাত চা-ব্যবসায়ী মেসার্স জে, টমাশ কোম্পানীর আফিসে শিক্ষানবীস-ভাবে ভর্ত্তি হইলেন। এইখানে কাজ করিতে করিতে যখন তিনি বুঝিলেন যে, নিজেই স্বাধীনভাবে ব্যবসা-পরিচালনা করিতে সমর্থ—তখন তিনি উক্ত আপিস পরিত্যাগ করিয়া 'ডি. এন্. মল্লিক এণ্ড কোং' নাম দিয়া চায়ের ব্যবসা খুলিলেন। সে সময়ে ভারতীয় চা এদেশে তেমন প্রচলিত হয় নাই, সর্ব্বত্র চীন দেশের চা-ই ব্যবহৃত হইত। দূরদর্শী দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতীয় চা-এর প্রচলন করিতে পারিলে ব্যবসা ভালভাবেই চলিবে। তিনি কলিকাতা ও বোম্বাই-এর হাসপাতালসমূহে চীনদেশীয় চা-এর পরিবর্ত্তে ভারতীয় চা চালাইতে সমর্থ হন। তাঁহার চেষ্টায় দেশীয় লোকও ভারতীয় চা-এর অনুরাগী হইয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে প্রভূত আয় হইতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে চায়ের বাজারে মন্দা পড়ে এবং এই ব্যবসায়ে বহুলোক অবতীর্ণ হন। তারপর চাহিদা অপেক্ষা উৎপন্ন মালের পরিমাণ বেশী হওয়ায়-- দেবেন্দ্রনাথ এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

চায়ের যাহাতে বহুল প্রচলন হয়, তাহার জন্য তিনি তৈয়ারী চা প্রতি কাপ এক পয়সা হিসাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতৎসত্ত্বেও তাঁহার চেষ্টা সফল ও লাভপ্রসূ না হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চায়ের ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

চায়ের ব্যবসায় হইতে অবসরগ্রহণ পূর্ব্বক তিনি জমি ও বাসগৃহের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাসের জন্য একটি বড় বাড়ীকে ছোট ছোট বিভিন্ন অংশে (flat system) বিভক্ত করিয়া তিনি ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রথার প্রবর্ত্তনে তিনি বিশেষ লাভবান হন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার দমদমার বাগানবাড়ীতে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও অতিথিশালা স্থাপন করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান চারি বৎসরকাল চলিয়াছিল। এখানকার অতিথিশালায় প্রতিদিন ১২০।১২৫ জন লোক অন্ন পাইত। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের অবহেলা ও অমনোযোগিতায় বিরক্ত হইয়া তিনি এই দুইটি প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।

পিতার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব হইতেই তিনি সুবর্ণবণিক্ চ্যারিটেবল এসোসিয়েশন-এর সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সভার ধনভাণ্ডার হইতে সুবর্ণবণিক্-জাতীয় বিধবা, অনাথ বালকবালিকা ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে অর্থ-সাহায্য করা হইয়া থাকে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সম্পাদক থাকা কালে এই সমিতির ধনভাণ্ডারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া স্বজাতিবর্গের মধ্য হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন সংগ্রহ করেন। পরে তিনি এই সমিতির সহকারী সভাপতির পদে বৃত হন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে দাতব্য ঔষধালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। যাহাতে এই ঔষধালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহে কোনরূপ বাধা না হয়, তজ্জন্য তিনি বার্ষিক বার শত টাকা দানের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত হাসপাতালে ১৮টি বেডের (শয্যা) জন্য মাসিক ২২৫৲ টাকার ব্যবস্থাও তিনি পাকা করিয়া দেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এতদুপলক্ষে যে মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে কলেজ-হাসপাতালের সভাপতি স্বর্গীয় কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ইংরেজীতে বলেন—“The institution has just been enriched by the gift of a large and handsome building facing Belgachia Road which is the generous gift of one of the most charitable citizens of Calcutta, Babu Debendra Nath Mullick.”

গভর্ণর রোণাল্ডসে বাহাদুরও বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়া বলেন—“It was my privilege after laying the foundation-stone of the new Hospital block a few minutes ago to perform another ceremony, namely, that of opening the

Debendra Nath Mullick Charitable Dispensary. By his splendid gift which includes not merely the building which I have opened, but what is even more important, an endowment which will provide for the carrying on of the work of the dispensary, Babu Devendra Nath Mullick has added one more to the many philanthropic works for which the people of Bengal are indebted to him, and has earned for himself an honoured place in the role of benefactors of the institution. We thank him for the gift itself and thank him even more for the example which he has thus set.”

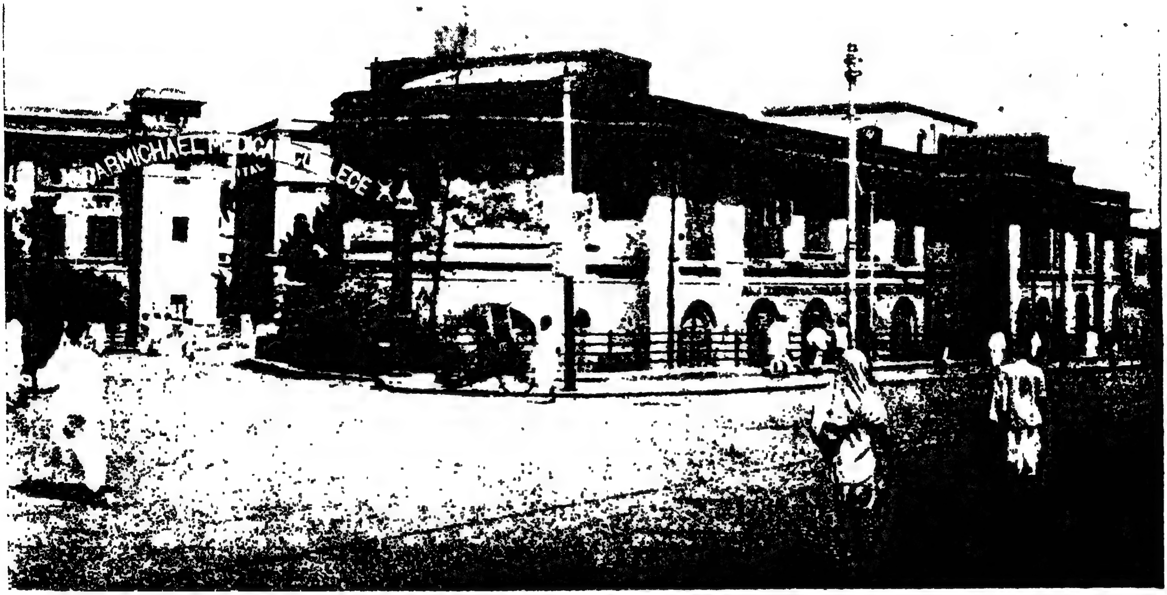

রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক দাতব্য চিকিৎসালয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা

এই চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বে আর, জি, কর মেডিক্যাল স্কুল নামে অভিহিত হইত। এই স্কুলকে মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করিবার প্রস্তাব সম্পর্কে নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ছয় লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু এই সর্ত্ত থাকে যে, এক বৎসরের মধ্যে জনসাধারণের নিকট হইতে বাকী তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ দেবেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হইলে তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে ট্রাষ্ট ডীড সম্পন্ন করিয়া বাকী তিন লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁহার এই দানে বিদ্যালয়টি কলেজ-রূপে পরিণত হইতে সমর্থ হয়।

রেভারেণ্ড ওল্ডরিভ্ ভারতীয় কুষ্ঠ মিশনের সম্পাদক। ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পত্নী মহোদয়া কুষ্ঠ-মিশনের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে ঐ মিশনের সাহায্যের জন্য সংবাদ-পত্র মারফতে জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচার করেন। এই আবেদন পাঠ করিয়া সহৃদয় দেবেন্দ্রনাথ কুষ্ঠ-মিশনের সম্পাদকের নিকট আশীটি কুষ্ঠ-রোগীর জন্য মাসিক দুইশত টাকা দানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে লেডী চেম্‌স্‌ফোর্ড মহোদয়া কুষ্ঠ-মিশনের বার্ষিক সভায় বলেন—“উদার-হৃদয় দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক কুষ্ঠমিশনের কলিকাতা শাখায় প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন।”

এতদ্ভিন্ন মাদ্রাজের ভেদাথোরাসেলুর নামক স্থানে একটি কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণের জন্য তিনি এককালীন ছয়হাজার টাকা দান করেন। রেভারেণ্ড ওল্ডরিভের মারফত তিনি বাঁকুড়া

অন্নের চেষ্টায় ঘুরতে হয়। এখানে তো পূর্বের মত আসা তাঁর আর সম্ভব নয়, কষ্ট জানানও ততোধিক কঠিন ···”

“থামো থামো—ছেলেমানুষের মত বোকো না। না জানালে লোক জানবে কি কোরে?”

নরসিংবাবু হাসি টেনে বললেন—“আমাদের বৈঠকে গ্রামের কোন্ বাড়ির কোন্ কথাটি অজানা থাকে, তা তো জানি না!”

বিশ্বনাথবাবু বললেন—“সে জানায় কাজ হয় না। বছর ফিরতে চললো—তারা কি না খেয়ে আছে—”

নরসিংবাবু বললেন—“দেখলে তো সেই রকমই মনে হয়। সে রহস্যপ্রিয় পরোপকারী মতি মুখুজ্যেকে আর চেনা যায় না।—দূরে দূরে সরে সরে থাকেন—”

“পরোপকারী!”

“নয় কিসে বলুন? কাজে কর্মে, বিপদে আপদে, রোগির সেবায়, আনন্দদানে—গ্রামে ওঁর মত কয়জন মেলে! আবশ্যকে ওরূপ স্বতপ্রস্তুত শ্মশানবন্ধু কয়জনই বা বেরয়! শিক্ষিত ধনী, উকীল, বুদ্ধিমান, চাকুরে অনেক আছেন—তাঁদের মধ্যে যে পরোপকারী নাই তা আমি বলছি না। তবে আমাদের পরোপকার প্রায়ই উপদেশ দানে—”

প্রতাপবাবু একটু রুষ্ট ভাবেই বললেন—“বিশ্বনাথ, তুমি থামবে না কি, যদি কেউ কারো অযাচিত সহায়ক হয়, ভার নেয়, তাকে বাধা দাও কেনো?”

নরসিংবাবু সবিনয়ে বললেন—“ভার নেবার মত বড় কথা আমি তো উচ্চারণ করিনি খুড়োমশায়, সেটা মধ্যবিত্তের অপমৃত্যুর মতই লাগে। তাই সে পরিচিত আপন জনের কাছে অবস্থা জানাতে পারে না—সকল কষ্টই সহ্য করে।”

প্রতাপবাবু বললেন—“তাই বা করা কেনো, এখন তো চারদিকে ‘জুটমিল্’ খুল্‌ছে, বিদেশীরা এসে বেশ দু’পয়সা রোজগারও করছে, তাদেরও স্ত্রীপুত্র আছে—”

নরসিংবাবু বললেন—“ক্ষমা করবেন, চূড়ামণি বংশের ভদ্র, মধ্যবিত্তের পক্ষে সেটা বোধ করি সহজসাধ্য নয়। আপনাদের ছেড়ে বিদেশে গেলে মুখুয্যে মশাইও চেষ্টা পেতে পারেন, কিন্তু আজন্ম যিনি আপনাদের একজন ছিলেন, এখন তাঁর পক্ষে এ শরীরে সে শ্রমও বোধ হয় সম্ভব হবে না।”

অম্বিকবাবু বললেন—“থাক্, রাত হয়েছে, মতির দৌড়টা দেখা যাক না।”

সকলে উঠলেন। নরসিংবাবু নীরবে ভাবতে ভাবতে বাড়ী গেলেন—“যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন্।”

৩

মতি মুখুয্যে নিজ সমাজের বা নিজ গাঁয়ের লোকের দ্বারস্থ হ’তে পারতেন না। ভোর না হ’তে দূর গাঁয়ে চলে যেতেন,—কোনো প্রকারে দুটি অন্নের উপায় করতে। যে গাঁয়ে পরিচিত কোনো ‘বাবু’ আছেন, সে গ্রাম বাদ্ দিতে বাধ্য হ’তেন—নানা কারণে। কৃপার আঘাতের চেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত আর নাই।

যে গ্রামে কৃষক ও গোয়ালদের বাস, সেই সব শ্রমিক-গৃহস্থবহুল গ্রামেই তিনি যেতেন। তাঁর সহাস সুমিষ্ট সত্যবাদিতা ও অমায়িক আলাপে—সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো। তাঁর কাছে তারা মেয়ে-পুরুষে রামায়ণ মহাভারত আগ্রহের সঙ্গে শুনতো—আরব্য উপন্যাসের গল্পও শুনতো। ভদ্রলোককে আপন জনের মত পেয়ে তারা যেন একটা অজানা সুখ উপভোগ কোরতো। কারণ, তাঁতে জাতির বা শিক্ষার ঝাঁজ ছিল না, দুঃখ দৈন্যের কাঁদুনিও ছিল না। তাঁকে তারা অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে কিছু না খাইয়ে ছাড়তো না। সন্ধ্যার পর ফিরতেন—তাদের দু-একজন—চাল, ডাল, কলাই, গুড়, দুধ, ফল মূল প্রভৃতি ক্ষেতের জিনিষ নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেতো—অতি কুণ্ঠার সহিত। তার মধ্যে হিতসাধন বা দয়ার ভাব ছিল না। কেনা জিনিষ নয়—ক্ষেতের জিনিষ—‘না’ বলবার অবকাশ দিত না।—নিত্য এক গ্রামে যেতেন না, যেতে বিলম্ব হ’লে সকলেই খোঁজ নিত—অপরাধীর মত। তাঁকে না পেলে, তাদের যেন সুখ ছিল না।

এই ভাবে বৎসরাধিক কেটে গিয়েছে। কিন্তু নিয়মিত দু-তিন ক্রোশ যাতায়াতে তাঁর শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের ভালোবাসা ও অনুরোধ তাঁকে টেনে নিয়ে যায়, নিজেই থাকতে পারেন না। দু-তিন দিন গায়ে বেদনা ও জরভাব সত্ত্বেও সেদিন বেরুতে হয়েছিল। কোনো প্রকারে গ্রামে পৌঁছে শুয়ে পড়েছিলেন—বেহুঁস।

সে গ্রামের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—বৈদ্যের কাজ করেন।

দেখে বললেন—"রোগ কঠিন, বোধ হচ্ছে বসন্ত বসে' গিয়েছে, ওঁকে গাড়ি কোরে এখনি বাড়ী পৌঁছে দাও। সেখানে ভালো চিকিৎসক থাকা সম্ভব। দেরী কোরো না।"

গ্রামে সহসা বিষাদের ছায়া ছেয়ে গেল। মেয়েরা দলে দলে এসে মুখুয্যে মশার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে চোখ মুছলে, ছেলেমেয়েদের মাথাও মুখুয্যের পায়ে ঠেকলো। অতি কাতরে মেয়েরা পুরুষদের জানালে—ঠাকুরকে বাঁচানোই চাই। ঘরে ঘরে সবাই মায়ের পূজার মানসিক করলে।

পুরুষেরা নীরব, কি করবে ভেবে পায় না। একখানি গরুর গাড়িতে খড় বিছিয়ে বিছানা পেতে তাতে মুখুয্যে মশাইকে অতি যত্নে শোয়ানো হোলো, আর একখানি গাড়িতে কিছুদিনের মত চাল ডাল গুড় প্রভৃতি বোঝাই করা হোলো।—মুখুয্যের একটু সংজ্ঞা এসেছিল, কষ্টে হাত তুলে সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন—"ভেব না, আমি তোমাদের মধ্যে ভগবানকে পেয়েছি, তিনি তোমাদের মঙ্গল করবেন। আমার তোমরা রইলে—" আর বলতে পারলেন না। সকলে কেঁদে ফেললে। গাড়ি ছেড়ে দিলে। মেয়েরা সঙ্গ নিয়েছিল, অনেক কোরে ফেরানো হোলো।—এত বড় আত্মীয় বহু ভাগ্যে মেলে।

গাড়ি যখন বাড়ির সন্নিকট হোলো, মুখুয্যের তখন বিকার-মিশ্রিত জ্ঞান হয়েছে।

গাড়ি আসতে দেখে—দু-একজন আত্মীয় ও জনকয়েক ভদ্রলোক—বিশ্বনাথবাবু, অম্বিকবাবু প্রভৃতি সাগ্রহে চাষীদের জিজ্ঞাসা করলেন—"গরুর গাড়িতে কি হ্যা—কে এলো?…"

"আমি এসেছি দাদা, গাড়ি চড়াটা ভাগ্যে ছিল, হয়ে গেলো। উঃ জল!"

"জল কেনো?"

"জলই অনেকদিন দয়া কোরে রেখেছিলেন—যাবার সময় আর বেইমানী করব না। উঃ!"

আমাদের মতি মুখুয্যের কথাবার্তা চিরদিনই এইরূপ সরস।

চাষীরা তাঁকে বাড়ির মধ্যে দিয়ে এলো। আর দশটি টাকা মায়ের পায়ে দিয়ে প্রণাম কোরে বলে এলো—"আমরা তোমার ছেলে মা, রোজই খবর নিয়ে যাবো। যা দরকার হয় বলবেন। ভালো ডাক্তারকে দেখান্, খরচ আমরা দেবো—"

বাইরে এলে ভদ্রেরা জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে—"বাবুর প্রতি মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে।—"

'বসন্ত' হয়েছে শুনে কয়েকজন শিউরে উঠে অলক্ষ্যে সরে গেলেন। বলে গেলেন—"awfully contagious! কত দিন বারণ করেছি, ছোটোলোকদের মধ্যে যাসনি। কেমন বদ অভ্যাস, তাদের সঙ্গে মিশতেই ওর ভালো লাগে। ফলে এই ভীষণ রোগটি এনে গ্রামে ঢোকালে! শুনতে পাচ্ছিলুম--চাষীর গাঁয়ে গিয়ে এর দোর ওর দোরে ভিক্ষে করে। কেনো—আমরা কি নেই!—"

মুখুয্যের আট-নয় বছরের ছেলে দীনবন্ধু উঠানে হতভম্বের মত একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বনাথবাবুর ধমক্ শুনে চমকে কেঁপে উঠলো—"অত বড় ছেলে, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? যা, শীগ্গির রাজকুমার ডাক্তারকে খবর দে, সেখানে ধারে কাজ হবে, ডেকে আন্!"

উঠানের সামনের ঘরেই মুখুয্যে যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে 'জল জল' করছিলেন। বিশ্বনাথবাবুর কথা কানে যাওয়ায় বলে' উঠলেন—"ছেলেটাকে এখন কোথাও আর পাঠাবেন না দাদা—ওর বড় কাজের সময় এসে পড়েছে। মা যদি কৃপা করেছেন, ডাক্তার ডেকে এ অপদার্থকে আর টেনে রাখবার কষ্ট নেবেন না। বড় কষ্ট পেয়েছি, অনেক ছুটেছি দাদা, আর শক্তি নেই যে ছুটাছুটি করি। মা ঠিক্ সময়েই দেখা করেছেন। তাঁর ভুল হয় না। যদি এসেছ মা, ভদ্রঘরের এ লুকিয়ে লুকিয়ে কান্না—আর দেখিয়ে দেখিয়ে হাসি—থামিয়ে দাও—এ জুচ্চুরি আর পারি না মা—জল্!"

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই অম্বিকবাবু ও বিশ্বনাথবাবু সরে পড়েছিলেন।

তিন দিনের দিন অবস্থা খুবই খারাপ, আশার আর কোনো চিহ্নই নেই। চাষীরা নিত্যই খবর নিতে আসে, আজও পাঁচ-সাতজন উপস্থিত ছিল।

নরসিংহবাবুও আসেন। তিনি বললেন—"আপনার দীনবন্ধু আর অজিতের লেখাপড়ার ভার আমার রইলো দাদা, আমিই সেটা নিলুম।"

পরিবার পায়ের উপর পোড়ে কেঁদে উঠলো—"বড় কষ্ট পেয়েছ। আর পাবে না—'আমি মোলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" চাষীদের দিকে দেখিয়ে বললেন—"ভগবান আমাদের এতো ছেলেমেয়ে দিয়েছেন, আমি এদের মধ্যেই তাঁকে পেয়েছি—এরা রইলো ‥"

তারা রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো—"আপনি যে আমাদের সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন! ··· আমাদের জোটে তো মায়েরও জুটবে, কাচ্চাবাচ্চাদেরও জুটবে।"

—"তবে আর কি! নারায়ণ!···"

শেষ।

কুমারীশ একটি কথাও না কোয়ে নীরবে বাড়ির দিকে ফিরলো।

"গুজব-সম্রাট!"

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর,
দ্বীপ-দ্বীপান্তর
দিকেদিকে যাঁর রাজ্যপাট
তিনিই সম্রাট—
তোমরা শুধুই জানো এই;
হয়ত একথা জানা নেই,
সম্রাট জাপানে এক আছে।
চীনেও একদা বহিয়াছে
সম্রাটের ধারা!
আর, যারা—
'মুকুট বিহীন রাজা,'
সহিয়াছে কারাগারে শাজা,
রাজনীতি আন্দোলনে মাতি,
কেহবা চড়িয়া কভু হাতী
অথবা বৃষভ-বাহী রথে
একদা জনতাপূর্ণ পথে,
ঘুরিয়াছে পুরুষ বিরাট,
'গণ-সম্রাট'
নাম দেয় তাহাদের লোকে।

রঙ্গ-মঞ্চে দর্পে যারা ঢোকে
হুঙ্কারে শ্রবণে ধরে ফাট,
তারা নাকি নাট্যের সম্রাট!
সাহিত্যেও শুনি ছোট-বড়
হয়েছিল জড়
সম্রাট ক'জন;
এ ছাড়াও এদেশে এমন
আছে একজন
নাম যার তিনকড়ি পাল;
কল্পনা বিশাল,
রসনা তালুতে বারে বারে
সংযোগ করিয়া নির্ব্বিচারে
শোনায় সে বিবিধ সংবাদ
যার যাহা শুনিবার সাধ!

সবাই প্রসন্ন মনে তাকে
'গুজব-সম্রাট' বলি ডাকে।
অজানা কিছুই তার নাই
যে কোনো খবর যার চাই
দিতে পারে 'গুজব-সম্রাট'!
এখনো শোনেনি যাহা দিল্লীতে স্বয়ং বড়লাট,
বিশ্বদূত বেচারা 'রয়টার'
যে বার্ত্তার পায়নি 'বেতার'
'রেডিও'তে হয়নি ঘোষণা—
সে খবরও বহু আগে শোনা!

'হোলিউড' কি ছবি তুলিছে,
আদালতে নালিশ ঝুলিছে
'লস্ এঞ্জেলেসে' কার নামে ;
কোন গণ্ডগ্রামে
কী রোগে কে গেল মারা,
দেউলিয়া হ'ল কারা,
মোটা সুদে টাকা খাটে কার ;
কার কাছে কে নিয়েছে কত লাখ ধার,
কে কবে কাহারে ল'য়ে জ্যোৎস্না রাতে
গিয়েছিল লেকে
এসেছে সে নিজে চোখে দেখে !
সিনেমা ফেরত কারা ঢোকে 'ফারপো'য়
জমায় 'কাফে'র 'বার' ম্যাটিনীর শো'য়,
কার সাথে কতদিন গোপনে চলেছে কার 'লভ্'
'গুজব-সম্রাট' জানে সব !
মেয়েটি দেখিতে কার ভালো
'ভদ্রাসন' কাদের বিকালো,
কোথায় বেধেছে জোর
ঘরোয়া-বিবাদ ঘোর
'রেস্' খেলে কে দাঁড়াল পথে,
পুরী চলে গেল কারা রথে ;
শ্রীমতীর নাচ কোথা শেখা,
রবিঠাকুরের হালে লেখা
একালের নবতর ছড়া !
'স্কটিশে' উচিত কিনা পড়া,
'আই-এফ-এ'র কী যে পরিবেশ—
তিনকড়ি জানে সবিশেষ !

'মহাসভা' মহাশয় যত
প্রচারে বিব্রত,
লীগ-বন্ধু মিতালীর-দায়,
বুঝি প্রাণ যায়
কোথা গান্ধী—কোথা 'এ্যাডহক্' !
তিনকড়ি বকে বক্‌বক্ !
লড়াইয়ের খবর ভারতে
'সেন্সার্' না হ'তে
তিনকড়ি সব আগে পায়,
ভয়ে ভয়ে গোপনে জানায়

ডেনমার্ক কত বড় 'ফুল'
নরওয়ের কী হয়েছে ভুল ;
'হেগের' হাঙ্গামা
থাক চাপা ধামা
ভারতের ভয় নাই কিছু
রাশিয়া আসেই যদি পিছু,
মাথা করি নীচু
যেতে হবে সীমান্ত ছাড়িয়া,
পাকাফল খেতে আর হবে না পাড়িয়া !
চীনেরে খেদায়ে যদি খাঁদারাও আসে
মার্কিণের গ্রাসে
মরিবে জাপান,
তোমরা চা-পান
কবে যাও সুখে ;
মিশরের মুখে
মুসোলিনী বাড়াইলে হাত
নীল নদে হবে কুপোকাৎ !

জানো তো এদের দলে নিজে আছে 'পোপ,'
'কৈসারের' গোঁফ
ঝুলাইয়া দিয়াছিল যেমন সেবার,
তেমনি এবার
হিট্‌লারও হয়ে যাবে ঢিট্
প্রদর্শন করিবেই পিঠ !
যে দলে স্বয়ং জনার্দ্দন
তারা কি কখনো হারে রণ ?

মহাসমরের পরে

শ্রীবিজনকুমার সেনগুপ্ত এম, এ,

প্রায় পঁচিশ বছর পরে আজ আবার ইয়োরোপে মহাসমর আরম্ভ হয়েছে ; কিছুদিন এর গতি ছিল স্তিমিত, এর পরিধি ছিল অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ — কিন্তু আজ ইহা দাবাগ্নির মত ইয়োরোপের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হয়, সমস্ত ইয়োরোপকে গ্রাস না ক'রে আর এর বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি হবে না। কিন্তু শুধু ইয়োরোপের সমরক্ষেত্রেই কি রুদ্রের ধ্বংসলীলা শেষ হবে ? এশিয়া, আফ্রিকা—এক কথায়, সমস্ত দুনিয়ায় কি তা ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে না ? জোর ক'রে কে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ? তবু মনে হয় যে তার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। আর যদি অবাস্তব আশাবাদীর মত কল্পনা ক'রে নেওয়া যায় যে, ইয়োরোপের সমর এশিয়া আফ্রিকার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছুবে না, তবু বলতে হবে এই বিপুল প্রলয়কাণ্ডের পরে পশ্চিমের ভাবধারা এবং জীবন-পদ্ধতিতে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন সংঘটিত হবে তার ফলে প্রাচ্যদেশসমূহও বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। কারণ, বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে স্থান এবং কালের দূরত্ব ক্রমে ঘুচে যাচ্ছে, জাতিগত বিচ্ছিন্নতা লুপ্ত হচ্ছে—সমস্ত মানবসমাজ একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ছে।

এই বিপুল ধ্বংসলীলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে মানব-সমাজের ভাবী পুনর্গঠনের কল্পনা অলীক বলে মনে হতে পারে। ইয়োরোপের ক্রমবিস্তৃতমান সমর-ক্ষেত্র থেকে আমরা বহু দূরে আছি, তার সর্ব্বনাশা রূপ আমরা চোখে দেখি না। কিন্তু কল্পনার নেত্রে তা দেখতে পারি এবং দেখে শিউরে উঠি। কিন্তু তবু যখন মানব-মনের স্বাভাবিক করুণার উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হয়ে আসে তখন ভাবি, দুঃখ ক'রে কোন লাভ নেই, বহুদিনের সঞ্চিত অন্যায় ও অবিচার এই ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই তার মুক্তি খুঁজবে, এরই মধ্য দিয়ে আবার মানব-সমাজ তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে। মার্কিণ মনীষী এমারসন বলেছিলেন, There is a sure law of compensation in this universe. হ্যাঁ, বর্ত্তমান এই রক্ত-স্নানের মধ্য দিয়ে সেই law of compensation-ই কার্য্যকরী হয়ে উঠছে। তবু, যে ভাবেই হোক্, এই যুদ্ধের একদিন সমাপ্তি হবে। তার পর ? তার পরে সমগ্র মানব-সমাজকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে যে, কি ভাবে পৃথিবী থেকে চিরতরে যুদ্ধের অবসান হবে, কি ভাবে আবার জগতে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে। এই প্রশ্নের সমাধান করতে না পারলে মানব-জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য, তার যুগে যুগে গড়া সভ্যতা এবং সংস্কৃতি এক নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে।

বিগত মহাযুদ্ধের পরেও মানুষের আর্ত্ত কণ্ঠ থেকে শান্তির বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। ইয়োরোপের শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ চেয়েছিল দুনিয়াকে সংঘর্ষের কালিম-মুক্ত করতে, জগতে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। যুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন মৈত্রীর বাণী নিয়ে ইয়োরোপে গেলেন, তখন তাঁর কি বিপুল অভ্যর্থনা ! সেই অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে তদানীন্তন পাশ্চাত্য মনের শান্তি-কামনা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আজ তাকে ভাবোচ্ছ্বাসের বুদ্বুদ বলে মনে করলে ভুল হবে। তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই তা উৎসারিত হয়েছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ রোল্যাঁর মত ভাব-প্রচারকেরাই তখন মৈত্রীর ভিত্তিতে শান্তি সৌধ গড়বার প্রয়াসী হন নি, ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-নায়কেরাও তখন সেই একই উদ্দেশ্যে নানারূপ চেষ্টায় ব্রতী হলেন। মহাপ্রাণ উইল্‌সনের চেষ্টায় জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণবিধি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল, রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশ হ'ল, জাতি-সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। সে সব তো মোটে পঁচিশটি বছরের কথা ! হায়, এরই মধ্যে কোথায় গেল জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, আর কোথায় গেল জাতি-সঙ্ঘ ! সাম্রাজ্য-লিপ্সা আবার তার বিকট নির্ম্মম রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার জাতিতে জাতিতে সংঘাত বেঁধেছে, নর-শোণিতে আবার ইয়োরোপের বক্ষ প্লাবিত হচ্ছে। কোথায় জাতিসঙ্ঘ ? অক্ষম লজ্জা, দুঃখ এবং রোষে কোনরূপে আত্মগোপন করে তা আজ নিজের ম্রিয়মাণ অস্তিত্বকে বজায় রেখেই মান বাঁচাচ্ছে। উইল্‌সনের অমর-আত্মা বোধ হয় স্বর্গ থেকে এই দৃশ্য দেখে নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করছে। সব কিছু দেখে এবং চিন্তা করে দেশে দেশে মানব-হিতৈষীদের চোখও আজ অশ্রু-সিক্ত হয়ে উঠছে।

কিন্তু শুধু অশ্রু-বিলাসে তো এই দুরূহ মানব-সমস্যার সমাধান হবে না। চাই কঠোর আত্ম-বিশ্লেষণ, চাই সকল দেশের মানব-কল্যাণকামীদের সমবেত বিপুল প্রয়াস। বিগত মহাসমরের পরে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার যে সব উপায় অবলম্বিত হয়েছিল, তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু সুবিবেচনা ছিল না। তা থাকাও তখন সম্ভব ছিল না। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে যে সমস্ত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত থেকে যুদ্ধের উদ্ভব বলে আজ প্রমাণিত হয়েছে, তার সর্ব্বব্যাপী রূপ তখনও চিন্তানায়কদের প্রজ্ঞা এবং কল্পনায় ধরা পড়ে নি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল পল্লবসঞ্চারী, সমস্যার মূল পর্য্যন্ত তা গিয়ে পৌঁছয় নি। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে রাজ্যের সীমা-নির্দ্দেশ ক'রে বল-দর্পিত শাসকদের সাম্রাজ্যলিপ্সা দমন করা সম্ভব নয় ; এমন কি, জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেও নয়। সমস্যার মূল আরও অনেক গভীরে—সমাধান-প্রয়াস তার উপযোগী না হলে সাফল্যের কোন আশা নেই।

কথাটা আরও পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আমরা যাকে সাম্রাজ্যবাদ বা ইম্পিরিয়্যালিজম বলি (ফ্যাসিসম্ তারই চরম রূপ) তা বিশিষ্ট এক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ফল। ধন-তান্ত্রিক

ব্যবস্থা দেশবিশেষে স্ফীত হতে স্ফীততর হয়ে দেশান্তরে তার বিপণি খুঁজে বেড়ায়। বাণিজ্যের জন্যই হয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন। আর দরিদ্রকে শোষণ করেই ধন-তন্ত্র পুষ্ট হয়। যারা ধনিক, তারাই রাজ্যের কর্ণধার এবং সাম্রাজ্য-ব্যাপ্তির প্ররোচক। তারাই বাধায় সংগ্রাম, আর এমনি বর্ত্তমান ব্যবস্থার দুঃসহ অভিশাপ যে, যে শোষিতশ্রেণী বুকের রক্ত দিয়ে তাদের সম্পদ-সৌধ গড়ে দেয়, যুদ্ধারম্ভে প্রথম বলির ডাক পড়ে তাদেরই। ধন-লিপ্সা এবং সাম্রাজ্যব্যাপ্তির যূপকাষ্ঠে তাদেরই পশুর মত টেনে নেওয়া হয়। এভাবেই সব চলেছে। কাজেই শুধু পরাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধবিরতির কোন আশা নেই। বরং বহুতর স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভবের ফলে যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও অধিক হবে। চাই প্রতি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ওলটপালট, একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন।

অথচ পশ্চিমের বর্ত্তমান অনেক রাষ্ট্রনায়কই এই সহজ সত্যটিকে মানেন না, অথবা বুঝেও তা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না। শ্রেণীস্বার্থ তাঁদের এমনি বিভ্রান্ত ক'রে রেখেছে। তাই চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্সের মুখে শান্তির ফাঁকা আওয়াজ শুনি, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার কোন সুচিন্তিত পথের নির্দ্দেশ পাই না। তাই এখনও তাঁরা শুধু সীমানার চিন্তায়ই বিভোর—তাও শুধু ইয়োরোপীয় রাজ্যসমূহের—আর এশিয়া, আফ্রিকা থাকবে তাদের চিরন্তন পাদ-পীঠ হয়ে। যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কারের ফলে এই ব্যবস্থাকে তাঁরা প্রায় ভগবানের বিধান বলেই বিশ্বাস করতে শিখেছেন। এম্নি তাঁদের মোহ, এই সহজ কথাটাও তাঁরা বুঝতে চান না যে, পরাধীন এশিয়া এবং আফ্রিকা হবে পরাক্রান্ত ইয়োরোপীয় জাতিসমূহের সাম্রাজ্যব্যাপ্তির অবারিত ক্ষেত্র; এই দুই মহাদেশের শৃঙ্খলের নীচেই ভাবী মহাসমরের বীজ আবার উপ্ত হবে।

কিন্তু স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়কদের চৈতন্যোদয় না হলেও পশ্চিমের কোন কোন চিন্তাশীল মণীষীর মনে সমস্যার আসল রূপ ধরা পড়েছে, কাজেই তাঁদের কাছে তার সমাধানও মিলেছে। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে ইংরেজ মণীষী এইচ্., জি., ওয়েল্সের একখানি বই-ই* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার প্রথমেই এই বলে আরম্ভ করেছেন যে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী আদর্শ সমাজ গঠনের প্রয়াস যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালের জন্য স্থগিত রাখলে চলবে না; তার সূচনা এখনই হওয়া প্রয়োজন। অন্তত এই বিষয়ের আলোচনা এখন হতেই আরম্ভ হোক। তিনি বলেছেন, "a great debate should start immediately about war-ends" এবং সেই আলোচনার ফলে যা স্থিরীকৃত হয় তা ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ বলে এখন থেকেই গ্রহণ করা হোক। কারণ যুদ্ধ যখন শেষ হবে, বিপদের ঘনকৃষ্ণ ছায়া যখন সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হবে, তখন রাষ্ট্রনেতারা আবার চিরাচরিত পথে চলতে থাকবেন, আবার সুরু হবে জাতিতে জাতিতে রেষারেষি, স্বার্থের হানাহানি, চলবে সমরায়োজন, আবার আরম্ভ হবে সর্ব্বনাশ, কুরুক্ষেত্র। ওয়েল্সের নিজের ভাষাই উদ্ধৃত করে বলি, "When the war will end the politicians will again disappear to settle things in their own bad way in the Darkness of the Council Chamber." তার বইখানির মূল কথা এই যে, এখন থেকেই সকল দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মানবের মৌলিক অধিকারকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কথাটা অস্পষ্ট, সেই অধিকার কি? এখানেই এসেছে ওয়েল্সের দ্বিতীয় বক্তব্য, যা তাঁর অন্যান্য পুস্তকের পাঠকদের নিকট পূর্ব্ব থেকেই পরিচিত রয়েছে। দেশে দেশে বর্ত্তমানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে প্রকাণ্ড বিভেদ আছে তা যথাসম্ভব দূর করতে হবে, কারণ ক্রমবর্দ্ধমান ব্যক্তিগত সঞ্চয় হতেই ধনতান্ত্রিকতার উদ্ভব। এইজন্য ধনসম্পদকে যথাশক্তি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন করতে হবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মণীষী লক্ (Locke) বলেছিলেন, অর্জ্জিত অর্থ ব্যক্তিবিশেষেরই সম্পত্তিতে পরিণত হবে। ইহাই উদারনীতির (liberalism) ভিত্তি। কিন্তু দু-তিন শতাব্দীর পরীক্ষায় এখন নিঃশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই নীতি বর্ত্তমানে অচল, কারণ ইহা ব্যক্তিস্বার্থের ওপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থকে একেবারে উপেক্ষা ক'রে। কিন্তু যদিও ওয়েল্স্ ভাবী সমাজের জন্য সমাজতন্ত্রের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, তবুও তা ঠিক রুশীয় আদর্শের অনুরূপ নহে। বুদ্ধি এবং মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি স্বীকার করেছেন এবং রুশিয়ার বর্ত্তমান ব্যবস্থা তার পরিপন্থী বলে তিনি সেই ব্যবস্থাকে নির্ভয়ে আক্রমণ এবং আঘাত করেছেন। তিনি ঠিকই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভৌগলিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ থেকে মানববুদ্ধির ক্ষেত্রে তার বিস্তার মানুষের চরম কল্যাণের পক্ষে ঢের বেশী অনিষ্টকর। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়াও আজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মতের স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে তার আরও অনেক প্রসার হবে। আর একটি বিষয়েও ওসেল্স্ বর্ত্তমান রুশীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর নিঃসঙ্কোচ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরাসরি নিঃস্ব, সর্ব্বহারা শ্রমিকদের নিকট হস্তান্তরিত করলে আশু অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। কারণ বহুকালের ঘনীভূত শ্রেণী-বিদ্বেষের ফলে ধনিকসম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রমিকসম্প্রদায়ও আজ স্বার্থ-কালিমায় কলুষিত হয়ে আছে। মানব-সমাজের স্থায়ী কল্যাণসাধন এখনই তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধী আছে, প্রতিভা এবং পরার্থবোধ আছে, সুতরাং তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত। কথাটা নূতন এবং ভেবে দেখবার মত। লেনিনও বলেছিলেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুনির্দ্দিষ্ট কোনরূপ শ্রেণী-বোধ নেই। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যেও শুধু তারাই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনের অধিকারী হবার যোগ্য, যারা নিজদিগকে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বহারাদের স্বার্থের সঙ্গে একীভূত করতে পেরেছেন, যারা নিঃস্বদের জন্য আত্মত্যাগ ও দুঃখভোগ করেছেন। তাদেরও থাকতে হবে শেষোক্ত শ্রেণীর পরিচালনাধীনে। ইহাই যদি ওয়েল্সের মত হয় তবে সোভিয়েট

---

* New World order (Secker and Warburg, 6s)

রুশিয়ার অনুসৃত মত এবং পথের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? এখনও সে দেশের রাষ্ট্রপরিচালনের ভার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপরেই ন্যস্ত আছে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির আইনকানুন দ্বারা তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ শোষিত শ্রেণীর মনোবৃত্তি যদি বিকৃতও হয়ে থাকে, কিছুকাল স্বাধীন মানুষের অধিকার উপভোগের পর তাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে, তখন সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য তারা সমবেতভাবে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সেখানে বাদ পড়বে শুধু শোষকেরা, অথবা শোষণের দুষ্ট অভিপ্রায়যুক্ত ব্যক্তিরা। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে তাদের সংস্কারসাধন আর তখন দুরূহ ব'লে মনে হবে না।

ওয়েল্‌স্ অথবা তাঁর মত সদাশয় মণীষীরা যাই ভাবুন অথবা বলুন, তাঁদের কল্পিত-ব্যবস্থা এখনও স্বপ্নের মত অলীক, রূঢ় এবং উত্তুঙ্গ বাস্তব এখনও তার পথরোধ ক'রে আছে। দেশে দেশে ধনিক এবং সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সহজেই তাদের সম্পদ এবং অধিকার ছেড়ে দিবে না। ওয়েল্‌স্ বলেছেন তার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার এবং শিক্ষাদান প্রয়োজন। কিন্তু শুধু তাই যথেষ্ট নহে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা আরও ঢের বেশী প্রয়োজন। শুধু ভাবপ্রচারকে হবে না, নিঃস্বার্থ এবং দুঃসাহসী নেতা এবং কর্ম্মী চাই। তার জন্য অর্থ এবং সর্ব্বোপরি সময়ের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মানুষের চরম কল্যাণের পথ কখনও সুগম নয়, দুস্তর বাধা অতিক্রম করেই তাকে লাভ করতে হয়। সেজন্য পশ্চাদ্‌পদ হওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

ব্যথা

কাদের নওয়াজ বি-টি

সৃষ্টির নব প্রাতে—
হে ব্যথা! তোমায় পাঠালেন বিধি,
সাথী করি মোর সাথে।
সঞ্জীবনীর ধারা—
পান করি কেহ গাহিল রে গান
কেহ বা আত্মহারা।
যবে এল মোর পালা—
দিল কে আমায় ব্যথার গরল
দুখের পাত্রে ঢালা।
পান করি হলাহল,
আজীবন আমি কাঁদিতেছি সখা
ফেলিতেছি আঁখিজল।
আজি, কত ফুল ফোটে কত পাখী গায়,
চাঁদিনী যামিনী সোহাগ বিলায়,
কুলুকুলু রবে নির্ঝরিণী ধায়,
ঢুলু ঢুলু চোখে কুমুদিনী চায়,
সকলেই সুখে রয়েছে বিভোর,
দিল্-পেয়ালায় ব্যথা-হলাহল
ল'য়ে শুধু কাঁদে চিত্ত এ মোর।
শোন তবে কল্পনে!
হোক না অসহ, জীবন অবহ
তবু সে ব্যথার সনে—
আছে মোর প্রীতি, মনে মনে টান
আজিও রয়েছে জানি,
যদিও দগ্ধ ব্যথার অনলে,
উজল হৃদয়খানি।
শোন সখা প্রিয়তম!
তুমিই সোহাগে কাঁটার মাল্য
কণ্ঠে দিয়েছ মম।
দুখের মুকুট তাজ—
পরায়েছ মোরে, তাই শিরে ধরি
সম্রাট আমি আজ,

হোক না যাতনাবোধ—
গানে গানে তবু ছেয়ে থেক' মোরে
এই শুধু অনুরোধ।

বিশ্ব-প্রবাহ

হুয়েনশাঙ্

শান্তির পথে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, সমগ্র য়ুরোপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, তাতে পৃথিবী শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। পোলাণ্ড গ্রাস করার পর মনে হ'য়েছিল জার্ম্মাণীর তীব্রতর ক্ষুধা অল্পের ওপর দিয়েই নিবৃত্ত হবে। কিন্তু তা হ'ল না, হয়ও না কোনদিন। জয়ের স্পৃহা মানুষকে একের পর এক রাজ্যের জন্যে প্রলুব্ধ ক'রে তোলে। নরওয়ে, তারই সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন করতলগত হবার পর জার্ম্মাণীর জিগীষা বেড়ে গেল সহস্রগুণ। হিট্‌লার যে ভাবে রণক্ষেত্রের পর রণক্ষেত্রের সম্মুখীন হ'য়ে চলেছে, তাতে তার সত্যিকারের মনোভাব ও কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই করা যায় না। মনে হয়, সে যেন শুধু যুদ্ধ ক'রবার জন্যেই যুদ্ধ ক'রে চলেছে। এ যুদ্ধের পরিণতি ও পরিণাম অন্যের পক্ষে অনুমান করাও সুকঠিন।

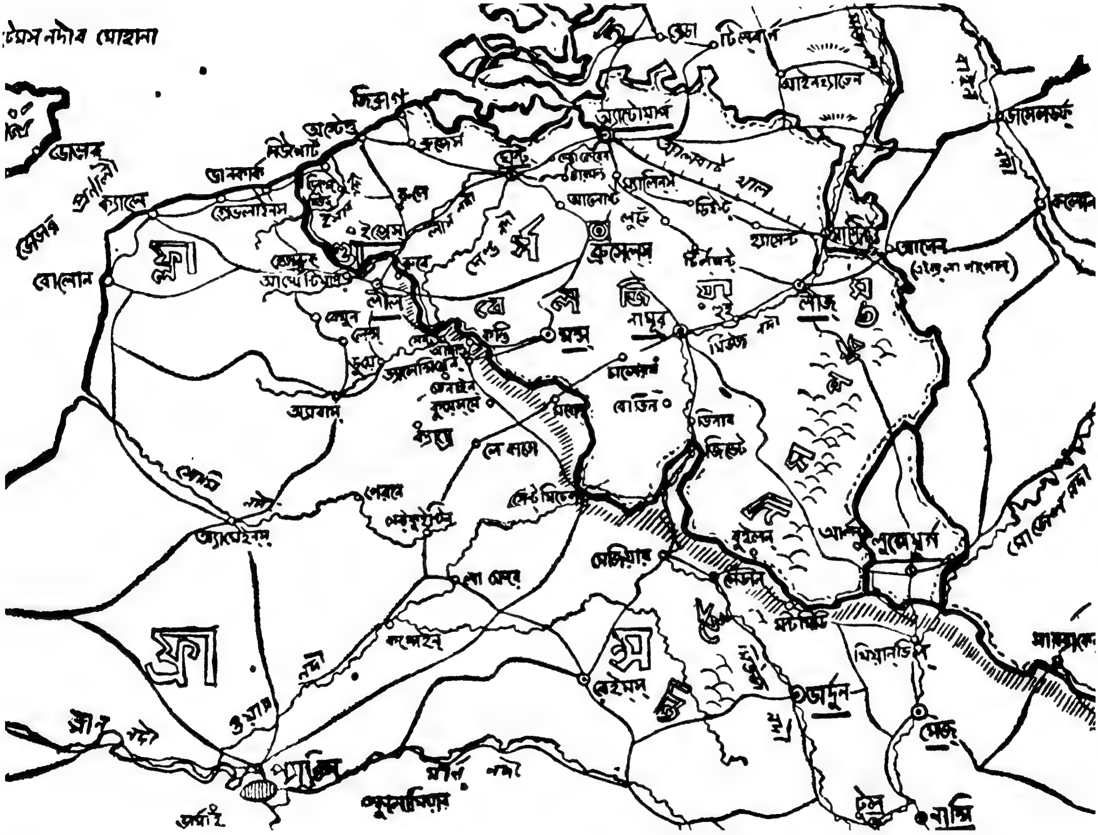

টেমস নদীর মোহানা
ডোভার
প্রণালী
ক্যালে
বোলোন
ডান্‌কার্ক
নিউপোর্ট
অস্টেণ্ড
জিব্রুগ
ব্রুজেস
ঘেন্ট
ইপ্রেস
লিল
ফ্রা ন্স
ফ্লা
বে ল জি য়া ম
অ্যান্টোয়ার্প
আলবার্ট খাল
ব্রুসেল্‌স
নামুর
মস
লীজ
আখেন
কলোন
ডুসেলডর্ফ
আইনড্‌হোভেন
টিল্‌বার্গ
অ্যারাস
লেকাটো
সেন্ট কুইন্টিন
পেরোন
অ্যামিয়েন্স
সোম নদী
লা ফেরে
কম্পেইন
ফ্রা ন্স
প্যারিস
মার্ণ নদী
রেইমস
সেডান
মেজিয়ার
ভার্দুন
মেৎজ
নান্সি
টুল
থিয়ানভিল
লুক্সেমবার্গ
মোজেল নদী
ডিনান্ট
জিভেট
বুইলন
আর্ডেন

ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্র

তবে এটুকু বোঝা যায় যে, জার্ম্মাণীর পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত রাজ্যসীমানাগুলি ভেঙে চুরে হিট্‌লার এক বিরাট ভূ-খণ্ড সৃষ্টি ক'রবার লালসায় এই প্রচণ্ড সমরানল জ্বালিয়ে তুলেছে। এই যুদ্ধ বাধাবার আগে, হিট্‌লার নাকি বড় বড় মনস্তাত্ত্বিক নিযুক্ত করেছিল যুরোপের সব জাতির মনোভাব পর্য্যবেক্ষণের জন্যে,

অন্ততঃ যাদের সঙ্গে জার্ম্মাণীকে সংগ্রামে সম্মুখীন হ'তে হবে। তারপর সেই মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে' হিট্লার এঁকে নিয়েছে আগামী রাষ্ট্রের এক অভিনব মানচিত্র, যার পরিকল্পনা শুধু হিট্লারের মস্তিষ্কেই আছে। হিট্লারের অসাধারণ কোন শিক্ষাদীক্ষা বা সামরিক অভিজ্ঞতা নেই। সে পূর্ব্বে শুধু সামান্য পদাতিক রূপে যুদ্ধ ক'রেছে মাত্র।

ওলন্দাজগণের যুদ্ধ ক'রবার ডবল-এঞ্জিনযুক্ত দ্বিমুখী সাঁজোয়া গাড়ী

ফ্রান্সে বৃটিশবিমানবাহিনী। এই বিমানপোতগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত। এগুলি ২৫০০০ ফিট ঊর্দ্ধে ঘণ্টায় ২৫৭ মাইল গতিতে চলে

অবশ্য ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি হিট্লারের মনোবৃত্তি সম্পর্কে পূর্ব্বেই অনুমান ক'রেছে। হিট্লার মানুষ হিসাবে অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। একদিকে যেমন সে প্রচণ্ড ক্রোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং অস্থিরচিত্ত, অপরদিকে তেমনি মতলবী ও চতুর। য়ুরোপের ইতিহাসে পূর্ব্বতন যে সব যোদ্ধা ও সেনাপতিগণের পরিচয় পাওয়া যায়—যথা

আলেক্‌জান্দার, নেপোলিয়ন, ক্রমওয়েল ও মার্লবোরো প্রভৃতি, তাঁদের সঙ্গে হিট্‌লারের কোন বিষয়ের কোন সাদৃশ্য নেই। ইতিহাসে শুধু এই ধরণের চরিত্র একটী পাওয়া যায়; সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস্। এই অদ্ভুত যুবক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সারা য়ুরোপে বিপ্লব বাধিয়ে তুলেছিল। তদানীন্তন শক্তিশালী রাজ্যগুলিকে চার্লস্ একটীর পর একটী অবলীলাক্রমে জয় ক'রে ফেলেছিল। ডেনমার্ক, নরওয়ে, পোলাণ্ড, সাক্সনী এবং পিটার দি গ্রেটের রুশ প্রভৃতি সেনাপতি চার্লসের কাছে পরাজিত হয়। ইতিহাসকারেরা বলেন—চার্লস ঐভাবে সব রাজ্যগুলিকে জয় ক'রতে পেরেছিল শুধু এই জন্যেই যে তার কার্য্যকলাপ ও যুদ্ধপদ্ধতি ছিল উন্মাদের মত, কিন্তু শত্রুপক্ষ সেটা বুঝ্‌তে পারত না। তারা মনে ক'রত কোন এক বিচক্ষণ সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হবে, তাই সেইভাবে প্রস্তুত হ'ত। অথচ চার্লস্, এলোমেলোভাবে আক্রমণ ক'রে তাদের বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত ক'রে দিত। যাক্, সেকথা ছেড়ে এখন বর্ত্তমান নিখিল প্রবাহেই আসা

বামে :—জার্ম্মাণীর হিটলার ; রুমানিয়ার ক্যারল ; শ্লোভাকিয়ার টিসো। মধ্যে : পোলাণ্ডের বেক ; জেকোশ্লোভাকিয়ার হাচা ; দক্ষিণে : রুশের ষ্ট্যালিন ; হাঙ্গারীর হর্থী ; শ্লোভাকিয়ার সীডর।

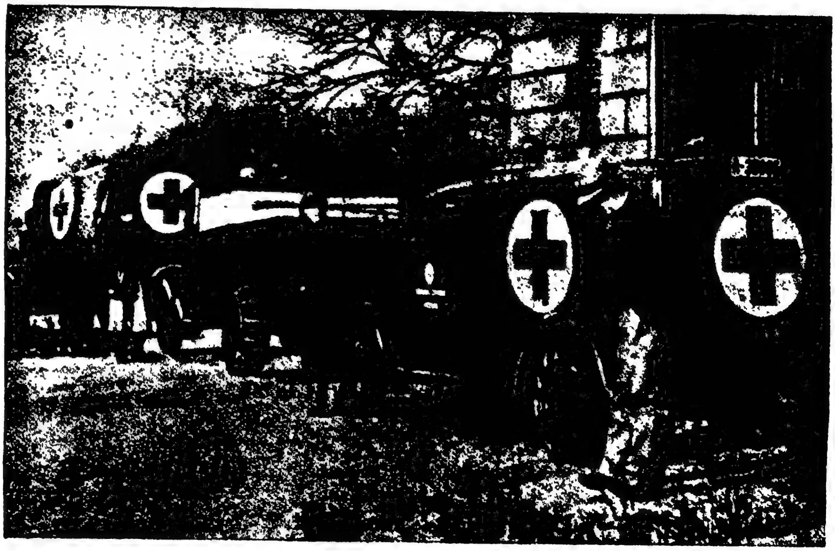

নরওয়ের বর্ত্তমান অবস্থা। এখন শুধু আহত আর লাঞ্ছিতদের চিকিৎসালয়ে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এম্বুলেন্স গাড়ী প্রস্তুত হয়ে থাকে

যাক্। হিট্‌লার সম্পর্কে য়ূরোপের অন্যান্য জাতির ধারণা কতকটা তেমনি হ'য়েছে। হিট্‌লারের পরিকল্পনা ও চালচলন ওই ধরণের দুর্ব্বোধ্য, তাতে সন্দেহ নেই। তার মনোগত ভাব সে কোনদিনই কারো কাছে প্রকাশ করে নি। অথচ মানচিত্র খুলে সে পরামর্শও করে অন্যান্য নেতা ও সহকারিদের সঙ্গে।

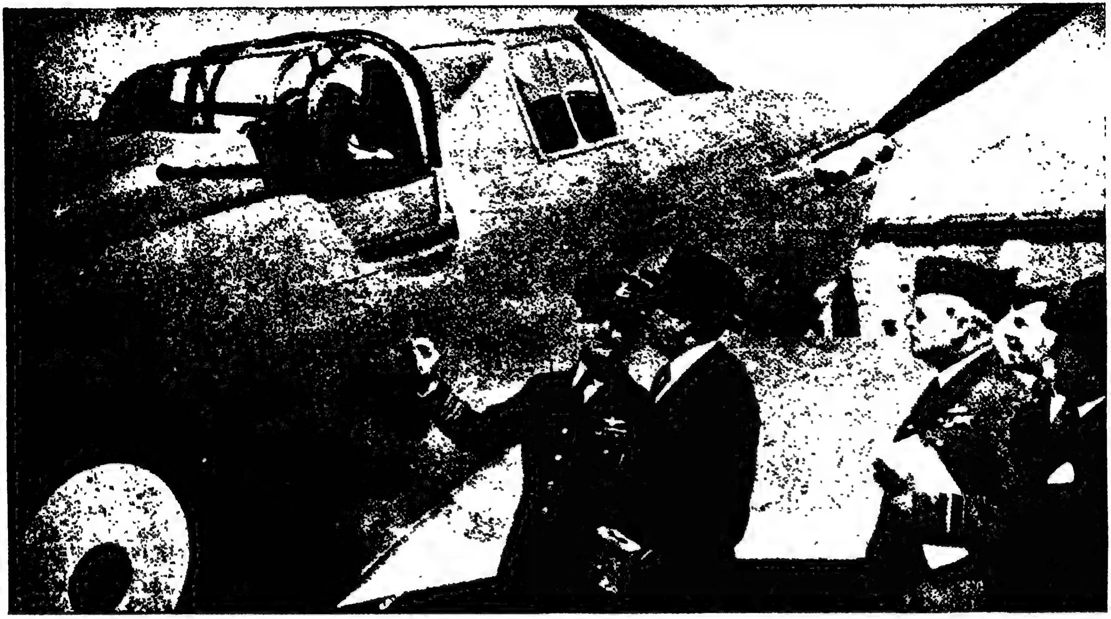

চারিটী কামান-বিশিষ্ট বৃটিশের এই শক্তিশালী বিমানপোত সম্প্রতি ফ্রান্সে উপস্থিত হ'য়েছে। পূর্ব্বে বহু জার্ম্মাণ পত্রিকায় এইরূপ বৃটিশ বিমানপোতের প্রশংসা প্রকাশিত হ'য়েছে।

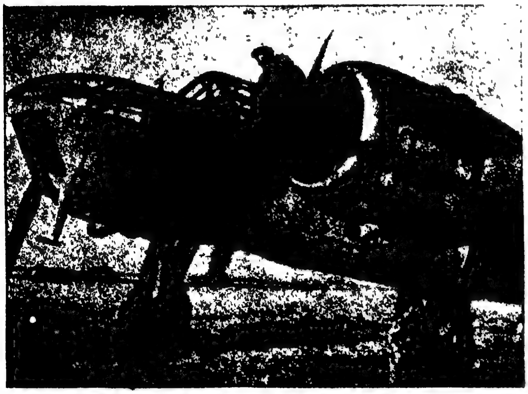

ফ্রান্সে আনীত বৃটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের বোমানিক্ষেপকারী ব্লেনহিম্ বিমানপোত ; ২০০০ মাইল ব্যাপী স্থানে যুদ্ধ চালাতে পারে এবং ঘণ্টায় গতি ২৯৫ মাইল।

এইভাবে যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার সাহস হয় ত হিট্‌লার পেত না, যদি না রুশ তার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি ক'রত। হিট্‌লারের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে যে সব গণনায়ক আপন আপন রাষ্ট্রের রূপ বদ্‌লে দিয়ে সমগ্র জাতিকে নতুনভাবে গড়ে' তুলেছেন, তাঁরা সমবেত শক্তিতে বাধা দিলে হিট্‌লার কখনই এতখানি দুঃসাহসিকতার আগুন জ্বালিয়ে তুল্‌তে পারত না। পৃথিবীর বুকে এই ধ্বংসলীলার তাণ্ডবকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে হৃতরাজ্য হ'য়ে বনবাসও ভাল, অন্ততঃ ভারতীয় আদর্শ সেই ভাবধারাকেই সমর্থন করে।

নরওয়ে জয় করার পর জার্ম্মাণী ইতিমধ্যেই বহুদূর অগ্রসর হ'য়েছে। হলাণ্ড বিধ্বস্তপ্রায় দেখে সেখানকার সেনাপতি ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা ক'রবার জন্যে জার্ম্মাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; হলাণ্ডের উইলহেলমিয়া সপরিবারে ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মান সম্রাট কাইজার গত মহাযুদ্ধের পর থেকে হলাণ্ডে বাস ক'রছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে হলাণ্ড লিপ্ত ও বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি পুনরায় জার্ম্মানীতে ফিরে গেছেন। এদিকে বেলজিয়মের অবস্থাও সঙ্কটজনক। ব্রুসেল্‌স্, ঘেণ্ট ও অন্যান্য নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হ'য়েছে; রাজধানী এণ্টওয়ার্পে

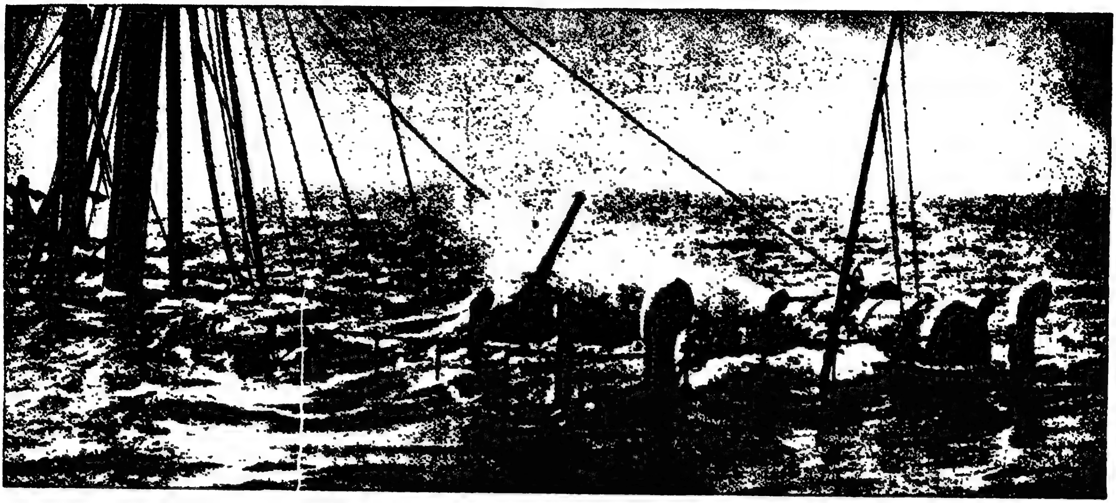

জার্ম্মাণ মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত একখানি ১০,০০০ টন জাহাজ

স্থানান্তরিত হ'য়েছে। জার্ম্মানগণ প্রচণ্ড আক্রমণে সমস্ত রাজ্যকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছে। প্রথমটা বেলজিয়ম আত্মসমর্পণ করে নি। শেষ পর্য্যন্ত সমানে বাধা দিয়ে চলেছিল দুর্ধর্ষ জার্ম্মাণশক্তিকে। গত মহাযুদ্ধেও বেলজিয়ম অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল এবং তাদের সেই বীরত্বই সেবার য়ুরোপকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে উপযুক্তভাবে তৈরী হবার সুযোগ ও সময় দিয়েছিল। অথচ রাষ্ট্র হিসাবে বেলজিয়মকে খুব বড় শক্তি বলা যায় না। কারণ তথাকার লোকসংখ্যা মাত্র ৮১০০০০০ (একাশি লক্ষ)। এই অল্পসংখ্যক লোক নিয়েও বেলজিয়ম যে ভাবে জার্ম্মানীকে বাধা দিয়েছে, হলাণ্ড ও অন্যান্য শক্তির পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। বেলজিয়মের অধিবাসীরা অত্যন্ত রণকুশল এবং ক্ষুদ্র রাজ্য হ'লেও বেলজিয়ম বহু দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বড় বড় কয়েকটী ঘাঁটি ও দুর্গ দখল করার পর বেলজিয়ম অতিক্রম ক'রে জার্ম্মাণবাহিনী ফরাসী রাজ্যে প্রবেশ করে। অপরদিকে লুক্সেমবার্গ দখল ক'রে অন্যান্য জার্ম্মাণবাহিনীও ফরাসীর পথে এগিয়ে যায়। ফরাসী সীমান্তে ও বেলজিয়মের স্থানে স্থানে ইংরেজ সৈন্যেরা এসে যোগদান করায় যুদ্ধ আরও ঘোরতর হ'য়ে উঠল। ফরাসীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ ম্যাজিনো লাইন নাকি জার্ম্মাণীরা কয়েক স্থানে ভেদ ক'রেছে। জার্ম্মাণীরা সম্প্রতি যে রীতিতে যুদ্ধ ক'রছে, শত্রুপক্ষ তার জন্যে প্রস্তুত না থাকায় কতকটা অসুবিধা হ'য়েছে। কাজেই জার্ম্মাণীর পোলিশ রীতির আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রবার জন্যে ফরাসীকে নূতন ভাবে ব্যূহ রচনা ও সৈন্য সমাবেশ ক'রতে হ'য়েছে। বৃটিশবাহিনীও ইত্যবসরে ফ্রান্সে উপস্থিত হ'য়ে জার্ম্মাণবাহিনীকে বাধা দিয়েছে এবং প্রচণ্ড সংগ্রামে জার্ম্মাণ সেনানীর সম্মুখীন হ'য়েছে।

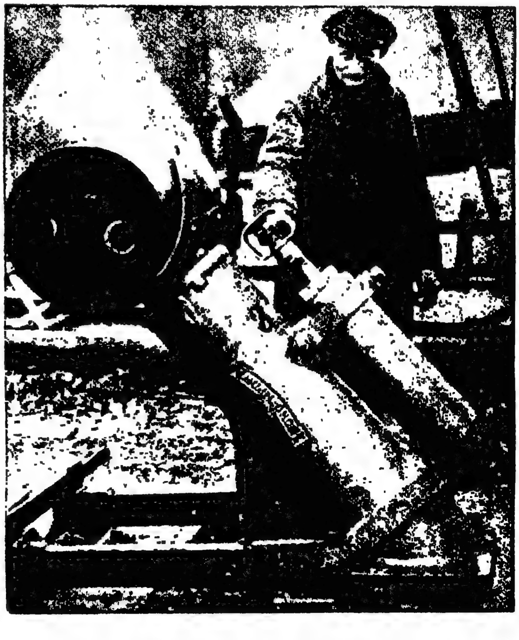

জার্ম্মাণ সাবমেরিনের সঙ্গে লড়াই ক'রবার জন্যে প্রস্তুত বৃটিশ রয়াল নেভির 'ডেপ্‌থ চার্জ্জ'।

উত্তর ফ্রান্স ও ফ্লাণ্ডার্সে যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধল, তা বোধহয় পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ। এতবড় প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ আর কখনো কোথাও হয় নি। ফ্রান্স, বৃটিশ ও বেলজিয়মের মিলিত শক্তির সঙ্গে জার্ম্মানীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হ'ল এই মধ্যবর্ত্তী রণক্ষেত্রে। জার্ম্মানেরা চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'রে ফ্লাণ্ডার্সকে ধ্বংস ক'রে উত্তর-পূর্ব্ব পথে অগ্রসর হ'য়ে ফরাসী ও ডোভার প্রণালী এবং ইংলিশ চ্যানেলের পার্শ্ববর্ত্তী বড় বড় বন্দরগুলি আক্রমণ ক'রে ডানকার্ক প্রভৃতি স্থান ধ্বংসস্তূপে পরিণত ক'রেছে। বোলোঁ, ক্যালে প্রভৃতি বন্দর সম্পূর্ণরূপে দখল ক'রতে না পারলেও বস্তুতঃ জার্ম্মানীর হস্তগত হ'য়ে পড়েছে। যুদ্ধের অবস্থা দেখে বেলজিয়ম-রাজ লিয়োপোল্ড শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার সাহস না পেয়ে হিটলারের হাতে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন, এই সংবাদ পাওয়া গেল। রাজা নাকি মন্ত্রীদের অসম্মতিক্রমেই এ কাজ ক'রেছেন। মন্ত্রীরা বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। মত বিভেদের মীমাংসা এখনো হয় নি।

বেলজিয়ম-রাজ লিওপোল্ডকে হিটলার সম্প্রতি বেলজিয়মের একটী দুর্গে বাস ক'রবার অনুমতি দিয়েছেন মিত্রশক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এবং তাদের পূর্ব্ব চুক্তির সর্ত্ত না রেখে হঠাৎ বেলজিয়ম আত্মসমর্পণ করায় মিত্রশক্তি যথেষ্ট বিব্রত হ'য়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। প্রজাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা ক'রবার জন্যে এরূপ কাজ ক'রে থাক্‌লেও, রাজা লিওপোল্ড মোটের ওপর মিত্রশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

অপর দিকে ইতালিতে রণোন্মাদনার বেশ একটা চাঞ্চল্য প'ড়ে গেছে। সিনর মুসোলিনী জার্ম্মানীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে এই মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে পারেন, এরূপ আশঙ্কা যে নেই তা বলা যায় না। ভূমধ্যসাগর প্রতিপত্তিতে ইতালির যথেষ্ট স্বার্থ ও আকাঙ্খা জড়িত আছে। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ রুশ-নায়ক ষ্ট্যালিনের সঙ্গে পরামর্শের জন্যে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে আপোষ-মীমাংসা বা রুশের সঙ্গে কোনরূপ চুক্তির সুবিধা হয় নি। তবে আশার কথা এই যে, আমেরিকা আন্তরিকতার সঙ্গে মিত্র-পক্তির সাহায্যকল্পে হস্ত প্রসারিত ক'রছে। এবার শান্তির প্রস্তাব ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান হ'লেও হ'তে পারে।

এ মহাযুদ্ধের পরিণতির কথা ভাব্‌তে আজ সত্যি সমস্ত সভ্য জগৎ শিউরে ওঠে। কোথায় এর শেষ হবে, সে কথা এখন অনুমান করাও কঠিন। জার্ম্মাণবাহিনী নাকি ইতিমধ্যে উত্তর পূর্ব্ব ফ্রান্স অতিক্রম ক'রে প্যারীর পথে অগ্রসর হ'য়েছে এবং প্যারীসহরে আসন্ন বিমান আক্রমণের সংবাদও পাওয়া গেছে।

সমাপ্তির গান

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

প্রশস্ত জীবনতটে নামিয়াছে পূর্ণ যবনিকা,
অন্ধকার সর্ব্বপথ ধাপে ধাপে হ'য়ে গেছে শেষ ;
সমাপ্তির করস্পর্শে নাহি জ্বলে ক্লান্ত দীপশিখা ঃ
জীবনের তীরে তীরে নিদ্রাহীন রাত্রির উন্মেষ !

যাদেরে দিয়েছি ক্লেশ, দুঃখ-ব্যথা, বিক্ষুব্ধ আগুন,
ব্যাকুল বাসনা বুকে বাজায়েছি বিজয় বিষাণ ;—
অসহ আঘাতে যার ভাঙিয়াছি স্বপনফাল্গুন ঃ
তাহারা ভুলিয়া যাক্‌, ক'রে যাক্‌ অব্যাহতি দান।

যাহারা জীবনপথে ফেলেছিলো ক্ষীণ পদরেখা—
আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চেয়েছিলো কলাপীর সাধ,
উচ্ছল গতির মাঝে দিয়েছিল ক্ষণিকের দেখা ঃ
অতল কালের তলে ডুবে গেছে সকল সংঘাত।

যাদেরে করেছি ঘৃণা, ভালবাসা যারে দিতে চাই,
যাহারা চেয়েছে মোরে, যাহারা বা দূরে দেছে ঠেলে,
জীবনের পূর্ণোৎসবে তাহাদের মূল্য কিছু নাই—
শেষের সীমান্ত দেশে সব কিছু দিতে চাই ফেলে।

পশ্চিমের অস্তদ্বারে থেমে-পড়া নিস্তব্ধ জীবন
আমার কঙ্কাল তলে সকলের স্মৃতিগুলি জমা—
পথের পাথেয় রূপে সঞ্চিত সে মহামূল্যধন।
তোমরা সকলে মোরে ভুলে যেও আর কোরো ক্ষমা।

বৈদেশিকী

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায় এম্-এ

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধকে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এরূপ অগণিত বাহিনী, অভূতপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক সমরসম্ভার, ঘটনাবলীর অভাবনীয় দ্রুততা ও আকস্মিকতা সামরিক ইতিহাসে বস্তুত অতুলনীয়। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহাকে বৃহত্তম যুদ্ধ বলা অন্যায় হয় না।

কিন্তু এই মহাযুদ্ধকে কেবলমাত্র শক্তির সংঘাত বলিলে ইহার সমুদয় তাৎপর্য্য ব্যক্ত হইবে না। প্রকৃতপক্ষে ইহা একসঙ্গে পরস্পরবিরোধী শক্তি ও মতবাদের সংঘাত। কেবলমাত্র গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের প্রশ্ন অপেক্ষা গভীরতর এবং কঠিনতর সামাজিক সমস্যা মহাসমরের ফলাফলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত আছে।

ইটালীর বালিকা সৈন্য

বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনও এই মতবাদ সংঘাতের ফলেই হইয়াছে। মহাযুদ্ধের ফলে একমাত্র রাজ্য-সীমানার পরিবর্ত্তনই ঘটিবে না, সমগ্র জগতের ভাবধারারও গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী নয় মাস পূর্ব্বে যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, হিটলারই বৃটিশের শত্রু, জার্মান জাতি নহে। বোমার বদলে জার্মানীতে প্রচারপত্র নিক্ষেপ করা হইল। চেম্বারলেন মনে করিলেন, বৃটিশ শাসকশ্রেণী এবং নাৎসী শাসকশ্রেণীর মধ্যে আসলে মতবাদের কোন পার্থক্য নাই। যত গোল কেবল উন্মাদ হিটলারকে লইয়া। হিটলারের পতন হইলে জগতে পুনরায় শান্তি ফিরিয়া আসিবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চেম্বারলেন মাসের পর মাস ধরিয়া জার্মানীর সন্তুষ্টি বিধানে যত্নবান রহিলেন। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে।

কিন্তু মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিল জানেন, বৃটেন এবং জার্মানীর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যে মতবাদের সমতা দৃষ্ট হয় উহা সত্য নহে। উভয় জাতির মনোভাবের মধ্যে ইহা অপেক্ষা গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। তাঁহার মতে বর্ত্তমান যুদ্ধ কেবলমাত্র হিটলারের বিরুদ্ধে নহে, জাতি হিসাবে জার্মানীর বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হওয়া উচিত। পরাজিত জার্মানী নাৎসী নবধনতন্ত্রবাদ দ্বারা জগতে সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার সুযোগ পাইবে না।

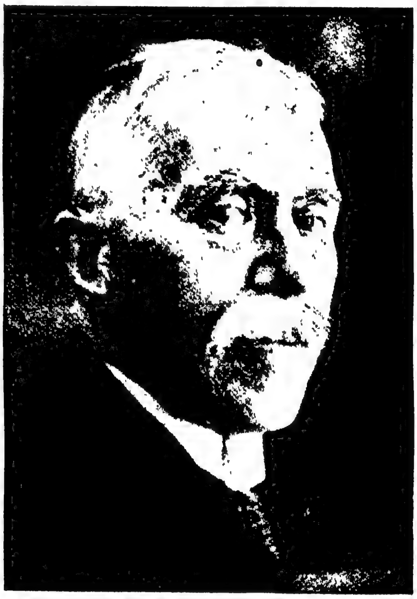

হল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী জঙ্গীর গিয়ার

পরস্পরবিরোধী তিনটি সুস্পষ্ট মতবাদের দ্বারা মহাযুদ্ধের গতি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ইহার সূচনাও এই তিনটি মতবাদের সংঘর্ষ হইতে। প্রথমটি বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন এবং অন্যান্য দেশে প্রচলিত ধনঃস্ত্রবাদ, দ্বিতীয়টি নাৎসী প্রবর্ত্তিত নবধনতন্ত্রবাদ, তৃতীয় সোভিয়েটের সমাজতন্ত্রবাদ। প্রচলিত ধনতন্ত্রবাদ দ্বারা সমাজে যে সমুদয় সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে জার্মানী চায় তাহার নবতন্ত্রবাদ দ্বারা তাহার সমাধান করিতে। সোভিয়েটের উদ্দেশ্য সমাজবিপ্লব।

চেম্বারলেন মনে করিয়াছিলেন, জার্মানীর সহিত বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

সোভিয়েটের সামাজিক বিপ্লবনীতি বিস্তারের প্রতিরোধ করিবেন। চার্চ্চিলের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরূপ। বিপ্লব প্রতিরোধের গুরুত্বের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে সচেতন। কিন্তু তাঁহার মতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের শক্তি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে নব ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। নাৎসীজ্‌ম্ ধ্বংস হইলে সম্মিলিত শক্তি দ্বারা সামাজিক বিপ্লববাদের মূল উৎপাটন করা খুব কঠিন হইবে না।

ধনতান্ত্রিক হইলেও সমাজতন্ত্রবাদ ব্রিটিশ মনোভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত বলিয়া মনে হয়। বহু শত বৎসর ধরিয়া ইংরেজ জাতি শাসনতন্ত্রের যে কাঠামো গঠন করিয়াছিল, মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহা লুপ্ত হইয়া গ্রেট বৃটেন এবং উত্তর আয়র্লণ্ড এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্যক্তি এবং সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বীকৃত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের আদেশ মত যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবে। ঐ কর্ম্মের সময় এবং পারিশ্রমিক রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার লুপ্ত হইয়া সমুদয় সম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া আর কিছুই রহিল না। মনস্বী বার্নার্ড শ বলিয়াছেন, বহু বৎসর ধরিয়া সোভিয়েট যাহা করিতে পারিল না, মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ড সেই বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে আনীত সমাজতান্ত্রিক শাসন হয়ত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইবে; কিন্তু সাময়িক হইলেও তাহার প্রভাব ইংরেজ জাতির উপর একেবারে লুপ্ত হইবে না।

জাপানের যুবরাজ—বিদ্যালয়ে যাইবার পোষাকে

হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম

বায়স্কোপের ছবির মত অতি দ্রুতবেগে মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী একের পর একটি করিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে এত বড় দুর্য্যোগ আর কখনও দেখা গিয়াছে কি-না সন্দেহ। প্রতীচ্যে যেন বহু লক্ষ বৎসর পরে আদিম বর্ব্বর যুগ আবার নামিয়া আসিয়াছে।

আকস্মিকতায় ও অভাবনীয়তায় এই ঘটনাসমূহের তুলনা অতি বিরল; নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পোল্যাণ্ড চার সপ্তাহে, ডেনমার্ক চব্বিশ ঘণ্টায়, নরওয়ের অধিকাংশ চার সপ্তাহে, হল্যাণ্ড পাঁচ দিনে এবং সর্ব্বশেষে ১৮ দিনে বেলজিয়াম সাম্রাজ্যলিপ্সার যূপকাষ্ঠে বলি পড়িল। পৃথিবীতে যেন অরণ্যের আইন পুনপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতির অনুসরণ করিয়া জার্ম্মানী ইউরোপের বুকের উপর দিয়া তাহার মরণ-রথ চালাইয়াছে। নিরপরাধ ও নিরপেক্ষ জনপদ আক্রমণ করিতে এখন আর কোন যুক্তির অবতারণা করিতে হয় না। তাহার প্রয়োজন—এই কথাই যথেষ্ট।

প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও হল্যাণ্ড জলস্রোতের ন্যায় অগণিত নাৎসী বাহিনীর গতিরোধ করিতে পারিল না। ওলন্দাজের বীরত্ব ইউরোপে প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত। পরাজিত হইলেও ডাচ বীরগণ তাহাদের বীরত্বের অবমাননা করেন নাই। কিন্তু আমষ্টারডাম ও রটারডাম পতনের পর তাহাদের যুদ্ধ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে জার্ম্মানীর যান্ত্রিকবাহিনী ও নৌবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ওলন্দাজ সৈন্যের পক্ষে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় বর্ত্তমান ছিল না। এ পর্য্যন্ত যতবার হল্যাণ্ড বিপন্ন হইয়াছে ততবারই সমুদ্রের বাঁধের মুখ খুলিয়া দিয়া কৃত্রিম বন্যা দ্বারা দেশ ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিপক্ষ অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। গত মহাযুদ্ধেও প্রধানত এই কারণে কাইজার উইলহেল্‌ম্ হল্যাণ্ড আক্রমণ করেন নাই। কিন্তু এবার কৃত্রিম বন্যার সাহায্য লওয়া হয় নাই। সম্ভবত তাহার অবসর পাওয়া যায় নাই। নাৎসীবাহিনী এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছিল যে, খালের ও নদীর উপরিস্থ সেতুগুলি পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিবার সময় হয় নাই। মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে সমগ্র দেশটা জার্ম্মানরা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল।

ওলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়া সমগ্র দেশকে ধ্বংস ও রক্তপাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সেনাপতি তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—ওলন্দাজ সৈন্যগণ অতুলনীয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সাহস কি করিবে? সহস্র সহস্র জার্ম্মান সৈন্য বিমান-ছত্রিক ও রবারের নৌকার সাহায্যে অবতরণ করিয়া সমগ্র দেশ ছাইয়া

ফেলে। পুরোহিত, ভ্রমণকারী, এমন কি, নারীর ছদ্মবেশে তাহারা জনপদসমূহে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ভয় ও আত্মকলহের বীজ বপন করে। তাহারা আবার সহায়তা পাইয়াছিল হিটলারের "পঞ্চম বাহিনী"র নিকট হইতে।

মিত্রশক্তির সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল গ্যামলিন (বর্ত্তমানে লর্ড গর্ট) ও জেনারেল আয়রন-সাইড

বর্ত্তমান যুগে এপর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য চারটি প্রধান উপায়ই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও প্রচারকার্য্য—এই চারিটি অস্ত্রের সাহায্যেই ইউরোপের শক্তিসমূহ যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নাৎসীগণ আর একটি অভিনব অস্ত্রের আবিষ্কার করিল। যুদ্ধঘোষণার বহু পূর্ব্ব হইতেই শত্রুর দেশে বহু গুপ্তচর পাঠাইয়া তথাকার প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদিগকে ভয় এবং প্রলোভনদ্বারা জার্মানীর অনুগত করা হয়। তাহারা স্বদেশে হিটলারের স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকে। তারপর শত্রু যখন দেশ আক্রমণ করে তখন মিরজাফর উমিচাঁদের দল মাতৃভূমিকে বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দেয়।

"পঞ্চমবাহিনীর" তৎপরতা কেবলমাত্র হল্যাণ্ডে দেখা যায় নাই। তাহার পূর্ব্বে ডেনমার্কে এবং অধিকতর ব্যাপকভাবে নরওয়েতে দেখা গিয়াছে ; বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাই পুর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়াছেন। স্যর অসওয়াল্ড মোজ্‌লী প্রমুখ ইংরেজ ফাসিস্তদের এবং কম্যুনিষ্টদের গ্রেপ্তার সেই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। ফ্রান্সেও বহু সমাজতন্ত্রবাদীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

ওলন্দাজ সেনাপতির বিবৃতির মধ্যে একটি কথা বিশেষ বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হয়। ওলন্দাজ সৈন্যগণের আত্মসমর্পণের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হল্যাণ্ডকে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কাজেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দেশরক্ষা করা আর কোন ক্রমেই সম্ভব নয় বলিয়া আমরা যুদ্ধ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

সত্যই কি ওলন্দাজগণ মিত্রশক্তির নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পায় নাই ? অথচ দিনের পর দিন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য ডাচসৈন্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। নরওয়ের আক্রমণ ব্যাপারেও ঠিক এইরূপ কথাই শোনা গিয়াছিল। বিপন্ন নরওয়ের নিকট সাহায্য গিয়াছিল শেষ মুহূর্ত্তে। প্রকৃত তথ্য এখন পর্য্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই এবং এপর্য্যন্ত ওলন্দাজ সেনাপতির এই উক্তির প্রতিবাদ মিত্রশক্তির তরফ হইতে আসে নাই।

হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে। রাণী উইলহেলমিনা সন্তান-সন্ততি ও মন্ত্রিবর্গসহ লণ্ডনে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। অষ্ট্রিয়া অধিকার হইতে হল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ছয়টি স্বাধীন জাতি জার্মানীর সাম্রাজ্যলালসার নিকট বলি পড়িল।

জাপ-প্রধানমন্ত্রী আরিতা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, মুহূর্ত্তে জার্মানী হল্যাণ্ড আক্রমণ করিবে—তখন জাপানও সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ-অধিকৃত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া বসিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে মিঃ কর্ডেল হাল তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। হল্যাণ্ড আক্রান্ত ও বিজিত হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধিকারভুক্ত হয় নাই। কিন্তু সে ঠিক নীরবে বসিয়াও নাই। হল্যাণ্ডের পতনের পর জাপান গভর্ণমেণ্ট উক্ত দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে জার্মানীর কি মনোভাব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে নাৎসী সরকার বলিয়াছেন যে, উক্ত দ্বীপ সম্বন্ধে তাহার কোন

সার স্যামুয়েল হোর বিমানসৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন

মাথাব্যথাই নাই। এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? হয়ত এই ইঙ্গিতের অর্থ জাপান পূর্ব্ব দ্বীপপুঞ্জে তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিলে জার্মানীর কোন আপত্তি থাকিবে না। সেনাপতি তাকাদা সাংহাইস্থিত বৃটিশ, ফরাসী, ইতালী এবং আমেরিকান বাহিনীর অধিনায়কগণকে বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ যাহাতে পূর্ব্ব এসিয়ায় ছড়াইয়া না পড়িতে পারে জাপান তাহার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। সেই "যথাযোগ্য" ব্যবস্থার স্বরূপ কি হইবে তাহা সম্ভবত অল্প দিনের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হইবে। চীনের যুদ্ধে জাপান বেশ একটু জড়াইয়া পড়িয়াছে, নতুবা সাম্রাজ্যলিপ্সায় সে কাহারও অপেক্ষা কম যায় না।

একশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের প্রধান শক্তিসমূহ—বৃটেন, ফ্রান্স, প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং রুষ—এক সন্ধি দ্বারা বেলজিয়ামকে চিরকালের জন্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ১৮৩৯ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেলজিয়ামের চারিদিকে বহু যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন শক্তি তাহার নিরপেক্ষতা নষ্ট করে নাই।

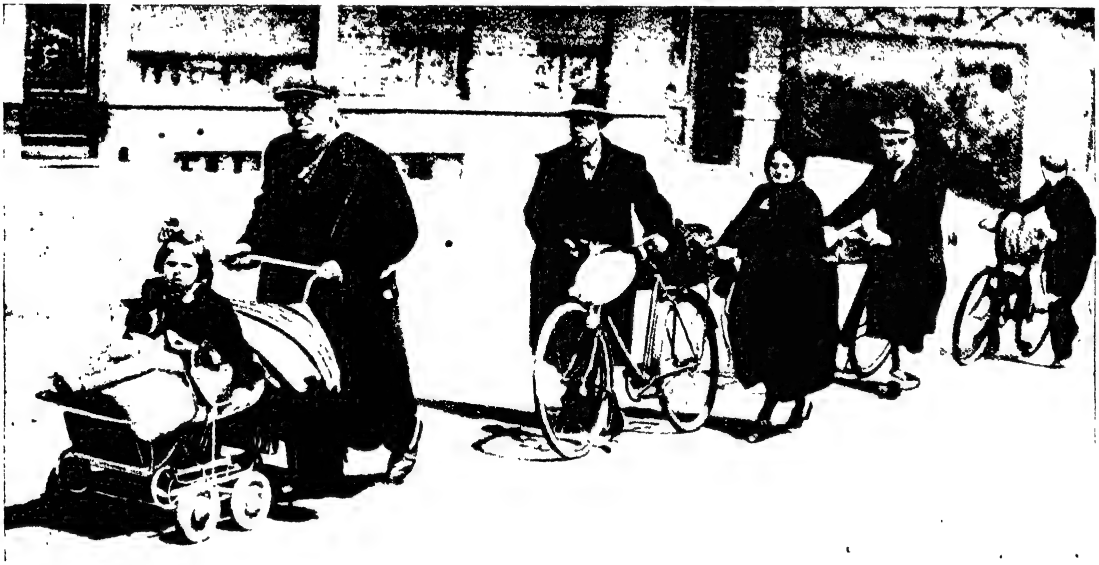

জার্ম্মাণ আক্রমণের ভয়ে বেলজিয়াম হইতে পলায়নের দৃশ্য—সকলেই নিরাপদস্থান অনুসন্ধানে যাইতেছেন

বহুশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বেলজিয়মের ভিতর দিয়া মধ্যযুগের বর্ব্বর জার্মানজাতি তখনকার দিনের গল অর্থাৎ ফরাসীজাতিকে আক্রমণ করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মিউজনদীর উপত্যকা পশ্চিম ইউরোপের যুধ্যমান মুকুটধারীগণের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। বস্তুত বেলজিয়াম বরাবরই আন্তর্জ্জাতিক ঝটিকাকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। জার্মানবাহিনী বেলজিয়মের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

গত মহাযুদ্ধে বেলজিয়মের উপর আক্রমণ অসম্ভাবিত রূপে আসিয়াছিল। এবার কিন্তু বেলজিয়ামবাসী সেজন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ দিন যুদ্ধের পর রাজা লিওপোল্ড যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়াছেন। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধরত আটলক্ষ বেলজীয় সৈনিকের মধ্যে পাঁচলক্ষের অধিক সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। রাজা লিওপোল্ডের যুদ্ধবিরতির আদেশে মিত্রশক্তি ও বেলজিয়ান জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। মন্ত্রিসভা রাজার আদেশ মানিয়া লইতে অসম্মত হইয়া যুদ্ধ চালাইবার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। গত ২৯শে মে সেনেট এবং চেম্বারের সভাপতিদ্বয় এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ এই অভিমতের পোষকতা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে রাজার কি স্থান হইতে পারে তাহা বেলজিয়ান পার্লামেণ্ট শীঘ্রই নির্ণয় করিবেন।

এই সম্বন্ধে বেলজিয়ামের শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গত ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামে যে শাসনতন্ত্র গঠন করা হইয়াছে তাহা প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র এবং বংশ-পারম্পরিক রাজতন্ত্র। দেশের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজা, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কোন মন্ত্রী যদি রাজার অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত আইনে পুনরায় স্বাক্ষর প্রদান না করিয়া ইহার দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তবে তাহা কার্য্যকরী হইবে না। সাক্ষাৎ অথবা পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া সিনেট গঠিত হয়। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। জরুরী অবস্থায় তাঁহাদিগকে সম্মেলনে আহ্বান করিবার ক্ষমতা রাজার রহিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই স্বতন্ত্রভাবে অথবা একাকীই সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইলে

ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী মেরী—বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে হাসপাতাল পরিদর্শন করিতেছেন

চল্লিশ দিনের মধ্যে পুনরায় নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বেলজিয়ম পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীবাহিনী ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। উদ্দেশ্য ইংলণ্ড আক্রমণ। হেষ্টিংস-এর যুদ্ধের পরে নয়শত বৎসরের মধ্যে কোন শক্তিই বৃটেন আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। ইংরেজজাতি আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সম্ভবত অতি শীঘ্রই এক বিরাট সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। মানবজাতি কম্পিতহৃদয়ে সেই চরম মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আমেরিকা কি করিবে ?

ইউরোপে নাৎসী বর্ব্বরতার কাহিনী নাকি মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে অভিভূত করিয়াছে। গত ২৭শে মে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক বেতার বক্তৃতায় বলেন, "নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্সে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে বেসামরিক নাগরিকদিগের প্রতি যে নৃশংসতা চলিতেছে তাহার অবিশ্বাস্য কাহিনী শ্রবণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মর্ম্মাহত হইয়াছে।" আমেরিকা যে এতদিনে ইউরোপের বিপন্ন নরনারীর ব্যথার ব্যথী হইয়াছে ইহা আশার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমবেদনা কি চিরকালই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিবে? বর্ত্তমান সহানুভূতি কি পূর্ব্বকার সহানুভূতিসূচক বাণীসমূহের ন্যায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে?

মার্কিন জাতির সহানুভূতি মিত্রশক্তির দিকে ধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। মার্কিনের সহিত বৃটেনের ভাষাগত ও কৃষ্টিগত নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। তাই এই দুর্দ্দিনে পাশ্চাত্যের গণরাষ্ট্রসমূহ যুক্তরাষ্ট্র কি করিবে তাহা জানিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি হয়ত অনেকখানি পরিমাণেই তাহার বন্ধুতা অথবা শত্রুতার উপর নির্ভর করিবে। আমেরিকার সাহায্য দ্বারা বিগত মহাযুদ্ধে যুধ্যমান শক্তিসমূহের ভাগ্য নির্ণীত হইয়াছিল; এবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে, বৃটেন এবং ফ্রান্সের পক্ষে এরূপ আশা করা কিছুই অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু যুদ্ধের প্রথম হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র মাত্র মৌখিক শুভেচ্ছা এবং ঋণদান করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছে। ইহার অধিক কিছু করা প্রয়োজন সে মনে করে নাই। এই নয়মাসের মধ্যে পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম—এই সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্র একে একে দুর্ব্বার সাম্রাজ্যলিপ্সার

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের (বর্ত্তমান ডিউক অফ উইণ্ডসর) পত্নী বর্ত্তমানে ফ্রান্সে এম্বুলেন্সে কার্য্য করিতেছেন

যূপকাষ্ঠে বলি পড়িল। পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও নরওয়ে ঋণ এবং শুভেচ্ছা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের পক্ষে সম্ভবত ঋণ অথবা শুভেচ্ছা গ্রহণের সময় ছিল না ; তাহার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে প্রবলের কুক্ষীগত হইতে হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার অন্যান্য শক্তির সহিত সম্মিলিতভাবে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্ সিনেটে পঞ্চাশ হাজার রণ-বিমান নির্ম্মাণের জন্য অর্থ দিয়াছেন। আয়োজন দেখিয়া মনে হয়, যুক্তরাষ্ট্র যেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার তোড়জোড় করিতেছে। দেশরক্ষার ব্যবস্থা ব্যতীতও মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকাবাসী উন্মুখ। মার্কিন রাজনীতিবিদগণের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ উক্তিও করিয়াছেন যে,' এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা নহে, বরং উহাকে গণতন্ত্রের সহিত স্বৈরতন্ত্রের—সংঘর্ষ বলাই সঙ্গত হইবে।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ—বাকিমহাম প্রাসাদে প্রহরী পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতেছেন

কিন্তু সত্যই কি আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে? গত মহাযুদ্ধের স্মৃতি তাহার পক্ষে বাস্তবিকই সুখকর নহে। পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে আদর্শ সংস্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অগণিত অর্থ এবং লোকক্ষয় করিয়াছিল প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের জীবদ্দশায় ঐ উচ্চ আদর্শ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের শেষভাগে সমগ্র মানব জাতির বিরুদ্ধে এই মানব-হিতৈষীর অভিযোগের অন্ত ছিল না। জগতের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের বিরাট আশা ইউরোপের কূট রাজনীতির চক্রে পড়িয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে অনবদ্য হইলেও তাহাতে ভাঙন ধরিবার পথ ছিল। যে কার্য্যে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাহা সেই সময়ের পক্ষে বস্তুত অসম্ভব ছিল। হয়ত তাঁহার অপেক্ষাও শক্তিমান পুরুষ এই ব্যাপারে বিফলমনোরথ হইতেন। তিনি চাহিয়াছিলেন, পরস্পরবিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিতে—গণতন্ত্রের সহিত সাম্রাজ্যবাদের, স্বায়ত্তশাসনের সহিত পরাধীনতার, শান্তির সহিত সাম্রাজ্যবাদের। তাহাও আবার সাম্রাজ্য-বাদী-নিয়ন্ত্রিত, শ্লথ-সংবদ্ধ লীগ অফ নেশনে্এর অধীনে। ফল যাহা হইল তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। যদি কখনও কোন সুদূর ভবিষ্যতে এক নিখিল জাতিসঙ্ঘ স্থাপিত হয় তাহা হইলে উইল্‌সনের এই আয়াস মানুষের জাগতিক শান্তি স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর যদি আবহমান কাল ধরিয়া সংঘাতই চলিতে থাকে, তাহা হইলেও ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণ ইতিহাসের এই অধ্যায় পাঠ করিয়া এ দরদী রাষ্ট্রবিদের স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতে বিরত হইবে না।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাতে জাতিসঙ্ঘের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। ফলে সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া রণোন্মত্ততার সৃষ্টি হইয়াছে। হয়ত যুদ্ধশেষে আবার এক নূতন করিয়া জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইবে। কিন্তু সার্ব্বজনীন শান্তি—যাহার সন্ধানে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই, তাহা কি এই ব্যবস্থার ফলে আসিবে অথবা তৃতীয় মহাযুদ্ধের বীজ এই নব জাতি-সঙ্ঘের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিবে?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকার সহানুভূতি স্বভাবতই মিত্র-শক্তির দিকে যাইবে। কিন্তু ঐ দেশে এমন লোকেরও অভাব নাই যাঁহারা মনে করেন যে, চিরকাল ধরিয়া ইউরোপের প্রবল শক্তিবর্গ যেমন রাজ্যবিস্তার লইয়া পরস্পরের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া আসিয়াছেন বর্ত্তমান মহাযুদ্ধও তাহার একটি বৃহত্তর রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। গণতন্ত্রের সহিত স্বৈরতন্ত্রের সংঘর্ষ বলিয়া এই যুদ্ধকে তাঁহারা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাদের মতে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অপরাধী যদি কেহ হইয়া থাকে তবে উভয় পক্ষই অপরাধী। অপরাধ না হইয়া থাকিলে কাহারও হয় নাই। জার্মানী আজ নিজকে প্রবল মনে করিয়া তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামিয়াছে, স্বাভাবিক আত্মরক্ষার নিয়মের বশেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রাণপণে শত্রুকে বাধা প্রদান করিতেছে। ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের সম্পর্ক নাই। যদি কোন নীতি জড়িত থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা চিরন্তন নীতি—আক্রমণ ও আত্মরক্ষা—যাহা অনাদিকাল হইতে জীবকুলের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে। আর, দুর্ব্বল জাতিসমূহের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্ন

উত্থাপন না করাই ভাল। কারণ—সাম্রাজ্যবাদী জাতিমাত্রেই স্ব স্ব অধীনস্থ জাতিসমূহের স্বাধীনতা অপহরণে অপরাধী।

এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা মার্কিন রাষ্ট্রে একেবারে অল্প নহে। সংখ্যালঘিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা রাষ্ট্রে এবং সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী বলিয়া প্রকাশ। ইঁহারা চাহেন, পুরাতন মনরো নীতি অবলম্বন করিয়া আমেরিকাকে প্রতীচ্যের ঘূর্ণী হইতে রক্ষা করিতে। Isolationist অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া ইহারা পরিচিত।

বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে যে নিরপেক্ষতা আইন প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহাতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। সিনেট নৌ-সাবকমিটি সুপারিশ করিয়াছেন, আমেরিকা সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধার্থে যাইতে পারে নী এবং ইউরোপের যুদ্ধে আমেরিকার যোগদান সঙ্গত নহে। তাহার কারণ প্রথমত, আমেরিকা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়; দ্বিতীয়ত আমেরিকার নৌবহর সাবমেরিনের আক্রমণে ও বিমান হইতে গোল বর্ষণে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

বিচ্ছিন্নতাবাদীগণ যুদ্ধের সুবিধা লইয়া আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে এক অভিনব নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন। ইংরেজীতে তাহাকে বলে "Cash and Carry." সোজা বাংলায় বলিতে গেলে, উহা এরূপ দাঁড়ায়, 'গরজ থাকে ত নগদ কড়ি দিয়ে মাল কেন, আর কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাও।" মার্কিনের নিরপেক্ষতা আইনের দুইটি ধারার মূলে এই অত্যুগ্র বণিকসুলভ মনোবৃত্তি নিহিত আছে। যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলিয়াছে তথায় আমেরিকার কোন যুদ্ধজাহাজ যাইবে না। ইউরোপের শক্তিবর্গকে আমেরিকা হইতে নগদ টাকায় মাল কিনিয়া নিজের জাহাজে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা এইরূপ ভয় করেন, যে-সমুদয় অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে তথায় আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ গেলে আক্রান্ত হইতে পারে এবং সেই সূত্রপথে মার্কিনের সহিত অন্য কোন শক্তির সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিতে পারে।

নগদ মাল কেনার একটু ইতিহাস আছে। গত মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গ আমেরিকার নিকট হইতে বহু টাকার মাল ধারে ক্রয় করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের পরিণাম সন্দেহজনক হইয়া উঠিল তখন কোটীপতি উত্তমর্ণগণ তাঁহাদের টাকার কথা ভাবিয়া অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মিত্রশক্তি হারিয়া গেলে তাহাদের টাকার উপায় কি হইবে মনে করিয়া আহার নিদ্রা লোপের উপক্রম হইল। তখন তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন কি করিয়া আমেরিকাকে যুদ্ধে নামাইতে পারা যাইবে। যুক্তরাষ্ট্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল কিন্তু সমরঋণের কি হইয়াছিল তাহা পাঠকমাত্রেই জানেন। মহাযুদ্ধের পরে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে সরকারী তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার রিপোর্টে অনেক গোপনীয় তথ্যই উদ্ঘাটিত হইয়াছিল।

যে রন্ধ্র পথে শনি আসিয়া ঢুকিয়াছিল, বিচ্ছিন্নতাবাদীগণ নিরপেক্ষতা আইন দ্বারা সেই পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অতি সাবধানী মনোবৃত্তি সব সময় মানুষকে পরিচালিত করে না। ব্যক্তি এবং জাতির জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন উচ্চতর আহ্বানের আকর্ষণে ক্ষুদ্রতর স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ সেই আহ্বানের পিছনে ছুটিয়া যায়। মানবতার আহ্বান আসিয়াছে, কিন্তু তাহা মার্কিনবাসীর অন্তর স্পর্শ করিতে পারিবে কি?

সেদিন আমেরিকার পক্ষ হইতে মিঃ কর্ডেল হাল বলিয়াছেন যে, স্থায়ী বিশ্বশান্তি ও সুনিয়ন্ত্রিত আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে পুনপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করিয়া অপরাজেয় হইতে হইবে। সামরিক শক্তি বর্দ্ধিত করিবার ক্ষমতা মার্কিন সরকারের অবশ্যই আছে। কারণ পৃথিবীর বার আনা স্বর্ণ তাহার ধনাগারে সঞ্চিত। কিন্তু অপরাজেয় সামরিক শক্তি দ্বারা জগতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন ও আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সমাধান করা যায় কি-না তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। বৃটেনও একথা একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দুর্জ্জয় নৌশক্তিই পৃথিবীতে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। কিন্তু ক্রমে তাহার প্রতিবেশীবর্গও "শান্তিপ্রতিষ্ঠা"র দিকে মন দিল। ফল হইল, কে কত বেশী পরিমাণে মারণাস্ত্র উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা লইয়া বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া প্রবল প্রতিযোগিতা চলিল। কত অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ কমিটি ও কনফারেন্স হইল। কিন্তু মূলে ভুল রহিয়া গেল। প্রত্যেকের মনের কোণে ছিল অপরের প্রতি গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস এবং আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা। তাহার স্বাভাবিক পরিণতি হইল ইউরোপব্যাপী বিরাট ধ্বংসলীলায়। অখণ্ড শান্তি পৃথিবীতে কখনও আসিবে কি-না জানি না; কিন্তু যদি আসে তাহা হইলে মহত্তর পথ অনুসরণ করিয়া মানবসমাজকে তাহা লাভ করিতে হইবে; বণিকসুলভ মনোবৃত্তি এবং সমরোপকরণের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দ্বারা নহে।

সাধারণের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করিবে কি-না অর্থাৎ জর্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কি-না। গণরাষ্ট্রসমূহকে সাহায্য করিতে মার্কিনবাসী সর্ব্বদাই প্রস্তুত; কিন্তু সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া মনে হয়, আগামী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে না।

সাময়িকী

নববর্ষ -

এই আষাঢ়ে ভারতবর্ষ অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় এদেশে সাময়িকপত্র পরিচালন সহজসাধ্য নহে। যাঁহাদের অনুগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষ গত ২৭ বৎসর কাল তাহার সাফল্যময় জীবন অতিক্রম করিয়াছে আজ আমরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতবর্ষের লেখক ও পাঠকগণকে নূতন করিয়া বলিবার আমাদের কিছু নাই। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা চিরদিনই আমাদিগকে তাঁহাদের প্রীতি ও করুণা দ্বারা সাহায্য করিবেন। ২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ প্রকাশের পূর্ব্বেই আমরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে হারাইয়াছিলাম—আজ তাঁহার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। ১৩৪৫ সালে রায় বাহাদুর জলধর সেন মহাশয় ও ১৩৪৬ সালে সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করায় সে শোক এখনও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। তাঁহাদের সকলকে আমাদের যথাযোগ্য ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আজ আমরা নববর্ষে নব উদ্যমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। শ্রীভগবান আমাদের সহায় হউন।

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব -

আমাদের পরম স্নেহাস্পদ ডাঃ শ্রীমান কনক সর্ব্বাধিকারী সম্প্রতি লণ্ডন ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এফ্. আর্ সি এস্ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। শীঘ্রই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। শ্রীমান কনক পরলোকগত লেঃ কর্ণেল ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই. এস্. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর সম্মান লাভের জন্য ইনি ১৯৩৮ সালে বিলাত গমন করেন। শ্রীমান্ দেশের দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশবাসীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করুন ইহাই আমরা কামনা করি।

কনক সর্ব্বাধিকারী

ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মিলন—

গত ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকা সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং খ্যাতনামা কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ সঙ্গে শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার এম-এল-এ'র সভানেত্রীত্বে

প্রাদেশিক মহিলা সম্মিলন, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক শ্রমিক সম্মিলন, শ্রীযুত আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে কিষাণ সম্মিলন ও শ্রীযুত অতীন্দ্রমোহন রায়ের সভাপতিত্বে ছাত্র সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং শ্রীমতী লীলা রায় মহিলা সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী হইয়াছিলেন। দেশের এই সঙ্কটকালে ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মিলন হইয়া গেল। জ্যোতিষবাবু তাঁহার অভিভাষণে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ সময়ে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সম্মিলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সেগুলিতেও দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের সকল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্যই এ সময়ে সকলকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলা হইয়াছে।

ভারতীয় ছাত্রের সাফল্য—

অধ্যাপক এন-এন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত বি-এন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ম্যাঞ্চেষ্টারে বস্ত্রশিল্প শিক্ষা করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি বোম্বায়ে শিক্ষা লাভের পর বিলাতে যান এবং ম্যাঞ্চেষ্টারে কলেজে শিক্ষার পর ল্যাঙ্কাসায়ারে কলে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

বি-এন-চট্টোপাধ্যায়

নবদ্বীপে পূর্ণিমা সম্মিলন—

প্রবীণ বৈষ্ণবসাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীযুক্তরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার নবদ্বীপে এডোয়ার্ড লাইব্রেরী হলে পূর্ণিমা সম্মিলনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, বৈষ্ণবাচার্য্য হরিদাস গোস্বামী, শ্রীযুত রমেশ আচার্য্য, শ্রীযুত জনরঞ্জন রায়, শ্রীযুত দেবনারায়ণ গোস্বামী প্রভৃতি সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় ১০২ বৎসর বয়সেও সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে পূর্ণিমা সম্মিলন

পরলোকে যোগেন্দ্রনাথ সিংহ—

নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গার খ্যাতনামা উকীল রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ সিংহ গত ১৯শে এপ্রিল ৭৮ বৎসর বয়সে হাওড়ায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টায় বড় হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৫০ বৎসরকাল নানাপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া দেশের ও দশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্মিলন—

গত ১১ই ও ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটে নিখিল বঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। পাবনার কবিরাজ শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র তর্কতীর্থ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

আপাতত একশত ছাত্র লইয়া ক্লাস খোলার সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুসারে বৎসরে বার হাজার টাকা আবশ্যক হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরিকল্পনা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং ইহার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা—

খান বাহাদুর মিঃ আজিজুল হক সম্প্রতি নাগপুরের এক জনসভায় মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি মধ্যপ্রদেশের মুসলমানদের, তথা সমগ্র মুসলমানসমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়া বলিয়াছেন তাঁহারা যেন দেশের আধুনিক ভাবধারার সহিত তাল রাখিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমান হইতে সচেষ্ট হন। মুসলমান নেতা ও শিক্ষাব্রতীরা মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন এবং মুসলমান জনসমাজকে যে ইহার উপযোগিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন ইহা আশা ও আনন্দের কথা। মুসলমান সমাজের মধ্যে এত যে গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা এবং নিজেদের কল্যাণ সম্বন্ধে এই যে অদূরদর্শিতা—ইহার প্রধানতম কারণ তাহাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। শিক্ষার বিস্তার ও আধুনিক চিন্তাধারার সহিত পরিচয় হইলেই মুসলমান সমাজের মধ্যে উদারতা দেখা দিবে এবং ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াও পরিষ্কার হইয়া আসিবে। খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক যে তাঁহার সমাজের দৃষ্টি এই দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন সেইজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র।

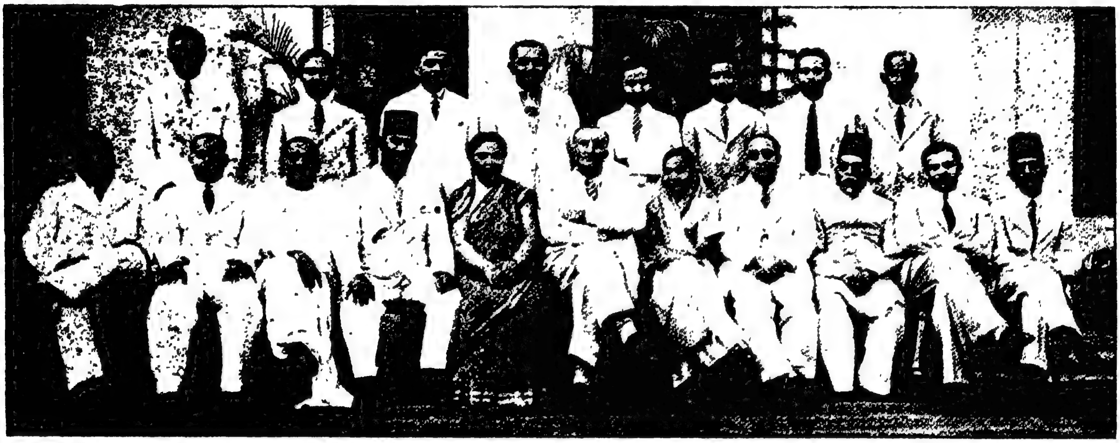

শিক্ষা বিভাগের সম্মিলন—ডিরেক্টার মিঃ বটমলী, সহকারী ডিরেক্টার খান বাহাদুর আবদর রহমান খান, খান বাহাদুর এম এ জাফর, মিঃ এস কে ঘোষ প্রভৃতি

শ্রীমতী সেনগুপ্তার জয়লাভ—

চট্টগ্রামের জননায়ক মহিমচন্দ্র দাস মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে আসন শূন্য হইয়াছিল শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা সেখানে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা কংগ্রেস মনোনয়ন লাভ করিয়াছিলেন। পরলোকগত মহিমচন্দ্র দাস মহাশয়ও কংগ্রেসী সদস্যই ছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি চট্টগ্রামবাসীর এই আনুগত্যে দেশবাসীমাত্রই গৌরবান্বিত। ইহা ছাড়া দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অন্যান্য প্রার্থীগণ যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন এজন্য তাঁহারাও ধন্যবাদের পাত্র।

বাঙ্গালায় নারী হরণ—

নারীহরণ বাঙ্গালায় প্রতিদিনকার ঘটনায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি পাবনা হইতে কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মুসলমানমহিলা হরণের খবর আসিয়াছে। ইহার মধ্যে আনন্দের কথা এই যে, অন্যান্য মহিলাদের জনৈক হিন্দু

বেলজিয়ামে জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ধ্বংসের দৃশ্য। বহু গৃহ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে

বেলজিয়ামে বৃটীশ সৈন্যদল—বৃটীশ সাঁজোয়া গাড়ী দেখিয়া বেলজিয়ামবাসীরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে

জিব্রাণ্টার বন্দরের দৃশ্য—বৃটীশ ও ইটালীয়ান রণতরীসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে

হল্যাণ্ডের দৃশ্য—একটি সুদৃশ্য দ্বীপ—নাম ভলেনডাম। জগতের মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য স্থান

ওলন্দাজদিগের একটি কল—হল্যাণ্ডের অপর দৃশ্য। পূর্ব্বে ইহা জল পাম্প করার জন্য ব্যবহৃত হইত

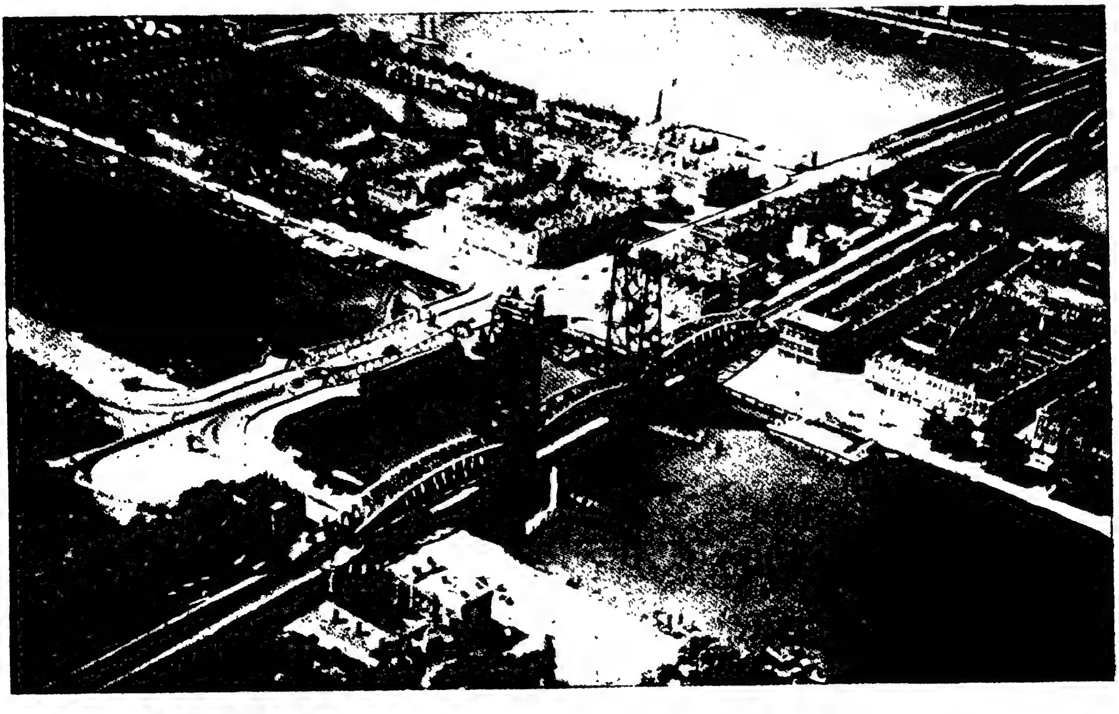

[illegible] রটারডাম—বর্ত্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। জার্ম্মাণীর আক্রমণের পূর্ব্বে বিমান হইতে দৃশ্য গৃহীত

ভদ্রলোক নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই জনকয়েক হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোক অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিছুকালের মধ্যেই অপহৃতা মহিলাটিকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। পাবনা শহরের পাশেই পদ্মার চর। অনেক মহিলাই সন্ধ্যাবেলা সেখানে বেড়াইতে যান। কাছাকাছি অনেক হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকের বাস; এরূপ ক্ষেত্রেও যদি মেয়েদের মানসম্ভ্রম নিরাপদ না থাকে তাহা হইলে শান্তি ও শৃঙ্খলার যাঁহারা রক্ষক তাঁহাদের পক্ষে কলঙ্কের কথা বই কি! কিন্তু অপরের উপর দোষারোপ না করিয়া মেয়েদের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের একযোগে প্রত্যেক শহরে ও গ্রামে রক্ষীদল গঠন করা উচিত।

চট্টগ্রাম সঙ্গীত সম্মিলনে সভাপতি গৌরীপুরের শ্রীবীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতি রায় বাহাদুর ক্ষীরোদচন্দ্র রায়প্রভৃতি

সর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যের ডাক টিকিট—

ব্রহ্ম সরকার স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর পাঁচ তোলার অনধিক ওজনের সংবাদপত্রের প্যাকেটের ডাকমাশুল এক পাই হইবে। এই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই তাঁহারা এক পাইয়ের ডাকটিকিট প্রচার করিবেন। পৃথিবীতে ইহাই হইবে সর্ব্বাপেক্ষা কমমূল্যের ডাক টিকিট। সংবাদপত্র আধুনিক জগতে লোকশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়। খবরের কাগজের বহুল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিরক্ষরতা দূর হইবার সম্ভাবনা বেশী এবং শিক্ষার মান উন্নত হয়। ব্রহ্ম সরকার ইহা বুঝিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার সংবাদপত্রের উপর যে মাশুল আদায় করেন তাহা ব্রহ্মদেশের নূতন হারের তিন গুণ। আশা করি ব্রহ্ম সরকারের এই দৃষ্টান্ত ভারত সরকারও অনুসরণ করিবেন।

ভারতরক্ষী সৈন্যদল—

যে কোন শত্রুর হাত হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয়দের দ্বারা ব্যাপকভাবে সৈন্যদল গঠনের অনুমতি দিয়া ভারত সরকার একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন; ভারতবাসী এই প্রয়োজনের কথা অনেকদিন হইতেই বলিয়া-আসিয়াছে এবং পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যেরা ইহার জন্য বহুবার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মালয়, মধ্য-প্রাচ্য ও ফ্রান্সে ভারতীয় সেনাদল প্রেরিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান যুদ্ধেও বহু ভারতীয় নিযুক্ত হইয়াছে। যুদ্ধের সঙ্কট এমনই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার জন্যও এখন সকল প্রদেশেরই প্রস্তুত হওয়া দরকার। যে

বাধার জন্য এতদিন ভারতীয়দের সৈন্যদলে যোগদানের অসুবিধা ছিল, আজ সে বাধা দূর হইয়াছে। কাজেই আশা আছে, দেশবাসীর নিকট উপযুক্ত সাড়া পাইতেও বিলম্ব হইবে না।

মফঃস্বলে কলেজ প্রতিষ্ঠা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা সম্প্রতি মফঃস্বলে তিনটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন। বরিশাল জেলার চাখার নামক গ্রামে 'ফজলুল হক কলেজ' নামে একটি, মালদহে 'ফজলুল হক আদিনা কলেজ' নামে অপরটি ও পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জে 'সিরাজগঞ্জ কলেজ' নামে তৃতীয়টি স্থাপিত হইতেছে। তিনটি কলেজেই ১৯৪০-৪১ সালের জুলাই মাস হইতে অধ্যাপনা আরম্ভ হইবে। তিনটিই দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এবং ঐ গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ে আই-এ পর্য্যন্ত পড়ান হইবে। শহরের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া শহরের কলেজে পড়াশুনা করা গরীব ছাত্রদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। কাজেই মফঃস্বলে উচ্চশিক্ষার প্রসারার্থ এইরূপ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। এই কলেজ তিনটির প্রতিষ্ঠায় আমরা আনন্দ প্রকাশ করি।

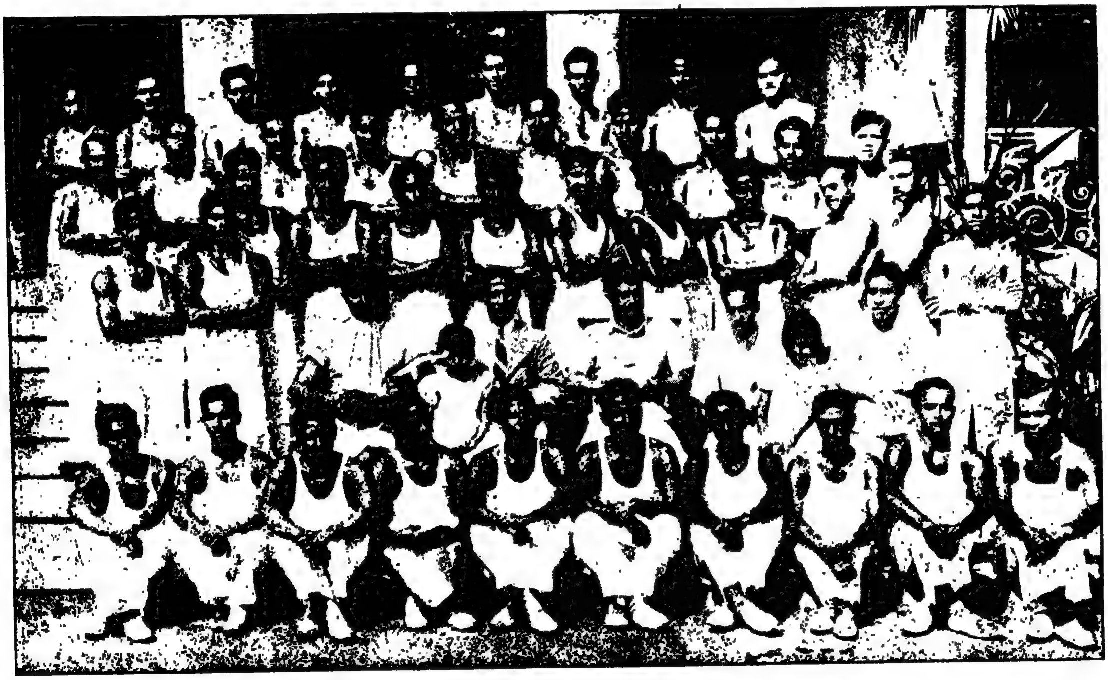

বাঙ্গালার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকবৃন্দ—ইহারা কলিকাতায় শরীর চর্চ্চা শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন।

ট্রটস্কির জীবননাশের ষড়যন্ত্র—

রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক নির্ব্বাসিত ট্রটস্কি বর্ত্তমানে মেক্সিকো শহরে বাস করিতেছেন। নির্ব্বাসিত হইয়াও ষড়যন্ত্রকারীদের হাত হইতে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। একদল ষড়যন্ত্রকারী সম্প্রতি মেসিন গান ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া তাঁহার বাড়ী আক্রমণ করে এবং মেশিন গান চালাইতে থাকে। ট্রটস্কি ও তাঁহার স্ত্রী মাটিতে শুইয়া পড়িয়া কামানের গোলা হইতে আত্মরক্ষা করেন, কিন্তু আক্রমণকারীরা তাঁহার সেক্রেটারীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। সুদূর নির্ব্বাসনেও ষড়যন্ত্রকারীদের হিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই, সেখানেও তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করা হইয়াছে। একদিন যিনি জনগণের প্রাণের মানুষ বলিয়া বন্দিত হইয়াছিলেন, দলগত চক্রান্তে তিনিই আবার বন্দী হইলেন এবং বন্দী অবস্থায়ও বিপদের শেষ হইল না। প্রতিহিংসার এই ভয়াবহ রূপই কি হিংস্র বিপ্লবের পরিণতি?

অজৈব রসায়নে গবেষণা—

অজৈব রসায়ন সম্পর্কে গবেষণার অধিকতর সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা অনুমোদন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বর্মা অয়েল কোম্পানির নিকট হইতে তেত্রিশ হাজার তিনশত একানব্বই টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গচ্ছিত তহবিল হইতেও ঐ পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে এজন্য সাধুবাদ করিতেছি।

ফ্লাউড কমিশন রিপোর্ট—

বাঙ্গালার ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার ফ্লাউড কমিশন নিযুক্ত করিযাছিলেন। তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রদ ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সম্পর্কে কমিশনের সকল সদস্য একমত হইতে পারেন নাই। কমিশনের অধিকাংশ সদস্য মালিকদিগকে খেসারত দিয়া ভূমির স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করিতে হইলে কোটি কোটি টাকার আবশ্যক, অথচ সরকারী তহবিলে অত টাকা নাই। কাজেই সব টাকাই ঋণ করিতে হইবে। জমিদারী প্রথা যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দেশের অহিতই করিয়াছে, এই প্রথার মধ্যে যে কোন গুণই নাই—একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করি না। কিন্তু প্রয়োজন বোধে বৃহত্তর স্বার্থের প্রতিষ্ঠার জন্য যুগোপযোগী পরিবর্ত্তনের উপযোগিতা অস্বীকার করিলে জাতীয় অগ্রগতির দিক দিয়া তাহা বোকামি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু কথা এই যে, জমিদারী প্রথা রহিত করিলে বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রদবদল করিলেই যে দেশের অধিকাংশের স্বার্থের প্রতিষ্ঠা হইবে, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। সরকারের পরিচালিত খাসমহলের প্রজারাও যে রামরাজত্বে বাস করিয়া নাই, তাহার প্রমাণও আমরা সময় সময় পাইয়া থাকি।

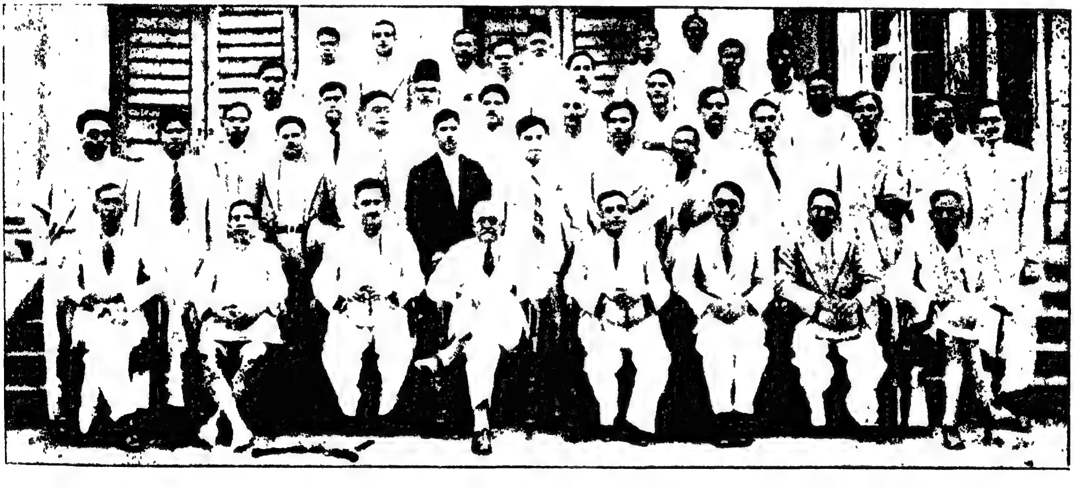

বহরমপুরে বাঙ্গালার রেশম শিল্প সম্পর্কিত সম্মিলনে সমবেত ব্যবসায়ীবৃন্দ

শিক্ষা ও অর্থনীতি—

দেশের বড় বড় বৃত্তি ও শিল্প-সংস্কৃতির বিস্তারের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই উচ্চশিক্ষা পাইতে গিয়া যে আর্থিক ব্যয় অপরিহার্য্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহা যে রকম প্রতিদানবিমুখ তাহাতে স্বল্পবিত্তদের পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবিকামূলক কোন বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষা করাই উচিত। তাহাতে একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক ভিড় কমিবে, অপর পক্ষে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে আরও একটু অবহিত হইবেন আশা করা যায়।

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার—

জয়পুর রাজ্যের অধীন বৈরাট, নালিয়াসর ও রায়েরে

ভূগর্ভে বহু প্রাচীন সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বৈরাটে একটি নূতন ধরণের বৌদ্ধস্তূপ ও অশোক শিলালিপি এবং নালিয়াসরে সম্বর হ্রদের ধারে একটি মধ্য-যুগীয় প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর রায়েরে মাটির নীচে যে উন্নত শিল্পকেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা বাইশ শত বৎসরের পুরাতন। ইহার দৈর্ঘ্য আড়াই হাজার ফিট ও প্রস্থ দেড় হাজার ফিট। আমরা আশা করি, এই নূতন আবিষ্কারের ফলে ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

দুর্ঘটনা ও তাহার প্রতীকার—

শহরে গাড়ী চাপা পড়িয়া, কলকারখানায় জখম হইয়া, মফঃস্বলে জলে ডুবিয়া সর্পদষ্ট হইয়া প্রতিদিনই বহু লোক প্রাণ হারাইয়া থাকে। এই সকল মৃত্যুকে আমরা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি। এগুলির হাত হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই বলিয়া অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া থাকি। আবালবৃদ্ধবনিতা সকল দেশ-বাসী প্রতিদিনই এই সব বিপদের মুখে পতিত হয়, অথচ এই সকল দুর্ঘটনা যে অনেক ক্ষেত্রেই সাবধানতা, মনোযোগিতা ও বিবেচনার অভাবে ঘটিয়া থাকে একথা আমরা ভাবিতেও চাহি না। সম্প্রতি রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভোজসভায় মিঃ পি-এন্-মুখার্জি এই সব দুর্ঘটনা নিবারণের উপযোগী শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করার পক্ষে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়াছেন। নাগরিক ও গ্রামবাসী উভয় শ্রেণীর মধ্যেই চলাফেরা বিষয়ে সতর্কতা ও আত্মরক্ষা ব্যাপারে সচেতন না হওয়ার জন্যই প্রতিদিন এত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কাজেই শহরে ও গ্রামে যথাক্রমে সেই শিক্ষাই জনগণকে দেওয়া দরকার।

ডাক্তার সৈয়দ মামুদ ও মিঃ আসফ আলি

বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার—

তানাকে নামক জনৈক জাপানী বৈজ্ঞানিক এক অতি অভিনব টাইপরাইটার ও অঙ্ক কষিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র চালাইতে মাত্র শব্দতরঙ্গই না কি যথেষ্ট। হাতে বোতাম টিপিয়া কল চালাইবার প্রয়োজন হইবে না। অক্ষর, শব্দ ও সংখ্যা মুখে উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই নূতন কলে তদনুযায়ী ছাপা হইয়া যাইবে। অধিকন্তু অঙ্ক কষিবার কলটিতে না কি যে-কোন প্রকার অঙ্কঘটিত প্রশ্নের উত্তর বাহির করা যাইবে। মাত্র শব্দতরঙ্গের গতি ও প্রকৃতি এবং মানুষের গলার আওয়াজের

ডক্টর ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত শিল্প বিষয়ক তথ্যসংগ্রহ কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন।

বিশেষত্ব—এই উভয়বিধ বিষয়ে গবেষণা করিয়াই না কি এই নূতন যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের উদ্ভাবন বিচিত্র সন্দেহ নাই।

ডাক্তারি শিক্ষায় নবব্যবস্থা—

নিখিল-বঙ্গ লাইসেন্‌সিয়েট মেডিকাল ছাত্রসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি মেডিকাল স্কুলসমূহ হইতে চারি বৎসরের পাঠ্যতালিকা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মোটামুটিভাবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমুদয় শাখায় অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে চারি বৎসর যথেষ্ট নহে এবং এই অপূর্ণ শিক্ষা লইয়া যাঁহারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তাঁহারা সত্যকার দায়িত্বশীল চিকিৎসক হইতে পারেন না বলিয়াই ডাঃ রায়ের বিশ্বাস। তাঁহার এই মন্তব্য যে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখার যোগ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিকিৎসার ন্যায় গুরু দায়িত্বপূর্ণ বৃত্তি যাঁহারা অবলম্বন করিবেন তাঁহাদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা যে কত প্রয়োজন তাহাও বলাই বেশী। কিন্তু মেডিকাল ডিগ্রী পাঠ্যের অনুরূপ করিয়া মেডিকাল স্কুল-সমূহেও ছয় বৎসরের কোর্স প্রবর্ত্তন করার প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমত, ইহার ব্যয়বাহুল্য ; দ্বিতীয়ত, ডিগ্রীপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দর্শনীর পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ইহার প্রথমটি ছাত্রদের ও দ্বিতীয়টি চিকিৎসার্থীদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই ক্লেশকর হইবে। সুতরাং ছয় বৎসরের কোর্স প্রবর্ত্তন হওয়া যেমন রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অঙ্কটা তেমনই যাহাতে কোন পক্ষে অত্যধিক না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

ম্যাডাম চিয়াং কাইসেক—জাপানী উড়োজাহাজ কর্ত্তৃক বোমা ফেলার পর ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়া যাইতেছেন

সার জর্জ ক্যাম্বেল—এদেশ হইতে বিদেশে মাল রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন

আশুতোষ স্মৃতিপূজা—

গত ২৫শে মে শনিবার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ষোড়শ মৃত্যু বার্ষিক উৎসব কলিকাতায় যথারীতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন সকালে বহু লোক চৌরঙ্গীতে সার আশুতোষের মর্ম্মর মূর্ত্তির নিকট সমবেত হইয়া তাহাতে মাল্য দান করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদে সার আশুতোষের আবক্ষ মূর্ত্তির নিকটও বহু লোক সমবেত হইয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ও তথায় কীর্ত্তন সঙ্গীত হয়। সকালে সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিকালে সার সর্ব্বপল্লী রাধাকিষণ

উৎসবে পৌরহিত্য করেন। মহতের কথা স্মরণ করিয়া আমরাও যদি মহৎ হইতে পারি—তবেই এই স্মৃতিপূজা সার্থক হয়।

কুমারী স্নিগ্ধা ঘোষ দস্তিদার—

বরিশাল গাভার শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার মহাশয়ের নয় বৎসর বয়স্কা কন্যা কুমারী স্নিগ্ধা সম্প্রতি নানাস্থানে তাঁহার সঙ্গীতের কৃতিত্ব দেখাইয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, বঙ্গীয় সঙ্গীত সমিতি, বাগবাজার, চন্দনগর প্রভৃতি স্থানের প্রতিযোগিতায় স্নিগ্ধা উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে এরূপ সঙ্গীত নৈপুণ্য সাধারণত দেখা যায় না।

স্নিগ্ধা ঘোষ দস্তিদার

মালদহে হিন্দু সম্মিলন—

গত ১লা ও ২রা জুন মালদহে জিলা হিন্দু সম্মিলন ও হিন্দু ছাত্র সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন ও মৈমনসিংহের মহারাজ কুমার শ্রীযুত সীতাংশুকান্ত আচার্য্য চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ছাত্র সম্মিলনে শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায় সভাপতিত্ব করেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু পরে যাইয়া হিন্দুসভা ও ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন। ঐ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুত পদমরাজ জৈন, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি বহু হিন্দু নেতা মালদহে গমন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। এখন প্রায় প্রতি জেলাতেই হিন্দু সম্মিলন করিয়া হিন্দুদিগকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানকুমারী জয়ন্তী—

বাঙ্গালার খ্যাতনামা মহিলা-কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসুর নাম সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি, শুভ-সাধনা, প্রিয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতির রচয়িত্রী। বহুদিন হইতে তিনি খুলনায় বাস করিতেছেন। আগামী জুলাই মাসের মধ্যভাগে খুলনার অধিবাসীরা তথায় 'মানকুমারী জয়ন্তী'র অনুষ্ঠান করিয়া এই বর্ষীয়সী কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। স্থানীয় জেলা জজ সিভিলিয়ান শ্রীযুত সুকুমার সেনকে সভাপতি এবং শ্রীযুত সুধীরকুমার মজুমদারকে সম্পাদক করিয়া সেজন্য খুলনায় একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। আমরা খুলনাবাসীদিগের এই প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছি এবং আশা করি, উৎসব সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করিবে।

ইটালীর সমুদ্র উপকূলে রক্ষা-ব্যবস্থা—মুসোলিনী নিজে ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন

পরিস্রুত জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ—

কলিকাতার অধিবাসীরা কলের জল যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া বৎসরে কর্পোরেশনের প্রায় দশ লক্ষ টাকা লোকসান করেন। এই লোকসান বন্ধ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ মিটার যন্ত্রের সাহায্যে জল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন। অপচয় নিবারণ দরকার, কিন্তু তাই বলিয়া কর্পোরেশন যে ব্যবস্থার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারি না। অপচয় নিবারণ করিতে হইলে আরও অনেক বিভাগেই হাত দিতে হয় এবং অনেক বিভাগেই হাত দেওয়া চলিবে না। সুতরাং মাথা পিছু পঁচিশ গ্যালন জলের ব্যবস্থা করিয়া কর্পোরেশনের কর্ত্তারা করদাতাদের যে হিত করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য। কেন না, কলের জলের অভাব হইলেই গঙ্গার জলের ব্যবহার বাড়িয়া যাইবে, ফলে নানা প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে। আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ এই সব বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন।

বিজ্ঞানের স্থায়ী মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা—

আগামী ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রজত-জয়ন্তী উৎসব হইবে। এই উপলক্ষে বিজ্ঞান কলেজে একটি বিজ্ঞানসম্পর্কিত প্রদর্শনী হইবে। এই প্রদর্শনটি যাহাতে স্থায়ী মিউজিয়ামে পরিণত হইয়া দেশের একটি বিশেষ অভাব দূর করিতে পারে, সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মিলিত ভাবে চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় বার হাজার ও কর্পোরেশন পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে সম্মত হইয়াছেন। এইরূপ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুতরাং এই চেষ্টা সাফল্যলাভ করিলে উদ্যোক্তারা দেশবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ হইবেন। ডাঃ

মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌দের পক্ষে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

টেলিফোনের নুতন পরিচালনা—

বাঙ্গালার টেলিফোন বিভাগ সরকারী পরিচালনায় লইবার চেষ্টা হইতেছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, পরবর্ত্তী ফোন ডিরেক্টরী প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই টেলিফোন বিভাগটি সরকারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এজন্য টেলিফোন কর্পোরেশন, ডাকবিভাগ ও সরকার আনুষঙ্গিক বুঝাপড়ায় ব্যস্ত আছেন। শীঘ্রই সমস্ত ব্যাপারের নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে মনে হয়। এই পরিবর্ত্তনে জনগণের পক্ষে যে কোন অসুবিধার কারণ ঘটিবে না তাহা নিশ্চিত। তবে আমরা টেলিফোনকে লোকের দৈনন্দিন জীবনে আরও ব্যাপক ভাবে গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহার মূল্য কমাইবার দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

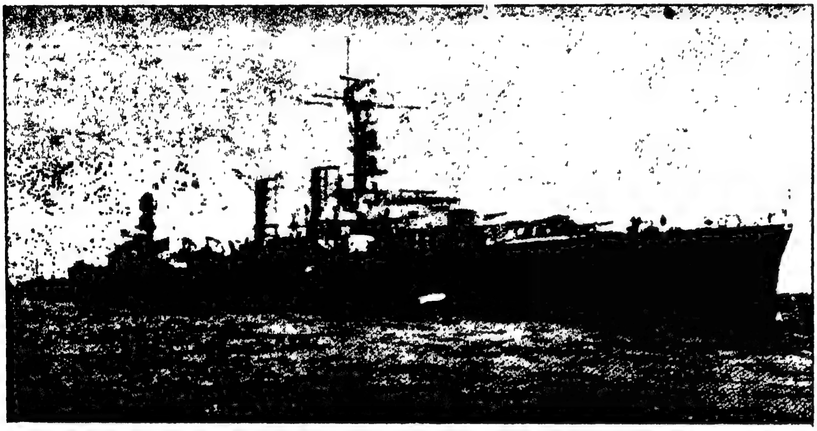

জার্মাণ ক্রুইজার এমডেন—সম্প্রতি নরওয়ের যুদ্ধে জলমগ্ন হইয়াছে। ইহা ৫৪০০টন ছিল এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল

পরলোকে সিদ্ধবাবা মহারাজ—

সম্প্রতি ১৬।২এ ডোভার লেনে স্বনামধন্য যোগী শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা মহারাজ মাত্র ষাট বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। স্বভাবত তিনি যুবকের ন্যায় স্বাস্থ্যবান ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর মাত্র আগের দিন রাত্রি দশটার সময় তিনি পাকস্থলীতে দুঃসহ বেদনানুব করিতে থাকেন এবং ইহাই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনান্তের কারণ হয়। চিকিৎসকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার রোগযন্ত্রণার উপশম করিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে সাধুজী গয়া জেলার ধানীপাহাড়ীর ঠাকুরদাস বাবাজীর নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তখন হইতেই তিনি যৌগিক জীবনযাপন করিতে থাকেন। ভাগলপুর জেলার মন্দার পর্ব্বতে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আশ্রমে সমাগত হাজার হাজার লোককে দৈনিক ভোজন করাইতেন। তাঁহার এই আকস্মিক পরলোকগমনে তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও ভক্তের প্রাণে বেদনা বোধ হইতেছে, আমরা তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ভারতে ইঞ্জিন তৈরির ব্যবস্থা—

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে রেলওয়ে ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার জন্য ভারতেই কারখানা স্থাপিত হইবে। কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপটিকে এই উদ্দেশ্যে পরিবর্দ্ধিত করা হইবে। রেলওয়ে বোর্ড ভারতের উপর যে অন্যায় অবিচার করিয়াছেন, ভারতে ইঞ্জিন ইত্যাদি তৈয়ারি করার ব্যবস্থা না করা [redacted] একটি। এই দিক দিয়া ভারতের বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক এখনও যদি ভারতের কারখানায় ইঞ্জিন ইত্যাদি তৈয়ারির ব্যবস্থা হয় তাহা হইলেও সুখের বিষয় বলিতে হইবে। এই সম্পর্কে ভারতে বিমান নির্ম্মাণ করিবার জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ভারতের অভাব যে কত বেশী, তাহা বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইতেই বুঝা যাইতেছে। ভারত সরকার শীঘ্রই বিমান নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি-না তাহাও আমরা জানিতে পারিলে সুখী হইব।

দিল্লীতে নিখিল ভারত ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তৃক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে অভিনন্দন দান। পণ্ডিতজী উত্তর দিতেছেন

বোম্বায়ে জাতীয়-উন্নতি-পরিকল্পনা সমিতির সভা—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন

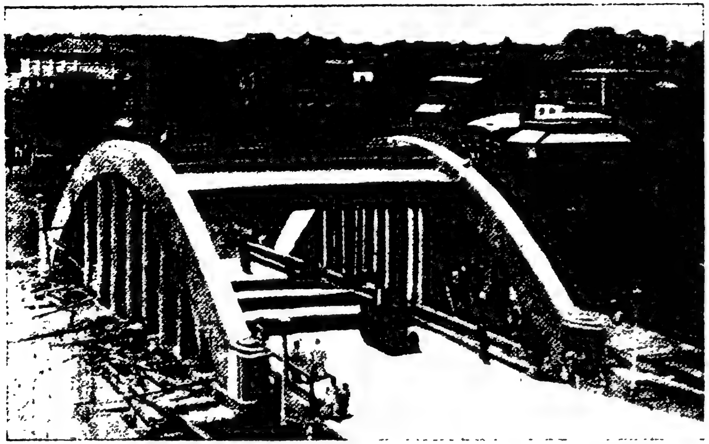

শ্যামবাজারে খালের উপর নির্ম্মিত নূতন ব্যারাকপুর ব্রিজ—সম্প্রতি উহার উপর দিয়া গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে

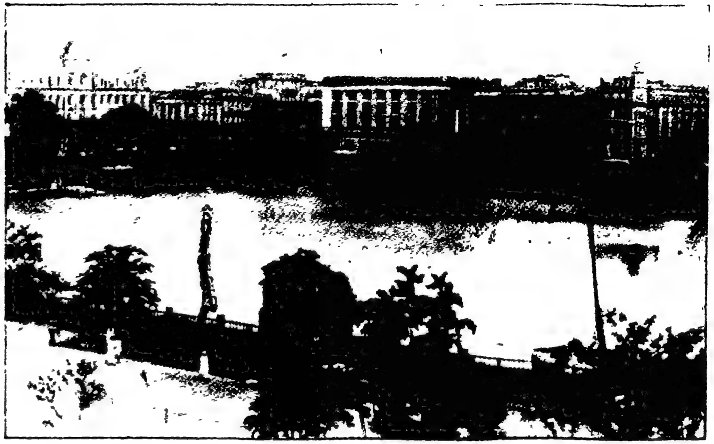

লালদিঘী বা ডালহৌসী স্কোয়ার পুষ্করিণী—এখন ইহা বুজাইয়া ঐ স্থানে মোটর গাড়ী রাখার জায়গা করা হইবে

রাধাবাজার ও পোলক ষ্ট্রীটের নূতন রাস্তা—ক্যানিং ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ইহা নিৰ্ম্মিত হইয়াছে

নূতন হাওড়া পুল—হাওড়ার দিকে এই ভাবে নির্ম্মিত হইতেছে

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হকি ঃ

জেপসন কাপ ফাইনাল ঃ

জেপসন কাপের ফাইনালে ইয়ং স্পোর্টর্স ৩-২ গোলে জি আই পি রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে উক্ত কাপ বিজয়ী হয়েছে। খেলার প্রথমার্দ্ধে রেলদল ২-১ গোলে অগ্রগামী থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত বিজয় লাভ করতে সক্ষম হয় নি। ইয়ং স্পোর্টর্স দলের এই জয়লাভে বিশেষ কৃতিত্ব ছিল রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের। কিন্তু তাদের অযথা শারীরিক শক্তিপ্রয়োগের ফলে রেলদলের আক্রমণ ভাগের দলের আক্রমণ ভাগের লতিফ কিম্বা হাকিম যতবার বিপক্ষ দলের গোলের সম্মুখে অব্যর্থ গোলের সন্ধান করেছে প্রায় ততবারই অন্যায় ভাবে ধাক্কা দিয়ে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করা [illegible]ছে।

একবার টেলিসকে মারাত্মক ভাবে 'ফাউল' করে ইয়ং স্পোর্টর্সের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ারা অব্যর্থ গোলের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। এরূপ অন্যায়ের বিচারে 'পেন্যালটি বুলির' পরিবর্ত্তে আম্পায়ার মাত্র 'সর্ট কর্ণার' দিয়েই ক্ষান্ত হয়। এ সমস্ত বাদ দিয়ে উভয় দলের আক্রমণভাগের গার্ডনার, ফার্ণানডিজ, মারজেলির খেলা উল্লেখযোগ্য ছিল।

কাইভান কাপ ফাইনালে আগ্রা দল (কাল পোষাক পরিহিত) ২-০ গোলে চক্রধরপুর দলকে পরাজিত করে উক্ত কাপ বিজয়ী হয়েছে

খেলোয়াড়রা বহুবার অব্যর্থ গোলের সন্ধান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আম্পায়ারদ্বয়ের বিচারের মধ্যেও বহু ত্রুটী ছিল। তাদের আম্পায়ারিংএ পক্ষপাতিত্ব থাকায় রেলদলের সামান্য অন্যায়ে কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়। রেল-

স্কটিশ কাপ ফাইনাল ঃ

গ্লাসগো রেঞ্জার্স ১-০ গোলে ডানডি ইউনাইটেডকে হারিয়ে লণ্ডনের স্কটিশ কাপ বিজয়ী হয়েছে। খেলাটিতে

প্রায় ৭৫,০০০ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল। খেলার প্রথমভাগে ডানডি ইউনাইটেডের আক্রমণ ভাগের খেলা ভাল হয়েছিল; ফলে প্রথমভাগের সর্ব্বক্ষণই গ্লাসগো রেঞ্জার্স আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত ছিল। ডানডি ইউনাইটেড খেলার প্রথম ৩৫ মিনিটে একটি গোল দেয়; কিন্তু গোলটি অফ্‌সাইড থেকে হওয়ার জন্য রেফারী তা বাতিল করেন। দ্বিতীয় ভাগে উৎকৃষ্টতর খেলেও ডানডি ইউনাইটেড দুর্ভাগ্যবশতঃ পরাজয় স্বীকার করে। বিজয়ীদলের স্মিথ গোলটি করেন।

সাইকেলে নুতন রেকর্ড ঃ

মিস্ প্যাট হকিন্স নামে জনৈকা অষ্ট্রেলিয়ান মহিলা মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে সাতদিন সাইকেল চালিয়ে, ১,৫৪৬·৬ পথ অতিক্রম করে মহিলাদের মধ্যে থেকে সাইকেল চালনায় পৃথিবীতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মিস্ হকিন্সের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব এই যে, মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সাইকেল চালনা শিক্ষা করেছেন। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল মেলবোর্ণের মিসেস ভালদা উথাঙ্কের ১,৪৩৮½ মাইল। মিস্ হকিন্সের বর্ত্তমান রেকর্ড অষ্ট্রেলিয়ার পেশাদার সাইকেল চালক ওসি নিকলসনের যে ১,৫০৭ রেকর্ড ছিল তা ভঙ্গ করেছে।

পাঞ্জাব সাইকেল চ্যাম্পিয়ানসিপ বিজয়ী জানকী দাস। প্রতিযোগিতায় ২৫ মাইল ৫৭ মি, ৭·১০ সেকেণ্ড অতিক্রম করেছেন। তাঁর রেকর্ডের অপেক্ষা পৃথিবীর রেকর্ড ৩·১০ সেকেণ্ড কম

পরলোকে অমর সিং ঃ

গত ২১শে মে বিখ্যাত টেষ্ট বোলার অমর সিং জামনগরে তাঁর নিজ বাসভবন 'ক্রিকেটার্স কটেজে' দেহরক্ষা ক'রেছেন। তিনি দুরারোগ্য নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন।

অমর সিং

বিখ্যাত ক্রিকেট সমালাচক, যাঁদের মতের মূল্য যথেষ্ট, তাঁদের মতে অমর সিং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একাদশের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। ১৯৩২ সালে যখন ইংলণ্ডে এখান থেকে ক্রিকেট টীম যায় তখন অমর সিং সম্বন্ধে টারাণ্ট বলেছিলেন যে, অমর সিং ইংলণ্ডে গেলে ইংলণ্ড বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোলারকে দেখতে পাবে। টারাণ্টের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য হ'যেছিল।

অমর সিংএর খেলা সম্বন্ধে সমালোচনা ক'রতে গিয়ে উইসডেন ব'লছিলেন "টেষ্ট ম্যাচে অমর সিংযের বোলিংয়ের মত উচ্চস্তরের বোলিং বহুদিন দেখা যায়নি। একাধিক বিখ্যাত প্রবীণ খেলোয়াড় খেলার শেষে ব'লেছিলেন গত মহাযুদ্ধের পর থেকে অমর সিংএর মত ভাল বোলার ইংলণ্ডে দেখেনি" ১৯৩৬ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডের টেষ্ট ম্যাচ দেখে নেভিল কারডাস ব'লেছিলেন 'Amar Singh I think to be one of the world's great bowler.'

১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে অমর সিংয়ের জন্ম হয়। তাঁর অগ্রজ রামজী তাঁকে ক্রিকেট খেলার প্রেরণা দেন। তাঁর ক্রিকেটের প্রথম জীবন কাটে রাজকোট টীমের সঙ্গে। রাজকোট ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টে তিনি একবার বাইশ মিনিটে

সেঞ্চুরী ক'রেছিলেন ; পৃথিবীতে এত কম সময়ের ভেতর কেউ সেঞ্চুরী ক'রতে পারেন নি। ১৯৩৫ সালে তিনি ইংলণ্ডের কোলোন ক্লাবে পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে যোগদান করেন ; তিনি জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই ল্যাকেসায়ারের হ'য়ে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রতেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলণ্ডে ক্লাব ক্রিকেট কনফারেন্সে খেলে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার বিপর্য্যয়ের কারণ হ'য়েছিলেন। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলে খুব অল্প রানে তিনি হ্যাসেট, বার্ণেট, ম্যাক্‌কেব, ব্রাউন, ওয়্যাট এবং ওরেলীকে আউট করেন।

লর্ড টেনিসনের মতে অমর সিংয়ের মত 'Jessopian hitter' তিনি জীবনে কখন দেখেন নি, আর বোলিংয়ে ওরেলীর পরই তাঁর স্থান।

অমর সিংয়ের মত একজন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোযাড়ের মৃত্যুতে ক্রীড়াজগতে যে ক্ষতি হ'ল তা অপূরণীয়। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।

৫০ মাইল সাইকেল চালনা ঃ

নিখিল বঙ্গ পঞ্চাশ মাইল সাইকেল প্রতিযোগিতার তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিযোগিতায় বহু খ্যাতনামা সাইকেল চালক যোগ দান করে এবং প্রতিযোগিতার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হয়। বরিশা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ পথের চারিপাশে বহু দর্শক সাইকেল চালকদের উৎসাহিত করেছিল।

ফলাফল (১) মণীন্দ্রনাথ সেন—(কলিকাতা, সময় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ) (২) জাহারুল হক—(দমদম্, সময় ২ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ ৯ সেঃ) (৩) কানাইলাল দাস—(শিবরামপুর বেহালা, সময় ২ ঘণ্টা, ৪৫ মিঃ ১৫ সেঃ) (৪) রণজিৎ চ্যাটার্জ্জি—(চুঁচুড়া, সময় ২ ঘণ্টা, ৪৫ মিঃ ৩০ সেঃ)।

পঞ্চাশ মাইল সাইকেল চালনায় বিজয়ী (বামদিক থেকে) ১ম—মণীন্দ্র সেন, ২য়—জে হক, ৩য়—কানাই দাস, ৪র্থ—রণজিৎ চ্যাটার্জ্জি

পৃথিবীর নূতন রেকর্ড ঃ

রাশিয়ার লিওনিড মেসকভ ৪০০ মিটার দূরত্ব জলপথ ৫ মিঃ ৪১ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেছেন। জার্ম্মাণির আর্থার হেইনা কর্ত্তৃক যে অফিসিয়্যাল রেকর্ড আছে তা বর্ত্তমান অনুষ্ঠিত রেকর্ড থেকে ২·৮ সেকেণ্ড কম।

ভারোত্তলন ঃ

গ্রিগোরিল নোভাগ ২৬৭·৮৬ পাউণ্ড ভার মিলিটারী প্রেসে উত্তোলন করে ঈজিপ্টের টনির ১১৭·৫ পাউণ্ডের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

পনের মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা ঃ

অলিম্পিক ও ইউরোপীয়ান ৫০ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হারোল্ড হোয়াইটলক্ সম্প্রতি তাঁর ক্লাব মেট্রোপোলিটান ওয়াকিং ক্লাব কর্ত্তৃক যে ১৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে উক্ত দূরত্ব পথ ২ ঘণ্টা, ১০ মিঃ ৩৮ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে প্রথম হয়েছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে মুরী (সময় ২ ঘণ্টা, ২ মিঃ ১৩ সেঃ) ও সি ই চার্চার (সময় ২ ঘণ্টা, ৫ মিঃ ১৫ সেঃ)।

"ওয়াকিং"-এ নূতন রেকর্ড ঃ

পৃথিবীর এক মাইল 'ওয়াকিং কম্পিটিসানে' বিজয়ী এ্যাথোল ষ্টাবস সম্প্রতি সিডনিতে ৫০,০০০ মিটার পথ

২২ মিঃ ৯ সেকেণ্ডে হেঁটে অতিক্রম করে ২৪ সেকেণ্ডে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন অষ্ট্রেলিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্যদল ভলিবল খেলায় যোগদান করেছে

এ ছাড়া ষ্টাবস এক মাইল থেকে ছয় মাইল 'ওয়াকিং' কম্পিটিসান ও ১০,০০০ মিটারে অষ্ট্রেলিয়ান রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ইমাম বক্স (উপরের দিকে) হরবনস সিংকে চিৎ করছে

সন্তরণে পৃথিবীর নূতন রেকর্ড ঃ

চিকাগোর এডলফ্ কিফার ১০০ গজ ব্যাকষ্ট্রোকে যে পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন তা সম্প্রতি নিউইয়র্কে ভঙ্গ করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি উক্ত পথ ৫৭.৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেছেন। পূর্ব্বেকার সময় ছিল ৫৮.৮ সেকেণ্ড; গত এপ্রিল মাসে কলোম্বাসে উক্ত রেকর্ড স্থাপিত হয়।

বিলিয়ার্ড ঃ

ইংলিস এমেচার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

গত তিন বৎসরের বিলিয়ার্ড বিজয়ী মিঃ কিংসলে

কিংস্লে কেনারলে

মার্চ্চেন্ট কাপ বিজয়ী লাভলক ও লুইস দল

কেনারলি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গত বৎসরের রাণার-আফ্ আর্থার পেন্সারকে ১৮৭ পয়েণ্টে পরাজিত করে এবৎসরের ইলিংস এমেচার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন।

খেলার ফলাফল ঃ কিংসলে কেনারলি—৩,৯৩১, পেন্সার—৩,৭৪৪। খেলার সর্ব্বক্ষণ উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। খেলায় দর্শক সমাগমও খুব হয়েছিল। বহুদিন নাকি এরূপ উত্তেজনা পূর্ণ খেলা দর্শকেরা লক্ষ্য করেননি।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে যাঁর কথা বার বার মনে পড়ছে এবং খেলা-ধূলার কথা লিখতে বসে যাঁর অভাব বিশেষ কয়ে অনুভব করি তিনি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক স্বর্গগত সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়।

দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠতায় তাঁর মত একজন নীরব সাহিত্য-সেবীর সংস্পর্শে এসে অনেক কিছু জানবার ও শেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় তাঁরই সম্পাদনায় 'খেলা-ধূলা' বিভাগ প্রথম আরম্ভ হয় এবং মৃত্যুশয্যায় শেষদিন পর্য্যন্ত এর খবরাখবর নিতে একটুও ক্লান্তিবোধ তিনি করেন নি। প্রবল বারি বর্ষণে অথবা শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি যে কোনদিন খেলার মাঠে উপস্থিত হননি এ ঘটনা আমার খুব কমই চোখে পড়েছে। সুধাংশুবাবু সত্যিকারের ক্রীড়ামোদী ছিলেন। অন্যায়ের প্রশ্রয় তিনি কোনদিন দেননি। ফলে ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্যও তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। তাঁর অবলম্বিত নীতির জন্যই খেলা-ধূলা বিভাগ এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

প্রতিষ্ঠাতার সম্মানার্থে তাঁর ছবি খেলা-ধূলা বিভাগের প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে দেওয়া হ'ল। তিনি যোগ্য ব্যক্তি—এ সম্মান তাঁর যথার্থ প্রাপ্য।

ফুটবল লীগ ঃ

এখনও পর্য্যন্ত গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ টেবলের প্রথম স্থানে রয়েছে; উভয়েই ১১টা ম্যাচ খেলে সমান ১৬ পয়েণ্ট পেয়েছে। তবে গোলে এভারেজে ইষ্টবেঙ্গল প্রথম স্থানে আছে। মোহনবাগান প্রথমেই পর পর দুটো ম্যাচে হেরে গিয়ে সমর্থকদের একটু হতাশ ক'রে দিয়েছিল। তারপর তাদের খেলার যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে। এরপর যদিও তারা ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ১ গোলে হেরে যায় তবু তারা এবারের লীগে জিতেছে আটটা ম্যাচে যা আর কোন টীম পারেনি। ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে তাদের অন্ততঃ ড্র করা উচিত ছিল; তারা একাধিক গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট ক'রেছে। গোলে কে দত্তর আগেকার মত আর খেলা নেই। ব্যাকে তরুণ খেলোয়াড় টি চৌধুরী ও পি চক্রবর্ত্তী দুজনের খেলাই বেশ ভাল হ'চ্ছে। হাফে খেলছে তিনজনই নূতন খেলোয়াড়; সেণ্টার হাফে খেলছে এস পরামাণিক, লেফটে নীলু মুখার্জ্জি আর রাইটে অনিল দে। আক্রমণভাগের স্থান ও খেলোয়াড়

পরিবর্ত্তন ক'রেও কোন উন্নতি হয়নি। প্রতিদিনই গোলের সামনে অজস্র বল নষ্ট হ'চ্ছে। তাদের পেনালটি কিক্ প্রাকটিস করা উচিত। এবারের লীগে এ পর্য্যন্ত তারা তিনটে পেনালটি নষ্ট ক'রেছে। তাদের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা যদি আর একটু ভাল ভাবে খেলতে পারে তাহলে এবারও লীগ তাদেরই প্রাপ্য।

ইষ্টবেঙ্গলে লক্ষীনারায়ণ এসেছে কিন্তু মুর্গেশ ও করিম না আসার জন্য বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারছেনা। ফরওয়ার্ড লাইনের খেলাও ক্রমশ লক্ষ্যহীন হ'য়ে পড়ছে।

কালীঘাট লীগ টেবলে দ্বিতীয় স্থানে র'য়েছে। লীগের প্রথম দিকে তারাই প্রথম স্থানে ছিল। বর্ত্তমানে মোহনবাগানের সঙ্গে মাত্র ১ পয়েণ্টের তফাৎ। রেঞ্জার্সের সঙ্গে তাদের সমান সমান পয়েণ্ট হলেও রেঞ্জার্স একটা বেশী খেলেছে। মাদ্রাজের খেলোয়াড়রা জলে ভাল খেলতে পারেনা তাই রিটার্ণ লীগে তাদের কি রকম অবস্থা দাঁড়াবে বলা শক্ত। প্রথম লীগে ভাল খেলেও শেষরক্ষা ক'রতে পারেনি এরকম অবস্থা তাদের একাধিকবার হ'য়েছে। এবার তারা এ পর্য্যন্ত একটা খেলাতে হেরেছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন কালীঘাটকে যেরকম ভাবে ড্র করিয়েছে তাতে তাদের যথেষ্ট প্রশংসা ক'রতে হয। কালীঘাট প্রথমই দুটো গোল দিয়ে দেয কিন্তু স্পোর্টিং চমৎকার খেলে দুটোই শোধ ক'রে দেয়। কালীঘাটের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলা বেশ দর্শনীয়।

এস গুহ

নন্দ চৌধুরী (অধিনায়ক, মোহনবাগান)

কে দত্ত

লক্ষ্মীনারায়ণ

মহমেডান আবার ফিরে এসেছে। তারা এখনও পর্য্যন্ত অপরাজিত আছে। প্রথম খেলাতেই তারা ড্র ক'রে কাষ্টমসের সঙ্গে তারপর ৩টে খেলায় জিতেছে। আর গোল ক'রছে দশটা। রেঞ্জার্সই এখনও পর্য্যন্ত সবচেয়ে বেশী গোল ক'রেছে আঠারটা। কিন্তু তারা খেলেছে বারটা ম্যাচ আর মহমেডান পাঁচটা। ই বি আর যখন নটা ম্যাচ খেলেছে তখন তাদের পয়েণ্ট হ'য়েছে নটা। তার ভেতর তিনটে জিতেছে, তিনটে ড্র ক'রেছে, আর তিনটে হেরেছে। গোল ক'রেছে এগারটা আর গোল খেয়েছে এগারটা।

স্পোর্টিং ইউনিযান যে সব খেলোয়াড় নিয়ে প্রথম বিভাগে উঠেছিল তাদের নিয়েই খেলছে। খেলোয়াড় আমদানীর দিকে তাদের ঝোঁক নেই। তাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ক্যালকাটা, এরিয়ান্স ও ভবানীপুরের অবস্থা খারাপ। ক্যালকাটা যদি শেষস্থান অধিকার করে তাহ'লে এবার তাদের কেমনভাবে বাঁচান যাবে আই এফ একে এখন থেকেই বোধহয় ভাবতে হবে।

ফুটবল বিরোধের অবসান ঃ

গত বৎসর লীগ খেলার শেষভাগে মহামেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট এই ক্লাব তিনটির সঙ্গে আই এফ এ-র যে মত বিরোধের সৃষ্টি হয় তা দীর্ঘ এক বৎসর পরে অবসান হয়েছে। এ বৎসরের ফুটবল লীগ খেলার প্রথম ভাগেই ইষ্টবেঙ্গল ও কালীঘাট আই এফ এ-তে যোগদান করেছে। একমাত্র মহামেডান স্পোর্টিংএর সর্ত্ত নিয়ে এ পর্য্যন্ত আই এফ এ-র সঙ্গে তাদের যে মতবিরোধ চলছিল তাও সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার ও পুলিশ কমিশনারের হস্তক্ষেপের পর মহামেডান স্পোর্টিং ও আই এফ এর সভাপতি

একত্র যোগে মিটমাটের যে সর্ত্তসমূহ প্রস্তুত করেন তা আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভায় গৃহীত হয়। ফলে বিরোধ অবসান হওয়ায় মহামেডান দল আই এফ এ পরিচালিত ফুটবল লীগে যোগদান করেছে। এই দীর্ঘ এক বৎসর কলকাতার ফুটবল মাঠে যে অপ্রীতিকর, অখেলোয়াড়ী সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় আমরাপেয়েছি তা সহজে আমাদের মন থেকে নিচিহ্ন হবার নয়। এই বিরোধের আবির্ভাবে আমরা যে ক্রীড়াজগতে কতখানি অখেলোয়াড়ী ভাবাপন্ন তা সহস্রবার খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেও এ ঘটনার ইতিহাস আমাদের পূর্ব্ব গৌরব অনেকখানি ম্লান করবে। খেলার নাম নিয়ে এই বিরোধের মধ্যে যে সব ব্যক্তিগত জেদ ও স্বার্থের আবির্ভাব হয়েছিল তা যে কোন সভ্য দেশের জাতীয় জীবনে ঘোর অনিষ্টকর। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেরূপ আইনের প্রয়োজন সেইরূপ আইন অমান্য করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও যে কোন সভ্য স্বাধীন দেশেও বলবর্তী। খেলার শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বিশ্বের কোন কোন বিখ্যাত খেলোয়াড়দেরও আইনের কবলে পড়ে শাস্তি পেতে হয়েছে। এর জন্য তাঁদের একযোগে আইন অমান্য করে ধর্ম্মঘট ক'রতে দেখা যায় নি। আমাদের বিশ্বাস কলকাতা মাঠের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড়, সভ্য এবং কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেকার দলাদলি ভুলে একত্রযোগে কাজ করবেন আর শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের উপর আইন প্রণয়নের ভার তাঁরা সাম্প্রদায়িক, নিজ দল কিম্বা জাতি বিশেষের প্রাধান্যের উপর ভিত্তি না করে আইন করবেন। ফলে ভবিষ্যতে এভাবের উৎকট পরিস্থিতির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা থাকবে না। তবে ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে বৃহৎ স্বার্থকে ভূমিসাৎ করা যাদের বিবেকে লাগে না, যারা নিজেদের দলের প্রাধান্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট দলকেও উস্কানি দিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে সেই সব বর্ণচোরা লোকের স্পর্শ বাচিয়ে চলাই শ্রেয়। জগতে এরূপ লোকের অভাব নেই !

এস মিত্র (ল্যাংচা)

নুরমহম্মদ

টি চৌধুরী

মিলস

ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ঃ

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ফুটবল খেলার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাষ পেলেও খেলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কোন উন্নতি হয়নি। বিশেষ করে এ বৎসর লীগ খেলার আরম্ভ থেকে এ পর্য্যন্ত যতগুলি খেলা হয়েছে তাদের একটি খেলার মধ্যেও উৎকৃষ্টতর খেলার নিদর্শন পাওয়া যায় নি। ক্রীড়ামোদীরা এবৎসর যে পরিমাণ হতাশ হয়েছেন বোধ হয় সে পরিমাণ পূর্ব্বে কোনদিন হননি। মাঠে আসা তাদের বহুদিনের অভ্যাস এবং বহুদিনের এই বাতিকগ্রস্ত অভ্যাসকে বিসর্জ্জন দিতে না পারার জন্যই তাঁরা যেন বাধ্য হয়ে আসনগুলিতে সমযমত উপস্থিত হন। আনন্দের আতিশয্যে উপস্থিত কম সমর্থকদেরই গ্যালারি থেকে ভূতলশায়ী হতে দেখা যায়। খেলার সর্ব্বক্ষণই জয় পরাজয়ের শেষ নিষ্পত্তির জন্য কোন সমর্থক বিশেষের মনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেশারেশি চলা স্বাভাবিক কিন্তু খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিক থেকে সেটা খুব বেশী বড় মাপকাঠি নয়। অনুশীলন চর্চ্চার অভাব এবং বাঙ্গলার বাহির থেকে খেলোয়াড় আমদানীর ফলে যে ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রতিদিন নিকৃষ্টতর হচ্ছে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। যে জিনিষের বিনিময়ে হওক না কেন বিদেশ থেকে

আগত খেলোয়াড়রা যে বাঙ্গলার ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড উন্নত করতে অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের খাতিরে ফুটবল খেলার সখের জন্য আসেনা তা প্রমাণ করতে আইনের প্রয়োজন হয় না। বিদেশ থেকে খেলোয়াড় আমদানীর ফলে বাঙ্গলা প্রদেশের খেলোয়াড়রা নিজ প্রদেশেই খেলবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পূর্ব্বে ফুটবল খেলায় বাঙ্গলার যে একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল তা চিরদিনের জন্য অধিকারচ্যুত হতে চলেছে। আইন আছে এবং আইনকে ফাঁকি দেবার নানাবিধ উপায়ও আছে। আইনের চোখে ধূলা দেবার লোভ সংবরণ কয়জনে করতে পারেন? ব্যক্তিগত স্বার্থই যাদের বড় তারা নিঃসন্দেহে বৃহৎ স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিতে কোন দিনই দ্বিধাবোধ করেন না। আত্মঘাতি জাতির এ দৃশ্য সকলেরই মনে করুণার উদ্রেক করে। খেলায় জয়লাভই একমাত্র কাম্যবস্তু নয়।

৬।৭।৪০

রাখাল মজুমদার

রসিদ খাঁ

নুরমহম্মদ (ছোট)

জে ঘোষ

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত "শরৎ সাহিত্যে পতিতা"—১।•

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এম্, বি, ই, প্রণীত নাটক "শিল্পী"—১৲

শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস "একাকী"—১৸•

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "ধূলোর ধরণী"—২৲, "মানুষ ও পৃথিবী"—২৲

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত "অতুলচন্দ্রের জীবনী"—।•

আবদুল কাদের প্রণীত "সোলতান সালাহুদ্দীন"—১৲

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছোটদের "পাতালপুরের দ্বিগ্বিজয়"—॥•

শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পুরাতন রোগের জল-চিকিৎসা"—১।•

M. N. Roy প্রণীত From Savagery to Civilisation—১॥•

প্রসাদ বসুর সঙ্গীতের বই "আলাহিয়া"—৷/•

শ্রীনীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র সম্পাদিত "শরদ-রসচন্দ্রিকা"—২৲

শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত "পরীর পাহাড়"—৸•

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অনেক দূরে"—১৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কম্যাণ্ডার কবুতর"—৸•

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "আধুনিক রবিণহুড"—৸•

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত "পোলাণ্ডের কবি পরিচিতি"—॥•, কবিতা গ্রন্থ "খোয়াই"—১৲

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ "গো-জীবন"—৪৲

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "ঝড়ের সঙ্কেত"—২৲

শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল সম্পাদিত "শ্রীগীতা প্রবেশিকা"—১৲, "বিদগ্ধ মাধব নাটক"—১॥•

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

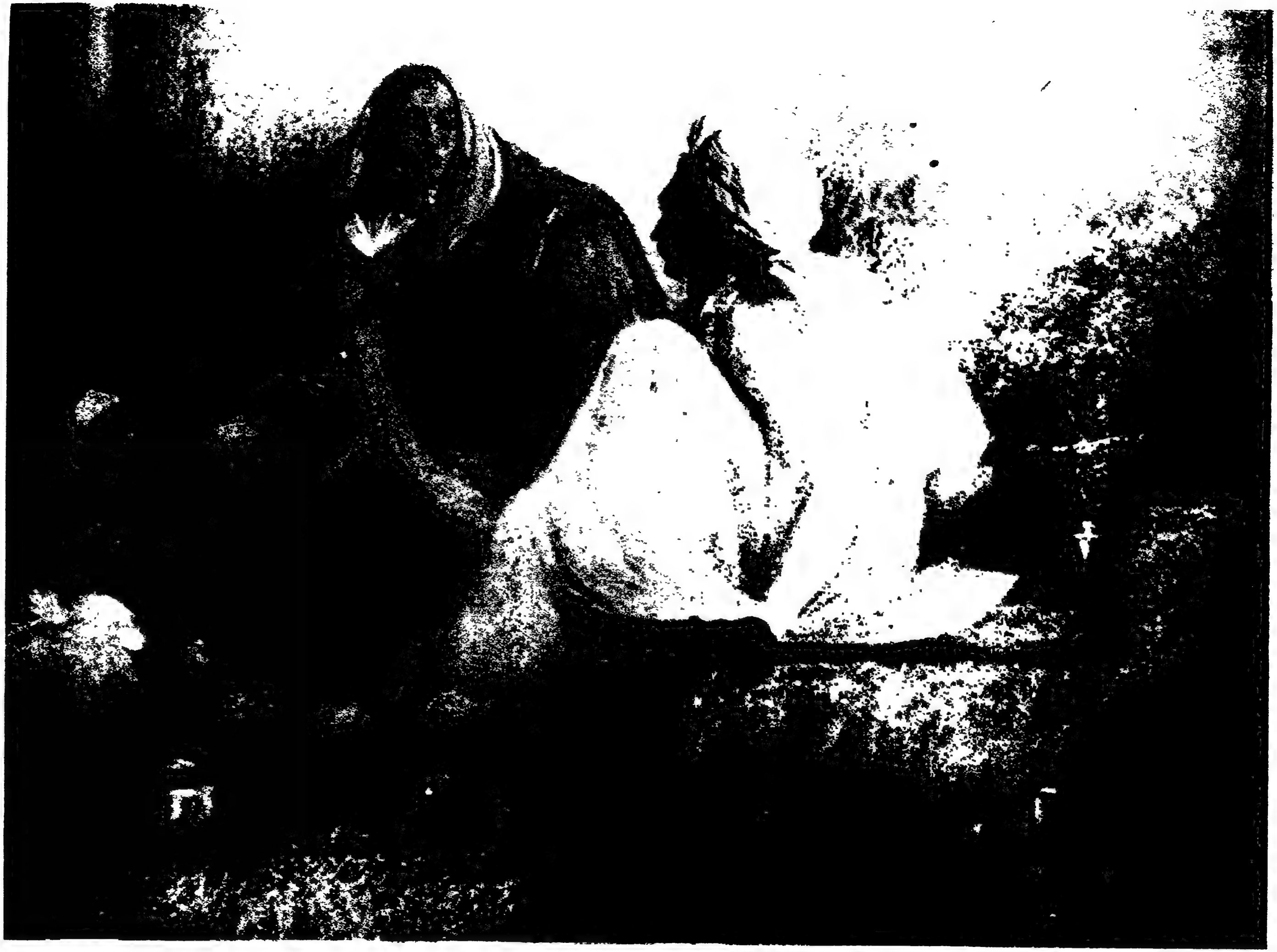

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী　　বন্দী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

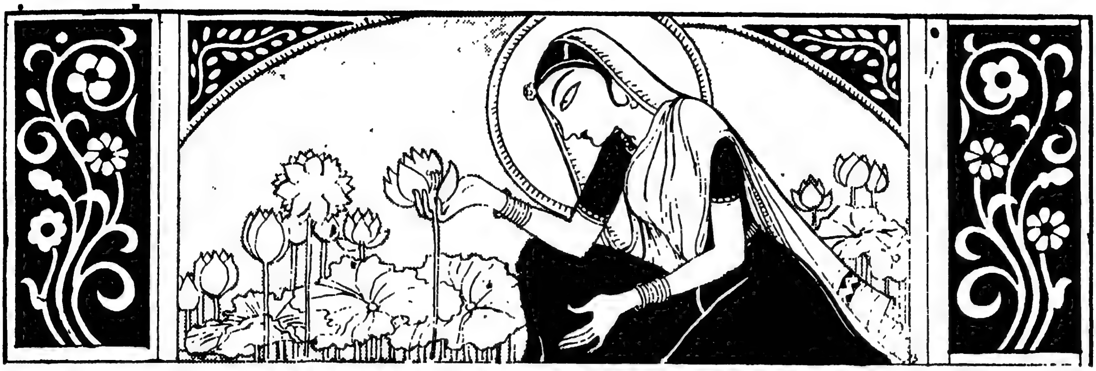

ভারতবর্ষ

শ্রাবণ—১৩৪৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শতবর্ষ পূর্ব্বের কলিকাতার বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিচয়

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পিএচ্-ডি, বি-লিট্

শহরের বিশিষ্ট অধিবাসিগণের নাম ও পরিচয় জানিতে হইলে ডিরেক্টরী বা Who's Who-শ্রেণীর বই দেখিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এরূপ বেসরকারী বই ছিল না। অথচ দেশীয় রাজ্যের রাজা ও তাঁহাদের মন্ত্রিগণের পরিচয় অনেক সময় ইংরেজ সরকারের প্রয়োজন হইত। এই জন্য তখনকার ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের উদ্যোগে সেকালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের বিস্তৃত তালিকা ও বংশবিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে এলফিনষ্টোন, মেটকাফ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা বিভিন্ন রাজ্যের রাজবংশ ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ সালে কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, বেনারস প্রভৃতি বড় বড় শহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই সকল তালিকা ও বংশপঞ্জী ভারত সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে।

একশত বৎসর আগে কলিকাতার যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি সরকারের বিবেচনায় অভিজাত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও পরিচয় জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এখনও তাঁহাদের অনেকের বংশধরেরা কলিকাতার সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। আবার বর্ত্তমান কালের অনেক প্রতিপত্তিশালী পরিবারের নাম শতবর্ষ পূর্ব্বে সংগৃহীত তালিকায় পাওয়া যায় না। সুতরাং কলিকাতায় সামাজিক ইতিহাসের উপাদান-হিসাবে এই তালিকার মূল্য আছে। এই জন্য পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজপত্র হইতে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও বংশপরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। বাবু জগন্নাথপ্রসাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ, মহারাজা দুর্ল্লভরামের বংশধর। দুর্ল্লভরামের পুত্র মুকুন্দবল্লভ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন। জগন্নাথপ্রসাদ, রাজবল্লভের ভগ্নীর বংশধর। তিনি মুর্শিদাবাদে বাস করেন, তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা কাশিনাথপ্রসাদ কলিকাতার ভদ্রাসনে থাকেন।

২। মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। ইঁহার পিতা রাজা নবকৃষ্ণ মিরজাফরের নবাবী প্রাপ্তির সময় লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। তখন তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ক্লাইভ তাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে একটি স্বর্ণ পদক দিয়াছিলেন। ১৭৯৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণ তখন নাবালক। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ। এই পরিবারের কালীকৃষ্ণ ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন।

৩। বাবু গোপীমোহন দেব, রাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। নবকৃষ্ণের যখন সন্তান লাভের আশা ছিল না তখন তিনি ইঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং সেই সূত্রে ইনি তাঁহার অর্দ্ধাংশের অধিকারী হন। গোপীমোহন ও তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু রাধাকান্ত দেব জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। ১৮৩৩ সালে বাবু গোপীমোহন দেব রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

৪। রাজা রামচন্দ্র রায়, ৺ রাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুখময় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জগন্নাথ যাইবার রাস্তা তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর কর্ণেল ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্ণরদিগের বাণিয়া (Banker) হিসাবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুখময় তাঁহার দৌহিত্র। তিনি স্যার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানী করিয়া মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর আমলে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন। রাজা রামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বাবু বৈদ্যনাথ রায়, বাবু শিবচন্দ্র রায় ও বাবু নরসিংহ রায় রাজা সুখময়ের সম্পত্তির বর্ত্তমান মালিক।

৫। মল্লিক বংশ। এই পরিবার বহুদিন হইতে কলিকাতার অধিবাসী। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বেই ইঁহাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়। শুকদেব মল্লিক ও নয়নচন্দ্র মল্লিকই এই বংশের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নয়নচন্দ্রের দুই পুত্র গৌরচরণ ও নিমাইচরণ। নিমাইচরণ নিমু মল্লিক বলিয়া সমধিক পরিচিত। গৌরচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর পিতৃ-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় পুত্র রামলোচনের চারি পুত্র। তাঁহার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন এখনও জীবিত আছেন। নিমু মল্লিকের পুত্রেরাই অধিক সম্পত্তিশালী। তাঁহারা আট ভ্রাতা—রামগোপাল, রামরতন, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল (মৃত), স্বরূপচাঁদ ও মতিলাল। সুপ্রীমকোর্টে নিমু মল্লিকের সম্পত্তি লইয়া যে মামলা হইয়াছে তাহাতে ছয় লক্ষের অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এখনও বিলাতে এই মামলার আপীল দায়ের আছে।

৬। বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাবালক পুত্র। কৃষ্ণচন্দ্র লালাবাবু নামে সমধিক পরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বৃন্দাবনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হেষ্টিংসের আমলের কৌন্সিল ও বোর্ড অফ রেভেনিউর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ।

৭। রাজনারায়ণ রায়, তারকনাথ রায় এবং অন্যান্য রায়েরা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত আন্দুলের অধিবাসী। ইঁহারা দেওয়ান রামচরণ রায়ের বংশধর। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ানী করিয়া রামচরণ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

৮। কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র। অল্পদিন হইল কাশীতে জয়নারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। সেই সূত্রে ইঁহারা সন্দ্বীপের জমিদারী লাভ করেন। কালীশঙ্কর খিজিরপুরে (ডাকনাম খিদিরপুর) বাস করেন। তিনি কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণের জন্য ভূমি ও অর্থদান করিয়াছেন।

৯। ঠাকুর পরিবার। এই বহু বিস্তৃত বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। এই বংশের প্রধান শাখার আদি পুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার সাত পুত্র—রামমোহন (মৃত), গোপীমোহন, (পিতৃ-সম্পত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ১৮১৬ সালে পরলোক গমন করেন)

কৃষ্ণমোহন (উন্মাদ), প্যারীমোহন (মূক), হরিমোহন, লাডলীমোহন এবং মোহিনীমোহন। গোপীমোহনের ছয় পুত্র সূর্য্যকুমার (অপুত্রক), চন্দ্রকুমার, কালীকুমার, নন্দকুমরার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার।

১০। গৌরচরণ শেঠ, কৃষ্ণমোহন শেঠ, ব্রজমোহন শেঠ, রাজকুমার শেঠ বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী (ব্যাঙ্কার) পরিবারের লোক। এই পরিবার বহুদিন হইতে এই অঞ্চলের অধিবাসী।

১১। রাধাকৃষ্ণ বসাক—ট্রেজারির খাজাঞ্চি। ইনি বড়বাজারের বিখ্যাত শরফ (Shroff) বংশের সন্তান ও শেঠদিগের আত্মীয়।

১২। রামদুলাল দে। ইনি বোধ হয় কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। বাণিজ্যসূত্রেই ইনি সম্পত্তি লাভ করেন। ইনি বহুদিন ফেয়ার্‌লি কোম্পানীর দেওযান ছিলেন এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদিগের সহিত ইঁহার কারবার ছিল। রামদুলাল এখন প্রাচীন হইযাছেন কিন্তু এখনও নিজেই ব্যবসাযের তত্বাবধান করেন।

১৩। প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস রামহরি বিশ্বাসের পুত্র। ভুলুযা ও চট্টগ্রামের লবণের এজেণ্ট হ্যারিশ সাহেবের দেওয়ানী করিযা রামহরি প্রভূত সম্পত্তি লাভ করেন। পুত্রেরা সেই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। কযেক বৎসর পূর্ব্বে জগমোহনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নাবালক পুত্রকে প্রাণকৃষ্ণ সম্পত্তির ন্যায্য অংশ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের তাঁহার অধিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রাণকৃষ্ণ ও তাঁহার পুত্র আনন্দময় বারাকপুরের সন্নিহিত বহু ভূসম্পত্তির মালিক।

১৪। রাজকৃষ্ণ সিংহ, বিকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ট্রেজারীর ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চি প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ পাটনার চীফ্ মিঃ মিড্‌ল্‌টন্ ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণ ও জযকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র।

১৫। ভগবতীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ মিত্র এবং তাঁহাদের আর চারি ভ্রাতা, অভয়চরণ মিত্রের পুত্র। ইঁহারা বিশ্বনাথ মিত্রের পুত্র কাশিনাথ মিত্রের সহিত প্রপিতামহ গোবিন্দরাম মিত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। গোবিন্দরাম কলিকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন এবং ব্যবসায়ের দ্বারা বিত্ত লাভ করিয়াছিলেন।

১৬। নবকৃষ্ণ মিত্র, হরলাল মিত্র, হরিশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গোকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। গোকুলচন্দ্র রসদের ঠিকাদারী করিয়া সমৃদ্ধি লাভ করেন এবং চিৎপুর রোডের নিকট বাগবাজারে সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন।

১৭। গঙ্গানারায়ণ সরকার পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চি। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ধনী। কেবল ব্যবসাযের দ্বারাই ইঁহার বিত্তলাভ হইয়াছে।

১৮। কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরীর অবস্থা প্রথম মোটেই ভাল ছিল না। তিনি লবণের ব্যবসায়ে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। তাঁহার চারি পুত্র ঈশানচন্দ্র (মৃত), প্রেমচন্দ্র, রতনচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী পিতৃসম্পত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের পিতৃব্য-পুত্রেরাও এই সম্পত্তির অংশীদার। সম্প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার একমাত্র পুত্র বৈদ্যনাথ সুপ্রীম কোর্টের বিচারে সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক সাব্যস্ত হইয়াছেন।

১৯। রাজনারায়ণ সেন, রূপনারাযণ সেন এবং অপর তিন ভ্রাতা মথুরামোহন সেনের পুত্র। মথুরামোহন শরফের (ব্যাঙ্ক) ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং জোড়াবাগানে এক বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

২০। রাধামাধব বান্নরজী এবং গৌরীচরণ বান্নরজী ফকিরচাদ বান্নরজীর পুত্র। ফকিরচাদের পিতা রামসুন্দর কুলীন ব্রাহ্মণ, রাজনারায়ণ মিশ্রের এক ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয। এই বিবাহের দ্বারা এবং পটুয়ার আফিমের এজেন্সীর দেওয়ানী চাকুরীতে এই পরিবারের সমৃদ্ধি লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত বান্নরজী পদবীর আরও কয়েকটি ধনী কুলীন পরিবার আছে।

২১। শিবনারায়ণ ঘোষ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা রামলোচন ঘোষের পুত্র ও বিশাল সম্পত্তির মালিক। রামলোচন হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন।

২২। মৃত সনাতন মল্লিকের ভ্রাতা বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধনী এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ইঁহাদের সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মল্লিকের ব্যবসায় লব্ধ। ইঁহাদের সহিত পূর্ব্বোল্লিখিত মল্লিক পরিবারের কোন সম্পর্ক নাই।

২৩। রসিকলাল দত্ত অধিকাংশ সময় বেনারসেই বাস করেন। তাঁহার পুত্র উদয়চাঁদ কলিকাতার ভদ্রাসনে থাকেন। রসিকলাল ও হরলাল মদনমোহন দত্তের পুত্র। হরলাল ১৮০০ সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, মণিমাধব, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র এবং রাজচন্দ্র।

ইহার পর কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

বাগবাজার—

১। রাজা রাজবল্লভ বাহাদুরের পুত্র রাজা মকুন্দবল্লভের দত্তক পুত্র রাজা গৌরবল্লভ।

২। উদয়চরণ মিত্রের পুত্র ভগবতীচরণ মিত্র।

৩। গোকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র হরলাল মিত্র।

৪। দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির পুত্র শম্ভুচন্দ্র মুখার্জ্জি।

৫। দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির দৌহিত্র ভগবতীচরণ গাঙ্গুলী।

৬। তারিণীচরণ বসুর পুত্র কাশিনাথ বসু।

শ্যামবাজার—

১। কৃষ্ণকান্ত বসু জমিদারের পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু এবং কালাচাঁদ বসু।

২। তুলসীরাম ঘোষের পৌত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

৩। মহারাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় (অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র nephew ?) কাশীপ্রসাদ রায়।

৪। রায় জগন্নাথপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ রায়।

শোভাবাজার—

১। রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্র রাজা শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি।

২। রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার পুত্র।

৩। জগমোহন বিশ্বাসের পুত্র কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাস।

৪। কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ।

৫। গুরুপ্রসাদ মিত্রের পুত্র জয়নারায়ণ মিত্র।

৬। বৃন্দাবন বসাকের পুত্র কৃষ্ণমোহন বসাক।

জোড়াবাগান—

১। রাধামাধব ব্যানার্জী।

গরাণহাটা—

১। পামার সাহেবের দেওয়ান গঙ্গানারায়ণ সরকারের পৌত্র শিবচন্দ্র সরকার।

নিমতলা—

১। কাশীনাথ দত্তের পুত্র বিশ্বেশ্বর দত্ত।

২। মদনমোহন দত্তের পৌত্র উদয়চাঁদের পুত্র মহেশচন্দ্র দত্ত।

সিমলা—

১। ফেয়ার্‌লি কোম্পানীর দেওয়ান রামদুলালের পুত্র আশুতোষ দে।

২। রামদুলাল সরকারের জামাতা রাধাকৃষ্ণ মিত্র।

৩। রসময় দত্ত।

জোড়াসাঁকো—

১। শান্তিরাম সিংহের পৌত্র ও প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ সিংহ ও নবীনচাঁদ সিংহ।

২। গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিক।

৩। শিবচন্দ্র সাণ্ডেল জমিদারের পুত্র মধুসূদন সাণ্ডেল।

পাথুরিয়াঘাটা—

১। রামলোচন ঘোষের পুত্র শিবনারায়ণ ঘোষ।

২। দেবনারায়ণ ঘোষ।

৩। গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

৪। হরিমোহন ঠাকুরের পৌত্র ললিতমোহন ঠাকুর।

৫। লাডলীমোহনের পুত্র শ্যামলাল ঠাকুর।

৬। মণিমোহন ঠাকুরের পুত্র কানাইলাল ঠাকুর।

৭। বৈদ্যনাথ মুখার্জ্জির পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জ্জি।

৮। রামকৃষ্ণ মল্লিকের পুত্র বৈষ্ণবদাস মল্লিক।

৯। নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক।

১০। মহারাজা সুখময় রায়ের পুত্র রাজা রামচন্দ্রের পুত্র কুমার রাজনারায়ণের দত্তক পুত্র ব্রজেন্দ্র রায়।

১১। মহারাজা সুখময়ের পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ।

১২। মহারাজা সুখময়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়।

১৩। রাজা শিবচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র কালীকুমার মল্লিক।

১৪। রামনিধি ঠাকুরের পুত্র গোপিকণ্ঠ ঠাকুর।

১৫। রামরতন ঠাকুরের পুত্র কালিকাপ্রসাদ ঠাকুর।

১৬। রামহরি ঠাকুরের পৌত্র শিবচন্দ্র ঠাকুর।

১৭। বৈষ্ণবদাস শেঠের পৌত্র রাজকুমার শেঠ।

১৮। সাবট্রেজারারের দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাক।

বড়বাজার—

১। দেওয়ান কাশীনাথের পৌত্র জগন্নাথপ্রসাদ দাস ও গোবর্দ্ধন দাস।

২। রামগোপাল মল্লিকের পুত্র উদয়চরণ মল্লিক।

৩। রামরতন মল্লিক।

৪। রামতনু মল্লিক।

৫। রামমোহন মল্লিক।

৬। মতিলাল মল্লিক।

৭। রামকানাই মল্লিকের পুত্র নবকিশোর মল্লিক।

৮। জগমোহন মল্লিকের পুত্র প্রেমসুখ মল্লিক।

৯। গৌরচরণ মল্লিকের পৌত্র কাশীনাথ মল্লিক।

১০। কলভিন কোম্পানীর দেওয়ান বিশ্বম্ভর সেন।

১১। নীলমণি ধরের পৌত্র ব্রজনাথ ধর।

মেছুয়া বাজার—

১। রামমণি ঠাকুরের পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর।

চোরবাজার—

১। মদনমোহন দত্তের পুত্র লক্ষীনারায়ণ দত্ত।

২। হরচন্দ্র ঠাকুর

৩। গুরুপ্রসাদ বসু।

৪। ব্যাঙ্কের একাউণ্ট্যাণ্ট কৃষ্ণমোহন দে।

কলুটোলা—

১। মতিলাল শীল।

২। মাধবচাঁদ দত্ত।

৩। বলরাম চন্দ্রের পৌত্র গোপাল চন্দ্র।

৪। রামকমল সেন।

৫। তারাচাঁদ দত্ত।

৬। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ ব্যানার্জী।

পটলডাঙ্গা—

১। রূপনারায়ণ ঘোষাল।

বহুবাজার—

১। হিদেরাম ব্যানার্জীর পুত্র অভয়চরণ ব্যানার্জী।

২। দুর্গাচরণ পিতুরীর দৌহিত্র অভয়চরণ ব্যানার্জী।

৩। দুর্গাচরণ পিতুরীর ভাগিনেয় বিশ্বনাথ মতিলাল।

মলাঙ্গা—

১। অক্রূর দত্তের পুত্র রামমোহন দত্ত।

২। রামতনু সরকারের পুত্র গোপীমোহন সরকার।

৩। কালীচরণ হালদারের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজচন্দ্র হালদার।

জান বাজার (John Bazar)—

১। রঘুনাথ পালের পুত্র দুর্গাচরণ পাল।

২। প্রীতরাম মারের পুত্র রাজচন্দ্র মার।

৩। গোপীমোহন ঘোষের পৌত্র রামধন ঘোষ।

৪। কালীপ্রসাদ দত্ত।

খিদিরপুর—

১। দেওয়ান গোকুল ঘোষালের দৌহিত্র গোবিন্দচন্দ্র ব্যানার্জী।

২। জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র কালিশঙ্কর ঘোষাল।

কাশিপুর—

১। কালীনাথ মুন্সী।

২। কালীশঙ্কর রায়ের পৌত্র রামরতন রায়।

৩। প্রাণনাথ চৌধুরী।

ভবানীপুর—

১। শ্রীহট্টের জমিদার লালা গৌরহরি সিংহের পুত্র রায় রাধাগোবিন্দ সিংহ।

২। বৈষ্ণবচরণ মিত্র।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বংশ-পরিচয় ও বর্ত্তমান তালিকা একই কাগজে পাওয়া গেলেও এক সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ বংশ-পঞ্জী সঙ্কলনের সময় যাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন তালিকা সংগ্রহের সময় তাঁহারা সকলে জীবিত ছিলেন না। হিদারাম বাড়ুয্যে, দুর্গাচরণ পিতুরী প্রভৃতি সকল অধুনাবিস্মৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে কলিকাতার কোন কোন রাস্তার নাম হইয়াছে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু খবর এই তালিকায় পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং যদি কেহ এই তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের বর্ত্তমান বংশধরদিগের নিকট কাগজপত্রের সন্ধান করেন তাহা হইলে সেকালের কলিকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান পাওয়া যাইতে পারে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি কলিকাতার সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায় ও বাণিজ্য করিয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন হইতেই চাকুরীর দিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে। কারণ, ক্লাইভের দেওয়ান, হেষ্টিংসের দেওয়ান ও সরকার, ভ্যান্সিটার্ট ও ভেরেলেষ্টের দেওয়ান, মিডলটন ও হুইলারের দেওয়ান,

রামরোল্ডের দেওয়ান, নিমকমহলের দেওয়ান খাজাঞ্চিখানার দেওয়ান, অহিফেন মহলের দেওয়ান মহাশয়েরা চাকুরীসূত্রে কেবল যে রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা নহে, রাজোচিত সম্মান লাভও করিয়াছিলেন। সেকালের সংবাদ পত্রে সম্পাদকদিগের মধ্যে মাত্র একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবে সরকারী তালিকায় স্থান পাইয়াছিলেন।

বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার কলিকাতায় বাসস্থাপন করেন নাই। মুর্শিদাবাদ, বেনারস প্রভৃতি শহরের অভিজাতবর্গের তালিকায় বহু মুসলমানের নাম আছে। কলিকাতার অধিবাসিগণের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য মুসলমান পরিবার থাকিলে তাঁহাদের নাম এই তালিকায় পাওয়া যাইত।

কলিকাতার জমিদারী কাছারীর দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র সম্বন্ধে বহু কাগজপত্র নয়া দিল্লীর মহাফেজখানায় আছে। সেকালের চিঠিপত্রের মধ্যে বড়লাট কর্ণওয়ালিসের নিকট ঘোষাল মহাশয়েরা একটি অনাথ মণ্ডপ ও ইনডাষ্ট্রি ঘর নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়া যে বাঙ্গালা চিঠি লিখিয়াছেন তাহাও পাওয়া গিয়াছে। বারান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নহে অভিশাপ

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

এপারে নামিছে সন্ধ্যা তন্দ্রালস শঙ্কিত শর্ব্বরী,
আঁধারের কালো ছায়া বহি ;
ওপারে জ্বলিছে চিতা দিবসের পর্য্যাপ্ত আলোকে—
সভ্যতার বর্ব্বর দেউলে। কাঁদিছে মানুষ ;
শ্বাসরুদ্ধ পাষাণ প্রাচীরে
ক্ষুধাতুর কবন্ধের তীব্র হাহাকার করে করাঘাত,
প্রতিধ্বনি কেঁদে মরে ঘূর্ণাবর্ত্ত মাঝে ;
মত্ত ঝঞ্ঝা হু হু রবে দিগন্ত ব্যাপিয়া
বাড়ায় বিকট জিহ্বা লোল জিঘাংসার ,
মানুষের রক্তলোভে উন্মত্ত মানুষ হানে সহস্র অশনি
শান্ত মৌন বসুধার পয়ঃস্রোতে উজারি গরল।
আকাশে আকাশে জ্বলে বিদ্যুতের শিখা ;
মাটির মায়ার গড়া সৌম্য দেবতার কুটিল ভ্রূকুটি
অট্টহাস্যে দানবের মত
আপনারে করিছে প্রচার !
সে-ই রূপ তার !
মানুষের কমনীয় লঘু আবরণে
প্রেতাত্মার বিক্ষুব্ধ আবেগ
জাগিয়া উঠেছে ঘুমঘোরে,
পৃথিবীরে করিতে শ্মশান।
রক্তে তার অদম্য উল্লাস ওঠে জাগি ;
অসহ দুর্ব্বার বেগে পূর্ণাহুতি দেয় দেবতারে,
কাপালিক সম,
রুদ্রের মন্দিরে।
প্রজ্জ্বলিত সেই অগ্নিশিখা
দিকে দিকে মরণের বাজায় ডমরু ;
কাঁপে প্রাণ, কাঁপে রক্তস্রোত,
উত্তাল তরঙ্গলেখা জলধির তটভূমি ঘিরে
মৃত্যুর তাণ্ডবে ওঠে জীবনের ভয়াল ক্রন্দন !
তবুও মানুষ তারা মানুষের বিকিকিনি পাটে !
দুর্ব্বলের অর্ঘ্য যত
তাদেরি শিয়রে
যুগে যুগে হ'য়েছে সঞ্চিত।
অক্ষম বিধাতা
ডরায় তাদেরে চিরকাল :
তাই বুঝি আপনার হাতে
রচে তারা আপন মরণ।
ওদের উদগ্র শক্তি খর্পর ধরিয়া
উলঙ্গিণী সর্ব্বনাশা রূপে
রচিতেছে ভ্রান্তিজাল অস্তাচল পারে,
তারি মায়া পৃথ্বীছায়া সম
ধীরে ধীরে করে গ্রাস সে আলোর প্রদীপ্ত তপন ;
সম্মুখে ঘনায় রাত্রি,
পতঙ্গের ধাঁধিয়া নয়ন—
সীমাহীন অন্ধকারে ছেয়ে আসে পশ্চিম আকাশ।
ছিন্নপক্ষ জটায়ুর মত
অসহ শক্তির বেগে লুটাবে ধূলায়
ওই রুদ্র প্রচণ্ড দানব,
শুষ্ক হ'য়ে যাবে তার ওষ্ঠপ্রান্তে অশ্রুর প্রবাহ,
শ্বাসে শ্বাসে বিষবাষ্প ছড়াইবে দূর বনভূমে ;
শক্তির সে পূজার দেউলে
যামে যামে শিবাদল করিবে রোদন।
নহে অভিশাপ,
এই তার জয়মাল্য—শিষ্ট পুরস্কার।

মতির মালা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভদ্রলোকের নাম জানতাম না। বেশ চট্‌পটে, সুমার্জ্জিত-রুচি সুষ্ঠু তরুণ। তাকে ফ্রি-মেশন-হলে দেখেছিলাম।

কাজের মানুষ অবসরকালের মানুষ হ'তে ভিন্ন। কিন্তু সে ভিন্নতার অন্তরে একটা মিলন-ক্ষেত্র থাকে। আজ আমার কর্ম্মস্থলে তরুণের যে রূপ দেখলাম সে রূপ তার ফ্রি-মেশন হলের উৎসব-প্রসন্ন আকৃতি হ'তে একেবারে বিভিন্ন। মুখ মলিন, চক্ষু কাতর, এমন কি, বেশ-ভূষাও দীন।

বুঝলাম, যুবক চায় দরদ। আমি তাকে স্নেহের সুরে অভিবাদন করলাম। বললাম—আপনি ফ্রি-মেশন না? বসুন।

সে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ সার। আপনার সহায়তা আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি বড় বিপন্ন। অপ্রত্যাশিত অন্যায় বিপদ। অযাচিত পরোপকারের ভীষণ পরিণাম।

আমি তাকে বোঝালাম। অকৃতজ্ঞতা স্বার্থ-পরতার সহজ পরিণতি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐতিহাসিক বিবৃতি তাকে স্মরণ করতে বললাম। কিন্তু বচন-সুধায় তার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'ল না।

অগত্যা তাকে কথা কয়ে মন হাল্কা করবার অবসর দিলাম। কিন্তু একটানা একুশ মিনিট বক্তৃতার ফলে তার উৎপীড়নের ইতিহাস সংশ্লিষ্টভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে অক্ষম হ'ল। মোটামুটি বুঝলাম, এক মেমের কুমারী কন্যার সে উপকার করেছিল। রাক্ষসী মেম তার ফলে তাকে এক সন্দেশে পত্রাঘাত করেছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ। স্পষ্ট বুঝেছি ঘটনাটা। কই দুষ্ট চিঠিটা দেখি।

সে সন্তুষ্টচিত্তে আমার হাতে পত্র দিলে। চিঠির ভাষা ইংরেজী। বানান ও ব্যাকরণের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করলে পত্রের ভাব নিম্নলিখিত রূপ:

প্রিয় অরুণ,

তোমার ব্যবহারে নিরীহ সোফী অতি তীব্র মর্ম্মপীড়া-কাতর। তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে আমি তোমাকে আমার কুমারী কন্যার সহিত অবাধে মিলিতে নিষেধ করিতাম। কালিম্পঙের সকল অধিবাসী তোমাদের বিবাহ-পণ অবগত। পাহাড়ের সকল নিভৃত স্থল তোমাদের নিবিড় সখ্যের সাক্ষ্য। তীস্তা নদীর স্বচ্ছ সলিলে তোমাদের ভালবাসার লীলা-চিত্র প্রতিফলিত। কেবল আলস্যবশত তোমাদের বিবাহ-সম্বন্ধের সূচনা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত করি নাই।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর হঠাৎ তোমার প্রেম-বহ্নি শীতল হইল কেন? কারণ সুস্পষ্ট। তুমি কুমারী সোফীর হৃদয় এবং তাহার কমনীয় দেহ লইয়া খেলা করিতেছিলে। তোমার প্রবঞ্চনা-রত মস্তিষ্কে কি তখন উপলব্ধি কর নাই যে, তুমি আগুন লইয়া ক্রীড়া করিতে মত্ত? আমরা মুগ্ধ সরল স্ত্রীলোক। একথা আমি কিম্বা আমার কন্যাও সে সময় বুঝি নাই।

এখন প্রমাণ পাইলাম, তোমার দেওয়া কলিকাতার ঠিকানা কাল্পনিক। তোমার নাম বোধ হয় মিথ্যা নয়, কারণ সৌভাগ্যবশে তোমার নাম-ছাপা কার্ড আমার হস্তগত হইয়াছিল। তোমার মিথ্যা ঠিকানা হইতে কয়েকখানি পত্র ফেরত আসার পর, কালিম্পঙ্ হোটেল হইতে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া এই পত্র দিতেছি।

তোমার আচরণে সোফী শয্যাশায়ী। তুমি বিলাতে পাশ-করা এঞ্জিনীয়ার, এ সমাচারও নিশ্চয় মিথ্যা। এখন বুঝিয়াছি তোমার চাতুরী। তোমার মত স্বেচ্ছাচারের হস্তে কন্যা সমর্পণ করা পাপ। কিন্তু আমার সরলা কুমারী তোমার কুহকে অভিভূত। তুমি তার প্রাণ ও মন লইয়া পরিহাস করিতে পার, আমি কিন্তু এ দুষ্ট আচরণ উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ আমি তার জননী।

তোমাকে আমি এই শেষ নোটিস দিলাম। যদি সাত দিনের মধ্যে ইহার প্রত্যুত্তর না পাই অগত্যা আমার উকিলের সঙ্গে এ বিষয় পরামর্শ করিব। সাত দিন পরে তোমাদের বাঙ্গালা সংবাদপত্রে তোমার নাম-ধাম দিয়া

বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিব। তাহাতে তোমার চরম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকিবে। তার পর আদালত।

আশা করি তোমার সুবুদ্ধি জাগিবে। ইতি

হেলেন আরাকী

পাঠান্তে বুঝলাম, ব্যাপারটা গুরুতর। মিঃ অরুণ রায় সত্যিই বিপন্ন। যৌন-দুর্ব্বলতা বেচারাকে এক শোষক রমণীর কবলে নিক্ষেপ করেছে—গায়ে কোনো আঁচড় না লাগিয়ে তাকে মুক্ত করা অসম্ভব। অর্থ কিম্বা যশ—উভয়ের মধ্যে একের হানি অনিবার্য্য।

তাকে সাহস দিলাম। বললাম—ইংরেজী প্রবচন জানেন তো মিঃ রায়, যে কুকুর চীৎকার করে সে কামড়ায় না।

সে বললে—সম্ভব। কিন্তু এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক যাত্রার দলের যোদ্ধার মত—মারবার আগে বক্তৃতা দেয়। ওঃ কি শয়তান! কি ভীষণ!

আমি অনেক প্রশ্নের দ্বারা ঘটনাটি পূর্ব্বাপর বুঝলাম। কারণ, সে আবেগভরে বহু অবান্তর কথা বলছিল। সেগুলিকে সংযুক্ত করে একটি সংলগ্ন কাহিনী সৃষ্টি করতে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। অথচ কল্পিত কাহিনী ওকালতীর ভিত্তি হ'তে পারে না।

পূজাবকাশে অরুণ কালিমপঙ্ পাহাড়ে হিমালয় হোটেলে বাস করছিল। নিছক একেলা। সাথী ছিল তার কয়েকখানা ইংরেজী উপন্যাস আর হিমালয় শৈলের নানা সুন্দর রূপ। সকাল বিকেল সে নির্জ্জন পাহাড়ে ভ্রমণ করত—শৈলশির হ'তে উপত্যকায় ছায়ার খেলা দেখত—উপত্যকায় দাঁড়িয়ে শৈল-শিরে পড়ন্ত রবির ম্লান হাসির লীলা-তরঙ্গে আত্ম-নিবেদন করত। দুপুরে একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকৃত। সম্মুখে উন্মুক্ত নভেল—দৃষ্টি চির-শুভ্র তুষার-ক্ষেত্রে—মনে অব্যক্ত এলোমেলো টুকরো আনন্দ।

বিলাতে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিখে সে কলিকাতায় এক প্রসিদ্ধ ইংরেজী অফিসে নিযুক্ত হ'য়েছিল। কিন্তু কল-কব্জা ঘেঁটে, দিনের পর দিন অজানা অন্ধশক্তির কার্য্যকারিতার হিসাব ক'ষে সে তার তরুণ প্রাণের সহজ উপলব্ধিগুলাকে যন্ত্র-দেবতার বেদীতে বলি দেয় নি।

আমার মনে হ'ল, তার চরিত্রের এই উৎকর্ষতাই তার যৌন-দুর্ব্বলতার কারণ। শিক্ষিত যুবক, আবেগভরা প্রাণ। তাকে একেবারে এ-কথা বললে সে অপমানিত হ'বে। তার গল্পের স্রোত ফিরিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—সোফী আরাকী কল্পনার মানুষ, না, প্রকৃত?

—রক্ত-মাংস-গড়া চক্‌চকে চামড়া-ঢাকা তরুণী। আর হেলেন আরাকীও মিষ্ট-ভাষিণী মাতৃ-মূর্ত্তির ছদ্মবেশে পিশাচিনী।

—হুঁ! কিন্তু এদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল কিরূপে? আপনি তো শৈল-কন্দরে অজ্ঞাতবাস করছিলেন।

সে কথার সে উত্তর দিলে। প্রথমটা কবিতার ভাষা। এ বিপদের দিনেও তার প্রাণের কবিতার উৎস শুকায় নি। বুঝলাম, যুবক মহাপ্রাণ।

এক শৈল-শিরে দাঁড়িয়ে সে হিম-গিরির ধবল-তুষারের সঙ্গে বিদায়-রবির রঙীন কিরণের খেলা দেখছিল। অদূরে সঙ্গীত-মুখর এক ঝরণা পাহাড়ের অ-মসৃণ দেহ ধুয়ে ঝরে পড়ছিল। কনক-চাঁপা গাছের ফাঁকে ফাঁকে ভ্রমণ ক'রে এক ঝাঁক চতুর রশ্মি তীস্তা নদীর তরঙ্গের মাথাগুলা রাঙিয়ে তুলছিল। সান্ধ্য যবনিকা কালো আবরণে এ-সৌন্দর্য্যের অবলুপ্তির আয়োজন করছিল।

হঠাৎ ঝোরার অন্তর হ'তে এক ব্যথিতের কাতর কণ্ঠ-ধ্বনি বেজে উঠ্‌ল—হেল্প, হেল্প! সেদিকে ঘন গাছের ঝোঁপ। একটু নেমে অরুণ দেখ্‌লে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে একটা প্রকাণ্ড শিলা-খণ্ডের উপর বসে কাতর চীৎকার করছে এক ইঙ্গ-ভারতীয় যুবতী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—সোফী আরাকী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ঝরণার জল ভীষণ শব্দে সেই পাথরটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে আবার একজোটে ব'য়ে যাচ্ছিল। পাথরের উপরটা তিন-কোণা। তাকে আঁকড়ে ধরে বসেছিল—সোফী। সত্যিই সাহায্য না পেলে তার পক্ষে আবার শুক্‌নো জমিতে ফিরে আসা অসম্ভব।

আমি বললাম—গল্পের অল্পবুদ্ধি তাঁতীর মত। ওঠ্‌বার সিঁড়ি ছিল—নামবার সিঁড়ির অভাবে সে নীচে ফিরতে পারে নি। সে অসম্ভব স্থলে বেচারা যে পথে পৌঁছে ছিল—সে পথে ফেরবার প্রতিবন্ধক কী ছিল? আপনাকে কাতরে ডাকা ছল? নিমেষে ভুলায়ে মোরে—

অরুণ বললে—আজ্ঞে না। তার কাতর ক্রন্দন ছলনার কুহক-গান নয়। সে যখন পাথরের উপর বসতে গিয়েছিল

তখন ঝরণার একদিক শুকনো ছিল। কতকগুলা উপলের তলায় তলায় জল ছিল। তাদের মাথায় পা দিয়ে পার হ'য়ে সে পাথরের চাঙ্গরের উপর পৌঁছেছিল।

আমি ভাবলাম—বিচিত্র ব্যাপার! তার অশ্রুজলের স্রোতে ঝরণায় বান এলো না কি?

প্রকাশ্যে বললাম—হঠাৎ এমন প্রচণ্ড জলের স্রোত এলো কোথা থেকে?

যুবক ম্লান-হাসি হেসে বললে—আপনি প্রবীণ উকীল, যে প্রশ্ন আপনার মনে উঠ্ছে—সে প্রশ্ন নবীন ইঞ্জিনীয়ারের মনে নিশ্চয় উঠেছিল। তখন ব্যাপারটা রহস্যময় ছিল—পরে জেনেছি। বাঁশের নলে ঝোড়ার জল নিয়ে পাহাড়ী কৃষক জমি সেচ করে। এমন বহু প্রণালীর ভিতর দিয়ে ঝরণার জল বহুভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়, তাই ঝরণার প্রধান প্রবাহ হয় ক্ষীণ। আশ্বিনের শুক্লা অষ্টমীর সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাহাড়ী কৃষকেরা একজোটে জল নেওয়া বন্ধ করেছিল। ইত্যবসরে মিস্ সোফী আরাকী পাথরে বসে তীস্তা দেখছিল কিম্বা কোন্ ভদ্র-সন্তানকে ফাঁসাবে তার কু-অভিসন্ধিতে মশ্গুল ছিল। হঠাৎ মুক্ত হ'য়ে ঝরণার জলের ধারা সহজ খাদে এক স্রোতে বইল। তাই বায়ু বয়ে আনলে সোফীর কাতর ক্রন্দন, আমার মনে জাগল সহজ ভদ্রতা ও নারী-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে রূপের টান নিশ্চয় ছিল। আমি সে কথার উল্লেখ করলাম না। এবার অরুণের গল্প স্বাভাবিক বর্ণনার খাদে বইতে আরম্ভ করেছিল।

সে সোফীর কাছে পৌঁছল—অর্থাৎ গিরি-প্রবাহের এ-পারে। ঝরণার উপলগুলা পিছল ছিল। মুক্তধারার সরস স্পর্শে তারা হড়হড়ে হ'ল। জল গভীর না হ'লেও ঝরণার বেগ ছিল প্রচণ্ড।

অরুণ সোফীকে সান্ত্বনা দিলে। এক দিকে তিন ফুট অন্য দিকে চার ফুট জলের বেগ, তৃষিত পাষাণের পিছল অঙ্গ। জুতা খুলেও শৈলের উপর পা রাখা অসম্ভব। কোন প্রকারে পার হয়ে দ্বীপের উপর পৌছান গেলেও ব্যাকুল তরুণীর ভার বয়ে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব।

অরুণ তখন বড় বড় শুকনো পাথরের চাঙ্গর সংগ্রহ ক'রে জলে ফেলতে লাগল। সোফীর তৃষিত ব্যাকুল আঁখি মুগ্ধ বিস্ময়ে সেতু নির্ম্মাণপ্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করছিল।

যখন সেতু রচনা শেষ হ'ল, সোফী আনন্দে করতালি দিল। অরুণ শিলাতলে পৌঁছে বললে—আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে পারে চলুন।

সোফী বললে—ধন্যবাদ, কিন্তু আমার বড় ভয় করছে।

অরুণ বললে—আর ভয়ের কারণ নেই। জল কম।

—কিন্তু পাগলা ঝোড়া যে ভীষণ গর্জ্জন করছে!

অরুণ হেসে বললে—যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না। অবশ্য সে ইংরেজীতে বলেছিল।

সোফী ভীরু। সোফী সৌখীন। তার নূতন জুতা আর চামড়ার রঙের মোজার উপর তার ভীষণ দরদ।

সে বললে—আমার জুতা ভিজে যাবে। মোজা নষ্ট হ'বে।

অরুণ সে কথায় ধৈর্য্য হারালে না। তাকে বললে—বেশ। জুতা মোজা খুলে আমার হাতে দিন, তারপর নির্ভয়ে আমার সবল কাঁধের উপর ভর দিয়ে পারে চলুন।

কুমারী সোফী আরাকী কুমার অরুণ রায়ের কাঁধে নির্ভর সুখে ভর দিয়ে ঝরণা পার হ'ল। সূর্য্যের শেষ তির্য্যক রশ্মি পাগলা ঝোড়ার জলে ঝুড়ি ঝুড়ি আলো ও ছায়ার তাল ছড়িয়ে দিচ্ছিল। জলের অঙ্গে এই দুই অপরিচিত নবীনের ছায়া ঢল ঢল করছিল।

হাসি মুখে অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে যখন সোফী তার সুঠাম পায়ে মোজা পরছিল, আর করুণ চোখে অরুণ তার দিকে তাকিয়ে অবলা উদ্ধারের আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল, নালার বাঁক-ঘোরার মুখে কে ডাকলে—সোফী, এসব কি!

ডান-পায়ে মোজা, বাঁ-হাতে জুতা, সোফী লাফিয়ে উঠে আগন্তুকের কণ্ঠে দুল্তে লাগল।

—মামী, মামী, মাম্ মা।

বিস্মিত অরুণ প্রথম দেখ্লে সোফী-জননী শ্রীমতী হেলেন আরাকীকে।

তার সারা অঙ্গে মাতৃত্ব মাখানো—মাতৃস্নেহে চোখে অপরূপ ভাব। দেখুন মিঃ দত্ত, দেবতার চেয়ে পিশাচ অনেক বড়। উঃ! যার চক্ষে অমন ভাব—সে কেমন ক'রে এ দারুণ চিঠি লিখতে পারে? পিশাচ পারে দেবতা সাজতে, কিন্তু দেবতা পিশাচের ভাণ করতে গেলেই ধরা পড়ে।

আমি মতামত ব্যক্ত করলাম না। মিঃ অরুণ রায়

বললে—আমার তখনই বোঝা উচিত ছিল। যখন সোফী সকল কথা বুঝিয়ে দিলে মিসেস আরাকী বললে—আমি উপরের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি।

—তারপর এদের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

—আমি এ ঘটনার পর আর এক সপ্তাহ কালিম্পঙে ছিলাম। দুদিন তারা চা খেতে ডেকেছিল। পথে তাদের সঙ্গে দুদিন সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু কোন দিন বিরলে সোফীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

হেলেন আরাকীর পত্রে যত দোষের উল্লেখ ছিল, আমি প্রত্যেকটি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম।

—বিবাহ প্রতিশ্রুতি ? বলা বাহুল্য অবশ্য অবশ্য মিথ্যা।

—মিথ্যা ! নরকের কথা। আমি রায়পুরেরর রায় বংশের ছেলে—ব্রাহ্মণকুলে একটা আধা-য়িহুদী আধা-ফিরিঙ্গিকে বধূরূপে প্রবেশ-অধিকার দেব ?

আমি বললাম—রাগ করবেন না। কুলের আশে পাশে উপ-বধূরূপে, মানে—

এবার সে কুপিত হ'ল। বললে—যদি অবিশ্বাস—

আমি বললাম—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় মিঃ রায়। যত রকম প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের প্রত্যেকটিকে বুঝতে হবে—আপনারা যেমন মাল-মসলা পরীক্ষা করেন তেমনি—

সে একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল, আমার কথায় না, তার পূর্ব্বের রুক্ষ ব্যবহারে। ক্ষমা প্রার্থনা করলে। সোফীর সঙ্গে ভাবীকালে কোন সম্পর্ক রচনা করবার সে প্রতিশ্রুতি দেয় নি।

পত্র বলছে—অবাধে মেশার কথা।

সে বললে—সবাধে বা অবাধে তার সঙ্গে মিশিনি। কালিম্পঙের কে অধিবাসী আমাদের বিবাহ-পণ অবগত তা জানি নে—কারণ, আমি পণ কিম্বা কোন অধিবাসী সম্বন্ধে নিজেই অবগত নই।

আমি হেসে বললাম—অবশ্য নিভৃত স্থল—তীস্তা নদী, যেহেতু মানুষ নয়, তাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের আশঙ্কা নাই।

এবার তাকে ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে—মিথ্যা কেন ? সত্য ঠিকানাই তাকে দিয়েছিলাম। কার্ড দৈবক্রমে পায়নি। যেদিন তার বাড়ীতে চা-য়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম—সেদিন তার পাহাড়ী আয়ার হাতে কার্ড দিয়েছিলাম।

—বংশ-পরিচয় ?

—বলেছি ত স্ত্রীলোকটা মায়াবিনী। এমন মোলায়েম স্নেহের ভাণ করত, যেন সে আমার মাসি কিম্বা পিসি। আমার পিতৃ-পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা, এমন কি, কর্ম্মস্থল, বেতন প্রভৃতি সকল সমাচার ধীরে ধীরে আমার অন্তর হ'তে টেনে বার ক'রে নিয়েছিল।

একটা রহস্য বোধ হ'ল। স্ত্রীলোকটা অরুণের কর্ম্মস্থলে পত্র লেখবার ভয় দেখায়নি কেন ?

সে বললে—সত্যিই যেন মাসি। আমার মা'র কথা এমন দরদ ক'রে কইত যেন সে আমাদের কতদিনের শুভানুধ্যায়ী। কলিকাতায় ফিরে আমার মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন আত্মীয়তারও আভাস দিয়েছিল। আমি দেশে ফিরে ওদের কথা চিন্তাও করিনি।

(২)

সাতদিনের মধ্যে অরুণ রায়ের উপকার করতে পারব এ আশা ছিল। আমার মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ব্যাপারটা কোনও দুষ্টা রমণীর পক্ষে অর্থশোষণের প্রচেষ্টা নয়। হেলেন আরাকী জানা নাম। ঠিকানাটা বিভিন্ন। সোফী ! আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছিল—ডেভিড আরাকীর মেয়ের নামও সোফী।

গত পঁচিশ বছরের মধ্যে হেলেন আরাকীকে মাত্র তিনবার কি চারবার দেখেছিলাম। শেষ দেখা রাজগঞ্জের ষ্টীমারে সাত বছর পূর্ব্বে। হ্যাঁ ! সোফী ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে শিশির-ধোয়া গোলাপের মত মুখ, সন্ধ্যার তারার মত উজ্জ্বল চোখ। আর একটি ছেলে ছিল—কি নাম—জন। উহুঁ—জোসেফ, না—হ্যাগাই না—নেথান এজরা, ইজিকিয়েল। উহুঁ ! হ্যাঁ, মনে পড়েছে, জেকব। হ্যাঁ—ডেভিডের বেটা জেকব আর কন্যা সোফী।

ডেভিড আরাকীকে প্রায়ই দেখি ময়দানে। সেই পুরাতন বন্ধুত্ব—পুরাতন কথা হয় না—কেবল খেলার কথা হয়। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হাজার প্রসঙ্গে আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। আজকাল হিটলারের কথা কয় ডেভিড—তার পাশবিক অত্যাচারের উল্লেখ করবার সময় তার চক্ষু জবাফুলের মত লাল হয়। হবারই কথা। তারই কথায় নগদ ছয় আনা ব্যয়ে লুই গোলডিঙের য়িহুদী-নিগ্রহের ইতিকথা কিনেছিলাম।

কিন্তু ডেভিড আরাকীর স্ত্রী কি হঠাৎ এক বাঙ্গালী তরুণের কাছে মেয়ের নাম ক'রে অর্থ শোষণ করতে চাইবে বা তার কন্যাকে বাঙ্গালী-ঘরণী করবার আযোজন করবে? আর ডেভিড? অসম্ভব! সে যদি এ-ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকে, তা হ'লে হিট্‌লার সত্য। কিন্তু যেহেতু হিট্‌লার সত্য নয়—আরাকী এত নীচ বা ক্ষিপ্ত হ'তে পারে না।

পঁচিশ বছর পূর্ব্বে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন তরুণ। দু বৎসর পুলিস কোর্টের বারের সভ্য হয়েছি। রাজা-উজীর মারি, তবে সারাদিন ভেরাণ্ডা ভাজি না। তখন নবীন উকীলদের উপার্জ্জনের সুবিধা ছিল। লোকে আদালতে অর্থ ব্যয় করতে কাতর হ'ত না।

এক প্রবীণ এটর্ণীর পরিচয়-পত্র নিয়ে ডেভিড আরাকী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। বেশ নধর চেহারা। ইংরেজ দর্জ্জির তৈরি পরিচ্ছদে ভূষিত। মিষ্টভাষী। ডেভিড আরাকীর প্রত্যেক কথা আজিও আমার স্মৃতিতে জাগরিত ছিল।

---মিঃ দত্ত! আপনি আমার মত তরুণ। আমার বিপদে আপনার সহানুভূতি, আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ও শ্রমকে সফল করবে। প্রবীণ উকীল তেমন দরদের সঙ্গে আমার মামলা লড়বে না—কারণ, আইনের নীরস কূটতর্কের উত্তাপে তার প্রাণ শুষ্ক।

লোকটা শিক্ষিত। ধনী যিহুদী-গৃহে তার জন্ম। হেলেন হ্যারিশন ইংরেজের মেয়ে। কিন্তু তার জন্ম ও শিক্ষা হ'য়েছিল এদেশে। চৌরঙ্গীতে সে তার বিধবা জননীর সঙ্গে সুখে বাস করত। হেলেনের চক্ষু সাগর-নীল, সোনার বরণ তার কেশরাশি, মন-ভোলানো তার সরল মৃদু হাসি।

তখন কলিকাতায় মাত্র দুটি স্থায়ী সিনেমা ছিল। ম্যাডান থিয়েটারের প্রেক্ষা-গৃহে ডেভিড হেলেনের রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে প্রথম-দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হয়েছিল। ডেভিড অকেজো নয়। তার উপর প্রেমের পরশ। সে হেলেনের গৃহে প্রবেশ-পথ রচনা করতে সক্ষম হ'ল।

হেলেন যখন ভোরের আলোয় ময়দানে টাট্‌কা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়, তার নির্জ্জন পথ-চলা অকঠোর কর্‌বার সুযোগ হারায় না ডেভিড্ আরাকী।

একদিন হেলেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে—কোন সওদাগরি আফিসে আমার কর্ম্ম মেলে না?

—কর্ম্ম মেলে না? কোন্ কর্ম্ম তোমার মত কর্ম্মী পায়?

তাতে হেলেন তার হাতের তালু একটু জোরে টিপে দিলে। ডেভিড্ সেই ধন্য হাতে তার দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে সলোমন এজরার দপ্তরে তাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্ম জুটিয়ে দিলে। আরাকীর আত্মীয় এজরা। দুপুরবেলা ডেভিড্ যুবতী সেক্রেটারীর অর্দ্ধেক কাজ নিজের হাতে করে দেয়। সন্ধ্যার সময় তার জননী ডেভিড্‌কে এক পেয়ালা চা দেয় পান করতে আর হেলেন সাঁঝের পাখির মত সঙ্গীতে মুগ্ধ করে তার কান।

গোলাপে কাঁটা, কুসুমে কীট, সীতাফলে বীজ, প্রেমে প্রতিযোগিতা—গণ্ডগোলের বিধাতার রচনা-রহস্যের কৌতুক। প্রেমিক ডেভিড্‌কে শর-বিদ্ধ করলে ব্যারিষ্টার নিখিল রায়ের প্রতিযোগিতা। সেও সুশিক্ষিত ধনী-পুত্র। ডেভিডের মত তার গায়ের চামড়া হরিদ্রাভ সাদা নয়, তার শিক্ষা হয়েছিল বিলাতে। তার মুখে বিধবা মিসেস হ্যারিশন হোমের কথা শুনতে পেত। নিখিলের দেহ সুঠাম। চাল-চলন, কথাবার্ত্তা হাব-ভাব চিত্তাকর্ষক।

হেলেন-জননী মিসেস হ্যারিশনের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছিল। সে মামলার ভার নিয়েছিল নবীন ব্যারিষ্টার মিঃ নিখিল রায় বি, ৭ (ক্যানটাব) অফ দি মিডিল টেম্পল, এস্কোয়ার।

ইঙ্গ-ভারতীয় সম্বন্ধে মিসেস হ্যারিশনের ধারণা উচ্চ ছিল না। যিহুদীকে সে ঘৃণা করত। আসল হোম্ থেকে আগত সওদাগরি দপ্তরের ছোট সাহেবেরা কেউ তার এদেশে প্রসূত কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'বে না—এ সমাচার বিধবার অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই সকল দিক্ হিসাব ক'রে প্রৌঢ়া চিত্তের অন্তস্তলে বাসনা পোষণ করত তার সুন্দরী হেলেনের সুখ-ভার ব্যারিষ্টার রায়ের স্কন্ধে চাপাবার।

হেলেন প্রথম প্রথম যেত জননীর সঙ্গে রায়ের মোটরে কলিকাতার আসেপাশে অনেক মনোরম হরিত পল্লীতে। রায় চালনা-কুশল। ক্রমশ রায়ের সঙ্গে একেলা যায় সুন্দরী, বাঙ্গালার তরু-কুঞ্জের পাখিদের কল-গান শুনতে। ডেভিডের সম্মুখে রায়কে দেখে হেলেন হাসে, তার হাসির প্রত্যুত্তর দেয় রায়ের হাসি। তাদের হাসি-বিনিময় আনন্দের

লহর তোলে মিসেস হ্যারিশনের প্রাণে। তাদের হাসি শেল-সম বেঁধে ডেভিড্ আরাকীর কোমল প্রাণে।

দিবা-ভাগে সলোমন সাহেবের বাড়ি ভাড়ার হিসাব রাখে হেলেন। তখন ডেভিড্ তাকে ইঙ্গিতে বোঝায় তার প্রাণের জ্বালা। হেলেন হেসে তার লম্বা নাকে টুস্কি মেরে বলে—ডেভিড্ বোকা, হিংসা ক'র না। আমি তোমার।

ডেভিড বলে—তুমি যখন ওকে মন্দিরের মোমের বাতির মত আঙ্গুলে বরফে ভেজানো শীতল লেমনেড দাও—তখন যে আমার হাড় হিম হ'য়ে যায় হেলেন।

সে বলে—দুর্ পাগল।

আবার যখন ডেভিড বলে—তুমি যখন ওর সঙ্গে ডজ্ গাড়ি চড়ে কে-জানে কোথায় ভগবান জানেন—কি করতে যাও হেলেন, আমার যে পাঁজরার উপর দিয়ে তোমাদের হাওয়া-গাড়ি চলে যায়।

সে তার পঞ্চম-ও সপ্তম পাঁজরার মাঝে একটা চাঁপার কলির মত বুড়ো আঙ্গুলের গোঁজ মেরে বলে—হিংসা ক'র না পাগলা ছেলে।

এমনি ক'রে কেটে গেল সাত মাস। কিন্তু শুক্ল পক্ষের চাঁদের মত যেমন ডেভিডের ভালবাসা বাড়তে লাগ্‌ল, অভাগার দুর্ভাগ্যের মত হেলেনের জননীর বিদ্বেষ কুৎসিত রূপ ধারণ করলে। প্রকাশ্যভাবে সে তাকে য়িহুদী বলে বিদ্রূপ করত। বিধবার বিরক্তি উল্লসিত করত ব্যারিষ্টারকে। শেষে ডিসেম্বরে হেলেন সলোমনের কর্ম্মত্যাগ করলে।

বড়দিনের ছুটিতে ডেভিড গেল মিসেস হ্যারিশনের গৃহে। বিধবা গৃহে ছিল না। যুবতী তাকে ঘরের কথা বললে—মার ইচ্ছা আমি রায়কে বিবাহ করি।

হেলেন!

বজ্রাহতের শব্দের সঙ্গে প্রসন্ন কণ্ঠস্বর মিশল—হেলেন!

ডেভিড্ দেখলে পিছনে রায়। হেলেন তার কাছে গেল। রায়ের হাতে ছিল একটা মতির কণ্ঠহার। হাত-তালি দিয়ে হেলেন সেই প্রীতির উপহার কণ্ঠে ধারণ করলে।

সে ছুটে এসে বললে—ডেভিড, কি সুন্দর মতির মালা! কি সুন্দর নিখিলের পছন্দ!

নিখিল বললে—কি বাজে কথা বলছ? কি মিঃ আরাকী, কেমন আছেন? কিছু পান করবেন?

তার ক্ষতস্থান জ্বলতে লাগল। সে ঢোঁক গিল্‌লে। সে মালিকী কথার জবাবই বা ছিল কি? ধীরে ধীরে ডেভিড্ বিদায় নিয়ে আঁধার প্রাণে আলোর পথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলে।

বলেছি এ কথা পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের। এ গল্প শুনতে আমার এক ঘণ্টার উপর সময় লেগেছিল। কারণ, ডেভিডের বর্ণনার মাঝে আবেগ ছিল আর অনেক ঘটনার উল্লেখ ছিল। তারা প্রেমের হাটে মূল্যবান, এ গল্পে অবান্তর—অন্তত অনন্যাবশ্যক নয়।

আমি বললাম—মিঃ আরাকী, আমার কাছে আপনার নিভৃত প্রাণের গোপন রহস্য কেন বলছেন, এখনও তার কারণ খুঁজে পেলাম না।

এবার সে হাসলে। বললে—নিভৃত প্রাণের নিগূঢ় রহস্য যদি প্রেমের দেবতাকে কেন্দ্র ক'রে গজিয়ে ওঠে, তার পরিমাণ হয় অনন্ত। ক্ষমা করবেন। কাজের কথা বলি।

আমি বললাম—না। আমার সঙ্গে কথা কয়ে যদি আপনার মনের বোঝা—

সে হেসে বললে—না, বোঝা না। কাঁটার বোঝা এখন আশীর্ব্বাদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সে আশীর্ব্বাদ কেমন ক'রে লাভ করতে পারব তারই পরামর্শ করবার জন্য আপনার শরণাগত হয়েছি!

প্রেমের উপন্যাসে এক একটা হেঁয়ালী গজিয়ে ওঠে। ভাবলাম এটা তেমনি। সুতরাং হেঁয়ালী-সমাধানে কাল ও জীবনী-শক্তি অপচয় না ক'রে মুচকি হেসে তাকে গল্পের নূতন অধ্যায় বর্ণনা করতে উৎসাহিত করলাম।

সে বললে—পনেরো দিন পরে হেলেনের এই চিঠি পেলাম। এ পনেরো দিন কি সূচীবেধ যন্ত্রণা সয়েছি তা কল্পনা করুন! কারণ, আমার মত আপনিও তরুণ।

জীবনে তিনবার সূচী-বেঁধার যন্ত্রণার স্বাদ পেয়েছি।—যখন ডাক্তারবাবু ম্যালেরিয়া তাড়াবার জন্য দেহে কুইনাইন ইনজেক্ট করেছিলেন। সেই স্মৃতিকে অতিরঞ্জন ক'রে মিঃ ডেভিড্ আরাকীর ব্যর্থ-প্রেমের দুর্ব্বিসহ সূচিকাঘাতের যাতনা অনুমান করবার দুরাশা ত্যাগ করলাম। বললাম, দেখি পত্র।

সে হেসে আমার হাতে দিলে লিপি। আরাকী এখনও জীবিত। হেলেনও সশরীরে বিদ্যমান। সুতরাং এ কাহিনীতে উচ্ছ্বাসগুলার আবৃত্তি করলাম না। মোট কথা, অনেক আদর ক'রে, তার প্রতি যে হেলেনের ভালবাসা আদি

ও অকৃত্রিম, তার ধমনীর প্রত্যেক রক্ত-কণিকা দিবারাত্র ডেভিড্ ডেভিড্ বলে তালে তালে মধুর ছন্দে নৃত্যশীল, এ সব সত্য বর্ণনা ক'রে শেষে সে লিখেছে—

"তোমার আমার মিলন ভগবানের অভিপ্রেত। আমার জননী পিশাচিনী—অর্থের মোহে, স্বার্থের বেদীতে সে আমায় বলি দিতে উদ্যত। ডেভিড্, এ আত্মা তোমার—এ জীবন তোমাকে উৎসর্গ করেছি। আমার এ ক্ষণ-ভঙ্গুর নারী-দেহের আত্ম-রক্ষার শক্তি নাই। তুমি এ দেহ উদ্ধার না করলে—সে রায়ের হারেমে প্রবিষ্ট হ'বে। আত্যন্তিক ভালবাসার চাপে তোমারও যদি মনুষ্যত্ব, বল, বুদ্ধি ও সাহস সমাধিস্থ হয় তখন আমার অনিবার্য্য আশ্রয়স্থল হবে সমাধি-ক্ষেত্র।" ইত্যাদি।

—হুঁ! হেলেন-উদ্ধার! ট্রয়! হোমার!

সে হেসে বললে—হ্যাঁ মিঃ দত্ত। কাঠের ঘোড়া নির্ম্মাণ করতে হবে আপনাকে।

—এ পত্রের পর হেলেনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! সে আমার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে আমাকে য়িহুদী-মতে বিবাহ করতে চায়।

—আপনার আত্মীয়-স্বজন?

—তাদের অমত নেই। আপনি ভাবছেন ক্ষণিকের মোহে তাকে বিবাহ ক'রে আমি তাকে ও নিজেকে গৃহহারা সমাজহারা করব? না মিঃ দত্ত, আমি নীচ নই। আমার বংশ বড় বংশ। আমি য়িহুদীদের দ্বাদশ গোত্রের আরাকী গোত্রের সন্তান।

গোত্র-পরিচয় বুঝলাম না। যাক্—কাশ্যপ গোত্রে হ্যারিসন-শোণিত প্রবেশ না করলেই হ'ল।

তাকে বোঝালাম। ষোল বছরের অধিক বয়সের অবিবাহিতা যুবতী স্বেচ্ছায় কারও সঙ্গে চলে গেলে মেয়ে-চুরির অপরাধ হয় না। তবে ওরা মিথ্যা দোষারোপ ক'রে একবার পুলিস কোর্টে তাদের নিয়ে টানাটানি করবে।

(৩)

অরুণ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর আমি ডেভিড্ আরাকীর সঙ্গে কথা কইতে কৃত-সঙ্কল্প হলাম। ময়দানে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা ডেভিড্ আরাকীর চিরদিনের সখ। তাকে রবিবার ইডেন উদ্যানের ক্রিকেট ক্ষেত্রে ধরলাম।

অবশ্য খেলার গল্পের পর তাকে বললাম—ডেভিড্, আমার এক বিষয় বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়। অবশ্য কথাটা তোমার একেবারে নিজের, মানে—পারিবারিক, তাই কোন দিন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিনি।

সে একটু ম্লান হাসি হাসলে। বললে—আমার পারিবারিক জীবনের গোড়ার কথাই তো তুমি জান সুবোধ।

তারপর সে খুব অট্টহাস্য ক'রে বললে—গালাগালি তো তুমিও খেয়েছ—ড্যাম্‌ড্ নিগার—ড্যাম্‌ড্ জু!

আমি খুব হাসলাম। পঁচিশ বছর পূর্ব্বের কথা। কিন্তু অমন চিত্র চিত্তপট হ'তে মোছে না। সে পুরানো কথা এ গল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব'লে মনে হ'ল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার সুপরামর্শে ডেভিড্ আরাকীর সঙ্গে হেলেন হ্যারিসন পালিয়ে এসেছিল। অচিরে মুরগীহাটার সিনেগগে দুটি প্রাণ এক হয়েছিল। সেদিন মিসেস্ হ্যারিসনের কাজ ছিল হাইকোর্টে। রাত্রে রায় এবং বিধবা উপলব্ধি করলে হেলেন অগোচর হয়েছে। সারা রাত সকল হাসপাতালে ও থানায় থানায় ঘুরে তারা যখন যুবতীর সংবাদ পেলে না তখন সন্দিগ্ধ হল। প্রভাতে বিধবা, কন্যার সন্ধান পেলে আরাকীর গৃহে। কিন্তু কন্যা বা জামাতা কেউ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে না। তার বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে কন্যাহারা য়িহুদী জাতির উদ্দেশে গালিবর্ষণ করতে লাগল।

সেটা য়িহুদী-পাড়া। ইসরায়েল বংশের স্বাধীন-চিত্ত অনেক তরুণের সে পাড়ায় বাস। তারা মিসেস হ্যারিসনের য়িহুদী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে। কিন্তু বৎসহারা গাভীর মত বিধবার মর্ম্মস্থল ক্ষতবিক্ষত। সে অশিষ্ট য়িহুদী তরুণ সম্প্রদায়ের আশু নরক-বাস প্রার্থনা ক'রে স্বস্থানে প্রস্থান করলে।

আমি পুলিস কোর্টে বড় হাকিমের ঘরে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিলাম। আমার অনুমান মিথ্যা হ'ল না। যথাসময়ে মিঃ রায় ব্যারিষ্টার সমভিব্যাহারে মিসেস্ হ্যারিসন নালিস করতে এল।

তার অভিযোগ—ডেভিড্ আরাকী নামক একজন নিষ্কর্ম্মা যুবক তার কন্যাকে স্টুটারকিন লেনে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। যুবতীর জীবন সংশয়। তার অঙ্গে প্রায় দু'হাজার টাকার

অলঙ্কার ছিল। তার সঙ্গে হাজার টাকা আন্দাজ নগদ অর্থ ছিল। এই সব পদার্থ আত্মসাতের অপচেষ্টাই এই কন্যা-ফুস্‌লানোর কারণ।

হাকিম বিচক্ষণ। কলিকাতায় অমন ঘটনা প্রায় ঘটে। পুলিস কোর্টে এমন কাহিনীর কোন নূতনত্ব নেই। মিঃ রায়ের আবেগময়ী বক্তৃতার অন্তে হাকিম আবশ্যক প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করলেন—কুমারীর বয়স ?

কোর্টে সমবেত ব্যবহারাজীবিগণ মৃদু হাসলে। মিঃ রায় অবজ্ঞার চক্ষে ইতস্তত তাকিয়ে বললেন—কেবল অপ্রাপ্ত-বয়স্কা যুবতীকে গার্জ্জেনের দখল থেকে নিয়ে গেলেই কন্যা-চুরির অপরাধ হয় না। প্রবঞ্চনা ক'রে যে-কোন বয়সের ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করলে মানুষ চুরি হয়।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পুলিস কোর্টের উকিল ও হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল না। প্রখ্যাত-নামা উকিল ব্যারিষ্টার অবশ্য চাণক্য-নীতি অনুসারে সর্ব্বত্র পূজ্যতে। কিন্তু সেকালের তরুণ ব্যারিষ্টারের মনে অভিমান ছিল যে, সে বিলাত-প্রত্যাগত সুতরাং অধিক শ্রদ্ধেয়। উকিলদের মনে ধারণা ছিল—তাদের দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। ধনীপুত্র বিলাত থেকে নকল সাহেবীয়ানা শিখে আসে মাত্র, আসল বিদ্যায় উকিলদেরই মস্তিষ্ক পূর্ণ।

সুতরাং পরিপাটি পোষাক-পরা নির্ভুল উচ্চারণে যখন মিঃ রায় আইন বিবৃত করলে, আমার সহকর্ম্মীরা আর এক কিস্তি মৃদুহাস্যে মিঃ রায়ের বিরক্তি উৎপাদন করলে।

সে বললে—বুঝছি, এখানে আইন সম্বন্ধে লোকের ধারণা নির্ভুল নয়।

হাকিম ব্যারিষ্টার। তিনি ক্ষুব্ধ হ'লেন। ভাবলেন, নূতন ব্যারিষ্টারটি বোধ হয় তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শেষ কথাগুলি বললেন।

তিনি বললেন—আমি জিজ্ঞাসা করেছি—স্ত্রীলোকটির বয়স কত ?

মিঃ রায় বললেন—তেইশ ! কিন্তু আমার অন্য অভিযোগ—এই ভদ্র-মহিলাটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক ক'রে রাখা হ'য়েছে। আমি আশু ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করি।

তেজস্বিতা ও ব্যগ্রতা অনুভূত হচ্ছিল মিঃ রায়ের ভাষায়। হাকিম পুলিস কোর্টের হোমরা-চোমরা উকিলদের—যথা অভিরুচি হুজুর—শুনতে অভ্যস্ত।

তিনি বললেন—নিঃসন্দেহ। এরূপ অভিযোগ আমি নিত্য শুনি। এ সাধারণ যৌন-মিলনের ব্যাপার।

মিঃ রায় গর্জ্জিয়া বললেন—আশ্চর্য্য।

বিচারক বললেন—ওঃ !

আমি ভাবলাম, এই মাহেন্দ্র যোগ। বললাম—এ-সম্বন্ধে আমি কিছু নিবেদন করবার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

সভাস্থলে বোমা ফাটলে অত উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ত না।

মিঃ রায় গর্জ্জিয়া বললেন—আমি আপত্তি করছি। এ অবস্থায় অপর পক্ষের কোন কথা বলবার অধিকার নেই। এ কার্য্য-বিধি নিতান্ত অবৈধ।

হাকিম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অনুমতি দিলাম। হ্যাঁ মিঃ দত্ত।

আমি বললাম—হুজুর, এই ভদ্র-মহিলাটি তাঁর কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন হিন্দুর সঙ্গে বিবাহ—

—অত্যন্ত মানহানিকর মিথ্যা কথা। আমি প্রতিবাদ করছি।—বললেন মিঃ রায়।

—মিথ্যুক।—বললে বিধবা।

—নিস্তব্ধ ! হ্যাঁ মিঃ দত্ত।—বললেন হাকিম।

আমি বললাম—হুজুর,সেই যুবতীটি একটি ধনী সুপুরুষ—

—ফুঃ ! বললে রায়।

—শয়তান ! বললে কন্যা-হারা।

—নিস্তব্ধ ! বললেন হাকিম।

—চোপ্ ! অস্টে।—বললে সার্জ্জেণ্ট।

আমি বললাম—হুজুর, সেই সুপুরুষ, সুশিক্ষিত ধনী য়িহুদীকে ভালবাসত যুবতী। যখন এই মহিলা তাকে হিন্দুর সঙ্গে বিবাহ-বাঁধনে বাঁধতে চাইলেন, সে প্রণয়ী-য়িহুদীর আশ্রয় প্রার্থনা করলে। তার জননী তাকে জোর ক'রে হিন্দু ব্যারিষ্টারের সঙ্গে—

—মানহানিকর মিথ্যা কথা।—বললে রায়। তার চক্ষু থে'কে আগুনের ফুলকি নির্গত হচ্ছিল।

আমি বললাম—মোট কথা হুজুর, তার আত্মীয়স্বজনের অনুমতি নিয়ে কাল য়িহুদী-মতে মিস্ হেলেন হ্যারিসনকে মিঃ ডেভিড্ আরাকী বিবাহ করেছে।

—হাঃ ভগবন !—বলে বিধবা চীৎকার ক'রে উঠল।

মিঃ রায় নির্ব্বাক। নিস্তব্ধ! তার মুখ পাংশু-বর্ণ ধারণ করলে।

হাকিম বললে—হুঁ ! সে এখন মিসেস আরাকী। এ বিষয় তদন্তসাপেক্ষ। মিঃ দত্ত, আপনি আরাকী-দম্পতিকে আমার এজলাসে হাজির করতে পারবেন ? না, আমি ওয়ারেণ্ট জারি করব ?

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম। মিসেস হ্যারিসন নানা প্রকার অসংলগ্ন শব্দ করছিল। বাগ্মী মিঃ রায়—নির্ব্বাক নিস্তব্ধ।

দ্বিতীয় দিন মিঃ রায় হাজির হ'ল না। অপর একজন ব্যারিষ্টার এলেন। ইনি প্রৌঢ়। আমাকে আড়ালে ডেকে বললে—মামলার ফল কি হ'বে বোঝা যাচ্চে। আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

—বলুন স্যার।

—কোনো প্রকারে রায়ের নাম আদালতে যেন না প্রকাশ পায়। তোমার মক্কেলকে শিখিয়ে দাও। হাকিম জিজ্ঞাসা করলেও বলবে না।

আমি প্রতিশ্রুত হলাম। ডেভিড্ ও হেলেন আরাকী আমার অনুরোধ উপেক্ষা করলে না।

হাকিমের খাস কামরায় মামলার শুনানী হ'ল। অবশ্য মিসেস্ হ্যারিসনের দরখাস্ত না-মঞ্জুর হ'ল।

কিন্তু আসল মজা হ'ল আদালতের বাইরে। যখন আরাকীরা হাত-ধরাধরি করে বাইরে এল—মিসেস্ হ্যারিসন কন্যার হাত ধরে টানলে—স্তবস্তুতি করলে। কিন্তু নব-পরিণীতা প্রত্যাখ্যান করলে তার স্নেহের অনুরোধ। শেষে বিধবা অজস্র গালাগালি দিল আরাকীকে, তাকে ছাতা-প্রহার করলে। যখন মেম তার গায়ে থুথু দিল—সার্জ্জেণ্ট মেমকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় বৎস-হারা আমায় বললে—ড্যাম্‌ড্ নিগার।

আমি বললাম—ব্যারিষ্টার রায়কে বলছ ?

(৪)

বলেছি অরুণ রায়ের পত্র-পাওয়ার রহস্য জানবার জন্য আরাকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে গিয়ে।

আজ খেলার মাঠে আরাকী সেই কথার উল্লেখ করে বললে—আমার পারিবারিক জীবনের প্রারম্ভে ছিলাম—জু ডগ, আমার জন্য তুমিও হয়েছিলে—ড্যাম্‌ড নিগার।

আমি বললাম—জিজ্ঞাসা করছিলাম—তুমি নিজে ম্যাচ দেখতে আস—তোমার স্ত্রী বা পুত্র-কন্যাকে কোন দিন তো আন না।

সে গম্ভীর হ'ল। বললে—জান না সুবোধ ?

—না। কি ব্যাপার ?

সে বললে—আজ চার বৎসর আমি পরিবার পরিত্যক্ত।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, হেলেন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার নামে প্রায় লক্ষ টাকা খরচ ক'রে আমি বাড়ি ক'রে দিয়েছিলাম। সে সেই বাড়ীতে থাকে। নগদ টাকাও অনেক দিয়েছিলাম—সে টাকা জেলে যাবার আগেই পুত্র জেকব উড়িয়েছিল।

—জেলে যাবার আগে ?

—তোমার বিদ্যাবুদ্ধি বাগ্মীতার কেন সাহায্য নিইনি সুবোধ তাই জিজ্ঞাসা করছ ?

আমি বিস্মিত হয়ে শুনছিলাম।

সে বললে—আমি মোটে দুঃখিত নই।

আমি অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—সোফী ? প্রকৃত কথা তখন আমি নিঃসন্দেহ। অরুণ রায় সম্পর্কিত সুন্দরী তার কন্যা সোফী।

সে বললে—সুবোধ,এই পোড়া চিত্তে একটি মাত্র ক্ষতস্থান আছে—সোফী। সোফী ! জিহোভার হাতে তাকে সঁপে দিয়েছি। কে জানে সে কি অবস্থায় আছে।

আমি কোন কথা বললাম না।

আমি বললাম—চল খেলা দেখিগে।

সে বললে—না সুবোধ, আজ আর নয়।

সে হেট-মুণ্ড হয়ে খেলার মাঠ ত্যাগ ক'রে বাইরে গেল।

(৫)

সোফীকে নিয়ে হেলেন আরাকী যেখানে বাস করে সে স্থলে না গেলে রহস্যের মীমাংসা অসম্ভব। মন খুলে সকল কথা না বললেও আমার অভিজ্ঞতা তার অন্তরের ভাব সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে নিশ্চয়ই।

গুটি গুটি গেলাম হেলেন আরাকীর গৃহে।

তিনতলা বাড়ি। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণ। অনেক ফ্ল্যাটে বিভক্ত অট্টালিকা।

কাঠের ফটকে চড়ে একটা চীনার ছেলে দোল খাচ্ছিল, আর একটা ইঙ্গ-ভারতীয় মেয়ে তার সহায়তা করছিল।

বুঝলাম বাড়িখানি আসিয়া-ভূখণ্ডের অন্তর্নিহিত নিবিড় একতার পরিপোষক।

তিনতলায় পথের দিকের ফ্ল্যাটে মিসেস আরাকীর বাসস্থান—এ তথ্য সংগ্রহ করলাম এক মুসলমান ভৃত্যের আনুকূল্যে।

আমি সিঁড়ির চাতালে উঠে রুদ্ধদ্বারে শব্দ করলাম। একটি ভুটিয়া আয়া অর্দ্ধেক দরজা খুলে মুখ বার করলে।

—মেম সাহেব হায় ?

কথার উত্তর দিল না। আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দক্ষিণ-পশ্চিম আসিয়ার প্রতিনিধি উধাও হ'ল। আমি অপেক্ষা করলাম, কারণ ভিতরে মানুষ-চলা ও কথোপকথনের শব্দ হচ্ছিল।

আয়া আবার দরজা খুলে বললে—সাহেবকা কিয়া নাম ?

আমি তার হাতে কার্ড দিলাম। আবার দরজা বন্ধ ক'রে সে রুদ্ধ-দ্বারের পরপারের রহস্যের মাঝে আত্মগোপন করলে।

তৃতীয়বার যখন দ্বার উন্মুক্ত হল—আমার দৃষ্টিপথে উদিত হ'ল আরাকী-ঘরণী শ্রীমতী হেলেন।

সাত বৎসর পরে দেখা। এখন তার চোখে প্রেমকাতর চাউনি নাই—অঙ্গ-ভঙ্গিতে বিশ্ব-বিজয়ের আয়াস নাই—গভীর মনে অপরে তার সম্বন্ধে কি বলে সে বিচার ফল জানবার ঔৎসুক্য নাই। তার গভীর মন এখন পরকে বিচার করতে বিরত, তার অঙ্গ-ভঙ্গি অঙ্গের স্থূলতা ও কমনীয়তার অভাব গোপন করতে ব্যস্ত। চক্ষু ভাবীকালের বিভীষিকার সঙ্গে সংগ্রামপ্রয়াসী। কাজেই অপাঙ্গে ছিল দুষ্টামি—কঠোরতা, তিক্ত-অভিজ্ঞতা-প্রসূত বিশ্ব-বিরোধিতা।

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে। বললে—কেমন আছেন ? আসুন।

বারান্দায় খাঁচার ভিতর মুনিয়া ছিল, একটা পিঞ্জরে ছিল কাকাতুয়া। একটা বেতের চৌকী টেনে আমায় বসতে দিয়ে হেলেন অন্য চৌকীতে বসল।

আমি হেসে বললাম—বহু বৎসর পরে আপনাকে দেখছি। আমায় চিনতে পারেন ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে সে বললে—আমার এ ঠিকানা আপনাকে কে দিলে ?

আমি সরল ভাবে বললাম—সেদিন খেলার মাঠে কথা-প্রসঙ্গে শুনলাম—আপনি এখানে বাস করেন। ডেভিড্ পূর্ব্বের ঠিকানায় বাস করে।

—আর কি শুনলেন ?

—বাকী কিছু শুনলাম না, অনুমান করলাম। বুঝলাম, কোন দাম্পত্য মনো-মালিন্যের ফলে আপনারা পৃথক পৃথক গৃহে বাস করছেন।

সে আর একবার আপাদ-মস্তক আমাকে দেখলে। তার পর বললে—মিঃ দত্ত, এই দীর্ঘকাল পরে আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কেন ?

আমি এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তাকে বললাম—আপনার কাছে আসব ব'লে আসিনি। এ পাড়ায় ঘর খুঁজছিলাম। হঠাৎ আপনার বাড়ির সম্মুখে এসে মনে হ'ল আপনার কথা। ভাবলাম—এখানে ঘর আছে কি-না সন্ধান করি।

তাকে এক কল্পিত মক্কেলের গল্প বললাম। সে বললে—আমার এখানে ঘর খালি নাই। তার সন্দেহ অপনোদন করবার জন্যে আমি একমুখ হেসে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—গুড্‌বাই। দেখি অন্য পাড়ায়।

এবার সে বুঝলে আমি তাদের দাম্পত্য-সংগ্রামের ভগ্নদূত নই। সে বললে—একটু চা খেয়ে যান—যদি এতদিন পরে এলেন।

অগত্যা আমাকে বসতে হ'ল। সে আমার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করলে। বললে—শুনেছি আপনার খুব পশার হয়েছে। আপনার নাম প্রায় শুনি।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম—আপনার একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। তারা কোথায় ?

সে বললে—পুত্র আলাদা থাকে। কন্যা আমার কাছে থাকে।

—ওঃ! কন্যাটি কত বড় হয়েছে ? তার নাম—রেচেল—না—কীটি—

সে বললে—না সোফী।

তার পর সে ডাকলে—সোফী! সোফী!

লম্বা যিহুদী ঘাঘরার প্রান্ত বাম হাতে তুলে ধরা।

প্রাচীন গ্রীক তরুণীর মত দেখাচ্ছিল সোফীকে। তার জননীর ঐ বয়সের রূপের একেবারে বিপরীত রূপ সোফীর। সোফী শান্ত হাস্য-মুখ, তুষ্ট শিশু। তার রূপ-মাধুরী তার আপনার অগোচর।

আমি বল্লাম —বাঃ! এঞ্জেল।

সোফী উল্লাসে হাসলে। তার মা বল্লে—দুঃখের কথা, ওর মধ্যে য়িহুদীর রক্ত আছে। যাও সোফী, আমার পুরাতন বন্ধু মিঃ দত্তর জন্য চায়ের ব্যবস্থা কর।

নৃত্য এবং দৌড়ের মাঝামাঝি চলনে সোফী কক্ষে প্রবেশ করলে।

তার জননী বল্লে—সোফী একেবারে ওরিয়েন্টল। ওর বিবাহ দিব প্রাচ্য যুবকের সঙ্গে।

আমি বল্লাম—নিশ্চয়। অনেক প্রাচ্য ধনী য়িহুদী ওকে বিবাহ করবে। বিলাতী য়িহুদীরাও অমন মেয়ে পেলে

—না য়িহুদী, না হিন্দু।

আমি হাসলাম। বল্লাম—সমাজ ছাড়তে হবে। তা না হ'লে আমার পুত্রের সঙ্গে ওর বিবাহ দিতাম।

সে বল্লে—তোমার মুখে একথা সাজে। কিন্তু তোমার পুত্র সত্য যদি কোনও য়িহুদী কন্যার সঙ্গে প্রেম করে, তাকে বোঝায় পৃথিবীতে একটি মাত্র শান্তির স্থল সেই প্রেমিকার আশ্রয়—তখন বিধর্ম্মী কুমারী কি দাবী কর্তে পারে না তার ধর্ম্ম-পত্নী হবার।

—অবশ্য। এ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা ক'রে স্নেহের কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। সে যদি সমাজকে মনে করে প্রেমের উচ্চে—তার পক্ষে ও পথে না যাওয়াই কর্ত্তব্য।

—আর যদি কেহ যুবতীর চিত্ত জয় কর্ব্বার জন্য তাকে মিথ্যা বিবাহের স্তোক দেয় আর সে প্রশ্ন সঙ্গীন হ'লে বলে—ছিঃ ছিঃ প্রেমের বেদীতে বিবাহকে বসাতে চাও। আমরা এমনি থাকব চিরদিন—তুচ্ছ বিবাহের কি প্রয়োজন?

আমি বললাম—উভয়ে যদি নিজ নিজ সমাজ উপেক্ষা ক'রে কেবল প্রেমের বেদীতে আত্মোৎসর্গ করতে পারে—উৎসর্গটা হয়তো উচ্চাঙ্গের হয়। কিন্তু মানুষের বিশ্ব এখন যে অবস্থায় আছে—সে অবস্থায় লোকে অবিবাহিত প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব করতে চায় না।

—আপনি উকীল। তাদের সন্ততিকে সমাজ কি বলে? আইন কি বলে?

বললাম—ওঃ!

গভীর জলে গিয়ে পড়ছিলাম। হেলেন আরাকীকে অবৈধ অর্থ-শোষক ব'লে মনে হচ্ছিল না। তবে কি অরুণ রায় আমাকে মিথ্যা কথা বলেছে? বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে শেষে কি সে সোফীকে উপ-পত্নী রূপে গ্রহণ কর্ব্বার প্রস্তাব করেছে?

সোফী চা, কেক বিস্কুট প্রভৃতি আনলে। নিজের হাতে চা তৈরি করলে। তার জননী বললে—আঙ্কলকে যত্ন করে খাওয়াও।

মা ও মেয়ের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা। সোফীর স্মৃতিতে পিতার ক্রিকেটের ম্যাচ না দেখে হেট-মুণ্ড হ'য়ে চলে যাওয়া স্বাভাবিক।

আমি সুবিধা পেলাম না অরুণ রায়ের কথা উত্থাপন কর্ব্বার। অন্ততঃ এ কথা বুঝলাম যে সহজে হেলেন এ ব্যাপার নিয়ে আদালতে যাবে না।

(৬)

রাত্রে মিঃ অরুণ রায় এলো। বিষাদ-মলিন মুখ। অথচ যৌবন-সুলভ আগ্রহ তার প্রশ্নে।

—সুবোধবাবু স্যার, দুদিন তো কেটে গেল। আমি তো প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা করছি বাংলা কাগজে আমার সংবাদ-চাওয়া একটা বিজ্ঞাপন। নিরুদ্দেশ বাঙ্গালী যুবক অরুণ রায়—বিবাহ পণে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বললাম—সে তো ভাল কথা। ছাপার অক্ষরে নাম বার করবার জন্য মানুষ কত কাণ্ডই করে।

সে বললে—ওঃ! বাবা!

আমি বললাম—বুঝেছি। এ সংবাদে আপনার আত্মীয়-স্বজন—পিতা—

সে বললে—আমার পিতা জীবিত নাই।

—ওঃ! তিনি কি বিষয়-কর্ম্ম করতেন?

—আজ্ঞে তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন। আজ প্রায় আঠারো বৎসর তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে। আমার তখন বয়স পাঁচ বৎসর।

—তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন? ওঃ! তাহ'লে তো আমার জানা উচিত। আমারও তো প্র্যাকটিস সাতাশ বছর হ'ল। তাঁর নাম?

—মিঃ নিখিল রায়।

—ওঃ!—

অকস্মাৎ মাঝ রাত্রে গৃহ-প্রাঙ্গণে বল্গা-হরিণ জোতা পলুকা গাড়িতে স্বদেশী পোষাকে এক লাপ-লাণ্ডার দেখলে যে প্রকার মুগ্ধ বিস্ময়ে তার প্রতি তাকাতাম ঠিক সেই রকম বিস্ময়ে তাকালাম অরুণের মুখের দিকে। কী ভীষণ যোগাযোগ! কি নিবিড় ভাঙ্গা গড়ার রহস্য। সোফী আরাকী—ডেভিড্ ও হেলেনের কন্যা আর অরুণ রায়—নিখিল রায়ের পুত্র। আর আমি—আমি সেই অভাগা যাকে হেলেন-জননী বলেছিল—ড্যামড্ নীগার—আর নিখিল রায় বলেছিল— ড্যামড্ পুলিস-কোর্ট পেটিফগার!

বিস্মিত হ'ল মার্জ্জিত-রুচি, কৃত-বিদ্য অরুণ রায় আমার অশিষ্ট চাহনীতে।

সে বললে—আপনি কি আমার পিতাকে জানতেন?

—হ্যাঁ জানতাম বই কি! ওঃ! হ্যাঁ আপনি মিষ্টার নিখিলরায়েরপুত্র। এ কথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

—কেন?

—কেন? আপনাকে কেউ বলেনি যে আপনার চেহারা হুবহু আপনার স্বর্গীয় পিতার চেহারার অনুরূপ—আপনার হাসি, আপনার চলন, মায় অন্যমনস্ক হ'য়ে আপনার মাঝের আঙ্গুল মট্‌কাবার অভ্যাস অবধি।

এবার সে হাসলে— প্রকাশ্য সরল হাসি।

বললে—মিঃ দত্ত, আপনি আমার পিতার পরিচিত। আমাকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করতেই হবে। যে কোনো মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

আমি তাকে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিলাম। হেলেন আরাকীর প্রকৃত স্বরূপটা জানবার জন্য ব্যগ্র হ'লাম। কী ছিল পত্রের মূলে? নিখিলের পুরাতন শত্রুতার প্রতিশোধের বাসনা? না হীন শোষকের মত ধনী-পুত্রের নিকট হ'তে অর্থ শোষণের প্রচেষ্টা।

একটা তৃতীয় সম্ভাবনাও ছিল। সত্য কি পিতার মত পুত্রও যৌন দুর্ব্বলতা-গ্রস্থ?

কে জানে কোন কথাটা সত্য।

ডেভিডের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল রবিবার। সোমবার তার পত্নী ও কন্যার সঙ্গে কথা-বার্তা হ'ল। বুধবার অরুণ রায়ের আসবার কথা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ডেভিড্ আরাকী এলো।

একবার বাসনা হ'ল তাকে অরুণ রায়ের কথা বলি। কিন্তু পরক্ষণে ভাবলাম তার কাছে পত্রের কথা গোপন করলে মঙ্গল হবে। হেলেন ও সোফী সন্দর্শন কথারও উল্লেখ করলাম না।

পুরাতন কাহিনীর সঙ্গে তার অনাগত কালের যে নিবিড় সম্পর্ক সে কথা নিশ্চয় এই দুই বৎসর তার অস্থি-মজ্জায় অনুভূত হ'চ্ছিল। অভিমান আত্ম-প্রবঞ্চনা। দিনে দিনে অভিমানী তার ভ্রম বোঝে। তার উপর কন্যার স্নেহ। আরাকীর বুকে আগুন জ্বলছিল। কাজেই সে এলো আমার কাছে—কারণ তার এই প্রেম-স্রোতের উৎসর সঙ্গে আমার সম্পর্ক।

সে পুত্রের কথা বল্লে। এ গল্পে তার পুত্র জেকব—কাব্যে উপেক্ষিত। মোট কথা জননীর আদরে সে হ'য়েছিল উদ্দাম। তিন বৎসর পূর্ব্বে সে এক ইঙ্গ-ভারতীয়ের কব্জির হাড় ভেঙ্গে দিয়েছিল। সে যাত্রা তাকে অর্থব্যয়ে ডেভিড্ উদ্ধার করেছিল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে চীনাদের জুয়ার আড্ডায় বাজি হেরে সে টাকার বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছিল। ডেভিড্ জান্‌তো তার গ্রেপ্তারের কথা। সে কথা সে স্ত্রীকে বলেনি। মাঝে মাঝে সে উধাও হ'ত। সাতদিন পরে সে হাকিমের কাছে দোষ-স্বীকার ক'রে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। এ কথা যখন তার জননী শুনলে—ডেভিডের উপর তার দারুণ ক্রোধ জন্মিল। সেই ঝগড়ার ফলে তারা পৃথক।

—পুত্র কি করে?

—জেল থেকে এসে একেবারে শুধ্‌রে গেছে। ই, বি, রেলে ইঞ্জিন-চালকের কাজ করে। আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না।

আমি বল্লাম—তাকে এখন যত্ন ক'রে আবার কেন সংসার নূতন করে গড় না।

সে স্থির হ'য়ে বসে আমার ব্লটিঙ্ প্যাডের উপর একটা হাঁস আঁক্‌লে। শেষে ধীরে ধীরে বল্লে—চীনা-মাটির ভাঙ্গা বাসন জোড়া লাগে না। সে অনেক কথা।

—প্রেমের ক্ষণিক বিচ্ছেদ—উচ্ছেদ নয়। কারণ প্রণয়ের শিকড় থাকে মনের গভীর স্তরে।

সে আমার দিকে এক বিকট দৃষ্টিতে তাকালে। বল্লে —এ সব কথা কি আইনের পুস্তকে লেখা থাকে ?

আমি বল্লাম—এসব কথা জীবন-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে লেখা থাকে। এস্‌কিমো থেকে জার্ম্মাণ অবধি সকলেই এসব শাশ্বত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

সে বল্লে—সার সত্য। প্রেমের গাছে গ্রাফ্‌ট্‌ কলম চলে। কিন্তু তার মূল-উচ্ছেদ হয় না।

—ফ্রয়েড্‌! ইনহিবিসান! হুঁ! গোত্তা খাইয়ে প্রেমকে আরও গভীরে নামিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তার জড়-মারা যায় না। সুযোগ পেলেই সে আত্ম-প্রকাশ করে।

তার চক্ষে এক অপূর্ব্ব ভাব এলো। উন্মত্তের মত সে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। সে জ্বলন্ত হস্তে আমার দু'টা হাত ধরলে। বল্লে—সত্য কথা শুনবে? হেলেনের যৌন-জীবনে আমি ছিলাম কলম-গ্রাফ্‌ট—তার মূলে ছিল—নিখিল রায়—অলক্ষ্যের দৃঢ়-ভূমিতে!

আমি শিহরে উঠ্‌লাম।

তবে সব কথা শোনো সুবোধ। জেকব আমার পুত্র নয়। সে নিখিলের পুত্র। এ কথা হেলেন স্বয়ং স্বীকার করেছে। নিখিলের উপর অভিমান ক'রে সে আমায় বিবাহ করেছিল। আমাকে দেহ দিয়েছিল—তার মনের রাজা ছিল নিখিল রায়।

(৮)

সারারাত্রি চক্ষে নিদ্রা এলো না। এলোমেলো আবল-তাবল চিন্তার ঝড়। নিখিল অরুণ সোফী জেকব হেলেন ডেভিড্‌ ফ্রয়েড্‌ বাৎসায়ন মস্তিষ্কের মধ্যে আমার অনুভূতিকেনিয়ে মল্ল-যুদ্ধ করতে লাগলো।

বুধবার কোনো প্রকারে কোর্টে দিনের কর্ত্তব্য পালন কর্ল্লাম। পাঁচটার সময় হেলেন আরাকীর গৃহে উপস্থিত হ'লাম।

সোফী ছিল না।

হেলেন হেঁসে বল্লে—সুবোধবাবু আজ কি মক্কেলের জন্য আসবাব ভাড়া করতে এসেছেন?

আমি অপ্রস্তুত হ'লাম। সে বল্লে—সেদিনে বল্লেই পারতেন।

এবার হাঁসলাম। বল্লাম—হেরে গেছি। মিসেস আরাকী এমন চিঠি লিখলেন কেন? মিঃ অরুণ রায় ভয়ে শুকিয়ে গেছে।

সে বল্লে—প্রথম দিনই জেনেছিলাম, অরুণ আপনার আশ্রয় নিয়েছে। তার পিতার পুরাতন বন্ধু।

আমি বল্লাম—সেদিন জানতাম না—অরুণ নিখিল রায়ের পুত্র। পরে জেনেছি। কিন্তু মিসেস আরাকী, সে আপনার পুত্র-স্থানীয়। যদি চিঠির কথায় কোনো সত্য না থাকে—

সে বললে—না সে সোফীকে বিবাহ কর্ত্তে প্রতিশ্রুত নয়।

তারপর একটু কঠোর স্বরে বললে—তার জননীর মত সে অবমানিতা না হয়, সে বিষয় আমি লক্ষ্য রাখি।

তার জননী কারো কাছে অবমানিতা হ'য়েছিল তা তো জানতাম না। তার পিতার প্রেম উপেক্ষা ক'রে হেলেন ডেভিড্‌কে বিবাহ করেছিল—সেই কথাই জানতাম। আমার উক্তরূপ মনোভাব নিবেদন করলাম।

এবার হেলেনের উদাসীন কটাক্ষ দৃঢ় হ'ল। সে বললে—হেলেন হ্যারিসন নিখিল রায়ের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেনি। সে পদাঘাত করেছিল তার প্রস্তাব—বিবাহ না ক'রে তার বার-বিলাসিনী হ'য়ে থাক্‌বার। আর—

সে স্থির হ'ল। পিঞ্জরের কাকাতুয়া বললে—সিট্‌ ডাউন, সিট্‌ ডাউন।

সে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বললে সকলের চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আমার জননীর য়িহুদী-বিদ্বেষ খৃষ্টীয় সংসারের কুমারীকে ঐ রকম ঘৃণিত জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করছিল।

আমি বললাম—মাপ কর মিসেস আরাকী, তোমার নিজের কথা শুনে লাভ নাই। বলছিলাম মিঃ নিখিল রায়ের পুত্রের কথা।

—আমার নিজের কথা না বললে তো বুঝতে পারবে ন সুবোধ—মানে মিঃ দত্ত—

আমি বললাম—আমাকে সুবোধ বল তাতে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।

—বলছিলাম আমার কথা না বললে—অরুণের কথ বুঝবে না। জান সুবোধ, তার মৃত্যুর ছ'মাস পূর্ব্বে নিখিল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্ষমা চেয়েছিল। আমি পতি কন্যা আর তার পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকি আর তাকে ক্ষম

করি—জগদীশ্বরের কাছে এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেছিল। তার পুত্র—অর্থাৎ জেকব—

সে আমার মুখের দিকে তাকালে। তার পর আবার শান্তভাবে বললে—হ্যাঁ জেকব তার পুত্র। শয়তান ডেভিড বোধ হয় সন্দেহ করেছিল—তাই সর্ব্বনাশের মুখ থেকে তাকে রক্ষা করেনি। সে যখন জেলে গেল—শয়তান ডেভিডের দোষে—তখন তারও শান্তি নষ্ট করবার জন্য তার কাছে জেকবের পিতৃ-পরিচয় দিলাম।

আমি বললাম—হ্যাঁ। হুঁ! তোমার নিখিলের প্রতি ভালবাসা, ছাই চাপা আগুনের মত ছিল বুঝছি। তবে তার পুত্র—

এবার সে হেসে বললে—এর পরও ভাবছ আমি তার পুত্রকে নিগ্রহ করবার জন্য চিঠি দিচ্ছি?

আমি বিস্ময় গোপন করলাম না। বললাম হেলেন আইন জানি, আর মনে গর্ব্ব আছে তার সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্র কতকটা বুঝি। কিন্তু ভয় দেখিয়ে পত্র দিয়ে পুরাতন বন্ধুর—

সে বাধা দিয়ে বললে—মৃত স্বামীর বল। শুনবে?

স্ত্রীলোকটা পাগল নাকি? আমি ফ্রয়েডের দর্শনের সার জানি। তার সকল তথ্য অবিদিত। এ আচরণ বিচিত্র।

বললাম—শুনব। হেলেন, আমার বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতার তুমি অতীত।

সে বললে—সুবোধ, তুমি ঘরে প্রিয়জনের চিত্র রাখো না? ও ছেলেটা যে তার প্রতিচ্ছবি। সোফীর রূপের লোভ তাকে মুগ্ধ করেনি। ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে আমার কাছে আসবে। তাকে পুত্রের মত যত্ন করব, আদর করব, ব্যর্থ জীবনের সাধ মেটাব এই বার্দ্ধক্যে মাতৃস্নেহের প্রসারে।

তার পর সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো।

কাকাতুয়া বললে—সিট্ ডাউন, সিট্ ডাউন, সিট্ ডাউন।

সে আমার হাত ধরলে বললে—সুবোধ, একবার উপকার ক'রে আমার অপকার করেছ—এবার এই পুত্র দান করে আমার মাতৃত্বকে তৃপ্ত কর।

তাকে বোঝালাম। যদি ঘুণাক্ষরে সে তার পিতার রহস্য-কথা জান্‌তে পারে, তার পিতৃ-ভক্তি চোট্ খাবে।

সে ভাবলে। বললে—সে কথা বিদিত আমি আর ডেভিড্। ছেলে জানবে কেমন করে?

আমি বললাম—না জান্‌লে সোফীর মন যাবে তার দিকে—আর ঋষি হ'লেও সোফীর প্রতি তাকে আকৃষ্ট হ'তেই হ'বে। ব্যাপার কত জটিল হবে ভাব তো।

সে দু মিনিট ভাবলে। তার পর ঘরে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা বাক্সে এক কণ্ঠহার আনলে। আর একখানা পত্র।

বললে—এ মতির মালা তার বাপের। ফেরত দিতে পারি?

আমি তার পাগলামির উত্তর না দিয়ে পত্র পড়লাম।

প্রিয় পুত্র অরুণ,

তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তুমি আমার পুত্রের মত। সোফী তোমার ভগ্নি। আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই কণ্ঠহার পাঠালাম। তোমার বিবাহ হ'লে আমার পুত্রবধূকে দিও।

আমার পুরাতন শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ সুবোধ দত্ত আমায় একখানা টাইপ করা জাল চিঠি দেখিয়েছে। তোমার কোনো বন্ধু রসিকতা করে তোমাকে ওরকম পত্র দিয়েছে। তাদের জানা উচিত ছিল ভাই-বোনকে নিয়ে ওরকম রসিকতা নীচ। যদি লেখককে ধরতে পার, সুবোধবাবুর কাছে হাজির কোরো। তিনি তার কান মলে দেবেন।

তোমার জননীকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তোমার জননী
হেলেন

বিচিত্র নারী চরিত্র!

আমি বললাম—তুমি পাগল। তোমার হাতের লেখা দেখে যে সে চিঠির সহি ধরবে।

সে বললে—আমি নারী। উকীল নই। সে পত্র অপরকে দিয়ে সহি করিয়েছিলাম—অবশ্য পত্রের ছাপা অংশ না দেখিয়ে।

পদে পদে স্ত্রীলোক আমাকে পরাজিত করিল। আমার অসূয়া বাড়লো।

বললাম—লেখককে ধরতে পারলে সুবোধকে কি করবার অধিকার দিয়েছ জান।

সে আমার হাত ধরে নিজের কান স্পর্শ করালে।

জাপান

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(৩)

জাপানের সঙ্গে বাংলার রক্তের সম্বন্ধের কথাটা রহস্য মনে করে’ ঠিক হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। এই দুই জাতির চাল-চলন, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক রীতি-নীতির মধ্যে আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে। বাংলা দেশে পাড়াগাঁয়ে গরীব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরে শীতকালে আজও আগুনের মালসা ব্যবহার করতে দেখা যায়। জাপানেও অধিকাংশ লোকে এই আগুনের মালসা ব্যবহার করে’ থাকে—তার নাম ‘হিবাচি’। তবে, বাংলাদেশের মালসাগুলি মাটীর এবং তা’তে পোড়ানো হয় তুষ, কিন্তু জাপানের মালসাগুলি সাধারণতঃ প্রোসিলেনের এবং তা’তে পোড়ে কাঠ কয়লা।

পারিবারিক জীবন

বাঙ্গালীদের মতই ভাত, তরকারি ও মাছ জাপানীদের সাধারণ খাদ্য এবং খাদ্যদ্রব্য দেবতাকে উৎসর্গ করে’ খাওয়ার প্রথাটা বাঙ্গলাদেশে অচল হ’য়ে উঠ্‌লেও জাপানে এখনও সচল আছে—এমন কি খৃষ্টানদের ভিতরেও।

পা মুড়ে’ বসার অভ্যাসটা শুধু বাঙ্গালী ও জাপানী কেন, প্রাচ্যের একটা সনাতন রীতি। সুয়েজ থেকে আরম্ভ করে’ প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এই স্বভাব প্রভাব বিস্তার করে’ আছে আবহমান কাল থেকে। বোধ হয়, জগতের সর্ব্বত্রই একদিন এমনই পা মুড়ে’ বসার অভ্যাস ছিল। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যদেশবাসীরা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের এ অভ্যাসটাকে বদ্‌লে দিয়েছেন। কিন্তু কোন কিছু একেবারে বর্জ্জন করা প্রাচ্যের প্রকৃতি নয়, তাই সে এখনও তাকে বজায় রেখেছে অতি কষ্টে, অতি সাবধানে।

চেয়ার-টেবিল সোফা-কৌচের সঙ্গে আমাদের সনাতন ফরাস-তাকিয়া বে-মানান হয়েও এখনও বেঁচে আছে; জাপানের মাদুরের মেজের সঙ্গেও সে মিতালি করে' নিয়েছে।

মনে হয়, এই পা মুড়ে' বসার অভ্যাসের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃতির একটা বেশ যোগসূত্র আছে। পাশ্চাত্যের লোকের চলা, ফেরা, কথাবার্ত্তা এবং তাদের কর্ম্মপদ্ধতিতে যেমন একটা চঞ্চলতার, একটা অধৈর্য্যের ছাপ আছে, প্রাচ্যের তা' নাই। তার কারণ বোধহয় এই চেয়ারে বসা ও পা মুড়ে বসার অভ্যাস। এই অভ্যাস প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের শুধু জীবন-যাত্রা নয়, তাদের চিন্তা, কল্পনা, শিল্প, সাহিত্য এমন কি ব্যক্তিত্বকে পর্য্যন্ত বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। মনে হয়, প্রাচ্যের লোকের আত্মসংযম এবং আত্মপ্রকাশ—মনের ভাব গোপন-রাখা এবং সহসা তা'কে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রকাশ করার স্বভাব এই পা মুড়ে' বসার ফল। প্রাচ্যের লোক একবার বসে' পড়্‌লে আর সহজে উঠ্‌তে চায় না, কিন্তু যখন সে উঠে দাঁড়ায়, তখন তার মুখে থাকে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, চোখে থাকে শক্তির জ্যোতি। একেই বলে প্রাচ্য এবং এই জাপান।

আদিম অধিবাসী

সহজ সরল জীবন-যাপন জাপানী চরিত্রের বিশেষত্ব। এ বৈশিষ্ট্য প্রাচ্যের। অতিরিক্ত বেশভূষা, নিজেকে জাহির কর্‌বার একটা অতিরিক্ত চেষ্টা প্রাচ্যের প্রকৃতি নয়—জাপানীরাও তা' করে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতরে কখনও তারা নিজেকে জোর করে' নিক্ষেপ করে না, আত্ম-প্রতিষ্ঠার অতি আগ্রহে সমাজ জীবনের সুশান্ত সমতাকে তারা ব্যাহত করে না। নিজেকে তারা সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলে, জীবনের সহজ গতির সঙ্গে তা'রা স্বচ্ছন্দে অপরিজ্ঞাতভাবে মিশে যায়। একেই বলে প্রাচ্য এবং এই জাপান।

গম্ভীর প্রকৃতি জাপানী, তার চোখে মুখে সর্ব্বদাই আছে একটা নিষ্ঠার, একটা আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। সে জানে, এমন সময় তার একদিন আস্‌তে পারে, যখন নিজের জন্য চিন্তা কর্‌বার তার এতটুকু অবসর মিল্‌বে না, একদিন অবলীলাক্রমে নিজেকে তার উৎসর্গ কর্‌তে হবে। একেই বলে 'বুশিডো' (শৌর্য্য)—ধাপ্পা নয়, চালাকি নয়, কথার মারপ্যাচ নয়—সত্য সত্যই একদিন হয় তো নিজেকে তার বলি দিতে হবে। দুর্ব্বল শত্রুকে সে করে না ঘৃণা, প্রবলকে সে করে না ভয়। একেই বলে প্রাচ্য—এবং এই জাপান।

জাপানীদের ব্যবহার দেখলে মনে হবে, স্ত্রীজাতিকে তা'রা তত বড় করে' তোলেনি যেমন করেছে পাশ্চাত্যে। নারীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ দেখানো সুনীতির পরিচায়ক নয়। পরিবারের অপর সকলে যে স্নেহ যে ভালোবাসা লাভ করে, তারাও পায় তেম্‌নি। তার চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়। নারী বা Sexএর দাস হওয়া তারা অপৌরুষ মনে করে। যদিই কখনও এ দুর্ব্বলতা তার আসে, প্রেয়সীর একটিবার মাত্র দর্শনের জন্য সত্যই যদি সে কাতর হয়ে ওঠে, দোহাই ধর্ম্মের, কাউকে সে তা' জান্‌তে দেবে না। লোকে জান্‌লে মনে কর্‌বে তাকে স্বার্থপর, মনে কর্‌বে নিজের প্রবৃত্তির সে দাস, মনে কর্‌বে সে দুর্ব্বল, শক্তিহীন। সে জানে, যে-কোন মুহূর্ত্তে হয়তো তার নিজের গলা তাকে নিজে কাট্‌তে হবে, নিজের পেট নিজে ফেঁড়ে তাকে কর্‌তে হবে—'হারাকিরি'! একেই বলে প্রাচ্য এবং এই জাপান!

জাপানের সঙ্গে বাঙ্গালার সবচেয়ে বেশী মিল আছে সামাজিক অনুষ্ঠানে। সকল অনুষ্ঠানের বড় অনুষ্ঠান বিয়ের কথাই ধরা যাক্। ত্রিশ বছর আগে, কন্যা বিবাহযোগ্য হ'লে জাপানী পিতা বাঙ্গালীদের মতই ভয়ানক বিপদগ্র মনে কর্‌ত। বিবাহের অনুষ্ঠান এবং তার পূর্ব্বের ও পরে আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি বড় সহজ ছিল না। সংস্কার পদমর্য্যাদা, এমন কি, কন্যার প্রতি পিতার স্নেহের পরিমা হ'তো এই উৎসবের মাপকাঠিতে। পিতা তাঁর পকেটে

দিকে নজর রেখে মোটামুটি একটা খরচের হিসাব কর্‌তেন, কিন্তু মাতার থাকৃত খুঁটিনাটির দিকে নজর বেশী এবং তার হিসাবটাই শেষটায় দাঁড়া'তো নিখুঁৎ এবং নির্ভুল!

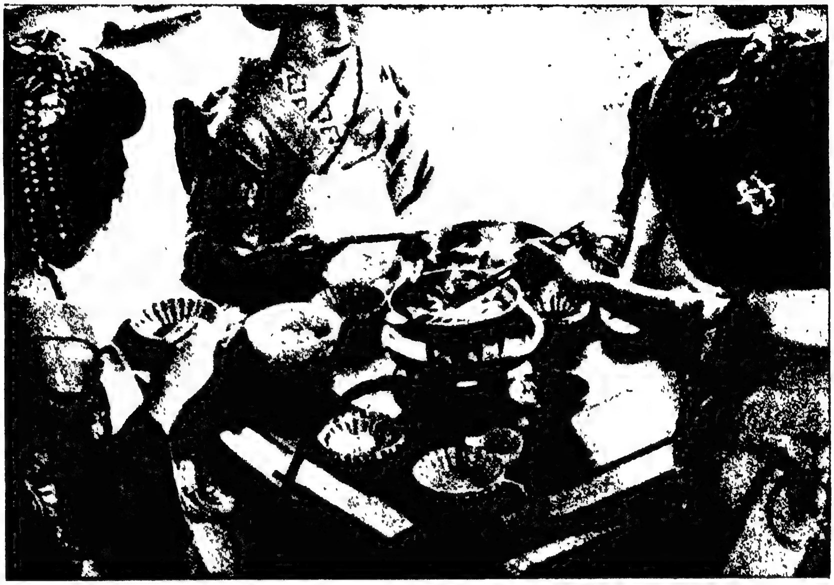

সুকিয়া কি ভোজ

চা-উৎসব

বরসজ্জা এবং যৌতুকতত্ত্বের বহর একটা দেখ্‌বার মত ব্যাপার ছিল। একটা সংসার কর্‌তে গেলে যা' কিছু প্রয়োজন—পিন থেকে পিয়ানো পর্য্যন্ত, সবকিছুই দিতে হ'তো মেয়েকে। নানা রকমের পোষাক পরে' দাস-দাসীরা সে-সব বহন করে' নিয়ে যেতো বরের বাড়ীতে। তারপর ভোজনের ব্যবস্থাও বড় সামান্য নয়। সপ্তাহব্যাপী নিমন্ত্রণের আয়োজন। প্রথম দিন নিকট আত্মীয় হ'তে আরম্ভ করে' শেষদিন চাকর-বাকর প্রভৃতির ভূরিভোজনের ব্যবস্থা! জাপানে একটা কথা ছিল—"তিন মেয়ে যার, লাল বাতি তা'র।" বাঙ্গালা দেশে অবশ্য তিনটির দরকার হয় না, একটিই যথেষ্ট!

তখনকার দিনে, জীবনের এই সবচেয়ে বড় ভূমিকা অভিনয় কর্‌বার সময় কনে'কে বলা হোত—'ফুলকনে'! ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা'কে বসে' থাক্‌তে হোত মাতুরেরমেজের উপর, সাম্‌নে তার নানা রকমের নানা লোক, কিন্তু কারও দিকে সে চাইতে পার্‌বে না—দৃষ্টি তার নিবদ্ধ থাক্‌বে নীচের দিকে! ঝক্‌ঝকে দামী 'ওবি' বুকে তার এত জোরে বাঁধা যে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল করা চল্‌বে না। হয়তো তার তৃষ্ণা পাবে, হয়তো পাবে ক্ষুধা, কিন্তু তার কথাটি কইবার উপায় নাই। তার ভুললে চল্‌বে না যে সে বিয়ের কনে' এবং ভদ্রঘরে তার জন্ম। পুতুলের মতো তাকে বসে' থাক্‌তে হবে একভাবে- শুধু তার অসহায় চক্ষু-দুটি বৃথাই খুঁজে ফিরবে মেজের উপর তার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার আহার। কিন্তু পরদিন সেই 'ফুলকনে' স্থান পাবে সংসারের কণ্টক বনে, সেখানে তাকে বাঁচ্‌তে হবে তার অতি-অনুসন্ধিৎসু, হয়তো বা অতি রুক্ষমেজাজী শ্বশ্রূমাতার দয়ার উপর। কাল রাত্রের ফুটন্ত

ফুল হয়তো রাত্রি প্রভাতেই হয়ে যাবে বিশুষ্ক, বিমলিন—বাঙ্গালা দেশের কনে'দের মতই !

বাঙ্গালা দেশের মতই জাপানেও ছিল ঘটক—পাকাপোক্ত ব্যবসাদার, ঘটকালি ছিল তাদের বেশ লাভের ব্যবসা। বিয়ের আগে বর ক'নের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হ'তো না। উভয়ের ফটোর আদান-প্রদান হ'তো, রীতিমত রিটাচ্ করা ফটো, আসল চেহারার সঙ্গে খুব-একটা মিল থাকার আবশ্যক ছিল না। তারপর 'মিয়াই'—বাঙ্গালা দেশে যাকে আমরা বলি পাকাদেখা এবং রাজপুতানায় বলে—'সাগাই'! অনেক সময় বর ক'নের দূর থেকে দেখা-দেখিরও ব্যবস্থা হ'তো; হয়তো বা কোন রেস্তোরাঁয়, থিয়েটারে, সিনেমায়, রেলষ্টেসনে, পার্কে অথবা চিড়িয়াখানার বানরের ঘরের বিপরীত দিক থেকে দুটি তরুণ-তরুণী উভয়ের মাঝখানের লালমুখো জানোয়ারগুলির দন্তবিকাশের দিকে একেবারেই লক্ষ্য না করে' পরস্পরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত! কোন কার্টুনিষ্ট সেখানে উপস্থিত থাক্লে তার ছবি-আঁকার বড় সুবর্ণ সুযোগই সে লাভ করত!

সহবৎ শিক্ষা

এখন আর সেদিন নাই। বিবাহের বিস্তারিত তালিকা এখন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সংস্কারের কঠিন খোলস ছেড়ে যারা এখনও বাইরে বেরিয়ে আস্তে পারেনি, এক তাদের ভিতর ছাড়া বিবাহের শোভাযাত্রা এখন আর দেখ্তে পাওয়া যায় না। ভূরিভোজনের আয়োজনও এখন আর নাই। 'লোকে কি বল্বে'—এই সনাতন ভয় চিন্তাশীল সাহসী জাপানীর আধুনিকতাকে এখন আর সন্ত্রস্ত কর্তে পারে না। নবীন জাপান বিবাহ-ব্যাপারে অনুষ্ঠানের চেয়ে কর্ত্তব্যকেই এখন বড় করে' দেখ্তে শিখেছে। ঘটক মহাশয়েরা চিরবিদায় নিয়েছেন এবং তার পরিবর্ত্তে ঘটক-আফিস ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মারফৎ এবং বরকনে'র পরস্পরের পছন্দে বিবাহই বেশী প্রচলিত হয়ে উঠেছে। স্বাধীন বিবাহ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং মনে হয়, জাপানের চিরাচরিত গার্হস্থ্যপ্রথা ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে পাশ্চাত্যের ব্যক্তিতন্ত্রতা প্রসারলাভ কর্ছে। তবে, একথা ঠিক যে জাপানের বিবাহপ্রথা আগেকার আড়ম্বর ও রং-তামাসা পরিত্যাগ করে' সুবিবেচনার সঙ্গে সংসারের জটিল সমস্যার সমাধানের পথে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে!

সাধারণ গৃহস্থঘরে বিয়ের খরচা এখন আর তিনচার শত টাকার বেশী নয়। তা'ছাড়া বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ যা'র যা'র খরচা সেই বহন করে। পিতার সংস্থান না থাক্লে অনেক সময় কন্যাকে চাকরি করেও সে অর্থ সঞ্চয় কর্তে হয়। অত্যন্ত অনাড়ম্বরেই বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হয় এবং একদিন কোন হোটেলে একটা ডিনার-পার্টির ব্যবস্থা করেই হয় সমস্ত ব্যাপারের সমাপ্তি। এর সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা কর্তে যাওয়া বিড়ম্বনা! আমাদের আধুনিকতা শুধু বাইরের চা'লচলনে, ঘরের ভিতর তা' প্রবেশ করেনি।

স্বামী-সেবায় জাপানী মেয়েরা আমাদের দেশের যে কোন পতিপরায়ণাকে হার মানাতে পারে। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত স্বামীকে কল্পিত ও অকল্পিত সহস্র অভাব অভিযোগের জন্য বিব্রত না করে' তা'রা তা'কে সেবায়, যত্নে, আদরে, আপ্যায়নে, প্রেমে, আন্তরিকতায় আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে। ভারতের হিন্দুনারীর পুরাকালের পাদ্য-অর্ঘ্য এদেশ থেকে চলে গেছে, কিন্তু জাপানে তা' রূপান্তরিত হ'য়ে আছে জাপানী নারীদের ঐকান্তিক পতিসেবায়। স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা তারা করে থাকে। এমন কি, মদ্যপায়ী উন্মার্গগামী স্বামীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে তারা পুরুষের অতি সাধারণ দুর্ব্বলতা বলে' ক্ষমা করে,—তা'কে অসম্ভব রকম বড় করে' তুলে' সাংসারিক জীবনকে তারা বিষময় করে না। অথচ, তাদের Civil marriage আছে, ডাইভোর্স আছে, ইচ্ছা কর্লে নাকের বদলে নরুণ লাভের ব্যবস্থা তা'রা অতি সহজেই কর্তে পারে। এত সুযোগ থাক্তেও কেন যে তা'রা অতখানি সহ্য করে, প্রাচ্যের পক্ষে তা' বোঝা বিশেষ দুষ্কর নয়, কিন্তু পাশ্চাত্যের লোকে হয়তো

এর হদিস্ খুঁজে পাবে না। ব্যক্তির চেয়ে যে পরিবার বড়, পরিবারের চেয়ে যে সমাজ বড়, একথা বুঝ্তে স্বার্থপর অসহিষ্ণু পাশ্চাত্যের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সেই জন্যই পিতাপুত্রের সম্বন্ধে সেখানে স্বার্থ-কলুষিত, আত্মীয়তা সঙ্কুচিত, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সন্দেহ-দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত।

জাপানের নর-নারীকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, যাঁরা বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশে বা টাকার সুদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; দ্বিতীয়তঃ চাকুরিজীবী, তৃতীয়তঃ দোকানদার ও কুটীরশিল্পের অধিকারী, চতুর্থতঃ শ্রমিক সম্প্রদায় এবং পঞ্চম—বিবিধ। বেশীর ভাগ লোকই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অর্থাৎ চাকুরিজীবী। তাদের জীবনের দিকে দিকে দৃষ্টি দিলেই জাপানের সাধারণ জীবন-যাপন প্রণালী অনেকটা বোঝা যেতে পারে।

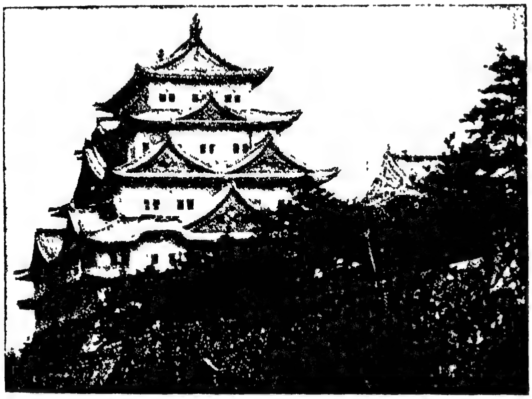

নাগোয়া দুর্গ

জাপানে চাকুরিজীবীর সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। বেশীর ভাগ তরুণ-তরুণী বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে মাস-মাইনের কথাটাই প্রথম ভাবে—পরিমাণ তা'র যা-ই হোক্ না কেন! প্রতি বৎসর বড় বড় সওদাগরি আফিসে, ব্যাঙ্কে হাজারে হাজারে দরখাস্ত করে, কিন্তু চাকরি পায় মাত্র কয়েকজন। কেহ-বা বিদেশী আফিসে গিয়ে আশ্রয় নেয়—কিন্তু বেশীদিন সেখানে তা'রা টিকে থাকতে পারে না। মহাযুদ্ধের আগে ইংলণ্ডের নাম ছিল 'দোকানদারের দেশ'। ভবিষ্যতের জাপান মনে হয়, কেরাণীর দেশ হ'য়ে পড়্বে। ব্যক্তিগত ব্যবসায় জাপানে ক্রমশঃই অচল হ'য়ে উঠ্বে।

জাপানের কেরাণীরা মাসে ত্রিশ থেকে দেড়শ'র ভিতর যা' হোক্ একটা কিছু মাহিনা পায়। যে কাজেই সে থাকুক্, কোথায়ও সে বেখাপ্পা নয়, মোটের উপর ভালো ভাবেই তার কাজ সে করে' যায়। মস্ত বড় একটা বাহাদুরও সে নয়, অথবা একেবারে অপদার্থও নয়। রবিবার ছাড়া অন্যদিন অতি প্রত্যুষে সে কাজে বার হয় এবং কাজ শেষ না করে' আফিস থেকে বেরোয় না। তা'তে যদি আফিস বন্ধ হওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের চেয়েও বেশী তাকে থাক্তে হয়, তা'তে তার আপত্তি নাই। পাঁচ্টা বাজ্বার আগে থেকেই ঘড়ির দিকে তাকানোর অভ্যাস তার নাই, অথবা আফিসের চেয়ারে চাদর বেঁধে চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা দেওয়ার চালাকি সে করে না। বিশ পঁচিশ বছর এইভাবে ঘানি ঠেলার পর হয়তো সে আফিসের কর্ম্মকর্ত্তাদের ভিতর একজন হ'তে পার্বে, অথবা পার্বে না। মামার জোর বা উপর থেকে দড়ি টান্বার লোক তার নাই। তাকে নির্ভর করতে হবে—নিজের শক্তির উপর, নিজের কর্ম্মকুশলতার উপর! মনে মনে সে আন্দাজ করে যে পঞ্চান্ন বছরে সে নিতে পার্বে অবসর। হয়তো সে সময় তার বিশ্বস্ত এবং একনিষ্ঠ কর্ম্মের পুরস্কার-স্বরূপ আফিস থেকে তাকে দেওয়া হবে একটা সোনার কাপ্ অথবা একটা মোটা টাকার চেক্। বাঙ্গালার কেরাণীদের সঙ্গে এইখানেই এদের তফাৎ।

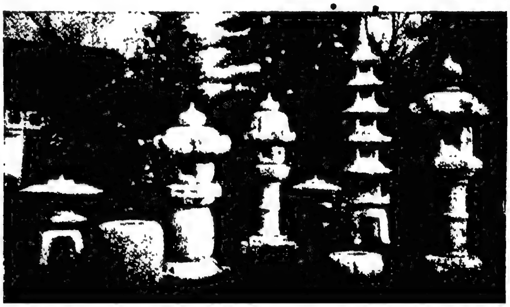

পাথরের দীপস্তম্ভ

পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বছর বয়সে দেহের কিঞ্চিৎ স্থূলত্ব ছাড়া, তাকে প্রৌঢ় বল্বার আর কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মেজাজ তার থাকে খুশী, প্রকৃতি থাকে স্ফূর্ত্তিবাজ। আমাদের দেশের কেরাণীর মতো কোমর ভেঙ্গে, কুঁজো হয়ে, দারিদ্র্য ও অবসাদের পূর্ণ প্রতীক হ'য়ে বিশ্বের সমস্ত

কিছুর উপর একটা দারুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে সে জীবন্মৃত হ'য়ে থাকে না!

অন্যান্য দেশে সাধারণ লোকের যে টাইপ্ দেখ্তে পাওয়া যায়, জাপানেও তার চেয়ে বেশী তফাৎ নয়। সকালবেলায় ভাত-তরকারি কোন রকমে গিলে নিয়ে ঠিক আটটার সময় তাকে কাজে বেরোতে হয়। বাড়ীতে থাকে কর্ম্মনিপুণা স্ত্রী, হয়তো-বা দু-একটি ছেলেপিলে। স্ত্রী তার সচিব ও সখী, হয়তো-বা কোন মেয়ে-স্কুলের গ্রাজুয়েট। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে' যথাসম্ভব কম খরচায় সে সংসার চালায়। অন্যান্য আধুনিক মেয়েদের মতো সেও পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করে। কিন্তু, মুস্কিল এই যে সিল্কের কিমনোর পরে অনুরাগ তার একেবারে যায়নি। অথচ বিদেশীরা কিমনোকে যত সস্তা মনে করেন, ঠিক তত সস্তা তা' নয়। তা' ছাড়া প্রতি ঋতুতে তার রকম বদলায়। অথচ সরকারী বাজেটের মতো গৃহস্থালীর বাজেটকে টেনে লম্বা করা সম্ভব হয় না।

স্ত্রীর চেয়ে হয়তো ছোট্ট ছেলেটি তার বেশী আব্দেরে। সংসারের আর্থিক অবস্থার বিচার না করেই হয়তো সে বেচারী আব্দার নেয় একটি বড় পুতুলের জন্য। লোকটি অপেক্ষা করে, কবে কোন বড় দোকানে 'সেল' হবে, যেখানে শতকরা ৫০ টাকা সস্তায় জিনিস পাওয়া যাবে। একদিন আফিস যাওয়ার মুখে হয়তো সে ঢুকে পড়্বে এম্নি একটা দোকানে, যেখানে সস্তার মোহে তার মতো বহু খরিদ্দার এসে ভিড় কর্বে। সে ভিড় থেকে মুক্ত হয়ে আস্তে তার আফিসে পৌছতে হবে দেরী। সেখানে বড়কর্ত্তার মিষ্টি মধুর বচন তার ছেলের মুখের হাসির কল্পনাকে পর্য্যন্ত হয়তো আড়ষ্ট করে' দেবে!

টোকিও রাজপ্রাসাদের একাংশ

তারপর নারী। জাপানের নারীদের অধিকাংশই এখনও পর্য্যন্ত পুরাতন সংস্কারের প্রভাব হ'তে মুক্ত হতে পারেনি—যদিও তা'রা পাশ্চাত্যের পোষাক-পরিচ্ছদ কায়দা-করণ অনেক স্থলে গ্রহণ করেছে। চাল-চলনের নম্রতা তারা অতি প্রাচীন যুগ হ'তে পেয়ে এসেছে তাদের পূর্ব্বপুরুষের কাছ থেকে। তাদের ব্যবহারের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম-কানুন আছে, যা' অতি সহজেই বিদেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আদব-কায়দার বহর এত বেশী এবং এত জটিল যে সে-সব পূরা দস্তর অভ্যাস কর্তে মেয়েদের অনেক বছর কেটে যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ মেয়েরা মোটামুটি কতকগুলি শিখে রাখে, যা প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় তাদের অনবরতই দরকারে লাগে। কি ভাবে দাঁড়াতে হয়, কি ভাবে চল্তে হয়, কি ভাবে অভিবাদন কর্তে হয়, সে সময় হাত দুটো কি অবস্থায় কোথায় থাক্বে, শরীরের উপর ভাগ সোজা রেখে কি করে' মাথা নোয়া'তে হয়, সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোককেই তা' অভ্যাস কর্তে হয় ছেলেবেলা থেকে। জাপানী মেয়েরা অনেকটা পা ঘস্ড়ে চলে, কেননা লম্বা পা ফেলে চলা কিংবা পা বেশী উঁচু করে' ফেলা তাদের কাছে অসভ্যতা বলে' গণ্য হয়।

দরজা খোলা ও বন্ধ করবার আদবকায়দাও বড় সহজ নয়। তারপর ফুল-সাজানোর কায়দা, চা-উৎসবের অনুষ্ঠান দেখ্লে জাপানী কায়দাকরণকে অনেকটা Mathematical বলে' মনে হবে। কিন্তু তার যে কমনীয়তা ও মাত্রাজ্ঞান আছে, তা' অস্বীকার করা চলে না। এই সমস্ত কায়দা অভ্যাস করা এত শক্ত যে স্কুলে পর্য্যন্ত এগুলি শেখানোর

ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক মেয়ে-স্কুলে কায়দাকরণের সমস্ত খুঁটিনাটি সযত্নে শিক্ষা দেওয়া হয়। তা'ছাড়া পৃথক এটিকেট-স্কুল তো আছেই।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়েরা নামমাত্র বেতনে অপরের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ নেয়, কেবলমাত্র গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম শেখ্‌বার জন্য। এতে তারা অপমান বোধ করে না। অধিকাংশ গৃহস্থ ঘরে অবশ্য ঝি-রূপী এই অশান্তির বীজের বালাই নাই। গৃহিণীর যে অপরের সাহায্যের আবশ্যক করে না, তা' নয়। রান্না, বাসন-মাজা, ঘরদোর পরিস্কার রাখা, এমন কি পায়খানা সাফ্ পর্য্যন্ত গৃহিণীকে কর্‌তে হয়, কেন না জাপানে মেথর বলে' কোন আলাদা শ্রেণী নাই। ভোর ছ'টায় উঠে প্রতিদিন—কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল ঋতুতেই তাকে রান্না কর্‌তে হয়, খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলের জলখাবার তৈরী করে' তাদের স্কুলে পাঠিয়ে, স্বামীর আফিসে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে' সংসারের সহস্র রকমের খুঁটিনাটি তাকেই কর্‌তে হয়। ঘর বারান্দা মেজে-ঘসে আয়নার মতো ঝক্‌ঝকে না করা পর্য্যন্ত তার তৃপ্তি হয় না। তারপর নিজের খাওয়া শেষ হ'লে কিছু সময় সে পায় এবং এই সময়টুকু সে ব্যয় করে সেলাইয়ের কাজে, বোনার কাজে, কাপড়-চোপড়ে সাবান দিয়ে, হয়তো বা হাট-বাজার করে' কিংবা কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে'। যা-ই করুক্ এবং যেখানেই যাক্, ঠিক সময়ে ফিরে এসে স্বামী-পুত্রের প্রত্যাগমন সে প্রতীক্ষা করে; নিজের হাতে তাদের রাত্রের খাবার সে প্রস্তুত করে। স্বামীপুত্রকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানো জাপানী নারীরা তাদের বিশেষ অধিকার বলে' মনে করে, ঝি-চাকরের হাতে কখনই এ কাজটির ভার তা'রা ছেড়ে দেয় না।

মেয়েদের পুতুল উৎসব

গৃহিণী হিসাবে জাপানী নারীর তুলনা নাই। তা'রা যেন রোজগার, মিতব্যয় এবং সঞ্চয়ের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তাদের কর্ত্তব্য অতি দক্ষতার সঙ্গেই তা'রা পালন করে। এই সব কাজের বহর দেখে অনেকে তাদের হয়তো দাসী বলেই মনে কর্‌বে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা'রা রাণী। রান্নাঘরের রাজ-তক্তে বসে' বেশ নিপুণভাবেই তা'রা তাদের রাজদণ্ড চালনা করে।

ভোজনরতা

জাপানের শ্রমিক নারীদের অবস্থা একটু বিচিত্র রকমের। শ্রেণী হিসাবে তাদের ঠিক শ্রমিক বলা চলে না। কারণ,

পেশা হিসাবে তারা যে কাজ গ্রহণ করে, তা'তে উন্নতি কর্‌বার, নাম কর্‌বার স্পৃহা তাদের যেন একটু কমই দেখা যায়। অধিকাংশই যেন শুধু বসে' না থেকে বেগার খাট্‌বার জন্যই কাজ করে। কাজ করে, যতদিন না মেলে তাদের জীবনের দোসর।

বিবাহ ব্যাপারটা জাপানে আগে ছিল পারিবারিক সমস্যা, এখন ব্যক্তিগত সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক জাপান এ সম্বন্ধে এমন সজাগ, এমন সতর্ক হ'য়ে উঠেছে এবং তাদের মতামত এমন অকুণ্ঠ ভাবেই তারা এখন প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে যে বিবাহ ব্যাপারে মা-বাপের অভিমতটা সময় সময় তা'রা অগ্রাহ্য কর্‌তেও দ্বিধা করে না। আধুনিক শিক্ষিতা জাপানী মহিলা এখন নিজের দায়িত্বে নিজের পছন্দমত বিবাহ করতে পারে—অবশ্য করা না-করা স্বতন্ত্র কথা। অনেকসময় এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয় যে জামাতা শ্বশুরবাড়ীর আদর-যত্ন লাভ করে, কিন্তু তার পিতামাতা বধূকে খুব সুনজরে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন, বধূ তাঁদের প্রিয় পুত্রকে ডাকাতি করে কেড়ে নিয়েছে, উড়ে এসে সে জুড়ে বসেছে। ফলে হয় অশান্তির সৃষ্টি। আগেকার দিনের বধূ হয়তো সে অশান্তি চোখ-কাণ বুঁজে সহ্য করা কর্ত্তব্য বলেই মনে কর্‌ত—এখন আর তা' করে না।

সেকাল ও একাল

অনেক পিতামাতাই এই আধুনিকতা পছন্দ করে না, বরং তারা একে কেলেঙ্কারি বলে' মনে করে। তাদের যৌবনকালে প্রণয় ব্যাপারটাকে দুর্নীতি বলেই মনে করা হো'ত। সে-কালের মেয়েদের সাম্‌নে বিয়ের কথা পাড়্‌লে লজ্জায় তাদের মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ত, কিন্তু এখনকার মেয়েরা বিয়ে সম্বন্ধে সোজাসুজি এমন কথাই শুনিয়ে দিতে পারে, যাতে লজ্জায় মা-বাপের মুখই রাঙা হ'য়ে ওঠে।

আজকালকার মেয়েরা বিয়ে সম্বন্ধে অনেক রকমের ধারণাই পোষণ করে। তার কতকগুলি বা যুক্তিপূর্ণ, কতক বা পাগ্‌লামি ভরা, আবার অনেকগুলি একেবারেই হাস্যকর। কেহ-বা বলে, পিতামাতা যে পাত্র ঠিক করেন তাকেই বিয়ে করা উচিত, কেননা সন্তানের মঙ্গলই তাঁদের একমাত্র কাম্য এবং বিচার-বুদ্ধিও তাঁদের পাকা। কাহারও মতে, সারা-জীবন তাকেই যখন লোকটিকে নিয়ে সংসার কর্‌তে হবে, তখন তার মতামতটাই সকলের চেয়ে বড় হওয়া উচিত। কারও মতে ডাক্তারকে বিয়ে করা চলে না, কেননা অপর স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ তাদের অনেক বেশী। কাহারও ধারণা, যার সঙ্গে প্রণয় হয়নি তা'কে বিয়ে করাই চলে না। যেমন করেই হোক, ভালবাসার পাওনা-দেনা সম্বন্ধে আধুনিক জাপানী মেয়েরা বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। বিবাহ-সম্বন্ধে সনাতন ধারণা নতুনের সাম্‌নে ভেঙ্গে-চুরে যাচ্ছে, যদিও অনেক মেয়েই এখনও সে প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হ'তে পারেনি।

গত কয়েক বৎসরে জাপানকে বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। 'সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের ধ্যান-ধারণারও অনেক অদল-বদল হয়েছে। তাই এই সকল সমস্যা সমাধানের কোন ধরা-বাঁধা রাস্তা মেয়েরা এখনও খুঁজে পায়নি—যদিও বিভিন্ন দিক্ দিয়ে তা'রা এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। সেইজন্য তাদের নিজেদের মতামতও একেবারে অবিসংবাদী নয়।

জাপানের নারী তাই শুধু তার নিজের কাছে নয়, সমগ্র দেশের কাছে একটা সমস্যার বস্তু হয়ে পড়েছে। এমন সব জটিল প্রশ্ন তা'দের সম্মুখে এসে পড়েছে, যা'র সমাধান করা সহজ নয়। প্রকৃতি তাদের সাধারণতঃ রক্ষণশীল, ধর্ম্ম বা রীতি-নীতি তাদের অনেকটা সেকেলে ধরণের, গার্হস্থ্য তাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার। সব কিছুর উপরে তা'রা

সুদক্ষ গৃহিণী এবং স্নেহময়ী জননী। তাদের জীবনটাই একটা আত্মোৎসর্গের কাহিনী। তা'রা পরকাল মানে, তাই উজ্জ্বলতর পরকালের জন্য ইহকালকে তা'রা হাস্‌তে হাস্‌তে বলি দিতে জানে। আদর্শ জাপানী রমণী গত যুগের সৃষ্টি —সে আধুনিক নয়। অতীতের সংস্কারকে পুরুষের চেয়ে নারী অধিকতর দৃঢ়ভাবে আঁক্‌ড়ে থাকে। আকস্মিক পরিবর্ত্তন যত মোহময় হোক, তা'রা বরদাস্ত ক'র্‌তে পারে না ; যা'রা করে, তা'দের তা'রা সহ্য কর্‌তে পারে না।

জাপান এখন তা'র প্রগতির চৌরাস্তায় এসে পৌঁছেচে। পঞ্চাশ বছর আগে, শতাব্দীর নিদ্রাভঙ্গে যখন সে জেগে উঠ্‌ল, অবস্থার চক্রে পড়ে' তখন এক নির্দ্দিষ্ট পথে তা'কে চল্‌তে হয়েছিল, নতুবা পাশ্চাত্যের নিষ্পেষণে তা'র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো। তখন তা'র বিবেচনার অবসর ছিল না, বেছে-নেওয়ার উপায় ছিল না ; তখন তাকে বীরের মত অগ্রসর হ'তে হ'য়েছিল পাশ্চাত্যের পথানুসরণ করে' অজ্ঞাত অপরিচিত জাতি-সংসদের তোরণ-দ্বারে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছাড়া তখন তা'র আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। নিজের ইচ্ছামত চল্‌বার শক্তি এখন সে সংগ্রহ করেছে। পাশ্চাত্যের প্রভাবের সম্মুখে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ না করে' এখন সে পিছন ফিরে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছে এবং তা'র অতীতদিনের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার সে চেষ্টা কর্‌ছে।

প্রান্তিক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক

পিছনের ফেলে রাখা উপলেতে কণ্টকিত পথ,
কভু ছিল ছায়া সুনিবিড়,
স্মৃতির ঐশ্বর্য্য বুকে চলিয়াছে জীবনের রথ
অচঞ্চল, কখনো অস্থির।
আজি যাহা স্মৃতি মাত্র অতীতের নহে অবান্তর,
যাহার উষ্ণতা মোর দোল দিয়ে জাগাত অন্তর,
আজি তার শীত বক্ষে নীহারের অশ্রু আলিম্পন
রহে না গোপন ॥

যবনিকা অন্তরালে বাসনার প্রয়াসের ভুল
পিছু টানে অশ্বরশ্মি মোর,
গিরিপথ ভেঙে আসা সরিতের হারা দুই কূল,
মরুভূমে কোথা আঁখি লোর,
ফসল যে এনেছিল উর্ব্বরতা, আজি সে উষর,
রং যেথা লেগেছিল, বৃষ্টিপাত করেছে ধূসর,
শক্র কি আনিছে সাথে জয়মাল্য দিতে মোর গলে —
বিদায়ের ছলে ॥

আজি শুনি প্রান্তে বসি প্রান্তিকের ঘরছাড়া গান,
কম্পমান স্নায়ুতন্ত্রী সুরে,
মোর প্রতি ধমনীতে জীবনের যে দিল সম্মান
সে বাউল প্রান্তরের দূরে।
যেথা মিশে চক্রবালে সন্ধ্যা সনে মাটীর স্বপন,
সেথায় নূতন যাহা আপনাতে রহে সঙ্গোপন,
সন্ধ্যাতারা যাত্রী আজো প্রান্তশেষে শুকতারা আশে
আকুল প্রয়াসে।

কূলছাড়া উপকূলে প্রান্তিকের মহা সিন্ধু পানে
দৃষ্টি মোর রহে অচঞ্চল.
পূরবী এনেছে মোরে মিলনের সাহানার গানে
বঁধু সনে মিলাতে অঞ্চল।
অস্ত গিরির দৃষ্টি রাঙা করে উদয়শিখর,
উদ্বেল সাগর হ'তে জন্ম পাবে নব রবিকর,
তাই শুনি বেলা ভূমে ভৈঁরো সুরে প্রান্তিকের গুরু
করে গান সুরু।

তীর ও তরঙ্গ

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

পাচ

উমেদপুর বাজার হইতে ফিরিবার পথে সুনীল এতক্ষণে ভাবিতে থাকে-- ঝোঁকের মাথায় কাজটা ভাল হইল না। কিন্তু চিরকাল তার ঐ এক স্বভাব। যাহা মনে হইবে— একবার যাহা করণীয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা তখনি শেষ করিয়া ফেলিতে যেন রুখিয়া ওঠে। তাহার জীবনের ধারা চলে আবেগের ঢেউ-এ ঢেউ-এ। তাহা না হয় চলিল। কিন্তু কাগজে জড়ানো কাপড়ের এই বাণ্ডিলটা লইয়া বাড়ী ঢুকিতে গেলে মার চোখে যদি পড়ে? মা জানেন, ছেলে তাঁহার দত্তবাড়ী পূজার ওখানে। অণিমাদের ঘরে বাণ্ডিলটা এ-বেলার মত রাখা যায় না? না। মাতাপুত্রের ছলনার খেলাটা বুদ্ধিমতী অণিমা টের পাইবে। একটা উপায় আছে বটে। নন্দ দাসের বাড়ী গিয়া সুন্দর বৌদির কাছে ঘণ্টা কয়েকের জন্য বাণ্ডিলটা রাখিবে। কিন্তু নন্দদাসের বৌএর কাছে আসল ব্যাপার তবে আরও রঙ-ফোড়ন লইয়া দেখা দিবে। অণিমাকে দুদিন বাদে এই নকসা-পেড়ে শাড়ীখানি পরিতে দেখিয়া হিংসায় সুন্দর-বৌদি পাড়ায় পাড়ায় মুখে বিষ ছড়াইয়া ফিরিবে নিঃসন্দেহ। বিশেষ করিয়া, নন্দর বড় মেয়ে দুটি এবার পূজায় কাপড় পায় নাই।—ঐ যে নন্দ দাসই অদূরে সশরীরে হাজির।

"এই যে বাদল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তোমার অপেক্ষায় বসে বসে এই উঠে আস্‌ছি। হাতে ও কিসের বাণ্ডিল?"

সে-কথার জবাব না দিয়া সুনীল চটপট প্রশ্ন করে, "নন্দ, ঠাকুরদা বাড়ী?"

"না।"

"মা?"

"তিনি আর কোথায় যাবেন?"

"না-না। এই—হ্যা—মা কি বাইরের ঘরে?—কী করছে দেখ্‌লে?"

নন্দর দৃষ্টি ঐ কাপড়ের বাণ্ডিলের দিকে। জবাব দিল, "তিনিই তো বললেন, খোকা দত্তবাড়ী গেছে। আমি বললাম, কখখনো নয়—এই আমি বরাবর সেখান থেকেই আস্‌ছি।"

"মা তবে বাইরের ঘরে নেই, না নন্দদা?"

"না, বড় ঘরে। আমি বললাম, বাদল তবে চৌধুরীদের-—"

"আচ্ছা, আমি যাই" বলিয়াই সুনীল তাহার পাশ কাটাইয়া খসিয়া পড়ে। নন্দ অবাক হইয়া পিছনে ডাকে, "আমি যে তোমার কাছেই এসেছিলাম ভাই।"

সুনীল পশ্চাতে না তাকাইয়াই জবাব দেয়, "দত্তবাড়ী দেখা হবে। আমি আর ঘণ্টাখানেক বাদেই যাচ্ছি।"

সুনীল সন্তর্পণে বাহিরের ঘরে ঢুকিল। দেখে নাই কেহ। ধারে কাছে কেহ নাই। শুধু নীলু বাবলু আর পাড়ার দু'চারটি ছেলে-মেয়ে উঠানের ওপাশে বসিয়া কি এক জটলা লইয়া ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি কাপড় ক'খানা সুটকেসের মধ্যে রাখিয়া দিয়া সুনীল বিছানায় আসিয়া সটান শুইয়া পড়ে। এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে এতক্ষণে— যেন এক মস্ত বড় ফাঁড়া কাটিয়া গেল এইমাত্র। তার লজ্জার সাক্ষী কেহ উপস্থিত নাই। তবু, কোথায় যেন একটু খচ করিয়া বিঁধে।···

শুইয়া শুইয়া সুনীল নিজের এই হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততার কথাটাই ভাবিতে থাকে। চিরকালই তার এমনধারা অসহিষ্ণু স্বভাব। তর সয় না একেবারে। তবু, মনে মনে আত্মপ্রসাদ, পূজার দিনে একটা অবশ্য করণীয় কাজ শেষ করিয়া আসিয়াছে। একটুখানি ছলনার ফাঁক থাকে তো থাকুক না। তাতে কি আর এমন আসে যায়! কর্ত্তব্য জিনিষটা একেবারে নিঃস্বার্থ হইবে এমন শক্ত নীতির কোন অর্থ হয় না। তবু, সর্ব্বস্বান্ত সরকার পরিবারের প্রতি অহঙ্কৃত কর্ত্তব্যবোধের তলে তলে নন্দদাসের অমার্জ্জিত কাঙালপনা বেশ একটু খচ্ করিয়া বিঁধিয়া যায়।···

সুনীলের আত্ম-সচেতন চঞ্চল মন নিজেকে ভুলাইবার কৌশল জানে নানা ভাবে।—এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায়, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে, মিনিটে মিনিটে মনের

গতি মোড় ফিরিয়া চলে। পূজা, নেমন্তন্ন, পদ্মা, ফরিদপুর, ঢাকা মেল—অবশেষে নমিতার চিঠি। ঢাকার ঠিকানায় আজই এক চিঠি দিবে। বিজয়ার প্রীতি-নমস্কারের জন্য আরো একটি সুযোগ তবে হাতে থাকে। আজ বিষ্যুদবারের ডাকে চিঠি দিলে, পরশু নাগাদ পাইবে নমিতা।···

তবু মনের তলায় কেমন একটু অস্বস্তি। বুদ্ধিবিচারের বকযন্ত্রে চোলাই করা অনুভূতি দিয়া যে-এক ব্যাপক জীবন-দৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে সুনীল, তাহার একমাত্র ন্যায়শাস্ত্র সেই সহজ স্বাধীন বোধ। সেই মানদণ্ডে নমিতাও খাপ খায়, অণিমাও অসঙ্গতি নয়, মায়ের সঙ্গে একটু আধটু ছলনারও স্থান আছে সেখানে; কিন্তু নন্দদাসের সঙ্গে অকারণ ছলনা সেখানে বেসুর পরদায় চলে।

ওদিকে উঠানের একপাশে তখন মহা ধুমধামে দুর্গাপূজা চলিতেছে। বজনী কর্ম্মকারের মেজো ছেলে নন্তু হইয়াছে পুরোহিত। গলায় পাড়ের সুতায় তৈরী লাল পৈতা। প্রতিমা গড়িয়াছে নীলু। ছ-সাত দিন আগেই কিম্ভূত-কিমাকার ছোট ছোট এক একটা পুতুল তৈরী শেষ হইয়াছিল। আজ সকালে শক্ত মাটির উপর চুরি-করা দোয়াতের কালি আর কৌটার সিঁদুর লেপিয়া রঙ্ দেওয়ার পালা সুসমাপ্ত। দত্তবাড়ীর প্রতিমার রঙ্-দিবার দিন পাঁচু কুমারদের ডালা হইতে কোন্ সুযোগে একটু সোনালী রঙ্ চুরি করিয়া রাখিয়াছিল। নীলু অঙ্গার ঘষিয়া কালো রঙ আর খড়ি দিয়া সাদা রঙ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। রঙে রঙে পুতুলগুলির এখন সত্যই এক অপরূপ শ্রী! সিংহটাই শুধু তৈরী করা সম্ভব হয় নাই—সে-অভাব দূর করিয়াছে বাবলুর চৈত্র সংক্রান্তির মেলায়-পাওয়া কাঠের ঘোড়াটা।

নন্তু পূজায় বসিয়াছে! পাঁচু তন্ত্রধার। বাবলু একটা কাঠি দিয়া ভাঙ্গা ক্যানেস্তারায় বাজনা সুরু করিয়াছে চমৎকার। নীলু আর বুলু নৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়াছে। মন্দাকিনীর লক্ষ্মীর আসনের ছোট একখানি রেকাবের মধ্যে চাল, কলা, বাতাসা আর বাতাবী নেবুর টুক্‌রা। ধূপধুনা জ্বলিতেছে। জ্বলে প্রদীপ। একখণ্ড ছেড়া কাগজের উপর ফুল, দুর্ব্বা আর বেলপাতা। কোন দিকে কোন ত্রুটি নাই। একেবারে ষোড়শোপচারে দুর্গাপূজা!

বলির পাঁঠা সামনেই খাড়া। একটা কলাগাছের বাচ্চার গায় সমান মাপের ছোট ছোট কাঠি ফুঁড়িয়া চার-পা-ওয়ালা বাচ্চা বানান হইয়াছে। পাশেই খড়্গ—ছোট একখানি হাত-দা!

শিশু মহলের নিজস্ব দুর্গোৎসব! মন্দাকিনী বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। নীলুর ভয় ছিল, মার অজ্ঞাতসারে কাজের জিনিস লইয়া আসায় হয় তো আজ বকুনি খাইবে। কিন্তু জননীরও সপ্রশংস দৃষ্টি দেখিয়া উৎসাহ তার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। নন্তুকে বার বার সাবধান করিয়া দেয়, "ভালো ক'রে মন্তর পড়িস্ কিন্তু।"

ইত্যবসরে ও-বাড়ীর অণিমাও কাঁচা লঙ্কা চাহিতে আসিয়াছে বড়মার কাছে। হাসিতে হাসিতে কহিল, "বড়মা, দাঁড়িয়ে দেখছ কী ?"

"ওদের পাগলামো। কামারের পোকে ওরা বামুন ক'রে ছেড়েছে।"

নন্তু হাঁকিল, "এবার উলুধ্বনি দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে ক্যানস্তারার ক্যান ক্যান আওয়াজ চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। অণিমা তার হো হো হাসি আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না। অতিকষ্টে কহিল, "বড়মা, বাদলদাকে ডেকে আনি। এমন মজা সে দেখবে না ?"

মন্দাকিনীও হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "খোকা বাড়ী নেই।"

"সে কি! এই তো সে বাড়ী ফিরেছে খানিক আগে। আমাদের রান্নাঘরের পেছন থেকে দেখলাম, নন্দদার সঙ্গে কথা বলছে—হাতে একটা বাণ্ডিল।"

"হাতে বাণ্ডিল ? দূর! খোকা ফিরে এলে আমি বুঝি টের পেতাম না ?"

"হ্যাঁ, বড়মা আমি তাকে বাড়ী ঢুকতে দেখেছি। হাতে কাগজে জড়ানো—বোধহয় কাপড়ের বাণ্ডিলই হবে। বাজারে পাঠিয়েছিলে নাকি ?—বাইরের ঘরে আছে হয়তো—আমি ডেকে আন্‌ছি।"

মন্দাকিনীর হাসি বন্ধ হয় মুহূর্ত্ত মধ্যে।···খোকা বাড়ী আসিয়াছে ? হাতে বাণ্ডিল ? কিসের বাণ্ডিল ? অণিমা দেখিয়াছে ?—আর সে এখনো টের পায় নাই ? ··

অণিমা তেমনি হাসিতে হাসিতে বৈঠকখানা ঘরের দিকে

চলিয়া গেল। সুনীল তখন পাশ ফিরিয়া শুইয়া ভাবিতেছে আকাশ পাতাল।

"বাদলদা উঠুন্—উঠুন্, শিগ্‌গির আসুন।"

"ব্যাপার কী রে?" সুনীল উঠিয়া বসে।

"আসুনই না। দেখবেন চলুন।"

"কী?"

"আঃ, আগে চলুন না," অণিমার কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর।

"আগে বল্না কী?"

"আপনি বড় অবাধ্য" বলিয়া অণিমা তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বিছানা হইতে তোলে। অণিমার পিছনে পিছনে সুনীল পূজার স্থানে আসিয়া হাজির।

ওদের তখন বলির বাজনা বাজিতেছে। লোকের অভাবে পুরোহিতই হইয়াছে জল্লাদ। "মাগো, দুগ্‌গা গো," বলিয়া নস্তু দা দিয়া এক কোপে কদলী চারার পশুজীবনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাইল। শিশুকণ্ঠে ওঠে একসঙ্গে হাসি আর জয়ধ্বনি!

অণিমা হাসিয়া কুটি-কুটি। হাসিতে হাসিতে কখনো পিঁড়ার গায় এলাইয়া পড়ে, কখনো সোজা হইয়া বুকের আঁচল ঠিক করিয়া লয়। সুনীলও মুচ্‌কি হাসে। উপভোগ্য দৃশ্য বটে! মন্দাকিনীও হাসিতে যোগ দিয়াছেন—কিন্তু খানিক আগের সেই উত্তাপটুকু যেন আর নাই!

এবার বিসর্জ্জনের পালা। শিশু-মহলের সার্ব্বজনীন পূজার রীতিনীতিও বেয়াড়া রকমের। একদিনেই বোধন, পূজা আর বিসর্জ্জন। ক্যানক্যানে বাজনা লইয়া সকলে প্রতিমা লইয়া পুকুরঘাটে চলিল।

"চলুন বাদলদা, ভাসান দেখতে যাই," বলিয়া অণিমা ওদের পিছন লইল। সুনীলও চলে সঙ্গে সঙ্গে। ছেলে-মেয়েদের এই সহজ সুন্দর অভিনয়ের চেয়েও তার কাছে এখন ভালো লাগে শুধু চল-চঞ্চল অণিমারাণীর অনর্গল হাসি। তার পাতলা গড়নখানির আদ্যন্ত এক অপরিমেয় আনন্দোচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত হইয়া ছমছম করে যেন। অণিমা সত্যই সুন্দরী!

অণিমা পিছন ফিরিয়া ডাকিল, "বড়মা, তুমি এলে না?"

মন্দাকিনী কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া যান। অণিমার এই বাড়াবাড়ি তার কাছে ভালো লাগে না। এ কি বেহায়াপনা! খোকা যেন বাবলুর মত একরত্তি ছেলে!

একটা কথা সহসা তার মনে পড়িয়া যায়। যে-কথাটা কাল বা আজ সকালেও খেয়ালের মধ্যেই আনেন নাই। গত আষাঢ় মাসে সুলতা নিস্তারিণী পিশীর মারফৎ সুনীলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আনিয়াছিল। মন্দাকিনী সম্মত হন নাই। কথাটা তার ছেলে অবশ্য জানে না। অনুও না জানিতে পারে। সুলতা তো জানে। মেয়েকে অমন যখন-তখন এ-বাড়ীতে পাঠায় কোন্ সাহসে? ওদের দুটিতে এত মাখামাখি মোটেই ভালো নয়।··

পুকুর ঘাট হইতে সুনীল ও অণিমা হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিল বাহিরের ঘরের বারান্দায়। বেতের কেদারাটা পদ্মার দিকে মুখ করিয়াই পাতা। সুনীল বসিয়া পড়িল আরামের গা ভাঙ্গিয়া। অণিমা বসিল মাটিতে হাঁটু ভাঙ্গিয়া তেরছা ভঙ্গিতে। আলতা-পরা পাদু'খানির তলায় সারা রাজ্যের ধূলা - তবু কি নরম!

অণিমার পাদু'খানি হইতে লোভাতুর দৃষ্টি ফিরাইয়া সুনীল কহিল, "অনু, আমরাও ছোট-বেলায় এমন পূজো-পূজো খেলতাম। তোর মনে পড়ে?"

"একটু একটু। আপনি একবার ডাকঘর খুলেছিলেন স্পষ্ট মনে আছে। এ-বাড়ী থেকে আমাদের ঢেঁকিঘর অবধি তার খাটিয়েছিলেন। পিয়ন হয়েছিল বলাই কাকা—মনে আছে?"

"হুঁ" —সুনীল পদ্মারদিকে চাহিয়া জবাব দেয়। অতীতের কাহিনী সব পাতলা কুয়াসায় ঢাকা। আবছায়ার মত কিছু কিছু দেখা যায়—বাকিটুকু পূরণ করে কল্পনা।

কবুতরের খোপের মুখে—বক্‌বকম্। একজোড়া পায়রা বাহির হইতে উড়িয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। দূর হইতে কুকুরটা চাহিয়া আছে নিস্ফল আক্রোশে—কবুতর দম্পতি তার নাগালের বাহিরে।

উভয় পক্ষে চলিল এ-কথা, সে-কথা, নানা কথা। নমিতা-প্রসঙ্গ আজ আর উঠিল না। সুনীল কিন্তু ইহাই চায়। অণিমার মুখে নমিতার কথা বড় ভালো লাগে। কিন্তু কে যে লক্ষ্য আর কে উপলক্ষ, সুনীল এখনো তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না।

"দ্যাখ্ দ্যাখ্ অনু, কী সুন্দর!" অণিমা সুনীলের

দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নদীর দিকে মুখ ফিরায়। এক ঝাঁক বেলে-হাঁস দিয়াছে ওপার থেকে এপারে পাড়ি। এখনো তারা বহুদূরে—নীল আকাশের পটে, নদীর মাঝামাঝি। পাখীগুলি চার সারিতে রওনা হইয়াছে—সামনের পংক্তি বড়, তারপর ছোট, তারপরে একটু বড়, শেষের লাইনটা অনেক ছোট। নির্মেঘ আকাশের গায় সাদা ডানার সরল রেখা কয়টি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, ছোট হইতে বড় হইয়া আসিতেছে ক্রমে ক্রমে।

সুনীল প্রশ্ন করে, "পাখীগুলো কতদূরে বলতে পারিস্?"

"আধ মাইল?"

"দূর!"

"তার বেশি?"

"অনেক—কম্‌সে কম দেড় মাইল হবে। এখান থেকে ফরিদপুরের পাড় কত দূর বল্ তো?"

"দু' মাইল।"

"তিন মাইলেরও বেশি—যাঃ, তোর কোন আন্দাজ-ই নেই।" সুনীল অণিমার দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

—"এ-কথা নমিতাও বলতে পারতো না," অণিমা একটু বাঁকাইয়া হাসে।

"আবার নমিতা?"

"ও! রাগ ভ্যাখ না," বলিয়া অণিমা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, "নাম শুনে খুশি হচ্ছেন, তবু তা স্বীকার করবেন না! পেটে ভোগ, মুখে লাজ!"

"ও অণি!"—পদিপিশী অণিমাকে ডাকিলেন! এক-কালের ব্রাহ্মণ বালবিধবা পদিপিশী বৃদ্ধবয়সে আজ সারা গ্রামের সরকারী গেজেট। গ্রামে বাহির হইয়াছেন আজ কি মতলবে কে জানে।

"ও ছুঁড়ি, কানের মাথা খেয়েছিস্—কথাই শুনতে পাস্ না?"

অণিমা এবার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া সাড়া দেয়, "কী পিশি?"

"দত্তবাড়ী নেমন্তন্ন নেই তোদের?"

"আমাদের শুধু পুরুষদের বলেছে, মেয়েদের তো বলেনি এবার।"

"আমাদের চিরকাল ঠাকুর-ঠাকরাণ বলে এসেছে। —এবার শুধু ঠাকুরদেরই বলেছে। ঠাকরাণদের খাওয়াতে পাঁচশ' টাকা খরচ পড়তো কিনা—ফতুর হয় লোকে সাধে!"

সুনীল ও অণিমার কাছ থেকে এমন একটা অভিমতে এতটুকু সায় না পাইয়া পদিপিশী গডগড করিয়া উঠানটুকু পার হইয়া যান। বাড়ীটা পার হন নাই কিন্তু। বড়-ঘরের পিছনের দুয়ার দিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "নীলুর মা ঘরে আছিস্?"

"কে, পিশি? —বসুন।"

"আর বসব! কালে কালে সব হচ্ছে কী, দেখে শুনে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যেতে চায়। ধর্ম্মকর্ম্ম মানে না কেউ, অকাল কি সাধে আসে!"

মন্দাকিনী বসিবার জন্য আসন পাতিয়া দেন।

"ভ্যাখ না বৌ, দত্তবাড়ীর পূজোয় এবার গাঁয়ের ঠাকরাণদের খেতে বলেনি।"

"ওদের সেদিন আর নেই তো পিশি—"

"তা হ'লে পূজোর পাট তুলে দিলেই হয়।" পদিপিশী বলিয়া চলিলেন, "আজেবাজে খরচা তো কম হচ্ছে না। অষ্টমীর দিন রাত্তিরে থিযাটর হবে, তাতে কোন্ আর দশ-বিশ টাকা খরচা হবে না! ইদিকে যত খরচ কমানো হচ্ছে আসল কাজে। ওদের ছেলে-ছোকরারা তো পূজো-মণ্ডপের কাছ দিয়েও ঘেঁষে না। পাড়ার ছেলেরা আছে তাই রক্ষে।"

"সে কথা যদি বললে পিশি, তবে—" মন্দাকিনী কহিতে থাকেন, "আজকালকার নিয়মই যেন ঐ। আমার ছেলেরও কী মতি হয়েছে, অঞ্জলি দেয় না—বলে, না খেয়ে অত বেলা অবধি শুকিয়ে থেকে পুণ্যি করার লোভ নেই। আমার তো বুক কাঁপে পিশি কী থেকে যে কী হয়—কে জানে গো!"

"ভাল কথা নীলুর মা!" পদিপিশী গলাটা এবার আরও খাটো করিয়া লন, "নরেশের মেয়েটার সঙ্গে ছেলেকে অত মিশতে দিস নে যেন। ছুঁড়িটার অহঙ্কার দেখেছিস্?—মেয়ের সরম-ভরম এতটুকু নেই। দশ বছর ধুবড়ী থেকে যেন মেম-সাহেব হয়ে এসেছেন।"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া থাকেন। যে-সংশয় তার মনেও দেখা দিয়াছে খানিক আগে, পদিপিশী তাহাই খোঁচাইয়া তুলিতে চাহেন।

"চুপ করে থাকিস্ নে। অত মাখামাখি ভাল নয়।

মেয়েটা তো আর কচি খুকী নয়। বিয়ে দিলে এদ্দিনে তিন ছেলের মা হত!"

"কী যে বলো পিশী, ছোট বেলা থেকে ওরা যে ভাইবোনের মত।" মন্দাকিনী প্রতিবাদ না জানাইয়া পারেন না। অণিমার সমালোচনা গায়ে লাগে না, কিন্তু পদিপিশীর ইঙ্গিতের মধ্যে তার ছেলেও যে রহিয়াছে।

"দ্যাখ বৌ, শত হলেও আগুন আর ঘি।—এক জায়গায় রাখতে নেই।"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া থাকেন।

প্রতিপক্ষকে নীরব পাইয়া পদিপিশী দ্বিগুণ উৎসাহে এবার ফস্ করিয়া বলিয়া বসেন, "আগে থেকেই সাবধান হ বৌ! নইলে শেষটায় চোখের জলে ভাসতে হবে।—জানিস তো, উমেদপুরের নরেন হালদারের মেয়েটা শেষকালে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেল।"

মন্দাকিনী এবার ফোঁস করিয়া ওঠেন, "মুখে লাগাম টেনে কথা বলবেন পিশি! আমার ছেলে আর নবগোপাল সিকদারের ছেলেতে সগ্‌গপাতাল তফাৎ।"

"এ তো আচ্ছা বিপদ! ভাল বললেও মন্দ শুনিস্!"

"আপনার নিজের মনে ময়লা—তাই অমন কথা ভাবেন।"

"তোর ছেলেকে আবার কী বললাম লো?" পদিপিশী অবাক হইয়া কথাটা হালকা করিতে চাহিলেন।

কিন্তু প্রসঙ্গটা আর হাল্‌কা হয় না। খানিকক্ষণ এ-কথা সে-কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া অপমানিত পদিপিশী এক সময় ঐ পিছনদুয়ার দিয়াই সসম্মানে সরিয়া পড়িলেন।

এদিকে সুনীল ও অণিমা নদীর দিকে চাহিয়া আছে। আর এক ঝাঁক পাখী ওপার হইতে পাড়ি ধরিয়াছে। এপারে পৌছিল বলিয়া।

পাড়ের কাছাকাছি আসিয়া পাখীর ঝাঁক কি জানি কেন দু'ভাগ হইয়া যায়। এক সার একটু দক্ষিণে মোড় ফিরিয়া ধীরে ধীরে গাছের আড়ালে মিলাইয়া গেল। আর একদল বরাবর সুনীলদের বাড়ীর উপর দিয়া উড়িয়া বাহির হইয়া গেল পতপত শব্দে।

"এ-দলটা দুভাগ হ'ল কেন বলতে পারিস?"

"আপনিও বলতে পারেন না।—ছেলেপেলের মতো খালি খালি বাজে বক্‌ছেন," বলিয়া অণিমা চোখে-মুখে এক ঝলক চাপা হাসির তরঙ্গ তোলে। অণিমার দাঁতগুলি তো ভারী সুন্দর! এ' কদিন ঐ সাদা ধবধবে দাঁতের পাটি সুনীলের নজরেও পড়ে নাই এ কেমন কথা!

বাদলদার মুখ হইতে চোখদুটি ফিরাইতেই অণিমার দৃষ্টি পড়ে লাউএর মাচার উপর। বাঁশের কঞ্চির উপর একটা ময়না আসিয়া উড়িয়া বসিযাছে। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আসে ঢেঁকিঘর থেকে বেড়ালের বাচ্চাটা। উঠানের মাঝখান থেকে কুকুরটাও শয়ন ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। তাড়া খাইয়া পাখীর বাচ্চা পালায়। বিড়ালের বাচ্চাটার আশাভঙ্গের ঝাঁজ গেল বাঘার উপর। লাফাইয়া পড়ে কুকুরটার ঘাড়ে। বাঘা তৎক্ষণাৎ চিৎ হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। আবার উঠিতে না উঠিতে মার্জ্জার শিশু কুকুরের ঘাড়টা কামড়াইয়া ধরে—আদরের কামড়। সুনীল ও অণিমা মিলিত দৃষ্টিতে এই অঘটন ঘটন দেখিতেছিল। বিড়ালটার আক্রমণ বাঘা বেশ খুশির সহিতই গ্রহণ করিতেছে।

"দেখ্‌ছিস, বাচ্চাটার এতটুকু ভয় নেই—বাঘাকে গ্রাহ্যই করছে না।"

"বাঘা কিছু বলবে না—এ ভরসায় না ওর এত সাহস।"

সুনীল একটু কৌতুকের হাসি হাসিয়া কহিল, "ওরা দুটিতে তা হ'লে প্রেমে পড়েছে।"

"বেড়ালের বাচ্চাটা যে ব্যাটাছেলে।"

"অ্যাঁ? তাই নাকি?"—বলিয়া সুনীল এমনি বোকার মত বিস্ময়ের ভান করে যে, অণিমা ওঠে খিলখিল করিয়া হাসিয়া। হাসি তো নয়, ঝকঝক্ করে অণিমার দুপাটি সাদা ধবধবে দাঁত।

"আপনি এত-ও হাসাতে পারেন বাদলদা!"—অণিমা আবার হাসে শুভ্র হাসি—যেন তপ্ত কড়াই থেকে এক বলকের পাতলা দুধ উতলাইয়া পড়ে এইমাত্র।

সুনীল যেন বোবা—একদৃষ্টে শুধু চাহিয়া আছে। ঐ অসহ্য হাসির আড়ালে সারা দুনিয়া এখন চাপা পড়িয়াছে আর কি! শুধু সে আর অণিমা, অণিমা আর সে। আর মাঝখানে শুধু একটুখানি নদীর ব্যবধান। জীবনের মর্ম্মমূল অবধি কাঁপিয়া ওঠে।

অণিমা চোখেমুখে হাসি চাপিতে চাপিতে আলগা খোঁপা ঠিক করিয়া লয় দুইটি সুডোল হাতে। দুদিকে দুইটি রক্তমাংসের জ্যামিতিক কোণ—বিশেষ মুহূর্ত্তের বিশেষ এক

ভঙ্গি। সুনীলের লোভ যায়—ইচ্ছা হয়, এক টান মারিয়া ঐ শিথিল খোঁপা খুলিয়া দেয়; তারপর অণিমার কপালের উপরে—কয়েক গাছ অশিষ্ট চুল বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজিয়া থামিয়া আছে যেখানে—সেই সজল মাধুর্য্যের উপর চট্ করিয়া একটা চুমু খাইয়া ফেলে। পরমুহূর্ত্তে না হয় দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে। দেখিয়া ফেলে যদি কেহ, দেখিলই বা! এত-বড় এক পরম ক্ষণের এতটুকু প্রাপ্তিতেই আপত্তি? সারা দুনিয়া শত কণ্ঠে ছি-ছি করিতে থাকিলেও, অবাধ কালের বুকে এই সদ্য মুহূর্ত্তের সামান্য ঘটনাটুকু নিখুঁত একটি কালো দাগ কাটিয়া রাখুক না—অণিমার সুন্দর মুখখানির বাম গণ্ডের ঐ ছোট্ট তিলটুকুর মতই!

"অণু!"

অণিমা মুখ তোলে না।

"অণু!"

অণিমা সলজ্জ চোখদুটি তোলে এবার! সুনীল কি যেন বলিবার জন্য মুখ খুলিবে এমন সময় পিছন হইতে গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দিলেন মন্দাকিনী, "খোকা!"

সুনীল ও অণিমা একসঙ্গেই চমকাইয়া মুখ ফিরায়।

"এখানে বসে বসে কেবল হাসাহাসি করছিস!—তোর যদি এতটুকুও আক্কেল থাক্‌ত!—সন্ধ্যে হয়ে এল। পূজো-বাড়ী পেসাদ নিতে যাবি কি শেষকালে রাতদুপুরে?" বলিয়াই মন্দাকিনী যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি সদর্প গাম্ভীর্য্য লইয়া চলিয়া যান। চলিয়া যান এক গোছা রসের ভারে টুস্‌টুস করা আঙুরফল যেন নির্দ্দয় পদাঘাতে ছড়াইয়া মাড়াইয়া!

সুনীল স্তব্ধের মত বসিয়া থাকে নির্ব্বাক। অণিমা আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়ে নিঃশব্দে। বড়মার কাছ থেকে লঙ্কা চাওয়া এ-বেলাও হইয়া উঠিল না।

অণিমা চলিয়া যাইতেই সুনীল দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মনে মনে। মার এ কেমনধারা রাগ-দেখানো? সন্ধ্যার এখনো অনেক বাকী। সূর্য্য মাঝ-আকাশ ছাড়িয়া সবে মাত্র পশ্চিমে হেলিয়াছে। বেলা এখন বড় জোর—আড়াইটা। মা নিজেই তো বলিয়াছেন, পূজা বাড়ীর প্রসাদ পাইতে সন্ধ্যার আগে নয়। দত্তবাড়ী কি সাত শ' মাইল দূরে?

মন্দাকিনী তখন ও-ঘরে নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছেন এই নিতান্ত অবেলায়। ঘন ঘন হাত-পাখা নাড়িয়া বোধহয় মাথাটা ঠাণ্ডা করিতে চান। পদিপিসীর উপরে রাগটা এখনো পড়ে নাই।

পদ্মার আক্রোশ আজ আর তেমন স্পষ্ট নয়। তবু যতখানি ভাঙ্গিবার ছিল ভাঙিয়াছে এবার।

ক্রমশঃ

সুন্দরী তুমি ঊষার আলোক সমা

শ্রীসমরেন্দ্র দত্ত রায়

সুন্দরী তুমি ঊষার আলোক সমা
বিরহ নিশার পারে
আলোকিত করি রয়েছ আমার
অশ্রুর ঝরণারে।
নিয়ত কাননে যে ফুল ফুটিছে,
পাখীর কণ্ঠে যে গান উঠিছে,
মিলন তৃষায় যে প্রাণ ছুটিছে
সফল করিতে তারে,
যুগে যুগে এসো জীবন প্রবাহে
সুখে দুখে বারে বারে।

সুন্দরী তুমি ঊষার আলোক সমা
বিরহ নিশার পারে
রয়েছ ডাকিতে সুপ্ত কবিরে
মিলনের অভিসারে।
নীলিমায় নিতি যে রঙ লাগিছে,
শ্যামল বসুধা যে সুধা মাগিছে,
ব্যাকুল হৃদয়ে যে প্রেম জাগিছে
সফল করিতে তারে
যুগে যুগে এসো জীবন প্রবাহে
সুখে দুখে বারে বারে।

Manuja Guha

সৃষ্টি ও প্রলয়

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় গুহ, বি-এস-সি

গোধূলির অবসানে উন্মুক্ত নীল আকাশে যখন অসংখ্য নক্ষত্র ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তখন নভোমণ্ডলের অপরূপ রূপ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। এই জ্যোতিষ্মান নক্ষত্রমালার মাঝে যেগুলি স্থির তাহারাই নক্ষত্র, যেগুলি গতিশীল তাহাদের প্রত্যেকটীই এক একটী গ্রহ। আমাদের চিরপরিচিত সৌরজগতে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া নয়টী গ্রহ অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অত্যাশ্চর্য্য পদার্থগুলির জন্ম কোথায়, কখন কাহার অনাদি শুভ্র স্পর্শে সম্ভব হইয়াছিল? যুগ যুগ ধরিয়া গবেষণার ফলে আমরা এই জ্যোতিষ্কদের সম্বন্ধে সামান্য যেটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

পূর্ব্বে মানুষের ধারণা ছিল, নক্ষত্রের যেরূপ সৃষ্টি হইয়াছে ঐ অবস্থাতেই চিরদিন থাকিবে—তাহার ধ্বংস নাই। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, প্রত্যেকটী জ্যোতিষ্ক, এমন কি সূর্য্য হইতেও আলোক ও তাপরশ্মি বিকীর্ণ হইবার ফলে তাহারা ক্রমে ক্রমে জ্যোতিহীন হইতে হইতে অবশেষে একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেই হয়তো এই বিশ্ব হইতে মানুষের স্মৃতি মুছিয়া যাইবে। এখন দেখা যাউক কি করিয়া ইহাদের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিন বাষ্পীভূত মেঘের সমষ্টি ছিল; তারপর সহস্র সহস্র বৎসর পরে সেগুলি ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া জমাট বাধিয়া যায়—তাহাতেই সৃষ্টি হয় যত গ্রহনক্ষত্রাদির। এইরূপ বাষ্পীভূত মেঘরাশিকে নীহারিকা (Nebula) বলা হয়। এই নক্ষত্রখচিত সুদৃশ্য আকাশে এখনও অনেক নীহারিকা দেখা যায়, ইহাদের এক একটী এত বৃহদাকারের যে একটী নক্ষত্রজগতও তাহার তুলনায় নগণ্য। এগুলির বিশেষ কোন আকৃতি নাই, তবে বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করেন, কুণ্ডলীভূত নীহারিকা (Spiral Nebula) হইতেই নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি।

এখন দেখা যাউক, সৃষ্টির আদিতে এই নীহারিকার উৎপত্তি কিরূপে সাধিত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও ইহার সৃষ্টি সম্ভব কি-না। বিশ্বের এই মহাশূন্যে কেহই নিশ্চল অকর্ম্মণ্য বসিয়া নাই। প্রতিটী বস্তুই নিয়ত প্রচণ্ডবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নক্ষত্রের সৃষ্টি এবং নির্ব্বাণ অনিবার্য্য—কাজেই হয়তো এই মহাশূন্যে অসংখ্য জ্যোতিহীন মৃত নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষপথে বিপুলবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা জ্যোতিঃহীন বলিয়া কখনও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একসময় এই জ্যোতিহীন নক্ষত্রগুলি হয়তো কক্ষচ্যুত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে হয় ভীষণ সংঘর্ষ। এই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের ফলে যে তাপের উৎপত্তি তাহাতে নক্ষত্র দুইটী বাষ্পীভূত হইয়া জ্যোতিষ্মান নীহারিকারূপে নূতন পথে বিপুলবেগে মহাশূন্যে ঘুরিতে থাকে। তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়। এইরূপে অসীম অন্ধকার মাঝে হঠাৎ একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন নক্ষত্র আত্মপ্রকাশ করে। যুগ যুগ পরে তাহার জ্যোতি এত ম্লান হইয়া যায় যে, তাহাকে আর খালি চোখে দেখা যায় না। আরও কয়েক যুগ পরে সেটা জ্যোতিহীন হইয়া একেবারেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। পণ্ডিতগণ ধারণা করেন, আমাদের সৌরজগতের উৎপত্তিও এইরূপে একটী নীহারিকা হইতেই হইয়াছিল এবং বহুবৎসর পূর্ব্বেই হয়তো একটী জ্যোতিহীন পদার্থে পরিণত হইয়াছিল, পরে দৈবক্রমে একটী তারকার সহিত ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের ফলেই পুনরায় তাহার রুদ্ররূপ ফিরিয়া আসিয়াছে।

আমাদের সূর্য্যকে একটী নক্ষত্র এবং প্রত্যেকটী নক্ষত্রকে এক একটী বিশাল সূর্য্য বলিয়া মনে করা যায়—কারণ তাহাদের সকলের সৃষ্টির ইতিহাসই সম্পূণ এক। একটী নক্ষত্র অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আধুনিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, তাহাদের অনেকেই আমাদের সূর্য্য হইতেও অনেক গুণ বড়—তবে পৃথিবী হইতে তাহাদের অপরিসীম দূরত্বই এইরূপ মনে হইবার একমাত্র কারণ। সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া যেরূপ গ্রহগুলি নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সেইরূপ হয়তো নক্ষত্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়া আরও অনেক নক্ষত্রজগতের সৃষ্টি হইয়াছে—সে সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভে এখনও আমরা অক্ষম। ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিকগণ হয়তো তাহাদের প্রকৃত পরিচয়দানে জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারেন।

সূর্য্য আমাদের সবচেয়ে বড় সুহৃদ, সে কথা ঠিক; কিন্তু পৃথিবীর আরও নিকটে অবস্থিত থাকিলে উহা আমাদের নিকট অতি ভয়ঙ্কর প্রতিবেশীরূপে গণ্য হইত। পৃথিবী সূয্য হইতে ৯,১৫,০০.০০০ মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত এবং প্রায় চল্লিশ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ুস্তরে আবৃত বলিয়াই সূর্য্যের প্রখর তাপের অতি সামান্যাংশই আমাদের নিকট পৌছিতে পারে।

পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের কোন কঠিন আবরণ নাই। যদিও খালি চোখে ইহাকে শান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে দেখিলে সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী বিক্ষিপ্ত লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখার ভয়াবহ রূপ কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়।

সময় সময় সূর্য্যগাত্রে বিরাটাকার গহ্বর দেখা যায়। এগুলিকে

সূর্য্যের কলঙ্ক বলা হয়। এই গহ্বরগুলির এক একটী এত বৃহৎ যে, আমাদের পৃথিবীও অনায়াসে তাহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। মনোযোগ সহকারে সূর্য্যের কলঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীর সূর্য্যও নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহার সকল অংশের ঘুরিবার বেগ সমান নয়। ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে, সূর্য্য ঘনীভূত পদার্থ নহে—বাষ্পীভূত ধাতুর সমুদ্রবিশেষ।

সূর্য্যরশ্মিকে "স্পেকট্রোস্কোপ্" (spectroscope) বা কাচের ত্রিফলার মধ্য দিয়া পাঠাইলে তাহা রামধনুর ন্যায় সাৎটী বর্ণে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাকে "সোলার স্পেক্ট্রাম" (solar spectrum) বলা হয়। প্রতিটী মৌলিক পদার্থ হইতেও এইরূপ নানাবর্ণরঞ্জিত "স্পেক্ট্রাম" পাওয়া যায়—উপরন্তু একটী মৌলিক পদার্থের "স্পেক্ট্রাম" আর কোন পদার্থের "স্পেক্ট্রামের" সহিত সম্পূর্ণ মিলিবে না। কাজেই সূর্য্যের "স্পেক্ট্রাম" দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিয়াছেন যে সূর্য্যে প্রধানত লৌহ, তাম্র এবং আরও অন্যান্য পদার্থ বর্ত্তমান—যাহাদের প্রতিটী আমরা পৃথিবীতেও দেখিয়া থাকি। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, পৃথিবী সূর্য্যদেহ হইতেই উদ্ভূত। অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদিও কোন কোন মৌলিক পদার্থদ্বারা গঠিত তাহাও এইরূপে বলা সম্ভব।

আমরা জানি, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘোরে। তাহাতেই হয় দিন এবং রাত্রি; উপরন্তু ইহা নিজের কক্ষপথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে ৩৬৫ দিনে, তাহাতেই হয় গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—ছয়টী ঋতু।

যদি পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর না ঘুরিত তাহা হইলে আমাদের দিন ও রাত্রি মেরুপ্রদেশের ন্যায় ছয়মাস কাল ধরিয়া থাকিয়া যাইত। আবার পৃথিবী যদি নিজকক্ষপথে মিনিটে ১০০ মাইল বেগে না ছুটিত তাহা হইলে সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীর সহিত তাহার ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হইত এবং বিশ্ব হইতে পৃথিবীর অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, পৃথিবী তাহার এই বিপুল গতিবেগের জন্য সূর্য্যের নিকট হইতে দূরে ছুটিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে—সৌভাগ্যবশত এই দুইটী বিপথগামী শক্তিই সমান। তাই পৃথিবী তাহার কক্ষপথে অবিরাম অনন্তকাল ধরিয়া ঘুরিতেছে। দৈবক্রমে ইহাদের সামান্য পরিবর্ত্তন হইলেও পৃথিবীর কি দুর্গতি হইবে তাহা ধারণা করিতেও কষ্ট হয়।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই মহাশূন্যে কিছুই স্থির নহে, প্রত্যেকেই, এমন কি, নক্ষত্ররাজিও নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের সূর্য্যও একটী নক্ষত্র এবং অন্যান্য নক্ষত্ররাজির মত ইহাও মহাশূন্যে বিপুলবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইতেছে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহকে তাহার বিপুল আকর্ষণে। পৃথিবী, সূর্য্য, এমন কি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত কাল যেখানে ছিল আজ হয়তো তাহা হইতে কোটী কোটী মাইল দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথায়, কে জানে? আমরা আজ যেখানে আছি, সেখানে আর কোন দিনই হয়তো ফিরিয়া আসিব না।

সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত মেদিনীর বুক শীতল হইল এবং মনোরম সবুজ রাগরঞ্জিত হইয়া দিকে দিকে প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। তাই যখন ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব—সর্ব্বপ্রথম আঁখি মেলিয়া শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর অতুলনীয় রূপ দেখিল তখন বিস্ময়ে তাহার প্রাণের স্পন্দন চঞ্চল হইতে চঞ্চলতর হইল। বিস্মিত মানবের মনে জাগিল নানা জিজ্ঞাসা এবং তাহার মীমাংসা করিতেই সে কালক্রমে এই বিশ্বের অপরাপর সৃষ্টির অনেক নূতন তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারিল। তাহার প্রসারিত চক্ষু দেখিল—এই বিশ্ব মহাসমুদ্রে জল বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী, তাহারই বুকে জীবকে আশ্রয় লইতে হইয়াছে, উপরন্তু তাহারাই এই বিশ্বের একমাত্র জীবন্ত সৃষ্টি। জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজন অতি সূক্ষ্ম তাপের পরিমাপ। ইহার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেও জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব—বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছে, পৃথিবী ব্যতীত অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে। তাহাদের কোনটী ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত, আবার কোনটী তুহিনশীতল।

এই সকল রহস্যের কথা চিন্তা করিলেই মনের মাঝে প্রশ্ন জাগে—"সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্য কি?" যদি বাস্তবিক জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, তবে এই বিশ্বের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদিতেও আমরা জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিকের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ তাই ধারণা করেন, সৃষ্টিকর্ত্তা জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই—জীবন্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছিল একটী দুর্ঘটনার ফলে।

আমরা জানি না, অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলিতে একদিন জীবন্ত প্রাণীর উদ্ভব হইবে কি-না। আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া এবং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা লইয়া দেখিতে হইবে জীবন ধারণের সহায়ক কি। অহর্নিশ লোকচক্ষুর সমক্ষে জলে স্থলে সর্ব্বত্র জীবন্ত প্রাণী চরিয়া বেড়াইতেছে—বৃক্ষলতাদি সজীব থাকিয়া তাহাদের প্রাণ ধারণের উৎসরূপে বিরাজ করিতেছে। প্রাণীদের অবয়বে এমন কি থাকিতে পারে যাহার শক্তি এত মহত্তর বা উচ্চতর হইতে পারে? বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, জীবন্ত পদার্থ ও প্রাণহীন বস্তু উভয়ই একই প্রকার মৌলিক পদার্থদ্বারা গঠিত। আমাদের প্রাণবন্ত দেহ গঠনের জন্য কোন নূতন ধরণের মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন হয় নাই। যে সকল মৌলিক পদার্থ বৃক্ষলতা ও মানবদেহগঠনে আবশ্যক, তাহাদের প্রতিটী জল, বায়ু এবং মৃত্তিকারূপ প্রাণহীন পদার্থেই বিদ্যমান। "প্রোটোপ্লাজম্" (protoplasm) যাহা জীবজগতে জীবনীশক্তির আধার, প্রকৃত পক্ষে "কার্ব্বন" (carbon), "হাইড্রোজেন" (hydrogen), "অক্সিজেন" (oxygen) প্রভৃতি উপাদানে গঠিত। ইহাদের প্রতিটী প্রাণহীন জড়পদার্থ এবং আমরা উহাদিগকে একত্রিত করিয়া শত চেষ্টায়ও প্রাণবন্ত "প্রোটোপ্লাজম্" (protoplasm) প্রস্তুত করিতে পারি না—যদিও প্রকৃতির যাদুমন্ত্রে এই সকল মৌলিক পদার্থের সহায়তায় নির্ব্বিঘ্নে প্রাণবন্ত "প্রোটোপ্লাজম্"-এর সৃষ্টি হয়—এইখানেই সৃষ্টির রহস্য।

অনুকূল আলোক এবং তাপের প্রভাবেই জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব। পৃথিবী সূর্য্যের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ আলোক এবং তাপ পায় বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি—নতুবা আমাদের অস্তিত্ব কোথায় কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইত তাহা কে বলিতে পারে। এই সমতার সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিলেই পৃথিবীর বুক হইতে জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া যাইত এবং এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়।

মানুষ বৃক্ষ অথবা অন্য কোন তৃণভোজী প্রাণীর দেহ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করে এবং নিঃশ্বাসের সহিত যে "অক্সিজেন" গ্রহণ করে তাহারই সাহায্যে তাহাদের দেহের অভ্যন্তরে খাদ্য দ্রব্যের দহনকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং তাহারই ফলে প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। সেই শক্তির সাহায্যেই জীব জীবনীশক্তির পরিচয় দেয়। জীবদেহে খাদ্যদ্রব্যের দহনের ফলে যে "কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড" (carbon dioxide)-এর উদ্ভব হয় তাহা প্রশ্বাসের সহিত বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়া আসে। বৃক্ষসকল সেই "কার্ব্বন ডাই অক্সাইডের" সহিত সূর্য্যালোক হইতে প্রাপ্ত শক্তি সংযুক্ত করিয়া পুনরায় "কার্ব্বোহাইড্রেট" (carbohydrate) জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ কোনরূপ অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অক্ষম সুতরাং তাহাদের ঐ সঞ্চিত শক্তির সবটা প্রয়োজন হয় না, তাই মানুষ এবং অপরাপর প্রাণী সেই শক্তি ক্ষয় করিয়া মহানন্দে চলিয়া বেড়ায়।

সূর্য্য আমাদের জীবন ও কর্ম্মের প্রেরণাদাতা। তাই সূর্য্যের অভাবে পৃথিবীর কি দশা হইবে তাহা কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই শস্যশ্যামলা ধরিত্রী অন্ধকার, তুহিন শীতল, জনপ্রাণীহীন মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে। যুগ যুগ ধরিয়া সূর্য্য আমাদিগকে প্রভূত আলোক এবং তাপশক্তি দান করিয়া আমাদের প্রাণের স্পন্দন জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাই হিন্দুগণ প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রণাম করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" অর্থাৎ সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী যে দেবতার নিকট হইতে আমরা ধীশক্তি এবং জীবনীশক্তি পাইয়াছি তাহারই মূর্ত্তি ধ্যান করি।

তাপ না থাকিলে জীবন অসম্ভব—সেই অমূল্য সম্পদ সূর্য্যের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। সূর্য্যের প্রখর তাপেই সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয় এবং তাহাই পরিশেষে পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসে বৃষ্টির আকারে। সেই বৃষ্টির জলেই নদ, নদী, খাল, বিল প্রভৃতি কূলে কূলে ভরিয়া ওঠে এবং জীবজগৎ পায় তাঁহাদের অপরিহার্য্য পানীয় জল। আদি যুগে মানব সর্ব্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া গাছের সবুজপাতা ও বৃক্ষজাত অপরাপর দ্রব্যাদির সহায়তায় জীবনযাত্রা সুরু করিয়াছিল। প্রাণীজগতকে খাদ্যের নিমিত্ত বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয় বৃক্ষের উপর। প্রাচীন মানবের অস্ত্র ও বস্ত্রাদি বৃষদেহের সহায়তায় রচিত হইত। নব্য সভ্য যুগের জ্বালানী কাঠ গাছেরই সঞ্চিত পদার্থবিশেষ। অনেকের হয়তো মনে জাগিবে, সভ্যজগৎ কয়লা ও তেলের বশীভূত বেশী। কিন্তু একথা তুলিলে চলিবে না, কয়লা তৈলাদিও বৃক্ষজাত দ্রব্য। উপরন্তু যে শক্তি লইয়া ইহারা আমাদের উপকারার্থ অগ্রসর হয় তাহার মূলে আছে সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত শক্তি—যাহা বৃক্ষ, সবুজপাতার সহায়তায় নিজদেহে সঞ্চিত করিয়াছে।

পণ্ডিতগণ মনে করেন, শক্তি কখনও প্রস্তুত বা নিঃশেষ করা যায় না যদিও ইহাকে নানাবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। সূর্য্য হইতে যে সমস্ত শক্তি নিয়ত বিকীর্ণ হয় তন্মধ্যে শুদ্ধ আলোকশক্তিকে বৃক্ষস্থ সবুজপাতা গ্রহণ করে এবং নিজদেহে বিভিন্ন প্রকৃতিতে সঞ্চিত করিয়া রাখে। পরিশেষে তাহা হইতেই পাওয়া যায় রাসায়নিক শক্তি—তাপশক্তি।

তাপশক্তি হইতে কর্ম্মশক্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সাধারণত উষ্ণ অবস্থার তাপকেই কতকাংশে কর্ম্মে পরিণত করা যায়। তাপ শীতল স্থান হইতে উষ্ণ স্থানে যাইতে চাহে না, কাজেই তাহা হইতে কর্ম্মও পাওয়া যায় না ; ইহাই তাপচাল-বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান নিয়ম। একটী উত্তপ্ত বস্তু শীতল জলে ফেলিলে বস্তুটীর তাপ কমিয়া এবং জলের তাপ বাড়িয়া সমতা প্রাপ্ত হয়—উত্তপ্ত বস্তুটী হইতেই তাপ প্রবাহিত হইয়া জলের উত্তাপ বাড়ায়, শীতল জল হইতে তাপ প্রবাহিত হইয়া উত্তপ্ত বস্তুটীর তাপ আরও বাড়াইতে পারে না। ইহাই প্রকৃতির চিরাচরিত প্রথা এবং ঠিক এইরূপই ঘটিতেছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে।

তাপচল-বিজ্ঞানের এই ধারা অবলম্বন করিয়া সূর্য্য ও অপরাপর উত্তপ্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি হইতে তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকিবে এবং তার ফলে একদিন বিশ্বের সর্ব্বত্র তাপ সমতা প্রাপ্ত হইবে। আকাশ-বাতাস গ্রহ-উপগ্রহ সর্ব্বত্রই তাপ সমান হইয়া যাইবে, তখন সেই তাপ হইতে কোন কর্ম্ম পাওয়া যাইবে না, উপরন্তু বিশ্বের তাপ হ্রাস পাইয়া এত শীতল অবস্থা প্রাপ্ত হইবে যে, তাহাতে কোন প্রাণী জীবন্ত থাকিতে পারে না। শীতের করাল স্পর্শে পৃথিবীর বুকে প্রাণের স্পন্দন চিরতরে থামিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকমতে সেইদিনই মহাপ্রলয়। এই বিচিত্র ধরণীর বুকে আমাদের আবির্ভাব হইয়াছিল হঠাৎ এবং তিল তিল করিয়া প্রতিদিন নিশ্চিত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে হইতে আবার তেমনি হঠাৎ একদিন এই বিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ হইতে আমাদের স্মৃতি নির্ম্মূল হইয়া যাইবে —যেন আমাদের অস্তিত্বই ছিল না কোন কালে। এমনি করিয়াই শেষ হইবে হতভাগ্য জীবের জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস।

গান

জ্বালিনি হৃদয়দীপে শিখাটি প্রেমে আমার
তাই বুঝি এসে প্রিয়, ফিরে যাও বারে বার ?
খুলিনি আগল মম—চাহিনি তো অভিসার
তাই বুঝি দ্বারে এসে ফিরে যাও শতবার ?

রহ ব'সে আড়ালে যে দোলাতে আলোর ডোর
বৃথা বেলা না কাটায়ে জ্বেলে নেব দীপ মোর।
তব আশা বৃথা ক'রে ধাই পিছে ছলনার,
তাই বুঝি এসে কাছে ফিরে যাও বারে বার ?

ফাঁদে পড়ি আজো হায় নিতি নব মমতার,
মায়া-কারা লই বেছে—রহে শেষে আঁখিধার।
তব কৃপা দূরে ঠেলি' যাচি দুখ পারাবার
তাই বুঝি এসে প্রিয় ফিরে যাও বারে বার।

প্রাণ বেদীমূলে আজো পূজারতি আনি নাই
শরণাগতির সুর আজো যে গো সাধি নাই
তব করে আপনারে সঁপি নাই প্রেমাধার !
তাই বুঝি এসে কাছে ফিরে যাও বারে বার ?

কথা ঃ—শ্রীমতী রাণী মৈত্র

সুর ও স্বরলিপি ঃ—দিলীপকুমার

II । সা -া রা । গা -া মা -া । । পা -া ধা । না -া র্সা -া ।
- জ্বা - লি নি - হৃ - - দ - য় দী - পে -
- ফাঁ - দে প - ড়ি - - আ - জো হা - - -

। নর্সা র্গা র্রা ¦ র্সা -া না -া : । র্সনা ধপা ধা | র্সা -া -া -া
- শি - খা টি - প্রে - - মে - আ মা - - র
য় নি - তি ন - ব - - ম - ন তা - - র

। না -া র্রা | নর্রা সর্সা পা -া | । ধা -া র্সা | ধর্সা ণণা ধা -া
- তা - ই বু - ঝি - - এ - সে প্রি - য -
- না - রা কা - রা - - ল - ই বে - ছে -

। পা ক্ষা পা ¦ ক্ষধা পপা রা -া | । মজ্ঞা -া সরা | সা -া -া -া
- ফি - রে যা - ও - - বা - রে বা - - র
- ব - হে শে - সে - - আঁ - খি ধা - - র

| গা -া গা | গা -া গা -া | মা মা পা পা | পা ধা ক্ষপা -া
০ খু - লি নি - আ - - গ - ল ম - ম -
০ ভু - ব রু - পা - - দূ - রে ঠে - লি -

। পা -া ধা | র্সা -া র্রা -া | -া র্গা মর্গা র্রা ¦ র্সা -া -া -া
- চা - হি নি - তো - - অ - ভি সা - - র
- যা - চি দু - খ - - পা - রা বা - - র

। র্সা না র্সা | নর্সা র্রজ্ঞা জ্ঞা -া | -া র্রা -া মর্জ্ঞা | র্রা জ্ঞর্রা র্সা -া
- তা - ই বু - ঝি - - দ্বা - রে এ - সে -
- তা - ই বু - ঝি - - এ - সে প্রি - য় -

। না -া র্সা | নর্সা না দা -া | । পা মা পা | মপা মগা সা মা
- ফি - রে যা - ও - - শ - ত বা - - র
- ফি - রে যা - ও - - বা - রে বা - - র

। র্সা ণা ণা | ধা -া ণা ধা | ণা পধা পা পা | ধা -া ধর্সা ণধা
- র - হ বো - সে - - আ - ড়া লে - যে -
- প্রা - ণ বে - দী - - মূ - লে আ - জো -

পা ধা ণা পধা | ধা পা মা গা | রগা মা -া পা | ধা মপা -া -া
- প - রা তে - আ - - লো - র ডো - - র
- পূ - জা র - তি - - আ - নি না - - ই

। পা -া পা | পা দা পমা -া | -া পা -া ণা | র্সা -া র্রা -া
- বৃ - থা বে - লা - - না - কা টা - য়ে -
- শ - র ণা - গ - - তি - র সু র

-া র্গা মর্গা র্রা | র্সা -া না -া | -া র্সনা ধপা ধা | র্সা -া -া -া |
- জ্বে - লে নে - ব - - দী - প মো - - র
- আ - জো যে - গো - সা - ধি না - - ই

। পা -া পা | ধনা র্সর্রা র্সর্রা র্সা | -া ধনা নর্সা র্সর্রা | র্রর্গা র্গর্রা র্সা -া |
- ত - ব আ - শা - - বৃ - থা কো - রে -
- ত - ব ক - রে - - আ - প না - রে -

-া র্সা -া র্গা | র্গা পমা র্গা মর্গা | র্রা র্গা না র্রা | র্গা র্সা -া -া |
- ধা - ই পি - ছে - - ছ - ল না - - র
- সঁ - পি না - ই - - প্রে - মা ধা - - র

। না র্সা র্রা | র্গা -া র্সা -া | -া পা ধা না | র্সা -া পা -া |
- তা - ই বু - ঝি - - এ - সে কা - ছে -
- তা - ই বু - ঝি - - এ - সে কা - ছে -

-া গা মা পা | পদা -া পা -া | । গা মগা রা | সা -া -া -া II
- ফি - রে যা - ও - - বা - রে বা - - র
- ফি - রে যা - ও - - বা - রে বা - - র

স্পর্শ

প্রিন্সিপাল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বেসুরাতে যতই আমি
গাই না কেন গান,
তোমার সুরে নিত্য বাঁধা
রয়েছে এই প্রাণ।
সংসারেরই নানা ব্যাপার
ধাঁধা লাগায় কাজে,
তোমার মুখে তখন আমি
চাইতে নারি লাজে।
একলা যখন বসে থাকি
আঁধার-ঘেরা রাতে,
তরুলতা নিঝুম ঘুমে
কেউ থাকে না সাথে।
তারারা সব মিট্‌মিটিয়ে
কোটি যোজন দূরে,
ছন্দে গাঁথা মন্ত্র পড়ে
সীমাহীনের সুরে।
এক নিমেষে বক্ষ ভরে
নবীন চেতনাতে,
হৃদয়-নাড়ী ছিন্ন করে
অসীম যাতনাতে।
মলিন করা পঙ্কে-ভরা
তপ্ত অহঙ্কার,
সুরের স্রোতে স্নিগ্ধ করে
বেদনা-ঝঙ্কার
তখন আমার একতারাতে
একটি যে গান ওঠে,
সেই গানেতে হৃদয়-কোরক
চরণতলে ফোটে।

মুরারির লীলা বর্ণনের ভঙ্গী

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার সাক্ষী মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্বন্ধে বিমানবাবুর কোন কোন মন্তব্যের সমালোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। বিমানবাবু তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" নামক গ্রন্থে (৭৯ পৃঃ) **মুরারির লীলা বর্ণনের ভঙ্গী** এই শিরোনাম লিখিয়াও অনেক কথা লিখিয়াছেন। মুরারির সংস্কৃত ভাষায় লিখিত করচার সহিত অনেকের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলা প্রভৃতির বর্ণনায় মুরারির অনেক কথাও প্রকাশ করা আবশ্যক। নচেৎ বিমানবাবুর মন্তব্যের সমালোচনা করা যায় না।

বিমানবাবু **মুরারির লীলা বর্ণনের ভঙ্গী** দেখাইতে লিখিয়াছেন—

"বৃন্দাবন দাস, লোচন, জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন জন্মের সময় হইতেই শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্রূপে ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন, মুরারি তাহা করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কেবলমাত্র একবার তিনি মাতাকে একাদশী ব্রত পালনের উপদেশকালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।" ৮১ পৃঃ

"জন্মের সময় হইতেই শ্রীচৈতন্যের ভগবদ্রূপে ব্যবহার" কি, ইহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। ভগবানের ন্যায় অলৌকিক কার্য্য করাই কি 'ভগবদ্রূপে ব্যবহার'? বিমানবাবুর কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, শচীনন্দন শ্রীবিশ্বম্ভর দেব বাল্যকাল হইতেই যে তাঁহার ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, ইহা মুরারি গুপ্ত বর্ণন করেন নাই। কারণ বিমানবাবু পরেই লিখিয়াছেন, "তিনি দেখাইয়াছেন যে গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কেবলমাত্র একবার তিনি মাতাকে একাদশী ব্রত পালনের উপদেশকালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।"

কিন্তু সেই উপদেশকালে শচীনন্দন শ্রীবিশ্বম্ভরের বয়স কত ইহাও বুঝিতে হইবে। "গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে" এই কথা লিখিলে কি বুঝা যায়। গয়া হইতে নবদ্বীপে পৌছিবার পূর্ব্বে ইহাও কেহ বুঝিতে পারেন না কি? বিমানবাবুর ঐরূপ অস্পষ্ট সময়-নির্দ্দেশের প্রয়োজনই বা কি?

বস্তুতঃ মুরারি গুপ্ত তাঁহার 'করচা'য় সপ্তম সর্গে শচীনন্দন শ্রীবিশ্বম্ভরের বাল্যলীলার বর্ণন করিতেই লিখিয়াছেন, —তদিত্থমাকর্ণ্য বচোঽমৃতং পুনস্তাং প্রাহ **"মাত র্ন হরেস্তিথৌ ত্বয়া ভোক্তব্যং"** ইত্যাদি। অর্থাৎ শচীনন্দন শ্রীবিশ্বম্ভর একদিন মাতাকে বলিয়াছিলেন, মা! তুমি একাদশীতে ভোজন করিও না। তখন তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র জীবিত ছিলেন।

মুরারি গুপ্ত পরে অষ্টম সর্গে জগন্নাথ মিশ্রের ৺বৈকুণ্ঠগমনের বর্ণন করিয়া নবম সর্গে শ্রীবিশ্বম্ভরের বিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে অধ্যয়নের কথা লিখিয়াছেন। পরে নবদ্বীপের বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবীর সহিত শ্রীবিশ্বম্ভরের বিবাহের প্রস্তাবের বর্ণন করিয়াছেন। সেই প্রস্তাব শুনিয়া তখন শচীমাতা কি বলিয়াছিলেন? মুরারি লিখিয়াছেন—

> "এতৎ শ্রুত্বা শচী প্রাহ বালোঽয়ং মম পুত্রকঃ।
> পিত্রা বিহীনঃ পঠতু তত্রোদ্যোগো বিধীয়তাম্॥" ৯।১১

পরে বিধাতার ইচ্ছায় প্রথমে লক্ষ্মী দেবীর সহিতই শ্রীবিশ্বম্ভরের বিবাহ হয়। প্রত্যক্ষদর্শী মুরারি গুপ্ত সেই বিবাহের অধিবাস ও পরে বিবাহোৎসবের যেরূপ সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তৎকালীন অনেক বিশিষ্ট আচারেরও সংবাদ জানা যায়। বিবাহের কিছু দিন পরে শ্রীবিশ্বম্ভর নবদ্বীপ হইতে কিছুদিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে নবদ্বীপে তাঁহারই গৃহে একদিন বধূ লক্ষ্মী দেবীর চরণমূলে দৈবাৎ সর্প-দংশন হয়। মুরারি লিখিয়াছেন—

> "এবংস্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী।
> অদশৎ পাদমূলে তাং লক্ষ্মীমালক্ষ্য মা শচী॥" ১।১১—২১

শচী মাতা বহু চেষ্টা করিলেও "মন্ত্রৈর্ব্বহুবিধৈ র্নাভূত্তদ্বিষমার্জনম্।" বহুবিধ মন্ত্রের দ্বারাও সেই বিষমার্জন না হওয়ায় শচীমাতা পুত্রবধূকে গঙ্গাজল-মধ্যে আনিয়া তাঁহাকে "তুলসীদামভূষিতা" করিয়া "সহ স্ত্রীভিশ্চকার হরি-কীর্ত্তনম্।" অর্থাৎ তখন সেখানে স্ত্রীগণের সহিত হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

মুরারি গুপ্ত তাঁহার করচার প্রথম প্রক্রমের একাদশ সর্গে ঐ ঘটনার বর্ণন করিয়া পরে দ্বাদশ সর্গে শচী দেবীর বিলাপ প্রভৃতির বর্ণন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ সর্গে নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীবিশ্বম্ভরের দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাবাদির বর্ণন করিয়া চতুর্দ্দশ সর্গে সেই বিবাহোৎসবের বর্ণন করিয়াছেন। পরে পঞ্চদশ সর্গে বর্ণন করিয়াছেন—

"শ্রাদ্ধং স কৃত্বা বিধিবদ্ বিধানবিদ্
গয়াং প্রতস্থে ক্ষিতি দেবতান্বিতঃ ॥৬।

অর্থাৎ বিধানবিৎ শ্রীবিশ্বম্ভর যথাশাস্ত্র ৺গয়াযাত্রারম্ভে নিজ গৃহে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণসমন্বিত হইয়া গয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। মুরারি পরে ৺গয়াধামে শ্রীবিশ্বম্ভরের যথাশাস্ত্র পিতৃকৃত্যের বিস্তৃত বর্ণন এবং গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে তাঁহার মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। পরে ষোড়শ সর্গে দৈববাণীর বর্ণন ও শ্রীবিশ্বম্ভরের নবদ্বীপে আগমন প্রভৃতির বর্ণন করিয়া প্রথন প্রক্রম সমাপ্ত করিয়াছেন।

ফল কথা, মুরারি গুপ্তের বর্ণনানুসারে শচীনন্দন শ্রীবিশ্বম্ভর দ্বিতীয় বিবাহের পরে গয়ায় গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি গয়াযাত্রার বহু পূর্ব্বে একদিন শচী মাতাকে বলিয়াছিলেন, মা! তুমি একাদশীতে ভোজন করিও না। তখন তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র জীবিত। কিন্তু মুরারি শ্রীবিশ্বম্ভরের বাল্যলীলার বর্ণন করিতে পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘটনার বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এমন কথা বলা যায় না যে, বিশ্বম্ভর "কেবলমাত্র একবার মাতাকে একাদশী ব্রতপালনের উপদেশকালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন।"

মুরারি পূর্ব্বে ষষ্ঠ সর্গে বর্ণন করিয়াছেন যে, একদিন তীর্থভ্রমণশীল কোন পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাদর অনুরোধে তাঁহার গৃহে ভোজনের পূর্ব্বে সেই পক্কান্ন নিজের উপাস্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করার পরেই শিশু বিশ্বম্ভর সহসা স্বয়ং আসিয়া সেই অন্ন ভোজন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বৃন্দাবনে নন্দগৃহের সেই কুতূহল স্মরণ করাইয়া ছিলেন। মুরারি লিখিয়াছেন—

"তীর্থভ্রমণশীলস্য দ্বিজস্যান্নং জনার্দ্দনঃ।
ভুক্ত্বা তং স্মারয়ামাস নন্দগেহ-কুতূহলম্ ॥
একদা ধর্তুমাত্মান মুদ্যতাং জননীং রুষা।
বীক্ষ্য কোপপরাপূর্ণো ভাজনানি বভঞ্জ সঃ।
পুরা ভগ্নে চ ভাণ্ডে যং যশোদা পশু-রজ্জুভিঃ।
ববন্ধ বেপিতা তস্য ভয়াদ্বীক্ষ্য মুখং শচী ॥" ৬।৮।১১।১২

চৈতন্যভাগবতে (১।৩) বৃন্দাবন দাস ঐ ঘটনার বিস্তৃত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত সূত্ররূপে ঐ ঘটনার বর্ণন করিতেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শেষে যে, "নন্দগেহকুতূহলং" লিখিয়াছেন এবং শেষোক্ত শ্লোকে যে, "যশোদা পশু-রজ্জুভিঃ"—লিখিয়াছেন, ইহারও তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। উহা কি "ভগবদ্রূপে ব্যবহার"—বর্ণন নহে?

মুরারি উহার পরেই বর্ণন করিয়াছেন—"উপর্য্যুপরি বিন্যস্তত্যক্তমৃদ্ভাণ্ডসংহতৌ" অর্থাৎ যে স্থানে পরিত্যক্ত ভাতের হাড়ীগুলি উপরে উপরে বিন্যস্ত ছিল, এমন অশুচিস্থানে উপবেশন করিয়া "মাতুরগ্রে জহাস সঃ" অর্থাৎ শিশু বিশ্বম্ভর ঐ অশুচি স্থানে বা সেই হাড়ীর উপরে বসিয়া মাতার সম্মুখে হাস্য করিতেছিলেন। তখন—

"তং দৃষ্ট্বা সা শচী প্রাহ ত্যজ তাত! জুগুপ্সিতং।
স্থানং, শুদ্ধং পুনঃ স্নাত্বা মমাঙ্কারোহণং কুরু ॥
এবমুক্তে তু তাং প্রাহ ভগবান্ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
দত্তাত্রেয়স্য ভাবৈকপূর্ণঃ সর্ব্বজ্ঞ পুত্রকঃ ॥" ৬।১৪।১৫

অর্থাৎ তখন শচীমাতা শিশুপুত্রকে বলিয়াছিলেন যে তুমি ঐ অশুচি স্থান পরিত্যাগ কর। শুদ্ধভাবে পুনর্ব্বার স্নান করিয়া আমার কোলে উঠ। তখন শচীমাতার ঐ কথা শুনিয়া সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ভগবান্ শিশু বিশ্বম্ভর দত্তাত্রেয়-ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন। কি বলিয়াছিলেন? মুরারি তাহা বর্ণন করিতে পরেই অতি সুন্দর শ্লোক লিখিয়াছেন—

"শৃণু শুচি রশুচির্ব্বা কল্পনামাত্র মে তৎ
ক্ষিতি-জল-পবনাগ্নি-ব্যোমচিত্রং জগদ্ধি।
বিতত বিভবপূর্ব্বা দ্বৈতপাদাজ্ঞ একো
হরিরিহ করুণাব্ধি র্ভাতি নান্যৎ প্রতীহি ॥১৬
অতঃ পবিত্র এবাস্মি নাপবিত্রঃ কথঞ্চন।
জানীহি মাত র্নান্যাং ত্বং শঙ্কাং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥"১৭

তাৎপর্য্য এই যে, শুচি ও অশুচি, ইহা অজ্ঞলোকের কল্পনামাত্র। এ জগতে সেই করুণাসাগর হরি ভিন্ন আর

কিছুই নাই। সমস্তই সেই হরি, সুতরাং সমস্তই পবিত্র। অতএব আমি পবিত্রই আছি, কোন রূপে অপবিত্র নহি। ইহাই তখন শিশু বিশ্বম্ভরের দত্তাত্রেয়ভাবের আবেশে মাতাকে উপদেশ। বিমানবাবু লিখিয়াছেন—"সম্ভবতঃ শিশু বিশ্বম্ভরের অশুচি স্থানে উপবেশন কালে দত্তাত্রেয়ভাব হইয়াছিল।" (৮১ পৃঃ)। কিন্তু মুরারি গুপ্তের "**ভগবান্ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ। দত্তাত্রেয়স্য ভাবৈক পূর্ণঃ**"—এই স্পষ্ট কথা পাইয়াও তাঁহারই কথা লিখিতে উক্তস্থলে "সম্ভবতঃ" কেন লিখিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলাম না। বিমানবাবু ঐ কথার পরে আবার লিখিয়াছেন—

"মুরারি যে নবদ্বীপ লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আবেশের সময় ব্যতীত অন্যসময়ে অলৌকিক অর্থাৎ যোগি-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন এমন কিছুই লেখেন নাই।"

তাহা হইলে বুঝিতেছি, বিমানবাবুর মতে বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার বর্ণনায় আবেশের সময় ব্যতীত অন্যসময়েও এমন বর্ণন করিয়াছেন, যাহা যোগি-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পক্ষেও বিশ্বাস করা কঠিন।

কিন্তু বিমানবাবু 'অর্থাৎ' বলিয়া "অলৌকিক" শব্দের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। কারণ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পক্ষেও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কোন নিয়ম বদ্ধ নাই। যাহা অনেকে বিশ্বাস করেন না, তাহা বহু লোকে বিশ্বাস করিতেছেন। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষেও বহু সম্প্রদায়ের বহু বিভিন্ন মত ও বহুবিধ বিশ্বাসের কথা চিন্তা করিলেই ইহা বুঝা যায়। বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে সমস্ত অলৌকিক বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও ভারতের সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিশ্বাস করেন। সুতরাং 'অলৌকিক' শব্দের উক্ত রূপ অর্থ ব্যাখ্যা করা যায় না। বিমানবাবু পূর্ব্বে (১১পৃঃ) লিখিয়াছেন :

"এযুগের গবেষকগণ শ্রীচৈতন্যের জীবনে অলৌকিক ঘটনা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আমাদিগের দেশে এখনও ত এমন লোক বিরল নহেন, যিনি সামান্য দুই-চার পয়সায় অলৌকিক ঘটনা দেখাইয়া থাকেন," ইত্যাদি।

এখানে বিমানবাবুর অনাবশ্যক দৃষ্টান্তটি কোনরূপেই সংগত বুঝি নাই। আর "সামান্য দুই-চার পয়সায়" প্রদর্শিত ঘটনাও কি বিমানবাবুর ব্যাখ্যানুসারে অলৌকিক ঘটনা? নচেৎ পূর্ব্বোক্ত "অলৌকিক" শব্দের অর্থ কি? পরন্তু এযুগের গবেষকগণের মধ্যে কেহই যে 'শ্রীচৈতন্যের জীবনে অলৌকিক ঘটনা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না, ইহাও কি সত্য? আমি কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে পারি না। সে যাহা হউক, মূল কথা, মুরারি গুপ্তও শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বর্ণন করিয়াছেন, ইহা সত্য।

মুরারি গুপ্তের বর্ণনা হইতে পরবর্ত্তী চরিতগ্রন্থকার বৃন্দাবন দাস প্রভৃতির বর্ণনায় যে বিশেষ নাই, ইহা কিন্তু আমি বলিতেছি না। বহু বিশেষ আছে। চরিতগ্রন্থে ক্রমে নানা কারণে অনেক অতিরিক্ত বর্ণন হইয়া থাকে। বৃন্দাবন দাস মুরারি গুপ্তের অনেক বর্ণনা গ্রহণ করিয়াই বিস্তৃতভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক বর্ণনা কোন অংশে অন্যরূপও করিয়াছেন এবং অনেক বর্ণনার প্রকাশও করেন নাই। মুরারিও সূত্ররূপেই শ্রীচৈতন্যদেবের নবদ্বীপলীলার বর্ণন করায় অনেক কথা লেখেন নাই। কিন্তু তথাপি তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যলীলার বর্ণনেও অনেক অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনিও মায়ী পরমাত্মার লোকোত্তর বিচিত্রবীর্য্য বলিয়া উহার অলৌকিকত্বই ব্যক্ত করিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গের শেষে তিনি আবার লিখিয়াছেন—

"অথান্য চ্ছৃণু বীর্য্যাণি বিচিত্রাণি মহাত্মনঃ।
লোকোত্তরাণি সাধূনি মায়িনঃ পরমাত্মনঃ ॥
রাত্রৌ কদাচিৎ সংসুপ্তা শচী পূর্ণাং জনৈরিব।
পুরীমালক্ষ্য সংবিগ্না ক্রোড়স্থং স্বসুতং শচী ॥
শঙ্কিতা প্রেষয়ামাস পতি-গেহে ত্বরান্বিতা।
পূজিতং পথি দেবৈশ্চ শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরং হরিং ॥"

অর্থাৎ একদিন রাত্রিকালে শচীমাতা সহসা সেই পুরীকে জনপূর্ণার ন্যায় দেখিয়া শঙ্কিতা হইয়া ক্রোড়স্থ বালক পুত্র বিশ্বম্ভরকে শীঘ্র পতিগৃহে পাঠাইয়াছিলেন। বালক বিশ্বম্ভর পিতৃগৃহে যাইবার সময়ে পথে দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তখন—

"পথি প্রয়াতস্য সুতস্য পাদয়োঃ
সুরক্তয়োর্নূপুর-নিস্বনং মুহুঃ ।
শ্রুত্বা সশঙ্কঃ কিমিদং কুতঃস্বনো
বাৎস্যঃ * শচীং প্রাহ শচী চ বাৎস্যম্ ॥"৬।৩৪

অর্থাৎ পথে যাইবার সময়ে বালক পুত্র বিশ্বম্ভরের রক্তবর্ণ চরণদ্বয়ে নূপুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া বাৎস্য (বাৎস্যগোত্র জগন্নাথ মিশ্র) সশঙ্ক হইয়া পত্নী শচী দেবীকে এবং শচী দেবীও পতি জগন্নাথ মিশ্রকে বলিয়াছিলেন -ইহা কি ? কোথা হইতে এই নূপুরধ্বনি শুনিলাম ?

"চৈতন্য ভাগবতে" কবিপ্রবর বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় ঐ ঘটনার বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন--

" একদিন ডাকি বোলে মিশ্রপুরন্দর ।
আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর ॥
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাই যায়ে ।
রুনু ঝুনু করিতে নূপুর বাজে পা'য়ে ॥
মিশ্র বোলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি ।
চতুর্দ্দিগে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ।
আমার পুত্রের পা'য়ে নাহিক নূপুর ।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর ॥

কি অদ্ভুত দুইজনে মনে মনে গণে ।
বচন না স্ফুরে দুইজনের বদনে ॥১।৩

মুরারি সপ্তম সর্গে আরও বর্ণন করিয়াছেন—

"নিবেদিতং পূগফলাদিকং যৎ
দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাং ।
ব্রজামি দেহং পরি পালয়স্ব
সুতস্য নিশ্চেষ্ট গতং ক্ষণার্দ্ধম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চাপতদ্ ভুবি ।
বিশ্বম্ভরং গতং দৃষ্ট্বা মাতা দুঃখসমন্বিতা ॥
স্নাপয়ামাস গাঙ্গেয়ৈ স্তোয়ৈরমৃত কল্পকৈঃ ।
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোহসৌ ভূত্বা সংস্থবসৎ সুখী ॥
তেজসা সহজেনৈব তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতোহভবৎ ।
জগন্নাথোহব্রবীচ্চৈনাং "দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে ॥"
১৬।২১—২৪

অর্থাৎ শচীনন্দন শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর পরে কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিবেদিত ফলাদি ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার মাতাকে বলিয়াছিলেন "আমি চলিলাম, তুমি কিছুকালের জন্য আমার দেহকে রক্ষা কর।" বিশ্বম্ভর এই কথা বলিয়াই সহসা উঠিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। "বিশ্বম্ভরং গতং দৃষ্ট্বা মাতা দুঃখসমন্বিতা।" তখন শচীমাতা তাঁহাকে অমৃতকল্প বহু গঙ্গাজলের দ্বারা স্নান করাইলে তিনি প্রবুদ্ধ ও সুস্থ হইয়াছিলেন। পরে জগন্নাথ মিশ্র ঐ ঘটনা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া পত্নী শচী দেবীকে বলিয়াছিলেন "দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে"—অর্থাৎ দৈবী মায়া বুঝি না।

মুরারি এই বর্ণনার পরেই ঐরূপ ঘটনার কারণ বিষয়ে দামোদর পণ্ডিতের প্রশ্নের বর্ণন করিয়া পরে অষ্টম সর্গে তাহার উত্তর বলিতে লিখিয়াছেন, "জনস্য ভগবদ্ ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি। হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ" ইত্যাদি। সুতরাং মুরারি গুপ্ত যে কেবলমাত্র একবার মাতাকে একাদশী ব্রত পালনের উপদেশ কালে বিশ্বম্ভরের আবেশের বর্ণন করিয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। পরন্তু বিমানবাবুও পরে লিখিয়াছেন,

"মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায় যে, শৈশবকাল হইতেই মাঝে মাঝে বিশ্বম্ভরের অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পাইত এবং তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া নানারূপ উপদেশ প্রদান

---

* মুরারি গুপ্ত এখানে জগন্নাথ মিশ্রকে 'বাৎস্য' নামেই উল্লেখ করায় তিনি যে শ্রীহট্টীয় প্রসিদ্ধ বাৎস্য গোত্র বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা নিশ্চিত। মুরারি পূর্ব্বেও পঞ্চম সর্গের শেষে লিখিয়াছেন—"বাৎস্যশ্চকার পুত্রস্য জাত কর্ম্মমহোৎসবম্ ॥" কিন্তু এদেশে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজে অনেক পণ্ডিতেরও সংস্কার আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভরদ্বাজ গোত্র ছিলেন। কলিকাতায় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে (১৩৪৬) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণেও (২২শ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে, "সামবেদী ভরদ্বাজগোত্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের" কিন্তু শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের নিকটবাসী মুরারি গুপ্তের কথাই সত্য। মুরারি পূর্ব্বে তৃতীয় সর্গে শ্রীহরির নিকটে নারদের প্রার্থনার বর্ণন করিতেও লিখিয়াছেন, "বাৎস্যে জগন্নাথসুতেতি বিশ্রুতিং সমাপ্নুহি ত্বং কুরুশং ধরণ্যাঃ।" (২০)। বিমানবাবু লিখিয়াছেন, "ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া বাৎস্যগোত্রে জগন্নাথসুত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিলেন।" (২৫৫-৫৬ পৃঃ) কিন্তু মুরারির ঐ শ্লোকে নারদের প্রার্থনাই বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকে শ্রীহরির উক্তি বর্ণিত হয় নাই।

করিতেন। মুরারি গুপ্ত এই ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন, "জনস্য ভগবদ্ ধ্যানাৎ" ইত্যাদি (৫৯০পৃঃ)।

কিন্তু বিশ্বম্ভরের মাঝে মাঝে অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ ও ভাবাবেশ হইলে—বিমানবাবুর পূর্ব্বলিখিত কথা—অর্থাৎ বিশ্বম্ভর, 'কেবলমাত্র একবার মাতাকে একাদশী ব্রত-পালনের উপদেশকালে আবিষ্ট হইয়াছিলেন' এই কথা—কিরূপে সংগত হইবে? আর মাঝে মাঝে যে অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ হইত, সে কিরূপ অলৌকিক বিভূতি? উক্ত "অলৌকিক" শব্দের অর্থ কি? বিমানবাবু পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "অলৌকিক অর্থাৎ যোগি-সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষের অধিবাসীর পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।" (৮১পৃঃ) কিন্তু ঐ অর্থ যে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বিমানবাবু ঐ কথার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—"মুরারি শ্রীচৈতন্যের ভগবদাবেশের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী বৈষ্ণবসমাজ গ্রহণ করেন নাই" (৮১ পৃঃ)। কিন্তু "বৃহদ্ভাগবতামৃতে"র তৃতীয় শ্লোকে বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামীও লিখিয়াছেন—"সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তরূপেই নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদনুসারে মুরারিও তাঁহার সেই দেহকে ভক্তদেহ বলিয়া তাহাতে ভগবদাবেশের কথা বলিয়াছেন। চৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবনদাসও অনেকবার ভগবদাবেশের বর্ণন করিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে আরও অনেক প্রশ্ন ও বক্তব্য আছে। কিন্তু অবতারতত্ত্বের আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অন্য প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে যথামতি আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

এখন বক্তব্য এই যে, মুরারি গুপ্তের করচায় চারিটি প্রক্রম আছে। বিমানবাবু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রক্রমের শ্লোকও গ্রহণ করিয়াছেন। আর তিনি পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন, "বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন শ্লোকই আমি প্রক্ষিপ্ত বলিতে রাজী নহি" (৭৬ পৃঃ)। পরন্তু তিনি তৃতীয় প্রক্রমের পঞ্চদশ সর্গের "সুখাসীনং জগন্নাথং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পরে লিখিয়াছেন—"বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে মুরারির উক্তির সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না। সেই জন্য গোপালভট্টের পিতার নাম ত্রিমল্লভট্ট বলিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম।" ১৫৮পৃঃ।

পরন্তু চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গও যে মুরারি গুপ্তের রচিত, এ বিষয়ে বিমানবাবু পূর্ব্বে কোন সন্দেহ সূচনা করেন নাই। কারণ তিনি পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—

"মুরারি (৪।১৪।৩-১১) বলেন যে, তিনি একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন।" "মুরারি ও বাসু ঘোষের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্য গৌড়ভ্রমণের সময়ে একবার নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। যে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসনিষ্ঠা বা মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, সে গুলি পরবর্ত্তী চরিতকারগণ বাদ দিয়াছেন।" (৬০-৬১ পৃঃ)।

কিন্তু এই মন্তব্যও কি সর্ব্বাংশে সত্য? এ বিষয়েও অনেক বক্তব্য আছে। যাহা হউক; বিমানবাবু যে মুরারির করচার চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গও অকৃত্রিম বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমার এখানে বক্তব্য। কারণ, ঐ চতুর্দ্দশ সর্গেই বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব পরে একবার নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার চরণবন্দনা করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শচীমাতার প্রদত্ত অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্ত হইয়াছিলেন। পরন্তু মুরারির করচার চতুর্থ প্রক্রমের ঐ চতুর্দ্দশ সর্গেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বর্ণনার পরেই "প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিং"—ইত্যাদি শ্লোক আছে। কিন্তু বিমানবাবু পরে লিখিয়াছেন,

"মুরারি গুপ্তের মুদ্রিত করচার চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্দ্দশ সর্গ যদি অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, যথা "প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়া" ইত্যাদি (৬০৩ পৃঃ)। কিন্তু বিমানবাবু পূর্ব্বে যে চতুর্দ্দশ সর্গকে অকৃত্রিম বলিয়াই গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন—তাহাতেই পরে "যদি অকৃত্রিম হয়" এইরূপ উক্তির দ্বারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন কেন? আর তিনি পূর্ব্বে "কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিতে রাজি নহি"—এই কথা লিখিয়াও পরে যদি আবার ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার মত কি বুঝিব? পরন্তু "প্রকাশরূপেণ নিজ প্রিয়ায়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি মুরারি গুপ্তের রচিত নহে—ইহা যদি কোন দিন প্রতিপন্নও হয়, তাহা হইলেও কি বিনা প্রমাণে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে?

বস্তুতঃ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই প্রথমে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। তখন তাঁহার

ভ্রাতা মাধবাচার্য্যও পরে ভ্রাতুষ্পুত্র যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সেবাভার গ্রহণ করেন। আমরা নবদ্বীপে অধ্যয়ন-কালেও বৃদ্ধমুখে ঐরূপ কথা শুনিয়াছি। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পরে নবদ্বীপের নৈয়ায়িক বংশে কেহই শ্রীচৈতন্যদেবের ঐরূপ পূজ্যতা স্বীকার করেন নাই—ইহা সত্য নহে। যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পুত্র জগদীশ তর্কালঙ্কার জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িক। পরে—জগদীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ষষ্ঠীদাস বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যদেব বিগ্রহের সেবক হন। জগদীশ অধ্যাপনা ও গ্রন্থ-রচনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

জগদীশের বহু গ্রন্থ আছে। তিনি রঘুনাথ শিরোমণির 'দীধিতি'র সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার। এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যাঁহারা নব্য ন্যায় পড়িতেছেন, তাঁহারা 'জাগদীশী' টীকা পড়িতেছেন। জগদীশের "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের এম-এ পরীক্ষায় সাধারণ শ্রেণীতেই উহা পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট। ভারতের সর্ব্বত্র পণ্ডিতগণ বলেন, "জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।"

ষষ্ঠীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদীশ তর্কালঙ্কারের সম্বন্ধে বহু কথা লেখ্য আছে। এই প্রবন্ধে তাহা লেখা সম্ভব নহে। কিন্তু কোন কোন কথা সংক্ষেপে লিখিতে হইতেছে। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা পণ্ডিত ৺পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী এম-এ মহাশয় (যাঁহার অনেক কথা পূর্ব্বে ষষ্ঠ প্রবন্ধে লিখিয়াছি) শিলচর হইতে প্রকাশিত **শিক্ষাসেবক** পত্রিকায় (১৩৩৭ শ্রাবণ সংখ্যায়—) লিখিয়া গিয়াছেন—

"জগদীশ যাদব মিশ্রের পুত্র ছিলেন। যাদব শ্রীচৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুজ ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা সনাতন শ্রীহট্ট জয়পুর হইতে নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট হন, অতএব জগদীশ শ্রীহট্টীয়ই বটেন।"

৺বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এ বিষয়ে কোন প্রমাণই প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার মতে নবদ্বীপনিবাসী "সময়প্রদীপ" নামক স্মৃতিনিবন্ধকার "বন্দ্যঘটীয়" (বন্দ্যোপাধ্যায়) স্মার্ত্ত হরিহরের পুত্র জগদ্বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রীহট্টীয়। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" পুস্তকে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ও ইহাই লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে কথা বাড়িয়া যাইবে। এখানে জগদীশের কথাই লিখিতেছি।

মৎপ্রণীত **'ন্যায়পরিচয়'** পুস্তকের ভূমিকায় আমি জগদীশকে শ্রীহট্টীয় না বলায় ৺বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরে "শিক্ষাসেবক" পত্রে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তিনি উক্ত পত্রে (১৩৩৭ শ্রাবণ সংখ্যায়) জগদীশের পূর্ব্বোক্ত রূপ পরিচয় লিখিয়া কেবল বিস্ময়প্রকাশ করিয়াই লিখিয়াছিলেন—"আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার জগদীশকে শ্রীহট্টের লোক বলিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছেন।"

এখনও নবদ্বীপে জগদীশ তর্কালঙ্কারের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন। জগদীশের অধস্তন নবম পুরুষ এবং নবদ্বীপে অধ্যয়নকালে আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ এখনও নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া জগদীশ ও তৎপুত্র রঘুনাথ প্রভৃতির রচিত এমন অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছি, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। অনুসন্ধিৎসু নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকটে গিয়া সেই সমস্ত গ্রন্থ দেখিলে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে তাঁহাদিগের গৃহে রক্ষিত যে প্রাচীন বংশলতা লিখিয়া আনিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়—শ্রীচৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্রের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন—মিথিলাবাসী। যাহা হউক, সনাতন মিশ্র যে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই। তাঁহার বংশধরগণও ইহা বলেন না।

পরন্তু উক্ত বংশলতায় দেখা যায়,—

সনাতন মিশ্রের পিতার নাম বটেশ্বর মিশ্র। সনাতনের পুত্রের নাম যাদব নহে, মাধব। মাধবের পুত্রই যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। সুতরাং বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে, যাদবকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুজ বলিয়াছেন ইহা সত্য নহে। যাদব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁহারই পুত্র জগদ্বিখ্যাত নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ষষ্ঠীদাস নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সেবক হওয়ায় তাঁহার বংশধরগণ গোস্বামী উপাধিতে খ্যাত হইয়াছেন। এখনও ৺নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বাড়ীতে ষষ্ঠীদাসের বংশধর গোস্বামিগণই মহাপ্রভুর সেবা করিতেছেন। তাঁহারা বঙ্গের ব্রাহ্মণসমাজে পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণীর কাশ্যপগোত্র ব্রাহ্মণ।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীনবগোপাল দাস পিএচ্-ডি, আই-সি-এস্

সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পর পুরীতে আসিয়াছি।

পুরীর সমুদ্রের ফেনিলোচ্ছল জলরাশি, পুরীসৈকতের বালুকণার মায়া প্রায় কাটাইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু কি-জানি-কেন প্রৌঢ়ত্বের মধ্যাহ্নে আঠারো বৎসরের পুরানো জীবনের ছবি চোখের সাম্‌নে এমন ভাবে ভাসিয়া উঠিল যে, একদিন হঠাৎ হাওড়া ষ্টেশনে অন্যান্য স্বাস্থ্যকামীদের সঙ্গে আমিও পুরী এক্সপ্রেসে চাপিয়া বসিলাম। বিচারবুদ্ধি দিয়া তখন ভাবিয়া দেখি নাই—কাজটা কতখানি সঙ্গত হইতেছে। ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে গাড়ী যখন ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্ম্-এ আসিয়া পৌছিল তখন যাত্রীদের কোলাহল, কুলীদের চীৎকার আর পাণ্ডাদের আকুল আহ্বানে আমার যেটুকু বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল তাহাও লোপ পাইবার উপক্রম হইল। কুলী যখন আমার স্যুটকেশটা একটা ট্যাক্সিতে লইয়া গিয়া তুলিল তখন বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতেই হইল, অমিয়নিবাসমে চ'লো ··

সেবারও এই অমিয়নিবাসেই আসিয়া উঠিয়াছিলাম।

পরিবর্ত্তন বেশ কিছু হইয়াছে লক্ষ্য করিলাম। নূতন ম্যানেজার, নূতন চাকর দারোয়ান, আসবাবপত্রও নূতন। তাহা ছাড়া, আধুনিকতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া ঘরগুলির ব্যবস্থাও বদ্‌লাইয়াছে। প্রত্যেক দুটি ঘরের সঙ্গে একটি বাথরুম এবং যাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য ড্রেসিং টেবিল, সোফা, আয়নাবসানো আলমারির বন্দোবস্তও আছে। মোট কথা, অমিয়নিবাস স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামদান-বিষয়ে কোন ত্রুটি রাখে নাই।

কিন্তু আমার মনে হইল, এই সব নূতন আযোজনের মধ্যে আমি যেন কেমন খাপছাড়া, অসংলগ্ন। যে আঠারো বৎসর আমি কলিকাতায় কাটাইয়াছি তাহা যেন পলকের মধ্যে আমার জীবন হইতে অপসৃত হইয়া গেল আমি অনুভব করিলাম, আমি আটত্রিশবৎসরের প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার মিঃ নরেশ মিত্র নই, আমি কলেজে-পড়া কুড়ি বৎসরের তরুণ যুবক নরেশ।

সুপ্রিয়ার সঙ্গে যেদিন প্রথম অসম্ভাবিতরূপে দেখা হয়, সেই মুহূর্ত্তগুলির স্মৃতি এতটুকুও ঝাপ্‌সা হইয়া যায় নাই। তখনকার তরুণীদের মধ্যে এযুগের সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য এবং মধুর স্বাধীনতা ছিল না সত্য, কিন্তু সুপ্রিয়া ছিল একযুগ অগ্রগামী। বোধ হয় সেই জন্যই আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

সুপ্রিয়া তাহার বাবা-মার সঙ্গে অমিয়নিবাসেই আসিয়া উঠিয়াছিল। আমি যে ঘরে থাকিতাম তাহারই পাশে তাঁহারা থাকিতেন। বাবার অসুস্থতার জন্য সুপ্রিয়াকে অধিকাংশ সময় ঘরের ভিতরে থাকিতে হইত, বাহিরে সমুদ্র-ভ্রমণে বা স্নানে তাহাকে কদাচিৎ দেখা যাইত।

অমরবাবুর অসুস্থতা একদিন খুব বাড়িয়া ওঠে এবং তখন পাশের ঘরে আমার ডাক পড়ে। সুপ্রিয়াই আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।

সেই প্রথম আহ্বানের সুরটি আমার কানে এখনও বাজিতেছে।

---দেখুন, বাবার শরীর আজ বড্ড খারাপ মনে হচ্ছে; ম্যানেজার মশায়ও নেই, আপনি একবার ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারেন?

ডাক্তার ডাকা, দোকান হইতে ঔষধ আনা, অমরবাবুর পরিচর্য্যা, এই সব বিষয়ে আমার তৎপরতা দেখিয়া আমি নিজেই সেদিন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। পরে আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম, সুপ্রিয়ার আহ্বানই আমাকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

তাহার পর নানা কাজে অকাজে সুপ্রিয়াদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়। আমার কল্পনাবিলাসী মন সুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া অনেক স্বপ্ন রচনা করিতে সুরু করে, যদিও শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহার আভাষটুকুও সুপ্রিয়াকে দেই নাই।

বাধা সরিয়া পড়িল তাহাদের পুরীত্যাগের দিন। সুপ্রিয়াকে ডাকিয়া বলিলাম, সুপ্রিয়া, যদি অভয় দাও একটা কথা বলি।

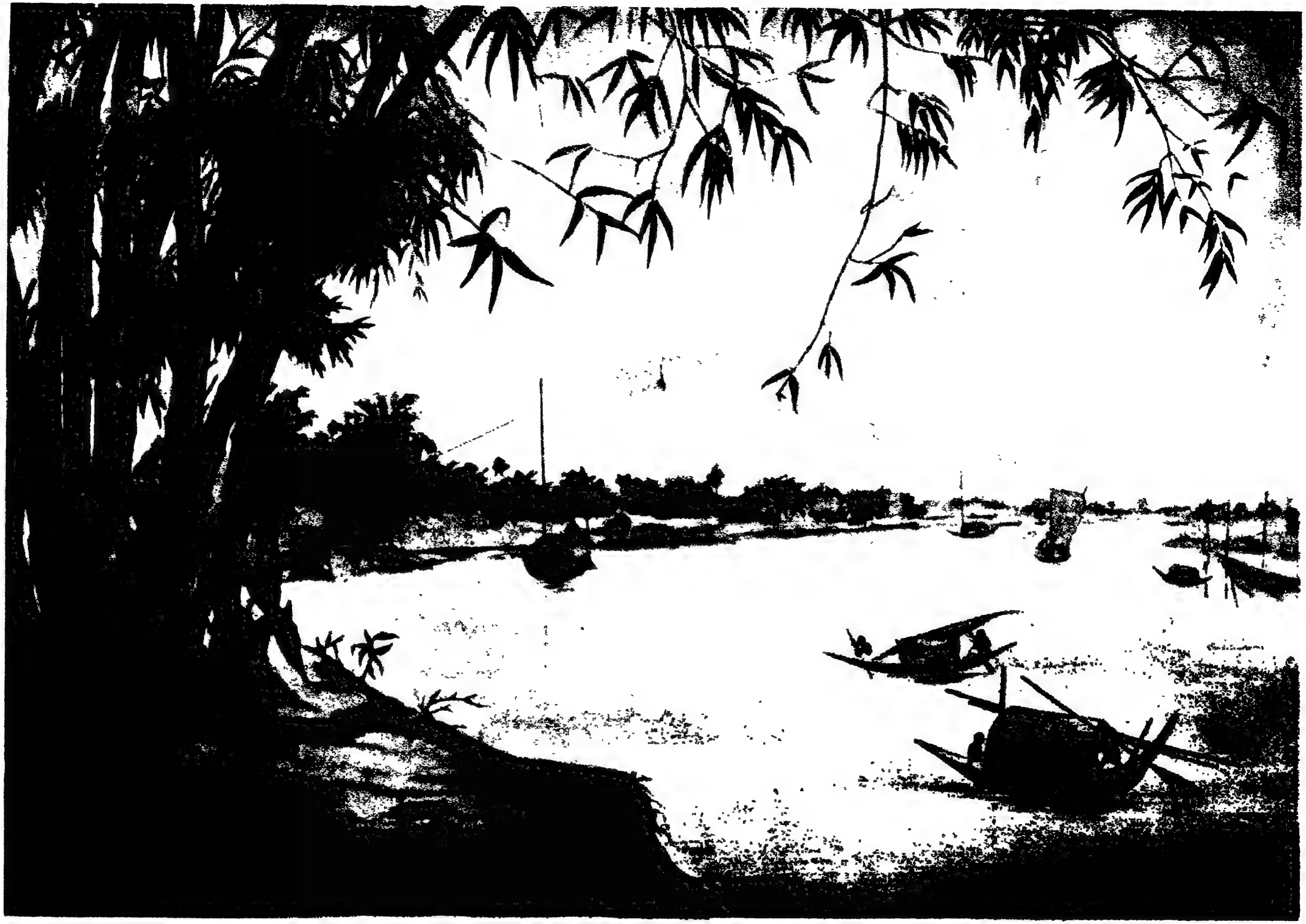

[illegible]

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

সুপ্রিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহার বড় বড় চোখদুটি তুলিয়া আমার দিকে তাকাইল। বলিল, বলুন।

—পুরীর এ কয়টা দিন যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটেছে। এই স্বপ্নকে আমি চিরন্তন ক'রে রাখতে চাই। তুমি যদি অনুমতি কর, তোমার বাবার কাছে আমি বিবাহের প্রস্তাব করি।

সুপ্রিয়ার মুখের ভাব এতটুকুও বদ্‌লাইল না। সে শুধু বলিল—সে হয় না, আমি বাগ্‌দত্তা!

সুপ্রিয়ার সঙ্গে এই আমার শেষ কথা। আমি তাহার কাছ হইতে ছুটিয়া পলাইলাম। আমার কানে শুধু বাজিতে লাগিল, সে হয় না, আমি বাগ্‌দত্তা!

তাহার পরদিনই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। পরের মাসেই আমি চলিয়া গেলাম বিলাতে—ব্যারিষ্টারী পড়িতে। তিন বৎসর পর দেশে ফিরিয়া পূর্ণোদ্যমে প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিলাম। শুনিলাম, অমরবাবু মারা গিয়াছেন, সুপ্রিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষটির সঙ্গে যাহার কাছে সে বাগ্‌দত্তা ছিল। ভদ্রলোক পশ্চিমের কোন একটা করদরাজ্যে শিক্ষকতা করেন।

আমার জীবনের বেসুরো তার আর সুরে বাঁধিতে পারিলাম না। বাবা-মা'র অশ্রু, ভাইবোন্‌দের অনুরোধ-উপরোধ, বন্ধুদের উপহাস—কিছুই আমাকে টলাইতে পারিল না। সুপ্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া আমি যে সুখস্বর্গ রচনা করিয়াছিলাম তাহা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেলেও তাহার আসনে অন্য কোন নারীকেই আমি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলাম না।

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। কর্ম্মজীবনের ব্যস্ততা আলস্যবিধুর অধিকাংশ মুহূর্ত্তই পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত, কিন্তু তবু এমন অনেক সময় আসিত যখন আমার কল্পনা উড়িয়া যাইত তরুণ যৌবনের সেই মদির দিনগুলির দিকে। আর তন্দ্রালস চোখ দুইটি বুজিয়া আমি ভাবিতাম, সুপ্রিয়া অন্যের গৃহলক্ষ্মী, তাহার অনুপম পরিচর্য্যা, স্নেহ ও প্রেম লাভ করিয়া আর একটি জীবন সৌরভমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই নিবিড় পরিপূর্ণতার মধ্যে ভাগ্যহত আমার স্মৃতি ক্ষণেকের জন্যও তাহাদের শান্তিময় জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে না। যদি তুলিত, তবে হয়ত আমি খানিকটা সান্ত্বনা পাইতাম, কিন্তু ইহা কল্পনা করিবার মত সাহস আমার ছিল না।

পুরীর দিকে সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর পা বাড়াই নাই। তাহার পর হঠাৎ একদিন ক্ষণিক খেয়ালের বশে আমার সেই পুণ্যতীর্থে আবার ফিরিয়া আসিলাম।

অমিয়নিবাসের নূতন ম্যানেজারটি অত্যন্ত গল্পপ্রিয়। প্রথম দিনই তিনি আমাকে তাঁহার হোটেলের অনেক খবর দিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন।

—আমি ত এখানে আছি বছর চারেক হ'ল। এর মধ্যে কত লোক যে এখানে এলেন গেলেন—তা বল্‌তে গেলে মস্ত বড় একটা ইতিহাস হয়ে যায়। এই ত গেল বছর লক্ষ্মীপুরের রাজা এসেছিলেন তাঁর একদল বন্ধু নিয়ে, সারা হোটেলটা রিজার্ভ ক'রে রেখেছিলেন দু'হপ্তার জন্য। তারপর রোজ সন্ধ্যায় তাঁদের তাসের আড্ডা বস্‌ত, সেটা ভাঙ্গত রাত দুটো তিনটেয় ··· সে যে কি হৈ হৈ কাণ্ড কি বল্‌ব!

আমি প্রশ্ন করিলাম, শুধু তাসের আড্ডা?

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, রাজারাজড়ার কাণ্ড, শুধু তাসের আড্ডা হবে কেন? ষ্টেশন থেকে পানীয় আর আহার যা আস্‌ত, তা সাম্‌লাতে আমাদের চাকরগুলো রীতিমত হিমসিম খেয়ে যেত! তবে একটা কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে, রাজা বাহাদুর ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্র, আর কোন নেশাই ওঁর ছিল না।

আমি হাসিলাম। সচ্চরিত্রতার মাপকাঠি যে দেশে বিশেষ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গপরিহারে, সেখানে রাজা বাহাদুরকে কে না সাধু বলিবে?

—তারপর এবছর পূজোর সময় এলেন কল্‌কাতার বিখ্যাত ধনী মিঃ বাট্‌লিওয়ালা আর তাঁর দুই মেয়ে। বাটলিওয়ালার নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, বম্বের লোক যদিও, তবু দুপুরুষ ধরে বাঙ্গালা মুল্লুকেই আছেন, আর নিজেও বাঙ্গালী বিয়ে করেছেন। তাঁর মেয়ে দুটি ছিল অনুপম রূপসী; বাট্‌লিওয়ালা তাঁর মেয়েদের নিয়ে আমাদের হোটেলে এসে উঠেছেন। এই খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল তখন এখানে সীট পাবার জন্য সে কি ভীড়, বিশেষ ক'রে বিলাত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার যুবকদের মহলে। মেয়ে দুটিকে কিন্তু প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।··· তাদের প্রেমপ্রার্থী

সকলকেই তারা সমান ওজনে মিষ্টি হাসি আর অমায়িক ব্যবহারে এমন মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল যে, বাট্‌লিওয়ালা পরিবার চলে যাবার পর কারো কাছে এতটুকু নিন্দা শুনতে পাই নি, রুবি রোজির (মেয়ে দুটির নাম) প্রশংসায় ওরা সবাই হয়ে উঠেছিল শতমুখ।

আমি বুঝিতে পারিলাম অভিজাত হোটেল-শ্রেণীর মধ্যে অমিয়নিবাস আজকাল শীর্ষস্থানে। আঠারো বৎসর আগে আমার মত বেকার যুবক আর অমরবাবুর মত রুগ্ন পেন্সনভোগীই ছিল ইহার প্রতীক অতিথি, আর এখন লক্ষ্মীপুরের রাজা আর বাট্‌লিওয়ালা-দুহিতারাই এখানকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সসঙ্কোচে আমি জানাইলাম আমি একজন নগণ্য ব্যারিষ্টার মাত্র।

ম্যানেজারটি অত্যন্ত সপ্রতিভ। আমার পরিচয়ের দৈন্যটুকু একপ্রকার গায়ে না মাখিয়াই তিনি বলিলেন, ওঃ—আপনিই কল্‌কাতার বিখ্যাত ব্যরিষ্টার মিঃ নরেশ মিত্র? আমরা খুবই খুশী হয়েছি আপনি আমাদের এখানে এসে উঠেছেন, বিলিতি হোটেলে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আমি বিনীতভাবে জানাইলাম, আমার খ্যাতি মোটেই নাই। আর বিলিতি হোটেলে না গিয়া অমিয়নিবাসে উঠিয়াছি, এখানে খানিকটা হৃদ্যতা মিলিবে এই আশায়।

ম্যানেজার মহাশয় খুবই প্রীত হইলেন। বলিলেন, আপনাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা ত আমাদের কর্ত্তব্য! তা আপনি কি এই প্রথম এদিকে এলেন?

সত্য গোপন করিলাম। সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর আগেকার কাহিনী এই নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে টানিয়া আনার ত কোন সার্থকতা নাই। বলিলাম, হ্যাঁ, এদিকে আর আসা হয়ে ওঠেনি। ··· আমার এক মক্কেল আপনাদের হোটেলের এত সুখ্যাতি করেছেন যে শুধু আপনাদের এখানে থাক্‌বার লোভেই এবার আমি পুরীতে এসে পড়েছি!

একগাল হাসিয়া ম্যানেজার বলিলেন, বিলক্ষণ! ··· তা আপনার কোনই অসুবিধে হবে না। এখানে যা যা দেখ্‌বার আছে, হপ্তাখানেকের মধ্যেই আপনাকে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। কল্‌কাতায় ফিরে গিয়ে অমিয়নিবাসের সুখ্যাতি আপনাকে করতেই হবে যে!

পুরীর ভূগোল আমি ভুলিয়া যাই নাই, কিন্তু যেন ম্যানেজার মহাশয়ের নির্দ্দেশমতই চলিতেছি এই ভাব দেখাইয়া আমি পরদিন প্রত্যূষে চলিলাম বি, এন্, আর হোটেলের দিকে—সমুদ্রসৈকত নাকি সেখানটায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং জনতাও সেদিকে অপেক্ষাকৃত কম।

একা হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্তিবোধ করিতেছিলাম, বহুদিন এই প্রকার ভ্রমণের অভ্যাস নাই। বি, এন্, আর হোটেলও অনেকখানি পশ্চাতে রাখিয়া যেখানে ধূসর মাটির স্তূপগুলি প্রায় সমুদ্রের কোলে আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে উপস্থিত হইলাম এবং শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে বালুকণার উপরেই বসিয়া পড়িলাম।

বিপর্য্যস্ত চিন্তার ধারাগুলি লইয়া কতক্ষণ খেলা করিয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ আমি অনুভব করিলাম আমি একা নহি। অদূরে আমারই মত উন্মনাভাবে সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে একটি আধুনিকা তরুণী।

মেয়েটি আমাকে লক্ষ্য করিয়াছে কি-না বুঝিলাম না। দেখিলাম, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া একই ভাবে বসিয়া রহিয়াছে।

তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না। তবে তাহার কেশ এবং বেশবিন্যাস হইতে সহজেই প্রতীত হইতেছিল—সে বাঙ্গালী, নব্যা এবং সরমকুণ্ঠাবিহীনা। তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে আমার মন্দ লাগিতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাতে, যেখানে আমি ছিলাম, একবার দৃক্‌পাত না করিয়া সে আবার সম্মুখের দিকে ধীরে ধীরে হাঁটিতে সুরু করিল।

আমি কৌতূহল বোধ করিলাম। অলস সময় কাটাইবার পক্ষে কৌতূহলের মত বড় ঔষধ বোধ হয় আর নাই। আমিও উঠিয়া পড়িলাম এবং মেয়েটির পশ্চাতে পশ্চাতে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

যেখানে মেয়েটি এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্য করিলাম—রুমালে বাঁধা একগোছা চাবি পড়িয়া আছে। মনে হইল ভুল করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। আমি ক্ষিপ্রতার সহিত সেটি তুলিয়া লইয়া বেশ দ্রুতগতিতে মেয়েটিকে অনুধাবন করিলাম এবং তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিলাম।

আমার পায়ের শব্দ বোধ হয় সে শুনিতে পাইয়াছিল। আমি তাহাকে ডাকিবার পূর্ব্বেই সে পিছন ফিরিয়া

তাকাইল এবং আমাকে দ্রুত পদক্ষেপে আসিতে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রৌঢ়ত্বের মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়াছি, রীতিমত হাঁফাইতেছিলাম। রুমাল বাঁধা চাবির গোছাটি তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, মাপ কর্‌বেন, এটি কি আপনার ?

পলকের জন্য মেয়েটি যেন সরমে রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার পর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—ও হ্যাঁ, আমি ভুলে ফেলে এসেছিলাম বুঝি ? ··· আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।

জিনিষটি তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিলাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর আর অপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে কি-না ভাবিতেছিলাম, মেয়েটিই আমাকে দ্বিধামুক্ত করিয়া দিল। বলিল, আপনি কি এখন ফিরে যাচ্ছেন ?

জবাব দিলাম, হ্যাঁ, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

—তা হ'লে চলুন, আমিও ফিরছি, আজ আর বেশী দূর যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

আমরা দুইজনে একসঙ্গে সুদীর্ঘ দুই মাইল পথ হাঁটিয়া আসিলাম। আমার প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে মেয়েরা কোন নির্ভর খুঁজিয়া পায় কি-না ইতিপূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই ; কিন্তু এই মেয়েটি অতি সহজেই আমাকে তাহার জীবনের অনেকখানি ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিল।

তাহার নাম নন্দিতা, বয়স সতেরো। কলেজে পড়িতেছিল, নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। পুরীতে আসিয়াছে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় মামার সঙ্গে—এই মামাই তাহার বর্ত্তমান অভিভাবক। বাবা মারা গিয়াছেন তাহার বয়স যখন সাত, আর মাও চলিয়া গিয়াছেন বছর দুই হইল। সংসারে সে নিতান্তই একা, তাহার কোন ভাই বা বোনও নাই।

—মা'র জন্যই আমার মনটা মাঝে মাঝে বড্ড খারাপ লাগে। বাবা চলে যাবার পর আটটি বছর মা অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাকে মানুষ করেছেন, অথচ আমাকে একমুহূর্ত্তও কিছু বুঝতে দেননি। তারপর মাও যখন চলে গেলেন, আমার এই মামাই এসে আমার ভার নিলেন এবং তখন থেকে আমি খানিকটা অনুভব কর্‌তে শিখ্‌লাম, মা আমার কি ছিলেন !

মা'র কথা বলিতে বলিতে নন্দিতার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

—মামা বলেন, মেয়েদের বেশী লেখাপড়া করে কি হবে, তাই কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার কিন্তু কাজ ছাড়া জীবন এতটুকুও ভাল লাগে না। তাই মামা যখন বল্‌লেন তীর্থ উপলক্ষে পুরীতে আস্‌বেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে চলে এলাম। আমি ত আর পুণ্যলোভাতুর হয়ে আসিনি, আমি এসেছি সমুদ্র দেখ্‌তে। ··· মামা অবশ্যি প্রথমে আমাকে আন্‌তে রাজী হননি, তারপর কি ভেবে আর আপত্তি কর্‌লেন না।

নন্দিতার সহজ সাবলীল ভঙ্গীটি আমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। আঠারো বৎসর পর পুরীর সমুদ্রসৈকতে আর একটি নারীর মধুর সাহচর্য্য আমার হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে কেমন যেন নাড়া দিয়া তুলিতেছিল।

কথা বলিতে বলিতে আমরা অমিয়নিবাসের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। নন্দিতার কাছে বিদায় লইবার সময় বলিলাম, আমি ঐ কাছের হোটেলেই আছি—আবার বিকেলের দিকে যদি আপনি ওদিকে যান্ দেখা হবে।

নন্দিতা ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া জবাব দিল, আমি ঐ নির্জ্জন জায়গাটাই বেশী ভালবাসি। আজ বিকেলের দিকে আস্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

বৈকালবেলা ম্যানেজার আমার সঙ্গে আসিতে চাহিয়াছিলেন, আমি একটা ওজর দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম। মনে হইল, তিনি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন ; কিন্তু নন্দিতার সঙ্গে আবার কথা বলিবার লোভ আমাকে এতখানি পাইয়া বসিয়াছিল যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এড়াইতেই হইল।

এবার বেশীদূর যাইতে হয় নাই। সমুদ্রতীর দিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম নন্দিতা অপেক্ষা করিতেছে।

আমাকে দেখিয়া সে হাস্যমুখী চপলা বালিকার মত ছুটিয়া আসিল। প্রথম সম্ভাষণেই বলিল, আপনার কাছে আমার একটা মস্ত বড় নালিশ আছে কিন্তু !

আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছিলাম না, প্রশ্ন করিলাম, কি নালিশ ?

—আমি আপনার চেয়ে অ-নে-ক ছোট, আমায় আপনি নাম ধরে ডাক্‌বেন।

আমি হাসিলাম।—এই ? তথাস্তু।

আবার আমরা হাঁটিয়া চলিলাম, অদ্ভুত আমরা দু'জন। আমার সঙ্গিনী সপ্তদশী তরুণী, হাসিলাস্যের সাবলীলতায় তাহাকে বালিকা বলিলেও চলে, আর আমি প্রৌঢ়ত্বের মধ্যাহ্নে উপনীত, শ্রান্ত বিক্ষুব্ধ। আমাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকা উচিত নয়, কিন্তু তবু আঠারো বৎসর আগেকার প্রমত্ত বাতাস যেন থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া একটি সূক্ষ্ম সেতু রচনা করিতেছিল।

—আচ্ছা নন্দিতা, শুধু নাম ছাড়া আর কোন পরিচয়ই ত তুমি দিলে না ? তোমার বাবা কে ছিলেন, কি কর্‌তেন, কোথায় থাক্‌তেন ?

—বাবা! বাবা কাজ কর্‌তেন পশ্চিমে, ভরতপুর ষ্টেটস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে। তাঁর নাম স্বর্গীয় সুবিমল বসু। বাবা স্বর্গগত হবার পর আমরা চলে আসি কল্‌কাতায়।

আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম। শুনিতে ভুল হয় নাই ত ?

—তোমার দাদামশায়ের নাম ?

—দাদু ? দাদুকে ত আমি দেখিনি! তাঁর নাম স্বর্গীয় অমর গুহ ; মা'র কাছে শুনেছি আমি জন্মাবার বছর খানেক আগেই উনি মারা গিয়েছিলেন।

—অমর গুহ ? বাঁশপুরের অমর গুহের নাতনী তুমি ?

আমার স্বরের আকুল বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া নন্দিতা বোধ হয় থতমত খাইয়া গিয়াছিল। ক্ষণেকের জন্য নীরব থাকিয়া বলিল, হ্যাঁ, কেন ? আপনি তাঁকে চিন্‌তেন কি ?

কি উত্তর আমি দিব ? আঠারো বৎসর আগে যে মায়ার বন্ধনে আমি জড়াইয়া পড়িয়াছিলাম, যে মায়ার মোহনস্পর্শ এখনও আমি অনুক্ষণ অনুভব করি, ভবিতব্য কি আজ আমাকে আবার সেই মরীচিকার সম্মুখে আনিয়া উপস্থাপিত করিল ?

স্থির করিলাম, সত্য গোপন করিয়া যাইব। অথচ সুপ্রিয়ার কথা জানিবার জন্য আমি এত উন্মুখ হইয়াছিলাম যে, নন্দিতার দাদামহাশয়কে আমি আদৌ জানি না এই বিরাট মিথ্যা কথা বলিলেও চলিবে না।

জবাব দিলাম—হ্যাঁ, ছেলেবেলায় আমি অমরবাবুকে একটু আধটু জান্‌তাম, তবে তিনি ছিলেন বয়সে আমার অনেক বড়, গুরুজনের মত। অনেক বছর ধরে তাঁর খবর আমি রাখিনি।

ছিন্নবন্ধন কাহিনীর সূত্র ধরিয়া নন্দিতা বলিতে লাগিল, দাদুকে আমি দেখিনি, তবে দিদিমা আমার জন্মের পরও কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। তাঁর কথা অস্পষ্টভাবে আমার মনে পড়ে। মা দিদিমা মারা যাবার পর খুব মুষ্‌ড়ে পড়েছিলেন, এও আমার মনে আছে।

সুপ্রিয়া সম্পর্কে সোজা কোন প্রশ্ন করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে পারিতেছিলাম না, যদি নন্দিতা সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু একজন সহানুভূতিসম্পন্ন শ্রোতা পাইয়া নন্দিতার সঙ্কোচ অনেকখানি চলিয়া গিয়াছিল, প্রগল্‌ভা বালিকার ন্যায় সে তাহার কাহিনী বলিয়া চলিল।

—মা কিন্তু আমায় বড্ড ভালবাস্‌তেন এবং এটা সবচেয়ে নিবিড়ভাবে অনুভব করেছি বাবার মৃত্যুর পর। তাঁর মনের কোন্‌খানে যেন একটা ক্ষত ছিল, কিন্তু আমি কখনও বুঝ্‌তে পারিনি সেটা কি। শুধু মনে পড়ে, গভীর রাত্রিতে তিনি কখনও কখনও আমায় বুকে চেপে ধ'রে বল্‌তেন, নন্দিতা, বড় হয়ে মাকে ভুলে যাস্‌নি যেন—তোর মুখ চেয়েই তোর মা বেঁচে থাক্‌বে।' ··· অথচ মা ত আমাকেও ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।

এতক্ষণ আমি নন্দিতার দিকে ভাল করিয়া তাকাই নি। এবার আমি আমার এই নবীনা বন্ধুটিকে তীক্ষ্ণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। ··· হ্যাঁ, আমার আঠারো বছর আগেকার সেই সুপ্রিয়াই যেন শ্যামল মেঘের আড়াল হইতে উঁকি দিতেছে। সেই শান্ত আঁখিপল্লব, সেই হাসির আলো, বাঁ কানের পিছনে চূর্ণ কুন্তলের পাশে তিলটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নি।

কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে নন্দিতার মুখে তাহার মায়ের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বোধ হয় নন্দিতা আমার মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল। অনুতপ্তস্বরে বলিল, আমার ছোটখাট কাহিনী বলে আপনার সন্ধ্যাটা নষ্ট কর্‌লাম, কিছু মনে কর্‌বেন না যেন।

সুপ্তোত্থিতের মত আমি বলিলাম, না, না, সে নয়, নন্দিতা। রাত হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ফেরা উচিত, তাই ভাব্‌ছিলাম।

অমিয়নিবাসে পৌছিতে তখনও মিনিট দশেকের পথ বাকী, এমন সময় নন্দিতা হঠাৎ থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমার মামাবাবু আস্‌ছেন বলে যেন মনে হচ্ছে।

তাহার মুখে ভয়ের রেখা, স্বরটাও যেন কেমন কাঁপিয়া উঠিল।

নন্দিতার ভুল হয় নাই। ম্লান গোধূলির আলোর মধ্য হইতে অচিরেই একজন স্থূলকায় ভদ্রলোকের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। নন্দিতার কাছে আসিয়া কর্কশকণ্ঠে সীতাংশুবাবু বলিলেন, এই রাতে মেয়ের কোথা যাওয়া হয়েছিল শুনি? পুরী আস্‌বার জন্যে এত আকুলিবিকুলি, তখন বুঝ্‌তেই পারিনি পেটে পেটে বিদ্যে এত!

লোকটার বর্ব্বর অসভ্যতা দেখিয়া আমি ক্ষেপিয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু আমার ডান বাহুতে একটা সাঙ্কেতিক তর্জ্জনীস্পর্শ অনুভব করিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নম্র অথচ দৃঢ়কণ্ঠে নন্দিতা জবাব দিল, ওদিকে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম, মামাবাবু। আপনি এত রাগ কর্‌ছেন কেন?—এই ত সবে সন্ধ্যে হ'ল।

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া একটা শব্দ করিয়া সীতাংশুবাবু বলিলেন, আমার বাড়ীতে যতদিন আছ এরকম বেহায়াপনা কিছুতেই বরদাস্ত কর্‌ব না নন্দিতা, এ আমি ব'লে রাখ্‌ছি।

বলিয়া সীতাংশুবাবু আমার দিকে তাকাইলেন, যেন আমিই নন্দিতার বেহায়াপনার জন্য দায়ী।

ব্যাপারটা কিন্তু আর বেশীদূর গড়াইল না। নন্দিতা সীতাংশুবাবুর হাত ধরিয়া বলিল, আর এরকম দেরী হবে না মামাবাবু, এখন বাড়ী চলুন।

আমার দিকে তাকাইয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথাটা ঈষৎ হেলাইয়া নন্দিতা চলিয়া গেল। সীতাংশুবাবুও রাগে গজ গজ করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিলেন।

ইহার পর দুই দিন নন্দিতার দেখা পাই নাই। প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় আমি সমুদ্রসৈকতের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়াছি, উৎসুকভাবে দুটি চঞ্চল চোখের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমার নবীনা বন্ধুর কোনও সাড়া মিলে নাই। মনটা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু দুরন্ত চিন্তাগুলিকে শাসন করিয়া বলিয়াছি, তাহার মামা অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে চলাফেরা পছন্দ করেন না, তাই সে আর কোন অনর্থের সৃষ্টি করিতে অনিচ্ছুক।

তবু মনের আনাচে কানাচে একটি গোপন ইচ্ছা উঁকি মারিয়াছে, বুদ্ধি বিচারশক্তির দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করিয়া আমার হৃদয় চাহিয়াছে, যদি একবারটি নন্দিতা আসিত, যদি একবারটি তাহার অসম্পূর্ণ কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদগুলি আমাকে বলিয়া যাইত!

নন্দিতার মধ্যে সুপ্রিয়াকে আমি যেন নূতনরূপে দেখিতে পাইতেছিলাম। সুপ্রিয়ার সরমকুণ্ঠাবিহীন চরিত্র—যাহা আঠারো বৎসর আগে আমাকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল— যেন আরও শোভন, আরও শুভ্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সপ্তদশী নন্দিতার হাসিতে, কথা বলায়, গতিভঙ্গীতে।

হঠাৎ খেয়াল হইল, সুপ্রিয়াও ছিল সপ্তদশী। পুরীর বাতাস আঠারো বৎসর আগেও ছিল এমন আন্‌মনা, সমুদ্রের কলস্বরেও ছিল এই রকমের আকুলতা। ভোরের স্বপ্ন এবং সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে সেই হারানো দিনগুলির ধূসর আলোর রূপ নূতন করিয়া দেখিতে পাইলাম।

এ আমার কি হইল? যে সুপ্রিয়া ছিল আমার কাছে শুধু একটা স্মৃতি সে আজ আবার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল কেন? আর যদিই বা সে আসিল, তাহার সপ্তদশীরূপে কেন আসিল? কেন সে জীবনপথে চলার শ্রান্তি লইয়া আমার কাছে আসিল না? কেন সে প্রৌঢ় নরেশ মিত্রের সম্মুখে প্রৌঢ়া সুপ্রিয়ারূপে দেখা দিল না?

মনের গোপন অন্তঃপুর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম। শ্রান্ত শান্ত প্রৌঢ়া সুপ্রিয়াকে দেখিয়া কি আমি এতখানি আনন্দলাভ করিতাম? আমার ভালবাসা কি সুপ্রিয়াকে তাহার চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন রূপে ও বেশেই দেখিতে চায় নাই? মনে হইল, আমি যেন জন্মদরিদ্র, আমার অনুভূতি যেন দায়িত্ববিহীন, তাই সুপ্রিয়াকে রূপায়িত মূর্ত্তিতে দেখিবার জন্য আমার কোনই আগ্রহ নাই।

কিন্তু নন্দিতা? আমি না হয় নন্দিতার মধ্যে আমার হারানো সুপ্রিয়াকে খুঁজিয়া পাইয়াছি, নিঃস্ব পথিক তাহার পুরাতন আশ্রয় যষ্টিটি লাভ করিয়া যেমন আনন্দ অনুভব করে, আমি নন্দিতাকে পাইয়া তেমনই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, কিন্তু নন্দিতা আমার মধ্যে সহানুভূতিসম্পন্ন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মানিত ভদ্রলোক ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইয়াছে কি?

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় এইসব বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা লইয়া খেলা করিতে করিতে আমার মনটাও কেমন বেসুরো হইয়া গেল—আমি আজ প্রথম অনুভব করিলাম, নিখিলের আঙিনায় আমি নিতান্ত একা।

অন্যমনস্কভাবে আমি হোটেলে ঢুকিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিলাম, ম্যানেজার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার একটা চিঠি আছে।

আমার চিঠি? আমি ত কাউকে আমার ঠিকানা দেই নাই!

পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, নিশ্চয় নন্দিতা লিখিয়াছে। দেখিলাম, আমার অনুমান সত্য। সংক্ষিপ্ত চিঠি:

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অত্যন্ত বিপদে পড়ে লিখ্‌ছি, প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর্‌বেন। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা নিতান্ত দরকার, কাল ভোরবেলায় সেখানে আস্‌বেন কি?

—নন্দিতা

সারারাত আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। নন্দিতা লিখিয়াছে, সুপ্রিয়ার নন্দিতা, বিপদে পড়িয়াছে, আমার উপদেশপ্রার্থী। এমন করিয়া সুপ্রিয়া ত কখনও আমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে নাই! নন্দিতার এই অনুরোধ আমি যেমন করিয়া হউক রাখিবই—তাহার লেখার প্রতি অক্ষরে যে আমি সুপ্রিয়ার স্পর্শ অনুভব করিতেছি।… আমি অনুভব করিলাম, আমার প্রৌঢ়ত্বের নিবিড় ছায়ায় লুকানো তরুণ হৃদয়টি যেন নূতন পত্রপুষ্পে বিকশিত হইয়া উঠিল।

নন্দিতা আমার আগেই সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে ছুটিয়া আমার কাছে আসিল। ভীরুকণ্ঠে বলিল, ভেবেছিলাম আপনি আমার চিঠি পান্‌নি।

আমার ভিতরের প্রবীণ ব্যারিষ্টারটি সজাগ হইয়াই ছিল। কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি হয়েছে নন্দিতা? কি বিপদের কথা তুমি লিখেছ?

সংলগ্ন অসংলগ্ন অনেক কথার স্রোত হইতে আসল কথাটি উদ্ধার করিলাম এই: সীতাংশুবাবু গত দুই বৎসর যাবৎ নন্দিতাকে তাঁহার গলগ্রহ বলিয়া মনে করিতেছেন, কোন উপায়ে তাহাকে কাহারও হাতে সমর্পণ করিয়া দিলে বাঁচেন। এতদিন স্ত্রীর ভয়ে কিছু করিতে পারেন নাই, এখন পুরীতে নন্দিতাকে একা পাইয়া এক তৃতীয়পক্ষের বৃদ্ধের সহিত বিবাহ স্থির করিয়াছেন। হয়ত এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা গড়াইত না, কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে নন্দিতাকে দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছে, পাছে আমি তাহার শুভার্থী বন্ধু হিসাবে কোন বিঘ্ন ঘটাই। তাই তিনি শুভকাজটা অবিলম্বে সমাধান করিয়া ফেলিতে চাহেন এবং আজই রাত্রে নন্দিতার বিবাহ।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নন্দিতা বলিল, ঐ বুড়োর ঘর আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌ব না, নরেশবাবু। আমি ত বিয়ে কর্‌তে চাইনে, তবু মামা কেন আমায় গলগ্রহ বলে ভাবেন? আমাকে যদি আর বছর দুই কলেজে পড়াতেন তা হ'লে আমি তাঁর বোঝা হয়ে থাক্‌তাম না কিছুতেই, নিজের কাজ নিজেই খুঁজে নিতাম। এখন যে আমার সে পথও রুদ্ধ, পালিয়ে গিয়েই বা আমি কি কর্‌ব? আমার যা বিদ্যা তাতে সামান্য একটা চাকুরীও যে জুট্‌বে না!

নন্দিতার কথা শুনিয়া আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলাম। সীতাংশুবাবু যে এতখানি খলপ্রকৃতির মানুষ তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। নীচ জেদের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি মেয়েটার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু উপস্থিত কি করা কর্ত্তব্য? আমি কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। শুধু সান্ত্বনা দিবার জন্য নন্দিতাকে বলিলাম, তুমি কিছু ভেবো না নন্দিতা। আমাকে তোমার বন্ধুভাবে যখন গ্রহণ করেছ তখন আমার ক্ষমতায়

যতদূর সম্ভব আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌বই। শুধু একটি প্রশ্ন আছে—এই বিবাহে তোমার আপত্তির অনেক কারণ থাক্‌তে পারে; একটা কারণের কথা আমি জানতে চাই, তোমার মন কি আর কোথাও বাঁধা রয়েছে?

হাস্যমুখী চপলা নন্দিতা পলকের মধ্যে রাঙা হইয়া উঠিল। নতমুখী থাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না।

—তা হ'লে একটা দিকে জিনিষটা সহজ হয়ে গেল।... আমি সব ব্যবস্থা কর্‌ছি, তোমার প্রতি আমার উপদেশ, তুমি বিয়ের সময় পর্য্যন্ত তোমার মামাবাবুর বিরুদ্ধাচরণ ক'রো না। কোনপ্রকার প্রতিকূলতা পেলেই তিনি আরও রেগে যাবেন এবং হয়ত তোমাকে এমন কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাবেন যেখানে তোমার সহায়তায় আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে।... শেষ পর্য্যন্ত তোমার এই বিয়ে আমি ঘট্‌তে দেব না এই ভরসা দিচ্ছি, তুমি শান্তধৈর্য্যে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো।

গভীর কৃতজ্ঞতার সুরে নন্দিতা বলিল, আমি জান্‌তাম আপনি উদ্ধারের একটা উপায় বার করবেনই। আমি নিশ্চিন্ত নির্ভরে আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌ব।

সারাটা দুপুর এবং সন্ধ্যা আমি ভাবিতে লাগিলাম। আমি প্রৌঢ়, আমার মধ্যে তারুণ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা নাই, কয়েকটা বিষয় আমি বেশ সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। নন্দিতার এই বিবাহ যদি আমি ঘটিতে না দেই তবে সীতাংশুবাবুর আশ্রয় হইতে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য চলিয়া আসিতেই হইবে। আর এই বয়সে তাহার মত মেয়ের পক্ষে জীবনযুদ্ধে একা অবতীর্ণ হওয়া যে অতি কঠিন সে সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। তাহার ভার নিতে হইবে আমাকেই।

নন্দিতার ভার নিতে আমার কোনই দ্বিধা ছিল না, থাকিতে পারে না, কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম কি ভাবে তাহাকে আশ্রয় দিব। যদিও আমি আজও অবিবাহিত, যদিও আমি প্রৌঢ়, তবু আমার বিবাহের বয়স চলিয়া যায় নাই। এখনও অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আমার সামান্য একটু সহানুভূতিপ্রার্থী হইয়া আমার বাড়ীতে আনাগোনা করেন। নন্দিতাকে আমার গৃহে স্থান দিব কি পরিচয়ে? দুষ্ট লোকের ইতর ইঙ্গিতে নন্দিতার জীবন কি আরও দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে না? তাহার এই তরুণ বিকাশোন্মুখ জীবনে কি একটা ছায়া আসিয়া পড়িবে না? তাহাকে ভালবাসিয়া আদর করিয়া কয়জন যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইবে?

পলকের জন্য মনে হইল, আমি যদি নন্দিতাকে বিবাহ করি তবেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। বয়স আমার যত বেশীই হউক না কেন, আমার মন ত তখনও আঠারো বছর আগেকার মতই সবুজ রহিয়াছে। ভালবাসার চরম রহস্য ত এখনও আমার কাছে অপরিজ্ঞাত, যে রঙীন্ উত্তরীয় দিয়া আমি সুপ্রিয়াকে আবরণ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার আশ্রয়ে ত আর কোন নারীকেই এ পর্য্যন্ত আসিতে দেই নাই।

তাহা ছাড়া, নন্দিতাকে আমি ভালবাসি। হ্যাঁ, এই ঘটনাসমাবেশের বিক্ষুব্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে আজ আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, নন্দিতাকে আমি ভালবাসি।... নন্দিতা যে শুধু নন্দিতা নয়, সে যে সুপ্রিয়ারও নন্দিতা। তাহার মুখে সুপ্রিয়ার চিহ্নহীন লাবণ্য, তাহার চোখে সুপ্রিয়ার নামহীন কমনীয়তা, তাহার অন্তরে সুপ্রিয়ার দুর্লভ অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য। সুপ্রিয়া আর নন্দিতা যে অভেদাত্মা, সুপ্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া যে রাগরাগিণী আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি নন্দিতার মধ্যে আসিয়া প্রত্যুত্তর পাইতেছে না?

কিন্তু নন্দিতার দিকটা আমি একেবারেই ভুলিয়া যাইতেছি! আমি না হয় নন্দিতাকে ভালবাসি, গভীর-ভাবে ভালবাসি, এমন ভালবাসি যে-কোন তরুণ যুবক তাহার সারা হৃদয় দিয়াও তাহাকে ইহার এক-শতাংশ ভালবাসিতে পারিবে না, কিন্তু নন্দিতা ত আমাকে ভালবাসে না। আমি তাহার নমস্য—তাহার প্রীতির অর্ঘ্য পাইবার কোন অধিকারই ত আমার নাই। আমার প্রৌঢ়ত্বই যে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

আচ্ছা, নন্দিতাকে যদি আমি আমার জীবনের সব কথা খুলিয়া বলি? আমার অন্তর্গূঢ় অনুভূতির মর্য্যাদা কি সে বুঝিবে না? সে কি ভাবিবে আমি তাহাকে ভালবাসি না, ভালবাসি তাহার মধ্যে যে সুপ্রিয়া লুকানো আছে তাহাকে? আর সে যদি আমার এই আকাঙ্ক্ষাকে উপহাস করে; যদি বলে, এ আপনার মনের খেয়াল, আপনার ঘোরতর কার্য্যপটুতার একটা উদাহরণ মাত্র?

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, অথচ কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। শুধু কানে আমারই কথাগুলি বাজিতে লাগিল, নন্দিতাকে আশ্বাস দিয়াছি, শেষ পর্য্যন্ত তোমার এই বিয়ে আমি ঘট্‌তে দেব না, তুমি শান্তধৈর্য্যে আমার জন্য অপেক্ষা ক'রো।

ভাবিতে ভাবিতে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কানে আসিল আমাদের ম্যানেজারের স্বর।—ওকি মিঃ মিত্র, আপনি এখনও শুয়ে রয়েছেন, আপনার শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে না ত?

শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলাম, উঃ, এ যে রীতিমত রাত হইয়া গিয়াছে। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাইলাম, রাত নয়টা!

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হইল নন্দিতার বিবাহের লগ্ন যে রাত দশটায়। খুব সময় মতই ম্যানেজার আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন দেখিতেছি!

—আমার বাইরে নেমন্তন্ন আছে, ম্যানেজারমশায়। আমাকে এখ্‌খুনি যেতে হবে, অজস্র ধন্যবাদ।

কোনপ্রকারে কাঁধে একটা চাদর ফেলিয়া আমি সীতাংশুবাবুর বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। বাহিরের ঘর খোলা—যেন আমার জন্যই কে খোলা রাখিয়াছে।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বিবাহের সংক্ষিপ্ত আয়োজন—ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধ বরের আসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার বিপরীত দিকে নতমুখী নন্দিতা। সীতাংশুবাবু পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, লগ্নের আর কত দেরী, ঠাকুরমশায়?

লক্ষ্য করিলাম, নন্দিতার চোখের উৎসুক চাঞ্চল্যকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছে শান্ত নির্ভর। সুপ্রিয়ার চোখেও আঠারো বৎসর আগে একদিন এই আলো দেখিয়াছিলাম।

আমি সীতাংশুবাবুর সম্মুখে গিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম, এ বিয়ে হ'তে পারে না!

সম্মুখে হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও সীতাংশুবাবু বোধ হয় এতখানি স্তম্ভিত হইতেন না। কিন্তু অদ্ভুত তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। পলকের মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি শ্লেষের সুরে বলিলেন—সে সম্বন্ধে আপনি বল্‌বার কে, মশায়? আমার ভাগ্নীকে আমি যেখানে খুশী বিয়ে দেব, তাতে আপনার এত মাথাব্যথা কেন?

আমি এতটুকুও না দমিয়া আগেরই মত দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, আমি নন্দিতার বন্ধু, তাহার সবচেয়ে বড় আত্মীয়দের চেয়েও বেশী শুভাকাঙ্ক্ষী। এই বৃদ্ধের হাতে আপনি কিছুতেই নন্দিতাকে সমর্পণ কর্‌তে পার্‌বেন না, অন্তত আমি তা হ'তে দেব না।

বর বোধ হয় এতক্ষণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, এসব কি সীতাংশুবাবু? ইনি আবার কে?

তীব্রকণ্ঠে সীতাংশুবাবু জবাব দিলেন, ইনি হচ্ছেন আপনার ক'নের বন্ধু ··· আজকালকার মেয়ে বিয়ে করার সখ যাঁদের, তাঁদের এরকম দু-একজন বন্ধু বরদাস্ত কর্‌তেই হবে; রসময়বাবু, উনিশ শতাব্দীর বেরসিক হ'লে চল্‌বে না।

রসময়বাবু বরের আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন। সীতাংশুবাবুকে শাসাইয়া বলিলেন, হতভাগা জোচ্চোর, এই মেয়েকে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না ··· তুমি আমায় ঠকিয়ে হাজার টাকা নিয়েছ, আদালতে এর জবাবদিহি করতে হবে ··· রসময় করকে তুমি চেন না!

বরও বাঁকিয়া যাইবেন সীতাংশুবাবু ভাবিয়া দেখেন নাই। অনুতপ্তস্বরে বলিলেন, আপনি রাগ কর্‌বেন না রসময়বাবু, এ একজন বাইরের লোক, ভুল ক'রে এসেছেন। তাই না কি, মশায়?—বলিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া আমার দিকে তাকাইলেন।

সীতাংশুবাবুর এই সমাধানপ্রয়াসে আমি মোটেই বিচলিত হইলাম না। বলিলাম, ভুল করিনি, সব জেনেশুনেই এসেছি। ··· নন্দিতাকে আমি ক'নের আসন থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

এবার সীতাংশুবাবু নিজমূর্ত্তি ধরিলেন।

—ওসব চালাকি আমার কাছে খাট্‌বে না মশায়। আমি নন্দিতার মামা, আইনের চোখে আমিই তাহার একমাত্র অভিভাবক ··· বেশী গোলমাল কর্‌বেন ত পুলিশ ডাক্‌ব।

রসময়বাবুও ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সপ্তদশী নন্দিতাকে অঙ্কশায়িনী করিবার লোভটা বোধ হয় তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সীতাংশুবাবুর

সঙ্গে গলা মিলাইয়া বলিলেন, যদি ভাল চান্ তবে আপনি মানে মানে সরে পড়ুন, নইলে আপনার বা মেয়ের কারোই মঙ্গল হবে না।

ইহাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করিতেও আমার ঘৃণা বোধ হইতেছিল। আমি নন্দিতার হাত ধরিয়া বলিলাম, নন্দিতা, উঠে এসো।

শান্ত নন্দিতা নীরবে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমি বলিলাম, আজ থেকে আমিই নন্দিতার ভার নিলাম। যদি আপনাদের সাহস থাকে আদালতে যাবেন, আমি কল্‌কাতার ব্যারিষ্টার মিঃ নরেশ মিত্র।

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। তাহার পর দুইজনেই সুর মিলাইয়া বলিল, বিয়ের আসন থেকে মেয়ে উঠিয়ে নিলে শাস্ত্রানুসারে মেয়ের আর বিয়ে হয় না। সে জানেন, নরেশবাবু?

এবার আমার শ্লেষের পালা। জবাব দিলাম, আমি ব্যারিষ্টার, সে পরিচয় ত আপনাদের আগেই দিয়েছি; শাস্ত্রের এই সোজা কথাটা আমার জানা আছে।

নন্দিতাকে লইয়া আমি ডাউন-এক্সপ্রেসে কলিকাতায় ফিরিতেছি। আমার জীবনের কোন কথাই তাহাকে বলি নাই। সারাটা পথ শুধু ভাবিয়াছি, কঃ পন্থা?

আমার এই বয়সে হঠাৎ খেয়ালের বশে কাজ করার মত সাহস নাই, সাহস থাকিলেও প্রেরণা পাই না। আমার জীবনী শ্রোতা-শ্রোত্রীর দল আমার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন কি?

সমুদ্রের প্রতি

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার

বাস্তবের পটভূমে আজি রূপায়িত
নিবিড় রহস্য তব। শান্ত সমাহিত
অপরূপ মূর্তি তব ওঠে আজি ফুটে
মুগ্ধ মোর মানস নয়নে। করপুটে
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য, স্বপ্নাবেশ মুদিত নয়নে,
বিস্তারিয়া আপনারে অনন্তশয়নে
পড়িয়া রয়েছ তুমি। ঘেরিয়া তোমারে
মহাশূন্য,—বক্ষে তারি জ্বলে অন্ধকারে
কোটি সূর্য, গ্রহ, তারা, দীপ্ত নীহারিকা
উৎস আলোকের। অনির্বাণ অগ্নিশিখা
জ্বলিতেছে দিকে দিকে প্রদীপ্ত ভাস্বর,—
তারি মাঝে সিন্ধু তুমি বহ নিরন্তর।
নাহি তীর, নাহি তল, বালুর বন্ধন,
নাহিক' তরঙ্গ ভঙ্গ, অশ্রান্ত-গর্জন!

সেই দূর অতীতের তুলি' যবনিকা
হেরি আজি সুগোপন তব মর্মলিখা
চোখের সমুখে যেন! করি অনুভব
তোমার দুঃসহ জ্বালা, ব্যথার গৌরব
অন্তরে আমার!

অর্ধ ঘুমে অচেতন
তখনো সৃজনপদ্ম হেরিছে স্বপন,
তুমি ছিলে হে বারিধি এই বসুন্ধরা,—
বিরাট অম্বরতলে প্রাণরসে ভরা
আত্মার মিলন সে যে! সর্বদ্বন্দ্বহীন
ছিলে তুমি আপনার মাঝেতে বিলীন!

খণ্ডিত ধরণী আজি, আপন সত্তারে
হারায়ে ফেলেছ তুমি, বিচ্ছেদ আঁধারে
তাই ত গুমরি মর, তাই রুদ্ররোষে
মাটিরে গ্রাসিতে চাহ তরঙ্গ নির্ঘোষে!

কালীঘাটের কালীমন্দিরে আত্মবলিদানপ্রথা

শ্রীগোপাললাল চক্রবর্ত্তী এম-এ

বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, আমাদের দেশে নানাপ্রকার কুপ্রথা প্রচলিত ছিল—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরিত হইত। চড়ক পূজায় জিহ্বা ও পৃষ্ঠদেশ বড়শীবিদ্ধ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান, গঙ্গাসাগরে শিশু নিক্ষেপ করিয়া পুণ্যলাভের প্রচেষ্টা এবং নরবলিদান করিয়া কাপালিকগণের অক্ষয় স্বর্গলাভের জন্য উদ্যম ইত্যাদি অনেক রকমের কদাচার অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ হইয়া যে লোকে স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিত, এরূপ কথা খুব কমই শোনা যায়। তবে এই প্রথাও যে বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রথা, এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম শতকেও প্রচলিত ছিল।

নয়াদিল্লীর ভারত সরকারের মহাফেজখানার কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সম্প্রতি দুইখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে—প্রথম চিঠিখানা ১৮৫৪ সালের ১৭ জানুয়ারী তারিখে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিষ্টার স্যামুয়েলস্ পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিষ্টার ডবলিউ ডেমপিয়ারকে লিখিয়াছেন; দ্বিতীয় চিঠিখানা মিষ্টার ডবলিউ ডেমপিয়ার ঐ মাসেরই ২১শে তারিখে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মিষ্টার সিসিল বীডন্কে লিখিয়াছেন। কালীঘাটের কালীমন্দিরে যে আত্মবলিদান বা আত্মহত্যা করা হইত এই চিঠি দুইখানি হইতেই আমরা তাহা জানিতে পারি।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের চিঠিতে এইরূপ একটি ঘটনার বিশদ বিবরণ উল্লিখিত আছে। ঘটনাটি এইরূপ :—

২৯শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণ পক্ষ—রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় কালীঘাটের কালীমন্দিরে একটি হিন্দুস্থানী নিজের গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে—এই সংবাদ পাইয়া নিকটবর্ত্তী দারোগা ও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ডাক্তার আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই হতভাগ্য প্রাণত্যাগ করে। লোকটির বয়স অনুমান ৩২ বৎসর। ঐ অঞ্চলের লোকজনের সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবুও যদি কোন খোঁজ পাওয়া যায় এই জন্য মৃতদেহ ৫ দিন সেইখানে সেই অবস্থাতে রাখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মৃতদেহ শেষ পর্য্যন্ত সনাক্ত হয় নাই। অবশেষে শব পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিলে উহা গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐ চিঠিতে দেখা যায়, এইরূপ ঘটনা যে এই প্রথমবার ঘটিল এমন নয়। ১৮৩৬ সালে এইরূপ আত্মহত্যা প্রায়ই সংঘটিত হইত এবং তখন উহার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে মন্দিরে পুলিশ পাহারা মোতায়েন করিতে হইয়াছিল। হালদারদের এই সমস্ত ব্যাপারে গোপন সহানুভূতি ছিল বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল।

সান্ত্রী নিযুক্ত করা সত্ত্বেও কিন্তু ধর্ম্মান্ধ এই সমস্ত মূঢ় তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করিতে কোন বাধা পাইত না। অন্তত দুইবার দুই ব্যক্তি প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া আপন আপন জিহ্বা দান করিতে পারিয়াছিল। যখন দেখা গেল যে প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াও এইরূপ আত্মবলিদান বন্ধ করা যাইতেছে না তখন ১৮৫০ সালের এপ্রিল মাসে প্রহরী উঠাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, এরূপ ঘটনা তখন নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইত।

১৮৫৪ সালের এই ঘটনা তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি করে এবং এই প্রথা নিবারণের প্রতি তিনি যত্নবান হন। তিনি দেখিলেন, হালদাররা এই কুপ্রথা নিবারণ করিবার কোন চেষ্টাই করিতেছে না—যথেষ্ট সিপাহি সান্ত্রী তাহারা নিযুক্ত করে নাই এবং যে ছয়জন চৌকীদার তাহারা মন্দির প্রাঙ্গণে নিযুক্ত করিয়াছে তাহাদের মাহিনাও হালদাররা দেয় না—চৌকীদাররা যাত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া যাহা আদায় করিতে পারিত তাহাই তাহাদের আয় ছিল; কাজেই যখন কিছু আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না তখন তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিত।

সম্ভবত হালদাররা প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে চাহিত না, কাজেই তাহারা এই কুপ্রথা দমন করিবার বিশেষ চেষ্টা করে নাই।

চিঠিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন যে, হালদাররা যখন মন্দিরের মালিক তখন যথোপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিতে এবং প্রহরীদের মাহিনা দিতে তাহাদের বাধ্য করা হউক এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে আইন করিয়াও এই সব কদাচার দমন করিতে হইবে। তাঁহার মতে এই কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমরা হালদারদের এই সমস্ত নৃশংস আত্মহত্যার জন্য দায়ী করিতে চাহি না। তবে তাহারা যে ইহা বন্ধ করিতেও বিশেষ চেষ্টা করিত না তাহাও চিঠি দুইখানি হইতেই প্রমাণিত হয়।

যাহা হউক, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও যে এই প্রকার বীভৎস রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আত্মবলিদানপ্রথা হিন্দুসমাজে কোথা হইতে আসিল? ইহা কি কাপালিকগণের বলপূর্ব্বক নরবলিদানের পরবর্ত্তী উন্নত সংস্করণ, অথবা জৈনদের অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার যে নীতি ছিল তাহারই বিকৃত এবং বীভৎস অনুকরণ?

ভারতীয় সঙ্গীত

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ষড়জোদীচ্যবা জাতি

'ষড়জোদীচ্যবা' জাতিতে স, ম, নি, ধ এই স্বরগুলির যে-কোনও একটি অংশস্বর। এই চারিটি স্বরের মধ্যে যেটিই অংশস্বর হউক, তাহার অপর তিনটি স্বরের সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি হইয়া থাকে। মন্দ্রস্থ গান্ধার স্বরটি এই জাতিতে অংশস্বর না হইলেও ইহার বহুল প্রযোগ হইয়া থাকে। তার ষড়জ ও তার ঋষভ এই জাতিতে বহু পরিমাণে প্রযুক্ত হয়। এই জাতি 'রি' লোপে ষাড়ব ও 'রি' 'প' লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। ধৈবত অংশস্বর হইলে ষাড়ব হয় না। ইহার মূর্চ্ছনা (ষড়জ গ্রামের) গান্ধারাদি। গীতি, তাল প্রভৃতি ষাড়জী জাতির ন্যায়। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ধ্রুবা গান রূপে এই জাতি প্রযুক্ত হয়। মধ্যম ইহার ন্যাস স্বর, ষড়জ ও ধৈবত অপন্যাস স্বর। এই জাতির প্রস্তার নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

সা	সা	সা	সা	মাঁ	মাঁ	গাঁ	গাঁ	১
শৈ	০	০	০	লে	০	০	০	
গা	মা	পা	মা	গা	মা	মা	ধা	২
শ	০	সৃ	০	০	০	০	ঙ্গ	
সা	সা	মা	গা	পা	পা	নী	ধা	৩
শৈ	০	লে	০	শ	সৃ	০	ঙ্গ	
ধা	নী	সা	সা	ধা	নী	পা	মা	৪
প্র	ণ	য়	০	প্র	স	০	ঙ্গ	

গাঁ	সা	সা	সা	সা	সা	সা	গাঁ	৫
স	বি	লা	০	স	খে	০	ল	
ধা	ধা	পা	ধা	পা	নী	ধা	ধা	৬
ন	বি	নো	০	০	০	দং	০	

সা	গাঁ	গাঁ	গাঁ	গাঁ	গাঁ	সা	সা	৭
অ	০	ধি	০	ক	০	০	০	
নী	ধা	পা	ধা	পা	ধা	ধা	ধা	৮
মু	০	খে	০	০	০	০	ন্দু	
র্সা	র্সা	মা	গা	পা	পা	নী	ধা	৯
অ	ধি	ক	০	মু	খে	০	০	
ধা	নী	র্সা	র্সা	ধা	নী	পা	মা	১০
ন	য	নং	০	ন	মা	০	মি	

গাঁ	সা	সা	সা	সা	সা	সা	গাঁ	১১
দে	০	বা	০	সু	রে	০	শ	
ধা	ধা	পা	ধা	র্মা	র্মা	র্মা	র্মা	১২
ত	ব	রু	চি	রং	০	০	০	

উল্লিখিত প্রস্তারে নিম্নলিখিতরূপে অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে।

১ম কলায় সা ১+গা ১+সা ১+সা ১+মাঁ ১+মাঁ ১+গাঁ ১+গাঁ ১=৮

২য় কলায়—গা ১+মা ১+পা ১+মা ১+গা ১+মা ১+মা ১+ধা ১=৮

৩য় কলায়—সা ১+সা ১+মা ১+গা ১+পা ১+পা ১+নী ১+ধা ১=৮

৪র্থ কলায়—ধা ১+নী ১+সা ১+সা ১+ধা ১+নী ১+পা ১+মা ১=৮

৫ম কলায়—গাঁ ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১+সা ১+গাঁ ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—ধা ১+ধা ১+পা ১+ধা ১+পা ১+নী ১+ধা ১+ধা ১=৮

৭ম কলায়—সা ১+গাঁ ১+গাঁ ১+গাঁ ১+গাঁ ১+গাঁ ১+সা ১+সা ১=৮

৮ম কলায়—নী ১+ধা ১+পা ১+ধা ১+পা ১+ধা ১+ধা ১+ধা ১=৮

৯ম কলায়—র্সা ১ + র্সা ১ + মা ১ + গা ১ + পা ১ + পা ১ + নী ১ + ধা ১ = ৮

১০ম কলায়—ধা ১ + নী ১ + র্সা ১ + র্সা ১ + ধা ১ + নী ১ + পা ১ + মা ১ = ৮

১১শ কলায়—গা̊ ১ + সা ১ + সা ১ + সা ১ + সা ১ + সা ১ + সা ১ + গা̊ ১ = ৮

১২শ কলায়—ধা ১ + ধা ১ + পা ১ + ধা ১ + র্মা ১ + র্মা ১ + র্মা ১ + র্মা ১ = ৮

এই প্রস্তারটি করা হইয়াছে নিম্নলিখিত পদ্যের উপর—

শৈলেশ—সূনু প্রণয় প্রসঙ্গ, সবিলাস খেলন বিনোদম্।
অধিকমুখেন্দু নয়নং নমামি দেবাসুরেশ তব রুচিরম্॥

ষড়জ মধ্যমা জাতি

এই জাতিতে সাতটি স্বরের যে কোনও একটি অংশস্বর হইতে পারে। যখন যেটি অংশস্বর হয়, সেই স্বরের অপর ছয়টি স্বরের সহিত সঙ্গতি ঘটিয়া থাকে। সম্পূর্ণ অবস্থায় নিষাদ স্বরটি অল্প প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু যখন গান্ধার অংশস্বর হয় তখন নিষাদ গান্ধারের সম্বাদী স্বর বলিয়া সম্বাদী নিষাদের বহুল ব্যবহার দূষণীয় বা নিষিদ্ধ নহে। আর নিষাদ নিজেই যখন বাদীস্বর হয় তখনও নিষাদের অল্প প্রয়োগ সম্ভবপর নহে। এই জাতি নিষাদলোপে ষাড়ব ও নিষাদ ও গান্ধারের লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। এই শ্রুতি-বিশিষ্ট নিষাদ ও গান্ধার যখন অংশস্বর হয়, তখন ষাড়ব ও ঔড়ুব হয় না। গীতি, তাল ও কলা প্রভৃতি ষাড়্জী জাতির ন্যায়, মূর্চ্ছনা মধ্যমাদি 'মৎসরীকৃতা' বিনিযোগ—ষড়জোদীচ্যবা জাতির ন্যায় অর্থাৎ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ধ্রুবাগান রূপে এই জাতি প্রযোজ্য। এই জাতির ন্যাসস্বর ষড়জ ও মধ্যম। প্রয়োগভেদে সাতটি স্বরই অপন্যাস স্বর হইতে পারে। নিম্নে ইহার প্রস্তার প্রদর্শিত হইতেছে—

মা	গা	সগ	পা	ধপ	মা	নিধ	নিস	১
র	জ	নি০	ব	ধূ০	০	স্থ০	খ০	
র্মা	র্মা	র্সা	বির্গ	র্মগ	নিধ	পধ	পা	২
বি	লা	০	স০	লো০	০০	০০	চ	
মা	গা	রী	গা	মা	মা	সা	সা	৩
নং	০	০	০	০	০	০	০	
ম	মগম	মা	মা	নিধ	পধ	পম	গমম	৪
প্র	বি০০	ক	সি	ত০	কু০	মু০	দ০০	
ধা	পধ	পরি	রিগ	গম	রিগ	সধস	সা	৫
দ	ল০	ফে০	ন০	স০	০০	০০০	নি	
নিধ	সা	রী	মগম	মা	মা	মা	মা	৬
ভং০	০	০	০০০	০	০	০	০	
মা̊	মা̊	ম̊গ̊ম̊	ম̊ধ̊	ধ̊প̊	প̊ধ̊	প̊ম̊	গ̊ম̊গ̊	৭
কা	০	মি০০	জ০	ন০	ন০	য়০	ন০০	
পা	পধ	পরি	রিগ	মগ	রিগ	সধস	সা	৮
হৃ	দ	য়া০	ভি০	ন০	০০	০০০	ন্দি	
মা	মা	ধনি	ধস	ধপ	মপ	পা	পা	৮
তং(নং)	০	০০	০০	০০	০০	০	০	
মা̊	ম̊গ̊ম̊	মা̊	নি̊ধ̊	প̊ধ̊	প̊ম̊গ̊	গা̊	মা̊	১০
প্র	ণ০০	মা	০০	মি০	দে০০	বং	০	
ধা	পধ	পরি	রিগ	মগ	রিগ	সধস	সা	১১
কু	মু০	দা০	ধি০	বা০	০০	০০	সি	
নিধ	সা	রী	মগম	মা	মা	মা	মা	১২
নং	০	০	০০০	০	০	০	০	

এই প্রস্তারের অষ্টলঘু যোজনা এইরূপ —

১ম কলায়—মা ১ + গা ১ + সগ ১ + পা ১ + ধ ১ + মা ১ + নিধ ১ + নিস ১ = ৮

২য় কলায়—র্মা ১ + র্মা ১ + র্সা ১ + বির্গ ১ + র্মগ + নিধ ১ + পধ ১ + পা ১ = ৮

৩য় কলায়—মা ১ + গা ১ + রী ১ + গা ১ + মা ১ + মা ১ + সা ১ + সা ১ = ৮

৪র্থ কলায়—মা ১ + মগম ১ + মা ১ + মা ১ + নিধ . + পধ ১ + পম ১ + গমম ১ = ৮

৫ম কলায়—ধা ১ + পধ ১ + পরি ১ + রিগ ১ + গম ১ + রিগ ১ + সধস ১ + সা ১ = ৮

৬ষ্ঠ কলায়—নিধ ১ + সা ১ + রী ১ + মগম ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ = ৮

৭ম কলায়—মা̊ ১ + মা̊ ১ + ম̊গ̊ম̊ ১ + ম̊ধ̇ ১ + ধ̊প̊ ১ + প̂ধ̊ ১ + প̊ম̊ ১ + গ̊ম̊গ̊ ১ = ৮

৮ম কলায়—ধা ১ + পধ ১ + পরি ১ + রিগ ১ + মগ ১ + রিগ ১ + সধস ১ + সা ১ = ৮

৯ম কলায়—মা ১ + মা ১ + ধনি ১ + ধস ১ + ধপ ১ + মপ ১ + পা ১ + পা ১ – ৮

১০ম কলায়—মা̊ ১ + ম̊গ̊ম̊ ১ + মা̊ ১ + নি̊ধ̊ ১ + প̊ধ̊ ১ + প̊ম̊গ̋ ১ + গ̊ ।১ + মা̊ ১ = ৮

১১শ কলায়—ধা ১ + পধ ১ + পরি ১ + রিগ ১ + মগ ১ + রিগ ১ + সধস̇ ১ + সা ১ = ৮

১২শ কলায়—নিধ ১ + সা ১ + রী ১ + মগম ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ + মা ১ = ৮

নিম্নলিখিত শ্লোকের উপর প্রস্তার করা হইয়াছে।

রজনীবধূমুখবিলাসলোচনং
প্রবিকসিতকুমুদদলফেনসন্নিভম্।
কামি-জল নয়ন হৃদয়াভিনন্দিনম্
প্রণমামিদেবং কুমুদাধিবাসিনম্॥

গান্ধারোদীচ্য বা জাতি

এই জাতিতে ষড়জ ও মধ্যম এই দুইটি স্বরের যে-কোনও একটি স্বর অংশস্বর হইয়া থাকে। এই জাতি ঋষভ লোপে ষাড়ব হয়। সম্পূর্ণ অবস্থায় অংশস্বর ষড়জ ও মধ্যম ভিন্ন অপর স্বরগুলির অল্পত্ব এবং ষাড়ব অবস্থায় নি, ধ, প ও গ স্বরের অল্পত্ব হইয়া থাকে। ঋষভ ও ধৈবত স্বরের পরস্পর সঙ্গতি। মূর্চ্ছনা ধৈবতাদি, তাল চঞ্চৎপুট, কলা ষোলটি, বিনিয়োগ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ধ্রুবাগানরূপে। মধ্যম ন্যাসস্বর, ষড়জ ও ধৈবত অপন্যাস স্বর। নিম্নে ইহার প্রস্তার লিখিত হইতেছে—

সা	সা	পা	মা	পা	ধপ	পা	মা	১
সৌ	০	০	০	০	০	০	০	
ধা	পা	মা	মা	সা	সা	সা	সা	২
ম্য	০	০	০	০	০	০	০	
ধা	নী	সা	সা	মা	মা	পা	পা	৩
গৌ	০	রী	০	মু	খা	০	স্থ	
নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	৪
রু	হু	দি	০	ব্য	তি	ল	ক	
মা	মা	ধা	নিস	নী	নী	নী	নী	৫
প	রি	চু	০০	ম্বি	তা	০	চি	
মা	পা	মা	পরিগ	গা	গা	সা	সা	৬
ত	স্তু	পা	০০০	দং	০	০	০	
গা	মগ	পা	পধ	মা	ধনি	পা	পা	৭
প্র	বিং	ক	সিং	ত	হেং	০	ম	
রী	গা	সা	সধ	নী	নী	ধা	ধা	৮
ক	ম	ল	নিং	ভং	০	০	০	
গা	রিগ	সা	সনি	গা	রিগ	সা	সা	৯
অ	তিং	রু	চিং	র	কাং	০	ন্তি	
সা	সা	সা	মা	র্সনি	ধনি	নী	নী	১০
ন	থ	দ	০	র্পং	ণাং	০	ম	
র্মা	র্পা	র্মা	র্পরির্গ	র্গা	র্গা	র্সা	র্সা	১১
ল	নি	কে	০০০	তং	০	০	০	
র্গা	র্সা	র্গা	র্সা	র্মা	র্পা	মা	র্পরির্গ	১২
ম	ন	সি	জ	শ	রা	র	০০০	
র্গা	র্মা	র্গা	র্সা	র্গা	র্গা	র্গা	র্সা	১৩
তা	০	০	ড়	নং	০	০	০	
নী´	নী	র্পা	ধ´া	নী´	র্গা	র্গা	র্গা	১৪
প্র	ণ	মা	০	মি	গৌ	০	রী	
নী	নী	র্ধা	র্পা	র্ধা	র্পা	র্মা	র্পা	১৫
চ	র	ণ	যু	গ	ম	নু	প	
ধা	পা	সা	সা	মা	মা	মা	মা	১৬
মং	০	০	০	০	০	০	০	

এই প্রস্তাবের অষ্ট লঘু যোজনা এইরূপ—

১ম কলায়—সা ১ + সা ১ + পা ১ + মা ১ + পা ১ + ধপ ১ + পা ১ + মা ১ = ৮

২য় কলায়—ধা ১ + পা ১ + মা ১ + মা ১ + সা ১ + সা ১ + সা ১ + সা ১ = ৮

৩য় কলায়—ধা ১ + নী ১ + সা ১ + সা ১ + মা ১ + মা ১ + পা ১ + পা ১ = ৮

৪র্থ কলায়—নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ = ৮

পঞ্চম কলায়—মা ১ + মা ১ + ধা ১ + নিস ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ = ৮

৬ষ্ঠ কলায়—মা ১ + পা ১ + মা ১ + পরিগ ১ + গা ১ + গা ১ + সা ১ + সা ১ = ৮

৭ম কলায়—গা ১ + মগ ১ + পা ১ + পধ ১ + মা ১ + ধমি ১ + পা ১ + পা ১ = ৮

৮ম কলায়—রী ১ + গা ১ + সা ১ + সধ ১ + নী ১ + নী ১ + ধা ১ + ধা ১ = ৮

৯ম কলায়—গা ১ + রিগ ১ + সা ১ + সনি ১ + গা + ১ রিগ ১ + সা ১ + সা ১ = ৮

১০ম কলায়—সা ১ + সা ১ + সা ১ + মা ১ + মনি ১ + ধনি ১ + নী ১ + নী ১ = ৮

১১শ কলায়—র্মা ১ + র্পা ১ + র্মা ১ + র্পরির্গ ১ + র্গা ১ + গা ১ + র্সা ১ + র্সা ১ = ৮

১২শ কলায়—র্গা ১ + র্সা ১ + র্গা ১ + র্সা ১ + র্মা ১ + র্পা ১ + র্মা ১ + র্পরির্গ ১ = ৮

১৩শ কলায়—র্গা ১ + র্মা ১ + র্গা ১ + র্সা ১ + র্গা ১ + র্গা ১ + র্গা ১ + র্সা ১ = ৮

১৪শ কলায় নী´ ১ + নী´ ১ + র্পা ১ + র্ধা ১ + নী´ ১ + র্গা ১ + র্গা ১ + র্গা ১ = ৮

১৫শ কলায়—র্নী ১ + নী ১ + র্ধা ১ + র্পা ১ + র্ধা ১ + র্পা ১ + র্মা ১ + র্পা ১ = ৮

১৬শ কলায়—র্ধা ১ + র্পা ১ + র্সা ১ + র্সা ১ + র্মা ১ + র্মা ১ + র্মা ১ + র্মা ১ = ৮

নিম্নলিখিত পদ্যের উপর প্রস্তারটি রচিত হইয়াছে।

সৌম্যগৌরীমুখাম্বুরুহ দৈব্যতিলক পরিচুম্বিতার্চ্চিতা সুপাদম্
প্রবিকসিত হেম কমলনিভম্।
অতি রুচিরকান্তি নখদর্পণামলনিকেতং
মমসিজ শরীর তাড়নং প্রণমামি গৌরীচরণযুগমনুপমম্॥

রক্ত গান্ধারী জাতি

এই জাতিতে ধৈবত ও ঋষভ ভিন্ন অপর পাঁচটি (স গ ম প নি) স্বরের যে-কোন একটি অংশ স্বর হইয়া থাকে। স ও গ এই দুইটি স্বরের ঋষভ ভিন্ন অপর চারিটি (ম প ধ ও নি) স্বরের যথাসম্ভব সন্নিধি ও মেলন করিতে হইবে। ‘সন্নিধি’ শব্দের অর্থ যে দুইটি স্বরের পূর্ব্বোক্তরূপ লঘুকাল ভিন্ন, সেই দুইটি স্বরের পরস্পর নিরন্তর সন্নিবেশ। আর যে দুইটি স্বরের লঘুকাল একরূপ তাহাদের নিরন্তর সন্নিবেশকে মেলন বলা হয়। রক্তি বা শ্রুতি মাধুর্য্যের হানি না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অপর (ম, প, ধ, নি) চারিটি স্বরের সহিত স ও গ স্বরের এইরূপ সন্নিধি ও মেলন করিতে হয়। এই জাতি রি লোপে ষাড়ব হয়। রি, ধ লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। ইহাতে নিষাদ ও ধৈবত স্বরের বহুল প্রয়োগ হয় যদিও অন্যতম অংশস্বর বলিয়াই নিষাদ স্বরের বহুত্ব স্বাভাবিক, তথাপি নিষাদ স্বরের অতি-বহুত্ব বুঝিবার জন্যই বহুল প্রয়োগের বিধান করা হইয়াছে। আর ধৈবত ঔড়ুবকারী স্বর বলিয়া সম্পূর্ণ ও ষাড়ব অবস্থায় তাহার অল্পত্ব হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এই জন্যই ধৈবতের বহুল প্রয়োগের বিধান করা হইল। ‘পঞ্চম’ অংশ স্বর হইলে এই জাতি ঋষভ লোপে ষাড়ব হয় না। কারণ ‘রক্ত গান্ধারী’ মধ্যম গ্রামের জাতি, মধ্যম গ্রামে পঞ্চম ও ঋষভ পরস্পর-সংবাদী স্বর, সুতরাং পঞ্চম অংশ স্বর হইলে তাহার সংবাদী স্বর ঋষভের লোপ করিয়া ষাড়ব করা সম্ভবপর নহে। আর স, নি, ম ও প অংশ স্বর হইলে ঋ ও ধ লোপে এই জাতি ঔড়ুব হয় না। একমাত্র গান্ধার স্বরটিই অংশস্বর হইলে এই জাতি ঋ, ধ লোপে ঔড়ুব হইয়া থাকে। যদিও ঋ ও ধ এই দুইটি স্বর স নি ম প এই চারিটি স্বরের অন্যতম অংশ স্বর হইলে ঋ, ধ লোপে এই জাতি ঔড়ুব হয় না, এইরূপ বলা হইল—ভরতের মত অনুসরণ করিয়া। ভরত বলিয়াছেন—

গান্ধারী রক্ত গান্ধার্য্যোঃ ষড়্জ মধ্যম পঞ্চমাঃ।
সপ্তমশ্চৈব বিজ্ঞেয়া এষু নৌড়ুবিতং ভবেৎ।

ভরতের মতে গান্ধারী ও রক্ত গান্ধারী জাতিকে ষড়্জ মধ্যম পঞ্চম ও নিষাদ অংশস্বর হইলে ঋষভ ও ধৈবতের লোপে ঔড়ুব হওয়া নিষিদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে ষড়্জ ও গান্ধার এই দুইটি স্বরের অপর চারিটি স্বরের সন্নিধি ও মেলন রূপ সঙ্গতির কথা বলা হইয়াছে, এতদ্‌ভিন্ন ষড়্জ ও গান্ধার এই দুইটি স্বরের মধ্যে পরস্পর সঙ্গতিরও বিধান আছে। ইহার মূর্চ্ছনা ঋষভাদি। তাল মার্গ প্রভৃতি ষাড়্জী জাতির ন্যায়। ইহার ন্যাসস্বর গান্ধার, মধ্যম অপন্যাস স্বর। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ধ্রুবারূপে এই জাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্তার নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

পা	নী	সা	সা	গা	সা	পা	নী	১
তং	০	বা	০	ল	ব	জ	নী	
র্সা	র্সা	পা	পা	মা	মা	গা	গা	২
ক	র	তি	ল	ক	ভূ	০	প	
মা	পা	ধা	পা	মা	পা	ধপ	মগ	৩
ণ	বি	ভূ	০	০	০	০০	০০	
মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	মা	৪
তিং	০	০	০	০	০	০	০	
ধা	নী	পা	মপ	ধা	নী	পা	পা	৫
০	০	০	০০	০	০	০	০	
মা	পা	মা	ধনি	পা	পা	পা	পা	৬
রী	গা	মা	পা	পা	পা	মা	পা	৭
প্র	য়	মা	০	মি	গৌ	০	রী	
রী	র্গা	র্মা	র্পা	র্পা	র্পা	র্মা	র্পা	৮
ব	দ	না	০	র	বি	০	০	
পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	পা	৯
ন্দ	০	০	০	০	০	০	০	
রী	গা	সা	সা	রী	গা	গা	গা	১০
প্রী	০	তি	ক	রং	০	০	০	
র্গা	র্গা	র্পা	র্ধর্মা	র্ধা	র্নর্ধা	পা	পা	১১
		০	০০	০	০০			
র্গা	র্পা	র্মা	র্পর্রির্গ৹	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	১২
০	০	০	০০০	০	০	০	০	

উপরি লিখিত বারটি কলায় অষ্টলঘু যোজনা নিম্নলিখিতরূপে হইবে—

১ম কলায়—পা ১+নী ১+সা ১+সা ১+গা ১+সা ১+পা ১+নী ১=৮

২য় কলায়—র্সা ১+র্সা ১+পা ১+পা ১+মা ১+মা ১+গা ১+গা ১=৮

৩য় কলায়—মা ১+পা ১+ধা ১+পা ১+মা ১+পা ১+ধপা ১+মগা ১+৮

৪র্থ কলায়—আটটি 'মা' স্বরে একটি করিয়া অষ্টলঘু যোজনা।

৫ম কলায়—ধা ১+নী ১+পা ১+মপ ১+ধা ১+নী ১+পা ১+পা ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—মা ১+পা ১+মা ১+ধনি ১+পা ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

৭ম কলায়—রী ১+গা ১+মা ১+পা ১+পা ১+পা ১+মা ১+পা ১=৮

৮ম কলায়—রী ১+গা ১+মা ১+পা ১+পা ১+পা ১+মা ১+পা ১=৮

৯ম কলায়—আটটি 'পা' স্বরে একটি করিয়া আটটি লঘু যোজনা হইবে।

১০ম কলায়—রী ১+গা ১+সা ১+সা ১+রী ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১১শ কলায়—র্গা ১+র্গা ১+র্পা ১+র্ধর্ম ১+র্ধ ১+র্নির্ধ ১+পা ১+পা ১=৮

১২শ কলায়—র্গা ১+র্পা ১+র্মা ১+র্পর্রির্গ ১+র্গা ১+র্গা ১+র্গা ১=৮

নিম্নলিখিত পদ্যের উপরে প্রস্তার রচনা করা হইয়াছে—

তং বালরজনিকর তিলকভূষণ বিভূতিং
প্রণমামি গৌরীবদনারবিন্দ প্রীতিকরম্।

কৈশিকী জাতি

কৈশিকী জাতিতে ঋষভ ভিন্ন অপর ছয়টি (স, গ, ম, প, ধ, নি) স্বরের যে-কোন একটি অংশস্বর হইবে। যখন নিষাদ ও ধৈবত অংশস্বর হয়, তখন কেবল পঞ্চমই ন্যাসস্বর হইয়া থাকে। তদ্‌ভিন্ন (স, গ, ম, প) স্বর অংশস্বর হইলে দ্বিশ্রুতি-বিশিষ্ট গান্ধার ও নিষাদ ন্যাসস্বর হয়। মতান্তরে নিষাদ ও ধৈবত অংশস্বর হইলে নিষাদ গান্ধার ও পঞ্চম এই তিনটি স্বরের যে-কোন একটি স্বর ন্যাসস্বর হইয়া থাকে। এই জাতি ঋষভ লোপে ষাড়ব ও ঋষভ ও ধৈবত লোপে ঔড়ুব হয়। এই জাতিতে ঋষভের অল্পতা এবং নিষাদ ও পঞ্চম স্বরের বাহুল্য অংশস্বরগুলির মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি। পঞ্চম অংশস্বর হইলে এই জাতি ষাড়ব হয়

না।' ইহার তাল মার্গ প্রভৃতি ষাড়জী জাতির ন্যায়, ইহার মূর্চ্ছনা গান্ধারাদি, ঋষভ ভিন্ন ছয়টি স্বর অপন্যাস। নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ধ্রুবারূপে এই জাতি বিনিযুক্ত হয়। নিম্নে এই জাতির প্রস্তার প্রদর্শিত হইল।

পা	ধনি	পা	ধনি	গা	গা	গা	গা	১
কে	০০	লি	০০	হ	০	ত	০	
পা	পা	মা	নিধ	নিধ	পা	পা	পা	২
কা	০	ম	ত০	নু০	০	০	০	
ধা	নী	র্সা	সা	রী	রী	রী	রী	৩
বি	০	ভ্র	ম	বি	লা	০	সং	
সা	সা	সা	রী	গা	গা	মা	মা	৪
তি	ল	ক	যু	তং	০	০	০	
মা	ধা	নী	ধা	মা	ধা	মা	পা	৫
মু	০	র্দ্ধো	০	র্দ্ধ	বা	০	ল	
গা	রী	সা	ধনি	রী	রী	রী	রী	৬
সো	০	ম	নি০	ভং	০	০	০	
গা	রী	সা	সা	ধা	ধা	মা	মা	৭
মু	খ	ক	ম	লং	০	০	০	
গা	গা	গা	মা	মা	নিধনী	নী	নী	৮
অ	স	ম	০	হা	০০০	ট	০	
গা	গা	নী	নী	গা	গা	গা	গা	৯
ক	স	রো	০	জং	০	০	০	
র্গা	র্গা	র্নী	নী	র্নিধ	পা	পা	পা	১০
হৃ	দি	সু	খ	দং০	০	০	০	
র্মা	র্পা	মা	র্পা	র্পা	র্পা	র্মা	র্মা	১১
প্র	ণ	মা	০	মি	লো	চ	০	
র্সা	র্মা	র্গা	র্নিধর্মি নী	র্নী	র্মা	র্গা		১২
ন	বি	শে	০০০	যং	০	০	০	

কৈশিকী জাতিতে নিম্নলিখিতরূপে অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে :—

১ম কলায়—পা ১+ধনি ১+পা ১+ধনি ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

২য় কলায়—পা ১+পা ১+মা ১+নিধ ১+নিধ ১+পা ১+পা ১+পা ১=৮

৩য় কলায়—ধা ১+নী ১+র্সা ১+সা ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=৮

৪র্থ কলায়—সা ১+সা ১+সা ১+রী ১+গা ১+মা ১+মা ১+মা ১=৮

৫ম কলায়—মা ১+ধা ১+নী ১+ধা ১+মা ১+ধা ১+মা ১+পা ১=৮

৬ষ্ঠ কলায়—গা ১+রী ১+সা ১+ধনি ১+রী ১+রী ১+রী ১+রী ১=

৭ম কলায়—গা ১+রী ১+সা ১+সা ১+ধা ১+ধা ১+মা ১+মা ১=

৮ম কলায়—গা ১+গা ১+গা ১+মা ১+মা ১+নিধনি ১+নী ১+নী ১=৮

৯ম কলায়—গা ১+গা ১+নী ১+নী ১+গা ১+গা ১+গা ১+গা ১=৮

১০ম কলায়—র্গা ১+র্গা ১+র্নী ১+র্নী ১+র্নিধ ১+র্পা ১+র্পা ১+র্পা ১=৮

১১শ কলায়—র্মা ১+র্পা ১+র্মা ১+র্পা ১+র্পা ১+র্পা ১+র্মা ১+র্মা ১=৮

১২শ কলায়—র্সা ১+র্মা ১+র্গা ১+র্নিধর্নি ১+র্নী ১+র্নী ১+মা ১+র্গা ১=৮

কৈশিকী জাতির উদ্ধৃত প্রস্তারটি নিম্নলিখিত পদ্যের উপর করা হইয়াছে—

কেলীহত কামতনু বিভ্রম বিলাসং তিলকযুতং
মূর্দ্ধোর্দ্ধবাল সোমনিভম্।
মুখ কমলমসম হাটকসারাজং হৃদিসুখদং—
প্রণমামি লোচন বিশেষম্॥

মধ্যমোদীচ্য বা জাতি

এই জাতিতে একমাত্র পঞ্চমই অংশস্বর হইয়া থাকে। 'মধ্যমোদীচ্য বা' সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ জাতি, কখনই এই জাতি ষাড়ব বা ঔড়ুব হয় না। এই জাতির অবশিষ্ট লক্ষণ 'গান্ধারোদীচ্য বা' জাতির ন্যায়। গান্ধারোদীচ্য বা জাতির ন্যায় এই জাতিতেও অংশস্বর পঞ্চম ভিন্ন অপর স্বরগুলির অল্পতা ঋষভ ও ধৈবত স্বরের পরস্পর সঙ্গতি, কলার সংখ্যা ষোল। ইহার মূর্চ্ছনা মধ্যম গ্রামীয় মধ্যমাদি। তাল চঞ্চৎপুট,

নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ধ্রুবারূপে এই জাতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ন্যাস স্বর মধ্যম। ইহার প্রস্তার নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

পা	ধনি	নী	নী	মা	পা	নী	পা	১
দে	০০	হা	০	র্দ্ধ	রূ	০	প	
রী	রী	রী	গা	সা	রিগ	গা	গা	২
ম	তি	কা	০	ন্তি	ম০	ম	ল	
নী	নী	নী	নী	নী	নী	নী	না	৩
ম	ন	লে	০	ন্দু	কু	০	ন্দ	
নী	নী	ধপ	মা	নিধ	নিধ	পা	পা	৪
কু	মু	দ০	নি০	ভং	০০	০	০	
পা	পা	রী	রী	রী	রী	রী	রী	৫
চা	০	মী	০	ক	রা	০	ম্বু	
মা	রিগ	স	স̊ধ	নীঁ	নীঁ	নীঁ	নী̊	৬
রু	হু০	দি	০০	০	ব্য	কা	ন্তি	
মা	পা	নী	সা	পা	পা	গা	গা	৭
প্র	ব	ব	গ	ণ	পূ	০	জি	
গা	পা̊	মা̊	নি̊ধ̊	নীঁ	নীঁ	সা	সা	৮
ত	ম	জে	০০	য়ং	০	০	০	
পা̊	পা̊	মা̊	ধ̊নি̊	পা̊	পা̊	পা̊	পা̊	৯
সু	রা	ভি	ষ্টু০	ত	ম	নি	ল	
মা̊	পা̊	মা̊	রিগ	গা	গা	গা	গা	১০
ম	নো	জ	০০	ব	০	ম	ম্বু	
পা	পা	মা	পা	নী	নী	নী	নী	১১
দো	০	দ	ধি	নি	না	০	দ	
মা	পা	মা	পরিগ	গা	গা	গা	গা	১২
ম	তি	হা	০০০	সং	০	০	০	
র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্মা	র্নিধ	নীঁ	নীঁ	১৩
শি	বং	শা	০	স্ত	ম০	সু	র	
নী	নী	ধপ	মা	নিধ	নিধ	পা	পা	১৪
চ	ম্	ম০	থ	নং০	০০	০	০	
রীঁ	র্গা	র্সা	র্সা	র্মা	র্নির্ধর্নি	নীঁ	নীঁ	১৫
ব	০	ন্দে	০	ত্রৈ	লো০০	ক্য	০	
নীঁ	নীঁ	র্ধা	র্পা	র্ধা	র্পা	মা	র্মা	১৬
ন	ত	চ	র	ণং	০	০	০	

উপরি লিখিত প্রস্তারে নিম্নলিখিতরূপে অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে—

১ম কলায় —পা ১ + ধনি ১ + না ১ + না ১ + মা ১ + পা ১ + নী ১ + পা ১ = ৮

২য় কলায়—রী ১ + রী ১ + রী ১ + গা ১ + সা ১ + রিগ ১ + গা ১ + গা ১ = ৮

৩য় কলায়—আটটি "নী" স্বরে (প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া) অষ্টলঘু যোজনা করা হইয়াছে।

৪র্থ কলায়—নী ১ + নী ১ + ধপ ১ + মা ১ + নিধ ১ + নিধ ১ + পা ১ + পা ১ = ৮

৫ম কলায়—পা ১ + পা ১ + রী ১ + রী ১ + রী ১ + রী ১ + রী ১ + রী ১ = ৮

৬ষ্ঠ কলায়—মা ১ + রিগ ১ + সা ১ + স̊ধ ১ + নীঁ ১ + নীঁ ১ + নীঁ ১ + নীঁ ১ = ৮

৭ম কলায়—মা ১ + পা ১ + নী ১ + সা ১ + পা ১ + পা ১ + গা ১ + গা ১ = ৮

৮ম কলায়—গা ১ + পা ১ + মা̊ ১ + নি̊ধ̊ ১ + নী̊ ১ + নী̊ ১ + সা ১ + সা ১ = ৮

৯ম কলায়—পা̊ ১ + পা̊ ১ + মা̊ ১ + ধ̊নি̊ ১ + পা̊ ১ + পা̊ ১ + পা̊ ১ + পা ১ = ৮

১০ম কলায়—মা ১ + পা̊ ১ + মা̊ ১ + রিগ ১ + গা ১ + গা ১ + গা ১ + গা ১ = ৮

১১শ কলায়—গা ১ + পা ১ + মা ১ + পা ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ + নী ১ = ৮

১২শ কলায়—মা ১ + পা ১ + মা ১ + পরিগ ১ + গা ১ + গা ১ + গা ১ + গা ১ = ৮

১৩শ কলায়—র্গা ১ + গা ১ + র্গা ১ + র্গা ১ + র্মা ১ + র্নিধ ১ + না ১ + র্নী ১ = ৮

১৪শ কলায়—র্নী ১ + র্নী ১ + ধপ ১ + মা ১ + নিধ ১ + নিধ ১ + পা ১ + পা ১ = ৮

১৫শ কলায়—রী ১ + র্গা ১ + র্সা ১ + র্সা ১ + মা ১ + নির্ধর্নি ১ + র্না ১ + র্নী ১ = ৮

১৬শ কলায়—র্নী ১ + র্নী ১ + র্ধা ১ + পা ১ + র্ধা ১ + র্পা ১ + মা ১ + র্মা ১ = ৮

এই প্রস্তারটি করা হইয়াছে নিম্নলিখিত পদ্যের উপরে—

দেহার্দ্ধরূপমতি কান্তিমমলমমলেন্দু কুন্দকুমুদনিভং
চামীকরাম্বুরুহু দিব্যকান্তি প্রবরগণ পূজিতমজেয়ম্।
সুরাভিষ্টুতমনিল মনোজবমম্বুদোদধি নিনাদ মতিহাসং
শিবং শান্তমসুর চমূমথনং বন্দে ত্রৈলোক্যনত চরণম্॥

বিদ্যাপতি

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

রসময়, তুঁহু মম পরাণ-সমান,
জীবন ঢুঁড়ি ঢুঁড়ি কহায়সি গান॥
জ্ঞেয়ান অবধি তব শুনই সুসঙ্গীত
শ্রুতিপথ সুশীতল ভেল,
প্রেম-মরতি তব মন-মন ঠারই
মরম মধুর ভৈ গেল।

বরখে বরখে কত মরি মরি যাওয়ত
চন্দ্রতপনদিনরাতি--
জগজ্জনমানসে চিরদিন জাগই
তুঁহু-প্রেম-পরদীপভাতি।

কবিজনগুণ-অনুধাবনে বৈছন
বিদগধ-চিতে অনুমান,
বিদ্যাপতি মম ঐছন বিশোয়াস,
নহি নহি তুহারি সমান।

*

রসকূপ, তুঁহু মম মরম-সমান,
অন্তর ঢুঁড়িঢুঁড়ি রসায়সি প্রাণ!
এক কবিতা তব বহুভাবসাগর
অমিয়-কি অতলসমানা,

ধাওয়ত কবিচিত সুখে অবগাহত
ন জানত আদি-অবসানা!

এহি মহাসাগরে পারগমনতরী
মাঙ্গত নহি দীনহীন,
তুহু-সঙ্গম যদি ভাগ্যে মিলায়ল
হব হাম জলচর মীন;
মজ্জনে মজ্জনে নিত সুখ ভুঞ্জব,
সোহি মত হৃদয়-কি যত্ন,
বৈছনে সম্ভব সকরুণ বিহি কব
মিলায়ব পরাণ-কি রত্ন!

*

তুঁহু মনোময়, তুঁহু সম বঁধুয়া সমানা,
সাধু-মধুর তব মাধব-কি গানা!
অতল এ দুস্তর মহাভবসাগরে
গীততরণী নিরমানি'
এক মাধবধনে বহু করি বণ্টত
কূলে কূলে বিশায়ত দানী!
তব ভাব চিন্তনে তব গুণ কীর্ত্তনে
বিচার রহল মুঝে জানা,
রাসগহনে যোই মাধব মিলায়ত
সোহি পুন মাধবসমানা!
বহুজন আওয়ত বহুজন গাওয়ত,
বহুজনে বহুতর ভেক,
রসগীতে অনুপম বিদ্যাপতি-সম
লাখে ন পাওয়ব এক!

শনিবার

শ্রীগৌতম সেন

বিবাহ করিয়াই পলাশ একখানি ঘর বাছিয়া লইয়া কায়েম হইয়া বসিল। কায়েম হইতে হইলে যাহা কিছু দরকার সকলই আসিল। আসিবার উপায় রাখিল না শুধু টাকার। টাকার কথা মনে হইলেই—কলিকাতায় তাহার সেই ছোট্ট মেস-ঘরের কথা মনে পড়ে। সেই ক্ষুদিরাম মিত্র, বিনোদ ঘোষ, নকড়ি হালদার। পলাশ কাঁপিয়া ওঠে! মাধুরীকে ছাড়িয়া থাকিবার কল্পনাও সে করিতে পারে না। মনে হয়, একখানি পাঁজরাই বা খসিয়া যাইবে।

চাকরি করিতেছে সে আজ পাঁচ বছর। তখন মাধুরী ছিল তাহার কল্পনার রঙীন স্বপ্নে। কিন্তু আজ –

আজ মাধুরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার একান্ত সন্নিকটে। গানে নয়—কাব্যে নয়—স্বপ্নে নয়। মনে হয়, তাহার প্রতিটি অণু-পরমাণুর সহিত কোথায় যেন ইহার যোগ রহিয়াছে। তাহাকে ছাড়িয়া –

দিন যায়। চাকরির কথা সে ভুলিবারই চেষ্টা করে। মা জিজ্ঞাসা করেন, তোর ছুটি আর ক'দিন?

পলাশ চম্‌কাইয়া ওঠে! বলে, এখনও একমাস মা। কিন্তু তারপর?—তারপর কি করিয়া তাহার মাকে বুঝাইবে, সে চাকরি আর করিবে না?—কিন্তু করিবেই বা কি? নকড়ি হালদারের কথা মনে পড়ে। প্রতি শনিবার—অফিস হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া ট্রেন ধরিবার সেই ব্যাকুল চেষ্টা! পলাশের বুক দুর্ দুর্ করিতে থাকে। ষ্টেশন হইতে বাড়ীর পথ অমনি তাহার চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। রাত্রি অন্ধকার—তাও একা!—পথ চলিবার যেন এক দুরন্ত সাধনা! হয়ত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে—মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ! হয়ত কড়্ কড়্ করিয়া কোথাও বাজ পড়িতেছে, কাল বৈশাখীর ঝড়! পলাশ ভয়ে ভয়ে চোখ বোজে।

একমাস বড় বেশী দিন নয়, তাহাও একদিন কাটিয়া গেল। একটা কৈফিয়তও সে ইহার মধ্যে সাজাইয়া লইয়াছে। কিন্তু মা আর কিছু বলেন না।

পলাশ নিজেই কথাটা একদিন পাড়িল। বলিল, একটা দোকান কর্‌বো মনে কর্‌ছি মা—তেল-নুনের দোকান। চাকরির যা অবস্থা।

মা কিছু বলিলেন না। সাতদিন দোকানের স্বপ্ন দেখিয়া একদিন সত্যই সে দোকান খুলিয়া বসিল। বাহিরের ঘরেই অল্প-কয়েকটি জিনিস লইয়া দোকানের এই ঠাট্। মা-ও বুঝিতেন না এমন নয়। কিন্তু কি আর বলিবেন।

শনিবার। সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে। পলাশ দোকান বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

মাধুরী হাসিয়া বলে, কি গো কত বিক্রী?

—অনেক।

তারপর সারা রাত্রি ধরিয়া কী বর্ষণ! যেন আকাশ আজ এক রাত্রিতেই দেউলিয়া হইবার পণ করিয়া বসিয়াছে! নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বাহিরের সেই উন্মাদ-বর্ষণের দিকে পলাশ স্থির হইয়া চাহিয়া থাকে। হয়ত নকড়ি এখনো মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে!

—কি ভাব্‌ছো? মাধুরী বলে।

পলাশ তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণ একটু হাসে। বলে, ভাবছি নকড়ির কথা। এখনো সে মাঠ ভাঙ্‌ছে!

—সে আবার কি?

পলাশ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাল হইয়া বসে। বলে, পৃথিবী রসাতলে গেলেও—শনিবারে সে বাড়ী যাবেই। তাও কি সহজগম্য! ষ্টেশন থেকে পাকা দু ক্রোশ!

মাধুরী হাসিয়া স্বামীর খাবার আনিতে যায়।

রাত্রে স্বামীর একান্ত কাছটিতে সরিয়া আসিয়া মাধুরী হাসিতে হাসিতে বলে, তোমাদের নকড়ির কথা বল না গো! পলাশও হাসে। বলে, সোমবারে—নকড়ি যখন মেসে ফেরে তখন দেখ্‌লে ভয় হয়! কারুর সঙ্গে কথা নাই—নিঃশব্দে এক সময় দুটি খেয়ে আসে। আলোটা জ্বাল্‌তেও যেন ভুলে যায়।

মাধুরীর মন সেই অন্ধকার মাঠের পানে ছুটিয়া চলে। বলে, তারপর?

—তারপরের দুদিন 'হাঁ না' ক'রেই কাটে। বিষ্যুৎবারে আবার তার হাসি ফোটে।

—আর শুক্রবার? বলে, আর মাধুরী হাসে।

—সেদিন তার নটরাজ মূর্ত্তি। সকাল থেকে সেই যে বক্তৃতা গান সুরু হবে—তার আর বিরাম নাই। মাধুরী চুপ করিয়া কি ভাবে। তারপর বলে, তুমি হলে কি কর্‌তে?

— আমি হ'লে আমার পাঁজিতে রোজই শনিবার হ'তো।

—তার মানে? মাধুরী বিস্মিত হ'য়ে বলে।

—তার মানে রোজই অফিস থেকে পালিয়ে আসতাম।

—আর চাকরি?

—চাকরি রাখ্‌তে পার্‌বো না ব'লেই তো আগে-ভাগে ছেড়ে দিয়ে এলাম।

মাধুরী তাহার মাথাটি পলাশের বুকের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

—আমার দোকানই ভাল—কি বল মাধুরী? বলিয়া পলাশ তাহার মুখখানা নিজের কাছে টানিয়া আনে।

মাধুরী একটি কথাও বলিতে পারে না। কারণ, দোকান করার সঙ্গে তাহার যেটুকু যোগ—কেমন করিয়া যেন উহা মার চোখেও ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ভাবে -ছি, ছি—ইহা অপেক্ষা স্বামী তাহার চাকরি করিত—সাতদিন পর পর বাড়ী আসিত, সেও ছিলো ভাল।

পলাশের দোকান চলিল না। ঠিক চলিল না বলিলে ভুল বলা হয়, কারণ চলিত আর কবে? দীর্ঘ ছয় মাস ধরিয়া সে তাহার দোকানটাকে যেন ঠাট্টাই করিয়া আসিয়াছে! বেলা আটটার সময় সিল্কের পাঞ্জাবি উড়াইয়া যখন সে দোকানে আসিয়া বসিত, তখন কুণ্ডুর দোকানে ভীড় জমিয়া গিয়াছে। বৈকালেও সেই পাঁচটা।

বলিলে বলিত, এ শিক্ষিতের প্রতিষ্ঠান— যা ক'রে যাব তাই একদিন চলে যাবে।

কিন্তু তাহাকেই যে একদিন চলিয়া যাইতে হইবে, একথা সে নিজে না বুঝিলেও অন্য সকলে বুঝিয়াছিল। তবে একটা কথা—পলাশ ধার করিয়া দেনা বাড়ায় নাই।

পলাশ দিনকতক বাড়ী হইতে বাহিরই হইল না। বলে, ছোটলোকের দেশ—জিনিসের ভাল-মন্দ বোঝে না। সস্তা পেলেই হ'লো! কিন্তু সেই পয়সাটা যে দাঁড়ি-টিপে মারে, এ বোঝবার ক্ষমতাই নাই মুখ্যুদের। আবার বলে কিনা, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা কর।—আরে, মিশবো কার সঙ্গে? ঐ সব বাগ্দী চাঁড়াল?

বাইরের ঘরে তাসের আড্ডায় যখন দুবেলা লোক জমিতে লাগিল, তখন পলাশ ভাবিত—এইভাবে বাকী জীবনটা কি করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়? কতজনের এমনও তো হয়—বাপ যাহা রাখিয়া গেল, চাকরি না-করার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। শরীরখানা কেমন নন্দদুলাল—হাড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। নিজের শরীরের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পলাশের কেবলই নিশ্বাস পড়ে। এই হাড় কখানা—বিধাতা যেন নিয়ত ঠোকাঠুকির জন্যই পাঠাইয়াছেন! অনেকদিন পরে পলাশের আবার নকড়ি হালদারের কথা মনে পড়িল। এই তো—এই তো তাহাদের আসল জীবন। ইহার বাহিরে তাহাদের মানাইবেও না—চলিবেও না। পথ ভুলিয়া যাহারা ঘুরিতে গিয়াছে, তাহারাই ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। ভাল-ছেলের মত নির্দ্দিষ্ট সীমাটুকু লইয়া সন্তুষ্ট থাকো—ভূগোলের পৃথিবী ভুলিয়া যাও—একটি একটি করিয়া গণিয়া পরমায়ুর দিনগুলিকে ঠেলিয়া এসো!

রাত্রির অন্ধকারে ভাল দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু দেখা যাইতেছিল না বলিয়াই শোনাইল ভাল। আরও এক সান্ত্বনা—অন্ধকার না হইলে, নিশ্চয়ই অমন করিয়া সে বলিতেও পারিত না। পলাশ বসিয়া বসিয়া ভাবে, মাধুরীর কণ্ঠে এতখানি তিক্ততা কোথায় ছিলো এতদিন!

সোজাসুজি মাধুরী জানাইয়া দিল, হয় তুমি বেরোও—নয় আমি বেরোই।

অন্ধকারে মাত্র দেখাই যায় না—যদি শোনাও না যাইত?

পলাশ পরদিনই মাকে জানাইয়া দিল, একটা নতুন চাকরি পাইয়াছে—দেশে দেশে ঘুরিতে হইবে, কোন স্থির ঠিকানা নাই, অসুখ না হইলে ছুটিও পাওয়া যাইবে না এবং কালই যাইতে হইবে।

মা বলিলেন, আচ্ছা, একটা হোক বাছা। যে ক'রে দিন কাট্‌ছে।—

পলাশের মনে হইল, এই মুহূর্ত্তে—একবস্ত্রে সে এই স্নেহহীন সংসার হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

স্ত্রী মাধুরী হয়ত কিছু বুঝিয়াছিল, তাই পলাশ রাত্রে ঘরে আসিতেই বলিল—সত্যিই চাকরি, না সন্ন্যাসী হ’য়ে বেরুচ্ছো?

সে আমার মাস-মাহিনা ক’ষে নিরূপণ ক’রো -বলিয়া পলাশ পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহার পর অনেক খানি মান-অভিমানের পালা অভিনীত হইতে পারিত। কিন্তু মাধুরী দেখিল, আর ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। যখন সুমতি হইয়াছে—কারণ অতি তুচ্ছ সুযোগও উপেক্ষা করিবার দৃঢ়তা পলাশের নাই। থাকিয়া যাইবার ছল-ছুঁতা যাহারা আবিষ্কার করিয়া বাহির করে, তাহাদের রাগ ভাঙাইতে নাই।

পলাশ পাশ ফিরিয়াই রহিল। কিন্তু মাধুরী হয়ত এখুনি ঘুমাইয়া পড়িবে—আর একবার ঘুমাইয়া পড়িলে—

পলাশের ব্যাকুল-মন প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া ওঠে।

এমন সময় মাধুরী যখন বলিল, কি গো—ঘুমুলে?

—‘না।’ কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়াই পলাশ নিজের দেহখানাকে স্প্রিং-এর মত ঘুরাইয়া লইল। যেন ‘স্প্রিং’টা পাক খাইয়া প্রস্তুত হইয়াই ছিলো—একটা স্পর্শের ওয়াস্তা।

মাধুরী খুব সহজকণ্ঠে বলিল, ছুটি না পাও—মন খারাপ ক’রো না। বড়দিনের ছুটি তো দেবেই—

পলাশ মনে মনে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। আর হইলও তাহাই। পলাশ এক বৎসর বাড়ী ফিরিল না।

শনিবার। নকড়ির কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। পলাশ ভাবে, কি করিয়া নকড়ি এই শনি-প্রীতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে! বিবাহ? হয়ত অনেকদিনই হইয়াছে। বয়সটা তো ঠিক প্রথম-যৌবন নয়। তবে?—

অফিস হইতে মেসে ফিরিয়া পলাশ দেখিল, সমস্ত মেসবাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করিতেছে! কেহ কোথাও নাই—প্রতি ঘরের বাহিরে একটি করিয়া তালা। শুধু তাহারই পাশের ঘরের দুইটি ছাত্র অসীম মনোযোগের সহিত পাঠ মুখস্থ করিতেছে।

পলাশ ঘরে ঢুকিয়া বসিতেই ভুলিয়া গেল। একবার মনে হইল, ছাদে উঠিয়া কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া আসে। কিন্তু —না, ঠাকুরকে বলিল—আমি কিছু খাব না রাত্রে। বলিয়া পলাশ যেমন আসিয়াছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

সারারাত্রি থিয়েটারে কাটাইয়া পলাশ মেসে ফিরিল এবং দীর্ঘ রবিবারটাকে লম্বা-লম্বা ঘুমে যেন উল্লম্ফন করিয়াই পার করিয়া দিল। পলাশের এক-একবার মনে হয়, বাড়ী বলিতে আমরা কি বুঝি? কয়েকখানি ঘরের সমষ্টি? —না, আর কিছু?

পলাশ মেসে আজকাল বেশীক্ষণ টিঁকিতে পারে না। গল্প? কি গল্পই বা করিবে সে? তাহাদের জীবনটাই তো আগাগোড়া ট্রাজেডি! ঘানির বলদ—চক্ষু বুজিয়া জাবর কাটিতে কাটিতে বাঁধাপথে আমরণ চলিয়াছে। ঐ তো সাহেবরাও আসিয়াছে কালাপানি পার হইয়া এদেশে চাকরি করিতে! পলাশ ঘুমের ঘোরেও চৌরঙ্গীর স্বপ্ন দেখে!

বিনোদ ঘোষ নিমন্ত্রণ করিয়া গেল, তার মেয়ের বিয়ে—যাইতেই হইবে।

এমনি তো কত বিবাহই হইতেছে! পলাশ নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলে, হয়ত আর একটি মেস-মেম্বার বাড়িল। পাশের ঘরে তখন কাব্যচর্চ্চা চলিতেছে। পলাশের ভারী ইচ্ছা করিতেছিল, একবার চীৎকার করিয়া বলে—ও-মুখে ওসব মানায় না।

নকড়ি আসিয়া বলিল—ওরে—ক্ষুদিরামের আজ দশপাতা এলো।

পলাশ হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু হাসিয়াই মনে হইল, নকড়ির কাছে ক্ষমা চায়। কেরাণি-জীবনের এই তো রোমান্স। নহিলে ত্রিশ টাকা মাহিনার ঐ ক্ষুদিরাম—তাহারও দশপাতা চিঠি আসে! পলাশের একবার ইচ্ছা করে, লুকাইয়া তাহার চিঠিখানা একবার দেখিয়া আসে। দশপাতা লিখিবার মত কি আছে তাহাদের ঘরে!

বৃদ্ধ তারক চাটুয্যে অনেক কষ্টে পলাশের খোঁজ লইয়া মেসেই উঠিলেন। বয়সকালে একবার তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন, তারপর এই। বলিলেন, যাই বল বাবাজী—সহর তো কলকাতা। আমার নীলুও তোমার মত বায়না ধরেছিলো, ব্যবসা করবে। আমি বল্লাম,

বাবা পলাশের ঘর-দোরের ছিরিখানা একবার দেখ্। ও লক্ষ্মী বাঁধা আছেন কলকাতায়। তার চেয়ে চল্—পলাশকে গিয়ে ধরি, একটা হিল্লে হবেই। তা কিছুতেই কি তাকে আন্‌তে পার্‌লাম। বলে লজ্জা করে!—দেখ তো একবার কথাটা! পর নয়—আপনার জন—

তারপর চাটুয্যে মশায় বলিলেন, যাওনি তো বাবা অনেকদিন, একবার গিয়ে দেখ। মাটির ঘর তো অনেকেরই হয়—হাঁ, পছন্দ বটে তোমার মায়ের!

পলাশ মাথা নীচু করিয়া রহিল।

—আসবার সময় আমার দুটো হাত ধ’রে সে কি কান্না তোমার মায়ের! বল্‌লে, একবার তাকে আস্‌তে ব’লো ঠাকুরপো। নইলে এ ঘরদোর কার জন্যে? আমরাও বলাবলি করি, সেই আমাদের পলাশ! বৌমাও হয়েছেন আমাদের মা-লক্ষ্মী! মুখে কথাটি নেই—

পলাশ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, স্নান করে নিন্ কাকা, নইলে আবার জল চলে যাবে।

—এই দেখ, কুঁড়ে হ’য়ে একটু বস্‌বার জো আছে? সেদিন অঘোর বাঁড়ুয্যে এসে বললে—দাদা, যাচ্ছো বটে কিন্তু টিঁক্‌তে পার্‌বে না। ইচ্ছে হ’লো বলি—ভায়া, ভাড়াটা তো বেশী নয়—একবার গিয়ে দেখেই এস না। ভূত—ভূত! ওসব দেশে মানুষ হয়না বাবাজী, ভূত হয়। দোকান চলে নি ব’লে সবাই হেসেছিলো, কিন্তু আমি হাসিনি। কলকাতায় হবে না তো হবে কোথায়? পয়সা ছড়ানো আছে বাবাজী—কুড়িয়ে নিতে জানা চাই। নীলুকে আমি তোমার কাছেই দেবো বাবা। বলে, সঙ্গগুণ বড়গুণ।

পলাশের অফিসের বেলা হইতেছিল। ঠাকুরকে ডাকিয়া যথাযথ উপদেশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

চাটুয্যে মশায় সাতদিন কল্‌কাতায় কাটাইয়া অবশেষে বাড়ী ফিরিলেন। পলাশ আবার নূতন করিয়া তাহার বাড়ীর কথা ভাবিতে বসিল। মাসিক খরচ হইতে বাচাইয়া মা গৃহ-সংস্কার করিতেছেন। কিন্তু এসব কাহার জন্য? জীবন তো তাহার মেসেই কাটিল! একটা শনিবারের জন্য এত আয়োজন কেন? গৃহের প্রয়োজন যেখানে মাথা গুঁজিবার জন্য, সেখানে এ অপব্যয় নয় তো কি? আর শুধু কি গৃহ? বিবাহই বা তাহারা করে কেন?

পলাশের হঠাৎ মনে হইল, ‘দম্পতী’ কথাটা কেরাণির অভিধান হইতে তুলিয়া দেওয়া উচিত।

অফিস হইতে ফিরিবার সময় সিঁড়ীর নীচে ক্ষুদিরামের সেই ‘দশপাতা’ পাওয়া গেল। হয়ত মালিকের অসাবধানে পকেট হইতে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। পলাশ চিঠি লইয়া চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া ঘরের দোর বন্ধ করিল। চিঠি পড়িয়াই পলাশের ইচ্ছা করিল, সেখানা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া উনুনের আগুনে দিয়া আসে। দীর্ঘ ছয়পাতা সংসারের দরকারি-অদরকারির ফর্দ্দ, বাকী তিনপাতা অভাব অভিযোগ, শেষটা সাবধানে থাকিবার উপদেশ!

ক্ষুদিরাম আসিতেই পলাশ চিঠিখানা তাহার গায়ে ছুড়িয়া দিল। বলিল, তোমার প্রেমপত্র—সিঁড়ির নীচে পড়েছিলো।

ক্ষুদিরাম একবার পলাশের মুখের দিকে চাহিল; তারপর মুখ টিপিয়া হাসিল।

নকড়ি আবার কাল বাড়ী যাইবে।—কী উল্লাস! পলাশ চাহিয়া চাহিয়া দেখে। ভাবে, কিসের নেশা এ?

নকড়ি তখন চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছে—“আমার কুটীর রাণী সে যে গো আমার কুটীর রাণী।”

পলাশের ভারী ইচ্ছা করে, একবার নকড়ির বাড়ীটা দেখিয়া আসে।

নকড়িকে বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিল।—সত্যি বল্‌ছিস?

পলাশ নকড়ির বাড়ী আসিল এবং আসিয়াই দেখিল, একদল ছেলে-মেয়ে নকড়িকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সকলেই চেঁচামেচি করিতেছে। কেহ চাহিতেছে বিস্কুট, কেহ লজেন, কেহ আর কিছু।

নকড়ি হাতের মোট নামাইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া খুব হাঁক-ডাক সুরু করিয়া দিল।

পলাশের বড় লজ্জা করিতেছিল। সে যেন এই বাড়ীখানার উপদ্রব হইয়াই প্রবেশ করিল। বলিল, আমাকে নিয়ে এতখানি বিব্রত হ’য়ে পড়্‌বে জান্‌লে আমি আসতাম না।

নকড়ি দমিয়া গেল। বলিল, না ভাই বিব্রত নয়—আমাদের বাড়ী এসেছো, এ যে ভাগ্যের কথা। আচ্ছা, একটু ব’সো—খবর দিয়ে আসি।

খবর দিয়ে আসাই বটে—নকড়ি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

পলাশ ব্যস্ত হইয়া ওঠে। বলে, না ভাই তুমি যাও। এতদিন পরে এলে, বরং—

নকড়ির আর ছুটাছুটির অন্ত নাই। কোথায় ভাল একটু দুধ পাওয়া যাইবে, কাহার বাড়ীতে চায়ের সরঞ্জাম আছে। সবই সহ্য হইল, কিন্তু নকড়ি যখন পলাশের ঘরেই শোবার ব্যবস্থা করিল, তখন পলাশ চটিয়া উঠিল। বলিল, না, তোমাকে কিছুতেই এ-ঘরে শুতে দেবো না।

নকড়ি হাসিল। বলিল, কেন বল তো ?

—না, না, সে হয় না। এতদিন পরে এলে, বৌদি—

নকড়ি হো হো করিয়া হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল, সে তো নাই—আজ তিন বছর—

পলাশ সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না। বিছানায় শুইয়া সে শুধু ছট্‌ফট্ করিয়াছে।

বাড়ীর পিছনেই কয়েকটা কুকুরের বাচ্চা সারারাত্রি কেঁউ-কেঁউ করিল।—হয়ত মা নাই, মরিয়াছে।

ভোরের আলোয় পলাশ দেখিল, একটা মদ্দা কুকুর সেই বাচ্চাগুলোর গা চাটিয়া দিতেছে।

পলাশ কলিকাতা ফিরিয়াই একমাসের ছুটির দরখাস্ত করিল। ছুটি পাইয়াই সে কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ষ্টেশনের পথ ধরিল।

পরিচিত সেই গ্রাম্যপথ, খাল-বিল-ডোবা। গ্রামে ঢুকিতেই সেই কামারের বাড়ী, সেই নিধিরাম, বঙ্ক নাপিত।—এ যেন তাহার রাত্রের স্বপ্ন !

মায়ের চুল যেন একটু বেশী সাদা হইয়াছে ! মাধুরী ? সেও যেন এই এক বৎসরে অনেকখানি বড় হইযা লইয়াছে ! পলাশ নূতন করিযা চাহিয়া চাহিয়া দেখে।

অনেকদিন পরে ছেলে বাড়ী আসিয়াছে, মার আর বিশ্রাম নাই। পলাশ বলে, আমি কি কুটুম এসেছি মা ?

মা হাসেন। বলেন, মেসে থাকিস—কাছে ব'সে তো খাওয়াতে পারি না।

তাই বটে, পলাশ যেন এ-বাড়ীর অতিথি !—

রাত্রে মাধুরী আসিযা প্রণাম করিযা দাঁড়াইল। কিন্তু না পারিল পলাশ কথা বলিতে, না পারিল মাধুরী !—মধুর একটি নীরবতা।

পলাশের মনে হইতেছিল, আজিকার এই রাত্রিটি যেন তাহার জীবন-অধ্যায়ের বাহিরে ! মেসের সেই দোতালা ঘরটিই তাহার নিজস্ব। এ যেন কোথাও ভাল কাপড়-জামা পরিয়া বেড়াইতে আসা !

মাধুরী কাঁদিতেছিল।—তাহার স্বামীর একি পরিবর্ত্তন আজ ! কিন্তু পলাশের বেশ লাগিতেছিল। কান্না যে এত মিষ্টি—পলাশ আজ প্রথম অনুভব করিল। ডাকিল, মাধুরী !

মাধুরী চুপ করিয়াছে। পলাশের ভারী ইচ্ছা—একবার সে জিজ্ঞাসা করে, এই একটা বছর তাহার কেমন কাটিয়াছে ?

কিন্তু মাধুরীই কথা বলিল, বড়দিনের ছুটি তো পেয়েছিলে ?

পলাশ হয়ত বলিতে পারিত—হাঁ, পেয়েছিলাম, কিন্তু আসিনি। এই না-আসাটাকে রূঢ় করিয়া বলিবার কি যে হেতু আছে—পলাশ খুঁজিয়া পায় না। তাই অতি সহজ করিয়াই বলিল, খুব মন-কেমন করতো—নয় ?

মাধুরী হাসিল। বলিল, তোমার বুঝি করতো না ?

পলাশ ঘাড় নাড়িয়া হাসিল।

—খুব শক্ত প্রাণ যা হোক্ !

—শক্ত বই কি। শক্ত প্রাণ না হ'লে, আমাদের মেস-বাড়ীর মাথার ওপরেও আবার চাঁদ ওঠে ! বলিয়া পলাশ হাসিতে লাগিল।

মাধুরী কিছুই বুঝিল না। বলিল, তবে যে শুনি—কলকাতায় চাঁদ ওঠে না ?

—না ওঠাই উচিত। বলিয়া পলাশ তাহার বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানিতে টানিয়া টানিয়া হাসি আনিবার চেষ্টা করে।

মাধুরীও হাসে ; হয়ত হাসিতে হইবে বলিয়াই হাসে।

সাতদিন কাটিল মন্দ নয। তারপরই পলাশ হাঁপাইয়া ওঠে। এ যেন নেশা কাটিবার পরের অবস্থা ! এক কথায় নেশা সকলেরই কাটিয়াছে। মা ইদানীং বলিতে সুরু করিয়াছেন, চাকরি আছে তো রে ?—'ঘর পোড়া গরু'—হয়ত ছেলেকে ভাল করিযাই চেনেন।

মাধুরী বলে, আবার কি দোকানের মতলব ফাঁদ্‌ছো ?

পলাশ হাসে। তাহার কোন কিছুতেই আর আঘাত লাগে না। কেন লাগিবে ? সে তো নকড়িকেও দেখিয়াছে, ক্ষুদিরামকেও দেখিয়াছে। মেসের সেই দোতলা-ঘরটি তাহার অক্ষয় হইযা থাকুক—মেসের জন্যই তো তাহারা !

বিদায়ের শুভদিন জানাইয়া মা বলিলেন—শনিবারে, শনিবারে সবাই তো বাড়ী আসে—

পলাশ চম্‌কাইয়া উঠিল ! হাঁ—ঠিক। তাহাদের জন্য তো শনিবার রহিয়াছে। যেন ঐ একটি মাত্র বার ছাড়া তাহাদের আর এ-ঘরে মানায় না ! মা রহিবেন—ছেলের পথ চাহিয়া, বধূর বুকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব—ট্রেণ পাইয়াছে তো ? পথে যদি—

একখানি উদ্বেগ-কাতর মুখ পলাশের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল : দুটি জলভরা বড় বড় চোখ, দুটি ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি !

কমলা দেবী ও দেবলা দেবী

শ্রীভূপতিনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল্‌

গুজরাটের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ জাতিতে বাঘল বংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং এই বংশ বহুদিন সেখানে বিশেষ সমৃদ্ধি ও সম্মানের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত তাহারা নানা ঝঞ্ঝা ও বিভ্রাটের ভিতরও নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। গুজরাটের হিন্দু রাজা ও অধিবাসীগণের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধনরাশি কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়া পুনঃ পুনঃ মুসলমান সম্রাট ও বিজয়ীগণের ঐকান্তিক মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। গুজরাট বিজয়ের এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রাণে প্রবল তৃষ্ণার উদ্রেক করে এবং অবশেষে সুলতান আলাউদ্দীন গুজরাটের বিরুদ্ধে এক প্রবল অভিযান প্রেরণ পূর্ব্বক ঐদেশ জয় করেন। গুজরাটের রাজপুত-বংশীয় শেষ ক্ষত্রিয় রাজা কর্ণদেব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী কমলা দেবী শত্রুর কবলে পতিত হইয়া বন্দিনী অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরিতা হয়েন। সুলতান আলাউদ্দীন তাঁহাকে তাঁহার অন্যতমা প্রিয়তমা মহিষীর স্থান দান করেন। শত্রুর হস্তে পতিতা নারী স্বীয় স্বামীর প্রেমের আশ্রয়চ্যুতা হইয়া ধর্ম্ম, মান ও মর্য্যাদা সকলই হারাইলেন। কিছুকাল পর ইহাও সত্য যে কমলা দেবীর কন্যা দেবলা দেবীও হয় কমলা দেবীর ইচ্ছানুসারেই কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক--আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে আনীত হয়েন। এই দেবলা দেবী ও তাহার জননীর ন্যায় অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন এবং বোধ হয় ইহাও সত্য যে হতভাগ্য পিতার আশ্রয় থেকে তাঁহাকে সুলতানের অন্তঃপুরে আনিবার জন্য প্রচেষ্টারও অবধি ছিলনা!

কমলা দেবী ও দেবলা দেবীর বৃত্তান্ত ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন আকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাদের বর্ণনামত সকল সত্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার ও যথেষ্ট কারণ আছে। খিলিজি রাজত্বের একমাত্র ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী তাহার "তারিফই-ফিরোজ সাহী" গ্রন্থে (যাহা ইলিয়ট সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন) বলিয়াছেন যে গুজরাটের শেষ হিন্দু নরপতি রাজা কর্ণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেবগিরিতে যাইয়া রাজা রামদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণ মুসলমান বিজয়ীগণের হস্তে বন্দিনী হয়েন, ইহার অধিক এ সম্বন্ধে তিনি আর কিছুই লিখিয়া যান নাই।

কিন্তু ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা একটু অন্যরূপ। তিনি বলেন রাজা কর্ণ পলায়ন করিবার সময় তাঁহার মহিষী কমলা দেবী বন্দিনী হন এবং আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইয়া সৌন্দর্য্য ও প্রতিভা বলে সুলতানের প্রেমের পাত্রী হয়েন। কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার কন্যা দেবলা দেবীর জন্য অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন এবং সে কারণ তাঁহার কন্যাকে রাজা কর্ণের কবল থেকে আনিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জানান।

আলাউদ্দীন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আলপ খানের নিকট উক্ত রাজার নিকট হইতে দেবলা দেবীকে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিবার আদেশ দেন। আলপ খান জানিতেন সম্রাটের মেজাজ এবং তাহার উপর কমলা দেবীর প্রভাব। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন—রাজা কর্ণের নিকট অনেক প্রকার প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যাহাতে তিনি তাঁহার কন্যাকে উহার হাতে সমর্পণ করেন—কিন্তু রাজা উক্ত ঘৃণিত প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবগিরির মহারাষ্ট্র রাজা রামদেবের পুত্রের সহিত দেবলা দেবীর বিবাহ দিতে রাজী হইলেন; কিন্তু পথিমধ্যে অজন্তা গুহার নিকট দেবলা দেবী ধৃত হইয়া আলপ খান কর্ত্তৃক দিল্লীতে প্রেরিত হয়েন এবং সেখানে সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র খিজির খাঁ তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া অনতিবিলম্বে তাহার পাণিগ্রহণ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে আলাউদ্দীনের পুত্র কুতুবুদ্দিনকে নিহত করিয়া খোসরু খান যখন সিংহাসন অধিকার করেন তখন তিনি দেবলা দেবীকে নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন।

ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—খোসরু খান রাজা হইয়াই নিহত কুতুবুদ্দীনের প্রধানা মহিষীকে বিবাহ করেন এবং এই মহিষী একজন হিন্দু রাজকন্যা ছিলেন। তিনি কিন্তু কমলা দেবী বা দেবলা দেবীর নামও উল্লেখ করেন নাই। খিজির খাঁ কিন্তু সুলতান হইতে পারেন নাই; আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাফুরের আদেশে বন্দী অবস্থায় তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে যদিও আলাউদ্দীনের এক শিশু পুত্রকে সিংহাসনে নামমাত্র সুলতান স্বরূপ অভিষিক্ত করা হয় তথাপি মালিক 'কাফুরই সর্ব্বপ্রকার রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করেন এবং মাত্র ৩৫ দিন রাজত্বের পর ক্রীতদাস রক্ষীগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন এবং পরে কুতুবুদ্দিন সম্রাট হন।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ যখন—বলেন খোসরু খান রাজা হইয়াই দেবলা দেবীকে নিজ অন্তঃপুরে আনয়ন করেন—তখন বুঝিতে হইবে দেবলা দেবী খিজির খাঁর হাত হইতে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুতুবুদ্দীনের হাতে পড়েন এবং কুতুবুদ্দিনের প্রাণ-বিলোপের পর খোসরু খাঁন তাহাকে বিবাহ করেন। ইহা হইতে এই উক্তি সম্পূর্ণ অনুমোদিত হয় যে দেবলা দেবী ক্রমে খিজির খাঁ, কুতুবুদ্দীন ও খোসরু খান তিন জনেরই ভোগ্যা হইয়াছিলেন। জিয়াউদ্দীন বারণী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ কুতুবুদ্দীনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন আলাউদ্দীনের চরিত্রহীনতা ও ভোগ বিলাস ইনি সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াছিলেন।

এমতাবস্থায় ইহা খুবই সম্ভব যে খিজির খাঁ বন্দী ও অন্ধ হইলে কুতুবুদ্দীন রূপসী দেবলা দেবীকে নিজ অন্তঃপুরে আনয়ন করেন।

কমলা দেবী ও দেবলা দেবীর কথা আলোচনা করিতে যাইলে হতভাগ্য রাজা কর্ণদেবের দুর্গতি ও লাঞ্ছনার কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না। ইন্দ্র তুল্য রাজ্য—অতুল ঐশ্বর্য্য—রূপসী ও গুণবতী স্ত্রী এবং কন্যা হারাইয়া তিনি দীন ভিখারীর ন্যায় দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সাধু চরিত্র এবং শান্তিপ্রিয় রাজা ছিলেন এবং সুশাসনের জন্য যথেষ্ট খ্যাতি ও যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন; আদর্শ নৃপতি, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী—রাজা কর্ণ দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া নিজের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইলেন। অবমাননা—লাঞ্ছনা—বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় ও মন শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইল। গুজরাটী ভাষায় লিখিত এক গ্রন্থে পাওয়া যায় তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে পরিশেষে আত্মঘাতী হইয়া সর্ব্বশান্তিময়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু আর একটা বিষয় স্বভাবতঃই মনে হয়—হয়ত এই কমলা দেবী এবং দেবলা দেবীর বৃত্তান্ত সমস্তই কাল্পনিক এবং অলীক। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে খিলজি রাজত্বের একমাত্র ইতিহাসকার জিয়াউদ্দীন বার্ণী এই সব কাহিনীর কোন উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক স্মিথ্ কমলা দেবী কিম্বা দেবলা দেবীর নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু এখনও দিল্লীর পুরাতন রাজপ্রাসাদের বর্ণনায় "কমলা দেবীর মহাল" উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইনি কোন্ কমলা দেবী এবং কখনই বা তিনি দিল্লী রাজপ্রাসাদে বাস করিতে আসিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য বাহির করিবার কোনও উপায় নাই। বিশেষতঃ দেবলা দেবীর নামে কখনও কোনও মহাল রাজপ্রাসাদে পরিচিত ছিল কিনা তাহাও জানা যায় নাই। আবার ইতিহাসে ইহাও পাওয়া যায় যে আলাউদ্দীন খিলজীর নির্ম্মিত অনেক প্রাসাদ এবং স্থাপত্যশিল্প পরবর্ত্তীকালে সের সাহ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। তাহা হইলে কমলা দেবীর মহাল বলিয়া যদি কখনও কিছু থাকিত তবে নিশ্চয়ই বর্ত্তমানে তাহার কোনই চিহ্ন নাই।

অধুনা বহুতর ঐতিহাসিক গবেষণা ও অনুসন্ধান ফলে ইহা যেমন এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তই হইয়াছে যে চিতোরের পদ্মিনী কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক—সেইরূপ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহাও খুবই সম্ভব যে এই কমলা দেবী ও দেবলা দেবীর কাহিনীও কল্পনাপ্রসূত। ভারতের ইতিহাস প্রণয়নে নানা প্রকারের ঐতিহাসিকগণ নানা উদ্দেশ্য সাধন মানসে বাস্তবতার থেকে কল্পনার উপরই অনেক সময় নির্ভর করিয়াছেন। পরাধীন জাতির ইতিহাস –বিশেষতঃ আবার যখন পরাধীন জাতির ভিতরেই স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত এবং সমস্যার উপর সমস্যা আছে—তখন প্রকৃত খাঁটী নিখুঁত সত্য ইতিহাস সকল সময়ে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! আমার মনে হয়—হয়ত এই কমলা দেবীর ও দেবলা দেবীর বৃত্তান্তও কল্পনা হইতে উদ্ভব হইয়া স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নানা রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া তথাকথিত ভারতের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটী ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি এবং উহা পাঠকবর্গের নিকটও কৌতুহলপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করি। প্রায় ইংরেজী ১৮৪৫ সালে স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত থাকিবার কালীন ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরে "The Indian Princess" নামক একখানি কুরুচিসম্পন্ন নাটক রাত্রির পর রাত্রি অভিনীত হইয়া সহস্র সহস্র দর্শক আকর্ষণ করে। বিষয়টীও গুজরাটের রাণী কমলা দেবীকে নিয়াই। তাহাতে দেখান হয় যেন মুসলমানগণ রাজধানী আক্রমণ করিলে স্বয়ং রাণীই কৌশলে নগরের দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া দেন এবং স্বয়ং সুলতানের নিকট প্রেম ভিক্ষা করেন। ভারতের কোন নারীর সম্বন্ধে এই প্রকার মিথ্যা কলুষিত চিত্র অঙ্কন করিয়া ভারত সম্বন্ধে প্রতীচ্যের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা সংঘটনের কদর্য্য চেষ্টাকে দূরীকরণ মানসে মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং অবশেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঐকান্তিক চেষ্টায় ঐ অভিনয়টী বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়েন। ঐ সময় ভারতবর্ষেও এই বিষয়টী নিয়া রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য নেতাগণ প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটীতেও কমলা দেবী ও তাঁহার কন্যা দেবলা দেবীর অস্তিত্ব এবং ইতিহাসবর্ণিত তাহাদের কাহিনী সম্বন্ধে স্বভাবতঃই আরও সন্দেহের উদ্রেক হয়!

শান্তিনিকেতনে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

গত মহরমের দিন কারমাইকেল মশ্‌লিম হোষ্টেলে ছিল নিমন্ত্রণ, একটি সাহিত্যিক সভার রথে সারথীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাঠের ঘোড়ার লাগাম ধরে চিত্রার্পিত চলৎভঙ্গীতে বসবার জন্যে। সভার পরে শ্রীমান শামশুল হুদা (ইনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র) আমাকে বললেন, আপনাকে বোলপুরে যেতে হবে। সেখানে আমাদের "সাহিত্যিকার" বৈঠকে রইল নিমন্ত্রণ। প্রত্যুত্তরে বললাম, ছেলেবেলা ত টিনের এঞ্জিন নিয়ে খেলেছ। দু-চার দমের পরই ওর স্প্রিংটা যখন যেত কেটে, তখন নিশ্চয়ই ওর মুখে দড়ি দিয়ে ওকে চালিয়েছ। আমারও সেই দশা। আমার ইচ্ছাশক্তির স্প্রিংটা কেটে গেছে, কিন্তু চাকাগুলো ঠিকই আছে, এখনো ঘোরে। যদি নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পার তবে ঠিক উত্তীর্ণ হব তোমাদের কেল্লায়। শামশুল বোলপুরে ফিরে গিয়ে ডাকে ওকালতনামা পাঠালেন তাঁর কবিবন্ধু শ্রীমান আবুল হোসেনকে, আমার জড়ত্বকে বোলপুরস্থ করবার জন্যে। হঠাৎ আবুলের কাছ থেকে শমন এল —পাল্কি উঠাও, বোলপুরে ধাও। ফুকো পাল্‌কিটা কর্মকর্তৃবাচ্যে স্বয়মেব স্বেন গুণেন উঠল শূন্যে। শুভদিনক্ষণ দেখে যাত্রা করা গেল বোলপুরাভিমুখে আবুল হোসেন সমভিব্যাহারে রবিবার সকাল ৮টা ৩৩ মিনিটের ট্রেনে! কিন্তু শ্রেয়াংশে বহুবিঘ্নানি। আমাদের গাড়ীটা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হঠাৎ হ'ল অচল। ঘণ্টাখানেক মাঝ রাস্তায় ত্রিশঙ্কুর দশা প্রাপ্ত হলাম। যাহোক অবশেষে যথাস্থানে পৌছন গেল নির্বিঘ্নে। ষ্টেশনে দেখা হল ত্রিমূর্তির সঙ্গে - শামশুল হুদা, রথীন্দ্র ঘটকচৌধুরী ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ত্রিমূর্তি বলছি এইজন্যে যে, নিকটতর পরিচয়ে দেখলাম ওরা তিনে এক, একে তিন। আমার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবিলম্বেই যখন হল পাকা, তখন ওদের নাম দিলাম—ওল, কচু, মান তিনই সমান। মোটর বাসে প্রায় একটার সময় উত্তীর্ণ হওয়া গেল শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায়। ঝটিতি কাকস্নানান্তে গেলাম ওদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভোজনাগারে। আমাদের প্রতীক্ষায় ওরা তিনজন এতক্ষণ ছিল অভুক্ত।

এই ভোজনশালায় ইতিপূর্বে একাধিকবার আতিথ্য গ্রহণ করেছি। পরিষ্কার বন্দোবস্ত, আহারাদির ব্যবস্থা অনাড়ম্বর পুষ্টিকর সুস্বাদু। পরমানন্দে একসঙ্গে খাওয়া গেল। এবার এবং আগেও লক্ষ্য করেছি, এই খাওয়ার ঘরে তদ্বির করেন একজন মহিলা। কি স্বদেশে কি বিদেশে মেয়েদের এই স্নেহসেবা ভোজন ব্যাপারটিকে মধুর ক'রে তোলে, মনে জাগে অন্নপূর্ণামূর্তি। আহারান্তে এই নবাগন্তুকের সঙ্গে ত্রিমূর্তির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। মনটা গুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, অপেক্ষা করতে লাগলাম কতকটা অধৈর্যের সঙ্গে তাঁর কাছে যাবার জন্যে। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে কোনো খবর পাঠাইনি তাঁর কাছে, সুতরাং তাঁর অবগতির সম্ভাবনা ছিল না। বোলপুরে এসে দ্বিধান্বিত হলাম, ফস্ ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হব কি-না। শুনলাম পরদিন বীরভূমযাত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের নৃত্যগীতাভিনয়ের মোহড়ায় তিনি ব্যস্ত। অপেক্ষা ক'রে রইলাম অবসরের জন্য। রাত্রে ছেলেদের সঙ্গে অভিনয়ের রিহার্সাল্ দেখতে গেলাম। কবি সেখানে ছিলেন না, তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথও অনুপস্থিত। নৃত্যগীতের আনন্দ ও আশ্রমগুরুর অদর্শনের বিষাদ মনে নিয়ে ঘরে ফিরলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে গল্প চলল।

পরদিন প্রাতে আর ধৈর্যে কুলালো না। সটাং গেলাম উত্তরায়ণে আমার পথের সাথী আবুলকে সঙ্গে নিয়ে। গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এসেছি। উত্তর শুনে বললেন, তুমি অপেক্ষা করলে কেন? এসে যদি দেখতে ঘরে খিল দেওয়া, তা হ'লে দরজা ভেঙেও ঢোকা উচিত ছিল তোমার। প্রতীক্ষার দুঃখটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁর মুখে স্বাস্থ্য আর স্ফূর্তির

লক্ষণ দেখে মনটা নিশ্চিন্ত হ'ল। কবির রহস্যালাপের কথা লিপিবদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই শ্রুতিধর দিলীপকুমারের স্মরণশক্তি! আমার স্মৃতিদৌর্বল্য মদীয় নানা দৌর্বল্যের অগ্রণী। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছেন, অমৃতময় লাগছে, কিন্তু ভাল ক'রে উপভোগ করতে পারছি না। কেবল ভয় হয়, এত কথা বলে হয়ত পরে শারীরিক অবসাদ বোধ করতে পারেন। তাঁর প্রতি মুহূর্তের মূল্য আছে। বেশীক্ষণ ব'সে তাঁর সময় নষ্ট করা অকর্তব্য হবে। বিদায় নিয়ে উঠ্‌তে যাব, আদেশ করলেন আর একটু বসতে; হেসে বললেন, যখন প্রয়োজন বুঝব, বলব তোমাকে পালাতে। আশ্বস্ত হয়ে আরো কিছুক্ষণ বসব ঠিক করলাম। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই ঘরে ছিলেন। দিব্যি রসালাপ জমে উঠেছে এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে কবি যখন আমাদের বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে উপনীত হলেন তাঁর সহাস্য মুখে হঠাৎ একটা ভাবান্তর হ'ল। অত্যন্ত বেদনা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তীব্রকণ্ঠে বললেন, আমাদের আত্মঘাতী দুর্নীতির দিকে কটাক্ষপাত ক'রে—কোনো আশা নেই, কিছু করবার নেই —defeatism defeatism, হার মানতে হবে, লোপ পেতে হবে আমাদের। অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে সেই হাস্যোজ্জ্বল ঘরে বজ্রপাত হ'ল। দেখলাম শুধু তাঁর আরক্ত মুখমণ্ডল এবং দ্রুত নিঃশ্বাসকম্পিত বক্ষস্থল। গভীর অনুশোচনা মনে জাগল, যদি আগে উঠে যেতাম, তা হ'লে তাঁর এই মানসিক উত্তেজনার জন্য দায়ী হ'তে হ'ত না। কিছুক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে রইলাম। তারপর আমি একটু সাহস ক'রেই বললাম, আপনার মুখে defeatism কথাটা কিছুতেই শুনব না। যখন জীবনে অবসাদ আসে তখন আপনার গানই আমরা গাই—'রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা।' যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াই, তার ত্রিসীমায় ভূতকে এগুতে দেব না। যেখানে তরুণরা অকালবৃদ্ধ সেখানে আপনি সকলকে দেন প্রাণরস। আমরা শুকিয়ে শোলাও যদি হই, সমুদ্রের তলে ডুবিয়ে দিলেও আবার যেন ভেসে উঠতে পারি আপনার প্রসাদে। কবি তখনো নীরব। আমিও হয়েছি মরিয়া, তাঁকে একটু হাসাতেই হবে। বললাম, আমি যখন শিবপুর কলেজে ছিলাম, তখন আমার মেয়ের খেলাঘর থেকে একটা জাপানী পুতুল তুলে এনে রেখেছিলাম আমার টেবিলের উপর। তার তলাটা গোল আর ভারী, উপরটা ফাঁপা। সে পুতুলটাকে যতবার চাঁটি মারি, কাৎ হয়ে পড়ে, আবার পর মুহূর্তেই ঠিক মাথা খাড়া করে উঠে বসে। কলেজের ছেলেদের বলতাম, তেত্রিশ কোটি দেবতার বদলে এই দেবতাটিকে সামনে বসিও, আর কেবল মেরো চাঁটি, হাত ক্ষয়ে গেলেও দেবতাকে পারবে না কাৎ করতে। তখন প্রাণে পাবে সেই দুর্জয় শক্তি, যার বলে লাফিয়ে উঠতে পারবে শত পরাভবে।

ঠিক এতটা গুছিয়ে বলতে পারিনি। ভাঙা ভাঙা কথার সঙ্গে চাঁটির মুদ্রাভঙ্গীকে সচল ক'রে আমার অচল মনোভাবটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলুম। সে চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আমার সবাক অভিনয়ে কৌতুকপ্রিয় কবির মনে হর্ষাভাস ফুটল। তাঁর মুখে চোখে দিব্যোজ্জ্বল হাসি দেখা দিল, শিশিরসিক্ত পদ্মে রৌদ্রাভাসের মত। আমারও ঘাম দিয়ে ভয়ের জ্বর ছাড়ল। তখনকার মত বিদায় নিলাম।

সাঁইত্রিশ বছর আগে এসেছিলাম এই শান্তিনিকেতনে, তখন গুরুদেবের আত্মজ এই ব্রহ্মবিদ্যালয়টি সবে হামাগুড়ি দিচ্ছে। সেই পূর্বস্মৃতির কথা 'সাহিত্যিকা'র বৈঠকে সেদিন রাত্রে বললাম। দিনকাল যেমন পড়েছে, তাতে এরূপ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখা যে পরিমাণে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে, সেই পরিমাণেই এর অনপনেয় প্রয়োজনের গুরুত্বও বেড়ে চলেছে। আমাদের যুগে আমরা যে পরিমাণে সত্যভ্রষ্ট হয়েছি, চরিত্রহীন হয়েছি, বহির্মুখী হয়েছি, চিত্তের শুদ্ধি ও সমতা হারিয়েছি এবং সর্বোপরি ইহকালসর্বস্ব হয়েছি, সেই অনুপাতে আমাদের উত্তর-কালীয়দের জীবন আরও কণ্টকাকীর্ণ, শ্রদ্ধাহীন, আস্থাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, ঈর্ষাদ্বেষকলুষিত করে তুলেছি। দেশের এই বর্তমান দুর্গতির জন্য আমরা যতটা দায়ী আর কেউ ততটা নয়। একথা আজ স্বতপরত হাড়ে হাড়ে বুঝছি। বাপ-মা প্রাণ দিয়ে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে চায়। কিন্তু আমাদের এমনই মোহ, যে, প্রাণপণে তাদের মারবার চেষ্টাই করেছি, তাদের পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীকে অসত্য উত্তেজনা ও বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত করে। নিসর্গ হচ্ছেন কাবুলিওয়ালা, সুদে আসলে দেনা উশুল ক'রে তবে ছাড়েন।

আমাদের অনেক পুরুষের দেনার উপর আত্মিক, সামাজিকও রাজনৈতিক বাজে খরচের দায়ে জাতকে জাত দাঁড়িয়েছি দেউলে হবার পথে। এতে পিতৃপুরুষের দেনার দায় থেকে কতকটা বাঁচা যেতে পারে বটে, কিন্তু মাথা কেটে মাথধরা সারানোর মত সে লাভ ভোগ করতে পারব না। তবু যদি পণ করি বাঁচতেই হবে আমাদের, তবে মারে কে? মানুষ মৃত্যুঞ্জয়, তার জীবন-মরণ কাঠি তার নিজের হাতে, আর কোথাও নেই। এই প্রাণধর্মে শিক্ষা ও দীক্ষার জন্য চাই সত্যাশ্রয়ী শিক্ষায়তন। পরীক্ষায় খাতা টুকে প্রশ্নপত্রিকা চুরী ক'রে পাশ হ'লে চলবে না। সে পাপের বিষ অস্থি-মজ্জাগত হয়ে থাকে, উত্তরকালে জীবনের কার্যক্ষেত্রে সর্বাঙ্গে দাগড়া ঘা হয়ে দেখা দেয়। সাহিত্যের পূতক্ষেত্রে সাধু-নিন্দা পরনিন্দা ও চিত্তবিকৃতির বীজ বপন করলে তরুণ তরুণীদের রক্ষা করতে পারব না। স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। পৃথিবীতে সঙ্গীতের চেয়ে মধুরতর বোধ হয় কিছু নেই। সুর আর তাল নিয়েই সঙ্গীত। সুর যদি হয় অ-সুর, আর তাল যদি হয় বে-তাল, তা হ'লে সঙ্গীত হয় অসুর আর বেতালের মল্লভূমি। এই শহরের ঘরে ঘরে বিজলি বাতি জ্বলছে, আর কলের পাখা ঘুরছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রশালায় যদি কলকব্জা সব ঠিক রেখে কেবল ধুতিময় চীনামাটি বা ইবনাইটের টুক্‌রাগুলির বদলে বিদ্যুৎসঞ্চারী নিরর্গল ধাতুখণ্ডগুলি বসিয়ে দেওয়া যায়, আর একটার পরিবর্তে পাঁচশটা ডাইনামোর প্রতিষ্ঠা হয়, তবে ক্ষণোৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ ব'য়ে যাবে মাটির তলে, জ্বলবে না একটা বাতি, ঘুরবে না একটা পাখা। যার স্থান একের কোঠায়, সেটাকে মুছে তার পিছনে হাজার শূন্য বসালেও সব শূন্যই হবে হাজার গুণ শূন্য। এটা পুরানো কথা, সহজ কথা, মাথা ঘামিয়ে আঁক-ক'সে বুঝতে হয় না। এ দেখেই ত গীতাকার বলেছেন-বুদ্ধিভ্রংশাৎ প্রণশ্যতি।

রেডিয়াম থেকে নানারকমের বিকীরণ বার হয়। প্রাণবান্ মানুষ মূর্ত রেডিয়াম, বিচিত্র তার আত্মধারা। কবিগুরুর সর্বতোমুখী প্রতিভার নানাপ্রস্রবণের নিদর্শন চোখে পড়ে শান্তিনিকেতনের এই চাক্ষুষ প্রতিষ্ঠানে এবং তার চেয়ে বেশী অনুভূত হয় অন্তস্তলে এর অন্তর্গূঢ় প্রভাবে। এখানকার দার মুক্তির মধ্যে আনন্দময় আব্‌হাওয়ায় নৃত্যে গীতে খেলায় অধ্যয়নপদ্ধতিতে ও আড়ম্বরবর্জিত সহজ সরল উপাসনায়।

কবির কাছে গেলাম পরদিন আমার স্মৃতিনিবন্ধের খস্‌ড়াখানি নিয়ে। ইতিমধ্যে আমি লোটাকম্বলসহ শান্তিনিকেতনের অতিথিশালা থেকে আশ্রয় নিয়েছি গুরুদেবের "পুনশ্চ" কুটীরে তাঁর নির্দেশে। স্থানমাহাত্ম্য ব'লে ত একটা জিনিষ আছে। কবির নিভৃত আশ্রমনীড়, সেখানে আমি একা। বোলপুরের এই ভুবনডাঙ্গা একদা ডাকাতের পীঠস্থান ছিল, একথা ত জানেই গায়ের পাঁচজনে। সুতরাং এই নিঃসঙ্গ অতিথিটিকে একলা পেয়ে সেখানে এল তরুণ ও খুদে ডাকাতের দল। শ্রীমান রথীন্দ্র ও অরবিন্দ এখানকার কলেজের ছাত্র। একজন আর্টস্-এর, আর একজন সায়ান্সের পড়ুয়া। দুজনেই কবি, একজন লিরিক অপরজন কমিক। ওরা দুজনে দুই আন্‌কোরা খাতা এনে অতি মোলায়েমভাবেই বললে—খাতা দুখানির নামকরণ ক'রে দিতে হবে, অপিচ, প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে নতুন কবিতাও লিখে দিতে হবে উভয়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে। ছুরিটা মিশ্রিরই হোক বা লোহার হোক—বেঁধে ঠিক। নিমেষেই বুঝলুম উদ্ধার নেই ওদের হাত থেকে, ওদের হুকুম তামিল না ক'রে। সর্দারদের হাতের মুঠোর মধ্যে যে হয়েছে অন্তরায়িত, তার কাছ থেকে পিল-ডাকাতরাও মাশুল আদায় না ক'রে ছাড়ে না। এরা মডারণ ডাকাতের লিলিপুটীয় সংস্করণ এবং এই শিশুদের দলে বোধ করি ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা অধিক হবে। সকলের হাতে একই হাতিয়ার—নামসই-এর খাতা। কেবল আত্মনাম বিঘোষিত ক'রে উদ্ধার পেলে বাঁচতুম। প্রত্যেক খাতায় অন্তত দুছত্তর পয়ার লিখে দিতেই হবে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এদের ভ্রূ-ভঙ্গীতে কম্পান্বিত মসীসিক্ত প্রাণকে কলমের ডগায় আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয়। সুতরাং প্রত্যেকের দাবী মিটোতেই হ'ল। শমন ধরিয়ে গেল রাত্রে ওদের আস্তানায় রইল দাদুর নিমন্ত্রণ। মনটা এ নিমন্ত্রণে খুশীই হ'ল, ভাবি আঁচাবো কোথা?

সন্ধ্যাবেলা শিশুভবনের দাবায় গিয়ে বসলাম ওদের বৃদ্ধ-বৎসল আসনে। সামনের আব্‌ছায়াঘন মাঠে বসল ওদের জটলা। মাল্য-চন্দনে হ'ল আমার যথারীতি সভাপতিত্বে বরণ। আলো কেবল ওই খুদে জোনাকিদের চোখে, আর আমার পাশের একটা হারিকেন লণ্ঠনের ক্ষীণাভাসে। সুতরাং

বৈঠকটা একরকম অন্ধকারেই বসল বলা চলে। সেই উৎসব সন্ধ্যার ভোজপঞ্জীতে, বেশী নয় মাত্র উনিশটি উপভোগ্য বস্তুর তালিকা। এই বালখিল্য লেখক লেখিকাদের গল্প, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও সঙ্গীতাদির নির্ঘণ্টপত্র প্রসারিত রইল আমার সম্মুখে। যথাক্রমে আবৃত্তিগুলি পরিবেশিত হ'ল আমাদের উৎসুক শ্রবণে। এ ভোজে ত পাতে কিছুই পড়ে থাকতে পারে না, সকলেরই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। চোখের ব্যবহার নেই বললেই চলে। পরমহংসদেবের একটি কথা পড়েছিলাম, ভগবান চিকের আড়ালে মেয়েদের মত। তিনি দেখেন সব, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় না কেউ। এক্ষেত্রে তার উল্টটা হ'ল সত্য, ওরা প্রায় সকলেই রইল আব্‌ছায়াঘন যবনিকার অন্তরালে, আর আমি রইলাম ওই ঝাড়লণ্ঠনের দীপালোকে। শুনলাম ওদের গানের পর গান আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ। বিস্মিত হলাম ওদের নিখুঁত কার্যপরিচ্ছেদে, সংযমে ও সুশৃঙ্খলায়।

কিন্তু সবচেয়ে তাক্ লাগল ওদের ভোটিং ব্যাপারে। শিশুসংসদের নানা বিভাগের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তার নির্বাচন হ'ল যথারীতি প্রস্তাবক সমর্থক ও ভোটসংখ্যার গণনার সাহায্যে। প্রতি বিভাগেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে নির্বাচিত হ'ল উভয়জাতীয় ভোটারের সমবেত সম্মতির যোগফলাধিক্যে। হাতে লেখা পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য সভ্যাদি বাছাই হয়ে গেল নির্বিরোধে বিনা বিতণ্ডায়। এ দৃশ্য আমার কলেজে, ইউনিভারসিটির সিনেট সিণ্ডিকেটে, ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক সভায় ও নানা স্থানের প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ইংরেজী একটি কথা আছে Pandemonium বা দৈত্যদালান। আমাদের সকলের মধ্যেই দৈত্য ও দেবতা নিজ নিজ কক্ষে বাস করেন। বহু স্থলেই দেখেছি এই ভোটিং ক্ষেত্রে সুপ্ত দানব জাগ্রত হয়। তার মঞ্জুবাক্ চিত্রপট এখনো চক্ষে কর্ণে ভাসে। তাদের তুলনায় এদের ভোট-সমস্যার এই সহজ সরল অপ্রমত্ত মীমাংসা দেখে যথার্থ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা হ'ল। সভাপতির দুটি মাত্র কথা বলবার অবসরটি ঠিক স'রে এসে যখন পৌছল শেষকালে, অমনি ভোজনাগারের প্রথম ঘণ্টা উঠল বেজে, দ্বিতীয় ঘণ্টার পূর্বেই তাঁর বক্তব্য বিনা উদ্বেগে যথাস্থানে সমাপ্ত হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সব ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে তখন এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা নানা যৌথ ব্যাপারে তাদের কার্যপরিচ্ছেদকে সংযম ও সুষমা দান করবে।

যে কদিন গুরুদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম সে কদিন প্রত্যহই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ও কথাবার্তা হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার কর্মজীবনের পূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার লেবরেটারী গড়ে তোলবার জন্যে কাঠবিড়ালের পদে বাহাল হয়েছিলাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে গুরুদেবের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ অপরিসীম। পূর্বস্মৃতির জের টেনে আবার লেবরেটারীর নব সংস্কারের কাজে লেগে যাবার জন্যে আমাকে আহ্বান করলেন। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত দেখলাম। তাঁর ছোট কামার-শালায় তাঁর স্বরচিত যন্ত্রের নমুনা দেখালেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনের সঙ্গে অনেক দিনের পর দেখা হয়ে বড় আনন্দ হ'ল। তিনি সম্পর্কে আমার নাতি-ছাত্র। সুতরাং তাঁর সঙ্গে রহস্যালাপ করবার পথ ছিল প্রশস্ত। তাঁর কুটীরে দেখা না পেয়ে লিখে এসেছিলাম—"তৃষিত চাতক, চাঁদ পলাতক।" বিজ্ঞানী চন্দ্র সশরীরে এসে হাজির হলেন অনতিবিলম্বে। "পুনশ্চ"র অলিন্দে ব'সে ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে লেবরেটারী সম্বন্ধে শেয়ালের যুক্তি করা গেল। আমাদের গরীব দেশ। লেবরেটারী বহু ব্যয়সাপেক্ষ। বিদেশ থেকে যন্ত্র নির্মাণের তোড়জোড় কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে আমাদের স্কুল কলেজের লেবরেটারীতেই যন্ত্রগুলি তৈরী করা যেতে পারে। এ কথাটা কল্পনার সাহায্যে বলছি না। বিগত যুদ্ধের সময় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সরকারী বার্ষিক বরাদ্দ বন্ধ হয়েছিল, যখন আমি তার তত্ত্বাবধানে ছিলাম। সে সময়ে কতকটা নিজের হাতে যন্ত্রপাতি গড়ে কাজ চালাতে হয়েছিল। আমার লেবরেটারীসংলগ্ন ছোট্ট একটা কারখানা ছিল, যেটা কলেজের বৃহৎ যন্ত্রশালা থেকে স্বতন্ত্র এবং আমার আয়ত্তের মধ্যে। সেখানে নিজের খেয়াল মত যন্ত্রাদি তৈরী করা যেতো এবং উদ্বৃত্ত কিছু কিছু বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির কাছে ও অন্যত্র বেচে সরকারী তহবিলে কিঞ্চিৎ মুনাফা সংগ্রহ করা গিয়েছিল। সেই সব ছাতা-পড়া অভিজ্ঞতা যদি আবার সরাচাপা হাঁড়ি খুলে

কাজে লাগানো যায়, এই নিয়ে কিছু জল্পনা কল্পনা করা গেল। আমার মত অ-কেজোর দ্বারা তার কতদূর কি হবে সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে, ‘অন্যে পরে কা কথা।’

অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে একটু কাছে পেলাম। আমি তাঁর distant admirer, নেপথ্যের ভক্ত। পথে ঘাটে এখানে ওখানে বহু বৎসর ধরে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত লীন হয়েছি তাঁর রসালাপে। তিনি একজন অভিজ্ঞ ডুবুরি। ভারতের মধ্যযুগের ভক্তদের ভক্তি-সাগরে ডুব দিয়ে সে অমূল্য রত্নাকর থেকে বহু রত্ন সংগ্রহ করেছেন। বাংলার আনাচে কানাচে বাউল সম্প্রদায়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের দর্শন ক্কচিৎ মেলে বহু সন্ধানে। তাঁদের গোয়েন্দা ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। মাল্যচন্দনে বিভূষিত হয়ে কথকঠাকুর যখন বেদীতে ব’সে তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতা ও রসবৈদগ্ধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন তখন ভিড়ের চিকের আড়ালে যুগপৎ অশ্রুমোচন ও অট্টহাস্য করেছি আর সকলের সঙ্গে। এবার বোলপুরের পান্থশালায় প্রথম রাত্রি যাপনের পরদিন সকালে দেখি সুহৃদ্বর এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গ নিয়ে উঠলাম তাঁর কুটীরে চায়ের নিমন্ত্রণে। এক পেয়ালা নিরাবিল ম্লেচ্ছ-মৌতাতের সঙ্গে বেলের মোহনভোগ উপভোগ ক’রে প্রাতরাশিক মৌতাত রক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় উদরসাৎ করা গেল। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে কমা-সেমিকোলন-বিবর্জিত জমাট রসালাপ চলল তাঁর সঙ্গে। বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শুনলাম তাঁর মুখে। তাম্বুল চর্বণের ন্যায় মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে চললাম গুরুদেবের দর্শনে। শ্লোকটি এই—

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িণী ক্রমেণ
লঘ্বীপুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ।
দিনস্য পূর্বার্দ্ধপরার্দ্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খলু সজ্জনানাম্॥

অর্থাৎ

প্রথমে ঘোরালো স্বচ্ছতা লভে পরে,
আরম্ভে ক্ষীণ ক্রমে দীঘল বিপুল,
দিনের দু-ভাগে ছায়া ভিন্নরূপ ধরে,
—সুজন-মিতালী হেরি তারি সমতুল।

উত্তরায়ণে এবার কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে নিকটতর পরিচয় হ’ল। বহুদিন পূর্বে হিন্দুস্থান সমবায় মন্দিরে বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তিনসন্ধ্যা খাবার টেবিলে তাঁর সঙ্গে দেখা ও গল্প হত। কলকাতায় ফিরবার পথে তিনিও গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে ট্রেনে এক কামরায় এলাম নানা আলোচনার ভিতর দিয়ে রেলযাত্রীর নৈঃসঙ্গ্যকে ভরাট ক’রে ওঁদের সাহচর্যে। সুরেনবাবুর সংযত মিতভাষণ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তি, সূক্ষ্ম রসানুভূতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বেশী কথা বলাটা আমাদের জাতীয় রোগবিশেষ, বাংলার ম্যালেরিয়ার মত। এই বাক্‌বাহুল্যের হাটে মাঝে মাঝে এই রকম দু-একজন শান্ত গম্ভীর স্বল্প অথচ মিষ্টভাষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে দৈবানুকূল্যে।

এ জীবনে সব সুখই স্বল্পায়ু। শান্তিনিকেতনের দুদিনের সুখ ফুরাল এবারকার মত। আসবার সময় কবিকে প্রণাম করে যখন বিদায় নিলাম, তিনি সস্মিতমুখে বললেন, ‘পুনরাগমনায়’। তাঁর সেই সস্নেহ নিমন্ত্রণটি শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিনই বাড়ছে আমার মনে। সে আহ্বানটি যেদিন ষোলকলায় পূর্ণ হবে, আবার ছুটে যাব তাঁর চন্দ্রাতপে। আমার সহযাত্রী শ্রীমান আবুল হোসেন আগেই চলে এসেছিলেন। কলকাতামুখী হয়ে বোলপুর ষ্টেশনে এসে দেখি অরবিন্দ ও রথীন্দ্র ষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ট্রেনে গিয়ে বসলাম, ওরাও বসল দুপাশে তিনজনে মিলে হলাম—যাকে বলে ‘স্যাণ্ডউইচ’। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ওদের ওঠার লক্ষণ নেই। বললাম, তোমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াও, আমি জানলার কাছে গিয়ে বসছি। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না ওরা। আতঙ্ক হ’ল ডাকাতের সর্দ্দাররা কি লুঠের মালের সঙ্গে লুণ্ঠিতের কোটরে ধাওয়া করে যাবে! আমি পুনশ্চ যখন বললাম, নেমে পড়, ঘণ্টা দিয়েছে, এক্ষুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে, ওরা বললে, বর্দ্ধমানে গিয়ে নামব। কবির “যেতে নাহি দিব” কবিতাটি মনে এল। যথাসময়ে গাড়ী পৌছল বর্দ্ধমানে, ওরা চলে গেল—

“তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।”

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৬

পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, দুরারোহণীয় দুরবরোহণীয়! কোথাও গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়া—কোথাও অলকনন্দার তীরে তীরে—কোথাও মন্দাকিনীর সঙ্গে তাহার বিষম সংঘর্ষ; দৃশ্যের পার্শ্বে পার্শ্বে ভীষণের ও সুন্দরের একত্র সমাবেশে অফুরন্ত পার্ব্বত্য পথ চলিয়াছে—আর চলিয়াছে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অক্লান্ত প্রাণে যাত্রীর দল। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে পথের রুদ্রতাও বাড়িয়াছে। অলকনন্দাকে ছাড়িয়া মন্দাকিনীর তীরে তীরে কেদারনাথ অভিমুখে গুপ্তকাশী, ভেতাদেবী, মৈথণ্ডার ভীষণ চড়াই অতিক্রমান্তে মহিষখণ্ডিনীর রাজ্যে পৌছিয়া সেদিন যাত্রীদলের বেশ স্ফূর্ত্তি আসিয়াছিল। এই প্রাণসঙ্কট ভীষণ পথে এত বড় একটা লৌহময় হিন্দোলা কে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে মৈথণ্ডার অপর নাম ঝুলা চটী হইয়াছে। চড়াইয়ের পর চড়াই অতিক্রমণে ক্লান্ত যাত্রীদল প্রথমে এই ‘ঝুলা’টা দেখিয়া এবং তাহাতে যাত্রীদলের অন্ততঃ এক একবার ঝুলিয়া লইতে হয় শুনিয়া বোধহয় মৈথণ্ডার পরিহাস কল্পনা করিয়া মায়ের উপর রাগই করিয়া বসে। তার পরে সকলেই কিন্তু ক্রমে ক্রমে একবারের পর আর একবার দুলিবার জন্য না গিয়াও থাকে না। সুজনবাবু ডাক্তারবাবুর দল তো একেবারে মাতিয়া উঠিল। মোহনকে কোন’ কাজেই সেদিন পাওয়া গেল না। প্রায় সর্ব্বক্ষণই সে দুই হাতে লৌহময় সুদৃঢ় ও স্থূল শিকল ধরিয়া পর্ব্বত অধিত্যকার একপ্রান্তে পূর্ণ খড়ের ঠিক্ উপরে অবস্থিত লৌহ ঝুলনায় দোল খাইতে লাগিল। সুজনবাবু ডাক্তারবাবু ও একবার একবার ঝুলিয়া লইলেন; শীলা মেয়েদের দল লইয়া অগ্রসর হইয়া মোহনকে কিছুক্ষণের জন্য স্থানচ্যুত করিল—কিন্তু ললিতাকে কেহ একবারও ঝুল্ খাওয়াইতে পারিল না। যাহার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী, তাহারই যেন ক্রমশঃ সকল বিষয়ে নিরুৎসাহতা আসিয়া পড়িতেছে।

ত্রিযুগী নারায়ণের সুউচ্চ শৃঙ্গ আরোহণের ভীষণ চড়াইয়ের পর হরগৌরীর বিবাহের যজ্ঞকুণ্ডাস্থিত ত্রিযুগের অনির্ব্বাণ অগ্নিতে আহুতি, ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড বিষ্ণুকুণ্ড গায়ত্রী সাবিত্রী ও সরস্বতী ইত্যাদি সপ্তকুণ্ডের দুর্গন্ধময় বদ্ধ জলের তীরে তীরে যখন তাহার দিদ্‌মাকে পাণ্ডারা ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং তিনি যখন মাঝে মাঝে ঈষৎ শ্বাসকষ্টের ভাবটা সাবধানে গোপন করিবার চেষ্টায় সন্ত্রস্ত, তখন ললিতা বলিয়া উঠিল—”ভাল লাগে না আর বাপু, চল দিদ্‌মা আমরা ফিরে যাই। ‘ওরা যাক্‌গে বদরী-কেদার!’ সকলে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিল -ব্যাপার কি! সুজনবাবু তো তাহার ক্ষুব্ধ ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া ভয় খাইয়াই গেলেন, ডাক্তারবাবুকে গোপনে কিছু ইঙ্গিত করায় ডাক্তারবাবু কোন ছলে হস্তস্পর্শ করিয়া তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিতে গিয়া বিষম ধমক লাভ করিলেন। শীলা অবাক্ হইয়া একান্তে তাহাকে বলিল—“হ’ল কি তোর? একপা ডাণ্ডি থেকে নামছিস্ না? এমন সব দৃশ্য যা জীবনে দেখা যাবে বলে মনের কল্পনাতেও আসেনি, সেই সব দৃশ্য দেখেও মুখ গোঁজ ক’রে বসে চলেছিস্, বুড়ো মানুষরা কিরকম উৎসাহ উদ্যম বজায় রেখে চলছেন; আর আহ্লাদী খুকির মত ভাল্ লাগছে না বলে নাকে কান্না জুড়লি যে দেখ্‌ছি?”

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একটুও না রাগিয়া ললিতা উত্তর দিল—“শীলাময়ীর পাহাড় ভাল ‘লাগ্‌ছে বলে—‘লীলাময়ী’রই বা ভাল লাগ্‌বে না কেন শুনি? মেয়ে যেন ধিঙ্গি পাহাড়ে নদী, কখন্ কোন পথে কোন্ পাহাড় ধসাবেন সেই ফন্দী! দিদ্‌মা—ঠাকুমার পাদ্দোক্ খা—হাপ্‌সে থাকিস্ যদি।” “বড্ড অপমানের কথাই বল্লি যে। তাই যাচ্ছি গে যাই।” বলিয়া ললিতা তাহার কাকিমার আহ্বানে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে শীলা একটু নিশ্চিন্ত হইল। সে মেয়েকে যে এক তাহার কাকিমাই বশে আনিতে পারে তাহা শীলা এই কয়দিনেই বেশ বুঝিয়াছিল।

মন্দাকিনী তটে গৌরীর তপোভূমি গৌরীতীর্থ। মন্দাকিনীর সহনাতীত তুষার শীতল জলের অনতিদূরেই

গৌরীকুণ্ডের তপ্ত ফুটন্ত বারি তাঁর তপস্যার মহিমার মতই যেন উষ্ণশ্বাসে চারিদিকের হিমশীতল বায়ুকে সুখতপ্ত করিয়া তুলিতেছে। দিদ্‌মার এই ভাবের মন্তব্যে ললিতা ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া বলিল "একবার ঐ সুখতপ্ত কুণ্ডে নেমে দেখ্‌বে ঠাকরুণ? তোমাকে মন্দাকিনীতে চুবিয়ে যদি বা বাঁচাতে পারা যায়—ঐ ফুটন্ত জলের ফোস্‌কায় সদ্য তীর্থপ্রাপ্তি হবে।" শীলা তাহার ঘাড় ধরিয়া বলিল "চল্‌, কত লোক নেমে নাইছে দেখ্‌বি চল্‌।" "তুইও নাম্‌ গে"—বলিয়া ললিতা ঘাড় ছাড়াইয়া লইল। পথে পথে বন্য গোলাপের অজস্র সম্ভার। রডোডেনড্রেন ফুলের বিচিত্র শোভা। কত বিচিত্র ভাবের সঙ্গীদলের সংযোগ, আবার ক্ষণপরেই বিয়োগ ঘটিতেছে। হাজারীবাগের এক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেবপ্রয়াগে চটিতে ইহাদের একবার পরিচয় হইয়াছিল—তিনিও ডাণ্ডি আরোহিণী, তাঁহার রূপে এবং সজ্জায় তাঁহার কথা সকলেরই মনে ছিল—তিনি সদলে পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট এই দলের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। পীতবর্ণের লালপাড় রেশমী শাড়ী তাঁর পরিধান, গাত্রবস্ত্র পীত, ডাণ্ডির মধ্যে তাঁহার যান সজ্জার র‍্যাগখানি, বালিশটি মায় ডাণ্ডির ক্ষুদ্র 'হুড' অয়েল ক্লথ পর্য্যন্ত পীত বস্ত্রে আচ্ছাদিত। কপালে সীমন্ত উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দু—এক ঢাল চুল এলাইয়া সুন্দরী সুমুখী তরুণী নরযানে চলিয়াছেন। শিষ্য ভক্ত দুই একজন প্রাণপণে সেই বাহনের সঙ্গেই প্রায় ছুটিতেছে। তাহাদের ভক্তির আধিক্যে দু একটি বিরুদ্ধ সমালোচনাও তাহাদের কর্ণে না যাইতেছে তাহা নয়, তাহাতে তাহাদের কিন্তু দৃক্‌পাত মাত্র নাই। দিদিমা বলিয়া উঠিলেন—"আহা সাক্ষাৎ গৌরীমাই যেন কেদারনাথ দর্শনে যাচ্চেন, দেখলি শীলা, দেখলি ললিতে?" ললিতা উত্তর দিল না—শীলা হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ, কিন্তু দিদিমা একালের গৌরী! সঙ্গে আমাদেরই মত ফ্লাস্ক্‌ ষ্টোভ্‌ হোল্ড-অল্‌ থেকে সোয়েটর অলষ্টর র‍্যাগ জুতো মোজা সব নিয়েই তিনি এবারে তপস্যায় বেরিয়েছেন—প্রয়াগে দেখনি? মাত্র গলিত পর্ণ আহার করে অপর্ণা নামের মোহ তিনি এবার কাটিয়াছেন।" দিদিমা মুখ ভার করিয়া বলিলেন "তপস্যার কথা তো বলিনি তোদের, দর্শন করতে যাচ্চেন তাই বলেছি। দক্ষিণে রামেশ্বরে দেখেছি পার্ব্বতী রাত্রে যখন মহাদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তখন সোনার দোলায় ছত্র চামর দর্পণ কন্দুক মায় মরকত মণিতে গড় শুকপাখীটি পর্য্যন্ত হাতে থাকে। যখনকার যে সজ্জা—এযুগের দেবীদের সজ্জা যা তাই তো ধর্‌বেন"—প্রচুর হাস্যের সহিত শীলা বলিল "তাইতো বল্‌ছি দিদিমা আমিও।" কাকিমা ও তাহার সহিত হাসিতেছেন দেখিয়া ললিতা বলিয়া উঠিল "কি যে তোমরা সকল কথায় হাস!—হাসির এতে কি পেলে?"

তিন দিকেই ভীষণ পর্ব্বত, মাঝে মন্দাকিনী প্রবাহিতা; গভীর অরণ্যানীর মস্তকে পর্ব্বত শির হইতে তুষার গলিত স্রোত ধারা ঝর্ঝর শব্দে নামিতেছে। একটা চটিতে যাত্রীদল ক্ষণিক অপেক্ষা করিল তাহার নাম চীরবাসা ভৈরব। সেখানে একটা গাছে কতকগুলা নেক্‌ড়া ঝুলিতেছে এবং একব্যক্তি পাণ্ডার ভাবে দাঁড়াইয়া যাত্রীদের নিকট হইতে একটুক্‌রা নূতন বস্ত্র ও প্রণামী লইয়া ভৈরবের উদ্দেশে গাছে ঝুলাইয়া দিতেছে। সেস্থান হইতে একটা গম্ভীর শব্দ সকলের কানে আসিতেছিল; কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই যাত্রীদল দেখিল ভীষণ ভৈরবমূর্ত্তি অতি উচ্চ পর্ব্বতের মস্তক হইতে বিস্তৃত জলধারা একেবারে খাড়াভাবে গিরি পাদমূলে নীচের বনের মধ্যে পড়ায় সেই পতন শব্দ ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে। জলটা একেবারে একখানা বস্ত্রের মত চওড়া, বায়ুবেগে দুলিতে দুলিতে নীচে নামিতেছে। ললিতা এতক্ষণে বলিয়া উঠিল "আ, এইতো চীরবাসা ভৈরবমূর্ত্তি! মানুষের কি আস্পর্দ্ধা। গাছে ন্যাক্‌ড়া টাঙিয়ে এই ভৈরবকে কাপড় দিতে যায়।"

এক রাণী, তিনি মহারাণী পদবাচ্য, তাঁহার সঙ্গের লোকদের তিনি বোধ হয় ওভাবে দৌড়াইতে দেন নাই, বাহকমাত্র সহায়ে প্রায় একাকিনীই সুজনবাবুদের দলের সম্মুখে পড়িলেন। তাঁহার ডাণ্ডির একটু বিশিষ্টতা সকলের চক্ষে পড়িতে সকলে চাহিয়া দেখিল—ডাণ্ডির আকৃতিটি যেন একটি ছোট ডিঙ্গী নৌকার মত দেখাইতেছে, তাঁহার মাথার উপর স্বাভাবিক ভাবের অয়েলক্লথের হুড্‌ তোলা, আবার ডাণ্ডির সম্মুখের সীমান্তে ও একটু পরিসর স্থানে ছোট্ট একটু সবুজ সাটিনের হুড্‌, তাহার মধ্যে রূপার ছাতার তলায় বহু স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়া বালগোপালমূর্ত্তি—বসিয়া আছেন! রাণীর রুক্ষকেশে সংযতবেশে তাঁহাকে যেন তপস্বিনীর মতই দেখাইতেছে। যাহার চোখে পড়িতেছে সেইই মুগ্ধভাবে এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

ক্রমে যাত্রীদল কেদারের তুষার রাজ্যে প্রবেশ করিল; বরফ — বরফ — চারিদিকেই শুভ্রোজ্জল তুষাররাশি। তুষারময় সেতুর নীচে দিয়া হুঙ্কার করিয়া নদী ছুটিয়া চলিযাছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র, তাহার মাঝে মাঝে ধূলীর ছাপা ছাপা দাগ, যেন মহাকালের বিস্তীর্ণ বাঘছাল। ডাণ্ডি-কাণ্ডিবাহী যাত্রীদের তখন যান ছাড়িয়া লাঠিও যানবাহকের সাহায্যে পাযে হাঁটিয়া চলিতে হইতেছে। তুষারের সামান্য অবকাশেও যেখানে সেখানে সামান্য একটু তৃণের মাথায়ও বিচিত্র বর্ণের ফুল, জ্ঞানের শুভ্র মহিমার মধ্যে ভক্তির রঙিন্ শোভায় যেন সকলের ক্লান্ত ভীত মনকে আনন্দে ভরিয়া দিতেছিল। বরফে পদত্রান সব ভিজিযা ভারি, দেহ অবসন্ন, এমনি অবস্থায় যাত্রীরা সহসা আশায় আনন্দে ‘জয় কেদারনাথ বাবা কি’ রব করিযা উঠিল। সম্মুখেই মন্দাকিনীর সেতু তাহার অপর পারেই কেদারনাথের বাসক্ষেত্র তুষারচূড়গৃহসকল যাত্রীদের চক্ষে পড়িতেছে। মন্দির তুষারপর্ব্বতমালার অন্তরালে অদৃশ্য। বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকেই জুতা খুলিয়া সেতু পার হইল এবং ওপারের তুষারে পদস্পর্শ মাত্রেই বুঝিল বাঙ্গালীভাবের ভক্তি প্রদর্শন এখানে চলিবে না—এ বড় কঠিন ঠাঁই! সম্মুখেই গলিত তুষারস্রোত একটা নলের মুখে অজস্র বারি উদ্গীরণ করিতেছে; অনেকেই লোটা বাল্তিতে সেই জল ধরিয়া লইতেছিল। মন্দাকিনীগর্ভের তুষার রাশি গলিয়া তখন জলাকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, তখনো বরফের চাপ ইতস্ততঃ ভাসিযা বেড়াইতেছে। তীরের নিকট যাইবার উপায় নাই, বরফ কাটিয়া সবে পথ তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে।

পাণ্ডাদের যত্নে পথশ্রম অপনোদনান্তে দেবদর্শনে সকলে ছুটিতেছিল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর মন্দির খুলিযাছে। ডাক্তারবাবুর মাতা, সুজনবাবুর স্ত্রী ও শ্বশ্রুমাতা “ধূলিপায়ে” কেদার দর্শনে চলিলেন। শীলা ললিতা মোহন সুধীর বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে ও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে ছাড়িলনা; মোহন বলিতেছিল “পায়ে ধূলো কই দিদিমা? ধূল্পায়ে না বলে বরফে হাজা অসাড় পায়ে দর্শন বলুন না কেন।”

দিদিমা উত্তর দিলেননা, ললিতা তাঁহার হইয়া উত্তর দিল “পায়ে না থাক্ মনে তো আছে—সেইটা এইসব দর্শনের পর যদি কাটে সেই জন্যই এব্যবস্থা—”

শীলা ললিতার তীক্ষ্ণ মন্তব্যে লজ্জিত হইয়া চকিতে মোহনের দিকে চাহিয়া দেখিল—সে নির্ব্বিকারভাবে সুধীরের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে। সুধীরের একই ভাবে সংযত গম্ভীর মুখ। পদচারী বৃদ্ধাদের দেবদর্শন যাত্রার সাহায্যেই ব্যস্ত সে। শীলা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

চারিদিকে রৌদ্রোজ্জ্বল শ্বেত মহিমার উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে বিশাল শ্বেতক্ষেত্রে পর্ব্বতময অঙ্গনের মধ্যে বিশাল মন্দির। সকলে একদৃষ্টে সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে চলিতেছে, সহসা ললিতা বলিয়া উঠিল—“কটি সাহেব আর মেম্ দেখছ? একটি মেমের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা”—সুধীর চাহিয়া দেখিযা বলিল “বোধহয় থিওজফিক্যাল সোসাইটির, কিম্বা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের হবে ওরা”।

নাগা ফকীর, অবধূত ও উদাসীনদল—“জয় কেদারনাথ’ শব্দে কেহ দর্শন করিতে চলিযাছে, কোন দল ফিরিতেছে—দেখিতে দেখিতে ললিতা মন্তব্য করিল—

“সবাই তো আসেন দেখ্ছি এসব তীর্থে, কেবল বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরাই আসেন না বুঝি?”

দলের লোক ললিতার প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না—কেননা এ বিষয়ে কাহারই অভিজ্ঞতা নাই, কেবল পাণ্ডা ব্যস্তভাবে বলিলেন “সেকি মা! এখানে হিন্দু মাত্রেই এসে থাকে। ঐ দেখেছেন বিদেশীর দল, অথচ প্রাণে ওরা হিন্দু, বাবার দর্শনে এসেছেন। এছাড়া টুরিষ্ট্ সাহেব মেম্রা তো বহুৎ আসে—”

“তাদের কথা হচ্চেনা—তুমি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কথা জাননা ঠাকুর তারা কেউ আসেনা।” ললিতার দৃঢ় কণ্ঠের উপরও পাণ্ডাঠাকুর প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, বিরক্তি ভরে ললিতা অন্যদিকে সরিযা গেল।

পার্শ্বে একটি ছোট দল চলিয়াছে। দুই তিনটি ব্রহ্মচারীবেশী যুবক এবং গৈরিকপরা এক যুগ্ম প্রৌঢ় দম্পতি, মুখে প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধতার প্রশান্তি। তাঁহাদের একপার্শ্বে একটি তরুণী—তাঁহারো গৈরিক বস্ত্র—মাথা মুড়ানো—সুকুমার মুখশ্রীর উপরে একজোড়া আয়ত সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষু। সেই অনন্যসাধারণ উজ্জ্বল চক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ললিতার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া তরুণী সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার সঙ্গীরা “জয় বদরী বিশাললালকি জয়—জয় কেদার” বলিয়া

যথারীতি তীর্থে প্রবেশকামী যাত্রীদের অভিনন্দন করিয়া নিজেরা দর্শনান্তে ফিরিয়া চলিয়াছে। ললিতা সেই তরুণীকে দাঁড়াইয়া তাহারই পাশে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিতে দেখিয়া নিজেও দাঁড়াইয়া গেল, দলের সব আগাইয়া চলিয়াছে। ললিতাই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল "কোথা থেকে এসেছিলেন আপনারা?"

তরুণী মৃদুস্বরে উত্তর দিল—"বাঙ্গালা থেকে, আপনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর কথা কি বল্‌ছিলেন?"

ললিতা সহসা সংযত গম্ভীর মুখে বলিল "যা বল্‌ছিলাম তা হয়ত ভুল! আপনারাই হয়ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবপন্থী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী।"

"কিন্তু আপনি বুঝি চেনালোক কাউকে খুঁজ্‌ছেন? তিনি বাঙ্গালী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী? কোথায় তাঁকে দেখেছিলেন? কি রকম তিনি?"

ললিতা কি যেন বলিতে গিয়া সহসা সংযত হইল—"না—না, আমি—আপনি কেন এ কথা বল্‌ছেন। আপনি কে?"

"দিদি জল্‌দি আসুন—বুড়া মা ভারি কাঁপছেন, ঝট্‌ তাঁকে দর্শন করিয়ে বাসায় ফির্‌তে হবে"—পাণ্ডার পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও ললিতা ফিরিতে পারিতেছিল না—কিন্তু সেই মেয়েটির দলস্থ লোকের আহ্বানে সে ত্রস্তে চলিয়া গেল, তাহার নাম ললিতার কানে বাজিতে লাগিল "চিত্রা—চিত্রা"।

গভীর রাত্রি। কাঠের দ্বিতল গৃহের মধ্যে পশুলোমজ ও তুলার গাত্রবস্ত্রে, পাণ্ডার বিশেষ যত্ন রচিত অগ্নিতাপে ভীষণ শীতের হস্ত হইতে অনেকটা আরাম পাইয়া যাত্রীদল ঘুমাইতেছে। দিদিমা পাণ্ডাদের কথামত কেদারনাথকে পূজান্তে আলিঙ্গন করিতে গিয়া জ্ঞান হারাইয়াছিলেন, ত্রিযুগী-নারায়ণেও তাঁহার শ্বাসকষ্ট অনুভূত হইয়াছিল—কেদারে তাহা সমধিক আকার ধারণ করিয়াছে। বাসায় আনিয়া অগ্নিতাপে এবং চিকিৎসা দ্বারা কথঞ্চিৎ সুস্থভাবে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতে পারিয়া সকলেই কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল ঘুমায় নাই ললিতা। লেপের গাদার মধ্যে তাহার কেমন অস্বস্তি ধরিতেছিল। এক সময়ে নিঃশব্দে সে দরজা খুলিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতেই দীপ্ত চন্দ্রালোকে সেই তুষার রাজ্যের অপরূপ মহিমার দৃশ্যে এমনি অভিভূত হইয়া গেল যে আর একজনও যে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া তাহার অনেকটা দূরে দাঁড়াইয়াছে তাহার তাহা অনুভবের মধ্যে আসিল না। অনেকক্ষণ পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃদুস্বরে "আর বেশীক্ষণ ঠাণ্ডা লাগাবেন না" বলিতে তখন সচমকে যেন ধ্যান ভাঙার মত ভাবে ললিতা বলিয়া উঠিল "কুমুদ বাবু! কি অদ্ভুত দেখছেন? চাঁদের আলোয় সাদা পাহাড়গুলোর মাথায় বেগুনি রংয়ের কেমন মণ্ডল দেখাচ্ছে। গায়েরও জায়গায় জায়গায় রামধনু রংয়ের আভাষ—যেন পরীর রাজ্য—মায়ার রাজ্য—সূর্য্যের আলোয় এই সব পাহাড়ের পানে চাইতে চোখ্‌ ঝল্‌সে যাচ্ছিল, আর এখন—"

"হ্যাঁ—কিন্তু আর বাইরে থাক্‌বেন না, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে"।

প্রভাতে ঘন তুষারবৃষ্টির মধ্যে আবার যাত্রীদল ফিরিয়া চলিল। এই বরফের রাজ্য শীঘ্র ত্যাগ করার জন্য তাহাদের ব্যস্ততাও পরিলক্ষিত হইতেছে, আবার এমন অপরূপ মহিমোজ্জ্বল স্থান আর বুঝি জীবনে দেখা হইবে না এই চিন্তায় পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেও হইতেছিল। রামবাড়া ছাড়াইয়া গৌরীকুণ্ডের অভিমুখে বরফকণা বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া দলে দলে যাত্রীরা চলিযাছে এবং আবার সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট গম্ভীর শোভা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইতেছে। শীলা ও ললিতা সেস্থানে হাঁটিয়াই চলিয়াছিল। উচ্ছ্বাস ভরে শীলা সহসা বলিয়া উঠিল—"খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে ওই ঝর্ণাটা কি ভাবে নাম্‌ছে দ্যাখ, যেন নীচমুখি হাউই। এর মধ্যে কোন্‌টার নাম গৌরীশিখর? এই বনেই তো

"অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি তবাস্মি দাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলী—"

অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভাবে ললিতা সখীর সে ভাবোচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল "থাম্‌ থাম্‌, তুই যে সংস্কৃতে অনার নিয়ে বি-এ, তা এই কঠিন পাহাড় আর আকাট জঙ্গল কিছুই বুঝ্‌বে না।" শীলা হয়ত বন্ধুর সঙ্গে তর্কই বাধাইয়া দিত, কিন্তু সেই সময়ে মোহন ও কুমুদ তাহাদের নিকটে আসিয়া পড়ায় সে আর কিছু না বলিয়া বন্ধুর বিদ্রূপের উত্তরে কেবল ব্যথিত বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল মাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই ললিতা কুণ্ঠিতভাবে যেন অর্দ্ধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল "দিদ্‌মার জন্যে মনে বড় ভাবনা চল্‌ছে ভাই, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।—কাকিমাও কত ব্যস্ত হয়েছেন দেখছিস্‌ ত"। শীলাও মুহূর্ত্তে নিজের বিস্ময়ব্যথিত ভাব সম্বরণ করিয়া লইয়া ঈষৎ চিন্তিতভাবেই উত্তর দিল

"সাম্‌লে গেছেন বলেই তো মনে হচ্চে। বেশ শান্তির ভাবেই তো চোখ্‌ বুজে জপ কর্‌তে কর্‌তে ডাণ্ডিতে চলেছেন, কাকিমার ডাণ্ডি কাছে কাছেই চলেছে।"

কুমুদ ও মোহন নীরবে তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছিল ; এইবার কুমুদ তাহাদের আলোচনার মধ্যে কথা কহিল "আপনারা তুঙ্গনাথেও উঠ্‌বেন কি ?"

মেয়েরা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মোহন বলিয়া উঠিল— "নিশ্চয় নিশ্চয়—কি বলেন শীলা দেবী ?"

"কাকাবাবু—ডাক্তার কাকাবাবু কি বলেন ?"

"তাঁরা আর কি বল্‌বেন, আপনাদের মতেই ব্যবস্থা ত হবে।"

"আমরা উঠ্‌লেও ওঁকে আর তোলা হবে না—কোন' রকমে বদরী পৌঁছে—কিন্তু সেও কেদার পাহাড় হ'তে উচ্চতায় বেশী পার্থক্য তো হবে না—কি জানি কেমন থাক্‌বেন"—কুমুদ চিন্তিতভাবে উচ্চারণ করিল "ডাক্তারবাবু তো বেশ ভাব্‌ছেন দেখ্‌ছি" !

ললিতা ধীরে ধীরে উত্তর দিল "তবুও সেখানে তো যেতেই হবে সকলকেই, অন্য আর উপায় নেই। কিন্তু বেশী দিন থাকা হবে না—ওঁকে নিয়ে নাম্‌তে হবে শীগ গির"।

আবার নালার চটীতে ফিরিয়া সেখান হইতে ত্রিযুগী-নারায়ণ ও কেদার পথে যাত্রার জন্য বেশী ভার যাহা রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল সেই সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে লইয়া যাত্রীদল ক্রমে উখী মঠ, তুঙ্গনাথ, গোপেশ্বর, যশীমঠ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কয়েকদিনে তাহাদের যাত্রার প্রধান ঈপ্সিত স্থান বদরী তীর্থে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

তুমি ও আমি

শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ বি-এ

তুমি কুসুম সুরভি ভাসিয়া বেড়াও
শারদ সান্ধ্য বাতাসে
আমি সলিল সিক্ত করুণ বাতাস
শাঙন-কৃষ্ণ আকাশে।
তুমি সবুজ নেশায় পড়িছ ঢলিয়া
চাহিছ আকাশ চুমিতে
আমি চলেছি ত্বরিতে পড়িয়া ঝরিতে
কাঁকর-বিছান ভূমিতে।
তুমি স্বপনে হেরিছ তাজের সুষমা
মানসে তুলেছ রাঙিয়া
আমি হারায়ে ফেলেছি সোনালী-স্বপন
তুলিটি গিয়াছে ভাঙিয়া।
তুমি মুরলী বাজালে যমুনা উথলে
মহুয়া মদিরা ক্ষরে গো
আমি বাজাই বিষাণ প্রলয় গরজে
মেদিনী কাঁপে যে ডরে গো।
তুমি বেহাগে বাঁধিছ বীণাটি তোমার
কত না যতন করিয়া
আমি দীপক আলাপে আগুন জ্বালাই
নিমেষে শুকাই দরিয়া।
তুমি বোধন গাহিয়া শকতি দানিলে
চেতনা জাগালে সানায়ে
আমি ঢাকীর সহিত প্রতিমা ভাসায়ে
বিজয়া দিতেছি জানায়ে।
তুমি তুমি তবুও চলেছ বাহিয়া হরষে
আমার রচিত সরণি
আমি পথটি আঁকিয়া চলিনু ভাটায়
বাহিয়া জীর্ণ তরণী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মবাদ

শ্রীকমলা দেবী এম-এ

যে কালে বঙ্গদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য চর্চার ফলে এবং ইংরেজ জাতির সভ্যতাই তাহার অভ্যুদয়ের হেতু এই ধারণা বশতঃ—কেহ বা খ্রীষ্টান্, কেহ-বা নাস্তিক, কেহ-বা সংশয়বাদী, আবার কেহ-বা রাজা রামমোহনের সদ্য-প্রচারিত বেদান্ত-উপনিষৎ-মূলক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেছিলেন, তেমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ-বিপ্লবের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়।

অধ্যয়ন-লিপ্সা অতিশয় প্রবল থাকায় তিনি ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের রসপানে যেমন বিভোর থাকিতেন, তেমনই ইংরেজ ফরাসী জর্মান্ মনীষিগণের রচিত বিস্তর দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন। উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—যাহার প্রধান ফল তৎপ্রণীত 'কৃষ্ণচরিত্র', ধর্মতত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অসমাপ্ত ব্যাখ্যা।

তাঁহার অক্ষয় ও বিপুল সাহিত্য-সৃষ্টির পত্রে পত্রে তাঁহার প্রাচ্য-প্রতীচ্য বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের সাক্ষ্য বিদ্যমান। সচরাচর ভারতীয় আচার্যগণের শাস্ত্রজ্ঞান সুগভীর হইলেও অপেক্ষাকৃত অনতিবিস্তৃত এবং হয়ত এইজন্যই তাঁহাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যাও কিছু একদেশদর্শী। বিনা বিচারে লোক-প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান পূজা উপাসনা প্রভৃতিকে চিরাচরিত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ ও আচরণ করিতেই তাঁহারা শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে সমাজকে স্থিতিশীল করিয়াছে এবং তাহার ফলে পিতামহগণের বহু চারিত্রিক উৎকর্ষ ও সদ্গুণ সমাজে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া লোককে অভ্যস্ত কল্যাণ-কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং অন্য বহুবিধ অবস্থান্তরের জন্য সমাজ-দেহে যে সকল কলুষ প্রবেশ করিয়াছে তাহার শোধনের জন্য যে স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন প্রয়োজন, স্থিতিশীল সমাজ তাহাকে বাধা দিতে গিয়া অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতে সমাজের সমূহ অবনতি হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া সনাতম আদর্শকেই নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং নিশ্চেষ্ট জড়বৎ সমাজে নূতন প্রাণের বেগ সঞ্চার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও সহজ অধিকার থাকায় আর্যশাস্ত্রসমূহকে তিনি যথোচিত যাচাই করিয়া লইতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ সমালোচন শক্তি প্রয়োগে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে যেসকল আবর্জনা সঞ্চিত হইয়াছিল সেগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া সারাংশ গ্রহণ ও প্রচার করেন।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

এই শাস্ত্র বাক্যের তিনি যথোচিত মর্যাদা দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে তিনি নিজে ঈশ্বরাবতার বলিয়া সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, একথা কৃষ্ণচরিত্রের গোড়াতেই তিনি লিখিয়াছেন। কিন্তু ধর্মজীবন যাপন করিতে হইলে সকলের সম্মুখে একটি মহোত্তম আদর্শ থাকা আবশ্যক বোধে নরদেহধারী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে তিনি মানবরূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে অসামান্য শ্রম স্বীকার করিয়া মহাভারত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সপ্তদশ পরিচ্ছেদে ঐ সকল পুরাণেতিহাস হইতে মানুষ-শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয়টি উদ্ধার করিতে যে বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। গীতার ধর্মকে তিনি যেমন বুঝিয়াছেন সেইরূপ বুঝাইতে ও সেই মত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' লেখেন। এই গ্রন্থের রচনায় তিনি মিল্, স্পেনসার, কাণ্ট, ফিক্‌টে, কোম্‌ৎ প্রমুখ বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতবাদ প্রয়োজনমত আলোচনা করিয়াছেন। যদিচ তিনি গীতোক্ত ধর্মকেই সর্বোচ্চ আসন দিয়াছেন তথাপি তাঁহার এই পুস্তকে পাশ্চাত্য মনীষিগণের, বিশেষতঃ কোম্‌তের প্রভাব বিদ্যমান। এই গ্রন্থে তিনি Religion ও ধর্ম শব্দ দুইটির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, অন্য জাতির বিশ্বাস ঈশ্বর ও পরকল লইয়াই ধর্ম, যাহাকে বলা হয় Religion. কিন্তু হিন্দু জাতির কাছে ইহকাল, পরকাল, মানুষ, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ সকল লইয়াই ধর্ম ; যাহা কিছু মানুষকে মনুষ্যত্বের দিকে, ভগবানের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয় তাহাই ধর্ম। ইহার সমর্থনে তিনি কোন-কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই 'ধর্ম' আচরণ করিতে হইলে মানুষকে তাহার সকল শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন করিতে হয়, যাহার ফলে তাহার সকল চিন্তায় কথায় কাজে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়া সমগ্র জীবনটাই একটা সুসঙ্গত সুন্দর পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে। এই অনুশীলন-তত্ব তাঁহার পরিণত বয়সের পরিপক্ক বুদ্ধির সুচিন্তিত প্রকাশ।

তাঁহার দেবীচৌধুরাণী পুস্তকে 'প্রফুল্ল'কে অনুশীলন তত্ত্বানুমোদিত হিন্দুধর্মের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রফুল্লর শিক্ষার ব্যবস্থায় কোম্‌তের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-র পঞ্চদশ অধ্যায়ে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, প্রাণবিজ্ঞান (Biology) ও সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পশ্চিমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। The substance of Religion is culture—the fruit of the higher life—সীলির এই কথাটি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল।

তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী মনস্বিগণের অনেকেই কোম্‌তের Humanity (নর-নারায়ণ) ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বঙ্কিমের বহু রচনায় কোম্‌তের গভীর প্রভাব ও তাঁহার প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ব্যক্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমের পূর্ববর্তী দেশীয় পণ্ডিতগণ যে কম বিদ্বান্ বা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বঙ্কিমের দৈবী প্রতিভা ও অভিনব শিক্ষার সন্ধানী-আলো তাঁহার অসামান্য শাস্ত্র-জ্ঞানের উপর একটা নূতন আলোক-সম্পাত করে। সেই জন্যই সংস্কৃত বাক্যমাত্রকেই তিনি 'বেদবাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের ন্যায় আর্যশাস্ত্রসমূহের তৎকালপ্রচলিত সকল ব্যাখ্যাকেই যথার্থ ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। হিন্দুসন্তানের চির-সংস্কারবশতঃ শাস্ত্রীয় কোন বাক্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ বা প্রশ্ন করিতে কুণ্ঠিত কিংবা পশ্চাৎপদ হন নাই। তাই আর্য-শাস্ত্রনিহিত অমূল্য রত্নরাজি, সত্যান্বেষী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির তীব্র আলোয় পরীক্ষা করিয়া, পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রগুলির সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়া, অধিকতর উজ্জ্বল ও মহার্ঘ্য বলিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিয়া ভাবীকালের অনাগত বংশধরগণের কল্যাণ কামনায় অজস্র বিতরণ করিয়াছেন।

বিনা বিচারে সকল বস্তুকেই অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া লইবার যে শিশু-সুলভ মনোভাব আমাদেব দেশের লোকের মজ্জাগত, বঙ্কিমে তাহার ব্যতিকম হইয়াছে। যথা, বেদকে তিনি অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও লোকহিতের জন্য তাঁহাকে মানব রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে যে পার্থসারথী শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতায় গ্রথিত সাতশত শ্লোকে লোকধর্ম শুনাইতে বসেন নাই তাঁহার এইরূপ মত। এবম্বিধ বহু দৃষ্টান্ত হইতে তাঁহার বলিষ্ঠ মনের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং বিচারপরায়ণ ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মশাস্ত্রের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে। তিনি গীতাকে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে তবে সে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্মতত্ত্বে গীতার ধর্মকেই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। 'সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখা এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখা ও সমান দেখা, ভগবানকে সর্ব্বত্র দেখা এবং ভগবানে সকলকে দেখা'—ইহাই গীতার বড় কথা। তিনি গীতার এই মহত্তম ধর্ম শিক্ষা দিতে গিয়া যে 'ধর্মতত্ত্ব' লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই - কিন্তু "সকল ধর্ম্মের উপর স্বদেশপ্রীতি" ইহাই বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তিটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। দেশপ্রচলিত যে হিন্দু-ধর্ম লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল তাহা যে হিন্দুধর্মের মহান্ উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করিতেছিল তাহা তিনি দেশবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে প্রচলিত ধর্মে উদার বিচারবুদ্ধি, বলিষ্ঠ পুরুষকার ও নির্মল বিশুদ্ধ ভক্তি পরাহত এবং যাহা বহুবিধ ভ্রান্ত সংস্কার ও বিশ্বাস, সংকীর্ণ আচার, সাড়ম্বর অনুষ্ঠান ও শুচিবায়ু প্রভৃতি বহুযুগ সঞ্চিত আবর্জনায় ভারাক্রান্ত ও কলুষিত, তাহার নিন্দা করিয়া স্বদেশপ্রীতি-ধর্মের প্রতি দেশের সদ্য-জাগ্রত চিত্তকে উন্মুখ হইতে আহ্বান করিয়া তিনি দেশ-কাল-পাত্রোপ-যোগী যুগধর্ম্মের প্রবর্তনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন!

ধ্বংসাভিমুখী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হে ধূর্জটি, কালকূট সনে সুধা উঠেছিল সাগর মন্থনে
সে গরল কণ্ঠে ধরি' সৃষ্টি রক্ষা করেছিলে শুনি মৃত্যুঞ্জয়।
অমৃত গরলে ভরা এ সংসারে সুধা বিষে নিত্য দ্বন্দ্ব হয়,
হেন জয় পরাজয় উত্তরিয়া সভ্যতার ক্রমবিবর্ত্তনে
উপজিল শিবজয়ী বিজ্ঞান কোবিদ নর, যার রসায়নে
নিখিলের সব সুধা বহ্নিঘন হলাহলে পরিণতি লয়।
মারণাস্ত্র উদ্‌গীরিত সে বহ্নিগরলস্রোত বজ্ররবে বয়,
নীলকণ্ঠ, গলবিষ অঙ্গে পশি' জাগালো কি প্রলয় নর্ত্তনে?

বিজ্ঞানলক্ষ্মীর ঘটে অমৃত রয়েছে জানি, কোথায় সে সুধা?
কোন সঙ্গোপনে আজি তাহারে রক্ষিছ তুমি হে ভুবনেশ্বর?
অমৃতের পুত্র যারা, দানবেরে দীক্ষা গুরু করিয়াছে বলি?
তুমি আত্মহত্যা দিয়া তাহাদের ভারশূন্য করিছ বসুধা?
অজ্ঞানীরে কর ক্ষমা, ব্যাভিচারী বিজ্ঞানীরে করি শক্তিধর
তারি স্বরচিত খড়্গে করাও তাদের নিজ হস্তে আত্মবলি।

১৫।৫।৪০

কল্পান্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সর্বসহা বসুন্ধরা, ছিন্নমস্তা মূর্তি তব আজি বিশ্বজন
সন্ত্রাস বিহ্বল নেত্রে নেহারিছে রুদ্ধশ্বাসে কম্পিত হৃদয়ে।
নিজ শির বাম করে, দক্ষিণে নৃমুণ্ডমালা রক্ত কুণ্ডলয়ে,
লক্ষ করপল্লবের পর্ণকাঞ্চি কটিতটে করিছ ধারণ,
ছিন্ন কণ্ঠে উদ্গীরিত রক্তধারা কর পান মেলিয়া বদন।
প্রত্যালীঢ় পদভরে ভূলুণ্ঠিত শিববক্ষে নাচিছ প্রলয়ে,
হে ধরণী হে ভরণী, এ কি নর্মে মূর্চ্ছাপন্ন কর মৃত্যুঞ্জয়ে?
সৃজনী পালনী শক্তি ধ্বংসমুখে আপনারে করে উৎসর্জন!

হে শঙ্কর ত্রিকালজ্ঞ, ভবিষ্যের কোষ্ঠিপত্র রুধির অক্ষরে
আপন কল্যাণ হস্তে লেখো তুমি মানবের দীর্ণ বক্ষপটে,
দারুণ দুঃখের দীক্ষা না লভিলে কভু তার জাগে না চেতনা
প্রেমহীন শক্তি ধরে বহ্নিমূর্তি আপনার অন্ত্যেষ্টির তরে,
সে পাবক শিখা যবে বিষকুম্ভে পরিণত করে সুধা ঘটে,
প্রেমোদ্বুদ্ধ শক্তিধর দেখা দেন ধর্মরাজ্য করিতে স্থাপনা।

১৭।৫।৪০

রেডইণ্ডিয়ান-বন্ধু পাদ্রী লাস্ কাশাস্

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত এম-এ, এফ্-আর-ই-এস্

ফ্রে বার্তোলোমে ডি লাস্ কাশাস্ ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে সেভিলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাধারণ সৈনিকরূপে কলম্বসের প্রথম অভিযানের সহিত নূতন জগতের সন্ধানে গিয়াছিলেন এবং স্বীয় চেষ্টায় প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন। লাস্ কাশাসের শিক্ষালাভ হইয়াছিল সালামাঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই স্থানে পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার একজন রেড্ ইণ্ডিয়ান দাস ছিল। এই রেড্ ইণ্ডিয়ান দাসকে তাঁহার পিতা হিস্‌পেনিওলা বা নবাবিষ্কৃত আমেরিকার 'নূতন স্পে' হইতে আনিয়াছিলেন। দাসপ্রথার চিরবিরোধী প্রচারক লাস্ কাশাস্ এইরূপে দাসের মালিকরূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দাসও আর বেশীদিন গোলাম হইয়া থাকে নাই, কারণ রাণী ইসাবেলার আদেশে সমস্ত গোলাম বা দাসই মুক্তি পাইয়াছিল।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পড়া শেষ হয়, তিনি আইন এবং ধর্ম্ম-বিষয়ে উপাধি লাভ করেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ওভিডো নামক বিখ্যাত নাবিকের সঙ্গে নবাবিষ্কৃত পশ্চিম দেশে বা আমেরিকায় রওনা হন। ইহার আট বৎসর পরে সেণ্ট ডোমিঙ্গো নামক স্থানে তিনি পুরোহিতের কার্য্য আরম্ভ করেন, ইহাই ইউরোপীয়ের পক্ষে আমেরিকায় প্রথম পাদ্রীর কার্য্য সুরু করা। সুতরাং লাস্ কাশাস্ ছিলেন আমেরিকার প্রথম রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী। যখন কিউবা দ্বীপ স্পেনের দখলে আসিল, তখন লাস কাশাস্ একটী ক্ষুদ্র উপনিবেশে পাদ্রী হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তিনি দ্বীপের গভর্ণর ভিলাস্ কুয়েজের বন্ধুত্ব অর্জ্জন করিলেন। লাস কাশাসের ধর্ম্মপ্রচার এবং রেডইণ্ডিয়ানদিগের প্রতি দরদ গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সময় হইতেই তিনি ইণ্ডিয়ানগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতেই 'রেপার্টিমেণ্টো' প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই প্রথা অনুযায়ী নূতন অধিকৃত দেশের জমি এবং ইণ্ডিয়ানগণকে স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। ইণ্ডিয়ানেরা জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহৃত হইত এবং এইরূপ অত্যাচারের ফলে তাহারা দিন দিন লোপ পাইতে বসিয়াছিল। সভ্যতার ইতিহাসে এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত আর আছে কি না সন্দেহ।

এই অত্যাচারের প্রতিকার করিবার জন্য লাস্ কাশাস্ দেশে ফিরিলেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পদিন পরেই রাজা ফার্দ্দিনাণ্ডের মৃত্যু হইল। নূতন রাজা চার্লস্ দেশে থাকিতেন না এবং রাজত্ব চালাইতেছিলেন কার্ডিনাল জিমেনে। তিনি স্বহৃদয়তার সহিত লাস্ কাশাসের অভিযোগ শুনিলেন এবং তিন জন সন্ন্যাসী দ্বারা একটা কমিটি গঠন করিয়া এই সকল দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাহাদের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। লাস্ কাশাস্‌কে "ইণ্ডিয়ানগণের প্রধান রক্ষক" উপাধিতে ভূষিত করা হইল।

লাস্ কাশাস্ যেরূপ ব্যবস্থায় রায় দিলেন, তদানীন্তন রাজ-কর্ম্মচারীগণের ঔদাসীন্যে তাহা কার্য্যকরী হইল না। এবার পাদ্রী নূতন প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাকে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য সমুদ্রের উপকূলে বড় একটা দেশ দেওয়া হউক; এখানে কোন সৈন্যসামন্ত বা গবর্ণমেণ্টের লোক থাকিবে না এবং কোন সরকারী লোকই এই এলাকার মধ্যে কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারিবে না। এস্থানে তিনি পঞ্চাশজন ধর্ম্মযাজক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন এবং ইণ্ডিয়ানগণকে ধার্ম্মিক ও সভ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। এই স্থান অন্যান্য উপনিবেশ হইতে একেবারে পৃথক রাখিতে হইবে এবং এখানকার স্পেনীয়েরা বিভিন্ন রকমের পোষাক পরিধান করিবেন যাহাতে ইণ্ডিয়ানদের ধারণা জন্মে যে, এস্থানের লোকেরা অন্যান্য স্পেনীয় হইতে পৃথক। এখানে প্রচার হইবে কেবল প্রেমের ধর্ম্ম এবং এখানকার সমস্ত ব্যবস্থা হইবে অহিংসামূলক।

অনেকের নিকট এই প্রস্তাব বাতুলের উক্তি বলিয়া মনে

হইল এবং বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া তাঁহারা উপেক্ষা করিলেন। কিন্তু লাস্ কাশাস্ ছাড়িবার পাত্র নহেন। শেষ পর্য্যন্ত রাজা পঞ্চম চার্লস-এর নিকট তাঁহার ডাক পড়িল। প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের বক্তব্য শুনা হইল। তাঁহারা বলিলেন যে, ইণ্ডিয়ানগণ সভ্য হইবার অনুপযুক্ত এবং লাস্ কাশাসের প্রস্তাব স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। লাস্ কাশাস্ বলিলেন যে, যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম পৃথিবীর সকলের জন্য, ইহা হইতে ইণ্ডিয়ান বাদ যাইতে পারে না। এই ধর্ম্ম কাহারও স্বাধীনতা হরণ করে না, কাহারও জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করে না এবং এই জন্যই খৃষ্ট ধর্ম্মমতে দাসপ্রথা থাকিতে পারে না। মহামহিম স্পেনসম্রাট যদি দাসপ্রথার দুর্নীতি দূর করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন তাহাতে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং ভগবান রাজার ও রাজ্যের মঙ্গল করিবেন। লাস্ কাশাস্ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি রাজার সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইল এবং তাঁহাকে জন ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে রাজসরকার প্রস্তুত হইল।

১৫২০ খৃষ্টাব্দে নবোদ্যমে নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লাস্ কাশাস্ স্পেন হইতে আমেরিকা রওনা হইলেন। তাঁহাকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছিল তাহার নিকট একটা স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল এবং এখানে স্থানীয় ইণ্ডিয়ানগণের উপর অত্যাচার করা হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ানগণকে সায়েস্তা করিবার জন্য হিস্পেনীওলা হইতে সৈন্যসামন্ত আসিল এবং যেখানে লাস কাশাস্ শান্তিদূতরূপে কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন সেখানে ইণ্ডিয়ান ও স্পেনীয়ের মধ্যে মর্ম্মান্তিক বিরোধ চলিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া তিনি যে সমস্ত শ্রমিককে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তাহারা সরিয়া পড়িল এবং তাঁহার সঙ্গের পাদ্রীরাও আর কাজ কারতে সক্ষম হইল না। তাঁহার সুখের স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখে তিনি হিস্পেনীওলার ডোমিনিকান সন্ন্যাসীগণের মঠে আশ্রয় লইলেন। লাস্ কাশাস্ ছিলেন ভাল মানুষ এবং আদর্শবাদী। বাস্তব তাঁহার নিকট আদর্শের কাছাকাছি ছিল। কিন্তু সত্যিকার জগতে বাস্তব ও আদর্শে যে অনেক তফাৎ, ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, সকল মানুষ ভাল নহে এবং সকলেই তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে।

কৃষ্ণবর্ণের বসনপরিহিত ডোমিনিকান্ সন্ন্যাসীগণের নিকট তিনি খুব সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহাদের মঠে যোগদান করেন। এখানে তিনি পঠন-পাঠনে সময় অতিবাহিত করিতেন এবং এখানেই ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিজের সাধারণ ইতিহাস' লিখিতে সুরু করেন। শুধু পঠন-পাঠনে তিনি নিরস্ত ছিলেন না, অবসর সময়ে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং ইণ্ডিয়ানগণকে দীক্ষিত করিতেন। যেখানে তাঁহার দেশবাসীর শাণিত অস্ত্র কিছু করিতে পারে নাই সেখানে এই খৃষ্টীয় ফকীরের বাণী পৌঁছিত এবং প্রাণ স্পর্শ করিত। এইরূপে তিনি নিকারাগুইয়ে এবং গাএটামেলার আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার একমাত্র সহকর্ম্মী ছিলেন ডোমিনিকান্ সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবৃন্দ। লাস্ কাশাস্ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নূতন কর্ম্মী সংগ্রহের জন্য আবার দেশে ফিরিলেন।

ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উপনিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারের কর্ত্তা হৃদয়হীন কন্সেকা তখন পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন রাজগুরু লয়াজা। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের এখন বয়স হইয়াছে এবং নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশী সচেতন। এবারে তিনি লাস্ কাশাসের কথা শুনিলেন এবং তাঁহার আমেরিকার প্রজাগণের মঙ্গলে যত্নবান হইলেন। লাস্ কাশাসের প্রচারেরও ফল ফলিতে লাগিল। রাজসভায় ও বাহিরে সকল স্থানেই ইণ্ডিয়ানগণের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা আলোচিত হইবে বলিল। এই সকল বিষয় লাস কাশাস্ যে গ্রন্থ (Brevisima Relacion) প্রকাশ করিলেন তাহা যেন তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া লেখা। দরদী লাস কাশাস্ নিশ্চয়ই পুস্তকে অতিশয়োক্তি করিয়াছিলেন এবং স্পেনীয় ঔপনিবেশিকগণের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার দরদী মন এই সকল অত্যাচারের সত্যমিথ্যাও অনেক সময় অনুসন্ধান করিতে রাজী হয় নাই। তাঁহার এই পুস্তক ইউরোপের অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং স্পেনীয় ঔপনিবেশিকের কলঙ্কের কাহিনী দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার ফল স্বরূপ আমেরিকার দেশীয় লোকগণকে রক্ষার জন্য স্পেন সরকার নূতন আইন পাশ করিলেন। কিন্তু ইহাদ্বারাও

হতভাগ্যদের দুঃখ দূর হয় নাই, কারণ একমাত্র আইন দ্বারাই দুঃখের লাঘব হয় না। আইন চালাইবার মত রাজকর্ম্মচারীর দরকার। স্পেন সরকারের আইনের সহিত স্পেন ঔপনিবেশিকের স্বার্থের সংঘাতে গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা কার্য্যকরী হয় নাই। বিরাট সাম্রাজ্যের দূর প্রান্তে এমন করিয়াই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দুর্ব্বল হস্ত প্রতিকার করিতে অক্ষম।

লাস্ কাশাসের কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'কুজকো'র (Cuzco) ধর্ম্মযাজক বা বিশপ নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যে যথেষ্ট আর্থিক আয়ের ও সম্ভ্রমের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু লাস্ কাশাস্ অর্থ বা মানের কাঙাল ছিলেন না বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে চিয়াপার (Chiapa) বিশপ করিবার প্রস্তাব আসিল তখন তিনি উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন, কারণ সেখানে গরীব এবং অজ্ঞ অবিবাসীগণকে সেবা করিবার অনেক সুযোগ ছিল। ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে লাস্ কাশাস্ পঞ্চমবার আমেরিকার পথে রওনা হইলেন। তাঁহার সুনাম পূর্ব্বেই আমেরিকায় পৌছিয়াছিল এবং সকলেই জানিয়াছিল যে, নূতন আইনের কর্ত্তা এই ইণ্ডিয়ান-দরদী কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রপরিহিত ডোমিনিকান সন্ন্যাসী। কোথাও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইল না। কারণ ঔপনিবেশিকেরা জানিত, এই পাদ্রীই যত সর্ব্বনাশের মূল। লাস্ কাশাস্ও আইনের কিছুমাত্র কঠোরতা দূর করিতে রাজী ছিলেন না। স্থানে স্থানে লাস্ কাশাসের নিজের উপরেও অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু এই অমিততেজ সন্ন্যাসী নিজের ব্যক্তিত্ববলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সমস্ত আমেরিকায় ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে যেন অসন্তোষের আগুন জ্বলিল। সকলেই আইন মানিত, কিন্তু কেহই আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে রাজী ছিল না। উপনিবেশের স্পেনীয়গণ, রাজকর্ম্মচারী এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহকর্ম্মী ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহযোগিতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কারণ যে গৃহে ইণ্ডিয়ান গোলাম আছে সে পরিবারে তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেও রাজী ছিলেন না। অথচ রোমান ক্যাথলিকগণ হিন্দুর মতই প্রতিপদে পুরোহিতের মুখাপেক্ষী। কিন্তু লাস্ কাশাস্ দমিবার নহেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইল। তিন বৎসর আমেরিকায় কাটাইয়া তিনি দেশে ফিরিলেন এবং ডোমিনিকান মঠের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না। তিনি আবার ইণ্ডিয়ানগণের পক্ষ হইয়া প্রচারে ব্রতী হইলেন। এবার বিখ্যাত পণ্ডিত সেপাল ভেডারের সহিত তর্কযুদ্ধে নামিলেন। কিন্তু যুক্তি এবং ন্যায় ছিল লাস্ কাশাসের দিকে। লাস্ কাশাস্ বলিলেন যে, যখন নব আবিষ্কৃত আমেরিকার অধিকার স্পেনরাজকে দেওয়া হয় তখন পোপ ধর্ম্মপ্রচারের জন্যই ইহা অর্পণ করিয়াছিলেন, অন্য কারণে নহে। যদি রাজা এই দায়িত্ব রক্ষা করিতে না পারেন এবং অন্য কারণে এই নূতন দেশ অধিকারে রাখিতে চান, তাহা হইলে তিনি অন্যায় করিবেন এবং এই রাজ্যের ন্যায্য দাবী করিতে পারিবেন না। সাদা কথায় ইহা রাজদ্রোহ; কিন্তু স্পেনের রাজা লাস্ কাশাস্কে চিনিতেন; তাঁহার রাজানুগত্যের ব্যতিক্রম হইয়াছে একথা কেহ ভাবিতেও পারিল না। মানুষ-দরদী, রেড্ইণ্ডিয়ানদের চিরবন্ধু মানবহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যে রাজদ্রোহ হইতে পারে ইহা ধারণার অতীত। বিনা বাধায় লাস্ কাশাসের মত প্রচারিত হইতে লাগিল, যদিও তাঁহার প্রতিপক্ষের মতামত প্রচারে বাধা পাইল। এই সময় তিনি একদিকে যেমন ধর্ম্মকর্ম্মে ও পাঠে রত থাকিতেন অন্যদিকে তাঁহার 'ইণ্ডিজের সাধারণ ইতিহাস' রচনায় ব্যাপৃত রহিতেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এবং মিতাচারী, এজন্য শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ এবং সবল ছিল। বিরানব্বই বৎসর বয়সে ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই মহাপুরুষ মেদ্রিদনগরের এটোশ নামক স্থানে নিজ মঠে দেহ রক্ষা করেন।

লাস্ কাশাস্ যে জগতের মণীষীগণের অন্যতম, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যুগে তাঁহার দেশবাসী হতভাগ্য রেড্ইণ্ডিয়ানগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া সভ্যজগতের ইতিহাস কলঙ্কিত করিতেছিল, সেই সময় অদম্য সাহস, উৎসাহ ও মহাপ্রাণতা লইয়া লাস্ কাশাস্ ইণ্ডিয়ানদিগের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি যথার্থই যীশুখৃষ্টের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিজয়োন্মত্ত দেশবাসীর নিকট স্বর্গীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের লোকের নিকট একজন বিপ্লবী এবং স্বপ্নাবিষ্ট সন্ন্যাসী। তাঁহার আদর্শ সে যুগে অচল বলিয়া

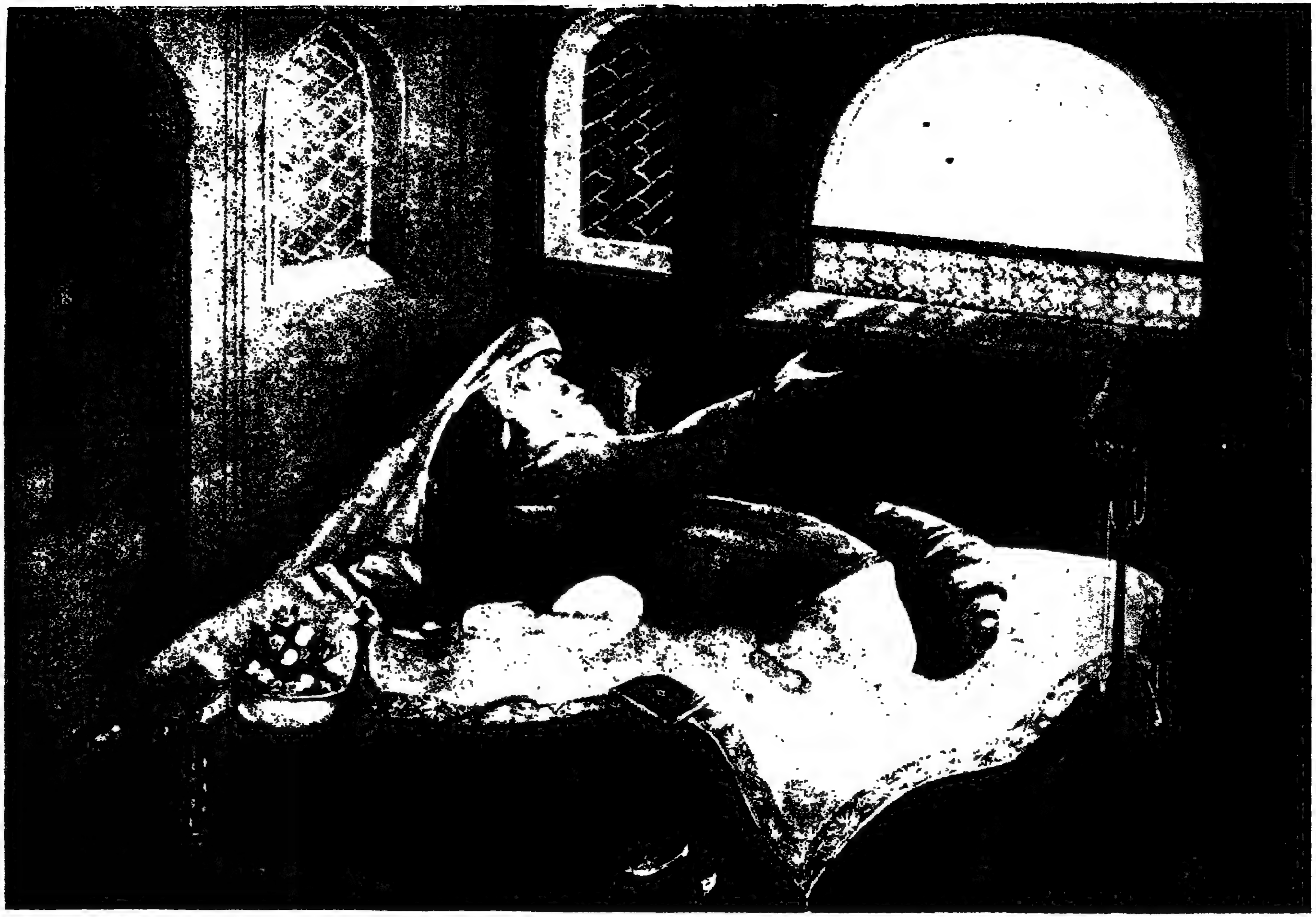

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

উপেক্ষিত হইয়াছিল কিন্তু এই বীর কিছুতেই আদর্শচ্যুত হন নাই বা হতভাগ্য ইণ্ডিয়ানগণের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই। মূক-বর্ব্বর ইণ্ডিয়ানগণকে সাহায্য করিতে গিয়া তিনি দেশবাসী ঔপনিবেশিকগণের শত্রু হইয়াছিলেন এবং আপনার-জনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এক মহামানবতার আকর্ষণে আশার বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া আপনার কর্ত্তব্যের পথে চলিয়াছেন। শেষ জীবনে যখন আমেরিকা হইতে প্রায়-বিতাড়িত হইয়া ফিরিলেন তখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য মোটা বিশ্রামবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল। কিন্তু অর্থ লইয়া সন্ন্যাসী কি করিবেন ? তিনি সমস্ত অর্থ পরার্থে বিলাইয়া দিতেন। ইণ্ডিয়ানদিগের জন্য যখনই কোন আইন প্রভৃতি প্রণয়ন হইত তাঁহার মত সর্ব্বাগ্রে গৃহীত হইত। সুখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি জনমতের পরিবর্ত্তন দেখিয়া গিয়াছেন এবং সকলেই স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, লাস্ কাশাস্-নির্দ্দিষ্ট পথই উপনিবেশ শাসনে প্রয়োগ করা উচিত। লাস্ কাশাস্ মহৎ ছিলেন, কিন্তু নির্ভুল ছিলেন না। তিনি সকল মানুষকেই বড় করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু জগতের মানুষ অতি দুর্ব্বল। তাহারা স্বার্থপর। তাহারা মানবের বিরাট স্বার্থ দেখিতে পায় না, চায় না, চায় ক্ষুদ্র সফলতা ও ক্ষণিকের আনন্দ। ইহাতেই তাহাদের মানবজীবনের চরম স্বার্থকতা মনে করে। লাস্ কাশাস্ এই ক্ষুদ্রত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ধ্বংসোন্মুখ ইণ্ডিয়ান জাতির জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া বার বার আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং দলিত পতিত ইণ্ডিয়ানগণের জন্য প্রাণপাত করিয়া খাটিয়াছিল। যে যুগে স্পেন বিজয়-গর্ব্বে ও সভ্যতার উম্মাদনায় একটা মহাজাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছিল এবং নিজেদের অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতেছিল সেই যুগে বিরাট মহান্ মহামানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত লাস্ কাশাস্ আপনার আদর্শের আলোক তাঁহার অন্ধ দেশবাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সে আলোকের শুভ্র জ্যোতি আজ চারিশত বৎসরের পরেও তেম্‌নি উজ্জ্বল, তেম্‌নি স্নিগ্ধ। নিপীড়িত জনগণ সে আলো দেখিয়া আজও আশা পায়, আর বলে এই আলো চিরদিনের, এ স্নিগ্ধতা চিরমধুর। স্পেনের ঔপনিবেশিক শাসনের সকল অগৌরবের মধ্যে আজ তাহার মহাগৌরবের বস্তু ত্যাগী সন্ন্যাসী লাস্ কাশাসের নিষ্কাম এবং পরহিত ব্রত জীবন ও সাধনা।

যৌবন

শ্রীসুভদ্রা রায়

যৌবনের প্রথম প্রভাতে হে তনিমা
অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়াছে সৌন্দর্য্যমহিমা।

অজানা আবেশে লজ্জানত তনুমন,
লাবণ্যের মায়া মন্ত্রে পূর্ণ অনুক্ষণ।

যৌবন-তরঙ্গে যেন উঠিছে দুলিয়া
কৈশরের প্রাণস্রোত রহিয়া রহিয়া।

চঞ্চল নয়নে জাগে নবতম প্রাণ ;
ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে লাস্য, মান অভিমান।

মর্ম্মের আবেগরাশি চিরমৌন হ'য়ে,
মর্ম্মর পাষাণ কক্ষে থাকে ব্যথা স'য়ে।

এ যৌবন মানিতে চাহে না কোন মানা,
ব্যথিত অন্তরে তার কবি দেয় হানা।

কবি সে লইতে চাহে নগ্ন বেদনারে,
উজারিয়া ছন্দে গানে নিত্য আপনারে।

উদারচরিতানামের বৌ

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীনের মত মজলিসি মিশুক মানুষ দেখা যায় না। বেঁটে গোলগাল মানুষটা, চিকণ চামড়া ঢাকা একটু চ্যাপ্টা ধরণের মুখখানিতে হাসিখুসী ভাবটাই বেশী সময় বজায় থাকে; তবে সময়বিশেষে সমবেদনাভরা গাম্ভীর্য্য, সংশয়ভরা জিজ্ঞাসু আশঙ্কা, বিচারহীন নির্ব্বিকার ক্ষমা, দুঃখ ক্ষোভ মায়ামোহ এসব ভাবও এমন পরিষ্কার ফুটিয়া থাকে যে, পটের ছবিও তার চেয়ে স্পষ্ট নয়। গলার আওয়াজটা একটু মোটা। কিন্তু কথা শুনিয়া মনে হয় মিষ্টত্ব একটু বেশীরকম ঘন হইয়া পড়ার জন্যই বুঝি এটা হইয়াছে। কথা সে যে খুব বেশী বলে তা নয়, যা বলে তাতেই সকলের প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভালমন্দ ধনীদরিদ্র মূর্খপণ্ডিত বোকা-বুদ্ধিমান --সকলেই ভাবে কি, উহুঁ, লোকটা আমার চেয়ে একটুখানি অধম যদি বা হয় উত্তম একেবারেই নয়, সমানই বরং বলা চলে সব বিষয়ে, আমার আপন জনের মত।

যতীনের কয়েকটা দোষ সকলে অনুমোদন করে না, তার মধ্যে প্রধান—মেলামেশা আর খাতির করায় বাচ-বিচারের অভাব। সমজ্ঞানী অবশ্য যতীন নয়। প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রামদাসকে মাঝে মাঝে অকারণেই ভক্তিভরে প্রণাম করে বলিয়া বাড়ীর সামনে ফুটপাতে যে মুচীটি বসিয়া থাকে তাকে দিয়া জুতা সারাইয়া লওয়ার পরে যে পায়ের ধূলা মাথা নেয় তা নয়, তবে যতক্ষণ সে জুতাটা সারাই করে, হয় তো সামনে উবু হইয়া বসিয়া সুখ দুঃখের গল্প জুড়িয়া দেয়। ব্যাঙ্কের টাকার পরিমাণে যে বড়লোক যতটা সম্মান চায় যতীন তাকে হয় তো বেশীই দেয় তার চেয়ে, আর যে গরীব মানুষটি উপযুক্ত পরিমাণে অবহেলা না পাইলে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে তাকেও যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলা দিতেও তার বাধে না। তবু বড়লোক আর গরীব দুজনেরই মনে হয়, দুজনকেই যেন সে সমান-ভাবে আপন করিয়াছে; বাপ আর ছেলের সঙ্গে দুরকম ব্যবহার করিয়াও কুটুম্ব যেমন দুজনের সঙ্গেই সমান কুটুম্বিতা বজায় রাখে। এটা সকলের ভাল লাগে না, মৃদু ঈর্ষার জ্বালায় মনটা খুঁতখুঁত করে।

বাড়ীতে হরদম লোক আসে, বাপের আমলের মাঝারি আকারের বাড়ীটিতে। ছুটির দিন হয়তো এত লোক আসিয়া হাজির হয় যে, ছোটখাট বসিবার ঘরটিতে জায়গা হয় না।

যতীন বলে, ‘চলুন দাদা, ওপরে যাই সবাই মিলে।’

কেউ কেউ আপত্তি করে, “না না, থাক গে। মেয়েদের অসুবিধে হবে।’

‘অসুবিধে হবে?’ আহত বিস্ময়ে যতীন এমন করিয়া বক্তার মুখের দিকে তাকায় যে মনে হয় গালে চড় মারিয়াই যেন তাকে আহত আর বিস্মিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তার বন্ধুরা বাড়ীর ভিতরে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে!

বিনা খবরে সদলবলে যতীন অন্তপুরে ঢুকিয়া পড়ে। মেয়েরা চটপট রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, শোয়ার ঘরে আর আনাচে কানাচে আশ্রয় লয়। যতীনের বৌ শতদলবাসিনী ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া জলের ডেকচি উনানে চাপাইয়া দেয় —এখনই সকলকে চা দিতে হইবে।

যতীন এক ফাঁকে চট্ করিয়া রান্না ঘরে আসে।—‘চা হ’ল?’

শতদলবাসিনী বলে, ‘জল চাপিয়েছি। আন্দাজ কত কাপ?’

‘এই ধরো কাপ চল্লিশেক?—পান পাঠিও কিন্তু।’

ছুটির দিনের পান সাজার দায়িত্ব সেজ ননদ কৃষ্ণার, বিবাহ হইয়া যতদিন না পরের বাড়ী যায়। জল গরম হইতে হইতে পানের খবরটা আনিতে গিয়া শতদলবাসিনী দ্যাখে কি, পান সাজা হইয়াছে মোটে পাঁচ-সাতটি, পান সাজার সরঞ্জাম সামনে দিয়া কৃষ্ণা মসগুল হইয়া পড়িতেছে চিঠি। হাতের লেখা চেনা, কার চিঠি তাও জানা।

‘ঠাকুরঝি!’

কৃষ্ণা চমকায়, থতমত খায়, চিঠিখানা ব্লাউজের আড়ালে চালান করিয়া দেয়, ঢোঁক গেলে।—‘এই হয়ে গেল বৌদি, এক্ষুণি সেজে দিচ্ছি।’

'চুলোয় যাক তোমার পান সাজা, ফের আরম্ভ করেছ? দুদিন বাদে তোর বিয়ে, আর তুই—'

'লিখলে আমি কি করব? আমি তো লিখি না।'

'লেখো কিসের, জবাব না পেয়েও সে চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাচ্ছে! এবার কিন্তু ওঁকে সব বলব আমি, আমার তো একটা দায়িত্ব আছে। একটা কিছু ঘটুক আর সবাই আমায় দুষুক যে জেনেও চুপ করে ছিলাম।'

টুকটুকে রাঙ্গা রঙ শতদলবাসিনীর, রূপের আর সব খুঁত যাতে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, চোখ দুটি যে একটু ছোটবড় প্রায় সে খুঁতটা পর্য্যন্ত। মুখ ভার করিয়া ট্যারা চোখে সে তাকায় তার সেজ ননদের দিকে ভৎসনার দৃষ্টিতে, আর মুখ নীচু করিয়া কৃষ্ণা নীরবে পান সাজে।

'দেখি কি লিখেছে আবার।'

কৃষ্ণা কাতরভাবে বলে, 'দেখে আর কি করবে বৌদি? বলেই যখন দেবে—'

শতদলবাসিনী বলে, 'আচ্ছা, এবারকার মত আর বলব না। কিন্তু ফের যদি তোমরা চিঠি লেখালেখি কর—তুই বুঝিস না ভাই, দুদিন পরে তোর বিয়ে—'

গভীর আগ্রহে শতদলবাসিনী চিঠি পড়ে, কৃষ্ণার ঠোঁটে দেখা দেয় মুচকি একটু হাসি, আর এদিকে রান্নাঘরে উনানে চাপানো চায়ের জলের ডেকচি টগবগ শব্দে বাষ্প ছাড়িতে থাকে।

চা দিতেও দেরী হয়, পান দিতেও দেরী হয়।

রাগে আগুন হইয়া যতীন আবার আসিয়া প্রায় দাঁত কড় মড় করিতে করিতে বলে, 'তোমরা সবাই হনুমান—একনম্বরের জাম্বুবান তোমরা সব। একটু চা আর দুটো পান দিতে কি বেলা কাবার করবে! চাউনি দ্যাখো একবার, মারবে না কি?'

সলজ্জ হাসি হাসিয়া শতদলবাসিনী বলে, 'ওমা, ছি, কি যে বল তুমি! মারব কি গো! গরম জলে হাতটা পুড়ে গেল কি-না।'

'পুড়বে না, যা কাজের ছিরি। নাও নাও, চটপট বানাও চা।'

উপরে মজলিসে ফিরিয়া গিয়া যতীন প্রায় তার বৌ-এর লজ্জা-পাওয়া হাসিটাই নকল করিয়া বলে, 'দুধ ছিল না কি-না, একটু দেরী হয়ে গেল চায়ের। যাক, এইবার এসে পড়েছে। চা না হলে কি আলাপ জমে!'

আলাপ প্রচণ্ডভাবেই জমিয়াছিল, বর্ষাকালে মেঘের গলিয়া গলিয়া অবিরাম ধারা বর্ষণের মত, যার ঝমঝম গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনে হয় ব্যাপারটা বিশ্বব্যাপীই বুঝি হইবে। ঘরখানা মস্ত, আগে যতীনের বাবার শয়নঘর ছিল, আসবাবে বোঝাই হইয়া থাকিত। এখন যতীন এ ঘরে শোয় বটে, ঘরে আসবাব পত্র এক রকম কিছুই নাই, মেঝের প্রায় সবটা জুড়িয়াই সতরঞ্চি পাতা, এক কোণে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিছানার তোষকপত্র গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। বসিবার ঘরে সবদিন সকলের স্থান সঙ্কুলান হয় না দেখিয়া যতীন এ ঘরখানা খালি করিয়া লইয়াছে। বসিবার জন্য দেয়াল দরকার হয় না, তাই দেয়ালে অনেকগুলি ছবি আর কেলেণ্ডার লটকানো। দক্ষিণের দেয়ালের মাঝামাঝি প্রকাণ্ড একটি তৈলচিত্র—যে জানে না দেখিলেই তার মনে হইবে নিশ্চয় যতীনেরই পরলোকগত পিতার ছবি।

জিজ্ঞাসা করিলে যতীন মাথা নাড়িয়া বলে, 'ওটা হ'ল গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার ছবি।' বছর তিনেক আগে পাশের বাড়ীতে এক ভাড়াটে আসিয়াছিল, বাপের একটি তৈলচিত্রের জন্য তার জোরালো সাধ ছিল। যতীন ছবিটি আঁকাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাসখানেকের জন্য দেশে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া দ্যাখে, পাশের বাড়ীর নতুন বন্ধুটি কোথায় যে গিয়াছে কেউ জানে না। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাড়ীটি যে তারা মোটে ছ'মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছে তা কি যতীন জানিত!

কারণ যাই হোক, পূবের দেওয়ালে কয়েকজন বিভিন্ন মানুষের সাধারণ কয়েকটি ফটোর মধ্যে নিজের বাবার একটি ফটো টাঙ্গাইয়া রাখিয়া কয়েকদিনের পরিচিত একজনের বাবার তৈলচিত্রকে এতখানি প্রাধান্য দিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়, ভাবে, যতীনের মনটা সত্যই উদার বটে!

এদিকে, যতীনের মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মালা জপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, 'ছেলে কি বলে গেল বৌমা?'

যতীনের মা কানে একটু কম শোনে। শতদলবাসিনী এতখানি গলা চড়াইয়া তার প্রশ্নের জবাব দেয় যে উপরের ঘরে যতীন আর সমবেত সকলেই প্রত্যেকটি কথা শুনিতে পায়: 'কি আর বলবে, বলে গেল চায়ে দুধচিনি কম দিতে, চা খাইয়েই ফতুর হবে।'

এ ধরণের অপরাধের জন্য শতদলবাসিনী শাস্তি পায়। দিনের বেলা যতীন সময় পায় না, বাড়ীতে অনেক লোক আসে, নিজেকে লোকের বাড়ীতে যাইতে হয়। রাত্রে—হয়তো অনেক রাত্রেই, কারণ, বিপদ রোগ আর শোক যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ঘাড়ে সব সময় চাপিয়া থাকিতে ভালবাসে এবং তাদের মধ্যে দু-চারজনকে সাহায্য, পরামর্শ সেবা আর সাঁন্ত্বনা দিতেই যে কত সময় লাগে বলিবার নয়—বাড়ী ফিরিয়া যতীন বৌকে ডাকিয়া তোলে। পাচ বছরের ছেলে আর দুবছরের মেয়েকে লইয়া শতদলবাসিনী এ ঘরের লাগাও ছোট ঘরটিতে শোয়, ছেলেমেয়ের কান্না আর নোংরামি যতীনের সহ্য হয় না। দুটি ঘরের মাঝে দরজা আছে, দরকার হইলে কখনো যতীন নিজেই ও ঘরে যায়, কখনে বৌকে এ ঘরে ডাকিয়া আনে।

শাস্তির রাত্রেও ডাক শুনিয়া প্রথমটা শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে না শাস্তির জন্য তাকে ডাকা হইয়াছে, ঘুমভাঙ্গার বিরক্তি আর অজানা একটা অস্বস্তির মধ্যেও হঠাৎ উগ্র প্রত্যাশায় সর্ব্বাঙ্গে তার বৈদ্যুতিক রোমাঞ্চ হয়। তারপর এঘরে আসিয়া যতীনের পাতা বিছানা তুলিয়া ঘর-জোড়া সতরঞ্চি উঠাইয়া বাহিরে লইয়া গিয়া তাকে ঝাড়িতে হয়। ঘর ঝাঁট দিয়া আবার সতরঞ্চি বিছাইয়া পাতিতে হয় বিছানা। সমস্তক্ষণ যতীন নীরবে চুরুট টানিয়া যায়।

বিছানা পাতা হইলে চিৎ হইয়া শুইয়া বলে, 'একগ্লাস জল দাও তো।'

জল দেওয়া হইলে বলে, 'হেঁটে হেঁটে পা দু'টো কেমন ব্যথা করছে। একটু টিপে দাও না? না, অপমান হবে?'

'ওমা, অপমান হবে কিগো! কি যে বল তুমি!'

যতীন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু ট্যারা চোখ প্রাণপণে মেলিয়া রাখিয়া দু'হাতে শতদলবাসিনী তার পা টিপিয়া দেয়, যে হাত দুটির রঙ তার হাতের সোনার চুড়ির সঙ্গে প্রায় মিশ্ খাইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণার গোপন চিঠির অদ্ভুত খাপছাড়া লাইনগুলি হয় তো তার মনে পড়িয়া যায়, স্বামীর পা টেপার সময় ওসব লাইন কি মনে না পড়িয়া পারে, যে মেয়ের এখনো স্বামী হয় নাই তার কাছে একটা মাথা-পাগলা ছেলের লেখা কাকুতি মিনতি হা-হুতাশ-ভরা লাইন? মনে পড়িতে দুস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া-ওঠার মত হঠাৎ তার ঘুম টুটিয়া যায়, ভাবে: পা টেপা শেষ হইলে—? পা টেপার পুরস্কার স্বরূপ—?

সন্তর্পণে গায়ে নাড়া দিয়া সে আধ-ঘুমন্ত যতীনকে চোখ চাওয়ায়, সলজ্জ একটু মৃদু হাসি মুখে আনিয়া বলে, 'এবার থাক? পরে আবার দেব'খন, এ্যাঁ?'

'দু'মিনিট দিয়েই হয়ে গেল? বলছি ভয়ানক পা কামড়াচ্ছে।'

ঘরে আলো আছে, রাস্তার একটা আলোও জানালা দিয়া দেখা যায়—অসমান চোখ দু'টি যতক্ষণ জলে ভরিয়া থাকে ততক্ষণ মুখ উঁচু করিয়া সে ঘরের আলোটা দ্যাখে, তারপর জল শুকাইয়া চোখ ঢুলু ঢুলু হইয়া আসিলে তাকায় রাস্তার আলোর দিকে। ঘড়িতে সময় চলার টিক্ টিক্, আর যতীনের নিশ্বাস ফেলার 'স্ স্' শব্দের সঙ্গে মাঝরাত্রির আরও কত শব্দ সে শোনে, সব শব্দ হয় তো শব্দই নয়।

তারপর এক সময় মেয়েটা কান্না সুরু করে, তার কান্নায় জাগিয়া গিয়া ছেলেটাও সে কান্নায় যোগ দেয়। পা টেপা বন্ধ করিয়া শতদলবাসিনী বলে, 'ওগো শুনছো, ওরা জেগেছে, আমি গেলাম।'

'না, এখন যেতে হবে না।'

'ওরা যে কাঁদছে?'

'কাঁদুক।'

আর পা টেপায় না, এবার যতীন তার আদরের বৌকে আদর করিয়া আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলে। ছেলেমেয়ের চীৎকার যত সপ্তমে ওঠে তার বাহুর বাঁধনও তত জোরালো। শাস্তিই বটে। এতক্ষণ এত করিয়াও যাকে শাস্তি পাওয়ানো যায় নাই এতক্ষণে যে তার শাস্তি সুরু হইয়াছে, দম আটকানো অধীর ব্যাকুলতার শাস্তি, দুজনেই তা বুঝিতে পারে, যে শাস্তি দিতেছে সেও, যে শাস্তি গ্রহণ করিতেছে সেও।

গোড়া হইতেই শতদলবাসিনী সব জানে, সব বোঝে। তবু সে কিছুই জানিতে চায় না. কিছুই বুঝিতে চায় না, এখনো চেষ্টা করে জয়ের।

'এতক্ষণে রাগ পড়ল?'

'রাগ আবার করলাম কখন?'

'কথা বল নি কি-না এতক্ষণ, তাই মনে হচ্ছিল রাগ করেছ। আচ্ছা, আজ দাড়ি কামালে কখন বল তো? সারাদিন তো এক মিনিট সময় পাও নি। কি খাটতেই

তুমি পারো, বাব্বা!—অত খেটো না, লক্ষ্মীটি, শরীর ভেঙ্গে পড়বে।'—মধুর হাসি হাসে শতদলবাসিনী, যতীন দাড়ি কামাইয়াছে কি-না গালে আঙ্গুল বুলাইয়া বুলাইযা তাই পরীক্ষা করে। হঠাৎ ভয়ানক বিরক্ত হইয়া বলে, 'আঃ, কি চিল্লানিটাই সুরু করেছে দুটোতে, জ্বালিয়ে মারল। মেঝেতে আছড়ে ফেলতে সাধ যায়। ছাড়ো তো দুটোকে শান্ত করে আসি, এখখুনি আসব, দু'মিনিটের মধ্যে।'

কিন্তু যতীন এত সহজে ভুলিবার ছেলে নয়, সে প্রায় নির্ব্বিকার ভাবেই বলে, 'কাঁদুক না। ছেলেপিলের কাঁদা ভাল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসছি, দাঁড়াও।'

যতীন দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গিয়া শতদলবাসিনী পাশ কাটাইয়া চট্ করিয়া ওঘরে চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু স্বামীর বাহুর বন্ধনের সঙ্গে বৌ কেন পারিয়া উঠিবে?

দরজাটা বন্ধ করা হয়, কিন্তু তাতে ছেলেমেয়ের চীৎকারের শব্দ আটকানো যায় না। একটু পরেই ওঘরের বারান্দার দিকের দরজায় দুম্ দুম্ করাঘাতের শব্দ পাওয়া যায়, কৃষ্ণার গলা শোনা যায়: 'বৌদি, ও বৌদি? কি ঘুম বাবা তোমার!—বৌদি! ও বৌদি?'

কৃষ্ণার বিবাহের মাস দুয়েক দেরী আছে। পাত্রটি তেমন সুবিধার নয়। বাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়, নিজের উপার্জ্জনও বেশী নয়, বয়সটাও কম নয়। কৃষ্ণার পছন্দ অপছন্দের অবশ্য প্রশ্নই ওঠে না, বাড়ীর অন্য কারো পছন্দ হয় নাই। মা দিনরাত খুঁত খুঁত করে, বিবাহিতা বড় বোন দু'টি আফশোষ-ভরা চিঠি লেখে, আত্মীয়স্বজনেরা জিজ্ঞাসা করে, এমন মেয়ের এমন পাত্র ঠিক করা কেন, বাজারে কি আর ছেলে নাই?

যতীন বলে, 'কত লোক বোনের বিয়েই দিতে পারছে না, কাণা-খোঁড়ার হাতে দিতে হচ্ছে শেষ পর্য্যন্ত। আমার বোন বলে কি তার জন্য রাজপুত্তুর আনতে হবে? মন্দই বা কি ছেলেটি? স্বাস্থ্য ভাল, রোজগারপাতি করছে—আবার কি চাই?'

তা ছাড়া পাত্রটি সস্তা।

এটাই যে একটা মস্ত বড় কারণ, শতদলবাসিনীর কাছেই সে কেবল তা স্বীকার করে। টাকা পয়সার টানাটানিটা তার সব সময় লাগিয়াই আছে। বাপের অবস্থা তার ভালই ছিল, দেশে কিছু সম্পত্তি আছে, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা ছিল, নিজেও মাসে মাসে বেতন পায় প্রায় তিনশ' টাকা। তবু ধার দিয়া আর দান করিয়া টাকায় তার কুলায় না। ব্যাঙ্কের টাকাগুলি যতদিন ছিল ততদিন চেক কাটিয়া কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে, এখন অসুবিধার সীমা নাই। দেশের সম্পত্তির আয়টা বছরে হাজার দু'য়ের কাছাকাছি ওঠে-নামে। এই আয়টা আছে বলিয়া রক্ষা, নয় তো কি যে হইত! বৌ-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে যতীন এ বিষয়ে আলোচনা করে। স্বামীর মুখে দুর্ভাবনার ছাপ দেখিয়া শতদলবাসিনী বলে, 'এমন ক'রে টাকাগুলো যদি নষ্ট না কর—'

'নষ্ট মানে?'

'আহা, যাদের ধার দাও, তারা কেউ একটি পয়সা কখনো ফেরত দিয়েছে, না দেবে? যাদের এমনি টাকা দাও, তাদের আদ্দেকের বেশী মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে তোমায় ভোলায়।'

'মিথ্যে কাঁদুনি গেয়ে ভোলায়? নাম কর তো একজনের, কে ভুলিয়েছে?'

শতদলবাসিনী আর যতীনের বন্ধু ক'জনের নাম জানে, কাকে কি উপলক্ষে কখন ধার দিয়াছে বা দান করিয়াছে তাই বা সে কি জানে। সে সময় তো যতীন তার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসে না। অনেক ভাবিয়া একটি দৃষ্টান্তই কেবল তার মনে পড়ে। তিন-চার বছর আগের ঘটনা, যখন হইতে যতীনের দান করা রোগটা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইযাছে।

'কেন, সেই যে সেবার শান্তির বিয়েতে সাতাশ শো টাকা দিলে? ওর বাবার মাইনে কম হোক, ওর দাদা তো সাত-আটশো টাকা মাইনে পায়।'

যতীন অসহিষ্ণু হইয়া বলে, 'সব দাদাই কি বেশী মাইনে পেলে বোনের বিয়েতে টাকা ঢালে? টাকা কম পড়ল. শান্তির দাদা দিতে চাইল না, তাই তো আমি দিলাম। আমি শেষ মুহূর্ত্তে পাত্র বদলে দিলাম, বেশী টাকার দরকার হ'ল, আমি না দিলে কে দেবে? আমার একটা দায়িত্ব নেই?'

শতদলবাসিনী জিজ্ঞাসা করে না যে পরের মেয়ের কোন পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হইতেছে, সাতাশ শো টাকার খেসারত

দিবার দায়িত্ব লইয়া সে বিষয়ে মাথা ঘামাইতে যাওয়ার কি দরকার পড়িয়াছিল, যতীনকে ওকথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। মৃদুস্বরে সে শুধু বলে, 'নাই বা বদল করতে পাত্র ? বেশী ভাল পাত্র এনে লাভ তো হয়েছে ভারি, মেয়ের চোখের জল শুকুচ্ছে না। তার চেয়ে আগের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হ'লে হয় তো—'

যতীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি ক'রে জানলে শান্তি দুঃখ পাচ্ছে ?'

'ওমা, তা জানবো না ? সেজদি যে ভাগলপুরে থাকে ? ননদ সেজদি নয়, আমার সেজদি—সেই যে বিয়ের সময় যে তোমার টিকি কেটে নিয়েছিল না ? —সে।'

টাকার আলোচনা বেশীক্ষণ তাদের মধ্যে চলে না, পরে অল্পক্ষণের মধ্যেই ব্যক্তিগত সমালোচনায় দাঁড়াইয়া যায়। এক তরফা সমালোচনা, যতীন বলিয়া যায় আর শতদলবাসিনী চুপ করিয়া শোনে। টাকা সম্বন্ধে শতদলবাসিনীর সঙ্কীর্ণতা কত যে পীড়ন করে যতীনকে বলিবার নয়। ভাল কাজেই যদি না লাগে, টাকার তবে আর মূল্য কি ? মানুষের চেয়ে টাকা কি বড় ? এতই যদি টাকা ভালবাসে শতদলবাসিনী, বাপ্‌কে বলিয়া রক্তমাংসের একটা মানুষের বদলে টাকার একটা বস্তাকে বিবাহ করিলেই পারিত !

'আমি মরলেই হাজার বিশেক টাকা পাবে। একদিন বিষটিস খাইয়ে দিও বরং।'

'ওমা, বিষ খাওয়াবো কি গো ? কি যে বল তুমি !'

আলোচনাটা হইয়াছিল বর্ষাকালের এক সন্ধ্যাবেলায়। তিন দিন পরে অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে যতীন ভাগলপুর চলিয়া গেল।

'শান্তির জন্য যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কি আশ্চর্য্য, সেজদি আন্দাজে কি লিখেছে না লিখেছে—'

'দেখেই আসি কেমন আছে।'

পাচদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল এবং আসিয়াই শান্তির শ্বশুরের নামে পাঠাইয়া দিল পুরা একটি হাজার টাকা। শতদলবাসিনী ব্যাপারটা জানিতে পারিল আরও দিন সাতেক পরে।

'টাকা পাঠালে কেন ?

যতীন হাই তুলিয়া বলিল, 'পণের সব টাকা দেওয়া হয়নি বলে ওরা শান্তিকে কষ্ট দিচ্ছিল কি-না, তাই পাঠিয়ে দিলাম।'

সহজ কৈফিয়ৎ, কিন্তু শতদলবাসিনীর ট্যারা চোখের সঙ্গে ভ্রূ দুটি পর্য্যন্ত কুঁচকাইয়া গেল।—'টাকা পেলে কোথায় ?'

'তা দিয়ে তোমার দরকার কি ?'

শতদলবাসিনী উদাসভাবে বলিল, 'না, আমার আর দরকার কি। ধার করেছ কি-না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'তাই বা জিজ্ঞেস করবে কেন ?'

যতীনের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে বুঝিয়া শান্তির ভয়ে শতদলবাসিনী আর কথাটি বলে না। টাকা সম্বন্ধে নিজের হীনতার চেয়ে স্বামীর উদারতাই তাকে বেশী কাবু করিয়া ফেলে এবং সেজন্য ক্ষণিকের গ্লানি বা অনুতাপ বোধ করিবার মত উদারও সে নয়। নিজের বোনের বিবাহের বেলা যার টাকা থাকে না, পরের মেয়ের জন্য সে হাজার হাজার টাকা খরচ করিতে পারে, নিজের না থাকিলে ধার করিয়া জোগাড় করে, এরকম পরোপকার আজ যেন হঠাৎ তার বড় বেশী রকমের খাপছাড়া মনে হয়। এবং দু-একটা দিন কাটিতে না কাটিতে মনে হয়, শুধু খাপছাড়া নয়, এটা অন্যায়ও বটে।

কৃষ্ণার জন্য সস্তায় অপাত্র কেনা হইতেছে বলিয়া শতদলবাসিনীর এতদিন বিশেষ আফশোষ ছিল না। যে মেয়ে গোপনে পরের ছেলের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেমন তেমন একজনের সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া যাওয়াই ভাল। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের রোগা লম্বা গোয়ার-গোবিন্দ এক ছোঁড়া যাকে ওরকম আবোল তাবোল কথা ভরা চিঠি পাঠায়, একটু বেশী বয়সের মোটা সোটা একজনের সঙ্গেই তার বিবাহ হওয়া উচিত—শাসনে থাকিবে। কেন যতীনও তো তাকে বেশী বয়সেই বিবাহ করিয়াছে, বিবাহের সময় যতীনও তো কম গোলগাল ছিল না, কিন্তু তাতে কি আসিয়া গিয়াছে তার ? স্বামীকে অপছন্দ করিয়া সে কি কোনদিন গোপনে কারও সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করিয়াছে ? তার যদি এতেই মন উঠিয়া থাকে, কৃষ্ণার উঠিবে না কেন ? রূপে বল, গুণে বল, কোন দিক দিয়া তার সঙ্গে কৃষ্ণার তুলনা চলে ? এমন রঙ আছে কৃষ্ণার, এমন গড়ন, এমন মধুর স্বভাব ? এই সব ভাবিত

আর অপাত্রটিকেই কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া তার বিশ্বাস জন্মিয়া যাইত। এবার কিন্তু তার মনে হয়, রূপে গুণে যতই তুচ্ছ আর খারাপ মেয়ে হোক কৃষ্ণা, সে তো শান্তির চেয়ে তুচ্ছ নয়, খারাপ নয়? শান্তির জন্য যদি দফে দফে এত টাকা খরচ করা যাইতে পারে, কৃষ্ণার জন্য কেন যাইবে না? পরের মেয়ের জন্য যতটা করা হইয়াছে, ঘরের মেয়ের জন্য অন্তত ততটুকু তো করা উচিত।

কিন্তু করিবে কে? যতীনের বড় টাকার টানাটানি।

ভাবিতে ভাবিতে শতদলবাসিনীর সোনার মত মুখের রঙ একটু বিবর্ণ হইয়া আসে, উনানের আঁচেও আর যেন তেমন রঙ খোলে না। সামনে দাঁড়াইয়া সে কৃষ্ণার কণ্ঠার হাড়ের কাছে জমানো ময়লা চাহিয়া দ্যাখে, পিছন হইতে দ্যাখে তার দোলনময় চলন। মমতায় কাতর হইয়া ভাবে, আহা, এই মেয়েকে টাকার জন্যে একটা ধেড়ে হনুমানের কাছে বলি দেওয়া হইবে, একটা পিপের মত মোটা জাম্ববান হইবে এই কচি মেয়েটার বর?

'মুখ তোমার শুকনো দেখাচ্ছে কেন ঠাকুরঝি?'

'কি জানি, জানি না তো!'

'না ঠাকুরঝি, অত ভেবো না তুমি। আমি সব ঠিক ক'রে দেব।' তারপর গলা নামাইয়া ফিস ফিস করিয়া বলে, 'আর চিঠি লিখেছে?'

কৃষ্ণা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করে কি-না সে-ই জানে, বলে, 'কে চিঠি লিখবে?'

'আহা, তোমার সে গো—সে। রোজ পাচ-দশটা চিঠি লেখালেখি করেছ, জান না কে?'

'ও, সে?' কৃষ্ণা হঠাৎ রাগিয়া যায়, 'তুমি যেন কেমন ধারা হ'য়ে যাচ্ছ বৌদি, বলছি আজ পর্য্যন্ত আমি একটা চিঠির জবাব দিইনি, বিশ্বাস হয় না কেন তোমার?'

শতদলবাসিনীও রাগিয়া যায়, 'কেন দাওনি জবাব? কি এমন মহাপুরুষটা তুমি যে একটা চিঠির জবাব দিতে বেধেছে? মিছিমিছি মানুষের মনে কষ্ট দিতে বড্ড ভাল লাগে, না? মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি।'

কথা শুনিয়া কৃষ্ণা একটু আশ্চর্য্য হয় আর যেন মেয়েমানুষ জাতটার সম্মান বাঁচানোর জন্যই বলে, 'একটা জবাব দিয়েছি। লিখে দিয়েছি, ফের আমার কাছে চিঠি লিখলে পুলিশে ধরিয়ে দেব।'

'ওমা, পুলিশে ধরিয়ে দেবে কি গো? কি যে বল তুমি!'

সে বিব্রত হইয়া থাকে, অশান্তি বোধ করে। ভাদ্রের গরমটা যখনই অসহ্য বোধ হয় তখনই মনে পড়ে আশ্বিনের বেশী দেরী নাই। আশ্বিনের গোড়ায় কৃষ্ণার বিবাহ হইয়া যাইবে। তার নিজেরই যেন একটা বড় রকমের বিপদের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। চিঠি লিখিলে পুলিশে ধরাইয়া দিবে লিখিয়া দিয়াছে? তার আগে একখানা চিঠিরও জবাব দেয় নাই? এ আবার কি ব্যাপার! অমন আগ্রহের সঙ্গে কেন তবে সে চিঠিগুলি পড়িত, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইত? ব্লাউজের আড়ালে চিঠি লুকাইয়া সারাদিন ঘুরিয়া বেড়াইত? বড় প্যাঁচালো কাণ্ডকারখানা সংসারের, বড় গোলমেলে মানুষের চালচলন।

তার এত দুর্ভাবনা কেন শতদলবাসিনী বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তবু দুর্ভাবনায় তার মাথা ঘুরিতে থাকে। শান্তির সঙ্গে কৃষ্ণার যেন একটা নেপথ্য সংগ্রাম চলিতেছে, কৃষ্ণার পরাজয়ের কথাটা সে ভাবিতেও পারে না। তাই যদি ঘটে, বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ কি? কিসের ছেলেমেয়ে, কিসের স্বামী, কিসের সংসার, কিসের রাঁধাবাড়া!

খাইতে বসিয়া যতীন চীৎকার করে, 'ডালে নূন পড়ে নি, মাছের ঝোল নূনকাটা, দিন দিন কি হচ্ছে শুনি? দূর করে দেব বাড়ী থেকে সব কটাকে —লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত এসে জুটেছে কোথা থেকে, জ্বালিয়ে মারলে।'

মা যদি বা কানে কম শোনে, এ কথাগুলি শুনিতে পায়। ডাকিয়া বলে, 'বৌমা, খারাপ শরীর নিয়ে কেন রাঁধতে গেলে বাছা? ভালমানুষের এ গরম সয় না, খারাপ শরীরে—'

যতীন ধমকাইয়া ওঠে, 'তুমি থামো, খারাপ শরীর না তোমার মাথা।'

পাশের বাড়ীর দোতলার ছাদের একদিকের খানিকটা আলিসায় ঝুঁকিলে এ বাড়ীর বারান্দা দেখা যায়। নাতির কাঁথা মেলিয়া দিতে দিতে পাশের বাড়ীর গিন্নি আলিসায় ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে বাবা?'

মুখ তুলিয়া চাহিয়া যতীন হাসিমুখে বলে, 'কিছু হয় নি পিসীমা। নন্দর চিঠি পেয়েছেন?'

যতীনের পাতানো পিসী সরিয়া গেলে শতদলবাসিনী একবাটি দুধ আনিয়া দেয়।

'আজ দুধ দিয়েই খাও। ক'দিন শান্তির রান্না খেয়ে এসে আমার রান্না মুখে রুচছে না, না ?'

মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারার জন্য ডালের বাটিটা তুলিয়া লইয়া যতীন দেখিতে পায় ওবাড়ীর পাতানো পিসীমা আড়ালে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু চলিয়া যায় নাই। আলিসার আড়ালে লুকাইয়া একটা ফাঁক দিয়া এদিকেই চাহিয়া আছে। ডালের বাটিটা যতীন নামাইয়া রাখে।

শতদলবাসিনী বুঝিতে পারে, শাস্তিটা রাত্রির জন্য তুলিয়া রাখা হইল। তা হোক, শাস্তির ভয় কে করে ? সব শাস্তির শেষ আছে কিন্তু কতগুলি ব্যাপার যেন কিছুতেই শেষ হইতে চায় না।

ননদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া সে বলে, 'একখানা চিঠি লেখো না ঠাকুরঝি ?'

'কাকে চিঠি লিখব ?'

'তোমার সেই তাকে ?'

'ও, তাকে ? তুমিই লেখো না ?'

শতদলবাসিনী মুখ ভার করিয়া নূনকাটা মাছের ঝোল মাখা ভাত খাইতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'তুমি বড় বোকা ঠাকুরঝি, বড্ড বোকা। আমি হ'লে কি করতাম জানো, পালিয়ে যেতাম।'

'পালিয়ে গিয়ে কি খেতে ?'

সেও একটা সমস্যা বটে। মেয়েমানুষ হইয়া মেয়েমানুষের এ সমস্যাটা না বুঝিয়া উপায় নাই। কৃষ্ণা তবে অনেক ভাবিয়াই পুলিশে ধরানোর ভয় দেখাইয়া চিঠি লিখিয়াছে!

কৃষ্ণা খাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। মুখের ভাবটা তার 'কাঁদ' কাঁদ'।

'তুমি যে বলেছিলে সব ঠিক করে দেবে, দাও না ? দু-চারদিনের মধ্যে বিয়েটা ঘটিয়ে দাও না ?'

'দু-চার দিনের মধ্যে বিয়ে'! কার সঙ্গে ?'

'যার সঙ্গে ঠিক হয়েছে, আবার কার সঙ্গে।'

'এই ভাদ্র মাসে ?'

'হোক ভাদ্র মাস।'

কথা শুনিলে মনে হয় তামাসা করিতেছে, মুখ দেখিলে বিশ্বাস হয় না। শতদলবাসিনী তাই মাখা ভাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে চুপ করিয়া থাকে। কৃষ্ণা অধীর হইয়া বলে, 'চোখ নেই তোমার ? আমায় দেখে বুঝতে পার না ?'

'একটু একটু যেন বুঝতে পারি পারি করছিলাম ঠাকুরঝি, ভরসা পাইনি। চিঠির জবাব দিতে না বললে, অথচ—দেখা হ'ত, না ?'

'হ'ত।'

তারপর দুজনেই চুপচাপ ! আর খাওয়া গেল না, মাছ তরকারীও আজ অখাদ্য হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে: 'ভাদ্র মাসে তো বিয়ে হয় না ঠাকুরঝি, একটা মাস দেরী করতেই হবে।'

রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িতে দেরী করিতে থাকে, একজন ঘুমায় তো আর একজন জাগিয়া ওঠে। যতীন দশটা বাজার আগেই শুইয়া পড়িয়াছিল, ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে শতদলবাসিনী আহ্বানের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া থাকে। আজ সে শাস্তি গ্রহণ করিবে না --যাই বলুক যাই করুক যতীন, আজ সে বিদ্রোহ করিবেই। একবার এখন ডাকিলেই হয়। আজ যেন তার সাহস বাড়িয়া গিয়াছে, সমাজ-সংস্কার নীতিধর্ম্ম সব কিছুর বিরুদ্ধে যাইতে কৃষ্ণার যত সাহস দরকার হইয়াছিল, তার চেয়ে বেশী। যতীন ডাকিয়া যেই বলিবে, পা টেপো, মাথা উঁচু করিয়া সে জবাব দিবে: পারব না, আমি কি তোমার পা-টেপা দাসী ?

তারপর ? তারপর যা হয় হইবে। কৃষ্ণা চোখ মেলিয়া ভবিষ্যতের কত গাঢ় অন্ধকারকে বরণ করিয়াছে, সে চোখ বুজিয়া গালে একটা চড় খাইতে পারিবে না ?

মনের মধ্যে সদিচ্ছার চিতা জ্বলিতে থাকে, বীরত্বের দীপ্তিতে আত্মসম্মান উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। নিজেকে শতদলবাসিনীর মনে হইতে থাকে অতি উত্তম, অতি মহৎ—একেবারে অসাধারণ কিছু। কিন্তু হায়, ছেলেমেয়ে ঘুমাইয়া পড়ে, রাস্তার ওপাশের বাড়ী দুটির সব আলো নিভিয়া যায়, পাড়া নিঝুম হইয়া আসে কিন্তু বিদ্রোহ করার সুযোগ দিতে কেউ তো ডাকে না।

তারপর যতীনের নাক ডাকার শব্দ কানে আসিলে মনটা খারাপ হইয়া যায়। শাস্তি দিতে না ডাকিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ? নিজেকে বড় অসহায়, বড় নিরুপায় মনে হইতে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া শতদলবাসিনী ঘুমন্ত স্বামীর পা টিপিতে আরম্ভ করে।

বেদ ও বিজ্ঞান

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

জ্ঞান-মীমাংসা

বিজ্ঞানের নিজ ভূমিকায় জ্ঞানের যে সব গভীর কথা আছে, সর্ব্বত্র তাহার পরিচয় না হলেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ফলিত-বিজ্ঞান মানুষের কত সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার ক'রে বিজ্ঞান মানব-জীবনকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। মানুষের জ্ঞানের সব বিভাগ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানানুমোদিত আবিষ্কার ও আলোচনার রীতি সকল রকম বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। ভূত-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, মন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, মানবধর্ম-বিজ্ঞান—সর্বত্রই ইহার গতি। বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ দ্বারা তত্ত্ব আবিষ্কার করে। ইহার পরিচয় স্বতই হয় এবং ইহার জন্য কোন ভিত্তিহীন বিশ্বাসের আবশ্যক হয় না। বিজ্ঞান ফল প্রসব করে। বিজ্ঞানের নিজস্ব মতামতের (Theory) রাজ্য আছে, কিন্তু বিজ্ঞানে সেই মতই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়, যা ঘটনাচক্রের নিপুণতর সন্নিবেশ করে। বিজ্ঞান ক্রম-অগ্রসরশীল (Progressive) কোন নির্দিষ্ট বাঁধাধরা সত্যকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হয না। এজন্য বৈজ্ঞানিক কোন একটা মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেন না, যার মূলে কোন অব্যর্থ প্রমাণ নেই। বিজ্ঞান চায় ঘটনা সমাবেশের দ্বারা মতবাদের সমর্থন। বিজ্ঞানের রাজ্যে ব্যক্তির কোন স্থান নাই, সে ব্যক্তি যত বড় সত্যের আবিষ্কারক হোন না। সত্যের স্থান সেখানে বড়। বৈজ্ঞানিক সত্য যদিও ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা আবিষ্কৃত, তথাপি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভূতবস্তু বিষয়ক (objective)। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকের ভেতর শ্রদ্ধার চেয়ে সত্যানুসন্ধিৎসার স্থান উর্দ্ধে।

যে শক্তি জগতে ক্রিয়াশীল, তার স্বরূপ ও গতি আজ বিজ্ঞানের বুঝ্‌বার বিষয় হয়েছে। বিজ্ঞান-ভূমিকায় একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তির সহিত আমাদের পরিচয়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কেন না ইহার কোন নিয়ামক নেই। বিজ্ঞানের স্থির-বিশ্ব (fixed or determinisic universe) ক্রমশ অন্তর্হিত হচ্ছে। এডিংটন্ বলেছেন—"The modern physics is drifting away from the postulate that the future is predetermined. (The nature of the physical world) বিশ্বের অন্তরালে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শক্তি ক্রিয়াশীল হ'লেও এ শক্তি যে চিৎশক্তি বিজ্ঞান-ভূমিকায় একথা বলা সহজ না। অবশ্য বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে একটা দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কিন্তু শক্তির চিৎস্বরূপতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। শক্তির কোন নিয়ামকতা নাই, তা হ'তে শক্তি চিদ্‌স্বরূপ—এ অনুমান হয় না। বস্তুত, শক্তির চিদ্রূপতা প্রতিপন্ন করা বিজ্ঞানের বিষয় নয়। এরূপ কিছু করতে বিজ্ঞানের নিজস্ব জগৎ ছেড়ে দিয়ে দর্শনের আশ্রয় নিতে হয়।

আইন্‌ষ্টাইন্ তাঁহার The World As I See It পুস্তকে ধর্ম সম্বন্ধে (values) মঙ্গল, সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন ; কিন্তু সেটা নিছক দার্শনিকতার কথা, বিজ্ঞানের কথা নয়। হয়ত এরূপ বৈজ্ঞানিক trans-empirical অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পাইতেছেন, কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুস্পষ্ট হয়ে দর্শনের রূপ নেয় নেই। বিজ্ঞান হয়ত শক্তির এরূপ রূপ দেখেছে, যা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত ; কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অতীত হলে তা চিদাত্মক হবে—এমন কোন নিয়ম নেই। অন্তত বিজ্ঞানে তা প্রতিপন্ন হয় নি। Schrodinger-এর Science and the Human Temperament গ্রন্থের ভূমিকায় লর্ড রুদার্‌ফোর্ড লিখেছেন—"The casting aside of all models and the wholesale employment of mathematical formulas in their stead, because the latter are found more suitable for the representation of what is called ultimate physical reality, come very close to the Berkelian standpoint and in the theory of wave mechanics, reduce the last building stones of the universe to something like a spiritual throb that comes as near as possible to our concept of pure thought. (Biographical introduction, page 19). কিন্তু এই যে চেতনার কম্পনের কথা বলা হয়েছে, এটা বিজ্ঞানলব্ধ সত্য নয়। বিজ্ঞানের চরম বিশ্লেষণে বিজ্ঞানে এই সত্য এখনও আত্মপ্রকাশ করে নি। এটি ছায়াপাত মাত্র। এরূপ সিদ্ধান্ত করতে গেলেই বিজ্ঞানের দ্বারা করা যাবে না। অনুমানের দ্বারা করতে হবে।

এডিংটন্ অবশ্য অন্তর-সংবিদের কথা বলেছেন। সমস্ত জ্ঞানই যে এই সংবিদকে অবলম্বন ক'রে হয়, তাতে কোন সন্দেহ নাই। "The cyclic scheme of physics presupposes a background outside the scope of its investigations. In this background we must find, first our very personality and then perhaps a greater personality. The idea of a universal mind or logos would be, I think, a freely planepibic inference from the present state of scientific theory, (The Nature of the Physical World, page 338) খুব সত্যি। এটা অন্তঃসংবিদের ভেতর বিশ্ব-চেতনার অনুপ্রবেশের কথা। বিজ্ঞান যেখানে উপস্থিত হয়েছে, সেখান হতে এরূপ একটি সম্ভাবনা অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠ হতে পারে।

আইনষ্টাইন নিউইয়র্কের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—"Behind the tireless efforts of the investigator there lurks a stronger, more mysterious drive. It is reality that we wish to comprehend···when a man is taking about scientific subjects, the little word 'I' should play no part in his expositions. But when he is talking about the purposes and aims of science, he should be permitted to speak of himself বিজ্ঞান এমন একটা জগৎ নির্ম্মাণ করতে চায়, যাতে পর্যবেক্ষিত ঘটনাসমূহের সুন্দর সন্নিবেশ হতে পারে। We are seeking for the simplest system of thought which will bind together the observed facts (আইনষ্টাইন)। বিজ্ঞানের গতি এ পর্যন্ত। অন্তর জীবন ও অন্তসংবিদ বিজ্ঞানের বাইরের। অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের (occult science) রাজ্যের কথা অন্যরূপ। কিন্তু এ অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকদের ভেতর সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। যে দৃষ্টি থাকলে অতীন্দ্রিয় বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকে সে দৃষ্টিসম্পন্ন নন। অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁরা বিশ্ব-স্পন্দনের (radiation) পিছনে একটা neutral staff স্বীকার করেন, যা জড় বা চেতন নয়। অতএব বিজ্ঞানের কাছে যে অধ্যাত্ম জগৎ ধরা পড়েছে, এ উপপত্তি সংশয়শূন্য নহে। সংস্কৃত ভাষায় বলতে হলে বলা যায়, বিজ্ঞান অধিভূত বিশ্বের সন্ধান পেলেও তার অন্তরে অনুভূত চেতনার (immanent conciousness) সন্ধান পায় নি। যাদের দৃষ্টি Panpsychism-এ প্রসারিত, তারা অধিভূত বিশ্বের অন্তরালে চেতনার সন্ধান পেয়েছেন—কিন্তু সেটা বিজ্ঞানের কথা নয়, সেটা দার্শনিকের বা মরমীদের কথা। উপনিষদের দৃষ্টিতে চেতনার সর্বত্র—অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব জগতে—অবস্থিতি আছে, কিন্তু এ দৃষ্টির রূপ অন্য। বৈজ্ঞানিক এ সত্যকে স্বীকার করবেন না—কারণ যে অনুভবশক্তিসম্পন্ন হলে এরূপ জ্ঞান সহজ হয়, তা সকলের নাই। যার এরূপ অনুভূতির বিকাশ আছে, তার কাছে এটা অতি সুস্পষ্ট। 'বিশ্বময় চেতনার' অবস্থিতি শুধু কবিত্ব নয়—এটা সত্য, স্বসংবেদ্য সত্য। এটি অন্য কোন প্রনাণকে নির্ভর করে না। একথা পরে আরও বিশদীকৃত করা যাবে। কোন বৈজ্ঞানিক যদি এরূপ চেতনাকে স্বীকার করেন, তাতে কিছু বলবার নেই—কারণ সত্যি করে তার বিষয় এ নয়। বস্তুত এডিংটন ও আইনষ্টাইনের দার্শনিক দৃষ্টি এরূপ একটি Pantheistic তত্ত্বের দিকে প্রসারিত।

বিজ্ঞানের একটি রূপই নাই। ভূত বিজ্ঞান ভিন্ন আজকাল প্রাণবিজ্ঞান-বাদীরা অনুভূত চেতনা (immanent) স্বীকার করেছেন। তারা প্রাণের আকুতির ভেতর চেতনার স্পন্দন অনুভব করেন। প্রাণ কেন্দ্রানুবর্ত্তী, কেন্দ্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত। প্রাণের অন্তরের ও বাহিরে শক্তির সমতা প্রতিষ্ঠা করে আত্ম-স্ফূরণ করবার যোগ্যতা আছে। শক্তিকে সমভাবাপন্ন করে তাকে নিজের প্রকাশে নিযুক্ত করা প্রাণের ধর্ম্ম। প্রাণের এই ক্রিয়া চেতনার পূর্ণ প্রকাশ না হলেও ইহা তার ছায়া। অন্ধ-নির্দ্দেশে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। এরূপ কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির যখন পূর্ণতর প্রকাশ হয়, তখনি আমরা মনস্তরে পৌছি, আরও পূর্ণ প্রকাশ হলে অধ্যাত্মস্তরে পৌছি। এ হতে প্রতিপন্ন হয় প্রাণবিদেরাও প্রাণ অভিব্যক্তির ধারায় চেতনার সন্ধান পাইতেছেন। হ্যালডেন প্রাণ-বিজ্ঞানে

এরূপ একটা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান দিয়েছেন, তাঁর Gifford Lecture-এ।

যাঁরা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে দর্শন রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আলেকজেণ্ডার ক্রমশ চেতনার এবং সত্য, শিব, সুন্দরের জগতের আবির্ভাবে স্বীকার করেছেন। এ স্বীকৃতির মূলে অবশ্য প্রাচীন দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নাই। এখানে ধর্ম্ম জগতের, চেতনার জগতের সন্ধান আছে, যদিও যেরূপে তাদের উপপন্ন হয়, তাহা বিচারসহ নহে। স্পেন্‌সার্‌-এর সময় হতে বৈজ্ঞানিকেরা অচেতন হতে চেতনা, অপ্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তির কথা বলেছেন। বর্ত্তমানকালে Emergent Evolution ও একথা বলে। বিভিন্ন রূপাত্মক বিশ্বে (যেমন শক্তি, প্রাণ, মন,)-এর সম্ভাবনা বিশ্বাসযোগ্য নয়, যদি সেই শক্তির অন্তরালে চেতনার কোন অনুস্যূতি না থাকে। চেতনাহীন শক্তির স্পন্দন হতে চেতনার উপপত্তি অর্থশূন্য। হতে পারে আধারের ও শক্তির স্পন্দনের তারতম্যানুসারে কোথাও চেতনার প্রকাশ হয়, কোথায় তারা প্রকাশ হয় না। তাই বলে চেতনা শক্তি নিয়ন্ত্রিত একথা বলা চলে না। বিজ্ঞান ভূমিকায় সে সব দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে, তাতে চেতনার অভিব্যক্তির ও প্রকাশের কথাটি বেশ পরিষ্কৃত হয় নেই।

এ বিষয়ে এদেশের সাংখ্যাচার্য্যের কথা সুস্পষ্ট। সাংখ্য বিজ্ঞানানুমোদিত পথ অনুসরণ করেছেন এবং পদার্থ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে প্রকৃতির বা শক্তির ক্রিয়ার পশ্চাতে এক চৈতন্যসত্তা আছে। এটা বিশ্বাসের কথা নয়, অপৌরুষেয় বেদের কথা নয় ; এটা নিত্য অনুভবসিদ্ধ—সমাধি জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত। অধিভূত বিশ্বে বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বিশ্বে যোগীরা সত্যকে অনুভব করেন সমাধি দ্বারা। অস্তিত্বের (existence) সব স্তরের জ্ঞান সমাধি দ্বারা অধিকৃত করা যায়। এটা পাতঞ্জলের সিদ্ধান্ত। আমাদের সব জ্ঞানের ভেতর থাকে—একটা অস্মিতা (আমি বোধ)। এই অস্মিতার সূত্রকে ধরে চল্‌লে ক্রমশঃ বিবেকাখ্যাতি হয়ে (আত্ম-অনাত্ম ভেদ জ্ঞান) নিত্য চেতনার জ্ঞান হয়। যাকে বলা হয় পুরুষ তত্ত্ব।

এই অস্মিতা জ্ঞানের স্বরূপ চিত্ত সত্ত্ব, প্রধান না হলে পরিষ্কার হয় না। সাধারণতঃ "আমি" জ্ঞান বেশ সুস্পষ্ট নয়, 'আমি'র ভেতর যে বৃত্তি জ্ঞানগুলি (psychoses) সদা সর্ব্বদাই উত্থিত হয়, আমাদের দৃষ্টি সেখানেই থাকে বদ্ধ। "আমি" মাত্র বৃত্তি আমাদের জ্ঞানে অস্মিতা সমাধিতে স্ফূর্ত্ত। অস্মিতা মাত্র বোধে ক্রিয়াশীলতা অতি অল্প, প্রকাশ ভাব অত্যধিক। এই জন্য এই অস্মিতাকে স্থির সত্তা বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা পূর্ণ স্থির সত্তা নয়—কথঞ্চিৎ স্থির একটি বৃত্তি জ্ঞান। এই জন্য ইহারও বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া পুরুষ সত্তা নিশ্চয় করাই বিবেক খ্যাতি। অস্মিতা বৃত্তি ও আমার স্বরূপ নয়। কার্য্যতঃ যেমন আমার স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশিত হয় তাই। ক্রিয়াত্মক আত্মার (actual self) সঙ্গে একে এক করা হয় ত ভুল হবে, কারণ ইহার প্রতীতি স্থির সত্তার মত হয়। কিন্তু একটা স্থিতির ভাব থাকলেও ইহা কিন্তু স্থিতিরূপ নয়। ইহার উর্দ্ধে পুরুষই স্থিতিস্বরূপ বৃত্তিহীন চেতনা।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বিশ্লেষণের দ্বারা এই তত্ত্ব স্থাপিত করেন। এরূপ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান। সমাধি লব্ধ বলে তাকে পরিত্যাগ করা যায় না। সমাধি subjective নয়। ইহা trans-subjective, কল্পনা নয়, স্বেচ্ছা-মূলক ধারণা নয়। সমাধি সিদ্ধ সকলেরই নিকট ইহা সুপরিচিত হতে পারে। সমাধিলব্ধ বিষয়কে এজন্য তত্ত্ব বলা হয়েছে।

সাংখ্যের সিদ্ধান্তে প্রকৃতি (অর্থাৎ শক্তি) ও পুরুষ দুটি তত্ত্ব থেকে যায়। প্রকৃতি প্রসব ধর্ম্মী, ভোগ ও মোক্ষদায়ক। বস্তুত শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণ দুইটি ক্রিয়া আছে। ভোগ ও মুক্তি শক্তিরই ক্রিয়া। পুরুষ চিতি স্বরূপ, ভোগ ও মোক্ষ বর্জ্জিত, কেবল স্বস্বরূপে অবস্থিত। স্পন্দনের অতীত এরূপ পুরুষের অনুসন্ধানই হয়েছে পরম কাম্য—কারণ সাংখ্যের দৃষ্টিতে ক্রিয়াত্মক বা স্পন্দনাত্মক বিশ্বে মানুষের চেষ্টা প্রাপ্তির দিকে, কিন্তু কেন্দ্রসত্তা প্রাপ্তির অতীত। ক্রিয়ার ভেতর সংকোচ ও বিকাশ থাকে—এ জন্যই উদার অবস্থিতির সহিত পরিচয় হয় না। সংকোচ বিকাশের অতীত যে তত্ত্ব, তাই পরম তত্ত্ব, তার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই—স্বরূপচ্যুতি নাই। এ পুরুষ তত্ত্ব, অতীন্দ্রিয় সত্তা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি স্বরূপ।

শৈব দর্শনে শক্তি শিবে আশ্রিত। শিবে নিত্য অনুস্যূত। শিবের প্রকাশ ধর্ম্মই শক্তি। শক্তিতে জ্ঞান,

ইচ্ছা, ক্রিয়া, আনন্দের প্রকাশ। সৃজন শক্তিই একমাত্র শক্তি নয়। প্রকৃতির ওপরে শক্তির নানা প্রকাশ আছে যে প্রকাশগুলি বিশ্বস্থ, বিশ্বাতীত (cosmic এবং supra-cosmic)। এই শক্তিরই সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর পরিচয় পাই মহাশক্তিতে ও পরাশক্তিতে। তত্ত্ব শিব-শক্তি-স্বরূপ। শক্তি কখনই পরম শিব-রূপ তত্ত্ব ভিন্ন থাকেনা। শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত, কোন নিয়ামকতা নাই। স্বতস্ফূর্ত্ত বলে তার স্বরূপ স্বাধীন, indeterorminate। তার প্রকাশ সোপাধিক ও উচ্চতম স্তরে নিরুপাধিক। নিরুপাধিক প্রকাশ মূর্ত্ত নয়—অমূর্ত্ত। সোপাধিক প্রকাশ মূর্ত্ত, শক্তির পুঞ্জীভূত বিকাশ।

এখানে দর্শনীয় হচ্ছে এই শৈব দর্শনে—শক্তির পশ্চাতে একটি তত্ত্বের অনুসন্ধান আছে—সেটা জ্ঞানস্বরূপতা। সৃজনাত্মক, স্পন্দনাত্মক ও নিস্পন্দনাত্মক অবস্থাগুলি শক্তির স্ফূর্ত্তি বিশেষ; কিন্তু এর মূলে থাকে শিব, যা' স্পন্দন, নিস্পন্দনের অতীততত্ত্ব। শিবতত্ত্ব শক্তির সর্ব ভূমিকাকে অন্তঃস্থ করে নিত্য বিদ্যমান।

প্রধান হিন্দু দর্শনগুলিতে শক্তির অতীত এরূপ জ্ঞান স্বরূপ তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞান নিত্য পদার্থ। অবশ্য এখানে জ্ঞান শব্দ সাধারণ জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এ জ্ঞতত্ত্ব (Being) পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানানুমোদিত জ্ঞান মীমাংসায় বিশ্বময় নিত্য জ্ঞান সত্তার সহিত পরিচিত হই না। বর্ত্তমানে কতকগুলি পাশ্চাত্য দার্শনিক—যাদের প্রধান কাজ হয়েছে বিজ্ঞানের সহিত সুর মিলিয়ে চলা, তারা অভিব্যক্তি ধারায় কোন স্তরবিশেষে চেতনার প্রকাশ স্বীকার করেন। এখানে বেদান্ত, সাংখ্য, শৈবদর্শনের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট—তারা নিত্য চেতনাবাদী। চেতনার স্তর বিশেষে স্ফূর্ত্তির হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু তাই বলে চেতনা জড়ের অভিব্যক্তি এ কথা স্বীকার করা যায় না।

কথা হচ্ছে এই, দর্শনে দুটি দৃষ্টি আছে—একটি অন্তঃকেন্দ্রীভূত দৃষ্টি, আর একটি বহিঃ কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি। প্রথমটিতে অন্তর অনুভূতি নিয়ে তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করি, দ্বিতীয়টিতে বাহিরের অভিজ্ঞতা হতে একটা কিছু গড়ে তুলি। কিন্তু বাহিরের বিশ্ব অন্তরানুভবে প্রকাশিত। এই আত্মানুভবকে বাদ দিলে বহির্বিশ্বের কোন সংবাদ পাইনা। বহির্বিশ্বের স্পন্দন অন্তরদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। সে কখনই সাক্ষী অন্তরসৃষ্টি করতে পারে না। সেটা স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষ ও অনুভব সিদ্ধ। মানুষের ভেতর শুধু স্থির জ্ঞানের নয়, একটি অপরোক্ষ জ্ঞানের স্পৃহা আছে। সেই জ্ঞান অনিশ্চিতের মধ্যে নিশ্চিতের সন্ধান পৌছিয়ে দেয়। মানুষের মন বিচারানুগত তথ্যকে স্বীকার করলেও তার ভেতর স্থির, নিশ্চিত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আর কিছু অনুসন্ধান করে; যাকে বলা যেতে পারে, সম্যক দর্শন। এ কাজটা বুদ্ধির নয়, বোধির। এই স্থির বিজ্ঞানের আস্পৃহা স্বভাবে আছে বলেই সুধু পর্য্যবেক্ষণ, ন্যায়ানুগত মনন, সত্যের অনুসন্ধানীকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এরূপ অপোরক্ষ জ্ঞানের দিকে দর্শন আকৃষ্ট হচ্ছে। এ জ্ঞান মনন ধর্ম্মের নিয়ামকতা হতে মুক্তি।

অপরোক্ষ জ্ঞান নানা স্তরে সন্নিবেশিত। অতীন্দ্রিয় পদার্থের সূক্ষ্ম রূপ, কারণরূপ, কারণাতীত রূপ আছে। তার সব রূপের সহিত পরিচিত হবার জন্য নানাবিধ অপোরক্ষের অবতারণা। যাদের বোধি শক্তি সুতীক্ষ্ণ, তারা সূক্ষ্ম, কারণ ও কারণাতীত ভূমিকায় জ্ঞান লাভ করেন। এরূপ বৃত্তিসম্পন্ন পুরুষের জ্ঞানে যে জগৎ উদ্ভাসিত, তা সর্ব্বত্র প্রকাশিত নয়। যে বৃত্তি থাকলে, সেরূপ জ্ঞান হয়, সেরূপ বৃত্তির অভাব সেখানে আছে। দার্শনিকেরা এরূপ জ্ঞান স্বীকার করেন; জ্ঞানের বিচার যেরূপ হক না কেন, জ্ঞানের প্রাথমিক স্ফুরণ এরূপ অনুভূতিতে।

অনুভূতির স্তর বিশেষে এক একটা জগৎ আছে। যেমন প্রাণের স্তরে যে অনুভব প্রাণের সূক্ষ্ম রূপের পরিচয় দেয়, তাহা কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যের পরিচয় দিতে পারে না। এইরূপে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ ইত্যাদি জগতের অনুভূতি বিশেষ স্বীকার করতে হয়। অনুভূতি হলেই যে সব সময় তার সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি হবে, একথা নিসন্দেহে বলা যায় না। এজন্যই দেখতে পাওয়া যায় অনুভবকে (intuition) অবলম্বন করেও নানাবিধ তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে। সুখের বিষয় অনেকেই, বৈজ্ঞানিকেরাও, অনুভূতিকে মেনে নিচ্ছেন—ম্যাক্স প্লাঙ্ক prophetic faithর কথা বলেছেন। অন্তর সংবেদ হয় কোন বিরাট সৃষ্টির কারণ, কি কর্ম্মজগতে, কি ধর্ম্মজগতে, কি জ্ঞান বিজ্ঞান জগতে। অনুভূতিতে হয় অন্তরে অপার্থিবের অনুপ্রবেশ (divine ingress)। কথাটি অতীন্দ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্তসত্ত্বার স্তরে স্তরে এইরূপ অনুভবের অনুপ্রবেশ হ'লে

নানাবিধ জ্ঞানলাভ করি। বাহ্যজগতের সুগভীর তত্ত্বগুলি এইরূপ অনুভবসিদ্ধ। অতীন্দ্রিয়কে পাবার আর কোনও পথ নাই। আমাদের অনুভূতি যতই উৎকর্ষ লাভ করুক না কেন তার সমষ্টিগত জ্ঞান দেবার পূর্ণ ক্ষমতা নেই। মানুষী অনুভব শক্তির সীমা আছে। সীমা থাকলেও অনুভবের দ্বারাই বিরাটের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিরাটের সঙ্গে সংযোগসূত্র না থাকলে জ্ঞান মানুষ-অনুভবের সীমাতেই বদ্ধ থাকত, তাকে অতিক্রম করতে পারত না। এইরূপ বিরাট অনুভূতিতেই মানুষের কাছে জ্ঞানের আর একটি রূপ উদ্ভুত হয়। এখানেই সীমাহীন চেতনার স্ফুর্ত্তি। বিশ্ববিজ্ঞান এইরূপ বিশ্ব অনুভূতিতেই উত্থিত ও প্রকাশিত। মানস অনুভূতির অতীত এই অতিমানস অনুভূতি। এইরূপ অনুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'লে বুঝতে পারি এরূপ জ্ঞান নিত্য, স্থির, অপৌরুষেয়। এখানে সনাতন সন্ততির সহিত সম্যক পরিচয়। এরূপ জ্ঞানই বেদবিজ্ঞান বা Revelation। সত্তার গভীর স্তরে এরূপ জ্ঞানের জন্য একটি নিয়ত সূক্ষ্ম আকর্ষণ আছে।

বেদ বিজ্ঞানের সহিত অনুভূতির পার্থক্য আছে। দার্শনিকের অনুভূতিকে স্বীকার করলেও বেদ বিজ্ঞান স্বীকার করেন না। অনুভূতি স্বসংবেদ্য, আমাদের চেতনাতেই প্রতিষ্ঠিত—তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু বেদবিজ্ঞানের অস্বীকৃতির কারণ হয়, আমাদের বুদ্ধির সম্যক উন্মেষের অভাব। কিন্তু তার পরিচিতি সুস্পষ্ট নয় বলেই তার মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

বেদবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান। তাহাই দেয় আমাদের বিশ্বদৃষ্টি এবং প্রকৃত সত্যদৃষ্টি কেননা তাহার কখনও বাধ হয় না। অনুভূতি বিশেষ আমাদের সত্তার কোনও পর্য্যায়ের অনুসন্ধান দেয়, বেদজ্ঞান কিন্তু সমষ্টিগত সত্ত্বার পরিচয় দেয়। সাধারণ অনুভব শক্তির এত উর্দ্ধে এর স্থান যে সব সময় ইহা প্রকাশিত হয় না। যখন প্রকাশ হয় তখন ইহার ব্যাপকতা, বিশালতা, অপৌরুষেয়তা উদ্ভাসিত হয়। মীমাংসকের দৃষ্টিতে এ জ্ঞান নিত্য, যেহেতু ইহা বিশ্বের মূলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। মানুষের অনুভবিক জ্ঞান যখন বিরাট বিজ্ঞানের সহিত সহজ সংযোগসূত্র পায়, তখনই বেদ-বিজ্ঞানের পরিচয়। এরূপ জ্ঞানধারা গ্রহণ করবার একটি বিশেষ যোগ্যতা আবশ্যক। যে সূক্ষ্ম জ্ঞানধারা চিদাকাশে স্বতই উদ্ভাসিত, তাহাই সত্যিকার বেদ।

বিচার ও অনুভূতি শীর্ষস্থানে আরোহণ করলেও বেদ-বিজ্ঞানের রূপ নিতে পারে না। আচার্য্য শঙ্কর তাই শিষ্টবাক্যকে শ্রুতি ধারা হ'তে বিভিন্ন করেছেন। অনুভূতির স্তর-বিশেষ অতিক্রম করলে এরূপ জ্ঞানের স্ফুর্ত্তি। অন্তরে উৎসারিত এরূপ জ্ঞান কাল্পনিক (imaginary or subjective) নয়। তাহলে অনুভবিক জ্ঞান মাত্রই কাল্পনিক হত। বুদ্ধিসত্ত্ব যখন রজস্তমো দ্বারা অনভিভূত, তখন একটা স্বচ্ছ স্থিতিপ্রবাহ হয়। একে যোগশাস্ত্রে বৈশারদ্য বলা হয়। এরূপ বৈশারদ্য হলে যুগপৎসর্ব্বার্থভাসক, ভূতবস্তু বিষয়ক জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে অতিসুন্দর ভাবে একথা বলা হয়েছে। "যদা নির্বিচারস্য সমাধের্বৈশারদ্যমিদং জায়তে, তদা যোগিনো ভবত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুট-প্রজ্ঞালোকঃ। ধ্যানের গভীরতায় অতিমানস স্তরে এরূপ প্রজ্ঞালোকের অনুপ্রবেশ হয়। ইহা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আশ্রয়। এরূপ জ্ঞান ভাববিলাস নয়।

বেদের প্রমাণ নিয়ে প্রাচীনেরা অনেক কথার অবতারণা করেছেন। পরমার্থতত্ত্বে বেদের প্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্র প্রত্যক্ষ ও বেদের প্রামাণ্য তুলনা করে বলেছেন লৌকিক জগতে প্রত্যক্ষের প্রমাণ গ্রহণীয়, কিন্তু অলৌকিক অদৃশ্য তত্ত্বে বেদের প্রমাণ স্বীকার্য্য। * প্রত্যক্ষের তাত্ত্বিকত্বই বেদে অস্বীকৃত হয়। যে তত্ত্ব আমাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয় অতীন্দ্রিয়, সেখানে বিচার ও যুক্তি হতে বেদ প্রমাণ শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাতে কোন দোষ নাই এবং তাহা অপৌরুষেয়। † অলৌকিকতত্ত্বে স্থির ও অসংশয় জ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা হয়না, অনুমান বা মননের দ্বারা হয় না। এই জন্যই প্রাচীনেরা বেদ-বিজ্ঞানে অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। কথা উঠ্‌ছে এরূপ জ্ঞানের প্রমাণ কোথায়? কথাটির বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। জ্ঞানের স্বরূপই স্বপ্রকাশ। আমার জ্ঞানে যে 'আমি'র বোধ এর প্রমাণ আমার জ্ঞানই। এর জন্য কোন বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা করেনা। জ্ঞান অতিরিক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য নির্ভর করে বিষয়ের সঙ্গতির ওপর। কিন্তু জ্ঞানই যেখানে

---

* নহ্যামপজ্ঞানং মাং ব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি, যেন কারণাভাবান্নভবেৎ, অপিতু তাত্ত্বিকম্। (ভামতী)

† তস্য অপৌরুষেয়া নিরস্ত সমস্ত দোষাশঙ্কস্য সেবিতত্ত্বয়া স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণভাবস্য স্বকার্য্যে প্রমিতাধনপেক্ষধাৎ। (ভামতী)

তত্ব, তার প্রমাণ আর কিছুর ওপর নির্ভর করে না। যেখানে অলৌকিক জ্ঞানে বিষয়ের অবভাসকতা থাকে, যেখানে বিষয়ের সঙ্গতি প্রমাণ প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় করবে।

বেদ-প্রমাণের কথা বলতে গিয়ে শব্দের অবতারণা করতে হয়। বেদ-প্রমাণ শব্দ-প্রমাণ। বেদের স্বরূপ শব্দ। বেদ শব্দ-সমষ্টি ৷ •(Revealed word) শব্দ ও অর্থের ভেতর (meaning and object) একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। শব্দ কোন না কোন অর্থের দ্যোতনশীল। শব্দের নানা স্তর আছে। শব্দ শাস্ত্র বলে থাকে—শব্দতরঙ্গের অন্তর্হিত সূক্ষ্ম ভাব আছে। অনাহত শব্দে গভীর জ্ঞানের প্রকাশ। যেখানে শব্দ বা বাক পরা বা পশ্যন্তী, সেখানে অনুপ্রবেশ লাভ করতে পারলে অতীন্দ্রিয় (super-sensuous) শব্দের জ্ঞান হয়। এরূপ শব্দ অলৌকিক জ্ঞানের আশ্রয়। এটি ঠিক স্থূল শ্রবণগোচর নয়—কিন্তু অতিমানসের প্রত্যক্ষ। এরূপ শাব্দিক প্রকাশ অনাদি। আজিও যদি কেহ চেষ্টা করেন, এরূপ অতীন্দ্রিয় শব্দের প্রকাশ অনুভব করতে পারবেন—যে অনুভব প্রত্যক্ষের চেয়েও সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ মানুষের অলৌকিক শ্রুতি, অলৌকিক দর্শন—অলৌলিক দিব্য সংবিদ আছে। এরূপ জ্ঞান যাদের কাছে প্রকাশিত, তাদের পক্ষে ইহা এত অবিসংবাদী যে, এর সম্বন্ধে সংশয়ের কথা উঠতে পারে না। এরূপ স্তরে জ্ঞানের এমনি বিস্তৃতি ও সূক্ষ্ম বিকাশ হয় যে অন্যত্র তা সুদুর্লভ। ধর্ম্ম মাত্রই এরূপ অলৌকিক জ্ঞানের কথা বলে, তার কারণ অন্যান্য জ্ঞানের চেয়ে এখানে সূক্ষ্মতত্ত্বের স্ফুরণ অধিকতর। এ জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মকে নিয়ে একটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের (occult) অবতারণা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ও জৈন সিদ্ধান্ত বেদ-প্রমাণ গ্রহণ করেনি সত্য। কিন্তু অলৌকিক জ্ঞান তাহারা স্বীকার করেন। জৈনেরা কেবল জ্ঞান ও কেবল দর্শনের কথা বলছেন। মানবের অভিব্যক্তি যখন তীর্থঙ্কর ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অলোকাকাশ উদ্ভাসিত হয়; কেবল জ্ঞান ও কেবল দর্শন সিদ্ধ হয়; তখন তাহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেবের জীবনে অনেক ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য অলৌকিক জ্ঞানের কথা ইতিহাস-সিদ্ধ। The Lotus of the Wonderful Law গ্রন্থে (আমাদের দেশের গীতার ন্যায় এ গ্রন্থ চীনদেশে আদৃত) দেখতে পাই—বোধিসত্ত্বের অলৌকিক বিজ্ঞানের বিস্তৃতি কত দূর। এসব জ্ঞানের কথার কোন স্থান দিই না বা বিশ্বাস করি না, তার কারণ অন্তরের সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় দর্শনের ক্ষমতা না হলে এদের শক্তি ও ব্যাপ্তি অনুধাবন করিতে পারিনা। নির্ব্বাণ বোধিসত্ত্বের পরম লক্ষ্য হলেও তার সাধনার পথে কত অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের লাভ হয়েছিল, কত না ঋদ্ধি ও সিদ্ধির আশ্রয় হয়েছিলেন তিনি।

চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে এই অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয়। ধাতু শুদ্ধির সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জগতের উন্মেষ। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরা বেদ না মানলেও, জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষের কথাকে বেদের সমান স্থান দিয়েছেন। এরূপ লোকোত্তর পুরুষের অনুভূতিগুলি মানব জীবনের পথে অলোক সম্পাত করে। যদি এরূপ লোকোত্তর পুরুষবিশেষের কথা অনুধাবনযোগ্য হয়, তবে যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যাঁর জ্ঞান কখনও অজ্ঞানাবৃত হয় না, যিনি সর্ব্বত্র স্থিত—সকলের হৃদয়ে অন্তর্যামী, যিনি যে জ্ঞানের প্রকাশ করেন, তাহা অনাদৃত হবে কেন? হতে পারে ঐতিহাসিক কোন পুরুষবিশেষের জ্ঞানের গভীর প্রকাশ মুগ্ধ করে এবং সেখান হতে জ্ঞানগুলি পাওয়া সহজ। সহজ হলেও কিন্তু তাদের সব কথাই কি মানুষ বোঝে। বোধিসত্ত্বের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে ধারণা কি সুস্পষ্ট? অন্ততঃ বৌদ্ধাচার্য্যদের ভেতর এ দিয়ে কত মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। লোকোত্তর পুরুষবিশেষের উপদেশ বরণীয় হলে অনাদি সিদ্ধ পুরুষ বিশেষ হতে প্রাপ্ত জ্ঞানরাশি কেন কল্যাণের কারণ না হবে। অদৃশ্য হলেই পদার্থের অনুপপত্তি হয় না। কিন্তু যে শক্তি ও সত্বশুদ্ধি থাকলে এরূপ বিরাট সত্তায় ও বিজ্ঞানের পরিচয়, তা নাই বলে আমাদের চিত্ত সংশয়াচ্ছন্ন। কিন্তু মানব জগতে অপার্থিব জ্ঞান মাত্র এরূপ শক্তি ও শুদ্ধি সাপেক্ষ। এরূপ জ্ঞানই মানুষের চরম কাম্য, এখানে মানুষ পায় তার হীনতা হতে মুক্তি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কবে কোন্ শুভক্ষণে রসতীর্থ বৃন্দাবনে
মহাব্রতে হ'লে তুমি বৃত,
গৌরলীলা দুগ্ধসিন্ধু মথিয়া জাগালে ইন্দু
বিলাইলে তাহার অমৃত।
ভবরোগে সঞ্জীবন সে যে দিব্যরসায়ন
তার লাগি কোটি হস্ত পাতা,
কবিরাজ তুমি ছাড়া— কার কাছে যাবে তারা ?
এ আর্ত্তজগতে তুমি ত্রাতা।
জরাতুর তেজোহীন দৃষ্টি শ্রুতি শক্তি ক্ষীণ,
স্মৃতিভ্রংশ হ'তো ক্ষণে ক্ষণে,
পাইতে কতই ব্যথা জুটিত না যোগ্য কথা
পরম্পরা পড়িত না মনে,
লিখিতে কাঁপিত কর তবু তুমি অকাতর
দেব আজ্ঞা করেছ পালন,
জানিনা সে শক্তি কি যে, বিস্মিত তুমিই নিজে
হলো কিসে অসাধ্য সাধন।
পারনিক মিল দিতে ভাবে শব্দ জুটাইতে
ছন্দ তাই পঙ্গু হ'য়ে চলে,
হিয়ার আকৃতি তব ধরিয়াছে রূপ নব
কেহ গদ্য, কেহ পদ্য বলে।
তোমার প্রাণের বাণী কোন রীতি নাহি মানি
চলে তাই আলু-থালু হেন।
শুনিয়া বাঁশীর স্বর সাজিবার অবসর
পায়নিক শ্রীরাধিকা যেন।
পঙ্গুপদে ধীরি ধীরি লঙ্ঘিয়া কালের গিরি
আসিয়াছে তব পুণ্যবাণী,
অন্নদা ভারতী বেশে দেখায় ছলিতে এসে
ধরা প'ড়ে, নিজ মূর্ত্তিখানি।
ফুরায়ে আসিছে দিন শোধিতে যে হবে ঋণ,
বিলম্ব যে হ'লো অসহন।

'অঞ্জলি ভরিয়া সবি নির্বিচারে দিলে কবি,
কোথা ছন্দো-যতির শাসন ?
অবশ কম্পিত হাতে দিলে যা কলার পাতে,
নহে তাহা ভোগের বৈভব,
দিলে যে প্রীতির সাথে সুরভিত পারিজাতে
গোবিন্দের প্রসাদ দুর্লভ।
এ ধন যাদের তরে তাহারা মাথার 'পরে
ধরিয়া রয়েছে কবিবর,
কত কাব্য কত গীতি বন্দনা গাহিছে নিতি,
এর ঠাঁই সবার উপর।
ব্রজে মাধুকরী করি' বিন্দু বিন্দু মধু হরি'
মধুচক্র করেছ গঠন,
আনন্দে করিছে পান তোমার স্বর্গীয় দান,
গৌরভক্ত যত গৌড়জন।
তৃণগুচ্ছ দন্তে ধ'রে গলবস্ত্রে করযোড়ে
রসক্ষেত্রে প্রবেশ তোমার,
তোমার জীবনখানি জীবন্ত চৈতন্য বাণী,
দীনতার তুমি অবতার।
যা কিছু লিখেছ কবি 'শুকের পঠন' সবি
বলিয়াছ তুমি আত্মহারা,
বিনয়ে বলেছ যাহা বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা,
শুকদেব কে বা তুমি ছাড়া ?
গলাইলে এ পাষাণ মূঢ় পাষণ্ডের প্রাণ
তিতাইলে অশ্রুর সলিলে
ইহা হ'তে অনুমানি ভক্তের প্রাণে না জানি
কি রসপাথার বিথারিলে।
করিয়াছ শান্তিময় ছায়াদানে নিরাশ্রয়
তাপদগ্ধ এ সংসার মরু,
আমি মূল্য কিবা জানি তোমার ও গ্রন্থখানি
ভক্তজন বাঞ্ছাকল্পতরু।

তব গ্রন্থ হাতে করি বার বার শুধু স্মরি
শ্রীগোপাল মন্দিরের ছবি।
করযোড়ে আছ বসি শ্রীমাল্য পড়িল খসি—
দেবের আশিস পেলে কবি।

স্মরিতে হৃদয় টুটে স্বপ্নে যেন ভেসে উঠে
আর এক চিত্র এ নয়নে,
তুমি রাধাকুণ্ড তীরে গুরুপদ ধরি শিরে
শুয়ে আছ অন্তিম শযনে।

তোমার সর্ব্বস্ব ধন লুটিয়াছে দস্যুগণ
গৌড় হ'তে এসেছে বারতা,
এ বারতা বিষবাণ হরিল তোমার প্রাণ,
পেয়ে গেলে শরশয্যা ব্যথা।

মুখে তব অবিরাম শুধু রাধাকৃষ্ণ নাম,
কণ্ঠে তব হরিনাম ঝুলি।
সর্ব্বাঙ্গে নামের মালা জুড়াল সকল জ্বালা—
বৈকুণ্ঠের দ্বার গেল খুলি।

সমস্ত জীবন মথি যে সুধা লভিলে যতি
গ্রন্থ-পুটে করিলে সঞ্চিত,
তোমারি সাধনা বলে তোমারি তপের ফলে
সে সুধায় হইনি বঞ্চিত।

জানি তাহা গেলে না যে এ বেদনা বুকে বাজে,
অশ্রুজলে হারাই আঁখর,
শুনিলে আশ্বস্ত হ'তে গ্রন্থ তব ভক্তি-পোতে
তরাইল আপন তস্কর।*

'ভেক জিহ্বাসম' পাঁকে এ রসনা বৃথা ডাকে,
কৃষ্ণনামে নাহি তার রুচি,
'কাণাকড়ি ছিদ্রসম' এই কর্ণযুগ মম
কুবচনে সদাই অশুচি।

বৈষ্ণবের দাস নহি মায়া-পাশে বদ্ধ রহি
ভক্ত নই করি না ভজন,
তবু উহা বুকে ধরি কত দিবা-বিভাবরী
ভাব-ঘোরে করেছি যাপন।

তবু উহা ভালবাসি অশ্রুর পাথারে ভাসি
তার মাঝে সন্তরে অক্ষর।
কোন্ সুদূরের স্মৃতি অই অশ্রুজলে তিতি
উদাসীন করে এ অন্তর।

সে স্মৃতি প্রত্যেক শ্লোকে বিঁধে এ মনের চোখে
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার মত,
কমল-কোরক অঙ্গে গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে
দংশে যেন শত মধুব্রত।

ছিন্ন করে সব ডোর তাপিত অন্তরে মোর
অমৃতের তুলিকা বুলায়।
ইহার পরশে মন রচি নব বৃন্দাবন
লুটে পড়ে তাহার ধূলায়।

সূত্রাকারে তব বাণী মলয়জ কাষ্ঠখানি
কঠিন বলিয়া মানি তায়,
এ পাষাণ চিত্তে যত ঘষি তায় অবিরত,
সৌরভে জীবন ভরি যায়।

জটিল বাক্যের বনে রসফল অন্বেষণে
ক্লিষ্ট হয় এ মন উন্মুখ,
সে ক্লেশে না গণি কবি, চরিতার্থ হই লভি
'তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের সুখ'।

---

* নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসোক্ত উপাখ্যান। তস্কর—বীর হাম্বীর, বিষ্ণুপুরের রাজা।

মিটমাট

শ্রীযামিনীমোহন কর

চরিত্র

বৃদ্ধ
বালক
যুবক—(শ্রীবিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়)
সাব-ইন্সপেক্টর—(শ্রীবলেন্দ্রচন্দ্র চন্দ)
ইন্সপেক্টর—(শ্রীমহাদেব মল্লিক)
তাঁর বন্ধু—(শ্রীপঞ্চানন পাল)
তরুণী—(শ্রীমালতী মিত্র)
ডাক্তার—(শ্রীবিভাস বসু)
তাঁর পিতা—(শ্রীসনৎ বসু)
ডিটেক্‌টিভ—(শ্রীহারীতকৃষ্ণ সোম)
তাঁর বন্ধু—(শ্রীসুদর্শন দেব)
তাঁদের সহকারী—(শ্রীনবদ্বীপ ঢোল)
হারাণো ছেলে—(তুষার)
তার পিতা—(শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ)
হারাণো গরুর মালিক—(শ্রীমুরলীধর মহাপাত্র)
কয়েকজন পুলিশ, "মেয়ে হাসপাতালের" কয়েকটি নার্স, লেক-বস্তীর একটি বৃদ্ধ ও মেয়ে, ভৃত্য মাতাল, পকেট-মার ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লেকের ধারে এক বেঞ্চিতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক লাঠির উপর ভর দিয়ে বসে, দেখে মনে হয় যেন ঘুমুচ্ছে। এমন সময় বছর পনোরর একটি বালক এল। বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে গিয়ে—

বালক। এই বেঞ্চিটায় একটু বসতে পারি কি ?

বৃদ্ধ। (তাকিয়ে)—না পারার তো কোন কারণ দেখি না।

বালক। (বসে) ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিলুম না তো ?

বৃদ্ধ। দিলেই বা উপায় কি ? এতো আমার ঠাকুরদাদার সম্পত্তি নয় যে আমি ছাড়া আর কেউ এখানে বসতে পারবে না।

বালক। আজকে যেন একটু ঠাণ্ডা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে না ?

বৃদ্ধ। মনে হয় তো বাড়ী ফিরে যাও, এত সকালে বেরিয়েছ কেন ?

বালক। বাড়ী ফিরে যাব! কি বলছেন আপনি ? কেন এত ভোরে বেরিয়েছি জানেন ?

বৃদ্ধ। জানবার কোন আগ্রহ নেই।

বালক। তবু আপনাকে শুনতে হবে।

বৃদ্ধ। তবে বল। কালা তো নই, শুনতে পাবই।

বালক। আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। জানেন, কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে এসেছি।

বৃদ্ধ। বেশ করেছ। এবার এখান থেকেও দয়া ক'রে পালিয়ে যাও। একটু চুপ ক'রে আমাকে বসে থাকতে দাও।

বালক। আমি নিজে উপার্জ্জন করব, স্বাধীন হব, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াব।

বৃদ্ধ। যত ইচ্ছে দাঁড়াও। (ভালো ক'রে দেখে) বলি ছোকরা, তোমার বয়স কত ?

বালক। পনেরো। তিন বার ফোর্থ ক্লাসে ফেল করলে যে বড় হওয়া যায় না তা আমি বিশ্বাস করি না। আমি দেখিয়ে দেব যে ফোর্থ ক্লাস ফেল ছেলেও দশের একজন হয়ে উঠতে পারে। আমেরিকায় –

বৃদ্ধ। ওসব বই-পড়া বিদ্যায় সংসার চলে না। খাবে কি ?

বালক। খেটে খাব। একটা না একটা কাজ জুটে যাবেই।

বৃদ্ধ। গেলেই ভাল। তবে যাবে বলে মনে হয় না। এম-এ, বি-এ পাস ক'রে ছেলেরা দশ টাকার পিওনের কাজ কাজ পায় না। বাড়ী ফিরে যাও।

বালক। কিন্তু বাড়ী ফিরে গেলে বাবা কি আর আমায় আস্ত রাখবে। তার উপর মা—অবশ্য সে আমার মা নয়—

বৃদ্ধ। মানে ?

বালক। সৎমা। আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তার জন্যই আমি পালিয়ে এসেছি। এতবড় হয়েছি এখনও আমায় যখন তখন মারে।

বৃদ্ধ। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় না খেতে পেয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে দু-এক ঘা মার খাওয়াও ভাল। বাড়ীতে তবু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে।

বালক। এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিছুদিন পরে যখন বাবা নিরুদ্দেশ কলমে আমাকে ফিরে আসতে বলবে, লিখবে—"ফিরে আয় বাবা, আমি আর কিছু বলব না, তোর মা তোকে আর মারবে না" তখন আমি ফিরবো।

বৃদ্ধ। তুমি কি মনে কর ফিরে গেলে তোমায় ওরা আদর যত্ন করবে ?

বালক। তাই লিখলে তবে যাব।

বৃদ্ধ। লেখে তাই সকলে, কিন্তু করে না কেউ। ফিরে গেলে প্রথমেই উত্তম মধ্যম দেয়।

বালক। (হতাশভাবে) তা হ'লে কি করব ?

বৃদ্ধ। এখুনি বাড়ী ফিরে যাও। শাস্তিটা অনেক কম হতে পারে।

বালক। না, আমি যাব না। আমি খেটেই খাব।

বৃদ্ধ। কি কাজ জান ?

বালক। তাতে কি ? শিখে নেব। বইয়ে লেখা আছে উচ্চ আশা থাকলে মানুষ উন্নতি করবেই।

বৃদ্ধ। তোমার কপালে বিলক্ষণ দুঃখ আছে।

বালক। কেন ?

বৃদ্ধ। জানি না। এইবার হয় চুপ ক'রে বস, না হয় সরে পড়। আমাকে একটু চুপ ক'রে বসে থাকতে দাও।

বালক। আমার চুপ ক'রে বসে থাকবার সময় নেই। আমি চল্লুম।

বালকের প্রস্থান

বৃদ্ধ। বাঁচলুম।

ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল
একজন শীর্ণকায় যুবক এসে বেঞ্চিটার কাছে গেল

যুবক। আমি এই বেঞ্চিটায় বসলে আপনার কোন আপত্তি আছে কি ?

বৃদ্ধ। থাকলেই বা তোমরা শুনবে কেন ? ভোরবেলায় নির্জ্জনে একটু চুপ ক'রে বসব তাও দেখছি তোমাদের জ্বালায় হবে না।

যুবক। কিছু মনে করবেন না—

বৃদ্ধ। নিশ্চয়ই না—তোমারও কি নিজের জীবনী শোনাবার ইচ্ছে আছে ?

যুবক। আজ্ঞে না। কেন, কেউ এসে আপনাকে বিরক্ত করেছিল বুঝি ?

বৃদ্ধ। একটা বালক—পনেরো বছরের ছেলে—এই একটু আগে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গেল। যত সব পাগলদের নিয়ে—

যুবক। আমি কবিতা লিখি।

বৃদ্ধ। কি সর্ব্বনাশ !

উঠিবার উপক্রম

যুবক। আমার উষা সম্বন্ধে বর্ণনা লেখবার ইচ্ছে আছে বলে আজ ভোরে বেরিয়েছি।

বৃদ্ধ। কিন্তু কোন দরকার নেই।

যুবক। কেন ?

বৃদ্ধ। কারণ, তোমার আগে কেউ-না-কেউ এ বিষয়ে লিখেছে, আর হয়ত ভালই লিখেছে। তা ছাড়া, কেউ কবিতা লিখবে শুনলে আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করি।

যুবক। বাঁচাবার। কিসের থেকে ?

বৃদ্ধ। পুলিশের হাত থেকে, অনাহারে মৃত্যু থেকে, তার নিজের কাছ থেকে। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে অন্ধ বধির পৃথিবীর কাছ থেকে। বাঁচতে হ'লে কবি হওয়া চলবে না। বাড়ীতে কি বেশী পয়সা আছে ?

যুবক! আজ্ঞে না।

বৃদ্ধ। তোমার বাবা কি করেন ?

যুবক। চাকরি—

বৃদ্ধ। তুমি কি কর ?

যুবক। কলেজে পড়ি।

বৃদ্ধ। বাপের পয়সায় খাও আর কলেজে পড়, তাই কবিতা লেখবার দুঃসাহস মনে জেগেছে। বয়স কম, তাই এখনও কল্পনা আর স্বপ্ন নিয়ে মেতে রয়েছ। বাস্তব জীবনে যখন ঢুকবে তখন কল্পনা স্বপ্ন সব ভেঙ্গে যাবে; আর যদি রূঢ়

সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে না চলতে পার তো তুমি নিজেও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে যুদ্ধ করতে হবে, কবিতা লিখে চলবে না।

যুবক। আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন বলে কবি-কল্পনাকে উড়িয়ে দিতে চাইছেন। হৃদয়ে আপনার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে।

বৃদ্ধ। কারণ, পেটে ডিসপেপসিয়া হবার কোন উপায় ছিল না। অতিরিক্ত খাওয়া ছাড়া তা হয় না।

যুবক। আমাদের বয়সে—আশা উদ্যম যখন আপনার অটুট ছিল, আপনিই কি কবিতা লেখেন নি?

বৃদ্ধ। তা ঠিক মনে পড়ছে না। হয়ত লিখেছিলুম। যদি লিখে থাকি তো নিজেকে নিজে ঠকাবার চেষ্টা করেছিলুম মাত্র। কবি দরদ ঢেলে দেয় প্রকৃত দরদীর জন্য। কিন্তু সংসারে ক'টা প্রকৃত দরদী পাওয়া যায়। তুমি যদি বিজয়ী হও, অর্থকষ্ট অন্নকষ্ট তোমার কাছে ঘেঁসতে না পারে তবে হয়ত মুখে তোমায় পাঁচজন দরদ দেখাবার ভান করতে পারে। কিন্তু দরকারের সময় দেখবে কেউ থাকবে না।

যুবক। কিন্তু আমি একজন সেই রকম দরদীর সন্ধান পেয়েছি, যে সুখে দুঃখে সব সময়েই আমার কাছে থাকবে। কখনও আমায় ছেড়ে যাবে না।

বৃদ্ধ। সেই পুরানো কথা। তুমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছ। তার মত ভাল মেয়ে সমস্ত দুনিয়া খুঁজলে আর একটিও মিলবে না—

যুবক। (সলজ্জভাবে) আপনি কি ক'রে জানলেন?

বৃদ্ধ। সকলের ঐ একই কথা। ভালবাসা, প্রেম—ওসব মিথ্যে। বিশ্বাস করো না। মারা পড়বে।

যুবক। তাকে অবিশ্বাস করলে ভগবানকেও অবিশ্বাস করতে হয়।

বৃদ্ধ। একদিন তাঁকেও অবিশ্বাস হয়ত করতে হবে।

যুবক। আপনি কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

বৃদ্ধ। পারবেও না। যখনকার যা বয়স। এ বয়সে আমার কথা বোঝবার শক্তি তোমার থাকতে পারে না। আমি চল্লুম। তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না। তবে মনে রেখ সবই মায়া, ধাঁধা। প্রেম আর কবিতা দুই-ই বড়লোকের রোগ। গরীবদের তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। গরীব স্বামীর স্ত্রী পর্য্যন্ত সুবিধা পেলে তাকে ত্যাগ ক'রে যায়।

প্রস্থান

যুবক। ছিঃ ছিঃ! লোকটা বুড়ো হয়ে পাগল হয়ে গেছে। আর কি সিনিক্যাল কথাবার্ত্তা। যেন পৃথিবীতে ভালবাসা বলে পদার্থ থাকতে পারে না। যাক, এইবার কবিতাটা লিখে ফেলি।

কবিতা লিখতে আরম্ভ করল। মধ্যে মধ্যে হাত নেড়ে পড়তেও লাগল। পিছন থেকে দুজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ

১ম। আপ্‌ কৌন্‌ হ্যায়?

২য়। আপ্‌ কা নাম কেয়া হ্যায়?

যুবক। আমি কবি হ্যায়। আমার নাম বিজনবিহারী বন্দ্যো হ্যায়।

১ম। ইতনে সবেরে হিয়া কেয়া করতে হ্যাঁয়?

২য়। কিউঁ আয়ে হ্যাঁয়?

একজন বাঙ্গালী সাব-ইন্সপেক্টরের প্রবেশ

সাব-ইন্স। কিরে, কি হয়েছে?

১ম। এই বাবু একেলা বইঠে হ্যাঁয়?

২য়। কেয়া সব লিখতে হ্যাঁয়, আওর আপনে মনমে বকবক করতে হ্যাঁয়।

সাব-ইন্স। আপনার নাম কি?

যুবক। আমার নাম বিজনবিহারী বন্দ্যো।

সাব-ইন্স। কি করা হয়?

যুবক। কলেজে পড়ি।

সাব-ইন্স। এত সকালে এখানে কেন?

যুবক। তাতে আপনার দরকার কি?

সাব-ইন্স। দরকার আছে। হাতে ওটা কি? দেখি।

(পাঠ)

ও মোর হৃদ্-গগনের চাঁদ।
মনের মাঝে পরাণ প্রিয়া পেতেছ কি ফাঁদ॥
পাখীর ডাকে আজকে ভোরে
উদাস কেন করলো মোরে
প্রেমের স্রোতের জোয়ার এল ভেঙ্গে সকল বাঁধ॥

ভুলে গেলে আমার কথা
পারব না সই সইতে ব্যথা
শীতল জলে জীবন সঁপে করব অবসাদ।

হুঁ, ঠিক হয়েছে।

যুবক। কি হয়েছে?

সাব-ইন্স। আপনি লেকে ডুবে মরতে এসেছেন।

যুবক। কি বলছেন! মরতে যাব কেন?

সাব-ইন্স। কেন, তা আমি কি ক'রে জানব; লেকে জোড়ায় ডোবে, আপনি একলা দেখে আমি একটু চিন্তায় পড়েছিলুম। এখন দেখছি—নাঃ, সবই ঠিক আছে। তিনি কোথায়?

যুবক। কিনি?

সাব-ইন্স। কেন, আপনার হৃদ-গগনের চাঁদ! আপিসে বলেছে যে যত ডুবে মরার ব্যাপার সব প্রেমঘটিত। একটি ছেলে একটি মেয়ে জোড়ায় ডুববে। ক'দিন থেকেই আমরা চারধারে বেশ ভালভাবেই পাহারা দিচ্ছি। আজ ধরা পড়লো।

যুবক। কিন্তু আপনি ভুল করছেন—

সাব-ইন্স। থানায় চলুন। সেখানে গিয়ে কর্ত্তাদের বোঝাবেন। তাঁরা হুকুম—আমরা তামিল। দৌড়সিং বাবুকো থানামেঁ লে চলো। লোটামল তুম হিঁয়া হমারে সাথ রহো। আপনি যান, গোলমাল করবেন না। আমি এখুনি আসছি।

যুবক। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

সাব-ইন্স। উপায় নেই। এখন তো থানায় চলুন। তারপর সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে সাক্ষীসাবুদ ক'রে যদি প্রমাণ হয় যে আপনার ডুবে মরবার ইচ্ছে ছিল না, তখন ছাড়া পাবেন। তবে আপনার কবিতাই আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। সমস্ত ফরমূলা-মাফিক। ভোর বেলা—ছেলে আর মেয়ে—প্রেম-ঘটিত ব্যাপার—লেকে জোড়ায় ডুবে মরার ইচ্ছা। একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। আপনি এগোন। আমি আপনার ডোববার সঙ্গিনী অর্থাৎ কি-না আপনার হৃদ-গগনের চাঁদের সন্ধানে রইলুম। তিনিও এই এসে পড়লেন বলে। তাঁকে নিয়ে একেবারে থানায় যাব। দৌড়সিং তুম যাও।

দৌড়সিং। আইয়ে বাবু।

যুবক। কিন্তু সত্যি বলছি—

সাব-ইন্স। যান, গণ্ডগোল করবেন না! মিছে কেলেঙ্কারী হবে।

দৌড়সিং ও যুবকের প্রস্থান

সাব-ইন্স। লোটামল, তুম্ ইধর্ সে যাও, হাম ইস্ তরফ সে চক্কর লাগায়েঙ্গে। খুব হুশিয়ার। কুছ শক্ হো তো উসি ওক্ত পকড়কে হমকো খবর দেও। এক লড়কী ভি জরুর মিলেগী।

২য়। জী হুজুর।

দুজনের দুদিকে প্রস্থান

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। পরে একজন পুরুষ ও মহিলার প্রবেশ। মহিলার কোলে তোয়ালে জড়ানো একটী ছেলে। চারিদিকে ভীতভাবে চেয়ে এগিয়ে এল।

পুরুষ। এই বেঞ্চিটায় শুইয়ে দাও।

মহিলা। না আমি পারব না।

পুরুষ। মনকে শান্ত কর। এখানে রেখে গেলে কেউ না কেউ তুলে নেবেই।

মহিলা। কিন্তু—

পুরুষ। তর্ক করো না।

মহিলা। আমার বড্ড—

পুরুষ। নাও আর দেরী করো না। এখুনি কেউ এসে পড়বে।

মহিলা ছেলেটিকে আদর ক'রে বেঞ্চিতে শুইয়ে দিলে।
হঠাৎ কেঁদে উঠে বল্লে—

মহিলা। না পারব না।

পুরুষ। (কঠোর কণ্ঠে) চলে এস। কেউ দেখে ফেল্লে মুস্কিল হবে।

হাত ধরে টানতে টানতে প্রস্থান

কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ। পরে একটি বছর
আঠারো বয়সের সুশ্রী তরুণী ঢুকল

তরুণী। কই এখনও তো বাস চলা আরম্ভ হয় নি। আটটার মধ্যে ব্যারাকপুর পঁহুছতে হবে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। একটু অপেক্ষাই করি। তা ছাড়া আর উপায় কি?

বেঞ্চিটায় গিয়ে বসতেই ছেলে কেঁদে উঠল।
তরুণী চমকে উঠে পড়ল।

তরুণী। এ কি! ছেলে না? কার ছেলে? এখানে শুইয়ে রেখে কোথায় গেল?

ছেলেটা আরও চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো

তরুণী। এ তো ভারি মুস্কিল। কাউকে তো দেখতেও পাচ্ছি না।

হঠাৎ ছেলেটা বেঞ্চি থেকে পড়ে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল
তাড়াতাড়ি তাকে তুলে নিলে।

তরুণী। না না, কাঁদে না, কাঁদে না। লক্ষ্মীসোনা। কই, কেউ তো আসছে না! আমি একে কতক্ষণ আগলাব?

বেঞ্চিতে শুইয়ে দিতে আবার কেঁদে উঠল। আবার তুলে নিলে।

তরুণী। আচ্ছা বিপদে পড়া গেছে যা হোক। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কাঁদতে নেই—(ছেলেটা চুপ করল) কই এখনও তো কেউ এল না। আমার আবার দেরী হয়ে যাবে। আমি চল্লুম—

চারিদিকে দেখে কাউকে না দেখতে পেয়ে বেঞ্চিতে রেখে যেই এগোতে
যাবে, সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালা লোটামল এসে পথ রোধ করল

লোটা। আপকা নাম?

তরুণী। কি বলছ? আমার নাম? কেন কি হবে?

লোটা। আপকা লড়কা ছোড়কে কঁহা যাতে হ্যাঁয়?

তরুণী। আমার লড়কা। কি বোলতা হ্যায়? এতো বেঞ্চিতে শোতা হ্যায় যখন আমি আয়া—

লোটা। হম য়ে সব বাত নাহি সুনেগা—

সাব-ইন্সপেক্টরের প্রবেশ

সাব-ইন্স। কি রে লোটামল, কি হয়েছে?

লোটা। ইএ জানানা এক লড়কা কো বেঞ্চ পর ছোড় কর চলি জা রহি থী।

সাব-ইন্স। আপনার নাম?

তরুণী। আমার নাম মালতী মিত্র। কেন?

সাব-ইন্স। আপনি কি করেন?

তরুণী। আমি স্কুলে মাষ্টারী করি।

সাব-ইন্স। কোন্ স্কুলে?

তরুণী। ব্যারাকপুর যাচ্ছিলুম, সেখানে এক স্কুলে চাকরির চেষ্টায়।

সাব-ইন্স। ওঃ! আপনি কি পাস?

তরুণী। আমাকে এ ভাবে জেরা করবার আপনার কি অধিকার আছে?

সাব-ইন্স। আপনারা লেকে ডুবে মরতে এসেছিলেন তো?

তরুণী। মানে? আপনি কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

সাব-ইন্স। একটি ছেলে একটি মেয়ে। লেকের জলে ডুবে মরা। এ একেবারে ফরমূলা-কষা। ছেলেটাকে ধরে চালান করেছি। আপনার অপেক্ষায় আমরা ছিলুম। এই দেখুন পদ্য। "ও মোর হৃদ-গগনের চাঁদ", আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম।

তরুণী। আমি এ সবের কিছুই জানি না।

সাব-ইন্স। আমার কাজ আপনাকে থানায় উপস্থিত করা। আমি তাই করব। সেখানে আপনার যা বলবার থাকে বলবেন। কিন্তু এই ছেলে নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। ছেলের কথা তো ছিল না। আপনার ছেলে—

তরুণী। কি বলছেন আপনি? আমার ছেলে হতে যাবে কেন? এই বেঞ্চিতে পড়েছিল—

সাব-ইন্স। তা তো ছিলই। ছেলেকে আপনি বেঞ্চিতে ফেলে রেখে সরে পড়ছিলেন।

গোলমাল দেখে কয়েকজন লোক জড় হয়েছে

১ম। কি ব্যাপার?

২য়। এই মেয়েটিকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?

৩য়। ছেলেটাকে এই ঠাণ্ডায় এমন ভাবে ফেলে রেখেছ কেন?

সাব-ইন্স। দেখুন, এই ভদ্রমহিলা এই ছেলেটিকে বেঞ্চিতে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিলেন।

১ম। অ্যাঁ বলেন কি?

তরুণী। এই বেঞ্চিতে ছেলেটি আগেই পড়েছিল—

২য়। ওসব আমাদের জানা আছে!

তরুণী। বার বার বলছি আমার ছেলে নয়, তবু সেই এক কথা। আমার এখনও বিয়ে হয় নি—

৩য়। সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

১ম। সেইজন্যই তো ফেলে যেতে এসেছেন।

তরুণী। আপনারা কি বলতে চান শুনি?

২য়। নাই শুনলেন। বুঝতেই তো পারছেন।

৩য়। এখন ছেলেকে নিয়ে চুপি চুপি বাড়ী চলে যান। নইলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে।

সাব-ইন্স। না, আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। হয় জোড়ে ডুবতে এসেছিলেন—আপনার সঙ্গীকে আগেই আমরা চালান দিয়েছি, না হয় এই ছেলেটিকে রাস্তায় ফেলে দিতে এসেছিলেন। দু-ই গুরুতর অপরাধ।

তরুণী। কিন্তু আমি এ-দুয়ের কিছুই জানি না।

সাব-ইন্স। ওকথা সকলেই বলে। চলুন, আর দেরী করবেন না। লোক জড় হচ্ছে। যত বেলা হবে ততই কেলেঙ্কারীটা আরও ছড়িয়ে পড়বে।

তরুণী। না আমি যাব না।

সাব-ইন্স। আমায় জোর করতে বাধ্য করবেন না।

১ম। হ্যাঁ ভালয় ভালয় চলে যান।

২য়। বেশী লোক জানাজানি হওয়াটা ভাল নয়।

৩য়। তাতে ব্যাপারটা আরও প্রকাশ হয়ে পড়বে।

তরুণী। বেশ, চলুন। আপনি যদি মিথ্যে গণ্ডগোল করতে চান—

ছেলেকে ফেলে রেখে এগোতেই

সাব-ইন্স। আহা, ছেলে নিয়ে চলুন।

তরুণী। আমার ছেলে নয়। আমি নেব না।

১ম। ছেলের ওপর রাগ ক'রে কি হবে। ওর আর দোষ কি?

সাব-ইন্স। বেশ, আমিই নিচ্ছি।

ছেলেকে তুলে নিতেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

২য়। আরে তুমি কখন ছেলে নিতে পার। ওতো কাঁদবেই। ওর মাকে দাও।

তরুণী। কি সব যা-তা আপনারা বলছেন। আমার সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

৩য়। আহা ছেলেটা কাঁদছে, নিন না একটু কোলে।

সাব-ইন্স ছেলেকে একরকম জোর করেই মালতীর কোলে দিল, ছেলে তখুনি চুপ করল।

১ম। দেখলে, মার কোলে যেতেই চুপ!

২য়। না, কোন ভুল নেই।

৩য়। অস্বীকার ক'রে আর লাভ কি?

তরুণী। আমি একে জীবনে এর আগে কখন দেখিওনি।

সাব-ইন্স। সে তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে।

তরুণী। এই রইল, আমি একে কোলে করে থানায় যেতে পারব না।

রেখে দিতেই ছেলেটা কেঁদে উঠল

১ম। আহা কেন মিছে ছেলেটাকে কাঁদাচ্ছেন?

২য়। দোষ করবেন আপনারা, আর ফলভোগ করবে একটা শিশু।

৩য়। রাস্তায় ঘাটে ছেলে ফেলে যাওয়াটা অতি জঘন্য ব্যাপার।

তরুণী। আমায় মিছামিছি অপমান করাই কি আপনার উদ্দেশ্য?

সাব-ইন্স। নিন, ছেলেকে তুলে নিন। এগিয়ে গিয়ে না হয় আমরা ট্যাক্সি ক'রে যাব।

১ম। সে-ই ভাল। হুডটা তুলে দিলে বিশেষ কেউ লক্ষ্য করবে না।

২য়। কেঁদে কেঁদে যে ছেলেটার গলা শুকিয়ে গেল।

তরুণী ছেলেটাকে কোলে নিতেই চুপ করল

৩য়। রক্তের টান। চুপ করবেই।

তরুণী। চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে আর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

সাব-ইন্স। চলুন। লোটামল, তুমভী আও।

১ম। কালে কালে কতই হ'ল।

৩য়। সমাজ আজ কোন্ পথে চলেছে—

লোটামল, সাব-ইন্সপেক্টর ও ছেলেসহ তরুণীর প্রস্থান

সকলে। চল হে চল, আমরাও যাই। মজাটা দেখা যাক।

তিনজন পিছন পিছন গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

থানার আপিস ঘর। দু'জন পাহারাওয়ালা টেবিল চেয়ার ঝাড়ছে আর গল্প করছে।

১ম। আরে ভাইয়া, দুনিয়া মেঁ তো আজকল গজব হো রহা হ্যায়। কল এক আদমী কো পকড়লায়া। উও এক সাবকে জেব সে ব্যাগ চুরায়া থা। ম্যাঁয় নে কহা—

"আধা আধা হিস্‌সা করো তো ছোড় দেঁ।" শালা গালী দেনে লগা। উসি ওক্ত উসকো চালান কর্ দিয়া। হম্ পুলিশ কে আদমী, গলতী নহীঁ দেখ সক্‌তে।

২য়। বিল্‌কুল্ নহীঁ। কল্ কোই রাত তিন বজে ভবানীপুরকে গাড়ী কে অড্ডে কে পাস এক বাঙ্গালীবাবুকো রস্তে মেঁ পড়ে হুয়ে দেখা। জনাব নশে মে চুরথে। উসি ওক্ত আচ্ছি তরহ সে উনকে সব জেব টটোলা পরকেয়া সিতম হ্যায় দেখো জনাব কে জেব মেঁ এক পয়সা তক নহীঁ মিলা। মিজাজ এক দম খরাব হো গয়া। দো ডণ্ডা কসায়া। কুছ হোশ আনে পর থানে মেঁ লে হাজির কিয়া।

এমন সময় অবলা আশ্রমের কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত পঞ্চানন পালের প্রবেশ। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, মুখে দাড়ী গোঁফ, এক হাতে এক গাদা কাগজপত্র আর এক হাতে ছাতা। পায়ে ক্যানভাসের জুতো, গলাবন্ধ কোট, হাঁটুর কাছে পরণের কাপড়।

পঞ্চানন। কি রে, তোদের সাহেব এখনও নামেন নি ?

১ম। আপ বৈঠিয়ে। সাব অভি আতে হ্যাঁয়।

পঞ্চানন। দেখি, তোদের খবরের কাগজটা ততক্ষণ পড়ি।

২য়। (কাগজ দিয়ে) লীজিয়ে।

পঞ্চাননবাবু কাগজ পড়ছেন এমন সময় ছোট
ছেলের কান্নার আওয়াজ এল

পঞ্চানন। কি রে, একটা ছোট ছেলে কাঁদতা হ্যায় না ?

১ম। জী হাঁ। আজ সবেরে এক জনানা লেক কে কিনারে অপনা লড়কা ছোড়কে ভাগ জা রহী থী। বলীন্দর বাবু উসকো পকড়কে লে আয়ে হ্যাঁয়।

পঞ্চানন। তাই নাকি !

থানার ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত মহাদেব মল্লিকের প্রবেশ। বেশ
মোটা সোটা চেহারা। পরণে পুলিশের পোষাক

মহাদেব। কি খবর পাঁচু ? এই সকালে ?

পঞ্চানন। আর বল কেন। রাণী শঙ্করী লেনের বদ্দিবাবু কাল রাত্রে মারা গেলেন, তাই সমস্ত রাতই প্রায় সেইখানে কেটে গেল। ছেলেপুলে নেই, এই যা রক্ষে। স্ত্রী বেচারী বড্ড কাতর হয়ে পড়েছেন। ভাবলুম যাবার সময় একবার তোমার এখানে হয়ে যাই, আর আশ্রমের কোন কেস আছে কি-না খোঁজটাও নিয়ে যাই। এসেই শুনলুম কোন এক মেয়েকে তোমরা ধরে এনেছ, সে নাকি তার ছেলে ফেলে যাচ্ছিল ইত্যাদি। ব্যাপারটা কি হে ?

মহাদেব। আমি এখনও কিছু শুনিনি। আরে বলেন্দ্রবাবুকো খবর দেও।

১ম। জী হুজুর। প্রস্থান

মহাদেব। আউর তুম জনানা কো লড়কা সমেত ইধর হাজির করো।

২য়। জী হুজুর। প্রস্থান

মহাদেব। তারপর তোমার আশ্রমের কাজকর্ম্ম কি রকম চলছে ?

পঞ্চানন। ভালই। শীগ্‌গিরই কিছু টাকা তোলবার জন্য একটা চ্যারিটি শো করব। এখন আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশজন মহিলা রয়েছেন। তাঁদের কিছু কুটীরশিল্প শেখাবার বন্দোবস্তও করা হয়েছে।

শ্রীবলেন্দ্রচন্দ্র চন্দের প্রবেশ

মহাদেব। বলেন্দ্র, কি ব্যাপার ? আজ ভোরে লেক থেকে কাদের ধরে এনেছ ?

বলেন্দ্র। যে রকম বলে দিয়েছিলেন স্যর ঠিক সেই রকমই করেছি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। লেকের ধার—ভোরবেলা—এ জোড়ে ডুবে মরা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

মহাদেব। তারা কি একসঙ্গে এসেছিল ?

বলেন্দ্র। আজ্ঞে না, তা আসেনি বটে কিন্তু তাতে কি আসে যায়। ছেলেটা আগে এসে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছিল।

মহাদেব। কি ক'রে জানলে ?

বলেন্দ্র। এই কবিতা পড়ে।

পকেট থেকে কবিতাটি বার করে মহাদেববাবুর হাতে দিয়ে

এই দেখুন, গোড়াতেই রয়েছে "ও মোর হৃদ-গগনের চাঁদ" আর শেষ লাইনে লিখছে, "শীতল জলে জীবন সঁপে করব অবসাদ।" এর পর আর নাকি সন্দেহ থাকতে পারে ?

পঞ্চানন। এ যে গডাডরচন্দ্রের নাক কাটার মত হল ! ওরা তো কেউ ডোবে নি, ডুববে বলেও নি। তার আগেই তাদের ধরে ফেল্লে।

বলেন্দ্র। আজ্ঞে ডুবে গেলে আর কাকে ধরতুম ?

পঞ্চানন। তা বটে।

ছেলে কোলে মালতী মিত্রের প্রবেশ

মহাদেব। বস, বাছা বস। তোমার নাম কি?

মালতী। (বসে) মালতী মিত্র।

মহাদেব। তোমার বাবার নাম?

মালতী। চিত্তরঞ্জন মিত্র।

মহাদেব। তিনি কি করেন?

মালতী। মারা গেছেন।

মহাদেব। কি করতেন?

মালতী। শেয়ার মার্কেটে দালালি।

মহাদেব। তোমার আর কে আছে?

মালতী। কেউ নেই। মা আগেই মারা গিছলেন। বাবার আর কোন ভাই-বোন ছিল না। আমারও কোন ভাই-বোন নেই।

মহাদেব। তুমি কি কর?

মালতী। আমি আই-এ পাস করেছি। বাবা মারা যেতে আর পড়াশুনা এগোয় নি। আগে এক হাসপাতালে নার্স ছিলুম, এখন স্কুলে চাকরি—

মহাদেব। কোন্ স্কুলে?

মালতী। এখন কোন স্কুলে নেই, তবে ব্যারাকপুর গার্লস স্কুলে একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে, তাই সেখানে যাচ্ছিলুম। এমন সময় আপনার লোকেরা আমাকে যাচ্ছে-তাই অপমান ক'রে ধরে এনেছে। ক্রন্দন

মহাদেব। এত ভোরে?

মালতী। ব্যারাকপুরে আটটার সময় দেখা করবার কথা ছিল। তাই অত ভোরে বেরিয়েছিলুম। যেতেও তো অনেকক্ষণ লাগতো।

মহাদেব। তা বাছা, তুমি তোমার ছেলেকে রাস্তায় ফেলে যাচ্ছিলে কেন?

মালতী। আমার ছেলে? কি বলছেন আপনি? বাসের জন্য অপেক্ষা করব বলে বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে দেখি এই ছেলেটি সেখানে পড়ে আছে! কাঁদছিল বলে কোলে করেছিলুম। ভাবলুম, কেউ একে রেখে কোথাও গেছে, এখুনি আসবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর কেউ আসছে না দেখে বেঞ্চিতে শুইয়ে রাখ্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় আপনার লোকেরা এসে আমায় ধরলে।

মহাদেব। তোমার বিয়ে হয় নি?

মালতী। না। আমি তো বার বারই বলছি যে ছেলে আমার নয়।

মহাদেব। হুঁ। তা বাছা, কি করব বল, সকলেই অমন বলে থাকে। আমাদের কাজ এ সব কেস ধরে চালান ক'রে দেওয়া। আচ্ছা দেখ মা, আমায় লজ্জা কোরো না, কে এর বাপ যদি বল তো আমি একবার তাকে ধরে এনে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়ে তোমাদের বিবাহের বন্দোবস্ত করি।

মালতী। তা আমি কি ক'রে জানব। আমি এই ছেলেটাকে আজ সকালে প্রথম দেখলুম।

মহাদেব। তুমি সত্যি কথা না বল্লে আমায় বাধ্য হয়ে কেস ডায়েরী করতে হবে। কোর্টে কেস যাবে, তাতে অনেক কেলেঙ্কারী বাড়বে।

মালতী। সত্যি বলছি আমি এ সবের কিছুই জানি না।

কেঁদে ফেল্লে

মহাদেব। হুঁ। আচ্ছা, তুমি গিয়ে ঘরে বস। আমি দেখি যদি এর কিছু একটা সদুপায় করতে পারি।

কাঁদতে কাঁদতে চেয়ারে ছেলেটাকে শুইয়ে মালতী চলে যাচ্ছে
ছেলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল

মহাদেব। আহা, ওকেও নিয়ে যাও।

রেগে ছেলে নিয়ে দুম দুম ক'রে মালতী চলে গেল

বলেন্দ্র। ওকে স্যর লেকে ডোববার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না?

মহাদেব। (হেসে) পরে করব। আগে এই ছেলের ব্যাপারটার একটা হেস্ত নেস্ত করি। তুমি এখন যাও। পরে দরকার হ'লে ডাকব।

দুঃখিতভাবে বলেন্দ্রের প্রস্থান

পাঁচু, তোমার কি মনে হয়?

পঞ্চানন। যা তোমার মনে হচ্ছে। কোন বড়লোক লম্পটের প্ররোচনায় এরকম ঘটেছে। হয়ত কিছুদিন অর্থ সাহায্য করেছিল, তারপর সুযোগ বুঝে সরে পড়েছে। এ বেচারী অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে ছেলেকে পথে ফেলে যাচ্ছিল, এমন সময় তোমরা ধরেছ। আমার মনে হয় একে আমাদের আশ্রমে স্থান দিলে মন্দ হয় না।

মহাদেব। তা বটে, তবে আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। সনৎ বসুকে মনে আছে ?

পঞ্চানন। খুব মনে আছে। নিজের কথা নিয়েই মশগুল, পরের কথা কখন কানে তুলত' না। "কেমন আছ" জিজ্ঞেস করলে একঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা চালাতো। সে-ই তো ?

মহাদেব। হ্যাঁ, এখনও ভোল নি দেখছি। লোকটা বিলক্ষণ পয়সা-কড়ি করেছে। টালায় একটা মেয়ে হাসপাতাল করেছে, আর তার ছেলে বিভাস ডাক্তারী পাশ ক'রে সব দেখাশুনা করছে। সেইখানে এই মেয়েটিকে নার্স বা অন্য কোন কাজে ভর্ত্তি ক'রে দিলে কেমন হয় ?

পঞ্চানন। উত্তম পরামর্শ। মেয়েটিকে দেখে ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে। ভদ্রভাবে থেকে উপার্জ্জন ক'রে ছেলে মানুষ করবার সুযোগ পেলে হয়ত ভবিষ্যত জীবনটা ভালভাবেই কাটাতে পারবে।

মহাদেব। সে তো বটেই। আচ্ছা আমি এখুনি বিভাসকে আসতে টেলিফোন ক'রে দিয়ে আসছি।

প্রস্থান

পঞ্চানন আবার কাগজে মন দিয়েছে, এমন সময়
পা টিপে টিপে বলেন্দ্র ঢুকল

বলেন্দ্র। দেখলেন তো, সব গুলিয়ে গেল। বলে দিলেন জোড়ে লেকে ছেলে আর মেয়ে ডুবে মরছে। এত মেহনত ক'রে ধরে আনলুম, তা উনি জলে ডোববার কথা একেবারে জিজ্ঞেসই করলেন না।

পঞ্চানন। মেয়েটি হয়ত ডুবব বলে আসেনি। সে তো স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছিল—

বলেন্দ্র। কিন্তু ঐ যে ছেলেটি তার উদ্দেশ্যে লিখছে, "হৃদ-গগনের চাঁদ" আর শেষে লিখছে "শীতল জলে জীবন সঁপে করব অবসান" এইতেই তো প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, একটি ছেলে আর একটা মেয়ে একসঙ্গে ডুবছে।

পঞ্চানন। হয়ত এরা কেউ কাউকে চেনেই না।

বলেন্দ্র। চেনে না তো ষড়যন্ত্র করে একসঙ্গে ডুবতে এল কি করে ?

পঞ্চানন। এক সঙ্গে এসেছিল নাকি ?

বলেন্দ্র। আজ্ঞে না, একসঙ্গে ঠিক আসেনি। ছেলেটা আগে এসে মেয়েটার জন্য অপেক্ষা করছিল। তবে এক সঙ্গে ডোববার কথা ছিল। কিন্তু আমি সব পণ্ড ক'রে দিলুম! ছেলেটাকে আগেই চালান ক'রে মেয়েটার জন্য ওৎপেতে বসে রইলুম। যাহাতক আসা, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার।

পঞ্চানন। মেয়েটা আসবে, কি ক'রে জানলে ?

বলেন্দ্র। ঐ তো। পুলিশে চাকরি করি আর এইটুক ধরতে পারব না। বিশেষ ক'রে যখন কর্ত্তারা ফরমূলা কষে দিয়েছিলেন। একটি ছেলে একটি মেয়ে—রাত্রি কাল—লেকের ধার—ডুবে মরবার চেষ্টা—এ ভুল হবার উপায় নেই। তার উপর আবার পদ্য।

পঞ্চানন। বুদ্ধির তারিফ করতে হয় বটে!

বলেন্দ্র। আপনি তো বুঝলেন কিন্তু কর্ত্তা বোঝেন কই ?

মহাদেববাবুর প্রবেশ

মহাদেব। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়। কাঁদছে। বেচারী একান্ত ছেলেমানুষ। হ্যাঁ হে বলেন্দ্র, তোমার লেকে ডুবে মরার কেস কই ?

বলেন্দ্র। কেস আর স্যর থাকছে কই ? একজনকে ছেড়ে দিলেন। ডোববার কথা মোটে জিজ্ঞেসই করলেন না।

মহাদেব। সে তো আর পালায়নি। পরে জিজ্ঞেস করা যাবে'খন।

বলেন্দ্র। তবে এর সঙ্গীকে নিয়ে হাজির করি ? সেই ছোকরাই এই ব্যাপারের মাথা। তবে মেয়েটারও মত ছিল।

প্রস্থান

মহাদেব। বলেন্দ্র আমাদের যা একবার ধরে তা ছাড়তে চায় না।

পঞ্চানন। পুলিশের লোক। বিনা তর্কে বিনা বাক্যে বিনা চিন্তায় যা বলবেন করে যাবে। ধরিয়ে দিয়েছেন জোড়ে লেকে ডুবে মরা, এখন তাই নিয়ে সে মেতে আছে। একেই বলে মিলিটারী ডিসিপ্লিন।

মহাদেব। বড় কষ্ট হয়। ছেলেমানুষ মেয়ে, মাথার উপর একটা অভিভাবক নেই, এখন এই ছোট ছেলেকে নিয়ে সে কোথায় যায়। আমাদের দেশে এই সব ছেলে মানুষ করার জন্য একটা বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

পঞ্চানন। আমাদের হোমে তো এসব মেয়েদের স্থান দেব ঠিক করেছি। তবে এখন অবধি স্বামী পরিত্যক্তা,

এবং বিধবা মহিলা ছাড়া ছেলে শুদ্ধ কোন কুমারীকে স্থান দেওয়া হয়নি।

বিজনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বলেন্দ্র ঢুকল

বলেন্দ্র। ইনিই আজ সকালে জলে ডুবে মরছিলেন।

বিজন। জলে ডুবে মরব কেন?

বলেন্দ্র। কেন, তা আমি কি জানি? আপনিই জানেন। সেই কথা এখন স্যরকে খুলে বলুন।

মহাদেব। তোমার নাম?

বিজন। আমার নাম বিজনবিহারী বন্দ্যো।

পঞ্চানন। বন্দ্যো মানে?

বিজন। আধুনিক কালে বন্দ্যোপাধ্যায় বলা উঠে গেছে। স্রেফ বন্দ্যোই যথেষ্ট।

মহাদেব। কি কর?

বিজন। কলেজে পড়ি।

মহাদেব। তোমার বাবার নাম?

বিজন। শ্রীদামোদর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাদেব। তিনি কি করেন?

বিজন। মার্চ্চেন্ট আপিসে চাকরি।

মহাদেব। মালতী মিত্রের সঙ্গে কতদিনের আলাপ?

বিজন। মালতী মিত্র! কই মনে হয় না তো, নাম পর্য্যন্ত শুনিনি।

মহাদেব। তুমি যখন লেকের ধারে গিছলে তখন সেখানে আর কে ছিল।

বিজন। আমি যে বেঞ্চিটায় বসেছিলুম, সেখানে আগে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে উঠে গেলেন।

মহাদেব। কাছাকাছি কোন বয়স আঠারোর মেয়েকে দেখনি?

বিজন। কই, না তো—

মহাদেব। কিংবা কোন ছোট ছেলে?

বিজন। আজ্ঞে না। দেখলে নিশ্চয়ই মনে থাকত।

মহাদেব। অত ভোরে লেকের ধারে কি করছিলে?

বিজন। আমি কবি, উষার বর্ণনা লিখব বলে শোভা দেখতে বেরিয়েছিলুম।

পঞ্চানন। তোমার লেখা কবিতা কোন কাগজে বেরিয়েছে?

বিজন। আজ্ঞে না। তার কারণ, আমার লেখা একটু উঁচু ধরণের, সাধারণ সম্পাদকেরা বুঝতে পারে না। কিন্তু আমার বন্ধু বান্ধবেরা সকলেই প্রশংসা করে। শীগ্‌গিরই একটা নতুন কাগজ বার করব ঠিক করেছি, যাতে আমাদের ছাড়া আর কারুর লেখা থাকবে না।

মহাদেব। পয়সা নষ্ট হবে আর দু'দিন পরে কাগজও উঠে যাবে। ও সব করো না। মন দিয়ে লেখাপড়া কর, আর নিজের শরীরের দিকে একটু নজর দাও! এই দেখ আমার কি আমার বন্ধু পঞ্চাননবাবুর চেহারা। ওঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছে হতে চলল। অথচ এখনও তোমার মত দু'জনকে দু'কাঁধে নিয়ে অনায়াসে ছুটতে পারেন। আর তোমার চেহারা দেখ। যেন হাওয়ায় উড়ছে।

বিজন। ললিতকলা ও তৎসম্পর্কীয় রসসৃষ্টি করতে হলে ওরকম চেহারায় চলে না। প্রাচ্য নৃত্যভঙ্গিমাও ওতে হতে পারে না।

মহাদেব। (হেসে) তা বটে। আচ্ছা তুমি তা হ'লে যাও।

বিজন। যে আজ্ঞে। আপনি যদি আমাদের নৃত্য গীতানুষ্ঠানে একদিন যান তো বড় বাধিত হব। আমার রচিত "রম্ভা ও হিপপটেমাস" গীতনাট্যের এখন মহলা চলছে।

মহাদেব। বেশ বেশ। সে দেখা যাবে।

বিজন। আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। নমস্কার।

মহাদেববাবু দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল। বিজনবাবু কাঁধের একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গী করল যেন পাখী ডানা নাড়ছে। বিজনবাবুর প্রস্থান।

পঞ্চানন। ভারতীয় নৃত্যের কথা শুনলে আজও আমার সেই কথা মনে পড়ে। হাইকোর্টের চৈতন্য চোঙদারের সঙ্গে পরিচয় হতে তিনি একদিন চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। ভদ্রলোকের বাপ কয়লার কারবার ক'রে অনেক টাকা রেখে গিছলেন। আমাদের আশ্রমের জন্য সাহায্য পাব এই আশায় গেলুম তাঁর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কথায় কথায় বল্লেন—"আমাদের খুকী চমৎকার নাচতে পারে, একটু দেখবেন?" ভদ্রতার খাতিরে বল্লুম "বেশ তো।" ভাবলুম বছর আট-দশের একটি মেয়ে নাচবে, মন্দ কি। হঠাৎ দেখি পঁচিশ বছরের আড়াই মণ ওজনের

একটি অশথ গাছের গুড়ি থপ থপ করে নাচতে নাচতে ঘরে ঢুকল। একবার এধার থেকে ওধারে যায়, আবার ওধার থেকে এধারে আসে। ভাগ্যিস একতলায় বসেছিলুম, নয়ত ছাদ ভেঙ্গে পড়ত। আর সেই একঘেয়ে হাতের ভঙ্গিমা। প্রাণ ওষ্ঠাগত। যাই হোক, মিনিট দশেকের। পর হাতীর সার্কাস শেষ হতে মুগ্ধ পিতা জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন লাগল?" আমি—"চমৎকার। আজ তা হ'লে উঠি, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।" বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম, পাছে আর একটা নাচ দেখতে হয় এই ভয়ে। তারপর আর কখনও তাঁর বাড়ী যাইনি।

মহাদেব। যা বল্লেছ। ওসব ন্যাকামি আমার অসহ্য। হাঁ হে বলেন্দ্র, আর কোন কেস আছে?

বলেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। একজন মাতাল আর একজন পকেট-মার। এরা তো সেই পুরানো টাইপের। নতুন দুটো কেস জোগাড় করলুম, কিন্তু আপনি তাদের ছেড়ে দিলেন।

মহাদেব। ওরা জলে ডুবতে যায়নি।

বলেন্দ্র। কিন্তু স্যর ডুবলে তো ডুবতে পারতো।

মহাদেব। তা পারত। আচ্ছা দু'জনকে হাজির কর।

বলেন্দ্র চলে গেল

পঞ্চানন। এই যুগটাই এই রকম। আমাদের সময় ব্যায়াম-কুস্তির আখড়া—এই সব নিয়ে মাতামাতি করেছি। আর আজকালকার ছেলেমেয়েরা নাচ, গান আর অভিনয়—এই নিয়ে মশগুল রয়েছে। যত সব ন্যাকামি আর মেয়েলীপনা। যেমন চেহারা, তেমনি বেশভূষা। দেখে দুঃখ হয়। আমাদের জাতের পুরুষেরা যতদিন শক্তিশালী না হচ্ছে ততদিন উন্নতি অসম্ভব।

মহাদেব। আমারও মনে হয়, দৈহিক শক্তি না থাকলে নৈতিক শক্তি থাকতে পারে না। যে ভুল করে, সে যত দোষী, যে সহ্য করে সেও তার চেয়ে কম নয়।

মাতাল ও পকেটমারকে নিয়ে বলেন্দ্রর প্রবেশ

মহাদেব। (মাতালের প্রতি) হ্যাঁ হে, তোমাকে নেহাৎ ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে। মদ খেয়ে রাস্তায় পড়েছিলে কেন?

মাতাল। (তখনও একটু নেশা রয়েছে) আজ্ঞে, আ-আমার স্ত্রীর জন্যই তো রা-রাস্তায় কাটাতে হয়েছে।

মহাদেব। কি রকম শুনি?

মাতাল। কাল রাত্রে যখন বা-বাড়ী ফিরলুম, তখন তি-তিনি বল্লেন—"রাত তিনটে বে-বেজেছে।" আমি বল্লুম—"না-না, মাত্র এ-একটা।" তিনি ঘড়ি দেখিয়ে বল্লেন—"দেখ ক'টা বে-বেজেছে।" আমি বল্লুম—"ঘ-ঘড়িতে তিনটে বে-বেজেছে বটে, কি-কিন্তু আমি বলছি, এ-একটা। জান না স্বা-স্বামী হ'ল দে-দেবতা। স্বা-স্বামীর কথার চেয়ে ঘড়িই কি ব-বড় হল!" তিনি আ-আমায় দরজার বা-বার করে দিয়ে ব-বল্লেন—"যেখানে এতক্ষণ কা-কাটিয়েছ সেই খানেই বা-বাকী রাতটাও কা-কাটাও। তা-তাই রা-রাস্তায় শুয়েছিলাম।

মহাদেব। বেশ করেছিলে। বলেন্দ্র, কেসটা ডায়েরী করে নাও।

বলেন্দ্র খাতা নিয়ে বসল

বলেন্দ্র! তোমার নাম?

মাতাল। হুজুর আ-আমি তো নি-নির্দ্দোষী। এর জন্য আমার স্ত্রীই দা-দায়ী। যদি সে আ-আমাকে বা-বাড়ী ঢুকতে দিত, তা-তা হ'লে তো আপনারা আ-আমায় ধরতে পারতেন না। ঐ আপনাদের স্যর ভা-ভারী অন্যায়। যে প্রকৃত দো-দোষী তাকে ছেড়ে দিয়ে নির্দ্দোষীকে সা-সাজা দেবার ব্যবস্থা ক-করেন।

মহাদেব। চুপ কর। বলেন্দ্র, একে নিয়ে যাও। তোমায় হয়ত এবার শুধু সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও এসব খেও না। তোমার ভালর জন্যই বলছি। সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে, নিজেকে এ ভাবে নষ্ট করো না। বলেন্দ্র, তুমি গিয়ে লোচনরামকে পাঠিয়ে দাও।

বলেন্দ্র ও মাতালের প্রস্থান

মহাদেব। (পকেট-মারের প্রতি) কাল তুমি এক সাহেবের পকেট থেকে ব্যাগ চুরি করেছিলে?

পকেট-মার। আজ্ঞে পড়ে গিছল, আমি তুলে নিয়েছিলুম।

লোচনরামের প্রবেশ

মহাদেব। এই পুলিশ তোমায় ব্যাগ চুরি করতে দেখেছে।

পকেট-মার। আর সাহেবের পকেট থেকে নিয়েছি তাও দেখেছে?

লোচনরাম। হাঁ। জরুর।

পকেট-মার। তবে ব্যাগটা তখনই সাহেবকে ফিরিয়ে দিলে না কেন?

লোচনরাম। সাহেব বহুত জল্‌দী ভীড় মেঁ কহাঁ চলে গয়ে, পতা নহীঁ মিলা।

পকেট-মার। পতা আর লাগ্‌বে কোত্থেকে। তুমি তো তখন আমার সঙ্গে বখ্‌রা নিয়ে গোলমাল করছিলে।

মহাদেব। বখরা! কিসের বখরা?

পকেট-মার। ও বলছিল, আধাআধি দিলে কোন গণ্ডগোল করবে না। আমি বল্লুম—"দিলেই যে করবে না তারই বা প্রমাণ কি? যে বখরা চাইতে পারে, সে বখরা পাবার পরও গণ্ডগোল করতে পারে।" ও তখন আমাকে চালান ক'রে দিলে।

লোচনরাম। একদম ঝুট বাত।

মহাদেব। বিলক্ষণ ঘোরালো মনে হচ্ছে। তুমি চুরি করেছ এটা ঠিক তো?

পকেট-মার। আজ্ঞে না, একেবারে ভুল। আপনি যার কাছে এ কথা শুনেছেন সে মিথ্যুক আর ঘুষখোর।

মহাদেব। যদি চুরি করনি তো ও বখরা চাইলে কি করে? ঠিক ক'রে বল, নয় ত গুঁতোর চোটে বলাব।

পকেট-মার। আজ্ঞে পেটের দায়ে আমাকে চুরি করতে হয়। বাড়ীতে বুড়ী মা, বিধবা স্ত্রী, অবিবাহিতা বোন—

মহাদেব। বিধবা স্ত্রী মানে?

পকেটমার। না, না। বিধবা মা, অবিবাহিতা স্ত্রী, বুড়ী বোন—

মহাদেব। ঢের হয়েছে। আর মিথ্যে কথা কপচাতে হবে না। বলেন্দ্র! বলেন্দ্র!

বলেন্দ্র ঢুকল

বলেন্দ্র। ডাকছেন স্যর?

মহাদেব। এর কেসটাও লিখে নাও—আর লোচনরামের বিরুদ্ধে একটা "এনকোয়ারী" করতে হবে, সেটাও ফাইলে টুকে নাও। যাও, তোমরা যাও।

বলেন্দ্র, পকেট-মার ও রামলোচনের প্রস্থান

মহাদেব। পঞ্চানন, তোমার তো খুব স্ট্রং কমন্‌সেন্স। কি মনে হয়?

পঞ্চানন। বলা শক্ত। লোকটা যা বল্লে তা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে। তবে আমার মনে হ'ল কথাগুলো যেন সত্যি।

মহাদেব। এ সব এদের বাঁধা গৎ। গড় গড় ক'রে বলে যায়। ভুল হচ্ছে, তা শুদ্ধ ধরতে পারে না। যা বল্লে তা বিশ্বাস করো না—

ডাক্তার বিভাস বোসের প্রবেশ

এই যে বিভাস, এসো। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

বিভাস। কি কাজ বলুন।

মহাদেব। বলছি। পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি আমার ও তোমার বাবার বিশেষ বন্ধু, আমরা তিনজন সকলে একসঙ্গে পড়েছি। অবশ্য তুমি এঁকে দেখনি, কারণ তোমার বাবা তো বেশীর ভাগ সময়ই পশ্চিমে কাটালেন। হ্যাঁ, তাঁর শরীর কেমন? ব্লড প্রেসার বেড়েছিল শুনেছিলুম।

বিভাস। তিনি সেই রকমই আছেন।

পঞ্চানন। আপনি একটা মেয়ে হাসপাতাল করেছেন না?

বিভাস। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমায় আপনি বলবেন না—আপনি আমার বাবার বন্ধু। মেয়েদের জন্য একটা ছোট-খাট হাসপাতাল করেছি। আশা আছে, আরও বড় ক'রে তুলতে পারব। জনসাধারণের কাছ থেকে সহানুভূতিও বিলক্ষণ পাচ্ছিলুম। তবে এবার লড়াইয়ের জন্য পয়সার একটু টানাটানি যাচ্ছে। সেইজন্য দু-চার জন নার্সকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে।

মহাদেব। দেখ, আজ সকালে একটি মেয়ে তার ছেলেকে লেকের ধারে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছিল। মেয়েটি এমনি ভদ্র বলেই মনে হ'ল। বোধ হয়, কোন দুর্বৃত্তের প্ররোচনায় তার এই দশা হয়েছে। তারপর সে সুযোগ বুঝে সরে পড়েছে। হয়ত কিছুদিন সাহায্য করেছিল, মেয়েটিরও চাকরি ছিল, তাই চলেছে। এখন দু-ই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অর্থাভাবে ছেলেকে ফেলে যাচ্ছিল। একটি চাকরি পেলে ছেলেটিকে পালন করবার সুযোগ পায়।

বিভাস। কিন্তু আমাদের এখানে নার্স ছাড়া আর কোন চাকরি তো নেই? সে কি তা পারবে? আর ছেলে নিয়ে বোধ হয় একটু অসুবিধাও হবে।

পঞ্চানন। আগে যেন কোথায় নার্সগিরি করেছে বললে।

মহাদেব। মেয়েটিকে ডেকে পাঠাই। তুমি একটু কথা-বার্ত্তা কয়ে দেখ। বলেন্দ্র! বলেন্দ্র!

বলেন্দ্রের প্রবেশ

বলেন্দ্র। কি বলছেন স্যর?

মহাদেব। সেই মেয়েটিকে নিয়ে এস। সঙ্গে ছেলেটিকেও আনতে বলো।

বলেন্দ্র। এবার কি স্যর ডুবে মরার কথাটা জিজ্ঞেস করবেন?

মহাদেব। (হেসে) হ্যাঁ। গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দাও। তোমার আর আসতে হবে না।

বলেন্দ্র। পদ্যটা দিয়ে যাব?

মহাদেব। তোমার যা বক্তব্য সব আমার মনে আছে।

বলেন্দ্রের প্রস্থান

মহাদেব। বলেন্দ্র লোক ভাল। কিন্তু একবারে পাগল।

ছেলে সহ মালতী মিত্রের প্রবেশ

বিভাস। আপনি আগে কোথাও নার্সের কাজ করেছেন কি?

মালতী। হ্যাঁ। টালিগঞ্জে একটা নার্সিং হোমে কিছুদিন কাজ করেছিলুম।

মহাদেব। সব তো শুনলে। ওকে একটা কাজ দিতে হবে।

বিভাস। বেশ। আপনি যখন বলছেন, আর কাজ-কর্ম্মও যখন জানেন, তখন আর আপত্তি কি?

মহাদেব। তোমাকে বাছা হাসপাতালে চাকরি দেওয়া হচ্ছে যাতে তুমি ছেলেকে মানুষ করে তুলতে পার। আর অর্থাভাবে থাকবে না, সুতরাং ছেলে ফেলে যেতে হবে না।

মালতী। কিন্তু ও ছেলে তো আমার নয়—

মহাদেব। অনেকবার ও কথা বলেছ। বুঝতে পারছি, মনের দুঃখে তুমি এ কথা বলছ, কিন্তু যদি অস্বীকার কর তা হ'লে আমায় কেস ডায়রী করতে হবে। তুমি ছেলেমানুষ, তাই আমাদের মায়া হচ্ছে। স্পষ্টভাবে উত্তর দাও, তুমি চাকরি চাও কি-না এবং এই ছেলে মানুষ করবে কি-না? মনে রেখ, তোমার কেউ দেখবার নেই, ঐ ছেলের জন্যেই তোমায় চাকরি দিতে উনি রাজী হয়েছেন।

মালতী। চাকরি করতে রাজী আছি, কিন্তু ও ছেলে আমি মানুষ করব কেন?

মহাদেব। যে এই ছেলের জন্য দায়ী, সে যখন ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে তখন তোমাকেই এর ভার বহন করতে হবে। ছেলে মানুষ করতে রাজী না থাকলে চাকরি পাবে না। অধিকন্তু রাস্তায় ছেলে ফেলে যাবার অপরাধে তোমার শাস্তি হতে পারে। আর কোর্টে কেলেঙ্কারী জাহির হয়ে পড়লে পরে আর কোথায়ও চাকরি পাবার আশা থাকবে না। সকল দিক ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে বল—চাকরি চাও কি-না?

মালতী। চাই।

মহাদেব। ছেলে মানুষ করতে রাজী আছ?

মালতী। হুঃ।

মহাদেব। বেশ। বিভাস, তোমাদের নার্সদের থাকবার কি বন্দোবস্ত?

বিভাস। হাসপাতালের সঙ্গেই তাদের থাকবার জায়গাও আছে। আর আমার বাড়ীও সেই কম্পাউণ্ডের মধ্যেই। ছেলের জন্যে একটা ঝি ঠিক ক'রে দিলেই হবে।

মহাদেব। বেশ, তবে একে তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।

বিভাস। আচ্ছা। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

ডাঃ বিভাস বসু ও ছেলে কোলে মালতী মিত্রের প্রস্থান

পঞ্চানন। যাক, মেয়েটার একটা হিল্লে হ'ল। এখন সে নিজেও ভদ্রভাবে থাকতে পারবে, আর ছেলেও মানুষ ক'রে তুলতে পারবে।

মহাদেব। সত্যি একটা খুব দুশ্চিন্তা গেল। হয় তো এই সুযোগে সমস্ত জীবনটা ভালভাবে কাটাতে পারবে, নইলে ক্রমেই নীচের দিকে নামতে থাকতো। সার্ভিসে আমার একটা বদনাম আছে। আমি নাকি সেন্টিমেন্টাল। কিন্তু আমি কি বুঝি জান? সাজা দেবার আগে শোধরান সহজ, কিন্তু একবার জেলে কিংবা কোর্টে গেলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আর শোধরাবার উপায় থাকে না। অনেক সময়ে

লোকে দোষ করে অজ্ঞানে কিংবা বাধ্য হয়ে। সুযোগ পেলে হয়ত ভবিষ্যতে আর সে কখনও ভুল করবে না। সে সুযোগ তাকে দেওয়া দরকার।

পঞ্চানন। তোমার মত লোক পুলিশের চাকরিতে বেশী নেই। থাকলে এই চাকরি সম্বন্ধে লোকের ধারণা অন্য রকম হ'ত।

পঞ্চাননের প্রস্থান

হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন্দ্রের প্রবেশ

বলেন্দ্র। স্যর, ঠিক হয়েছে!

মহাদেব। কি ঠিক হয়েছে?

বলেন্দ্র। এবার আর ভুল হবার জো নেই। মেয়েটি লেকের জলে ডুবতেই এসেছিল। তবে যে ছেলেটাকে আমি ধরে এনেছিলুম তার সঙ্গে নয়।

মহাদেব। তাই না কি? কি ক'রে জানলে?

বলেন্দ্র। এই মাত্র জানলা দিয়ে দেখলুম যেন কার সঙ্গে সেই মেয়েটি ছেলে শুদ্ধ মোটরে চড়ে চলে গেল। আমার মনে হয় এই লোকটি লেকে গিয়ে মেয়েটির দেখা না পেয়ে খোঁজ নিয়ে নিয়ে এইখানে এসে অপেক্ষা করছিল। যেই মেয়েটা ছাড়ান পেয়েছে অমনি তার সঙ্গে সরে পড়েছে।

মহাদেব। (হেসে) বটেই তো। ঠিক ধরেছ। যাক্, এ নিয়ে আর কারুর সঙ্গে গল্প করো না।

বলেন্দ্র। পুলিশে চাকরী করি স্যর, আর এটা বুঝি না।

(ক্রমশঃ)

বর্ষা বধূ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অবসর কোথা তার? বোঝে নাক' অবুঝে,
খেটে সারা, কাজ সারা হয় না ক' তবু যে।
এলো-মেলো এ ভবন
ক'রে নিলে সুশোভন,
ধীরে ধীরে ধরাসন ঢেকে দিলে সবুজে।

২

আকাশেতে সাত রঙা হবে তুলি বুলাতে,
মুকুতা ঝালর হবে ঝাউ গাছে ঝুলাতে।
গাছে গাছে ফুল মেলা
বসাইতে যাবে বেলা,
চাতকীরে জলকণা দিয়ে হবে ভুলাতে।

৩

দীঘি চায় শতদল, সেফালিকা পুষ্প,
সমীরণ খনে খন পেতে চায় খুশ্‌বো.
অলি চায় পরিমল,
শুক্তি স্বাতীর জল,
কা'কে রেখে কা'কে দেখে বৃথা তারে তুষবো।

৪

এত খেটে এত হেঁটে টোটে নাক' শোভাটি,
মেঘমালা এসে হেসে খুলে দেয় খোঁপাটি।
আলো ছায়ে লুকোচুরি,
রূপে লাজে কি মাধুরী!
চোখোচোখী হয়ে হেসে লুটাপুটি দোপাটি।

৫

বিজলি যে ভালোবাসে সাথে তার থাকিতে
বসুধারা ভালবাসে ঘিরে তারে রাখিতে।
তনু তার সুকোমল—
তবু এত ধরে বল,
এত সুধা, এত আলো, কালো তার আঁখিতে।

৬

শাখী শাখা, পাখী পাখা, মাখা তারি আদরে
বাতাসেতে বনে তারি বেণু বাজে বাদরে।
বুঝি তারি নিতে পূজা
আসিতেছে দশভূজা,
নিরালাতে বসি বালা চাঁদমালা গাঁথে রে।

জঙ্গম

বনফুল

৩৭

যদিও মৃন্ময় হাসপাতাল হইতে ভাল হইয়া বাড়িতে আসিয়াছে তবু হাসির মনে স্বস্তি নাই। হাঁটিতে গেলে এখনও হাঁটুতে খচ্‌খচ্‌ করিয়া যখন একটু বেদনা লাগিতেছে তখন আরও কিছুদিন বিছানায় শুইয়া থাকিয়া একেবারে সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়া ওঠা-হাঁটা করিলেই তো ভাল হয়। কিন্তু মৃন্ময় কিছুতে তাহার কথা শুনিবে কি! ওই পা লইয়াই বিশ্ব জয় করিয়া বেড়াইতেছে! প্রতিবেশী পরেশবাবুদের বাড়িতে একটি ছেলে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে। পরেশবাবুর পিসিকে ধরিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া একটি মালিশের প্রেসক্রপ্‌শন্ হাসি লিখাইয়া লইয়াছে। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, এই মালিশটি দিন-কয়েক ঘসিয়া ঘসিয়া লাগাইয়া দিলেই ওই সামান্য ব্যথাটুকু সারিয়া যাইবে। হাসি আজ তিন দিন ধরিয়া মালিশ আনাইয়া রাখিয়াছে, মৃন্ময়ের কিন্তু ফুরসৎ হইতেছে না। রোজই একটা না একটা কোন বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

আজ হাসি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছে যেমন করিয়া হোক মালিশ করিবেই। রাত্রে শুইবার সময় মালিশ করিয়া দিলে চলে কিন্তু মৃন্ময় তাহাতে কিছুতেই রাজি হয় না। বলে বিছানা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রাণের চেয়ে বিছানা বড় হইল! অদ্ভুত লোক। অথচ দিনের বেলায় নানা কাজের ছুতায় কিছুতেই করিতে দিবে না। এমন কাজ-পাগল মানুষ হাসি আর কখনও দেখে নাই। আজ বৈকালে খাকি হাফ্-প্যাণ্ট্ হাফ-শার্ট-পরা কে একটা মিনসে আসিয়াছিল, তাহার সহিত গল্প করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাহার পর তাহারই সহিত আবার বাহির হইয়া গিয়াছে! কখন যে ফিরিবে তাহার ঠিক নাই। মাথামুড় খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা করে হাসির! তিন দিন ধরিয়া ওষুধটা পড়িয়া আছে, পড়িয়া পড়িয়া শেষটা হয়তো খারাপ হইয়া যাইবে—ঝাঁজ চলিয়া গেলে কখনও ফল হয়!

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা ও স্বগতোক্তি করিতে করিতে হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল। চিন্ময় নিজের দ্বিতলের ঘরটিতে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিল। মুকুজ্যে মশাই আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

পাগলি কই রে!

যান, আমি আপনার সঙ্গে কথা কইব না! আপনি আপনার অমিয়াকে নিয়ে থাকুন গিয়ে—

বলিয়া হাসি উঠিয়া একখানা আসন পাতিয়া দিল।

হাসি চাপিতে চাপিতে আসনে উপবেশন করিয়া মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, চলে যেতে বলছিস, আবার আসন পেতে দিলি যে!

ইহার উত্তর না দিয়া হাসি ঘস্‌ঘস্ করিয়া বেগুন কুটিতে লাগিল।

একটু পরে বলিল, ভারি ওঁর এক অমিয়া হয়েছেন, সেই ছুতোয় আর এদিকে মাড়ানোই হয় না। একেবারে সেইখানে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। আমরা যেন কেউ নই।

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, তোর তো বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, কেমন সুখে আছিস। অমিয়া বেচারির বিয়েটা দিয়ে দি, থাম। তোর তো দুঃখু নেই আর!

বিয়ে আর দিতে হবে না কারুর। বিয়ে দিয়ে ভারি স্বগ্‌গে তুলেছেন আমাকে! এক অন্যমনস্ক দামাল দুরন্ত লোক, কখন কি যে করে বসে তার ঠিক নেই; তাকে সামলাতে সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার জোগাড় হয়েছে আমার।

মুকুজ্যে মশাই কিছু না বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

হাসছেন যে বড়? থামুন, আপনার অমিয়ার সঙ্গে দেখা করে একদিন বলে দিয়ে আস্‌ছি—সে যেন কিছুতে না বিয়ে করে। এমন পাপের ভোগ আর নেই।

হঠাৎ ক্ষেপে গেলি কেন, কি হয়েছে তাই বল না?

না, ক্ষেপবে না! তিনদিন ধরে মালিশের ওষুধ নিয়ে বসে আছি, ফুরসতই হচ্ছে না বাবুর; তারপর হাঁটু ফুলে পেকে একাকার হয়ে উঠুক, আবার তাই নিয়ে ভুগি আমি কিছুদিন!

কিসের মালিশ ?

আপনি আজ যেতে পাবেন না, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে তবু। আজ মালিশ না করলে ও ওষুধে আর ফলই হবে না। ওষুধ বেশী বাসি হয়ে গেলে কি আর ফল হয় ?

আরে পাগলি, কিসের ওষুধ তাই বল্ না !

মালিশ, মালিশ ! সেই হাঁটুর ব্যথা এখনও সারে নি, তাই নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে। মালিশের ওষুধ আনিয়ে রেখেছি সেই কবে, আজ পর্য্যন্ত লাগাতে পারলাম না ! আজ আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, একটু বসুন, আপনি বললে আপনার কথা শুনবে।

আমাকে যে এখুনি উঠতে হবে রে !

লক্ষ্মীটি, একটুখানি বসুন, এক্ষুনি এসে পড়বে ও। তামাক খাবেন ? আপনার জন্যে হুঁকো কলকে তামাক টিকে স—ব আনিয়ে রেখেছি, কিন্তু আপনারই দেখা নেই, তামাক খাবে কে ? ঠাকুর-পো, ও ঠাকুর-পো, নেবে এসো না একবার।

চিন্ময় নামিয়া আসিল ও মুকুজ্যে মশাইকে দেখিয়া পুলকিত হইল। আপনি কখন এলেন ?

মুকুজ্যে মশাই তাহার দিকে চাহিয়া প্রথমে একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন, এই এখুনি।

হাসি চিন্ময়কে বলিল, তুমি ওঁকে নিয়ে ওপরের ঘরটায় বস গিয়ে, আমি তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি। উনি এসেই পালাই পালাই করছেন !

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, কেন, বেশ তো বসে আছি।

না, এখানে বসতে হবে না, যা ঠাণ্ডা, ভিজে সপসপ করছে। আপনি ওপরেই গিয়ে বসুন।

মুকুজ্যে মশাই পুনরায় বলিলেন, তোর তরকারি কোটা হয়ে গেল !

ভারি তো তরকারি কোটা ! হাতে কোন কাজ ছিল না বলে কাল সকালকার জন্যে কুটে রাখছিলুম !

চিন্ময় বলিল, চলুন ওপরে।

মুকুজ্যে মশাইকে উঠিতে হইল।

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে হাসি উপরে আসিয়া দেখিল—বাঘবক্‌রির ছক পাতিয়া মুকুজ্যে মশাই চিনুর সহিত খেলিতে বসিয়াছেন। হাসি মুকুজ্যে মশায়ের হাতে হুঁকাটা দিয়া বলিল, দেখুন জল ঠিক হয়েছে কি-না। তাহার পর বক্রকটাক্ষে চিন্ময়ের দিকে চাহিয়া বলিল, এখন বুঝি পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না, আমি খেলতে চাইলেই যত ক্ষতি হয় !

"বাঃ, রোজ সন্ধেবেলা তোমার সঙ্গে বাঘ-বকরি খেললে আমার ক্লাসের টাস্ক কে ক'রে দেবে ! আর ভারি তো খেলতে জানেন, খেলতে বসলেই তো হেরে যান !"

"তোমার মত চুরি করতে পারি না বলেই হেরে যাই ! মিথ্যুক কোথাকার, ক্লাসের টাস্ক না হাতি ! ক্লাসে তোমাদের গীতা পড়া হয়, না আনন্দমঠ পড়া হয় ! জানেন দাদামশাই, লুকিয়ে লুকিয়ে খালি যা-তা বই পড়বে বসে বসে।"

মুকুজ্যে মশাই হুঁকার জল ঠিক করিয়া এবং হুঁকার উপর কলিকাটি স্থাপন করিয়া চক্ষু বুজিয়া ধীরে ধীরে টান দিতেছিলেন, ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত এবং মুখে মৃদু হাসি। আরও দুই-একবার টানিয়া চিন্ময়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাড়িতে আবার অত পড়া কেন, বাঘ-বকরি খেলাই তো ভাল। এস এবার সুরু করা যাক, তুমি বাঘ হবে না বক্‌রি—"

চিন্ময় বলিল, "আসুন, টস্ করা যাক !"

হাসি বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "টস্ ! টস্ আবার কি ?"

"একটা পয়সা দাও না তুমি, আচ্ছা থাক, আমার কাছেই আছে একটা পয়সা—"

চিন্ময় উঠিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা পয়সা বাহির করিল এবং যথারীতি 'টস্' করিল। চিন্ময় বাঘ হইল এবং মুকুজ্যে মশাই বকরি হইলেন। হাসি নীরবে সমস্ত ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; এইবার বলিল, "জোচ্চুরির নতুন একটা ফন্দি শিখেছে দেখছি। বকরি হলে ও কিছুতে পারে না, খালি হেরে যায়, কেমন চালাকি ক'রে বাঘ হয়ে গেল দেখলেন ?"

মুকুজ্যে মশাই যেন সব বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতেছেন না এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া হাসির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সব চালাকি বার করছি দেখ্ না—"

"এতে আবার জোচ্চুরি কোথা দেখলে তুমি—"

চিন্ময় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চিন্ময়ের অকৃত্রিম হাসির তোড়ে হাসি বেচারা একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল বটে

কিন্তু মুখে সে হটিবার পাত্রী নয়। বলিল, "তোমাকে চিনি না আমি যেন !"

খেলা চলিতে লাগিল।

হাসি মুকুজ্যে-মশাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

মৃন্ময় যখন বাড়ি ফিরিল তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। মুকুজ্যে মশাই খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, চিন্ময়ও আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, হাসি কেবল একা জাগিয়া বসিয়া আছে। মৃন্ময় ভিতরে ঢুকিতেই হাসি কিছু না বলিয়া কেবল তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।

মৃন্ময় বলিল, "কি, হ'ল কি !"

"হবে আর কি, রোজ যেমন হয়, খাও দাও শুয়ে পড়, মালিশটা পচুক !"

"দরকার কি মালিশের, ব্যথা তো কমে গেছে, প্রায় নেই বললেই হয়—"

"তবু একেবারে সারে নি তো, চল আগে মালিশ করে দি, তারপর যাবে, খুব ক্ষিদে পায় নি তো ?"

"খিদে ? না, খিদে খুব পায় নি। কিন্তু এখনও আমার একটু কাজ বাকি আছে, ক'দিন থেকে করাই হচ্ছে না, তাড়াতাড়ি সেরে নি সেটা। এক্ষুনি আসছি আমি—"

মৃন্ময় বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল এবং ঘরে খিল দিয়া স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিতে বসিল। বাঁকা বৃন্তের উপর রক্ত-জবার মতো বৈদ্যুতিক টেবিল ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মৃন্ময় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন চিঠি লিখিতে পারে নাই বলিয়া সে যেন স্বর্ণলতার কাছে অপরাধী হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায়ই চিঠি লেখায় বাদ পড়িয়া যাইতেছে। কই, আগে তো এমন হইত না। একটু ইতস্তত করিয়া সে লিখিতে সুরু করিল—

প্রিয়তমাসু,

আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয় তাহা জানি, কিন্তু আমি তোমাকেও জানি সেইজন্য আমার ভয় নাই। একটা কথা আজ তোমাকে বলিতে চাই। একথা আমার সহকর্ম্মী মিস্টার মজুমদার ছাড়া আর কেহ জানে না। হাসিকেও জানাই নাই। হাসি নিতান্ত ছেলেমানুষ, শুনিলে হয় তো কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে এবং বলিবে পুলিশের চাকরি ছাড়িয়া দাও। কিন্তু তোমার জন্যই পুলিশের চাকরি লইয়াছি এবং তোমাকে যতদিন না খুঁজিয়া পাইতেছি ততদিন এ চাকরি আমি ছাড়িব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায় তাহাতেও আপত্তি নাই। প্রাণ তো যাইতেই বসিয়াছিল, সেই কথাই আজ তোমায় বলিব। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমি মোটর-চাপা পড়িয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। আমি অন্যমনস্ক লোক বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস অন্যমনস্কতার জন্য আমি চাপা পড়ি নাই। যে লোকটা আমাকে চাপা দিয়াছিল সে যেন পিছু পিছু ছুটিয়া তাড়া করিয়া আমাকে চাপা দিয়া গেল। আমি বেশ বুঝিয়াছি, লোকটা ইচ্ছা করিয়াই আমাকে চাপা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার একটা ওয়েটিং রুমে একটা লোক লুকাইয়া আমার ফোটো লইয়াছিল। তাহা জানিতে পারিয়া আমিও গোপনে তাহার ফোটো লই। সেই ফোটোর সাহায্যে মিস্টার মজুমদার আবিষ্কার করিয়াছেন যে, লোকটার নাম অচিনবাবু, মোটরের দালালি করে। লোকটার কি উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না। পুলিশে চাকরি করা বিপজ্জনক, কিন্তু তোমার জন্য আমি সমস্ত বিপদই বরণ করিব। একটা সুসংবাদও আছে। কর্ত্তৃপক্ষ আমার শরীররক্ষী-হিসাবে দুইজন সশস্ত্র লোক দিয়াছেন এবং আমাকে মোটরে ভ্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। খরচ তাঁহারাই দিবেন। একটা বড় বম্ব্ কেসের অনুসন্ধানের ভারও আমার উপর পড়িয়াছে। যদি ইহাতে দক্ষতা দেখাইতে পারি, কাজে উন্নতি হইবে। তখন তোমাকে খোঁজার আরও সুবিধা হইবে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, তোমাকে হয় তো আর খুঁজিয়া পাইব না। হয় তো তুমি আর বাঁচিয়া নাই, কিম্বা হয়ত বাঁচিয়া থাকিলেও আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ। তুমি আমাকে খুঁজিতেছ কি ? নানা রকম অসম্ভব কথা মনে হয়। আমার এ দুর্ব্বলতার জন্য আমাকে তুমি মাপ করিও। আমার যতদিন শক্তি আছে, ততদিন তোমাকে খুঁজিব এবং যতদিন পাগল না হইয়া যাই, তোমার আশায় থাকিব ···

মৃন্ময় তন্ময় হইয়া লিখিয়া চলিল।

হাসি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ঢুলিতেছিল।

৩৮

শৈল আপনমনে বসিয়া আলপনা দিতেছিল। প্রতি বৃহস্পতিবারে উপবাস করিয়া সে লক্ষ্মীপূজা করে, তাহারই আয়োজন চলিতেছে। ঠাকুর দেবতার প্রতি শৈলর খুব যে একটা ভক্তি আছে তাহা নয়, ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, শৈল লক্ষ্মীপূজা করে সময় কাটাইবার জন্য। সোয়েটার বোনা, লক্ষ্মীপূজা করা, আচার-জেলি প্রস্তুত করা, কার্পেটে ফুল তোলা, এমন কি ঝিয়ের মেয়ের ফ্রক বানাইয়া দেওয়া—সমস্তই শৈল করে তাহার সত্যকার কিছু করিবার নাই বলিয়া। একা একা বসিয়া থাকিলে অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে, এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও সমস্ত জীবনটা কেমন যেন দৈন্য-নিপীড়িত ব্যর্থতা বলিয়া মনে হয়। কিছুই করিবার নাই! স্বামী নিজে এমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ যে তাঁহার জন্য কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই; এমন কি, তাঁহার জামায় বোতাম লাগাইবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয় না। তাঁহার নিজের প্রয়োজনীয় যাহা-কিছু সমস্তই বাহিরের ঘরে থাকে, তাঁহার আপিসের চাপরাশি সে সমস্ত তত্ত্বাবধান করে এবং তাঁহার খাস-চাকরটি এমন ভালো যে শৈলর কোন কিছু করিবার, এমন কি, দেখিবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয় না। মিস্টার বোস হাবজা-গোবজা শাকচচ্চড়ি সুক্তো-ডালনা পছন্দ করেন না, সাহেবিয়ানাই তাঁহার পছন্দ। বেশী মশলা পেঁয়াজ দেওয়া মাংস অথবা তরকারি তিনি বরদাস্তই করিতে পারেন না। একটু ঝাল বেশী হইলেই মেজাজ এবং অর্শ বিগড়াইয়া যায়! সাহেবদের মতো রোষ্ট স্টু প্রভৃতি লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার্য্যই তাঁহার খাদ্য। তরিতরকারিও শুধু সিদ্ধ করিয়া খান এবং এসব জিনিস তাঁহার বাবুর্চ্চিই ভালমত করিতে পারে। একেবারে মশলা দিয়া রান্না না করিতে শৈল ঠিক কেমন যেন পারে না। বাবুর্চ্চিরা টুকিটাকি কি সব জিনিস দিয়া মাংসের রং গন্ধ করে তাহা শৈলর জানা নাই। শৈল যে ইচ্ছা করিলে এসব শিখিতে পারে না তাহা নয়, বরং সে শিখিবার চেষ্টাও একদা করিয়াছিল, কিন্তু সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই বোস সাহেব এমন টিটকারি দিতেন যে, রাগ করিয়া শৈল শেষকালে বাবুর্চ্চির হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছে। শুধু টিট্‌কারির জন্যই নয়, বাবুর্চ্চি রাখাটা বোস সায়েবের স্টাইলের পক্ষেই অপরিহার্য্য। মিসেস বোস রান্নাঘরে উবু হইয়া বসিয়া রান্না করিতেছে, ইহা মিস্টার বোসের সম্মানের হানিকর। সুতরাং বাহিরের জন্য বাবুর্চ্চি এবং অন্দরের জন্য রাঁধুনি রাখিতেই হইয়াছে। একজন পদস্থ অফিসারের পক্ষে যাহা অশোভন তাহা কি করা চলে! গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে শৈলর প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগিত। স্বামীকে রান্না করিয়া খাওয়াইতে পারিবে না, এ আবার কি রকম ব্যবস্থা। কিন্তু ক্রমশ এই সাহেবিয়ানা তাঁহার সহিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সবই সহিয়া যায়। এখন, ক্বচিৎ-কদাচিৎ দুই-একটা সৌখীন খাবার, তাহাও জ্যাম, জেলি, প্যাটি, কাটলেট-জাতীয় বিজাতীয় খাবার সে প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং বোস সায়েব তাহা একটু চাখিয়া প্রশংসা করিলে সে খুশি হয়। মাঝে মাঝে রান্না করিবার অর্থাৎ দিশি ধরণের রান্না করিবার সখ হইলে শঙ্করদা'কে সে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু শঙ্করদা'রও আজকাল দেখা পাওয়া মুস্কিল। কখন সে যে কোথায় থাকে বলা যায় না।······শৈলর সময় কাটে কি করিয়া! যে পাড়ায় তাহারা থাকে তাহাও বাঙালীপাড়া নহে যে, পরনিন্দা পরচর্চ্চা করিয়া খানিকটা সময় কাটিবে। আশেপাশে সকলেই অফিসার-শ্রেণীর, সকলেই কেতা-দুরস্ত। পরনিন্দা পরচর্চ্চা তাহারা যে করে না তাহা নহে, কেতা-দুরস্তভাবে করে। শৈল তাহা ঠিক পারে না। যখন তখন যাহার তাহার বাড়িতে যাওয়াই যায় না! তা ছাড়া অধিকাংশই অ-বাঙালী। হয় য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান, না হয় মাদ্রাজি, না হয় মারহাট্টি। ইংরেজীতে কথা না বলিতে পারিলে আলাপ করাই চলে না। এই সব অসুবিধার জন্য শৈল পারতপক্ষে ইহাদের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সময় কাটে কি করিয়া। বৃহস্পতিবারটা অন্তত লক্ষ্মীপূজার কল্যাণে ভালভাবেই কাটিয়া যায়। কিন্তু অন্যদিনগুলি যেন আর কাটিতেই চায় না। বোস সায়েব সমস্ত দিন আপিসে থাকেন, সন্ধ্যায় আসিয়াই ক্লাবে চলিয়া যান। যেদিন ক্লাবে যান না, সেদিন হয় কোন পার্টি বা কোন বন্ধুর বাড়িতে ডিনার থাকে। শৈলর কেমন যেন মনে হয়, এই ক্লাব-পার্টি-ডিনার প্রভৃতিও চাকরির একটা অঙ্গ। ভালভাবে চাকরি বজায় রাখিতে হইলে ক্লাব-পার্টি-ডিনারে যোগ না দিলে চলে না।

বড় বড় সাহেব-সুবো সেখানে আসে! অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন তাহাদের স্বামীদের সঙ্গে পার্টিতে যায়, টেনিস খেলে, তাস খেলে, কিন্তু শৈল ঠিক ওসব পারে না। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরূপ। তাহার স্বামীর সঙ্গে অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীরা কেমন স্বচ্ছন্দে হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব করে সে তেমন পারে না। সে যে ইংরেজী বলিতে পারে না বলিয়াই পারে না তাহা নহে,ইংরেজী বলিতে পারিলেও সে পারিত না। যখন তখন অমন হাসি, অমন বিস্ময়, অমন ওজন-করা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করা তাহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইবার সে ঠিক করিয়াছে ইংরেজী শিখিবে। বোস সায়েবের তাহাতে শুধু যে অমত নাই তাহা নয়, পূর্ণ উৎসাহ আছে। শৈল ঠিক করিয়াছে শুধু ইংরেজী নয়, গানবাজনাও কিছু শিখিতে হইবে। কিছু একটা না করিলে সময় যে কাটে না। বোস সায়েব বলিতেছিলেন, শৈল ইংরেজীতে কথা-বার্ত্তা বলিতে পারিলে চাকরির নাকি সুবিধা হয়। উপরওলা সাহেবদের সহিত শৈল যদি সহজভাবে আলাপটালাপ করিতে পারে, উন্নতির শিখরে উঠিবার ধাপগুলা তাড়াতাড়ি অতিক্রম করা নাকি সহজ হইবে। কি করিয়া হইবে, তাহা শৈলর বুদ্ধির অতীত। কিন্তু অপর দুই-একজন প্রতিবেশী অফিসারের উন্নতি নাকি তাহাদের পত্নীদের সাবলীল স্বচ্ছন্দতার জন্যই এত তাড়াতাড়ি হইয়াছে। ইহা সত্য, মিথ্যা অথবা সম্ভবপর কি-না তাহা শৈল জানে না, কিন্তু ইহাই গুজব। কোন অফিসারের কার্য্যনিপুণতা এবং যদি একটু আপ-টু-ডেট্ ধরণের চটুলা একটি পত্নী থাকে ,তাহা হইলে উপরওয়ালাদের 'ওপিনিয়ন' না কি তাড়াতাড়ি ভাল হয়, উন্নতির জন্য বেশী নাকি বেগ পাইতে হয় না। অর্থাৎ নিপুণ দাঁড়িমাঝি একটা নৌকাকে চালাইয়া লইয়া যাইতে নিশ্চয়ই সক্ষম, কিন্তু একখানা নিখুঁত পাল থাকিলে অনুকূল হাওয়ার মুখে আরও সুবিধা হয়। শৈল ইংরেজী শিখিতে রাজি হইয়াছে বটে কিন্তু সে বোস সায়েবকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে যে, সায়েবসুবোর সঙ্গে মিশিতে টিশিতে সে পারিবে না। সে ইংরেজী শিখিতে চায় এবং বিশেষ করিয়া এস্রাজ বাজাইতে শিখিতে চায় নিজের সময় কাটাইবার জন্য। সময়কে লইয়াই যত সমস্যা। দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘতর সন্ধ্যা আর কাটিতে চায় না। আরও একটা কাজ সে করিয়াছে, অবশ্য খুব লুকাইয়া। ঝিয়ের মারফত সন্তানকামনায় একটি মাদুলি সে গোপনে সংগ্রহ করিয়াছে। বোসসায়েব ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছু জানেন না। এত ঘটা করিয়া লক্ষ্মীপূজা করিবার ইহাও একটা কারণ। যিনি মাদুলি দিয়াছেন তিনি লক্ষ্মীপূজা ও করিতে বলিয়াছেন। আজ বৃহস্পতিবার, শৈল উপবাস করিয়া লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতেছে ; এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল যে, মিস মল্লিক বাহিরের ঘরে আসিয়াছে, সাহেব তাঁহাকে সেলাম দিতে বলিলেন। শৈল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, “বাইরের ঘরে আর কেউ আছে ?”

“না।”

“এই আলপনাটুকু দিয়ে যাচ্ছি আমি। বল্ গে যা, আমার হাত জোড়া।”

বেয়ারা চলিয়া গেল। শৈল খানিকক্ষণ আলপনা দিল। কিন্তু তাহার নারীপ্রকৃতি এই শিক্ষিতা এবং গীতবিদ্যা-পারদর্শিনী মহিলাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। আলপনা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে উঠিয়া পড়িল এবং হাত ধুইতে লাগিল। কিন্তু ড্রয়িং রুমে তাঁহাকে যাইতে হইল না, বোস সাহেব মিস্ মল্লিককে সঙ্গে করিয়া ভিতরেই আসিয়া হাজির হইলেন এবং ইংরেজী-কেতায় পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, “আপনারা তা হ'লে আলাপ করুন, আমার কতকগুলো ফাইল ক্লিয়ার করতে হবে, আমি একটু আপিস-ঘরে যাই। এক্স্‌কিউজ্ মি মিস্ মল্লিক—”

বোস সায়েব সহাস্যে 'নড্' করিয়া চলিয়া গেলেন। বেলা তাঁহার স্বাভাবিক রীতিতে অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সবিস্ময়ে শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। এত উগ্র সাহেবের পট্টবস্ত্র-পরিহিতা পত্নী! আলপনা দিতেছে!

শৈল হাসিমুখে বলিল, “চলুন, আমরা ওপরে যাই।”

“চলুন।”

উভয়ে উপরে চলিয়া গেল।

৩৯

সেদিন হইতে শঙ্কর আর মিষ্টিদিদির কাছে যায় নাই। ঔদাসীন্য ইহার কারণ নয়, বরং ঠিক উল্টা, আগ্রহাতিশয্যের অতি-প্রবণতার প্রতিক্রিয়া। ধাবমান তুরঙ্গ ছুটিতে ছুটিতে সহসা সম্মুখে অতলস্পর্শী অলঙ্ঘনীয় গহ্বর দেখিয়া যেমন

সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, বিহ্বল শঙ্করও তেমনি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। অগ্রসর হওয়া নিরাপদ মনে হইতেছিল না, কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা এবং মোহ তাহাকে প্রলুব্ধও করিতেছিল! এতদিন রিণিই তাহার অন্তর-দেশ আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মানস বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপরূপ সুর সৃষ্টি করিতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে রিণিকে ঘিরিয়াই নানা বিচিত্র স্বপ্ন তাহার কল্পলোককে আবেশময় করিয়া তুলিতেছিল—মিষ্টিদিদি তাহার মনোজগতে কোন বিপ্লব সৃষ্টি করেন নাই। মিষ্টিদিদি এতদিন নিতান্তই বাহিরের পরিজন ছিলেন এবং রিণির জন্যই শঙ্কর মিষ্টিদিদির সঙ্গকামনা করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন মুখে না বলিলেও হাব-ভাবে আকার-ইঙ্গিতে মিষ্টিদিদি যেন নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্তত শঙ্করের তাহাই মনে হইয়াছে। মিষ্টিদিদির এই স্বরূপ এতই ভয়ঙ্কর ও মনোরম, এতই অপ্রত্যাশিত অথচ স্বাভাবিক, এতই প্রচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট, এতই লোভনীয় ও অনুচিত যে শঙ্কর দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। এত দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে যে, এ কয়দিন সে কিছুই করিতে পারে নাই। দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু তাহা যন্ত্রচালিতবৎ। ক্লাসে যাইতেছে, লেকচার শুনিতেছে, প্র্যাকটিকাল ক্লাস করিতেছে, পরিচিত লোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তাও বলিতেছে—কিন্তু আসলে মনে মনে সে এই অতলস্পর্শী গহবরটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্তত করা ছাড়া আর কিছুই করিতেছে না।

বাড়িতেও চিঠি লেখে নাই। বাড়ি হইতে বাবার পত্র পাইয়াছে যে, এখন মাকে কলিকাতায় লইয়া আসা সম্ভবপর হইবে না। এ পত্র পাইয়া সে নিশ্চিন্তই হইয়াছে। নিজের মায়ের এই নিদারুণ অসুখেও সে উদ্বিগ্ন হইতে পারিতেছে না ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিত হইতেছে, নিজেকে ধিক্কার দিতেছে, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিতেছে না। চিন্তিত হইবার ভান করিয়া একখানা পত্র লিখিবে ভাবিয়াছে, তাহাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। অর্থাৎ কোন কিছু করিবার মত মানসিক সক্রিয়তা তাহার নাই। তাহার সম্মোহিত মন একটা অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার ঘূর্ণিপাকে যেন তলাইয়া গিয়াছে, সহজভাবে কোন কিছু করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে। রিণিকে দেখিবার প্রবল বাসনা সত্ত্বেও সে রিণিদের বাড়ি আর যায় নাই। শুধু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে যায় নাই তাহা নহে, মনে মনে সে প্রলুব্ধ হইয়াছে তো! মনের কাছে কিছুই তো অগোচর নাই। নিজের মনের এই দুর্ব্বলতায় নিজের কাছেই সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে এবং নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে বলিয়াই রিণির নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে। নিজের সঙ্কোচ তো আছেই, তাহার উপর মাঝে মাঝে ইহাও তাহার মনে হইতেছে যে, হয় তো তাহার চোখে মুখে ব্যবহারে রিণি তাহার অপরিচ্ছন্ন মনের পরিচয় পাইবে, হয়ত ভাবিবে—কি ভাবিবে তাহা আর শঙ্কর ভাবিতে চাহে না, জোর করিয়া অন্য কিছু ভাবিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কল্পনার সঙ্গে জবরদস্তি চলে না। রিণির বিস্মিত ব্যথিত নির্ব্বাক মুখচ্ছবি মানসপটে ফুটিয়া ওঠে। মনে হয়, রিণি যেন তাহার কলুষিত সত্তার পানে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া আছে, কিছু বলিতেছে না। তাহার চোখের দিকে আর সে তাকাইতে পারে না। কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। রিণি তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেছে ইহা চিন্তা করা তাহার পক্ষে অসহ্য। কল্পনার আকাশ-কুসুমে ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা, সামান্যতম গ্লানিও স্পর্শ করিতে পারিবে না ইহাই ছিল আদর্শ। সেই আদর্শকে সহসা মলিন দেখিয়া শঙ্কর শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজ রবিবার। সমস্ত দিন কিছু করিবার নাই। গত কয়েক দিন ক্লাস প্রভৃতি লইয়া সময়টা একরূপ কাটিয়া গিয়াছে, আজ এই অস্বস্তিকর অবকাশ তাহাকে পীড়ন করিতেছে।

আশ্চর্য্য মানুষের মন। একই মন তাহাকে কত রকম পরামর্শই না দিতেছে। কত পরস্পর-বিরোধী যুক্তি একসঙ্গে একনিশ্বাসে বলিতেছে ও খণ্ডন করিতেছে। তাহার মনে পড়িল অনেক দিন আগে সে একবার যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তাহাতে দ্বিধাগ্রস্ত নায়কের সম্মুখে সুমতি-কুমতির তর্ক শ্রবণ করিয়া ভাবিয়াছিল এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড। যাহা কর্ত্তব্য, যাহা ন্যায়সঙ্গত তাহা যে-কোন সুস্থ ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে করিবে। শুধু যে উচিত বলিয়াই করিবে তাহা নয়, করিয়া আনন্দ পাইবে বলিয়া করিবে। সুস্থ সবল ব্যক্তির মনে সুমতিরই স্থান আছে, কুমতির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। নিজেকেও সে

এতদিন সুস্থ সবল বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ সে নিজের মনের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে শুধু সুমতি কুমতি নয়, বহু প্রকার মতি আসিয়া ভীড় করিয়াছে এবং সকলের যুক্তিই সে সমান আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার কার্য্যের সমর্থক একটা যুক্তিই কিন্তু ক্রমশ মনের মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। বৈজ্ঞানিক মন লইয়া সে ভাবিতেছিল নিছক পুরুষত্বের জন্য লজ্জিত হইবার কি আছে! যে লোলুপ কামনা তাহার মনের মধ্যে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রেরণা জোগাইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কতক্ষণ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারে। সমাজ, সংস্কার—সমস্তই কৃত্রিম। কৃত্রিমতার জবরদস্তিতে অকৃত্রিম পৌরুষকে, বলিষ্ঠ যৌবনের ন্যায্য দাবীকে অস্বীকার করিবার কোন সঙ্গত হেতু নাই।

আর একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল। মিষ্টিদিদিকে সে যাহা ভাবিতেছে, তিনি তাহা না-ও হইতে পারেন। জোলা, মোপা সাঁ পড়িলেই যে খারাপ হইতে হইবে অথবা কতকগুলি ছবি গোপনে রাখিলেই যে নিঃসন্দেহে তাহা দুশ্চরিত্রের প্রমাণ-স্বরূপ ধরিয়া লইতে হইবে এমন কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। নিছক আর্ট-প্রীতির বশেই এসব করা অসম্ভব নহে। অকারণে হয়তো সে···। তাহার মনের মধ্যে একটা লুব্ধ পশু, একটা ক্ষুব্ধ ঋষি এবং একটা আর্ত্ত প্রেমিক পাশাপাশি বসিয়া তিন রকম চিন্তা করিতে লাগিল। প্রেমিক চিন্তা করিতেছিল না, ধ্যান করিতেছিল, প্রার্থনা করিতেছিল—এ সমস্তই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মিলাইয়া যাক। নির্ম্মল মনের মধ্যে রিণির হাস্যস্নিগ্ধ সলজ্জ মুখখানি সগৌরবে আবার বিরাজ করিতে থাকুক।

সহসা বাহিরে পদশব্দ হইল।

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল মিষ্টিদিদির বালক ভৃত্যটি পত্র লইয়া আসিয়াছে। সেলাম করিয়া জানাইল, মাইজি জবাব চাহিয়াছেন।

শঙ্কর খুলিয়া পড়িল—

শঙ্করবাবু,

এর মধ্যেই যে পুরোদস্তুর জামাই হয়ে উঠলেন দেখছি! নেমন্তন্ন না করলে আর আসাই হয় না। রিণি বেচারা কয়েক দিন থেকে মন-মরা হয়ে আছে, আমার কথা আর না-ই বললাম। উনি কাল এক বন্ধুর সঙ্গে গিরিডি গেলেন এই উইক্‌-এণ্ডটা কাটিয়ে আসতে। ভারি একা লাগছে আমাদের। আজ সন্ধে বেলা আসবেন নিশ্চয়ই। খাওয়া দাওয়া এখানেই করবেন। আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাঁকে ফোন ক'রে আজ রাত্তিরের মত ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছি। আসবেন কিন্তু নিশ্চয়ই। কটা নাগাদ আসবেন এর মারফত জানাবেন। প্রস্তুত থাকবো। ইতি

চাকরের হাতেই জবাব দিতে হইল, বেশীক্ষণ গবেষণা করিবার অবসর মিলিল না। লিখিয়া দিল সন্ধ্যা সাতটায় যাইবে। ব্যাপারটার একটা সুনিশ্চিত মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় মনের ভার লাঘব হইয়া গেল। টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া সে অপটুভাবে শিস দিতে লাগিল।

৪০

ওরিজিনাল অর্থাৎ দশরথ সাইকেলের দোকানে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার বেশ-বাস ঠিক আগের মতই। টাইট ফিটিং গলা-বন্ধ, চকোলেট রঙের সোয়েটার, খাকি হাফপ্যাণ্ট, পায়ে আজানু কপিল-বর্ণের মোজা, মাথায় কান-ঢাকা কালো রঙের টুপি। প্রতিদিনকার অভ্যাসমত তিনি চেয়ারে বসিয়া গড়গড়া হইতে ধূমপান করিতেছিলেন।

ভন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল। ভন্টুরও সেই সাবেক মূর্ত্তি। মালকোচা-মারা, গায়ে বুকখোলা জামা এবং পার্শ্বে সাইকেল। ভন্টু যথাবিধি নমস্কার করিয়া (ওরিজিনালের পায়ের ধুলা লইবার ইচ্ছা এবং সাহস ভন্টুর কোন দিন হয় নাই) বিনীত ভদ্রভাবে বলিল, "লক্ষণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।"

ওরিজিনাল কোন উত্তর না দিয়া একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ভন্টুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভন্টু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের চোখ দুইটি লাল, হঠাৎ মনে হয় চোখ উঠিয়াছে। হয়তো বরাবরই তাঁহার চক্ষুর বর্ণ এইরূপ, কারণ ভন্টু ইতিপূর্ব্বে এত কাছে আসিয়া তাঁহার চক্ষু

লক্ষ্য করিবার সুযোগ পায় নাই। ওরিজিনালকে চিরকালই সে দূরে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। লক্ষণবাবুর সহিতই তাহার কারবার এবং তাহা এ যাবৎ ওরিজিনালের অগোচরেই হইয়াছে। গত তিন-চার দিন হইতে সে কিন্তু লক্ষণবাবুর পাত্তা পাইতেছে না। নিবারণবাবুর চায়ের দোকানে রাত্রি দশটাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ভন্টু দেখিয়াছে, লক্ষণবাবু সন্ধ্যার সময় আসেন না। লক্ষণবাবুর বাড়িটাও ঠিক কোনখানে তাহা ভন্টুর জানা নাই। সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত আলাপ হইয়াছিল এবং প্রয়োজন হইলে এই সাইকেলের দোকানেই তাহার সহিত দেখা হইত। গত দুই দিন হইতে কিন্তু প্রোটোটাইপের দেখা নাই। হয়তো তাহার দোকানের ডিউটির সময় বদলাইয়াছে, হয়তো আজকাল সে সন্ধ্যায় না আসিয়া দুপুরে আসিতেছে। ব্যাপারটা ঠিক জানিয়া লওয়া দরকার, কারণ সাইকেলটি পুনরায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে প্রোটোটাইপের হদিস্ না পাইলে হাঁটিয়া আপিস যাইতে হইবে। নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাই আজ ভন্টুকে ওরিজিনালের সম্মুখবর্ত্তী হইতে হইয়াছে।

ওরিজিনাল কোন উত্তর দিলেন না।

রক্তচক্ষু মেলিয়া ভন্টুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভন্টু অস্বস্তি-বোধ করিতে লাগিল এবং পুনরায় সবিনয়ে বলিল, "লক্ষণবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল!"

"আমি কি লক্ষণবাবু?"

এ প্রশ্নের জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর সে অবিলম্বে দিল, "আজ্ঞে না—"

"তাহলে আমার কাছে ঘুরঘুর করছেন কেন?"

"লক্ষণবাবু কখন দোকানে আসেন তাই জানতে চাইছিলাম!"

"তিনি দোকানে আর আসেন না, আসবেনও না!"

"কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে তা হ'লে?"

"দেখা হবে না—"

ওরিজিনাল আবার তাঁহার গড়গড়ায় মন দিলেন।

ভন্টু বুঝিল এখন সুবিধা হইবে না, ভদ্রলোক চরম তিরিক্ষি হইয়া রহিয়াছেন। সে সাইকেলটি ঠেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল—ওরিজিনাল বলিলেন, "লক্ষণবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে নাকি?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তা হ'লে বসুন ওইখানে—"

ওরিজিনাল বাম হস্ত দিয়া তাঁহার গোঁফদাড়িটা একবার চুমরাইয়া লইলেন এবং নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে দোকানের সম্মুখে ফুট-পাথের উপর যে টিনের চেয়ারটি ছিল সেইটি দেখাইয়া পুনরায় বলিলেন, "ওইটে একটু এদিকে টেনে এনে বসুন। সাইকেল সারাবেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু এখন নয়, পয়সা সঙ্গে নেই। কত পড়বে সেইটে লক্ষণবাবুর কাছে জেনে নিতে এসেছিলাম।"

"আমি বলে দিচ্ছি। যে সাইকেলের দোকানে লক্ষণবাবু নেই সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?"

নীরব থাকাই ভন্টু সমীচীন মনে করিল।

ওরিজিনাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "বলুন আপনি, সে সাইকেলের দোকান কি চলছে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চলছে বই কি।"

ওরিজিনাল তাঁহার রক্তচক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গড়গড়ায় সুদীর্ঘ একটি টান দিলেন এবং আদেশ করিলেন, "মটরা, সাইকেলটা তুলে দেখ্, কি কি করতে হবে আর কত পড়বে। আপনি বসুন, চেয়ারটা আর একটু টেনে আনুন এদিকে!"

পিছনের ঘর হইতে লুঙ্গি-পরা মটরা বাহির হইয়া আসিয়া ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই সাইকেলটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ওরিজিনালের ধমকে নিরস্ত হইল। ওরিজিনাল দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "সাইকেলটা দোকানের ওপর তুলতে কি কষ্টবোধ হচ্ছে বাবুর! গতরে কি আগুন লেগেছে হুজুরের?"

মটরা অবিলম্বে সাইকেলটা দোকানের উপর তুলিয়া ফেলিল এবং কাঠের আলনার মত জিনিসটার উপর চাপাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ভন্টু বলিল, "সামনের চাকার টায়ার-টিউব দুটোই নষ্ট হয়েছে, পেছনের চাকার য়্যাক্‌সেলের নাট্‌টাও বদলাতে হবে।"

"এখন থাক, পয়সা সঙ্গে আনি নি—"

"বেশ তো, কাল পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবেন, কটার সময় চাই কাল?"

"কাল সকালবেলা পেলেই ভাল হয়।"

"বেশ, সকালেই পাবেন, তৈরি থাকবে।"

মটরা বলিল, "নতুন টায়ার ফুরিয়েছে—"

"চৌধুরীর ওখান থেকে নিয়ে এস গিয়ে। যাও, এখুনি যাও, কাল সকালেই ওঁর চাই।"

"সিলিপ্ দেবেন ?"

"এক ডজন টায়ারের অর্ডার আমার দেওয়াই আছে, গেলেই পাবে তুমি, পা চালিয়ে যাও।"

মটরা চলিয়া গেল।

ওরিজিনাল গড়গড়ায় মন দিলেন। ভন্টুও উঠিবে কি-না ভাবিতেছিল, এমন সময় ওরিজিনাল তাহাকে একটি কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন।

"পৃথিবীতে ক'রকম লোক আছে জানেন ?"

মঙ্গোলীয়, ককেশিয়, নিগ্রো প্রভৃতি কয়েক রকম শ্রেণীবিভাগের কথা ভন্টু পাঠ করিয়াছিল বটে কিন্তু সব তাহার মনে ছিল না। নিজের বিস্মরণশক্তিরও পরিচয় দিবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং সে সাধারণভাবে বলিল, "অনেক রকম।"

"অনেক রকম নয়, দু'রকম—জুয়াচোর আর খাঁটি !"

ভন্টু স্তম্ভিত হইয়া ওরিজিনালের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। ওরিজিনাল বলিয়া চলিলেন, "জুয়াচোরের সংখ্যাই অধিক, খাঁটির সংখ্যা অল্প। অল্প কয়েকটি খাঁটি লোক এক দঙ্গল জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে অহরহই কষ্ট পাচ্ছে, এইটেই হল সার কথা।"

এই সার কথা শুনিবার জন্য ভন্টু প্রস্তুত ছিল না, আগ্রহও ছিল না। কিন্তু ওরিজিনালকে কথায়বার্ত্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে হয়তো সুবিধা হইতে পারে এই ভাবিয়া সে তাহার প্রিয় বচনটির পুনরুক্তি করিল। এই জাতীয় লোকের কাছে এই বচনটি আওড়াইয়া ভন্টু প্রায়ই সুফল পাইয়াছে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে, মহাভারতের আমল থেকে এ ঘটনা ঘটে আসছে।"

ওরিজিনালও মহাভারত হইতে উদাহরণ আহরণ করিয়া বলিলেন, "গোটা মহাভারতে মাত্র দুটি খাঁটি লোকের দেখা পাবেন, দুর্য্যোধন আর ভীম। বাকী সব জুয়াচোর—"

ভন্টু আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, উঠিয়া ওরিজিনালের পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

"ও কি—"

"পায়ের ধুলো নিলাম আপনার, এমন ভাল কথা একটা শোনালেন !"

ওরিজিনাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভন্টুর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, বুঝিবার চেষ্টা করিলেন যে ভন্টু ব্যঙ্গ করিল কি-না। কিন্তু ভন্টু সুদক্ষ অভিনেতা, সমস্ত মুখচ্ছবিতে এমন একটা গদগদ শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া তুলিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ওরিজিনাল মনে মনে পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন দেখিয়া ভন্টু বলিল, "ওর জন্যে কিছু মনে করবেন না, আপনি লক্ষ্মণবাবুর বাবা, আপনার পায়ের ধুলো নিলে দোষ আর এমন কি আছে। লক্ষ্মণবাবু আমার বন্ধু—"

ওরিজিনাল মুখ ফিরাইয়া গড়গড়াতে আর একটা টান দিলেন এবং তাহার পর বলিলেন, "আপনার বন্ধুটি একটি প্রকাণ্ড জুয়াচোর ছিলেন—"

"কে, লক্ষ্মণবাবু ?"

"হ্যাঁ, লক্ষ্মণবাবু !"

"মানে—"

"মানে, আমি তাদেরই জুয়াচোর বলি, যাদের মনে মুখে এক নয়, যারা ভাবে একরকম, করে আর একরকম। গাটকাটাদের আমি জুয়াচোর বলি না, তারা খাঁটি লোক !"

জুয়াচোরের এবম্বিধ সংজ্ঞা ভন্টু এই প্রথম শুনিল। তাহার ইচ্ছা হইল ওরিজিনালের আর একবার পদধূলি সে লয়, কিন্তু ওরিজিনালের কথা-বার্ত্তায় এমন একটা আন্তরিকতা ক্রমশ ফুটিয়া উঠিতেছিল যে তাঁহাকে অপদস্থ করিতে ভন্টুর আর ইচ্ছা হইল না। ওরিজিনাল গড়গড়ায় আবার একটি টান দিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি বেশ্যাসক্ত। রীতিমত মাইনে দিয়ে একজন রক্ষিতাকে আমি রেখেছি, তার কারণ স্ত্রীবিয়োগের পর দেখলাম ওসব সংযম টংযম আমার দ্বারা পোষাবে না, বিয়ে করাও পোষাবে না—তাই আইনত যেটা অন্য উপায় আছে সেইটেই আমি নিলাম। পেটে খিদে মুখে লাজ এরকম ভণ্ডামির কোন মানে আমি বুঝি না। এতে কি যে এমন চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যায় তাও আমার মাথাতে আসে না। তুইও একটা রাখলে পারতিস, যার তার আনাচে কানাচে অমন ছুং ছুং করে না বেড়িয়ে পছন্দমত একটা মেয়েমানুষ রাখলেই পারতিস ! টাকার

তো অভাব ছিল না, ন্যায্য খরচে আমি আপত্তিও করিনি কোনদিন—"

ওরিজিনাল পুনরায় গড়গড়ায় কয়েকটা টান দিলেন।

ভন্টু অবাক হইয়া শুনিতেছিল। ওরিজিনালের এই স্বীকারোক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য সে কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ ওরিজিনাল বলিয়া উঠিলেন, "জুয়াচোর, পাজি, নচ্ছার! এতকাল খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এত বড় একটা দাগা দিতে লজ্জা করল না ওর! উনি আবার লেখাপড়া শিখেছিলেন, কচু শিখেছিলেন! গ্র্যাজুয়েট! ঝাড়ু মারি আমি অমন গ্র্যাজুয়েটের মাথায়!"

ভন্টু ভাবিল, প্রোটোটাইপ নিশ্চয় কিছু টাকা মারিয়া সরিয়াছে। কি ভাবে কি ঘটিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া সহসা ভন্টু লক্ষ্য করিল যে, ওরিজিনালের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং তিনি নিস্পলকভাবে সামনের দেওয়ালটার দিকে চাহিয়া আছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ভন্টু বলিল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।"

ওরিজিনাল হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

"খাঁটি লোকের কথা জুয়াচোরেরা বুঝতে পারে না, আপনি বুঝবেন কি করে! আপনি তো লক্ষণেরই বন্ধু! আমার এই পোষাক দেখে আপনারা হাসেন, কিন্তু আমার শীত করে বলে এই পোষাক আমি পরি। লোকের মন রাখবার জন্যে আপনার মতো বুকখোলা জামা পরে শীতে কেঁপে মরি না। আপনাদের মতো মরাল সেজে ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকি না—সোজা বেশ্যাবাড়ী যাই। আমি খিদের সময় চাই খাবার, চা নয়। চটলে লাথি মারি, ভালোবাসলে জড়িয়ে ধরি। ঢাকঢাক্ গুড়গুড় পছন্দ করি না। আমার কথা আপনারা বুঝবেন না। কোনও জুয়াচোরই কোন খাঁটি লোকের কথা কখনও বোঝেনি, বুঝতে পারবে না, পারবে না, পারবে না—"

ওরিজিনাল প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ভন্টু ভয় পাইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া ওরিজিনালের হাত দুইটি ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "আপনি অমন করছেন কেন, কি হয়েছে খুলে বলুন না, লক্ষ্মণবাবু কি করেছেন—"

"রাসকেল, আত্মহত্যা করেছে, ভেবেছে আমাকে দমিয়ে দেবে! কিন্তু দমবার ছেলে আমি নই—"

ওরিজিনাল দুই হাত দিয়া চক্ষু দুইটি কচলাইতে লাগিলেন।

নির্ব্বাক ভন্টু দাঁড়াইয়া রহিল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

৪১

শঙ্কর দ্রুতবেগে পথ অতিবাহন করিতেছিল।

এত দ্রুতবেগে যে, মনে হইতেছিল কেহ তাহাকে তাড়া করিয়াছে, সে ছুটিয়া পলাইতেছে। যে পথে সে চলিতেছিল তাহা অপেক্ষাকৃত জন-বিরল, যান-বাহনের তেমন ভীড় নাই, থাকিলে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল না, কারণ শঙ্কর পথ দেখিয়া চলিতেছিল না। আত্মরক্ষার জন্য, যে অদৃশ্য শত্রুটা তাহাকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শঙ্কর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য ঠিক নাই, গন্তব্যপথ অনির্দ্দিষ্ট, কোথাও পলাইয়া লুকাইতে পারিলেই সে যেন বাঁচে। কিন্তু ইহাও সে বুঝিতেছে কোথাও পলাইবার তাহার উপায় নাই, কোথাও লুকাইয়া সে নিস্তার পাইবে না, কারণ শত্রু নিজের মধ্যেই রহিয়াছে; যে বৃশ্চিকটা তাহাকে দংশন করিয়াছে তাহার বাসা তাহার হৃদয়-বিবরেই, অন্য কোথাও নহে। কিন্তু ছি ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা, কি অপরিসীম লজ্জা—রিণি দেখিয়া ফেলিয়াছে! তাহার মহিমার ছদ্ম মুখোসটা খুলিয়া যে মুহূর্ত্তে ক্লিন্ন কদর্য্য পশুটা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রিণি তাহার স্থূল রূপটা দেখিয়া ফেলিয়াছে। উত্তেজনার আধিক্যে ওদিক্কার জানালাটা বন্ধ করা হয় নাই।

এতদিনকার সাধের প্রাসাদ নিমেষের মধ্যে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অতর্কিতে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্প আসিয়া সব যেন ওলোট পালোট করিয়া দিয়াছে, কোন কিছুর উপর নির্ভর করিবার আর যেন সাহস নাই। এতদিনকার সমস্ত নীতি, সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত যুক্তি, সমস্ত শক্তি অপ্রত্যাশিত প্লাবনে কোথায় যেন তলাইয়া গিয়াছে; যে ভিত্তির উপর মন এতকাল পরম নির্ভরতার সহিত দাঁড়াইয়া ছিল সহসা সেই ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে, যাহাকে ভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল এখন দেখা যাইতেছে তাহা বিরাটাকার অন্ধ একটা সরীসৃপের কুণ্ডলীকৃত ক্লেদাচ্ছন্ন দেহ নড়িয়া চড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অকস্মাৎ জীবনের সমস্ত পটভূমিকাই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যে রিণিকে পত্নী কল্পনা করিয়া সে এতদিন, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পর্য্যন্ত স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে নীত হইতেছিল, সেই রিণিকে সে আর জীবনে মুখ দেখাইতে পারিবে না। যে মিষ্টিদিদি এই খানিকক্ষণ আগে পর্য্যন্ত তাহার অত্যন্ত আপন জন ছিলেন তাঁহাকে সে জীবনে ক্ষমা করিতে পারিবে না। মিষ্টিদিদির একারই দোষ? তাহার নিজের লোভ ছিল না? ছিল বই কি। কিন্তু মিষ্টিদিদি না থাকিলে তাহা এমন কুৎসিত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিত না। স্ফুলিঙ্গ হয়তো ছিল, মিষ্টিদিদি তাহাকে দাবানলে পরিণত করিয়াছেন; ওই ক্ষুধিতা রমণীটির আকস্মিক কামনার ঝটিকায় লেলিহান শিখা আকাশ-বিসর্পী হইয়া উঠিয়াছে। মিষ্টিদিদির প্রতি নিদারুণ ঘৃণায় তাহার সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবু সে মিষ্টিদিদিকে ভুলিতে পারিতেছিল না। দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে অচেতন মন মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন ছিল। সেই দৃশ্যটি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না—সেই অতিশয় ঘৃণ্য চারু চিত্রটি—পরম রমণীয় অথচ পরম গ্লানিকর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতাটি—সেই—

সহসা শঙ্কর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কোথায় চলিয়াছে সে! মনে হইতেছে যেন এ রাস্তায় সে আর কখনও আসে নাই। কোন্ গলি এ! গলিটা হইতে বাহির হইয়া সে সার্কুলার রোডে আসিয়া পড়িল। সম্মুখেই দেখিল সমাধিক্ষেত্র, যে সমাধিক্ষেত্রে কবি মধুসূদন সমাহিত রহিয়াছেন। সে অন্যমনস্কভাবে ভন্টুর বাড়ীর উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিয়াছিল; কিন্তু এখন দেখিল বেলেঘাটার মোড় ছাড়াইয়া অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছে। রাস্তাটা পার হইয়া সে সমাধিক্ষেত্রের পাশে আসিয়া একবার দাঁড়াইল, একবার ইচ্ছা হইল সমাধিক্ষেত্রের ভিতর ঢুকিয়া মধুসূদনের সমাধির পাশে খানিকক্ষণ বসে। কবি মধুসূদনের জীবনেও নানা দুঃখ নানা মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিল, হয়তো জীবনের পরপারে গিয়া তিনি সান্ত্বনা পাইয়াছেন, হয়তো সে সান্ত্বনার ক্ষীণতম আভাস অন্ধকারে মৌন সমাধির ধারে একা কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে পাওয়া যাইবে। শঙ্কর আর একটু গেল, গিয়া দেখিল গেট বন্ধ। গেটের সামনে সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল তাহা সে নিজেও জানে না ··· চেতনা হইলে হঠাৎ সে দেখিল ওদিকের ফুটপাথে চলমান একটি নারীমূর্ত্তির পানে সে সাগ্রহে চাহিয়া আছে। আঁটসাঁট পোষাকপরা একটি মেম সাহেব ওদিকের ফুটপাথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে এবং তাহার অন্তর-গুহা-বাসী নারী-দেহ-লুব্ধ পশুটা তাহারই চোখ দিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নারী-মূর্ত্তি চলিয়া গেল, শঙ্কর সহসা স্থির করিল, ভন্টুর বাড়ি সে আর যাইবে না। তাহার কলুষিত মন লইয়া সে আর বউদিদির সম্মুখীন হইতে পারিবে না। ভন্টুর সম্মুখেই বা সে দাঁড়াইবে কি করিয়া! অন্যমনস্ক উদ্‌ভ্রান্ত শঙ্কর আবার হন্ হন্ করিয়া হাঁটিতে সুরু করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারাস্তা নানাগলি অতিক্রম করিয়া শঙ্কর আবার সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিল একটা ল্যাম্প পোষ্টের ধারে একফালি সরু বারান্দার উপর রঙীণ কাপড় পরা কয়েকটি মেয়ে হাসাহাসি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে আবার একজন কোমরে হাত দিয়া সিগারেট খাইতেছে। দৃশ্যটা শঙ্করের কেমন দৃষ্টিকটু লাগিল, সে একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মেয়েটির পানে চাহিল। শঙ্করকে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া মেয়েগুলিও তাহার পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। যে মেয়েটি সিগারেট খাইতেছিল সে আরও একটু কায়দা করিয়া মুখ তুলিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল। একটি মেয়ে বঙ্কিম ভঙ্গীতে অল্প একটু অন্ধকারে বারান্দার উপর দাঁড়াইয়াছিল সে রাস্তায় নামিয়া আসিল এবং শঙ্করের দিকে চকিতে একবার চাহিয়া সঙ্গিনীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর একজন সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল, "আমার খোঁপাটা একটু ঠিক করে দে তো, বারবার এলিয়ে যাচ্ছে।"

সঙ্গিনী খোঁপা ঠিক করিয়া দিল।

মেয়েটি আবার শঙ্করের দিকে ফিরিয়া চাহিল ও আবার একটু হাসিল। শঙ্কর অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শঙ্করকে এমন বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই চটুলা মেয়েটিই প্রশ্ন করিল, "আপনি কাউকে খুঁজছেন?"

শঙ্কর আগাইয়া গেল এবং মেয়েটির মুখের পানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া বলিল, "আপনি কি ১৮ নং কেরানীবাগানে থাকেন?"

'আপনি' শুনিয়া মেয়েটি গম্ভীর হইয়া গেল। তাহার পর আবার চোখ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কেন বলুন তো !"

শঙ্কর কিছু বলিতে পারিল না; তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন তাহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নিদারুণ তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

শঙ্কর সহসা বলিয়া ফেলিল, "আমাকে একগ্লাস জল খাওয়াতে পারেন ?"

"খুব পারি, আসুন —"

মেয়েটির পিছন পিছন শঙ্কর অগ্রসর হইল।

বাকী মেয়েগুলির মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "মুক্তোটার কপাল ভাল, আমাদের আর কতক্ষণ ভোগান্তি আছে কে জানে বাপু !"

আর একজন একটু হাস্যতরল কণ্ঠে বলিল, "ওলো মুক্তো, শুধু জল দিসনি, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিস বাবুকে।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই মুক্তো প্রশ্ন করিল, "আমার ঠিকানা জানলেন আপনি কি করে ?"

"আপনারাই দিয়েছিলেন।"

"কবে ?"

"কিছুদিন আগে হাওড়া স্টেশনে। আমাকে আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলেন, ভুলে গেলেন ?"

মুক্তো হাসিয়া বলিল, "ভুলে গেছি —"

"আপনি হাওড়া স্টেশনে মূর্চ্ছা যান, আমি আপনার মুখে জল দিয়ে মূর্চ্ছা ভাঙাই। আপনার সঙ্গে আরও যেন কে ছিলেন একজন !"

মুক্তো মন দিয়া কথাগুলি শুনিল; তাহার পর ভঙ্গীভরে স্কন্ধযুগল ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া আবার নামাইয়া লইয়া বলিল, "মনে নেই— "

"অতবড় একটা ঘটনা ভুলে গেলেন ? বেশীদিনের তো কথা নয়—"

মুক্তোর সমস্ত মনে ছিল, কিন্তু সে স্বীকার করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "শুধু জল খাবেন ? খাবার টাবার—"

"না, শুধু একগ্লাস ঠাণ্ডা জল।"

ঘরেই কুঁজোয় জল ছিল, মুক্তো কাচের গ্লাসে ঢালিয়া দিল এবং শঙ্কর তাহা ঢকঢক করিয়া পান করিয়া ফেলিল।

"কতক্ষণ বসবেন ?"

"কতক্ষণ আর, এই খানিকক্ষণ, মানে আপনার কি অসুবিধে করছি ?"

"কিছুমাত্র না। ঘণ্টা পিছু দু'টাকা ক'রে লাগবে, এই আমার রেট—"

শঙ্কর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর বলিল, "ও—"

পকেট হইতে ব্যাগটা বাহির করিয়া দেখিল একটি দশ টাকার নোট রহিয়াছে, সেইটি বাহির করিয়া মুক্তোর হাতে দিতেই মুক্তো খিল খিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"বাবা, রাগ তো আপনার কম নয় দেখছি !"

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, "না, ছি, আপনি অতিথি মানুষ, আমাদের নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছেন বলছেন, আপনার কাছে কি টাকা নিতে পারি ! সব জায়গায় কি আর ব্যবসাদারি চলে ! দাড়িয়ে রইলেন কেন, বিছানায় বসুন না, আমি আসছি এক্ষুনি !"

মুক্তো বাহির হইয়া গেল।

একটু দেরি করিয়াই ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল ক্লান্ত শঙ্কর তাহার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মুক্তো নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বেল ফুল

এস-ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেণ্টাব), বার-এট-ল

গোলাপের গৌরব লিখে শেষ করা যায় না। ইরাণের অতুলনীয় কাব্য-সাহিত্য—সে ত গোলাপেরই গৌরব-গাথা!

ফুলদানীতে ক্রাইসিনথিমাম যেন নাট্যমঞ্চের এক প্রাইমাডোনার মতই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্তব-স্তুতির অপেক্ষায়। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সৌরভ তার নাই বটে, কিন্তু গঠনের লালিত্যে, সৌন্দর্য্যের অনুপমত্বে তার তুলনা কোথায়? জাপানের সৌন্দর্য্য-পিপাসা যদি তাতে তৃপ্ত হয়ে, থাকে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই!

শতদলের মহিমা কীর্ত্তন করেছেন ভারতবর্ষের অমর কবিরা। বাণী দেবীর রাতুল চরণ যে-ফুল তার বক্ষে ধারণ করে আসছে, তার তুলনা কোথায়?

আমার অন্তরকে দখল করেছে কিন্তু ক্ষুদ্র, অনাদৃত বেল ফুল। সব ফুলকে ছেড়ে তাকেই আমি ভালবাসি!

তরুণ কিশোরীর মতই তার নম্রতা!

সাধ্বী সতীর মতই সে নিরাভরণা!

জীবনের সুখ-দুঃখের চির-সঙ্গিনীর মতই মধুর তার সৌরভ!

শিল্পীর মনে অরূপের চারু-কল্পনার মতই তার অঙ্গমাধুরী!

পাঠক যাই বল, আর যাই ভাব, আমি বলি আমার বেল ফুলের তুলনা কোথায়!

আমি যদি আমার মানসীকে কখনও চর্ম্ম-চক্ষে দেখতে পাই, তাহলে সব ফুল ছেড়ে এই বেল ফুলের মালা দিয়েই তার সম্বর্দ্ধনা করব! খোদার কাছে কখনও আমার অন্তরের ভালবাসা নিভৃতে কোথাও মনের মতন করে যদি নিবেদন করতে চাই, তাহলে এই বেল ফুলের সাজি দিয়েই তা করব!

আর প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

তোমাদের ভদ্রতা দেখে সত্যই যদি কখনও আমার অন্তরের স্নেহ-তরঙ্গ নেচে উঠে, তা হ'লে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ এই বেল ফুল কিশোরীরাই বয়ে নিয়ে যাবে!

আমার এ-নিরাড়ম্বর উপহারকে তুচ্ছ মনে করো না। অকৃত্রিম ভালবাসার সেই হলো সুন্দরতম নিদর্শন!

'কি পুছসি হৃদয় সম্বাদ—'

বিদ্যাপতির পদাঙ্কানুশরণে বিদ্যাবিনোদ রচিত

সখি! কি পুছসি[১] হৃদয় সম্বাদ[২]।
যব[৩] কানু নাগর   চলল মথুরাপুর,
গেহ ভেল শূন,[৪] শূন ভেল সাধ॥
বিদগধ[৫] এ গোকুল,   সগরি[৬] আঁধার ভেল,
নিঙারি মরম করল হুতাশ।
সু-নীরব সারি শুক,   ধেনু হি মথুরামুখ,
গোপী গোপে বেঢ়ল[৭] দুঃখ হি পাশ॥
এ কান-বিরহে অব[৮]   পরাণ নাহি ধরব,
কাঁহে কহব মঝু[৯] এহ[১০] সন্তাপ।
না নিরখি কানু-ধনে   ধৈরজ না তন-মনে,
সাগর বারি মাঝ দেব কি ঝাঁপ॥

হোয়ব হাম মাধব,   হয়ব[১১] রাধা মাধব,
তবহি[১২] জানব বিরহক[১৩] বাধা—
ভনহু অব গোপাল,   পঁহু[১৪] মাধব পূরল,[১৫]
হৃদয়ক সব মনোরথ রাধা।

আনক[১৬] জনমে ভেল,   রাধা-কানু মি-ল-ল,
সোহি[১৭] পুন ধৈরজ ধরহ[১৮] রাধা॥

১। জিজ্ঞাসা করিতেছ। ২। সংবাদ। ৩। যখন। ৪। শূন্য হইল। ৫। বিদগ্ধ। ৬। সকলই। ৭। বেষ্টন করিল। ৮। এখন। ৯। আমার। ১০। এই।

১১। হইবে। ১২। তখনই। ১৩। বিরহের। ১৪। প্রভু। ১৫। পূর্ণ করিল। ১৬। অন্য এক। ১৭। সেইজন্যই, তাই। ১৮। ধর গো।

সাময়িকী

মেয়র মিঃ সিদ্দিকির মর্য্যাদাজ্ঞান—

সকল প্রকার অসহায় আশ্রয়হীন নরনারীকে কলিকাতার 'রেফিউজ' নামে প্রতিষ্ঠানটি আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সাহায্য করিয়া আসিতেছে। আগামী বাৎসরিক অধিবেশনে মেয়র মহাশয়কে সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করা হয়। মিঃ সিদ্দিকি ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সভার সভ্য তালিকায় একজনও মুসলমানের নাম না দেখিতে পাইয়া সভাপতিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এই অনুরোধ করিয়া নাকি তাঁহাকে অপমান করা হইযাছে। তাঁহার উক্তি এই (সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে লিখিত)

"Your colleagues on the Governing body will, I hope, forgive me if I do not permit myself to be humiliated by accepting the invitation of a body which take such scrupulous care to exclude Muslims from its organisation."

দেশবন্ধু স্মৃতি দিবসে কেওড়াতলা শ্মশানে সমবেত দেশবাসীবৃন্দ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কর্পোরেশন যাহাতে অর্থ সাহায্য না করে, তাহার তিনি ব্যবস্থাও করিবেন বলিয়াছেন।

'রেফিউজ'-এর নিয়মাবলী অনুযায়ী যে-কেহ মাসিক এক টাকা চাঁদা দিলে প্রতিষ্ঠানের সভ্য হইয়া থাকেন এবং এই সকল সভ্য হইতে কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। মুসলমানদিগের মধ্যে এই চাঁদা দিয়া কেহ ক্বচিৎ সভ্য হইয়া থাকেন। মুসলমান বাদে সহস্র সহস্র মুদ্রা এককালীন দান করিয়াছে প্রায় অন্য সকল জাতির লোকেরা। কিন্তু রেফিউজ কোনও মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীকে নিরাশ করে নাই। ১৯৩৯-৪০ সালেও ২৫জন মুসলমান আশ্রয় পাইয়াছেন এবং তাহার মধ্যে চারজন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে।

কোনও মুসলমান যদি মাসিক এক টাকা ব্যয় করিতে না পারেন, তবে তিনি রেফিউজের সভ্য হইবেন কিরূপে? যিনি সভ্য নন, তিনি কার্য্যকরী সমিতিতে যাইবার আশ করেন কেন? এককালীন দানে যখন কোনও প্রতিবন্ধক নাই, তখন মুসলমান সমাজ রেফিউজকে নিশ্চয়ই সাহায

করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ হিসাবের খাতা হইতে পাওয়া গেল না কেন ?

প্রতিষ্ঠান হইতে মুসলমান সমাজকে "scrupulous care" লইয়া বাদ দেওয়ার কোনও প্রমাণ নাই। ১৯৩২-৩৩ সালে একজন মাত্র মুসলমান ভদ্র মহোদয় সভ্য হন এবং তাঁহাকে ঐ সালে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি করা হয়। পরে আরও একজন মুসলমান ভদ্রলোক সভ্য হইলে তাঁহাকে কার্য্যকরী সমিতিতে গ্রহণ করিয়া সহকারী সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলে অসুস্থতার জন্য তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডে বালিকারা যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে

বর্ত্তমানে বাঙ্গলার প্রধান উজির মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এবং মিঃ এ, কে, এম, জেকারিয়া সাহেব উভয়েই মেয়র থাকাকালীন তত্তৎ বৎসরে রেফিউজের বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন। সুতরাং এখানেও মুসলমান সমাজের প্রতি কোনও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নাই।

কোনও সমিতিতে নিজ গোত্রের কোনও সভ্য না থাকিলে যে একবার সভাপতিত্ব করা যায় না, তাহা আমরা মনে করি না। বরং মনে হয়, ইহাতে অন্য জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে সকল সভ্য দেশেই এই প্রথা আচরিত হয়। ভিন্ন দেশ হইতে বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক আসিলে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত মহাসভার সভ্য তালিকায় ইংরেজ না থাকিলেও ইংরেজ সভাপতি করা চলে—যদিও তাহা একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও অ-মুসলমান তাঁহার স্বধর্ম্মী ছাত্র দৈবাৎ না থাকায় কন্‌ভোকেশনে প্রধান অতিথি হইতে যদি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সে অশিষ্টতা কি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ?

রেফিউজ যদি কোনও মুসলমানকে আশ্রয় না দিত এবং সাহায্য করিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে মিঃ সিদ্দিকি প্রদত্ত যুক্তির কতকটা সারবত্তা উপলব্ধি করা যাইত।

লণ্ডনে রাণী উইলহেলমিনা—ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের ডিন কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা

কোনও সভায় সভাপতিত্ব করা বা তাহা প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কিন্তু পূর্ব্বাপর কোনও দিক বিবেচনা না করিয়া মেয়রের মত লোকের মতামত দেওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ইহাতে মুসলমান প্রীতি প্রচার করা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহা যে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, শিষ্টাচারিক সকল বিধির বহির্ভূত হইয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

আমরা জানি না মেয়রকে রেফিউজের যে কার্য্য

বিবরণী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সম্পূর্ণ সভ্য-তালিকা ছিল কি না। যদি নাই থাকে, পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নাগরিক মহাশয়ের তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাৎসরিক সভার সভাপতিত্ব করা প্রত্যাখ্যান কি উচিত ছিল না ?

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি –

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের ভ্রাতা ডিউক অফ গ্লষ্টারের পত্নী যুদ্ধের কার্য্যের জন্য মহিলা সেবিকা সংগ্রহ করিতেছেন

মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভারত মহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মতান্তর ঘটিয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আর মনে করেন না, অহিংসভাবে বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ হইতে ভারতকে রক্ষা করা যাইতে পারে। ফলে মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের নীতি-নিয়ন্ত্রণের গুরুভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে চিন্তার কোনও কারণ নাই, কারণ এখন ঘর সামলাইবার পন্থা উদ্ভাবন করা ছাড়া কোনও কাজই নাই। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন যদি আবার নূতন ভাবে সুরু করিতে হয়—যাহার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে খুবই কম—তাহা হইলে দেশ কাহার নির্দ্দেশে চলিবে ? মহাত্মা গান্ধী ব্যতিরেকে কোনও আন্দোলন চলিতে পারে না, দেশের লোককে এই শিক্ষাই দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তিনি যদি কর্ণধার না থাকেন, তাহা হইলে নব আন্দোলনের রূপ দিতে পারেন এবং তাহা সুপথে চালাইতে পারেন এমন লোকের প্রয়োজন। কংগ্রেস এখনও স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে অহিংস অস্ত্র প্রকাশ্যে পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য হিংসামূলক উপায় অবলম্বন করিয়া, স্বাধীনতা লাভের জন্য অহিংস সংগ্রামের পরিকল্পনা কতদূর সম্ভব তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, মহাত্মার নিকট এই পরস্পরবিরোধী দুই পথ শীঘ্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে এবং তিনি কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন।

তদবস্থায় ভারতীয় আন্দোলনের গতি কোন্ পথ ধরিবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই বিচলিত করিবে। প্রথমে যথোপযুক্ত লোকের দারুণ অভাব। এই সে-দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যে পসার প্রতিপত্তি ছিল, তাহা আত্মকলহে এবং জননায়কদিগের পরস্পর মতবাদের বিরাট সমালোচনা প্রকাশ্যে পরিচালিত হওয়ায় নষ্ট হইয়াছে এবং জনসাধারণ মূল লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া এক একজন নায়ক বা লীডারের ব্যক্তিগত মতবাদের পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াইয়া নানা দল সৃষ্টি করিতেছে। যদিও সকলেই একমত হইয়া একযোগে কাজ করিতে অনুরোধ আবেদন করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও নিজ মত বা দল ত্যাগ করিয়া অপর দলপতি বা মতের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবার কোনও লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না।

প্যারিসে বোমা ফেলার পর—মঁসিয়ে রেণো পরিদর্শন করিতেছেন

এরূপ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি কেবল যে মন্থর হইবে তাহা নহে, বহুধা ভিন্নমুখী হইয়া ভারতের শত্রুর সহায়তা করিবে মাত্র। ইদানীং গান্ধীজীর ভক্তসংখ্যা হ্রাস পাইতেছিল, কিন্তু তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান, ধীসম্পন্ন কোনও লোকের কথা ভাবিতে গেলে, ডাকিয়া পরামর্শ লইতে তাঁহার কথাই মনে পড়ে। আজ তাঁহার অবসর গ্রহণে ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আসিয়া পড়িল। পূর্ব্ব হইতে

ভাবিয়া পথ বাছিয়া লইতে পারিলে, হয়ত ভবিষ্যতে ভারতীয় আন্দোলন শক্তি লাভ করিতে পারে, নচেৎ এই অবস্থার পরিসমাপ্তি কোথায়, তাহা বলা কঠিন।

ভারতের যুদ্ধায়োজন—

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের সহিত ভারতের কোনও সংশ্রব না থাকিবারই কথা, কিন্তু আমাদের শাসনকর্ত্তা ইংরেজ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় আমরাও আজ “যুদ্ধরত”। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংরেজকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা এবং ভারতকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এখানে “সাজ সাজ” রব পড়িয়া গিয়াছে এবং যাহাতে প্রয়োজনবোধে ভারতবাসী-মাত্রকেই যুদ্ধের কাজে লাগাইতে বাধ্য করা যায়, তাহার জন্য নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার মূলের একটা কথা অনেকেই বলিতেছেন, তাহা ইংরেজ বিচক্ষণেরা কেন বুঝিতেছেন না তাহা বলা বড় কঠিন। এ যুদ্ধে ভারতের লাভ কি তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে পূর্ণ উৎসাহে ভারতবাসী যোগ দিতে পারিতেছে না। পরকে রক্ষা করা অপেক্ষা আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা যে অন্তর হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। আজ ইংরেজ আমাদের বুঝিতে দিন যে ভারতবর্ষের বিপদ, যুদ্ধে জয়ী হইলে ভারতের মঙ্গল এবং সেই মঙ্গলে ইংরেজের মঙ্গল, জগৎবাসীর মঙ্গল। এখন আমরা বুঝিতেছি এই জয়ে ইংরেজের মঙ্গল,সেই সঙ্গে আমাদের মঙ্গল। তাহাতেই যত গোলোযোগ উপস্থিত।

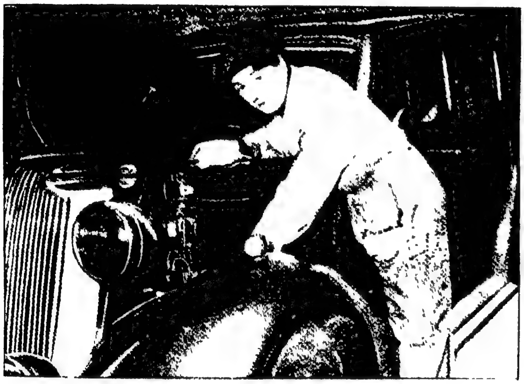

লণ্ডনে মোটর কারখানায় বালিকারা কাজ করিতেছে

নিরপেক্ষতার অভাব—

কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রায় সকল বিষয় লইয়াই দলে দলে লড়াই চলিতেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে কাহাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, তাহা লইয়া প্রতিবৎসরই কম-বেশ লড়াই হইয়া থাকে। অন্যান্য “নামকরা” পত্রিকাগুলির মধ্যে এ বৎসর “অমৃতবাজার পত্রিকা” এবং “যুগান্তর”-এর বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হইয়াছে। আরও যে কতগুলি পত্রিকার নাম নূতন তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের অনেকের অপেক্ষা যে এই পত্রিকা দুইটির প্রচার-সংখ্যা অনেক বেশী তাহা যাঁহারা এই নূতন বিধানের কর্ত্তা তাঁহারাও জানেন। এই এক কথা। অপর পক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে “আনন্দবাজার পত্রিকা” ও “হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড” পত্রিকা কর্পোরেশন বিজ্ঞাপন পাইত না। ইহাদের প্রচার-সংখ্যা, বিশেষত “আনন্দবাজার পত্রিকা”র প্রচার সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে তাহা মনে হয় না। এই সকল লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, দলগত প্রাধান্যই এই পক্ষতাচরণের মূল এবং দলের স্বার্থেই একবার এক দলের পত্রিকা বিজ্ঞাপন পায়---অপর দলের পায় না; vice versa. কর্পোরেশনের এবং করদাতাদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারেন এরূপ নিরপেক্ষ লোকের কি সত্যই অভাব? বাঙ্গলার ঘোর দুর্দ্দিন বলিতে হইবে।

বৃটেনের নূতন সমরসচিব— মি এন্টনী ইডেন ও স্যার জন ডিল

রুশিয়ায় সংবাদপত্রের সংখ্যা—

১৯১৩ সালে জারের আমলে রুশিয়ায় দৈনিক খবরের কাগজের প্রচার-সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ। ১৯৩৯ সালে তাহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি ৮০ লক্ষে। ১৯১৩ সালে ৮৫৯ খানি খবরের কাগজ প্রকাশিত হইত, তার মধ্যে ৭৭৫ খানি রুশ ভাষায় এবং ৮৪ খানি অন্যান্য ভাষায়। সেই জায়গায় ১৯৩৯ সালে সোভিয়েট রুশিয়ার খবরের কাগজের সংখ্যা ছিল ৮,৭৬৯ খানি। ইহার মধ্যে ৬,৪৭৫ খানি রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। সোভিয়েট রুশিয়ার ৭০-টি বিভিন্ন ভাষায় খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। রুশ বিপ্লবের আগে ছোটদের কোন পত্রিকা ছিল না। এখন এই শ্রেণীর পত্রিকার সংখ্যা দেড়শতখানি এবং তাহার প্রচার-সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। এই সংখ্যার সহিত আমাদের দেশের সংবাদপত্রের সংখ্যার তুলনাই করা চলে না।

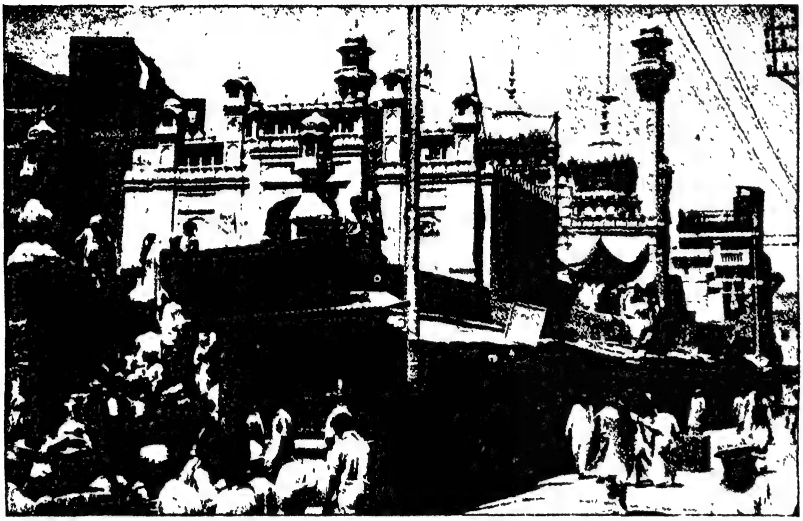

লাহোরের স্বর্ণমসজিদ হইতে পুলিস খাকসারদিগকে গ্রেপ্তার করিতেছে

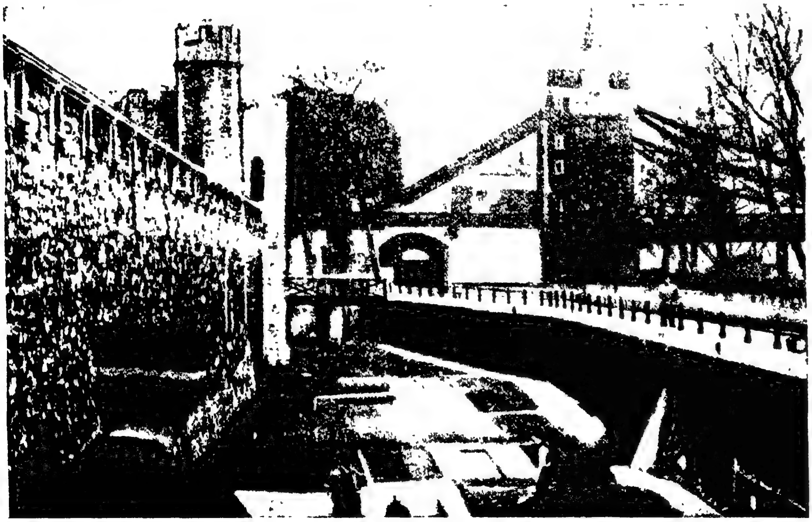

যুদ্ধের জন্য খাদ্যাভাব হেতু লণ্ডন টাওয়ারে সব্‌জীর চাষ করা হইয়াছে। মাংসপ্রিয় ইংরাজগণও খাদ্যাভাবে সব্‌জী খাইতেছে

আগামী আদম-সুমারির পরিকল্পনা—

আগামী লোকগণনা সম্পর্কে একটি সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা গিয়াছে, ভারতবাসীদের জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা সম্পর্কে আরও ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা, সাময়িক বেকারদের সংখ্যা এবং যাঁহারা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কয়েক মাস বেকার থাকেন তাঁহাদিগের সংখ্যা গণনা করা হইবে। পরিবারস্থ ব্যক্তিগত কে কত সময় পরিশ্রম করেন তাহাও সংগ্রহ করিতে হইবে এবং যাঁহারা আংশিকভাবে পর নির্ভর শীল তাঁহাদেরও সংখ্যা গণনা করা হইবে। কে কোন্ পেশা অবলম্বন করেন তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে, শুধু চাকরি, লেখাপড়া বা ব্যবসা বলিলেই শেষ হইবে না। যাহারা নিজেদের হাতে জমি চাষ করে, যাঁহারা

রাজকীয় বিমান বাহিনী পরিদর্শনে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ—সঙ্গে মার্শাল বলড্‌উইন

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের পত্নী এম্বুলেন্স পরিদর্শন করিতেছেন

সম্রাটের ভ্রাতা ডিউক-অফ্-কেণ্ট উড়োজাহাজের আড্ডা দেখিতেছেন

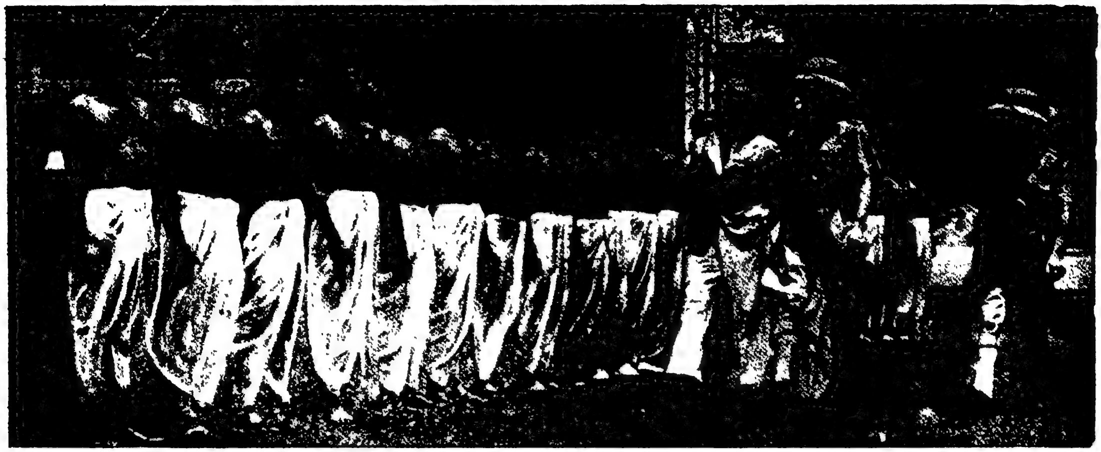

নূতন কোষ্টাল ডিফেন্স সৈন্যদলভুক্ত বাঙ্গালী যোদ্ধার দল—ফোর্ট উইলিয়মে স্বাস্থ্যপরীক্ষা

বাঙ্গালী সৈন্যগণ ও তাঁহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীবৃন্দ

বোম্বায়ে মহিলাগণের বন্দুক পরিচালনা শিক্ষা

অপরের জমি চাষ করে এবং যাঁহারা জনমজুর খাটাইয়া নিজেদের জমি চাষ করে তাঁহাদের সংখ্যা আলাদা করিয়া গণনা করিতে হইবে। যাঁহারা নিজেরা পণ্য উৎপন্ন করিয়া নিজেরাই তাহা বিক্রয় করে তাঁহাদিগকে বিক্রয়কারী অথবা উৎপাদনকারী শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। জন্মের হার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের সন্তান-সংখ্যা গণনা করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কত বয়সে প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইবে। কিন্তু শুধু এই বিষয়ে গবেষণা করিলেই কোন লাভ হইবে না। শাসনকার্য্যের সময় ঐ হিসাব বিবেচনা করিয়া তদনুসারে ব্যবস্থার আয়োজন হইলে তবে লোক উপকৃত হইবে।

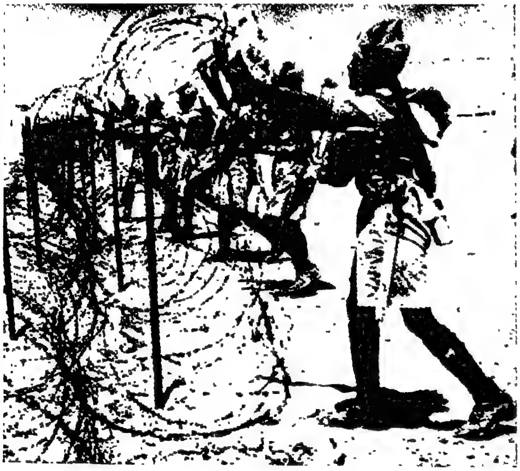

মিশরে ভারতীয় সৈন্য—যুদ্ধসংক্রান্ত নানারূপ কার্য্য শিক্ষা করিতেছে

কাগজ-শিল্প সম্পর্কে গবেষণা—

সম্প্রতি শিল্প গবেষণা বোর্ডের বৈঠকে এদেশে মিকানিকাল এবং আর আর সকল প্রকার কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা সম্ভব কি-না সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। খবরের কাগজের উপযোগী কাগজ তৈরি করা সম্ভব কি-না তাহা ঠিক করিবার জন্য অবিলম্বে দেরাদূনে অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণভারতের একটি কল ছাড়া অন্য কোথাও খবরের কাগজের উপযোগী কাগজ তৈরি হয় না বলিয়াই আমরা জানি এবং ঐ কলে তৈরি কাগজের পরিমাণ স্থানীয় প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। এখন নরওয়ে হইতে এদেশে কাগজ আমদানি বন্ধ হওয়ায় এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বহু পূর্ব্বেই এ দেশে সংবাদপত্রের জন্য কাগজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

গত বি-এ পরীক্ষায় শ্রীমান বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য রিপন কলেজ হইতে সংস্কৃত অনার্সে প্রথম হইয়া 'ঈশান স্কলার' হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বিষ্ণুপদ আই-এ পরীক্ষাতেও চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি হাওড়া ঝাপড়দহ নিবাসী খ্যাতনামা স্মার্ত্ত পণ্ডিত ষষ্ঠীদাস ভট্টাচার্য্যের প্রপৌত্র এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের দৌহিত্র। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

বিক্ষিপ্ত জমি একত্রীকরণের ব্যবস্থা—

ভারতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত বিক্ষিপ্ত জমি একত্রীকরণ সম্পর্কে যে তদন্ত করা হইয়াছিল তাহার ফলে

জানা যায় যে, এ সম্পর্কে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ এবং বরোদা, জম্বু ও কাশ্মীর এই তিনটি দেশীয় রাজ্যে এইরূপ একত্রীকরণ ব্যবস্থার সুবিধা স্বীকৃত হইয়া সেইমত কর্ম্মপন্থাও গৃহীত হইয়াছে। পাঞ্জাবে সমবায় সমিতিগুলির চেষ্টায় এই ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্ভব হয় এবং এই দুই প্রদেশে একত্রীকরণ সম্পর্কিত আইনও বলবৎ হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে সমবায় বিভাগ এই দিকে কার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছেন। তবে নলকূপের সাহায্যে যে সকল অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা হইয়াছে সেই সকল অঞ্চলের শস্য একত্রে তুলিবার ভার কৃষিবিভাগের উপর ন্যস্ত আছে। বরোদা রাজ্যে গত ১৯২১ সালে এই আইন প্রবর্ত্তিত হয় এবং বর্ত্তমানে উক্ত রাজ্যে কৃষির শতকরা নব্বই ভাগ কাজ সমবায় সমিতির মারফত সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপরোধ অনুরোধ করিয়া এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই জমি একত্রীকরণের প্রয়োজন বহুদিন হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন উপায়ই অবলম্বিত হয় নাই।

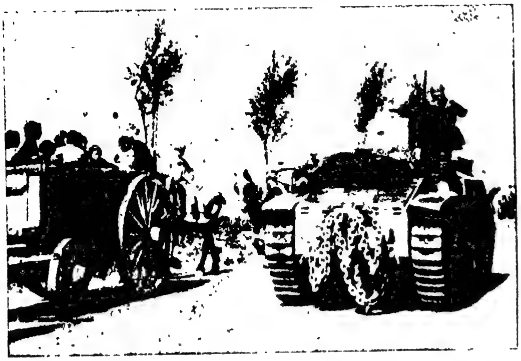

ফ্রান্সের একটি গ্রাম—জর্ম্মান আক্রমণের পূর্ব্বে গ্রামবাসীদের পলায়নের দৃশ্য

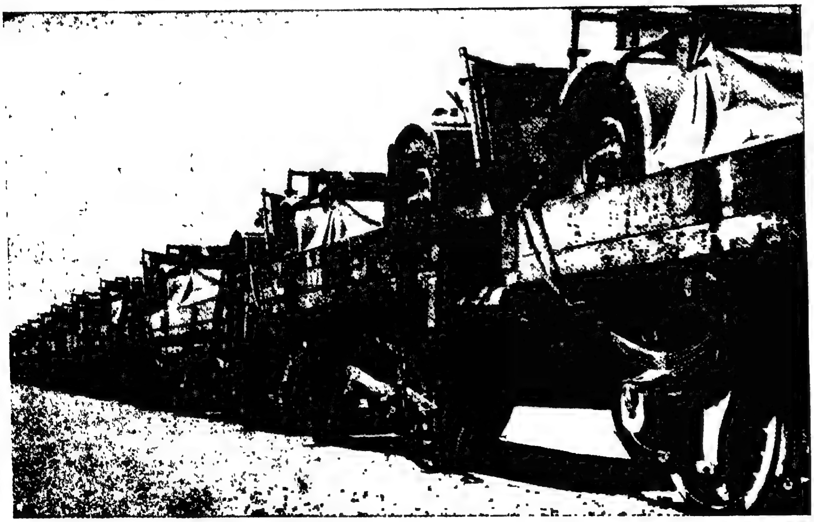

কারখানা হইতে মেশিন গান প্রেরিত হইতেছে

আইন-সভার ব্যয় বৃদ্ধি—

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা আগে প্রতি বৈঠকের জন্য দিনে দশ টাকা হিসাবে ভাতা পাইতেন। বর্ত্তমানে সেই জায়গায় তাঁহারা মাসিক দেড়শত টাকা বেতন এবং বৈঠকের সময় দৈনিক দশটাকা ভাতা এবং মোটর ভাড়া বাবদ দিনে আড়াই টাকা পান। ইহার ফলে ১৯৩৬-৩৭ সালে যেখানে ৪২,৩৪৪ টাকা ব্যয় হয়, সেখানে একমাত্র ভাতা ও মোটর ভাড়া বাবদ ১৯৩৮-৩৯ সালে ২,৬৪,০৮০ টাকা ও বেতন বাবদ ৪,২১,৬৫২ টাকা ব্যয় হয়! বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনার ব্যয় ১৯৩৬-৩৭ সালে ১,৫৪,৮৪২ টাকার জায়গায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮,৯৩,৯০৮ টাকা হয়। আইন সভা দুইটির সদস্যদের জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট ১৪,৬৫,৫৬০ টাকা ব্যয় হয়! নূতন শাসন ব্যবস্থায় ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রজাসাধারণ কিরূপ উপকৃত হইতেছে, তাহা বিচার করিলে তবে নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করা যাইবে।

ভারতে তৈরি কাগজের পরিমাণ—

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন কাগজ কলে মোট ১৪,১৬,২৬৭ হন্দর কাগজ তৈরি হয়। আগের বছর ইহার পরিমাণ ছিল ১১,৮৩,৯৫৭ হন্দর। ইহার মধ্যে খবরের

কাগজ মুদ্রণের উপযোগী কাগজ ছাড়া সাদা ও খসখসে কাগজ ৫,৯১,৪৩৯ হন্দর, রপ্তানি কাগজ ৪৩,০৮৮ হন্দর, ম্যানিলা ২১,৬৭৮ হন্দর, বাদামী ১,৬২,১১৬ হন্দর, প্যাকিং কাগজ ৮২,৮৫৯ হন্দর, মণ্ডের তৈরি বোর্ড ২২,১১২ হন্দর, ব্লটিং কাগজ ১৪,৬৩৪ হন্দর এবং অন্যান্য ধরণের ৮৩,৭৭২ হন্দর কাগজ তৈরি হয়। ভারতে যে পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হয়, তাহার তুলনায় ভারতে প্রস্তুত এই কাগজ হিসাবের যোগ্যই নহে। এখনও ভারতে বহু কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এবার শ্রীহট্টের উকিল শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র পুরকায়স্থের কন্যা শ্রীমতী কনক পুরকায়স্থ সর্ব্বশীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এ পর্য্যন্ত আর কোন ছাত্রীই প্রবেশিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রী শ্রীমতী লতিকা বন্দোপাধ্যায়ও সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা এই দুটি কৃতী ছাত্রীর জীবনে সাফল্য কামনা করি।

কনক পুরকায়স্থ

বালিকার সঙ্গীতে কৃতিত্ব—

কুমারী সুদক্ষিণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসনের চতুর্থ বার্ষিক সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে ও শ্রীরামপুর সঙ্গীত-সম্মিলনীতে পারদর্শিতা দেখাইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। সুদক্ষিণা গল্পলেখক শ্রীযুত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা।

সুদক্ষিণা বন্দ্যোপাধ্যায়

যোধপুর রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা—

যোধপুর সরকারের সহিত গণ-পরিষদের মিটমাট হইয়া যাওয়ায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সেখানে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল তাহাও আপাতত স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইউরোপীয় যুদ্ধ যে রকম ভয়াল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষও ইহার সহিত কোন না কোনভাবে জড়াইয়া পড়িতে পারে এবং সেরূপ স্থলে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্মুখে প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষামূলক একাধিক দায়িত্বপূর্ণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। এইসব আশঙ্কা করিয়াই যোধপুর সরকার রাজ্যের ভিতরকার বিসম্বাদ মিটাইয়া ফেলিলেন—ইহা সত্যই বুদ্ধিমানের মত কাজ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার মুখ চাহিয়া যে জরুরী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবার পরও বহাল থাকিলে এবং অতঃপর প্রজাদের সঙ্গত দাবী রক্ষা করিয়া রাজ্যের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে সরকার কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, প্রজারাও সন্তুষ্ট হইবেন।

বড়লাটের নূতন ক্ষমতালাভ—

মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে বিলাতের পার্লামেণ্টে যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। বরং ইতিপূর্ব্বেই এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। এই আইনে ভারতের বড়লাটকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষমতার বলে পার্লামেণ্টের অনুমতি ও অনুমোদনের অপেক্ষা না রাখিয়াই এদেশে যুদ্ধের আয়োজন বৃদ্ধি করা যাইবে। যুদ্ধে এমন অবস্থারও উদ্ভব হইতে পারে যাহাতে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না; সেই সময়ে যাহাতে বড়লাট অবস্থানুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন এই আইনের আসল উদ্দেশ্য তাহাই। বৃটেনের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এ দেশে সামরিক, বেসামরিক ও শিল্প-সম্বন্ধীয় কাজে লোক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা যাইবে। তবে এখনই ভারতবাসীদের সেনাদলে প্রবেশ বাধ্যতামূলক করিবার অভিপ্রায় সরকারের নাই। বাধ্যতামূলক কার্য্যপদ্ধতি প্রথমে এ দেশের অধিবাসী ইংরেজদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রীতি—

অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ভাষাকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। জানা গিয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে ভারতের একটি প্রধান ভাষারূপে গণ্য করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সম্প্রতি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এই স্পেশাল কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাদের সাধুবাদ দিতেছি।

নারীশিক্ষার ব্যবস্থা—

ভারতীয় নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া স্যর এম্ বিশ্বেশ্বরায় বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ছাত্রীকে নাগরিক বিদ্যা ও প্রাথমিক অর্থনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া দরকার। তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, সেখানে মেয়েদের গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। সেলাই, সংসার পরিচালনা, শিশুপালন ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত। অবসর সময়ে উপার্জ্জনের জন্য গৃহস্থবধূদের অর্থকরী বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হয়। পুরুষের ও নারীর জীবনের ক্ষেত্র যে প্রধানত ভিন্ন, সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। কাজেই উভয়ের শিক্ষার ব্যবস্থায়ও পার্থক্য থাকিবে। যে শিক্ষা যাহার জীবনে আবশ্যক সেই শিক্ষাই তাহার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। এদেশের শিক্ষা পরিচালকদের এ সত্যটা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

কৃতী চিকিৎসকের সম্মানলাভ—

কারনাইকেল মেডিকাল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও অধুনা শিক্ষক ডাঃ প্রভাসচন্দ্র রক্ষিত এম্-বি, এম্-এস্-সি (কলি), এল্, এম্ (ডাব) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্ম সমাবর্তন উৎসবে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৯৩৮-৪০ সেসনে অধ্যাপক ডেলির অধীনে রিসার্চ ছাত্ররূপে গবেষণা করিয়া 'ফুসফুসের রক্ত নিয়ন্ত্রণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার উক্ত মৌলিক গবেষণাটি তাঁহার অধ্যাপক ও অন্যান্য শারীরতত্ত্ববিদগণ কর্ত্তৃক বহুল

ডঃ পি, সি, রক্ষিত

প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ডঃ রক্ষিতের দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

ভারত সরকারের নূতন অর্ডিনান্স—

নির্দ্দিষ্ট বেতনের কর্ম্মচারীদের বেতন হইতে যুদ্ধ তহবিলে টাকা জমা দেওয়ার সুবিধার জন্য ভারত সরকার বেতন-আইনের সংশোধনে একটি অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। এই অর্ডিনান্সের সংশোধন অনুসারে অতঃপর নিয়োগকর্ত্তা কর্ম্মচারীর বেতন হইতে সরকার-অনুমোদিত যুদ্ধ সঞ্চয়-ভাণ্ডারে লগ্নি করার জন্য বেতন দেওয়ার সময় টাকা কাটিয়া রাখিতে পারিবেন।. অবশ্য কর্ম্মচারীদের ইহাতে সম্মতি থাকা দরকার। ভারত সরকারের এই ব্যবস্থা স্বেচ্ছামূলক। কর্ম্মচারী স্বেচ্ছায় নিজের বেতনের কিয়দংশ মাহিনা লওয়ার সময়ই নিয়োগকর্ত্তার মারফতে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে লগ্নি করিতে না চাহিলে কেহ তাঁহাকে বাধ্য করিবে না।

এগার বৎসরের খাকসার বালিকা ও আট বৎসরের খাকসার বালক লাহোরে মসজিদ পাহারা দিতেছে

যুদ্ধ-সম্পর্কে মার্কিনী নীতি—

বৃটেনের অসম্মতিতে অস্ত্রত্যাগ ও সন্ধিচুক্তি করিয়া মার্শাল পেতঁ্যা যে নূতন ফরাসী মন্ত্রিসভা গড়িয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বৃটেনকে বাধ্য হইয়া অবরোধনীতি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে; এই নীতি মার্কিনের মনঃপূত কি-না বলা কঠিন; কিন্তু গণতন্ত্র ও যুক্তির আদর্শ লইয়া বর্ত্তমানে বৃটিশ সরকার যে একক সংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহাতে গণতন্ত্রের পীঠস্থান যুক্তরাষ্ট্রের সকল শক্তিই নিয়োগ করিবার কথা। অথচ তাঁহাদের ঘন ঘন বিপরীত আইন পাশ করা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা যে কেবল খেয়াল খুশীরই প্রশ্রয় দেন তাহাই নহে, কোন অজানা কারণে বৃটিশ সরকারের উপর তাঁহাদের অভিমানও কিছু জমিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান—

বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের রবীন্দ্রনাথকে 'সাহিত্যাচার্য্য' (ডি. লিট) উপাধি ভূষণে ভূষিত করিবেন স্থির করিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই উপাধি দানের ভার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় প্রতিনিধি স্যর মরিস্ গয়ারের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কবি এই উপাধি দানের তারিখ ৭ই আগষ্ট ধার্য্য করিয়াছেন। আমরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচেষ্টায় সাধুবাদ করিতেছি।

ফ্রান্সে ইংরাজ বালিকা—প্যারিসে প্রহরীর কাজ করিতেছে

দেশপ্রীতির রূপ—

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কেমন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে হয় আয়র্ল্যাণ্ড তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি আয়র্ল্যাণ্ডের তিন দলের নেতা ডি'ভ্যালেরা-কস্গ্রেভ-গ্রিফিথ্স্ একত্রে দেশ রক্ষার জন্য প্রচারকার্য্যে

বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি ডাবলিনের এক বিরাট জনসভায় তিন নেতাই বলিয়াছেন, দেশের এই সঙ্কটকালে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়াছেন এবং আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে এক পক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেশের সমগ্র শক্তি একত্র করিয়া তাঁহারা যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্র-নেতাদের এ দৃষ্টান্তে চৈতন্যের উদ্রেক হইলে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে পাপ আজ সভ্যতার অস্তিত্ব লোপ করিতে উদ্যত তাহার গতিরোধ করিবার জন্য আমাদের ভারতবাসীদের ক্ষমতা ও অধিকার কত কম তাহা ভাবিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার আক্ষেপ হইতেছে। আজ আমাদের সমুদয় রাজনৈতিক সমস্যা এক বিরাট বিশ্বসমস্যার অঙ্গীভূত হইয়াছে। আমি জানি, মানুষের অধ্যাত্মবাদ রক্ষার শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমার এই বাণী আবশ্যক হইলেও আমি এতদ্দ্বারা এই আশাই জ্ঞাপন করিতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র এই

প্যারিসে বৃটেনের সমর পরিষদের সভা—মিঃ চার্চ্চিল, সার জন ডিল, সার রোণাল্ড ক্যাম্বেল. মেজর এটলি ও মঁসিয়ে রেণো

আসন্ন বিশ্বব্যাপী সর্ব্বনাশ প্রতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইতে পরাঙ্মুখ হইবে না।" দুর্ব্বল পরাধীন জাতির কবি স্বাধীন শক্তিমান জাতির রাষ্ট্রপতির নিকট করুণ আবেদন জানাইয়াছেন; তাঁহার সে আবেদন মানবতার আবেদন, কিন্তু এ যুগে অস্ত্রের আবেদন ছাড়া আর সব কিছুই নিরর্থক, মূল্যহীন।

রবীন্দ্রনাথ ও বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ—

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক রুজভেল্টের নিকট এই আশা পোষণ করিয়া একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, প্রত্যাসন্ন বিশ্বব্যাপী সর্ব্বনাশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমেরিকা কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। উক্ত তারে কবি বলিয়াছেন : "যে ভয়ঙ্কর প্রলয়ঙ্কর শক্তি আচম্বিতে পৃথিবীর বক্ষ বিমথিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ আমরা সকলেই সশঙ্কচিত্তে তাহার

ডাকবিভাগের নব ব্যবস্থা—

সম্প্রতি ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, এক আনা মূল্যের ছাপান খাম হয় বাতিল করিবেন,

না হয় তাহার দাম বাড়াইয়া দিবেন। মহাযুদ্ধের জন্য কাগজপত্রের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় সাদা খামের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাই সাধারণে তাহার ব্যবহার কমাইয়া দিয়া ছাপান খামই বেশী ব্যবহার করিতেছে। এ অবস্থায় উক্ত খামের অত্যধিক চাহিদা মিটাইতে হইলে হয় দাম বাড়াইতে হইবে, নতুবা উহার প্রচার একদম বন্ধ করিতে হইবে। কেন না, তাহা না করিলে ডাকবিভাগের অনেক লোকসান হইবে। ডাকবিভাগের ক্ষতির দিকটা যেমন বিবেচ্য, তেমনই গরীব সাধারণের সুবিধা-অসুবিধার—এক কথায় অর্থনীতিক প্রশ্নটিও কর্তৃপক্ষের ভাবিয়া দেখা দরকার। বর্ত্তমানে খাম ও পোষ্ট কার্ডের যে মূল্য রহিয়াছে, তাহাই সাধারণের পক্ষে অত্যধিক, উহার উপর আবার যদি কিছু বাড়ে, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ অসুবিধায় পড়িবেন। আমাদের মতে বিভাগের মোটা মাহিনার কর্ম্মচারীদের বেতন কমাইয়া এই ক্ষতি নিবারণ করাই শোভন ও সঙ্গত হইবে।

মহাযুদ্ধ ও আমরা—

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাহার ফলাফল সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের মনে একটা দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বাহির হইতে ভারতবর্ষ আক্রমণের যে কোন সম্ভাবনা আছে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন এবং ভারতের মধ্যেও যে অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ হইতে পারে তাহাও তিনি স্বীকার করেন না। আমরাও পণ্ডিতজীর কথা সমর্থন করি। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও দেশবাসীকে জানাই যে অনর্থক ভীত সন্ত্রস্ত না হইয়া বহিরাক্রমণ হইতে দেশরক্ষা এবং আভ্যন্তরিক গোলযোগ হইতে গৃহসম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া দরকার। বিপদ না আসে ইহাই কাম্য, কিন্তু বিপদ যদি সত্যসত্যই আসিয়া পড়ে তবে তাহাকে যেন ঠেকাইতে পারি—ইহাই সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ ও ‘ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া’—

‘শয়তান ছাড়া পাইয়াছে’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ কলিকাতার ইংরেজী সান্ধ্য পত্রিকা ‘ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া’ পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ‘বৃন্দাবনের লম্পট’ বলিয়া আখ্যাত করায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি তিন মাসকাল সম্পাদকীয় নিবন্ধাবলী প্রকাশের পূর্ব্বে উহা স্পেশাল প্রেস এড্‌ভাইসরকে দেখাইয়া প্রকাশ করার নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহারা স্বেচ্ছায় অপরের ধর্ম্মে আঘাত করে তাহারা দণ্ডনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন সম্পাদককে তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধাদি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন লইয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য করা উহার অপরাধের যোগ্য শাস্তি নহে। উহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। ‘ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া’ যদি সত্যই আপত্তিকর ও অপরাধজনক আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া সরকার মনে করেন, তবে তাহাকে প্রকাশ্য আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতায় ফেলিয়া বিচার করাই সমীচীন। সম্প্রতি উক্ত পত্রিকা তাহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ অস্ত্র-কারখানায় যাইয়া বন্দুক পরীক্ষা করিতেছেন

পরলোকে স্বামী পরমানন্দ—

স্বামী পরমানন্দ সম্প্রতি মাত্র ষাট বৎসর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী

বিবেকানন্দ ছাড়া আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ প্রচারে যে কয়জন ত্যাগী সন্ন্যাসী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরমানন্দ মহারাজ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ১৯০৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বোষ্টন শহরে বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করিলে স্বামী পরমানন্দজী তাহাতে যোগদান করেন এবং চৌত্রিশ বৎসর কাল একনিষ্ঠভাবে হিন্দুর আদর্শ প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বোষ্টন ছাড়া আমেরিকায় আরও কয়েকটি শহরে বেদান্ত প্রচারের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। আমেরিকায় যাঁহারা ভারতের সম্মান বৃদ্ধি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রচার করিয়া মানবসভ্যতাকে একটা নূতন পথ দেখাইয়াছেন, স্বামীজী ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার এই অকাল বিয়োগে ভারতের অনপনেয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

কায়রোতে রাজা ফারুক মিলিটারী কলেজের উদ্বোধনে
নিজেই বন্দুক ছুঁড়িতেছেন

আসামে আফিং বর্জ্জন—

আগামী ১৯৪১ সালের পয়লা মার্চ হইতে আসামের শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত এলাকায় ক্রমবর্দ্ধমান অহিফেন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য সম্প্রতি আসাম সরকার এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। যাহারা আফিং খাইতে অভ্যস্ত, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া ইস্তাহারে জানান হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, সরকারের এই অহিফেন বর্জ্জন প্রচেষ্টায় জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা সক্রিয় হইয়া দেখা দিবে।

শিক্ষাব্রতীর অবসরগ্রহণ—

দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১লা জুন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১৯১৪ সালে ইংরেজীর সহকারী অধ্যাপকরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিল-ইন-আর্টস-এর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। উহার তিন বৎসর পর তিনি কলেজসমূহের ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। এইভাবে ষোল বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করার পর ১৯৩৬ সালে তিনি পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ইংরেজী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হন। ১৯৩৩ সালের জুলাই মাস হইতে অবসর গ্রহণের তারিখ পর্য্যন্ত ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বেতনের মাত্র দুই হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া বাকী একাশী হাজার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় খৃষ্টান ছাত্রদের সাহায্যকল্পে দান করেন। উহা দ্বারা তাহাদের বিদেশে গিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের সুবিধা হইয়াছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় নিরহঙ্কার, অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিয়া শিক্ষাকে ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর গালার ছবি—

সন্তোষের মধ্যম মহারাজকুমার শিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী যুদ্ধের সাহায্যকল্পে তাঁহার স্বহস্ত রচিত ৩০২৫ টাকার মূল্যের কয়েকখানি রঙিন গালার ছবি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ওয়ার ফণ্ড কমিটীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন। ছবিগুলির প্রস্তুত প্রণালী অদ্ভুত এবং দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার কয়েকখানা ছবি একাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। মহারাজ-

ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটীর পথে মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল ও সর্দ্দার পেটেল

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—রাজাগোপালাচারী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্কররাও দেও, সর্দ্দার পেটেল ও আচার্য্য কৃপালানী

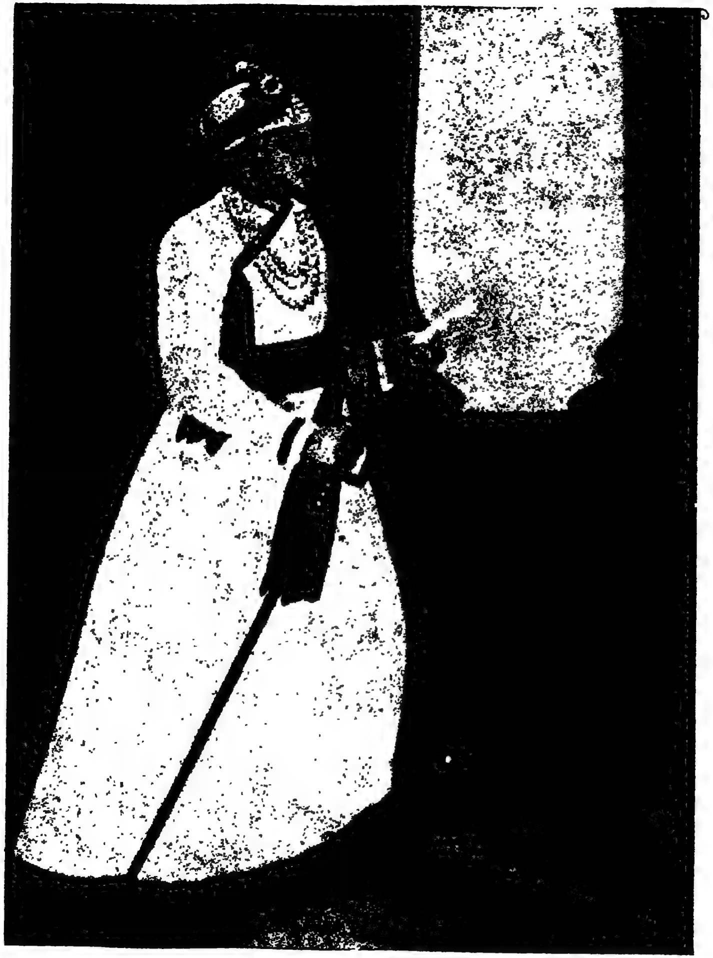

নবাব সিরাজদ্দৌলা

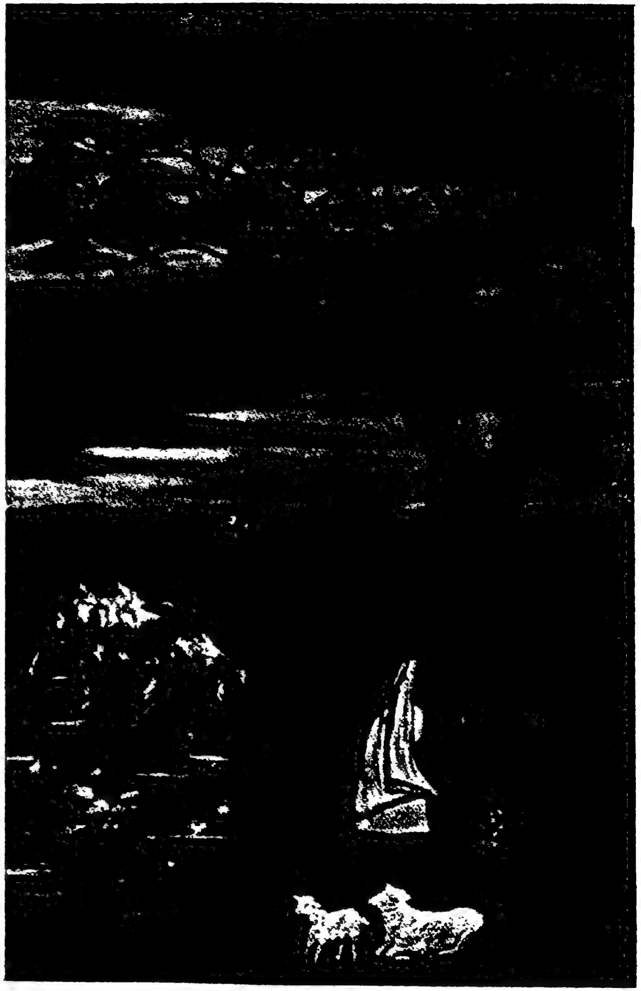

সোনার বাঙ্গালা

শিল্পী—মহারাজকুমার রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (সন্তোষ)—রঙ্গীণ লাক্ষার প্রতিকৃতি

কুমার একখানা ছবির সম্পূর্ণ মূল্য ৫০০ টাকা ও অপর ছবিগুলির মূল্য হইতে শতকরা ২৫ টাকা হারে ওয়ারফাণ্ডে দান করিবেন। ছবিগুলি এখন কলিকাতার মেসার্স হল এণ্ড এণ্ডারসনের প্রদর্শনী-গবাক্ষে দেখান হইতেছে। আমরা অন্যত্র একখানা চিত্রের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম।

মহারাজকুমার রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

দেশরক্ষার উপাদান—

বার্লিনের সরকারী খবরে জানা গেল, হিটলার 'ম্যাজিনো লাইন'-এর কোন কোন স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং উহা শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে স্থির হইয়াছে। দশ বৎসর ধরিয়া কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যে রক্ষীপ্রাকার গড়িয়া উঠিয়াছিল, এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্কের মুখে তাহার কোন দামই রহিল না। ফ্রান্সের গৌরব ম্যাজিনো লাইন আজ কংক্রিটের স্তূপ মাত্র! এরোপ্লেন ও ট্যাঙ্কই আজ দেশরক্ষার প্রধান উপাদান।

সিরাজদ্দৌলা দিবস ও হলওয়েল মনুমেণ্ট—

গত ৩রা জুলাই কলিকাতায় সিরাজদ্দৌল্লা দিবস প্রতিপালিত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদিগণ একযোগে সিরাজদ্দৌলা দিবস পালন করিয়াছেন। বহু বিদেশী ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলাকে নানারূপ অনাচারের অনুষ্ঠাতা বলিয়া চিত্রিত করিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্নেল ম্যালিসনের মত লোক লিখিয়া গিয়াছেন—Whatever may have been his faults, Sirajud-daulah had neither betrayed his master nor sold his country. সিরাজদ্দৌলার নিরপেক্ষ ইতিহাস স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সিরাজদ্দৌলা পুস্তকে (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, মূল্য তিন টাকা) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের একটি লাইন নীচে তুলিয়া দিলাম—তাহাই সিরাজের শ্রেষ্ঠ পরিচয়—Sirajud-daulah was more unfortunate than wicked দেশবাসী এই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ঐ ৩রা জুলাই হইতে কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে। হলওয়েল মনুমেণ্ট যে ঐ স্থানে রাখা উচিত নহে, সে বিষয়ে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলল হক ও মিঃ নাজিমুদ্দীন প্রভৃতিও সত্যাগ্রহীদের সহিত একমত। তথাপি কেন যে সত্যাগ্রহ বন্ধের ব্যবস্থা হইতেছে না, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত—

দিল্লীতে পাঁচ দিন ধরিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশনের পর কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যুদ্ধ বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত বড়লাটের সাক্ষাতের পর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সম্মুখে গভর্ণমেণ্ট পক্ষের বক্তব্য বিবৃত করিয়াছিলেন এবং সেই বিবৃতি অবলম্বন করিয়াই ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ কয়দিন ধরিয়া আলোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস পক্ষ শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"(১) ভারত ও গ্রেট বৃটেন যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে গ্রেট বৃটেনের পক্ষ হইতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার ও ঘোষণা করা কর্ত্তব্য। (২) উহা কার্য্যকরী করিবার জন্য অস্থায়ীভাবে এক কেন্দ্রীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে—যাহা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যদের আস্থাভাজন হইবে এবং প্রাদেশিক দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্টগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিবে। (৩) পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে দেশরক্ষার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন ফলপ্রসূ হইবে না। (৪) এই প্রস্তাবে সম্মতি পাওয়া গেলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।" এই প্রস্তাবে কংগ্রেস এমন দাবী করে নাই যে, এখনই আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। তাঁহারা কেবল একটা মৌখিক প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন এবং অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। এক কথা, ওয়ার্কিং কমিটী গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতার কথাই বলিয়াছেন। এখন বড়লাট যদি কংগ্রেসের দাবী পূরণে অগ্রসর হন, তবেই সকল দিক রক্ষা পায়। মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটীর এই দাবী

সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি এক বিবৃতিতে গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কংগ্রেসের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত হইবে না। ইহার উপর আমাদেরও বলিবার আর কিছুই নাই।

পরলোকে ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার—

সম্প্রতি ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ তরাগ্রাম নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ও জমিদার ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার মহাশয় আশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পুনা ও বোম্বায়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রিলিফ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দিল্লীতে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী—মিঃ এ-কে-ফজলল হক। সম্বর্দ্ধনার দৃশ্য

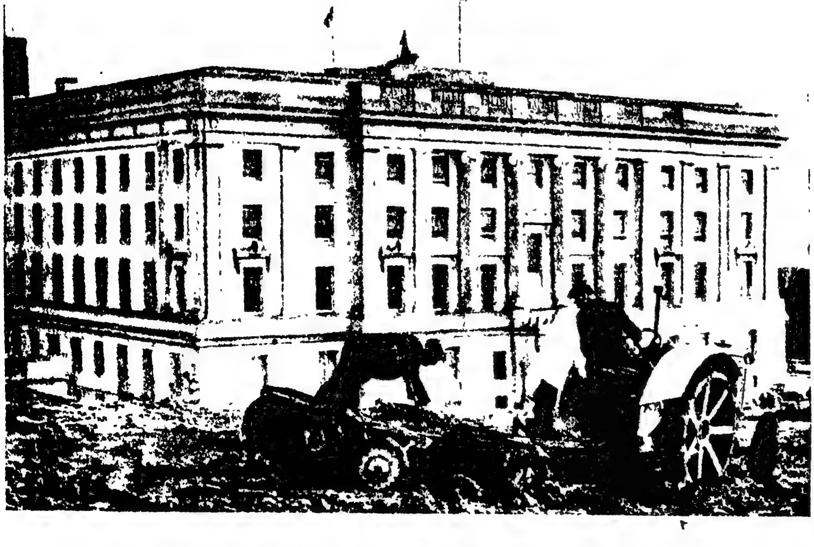

উত্তর আয়র্লণ্ডে পার্লামেণ্টের উঠানে চাষ হইতেছে—পাছে খাদ্যাভাব হয়, সেজন্য সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে

চুঁচুড়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি সভা—

গত ২রা আষাঢ় হুগলী চুঁচুড়ার বাণীমন্দির বিদ্যা নিকেতনে সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের এক স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় দুইটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—(১) কবি দ্বিজেন্দ্রলাল চুঁচুড়ায় যে বাটীতে বাস করিতেন, সেই বাটীর গাত্রে একখানি মর্ম্মর স্মৃতিফলক সংলগ্ন করা হউক, (২) কবি হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন, অতএব কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ কলেজের প্রধান কক্ষে তাঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করুন। ঐ সঙ্গে আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত ছিল—কবি চুঁচুড়ার যে পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীর একটি পথের নাম ‘দ্বিজেন্দ্রলাল রোড’ করা উচিত। ঐ স্মৃতিসভা উপলক্ষে চুঁচুড়ায় ‘পূর্ণিমা মিলন’নামক একটি সাহিত্যিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে—চুঁচুড়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ভূদেব, বঙ্কিম, অক্ষয়, দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতির রচনা সম্বন্ধে তথায় আলোচনা হইবে।

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলা ঃ

আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ভারতীয় দল ৩-২ গোলে ইউরোপীয়ানদের পরাজিত ক'রে বিজয়ী হ'য়েছে; যদিও এ বিজয় তাদের প্রাপ্য নয়। ইউরোপীয়ানরা বেশীর ভাগ সময় ভারতীয়দের আক্রমণ ক'রে বিধ্বস্ত করে আর তার ফলে ২ গোলে অগ্রবর্ত্তী থাকে। এছাড়া তারা অনেকগুলি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট ক'রেছে। ইউরোপীয়ানরা কিন্তু শেষ রক্ষা ক'রতে পারেনি। তাদের শৈথিল্যের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় দল মাত্র নয় মিনিটে ৩টি গোল করে।

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান দলের সম্মিলিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গত কয়েক বৎসরের, বিশেষতঃ এবারের লীগ খেলা দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, ফুটবলের শীর্ষ স্থানগুলি অধিকার ক'রে র'য়েছে ভারতীয় দলগুলি। অথচ আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ভারতীয়দের এরূপ অবস্থা হয় কেন? এর একমাত্র কারণ টীম মনোনয়ন। মনোনয়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোটেই পক্ষপাত শূন্য নয়। যেখানে জাতীয় সম্মান নিভর করে সেখানে তাঁদের কোন টীম বিশেষকে বা কোন বিশেষ বিশেষ খেলোয়াড়কে প্রাধান্য দিতে যাওয়া—তাতে তারা যতই খারাপ খেলুক, জোর ক'রে টীমে স্থান দেওয়ার মনোবৃত্তি অত্যন্ত নিন্দনীয়। মোহনবাগান ক্লাবের পি চক্রবর্ত্তীকে নিঃসন্দেহে এবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাক বলা যায়। কিন্তু তাকে আন্তর্জ্জাতিক খেলায় স্থান দেওয়া হ'ল না, অথচ রাখাল মজুমদার স্থান পেল। এর ফল পেতে মোটেই দেরী হয়নি। মাঠের মধ্যে সে নিকৃষ্টতম খেলেছে ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না; প্রথম গোলটির জন্য সে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। ডি মিত্র এ বছর একটা ম্যাচও

এমন ভাল খেলেনি যাতে ক'রে তাকে টীমে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কাজেই মাঠে নেমে সে যে হতাশ ক'রবে তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। জোসেফ ড্রিবলিং করে ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্যালারী শো'তে খেলার জয় পরাজয় নির্ভর করে না। এই ড্রিবলিংএর জন্যে সে নিজের ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গেই অধিকাংশ সময় মানিয়ে খেলতে পারে না, 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ' ম্যাচে তো কথাই নেই। ডি ব্যানার্জ্জির খেলা তার চেয়ে অনেক বিষয়ে উন্নততর। সোমানা একটি গোল ক'রেছে বটে কিন্তু এছাড়া সমস্তক্ষণই দর্শকদের হতাশ ক'রেছে। এই রকম টীম মনোনয়নের ফলে দর্শক সংখ্যাও অল্প হয়। তার প্রমাণ আন্তর্জ্জাতিক খেলায় টিকিট বিক্রয় হ'য়েছে ২৬৫৮ টাকার আর মোহন-বাগান-মহমেডানের খেলায় হ'য়েছে ১৩২০০ টাকারও বেশী। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন।

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান দলের অধিনায়কদ্বয় করমর্দ্দন করছেন

এবারের আন্তর্জ্জাতিক খেলায় ইউরোপীয়ানরা ভাল খেলেও পরাজিত হ'ল। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে তারা ভারতীয়দের গোলে প্রবলভাবে আক্রমণ ক'রেছে। এই সময় আর লামসডেন ও গ্রেভস্ গোল ক'রে। এছাড়া তারা একাধিক গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট ক'রেছে। অবশ্য কে দত্ত আর বাচ্চিখাঁর খেলা ভাল না হ'লে তারা আরও অনেক গোল ক'রতো। হাফে একমাত্র অনিল দে ছাড়া আর কারো খেলা ভাল হয়নি। ফরওয়ার্ড লাইনে গুঁই আর নন্দীর খেলা ভাল হ'য়েছিলো তবে তারা ইন্‌ম্যানদের কাছ থেকে মোটেই উপযুক্ত সহযোগীতা পায়নি। গোলে দত্ত আর ব্যাকে বাচ্চি ভাল খেলেছে। ইউরোপীয়ানদের ভেতর সেণ্টার হাফে জে লামসডেন আর ব্যাকে হজেসের খেলা অতুলনীয়। এছাড়া আর লামসডেন, গ্রেভস ও কক্সের খেলাও দর্শনীয় হ'য়েছে।

আর লামসডেন

খেলা শেষ হবার ৯ মিনিট আগে গুঁই-এর একটি সেণ্টার র‍্যানসন প্রতিরোধ ক'রে কিন্তু অনিল দে সেই বল আয়ত্বে এনে দর্শনীয় ভাবে গোল দেয়। এর দু'মিনিট পরে মোহিনী ব্যানার্জ্জির 'ফ্রি' কিক্ থেকে সোমানা হেড দিয়ে দ্বিতীয় গোল করে। খেলার শেষ মিনিটে গুঁই কক্সকে কাটিয়ে অতি চমৎকার ভাবে সাবুকে বলটি পাস ক'রে দেয় আর সাবু খুব দর্শনীয় ভাবে দলের বিজয় সূচক গোল করে।

১৯২০ সালে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ও ইউরোপীয়ানদের খেলা সুরু হয়। সেই থেকে ২২ বার এই আন্তর্জ্জাতিক খেলা অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। ভারতীয় দল বিজয়ী হ'য়েছে ১২ বার আর ইউরোপীয়ানরা ৮ বার; দু'বার খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'য়েছে।

কে দত্ত

এস গুঁই

ভারতীয় দল :—কে দত্ত (মোহনবাগান) ক্যাপ্টেন; বাচ্চি খাঁ (মহমেডানস্পোর্টিং) এবং আর মজুমদার (ইষ্টবেঙ্গল);

এ দে (মোহনবাগান), এম ব্যানার্জ্জি (কালীঘাট) এবং ডি মিত্র (এরিয়ান্স) ; এস গুঁই (মোহনবাগন), সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল), সাবু (মহমেডানস্পোর্টিং), জোসেফ (কালীঘাট) এবং এস নন্দী (ই বি আর)।

ইউরোপীয়ান দল :—জাডিন (কাষ্টমস) ; র‍্যানসন (বর্ডার) এবং হজেস (কাষ্টমস) ; মার্স (ক্যালকাটা), জে লামসডেন (রেঞ্জার্স) ক্যাপ্টেন এবং কক্স (বর্ডার) ; ব্যাটার্সবি (বর্ডার), গ্রেভস (বর্ডার), আর লামসডেন (রেঞ্জার্স), পি ডিমেলো (পুলিস) এবং হুইটবার্ণ (রেঞ্জার্স), রেফারী—বি ডি চ্যাটার্জ্জি।

পূর্ব্ববর্ত্তী খেলার ফলাফল

সাল	বিজয়ী দল	গোল সংখ্যা
১৯২০	ইউরোপীয়	৪-১
১৯২১	ভারতীয়	১-০
১৯২২	ইউরোপীয়	১-০
১৯২৩	ইউরোপীয়	২-১
১৯২৪	ভারতীয়	৩-১
১৯২৫	ভারতীয়	২-০
১৯২৬	ভারতীয়	২-০
১৯২৭	ভারতীয়	১-০
১৯২৭	ভারতীয় (আশুতোষ স্মৃতিভাণ্ডার)	২-০
১৯২৮	ইউরোপীয়	২-০
১৯২৯	ভারতীয়	৩-০
১৯৩০	খেলা হয় নাই	
১৯৩১	ইউরোপীয়	৩-০
১৯৩২	ভারতীয়	৫-০
১৯৩৩	ভারতীয়	২-১
১৯৩৪	ইউরোপীয়	৪-০
১৯৩৫	ইউরোপীয়	২-১
১৯৩৫	ভারতীয় (রজত-জয়ন্তী ভাণ্ডার)	৩-১
১৯৩৬	অমীমাংসিত	৩-৩
১৯৩৭	ভারতীয়	১-০
১৯৩৮	ইউরোপীয়	৩-০
১৯৩৯	অমীমাংসিত	২-২

ফুটবল লীগ ঃ

মোহনবাগান ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত লীগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রেছিল ; তার পর থেকে মহমেডন। লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে এবার মোহনবাগান ও মহমেডানের মধ্যে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে ব'লে আশা করা গিয়েছিলো মোহন বাগান ও মহমেডানের রিটার্ণ ম্যাচে সে আশা প্রায় নিঃশেষ হয়েছে। মহমেডান ২-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়েছে। উপস্থিত সমান ২১টা খেলে মহমেডান স্পোর্টিং মোহনবাগানের থেকে ৩ পয়েন্টে অগ্রগামী আছে। আর তাদের খেলা বাকি মাত্র ৩টে—তাও ইষ্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স ও ভবানীপুরের সঙ্গে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ দলকেও নিশ্চিত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হ'তে হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীর মধ্যে যে পয়েণ্টের ব্যবধান এবং মহমেডান ক্রমশঃ যেরূপ উন্নততর খেলা প্রদর্শন করছে তা'তে অলৌকিক কিছু ঘটবার সম্ভাবনা কম। মোটকথা মহমেডান দলই যে এ বৎসর লীগ বিজয়ী হবে সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। মহমেডান ও মোহনবাগান উভয়েই জিতেছে ১৪টা ম্যাচ। মহমেডান গোল ক'রেছে সবচেয়ে বেশী ৩৫টা আর গোল খেয়েছে মাত্র ৭টা। এবার তাদের রক্ষণভাগ তেমন শক্তিশালী নয় তবু ফরওয়ার্ড লাইন অত্যন্ত ভাল থাকার জন্য বিপক্ষদল বেশী গোল করতে পারে নি। তাদের ফরওয়ার্ড লাইনের আদান প্রদান যেমন নিখুঁত নিজেদের

পি চক্রবর্ত্তী

নুরমহম্মদ (ছোট)

লসন

রসিদ খাঁ

রসিদ

মধ্যে বোঝাপড়াও তেমনি চমৎকার। এখন পর্য্যন্ত তারা একটি মাত্র খেলায় পরাজিত হ'য়েছে।

মোহনবাগান মহমেডানের প্রথম ম্যাচ চ্যারিটি হ'য়েছিলো তাতে মোহনবাগান ২-০ গোলে বিজয়ী হয়। হাজার হাজার দর্শকের সামনে খেলা আরম্ভ হ'লো; একপক্ষে নেমেছে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে আমদানী করা সেরা সেরা প্রবীণ খেলোয়াড় আর একপক্ষে অধিকাংশ খেলোয়াড় তরুণ—যারা এই প্রথমবার নিয়মিত ভাবে প্রথম বিভাগে খেলতে পাচ্চে। এ ধারণা আমাদের বরাবরই ছিলো এবং এখন তা সুদৃঢ়ই হ'ল যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে ফুটবল খেলায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ক'রবে। বহুদিন ধ'রে স্থানীয় ক্লাবগুলির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট ক'রেও কোন ফল হ'চ্ছে না; এখনও তাদের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলার বাইরের থেকে খেলোয়াড় আনানোর অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ছাড়া অন্য কোন ক্লাব এই ব্যবস্থায় লাভবান হ'যেছে ব'লে আমাদের মনে হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় এবার এ আই এফ এফ এবিষয়ে কিছু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রেছে যার ফলে একাধিক বাইরের খেলোযাড় ক'লকাতায় দু একটা ম্যাচ খেলে কেউ বা একেবারেই না খেলতে পেয়ে বসে আছে। এবিষয়ে মোহনবাগান ক্লাবের ব্যবস্থা উন্নততর। তাদের কর্ত্তৃপক্ষ যে শুধু স্থানীয় খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছেন তাই নয় তাঁরা তরুণ খেলোয়াড়দের প্রতি যেরূপ সুবিচার ক'রে আসছেন তা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়।

আর ভট্টাচার্য্য

এ রায়চৌধুরী

এই খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধের কিছুক্ষণ আক্রমণ করা ছাড়া মহমেডান বিশেষ কিছুই ক'রতে পারেনি। মোহনবাগান সমস্তক্ষণ বিজয়ীর মত খেলেছে। ব্যাকে পি চক্রবর্ত্তী, সেণ্টার হাফে পরামাণিক আর ফরওয়ার্ডে রায় চৌধুরী ও গুঁইয়ের খেলা অতুলনীয়। হাফ ব্যাক তিনজনই নূতন; সকলেই মহমেডানের বিরুদ্ধে যে এত ভাল খেলবে তা আশা করা যায় নি। মহমেডানের নূর (বড়) প্রাণপণ খেলেছে; ব্যাকে বাচ্চি শ্রেষ্ঠ। মোহনবাগান রক্ষণভাগের কাছে মহমেডানের ফরওয়ার্ড লাইন বিশেষ সুবিধা ক'রতে পারেনি আর সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় ৫০ মিনিট খেলার ভেতর মহমেডান একটাও কর্ণার পায়নি। ১৯ মিনিটের সময় এ দে ৪৫ গজ দূর থেকে সট ক'রে প্রথম গোল করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে রায়চৌধুরীর গোলটি খুব চমৎকার ও দর্শনীয় হ'য়েছিলো। এ দের কাছ থেকে বল পেয়ে গুঁই সেণ্টার ক'রলে নন্দ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হেড দিয়ে গোল করে। রায়চৌধুরীর ড্যাসিং এখনও চমৎকার আর ক্ষিপ্রগতিতে হেড প্রদান এখনও তার পুরাতন 'ফরমের' কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

লীগের রিটার্ণ ম্যাচে মহমেডান মোহনবাগানকে দুগোলে হারিয়ে পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। খেলা আরম্ভ হবার মাত্র ছয় মিনিট পরে নীলু ছোট নূরকে 'ফাউল' করার জন্য পেনাল্টি হয় এবং তার থেকে বাচ্চি খাঁ গোল করে। এর আট মিনিট পরেই কে দত্ত রসিদের একটি সট আটকাবার পর বলটি মাটিতে পড়ে যায়; টি চৌধুরী দত্তকে সাহায্য ক'রতে এলে রসিদ চৌধুরীকে ফাউল করে; এই অবসরে ছোট নূর গোল দিয়ে দেয়। পর পর দুটি গোল হ'য়ে যাওয়ার ফলে মোহনবাগান একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়ে। অনুরূপ ক্ষেত্রে মহমেডানদের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম হ'ত। গোল খেলে পরাজয়ের কালিমা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাদের কি আপ্রাণ চেষ্টা!—বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। যেমন ক'রে হো'ক গোল পরিশোধ ক'রতেই হবে। দলের কেউ গোল দিলে তারা সকলে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে।—দলের জয় হ'লেই হ'লো। তাতে প্রাণ দিতেও পরাঙ্মুখ নয়। বাহবা দিতেই হয়।

ইষ্টবেঙ্গল কালীঘাট ও রেঞ্জার্স যারা লীগের প্রথম দিকে বেশ জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রেছিলো, তারা এখন পিছিয়ে প'ড়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের লক্ষ্মীনারায়ণ এবং মদ্রপ্রদেশের অপর একটি খেলোয়াড় এ আই এফ এফের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এখানে খেলতে পাচ্ছে না। লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য তাদের হয়ত কিছু ক্ষতি হ'তে পারে কিন্তু অপর খেলোয়াড়টি না খেলার জন্য তাদের কোন ক্ষতি হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। বরং তাতে দু একজন বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড় সুযোগ পাচ্ছে এবং তারা উন্নততর খেলছে। কালীঘাট তাদের tradition

বজায় রেখেছে ; প্রায় প্রতি বছরই তারা লীগের প্রথম বিভাগে খুব ভাল খেলে কিন্তু শেষের দিকে তাদের অবস্থা বরাবরই মধ্যস্থানীয়। কে ভট্টাচার্য্য ও আব্বাসের খেলা পড়ে গেছে। যারা মস্তিষ্কের স্থিরতা রেখে ধীরভাবে খেলে, কাষ্টমসে গিয়ে তাদের মত খেলোয়াড়দের 'ফরম' রাখা সম্ভব নয়। লীগের নিম্নস্থানীয় টীমগুলির মধ্যে এবার খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা চ'লছে। ক্যালকাটার অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় ; দ্বিতীয় বিভাগের খেলায় উপস্থিত ডালহৌসী প্রথম স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে তবে তাদের সঙ্গে অরোরা ও জর্জ্জ টেলিগ্রাফের পয়েণ্টের ব্যবধান খুবই কম।

রেফারিং ঃ

সম্পূর্ণ ত্রুটি বিচ্যুতিহীন রেফারিং সম্ভব নয়। আমরা দর্শকরা যা দেখি তা সহস্র সহস্র চোখ দিয়ে আর রেফারিকে একা সমস্ত খেলার বিচার ক'রতে হয়। দর্শকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে খেলা দেখতে পারেন না এবং দর্শকের গ্যালারীতে ব'সে সব সময় খেলার প্রকৃত অবস্থা দেখতেও পান না সেই জন্য তাঁদের বিচারেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রেফারির মারাত্মক ভুলেরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে যা অধিকাংশ সময়েই স্বেচ্ছাকৃত! আবার অনেক সময় ইচ্ছাকৃত না হ'লেও রেফারি নিজের ভুল বুঝেও মিথ্যা সম্মান ও জিদ বজায় রাখবার জন্য পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন ক'রতে চান না।

প্রতিবারের ন্যায় এবারের লীগে অনেকগুলি খেলায় রেফারির মারাত্মক ভুল লক্ষিত হ'য়েছে। মহমেডান-ক্যালকাটার খেলায় মহমেডান শেষ মুহূর্ত্তে অফসাইড থেকে গোল দিয়ে খেলাটিতে জয়ী হয়। রেঞ্জার্স-স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলায় রেফারি আমেদ রেঞ্জার্সের একটি সম্পূর্ণ বৈধ গোলই অগ্রাহ্য করেন। মহমেডান-বর্ডারের প্রথম খেলায় বর্ডার যখন এক গোলে জিতছে এই আমেদই পেনাল্টি সীমানা থেকে অনেক দূরে বর্ডারের একজন খেলোয়াড়ের হ্যাণ্ডবল হওয়ায় পেনাল্টি দেন। ল্যাইন্সম্যান মাঠের ভেতর এসে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলেও তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। অবশ্য এইরূপ রেফারিংয়ের ফলে তাঁর মত একজন প্রবীণ রেফারীকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের ম্যাচ খেলানোর থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'য়েছে।

খারাপ রেফারিংয়ের জন্য রেফারিকে দর্শকদের কাছ থেকে যে সমাদর লাভ ক'রতে হয় তা সকলেই জানেন। অবশ্য কোন কোন বিশেষ ক্লাব পরাজিত হ'লে তাদের সমর্থকরা এবং সময় সময় খেলোয়াড়রাও পরাজিত হওয়ার জন্য রেফারিকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেন তাতে রেফারিং যত ভালই হ'ক। ফলে এইরূপ টীমের পরাজয় ঘটলে রেফারীকে পুলিশ বেষ্টিত হ'য়ে মাঠ ত্যাগ ক'রতে হয় এবং সময়ে সময়ে দৈহিক লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়।

কিন্তু আমাদের দেশে রেফারীকে লাঞ্ছিত করার যে সব ঘটনা পাওয়া যায় তার তুলনায় ইউরোপ ও আমেরিকার ঘটনাগুলি যেমন অভিনব তেমনি ভয়াবহ ও রোমাঞ্চকর।

আর্জেণ্টাইনে একবার ছুটি টীমের ভেতর খেলা হ'চ্ছে ; প্রবল উত্তেজনার ভেতর একপক্ষ অপর পক্ষকে গোল দিলে। যারা গোল খেলো তাদের একজন খেলোয়াড় বিপক্ষের একজনকে ধাক্কা দিয়েছে। গাটি নামে একজন খেলোয়াড় রেফারিকে ব'ললে তাহ'লে গোল অগ্রাহ্য ক'রে দেওয়া হ'ক। কিন্তু রেফারি তাতে রাজি না হওয়ায় গাটি রেফারির নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুঁসি লাগালে। বলা বাহুল্য এর পর গাটিকে পুলিস দিয়ে মাঠ থেকে বার ক'রে দিতে হ'য়েছিলো।

আর্জেণ্টাইনের লা প্লাটা নামক আর একস্থানে রেফারী যখন অনেক কথা কাটাকাটির পরও স্থানীয় ক্লাবের পক্ষে একটি পেনাল্টি দিলেন না তখন ঐ ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট রেফারির মাথাটিকে চমৎকার তাক করে রিভলবার ছুড়েছিলেন। কোন খেলোয়াড়ের আচরণ অথবা রেফারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করাটা ওখানে কোন রকম দোষনীয় নয়।

লেক ক্লাব মনসুন রেগাটা ফাইনালে কে সি সেন ২½ লেংথে আর পারাখকে পরাজিত ক'রে সিনিয়র স্কাল বিজয়ী হয়েছেন। সময়—১ মিঃ ১০½ সেঃ

১৯৩২ সালে নববর্ষের দিন একটি ফুটবল ম্যাচে রেফারি বাক্স্টার বার্কিং টাউন টীমের বিরুদ্ধে একটি পেনালটি দেওয়ার ফলে খেলাটি ড্র হ'য়ে যায়। রেফারি কিন্তু মাঠের সন্নিকটস্থ ষ্টেশনে অক্ষত দেহে পৌছতে পারেন নি। চক্ষু ছুটি তাঁকে একেবারে হারাতে হয়নি বটে তবে তাঁকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হ'য়েছিলো।

ঠিক একই সময়ে, যদিও এই ঘটনা স্থল থেকে বহু দূরে এক স্কটিশ স্পোর্টসমানের (?) মুষ্টি চালনার ফলে ওয়াটসন নামে অপর এক রেফারির জন্য খেলার মাঠে ডাক্তার ডাকবার প্রয়োজন হ'য়েছিলো।

রেফারিকে লাঞ্ছনা করা বিষয়ে পূর্ব্বে প্রেগের বেশ একটু সুনাম ছিলো ; অবশ্য বর্ত্তমানে তা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। পৃথিবীর বিখ্যাত ইন্টার ন্যাশানাল রেফারী গ্রুথেফের এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। একবার প্রেগে বোহেমিয়া ও ইংলণ্ডের খেলায় তাঁকে রেফারী হ'তে অনুরোধ করা হয় কিন্তু সেইদিনই তাঁর অপর স্থানে যাবার কথা ছিলো ব'লে তিনি সে অনুরোধ রাখতে পারলেন না। পথে এক ষ্টেসনে তিনি একটি 'ইভনিং পেপার'-এ দেখেন তাতে বড় বড় হরফে লেখা র'য়েছে যে, বিখ্যাত রেফারি জনলুই বোহেমিয়া ও ইংলণ্ডের খেলা পরিচালনা ক'রতে গিয়ে এরূপ গুরুতর ভাবে জখম হ'য়েছেন যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাতে হ'য়েছে।

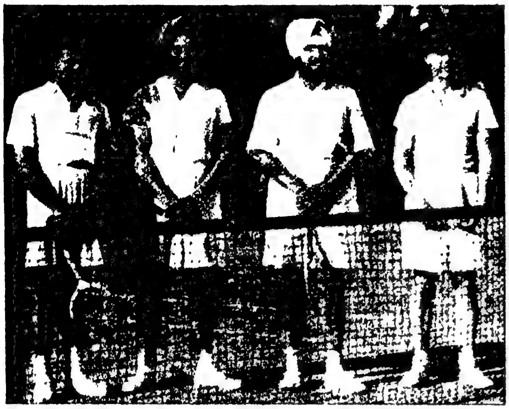

সিমলা ডবলস টেনিস চাম্পিয়ানসিপ বিজয়ী (বামদিক হইতে) আর সি খাঁ ও সর্দার জসপাল সিং, (ডানদিক হইতে) এস সি গিল ও বি আউন (বিজিত)

প্রেগে খেলা থাকলে গ্রুথেফ ফাইনাল হুইস্ল বাজাতেন একেবারে টেণ্টের কাছে এসে। তারপর একেবারে ছুটে ড্রেসিং রুমে ঢুকে দরজায় খিল দিতেন। অবশ্য তিনি ভিতর থেকেই রেফারীর দর্শনপ্রার্থী উন্মত্ত জনতার কোলাহল শুনতে পেতেন। প্রবাদ আছে, সেখানে রেফারিং ক'রতে যাবার আগে রেফারিরা তাঁদের লাইফ ইন্সিওরেন্সের কাগজগুলো ঠিকমত আছে কিনা দেখে যেতেন। একবার একজন বিখ্যাত সুইডিস রেফারি একটি খেলা পরিচালনার পর ড্রেসিং রুমে আশ্রয় নিয়ে সেইখান থেকেই শুনতে পেলেন বাইরে উন্মত্ত দর্শকবৃন্দ তাঁর রক্ত দর্শনের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তিনি ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষকে জানালেন যে, তিনি যদিও মোটেই ব্যস্ত হ'চ্ছেন না তবে তাঁর গৃহিণীকে তিনি যে জীবিতাবস্থায় আছেন এইটুকু টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিতে পারলে বড়ই ভাল হয়। কেননা তাঁর গৃহিণীর নিকট প্রেগের ফুটবল খেলায় দর্শকদের সুনাম অজানা নেই। ১০, ৭. ৪০.

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সহরতলী"—২৲
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পসঞ্চয়ন "বিষকন্যা"—১৷৹
'বনফুল' প্রণীত "মৃগয়া"—২৲
প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস 'তরঙ্গ"—২৲
বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত উপন্যাস 'ফল্গু"—১৲
আশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস 'কাঞ্চনদীঘির মেয়ে"—২৲
প্রসাদচন্দ্র দে প্রণীত উপন্যাস 'কালস্রোত"—১৷৹
বিজয়নাথ সরকার প্রণীত "কেদার বদরী কুমাওন"—১৲
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রণীত "মহাভারতের কথা"—১৲
শিবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "রাজা"—৷৵৹
মুজিবর রহমান প্রণীত "সিরাজ উদ্দৌলার কলঙ্ক মোচন"—৷৵৹
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "এ যুগের সম্রাট"—৷৷৹
লীলাময় দে প্রণীত উপন্যাস "কবিতার জন্মদিন"—২৲
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১ম ভাগ) (৩য় সং)—৩৲
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "নার্সিং হোম"—১৷৹
বিহারীলাল সরকার প্রণীত "তন্ত্রপ্রদীপ" (১ম)—৷৷৹
আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত উপন্যাস "জল আর আগুন"—২৷৹
সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আত্মহত্যা"—১৲
ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'ঋষি অরবিন্দ"—৷৷৵৹
সুবোধকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত "সাহারার আতঙ্ক"—৷৷৵৹
ভূধরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রাতের বিভীষিকা"—৷৵৹
গঙ্গাপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রণীত "পিশাচ দ্বীপের বিভীষিকা"—৷৷৵৹
নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রণীত "রক্তমুখী ড্রাগন"—৷৷৹
ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূপর্য্যটক) প্রণীত "প্রবাসে"—১৷৷৹
কবিরাজ ক্ষেত্রকালী রায় প্রণীত "ভূ-সেন দেবের কথা"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র ধর

বন্যা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৪৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

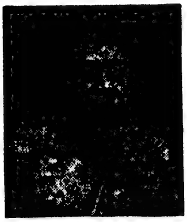

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-জ্ঞান

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ঈশ্বর অর্থাৎ জগতের একজন সচেতন নির্ম্মাতা যে আছে, এক সময়ে তার নিঃসন্দেহ প্রমান-হিসাবে দেখান হ'ত জগতের নির্ম্মাণ-কৌশল। একটা ঘড়ি যদি দেখি, দেখি তার বহুল কলকব্জা, কি রকমে তারা সব সাজান গোছান রয়েছে, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার, কত জটিল গতি তাদের, অথচ পরস্পরে মিলে কি অপরূপ সামঞ্জস্যে চ'লে একই উদ্দেশ্য-সাধনে নিযুক্ত। তখন তা থেকে অব্যর্থভাবে সিদ্ধান্ত করি, ঘড়ি-নির্ম্মাতার অস্তিত্ব, যার বুদ্ধির নৈপুণ্য প্রতিফলিত হয়েছে তার নির্ম্মিত বস্তুতে। জগৎ কি ঠিক সেই রকম একটা চমৎকার যন্ত্র নয়?

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কেমন অব্যভিচারী নিয়মে পরস্পরের সম্বন্ধ অটুট রেখে কোটি কোটি বৎসর ধরে চলেছে, ঋগ্বেদীয় ঋষির ভাষায়, তারা মিশে যায় না, থেমেও পড়ে না—ন মেথতে ন তস্থতুঃ। আর যে নিয়মে তারা চলছে, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমরা যা আবিষ্কার করেছি তা কি অপরূপ গাণিতিক নিয়ম। বৃহৎকে ছেড়ে ক্ষুদ্রের মধ্যে দেখ—দেখ দানা-বাঁধার জ্যামিতি, পরমাণুর মধ্যে চ'লে যাও, দেখ প্রোটন ইলেকট্রনের ছক সব, কোথায় লাগে তার কাছে তাজমহলের স্থাপত্যকৌশল!

একটি ফুলের মধ্যে—তার বোঁটা পাপড়ী, তার গর্ভকোষ রেণু পরাগ, তার রঙের মেলা, রেখার সমাবেশ—সেখানে কি যে নিখুঁৎ নিপুণ কারিগরী রয়েছে তার উপরে একটু ধ্যান দিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতে হয়। ফুল তার পর কি রকমে ফলে রূপান্তরিত হয়ে উঠছে—ফল ধীরে ধীরে কি রকম পুষ্ট পরিণত রসায়িত হয়ে এক সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করছে, সে ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

আবার দেখ এই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যাতীত তৃণগুল্ম তরুলতা, তাদের জীবন কত বিচিত্র কত বহুরূপ—দেশে দেশে মাটির আবহাওয়ার সাথে অপরূপ সামঞ্জস্য রেখে তারা কত আকারে প্রকারে দেখা দিয়েছে। মরুভূমিতে থাকতে হবে তৃণের, দেখ কি শক্ত সমর্থ আভরণ-হীন বাহুল্য-বর্জ্জিত তপস্বীর মত তার গঠন—কত অল্প জলেই তার প্রয়োজন মিটে যায়, তার শীষ, তার শিকড়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব ঐ এক লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত হয়েছে। শীতপ্রধান দেশের, সাইবেরিয়ার 'লিচেন' আবার তার নিজস্ব পরিস্থিতির সমতালে চলবার জন্য পৃথক ধরণধারণ গ্রহণ করেছে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলের গুল্ম হতে মহান মহীরুহ আবার তৃতীয় পর্য্যায়ের ব্যবস্থা দেখায়। প্রাণীজগতে দৃষ্টি দাও—জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর প্রত্যেকের দেহখানি গঠিত হয়েছে আপন আপন পারিপার্শ্বিকের প্রয়োজন অনুসারে। এই যে প্রয়োজন অনুসারে বৈষম্য এর মধ্যে যে কতখানি পরিমিতি শাস্ত্রজ্ঞান রয়েছে তার ইয়ত্তা নাই। পরিমিতি অর্থ প্রয়োজন অনুসারে আয়োজন—অযথা ব্যয় নাই, শ্রমের কি উপকরণের। মাছকে জলে থাকতে হবে, চলতে হবে—জলের চাপ সহ্য করার মত ক'রে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত হয়েছে, সাজান হয়েছে, জলের চাপ কেটে দ্রুত চলবার জন্য তার বিশিষ্ট আকারও দেওয়া হয়েছে (যার নকল করে মানুষ সবমেরীন টরপেডো তৈরী করেছে)। পাখীকে আকাশে উড়তে হবে—যে জিনিষ ভর করে সে উড়বে তার ওজন হওয়া চাই অল্প, আবার গঠন হওয়া চাই দৃঢ় অথচ নমনীয়। পাখীর ডানার কলম দেখ—তার হালকা হওয়া চাই, তাই সে ফাঁপা আবার পাতলা অথচ দৃঢ়, বাঁকে কিন্তু ভাঙ্গে না। মানুষের তৈরী এরোপ্লেন ঠিক এই সব বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর সব ছেড়ে যখন নিজেকেই দেখি, দেখি মানুষের দেহ—কি অপরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সেটি। সত্য সত্যই একটি বিপুল জটিল কারখানা সে। মানুষ নিজে যে যন্ত্র—তার তুলনায় মানুষের তৈরী যন্ত্র সব অকিঞ্চিৎকর। অস্থির সংস্থান, পেশীর সংস্থান, গ্রন্থীর সংস্থান, স্নায়ুমণ্ডলীর সমাবেশ, রক্তের চলাচল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কলা-কৌশল, জারণ সারণের ব্যবস্থা, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ—পদার্থতত্ত্বের রসায়নতত্ত্বের কত রকমে প্রয়োগ ক্ষেত্র এই দেহ—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যখন বস্তুটিকে দেখি তখন সাধারণ মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে এ বস্তু আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে, নাই এর একজন পরমনিপুণ সচেতন কারিগর।

এক সময়ে তাই মনে হ'ত, জগৎ-যন্ত্রের যন্ত্রী-হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মেনে নিয়ে আর উপায় নাই। চার্ব্বাক-পন্থীরা, লোকায়তেরা অবশ্য ছিলেন—কিন্তু তাঁদের অস্বীকৃতির বিশেষ মূল্য ছিল না। কারণ, তাঁরা এক রকম যাকে বলে গায়ের জোরে অস্বীকার করতেন, অস্বীকারের যথাযথ যুক্তি দিতেন না। সৃষ্টি আপনা থেকেই আপনি হয়েছে, আপনিই চলেছে, প্রকৃতির যে যন্ত্রপাতি কলকব্জা তার মধ্যে রহস্য কিছু নাই, প্রকৃতির প্রকৃতিই এই—স্বভাবো যদৃচ্ছা। এ ধরণের কথা বললে কিছুই বলা হয় না। (অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যেও কেউ কেউ—বৌদ্ধেরা, সাংখ্যপন্থীরা—ঈশ্বর মানেন না বটে ; কিন্তু তাঁরা চিন্ময় পুরুষ বা চিন্ময়ী প্রকৃতি বা চিন্ময় পুরুষের সংসর্গে চেতনাবান প্রকৃতি মানেন।)

কিন্তু বিজ্ঞানের যুগ নিয়ে এল এক নূতন রূঢ় আলো। মানুষের এক নূতন দৃষ্টি খুলল, তার কল্যাণে সৃষ্টিরহস্যের সকল রহস্য সহজ স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারল। সৃষ্টির অতীত এক যাদুকরের (Dens-ex machina) আর কোন প্রয়োজন রইল না। লামার্ক-ডারইনের ক্রম পরিণামবাদ সৃষ্টিধারার মধ্যে ফেললে এমন আলো যে, সব সমস্যাই আপন আপন সরল অব্যর্থ মীমাংসা নিয়ে পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। তাঁদের আবিষ্কারের ফলে মোট কথাটি দাঁড়াল এই—সৃষ্টির মধ্যে যে অদ্ভুত লক্ষ্যানুসরণ, উদ্দেশ্য অনুযায়ী যথাযথ উপায় নির্দ্দেশ, অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার সমাবেশ দেখি—তার কারণ ও-জিনিষটি এক ক্রমপরিণামের ধারায় নির্ব্বাচন ও উদ্বর্ত্তনের অলঙ্ঘনীয় ফল মাত্র। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সজীব দেহের, দেহের ও নিজের অঙ্গ সকলের পরস্পরের মধ্যে যে জটিল ছন্দ-সৌষীম্য, সৃষ্টির সর্ব্বত্র যে এত কলকৌশল তা একদিনে দেখা দেয় নাই, প্রথমে তা এত বিচিত্র এত নির্দ্দোষ ছিল না। প্রথমে একটা মোটামুটি ধরণের, একটা কোন-রকমের ব্যবস্থা মাত্র ছিল, সংস্পর্শের সংঘর্ষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আদানপ্রদানের ফলে ধীরে ধীরে এই সামঞ্জস্য এই লক্ষ্যানুগতা—বস্তুর উদ্দেশ্যানুযায়ী গঠন ও ক্রিয়া ফুটে উঠেছে। জীবনধারণের কঠোর

প্রয়োজনের চাপে জীব-জগতে জড়দেহে এই অপরূপ যন্ত্র গড়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে যারা বেঁচে-বর্ত্তে আছে—উদ্ভিদ্ হোক, প্রাণী হোক, আর মানুষ হোক—তারা বেঁচে-বর্ত্তে আছে ঠিক এই জন্যেই যে, তারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে, তাদের আধার—তাদের দেহের গঠন ও কর্ম্মসামর্থ্য—বহুদিনের বহুযুগের একটা বাছাই ও যাচাই-এর ফলে প্রস্তুত হয়েছে। অপটু আধার যত নষ্ট ও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, যেখানে পটুতা দেখা দিয়েছে, বাড়তে পেরেছে—সেখানেই উদ্বর্ত্তনের সম্ভাবনা হয়েছে। উদ্ভিদ থেকে প্রাণী, প্রাণী থেকে মানুষও এই রকম একটা সুষ্ঠু হতে সুষ্ঠুতর, সরল সামঞ্জস্য থেকে বহুমুখী সামঞ্জস্যের দিকে ক্রমগতির পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যে যন্ত্রকৌশল দেখতে পাই সেটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চাপে, বাছাই-ছাঁটাইর ফলে অব্যর্থভাবে দেখা দিয়েছে—অন্যপ্রকার হওয়ার কোন অবসরই এখানে ছিল না। পার্ব্বত্য নদীর স্রোতে ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে উপলখণ্ড যেমন মসৃণ গোলাকার হয়, পায় একটা সুষীম রূপ, ব্যাপারটি সেই রকমের। প্রকৃতি নিজের ভিতর থেকেই যন্ত্র হয়ে গড়ে উঠেছে, বাহিরের কোন যন্ত্রীর হাত এখন প্রয়োজন নাই।

প্রকৃতি-রূপ যন্ত্র এইভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরকে সৃষ্টি হতে বহিষ্কার করে দিয়েছেন—লাপলাস তাঁর সৃষ্টির মানচিত্রে স্রষ্টার বা ভগবানের জন্য কোন স্থানই খুঁজেই পান নাই; তার কিছু প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সৃষ্টির স্রষ্টা, যন্ত্রের যন্ত্রী যদি কেউ কোথাও থাকে তবে তাঁর উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক বলেছে—Verily thou art a God that hidest thyself.

বিজ্ঞান সৃষ্টি-সমস্যার এই মীমাংসা পেয়ে ও ধরে কিছুদিন বেশ নিশ্চিত ছিল—কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও ফাঁক দেখা দিতে সুরু করল, সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে আসতে লাগল। নূতন নূতন তথ্যের ঘটনার ব্যাপারের আবিষ্কার পূর্ব্বতন মীমাংসাকে টলিয়ে দুলিয়ে দিল। এই যেমন মীমাংসা হয়েছিল, স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল যে জীবন ধারণের পক্ষে আধারে যে পরিবর্ত্তনটি কাজে লাগে সেইটি বর্ত্তে যায় ও ক্রমে পুষ্ট হতে থাকে—এবং অনুপযোগী যা তা ক্ষয় পেতে থাকে, লোপ পেয়ে যায় শেষে। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন, গোড়ায় যে পরিবর্ত্তন হঠাৎ দেখা দিল তা সামান্য অকিঞ্চিৎকর, তখন তার উপযোগিতা ত প্রমাণ হয় নাই, উপযোগিতা প্রমাণ হয় যখন পরিবর্ত্তনটি পূর্ণ, যথেষ্ট পরিণত হয়েছে। লামার্কের তত্ত্ব মানলে বলতে হয়, পরে কাজে লাগবে এই ভবিষ্যতের আশায় বা পূর্ব্বদৃষ্টির আশায় সামান্য পরিবর্ত্তনটি বর্ত্তে থাকে ও বেড়ে চলে। কিন্তু এ ত আদৌ যান্ত্রিকতার ধর্ম্ম নয়—এ ত চৈতন্যের ধর্ম্ম। তাই এই সঙ্কট হতে উদ্ধার লাভের জন্য আকস্মিক-বৃহৎ-পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব (Mutation) আবিষ্কার করা হল। কিন্তু তাতেও সব মুস্কিলের আসান হ'ল কি? বাস্তব বস্তুর ও ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ যত বিস্তৃত হতে লাগল, দেখা গেল ফলে যে দূর, সুদূর ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, বর্ত্তমানে তার কোনই প্রয়োজন নাই, এ রকম ব্যবস্থা জীবদেহে বা জীব ও তার পরিস্থিতির সম্বন্ধের মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কেবল যন্ত্রের মত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে এ রকম ব্যবস্থাও যে গড়ে উঠেছে তা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। বেশি কথা কি, যখন চিন্তা ক'রে দেখি, অনু পরিমাণ একটি বীজকোষের মধ্যে সমগ্র মহীরুহটি কি প্রকারে লীন হয়ে থাকে, একই মাটির একই আহার্য্যে একটি বীজকোষ আপনাকে বিপুল অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত করে, আর একটি সামান্য লতা বা গুল্মের পরিমাণ অতিক্রম করতে পারে না, কয়েক জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে জীবদেহের, জীবচরিত্রের যাবতীয় বৈচিত্র্য সমুচিত থাকে—তখন রাজকোষ যে শুধু একটা জড় যন্ত্র মাত্র রূপায়নিক-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র মাত্র এ সিদ্ধান্ত শুধু জোর জবরদস্তি ক'রেই করতে হয়।

কেবল জড়শক্তির ক্ষেত্রে যাই যোক—সে কথা পরে বলছি—জীবনীশক্তির ক্ষেত্রে যে একটা পূর্ব্বানুভূতি, উদ্দেশ্য-পরায়ণতা, লক্ষ্যাভিমুখী গতি, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য বর্ত্তমানেই আয়োজন—এ সকলের উদাহরণ যে যথেষ্ট পাওয়া যায়, তা আজকাল আর অগ্রাহ্য করা চলে না। প্রাণশক্তির খেলাকে কেবলই জড়শক্তির কথা দিয়ে সম্পূর্ণ বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভবই। মনের জগতে (বিশেষভাবে মানুষের মধ্যে এবং কথঞ্চিৎ হয়ত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে) সচেতন ইচ্ছাশক্তি প্রকট। প্রাণের, জীবনীশক্তির জগতে ইচ্ছাশক্তি সচেতন হয় নাই, কিন্তু তাই বলে নাস্তি নয়। মানস ইচ্ছাশক্তির পরিবর্ত্তে

নিম্নতন প্রাণীর এবং উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি। মানবেতর উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে প্রাণজ ইচ্ছাশক্তিই প্রধান, তবে তার মধ্যে মানস ইচ্ছাশক্তির ন্যূনাধিক আবেশ হয়েছে। প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি-অধিকৃত মানস-ইচ্ছাশক্তিরই নাম হল পশুসুলভ সহজাত প্রেরণা (instinct)। উদ্ভিদের মধ্যে মনের কোনই আবেশ নাই, সেখানে বিশুদ্ধ অমিশ্র প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি। উদ্ভিদের যে বৃত্তিকে বলে "আভিমুখ্যতা" (tropism) অর্থাৎ যেদিকে আলো বা আহার্য্যের বা অবলম্বনের সম্ভাবনা সেদিকে মাঝে বাধা সত্ত্বেও ঘুরে বেঁকে চলা, সে ব্যাপারটি উদ্ভিদের প্রাণজ ইচ্ছাশক্তির অপূর্ব্ব পরিচয়।

তবে জড়স্তরে, বিশুদ্ধ জড়স্তরে কোন রকম ইচ্ছাশক্তির চিহ্ন কিছু পাওয়া যায় কি? জড়জ ইচ্ছাশক্তি যদি থাকে, কি ধরণের বস্তু তা? অবশ্য জড়ের আকর্ষণ বিকর্ষণকে এই ধরণের শক্তি অনেকে বলেন—কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তা মানবেন না, বলবেন এ কেবল কবিতা, উপমা—pathetic fallacy. ইচ্ছাশক্তির খেলার মধ্যে একটা নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা থাকা চাই, দ্বৈতভাবের অনিশ্চয়তার অবকাশ থাকা চাই—নতুবা জিনিষটি একান্ত যন্ত্র সর্ব্বতোভাবে নিয়মের বাধ্য ও বদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান জড়ের এমন একটা স্তরে আমাদের নিয়ে গিয়েছে যেখানে জড়ের আচার-ব্যবহার অপ্রত্যাশিত রকমের হয়ে গিয়েছে—এবং সে যে যন্ত্রবৎ নিয়মবদ্ধ, তার গতির মধ্যে দ্বৈতভাবের অনিশ্চয়তার কোন অবকাশ নাই একথা আর বলা চলছে না। জড়ের যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড—বৈদ্যুতিক কণা—ব্যষ্টি-হিসাবে তার গতিবিধি নির্ণয় করা হয় না—প্রত্যেকে যে কোন পথে চলবে না চলবে কোন রকম হিসাব—নিকাশ ক'রেও তা আবিষ্কার করা যায় না, বলতে ইচ্ছা হয় তারা খোস-মেজাজীখেয়ালী ; তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ গতিবিধিকেই কেবল নিয়মের মধ্যে বাঁধা যায়। শুধু তাই নয় ; আরও বিস্ময়ের কথা আছে। বৈদ্যুতিক কণাও নাকি সকল যান্ত্রিক ধর্ম্ম ও নিয়ম অগ্রাহ্য ক'রে সম্মুখে বাধা সত্ত্বেও বাধাকে ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে যায় দূরস্থ তার সহধর্ম্মীর সাথে মিলবার জন্য *।

এ ধরণের গতি বা বৃত্তিকে আমরা ইচ্ছাশক্তির পর্য্যায়ে ফেলতে চাই না, কারণ ইচ্ছাশক্তি অর্থে আমরা বুঝি প্রধানত মানস ইচ্ছাশক্তি—প্রাণজ ইচ্ছাশক্তি একটু কল্পনা ক'রে বুঝলেও বুঝতে পারি, জড়জ ইচ্ছাশক্তি আমাদের কল্পনার ধারণার অতীত।

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে ক্রমপরিণাম বা বিবর্ত্তন যদি সত্য হয়, তবে আমাদের সাহস ক'রে ঐ ধরণের বস্তুকে অস্বীকার করাও সমীচীন হবে না। বিবর্ত্তনের যত নিম্নস্তরে নেমে আসি চেতনার প্রকাশ তত হ্রাস পেতে থাকে। মানুষে যে বৃত্তি স্পষ্ট স্ফুট নিঃসন্দেহ, মানুষেতর উচ্চতর প্রাণীতে তার উপর পরদা পড়তে তার নিমীলন হতে সুরু হয়েছে, নিম্নতন প্রাণীতে তা ক্ষীণ, উদ্ভিদে তা সন্দেহের বিষয়, জড় পদার্থে তা একেবারে লীন বা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। তবে কথা এই, লীন বা আচ্ছন্ন হয়ে বলে সে বস্তু যে লয় বা লোপ পেয়েছে, আদৌ নাই, তা নয়। নিম্নতম স্থূলতম জড়ের মধ্যেও চেতনা ইচ্ছাশক্তি রয়েছে—তবে তা সুপ্ত, অন্তর্লীন, অন্তর্গূঢ়—এবং সেই অবস্থাতেও পশ্চাৎ হতে তার একটা নিভৃত চাপ বাইরের ক্রিয়াকলাপের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করবেই, বাইরের রূপকে কথঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত করবেই। বৃক্ষের বন্ধন, দেহস্থ কেশ বা নখ পৃথক ক'রে দেখলে মৃত জড় পদার্থ মাত্র, কিন্তু জীবন্ত বৃক্ষের ও দেহের জীবনীশক্তি যখন পিছনে তার

---

* পাছে আপনারা মনে করেন যে, আমি রঢ় বিজ্ঞানের কথা না ব'লে উপন্যাস রচনা করছি, তাই বৈজ্ঞানিকের নিজের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করলাম ; যদিও বৈজ্ঞানিকটি হলেন "প্রাণ-বৈজ্ঞানিক" মাত্র, একেবারে আদি অকৃত্রিম "জড়-বৈজ্ঞানিক" নন : "One of the most amazing features of quantum mechanical theory is the discovery that electrons and other elementary particles will leak through a potential barrier which they could never cross if the classical physics were true. The electron is imprisoned, for example, in a metal filament and would gain Kinetic energy like a stone rolling downhill, if it could cross a gap to a positively changed plate. But to leave the metal it has to traverse a potential barrier at the surface of the filament and does not possess the requisite energy. According to the classical physics, it is like a stone in a small depression on a hillside, which cannot get out so as to roll down the hill. There is no force acting on the electron or the stone which will take them over the barrier. But such an electron does go out, though the stone does not."

The Marxist Philosophy and the Sciences by J. B. S, Haldane, pp. 145—146

চাপে তখন এরা সজীব, এদের ব্যবহারে সজীবতার ধর্ম্ম দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটি কতক এই ধরণের।

আলোর পশ্চাতে—আলো হ'ল জড়ের সবচেয়ে কম মাত্রার জড় রূপ—যেমন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রগত চাপের অস্তিত্ব বিজ্ঞানে আবিষ্কার করেছে, সেইরকম—আরও এগিয়ে যদি যেতে পারি তবে দেখি, এই জড় চাপের পশ্চাতেও রয়েছে একটা চেতনা অর্থাৎ অবচেতনার চাপ। সেটি অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিষয় নয়—তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির বিষয় করবার চেষ্টাও যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ সেটি হল আরও সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়াতীত, চিন্ময় দৃষ্টির বিষয়। আজকাল force(বল)-কে ছেড়ে field(ক্ষেত্র)-এর কথা বেশি বলা হয়। বোধ হয় তেজকে ছেড়ে বিজ্ঞান মরুৎকে আশ্রয় করতে চলেছে—কিন্তু তারও আগে রয়েছে ব্যোম—চিদাকাশ।

জড় প্রকৃতির, একান্ত জড়ের মধ্যে—তা মহতো মহীয়ান জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী হোক—আর অনোরণীয়ান পরমাণু হোক—সর্ব্বত্র একটা যে অপরূপ শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, ছন্দায়িত গতি, তাল মান রয়েছে তা খুবই স্পষ্ট। সকলেই জানে, আমরাও বলেছি, বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধে, তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়, তাদের আণবিক গঠনে, ওজনে পরিমাণের অর্থাৎ সংখ্যার যে নিয়মিত ধারা ছক বা প্যাটার্ন পাই তা বড়ই আশ্চর্য্যের। বস্তুর চলনের মধ্যে জড়বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে সমতালের ও পৌনঃ পুন্যের নিয়ম। (law of harmonics and heriodicity) বস্তুর গঠনে আবিষ্কার করছে জ্যামিতিক আকৃতি।

বলা হয় জড়বস্তুর ধর্ম্মই এই, জড় যে জড় তার প্রমাণও এই এখানে। ক্রিয়ার ধারায় একটা পুনরাবর্ত্তন, পৌনঃপুনিকতা, গঠনে একটা সমমান সমভঙ্গ হ'ল যন্ত্রের যান্ত্রিকতার লক্ষণ। দোলক দুলে চলেছে সমতালে, এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? অবশ্য, কেবল বাইরের দিক থেকে দেখলে, প্রকৃতির চলনের ও বলনের তালসাম্য মানসাম্য প্রভৃতি সম্বন্ধে তাদের সূক্ষ্মতা যথাযোগ্যতা তারিফ ক'রেই নির্ব্বাক থাকতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির অপরূপ যান্ত্রিকতা বিশ্লেষণ ক'রে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কলকব্জা খুলে খুলে আমরা তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পেরেছি হয়ত—কিন্তু এমন যান্ত্রিকতার উৎপত্তি কেন হ'ল, কি রকমে হ'ল তা বুঝি না, জানি না। ক্রমপরিণামবাদ সমস্যাটির উপর কিছু আলোকপাত করেছে বটে, কিন্তু তা বাহ্যত এবং তারও সামান্য অংশ নিয়ে। বেশিরভাগই রয়েছে অন্ধকারে, কতক ভাগ আবার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ হ'ল পরিমাণনির্ণয়—মাপজোফ। সেদিক দিয়ে কিছু বলা যায় কি—বর্ণছত্রে সাত রং কেন, স্বরগ্রামে সাতটি পর্দা কেন, পরমাণু-অন্তর্গত ইলেকট্রনেরও (ক্রিয়াশক্তি হিসাবে) সাতটি ক্রম কেন, আবার সে ইলেকট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা ঠিক সাতটি রকমে প্রভাবান্বিত হয় কেন! অন্যদিকে সৃষ্টির মূলতত্ত্বের দিক দিয়ে যে সব ক্রম বা লোকের কথা আধ্যাত্মিক দ্রষ্টারা বলে থাকেন তাদেরও সংখ্যা সাত—সপ্তচক্রং সপ্ত বহন্ত্যশ্বাঃ (ঋগ্বেদ)—সপ্ত ইমে লোকা (মুণ্ডক উপনিষদ)।

ফলত এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়েই এ জাতীয় সমস্যার সদর্থ আমরা পেতে পারি—অন্যথা নয়। অবশ্য তাই বলে আমাদের বক্তব্য এমন নয়—মধ্যযুগে যেমন সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, বিশ্বের একজন নিপুণ চতুর স্রষ্টা আছেন, বিধাতা আছেন, যিনি তাঁর সৃষ্টির ঊর্দ্ধে বসে এই রকমে গুণে গুণে মেপে জুখে সাজিয়ে গুছিয়ে জগৎটাকে গড়ে তুলেছেন (কেউ কেউ বলে এ কাজটি করতে তাঁর ছয় দিন লেগেছিল—সাত দিনের দিন তিনি বসে বসে নিজের গড়া জিনিষ নিজে দেখে আনন্দ উপভোগ করছিলেন—এখানেও সাতের প্রভাব!) কিন্তু ব্যাপারটি এ রকমের না হ'লেও এমন হওয়া অসম্ভব নয়, আমরা পূর্ব্বেই যে কথা বলেছি—যে একটা চেতনার চাপ পিছনে রয়েছে বলেই তার ছাপ বাইরে এই গোণাগুণতির কাঠামে ফুটে উঠেছে।

একটা ঘড়ির মধ্যে যে কলকৌশল (যার স্বরূপ গাণিতিক), তা হতে ঘড়িকারের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা যতই সুষ্ঠু হোক, তার চেয়ে আরও রহস্যের জিনিষ হ'ল কলকৌশলেরই মধ্যে মনের বা চেতনার ছাপ যে বাঁধা পড়েছে সেই কথা। চৈতন্যের সংস্পর্শে জড়ও চেতনবৎ হয়ে ওঠে। ঘড়ির চেয়ে আরও জীবন্ত রচনার উদাহরণ গ্রহণ করতে পারি—একখানি চিত্র বা একটি কবিতা। কবিতার মধ্যে গণিত রয়েছে অনেকখানি, চিত্রের মধ্যেও রয়েছে বহুল পরিমাণে জ্যামিতি—কিন্তু সে জ্যামিতি সে গণিত একটা জীবন্ত অনুভব বা চেতনার অব্যর্থ প্রকাশ বা সুশ্রী অবয়ব। রংএর, রেখার, ধ্বনির বিক্ষিপ্ত পরমাণুরাজিকে সংশ্লিষ্ট

সুষীম, মূর্ত্তিমান ক'রে ধরেছে শিল্পীর চেতনার চাপ। চেতনারই ধর্ম্ম নিয়ম শৃঙ্খলা সুসংস্থান সংগঠন—অচেতনার ধর্ম্ম হ'ল বিশৃঙ্খলা বিশ্লিষ্টতা বিপর্য্যস্ততা।

বললাম চেতনার সংস্পর্শে জড়ও চেতনবৎ হয়ে ওঠে—কিন্তু কেন, কি রকমে। ও দুটি যদি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, বিভিন্ন পর্য্যায়েরই হয় তবে ওদের সংযোগ, পরস্পরের পরস্পরের উপর প্রভাব কি ক'রে সম্ভব? যেমন দার্শনিক মহলে এক সময়ে সমস্যা হয়েছিল কর্ত্তৃকারককে লাঠ্যাঘাত করা যায় কি প্রকারে? তাই কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে একটা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা (pre-established harmony) দিয়েছেন। কেউ বা মীমাংসাকে একেবারে সরাসরি সরল ক'রে দিয়েছেন এই বলে যে, চিন্তা বা চেতনা বলে স্বতন্ত্র কিছু নাই, আছে কেবল জড়—চিন্তা চেতনা হ'ল জড়ের এক প্রকার রসস্রাব।

কিন্তু আমরা বলছি জড় যদি চৈতন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তার হেতু এই যে, জড়ের মধ্যে নিহিত বিলীন রয়েছে চেতনা। জড় হ'ল চৈতন্যের আত্মবিস্মৃত ঘনীভূত আকার।

এই সম্পর্কে একটি বিচিত্র ব্যাপার উল্লেখ করা যেতে পারে—তা হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; কিন্তু তার যে বিশেষ অর্থ কিছু আছে এমন কথা সাহস ক'রে সাধারণত কেউ ভেবেছে কি-না সন্দেহ। অনেক সময়ে একটা যন্ত্রের ব্যবহার কেমন অদ্ভুত মনে হয়। একটা ঘড়ি বা ইঞ্জিন বা নৌকা বা জাহাজ কখন কখন (যদি প্রায়ই না হয়) সজীব প্রাণীর মত চাল চলন দেখায়—যেন তাদের আছে ব্যক্তিগত খেয়াল, মেজাজ, নিয়তি। একান্ত জড় কলের ধর্ম্ম ছাড়াও তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে জড়াতিরিক্ত কিছুর, সজীব কিছুর আভাস ফুটে ওঠে। ইঞ্জিনের চালক, নৌকার মাঝি, জাহাজের সারেং (বা কাপ্তান) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে; তারা তাদের যন্ত্রকে (বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য) জীবন্ত জিনিষ বলে বোধ করে—আর এ বোধ যে কেবলই কাল্পনিক আরোপ মাত্র তা নয়।

* গুহ্যজ্ঞানের এক বিদ্যা আছে তাতে জানা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে এই জাতীয় যন্ত্র এক একটা অশরীরী সত্তা দিয়ে অধিকৃত হয়—অবশ্য যন্ত্রীর, যন্ত্রের মালিক বা চালকের চেতনাও ঐ অশরীরী সত্তার গঠনে কিছু উপকরণ নিশ্চয়ই জোগায়, তবুও তাকে একটা স্বতন্ত্র ও সজীব সত্তা বলেই মানতে হয়। এ ধরণের সত্তা তাই বলে যে বিশেষ উচ্চ স্তরের সচেতন জীব আদৌ তা নয়—যন্ত্রের অনুরূপই, যন্ত্রের অনুপাতেই সে হ'ল একটা জড়ানুগত, জড়াশ্রয়ী অবচেতন শক্তি।

এই রকম আরোপের বা অধিকারের ব্যাপারটি হয়ত সাধারণ সত্য নয়—কিন্তু এই দৃষ্টান্ত থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত এই করা যায় যে, যন্ত্রকার যেখানে রয়েছে সেখানে যন্ত্রের মধ্যে উদ্দেশ্যানুগতা (purposiveness) হ'ল যন্ত্রকারের চেতনার প্রতিরূপ, সেইরকম কোন যন্ত্রকারকে না দেখেও দেখি শুধু যেখানে যন্ত্রটি সেখানেও যন্ত্রগত উদ্দেশ্যানুগতা একটা চৈতন্যের পরিচয়—সে চেতনা বহিঃস্থ কোন যন্ত্রকারের কাছ থেকে না আসলেও, তা হতে পারে যন্ত্রেরই অন্তর্গত এক প্রচ্ছন্ন আপন-হারা বা আত্মবিস্মৃত চেতনা। সমস্ত জড়সৃষ্টিকে যদি এই রকম একটা যন্ত্র-হিসাবে গ্রহণ করি তবে সেখানেও বাহ্যযন্ত্রী না হোক, এক অন্তঃযন্ত্রী, এক প্রসুপ্ত অথচ সক্রিয় ইচ্ছাশক্তির সন্ধান পাই।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও অনুভূতি বলে যে সমস্ত সৃষ্টিই হ'ল চৈতন্যের (চিন্তার নয়—ব্যষ্টিগত চিন্তার ত নয়ই) বিকাশ। আপাতপ্রতীয়মান জড়ের অন্তরেও রয়েছে চৈতন্যের অস্তিত্ব, তবে সেখানে চৈতন্য হ'ল অবচেতন অর্থাৎ সুপ্ত আত্মগুপ্ত অন্তর্লীন। এই অন্তর্লীন চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন চাপেই জড়ে দেখা দিয়েছে জড়জগতের অপরূপ অত্যাশ্চর্য্য ছন্দের তালের মানের শৃঙ্খলা ও নিয়ম। জীবের মধ্যে, জীবনের ক্রমবিকাশের ধারায় এই চৈতন্য যত সজাগ পরিস্ফুট প্রকট হয়ে উঠেছে—প্রথমে উদ্ভিদে, তারপর ইতর প্রাণীতে, শেষে মানুষে—তত আধারের যান্ত্রিক সংগঠনটি জৈবিক ধর্ম্ম অর্জ্জন ক'রে চলেছে। বিপরীত দিকে, মানুষের মধ্যে যে চিন্ময় ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ জাগ্রত, ইতর প্রাণীতে তা অর্দ্ধজাগ্রত, উদ্ভিদে তা স্বপ্নগত, জড়ে তা সুপ্ত—কিন্তু সুপ্ত বলে নাস্তি নয়। ঊর্দ্ধতন স্তরে যা হ'ল সজাগ ইচ্ছার খেলা, উদ্দেশ্যমুখী সচেতন চেষ্টা, নিম্নতন স্তরে ক্রমে তা অনিচ্ছাকৃত, অবশ, শেষে যান্ত্রিক ব্যবহারে পরিণত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সর্ব্বত্রই রয়েছে একই চৈতন্যের চাপ, তবে বিভিন্ন প্রকারে, বিবিধ মাত্রায়—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ—

গল্প ও উপন্যাস

রাঙাদিদি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একে পটুয়ার মেয়ে—তার উপর বৃদ্ধের তরুণী-ভার্য্যা। ঠিক যেন জীর্ণ প্রাচীন সহকার-বিহারিণী আলোকলতা। জীর্ণ সহকারকে আপনার দেহজালের জটিল জালে আচ্ছন্ন করিয়া যেমন আলোকলতার অগ্রভাগগুলি সাপিনীর মত আশপাশের সরস সহকারগুলির দিকে উদ্যত হইয়া নাচে, বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার তরুণীভার্য্যা সরস্বতীও ঠিক তেমনি করিয়া হেলিয়া দুলিয়া যেন নাচিয়া ফেরে।

গণপতি পটুয়া এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিখ্যাত গুণী। তাহার হাতের আঁকা পট সাহেব-সুবায় কিনিয়া লইয়া যায়;—এমন নিখুঁত পটল-চেরা চোখ, ঠিক তিলফুলটির মত নাক, এমন মুঠিতে-ধরা কোমর, এমন সুডৌল কলসীর মত বুক—এ আর কাহারও তুলিতে ফুটিয়া ওঠে না। গণপতি শুধু তুলির টানে পট আঁকিতে বা হাতের কৌশলে পুতুল প্রতিমা গড়িতেই ওস্তাদ নয়, তাহার রচনা করা পটমাহাত্ম্যগান, দেবদেবীর নানা লীলার গানও বিখ্যাত। তাহার গান নাকি গেজেটে ছাপা হইয়াছে। 'দুর্গাঠাকরুণের শাঁখা পরা' 'শিবের মাছধরা' 'শিবের চাষ' 'শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ' প্রভৃতি অনেক পালাগানই সে রচনা করিয়াছে। এ অঞ্চলের পটুয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনে-মানে-গুণে গণপতি শ্রেষ্ঠ লোক। বৃদ্ধ বয়সে সেই লোক, সরস্বতী পটুয়ানীকে দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। সরস্বতীর বাপ-মা গণপতির টাকা দেখিয়া অমত করিল না, অনেকগুলি টাকা দিয়া বুড়া সরস্বতীকে ঘরে আনিয়া তুলিল। বুড়ার কয়জন সম্পর্কিত নাতি নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া মুচিদের ডাকিয়া বাজনা বাজাইয়া দিল—ঢাক ও শিঙা! বুড়া গণপতি কিন্তু অদ্ভুত লোক, সে ইহাতে রাগ করিল না, নাতিদের আদর করিয়া বসাইয়া পেটপুরিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া ছাড়িল।

কথাতেই আছে—"পটোনী আর নটোনী চাল-চলনে এক ছন্দ, কে ভাল তার—কে মন্দ!" 'পটোনী' অর্থাৎ পটুয়ার মেয়ে, আর 'নটোনী' অর্থে নটিনী এ দুইই নাকি এক; চলনে বলনে, রীতে করণে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, হাসিতে-কাশিতে ইহাদের পার্থক্য বিশেষ নাই। যেটুকু আছে তাহাকে এপিঠ ওপিঠ বলিলেই চলে—নক্সীপাড় সাড়ীর সদর মফস্বলের মত। সরস্বতীও পটুয়ার মেয়ে, নববধূ হইয়াও সে মুখ বাঁকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার ম্যাজেণ্টার রঙমাখা ঠোঁটের অন্তরাল হইতে মিশিদেওয়া দাঁতগুলি সেই যে কলঙ্করেখার মত আত্মপ্রকাশ করিল, সে আর কোনদিন আত্মগোপন করিল না। সকলের উপর আশ্চর্য্য—তাহার ওই হাস্যকলঙ্কচিহ্নিত মুখের উপর কখনও দুখের কৃষ্ণপক্ষ নামিয়া আসে না; চকিত অবগুণ্ঠনের লঘু মেঘেও কখনও সে মুখ ক্ষণিকের জন্য আবৃত হয় না।

বেলা দশটা বাজিতেই রাঁধা-বাড়া শেষ করিয়া পটুয়াদের মেয়েরা ব্যবসায়ে বাহির হয়। কাচের চুড়ি, মাটির পুতুল, পুঁতির মালা, কারঘুনসী, কাচপোকা-সোনাপোকা ডালায় সাজাইয়া তাহারা গ্রামে গ্রামান্তরে ফিরি করিয়া বেচিতে যায়। রঙীন ছিটের খাটো কাঁচুলীধরণের জামার উপর মুসলমানী ঢঙে ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া মাথায় ডালাটি তুলিয়া লয়। অভ্যাস এমনই হইয়া গেছে যে, ডালাটা ধরিবার পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয় না, দু'খানি হাতই দিব্য দুলাইয়া হেলিয়া দুলিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথেও তাহারা চলিয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া বেশ এক বিচিত্র সুরে হাঁকে—চাই রে-শমী চুড়ি—! সোহা—গি—নী! নী—ল্ মা-ণিক! গুল্ বা-হা-র!

চুড়িগুলির রঙের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নাম-করণ উহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। হলুদ রঙের চুড়িগুলির নাম সোহাগিনী, গাঢ় সবুজগুলিকে বলে নীলমাণিক, গুল্‌বাহার চুড়ির রঙ গোলাপী। ঘোর লালের নামের বাহার সব চেয়ে বেশী—'মন্‌চোরা'!

পুতুলেরও নাম আছে—‘কেশবতী’, ‘চম্পাবতী’ ‘কালিন্দী’। কেশবতীর মাথায় বেঢক রকমের খোঁপা, চম্পাবতীর গায়ের রঙ হলুদ, নীলরঙের পুতুলের নাম কালিন্দী। মাথায় হাঁড়ি ‘গোয়ালিনী, হাতে সাজি ‘মালিনী’, এ তো পুরানো নাম। এ ছাড়া পক্ষীরাজ-ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, লক্ষ্মীপেঁচা এসবও আছে। সরস্বতী নিজেই পুতুল গড়ে; গণপতি তাহাকে সখ করিয়া একাজ শিখাইয়াছে।

ফিরি করিযা ব্যবসা করিতে গেলে মুখও দেখাইতে হয়, মুখরাও হইতে হয়; কিন্তু সরস্বতীর সবই স্বতন্ত্র; মুখের সঙ্গে মাথায় কোঁকড়া চুলের খোঁপাটাও সে বাহির করিয়া রাখে, মিশি-দেওয়া দাঁতের হাসিতো কলঙ্ক রেখার মত দেখাই যায় এবং সে কলঙ্করেখা শুধু রূপেই বিকাশমান নয়, রবেও প্রকাশমান। সে রূপও রবের স্পর্শে তাহার জাতি-সুলভ মুখরতা নটিনীর পায়ের নূপুরের মত উচ্ছল মাদকতাময় এবং নিঃসঙ্কোচ। হাটে সে লোককে ডাকিযা জিনিষ বিক্রী করে। মনিহারীর দোকানে যে যুবকটি সাবান কিনিতেছে তাহাকে ডাকিয়া সে হাসিয়া বলে—চুড়ি নিবে না—চুড়ি?

—চুড়ি! সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—চুড়ি?

—হ্যাঁ চুড়ি। সোহাগিনী, নীলমাণিক, গুলবাহার, মনচোরা! কি লিবে দেখ! সরস্বতীর মিশি দেওয়া দাঁত মৃদু হাসিতে ঈষৎ বাহির হইয়া কাল বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক হানে, লোকটি চুপ করিয়া থাকে কিন্তু সরিয়া যাইতে পারে না। সরস্বতী বলে ব’স দেখ, চুড়ি দেখ; কেমন রঙ বল তোমার বউয়ের, আমি পছন্দ ক’রে দি দেখ। আমার মত গোরো রঙ?

লোকটা এবার মুচকি হাসিযা বলে—না!

—তবে? কচি কলাপাতার মত শ্যামলা? না, আরও কালো? কালো জামের মত ঘোর কালো?

শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে সে ঘোর লাল রঙের ‘মনচোরা’ রেশমী চুরি বিক্রী করিয়া ছাড়ে।

আরও একটি ব্যবসা আছে পটুয়ার মেয়েদের। ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তুলিবার জন্য। ছোট-বড় তিন-চার রকমের স্বচ হাতে করিয়া তাহারা গৃহস্থের বাড়ীতে যায়, গৃহস্থ কাপড় দেয় কস্তা দেয়—তাহারা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর নক্সা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নক্সাগুলিও তাহাদের মুখস্ত। লতাপাতা, পাখী-ফুল, খেজুরছড়ি, বরফি কাটা, বৃন্দাবনী, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। পাঁচ বছরের পটুয়ার মেয়ে মা-ঠাকুরমার কাছে উঠানে বসিয়া ধূলার উপর আঙুল দিয়া নক্সা আঁকিয়া শেখে, মুখস্ত করে। গৃহস্ত বাড়ীর বউ-ঝিয়েরা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া দূরে বসিযা তাহাদের অবলীলায় চালিত স্বচের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, গ্রাম গ্রামান্তরের দশের বাড়ীর গল্প শোনে। মুখরা পটুয়ার মেয়ে তাহাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া স্বচ চালাইতে চালাইতে বলিয়া যায় কোন্ গ্রামের কোন্ বাড়ির বউয়ের নতুন চুড়ি হইয়াছে, সে চুড়ির প্যাটার্ন কি; কাহার বাড়ির বউয়ের হাতের চুড়ি হঠাৎ অন্তর্হিত হইযাছে; কোন্ বাড়ির গিন্নীর কণ্ঠস্বর কুরুক্ষেত্রের কোন্ শঙ্খের মত; কোন্ বাড়ির বধূব কথা-গুলির ধার শাঁখের করাতের মত, ভাল মন্দ দুই ধারাতেই না কাটিযা ছাড়ে না; ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতী ইহার উপরে বউদিদি দিদিমণিদের লইয়া ঠাট্টা তামাসা করে; মুচকি মুচকি হাসিয়া ছড়া কাটে, কত নূতন লীলা রঙ্গ শিখাইয়া যায়। তাহারা তাহাকে গণপতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেই—বাস্ আর রক্ষা থাকে না। মুখে কাপড় দিয়া লজ্জার ভাণ করিয়া সেই যে সে হাসিতে আরম্ভ করে সে হাসি আর তাহার শেষ হয় না। অবশেষে সে তাহার স্বচগুলি গুটাইয়া লইয়া বলে—আজ আর হবে না দিদিঠাকরুণ, আজ চললাম, কাল আসব। দুষমনের হাড়ের দাঁত ও আর আজ বারণ শুনবে নাই।

সরস্বতী চলিয়া গেলে, মেয়েরা কঠোর সংযমে শীলতায় উগ্র হইয়া উঠে, সকলেই একবাক্যে বলে—সরস্বতীর মরণই ভাল! বৃদ্ধ হইলে কি হয় সে তো স্বামী, তাহার নামে ওই হাসি!

সরস্বতীর হাসি কিন্তু তখনও থামে না, সে হয়তো পথ চলিতে চলিতে তখনও আপন মনে হাসে, অথবা বাড়ি ফিরিয়া চিত্রাঙ্কন-রত গণপতিকে হাসিতে-হাসিতেই বলে—বাবুদের মেয়েরা কি বলছিল জান?

পট হইতে তুলি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গণপতি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করে—কি বলছিল?

মুখে কাপড় দিয়া তাহারই দিকে আঙুল দেখাইয়া সরস্বতী বলে—তোমার কথা শুধাচ্ছিল।

হাতের তুলিটা এবার নামাইয়া রাখিয়া সকৌতুকে গণপতি প্রশ্ন করিল—কি শুধাচ্ছিল ?

—বলছিল—। খুব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া সরস্বতী আরম্ভ করিল—বলছিল—। কিন্তু আর সে বলিতে পারিল না।

কি বলছিল ?

একখানা কাচের বাসন যেন অকস্মাৎ সঙ্গীতময় ঝণৎকারে ভাঙিয়া পড়িল—খিল-খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া সরস্বতী বলিল—শুধাচ্ছিল, বুড়াকে বিয়ে করলি কেনে ?

কৌতুক হাস্যে গণপতির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু কি বল্‌লি ?

—বললাম ? বল্‌লাম—বুড়া হ'লে কি হয় গো ঠাকরুণ, দাম যে বুড়ার লাখ টাকা। জান না, মরা হাতি লাখটাকা ? তা--ই-তো মরা লয়, বুড়া। গণপতি মানে গণেশ—আর গণেশের যে শুঁড় আছে গো !

গনপতি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বারবার ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিয়া বলিল—বড়ই বলেছিস রে সরস্বতী—খব বলেছিস তু। বুড়া হাতি ! গণপতি হ'ল গণেশের নাম ! গণেশের মাথায় গজের মুণ্ডু ! বাঃ।

সরস্বতীও পা ছড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি হঠাৎ তুলিয়া লইয়া সরস্বতীর ছড়ানো পা দুইখানির একখানি বাঁ হাতে ধরিয়া বলিল—তুলি দিয়া তোর পায়ে আলতা পরায়ে দি, দেখ্ !

ক্ষণিকের জন্য সরস্বতীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; ক্ষণপরেই সে মিশি দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, বলিল—ইয়ারা এলে বলে দিব কিন্তু !

গণপতি কোন উত্তরই দিল না। ইহারা অর্থে পাড়ার নাতি-সম্পর্কিত তরুণের দল। নিত্য সন্ধ্যায় তাহারা এখানে নামাজ পড়িতে আসে, নামাজ সারিয়া প্রহরখানেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা আড্ডা জমাইয়া হৈ-চৈ করিয়া কাটায়। নাতিরা সকলে একদিক হইয়া সরস্বতীকে রঙ্গরহস্যে বিপর্য্যস্ত করিতে চেষ্টা করে—সরস্বতী একা তাহাদের বাণ কাটিয়া তাহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। বুড়া গণপতি বসিয়া মৃদু মৃদু হাসে—প্রয়োজন হইলে মধ্যস্থতা করিয়া বিচার করিয়া দেয়।

* * * *

পটুয়ারা ধর্ম্মে ইসলামীয়, কিন্তু আচারে ব্যবহারে নামে, পুরা হিন্দু। তাহারা নামাজও পড়ে, আবার হিন্দুর ব্রত আচারও পালন করে, হিন্দুর অখাদ্যও খায় না। দেব-দেবীর প্রতিমা গড়ে, পটের উপর হিন্দুর পুরাণকথার ছবি আঁকে; সেই পট দেখাইয়া লীলা গান করিয়া ভিক্ষা করে। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে—পটুয়া, চিত্রকর। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ইসলাম। চাষবাসের বালাই নাই; ভিটা, চলিবার পথ, গৃহস্থের দুয়ার—এ তিন ছাড়া মাটির সহিত সম্বন্ধ নাই। সেই বলিয়াই সরস্বতীর মত মেয়েরও তাহাদের সমাজে সাজা নাই, কিন্তু তাহাদের রসনা তো মানুষেরই রসনা—সুতরাং নিন্দা না থাকিয়া পারে না; সরস্বতীর নিন্দায় পটুয়া-পাড়া ভরিয়া উঠিল। কিন্তু দিগন্তেরও ওপারের বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটার চকিত আভাস পাইলেও প্রাণঘাতী বিদ্যুৎ-শিখার সংস্পর্শ বা মেঘ-গর্জ্জনের ধ্বনি সরস্বতী ও গণপতির প্রত্যক্ষ গোচরে কোনও দিন আসে নাই। সে বিদ্যুৎশিখার উত্তাপ, আভা এবং গর্জ্জন প্রথম প্রত্যক্ষ করিল সরস্বতীই। হাটের পথে সরস্বতীর সঙ্গিনী ছিল সে-দিন তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ে, তাহার বাড়ির সান্ধ্যমজলিসের নিয়মিত সভ্য এক নাতির পত্নী। পথে নির্জ্জন মাঠে ছুতা করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া মেয়েটি বিদ্যুৎশিখার মতই জলিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ চীৎকারে সরস্বতীকে বলিয়া দিল—কালামুখী, কলঙ্কিনী, গলায় দড়ি দি গা তুই, গলায় দড়ি দি গা !

সরস্বতী হাসিয়া আকুল হইল, বলিল, গলায় দড়ি দিব কি বুন, সাওড়া গাছের ডালে দড়ি বাঁধতে গিয়া ভূতের ভয় লাগে; মনে পড়ে যায় তোর বরকে !

সঙ্গিনী মেয়েটা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে সরস্বতীর সঙ্গ ছাড়িয়া বিপথে ভিন্ন গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

বাড়ি ফিরিয়া মুখে কাপড় দিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া সরস্বতী গণপতিকে বলিল—কি এনেছি দেখ !

গণপতি কৃষ্ণলীলার পট আঁকিতেছিল, সে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—কি ?

—এই দেখ ! বলিয়া সে ডালা খুলিয়া দেখাইল।

—আরে বাপ ! এত ধানী-লঙ্কা কি হবে রে ?

—পাড়াতে বিলাব।

—কেনে ?

সরস্বতী হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তারপর কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সকল কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বলব, আমার হাতের গাছের লঙ্কা! লঙ্কা খেলে টিয়া পাখীতে খুব ভাল বুলি বলে। তোমরা খেয়ে দেখো, তোমরাও বুলি বলবে ভাল!

গণপতি মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটে তাহার কৌতুক ভরা মৃদু হাসি। সরস্বতী বলিল—কি ? কথা বলছ না যে ? 'বুড়া হাতির মাথায় দিলম ডাঙ্গসেরই বাড়ি'—না কি গো ? বলিয়া সে আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি বলিল—তার চেয়ে চিটে কদমা দিলি না কেনে 'দুষ্টু সরস্বতী' ? লোকের দাঁতে-দাঁতে লেগে গিয়ে আর খুলত না!

—উঁ হুঁ! সরস্বতীর কথাটা পছন্দ হইল না।

কিছুক্ষণ পর গণপতি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল—দেখ! সে নূতন পটের নূতনতম অধ্যায়ের ছবিটি তাহাকে দেখাইল। যমুনার ঘাটে একটি মেয়ের মুখের কাছে আর একটি মেয়ে তর্জ্জনী তুলিয়া চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কৃষ্ণলীলার পটের মধ্যে এ ছবি কোন কালে সরস্বতী দেখে নাই, সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—ই আবার কি হ'ল গো গুণিন ?

গণপতি বাঁ-হাতে পটখানি তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে ছবি দেখাইয়া গাহিল—

কুটিলার চসকু দুটি তারা হেন জ্বলে,
দন্ত কিড়িমিড়ি করি রাধিকাকে বলে।'
"কালামুখী কলঙ্কিনী রাইলো!
তোর মতন কুল-মজানী গোকুলে আর নাইলো!"

সরস্বতী মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। বলিল—কুটিলের নাকটা কিন্তুক আর টুকচা তুলে দিতে হ'ত বাপু! এমনি—ক'রে! বলিয়া সে নিজেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দেখাইয়া দিল। গণপতি হাসিল। সরস্বতী আবার মন দিয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। আবার সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কোন্ দোকানের রঙ আনছ বল দেখি ? সব রঙ কেমন মেটে মেটে খস্‌খসে লাগছে!

গণপতি বলিল—ধূলা পড়ছেরে, রঙের দোষ নাই। পথের ধারে ঘর—ফাগুন মাসের কাঁচা সড়ক—গাড়ীতে গাড়ীতে পথের ধূলা উড়ছে!

এ কথাতেও সরস্বতীর হাসি।

—তোমার মাথাটা কি হয়েছে গো! হি-হি-হি-হি! পাকা চুলের ডগায় ডগায় মেটে মেটে ধূলা—ঠিক কদম ফুল!

ওই মেয়েটির রাগের কারণ আছে। উহার স্বামী ঘনশ্যাম পটুয়াই গণপতির নাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সরস্বতীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রীর কাজ করে, দু পয়সা উপার্জ্জনও করে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গোটা কয়েক নূতন কাজ পটুয়াদের পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে। আগে তাহারা পট আঁকিত—পট দেখাইয়া গান করিত, বিনা পটেও মন্দিরা বাজাইয়া পুরাণের পালা গান করিত, প্রতিমা গড়িত, পুতুল গড়িত, রাজমিস্ত্রীর কাজ করিত, যাহারা সূক্ষ্ম কাজ পারিত না—তাহারা মাটির ঘর তৈয়ারী করিত। এখন তাহারা দেওয়ালে তেল রঙ দিয়া লতাপাতা ফুল আঁকে—কাঠের উপর রঙ ও বার্নিশের কাজও করে। কেহ কেহ তাঁতের কাজও করে। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রীর কাজ শিখিয়াছে, এখান ওখান করিয়া বড়লোকের বাড়িতে রঙের কাজ করে। শহর-বাজার হইতে সরস্বতীর পাতিজরদাটি সে নিয়মিত জোগাইয়া থাকে; রূপালী জরদা, কিমাম, কখনও বা আর দুই-চারিটা সখের জিনিষও আনিয়া দেয়।

ঘনশ্যাম তাহাকে বলে—রাঙাদিদি।

সরস্বতী মিশি দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিয়া তাহাকে ডাকে—কেলেসোনা। ঘনশ্যামের রঙ কালো। নামকরণ করিয়া দিয়াছে গণপতি নিজে।

সেদিন সরস্বতীর বিলানো ধানী-লঙ্কার ঝাল গোটা পাড়ায় একটা জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। নাতিদের দল মুখ ভার করিয়াই আসিয়া বসিল। ঘনশ্যামের সমাদরটা সকলের মনেই এতদিন গোটা ধানী লঙ্কার মত সরস রহস্যের আবরণে জ্বালা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লুকানো ছিল। আজ সরস্বতীই সেগুলি ভাঙিয়া ভিতরের বিষ বাহির করিয়া

দিয়াছে। ঘনশ্যামও আসিয়াছে। তাহার মনটাও ভাল নাই, তাহার স্ত্রী আজ তাহার সহিত চরম বচসা করিয়া ছাড়িয়াছে।

গণপতি নূতন পট দেখাইতেছিল। সরস্বতী রান্না করিতে করিতে অভ্যাসমত সরস রহস্যবাণগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের দল আজ তেমন সাড়া দিতেছে না। সরস্বতীর জলের অভাব ঘটিয়াছিল, সে ঘড়াটা কাঁখে লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলোটা কেউ দেখাবে হে নাগরেরা?

একজন বলিল—তোমার কেলেসোনা যাক।

—তাই এস হে, তুমিই এস ভাই।

ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল—যাবে তো কেলেসোনা, মজুরি কি দিবে গো রাঙাদিদি?

দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া সরস্বতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—মজুরি কিসের হে? বেগার দিয়া কে কোন্ কালে মজুরি পায়?

—উঁ—হু! ঘনশ্যাম বেগার লয়।

—বেগার লয়?

—না। উ হ'ল গিয়ে কেলেসোনা; কাল রঙের সোনা, সোনার পাথরবাটি, উ কেনে বেগার হবে?

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তা বটে! বল হে কেলেসোনা কি লিবে মজুরি?

ঘনশ্যাম কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একজন বলিয়া উঠিল—

"সব সখিকে পার করিতে লিব আনা আনা,
শ্রীমতীকে পার করিতে লিব কানের সোনা।"

অপর একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তোমাকে রাঙাদিদি আর বলব না ঠাকরুণদিদি—বলব 'বিনোদিনী'। 'কেলেসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী'। তোমার নাম হ'ল 'বিনোদিনী'।

গণপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তুমি বড় ভাল বলেছ হে নাতি; এ মজলিসে কল্কে তোমারই আগে পাওনা! লাও, কল্কে লাও। হুকা-সমেত কল্কেটি সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

সরস্বতীও খিল খিল করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সে উচ্ছল হিল্লোলে ঘাটের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তবে বাঁশী লাও হে কেলেসোনা, ঘাটের ধারে তুমি বাজাইবা—আমি জল ফেলব আর জল ভরব।

সরস্বতীর এই নির্লজ্জতায় সমস্ত নাতি-সম্প্রদায়ও আজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘনশ্যামের সহিত গোপন প্রেমের কথাটা এমন ঘোষণা করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় তাহাদের অন্তর রি-রি করিয়া উঠিল। একজন গণপতিকে বলিল—তোমাকে আমরা খাতির করি—ভালবাসি; কিন্তু তুমি এইবার গলায় দড়ি দিয়া মর! ছি!

গণপতি উত্তরে নাতি-সম্প্রদায়কে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গণনা শেষ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ভাবেই বুড়া বলিল—হ'ল না ভাই। তোমরা পাঁচের অনেক বেশী, আট জনা। পাঁচ হ'লে না হয়—বউয়ের নাম দিতাম দ্রৌপদী—তোমরা হতে পাণ্ডব। কথা শেষ করিয়া বুড়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

নাতির দল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরবেই একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী ঘাট হইতে ফিরিল উচ্চ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে। ঘনশ্যাম নীরবে আলোটি নামাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গণপতি বলিল—বস হে কেলেসোনা!

ঘনশ্যাম ঢোক গিলিয়া বলিল—রাত অনেক—না—বসব না। বলিতে বলিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতীর হাসি আরও বাড়িয়া গেল।

গণপতি কোন প্রশ্ন করিল না, সে তামাক সাজিতে বসিল। সরস্বতী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বলে তালাক দাও বুড়াকে, নিকা কর আমাকে!

গণপতি চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেও মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

* * * *

পরদিন হইতে নাতি-সম্প্রদায় গণপতির বাড়িতে নামাজ পড়িতে আসা বন্ধ করিল; অপর এক প্রৌঢ় পটুয়ার বাড়িতে তাহারা নামাজের আস্তানা গাড়িল। অভিরাম পটুয়া পয়সায় গণপতি অপেক্ষা কম নয়, সে ভাল রাজমিস্ত্রী, সৌখীন নক্সার কাজ সে ভালই করে। কিন্তু কুলকর্ম্মে রাজের কাজটা পটুয়া সম্প্রদায়ের নিকট কৌলীন্যজনক নয়। অভিরাম নামাজপ্রার্থীদের পুরোভাগে দাঁড়াইবার অধিকার

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া খুশী হইয়া উঠিল। সে শুধু জল তামাকের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ির ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিল। ডুগি তবলা—মন্দিরা কিনিয়া পালা গানের মহড়ার আড্ডাও খুলিয়া দিল।

কেবল ঘনশ্যাম আসা ছাড়িল না। এই লইয়া পটুয়াদের রমণী-সমাজ একেবারে শতমুখী হইয়া উঠিল। তাহারা সরস্বতীর সহিত একসঙ্গে ব্যবসায়ে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু সরস্বতীর তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। চুড়ি-পুতুলের পসরা চাপাইয়া সে একাই গ্রামগ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিত। প্রতিবেশিনীদের মুখে মুখে তাহার কলঙ্ক-কাহিনী অঞ্চলময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ফলে হাটে তাহার পসরার সম্মুখে ভিড় জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল মধুমক্ষিকার ঝাঁকের মত। নির্জ্জন পথে প্রান্তরেও দুই-একজন ক্রেতার পর্য্যন্ত অভাব হইত না। সরস্বতী সেইখানেই চুড়ি পুতুলের পসরা নামাইয়া বসিত। তাহার রাঙাদিদি নামটা পর্য্যন্ত সকলের জানা হইয়া গিয়াছে; ক্রেতারা হাসিয়া ডাকে—রাঙাদিদি!

সে বলে—কি লিবে লাও লাতি!

ঘনশ্যাম ইহাতে একদিন রাগ করিল—না রাঙাদিদি, ছি!

সরস্বতী কথায় জবাব দিল না, হাসিয়া সোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

ঘনশ্যাম আবার বলিল—হেসো না, এটা হাসির কথা লয়!

চোখ দুইটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া সরস্বতী প্রশ্ন করিল—লয়?

পরমুহূর্ত্তেই মুখে কাপড় দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে সে ভাঙিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুই দিন সে আসিল না পর্য্যন্ত। তৃতীয় দিনে সরস্বতী পসরা মাথায় করিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোপালপুরের পথ ধরিল। ওই গ্রামেই ঘনশ্যাম এখন জমিদারদের পুরানো বাড়িখানা নূতন করিয়া রঙ করিতেছে। বাবুরা না কি শহর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিবেন। গ্রামে কাহারও বাড়ি সরস্বতী যায় না, গেলে মেয়েরা তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তোলে।

প্রকাণ্ড বড় বড় থামওয়ালা জমিদারদের সদর কাছারী; ফটকের দুই পাশে জমানো-চূণ-বালিতে গড়া দুইটা সিংহ। সরস্বতী ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাঁকিল—চা—ই—রে—শনী—চুড়ি—

হাঁক সে আর শেষ করিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল। কিন্তু সে হাসিতে তাহার অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়া গেল। জমিদারদের কাছারী-বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া কুড়ি-বাইশ বৎসরের সোনার বরণ সে যেন কোন্ রাজার ছেলে।

ঘনশ্যামও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া বারবার হাত ইসারা করিতেছিল—পালাও, পালাও!

সরস্বতীর তখন ঘনশ্যামের ইসারা দেখিবার বা বুঝিবার অবসর ছিল না, বিস্ময় বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে সে ওই রাজার ছেলের দিকেই চাহিয়াছিল।

ছেলেটি রাজারই ছেলে, জমিদারের বড় ছেলে; সম্প্রতি পড়া-শুনার শেষ পরীক্ষা দিয়া গতকাল এখানে আসিয়াছে, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবে। ছেলেটি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি চাই?

—চুড়ি, রেশমী চুড়ি আছে, লিবেন?

ছেলেটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি নিয়ে কি করব?

সরস্বতী অপ্রতিভ হইয়া গেল—কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে উত্তর খুঁজিয়া পাইল, বলিল—বউরাণীর হাতে পরায়ে দিব।

—বউরাণী নেই। চুড়ির দরকার নেই।

—পুতুল, পুতুল লিবেন?

—তাই বা নিয়ে কি করব?

—টেবিলে সাজায়ে রাখবেন। সায়েবরা লিয়ে যায় আমাদের পুতুল।

—তাই না কি? দেখি তোমার পুতুল!

সরস্বতী পসরা নামাইয়া বসিল, সম্ভ্রমভরেই বোধ করি মাথায় সে আজ ঘোমটা টানিয়া দিল। তার পর বাহির করিল মাটির পুতুল—কেশবতী, কঙ্কাবতী, মালিনী, গোয়ালিনী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ।

রাজার ছেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—বাঃ! এ পুতুল তোমরা নিজেরা গড়?

—আজ্ঞা হ্যাঁ গো!

ঘোড়াটি তুলিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া তরুণ জমিদার বলিল—এটা কি ঘোড়া নাকি?

—আজ্ঞা হ্যাঁ। পক্ষীরাজ ঘোড়া। পক্ষীরাজ আকাশে উড়ে কি না!

—ঠিক কথা। কত দাম নেবে বল তো?

সরস্বতী মুচকি হাসিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিল—ওরে বাপরে! দাম আমি বলতে পারি—না লিতে পারি! আপনি দিবেন বক্‌শিস্। আপনারা হাত ঝাড়লে তাই আমাদের পব্বত।

জমিদারের ছেলেটি একটি টাকা সরস্বতীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুতুলের দাম দু'-পয়সা হিসাবে সাতটা পুতুলের জন্য চৌদ্দ পয়সার বেশী কেউ দিত না; সে টাকাটা কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। টাকা বাঁধিয়াও সে উঠিল না, আবার আরম্ভ করিল—পট লিবেন না? পট?

—পট?

—আজ্ঞা হাঁ; রামলীলা, কেষ্ট লীলা, গৌরলীলা! সাযেবরা কিনে লিয়ে যায় আজ্ঞা!

—ও! পট! তোমরা পট আঁক না কি? কিন্তু নতুন পট তো চলবে না, পুরনো পট চাই, আছে তোমাদের?

—আজ্ঞা, আমার মরদ খুব পুরানো নোক, ষাট বছরের বুড়া; তারই আঁকা পট আছে।

—তোমার মরদ মানে—তোমার স্বামী? ষাট বছরের বুড়ো?

—আজ্ঞা হাঁ গো! সরস্বতী মুখ হেঁট করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুক—খুক করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঘনশ্যাম আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনিতেছিল, সরস্বতীর চাপা হাসির শব্দে তাহার সর্ব্ব অন্তর ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা—ই, রে—শমী চুড়ি—

জমিদার-বাড়ির কাছারী-ঘরের জানালায় রাজার ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল।—পট এনেছ?

মাথার পসরা কাঁখে নামাইয়া—মাথায় ঘোমটা টানিয়া সরস্বতী হাসিয়া বলিল—রাজার হুকুম, না এনে পারি? বাপ রে!

—তবে? রেশমী চুড়ি বলে হাঁকছ যে?

—চাই—পট—বলতে কেমন লাগে যে! বলিয়া সে-খালি হাতটায় কাপড় টানিয়া মুখে চাপা দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—কই, আন তোমার পট, এই ঘরেই নিয়ে এস।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পসরা নামাইয়া সরস্বতী বলিল—খুব ভাল পট এনেছি, গৌরলীলার পট!

—গৌরলীলার পট বুঝি খুব ভাল?

—গৌরলীলার পট আপনার লাগবে ভাল। গৌরচাঁদের মত বরণ আপনার, তেমুনি রূপ—

—বল কি?

—হ্যাঁ। আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। এই দেখেন—বলিয়া পট খুলিয়া সে সুরে আরম্ভ করিল—

সোনার গৌর যায় পথ আলো করি—
যুবতীরা লাজে যায় মরমেতে মরি—
হায় রে এরে কেউ বাঁধতে লারে!

ত্রিশ-টাকায় তিনখানা পট বিক্রী করিয়া সরস্বতী রঙ্গভরে বিপুল উচ্ছ্বাসে হেলিয়া দুলিয়া ঘরে ফিরিল। নোট তিনখানা গণপতির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—লাও; আমার গৌরচাঁদের কেমন দরাজ হাত দেখ! পরমুহূর্ত্তেই মুখে কাপড় দিয়া হাসি আরম্ভ হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল—বলেছি বাবুকে। রাগ করে নাই! বললাম আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। তা মুখখানা হয়ে উঠল সিন্দূরে মেঘের পারা!

গণপতিও হাসিল—আজ কিন্তু তাহার হাসি ম্লান! সে বলিল—কিন্তুক গৌর—প্রেম ইয়ারা যে সইবে না বলছে! মেয়েগুলান তো শাঁখের মত গলা বার করেছে। কেলে-সোনা তোমার ধূয়া তুলেছে—মলে ফেলব না।

সরস্বতী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—বাবারে—তবে তো ভয়ে আমি মরে গেলাম! ভেবো নাই তুমি, তুমার আগে আমি মরব। তুমি আবার একটা নিকা করবে—টুকটুকে—চম্পাবতীর-পারা বরণ।

গণপতি হাসিয়া বলিল—না রে রাঙা-বউ ; দেহ আমার ভাল নাই।

সরস্বতী হাসিল—বিষণ্ণ হাসি, বলিল—সেও তুমি ভেবো নাই।

গণপতি আর কিছু বলিল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা-ই, রে-শমী চুড়ি !

* * * *

গণপতি মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু সরস্বতীর চোখে তাহা পড়ে নাই। গণপতির শরীর ভিতরে ভিতরে শূন্যগর্ভ হইয়া উঠিয়াছিল। দিনদশেক পরেই একদিন সরস্বতী ওই গোপালপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তুলি হাতে করিয়াই অর্দ্ধসমাপ্ত পটের সম্মুখে গণপতি নিস্পন্দ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে। একটা দুর্দ্দমনীয় কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপিয়া সে বসিয়া পড়িল।

গণপতি মরিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতে যে আশঙ্কা করিয়াছিল সে আশঙ্কা মিথ্যা হইয়া গেল। তাহার নাতির দল ছুটিয়া না আসিয়া পারিল না। কিন্তু একটি মেয়েও আসিল না—সরস্বতীকে সান্ত্বনা দিতে।

গণপতির সৎকার শেষে নাতিরা আসিয়া বহুদিন পরে আবার রাঙাদিদির দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া তবে বাড়ি গেল।

দিন তিনেক পরে।

ঘনশ্যাম সকালেই আসিয়া দাওয়ায় বসিল—কই ? কি হচ্ছে গো ?

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—এস লাগর এস।

বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যাম বলিল—কি বলছ বল, এইবার ?

মুখে কাপড়-চাপা দিয়া সরস্বতী বলিল—কিসের গো ?

—নিকার কথা। কি বলছ বল দেখি ?

—উঁ—হু। সতীন নিয়া ঘর করতে লারব আমি !

—উকে যদি তালাক দি ?

—হুঁ—তবে করব নিকা।

—দেখিয়ো ?

—হুঁ গো ! আমার কেলেসোনার দিব্যি। হ'ল তো ?

—কিন্তু তুমি এমন ক'রে বেড়াতে পাবে নাই।

—বেশ !

কথায় কিন্তু বাধা পড়িল ; নাতি-সম্প্রদায়ের অন্যতম নাতি দ্বিজপদ আসিয়া উপস্থিত হইল—কই ? রাঙাদিদি কই ?

—এস, এস, ভাই এস। সরস্বতী হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল।

ঘনশ্যাম উঠিয়া গেল। দ্বিজপদ বসিয়া বলিল—তারপরে ?

হাসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো। হা নটে তুই—

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজপদ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ—

—কেনে—ধ্যেৎ কেনে ?

—বুড়া দাদু তো গেলো, তুমি কি করবে—শুধাতে এলাম—তা—না—

—বুড়া মরেছে—আমি নেকা করব।

—হুঁ—তা—

—উঁ—হু। সতীন নিয়া আমি ঘর করতে লারব হে, তুমি উঠে যাও।

—আমি যদি তালাক দিই ?

—তখন এস ; পিঁড়ি পেতে রাখব আমি। এখন উঠ—আমি যাব গোপালপুর ; জমিদারবাবুর পুতুলের বরাত আছে।

সে ডালা সাজাইয়া দুয়ারে তালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তালা দিতে গিয়া সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। বুড়া ওই ঠাঁইটিতে বসিয়া ছবি আঁকিত। তালাচাবীর অভ্যাস তাহার নাই।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা—ই, রেশমী চুড়ি !

কিন্তু জমিদার-বাড়ীর জানালা আজ খুলিয়া গেল না। কোথাও এতটুকু শব্দ হইল না ; বাতায়ন-পথগুলি সবুজরঙের কপাটে কপাটে ভাঁজ মিলাইয়া নিরন্ধ্র রুদ্ধ !

গৌরচাঁদ চলিয়া গিয়াছে।

পটুয়াপাড়ার প্রায় প্রতিঘরেই একটা অবরুদ্ধ কান্না গুমরিয়া মরিতেছিল। তরুণী বধূগুলি গোপনে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে ; কিন্তু কেহ কাহারও কান্নার কথা জানে না। তাহাদের স্বামীরা তালাক দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

সর্ব্বনাশী কলঙ্কিনী সরস্বতী মরে না কেন ?

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—সরস্বতী না মরিয়াও তাহাদের রেহাই দিল। সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল—সরস্বতী নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নাতিরা সকলেই পরস্পরের সন্ধানে চাহিয়া পরস্পরকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল ; তাহারা সকলেই আছে—সে-ই নাই।

সকলেই ছুটিল—তালাকের আর্জ্জি ফিরাইয়া আনিতে। মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া গালিগালাজে শতমুখী হইয়া উঠিল।

* * * *

সরস্বতী আজও বাঁচিয়া আছে।

সরস্বতী বলিয়া তাহাকে কেহ চেনে না। শহরে রাঙাদিদির চুড়ি ও মাটির পুতুলের দোকান বিখ্যাত।

পাকা আমের মত গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া রাঙাদিদির খরিদ্দারেরা নিত্য তাহার পুতুল কেনে। সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েরা নিত্য পুতুল ও চুড়ি ভাঙে, নিত্য কেনে।

—কি চাই ভাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া ? কালকেরটা রাক্ষসে খেয়ে নিয়েছে ?

—কি দিদি ?—আজ কি পরবে ? মনচোরা না নীলমাণিক ?

লোকে বলে, বুড়ী পটুয়ানীর অগাধ পয়সা।

বেলা বয়ে যায়

শ্রীমতী গীতাদেবী আচার্য্য চৌধুরী

বেলা যায় সাথে লয়ে
অফুরন্ত হাসি,
আঁধারে লুকায়ে যায়
সূর্য্যকররাশি,
প্রকৃতির নীল রেখা
ধূসর আকাশ,
সাঁঝের মমতা ভরা
আকুল বাতাস,
প্রভাতের যে আলোকে
বাসনার খেলা,
সাঁঝের আঁধারে তাই
ভাসাইতে ভেলা,
তবু কি হ'ল না শেষ
মিটিল না সাধ ?
জীবন-নদীর বুকে
ভাঙ্গিল না বাঁধ ?
স্বপন-আবেশ চোখে
কুহেলী মাখিয়া,
গোপন কামনা ভরা
মূরতি আঁকিয়া,
আজি কি হয়েছে শেষ
মায়া মরীচিকা,
বুকভরা ছিল যার
বাসনার শিখা,
প্রকৃতির ম্লান হাসি
নিমীলিত আঁখি,
করে করে বাঁধিয়াছে
নিরাশার রাখী।
বেলা যায় সাথে লয়ে
নিরাশার গান,
চলেছে আজিকে তাই
মগ্ন অভিযান।

ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ

শ্রীসুধাংশুভূষণ রায় এম-এ

এ প্রদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া তাহাব প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকার স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান করিয়া ১৯৩৮ সালে একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রথমেই লক্ষ্য করিবার বিনয় এই যে অধিকাংশের মত হিসাবে উহাতে কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করা হইলেও কমিশনের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য ঐ সব প্রস্তাব সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—কমিশনের এই তিন জন বিশিষ্ট সদস্য অনেক ক্ষেত্রেই কমিশনের মূল সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশ অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আরও তিন জন সদস্যও দুই একটি বিষয়ে অধিকাংশের সহিত এক মত হইতে না পারিয়া স্বতন্ত্র মন্তব্যলিপি পেশ করিয়াছেন। কমিশনের মোট ১২ জন সদস্যের ভিতর ছয় জন সদস্যই এই ভাবে কম বেশী পরিমাণে মতানৈক্য প্রদশন করাতে সাধারণের নিকট বর্ত্তমান রিপোর্টের গুরুত্ব যে অনেকখানি কমিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অধিকাংশ সদস্যের মত হিসাবে বর্ত্তমান ফ্লাউড কমিশন যে সব সুপারিশ উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ ও জমিদারীসমূহ সরকারে খাস করিয়া লওয়ার প্রস্তাবই সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। গত ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই বন্দোবস্ত বলবৎ করার পর হইতে বাঙ্গলায় উহা কায়েমীভাবে বলবৎ আছে। উহাকে ভিত্তি করিয়া এ প্রদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উহা দ্বারা বাঙ্গালীর সামাজিক ও আর্থিক জীবন বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হইতেছে। কিন্তু আজ প্রায় দেড় শত বৎসর পর ফ্লাউড কমিশন ঐ ব্যবস্থার দোষগুণ বিবেচনা করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থার (প্রণয়ন) যে সার্থকতাই থাকুক না কেন বর্ত্তমান সময়ে উহাকে আর কায়েমী করিয়া রাখিবার কোন সার্থকতাই দেখা যাইতেছে না। প্রথমতঃ কমিশন দেখাইয়াছেন যে দেশে সরকারী রাজস্বের দিক হইতে এই বন্দোবস্ত বাৎসরিক ২ কোটি টাকা হইতে ৮ কোটি টাকা পরিমাণে ক্ষতির কারণ হইয়াছে। জমিদার ও তালুকদারদের নিকট হইতে আদায়ী রাজস্ব বরাবরের জন্য নির্দ্ধারিত থাকায় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে আয়কর আদায়ের রীতি না থাকায় সরকারী রাজস্ব শোচনীয়রূপে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তনের পর নানা দিক দিয়া জমিদারি ও তালুকদারি প্রভৃতির আয় বাড়িলেও গবর্ণমেণ্ট সেই বর্দ্ধিত আয়ের অংশ পাইতেছেন না। মৎস্যশিল্প ও খনিজ শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও সরকারী আয় অনুরূপভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দেশের সমুচিৎ আর্থিক অগ্রগতির পক্ষে ঐ বন্দোবস্ত একটা বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বন্দোবস্তের ফলে ভূমির স্থায়িত্ব ও মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় লোকে ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ না করিয়া কেবল জমিজমা খরিদের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছে। ফলে প্রয়োজনানুরূপ শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া না উঠিয়া দেশ অনুন্নত ও দরিদ্র থাকিয়া যাইতেছে। তৃতীয়তঃ সামাজিক দিক হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল আলোচনা করিয়া কমিশন দেখাইয়াছেন যে উহার ফলে দেশে ভূমির উপর অসংখ্য ধরণের মধ্যস্বত্বাধিকার সৃষ্ট হইয়া এক অবাঞ্ছিত মালিক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। এই মধ্যস্বত্বভোগীর দল নিজেরা জমি চাষাবাদের কায়িক পরিশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া মুখ্যভাবে কৃষকদের শ্রমলব্ধ আয়ের অংশ গ্রহণ করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ লইতেছে। ভূমির স্বত্ব খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ার ফলে মামলা মোকদ্দমা বাড়িয়া সমাজজীবন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অসংখ্য মালিকের সৃষ্টি হওয়াতে ভূমির উন্নতি বিধানের দায়িত্ব সর্ব্বপ্রকারে অবহেলিত হইতেছে। প্রয়োজনীয় জলসেচ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া ও অন্য নানা উপায়ে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দিকে আজ আর কাহারও বড় একটা গরজ নাই। ফলে দেশে কৃষির উন্নতি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতেছে।

এই অবস্থায় এক দিকে দেশে আদর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য এবং অপর দিকে সমস্ত কৃষক প্রজা ও গবর্ণমেণ্টের ভিতর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দেশে কৃষি উন্নতির সুব্যবস্থা করিবার জন্য ফ্লাউড কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐ সঙ্গে ভূমির উপর জমিদার, পত্তনীদার ও তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর সমস্ত স্বত্ব সরকারে খাস করিয়া লওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। ঐ প্রস্তাবে এ প্রদেশে যে সম্পত্তির জন্য প্রজা বা চাষীর নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হইয়া থাকে তাহাকেই ক্রয়যোগ্য ভূমিস্বত্ব বলিয়া ধরা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় ভূমিস্বত্ব সরকারের হাতে নিয়া আসাই কমিশনের লক্ষ্য। আর সে হিসাবে তাঁহারা দেবোত্তর ও ওয়াকফ্ শ্রেণীর দাতব্য ও ধর্ম্মনৈতিক কার্য্যে নিয়োজিত সমস্ত সম্পত্তি কিনিয়া লওয়ার জন্যও সুপারিশ করিয়াছেন। তবে কমিশন বর্গাজমির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার কার্য্য আপাততঃ কিছুকাল স্থগিত রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে বর্গা জমির মালিকেরা বর্গা জমির চাষীদিগের নিকট হইতে যে পাওনা আদায় করে তাহা কমিশনের মতে অনেক স্থলেই বেশী। সেজন্য এখনই বর্গাজমির স্বত্ব কিনিয়া লইতে গেলে তৎবাবদ মালিকদিগকে বেশী পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই

অবস্থায় এখনই বর্গা জমির স্বত্ব না কিনিয়া কমিশন গবর্ণমেণ্টকে প্রথমতঃ আইন করিয়া বর্গা জমির মালিকদিগের পাওনা উৎপন্ন পণ্যের এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এই ভাবে বর্গা জমির মালিকদের প্রাপ্যের পরিমাণ কমিয়া আসিলে পরে বর্ত্তমানের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ ক্ষতিপুরণ দিয়া তাহাদের স্বত্ব কিনিয়া লওয়া যাইবে।

ফ্লাউড কমিশনের উপরোক্ত প্রস্তাব অনেক দিক দিয়া কঠোর বলিয়া মনে হইলেও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কোনরূপে অপ্রত্যাশিত বা অভাবনীয় নহে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানারূপ গলদ ও কুফল সম্বন্ধে কমিশন যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন সে সম্পর্কে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকিলেও ঐ সমস্ত যে অনেক পরিমাণে সত্য তাহা আজ জনসাধারণের অবিদিত নাই। সে কারণে দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে নানাদিক দিয়া তীব্র অসন্তোষ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি প্রজা আন্দোলন ও কৃষক জাগরণের ভিতর দিয়া তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইন ক্রমাগতভাবে প্রজাদের অনুকূলে সংশোধন করিতে আরম্ভ করায় এবং প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ায় দেশে জমিদারী পরিচালনা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাকী সরকারী রাজস্বের দায়ে প্রতিনিয়তই দুই একটি জমিদারী নিলামে চড়িতেছে। কাজেই নানা আভ্যন্তরীণ গলদ ও প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তথা জমিদারী প্রথা আজ আপনিই ফেল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। এই অবস্থায় দেশের অনেক ভূম্যধিকারীই উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ পাইলে আজ স্বেচ্ছায়ই তাঁহাদের জমিদারী ও তালুকদারী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কাজেই ফ্লাউড কমিশন তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে কোন অভিনব বা অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থার নির্দ্দেশ দেন নাই। তাঁহারা বর্ত্তমানের প্রচ্ছন্ন দাবী-দাওয়াকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন মাত্র।

আধুনিক যুগে জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশেই দেশের ধন সম্পদের আকরস্বরূপ কৃষি ভূমির স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের হাতে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। চাষীর বিহিত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়া কিংবা কোন দিক দিয়া কৃষির উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটিয়া যাহাতে জাতীয় সম্পদের অপচয় না ঘটিতে পারে সেজন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি ও সতর্ক দৃষ্টি ঐদিকে সুপ্রসারিত করার ব্যবস্থা হইতেছে। আমাদের দেশে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে ভূমির উপর অসংখ্য ধরণের স্বত্বাধিকার সৃষ্ট হইয়া ও সেকারণে নানারূপ অহেতুক জটিলতা ও অব্যবস্থা ঘটিয়া সমগ্র ভাবে কৃষির যে ক্ষতি হইতেছে তাহাতে উহার সমুচিৎ প্রতিকারের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা পুনর্বিবেচনার সময় আসিয়াছে। কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ সাধন করিয়া দেশের গবর্ণমেণ্ট যদি সমস্ত ভূমিস্বত্ব খাস করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং তৎপর সকল দিক দিয়া যদি প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধায়ক কার্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা হয় তবে দেশে একদিন আদর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হইবে। এইভাবে কৃষক ও গবর্ণমেণ্টের ভিতর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সাধিত হইলে কৃষি ও কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইবে। কাজেই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া যুগোপযোগী কার্য্যনীতি হিসাবে ফ্লাউড কমিশনের উপস্থাপিত প্রস্তাবের মূলনীতি আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি।

এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ থাকার দরুণ লোকে এতদিন ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মনোযোগ না দিয়া সামাজিক পদমর্য্যাদা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির অবলম্বন বিবেচনায় কেবল জমিজমা ক্রয়ের দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছে। দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের সম্যক ভরণপোষণের জন্য শিল্প প্রসারের দিকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া সকলে বেশী পরিমাণে কেবল ভূমিকেই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। ফলে দেশে গরীব ও অন্নহীনের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য শিল্পবাণিজ্যের দিকে আজ অন্ততঃ কিছু সংখ্যক লোকের দৃষ্টি ফিরাইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। আর তাহা করিতে হইলে প্রথমে কৃষির উপর নির্ভরশীল জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদিগকে কৃষির পরিবর্ত্তে শিল্প ব্যবসায়ের দিকে জীবিকা সংস্থানের সুযোগ দেখিতে বাধ্য করাই বিহিত পন্থা। ফ্লাউড কমিশন জমিদারী ও ও তালুকদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে সেদিক দিয়া একটি শুভ প্রেরণা সঞ্চারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কেননা ইহা খুবই স্বাভাবিক যে নিজেদের ভূমিস্বত্ব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলে এই শ্রেণীর লোকেরা নিজের এবং পরিবার প্রতিজনের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য সাক্ষাতভাবে শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিবেন। আর তাহাতে প্রয়োজনীয় শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়া দেশ ক্রমে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিবে। সেদিক দিয়া ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনার কথা ভাবিলে বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূলগত নীতির সার্থকতা বিশেষভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

তবে দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া জমিদারী-সমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য হইলেও উহা যথোচিতভাবে কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে বর্ত্তমানে কতকগুলি অসুবিধা রহিয়াছে। সেই সব অসুবিধা কাটাইয়া উঠা সম্পর্কে কমিশন তেমন কোন সদুপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা উহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য একতরফা ভাবে একটা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। সকল দিক নিরপেক্ষভাবে বিচার না করিয়া এই পরিকল্পনার অনেক স্থলে অহেতুকরূপ কঠোর বিধি-ব্যবস্থার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ বিধান অবলম্বন করিতে গেলে তাহাতে নানা দিক দিয়া বিশৃঙ্খলা দেখা যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেজন্য আমাদের মতে দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাড়াতাড়ি কোন কিছু করিতে না গিয়া সময় ও সুবিধা বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে কমিশনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের জমিদারী ও তালুকদারী প্রভৃতি খাস করা সম্পর্কে দুই রকম নীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়া জমিদারদিগকে তাঁহাদের স্বত্ব হইতে উচ্ছেদ করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাঁহারা জমিদারী সমূহ ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। প্রথমোক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধারায় সুস্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে। এই অবস্থায় কমিশন সেদিক দিয়া বিষয়টি বিবেচনা না করিয়া সরাসরি ক্ষতি-পূরণ দিয়া জমিদারী করায়ত্ত করারই সুপারিশ দিয়াছেন। কমিশন সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট দৃষ্টে বাঙ্গালা দেশের সমস্ত জমীদারী ও তালুকদারী প্রভৃতির বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা বলিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন। সরকারী রাজস্ব বাবদ দেয় টাকা ও জমিদারদের প্রদত্ত সেস মিলাইয়া যে ২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা হয় তাহা উপরোক্ত অঙ্ক হইতে বাদ দিলে জমিদারী ও তালুকদারীসমূহের মোট আয় দাঁড়ায় ১০কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। জমিদারী ও তালুকদারী পরিচালনায় যে ব্যয় হয় তাহা মোট আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ অর্থাৎ ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। উহা বাদ দিলে কমিশনের মতে বাঙ্গলা দেশের জমিদার ও তালুকদারদের বাৎসরিক নিট লাভ দাঁড়ায় ৭ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। কমিশন ঐ টাকারই দশগুণ মূল্য দিয়া জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে নিট লাভ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার দশগুণ মূল্য দিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মোট ৭৭ কোটি ৯ লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে। কিন্তু কমিশন যে ধরণের নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাতে ঐ টাকায়ও সমস্ত সঙ্কুলান হইবে না। প্রথমতঃ জমিদারী কিনিবার পূর্ব্বে কমিশন গভর্ণমেণ্টকে নূতন একটি জরীপ কার্য্য করাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ অনাদায়ী বকেয়া খাজনা বাবদও তাঁহারা জমিদারদিগকে কিছু অর্থ দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই দুই দফায়ও যথাক্রমে ৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি টাকার দরকার হইবে। কাজেই দেশের জমিদারী ও তালুকদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব কার্য্যতঃ গ্রহণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে ঐ বাবদ সর্ব্বসমেত মোট ৯৮ কোটি টাকার মত ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

কিন্তু এককালীন এত বেশী টাকা সঙ্কুলান করিবার মত সঙ্গতি বাঙ্গলা সরকারের নাই। ফ্লাউড কমিশন উহা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্টের সুবিধার জন্য জমিদারীর বরাদ্দকৃত মূল্য পরিশোধের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে ৬০ বৎসরের মধ্যে আসল টাকা পরিশোধের সর্ত্তে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা সুদের ঋণপত্র বাহির করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই হিসাবে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দেয় সুদের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়া ৬০ বৎসর পরে ঋণপত্রের আসল পরিশোধ করিবার জন্য প্রথম হইতেই একটি ঋণপূরণ তহবিল গড়িয়া তুলিতে হইবে। কমিশন বলিতেছেন জমিদারী ও তালুকদারীসমূহ হাতে নিলে উহার আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ পরিচালনা বাবদ ব্যয় হইবে। তাহা ছাড়া শতকরা ১০ ভাগের মত অনাদায়ী থাকিতে পারে কিংবা মকুব দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বাদে গবর্ণমেণ্টের হাতে যে বাকী আয় থাকিয়া যাইবে তাহা হইতে প্রদত্ত ঋণপত্রের সুদ ও উপরোক্ত ঋণপূরণ তহবিলের টাকা সঙ্কুলান করিয়াও গবর্ণমেণ্ট শেষপর্য্যন্ত বার্ষিক ২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার মত নিট লাভ করিতে পারিবেন। ১০গুণ মূল্য দিয়া জমিদারী কিনিয়া লইলে উপরোক্তরূপ নিট লাভ দাঁড়াইবে। যদি ১২ গুণ মূল্য দিয়া জমিদারী কিনিয়া লওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয় তবে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্তব্য নিট লাভ সেই অনুপাতে কমিয়া ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইবে। ১৫গুণ মূল্য দিতে গেলে গবর্ণমেণ্টের নিট লাভের পরিমাণ ৩৩ লক্ষ টাকার মত হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থায় তাঁহাদিগকে একরূপ বিনা টাকায় জমিদারী কিনিয়া লওয়ার যে পন্থা কমিশন দেখাইয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের দিক হইতে ঐ পরিকল্পনা সহজেই বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের পক্ষ হইতে নানারূপ আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথমতঃ বলা যায় কমিশন যেভাবে যথাসম্ভব কম করিয়া জমিদারী সমূহের নিট লাভ বরাদ্দ করিয়াছেন তাহা এ প্রদেশের জমিদারগণ যথোপযুক্ত মনে না করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ সাব্যস্তীকৃত মূল্য নগদ না পাইয়া সেজন্য ৬০ বৎসরের মিয়াদী ঋণপত্র গ্রহণ করিতে অনেকেই অনিচ্ছুক হইতে পারেন। কেননা এইরূপ ব্যবস্থা মানিতে গেলে দেশের ভূম্যধিকারীদের ভবিষ্যৎ খুবই নিরাশাময় হইয়া উঠিবে। আদম সুমারী রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩১ সালে সারা বাঙ্গলায় জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৮০ হাজার জন। এই শ্রেণীর লোকদের যে অনুজন ও প্রতিজন রহিযাছে তাহা যোগ করিলে এই সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেশীই দাঁড়াইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারেই এই শ্রেণীর লোকেরা এতদিন ভূমিস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। প্রাপ্য খাজনার ৩০।৩৫ গুণ মূল্য দিয়া জমিদারী ক্রয় করিয়াছেন এরূপ লোকও উহাদের ভিতর রহিয়াছেন। আজ জমিদারী ও তালুকদারী প্রভৃতি কিনিয়া লওয়ার নামে এই সব লোকদিগকে নিঃসম্বল করিয়া পথে বসান কোন দিক দিয়া সঙ্গত নহে। কাজেই আমাদের মতে নিট লাভের মাত্র দশগুণ মূল্য দেওয়ার বদলে কমপক্ষে ১৫ হইতে ২০গুণ মূল্য দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত। আর ভূম্যধিকারীরা ঐ মূল্যের অন্ততঃ কতকাংশ যাহাতে প্রথমেই নগদ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও করা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যৎ জীবিকার জন্য কমিশন ভূম্যধিকারীদিগকে শিল্প ব্যবসায়ে আত্ম-নিয়োগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু আপাততঃ প্রতি বৎসরের হিসাবে মোট দেয় টাকার সামান্য সুদ ছাড়া কমিশন তাঁহাদিগকে আর কিছুই দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু অল্পসংখ্যক বড় জমিদার ছাড়া ভূমির উপর নির্ভরশীল তালুকদার ও সাধারণ মধ্যস্বত্বভোগী তথা মধ্যবিত্ত দিগের সঞ্চয় সাধারণতঃ যেরূপ কম তাহাতে এই ব্যবস্থায় উপযুক্তরূপ অর্থনিয়োগ করিয়া শিল্প ব্যবসায় আরম্ভ করিবার সঙ্গতি তাঁহাদের অনেকেরই থাকিবে না। ফলে কমিশনের প্রস্তাব অচিরে কার্য্যকরী

করিতে গেলে দেশে অসহায় দরিদ্র মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অবস্থায় এখনই এতবড় একটা কার্য্যে হাত না দিয়া অন্ততঃ কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ নিয়োগ করিয়া জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার জন্য সঙ্গতি বাড়াইবার দিকেই প্রথমে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। এককালে বেশী পরিমাণ অর্থ সঙ্কুলন করা নিতান্তই অসুবিধাজনক মনে হইলে ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া জমিদারীসমূহ খাস করিবার কার্য্য নীতি গ্রহণই সঙ্গত হইবে।

ফ্লাউড কমিশন যথাসম্ভব সত্বর গবর্ণমেণ্টকে জমিদারী ও তালুকদারী সমূহ কিনিয়া লওয়ার পরামর্শ দিলেও সেরূপ কোন কার্য্যনীতি অবলম্বনের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে সমস্ত দেশে নূতন করিয়া একটি জরীপ কার্য্য সমাধা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ঐরূপ জরীপ করাইতে যে সময় লাগিবে তাহাতে জমিদারী কিনিয়া লওয়ার কাজে কার্য্যতঃ হাত দিতে স্বভাবতঃই কয়েক বৎসর বিলম্ব হইবে। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য সরকারী রাজস্বের দিক দিয়া যে ক্ষতি হইতেছে তাহার একটা প্রতিকার অচিরেই আবশ্যক। এই অবস্থায় কমিশন অবিলম্বে গবর্ণমেণ্টকে কৃষিজাত আয়ের উপর একটা কর নির্দ্ধারণের সুপারিশ করিয়াছেন। জমিদারী সমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তবে তাহা কার্য্যে পরিণত না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি জমিদারী কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব কার্য্যতঃ গৃহীত না হয় তবে বরাবরের জন্যই ঐ কর বসাইতে হইবে। তবে কমিশনের নির্দ্দেশ এই যে এই করজাত আয় অন্য কোন দিকে নিয়োগ না করিয়া দেশের কৃষির উন্নতির জন্যই তাহা ব্যয় করিতে হইবে।

কৃষিজাত আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণের এই প্রস্তাব আমরা সর্ব্বদা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। দেশের শিল্পব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবিগণ যেস্থলে বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টকে উচ্চহারে আয়কর দিতেছেন এবং নানাদিক দিয়া বর্ত্তমানে সরকারী আয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা যেস্থলে রহিয়াছে সেস্থলে কৃষি হইতে উচ্চ আয় বিশিষ্ট লোকদিগকে বরাবরের জন্য আয়কর হইতে রেহাই দেওয়ার কোন যুক্তি নাই। ১৯২৫ সালে ভারতীয় কর তদন্ত কমিটি ঐরূপ কর নির্দ্ধারণের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন। বিহার ও আসাম গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঐরূপ কর কার্য্যতঃ বহালও করিয়াছেন। আজ বাঙ্গলাদেশে কৃষি হইতে ভালরূপ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে যদি উপরোক্ত হারে আয়কর আদায়ের ব্যবস্থা হয় তবে গবর্ণমেণ্টের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িতে পারে। আর সেই বাড়তি আয়ের কতকাংশ দিয়া গবর্ণমেণ্ট কৃষি উন্নতির কাজ চালাইতে পারেন। তাহাছাড়া জমিদারী ও তালুকদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার কার্য্যনীতি অবলম্বন করিলে এই করজাত আয়ের কতকাংশ দ্বারা তাঁহারা সেজন্য এখন হইতেই একটি তহবিল গড়িয়া তুলিতে পারেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারাই সকল দিক দিয়া সঙ্গতি রক্ষা করা যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বিশ্ববাসী মরুক কেঁদে

আবদুর রহমান

নওবাহারে এই নহর তীরে
পাত্রখানি নেশায় ভরে
(সখি) পান করে যাও পাপের পীযূষ
দিওয়ানা-দিল্ রঙীন করে।
চাঁপার কলি রোজ ফোটে না
চুম্বনে সাধ রোজ মেটে না,
দিন-গোণা এই দুনিয়াটা ত
দূরে যাবে দুদিন পরে
পান ক'রে নাও প্রিয়া তুমি
বিম্ব অধর ওষ্ঠে ধরে।

উড়িয়ে দাও ওই ওড়নাখানা
অলক তোমার যাক্ গো উড়ে
(আজ) হরিণ চোখের করুণ চাওয়ায়
পতঙ্গেরা মরুক পুড়ে।
ওই দেখ ওই পুঁথির খাতায়
লিখছে কবি পাতায় পাতায়
এই জওয়ানী রইবে না হায়—
বইবে না আর বসন্ত বায়
দ্বিধা কি আর প্রিয়া তোমার
পূর্ণ সোরাই কক্ষে ধরে
পান ক'রে নাও প্রেমের সারাব
তরুণ অরুণ সোহাগ ভরে
মরুক না সব মর্ত্ত্যবাসী
মরার শোকে মাতম করে।*

---

* হাফেজের অনুসরণে।

নীড়ের মায়া

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

তিন দিনের জ্বরে যখন দ্বিতীয়া গৃহিণী কাঞ্চনমালাও বনমালীকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, তখন বনমালীর বয়স একান্ন কি বাহান্ন। কচি কচি ছেলেমেয়েগুলিকে তিনি কোলে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু তারপরে কি যে করবেন ভেবে পেলেন না।

বড় ছেলেটি বছর পোনেরোর। তার জন্যে ভাবনা নেই। নিজের খবরদারী নিজেই করবার বয়স তার হয়েছে। মেজটি মেয়ে, বয়সও বছর এগারো-বারো। তারও জন্যে না হয় ভাবনা নেই। কিন্তু পরের দুটি? তারা যে নিতান্তই বাচ্চা! ছোটটি তো সবে হাঁটতে শিখেছে।

ভগবান যার সর্ব্বনাশ করেন, বুঝি এমনি ক'রেই করেন। বড়টি যদি মেয়ে হ'ত, তা হ'লে এত বিপদ হত না। পোনেরো বছরের বাঙালী মেয়ে স্বচ্ছন্দে সংসারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সকলকে নিশ্চিন্ত করতে পারত। কিন্তু ওই বয়সের একটা ছেলে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য। সংসারের বোঝা বইবার তার শক্তিও নেই, অবসরও নেই।

সম্বল একটি বৃদ্ধা পিসিমা। তিনি দিনে মরছেন, রাতে বাচছেন। মৃত্যু যদি এঁকে নিয়ে তাঁর কাঞ্চনমালাকে রেহাই দিত, কি সুখেরই না হ'ত!

বনমালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই পিসিমারই ঘরের দিকে চললেন। এ ক'দিন যদি বা তিনি উঠে-হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, কাঞ্চনমালা যাওয়ার পর থেকে একেবারে শয্যা নিয়েছেন।

তাঁর বিছানার পাশে ব'সে বনমালী শাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তত্ত্বকথা শোনালেন। এই জীবন যে নলিনীদলগত জলের মতো তরল—এই পৃথিবী যে পান্থনিবাস, মানুষ এখানে দু'দিনের জন্যে আসে এবং কাজ ফুরিয়ে গেলেই চলে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রীয় বাক্যে পিসিমার অশ্রুস্রোত কিছু পরিমাণে নিরুদ্ধ হ'ল সত্য, কিন্তু তিনি উঠে বসতে পারলেন না। শাস্ত্রবাক্য মনকে প্রবোধ দিতেই পারে, দেহে শক্তিসঞ্চার করতে পারে না। বনমালী বুঝলেন, এ বিপদে পিসিমার কাছ থেকে কয়েক গ্যালন অশ্রু ছাড়া আর কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। এই বানচাল সংসার-তরণী চালাতে তিনি নিতান্তই অশক্ত।

প্রথম পক্ষের দুটি মেয়ে আছে বটে, কিন্তু তারা ঘরণী-গৃহিণী। দুজনেরই সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ীতে বিবাহ হয়েছে। ক্ষেত-খামার, জোত-জমা, জন-মজুর প্রচুর। তাদের পক্ষে বড় জোর দু-দশ দিনের জন্যে এখানে আসা সম্ভব। তার বেশী নয়।

পত্নী-শোকের চেয়ে এই সব দুশ্চিন্তাই বনমালীর মনে প্রবল হয়ে উঠল। রাঁধা-বাড়া করবে কে? ছেলেপুলেদের নাওয়াবে-ধোয়াবে কে? মনমালী সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসারটি ছোট নয়, কাজও কম নয়। কাঞ্চনমালা দিন-রাত্রি খিটমিট করত ব'লে মনমালী কত বিরক্ত হতেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কতদিন কত ঝগড়াই হয়েছে। আজ বনমালী বুঝতে পারলেন, এতবড় বোঝা যাকে দিনের পর দিন বইতে হয়, শনিবার নেই, রবিবার নেই, ছুটি নেই, তার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা সত্যিই বড় কঠিন।

বনমালীর দূর সম্পর্কের বিধবা একটি বোন আছে। সম্পর্কটা দূর হলেও ক্রমাগত যাওয়া-আসা, মেলা-মেশায় সম্বন্ধটা নিকটই। নির্ঝঞ্ঝাট বিধবা স্ত্রীলোক, ছেলে-মেয়ে নেই। দেওর-ভাসুরের ঘরে উদয়াস্ত নিরবকাশ পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'বেলা নির্য্যাতন এবং এক বেলা দুটো খেতে পায়। সেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাঞ্চনমালার জীবিতকালে একবার সে কিছুদিনের জন্যে এখানে এসেছিল। ইচ্ছা ছিল, বৈধব্য জীবনের অবশিষ্টকাল ভায়ের আশ্রয়েই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মুখরা কাঞ্চনমালার জন্যে তার এখানকার অবস্থিতি-কালও দীর্ঘ হতে পারেনি।

সেই বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস স্মরণ ক'রে বনমালী দমে গেলেন। যেদিন সুরবালা চৌর্য্যাপরাধে বিতাড়িত হয়েছিল, সেদিন বনমালী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। তাকে রক্ষা করতে পারেনি, একটা সান্ত্বনার কথাও বলতে পারেনি। অথচ কলঙ্কটা যত বড়ই হোক, অপরাধটা তত বড় ক'রে দেখতে অন্তত বনমালী পারেনি।

দেবরের শিশুপুত্রের ঘুড়ির পয়সা জোগাবার জন্যে সুরবালা যদি সামান্য কিছু চাল চুরি ক'রে গোপনে বিক্রিই ক'রে থাকে, সেটা এমন একটা অপরাধ নয় যে তার জন্যে পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এনে পঞ্চায়েৎ বসাতে হবে। বনমালী ইচ্ছা করলে তাকে রক্ষা করতে পারত। কিন্তু তার কেমন মনে হ'ল, স্বামীগৃহে নির্য্যাতিতা যে বিধবা ভ্রাতৃগৃহে এসেও দেবরপুত্রের মমতা বিস্মৃত হতে পারে না, দেবর-ভাশুরের লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তার অবলম্বনহীন জীবনের মূল শিকড়টি যে আসলে ওই নিষ্করুণ স্বামীগৃহের মাটিতেই আবদ্ধ তাতে আর ভুল নেই। সেইখানেই তার ফিরে যাওয়া উচিত।

সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে-ভগিনীর একটা খোঁজ নেওয়ার পর্য্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেনি, আজকে তারই কাছে গিয়ে কি ক'রে সে দাঁড়াবে সেই ভেবে সে বিব্রত হয়ে উঠল।

কিন্তু বনমালীকে বিশেষ বিব্রত হতে হ'ল না।

একদিন সকালে মড়াকান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে উঠেই দেখে, তারই বাড়ীর উঠানে ব'সে সুরবালা অতি করুণ কণ্ঠে মৃতা ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশে শোক নিবেদন করছে।

বনমালী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। কোঁচার খুঁটে অশ্রুমার্জ্জনা ক'রে বললেন, সুরবালা এলি?

কান্না থামিয়ে সুরবালা বললে, থাকতে পারলাম কই দাদা? কিন্তু কাছেই তো থাকি, সে সময় একটা খবর দিয়ে আনতেও তো পারতে।

অপ্রস্তুত হয়ে বনমালী বললেন, তখন সময় ছিল না দিদি। এখন সময় হতে তোকে আনবার কথাই ভাবছিলাম। বেশ হ'ল, তুই নিজেই এলি। এই তো দেখছিস্ ঘর-দোরের ছিরি। ওই দেখ ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা। পিসিমা বোধ হয় এখনও ওঠেনইনি। এই সব দেখে-শুনে নিয়ে আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দে ভাই, শেষ বয়সে এ আর আমার সহ্য হবে না।

শেষের দিকে তাঁর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

কান্নার শব্দে ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই পিসিমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরবালা দু'হাত দিয়ে তাদের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

বনমালী সেদিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। পত্নীবিয়োগের এত দিন পরে কান্না তাঁর গলার কাছ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল। এতদিন পরে নিজেকে সম্বরণ করা তাঁর পক্ষে যেন অসম্ভব হয়ে উঠল।

তারপরে পিসিমা উঠলেন। পাড়া-প্রতিবেশী গৃহিণীরা এলেন। কর্ম্মহীন দু-চার জন উলঙ্গ শিশুরও সমাবেশ হ'ল।

সবাই বললেন, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। তুই আসবি না তো কে আসবে? ওই তো পিসিকে দেখছিস্। ওর কি আর শক্তি আছে? যদ্দিন না নতুন বৌ আসছে, তদ্দিন সব দেখ্ শোন্, ছেলেমেয়েদের সময়ে দুটো খেতে দে, থাক্।

বনমালী ফিরে এসে দেখলেন, উঠান ঝরঝরে নিকানো। ঘরের মেঝে, বারান্দা ঝকঝক করছে। অনেকদিন পরে বাড়ীর আবার শ্রী ফিরেছে। পত্নীবিয়োগবেদনা ভুলে বনমালীর ঠোঁটে পরিতৃপ্তির আভাস জাগল।

বারো বছর বয়সে সুরবালার বিবাহ হয়েছিল। পোনেরো বছরে বিধবা হয়। ছেলেপুলে হয়নি। স্বামীকে চেনবার সবে সুযোগ পেয়েছিল। নীড় বাঁধবার সাধ প্রতিপদের শশিলেখার মতো মনের আকাশে উঠতে না উঠতেই মিলিয়ে গিয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পরে তার কাজ হ'ল দাসীর। যা-কিছু শ্রমসাধ্য সেই সব কাজের ভার পড়ল তার উপর। তার কাজ শুধু খাটবার, শুধু হুকুম তামিল করবার। দেবার-থোবার সাজাবার-গোছাবার কাজ তার জায়েদের। তাদেরই ঘর, তাদেরই সংসার। সে শুধু এক বেলা দু'টি অন্নের বিনিময়ে খাটে।

বনমালীর সংসারে এবারে এসে সে প্রথম গৃহিণীত্বের স্বাদ পেলে। বৃদ্ধা পিসি বিছানা ছেড়ে বড় একটা ওঠেন না। বনমালী বাইরে-বাইরেই ঘোরেন। ঘুম থেকে উঠে ঘর-দোর নিকোনো থেকে আরম্ভ ক'রে শয্যা গ্রহণ করার পূর্ব্বে বনমালীর কনিষ্ঠ সন্তানটিকে দুধ খাওয়ানোর হাঙ্গামা পোয়ানো পর্য্যন্ত সব কাজ একা তার। তাকে হুকুম করার কেউ নেই। যেটি সে নিজে না করবে সেইটিই হবে না। বাঁধবার জন্যে এমনি একটা ঘরেরই কল্পনা বোধ হয় তার

অবচেতন মনের মধ্যে ছিল। তার আনন্দের আর সীমা রইল না।

প্রত্যেকটি ঘর সে আবার নতুন ক'রে নিজের মনের মতো সাজিয়েছে। এদিকের খাট ওদিকে গেছে। ছবিগুলো ঝেড়ে-মুছে ফের নতুন ক'রে সাজিয়েছে। বনমালীর শোবার ঘরে জোড়া-খাট ছিল। কাঞ্চনমালার মৃত্যুর পরে তার আর দরকার নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি অন্য ঘরে তার কাছে শুচ্ছে। একখানি খাট সে সরিয়ে নিয়ে গেল পিসিমার ঘরে। গদির বিছানায় শুয়ে পিসিমা বড় সুখী। এতদিন তাঁকে মেঝের উপর শুতে হ'ত! খুশি হয়ে তিনি সুরবালার মাথায় হাত দিয়ে অনেক আশীর্ব্বাদ করলেন।

বনমালীর জোড়াখাটের আর দরকার নেই সত্যি। তবু এত তাড়াতাড়ি একখানা খাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া তাঁর ভালো লাগল না। বহুকাল ধরে ওঘরে দু'খানি খাট পাতা ছিল। দুপুরে শুতে এসে তাঁর বড় ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলেন, সে-খাটখানা আবার কোথায় চালান করলি সুরো ?

সুরবালা বললে, পিসিমার ঘরে। নীচেয় শুতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। বুড়ো মানুষ!

বনমালী আর কিছু বলতে সাহস করলেন না। সুরবালা এবারে আর ভিক্ষুকের মতো আসেনি। বনমালীর গৃহে আজকে তার প্রয়োজন অবিসম্বাদী। বনমালী চুপ ক'রে রইলেন। কিন্তু দুপুরে আর তাঁর ঘুম হ'ল না। তাঁর কেমন মনে হ'ল, শুধু পিসিমার প্রয়োজনেই খাটখানি ওঘরে অপসৃত হয়নি। এর মধ্যে আরও যেন কিছু আছে। এর মধ্যে কাঞ্চনমালার বিগত ব্যবহারের প্রতিশোধের প্রচ্ছন্ন ঝাঁঝও যেন পাওয়া যায়। কাঞ্চনমালার স্মৃতি অনন্তকাল ধ'রে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এমন পণ অবশ্য বনমালী করেনি। তাই ব'লে এত শীঘ্র তার হাতের সমস্ত স্পর্শ মুছে ফেলে দেবার প্রয়াসও তার শোভন মনে হ'ল না।

কিন্তু বনমালীর মনের কথা সুরবালা টের পেলে কি-না বোঝা গেল না। সে যথাপূর্ব্ব নিজের একচ্ছত্র গৃহিণীপনায় মনোনিবেশ করলে। সে গৃহিণীপনা শান্ত এবং অনুচ্ছল না হতে পারে। ভরা বর্ষার উন্মত্ত নদীর মতো তাতে উপদ্রব থাকতে পারে। কিন্তু তাকে তিরস্কার করা চলে না। পরিচ্ছন্ন গৃহসজ্জায়, ছেলেমেয়েগুলির দেহশ্রীতে তার পরিচয় এতই স্পষ্ট। এমন কি এই ক'মাসে বনমালীর শুষ্ক দেহেও একটুখানি নেয়াপতি ভুঁড়ির উন্মেষও হয়েছে। এ নিয়ে বন্ধুমহলে আজকাল তাঁকে কিছু কিছু বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়।

বনমালী হাসে।

কাঞ্চনমালার হাতের রান্না সুরবালার মতো এমন সুন্দর ছিল না। তার খাওয়ানোও ছিল নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। তাতে আন্তরিকতা যদি বা ছিল, এমন যত্ন ছিল না। আর এ যেন সুরবালার গৃহে তার প্রাত্যহিক নিমন্ত্রণ।

কিন্তু এত ক'রেও সুরবালার মনের ভয় যায় না।

কে জানে তার এ গৃহিণীপনা কতদিনের। কবে হয়তো শুনবে, বনমালীর বিবাহের দিন স্থির হয়েছে। একে বনমালীর বুড়ো বয়সের বিয়ে, তাতে এ কালের মেয়ে, নিতান্ত ছোট মেয়ে তো আর আসবে না। বিয়ের পরে সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নিতে তার বেশী দিন হয়তো লাগবে না।

তখন ?

আবার যে-কে-সেই। দু'বেলা মুখ-ঝামটা খেয়েও এই ছেলে-মেয়েগুলি তাকেই মা ব'লে ডাকবে। তারই পিছু পিছু ঘুরবে। সুরবালা উদয়াস্ত খাটবে-খুটবে, ফরমাসমত রাঁধবে-বাড়বে। কিন্তু সুমুখে বসিয়ে কাউকে খেতে দিতে পারবে না। সেই যেমন কাঞ্চনমালার রাজত্বে ছিল। যেমন তার দেবরের সংসারে ছিল। অথচ সুমুখে বসিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন ক'রে মেয়েমানুষ যদি খাওয়াতেই না পারে, তবে আর তার ইহজীবনে রইল কি ?

এত সুখেও সুরবালার সুখ নেই। তার কেবলই ভয় ক'রে তার দুর্ভাগ্যে এত সুখ বুঝি সইবে না।

এই ভয় ক্রমে উপসর্গে পরিণত হ'ল।

বাইরের ঘরে বনমালীকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে পরিহাস করতে শুনলেই সে সব কাজ ফেলে রেখে আড়ি পেতে শোনে, কি কথা হচ্ছে। কোনো অপরিচিত লোককে আসতে দেখলেই ভয়ে তার বুক কেঁপে ওঠে। কে যে কি মতলবে আনাগোনা করে কে বলতে পারে। বনমালীর মনের মধ্যেই যে ধীরে

ধীরে আবার কি আকাঙ্ক্ষা দানা বেঁধে উঠছে, তাই বা কে জানে?

অবশেষে কৌশলে একদিন সুরবালা নিজেই কথাটা পাড়লে।

সুরবালা সেদিন অনেক যত্নে একটা নতুন তরকারি রেঁধেছিল। তার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বনমালী পুলকিত চিত্তে বললেন, তুই রাঁধিস বড় চমৎকার সুরো। সবাই বলছে, তোর হাতের রান্না খেয়ে আমার শরীর সেরে উঠেছে।

—আচ্ছা, হয়েছে!—বলে লজ্জায় আনন্দে সুরবালা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

ওর লজ্জা দেখে বনমালী হেসে ফেললেন।

বললেন, সত্যি রে'। লোকের কথা ছেড়ে দে, আমি নিজেই তো বুঝতে পারছি।

—ছাই পারছ!

ব'লে রান্নাঘর থেকে আর একটু তরকারি নিয়ে এসে সুরবালা ওর পাতে দিলে।

একটু পরে বেশ ভব্যযুক্ত হ'য়ে বললে, আমার মামা-শ্বশুরের একটি মেয়ে আছে, বেশ বড়-সড়। হাসছ যে, বিশ্বাস হচ্ছে না?

হাসি থামিয়ে বনমালী বললেন, বিশ্বাস হবে না কেন? অনেকের মামাশ্বশুরেরই তো বড় মেয়ে থাকে। তার পর কি হ'ল বল।

—বলছিলাম কি, তুমি অনত কোরো না। আমি বিয়ের জোগাড় করি। যদি দেখতে যেতে চাও তো—

—কিছু দরকার হবে না। কিন্তু তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে সুরো? আমি এই বয়সে আবার বিয়ে করতে যাব কোন্ দুঃখে?

—এ বয়সে কি কেউ বিয়ে করে না?

—করুক গে। কিন্তু আমার অদৃষ্টে যদি বউ নিয়ে সংসার করাই থাকত তা হ'লে পর পর দুটো বউ মরবে কেন?

—তাই ব'লে—

সুমুখের ভাতগুলি তাড়াতাড়ি কোলের দিকে টেনে নিয়ে বনমালী বললেন, না, না সুরো। ওসব পাগলামি করিস নে। যে ক'টা দিন বাঁচি, এমনি ভাল-ভাল রান্না রেঁধে খাওয়া, ছেলে-পুলেদের দেখ্-শোন্। ব্যস্।

বনমালীর কথা শুনে সুরবালা খুশি হ'ল, কিন্তু সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারলে না। পুরুষমানুষের মন বদলাতে কতক্ষণ! তাদের যত দরদ সংসারের উপর, তত দরদ ছেলে-মেয়ের উপর! তারা যে কি চায়, তা নিজেই জানে না। পুরুষমানুষকে সে বয়স্ক শিশু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। শিশুর মত তাদের চিন্তারও সামঞ্জস্য নেই, বুদ্ধিরও স্থিরতা নেই।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে বনমালীর উপর আক্রমণ আরম্ভ হ'ল। বন্ধু-বান্ধব তো আছেই, সেদিন মুখুয্যেগিন্নিও এই নিয়ে যথেষ্ট অনুরোধ ক'রে গেলেন।

বললেন, ব্যাটা ছেলে বিয়ে করবে না, এই কি কখনও হয় ঠাকুরপো? কি বল্ সুরো?

শান্তকণ্ঠে সুরো বললে, তোমরাই বল বৌদি। আমি ব'লে-ব'লে হয়রাণ হয়েছি।

বনমালী হেসে ফেললেন। বললেন, হয়রাণ হয়েছিস তো আবার ওঁকে ডেকে এনেছিস কেন?

এই প্রসঙ্গ ওঠামাত্র সুরবালার মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য না ক'রেই মুখুয্যেগিন্নি বললেন, আমাকে কেউ ডেকে আনেনি ভাই, আমি নিজেই এসেছি। পাড়া-শুদ্ধ লোককে জিগ্যেস ক'রে দেখ, আমি উচিত কথা বলছি কি-না।

বনমালী হাত জোড় ক'রে বললে, পাড়াশুদ্ধ লোককে জিগ্যেস করতে হবে না বৌদি, কিন্তু আপনিই বলুন আমার বয়সটা কত?

—কত শুনি?

—পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে মুখুয্যেগিন্নি সুরবালার দিকে চেয়ে বললেন, শুনলি কথা? পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে! পঞ্চাশ বছর আবার ব্যাটাছেলের একটা বয়স নাকি?

মুখুয্যেগিন্নির বোধ হয় কোনো স্বার্থ ছিল। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারলেন না। পিসিমার চোখের জল ব্যর্থ হ'ল। এমন কি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দলও একে একে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুর দলও হাল ছেড়ে দিলে।

এমনি ক'রে প্রতিপক্ষ দলের সর্ব্বদিকের আক্রমণ বনমালী প্রতিহত করলেন সত্যি। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরেও গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে বনমালীর মনোদুর্গের কতখানি ক্ষতি ক'রে দিয়ে গেল তা তখন টের পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু কিছু দিন পরেই টের পাওয়া গেল।

বনমালী তখন রোগশয্যায়।

সাধারণ জ্বর। কঠিন কিছু নয়। কিন্তু উত্তাপ ৯৯ ছাড়ালেই আর বনমালীর জ্ঞান থাকে না। গানে-বক্তৃতায় হাসিতে কান্নায় চীৎকারে সে বাড়ীশুদ্ধ লোককে অস্থির ক'রে তোলে।

সুরবালা একা মেয়ে, কি করবে? তবু ওরই মধ্যে দশবার এসে ওষুধটা খাইয়ে যায়, সাগুর বাটিটা এনে মুখে ধরে, দু'টো ফল কুটে দিয়ে যায়। কখনও বা একটু ব'সে মাথায় বাতাসও করে। আসলে ছেলেগুলো হয়েছে দুষ্টুর শিরোমণি। সুস্থ অবস্থায় বাপের কাছে গিয়ে যদি বা একটু বসত, এখন আর কেউ তাঁর ছায়া মাড়ায় না। সুরবালা সেজন্যে তাদের তিরস্কারও করে, যদিও জানে শিশুর মন রোগীর কাছে কিছুতে বসে না।

এমনি একটা সময়ে ক'দিন রোগ ভোগের পর বনমালী একদিন সুরবালাকে ডেকে বললেন, তোর সেই মামাশ্বশুরের মেয়ে না কে আছে বলছিলি সুরো, সেইখানেই বরং চেষ্টা কর্। আর তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এই অসুখের সময় স্ত্রী না হলে ···

সুরবালার মুখের সমস্ত রক্ত নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় উড়ে গেল।

বনমালী বলতে লাগলেন, রাত্রিটা কি ক'রে যে কাটে আমিই জানি। তেষ্টায় মরে গেলেও এক ফোঁটা জল দেবার কেউ নেই। ছেলেমেয়েগুলোও এমনই হারামজাদা হয়েছে যে, কেউ একটা উঁকি মারে না। সত্যি বলছি তোকে, আমার আর বিয়ের বয়স নেই সে ইচ্ছেও নেই। কিন্তু তাই ব'লে এমন বেঘোরেও তো মরতে পারব না। রাত্রে একা থাকি, যদি ম'রেও যাই ভোর না হ'লে একটা খবর পর্য্যন্ত কেউ পাবে না।

সুরবালার সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছিল। নিজেকে সামলাবার জন্যে সে দরজার একটা পাটি শক্ত ক'রে ধ'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বনমালী আপন মনেই বলে চললেন, এখন বুঝছি, তোদের সকলের কথা অমান্য ক'রে ভালো করিনি। তা সে যা হবার হয়েছে, এখন তুই যা খুশী কর্, আমি বাধা দোব না।

সুরবালা কঠিনভাবে হাসলে। বললে, সে তো পরের কথা দাদা। এখনই তো আর তোমার বিয়ে হ'তে পারে না। বউও কিছু এখনই এসে তোমার সেবায় ব'সে যেতে পারবে না।

নিজের অশোভন ব্যগ্রতায় লজ্জিত হয়ে বনমালী বললেন, না, না, সেই পরের কথাই বলছি।

সুরবালা নিঃশব্দে রান্নাঘরে ফিরে এল।

ভালো তরকারি রান্নার আগ্রহ আর তার নেই। কিন্তু এই কয় মাসের স্বাধীন এবং অবারিত গৃহিণীপনায় যে আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি ক'রে? আনন্দসরোবরের জলে নেমে আবার সে ফিরে যাবে তার পুরাতন পচা নরককুণ্ডে?

সুরবালার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বনমালী বিয়ে করবার জন্যে মনঃস্থির করেছেন। তাঁকে সে ভালো ক'রেই জানে। এর অর্থ, একবার তাঁর সেরে উঠতে দেরী। তারপর সব চেয়ে কাছে যে দিন পাওয়া যাবে সেই দিনেই বিবাহ স্থির হবে। তার পর নববধূ আসবে। হয়তো সে কাঞ্চনমালার মতো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে, নয়তো সদয় ব্যবহারই করবে। কিন্তু এই অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহের অর্থ কি? উভয় ক্ষেত্রেই তার অবস্থা পরিচারিকা অথবা আশ্রিতা আত্মীয়ার উপরে তো আর উঠবে না।

হায় ভগবান! যদি সুরবালাকে বনমালীর আত্মীয়া ক'রেই পাঠিয়েছিলে, আরও নিকটতর আত্মীয়া ক'রে পাঠাওনি কেন? তা হ'লে বনমালীর এই অসুখে আরও বেশী শুশ্রূষা করা সম্ভব হ'ত। রাত্রে তাঁর নির্জ্জন রোগশয্যায একাকী উপস্থিত থাকাও অসম্ভব হ'ত না। কিন্তু এ কি!

সুরবালা বনমালীর বড় পিসিমার জা-এর মেয়ে। নিজের জা-ও নয়, স্বামীর খুড়তুত ভায়ের স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই জা বনমালীর বড় পিসিমার আশ্রয়েই ওঠেন এবং আরও কিছুকাল পরে তাঁরই হাতে আট বছরের সুরবালাকে সমর্পণ ক'রে স্বামীর অনুগমন করেন। সেই থেকে সুরবালা তার জ্যাঠাইমার কাছে মানুষ। সেই সূত্রেই বনমালীর সঙ্গে

আত্মীয়তা। সেই জ্যাঠাইমা আজ নেই। আছে সুরবালা আর বনমালী, আর সেই ছিন্ন তারের নতুন ক'রে জোড়াতালি দেওয়া আত্মীয়তা। তারই উপর নিভর ক'রে বনমালীর রোগশয্যায় রাত্রি কাটানো চলে কি-না সংশয়ের বস্তু।

সমস্ত দিন ধ'রে সুরবালা কত কি ভাবলে, তার মাথাও নেই মুণ্ডও নেই। ছেলেগুলো কে যে পেট ভরে খেলে, আর কে খেলে না চোখেও দেখার সময় পেলে না। খাওয়ার শেষে পিসিমা একটুখানি আচারের জন্যে গলা ভেঙ্গে ফেললেন, তবু পেলেন না। তিন বারের ওষুধ বনমালী দু'বারে খেলেন। আর সে নিজে ভাত বেড়ে সে ভাত হাঁড়িতেই ঢেলে রাখলে।

তারপরে সন্ধ্যাবেলায় অনেকদিন পরে চুলগুলো পরিপাটি ক'রে বাঁধলে। মুখে একটুখানি সাবানও গোপনে দিলে। রাত্রে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে-শুইয়ে বনমালীর ঘরে এল।

তার পায়ের শব্দে চোখ মেলে বনমালী আশ্চর্য্যের সঙ্গে বললেন, সুরো?

সুরবালা নীচে মেঝেয় নিজের জন্যে একখানা মাদুর পাতছিল। সংক্ষেপে বললে, হুঁ।

—এইখানেই শুবি নাকি?

—হুঁ।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বনমালী বললেন, আমি বলতে পারছিলাম না সুরো, কিন্তু জ্বর অবস্থায় একলা শুতে আমার বড় ভয় করে। তোর বৌদিকে কেবল স্বপ্ন দেখি। দেখে ভয় পাই। ভালোই হ'ল তুই এলি।

সুরবালা তাঁর মাথার শিয়রের বালিশটা ঠিক ক'রে দিয়ে ললাটে হাত বুলিয়ে বললে, এখন তো জ্বর নেই। ঘুমোও।

কোমল হাতের স্পর্শে তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে এল। সুরবালার ঠাণ্ডা হাতখানি চোখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে সুরো?

—কি জানি। দশটা বাজে বোধ হয়।

বনমালী আর কিছু বললেন না। শুধু ললাটে, মুখে, বুকে পরম আগ্রহে সেই শীতল হাতের স্পর্শ উপভোগ করতে লাগলেন।

সুরবালা কাঠের মতো শক্ত হয়ে সেইখানে ব'সে রইল।

* * * *

ভোরবেলায় ছেলেরা উঠে দেখলে, সুরবালা বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে ঊর্দ্ধমুখে ব'সে আছে। মুখ মড়ার মতো শাদা, চোখে পলক পড়ে না, দুই কোণে দু'বিন্দু অশ্রু জমে আছে।

ছোট খোকা একটা ঠেলা দিয়ে ডাকলে, আমাকে খেতে দেবে না পিসি?

সে ডাকে সুরবালা একবার চমকে উঠল।

তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে বললে, চল।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্, এ

নহ তুমি শকুন্তলা—নহ সাগরিকা;—
অবাস্তব সৃষ্টি নহ কবিকল্পনার

মিথ্যাময়! যে রূপের বাড়বাগ্নিশিখা
একদা বিশাল ট্রয় করি' ছারখার
হয়েছিল নির্ব্বাপিত—সে লাবণ্য তব
অঙ্গে নাহি ঝলে। অয়ি নিতান্ত মানবী,
তোমার ও দেহবল্লী নহে অভিনব,—
তুমি নহ অপরূপ পটে আঁকা ছবি।

রোগশোকদুঃখক্ষুব্ধ সংসারের মাঝে
কোন্ এক পল্লীগেহে কুটীর-প্রাঙ্গণে
যৌবনের সুখস্পর্শে আকুঞ্চিত লাজে
ফুলকলিকার মত আপনার মনে
উঠেছিলে ফুটে। তাই ভালবাসি প্রিয়া,
চিরদিন তোমারেই সারাপ্রাণ দিয়া!

আয়ুর্ব্বেদ ইতিহাসের এক অধ্যায়

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

গোড়ার কথা—বৈদিক যুগ

চিকিৎসাতত্ত্বের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হয়। ভারতে এই বিদ্যা প্রচারিত হওয়ার পর আরবীয়েরা, তাহার পর গ্রীসবাসিগণ এবং তাহার পর সমগ্র বিশ্বে এই বিদ্যা প্রসারলাভ করে। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। নহিলে আমাদের জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় বিশাল ও গভীর শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে এতদিন যত্নবান হইতাম। বস্তুতঃ যে কোন বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সেই শাস্ত্রের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমোন্নতির ইতিহাস সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক, এ কথা আয়ুর্ব্বেদ কেন—সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই সত্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শরীরে যে রক্ত সংবহন ক্রিয়ার (blood-circulation) কথা পাশ্চাত্যবিজ্ঞান অল্প দিন মাত্র জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহার অনুরূপ জ্ঞান বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের ১৪ অধ্যায় পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয়। এমন কি যে ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে তাহার বিষয়ও আর্য্য ঋষিগণের অপরিজ্ঞাত ছিল না। অথব্ব বেদ পাঠে জানা যায় যে, পুরাকালে 'তক্মন' বলিয়া এক প্রকার রোগ ছিল। উহার লক্ষণাবলীর সহিত আধুনিক কালের ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 'তক্মন জ্বর শরৎকালে হইত এবং ইহা হইতে কামলা, হলীমক প্রভৃতি দেখা দিত। ম্যালেরিয়া জ্বরও বর্ষার শেষে শরৎকালেই হয় ও বেশীদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিবার পর কামলা, হলীমক প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অথর্ব্ব বেদ পাঠে ইহাও জানা যায় যে, দূষিত জল-বায়ু হইতে যে রোগের উৎপত্তি হয় এ তথ্যও তাঁহাদের অজানা ছিল না। স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, "সমস্ত পৃথিবী যখন অন্ধকারে মগ্ন ছিল, তখন আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানালোকে ভারত উদ্ভাসিত ছিল।" আর এক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবী যখন অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, নব সভ্যতাভিমানী জাতিসমূহ যে সময় বর্ব্বর বলিয়া গণ্য ছিল, চিকিৎসা বিদ্যা সে সময়ে উত্তরাপথণ্ডের মঠের অভ্যন্তরে ধর্ম্মযাজকদের প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই সময়ের পূর্ব্বেও আমাদের বৃদ্ধ সুশ্রুত ঋষি গর্ভাবক্রান্তি, গর্ভিনী ব্যাকরণ, প্রসব কৌশল, মূঢ়গর্ভ নিদান ও চিকিৎসা, শিশু-পরিচর্য্যা ও শিশু-রোগ নিদান ও চিকিৎসা ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে ফরাশী চিকিৎসক এম্‌ব্রশে পারে (Ambroise Para) প্রসবে বিলম্ব হইলে পা ধরিয়া শিশুকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার প্রণালী (যাহাকে ইংরাজীতে বলে Podalic Version) বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সুশ্রুত এই প্রণালী বর্ণনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দিতে ফরাশী দেশের পিটার চেম্বারলেন শিশু আকর্ষণের জন্য সাঁড়াশী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার বহুকাল পূর্ব্বে সুশ্রুত 'যুগ্মশঙ্কু' বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থে মণ্ডলাগ্র, অঙ্গুলী প্রভৃতি (যাহাকে আমরা এখন Blurt hook, perforator বলি) অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে। যে Caesarian section (বা পেট কাটিয়া ছেলে বাহির করা) উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দির একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, সুশ্রুত তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। সু. নি. অ ৮।

এইরূপ যে যে ব্যাধিকে বা প্রণালীকে আমরা আধুনিক মনে করিতেছি, অথবা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সব মত আমরা নব্য মত বলিয়া ভাবিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহার অনেকই আধুনিক বা নূতন নহে। আয়ুর্ব্বেদের পূর্ব্বাপর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা এইরূপ বহু বিষয়ের বিবরণ পাইতে পারি। শুধু তাহা নহে; ঐ সকল বিবরণ হইতে বহু ব্যাধির প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধেও নূতন আলোকের সন্ধান পাইতে পারি।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসের কথা বলিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদ কতকালের তাহার আলোচনা প্রথমে করা আবশ্যক।

কথিত আছে যে, লোক পিতামহ ব্রহ্মার মুখপদ্ম হইতে আয়ুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেইরূপ লোকহিতার্থ আয়ুর্ব্বেদও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জগৎ সৃষ্টি যেমন অনাদি, আয়ুর্ব্বেদও তেমনই অনাদি।

সুশ্রুত সংহিতার সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

> "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ
> শ্লোকশতসহস্র অধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান স্বয়ম্ভুঃ।"

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ শ্লোকে ও সহস্র অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ রচনা করেন। এই গ্রন্থ বহুকাল হইতে লুপ্ত। ইহা কিরূপ আকারে ছিল ও কতকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল তাহা বলিবার উপায় নাই।

ভারতীয় আর্য্যজাতির ইতিহাস, দর্শন, সভ্যতা প্রভৃতি যে কোন বিষয় জানিতে হইলে আমাদিগকে বেদের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। কারণ বেদ চতুষ্টয়ই হিন্দুদিগের প্রাচীনতম প্রামাণ্য বিষয়। বেদের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ঐ সমগ্রকালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা—

(১) বৈদিক যুগ বা দৈবার্ষ যুগ (৪০০০—২০০০ খৃঃ পূঃ)
(২) ব্রাহ্মণ্য যুগ (২০০০—৬০০ খৃঃ পূঃ)

(৩) বৌদ্ধ যুগ (৪০০ খৃঃ পূঃ—৭০০ খৃঃ)

(৪) তান্ত্রিক যুগ (৮০০ খৃঃ—১২০০ খৃঃ)

(৫) বর্ত্তমান যুগ

বেদে— আয়ুর্ব্বেদ

এক্ষণে দেখা যাউক বেদ চতুষ্টয়ের সহিত আয়ুর্ব্বেদের সম্বন্ধ কি? মহামতি সুশ্রুত বলেন—আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ।

(সু, সূ—অঃ ১)

বাগভট কৃত অষ্টাঙ্গ সংগ্রহে দেখা যায় যে

আয়ুষঃ পালনং বেদম্ উপবেদম অথর্ব্বণঃ।

(অষ্টাঙ্গ হৃদয়, সূঃ অঃ ১)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সুশ্রুত এবং বৃদ্ধ বাগভট্ আয়ুর্ব্বেদকে বেদের উপাঙ্গ ও উপবেদ বলিয়াছেন। এই উপাঙ্গ বা উপবেদ বলিতে বেদ অপেক্ষা অল্প বুঝিলে চলিবে না। কারণ অথর্ব্ব বেদে মোট ছয় হাজার মন্ত্র আছে, আর ব্রহ্মা রচিত আয়ুর্ব্বেদ লক্ষ শ্লোকাত্মক ছিল। এখানে উপাঙ্গ বা উপবেদ শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, অথর্ব্ব বেদে আয়ুর্ব্বেদের বীজ বা মূলসূত্র বিশেষ ভাবে নিহিত আছে। প্রকৃত পক্ষে ঋক্ ও অথর্ব্ব এই দুই বেদেই আমরা আয়ুর্ব্বেদের বীজ অধিক দেখিতে পাই।

মহর্ষি চরক বলেন—আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী অথর্ব্ব বেদের উপর ভক্তি রাখিবে।

"চতুর্ণাম্ ঋক্সামযজুরথর্ব্ববেদানামাত্মনোঽথর্ব্ববেদে ভক্তিরাদেশ্যা।" (চরক সূঃ অঃ ৩০)

চরক আরও বলেন যে অথর্ব্ব বেদ স্বস্ত্যয়ন, বলি, হোম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস ও মন্ত্রাদি উপলক্ষ করিয়া আয়ুর হিতকর চিকিৎসাতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছেন। অতএব অথর্ব্ব বেদে ভক্তি রাখিবে।

"বেদে হ্যাথর্ব্বণঃস্বস্ত্যয়নবলিমঙ্গলহোমপ্রায়শ্চিত্তোপবাসমন্ত্রাদিপরিগ্রাহ্যাচ্চিকিৎসাং প্রাহ।" (চরক, সূঃ অঃ ৩০)

অবশ্য উহাতে এই বুঝায় না যে আর কোন বেদে ভক্তি রাখিবে না।

এইবার দেখা যাউক যে বেদ চতুষ্টয়ে কিরূপভাবে চিকিৎসাতত্ত্বের বীজ নিহিত আছে।

ঋগ্বেদে আয়ুর্ব্বেদ

প্রথমে ঋগ্বেদের কথা ধরা যাউক।

(১) ঋগ্বেদের ৯-১১২ মণ্ডলে, সূক্তে ও মন্ত্রে চিকিৎসক রোগের আরোগ্য দাতা এইরূপ বর্ণনা আছে।

(২) চ্যবন মুনি জরাজীর্ণ হইলে স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে চিকিৎসা দ্বারা পুনর্যৌবন দান করিয়াছিলেন। (১।১১৬।১০ ; ১।১১৭।১৩)

(৩) যুদ্ধে বিশ্‌পলার শস্ত্র দ্বারা পদ ছিন্ন হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার লৌহ নির্ম্মিত পদ যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। (১।১১৬।১৫)

(৪) বিভিন্ন অঙ্গ বিশ্লিষ্ট হইলে সে অবয়বগুলি অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনঃ সংযোজন করিতেন। (১।১১৭।১৯ এবং ১।১১৭।২৪)

(৫) এমন কি শিরশ্ছেদ হইলেও অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনঃ শির যোজনা করিতেন ইহাও ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়) (১।১১৬।১২ এবং ১।১১৭।২২)

(৬) অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্ধ কণ্বকে দৃষ্টিদান ও বধির নার্ষদের শ্রবণশক্তি দান করিয়াছিলেন। (১।১১৭।৮)

(৭) পঙ্গু পরাবৃজ ও অচল-জানু শ্রোণর্ষিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা করিয়া উঁহাদের গতি প্রদান করিয়াছিলেন। (১।১১২।৮)

(৮) কক্ষীবতীর কন্যা ঘোষা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলে স্বামী সহবাসে বঞ্চিত হইয়া যখন পিতৃগৃহে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার চিকিৎসা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করিয়া স্বামীর সহিত তাঁহাকে পুর্নমিলিত করিয়াছিলেন। (১।১১৭।৭)

(৯) নানাবিধ ক্রিমির বর্ণনা ও তাহার প্রতিকারের উপায় ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। (১।১১৯।১ হইতে ১৬ মন্ত্র)

(১০) যক্ষ্মা রোগের বিষয় ঋগ্বেদে বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। (১০।১৬৩।১ হইতে ৬ মন্ত্র)

ইহা ভিন্ন রাজযক্ষ্মা, ফুসফুস, বৃক্ক (Kidney), উদর, অন্ত্র, মূত্রনাড়ী, কোষ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি অনেক বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। (১০।১৬৩ ; ৬।৫৩।৮ ; ৩।৬১।৮ ; ৮।১।২৬ ; ৩।৫০।৬ ; ১০।১।৮৪ ; ১০।৯৭।১০৫, ১৩৭, ১৬১ এবং ১৬৭)

(১১) হৃদ্‌রোগ নিরসন সম্বন্ধে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। (১।৫০।১১ হইতে ১৩ মন্ত্র)

(১২) অন্নের পাক প্রণালী, তাহা হইতে যে শরীরের মধ্যে বায়ু উৎপন্ন হয় তাহার প্রসারণ, মাংস, মেদ, স্নায়ু প্রভৃতির কথা প্রসঙ্গক্রমে ও দৃষ্টান্ত স্বরূপে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। (১০।১৮৬)

(১৩) জলের রোগনাশক শক্তি, জলই যে ঔষধের প্রাণস্বরূপ এরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। (১।২৩।১৯ ; ১০।১৩৭।৬ ; ১০।৯।১)

(১৪) নানাপ্রকার বনস্পতি ও ঔষধির বর্ণনা ও স্তুতি ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (১।২৫।৯ ; ১০।৯৭।১ হইতে ২৩ মন্ত্র)

(১৫) অনেক ঋক্ মন্ত্রে ঔষধির রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব বিষয়ক বর্ণনা আছে। (১।৫।১২)

(১৬) ত্রিধাতু বা ত্রিদোষের বর্ণনা তাহাও ঋগ্বেদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। উক্ত ত্রিধাতু সমান থাকিলে সুখ বা স্বাস্থ্য লাভ হয় এবং অসমান হইলে দুঃখ বা রোগ হয় একথাও ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। (১।৩।৬)

ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য এই ত্রিধাতুকে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদ

(১) তকমন্ জ্বরের বর্ণনা অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (৬।২১।১ হইতে ৩)

শুধু তাহাই নহে তকমন জ্বরের কয়েক প্রকার ভেদের উল্লেখ অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—শরৎ, গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষাকালীন, সতত তৃতীয়ক ইত্যাদি (১।২৫।৪ ; ৫।২২।১ হইতে ১৪)

(২) হৃৎপীড়া সম্বন্ধে বর্ণনা (৬।১৪।১ হইতে ৩)

(৩) অপচী-গণ্ডমালা রোগের বিষয় (৬।৮৩।১ হইতে ৩)

(৪) শিরঃপীড়া, কর্ণশূল, অঙ্গভেদ, অঙ্গভার, বলাশ, যক্ষ্মা, হৃদয়গত যক্ষ্মা, মজ্জাগত পীড়া, অলজী, পাদ-জানু-শ্রোণী পীড়া ইত্যাদি নানা প্রকার রোগের বর্ণনা অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে। (৯।১৩।১ হইতে ২২)

(৫) শরীরের নাড়ী, ধমনী ও শিরা নির্দেশ অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায় (১।১৭।১ এবং ৪ ; ৭।৩৬।২)

(৬) নানা রোগের সহিত শরীরের অবয়ব বর্ণনা (২।৩৩।১ হইতে ৭)

(৭) শরীরের বিভিন্ন অবয়বের উল্লেখ (২।৩৩।২ ; ৪।১২।৪ ; ১০।২।১ ; ১০।৯।১৩ হইতে ২৫)

(৮) কেশ, অস্থি, মাংস, মজ্জা, পক্ষ্ম, উরু, পাদ, শিরঃ, হস্ত, মুখ, পার্শ্ব, জিহ্বা, গ্রীবা, কিকস, ত্বক প্রভৃতির উল্লেখ (১১।১০।১১-১৫)

(৯) মূত্রাঘাতে শর, শলাকা প্রভৃতির দ্বারা মূত্র নিঃসরণ বা ভেদন প্রণালী অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায় (১।৩।১-৯)

(১০) সুখ প্রসব ও উহার চিকিৎসায় যোনি ভেদনাদি করিবার উল্লেখ, তাহাও অথর্ব্ববেদে দৃষ্ট হয়। (১।১১।১-৬)

(১১) জলধারা দ্বারা ব্রণের উপচার (৫।৫৭।১-৩)

(১২) অপচী রোগে পিণ্ডের (Glands) শলাকার দ্বারা বেধন প্রণালী অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (৭।৭৮।১-২) অপচী রোগে লবণ চিকিৎসার বিষয় (৭।৮০।১-২)। এইরূপ বিভিন্ন শল্য চিকিৎসার বিষয় অথর্ব্ববেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

(১৩) বাহির হইতে শরীরের ভিতরে ক্রিমি প্রবেশ করিয়া রোগের কারণ হয়, ইহার উল্লেখ ও ক্রিমি নাশের উপায় অথর্ব্ববেদে দৃষ্ট হয় (২।৩১।১-৫) এবং নানা বর্ণের ক্রিমির বর্ণনা ও মনুষ্যগত, গবাদিগত ক্রিমি সূর্য্যকিরণের দ্বারা নিবারণ হয়—তাহার উল্লেখও অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (২।৩২।১-৬)

(১৪) শরীরের হানিকর রোগজন্তুদিগের সূর্য্যকিরণের দ্বারা নাশের উপায় (৪ ৩৭।১-১২)

(১৫) সূর্য্যের রক্তকিরণের দ্বারা হৃদ্‌রোগ, কামলা, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নাশের উপায় (১।২২।১-৪)

(১৬) প্রাতঃকালের রৌদ্রসেবা ও জলস্নানের দ্বারা শরীরের রোগ নাশের কথা অথর্ব্ববেদে দেখিতে পাওয়া যায় (৩।৭।১-৭)

(১৭) হৃদ্‌রোগে হৈমবৎ নদীজলের (cold river stream) দ্বারা উপচার (৬।২৪।১-৩)

(১৮) সমস্ত রোগের ঔষধ হিসাবে জলের উল্লেখ (৬।৯২।৩)

(১৯) বানস্পত্য ও পার্ব্বত্য (Forest and Hill air) বায়ুর দ্বারা আরোগ্য লাভের উপায় (১।১২।১-৪)

(২০) ভেষজ হিসাবে বায়ুর উল্লেখ (৪।১৩।২-৩)

(২১) ঔষধ বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, করঞ্জ (নক্তমাল বা নক্ত মাল) কিলাস নাশক (১।২৩।১-৪), সুপর্ণা (সুপর্ণিকা) বাঙ্গালা নাম বাকুচি, আসুরী বা রাইসরিষা, শ্যামা বা শ্যামালতা ত্বকরোগ নাশক (১।২৪।১ ৪), পৃশ্নিপর্ণীর গর্ভনাশ ক্ষমতা, রক্তবিকার প্রতিকার ও শরীরের বৃদ্ধিকারত্ব (২।২৫।১-৪), শতমূলী ও দূর্ব্বার দীর্ঘায়ুষ্য ও নানা রোগ নিরাকরণত্ব (৩।১১।১-৮), সহদেবী (বেড়েলা) ও অপামার্গ যে তৃষ্ণা, ক্ষুধা ও ইন্দ্রিয়াদিগত নানা রোগনাশকত্ব শক্তি আছে তাহার উল্লেখ (৪।১৭।১-৮ ; ৪।১৮।১-৮ ; ৪।১৯।১-৮) এবং অপামার্গের মুখ-দন্ত শোধকত্ব (৭।৬৭।১-৩) ; গুগ্‌গুল ও ধূপের গন্ধে যক্ষ্মানাশ (১৯।৩৮।১-৩) এবং দূষিত জলবায়ুর দ্বারা প্রসপিত রোগ নাশে অজশৃঙ্গী বা কাকড়া শৃঙ্গীর প্রয়োগ ও বিষের দ্বারা বিষের প্রতিকার (৭।৮৮।১)

(২২) অথর্ব্ব বেদ সংহিতায় বহু মণি রত্নাদির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—শীসং (১-১৬), মণিঃ (১-২৯), সুবর্ণ (১-৫৫), শঙ্খঃ (৪-১০) ইত্যাদি।

(২৩) অথর্ব্ব বেদে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সকল রোগই বহুভক্ষণ, আলস্য, লাম্পট্য ও স্ত্রী সংসর্গ হইতে উৎপন্ন হয়। (১-২৩, ১-২৪, ১-৩৪ মন্ত্র)

(২৪) অথর্ব্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে যে, শারীরিক প্রকৃতির বিপর্য্যয় হইলেই রোগ হয়। (১-৩০)

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার History of Indian Philosophy নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অথর্ব্ব বেদ হইতে বহু শারীর যন্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

(১) হৃদয় (Heart), ক্লোম (Lungs), হালিক্ষ্ণ (Gall bladder), মৎস্নাভ্যাম্ (Kidneys), যক্ন (Liver), প্লীহন্ (Spleen), অন্ত্রেভ্যঃ (Stomach and Small Intestines) গুদাভ্যঃ (Rectum), বনিষ্ঠু (Large Intestine), ইহা সায়নাচার্য্য মতে স্থবিরান্ত্র। প্লাশি (Colon), নাভি (umbilicus), শিরা ও ধমনী।. ইহা ভিন্ন অথর্ব্ব বেদে অস্থি বর্ণনারও (২।৩৩ এবং ১০।২) একটী তালিকা দিয়াছেন। যথা—পার্ষ্ণি (two heels), গুল্‌ফৌ (two ankle bones), অঙ্গুলি, উচ্ছলঙ্খ (পাণিপাদ শলাকা metacarpal and meta tarsal bones), প্রতিষ্ঠা (পাণিপাদ শলাকাধিষ্ঠান base), অষ্ঠীবন্তৌ (two knee caps), জঙ্ঘা (two shanks), শ্রোণী (two pelvic bones), উরু (two thigh bones), উরঃ (breast bones), গ্রীবা (wind pipe), স্তনৌ (the breasts), কফোডৌ (two shoulder bones), পৃষ্ঠী (back bone), অংসৌ (two coller bones), ললাট (brow), ককাটিকা (central facial bone), হনুচিত্য (jaw), কপাল (cranium bone),

আয়ুর্ব্বেদের শারীরতত্ত্ব পুস্তকে বেদোক্ত বহু নামের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অথর্ব্ববেদের সময়ে শারীর যন্ত্রের ও অস্থি প্রভৃতির বেদোক্ত কিরূপ নাম ছিল তাহাই দেখাইবার জন্য ডাঃ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ইংরাজী নামকরণই উল্লিখিত হইল।

ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁহার পুস্তকে অথর্ব্ববেদের কৌশিক সূত্র হইতে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ক্ষতস্থানে জলৌকা লাগাইবার বিধি ও সর্পদষ্ট স্থান অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা পুড়াইবার বিধি ছিল।

যজুর্ব্বেদে আয়ুর্ব্বেদ

(১) ওষধির বল-বীর্য্য ও তাহাদের রোগনাশিনী শক্তির বিষয় ১২ অঃ ৭৪ মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বল-বীর্য্যের পারম্পর্য্য ক্রম অনুসারে শরীরের অঙ্গে অঙ্গে প্রসর্পণের উল্লেখও ১২ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) যজুর্ব্বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণে শারীরতত্ত্ব, শিরা প্রশিরার সংস্থান (১২ অধ্যায়) এবং উক্ত আরণ্যক ব্রাহ্মণের ৮ম অধ্যায়ে অগ্নির উল্লেখ আছে এবং অগ্নিই যে জীবদেহের পরিচালক, উহার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ তাহাও বলা হইয়াছে।

(৩) যজুর আরণ্যকের ৮ম অধ্যায়ের ৪র্থ ব্রাহ্মণে জাতকর্ম্ম প্রকরণে দেওয়া আছে যে, প্রসূত বালককে নালচ্ছেদের পর মধু মিশ্রিত ঘৃত পান করাইবে।

চরকও বালাধিকারে প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এই তত্ত্ব তিনি পারম্পরাক্রমে যজুর্ব্বেদ হইতে পাইয়াছিলেন।

(৪) শুক্ল যজুর্ব্বেদে বহু ঔষধের নাম, যক্ষ্মানিবারণ প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে (১২।৭৫-৮৯ ; ১২।৯০-১০১) এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদে অর্শ, শোথ, শ্লীপদ, যক্ষ্মা, মুখপাক ও ক্ষতাদি নাশকত্ব বিষয়ও দৃষ্ট হয় (১৯।৮১-৯৩ ; ২০।৫-৯ ; ২৫।১-৯ ; ৩১।১০-১৩ ; ২০।৮-১০)।

সামবেদে আয়ুর্ব্বেদ

অন্যান্য বেদের ন্যায় সামবেদেও আয়ুর্ব্বেদের বীজ বা মূল সূত্র প্রচুর পরিমাণে নিহিত আছে। এতদ্ভিন্ন সামবেদে শারীরক্রিয়া বিজ্ঞান বিষয়ক মূলসূত্রই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে—জাঠরাগ্নি, অন্ন পরিপাক প্রণালী ও ইন্দ্রের পরিপুষ্টির বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ভেষজের সহিত মনুষ্যের আয়ুঃ সম্বন্ধেও সামবেদে উল্লিখিত হইয়াছে (২, ১০, ৭০, ১৮৪)। এক্ষণে পাঠক দেখিতে পাইলেন যে বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের বীজ বা মূলসূত্রসমূহ কিরূপ নিহিত রহিয়াছে।

প্রতীক্ষায়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আশ্রমগুরু কয়ে গেছে শেষে—"যেও না শবরী চলে,
আসিবেন রাম কুটীরে আমার একদা সময় হলে।
তাঁরে সমাদর করিও কন্যা প্রাণের অর্ঘ্য সঁপি'
জীবন তোমার ধন্য করিও প্রভুর চরণ লভি'।"
আশ্রমদ্বার মুক্ত করিয়া প্রভুর পথটি চেয়ে,
ত্রস্ত ব্যাকুল ঋষির শিষ্যা রহে অনার্য্য মেয়ে।

নিরাশার বুকে ঝরে শতদল, নীরবে ফুরায় বেলা,
নীল সরোবরে স্তব্ধ নিরালা, করেনা হংস খেলা।
আঁধার আননে চলেছে বিহগ সুদূরের নীলিমায়,
মায়ার হরিণ আসনের পানে উদাস নয়নে চায়।
শূন্য আসনে পড়ে আছে পুঁথি, জ্বলে না ধ্যানের ধুনি,
নাহি তপোবনে সামসঙ্গীত, নাহি মাতঙ্গ মুনি।

কাননে কাননে বিষাদের গীতি ভ্রমিছে মেদুর বায়ে,
পম্পাতীরের পত্র-কুটীর কাঁদে পল্লবছায়ে।
সেদিন কিশোরী শবরীর প্রাণে বাজিল ব্যথার বীণা,
আশার কুঞ্জে কল্পবীথিকা শোকেতে তন্দ্রালীনা।

মনে পড়ে কোন্ অতীত দিনের জীবন প্রভাত মাঝে,
তাহারে তাপস নিয়েছিল টেনে রিক্ত বুকের কাছে।
সেদিন ছিল না বিশ্বভুবনে শবরীর বলে কেহ,
পতিত জাতির সন্তান পে'ল আর্য্যঋষির স্নেহ।
জনকজননী আত্মীয় গুরু একাধারে সেই ঋষি,
বিহনে তাঁহারি অনাথা মেয়ের কালো হ'ল দশদিশি।
আসিবেন রাম এই আশ্রমে বাণী করে কানাকানি,
পারে না শবরী ভুলিতে গুরুর বিদায়-শেষের বাণী।

জটাবল্কল পরিয়া বালিকা সদা রহে উন্মন,
কৈশোর তার শেষ হয়ে আসে—দেখা দেয় যৌবন।
কবে আসিবেন—কে তিনি ! কোথায় ?—
ভাবিছে বিরলে বালা,
তাঁহারি আসার ব্যাকুলতা নিয়ে গাঁথিছে প্রাণের মালা।
নাহিক নিদ্রা নয়নে তাহার পাছে ফিরে যায় রাম,
গুরুর আদেশ লঙ্ঘিলে যদি বিধি হয় শেষে বাম ;
হরি-চন্দন, অর্ঘ্যকুসুম, নানাবিধ উপচার—
সাজায়ে শবরী সযতনে বহে গুরুজীর গুরুভার।

প্রভাত বেলায় কুসুমচয়ন করিছে পূজার তরে,
সাঁঝের বেলায় আরতি প্রদীপ জ্বালায় কুটীর 'পরে।
শয্যাবিছায় পুষ্পলতায় প্রভুর শয়ন লাগি,
বসে বসে ভাবে—কে তিনি কোথায় ?
সারাটি রজনী জাগি'
আলিপনা-আঁকা পত্র-কুটীরে ভোগ উপচার রহে,
দিবস রজনী নীরবে সেথায় ধূপেরি গন্ধ বহে।
রাম রঘুমণি আসে না ক হায় ! নিবে যায় সব বাতি,
দিন আসে, আর দিন চলে যায়, ভোর হয়ে যায় রাতি।

শবরীর মুখ ম্লান হয়ে আসে, অভিমানে ভাসে হৃদি,
আশ্রম ছাড়ি বনপথে যায় সন্ধান পায় যদি —
আঁকা বাঁকা পথ বহু দূর গেছে বনপ্রান্তর বাহি'—
পথ ঘুরে যায়, নাহি দেখা পায় হতাশায় রহে চাহি'।
আশ্রমে ফিরি বুকে করে লয় হরিণ শিশুর মায়া,
নয়নের 'পরে নেমে আসে তার সন্ধ্যার কালো ছায়া।

কতদিন আর দেহের দেউলে প্রদীপ রহিবে জেগে,
রূপযৌবন মাগিল বিদায় অশ্রুবাদল মেঘে।
মনে হ'ল তার যা-কিছু জগতে জীবনের জঞ্জাল,
নয়নের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে' গেল, দেহ হ'ল কঙ্কাল।

ভোরের বেলায় বৃদ্ধা শবরী রাখাল বালকে কয়—
'দেখা হ'লে তাঁরে আনিস্ ডাকিয়া—ভুল যেন নাহি হয়।'
রাখাল বালক চলে যায় মাঠে নিয়ে গোষ্ঠের ধেনু,
বনে বনে ওঠে মর্ম্মরধ্বনি, মেঠোসুরে বাজে বেণু।
সন্ধ্যার পথে দাঁড়ায়ে শবরী শুধায় রাখালগণে,
রাখালেরা বলে—'বহুদূর গেছি, দেখি নাই সেই জনে।'

'ছোটজাত বলে হয়তো প্রভুর নাহি পাই দরশন,'
—ভাবে আর কাঁদে, পেলো না ক তাঁর চরণের পরশন।
জীবন-গোধূলি-লগনে বহিল উদাস করুণ হাওয়া,
হৃদয়-কুটীর ভেঙে পড়ে তার, মিছে আর পথ চাওয়া।
তবুও মাগিছে দেবতার কাছে ক্ষণিক আলোর শিখা,
সেই আলো দিয়ে দেখে নিতে চায় শেষের ভাগ্য লিখা।
যদি প্রভু এসে দাঁড়ায় গুরুর শূন্য কুটীর মাঝে,
মরণেও তার জাগিবে বেদনা অতি দুঃসহ লাজে।

বরষের পর বরষ অতীত—সুপ্ত কত না যুগ—
সহসা একদা আসিলেন রাম মিটাতে তাহার দুখ।
বৃদ্ধা শবরী ছিল উদাসীন, মৃত্যু ঘনায় তার,
ছিল অতীতের পূজা আয়োজন, ছিল নানা উপচার।
কহিল শবরী—"অসময়ে এলে, চরণে লহগো নতি,"
ছিল না তখন শবরীর চোখে অতীত দিনের জ্যোতি।
—"ভালো ক'রে আজ পাই না হেরিতে তোমার চরণ তবু,
অশ্রুজলের অঞ্জলি লহ—চলিয়া যেও না প্রভু।"
নয়নের জলে ভিজে গেল শেষে শবরীর অঞ্চল,
রামের রূপেতে পম্পার বুকে ফুটে ওঠে শতদল।
—"মানবের রূপে এসেছ আমার বিশ্বের অধিরাজ—"
—"দুঃখ করো না সময় হয়েছে এসেছি শবরী আজ—"
বৃদ্ধা শবরী চরণের ধূলি বারে বারে লহে শিরে—
অস্তাচলের সূর্য্য তখন পূর্ব্বগগনে ফিরে।

স্প্যানিস্ রেফুজি

শ্রীচিন্তামণি কর

আমার ইউরোপ যাত্রায় বোধ হয় সবকটি গ্রহের কুদৃষ্টি ছিল। আট্‌ত্রিশ দিন জাহাজে থাকায় বন্ধুদের কাছে ধৈর্য্যশীলতার মানপত্র পেয়েছি। যে কটি মাস ইউরোপে ছিলাম, যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনার ভীতি এবং তার সংঘটনের অবিস্মরণীয় শোচনীয় পরিণতির স্মৃতি আজও মনকে ব্যথিত করে।

সর্ব্বহারা স্প্যানিস শিশুরা (সামনের ছোট মেয়েটি মুণ্ডহীন শবদেহের আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় পড়েছিল)

ও:বোন্-এর সর্ব্বহারা স্প্যানিস শিশুরা

ডিসেম্বর মাসের শেষ। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেনের লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারা নারী, শিশু ও ভগ্নাঙ্গ-পীড়িত—অসহায় পুরুষ ফ্রান্সের মাটীতে আশ্রয় পাবার জন্য সীমান্তে ভিড় করেছে। অতি-ভাগ্যবানদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি বিদেশী মাটীতে মুমূর্ষু প্রাণের শেষ শিখাটুকু ধরে রাখবার আশাবর্ত্তিকাকে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। হায়! বর্ত্তমান ইউরোপীয় দেশ ও জাতির আশ্রয়, তার আশ্বাস ও মানবতার বাণী! ভারতীয় ছাত্রদের হিতৈষিণী মাদাম মোরাঁ একদিন বললেন, "স্পেনের রেফুজি ছেলেমেয়েরা সাঁ মার্তার রঙ্গমঞ্চে একটি নৃত্যগীতানুষ্ঠান করেছে, দেখে এস কর, তুমি শিল্পী, শিল্পের অনেক খোরাক পাবে।" যাবার জন্য উদ্যোগী হ'তে কয়েকজন বন্ধুকেও সঙ্গী পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমার একটি পোলিস্ বন্ধু। ইনি ইতিমধ্যেই কয়েকবার সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠানের কর্ত্তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। শুনলাম, এই অনুষ্ঠানার্জ্জিত অর্থে একটি রেফুজি দলের অন্ন-সংস্থান হয়। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে স্প্যানিস্ অর্কেষ্ট্রা বাজতে লাগল। বাজনার সুরে মনে হ'ল যেন আমাদের দেশের সঙ্গে বেশ একটা সংযোগ আছে। সুরটি বড় করুণ। উচ্চ স্বরগ্রামকে স্পর্শ ক'রে যেন বল্‌তে চাইছে—আমরা কাপুরুষের মত কাঁদি না, আবার হঠাৎ নেমে এসে বিনিয়ে উঠে সর্ব্বহারার ব্যথাকে গুমরে মুচড়ে রঙ্গালয়ের মঞ্চে আসনে, দেওয়ালে, দর্শকদের মনে, হৃদয়ে আবেগের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। নাচ ও গান বাদে স্পেনের জাতীয় জীবনকে কল্পনা করা যায় না। গীটার-এর জন্মভূমি স্পেনে যখন জিপ্সীছেলে সুরের তরঙ্গে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, তন্বী, সুঠামা, সুন্দরী মেয়ের দেহবল্লরী ঘিরে সেই সুরতরঙ্গ নৃত্যের লীলাভঙ্গে আছড়ে পড়ে তাকে চমকিয়ে দেয়। দীর্ঘকাল মূরদের শাসনাধীন থাকায় ইউরোপের অন্যান্য

দেশ থেকে এখানে প্রাচ্য জীবনের বেশ ছাপ রয়ে গিয়েছে। বাংলার মাঝির একটানা ভাটিয়ালী সুর, মরুভূমির বেদূঈন ছেলের বাঁশীর লম্বা একঘেয়ে তান এদের সঙ্গীতে বেজে উঠে মনকে উদাস ক'রে দেয়। এরা সব নাচপাগল। রাস্তায় ঘাটে যেখানেই ছেলেমেয়েরা জড় হয়েছে, অমনি সুরু হয়েছে পল্লীনৃত্য। পর্দ্দা উঠতে একদল ছোট ছেলেমেয়ে, রঙ্গীন্ ফুলদার ঘাঘরা, ওড়না ক'রে মাথায় বাঁধা রঙ্গীন রুমাল, ছেলেদের ঢিলে হাতওয়ালা শার্ট, কোমরে জড়ান লাল কাপড়, মোজা ও প্যাণ্টের সন্ধিস্থলে রঙ্গীন ফিতের বাহারী ফাঁস ইত্যাদির বিচিত্র তাদের দেশীয় পোষাকে মঙ্গলাচরণ-মত গান গেয়ে নাচলে। তাদের নাচের ভঙ্গী, হাতের মুদ্রা ভারতীয় নাচের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এর পরে একটি বছর সাতেকের মেয়ে হাতে ভায়লেট ফুলের তোড়ায় ভরা সাজি নিয়ে একটি গান গাইলে। গানের ধূয়ার শেষ কথাটি “স্তেনরিতা”, ভারী মিষ্টি ক'রে টান দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে একটি ফুলের তোড়া দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। এর পর একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে কাস্তানিয়েত্ (কাষ্ঠনির্ম্মিত করবাদ্য) বাজিয়ে নাচ দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করলে। জিপ্সীদের পোষাকে একটি সুন্দরী মেয়ে একা নানা মুদ্রাভঙ্গী সহকারে নাচলে। তার সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলি মাথার লীলাভঙ্গে দুলে বেশ একটা মোহের সৃষ্টি করছিল। হঠাৎ বাজনার সুর বদলে গেল। সঙ্গীতের ছন্দ যেন রঙ্গালয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ছন্দের সতেজ মাত্রায় তাল যেন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করবার সঙ্কেত। রঙ্গমঞ্চের ক্ষীণ লাল আলোয় ঈষৎ অস্পষ্ট একটি মেয়ের নৃত্যগতি চঞ্চল হয়ে উঠল। এ যেন নদীর সুললিত বীচিমালার মৃদু কম্পন নয়, সাগরবিক্ষুব্ধ ভীম তরঙ্গের প্রলয়োচ্ছ্বাস। স্পেনের রণক্ষেত্রের প্রাণকে যেন রূপ দিয়ে দেখাতে চায় তার ভয়ঙ্কর বীভৎসতা। প্রাণে প্রাণে তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছে বলেই হয়ত তার প্রকাশ এমন স্পষ্ট করে তুললে তার নাচে। নানা রকম পল্লীনৃত্য ও গীত, একা, যুগ্ম বা বহুজনে ছেলে-মেয়েরা নাচলে গাইলে। স্পেনের প্রত্যেকটি প্রদেশের পোষাকে নাচে গানে ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে। আন্দালুসিয়ার জিপ্সীমেয়ের লম্বিত লুলিত বেশ-ভূষা মহিমাম্বিত নৃত্যভঙ্গীমা আবেগভরা সুর যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তা যেন মর্ত্তের নয়। ক্যাস্তিলিয়া, আরাগন, কাটালন, গ্যালিসিয়া, বাস্ক প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট নৃত্য ও সঙ্গীত দেখে মুগ্ধ হলাম। অনুষ্ঠান শেষ হ'লে সবাই বাড়ী ফিরলাম। কিন্তু কানে বাজতে লাগল তখনও সেই সঙ্গীত ও কাস্তানিয়েতের অনুরণন, চোখে ভাসতে লাগল তাদের লীলায়িত ভঙ্গিমার বিচিত্র বিলাস। তাদের স্মৃতিকে একেবারে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না। পথে পোলিস বন্ধুকে বললাম, ‘এ উচ্ছ্বাস হয়ত এদের হৃদয় থেকে বেরুচ্ছে না। কারণ আজ তাদের আনন্দের কিই-বা আছে। গৃহহারা, আত্মীয়স্বজনহীন, পরদেশে ভিক্ষান্নপ্রত্যাশী এরা যে বাহ্য আনন্দটুকু আমাদের দেখালে এ ত সম্পূর্ণভাবে অকৃত্রিম হ'তে পারে না। আমি এদের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা দেখতে উৎসুক, পারবে বন্ধু আমাকে দেখাতে?’ বন্ধু বললেন, “এরকম একটি দল নয়, শত শত ক্ষুদ্র রেফূজি দল ফ্রান্সের চারিদিকে, আচ্ছাদনতলে, ভূমিশয্যায় শাক পাতা খেয়ে কোন মতে বেঁচে আছে। যদি দেখতে যাও ত চল আমার সঙ্গে কাল একটি গ্রামে, রেফূজিদের পাড়ায়।”

ভায়লেট ফুলের সাজী হাতে গানে রতা স্প্যানিস বালিকা

পরের দিন ভোর সাতটায় গার্ দ্য লিয়ঁ ষ্টেসনে বন্ধুর

কথামত হাজির হলাম। আমরা পারী থেকে প্রায় কুড়ি-কিলোমিটার দূরে ওবোন্ বলে একটি ছোট জায়গায় নামলাম। বন্ধু জানালেন, এক চাষী ভদ্রলোক (চাষীকে ভদ্রলোক বলা অনেকের হয়ত অসঙ্গত ঠেকবে, কিন্তু শুধু ও দেশ বলে নয়, চাষীরা মনে হয় সর্ব্বত্রই ভদ্র) তাঁকে ঠিকানা দিয়ে বলেছেন এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনিই আমাদের রেফ্যুজি ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন। রাস্তায় একটি কাফেতে জলযোগ সেরে কাফের কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা গেল ঠিকানাটা, "শ্মেন্যা ভেয়ার্ত (সবুজ পথ) কোথায় ?" উপস্থিত সকলেই মুখচাওয়া-চাওয়ি ক'রে বললে, এ নামের রাস্তা তারা কেউ কোন দিন শুনেনি। পথে যাকেই জিজ্ঞাসা করি --ঐ একই উত্তর আসে। শেষে এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করতেই তার পুরু কাঁচের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে ঘোলাটে চোখ যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, "এ ঠিকানা তোমাদের দিলে কে ?" নাম বলায় বৃদ্ধ বললে, "একটি রাস্তার ঐ নাম ছিল ত্রিশ বছর আগে, এখন তার নাম অন্য।" আমরা ত প্রায় রিপভ্যান্ উইঙ্কলের অবস্থায় পড়লাম। এমন সময় যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনি সশরীরে হাজির হলেন। আমরা এঁকেই খুঁজছি শুনে বৃদ্ধ ধমকে বললে, "ভুল ঠিকানা দিয়েছিলে কেন হে ছোকরা ?" ভদ্রলোক অতি বিনীতভাবে বললেন, "আজ্ঞে; ভুল বলিনি ত। প্রায় তিন-চার পুরুষ ধরে নামের ঠিকানা চলে আসছে। বাবার আমলেও ঐ নাম আমরা শুনেছি।" ব্যাপারটায় বেশ একটু হেসে নেওয়া গেল। ভদ্রলোক প্রথমে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমাদের তাঁর ক্ষেত, খামার, হাঁস, মুরগী, গরু বাছুর, শূয়োর--সব দেখালেন। তাঁর স্ত্রী সব্জীবাগানে কাজ করছিলেন, আমাদের দেখে ছুটে এসে অভিবাদন জানালেন। তাঁর ছোট মেয়েটি আমার হাতে একটি টান দিয়ে বললে, "এই, তুমি এ্যাঁদু (হিন্দু) ? তোমাদের দেশে মুরগী পাওয়া যায়।" "হ্যাঁ," বলায় বললে, "এই রকমই ?" বললাম, "না, এর চেয়ে অনেক বড়।" সে তখনই তার দু'হাত যতদূর সম্ভব প্রসারিত ক'রে উপস্থিত আর সকলকে ভারতীয় মুরগীর বপুর পরিমাণটা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

দলনৃত্যের লীলায়িত লাস্য

কাণ্ডানিয়েতের সুরসঙ্গত

চমৎকার জীবন এদেশী চাষীদের। সমবায়ভাবে এদের জীবন ও সমাজ চলে ব'লে এদের দুঃখ কষ্ট বিশেষ নেই। তিন-চার জন মিলে যুক্তভাবে এরা নিজেদের জমিগুলি চাষ করে। সমবায়ভাবে টাকা দিয়ে ট্রাক্‌টর কেনে, বসতবাড়ী

করে। তারপর ফসল হ'লে জমির মাপ হিসেবে ভাগ ক'রে নিজেদের মধ্যে টাকা বা ফসলের ভাগ নেয়। বহু স্থানে আইন বাঁচিয়ে এই চাষীরা রেফূজিদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছে। যে দেশেরই লোক হোক, বিদেশীদের এরা ভালবাসতে চায়, বুঝতে চায়।

জিপ্‌সী পোষাক পরে মনোহর নৃত্য

ভদ্রলোক তাঁর ভাইয়ের মোটরটি ধার নিয়ে আমাদের রেফূজি কাম্পে নিয়ে চললেন। পথে প্রকাণ্ড একটি বন দেখতে পাওয়া গেল, তার নাম "পেতি পারিজিয়াঁ।" প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পরে আমরা একটি উঁচু পাহাড়ের মত জায়গায় এসে পড়লাম। উঁচু স্থানটির মাঝে চারিদিকে সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখা গেল। আমাদের পথপ্রদর্শক ভদ্রলোক বললেন, এইখানে রেফূজিরা থাকে। আমরা ভিতরে যেতেই একদল ছোট ছেলেমেয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। এর মধ্যে আমি যে বিশেষ আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েছি তা বুঝলাম আমার উপর তাদের ঘন ঘন দৃষ্টিপাতে ও নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কিতে। আমি ভারতীয় জানিয়ে তাদের সন্দেহভঞ্জন ক'রে দিলাম। একটু বড় কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে বললে, "তুমি ত আমাদের জাত্‌ভাই।" আমি ত অবাক! ছেলেমেয়েগুলি বললে তারা জিপ্সী (বেদে), স্প্যানিস ভাষায় বলে "মিতানো"। এদের নাচগান স্পেনে সবাই খুব তারিফ ক'রে থাকে। এখন আমি কেমন ক'রে তাদের জাতভাই হলাম জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, তাদের পূর্ব্বপুরুষরা ভারত থেকে স্পেনে এসেছিল। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আমরা ভাবতেই পারি না। তবে এটা ঠিক, শুধু এরা বলে নয়, গোটা স্প্যানিস জাতটার সঙ্গেই আমাদের বহু মিল আছে। এদের সঙ্গীতে একটি সুরের নাম "হিন্দুস্থান", শুনতে অবিকল আমাদের ভৈরবী সুরের মত। তাদের মতে এ সুরটিরও আগমন ভারত থেকে। এই কাম্পে দুই থেকে পনেরো বছর বয়সের প্রায় দু শ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। একজন প্রৌঢ়া স্প্যানিস্ নার্স এদের দেখাশুনা করেন। ছেলেমেয়েদের সকলের পরণে জীর্ণ পুরাতন পোষাক। একেবারে শিশুরা কটিবস্ত্রখণ্ডমাত্র সম্বল ক'রে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের বাপ-মা ভাই-বোন্‌রা কোথায় ছড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। তারা বেঁচে আছে কি-না বা আবার তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি-না তারও ঠিক নেই। একটি দু বছর বয়েসের ছোট মেয়েকে দেখলাম সকলের কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনলাম, বার্সিলোনায় যখন বোমা বর্ষণ হচ্ছিল তখন একদল রেফূজি পালাবার সময় কান্নার শব্দ শুনে দেখে—এই মেয়েটিকে বুকে আঁকড়ে একটি মুণ্ডহীন মায়ের দেহ পড়ে রয়েছে। শবদেহটি তখনও উষ্ণ ছিল, হাতের স্নেহবন্ধন তখনও শিথিল হয়নি। আশ্চর্য্য! এই মেয়েটির গায়ে কিন্তু একটুও আঁচড় লাগেনি। মা তার দেহ আড়াল ক'রে সন্তানকে শেষবার রক্ষা ক'রে গিয়েছে। এদের দুঃখের তীব্রতা কান্নাকে অতি সামান্য তুচ্ছ ক'রে দিয়েছে, চোখের জলকে শুকিয়ে শেষ ক'রে দিয়েছে। হয়ত তাই ছোট মেয়েটি আর কাঁদে না। স্পেনের রাজনৈতিক বিপর্য্যয় শিশুটিকে পর্য্যন্ত তার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছে। সৈন্যদের চেয়েও যেন তারা বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজ করতে ব্যস্ত এবং ব্যগ্র। তারা যেন একটি বিরাট যন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। উপরের একটি ঘরে হল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা এবং তার তলায় একটি ফুলের তোড়া সযত্নে কে রেখে দিয়েছে।

কৌতূহল হ'ল জানতে—কি ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করতে নার্স মহিলাটি বললেন, এ প্রাসাদটি এক রাজকুমারীর। তিনি রেফ্যুজি ছেলেমেয়েদের এখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন এবং ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট এদের খাওয়া ও অন্যান্য খরচের জন্য টাকা দিচ্ছেন। তাই ছেলেমেয়েরা ডাচ্ জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। অনেক ঘরের দেওয়ালে ছেলেরা কাগজে রঙীন পেন্সিলে আঁকা ডাচ্ পতাকা টাঙিয়ে তলায় লিখেছে, "ডাচ্ জাতি দীর্ঘজীবী হোক, ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন," ইত্যাদি। মহিলাটি আরও বললেন, "ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আমাদের ফ্রান্সে প্রবেশের অনুমতিটুকু দিয়ে জগতে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ যশোলাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা—আশ্রয় ও আহার, তাঁদের কাছে পেলাম না। পরে সে ব্যবস্থা করছে এও বোধ হয় তাঁদের সহ্য হচ্ছে না, তাই দু'বেলা স্থানীয় পুলিসের লোক এসে শিশুগুলিকে এখান থেকে চলে যাবার তাগিদের হুমকি দেখায়। আশ্চর্য্য হলাম! সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এত বড় ফরাসী জাতির এই অমানুষী ক্ষুদ্রতা, নিষ্ঠুরতা দেখে। আমরা আসায় ছেলেমেয়েরা তাদের নৈমিত্তিক কাজ থেকে একঘণ্টা ছুটি পেলে। আমায় তারা ধরল ভারতীয় গান শোনাতে হবে। বললাম, "গাইতে পারি না।" তখন তারা বলল "একটা কবিতা বল।" অনেক ভেবে রবীন্দ্রনাথের "তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে" কবিতাটি আবৃত্তি করলাম। ওদের ভাষাতেও "গানে, প্রাণে"র মত শেষে স্বরবর্ণের লম্বা টান থাকায় ওদের কবিতাটি বোধ হয় বেশ ভাল লেগেছিল। কারণ ওর. অনেকেই এই কথাগুলি অনুকরণ করে পরস্পর বলাবলি করছিল, "কথাগুলি ভাই কি সুন্দর!" তার পর আমাদের খুশী করতে ওরা নাচলে, গাইলে, আবৃত্তি করলে। কেন জানি না, আমার বন্ধুর চেয়ে আমার সঙ্গে ওরা বেশী আপনার জনের মত ব্যবহার করছিল। নানা কথার ফাঁকে নার্স বললেন, "মনে ক'র না, আমরা এই ছেলেমেয়েগুলির শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যাশী মাত্র। এদের আমরা এমন শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তুলব যাতে এরা বড় হয়ে এদের বাপ মা ভাই বোনদের প্রতি, দেশের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয় এবং রিপাবলিককে ফের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এরা এখন স্পেনকে ফের্ নতুন ক'রে গড়বে; নিজেরা কাটাকাটি ক'রে স্প্যানিস জাত যে কালি নিজ অঙ্গে মেখেছে, সে কালিমা ও গ্লানির তিলমাত্র তার মধ্যে থাকবে না।"

সেইদিনের পরিচয়টুকু সেইদিনেই শেষ ক'রে ফেল্‌তে কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। পরে বহুবার ওখানে যাতায়াতে হৃদয়ে মমতা এসে অভিভূত করেছিল। ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে স্হেনর (মহাশয়) পর্য্যায় থেকে আমাকে তাদের এয়ার-মানোর (ভাই)-পর্য্যায়ভুক্ত করে নিয়েছিল। কয়েকটা মাস

গ্রামের চাষী

আপ্রাণ চেষ্টার পর ফরাসী ও স্পেন গভর্ণমেণ্ট থেকে ছেলে-মেয়েগুলিকে তাদের স্বদেশে গৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেদিন তারা চলে গেল সকলেই ছল ছল চোখে বললে, "আদেওস্ এয়ারমানো কর (বিদায় ভাই কর)।" একটি ছোট মেয়ে দুটি হাত ধরে আধ-আধ কথায় বললে "এস্-পেরো কে ভোল্‌ভেরা প্রোন্‌তো, (আশা করি যে শীঘ্র তুমি আবার আসবে)—আস্তা লা ভিস্‌তা, (বিদায়, যে পর্য্যন্ত না আবার দেখা হয়)।"

অদৃষ্ট হয়ত অলক্ষ্যে হাসল।

—নিমেষের সাথী—

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিভূষণ

১

পথে পথে আজি ঘুরে মরি শুধু
হারানো সাথীর লাগি,
কোথা হতে এসে কোথায় মিলালো
ভাবি তাই নিশি জাগি ;
কি যেন জানে সে যাদুমন্তর,
নিমেষে হরিল মর্ম অন্তর
বেদনা জাগায়ে চলে গেল হায়
ইসারায় মোরে ডাকি’,
তাই পথে পথে ঘুরে’ মরি আজ
ক্ষণ অতিথির লাগি’।

২

প্রভাতের ম্লান শুকতারা যবে
লুটায় গগনকোণে,
পাখীরা যখন জাগরণী গান
গাহিল আপন মনে,
তখন আমার এ হিয়ার তলে
কার ইঙ্গিত জাগে পলে পলে
কার ইসারাতে পথের বাহিরে
আসিনু সঙ্গোপনে,
বাহু দুটি মোর জড়াইতে চায়
কাহার আলিঙ্গনে।

৩

পথখানি মোর ছিল অনাবিল
মনে ছিল না ক’ দুখ,
সহসা তাহারে মোর পাশে দেখে
কাঁপিয়া উঠিল বুক ;
জাফরাণী তার শাড়ীর আঁচল
প্রভাত আলোকে করে ঝলমল
চাঁদের সুষমা চুরি করে বিধি
গড়িয়াছে সেই মুখ,
একলা পথের সঙ্গীরে দেখে
কাঁপিয়া উঠিল বুক।

৪

দুজনেই মোরা চলেছি নীরবে
কারো মুখে নাহি বাণী
সে যেন চলেছে মোর পাশে পাশে
আমার হৃদয়-রাণী—
সহসা চাহিল আঁখি তুলে সে যে
শত বীণা বেণু উঠে তাই বেজে
আমার নয়ন অপলক হয়ে
দেখিত সে মুখখানি।
দুজনের আঁখি দুজনে নিরখি’,
মুখে নাহি সরে বাণী।

৫

পথমাঝে মোর পথ শেষ হলো
দেখা ত হলো না শেষ
গান চলে গেল সুদূরে ভাসিয়া
রাখিয়া করুণ রেশ ;
উদাস নয়নে চাহি তার পানে
ভাষাহীন মোর রিক্ত পরাণে
শুধু বার বার ওঠে ভেসে তার
কুঞ্চিত কালো কেশ,
পথমাঝে তারে ছেড়ে দিয়ে মোর
যাত্রা করিনু শেষ।

৬

কোন অজানাতে লুকানো রয়েছে
তাহার তন্বী কায়া,
নিমেষের তরে পারি না ভুলিতে
ক্ষণ-অতিথির মায়া,
সে কভু আমারে চাহে কি না চাহে
মোর গান কভু গাহে কি না গাহে,
তবু আমি পথ চলেছি আবার
বুকে ধরে তার ছায়া,
নিমেষের সাথী ভুলেছে আমারে
আমি ত ভুলিনি মায়া।

জঙ্গম

বনফুল

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

শিরিষবাবুর বাড়ির অন্তঃপুরে বসিয়া মুকুজ্যে মশাই, শিরিষবাবু এবং শিরিষবাবুর পত্নী সুশীলাসুন্দরী কথা-বার্ত্তা বলিতেছিলেন। সুশীলাসুন্দরী অবশ্য বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন না, তিনি একটু দূরে বসিয়া মাথায় আধ-ঘোমটা টানিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন এবং ইহাঁদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। গুরুজনদের সম্মুখে অকারণে বাচালতা প্রকাশ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং স্বভাবতই তিনি নীরব প্রকৃতির। সব কিছু মন দিয়া শোনেন, কিন্তু বেশী কিছু বলেন না।

চিন্তিতমুখে শিরিষবাবু বলিলেন, "আপনি যাবেন না, তা হ'লে কি ক'রে হবে! আমার পক্ষে একা—"

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "হ'লেই বা একা, তারা তো বাঘ-ভালুক নয় যে তুমি গেলেই টপ ক'রে খেয়ে ফেলবে। তুমি মেয়ের বাপ, তুমি না গেলে চলবে কেন?"

শিরিষবাবু মুখটা উঁচু করিয়া চিবুকের তলাটা চুলকাইতে লাগিলেন। মুকুজ্যে মশাই সহাস্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ছেলেটিকে একবার দেখা-ও হবে, আর ভদ্রলোকের মনোভাবও খানিকটা বোঝা যাবে। চিঠিপত্রে তিনি খোলাখুলি কিছু বলতে চান না সে তো দেখছ।"

শিরিষবাবু চিবুক চুলকানো শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা দিয়া মাথাটা বাহির করিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন। কোঁচা দিয়া নাকটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সর্দ্দিও করেছে, ভাবছি ট্রেনে আবার এক্‌স্‌পোজার লাগবে। পরের শনিবারে গেলে কেমন হয়? রাজমহলে ক'দিন লাগবে আপনার?"

"আদালতের ব্যাপার তো, ঠিক বলা যায় না। সাক্ষী-ফাক্ষিগুলোও সব ঠিক করতে হবে, তা ছাড়া, মনু হয়তো ছাড়তে চাইবে না, অনেক দিন যাই নি।"

সুশীলাসুন্দরী চকিতে একবার মুকুজ্যে মশায়ের মুখের পানে চাহিয়া আবার সুপারি কুঁচানোতে মন দিলেন।

মনু অর্থাৎ মনোরমা নামক বিধবাটির সহিত মুকুজ্যে মশায়ের প্রকৃত সম্পর্কটা যে কি কেহ তাহা জানে না। সম্পর্ক একটা নিশ্চয়ই আছে, কারণ মুকুজ্যে মশাই তাঁহার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। মনোরমার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, খুব নিষ্ঠাবতী বিধবা। মুকুজ্যে মশাই যদিও তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন, কিন্তু কখনও নিকটে রাখেন না। নানাস্থানে মুকুজ্যে মশায়ের পরিচিত লোকের অভাব নাই, কাহারো না কাহারো পরিবারে মুকুজ্যে মশাই মনোরমাকে রাখিয়া দিয়া নিজে অন্যত্র চলিয়া যান। সাধারণত যে সকল পরিবার মুকুজ্যে মশায়ের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর করে সেই সব পরিবারেই মনুকে তিনি রাখিয়া থাকেন। সম্প্রতি মনোরমা রাজমহলে যে পরিবারে রহিয়াছে সেই পরিবারের কর্ত্তাটি জেলে গিয়াছেন, আপিসের টাকা ভাঙিয়াছেন এই তাঁহার অপরাধ। মুকুজ্যে মশায়ের ধারণা লোকটা নিরীহ, তাহার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি এই অপবাদ খণ্ডন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। উকিল ব্যারিস্টার দ্বারা যতটা করা সম্ভব সবই করিয়া দেখিবেন ঠিক করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি অমিয়ার বিবাহ ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন এবং এ সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও নড়িবেন না ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু গতকল্য মনুর একখানি পত্র আসিয়াছে যে অন্তত দুই-একদিনের জন্য রাজমহলে আসা তাঁহার নিতান্ত দরকার, না আসিলে মোকদ্দমার ক্ষতি হইবে। সেইজন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুকুজ্যে মশাইকে যাইতে হইতেছে।

শিরিষবাবু অকূল পাথারে পড়িয়া গিয়াছেন।

শিরিষবাবুর মুখের উপর হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন, "আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। এতদিন যখন গেছে তখন দু-চার-দশ দিনে আর কি এমন

এসে যাবে। তা ছাড়া, যতই তাড়াতাড়ি করুন, বোশেখের আগে তো আর বিয়ে হচ্ছে না!"

মুকুজ্যে মশাই বলিলেন, "হাতে কি খুব বেশী সময় আছে মনে কর তুমি? তিরিশটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম, চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে তো জন পনেরোকে বাতিল করা গেছে, কুষ্ঠির মিল জন ছয়েকের সঙ্গে হ'ল না। বাকী আছে ন'জন, এদের সঙ্গে চিঠিপত্রে যতটা হবার হয়েছে, এইবার দেখাশোনা করা দরকার। সব ক'টিই সুপাত্র। ন'জনের সঙ্গে দেখা করতে তোমার অন্তত এ সপ্তাহ লাগবে, তোমার তো শনি রবি ছাড়া ছুটি নেই।"

শিরিষবাবুকে স্বীকার করিতে হইল—ছুটি নাই। কিন্তু তিনি অবুঝের মতো বলিলেন, "ন জনকেই দেখতে না হ'তে পারে। এই শঙ্কর ছেলেটিকেই আমাদের পছন্দ, শঙ্করের বাবা অম্বিকাবাবু আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ও। সেজদার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে কি যেন সম্পর্ক আছে ওঁদের। ওইখানেই হয় তো হয়ে যাবে। কুষ্ঠি অনুসারে তাই হওয়া উচিত।"

"ধর, যদি না হয়—"

শিরিষবাবু অবশ্য ধরিতে রাজি নহেন, কিন্তু যুক্তির আবশ্যকতা অস্বীকার করা মুস্কিল। ওপথে না গিয়া সুতরাং তিনি বলিলেন, "বুঝছেন না, আপনি সঙ্গে না থাকলে বেশ জোর পাওয়া যায় না, তা ছাড়া আপনিই সব করসপন্‌ডেন্‌স করেছেন। আপনি ঘুরে আসুন, তারপর যাওয়া যাবে। ভাগ্যে যা আছে তা হবেই! একা একা এসব ব্যাপারে যাওয়া ঠিক নয়, আমি এর ভালোমন্দ তেমন বুঝিও না। তা ছাড়া নিজের দায়িত্বে একটা কিছু ক'রে ফেলে শেষে যদি গোলমাল হয়, সুশীলা আমাকে—"

কথাটা শিরিষবাবু শেষ করিলেন না, সুশীলার দিকে একবার চাহিয়া উঠিয়া গিয়া পুনরায় নাকটা ঝাড়িলেন। মুকুজ্যে মশাই ও সুশীলা পরস্পরের দিকে তাকাইয়া সহাস্য দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

অগত্যা স্থির হইল, মুকুজ্যে মশাই রাজমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া শিরিষবাবুকে লইয়া অম্বিকাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তৎপূর্ব্বে কিছুই হইবে না।

মুকুজ্যে মশাই উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "যাই তা হ'লে মন্টুকে একটা চিঠি লিখে দিই, কাল সকালের ট্রেনেই যাব।"

মুকুজ্যে মশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

মুকুজ্যে মশাই চলিয়া গেলে সুশীলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন ও বলিলেন, "সত্যিই তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে না কি? দেখি—"

"কি দেখ্‌বে?"

সুশীলা উঠিয়া স্বামীর কপালে হাত দিয়া দেখিলেন।

শিরিষবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ও তেমন কিছু নয়, সামান্য একটু সর্দ্দির মতো—"

"গা-টা কিন্তু ছ্যাক ছ্যাক করছে, আজ বরং ভাত খেয়ে কাজ নেই, রুটি দুখানা করে দি, শুক্‌নো শাক্‌না খেয়ে থাকাই সর্দ্দির ওষুধ—"

"না, না, রুটি খাবো কি!"

"সাবধান হওয়াই ভালো, মোজা পায়ে দাও—"

শিরিষবাবু মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। সুশীলা আলনা হইতে গরম মোজা আনিয়া দিলেন। শিরিষবাবু মোজা পরিতে পরিতে বলিলেন, "রুটি কিন্তু খাবো না, বুঝলে—"

"তোমার কথা শুনছি কি-না আমি!"

সুপারির ডালা লইয়া সুশীলাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন।

শিরিষবাবু মুখবিকৃতি করিয়া গরম মোজাকে গোড়ালি পার করাইতে লাগিলেন। এ কি বিপদে পড়িয়া গেলেন তিনি!

রান্নাঘর হইতে অমিয়াকে দেখিয়া সুশীলা মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, ওর শিব পুজো যেন সার্থক হয়, শঙ্করের সঙ্গেই ওর যেন বিয়ে হয়।"

অমিয়া উঠানের ওধারে মাটির শিব গড়িয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছিল। যদিও মুকুজ্যে মশাই শিব লইয়া যখন তখন তাহাকে ঠাট্টা করেন তবু সে শিবপূজা ছাড়ে নাই। তাহার মনের গহনে যে চিরন্তনী উমা বসিয়া আছে তাহার তপস্যায় বাধা দিবার সামর্থ্য তাহার নিজেরও নাই।

২

বেলা মল্লিকের বাসায় প্রফেসার গুপ্ত বসিয়াছিলেন।

বেলা বাড়িতে নাই, বাহিরে গিয়াছেন এখনও ফেরেন নাই। জনার্দ্দন সিংহের 'জেরা সে ঠহর যাইয়ে হুজুর' এই কথাগুলির উপর নির্ভর করিয়া প্রফেসার গুপ্ত বাহিরের ঘরটাতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলার নিকট আসিবার একটা ওজুহাত অবশ্য প্রফেসার গুপ্তের আছে, সর্ব্বদাই থাকে

এবং সে ওজুহাতগুলি যে যুক্তিসহ নহে তাহাও প্রফেসার গুপ্ত এবং বেলা উভয়েই জানেন। কিন্তু না-জানার ভান করেন। আজ প্রফেসার গুপ্ত আসিয়াছিলেন বেলাকে জানাইতে যে তাঁহার কন্যা মান্তু মামার বাড়ি গিয়াছে, আজ আর বেলার সন্ধ্যাকালে পড়াইতে যাইবার দরকার নাই। এ খবরটা কোন চাকরকে দিয়ে পাঠাইলেই চলিত, কিন্তু---

আধ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বেলা দেবীর দেখা নাই। কখন যে সে ফিরিবে তাহা জনার্দ্দন ঠিক বলিতে পারিল না। বোস সায়েবের পত্নীকে বেলা সকালের দিকে এস্রাজ শিখাইতে যায় তাহা প্রফেসার গুপ্ত জানেন। সেখানে এতক্ষণ দেরি হইবার কথা নয়। প্রফেসার গুপ্ত আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, আর একবার হাত ঘড়িটা দেখিলেন, অবশেষে হতাশ হইয়া এক্‌টুকরা কাগজে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা এবং আগমনের হেতু লিখিয়া জনার্দ্দনের হাতে দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ‘কার’টা যখন গলিটা হইতে বাহির হইয়া গেল এবং সাত নম্বরের বাড়ির দ্বিতলের বাতায়ন হইতে বেলা যখন তাহা দেখিতে পাইলেন তখন তিনিও নামিয়া আসিলেন।

এই গলির সাত নম্বরের বাড়ির বাসিন্দাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে বেলার ভারি সুবিধা হইয়াছে। প্রফেসর গুপ্তের সান্নিধ্য এড়াইবার প্রয়োজন যখনই ঘটে (এবং সে প্রয়োজন অধুনা প্রায়ই ঘটিতেছে) বেলা সাত নম্বরের বাড়িতে আত্ম-গোপন করেন এবং যতক্ষণ না প্রফেসার গুপ্তের ‘কার’টা চলিয়া যায় ততক্ষণ সেখানে বসিয়া গল্পগুজব করিতে থাকে। একটি জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ব্যতীত সাত নম্বরের বাড়িতে পুরুষ কেহ নাই। বেলার সমবয়সী একজন এবং বেলার চেয়ে ছোট তিনজন মেয়েকে লইয়া বিপত্নীক বৃদ্ধ হলধরবাবু সাত নম্বরে বাস করেন। হলধরবাবু পিতৃভাবাপন্ন, মেয়েগুলি মিশুক প্রকৃতির, বেলার সহিত বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে। বড় মেয়েটি কলেজে এবং বাকি মেয়েগুলি স্কুলে পড়ে। বড় মেয়েটি বেলাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে এবং বেলা তাহাকে গান বাজনা শিখিতে সহায়তা করিবে এরূপ একটা বন্দোবস্তও হইয়া গিয়াছে।

আজ শৈলদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া গলিতে ঢুকিয়াই প্রফেসার গুপ্তের ‘কার’খানা চোখে পড়িতেই বেলা সোজা সাত নম্বরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন। ‘কার’ চলিয়া গেলে নিশ্চিন্ত চিত্তে নামিয়া আসিলেন এবং জনার্দ্দন সিংহের নিকট হইতে প্রফেসার গুপ্তের গমন ও আগমন সংবাদটা এমনভাবে শুনিলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। প্রফেসার গুপ্তের লেখা কাগজখানাও অত্যন্ত নির্ব্বিকার ভাবে দেখিলেন।

আজ রবিবার, তাড়াতাড়ি স্নানাহারটা সারিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা না হইলে আবার কেহ হয়তো দয়া করিয়া আসিয়া জুটিয়া যাইবেন। বিগত কয়েকটি রবিবারের অভিজ্ঞতা হইতে বেলা দেবী স্থির করিয়াছেন যে রবিবারটা তিনি বাহিরেই কাটাইবেন। একের পর এক পুরুষ বন্ধুর অভ্যাগম আর কিছু না হউক দৃষ্টিকটু।

স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বেলা দেবী বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময়ে প্রিয়বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ভদ্রলোকের শুষ্ক মুখ, চুল উস্‌কো-খুসকো, চোখে এমন একটা দৃষ্টি যাহা অল্পকথায় বর্ণনা করা শক্ত। ভয় এবং মরিয়া ভাব, ভালবাসা এবং রাগ, বিশ্বাস এবং নিশ্চয়তা প্রিয়বাবুর চকিত দৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া ছিল।

“দাদা যে, হঠাৎ ?”

প্রিয়বাবু নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, “ভেতরে চল, বলছি।”

উভয়ে ভিতরে আসিয়া প্রবেশ কারলেন। প্রিয়বাবু ইতিপূর্ব্বে নিজে বেলার নিকট আসেন নাই, তিনি এই প্রথম আসিয়াছেন। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া এবং বেলার ঘরখানি পরিপাটিরূপে সজ্জিত দেখিয়া তিনি কেমন যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। মনে মনে বেলার যে দৈন্য-নিপীড়িত অবস্থা তিনি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে বাস্তবের কিছুমাত্র মিল নাই দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন না, ভয় পাইয়া গেলেন। বেলা তো বেশ সুখেই আছে! আর যাই থাক, বেলার আধিভৌতিক কোন দুঃখ নাই তাহা ঠিক।

তাঁহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া বেলা প্রশ্ন করিলেন, “তিন মাস পরে আজ হঠাৎ এসে পড়লে যে! বিয়ের নেমন্তন্ন করতে না কি!”

প্রিয়বাবুর সহসা যেন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল।

“চোপ রও, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!”

প্রিয়বাবু ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। প্রিয়বাবুর

ক্রোধের আকস্মিকতা ও অযৌক্তিকতার পরিচয় বেলা ইতিপূর্ব্বে বহুবার পাইয়াছেন, সুতরাং তিনি বিস্মিত হইলেন না, একটু মৃদু হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রিয়বাবু কিছুক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি এ কি করিয়া বসিলেন। আসিয়াছেন বেলাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য, তাহার সহিত ঝগড়া করিবার জন্য নয়, কিন্তু হঠাৎ তিনি এ কি বলিয়া ফেলিলেন! রাগারাগি করিবার জন্য তো তিনি আসেন নাই। নিকটেই একখানা চেয়ার ছিল তাহার উপর বসিলেন এবং নিস্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন; আত্মধিক্কারে তাঁহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই খাপছাড়া রাগের জন্য জীবনে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বহুবার লজ্জিত হইতে হইয়াছে কিন্তু কিছুতেই তাঁহার স্বভাব বদলাইল না। হঠাৎ পাশের ঘরে স্টোভ জ্বালার শব্দে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন. বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, বেলা স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইতেছে।

"তুমি ওই ঘরেই বস, চা ক'রে নিয়ে যাচ্ছি এখুনি—"

কোন কথা না বলিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন, তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, মেয়েটার শরীর রক্তমাংসের না পাথরের।

একটু পরে বেলা রেকাবিতে কিছু জলখাবার এবং এক-বাটী চা আনিয়া তাহার সামনে একটি ছোট টিপয়ে সাজাইয়া দিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "খাও—"

"খাব। আমি কি এখানে খাবার জন্যে এলাম?"

বেলা এক গ্লাস জল আনিয়া টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলেন, "খাবার জন্যে কেউ কারো বাড়িতে যায় নাকি, তবে অতিথি এলে চা জলখাবার দেওয়াটা ভদ্রতার একটা অঙ্গ—"

"আমি কি অতিথি না কি--যে আমার সঙ্গে ভদ্রতা করতে হবে!"

বেলা কিছু না বলিয়া পুনরায় বাহির হইয়া গেলেন এবং একটা ডিসে কয়েকখিলি পান লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

প্রিয়বাবু বলিলেন, "আগে আমার কথার একটা জবাব দে, তা না হ'লে কিছু খাব না আমি—"

"বল।"

"আমার কাছে ফিরে যাবি কিনা?"

"না।"

"রাগের মাথায় একটা কথা বলে ফেলেছি, সেইটেকেই বড় ক'রে দেখতে হবে?"

"বড় ক'রে দেখতাম না—যদি সেটা সত্যি কথা না হ'ত। আমি ভেবে দেখেছি, তুমি সেদিন যা বলেছিলে সেটা খুব বড় সত্যি কথা, তার জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞ আমি!"

"কি সত্যি কথা?"

"মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই যে চিরকাল তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে এর কোন মানে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা মানুষমাত্রেরই থাকা উচিত—তা সে মেয়েমানুষই হোক বা পুরুষমানুষই হোক।"

"তার মানে?"

"তার মানে আমি স্বাধীনভাবে থাকতে চাই।"

"আমার কাছে থাকা মানে তা হ'লে কি পরাধীনতা বলতে চাও? আমি কি তোমার পর!"

"পর কেন হতে যাবে, কিন্তু আমি মেয়েমানুষ বলেই চিরকাল তোমার উপার্জ্জনে ভাগ বসাব কেন? তাতে আমারও সম্মান নেই, তোমারও সম্মান নেই।"

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

"চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—"

চায়ের দিকে মনোযোগ না দিয়া প্রিয়বাবু বলিলেন, "বেশ তো রোজগার করতে চাও রোজগার কর, কিন্তু আমারই কাছে থাকো, আলাদা বাসা করবার দরকার কি?"

"আলাদা থাকলে যে পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করা যায়, একসঙ্গে থাকলে তা সম্ভব নয়। পরস্পরের স্বাধীনতা খর্ব্ব ক'রে একসঙ্গে বাস করার কোন সার্থকতা দেখতে পাই না আমি।"

"খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস তো!"

বেলা কোন উত্তর দিলেন না।

"যাবে না তা হ'লে ফিরে?"

"না।"

প্রিয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

"উঠলে যে, খাবে না?"

"খাবার জন্যে আমি আসি নি, চললাম!"

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া প্রিয়বাবু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "আমার মনে এই যে কষ্ট দিচ্ছ এর

ফল ভাল হবে না জেনে রেখো। শুধু আমার মনে নয়, অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছ তুমি, লক্ষ্মণবাবুর মত ছেলে তোমারই জন্যে আত্মহত্যা করেছে। এ সবের ফল কখনও ভাল হয় না, কখনও না, কখনও না। এই তেজ বেশী দিন থাকবে না!”

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে গিয়া প্রিয়বাবুর মাথাটা চৌকাটে ঠুকিয়া গেল, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

বেলা নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লক্ষ্মণবাবুর তরুণ বিহ্বল মুখচ্ছবিটা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল।

• • •

খুট্ করিয়া শব্দ হইল।

বেলা চাহিয়া দেখিলেন শঙ্কর দাঁড়াইয়া আছে।

“শঙ্করবাবু যে, আসুন।”

শঙ্কর ভিতরে প্রবেশ করিল।

শঙ্কর আসাতে বেলা যেন অনেকটা আত্মস্থ হইলেন।

হাসিয়া বলিলেন, “এমন অবস্থা কেন আপনার? চান করেন নি নাকি?”

শঙ্কর সত্যই কয়েকদিন স্নান করে নাই। কাপড় ময়লা, গরম জামার পিছন দিকটায় দেওয়ালের চুণ লাগিয়াছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, চুল উস্‌কো-খুস্‌কো।

শঙ্কর মিথ্যা কথা বলিল।

“শরীরটা ভাল নেই, জ্বর হয়েছে বোধ হয়!”

“সেই জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন?”

“একটা ভীষণ দরকারে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিছু টাকা চাই—ধার।”

“ওমা, টাকা ধার চাইবার আর লোক পেলেন না আপনি? ক টাকা?”

“গোটা দশেক হ’লেই আপাতত চলবে—”

“এখন দশটাকা তো আমার হাতে নেই। কাল শৈল-দি মাইনে দেবেন, কাল বরং দিতে পারি।”

“শৈলদি কে?”

“মিসেস এস্, কে, বোস। তিনি তো আপনাকে চেনেন।”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, “সে কি গান শিখছে আজকাল আপনার কাছে?”

“গান নয় বাজনা, আর একটু একটু ইংরেজী।”

“আপনার সঙ্গে যে আলাপ আছে আমার—সে কথা বলেছেন শৈলকে?”

“না, বলি নি—”

“বলবেন।”

“বলে চাকরিটি খোয়াই আর কি!”

“তার মানে?”

“আপনার সঙ্গে আর কারো ভাব থাকতে পারে এ শৈলদির পক্ষে অসহ্য!”

শঙ্কর একটু হাসিল।

বেলা বলিলেন, “চা খাবেন?”

“খেতে পারি—”

প্রিয়বাবুর চা ও জলখাবারটা বেলা শঙ্করকে বসাইয়া খাওয়াইলেন।

খাইতে খাইতে শঙ্কর প্রশ্ন করিল, “শৈলর মনোভাবটা কি ক’রে বুঝলেন আপনি?”

“অনেক কথা আমরা মেয়েরা বুঝতে পারি।”

“তবু বলুন না একটু শুনি।”

“তা হ’লে চলুন রাস্তায় যেতে যেতে বলছি। আমাকে এক জায়গায় বেরোতে হবে, কাজ আছে—”

রাস্তায় বাহির হইতেই শঙ্কর বলিল, “এইবার বলুন—”

বেলা হাসিয়া বলিলেন, “এই ধরুন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। রিণির সঙ্গে আপনার বিয়েটা যখন ভেঙে গেল তখন শৈলদি ভারি খুশি। একমুখ হেসে বললেন, শঙ্করদাকে জানি তো ছেলেবেলা থেকে, ওর নাড়িনক্ষত্র সব জানি, রিণির মতো মেয়েকে দেখে গলে পড়বার ছেলেই ও নয়। আমার তখুনি মনে হয়েছিল ওসব বাজে গুজব, শঙ্করদা বিয়ে করবে রিণিকে—তবেই হয়েছে!”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বেলা দেবী থামিলেন, চকিতে একবার শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, “বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে শেষ পর্য্যন্ত ভেঙে গেল কেন বলুন তো!”

শঙ্কর কোন উত্তর দিল না, নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল।

বেলা দেবী এই নীরবতা-প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন এমন সময় পাশের একটি গলি হইতে একটি সুদৃশ্য মোটরকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং একবার

হর্ন দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মোটরের দালাল অচিনবাবু গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া শঙ্করকে সম্বোধন করিলেন—“নমস্কার শঙ্করবাবু, আপনাকেই খুঁজছি ক'দিন থেকে—”

“আমাকে? কেন বলুন তো?”

অচিনবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং স্মিতমুখে বলিলেন, “হস্টেলে যাচ্ছি—”

“আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল আমার—”

তাহার পর বেলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ইনি কি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন? চলুন না, কিছু যদি মনে না করেন, লিফ্‌ট্ দিয়ে দি আপনাদের!”

বেলা বলিলেন, “না ধন্যবাদ, আমি অন্য জায়গায় যাব। শঙ্করবাবু, আপনি যান ওঁর সঙ্গে আমি একাই যাচ্ছি—”

সকলেই যখন কি করিবেন ইতস্তত করিতেছেন, তখন অচিনবাবু শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ইনি কি প্রফেসর মিত্রের কেউ হন নাকি? মিষ্টিদিদির ওখানে ওঁকে দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।”

শঙ্কর পরিচয় করিয়া দিল।

“না, মিষ্টিদিদির কেউ হন না ইনি। ইনি হচ্ছেন মিস বেলা মল্লিক, গান বাজনা খুব ভাল জানেন, অনেককে শিখিয়েও থাকেন। আর ইনি হচ্ছেন অচিনবাবু, মোটরকারের দালালি করেন।”

উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।

অচিনবাবু নামটা শুনিয়া বেলা মনে মনে একটু উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকই তাহা হইলে শিক্ষয়িত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং ইঁহারই সংস্রব পরিহার করিয়া চলিতে প্রফেসার গুপ্ত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন! অচিনবাবু বেলা দেবীকে এক নজর আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, “কিছুদিন আগে আপনিই কি আমার কাছে শিক্ষয়িত্রীর একটা পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন? বেলা মল্লিক নামটা মনে পড়ছে যেন!”

“প্রথম প্রথম অনেক জায়গায়, দরখাস্ত করেছিলাম, আপনার কাছেও হয়ত করে থাকবো—”

বেলা দেবী হাসিয়া উত্তর দিলেন।

অচিনবাবু বলিলেন, “বাইরে, মানে কোলকাতার বাইরে মেয়ের সঙ্গে থাকবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার আমার একজন বন্ধুর। ভাল লোক পাইনি এখনো তেমন। আপনি যান তো এখনো জোগাড় করে দিতে পারি। মাইনে পঞ্চাশ থেকে সুরু, একশো পর্য্যন্ত হবে। রেস্‌পেক্‌টেবল্ জমিদার ফ্যামিলি—”

“না, ধন্যবাদ। আমার আর দরকার নেই—”

একটু থামিয়া বেলা দেবী বলিলেন, “আপনারা যান তা হ'লে, আমি চললাম, আমার একটু কাজ আছে, নমস্কার।”

বেলা দেবী চলিয়া গেলেন।

তাঁহার প্রস্থানপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অচিনবাবু বলিলেন, “বেশ স-প্রতিভ মহিলাটি—”

শঙ্কর বলিল—“হ্যাঁ—”

শঙ্কর অচিনবাবুর মোটরে চড়িয়া বসিল, অচিনবাবু স্টার্ট দিলেন। কিছুদূর গিয়া অচিনবাবু বলিলেন, “হস্টেলেই ফিরবেন এখন? চলুন না একটু বেড়িয়ে আসা যাক, সন্ধে বেলা হস্টেলে পৌঁছে দেব আপনাকে।”

“চলুন।”

কয়েক মিনিট নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, “দরকারটা কি?”

“চলুন বলছি।”

শঙ্কর কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় মুক্তোর সহিত দেখা করিতেই হইবে। অচিনবাবুর পাল্লায় পড়িয়া আবার দেরি না হইয়া যায়।

গড়ের মাঠের কাছাকাছি আসিয়া অচিনবাবু গাড়ির গতিবেগ কমাইলেন এবং নির্জ্জন একটা স্থান দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন। সিগারেট কেস হইতে সিগারেট বাহির করিয়া শঙ্করকে দিলেন ও নিজে ধরাইলেন।

“চলুন একটু বসা যাক্।”

উপবেশন করিলে শঙ্কর বলিল, “ব্যাপার কি বলুন তো?”

“ভন্টু বাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে?”

“আছে।”

“মৃন্ময়বাবু বলে ভন্টুবাবুর একজন বন্ধু আছেন, জানেন আপনি?”

“জানি।”

“মৃন্ময়বাবু লোকটি ইন্‌টেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন, তিনি অকারণে আমার পেছনে লেগেছেন।”

“আপনার পেছনে? কেন, কারণটা কি!”

“কিছুই কারণ নয়, পুলিশের লোকেদের কারণের অভাব থাকে নাকি, খাড়া করলেই হ'ল একটা।”

একটু নীরব থাকিয়া শঙ্কর বলিল, "আমাকে কি করতে হবে?"

"আপনি ভন্টুবাবুকে বলে একটু ইনফ্লুয়েন্স করতে পারেন যদি বড় ভাল হয়।"

"বেশ, বলব আমি ভন্টুকে।"

তাহার পর হাসিয়া শঙ্কর বলিল, "এই ব্যাপারের জন্যে এত! আগে বললেই হত।"

অচিনবাবু সিগারেটের ছাইটা ঝাড়িয়া বলিলেন, "না, আর একটা কথাও আছে।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটু ইতস্তত করিয়া অচিনবাবু বলিলেন, "একটা গুজব শুনেছিলাম, রিণির সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে, এখন আবার গুজব শুনছি—হচ্ছে না। কোন্‌টা সত্যি বলুন তো।"

"দু-ই সত্যি, হবে ঠিক হয়েছিল, এখন ভেঙে গেছে।"

"ভেঙে গেল কেন?"

"সে অনেক কারণে।"

অচিনবাবু প্রশ্ন করিলেন, "ভেঙে গেছে—এটা ঠিক?"

"ঠিক।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "এসব কথা জিগ্যেস করবার মানে?"

"আমার একটা উপকার করবেন?"

"কি বলুন?"

"আমরা স্বজাতি, আমার একটি মেয়ে আছে, নেবেন তাকে? দেখতে সে সুশ্রী, পণও আমি যথাসাধ্য দেব, ওই আমার এক মাত্র মেয়ে, আর আমার কেউ নেই। আপনার মত ছেলের হাতে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হই!"

"আমার মতো ছেলের হাতে! আমার কতটুকু জানেন আপনি?"

"যা জানি তাই যথেষ্ট। আপনি রাজি কি না বলুন, আপনি মত দিলে আপনার বাবাকে চিঠি লিখব।"

"আমি বিয়েই করব না!"

"একেবারেই না?"

"একেবারেই না। তবে আপনার মেয়ের জন্যে অন্য পাত্র চেষ্টা করতে পারি। মেয়েটি কোথা?"

"মেয়েকে দেশে রেখেছি মশাই, এ কোলকাতা শহরের যা কাণ্ডকারখানা, তাতে মেয়েকে এখানে রাখতে ভরসা পাই না। দেশে আছে সে। দরকার হ'লে আনাতে পারি।"

"ওরই জন্যে কি শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন না কি?"

"না, ওর জন্যে নয়, আমি অত টাকা কোথায় পাব বলুন, ও আর একজনের জন্যে!"

অচিনবাবু সিগারেটে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, "আপনি বিয়েই করবেন না ঠিক করে ফেলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কারণটা জানতে পারি কি!"

শঙ্কর একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "আমাদের মতন ভালো ছেলের পক্ষে বিয়ে ক'রে গোল্লায় যাওয়া উচিত নয়। জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের আহ্বান করছে।"

অচিনবাবু একটু হাসিলেন।

বিবাহ-প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল। নানারকম মামুলি কথা-বার্তা চলিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে তাহাও বন্ধ হইল। নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল মুক্তোর কথা এবং অচিনবাবু ভাবিতে লাগিলেন বেলার সহিত তিনি আর একবার দেখা করিবেন কি-না, করিলে কি ভাবে কোথায় করিবেন। ক্রমশঃ

দু'ধারা

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতে উঠিয়া হেরি টেবিলে আমার
রয়েছে খামেতে ভরা দুই খানি "তার"।
প্রথম খুলিয়া হেরি, মোর ছোট মেয়ে
টুকটুকে খোকা এক নিজ কোলে পেয়ে
চেয়েছে আশীষ। এই আনন্দ খবরে
কপোল ভাসিল মোর নয়নের লোরে।

খুলিয়া দ্বিতীয় তার হেরিলাম আমি
বড় মেয়ে রমা মোর হারাইয়া স্বামী
লিখেছে, কেমন ক'রে থাকিবে সে একা
আর কবে মোর সাথে হবে তার দেখা?
আনমনে বসে থাকি "তার" দুটি হাতে
আনন্দাশ্রু মেশে মোর শোকাশ্রুর সাথে!

অগ্নিমন্ত্র

গান

অগ্নিময়ী ! অগ্নি জ্বালো কায়ায় তুলি' সাড়া ।
রক্তে আমার বহাও তব বহ্নিরসধারা ।
তারার ম'ত ঊর্দ্ধ শিখা
ধরি' উঠুক সব ধূলিকা
মুক্ত করো ভাঙি' আমার মৃত্তিকার এই কারা ।
(নাশি' কালো আজি ঢালো তব আলোধারা)
আঁখি তোমার যেমন জাগে
জাগাও তেমন অনুরাগে
শরণবেদীর তলে জ্বলুক জীবন আত্মহারা ।
বোসো কমলমর্ম্মসাথী,
কমলে মোর আসন পাতি'
আপন মাঝে লুপ্ত করো আপন মম যারা ।
(নাশি' কালো আজি ঢালো তব আলোধারা)

কথা ঃ—সাহানা দেবী

সুর ও স্বরলিপি ঃ—দিলীপকুমার

আড়কাওয়ালি

• ১ + ৩
। সা। ন্। ঋসা । ণ্। ধ্। ধা। ণ্। । । সা গা মা। । পমা। গমা। জ্ঞজ্ঞা। সা !
- অ গ্ নি ম - য়ী - - অ গ্ নি জ্বা - - লো

০ ১ + ৩ ‖
সা মজ্ঞা মা দা। । পণা। দদা। জ্ঞা মা। । জ্ঞা দা পা ঋা । র্সা। -া -া -া ।
কা - য়া - - -য় তু লি সা - - - ড়া - - •

। র্সা -া র্সা । নর্সা ঋ্ঁা র্সা -া । নর্সা ঋর্সা ণদা পমা । জ্ঞা পর্মা দা ণা ।
- র ক তে আ - মা র ব - হ্না - - ও ত ব

জ্ঞা জ্ঞ্ঁা -া জ্ঞ্ঁা । র্সা -া ণা -া । র্সণা দপা মজ্ঞা রজ্ঞা । সা -া -া -া II
ব ন্ - হি র - স - ধা - - - রা - - -

র্সা -া র্সা ঋর্সা । ণা র্সা দা ণা । র্সা দা ণা র্সা । দা ণা র্সা -া ।
তা - রা - - র ম ত উ - র্ ধ শি - খা -
বো - সো - - - ক মল ম - র্ ম সা - থী -

। জ্ঞ্ঁা -া জ্ঞ্ঁা । জ্ঞ্ঁা -া জ্ঞর্মা জ্ঞজ্ঞ্ঁা । র্সা ণা -া র্সা । দা ণা মা -া ।
- ধ - রি উ - ঠে - ক ন ব বৃ লি - কা -
- ক - ম লে - মো - র আ - সন পা - তি -

। জ্ঞ্ঁা -া জ্ঞ্ঁা । র্জ্ঞ্ঁা র্মা র্মা -া । -া মা -া মা । জ্ঞমা পা সা -া ।
- ম ক্ ত ক - রো - - ভা - ঙি আ - মা র
- আ প ন মা - ঝে - - লু প্ ত ক - রো -

। সা -া জ্ঞা । রজ্ঞা মা জ্ঞমা পা । মপা দা পদা ণা । দণা র্সা -া -া ।
- মৃ - ত্তি কা র এ কৈ কা - - - রা - - -
- আ - পন ম - ম - ধা - - - রা - - -

। র্সা -া ঋ্ঁা । র্সঋ্ঁা র্সণা দা -া । । ণা -া র্সা । ণর্সা ণদা মা -া ।
- না - শি কা - লো - - আ - জি ঢা - লো -
- না - শি কা - লো - - আ - জি ঢা - লো -

। জ্ঞা -া মা । জ্ঞমা জ্ঞজ্ঞা সা -া । ন্সা রজ্ঞা মপা দণা । র্সনা র্সা -া -া II
- ত - ব আ - লো - ধা - - - রা - - -
- ত - ব আ - লো - ধা - - - রা - - -

০ ১ ২ ৩ ০
। সা -া গা । গা মা গরা গা । । মা পা দা । পমা পা মগা মা । । মা ধা -া ।
- আঁ - খি তো - মা র - যে ম ন জা - গে - - জা গা ও

১ ২ ৩ ০ ১
ধা ণা র্সা ঋর্সা । । ণধা ণা র্সা । ণদা ণদা পা -া । । মা জ্ঞ্ঁা -া । র্জ্ঞ্ঁা র্র্সা ণা -া ।
তে - ম ন - অ - ন্ত রা - গে - - শ র ণ বে - দী -

২ ৩ ০ ১ ২
-া র্পা র্রা -া । র্সর্রা র্সণা দা -া । । ণা র্সা -া । ণর্সা ণদা মা -া । জ্ঞমা পদা ণর্সা জ্ঞঋ্ঁা ।
র ত লে - জ্ব - লু ক - জী ব ন আ - ত্ম - হা - - -

৩
র্সা -া -া -া ।
রা - - -

রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা

(আলোচনা শেষাংশ)

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

আদিশূরের তারিখ

দ্বিতীয় প্রবন্ধে ডঃ মজুমদার মহাশয় আদিশূরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে প্রধানতঃ চতুর্বিধ প্রমাণ আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে লিখিত হইল।

(১) আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে সাত জন রাজার (পৃ ৮৩৮-৩৯) নাম পাইয়া গড়পড়তা ধরিয়া "শকাব্দের দশম শতকের প্রথমে" (পৃ ৮৪১) আদিশূরের রাজত্বকালের অনুমান করা হইয়াছে। রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় কতিপয় কুলীনের বংশাবলী ও কুলক্রিয়ার বিবরণ, রাজা ও রাজবংশের বিবরণ ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে এবং কোন প্রামাণিক গ্রন্থে শূররাজগণের নামমালা নাই। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' প্রণেতার প্রমাপক কুলাচার্য্য গ্রন্থ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। লক্ষ্য করিবার বিষয়, শেষ শূররাজ অনুশূরের পর ডঃ মজুমদার মহাশয়ের স্বলিখিত উক্তি (পৃ ৮৩৮) অনুসারেই বল্লালসেন (১১৬০ খৃঃ) নহে, তাহার পিতা বিজয়সেনই (১০৯৮ খৃঃ) রাজা হন, অথচ কালগণনাকালে বল্লালসেনকেই ধরা হইয়াছে। বিজয়সেনকে ধরিয়া তাঁহার নিজ গণনানুসারেই আদিশূরের সময় হয় "শকাব্দের" নহে, পরন্তু খৃষ্টাব্দের ১০ম শতকের প্রথমে। বসু মহাশয় যে গ্রন্থ হইতে "সপ্তশূরে"র নামমালা উদ্ধৃত করিয়াছেন (রাজন্যকাণ্ড, পৃ ১০০) সেই গ্রন্থেই "শ্রীজয়ন্তসুতেন চ" পাঠ আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

(২) ব্রাহ্মণানয়নের তারিখ সম্বন্ধে ১৪টি বিভিন্ন মত কুলগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে (পৃ ৮৪০-৪১)। ১২টির সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার মহাশয় নিজেই লিখিয়াছেন, 'কোনটিই কোন প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থে আছে এরূপ প্রমাণ নাই।' "লঘুভারত"-কারের দোহাই দেওয়া এক শ্রেণীর গবেষকের প্রিয় কার্য্য, ডঃ মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার মত পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার প্রামাণ্যপরীক্ষা এ যাবৎ কেহ করিয়াছেন কি-না জানি না। যাঁহারাই ধৈর্য্যসহকারে এই গ্রন্থ পড়িবেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে, ইহার পনর আনা জনশ্রুতি ও কল্পনামূলক এবং ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য, অনেক অধুনা-বিলুপ্ত প্রাচীন জনশ্রুতি ইহাতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের কোন উক্তিই বিনা বিচারে ও পরিপোষক প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা দুষ্কর। বিপ্রকল্পলতার মতই বা কেন পৃথক্ লিখিত হইল জানি না। অপ্রামাণিক ও অর্ব্বাচীন গ্রন্থোক্ত এই চতুর্দ্দশ মতপরম্পরার আলোচনা পণ্ডশ্রম ; কালনির্দ্দেশ ভারতীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র ও ধ্রুবানন্দ এ বিষয়ে প্রকৃতিসিদ্ধ নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছেন। তারিখগুলি শকাব্দের সপ্তম, নবম ও দশম শতকের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের অন্যতমের প্রামাণ্য আলোচনার পূর্ব্বে দুইটি বিষয়ে আরও গবেষণা আবশ্যক। যাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বাচস্পতি মিশ্র (৭ নং)। ইঁহার গ্রন্থে বস্তুতই "বেদবাণাঙ্গ" পাঠ আছে কি-না পুঁথি মিলাইয়া নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন কুলশাস্ত্রকার হরিমিশ্রের যে শ্লোকে "দেবপালে"র নাম পাওয়া যায় (রাজন্যকাণ্ড, পৃ ১২৩ পাদটীকা) তাহার সত্যতা নির্ণয় আবশ্যক।

(৩) ডঃ মজুমদার মহাশয় শেষ প্রবন্ধে (পৃ ৩৬৭) তাম্রশাসনাদির অকাট্য প্রমাণবলে খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে কতিপয় শূরবংশীয় রাজার সঙ্গে সঙ্গে আদিশূরেরও অস্তিত্ব অধিকতর সমীচীন বলিয়া ধরিয়াছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহা আপাততঃ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, যদি কুলশাস্ত্র দ্বারা ইহা সমর্থিত হয়। কিন্তু উল্লিখিত সপ্তশূর কাহিনী, হরিমিশ্রের দেবপালঘটিত শ্লোক, বাচস্পতি মিশ্রের "বেদবাণাঙ্গ" পাঠ এবং সর্ব্বোপরি কুলগ্রন্থের বংশাবলীর নির্দ্দেশ আদৌ ইহা সমর্থন করে না। একাদশ শতাব্দীর রণশূরাদির সহিত আদিশূরের সংযোগ কেবলমাত্র শূর উপাধি দৃষ্টে অনুমিত হইয়াছে, কিন্তু এই সংযোগের নৈকট্য ও অবিচ্ছিন্নতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গের চন্দ্র-বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বেও যেমন বিচ্ছিন্ন গোপচন্দ্র কিম্বা দেববর্ম্মার আবির্ভাব হইয়াছিল আদিশূরেরও সেইরূপ হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। একটি কুলগ্রন্থে যেমন "বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং" পালরাজগণের পরাজয় সূচিত করিয়াছে (পৃ ৮৩৯), তেমনি "লাহেড়ী কুলপঞ্জী" অনুসারে (সম্বন্ধনির্ণয়, ক্রোড়পত্র, পৃ ৪৩) রাজা ধর্ম্মপাল আদিশূরানীত ক্ষিতীশের পৌত্রকে ভূমিদান করিয়া সমগ্র পালবংশকে আদিশূরের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রতিপন্ন করিয়াছে।

(৪) বল্লালী কুলীনদের বংশাবলীর পর্য্যায়গণনা দ্বারা আদিশূরের সময় নির্দ্ধারণের "ঐতিহাসিক কোন মূল্য নাই"—ইহাই ডঃ মজুমদার মহাশয়ের সিদ্ধান্ত (পৃ ৮৪২-৩)। প্রাগ্‌বল্লালযুগের বংশাবলী সম্বন্ধে কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য প্রদর্শন করিয়া তিনি স্বমত পরিপোষণের জন্য বসু মহাশয়ের একটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার এই আলোচনায় কিঞ্চিৎ সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন আবশ্যক। বল্লাল মাত্র উনিশ জনের কৌলীন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, রাঢ়ীয় প্রামাণিক

কুলশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এই উনিশ জনের বংশমালা ও কুলক্রিয়া বিবৃত করা। তন্মধ্যে সতর জনের উর্দ্ধতন বংশাবলী বসু মহাশয় মুদ্রিত করিয়াছেন (পৃ ১৩৮-৪১) :—

শাণ্ডিল্য বন্দ্য বংশের ৬ জন—২ জন প্রথম সমীকরণে ও ৪ জন দ্বিতীয় সমীকরণে উল্লিখিত হইয়াছে (মহাবংশ, পৃ ১-৩)। একজন ঈশান ক্ষিতীশ হইতে ১২শ পুরুষ, অবশিষ্ট ৫ জন ১১শ পুরুষ। এস্থলে বসু ও বিদ্যানিধির মধ্যে (সম্বন্ধনির্ণয়, বংশাবলী প্রকরণ, পৃ ২-৪) পর্য্যায় গণনায় একটুও পার্থক্য নাই। অথচ স্থানে স্থানে সামান্য রকমের পাঠভেদ ও বিবৃতি হইতে পাওয়া যায়, বিদ্যানিধি মহাশয় গদ্যে লিখিত পৃথক্ গ্রন্থ হইতে বংশাবলী মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

কাশ্যপ (চট্ট) বংশের ৪ জন—১ জন ১ম সমীকরণের ও ৩ জন ২য় সমীকরণের, কিন্তু ধ্রুবানন্দ-মতে ২য় সমীকরণে আর একটি বেশী নাম পাওয়া যায় (হল)। বসু ও বিদ্যানিধির পর্য্যায় সংখ্যা ও বংশধারায় অনুপেক্ষণীয় প্রভেদ বর্ত্তমান (সম্বন্ধনির্ণয়, বংশাবলী, পৃ ২২৫-৬)। সৌভাগ্যক্রমে ধ্রুবানন্দের কারিকাংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় বসু লিখিত বংশাবলীর প্রামাণ্য কতক পরিমাণে সমর্থিত হইয়াছে—যদিও তিন জনের মতেই বহুরূপ বীতরাগ হইতে নবম পুরুষ অধস্তন বটে। বসু মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, "কাশ্যপ গোত্রের বংশাবলী অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত।"

বাৎস্য গোত্রে ৪ জন—গোবর্দ্ধন পুতিতুণ্ড ধ্রুবানন্দ-মতে সুধানিধি হইতে ১১শ, বসু মতে ১২শ, বিদ্যানিধি-মতে প্রথমতঃ ১০ম (বংশাবলী পৃ ২৬৯), সংশোধনক্রমে পরে ১২শ (ক্রোড়পত্র পৃ ৬৪-৫)। কাঞ্জি কানু-কুতুহল বসু-মতে ১২শ, বিদ্যানিধি-মতে পূর্ব্বে ১০ম ছিল (বংশাবলী পৃ ২৭১-২), পরে সংশোধন করিয়া ১২শ হইয়াছে (ক্রোড়পত্র পৃ ৬৭-৬৮)। লক্ষ্য করিবার বিষয় সংশোধনকালে বিদ্যানিধি বসুধৃত শ্লোক হইতে পৃথক্ কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সামান্য মতভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্থ শিরো ঘোষাল বিষয়ে উভয়ের পর্য্যায় গণনায় গুরুতর মতভেদ ছিল (৫-১২), কিন্তু ডঃ মজুমদার মহাশয় বোধ হয় পরিজ্ঞাত নহেন যে এখানেও বিদ্যানিধি ক্রোড়পত্রে (পৃ ৬৫) তাহা বসুর মতেই সংশোধন করিয়াছেন। গদ্যে লিখিত কুলপঞ্জিকার অবিশ্বাস্যত্বের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ডঃ মজুমদার মহাশয় বসু মহাশয়ের দীর্ঘ মন্তব্যের শেষ বাক্যটি পরিত্যাগ করিয়াছেন—"শ্লোকে লিখিত হরিমিশ্রের কারিকা ও কুলরাম হইতে··· অবিকল উদ্ধৃত" (বসু, পৃ ১৩৮) বংশাবলীর প্রামাণ্য পরিগ্রহের বিরুদ্ধে ডঃ মজুমদার মহাশয় যুক্তি প্রয়োগে বিমুখ হইলেন কেন জানি না। অনাবশ্যক বোধে এবং পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় বাকী ? গোত্রের আলোচনা পরিত্যক্ত হইল। নানাবিধ অসঙ্গতি ও মতভেদ সত্ত্বেও বিবিধ পুরাণের বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ হইতে শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে ঐতিহাসিকগণ যদি রাজাবলীর নামমালা ও পর্য্যায় গ্রহণযোগ্য করিয়া উদ্ধার করিতে পারেন, তবে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিভিন্ন একনিষ্ঠ ঘটক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রযত্নরক্ষিত কুলীন বংশাবলীর অপেক্ষাকৃত অল্প অসঙ্গতি ও মতভেদ থাকিলেও কেন কোন "ঐতিহাসিক মূল্য" থাকিবে না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ ডঃ মজুমদার মহাশয়ের আলোচনায় পাওয়া যায় না। প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থোক্ত কুলীন বংশাবলীর সহিত অর্ব্বাচীন গ্রন্থোক্ত প্রসঙ্গাগত শূর বংশাবলীর সামঞ্জস্য না হইলে শূর বংশাবলীই সর্ব্বথা অবিশ্বাস্য প্রতিপন্ন হইবে। বর্গির হাঙ্গামা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয় নাই এবং কুলতত্ত্বার্ণবোক্ত যবন কর্ত্তৃক কুলগ্রন্থ বিলোপের কথা অলীক।

আদিশূর ও বল্লালসেনের মধ্যে উক্ত বংশাবলীর নির্দ্দেশ মতে ৯ হইতে ১২ পুরুষের ব্যবধান। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি, বংশপর্য্যায়ের গড়পড়তা দ্বারা কালনির্ণয় এতই স্থূলরূপে সাধিত হয় যে, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকে না। কিন্তু এই গড়পড়তারও উভয়দিকে পরমসীমা আছে। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মতারিখ ১৭১০ খৃঃ (আষাঢ়ী পূর্ণিমা তাঁহার জন্মতিথি ছিল)। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রের জন্মতারিখ ঠিক শকাব্দা ১৬৪৯।০।৮,৬ অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল ১৭২৭ খৃঃ। ইহাকে একদিকে পরম সীমা ধরিলে ৫½ কিম্বা ৬ পুরুষে এক শতাব্দী হয়। এই হিসাবেও আদিশূরকে খৃঃ ১১শ শতাব্দীতে টানিয়া আনা যায় না। পক্ষান্তরে বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কার নামক আমাদের গবেষণার গোচরীভূত একজন প্রাচীন পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে বয়স ছিল অন্যূন ৭৫ বৎসর ; হিসাব করিলে ১⅓ পুরুষেরও কমে এক শতাব্দী হইল ! বস্তুতঃ এই গড়পড়তা উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত পরিবারে ২।২½ পুরুষে শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারাদিতে ৪,৪½ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইতে দেখা যায়। এতদনুসারে আদিশূরের কাল ৭০০—৯০০ খৃঃ অতিস্থূলরূপে নির্ণীত হয়।

ডঃ মজুমদার মহাশয়ের সবগুলি প্রবন্ধের সম্যক্ আলোচনা প্রবন্ধাকারে অসম্ভব। আমরা কেবল তাঁহার শেষ প্রবন্ধোক্ত শেষ তিনটি সিদ্ধান্ত এবং কুলশাস্ত্রের বিরোধী প্রমাণগুলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

পঞ্চব্রাহ্মণের নাম ও বংশাবলী

বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ পঞ্চকের নামকরণ সম্বন্ধেও মতভেদ লক্ষিত হয়" (পৃ ১০৫)। এই মতভেদ অতি সামান্য—প্রামাণিক মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পিতৃপর্য্যায়, বাচস্পতি মিশ্রাদি মতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পুত্রপর্য্যায়। ক্ষিতীশাদির সহিত ভট্টনারায়ণাদির যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ তাহাতে কোনই মতভেদ দৃষ্ট হয় না। বসুধৃত (পৃ ১০৬-৭) এবং বিদ্যানিধিধৃত (৩য় সং, পৃ ৫২৯-৩৩) হরিমিশ্রাদির কারিকানুসারে বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর উক্তির সহিতও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ডঃ মজুমদার মহাশয় নিজেও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ ৮৪৫), তৎসত্ত্বেও তাঁহার মতে এ বিষয়ে মতভেদটা দ্বিতীয় প্রবন্ধে "যথেষ্ট" (পৃঃ ৮৪৪), এ বিষয়ে কুলশাস্ত্রের উক্তি শেষ প্রবন্ধে "অবিশ্বাস্য" (পৃঃ ৩৬৮) এবং সর্ব্বশেষে "বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য" (পৃ ৩৭১) হইয়া দাঁড়াইল—এই অপূর্ব্ব বিশেষণ প্রয়োগের পরিপাটি বিদ্বেষমূলক নহে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন, বিজ্ঞানমূলক কি-না পাঠকগণ বিচার করিবেন।

ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বরপ্রশস্তি কুলগ্রন্থের বিরোধী বলিয়া অনেকেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আদিশূর খৃঃ ১১শ শতাব্দীর লোক হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী। ডঃ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—(ফাল্গুন, পৃ ৩৬৯) “আর যদি তর্কস্থলে ধরা যায় যে, আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন—তাহা হইলে কুলগ্রন্থের বংশাবলীর মধ্যে আমরা ভট্টভবদেবের পূর্ব্ব পুরুষের নামের উল্লেখ আশা করিতে পারি।” কুলগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে ডঃ মজুমদার মহাশয়ের ভ্রান্ত ধারণা আছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে। প্রাগ্‌বল্লালযুগের পৃথক্ কোন কুলগ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী এবং মহেশকৃত নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকা (ইহার সহিত লক্ষ্মণসেন পূজিত মহেশ্বরের অভেদ কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত) সাধারণতঃ এই দুইটি গ্রন্থে বংশাবলী ধারাবাহিক নিবদ্ধ আছে ; কিন্তু কেবলমাত্র বল্লালপূজিত ১৯ জন কুলীনের বংশধারা ইহাদের অভিধেয়, তন্মধ্যেও যাহাদের কুলধ্বংস হইয়াছে তাহাদের অধস্তন বংশধারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ৫৬ গাঞির অন্য কোন বংশেরই নামমালা কুলগ্রন্থে নাই। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে ‘বন্দ্যঘটীয়’ ৬ জন কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই ৬ জন ভিন্ন সমস্ত বন্দ্যঘটীয় ব্যক্তির বংশাবলীই কুলগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বহির্ভূত—অন্য গাঞির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে একটিও অকুলীন বংশ লিপিবদ্ধ হয় নাই। গ্রন্থাতিরিক্ত বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা বা পাতড়ায় অকুলীন বংশের বিবরণ পাওয়া যায়। এইরূপ বহু পাতড়া সম্বন্ধনির্ণয়কার মুদ্রিত করিয়া কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ঘটকগণ প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও বংশজ পরিবারের নামমালা এইরূপ পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন। বিক্রমপুরের এক ঘটক-গ্রন্থে মূলপাড়ার চাটাতি, মুড়াপাড়ার বন্দ্য এবং রাজনগরের পূতিবংশের বিবরণ আমরা দেখিয়াছি। এই সকল বিচ্ছিন্ন পত্রিকার প্রামাণ্য বিচার-সাপেক্ষ। ডঃ মজুমদার মহাশয় দেখিতেছি পরিজ্ঞাত নহেন যে, ভট্টভবদেবের পূর্ব্বপুরুষেরও নামমালার কারিকা সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্রে মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ ৬৫-৬৭)—বেদগর্ভ-পুত্র বশিষ্ঠ সিদ্ধলগ্রামী, বশিষ্ঠের তৃতীয় পুত্র শ্রীপতি, তৎপুত্র কৃষ্ণ, তৎকনিষ্ঠ পুত্র বামন, তৎপুত্র ভুবন, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র আদিভবদেব প্রভৃতি। অর্থাৎ সৌভরি হইতে ভট্টভবদেব ১৫ পুরুষ অধস্তন। এই তালিকা কতদূর প্রামাণিক নির্ণয় করার উপায় নাই। ইহা বিদ্যানিধি মহাশয়ের ফরমাইস মত রচনা বলিয়াও মনে হয় না ; তিনি বংশপর্য্যায় সংখ্যা পরিজ্ঞাত ছিলেন। জীমূতবাহনের বংশাবলীও বিদ্যানিধি মহাশয় মুদ্রিত করিয়াছেন—তাহা এড়ুমিশ্রের কারিকা বলিয়া লিখিত হইয়াছে (ক্রোড়পত্র, পৃ ৯২-৩), যদিও বসু মহাশয় সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন (রাজন্যকাণ্ডের ভূমিকা, পৃ ৩)। এতদনুসারে জীমূতবাহন ক্ষিতীশ হইতে ১০ পুরুষ অধস্তন। এই উভয় বংশই শ্রোত্রিয়, সুতরাং কুলগ্রন্থের ধারাবাহিক কুলীন বংশমালার অন্তর্ভূত হইতে পারে না। ভট্টভবদেবের পক্ষে বেদগর্ভ অথবা সৌভরির নাম উল্লেখ না করা একেবারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রথমতঃ, তর্পণকালে ৭ পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডের নাম গ্রহণ করাই শাস্ত্র ও শিষ্টাচারসিদ্ধ এবং তজ্জন্যই অন্যতম স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব এবং (পরিশিষ্ট-প্রকাশকার) নারায়ণ উভয়েই ৭ পুরুষের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সিদ্ধলগ্রামী বলাতেই প্রকৃষ্ট কুলপরিচয় এবং আদিপুরুষের নাম এক সঙ্গে কীর্ত্তিত হইল ধরা যায়—যেমন, পরবর্ত্তীকালে একাধিক গ্রন্থকার ‘নপাড়ীয়’ ‘গয়ঘরীয়’ প্রভৃতি দ্বারা কুলনির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভবদেব প্রশস্তির সহিত কুলশাস্ত্রের এই বিরোধ আশঙ্কা বহুপূর্ব্বেই উভয়পক্ষে আলোচিত হইয়াছিল (ঢাকার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ৯৩-৯৭)। ভবদেব প্রশস্তি ও ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন উভয়ই সিদ্ধলগ্রামকে রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্রের অন্যতম কুলস্থানরূপে উল্লেখ করিয়া কুলগ্রন্থের পোষকতাই করিয়াছে এবং তাম্রশাসনে “মধ্যদেশ-বিনির্গত” বিশেষণ দ্বারাও কান্যকুব্জ প্রবাদ সমর্থিত হইয়াছে, অথচ ঐতিহাসিকের লিপি কৌশলে ভবদেবপ্রশস্তি কুলগ্রন্থের বিরোধী প্রতিপন্ন হইতেছে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

বাদালস্তম্ভলিপি দ্বারাও কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ব্যাহত হয় না। প্রাচীন কুলগ্রন্থ-মতে আদিশূরের পূর্ব্বে “মাত্র” সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে বাস করিতেন এবং ঐ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে “মাত্র” আটটি গোত্র ছিল (পৃ ৩৭০)—এই উক্তি অমূলক। বসু মহাশয় ‘সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য’ (পৃ ৮৩) সাতশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাঁহার মতে কোনটাই প্রকৃত নহে। তন্মধ্যে “প্রেমনারায়ণ সভাস্থ ধ্রুবানন্দ” একজন অর্ব্বাচীন লোক—প্রসিদ্ধ ধ্রুবানন্দমিশ্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এড়ুমিশ্রের বল্লালসৃষ্ট সপ্তশত ব্রাহ্মণের সহিত আদিশূরের পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণের কোনই সম্পর্ক নাই। বাচস্পতিমিশ্র-মতে “সপ্তশতপ্রমাণাঃ দ্বিজাতয়ঃ” (পৃ ৮৮) বৃষাধিরূঢ় হইয়া বীরসিংহপুরে গিয়াছিলেন কিন্তু বঙ্গদেশে এতদ্ভিন্ন আর একজন ব্রাহ্মণও ছিল না এইরূপ অসম্ভব উক্তি বাচস্পতিমিশ্রে নাই—বসু-বিদ্যানিধি যাহাই অনুমানে বলুন না কেন। গোত্র সম্বন্ধে বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—“বোধ হয়, পূর্ব্বে উক্ত শুনকাদি আটটি গোত্রই ছিল” (পৃ ৯২)। কুলশাস্ত্রাদিগ্রন্থের বিশিষ্টতাই এই যে, প্রতিপাদ্য বহির্ভূত বিষয়ে ইহারা নীরবতা অবলম্বন করিয়া থাকে। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থগুলি পড়িলে মনে হইবে, বঙ্গদেশে তৎকালে অবৈষ্ণব প্রায় কেহ ছিল না। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের উৎকট আভিজাত্য ও তদ্রূপ ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ বিবরণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে, ডঃ মজুমদার মহাশয়ের আর একটি ভ্রম প্রদর্শিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন (পৌষ, ১২৮ পৃ) “দানসাগরে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, বল্লালসেনের গুরু বারেন্দ্রবাসী অনিরুদ্ধ ভট্টও সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন।” দানসাগরের উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি—

“নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলধী-বিলাসনয়নঃ সারস্বতব্রহ্মণি”

মুরারির “সারং তু সারস্বতং”-এর ন্যায় অনিরুদ্ধের কাব্যশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সূচিত করে—সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গন্ধ এখানে একটুও বর্ত্তমান নাই। রামচরিতের ন্যায় দুরূহ শ্লেষকাব্যের সংস্করণে এবং টীকাপ্রণয়নে যাঁহার

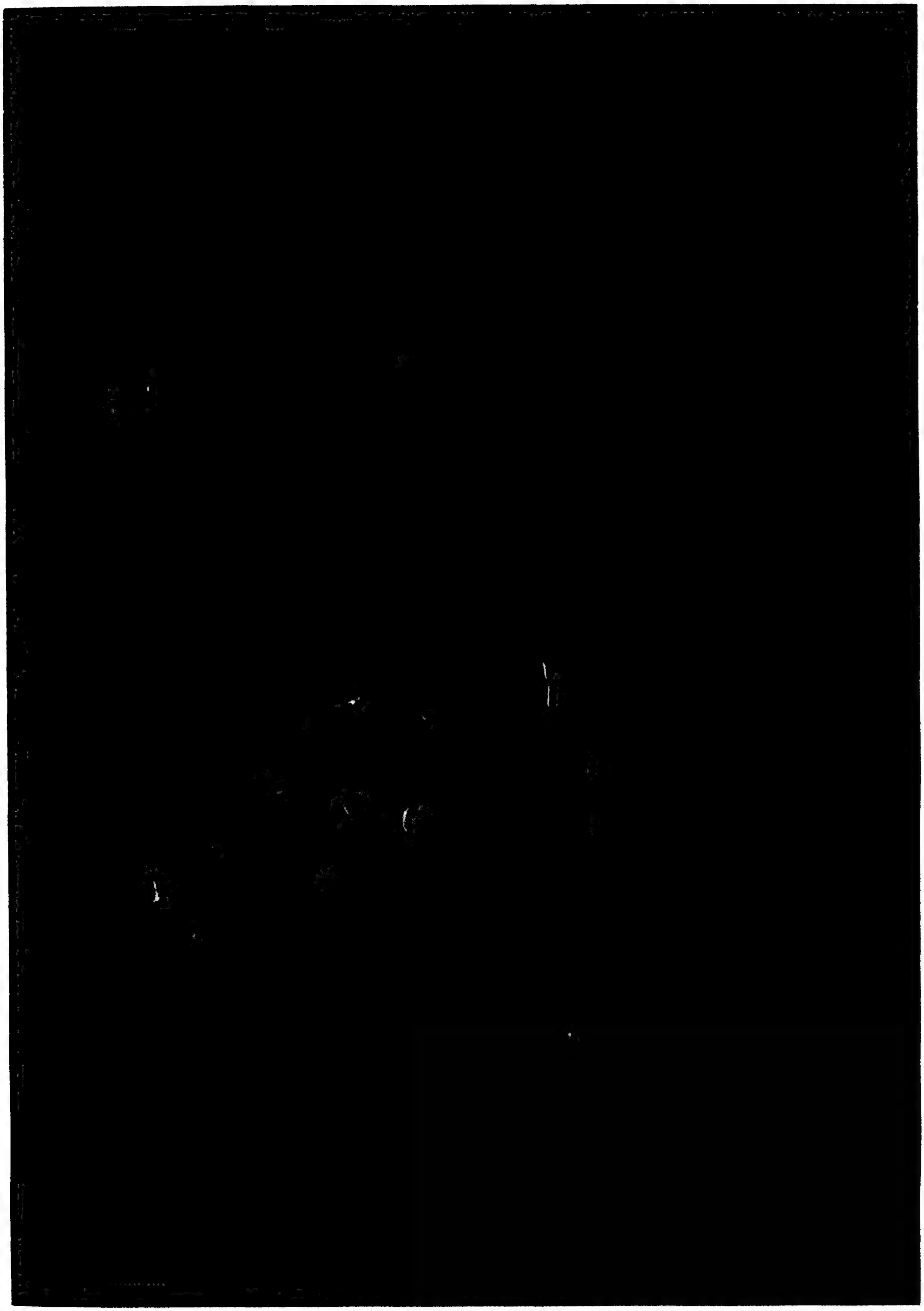

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী [illegible] ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

লেখনী সম্ভঃ গৌরবান্বিত তাঁহাকে এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। অনিরুদ্ধের "হারলতা"গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, গ্রন্থের পুষ্পিকায় "চাম্পাহট্টিয়" বলিয়া নির্দ্দেশ থাকায় তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন নিঃসন্দেহ—এখনও "চম্পটি" গাঞি প্রচলিত আছে।

ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশের রচয়িতা নারায়ণ সম্বন্ধে বসু মহাশয়ের যে অভিমত দ্বারা "বঙ্গীয়কুলগ্রন্থের প্রধান ভিত্তি ধ্বংস হইয়াছে" (পৃ ৩৭০) তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এ বিষয়ে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। নারায়ণের উক্ত গ্রন্থ অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে। (কর্ম্মপ্রদীপ, Bibl-Indica Ed.) স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় (J. A. S. B., 1915, p. 367) এই নারায়ণ উপাধ্যায়কে গোভিল ভাষ্যকার নারায়ণ ভট্টের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। ভট্টভাষ্যের মত নারায়ণ উপাধ্যায় বহুস্থলে (কর্ম্মপ্রদীপ, পৃ ৭১, ১৩৬, ১৭৬, ১৭৮) উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং একস্থলে "ইতি গোভিলভাষ্যকারাভ্যাং ভট্টনারায়ণ বল্লসোমাভ্যামুক্তং" (Fasc. II, p. 8) বলিয়া সকল সন্দেহের নিরসন করিয়াছেন। নারায়ণ উপাধ্যায় কল্পতরুকার ও হারলতাকারের পরবর্ত্তী এবং শূলপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃঃ ত্রয়োদশ শতকের পূর্ব্বে নহে এবং চতুর্দ্দশ শতকের পরে নহে। তাঁহার পিতামহের পৃষ্ঠপোষক "রাজা জয়পাল" পালবংশীয় ত নহেনেই, শিলিমপুর প্রস্তরশাসনের জয়পালের সহিত ও অভিন্ন কি-না সন্দেহ। আদিশূরকে ১১শ শতাব্দীর লোক ধরিলেও নারায়ণের উর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ "কাঞ্জিবিল্বীয়" পরিতোষ তাঁহার পূর্ব্বে যান না। "কাঞ্জিবিল্বীয়" কাঞ্জারির সহিত অভিন্ন নহে এবং সপ্তশতীও নহে (রাজন্যকাণ্ড, পৃ ১০৯-১০), সমস্তই বসু মহাশয়ের প্রমাদবিজৃম্ভন। কাঞ্জি কিম্বা কাঞ্জিলাল বংশেরই প্রাচীন নাম কাঞ্জিবিল্বীয় এবং ধ্রুবানন্দের মহাবংশে বহুস্থলে (পৃ ২৮, ৩৩ প্রভৃতি) শেষোক্ত নামও পরিগৃহীত হইয়াছে। কাঞ্জিবংশের দুইজন মাত্র কানুকুতূহল কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অন্য কোন কাঞ্জিকুলোদ্ভবের বংশাবলী কুলগ্রন্থের অপ্রতিপাদ্যবিধায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না —নারায়ণ প্রভৃতির বংশাবলীও এই সহজ কারণেই কুলগ্রন্থে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে কুলগ্রন্থের প্রধান ভিত্তির ধ্বংস হয় না এবং কোন অসামঞ্জস্যও ঘটে না।

কুলগ্রন্থের প্রামাণ্যপরিপোষক দশরথদেবের তাম্রশাসনের যতটা পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহার ৯টি বিভিন্ন গাঞির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—সমস্তগুলিই কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, ৮টি রাঢ়ীয় একটি (করঞ্জ গ্রাম) বারেন্দ্র। এতদ্ভিন্ন সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবিগণের মধ্যেও কতিপয় গাঞির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"করঞ্জ" ৩জন (সদুক্তিকর্ণামৃতঃ, Introd., p. 43) কেশরকোনীয় (p, 47) তৈলপাটীয় (p. 58), ভট্টশালীয় (p. 81) শকটীয় (p. 122) এক একজন। এই সকল গাঞি রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের অন্তর্ভূ‌ত। অপর কতিপয় গাঞি—গোতিথীয় (p. 50), তালহড়ীয় (p. 57) রত্নমালীয় (p. 71) এবং ভবগ্রামীন (p. 82)—কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভূ‌ত নির্ণয় করা কঠিন। এগুলিও সম্ভবতঃ বারেন্দ্রশ্রেণীর অন্তর্গত।

ক্ষিতীশাদি পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত গ্রামের নাম সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই এবং ব্রাহ্মণানয়নের কারণ যে 'যজ্ঞানুষ্ঠান' ইহাতেও মতভেদ নাই বলিলেই চলে। যজ্ঞের অবান্তর প্রকার সম্বন্ধেই মতভেদ বিদ্যমান তাহাতেই কি কুলগ্রন্থোক্ত কারণ বিবরণ অবিশ্বাস্য হইয়া গেল? বহু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয়েও এরূপ অল্পবিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর প্রামাণিক গ্রন্থে আদিশূরের সময়ের অনুল্লেখ কিম্বা অর্ব্বাচীন গ্রন্থে তাহার ভ্রান্ত উল্লেখ যদি কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিনষ্ট করিয়া থাকে, তবে ভারতীয় সাহিত্যের প্রায় কোন গ্রন্থেরই ঐতিহাসিকতা বিচারে হস্তক্ষেপ করা অবিধেয়। সঠিক তারিখ দেওয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল এবং ডঃ মজুমদার মহাশয়ও এক স্থলে লিখিয়াছেন সাধারণতঃ কুলগ্রন্থে এইরূপ ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসৃত হয় না (পৌষ, পৃ ১২৭)।

পঞ্চম সিদ্ধান্তে (পৃ ৩৭১) এবং অন্যত্র ইহার আলোচনায় (৩৬৮ পৃ) ডঃ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—"পাঁচজন ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততিতে সারা বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিল, বাতুল ভিন্ন এ কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।" কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা বিচারে এই উক্তির প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট নহে। খৃঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা রাঢ়ীয় সমাজে নিকষ কুলীন কিম্বা অবিসম্বাদিতরূপে কুলীনের বংশধর বলিয়া পরিচিত সেই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের সকলেই—তন্মধ্যে একজনও বাদ পড়িবে না—বল্লালপূজিত ১৭জন কুলীনের বংশধর সন্দেহ নাই। ইহাদের বংশাবলী নিবদ্ধ করাই কুলগ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য। রাঢ়ীয় শ্রেণীর আভিজাত্য ও প্রতিষ্ঠায় প্রলুব্ধ হইয়া যুগে যুগে যে সকল ভিন্নজাতীয় ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় সমাজের অন্তর্ভূ‌ত হইয়াছে তাহা সমস্তই শ্রোত্রিয় ও বংশজের মধ্যে, একটিও কুলীনের মধ্যে নহে এবং ঘটকগণ কুলক্রিয়া ও মেলপরিচয়ের প্রসঙ্গে এই সকল অভিনব রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে 'সন্দিগ্ধ', 'আধুনিক' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অকপটে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। রাঢ়ীয় কুলতত্ত্বগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে (পৃ ২৩৭) এখনও 'সাগাঞি" নামক শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এক সমাজের সাতশতী ব্রাহ্মণগণ 'বাড়ুয্যে' হইয়া যাইতেছেন এবং বংশজকুল বর্দ্ধিত করিতেছেন। প্রত্যেক পৃথক্ সমাজে যাঁহারা নূতন করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রবল জনশ্রুতি এবং ঘটকগ্রন্থের বিশেষণ প্রয়োগ এখনও চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন সমাজে পঞ্চগোত্রের বহির্ভূ‌ত ভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণও রাঢ়ীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এইরূপ নানাযুগের নানাবিধ সংমিশ্রণের ফলে রাঢ়ীয়সমাজ বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু কুলগ্রন্থের কিম্বা ঘটকসম্প্রদায়ের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। যুগযুগান্তর ধরিয়া কোন প্রকার সংমিশ্রণ ঘটে নাই—এইরূপ ধারণা একমাত্র কুলীনসম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ এবং তাহা ঘুণাক্ষরেও ভ্রান্ত নহে। কিন্তু বংশজ কিম্বা শ্রোত্রিয় সম্বন্ধে এ ধারণা কাহারও নাই এবং মস্তিষ্কবিকৃতির আরোপটা অস্থানসংন্যস্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সিদ্ধান্তে লিখিত হইয়াছে কুলগ্রন্থগুলি মুখে মুখে প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বনে লিখিত এবং গ্রন্থকারদের বিচারবুদ্ধির ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের

অভাব ছিল (পৃ ৩৭১)। তথাকথিত এডুমিশ্রের কারিকায় আদিশূরের পর "কালে গতে বহুতিথে" বল্লালসেনের রাজত্বাদির এবং কেশব সেনের তুরস্কহস্তে পরাজয় প্রভৃতির বর্ণনা ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব সূচিত করে না। হরিমিশ্রের কারিকাও যতদূর বসুমহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ইতিহাসবিরুদ্ধ কিছু নাই ; আছে কতিপয় বাঙ্গালায় লিখিত এবং অর্ব্বাচীন কুলগ্রন্থে। ডঃ মজুমদার মহাশয় প্রাচীন অর্ব্বাচীন নির্ব্বিশেষে ব্যাপকভাবে কুলগ্রন্থের উপর এই দোষারোপ করিয়া বিচারে শিথিলতা দেখাইয়াছেন। ধ্রুবানন্দের মুদ্রিত মহাবংশে বহুস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটকগণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যথা, পৃ ৩ "কেচিন্মতে", 'কিঞ্চ' বলিয়া একই বিষয়ে পৃথক্ কারিকা।

পৃ ৪ কেচিৎ

পৃ ৫ কিঞ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি।

৭৭ পৃঃ পুতি শোভাকরের মৃত্যুশকাঙ্কের উল্লেখও "তথা চ ঘটকৈর্গীতং" বলিয়া পূর্ব্বগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। সুতরাং ধ্রুবানন্দ প্রভৃতির নিকট কোন বিশ্বস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ছিল না—এই উক্তি প্রমাণ-বিরুদ্ধ। আর, বিচার বুদ্ধির অভাব বিংশ শতাব্দীর মাপকাঠিতে কেবল কুলশাস্ত্রকারদের কেন, বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল গ্রন্থকারেরই ছিল। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শঙ্করাবতার বাচস্পতিমিশ্র ভামতী টীকায় "যোগব্যাঘ্রে"র (অর্থাৎ যোগবলে যে মানুষ ব্যাঘ্রশরীর পরিগ্রহ করে) উল্লেখ করিয়া বল্লাল কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণসৃষ্টির বর্ণনাকারী এডুমিশ্রের প্রায় একপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়েন।

বল্লালের পূর্ব্বেও কৌলীন্যপ্রথার অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ ডঃ মজুমদার মহাশয় চক্রদত্তের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'কুলীন' শব্দ পাণিনির একটি পৃথক্ সূত্র দ্বারা বিহিত ('কুলাৎ খঃ' ৪—১—১৩৯) এবং অমরকোষেও পাওয়া যায়। এই প্রসিদ্ধ কুলীনশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কুলের অপত্য অর্থাৎ কুলোৎপন্ন। বল্লাল সেন রাজশাসন দ্বারা কুলীনশব্দের পারিভাষিক অর্থ প্রবর্ত্তিত করিয়া আভিধানিক অর্থ রহিত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রমাণ নাই। শিবদাস সেনও তাঁহার টীকায় আভিধানিক অর্থই দিয়াছেন—"লোধবলীকুলীনঃ লোধবলীসংজ্ঞকদত্তকুলোৎপন্নঃ।" অমরকোষের শ্রেষ্ঠ-টীকাকার রায়মুকুট ও "কুলীনাগ্রণীঃ" আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। সামাজিক মর্য্যাদা মানবজাতির মজ্জাগত এবং বল্লাল সেনের পূর্ব্বেও নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকারের কুলাকুলব্যবস্থা প্রচলিত ছিল যাহা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। বল্লাল-কৌলীন্যের সৃষ্টি হইতেই অংশ-বংশ পরিবর্ত্তাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং দুরূহ মর্য্যাদা ব্যবস্থা যেরূপ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবস্থা অন্তর্নিহিত থাকা খুব স্বাভাবিক। এডুমিশ্রও কুলাকুলপরীক্ষাণং বলিয়া বল্লালসেন কর্ত্তৃক ঐরূপ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনই সূচনা করিয়াছেন, তাহার নূতন সৃষ্ট নহে। ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনোক্ত "বৃহচ্চট্ট" নামের মধ্যে ডঃ মজুমদার মহাশয় যে চট্ট উপাধির আবিষ্কার (পৃঃ ৩৭০) করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা চরমাবশিষ্ট তৃণখণ্ডের অবলম্বনার্থ কি-না জানি না।

এতাবৎ আলোচনা দ্বারা আমরা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, কুলশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষা না করিয়া তাহার ঐতিহাসিকতা বিচার উচিত নহে। ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ তাহাতে অবশ্যম্ভাবী। অথচ ঐগ্রন্থসমূহ হস্তলিখিত পুথিসংগ্রহের কোন প্রতিষ্ঠানে উপযুক্তরূপে সঞ্চিত হয় নাই। ব্যক্তিগত সংগ্রহের শোচনীয় পরিণাম স্বর্গত বসু মহাশয়ের আচরণ হইতে বোধগম্য হইবে। তাঁহার জীবনব্যাপী সঞ্চয়ের সাক্ষাৎ আলোচনা হইতে বিদ্বৎসমাজ বঞ্চিত রহিয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংগৃহীত কুলগ্রন্থরাশিরও বোধ হয় অনুরূপ অবস্থা। সুতরাং আমরা সাদরে অভিজ্ঞ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যাঁহাদের সুযোগ ও সুবিধা আছে তাঁহারা যেন কুলশাস্ত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানে অর্পণ করেন। এখনও ঘটক-গৃহে বহুতর গ্রন্থ সঞ্চিত আছে। আমরা যে সকল সাধারণ পুথিশালায় এ যাবৎ অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাদের সর্ব্বত্র সুব্যবস্থা বিদ্যমান এবং আমরা বিশেষভাবে নবদ্বীপ পাব্‌লিক লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক মূল্যবান্ পুথি পরীক্ষা করিয়া তাহার অংশবিশেষ উদ্ধার করার সুযোগ ও অনুমতি দেওয়ায় এই আলোচনা লেখা অনেকাংশে সম্ভবপর হইয়াছে।

পরিশেষে আমরা ডঃ মজুমদার মহাশয়ের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি উপেক্ষার যোগ্য প্রতিবাদেরও উত্তর দিয়া আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ভাষার ইচ্ছাকৃত তীব্রতার বহিরাবরণ তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে দেখিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম—তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রতিপাদ্যাংশের উপর মন্তব্য করিলে আলোচনার উপকার হইত। আমরা প্রথমাংশে উদাহরণস্বরূপ ৩খানি কুলগ্রন্থের প্রামাণ্যবিচার করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে ২খানি মুদ্রিত এবং সহজলভ্য এবং তৃতীয়টীর অংশবিশেষ সদ্যোমুদ্রিত। ডঃ মজুমদার মহাশয় যে গ্রন্থদ্বয়কে প্রামাণিক ও কৃত্রিম বলিয়াছেন আমরা নানাবিধ প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাই অভ্রান্ত ও জাল বলিয়াছি ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাদের প্রদর্শিত প্রমাণাবলী উপেক্ষা করিয়া, কোথায় এবং কেন কিছুই নির্দ্দেশ না করিয়া প্রামাণিকগ্রন্থেও অবিশ্বাস্য অংশ এবং কৃত্রিমগ্রন্থেও অবর্জ্জনীয় বা বিশ্বাস্য অংশের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। বল্লালসেন-লক্ষ্মণসেন কিম্বা ধ্রুবানন্দের অভ্যুদয়কাল বিতর্কের বিষয় না হইলেও বংশপর্য্যায়ের গড়পড়তা ধরিয়া তিনি কেন গণনা করিয়াছিলেন, ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বংশধারা বিষয়ে তাঁহার ভ্রমপ্রদর্শন সত্ত্বেও তাহা এখনও অবিশ্বাস্য কি-না প্রভৃতি বহু প্রশ্ন তাঁহার উত্তর পড়িয়া আমাদের উদিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার অপ্রচুর অবসরের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমরা বিরত থাকিলাম। ভারতবর্ষের এক বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের লেখার প্রতিবাদ রচনায় আমাদের ক্ষুদ্র লেখনীর ধৃষ্টতা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু যাঁহার লেখার স্বতঃসিদ্ধ প্রামাণিকতা রহিয়াছে ; তাঁহার দায়িত্বও অনন্যসাধারণ—ইহার উপলব্ধি হইলেই আমাদের প্রতিবাদের কৃতার্থতা সাধিত হয়।

এই আলোচনা লিখিত হওয়ার পর সম্প্রতি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহ তত্রত্য কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। মহেশ মিশ্র রচিত "নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার" কতিপয় পুথি রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে দুইটিতে মুখবংশের শেষে "অথ সমুদ্রগড়িয়া মুখৈটী" নামে বিখ্যাত কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্রের বিস্তৃত বংশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। সংক্ষিপ্তাকারে একটী মাত্র ধারা উদ্ধৃত হইল :—

ধাধু, জলাশয়, জিয়া ("দক্ষিণকপাটে স্বয়ম্ভুমণিঃ"), শঙ্করাচার্য্য, বলদেব (দক্ষিণরাঢ়ী), গদো, দুর্য্যোধনাচার্য্য, এড়ুমিশ্র কুলপতি, মাণ্ডু কবিরাজ, ঈশ্বর, রাঘব ঘটক. পরমেশ্বর, আখণ্ডল ঘটকাচার্য্য, বাগীশ শিকদার, মহেশ্বর ঘটকসিংহ, রাজারাম বিশারদ, হরিরাম সার্ব্বভৌম।
(৪৪৪ ক পুথি ৪১৮-১৯ পত্র, ৩২৩৩ পুথি ২৮১-২ পত্র)

মুখবংশের এই ধারা আদ্যন্ত কৌলীন্যবর্জ্জিত এবং একমাত্র এড়ুমিশ্রের গৌরবার্থ-ই কোন কোন গ্রন্থে ইহা স্থান লাভ করিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এড়ুমিশ্র জিয়া হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ এবং জিয়ার ভ্রাতা গুয়িকের বংশধর প্রথম বল্লালী কুলীন আহিতের পৌত্রপর্য্যায়ের লোক। সুতরাং দনুজমাধব ও কেশব সেনের সহিত তাঁহার সংযোগ অসম্ভব হয় না। এড়ুমিশ্রের ৬ পুত্রের মধ্যে কারিকায় উল্লিখিত কুশধ্বজের নাম নাই, কিন্তু অনুরূপ একটি নাম (মকরধ্বজ মিশ্র) আছে।

শ্রাবণসন্ধ্যা

কাদের নওয়াজ

রিম্ ঝিম্ জল, ঝরে অবিরল
এসেছে শ্রাবণসন্ধ্যা,
যেন আনন্দে মধুর ছন্দে
নামিছে অলক-নন্দা।

দুল দুল তুই বুল বুল,
তুল তুল জুঁই ফুল তুল,
কদম কাঁঠালে-চাঁপা যে আকুল,
ফোটে কেয়া মধু-গন্ধা।

রিম্ ঝিম্ রবে ঝরিছে নীর
সেতারের যেন বাজিছে মীড়—
টুং-টাং আর টুং টুং,
শুনিতেছি সারা মর্‌সুম্,
হাওয়া বহে মৃদু-মন্দা।

বারিরাশি বহে কল কল,
তড়াগের আঁখি ছল ছল,
হাঁকে তরঙ্গ চল চল,
বেণু বনে হাওয়া চঞ্চল,
নাচে নদী লীলা-ছন্দা।

শ্রাবণের সাথে কানাকানি—
করিছে প্রকৃতি রূপ রাণী,
বিজুরী শাসায় দিঠিঁ হানি—
পাছে সে প্রেমের নব বাণী,
পৃথিবী আজিকে লয় জানি'
হয় ধরা নিরদ্বন্দ্বা।

কপোত-মিথুন রয়্ কুলায়—
ঠোঁটে ঠোঁট, মুখে মুখ বুলায়,
কূজনে, দুজনে, মন-ভুলায়,
উতল-বাতাসে নীড় দুলায়,
নয়নে রূপার কাঠি বুলায়
যামিনী চাঁদিনী ছন্দা।

বালি-হাঁস বক কোয়া-পাখী
খঞ্জন, মনোহর-আঁখি,
দল্-পিঁপী-দলে ডিম ঢাকি,
ডাকে না ক' আর থাকি থাকি,
শ্রাবণের গানে কান রাখি—
কবি চাহে, এক ছবি আঁকি'
সবার নয়নানন্দা,
এসেছে শ্রাবণসন্ধ্যা।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা পত্র

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পিএচ-ডি, বি-লিট্

সরকারী কাগজপত্রে যে কেবল প্রাচীন কলিকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসিগণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, তখনকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ১১৯৪ সালের ১৫ই আষাঢ় খিদিরপুরের বিখ্যাত ঘোষাল পরিবারের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল এবং তাহার পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল কলিকাতার অনাথ ও দুঃস্থদিগের দুর্গতি মোচনের জন্য একটি অনাথ মণ্ডপ ও ইণ্ডাষ্ট্রি বাটী নির্ম্মাণের প্রস্তাব বড়লাটের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সেকালের রীতি অনুসারে তাহাদের মূল পত্র পারসী ভাষায় লেখা হইয়াছিল এবং তাহার সঙ্গে একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠান হইয়াছিল। এই দুইখানি পত্রই এখন ভারত সরকারের মহাফেজখানায় আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, গোকুলচন্দ্র ঘোষালের সময় এই পরিবারের সৌভাগ্যের সূচনা হয়। তিনি ভেরেল্‌ষ্ট (Verelst) সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। নবাব মীরকাসিম ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রামের মালিকানাস্বত্ব দান করিবার পর ভেরেল্‌ষ্ট সাহেব ঐ জিলার বন্দোবস্ত করেন। বোধ হয় সেই সময়ই ঘোষালেরা সন্দ্বীপের জমিদারী পাইয়াছিলেন। স্বনামধন্য জয়নারায়ণ ঘোষাল ঢাকায় শেক্সপীয়র (Shakespear) সাহেবের অধীনে চাকুরী করিয়া পৈতৃক সম্পত্তির বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি শেষ জীবনে ৺কাশীবাসী হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি বেনারসের বিখ্যাত ব্যবসায়ী কাশ্মীরী মলের দুর্গাকুণ্ডের নিকটস্থ সম্পত্তি খরিদ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই সম্পত্তির আয় দ্বিগুণ হইয়াছিল। বাঙ্গালী-টোলার মিশনরী স্কুলে তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র কালীশঙ্কর কলিকাতায় কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক টাকা ও জমি দিয়াছিলেন। সুতরাং জয়নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষাল পরিবারের সমাজসেবা ও দানশীলতা শেষ হয় নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র ও জয়নারায়ণের বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ যে, তাঁহারা এক বৎসর একজন মুহুরী রাখিয়া কলিকাতার অনাথ, আতুর, দুঃস্থ ও অক্ষমদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন আদমসুমারীর ব্যবস্থা ছিল না; সুতরাং ঘোষালদিগের এই চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তাঁহাদের হিসাব মতে তখন ৪৬০ জন জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তি কলিকাতার রাস্তায় ও গলিতে থাকিত। ইহাদের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ঘোষালেরা বড়লাটের নিকট প্রস্তাব করেন যে, পাঁচ শত জনের বাসের উপযোগী একটি অনাথমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলে ইহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয় এবং একটি ইণ্ডাষ্ট্রি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হইলে কাহাকেও অনাথমণ্ডপে আশ্রয় দিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না। ঘোষাল মহাশয়েরা কেবল কলিকাতার গরীবদিগের ঐহিক মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মৃত্যুর পরে যাহাতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে এই সকল অনাথদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শাস্ত্রসম্মতভাবে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য ব্রাহ্মণ ও মৌলবী নিয়োগের প্রস্তাবও তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনাথমণ্ডপের প্রতিষ্ঠাকল্পে বজবজের রাস্তার নিকট জমি দিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থসংগ্রহের বিভিন্ন উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভাষার দিক দিয়াও এই চিঠিখানি অত্যন্ত মূল্যবান। ইংরেজ পাদরীদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই যে সহসা বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি হয় নাই তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সুতরাং বাঙ্গালা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করিতে হইলে এই সকল প্রাচীন চিঠিপত্রের রচনারীতি ও শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করিতে হইবে। সেই জন্য নিম্নে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও তস্য পুত্র জয়নারায়ণের পত্র সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হইল। বলা বাহুল্য যে ইহাতে প্রাচীন বানানের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

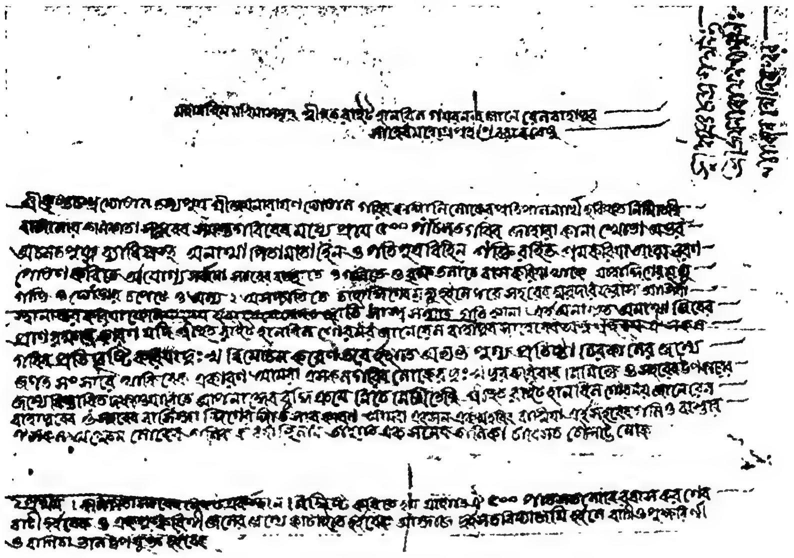

শ্রীশ্রী

মহামহিম মহিমাসমূহ শ্রীযুত রাইট হানবিল
গবরনর জানেরল বাহাদুর সাহেব
মহোগ্রপ্রতাপ বরাবরেষু

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মণঃ
শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণঃ
সাকিন খিদিরপুর

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল তস্য পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ ঘোষাল গরিব কাঙ্গালি লোকের প্রতিপালনার্থে হকিকত[১] লিখিতেছি—বাঙ্গালার কলিকাতা সহরের সমস্ত গরিবের মধ্যে প্রায় ৫০০ পাঁচশত গরিব জাহারা কানা খোড়া অতুর অচল ও পুঙ্গ[২] ব্যাধিগ্রস্থ অনাথা পিতামাতাহিন ও পতিপুত্র বিহিন শক্তিরহিত শ্রম করিয়া আত্মভরণ পোষণ করিতে অযোগ্য সর্ব্বদা সহরের রাস্থাতে ও গলিতে ও বৃক্ষতলাতে বাস করিয়া থাকে যাহাদ্দিগের মৃত্যু গাড়ি ও ঘোড়ার চপেটে ও অন্য ২ অসদ্গতিতে তাহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে পরে সহরের মুর্দ্দারফরাস আসিয়া স্থানান্তর করিয়া ফেলিয়া দেয় ইহাতে যে যেমত জাতি সাস্ত্র সন্মত গতি হয়না এই অনাহুত অনাথাজিবের প্রাণরক্ষার কারণ যদি শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌবনর জানেরেল বাহাদুর সাহেবের অনুগ্রহ হয় ঐ সকল গরিব প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুঃখ বিমোচন করেন তবে ইহাতে অত্যন্ত পুণ্য প্রতিষ্ঠা চিরকালের জন্যে জগতসংসারে থাকিবেক একারণ আমরা এসকল গরিব লোকের দুঃখ দুর করিবার নিমিত্যে ও সহরের উপকারের জন্যে বিস্তারিত দফাওয়ারিতে[৩] আপনাদ্দের বুদ্ধিক্রমে নিচে লিখিতেছি—শ্রীযুত রাইট হানবিল গৌবনর জানেরেল বাহাদুরের ও সহরের বাসিন্দাদ্দিগের জ্ঞাতসার কারণ আমরা একসন এক এক মুহরির রাখিয়া এই সহরের গলি ও রাস্তার ঐ সকল অক্ষেম লোকের তালিক করিয়াছিলাম তাহাতে একসনের তালিকা চারিসত চৌসাট্ট লোক—

১ প্রথম। কলিকাতা সহরের নিকট একস্থান নিদ্দিষ্ট করিতে হয় যাহাতে ঐ ৫০০ পাচসত লোকের বাসকরণের বাটী হইবেক ও এক পুষ্করিণী জলের জন্যে কাটাইতে হইবেক আন্দাজ দুইসত বিঘা জমি হইলে বাটী ও পুষ্করিণী ও বাগিচা ভাল উপযুক্ত হইবেক—

২ দ্বীতিয়। এই অনাথমণ্ডপের ঐ সকল অনাথার রক্ষার কারণ এক কমিটী ছয়জন কলিকাতার বাসস্থ[৪] হিন্দুধর্ম্মভিতু বড় মনুস্য ও একজন শ্রীযুত বড়সাহেব এই কয়েক ব্যক্তি নিরোপিত হয় যে তাহারা সর্ব্বদা এই স্থানের

---

[১] হকিকত—(আরবী) তথ্য, বৃত্তান্ত।

[২] বোধ হয় পঙ্গু।

[৩] দফাওয়ারি—(আরবী দফা+পারশী ওয়ার) দফায় দফায় item by item.

[৪] এখনকার ভাষায় বাসিন্দা—

ও এই নকসার এবং ঐ সকল গরিবেদ্দিগের খবরদারি কারণ শ্রীযুত বড়সাহেব প্রতি সপ্তাহতে একবার ঐ কমিটিতে বসিবেন—অথবা ঐ অনাথমণ্ডপের বাটীতে জাইয়া ভাল মন্দ তত্ত করিবেন জখনকার যে আবিস্যক কঙসলের হুকুম ও গৌরসি[5] দরকার হইবেক তখনি তাহা শ্রীযুত বড় সাহেবতক জ্ঞাতসার করেন যে তিনি কঙসলতক জানাইয়া তাহার প্রতুল করিয়া দিবেন জখনকার যে বিষয় সমস্ত শ্রীযুত বড় সাহেবতক এত্তলা থাকিবেক—

৩ তৃতীয়। ঐ সকল গরিবেদ্দিগের মধ্যে জাহারা আরাম পাইয়া আপন ২ শ্রম করিয়া গুজরাণ করিতে সমর্থ হইবেক তাহারা ইওষ্টরি বাটী ও অনাথমণ্ডপ হইতে গিয়া অন্যন্তরে তাহাদ্দিগের আপন ২ ব্যবসার চেষ্টা করিবেক অক্ষমলোক ব্যতিরেক ঐ স্থানে থাকিতে পারিবেক না—

৪ চতুর্থ। ইণ্ডষ্টরি বাটীতে থাকিয়া জাহার যে সাধ্যানুজাই কর্ম্ম করিতে পারিবেক তদনুরূপ কার্য্য দেওয়াইতে হইবেক তাহাতে যে উপস্বত্ত হইবেক তাহা গরিবলোকের ভরণপোষনার্থে বাটীর খরচপত্র হইবেক—

৫ পঞ্চম। তাহারা যে জেমন জাতি তাহার তদনুরূপ লোক ব্রাহ্মণ ও মৌলবি নিযুক্ত করিতে হইবেক তাহাদ্দিগের মৃত্যু হইলে পরে অগ্নিতে দাহন করে এবং কবর দেয় সে সময় সাস্ত্রমত বিধান করেন—

৬ সষ্টম। কলিকাতা সহরের পলিস আফিস হইতে সহর কোতয়ালকে আজ্ঞা করিবেন সে জখন যে আমাদ্দিগের জিকির[6] মত গরিব কাঙ্গালি লোক দেখিবেক তখনি সে সকল লোককে ইণ্ডষ্টরি বাটীতে পৌছাইয়া দেয়—

৭ সপ্তম। ৫০০ পাচসত গরিবের সালিয়ানা খরচ যে হইবেক ইহার আলাদা হিসাব ইঙ্গরেজিতে এই নকসার সঙ্গে দিলাম ইহাতে ব্রাহ্মণ ও মৌলবি আদির যে অল্প খরচ হইবেক তাহার নিরোপন লেখা যায় নাই ইহার কর্ত্তা যাহারা হইবেন তাহারাই নিরোপন করিবেন—

৮ অষ্টম। সেই কমিটীর কর্ম্ম কর্ত্তারা মাহেনা পাইবেন না—সেওয়ায়[7] তাহাদ্দিগের মুহরির ও অন্য অন্য চাকর জাহারা মাহিনা লওনের উপযুক্ত ঐ স্থানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেক—

৯ নবম। একজাই খরচের ও জিনিসের হিসাব ও আর যে কিছু হিসাব প্রতি মাস কাবার বাদে ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারা সহি করিয়া হিসাব দপ্তরে রাখিবেন নকল দস্তখত করিয়া কঙসলে পাঠাইবেন—

১০ দসম। ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারা ও শ্রীযুত বড়সাহেব এই কয়েকজনে ঐ ৫০০ লোক থাকনের উপযুক্ত বাটীর নক্‌সা তৈয়ার করিয়া নক্‌সা মাফিক বাটীর ফুরান করিবেন তাহাতে জিনি অল্প দরে বনাইবার দরখাস্ত দিবেন এবং মাঙ্গল[8] মাল জামিন দিবেন তাহারি সহিত বাটী বনাইবার সওদা[9] নির্দ্দিষ্ট হইবেক—

১১ একাদস। অনাথার বিদ্যাসিক্ষার নিমিত্যে সিক্ষাগুরু নিরোপিত করিতে হইবেক তাহাতে তাহার মধ্যে যে যেমন বিদ্যাসিক্ষা করণের উপযুক্ত তাহারে তদনুরূপ সিক্ষা করাইবেক

১২ দ্বাদস। গরিবেদ্দিগের সালিয়ানা যে খরচ হইবেক তাহার সংস্থা তাহাদ্দিগের আষনের পুর্ব্ব স্থির করিতে হইবেক—

১৩ ত্রিয়োদস। আবিস্যক জখনকার যে কর্ম্মের যে ধারা করিতে হয় তাহা ঐ কমিটীর কর্ম্মকর্ত্তারা ও শ্রীযুক্ত বড়সাহেব করিবেন কিন্তু প্রথমত ইণ্ডষ্টরি বাটী তৈয়ার করিতে যে টাকা চাহি তাহা মজুদ করিবেন ২ দ্বীতিয় বাটী তৈয়ার করণের উপযুক্ত স্থান নিরোপিত করিবেন ৩ তৃতীয় এই ৫০০ পাচসত লোকের নির্ব্বাহের নিমিত্যে পুজি স্থির করিবেন সালিয়ানা খরচ যে হইবেক তাহাতে আমরা এমত দৌলতমন্দ[10] নহি যে এত খরচের সংস্থা করি এই প্রযুক্ত এ বিষয় হুজুরে এত্তলা করিতেছি ইহার উপায় কোম্পানীর মেহেরবানি[11] ব্যতিরেক এ মুলুকে অন্য উপায় নাহি অতএব যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাতে শ্রীযুক্ত রাইট হানবিল গৌবনর বাহাদুর ও কঙসাল সাহেবান নিচের

---

[5] গৌর সি—মুল পারশী পত্রে রুবকার শব্দ পাওয়া যাইতেছে।

[6] জিকির—(আরবী) কথা, statement.

[7] সেওয়ায় (পারশী)—ব্যতিরেকে।

[8] মূল পারশী পত্রে আছে—মাতব্বর মাল বা প্রচুর জিনিষ।

[9] সওদা—(পারশী) বন্দোবস্ত।

[10] দৌলতমন্দ—ধনবান।

[11] মেহেরবাণি—অনুগ্রহ।

হকিকত দৃষ্টী করিয়া মতজ্জ[12] হন তবে এই নকসার প্রতিপালনের রাহা[13] হইতে পারে।

১৪ চতুর্দ্দস। যে কাল অবধি কোম্পানি বাঙ্গালা আমল করিয়াছেন সেই কালাবধি কোম্পানি দ্বারা এবং জমিদার ও তালুকদার ও ইজারদার লোকে দ্বারা অনেক ভূমি দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ও মহোত্রাণ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে এমত খয়রাত কারণ জমি মকরর[14] হয় নাই অতএব আমরা বিবেচনা করিলাম এবং উচিত হয় যে সকল জমিদার ও তালুকদার জাহারা কলিকাতার নিকটস্থ এবং জাহাদ্দিগের গমনাগমন এবং তাহাদ্দের উকিল সর্ব্বদা সহরে বাষ করে এহারা সকলে ৪০০০০ চল্লিশ হাজার বিঘা লায়েক পতিত জমি দেন সনেক দুই সনের মধ্যে আবাদ হইতে পারে ইহাতে তাহাদ্দিগের লোকসান হইবেক না আর এই সকল জমির যে উপস্বত্ত হইবেক তাহা হইতে গরিব লোকের খরচ চিরকালের জন্য থাকিবেক এবং এহাদ্দিগের নেকনাম[15] থাকিবেক ঐ সকল জমি আবাদ করিতে ২ দুই বতসর লাগিবেক তাহাতে জমি আবাদ করণের যে খরচ হইবেক তাহা ঐ কমিটী হইতে হইবেক—

১৫ পঞ্চদস। অথবা যেমত কোম্পানির মদরসা করিয়া ভরণ পোষণার্থ জমি দাতব্য করিয়াছেন যদি সেই মত কোম্পানির ২৪ চব্বিষ পরগণার খাষমহল হইতে জমি দাতব্য হয় তবে আবাদ তরদ্দুদের[16] দরকার থাকেনা ও আবাদ তরদ্দুদের খরচ লাগেনা ২০০০০ বিষ হাজার তঙ্কা সালিয়ানা উতপত্তি হয় ১৫০০০ পোনের হাজার বিঘা হাসিল জমি হইতে ইহাতে সরকারের লোকসান সালিয়ানা কমোবেষ ১৫০০০ পোনর হাজার তঙ্কা হইবেক

১৬ সষ্টদস। অথবা যে সময় শ্রীযুত মে টাচ্‌ট সাহেব ও তাহার আমিন এহারা জখন ২৪ চব্বিষ পরগণার জমি জরিপ করিয়া হস্তবুধ করিয়াছিলেন তাহাতে পরগণার জমিদার লোক ও তালুকদার ও আমিন এহারা কোম্পানির ৬৭০০০ সাতসট্টি হাজার বিঘা জমি বিক্রী করিয়া খয়রাত লিখিয়া দিয়াছেন তাহাতে এদানন্তরে চব্বিষ পরগণার তহসিলদারের দরখাস্ত মত রিবিনিউ বোরড এই সকল জমি ফিরিয়া লইতে হুকুম করিয়াছেন এবং জমির জমা সরকার কোরক রাখিতে হুকুম করিয়াছেন অতএব যদি কঙসলে এই সকল জমি প্রকত[17] বাজেআপ্ত করেন তবে এই এক নতুন মনাফা কোম্পানিতে হইবেক ইহা হইতে গরিব লোকের ভরণপোষণার্থে যদি কোম্পানি ঐ সকল জমির মধ্যে বিষ হাজার তঙ্কা উতপত্তি হওনের মত জমি হুকুম করেণ তবে ইহাতে কোম্পানির লোকসান হয়না এবং ৫০০ পাচসত গরিব লোক প্রতিপালন অনায়াসে হয় যেমন আমার দেসে খয়রাত জমি ব্যতিরেক চিরকালের জন্যে বিষ হাজার তঙ্কার সালিয়ানা সংস্থা হয়না অতএব শ্রীযুত গৌবনর জানেরেল বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া যে কয়েক প্রকার লেখা গেল ইহার একপ্রকার অথবা আর কোনো প্রকার বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া দেন—

১৭ সপ্তদস। ইণ্ডষ্টরি বাটী বনাইবার লায়েক জমি ২০০ দুইসত বিঘা মাগুরা পরগণার মধ্যে কলিকাতার নিকট পাওনের বাধা নাই সরকার হইতে এ জমি দেন কিম্বা আমাদ্দিগের বজবজিয়ার রাস্তার নিকট কিঞ্চিত জমি আছে তাহা হইতে আমরা জায়গা বনাইবার জমি দিব যে সকল ধারা বিষ হাজার তঙ্কার সংস্থানের কারণ লেখা গেল যদি কঙসলের পছন্দ না হয় এ কারণ আর এক প্রকার লিখিতেছি তাহার হকিকত এই কুলু হাসিলের[18] উপর সায়ের মহলে[19] পুর্ব্বের রিত আছে হুজুর হইতে খয়রাত করেন যে (ছিন্ন অংশ) সেইমত মহাজনান সকলে দিত এইরূপ এখন তক সায়ের মহলে ও হাসিলাতের উপর স্থানে স্থানে খয়রাত মকরর আছে যদি এই বিষ হাজার তঙ্কার সংস্থান কারণ আমদানি ও রপ্তানি কলিকাতা সহরে জত হয় ইহার উপর ফি সতকরা এক আনার হিসাবে মকরর হয় এবং আমদানি ও রপ্তানি কি খালিয়া নৌকার উপর কিছু নিরিখ হয় এইরূপ হুকুম হইলে মহাজনানের[20] লোকসান অতি

---

[12] মতজ্জ—(আরবী) মনোযোগী।

[13] রাহা—রাস্তা।

[14] মকরর—(আরবী) নির্দ্দিষ্ট, নিযুক্ত।

[15] নেকনাম—(পারশী) সুনাম।

[16] তরদ্দুদ—(আরবী) বিবেচনা, ব্যবস্থা।

[17] প্রকৃত।

[18] কুলু হাসিল—সম্পূর্ণ আয়।

[19] সায়ের মহল—লবণ প্রভৃতির ট্যাক্স ও আবোয়াব।

'অল্প কিন্তু অহিক[২১] খোষনাম[২২] এবং পরকালের জন্যে অনেক পুন্য অনায়াসে এত গরিব লোকের দোয়া[২৩] পৌছে হুজুরের এতফাকের[২৪] কারণ এই একরূপ এত্তলা দিলাম যদি মঞ্জুর হয় তবে পরমিট পঞ্চত্তরার সাহেবদ্দিগের নামে হুকুম হইবেক তাহারা সন সন উষুল করিয়া ইগুষ্টরি বাটীতে পৌছাইয়া দিবেন

১৮ অষ্টাদস। যেমন কলিকাতার নতুন গিরিজার খরচ মাথট্ট করিয়া হইয়াছে ইণ্ডষ্টরি বাটী বনাইবার খরচ সেইরূপ মাথট্ট হইয়া হইবেক কিন্তু ইহার আমাদ্দিগের দেসের দস্তরমত জদি সাহেবেরা মাথট্টের এক নিয়ম করিয়া দেন তবে অতি ত্বরায় এ জায়গা বনাইবার টাকা মজুদ হইতে পারে তাহার নিয়ম এই কমোবেব লাক টাকা খরচ হইলে বাটী ও ইহার লওাজিমা[২৫] স্থান তৈয়ার হইবেক ইহার আহোয়াল[২৬] কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি চাকরহায়ের[২৭] উপর ইহাদ্দিগের পায়া কিম্বা খেদমত মাফিক এবং সহরের কোম্পানির চাকর সেওায় পাকা হাবেলিওয়ালা বাসিন্দার উপর এক নিরিখ মকরর করিয়া দেন সরকারের খাচাঞ্চি ও পুলিষ আফিসের দ্বারা এ টাকা আদায় হয় এমত হইলে অতি শীঘ্র টাকা আদায় হইয়া বাটী তৈয়ার হইতে পারে সহরের গলি ও রাস্তা হইতে এসকল অক্ষেম গরিব অন্যত্রে স্থাপিত হইলে সহরের লোকের অনেক প্রকার আরাম হইবেক মোছলমানের আমল অবধি এসকল ধারা বন্দ হইয়াছে পূর্ব্বে হিন্দুর আমলে এমতরূপ গরিবের জন্যে স্থান ও ইহার ব্যয় নিরোপন ছিল মহারাজা যুধিষ্ঠিরের আমলে এই স্থানের নাম অনাথমণ্ডপ ছিল এখন সেইমত নিয়ম বিলাতেও আছে ষুনিতে পাই—

গরিব কাঙ্গালি লোকের দুঃখ বিমোচন কারণ এবং তাহাদ্ধিগের ষুখতপত্তি নিমিত্যে যে নকসা আমরা তৈয়ার করিয়া শ্রীযুত গৌবনর জানরেল কওসলে জ্ঞাত করিতেছি ইহাতে কোনো বিষয় আমাদ্দিগের বিবেচনার ও লিখিবার ত্রুটী ও ভুল হইয়া থাকে তাহার যাহাতে ভাল হয় সাহেবেরা বিবেচনা করিবেন এ বিষয় সম্পুক্ত[২৮] কারণ আমাদ্দিগে হইতে মেহনত ও তরদ্দুদ যেতক দরকার হইবেক তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ইহার ইঙ্গরেজিতে তরজমা কারণ উপযুক্ত আমরা নহি এজন্যে বাঙ্গলা লিখিয়া দিলাম ইতি--সন ১১৯৪ সাল তেরিখ ১৫ আশাড়।

এখন আর আমরা হকিকত লিখি না, নেকনাম বা খোস নামের জন্য চেষ্টা করি না, কিন্তু খয়রাত, খবরদারি, দোয়া, মেহেরবানি, মঞ্জুর, মকরর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ বেমালুম বাঙ্গালার সামিল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই চিঠিতে সংস্কৃত শব্দের বানান যতই বিকৃত হউক না কেন ইহার ভাষার উপর পারশী প্রভাব খুব অল্পই বলিতে হইবে। এমন কি অনুবাদে সর্ব্বদা মূল পারশীর অনুসরণও করা হয় নাই। দুই চারিটি অধুনা অপ্রচলিত পারসী শব্দ বাদ দিলে ভাষা হিসাবে ঘোষালদিগের পত্র আধুনিকতা দাবী করিতে পারে! অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুচবিহার হইতে লিখিত কতকগুলি বাঙ্গালা পত্র ভারতসরকারের মহাফেজখানায় পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পারশী শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশী। বর্ত্তমান পত্রে মাত্র একটি পর্ত্তুগীজ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মাসকাবারের "কাবার" (acabar) পর্ত্তুগীজ। সেইরূপ "রাইট হানবিল" "গবরনর জানেরল" "কওসিল" (council) "ইগুষ্টরি" প্রভৃতি ইংরেজী শব্দের বিকৃতরূপ আলোচ্য পত্রে স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা বিদেশী শব্দের বিরুদ্ধে কখনও বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করে নাই এবং নানা ভাষার দানেই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি হইয়াছে শব্দসম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালা ভাষা ভবিষ্যতে বিদেশ হইতে নূতন শব্দ আমদানি করিবে না কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

২০। মহাজনের (পারশী) বহুবচন।
২১। ঐহিক।
২২। খোসনাম—সুনাম।
২৩। দোয়া—(আরবী) আশীর্ব্বাদ।
২৪। এতফাক—(আরবী) যুক্ত হওয়া এখানে অবগতি।
২৫। লওজিমা—(আরবী) আবশ্যকীয় জিনিষ।
২৬। আহোয়াল—(আরবী) হকিকত, তথ্য।
২৭। চাকরের পারসী বহুবচন।
২৮। সম্পূর্ণতা?

মিটমাট

শ্রীযামিনীমোহন কর

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেটার্নিটি হোমের সংলগ্ন-বাগান। কয়েকজন নার্স গল্প করতে ব্যস্ত

১মা। কই, হাসি এখনও এলো না ?

২য়া। এখুনি এসে পড়বে। ওর সাড়ে তিনটা অবধি ডিউটি ছিল। আস্‌বার সময় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললে, “কাপড়জামা বদলে এখুনি আসছি।”

৩য়া। ততক্ষণ বেলা, তুই ভাই, একটা গান কর্। হাসি না এলে সেই সব কথাবার্ত্তা ঠিক জমবে না।

বেলা। হাসিদির মুখের হাসি আজকাল একেবারে মিলিয়ে গেছে।

১মা। যাবেই না বা কেন ? বিভাসবাবুর এইটা ভারী অন্যায। এতদিন হাসি বলতে একেবারে অজ্ঞান। এই নিয়ে আমরা হাসিকে কত ক্ষেপিয়েছি। আর এখন ঐ মালতী বলে কে এক মেয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে এত মশগুল যে হাসির দিকে আর ফিরেও চান না।

২য়া। মেয়েটার সঙ্গে আবার একটা ছেলে। স্বামী নাকি নিরুদ্দেশ।

৩য়া। আমি ভাই একদিন স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করতে প্রথমে ফোঁস ক'রে উঠেছিল। পরে বললে, “স্বামীর নাম করতে নেই।”

বেলা। আমি সেদিন জিজ্ঞেস করলুম, “মালতীদি, তোমার ছেলের ভাই বয়স কত ?” সে উত্তর দিলে, “দু-বছর।” তাতে আমি বললাম, “আমার দিদির ছেলের বয়স এক বছর, সে কিন্তু এর চেয়ে কেমন মোটা সোটা।” আমার দিকে কটমট ক'রে চেয়ে বললে, “ছেলে কি রোগা হতে নেই !” সেই সময় ওর ঘরে আমাদের ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন, আমিও তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম।

১মা। তুই আগে একটা গান শোনা। হাসি এলে সব খবর পাওয়া যাবে। ওর সঙ্গে ডাক্তারের কি সব নাকি গণ্ডগোল হয়েছে।

বেলা। আমার যে পাঁচটার সময় ডিউটি আরম্ভ। আমি শুনবো কি ক'রে ?

২য়া। একটা ভাল দেখে গান শুনিয়ে দে, তা হ'লে তোর ডিউটি শেষ হ'লে আমি নিজে তোর ঘরে গিয়ে তোকে সব শুনিয়ে আসব।

বেলা। ঠিক তো ? ভুল না কিন্তু রেণুদি। তা হ'লে রাত্রে আমার ঘুম হবে না।

২য়া। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। এইবার গান কর্।

বেলার গান

রাঙা অধরে কেন হাসি খেলে ?
গোলাপবালা কোন্ রতন পেলে ?
কোন্ ভোমরা এসে
তোমায় ভাল বেসে
পরশ দিয়ে গেল হৃদয় মেলে ॥
দখিন বাতাস প্রাণে দিল দোলা।
বদ্ধ মনের দ্বার হ'ল খোলা ॥
কোন্ মাতাল ফাগুন
প্রাণে জ্বালল আগুন
ব্যথা বেদন দিল দূরে ঠেলে ॥

১মা। হ্যাঁ রে বেলা, কি রতন পেয়েছিস, বলবি না ?

২য়া। আর তোর প্রাণেই বা কে এসে আগুন জ্বালল’ ?

বেলা। যাও, তোমরা সব তাতেই খালি ঠাট্টা কর।

৩য়া। তোর সঙ্গে যে ছেলেটি প্রায়ই দেখা করতে আসে—

বেলা। সে তো আমার দিদির দেওর। পশ্চিমে থাকত, এই কিছুদিন হ'ল এখানে বদলি হয়ে এসেছে।

২য়া। দিদির দেওর—বৌদির বোন—মিলেছে ভাল!

১মা। এখন ভালয় ভালয় বেলার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লে হয়।

বেলা। যাও, তোমরা ভারী ইয়ে। আমি চললাম। আমার ডিউটির সময় হয়ে গেল।

প্রস্থান

৩য়া। মেয়েটি বেশ। ওর যদি বিয়ে হয়ে যায় তো আমি খুব সুখী হই।

২য়া। আমরা সকলেই হই। এখন না হ'লে বড় হয়ে গেলে আর বিয়ে হবে না।

১মা। আমাদের এ জীবনে কি সুখ আছে বল্? মেয়েদের সবচেয়ে আকাঙ্খার জিনিস হ'ল স্বামীর ঘর।

২য়া। ঐ যে হাসি আসছে।

১মা। ভয়ানক গম্ভীর দেখাচ্ছে, ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নিশ্চয়ই।

হাসির প্রবেশ

৩য়া। তোমার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করছি।

হাসি। আর বল' কেন? ডিউটি শেষ ক'রে চলে আসছি, এমন সময় আমার ওপর হুকুম হ'ল, কেবিনে কে এক নূতন মহিলা এসেছেন তাঁর টিকিট তৈরী করবার। তিনি আবার এমন নার্ভাস যে কোন কথার উত্তরই ঠিকভাবে দিতে পারেন না।

১মা। এত গম্ভীর কেন? কিছু একটা হয়েছে নাকি!

হাসি। তুমুল। আজ বেলা এগারোটার সময় বিভাসবাবু জেনারাল ওয়ার্ডে ঘুরতে এসেছিলেন। একজন রুগীকে স্পঞ্জ করাবার কথা ছিল। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "স্পঞ্জ করানো হয়েছিল?" আমি বল্লুম, "জানি না।" তিনি প্রশ্ন করলেন, "জানেন না, মানে?" আমি উত্তর দিলুম, "ও রুগী আমার চার্জ্জে নয়, মালতীর চার্জ্জে।" তিনি রেগে জবাব দিলেন, "সে ছেলেমানুষ, নতুন এসেছে। যদি কোন কাজ ভুলে যায়, আপনাদের উচিত তাকে শুধরে দেওয়া।" আমি বল্লুম, "ছেলেমানুষ কি-না জানি না, তবে ছেলের মা, সেটা জানি। আর আপনি থাকতে আমরা তাকে কি শোধরাব?" তিনি চটে গিয়ে একটা সীন করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমি বল্লুম, "এটা রুগীদের ঘর। আপনি ডাক্তার, ভুলে যাবেন না।" তিনি কথা না কয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

২য়া। তোমার তা হ'লে এবার চাকরি নিয়ে টানাটানি।

হাসি। বোধ হয়। চাকরি যায় যাবে, তাই ব'লে অন্যায় সহ্য করতে যাব কেন? কোথাকার কে একটা মেয়ে, না জানে ভাল কাজকর্ম্ম, না জানে ভদ্রভাবে মিশতে, সে এসে আমাদের ওপর আধিপত্য করছে। তার দশ খুন মাফ। অথচ তার চরিত্র সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহের কারণ রয়েছে। এই যে ওর ছেলেটা, এটা কার? ও বলে বটে ওর স্বামী নিরুদ্দেশ, কিন্তু আমার তাতে যথেষ্ট সন্দেহ হয়—

১মা। আমরা এক ঘরে তিনজন ক'রে রয়েছি, কিন্তু ওর জন্য একটা স্বতন্ত্র ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

২য়া। আবার একজন ঝি রাখা হয়েছে—

৩য়া। তা না হ'লে কি ক'রে চলবে? ও যখন ডিউটিতে যাবে তখন ছেলে দেখবে কে? তা ছাড়া, ঝির মাইনে তো ও নিজে দেয়—

হাসি। নিজে দেয়! তোমার কথা শুনে বাঁচি না—

৩য়া। এই চুপ! ডাক্তারবাবু আসছেন।

২য়া। অনেক দিন সিনেমা যাওয়া হয়নি, চল্ একদিন যাওয়া যাক।

ডাক্তার বিভাস বোসের প্রবেশ

বিভাস। মালতী দেবীকে দেখেছেন?

১মা। না। এদিকে তো আসেনি।

২য়া। হয়ত' তার কোয়ার্টারে আছে।

বিভাস। আচ্ছা।

৩য়া। বসবেন?

বিভাস। না, কাজ আছে।

প্রস্থান

হাসি। কাজ আছে, না, ছাই আছে। এখন চললেন মালতীর কাছে। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে! রোজ রাত্রে তার ঘরে বসে গল্প, হৈ চৈ। আমরা যেন ন্যাকা, কিছু বুঝি না।

১মা। হ্যাঁ রে হাসি, ঐ ছেলেটা আমাদের ডাক্তারবাবুর মত অনেকটা দেখতে, না?

হাসি। তোমার বুঝি এতদিন পরে সেই খেয়ালটা হ'ল! আমি সেটা অনেকদিনই ধরেছি। আগে থেকেই ওদের জানাশুনা ছিল। ছেলে হ'তে মানুষ করবার অসুবিধা হবে বলে চাকরি দিয়ে এখানে এনে রেখেছে।

২য়া। ঐটুকু মেয়ের পেটে এত শয়তানি!

হাসি। ঐটুকু মেয়ে! তোমার মাথা খারাপ। কম ক'রে ওর বয়স আটাশ হবে।

৩য়া। না, না, বছর আঠারো-উনিশ হবে।

হাসি। শোন কথা। দশ বছর আগে হয় ত তাই ছিল।

১মা। কিন্তু এ রকম বেহায়াপনা আমরা কতদিন সহ্য করব?

হাসি। বেশীদিন না। কলকাঠি টেপা হয়েছে। জারিজুরি সব ভেঙে যাবে।

২য়া। কি রকম?

হাসি। দেখতেই পাবে। এখন কিছু বলব না।

৩য়া। তোমায় ডাক্তারবাবু কিছু বলেন কি?

হাসি। (ঝঙ্কার দিয়ে) কিসের কি বলবেন?

৩য়া। এই, একসঙ্গে সিনেমা যাওয়ার কথা, কিংবা লেকে বেড়াতে যাওয়ার কথা—

হাসি। এর পর আবার ওঁর সঙ্গে আমি যাব? আমায় কি ভেবেছ?

২য়া। আগে তো তোমায় খুব স্নেহ করতেন।

হাসি। সে সব কথায় কি আর কোন প্রযোজন আছে?

১মা। ঐ কে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এদিকে আসছেন।

হাসি। ডাক্তারবাবুর বাবা। এই হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। তুমি এঁকে দেখনি, ওরা দেখেছে।

বৃদ্ধের প্রবেশ

হাসি। (এগিয়ে গিয়ে নমস্কার ক'রে) আসুন, ভাল আছেন?

সকলের নমস্কার

সনৎ। কে, হাসি না? চিনতে পারি না—অনেকদিন দেখিনি কি-না? এই তো সেই কমলা আর সুধা, না? এইটিকে তো চিনতে পারছি না—

হাসি। নতুন এসেছে, এর নাম বাণী।

সনৎ। বেশ বেশ। কাজকর্ম্ম কেমন চলছে?

হাসি। ভালই।

সনৎ। দেখ মা, তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।

হাসি। কি, বলুন।

সনৎ। মালতী ব'লে কোন নতুন নার্স এসেছে?

১মা। হ্যাঁ। এই বছরখানেক হ'ল এসেছে।

সনৎ। মেয়েটি কি রকম?

২য়া। বয়স আঠারো-উনিশ হবে, অন্তত সে তাই বলে। দেখতে ভালই। তবে—

সনৎ। তবে কি?

৩য়া। তার আবার একটি ছেলে আছে—

হাসি। অথচ তার স্বামীর সম্বন্ধে সে কিছু বলতে চায় না।

১মা। জোর করলে বলে, "স্বামীর নাম মেয়েদের করতে নেই—"

২য়া। কখনও বলে, "স্বামী নিরুদ্দেশ—"

৩য়া। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, ওর ভেতর অনেক গোলমাল আছে।

হাসি। বলুন, এ রকম ক্ষেত্রে আমাদের একসঙ্গে থাকতে কি রকম বিশ্রী লাগে না!

সনৎ। বটেই তো। তা তোমরা বিভাসকে বলো না কেন?

হাসি। তিনি তো মালতী বলতে অজ্ঞান। কেউ কিছু বললেই তিনি ফোঁস ক'রে ওঠেন। আর ওকে তো উনিই একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

১মা। রাত্রি এগারোটা-বারোটা অবধি ওর ঘরে বসে ডাক্তারবাবু গল্প করেন—

২য়া। ওর আর ওর ছেলের সমস্ত খরচ প্রায় ডাক্তারবাবু বহন করেন বললেই চলে—

৩য়া। বিকেলে ছেলেকে নিয়ে সে এইখানে বেড়াতে আসে, ডাক্তারবাবুও সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত হন।

সনৎ। ওঃ! (একটু ভেবে) আচ্ছা, ছেলেটি দেখতে কেমন?

হাসি। কিছু যদি না মনে করেন তো বলি।

সনৎ। মনে করব কেন? বল না।

হাসি। অবিকল—ডাক্তারবাবুর মত।

সনৎ। বিভাসের মত?

১মা। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের সকলেরই সেই মনে হয়।

২য়া। এই নিয়ে হাসপাতালে সকলেই কানাঘুষো করে।

৩য়া। মধ্যে মধ্যে দু-একজন রুগীও আমাদের দু-চারটে কথা বলে।

হাসি। একসঙ্গে আমরা সকলে থাকি, কাজেই আমাদের ওপরও লোকের ধারণা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সনৎ। বেশ। আমি আজই ওকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করব।

হাসি। ঐ আসছে। আপনি যদি ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে দেখতে চান তো একটু তফাতে থাকুন। আমরাও সরে পড়ছি।

সনৎ। ওরা এইখানেই আসবে?

হাসি। হ্যাঁ। সন্ধ্যার সময় আমাদের সব ডেলী রিপোর্ট সাবমিট করতে চলে যেতে হয়। সেই সময় ওঁরা এখানে বসে অনেকক্ষণ গল্প করেন।

সনৎ। ওকে রিপোর্ট দিতে হয় না?

হাসি। না। ওর কথা আলাদা। আচ্ছা, আমরা পালাই—

নার্সদের প্রস্থান

সনৎবাবু আস্তে আস্তে একটা গাছের পিছনে গিয়ে লুকোলেন। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। পরে ছেলের হাত ধরে মালতীর প্রবেশ। পশ্চাতে বিভাস

বিভাস। আজ কেমন আছ?

মালতী। ভাল।

বিভাস। আর অম্বল হয় নি তো?

মালতী। না।

বিভাস। ছেলের আর জ্বর হয় নি নিশ্চয়ই?

মালতী। না। সেই ওষুধটা খেয়ে ভাল আছে।

খোকা। মা, ব'।

মালতী। খেলা কর।

খোকা বল খেলতে লাগল

বিভাস। সে বইটা পড়া হয়ে গেছে?

মালতী। হ্যাঁ, শেষ হয়ে গেছে। যদি অসুবিধা না হয় তো আর একটা দেবেন?

বিভাস। না না, অসুবিধা কিসের?

ছেলেটি বল খেলতে খেলতে হঠাৎ পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠল। বিভাস তাড়াতাড়ি তাকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল

বিভাস। আহা হা, লাগেনি তো? কাঁদে না—

এমন সময় সনৎবাবু বেরিয়ে এলেন

বিভাস। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে—আপনি—

সনৎ। হ্যাঁ—আমি। (ছেলের দিকে) এ কে?

বিভাস। (মালতীকে দেখিয়ে) এঁর ছেলে।

সনৎ। তা জানি। আমায় দাও।

বিভাস ইতস্তত করতে লাগল

সনৎ। (মালতীর প্রতি) আমার কোলে ছেলে দিতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

মালতী। (ভীতভাবে) আজ্ঞে, না।

বিভাসের কোল থেকে ছেলে নিয়ে সনৎবাবুর কোলে দিল

সনৎ। (আদর করে) আমি তোমার দাদু হই, বুঝলে?

খোকা। দাদু!

সনৎ। হ্যাঁ দাদু। চমৎকার দেখতে হয়েছে। কি নাম রেখেছ?

মালতী। নাম?

বিভাসের প্রতি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল

বিভাস। নাম? কই নাম তো—

সনৎ। রাখা হয় নি—কেমন? (ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত হতে লাগলেন) তা আমাকে জানান হয় নি কেন? তোমার যখনই বিবাহের চেষ্টা করেছি, তখনি আপত্তি করেছ; এখন তার কারণ বুঝতে পেরেছি। আমাকে না জানিয়ে গোপনে বিবাহ করবার উদ্দেশ্য কি? এবং এরূপ ভাবে বাস করারই বা কারণ কি? আমার বংশধরকে লোকে হীনচক্ষে দেখে। আমার পৌত্র—

বিভাস ও মালতী। কি বলছেন আপনি?

সনৎ। চুপ কর। আমাকে রাগিও না। না জানিয়ে বিয়ে করেছ—

বিভাস। বিয়ে করেছি! কি বলছেন সব যা-তা—

সনৎ। বিয়ে করনি? কেন? দরকার মনে করনি? ছেলে হয়েছে—

বিভাস। ও ছেলে আমার নয়—

মালতী। আমারও নয়—

সনৎ। বাজে বোকো না। আমার এতখানি বয়স

হ’ল, কত লোক চরিয়ে পয়সা রোজগার করলুম, তোমাদের কথায় ভুলছি না। যা হয়ে গেছে, তার আর কোন চারা নেই। —আমি অবিলম্বে বিবাহের ব্যবস্থা করছি। ছিঃ ছিঃ,তোমাদের আজকালকার ছেলেমেয়েদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—

বিভাস। আপনি তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করছেন না। আজ যদি মহাদেববাবু বেঁচে থাকতেন তা হ’লে তিনি সব পরিষ্কার ক’রে দিতে পারতেন—

সনৎ। আমায় বকিও না বিভাস। মৃত ব্যক্তি যে কোন সাক্ষ্য দিতে পারে না তা আমি জানি। তাঁর মৃত আত্মার অসম্মান কোরো না।

বিভাস। আপনি উত্তেজিত হবেন না—

সনৎ। আমি সব’জেনেছি। এখন অস্বীকার করার চেষ্টা বৃথা। আজই ওর জিনিষপত্তর তোমার কোয়ার্টারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। নার্সদের কোয়ার্টারে ওদের আর ফেলে রাখা উচিত নয়। যত শীগ্‌গির সম্ভব আমি এদের নিয়ে দেশে চলে যাব।

মালতী। ও ছেলে কিন্তু—

সনৎ। সেখানে ভালই থাকবে। বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি চললুম, রাত্রি হয়ে গেছে, হিম পড়ছে। তুমি এখুনি ওর জিনিষপত্তর নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

সনৎবাবুর ছেলে সহ প্রস্থান। দু’জনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল

বিভাস। কোত্থেকে কি সব—

মালতী। উনি মনে করলেন ও আমার—

বিভাস। উনি তো বিয়ে না দিয়ে ছাড়বেন না—

মালতী। জোর ক’রে কিংবা দয়া ক’রে আমাকে এই মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে আপনাদের গ্রহণ করতে হবে না। তা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না।

বিভাস। না, না, তোমার কথা বলছি না। তোমার খোকার—

মালতী। আমার নয়—

বিভাস। (রাগত ভাবে) হ্যাঁ হ্যাঁ, তা সবই জানি—

মালতী। (চেঁচিয়ে) আমি কিন্তু বার বার বলেছি, ও ছেলে আমার নয়। আমার ওপর আপনারা একটা মিথ্যে সন্দেহ ক’রে—

বলতে বলতে কেঁদে ফেললে। বিভাস হতাশভবে চুপ ক’রে দাঁড়িয়ে রইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

হারীত সোমের ডিটেকটিভ ব্যুরো। আপিসে একটি টেবিল, গোটা চারেক চেয়ার, একটা সোফা। ব্যুরোর নাম বড় বড় অক্ষরে প্রাচীর-পত্রে লেখা। শার্লক হোমস, রবার্ট ব্লেক ইত্যাদি ডিটেকটিভ গল্পের বই আলমারীতে সাজান। মিষ্টার সোম ও তার অ্যাসিষ্টান্ট ডাক্তার সুদর্শন দেব জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছেন

হারীত। ঐ যে ছাতা-হাতে লোকটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ও হ’ল একজন কেরাণী।

সুদর্শন। আর ঐ যে মেয়েটি বই হাতে বাস থেকে নামল, ও স্কুলে কিংবা কলেজে পড়ে।

হারীত। আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেখছি তোমারও ইন্‌টিউশনের ক্ষমতা বেড়ে যাচ্ছে।

সুদর্শন। তুমি হ’লে আমাদের শার্লক হোমসের মোস্ট আপটু-ডেট সংস্করণ।

হারীত। আর তুমি আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াট্‌সন্। এই নতুন লাইনে নামাটা মন্দ হয় নি। আর সব ব্যবসাই তো একেবারে ভরা—

সুদর্শন। কিন্তু এ ব্যবসা যে বড় ফাঁকা।

হারীত। তবে উইদ আওয়ার ব্রেণ (হঠাৎ বাইরে দেখে লাফিয়ে উঠল) চুপ, এসেছে এসেছে—

সুদর্শন। কি হ’ল ?

হারীত। একজন মক্কেল। দেখ কি রকম পোজ্ নি। তুমি একটা বই নিয়ে সোফায় বস।

সুদর্শনের তথাকরণ। একজন লোকের প্রবেশ

হারীত। বসুন। আপনি নিশ্চয়ই কোন মার্চ্চেণ্ট আপিসে কাজ করেন ?

আগন্তুক। আমি দুধের ব্যবসা করি।

হারীত। ঠিক হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধে কি একদল লোক মিথ্যে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছে—

আগন্তুক। আজ্ঞে না—এই কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখে—

হারীত। ও আর বলতে হবে না। আগেই বুঝতে পেরেছি। আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যাই চুরি যাক না কেন—

আগন্তুক। আহা—সবটা শুনুন আগে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চুরি যাবে কোত্থেকে, আমি বিয়েই করিনি। আপনারা

বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—"আপনার জীবন যদি বিপদসঙ্কুল হয়ে থাকে, আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, গয়না তৈজস-পত্র যদি চুরি গিয়ে থাকে তবে আমাদের কাছে আসুন। যা হারাবে সবই আমরা খুঁজে দিতে পারি।"

হারীত। পারি বই কি। আপনার তৈজস-পত্র—

আগন্তুক। আজ্ঞে না—আমার—

হারীত। কিছু সঙ্কোচ করবেন না। আমার সামনে যা বলবেন আমার বন্ধুবর ডাক্তার সুদর্শন দেবের সামনে তা বলতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করি।

আগন্তুক। আমার—বুঝলেন কি-না—গরু হারিয়েছে। এ যে-সে গরু নয়। টালিগঞ্জে যে প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। সবশুদ্ধ চারজন গরু প্রদর্শনীতে এসেছিল। আমার দাদার শ্বশুর মহাশয় প্রদর্শনীর সেক্রেটারী ছিলেন—

হারীত। (খুব গম্ভীরভাবে) আমায় একটু চিন্তা করতে দিন। সুদর্শন, তুমিও চিন্তা কর।

দুজনে কপালে হাত দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে চিন্তা করতে লাগল

আগন্তুক। (কিছুক্ষণ পরে) আমায় আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে—

হারীত। (চাপা কণ্ঠে) দেখুন, ব্যাপারটা গুরুতর। প্রত্যেক স্টেপ ভেবে চিন্তে নিতে হবে। আর জিনিষটা খুব গোপনে করতে হবে—যেন কাক পক্ষী টের না পায়। কিছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আচ্ছা, এইবার কাজে লেগে যাওয়া যাক। সুদর্শন, তুমি নোটবুকে সব টুকে নাও। খুঁটিনাটি গুছিয়ে বলুন। কখন কি কোন্ কাজে লেগে যাবে কিছু বলা যায় না। হুঁ—নাম?

আগন্তুক। মুরলীধর মহাপাত্র।

হারীত। বাপ মা?

আগন্তুক। বাপ মারা গেছেন, মা আছেন।

হারীত। তাদের আর কোন।

আগন্তুক। আজ্ঞে না—আমিই তাঁদের একমাত্র সন্তান।

হারীত। (লাফিয়ে উঠে) না—না—আমি গরুর কথা জিজ্ঞেস করছিলুম।

আগন্তুক। তা তো বুঝতে পারিনি।

হারীত। আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে। সুদর্শন ওগুলো কেটে দিয়ে আবার নতুন ক'রে নোট লিখে নাও। বলুন—গরুর নাম? বেশ ভেবে বলবেন।

মুরলী। মুঙলী।

হারীত। জন্মস্থান?

মুরলী। বঁড়শে।

হারীত। রঙ?

মুরলী। শাদা।

হারীত। শিঙ?

মুরলী। দেড়টা।

হারীত। তার সাইজ?

মুরলী। কার? গরুর না শিঙের?

হারীত। শিঙের।

মুরলী। মাপা নেই।

হারীত। গরুর?

মুরলী। ঠিক বলতে পারি না। আমার বুক অবধি উঁচু হবে।

হারীত। সুদর্শন, হাইটটা মেপে নাও।

সুদর্শন। (মাপতে মাপতে) উঁহু ঝুঁকবেন না। ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়ান। কোন্ অবধি দেখিয়ে দিন। হয়েছে—হাইট ৩ ফুট—১০½ ইঞ্চি।

হারীত। নাকে ডগা থেকে লেজের ডগা পর্য্যন্ত ক'ফুট হবে?

মুরলী। ঠিক বলতে পারিছি না।

হারীত। পাঁচ ফুট?

মুরলী। তা হতে পারে।

সুদর্শম। দশ ফুট?

মুরলী। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

হারীত। লিখে নাও, পাঁচ হইতে দশ ফুট পর্য্যন্ত। ক'টা পা?

মুরলী। চারটে। ও তো কম-বেশী হয় না।

হারীত। কেন হবে না—এই তো আপনার গরুর দেড়টা শিঙ।

মুরলী। আজ্ঞে না—চারটে পাই আছে।

হারীত। ভাল। এই অবধি বেশ হ'ল। এখন নেক্সট্ পয়েণ্ট। আপনার এই হারানো পদার্থটির ছবি আছে?

মুরলী। আছে। প্রাইজ পাবার পর তোলা হয়েছিল। এই নিন।

ছবি দিল। হারীত ও সুদর্শন মন দিয়ে দেখতে লাগল

হারীত। যাক, এই দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

সুদর্শন। অগত্যা। উপায় কি ?

মুরলী। কেন ? ছবিতে কি দোষ হয়েছে ?

হারীত। অনেক দোষ। প্রথমত সব সময় গরুর গলায় মালা থাকবে না ; দ্বিতীয়ত তার পাশে কাপ হাতে আপনি থাকবেন না ; আর তৃতীয়ত এবং সেইটাই সবচেয়ে মুস্কিল, আপনার পাশে দাঁড়িয়ে গরুর মুখে চোখে যে একটা আত্মীয়তার ভাব ফুটে রয়েছে—অন্য সময় সেই ভাবটা থাকবে না। সুদর্শন, কে চুরি করেছে বুঝতে পারছ ?

সুদর্শন। না। তুমি কিছু আন্দাজ করেছ নাকি ?

হারীত। হ্যাঁ।

সুদর্শন। কে ?

হারীত। ঐ দাদার শ্বশুর।

সুদর্শন। না না—

হারীত। নিঃসন্দেহ।

মুরলী। তা কখনও হতে পারে না।

হারীত। তা যদি না হয়, তবে কালু গুণ্ডা।

মুরলী। আপনারা কি জানতে পেরে গেছেন কে চুরি করেছে ?

হারীত। নিশ্চয়ই। চুরির ঢঙ্ দেখেই আমরা ধরে ফেলি---কে দোষী।

মুরলী। তবে গিয়ে আজই ধরে ফেলুন।

হারীত। তাড়াতাড়ি করলে আমাদের একাজ চলে না। অবজারভেশন্ দরকার। ধরতে হবে তো বামাল। আচ্ছা, এইবার খাওয়ার কথা। সুদর্শন মনে আছে, নবাব খাপ্পাখানের বেগমের বেরাল হারিয়ে যেতে আমরা তার খাওয়া দেখে কি রকম ধরে ফেলেছিলুম—

সুদর্শন। সে ঘটনাটা আমি লিপিবদ্ধ করেছি। আর সেই রাজা ক্যাবলাকান্তের ইঁদুর--

হারীত। (হেসে) সেও এক অদ্ভুত ব্যাপার। যাক, আপনার গরু কি খায় ?

মুরলী। কি খায় মানে ? সবই খায়।

হারীত। মানুষ খায় ?

মুরলী। কোন গরুতেই তা খায় না বোধ হয়। তবে আমার গরু জুতো থেকে বই পর্য্যন্ত সবই খেয়ে ফেলে।

হারীত। কি জুতা ? পেটেণ্ট লেদার, ক্রোম, কাফ্—

মুরলী। সব। ওসব বাছ-বিচার নেই।

হারীত। আর বই মানে ? কি সাইজের ? কাদের পাব্লিকেশন ? পদ্যের না গদ্যের ? ছবি শুদ্ধ, না অমনি ? মলাট নরম, না শক্ত ?

মুরলী। সব রকমই চলতে পারে।

হারীত। কেসটা খুব ঘোরাল মনে হচ্ছে না ?

সুদর্শন। রীতিমত ঘোরালো। একটা পয়েণ্ট ঠিক ক্লিয়ার হ'ল না। এক একটা বইয়ের ওজন কত, আর একসঙ্গে বিশ্রাম না ক'রে কতগুলো খেতে পারে জানা দরকার।

হারীত। ঠিক বলেছ।

মুরলী। তাতে কি লাভ ?

হারীত। কোন হারানো গরুর সন্ধান পেলে তাকে সেই সংস্করণের ততগুলো বই খাইয়ে যাচাই করতে হবে, সেটা আপনার কি-না ?

সুদর্শন। আপনার গরুকে খুঁজে বার করবার এর চেয়ে সুবিধাজনক এবং সহজ উপায় আর আছে কি ?

মুরলী। আজ্ঞে না। তা—গরু পাওয়া যাবে কি ?

হারীত। নিশ্চয়ই যাবে। এইবার পুরস্কারের কথা। একটা পুরস্কার ঘোষণা করলে কাজ অনেক তাড়াতাড়ি এগোবে। ধরুন, যদি আপনি হারানো সামগ্রীর জন্য পাঁচশ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন, আর আমাদের মেহন্নতের জন্য আর পঁচাশ' টাকা দেন—

মুরলী। কি বলছেন আপনি ? গরুটা কিনেছিলুম মাত্র দেড় শ টাকায়। তাকে খুঁজে পাবার জন্য খরচ করতে হবে এক হাজার টাকা। দরকার নেই আমার গরু পেয়ে—

হারীত। আপনি কত অবধি দিতে রাজী আছেন ?

মুরলী। সবশুদ্ধ টাকা দশেক।

হারীত। তাতে কি হবে ?

সুদর্শন। আমাদের ঘোরাঘুরিতেই তো তার চেয়ে বেশী খরচ হয়ে যাবে। তার ওপর মেহন্নত—

মুরলী। বেশ। না হয় আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু পনেরোর চেয়ে এক পয়সা বেশী দেব না।

হারীত। আচ্ছা তাই। এ আমাদের পরোপকারের ব্রত। পয়সার জন্য আটকাবে না। তবে অর্দ্ধেক অগ্রিম দিতে হবে।

মুরলী। অর্দ্ধেক তো আমার কাছে এখন নেই। মাত্র পাঁচ টাকা আছে—

সুদর্শন। তাই এখন দিয়ে যান। ঐ যে বললুম, পয়সাই সব নয়।

মুরলী। (সুদর্শনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে) এই নিন। কবে নাগাদ খবর পাব ?

হারীত। এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার বাড়ীতে গরু পৌঁছে দিয়ে আসব। মধ্যে একদিন এসে বাড়ীর ঠিকানা আর গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে আমাদের কাজ কতদূর এগেলো খবরও নিয়ে যাবেন।

মুরলী। ঠিকানাটা আজই না হয় আপনাদের কাছে রেখে যাই—

হারীত। কোন তাড়াতাড়ি নেই। সেইদিনই সব হবে। আচ্ছা নমস্কার—

মুরলী নমস্কার ক'রে চলে গেল। সুদর্শন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল

হারীত। সুদর্শন, কি ভাবছ ?

সুদর্শন। এ ভদ্রলোকের গরুর কি হবে ?

হারীত। কিছু ভেব না। এখনও সাত দিন সময় আছে। আমি সব ঠিক ক'রে দেব। কিন্তু জিতেনবাবুর যে এখুনি আসবার কথা।

সুদর্শন। রিপোর্ট সব ঠিক ক'রে রেখেছি।

হারীত। আজ সকালে নবদ্বীপকে "অন দি স্পট্" পাঠিয়ে দিয়েছি। দশটার একটু পরেই এখানে আসবে।

সুদর্শন। দশটা তো বাজল।

হারীত। (জানলা দিয়ে বাইরে দেখে) ভদ্রলোকের বিল কত হয়েছে ?

সুদর্শন। দু'শো টাকার।

হারীত। কত এডভান্স দিয়ে গিছলেন ?

সুদর্শন। দেড়শো।

হারীত। আমাদের কাজকর্ম্ম মন্দ হচ্ছে না। মক্কেল খুশী হবে বলেই মনে হয়। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কাজে বস। মনে রেখ ডিটেক্‌টিভরা সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। কখনও গল্প করে না।

সুদর্শন একটা খাতা হাতে বসল। হারীত রিপোর্টগুলো পড়তে লাগল। এমন সময় শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষের ঘরে প্রবেশ

হারীত। এই যে জিতেনবাবু, আসুন, আসুন, বসুন।

জিতেন। (বসে) তারপর, কোন খবর পেলেন ?

হারীত। আপনার ছেলের ছবির একহাজার কপি ছেপে আমাদের সহকর্ম্মীদের দেব মনে করেছি, আর "লস্ট, লস্ট, লস্ট" ছবিশুদ্ধ প্লাকার্ড দশ হাজার ছাপিয়ে চারিধারে মেরে দিতে হবে। কাজ আমাদের ভালই এগোচ্ছে। সমস্ত দিকে কর্ম্মীদের লাগিয়ে দিয়েছি। সুদর্শন দু'-চারটে রিপোর্ট পড়ে জিতেনবাবুকে শোনাও।

সুদর্শন খাতা খুলে পড়তে লাগল

সুদর্শন। বারাসতে সন্ধান পেয়েছিলুম। হুবহু মিলে গিছল। সেই নাক সেই মুখ সেই চোখ। তাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হয়ে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলুম, "ছেলেটি কি আপনাদের ?" ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে, চোখ মুখ দেখেই ধরে ফেললুম—যদিও মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। বললেন, "না কেন ?" প্রশ্ন করলুম, "কোথেকে কুড়িয়ে পেয়েছেন ?" তিনি চটে বললেন, "কি বলছেন পাগলের মত ? কুড়িয়ে পাব কেন ? ও আমার বোনের ছেলে, এখানে তারা বেড়াতে এসেছে।" আমি না দমে বললুম, "ওসব আমাদের জানা আছে। এখন লক্ষ্মী ছেলের মত ছেলেটিকে আমাদের হাণ্ডওভার করুন।" তিনি রেগে গালমন্দ ক'রে আমাকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলেন। অবশ্য আমিও ওঁকে দু-ঘা দিতে পারতুম, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য বিচলিত না হওয়া। এমন সময় ছেলেটি বেরিয়ে এল। তাকে দেখে হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, আপনার ছেলের বয়স দু বছর আর এর বয়স আট বছর অথবা তার চেয়ে বেশী। আমি সেখান থেকে চলে এলুম। হাল ছাড়িনি। অন্য জায়গায় সন্ধান চালাচ্ছি। ইতি

হারীতকৃষ্ণ সোম

সুদর্শন। দেখেছেন কি রকম সব আপ এণ্ড ডুইং!

জিতেন। বটেই তো।

সুদর্শন। আর একটা শুনুন। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সন্ধান পেয়েছিলুম। ছবিতে আর সে চেহারাতে কোন পার্থক্য ছিল না। চাকরের কোলে ছিল, একজন ভদ্রলোক ও মহিলা সঙ্গে ছিলেন। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনাদেরই?" ভদ্রলোক আমার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "না।" বুঝলুম ঠিক ধরেছি। আবার প্রশ্ন করলুম, "কত বয়স হবে?" তিনি উত্তর দিলেন "দু'বছর।" জিজ্ঞেস করলুম, "কোত্থেকে কুড়িয়ে পেলেন?" তিনি তার জবাব না দিয়ে উল্টে আমায় প্রশ্ন করলেন, "কদিন আগে' ছাড়ান পেয়েছেন?" এমন সময় একটি যুবক ও তরুণী এল। মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে মা?" ভদ্রমহিলা হেসে উত্তর দিলেন, "একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। তোর মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করছে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছি।" দেখলুম যুবক আস্তীন গুটোচ্ছে। তাড়াতাড়ি পাতলা হয়ে পড়লুম। আরও সন্ধান করছি। ইতি

সুদর্শন দেব

হারীত। দেখছেন, সুদর্শনের কি রকম বুদ্ধি!

জিতেন। একটু অতিবুদ্ধি হয়ে গেছে।

হারীত। "অন দি স্পট" একজন এখন কাজ করছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ট্রেসার—

জিতেন। ট্রেসার কি!

হারীত। যে সমস্ত ক্লু ট্রেস করে।

সুদর্শন। ঐ যে সে আসছে।

জিতেন। কিন্তু দু'বছর আগের ঘটনার আপনার ট্রেসার অন দি স্পট কি ক্লু পাবেন?

হারীত। দোষী অন দি স্পট আসবেই।

নবদ্বীপ ঢোলের প্রবেশ

নবদ্বীপ। (চেয়ারে বসে) উঃ, সমস্ত সকালটা যা মেহন্নত গেছে!

হারীত। সে তো আমরা জানিই। সেই জন্যই তো এই সবচেয়ে শক্ত কাজের ভারটা তোমার উপর চাপিয়েছি। কিছু পেলে?

নবদ্বীপ। নবদ্বীপ ঢোল কখনও কোন কাজে আজ অবধি অকৃতকার্য্য হয়েছে?

হারীত। না। সে কথা তুমি বলতে পার বটে।

সুদর্শন। তোমার কার্য্য-প্রণালীটা জিতেনবাবুকে শুনিয়ে দাও।

নবদ্বীপ। ভোরে উঠেই লেকের ধারে গিয়ে পায়চারী করতে লাগলুম। দেখি একটা গাছের পাশে ন্যাকড়ায় জড়ানো কি যেন পড়ে আছে। তখুনি বুঝলুম এই আপনার হারানো ছেলে। বলেছিলেন লেকের ধারে ফেলে গেছে—

জিতেন। সে তো দু'বছর আগেকার কথা। এখনও কি সেই রকম ভাবে লেকের ধারে পড়ে থাকবে!

নবদ্বীপ। চেষ্টার ত্রুটি করতে নেই। গিয়ে ন্যাকড়া খুলে দেখি একজোড়া ছেঁড়া চটী জুতো। কিন্তু এতেই দমে গেলুম না। "একবার নাহি পার দেখ শতবার।" এই হ'ল আমাদের ব্যবসার মূল মন্ত্র। খুঁজতে খুঁজতে দেখি, এক বেঞ্চিতে একটি ছোট ছেলে বসে আছে। পকেট থেকে আপনার ছেলের ছবি বের করে মিলিয়ে দেখলুম—একেবারে মিলে যাচ্ছে। কোথাও একটু ভুল নেই। ছেলেটাকে নিয়ে আসব বলে কোলে করেছি এমন সময় একটি চাকর এসে হাজির। "ছেলে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?" বলে এমন চীৎকার আরম্ভ করলে যে সব লোক জড় হয়ে গেল। আমার বুদ্ধিটা খুব তীক্ষ্ণ। তখনই বুঝতে পারলুম, কোথায় ভুল হয়েছে। তাই, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম, "ছেলেটা বেশ দেখতে। একটু আদর করছিলুম।" এই বলে চাকরের হাতে একটা টাকা দিয়ে সরে পড়লুম। পিছনে শুনলুম একদল লোক, "চোর, গয়না চুরি করতে এসেছিল" বলতে লাগল। একদল লোক "পাগল" বললে। দু-একজন বৃদ্ধ পুলিশ ধরিয়ে দেবার পরামর্শ দিলেন। আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। একটু এগিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি ঝি ছেলে কোলে যাচ্ছে। সে যে আপনার ছেলে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না। এগিয়ে গিয়ে কার ছেলে প্রশ্ন করতে, সে হেসে বললে, "যে বাড়ীতে কাজ করি তাদের। তবে এ ছেলে নয়, মেয়ে।" একটুখানির জন্যে ফস্কে গেল।

হারীত। কি রকম করিতকর্ম্মা লোক, দেখছেন?

জিতেন। তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

নবদ্বীপ। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, চুরি করে জঙ্গলে

কিংবা বস্তীতে লুকোতে হয়। কাছাকাছি কোন জঙ্গল না থাকায় লেকের আশে পাশে বস্তীতে ঘুরতে আরম্ভ করলুম। দু'জনের উপর সন্দেহ হল। তাদের ছেলেদের চেহারাও মিলে গেল। বয়সও দুবছর মনে হল। পুলিশের ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের এখানে আসতে রাজী করিয়েছি। দশটার পর আসতে বলেছি। এই এল বলে। অনেক বকাবকি করতে তারা স্বীকার করেছে যে ছেলে তাদের নয়।

জিতেন। দুটো! আমার তো মাত্র একটি ছেলে হারিয়েছে—

ছেলে কোলে একজন বৃদ্ধের প্রবেশ

নবদ্বীপ। দেখুন, এই আপনার ছেলে তো?

জিতেন। না।

নবদ্বীপ। না মানে? হতেই হবে। হ্যাঁ হে, এ ছেলে তোমার?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে না। কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।

নবদ্বীপ। কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে?

বৃদ্ধ। লেকের ধারে।

নবদ্বীপ। কদিন আগে?

বৃদ্ধ। প্রায় বছর খানেক।

নবদ্বীপ। তখন এর কত বয়স হবে?

বৃদ্ধ। এক বছর।

নবদ্বীপ। হ'ল তো। এ আপনার ছেলে না হয়ে যায় না।

ছেলে কোলে একটি মেয়ের প্রবেশ

হারীত। তুমি কি চাও?

মেয়ে। (নবদ্বীপকে দেখিয়ে) উনি আমায় পুলিশে দেবেন ভয় দেখিয়ে এখানে আসতে বাধ্য করেছেন। আমার নিজের ছেলে না হ'লেও একে আমি এক বছর বয়স থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। নিজের ছেলের মতনই মায়া পড়ে গেছে।

হারীত। তা হ'লে এ ছেলে তোমার নয়?

মেয়ে। আজ্ঞে না।

হারীত। কোথায় পেলে?

মেয়ে। লেকের ধারে বছর খানেক আগে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। আমাদের ছেলেপুলে ছিল না, তাই আমি একে মানুষ করছিলুম। উনি গিয়ে জোর করে—

ক্রন্দন

নবদ্বীপ। আহা হা, কাঁদ কেন? পরের ছেলে চিরকাল তো রাখা যায় না। সন্ধান পেলেই তারা নিয়ে যাবে। কেঁদে আর কি হবে?

সুদর্শন। এ ঠিক আপনার ছেলে। সেই নাক, সেই মুখ, দেখেছেন?

জিতেন। একটুও মিল নেই। এ ছেলে আমার নয়।

সুদর্শন। বলেন কি! হিসেবের গরু কি বাঘে খায়? এঁ ছেলে আপনার হতে বাধ্য।

জিতেন। বার বার বলছি, এ আমার ছেলে নয়—

নবদ্বীপ। যখন কোন ছেলেই আপনার পছন্দ হচ্ছে না, তখন আমরা আর কি করতে পারি?

জিতেন। আপনাদের আর কিছু করতে হবে না। এখানে আসাটাই আমার অন্যায় হয়েছিল।

হারীত। কিন্তু এই যে ছবির একহাজার কপি করতে দিয়েছি—

সুদর্শন। আর দশহাজার প্ল্যাকার্ড—

নবদ্বীপ। আর দেশবিদেশে আমাদের কর্ম্মীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে—

হারীত। এর খরচ?

সুদর্শন। তার চেয়ে এক কাজ করুন। পুরস্কারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন—

নবদ্বীপ। আর একটু ক্ষমাঘেন্না করে একটি ছেলে বেছে নিন—

জিতেন। আপনারা চুপ করুন মশাই। এ কোন ছেলেটি আমার নয়। আমি আপনাদের নামে কেস করব। এখুনি পুলিশে গিয়ে খবর দিচ্ছি। আপনারা সব জোচ্চোর। দেড়শ' টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন, আরও নেবার চেষ্টা করছেন—

হারীত। আপনি স্যর মিছিমিছি রাগ করছেন। যদি আর কিছুদিন সময় দেন—

সুদর্শন। তা হ'লে হয়ত আমরা আপনাকে—

নবদ্বীপ। আরও গুটিকতক ভাল ছেলে জোগাড় করে দিতে পারি।

জিতেন। ধন্যবাদ। যা আপনারা আমার জন্য করেছেন এই যথেষ্ট।

রেগে প্রস্থান

তিনজনে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল

বৃদ্ধ। (একটু পরে) আমাদের টাকা দিন। আমরা বাড়ী চলে যাই।

হারীত। (চটে) টাকা দেবে না—আরও কিছু! যাও, এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

মেয়ে। যাচ্ছি। কিন্তু আপনাদের রাস্তায় বার হওয়া বন্ধ করে দেব। এখুনি বস্তীতে গিয়ে সকলকে আপনাদের কথা বলছি।

বৃদ্ধ। চেয়ার টেবিল সব নিয়ে যাব। ভেবেছেন কি?

বৃদ্ধ ও মেয়ের ছেলে নিয়ে প্রস্থান

হারীত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ব্যাড্ লাক্। ফার্ষ্ট কেস্‌টাই আন্‌সাক্সেস্‌ফুল হয়ে গেল!

মাথায় হাত দিয়ে তিনজনে আবার বসল

তৃতীয় অঙ্ক

ডাক্তার বিভাস বসুর কোয়ার্টার। মালতী একলা বসে সেলাই করছে আর গুন গুন ক'রে গান গাইছে

গান

মন্দির রচেছি হৃদয় মাঝারে নিদয় নিঠুর শ্যাম
ক্ষণেক আসিয়া দাঁড়াও হাসিয়া হোয়ো না হোয়ো না বাম ॥
তোমার চরণ-পরশ লাগিয়া
সুপ্ত পরাণ উঠিবে জাগিয়া
জীবন সফল হইবে হেরিয়া নয়নেরি অভিরাম ॥
আকুল মিনতি শুনিতে না পাও
বিমুখ হইয়া কেন গো কাঁদাও
বল প্রভু বল, বৃথাই কি তবে ভকত বৎসল নাম ॥

বিভাসের প্রবেশ। হাসপাতাল থেকে ফিরল। ষ্টেথেস্কোপটা টেবিলে রেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল

মালতী। চা আনতে বলব?

বিভাস। হুঁ, বল। সেই নতুন বইখানা কোথায়?

মালতী। টেবিলের ওপরই রয়েছে।

বলে বইখানা না দিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিভাস উঠে বইখানা নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। পড়ছে এমন সময় তুষারের প্রবেশ। সনৎবাবু খোকার নাম তুষার রেখেছেন

তুষার। বাবা, আমাল নল—

ষ্টেথেসকোপ নিতে গেল

বিভাস। হাত দিও না। যাও এখান থেকে—

তুষার। ফু—

বিভাস। মালিকে বল তুলে দেবে।

চাকর চা নিয়ে এসে টেবিলে রেখে চলে গেল। মালতী এসে চেয়ারে বসে আবার সেলাই করতে লাগল

তুষার। মা—কোয়ে—

মালতী। আঃ, বিরক্ত কোরো না।

তুষার। (সেলাইটা টেনে) তুমি—

মালতী। কি দুষ্টুমী কর—

এমন সময় সনৎবাবুর গলা পাওয়া গেল

সনৎ। (নেপথ্যে) তুষ্ দাদু, কোথায় গেলে?

তুষার। এই যে।

সনৎবাবুর প্রবেশ

সনৎ। দাদু তুমি এখানে, আর আমি তোমায় সারা বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি!

তুষার। দাদু, মা কোয়ে না।

মালতী। কি? কোলে আসবে? এস, এস—(কোলে নিয়ে) মাণিক আমার, সোনা আমার—

তুষার। দাদু, বাবা—

বিভাস। (তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে) খোকা, কাল তোমার নতুন গাড়ী আসবে।

সনৎ। চলো দাদা, এবার আমরা যাই।

তুষার। দাদু, ফু—

সনৎ। হ্যাঁ, তোমায় ফুল তুলে দেব। দাদু, তোমায় কে ভাল বাসে?

মালতী ও বিভাসের দিকে একবার চেয়ে পরে সনৎবাবুর কাছে এসে

তুষার। তুমি। মা—না, বাবা—না।

সনৎ। খালি আমি ভালবাসি?

তুষার। হাঁ, তুমি ভায়ো।

সনৎ। (হেসে) বেশ, এই কথা মনে রেখ। চলো, বাগানে গিয়ে ফুল তুলি।

তুষারের হাত ধরে সনৎবাবুর প্রস্থান

বিভাস। আমি আড়াল থেকে তোমার গান শুনছিলুম।

মালতী। চুরি করে?

বিভাস। তাছাড়া আর উপায় কি? চেঁচিয়ে তো কখনও গাইলে না।

মালতী। বাবা শুনলে যদি কিছু মনে করেন।

বিভাস! তোমার ওপর বাবা খুব সন্তুষ্ট। বলেন, এমন চমৎকার কাজের মেয়ে দেখা যায় না।

মালতী। উনি সদাশিব লোক। অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট।

বিভাস। তা বটে, কিন্তু দোষ হচ্ছে এই যে নিজের ছাড়া আর কারও যুক্তি তিনি মানতে চান না। অন্যায়কে প্রশ্রয় তিনি দেন না এবং ওঁর যদি মনে হয় কোন অন্যায় হয়েছে, উনি তখুনি জোর ক'রে তার প্রতিকার করেন। সত্যসত্যই সেটা অন্যায় কি-না, তার প্রতিকার সম্ভব অথবা উচিত কি-না—সে সব কথা ভাবা উনি দরকার মনে করেন না।

মালতী। বাবার এই দোষটা আপনার খুব বেশী ক্ষতি করেছে বোধ হয়—

বিভাস। কোন্ দোষটা?

মালতী। আরও পরিষ্কার ক'রে বলবার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, বুঝতে পেরে না বোঝবার ভান করলে বোঝান যায় না।

বিভাস। যদি বাবা একটা ভুল করেছেন বলি তো এতে দোষের কিছু হবে না নিশ্চয়ই। মিথ্যে করে আমার সম্বন্ধে একটা কুধারণা—

মালতী। আর আপনারা আমার প্রতি অবিচার করেন নি। এই যে দয়া অথবা—

বিভাস। আমার যে কোন দোষ নেই তা তুমি জান। কিন্তু—

মালতী। কিন্তু আমি যে নির্দ্দোষ তার কোন প্রমাণ নেই। এই তো আপনি বলতে চান? একটা গরীব মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন বলে তার ওপর যথেচ্ছা কলঙ্ক চাপাবার অধিকার আপনাদের নেই। আপনি ভয়ে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিবাহটাকে স্বীকার করেছেন তা আমি জানি, কিন্তু আপনার বাবাকে সমস্ত কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন নি কেন?

বিভাস। তিনি কারও কথা শোনেন না। তার ওপর আবার ব্লড প্রেসারের রুগী। উত্তেজনা তাঁর পক্ষে খারাপ।

মালতী। তাই বলে আমার ওপর এই অত্যাচার—

এমন সময় ফুল হাতে তুষারের প্রবেশ

তুষার। মা, ফু—

মালতী তাকে এক চড় মারলে। সে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল

বিভাস। ও কি করলে?

মালতী। এই তো যত নষ্টের গোড়া। কোথাকার কার ছেলে—

বিভাস। সেইটাই তো—

মালতী। (চীৎকার ক'রে) আপনি কি বলতে চান স্পষ্টভাবে বলুন—

বিভাস। (উত্তেজিত ভাবে) বলবার কোন দরকার আছে কি? এমনিতেই তুমি বেশ বুঝতে পারছ—

সনৎবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই চুপ ক'রে গেল। সনৎবাবুর ঘরে প্রবেশ। হাতে একটা গহনার ক্যাটালগ

সনৎ। বৌমা, খোকা কাঁদছে কেন?

মালতী। কি হয়েছে খোকা? কি হয়েছে?

তুষার। দাদু, মা মায়ে।

মালতী। না খোকা, না। সেলাইটা পড়ে গিছল তুলতে গিয়ে কনুই লেগে গেছে।

আদর করতে লাগল

বিভাস। কোথায় লেগেছে খোকা? এস আমার কাছে, আমি ফুঁ দিয়ে দিই। ব্যথা ভাল হয়ে যাবে।

তুষার। (মালতীর প্রতি) না, তুমি ভায়ো না।

সনৎ। এস দাদা, তুমি আমার কাছে এস।

তুষারকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সনৎবাবুর একটা চেয়ারে উপবেশন। একজন বেয়ারার প্রবেশ

বেয়ারা। (বিভাসের প্রতি) আপনার সঙ্গে কে একজন বাবু দেখা করতে চাইছেন।

বিভাস। কে? কি নাম জিজ্ঞেস করেছিস?

বেয়ারা। আজ্ঞে হ্যাঁ, করেছিলুম। তিনি বললেন নাম বললে চিনতে পারবেন না।

বিভাস। আচ্ছা, চল যাচ্ছি।

বিভাস ও বেয়ারার প্রস্থান

সনৎ। বৌমা, তুষুর জামার বোতাম ছিঁড়ে গেছে।

মালতী। বসিয়ে দেব বাবা।

সনৎ। তুমি আজকাল আছ কেমন?

মালতী। ভালই তো রয়েছি।

সনৎ। কিন্তু দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তোমায় কত দিন থেকে বলছি একটু রেস্ট নাও, কাজকর্ম্ম একটু কম ক'রে কর, তা তুমি শুনবে না।

মালতী। কি আর এমন কাজকর্ম্ম।

সনৎ। হ্যাঁ দেখ বৌমা, কাল দ্বিজেনদের ওখানে গিছ্‌লুম। তার বৌমাদের জন্য কি এক রকম নতুন প্যাটার্নের চুড়ী গড়ে এসেছে দেখিয়ে তার মেয়ে কণিকা বল্লে, সেই নাকি আজকালকার ফ্যাশান। এক্ষুণি ক্যাটালগ খানা ওদের চাকর দিয়ে গেল। তুমি দেখ',তো তোমার পছন্দ হয় কি-না?

মালতী। আমার তো অনেক গয়না আছে বাবা।

সনৎ। তা থাকতে পারে, কিন্তু এই রকমের প্যাটার্নের তো নেই।

মালতী। মিছামিছি পয়সা নষ্ট—

সনৎ। (উত্তেজিতভাবে) আমার পয়সা, তোমাদের নয়, সেটা সর্ব্বদা মনে রাখবে। কি বল দাদু ?

তুষার। হ্যাঁ। আমাল পয়তা।

সনৎ। (হাসিয়া) হ্যাঁ, তোমার পয়সা, ঠিক বলেছ।

মালতী। আপনার বেড়াতে যাবার সময় হ'ল। জলখাবার এইখানেই নিয়ে আসব ?

সনৎ। না না, আমিই যাচ্ছি, চল।

তুষার। দাদু, আমি বেই—

সনৎ। বেশ তুমি আর আমি দুজনে বেড়াতে যাব। দুধ খেয়েছ ?

তুষার। দুধ না, বিস্কু।

মালতী। আগে দুধ খেয়ে নেবে চল, তারপর বিস্কুট দেব।

তিনজনের প্রস্থান

বিভাস ও জিতেনবাবুর কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ

বিভাস। তার পর জিতেনবাবু, আপনি কি করলেন ?

জিতেন। বাবা ভয়ানক গোঁড়া ছিলেন। গবর্ণমেণ্টে খুব বড় চাকরি করতেন। আমি কিন্তু একেবারে অপদার্থ ছিলুম। কখন কোন কাজকর্ম্ম করিনি। দেশভ্রমণ করাই আমার একমাত্র নেশা ছিল। যে মেয়েটির কথা বলছি তার সঙ্গে কলকাতায় আলাপ হয়। আমি তাকে সত্যই ভালবেসে ফেলি এবং সেও আমায় ভালবাসত'। গরীবের মেয়ে, আমি তাকে গোপনে বিবাহ করি।

বিভাস। তার পর—

জিতেন। প্রথমে ভেবেছিলুম, সুবিধা মত বাবার কাছে প্রকাশ করবো, কিন্তু—

বিভাস। আপনার বাবা যখন জানলেন—

জিতেন। বাবাকে আমি জানাতে সাহস করলুম না। সুদূর দিল্লীতে তিনি থাকতেন, কলকাতায় বলতে গেলে আসতেনই না। একটা আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি এবং ছবি আঁকা শিখছি এই বলে কলকাতায় বাড়ী ভাড়া ক'রে আমার স্ত্রীকে নিয়ে থাকৃতে লাগলুম। কি সে আনন্দ, কি সে তৃপ্তি। কিন্তু আমার সে সুখ বিধাতার সইল না। বছর খানেক পরে ছেলে হবার সময় আমার স্ত্রী মারা গেল। সে সময় আমার পরিচিত পাড়ার এক গরীব দম্পতি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁরাই ছেলের ভার নেন।

বিভাস। আপনার বাবা তখন বেঁচে ?

জিতেন। হাঁ, ছেলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে সাহস হ'ল না। আর ছেলেও তখন বড্ড ছোট। এদিকে আমার স্ত্রীর শোকে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলুম। ছেলে তাদের কাছেই রইল। আমি আর কলকাতায় টিকতে পারলুম না—দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লুম। অবশ্য মাঝে মাঝে আমি টাকা পাঠাতুম। আর মধ্যে মধ্যে কলকাতায় এসে খোকাকে দেখে যেতুম। এমন সময় খবর পেলুম—বাবার অসুখ। দিল্লীতে গিয়ে পৌছবার দিন দশেক পরেই বাবা মারা গেলেন।

বিভাস। তখন ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন না কেন ?

জিতেন। বাবার অসুখ আর শেষ কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে সময়ে টাকা পাঠাতে পারিনি। একসঙ্গে দুমাসের টাকা এবং ছেলেকে নিয়ে আসবার জন্য একখানা চিঠি লিখে ও ভাড়ার টাকা শুদ্ধ দিয়ে একটা ইনসিওর্ড লেটার পাঠালুম। সেটা ফিরে এল। তাদের সন্ধান নেই।

বিভাস। ভারী বিপদ তো! তারপর—

জিতেন। আমি তখনই কলকাতায় ফিরে এসে সোজা তাদের বাড়ী গেলুম। দেখলুম সেখানে তারা নেই।

পাড়ার কেউ কোন খবর দিতে পারল না। হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এসে পুলিশে খবর দেব কি না ভাবছি, এমন সময় চাকর একটা চিঠি দিয়ে গেল। অনেকদিন আগে এসেছে। খুলে দেখি আমার সেই প্রতিবেশী—যার কাছে ছেলে রেখে গিয়েছিলুম, তার চিঠি।

বিভাস। তখন আপনার ছেলের সন্ধান পেলেন?

জিতেন। না। তিনি লিখেছেন যে বিশেষ পলিটিক্যাল কারণে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে হঠাৎ কলকাতা ত্যাগ ক'রে পালাতে হয়েছে। ছেলে সঙ্গে থাকলে ধরা পড়তে হবে বলে তাঁরা লেকের ধারে ১৫ই মার্চ্চ ভোরবেলায় ছেলে রেখে দিয়ে যান। তাঁদের বিশ্বাস, কেউ না কেউ নিয়ে যাবেই—এবং আমি ছেলে ফিরে পাবই।

বিভাস। একটা ছোট ছেলেকে রাস্তায় ফেলে তাঁরা চলে গেলেন! এ ত অতি অন্যায় কাজ। ছেলের বয়স তখন কত হবে?

জিতেন। বছর খানেক।

বিভাস। তখন কি করলেন?

জিতেন। পুলিশে খবর দিলুম। কিন্তু কোন সুবিধা হ'ল না। তারা বললে, এরকম ছেলে তো প্রায়ই ফেলে যাচ্ছে। থানার বলেন্দ্রবাবু বলে একজন ভদ্রলোক বললেন যে, বছরখানেক আগে একজন ভদ্রমহিলা ছেলে নিয়ে লেকে ডুবে মরতে এসেছিল। তবে আর কোন সঠিক সন্ধান দিতে পারলেন না, কারণ কেসটা ডায়েরী করা হয় নি। তখন যিনি থানার কর্ত্তা ছিলেন তিনি মৃত। সেই মহিলাটি ছেলে শুদ্ধ একজনের সঙ্গে চলে যায়, এই অবধি বলেন্দ্রবাবু বলতে পারলেন। তবে কোথায় গেছে, সে খবর তিনি দিতে পারলেন না। তার পর এক ডিটেকটিভ ব্যুরোতে গিয়ে সে এক কর্ম্মভোগ। প্রায় দু'শ টাকা খরচ হ'ল, অথচ কিছু খবর পাওয়া গেল না।

বিভাস। তারা আপনাকে ঠকিয়েছে। যত সব জোচ্চর।

জিতেন। হয়ত তাই। কিন্তু এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আশা ছেড়ে দিয়ে—

বিভাস। কিন্তু আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন, সেকথা তো এখনও বললেন না।

জিতেন। ক'দিন আগে পার্কে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছি, এমন সময় একটি ছেলেকে দেখে কি রকম যেন চমকে উঠলুম। ভাল ক'রে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম হুবহু আমার সেই হারানো খোকার মত দেখতে। চাকরের সঙ্গে বল খেলছিল। আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হ'ল, আমার ছেলে একবছর পরে ঠিক এই রকমই দেখতে হ'ত। তারপর যখন চাকর সেই ছেলে কোলে ক'রে বাড়ী ফিরে চলল, আমি তার অনুসরণ করলুম। আপনার বাড়ীতে সে এসে ঢুকল। বুঝলাম আপনারই ছেলে। সেই থেকে আমি প্রায়ই দূর থেকে আপনার ছেলেকে দেখি, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ করতে সাহস হয় না। আজ আর থাকতে পারলুম না, তাই আপনাকে দেখা করতে অনুরোধ করলুম। বুঝছি, আমার এ সবই পাগলামি, তবুও—

বিভাস। কিন্তু আপনি কি মনে করেন এ ছেলে আপনার?

জিতেন। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমি তা বলিনি। তবু আমি আপনাকে আমার ইতিহাসটা না জানিয়ে থাকতে পারলুম না। কে যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে এল।

বিভাস। আচ্ছা আপনার ছেলের কোন ছবি নেই?

জিতেন। আছে। বাবার অসুখের খবর শুনে দিল্লী যাওয়ার আগে তুলেছিলুম। আমার সঙ্গেই রয়েছে। (পকেট থেকে ছবি বার করে) এই দেখুন—

ঠিক সেই সময়ে মালতীর ঘরে প্রবেশ

মালতী। (কম্পিত আবেগপূর্ণ স্বরে) দেখি ছবিখানা।

জিতেন। আপনি—

ছবি মালতীর হাতে দিল

বিভাস। ইনি আমার স্ত্রী।

মালতী। (ছবির দিকে চেয়ে) সেদিনও ঠিক এই কাপড়জামা পরে ছিল—

বিভাস। হ্যাঁ।

জিতেন। তবে কি—

মালতী। আমাদের ছেলে নয়, সে আপনারই ছেলে। লেকের ধারে আমি তাকে কুড়িয়ে পাই। আর সেইজন্যে—

কেঁদে ফেল্লে

বিভাস। মালতী, চুপ কর। যা হয়ে গেছে—

মালতী। না না, আমার ছেলে নয়, আমি বার বার বলেছি—

জিতেন। আপনাদের ছেলে নয়—তবে কি সত্যই সে—

তুষারের ঘুড়ি হাতে প্রবেশ

তুষার। মা, ঘুই।

নতুন লোক দেখে সে ভয় পেয়ে গেল

তুষার। (মালতীর কাছে ঘেঁসে) মা, কোযে।

মালতী। (কোলে করে) বেশ ঘুড়ি। কে দিলে ?

তুষার। দাদু।

বিভাস। তুষু, তুমি এই বাবুর কাছে যাবে ?

তুষার। না, যাই না।

বিভাস। আপনি কি একে—

জিতেন। মানে—দেখুন—কিছু মনে করবেন না—

মালতী। না, আমি দেব না। ওর জন্যে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়েছি, কিন্তু তবু ওকে ছেড়ে দিতে আমি পারব না।

বিভাস। মালতী, অধৈর্য্য হয়ো না। তিনি যখন—

মালতী। না-না-না, ও আমারই ছেলে, আমি দিতে পারবো না—

জিতেন। (খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে) না, আপনাদের কাছেই ও থাক্। আপনাকেই ও মা বলে জানুক। তাই ওর পক্ষে ভাল। কোন কর্ত্তব্যই আমি আজ অবধি করিনি। হয়ত এ তারই সাজা। কিন্তু বিভাসবাবু, মধ্যে মধ্যে আমায় এসে দেখে যেতে দেবেন। তার বেশী আমি কিছুই চাইছি না।

বিভাস। খোকা, যাও তোমার কাকাবাবুর কোলে। কাকাবাবু কেমন ভাল—

তুষার। না, ভায়ো না।

সনৎ। (নেপথ্যে) তুষু দাদু, আবার কোথায় পালিয়ে গেলে—

তুষার। এই যে মা কোয়ে—

বিভাস। জিতেনবাবু, আপনি আমার বাবার কাছে এ বিষয়ে কোন কথা কখনও উল্লেখ করবেন না। বাবা তুষারকে তাঁর নাতি বলেই জানুন। এসব কথা জানলে ওঁর মনে বড্ড শক্ লাগবে।

সনৎবাবুর প্রবেশ

বিভাস। বাবা, এঁর নাম জিতেনবাবু। আমার বহুদিনের বন্ধু।

জিতেন প্রণাম করলে

সনৎ। বেশ বাবা, বেশ। বেঁচে থাক। আমার দাদু তুষুর সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি বুঝি ?

জিতেন। আজ্ঞে না। ও নতুন মানুষ দেখে ভয় পাচ্ছে।

সনৎ। দাদু, আমার কাছে এস।

মালতীর কোল থেকে নেমে সনৎবাবুর কাছে এল

সনৎ। এ কাকা, বুঝলে ?

তুষার। হুঁ। কাকা।

সনৎ। ওর কাছে যাও। কিছু বলবে না।

তুষার। বকে না।

জিতেন। না খোকা। আমি কাউকে বকি না। তোমার সঙ্গে খেলা করব।

তুষার। ঘুই—

জিতেন। হ্যাঁ, ঘুড়ি ওড়াব।

সনৎ। তুমি বাবা, আজ এখানে খেয়ে বাড়ী যাবে। কি বল ? অসুবিধা হবে না ত' ?

জিতেন। আজ্ঞে, অসুবিধা না, তবে—

সনৎ। তবে আর কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

তুষার। চও—ঘুই—ব—

সনৎ। চল। এখন তোমার সঙ্গে না খেললে দাদুর আর তৃপ্তি হবে না।

তিনজ'নের প্রস্থান

বিভাস। মালতী !

মালতী। বলুন।

বিভাস। এখনও বলুন। আমায় ক্ষমা কর। আমাদের ভুল হয়েছিল—

মালতী। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা কতখানি লজ্জা—

বিভাস। জানি। কিন্তু আমাদের এ ভুল তুমি না ক্ষমা করলে আমি যে চিরকাল তোমার কাছে দোষী হয়ে থাকব। অবশ্য দোষ আমারই—

মালতী। আপনার নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের—

ফাউন্‌টেন্‌পেন হাতে তুষারের প্রবেশ

তুষার। মা, কাকা কম—কাকা ভায়ো।

মালতী। (কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে) খোকা, তুমি কার কাছে থাকবে ? আমার কাছে, না কাকার কাছে ?

তুষার। তোমার কাছে।

বিভাস। আমার কাছে ?

তুষার। হ্যাঁ। বাবা নল—

বিভাস। (তুষারের হাতে স্টেথেসকোপ দিয়ে) এই নাও নল—

তুষার। (স্টেথেস্‌কোপ হাতে) দাদু, বাবা নল—

প্রস্থান

বিভাস। বল মালতী, আমায় ক্ষমা করলে ? (হাত ধরে) নইলে—

মালতী। একেবারে অত আদর ভাল নয়—ভয় করে।

যবনিকা

জননীর ব্যথা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রাত জেগে ছেলে পড়ে   অবিশ্রান্ত উচ্চস্বরে
প্রত্যাসন্ন পরীক্ষার পড়া।
যেন গোটা বাড়ীখানি   আসন্ন বিপদ জানি'
ভয় দ্বিধা উৎকণ্ঠায় ভরা।
অন্য ঘরে তার সাথে   জননী জাগিয়া রাতে
অস্বস্তির সহিছে বেদনা,
না জানি কতই ব্যথা   কত শ্রম-কাতরতা
পায় ছেলে, করিছে কল্পনা।

মনে ভাবে বার বার   যদিই বদলে তার
খাটিলে হইত কোন ফল,
তাহা হ'লে নিজে গিয়া   ছেলেরে বিশ্রাম দিয়া
নিজেই খাটিত অবিরল।
পড়িতে পড়িতে ছেলে   নিতান্তই ঘুম পেলে
পুঁথি বুকে ঘুমাইয়া পড়ে,
সন্তর্পণে মাতা গিয়া   মশারিটি খাটাইয়া
দেয় ধীরে, যেন চুরি করে।
চুরি ছাড়া কি বা আর ?   হ'রে লয় ক্লেশভার
ভাবে আহা একটু ঘুমাক,
যা আছে কপালে হবে   এত পড়া কেন তবে ?
বিদ্যা পরে আহা বেঁচে থাক।

এ জননী জানে না কি   এ সময়ে দিলে ফাঁকি
হবে সারা জীবনই বঞ্চনা ?
যাহারা হয়েছে বড়   তাহারা কঠোরতর
করেছে যে তপস্যা-সাধনা ?
পুত্রভাগ্যবতী ব'লে   গৌরব পাইতে হ'লে
মূঢ়মায়া হবে ত্যজিবারে,
জানে নাকি জননী তা   এ শ্রম হবে না বৃথা
লক্ষ্মী আসে উদ্যমীর দ্বারে ?

যুঝে মাতৃমমতার   সাথে শুভবাঞ্ছা তার,
মহাদ্বন্দ্ব চলে তার প্রাণে।
এ দ্বন্দ্বের কী যে ব্যথা   অন্য কেবা বুঝিবে তা ?
স্নেহাতুর জননীই জানে।
সাফল্য লভেছে যারা   নিশ্চয় বলিবে তারা,
এই ক্লেশে কি এমন ব্যথা ?
ঢের কষ্ট এর চেয়ে   এ সংসারে পেয়ে পেয়ে
তবে ভাগ্যে জুটে সার্থকতা।
মূঢ় জননীর হৃদি   গূঢ়তার নীতিবিধি
যুক্তিতে ত বুঝে না হৃদয়।
রাতজাগা মিছে তার   ভ্রান্তি জাগে পিছে তার
মমতা ত মিছে কভু নয়।

ভাগবতে রূপক

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

অনাদিকাল থেকে বিশ্বে যে মিলনের স্রোত চলেছে—তার বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, অন্ত নেই, তরঙ্গিনী বুকভরা বীচিভঙ্গ নিয়ে নেচে নেচে চলেছে সাগরে মিশতে—তার সেই উদ্দামগতিকে বাধা দেয় কার সাধ্য। জলভরা মেঘের কোলে বিদ্যুৎ ঝকমক্ ক'রে জানিয়ে দিল মিলনের হাসি। আবার সরসীর স্বচ্ছ হৃদয়ে নিটোল চাঁদের লুকোচুরিখেলা—সে এক অপূর্ব্ব মাধুরীলীলা। পুষ্পতরু মাটীর রস নিয়ে বেড়ে উঠ্‌ল, কুসুমসম্ভারে বায়ু আবার তার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে জগৎকে মাতিয়ে তুলল। এই পুষ্প অতি নির্ম্মল, পবিত্র—যেন মানবের প্রেম। দেবতার উদ্দেশ্যে ফোটে,' কিন্তু তার সৌরভ আনন্দ দেয়—সারা বিশ্বকে।

অখিল বিশ্ব তোলপাড় কর্‌লে দেখা যায় মিলনের সঙ্গীত ছাড়া আর কিছু নেই। পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলে এই সুন্দর জগৎ রচনা করেছে। প্রকৃতির পেলবগাত্রে ফুলের জাগরণ দেখা দিয়েছে, চাঁদের আলোক তার মুখে হাসি ফুটিয়েছে, পাখীর কূজন ও তটিনীর কলতান তার মুখে ভাষা দিয়েছে। সে জোছনার রঙ্ মেখে ফুলের অলঙ্কার প'রে তালবৃন্ত হাতে ক'রে তার নিয়ন্তার প্রতি পবিত্র প্রেম নিবেদনে আপনাকে ধন্য মনে করছে। এই প্রেম—এই মিলনই সত্য। ইহা শাশ্বত, নির্ম্মল, নিরবদ্য। এই প্রেমই সমগ্র জগৎকে জাগিয়ে রেখেছে। মন্দাকিনীর পূতবারি স্বর্গের সম্পদ্। যে মন্দাকিনীবারি স্বর্গদ্বার প্লাবিত ক'রে হরিদ্বারে ব'য়ে যাচ্ছে তাহা কত স্বচ্ছ! কত শীতল! তার স্পর্শে সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়, তার হৃদয়ের লুকোন পাথরটি পর্য্যন্ত অবাধে দেখা যায়, অবিরাম স্রোতে কোন শৈবাল জমে না। যেন প্রেমিকার হৃদয়—স্বচ্ছ শীতল নিষ্কলঙ্ক। আপনার ভাবেই বিভোর—দেবতার পায়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতেই যেন তার জন্ম। মর্ত্তে এই তরঙ্গিনীর নাম ভাগীরথী—কল্মষ-নাশিনী। সমতল ভূমিকে প্লাবিত ক'রে হৃদয়ের দুই পার্শ্বে শস্যসম্ভার বহন ক'রে কত জীবকে প্রাণদান করে কে তা বলতে পারে? তার পূত পীযূষধারা সেবনে কত পাপী উদ্ধার পায় তার কি গণনা আছে! পাতালে আবার তাহাই ভোগবতীরূপে আনন্দদান করে। পাতালের জল শীতল ও শরীর-গঠনোপযোগী। এই প্রেমও গঙ্গাবারির ন্যায় অনাবিল। দেবপূজায় মন্দাকিনী নায়কপূজায় ভাগীরথী এবং সন্তানের কাছে ভোগবতী। অনন্তশায়ী বিষ্ণু যিনি জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী-রূপে নিত্য বিরাজ করছেন তিনিই এই প্রেমের সংকর্ষণ বিকর্ষণে রত। এই যে বিরাট মনোরম বিশ্ব—তাঁরই প্রেমরূপ আনন্দশক্তির বিকাশ। ইহা তাঁর লীলা—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন বিচিত্র। এই লীলারস আপামরসাধারণকে পান করাবার জন্যই সেই পরমব্যোমাধিকারী বিষ্ণুর নরদেহধারণ। যে রূপে তিনি বৃন্দাবনকে পাগল ক'রেছিলেন, যমুনার তটে রূপের হাঠ বসিয়েছিলেন, রাসমঞ্চে ক্রীড়াবিচঞ্চল কামিনীফুল ফুটিয়েছিলেন—সেই রূপ কই? যে বাঁশীর তানে যমুনা উজান বহিত, গোপবধূগণ পাগল হ'য়ে ছুটে আস্‌ত, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য কর্‌ত, সে বাঁশীর কলতান আজ নীরব কেন? কত হাস্য কত লাস্য, যমুনার

> "ফেনিল তরঙ্গ ভঙ্গে কত সঙ্গীতধারা,
> পুলিনের প্রতি রেণুমাঝে প্রাণ নিয়ে লুকোচুরি খেলা।"

আজ কোথায় গেল। আছে সব। সেই বৃন্দাবন আছে, সেই যমুনা আছে, সেই ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য আছে, কিন্তু সব যেন প্রাণহীন নিস্পন্দ। কৃষ্ণ নেই, গোপবধূ নেই—তাই অন্তর্বাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় উপরে একটা বিরাট বালুকার রাজ্য হাহাকার করছে। এই কৃষ্ণ কে? কে ব'লতে পারে এই বিরাট ব্যোমাধিকারী কৃষ্ণ কে? সান্ত মানুষ, সেই অনন্তের স্বরূপনির্ণয় কর্‌বে কি তার শক্তি? তবে কল্পনা! যুগে যুগে ঋষিগণ কল্পনার নেত্রে সেই বিরাটের এক একটা রূপ দিয়েছেন, মানুষের কল্পনা তাঁকে মানুষ ক'রে গড়েছে। তাই ক্ষুদ্র মানুষ আমরা—আজ তাঁকে আমাদের মত ক'রে বুঝ্‌তে শিখেছি। তাতেই আমাদের সুখ, তাতেই আমাদের তৃপ্তি, তাতেই আমাদের পুরুষার্থ। যশোদা তাঁকে বাৎসল্যরসে অসহায় শিশুপুত্র ব'লে জানতেন, গোপীগণের কাছে তিনি ইষ্ট, আরাধ্য, প্রিয় ছিলেন। আবার নারদাদির ধ্যানে তিনি অচিন্ত্য অব্যক্ত চিদাভাস। সকলেই আনন্দ পায়, সকলেই সেই পীযূষ রসের আস্বাদন করে, সকলেই সেই এক বিরাটকে দেখে, কিন্তু মূর্ত্তিভেদ মাত্র। ইষ্টমূর্ত্তি—সম্মুখ থেকে একপ্রকার, পার্শ্ব হ'তে বিভিন্ন, আবার পশ্চাৎ হ'তে অন্যবিধ। কিন্তু ইষ্ট একই। বিরাট্ সূর্য্য ক্ষুদ্র মুকুরে ক্ষুদ্র হ'য়ে পড়ে বলে কি তার তেজস্বিতা থাকে না? আকাশের পূর্ণ সূর্য্য মুকুরে ছোট হ'লেও পূর্ণই থাকে। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হ'তে পূর্ণ নিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। তাই কৃষ্ণ—অবতার হ'লেও পূর্ণ।

এই কৃষ্ণের বিস্তৃত বিবরণ আমরা বিষ্ণুপুরাণে, ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাই। মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর উল্লেখ আছে মাত্র। বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণ অমিতশক্তি ঈশ্বর। মানবত্বকে চাপা দিয়ে ঈশ্বরত্ব প্রকট করাই এই পুরাণকারের উদ্দেশ্য। ভাগবতকার কৃষ্ণকে আরও নরম ক'রে গড়েছেন। তাঁর কৃষ্ণ শুধু বীর নন্—মধুর ও প্রেমিক। ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায় পড়্‌লে বুঝা যায়, গ্রন্থকার ভগবানের মাধুর্য্যলীলা বর্ণনায় তাঁর সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রেছেন। সেই জন্যই ভাগবতকে কেহ কেহ কাব্য বলে। কিন্তু কাব্য হ'লেও এরূপ বিচিত্র

কাব্য বড় দেখা যায় না। ইহা ব্যাসের একটা মহৎ দান। কাব্যের ছলে তিনি অখিল আধ্যাত্মিক ব্যাপার বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখায় নৈপুণ্য আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার কৃষ্ণকে আরও নামিয়েছেন। তিনি ভাগবতের প্রধানা গোপীর নাম দিয়েছেন রাধিকা। রাধিকা আয়ান-কামিনী। কিন্তু আয়ানের সঙ্গে বিবাহের বহু পূর্ব্বে তাঁর কৃষ্ণের সহিত বিবাহ হয়—ইহা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণই বর্ত্তমান কালের বৈষ্ণব কবিগণের উপজীব্য। বৈষ্ণবপদাবলী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মাধুর্য্যরস নিয়েই রচিত। ঘাটে, মাঠে, পথে, নদীর ধারে—বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা—সকলের মুখেই সরস বৈষ্ণবপদাবলী ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মাধুর্য্যরসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এঁরা সব কৃষ্ণকে মানুষ ক'রে গড়েছেন। তাই তাঁর হাতে বাঁশী, মাথায় শিখিপুচ্ছ, কটিতে পীতধড়া। তাই তিনি গোষ্ঠে ধেনু চরাচ্ছেন, আর বাঁশীর মধুর তানে গোপীমন মুগ্ধ করছেন। তাই তামাসা দেখবার জন্য কখনও বা ব্রজবধূগণের কাপড় চুরি ক'রে গাছের উপরে তুলে রাখছেন।

এটা নরলীলা। কিন্তু ভগবল্লীলার একটা রূপ দেওয়া যায়—যা নিষ্কলঙ্ক, নিত্যশুদ্ধ, নিরবদ্য। তা ব্যাসের অভিপ্রেত হ'লেও ভাগায় পরিস্ফুট করেন নি। শুনা যায়, পুরাণাদি রচনার পর একদিন দেবর্ষি নারদের সঙ্গে ব্যাসের দেখা হয়। ভগবান্ ব্যাসের মানসিক শান্তি তখনও আসে নাই। তাই দেবর্ষি তাঁকে শ্রীভগবল্লীলা কীর্ত্তন করতে অনুরোধ করেন। বললেন—তাতেই তাঁর চিত্তপ্রসাদ ঘটবে।

শ্রীভাগবতের গোপীলীলাই বৈষ্ণবের ভূতশুদ্ধি। ভূতশুদ্ধি বিনা ব্রহ্মদর্শন হয় না। তাই ব্রজে গোপীলীলার প্রয়োজন হ'য়েছিল।

শাস্ত্রে আছে—"দেবোভূত্বা দেবং যজেত।" অর্থাৎ দেবতা হ'য়ে দেবতাকে পূজা করতে হয়। মৃন্ময় শরীরকে চিন্ময় না করতে পারলে চিন্ময়ের উপাসনা অসম্ভব। "সমঃ সমমাকর্ষতি"—সমান বস্তু সমানকে টানিয়া থাকে। জল জলকে টানে, মাটী মাটীকে টানে, বায়ু বায়ুকে টানে। দুটি জলধারা পরস্পর মিশবার জন্যই সকল সময়ে চেষ্টা করে। ভূতলে না পারলে ভূমির অভ্যন্তরে কিম্বা বাতাসে গিয়ে তারা মিশবে। মাটীতে যে গাছ জন্মে তার পাতা মাটীতে প'ড়ে মাটীই হয়, প্রাণবায়ু প্রাকৃত বায়ুকে আকর্ষণ করে। সেইরূপ চিন্ময় শরীরই চিন্ময় ব্রহ্মকে পূজা করতে পারে।

মূলাধারে যে দীপকলিকাকার জীবাত্মা আছে, তাকে কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে সুষুম্না পথ দিয়ে বাইরে এনে, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্চক্র ভেদ ক'রে, ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রদলপদ্মে পরমাত্মায় সংযুক্ত করবার পর, সেখানে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে লীন মনে ক'রে, "যং" এই বায়ু বীজ চিন্তা ও জপ করবার পর, বহ্নিবীজ "রং" মন্ত্রে কুম্ভক ক'রে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহকে ভস্ম করতে হয়। তার পর চন্দ্রবীজ "ঠং" মন্ত্রে শরীরকে অমৃতময় করবার পর "বং" নামক বরুণবীজে শরীরকে নূতন ক'রে গড়তে হবে। পরে পৃথ্বীবীজ "লং" মন্ত্রে শরীরকে সুদৃঢ় করে, সেই নূতন দেহে "সোঽহম্" অর্থাৎ আমিই সেই ঈশ্বর—এই মনে করতে হবে। ইহারই নাম ভূতশুদ্ধি। এই ভূতশুদ্ধি হ'লেই জীব পরমাত্মপূজার অধিকারী হয়।

এত বড় ব্যাপারটাকে সংক্ষেপে ধরতে গেলে বলতে হয়—অহংজ্ঞানযুক্ত জীব, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ বুদ্ধি ও অহংকার—এই অষ্ট ইন্দ্রিয় নিয়ে সুষুম্না নাড়ীপথে ষট্চক্র ভেদ ক'রে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে যাচ্ছে। এই মিলনেই জীবের শুদ্ধি। একটু প্রণিধান করলেই দেখা যায়—ভূতশুদ্ধির এই জটিল ব্যাপার গোপী-লীলায়ও অবস্থিত। তন্ত্রোক্ত মূলাধারচক্র বৈষ্ণবদের গোকুল। গো শব্দের অর্থ ভূমি এবং কুল শব্দে স্থান বুঝায়। অতএব গোকুলের অর্থ ভূস্থান। মূলাধারচক্রই ভূস্থান। মূল আধার অর্থাৎ পার্থিব শরীরধারী জীবের প্রধান স্থান। কাজেই মূলাধারচক্র গোকুল। এই মূলাধারচক্র জীবের কোষমধ্যে বর্ত্তমান। ইহা ত্রিকোণ এবং চতুর্দ্দল পদ্মবেষ্টিত। তিনটি কোণকে জীবের ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বলে। পদ্মের চতুর্দল যথাক্রমে প্রিয়, মোদ, প্রমোদ এবং সংমোদবৃত্তি। এই মূলাধারচক্রেই জীবের বাস। এইখানে শুদ্ধানন্দ জীব বীজরূপে সুপ্ত। তাই কোনও স্ফুট স্পন্দন লক্ষিত হয় না। যেন গোকুলে যশোদার ক্রোড়ে সদ্যোজাত কৃষ্ণ নিদ্রিত। বীজরূপে শিশুকৃষ্ণ যেন আনন্দপদ্ম দিয়ে ঘেরা। কুলকুণ্ডলিনী জীবের অহংজ্ঞান। অহংজ্ঞান জীবে নিত্য বর্ত্তমান। আমি করছি, আমি দিচ্ছি—এরূপ আমিত্ব না থাকলে জীবের কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাই জীব কুলকুণ্ডলিনীযুক্ত। এই জীবকে বৈষ্ণবতন্ত্রে রাধিকা নাম দেওয়া হয়েছে। রাধিকা বা আরাধিকা অর্থে পূজয়িত্রী বুঝায়। শিবরূপী পরমাত্মার জীবই পূজক। বিশুদ্ধবুদ্ধিসত্ত্বে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে সাংখ্যদর্শনে ব্যাবহারিক জীব বলে। রাধিকাই জীব; কেন-না, রাধিকা নিত্য কৃষ্ণসান্নিধ্যযুক্ত। কৃষ্ণকে শুদ্ধ চৈতন্য বলা যায়। কৃষ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণক্ প্রত্যয় ক'রে কৃষ্ণ শব্দ হয়। কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা। যিনি অখিল অজ্ঞান আকর্ষণ করেন অর্থাৎ যাঁর উদয়ে অখিল অজ্ঞানের নাশ হয় তিনিই জ্ঞানরূপ কৃষ্ণ। এই জ্ঞানরূপ কৃষ্ণ অজ্ঞানরূপ কংসকে বধ ক'রে সত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি দেবকীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কৃষ্ণের রাধাদি অষ্ট সখী যেন জীবের বুদ্ধ্যাদি অষ্ট ইন্দ্রিয়। পরমাত্মা কৃষ্ণ। সুষুম্না নাড়ী যমুনা নদী। বুদ্ধ্যাদি অষ্টেন্দ্রিয়যুক্ত জীব যেমন সুষুম্না নাড়ী দিয়ে ষট্চক্র ভেদ ক'রে পরমাত্মার সঙ্গে মিলতে যায়, কৃষ্ণভাবযুক্তা রাধিকাও তেমনি ললিতাদি অষ্টসখী নিয়ে গোকুলাদি ষট্-ক্ষেত্রে লীলা ক'রে যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের সঙ্গলাভে সুখিনী হ'তে চায়। এই গেল প্রথম চক্র মূলাধার—বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত গোকুল। দ্বিতীয় চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান—জননেন্দ্রিয়ের মূলভাগে অবস্থিত। ইহাকে কামস্থান বা কামলোক বলে। ভুবর্লোক এর নামান্তর। এই স্বাধিষ্ঠানচক্রে ষড়্দল পদ্ম আছে। পদ্মের ছয়টি দলে ছয়টি কর্ম্ম—শান্তি, বশ্য, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন ও মারণ। বৈষ্ণবগণ এই চক্রকে বৃন্দাবনের স্থানবিশেষ ব'লে থাকেন—যেখানে বালক

কৃষ্ণকে গোপ রক্ষার জন্য শান্তি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম করতে হয়েছিল। এখানে স্ব অর্থাৎ আত্মার নিত্য অধিষ্ঠান। আত্মা এখানে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাই এই চক্রে অবস্থানকালে জীবের "বহুস্যাম্" "প্রজায়েয়ম" অর্থাৎ 'আমি বহু হ'ব, জন্মগ্রহণ করব' এই বৃত্তি হয়। তারই ফলে জননেন্দ্রিয়ের সবলতা ও মিলনচেষ্টায় জীবের শান্ত্যাদি ষট্‌কর্ম্ম। এখানে কৃষ্ণ আর মূলাধার গোকুলের ন্যায় যশোদার কোলে সুপ্ত নন—বালকবেশে বৃন্দাবনক্ষেত্রে চঞ্চলপদচারী এবং শান্ত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা গোপরক্ষায় তৎপর।

এই শান্ত্যাদি কর্ম্মের বিবরণ অতি মনোরম। তন্ত্রে পাওয়া যায়,—

"শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে ততঃ।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্ কর্ম্মণি মণীষিণঃ॥"

শান্তি, বশ্য, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন ও মারণ এই ছয়টি তন্ত্রোক্ত শত্রু-নির্যাতন কর্ম্ম। এই ষট্‌কর্ম্মের দেবতা যথা :—

"রতির্বাণী রমাজ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমম্।
ষট্‌কর্ম্ম দেবতাঃ প্রোক্তাঃ কর্ম্মাদৌতাঃ প্রপূজয়েৎ॥"

রতি, বাণী, রমা, জ্যেষ্ঠা, দুর্গা ও কালী যথাক্রমে শান্ত্যাদি ষট্‌কর্ম্মের দেবতা। এই সকল কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে দেবতার পূজা করলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই শান্ত্যাদি কার্য্যের কাল নিয়ম আছে, যথা :—

"হেমন্তঃ শান্তিকে প্রোক্তঃ শিশিরোবশকর্ম্মণি।
বসন্তঃ স্তম্ভনে প্রোক্তো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম এব চ॥
প্রাবৃড়ুচ্চাটনে জ্ঞেয়া শরন্মারণ কর্ম্মণি।"

পুনশ্চ :—

"নিশামুখে চ হেমন্তঃ প্রদোষে শিশিরাগমঃ।
প্রহরার্দ্ধে বসন্তঃ স্যাদ্ গ্রীষ্মোমধ্য নিশাগমে।
তুর্য্যযামে চ বর্ষাখ্যঃ শরদহর্ম্মুখে মতা॥"

অর্থাৎ শান্তিকর্ম্মে হেমন্ত উপযুক্ত এবং নিশামুখই তন্ত্রে হেমন্ত বলিয়া কথিত। বশ্যকর্ম্মে শীতকাল যোগ্য—যাহার নামান্তর প্রদোষ। বসন্ত স্তম্ভনপক্ষে উপযুক্ত এবং প্রহরার্দ্ধই তন্ত্রোক্ত বসন্তকাল। বিদ্বেষ কর্ম্ম গ্রীষ্মকালেই বিহিত এবং তন্ত্রে মধ্যনিশাগমকে গ্রীষ্ম বলে। উচ্চাটনের উপযুক্ত কাল বর্ষা—যাহার নামান্তর তুর্য্যযাম। মারণকর্ম্ম শরৎকালে অর্থাৎ অহর্ম্মুখেই হ'য়ে থাকে।

যখনি অসুরগণ কৃষ্ণ ও গোপগণকে বধ করবার জন্য এসেছে তখনি কৃষ্ণ কৌশলে রতি অর্থাৎ মনস্তুষ্টির দ্বারা তাদের ক্রোধের শান্তিবিধান করেছেন। শান্তিকর্ম্মের রতিই দেবতা। কামপক্ষে শান্তিকর্ম্ম—সহবর্ত্তন। কারণ, একত্র অবস্থানেই নায়ক নায়িকার মদনশান্তি এবং এই শান্তি কর্ম্মের নিশামুখই বিহিত সময়। আবার কাব্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়—"রতি স্তৎসহবর্ত্তনম।"—তৎসহ বর্ত্তনই রতি নামক মিলন। দ্বিতীয় দলের কর্ম্ম বশ্য। বশ্যের দেবতা বাণী। কৃষ্ণপক্ষে—চাটুবাক্য প্রয়োগে শত্রুগণের বশ্যতা সম্পাদন এবং কামপক্ষে—নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি মর্ম্মবাক্যে আনুকূল্য লাভ। প্রদোষই এর উপযুক্ত সময়। স্তম্ভন তৃতীয় দলে। কৃষ্ণপক্ষে—সম্মোহন দ্বারা শত্রুগণের নিশ্চেষ্টতা সম্পাদন। রমা এই কার্য্যের দেবতা। রমা শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ সম্মোহন (রময়তি মোহয়তীতি রমা) কামপক্ষে—সন্তোষকর মিলনের দ্বারা নায়ক নায়িকার পরস্পর স্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতাপ্রাপন। সুখপারবশ্যই ইহার কারণ। প্রহরার্দ্ধে এই ব্যাপার সম্ভবপর, কারণ প্রহরার্দ্ধই এর উপযুক্ত কাল। চতুর্থ দলের কার্য্য বিদ্বেষ। কৃষ্ণপক্ষে—আক্রমণকারিগণের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা সম্পাদন, যার ফলে কলহের দ্বারা নিজেদেরই ধ্বংস। কামপক্ষে—বিদ্বেষের অর্থ—রতিকলহ, অর্থাৎ—সংযোগে পরস্পরের অভিভাবেচ্ছা। ইহার দেবতা জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ কর্ম্মপটু নায়িকা। কাব্যশাস্ত্রে নায়িকা দুই প্রকার—কনিষ্ঠা ও জ্যেষ্ঠা। কনিষ্ঠা সলজ্জা যেন ঈষন্মুদিতা। জ্যেষ্ঠা প্রগল্‌ভা অর্থাৎ বিগতলজ্জা অতএব কর্ম্মপটু। সেই জন্যই জ্যেষ্ঠ ভাবই নায়ক-নায়িকার পরস্পরাভিভবে প্রধান সাধন। মধ্য নিশাগমই এই ব্যাপারের উপযুক্ত কাল। পঞ্চম দলে উচ্চাটন। কৃষ্ণপক্ষে—স্থানভ্রংশ অর্থাৎ একস্থান হ'তে অন্যস্থানে প্রেরণ। আক্রমণে উদ্যত অসুরগণকে সময়ে সময়ে কার্য্যব্যাজে কৃষ্ণ অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রে দিতেন। কামপক্ষে উচ্চাটনের অর্থ—রতি-কলহের উত্তেজনায় শরীরের ভূষণাদির স্থানচ্যুতি। এই কার্য্যের দেবতা দুর্গা। কারণ দুঃখ অর্থাৎ মিলনবিষয়ে অতি কৃচ্ছ্র সাধনের ফলেই এই অবস্থা এবং চতুর্থ প্রহরই এর উপযুক্ত সময়। ষষ্ঠ দলের কার্য্য মারণ অর্থাৎ হত্যা। কৃষ্ণপক্ষে—অসুরবিনাশ এবং কামপক্ষে অবসাদ বা রতিক্লেশ। ইহার দেবতা কালী—যিনি নিবৃত্তিবিধায়িনী এবং সময় অহর্ম্মুখ বা উষা। এই গেল ষড়্‌দলসমন্বিত স্বাধিষ্ঠানচক্র। জীব যতক্ষণ স্বাধিষ্ঠান চক্রে থাকে ততক্ষণ কামনা অতিক্রম করতে পারে না। তাই সৃষ্টিকামনায় জীবকে শরীরমিলনের অপেক্ষা করতে হয়। তৃতীয় চক্রের নাম মণিপূর। মণিপূর চক্র নাভিতে অবস্থিত। স্বর্লোক তার নামান্তর। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বৃন্দাবনের রাসস্থল বলেন। নাভিতে চিত্তের অবস্থান। চিত্তের সংশয়বৃত্তি। সেই জন্য চিত্তস্থ মণিপূর চক্রে জীব আত্ম সম্বন্ধে কিছুই স্থির-নিশ্চয় করতে পারে না। জীবের জ্ঞান হয়—এই দেহ আত্মা কিম্বা দেহ ব্যতিরিক্ত কোন অবিনশ্বর আত্মা আছে। এই হেতু মণিপূরকে "মেঘাভ ও বিদ্যুদাভ" বলা হ'য়েছে। কখন সান্ধকার, কখনও বা আলোকময়। বৃন্দাবনের রাসস্থলেও গোপীদের মনে সংশয় জেগেছিল—যাদব কৃষ্ণ মানব, না অতিমানব। তাঁরা কখনই স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেন নি। কৃষ্ণের মধুর লীলা দেখে তাঁরা মনে করতেন কৃষ্ণ সামান্য মানুষ—আবার যখনই দেখতেন কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করছেন, ব্রহ্মমোহন করছেন, অসুর দলন করছেন, তখনই তাঁকে অতি-মানব বলে মনে হত। এই রাসস্থল নামক মণিপূরচক্রে রাধিকারূপ জীবের সংশয়বৃত্তি কখনই দূর হয়নি। এই তৃতীয় চক্রে একটা দশদল পদ্ম আছে। ইহা স্বর্গ অর্থাৎ আনন্দ ভোগের স্থান। প্রেম এখানে নিত্য বিরাজমান। পদ্মের দশটি দলে প্রেমের দশবিধ বিকাশ দেখা যায়। যথা—"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ

সংকল্পো নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতাবিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশ উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃস্মরদশাদশৈব স্যুঃ ॥” চক্ষুঃপ্রীতি অর্থাৎ চোখে ভাল লাগা—প্রথম দলের কার্য্য। নয়নাভিরাম যাদব কৃষ্ণকে গোপীগণ যখন প্রথম দেখেন, তখনই তাঁদের চক্ষুঃপ্রীতি জন্মেছিল। তারপর কৃষ্ণের প্রতি চিত্তের আসক্তি দ্বিতীয় দলের কার্য্য। কৃষ্ণকে পাবার জন্য দৃঢ় সংকল্প তৃতীয় দলে। চতুর্থ দলে নিদ্রাচ্ছেদ। নিদ্রার অভাবে কৃশতা পঞ্চম দলের কার্য্য। ষষ্ঠ দলে ঔদাসিন্য অর্থাৎ কৃষ্ণেতরবিষয়বিরাগ। সপ্তম দলে লজ্জাত্যাগ। অষ্টম দলের কার্য উন্মত্ততা, নবমে মূর্চ্ছা এবং দশমে মৃত্যু বা ভাবসমাধি। কৃষ্ণকে পরমাত্মা এবং রাধাকে জীব ভাবলে জীব সম্বন্ধেও এই দশবিধ ভাবের অবকাশ আছে অর্থাৎ যতক্ষণ জীব মণিপুর চক্রে থাকে ততক্ষণ জীবের পরমাত্ম সম্বন্ধে চক্ষুপ্রীত্যাদি দশবিধ প্রেমের বিকাশ হয়। স্বর্গে জীব বিপুল আনন্দ ভোগ করে। তত্ত্বদর্শিগণের মতে স্বর্গের লক্ষণ—“যন্নদুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্ অভিলাষোপনীতঞ্চ যৎ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্।”—যে সুখ দুঃখযুক্ত নয়, আসিবামাত্র চলিয়া যায় না এবং ইচ্ছামাত্র উদিত হয়, তাহার নাম স্বর্গ। মণিপুর চক্র বা রাসস্থলেও স্বর্গের মত আনন্দ ভোগ। এই আনন্দ বিশুদ্ধ, দীর্ঘকালস্থায়ী এবং ইচ্ছামাত্রে উপনীত। স্বর্গের জীবগণেরও মুক্তিবিষয়ে সংশয় থাকে। স্বর্গ, ভোগের স্থান—মুক্তির স্থান নয়। তাই মণিপুরচক্রকে বা রাসস্থলকে স্বর্গ বলা ন্যায়সঙ্গত। চতুর্থ চক্রের নাম অনাহত—হৃদয়ে অবস্থিত। উজ্জ্বলাদিত্যের ন্যায় এই চক্রের প্রভা। এখানে ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত শব্দ অনাহত বা সূক্ষ্মাবস্থায় থাকে। তাই এই চক্রের নাম অনাহত। মহর্লোক এর নামান্তর। বৈষ্ণবগণ এই চক্রকে মথুরা বলেন। হৃদয় অহংকারের স্থান বলে, এই অনাহত চক্র কর্ম্মের কেন্দ্র। অহংকার বা অহংজ্ঞান হতেই কর্ম্মের প্রবৃত্তি। এই চক্রে একটি দ্বাদশদল পদ্ম আছে। পদ্মের দ্বাদশদলে অহংকারের দ্বাদশ ভাব বর্ত্তমান। অহংকার হ'তে একাদশ ইন্দ্রিয় ও ভূতগণের সূক্ষ্মাবস্থার উৎপত্তি হয়। এই দ্বাদশ ভাবে বর্ত্তমান জীব অনাহত চক্রে পরমাত্মার পূজায় নিমগ্ন। কর্ম্মক্ষেত্র হৃৎপিণ্ড ও শরীরের দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং সেই বিশুদ্ধ রক্ত শিরাসমূহে চালিত হ'য়ে অন্য অবয়বের সত্তা রক্ষা করে। হৃদ্‌গহ্বরস্থিত অনাহত চক্রেও জীব একাদশেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রদ্বারা দ্বাদশ দল পদ্মে অজ্ঞান নাশপূর্ব্বক দিব্য বিষয়ানুভব, দিব্যকার্য্য ও দিব্য ভাবদেহ গঠন ক'রে পরমাত্মতত্ত্বের সন্ধানে অপর চক্রসমূহের সত্তা রক্ষা করে। মথুরাক্ষেত্রেও জ্ঞানরূপ কৃষ্ণ অজ্ঞানরূপ কংশনাশ করে' সত্ত্বরূপা দেবকীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারই ফলে জগতের সত্তাসংরক্ষণ হ'য়েছিল। মথ্ ধাতুর উত্তর উর প্রত্যয় ক'রে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ যোগে মথুরা শব্দের উৎপত্তি। মথ্ ধাতুর অর্থ মন্থন বা বিলোড়ন। যে স্থানে কংস মন্থন করে' বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানা দেবকীর প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল তার নাম মথুরা। এই মথুরায় জগতের বীজরূপ কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং গোকুলে পালিত হন। মূলাধারচক্র অর্থাৎ বীজকোষে সঞ্চিত বীজ ও যাহা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তাহা হৃদয়ের বিশুদ্ধ রক্ত হ'তে উদ্ভূত। এইজন্য পুত্রকে ঔরস বলা হয়। উরস্ শব্দের অর্থ হৃদয়। পর্য্যালোচনা ক'রে দেখা গেল হৃৎপিণ্ডে রক্তমন্থন, অনাহত চক্রে অজ্ঞান মন্থন বা অজ্ঞান নাশ এবং মথুরায় কংসমন্থন হয়। আবার মহঃ অর্থে তেজঃ বা অহংকার। মহর্লোক ও সপ্তলোকের হৃদয় স্বরূপ। এই মহর্লোকে জীব তেজঃ বা অহংকার দ্বারা কর্ম্মমন্থন করে' বিশুদ্ধচক্রস্থিত জনলোকে সাত্ত্বিক শরীর গ্রহণ করে। এই সমস্ত কারণে হৃৎপিণ্ড, অনাহতচক্র' মথুরা ও মহর্লোক এক পর্য্যায়ভুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়।

পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধ কণ্ঠে অবস্থিত। বৈষ্ণবগণ ইহাকে দ্বারকা বলেন। জনলোক এর নামান্তর। এখানে সত্ত্ববিশুদ্ধি হয় বলে এই চক্রের নাম বিশুদ্ধ। কর্ম্মফলের দ্বার ব'লে ইহাকে দ্বারকা বলে। দ্বারকায় কৃষ্ণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের পূর্ণফল পুত্র লাভ করেছিলেন। জ্ঞান ভক্তির জন্মস্থান বলে জনলোক এর নাম। কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধচক্র প্রকৃতির লীলাভূমি—বাণীর জন্মস্থান। এখানে একটি ষোড়শদল পদ্ম আছে। ষোড়শদলে ষোড়শ স্বরের বিকাশ। মাতৃকা সরস্বতীর হল বর্ণবীজ এবং স্বরই শক্তি, স্বরবর্ণ যোগেই শব্দের উচ্চারণ। তাই কণ্ঠে শব্দময়ী সরস্বতী পরিস্ফুটা। এই স্বরের মধ্যে আবার আটটি প্রধান। যথা—অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ ও অং। দ্বারকায়ও কৃষ্ণ ন্যূনাধিক ষোড়শ সহস্র স্ত্রী নিয়ে লীলা করেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণা, কালিন্দী ও মিত্রবিন্দা এই আট মহিষী প্রধানা ছিলেন। এই দ্বারকা বা জনলোকে কৃষ্ণ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির সংস্পর্শে জ্ঞানবীর ভক্ত পু লাভ করেছিলেন। বৃন্দাবনে গোপীলীলায় কিন্তু তা হয় নি বৃন্দাবনের রাসস্থল বা স্বর্গ, ভোগের স্থান—জন্মের স্থান নয়। ষষ্ঠ চক্রের নাম আজ্ঞা—ভ্রূমধ্যে অবস্থিত। বৈষ্ণবগণের মতে কুরুক্ষেত্র এর সংজ্ঞা। তপোলোক এর অন্য নাম। আজ্ঞাচক্রে অবস্থানকালে জীব কর্ম্মনিবৃত্ত হ'য়ে জ্ঞান ও আনন্দে বিরাজ করে এবং জীবের সমস্ত আজ্ঞা বা প্রেরণা এই আজ্ঞাচক্র থেকেই আসে। এখানে যে দ্বিদল পদ্ম আছে তার দুটি দলে “হ-ক্ষ” বর্ণদ্বয়ের ন্যাস হয়। হকার শিববীজ বা জ্ঞানতত্ত্ব এবং ক্ষকার অক্ষরবীজ বা আনন্দতত্ত্ব। শাস্ত্রে আছে—“জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেদ্ জনার্দ্দনাৎ।”—অর্থাৎ শঙ্কর বা শিব হতে জ্ঞান এবং জনার্দ্দন বা অক্ষর হতে আনন্দরূপ মুক্তি ইচ্ছা করা উচিত। কুরুক্ষেত্রেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মত্যাগ ক'রে জ্ঞান ও আনন্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধরেন নি—অর্জ্জুনের সারথ্য করেছিলেন এবং জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে তিনি কেবল আজ্ঞাই করেছিলেন। তাই কুরুক্ষেত্রকে আজ্ঞাচক্রের নামান্তর বলা হ'য়েছে। তপোলোকেও সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ কর্ম্মনিবৃত্ত হয়ে জ্ঞান ও আনন্দে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন। শাস্ত্রে আছে—“সনকাদ্যাস্তপঃ সিদ্ধা যে চাপি ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। অধিকার নিবৃত্তা যে তিষ্ঠন্ত্যস্মিং স্তপস্ততঃ।” তপোলোক হতে কেবল আজ্ঞাই আসে, কর্ম্ম আসে না। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রকে তপোলোক বলা অসঙ্গত নয়। “ভূর্ভুবঃ স্ব” এই তিন লোকেই জীবভাব থাকে বলে গোকুল বৃন্দাবন ও রাসস্থলেই জীবরূপা রাধিকার লীলা। “মহর্জনতপঃ” এই তিন লোকে জীবের জীবত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই মথুরা দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে রাধিকার স

নেই—কৃষ্ণেরই লীলা। জীব এই ষট্‌চক্র ভেদ করে' ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পরমাত্মায় মিলিত হয়। সেখানে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব লীন হ'য়েছে মনে করে। তার পর সহস্রার হ'তে নির্গত সত্যের আলোকে তার "চিদানন্দ-রূপঃ শিবোহহং" অর্থাৎ আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ হ'য়েছি এই প্রতীতি হয়। এই ব্রহ্মরন্ধ্রে সপ্তম লোক—সত্য অবস্থিত। এখানে পরমাত্মরূপ শিব নিত্য বিরাজমান। তাঁর জ্যোতিঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে উদ্ভাসিত করে। বৈষ্ণবগণের মতে এই লোকের নাম প্রভাস। প্র-পূর্ব্বক ভাস্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অন্ প্রত্যয় ক'রে প্রভাস শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। ভাস্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। অতএব প্রকৃষ্টরূপে দীপ্ত অর্থাৎ জ্ঞানোজ্জ্বল যে করে তার নাম প্রভাস। এই প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ বিরাট্ যজ্ঞ করেছিলেন। যজ্ঞে ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হ'য়েছিল। তাই জীবের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সহস্রদল পদ্মে লীন হয়। গোপীগণের সঙ্গে রাধিকাও এসেছিলেন। জীবরূপা রাধিকার এই প্রভাসরূপ সত্যলোকে পরমাত্মরূপ কৃষ্ণের সঙ্গে একত্বপ্রাপ্তির ফলে সত্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। এই হ'ল ভাগবতের কৃষ্ণগোপীতত্ত্ব। এই তত্ত্ব মনে মনে বিচার ক'রে ভগবান্ ব্যাসদেব আনন্দকামনায় ভাগবত লিখেছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর এই ভাগবত জগতে একটা অমর দান—একটা অক্ষয় কীর্ত্তি।—যা যুগে যুগে মানুষকে কলুষ থেকে দূরে রেখে' বিমল আনন্দ দান করবে। তবে দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব পাছে মানুষ বুঝ্‌তে না পারে তাই তিনি কৃষ্ণ, রাধা, গোপী, আয়ান প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা ক'রে এই ভাগবতকে সরল করে' দিয়েছেন। তাঁর এই অপার করুণার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

কোকিলের ব্যথা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মনে পড়ে রে—সেই দূর বনভূম।
প্রিয় কাক কাকীদের কাকলির ধুম।
সেই সুখময় ভোর,
আজ মনে পড়ে মোর,
শাখে শাখে জল্‌সার মহা মরশুম।

২

আমি যে পরের ছেলে, আমি এত পর,
ভাবি নাই লভিয়াছি—মায়ের আদর।
হায় কি সুখের নীড়,
সে কি পুলক নিবিড়,
জননীর পাখা ঢাকা নির্ভয়ে ঘুম।

৩

কণ্ঠে ও দেহে মনে মাখা মমতা,
ভুলিব কি ? ভুলিবার নাহি ক্ষমতা।
স্মৃতি তাদেরি শুধু,
বুকে জোগায় মধু,
যেথা যাই পথে পথে ফোটায় কুসুম।

৪

এ জীবনে হায় আমি আর পাব না,
স্নেহচঞ্চুর সেই শস্য কণা।
কোথা কোথারে তারা ?
ডাকি আপনাহারা
সাড়া নাই, সারা বন রয়েছে নিঝুম।

৫

ফাল্গুনে হেরি নিতি নূতন শোভা,
ধাত্রী সে কোথা ? জগধাত্রীরূপা ?
সেই ভোলা ভাইবোন—
সদা টানে মোর মন,
সেথাকার ধূলি মোর রেণু কুঙ্কুম।

৬

মোর ডাকে মাধবীরা ফুটাইছে ফুল,
থরে থরে জাগিতেছে আম্র মুকুল।
মোর সকল এ গান
জানি তাহাদেরি দান।
তাহাদের ছেলে আজ বিদেশে কুটুম।

তীর ও তরঙ্গ

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

ছয়

পুত্র বাড়ীর বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দাকিনী আসিয়া শ্বশুরের ঘরে ঢুকিলেন। চতুর্দ্দিকে সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইতেই আলমারীর মাথায় কাগজে-মোড়া কাপড়ের বাণ্ডিলটা দেখিতে পান। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বাণ্ডিলটা পাড়িতেই তাঁহার চক্ষু স্থির। এই ছেলের পাড়া-বেড়ানো! এই দুপুরবেলাই যদি উমেদপুর বাজারে না গেলে নয়, তো মার কাছে অমন মিথ্যা কথার কি প্রয়োজন ছিল? মন্দাকিনী প্রথমটায় খানিক স্তম্ভের মত বসিয়া রহিলেন। কাপড় দিবার কথা সুলতা আর অণিমাকে। কিন্তু এ যে ছেলে-বুড়ো সকলেরই একখানা করিয়া ধুতি আর শাড়ী। অণিমাকে কাপড় দিতে হইবে বলিয়া কি তাহা এত দামের শাড়ী? কমলা রঙের শাড়ীখানা চার-পাচ টাকার কম কিছুতেই নয়। মন্দাকিনীর সর্ব্বাঙ্গ রাগে থর থর করিয়া কাঁপে। এতই যদি নিজে কর্ত্তা, তবে আগে মার সম্মতি লওয়ার কি দরকার ছিল?

তার মা হইবার আগেই মন্দাকিনীর শাশুড়ী মারা যান। সেই থেকে এ-সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী তিনিই। শ্বশুর আর স্বামীর উপর এতকাল যে আবদার আর অধিকার খাটাইয়া আসিয়াছেন সেই একটানা আধিপত্যের উপর পুত্রের এই হস্তক্ষেপ আজ দারুণ আঘাত করিয়াছে। অভিমানে মন্দাকিনী গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন বহুক্ষণ। কিসের এত দরদ? অণিমারা এমন কোন্ আপন জন? মায়ের সঙ্গে ছেলের এই ছলনার অর্থ কি?

মন্দাকিনী শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। মনে পড়ে, গত চৈত্র মাসে সরোজিনী মাসীমার মারফৎ সুলতা সুনীলের সঙ্গে তার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করেন। মন্দাকিনী হাসিয়া সে প্রস্তাব উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দশ-বিশ ভরি সোনা পাইবার ভরসা নাই, আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সকলকে বিবাহ উপলক্ষে এক স্থানে জড় করিবার আশা নাই, ছেলে তাঁহার আর কিছু না হউক অন্তত এক সেট্ সোনার বোতাম আর একটা হাতঘড়িও পাইবে না—এমন বিবাহ মন্দাকিনী মনের কোণেও স্থান দেন না। বিশেষত, নানা স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছে—দর উঠিয়াছে আড়াই হাজার পর্য্যন্ত। সুলতার দুরাশা তো কম নয়! যাক্ প্রস্তাবটা উঠিতে না উঠিতেই থামিয়া যায়। মন্দাকিনীও কথাটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলেন।

কিন্তু আজ তার মনে দারুণ শঙ্কা দেখা দিয়াছে। এ নিশ্চয়ই সুলতার চক্রান্ত। মেয়েকে তার ছেলের ঘাড়ে গছাইতে চায়। তারই জন্য ফাঁদ পাতিয়াছে সে। নহিলে, মা হইয়া অমন সোমত্ত মেয়েকে এ-বাড়ীতে যখন-তখন আসিতে দেয় কোন্ প্রাণে? যেমন মা, তেমনি মেয়ে! পুরুষের কাছে হো-হো হি-হি করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া মেয়েছেলেকে অমন হেলিয়া দুলিয়া পড়িতে কে কবে দেখিয়াছে! সতের-আঠার বছরের মেয়ের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞানও থাকিতে নাই!—তার ছেলের কি দোষ? ওদের মনে যে এত বিষ সে কি করিয়া জানিবে? তাঁহার ছেলেকে ভালমানুষ পাইয়া মা-মেয়েতে মিলিয়া পর করিবার চেষ্টায় আছে। সে গুড়ে বালি! মন্দাকিনী কঠোর সঙ্কল্পে বুক বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়ান।

কাপড়ের পুঁটুলিটা লইয়া অণিমাদের বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হন। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শীদের সঙ্গে ভদ্রতা লৌকিকতা বজায় রাখিবার মালিক এখনও তিনিই। ছেলে যত বড়ই হউক, যত স্বাধীন ইচ্ছাই থাকুক তার, তাঁহারই ছেলে সে। মন্দাকিনী মনে মনে আত্মাভিমানে ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠেন।

সুলতা ঘরের মেঝেতে কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়াছেন। মন্দাকিনীকে দেখিয়াই অনুগৃহীত অনুগতের মত উঠিয়া দাঁড়ান, “দিদি, হঠাৎ কি মনে করে?—অণু, তোর বড়মাকে পিঁড়ি দে একখানা।”

অণিমা পিঁড়ি পাতিয়া দেয়। মন্দাকিনী বসিয়া পড়েন গম্ভীর মুখে। তাহার এই মেঘভার লক্ষ্য করিল অণিমা—খানিক আগের উগ্র মূর্ত্তির সঙ্গে ইহার যোগাযোগ আছে অনুমান করিয়া লজ্জায় একটু রাঙা হইয়া ওঠে।

“এ নতুন কাপড় কিসের দিদি?”

"তোদের দিতে এসেছি, সুলু।"

"সে কি!" বিস্ফারিত নেত্রে সুলতা মন্দাকিনীর মুখের দিকে তাকান।

"কেন, আমি বুঝি তোদের পূজোয় কাপড় দিতে পারি না?"

"তা বল্‌ছি নে দিদি। ভাব্‌ছি, এ দুর্দ্দিনে খামকা—"

"তোরা তো আমার পর নোস্‌।—আমার বড় খুকী যাবার পর অণুকে তো আমি কোলের কাছে শুইয়ে মরার শোক ভুলতে চেয়েছিলাম। বাদল আর অণু মায়ের পেটের ভাই-বোনের চেয়ে বুঝি কম?"

"সে-কথা মিথ্যে নয়," সুলতা মৃদু হাসিয়া বলিতে থাকেন, "মেয়েকে শুধু আমি পেটে ধরেছি, ও তোমারি মেয়ে। দ্যাখো না, আমি এত ক'রে বললাম—অণু, শীতের দিন আস্‌ছে,আমি আজকাল আর ভালো ক'রে চোখে দেখতে পাই না, ছুঁচে সুতো পরাতে অন্য লোক ডাকতে হয়, তুই কাঁথা নিয়ে বোস। মেয়ে কথা আমার কানেও তুললে না। সে এখন রুমাল সেলাই নিয়েই ব্যস্ত—বাদলদা চলে যাবার আগে ফুল তুলে তাকে দেওয়া চাই।"

মন্দাকিনীর মুখের উপর পিছলাইয়া যায় একখানি ফ্যাকাশে পরদা। সুলতা কিন্তু তেমনি বলিয়া চলিয়াছেন, "দিদি, তুমি রত্ন পেটে ধরেছ। ও ছেলে এখন বেঁচে থাকলে হয়।"

মন্দাকিনী মাথা নোয়াইয়া কাপড়গুলি এক একখানা করিয়া মাটিতে রাখিতে রাখিতে বলিয়া চলিলেন, "এ খানা তোর, এ শাড়িখানা অণুর—এ তিনখানা ছোটদের, অণুর বাবার জন্যে সাদা পাড় আনতে বলেছিলাম, তাই এনেছে।"

"কাপড় বুঝি বাদল কিনে এনেছে?"

"না ··· হ্যাঁ ··· আমি বললাম, পূজোর মধ্যেই যদি কাপড় না দেওয়া হ'ল তবে দেওয়া না-দেওয়া সমান। খোকাকে উমেদপুরে এই দুপুরবেলাই পাঠিয়ে দিলাম।"

সুলতা উল্লাস চাপিয়া বলিলেন,"তোমার যত বাড়াবাড়ি।—এই দুপুর রোদে ছেলেকে পাঠিয়েছ এক ক্রোশ পথ দূরে উমেদপুর বাজারে? ছেলেটা বাড়ীতে দুদিন জিরোতে এসেছে, তাও তোমরা দেবে না।"

মন্দাকিনী অসহ্য মনোভাব অতিকষ্টে চাপিয়া রাখেন। এ যে মায়ের চেয়েও মাসীর দরদ বেশী!

"--অণুর সিল্কের শাড়িখানি পুরোনো হয়ে গেছে—জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। যাক্‌, এ শাড়িখানি ধুইয়ে বাক্সে তুলে রাখব। কোথাও বেরোতে হ'লে—আমার তো আর সাধ্যি নেই দিদি!"

"হ্যাঁ, আমিই খোকাকে বলেছিলাম, অণুর শাড়ি ভালো দেখে আনতে। নইলে, ওর বুঝি সে-সব খেয়াল আছে, ভেবেছ!"

সুলতা মেয়েকে ডাকেন, "অণু! তুই আবার কোথায় গেলি?"

"কেন?" ঘরের বাহির হইতে জবাব আসে।

"শাড়িখানা প'রে তোর বড়মাকে একবার পেন্নাম করে যা।"

বাহির হইতে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। অণিমা পিঁড়ায় ঠেস্‌ দিয়া দাঁড়াইয়া মা আর বড়মার কথা শুনিতেছে নিঃশব্দে।

"সুলু, খোকাকে এবারই বিয়ে দেব।"

"বাদল নাকি বিয়ে করতে চায় না?"

"কে বললে?"

"অণু বলছিল।"

"অণু তো সব জানে! আমার পেটের ছেলেকে আমি চিনি না, চিনতে এসেছে অপরে!"— মন্দাকিনী গরম হইয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণে সামলাইয়া লইয়া নরম সুরে কহিলেন, "ও-সব মনের কথা নয়, মুখের কথা। নিজের বিয়ের কথা বুঝি নিজে সেধে বলবে?"

এবার সুলতা একটু অবাক হন। মন্দাকিনীর কথার মধ্যে যে অকারণ উষ্মা প্রকাশ পাইল তাহার মর্ম্ম ভাল বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়া রহিলেন।

"ছেলের কর্ত্তা তার ঠাকুর্দ্দা, আর তার মা।—তারা যা ঠিক করবে তা মানবে না এমন ছেলেই নয় আমার।" অকারণেই একবার ঢোক গিলিয়া লইয়া মন্দাকিনী বলিয়া যান, "মালদহ থেকে যে সম্বন্ধ এসেছে সেখানেই কথাবার্ত্তা ঠিক ক'রে ফেলি, কি বলিস্‌ সুলু?—মেয়ে দেখতে ভালো, গায়ের রঙ তোর চেয়েও ফরসা হবে। একুশ ভরি সোনা দেবে। শ পাঁচেক টাকার জিনিষপত্তর দেবে বলেছে। নগদও আটশ' টাকার মত দিতে চায়। হাজার টাকা দিতে রাজী হ'লেই ওখানে পাকা কথা দিয়ে ফেলব।"

সুলতা চুপ করিয়া শুনিয়া যান—কোনরূপ মন্তব্য জানান না।

"কি বলিস্ সুলু?—তোদের কি মত?—আত্মীয়-স্বজনদেরও একবার জিগ্‌গেশ করে নিতে হয়।"

"বেশ তো—এখানেই কাজ ঠিক করো," সুলতা কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "বাদলের বিয়ে, এ যে আমাদের সকলকারই আনন্দের ব্যাপার!—কিন্তু দিদি, বাদলের বৌ দেখে শুনে পছন্দ করে আনতে হবে। শুধু টাকার কথা ভাবলেই তো চলবে না। অমন ছেলের সঙ্গে তেমনি মেয়েই খুঁজে বার করতে হয়।"

"সন্ধ্যে হয়ে এল সুলু, আমি এবার উঠি," বলিয়া মন্দাকিনী সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুলতা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বলিলেন, "বাদলকে একবার আসতে বলো দিদি! ইস্কুল নিয়ে ওর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।"

"হুঁ"—মন্দাকিনী বক্রকটাক্ষে একবার পিঁড়ার গা-ঘেঁষিয়া-দাঁড়ানো অণিমাকে দেখিয়া লইয়া উঠানটুকু পার হইয়া যান।

অণিমা আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া আসে। এই পূজার কাপড় যে বড়মা দেন নাই—অন্তত তাঁর ইহাতে পুরাপুরি সম্মতি ছিল না সে-কথা অণিমার বুঝিতে বাকী নাই। দুপুরের ঘটনাটা আর সন্ধ্যার এই পরিশিষ্টের মধ্যে যে যোগাযোগ রহিয়াছে তাহা অনুমান করিয়া লইবার মত বয়স ও বুদ্ধি তাহার আছে। ছি! বড়মার কি কুৎসিত মন। বাদলদার মা'র উপর অণিমা মনে মনে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মার উপরও তার রাগ হয় দারুণ। মার এই কাঙালপনা অসহ্য! বড়মা এমন কোন্ রাণী রাসমণি, আর তারাই বা এমন কি জলে পড়িয়াছে যে, বার বার করুণা ভিক্ষা চাহিতে হইবে কালীঘাটের ভিখারীর মত?

সুলতা ঘরে ঢুকিয়াই সর্ব্বপ্রথমে মেয়ের উপর ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন, "তোর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। শাড়িখানা পরে তোর বড়মার পায়ের ধুলো নিলে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হত শুনি?—এমন জেদের মুখে আগুন!"

"থামো। আর বক্‌বক্ করো না," বলিয়া অণিমা সন্ধ্যা-প্রদীপটা জ্বালিতে যায়।

সুলতা ঝাঁজিয়া উঠিলেন, "পরের ঘরে গেলে এত জেদ চলবে না তখন—দেখে নিস্।"

অণিমা ফিরিয়া দাঁড়ায়। রাগে তার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে। মার মতই ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "হ্যাংলা স্বভাব তোমার ম'লেও যাবে না। যার তার কাছে অমন দৈন্য জানাতে লজ্জা করে না তোমার?"

"পোড়ারমুখীর কথা শোন! বাদলরা যেন আমাদের পর!"

"আপনার লোক যে নয় তা তুমিত জানো, আমিও জানি।—নতুন কাপড় দেখে ভিখিরীর মত তুমি নীলুর মার পা চাটতে পার, আমি পারি না।"

"কি বললি!" সুলতা টগবগ করিয়া ওঠেন, "তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। হায় ভগবান! পেটের মেয়েও চোক রাঙায়।—চোকখাকী, তুই তো জানিস না তোর ভাবনায় রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। মর তুই, মর—মরে আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যা।—যার জন্যে চুরি করি সে-ই বলে চোর!"

"আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"বটে! যা না চলে—যেখানে দু'চোক যায় চলে যা। কত কুটুম আছে, বরণডালা সাজিয়ে রেখেছে। যা না চোকখাকী। কে তোকে সারা জীবন খাওয়াবে—কার অত দায় ঠেকেছে।"

মা-মেয়েতে এমন ঝগড়া প্রায়ই হয়। গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে উভয়েরই। কিন্তু ইদানীং অণিমার বড় করিয়া বাজে ঐ ভাত-কাপড়ের খোঁটা। কবে, কোথায়, কোন্ ঘরে গিয়া ভাত-কাপড়ের আশ্রয় মিলিবে তারই জন্য যেন আজন্ম আবেষ্টনীর মধ্যে জলের উপর তেলের মত আলগা হইয়া ভাসিয়া থাকিতে হইবে—মিশ খাইবার অধিকার নাই। মায়ের সঙ্গে সমানে সমানে লড়িতে গিয়া এই উদারান্নের প্রসঙ্গে আসিলেই কে যেন সহসা তার মুখ সুচ-সুতায় সেলাই করিয়া দেয়। সে যেন এ-ঘরে কিছুকালের অতিথি—কোথায় যাইবে তাহারও কোন নির্দ্দিষ্ট ঠিকানা নাই।

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া অণিমা নীরবে এই অসময়ে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সুলতার মুখ কিন্তু তখনও বন্ধ হয় নাই। ঝাঁজিয়াই চলিয়াছেন, "আমারি হয়েছে মরণ। বাপ তো খায় দায় আর পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। কুটো ছিঁড়ে দু'খানা করবার উপকার নেই। অথচ বাবুর

মান কত! তোর আর দোষ কী! যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি তো হবি। হাভাতের গোষ্ঠী! আবার আমায় বলে হ্যাঙলা!

খানিকবাদে গজ গজ করিতে করিতে সুলতা আহ্নিক সারিতে বসেন। আহ্নিক না ছাই! থাকিয়া থাকিয়া মেয়ের উপর গায়ের ঝাল মিটাইয়া লন। অণিমা কিন্তু চুপ করিয়াই আছে। কথার পৃষ্ঠে কথা বলিতে সে-ও জানে। কিন্তু নানা কারণে মার ভাত কাপড়ের খোঁটাটা আজ তাহার মনে একটা নিষ্ফল আক্রোশের ঝড় তুলিয়াছে। ধুবড়ী থাকিলে এতদিনে তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় হইয়া আসিত। সুরমাদিদির মত ট্রেনিং পাশ করিতে পারিলে তারও একটা বিহিত হইত নিশ্চয়ই।

আধ ঘন্টা বাদে সুলতা আহ্নিক সারিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। বহুক্ষণ নীরবতার পর আসনটা গুটাইতে গুটাইতে আবার সুরু করেন, “আঠার বছরের বুড়ী মাগী—এখনো তার হুঁস নেই এতটুকু!—একদিন তোকেও মেয়ের মা হতে হবে রে—বুঝবি তখন কত জ্বালা।”

এমন সময় দুয়ারের বাহির হইতে বাদলের সহাস্য কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে, “ন’কাকীমা, মা-মেয়েতে ঝগড়া সুরু করেছ বুঝি।”

“বাদল? আয় আয়।” সুলতার কণ্ঠস্বর চট্ করিয়া কোমল পরদায় নামিয়া আসে, “দিদি বুঝি পাঠিয়ে দিয়েছে? আমি তোকে আসতে বলে দিয়েছিলাম—”

“কার কথা বল্‌ছ?”

“তোর মা।—এ গাঁয়ে আমার আর দিদি কে রে?”

“মা বুঝি তোমাদের এখানে এসেছিল?”

“হ্যাঁ! আমাদের সব পূজোয় কাপড় দিয়ে গেল।—কি পাগলামো তোমার, বলো তো?”

সুনীলের চক্ষু স্থির! অপ্রতিভের মত কহিল, “পূজোর কাপড়—হ্যাঁ—তা ··· মা কখন এসেছিল কাকীমা?”

“এই তো সন্ধ্যের আগে।—বোস্ না, দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন?”

মেঝের উপর কাপড়গুলি তেমনি পড়িয়া আছে। সুনীল দেখিয়াই সমস্ত ব্যাপার মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিয়া লইল। প্রথমে ভয়, তারপরে লজ্জা, তারপর রাগ—তিনটি অনুভূতি একসঙ্গে মিলিয়া অসহনীয় অবস্থা! সামনের একটা জলচৌকির উপর যন্ত্রচালিতের মত বসিয়া পড়ে। ন’কাকীমার কথায় কান নাই। মনে মনে মার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। সে না হয় দুপুরেই বাজার হইতে কাপড় ক’খনা কিনিয়া আনিয়াছিল; তাই বলিয়া বার বাড়ীর আলমারীর মাথার এক কোণ হইতে চোরের মত সেগুলি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইবে? এত বিশ্রী সন্দেহ তাঁর কোন্ সাহসে? না, সুনীল এই বাড়াবাড়ি সহ্য করিবে না কিছুতেই। কিসের ভয়? কাহাকে ভয়? মনে মনে আবার সে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে।

সুলতা বলিয়াই চলিয়াছেন, “ছেলে আগে মেয়ে দেখে পছন্দ করুক, তবে তো কথাবার্ত্তা চালাচালি। দিদিকে আমি তাই বল্‌ছিলাম। বাদলের মত ছেলের ঘাড়ে তো আর যা-তা একটা গছিয়ে দিলে চলবে না—দেখতে ভাল হওয়া চাই, ইংরেজীটাও একটু-আধটু জানবে, তোর মা আর ন’কাকীমার মত সেকেলে মেয়ে মানাবে কেন?—টাকা-পয়সার কথা হচ্ছে পরে। কি বলিস?”

আনমনা সুনীল ছোট্ট একটা “হুঁ” করিয়া মায়ের উপর ঝাঁজিয়া চলে মনে মনে। তাহার অন্যমনস্ক ভাবটা টের পাইল শুধু অণিমা।

সুলতা কিন্তু উৎসাহিত হইয়া বলিতে থাকেন, “জানা-শোনা ঘর থেকে মেয়ে আনতে হয়। নইলে, কি আনতে কি এসে হাজির হবে তার ঠিক কি! পরের টাকায় কে আর কত বড়লোক হয় রে বাদল; কিন্তু যাকে নিয়ে সারা জীবন ঘর করতে হবে সে জিনিষটি দেখে শুনে বাজিয়ে আনতে হয়।”

“ন’কাকীমা, আমি আজ এখন উঠি।”

“সে কি! বোস্ না। তোর কাছে যে আমার অনেক কথা আছে,” বলিয়া সুলতা মেয়েকে ডাকেন, “খুকী, ওঠ্ না।”

অণিমা সাড়া দেয় না।

“ওঠ না।—উঠে এসে নতুন শাড়িখানা পরে তোর বাদলদার পায়ের ধূলো নে।”

মেয়ে তেমনি নির্ব্বিকার।

“উঠ্‌বি নে আজ?”—সুলতা কণ্ঠস্বর চড়াইয়া দেন।

“থাক্ না ন’কাকীমা। ওর বোধ হয় শরীর ভাল নেই।”

“শরীর খারাপ নয় আরো কিছু!—মাঝে মাঝে ওকে অমনি ভূতে পায়।”

অণিমা চুড়ির আওয়াজ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয়।

"কানের মাথা খেয়েছিস ?—শুনতে পাস্ না ?" সুলতা ঝঙ্কার দিয়া ওঠেন।

"কি ?"

"কি আর কি !—এই ভর সন্ধ্যেবেলা মানুষ নাকি বিছানায় শুয়ে থাকে। তোর ভালমন্দের ভয়ডরও নেই ?"

নাই যে তাহা নিঃসন্দেহ। কেন না, ইহার পরেও অণিমা কি-না বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল না। ভাবিতেছে কত কি। বড়মার উপর অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছে। কি পাপ মন তাঁহার। নহিলে দুপুরবেলাই বা অমন কাণ্ড করিবেন কেন, আর সন্ধ্যার আগে—এই খানিক আগে রোজগারে ছেলের মা বলিয়া কি দেমাকটাই না দেখাইয়া গেল। অণিমারা না হয় গরীব আজ। তাই বলিয়া বড়মারই বা অত গুমর কিসের ?

সুনীল এবার উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ন' কাকীমা, দত্ত-বাড়ীতে মনোমোহন বাড়ুজ্যের সঙ্গে দেখা হয়েছে—আমাদের হেডমাস্টার মশায়। তাঁকে তোমার স্কুলের কথা বললাম। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট থেকে সুরু করে ডিষ্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত তাঁর জানাশোনা আছে বহু লোকের সঙ্গে। তিনি কথা দিয়েছেন, তোমায় গ্র্যাণ্ট পাইয়ে দেবেন।"

"বাদল, তোদের দয়াতেই বেঁচে আছি বাবা। নইলে যার হাতে পড়েছি তার বুঝি কোন হুঁস আছে !—রাত পোহালে হাঁড়িতে জল ফোটাতে হয় সে-ভাবনা আমি মেয়েমানুষ হয়েও আমাকেই ভাবতে হচ্ছে।"

অণিমা মনে মনে মায়ের উপর আবার ফোঁস করিয়া ওঠে। সুনীল না থাকিলে এখনি দু'কথা শুনাইয়া দিত সে। আবার সেই কাঁদুনি। কেবল কাঁদিয়াই জিতিতে চায়—তাই সারাজীবন কপালে শুধুই কান্না। অণিমা অপরের কাছে মাকে অমন কৃপাভিক্ষা করিতে দেখিলে সহ্য করিতে পারে না—কোথায় যেন বড় লাগে তার। এখন সে বড় হইয়াছে, বুদ্ধি হইয়াছে, মান-অপমান শোভন-অশোভনের বোধ জন্মিয়াছে।

সুনীলকে লণ্ঠন ধরিয়া উঠানটুকু পার করিয়া দিয়া সুলতা ঘরে ফিরিয়া আসিতেই অণিমা ধরা গলায় কহিল, "তুমি আর ওদের বাড়ী যেতে পারবে না।"

"কাদের বাড়ী ?"

"নীলুদের বাড়ী"

"তোর কথায় ?"

"হ্যাঁ, আমারি কথায়," অণিমা দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দেয়। সুলতাও সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ঝামটা দেয়, "আমার পেটে তুই হয়েছিস, না তোর পেটেই আমি হয়েছি, শুনি ?—তোর হুকুমে আমি উঠব আর বসব ?"

"তুমি অমন যার-তার কাছে মরাকান্নাকাঁদতে বসোনা।"

"হ্যা রে আমার নবাবনন্দিনী ! মান দেখে মরে যেতে ইচ্ছে যায়। যেমন বাপ তেমনি তার মেয়ে।—থাক না, তোরা, মান ধুয়ে ধুয়ে খা। আমি চলে যাব—যেদিক দু'চোখ যায়। আমি আর ওসব ইস্কুল-ফিস্কুলের হাঙ্গামার মধ্যে নেই। খাওয়া জুটবে কোত্থেকে দেখব'খন। সকাল না হতেই যে তোদের চোদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধের চড়া না বসালে চলে না !—আবার গুমর দ্যাখো !"

অণিমা বিছানা ছাড়িয়া নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া বসে। মায়ের উদ্দেশ্য, বাদলদার অভিপ্রায়, বড়মার আক্রোশ—সবই সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই চক্র ঘুরিতেছে। ঘুরুক্ ! আপত্তি নাই। কিন্তু বাদলদাকে সে ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অণিমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে চায় যদি, নমিতা সেনকে ভালবাসে না তবে ? না, তার খেয়ালী মনের ঘোলাটে আবর্ত্তে নমিতা আর অণিমা দুজনেই অসহায় দুটি স্রোতের ভেলা ? তার উদ্দেশ্য কি ?—মনের শেষ কথাটি ?

দুপুরবেলা বড়মার কাছে ধমক খাইয়া নানা কথার সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি অণিমাকে পাইয়া বসিয়াছে। মনে মনে সঙ্কল্প করে, আর সে ও-বাড়ী যাইবে না। যাদের মনে অত কালি, তাদের সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি ? কি কদর্য্য সন্দেহ বড়মার ! তার ছেলে অমন বার বার আসে কেন এ-বাড়ীতে ? সে দোষও কি অণিমাদের ?

ক্রমশঃ

বার্লিনে—অলিম্পিক গেমস্

ডাঃ গোরাচাঁদ নন্দী এম্-বি, এম্-সি-ও-জি (লণ্ডন)

বার্লিনের নদী

XI. OLYMPIADE BERLIN 1936
OLYMPIA
STADION
OST
TUNNEL
07
Fussball
5.-
13587
ফুটবলের টিকিট

কপাল ঠুকে বেরিয়ে পড়লাম বার্লিনে। কিছুই ঠিক নেই। খেলা দেখার টিকিটও পাইনি, সঙ্গীও পেলাম না। যদিও প্রথমটা দুজন ভাবী যাত্রীর দেখা পেয়েছিলাম, কিন্তু দুজনেই যাওয়া না যাওয়ার মাঝখানে এমন ইতস্ততঃ আরম্ভ করল যে —একাই বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। শিক্ষা যথেষ্টই হচ্ছে। বরাতে আরও অনেক আছে বুঝতে পারছি। পরনির্ভরতা এবং সঙ্গী খোঁজা এ দুটো স্বভাব না বদলালে আর চলছে না। তার ওপর ইন্ধন যোগাচ্ছে আমার স্বাভাবিক সঙ্কোচ। কেন যে এমন হয় বলতে পারি না। দল না হলে যেন আমার চলে না। অথচ শেষ পর্য্যন্ত দলও জোটে না। হয়তো বা সারা জীবনটাই এমনি যাবে। দশটার সময় ব্যাঙ্কে গিয়ে একটু আশ্বস্ত হলাম যে হিসাবে এখনও ৪০ পাউণ্ড আছে। আমার ধারণা ছিল অবশিষ্ট মাত্র পনের পাউণ্ড আর আছে। যাক্ ১৫ পাউণ্ড তুলে তার থেকে দশ পাউণ্ড জার্ম্মাণ মার্কএ ভাঙিয়ে নেওয়া গেল। এর একটা মজা আছে—বিদেশে ভাঙালে এক পাউণ্ডে বাইশ মার্ক পাওয়া যায়, বার্লিনে এসে ভাঙালে ১২ মার্ক পাওয়া যায়। এটা আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা। জার্ম্মাণী যাদের কাছে ঋণী, এই রকম করে তাদের ধার শোধ হচ্ছে। এর অপব্যবহার বন্ধ করবার জন্য কড়া বন্দোবস্তও আছে। আমি সেদিনকার দর অনুসারে ২০·৮০ মার্ক করে পেলাম। পরে জেনেছিলাম ঐ দরেও ১ মার্ক করে ঠকেছি! যাহোক, তারপর গাওয়ার ষ্ট্রীটে গিয়ে আর একজন যাত্রীর সন্ধান করলাম। তিনি যাবেন কি যাবেন না—ঠিক বললেন না। আর একজন যাবেন না আমায় আগেই বলেছিলেন। সেখান থেকে আমাদের বিষ্ণু মুখুজ্জেকে ধরে সঙ্গে নিয়ে দেশী ট্র্যাভলিং এজেন্সি—ওরিয়েন্ট লায়ডে গেলাম। সেখানে টিকিট সস্তা। ৪ পাউণ্ড ৭ শিলিং দিয়ে বার্লিনের রিটার্ণ টিকিট কাটা হল। একটার সময় বাড়ী ফিরে দেখি আমাদের বাসার বুড়ী কর্ত্রী আমার যাত্রার জন্য সব গোছগাছ করে রেখেছে। বুড়ী জিজ্ঞাসা করলে—খাওয়া হয়েছে? এদের সঙ্গে সম্বন্ধ অনেকটা বাড়ীর মত হয়ে গিয়েছে কিনা! এই নিবান্ধব দেশে এদের সহানুভূতিটুকু ভালই লাগে! আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পথে একটা মিল্ক-বারে আমি স্যাণ্ড্উইচ্ আর দুধ খেয়েছিলাম। এখানে 'মিল্ক্-বার' সম্বন্ধে কিছু পরিচয় আবশ্যক। মিল্ক-বার লণ্ডনে নূতনতম দোকান। এর আদর্শ আমেরিকা থেকে আমদানী। আমেরিকা যখন ড্রাই—অর্থাৎ মদ্যহীন দেশ ছিল—তখন পথিকের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ইংরাজী বার বা মদের দোকানের অনুকরণে মিল্ক-বার করেছিল। এতে পান ও পুষ্টি দুইই হয়—অথচ খুব সস্তা। দুধের সঙ্গে ফলের সিরাপ মিশিয়ে অথবা কোকো, হরলিক্স, ওভাল্টিন্ এই সব নানা জিনিষ মিশিয়ে নানা রকম মুখরোচক পানীয় তৈরী করে এবং কলের সাহায্যে দুধকে ঝাঁকিয়ে—খুব সুস্বাদু করে খেতে দেয়। সস্তায় ভাল জিনিষ খেতে পায় লোকে, পেটও ভরে। এটা আমেরিকাতে নাকি ভীষণ চলেছে—তাই লণ্ডনেও আমদানী

হয়েছে, কাগজে এই সব পড়েছিলাম। আমেরিকা-ফেরত বিষ্ণুমুখুজ্জের কাছে সব সঠিক শুনে আমি আর মুখুজ্জে—আমাদের দুজনেরই খেয়াল হল যে এ ব্যবসা আমাদের দেশেও বেশ চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা খসড়া পর্য্যন্ত তৈরী হয়ে গেল কি করে, ব্যবসা ফাঁদা যাবে। কল্পনা কোন দিন হয়ত বা কাজ প্রসব করতে পারে—দেখা যাক। আশায় আছি তো অনেক কিছুরই। কল্পনার ত আর কাষ্টম্‌স্ ডিউটি দিতে হয় না, সব দেশেই তাই এর অবাধ গতি, বিশেষতঃ চারিদিকে যতই নূতন জিনিষ দেখি— ততই মগজের ভিতর উদ্ভট কল্পনা সব ফেনাতে থাকে! হয়ত কোনদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাতে মগজের কাল্পনিক বেলুনটি ফেটে গিয়ে সব হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে! উপস্থিত নব নব কল্পনার সুখেই দিন কাটছে, জল্পনায় যাপিতে হচ্ছে বেশীর ভাগ অবসর। যাক, বড় রাস্তা ছেড়ে অনেক গলি ঘুঁজির মধ্যে ঢুকে পড়েছি দেখছি, মোড় ফিরি এইবার। * * *

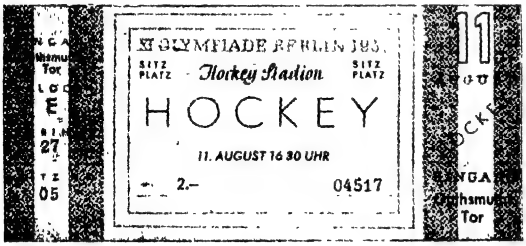
XI OLYMPIADE BERLIN 193

SITZ PLATZ Hockey Stadion SITZ PLATZ

HOCKEY

11. AUGUST 16 30 UHR

2.– 04517

হকির টিকিট

গাড়ী ছাড়বে তিনটেয়। বাড়ী থেকে দুটো কুড়িতে রওনা হলাম। যাত্রার সময় আবার বিদায়ের পালা! বাড়ীর বুড়োর সঙ্গে আমার বেশী ভাব এবং বেশী ঝগড়া কিনা—বুড়ী বলে যে তুমি গেলে বুড়ো দুঃখিত হবে! বুড়ো বলে—সত্যিই, তুমি চলে গেলে আমি কার পিছনে লাগব—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দেখি যেখানেই যাই কেমন ক'রে যেন শিকড় গজিয়ে যায়। যেমন সর্ব্বত্র বলি—এখানেও বলে গেলাম—চিঠি লিখব। বাসে উঠে অতিষ্ঠ এবং অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। পাঁচ মিনিট থাকতে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। সময়-জ্ঞান একেবারে বড় সাহেবদের মত। আমার এই ইউরোপ ভ্রমণে দুজন বন্ধু দেখি বিদায় দিতে এসেছেন; ডঃ মুখার্জি অর্থাৎ সেই বিষ্ণু মুখুজ্জে আর মিঃ ঘোষ সেই 'ওরিয়েন্ট্ লয়েড্' টিকিট কোম্পানির লোক। তিনি আমার জন্যে টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

গাড়ীর পর্ব্ব একেবারে 'সাইলেন্ট্ পিক্‌চার'—সঙ্গে ত সুটকেশ আর ওভারকোট। জায়গা পেলাম এক ঘরে যেখানে দুটী জার্ম্মান মহিলা নিজেদের ভাষায় দ্রুতগতিতে রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলে চলেছে। মহিলা শব্দটি ব্যবহার করেছি দেখেই আশা করি বুঝবেন এঁদের বয়েস হয়েছে—অর্থাৎ উপযুক্ত তরুণীর দলে পড়েন না—আমার হিসাবে! আমি নীরব এবং জড়পদার্থবৎ বসে—আশে পাশের দৃশ্য দেখছি, আর মাঝে মাঝে 'প্লেয়ার্স-প্লিজ্' এর সদ্ব্যবহার করছি। লণ্ডন থেকে ডোভার পর্য্যন্ত একটাও কথা বলিনি—এই ভাবে ভ্রমণ করলে মৌনীবাবা হয়ে দেশে ফিরব—তবে একটা ভরসা, জটা কিছুতেই গজাতে পারবে না—কারণ টাকমহাশয় দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বাড়ছেন! দেড়ঘণ্টায় ষাট মাইল নন্-ষ্টপ্ ছুট মেরে ডোভার পৌঁছে দে-দৌড় ষ্টীমারঘাটে—সহযাত্রী আর সকলের দেখাদেখি। আশে পাশে কাতরভাবে তাকিয়ে কোথাও একটীও গাঢ়বর্ণের লোক দেখলাম না। বুঝলাম এ যাত্রায় আমিই রঙীন জাতের (Coloured Nation) একমাত্র প্রতিনিধি! তা'বলে ভাববেন না যে তার জন্যে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম! বরং—সুদীর্ঘ মৌন যাত্রার দুঃসহ অবস্থা ভেবে মনে মনে যথেষ্টই কষ্ট হচ্ছিল! নৈসর্গিক শোভাও ভাল করে উপভোগ করতে পারিনি। ডোভারের শ্বেতগিরি 'চক্ ক্লিফ্‌স্' এর কথা বইতে পড়েছিলাম এবার চাক্ষুষ দেখা গেল। ধারণা ছিল একেবারে সাদা—দেখলাম তা নয়—মাটীর ধূসরবর্ণের সঙ্গে খড়ির সাদা রং মেশান।

আমার সহযাত্রিণীদের একটু পরিচয় না দিলে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বাচনিক পরিচয়ের সুযোগ হয়নি—চাক্ষুষ পরিচয়ই সসঙ্কোচে কিছু হয়েছে। একজনের সঙ্গে তেরঘণ্টা পরে সামান্য কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছিল—সে কথা পরে বলব। দুজনেই জার্ম্মান, তবু তাদের কথা আড়ি পেতে শুনে বুঝেছিলাম—একটু একটু ইংরিজি জানে। দুজনেই মোটা এবং 'বাংলায়' যাকে বলে Buxom. এদের চেহারা দেখে জার্ম্মান মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তা বদ্ধমূল হল।—পরে অবশ্য বার্লিনে পৌঁছে সে মত বদলাতে হয়েছিল।

জার্ম্মাণীতেও সুন্দরী মেয়ে আছে। সঙ্গী মহিলা দুটির বয়েস তিনের কোঠার মাঝামাঝি—পাশ্চাত্য শাস্ত্র মতে যৌবন এখনো যায়নি। একজনের চেহারা মুখ এবং হাসির ধরণ দেখে আমার কেবলই মিস্ বোসের কথাই মনে পড়ছিল। এটী স্বভাবতঃ একটু গম্ভীরা—আর একজন এর তুলনায় চটুলা! সে সারাপথই হি হি আর হাহা ক'রে হাসছিল আর এত কথা বলছিল যে আমার বেজায় রাগ এবং হিংসা হচ্ছিল। আমারও সঙ্গে একজন কেউ থাকলে আমিও কথা আর হাসির ফোয়ারা ছোটাতে পারতাম! নেহাৎ একলা পড়ে গেছি তাই ঠোঁটে দাঁত চেপে বোবা হ'য়ে বসে আছি। এটী যেমনি মোটা, তেমনি গালফুলো গোবিন্দর মা! আর দাঁতগুলো এতো উঁচু যে ছোট ছেলেমেয়েরা দেখে ভয় পেতে পারে! পরে এর আরও পরিচয় পেয়েছিলাম। আপনারাও পাবেন। তবে ২৪ ঘণ্টার সঙ্গলাভে এটী বেশ বুঝতে পেরেছিলাম—মহিলাটি একটী রাক্ষসী বিশেষ! সারা রাস্তা আপেল কামড়াতে কামড়াতে চলেছেন,—এত আপেলও সঙ্গে এনেছিল!

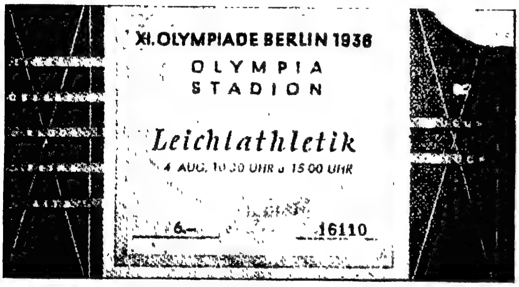
XI. OLYMPIADE BERLIN 1936
OLYMPIA
STADION
Leichtathletik
4 AUG. 10.30 UHR u 15.00 UHR
6.–
16110

এথ্লেটিকের টিকিট

ডোভারে পাসপোর্ট পর্ব্ব শেষ করে একটী ষ্টিমারে উঠলাম—এটা বড় জাহাজও নয়, ছোট লাঞ্চও নয়, মাঝামাঝি। অর্থাৎ 'না গাধা-না ঘোড়া' আর কি! কেবলমাত্র ফার্ষ্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাস আছে। যদিও ডোভারে নেমে দৌড় দিয়েছিলাম, জাহাজে উঠে দেখি রেলিং এর ধারগুলো ডেক চেয়ারে আর লোকে ভরে গেছে, আর মাঝখানটা মালপত্রে বোঝাই। কোনও রকমে একজায়গায় দাঁড়ালাম। তখনও লোকের আসা বন্ধ হয় নি। জাহাজ ছাড়লে—চক্ ক্লিফ্স্ গুলো ভাল করে দেখা গেল। খানিক দূর পর্য্যন্ত জলের মধ্যে টানা পাথরের দেওয়াল গাঁথা আছে, আর তার ওপর সারি সারি কামান বসান আছে—দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য। দেখে আমার মনে হ'ল এগুলো কি আর কাজে লাগবে, ভবিষ্যৎ যুগের আক্রমণ ত আর স্থলপথে বা জলপথে হবে না—এবার যুদ্ধ হবে বিমানে। জাহাজ পুরা বেগে ওপারে বেলজিয়মের দিকে অগ্রসর হলো। আমিও ভাল জায়গার চেষ্টায় বেরুলাম। ষ্টিমারের ওধারে গিয়ে দেখি একটা দড়ির বেড়ার ধারে খানিক জায়গা আছে। শ্রীমান স্যুটকেসকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে আস্তানা গাড়লাম। তখনো দেখি চেয়ারের আমদানি হচ্ছে। আমিও লোকটীকে বললাম একখানা চেয়ার এনে দিতে পারো? লোকটি অম্লানবদনে বললে—'আর নাই!' আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। কিছু পয়সা বাঁচল। যতলোক বসে আছে তার চেয়ে বেশী লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দড়িতে হেলান দিয়ে সধূম্র চিন্তায় সময় কাটাতে লাগলাম। জলে দেখবার মত কিছু ছিল না—দেখবার ছিল অনেক কিছু ছোট্ট জাহাজটীতে। জাহাজ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটী বয় ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে হেঁকে গেল—চা প্রস্তুত! জাহাজটী বেলজিয়ানদের—ভাল ইংরাজী বলতে পারে না, জাহাজের লোকেরা তাদের উচ্চারণ শুনে সকলেই হাসছিল! কথায় একটু টান ছিল তাদের—অনেকটা এই রকম "টী রেড্ডী"! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আশে পাশের লোক চলাচল দেখতে লাগলাম—স্কুলের ছেলেরা দলে দলে মাষ্টারদের সঙ্গে যাচ্ছে আগষ্ট মাসের শরতের ছুটিতে ভ্রমণ করতে। এদেরই মজা! দল বেঁধে মনের আনন্দে চলেছে। কবে যে আমাদের দেশে এরকম হবে। কত জায়গাই ত দেখবার আছে। ইউনিভার্সিটি থেকে বা শিক্ষা বিভাগ থেকে অনায়াসে

অলিম্পিক ষ্টেডিয়ামের একটি দৃশ্য

বন্দোবস্ত করে দিতে পারে—তাতে সত্যিকারের শিক্ষা হয়। যাক, সঙ্গী অভাবে কল্পনাকে সঙ্গিনী করেছিলাম। আর দেখছিলাম এদেশের মেয়ের দলে কত রকম চেহারা, বয়স অনুসারে সাজালে কত সারি হ'তে পারে—আর কতরকমের পোষাক, কত রকম চুলের বাহার, আর কতরকম প্রসাধন চাতুর্য্য। শুনেছিলাম অনেক মেয়ে একলা বেরোয় সঙ্গীর খোঁজে এবং পেয়েও যায়। তাকে বলা হয় নাকি 'কম্প্যানিয়নসিপ্'! ভাল কথা। তবে তাৎপর্য্য সবাই জানে এর, ছেলে এবং মেয়ে উভয়পক্ষই। স্টেশনে আসবার পথে বিষ্ণুর সঙ্গে এই সব কথাই হচ্ছিল। তাই মনে মনে এই রকম একটা কিছু দেখবার প্রলোভন ও কৌতুহল ছিল এবং দেখবার সৌভাগ্যও হয়েছিল।

অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম

ক্রমশঃ জাহাজের লোকেরা শান্ত হয়ে উঠল। যার বই আছে বার করে পড়তে আরম্ভ করল, যাদের সঙ্গী আছে গল্প সুরু করল, বুড়ো বুড়ীরা চোখ বুজল, আর ছেলেরা মহা উল্লাসে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর একে একে লাঞ্চ-ব্যাগ থেকে যে যার খাবার বার করে যেন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়েই খেতে লাগল। যার সঙ্গে খাবার নেই সে জাহাজের পেছনদিকের ক্যান্টিন থেকে বিস্কুট, স্যাণ্ডউইচ, চকোলেট এই সব কিনে এনে খেতে আরম্ভ করল। আমারও লোভ হচ্ছিল, কিন্তু আমি মন স্থির করতে পারছিলাম না। খাব কি খাব না—জাহাজে খেতে গেলে অনেক পয়সা খরচ, তার চাইতে পার হয়েই খাওয়া যাবে। অথচ কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেকও হয়েছে—আর যে দিকেই চাই, আশে পাশে সবাই খাচ্ছে—কাজেই আর স্থির থাকতে পারা গেল না! মনটা খাই খাই করে উঠল। একলা অবস্থায় মনের ভাবটা কি রকম হয়েছিল জান?—যেন মস্ত এক প্রতিযোগিতাঃ আমি—আর—বাকী সকলে! শেষ পর্য্যন্ত পেটেরই জয় হল। চলে গেলাম নিচে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে, সেখানে দেখি খুব মদ চলছে। আশে পাশে টেবিল খালি আছে দেখে একটাতে বসে পড়লাম এবং বোকার মতন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। মিনিট পনেরর মধ্যেও কোন ওয়েটার আসে না দেখে অনেকে উঠে গেল। আমি এবং আরও কয়েকজন বসেই রইলাম।—খেতে পাই না পাই—বসতে পেয়ে আমি বেঁচেছিলাম। ডেকের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছল! অবশেষে চা এল—এক শিলিং ছ পেন্স অর্থাৎ ১ টাকা দিয়ে এক কাপ চা আর একখানা কেক খেয়ে টাকে হাত বুলোতে বুলোতে ওপরে উঠলাম। দেখি আমার জায়গায় পাশের চেয়ার খানি বিরাজ করছে! কি আর করব, দড়ির পেছনে অর্থাৎ মেয়েদের যাতায়াতের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল। যাব কোথায়? সেই রাস্তা দিয়ে যখন তখন মেয়েরা এক একজন যায় আর আসে। কোথায় তা আর বলতে হবে না বোধহয়। সে দরজায় লেখা ছিল Laslies, Damen, Dames তিন ভাষার-"মহিলারা"। যাঁরা যাচ্ছেন ভ্রূক্ষেপ নেই! আমারই শেষটা ওদের পথের কালো কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জা করতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নস্যের প্রয়োজন অনুভব করতে লাগলাম। থার্ডক্লাশ সব দেশেই সমান। পরে রেলেও এই কাণ্ড দেখেছি। এইবার একটা মজার ব্যাপার দেখবার সৌভাগ্য হল—সেই কথা—সঙ্গী খোঁজার—যা আগে বলেছি। একটি ভদ্রবেশিনী, মাথায় বড় টুপি দেওয়া, মাঝামাঝি রকম পালিশ করা, তিনের কোটার গোড়ার দিকের—আমার কিছু সামনে এসে দাঁড়াল—জাহাজ তখন দুলছিল—চেহারা দেখে বিবাহিতা বলে ধারণা হয়েছিল। আধ ঘণ্টা পরে দেখি যারা পায়চারী করছিল তাদের মধ্যে একটী গাঢ় রংএর লোক মেয়েটির সামনে এসে চেনা চেনা ভাবে তাকাতে লাগল। চোখের ভাষা আছে বইয়ে পড়েছি এবং চোখেও পড়েছি, ব্যাপারটা জানি এবং দেখেওছি। কিন্তু, তার যে এ হেন প্রশ্নোত্তর সংগ্রহের code বা সাঙ্কেতিক লিপি আছে তা জানতাম না। দেখে বেশ আনন্দ পেলাম। লোকটির ধরণ ধারণ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল। মেয়েটির চোখ দেখতে পাইনি—পেছনে ছিলাম। না হলে দুদিকেরই শিক্ষা হত। যাহোক, পরের ঘটনাগুলি চমৎকার। মেয়েটীই প্রথমে কথা

সুরু করল। বুদ্ধিমতী কিনা—Damsel in distress সেজে গেল! বলল Would you mind bringing down my case? (আমার বাক্সটা গাদা থেকে পেড়ে দেবে?) সে ত তিন পায়ে খাড়া! সেদো ভাতখাবি, না আঁচাব কোথা? বাক্স নামান হল—বড় ভারী। নামাবার পরে দেখা গেল হাতলটা এক জায়গায় খুলে গেছে। মেরামত সুরু হল—মেয়েটী ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। কাণে কাণে কিছু কথা হল কিনা জানি না—মোট কথা দেখা গেল—মেয়েটীর সব কটা লাগেজই ছেলেটী নিয়ে দুজনে একসঙ্গে উপরে উঠে গেল। তখন বেলজিয়ামের তীর কাছে এসেছে, কাজেই আমিও আমার সুটকেসের হাতল ধরে উপরে উঠলাম। তখনও অগ্রগামী দুজনের নূতন আলাপের ধরণটী দেখবার খুব ইচ্ছে আছে। দেখতেও পেলাম। দুজনে দাঁড়িয়ে অনর্গল বকছে আর হেসে চলেছে। জাহাজের দোলানিতে মেয়েটী টলে টলে পড়ছে আর ছেলেটী তাকে পড়া থেকে বাঁচাবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে আগলে ধরছে। তবে biast হয়ে পড়েছিলাম বলেই আমার মনে হচ্ছিল যেন টলার মধ্যে একটু চেষ্টা আছে। আর বাঁচাবার চেষ্টার মধ্যেও একটু যেন আতিশয্য আছে। জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে ওঠবার সময় দেখতে পেয়েছিলাম—গাড়ীতে দুজনে এক কামরায় উঠছে—তারপর দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়েছে—সদ্য আলাপী দুটী ক্ষণপূর্ব্বের অপরিচিত নর নারী। আমি তাদের কয়েকদিনের মিলনের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি!

বিজেতাদের সম্মানের পর জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে—
সকলে হাত তুলে আছে

জাহাজ থেকে নেমে—আবার পাসপোর্ট পর্ব্ব এবং আবার কাস্টাম্‌স্ পর্ব্ব। আমার ছোট্ট বাক্স এবং স্বাভাবিক সাধু মুখ দেখেই বোধ হয়—বাক্স না খুলিয়ে ছেড়ে দিল।

ট্রেন ছাড়ল সাড়ে আটটায়। ইণ্টারন্যাশান্যাল ট্রেণ লম্বা দৌড় দেবে বেলজিয়ামের অষ্টেণ্ড্ থেকে হাঙ্গেরীর বুদাপেষ্ট্ পর্য্যন্ত—পাঁচটা দেশের ভেতর দিয়ে—কাজেই সুবন্দোবস্ত। ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড্ আর থার্ড ক্লাস এবং 'রেষ্টুরাঁকার' আছে। করিডর ট্রেণ, অর্থাৎ বারান্দাওয়ালা আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং মেলে যেমন আছে। তবে থার্ড ক্লাস গাড়ীর কাঠের বেঞ্চিতে বসে যেতে হয়, শোবার বন্দোবস্ত নেই, সিটে নম্বর দেওয়া। একজন সহযাত্রীর দেখাদেখি ছ'পেনি দিয়ে এক গদি কিনলাম—সারা রাত বসে যেতে হবে ত'। রাত তিনটেয় কোলোনে পৌছাব এবং সেখানে গাড়ী বদল করতে হবে। আমাদের দুবেঞ্চিওয়ালা কামরায়—দুটী মেয়ে এবং পাঁচটী পুরুষ। তার মধ্যে একটী দম্পতী। আমার জন্ম-পত্রিকায় কন্যারাশি আছে বলেই বোধ হয়। কারণ, একটী মেয়ে আমার সামনে এবং একটী পাশে এসে বসল। সামনেরটীর একটু পরিচয় দেব। জার্ম্মান যুবতী, স্বাস্থ্যবতী এবং কিঞ্চিৎ বিদুষীও, কারণ গাড়ীতে অস্‌কার-ওয়াইল্ডের ইংরাজী সংস্করণ পড়ছিলেন। মনে হল মেয়েটী একটু চিন্তাশীলা এবং গভীর প্রকৃতির কিন্তু অলঙ্কারবিলাসিনী। পরে জেনেছিলাম জার্ম্মান মেয়েরা ঠোঁটে রং না মেখে কানে এবং হাতে গয়না পরাই বেশী পছন্দ করে। মেয়েটীকে দেখে 'শিকারী ললনা' বলেই মনে হয়েছিল। শুনেছিলাম কন্টিনেণ্টাল শিকারী মেয়েরা ট্রেণে ট্রেণে ঘুরে বেড়ান। নাও হতে পারেন ইনি হয়ত সে দলের, তবে মগজে তখনো জাহাজের ঘটনাটা ঘুরছিল—তাই আলাপ করবার

হকি ফাইনাল—জার্ম্মাণীর গোলের কাছে—
ভারতবর্ষ ৮-১ গোলে জিতেছে

লোভ হচ্ছিল। একলা আর এমনভাবে কতক্ষণ মুখ বুজে থাকা যায়। পাশের মেয়েটী ত তার স্বামীর সঙ্গে প্রাণভরে গল্প করে চলেছে। ইংলণ্ডে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে স্বামীদের সব সময়েই স্ত্রীদের চাইতে বয়সে ছোট দেখায়। এক্ষেত্রেও দেখছি তাই। ট্রেনেও আবার জাহাজের মত সকলে বাস্কেট্ খুলে খেতে আরম্ভ করল। লোভ সামলাতে না পেরে দুজন রেস্তোরাঁ কারে চলে গেল। আমিও তাদের অনুসরণ করলাম এবং গাড়ীর ভিতর দিয়ে দিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে দেখলাম সব টেবিলই ভর্ত্তি! বাবাজীদের ভাষা একটুও বুঝি না। আলাদা একটু জায়গা করে নেবো যে তারও উপায় নেই! খানিকক্ষণ ঘুরে ফিরে চলে এলাম এবং ঠিক করলাম আজ রাত্তিরে ট্রেনে একাদশী করব। কিন্তু পেটের তাগিদ্ বেড়ে যাওয়াতে - আবার রওনা হ'লাম রাত দশটায়। এবার একটা টেবিলে একটি জায়গা পেলাম। সে টেবিলে আর দুজন জেকোস্লোভাকিয়ার লোক আর একজন জাপানী। জাপানী দু একবার তাদের সঙ্গে ইংরাজীতে গল্প করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল—পরে আমার সঙ্গে কিছু কিছু কথা বলতে সুরু করল। খাওয়া দাওয়া ভাল। আমাদের দেশের মতই পরিবেশন করে—বার বার দেয়। আর চাই—আর একটু মাংস দেব, একটু সব্‌জী নিন্‌না? ভালই লাগছিল বিদেশীদের এই যত্ন যাদের। তৃপ্তির সঙ্গে খেলুম। জল পাওয়া যায় না। দিলে বিয়ার। আমি বললাম একটু জল দিতে পার। এনে দিল সোডা। তার দাম বিয়ারের চাইতে বেশী। তবে সতীত্ব যখন বজায় আছে—আর বিয়ার খেলাম না। বিল যখন এল খাওয়ার সুখ ও তৃপ্তি নিমেষে মিলিয়ে গেল—৩৫ ফ্র্যাঙ্ক! অর্থাৎ ৫ শিলিং। ঘরে যখন ফিরলাম—সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। আমাদের ঘরে তখন নীল আলো জ্বলছে। পাশের মেয়েটী—হাঁ করে ঘুমুচ্ছে এবং কিঞ্চিৎ নাসিকাধ্বনিও করছে! বিয়ের পরে একটু আয়েসী হয়ে পড়েছে বোধ হয়! আর সামনের মেয়েটী আমার সিটে দিব্যি পা তুলে দিয়ে—পাশে ঝোলান ওভার কোটে মাথা এবং দেহ ঢেকে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলাম কি করা যায়! মেয়েটিকে জাগাবো কি? ডেকে তুলব? এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি বোধ হয় আমার দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে জেগে উঠে পা একটু সরিয়ে নিল। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বেঞ্চের তলায়—পায়ের ভিড়ের মধ্যে আমার পা দুটোর একটু জায়গা করে নিয়ে চক্ষু বুজলাম। চক্ষুই বুজলাম—মগজ কিন্তু জেগেই রইল। গাড়ীর দোলানিতে এবং স্থানাভাবে—সামনাসামনি পরস্পর চতুষ্পদে ক্রমাগতই আলাপ হতে লাগল। একটু তন্দ্রা আসে—আর কঠিন চরণ পরশে ঘুম ভেঙে যায়। এইরকমেই ঘুমে ভারী চোখ নিয়ে জার্ম্মান সীমান্তে পৌছালাম। ষ্টেশনে তখন রেডিয়োতে বক্তৃতা আর বাদ্য হচ্ছে—চেয়ে দেখি ষ্টেশন ফুলে আর পতাকায় সাজান। গাড়ী থাম্‌তেই নেমে পড়লাম। ভীষণ জলতৃষ্ণা পেয়েছিল—রেলে ভোজনটা একটু গুরুতর হয়েছিল কিনা। জলের খোঁজে বেরিয়ে গরম কফি খেলাম। মধ্বাভাবে গুড়ং আর কি! গভীর রাতে একটু শীত অনুভব করতে লাগলাম এবং বেশ একটু অন্তর কাঁপুনি লাগতে সুরু হল। কফি খেয়ে প্লাটফর্ম্মে পায়চারী সুরু করলাম। এখানেও কাস্‌টাম্‌সের তাড়া। সঙ্গে বিদেশী অর্থ থাকলে—লিখিয়ে নিতে হবে। আমার ছিল না। নিশ্চিন্ত!

লেবার ক্যাম্পে খাল কাটা হচ্ছে

রাত সাড়ে তিনটেয় কোলোনে নামতে হল। নামবার সময় সামনের মেয়েটী আমাকে বলল—দয়া করে আমার বাক্স দুটো নামিয়ে দেবেন। নামিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলাম কি সর্ব্বনাশ! আর কোনো শিকার খুঁজে পেলেনা না কি? কিন্তু তা নয়, আশঙ্কা অমূলক—মেয়েটী এখানেই নেমে গেল। মনে মনে তখন একটু দুঃখই অনুভব করলাম। এক ভদ্রলোককে বার্লিনের গাড়ী কোথায় এবং কখন ছাড়বে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—দু নম্বর প্লাটফর্ম্ম—৪-৫৬ মিনিটে। নীচে নেমে গেলাম। টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে খোঁজ করাতে আমার ভাষা কেউ এক বর্ণ বুঝতে পারলে না, আমিও বোঝাতে পারলাম না। এবার উদ্ধার করলেন—

সেই ইংল্যাণ্ডের গাড়ীর মোটা হাস্যময়ীটী। তিনি এসে বললেন—আমি একটু একটু ইংরাজী জানি। অনেক কথাই বললেন যার সারাংশ হচ্ছে, তুমি বার্লিনে যাবে? আমিও যাব। তোমাকে সব দেখিয়ে দেব। তুমি কোথায় থাকবে? থাকবার জায়গা চাই? কি রকম? সস্তা না বেশী দামের? আমি তাঁকে সবিনয়ে ধন্যবাদ দিয়ে জানালাম—আমি একটা আস্তানা ঠিক করেছি, নাম হিন্দুস্থান হাউস—কার্ডটা দেখালাম—তাতে ঠিকানা লেখা ছিল। ভদ্রমহিলা একটু দমে গেল। পায়চারী আর ধূম উদ্গীরণে সময় কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ সেই মেয়েটী এবং তার সঙ্গের ছেলেটী এগিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি তাদের অনুসরণ করলাম। ভুল ভাঙল। ওরা দম্পতী নয়। সঙ্গেরটী রাস্তার জোগাড়। একই গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম তবে পাশের কুঠ্‌রিতে। বসে বসে ঢুলছি। একটু একটু আলো হয়েছে—কোলোন—কোলোন সৌন্দর্য্যের জন্যে বিখ্যাত—রাইন নদীর তীরে এই সুন্দরী নগরী। আবার গাড়ী বদলাতে হল—ডুসেলডর্ফ্ এ শহরের নাম—এখানেও গাড়ীতে বসে ঢুলতে ঢুলতে বেলা বাড়তে লাগল। কত লোক এল গেল। কত অপরিচিতা পাশে এসে বসল, উঠল, নামল। দুজনের কথা মনে আছে। কফি খাওয়ার কথা মনে আছে। ঠাণ্ডায় লেগেছিল ভাল। ছোট ছেলেদের কাল লোক দেখে আমোদ লাগার কথা মনে আছে। তাদের আমোদ বেড়ে গেল যখন তাদের ডেকে সিগারেটের ছবি দিলাম। তাদের "ব্ল্যাকী" বলতে শেখালে কে? বেলা তিনটের সময় বার্লিনে পৌছে গেলাম।

খবরের কাগজে আগেই পড়েছিলাম যে সমস্ত জার্ম্মাণী অলিম্পিকের জন্যে ভাল করে সাজান হচ্ছে। সারা পথ তার চিহ্ন পাওয়া গেল। সব বাড়ীতেই নূতন করে রং দেওয়া হয়েছে। বাগান তৈরী করা হয়েছে। আর ফুলগাছ সাজান হয়েছে। জার্ম্মাণীর স্বস্তিকাঙ্কিত জাতীয় পতাকার অভাব নেই। সব বাড়ীতেই টাঙান আছে, ছোট এবং বড়। কুইন ভিক্টোরিয়ার জুবিলির সময়েও বোধহয় আমাদের দেশ এত সাজানো হয় নি। তার কারণ এর মধ্যে খানিকটা তরুণ 'নাজী' জাতীয়তা এবং 'কর্ত্তার হুকুম' আছে। বেশীর ভাগ লোকই এখানে কর্ত্তার নাম করতে অজ্ঞান। এদের দেখা হলে বলতে হয়—'হেল্ হিটলার!' আমাদের দেশে দেখা হলে হিন্দুস্থানীরা যেমন বলে "রাম রাম বাবু সাহেব।" গাড়ীতে আসতে আসতে চারিদিকের এই কৃত্রিম সৌন্দর্য্য এবং সৌষ্ঠব দেখতে পাচ্ছিলাম বটে, তবু আরও একটা জিনিষ চোখে পড়েছিল—সেটা এদেশের অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য। পাহাড়, জঙ্গল, জলাশয় কিছুরই অভাব নেই, এখানকার প্রকৃতির রূপে ইংল্যাণ্ডের মত একঘেয়েমি নেই, বরং আমাদের দেশের তরুলতার ঘনঘটার কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে শহরের মাঝে মাঝে কলকারখানা অনেক। কলকারখানায় এদেশ পৃথিবীর অনেক দেশকেই পেছিয়ে রেখেছে। দেখে মনে পড়ল—আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে "জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত" জিনিষের বহর।

বার্লিন ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য এবং স্বস্তিকা পতাকায় লাল হয়ে আছে। এদের জাতীয় পতাকা লাল এবং তার মধ্যে 'স্বস্তিকা' চিহ্ন আঁকা। স্যুটকেস হস্তে চারিদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে রক্তবর্ণমুখে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ভাগ্যে কোথায় যাব সেটা ঠিকই ছিল! ট্যাক্সীর জন্য অপেক্ষা করতে করতে দেখলাম একটী ছোট ছেলে অটোগ্রাফের জন্যে এসে হাজির!—সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম এক ভাড়াটে ঘোড়া গাড়ীওয়ালার দয়ায়! সে ছেলেটীকে কি বলাতে সে চলে গেল। ট্যাক্সী চড়ে কার্ড বার করে হিন্দুস্থান হাউসের ঠিকানা দেখালাম। সঙ্গের পয়সা গুণে দেখলাম ১ মার্ক ৯৫ কেনিগ আছে। মিটারে বেশী উঠলে হোটেল থেকে চেয়ে দিতে হবে। লজ্জার কথা; যাহোক, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানিনা—বরাতগুণে ঠিক উঠল ১'৯৫! বড্ড বেঁচে গেলাম। ভগবান রক্ষে করেছেন! 'হিন্দুস্থান হাউসে' কর্ত্তা নলিনী গুপ্তের সঙ্গে দেখা হল। ইনিই এই হোটেলের মালিক। এখানকার পরিচয় সবিশেষ পরে দেব। ঘর ঠিক হল—৬ মার্ক রোজ, আর খাওয়া প্রায় ৪ মার্ক—রোজ দশ মার্ক। মনে মনে হিসাব ঠিক করলাম, এতে দিন দশেকের বেশী চলবে না। মিঃ গুপ্ত এখানকার পুরাতন বাসিন্দা। সকলেই আমায় বললেন এভাবে আসা উচিত হয়নি। কারণ athletic-sportএর টিকিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। হকি, ফুটবল এসব হয়ত পাওয়া যেতে পারে। তবু নলিনীবাবু বললেন চেষ্টায় থাকুন। মিঃ বোস বলে আর একজন ভদ্রলোক যিনি সকলের চেয়ে খবর বেশী রাখেন, আমাকে কিছু বেশী দাম

দিলে টিকিট জোগাড় করে দেবেন বললেন। ইনি এই ব্যবসাই করেন। আমাদের দেশে বায়োস্কোপের চার আনার টিকিট ছ-আনার মতন। আমাকে একদিন একখানা দু মার্কএর টিকিট দশ মার্কে দিতে চেয়েছিলেন। আমি নেব বলে পরে কিন্তু আর নেইনি। তাই তিনি আমার ওপর কিঞ্চিৎ রুষ্ট। এখানকার পুরান বাসিন্দারাও লণ্ডনের মত নিজেদের তালে থাকেন এবং বান্ধবীদের সাহচর্য্যেই দিনপাত করেন। নবাগতদের সাহায্য করা দূরে থাকুক অনেকেই তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু রোজগার করে নিতে চান। হায়, বাঙ্গালী জাতের স্বভাব—সব দেশেই সমান। ব্যবসা বুদ্ধিটা একটু অন্যদিকে ঘোরালেই ত হয়! সব বাঙ্গালীই অবশ্য এ রকম নয়, ভাল লোকেরও দেখা পেয়েছি। তবে 'হিন্দুস্থান'এর যে কয়টী ছোকরা দৃষ্টিপথে এসেছে তাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। বেলা সাড়ে চারটেয় দাড়ী কামান এবং মুখ ধোবার পর—আহারটা কিছু গুরুতর হয়ে গেল। একটু গড়িয়ে নিতে বললেন মিঃ গুপ্ত। ঘরে গিয়ে সোফার ওপরে হেলান দিতেই ভরা পেটে ঘুম আসতে দেরী হল না। গুপ্ত মশাই আমার কথামত মিঃ বোসকে টিকিট জোগাড়ের চেষ্টায় ধরে নিয়ে এলেন। তিনি যে যে উপদেশ দিলেন তা পরে পালন করেছিলাম বটে, তবে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি সেকথা আগেই বলেছি। বিকেলে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাহেবী চালে বেড়াতে বেরুলাম। তখনও একটু রোদ্দুর আছে—আর ঠাণ্ডাও নেই তত। মিঃ গুপ্তর কাছে রাস্তার হদিস জেনে নিলাম—আমাদের রাস্তা LITZENBURGERTRASSE ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। হিসেব রাখতে লাগলাম কোনদিকে চলছি, আর কোন পাশে কয়বার মোড় ঘুরছি। কারণ, হারিয়ে গেলে পথ চেনা মুস্কিল, জিজ্ঞাসা করাও মুস্কিল। এরা কথা বোঝে না। আমিও বুঝি না! তখন সন্ধ্যেবেলা গাড়ী ঘোড়া বেশী ছিল না। রাস্তা ঘাট এখানে বেশ পরিষ্কার। বড় বড় বাড়ী। দোকানগুলি খুব সাজান। অলিম্পিক্ খেলা উপলক্ষে—যত বেশী বিক্রয় হবে তত বিদেশী পয়সা আসবে। এখানে নাকি এক মিলিয়ান বিদেশীর আমদানী হয়েছে। তাছাড়া, জার্ম্মাণীর সব জায়গা থেকেই লোক বার্লিনে এসেছে। রাস্তায় ছোট বড় এবং ছেলেমেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে পথ চলতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। দুজন থাকলে ততটা অসুবিধা বোধ হয় না—একলা যেন কি রকম লাগে! মেয়েরা আশ্চর্য্য হয়ে তাকাচ্ছে—তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ডেকে দেখাচ্ছে—এই রকম।—কাজে কাজেই রঙীন গায়ে আশে পাশের সকৌতুক দৃষ্টি মাখিয়ে একটু তাড়াতাড়িই বাসায় ফিরলাম। রাস্তা পার হতে গিয়ে বিপদ। এযাবৎকাল Keep to the left দেখে এসেছি—এখানে Keep to the Right! সবাই রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলে। ট্রাম বাসের দরজা ডানদিকে। রাস্তা পার হবার সময় কোনদিক দিয়ে গাড়ী যায় আগে ভেবে নিতে হয়। এখানকার হোটেলে রাস্তার ধারে বসে খাবার বন্দোবস্ত আছে। শুনেছি ফ্রান্সেও নাকি তাই। ঘণ্টা দেড়েক বাদে ফিরে খাবার আর ইচ্ছে হলো না। কাপড় চোপড় ছেড়ে রাত সাড়ে আটটাতেই শয্যা নিলাম। মাথার কাছেই টেবিল ল্যাম্পটা জলছিল। অনেক রাত্রে গুপ্ত মশাই আমার খোঁজ করতে এসে নিবিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ

বসন্ত-বন্দনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

হে বসন্ত! হে কিশোর! আজি তুমি আসিয়াছ দ্বারে
নম্র নমস্কারে
তোমারে বন্দনা করি হে বাঞ্ছিত চির মনোহর!
ধরণীর পর
যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে আন তুমি নব শিহরণ।
যেথায় বিরাজ তুমি সেথাকার গগন পবন
মুখরিত যৌবনের গানে,
সুললিত তানে
অবিরাম তোলে তান সেথাকার বিহঙ্গম যত;
সেথা শত শত
শুষ্ক তরু যাদু স্পর্শে ফলে ফুলে ওঠে মুঞ্জরিয়া
তপ্ত মরু ওঠে শিহরিয়া।

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৭

বালুময় বিস্তৃত চরের মধ্যে ক্ষীণধারা যমুনা প্রবাহিত। দূরে নদীগর্ভে অথবা অধুনা সেই বালুচরে অবতীর্ণ হইবার বিস্তৃত সুদৃঢ় প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ, চাঁদনি বা চন্দ্রশালিকাযুক্ত, অস্তমান সূর্য্যের আরক্ত কিরণে করুণ হাসি হাসিতেছে। আজ নদীর জলধারার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই, অথচ তাহাদের এই বিস্তৃত ঐশ্বর্য্যময় ঘাটের বুকেই একদিন ঐ যমুনা লহরী তুলিয়া নাচিয়া আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া যাইত। আজ দূর বালুকাপ্রান্তরের বুকে তাহার সেই লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ কায়া যাহা সান্ধ্য সূর্য্যের আভায় মরীচিকার মতই কেবল চক্ চক্ ছল্ ছল্ করিয়া মৃদুস্রোতে বহিয়া যাইতেছে তাহারই পানে চাহিয়া ঘাটগুলি যেন অতীত দিনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। ততোধিক দূরে দেবালয়ে সুউচ্চ মন্দির চূড়াগুলি যেন আকাশপটে লেখা ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে, নদীতীর নির্জ্জন, চাঞ্চল্য রহিত।

ক্রমে সূর্য্যালোক একেবারে নিভিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ধূসর আভায় নদী চরের বিশাল দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহাও বিলীন হইয়া অন্ধকারেরই একাধিপত্য স্থাপিত হইল।

সেই শীর্ণা নদীতীরে বালুকারাশির বিস্তৃত মরুভূমিতুল্য বক্ষে এক উদাসীন মূর্ত্তি। দেহ ধূলিময় রুক্ষ, জীর্ণ কৌপীন ও বর্হিবাসে আবরিত। উজ্জ্বল বিশাল নয়নের দৃষ্টি তীব্র, ক্ষণে ক্ষণে তাহা যেন কিসের তৃষ্ণায় দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল, যেমন করিয়া দূরান্তে শ্মশানের চিতাবহ্নি কিম্বা আলেয়ার আলো ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া আবার তখনই দিগন্তে অদৃশ্য হইতেছে। চড়ার বুকের গভীর অন্ধকার এক মৌন গাম্ভীর্য্যে ক্রমশ গভীরতর হইতেছিল, নীরব আকাশের বুকেও তেমনি গভীর মৌনতা, উজ্জ্বল তারকারাশির নিস্পন্দতা ক্বচিৎ জ্যোতিচাঞ্চল্যে একএকবার স্পন্দমান হইয়া উঠিতেছে, যেন কিসের একটা ভয় অন্ধকারের আবরণে গ্রীষ্মরাত্রির গুমটের মত ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সঞ্চিত হইতেছে, কখন এক মুহূর্ত্তে তাহা যেন ফাটিয়া পড়িবে। নদীর অপর তীরে কদাচিৎ নিশাচর পশুর কণ্ঠধ্বনি, তাহাও যেন ভীতির জড়িমাপূর্ণ।

উদাসীন সেই বালুকারাশির মধ্যে আসন করিয়া স্থির ঋজু দেহে নিশ্চল নেত্রে সেই অন্ধকার-পানে চাহিয়া ছিলেন। যেন সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার রাশিতে তাঁহার সূচীতীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা ভেদ করিতে চান। সেই অন্ধকারের আবরণে যেন কি এক মহা রহস্য আবরিত হইয়া আছে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা বিঁধিয়া ফুঁড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই অদৃশ্য বস্তু আবিষ্কার করিবে। দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর অতীত, কোথাও নূতনত্বের কোন সাড়া বাজিলনা। প্রকৃতি একইভাবে মূক স্তব্ধ—যেন জড়রূপা। একই কালিমাময় আবরণে তাহার সারা দেহ ঢাকিয়া অচল হইয়া রহিয়াছে কোথাও যেন আলোকের আশার আনন্দের কোন রেখাই তাহার বুকে পড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সহসা কোথায় একটা সাড়া জাগিল। অস্পষ্ট গোঁ গোঁ গুম্ গুম্ ধ্বনি। দূরে বায়ুর পাদচারণ চাঞ্চল্যের আভাস, ক্রমে অধিকতর স্ফুট হইয়া ঝড়ের আকারে অগ্রসর হইল। স্থির বালুরাশি আঁধারে আঁধারে উড়িয়া পাক খাইয়া স্তম্ভাকারে পুঞ্জে পুঞ্জে উদাসীর অচল দেহকে আবৃত করিতে লাগিল, যেন সেই দেহকে তাহারা নিজের মধ্যে একেবারে চির-আবৃত ও প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু সে দেহ একইভাবে অচল, নিস্পন্দ।

কক্কড়—কড়্ কড়্, মসীময়ী প্রকৃতিকে যেন চিরিয়া ফাড়িয়া বিদ্যুতের অসি খেলাইয়া বজ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে বায়ুর হুহুঙ্কার। দেব-দানবের যুদ্ধের যেন দ্বিতীয় অভিনয়। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার ভিন্নরূপ, করকা ধারার মত অশ্রান্ত ভাবে স্থূল ধারায় বারিবর্ষণ আরম্ভ হওয়ায় আকাশের বিদ্যুতাগ্নি ও অন্তরীক্ষের বায়ুবেগ প্রশমিত হইয়া গেল। সদ্য বালুকাসমাধিমুক্ত দেহের উপর সেই তীব্র বেগময় ধারা অবাধে আঘাত করিয়া চলিল, কিন্তু সে দেহ নড়িল না।

রজনী শেষযামা, বায়ুমণ্ডল ও অন্তরীক্ষ পরি-

ঙ্কার, পূর্ব্বদিকে আলোকের ঈষৎ পিঙ্গল আভাস। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অথচ আভাসমাত্রে প্রকাশিত বালুময়। প্রান্তরে ষেন তেমনি আভাস মাত্রে প্রকাশিত কতকগুলা দেহ বা দেহী সারি সারি দল বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উদাসীনের অচল দেহ বেষ্টন করিতেই তাহারা অগ্রসর হইল। ক্রমে তাহাদের সে আভাস মাত্রে প্রকাশিত দেহ আরও অস্পষ্ট হইয়া গেল, আর তাহা বুঝা যায় না, কেবল কতকগুলা দীর্ঘ দীর্ঘ পদশ্রেণী তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এতক্ষণে উদাসীনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবং দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে যেন ঈষৎ হাসির আভাস প্রকাশিত হইল। সে হাসি তেমনই তীক্ষ্ণ, বিদ্রূপময়! সেই হাসি ও দৃষ্টির সম্মুখে কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার সেই দৃশ্যও তেমনই বাতাসে মিশিয়া গেল। কোথাও আর কিছু নাই, বৃষ্টিধারা-স্নাত শান্ত নদীতীরসিক্ত বালুকাভূমি! পূর্ব্বাকাশে উষার আভাস জলস্থলকে সুস্পষ্ট প্রকাশিত করিতে চাহিতেই উদাসীন তাঁহার সেই দৃঢ়বদ্ধ আসন খুলিয়া ধীরে ধীরে যমুনার তীরে তীরে লোকালয়পূর্ণ স্থানের বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

নির্মেঘ সুন্দর পূর্ণিমা রাত্রি। বনমধ্যস্থ কুণ্ডের চারিপাশে গভীর জঙ্গলের শ্যাম শোভা যেন প্রকৃতির পরম বিভব। জলের চারিদিকে তাহাদের স্থির ছায়া, মধ্যস্থলে চন্দ্র সনাথ তারকামালার প্রতিচ্ছবি। বনের অভ্যন্তরে নিভৃতে কোথায় কোন্ ফুল ফুটিয়াছে কিন্তু বায়ুর অগোচরে থাকিতে পায় নাই, সুগন্ধে রজনীর সর্ব্ব অঙ্গে যেন আবেশময় শিথিলতা। একটা ঝিম্ ঝিম্ শব্দ যেন যামিনীর অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত হইতেছে মাত্র, আর সব নীরব নিস্তব্ধ। কুণ্ডের চারিদিক সোপানশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। জলের উপর স্থানে স্থানে কয়েকটি খিলান দীর্ঘভাবে কুণ্ডের ভিতরে খানিকটা প্রবেশ করিয়া এক একটা স্তম্ভে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে স্তম্ভের উপরে আট দশ জন স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে এতখানি স্থান আছে।

হস্তে জপমালা—অতন্দ্র চক্ষে চন্দ্রের পানে চাহিয়া উদাসীন সেই বনমধ্যস্থ কুণ্ডজলের চন্দ্রশালিকায় উপবিষ্ট ছিলেন। সুদীর্ঘ ছায়া পশ্চাতে ফেলিয়া ধ্যানামগ্নভাবে উপবিষ্ট সরল দীর্ঘ দেহ। চারিদিকে উচ্ছল চন্দ্রকিরণে যেন হাসিতেছে, অথচ তিনি ভিন্ন সেখানে দ্রষ্টা আর কেহই নাই। একটা পশু পাখী পর্য্যন্ত কোথাও শব্দ করিতেছে না।

সহসা তাঁহার সেই ধ্যানমগ্নভাবে বাধা পড়িল। জলস্থল যেন আঁধারে ঢাকিয়াছে। এ ধ্যানে তাঁহার হয়ত বাহ্য প্রকৃতির রূপের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল—তাই সেরূপ ঢাকা পড়িতেই সে ধ্যানও ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সেস্থান হইতে উঠিয়া স্থানত্যাগ করিতে চেষ্টা পাইলেন, সাধ্য হইল না, করচরণ একেবারে অচল, বুকের উপর দেহের উপর যেন বিষম একটা ভার চাপিয়া সে ভার শ্বাসপথকেও যেন আক্রমণ করিতেছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে ভার ঠেলিয়া বার বার উঠিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু বিফল পরিশ্রমে ক্রমে যেন অজ্ঞানের মত একটা মোহ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল—বিস্ফারিত চক্ষু মুদিয়া গেল।

কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র! তাহার পরেই "নৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয়" উচ্চ রবে এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে উদাসীন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কিছু নাই, সেই অম্লান চন্দ্রকিরণে জলস্থলকানন কুণ্ডমধ্যস্থ জলজ পুষ্প পত্র সব হাসিতেছে, সে শোভার তুলনা নাই। চারিদিক স্নিগ্ধ শান্ত, মধ্যস্থলে তিনিই কেবল অশান্তের মত উগ্রভাবে দাঁড়াইয়া। পীড়িত বক্ষকে নিজের অজ্ঞাতেই এক এক বার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছিলেন।

আবার তিনি স্তম্ভগাত্রস্থ অনতি উচ্চ আলিশায় দেহভার রক্ষা করিয়া বসিয়া করচ্যুত মালা হস্তে তুলিয়া লইলেন এবং দেখিতে দেখিতে কি এক অজ্ঞাত ক্ষোভের বেদনায় অথবা কাহার উপর অভিমানেই বিশাল নয়ন-কোণে জলকণার সঞ্চার হইল। সেই জলবেগ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গণ্ডে বক্ষে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্ফুরিত অধরোষ্ঠে অর্দ্ধরুদ্ধ ভাষা যেন কাহাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিয়া বলিল, "আমার জন্য বুঝি শুধু এইই বিধান? তোমার অভয়ের রাজ্যেও শুধু কি ভয়ের বিভীষিকাই আমার ভাগ্যফল?"

ক্ষণপরে ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া জলস্থল পূর্ণ করিয়া গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন

"নাহং বিভেম্যজিত তেহতি ভয়ানকাস্য
জিহ্বার্কনেত্র ভ্রূকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ
আন্ত্রস্রজ ক্ষতজ কেশর শঙ্কুকর্ণান্নির্হ্রাদ ভীত
—দিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ।

ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণ বৎসল দুঃসহোগ্র
—সংসার-চক্র-কদনাৎ গ্রসতাং প্রণীত
বদ্ধ স্বকর্ম্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্বয়সে কদানু।”

* * * * *

বৃক্ষছায়াহীন রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, উত্তপ্ত তীক্ষ্ণ বায়ু, ততোধিক উত্তপ্ত বালুকা ও কঙ্করময় পথচিহ্ন। তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট রৌদ্র যেন জীব জগতকে পোড়াইয়া একেবারে ভস্মসাৎ করিতে চায়। চারিদিকে শুধুই গৈরিকবর্ণ বালুকা ও কঙ্করময় ক্ষেত্র। দিগন্তের রেখাতেও একটু শ্যামলতার আভাসমাত্র নাই। ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত তপ্ত বায়ুতে কেবল অগ্নিজ্বালাময় স্পর্শ হানিতেছে।

একটা অর্দ্ধমৃত শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড, শাখাপ্রশাখাবিহীন অবস্থায় যেন ঝড়ে ভাঙিয়া পড়িবারই অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই নিম্নে সেই উদাসীন, সেই রৌদ্রে সেই রৌদ্রজ্বালাদীর্ণ মাঠের মধ্যে বসিয়া আছেন। মুখ ও চক্ষু রৌদ্রতাপে আরক্তবর্ণ হইতে ক্রমে কালিমাময় হইয়া উঠিতেছে; অনাবৃত কেশহীন মস্তক ও সুপ্রশস্ত ললাট—দর্শক থাকিলে ভাবিত বুঝি এইবার সত্যই ফাটিয়া যাইবে। প্রকৃতির সেই রুদ্র-লীলায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া একভাবে বসিয়া আছেন! বুঝি বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই—চক্ষু কর্ণ কিছুই দেখিতে শুনিতেছে না, শরীরও বুঝি এত বড় তীব্র তাপের কিছুই অনুভব করিতেছে না;—করিলে সে কি সহিতে পারিত?

সেই ক্রোশের পর ক্রোশব্যাপী বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগন্তে সূর্য্য পশ্চিম পথে হেলিয়া পড়িলেন। একটা বৃক্ষ ছায়া পর্য্যন্ত বর্জ্জিত স্থান, কেবল মাঝে মাঝে কতকগুলা কাঁটা ঝোপ। একটা গাভীও সে মাঠে চরে না, দূরান্তেও গ্রাম কিম্বা লোকালয়বর্জ্জিত সে প্রান্তর।

উদাসীনের ধ্যান ভঙ্গ হইল। আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া আবার তিনি চক্ষু মুদিলেন। নিশ্চল বক্ষ কি এক মনঃক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠা-নামা করিতে লাগিল।

সুষুপ্তির অতীত সে অবস্থার স্মৃতিতেও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

সহসা নাসিকায় এ কি অপূর্ব্ব সুবাস! ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেন এক ঘনীভূত আনন্দ মস্তিষ্কের কুহরে কুহরে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত সত্তাকে আনন্দ-শিহরণে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। সে অনুভব যেন তাহাকে একটা সুখ সমুদ্রের মধ্যেই ডুবাইতে চাহিতেছে; সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল—মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয়ভাবে শুধু সেই সুবাসময় হইয়া যাইতে চায়, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাবস্থায় কারণ-অনুসন্ধিৎসু মন তাহাতে মগ্ন হইতে চাহিল না। কোথা হইতে এ সুগন্ধ আসিতেছে তাহার অন্বেষণে যেন চক্ষুকে ইতস্তত প্রেরণ করিতে লাগিল। গন্ধটা পরিচিত, যেন অতি সুজাতীয় বহু গোলাপ ফুল অতি নিকটেই আছে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তিনি সে প্রদেশের সবই জানিতেন। অন্তত আট-দশ ক্রোশের মধ্যে গোলাপ ফুলের অস্তিত্ব মাত্রেরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব। অথচ এত নিকটে এই পশ্চাতস্থিত শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ড হইতেই যেন সে পুষ্পসার ঘন সৌরভ বহির্গত হইতেছে। শিথিল দেহমনকে অতি চেষ্টায় স্বভাবে ফিরাইয়া আনিয়া উদাসীন সেই শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের দিকে ফিরিলেন। বৃক্ষগাত্রে একটা গহ্বর—সেই স্থান হইতেই এই পুষ্পসারের উদ্ভব বুঝিতে পারিয়া উদাসীন গর্ত্তের মধ্যে অবলীলা ক্রমে হাত পুরিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হস্তে উঠিয়া আসিল আলোহিত শতদলের মত প্রকাণ্ড দুইটা গোলাপ পুষ্প। সর্ব্বাঙ্গে আবার সেই আনন্দ-শিহরণ। জিহ্বা হইতে অতর্কিতে উচ্চারিত হইল—“অহং পদ্মকোশঃ সুপেশসাং।” সেই দুইটির দিকে চাহিতে চাহিতে সেই শোভা দর্শনে এবং আবার সেই পুষ্পসারের ঘন সৌরভের আনন্দময় সত্তায় মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত সত্তা মিশিয়া একীভূত হইয়া গেল। রূপ ও গন্ধের সহযোগে অন্তরের ঘনীভূত ভাবরস সাহায্যেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট ভাবাতীত বস্তুকে যেন প্রাপ্ত হইলেন।

* * * * *

বহুকালের বটবৃক্ষ, তাহার প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা। মূল শিকড় সকল নামাইয়া যমুনার রস টানিয়া লইতে লইতে একেবারে তাহার কূলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নাম বংশীবট।

গভীর রাত্রি—স্বল্প জ্যোৎস্নাময়ী। রাসগান কখন থামিয়া গিয়াছে—পল্লীবাসী সকলেই নিদ্রিত। চারিদিক নিস্তব্ধ।

উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিয়া কে একজন সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। কি যেন তিনি শুনিতেছেন—কি যেন দেখিতে চান। দৃষ্টি সেই বৃক্ষতলে নিবদ্ধ হইল এবং কর্ণে কি যেন পরমানন্দ রস পান করিতে করিতে দেখিতে দেখিতে বাহ্য চৈতন্য হারাইয়া সেই বৃক্ষতলে পতিত হইলেন।

প্রভাতে ব্রজবাসীরা সেই দেহ সযত্নে গৃহে লইয়া গিয়া কয়েক দিনের সেবায় তাঁহাকে জাগতিক জ্ঞানে ফিরিয়া আনাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইল তাহা তাহাদের বোধের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল না। ক্রমশঃ

ভট্ট কুমারিলের পরিচয়

শ্রীপঞ্চানন তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভট্ট কুমারিলের বাসস্থান সম্বন্ধে অনেকের মতের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তন্মধ্যে ভট্ট কুমারিল আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী ছিলেন—এই মতই আমাদের সঙ্গত বোধ হইয়াছে। তাহার কারণও পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। কিন্তু ভট্ট কুমারিলের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরিপূর্ণ অনুসন্ধান আবশ্যক। সুতরাং তাঁহার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহারও আলোচনা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে এখানে দুইটী মত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মত—তিনি প্রথমে বৌদ্ধই ছিলেন। পরে কোন কারণে আবার বৈদিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। **দ্বিতীয় মত**—তিনি জন্মাবধি ব্রাহ্মণ হইলেও পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায় পণ অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ হন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইলিয়ট্ সাহেব পূর্ব্বোক্ত প্রথম মতের প্রচারক।[১] প্রখ্যাত পণ্ডিত স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ স্বকৃত "হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ান্ ফিলোসফি" নামক গ্রন্থে ইলিয়টের উক্ত মতের উল্লেখ করিলেও তাহার কোন সমালোচনা করেন নাই। যাহা হউক, ইলিয়টের উক্ত মত কোনরূপেই গ্রাহ্য বা বিশ্বাস্য হইতে পারে না। কারণ এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ কিছুই নাই। ইলিয়ট্ও তাঁহার নিজ মতসমর্থনে কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই।

পরন্তু যে সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিত বৌদ্ধদের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন এবং যাঁহাদের সেই ইতিবৃত্ত পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস সঙ্কলনে প্রধান উপজীব্য হইয়াছিল, তাঁহারাও ঐরূপ কোন কিছু উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। মাধবাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করের জীবনচরিত-লেখকগণ প্রসঙ্গক্রমে ভট্ট কুমারিলের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্বারা ভট্ট কুমারিলের বৌদ্ধদের নিকট অধ্যয়ন বুঝা গেলেও তিনি যে আজন্ম বৌদ্ধ ছিলেন—ইহা কোনরূপেই বুঝা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস—ভট্ট কুমারিল কখনও বৌদ্ধ ছিলেন না। কারণ তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-সমাজে কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের ব্রাহ্মণ বৈদিক পণ্ডিতের সম্মানলাভ একেবারেই অসম্ভব ছিল। ইহা আমরা ভট্ট কুমারিলের পরবর্ত্তী আচার্য্য উদয়নের কথা হইতে বুঝিতে পারি। তিনি তৎকালীন বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ-সমাজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে "ন্যায-কুসুমাঞ্জলি"র দ্বিতীয় স্তবকে লিখিয়াছেন—

"নাপি অন্যত্র সিদ্ধপ্রামাণ্যে অভ্যুপায়ে অনধিকারেণ অস্মিন্ অনন্যগতিকতয়া অনুপ্রবেশঃ, পরৈঃ পূজ্যানামপি অত্র অপ্রবেশাৎ। সম্ভবন্তি চ এতে হেতবো বৌদ্ধাদ্যাগমপরিগ্রহে। ·· ···ইতঃ পতিতানাম্ অপি অনুপ্রবেশ ইতি অনন্যগতিকাঃ"।—(এসিয়াটিক্ সোসাইটি মুদ্রিত, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ ৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠা)

ইহা দ্বারা বুঝা যায়—ভট্ট কুমারিল আজন্ম বৌদ্ধ হইয়া পরে তিনি বেদবিশ্বাসী মহাপণ্ডিত হইলেও তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া এবং শ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইতেন না। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, ভাগবত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতেন এবং তিনি যে প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁহারা কেহই কিছুমাত্র আভাস দেন নাই।

আরও কথা—ভট্ট কুমারিল স্বকৃত গ্রন্থে বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষায় লুপ্তপ্রায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচারে যে সাহস, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি সহজাত দৃঢ় অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রথমাবধি বৈদিক না হইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না এবং এরূপভাবে শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে তাঁহার একটী প্রবল সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিত না।

পরন্তু ইলিয়টের মতানুসারে কুমারিল ভট্ট যদি

---

[১] Eliot—"Hinduism and Buddhism", Vol. II, P. 207.

বৌদ্ধবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মকীর্ত্তি যদি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয় হন, তবে ধর্ম্মকীর্ত্তিও প্রথম হইতেই বৌদ্ধ ছিলেন—ইহাই সম্ভব। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি যে পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ মত সমর্থনের জন্য নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় দশম শতকের মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।২ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ইণ্ডিয়ান্ লজিকে"ও ধর্ম্মকীর্ত্তির বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা পাওয়া যায়।৩ বৌদ্ধ পণ্ডিত তারানাথেরও যে এই মত, ইহাও বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে এবং প্রমাণাভাবে আমরা ইলিয়টের উক্ত মতকে কোনরূপেই গ্রহণ করিতে পারি না।

এখন ভট্ট কুমারিল সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটী আলোচ্য। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ইণ্ডিয়ান্ লজিক্" গ্রন্থে উক্ত দ্বিতীয় মতের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে বুঝা যায় যে—তিব্বতীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভট্ট কুমারিল প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রসঙ্গে ভট্ট কুমারিলের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে যে ঘটনার উল্লেখ করিরাছেন, তাহা কোন প্রমাণ নয় লোকপ্রসিদ্ধিমাত্র। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও তাহাকে লোকপ্রসিদ্ধিমাত্র বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমরাও নানা কারণে তাহাই বিশ্বাস করি। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় শ্রীভারতী পত্রিকায় (১৩৪৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায়) উহাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আবাল্য বৈদিক ধর্ম্মের পরিপালক ভট্ট কুমারিলের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কারণ প্রকাশ করিতে উক্ত শ্রীভারতী পত্রিকায় (১৩৪৬, ভাদ্র সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—

"তিনি যে বৌদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতের নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া, শিষ্যদল সমেত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চিতানলে দেহপাত করিয়াছিলেন, একথা বৈদেশিক অনুবাদ গ্রন্থে আবিষ্কৃত না হইলে ধামাচাপা পড়িয়াই থাকিত। সত্য কখন চিরকাল গোপন থাকে না।……অতএব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে মিথ্যা যে থাকে না ইহাও বলা যায় না।"

হরিদাসবাবুর এই কথা দ্বারা আমরা দুই প্রকার অর্থ বুঝিতে পারি। **প্রথম**—ভট্ট কুমারিলের ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত বিচারে পরাজয় হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ এবং পরে সেই অনুতাপে চিতানলে দেহত্যাগ। **দ্বিতীয়**—বৈদেশিক অনুবাদকগণ সত্যবাদী এবং বৈদিকগণ বিশেষতঃ শঙ্করের জীবনচরিত লেখক মাধবাচার্য্য মিথ্যাবাদী। তাঁহারা মিথ্যার আবরণে কুমারিল সম্পর্কীয় এই জাজ্বল্যমান সত্যটীকে এতকাল লুকাইয়া রাখিয়া নিজেদের খলতারই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাই ব্যক্ত করিতে তিনি উক্ত পত্রিকায় অন্যত্র (আশ্বিন সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—

"ভট্ট মাধবাচার্য্য বৌদ্ধবিদ্বেষমূলে কেবল লেখনী সাহায্যে যে গল্প বা উপন্যাস লিখিয়াছেন—উহার প্রায় সবটাই কল্পনামূলক রচা কথা, ঐতিহাসিক সত্য উহাতে অতি নগণ্য। হিংসাবশে মানুষ করে না কি! জনৈক বৈদিক পণ্ডিত লোক মোহনার্থে যে এতাদৃশ অলীক কথা লিখিতে পারেন—ইহা মানববুদ্ধির অগোচর ব্যাপার।" "তিনি আচার্য্যের পরাজয় ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ গোপন করিয়া গিয়াছেন।" ইত্যাদি—

হরিদাসবাবু ভট্ট কুমারিলের সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অনেকের অজ্ঞাত হইলেও নূতন নহে। কারণ তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলি কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়—প্রকৃত সমালোচনা কোন গ্রন্থেই হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের সেই বক্তব্য বিষয়গুলি নির্বিচারে স্বীকার্য্য নহে বলিয়া তাহার আলোচনা অত্যাবশ্যক। তাই আমরা ভট্ট কুমারিলের প্রসঙ্গে মাধবাচার্য্যের সম্বন্ধে হরিদাসবাবুর উক্তিকেই প্রথম আলোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

---

[২] "নত্বেবং বেদে কর্ম্মণ্যেব নির্ভরত্বাৎ ত্রৈবর্ণিক-বহিষ্কৃতৈরনধিকারিভিরনন্যগতিকত্বাৎ কীর্ত্তিপ্রজ্ঞাকরবৎ" (কলিকাতা মুদ্রিত বৌদ্ধাধিকার ৯৩ পৃষ্ঠা)। এখানে কীর্ত্তিশব্দে ধর্ম্মকীর্ত্তিই আচার্য্যের অভিপ্রেত। বহু প্রাচীন গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তি কীর্ত্তি নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

[৩] See Indian Logic Mediaeval School. P. 103,

হরিদাসবাবু উক্ত পত্রিকায় (আশ্বিন সংখ্যায়) মিথ্যাবাদী মাধবাচার্য্যের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“তিনি নিশ্চয় ধর্ম্মকীর্ত্তির বিখ্যাত ন্যায় ‘প্রমাণ-বার্ত্তিক’ অবগত ছিলেন এবং পাঠও করিয়া থাকিবেন। যেহেতু মাধবাচার্য্য তাহার প্রখ্যাত ‘সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ’ নামক গ্রন্থে প্রমাণ বার্ত্তিকের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।”

ইহা দ্বারা বুঝা যায—হরিদাসবাবুর মতে ‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ’কার মাধব এবং ‘শঙ্করদিগ্‌বিজয়’কার মাধব—একই ব্যক্তি।

আমরা কিন্তু মাধবাচার্য্যের বিভিন্ন গ্রন্থ দ্বারা তিনজন মাধবাচার্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম- **মায়ণ-পুত্র মাধব**। দ্বিতীয়—**সায়ণ-পুত্র মাধব**। তৃতীয়—**শঙ্কর দিগ্‌বিজয়-লেখক মাধব**। হরিদাসবাবু ‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে’র প্রাথমিক শ্লোক কয়টীর অর্থ বুঝিলে ‘উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে’ চাপাইয়া এরূপ মিথ্যা কুহকের সৃষ্টি করিতেন না।

“সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ”কার মাধবাচার্য্য তাঁহার প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ ‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে’ নিজ গুরুর পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন—

> শ্রীশার্ঙ্গপাণিতনয়ং নিখিলাগমজ্ঞং
> সর্ব্বজ্ঞবিষ্ণু-গুরু মন্বহমাশ্রয়েঽহম্।

ইহা দ্বারা বুঝা যায়—উক্ত মাধবাচার্য্যের গুরু শার্ঙ্গপাণি-তনয় **সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু**। পরে তিনি নিজের আত্মপরিচয় দিতে লিখিয়াছেন—

> শ্রীমৎ সায়ণ-দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভেন মহৌজসা।
> ক্রিয়তে মাধবার্য্যেণ সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ॥

অর্থাৎ সায়ণরূপ দুগ্ধ সমুদ্রের কৌস্তুভ-স্বরূপ মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক ‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ’ রচিত হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ’কার মাধব বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের পুত্র।

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, মাধবাচার্য্য সায়ণকে দুগ্ধ-সমুদ্র বলায় অনেকেই সায়ণ নামটীকে মাধবের বংশনাম বলিয়াই মনে করেন এবং কেহ কেহ ঐরূপই লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা একেবারেই অসত্য। কারণ **স্মৃতিরত্ন** নামক গ্রন্থে মাধব সায়ণকে নিজের পিতা বলিয়াই স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে তিনি নিজের আত্ম-পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন—

> “তমেকদা সায়ণমন্ত্রিবর্য্যাস্তনূদ্ভবং স্বপ্রতিবিম্বরূপং
> শ্রিয়ো বিশেষাস্পদমার্য্যবর্য্যং মধ্যেসভং মাধবমিত্যবোচৎ।”

* * * *

> “এবং পিত্রা সমাদিষ্টো মাধবঃ কৃতবান্ কৃতী।
> অতিন্যূনং প্রযত্নেন স্মৃতিরত্ন মনুত্তমম্॥”[৪]

উক্ত গ্রন্থে মাধবাচার্য্যের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়—মায়ণ-পত্নী শ্রীমতীর গর্ভে প্রখ্যাত পণ্ডিত সায়ণাচার্য্যের জন্ম। ‘মাধবীয়-ধাতুবৃত্তি’তেও তিনি নিজকে মায়ণ-পুত্র বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। এই সায়ণেরই পুত্র ‘সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ’কার মাধব। ‘স্মৃতিরত্ন’ ও ‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে’র বর্ণনার ঐক্য হেতু আমরা ঐ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি।

‘জৈমিনীয়-ন্যায়মালা’ প্রণেতা ও ‘পরাশর-স্মৃতি’ ব্যাখ্যাতা মাধব এক হইলেও পূর্ব্বোক্ত ‘সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ’কার মাধব হইতে যে ভিন্ন—তাহা ইহা দ্বারা এবং তাঁহার নিজের উক্তি দ্বারা বুঝা যায়। তিনি ‘পরাশর স্মৃতি’ ব্যাখ্যায় নিজের আত্মপরিচয় দিতে লিখিয়াছেন—

> “শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
> সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধি-সহোদরৌ॥”

ইহা দ্বারা বুঝা যায়—মায়ণ-পুত্র সায়ণ-সহোদর মাধবই ‘পরাশর স্মৃতি’র ব্যাখ্যাতা এবং ইনিই পরে ‘জৈমিনীয়-ন্যায়মালা’ রচনা করেন। ইহাও আমরা তাঁহার নিজের উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারি। পরন্তু ইহার গ্রন্থের অপর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে ইনি স্বরচিত প্রত্যেক গ্রন্থের প্রারম্ভে—“বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ” ইত্যাদি নানার্থক শ্লোকটীকে মঙ্গলাচরণরূপে লিপিবদ্ধ করিলেও ইহাকে তিনি স্বকীয় মুদ্রারূপেও ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ যে গ্রন্থের প্রথমে “বাগীশাদ্যাঃ” ইত্যাদি শ্লোক থাকিবে, সে গ্রন্থ মায়ণ-পুত্র

---

[৪] এই পুস্তকখানি এখনও প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমানে উহা মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ম্যানাস্ক্রিপ্ট্‌ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। See A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, *Madras*. Vol. XXVII—Supplemental, page. 10085.

মাধবের রচিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। "জৈমিনীয় ন্যায়মালা" গ্রন্থে উক্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি নিজেই ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।৫

কিন্তু "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে"র প্রথমে মায়ণ-মাধবের ঐ প্রখ্যাত শ্লোকটী না থাকায় এবং উভয়ের গুরু ও পিতা ভিন্ন হওয়ায় 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে'র রচয়িতা মাধবকে আমরা ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বুঝিয়াছি।

এখন "শঙ্কর-দিগ্বিজয়"কার মাধব পূর্ব্বোক্ত দুই জনের মধ্যে কেহ কিনা, তাহাই বিচার্য্য। হরিদাসবাবু মাধবকে এক বলিলেও আমরা কিন্তু ইহাঁকে তৃতীয় মাধব বলিয়া মনে করি।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, 'শঙ্কর দিগ্বিজয়ে'র প্রারম্ভে মায়ণ-পুত্র মাধবের সেই প্রখ্যাত "বাগীশাদ্যাঃ" শ্লোকের উল্লেখ নাই এবং তাঁহার প্রতিপালক বুক্ক নরপতিরও প্রশস্তি নাই। সুতরাং ইহাঁকে আমরা মায়ণপুত্র মাধবের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। "শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে"র প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে, তাহা মায়ণ-মাধবের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের আংশিক অনুরূপ হইলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহাকে মায়ণমাধবের রচিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। টীকাকার ধনপতি সূরিও উক্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকোক্ত 'শ্রীবিদ্যাতীর্থ' শব্দের অর্থ—মাধবের গুরু—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও পরে তিনি ঐ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া উহার অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আর সায়ণ-মাধবের রচিত বলিয়াও তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ 'শঙ্করদিগ্বিজয়ে' মাধবের গুরু বিদ্যাতীর্থ। কিন্তু 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' শ্রীবিদ্যাতীর্থের উল্লেখ নাই। সেখানে সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুই মাধবের গুরু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু ও শ্রীবিদ্যাতীর্থ যে এক, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

দ্বিতীয়তঃ "শঙ্করদিগ্বিজয়ে" যে সমস্ত দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে, 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে'র দার্শনিক মতের সহিত তাহার কোন কোন অংশে বৈপরীত্য দেখা যায়। উভয় গ্রন্থের লেখক এক হইলে একই বিষয়ে এইরূপ বিপরীত সিদ্ধান্তের সমাবেশ কেন করিবেন? ফল কথা—সায়ণ-মাধব বা মায়ণ-মাধবই 'শঙ্করদিগ্বিজয়ের' লেখক—ইহা কোনরূপেই বুঝা যায় না। হরিদাসবাবু কিন্তু ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন অনুসন্ধানই করেন নাই।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, 'শঙ্করদিগ্বিজয়ে'র লেখক মাধবাচার্য্য ভট্ট কুমারিলের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক সত্যতা সর্ব্বজনের স্বীকৃত না হইলেও তাঁহাকে সত্যগোপনকারী মিথ্যাবাদী বলা যায় না। কেন বলা যায় না, তাহার কারণ বলা আবশ্যক। হরিদাসবাবু উক্ত পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"তিনি কুমারিলের চিতারোহণে দেহত্যাগের কারণ কি, কিছুই দেখান নাই"; "ধর্ম্মকীর্ত্তির বদলে শঙ্করের নিকট পরাজয় কাহিনী মাধব বর্ণনা করিয়াছেন" ইত্যাদি।

আমরা কিন্তু ভট্ট কুমারিলের চিতারোহণের অন্য কারণ 'শঙ্করদিগ্বিজয়ে'ই দেখিতে পাই। মাধব 'শঙ্করদিগ্বিজয়ে' (৭।১০২) ভট্ট কুমারিলের চিতারোহণের সেই কারণ প্রকাশ করিতে লিখিতেছেন—

দোষদ্বয়স্যাঽস্য চিকীর্ষুরর্হন্
যথোদিতাং নিষ্কৃতিমাশ্রয়াসম্।
প্রাবিক্ষম্ ……………"

ইহা দ্বারা বুঝা যায়—**গুরুকুলের অপমান ও ঈশ্বরানঙ্গীকারই** মাধবের মতে ভট্ট কুমারিলের তুষানলে দেহত্যাগের কারণ। তিনি ঐরূপই অবগত ছিলেন।

আর শঙ্করাচার্য্যের নিকট ভট্ট কুমারিলের পরাজয়-কথা মাধবের 'শঙ্করদিগ্বিজয়ে' কোথাও দেখা যায় না। পরন্তু মাধবের বর্ণনানুসারে বুঝা যায়—আচার্য্য স্বকৃত ভাষ্যের বার্ত্তিকরচনার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভট্টের নিকট উপস্থিত

---

(৫) "ন্যায়মালায়া আদৌ স্বকীয়-গ্রন্থত্বদ্যোতনায় স্বমুদ্রারূপমনেকার্থগর্ভং দেবতানমস্কারপ্রতিপাদকং শ্লোকং পঠতি"—ন্যায়মালা টীকা। অবশ্য মাধবাচার্য্যের নামে যতগুলি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার সবগুলিই মাধবাচার্য্যের রচিত নহে। সায়ণাচার্য্য নিজে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রীতিবশতঃ মাধবাচার্য্যের নামে প্রচার করিয়াছেন এবং সেগুলিতেও "বাগীশাদ্যাঃ" শ্লোক নিবেশ করিয়াছেন। 'দুর্জ্জন-মুখ-চপেটিকা'য় রামাশ্রমের (ভট্টোজি দীক্ষিত) বর্ণনার দ্বারাও ইহা বুঝা যায়।

হইয়াছেন। সেখানে আচার্য্যের চিত্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব নাই। পরন্তু তিনি তখন তাঁহাকে কার্ত্তিকেয়ের অবতার বলিয়া সম্মান করিতেছেন। মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন—

ইত্যুচিবাংসমথ ভট্ট কুমারিলং ত-
মীষদ্‌বিকস্বরমুখাম্বুজমাহ মৌনী।
শ্রুত্যর্থকর্ম্মবিমুখান্‌ সুগতান্‌ নিহন্তুং
জাতং গুহং ভুবি ভবন্তমহং তু জানে॥ (৬)

—শঙ্করদিগ্‌বিজয় ৭।১০৬

হরিদাসবাবু মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ পড়িলে বা বুঝিলে এইরূপ কথা লিখিতে পারিতেন না।

এখন শেষ কথা—হরিদাসবাবু লিখিযাছেন—কুমারিল ভট্ট ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া তুষানলে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে কুমারিল ভট্ট এবং ধর্ম্মকীর্ত্তি যে সমসাময়িক—এ বিষয়ে প্রকৃত প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। হরিদাসবাবু কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই। আমরাও এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। যাহা হউক, ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকটে কুমারিল ভট্ট বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ক্রমে ইহার কারণ বলিতেছি।

১। ধর্ম্মকীর্ত্তি ও কুমারিল ভট্ট যে সমসাময়িক—ইহার কোন প্রমাণ নাই।

২। ধর্ম্মকীর্ত্তি ও ভট্ট কুমারিল সমসাময়িক হইলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুমারিল ভট্টের সহিত তাঁহার বিচার হইয়াছে—ইহা বলিতে হইবে। কারণ খৃষ্টীয় ৬০০—৬৫০ পর্য্যন্তই ধর্ম্মকীর্ত্তির সময়—ইহাই বহুসম্মত মত। (৭)

কিন্তু তাহা হইলেও ভট্ট কুমারিলকে ধর্ম্মকীর্ত্তির পরবর্ত্তী বলিতে হইবে। কারণ ভট্ট কুমারিলের প্রসিদ্ধ "শ্লোকবার্ত্তিক" গ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তির মতের খণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায় (৮) কিন্তু

---

(৬) হরিদাসবাবু উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধকে ভট্ট কুমারিলের উক্তি বলিয়া এখানেও 'উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন। তাঁহার কথা দ্বারা বুঝা যায়—তিনি উক্ত শ্লোকের বক্তা বা শ্রোতা কে—তাহাই বুঝেন নাই এবং শ্লোকার্থও বুঝেন নাই। কারণ তিনি উক্ত স্থলে টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন —"এ শ্লোকের ভাষা বৈদিক ঢংয়ের—১৪শ খ্রীষ্টাব্দে এ প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল না। তখন বোপদেবের মুগ্ধবোধ প্রচলিত ছিল। 'নু জানে-বাক্য দ্বারা 'চিনি না' বুঝায়—শঙ্করকে চিনি নাই বুঝায়"। হরিদাসবাবুর উক্ত টিপ্পনীর তাৎপর্য্য কি উহাকে প্রক্ষিপ্ত প্রতিপাদন করা? তাহা কি তিনি পারিয়াছেন? আর উক্ত শ্লোকের ভাষায় বৈদিকত্বের কি পরিচয় আছে, তাহা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণই বুঝিতে পারিবেন। আনন্দাশ্রম মুদ্রিত পুস্তকে 'তু জানে' পাঠ আছে। 'তু' অর্থ—কিন্তু। 'নু জানে' পাঠান্তর গ্রহণ করিলে নু শব্দ যে নকারার্থ, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই, সুতরাং 'নু জানে' এই কথার ব্যাখ্যা—ন জানে, অর্থাৎ জানি না—ইহা হরিদাসবাবুর নূতন আবিষ্কার। পরন্তু কুমারিল ভট্ট যে শঙ্করাচার্য্যকে বিশেষরূপে জানিতেন—ইহা মাধবাচার্য্য পূর্ব্বেই "জানে ভবন্তম্‌" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭) খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের (খৃঃ ৬৩৫-) ভারত পর্য্যটক য়ুয়াং চ্যাংএর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ নাই ; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী (খৃঃ ৬৭১—৬৯৫) ভারত পর্য্যটক ইৎ সিংএর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে জিন, ধর্ম্মপাল, ধর্ম্মকীর্ত্তি, শীলভদ্র, শীলকণ্ঠ, স্থিরমতি, প্রজ্ঞাগুপ্ত, জিনপ্রভা প্রভৃতি নব্য বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কুমারিল ভট্টের নাম নাই এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মকীর্ত্তির সেই প্রসিদ্ধ প্রাণান্তকর বিচারের কথার উল্লেখ নাই; ধর্ম্মকীর্ত্তি যে ইৎসিংএর সময় জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত যে ইৎ সিংএর সাক্ষাৎ হইয়াছিল—ইহা তাঁহার বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় না। পরন্তু তাঁহার লেখা দ্বারা বুঝা যায়—ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রসিদ্ধি ঘটিলেও য়ুয়াং চ্যাংএর সময় তাঁহার সেরূপ প্রসিদ্ধি হয় নাই। মনে হয়—এই কারণেই য়ুয়াং চাং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ধর্ম্মকীর্ত্তির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং খৃঃ ৬০০-৬৫০ পর্য্যন্তই ধর্ম্মকীর্ত্তির সময়। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও ধর্ম্মকীর্ত্তির ঐরূপ সময়ই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রসিদ্ধ কবি সুবন্ধুর বাসবদত্তায়—'বৌদ্ধসঙ্গতিমিবালঙ্কারভূষিতাং' —এইরূপ একটী বাক্য আছে। উহার ব্যাখ্যায় শিবরাম লিখিতেছেন— 'বৌদ্ধ-সঙ্গতি ধর্ম্মকীর্ত্তিপ্রণীতোঽলঙ্কারগ্রন্থবিশেষঃ।' 'ঔচিত্যবিচার চর্চ্চার' (১৭ পৃঃ) টিপ্পনীতে মহামহোপাধ্যায় দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ও শিবরামের ঐরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তির 'বৌদ্ধসঙ্গতি' নামক অলঙ্কার গ্রন্থ থাকিলে ধর্ম্মকীর্ত্তিকে ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে বা তাহারও কিছু পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়। কারণ সপ্তম শতকে বাণভট্ট সুবন্ধুর যশঃকীর্ত্তন করিতে কাদম্বরীতে লিখিয়াছেন—"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া"। সুতরাং বাণভট্টের উক্ত কথানুসারে সুবন্ধুকে ৬ষ্ঠ শতকে এবং ধর্ম্মকীর্ত্তিকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বীকার না করিলে এই সমস্ত কথার সামঞ্জস্য হয় না। তাহা হইলে ভট্টের সহিত ধর্ম্মকীর্ত্তির সাক্ষাৎই সম্ভব নহে—বিচার ত দূরের কথা। অবশ্য 'বাসবদত্তার' উক্ত স্থলে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ পাঠও আছে।

(৮) "বিবেকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ সাকারস্য চ দর্শনাৎ।
সাকারবত্তয়া বোধো জ্ঞানস্যৈব প্রসজ্যতে॥"

—শ্লোকবার্ত্তিক, শূন্যবাদ ৩২ শ শ্লোক।

ধর্ম্মকীর্ত্তির 'ন্যায়বিন্দু' ব' 'প্রমাণবার্ত্তিক' প্রভৃতি গ্রন্থে কুমারিল ভট্টের মতের সবিশেষ উল্লেখ পূর্ব্বক খণ্ডন দেখা যায় না। পরন্তু ভট্ট কুমারিলের পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য কর্ণকগোমী ধর্ম্মকীর্ত্তির "প্রমাণবার্ত্তিকের" টীকা করিতে কুমারিল ভট্টের মতের সবিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন (৯)। তদ্দ্বারা বুঝা যায়—ধর্ম্মকীর্ত্তির পরে ভট্ট কুমারিলের গ্রন্থ রচিত হয় এবং উক্ত কারণেই পরে বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে কুমারিল ভট্টের মত খণ্ডন করিতে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মকীর্ত্তি পূর্ব্বে কুমারিল ভট্টের সমস্ত মতের খণ্ডন করিলে অথবা পরে বিচার দ্বারা তাঁহার মত অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে শান্তরক্ষিত বা কর্ণকগোমী প্রভৃতির ঐরূপ প্রয়াস আবশ্যক হইত না।

৩। শঙ্করাচার্য্য 'শারীরক-ভাষ্যে' ধর্ম্মকীর্ত্তির মতের খণ্ডন করিযাছেন (১০)। তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরও ধর্ম্মকীর্ত্তির নাম করিয়া তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন (১১)। সুতরাং ধর্ম্মকীর্ত্তি যে তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী—ইহা নিশ্চিত। শঙ্করাচার্য্যের দিগ্‌বিজয় কালে ভট্ট কুমারিল ভারতের অতি প্রখ্যাত মীমাংসাচার্য্য—ইহাও চিরপ্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্য ঐ প্রসিদ্ধি অনুসারে শঙ্কর ও কুমারিলের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ নানা কারণেই আমরা বুঝিয়াছি যে—ধর্ম্মকীর্ত্তি ভট্ট কুমারিল ও শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত ভট্ট কুমারিলের শাস্ত্র বিচার হইয়াছে, ইহা আমরা কিরূপে বুঝিব ?

'কাশিকা'কার সুচিত মিশ্রও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'অপিচ সহোপলম্ভনিযমাৎ ত্রয়স্যাভেদাপত্তিরিত্যাহ—বিবেকবুদ্ধ্যভাবাচ্চেতি।'

(৯) তেন ভট্টেন যদুচ্যতে (কর্ণকগোমিকৃত প্রমাণবার্ত্তিক টীকা, ৮৭ পৃঃ)। তেন যদুচ্যতে কুমারিলেন (ঐ ১৪৪ পৃঃ)। ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণবার্ত্তিক' বিলুপ্ত। উহার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ মাত্র আছে—এইরূপ কথা সত্য নহে। বর্ত্তমানে উহা পণ্ডিত রাহুল সাঙ্কৃত্যায়নের সম্পাদনায় মুদ্রিত হইতেছে। আমি দৈবক্রমে ইহার সম্পূর্ণ 'মেকাপ' করা প্রুফটী দেখিতে পাইয়াছিলাম। এজন্য প্রুফের পৃষ্ঠাঙ্কই বর্ত্তমানে গ্রহণ করিয়াছি।

(১০) অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োরুপায়োপেয়ভাবহেতুকো নাভেদ-হেতুক ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্।'—শারীরকভাষ্য (২।২।২৮)। তত্ত্বসংগ্রহে "যৎ সংবেদনমেব স্যাৎ" ইত্যাদি কারিকা ব্যাখ্যায় কমল শীলের কথা দ্বারা বুঝা যায়—"সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইত্যাদি কারিকাটী আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত। (তত্ত্বসংগ্রহ ৫৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আমাদেরও তাহাই মনে হয়। কারণ উহা প্রাচীন কারিকা হইলে শবরস্বামী বা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি উহার খণ্ডন করিতেন। 'বৃহতী' টীকায় শালিকনাথ এবং 'নয় বিবেকে' বরদরাজের কথা দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। ভগবান্ শঙ্কর অভাবাধিকরণে (২।২।২৮) ধর্ম্মকীর্ত্তির মত খণ্ডন করিয়াছেন ; কিন্তু ভাষ্যের কোনখানেই ভট্টের নাম নাই এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ বিশেষ মতেরও উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয়—শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য রচনাকালে ভট্টের গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। অবশ্য কোন কোন টীকাকার শারীরক ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন—'ভাট্টমতমাহ'। 'ভাট্টমতমুপসংহরতি' ইত্যাদি। কিন্তু উহা ভট্টের নিজস্ব মত নহে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রচলিত প্রসিদ্ধ মীমাংসক মতই পরে ভট্টমত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

(১১) ত্রিষেব ত্ববিনাভাবাদিতি যদ্ধর্ম্মকীর্ত্তিনা।
প্রত্যজ্ঞায়ি প্রতিজ্ঞেয়ং হীয়েতাসৌ ন সংশয়ঃ॥
—বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক ৪।৭৫৩

শবরীর প্রতীক্ষা

ব্রজ শর্ম্মা

দূরদিগন্তে সূর্য্য ডুবিছে চম্পকবন পারে—
হুতাশন জ্বালি পম্পার বুকে উচ্ছল রাঙ্গা ধারে
দূর বনানীর শ্যামল শিয়রে তাহারই পরশ লাগে
আঁধারের কাছে রক্ত-আলোক ক্ষণিক বিদায় মাগে॥
অদূরে হোথায় পলাশের দেহ দ্বিগুণ আগুন বহে
প্রতি পলে পলে সে বহ্নিশিখা ব্যর্থ হিয়ারে দহে।

যুগ যুগান্ত আসে আর যায় বহি শুধু একই ভাষা
আনে না শ্রবণে দয়িতের বাণী আঁখিতে আলোর আশা।
আকাশে বাতাসে আলোকে আঁধারে তোমারই পরশ খুঁজি
নির্জ্জন রাতে একাকিনী জাগি কত না প্রহর গণি,
স্খলিত পাতার মৃদু মর্ম্মরে মনে হয় আস বুঝি
কতবার হায় চমকিয়া উঠি—শুনি যেন পদধ্বনি

ওগো প্রিয়তম, নয়নের আগে আঁধারের আলো লাগে—
তব পথ চাহি পতিতা শবরী আজিও কে একা জাগে।

ত্রুটি

শ্রীসুধীরঞ্জন ঘোষ

আপিসের একটানা একঘেয়ে ক্লান্তির পর নিজের টেবিলের সামনের চেয়ারটাতে আসিয়া অবসাদগ্রস্ত দেহটাকে স্থাপন করিলাম। সংগে সংগে বাহির হইয়া আসিল ছোট্ট একটি শব্দ—আঃ। ভাবিতেছিলাম আপাতত কি করা যায়। কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না চঞ্চল মনটার জন্য। এ যেন লাগামবিহীন সবল ঘোড়া। কোনমতেই স্থির থাকিতে রাজী নয়।

অতীত জীবনের নানা কথাই মনে পড়িতে লাগিল। হঠাৎ স্কুলের সেই ভ্যাব্‌লাটার কথা মনে হইল। এখনও হাসি পায় ওর কথা মনে হইলে। ওর ঐ নামকরণের কোনও যুক্তি আছে বলিয়াই মনে হয় না। ভ্যাব্‌লা নামটা শুনিলেই কেন যেন মনে হয় জীভ বাহির করা। কিন্তু মাস্টারদের ভেংচান ছাড়া আর একদিন মাত্র তাহার জীভ দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। একদিন বাংলা পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন চতুর্থ ইন্দ্রিয়ের নাম। ভ্যাব্‌লা নামোচ্চারণের পরিবর্তে দেখাইয়াছিল তাহার জীভটি। যদিও সেই মুহূর্তেই পণ্ডিতও তাঁহার বেতের মহিমা তাহাকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে ভ্যাব্‌লা আর একবার মাত্র তাহার জীভটি বাহির করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটিও একটুকু কুঞ্চিত করিয়া।

ভ্যাব্‌লার মাথায় খেলিত নিত্য নূতন ফন্দি। আমাদের ক্লাসের দুইটি ছেলের ছিল লম্বা লম্বা টিকি। দুজনায় খুব ভাব, আর বসিতও পাশাপাশি। একদিন ভ্যাব্‌লার ফন্দি মিলন ঘটাইল দুই টিকির। টিকি দুইটির মালিক জানিতে পারিয়া নালিশ করিল হেড্‌মাস্টারের কাছে। ভ্যাব্‌লার তলব পড়িল। ভ্যাব্‌লাকে তাহার জন্য মোটেই চিন্তিত দেখা গেল না, কারণ ইহা পুরানো ব্যাপার। হেড্‌মাস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখো বাপু, ইস্কুলে আস কি জন্য ?"

ভ্যাব্‌লা উত্তর করিল—"আজ্ঞে, ইস্কুলে এসে যা যা করতে হয় সবই তো করি, করি না শুধু পড়াশুনা ; আমার দোষ কি বলুন, সব বিষয়ে সবাই তো আর পাকা হয় না! ওটি আমার দ্বারা হ'বে না।"

ইহার উত্তর হেড্‌মাস্টার কি দিয়াছিলেন ঠিক মনে নাই। তবে তাহার পরের দিন হইতে তাহাকে স্কুলে দেখা যাইবার পরিবর্তে দেখা গেল এক পানের দোকানে। মনে মনে ভাবিলাম, ভালই হইল, বুদ্ধি আছে, কিছু করিয়া খাইতে পারিবে।

সেইদিন হইতেই তাহার সহিত একরূপ বিচ্ছেদ সুরু হইয়াছে। তবুও মাঝে মাঝে যাইতাম, খোঁজখবর লইতাম। দুই-একটা পানও সে সুন্দর করিয়া বানাইয়া দিত। হয়ত সেই লোভেও প্রথম প্রথম একটু বেশী করিয়াই যাইতাম। আমরা গেলে সে খুব খুশীই হইত। খদ্দের থাকিলে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিত, "কিছু মনে করিস না ভাই, ওরা থাক্‌লে কিছুতেই আমার গল্প জমে না, কেমন যেন বোঝা বোঝা লাগে, তাই আগেই ওদের বিদায় করে নি।" তারপর সুরু করিত তাহার গল্প। প্রথম প্রথম গল্পের মধ্যে থাকিত তাহার নূতন জীবনের অভিজ্ঞতা। শিশুর প্রথম দিনের স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন আর কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না, তেমনি প্রথম প্রথম দেখা হইলেই সুরু হইত তাহার নূতন জীবনের অফুরন্ত সংবাদ। কান যাইত ঝালাপালা হইয়া, তবুও ধৈর্য ধরিয়া শুনিতাম শেষ মুহূর্তের বিদায়ী পানটির লোভে।

ক্রমে ক্রমে তাহার পসার বেশ জমিয়া উঠিতেছিল। আর ক্রমে ক্রমে আমাদের যাতায়াতও শিথিল হইয়া আসিতেছিল, নির্মম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুভারের দরুণ। তথাপি স্কন্ধের সেই গুরুভার সত্ত্বেও বহুদিন তাহার নিকট গিয়াছি ; কেন জানি না, হয়ত বা সেই পানের লোভেই, নয়ত, তাহার মধ্যে যে কোমলতা, স্বভাবের মিষ্টতা এবং লোকের সংগে মিশিবার অদ্ভুত ক্ষমতাটুকু ছিল, সেইজন্য।

একটি কথা মনে পড়িয়া গেল—সেইদিন এক ভদ্রলোক তাহার দোকান হইতে পান কিনিয়া পয়সা দিতে গিয়া পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন ব্যাগটি নাই। তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "কিছু মনে করো না ভাই, এখন পান নেওয়া হবে না, ব্যাগটি চুরী হ'য়ে গেছে।

মেয়েকে বলেছিলাম আজ শাড়ী নিয়ে যাব, কিন্তু তাও আর হ'ল না।"

ভ্যাব্‌লার কোমল মনে বড় লাগিল, সে বলিল, "তাতে কি হয়েছে বাবু, পান আপনি নিয়ে যান, আর মেয়েকেও শাড়ী কিনে দিন গিয়ে—যখন সুবিধা হ'বে টাকা দিয়ে দেবেন।"

ভদ্রলোক বোধহয় অবাক হইয়া গেলেন সামান্য একটি পানওয়ালার এমন সহৃদয়পূর্ণ কথা শুনিয়া। তিনি শুধু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অপলক নয়নে তাকাইয়া রহিলেন ভ্যাব্‌লার মুখের দিকে। ভ্যাব্‌লা বাক্স খুলিয়া দুইটি নোট গুঁজিয়া দিল তাহার হাতে।

তাহার মধ্যে ছিল প্রাণের একটা স্পন্দন। সে ছিল রসের একটা উৎস। মানুষকে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার অসীম। মাঝে মাঝে ভাবিতাম, এত রস সে পাইল কোথায়। কিন্তু তাহার উত্তরও পাইয়াছি। অনেক যত্ন করিয়া বাগানে কয়েকটা ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলাম, কিন্তু বাল্‌তি-ভরা এত জল ঢালা সত্ত্বেও কোনটা বা মরিল, কোনটা হইয়া রহিল ত্রিভংগ-মুরারী—আর সূর্য ঢাকা পড়িবার ভয়ে বাগানের বাহিরের গাছগুলিকে মাসে দুইবার কাটিবার দরকার হয়।

আজ দুই বৎসর হইল ভ্যাব্‌লার ঐদিকে বড় একটা যাই নাই। আর যখনই বা গিয়াছি দেখা করিবার অবসরও পাই নাই। তাহা ছাড়া উহার কথা বড় বেশী মনেও হয় নাই।

আজ হাতে কোন কাজ ছিল না। তাই ভাবিলাম একবার ভ্যাব্‌লার খোঁজ লইয়া আসি। তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদিন আগে একবার ঐ স্থান দিয়া যাইবার পথে দেখিয়াছিলাম উহার দোকানটির নাম "বাণী-মন্দির।" কিছুক্ষণ পরে সেইখানে গিয়া পৌছিলাম। ভ্যাব্‌লা তখন ব্যস্ত। বলিলাম, "কেমন আছ ভ্যাব্‌লা?"

স্বর শুনিয়া সে চমকিয়া চাহিল, অবাক হইয়া হাসিয়া কহিল, "আরে প্রকাশ যে? কেমন আছ, কোথায় থাক আজকাল? তোমায় তো বহুদিন দেখি না?"

বলিলাম,"ভালই আছি—কাজের তাড়ায় বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, তাই এলাম।" বলিলাম, "এখানেই একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করছি।" শুনিয়া সে খুব খুসীই হইল। তাহার কথায় বুঝিলাম তাহার বেশ ভালই চলিয়াছে। হঠাৎ কি খেয়াল হইল জিজ্ঞাসা করিলাম,"দোকানের নাম হঠাৎ 'বাণী মন্দির' রাখলে কেন ভ্যাব্‌লা?"

ভ্যাব্‌লা বলিল, "বাণী আমার মেয়ের নাম। ওই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল, বছর ছয়েক ওর বয়স। মাত্র ছ মাস বয়সে আমার কোলে ওকে দিয়ে ওর মা গেছে মারা। সেই থেকে ওর দুটো অভাবই আমি পূরণ করে আস্‌ছি। ওকে আমার পালন করতে হয় কত যত্নে। এই যত সব—সবই তো ওর জন্য। ও ছাড়া আমার সংসারের আকর্ষণ কি?"

বুঝিলাম পিতৃ হৃদয়ের কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে সেই মাতৃহীন শিশু। অবশেষে নানা কথার পরে তাহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আসিবার সময় সে বারবার করিয়া বলিয়া দিল, যেন মাঝে মাঝে আসি। দোকানখানা এখন তাহার বেশ বড়ই হইয়াছে। বেশ করিয়া সেখানা সে গুছাইয়া লইয়াছে। তাহার বাল্যের সেই চাপল্য এখন বৃদ্ধের ধীরতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু সেইজন্য রস তাহার এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

তারপর হইতে প্রায়ই সেখানে যাইতাম। এইভাবে সন্ধ্যাটা কাটিতও বেশ। নানারূপ আলোচনাই হইত তাহার সহিত।

সেই দিন শনিবার। একটু তাড়াতাড়ি আজ ভ্যাব্‌লার কাছে চলিয়াছি, কারণ কাজের চাপে দুইদিন আসিতে পারি নাই। দোকানের কাছে আসিয়া দেখিলাম দোকানঘর বন্ধ। কারণটা বুঝিলাম না। দোকানের পাশের বাড়ীটাতেই সে থাকে। সেইখানে গিয়া কয়েকবার তাহাকে ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "তুমি এসেছ ভাই, আজকে আমি বড় ব্যস্ত।"

বলিলাম, "না থাক, আমি তবে আজ যাচ্ছি—" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু মনে হ'ল, ভ্যাব্‌লা যেন কিছু বলিতে চায়—হয়তো সংকোচ হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু বলিবে তুমি?"

সে চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম—"বল না, কি বলতে চাও, আমার কাছে তোমার লজ্জা কিসের?"

এবার ভ্যাব্‌লা মুখ খুলিল, বলিল, "প্রকাশ, মেয়েটির বড় অসুখ, ছোট খাটো অনেক ডাক্তারই দেখাইয়াছি, তাহারা কিছুই বুঝিল না, ইচ্ছা আছে একজন বড় ডাক্তার দেখাইব। কিন্তু কিছুতেই ভিজিটের টাকা জোগাড় হইতেছে না, তুমি ছাড়া এমন কেহ নাই যে আমাকে এই বিপদে সাহায্য করিতে পারে।"

মনে পড়িল সেইদিনের কথা, যেদিন পাইয়াছিলাম তাহার স্নেহপরিপূর্ণ পিতৃহৃদয়ের পরিচয়। দুঃখ হইল তাহার জন্য, বলিলাম, "তুমি সেইজন্য ভাবিও না ভ্যাব্‌লা, আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

ভ্যাব্‌লা বলিল, "তোমার এইজন্য আজ আর তাড়াহুড়া করতে হবে না প্রকাশ, কাল বন্দোবস্ত করলেই চলবে।"

ইহার পর সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। মনটা বড় ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল।

সোমবার। আপিস হইতে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছি। কাল ভ্যাব্‌লাকে টাকা দিবার কথা ছিল, কিন্তু কাজের তাড়ায় সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহা মনে পড়ায় আপিস হইতে পঞ্চাশ টাকা ধার করিয়া একটু তাড়াতাড়ি ফিরিয়াছি। পোষাক বদলাইয়া ভ্যাব্‌লার বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। বার কয়েক ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু এ কি তাহার চেহারা! একেবারে যে আধখানা হইয়া গিয়াছে, বলিলাম, "এই নাও তোমার টাকা, কিছু মনে ক'র না ভাই, কাল একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

ভ্যাব্‌লা আমার দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "প্রকাশ, কিছু মনে ক'রো না, ও টাকা আর লাগবে না।"

একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, "কেন, বাণী কি ভাল হ'য়ে গেছে?"

ভ্যাব্‌লা বলিল, "বাণী কাল মারা গেছে।" দেখিলাম তাহার দুই চোখে দুই ফোঁটা জল শুধু ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে, কিন্তু কোন মতেই আর গাল বহিয়া নামিতেছে না।

মাথাটা ধীরে ধীরে নীচু হইয়া আসিল, ভাবিলাম শুধু আমারই একটু ত্রুটির জন্য এত বড় একটা ঝড় বহিয়া গেল। দুঃখে অনুশোচনায় মাটির সংগে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, মুখ তুলিতেই চোখে পড়িল বড় বড় হরফে 'বাণীমন্দির'; দেখিলাম ভ্যাব্‌লাও সেই দিকেই তাকাইয়া আছে, আর তাহার সেই কম্পমান অশ্রুজল নীরবে কপোল বহিয়া চলিয়াছে। কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আমারও গালে আসিয়া পড়িল, নোট পাঁচখানি হাত হইতে পড়িয়া গেল।

বঙ্গজননী

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

পঞ্চাশ হয়েছি পার, রৌপ্য রেখা শিরে,
পায়ে পায়ে চলিয়াছি বৈতরণীতীরে।
সুর হয়ে গেছে ক্ষীণ, ক্লান্ত ক্লিষ্ট মন,
ধূলি-ধূসরিত দেহ, কম্পিত চরণ।
তথাপি যখনি চাহি ওই পূর্ব্ব-ধারে
যেখানে জননী বসি কুটীরদুয়ারে
আজো চেয়ে পথপানে—ভুলে যাই সব
দৈন্য ব্যথা; ফিরে আসে অন্তরে বিভব,
চক্ষে দীপ্তি, বক্ষে বল—উৎসাহ অপার।
মনে মনে ভাবি— যদি আসি মা আবার,
ফিরে যেন যাই তোর কোল—স্নেহভরা
বনচ্ছায়ে—গীতিগন্ধে উচ্ছ্বসিত-করা।
আমার সায়াহ্ন তাই সজল নয়ানে
চেয়ে আছে দূরাতীত প্রভাতের পানে।

ফ্রয়েড ও স্বপ্নতত্ত্ব

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এম-এ

স্বপ্নতত্ত্বের ইতিহাস রহস্যময়। মানুষের প্রতিভা চিরদিনই প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে প্রচেষ্টা ক'রে এসেছে। সর্ব্বত্রই যে তার প্রচেষ্টা জয়ী হয়েছে এমন নয়। জয়ের চেয়ে বরং তার পরাজয়ের ইতিহাসই বড়; কিন্তু তা হ'লেও তার পরাজয়ের মূল্যও নেহাৎ কম নয়। পরাজয়ই সর্ব্বত্র জয়ের সিঁড়ি গড়তে সাহায্য করেছে। স্বপ্নরাজ্যের রহস্য ভেদ করতেও এইরূপ বহু পরাজয় এসেছে। তবে এই পরাজয়ই বোধ হয় তার ভবিষ্যতের বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছে। স্বপ্ন সম্বন্ধে যে নানা মুনির নানা মত, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। প্রত্যেকেই স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছে; যাদের সে ক্ষমতা নেই তারা অন্তত একে 'ভাল-মন্দ' বলে ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেবেলায় মনে পড়ে, ভোরে উঠে স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনাই ছিল আমাদের দিন-পাঁজির প্রথম অধ্যায়। বাড়ীর বয়োবৃদ্ধেরা, দিদিমা পিসিমা ইত্যাদিরা ছিলেন আমাদের স্বপ্নবিশ্লেষক। কে কি স্বপ্ন দেখেছে তাদের কাছে বলা হ'ত এবং তাঁরা অমনি গভীর ভাবে 'ভাল-মন্দ' বলে দিতেন। যে ভাল স্বপ্ন দেখত তার আনন্দের সীমা থাক্‌ত না; কিন্তু যদি কেউ তেমন মন্দ স্বপ্ন দেখ্‌ত তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করতে হ'ত। দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে পাতি দিতেন, "যাও কালো-গরুর কানে গিয়ে তোমার স্বপ্ন বলে এস।" সে অমনি ছুটত। কালো-গরু না পাওয়া গেলে অন্তত একটা কালো গয়লার কানে বললেও ফলত। নিয়মটাকে লঘু করবার অবশ্য এমন একটা কারণ ছিল; আমাদের বাড়ীর পাশে অমন এক ঘর কালো গয়লা ছিল। দিদিমার বিচারে না কুলালে হাইকোর্ট হ'ত ভটচায্যি মশাইর কাছে। তিনি পাঁজি দেখে প্রথম রাত্রির স্বপ্নকে এক রকম, শেষ রাত্রির স্বপ্নকে অন্য রকম ব্যাখ্যা দিতেন। ভটচায্যি মশাইর মতে স্বপ্নের ফল বিভিন্ন। তবে স্বপ্নের যে আমাদের জীবনের উপর একটা বিশেষ প্রভাব আছে এ বিষয়ে দিদিমা ও ভটচায্যি মশাই উভয়েই একমত। কেবল দিদিমা ও ভটচায্যি মশাই নয়, এমন কি বিলেতের অ্যাড্‌লার সাহেবও মেনে নিয়েছেন। অ্যাড্‌লার সাহেবের মত আপাতত দিদিমার কাছেই থাক; আজ ফ্রয়েডের মতবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন আমাদের রুদ্ধ অবচেতনী বাসনার বিকৃত প্রকাশ মাত্র। আমাদের অবচেতন মনের অন্তঃস্থলে কতগুলি অদমিত (repressed) বাসনা আছে। এই অবদমিত বাসনাগুলির সকলেই আমাদের শৈশবের যৌন-বাসনা। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কড়া শাসনে দমিত হয়ে এরা আশ্রয় নিয়েছে আমাদের অবচেতন মনের অন্তরালে। কিন্তু এই বাসনাগুলি অবচেতন হ'লেও সচেতনের মতই সজাগ ও ক্রিয়াশীল। তারা সর্ব্বদাই বহির্মুখী ও চেতনালোকে আসতে সমুৎসুক। পর্দ্দানশীন নারীর মত অবচেতন মনের অন্ধকার হারেমে থেকে থেকে এদের প্রাণ ওঠে অতিষ্ঠ হয়ে। তাই সুবিধে পেলেই এরা পর্দ্দার অন্তরাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। কিন্তু আমাদের আত্ম-চেতনা (Ego) বড় সজাগ ও তার শাসন বড় কঠোর। সে সব সময়ই এই দমিত দুষ্ট যৌন-বাসনাগুলিকে চেতনালোক থেকে সরিয়ে রাখতে চায়। তাই তার সজাগ অবস্থায় এরা চেতনালোকে আসতে সুযোগ পায় না। তবে মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় আত্ম-চেতনাও যখন ঘুমিয়ে পড়ে—তখন এই বাসনাগুলি চেতন-রাজ্যে ফিরে আসতে প্রয়াস পায়। কিন্তু এই রুদ্ধ যৌন-বাসনাগুলি এত কুৎসিত যে তাদের পূতিগন্ধে ঘুমন্ত আত্ম চেতনার পর্য্যন্ত ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাই আত্ম-চেতনার চোখে ধূলো দেওয়ার জন্য এই বাসনাগুলি আসে নানা রকম ছলনার খোলস পরে। আমরা স্বপ্নে যে সব ঘর বাড়ী সাপ ব্যাং দেখি সে সব ঘর-বাড়ী সাপ ব্যাং নয়, সে সবই ছলনার খেলা। এরা আমাদের অবচেতনী বাসনার এক একটি প্রতীক (symbol) মাত্র—বাসনার প্রকৃত রূপের বিকৃত প্রকাশ। তাই স্বপ্নের দুইটা রূপ—অন্তঃরূপ ও বহিঃরূপ। অন্তঃরূপ (latest content) হচ্ছে আমাদের শৈশবের দমিত যৌন-বাসনার যেরূপ—তার ঘর হ'ল আমাদের অবচেতন মনের অন্তরালে; আর বহিঃরূপ (manifest content) হচ্ছে সেই অবচেতনী বাসনার স্বপ্নে প্রকাশিত যে রূপ—যা আমরা সাক্ষাৎ স্বপ্নাবস্থায় দেখি। বহিঃরূপ হ'ল অন্তঃরূপের প্রতীক (symbol)—তার সাংকেতিক প্রকাশভূমি। বহিঃরূপই স্বপ্নের সব নয়—অন্তঃরূপই হ'ল তার প্রকৃত স্বরূপ। তাই বহিঃরূপ দেখে স্বপ্নের নব বিকার করা চলে না, তার অন্তঃরূপ জানা চাই। অন্তঃরূপ জানতে হ'লে স্বপ্নের বিশ্লেষণ করতে হবে ও তার প্রতীকের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হবে।

এখানে ফ্রয়েড থেকে একটি স্বপ্নের বিশ্লেষণ দেখাচ্ছি। শ্রীমতী নামে একটি মেয়ে ছিল। সে তার দিদির বাড়ী থাকত। শ্রীমতী স্বপ্ন দেখল, তার দিদির মেয়েটি মরে গেছে। দিদির মেয়েটিকে সে খুব ভালবাসত। তার মৃত্যুর ইচ্ছা কখনো তার মনে আসে নি; তবে সে কেন এমন স্বপ্ন দেখল? ফ্রয়েডকে সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল এবং ফ্রয়েড বিশ্লেষণ ক'রে এক অদ্ভুত জিনিষ পেলেন। দেখা গেল শ্রীমতী যখন তার বোনের বাড়ীতে ছিল তখন তার ভগ্নীপতির এক বন্ধু ঐ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করত। শ্রীমতী ক্রমশ ঐ ভদ্রলোকটির প্রতি আসক্ত হয় ও তার প্রেমে পড়ে। শ্রীমতীর দিদি এই ব্যাপার জানতে পায় ও এ ভদ্রলোকটিকে সরিয়ে দেয়। তারপর বহুদিন কেটে গেল। শ্রীমতীর ঐ ভদ্রলোকটিকে দেখবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হ'ত; কিন্তু কোথাও দেখবার সুযোগ তার

হয় নি। একদিন হঠাৎ শ্রীমতীর দিদির বড় মেয়েটি মারা গেল; সেইদিন ঐ ভদ্রলোকটি ঐ বাড়ীতে এসেছিল। শ্রীমতী এই সুযোগে তার বহুদিনের বাসনার কিছু চরিতার্থ করল। দিদির মেয়ের মৃত্যু স্বপ্নে দেখেছিল এইবাসনাকে আর একবার চরিতার্থ করবার জন্য। মেয়েটির মৃত্যু হ'লে হয়ত ঐ ভদ্রলোকটি আর একবার আসবে এবং সে তার বাসনাকে আর একবার চরিতার্থ করতে পারবে।

এখন দেখা গেল, স্বপ্নের বহিঃরূপ ও অন্তঃরূপের কত প্রভেদ। আমরা যখন কোন দুঃস্বপ্ন দেখি—কোন আত্মীয়ের মৃত্যু বা কোন আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় তখন আমরা সাধারণত খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কিন্তু এই স্বপ্নের অন্তরালে যে কি অবচেতনী বাসনা লুপ্ত আছে তা না জানলে আমরা স্বপ্নকে ভাল-মন্দ বলতে পারি নে। আপনারা অনেকেই হয়ত ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-বিশ্লেষণ মানেন নে। বাস্তবিকই স্বপ্নের প্রতীক বোঝা ও মানা খুবই কঠিন। এমন কি, অভিজ্ঞেরাও অনেক সময় হার মেনে যান এবং বিশ্লেষণের প্রতি আস্থা হারান। তবে আপনারা যদি স্বপ্নের ফ্রয়েডীয় মতবাদটি মনে রাখেন তবে আপনাদের অন্তত একটি লাভ হবে। দুঃস্বপ্ন দেখে তার পরদিন দুশ্চিন্তা কিছু কম হবে; এবং দিনের বেলা কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি ও রাত্রিতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে না।

বাজ! বাজ! রণভেরী—

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম্-এ

বাজ! বাজ! ভেরী!—বাজ! বিউগ্‌ল্‌! বাজ!
বিদ্যুত্‌বেগে ফেটে পড় দিকে দিকে।
বাতায়ন-পথ—রুদ্ধ দূয়ার,
তীব্র আবেগে হয়ে যাও পার,
ফেটে পড়' যেথা গীর্জার মাঝে গম্ভীর ধ্বনি ওঠে—
হান সংঘাত প্রার্থনারত মানুষের বুকে বুকে,
সংঘাত হান কর্মনিরত শিক্ষাব্রতীর বুকে।
বরবেশে আজ ঘুমায়েছে যারা,
তাদের আঘাত কর,
বঁধুয়ার সাথে প্রণয় আজিকে নয়।
মাঠে মাঠে যত কৃষকের দল শান্তিতে করে কাজ,
শান্তির নীড়ে তোল উদ্দাম ঝড়।
তীব্র স্বননে ঘূর্ণির বেগে বাজ বাজ ভেরী বাজ—
তীব্র নিনাদে বাজ বিউগ্‌ল্‌ বাজ!

বাজ! বাজ! ভেরী!—বাজ! বিউগল! বাজ!
শহরের পথে জনতার বুকে বাজ—
রাজপথে ওঠে চক্রের গান,

তারি তালে তালে বাজ।
ঘরে ঘরে আজ নিশীথ-শয়ন পাতা হয়েছে কি সারা?
সে-শয়ানে যেন কারো ঘুম নাহি হয়;
আজিকার দিনে দরকষাকষি নয়;
বন্ধ সকল কাজ।
তবু যদি চলে দালালের আনাগোনা?
কথকেরা যদি সুরু করে কথাকলি?
গীতিকার তবু তোলে যদি তার সুর?
ব্যবহারাজীবী মামলা চালায় যদি?
বেজে ওঠ তবে তীব্র দৃপ্ত সুরে—
বাজ রণভেরী বাজ,
উন্মাদ সুরে হাঁক বিউগল হাঁক।

বাজ! বাজ! ভেরী!—বাজ! বিউগল বাজ!
আলোচনা নয়—থামাও সম্ভাষণ:
ভীরু যারা, আর ক্রন্দনরত; প্রার্থনারত যারা
কারো প্রতি আজ দৃকপাত ক'র না ক';
বুড়ো কেউ যদি স্নেহের বাঁধনে যুবাকে ফেরাতে চায়,
তারেও করুণা নয়;
শিশু-কণ্ঠের আহ্বান আর জননীর অনুরোধ
ডু'বে যাক, তোলো সুউচ্চ রোল।
কেঁপে কেঁপে যেন মৃতের শয্যা মৃতজনে দেয় নাড়া,
তেমনি ভীষণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাজ রণভেরী বাজ—
উদাত্ত সুরে হাঁক বিউগল হাঁক।*

[* মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Beat! Beat! O Drums। কবিতার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ]

নিখিল প্রবাহ

হুয়েন শাঙ্

নানা মতভেদ ও দলাদলির ভিতর দিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মাণীর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল এবং ইতালিরও একটা বোঝাপড়া হ'য়েছিল। কিন্তু সেইখানেই শেষ হয়নি। যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল তাতে ফরাসী জনসাধারণের পুরোপুরি সম্মতি ছিল না ব'লেই জানা যায়। একদল শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাঁরা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়েও জাতীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য উন্মুখ ছিলেন। মার্শাল পেতাঁর সিদ্ধান্ত এঁরা সার্ব্বজনীন ব'লে মান্‌তে রাজী হন্‌নি। কিন্তু এবার সে মতবিরোধ ও দলাদলির পূর্ণাহুতির আয়োজন হ'য়েছে বলে মনে হয়। মসিয়ে দালাদিয়ে প্রভৃতি উনিশজন বিশিষ্ট ফরাসী জননায়ক

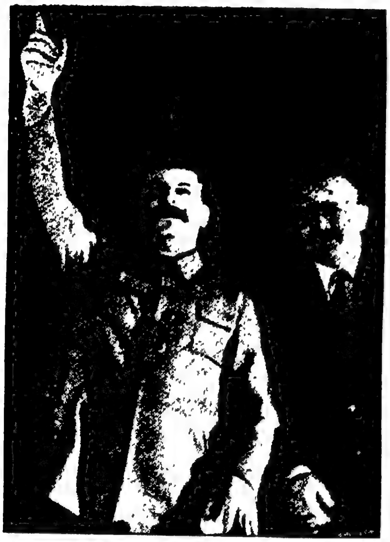

সেক্রেটারী ষ্ট্যালিন ও চেয়ারম্যান মলোটফ্

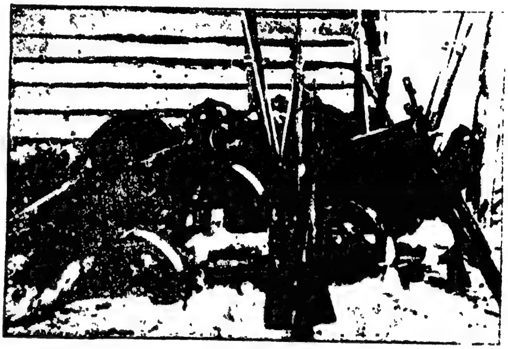

শত্রুপক্ষের যে সব অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হ'য়েছে

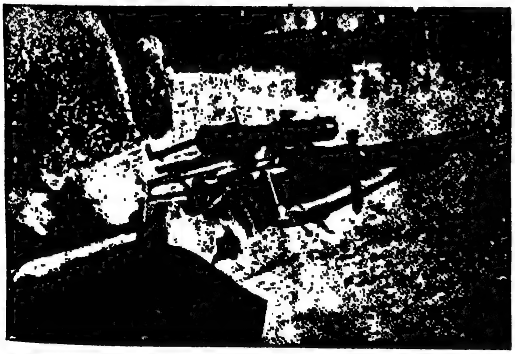

দূরবীক্ষণযুক্ত রাশিয়ান রাইফেল। এই বন্দুকের পাল্লা সুদূরগামী এবং অতি দূরেও যাতে লক্ষ্য অব্যর্থ হয় তার জন্যে বন্দুকের মাথায় দূরবীক্ষণ দেওয়া আছে

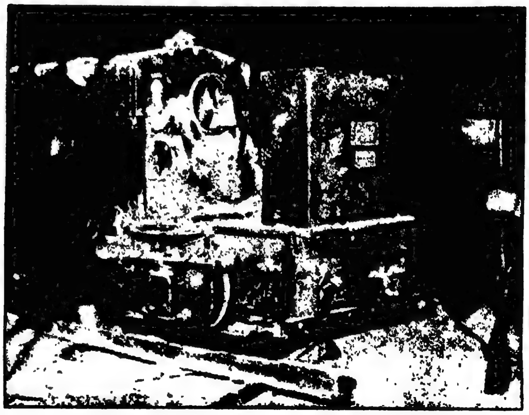

যুদ্ধক্ষেত্রে ভারী কামান গোলা ইত্যাদি ব'য়ে নেবার জন্যে তৈরী জার্ম্মাণীর ডায়াসেল এঞ্জিন

এই বিরোধী দলের মুখপাত্র ছিলেন। পেতাঁ গভর্ণমেণ্ট এঁদের সামরিক প্রথায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ক'রেছে। যাক্ যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'য়েছে, তার সর্ত্তাবলী যতদিন ইংরেজের সঙ্গে জার্ম্মাণীর লড়াই চল্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হবে এই মর্ম্মেই গ্রথিত।

যুদ্ধক্ষেত্রে মালবাহী ট্রাকসমূহ

তারপর ফ্রান্সের ভাগ্যে যে কি ঘট্‌বে, সে কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নি। তবে পেতাঁ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপদ্ধতি থেকে ভবিষ্যৎ ফ্রান্সের রূপ কতকটা অনুমান করা যায়।

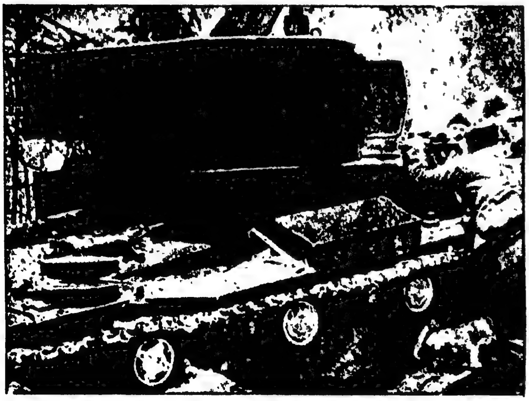
জার্ম্মাণীর একটী অব্যবহার্য্য ট্যাঙ্ক

সন্ধিবদ্ধ ফ্রান্সের বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে পেতাঁ গভর্ণমেণ্ট ব'লেই আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। জার্ম্মাণীর আদর্শে গঠিত এই নূতন ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ডিক্টেটরিয়াল শাসন পদ্ধতিরই রূপান্তর মাত্র হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্রিটিশ নাবিক সৈনিক

যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ইতিমধ্যেই পেতাঁ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। যাই হোক্, মিত্রশক্তির

বোমাবিশারদ মিঃ বুগিন একটী ছোট বোমা পরীক্ষা ক'রছেন

সাহায্যের আশা একে একে ত্যাগ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজকে একাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'তে হ'য়েছে। আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র ও এরোপ্লেন ইত্যাদি সরবরাহ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট সাহায্য ক'রবে ব'লে যে ভরসা দিয়েছিল, তার আশাও ত্যাগ ক'রতে হ'য়েছে।

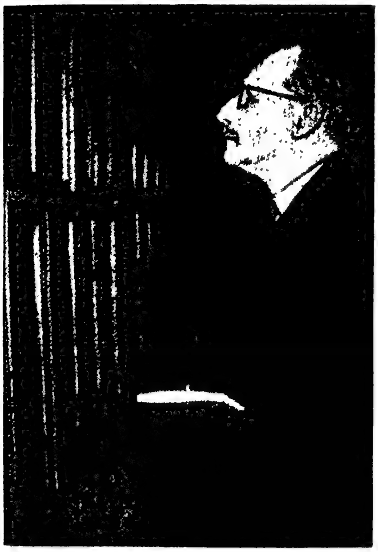

ফরাসী রাজদূত আঁদ্রে কর্বিন

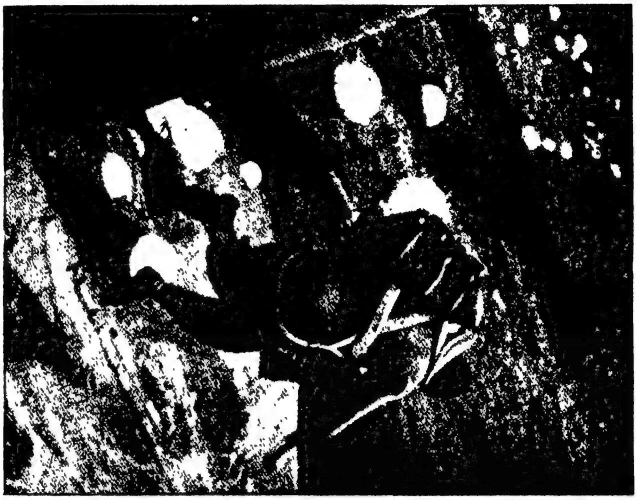

প্যারাসুটবাহিনী। একজনমাত্র সৈনিককে দেখা যাচ্ছে। ছাতার মত (শাদা) প্যারাসুটগুলির প্রত্যেকটী অবলম্বন ক'রে এক একজন সৈনিক এরোপ্লেন থেকে নাম্‌ছে

নরওয়ে, হলাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির জার্ম্মাণীর যে সংঘর্ষ হ'য়েছে, তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশী সংঘর্ষ হবে এবার। ইংরেজ ইতিমধ্যে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় ও সংগ্রামোপযোগী উপকরণাদি সংগ্রহ ক'রেছে। গত মহাযুদ্ধে জলপথে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হ'য়েছিল—এবার ততোধিক প্রচণ্ড সংগ্রাম ঘট্‌বে আকাশ পথে। স্থলের মানুষ জলে লড়াই ক'রবার শক্তি সংগ্রহ ক'রেও ক্ষান্ত হয় নি, তাই এবার জল ও স্থল দু-ই অতিক্রম ক'রে তারা বৈমানিক শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হ'য়েছে।

জিব্রাল্‌টারের নিকটবর্ত্তী ব্রিটিশ নৌবাহিনী

ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মাণীর সন্ধি হওয়ার পর থেকেই ইংলণ্ডের উপর বোমারু জার্ম্মাণ বিমানের হানা এবং জার্ম্মাণীতে রয়াল এয়ার ফোর্সের আক্রমণ প্রবলভাবে চলেছে। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূলে জার্ম্মাণ বিমান-

বাহিনী ইতিমধ্যে পর পর অনেকবার বোমা নিক্ষেপ ও আক্রমণ ক'রেছে এবং জার্ম্মাণীর কতকগুলি পেট্রোল গুদাম ও অস্ত্রাগারের উপর ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্স বোমা নিক্ষেপ ক'রে সেগুলি বিধ্বস্ত ক'রেছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গেছে।

এক দল ভারতীয় সৈনিক

যুদ্ধের প্রাক্কালে ষ্ট্যালিন ও হিট্‌লারের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি হ'য়েছিল, তার সর্ত্তাদি সম্পর্কে পূর্ব্বে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে বর্ত্তমানে, অবস্থানুযায়ী সুযোগ বুঝে হঠাৎ ষ্ট্যালিন যেভাবে রুমানিয়ার বেসাবেরিয়া প্রদেশ দাবী ক'রে ব'স্‌লেন এবং হিট্‌লার তার জন্যে সুপারিশ ক'রলেন, তাতে পারস্পরিক চুক্তির কতকটা গূঢ় রহস্য অবগত হওয়া গেল।

যুদ্ধ বিরতির পর ফরাসী সৈনিকেরা
মদ্যপান ক'রছে

বল্‌কানেও যুদ্ধ আসন্ন এবং তার ভবিষ্য রূপ আতঙ্ককর ব'লেই মনে হয়। ও দিকে ইতালি কিন্তু নাজি-ফরাসী যুদ্ধ বিরতির পর থেকে চুপটি ক'রে ঘাঁটি আগলে ব'সে আছে। ফরাসীর কাছে তার যা প্রাপ্য ছিল, সেটুকু আদায় ক'রে বাকী আর কোন কোন অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সে চায়, তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন ইঙ্গিত আজ পর্য্যন্ত দেয় নি। তবে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে তার শ্যেন দৃষ্টি সর্ব্বদাই নিবদ্ধ আছে এবং মাঝে মাঝে অতর্কিতে ইংলিশ জাহাজ ও সাবমেরিণ প্রভৃতি আক্রমণ ক'রে এঁদের বিব্রত ক'রবার চেষ্টা ক'রছে।

কর্পোরাল আলেক্‌জাণ্ডার বিকারষ্টাফ্‌: বয়স ২৭ বৎসর।
লিভারপুলের এই যুবক ৫ খানি শত্রুপক্ষীয় বিমান ভূপাতিত
ক'রে সম্রাট প্রদত্ত ফ্লাইং ক্রস্ লাভ ক'রেছেন। রয়াল
এয়ার ফোর্সে যোগদান ক'রবার পূর্ব্বে ইনি
একজন সামান্য কেরাণী ছিলেন

ব্রিটিশ সাবমেরিণ। এই সাবমেরিণ ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে অন্তর্ধান ক'রতে পারে

অপর দিকে য়ুরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বুঝে ইংলণ্ড তার প্রাচ্য নীতির পরিবর্ত্তন সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রেছে সেটা এক হিসাবে ভাল ব'লেই মনে হয়। জাপানের সঙ্গে চীনের যে সুদীর্ঘকাল-ব্যাপী সংগ্রাম চলেছে, তার সঙ্গে বৃটিশ প্রাচ্যনীতির একটা ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল। ব্রহ্মের পথে চীনকে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি সরবরাহ ক'রবার যে ব্যবস্থা ছিল, তার মূলোচ্ছেদ ক'রবার শক্তি ইংরেজের হাতেই ছিল এবং যতদিন সে পন্থা রোধ করা জাপানের পক্ষে সম্ভব না হ'ত, ততদিন চিয়াংকাইশেক তথা চীন-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করা জাপানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ জাপান বর্ত্তমানে প্রাচ্যশক্তির প্রতীক এবং ইংলণ্ডের মহাযুদ্ধে লিপ্ত থাকার সুযোগ গ্রহণ ক'রে জাপানের পক্ষে অনেককিছু গোলযোগ বাধিয়ে তুলবার সম্ভাবনা আছে। এই সব নানাদিক ভেবে ইংরেজ জাপানের সঙ্গে এ বিষয়ের একটা রফা ক'রতে স্বীকৃত হয়েছে বলে জানা গেছে। ব্রহ্মের পথে চীনকে আর কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসাদি সরবরাহ করা হবে না বা সে বিষয়ে রীতিমত প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে ব'লে ইংরেজ জাপানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জাপানও তার লোকজন মোতায়েম রেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বার বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে—যাতে ক'রে এই চুক্তি অনুযায়ী কাজ হ'চ্ছে কিনা, সেটা লক্ষ্য করা যায়। এই ইঙ্গ-জাপ চুক্তির অন্যান্য সর্ত্তাদি সম্পর্কে এখনো বিশেষ কিছু জানা যায় নি। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে আবার জানা গেল যে জাপ সরকার হঠাৎ কয়েকজন ইংরেজকে গ্রেপ্তার ক'রেছে ও তাদের মধ্যে কয়েক জনকে আবার মুক্তিও দিয়েছে।

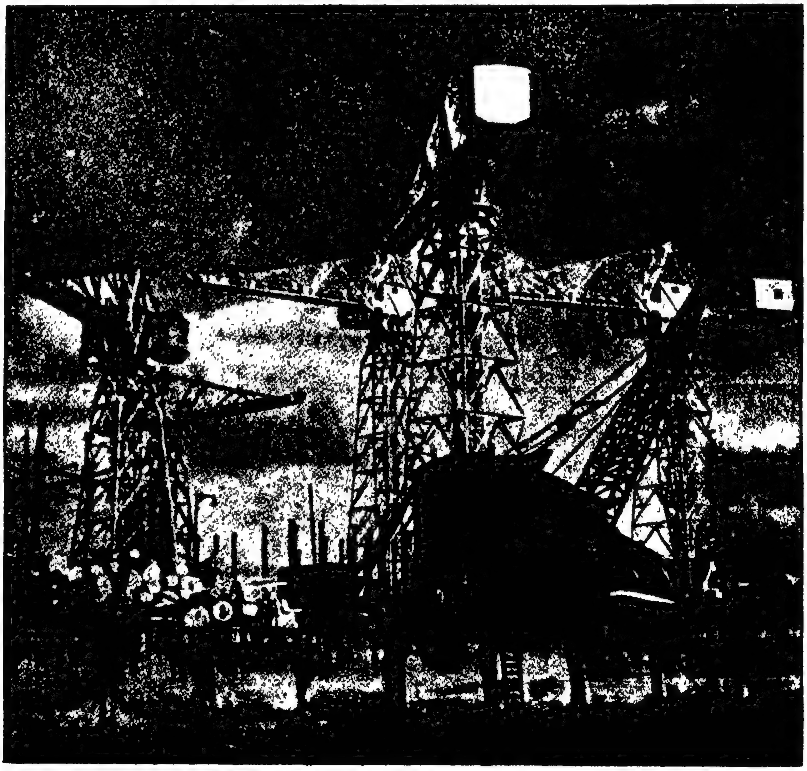

প্রেক্ষাগার ও যন্ত্রনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র

সে কথা এখন থাক্। নরওয়ে, হলাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে জার্ম্মাণী যে তৎপরতা ও রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছিল ইংলণ্ডের বেলায় ঠিক সেই তৎপরতা দেখাতে পারে নি। হিট্‌লার পর পর শুধু হুমকি দিয়েই চলেছে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইংলণ্ড আক্রমণের ব্যাপারে বেশ বুঝা যায় যে, ফ্রান্স পর্য্যন্ত যে অপ্রতিহত শক্তিতে অগ্রসর হ'য়ে

জার্ম্মাণী সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত ক'রেছিল, ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে সে শক্তি অনেক বেশী শৈত্য লাভ ক'রেছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদে অবশ্য জানা গেছে যে জার্ম্মাণী উত্তর সাগর ও ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য ও তৎসহ রণপোতাদির সমাবেশ ক'রেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তারা ইংলণ্ড আক্রমণে অগ্রসর হ'তে পারে নি। তবে ইংলিশ চ্যানেল ও উত্তর সাগরে নৌ-শক্তি ও বিমান শক্তির একটা ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। জার্ম্মাণ-বাহিনী ইংলণ্ড আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হ'লেই এই প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা তথা সম্মুখ সমর আরম্ভ হবে। নৌশক্তিতে যে ইংরেজরা জার্ম্মাণদের চেয়ে বেশী ক্ষমতাপন্ন সে কথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য জার্ম্মাণীর বৈমানিক শক্তি বোধহয় এখন ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী। তা হোক্, বেশী দিন ধ'রে লড়াই ক'রতে হ'লে জার্ম্মাণী বৈমানিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিমান হ'য়েও বিশেষ কোন সুফল অর্জ্জন ক'রতে পারবে না। কারণ, যুদ্ধ মিট্‌তে যতই দেরী হবে ততই পারস্পরিক আমদানি রোধের চেষ্টা প্রবলতর হ'য়ে উঠবে। তাতে ইংলণ্ড অপেক্ষা জার্ম্মাণীর বেশী বিব্রত হ'য়ে পড়বার কথা; অন্ততঃ পেট্রল আমদানির ব্যাপারে। রুমানিয়া থেকে জার্ম্মাণীর যে পেট্রল পাবার কথা তার ওপর নির্ভর ক'রে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধ চল্‌বে না।

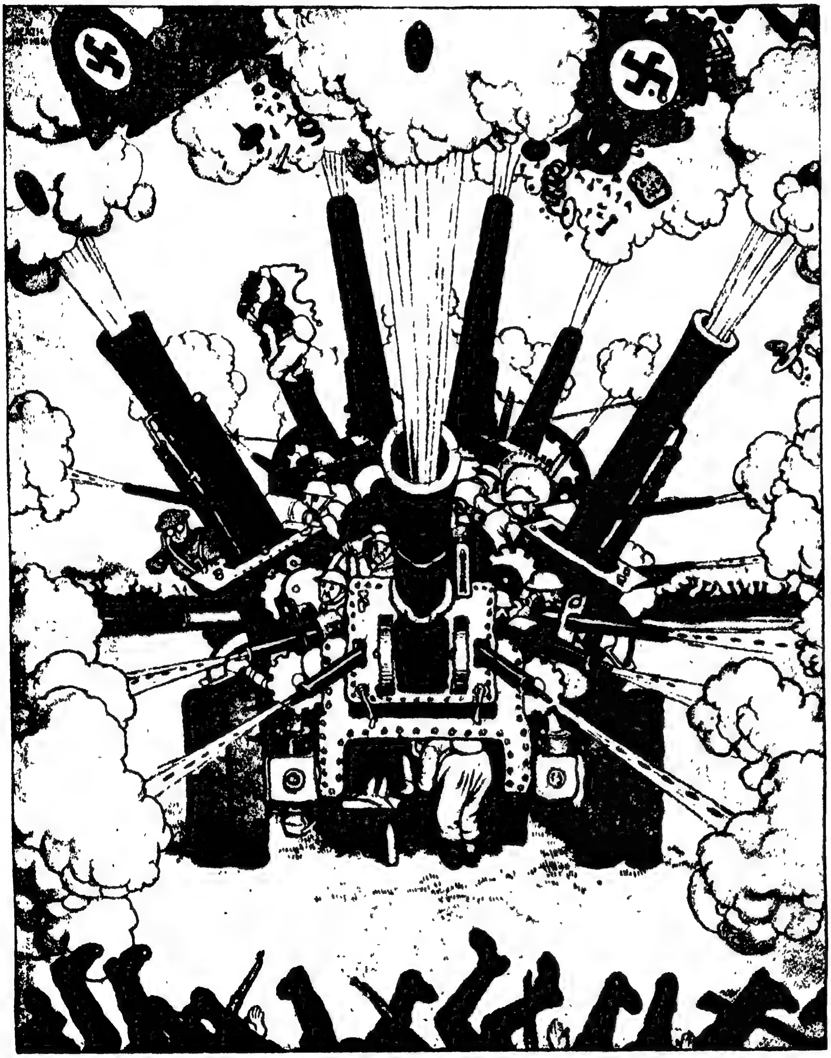

ব্রিটিশ সেনা বিভাগের কোন সৈনিক-শিল্পী পরিকল্পিত 'হিটোমিসলার' কামানের চিত্র। সৈনিক শিল্পীর মানসিক অবস্থাও এই চিত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে

জয় পরাজয়ের দিক থেকে এ যুদ্ধের পরিণামফল যাই হোক, সমগ্র পৃথিবীর বুকে দানবের ধ্বংসলীলার মূর্ত্তিতে এই যে মহাসমরের আগুন জলে উঠেছে তাতে পৃথিবীর অকল্যাণ এবং শান্তি নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মানবতার দিক থেকে এই ক্ষতির সীমা নেই। মানুষ যখনই প্রচণ্ড লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে অন্যের ধনসম্পদ ও সাম্রাজ্য গ্রাস ক'রতে চায়, তখন এই ক্ষতির দিকে দৃক্‌পাত ক'রবার মনোবৃত্তি তার থাকে না। কিন্তু যে পশুশক্তিতে বলীয়ান হ'য়ে মানুষ করে সংগ্রাম, সেই পশুশক্তির বর্ত্তিকাও একদিন ক্ষীণ হ'য়ে আসে। একথা আজ বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সমৃদ্ধিতে য়ুরোপ বিস্মৃত হ'য়েছে।

অবশ্য আর্য্যপন্থী হিট্‌লার তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় ইত্যবসরে একবার মানবতার দোহাই দিয়ে বেশ কায়েমি একটা ‘গৈবী’ চাল দিয়েছেন। তিনি নাকি শান্তিকামী এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অকারণ লোকক্ষয়, নরহত্যা ও নরবলি ইত্যাদি তাঁর কাছে অত্যন্ত অনভিপ্রেত ব্যাপার এবং তিনি তাতে পরাঙ্মুখ। তবে ইংলণ্ড এখন আর ফুয়ারহারের কথা অত সহজভাবে গ্রহণ ক’রতে বা বিশ্বাস ক’রতে রাজী নয়। হিট্‌লারের মতলব ছিল, এই ‘গৈবী চালে’ ভাল রকম একটা কিস্তি দেওয়া, যাতে দাবা ও বোড়ের মধ্যে বেশ একটা মতবিরোধের সৃষ্টি হ’য়ে শেষ পর্য্যন্ত ‘মাতের’ পথে এগিয়ে আসে। কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সে জিনিষটা ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ক’রে দিয়েছেন। ইংলণ্ড তার কর্ম্মপন্থা স্থির ক’রেই রেখেছে এবং তা’ থেকে একটুও বিচলিত হবে না।

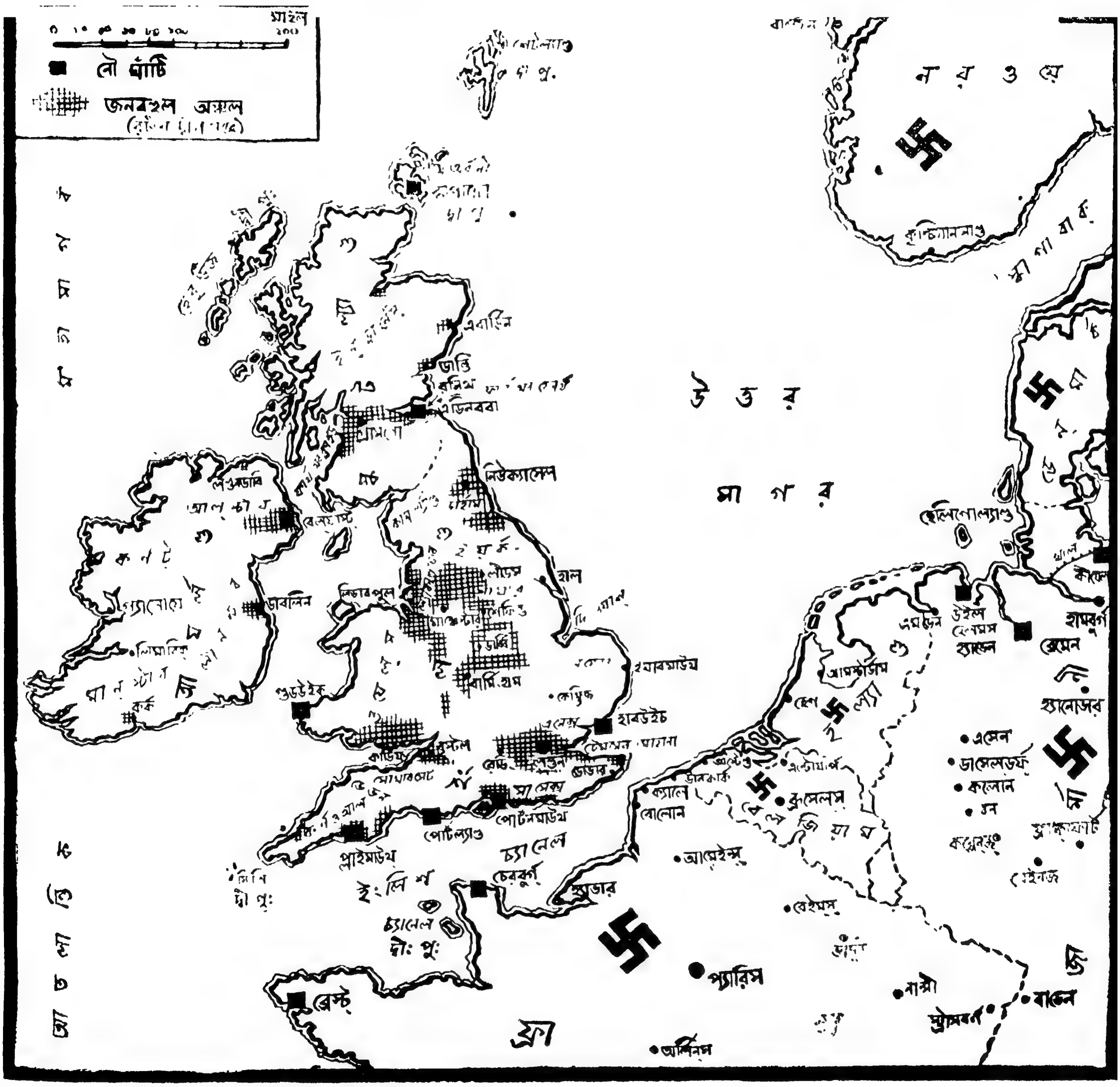
মাইল
নৌ ঘাঁটি
জনবহুল অঞ্চল
ন র ও য়ে
উ ত্ত র
সা গ র
এবার্ডিন
ডান্ডি
রসিথ
এডিনবরা
গ্লাসগো
নিউক্যাসেল
লণ্ডনডারি
আল্‌ স্টা র
বেলফাস্ট
ক ন ট
গ্যালোয়ে
ডাবলিন
লিমারিক
মা ন স্টা র
কর্ক
লিভারপুল
লীডস
হাল
বার্মিংহাম
ইয়ারমাউথ
কেম্ব্রিজ
হারউইচ
লণ্ডন
ডোভার
পোর্টসমাউথ
পোর্টল্যাণ্ড
প্লাইমাউথ
ইং লি শ
চ্যানেল
চ্যানেল দ্বীঃ পুঃ
চেরবুর্গ
ব্রেস্ট
ফ্রা
প্যারিস
আমিয়েন্স
ক্যালে
বোলোন
ডানকার্ক
ব্রুসেলস
বে ল জি য়া ম
এন্টোয়ার্প
আমস্টার্ডাম
হেগ
হেলিগোল্যাণ্ড
উইল্‌হেলমস্‌হ্যাভেন
ব্রেমেন
হামবুর্গ
হ্যানোভর
এসেন
ডাসেলডর্ফ
কলোন
বন
কব্লেনজ
ফ্রাঙ্কফোর্ট
রেইমস
নান্সী
স্ট্রাসবুর্গ
বাডেন
অর্লিন্স
ক্রিস্টিয়ানস্যাণ্ড

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীব্যোমকেশ কোঙার

বর্ত্তমান যুগে যে সকল মহাপুরুষ ভারতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বিদেশীয় রীতিনীতিসমূহের মোহমুক্ত করিয়া আর্য্য ঋষিদের সুমহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাদের অন্যতম।

শান্তিপুরের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবংশে ৺আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের পুত্ররূপে ১২৪৮ সালের পবিত্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে বিজয়কৃষ্ণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভাগবতশাস্ত্রে আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল। গৃহবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের পূজা-অর্চ্চনা তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শুচিতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। বিজয়কৃষ্ণের মাতা স্বর্ণময়ী দেবীও কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশিষ্ট গুণের অধিকারিণী ছিলেন। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দীনদুঃখীর অভাব মোচনে তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। অনেক সময়ে আহার্য্যবস্তু অপরকে দান করিয়া পরিবারবর্গকে উপবাসী রাখিতেন। দরিদ্রগণকে বস্ত্রদান করিয়া তিনি স্বয়ং ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিতেন।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার চরিত্রের মূল উপাদানগুলি পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তরুণ বয়সেই একটা প্রবল ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল। শৈশবে তিনি অতি সহজ ও সরলভাবে ভগবানে বিশ্বাস করিতেন। জীবে দয়া বিজয়কৃষ্ণের স্বভাবগত ধর্ম্ম ছিল। তাঁহার এই দয়াপ্রবৃত্তি উত্তরকালে এত প্রবল হইয়াছিল যে তিনি নির্ব্বিচারে সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেন। কাহারও দুঃখকষ্ট দেখিলে বিজয়কৃষ্ণের হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত। বাল্যকালে একটি শরবিদ্ধ পক্ষীকে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর দেখিয়া তিনি মর্ম্মভেদী ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

ভগবানে অটুট বিশ্বাস বাল্যকাল হইতেই বিজয়কৃষ্ণকে নির্ভীক করিয়া তুলিয়াছিল। ভগবানকে তাঁহার আশ্রয়স্থল বলিয়া প্রথম হইতেই ভাবিতে শিখিয়াছিলেন এবং সকল অবস্থায় ভগবানকেই তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সে জন্য কিছুতেই তিনি ভয় করিতেন না। বিজয়কৃষ্ণের নির্ভীকতার বহুবিধ দৃষ্টান্ত তাঁহার বাল্যজীবনে লক্ষিত হইয়াছিল।

তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভগবৎ বিশ্বাস যেমন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক করিয়াছিল, তাঁহার নির্ভীকতা তেমনি তাঁহাকে সত্যনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। যে কোন কিছুতেই ভয় করে না, তাহার পক্ষে মিথ্যা আচরণের প্রলোভন থাকে না। মিথ্যাকে বিজয়কৃষ্ণ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিপদ আপদ তুচ্ছ করিয়াও সত্যের বাণী প্রচার করিতেন। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবন মিথ্যাকে পরিহার করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক সমুজ্জ্বল ইতিহাস।

বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণ প্রথমতঃ শান্তিপুরের ভগবানগুরুর পাঠশালায় এবং তৎপরে হেজেল সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। হেজেল সাহেবের স্কুলে তিনি অধিক বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর শান্তিপুরের কোন চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। গুরুগিরি ব্যবসায় বজায় রাখিবার জন্য অল্পবয়স হইতেই বিজয়কৃষ্ণকে পৈতৃক শিষ্যদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। শিষ্যবাড়ী হইতে তিনি যে বৃত্তি পাইতেন, তাহাতেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিজয়কৃষ্ণ স্বয়ং কাহাকেও কৌলিক দীক্ষা প্রদান না করিলেও শিষ্যবাড়ী যাইয়া গুরুপুত্ররূপে লৌকিকভাবে তাঁহাকে সকলের সেবা গ্রহণ করিতে হইত। রঙ্গপুর জেলার কোন শিষ্যবাড়ীতে একটি বর্ষিয়সী মহিলা বিজয়কৃষ্ণের পাদপূজা করিয়া সংসারসাগর হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করেন। মহিলাকে এই ভাবে পাদপূজা ও প্রার্থনা করিতে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তরে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইল।

বিজয়কৃষ্ণ ভাবিলেন, তিনি নিজে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইবেন তাহারই নিশ্চয়তা নাই, অপরকে উদ্ধার করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? শিষ্যগৃহে যাইয়া সকলের পূজা

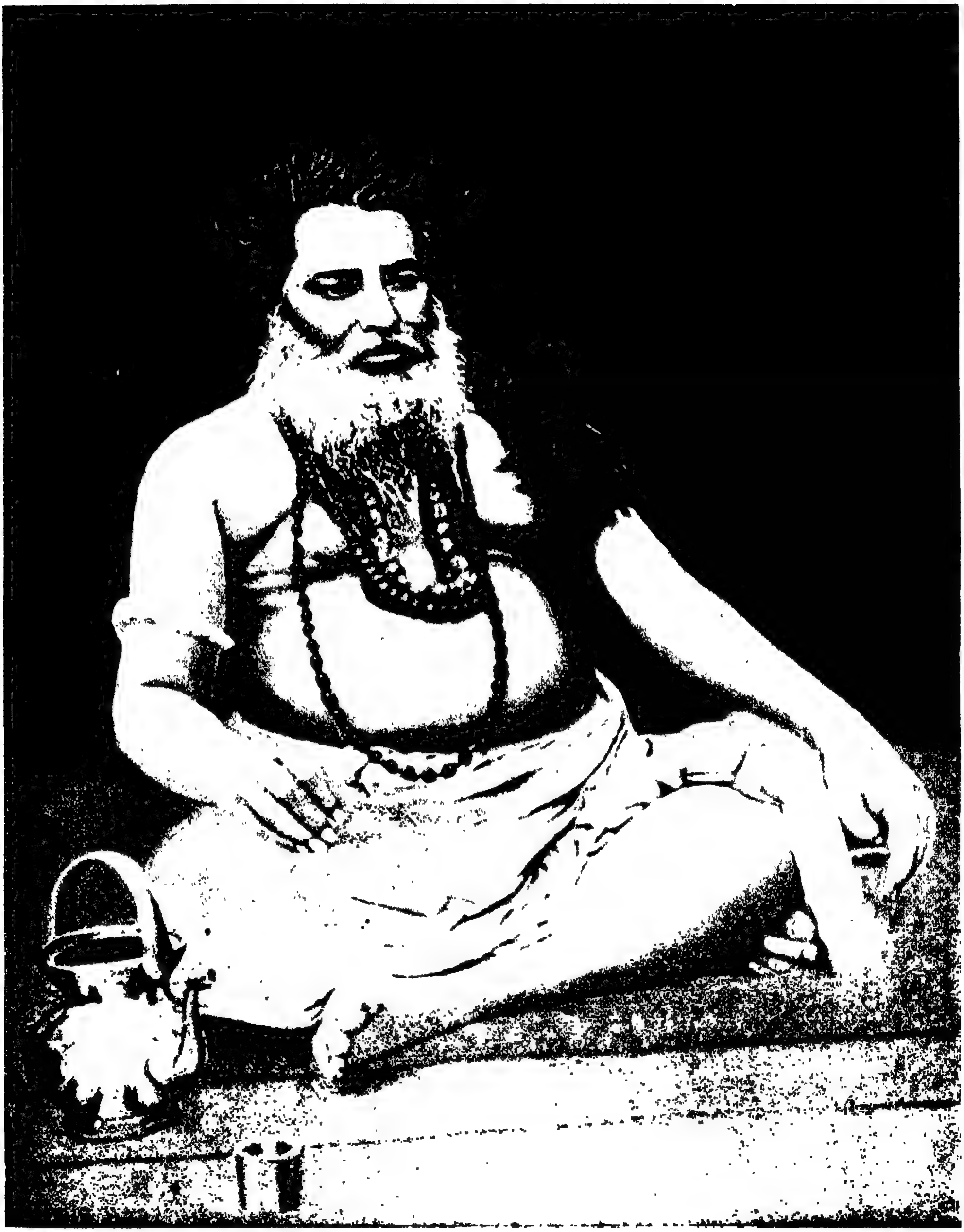

জন্ম—১৯শে শ্রাবণ ১২৪৮ সাল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। মৃত্যু—২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল

গ্রহণ করিয়া তিনি অসত্য ব্যবহার করিতেছেন, এই প্রকার বিচার তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সত্যের পূজারী বিজয়কৃষ্ণ শিষ্যবাড়ী যাওয়া পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার আত্মচৈতন্যের উদয় হয় এবং মুক্তিলাভের জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠেন। হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা মুক্তির সন্ধান পাইবেন ভাবিয়া সপ্তদশবর্ষ বয়সে টোল পরিত্যাগ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় গমন করেন এবং সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত বিভাগে প্রবেশ করেন। জননীর আদেশে অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দহকুলনিবাসী ৺রামচন্দ্র ভাদুড়ী মহাশয়ের ষষ্ঠবর্ষীয়া কন্যা যোগমায়া দেবীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের উপর বিজয়কৃষ্ণের পুরুষানুগত বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গেল এবং তিনি 'অহং ব্রহ্ম' এই অভিমানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। জীবই যখন ব্রহ্ম, তখন কে কাহার পূজা করিবে? কিছুদিন পূর্ব্বেও যে বিজয়কৃষ্ণ নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, দেবার্চ্চনায় যিনি নিরতিশয় আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন, সেই বিজয়কৃষ্ণ এখন সমুদয় পূজা-অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিলেন।

বেদান্ত পাঠ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ পুঁথিগত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, কিন্তু পথের সন্ধান পাইলেন না। তাঁহার বেদান্তজ্ঞান প্রাচীনের আশ্রয় ভাঙ্গিয়া ফেলিল, অথচ কোন নূতন আশ্রয়ের সন্ধান দিতে পারিল না। বিজয়কৃষ্ণ অত্যন্ত অধীর হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জনৈক চিকিৎসাব্যবসায়ীকে কোন দরিদ্র রোগীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। জনসেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া মনের আবেগে বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন।

বগুড়ানিবাসী কয়েকজন সাধুপ্রকৃতির ব্রাহ্মবন্ধুর অনুরোধে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে বিজয়কৃষ্ণ একদিন ব্রাহ্মমন্দিরে গমন করেন। সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী ধর্ম্ম-উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ হয়। এই সময় হইতে প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। মেডিক্যাল কলেজে পাঠকালে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। বেদান্তপাঠ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ হিন্দুয়ানী বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে উদার মতবাদ তিনি মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল হইবে এই প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ স্বীকার করেন না বলিয়া জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া তিনি অসত্য আচরণ করিতেছেন—সর্ব্বক্ষণ এইপ্রকার উদ্বেগভোগ করিতে থাকায় বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের কিছুদিন পরেই যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করেন।

উপবীতত্যাগের পর বিজয়কৃষ্ণ যখন প্রথম শান্তিপুরে গমন করেন, তখন তাঁহার উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। শান্তিপুরের ব্রাহ্মগণ উপবীত ধারণ করিতেন বলিয়া বিজয়কৃষ্ণের বাড়াবাড়ি তাঁহারাও সমর্থন করিতে পারেন নাই। অতএব হিন্দু ও ব্রাহ্ম সকলে মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণের পক্ষে পথচলা দুরূহ হইল। পথে বাহির হইলেই কেহ গালি দিত, কেহ ইট পাথর ছুঁড়িত, কেহ ধূলি নিক্ষেপ করিত, কেহ বা পাগল বলিয়া গায়ে থু থু দিত। কতলোক তাঁহার কত নিন্দা অপযশ ঘোষণা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দিবার জন্য আমার গায়ে রাবগুড় লেপিয়া বোলতা লাগাইয়া দিয়াছিল।" অসাধারণ ধৈর্য্যসহকারে বিজয়কৃষ্ণ এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"সত্য আমার দিকেই আছে। আমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হই নাই। আর এই সত্য জয়যুক্ত হইবেই।"

মেডিক্যাল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে প্রায় তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করার পর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের কোন অন্যায় আচরণে বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মবুদ্ধি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সহপাঠীগণকে লইয়া তিনি ধর্ম্মঘট করেন এবং পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যাইয়া সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যায়, কিন্তু এইখানেই

বিজয়কৃষ্ণের ডাক্তারী শিক্ষার যবনিকাপাত হয়—শেষ পরীক্ষা দিবার কয়েকমাস পূর্ব্বেই তিনি কলেজ পরিত্যাগ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যহারা হন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তিনি তেমনি মুক্তি পথেরই পথিক ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে অবস্থান কালে দেবতাকে আশ্রয় করিয়া তিনি পথ চলিয়াছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একান্তভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর শরণাপন্ন হইলেন এবং তীব্র কঠোরতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী সাধন ভজন করিতে লাগিলেন।

মেডিক্যাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বিপুল উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখে পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। শব্দযোজনা করিয়া লোকচিত্তের উপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রাণের ভাবগুলি এমন সহজ ও আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিতেন যে তাঁহার আন্তরিকতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চারি পাচশত পর্য্যন্ত লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিত।

বিজয়কৃষ্ণের ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার সাধনের অঙ্গস্বরূপ ছিল। অপরকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে গিয়া সেই উপদেশ তিনি সর্ব্বাগ্রে নিজেকেই প্রচার করিতেন এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহা পালন করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই দুইয়ের সংযোগে যেমন জ্ঞানের পূর্ণতাসাধন হয়, বিজয়কৃষ্ণ তেমনি তাঁহার ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তিগত সাধন ও ধর্ম্মপ্রচার এই উভয়কেই আশ্রয় করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত মতভেদ হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্ষি অনেকটা প্রাচীন মনোভাবাপন্ন ছিলেন—এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেশবচন্দ্রের প্রগতিশীল দলের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়কৃষ্ণ বিপুল উৎসাহের সহিত দেশবিদেশ প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং প্রচার কার্য্যে তাঁহার উদ্দীপনা ও উন্মাদনা দর্শন করিয়া, কেশবচন্দ্র উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

অবশেষে কেশবচন্দ্রের সহিত বিজয়কৃষ্ণের বিরোধ বাধিল। কেশবচন্দ্রের কয়েকটি আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ স্বতন্ত্র একটি সমিতি গঠন করিলেন এবং ১২৮৫ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং তাহার আচার্য্য ও প্রচারক পদে ব্রতী হইলেন।

যেরূপ ত্যাগ ও দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। প্রচার বিভাগ হইতে কোনপ্রকার বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্যের প্রত্যাশা না হইয়া শুধু ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াই স্ত্রীপুত্রাদি সহ তিনি জীবনযাপন করিয়াছেন। যখন জুটিয়াছে খাইয়াছেন, নতুবা সপরিবারে উপবাস দিয়া দিন কাটাইয়াছেন। ভগবৎ নির্ভরতার যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিজয়কৃষ্ণ-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে, অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত এই আকাশবৃত্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

সুদীর্ঘকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া এবং বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত উপাসনা, ধ্যানধারণা, প্রচার-কার্য্যাদি করিয়াও বিজয়কৃষ্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার ও অশেষবিধ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া তিনি যে বস্তুর অন্বেষণ করিতেছিলেন, কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না। এই কারণে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি যে সুদৃঢ় বিশ্বাস লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল—গভীর নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্রব পরিত্যাগ না করিয়াও তিনি আপনাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিরবলম্ব হৃদয় গুরুর পায়ে লুটাইয়া আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। আকুল উন্মাদনায় অনাহারে অনিদ্রায় তিনি দুর্গম পাহাড়ে পর্ব্বতে বনে জঙ্গলে গুরুর অন্বেষণে ছুটিতে লাগিলেন।

অবশেষে ১২৯০ সালে মানসসরোবরনিবাসী ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী একদিন গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অপ্রত্যাশিত

ভাবে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত পরম বস্তু লাভ করিলেন—তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনা জয়যুক্ত হইল। কিছুদিন পরে অকস্মাৎ তাঁহার গুরুদেব পুনরায় তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন। তাঁহার আদেশে বিজয়কৃষ্ণ কাশীধামে গমনপূর্ব্বক হরিহরানন্দ স্বামীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নির্জ্জন পাহাড়ে পর্ব্বতে আরও কিছুকাল তীব্র সাধন ভজনে অতিবাহিত করিয়া আবার তিনি বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিদ্দেশক্রমে তিনি আশ্রয়প্রার্থী নরনারীকে যোগধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দজী ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মত পোষণ করিতেন। শা সাহেব নামক একজন মুসলমান ফকির তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার এই মুসলমান গুরুভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। ব্রহ্মানন্দজীর উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মতবাদ প্রচার না করিয়া গোস্বামী মহাশয় বিভিন্ন-পথাবলম্বী ধর্ম্মার্থিগণকে নিষ্ঠার সহিত আপনাপন আচার অনুষ্ঠান পালন করিতে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন! এরূপ অসাম্প্রদায়িকতার সমর্থন করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দুরূহ হইতেছে বুঝিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেন এবং ১২৯৫ সালে ঢাকার গেণ্ডেরিয়া অঞ্চলে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থান করেন।

দীক্ষাপ্রাপ্তির পর হইতে ক্রমশঃ বংশগত ভাবের বন্যা বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। করতালির শব্দে তিনি শিহরিয়া উঠিতেন, হরিনাম শুনিলেই প্রেমের উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত, মৃদঙ্গের ধ্বনি শুনিয়া তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করিতেন।

গুরুর আদেশক্রমে ১২৯৬ সালে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া বিজয়কৃষ্ণ একবৎসর কাল তথায় বাস করেন। ১৩০০ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় গমন করিয়া তিনি গঙ্গাযমুনার সঙ্গম স্থলের নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ চড়ায় সাধুদের মধ্যে একমাস কাল অবস্থিতি করেন। এখানে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসীগণ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষরূপে তাঁহার মর্য্যাদা প্রদান করেন। ১৩০৪ সালে বিজয়কৃষ্ণ পুরীধামে গমন করেন।

এই সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির আদেশে পুরীধামে ব্যাপকভাবে বানর বধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। পুরুষোত্তমক্ষেত্র হিংসার লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের অন্তর কাঁদিয়া উঠে এবং এই অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র আন্দোলন করেন। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে মিউনিসিপ্যালিটি বানর বধের আদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত এখানকার আরও কয়েকটি কুপ্রথা তাঁহার চেষ্টায় নিবারিত হয়।

পুরীধামে অবস্থান কালে বিজয়কৃষ্ণের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হয় এবং ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে ৫৮ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তর প্রান্তে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করিয়া তাঁহার ভক্তগণ সমাধির উপর অতি সুন্দর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

হিন্দু এবং ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ই গোস্বামী মহাশয়কে আপনাপন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। হিন্দু বলেন, বিজয়কৃষ্ণ ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলেন, পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া আবার হিন্দুধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন; আর ব্রাহ্ম বলেন, হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ বিজয়কৃষ্ণ কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না; তিনি ছিলেন সকল ধর্ম্মের, সকল জাতির—তিনি ছিলেন বিশ্বজনীন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম এমন সাম্প্রদায়িকতাবর্জ্জিত ছিল যে শুধু হিন্দু বা শুধু ব্রাহ্ম নয়, মুসলমান এমন কি ক্রীশ্চানও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিতেন "শিবের ত্রিশূল, মহম্মদের অর্দ্ধচন্দ্র এবং যীশুখৃষ্টের ক্রশ --এই তিন নিয়ে ওঁকার রচিত হয়েছে।"

কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদারনৈতিক মত পোষণ করিলেও গোস্বামী মহাশয় সমস্ত ধর্ম্মকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া এক করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দু, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, মুসলমান, ক্রীশ্চান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ সনাতন ধর্ম্মের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া পুষ্ট হউক এবং আপনাপন রীতি নীতি আচার ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নির্ব্বিবাদে গন্তব্য পথে অগ্রসর হউক, ইহাই ছিল বিজয়কৃষ্ণের উপদেশ। কেহ উচ্চ বা কেহ তুচ্ছ নয়—সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই এক একটা সার্থকতা আছে। বিভিন্ন ধর্ম্ম আপনাপন বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিলে সনাতন ধর্ম্মের, তথা শাখাধর্ম্মগুলিরও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। স্বধর্ম্ম বা স্বজাতির আচার অনুষ্ঠান বিসর্জ্জন দিয়া বিজাতীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করিলে তাহা অস্বাস্থ্যকর, এমন কি মারাত্মক হইয়া উঠে।

সাময়িকী

দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি-সভা—

নদীয়া সম্মিলনের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার আর্য্যসমাজ হলে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মৃতি-সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় নদীয়া সম্মিলনীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় মহাশয়কে এই অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, পরলোকগত কবির যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশের যোগ্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করুন এবং যাহাতে স্থায়ীভাবে কবির যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা, হয় তাঁহার জন্ম-ভিটায়—না হয় ত কোন যোগ্যতর স্থানে---করা হোক। এই উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করিতে বাঙ্গালার সকল নরনারীকে সহযোগিতা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। বাঙ্গলার জাতীয় জাগরণে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশসঙ্গীত ও নাটকগুলি কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী তাহার জাতীয় কবির যথাযোগ্য স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থায় কার্পণ্য করিবে না।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী—

উনপঞ্চাশ বৎসর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগমন করেন। সম্প্রতি কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীতে যে কয়জন মণীষী বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, অপর দিকে খাঁটি ইংরেজের মন লইয়া তিনি সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি সমাজের ভিতর থাকিয়াই সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন এবং তাঁহার সে উদ্যম—যতই দিন যাইতেছে—সাফল্যের পথে আগুয়ান হইতেছে। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ বিমোচন চেষ্টা তাঁহার জীবনের একটা প্রধান দান। তিনি বাঙ্গালা ভাষার সে যুগে ভাষার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বাঙ্গালীজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রচলনে কি চেষ্টাই না তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে একদিকে যেমন নারীসুলভ কোমলতা ছিল, অপর দিকে পৌরুষও ছিল তাঁহার দুর্জ্জয়। আজ জাতির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরাও তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করিতেছি। এবার বিদ্যাসাগর স্মৃতিপূজা উপলক্ষে বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণ যে বিজ্ঞান প্রদর্শনী করিয়াছিলেন, তাহা দর্শকমাত্রকেই সন্তোষ দান করিয়াছে। এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ হয়।

মহিলা-কবির জয়ন্তী—

প্রসিদ্ধ মহিলা-কবি শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়ার জয়ন্তী-উৎসব বাঙ্গলা দেশে একটি বিশেষ স্মরণীয় অনুষ্ঠান। খুলনায় যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহারা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালীর পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও যে সকল মহিলা বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন শ্রীযুক্তা মানকুমারী তাঁহাদের মধ্যে একজন। জীবনে বহু আঘাত পাইয়াও তিনি সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন আজ পরিণত জীবনে তাহা সাফল্যলাভ করিয়াছে। একদিন যে সঙ্কোচের সহিত তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সেদিনে তাঁহার সঙ্গিনীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কিন্তু আজ বাঙ্গলায় বহু লেখিকাই প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন। আমরাও কবিকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাকমাশুলের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব—

সরকার পক্ষ হইতে ডাকমাশুলের মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী হৈমন্তিক অধিবেশনে পেশ করা হইবে। লড়াইয়ের জন্য সরকারী

লের আয় বৃদ্ধি করাই যদি প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হইত, হইলে আমরা বলিতাম সরকারের আশা সফল হইবার না খুব অল্প। কেন না, ডাকমাশুলের বর্ত্তমান হারই অতিরিক্ত এবং সেই কারণে চিঠিপত্র লেখা সম্বন্ধে াধারণ ইতিমধ্যেই ব্যয়সংক্ষেপে বাধ্য হইয়াছে। ইহার যদি মূল্য আরও বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে ডাকটিকি- ব্যবহার যে আরও কমিবে তাহাতে আমাদের াত্র সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, আয়বৃদ্ধি তে হইলে জিনিষের মূল্য কমাইলেই উদ্দেশ্য সফল বেশী।

ল্পোন্নতির পরিকল্পনা—

ন্ধের জন্য ভারতের শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা স্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানি বন্ধ য় ও আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় অনেক দের বিশেষ অসুবিধা ঘটিতেছে। ঐ সকল দ্রব্য ভারতে ত করিতে পারিলে একদিক দিয়া যেমন দেশে নূতন ন শিল্প গড়িয়া উঠিবে, অপর পক্ষে তেমনই বর্ত্তমানে তারা যে অসুবিধা বোধ করিতেছেন তাহাও দূর হইবে। রের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বোর্ড বর্ত্তমানে দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বাঙ্গালার আলীপুর ও ঙ্গের গবেষণাগার এবং কলিকাতা, বোম্বাই, লাহোর ও াজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য ষণা আরম্ভ করা হইবে। বোর্ডের হেড কোয়ার্টার লীপুরে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, উদ্ভিজ্জ তৈল, প্লাস্টিক ও রিক সার সম্পর্কে গবেষণা করা হইবে। বাঙ্গালোরের ষণাগারে ঔষধপত্র, কেমিক্যাল এবং গ্রাফিক ইলেক্ট্রোড র্কে গবেষণা হইবে। বস্ত্রশিল্প এবং উদ্ভিজ্জ তৈল র্কে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলিবে। গুড় ও ত্রাদি সম্পর্কে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গুড়, স্টিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কলিকাতা বিদ্যালয়ে গবেষণা সুরু করা হইবে। বনবিভাগের ষণাগার এবং কটন টেক্নলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট ই কৃত্রিম রেশম ও সংবাদপত্রের কাগজ তৈরির চেষ্টা তেছে। এই সকল বিষয়ে গবেষণা ছাড়া ভারতীয় র সরবরাহ বিভাগ গ্যাস-মুখোসের জন্য কার্বন, যান্ত্রিক বাহিনীর জন্য কলকব্জায় ব্যবহারের উপযোগী তৈল, গোলাবারুদের উপাদান এবং আরও কয়েকটি মূল রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তার কথা জানাইয়াছে। এ সম্পর্কে আলীপুরে একজন বিশেষজ্ঞ কর্মচারীর নিয়োগও হইয়াছে। ইহাদের গবেষণা সফল হইলে এদেশের শিল্প-পতি ও পুঁজি-পতিরা একযোগে উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারিবেন।

ছাত্র ও পুলিশ—

গত ১৯শে জুলাই এক বিশেষ আদেশ জারী করিয়া বাঙ্গালা সরকার সরকারী বা বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পক্ষে ধর্ম্মঘট বা ঐ রকম কোন বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এই আদেশের প্রতিবাদে কলিকাতার ছাত্রেরা ২২শে জুলাই স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া শোভাযাত্রা করিয়া ইসলামিয়া কলেজে যায়; সেখানে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের সভাপতি মিঃ ওয়াসেকের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। এই সময় বাহির হইতে অন্য ছাত্রেরা আসিয়া সভায় যোগ দিতে চাহে। পুলিশ প্রথমে বাধা দিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দেয়। পরে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার গুর্খা পল্টন লইয়া ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ঢোকেন এবং ছাত্রদের চলিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু ছাত্রেরা চলিয়া যাইতে রাজী না হওয়ায় পুলিশ লাঠি চালায়। ফলে আঠার-উনিশ জন হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র আহত হইয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ একসঙ্গে প্রহৃত হওয়ায় বাঙ্গালা সরকার বড় গোলমালে পড়িয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এক বিবৃতিতে মুসলমান ছাত্রদের প্রতি পুলিশের আচরণে মৌখিক দুঃখ জানাইয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে অবিলম্বে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিবেন। কমিটি হয়ত নিযুক্ত হইবে কিন্তু কমিটির রিপোর্ট যদি সরকারের অনুকূল না হয় তাহা হইলেও অপরাধীর যোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা হইবে কি? ভবিষ্যতে শিক্ষায়তনের পবিত্রতা যাহাতে এইভাবে কলুষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

সংস্কৃত পাঠাগারের রজত জয়ন্তী—

গত ১৮ই জুলাই নবদ্বীপ সপ্তম এডোয়ার্ড এংলো সংস্কৃত পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় ঐ উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার লিখিত বিবরণে নবদ্বীপের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মফঃস্বলে এরূপ সুবৃহৎ লাইব্রেরীর সংখ্যা অধিক নহে। নবদ্বীপ যে এককালে জ্ঞান-চর্চ্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা এই পাঠাগার দেখিলেই বুঝা যায়। যাঁহাদের উদ্যোগে ও চেষ্টায় নবদ্বীপের মত স্থানে এই পাঠাগারের উদ্ভব ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা দেশবাসী সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

হল্‌ওয়েল স্মৃতি স্তম্ভের অপসারণ—

হল্‌ওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত করার যে সিদ্ধান্ত বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ফজলল হক্ সাহেব প্রচার করিয়াছিলেন, শোনা গেল ইতিমধ্যে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভটি একেবারে নষ্ট করা হইবে না, তবে প্রকাশ্য রাজপথের সহস্র সহস্র লোকচক্ষুর আড়ালে কোন এক গীর্জ্জার নির্জ্জন কোনেই নাকি স্থাপিত হইবে।

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউট—

ডক্টর দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। ডক্টর ভাণ্ডারকর ইণ্ডিয়া রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউট নামক গবেষণা মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান কালচার' নামক ইংরাজি পত্রের অন্যতম সম্পাদক। ভাণ্ডারকর সাহেব তাঁহার বহুমূল্য গ্রন্থাগারটি ইনিষ্টিটিউটকে দান করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনিষ্টিটিউট ভাণ্ডারকর সাহেবকে 'আচার্য্য পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থ' উপহার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে পৃথিবীর বিশিষ্ট মণীষীবর্গের রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইনিষ্টিটিউট ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ায় তাহার পরিচালকবর্গকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা—

শুনা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা সরকারের গ্রাম্য স্বাস্থ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য বাঙ্গালার সাতটি মহকুমায় অবিলম্বে কার্য্য সুরু করা হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, বিদ্যালয় যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কার্য্যে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার আয়োজন হইয়াছে। এই ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ড লইয়া একটি গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এরূপ কয়েকটি কেন্দ্র লইয়া একটি প্রধান এবং দুইটি অধীনস্থ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। এই কল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে সরকার পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সমগ্র প্রদেশে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলে বাঙ্গালার হৃত স্বাস্থ্য পুনরুজ্জীবিত হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহা হইবে কি?

বাল্টিকে সোভিয়েট—

সম্প্রতি সোভিয়েটের রাজ্যসীমা আরও বিস্তৃত হইয়াছে। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার নবনির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের সদস্যরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে কমিউনিষ্ট গণতন্ত্র নিজ নিজ রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করেন এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইতে চাহেন। বাল্টিকদেশের জনগণ সানন্দে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন জ্ঞাপন করে। বাল্টিক জমিদারদের, বিশেষত জর্মান জমিদারদের এতদিনের স্বেচ্ছাতন্ত্র গণশক্তির কাছে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সবার চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে এতবড় একটা সমাজবিপ্লব বিনা রক্তপাতে সম্ভব হইল। বাল্টিক সোভিয়েটীকৃত হওয়ায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি হইল ষাট হাজার বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা বাড়িল ষাট লক্ষ।

নমস্কার ও আদাব—

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তনে বি. এ উপাধি গ্রহণ করিবার সময় চান্সেলর ও ভাইসচান্সেলরকে অভিবাদন করিবার অসুবিধা ঘটে, এই সম্পর্কে জনকয়েক মুসলমান

গ্রাজুয়েট ছাত্র আপত্তি তোলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ একটি সভায় স্থির করিয়াছেন, নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী নমস্কার ও আদাব—এই দুই শব্দ ব্যবহার করিয়া ছাত্রগণ অভিবাদন জানাইবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দুই সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রও আছে, তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা হইবে ?

প্যারিসে বেলজিয়ামের মন্ত্রীবর্গ

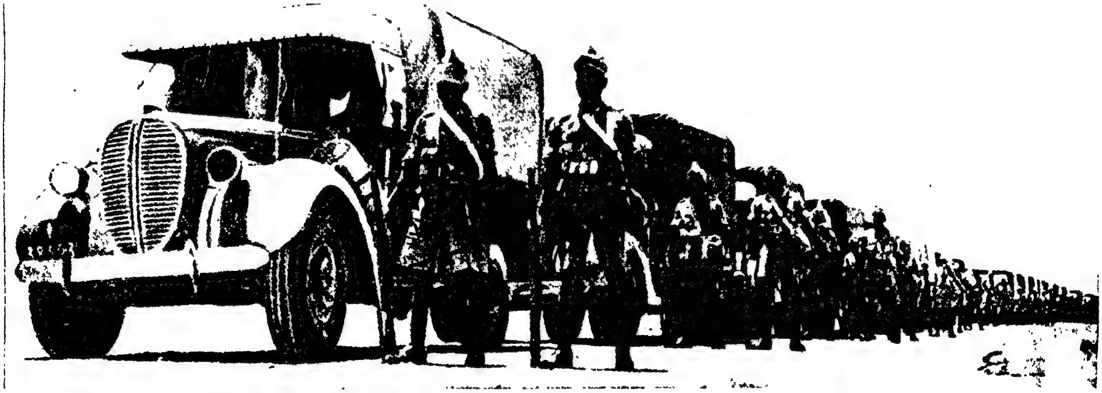

মিশরের মরুভূমির মধ্য দিয়া ভারতীয় সৈন্যগণের গমনের দৃশ্য

রুজভেল্ট ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক রুজভেল্ট সর্ব্বসম্মতিতে তৃতীয়বারের জন্য অধিনায়কের পদপ্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন। তৃতীয়বার অধিনায়ক নির্ব্বাচনে দাঁড়ান নিয়মবিরুদ্ধ; তাই প্রথমটায় দু-একজন আপত্তি করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারাও তাঁহাদের আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। রুজভেল্ট সম্প্রতি এক বক্তৃতায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাহারা ইউরোপীয় যুদ্ধে আমেরিকাকে জড়িত করিবেন না, তবে আমেরিকাকে কেহ আক্রমণ করিলে বা মন্‌রো নীতিতে হস্তক্ষেপ করিলে আমেরিকা যুদ্ধ করিবে। সাধারণভাবে তাঁহারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন এবং আইনানুযায়ী যতদূর সম্ভব গণতন্ত্রী দেশকে তাঁহারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

জাপানে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল—

জাপ সৈন্যবাহিনী নূতন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য চাপ দেওয়ায় জাপ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন! নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। যাঁহার ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের সংঘটন সম্ভব হইয়াছে সেই প্রিন্স কোনোয়ে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। শোনা যাইতেছে যে জাপানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে লোপ করিয়া দিয়া একরকম ফাসিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করাই প্রিন্স কোনোয়ের উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বেই জাপানে ট্রেড ইউনিয়ন উঠাইয়া দিয়া ফাসিস্ট ধরনে মালিক শ্রমিক পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। সুতরাং জাপানের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল নিরঙ্কুশ-ভাবেই শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তাহাতে পৃথিবীর একশ্রেণীর রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক সহানুভূতিও জাপানের উপর বর্ষিত হইবে।

যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করিবার জন্য নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডবাসীরা বিলাতে আসিয়াছে—স্কটল্যাণ্ডে তাহারা গাছ কাটিতেছে

বাঙ্গালা সরকার ও হরগঙ্গা কলেজ—

আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, বাঙ্গালা সরকার ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজকে বি-এ ক্লাশ খুলিবার অনুমতি দেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে সে অধিকার তাঁহাদের প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গালা সরকারের এই অদ্ভুত আচরণে যে কৈফিয়ৎ সরকার পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহা আরও অদ্ভুত।—ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবে এই আশঙ্কা! অথচ ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা বলিতে গেলে শহর ও শহরত পর্য্যন্ত; আমরা যতদূর অনুমান করিতে পারি তাহা এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অদূর ভবিষ্যতে হইবে না। কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ রকম গণ্ডীর বাহিরে গিয়া বাধা দেওয়া মনোবৃত্তিকে আমরা কোন মতেই সুস্থ বলিয়া মানিয়া লই পারিবনা। আর সরকারেরই বা এরকম অসঙ্গত আ মানিয়া লইবার কি কারণ থাকিতে পারে?

যুদ্ধ ও ঔষধ শিল্প—

ইউরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভা বিদেশ হইতে ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপা আসা প্রায় বন্ধ হইয়াছে, ফলে চিকিৎসা-জগতে অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহা আংশিক বিদূরীত ক আশায় এ দেশেই ঔষধপত্র ও আবশ্যক যন্ত্রপাতি তৈয়া চেষ্টা চলিতেছে। উদ্ভিজ, খনিজ এবং জান্তব উপা হইতে যে সমস্ত ঔষধ তৈয়ারি হয় তাহা এদেশে সম্ হইতে পারে। কাঁচ, রবার, ইস্পাত ইত্যাদির তৈয়ারিও অসম্ভব হইবে না। কিন্তু বিশুদ্ধতায় ও ক কারিতায় এই সকল ঔষধ ও যন্ত্রাদি যাহাতে দ্রব্যের তুল্য হয় এবং দামের দিক দিয়াও সস্তা হয় সে

দিল্লীতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

সিমলায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আনে

জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোই

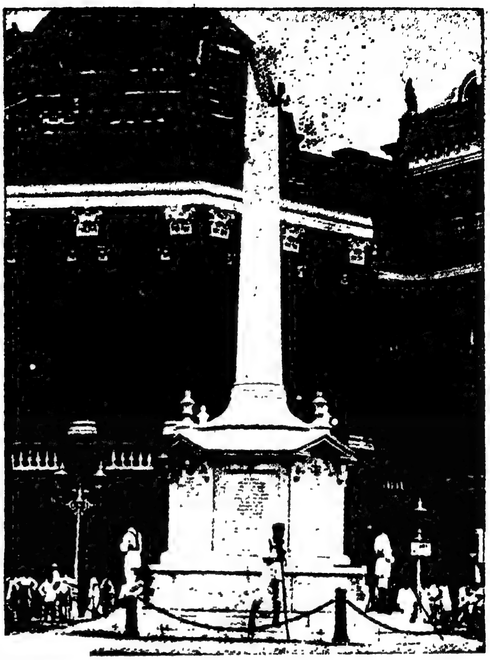

হলওয়েল মনুমেণ্ট

বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বাট হাওড়ার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত স্পেশাল কনেষ্টবল পরিদর্শন করিতেছেন

সকলের নজর রাখা উচিত। তাহা ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ হইতে আমদানি পেটেণ্ট ঔষধ-(আজকাল এগুলির প্রচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে) গুলি উৎপাদনের বা তাহাদের অনুরূপ ঔষধ প্রস্তুতেরও ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরলোকে ইলা দেবী—

আমরা জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম বাঁকুড়ার জেলা জজ শ্রীযুত সুধাংশুকুমার হালদার মহাশয়ের পত্নী সুলেখিকা ইলা দেবী মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীযুত নুটবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। ইলা দেবীর রচিত ‘যে ঘরে হল না খেলা’ ও ‘ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া’ পুস্তক দুইখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইয়াছিল। তিনি সুধাংশুবাবুর সহিত একযোগে ‘সপ্তক’ নামক একখানি গল্প পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে ইলা দেবী স্বামীর সহিত সমগ্র ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমরা তাঁহার স্বামী সুধাংশুকুমারকে ও একমাত্র সাত বৎসর বয়স্ক পুত্র দীপককে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইলা দেবী

পরলোকে শিল্পী সারদা উকীল—

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত যে নূতন শিল্পাদর্শ বাঙ্গালায় গড়িয়া ওঠে, সারদাচরণ প্রথম যৌবনেই তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি নিজস্ব পদ্ধতির সন্ধান পান এবং এই স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়া তিনি এদেশীয় ও বিদেশীয় অসংখ্য শিল্পরসিকের প্রশংসা লাভ করেন। তিনি ও তাঁহার দুই ভ্রাতা বরদা উকিল ও রণদা উকিল একযোগে দিল্লীতে যে শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন তাহাও দেশের শিল্পবোধকে উদ্রিক্ত করিতে বিশেষ সাহায্য করে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছিল। দলাদলির হট্টগোলে কোনদিন তাঁহাকে দেখা যায় নাই, নীরবে একান্তে তিনি শিল্পসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও অমায়িক সরল ব্যবহারে তিনি অসংখ্য নরনারীর চিত্ত জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত ভ্রাতৃবর্গ ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

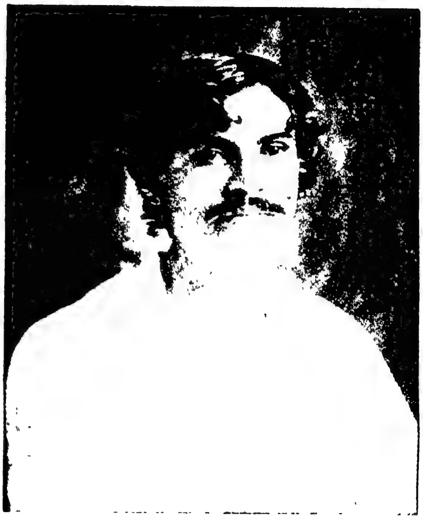

সারদাচরণ উকীল

পরলোকে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী—

গত ৩০শে আষাঢ় মেসার্স বি-এম্-গাঙ্গুলী এণ্ড সন্স-এর প্রধান পরিচালক সুরদেব গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ডি-এল্-রায় ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে মাত্র তেষট্টি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি স্বর্গীয় বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও আলীপুর চিড়িয়াখানার পরিচালক রায়সাহেব সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায়, গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও রায় সাহেব ডাঃ মহাদেব গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনি সদাশয়, পরোপকারী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

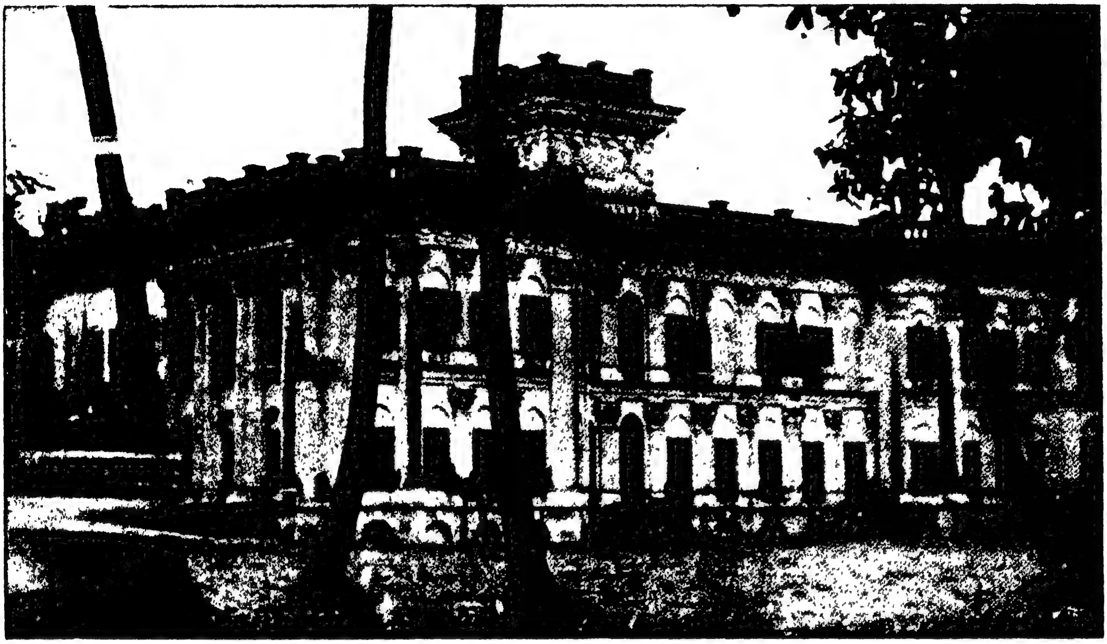

মানকুণ্ডুতে উন্মাদ আশ্রম। (সুরজমল নাগরমল কর্ত্তৃক ২৫ বিঘা জমীর উপর এই বাড়ীটি প্রদত্ত হইয়াছে)

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু—

চিকিৎসাসাধ্য রোগে ভারতের লোকের মৃত্যুসংখ্যা দিন দিনই ভয়াবহরূপে বাড়িয়া উঠিতেছে। অথচ প্রতীকার চেষ্টা যে না হইতেছে তাহাও নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ব্যাপকভাবে রোগের প্রকোপ কমাইবার চেষ্টা না করায় ভস্মে ঘি ঢালা-গোছ অর্থ ব্যয়ই হয়। সম্প্রতি সরকারের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এ দেশে বৎসরে প্রায় ষাট লক্ষ লোক বিভিন্ন রোগে মারা যায়। তার মধ্যে এক ম্যালেরিয়াতেই মরে প্রায় পনর লক্ষ!—অর্থাৎ মোট মৃত্যু-সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। অথচ ম্যালেরিয়া দমনের তেমন কোন ব্যাপক চেষ্টাই এ দেশে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে যে প্রায় জনশূন্য হইয়া উচ্ছন্ন যাইতেছে তাহার প্রতীকার চেষ্টা—কই তেমন ভাবে ত দেখিতেছি না।

কৃষি গবেষণা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রচারের যে উদ্যম প্রদর্শন করিতেছেন তাহা নিঃসংশয়ে প্রশংসার যোগ্য। বারাকপুরে যে কৃষি-বিভাগ খোলা হইয়াছে তাহাতে কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষা ছাড়া গোপালন, পশুপালন, মৎস্যের চাষ, কুটীর শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা দিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিবেন না, উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এ সবই প্রচুর অর্থসাপেক্ষ এবং আশা করা যায় বাঙ্গালা সরকার এই মহৎকার্য্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে আবশ্যক সাহায্য অকুণ্ঠিতচিত্তেই করিবেন। কৃষিপ্রধান বাঙ্গালার কৃষক-বন্ধু প্রধান

মন্ত্রী এদিকে বিশেষ নজর দিবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি; কেন না, তিনি শুধু প্রধান মন্ত্রী নহেন, প্রদেশের শিক্ষা মন্ত্রীও বটে।

বাঙ্গালায় বয়স্ক শিক্ষা—

ভদ্রকালী সাহিত্য সমিতিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী

আজকাল ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। যে সকল প্রদেশে কংগ্রেসী দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রদেশে বয়স্ক শিক্ষার যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা প্রশংসনীয়। বিহারের শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ ইহার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং এই আন্দোলনে বিহারপ্রদেশব্যাপী উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের গবর্ণমেণ্ট এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটি সাবরেজিষ্টার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের সাহায্যে পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্যোগ বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই এবং এখন এই কমিটির কাজকর্মের কোন কথাও শুনা যায় না। তাহার পর এসেমব্লী ও কাউন্সিলের কয়েকজন সভ্যকে লইয়া আর একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীসংস্কার বিভাগের ডিরেক্টার শ্রীযুত নুরন্নবী চৌধুরী মহাশয় ইহার সেক্রেটারী। এই সমিতির কয়েকটি অধিবেশন হইয়াছে, কিন্তু কোনও কার্য্যপদ্ধতি স্থির হইয়াছে কিনা বাঙ্গালার জনসাধারণ তাহা জানে না। গবর্ণমেণ্ট এইপ্রকার ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেও দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই আন্দোলনের সহিত যথাসাধ্য যোগ ও সহানুভূতি থাকা কর্তব্য। সুখের বিষয় যে, আজ দুই বৎসর হইল কলিকাতায় বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতি (Bengal Adult Education Association) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সভাপতি। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ সর্বজনবিদিত। কলেজ স্কোয়ারে ষ্টুডেণ্টস্ হলে এই সমিতির অফিস, প্রোফেসার বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। নানা অসুবিধা ও অর্থাভাব সত্ত্বেও বিলাসবাবু একনিষ্ঠভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন। বয়স্ক শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের অভাব এই আন্দোলনের প্রধান অন্তরায়। এই অভাব দূর করিবার জন্য সমিতি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। প্রোফেসার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী লতিকা দেবী বি-এ একটি বর্ণ-পরিচয় রচনা করিয়াছেন। ইহার নাম 'পড়ার বই'। ভাষাশিক্ষা আরও সুগম করিবার জন্য সমিতি একটি চাট প্রকাশও করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের জজ শ্রীযুত এচ-এস-বিভার মহাশয় এই চার্টের পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন। বর্ণমালা শিক্ষার পর পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব হইলে শিক্ষা নিষ্ফল হয়। সেইজন্য গ্রামবাসীদের উপযোগী একটি সহজ গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রেরও অভাব। বর্তমানে দেশে যে

পরলোকগত নটবর দত্ত (কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলার)

সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় তাহার ভাষা ও লিখনপ্রণালী অনেক ক্ষেত্রে অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লীবাসীর বোধগম্য নহে। এক বৎসর হইল বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতন পল্লীসংস্কার বিভাগ হইতে "দেশে বিদেশে" নামে একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভাষা ও লিখনপ্রণালী সহজ। সাময়িক সংবাদ ব্যতীত স্বাস্থ্য, কৃষি ও গোজাতির উন্নতি ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হয়। বিহার প্রদেশে বয়স্কশিক্ষার উপযোগী পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। যুক্তপ্রদেশে নানা চিত্র, কবিতা ও প্রবন্ধ সম্বলিত একটি মাসিক পত্রিকা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের অভাব ছিল। "দেশে বিদেশে" প্রকাশিত হওয়ায় সেই অভাব দূর হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই আন্দোলন ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিবে।

ডাক্তার হরিহর সরকার—

গত ১লা শ্রাবণ কলিকাতাস্থ চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয় ভবনে দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের কর্ম্মী স্বর্গত ডাক্তার হরিহর সরকার মহাশয়ের এক স্মৃতি সভা হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার সরকার পরহিতে আত্মনিবেদিতপ্রাণ যুবক ছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তিনি যেরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিলেন, সেরূপ সাধারণতঃ দেখা যায় না। চিকিৎসা ব্যবসা তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করিলেও তাহাই তাঁহার নেশায় পরিণত হইয়াছিল। সেজন্য তিনি অহোরাত্র রোগীদের মধ্যে থাকিয়া ও তাহাদের সেবা করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। তাঁহার স্মৃতি সভা করিয়া কর্ম্মীরা প্রকৃতই যোগ্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুরীতে স্বর্ণলতা বিধবাশ্রম—

গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীদের চেষ্টায় পুরীধামে 'স্বর্ণলতা বিধবাশ্রম' নামক একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা বসু ও তাঁহার জামাতা শ্রীযুত সনৎকুমার রায় চৌধুরী (কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র) এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য মিশনকে পুরীধামে তিনখানি পাকা বাড়ী দান করিয়াছেন। সকল প্রদেশের নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা বিধবাদিগকে ঐ আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে। ইতিপূর্ব্বে পুরীধামে স্বর্গত সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী কর্ত্তৃক প্রদত্ত গৃহে একটি বিধবাশ্রম পরিচালিত হইতেছে। তাহা দ্বারা যেমন বহু বিধবা উপকৃত হইতেছেন, আমাদের বিশ্বাস রামকৃষ্ণ মিশনের এই নূতন আশ্রম দ্বারা আরও অধিক বিধবা উপকৃত হইবেন। যাঁহারা এজন্য গৃহ দান করিলেন, তাঁহারা দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বাঙ্গালায় যক্ষ্মা চিকিৎসাকেন্দ্র—

বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতা কালীঘাট অঞ্চলের কয়েকজন লোক সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সেজন্য তাঁহারা শ্রীযুত তারিণীচরণ লাহাকে সভাপতি, ডাক্তার ডি-সি-লাহিড়ীকে সম্পাদক ও শ্রীযুত প্রণবনাথ মুখোপাধ্যায়কে সহকারী সম্পাদক করিয়া এক শক্তিশালী কমিটী গঠন করিয়াছেন। ১১৮ পরাশর রোডে উক্ত স্বাস্থ্যনিবাসের কার্য্যকরী কমিটীর কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহাতে সত্বর স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার আয়োজন চলিতেছে। বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মারোগ যেরূপ দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে তাহার চিকিৎসার ব্যাপক ব্যবস্থা না হইলে শীঘ্রই দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। কাজেই এ বিষয়ে যত নূতন চেষ্টা আরম্ভ হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ হইতে সম্প্রতি যে 'প্রবেশিকা' ও 'বিশারদ' উপাধি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই উৎসাহ দান করা কর্ত্তব্য। প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সহিত সর্ব্বসাধারণকে পরিচিত করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসের শেষ ৪ দিনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এলাহাবাদ জর্জ্জ টাউনে স্বস্তিক ভবনে শ্রীযুত প্রসন্নকুমার আচার্য্যের নিকট পত্র লিখিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালীমাত্রকেই এই সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি—

গত ১৫ বৎসর ধরিয়া সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি বাঙ্গালা দেশে মহিলাদের নানাপ্রকার হিতকর কার্য্য করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত উক্ত সমিতির কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না। ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সমিতির কার্য্য পরিচালিত হইত। সম্প্রতি আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম কলিকাতা কর্পোরেশন উক্ত সমিতিকে বালীগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট নাম মাত্র খাজনায় দেড় বিঘা জমী দান করিয়াছেন। জমীটি ষ্টেশন রোডের উপরই অবস্থিত। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও সমিতিকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এক কালীন ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিতে আরও ৩০ হাজার টাকা প্রয়োজন। ঐ টাকা সংগ্রহের জন্যও বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায় যে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সমিতির গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে।

আজাদ-জিন্না সংবাদ—

ভারতের ভবিষ্যৎ কেন্দ্রী-সরকার কোন এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল কর্ত্তৃক গঠিত না হইয়া সকল দলের লোক লইয়া (National Government means a composite cabinet, not limited to a single party) গঠিত হইলে কিছু আপত্তি থাকিতে পারে কিনা তাহা জানিবার জন্য রাষ্ট্রপতি আজাদ বিশ্বস্ততা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া মিঃ জিন্নার মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—ভারতবর্ষ এক এবং অভিন্ন এবং ভারতবাসীমাত্রেই এক—এই কথা মানিয়া লইয়া সম্মিলিত দল গঠিত হইতে পারে, নচেৎ নহে। তদুত্তরে মিঃ জিন্না প্রকাশ্যে যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ধৃষ্টতা ও অশিষ্টতার চরম আদর্শরূপে রক্ষা করা চলিতে পারে। কংগ্রেসের সভাপতিকে এইভাবের ভাষা প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তাহা মিঃ জিন্নার টেলিগ্রাম প্রকাশিত না হইলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। আজাদের তারের উত্তরে "cannot reciprocate confidence" হইল প্রথম প্রতিক্রিয়া। তাহার পর "Can't you realise you are made a Muslim show-boy Congress President to give it colour that it is national and decieve foreign countries." ইহাতেও শেষ না করিয়া "If you have self-respect, resign at once" পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। মিঃ জিন্না বিদেশের রাজনৈতিকদের অপেক্ষা নিজেকে বিজ্ঞ মনে করেন এবং কংগ্রেসের ও তাহার নির্ব্বাচিত সভাপতির মর্য্যাদা সম্বন্ধে নিজের মতামতই সকলেই গ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করেন। মৌলানা আজাদকে "muslim show-boy Congress President" বলা ক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত মিঃ জিন্নারই সাজে। পণ্ডিতেরা বলেন—নিজের শক্তি না থাকিলে বা অর্জ্জিত শক্তি হ্রাস পাইতে থাকিলে দ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করে এবং যাহার উপর মনে মনে হিংসা বা আক্রোশ স্থান লাভ করিতেছে তাহাকে গালি দিতে হয়। দিনে দিনে মুসলীম লীগের শক্তি ক্ষয় হইতেছে, আর মিঃ জিন্নার অবস্থা এইরূপ হইতেছে।

যুদ্ধনিরত বৃটীশ সৈন্যগণকে নদীতে পুল নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে

মহাচীনের বন্ধুহীন অবস্থা—

প্রাচীন গৌরব যতই মহিমান্বিত হউক, লোকসংখ্যা এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার যতই বিরাট হউক, দেশ মধ্যে

অসংস্কৃত উপকরণ যতই প্রচুর থাকুক, কালের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে না পারিলে কি অবস্থা দাঁড়ায়—মহাচীন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আত্মকলহে শতধা ভিন্ন, জগতের আধুনিক তথাকথিত সভ্যজাতির সমরায়োজনের সহিত যোগশূন্য মহাচীন শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয় জাতির লীলাক্ষেত্র ছিল। তাহার পর জাপানের নব অভ্যুদয়ে বিপর্য্যস্ত চীন জাপানের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়িয়া নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হইতেছিল। চীন সাম্রাজ্যের অংশ কাটিয়া নকল-সাম্রাজ্য মাঞ্চুকুয়ো জাপান সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাহাতেও তাহার বিরাট ক্ষুধা মিটে নাই। অকারণে আজ দুই বৎসরাধিককাল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জাপান ক্রমেক্রমে দেশের পর দেশ লইয়া চীন রাজ্য গ্রাস করিয়া আসিতেছে। কেহই আশা করে নাই চীন এতদিন ধরিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। বিপন্ন চীন আজ চিয়াংকাইসেকের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া যে বুদ্ধিমত্তা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে তাহা জগতে অতুলনীয়। কিন্তু এতদিন বিপন্ন চীন রুশগণতন্ত্র, ফরাসী এবং ইংরেজের নিকট ক্রয় করিয়া কিছু কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম পাইতেছিল। এ্যান্টি-কোমিণ্টার্ণের অংশভাগী হিসাবে জাপানে-জার্ম্মাণে মিতালী ছিল। আবার রুশ-জার্ম্মাণে মৈত্রী স্থাপিত হওয়ার ফলে জাপানের "শত্রু" চীনকে রুশ আর পূর্ব্বের ন্যায় সাহায্য করিতেছে না। তাহার উপর জার্ম্মাণীর নিকট ফ্রান্সের পরাজয়ের সুযোগ লইয়া চতুর জাপানী ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া চীন দেশে যে অস্ত্রাদি প্রেরিত হইত তাহা পরাজিত ফ্রান্সকে এক হুমকী দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ইংরেজের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আবার তাহার সুযোগ লইয়া জাপান ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া যে অস্ত্রাদি চীনে যাইত তাহাও ইংরেজকে ভীতি ও স্তোক দিয়া বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহার পর চীনের অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বন্ধুহীন চীন সাক্ষাৎ সাহায্য কাহারও পায় নাই, পরোক্ষভাবে অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামের যে সাহায্য পাইতেছিল তাহা জাপানীরা বিনা যুদ্ধে বন্ধ করিতে সমর্থ হইল। আমাদের সহানুভূতি সর্ব্বপ্রকারে চীনাদের পক্ষে, কিন্তু "মিষ্ট কথায় কি চিঁড়ে ভেজে ?"

টাকার বিপদ—

টাকা থাকিলে, বিশেষতঃ কিছু বেশী টাকা থাকিলে চোর ডাকাতের হাতে নিগ্রহ ঘটে। কিন্তু এমন অবস্থা সময় সময় আসে, যখন বেশী টাকা থাকায় যাহারা চোর ডাকাত তাড়ায় তাহাদের হাতেও বিব্রত হইতে হয়। কলিকাতায় কয় দিন পূর্ব্বে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। বেশী টাকা (কাঁচা টাকা, সুতরাং নোট নহে) সঙ্গে থাকার অপরাধে হাওড়ার রেল পুলিশ দেশে প্রত্যাগমনোন্মুখ—চার জনকে গ্রেপ্তার করে এবং আটক রাখিয়া দেয়। বেশী টাকা রাখিলে ডাকাত-পুলিশের হাতে একই রকম ব্যবস্থা; তবে বর্ত্তমানে তফাৎ এই—পরের অসুবিধা করিয়া নোটের পরিবর্ত্তে টাকা রাখায় পুলিশের নিকট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে এবং ইহা সবই নোটের আকারে ফেরত পাইবার সম্ভাবনা; আর চোর ডাকাতের হাতে পড়িলে নোট বা টাকার মধ্যে কোনও বিচার প্রয়োজন হইত না, উপরন্তু তাহা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

সভাপতিত্ব সমস্যার সমাধান—

রেফিউজের বাৎসরিক সভার সভাপতিত্ব লইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ সিদ্দিকি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা গতমাসে দিয়াছি। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়—যে সভায় মিঃ সিদ্দিকি সভাপতিত্ব করিতে অসম্মত হন, সেই সভায় বাঙ্গালার প্রধান উজির ফজলল হক্ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। তিনি রেফিউজের কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং একশত টাকা দান করেন। টাকার পরিমাণ কম বলিয়া তিনি বলেন—উহা তাঁহার আন্তরিকতার দান, সুতরাং পরিমাণ উপেক্ষণীয় হইলেও উহা শ্রদ্ধায় গ্রহণযোগ্য। তাঁহাব শক্তি অনুযায়ী সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিও দেন। মুসলমান সমাজের দুই নেতার মধ্যে মনোভাবের এই পার্থক্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। হক সাহেব খাঁটী বাঙ্গালী বলিয়া হয়ত বাঙ্গালার প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দরদ বেশী। যাহাই হউক ইংরাজির অনুসরণে আমরাও বলি "All's well, that ends well."

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর সেন—

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর সেন এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-কম পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং কতকগুলি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব সমস্ত পরীক্ষাতেও তিনি সরকারী বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছেন। আমরা এই কৃতী বাঙ্গালী যুবকের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর সেন

গোবরডাঙ্গায় সাহিত্য সম্মিলন—

গত ৩০শে আষাঢ় রবিবার গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ গোবরডাঙ্গানিবাসী খ্যাতনামা লেখিকা শ্রীমতীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে এক মিউনিসিপাল অভিনন্দন প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে মফঃস্বল মিউনিসিপালিটীগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গোবরডাঙ্গাই একজন লেখিকাকে এই সম্মান দান করিলেন—সেজন্য আমরা উক্ত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ঐ উপলক্ষে গোবরডাঙ্গা টাউন হলে একটি সাহিত্য সম্মিলনও হইয়াছিল। ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। কবি শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে ঐ অঞ্চলের সাহিত্য সাধনার একটি ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। মফঃস্বলে এরূপ অনুষ্ঠান যত অধিক হয়, দেশের সাহিত্যিকগণের পক্ষে তাহা ততই আশা ও আনন্দের বিষয়।

পাঁজিয়ায় কৃষক সম্মিলন—

বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলনের আবির্ভাব অধিক দিনের না হইলেও এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। দেশব্যাপী দারিদ্র্য, কৃষকদের মধ্যে কর্ম্মাভাব, জমির পরিমাণের অল্পতা ও তজ্জনিত আর্থিক দুরবস্থা এই আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণা যোগাইতেছে। যশোহর পাঁজিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কৃষক সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁহাদের সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। অধিবেশনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সম্মেলন পাজিয়ায় আহূত হয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্মেলন সকল দিক দিয়া যেভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল তাহাতে উদ্যোক্তাদিগের কৃতিত্ব ও কর্ম্মশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সম্মিলনস্থানের নামকরণ হইয়াছিল 'কৃষকনগর'। বহু তোরণ শোভিত সভাস্থলের মধ্যভাগে দশসহস্র লোকের উপযোগী বিরাট মণ্ডপটি শোভা পাইতেছিল। ৩০ হস্ত উচ্চ মণ্ডপের শীর্ষদেশে লালপতাকা এবং তাহার নীচে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত 'কৃষকনগর' নগরের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের দূরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ হইতে বহু প্রতিনিধি ও দর্শক সভায় যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রাক্তনমন্ত্রী সৈয়দ নওশের আলি,

পাঁজিয়ায় কৃষক সম্মিলন

কমরেড মুজাফর আহমদ, সোমনাথ লাহিড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের আগমনে সম্মিলনের গুরুত্ব বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অনেক বিশিষ্ট মহিলাও সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সভাপতি পরিষদ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কৃষকপতাকা উত্তোলন করেন। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির কার্য্য করেন। কমরেড শম্ভুবসুর অধিনায়কত্বে এগারশত স্বেচ্ছাসেবকের বিরাট-বাহিনীর সামরিক কুচকাওয়াজ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

আবার ভীষণ রেল দুর্ঘটনা—

গত ১৯শে শ্রাবণ রবিবার রাত্রি শেষে আবার চুয়াডাঙ্গার নিকট ডাউন ঢাকা মেল লাইন চ্যুত হওয়ায় এ পর্য্যন্ত ৪১জন মারা গিয়াছে এবং প্রায় একশত যাত্রী আহত হইয়াছেন। রেল দুর্ঘটনা এদেশে নূতন নহে; অধিকন্তু ঐ স্থানের নিকটেই আরও কয়েকবার কয়েকটি ভীষণ রেল দুর্ঘটনা হইয়া যাওয়ায় সকলে এবার স্তম্ভিত হইয়াছেন। এ বিষয়ে রেল কর্ত্তৃপক্ষের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? শুধু ক্ষতিপূরণ দিলেই রেল কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না, যাহাতে আর কখনও এরূপ ঘটনা না হয়, সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রেল কর্ত্তৃপক্ষকে অবহিত হইতে হইবে।

ঢাকা মেল দুর্ঘটনা ফটো—সুদিন রায়, সিঁথি

ঢাকা মেল দুর্ঘটনা ফটো—সুদিন রায়, সিঁথি

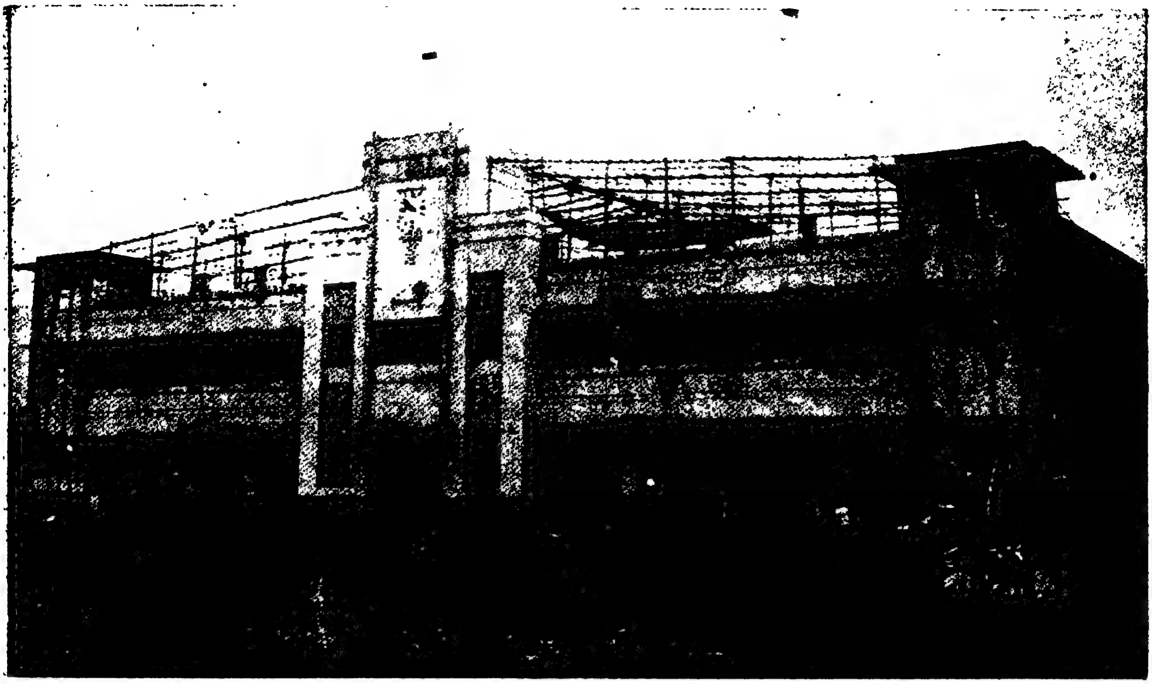

পুনা কংগ্রেস হাউস—সম্প্রতি এখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা হইয়াছিল

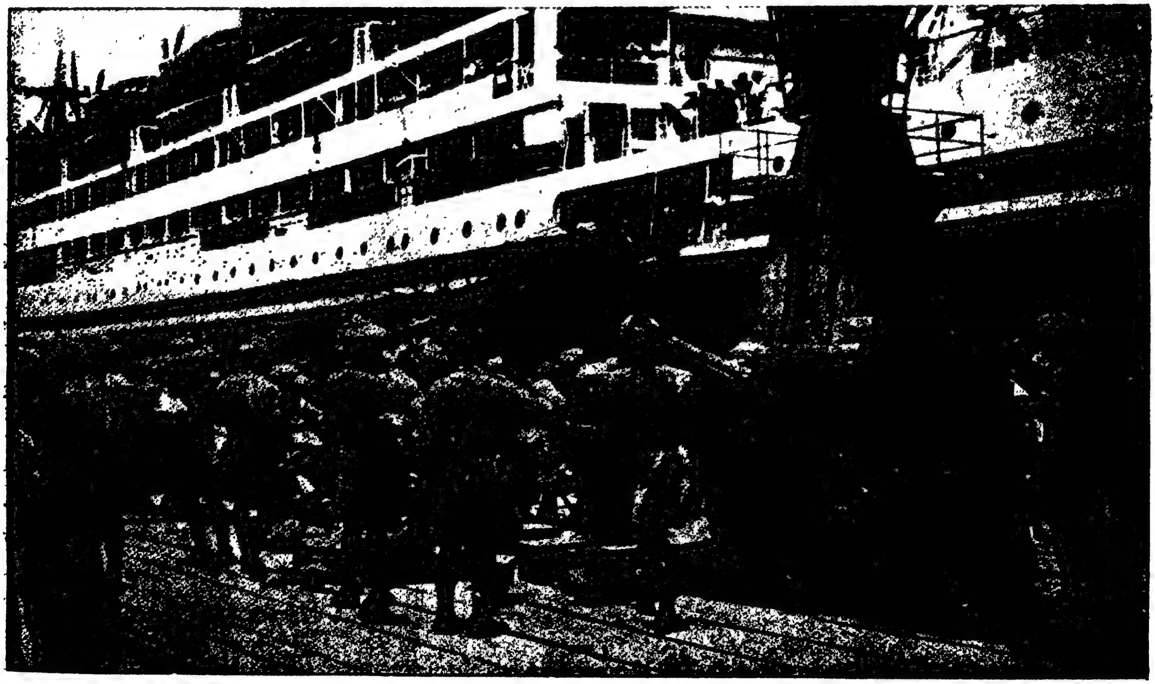

করাচীতে কেনিয়া-যাত্রী ভারতীয় সৈন্যদল

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে নূতন টেলিফোন লাইন সংযোগ উপলক্ষে সমবেত জনবৃন্দ

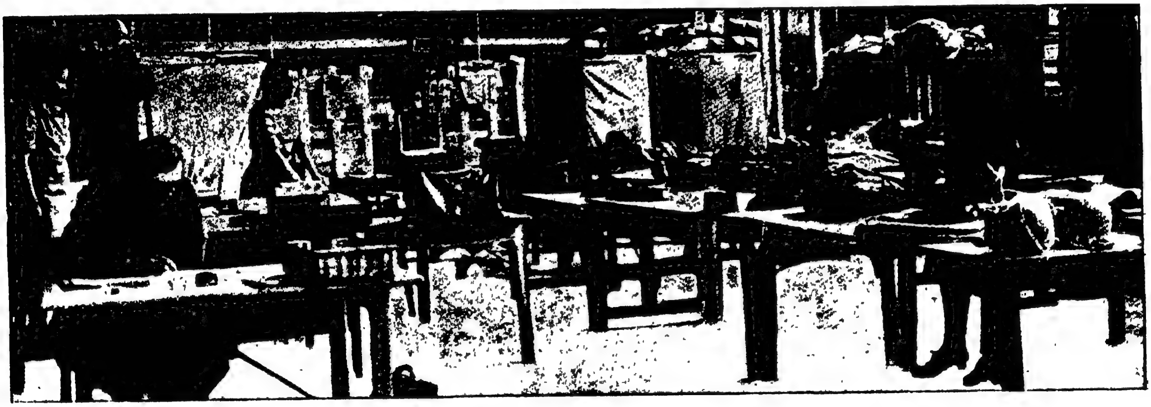

ভিজাগাপত্তন বন্দর—এখানে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা খোলা হইয়াছে

বৃটিশ সম্রাটগণের বাসগৃহ সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদে এখন যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য জিনিষপত্র রাখা হইয়াছে

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

আই এফ এ শীল্ডের ৪৭তম ফাইনাল খেলা লক্ষাধিক দর্শকের সামনে শেষ হয়েছে। যাঁরা অধীর আগ্রহে ফাইনাল খেলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা ক'রছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্রীড়ামোদীই এ ফলাফলের আনন্দে যোগদান করতে পারেননি। এ কয়দিন যাবৎ ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে যে প্রবল উদ্বেগ ও উত্তেজনার স্বষ্টি হয়েছিল তা খেলার ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাপিত হয়েছে। ফাইনালে তিপ্পান্ন বৎসরের পুরাতন এরিয়ান্স ক্লাব ৪—১ গোলে জনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবকে পরাজিত ক'রে এ বৎসরের শীল্ড বিজয়ী হ'ল। ফাইনাল খেলার পূর্ব্ব দিনেই সমস্ত রিজার্ভ টিকিটগুলি বিক্রয় হ'য়ে যায়। অনেকে চতুর্গুণ মূল্য দিয়েও টিকিট সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নি। খেলার দিন বেলা প্রায় ৯টা থেকে দর্শক সমাগম আরম্ভ হয় এবং নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যাঁরা টিকিট সংগ্রহ করতে পারেননি তাঁরা মাঠের চারিপাশে, কেল্লার দিকে জনসমুদ্রের স্বষ্টি করেছিলেন। শীল্ড ফাইনালের খেলায় মোট কুড়িহাজার সাঁইত্রিশ টাকা আট আনার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল। পূর্ব্বে এত অধিক সংখ্যক টিকিট কোন ফাইনাল খেলায় বিক্রয় হয়নি। আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাসে এরিয়ান্স ক্লাব শীল্ড বিজয়ী হওয়ায় ভারতীয় দল তৃতীয়বার শীল্ড বিজয়ের গৌরব লাভ করলে। আমরা তাঁদের এ আনন্দে যোগদান ক'রে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মোহনবাগান ইতিপূর্ব্বে দু'বার ফাইনালে উঠেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমবার

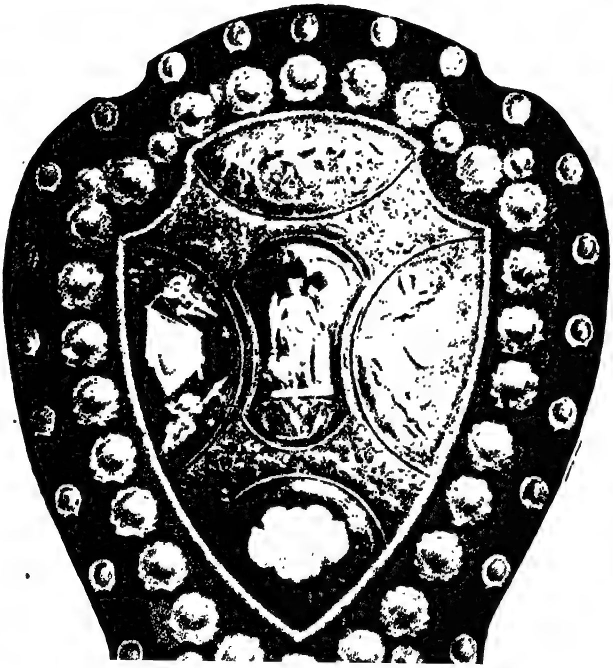

আই এফ এ শীল্ড

এ রায় চৌধুরী
ক্যাপটেন—মোহনবাগান

নির্ম্মল ঘোষ
ক্যাপটেন—এরিয়ান্স

শীল্ড বিজয়ী হন। পরে ১৯২৩ সালের শীল্ড ফাইনালে ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড বৃষ্টিতে খেলার অযোগ্য থাকার জন্য তাঁরা ফোর্টের মধ্যে খেলে ক্যালকাটার কাছে হেরে যান। এরিয়ান্স আগে কখনও সেমিফাইনালেও ওঠেনি।

আর ভট্টাচার্য্য

আই এফ এ শীল্ডের ইতিহাসে এই প্রথম দুটি ভারতীয় টীম ফাইনালে খেল্‌লে। এরিয়ান্স ৪-১ গোলে বিজয়ী হ'য়েছে। কিন্তু যাঁরা খেলা দেখেননি তাঁরা ফলাফল দেখে খেলা সম্বন্ধে কোনরূপ সঠিক ধারণা ক'রতে সক্ষম হবেন না। মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা এরিয়ান্সের গোলে উপর্য্যুপরি আক্রমণ ক'রে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছেন, বল পোষ্টে লেগে, সম্পূর্ণ পরাভূত গোলরক্ষকের পায়ে লেগে ফিরে এসেছে; সেই বল নিয়ে গেছে এরিয়ান্স, আর কে দত্ত নির্ব্বোধের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেয়েছেন। মোহনবাগানের অদৃষ্টের থেকে এই পরাজয়ের জন্য বেশী দায়ী কে দত্ত। 'Big match'য়ে তিনি এই প্রথম খেলছেন না, ইণ্টারন্যাশনালে বহুবার খেলেছেন, অষ্ট্রেলিয়ায় তিনি ফুটবল টেষ্ট ম্যাচ খেলে এসেছেন। তাঁর ত 'নারভাস' হবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু কেন যে তিনি এই রকম নির্লিপ্তভাবে খেললেন তা বোঝা যায় না।

এস গুঁই

প্রথম গোল ব্যানার্জ্জি অনেক দূর থেকে সট করেছিলেন আর তাও খুব জোর ছিল না—কিন্তু দত্ত 'position' নেবার যথেষ্ট সময় পেয়েও বল ধরতে পারলেন না; এরিয়ান্সের সমর্থকরাও ভাবতে পারেননি যে ঐ সটে গোল হবে। দ্বিতীয় গোল দত্তর হাতে লেগে গোলে ঢুকলো। চতুর্থ গোলটি বহু দূর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এসে গোলে ঢুকেছে, দত্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখলেন। স্বচ্ছন্দে তিনি বলটা

মহারাণা ক্লাব (গৌহাটী)

হাতে তুলে নিতে পারতেন। প্রকাশ, রেফারী নাকি ফ্রি কিক্ সর্টের ‘হুইসিল্’ দেয় নি; কিন্তু তাই ব’লে গোলরক্ষক কেন গোলের ভেতর বল ঢুকতে দেবে! টীম যদি পর পর বাজে গোল খেতে থাকে তাহ’লে ফরওয়ার্ড লাইনের খেলা মোটেই ভাল হওয়া সম্ভব নয় তবুও তাঁরা হতাশ না হ’য়ে বিপক্ষদলকে আক্রমণ ক’রে বিপর্য্যস্ত ক’রে তুলছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের জন্য গোল ক’রতে পারেননি। এদিকে এরিয়ান্স যেক’টি বল নিয়ে গেছে প্রায় সবগুলিই গোল ক’রেছে; দত্ত একটি বলও ভাল ক’রে আটকাতে পারেননি। সেবার চতুর্থ রাউণ্ডে ডি সি এল আইয়ের সঙ্গে খেলায় মোহনবাগান কে দত্তর জন্যই হেরেছিল। কায়দা দেখাতে গিয়ে বল ধ’রে মাটিতে ফেললে লিপিট ছুটে এসে সর্ট ক’রে গোল দিলেন। তার আগে পর্য্যন্ত মোহনবাগান একগোলে জিতছিল, সৈনিকদের একজন খেলোয়াড় অফ্‌সাইডে থাকার জন্য দত্ত একটি বল ধরবার তেমন চেষ্টা ক’রলেন না তাতে গোল হ’য়ে গেলো। শীল্ডে এরিয়ান্সের (মোহনবাগানের আগেকার) গোলকিপার রাম ভট্টাচার্য্য অদ্ভুত খেলা দেখিয়েছেন। বিজয়ী দলের আক্রমণভাগে নির্ম্মল ছাড়া কোন খেলোয়াড়ই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। ডি ব্যানার্জ্জি একাই তিনটি গোল দিলেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল না; বিজিত দলের গোল রক্ষকের অমার্জ্জনীয় ত্রুটী তাঁর প্রশংসাকে অনেকাংশে সাহায্য ক’রেছে। রক্ষণভাগে ব্যাকদ্বয়ের মধ্যে গড়গড়ির খেলা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাফব্যাকদের মধ্যে নাসিমের খেলা প্রশংসনীয় হয়েছিল। তৃতীয় গোলটিতে ভৌমিক বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন

মোহনবাগান দলের পি চক্রবর্ত্তী দর্শকদের হতাশ করেন। রাইট ব্যাক তারক চৌধুরীর খেলা রক্ষণভাগে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। খেলার গোড়াতেই প্রামাণিক আঘাত পাওয়ায় হাফ লাইনে খেলোয়াড়দের স্থান পরিবর্ত্তন করাতে একমাত্র নীলু ছাড়া কেও ভাল খেলতে পারেন নি। এই দিনকার উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলতে এস গুঁই। নিজদলকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গুঁইয়ের অদ্ভুত ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শকদের চমৎকৃত করেছে। মোহনবাগান প্রথম গোল খাবার ৯ মিনিটের পরই গুঁই দর্শনীয় গোলটি দিয়ে সে সময়ের মত খেলা ‘ড্র’ করেন। এছাড়া আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় বিপক্ষদলের গোল সম্মুখে বহুবার মহা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। অধিনায়ক এ রায়চৌধুরী নিজদলের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেও অদৃষ্টের

দোষে কোনরূপ গোল দিতে পারেন নি। এস মিত্র ও নির্ম্মলের চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

মোহনবাগান ঃ কে দত্ত; টি চৌধুরী ও পি চক্রবর্ত্তী; নীলু মুখার্জ্জি, এস প্রামাণিক ও প্রেমলাল; এস গুঁই, এস মিত্র, এ রায়চৌধুরী, এ ভট্টাচার্য্য ও এন মুখার্জ্জি।

এরিয়ান্স ঃ আর ভট্টাচার্য্য; এন মজুমদার ও এ গড়গড়ি; ডি মিত্র, নাসিম ও এ মুখার্জ্জি; এন ঘোষ, এস রাও, ডি ব্যানার্জ্জি, এ জর্ডন ও এ ভৌমিক।

শীল্ড খেলা ঃ

এ বৎসরের শীল্ড খেলায় মোট ৪৪টি টীম যোগদান করে। বাইরের কোন মিলিটারী টীম আসেনি। বর্ডার রেজিমেণ্ট এবং ফার্ষ্ট ব্যাটেলিয়ান লিনকোনসায়ারল্ড রেজিমেণ্ট শীল্ড তালিকা থেকে নাম তুলে নেয়। এ ছাড়া কানপুরের গোল্ডেন স্পোর্টস ক্লাব ও ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং-ক্লাব প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় নি। শীল্ডের তালিকা যেরূপভাবে প্রস্তুত হয়েছিল তাতে অনেকেই আশা ক'রেছিলেন ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ও মহমেডান ক্লাবই উঠবে। কিন্তু ঘটনাক্ষেত্রে অন্যরূপ হয়েছিল। শীল্ড তালিকার উপরে দিক থেকে মোহনবাগান উঠলেও নীচের দিক থেকে এরিয়ান্স ক্লাব সেমি-ফাইনালে রেঞ্জার্স ক্লাবকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। মহমেডান ক্লাব শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে রেঞ্জার্সের কাছে ২-০ গোলে পরাজিত হয়। শীল্ড খেলায় মহমেডান দলকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডেই মহামেডান ১-১ গোলে প্রথম দিন গৌহাটী থেকে আগত মহারাণা ক্লাবের সঙ্গে 'ড্র' করে। মহারাণা ক্লাব প্রথমে গোল দেয় এবং খেলার শেষ দিকে মহমেডান গোল শোধ ক'রে কোনক্রমে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। মহারাণার রক্ষণভাগ বেশ শক্তিশালী ছিল; এবং শক্তিশালী রক্ষণভাগের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের ফলেই মহমেডান দল কোনরূপ সুবিধা ক'রে উঠতে পারে নি। মহারাণার গোলরক্ষক বি বল এবং ব্যাক এস দাস ও জে চৌধুরী অদ্ভুত ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনের 'রিপ্লে'তে মহমেডান মাত্র ১-০ গোলে মহারাণাকে পরাজিত ক'রে তৃতীয় রাউণ্ডে হবিগঞ্জ টাউন ক্লাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং ১-০ গোলে বিজয়ী হয়। দিল্লী থেকে আগত দিল্লী ফুটবল দলে মহমেডানের ভূতপূর্ব্ব গোলরক্ষক ওসমান যোগদান করলেও দলটি যে মোটেই শক্তিশালী নয় তা ভবানীপুরের

রেঞ্জার্স ক্লাব

সঙ্গে খেলাতেই দেখা গেছে। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের সঙ্গে তৃতীয় রাউণ্ডে ১-০ গোলে পরাজিত হয়ে দর্শকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বাঙ্গালোরের টীমে নামজাদা খেলোয়াড়দের অভাব থাকায় তারা দ্বিতীয় রাউণ্ডে হুগলী সেণ্ট্রালকে ৩-০ গোলে পরাজিত ক'রে কাষ্টমসের কাছে ১-০ গোলে তৃতীয় রাউণ্ডে হেরে যায়। বাঙ্গালোরের রক্ষণভাগ মোটেই শক্তিশালী ছিল না।

এবারের শীল্ড খেলায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল সেমি-ফাইনালে চারটি স্থানীয় দলের খেলা। পূর্ব্বে একবার ১৯৩৬ সালে এরূপ ঘটনা হয়েছিল। এবৎসরের শীল্ড খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ৮-০ গোলে বেঙ্গল আর্টিলারি দলকে পরাজিত ক'রেছে। এত বেশী গোলের ব্যবধানে এবৎসর আর কোন টীম জয়লাভ করতে পারে নি। শীল্ডে যে সমস্ত খেলা এবার হ'য়েছিল তাদের কোনটিই প্রথম শ্রেণীর ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দেয় নি। শক্তিশালী মিলিটারী টীমের অভাবেই শীল্ড খেলার standard যে প্রতি বৎসর অতি নিম্ন শ্রেণীর হচ্ছে তা কয়েক বৎসরের খেলা দেখলেই বেশ বোঝা যায়। শীল্ড খেলায় পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী টীম যোগদান ক'রছে বটে কিন্তু খেলার কোন উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় নি।

বহু অর্থ ব্যয় করেও আই এফ এ ক্রীড়ামোদীদের উচ্চাঙ্গের খেলা দেখাতে সক্ষম হয়নি টাকার অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই হ'ল না।

পুলিস দল

বাঙ্গালোর মুসলীম দল

১৯৪০ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার ফলাফল

প্রথম রাউণ্ড

সুবার্ব্বণ ক্লাব ১-১
ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব (খুলনা) ১-২

বহরমপুর টাউন ক্লাব ০
অরোরা এথলেটিক এসোসিয়েশন ১

রাজসাহী স্পোর্টিং এসোসিয়েশন ১
ই বি আর (প্রিন্টিং) ০

কুমারটুলি ইন্‌ষ্টিটিউট ০
পুলিস এ সি ১

ই বি রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ২
নর্থ সুবার্ব্বণ স্পোর্টস এসোসিয়েশন ০

বরিশাল ফুটবল এসোসিয়েশন ১
টাউন ক্লাব (খুলনা) ২

তরুণ সমিতি ক্লাব (মধুপুর) ২
বনবিহারী জেলা এসোঃ (বর্দ্ধমান) ১

ভবানীপুর ক্লাব ১-২
হাওড়া জেলা এসোসিয়েশন ১-১

এরিয়ান ক্লাব ২
ডোমোহানী ফুটবল ক্লাব ১

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব ১
বার্ণপুর ইউনাইটেড ০

কাষ্টমস এ সি ১
ফরিদপুর ০

হুগলী সেণ্ট্রাল এসোসিয়েশন ১
হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব ০

দ্বিতীয় রাউণ্ড

ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব, খুলনা ০
মোহনবাগান ক্লাব ৬

অরোরা এথলেটিক এসোঃ ০
বেঙ্গল আর্টিলারী ২

রাজসাহী এসোঃ ০
কালীঘাট ২

পুলিস ৩
পেশোয়ার ক্যাণ্ট জিমখানা ক্লাব ০

ই বি রেলওয়ে ০
ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ১

টাউন ক্লাব, খুলনা ০-০-০
দিল্লী ফুটবল এসোঃ ০-০-২

তরুণ সমিতি ক্লাব (মধুপুর) ওয়াকওভার
গোল্ডেন স্পোর্টস ক্লাব (কানপুর)

ভবানীপুর ওয়াকওভার
ফাষ্ট বেটালিঃ লিনকোলনসায়ার রেজিঃ (দানাপুর)

এরিয়ান ৩
বি এন রেল এ সি (খড়্গপুর) ০

স্পোর্টিং ইউনিয়ন ওয়াকওভার
সেকেণ্ড বেটালি, বর্ডার রেজিমেণ্ট

কাষ্টমস ১
ওয়ারী ক্লাব (ঢাকা) ০

হুগলী সেণ্ট্রাল এসোঃ ০
বাঙ্গালোর মুসলীম ফুটবল ক্লাব ২

ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব ৩
কুটিগিরনি ফুটবল ক্লাব (কিশোরগঞ্জ) ১

অন্ধ্র একাদশ (ভিজাগাপটম) ০-০
ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ০-২

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব (ঢাকা)
হবিগঞ্জ টাউন ক্লাব ওয়াকওভার

মহারাণা ক্লাব (গৌহাটী) ১-০
মহামেডান স্পোর্টিং ১-১

তৃতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান ক্লাব ৫
বেঙ্গল আর্টিলারী ০

কালীঘাট ১
পুলিশ ২

ইষ্টবেঙ্গল ০
দিল্লী ফুটবল এসো ১

তরুণ সমিতি ক্লাব ০
ভবানীপুর ২

এরিয়ান ১
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ০

কাষ্টমস ১
বাঙ্গালোর মুসলীম ০

রেঞ্জার্স ২
ক্যালকাটা ০

হবিগঞ্জ টাউন ক্লাব ০
মহামেডান স্পোর্টিং ১

চতুর্থ রাউণ্ড

মোহনবাগান ২-১
পুলিশ ১-০

দিল্লী ফুটবল এসোঃ ০-০
ভবানীপুর ০-২

এরিয়ান ১-২
কাষ্টমস ১-১

রেঞ্জার্স ২
মহামেডান স্পোর্টিং ০

সেমি-ফাইনাল

মোহনবাগান ১
ভবানীপুর ০

এরিয়ান ১
রেঞ্জার্স ০

ফাইনাল

মোহনবাগান ১
এরিয়ান ৪

এরিয়ান

ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান ঃ

এ বৎসরের কলিকাতা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম স্থান অধিকার ক’রে লীগ চ্যাম্পিয়ান হ’য়েছে। এবার নিয়ে তাদের ষষ্ঠবার লীগ পাওয়া হ’ল। আজ পর্য্যন্ত কোন ফুটবল ক্লাব এতবার লীগ পাবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। ছয়বারের মধ্যে তারা পর পর লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পাঁচবার। ফুটবল খেলার ইতিহাসে তাদের যে রেকর্ড স্থাপিত হ’য়েছে তা ভঙ্গ করতে বোধ হয় আর কোন ক্লাব সহজে পারবে না। লীগে এবৎসরে রাণার্স-আপ্ হয়েছে গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব। উভয় দলের মধ্যে ৩ পয়েণ্টের ব্যবধান। মোহনবাগান লীগ তালিকায় ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার ক’রে থেকেও শেষ রক্ষা করতে পারলে না। মহমেডান দলের সঙ্গে রিটার্ণ খেলায় ২—০ গোলে হেরে যাওয়ায় লীগ চ্যাম্পিয়ান-সীপের যে আশা তাদের ছিল তা একেবারে দূর হ’য়ে গেল। প্রথমার্দ্ধের খেলায় এই মহামেডান দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে তারা শেষের দিকে তাদের সমর্থকদের যেভাবে হতাশ করছে তা কেউ সহজে ভুলতে পারবে না। তাছাড়া ভবানীপুর এবং এবৎসরের লীগের নিম্নস্থান অধিকারী ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগান যেভাবে খেলা ড্র করেছে তাতে তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবার পথে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছিল। এই টীম দু’টির সঙ্গে ‘ড্র’ করার কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্ব্বল টীমকে সহজেই পরাজিত করতে পারব এ ধারণা নিয়ে খেলোয়াড়রা যদি মাঠে নেমে খেলার কোন গুরুত্ব না ভাবেন তাহ’লে ফল যে কি দাঁড়ায় তা মোহন বাগানকে একবার নয়, বহুবার দেখতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় খেলোয়াড়রা এবিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপ করতে এপর্য্যন্ত পারলেন না। এবৎসরের ফুটবল লীগ মোহনবাগানেরই পাবার সবচেয়ে বেশী সুযোগ ছিল।

দ্বিতীয় বিভাগ থেকে ডালহৌসী ৩৩ পয়েণ্ট পেয়ে আবার প্রথম বিভাগে ফিরে এল। অরোরা ১৯ পয়েণ্ট পেয়ে রাণার্স-আপ হয়েছে ; প্রথম দিকে লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে ট্রপিক্যাল স্কুল ২৮ পয়েণ্টে এবং রবার্ট হাডসন শেষ খেলায় জোড়াবাগানকে ৩-০ গোলে পরাজিত ক’রে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় কাহার কিরূপ স্থান

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
মহঃ স্পোর্টিং	২৪	১৭	৬	১	৪২	৭	৪০
মোহনবাগান	২৪	১৭	৩	৪	২৬	১১	৩৭
রেঞ্জার্স	২৪	১৩	৬	৫	৩৯	২১	৩২
ইষ্টবেঙ্গল	২৪	১০	১০	৪	২২	১৫	৩০
কালীঘাট	২৪	৯	৯	৬	২৯	২৩	২৭
ই বি আর	২৪	৬	৯	৯	১১	২৫	২১
এরিয়ান	২৪	৬	৮	১০	২৭	৩১	২০
পুলিশ	২৪	৭	৫	১২	৩০	৩৪	১৯
বর্ডার রেজিঃ	২৪	৭	৫	১২	২০	২৮	১৯
কাষ্টমস্	২৪	৫	৯	১০	১৯	২৮	১৯
ভবানীপুর	২৪	৭	৪	১৩	১৩	২৯	১৮
স্পোর্টিং ইউঃ	২৪	৫	৬	১৩	১৫	৩৩	১৬
ক্যালকাটা	২৪	৩	৮	১৩	১৮	৩৪	১৪

এ বৎসরের প্রথম বিভাগের লীগে অধিক সংখ্যক গোলদাতাদের নাম—

আর লামসডেন (রেঞ্জার্স) ২৩ ; সাবু (মহমেডান স্পোর্টিং) ১৬ ; ডি ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান) ১৩ ; জোসেফ (কালীঘাট) ১১ ; রসিদ (মহমেডান স্পোর্টিং) ১১ ; সোমানা (ইষ্টবেঙ্গল) ১০ ; এ রায় চৌধুরী (মোহনবাগান) ৯ ; পি ডি মেলো (পুলিশ) ৮; এন মজুমদার (ই বি আর) ৭ ; ল্যাং (বর্ডার রেজিমেণ্ট) ৬ ; জে মিলস (পুলিশ) ৬ ;

লীগ চ্যাম্পিয়ান বনাম অবশিষ্ট দল ঃ

এ বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান দলের সঙ্গে অবশিষ্ট দলের যে চ্যারিটি ম্যাচ হয় তাতে লীগ চ্যাম্পিয়ান ৪-০ গোলে অবশিষ্ট দলকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছে। অবশিষ্ট দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে মনোনয়ন কমিটির মারাত্মক ত্রুটী। বিভিন্ন ক্লাব সমূহ থেকে যে সব খেলোয়াড় নিয়ে অবশিষ্ট দল গঠন করা হয়েছিল, তা লীগের নিম্ন স্থান অধিকারী যে কোন দল অপেক্ষা যে নিকৃষ্টতম খেলেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অবশিষ্ট দলকে পরাজিত করতে লীগ চ্যাম্পিয়ান দলকে কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। অতি সহজে, বিনা আয়াসে তারা মাঠে সর্ব্বক্ষণ নিজেদের

প্রাধান্য রক্ষা করেছিল; মহমেডান দল এই খেলাকে যেন খেলা হিসাবে গণ্য করেনি।

মহমেডান দলের মত ফাষ্ট টীমের বিরুদ্ধে একই মিলিটারী বর্ডার রেজিমেণ্ট দল থেকে চারজন বুটধারী খেলোয়াড়কে অবশিষ্ট দলে স্থান দেওয়াতে মনোনয়ন কমিটি যে কতখানি ভুল করেছিলেন তা খেলা দেখেই বোঝা গেছে। জন্ লামসডন ও জোসেফ অবশিষ্ট দলে নির্ব্বাচিত হয়েও কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন। অবশিষ্ট দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে বলের আদান প্রদান এবং বুঝাপড়ার কোন লক্ষণই ছিল না। রহিম ২টি, করিম ও সাবু যথাক্রমে একটি ক'রে গোল দেন। টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৪৫০০ টাকা।

মহমেডান দল :—আলিহোসেন; সিরাজুদ্দিন ও জুম্মা খাঁ; নাইম, রসিদ খাঁ ও বাচ্চি খাঁ; নুরমহম্মদ (জুনিয়ার), রহিম, রসিদ, সাবু ও করিম।

অবশিষ্ট দল :—ডি সেন (ইষ্টবেঙ্গল); র‍্যানসন (বর্ডার রেজিঃ) ও পি চক্রবর্ত্তী (মোহনবাগান); এ নন্দী (ইষ্টবেঙ্গল) জুম্মান (ভবানীপুর), কক্স (বর্ডার রেজিঃ), বাটার্সবাই (বর্ডার রেজিঃ), গ্রেভস (বর্ডার রেজিঃ); ডি ব্যানার্জ্জি (এরিয়ান্স), জে মিলস (পুলিশ) ও এস নন্দী (ই বি রেলঃ) রেফারী—সি এস এম টেলার

জুনিয়র ইণ্টার ন্যাশানাল ফুটবল ঃ

ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় দলের সপ্তদশ বার্ষিক জুনিয়ার ইণ্টার ন্যাশানাল ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল ১-০ গোলে ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করেছে। ভারতীয় দলের জয়লাভ ন্যায়সঙ্গত হ'লেও খেলাটি প্রথম শ্রেণীর হয়নি এবং বেশীর ভাগ সময়েই বৃষ্টির জন্য খেলা মন্থরগতিতে চলতে থাকে। ইউরোপীয় দলের গোলটির জন্য গোলরক্ষক লসন দায়ী। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে জর্জ্জটেলিগ্রাফের এস হোসেন গোলটি করেন। ১০।৮।৪০

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাঙ্গামাটীর পথ"—২৷৷৹
কালীপ্রসন্ন দাশ প্রণীত উপন্যাস "ঘাতপ্রতিঘাত"—২৷৷৹
শশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "স্বর্গাদপি গরীয়সি"—২৲
শশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহন"—২৲
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ডাক্তার"—১৸৹
ভূপেন্দ্রকিশোর বর্ম্মণ প্রণীত উপন্যাস "অজানার সন্ধানে"—১৷৹
গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মরম দেউলে"—১৲
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "যৎকিঞ্চিৎ"—১৷৷৶৹
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "লালাসাহেব"—৷৷৹
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "একাদশ অবতার"—৵৹
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "ছাপ্পড়-ফাড়া দান"—৸৹
কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "হামজুল্লি"—২৲
ইন্দিরা দেবী প্রণীত "নির্য্যাতিতা ধরিত্রী"—৸৶৹
শিশিরকুমার মিত্র সম্পাদিত "ইটালীর শ্রেষ্ঠ গল্প"—১৲
অনাথগোপাল সেন প্রণীত "কর-নীতি"—১৷৹
হৈমীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "পল্লীর বুকে"—১৷৹
প্রসাদ বসু প্রণীত "সঙ্গীত সরণি"—৷৹
ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য ও ভবানী দেবী সম্পাদিত 'ঋতু সংহার"—১৷৹
প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "যক্ষ্মা চিকিৎসা" (১ম খণ্ড)—২৷৷৹
শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত "গান্ধী সমাধিপত্রাবলী"—৷৹
আশুতোষ সান্যাল প্রণীত নাটক "বন্দিনী"—১৲
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "আগামী কাল"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী ২১ আশ্বিন হইতে ৺দুর্গা পূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের আশ্বিন সংখ্যা ২০ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর এবং কার্ত্তিক সংখ্যা ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কাপি আশ্বিন জন্য ৮ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট এবং কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পরে আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

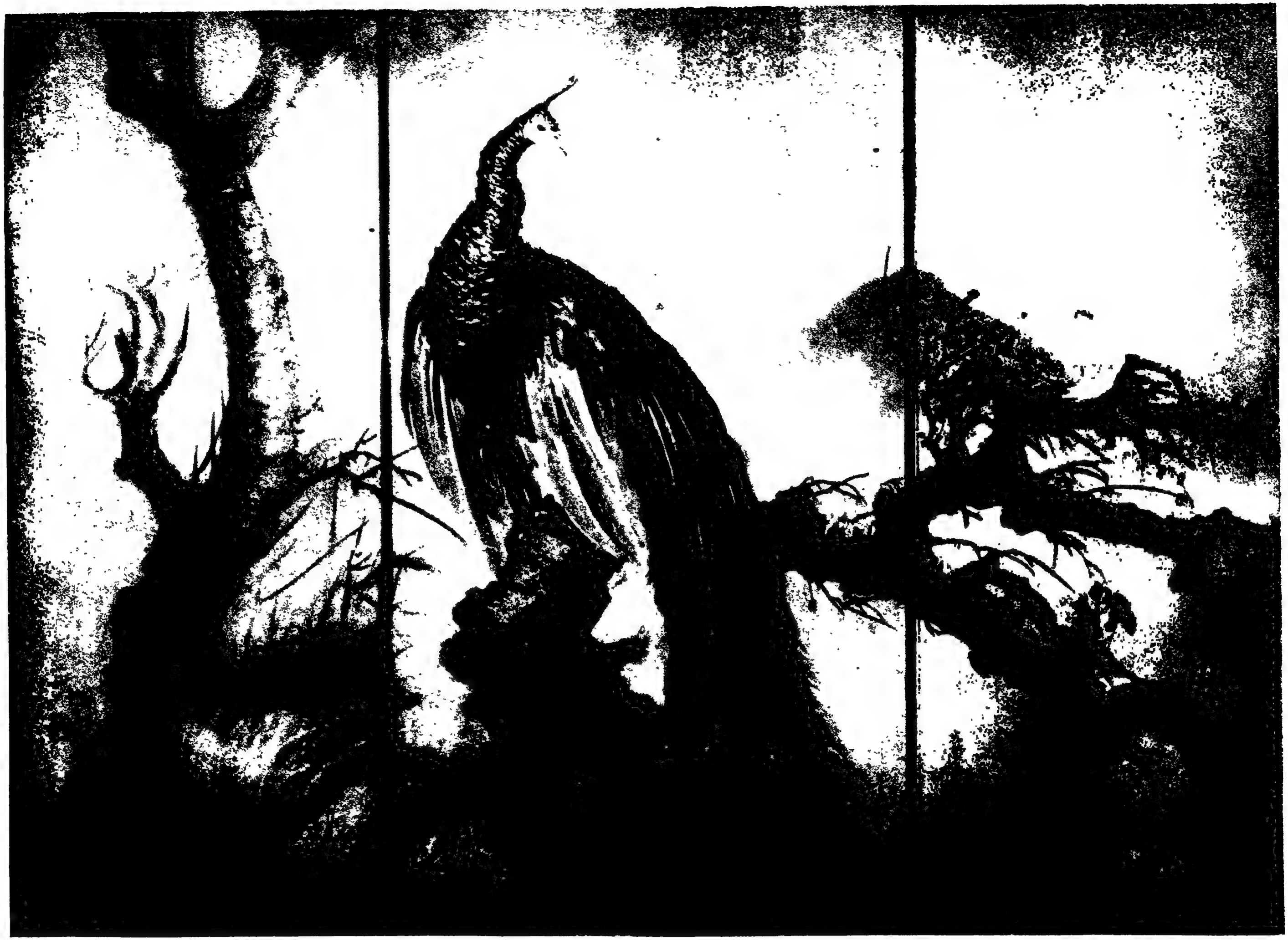

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রতীক্ষা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৪৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

উপনিষদ নির্ব্বাচন

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস

কোন্ উপনিষদ কোন্ যুগের, সে নিয়ে অনেক মতদ্বৈধ আছে। সংক্ষেপে সেগুলি এখানে বিবৃত করিতেছি।

ডয়সেনের মতে প্রাচীন উপনিষদগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম আসে প্রাচীন গদ্যে লেখা উপনিষদ। যেমন—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌশিতকী ও কেন। দ্বিতীয় ভাগে আসে কবিতায় লেখা উপনিষদ, যেমন—ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর। তারপর আসে পরবর্ত্তীকালের গদ্যে লেখা উপনিষদ, যেমন—প্রশ্ন ও মৈত্রায়নী। উইণ্টারনিৎজ উপনিষদের যে বিভাগ করেন তাও মোটামুটি ডয়সেনেরই অনুরূপ। ডাঃ দাশগুপ্তের মতে শঙ্কর যেগুলির উপর ভাষ্য লিখেছেন সেইগুলিই প্রধানত প্রাচীন এবং আসল উপনিষদ। রাধাকৃষ্ণনের মতে মোটামুটি ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌশিতকী, কেন, ঈশ ও মাণ্ডুক্যই প্রাচীন এবং বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের এখন প্রাচীন ও নকল উপনিষদের মধ্যে বিভাগ ক'রে দিতে হবে। সকল দার্শনিকের মতেই প্রাচীনতার একটি লক্ষণ হল গদ্যরূপে রচনা। এটিকে আমরা একটি প্রাচীনতার লক্ষণ বলে গ্রহণ করতে পারি।

কিন্তু তাকে আমরা একেবারেই অভ্রান্ত লক্ষণ বলে গ্রহণ করতে পারি না। বৃহদারণ্যক উপনিষদ সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে প্রাচীন উপনিষদ। কিন্তু তার মধ্যেও কতক অংশ কবিতায় রচিত (চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ থেকে ২১ ব্রাহ্মণ)।

এই ভাষার সম্পর্কে যেটি আমাদের সব থেকে প্রাচীনতার প্রমাণ-হিসাবে নির্ভরযোগ্য হবে, সেটি মনে হয় ভাষার ধরণ-হিসাবে। আমরা জানি, উপনিষদগুলি

সাধারণত সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত, বৈদিক ভাষায় নয়। তবু বেদের অংশ-হিসাবে বেদের সমযুগে রচিত হওয়ার জন্যই হোক বা বেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকা হেতুই হোক, প্রাচীন উপনিষদে অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক ভাষায় অনুমোদিত কথার ব্যবহার পাই। এরকম ঘটা খুবই স্বাভাবিক। সম্ভবত বৈদিক যুগে রচিত হওয়ার জন্যই বেদের ভাষার ব্যবহার হয়ে থাক্‌বে। এই অনুমানকে যদি গ্রহণ করা যায়, তা হ'লে এই বৈদিক ভাষার বা কথার প্রয়োগ উপনিষদের প্রাচীনতার একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ হবে। সুতরাং যে উপনিষদে এইরূপ বৈদিক ভাষার প্রয়োগ পাব সেই উপনিষদকে প্রাচীন ব'লে আমরা গ্রহণ কর্‌তে পারি। এই সম্পর্কে এক বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়্‌বে। উপনিষদে বৈদিক ভাষার প্রয়োগ এইরূপে হওয়া সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে বৈদিক সূত্রের সোজাসুজি উল্লেখও হয়ে থাকে। সেখানে কিন্তু এই বৈদিক ভাষার প্রয়োগ তার প্রাচীনতার লক্ষণ-হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, তার কারণকে স্পষ্ট করবার প্রয়োজন হবে না। অপর পক্ষে, উপনিষদের রচনার অঙ্গ-হিসাবে অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ত আকারে বৈদিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সেস্থলে সত্যই সেটি উপনিষদের প্রাচীনতার প্রমাণ। এখন আমরা এর কয়েকটি উদাহরণ দেব।

ঈশ উপনিষদ প্রাচীন বলে গণ্য হয়। তার একেবারে সর্ব্বশেষের শ্লোকটি অগ্নির উদ্দেশে বৈদিক ভাষায় লেখা একটি প্রার্থনা।

অগ্নে নয় সুপথারায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান ॥ ··· ··· ··· ··· ॥১৮॥

কেন উপনিষদ কবিতায় লেখা, তবুও তাকে প্রাচীন বলে গণনা করা হয়ে থাকে। এতে বৈদিক ভাষার প্রয়োগ আদৌ পাওয়া যায় না, বরং পৌরাণিক যুগের এক দেবী উমা হৈমবতীর উল্লেখ আমরা তাতে পাই। এই হিসাবে দুটি প্রমাণ তার প্রাচীনতার বিপক্ষে গেলেও তার প্রাচীনতাই ইঙ্গিত করে। প্রধানত সে প্রমাণ হল এই যে, তা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত সমর্থন করে না এবং দ্বিতীয়ত দার্শনিক মনোবৃত্তির যা লক্ষণ তা এতে বহু পরিমাণে বর্ত্তমান।

প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই তিনটি উপনিষদের অভ্যন্তরে আমরা কোন বৈদিক ভাষার প্রয়োগের প্রমাণ পাই না। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই আরম্ভে যে শান্তিপাঠ ব্যবহার করে, তা একই এবং সেই শান্তি পাঠে আমরা বৈদিক ব্যাকরণসিদ্ধ পদের প্রয়োগ পাই। শান্তি-পাঠটি এইরূপ :

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং
পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ ॥ ··· ···

ঐতরেয় উপনিষদের আরম্ভেই আমরা একটি বৈদিক কথার প্রয়োগের উদাহরণ পাই। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিংচন মিষৎ ॥ স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ ব্রাহ্মণের ৬নং রচনায় আমরা এই বৈদিক কথাটির প্রয়োগ পাই : "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদ স্যামৃতং দিবীতি।" এটি পুরুষ সূত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাচীনতার অন্য লক্ষণও বর্ত্তমান আছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম অংশেই ঈশ উপনিষদে অগ্নির বিষয় বৈদিক ভাষায় যে প্রার্থনাটি আছে তা উদ্ধৃত আছে। শুধু তাই নয়, এই উপনিষদে অন্যত্রও বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে বৈদিক ভাষাতেই আরও উক্তি আছে। প্রমাণ-স্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের উনিশ সংখ্যক রচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হি অস্য হরয়ঃ শতাঃ" এটিও ঋগ্বেদের এক সূক্ত থেকে উদ্ধৃত একটি অংশ (১)।

শঙ্করের দ্বারা ব্যাখ্যাত একাদশটি উপনিষদের বাকি রইল আর দুটি—কঠ ও শ্বেতাশ্বতর। এই দুটি উপনিষদেও আমরা বৈদিক ভাষার প্রয়োগ পাই। কঠ উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ সংখ্যক শ্লোকটি এইরূপ : "গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত এতদ্বৈতৎ ॥"

কিন্তু তা ভিন্ন তাদের প্রাচীনতার বিপক্ষেও আমরা কিছু কিছু প্রমাণ পাই। সেই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যেন ইঙ্গিত করে যে, এই দুটি উপনিষদ সমকালের। সেই

---

(১) ঋগ্‌বেদ, ৬।৪৭।১৮

কারণে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা একসঙ্গে করা যুক্তিসঙ্গত হবে। উভয় উপনিষদই গদ্যে লেখা নয়, পদ্যে রচিত। সুতরাং অতি প্রাচীনতার যে একটি লক্ষণ, তা এখানে বর্ত্তমান নয়। দ্বিতীয়ত, অন্য একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করবার এই যে, এই দুটি উপনিষদই বেশ বেশী রকম সাংখ্য ও যোগমতের প্রভাববিশিষ্ট। এটা নিশ্চিত ঠিক যে, অতি প্রাচীনকালের উপনিষদ বৈদিক যুগের জিনিষ। সুতরাং সে সময় ভারতীয় ষড়্দর্শনের উৎপত্তি হয় নাই, ভারতীয় ষড়্দর্শন তার পরবর্ত্তী যুগের জিনিষ। এক্ষেত্রে এই দুইটি উপনিষদে যদি এমন কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্যযোগের সঙ্গে তাদের পরিচয় প্রমাণ করে, তা হ'লে তাদের অতিপ্রাচীনতা আর প্রতিপন্ন হয় না। কঠ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে সাংখ্যযোগদর্শনের 'অব্যক্ত', 'মহান' ও 'পুরুষের' আমরা ব্যাখ্যা পাই। (২) শুধু তাই নয়, গীতায় যে সব বচন পাই তারও কিছু কিছু এই উপনিষদে উদ্ধৃত পাই।

> হন্তাচেৎ মন্যতে হন্তুং হতশ্চেৎ মন্যতে হতম্।
> উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই শ্লোকটি এবং অন্য শ্লোক কঠ উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীতে স্থান পেয়েছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা কোন বৈদিক কথার প্রয়োগ পাই না। তার রচনাপদ্ধতিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বলে মনে হয়। এই উপনিষদের মধ্যে স্পষ্টই সাংখ্যযোগদর্শনের উল্লেখ আছে। তার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৩ সংখ্যক শ্লোকে আমরা পাই "তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" শুধু তাই নয়, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ যে সব মত প্রচার করেন তা সম্পূর্ণরূপে সাংখ্যযোগদর্শনের নিজস্ব মত। এই উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে "অজা-মেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ। অজোহ্যেকো জুষমানোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগাম জোহন্যঃ।"(৩) এখানে এক অজ হলেন পুরুষ এবং অন্য অজ হলেন প্রকৃতি; মোটামুটি এই উপনিষদটি যেন সাংখ্যযোগের মতের সঙ্গে বেদান্তের সর্ব্বেশ্বরবাদের একটা সামঞ্জস্য আন্‌তে চেষ্টা করেছে, এইরূপ মনে হয়। যাই হোক সাংখ্যযোগদর্শনের সঙ্গে তার পরিচয়, এই কথাই প্রমাণ করে. যে তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ, তাকে আসল খাঁটি উপনিষদ বলা চলে না। এইরূপ ধারণার সমর্থনে আমরা আরও একটি প্রমাণ পাই। সকল প্রাচীন উপনিষদই কোন-না-কোন বৈদিক শাখার সহিত সংযুক্ত, যেমন—বৃহদারণ্যক উপনিষদ বাজসেনেয় শাখার সৎপথব্রাহ্মণের অংশ, কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ কোন্ শাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

উপনিষদগুলির প্রাচীনতার আর একটি প্রধান লক্ষণ হল তা যে তত্ত্ব প্রচার করে তার প্রকারভেদ। এখানে বেদান্তদর্শনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। পরবর্ত্তীকালে যে ছয়টি দর্শন ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়েছিল তাদের মধ্যে বেদান্ত ব্যতীত অন্য সকল দর্শনগুলিই মোটামুটি দ্বৈতবাদ বা সৃষ্টির বহুত্ব স্বীকারের পক্ষপাতী। সাংখ্য ও যোগের মতে প্রকৃতিও বহু পুরুষ বা জীবাত্মার সাহচর্য্যেই এই দৃশ্যমান জগৎ গড়ে ওঠে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে দৃশ্যমান জগত রচিত হয়েছে বহু আত্মা ও বহু অণু দিয়ে। বহু অণুই হ'ল জড়-জগতের উপাদান। পূর্ব্বমীমাংসা ততখানি কোন দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করাবার চেষ্টায় নিজেকে ব্যাপৃত করেনি—যতখানি বেদের সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়ে নিজেকে জড়িত করেছে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও সূত্রের ব্যাখ্যা নিয়েই তার কারবার। একমাত্র উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনই অদ্বৈতবাদের পরিপোষক। আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করেছি যে, এই ব্রহ্মসূত্রের যে যে প্রধান ব্যাখ্যাগুলি আমরা পেয়ে থাকি, তারা সকলেই মোটামুটি অদ্বৈতবাদকে স্বীকার ক'রে নেন। শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বল্লভ এই কয়জনই এ বিষয়ে এক মত, যদিও এই অদ্বৈত বা একত্ববাদের সংগঠন বিষয়ে তাঁদের মত পরস্পরবিরোধী। একমাত্র মাধ্বাচার্য্যই অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন না এবং বহুত্ববাদের পরিপোষক। কিন্তু মাধ্বাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা উপনিষদের বাণী দ্বারা সমর্থিত হয় না। যে উপনিষদগুলির প্রাচীনতা সম্বন্ধে আমরা ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিমধ্যেই পেয়েছি, তাদের সকলের

---

(২) মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥ পুরুষান্ন ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥ কঠ, ১॥৩॥১১

(৩) শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫

মধ্যে অন্য বিষয়ে মতদ্বৈধ থাক্‌লেও একটি একটানা বড় সুরের পরিচয় আমরা পাই।

প্রাচীন উপনিষদগুলির এই প্রধান সুরটি হ'ল একত্ববাদের প্রচার। তারা সকলেই একবাক্যে এই কথাটিই বড় করে শোনাতে চেষ্টা করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যে বিশ্ব বহু ও নানার বিভাগে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, তা বিচ্ছিন্ন নয়, তা বিভক্ত নয়, তা একই শক্তির বিকাশ, তার মধ্যে একত্বের যোগসূত্র সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই কথাগুলির সমর্থনের জন্য আমরা এবার কয়েকটি উপনিষদের বচন এইখানে উদ্ধৃত করব। সকল বড় উপনিষদগুলিরই প্রধান সুর হ'ল এই যে, ব্রহ্ম সমগ্র সৃষ্টি ব্যেপে রয়েছেন, ব্রহ্মের বাইরে কিছু নেই। এই ব্রহ্ম থেকেই সকলের উৎপত্তি, এই ব্রহ্মেই সকলের স্থিতি এবং ব্রহ্মেই সকলের বিলোপ, এই ত হ'ল উপনিষদের অতি মূল কথা। ঈশাবাস্য উপনিষদ বলেন, "জগতে যা-কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত।" (৪) ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেন, "এই সমস্ত কিছুই হ'ল ব্রহ্ম, তাতেই তাদের জন্ম, পরিবর্দ্ধন এবং বিলয়।" (৫) মুণ্ডক উপনিষদ বলেন, "ব্রহ্মই অমৃত, আমাদের সম্মুখে ব্রহ্ম, পশ্চাতে ব্রহ্ম, দক্ষিণে ব্রহ্ম, উত্তরে ব্রহ্ম। ঊর্দ্ধ এবং অধঃ সর্ব্বত্রই সেই বরিষ্ঠ ব্রহ্ম বিস্তার করে রয়েছেন।" (৬) তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে আছে এই যে, "পুরুষে যিনি আছেন, আর এই আদিত্যে যিনি আছেন তাঁরা উভয়েই এক।" (৭) এমন কি, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মত তুলনায় অপ্রাচীন ও আধুনিক ভাবাপন্ন উপনিষদও এই একত্বের সুরকে একেবারে অস্বীকার কর্‌তে পারেনি। এই উপনিষদে আমরা পাই "যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি সমস্ত ভুবনের মধ্যে প্রবেশ করেছেন, যিনি ওষধি ও বনস্পতিতে আছেন সেই দেবতাকে নমস্কার।"(৮) উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নাই। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অক্লেশে করা যেতে পারে যে, মাধ্বাচার্য্যের বহুবাদ আদৌ প্রাচীন উপনিষদসম্মত নয়।

এই ধারণা যদি আমরা ক'রে নিতে পারি, তা হ'লে এই অবস্থা দাঁড়ায় যে বেদান্তদর্শনের এবং তথা উপনিষদ দর্শনের বিশিষ্টতা এই যে, তা সর্ব্বেশ্বরবাদী, অদ্বৈতবাদী। সেই অদ্বৈতবাদের প্রকারভেদ থাকতে পারে, কিন্তু মূলত তা অদ্বৈতবাদী। এই অদ্বৈতবাদের সুর সমস্ত প্রাচীন উপনিষদেই বর্ত্তমান, কিন্তু যা আধুনিক উপনিষদ, তাতে এ লক্ষণ বর্ত্তমান নয়। এমন কি, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ উক্তির আমরা কিছু কিছু আভাস পাই। পরবর্ত্তী উপনিষদে এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধতাই বিশেষ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রাচীন ও অপ্রাচীন উপনিষদকে পৃথক্ করতে একটি ধ্রুব লক্ষণ হ'ল—এই অদ্বৈত ও সর্ব্বেশ্বরবাদের সমর্থন।

মেকি উপনিষদগুলিতে যেমন এক পক্ষে প্রাচীন উপনিষদের সর্ব্বব্রহ্মবাদ এবং একত্ববাদ-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়, অপর পক্ষে তেমন তার পরিবর্ত্তে কতকগুলি নূতন মত স্থান পেয়েছে। পরবর্ত্তীকালের উপনিষদগুলিকে এই লক্ষণ দিয়ে হিসাব করলে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণী আছে, যেখানে যোগ শিক্ষা বা সন্ন্যাসের উপর অত্যধিক নজর দেওয়া হয়েছে এবং আর এক শ্রেণী আছে, যেখানে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতকে বিশেষ প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর উপনিষদের একটু বিস্তারিত আলোচনার এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সাংখ্য ও যোগদর্শনের দার্শনিক মত মূলত একই। বাস্তবিক বলতে, যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের দার্শনিকতত্ত্ব হুবহু গ্রহণ করেছেন, কেবল এইটুকু পার্থক্য নিয়ে যে, সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কিন্তু যোগ তা করেন। যোগের বৈশিষ্ট্য হ'ল তার দর্শন নিয়ে নয়। তার বৈশিষ্ট্য হ'ল মানসিক একাগ্রতা সঞ্চয়ের জন্য এবং মনকে সংযত করবার শক্তিসঞ্চয়ের জন্য উপায় অনুসন্ধান করা। মানুষের মনকে সংযত করবার প্রয়োজন হয় মানসিক চিন্তার সাহায্যের জন্য, মনকে সংযত করা মাত্রেই তার সার্থকতা লাভ হয় না। সংযম শিক্ষাটা মানুষের গৌণ উদ্দেশ্য, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সেই সংযম শক্তির সাহচর্য্যে বিজ্ঞান লাভ। মানুষ মই তৈয়ারী করে উপরে উঠ্‌বার জন্য, মই সুন্দর,

---

(৪) ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ॥১॥ ঈশাবাস্য

(৫) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি ॥৪॥৩॥১॥ ছান্দোগ্য

(৬) ব্রহ্মৈ বেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈ বেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥২॥১১॥ মুণ্ডক

(৭) যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসৌ আদিত্যে। স একঃ ॥২॥৮॥ তৈত্তিরীয়

(৮) যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু
যো বনস্পতীষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥২॥১৭॥ শ্বেতাশ্বতর

সুরূপ সুদৃঢ় করাতেই তার সার্থকতার সমাপ্তি হয় না, উপরে ওঠায় সেই মইকে কাজে লাগানতেই তা যথার্থ সার্থকতা মণ্ডিত হয়। মানুষ ব্যায়ামচর্চ্চা করে শারীরিক বলসঞ্চয়ের জন্য। সেখানে শারীরিক বল সঞ্চয় করা তার গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সেই শক্তিমান দেহকে কর্ম্মতৎপর করা। কর্ম্মক্ষমতাতেই শারীরিক বল ধারণের সার্থকতার পরিসমাপ্তি, কেবলমাত্র বল সঞ্চয়ে নয়। যোগ সাধনারও প্রয়োজন সেইরূপ শারীরিক মানসিক ক্ষমতা-বৃদ্ধি সাধনের জন্য। সেইটা তার গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ উদ্দেশ্য নয়; তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সেই দেহমনকে জ্ঞানসঞ্চয়ে নিয়োজিত করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমনি হয়ে থাকে যে, মানুষ মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র গৌণ উদ্দেশ্যকে নিয়েই ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। অনেকে মই চড়া অভ্যাস করতে গিয়ে সারাজীবন মই চড়েই কাটিয়ে দেন। উপরে ওঠা আর তাঁর হয় না। সেইরূপ ব্যায়ামবীর শরীরকে বলের আধার করেই সন্তুষ্ট থাকেন, কর্ম্মে সেই শরীরকে নিয়োগ কর্‌বার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যান। যোগী যোগ সাধনের দ্বারা শরীর ও মনের উপর নৈসর্গিকপ্রভাব অর্জ্জন ক'রেই ক্ষান্ত হন, জ্ঞান সাধনার পথে অগ্রসর হন না। কোন মানসিক বা শারীরিক বৃত্তির একপেশে পরিবর্জ্জন করতে গেলেই সাধারণত ফল দাঁড়ায় এই রকম।

সেই কারণে যোগী যোগাভ্যাসের উপরেই নজর দেন ষোল আনা। এই যোগশিক্ষা ভারতে যথেষ্ট প্রচার লাভ করেছিল এবং তার প্রভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ফলে অনেক যোগপন্থী সন্ন্যাসী নিজেদের মতকে সুপ্রচলিত করবার আশায় উপনিষদের আকারে তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। এইরূপেই পরবর্ত্তী কালে এক শ্রেণীর উপনিষদ উৎপন্ন হয়েছিল, যারা যোগাভ্যাসকেই মানুষের পরমার্থ বলে প্রচার কর্‌ত। এই শ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিত উপনিষদগুলিকে গণনা করা যেতে পারেঃ হংস, গর্ভ, পরমহংস অমৃতনাদ, অর্থবশিখা, বৃহজ্জাবাল, ক্ষুরিকা, তেজোবিন্দু, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, যোগচূড়ামণি, মণ্ডলব্রাহ্মণ, শারীরক, যোগশিখা, তুরীয়াতীত, অব্যক্ত, যোগকুণ্ডলী, জাবালদর্শন—এই আঠারখানি উপনিষদ। এদের সকলেরই এ বিষয়ে একমত যে যোগাভ্যাসই মানুষের পরমার্থ। হংস উপনিষদ বলেন যে, জন্মের পূর্ব্ব হতেই জীব জরায়ুতে বসে প্রতিজ্ঞা করে, "যদি যোনি হতে আমি মুক্তি লাভ করি আমি সাংখ্যযোগ অভ্যাস কর্‌ব।" (৯) বৃহজ্জাবাল উপনিষদ বলেন যে, যিনি যোগমার্গ অবলম্বন করেন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। (১০) বলা বাহুল্য যে, এই সকল উপনিষদগুলির যোগদর্শনের প্রতি অত্যধিক প্রীতিই তাদের অপ্রাচীনতা প্রমাণ কর্‌বার একটি উৎকৃষ্ট অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ।

এই যোগপন্থী সাধকরা যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, তারই সমস্থানীয় চিন্তাধারাই আমাদের দেশে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করে। যোগপন্থীদের যেমন উদ্দেশ্য হ'ল দেহ ও মনকে শাসনে আনা, সন্ন্যাসীদের তেমন উদ্দেশ্য হ'ল শরীর ও মনকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে নিরুদ্ধ করা। মানুষের মনের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি একটি স্বাভাবিক আসক্তি আছে। বিষয় ভোগের প্রতি ইন্দ্রিয়ও আকৃষ্ট হয়, মনও হয়। মন যখন হয় তখন ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প কিছুই তার থাকে না। সন্ন্যাসপন্থী দেখেছেন যে, এরকম ঘটলে চিত্তবিক্ষোপ হয়, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, কাজেই মানসিক একাগ্রতা-সাধনেই সন্ন্যাসপন্থীর চরম উদ্দেশ্য থাকে না। কেউ ইন্দ্রিয় সুখে তৃপ্তি বা শান্তি পান না, কেউ কোন বিশেষ মানসিক আঘাত হেতু বৈরাগ্য সাধনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। এই ধরণের সকল লোকদেরই তখন উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় যে কৃচ্ছ্র সাধন করব। তাঁদের কর্ত্তব্য তখন হয় ইন্দ্রিয়কে ভোগের বিষয় হতে সর্ব্বক্ষণে বিচ্ছিন্ন রাখা এবং মনের মধ্যে এমন এক বৈরাগ্য-ভাব সৃষ্টি করা, যাতে ক'রে মানসিক অবস্থা কৃচ্ছ্রসাধনের অনুকূল হয়। এই দুটি ব্যবস্থা করা হয় সাধারণত দুইটি উপায় অবলম্বন ক'রে। ইন্দ্রিয়ভোগে যে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, তা ক্ষণভঙ্গুর এই প্রতিপন্ন করা তাঁদের একটা বিশেষ চেষ্টা হয়। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়ের বিষয় যা-কিছু সুন্দর ও মধুর আছে, তাকে বিশ্রী কুৎসিত এবং অসুন্দর বলে প্রতিপন্ন ক'রে তার প্রতি মানসিক বিতৃষ্ণা জাগানর চেষ্টা হয়। মোটামুটি এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁদের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়—কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করা অর্থাৎ সকল প্রকার

---

(৯) 'যাদি যোগ্যাঃ প্রমুচ্যোঽহং সাংখ্যযোগমভ্যসে'—গর্ভ

(১০) 'শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধ্বা শক্তিসোমামৃতেন যঃ। প্লাবয়েদ্ যোগমার্গেণ সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।'—বৃহজ্জাবাল।

ভোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করা। এই নির্দ্দেশের সপক্ষে যত কিছু যুক্তি সম্ভব তাও তাঁরা প্রযোগ ক'রে থাকেন।

প্রাচীন উপনিষদ যে একেবারেই ইন্দ্রিয়সংযম বা মানসিক একাগ্রতার প্রয়োজন অনুভব কর্‌ত না এমন নয়। তবে তার সঙ্গে এই পরবর্ত্তী মনোভাবগুলির পার্থক্য হ'ল এই যে, প্রাচীন উপনিষদ এদের কোন দিন মুখ্য জিনিষ বলে গ্রহণ করেন নি; এদের প্রয়োজনীযতা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু এদের প্রয়োজনীযতা অতিরঞ্জিত করা হয়নি। মানসিক একাগ্রতাকে জ্ঞান অর্জ্জনেই নিয়োগ করা হয়েছে এবং যোগসাধনেই তা পর্য্যবসিত হয়নি। অপরপক্ষে, ঠিক সেইরকম ইন্দ্রিয়সংযমকে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে আদৌ আমল দেওয়া হয়নি।

এই সম্পর্কে কঠ উপনিষদের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কঠোপনিষদ বলেন যে, "যার অবিজ্ঞানে মতি হয় এবং মন চঞ্চল হয়—তার ইন্দ্রিয়গুলি, দুষ্ট অশ্ব যেমন সারথির বশ্যতা মানে না, তেমনি তার বশে আসে না। আর যে বিজ্ঞানে রত হয় আর মনকে সর্ব্বদা অবহিত রাখে, তার কাছে ইন্দ্রিয়রা বশে থাকে, যেমন ভাল অশ্ব সারথির বশ মানে।" (১১) এখানে লক্ষ্য কর্‌বার বিষয় এই যে, এখানে মানসিক একাগ্রতারই প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে, যোগ সাধনার প্রয়োজন বোধ তখনও জাগেনি এবং অপরপক্ষে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখ্‌বার কথা হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়কে বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ করবার প্রশ্ন এখানে আদৌ জাগেনি। অন্যত্র তৃতীয় মুণ্ডকের প্রারম্ভে মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, "সত্যের দ্বারা তপস্যার দ্বারা এবং সম্যগ্‌ অবধারণের দ্বারা এবং ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।" (১২) এখানে তপস্যা মানে যে নিরন্তর কৃচ্ছ্রসাধন নয় এবং ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ হ'ল অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা, তা এই মুণ্ডকের অষ্টম শ্লোকে ভালরূপেই পরিষ্কার হয়েছে। সেখানে বলা হয়, "চক্ষুর দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না, বাক্যের দ্বারাও নয়, অন্য দেবতার সাহায্যেও নয়, তপস্যা বা কর্ম্মের দ্বারা নয়, বিশুদ্ধ মন নিয়ে ধ্যান কর্‌লে পরে জ্ঞানের প্রসাদেই সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দেখা যায়।" (১৩)

---

(১১) কঠোপনিষদ, ৯।২।৫, ৬॥

(১২) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগজ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্॥ মুণ্ডক, ৩॥১॥৫

(১৩) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মনা বা॥ জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ মুণ্ডক, ৩॥১॥৮

লালন-প্রশস্তি *

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

বন্দি তোমারে ভক্তশ্রেষ্ঠ দীনের ঠাকুর লালনসাঁই
তোমার বিমল ভাবধারামাঝে এ-নীচযুগের বন্ধ নাই।
ভাঙিয়া কঠোর সমাজশাসন দলিয়া তুচ্ছ ধনের মান
কোলে তুলে নেছ ধনী নির্ধনে না গণি হিন্দু-মুসলমান।
আজিও পল্লী-বিটপী ছায়ায় তৃণাসনে বসি যখন শুনি
তোমার উদার উদাত্ত গান মৃত্যুবিজয়ী হে মহামুনি—
অতি হেয় মোরা স্বার্থপিশাচ আপনার পানে চাহি না কভু
তোমার সে গান মরমে পশিয়া কি যেন কি ভাব জাগায় তবু।
ক্ষণিকের তরে ভুলে যাই যত ক্ষুদ্র স্বার্থ হিংসা দ্বেশ
শুধু প্রাণে বয় আনন্দ বায়, থাকে না ক' মনে নীচতা লেশ।
গেছ তুমি দেব গেছ সাধি তব মর্ত্ত্যকর্ম পুণ্যব্রত
তব উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে লভিয়াছে পথ পাতকী কত!
তোমার জ্ঞানের 'রঞ্জন' আলো বহিরাবরণ করিয়া ভেদ
দেখায়েছে সদা নানাধর্মের শুদ্ধ আত্মা সত্য বেদ।
মানবমনের কলুষকালিমা নাশ যুগে যুগে সাধকমণি
বন্দি তোমারে সত্যনিষ্ঠ ত্যাগগরিষ্ঠ জ্ঞানের খনি।

* শিলাইদহে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ পল্লী-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে গীত লালনসা ফকিরের সহজ সরল অথচ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ গানগুলি কুষ্টিয়া অঞ্চলে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমাদৃত হইয়া থাকে।

গল্প ও উপন্যাস

আরোহণ ও অবরোহণ

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

যথোচিত চিন্তা করিয়া মহেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে প্রস্তাবিত কাজটি যদি করা যায় তবে তাহা অসমীচীন হয় না। মহেন্দ্রনাথ স্বয়ং চিন্তা করিয়াছেন—উপরন্তু তাঁর হিতৈষী বন্ধুগণও ঠিক্ তাঁরই মত যথোচিত চিন্তা করিয়া প্রস্তাবিত কাজে দুর্লঙ্ঘ্য আপত্তির কারণ কিছুই দেখিতেছেন না।

একটিমাত্র আপত্তির কারণ যা আছে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল তাহাই আপত্তিজনক এবং তাহা এই যে, প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে এক-ঘর কুটুম্ব কমিয়া যাইবে অর্থাৎ বাড়িলে বাড়িতে পারিত কিন্তু বাড়িবে না।

কিন্তু কুটুম্ব বাড়িবার কথায় একটা বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দই উঠিল ···

মহেন্দ্রনাথের বন্ধু দীনবন্ধু দত্ত বলিয়া উঠিলেন: ছোঃ! তারপর ঠোঁট বাঁকাইয়া একটু হাসিলেন এবং তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটির দৃষ্টি শাণিত করিয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক বলিলেন—কুটুম্ব বাড়িয়ে ত ঢের মজা হে! তিনটি কন্যা আর দুটি পুত্রের বিয়ে দিয়েছি—কুটুম্ব হয়েছে পাঁচ ঘর—শুন্‌তে ভারি মধুর, নয়? ঐ কুটুম্বদের আবার ডালপালা আছে—শাখাপল্লবে ছত্রাকার হয়ে সংসারময় ছড়িয়ে তাঁরা আমার মাথার উপর বিরাজ করছেন। মাথায় আমার তাপ লাগ্‌বার উপায় নেই। সুখ কত! ··· কুটুম্বের কেবল দাবি খাতির করো, আর যত পারো দাও আর খাওয়াও—বলিয়া দীনবন্ধু কুটুম্বিতা রক্ষার অর্থাৎ অন্যায় চাপের দরুণ একটি সশব্দ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সখারাম বলিলেন, ভারি একটা নিঃশ্বাসই ফেল্‌লে যে হে!

—তা ছাড়া আর উপায় কি! নিঃশ্বাসে যে শব্দ হয় তার বেশি শব্দ করতে পারিনে যে। না আছে কুটুম্বগণের মরণ, না আছে আমার মরণ।

দীনবন্ধুর এই কথায় হাসির শব্দ উত্থিত হইল।

দীনবন্ধুই পুনরায় বলিলেন, দিন-কাল যা দাঁড়িয়েছে, আর পাওনার দিকে মানুষের যেমন চোখ ফুটেছে তাতে কুটুম্ব যত কমে ততই সুখ।

কুটুম্বের সংখ্যাবৃদ্ধি যে নিছক্ আনন্দের কথা নয়, অতঃপর সবাই তা স্বীকার করিলেন।

কথাটা এই:

মহেন্দ্রনাথের দুটি কন্যা সতী এবং উষা যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া একই সঙ্গে বিবাহযোগ্যা হইয়াছে—সতীর বয়স উনিশ, উষার বয়স সতের; এবং মহিমগঞ্জের ইন্দ্রনাথবাবু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনোরঞ্জনের জন্য সতীকে দেখিতে আসিয়া উষাকেও পছন্দ করিয়া ফেলিযাছেন—দেখিবার আয়োজন করিয়া দেখেন নাই, তবু পছন্দ করিয়া আসিয়াছেন; পত্রে তিনি আরও লিখিয়াছেন যে তিনি তাঁর দুটি পুত্রেরই বিবাহ একই সঙ্গে দিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছেন—পূর্ব্বে অভিলাষী ছিলেন না, মেয়ে দুটিকে দেখিবার পর অভিলাষী হইয়াছেন; কারণ দুটি কন্যাই উত্তম, এমন কি অনুপম। মহেন্দ্রনাথের যদি অমত না থাকে তবে কথাবার্ত্তা চালানো যাইতে পারে এবং তদনন্তর যুগলবধূকে একত্রেই গৃহে আনয়ন করা যাইতে পারে ···

এই পত্র পাওয়ার পরই কুটুম্বের সংখ্যা-হ্রাসের অর্থাৎ সামাজিক বৃদ্ধি হানির আপত্তি চাঞ্চল্যকর হইয়া উঠার উপক্রম হইয়াছিল; মহেন্দ্রনাথ সামান্য দ্বিধাবোধ করিতেছিলেন, কিন্তু কুটুম্বগণের কিংবা ন্যূনকল্পে স্বীয় মৃত্যুকামনা করার সঙ্গে সঙ্গে একটি শোকনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু সে আপত্তি আর দ্বিধা প্রায় ভস্মীভূত করিয়া দিলেন।

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন—দীনবন্ধু নেহাৎ মিছে বলে নাই।

তারপর আলোচনা আর হিসাব করিয়া দেখা গেল, কন্যার বিবাহের মত বৃহৎ ব্যাপার অপেক্ষাকৃত সুলভে সম্পন্ন নিশ্চয়ই হয় যদি ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া দুটিকেই এক-সঙ্গে, সখারাম বলিলেন "পার করা যায়।"

ব্যয় হ্রাসের জায়-তফ্‌সিলও মুখে মুখেই খতাইয়া দেখা হইল ঃ

প্রীতিভোজ, বরানুগামী ভদ্রমহোদয়গণের আপ্যায়ন, গৃহে আত্মীয়সংগ্রহ প্রভৃতির খরচ দু বার বহন করিতে হইবে না—

দীনবন্ধু বলিয়া উঠিলেন—বিয়ে বাড়ীতে আত্মীয় স্বজন যারা আসে, বাপ্‌ রে ওঁদের খিদে কত ! ··· যাক্, তারপর ?

তারপর, চেষ্টা করিলে পণ প্রভৃতি কিছু কমানো যাইবে না এমন নয় ; কারণ, একই ব্যক্তির নিকট হইতে দুই পুত্রের জন্য দ্বিগুণ আদায় না করিয়া ভদ্রলোক দেড়া-মাশুলেই সন্তুষ্ট হইবেন আশা করা যায় ; কারণ চক্ষুলজ্জা সবারই কিছু আছে।

তারপর গার্হস্থ্য প্রীতি ও শান্তির উল্লেখ করিয়া তারাপদ বলিলেন, দুই ভগিনীর পরস্পরের মধ্যে যে প্রণয়বন্ধন বিদ্যমান্ জা সম্পর্ক দাঁড়াইলে তাহা দৃঢ়তর হইবে—তাহা না হইলেও সহসা তা ছিন্ন হইবে না ; কারণ ঈর্ষার উদ্ভব হইলে উহারা সংবরণ করিবে, কর্তৃত্ব লইয়া কলহ করিবে না এবং অপরিচিত ব্যক্তি নহে বলিয়াই সন্দেহের চক্ষে দেখিবে না ; পিতৃশাসনের ভয়েই ত্যাগ এবং আনুগত্য স্বীকারে কাহারও অনিচ্ছা প্রকাশ পাইবে না-- ইত্যাদি।

তারপর বিবেচনার বিষয় হইল, পারিবারিক উত্থান-পতন। উহা আছেই। একই সঙ্গে দুই ভগিনীর উত্থান-পতন ঘটিবে ; কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে বিবাহ হইলে তাহা ঘটে না—নিজের নিজের অদৃষ্টই প্রবল হইয়া থাকে ···

দীনবন্ধু বলিলেন, এ বিঘ্ন মারাত্মক নয়—দুই ভগিনী যদি সতীন হ'য়ে যায় তবে সেইটাই হয় ভয়ঙ্কর ; কিন্তু তাও লোকে দিত এবং বোধ হয় দিচ্ছেও।

শচীপতি বলিলেন—এ-ক্ষেত্রে পতনের কারণ কিছু দেখ্‌ছিনে-- উন্নতির লক্ষণই ষোল আনা। দু ভাইই বিশেষ শিক্ষিত, উপার্জ্জনে অক্ষম তারা কোনো দিনই হবে না। বাপের টাকা দু ভাগ হলেও ক্ষতি নেই—এক এক অংশে বিস্তর পাবে। ··· তার উপর ভেবে দেখ, ছেলের ধাপ্পাবাজ বাবা মেয়ের বাপ্‌কে ঠকিয়ে দাঁও মেরেছে, এ-দৃষ্টান্তও কম নয়—সম্পত্তি দেখায়, কিন্তু সে সম্পত্তি অন্যত্র আবদ্ধ ; ছেলে চরিত্রহীন। এমনতরো ঘটে না কি ?

—ঘটে। সবাই সমস্বরে স্বীকার করিলেন।

দীনবন্ধু লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—লাখো লাখো।

শচীনাথ বলিলেন—তবে ?

অর্থাৎ অভিজাত এবং ধন-সম্পন্ন আর নিষ্কলঙ্ক পরিবারে উভয় কন্যার বিবাহ দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছ কেন ?

মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী কালিদাসীর প্রাণে আনন্দ উত্তাল হইয়া কল্লোলিত হইতেছে ··· এই যোগাযোগ যে ঘটিতেছে তাহার কারণ মেয়েদের পয়, না পূর্ব্বপুরুষের পুণ্য, না দেবতার আশীর্ব্বাদ, না কি এ ? কালিদাসী চিন্তা করিয়া কূল পাইতেছেন না—

কিন্তু টাকা ; এইখানটায় একটু নরম হইয়া কালিদাসী বলিলেন—কিন্তু টাকার বেলায় কিছু ছাড়্‌বে ব'লে মনে হয় না। ছেলের কি পাইকারী দর আছে ?

মহেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—দাঁড় করাতে হবে। ছেলে দুটিই ভালো।

শুনিয়া কালিদাসীর নূতন করিয়া এত আনন্দ জন্মিল যে মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না—কথা এবং আনন্দ চোখের পথে উপচিয়া পড়িতে লাগিল ···

মহেন্দ্র জানিতে চাহিলেন, এখানে ওরা চুলোচুলি করে না ত ?

কালিদাসী বলিলেন—খেপেছ ! গলায় গলায় ভাব।

শুনিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহা সত্যই যে, ছেলে দুটিই ভালো—

ইন্দ্রনাথের বড় ছেলে মনোরঞ্জন কৃতিত্বের সহিত এম্‌. এ. পাশ করিয়া বছরখানেক্ হইল সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার বেতন পঁচাত্তর টাকা—দ্রুত পদোন্নতি হইবে, মুরুব্বিগণ আশা দিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র জ্ঞানরঞ্জন এম্‌. এ. পড়িতেছে—মেধাবী ছাত্র বলিয়া তার সুনাম আছে ; তারও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—মুরুব্বিগণ তাহাকেও পদান্বিত করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন ···

কালিদাসী এবং তাঁর সঙ্গিনীগণের বিশেষ আনন্দ এই যে, উল্টা কথা যে যতই বলুক, চাকরিতে দুধ-ভাতের বরাদ্দ অর্থাৎ যথার্থ শিক্ষার উপর লক্ষ্মীকান্ত ভগবানের সুদৃষ্টি এখনও আছে।

মনোরঞ্জন পিতামাতার প্রথম সন্তান। জীবজগতে স্ত্রীর চাইতে পুরুষের কলেবর বৃহৎ; শ্রী সম্বন্ধেও পুরুষই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া অনুমিত। পিতামাতার প্রথম সন্তান আকারে অবয়বে সামর্থ্যে মহত্তর হইলে তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের সিদ্ধি বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে; কারণ যৌবনের সহজ এবং আদিতম উল্লাস আর তেজ পূর্ণতম প্রভাব লইয়া দেখা দেয় প্রথম সন্তানের দেহেই। এই নিয়মের বশেই হউক, কিংবা দৈবাৎই হউক মনোরঞ্জন জ্ঞানরঞ্জনের চাইতে উৎকৃষ্টতর—

কিন্তু এদিকে দেখিতে ভালো ঊষা—মহেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা—দ্বিতীয়া কন্যা তাঁর তৃতীয় সন্তান। বড় মেয়ে সতীর বর্ণও খুবই উজ্জ্বল, সে-ও গৌরাঙ্গিনী; তবু একটুখানি ছায়া-ম্লানিমা যেন তার রঙের উপর আছে—তা লক্ষ্য করিবার মত নয়, কিন্তু আছে বলিলে তা অস্বীকার করা চলে না। ঊষার রং আরও সুশ্রী—মুখখানা আরও ভালো—ছাঁদে খুঁত নাই; কিন্তু সতীর মুখখানা একটু ভাঙা-ভাঙা-মত—চুপসে যাওয়ার আভাসটি হঠাৎ চোখে পড়ে না, কিন্তু মন দিয়া দেখিলে তা ধরা যায়। সতীর দৃষ্টি যেন ভাববঞ্চিত বহির্মুখ; ঊষার চক্ষু চমৎকার ভাবময়—নিবিড়পক্ষ্মের ছায়ার অভ্যন্তরে তার চক্ষু দুটি যেন মুকুলিত হইয়া আছে; তার নিবিড়তার চক্ষু দুটির দৃষ্টি তীরের মত ছুটিতে জানে না—মনে হয়, সে দেখিতেছে ভাসা-ভাসা ভাবে, যাহাকে দেখিতেছে তাহাকে প্রীতিসিঞ্চিত করিয়া। কেহ কথা বলিলে সেই কথা শুনিবার অপরূপ একটি ভঙ্গিমা তার আছে—চোখের এবং গ্রীবার; তার ঐ ভঙ্গিমাকে বাহন পাইয়া বক্তার বচন যেন সহজেই মনোরম হইয়া ওঠে। কিন্তু কণ্ঠস্বর সতীরই মধুরতর—আলাপের বেলায় তার ভীরু সুরকূজনের আবেশটুকু যেমন নিরীহ তেম্‌নি কোমল লাগে, আর তা প্রাণের অনুকম্পন দিয়া গ্রহণ করার মত। … সতীর চুল লম্বা বেশি, ঊষার চুল গাঢ় বেশি; কিন্তু সকলের চাইতে লক্ষ্য করিবার মত ঊষার পদপৃষ্ঠ—ঠিক্ ততটা মাংসল যতটায় শিরাজাল কেবল আবৃত হইয়া থাকে; ঐ সুন্দর পদপৃষ্ঠের ক্রমাবনতির শেষ হইয়াছে সুসজ্জ নখমালার প্রান্তে; একটি ক্ষীণ-কোমল রক্তাভ তার নখমালার শুভ্রতাকে ভারি সরস স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; অঙ্গুলিগুলি এমনি সুকুমার যে মনে হয়, দৈবাৎ কেহ স্পর্শ করিলে দেখিতে দেখিতে লজ্জাবতী লতার পল্লবের মত বুঝি তারা অনিচ্ছা আর অসুখের বেদনাভরে তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে; তার পায়ের গঠনলালিত্যের দরুণ মনে হয়, পৃথিবীর বুকে সে পা পাতিয়া দাঁড়ায় আপনার লোককে অশেষ প্রীতিভরে স্পর্শ দিবার মত করিয়া; সতী দাঁড়ায় আল্গা হইয়া; তার পা অত সুন্দর নয়—আঙ্গুলগুলি লম্বাটে। … সতীর ওষ্ঠাধর বিশেষত্বহীন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বা গ্লানিজনক কিছু নাই; কিন্তু ঊষার তা নয়—তার ওষ্ঠাধরে তার মনের বিলাসী স্তিমিত রূপটি ফুলের গায়ে আভার মত যেন প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। ওষ্ঠের মধ্যস্থলটি একটু বেশি বিস্তৃত, ওষ্ঠপ্রান্তবাহী বন্ধনীর মত সেই রেখাটি একটু বেশি স্পষ্ট, আর অধর একটু চাপা বলিয়াই বোধ হয় অমন মনে হয়।

অমনি ওদের রূপ—

এবং রূপের বিচার দুই ভগিনী মনে মনে করে বই কি! ঊষা নিশ্চয়ই জানে, দিদির চাইতে সে সুন্দরী …

প্রতিবেশিনীরা চোখে ঝাপ্সা দেখে না, আর তাদের রসনা অলস নহে—পানের ডাবর-বাটার সাম্‌নে বসিয়া মেয়েদের রূপের তুলনামূলক সমালোচনা তারা করিত …

"তোমার ঊষাই বোন্, দেখ্‌তে আরও ভাল।"

"সতীই বা মন্দ কি!" বলিয়া সতী এবং ঊষার মা কালিদাসী কন্যার রূপের গরবিনী হইয়া হাসিতেন; আর, একসঙ্গে চম্‌কিয়া উঠিতেন নয়নতারা, সুখময়ী, গুরুদাসী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীগণ …

অসহিষ্ণুভাবে পানের বাটায় একটা ঠেলা দিয়া অগ্রণী নয়নতারা বলিতেন, "মন্দ! মন্দ বল্‌বে কোন্ চোখখাগী! দেশ খুঁজে অমন আর-একটি কেউ আনুক্ দেখি"!—বলিয়া নয়নতারা পানের বাটা পুনরায় কোলের দিকে টানিয়া লইয়া নিঃশব্দে ধম্‌কাইতে থাকিতেন তাদের—যারা সতীর সম্বন্ধে ঐরূপ বিদ্রোহী মত্ প্রমাণাভাবসত্ত্বেও প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া সন্দেহ হয়।

রূপের দিক্ দিয়া সে-ই বড় এমন ব্যাখ্যামূলক উক্তি ঐ রকমে ঊষা অনেক শুনিয়াছে—বুঝিবার মত বয়স যখন হইয়াছে তখন হইতেই সে শুনিয়া আসিতেছে … কিন্তু সে নির্ব্বোধ নয়, অহংকার তার নাই—

সে বলে—দিদি, তোমার চাইতে আমি নাকি সুন্দর!—বলিয়া হাসিতে থাকে … যারা কাজের অভাবে ঐ অদরকারী বিচারের কাজে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া খায় তাদের মতের অকিঞ্চিৎকরত্বের উদ্দেশে সে হাসে।

সতী বলে: তা সত্যিই ত। তোর বিয়েও হবে তেম্‌নি খুব বড় ঘরে।

—তোমার বুঝি গরীবের ঘরে হবে?

গরীবের ঘর কল্পনাতেও আতঙ্কজনক বই কি!

সতী বলে: আচ্ছা ভাই, যদি দাঁত-পড়া বুড়ো হয়?

—তবে তোমার আগে আমি দেব গলায় দড়ি।

—আমার আগে মানে? আমি কি করব তা কি ক'রে জান্‌লি?

—কাঁদবে না?

হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সতী বলে: দূর! বলিয়া সে হাসে, উষাও হাসে।

কিন্তু বুড়ো বা গরীবের হাতে ওরা কেউই পড়িল না —একই ধনী ঘরের দুই ভাই মনোরঞ্জন এবং জ্ঞানরঞ্জনের সঙ্গে যথাক্রমে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল —কিঞ্চিদধিক দেড়া-মাশুলেই ইন্দ্রনাথ ওদের 'পার' করিয়া লইয়া গেলেন।

মুঠা মুঠা টাকা খরচ করিয়া মহেন্দ্রবাবু বৈবাহিক প্রভৃতিকে প্রকৃত সন্তোষ দান করিলেন … প্রাণভরা যুগপৎ দু'টি জামাই পাইয়া তিনি নিজেও সন্তুষ্ট হইলেন যথেষ্ট; আর মেয়েরা দুই বাসরঘরে ছুটাছুটি করিয়া ছুটাছুটির আনন্দে অস্থির হইয়া গেল এবং উঠানের এত মাটি ঘরে তুলিল যে তার ইয়ত্তা নাই।

দুটি বধূরই রূপলাবণ্য মনোমুগ্ধকর—ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী এত তৃপ্ত হইলেন যে, মনে হইতে পারে ঐ সূত্রেই তাঁদের পরমানন্দের সঙ্গে পরমার্থও লাভ হইয়াছে—তাঁরা ধন্য হইয়াছেন। লোকের মুখে প্রশংসা ধরিল না … মেয়েরা যেন জয়োৎসব সুরু করিয়া দিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল …

অর্থাৎ বধূদ্বয় আদৃত হইল যৎপরোনাস্তি —

এবং দেখা গেল গার্হস্থ্য কাজে উভয়েই সমান পটু, আদেশ পালনে সমান তৎপর, মুখের কথা আর আহ্বান সমান মিষ্ট; ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রীর আরও মনে হয়, বেশ হইয়াছে, বেশ সাজিয়াছে, যাবজ্জীবনের জন্য লাভবান হইয়াছি—আর, এত ভালবাসিতে ইচ্ছা করে যে তা বলিবার নয়—

অষ্টপ্রহরই ওঁরা গদগদ হইয়া থাকেন …

কিন্তু বউয়েরা চা খায় না; বলে অভ্যাস নাই। শুনিয়া ইন্দ্রনাথ দুঃখিত হইলেন—প্রিয়জন অকারণে আনন্দে বঞ্চিত হইলে যে দুঃখ জন্মে ইন্দ্রনাথের এই দুঃখ সেই দুঃখ।

বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনাথের পরিবার খানিক্ অগ্রগত পরিবার; তা-ই বলিয়া অসংযম কিছু নাই; কিন্তু ঘোম্‌টা দিয়া পরিবারেরই ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে অন্তরালের সৃষ্টি করা অযৌক্তিক এবং তাহার মূলে যে গুরু-লঘু-জ্ঞান থাকে তাহা অকারণ বলিয়াই তাঁর মনে হয় … এমন কি, কৌতুক জাগিয়া তাঁর একটু হাসিই পায় যখন তিনি ঘোম্‌টার কথা ভাবেন—আর মেয়েমানুষকে ভারি অপদার্থ ভীরু আর অস্বাভাবিক ক্রূর মনে হয় … ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া যাহাকে দূরে রাখা হয় সে হয়তো তাহার দরুণ একটা নিঃসঙ্গতার বেদনাই অনুভব করে …

এ-সব কথা তিনি প্রকাশ্যেই বলেন—

কিন্তু যা বলেন না তাহা এই যে, মনে হয় ঘোম্‌টা দেওয়া নারী যেন মনে মনে অবিরাম কলহে উদ্যত হইয়া থাকে; আর, ঘোমটার ইঙ্গিতে ইহাই সে ঘোষণা, এমন কি, স্বীকার করিতে চায় যে পুরুষের সঙ্গে প্রণয়িনী সম্পর্ক ছাড়া আর-কোন সম্পর্ক তার ঘটিতে পারে না; আর, পুরুষমাত্রেই নির্লজ্জ ত বটেই, দুর্বৃত্তও। পুরুষ সম্বন্ধে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া অধুনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিয়াছে এবং বিবর্জ্জিত হইতেছে …'

ইন্দ্রনাথ আরও বলেন যে, পারিবারিক মিলনের কেন্দ্রে থাকে চা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের নিজের কাজে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পর এবং ঘূর্ণন সুরু হইবার পূর্ব্বে প্রাতঃকালে চা-পান উপলক্ষে সকলের সমবেত হওয়ায় যে-আনন্দ আছে অন্য উপায়ে সে আনন্দ পাওয়া যায় না—

বলেন: অভ্যাস নেই, এই আপত্তি ছাড়া তোমাদের অপর কোনও আপত্তি নেই ত বৌমা?

—না। সতী ও উষা জানায়।

—তবে খেতে সুরু কর।

এম্‌নি করিয়া পুনঃ পুনঃ আহূত এবং অনুরুদ্ধ হইয়া

সতী ও উষা চা খাইতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু পুরুষবর্গের সম্মুখে যে ভারি লজ্জা করে!

কিন্তু সে-লজ্জাও তাদের ত্যাগ করিতে হইল—ইন্দ্রনাথ ডাকিয়া লইয়া আসরে বসাইয়া তাদের সে-লজ্জা ত্যাগ করাইলেন ···

সতী ও উষা দেখিল ব্যাপারটা ভালই। প্রত্যেকেরই মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ফিরাইয়া তাদের কৌতুকে আনন্দে রহস্যে উজ্জ্বল মুখ নিরীক্ষণ করা আর আনন্দের অংশ গ্রহণ করা নিজেরই আনন্দবর্দ্ধনের একটা উপযুক্ত উপায়—মন তাহাতে চমৎকার সরস হয়;—আবহাওয়াটা ভারি উপভোগ্য ···

কিন্তু তাঁদের চায়ের মজলিস টেবিলে বসে না—রান্নাঘরের পাশে যে খাবার-ঘর আছে সেই ঘরে সবাই পিঁড়িতে বসিয়া খান্—গৃহিণী চা বিতরণ করেন ···

ইন্দ্রনাথ ত রীতিমত আচমনই করেন—আর পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে ভোজ্য ও পানীয়ের মধুময় সারাংশ উৎসর্গ করিয়া দেন।

চা খাইতে খাইতে মনোরঞ্জন একদিন বলিল, মা যদি কোন কারণে কোন দিন অনুপস্থিত থেকে চা না দেয়, তবে আমরা কি ক'রে চা খাব তা'-ই মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাবি।

জ্ঞানরঞ্জন বলিল, বৌদি দেবে—মায়ের পরই বৌদি ···

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর স্থান মায়ের অব্যবহিত নীচে; কিন্তু মনোরঞ্জন আর কথা কহিল না—অনুমোদন করিয়া একটু হাসিলও না, যেন এই সেবাটুকু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার নেই, অথবা সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেছে ···

উষা ইহা লক্ষ্য করিল এবং পুলকিত না হইয়া পারিল না, কিন্তু পুলকের কারণটি এত অস্পষ্ট যে অলীক বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে—অত্যন্ত আকস্মিক বলিয়াই বোধ হয় মনে মনে তাকে স্বীকার করিতেও বাধিল ···

উষা তাকাইয়া দেখিল, সতী যেন একটু লজ্জা পাইয়াছে।

তার পরদিনই ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ছোট বৌমার একটা মত নিই। বলিয়া উষার দিকে চাহিয়া রহিলেন ···

উষা বলিল—ভালই হবে। বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারি কি-না দেখ্‌ব।

ইন্দ্রনাথের মনে হইল, এই সপ্রতিভ উত্তরটি প্রখর বুদ্ধির লক্ষণ। বলিলেন,—বুদ্ধি তোমার চমৎকার, সে-পরিচয় আমরা পেয়েছি; কিন্তু এ-টা বুদ্ধি খাটাবার বিষয় নয়, সংসারে থাক্‌তে হ'লে অনুকম্পার বশে ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য কি-না, সেই সম্বন্ধে তোমাদের একটা মত চাই। বড় বৌমা, তোমারও মত্‌টা দিও। আমার সঙ্গে তোমাদের মত মিল্‌লে বুঝব ··· বলিয়া ইন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন ··· ইন্দ্রনাথের ধরণই ঐ—কথার মাঝে হঠাৎ চুপ করিয়া যান্।

—কি বুঝ্‌বেন, বাবা? উষা জানিতে চাহিল।

—হ্যাঁ; না, তা নয়; তবে বুঝব যে, বিজ্ঞ জুরীর বিচারে চক্ষুলজ্জাই বড়, কি স্বার্থই বড়। গরীব একটি ভাড়াটে আমার ছিল, পাঁচ মাসের বাড়ী ভাড়া না দিয়ে সে অন্য বাড়ীতে উঠে গেছে। নালিশ করেছিলাম—ডিক্রী হয়েছে। এখন বল, ডিক্রী জারি দিয়ে তার ঘটি বাটি ক্রোক করব, না ছেড়ে দেব?

উষা তৎক্ষণাৎ বলিল—ছেড়ে দিন্।

—বড় বৌমা কি বল?

সতী হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া কি দেখিল কে জানে; বলিল—উঁ হুঁ, টাকা আদায় ক'রে ফেরত দিন্।

ইন্দ্রনাথ জানিতে চাহিলেন, কেন?

—সে সত্যিই দিতে অক্ষম কি-না তা নিশ্চয় জানা নেই; তার কুমত্‌লবও ত থাকতে পারে। শিক্ষা হোক্।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় উষাকেই সালিশ মানিলেন—ছোট বৌমা, কি বল?

উষা বলিল—এম্‌নি ক'রে শিক্ষা দিতে হ'লে যে লোকের অন্য কাজের আর অবসরই থাকে না। অন্যায় লোকে করছেই। অন্যায়ের দরুণ তাদের প্রত্যেককে শিক্ষা দিতে হ'লে—

বাকিটা কল্পনা করিয়া লইয়া সবাই হাসিয়া উঠিল ··

অন্যায়ের দরুণ অন্যায়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হইলে কি রকম একটা বিপরীত গোঁয়ারতুমির কাণ্ড অবিরাম চালাইয়া যাইতে হয় তাহারই ছবি যেন সহসা উদ্ঘাটিত হইয়া একটা পরিণত কৌতুকরসের সৃষ্টি করিল ···

সতী দেখিল, সমস্যার মীমাংসা করা হইল না—পূর্ব্বাপরের সামঞ্জস্য রহিল না—তাঁহার সঙ্গে কাহার মতের মিল হইল তাহা ইন্দ্রনাথ বলিলেন না—বালসুলভ চপল

একটা হাসির মধ্যে উষার জয়ধ্বনি করিয়া তাহাকে হাস্যাস্পদ করা হইল কেবল ···

সতী অত্যন্ত আহত হইল।

বিবাহের পর মাস তিনেকের মধ্যেই দুই ভগিনীর কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল যে বাড়ীর সকলকার আগ্রহ উষার প্রতিই বেশি। তুচ্ছ তুচ্ছ কথায়, কাজের ফরমাইসে, আহ্বানের বাহুল্যে, অর্থাৎ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বড়কে ডিঙাইয়া ছোটকে স্মরণ হওয়ায়, মনে হয়, নিতান্ত ভদ্রভাবেই ওঁদের সম্বিতে এবং উভয় বধূর মধ্যে যেন একটা মিষ্টতার তারতম্য লক্ষ্য এবং রক্ষা করা হইতেছে—খুব বেশি ভাল লাগা—আর তার চাইতে একটু কম ভাল লাগার অতি সূক্ষ্ম একটি ছেদ-রেখা উভয় বধূর মাঝখানে বসানো হইয়াছে। ইহা লইয়া ঘোরতর গর্ব্ব কি কলহ করা কি ইঙ্গিতেও অভিব্যক্ত করা কিছুমাত্র চলে না, কিন্তু মনটাকে খুশী কি খারাপ করিয়া রাখা চলে যথেষ্ট ···

বাড়ীর লোকের বিশেষ অপরাধ আছে বলিয়া মনে করা যায় না—ভাল লাগার ব্যাপারে মানুষের মন খেয়ালী না হোক্—অজ্ঞাতসারেই অত্যন্ত অবাধ, সেখানে তার অনিবার্য্য বিলাস; মনকে ধম্‌কাইয়া নিবৃত্ত করা যায় না—কর্ত্তব্য বুদ্ধির চাপ দিয়া দমন করা যায় না—ভাল লাগার আনন্দটুকু মানুষ কেবল অপরের মতামতের মুখ চাহিয়া নষ্ট করিতে চায় না। আবার এরূপ ক্ষেত্রে ইহাও সত্য যে, দৃষ্টির এই তারতম্য স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ হইয়া ধরা পড়ুক এ ইচ্ছাও কেহ করে না—চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে হয়তো লজ্জিতই হইবে ···

কিন্তু সতী কাহাকেও লজ্জা দিল না—

উষাকে একদিন বলিল—উষা, তোরই এ-বাড়ীর বড় বৌ হওয়া উচিত ছিল, আর আমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল অন্য কোথাও।

উষা যেন হঠাৎ বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—কেন, দিদি? দাদা কিছু বলেছেন?

ভাসুরকে উষা দাদা বলে।

উষার প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে সতীর চক্ষু নিষ্পলক হইয়া গেল—এ কি অন্যায় প্রশ্ন উষার? বলিল—তিনি কি বল্‌বেন? তোর কথার মানে আমি বুঝলাম না, উষা।

কিন্তু উষা ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্নের অপরাধ উপলব্ধি করিয়াছে; তার এ-বাড়ীর বড় বৌ হওয়া সম্বন্ধে বাড়ীর বড়ছেলে কি বলিতে পারে! যদি বলে তবে সে-বলা যে কত দোষের তার কি ইয়ত্তা আছে, না তা ক্ষমা করা যায়! ··· ভারি অপ্রস্তুত, ভারি কুণ্ঠিত আর ভারি বিষণ্ণ হইয়া সে বলিল—তুমি আমার ওপর রেগেছ দিদি; কিন্তু আমি ত কোন অপরাধ করিনি! আমি তোমার ছোট বোন্, এখানেও সেখানেও। তুমি ত জানই আমি বড় একটু উপর-পড়া ছট্‌ফটে মানুষ। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

আর কথা হইল না—

কিন্তু সতীর মনে হইল, একই বাড়ীতে দুই ভগিনীর বিবাহ একই দিনে না হইলে ভাল হইত। দুজনেই একসঙ্গে আসিয়া আসন লইয়াছে—পূর্ব্ববর্ত্তিনীর সম্মান আর প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ আসে নাই; জ্যেষ্ঠের গুরুত্ব আর তার দখল পাওয়ার অগ্রিম দাবি এখানে লক্ষিতই হয় নাই—একই পরিবার হইতে দুই সহোদরাকে বধূ করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তুলনাগত একটা স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত দ্রুত আর স্বতই আসিয়া পড়া অসম্ভব হয় নাই—আপন বোন্ বলিয়াই বেপরোয়া হইয়া কর্ত্তৃত্ব খাটানো যাইতেছে না—মাত্র দু বৎসরের ছোট বোনের নিকট হইতে বড় বোনের মর্য্যাদা আদায়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়াও যেন কঠিনই—আজন্মের পরিচয়ও কেমন একটা বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছে যেন ··· বাপের বাড়ীতে গুরুত্বে তারা ছিল প্রায় সমান সমান। অন্য ঘরের মেয়ে হইলে চক্ষুলজ্জার ব্যাপারেও যে-জোর খাটিত, হঠাৎ বড়-জা হইয়া ছোট বোনের প্রতি সে-জোর খাটে না এমন নয়, কিন্তু একত্র লালিত ছোট বোনের কাছে তা কৌতুকপ্রদ অবস্থা বিপাক-হিসাবে হাস্যকর হইয়া ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়—উষা হয়তো মনে মনে হাসেই—উষাই বড় হইয়া আছে, আর কোন কারণে নয়, উষার রূপ একটু বেশি, আর মুখ খানিক ধারালো বলিয়া।

সতী বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু মনের কথা কাহাকেও জানিতে দেয় না—জ্যেষ্ঠত্ব স্থাপিত করার সুযোগ খুঁজিবার মত অধীরতা তার নাই।

এই প্রথম ওঁদের আলোকময় সরল স্বচ্ছ চলার সঙ্গে গাঢ় একটা ছায়া পড়িল, যাহার শোচনীয়তা এমনি যে,

একটি সমগ্র দিন কাহার মুখে উচ্চ হাসি রহিল না। এই ঘটনার গুরুত্ব যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ওঁরা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন জ্ঞানরঞ্জনের কাতরতা দেখিয়া ···

জ্ঞানরঞ্জন এম্‌-এ পরীক্ষায় বসিয়াছিল—

সংবাদ আসিয়াছে, সে ফেল্ করিয়াছে।

দুর্দ্দৈব সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি একবার পড়িতেছে অদৃষ্টের এ-পিঠে, পরক্ষণেই পড়িতেছে অদৃষ্টের ও-পিঠে—তার এই দৃষ্টি কখনও বিরূপ, কখনও প্রসন্ন। তাঁরই কৃপায় এবং অত্যন্ত নিগূঢ় আর শুভ একটা যোগাযোগের ফলে মনোরঞ্জনের পদ-মর্য্যাদার সঙ্গে বেতন বাড়িয়া হইয়াছে একশো কুড়ি, অর্থাৎ প্রায় ডবল, এ-সংবাদও আসিল ঐ সংবাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—এবং দেখিতে দেখিতে উৎসাহের আর অন্ত রহিল না—

মনোরঞ্জন নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল।

জ্ঞানরঞ্জন ফেল্ করায় মনে অকস্মাৎ একটা ক্ষতিবোধ জাগিয়াছিল; মনোরঞ্জনের বেতনবৃদ্ধিতে সে ক্ষতিবোধ বিলুপ্ত হইয়া পুলক অন্তর আর দৃষ্টি ছাপাইয়া উৎসারিত হইতে লাগিল ···

ছেলেদের বাপ-মায়ের কথা আলাদা—তাঁদের সুখ দুঃখ আর অনুকম্পা যথার্থ আন্তরিক—ছেলের অকৃতকার্য্যতায় তাঁরা ছেলেকেই সান্ত্বনা দিবেন এবং ছেলের পদোন্নতিতে তাঁরা ছেলেকে অভিনন্দিত করিবেনই ···

কিন্তু বউয়েরা গেল অন্যদিক দিয়া—

পিতামাতা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করিলেন অদৃষ্টকে এবং কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিলেন ভগবানের প্রসন্নতাকে; সতী এবং ঊষা স্বীকার করিল উহাদের কৃতিত্বকে এবং তার অভাবকে; প্রশংসা অপ্রশংসাকে। একজনকে কাজের লোক এবং আর একজনকে অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তারা বক্র ছোট-বড়র ভেদ-দৃষ্টি লইয়া পথ ধরিল ···

সতী তাহার জ্যৈষ্ঠত্ব একটু জাহির না করিয়া পারিল না; বলিল—ঠাকুরপো ফেল্ করলেন কেন! করতেন কি! তোর দোষ না পড়ে, ঊষা!

ঊষা বলিল, করতেন কি তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আর, দাদার মাইনে বাড়ায় যেমন তোমার হাত নেই, ওঁর ফেল্ করায় তেম্‌নি আমার পরামর্শ নেই, প্রশ্রয়ও নেই।

সতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—তা জানি। তবু ··

—আমায় নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেন, আর আমি তাঁকে ছেড়ে দিতে না চেয়ে তাঁর ক্ষতি করেছি, এই ত তুমি বল্‌ছ? কি ক'রে তা জান্‌লে তুমি? আর আমাকে তোমার ধম্‌কাবার কারণটা কি?

সতী তেমনি অনুত্তেজিতভাবেই বলিল—সে যা-ই হোক্, তবু ফেল্ করার একটা অসম্মান ত আছেই। তোর উচিত ছিল ঠাকুরপোকে দূরে দূরে রাখা। ··· যাই। বলিয়া সতী চলিয়া গেল।

অসম্মানের কথায় ঊষা ভারি মলিন হইয়া উঠিল। দিদির তুলনায় তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—এই সম্মান তার প্রাপ্য, রূপের দরুণ প্রাপ্য, গুণের দরুণ প্রাপ্য। তাহার সম্মান আর স্বামীর সম্মান একাকার করিয়া লইয়া সে পরম পুলকিত হইত; কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপার ঠিক তা নয়। তার সম্মানের স্থান আর মূল আলাদা—তা কেবল ঘরে পাওয়া যায়; কিন্তু বাহিরের সম্মান আসে স্বামীর মারফৎ। এই সম্মান আদায় করিয়া লইয়া স্বামীর সহযোগে দিদি অভ্রান্তভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব আর জ্যেষ্ঠত্ব অনুভব করিয়াছে এবং করাইয়াছে—তাহাই সে জানাইতে আসিয়াছিল; আর তা এমন সত্য যে, অস্বাভাবিক উগ্রভাবে রীতিলঙ্ঘন না করিয়া তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—তার প্রতিবাদ করা চলে না।

অন্য ঘরে বিবাহ হইলে এই যন্ত্রণাটা সে পাইত না, ভাবিয়া ঊষা পিতার দুর্ব্বুদ্ধিকে আর নিজের অদৃষ্টকে আরও ধিক্কার দিল।

রাত্রে ঊষা স্বামীর কাছে জানিতে চাহিল—তুমি ফেল্ কর্‌লে যে?

জ্ঞানরঞ্জন যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা ঘৃণ্য অপরাধ করিয়াছে, ঊষার কথায় এম্‌নি একটা তীব্র ভর্ৎসনার সুর। কিন্তু জ্ঞানরঞ্জন তা ভ্রূক্ষেপ করিল না—সে জানে, স্বামীর লজ্জায় স্ত্রীরও লজ্জা এবং লজ্জা যে দেয় তার উপর অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। লঘুকণ্ঠে বলিল—অপরাধ যদি হ'য়ে থাকে তবে তার প্রায়শ্চিত্ত আজ রাত্রেই করব।

—তার মানে?

—ওদিকে মুখ ক'রে শুয়ে থাক্‌ব—তোমার উল্টো

দিকে—প্রাণ ফাট্‌ফাট্ কর্‌বে, সারারাত ঘুম হবে না, তবু অম্‌নি ক'রেই পড়ে' থাক্‌ব।

উষা বলিল—অকর্ম্মা লোকই ফাজিল আর বেহায়া হয় বেশি ···

কণ্ঠ অত্যন্ত কঠোর।

জ্ঞানরঞ্জন বলিল—গা'ল দিচ্ছ! বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আর বিস্মিত হইয়া রহিল। পরীক্ষায় ফেল্ করা এমন কি গর্হিত অপরাধ, আর তাতে এমন কি দুর্গতি ঘটিয়াছে যে স্ত্রীর মুখ দিয়া এমন তীব্র সুরে অসন্তোষের ভাষা নির্গত' হইবে! বাবা-মা-দাদা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; বলিয়াছেন, "ঘাব্‌ড়াসনে, মন একটুও খারাপ করিস্‌নে।" তার অকৃতকার্য্যতার প্রসঙ্গে তাঁরা কেবল ঐ কথা বলিয়াছেন; "ভাল করিয়া পড়।" বলিয়া আদেশ পর্য্যন্ত দেন নাই—তাহার বেদনা তাঁহারা অনুকম্পার চক্ষে দেখিয়া স্বাভাবিক বিবেচনার আর অপার স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু উষার মনে এমন কি আঘাত বাজিল যে সে সহ্য করিতে পারিতেছে না—তার এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি যে এমন মর্ম্মান্তিকভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করিয়াছে!

অতিশয় ভালমানুষ জ্ঞানরঞ্জন অতিশয় ম্লানচক্ষে আর অসহায়ের মত উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ···

কিন্তু তবু উষা তাকে আমল দিল না; বলিল—আমাকে রায়গঞ্জে যেতে দাও একবার।

রায়গঞ্জে উষার পিত্রালয়।

জ্ঞানরঞ্জন মুদ্রিত চক্ষু খুলিয়া একবার উষার দিকে তাকাইল; তারপর বলিল—মা আর বাবাকে বল। তাঁরা যেতে দেবেন হয়তো।

সকালবেলা যথারীতি চায়ের মজ্‌লিস বসিয়াছে—সকলেই উপস্থিত আছেন ··· ইন্দ্রনাথ আচমন করিয়াছেন—মনোরঞ্জন গল্প করিতেছে যে কোথাকার এক সাহেব বিষাক্ত সর্পের চাষ করিতে সুরু করিয়াছে—গরু ভেড়ার মত বাথান করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ সে পালন করে; উদ্দেশ্য, বিষ বিক্রয় করিয়া টাকা পাইবে—কিন্তু পাইলে হয়! বিষ নিংড়াইতে গিয়া ·· সর্পদংশনে প্রাণ হারাইতে পারে, এইরূপ মন্তব্য করার ইচ্ছাই বোধ হয় মনোরঞ্জনের ছিল—

কিন্তু উষা হঠাৎ মাঝখানে বলিয়া উঠিল—বাবা, আমি একবার রায়গঞ্জে যাব। পাঠিয়ে দিন্।

কণ্ঠস্বরে আর যা-ই থাক্, নববধূপযোগী নম্রতা নাই।

ইন্দ্রনাথ নড়িয়া উঠিলেন; বলিলেন—কেন বৌমা? হঠাৎ এ-ইচ্ছা হ'ল কেন?

এ-ইচ্ছার উদয়ের কারণ উষা কিছু দেখাইত কি-না কে জানে—কিন্তু সতী তাকে অবসর দিল না; বলিল—ঠাকুরপো ফেল করেছে বলে' উষা ভারি লজ্জা পেয়েছে।

—তা-ই নাকি? বলিয়া ইন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে সবাই হাসিতে লাগিলেন, এমনভাবে যেন এমনধারা ছেলে-মানুষী তাঁরা ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই।

কিন্তু উষা ক্রোধে চঞ্চল হইয়া উঠিল: দিদি তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—সে নীরব থাকিলেই পারিত! দিদি প্রতিশোধ লইতেছে—তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে দিদির অমানুষিক নির্ম্মম আগ্রহ দেখা দিয়াছে ···

তার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেই হাস্য সম্বরণ করিলেন; ইন্দ্রনাথ তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে বলিলেন—তা যেও মা, তোমার যেদিন ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে···

বলিতে বলিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন সতী অন্যদিকে চোখ্ ফিরাইয়া প্রসন্নচিত্তে হাসিতেছে, আর উষা তাহার দিকে তাকাইয়া আছে এম্‌নি করিয়া—যেন তুমুল কলহের পর সে এইমাত্র থামিয়াছে, কিন্তু ক্রোধ সম্পূর্ণ প্রশমিত হয় নাই ··· সকলে অবাক্ হইয়া গেলেন খুব।

পুলকে উচ্ছলকণ্ঠে সতী বলিল—বাবা, মাইনে বেড়েছে—একদিন দশজনকে ডেকে' ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া হোক্।

—বেশ, হোক্। ··· এবং তারপর সতীকেই সর্ব্বময়িত্বের দিকে আরও অনেকটা আগাইয়া দিয়া বলিলেন, ফর্দ্দ কর। একটা ছুটির দিনে—

বলিতে বলিতে ইন্দ্রনাথ দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন যে, এই মনোরম উল্লসিত পারিবারিক পরিধির ভিতর হইতে তাঁর ছোট বৌমা উষা ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া যাইতেছে ···

ভারতের খনিজ পণ্য

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতীয় পণ্যের পূর্ণ পরিচয় আজও হয় নাই ; কতদিনে হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিদেশীর প্রয়োজনে যাহা লাগিয়াছে, তাহার বিষয় লোকে অনেকটা জানিতে পারিয়াছে এবং তত্তৎ পণ্যের বাণিজ্যের একটা আনুমাণিক মূল্য স্থির করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কৃষিজাত পণ্যই প্রধান।

খাদ্যতণ্ডুলের মধ্যে প্রধান ধান্য বা চাউল এবং দ্বিদলের মধ্যে ছোলা ও মসূর, তৈজ বীজের মধ্যে চীনাবাদাম, নারিকেল, তিসি ও তিল, তন্তুর মধ্যে পাট তুলা, আবাদী ফসলের মধ্যে চা, রবার, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি পণ্য তালিকায় বিশেষ স্থান পাইবার যোগ্য। জীবজ পণ্য রেশম ও পশম তন্তু তালিকায় স্থান পাইয়া থাকে। তাহা ছাড়া লাক্ষা ও পশুচর্ম্ম বহু পরিমাণ রপ্তানি হইয়া থাকে। রঞ্জন কার্য্য বা "কষ্" ধরাইবার জন্য (tanning) নানা পণ্যের রপ্তানি আছে ; তাহা ছাড়া মূল্য উদ্ভিজ্জ ভেষজ পণ্য হিসাবে বিশেষ স্থান পাইয়াছে।

আমার মনে হয়, ভারতের বাণিজ্যে এই সকলের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলিই ক্রমে ক্রমে ভারতের রপ্তানি পণ্য তালিকা হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িবে। পাটের অনেক পরিবর্ত্ত জুটিয়াছে, দামে সস্তা বলিয়া এখনও ইহা টিকিয়া আছে ; ভারতীয় তূলার প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মিয়াছে দেশে দেশে ; ভারতীয় রেশম হার মানিয়াছে জাপানী রেশম ও রেয়নের নিকট ; নীল মরিয়াছে জার্ম্মাণীর কারখানায়-প্রস্তুত যৌগিক নীলের হাতে পড়িয়া ; বৎসরে দশ কোটী টাকার গম রপ্তানি এখন শূন্য হইয়া গিয়াছে ; লাক্ষার যৌগিক পরিবর্ত্ত বাড়িয়াছে, সুতরাং তাহার মহা বিপদ। এইভাবে ভারতীয় বহু পণ্যের বাণিজ্যের চরম হইয়া গিয়া এখন ক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে। ভারতবর্ষে এ সকল পণ্যের এখন চাহিদা থাকিলেও সস্তায় বিদেশী দ্রব্য পাইলে আমরাও ক্রমে আমাদের পণ্যের অবহেলা করিতে আরম্ভ করিব ; রেশম ও নীল ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে আমাদের ঠিক সেই কথা প্রযোজ্য নহে। যে সকল পণ্যের চূড়ান্ত বাণিজ্য হইয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইংরেজ পরিচয় করাইয়া না দিক, চর্চ্চা করিয়াছে, উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, নিজে লইয়াছে এবং অন্যান্য বিদেশীর চক্ষু ফুটাইয়াছে। এই সকল পণ্য তাহার সমক্ষে উপস্থিত ছিল এবং ইহাতে তাহার গুরু প্রয়োজনও ছিল ; সেই কারণে ইহারা জগতে ভারতের পণ্য হিসাবে আদৃত হইল। কিন্তু ভারতের খনিজ সে ভাবে পরিচয় লাভ করে নাই এবং ইহার জন্য যে তত্ত্বানুসন্ধান প্রয়োজন সে দিকে তাহার মন দিবার সময় ও সুযোগের অভাব ছিল। ভারতের লৌহ ও কয়লা না লইয়াই তাহার চলিয়াছে, সুতরাং প্রধান এই দুই খনিজ আমাদের দেশে আধুনিক বিরাট প্রয়োজনের অনুপাতে তখন উৎখাত হয় নাই। স্বর্ণের প্রয়োজন ছিল ; হয়ত তাহার অনুসন্ধান পূর্ণ মাত্রায় হইয়া গিয়াছে। ক্রমে এদেশে ইংরেজের ইঞ্জিন ও বড় কারখানা চালাইবার জন্য কয়লা প্রয়োজন হইয়াছে ; প্রথম প্রথম বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া ভারতের কয়লার অভাব মিটাইতে হইয়াছে, এখন ভারতীয় কয়লার উৎপত্তি কেন্দ্র হইতে অত্যন্ত দূর না হইলে আর বিদেশী কয়লা আমদানি করিতে হয় না।

ইংরেজ ভারতের খনিজের পূর্ণ সন্ধান না পাওয়ায় এক প্রকার মঙ্গল হইয়াছে। খনিজ পদার্থ কৃষিজাত পণ্যের মত নহে। ইহা উঠাইয়া লইলে তাহা আর ঐ জাতীয় খনিজ দিয়া পূর্ণ করা যায় না ; কিন্তু কৃষিজাত পণ্য প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে। সেই হিসাবে বিদেশীরা ভারতের খনিজ লইয়া না-যাওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ হইয়াছে। এখন ভারতের মধ্যে প্রচুর খনিজ দ্রব্য বর্ত্তমান থাকায় নানাপ্রকার শিল্প বাণিজ্যের প্রসার হওয়া সম্ভবপর হইয়া পড়িয়াছে।

তাহা ছাড়া ভারতের খনিজের অবস্থিতি সম্বন্ধে এখনও পূর্ণ-সন্ধান হয় নাই। এখনও বহু জিনিষ ভূগহ্বরে লুক্কায়িত আছে, যাহা ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এখন আর লৌহ প্রস্তর (ores) বা লৌহ মাক্ষিক (pyrites)-এর অভাব বোধ করিতে হয় না। স্থানীয় লোকের জানা থাকিলেও ভারতে ময়ূরভঞ্জের মাটীতে যে অফুরন্ত লৌহ আছে, তাহা শ্রদ্ধেয় মিঃ পি. এন. বসু মহাশয় জানাইবার পূর্ব্বে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে ম্যান্‌গ্যানিসের সেদিন পর্য্যন্ত বিশেষ পরিচয় ছিল না, কিন্তু কয়েক বৎসরেই জগতের মোট মাল সরবরাহে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষের বক্সাইট হইতে এ্যালুমিনিয়ম প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হইতেছে। বিহার অঞ্চলে যে পরিমাণ গন্ধকের "পাথর" ও তৎসঙ্গে ফেরোম্যান্‌গ্যানিসের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে উভয়বিধ পদার্থের জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশে প্রয়োজন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে সেই পরিমাণে গুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং অনেক পরিমাণে সফল হইতেছে। Monazite, Ilmenite, Zircon, Asbestos প্রভৃতি একে একে সবই পাওয়া যাইতেছে। ভারত হইতে ব্রহ্ম বিযুক্ত হওয়ায় ভারতের মোট হিসাব হইতে কয়েকটা নাম বাদ পড়িলেও ঐ সকল খনিজ ভারতবর্ষে সহজলভ্য হইয়া রহিল।

সাধারণতঃ তণ্ডুল, তৈলবীজ, তন্তু, আবাদীফসল, বনজ পণ্য প্রভৃতি বৎসরে কত পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্ণয় করা হয় না ; কেবলমাত্র বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ও মূল্যের হিসাব রাখা হয়। কিন্তু খনিজ সম্বন্ধে সরকারী হিসাবে ইহার কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রতি

বৎসরে কত খনিজ উঠে তাহার একটী আনুমাণিক হিসাব করা হয়। এই হিসাবে ১৯৩৮ সালেও ৩৪ কোটী টাকার খনিজ উঠিয়াছে, তন্মধ্যে একমাত্র কয়লার মূল্য ১১ কোটী টাকা ; কারখানায় প্রস্তুত নানারূপ লৌহ ১০ কোটী টাকার উপর, ম্যান্‌গ্যানিস, সোণা প্রত্যেকটী ৩ কোটী টাকার উ়পর ; পেট্‌্রলিয়ম, অভ্র, গৃহাদি নির্ম্মাণযোগ্য প্রস্তরাদি, লবণ প্রত্যেকটী ১ কোটী টাকার উপর, তামা প্রায় এক কোটী টাকা, ইলমেনাইট ও সোরা প্রত্যেকটী ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা, তাহা ছাড়া কায়েনাইট (Kyanite),, ক্রোমাইট, মোনাজাইট (Monazite), জিপসম, ষ্টিয়াটাইট, ম্যাগনেসাইট, সাজিমাটী (Fuller's earth) প্রভৃতি বহুপ্রকার খনিজ প্রত্যেকটী এক লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের উঠিয়াছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে ইহাদের দাম অনেক বেশী তাহা বলা বাহুল্য।

বাণিজ্যের হিসাব ধরিলে খনিজ ও খনিজজাত দ্রব্যাদি বহু কোটী টাকার আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। আমদানির হিসাবে ইহার মূল্য ন্যূনাধিক ৬২ কোটী টাকা। ইহাতে অসংস্কৃত খনিজ দ্রব্য কিছু নাই ; সাধারণের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ভারতবর্ষে কেবল প্রস্তুত দ্রব্যাদি দিয়া এই টাকা বিদেশী প্রতি বৎসর ঘরে লইয়া যায়। সাধারণ ব্যবহারের নানা-রকম যন্ত্রপাতি, পাম্প, ধাতব আলো বা ল্যাম্প, লোহার ট্রাঙ্ক, সিন্দুক এবং অন্যান্য নাতিবৃহৎ দ্রব্যাদি প্রায় ৩ কোটী টাকা ; বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তার প্রভৃতি দেড় কোটী টাকা ; বড় কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ১৯ কোটী টাকা ; কড়ি বরগা, angles and tees, ধাতব চাদর, (Speets) পেরেক, বোল্টনাট (bolts and nuts), পাইপ, ধাতব তার, দস্তা, সীসা প্রভৃতি মিলিয়া ১১ কোটী টাকা ; খনিজ তৈল প্রভৃতি ১৭ কোটী টাকা ; ধাতু নির্ম্মিত যানবাহন ৭ কোটী টাকা ; স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ৩ কোটী টাকা এবং অপরাপর নানাবিধ খনিজ পদার্থজাত দ্রব্যাদি প্রায় তিন কোটী টাকা মিলিয়া সর্ব্বসমেত ৬২ কোটি টাকা হইয়াছে।

রপ্তানির হিসাবে এখন প্রায় ২৫ কোটী টাকা পড়ে ; তন্মধ্যে এক স্বর্ণ রৌপ্য প্রায় ১৫ কোটী টাকা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে কেবল স্বর্ণ রপ্তানির পরিমাণ ৩০ কোটী টাকার উপর ছিল। অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে অসংস্কৃত খণিজ পদার্থ (বিশেষতঃ manganese ore) ৫ কোটী টাকা, কয়লা ও অভ্র প্রত্যেকে ১ কোটী টাকার উপর এবং সোরা, ছোট যন্ত্রপাতি, খনিজ মোম (paraffin wax) মিলিয়া কিঞ্চিন্ন্যূন ১ কোটী টাকা দাঁড়ায়।

জগতের খনিজের বাজারে ভারতবর্ষের স্থান একেবারে নগণ্য না হইলেও খুব বড় নয়। বহু দেশে ভারত-বাণিজ্যের বহুগুণ মূল্যের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া বিদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখন উপযুক্ত সময় আসিয়াছে এবং অব্যবহৃত ও কতক পরিমাণ অজ্ঞাত খনিজ দেশে রহিয়াছে। বর্ত্তমানে বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০ কোটী টাকাও নহে ; সেই তুলনায় ভারতবর্ষে তস্তর বাণিজ্য খনিজ হইতেও বিরাটতর। ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তাহার মধ্যেও খনিজ সংক্রান্ত শিল্প অপেক্ষা অন্যান্য বৃহদাকার শিল্প সংখ্যায় অনেক বেশী। অসংস্কৃত খনিজ (ores) হইতে ধাতু উদ্ধার করিয়া ব্যবহারের যোগ্য রূপ দিবার জন্য বড় কারখানা সংখ্যায় নগণ্য বলিলেও হয়। কিন্তু এদিকে লোকের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং উন্নতির আশা ফুটিয়াছে। ধাতুর উদ্ধার সহজ হইলে আজিকার সভ্য জগতে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই ভারতবর্ষে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। প্রতি দেশকেই কোনও না কোন কাঁচা মালের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় ; সে হিসাবে অনেক দেশ অপেক্ষা ভারতের সুযোগ খুবই বেশী। তাহার উপর যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা সুবিধামত বিদেশ হইতে আমদানি করার কোনও দোষ নাই।

অন্যান্য সকল বিদ্যা অপেক্ষা খনি, খনিজ দ্রব্য এবং তাহা রূপান্তর করিবার বিদ্যার অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আশা হয় এদিকে কর্ত্তৃপক্ষদের সুনজর পড়িবে।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে আজকাল খনিজ লইয়াই জগতের যত মারামারি। প্রথম, তৈল ও লৌহ, পরে তামা, সীসা, দস্তা ও গন্ধক, এবং মৃত্তিকা-সার বা ফস্ফেট, নাইট্রেট ও পটাস এবং সঙ্গে সঙ্গে নিকেল, ম্যান্‌গ্যানিস, ভ্যানাডিয়ম, ক্রোমাইট, টংষ্টেন, ফ্লাওয়ারস্পার প্রভৃতি খনিজ নিজ আয়ত্তে রাখিবার জন্য জাতিতে জাতিতে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যুদ্ধের সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ, যান প্রভৃতি নির্ম্মাণে ত খনিজের প্রয়োজন আছেই, তাহা ছাড়া যুদ্ধকালে এই সকল পাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় বলিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই খনিজ সংগ্রহের প্রবল চেষ্টা চলিতে থাকে।* অনেকে মনে করেন সকল জাতির যদি খনিজ পাইবার সমান সুবিধা থাকে, তাহা হইলে জগতে এত দ্বেষ থাকে না ; ইহার সহিত অবশ্য জাতির প্রয়োজনের অন্যান্য কাঁচা মালের কথাও ধরিয়া লওয়া যায়। যদি কোনও দেশে খনিজের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা শক্তিশালী লোকে যাহাতে দখল করিয়া নিজ কাজে লাগাইতে পারে তাহা প্রমাণ করিবার করিবায় জন্য দার্শনিক তত্ত্বের অভাব নাই।

---

* The motives of this great political movement (spread of national political controls) vary widely in time and place, but common among them are the fear of future shortage, the fear of being crowded into disadvantageous commercial position by other nations, the fear of being caught without supplies in case of war, the desire to secure and retain markets for mineral surplus, and the desire in general to get as large a return to the nation as possible, through development and royalties and through encouragement to smelting and manufacturing designed to keep the profit at home."—C. K. Leith in "World Minerals World Politics,"

বলা বাহুল্য "বহুর কল্যাণ" যুক্তি হইতে যে কোনও উপায়ে এই সকল খনিজ উপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া আছে।*

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই যুক্তি কোনও প্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারে না। এখানে তাহার খনিজকে সর্ব্বপ্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য ব্যবসায়ী বণিক ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলে অতি সত্বর খনিজ শিল্প নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

---

* The claim of an indigenous population to retain indefinitely control of territory depends not upon a natural right, but upon political fitness ..…shown in the political work of governing, administering and developing in such a manner as to ensure the natural right of the world at large that resources should not be left idle but be utilized for the general good. Failure to do this justifies in principle compulsion from outside; the position to be demonstrated in this particular instance, is that the necessary time and the fitting opportunity have arrived.—A. T. Mahan, —"Problem of Asia."

সেই রূপ

শ্রীমতী সাহানা দেবী

দুয়ারে তোমার রেখে গেছে এঁকে অনন্ত রূপটীকা,
তাই সুদূরের পার হ’তে ভাসে তোমারি অগ্নিলিখা ;
তোমার প্রাণের স্বরূপ খুলিয়া
অরূপের শশী ওঠে যে দুলিয়া
রূপজালে তার নিশি আকুলিয়া
সুন্দর হৃদি মেলে,
লগনে লগনে রূপালি ছায়ায় গগনের মায়া খেলে।

দূর হ’তে দূরে নিয়ে যায় সেই লগ্নের আহ্বান,
পার হ’তে পারে ভেসে ভেসে চলে পার-অন্তের গান ;
সে যে গো তোমার অতল তিমিরে
গোপনে ঝলসি তোলে স্বপনীরে,
স্বপ্নমাখানো সে নয়নতীরে
পরাণ পলক হারা !
আপনার পারে ঝলি’ আপনারে জ্বলে সে নয়নতারা।

একে একে যায়, ঝ’রে ঝ’রে যায় কামনার সুরগুলি,
দুলে দুলে আসে অমৃত উছাসে নীলিমা লহর তুলি।
নাই নাই আর রাতের কুয়াসা
হিয়ায় ফোটে যে তারকার ভাষা,
অম্বরলীন অবারিত আশা
অন্তর পারে খোলে,
নিষ্কণ্টক বৃন্তে আজি যে রক্তগোলাপ দোলে !

খুলে যায় ওগো খুলে যায় ওই আকাশের গুণ্ঠন,
এক হ’য়ে যায় এপার ওপার তুলি সেই আবরণ ;
এক হ’য়ে যায় স্বরূপ অরূপ,
এক হ’য়ে ওই ভাসে সে-অনুপ !
আপনার মাঝে এ কি অপরূপ
সত্তার বিকশন !
কূলহারা মোর হৃদয় অপার তারি রসে নিমগন !

ওই ওঠে সব রূপতরঙ্গ সে মহাকেন্দ্র হ’তে !
ওই আসে যায় জীবনের দোলা মরণশূন্য পথে !
ঐ কত আসে, কত যায় ফিরে—
মিশে যায় পুন সেই মহা নীরে,
বহু রূপরেখা এক হয় ধীরে
পূর্ণ পরম মূলে !
থেমে যায় সব গতি-উৎসব সে নীরব উপকূলে।

অবাস্তব

"বনফুল"

(নাটিকা)

একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের দুইটি দ্বার। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু অল্প যাহা আছে তাহা বেশ মূল্যবান। ঘরে দুইখানি টেবিল আছে। একটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেটি কোণের দিকে রহিয়াছে। তাহার উপর রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি এবং তিন-চারখানি পুস্তক ছাড়া আর কিছু নাই। পুস্তকগুলি উপর্য্যুপরি সাজানো আছে। টেবিলটির পাশে একটি আরাম-কেদারা এমনভাবে রহিয়াছে যে তাহাতে শুইয়া ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিটির সহায়তায় বেশ পড়া যায়। আরাম কেদারার নিকট একটি চেয়ারও রহিয়াছে। দ্বিতীয় টেবিলটি ছোট। সেটি ঘরের মাঝামাঝি বাম দেওয়াল ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। দুইটি টেবিল এমনভাবে আছে যে, একটি আর একটিকে আড়াল করিতেছে না। দ্বিতীয় টেবিলটির দুই পাশেও দুইখানি বেতের চেয়ার রহিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছোট টেবিলটির সামনে দাঁড়াইয়া বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত পাইপে তামাক ভরিতেছেন। টেবিল ল্যাম্পটি এখন জ্বলিতেছে না, শিলিং ল্যাম্প হইতে ঘরটি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। অশোকবাবু বেশ একটি মূল্যবান ড্রেসিং গাউন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ভৃত্য সিতাবি একটি ট্রে-তে করিয়া কফির সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

অশোক। কি রে, কজনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করলি?

একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া সিতাবি ছোট টেবিলটিতে কফির সরঞ্জাম রাখিল

আলাপ টালাপ বেশী কোরো না, বুঝলে?

পাইপ ধরাইলেন

সিতাবি। আজ্ঞে না।

অশোক। কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি?

সিতাবি। মাত্তর একজনের সঙ্গে হয়েছে।

অশোক। হয়েছে!

সিতাবি। আজ যখন বাজার করতে যাচ্ছিলাম, তখন মাঠের ওপাশে যে বাড়িটা রয়েছে সেই বাড়ীরই একটি বাবু আমাকে ডেকে আমাদের কথা জিগ্যেসাবাদ করছিলেন।

সিতাবি কাপে কফি ঢালিতে লাগিল

অশোক। কি জিগ্যেসাবাদ করছিলেন?

সিতাবি। আপনার নাম ধাম সব জিগ্যেস করছিলেন; আরও জিগ্যেস করছিলেন এখানে এসেছেন কেন, এই সব আর কি—

অশোক। তুই কি বললি?

সিতাবি। বললাম বাবুর শরীর খারাপ তাই এখানে এসেছেন হাওয়া বদলাতে। বাবুটি বেশ আলাপী লোক। আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করবেন বললেন।

অশোক একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া উপবেশন করিলেন

অশোক। ও, সে সব বন্দোবস্তও ক'রে এসেছ তা হলে! আর কি কি আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে?

সিতাবি কফিতে দুধ ঢালিয়া পেয়ালা আগাইয়া দিল

সিতাবি। এই সব আর কি, জিগ্যেস করছিলেন তোমার বাবু কি করেন।

অশোক। (স্মিত মুখে) কি বললি তুই?

সিতাবি। বললাম—বাবু বই লেখেন!

অশোক। বলেছ তো? সবাইকে ওই কথা বলে বেড়াও, আর দলে দলে লোক এসে বিরক্ত করুক আমায়।

কফিতে এক চুমুক দিলেন

সিতাবি। না, সবাইকে বলব কেন।

অশোক। আর কাউকে বোলো না। নিরিবিলিতে থাকবার জন্যে কোলকাতা থেকে পালিয়ে এসে শহরের বাইরে তেপান্তর মাঠে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। তুমি লোক জুটিও না যেন!

সিতাবি। (একটু ইতস্তত করিয়া, চুপি চুপি) শুনছি এটা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি বাবু!

অশোক। কে বললে?

সিতাবি। বাজারে শুনলাম। সেই জন্যেই নাকি কেউ ভাড়া নেয় না, আর সেই জন্যেই নাকি এতবড় বাড়ির ভাড়া এত কম।

অশোক। ওসব বাজে কথা। তুই যা রান্না কর গিয়ে—

সিতাবি চলিয়া গেল। অশোক দত্ত পেয়ালা তুলিয়া আরও দু-এক চুমুক কফি পান করিলেন। তাহার পর আপন মনেই বলিলেন

ভূতুড়ে বাড়ি—হাঃ—যত সব গাঁজাখুরি!

আরও দুই-এক চুমুক পান করিলেন। সিতাবি পুনঃপ্রবেশ করিল

সিতাবি। ভূদেববাবু দেখা করতে এসেছেন।

অশোক। ভূদেববাবু কে?

সিতাবি। ওই যে সকালে যিনি ডেকে জিগ্যেসাবাদ করছিলেন—

অশোক। ও। এই সুরু হ'ল! আচ্ছা ডেকে নিয়ে এস।

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণপরে ভূদেববাবুকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। অশোকবাবু উঠিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন

নমস্কার, আসুন, আসুন, বসুন। একটু কফি খান, সিতাবি আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়।

সিতাবি চলিয়া গেল, ভূদেববাবু উপবেশন করিলেন

ভূদেব। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত?

অশোক। (হাসিয়া) বিখ্যাত কি না জানি না, তবে লিখি বটে।

ভূদেব। আমি আপনার লেখার একজন বিশেষ ভক্ত।

অশোক স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন

আপনি এখানে এসেছেন কি বেড়াতে?

অশোক। ঠিক বেড়াতে নয়, চেঞ্জে। কোলকাতায় শরীরটা কিছুতেই ভাল থাকছে না। ভাবলাম বাইরে কিছুদিন কাটালে যদি—

ভূদেব। হয়েছে কি আপনার?

অশোক। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কিছুই হজম হয় না—এই চা কফি টফি খেয়েই কাটাই!

সিতাবি আর একটি কাপ লইয়া আসিল এবং ভূদেববাবুকে কফি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভূদেব কফি পান করিতে লাগিলেন। মিনিট খানেক পরে—

ভূদেব। আপনি এই বাড়িটা নিলেন কেন?

অশোক। কোলকাতায় একদিন এই বাড়ির প্রোপ্রাইটার রমেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর কাছেই শুনলাম যে এ জায়গাটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পক্ষে ভাল। তাছাড়া তিনি খুব শস্তায় দিতে চাইলেন বাড়িটা। এমন ইলেকট্রিক ফিটেড্ বাড়ির মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়া—খুবই শস্তা!

অশোক পুনরায় পাইপ ধরাইলেন

ভূদেব। (একটু মৃদু হাসিয়া) বিনা পয়সায় থাকতে দিলেও এ অঞ্চলের কেউ এ বাড়িতে থাকতে রাজি হবে না।

অশোক। কেন, বলুন তো?

ভূদেব। বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে

অশোক। কি ইতিহাস?

ভূদেব। (হাসিয়া) সে আর নাই শুনলেন রাত্তির বেলা! নিয়েই যখন ফেলেছেন তখন দেখুন না দু-চার দিন বাস ক'রে। আপনি তো আজই এসেছেন, না?

অশোক। হ্যাঁ। শুনিই না কি ইতিহাসটা।

ভূদেব। রাত্তিরে হয়তো ভয়টয় পাবেন, দরকার কি! (হাসিয়া) আমিও আসতাম না এখানে রাত্তিরে, কেবল আপনার নাম শুনে দেখা করতে এলাম। যদিও নিজের চোখে দেখিনি কখনও কিছু—তবু—

অশোক। শুনিই না ব্যাপারটা কি—

উভয়ের কফি পান শেষ হইল

ভূদেব। যদি ভয়টয় পান—

অশোক। ভয় আমি কাউকে করি না। কাউকে করি না অবশ্য ঠিক নয়, জন্তু-জানোয়ার চোর-ডাকাতকে করি এবং সে সবের জন্যে আমি প্রস্তুতও থাকি সর্ব্বদা।

টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া স্মিতমুখে সেটি তুলিয়া দেখাইলেন

ভূদেব। (সবিস্ময়ে) পিস্তলের লাইসেন্স আপনাকে দিয়েছে! সাধারণত কাউকে দেয় না

অশোক। আমার বাবা একজন রিটায়ার্ড বড় পুলিশ অফিসার। তাঁর খাতিরেই পেয়েছি আর কি—

ভূদেববাবু পিস্তলটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন

ভূদেব। বাঃ, চমৎকার পিস্তলটি, একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া যায়!

অশোক। সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন—লোডেড্ আছে—দিন্ আমাকে।

পিস্তলটি দত্ত টেবিলের একধারে সরাইয়া রাখিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন

এইবার বলুন তো শুনি, বাড়ির ইতিহাসটা কি। কোন ভৌতিক ব্যাপার? আমার চাকরটা বলছিল সে কার কাছে নাকি শুনেছে এটা ভূতুড়ে বাড়ি!

ভূদেব। ও, আপনি শুনেছেন তা হ'লে?

অশোক। এখুনি শুনলাম। ব্যাপারটা কি বলুন তো

ভূদেব। ওই ভৌতিক ব্যাপারই—

অশোক। ভূতে করে কি, ঢিল ছোঁড়ে?

ভূদেব। (হাসিয়া) ঢিল ছোঁড়ে না।

অশোক। তবে?

ভূদেব। তা হ'লে গোড়া থেকেই বলি শুনুন—

অশোক। বলুন।

পাইপ নিবিয়া গিয়াছিল, পুনরায় ধরাইয়া লইলেন

ভূদেব। এ বাড়িটা অনেক দিনের। শুনেছি মিস্টার চৌধুরি বলে একজন বিলেত-ফেরত বাঙালী প্রথমে তৈরি করান বাড়িটা। তিনি ছিলেন সেকেলে বিলেত-ফেরত, বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেছিলেন।

অশোক। তাই না কি।

ভূদেব। হ্যাঁ। মেমসায়েবকে নিয়েও এসেছিলেন সঙ্গে ক'রে এদেশে। তাঁকে নিয়ে সমাজে বাস করতে পারবেন না বলেই বোধ হয় লোকালয়ের বাইরে বাড়িটা করিয়েছিলেন। অগাধ টাকা ছিল তাঁর।

অশোক। কি ছিলেন তিনি, ব্যারিস্টার?

ভূদেব। না, তিনি পাটের ব্যবসা ক'রে লক্ষপতি হয়েছিলেন শুনেছি।

অশোক। ও। তারপর?

ভূদেব। বিলেতে থাকতেই তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান করবার জন্যে একটি নিগ্রো চাকর রাখেন তিনি। দেশে আসবার সময় নিগ্রো ছেলেটিকে সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

অশোক। নিগ্রো?

ভূদেব। হ্যাঁ কুচকুচে কালো একটি নিগ্রো ছেলে।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তাঁরা সবাই এই বাড়িতেই ছিলেন—মিস্টার চৌধুরি, মিসেস চৌধুরি, মিস চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটি। আরও অবশ্য অনেক চাকর বাকর ছিল, রীতিমত সায়েবি কেতায় থাকতেন তাঁরা।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। মিস্ চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটির বয়সের তফাৎ ছিল সাত আট বছর মাত্র। তারা দুজনে একসঙ্গে এই বাড়িতে মানুষ হতে লাগল। তারপর সাধারণত যা হয়—

অশোক। প্রেম?

ভূদেব। হ্যাঁ

অশোক। (হাসিয়া) বেশ জমিয়ে এনেছেন তো, তারপর কি হ'ল আত্মহত্যা?

ভূদেব। না, আত্মহত্যা ঠিক নয়, যা হ'ল তা ভয়ানক।

অশোক। কি!

ভূদেব। মিস্টার চৌধুরি রগচটা রাগী মেজাজের লোক ছিলেন। ভয়ানক মদ খেতেন, রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকতো না। কেলেঙ্কারি যখন অনেকদূর গড়িয়েছে মিস্টার চৌধুরি হঠাৎ একদিন টের পেলেন। টের পেয়ে তিনি যা করলেন তা সাংঘাতিক। নিগ্রো ছেলেটাকে আর মিস চৌধুরিকে গুলি ক'রে মেরে ফেললেন।

অশোক। বলেন কি মশাই, নিজের মেয়েকে গুলি করলেন?

ভূদেব। তাই তো শুনেছি আমরা।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তারপর তাদের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পুঁতে ফেললেন।

অশোক। কোথায়?

ভূদেব। এই বাড়িরই কোনখানে।

অশোক। তাই না কি! তারপর কি হ'ল?

ভূদেব। তারপর তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা চলে গেলেন এবং কোলকাতাতেই বাড়িটা জলের দামে এক য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিক্রি ক'রে দিলেন। সেই

য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই এসে প্রথমে ইলেকট্রিক্‌ কানেক্‌শান নিয়েছিল বাড়িটাতে। বেচারা কিন্তু বাস করতে পারে নি।

অশোক। কেন, কি হ'ল ?

ভূদেব। প্রথম প্রথম আবছা আবছা তারা নাকি ছায়া-মূর্ত্তি দেখতে পেত। প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু একদিন সকালে উঠে দেখা গেল, তাদের সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি বিছানায় মরে পড়ে আছে। কে তার ঘাড়টি মুচড়ে রেখে গেছে।

অশোক। (সবিস্ময়ে) সে কি !

ভূদেব। হ্যাঁ। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সায়েব পালালো। বাড়িটা এমনি খালি পড়ে রইলো অনেক দিন। অনেক দিন পরে এক ভাটিয়া কিনলে বাড়িটা। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভাটিয়া যেদিন এসে পদার্পণ করলে বাড়িতে সেইদিনই তার মৃত্যু হ'ল !

অশোক। সেই দিনই ! কি ক'রে ?

ভূদেব। কি ক'রে তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়েছে—হঠাৎ গভীর রাত্তিরে তার-স্বরে চীৎকার ! সবাই ছুটে গিয়ে দেখে বাড়ির মালিক মেজের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, কান দিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কফির সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল

অশোক। আর কোন ঘটনা আছে ?

ভূদেব। অনেক ঘটনা আছে। তারপর বাড়িটা যায় উমাকান্তবাবুর হাতে। উমাকান্তবাবুর ব্যাপারটাও খুব আশ্চর্য্যজনক। তাঁকে এসে বাড়িতে বাসও করতে হয় নি। বাড়ি কেনবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ যেদিন ডকুমেণ্ট রেজিস্টার্ড হয়ে গেল সেই দিনই তাঁর বড় ছেলে কলেরায় মারা গেল। তিনি অলুক্ষণে বাড়ি রাখিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেচে ফেললেন। কিনলে বেহারের এক জমিদার। বাড়িটা কেনবার পর মাস ছয়েক তিনি আসেন নি। যেদিন এলেন সেদিনটা কিছু হ'ল না, কিন্তু তার পর দিন তিনিও মারা গেলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ! সর্পাঘাতে মারা গেলেন ভদ্রলোক !

অশোক। কি রকম ?

ভূদেব। তার চাকরটা বললে যেদিন রাত্রে তিনি মারা যান সেদিন দুটো প্রকাণ্ড সাপ—একটা টকটকে লাল আর একটা কুচকুচে কালো সমস্ত রাত সারা বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। এত ভীষণ তাদের তর্জ্জন যে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে !

অশোক। অদ্ভুত তো।

ভূদেব। সত্যিই অদ্ভুত !

অশোক। তারপর ?

ভূদেব। তারপর বাড়িটা কিনলেন রমেশবাবু। ঠিক কিনলেন না, পেলেন। তিনি ওই বেহারি জমিদারদের উকিল ছিলেন, ফি হিসেবে তাঁদের কাছে অনেক টাকা বাকী পড়েছিল ; জমিদার মারা যাওয়ার পর তারা আর টাকা দিতে পারলে না, তার বদলে এই বাড়িটা পেলেন তিনি। নিজে তিনি অবশ্য কখনও এসে এ বাড়িতে বাস করেন নি, করবার সাহসই হয় নি। কিন্তু ভাড়াটে পেলে তিনি ছাড়েন না, বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেন, আর যে ভাড়াটে আসে—

সহসা থামিয়া গেলেন

অশোক। কি হয় তাদের ?

ভূদেব। একটা না একটা কিছু হয় !

অশোক। (হাসিয়া) আপনি বিশ্বাস করেন এসব ?

ভূদেব। আমি নিজেই তো তিনজন ভাড়াটের খবর জানি—একজন পাগল হয়ে গেল, একজনকে ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিলে আর একজনের ছোট ছেলেটি যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। আর একটা কি বিশেষত্ব জানেন, প্রত্যেকবার আলাদা রকম কিছু একটা হয় !

অশোক পাইপ ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন

অশোক। (হাসিয়া) আপনি অবশ্য যা বললেন তার থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। এ বাড়িতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুরই তো একটা না একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে। কেউ সাপে কামড়ে, কেউ কলেরায়, কেউ ছাত থেকে পড়ে, কেউ য়্যাপোপ্লেক্‌সিতে। এ সবের দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ভুতুড়ে বাড়ি !

ভূদেব। তা অবশ্য ঠিক।

নিজের হাত-ঘড়ি দেখিলেন

এ অঞ্চলের কিন্তু সব্বাই ভয় করে এই বাড়িটাকে! আপনাকে রাত্তির বেলা এসব গল্প শোনালাম, আপনার ভয় টয় করবে না তো?

অশোক। কিচ্ছুমাত্র না। ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবার বয়স আর নেই —

ভূদেব পুনরায় হাত-ঘড়ি দেখিলেন

ভূদেব। আজ তা হ'লে এবার উঠি। রাত প্রায় দশটা হল।

অশোক। আচ্ছা।

অশোক ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আগাইয়া গেলেন। ভূদেব যথাবিধি নমস্কারান্তে বাহির হইয়া যাইবার পর অশোক খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর-পদ-সঞ্চারে ফিরিয়া আসিয়া ছোট টেবিলের নিকট চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং চিন্তিতমুখে রিভলভারটি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তাহার পর পাইপে তামাক ভরিলেন এবং পাইপটি ধরাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে পাইপে টান দিতে লাগিলেন।··· সহসা চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই যখন আলো জ্বলিল তখন দেখা গেল অশোকবাবু কোণের দ্বিতীয় টেবিলটির নিকট আরাম কেদারায় শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন, গাঢ়রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। ঘরের অন্ধকার শেডের আভায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। অশোক তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন। দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে একটি কালো কাফ্রি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিধানে ধপধপে সাদা সাহেবি পোষাক। অশোকের পানে নিষ্পলক-নেত্রে চাহিয়া আছে।

অশোক। সিতাবি, সিতাবি?

পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই সিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল অশোক আরাম কেদারায় নয়, ছোট টেবিলটির কাছে বেতের চেয়ারেই বসিয়া আছেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল।

সিতাবি। কি বলছেন বাবু?

অশোক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন

অশোক। কি আশ্চর্য্য-জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলুম না কি। দেখ্ তো বাইরে কেউ এসেছে কি-না?

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল।

সিতাবি। না, কেউ নেই তো!

অশোক। ভাল ক'রে দেখিছিস্?

সিতাবি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আবার কে আসবে!

অশোক। রান্নার কত দেরি?

সিতাবি। বেশী দেরি নেই আর। আমি যাই, সুপটা চড়িয়ে এসেছি—

চলিয়া গেল

অশোক। আশ্চর্য্য! ঠিক মনে হচ্ছিল আমি যেন খাওয়া দাওয়ার পর আরাম কেদারায় শুয়ে বই পড়ছি আর সেই নিগ্রো ছেলেটা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ফানি!

একটু অস্বাভাবিক ভাবে হাসিলেন

না, এ রকম কল্পনা করা তো ঠিক নয়! আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঠিক কিন্তু মনে হচ্ছিল —

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পদচারণা করিলেন। তাহার পর আসিয়া ছোট টেবিলটায় বেতের চেয়ারে বসিলেন। পুনরায় পাইপ ধরাইলেন এবং রিভলভারটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে পুনরায় আবার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই আলো জ্বলিলে দেখা গেল আগেকার মতো অশোকবাবু কোণের বড় টেবিলটার কাছে আরাম কেদারায় শুইয়া বই পড়িতেছেন। গাঢ় রক্তবর্ণ শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। পুনরায় দ্বার প্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল, অশোকবাবু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন; দেখা গেল সাদা সাহেবি পোষাক পরা কাফ্রি যুবকটি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অশোকের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

অশোক। কে?

কাফ্রি যুবক আগাইয়া আসিল এবং আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দণ্ডকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। অশোক খোলা বইখানা টেবিলের উপর উপুড় করিয়া রাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

কি চাই?

কাফ্রি যুবক আরও আগাইয়া আসিল, আর একবার সেলাম করিল এবং পকেট হইতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিল। অশোক টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কার্ডটি পড়িয়া দেখিলেন।

মিস্ চৌধুরি! কি চান তিনি?

কাফ্রি। (অস্বাভাবিক মোটা গলায়) মো-লা-কা-ং!

অশোক ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া উত্তর দিলেন

অশোক। বেশ, ডেকে নিয়ে এস তাঁকে?

কাফ্রি-মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল। মেয়েটির পরিধানে

ধপধপে সাদা গাউন, পায়ের মোজা এবং জুতাও সাদা। পিঠে টকটকে লাল রিবন-বাঁধা বেণী দুলিতেছে।

কি চান আপনি ?

মেয়েটি মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিল

আসুন, বসুন।

মেয়েটি আসিয়া চেয়ারে বসিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না,
কেবল মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি চান আপনি ?

মেয়েটি নীরব

কথা বলছেন না কেন ?

মেয়েটি নীরব

কি চাই আপনার ?

মেয়েটি নীরব

কোন দরকার যদি না থাকে যেতে পারেন আপনি।

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠিয়া চলিয়া গেল। অশোক পুনরায় পড়িতে যাইবেন এমন সময় আবার দ্বারপ্রান্তে সেই কাফ্রি-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ঠিক সেইরূপ আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিল এবং সেলাম করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে কার্ড দিল।

মিস চৌধুরি! কি চান তিনি ?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। যদি কিছু দরকার থাকে আসতে বল! কিন্তু---

অশোকের কথা শেষ হইতে না হইতে কাফ্রি মিলাইয়া গেল এবং
মিস চৌধুরি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া পূর্ব্ববৎ মুচকি হাসিতে
হাসিতে আগাইয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল

আমার কাছে কি দরকার আপনার বলছেন না তো!

মেয়েটি নীরবে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি, দরকারটা কি ?

মেয়েটি নীরব

বলুন না, গোপনীয় কিছু ?

মেয়েটি নীরব

আপনি বোবা না কি!

মেয়েটি নীরবে মুচকি হাসিল

কিছুই যদি বলবেন না, তা হ'লে এসেছেন কেন ?

মেয়েটি নীরব

উদ্দেশ্য কি আপনার ?

মেয়েটি নীরব

কি আশ্চর্য্য! কিছু যদি বলবার থাকে বলুন, আর না থাকে তো যান।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। আবার দ্বারপ্রান্তে কাফ্রি-মূর্ত্তি
দেখা দিল এবং পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে আসিয়া
সেলাম করিয়া সে কার্ড দিল

আবার মিস্ চৌধুরি! কি আশ্চর্য্য, কি চান তিনি ?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। কিন্তু মোলাকাতের উদ্দেশ্যটা কি! আচ্ছা বিপদে পড়লাম তো! দরকার থাকে তো আসতে বল—আর

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাফ্রি অন্তর্হিত হইল এবং মুচকি হাসিতে
হাসিতে মিস্ চৌধুরি আসিয়া চেয়ারে বসিলেন

দেখুন আমি পড়ছি, আমাকে এ রকমভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় আপনাদের।

হাত দিয়া টেবিলে উপুড় করা বইটি দেখাইলেন।
মেয়েটি কোনই উত্তর দিল না

সত্যি সত্যি আপনার দরকারটা কি বলুন দেখি খুলে।

মেয়েটি নীরব

এমন ভাবে বিরক্ত করবার মানে কি ?

মেয়েটি নীরব। অশোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি
উচ্চতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন

কোন উত্তর দেবেন না আপনি ?

মেয়েটি নীরব

আপনি কি মনে করেন আমি ভয় পেয়ে যাব ?

মেয়েটি নীরব

দেখুন ভয় পাবার ছেলে আমি নই। ভূতটুতে আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, এই দেখুন আমার পিস্তল আছে, আমাকে বেশী রাগাবেন না। রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না আমার!

পিস্তল দেখিবামাত্র মেয়েটি পাশের দরজা দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া
গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই একটি মরা শিশু আনিয়া সেটা টেবিলে
শোয়াইয়া দুই কোমরে হাত দিয়া বিকট রবে হাসিয়া উঠিল

মিস চৌধুরি। হা-হা-হা-হা-হা—

সঙ্গে সঙ্গে অশোকের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল—পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণপরে যখন ঘরের শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল তখন দেখা গেল, অশোকের রক্তাক্ত দেহটা ছোট টেবিলটার উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছে, ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ পিস্তলটা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কোণের বড় টেবিলটায় ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিতেছে না এবং সেখানকার একটি পুস্তকও স্থানচ্যুত হয় নাই।

যবনিকা

অর্দ্ধনারীশ্বর

শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ

নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং পাশারুণোৎপলক
পালক শূলহস্তং
অর্দ্ধাম্বিকেশ মনিশং প্রবিভক্তভূষং বালেন্দুবদ্ধমুকুটং
প্রণমামি রূপং ॥”—তন্ত্রসার

“শিবের দেহকান্তি নীল প্রবালের ন্যায়, ইনি ত্রিনয়ন এবং হস্তে পাশ, রক্তপদ্ম, কপাল ও শূল ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার অর্দ্ধাঙ্গে অম্বিকা ও অর্দ্ধাঙ্গে মহাদেব; ইঁহারা পৃথক বিভূষণে বিভূষিত ও মুকুটে বালচন্দ্রধারী।”

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে সংরক্ষিত হইতেছে। অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বেশী সংখ্যায় আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ইহা বাঙ্গালা দেশে বিরল।

বাঙ্গালা দেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীর ন্যায় দাক্ষিণাত্যে এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কাম্বকোনাম, মহাবল্লীপুরম, কোনাজিভোরামের মূর্ত্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। নানাবিধ লীলাভঙ্গি এই মূর্ত্তিগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কথিত আছে আমাদের দেশে সেন বংশের রাজারা সদাশিবের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহাদের সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বরের পূজা প্রচলিত ছিল। এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির সম্বন্ধে শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে বল্লাল সেনের নৈহাটী তাম্রলিপিতে লিখিত আছে।

“সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সম্বিধানবিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভিন্নির্মর্যাদ-
রসার্ণবো দিশতু বঃ **শ্রেয়োর্দ্ধনারীশ্বরঃ**।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈবর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈর্ন্নাট্যা-
রম্ভরসৈর্জ্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥

(Mojumder N. G: Inscriptions of
Bengal, Vol 3)

কিন্তু এই বংশের রাজত্বকালে অন্যান্য দেব-দেবীর ন্যায় এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বিশেষরূপে উপাসনালয়ে স্থান পায় নাই। কারণ এখনও অজ্ঞাত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রামপাল রাজধানীর অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে পূরা-পাড়া নামক একটি গ্রামে এক ভগ্নাবশেষ মন্দিরে হস্তপাদবিহীন একখানি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। অধুনা এই মূর্ত্তিখানি রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে সংরক্ষিত হইয়াছে।

এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির দক্ষিণার্দ্ধ শিব, বামার্দ্ধ উমা। ইহাদের বসনভূষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দক্ষিণার্দ্ধ শিরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্র, জটাজুট মুকুট ও বামার্দ্ধ শিরোভাগে কনক কিরীট ভূষিতা। দক্ষিণ কর্ণে নাগ-কুণ্ডল এবং বাম কর্ণে রত্নকুণ্ডল। গলদেশে নাগোপবীত এবং রত্নমালা। অর্দ্ধাঙ্গে কিঙ্কিণী ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত অপরাঙ্গে মেখলা এবং রত্নখচিত সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেবীর স্তনটি আবৃত। দক্ষিণার্দ্ধ শিবদেহে অনাবৃত বক্ষঃস্থল। শিবের মুখকমল জ্ঞানের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত। আবার পরক্ষণেই বামার্দ্ধে যুগলনয়না শান্তিময়ী স্নেহদৃষ্টি। ভ্রূযুগল, ললাটনেত্র, বিচিত্র বিলাস, ইঁহারা সাম্যদীপ্তা মূর্ত্তিতে অবিচ্ছিন্নভাবে বিরাজিত।

ধারাসুরামের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিখানিতে তিনটি মুখ এবং আটখানি বাহু দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে এইচ, কে, শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন: সম্ভবত আরও দুইটি মুখ পশ্চাৎভাগে থাকিতে পারে। (With perhaps two other faces behind)

অর্দ্ধনারীশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে শিল্পরত্ন, সুপ্রভেদাগম, কমিকাগম ও মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে।

এই মূর্ত্তি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে পূজা হয়। ইহার পূজা-পদ্ধতি সারদাতিলক, রুদ্রযামল, তন্ত্রালোক প্রভৃতি নানা তন্ত্রে বর্ণিত আছে। যাঁহারা দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণের পর অতি উচ্চ স্তরে উপাসনাক্ষেত্রে যাইতে চাহেন তাঁহারা এই মহামন্ত্রের উপাসক হইতে পারেন। তন্ত্রে আছে যে, কশ্যপ মুনি ইহার ঋষি। এই মহামন্ত্র অনুষ্টুপ্ ছন্দে লিখিত। অস্য মন্ত্রস্য অর্দ্ধনারীশ্বরো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দ…ইত্যাদি।

এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সম্বন্ধে নানা পুরাণে ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। পৌরাণিক বৃত্তান্ত—

পিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথমমৈথুনজ প্রজার সৃষ্টি করিতে

ইচ্ছা করিয়া নিত্যা মহামায়ার আরাধনা আরম্ভ করিলেন। আদ্যা পরমাশক্তি তখন ব্রহ্মার মানসপটে উদিতা হইলেন।

অর্দ্ধনারীশ্বর

রাজসাহী, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সৌজন্যে

ব্রহ্মা সেই পরমাশক্তির সহিত পরাশিবের একত্র ধ্যান করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই তীব্র তপস্যায় সেই শিব সমীপবর্ত্তিনী নিত্যাদেবী ও ভগবান যোগেশ্বর ত্র্যম্বক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য মহাদেব অর্দ্ধনারীশ্বররূপে ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা তখন সানন্দ চিত্তে কমনীয় দেবতার স্তব করিতে লাগিলেন।

—শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা, ত্রয়োদশ অধ্যায়

একদা স্মরহর সমীপে সমুপাসীনা মহাদেবী বিষ্ণুমায়াজনিত মোহবশে শঙ্কর বক্ষঃস্থলে নিপতিত স্বীয় মনোহারিণী ছায়াকে অপর রমণী মনে করিয়া ঈর্ষাবশত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করেন। অনন্তর যোগেশ্বর মহামায়ার বিমূঢ়তার কারণ জানিতে পারিয়া মোহভঙ্গ করিয়া দিলেন। তখন দেবী পার্ব্বতী ছায়ার ন্যায় মহাদেবের অনুগতা হইবার জন্য অবিচ্ছিন্ন মিলনের বর প্রার্থনা করিলেন। গিরিজার প্রার্থনানুসারে অতীব প্রেমপাশে আবদ্ধ হইবার জন্য শঙ্কর অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন।

- কালিকা পুরাণ

ভৃঙ্গি ঋষি পরম শিবভক্ত ছিলেন। মহাদেব ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দেবতা উপাস্য ছিল না। একদিন শিব ও পার্ব্বতী কৈলাসে উপবিষ্ট আছেন; ইত্যবসরে ঋষিপ্রবরকে সেখানে আসিতে দেখিয়া এই পরম শৈবকে পরীক্ষা করিবার জন্য যোগেশ্বর ও যোগেশ্বরী অর্দ্ধনারীশ্বররূপে ভৃঙ্গির পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ভৃঙ্গি ভ্রমররূপে মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া কেবলমাত্র ভবানীপতির শরীর পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। দেবী ভৃঙ্গির এই পক্ষপাতিত্বে রুষ্ট হইয়া "রক্তমাংসহীন শরীর হউক" বলিয়া অভিশাপ দেন। এই অভিশাপে জর্জ্জরিত হইয়া অভিশপ্ত ঋষি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভক্তাসক্ত শিব ভক্তের কথায় ব্যথিত হইয়া 'ত্রিপদী হও' এই বলিয়া তাঁহাকে বর দেন। শিব-বরে বলীয়ান তৃতীয় পদলব্ধ মুনিবর পুলকিত হইয়া শিবগীত গাহিতে গাহিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

অর্দ্ধনারীশ্বর

—Shastri H. K : South Indian Images of Gods & Goddesses.

ভঙ্গির সহিত এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বাদামী মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মার্কণ্ড মুনি বলিয়াছেন যে, রুদ্র এবং বিষ্ণু অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপে এই বিশ্বের স্রষ্টা।

শিবের নিত্য সহচরী দেবী দুর্গা শঙ্খ ও চক্র হস্তে বিরাজমানা এবং বিষ্ণুর হস্তেও এই শঙ্খ ও চক্র। এইজন্য এই অর্দ্ধনারীশ্বরকে বিষ্ণুর ভগিনীও বলা হয়।

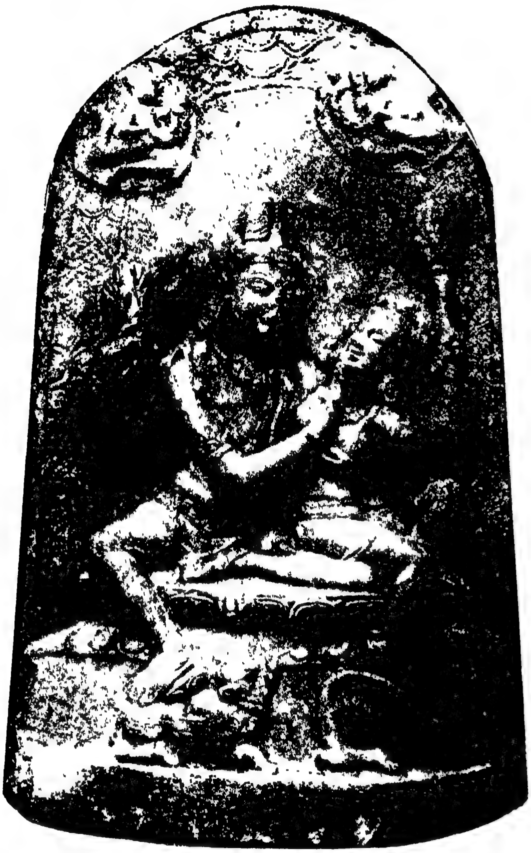

অর্দ্ধনারীশ্বর

(Durga the consort of Siva is represented in all sculptures with the Sankha and the Chakra, the weapons characteristic of Vishnu. So she is called the sister of Vishnu. Hindu Iconography p. I, Vol. II)

উত্তর কামিকাগমে ষষ্ঠিতম পটলে এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে নারীর স্থলে বিষ্ণু দণ্ডায়মান দেখা যায়। ইহা হরিহর বা হর্য্যর্দ্ধ-রূপে প্রকাশিত। (Vishnu is also viewed as the prakrititava and hence we see Vishnu substituted in the place occupied by Devi in Ardhanarisvara aspect of Siva. Hindu Iconography).

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে, প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দক্ষিণভাগ পুরুষ এবং বামভাগে প্রকৃতির স্বরূপ রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই প্রকৃতি ও পুরুষের অর্দ্ধনারীশ্বরই যেন একটি প্রতীক।

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।"

সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মা নিজের রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

পরম-ব্রহ্ম প্রথমে অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপে প্রকাশিত হইয়া পরবর্ত্তী আকারে আলিঙ্গনাবদ্ধ উমা-মহেশ্বর। এই লাবণ্যময় উভয় মূর্ত্তি একই প্রকৃতি-পুরুষ সম্মিলিত ভাবে বিকাশ।

"In the ordinary Hara-Gauri or Uma-Mahesvara conception we have frequently the picture of a pair of lovers locked up in embrace. In the conception of the Ardhanarisvara the two principles are merged (avyakta), but about to emerge (vyakta). It represents a stage in iconograpic revelation which emphasises the fact that "Each is both" "Two are one".

(The Cultural Heritage of India, Vol 3)

উমামহেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অর্দ্ধনারীশ্বররূপে ভিন্নাকারে প্রকটিত হইয়াছে।

"Uma-Maheswar, Lakshmi-Narayana, Sita-Ram and in an earlier stage evolution ; in the composite form known as the Ardhanarisvara, in which the two are one and inseparable, for the one must co-exist with the other.—

—The Cultural Heritage of India." Vol 3

আদমের পঞ্জরাস্থি হইতে ঈভের সৃষ্টি। ইহা প্রকৃতি-পুরুষ রূপেই যেন উমা-মহেশ্বরের আর একটি প্রতীক এবং অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপে প্রকটিত।

"It is something like picture of Adam

at the moment when Eve was created from his rib.

—The Cultural Heritage of India."

এই বিশ্বের স্ত্রী পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্টি। যখনই সৃষ্টির দরকার হইয়াছে তখনই ব্রহ্মা নারী ও পুরুষরূপে বিভক্ত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুসংহিতায় সৃষ্টিপ্রকরণে ইহার আভাষ পাওয়া যায়।

"দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমার্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥"

বঙ্গানুবাদ—সেই প্রভু (ব্রহ্মা) আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাট্‌কে উৎপাদন করিলেন।

এই উভয় শক্তি হইতেই সৃষ্টি হয় বলিয়া সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে উভয়শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারম্ভন্তে।"

এই বিশ্বের চরাচরে প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে স্ত্রীপুরুষরূপে অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বররূপে উভয় শক্তি বিদ্যমান ও পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ।

"আধেক গৌরী, আধা শঙ্কর
পুরুষ প্রকৃতি, অশেষ লীলা;
ব্যক্ত পাষাণে প্রেমের স্বরূপ,
চেতনায় আজ জেগেছে শীলা।"

—বিমলাচরণ মৈত্রেয়

এই অর্দ্ধনারীশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ এবং এই বিশ্বের প্রতীক, সৃষ্টির স্রষ্টা। এই প্রকৃতি-পুরুষে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশমান এবং চেতনাশক্তির দানকারী। ইহারা নিত্য সহচর ও সহচরী এবং বিশ্বের সৃষ্টির কারণ। "In Ardhanariswar left is occupied by Devi or Prakriti and Purush while Prakriti are united with each other for the purpose of generating the universe.

--Hindu Iconography. Vol. II, part I

এই পুরুষ ও প্রকৃতি অর্দ্ধনারীশ্বরের ভিন্নাকারে লিঙ্গ ও যোনি এবং বিশ্বের প্রজননকর্ত্তা (বচনা—অর্দ্ধনারীশ্বরোঽভবৎ) লিঙ্গ পুরাণ। পুনর্বার এই যোনিকে পীঠিকা বলিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে "লিঙ্গমাকাশমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা" অর্থাৎ লিঙ্গই আকাশ, পৃথিবী তাঁহার পীঠিকা। এই লিঙ্গ এবং পীঠিকা জগতের যোনি এবং বীজস্বরূপ-রূপে অর্দ্ধনারীশ্বর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত। এই লিঙ্গ ও যোনি শিব ও শক্তি অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপে বিকশিত। শিব ও শক্তি যাহা অভিন্নতত্ত্ব তাহাই পরম ব্রহ্ম এবং বিশ্বময়। "শিব ও শক্তিময়ং বিশ্বম্।" তত্ত্বে এই শিব ও শক্তির অভেদ অভিব্যক্ত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজিত। এই শিব ও শক্তি অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বর সাধকের নিকট দেবতারূপে প্রকটিত হইয়া এই বিশ্বের কল্যাণ কামনা করিতেছে।

"শক্তি ও শিব, শিব ও শক্তি
অনুপরমাণু সকলময়
প্রেমমঙ্গল গাহিছে নিখিল
মঙ্গলদেবতা তোমারি জয়॥"

স্তব্ধ অতীত, কথা কও

ইলা দেবী

কাপ্রি দ্বীপ। নিষ্কলঙ্ক নীল আকাশ—নীচে শান্ত সমুদ্র ময়ূরকণ্ঠী মায়ায় ঝলমলে। সমুদ্রের ধার থেকে খাড়া পাথরের পাড় উঠেছে কর্কশ ধূসর। পাহাড়ের মাথার ওপরে রোমক সম্রাট টিবেরোর ভগ্ন প্রাসাদের পাথরের অরণ্য বুনো অলিভের বাঁকা বাঁকা গাছ কাঁটাভরা ক্যাকটাসের চ্যাপ্টা পাতার ঝোপে দু-একটি ফুল রংয়ের শিখায় জ্বলছে। নীচে অনেক দূরে কমলালেবুর ঘন সবুজ বন—দ্রাক্ষা ফলের বাগান। ভগ্নস্তূপের পাথর পেরিয়ে কাবেরী হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এসে একটা ভাঙ্গা খিলানের ছায়ায় শ্রান্তভাবে বসে পড়ল।

"হাঁপিয়ে গেলে?—এঃ, হেরে গেলে—হেরে গেলে একেবারে—" ভাস্কর তার পাশে এসে বসে সিগারেট ধরালে।

কাবেরী তখনও হাঁপাচ্ছে। চুলের গুচ্ছ এলোমেলো হয়ে মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে—তবু ফোঁস ক'রে উঠল, "ইস্, হেরে গেলাম বই কি। তুমিই ত হাপাতে পারলে না। বললে তুমি জান সম্রাট টিবেরো কোন্ সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে সমুদ্রের নীল গুহায় স্নান করতে যেত পারলে বার করতে?—চল না আমি এখুনি যাচ্ছি—হাপাবে আমায়!" কাবেরী উঠে দাড়াল।

ভাস্কর তার হাতটা ধরে ফেলে বলল, "বস বস—আরে আমি কি জানি কোথায় সে সুড়ঙ্গ! ও সব রাজা-রাজড়ার ক্ল্যাণ্ডেষ্টিন লীলাখেলার নীল গুহার খবর কি আমি রাখি—যে সে পথ জানব! আমায় কি এমনি ইম্‌মর‍্যাল্ ভাব? হুঁঃ—"

"বা রে, তবে বললে কেন ওদের ছেড়ে দিয়ে আমায় মিছিমিছি এখানে টেনে আনলে কেন?"—একটা দীর্ঘশীর্ষ ঘাসফুল ছিঁড়ে নিয়ে কাবেরী ভাস্করের মুখে চোখে ক্ষিপ্রহস্তে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বললে, "কেন—কেন কেন—আর করবে?"

ভাস্কর ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, "উঃ, কি কর—শোনই কারণটা। তোমায় একটা ভীষণ দরকারি কথা বলতে এখানে এনেছি।"

"এত জায়গা থাকতে কথা বলতে এখানে আনতে হ'ল? কি কথা শিগ্‌গির বল।"

"অমন তাড়া দিলে কি বলা চলে—চিন্তার জালে গেল জট্ পাকিয়ে।"

কাবেরী ডিক্‌টেটোরিয়াল আল্‌টিমেটাম্ দিয়ে বললে, "আচ্ছা, দু মিনিট সময় দিলাম।"

"শোন, বলছিলাম কি তুমি আমায় বিয়ে কর।"

একমুহূর্ত নীরব থেকে কাবেরী উচ্ছ্বসিত হাসিতে লুটিয়ে পড়ল—"ওঃ, এই তোমার দরকারি কথা?"

"দরকারি নয়?"—ভাস্কর হতাশভাবে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে বললে, "তুমি একটা hopeless case of frivolity—বিয়ে করাটা হাসির কথা?"

কাবেরী কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "তোমায় বিয়ে করব? জান না বুঝি কতগুলি আদর্শ সৎপাত্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হচ্ছে। তারা কেমন সাবধানী শান্তশিষ্ট নাদুসনুদুস—বাপের অগাধ টাকা আছে।" সেইজন্যে বিয়ের বাজারে নীলামে এই সব পাত্রদের দাম অনেক চড়ে। কাবেরী ধনীর কন্যা—পিতৃ-আদেশ পালনে তাই রামচন্দ্র হয়ে ওদের এরকম মেয়েকে বিয়ে করা চলে—তারপর ভাল ছেলে হয়ে মায়ের আঁচল ধরে ধরে বসে দিন কাটাবে—হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ির মধ্যে ওরা নেই—ওরা ঘুমিয়ে উঠে খাবে আর খেয়ে উঠেই ঘুমতে যাবে—মনে কল্পনার বাজে খরচ নেই—মাথায় জগতের নবনব চিন্তাধারার ভিড় নেই—সমাজশাসনে মান্ধাতার পন্থী এবং মেয়েদের সম্বন্ধে মনুর মত কড়া হিসেবী—মিটিং-এ গিয়ে ওরা গলাচিরে দেশোদ্ধার করবে—আর বিয়ের সময় মেয়ের বাপের গলায় পা দিয়ে ওরা টাকা আদায় করবে।—কর্ণাভরণ নেড়ে কাবেরী বললে, "এমন সব নীতিজ্ঞানী খাঁটি বঙ্গসন্তান আমায় বিয়ে করতে চায়—তোমার মত তারা বেহিসেবী আদর্শবাদী নয়—তা জান?"

ভাস্কর সিগারেটের ক্ষীণ ধূমজাল রচনা করছিল—বললে—"বেচারা!"

"আমি বেচারা ! —ওঃ, ওঁকে বিয়ে না করলে বেচারা—কী gigantic ego—"

"তুমি কেন—ওই শান্তশিষ্ট হৃষ্টপুষ্ট হিসেবী নীতিজ্ঞানী লোকটি—যার সংসারে তুমি মূর্তিমতী উপদ্রবের মত আসবে—সে-ই সহানুভূতির পাত্র।"

"যাঃ, তুমি আমায় হতাশ করলে। তাকে সহানুভূতি করা রেখে তোমার এমন প্রত্যাখ্যানে পটাশিয়াম সায়ানাইড খাওয়া উচিত।"

"সঙ্গে নেই।"

"তবে অন্তত সমুদ্রে লাফ দিলেও ত পার।"

"সাঁতার জানি, ডুবব না।"

"তাই ত, ভাবালে তুমি।—কি করলে শোভন হয় ?"

"বিয়েই ক'রে ফেল—আর যখন কিছু মনে পড়ছে না।"

কাবেরীর মুখ রোদে রক্তাভ হয়ে উঠেছে—কালো চোখ কৌতুকে ঝলমল করছে। চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে বললে, "আর ওই যে যারা রয়েছে ধনবান নীতিবান স্থিতিমান পাত্র, তাদের কি ব্যবস্থা হবে ?"

ভাস্কর সিগারেটটা ফেলে দিয়ে উঠে বসল। সহসা গম্ভীর হয়ে বললে, "শোন কাবেরী, অর্থ আমার নেই—আরাম তোমায় দিতে পারব না—সুখ পাবে কি-না জানি না। আনন্দ আসবে কি-না জানি না। আমার রিক্ত ভালবাসা তোমার কোন কাজে লাগবে ?—অনেকবার তাই ভেবেছি—অনেক দ্বিধা করেছি, তবু আজ বলছি—গ্রহণ করবে একে ? পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধনরত্ন নেই ব্যাঙ্কের মোটা ব্যালান্স নেই—বড় বড় বাড়ী নেই—বিলাস নেই—এসব কিছুই তোমায় দিতে পারব না—হয়ত দেব শুধু অনিশ্চয়তা অশান্তি বেদনা—তুমি কি তাকে স্বীকার করবে ?"

কাবেরী অনেকক্ষণ কোন কথা বললে না—তারপর ধীরে বললে, "বেদনায় যে আনন্দ আছে—তোমায় চিনে আমি সে সত্যকে জেনেছি ভাস্কর।"

ভাস্কর কাবেরীর হাত নিজের হাতের ভেতর তুলে নিলে—দুজনে নীরব হয়ে রইল।

একদল শিংওলা সাদা ছাগল হিলওলা জুতোর মত খটাখট আওয়াজ ক'রে পাহাড় বেয়ে এসে চারপাশে চরতে আরম্ভ করলে। ছাগলগুলোর রক্ষক কাপ্রিবাসী এক যুবা তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে ওদের দেখে অবাক হয়ে গেল। হাতের দ্রাক্ষাদণ্ডটা নামিয়ে রেখে সে একটা প্রাচীন থামের ভাঙ্গা পাথরে হেলে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে ওদের দেখতে লাগল। কাবেরী বললে, "লোকটার কি চেহারা ! এই ভগ্নস্তূপের ভাস্কর যেন ওকে পাথর কেটে ক'রে রেখে গেছে।"

"হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু ও যেরকম মুগ্ধ হয়ে তোমায় দেখছে—আমার ওকে ডুয়েল-এ ডাকা উচিত !"

কাবেরী হেসে আকুল হয়ে বললে, "তাতে ত হার তোমারই হবে ওর হাতে তবু একটা লাঠি আছে তোমার একটা কাঠিও নেই।"

ভাস্কর বললে "হ'ত যদি টিবেরিয়োর রাজ্য—দেওয়া যেত ওকে বন্দী ক'রে সিংহের খাঁচায় ফেলে ব্যস্, ল্যাঠা চুকে যেত। নাঃ যতই দেখছি সেই সব দিনগুলোই ছিল ভাল—সোজাসুজি ব্যবস্থা, আইনের ঘোর-প্যাঁচ নেই।"

"আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে ভাস্কর, কেমন ছিল তারা। তাদের জীবনের নিত্যকার দিনযাত্রার একটি দিন দেখতে ইচ্ছে করে। প্রভাতের মধ্যে একটি দিন কি করত, কি ভাবত—how they lived and loved—"

কাবেরীর দৃষ্টি পরিত্যক্ত পুরীর ওপর, ধূসর প্রস্তরস্তূপের ওপর ছাগল-চরা কাঁটাবনের ওপর স্বপ্নের মত ঘন হয়ে উঠল। এমনি দীপ্ত রৌদ্রভরা দিনে নীল আকাশের তলে গাঢ় নীল সমুদ্রের জলে স্নানরতা সুন্দরীদের কি লীলা চলছে—শুক্তিশুভ্র নগ্নদেহ মার্বেল মূর্তির মত মনোহর সুন্দর—কে জানে কার মনকে মুগ্ধ বিহ্বল করেছে। জনহীন সমুদ্রসৈকতের উপলসঙ্কুল তটে সিন্ধুশকুনের দল সুন্দরীদের তীক্ষ্ণ হাসির তীরে চমকে উঠেছে—করতালির কলরোলে জল ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে। নির্জন দ্বীপের দ্রাক্ষাবিতান বেয়ে কমলালেবুর বনের পরিপক্ক ফলে ভরা বৃক্ষের তলে তলে স্নান শেষে শুভ্র চরণের সজল চিহ্ন রেখে রেখে রমণীর দল চলে গেছে।…

ভাস্কর অন্যমনস্ক হয়ে বললে, "কে জানে। কি ভাবত তারা—ভালবাসত কি কখন ?—কি ছিল তাদের প্রেমের পরিমাণ ? কি দিয়ে চিনত কেমন ক'রে বিচার করত, কতটুকু মূল্য দিত—কতটুকু ত্যাগ করতে পারত ? আমাদের আজকের মনের সঙ্গে তাদের সেদিনের মনের কোন কি যোগ ছিল ? মানুষের দেহগত ইতিহাসকে জীবসৃষ্টির সেই সুরু থেকে বের ক'রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

কিন্তু মনোগত য়্যাফিনিটি-র ইতিহাস কিই বা জানা যায়। কি ক'রে বলা যায়।"

"তাই ভাবি"-- কাবেরী ভাঙ্গা পাথরগুলো একটু স্পর্শ ক'রে বললে, "এখন এইগুলো দেখলে কি বোঝা যায় তখন কি ছিল এখানে --কে তারা ছিল -- কি ভেবেছিল-- আমাদেরই মত সুখদুঃখে বিচলিত হয়ে তাদেরও দিন কেটেছিল ?" খররৌদ্রমধ্যাহ্নে ছায়াচ্ছন্ন প্রাসাদের প্রায়ান্ধকার কক্ষ -কারথেজের কালো ক্রীতদাসীর দল চিত্রিত ঝারি ভরে সুগন্ধ বারি বয়ে এনে মসৃণ রঙীণ কক্ষতল মার্জিত শীতল করেছে—গ্রীক রোমক চিত্রকরের দল কক্ষগাত্রে চিত্র এঁকে করেছে তাকে অপূর্ব সুন্দর। কে জানে কেমন বরাঙ্গনারা সে ঘরে বিহার করেছে, সুদীর্ঘ কেশ সযত্ন কৌশলে প্রসাধন করে বেঁধেছে— মহার্ঘ বসন বিচিত্র ভঙ্গীতে বিন্যাস ক'রে পরেছে। তাদের কেশের স্খলিত কুসুমে সুরভি অঙ্গরাগের চূর্ণ রেণুতে চিকণ কক্ষতল চিত্রিত হয়েছে। স্নিগ্ধ সায়াহ্নে তারা উদ্যান-উৎসের পাশে মর্মর আসনে বসে সুবর্ণ তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়েছে—উপবন বৃক্ষের ফুল্ল শাখায় সোনার ঝোলনা ঝুলিয়ে দুলেছে। তার পর দূরে নাপোলির উপকূলে পম্পি নগরীর দেউলগুলি ধীরে মিলিয়ে গেলে, ভিনাসের মন্দিরে দীপ নিভে গেলে স্তব্ধ মধ্য রাত্রে অন্ধকারে সৌধশিরে রত্নখচিত রেশমশয্যায় শুয়ে কার আগমনের প্রতীক্ষা করেছে—কালো জলে ছায়া-ফেলা দীপ্ত অগণিত নক্ষত্রের মত আশায় বারেবারে স্পন্দিত হয়েছে---কুন্তলায়িত ভিসুভিয়াসের অকস্মাৎ-উদ্যত অগ্নি-ফণার মত হয়ত কখন হিংসায় আত্মহারা হয়ে আক্রোশে ফুলে উঠেছে। …

কাবেরীর দলের অন্য সকলে কলরব করতে করতে উঠে এল। কাবেরীর ভাই কাঞ্চন বললে "বেশ যা হোক তোমরা —এখানে এসে বসে আছ, আর আমরা খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হলাম।"

একজন বললে, "কাবেরী, তোমাদের অন্তর্দ্ধানে আমরা ভাবলাম তোমায় কোন ড্রাগন এসে ধরে নিয়ে গেছে—আর ভাস্কর গেছে তোমার উদ্ধারে।"

ভাস্কর বললে, আর এসে দেখছ দিব্যি বসে আছি! ভায়া হে, এই মেটিরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর যুগে কোন মিরাক্‌ল্‌কি ঘটে—ড্রাগনগুলো কোথায় যেপালাল—শিভাল্‌রি দেখিয়ে হৃদয় জয় করার পথ একেবারে বন্ধ। তাইত আমি ভাবছিলাম, ওই লোকটিকেই ডুয়েল-এ ডাকব!" ভাস্কর কাপ্রি যুবককে দেখিয়ে দিলে।

সবাই হৈ হৈ ক'রে হেসে উঠল।

কাঞ্চন হাসি থামিয়ে বলল, "আপাতত ডুয়েল লড়াটা স্থগিত রেখে Grotta azzurra দেখতে যাবে চল। আমাদের এত দেরী দেখে মাঝিরা যা চটেছে, ওদের সঙ্গেই একটা লড়াই হবে-- কিছু ভেব না।"

সবাই হুড়োহুড়ি হাসাহাসি করতে করতে বন্ধুর পথ দিয়ে নেমে চলে গেল। জনহীন ভগ্নপুরী আবার নীরব হয়ে রইল। রাখাল যুবক তার বাঁশী বের ক'রে বাজাতে লাগল। অনেক দিনের পুরানো রাগিণীর করুণ সুর ভাঙ্গা পাথরের ভেতরে ভেতরে উদাস হয়ে ঘুরতে লাগল।

প্রায় দুহাজার বছর আগে। কাপ্রিদ্বীপশিখরসৌধে সেদিন উৎসবের সমারোহ লেগেছে। সম্রাট টিবেরো তাঁর নবতমা প্রেয়সীকে নিয়ে প্রমোদের জন্যে কিছুদিন আসছেন সেখানে। দাস দাসী সৈনিক কর্মচারীদের কাজের শেষ নেই। নানা দেশের নানা ভাষার মিশ্রিত কলরবে কোলাহল চলেছে। প্রহরীরা অস্ত্রশস্ত্র শাণিত করছে, গ্রীক ক্রীতদাসেরা প্রাসাদস্তম্ভগুলিকে ফুলের মালা দিয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যে জড়াচ্ছে। কয়েকজন ফিনিশিয়ান শঙ্খশিল্পীদের সঙ্গে মুক্তা গেঁথে গেঁথে মনোহর চামর তৈরী করছে। কারথেজিয়ান কৃষ্ণ ক্রীতদাসীরা স্নানাগারের মর্মর আধারগুলি কোনটি পুষ্পনির্য্যাসে কোনোটি উষ্ণ সফেন দুগ্ধ দিয়ে কোনোটি স্ফটিক-স্বচ্ছ শীতল জলে ভরে রাখছে। একদল লোক সম্রাটের ভোজনকক্ষ অতি সাবধানে সাজাচ্ছে। দুখানি সোনার সুখাসনে সোনায় বোনা আবরণ দেওয়া, তার পাশে পাশে গজদন্তের ত্রিপদীতে স্বর্ণথালে থোলো থোলো কালো আঙুর ডালিম লেবু পীচ—দূর-থেকে-আনা নানা দুষ্প্রাপ্য ফল—আর সকল দেশ থেকে আহৃত আসব—বাক্কাসের (Bacchus) হাস্যবিহ্বল মর্মর মূর্ত্তিগুলির হাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নীলার পাত্রে নীল পান্নার পাত্রে সবুজ গোমেধপাত্রে তরল স্বর্ণবর্ণ মণির আধারে রক্তের মত লাল আর স্বচ্ছ স্ফটিকপাত্রে বর্ণহীন তীব্র সুরা ভরে রয়েছে।

শয়নমন্দিরে ভারতীয় চন্দনতরুর সুগন্ধি সুখাসন—তার ওপর নরম রেশমের উপাধান। বাবিলোনীয় দাসেরা ধনগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় চিত্রিত কক্ষগাত্র ধূসর ক'রে দিয়েছে। সুন্দরী এ্যাথেনিয়ান দাসীরা সোনার সুতোয় বাঁধা ফুলের পাখা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছে। কক্ষকোণে ফুলধনুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুমূর্তির মাথায় সুবর্ণ দীপাধারে স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বল দীপ জ্বলছে।

গভীর তূর্যধ্বনিতে সম্রাটের আগমন ঘোষিত হ'ল। বলিষ্ঠ গলিক্ (Gaulic) দাসেরা বন্ধুর পার্বত্যপথে সাবধানে চীনাংশুকের চতুর্দোলায় সম্রাট ও তাঁর সঙ্গিনীকে প্রাসাদদ্বারে বহন ক'রে নিয়ে এল। নানা সঙ্গীতের সঙ্গে মেয়েরা ফুল ছড়িয়ে ঝারিভরা সুগন্ধি বারি ঢেলে তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিলে। সম্রাটের বিরাট স্থূল বপু—রক্তনীল মখমলের প্রকাণ্ড পুরু টোগায় আচ্ছাদিত, মোটা খাটো ঘাড়ের ওপর মস্ত মাথা বাঘের মত বৃহৎ চৌকো মুখ ওষ্ঠে নিষ্ঠুরতা, তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র চোখের বাঁকা চাহনি কোন্ দিকে চেয়ে আছে ঠিক বোঝা যায় না, তবুও তার বিষাক্ত তীব্রতা মনকে ভীত কাতর ক'রে তোলে। সম্রাটের পাশে তার নতুন প্রণয়িনী—তাকে দেখে সকলে অবাক হয়ে রইল। একখানি ক্ষীণ দীর্ঘ রশ্মিরেখার মত কোন স্বপ্নচারিণী এ! অতল কালো চোখে বাদল মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া রক্ত ওষ্ঠপুটে তীব্র সুরার মদিরমায়া দীর্ঘ কালো কেশে জড়ান স্থূল মুক্তার মালা কুয়াশার আড়ালে অগ্নিশিখার মত স্বচ্ছ সাদা বসনে আবৃত তনুদেহ। সবাই ভাবতে লাগলে কোথা থেকে এল এ? দূরে সমুদ্র পারে শোনা যায় যেখানে আর এক সভ্যদেশ আছে—মঠমন্দির-চূড়া-চুম্বিত যার আকাশ—কবির বীণায় আর ঋষির বন্দনায় ঝঙ্কৃত যার বাতাস যারা নাকি জগতকে শেখায় সম্রাজ্যবিজয় অসি দিয়ে নয়- ভালবাসায়, সেই রৌদ্রঝলসিত মহাদেশের শ্যামঘন উপবনের উচ্ছ্বসিত ফাল্গুনের মত এল কি এ! অথবা নীলনদকূলে গাঢ় নীল আকাশতলে পীত আতপ্ত রুক্ষ মরুর দ্রাক্ষাকুঞ্জের পত্রতলে পরিপক্ক ফলগুচ্ছের অন্তরসঞ্চিত সুরারসের মত অপেক্ষায় ছিল এতদিন? কিম্বা কোন তরঙ্গসঙ্কুল সিন্ধুবিধৌত দ্বীপের সৈকতশায়ী শুক্তির মুক্তার মত গোপন ক'রে রেখেছিল নিজেকে? নয়ত নগণ্য অসভ্য হিমমজ্জিত এক তুষারপুরে শ্বেত স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়েছিল কোন খানে! জগতের কোন্ প্রান্তের কোন্ প্রদেশ হতে সম্রাট এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন এখানে? …

এসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য কেউ দেয়নি কোন দিন। অসংযত বিলাসে আর উন্মত্ত আমোদে প্রাসাদের দিনগুলি কেটে যেতে লাগল।

সে দিন জ্বলন্ত মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে আতপ্ত মূর্চ্ছাহত সমস্ত। পাথর তেতে বালি তেতে সমুদ্রের শীতল জলকেও তাতিয়ে তুলেছে। সম্রাটের রাত কেটেছে সৌধশিরে সুরা সঙ্গীতে প্রমোদনৃত্যে। এখন দিনে নিদ্রা দেবার অবসর—কিন্তু অবাধ্য নিদ্রা আজ কিছুতেই আসছে না এই গরমে। প্রায়ান্ধকার স্নিগ্ধগন্ধ কক্ষে চন্দনপালঙ্ক ছেড়ে সম্রাট মার্জিত মসৃণ মর্মর মেঝেতে শুয়েছেন, স্বল্পবসনা সুরূপা দাসীরা সুগন্ধে সিক্ত পুষ্পপাখায় ব্যস্ত হয়ে ব্যজন করছে শীতল জল সিঞ্চন করছে—কতরকমে অঙ্গসেবা করছে কিন্তু কিছুতে সম্রাটের স্বস্তি নেই, অস্থির হয়ে উঠেছেন সবাই শঙ্কিত হয়ে রয়েছে। সহসা সম্রাট ব'লে উঠলেন "চল। স্নান করা যাক নীলগুহায় গিয়ে—"

নীলগুহা খেয়ালী প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। সেখানে সূর্যের প্রখরোজ্জ্বল আলো জলের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ হয়ে আসে। সে যেন পাতালতলে নীল পরীদের দেশ নিদ্রার মত ঘননীল জল—স্বপ্নের মত স্নিগ্ধ নীল আলো—সেখানে গেলে সব কিছুকে নিবিড় নীল মায়ায় নিষিক্ত হয়ে আশ্চর্য নীলাভ দেখায়। দ্বীপের উচ্চ চূড়ায় প্রাসাদ, সেখান থেকে পাহাড়ের আভ্যন্তর কুরে কুরে সুড়ঙ্গ সমুদ্রজলের তলায় নীলগুহায় নেমে গেছে।

সম্রাটের ইচ্ছা ব্যক্ত হওয়া মাত্র একদল দৃঢ়দেহা রূপসী দাসী তৎক্ষণাৎ চতুর্দোলা নিয়ে উপস্থিত হ'ল। সম্রাটের বিপুল দেহ অতি সাবধানে দোলায় তোলা হল—সঙ্গিনী ও পরিচারিকা-পরিবৃত হয়ে তিনি স্নানে চললেন। পরিচারিকাদের হাতের জ্বলন্ত মশালের আলোয় ঝিনুকে বাঁধান গোপন সোপান-পথের অন্ধকার ঝলমলিয়ে উঠল।

সোপান শেষে প্রবাল বেদী—সম্রাট সেখানে বসলেন। সুন্দরীরা তাঁর চারিধারে ঘিরে স্বর্ণঘটে জল ঢাললে—কেউ গাত্র মার্জনা করলে, কেউ পদপ্রক্ষালন ক'রে দিলে। নীল কাচের মত স্বচ্ছ অচ্ছেদ জল স্নানরতাদের দেহাঘাতে চঞ্চল তরঙ্গবিহ্বল হয়ে উঠল। সম্রাট তৃপ্তনেত্রে তাঁর নবলব্ধা

প্রেয়সী অভ্রদিতার স্নানলীলা দেখছিলেন। মৎস্যকন্যার মত লাবণ্যলীলায়িত ওর নিরাবরণ দেহ স্বচ্ছন্দ লালিত্যে জলে হিল্লোলিত হচ্ছে—ঘন কেশভার নীল মেঘস্তূপের মত জলের ওপর ভাসছে। মুক্তামসৃণ শুভ্রদেহের রেখায় রেখায় জলেতে আলোতে নীলরংয়েতে পিছ্‌লে মিলে গলে গিয়ে ওকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে—অঙ্গে অঙ্গে যেন যৌবনের প্রচ্ছন্ন অগ্নির স্তিমিত আভা শত নীল শিখায় থেকে থেকে ঝলমলিয়ে নৃত্য করে উঠছে।

টিবেরো স্থূল একখানা হাত বাড়িয়ে অভ্রদিতার দেহটা কাছে টেনে নিলেন, বললেন “অভ্রদিতা, তুমি দেখছি সত্যিই সুন্দর। এর আগের বারে যখন এখানে এসেছিলাম, মনে পড়ছে, তখন যে সঙ্গে ছিল সে এত সুন্দর ছিল না।”

অভ্রদিতা বললে “সম্রাটের অনুগ্রহ।”

একবার ক্রূর চোখে চেয়ে সম্রাট বললেন, “হুঁ। অনুগ্রহ যাতে স্থায়ী হয় তোমার জীবনে সেটাকেই লক্ষ্য ক’রো। নইলে আবার যখন এখানে আসব তখন যে সঙ্গে আসবে, সে তোমার চেয়েও সুন্দর কেউ হবে।” তিনি বিষাক্ত হাসি ঈষৎ হাসলেন। গুহার এবড়ো খেবড়ো পাথরের নীচু ছাদে বাঁকা হাসিটা ঠেকে গিয়ে যেন আট্‌কে রইল।

অভ্রদিতা কোন কথা বললে না। শুধু তার অতল কালো চোখ দুটি কোন্ বেদনায় বৈদূর্য মণির মত নীল হয়ে জেগে রইল।

প্রাসাদে ফিরে এলে প্রতিহারী জানালে রোম থেকে রাজকার্যের প্রয়োজনীয় সংবাদ নিয়ে দূত এসে সম্রাটের দর্শন প্রার্থনায় রয়েছে। সম্রাট দূতকে আনতে ইঙ্গিত করলেন।

দূত এসে উত্তোলিত হস্তে অভিবাদন জানালে, তারপর সভয়ে সবিনয়ে বক্তব্য নিবেদন করলে। মধ্য-ইয়োরোপের খণ্ডযুদ্ধে বড়ই গোলযোগ চলেছে। সম্রাটের পোষ্যপুত্র জার্মানিকো স্বয়ং সেখানে যুদ্ধে গিয়েও সামলাতে পারছেন না। অবাধ্য শত্রুরা অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করেছে। সৈন্যেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে—মন্ত্রী সামন্তগণ এখন সম্রাটের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

সম্রাটের মুখ গম্ভীর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। “অসভ্য বর্বরদের এত বড় স্পর্ধা!”—দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, “আচ্ছা, আমি শিক্ষা দেব। ওদের পায়ের চামড়া দিয়ে আমাদের যাত্রাপথ ঢেকে দেওয়াব—ওদের মুণ্ড দিয়ে বিজয়-তোরণ তৈরি করাব! চেনেনি সুসভ্য রোমের সশস্ত্র সভ্যতাকে—জানে না রোমের সাগরিক শক্তিকে—জানে না বর্বররা রোমের কঠিন দৃঢ়তায় দয়ার দুর্বলতা নেই—জানিয়ে দিচ্ছি আমি।”

প্রাসাদে সকলে ব্যস্ত হয়ে হৈ হৈ ক’রে উঠল। সম্রাট তৎক্ষণাৎ সাজসজ্জা ক’রে প্রস্তুত হ’তে লাগলেন। পাত্র-মিত্র দেহরক্ষীদের নিয়ে তিনি সেইদিনই রোমে ফিরে চললেন। অভ্রদিতাকে সেইখানে থাকতে আদেশ দিয়ে গেলেন। প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে অভ্রদিতা দেখতে লাগল সাদা পালতোলা নৌকা শৃঙ্খলিত দাসেদের দ্রুত উৎক্ষিপ্ত দাঁড়ে জোরে ভেসে চলে গেল।

সম্রাট চলে যাবার পর কাপ্রিতে উৎসবের উত্তেজনা থেমে গেল। প্রাসাদে এখন কর্মব্যস্ততা কমে গেছে—দিনগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে একটি শিথিল শান্তি। ভোগ-ক্লান্ত গ্লানির পর এসেছে নিদানির্মল ছুটি। তৃপ্ত আলস্যে মধুর অভ্রদিতার অবসর। কখন সে গুঞ্জন ক’রে গান গেয়ে বেড়ায়—উপবনে গিয়ে অকারণে ফুল তোলে—ঝোলনায় দোলে, উদ্যান-উৎসের রাজহংসদের নিয়ে খেলা করে—প্রাসাদ-অলিন্দে পারাবতগুলিকে শস্যকণা খাওয়ায়। রাত্রি-শেষে শিথিলকেশে ত্রস্তবেশে শয্যা ছেড়ে উঠে আসে স্তিমিততারকা আকাশের পানে নিদ্রাবিজড়িত চোখে চেয়ে দেখে—তারপর সহচরীদের ডেকে নিয়ে সমুদ্রস্নানে চলে। প্রাসাদের পাষাণ-বাঁধান পথ ধ’রে পাখীর কুণ্ঠিত কাকলী-ভরা উপত্যকাভূমির ভিতর দিয়ে স্খলিত আঁচলের মত এলায়িত সৈকতের পাণ্ডুর বালুস্তূপ পার হয়ে রাত্রির মত আঁধার গভীর সমুদ্রের আলিঙ্গনে নিজেকে নিমজ্জিত ক’রে দেয়।

কোন দিন চলে মৌমাছিমুখর কমলা-কানন পেরিয়ে দ্রাক্ষাক্ষেতে কৃষক রমণী কাজ করে তাদের ছাড়িয়ে বিজন বনপথ বেয়ে বিশাল বীচ ও সাইপ্রাসের সবুজ অন্ধকারে জনহীন জায়গায় যেখানে বনডুমুরের বড় বড় পাতার আড়ালে থোলো থোলো ফল পেকেছে—বুনো অলিভের বৃক্ষতলে ঝরা ফলে ভরে রয়েছে—বন্য ছাগলের দল লোভে লোভে এসেছে—অভ্রদিতা চুপে চুপে গিয়ে তাদের অবাক ক’রে দিয়েছে।

কখন তারা দল বেঁধে পাহাড়ের চূড়ায় বেড়ায়—সঙ্কটশীর্ণ পথ উপলসঙ্কুল—অভ্রদিতা উল্লসিত হয়ে চলে—বড় বড় আলগা পাথরের আড়ালে কোন গোপন ফাটলে ঈগল-দম্পতী নীড় বেঁধেছে নিভৃতে—খুঁজে পেয়ে তারা হঠাৎ হাসিতে তাদের ক্রুদ্ধ সচকিত ক'রে উড়িয়ে দিয়েছে।

কোনো নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় যায় নির্জন পাহাড়তলীতে—যেখানে জলের ধারে ঘনদীর্ঘ শরবন কালো সাপের মত কাঁপে—স্থির কালো জল কাঁচের মত চকচকে—শেষ সূর্য্যের এক ঝলক আলো এক পাশে সোনার মত জ্বলে—দূরে দিগন্তে কালো হয়ে আসা আকাশের কোলে ভিসুভিয়সের অগ্নিজিহ্বা আলেয়ার মত থেকে থেকে জ্বলে ওঠে। নীল্‌চে নরম কুয়াশা আস্তে আস্তে নেমে আসে—ভিজে শ্যাওলার গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে—নলখাগড়ার আড়ালে গাঢ় সবুজ জলজলতার বাসায় বনহংসী বসে থাকে—বুকের নরম পালকের তলায় মসৃণ ডিমগুলিকে ঢেকে নিয়ে—তাদের ডানার ময়ূরকণ্ঠী পালক আধ-অন্ধকারে চকচকিয়ে ওঠে। অভ্রদিতা দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে সন্তর্পণে চলে যায়—পাছে তারা ভয় পায়।

প্রাসাদে সকলে কাণাকাণি করে—এ কেমন বন্য-স্বভাবা দুরন্ত নারী! সোণার খাঁচার পাখিকে যখন তার বাঁধা বুলি বলতে না হয় তখন সে বসে বসে বাঁধা নিয়মের দানা খাক্ না। মুক্ত আকাশের আলো দেখে তা বলে ওর ডানা অমন উস্‌লে উঠবে কেন—এ কি অনিয়ম! তারা পরস্পরকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে—এ মেয়ের ললাটে দুঃখ লেখা আছে।

অভ্রদিতা সেদিন স্নান সেরে ফিরছে। অঙ্গে সাগরের আলিঙ্গনের মত স্বচ্ছ নীল বাস, কণ্ঠে নীলার একটি কণ্ঠী—শাঁখের গায়ে যেন জলের নীল দাগ। কোথায় কে বাঁশী বাজায়। অভ্রদিতা শব্দ শুনে তার সন্ধানে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গিনীরা পেছিয়ে পড়ে আছে। কয়েকটি কমলালেবুর গাছে আঙ্গুরের লতা জড়িয়ে উঠেছে। ফুল্ল ডালে মাতাল মৌমাছিদের কম্পিত ডানা ফুলের রেণুতে রঙীন হয়ে গেছে। ঝরা ফুলে ভরা ঘাসে বসে এক বিদেশী বাঁশী বাজাচ্ছে। দৃঢ় দীর্ঘ দেহ—রৌদ্রচুম্বিত রং—সিংহের মত রুক্ষ পিঙ্গল চুল—ধাতু বেষ্টনী দিয়ে আবদ্ধ চওড়া ললাটতলে সোজা সুগঠিত নাক। মোটা কাপড়ের কটিবাস, পায়ে জানু অবধি চরণাবরণ—দ্রাক্ষা দণ্ডখানি পাশে রেখে সে বাঁশী বাজাচ্ছে। য়্যাম্বারের মত তার গভীর দুটি চোখ—সুরের ঘোরে কখন করুণ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে—কখন দিন-শেষের সূর্যের মত পিঙ্গল উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

অভ্রদিতা মুগ্ধ হরিণের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ কি সেই স্বরস্রষ্টা সাতায়ার (Satyr)?—যারা গোপন বনের সবুজ অন্ধকারে বিচরণ করে—উজ্জ্বল ঝরণার ধারে শ্যাওলা-শ্যামল পাথরে বসে বাঁশী বাজায়—পাখীরা কাকলী ভুলে সে বাঁশী শোনে শান্ত হয়ে—হরিণরা একে একে এসে ঘেঁষে দাঁড়ায়—বনফুল বিবশ হয়ে খসে খসে পড়ে—আকাশের দীপ্ত তীক্ষ্ণ তারাগুলি বাঁশীর নেশায় স্নিগ্ধ স্তিমিত হয়ে আসে। …

অভ্রদিতার সঙ্গিনীরা সেই পথে এল। বংশীবাদক তাদের দেখে বাঁশী থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। অভ্রদিতাকে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে রইল। তারপর জোড়হস্তে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী?"

বিদেশীর মূঢ়তায় সহচরীরা হেসে গড়িয়ে পড়ল। অভ্রদিতা শুষ্কস্বরে বললে "না। দ্বীপের যিনি অধীশ্বর—আমি তাঁর আজ্ঞাধীনা দাসী।"

সেদিন হ'তে বিদেশীর কাজ হ'ল অভ্রদিতাকে বাঁশী শোনান। তার নাম অরিয়াস—গতগৌরব গ্রীসের ক্ষুদ্র এক গ্রাম থেকে সে এসেছে। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় ভাগ্য অন্বেষণে। শতাব্দীগত সংস্কৃতিতে রসসৃষ্টি ওর রক্তে রয়েছে—রূপানুভূতি ওর স্বভাবগত ধর্ম। বনিয়াদি বাড়ীর পরিত্যক্ত বাগানের প্রাচীন গাছ আগাছায় আচ্ছাদিত হয়েও পুষ্পপ্রচুর হয়ে ওঠে। অদৃষ্টের উৎক্ষেপে নিক্ষেপে অবসন্ন ওদের জাতি—তবু অযত্নের মাঝেও মন ওদের সহজে রস-সুন্দর।

কোনদিন উষার উদয়ের আগে অরিয়াসের বাঁশী বাজে। অভ্রদিতা শুয়ে শুয়ে শোনে—স্বর্গহারা দেবতার বেদনার মত এর সুর—দুঃখদীর্ণ লোভে ক্লিষ্ট পৃথিবীর হিংস্র নিষ্ঠুরতায় কে যেন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ফিরে যেতে চায়। অভ্রদিতা জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে—নীল শৈলশিখরশিরে অস্তমিত ক্লান্ত চন্দ্র তুষারের মত তেজোহীন দেখায়—শান্ত সমুদ্রের ওপরে উজ্জ্বল শুকতারা তখনও জ্বলতে থাকে। বাঁশীর করুণ তানে অভ্রদিতার চোখে অশ্রু আনে। কিসের স্মৃতি জাগে ওর মনে কে জানে! কোন নদীতীরে রাত্রি-

শেষের তন্দ্রাচ্ছন্ন অন্ধকারে অস্পষ্ট এক মন্দির—বিরাট গম্ভীর। মন্দির-অঙ্গন হতে পাষাণ সোপানশ্রেণী নেমে গেছে উপল উচ্ছল স্বচ্ছ নদীজলে। মেয়েরা স্নান সেরে শুচিবস্ত্রে থালায় ভরে ফুল নিয়ে চলে, পূজারীরা মন্দ মন্দ ছন্দে মন্ত্র বলে, ধীরে ঘণ্টা বাজে—উষার আকাশ ক্রমে লাল হয়ে ওঠে। ঘুম-ভাঙা চোখে তখন যে বালিকা চলত মায়ের হাত ধরে, তারই কথা কি আজ মনে পড়ে ? …

রৌদ্রময়ী রাত্রির মত স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। সমুদ্র যেন নিশ্বাস নিরুদ্ধ ক'রে নিঃশব্দে পড়ে রয়েছে—অলিন্দে ক্লান্ত কপোতের কূজন ক্ষীণ হয়ে এসেছে—এমন সময় অরিয়াসের বাঁশী বাজে—মরুর নিশ্বাসের মত নিঃসঙ্গ—তপ্ত বাতাসে উদাস হয়ে ঘোরে। অভ্রদিতা কান পেতে শোনে।… যোজন জুড়ে পড়ে আছে আরক্ত পাথরের আতপ্ত প্রান্তর। কবেকার মানুষ কোন্ দিন সেখানে বসতি করেছিল, গড়েছিল নগর—লাল পাথর কেটে কেটে করেছিল পথঘাট, ঘরবাড়ী। জনহীন নগরে আজ পরিত্যক্ত পাথরের অরণ্যে পাগল হাওয়া প্রমত্ত বেগে বেগে চলে—রুক্ষ বালি তীক্ষ্ণ হয়ে ওড়ে—খররৌদ্রে মরীচিকা মিথ্যা মায়া হানে। বাঁশী সেই ভীষণ সুদূরে আহ্বান করে বারে বারে।… উন্মুক্ত আকাশতলে উন্মত্ত হাওয়ার মত দুরন্ত মুক্তির বন্ধনহীন আনন্দের আমন্ত্রণ জানায়।… অভ্রদিতার বক্ষ দুলে ওঠে। অলস ভোগের অবসাদ চূর্ণ ক'রে সমস্ত নিয়মের নিষেধের শাসনের পাশ ছিন্ন ক'রে অবুঝ অযৌক্তিকতায় চলে যেতে চায় অজানায়—বাধাহীন বেগে—অনাস্বাদিত স্বাধীনতার উদ্দাম উল্লাসে।

মৌনমধুর সন্ধ্যায় বাদাম ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে বাতাস—মাট্‌ল্ গাছের পত্রপুঞ্জের আড়ালে সন্ধ্যাতারা দেখা দেয়—নাপোলির উপকূল তরল তিমিরে তলিয়ে যায়—গৃহে গৃহে জ্বালা সন্ধ্যাদীপগুলি আলোর বুদ্বুদের মত জ্বলতে থাকে। উদ্যানদীঘিতে নিদ্রিত রাজহংসের পাশে পদ্মের পাপড়িগুলি মুদ্রিত হয়ে আসে। বাঁশী বাজে সন্ধ্যার পদপাতের সুরে। জালিকাটা অলিন্দ দিয়ে চাঁদের আলো চিত্রিত হয়ে অভ্রদিতার কেশে বেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে গালে হাত রেখে বসে থাকে।… গোধূলিধূসর সুদূর আকাশ, অবারিত মাঠ, পরিপক্ক শস্যে স্বর্ণাভ—মাঝখান দিয়ে পথ গিয়েছে বেঁকে—কর্মশেষে ক্লান্ত কৃষক ঘরে ফেরে সেই পথে—রাখাল ছেলে বাঁশী বাজিয়ে যায়—পাখীরা কলরব ক'রে নীড়ে ফেরে—গৃহমুখী গাভী ব্যাকুল হ'য়ে বৎসকে ডাকে—অঙ্গনে মঞ্জরিত বৃক্ষশাখায় গুঞ্জরিত মৌমাছিরা নীরব হয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে দুরন্ত শিশু মায়ের ঘুমপাড়ানি শুনে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কবে অভ্রদিতা সে গান শুনেছিল ? … সারাদিনের চঞ্চলতায় ক্লান্ত দেহ কে কোলে টেনে নিয়েছিল ? —নিদ্রাতুর নয়নে তার সস্নেহ চুম্বন দিয়ে কে বন্ধ করে দিত ! …

স্তব্ধ মধ্যরাত্রি। বাঁশীর সুর বিষণ্ণ গম্ভীর। অভ্রদিতা সচকিতে শয্যা ছেড়ে উঠে বসে।… দীপ নিভে গেছে—নিশিগন্ধা ফুলের গন্ধভরা অন্ধকারে কক্ষ ভরেছে। নিদ্রিত দ্বীপ—নিদ্রানির্জন রাজপুরী। অভ্রদিতা ধীরে সৌধশিরে দাঁড়ায় এসে। নীচে মৃত্যুর মত আঁধার গভীর সমুদ্রে অদৃশ্য তরঙ্গের অশ্রান্ত ধ্বনি—ধ্যান-অচেতন মহাকালের কালো জটাজালের অন্তরালে জীবন-জাহ্নবীর বিরামহীন বক্ষধ্বনি। ওপরে কৃষ্ণাতিথির স্বচ্ছ আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডলে অনন্ত জিজ্ঞাসার জ্বলন্ত চিহ্ন। ধ্রুবতারা লক্ষ্যহারা নাবিকের পথের পানে নিমেষহারা চোখে চেয়ে আছে। কালো সমুদ্রের ওপরে কালপুরুষ অতন্দ্র হয়ে প্রহর জাগে। মধ্যগগনে নক্ষত্রধূলিবিকীর্ণ ধূসর ছায়াপথ—বাঁশীর সুর ওই পথ ধরে মনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে চলে বিস্মৃতির দূর লোকে।

…উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় বিলোল রাত্রি। ঘনপল্লব বৃক্ষের তলে তলে পথ চলেছে, আলোছায়ায় আবিল হয়ে ঈষৎ বাতাসে তরুশাখা হতে মুকুল খসে খসে পড়ছে। সচকিতা তরুণী সাবধানে চলেছে চঞ্চল দীপশিখাখানি অঞ্চল আড়ালে নিয়ে। নদীতটের নরম দূর্বাদল দলিত ক'রে জলের কূলে গিয়ে দীপখানি সে ভাসিয়ে দিলে। স্রোতের শুভ্র ধারায় প্রদীপ একটি রক্ত বিন্দুর মত ভেসে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। তরুণীর কালো চোখ আলো হয়ে উঠল—ধীরে সে ফিরে চলে গেল আলোছায়ার আলপনা-আঁকা পথখানি ধরে… মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিল দীপশিখা তাকে। সেদিনের অনির্বাণ সে শিখা ভাগ্যরাতের অন্ধকার পারে নি ঘোচাতে।… অঝর অশ্রুতে অভ্রদিতার চোখ কঠিন হয়ে ঝকমক করে।

বনের ভিতরে স্বচ্ছ সরসীতীরে বিশাল এক বনস্পতি। পূর্ণিমা তিথিতে নিভৃত নিশীথে কুমারী মেয়েরা যায় সেখানে বনদেবতার পূজা দিতে। ঘটভরা মধু নিয়ে চলে বনফুলের মালা—আঙ্গুরের গুচ্ছ সরসীকূলে তরুমূলে নিবেদন করে রে

দিয়ে আসে বনদেবতার উদ্দেশে। কুমারী-মনের কামনা শোনে নি সেদিন দেবতা। ··· পেল না যা চেয়েছিল তা। ··· দেখা দিল না দুঃসাহসী। এল না—ভেবেছিল যে আসবে জীবনে, বিঘ্নজয়ী বীরত্ব নিয়ে—বজ্রে যার বিজয়বার্ত্তা—ঝড়ের সমুদ্রে জাগে যার প্রাণচঞ্চলতা—অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত যার অপরিমেয় উদারতা—বিপদদুর্গম পথ বেয়ে যে আসে উল্কার মত তেজে—অশ্বক্ষুরে আগুন ঠিক্‌রে—অন্যায়ে অত্যাচারে যার উদ্যত অসি আগ্নেয়গিরির অগ্নিজিহ্বার মত প্রলয় উল্লাসে ঝলসে ওঠে—প্রবলের সঙ্গে, পশুশক্তির সঙ্গে নিষ্ঠুর নীচতার সঙ্গে সঙ্কীর্ণচেতা সমাজের সঙ্গে যে যুগে যুগে সংগ্রাম করে—বিশ্বলোকের অন্ধকারের কারাগারে মুক্তির বিদ্যুৎ হানে—উৎপীড়িত মনুষ্যত্বকে অবমানিত, নারীত্বকে সস্নেহ সম্মানে সঞ্জীবিত করে—কোথা সেই নির্ভীক, কোথা তুমি বীর! ···

·· দূরে বাঁশীর সুরে আশ্বাস নিশ্বসিয়ে ওঠে। · শুনে অভ্রদিতার অঙ্গে রক্ত মত্তচঞ্চল হয়ে ওঠে। শুনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনাদি জিজ্ঞাসা ধীরে সমুদ্রনীরে নেমে আসে। নিমেষহারা ধ্রুবতারা আশ্বাস পেয়ে আকাশের প্রান্তে ঢলে পড়ে—অতন্দ্র কালপুরুষের এতক্ষণে তন্দ্রা আসে— শুকতারা শিশিরে সজল হয়ে শৈলশিখরে চেয়ে দেখে। বাঁশী থেমে আসে। ···

দ্বীপবাসী সকলে সেদিন মধুপানে মত্ত। রাজধানী হতে শুভসংবাদ এসেছে। সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধ পরিচালনা ক'রে সম্রাটপুত্র জার্মানিকো যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরেছেন। সম্রাট তাঁর প্রতিশ্রুত কোন শাসনটাই বাদ দেন নি। পুত্রের সম্মানের জন্যে বিজিত জাতিকে তার নামের অনুকরণে ডাকা হচ্ছে। নগরে গ্রামে সবত্র বিজয়োৎসব চলেছে। সম্রাটের আদেশে কাপ্রিতে রাজপুরীর সুরাভাণ্ডার খুলে সকলকে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৌরজনেরা পানোন্মত্ত হয়ে পল্লী ছেড়ে সমুদ্রতীরে সারারাত ধরে নাচগান করছে। প্রাসাদের যত দাসদাসী কর্মচারী সকলে আজ সেখানে গিয়ে যোগ দিয়েছে। অভ্রদিতা উৎসের ধারে একা বসে ছিল। ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে—ছিন্ন কালো মেঘদল থেকে থেকে চাঁদকে আড়াল করছে। অভ্রদিতার দীর্ঘ কালো কেশ হাওয়ায় উড়ে মুখের ওপর ঢেকে পড়ছে। নিঃশব্দ পদপাতে অরিয়াস পার্শ্বে দাঁড়ালে এসে। আজ সে বাঁশী আনে নি—হাতের দণ্ডের ওপর ভর দিয়ে সঙ্গীহীন সাইপ্রাসের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার দীপ্ত দৃষ্টির ব্যগ্র আগ্রহ উত্তপ্ত স্পর্শের মত অভ্রদিতাকে দৃঢ় বেষ্টনে জড়িয়ে ধরল। লতাবিতান থেকে ফোটা ফুলগুলি একে একে অভ্রদিতার কেশে বেশে খসে পড়তে লাগল।

অনুচ্চগম্ভীর স্বরে অরিয়াস বললে, "অভ্রদিতা, আজ এসেছি তোমায় ডাকব বলে। তোমায় নিয়ে যেতে চাই বলে।"

বড় বড় দুটি চোখে ব্যাকুল বিস্ময় নিয়ে অভ্রদিতা বললে, "কোথায়?"

"যেখানে হয়। এখান থেকে দূরে অন্য কোনোখানে। এই দাসত্বের সীমানার বাইরে কোন মুক্তিময় স্বাধীনতার মধ্যে।"

বীচবনে বাতাস ব্যাকুল হয়ে উঠল—মেঘের ফাঁকে চোখের জলের মত একটি তারা টলটল করতে লাগল।

অরিয়াস বললে, "ঐশ্বর্য আমার নেই—বিলাসবৈভব অর্থসম্পদ কিছুই আমার নেই। আরাম তোমায় দিতে পারব না—সুখ তুমি পাবে না হয়ত—আনন্দ আসবে কি-না জানি না। নিবিড় প্রেমে রয়েছে নিগূঢ় বেদনা—আছে আঘাত অপমান—আছে অশেষ আশঙ্কা সর্বদা। আমার আছে সেই বেদনা-উদ্বেল প্রেম—নেবে কি তুমি? এত ঐশ্বর্যের পরিবর্তে অলস আরামের পরিবর্তে নিশ্চিন্ত ভোগের পরিবর্তে আমার প্রেমের দুঃসহ দুঃখকে কি তুমি গ্রহণ করবে?"

বাতাস বজ্রের গর্জন জেগে উঠল—কালো সমুদ্রের প্রলয় শঙ্খ বেজে উঠল, রুদ্ধ মেঘের আড়ালে চাঁদ চলে গেল। কতক্ষণ বাদে অভ্রদিতা মুখ তুলে চেয়ে দেখলে অরিয়াস অন্ধকারে কখন চলে গেছে। ···

* * * *

কয়েকদিন বাদে প্রাসাদে উত্তেজনা জাগল আবার। রোম থেকে লিপিবাহক এসেছে—সম্রাট আসছেন সংবাদ নিয়ে। অভ্রদিতা লায়ারে সুর মেলাচ্ছিল বসে—চম্‌কে উঠে অসাবধানে লায়ারের তার সঝঙ্কারে ছিঁড়ে ফেললে। দাসীরা শশব্যস্তে অন্য যন্ত্র নিয়ে এসে দিলে।

সেদিন মধ্যাহ্নে যখন সকলে বিশ্রামে ব্যস্ত, অভ্রদিতা শঙ্কিত সচকিত পদে প্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে এল। রৌদ্রতপ্ত পাথরের স্পর্শে অনভ্যস্ত পদতল আরক্ত হয়ে উঠতে লাগল। বনের মাঝে গাছের ঘনছায়ায় যেখানে ক্ষীণা ঝরণা ফেনায় উচ্ছল হয়ে চলেছে তার পাশে বসে অরিয়াস ফুলের রসের রং দিয়ে দিয়ে পাথরের ওপর অভ্রদিতার ছবি আঁকছে। অভ্রদিতাকে দেখে সে বিস্মিত আনন্দে তুলি ফেলে উঠে দাঁড়ালে।

চারিদিকে একবার চকিতদৃষ্টি হেনে অভ্রদিতা দ্রুত বললে, "অরিয়াস, আমি তোমারই দানকে গ্রহণ করলাম। বেদনার মাঝে কত যে আনন্দ আছে—তোমায় চিনে সে সত্যকে আমি চিনতে পারলাম। তাকেই মেনে নিলাম। তাই জানাতে এলাম—আমি আসব।"

অরিয়াসের চোখ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত পিঙ্গল হয়ে জ্বলে উঠল, "তুমি আসবে!"

"হ্যাঁ শোন, আজ পূর্ণিমা—আজ মধ্যরাতে চাঁদ নীলগুহার মুখের ওপর পড়বে—সেই দেখে তুমি পথ চিনে যেও সেখানে—আমি আসব—তোমার সঙ্গে যাব।"

ত্বরিত পদে সে ফিরে চলে গেল।

স্তব্ধ মধ্যরাত্রে নিদ্রিত রাজপুরী পরিত্যাগ ক'রে অভ্রদিতা ধীরে গোপন সোপানের পাষাণপথ ধরে নেমে চলতে লাগল। তার হাতের প্রদীপের ক্ষীণ শিখাটি গভীর অন্ধকারে অদ্ভুত ছায়া রচনা করলে। অস্বাভাবিক ছায়াগুলো অসম্ভব কল্পনা জাগালে—কারা যেন সঙ্গে সঙ্গে আসছে—কে যেন অন্ধকারে ওৎ পেতে রয়েছে—সাপের উদ্যত ফণার মত দংশনে উৎসুক হয়ে আছে। গভীর তিমিরের বিভীষিকার মাঝে অরিয়াসের দীপ্ত সূর্যের মত উজ্জ্বল দুটি চক্ষুর স্মৃতি তাকে সাহস দিলে।

গুহায় এসে সে প্রদীপ নিবিয়ে প্রতীক্ষায় বসে রইল। আজ পূর্ণিমা—নীলগুহার নীল আলো নিবিড়তর—নীল জলের জোয়ারে তার আকণ্ঠ আজ পূর্ণ হয়ে যাবে। অরিয়াস পথ চিনে নেবে ত—গুহার ক্ষুদ্র ছিদ্রমুখ খুঁজে পাবে ত! ··· অন্যমনস্ক হয়ে অভ্রদিতা কতক্ষণ বসেছিল মনে নেই—সমুদ্রের শীতল জল কখন তার চরণ আবরণ ক'রে উঠে এসেছে। ভীত হয়ে অভ্রদিতা দেখলে চাঁদ কখন গুহামুখ থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ের আড়ালে হেলে পড়েছে। এ কি - এত দেরী কেন! আজ পূর্ণিমার জোয়ারের জলে ভরে যাবে গুহা কি ক'রে সে আর অপেক্ষা করবে! অরিয়াস কি আসবে না! অন্ধকারে অভ্রদিতা ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রইল। ··· চাঁদ আরও দূরে সরে গেল—আঁধার ক্রমে নিবিড়তর হল। বিষাক্ত সাপের মত সমুদ্রের চাপা শব্দ—পাতালতলের ভুজঙ্গদল ক্রূর হিংসায় নিষ্ঠুর হয়ে কাকে নির্মমভাবে দংশন করতে চায়। ··· জল ক্রমে অভ্রদিতার কটি বেষ্টন ক'রে উঠে এল। ··· অভ্রদিতা অগত্যা ফিরে যাওয়ার জন্যে অন্ধকারে আস্তে আস্তে সোপানপথের কাছে সরে এল।—এ-সে বজ্রাহতা লতার মত স্তব্ধ হয়ে রইল। সোপানপথ বন্ধ হয়ে গেছে। ···

কে যেন অন্ধকারে পিশাচের মত হেসে উঠল। টিবেরোর সেই দিনের আটকে যাওয়া হিংস্র হাসিটা আজ সুযোগ পেয়ে লোলুপ তৃপ্তিতে দাঁত বার ক'রে বেরিয়ে এল দংশন করতে। ··· অভ্রদিতা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। উদার সমুদ্র তাকে চিরদিনের মত নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন ক'রে নিয়ে গেল।

আর অরিয়াস। বিপুল সমুদ্রের অগাধ জল ক্ষণিকের জন্যে তার দেহের রক্তে ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর আবার সমস্ত নিঃশেষে ধুয়ে নিয়ে নীলকণ্ঠের মত নীল হয়ে রইল।

মৎস্য-শীকার

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

মৎস্যশীকারে প্রাচীনতম আদিম পন্থা হচ্ছে বর্শা বল্লম (spears) সাহায্যে মাছগুলিকে অন্যান্য পশুপতঙ্গের মতই আঘাত করে ধরা। উড়ন্ত পাখীর মতই জলচর মীনজাতিকে বর্শার সাহায্যে শীকার করায় যে কতদূর লক্ষ্যের প্রয়োজন হয়, তা যাঁরা বন্দুক ছোড়েন তাঁরা বুঝতে পারবেন। কিন্তু এই আদিমতম উপায় অবলম্বন ক'রে আহার্য্যের জন্য মাছ ধরে থাকে এখনও তারাই, যে সমস্ত আদিম জাতি আজিও সভ্যতার বহু পশ্চাতে পড়ে আছে।

অবশ্য উন্নত অবস্থায় ফাঁদ বা জাল সাহায্যে মাছ ধরার রেওয়াজ আমাদের দেশে থাকলেও বাঁশের কোঁচ, ট্যাটা, এককাটা প্রভৃতির সাহায্যে জেলের ছেলেরা অবসর সময়ে খালবিলে বা ক্ষুদ্র নদীতে মাছ মেরে থাকে। নিক্ষেপণ অস্ত্র বহু প্রকার—অনেক সময় সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণধার ধাতু নির্ম্মিত মুখাংশকে যষ্টি থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়।

লোহার সরু মুখ ঠিক করিয়া লাগাইয়া পাড়াগাঁয়ে কাঁদা পাঁকে মাছকে আঘাত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা খুব সাধারণ রকমের বর্শা, লুক্কায়িত মাছ, চিংড়ী, কাঁকড়া প্রভৃতি শীকার করা যায়। বহু রকমের নিক্ষেপণ অস্ত্র আছে—যার বেশীরভাগ আদিম জাতিদের মধ্যে চল্‌তি, কারণ জালে মাছ ধরা বা ফাঁদে মাছ ধরা অনেক অসভ্য জাত জানেই না। তবে কইবর্ষা শোলবর্ষা এ ধরণের অনেক প্রকার এখনও পল্লীগ্রামে ব্যবহার হয়।

পুরীর নুলিয়ারা কাটামারাণ নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছে

হুলবিশিষ্ট নিক্ষেপণ অস্ত্র দিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে আবর, মিশমী, দাফ্‌লা ঝরণায় বা নদীতে মাছ ধরে থাকে। এই ধরণের বর্শায় তিনটা বা পাঁচটা বা সাতটা ক'রে সরু ধারালো গোঁজ থাকে—এই দিয়ে বড় মাছ জখম করা যায়।

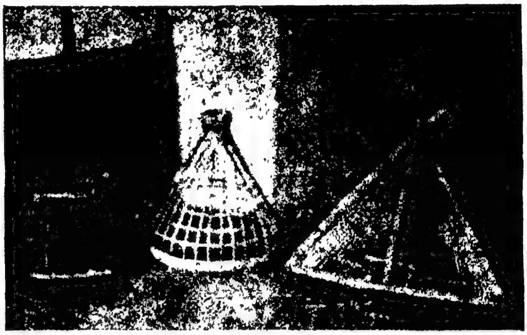

কয়েকটা ফাঁদ

নিক্ষেপণ অস্ত্রের মধ্যে এস্কিমো এবং আফ্রিকার নিগ্রোদের বল্লম এবং ছুরী (knife) অতি তীক্ষ্ণাগ্র এবং মৎস্যশীকারের উপযোগী। সমুদ্রের জলে ছিপ বা নৌকা ক'রে গিয়ে এই সব অস্ত্রের সাহায্যে তিমি থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট বড় অনেক রকমের মাছ (সামুদ্রিক) সাহসী ধীবরেরা শীকার করে।

তীর ধনুকের ব্যবহারও মৎস্যশীকারে স্থানে স্থানে চল্‌তি আছে। পশু পক্ষী শীকারে যেখানে তীর ধনুকের প্রচলন, সেখানে মৎস্য শীকারেও এর ব্যবহার চলিত আছে অনেক সময় দেখা যায়। আমাদের কাছাকাছি গঙ্গা নদীর আশে পাশে, দ্বারভাঙ্গায়, সাঁওতাল পরগণায়, পালামৌতে তীর ছুঁড়ে মাছ মারতে দেখা গেছে। আন্দামানের নেগ্রিটোরা তীর ধনুক ব্যবহারে অভ্যস্ত, আফ্রিকার বামন-নিগ্রো (Negrillos), ফিলিপাইনের আয়েটা এবং অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যেও তীর ধনুকের প্রচলন থাকাতে এরা সকলেই সময়ে সময়ে জলে মাছকে তীরের সাহায্যে বধ করে বা আঘাত করে তুলে নিয়ে এসে ভোজের কাজে লাগায়।

সাধারণ তীর ধনুক অপেক্ষা আড়ি ধনুই সাঁওতালরা এবং

দক্ষিণে মালাবার দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা বেশী ব্যবহার করে, তার আরো একটা কারণ এতে লক্ষ্য খুব ভাল হয়।

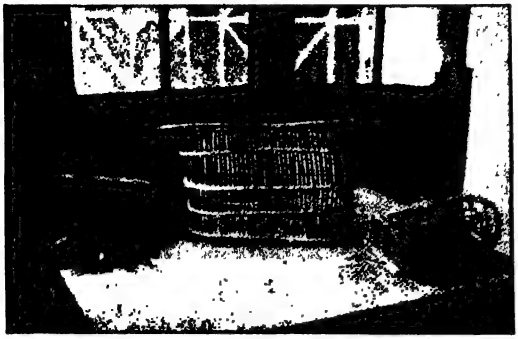

কয়েকটা ফাঁদ

আন্দামানের ক্ষুদ্রকায় (Pygmy) নীগ্রোরা জলে ডুব (dive) দিয়েও মাছ ধরে আনতে পারে। ডুবিয়ে মৎস্য ধরা আমাদের দেশে দেখেছি। নদীর বালুময় গর্ভে বালিয়া মাছগুলি গর্ত্ত করে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে—চতুর জেলেরা প্রথমে নৌকা থেকে বাঁশের ডগা দিয়ে সেই গর্ত্তগুলি সন্ধান করে নেয়, তারপর জলে ডুব মেরে হাত ঢুকিয়ে সেগুলিকে ধরে তুলে নিয়ে আসে। বড় বড় বেলে মাছ এমনি করে ধরে থাকে ধীবরেরা; বেলে ছাড়া অনেক মাছ গভীর জলে থাকতে ভালবাসে তাদের ধরতে গেলে ডুবে ছাড়া উপায় নেই।

জেলেদের মাথায় অনেক রকমের বুদ্ধি খেলে—আবার দেশে দেশে পদ্ধতিও নূতন নূতন চোখে পড়ে। মালাবার বা লাকাদ্বীপের বাসিন্দারা সড়কি বা কাস্তে দিয়ে মাছকে ক্ষত করে জল থেকে তুলে নেয—প্রাচীন পন্থাগুলির মধ্যে যা আদিম জাতিদের মাঝে চল্‌তি তার মধ্যে কাস্তে দিয়ে বা সড়কি দিয়ে টিপ্‌ করে মাছকে নিহত করাও অন্যতম চতুর প্রণালী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এবং মালাবার দ্বীপপুঞ্জে নদীর ধারে ধারে ভাঁটার সময় জেলেরা গভীর রাত্রে মশাল জেলে মাছগুলিকে থতমত খাইয়ে অস্ত্রের সাহায্যে মেরে নিয়ে আসে। রাত্রে আলোর জ্যোতিতে মাছকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করে শীকার করার গল্প অনেক শুনেছি। গঙ্গানদীর আশে পাশে ও অনেক জায়গায় জেলেরা রাত্রে ধীরে ধীরে ছিপের (জেলে ডিঙ্গি) মুখে মশাল জেলে এগোতে থাকে এবং সামনে মাছ পড়লেই যে কোন অস্ত্র—ট্যাঁটা, এক-কাট্যা বা সড়কি দিয়ে মারতে থাকে এবং জালে করে তুলে নেয়।

রজ্জু ও বঁড়শীর সাহায্যে মাছ ধরাও অন্যতম প্রাচীন উপায়।* যদিও সভ্য জগতে সখ করে ছিপের গোড়ায় রেশমী সূতা এবং সূক্ষ্ম বঁড়শীতে টোপ দিয়ে (angling করেও) সভ্যতর মানুষ ক্রীড়া হিসাবে মাছ ধরে থাকে। সৃষ্টির প্রথম যুগে চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ মাছ ধরা চর্চ্চা করেছিল। ধাতু আবিষ্কারের পূর্ব্বে মাছের কাঁটা, জন্তু জানোয়ারের হাড়, শিং এবং বাঁশ এই সবেতেই তার অস্ত্র প্রস্তুত হত। বঁড়শীও সে সময়ে অস্থি থেকে খুব তীক্ষ্ণ গোছের তৈরী হত এবং তাতে লম্বা লম্বা কাছি জুড়ে সমুদ্রে বা নদীর খুব দূরে যেখানে মাছ বেশী সেখান থেকে মাছ ধরে নিয়ে আসত।

বঁড়শীতে টোপ দেওয়াই সাধারণ পদ্ধতি; কিন্তু চীনদেশের ধীবরেরা অনেক সময় এমনি বঁড়শী জলে ফেলে লক্ষ্য করে মাছকে বিদ্ধ করে খেলিয়ে তারপর তুলে নেয়।

বঁড়শীর দড়ি (line) সময় সময় ছয়-সাত মাইল পর্য্যন্ত যেতে পারে এমনি লম্বা করে তৈরী হয়—রাত্রে জেলে মাঝিরা ছিপে করে গভীর জলে গিয়ে দড়ির বঁড়শী মুখটা টোপ দিয়ে ফেলে দিয়ে আসে, তারপর সকালবেলা পার থেকে দড়ি টেনে নিয়ে দেখে—মাছ পড়েছে কি-না।

বুদ্ধিমান জেলেরা একটি মোটা কাছিতে দু-এক হাত অন্তর (trunk line) অনেকগুলি ছোট ছোট সরু দড়ি এবং তার মুখে বঁড়শী আটকে রাখে; তাহলে একত্রে অনেক মাছ পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

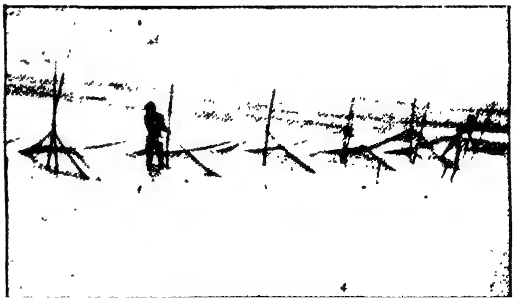

জোয়ারে মাছ ধরা—কাথি

---

* ("Fishing with hook and line is also a very ancient method."—Gibles—Fish Industry, p.43)

আর এক রকম অদ্ভুত উপায়—অসভ্য আদিম জাতির মধ্যে বেশ প্রচলিত—বিষ প্রয়োগে জলকে বিষাক্ত করে মাছগুলিকে মেরে ফেলা। পাহাড় পর্ব্বতের জঙ্গলময় মনুষ্য নিবাসে ছোট বড় জলাধারে springএ ঝরণায় অগভীর জলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আদিম অধিবাসীরা বিষাক্ত গাছের পাতার রসে জলকে বিষাক্ত করে তৎনিমজ্জিত মৎস্যজীবগুলিকে ছটফট করিয়ে বা একপ্রকার মেরেই জল থেকে তুলে নেয়।

পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মাছধরা (ডায়মণ্ডহারবার)

আসামে গারো, খাসিয়া, সীণ্টং, নাগা, কুকি এবং নওগার মিকিররা বাক্‌রাল গাছের শিকড়ের রস বা ক্রোটন বীজ গুঁড়িয়ে জলে ফেলে দিয়ে মাছগুলিকে যন্ত্রণা দিয়ে পলাইবার শক্তি রহিত করে হাতে করে তুলে নেয়—এই নিষ্ঠুর পন্থা শুধু অসভ্য জাতিদের মধ্যেই নিবদ্ধ।

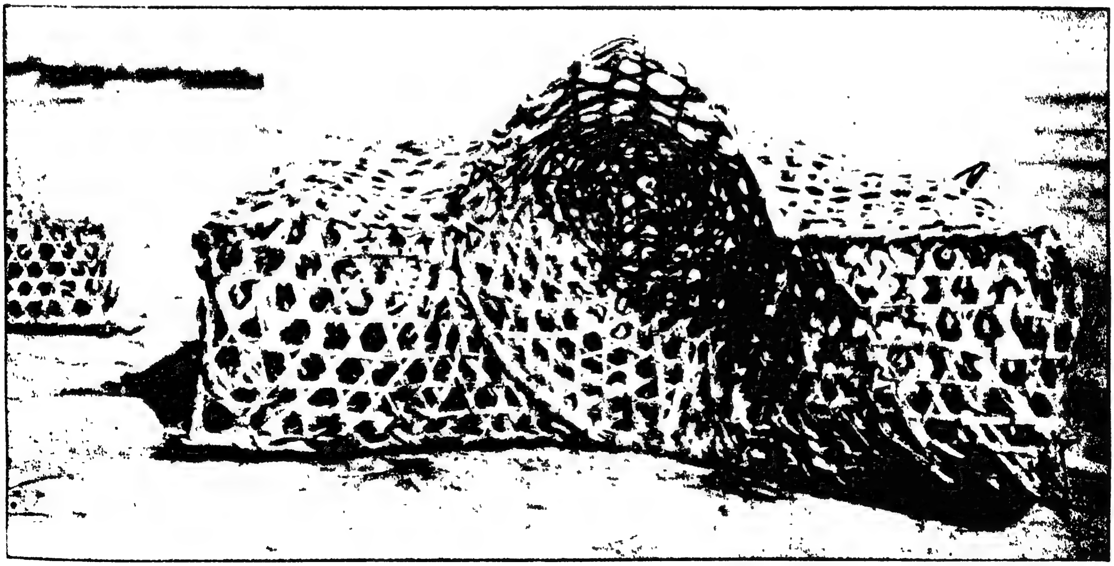

বেতের ফাঁদ

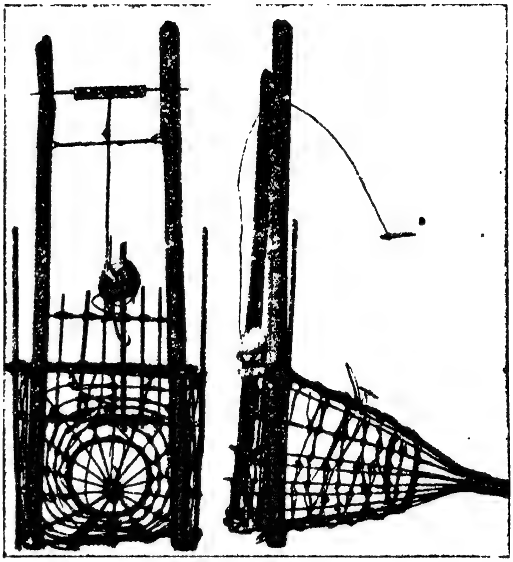

মণিপুর, সান এবং উত্তর ব্রহ্মে ব্যবহৃত মাছ ধরবার দরজা-যুক্ত ফাঁদ। ইহা দ্বারা বড়মাছ ধরা সুবিধাজনক

বর্ষার সময় নাগারা—যেখানে যেখানে জল জমে থাকে সেখানে মাছ দেখতে পেলে বাঁশের খুঁটি করে মাচা তৈরী করে মাঝামাঝি জায়গায়—তারপর তার উপর থেকে বিষ

ফেলে মাছ মারতে থাকে; মাছগুলি মরে গেলে জলের উপর ভাসতে থাকে, সেগুলি এরা সংগ্রহ করে এনে ভক্ষণ করে।

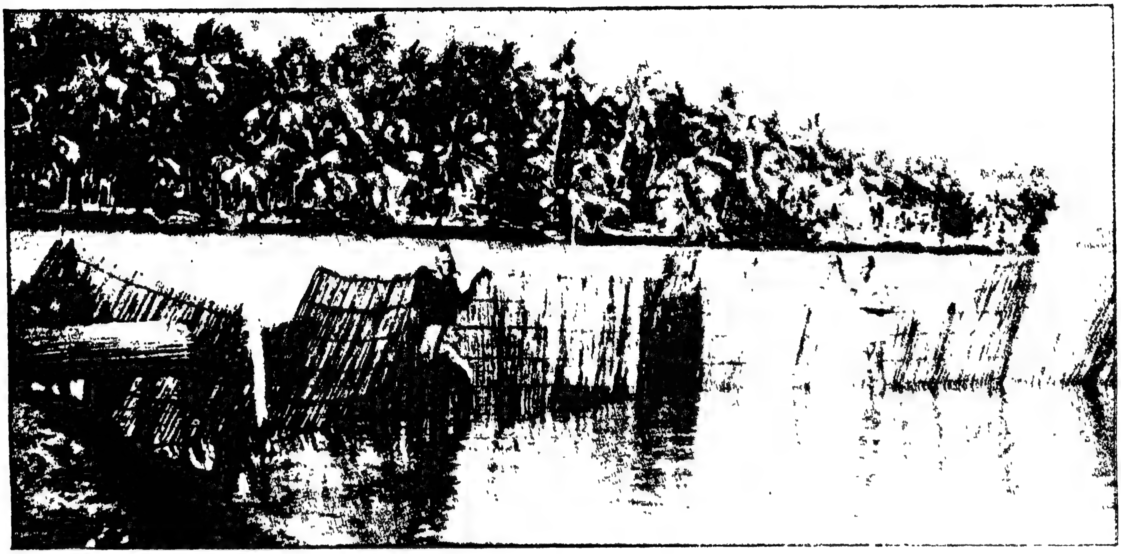

বেতের চাঁচীর সাহায্যে মাছ ধরা

আমাদের পল্লীগ্রামে একটি সহজ উপায় মাছগুলিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরা—অনেকের চোখে পড়তে পারে। জোয়ারে বা বানে নদী এবং খালের জল সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে বেশ দূর পর্য্যন্ত যতটা নিম্নভূমি পায়—সেই সঙ্গে মাছও ভেসে যায় বহু—চতুর মৎস্য-শীকারীরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র জলস্রোতে মাছগুলিকে আবদ্ধ করবার জন্য নালার মুখে ছোট ছোট ছিদ্রসম্পন্ন বাঁশের বেড়া দিয়ে পটির মতন বাঁধ তৈরী করে দেয়। ভাঁটার স্রোতে জল বেরিয়ে যায় কিন্তু বাঁধের মুখে মাছগুলো আটক পড়ে—অনেক সময় তারা লাফিয়ে পালাতে চেষ্টা করে—সে সব ক্ষেত্রে বাঁধের মুখে নৌকা বা ছিপ্ রেখে দিলে মাছ তাতেও আটক পড়ে।

বর্ষার সময় ধানক্ষেতে বান ঢুক্‌লে তার মাছগুলোকে ধরবার জন্য অনেক জায়গায় দড়ি আর খড় গেরো দিয়ে ঘাসের চাবড়া ঢেকে ফাঁদ তৈরী করে রাখা হয়; আলের ভাঙ্গা মুখে জল বার হয়ে যায় কিন্তু আটক পড়ে মাছগুলো; নদী বা সমুদ্রের জোয়ারের মাছগুলোকে [illegible]

দিয়ে খানিকটা ফাঁদ সৃষ্টি করা কয়েক জায়গায় দেখেছি। একে বাখরগঞ্জের লোকেরা বলে গরাই। নদীর স্রোতের মুখে খানিকটা তীরাংশ চাঁচাড়ীর সাহায্যে খাড়াই করে বেড়া দিয়ে রাখে জেলেরা, কেবল জল প্রবেশ করবার জন্য একদিক খোলা থাকে—স্রোতের টানে মাছগুলো সেই পথ দিয়ে প্রবেশ করে আটক পড়ে যায়, ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বেই জেলেরা ফাঁদ বার করে মাছ তুলে নেয়।

বাঁশের কেঁচা দ্বারা মাছ ধরা

বিস্তর রকমের ফাঁস ও ফাঁদ আছে। ফাঁস দিয়ে মাছ ধরা খুবই কম, তবে অদ্ভুত ফাঁসের মধ্যে কল্‌কাতার [illegible] একটা ফাঁস আছে—ভারী সোজা,

একটা কাঠিতে শক্ত সুতোর ফাঁস লাগিয়ে টোপ দিয়ে জলে রেখে এলে মাছ টোপ গিল্‌তে গেলে ফাঁসের রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে যায়। এতে অনেক সময় কিন্তু মাছ পিছলে পালিয়ে যায়, এই জন্য লক্ষ্যের দরকার।

ফাঁদ আর জাল এবং জালের কতকগুলি বিশিষ্ট নক্সার কথা বল্‌ব। মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক হতে এই দুটি জিনিষ আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই মৎস্য শীকারের সুবিধা হয়েছে; আদিম পন্থাগুলি ছেড়ে দিয়ে সভ্য মানুষ রকম রকম ধরণের জাল ও ফাঁদ ব্যবহার করে আসছে।

স্থিরীভূত কল এবং গতিশীল কল উভয় প্রকারেরই ফাঁদ ও জাল আছে। স্থিরীভূত ফাঁদ জলে বসিয়ে রেখে দিলে আপনা থেকে তাতে মাছ ধরা পড়ে এবং সেই বন্দী অবস্থায় অনেকগুলি ধৃত হলে পরে সেগুলিকে তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু গতিশীল ফাঁদ হাতে নিয়ে নেড়ে ব্যবহার করলে তবেই মাছ ধরার সুবিধা।

স্থায়ী ফাঁদে মাছের টোপ দিয়ে রেখে মৎস্যশীকার করা খুব প্রাচীনতম পন্থা—এখনও অল্পসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য মনুষ্যমতিতে এ দেখা যায়। এই রকম টোপ দেওয়া সাঁওতালদের আছে—বর্ম্মাতেও একটা নমুনা পাওয়া গেছে—চুবড়ীর মধ্যে টোপ থাকে, তাড়া করবার সময় একটা কাঠির সাহায্যে তাকে অল্প তুলে রাখা হয়—মাছ টোপ্ গিলতে গেলেই দড়ি আল্‌গা হয়, চুবড়ীটা পড়ে তাকে আবদ্ধ করে দেয়।

সাধারণ ফাঁদের মধ্যে বেশী প্রচলিত হচ্ছে পোলো—এর ছোট বড় অনেক রকম আছে, এগুলো বেশ সহজ বলে অনেকদিন হতেই ব্যবহার হচ্ছে। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বালেশ্বর, মাদ্রাজ, ত্রিপুরায় এর মাথাটা কুঁজোর মতন এ ছাড়া সরু কাঠির মুঙ্গড়ী, ভুনী, ঘোনী, বৈচনা, ঘোরা, ডোলিকা, চাওড়া এই রকম নামের অনেক রকমের ফাঁদ দেখতে পাওয়া যায়।

হোচা আপনারা অনেক দেখতে পাবেন—খাল ডোবার জলে হাতে করে ছেলেরা অনেক সময় মাছ ধরে—এটি হল একটি গতিশীল কল, তৈরী করাতেও নৈপুণ্য আছে—সরু বাঁশের কাঠামোতে কাঠির জালের মত, স্রোতের মুখে মাছ এলে টক্ টক্ করে এই দিয়ে তুলে নেওয়ার সুবিধা—ধৃত মাছ তুলে নেওয়ারও সুবিধা। ছিপে মাছ ধরে তাকে খেলিয়ে জল থেকে তোলবার সময় আমরা অনেক সময় হোচা ব্যবহার করেছি। ছবিতে আপনারা যেটা দেখছেন সেটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নৃতত্ত্ব বিভাগের মডেল বলে বিশেষ ছোট, এর চেয়ে বড় বড় হোচা অনেক দেখতে পাবেন।

সরু বাঁশকে চিরে একরকমে ফাঁদ দেখতে পাওয়া যায়—তাকে আমাদের বাংলাদেশে বলে তুরা, রেওয়াতে বলে কুকড়ী। জলের স্রোতের মুখে বসিয়ে দিলে মাছ ঢুকে সরু মাথার দিকে প্রবেশ করে, যতই বেরোতে যায় ততই যায় আট্‌কে—ঘুরে যে ফিরে আসবে তার মতন জায়গাও থাকে না। এগুলো লম্বাও হয় প্রায় ছয়-সাত ফুট পর্য্যন্ত।

জালে মাছ ধরা খুব যে আধুনিক তা নয়—ইউরোপে ভূমধ্যসাগরে ফিনিসিয়ানরা অতীত যুগে জালে মাছ ধরত, তার উল্লেখ পাওয়া যায়—তা ছাড়া আমাদের দেশে ত অনেকদিন ধরেই গাঙ্গেয় এবং দাক্ষিণাত্য ধীবরদের মধ্যে জালে মাছ ধরবার পদ্ধতি অল্পবিস্তর চলে আসছে। বঙ্গোপসাগরের ধারে ধারে মোহানায় মোহানায় মাছ ধরবার খুঁটি বিস্তর আছে—সেগুলিতে কি রকম মাছ ধরা হয় তা অনেকেই জানেন। জালে মাছ ধরবার ধুয়ো প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রতীরবাসী জেলেদের মধ্যেই ও বড় বড় নদ নদীতেই চলতি এবং সত্যিকার জালে মৎস্য শীকার দেখতে হলে এই সবই দেখতে হয়। পুষ্করিণীতে ঝিলে খালে যা সচরাচর চোখে পড়ে তা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। মাছ ধরবার ফাঁদি জাল অনেক রকমের এবং অনেক সাইজের আছে—ছোট বড় মাঝারি।

নদীতে বা সাগরে নৌকা করে গিয়ে ধীবরেরা যে প্রকার জালে মাছ ধরে তাদের বলে বেড় জাল, ছোট বেড় ছাড়া প্রায় হাজার ফুট লম্বা বড় বড় বেড় থাকে জেলেদের, তাদের বলে মহা বেড়, জগত বেড়।

সবই সুতায়, তাই সাধারণ ভাবে সুতি জাল বলে পরিচিত। বেড় চালিয়ে আনতে অনেকগুলি নৌকা নিয়ে জেলেরা গভীর জলের উপর হাজির হয়, কারণ সে সব জায়গায় বড় বড় মাছ ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

অনেক সময় অনেকগুলি জাল একত্র করে মাছ ধরে জেলেরা, আমাদের দেশে তাকে বলে দল জাল। পা জাল বা আংটা জাল ব্যবহার হয় অগভীর জলে, পা জাল নাম

দেওয়ার কারণ জলের নীচে যে কোণ থাকে তা পায়ের গোড়ালীতে আটকে চালালে মাছ তলা হতেই ধরা পড়ে।

আংটা জালে আংটা আটকান থাকে, কারণ সে ক্ষেত্রে নীচের কোন পায়ে না আটকে বাঁশের খুঁটিতে আটকান থাকে।

ফাঁদি জালের মধ্যে ড়োরা বা থলি জাল অনেকটা থলির মত মাছকে বন্দী করে, তাই নাম থলিজাল।

আর এক রকম জাল আছে, তাদের আমরা গুল্‌টি জাল বলে জানি—এর মজা হচ্ছে যে, জালের নীচের শেষমুখে পকেটের মত গুলটি থাকে—এতে মাছ আবদ্ধ হয়ে থাকে, পালাতে পারে না।

টানা জাল drift net, ইহা খুব সাধারণ, প্রায়ই চোখে পড়ে—টানা জালের মধ্যে মালদহের পানোরী, পাবনার কাদাই জাল উল্লেখ করলাম। কাত্‌লা জাল, প্যাঙ্গাস্ জাল drift net-এর দুটি উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে—চণ্ডীজালের মত এদের উপরকার দড়িতে কঞ্চি বা বাঁশের ভাসমান টুক্‌রা বাঁধা থাকে, তাতে সুবিধা এই যে একটা ধার জলের উপরে থাকে।

থলি জালের মধ্যে ত্রিপুরার হরকরি, বগুড়ার টৌনি এবং ইলিস মাছ ধরবার খড়কি বা শাংলী জাল উপযুক্ত উদাহরণ। থলি জালের আর একরকম বৈচিত্র্য আছে সেগুলি স্থতি জাল—যেমন বাদা জাল।

নিক্ষেপ করে জাল ছড়িয়ে মাছ ধরা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি আমরা ঝাঁকি বলি; এক জনেই এতে মাছ ধরতে পারে।

খুঁটায় সংবদ্ধ মৎস্যধারণ জাল এবং ফ্রেমে বাঁধান জাল—যেমনধারা খোলা জালগুলি—অল্প বিস্তর ব্যবহার হয় পল্লীগ্রামে। এ সমস্ত ছাড়া আরও বিস্তর রকমের জাল আছে এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি মাছ ধরবার ভিন্ন ভিন্ন দেশে।

ধীবরেরা যেদিন জালের সাহায্যে একত্রে বেশী মৎস্য ধরবার প্রয়াস পায় সেদিনই তাদের জেলে নাম হয়। আমাদের বাংলাদেশে জেলে নামে এক জাতিরই সৃষ্টি হল। তারা আমাদের চাষীদেরই মত পাশ্চাত্যের কোন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে না। তবে আজকাল দেখছি বেকার সমস্যার চাপে উচ্চজাতির শিক্ষিত যুবকেরা মৎস্য শিকারের আশ্রয় নিয়েছে।

ভ্রম-সংশোধন

ডঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পিএচ্-ডি

শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ'-এ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসিগণের যে দুইটি সরকারী তালিকা বাহির করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে মহারাজা দুর্ল্লভরাম বা রায়দুর্ল্লভের বংশধরদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনৈক্য আছে। প্রথম তালিকায় বলা হইয়াছে, "দুর্ল্লভরামের পুত্র মুকুন্দবল্লভ পিতার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন।" দ্বিতীয় তালিকায় বাগবাজারের সম্পন্ন অধিবাসিদিগের মধ্যে রাজা গৌরবল্লভকে প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। গৌরবল্লভের পরিচয়—"রাজা রাজবল্লভ বাহাদুরের পুত্র রাজা মুকুন্দবল্লভের দত্তক পুত্র।" রাজবল্লভ দুর্ল্লভরামের পুত্র। সুতরাং প্রথম তালিকায় বোধ হয় মুকুন্দবল্লভকে ভুল করিয়া দুর্ল্লভরামের পৌত্র (grandson) না বলিয়া পুত্র (son) বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় তালিকার শ্যামবাজারনিবাসী কাশীপ্রসাদ রায় মহারাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয়। এই কাশীপ্রসাদ ও প্রথম তালিকার জগন্নাথপ্রসাদের ভ্রাতা কাশিনাথপ্রসাদ নিশ্চয়ই অভিন্ন ব্যক্তি। প্রথম তালিকায় রাজবল্লভের ভগ্নীর বংশধর বলিয়া জগন্নাথপ্রসাদ ও কাশিনাথপ্রসাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় তালিকায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, কাশীপ্রসাদ মহারাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয়। দ্বিতীয় তালিকায় কাশীপ্রসাদের নামের পরেই রায় জগন্নাথপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ রায়ের নাম পাওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, প্রথম তালিকায় বাবু জগন্নাথপ্রসাদ ও দ্বিতীয় তালিকার রায় জগন্নাথপ্রসাদ একই ব্যক্তি। দুর্ল্লভরাম নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রাজা জানকীরামের পুত্র। জানকীরামের বংশধরেরা কি আজিও কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করিতেছেন? দ্বিতীয় তালিকার বাগবাজারনিবাসী ভগবতীচরণ মিত্রের পিতার নাম উদয়চরণ নহে—অভয়চরণ। এখানে সরকারী তালিকা নির্ভুল। হয় মুদ্রাকর প্রমাদে অভয়চরণ উদয়চরণ হইয়াছেন, না হয় তো নকল করিবার সময় আমার ভুল হইয়াছে। অভয়চরণ কলিকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র। শুনিয়াছি যে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও এক গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধর। যদি সেই গোবিন্দরাম ও এই গোবিন্দরাম অভিন্ন ব্যক্তি হন তবে তাহার বংশধরেরা কোন সময়ে বাগবাজার ত্যাগ করিয়া বেলিয়াঘাটায় বাড়ী করিয়া থাকিবেন। এই সম্বন্ধে গোবিন্দরামের কোন বংশধর অনুগ্রহ করিয়া আমার সংশয় দূর করিলে বাধিত হইব।

পথ বেঁধে দিল

(চিত্র-নাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পের সমস্ত ঘটনা একই কালে বা একই স্থানে ঘটে না। লিখিত গল্পে দু-একটি কথার দ্বারা স্থানকালের পরিবর্ত্তন দেখানো যায়। নাটকে অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের ব্যবস্থা আছে। চিত্রনাট্যে উক্ত স্থানকালের পরিবর্ত্তন নিম্নোক্ত কয়েকটি উপায়ে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই চিত্র-নাট্যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম নির্দ্দেশগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষজ্ঞের নিকট যে-সকল নির্দ্দেশ প্রয়োজনীয়, গল্পের রস-পিপাসু সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা ক্লান্তিকর বোধ হইতে পারে; তাই মোটামুটি চিত্রনাট্যের ছাঁচ বজায় রাখিয়া গল্প বলার চেষ্টা হইয়াছে। তবে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলে অলিখিত নির্দ্দেশগুলি অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

ফেড্ ইন্—ফেড্ আউট্ঃ একটি দৃশ্য মিলাইয়া যাইবার পর অন্য দৃশ্য ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে। ইহার দ্বারা স্থানকালপাত্র সকল রকম পরিবর্ত্তন বুঝানো যাইতে পারে।

ডিজল্‌ভ্ঃ একটি দৃশ্য সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অন্য দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। ইহার দ্বারা সময়ের পরিবর্ত্তন সূচিত হয়; যে ঘটনা আগে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা দেখানো যায়; চিন্তা স্বপ্ন কল্পনার বস্তু প্রভৃতি চাক্ষুষ করানো যায়।

ওয়াইপ্ঃ সংক্ষিপ্ত ডিজল্‌ভ্। দুইটি ঘটনার মধ্যবর্ত্তী অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। যথা—নায়ক বিলাত যাইবার জন্য জাহাজে চড়িল—ওয়াইপ্—নায়ক বিলাতে পৌঁছিল।

কাট্ঃ প্রধানত স্থান পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে। ধারাবাহিক ঘটনা বিভিন্ন স্থানে দেখাইতে হইলে অথবা একই দৃশ্যের ভিন্ন অংশ দেখাইতে হইলে ইহার প্রয়োজন।

ফেড্ ইন্।

বঙ্গদেশ ও সাঁওতাল পরগণার মাঝামাঝি গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের এক অংশ। পথ নির্জ্জন; কেবল একটিমাত্র মোটর সাইক্‌লের আরোহী প্রচণ্ড বেগে সাইক্‌ল্ চালাইয়া যাইতেছে।

মোটর সাইক্‌লের আরোহী সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান এক যুবা—তাহার নাম রঞ্জনপ্রকাশ সিংহ। সে মনের আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। মোটর সাইক্‌লের আওয়াজে তাহার গানের কথাগুলা কিন্তু ভাল ধরা যাইতেছে না।

এই ভাবে চলিতে চলিতে রাস্তার পাশে একটি সাইন্-পোষ্ট যুবকের দৃষ্টিগোচর হইল। সে গাড়ীর গতি হ্রাস করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

মোটর সাইক্‌ল্ সাইন পোষ্টের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন গাড়ী হইতে না নামিয়া সাইন্-পোষ্টের লেখা পড়িল—

"ঝাঝা—১৭৫ মাইল"

রঞ্জনঃ ঝাঝা—১৭৫ মাইল। বেশ কথা ···

রঞ্জন শিষ্টতাসহকারে সাইন-বোর্ডের দিকে ঘাড় নাড়িল; সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল; তারপর সাইন-পোষ্টের দিকে চক্ষু বাঁকাইয়া অর্দ্ধস্ফুট একটি 'থ্যাঙ্ক্ ইউ' বলিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িল।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। মোটরের ফট্ ফট্ শব্দের সহিত গানের সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

ডিজল্‌ভ্

কলিকাতা শহর।

একটি বড় দোকানের দরজার মাথায় প্রকাণ্ড সাইন-বোর্ড টাঙানো রহিয়াছে—

'বৃহৎ দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা'

স্বত্বাধিকারীঃ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ

দোকানের প্রশস্ত দ্বার কাচ-নির্ম্মিত। এই পথে ক্রমাগত বহু ক্রেতা প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইতেছে। কাহারও কাহারও গাল ও মাথা ঘিরিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; তাহা হইতে অনুমান হয় ইহারা দন্তশূলের রোগী। যাহারা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাদের সকলের হাতেই সদ্য-ক্রীত ঔষধের শিশি।

দোকানের অভ্যন্তর।

একটি বড় ঘর। প্রত্যেক দেয়াল বহু ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ঔষধের আলমারি দিয়া ঢাকা। ঘরের মাঝখান দিয়া উঁচু কাউণ্টার এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত চলিয়া গিয়াছে। কাউণ্টারের

এক দিকে ক্রেতারা, অপর দিকে দোকানের কর্ম্মচারিগণ। দ্রুত কাজ চলিতেছে; কর্ম্মচারিগণ ঔষধ কাগজে মুড়িয়া দিতেছে, টাকা লইতেছে; ক্যাস্‌মেমো কাটিতেছে। একটা সমবেত গুঞ্জন শব্দ মৌমাছিপূর্ণ মৌচাকের কর্ম্মতৎপরতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

কাউণ্টারের ঠিক মধ্যস্থলে স্বত্বাধিকারী প্রতাপবাবু একটি উঁচু চেয়ারে বসিয়া আছেন; তাঁহার সম্মুখে কাউণ্টারের উপর মোটা মোটা কয়েকটি খাতা কাগজ কলম প্রভৃতি রহিয়াছে। প্রতাপবাবুর বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। তাঁহার বাম গণ্ডে সুপারির আকারের একটি আব্ আছে। তিনি যে একজন পাকা ও হুঁসিয়ার ব্যবসাদার, তাহা তাঁহার চোখের সতর্ক দৃষ্টি হইতে পরিস্ফুট। তাঁহার চোখ দোকানের চারিদিকে ঘুরিতেছে; অথচ তিনি অমায়িকভাবে বন্ধু বিধুবাবুর সহিত গল্প করিতেছেন।

বিধুবাবু কাউণ্টারের বাহিরের দিকে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি প্রতাপবাবুর মত মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক; একজোড়া ভিজা-বিড়াল জাতীয় গোঁফ্ আছে। তিনি সামাজিক জীব, অত্যাধুনিক সমাজে তাঁহার গতিবিধি আছে। এখানকার কথা ওখানে চালাচালি করা এবং নিজে নির্লিপ্তভাবে মজা দেখাই তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

বিধুবাবু ও প্রতাপবাবুতে কথা হইতেছে। বিধু সপ্রশংস নেত্রে প্রতাপের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

বিধু: বাস্তবিক তোমাকে দেখলে আনন্দ হয়। এই দাঁতের ওষুধ তৈরি ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছ—কিন্তু এখনও রোজ দোকানে এসে বসা চাই ···

প্রতাপ একটু গ্রাম্ভারি ভাবে হাসিলেন।

প্রতাপ: ভায়া, নিজে না দেখলে ব্যবসা চলে না—সব ব্যাটা চোর। বুঝলে?

বিধু: যাই বল, এবার কিন্তু তোমার বিশ্রাম করা দরকার। আর কি, ছেলে লেখাপড়া শেষ করল, এবার তার হাতে দোকান তুলে দিয়ে বাড়ীতে বসে আরাম কর।

প্রতাপের মুখচোখের ভাব একটু কড়া আকার ধারণ করিল।

প্রতাপ: হুঁ:—আরাম করব!

এই সময় একটি কেরাণী কয়েকটি কাগজপত্র লইয়া প্রবেশ করিল ও সেগুলি প্রতাপের সম্মুখে স্থাপন করিল। প্রতাপ সেগুলির উপর চোখ বুলাইয়া দস্তখৎ করিলেন। কেরাণী কাগজপত্র লইয়া চলিয়া গেল।

বিধু এইবার কথা কহিলেন।

বিধু: (ঈষৎ বিস্ময়ে) কিন্তু তোমার রঞ্জন তো খুব ভাল ছেলে! সমাজে সকলের মুখেই তার সুখ্যাতি শুনতে পাই। সবাই বলে অমন ছেলে হয় না!

প্রতাপ: (সক্ষোভে) আরে, ভাল ছেলে হয়েই তো হয়েছে বিপদ। তাকে কলকাতা থেকে একেবারে বাইরে পাচার করে দিয়েছি।

বিধু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন।

বিধু: বল কি! কেন হে?

প্রতাপ: কেন আবার! তুমি তো সবই জানো। ··· (গলা খাটো করিয়া) আমাদের সমাজে যত—এই—প্রবীণা ভদ্রমহিলা আছেন না?—সকলের নজর আমার ছেলেটির ওপর। সবাই চান, কোনও ফিকিরে আমার ছেলেটিকে ফাঁসিয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। তার ওপর, এখন ছেলে আমার এম্‌-এস্‌সি পাশ করেছে—এখন তো কি বলে ভদ্রমহিলারা সব হুমড়ি খেয়ে পড়বে। তাই মষ্টে মষ্টে ছেলেটিকে ···

আঙুলে তুড়ি দিয়া প্রতাপ এমন একটি হস্তভঙ্গী করিলেন যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি পুত্রকে বহুদূরে প্রেরণ করিয়াছেন। বিধু হাস্য গোপনের চেষ্টায় মুখ বিকৃত করিয়া গালের উপর হাত রাখিলেন; প্রকাশ্যে হাসিয়া ফেলিলে হয় তো প্রতাপ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। প্রতাপ কিন্তু তাঁহার মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করিলেন।

প্রতাপ: কি হে, তোমারও আবার দন্তশূল চাগাড় দিল না কি? (পকেটে হাত দিয়া) ভেবো না, আমার পকেটেই দন্তশূল উৎপাটনী বটিকা আছে—এই নাও, খেয়ে ফ্যালো—দু' মিনিটে আরাম হয়ে যাবে।

তিনি বড়ি বাহির করিয়া ধরিলেন। বিধু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

বিধু: না না, দন্তশূল নয়। বলছিলুম কি যে, ছেলের বিয়ে তো তোমাকে দিতেই হবে—তা, সমাজেরই একটি ভাল মেয়ে দেখেশুনে—

প্রতাপ বড়ি পুনশ্চ পকেটে পুরিলেন; তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন।

প্রতাপ : হুঁঃ—আমি একটা হাড়হাবাতে ফাজিল বেহায়া মেয়ে বৌ ক'রে ঘরে আনব ? আমার হীরের টুক্‌রো ছেলে, আমি রাজার ঘরে তার সম্বন্ধ ঠিক করছি।

বিধু পুলকিত আগ্রহে কথাগুলি শুনিলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িলেন।

বিধু : ও—তাই। বুঝেছি।—তা, সে জন্যে ছেলেকে একেবারে দেশান্তরী করবার কি দরকার ছিল ?

প্রতাপ সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া ঈষৎ খাটো গলায় জবাব দিলেন।

প্রতাপ : তুমি বোঝো না বিধু। আজকালকার নয়া আমলের ছোঁড়ারা একটু ফর্সা-গোছ মেয়ে দেখেছে কি পট্ ক'রে প্রেমে পড়ে গেছে। আমার রঞ্জন অবশ্য তেমন নয়—কিন্তু বলা তো যায় না। এখন ধর, আমার ছেলেটি একদিন এসে যদি বলে—'বাবা, আমি অমুক কলেজের কুমারী অমুককে ভালবেসে ফেলেছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'—তখন আমি কি করব ? তাই এই মৎলব করেছি, বাবাজীকে একেবারে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারপর এদিকে সব ঠিকঠাক ক'রে একদিন নিজে গিয়ে বাবাজীকে নিয়ে আসব। ব্যস্।

বিধু হাসিতে হাসিতে বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন।

বিধু : মন্দ ফন্দি আঁটোনি। তা, ছেলেকে পাঠালে কোথায় ?

প্রতাপ : (সগর্ব্বে) এমন জায়গায় পাঠিয়েছি যেখানে কোনও ভদ্রমহিলা নাগাল পাচ্ছেন না। ঝাঝাতে নতুন বাড়ী কিনেছি জানো তো ?

প্রতাপ মস্তক সঞ্চালন ও চক্ষের ভঙ্গী করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে ছেলেকে তিনি সেইখানেই পাঠাইয়াছেন। বিধু সংবাদটি পরিপাক করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, তারপর ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বিধু : বেশ বেশ। আজ চল্‌লুম ভাই—

বিধু প্রস্থানোদ্যত হইলে প্রতাপ সহসা সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন।

প্রতাপ : ওহে বিধু—! দেখো, তোমাকে চুপি চুপি বল্‌লুম, কথাটা যেন চাউর হয়ে না পড়ে—

বিধু : আরে না না, পাগল নাকি ?

বিধু প্রস্থান করিলেন। প্রতাপ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত সংশয়ের ভাব মুখে ফুটাইয়া সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়া রঞ্জন মোটর সাইক্‌লে চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে ঋজু নির্জ্জন পথ পড়িয়া আছে।

কাট্।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের অন্য অংশ। রাস্তার একপাশে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে আরোহী কেহ নাই।

গাড়ীর আরও নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায়, গাড়ীর তলা হইতে দুটি পা বাহির হইয়া আছে, যেন কেহ গাড়ীর তলায় ঢুকিয়া গাড়ী মেরামত করিতেছে। পা দুটি আকারে ক্ষুদ্র ও জুতা বর্জ্জিত।

দূরে মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গেল। তারপর দেখা গেল রঞ্জন এইদিকেই আসিতেছে।

রঞ্জনের বাইক ঠিক মোটরকারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন তদবস্থায় গাড়ীর মধ্যে উঁকি মারিল।

রঞ্জন : আরে! বিলকুল ফাঁকা—ওঃ!

নীচের দিকে নজর পড়িতে সে পা দুটি দেখিতে পাইল। বাইক হইতে নামিয়া সে পদদ্বয়ের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল; কোমরে হাত রাখিয়া সহাস্য দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকাইয়া বলিল—

রঞ্জন : ওহে ছোকরা! কি হয়েছে তোমার কারের ? বেরিয়ে এসো।

কারের তলা হইতে কোনও জবাব আসিল না। তখন রঞ্জন নত হইয়া পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল। পায়ের আঙুল কুঁক্‌ড়াইয়া যতই সরিয়া যাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল, রঞ্জন ততই আমোদ বোধ করিয়া সুড়সুড়ি দিতে লাগিল।

অবশেষে পায়ের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল গাড়ীর নীচের লোকটি বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। রঞ্জন তখন একটু দূরে সরিয়া গিয়া সকৌতুকে এই নিষ্ক্রমণ-ক্রিয়া দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে তাহার সহাস্য মুখের ভাব বদলাইয়া

গেল; কৌতুকের পরিবর্ত্তে একটা বোকাটে বিস্ময়ের ভাব তাহার চক্ষু ও অধরকে সুবর্ত্তুল করিয়া দিল।

তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখা গেল, যিনি গাড়ীর তলা হইতে বাহির হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছেন তিনি একটি যুবতী। তাঁহার চেহারা অতিশয় সুশ্রী, কিন্তু সম্প্রতি কালিমাখা এক ফোঁটা চর্ব্বির দাগ তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাঁহার বুক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত একটি ক্যাম্বিসের ওভার-অল্ দ্বারা আবৃত। দক্ষিণ হস্তে একটি স্প্যানার, দুই চক্ষে জ্বলন্ত বিদ্যুৎ মানাসিক উষ্ণতার পরিমাপ ঘোষণা করিতেছে।

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া রঞ্জনের মুখোমুখি দাঁড়াইলেন; হাতের স্প্যানার দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া চাপা ক্রোধের স্বরে কথা কহিলেন।

যুবতী: কে আপনি?

রঞ্জন যুবতীর মুখ হইতে স্প্যানারের দিকে তাকাইয়া এক পা পিছু হটিল; তারপর কোণাচে ভাবে নিজের বাইকের দিকে আগাইতে লাগিল। যুবতীর দৃষ্টি তাহার অনুসরণ করিল। নিজের গাড়ীর উপর চাপিয়া বসিয়া রঞ্জন ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিল; যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি ভাবে কহিল—

রঞ্জন: আমি!—কেউ না—মানে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম—

যুবতী আরও দুই পা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ চোখের ভঙ্গীতে অহিংসা-নীতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইল না।

যুবতী: আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিলেন কেন?

শান্তিকামী রঞ্জন ডান হাত নাড়িয়া ব্যাপারটাকে সহজতার পর্য্যায়ে আনিবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জন: মানে—আমার কোনও ইয়ে ছিল না। আমি পা দেখে ভেবেছিলুম আপনি পুরুষ মানুষ—অর্থাৎ কি-না—ছেলেমানুষ—অর্থাৎ—

কথার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার হস্তভঙ্গী করিয়া রঞ্জন বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে সে যুবতীটিকে কিশোর বয়স্ক বালক বলিয়া ভুল করিয়াছিল।

যুবতীর মুখমণ্ডলের দৃপ্ত অরুণিমা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল; তিনি নিজের নগ্ন পদদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি অবনত করিলেন।

যুবতী: ওঃ—

ফিরিয়া গিয়া তিনি নিজের গাড়ীর ভিতর হইতে একজোড়া স্লিপার বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। হাতের স্প্যানার ফেলিয়া দিয়া, গাড়ীর ফুট-বোর্ডের উপর উপবেশন করিলেন। তারপর করতলে কপোল রাখিয়া এমন ভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন চক্ষু দ্বারা তাহাকে যাচাই করিতেছেন।

মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করিলেও রঞ্জন যুবতীটির সহিত সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিল। সে উঠিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিতে করিতে যুবতীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া রুমালটি তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিল—

রঞ্জন: ইয়ে—আপনার গালে—একটু কালি-ঝুলি—মুছে ফেলুন—

যুবতী সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজ দক্ষিণ গণ্ডে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিতে কালির দাগ দেখিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। অস্ফুট আক্ষেপোক্তি করিয়া তিনি নিজের গাড়ীর ভিতর হইতে রুমাল ও ভ্যানিটি কেস্ বাহির করিয়া ক্ষুদ্র আয়নায় নিজের মুখ দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে নিরতিশয় ক্ষুব্ধভাবে রঞ্জনের প্রতি একটা কটাক্ষ হানিয়া তিনি গালে রুমাল ঘষিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে রঞ্জন সদ্ভাব আরও ঘনীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিল।

রঞ্জন: কি হয়েছে বলুন তো আপনার গাড়ীর? মোটর সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানি—যদি ইঞ্জিনের কোনও গোলমাল হয়ে থাকে—অথবা—। মোট কথা, সব মোটরের নাড়ী নক্ষত্র আমার জানা আছে—মেরামৎ করতেও জানি—

যুবতীটি রঞ্জনের দিকে পাশ ফিরিয়া গালে রুমাল ঘষিতেছিলেন, এখন ক্ষণেকের জন্য ঘাড় ফিরাইয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিলেন—

যুবতী: আমিও জানি।

এই বলিয়া যুবতী আবার আয়নার মধ্যে চাহিয়া গণ্ডে রুমাল ঘষিতে লাগিলেন।

যুবতীর কথা বলার ভঙ্গী হইতে বিশেষ উৎসাহ না পাইলেও রঞ্জন হাল ছাড়িল না।

রঞ্জন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তবে কি-না—আপনি মহিলা—

যুবতী এতক্ষণে গণ্ডের কলঙ্ক মোচন শেষ করিয়াছেন। এবার অত্যন্ত নিঃসংশয়ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করিলেন।

যুবতী ঃ মহিলা হ'লেও আমি নিজের কাজ নিজে করতে পারি। আপনার সাহায্যের দরকার নেই।

রঞ্জন মুষ্‌ড়িয়া গেল; একটু রাগও হইল। স্কন্ধদ্বয়ের একটি নিরুপায়সূচক ভঙ্গী করিয়া সে নিজের মোটর বাইকের কাছে ফিরিয়া গেল; তারপর বাইকের আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিয়া গম্ভীর চোখে যুবতীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করায় সে যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা তাহার মুখভাব হইতে বুঝা যায়। ক্ষমতা থাকিলে সে চলিয়া যাইত, কিন্তু যুবতীটির এমন একটি আকর্ষণী শক্তি আছে যে—

যুবতীটি আবার গাড়ীর ফুট বোর্ডে বসিয়াছেন এবং পূর্ব্ববৎ করলগ্নকপোলে রঞ্জনকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবশেষে তিনি নির্লিপ্তভাবে কথা কহিলেন।

যুবতী ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

রঞ্জন চমকিয়া উঠিল। যুবতী যে যাচিয়া তাহার সহিত কথা কহিবেন তাহা সে প্রত্যাশাই করে নাই; হাস্যবিস্মিত মুখে সাগ্রহে উত্তর দিল।

রঞ্জন ঃ আমি? আমি ঝাঝায় যাচ্ছি।—ঐ যে—ঝাঝা—!

হস্ত প্রসারিত করিয়া সে ঝাঝার দিকটা দেখাইয়া দিল, যেন ঘাড় ফিরাইলেই ঝাঝা দেখা যাইবে।

যুবতীটি কিন্তু তীক্ষ্ণ জবাব দিলেন; তাঁহার বিনীত সুরের ভিতর হইতে তীব্র শ্লেষ ফুটিয়া উঠিল।

যুবতী ঃ তবে যাচ্ছেন না কেন?

রঞ্জন হতভম্ব হইয়া গেল। নিরীহ প্রজাপতি যদি হঠাৎ বোলতার মত হুল ফুটাইয়া দেয় তাহা হইলে বোধ করি মানুষের মুখের ভাব এমনই হয়। ক্রমে সে রাগিয়া উঠিল। যুবতীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া নিজের গাড়ীর উপর সোজা হইয়া বসিল; গাড়ীর যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করিয়া ষ্টার্ট দিতে গিয়া শেষে কি ভাবিয়া আবার আগের মত আসনের উপর পাশ ফিরিয়া বসিল। বিদ্রোহীর মত বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া যেন আকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

রঞ্জন ঃ আমার ইচ্ছে আমি যাব না—সরকারী রাস্তা—!

যুবতী নয়ন হইতে রঞ্জনের প্রতি একটি অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন; তারপর অপরিসীম অবজ্ঞায় চিবুক ও নাসিকা উন্নত করিয়া পুনরায় গাড়ীর তলায় প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

রঞ্জন ভ্রূবদ্ধ ললাটে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। দ্রুত ডিজল্‌ভ্‌।

কিছুক্ষণ সময় কাটিয়াছে। রঞ্জন পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে। সিগারেটের শেষাংশটুকু ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আড়ামোড়া ভাঙিল।

মোটরের নীচে হইতে ঠুং ঠাং মেরামতির আওয়াজ আসিতেছে। রঞ্জন অলসপদে মোটরখানাকে একবার প্রদক্ষিণ করিল; খোলা বনেটের ভিতর দিয়া ইঞ্জিনের ভিতর উঁকি মারিল; তারপর পশ্চাদ্দিকে গিয়া যেখানে পেট্রোল্‌ ট্যাঙ্ক্‌ আছে সেইখানে দাঁড়াইল। একটু ইতস্তত করিয়া নিঃশব্দে পেট্রোল ট্যাঙ্কের মুখ খুলিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। শেষে পূর্ব্ববৎ নির্লিপ্ত ভাবে একটি গানের সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার মুখের মেঘ আর নাই।

ডিজল্‌ভ্‌।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। রাস্তার এক স্থানে অনেকগুলা সিগারেটের টুক্‌রা পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে একটা হইতে এখনও ধুঁয়া বাহির হইতেছে। রঞ্জন পায়ে তাল দিতে দিতে একটি গান গাহিতেছে। তালমান শুদ্ধ হইলেও গানের বিষয়বস্তু অতিশয় লঘু।

রঞ্জন ঃ "এক যে আছে মজার দেশ সব রকমে ভাল
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ দিনে চাঁদের আলো—"

রঞ্জন আকাশের দিকে চাহিয়া নিজমনেই গান গাহিতেছে; যদিও তাহার দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া চকিতের ন্যায় মোটরের তলাটা ঘুরিয়া আসিতেছে।

রঞ্জন ঃ "সেই দেশেতে বেরাল পালায় নেংটি ইঁদুর দেখে
ছেলেরা খায় ক্যাষ্টরয়েল রসগোল্লা রেখে।"

তৃতীয় চরণ গাহিতে আরম্ভ করিয়া রঞ্জন থামিয়া গেল; যুবতী গাড়ীর তলা হইতে আবার বাহির হইয়া আসিতেছেন।

বাহির হইবার পর তিনি ক্রোধ-ক্ষোভ-ব্যর্থতা-লজ্জা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রঞ্জনকে অভিসিঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মোটরের চালকের আসনে প্রবেশ করিয়া গাড়ী স্টার্ট দিবার চেষ্টা করিলেন। গাড়ী কিন্তু চলিল না, কেবল তাঁহার পেটের মধ্যে ভুট্-ভাট্ শব্দ হইতে লাগিল। যুবতী তখন গাড়ীর ষ্টীয়ারিং হুইলে একটা হিংস্র মোচড় দিয়া বাহিরে ফুট-বোর্ডে আসিয়া বসিলেন।

রঞ্জন সিগারেট কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট বাহির করিল, অতি যত্নে সেটি ধরাইয়া একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ করিল; তারপর যুবতীর দিকে ফিরিয়া ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—

রঞ্জন: হ'ল না মেরামত?

অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত যুবতী জ্বলিয়া উঠিলেন।

যুবতী: না—! কিন্তু তাতে আপনার কি?

রঞ্জন নির্ব্বিকার। পুনশ্চ সিগারেট হইতে অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া সে সিগারেটের জ্বলন্ত প্রান্তের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

রঞ্জন: গাড়ীর কি হয়েছে আমি জানি—

যুবতীর চক্ষে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল; তিনি সপ্রশ্ন-ভাবে রঞ্জনের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। রঞ্জন তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে তাহার কথা শেষ করিল—

রঞ্জন: পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে।

যুবতী বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিলেন; তারপর দ্রুত উঠিয়া গাড়ীর পশ্চাদ্দিকে অনুসন্ধান করিতে গেলেন।

রঞ্জন আড়চোখে চাহিয়া একটু বিজয় হাস্য করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব গোপন করিয়া নির্লিপ্ত মুখে সিগারেটে টান দিল।

যুবতী পেট্রোল ট্যাঙ্কের ঢাকা খুলিয়া তাহার মধ্যে একটি কাঠি প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কাঠিটি টানিয়া বাহির করিয়া দেখিলেন উহা সম্পূর্ণ শুষ্ক। ধীরে ধীরে তাঁহার গণ্ডদ্বয় লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়া মোটরের গায়ে হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন; রঞ্জনের মুখের পানে ভাল করিয়া তাকাইতে পারিলেন না।

রঞ্জন সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ফেলিয়া দিয়া আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল; হাই তুলিয়া তুড়ি দিল; তারপর নিজের গাড়ীর উপর সোজা হইয়া বসিয়া পিছন দিকে তাকাইয়া বিদায়-জ্ঞাপক হাত নাড়িল।

রঞ্জন: আচ্ছা চললুম—নমস্কার।

সে গাড়ীতে স্টার্ট দিল।

যুবতী অসহায় ক্ষোভে অধর দংশন করিলেন। এদিকে রঞ্জন চলিয়া যায়, তাহার গাড়ী নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দর্প বিসর্জ্জন দিয়া শেষে যুবতী ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন।

যুবতী: শুনুন—

রঞ্জন বোধ করি এই আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছিল; গাড়ী থামাইয়া যুবতীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। নীরস শিষ্টতার কণ্ঠে বলিল—

রঞ্জন: আপনি ডাকছিলেন?

লজ্জায় যুবতীর মাথা কাটা যাইতেছিল; তবু তিনি ঢোক গিলিয়া কোনও ক্রমে বলিলেন—

যুবতী: আমি—আমি—আপনার কাছে পেট্রোল আছে?

রঞ্জন: (নিরুৎসুক ভাবে) আছে।

যুবতী পুনরায় অধর দংশন করিলেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই; মনের বিদ্রোহ দমন করিয়া বলিলেন—

যুবতী: তা হ'লে—যদি—আমাকে দেন—

রঞ্জন ঈষৎ বিস্ময়ে যুবতীর দিকে তাকাইল।

রঞ্জন: আমার পেট্রোল আপনাকে দেব!—তারপর? আমি কি এখানে বসে বসে হাপু গাইব?

যুবতীর চক্ষু ফাটিয়া প্রায় জল আসিয়া পড়িল। তিনি কষ্টে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

যুবতী: আমিও ঝাঝা যাচ্ছি—আপনি আমার গাড়ীতে আসতে পারেন—

রঞ্জন: ও—আপনিও ঝাঝা যাচ্ছিলেন?—

মনে মনে উৎসুক হইয়া উঠিলেও রঞ্জন বাহিরে যুবতীর প্রস্তাব বিবেচনা করার ভঙ্গীতে বলিল—

রঞ্জন: বুঝেছি। আপনি ঝাঝা যাচ্ছেন—

যুবতী: হ্যাঁ—আমরা ঝাঝাতেই থাকি—আমার বাবার ওখানে অভ্রের খনি আছে—

রঞ্জন: ও—

যুবতী: বাবা ঝাঝাতেই থাকেন—আমি—

রঞ্জন: আপনি কলকাতায়।

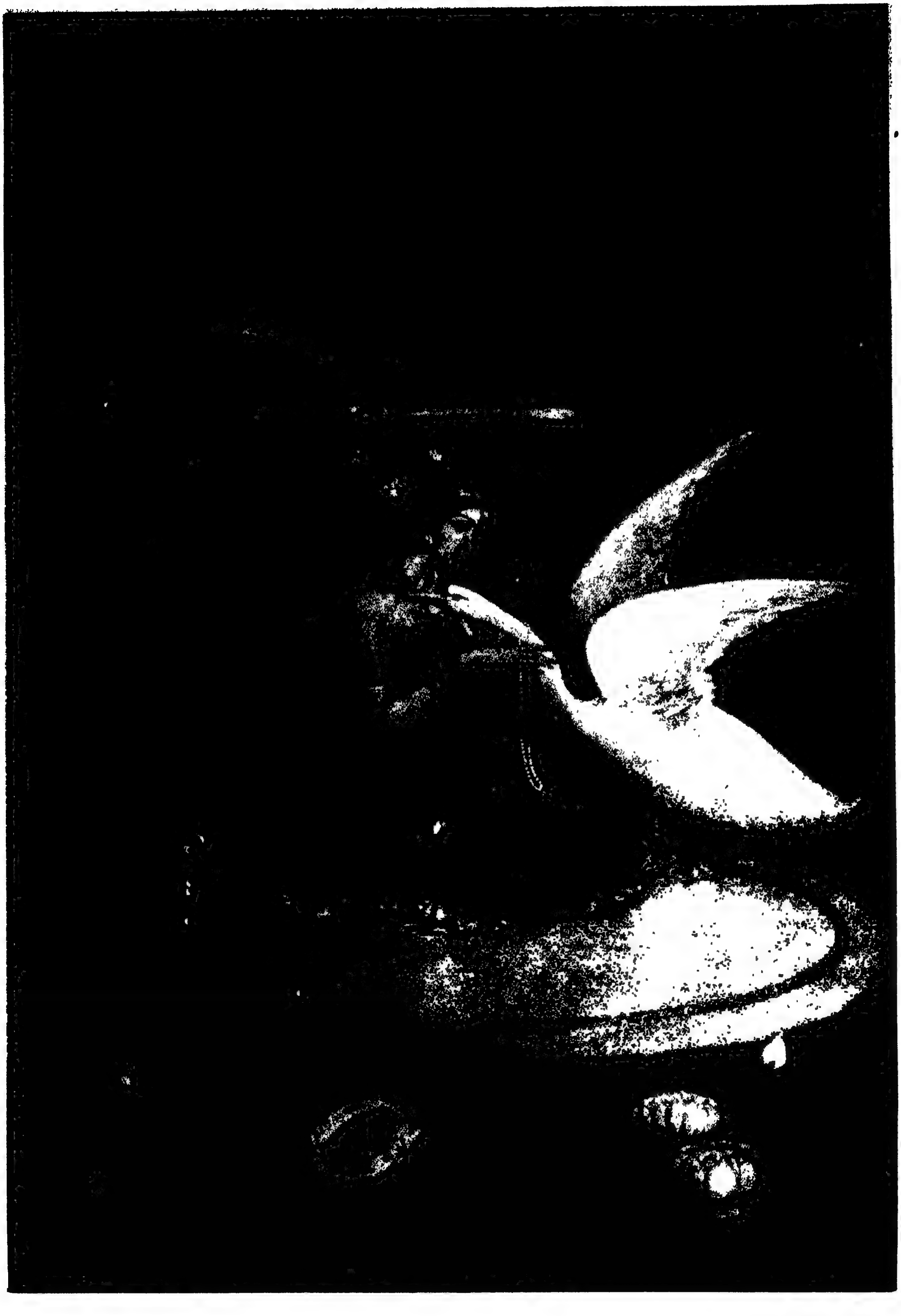

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত হংসদূত ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

যুবতী ঃ হাঁ। হঠাৎ বাবার অসুখের 'তার' পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি—

রঞ্জন ঃ পেট্রোল না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছেন।

যুবতী ক্ষুব্ধ ধিক্কারে কেবল ঘাড় নাড়িলেন।

রঞ্জন ঃ তা যেন হ'ল। আমি আপনাকে পেট্রোল দিলুম, বদলে আপনি আমাকে ঝাঝা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিলেন। কিন্তু আমার গাড়ীটা কি এখানেই পড়ে থাক্‌বে?

যুবতীর মনে আশা জাগিল। তিনি সাগ্রহে বলিলেন---

যুবতী ঃ তা কেন? আপনার মোটর বাইক আমার গাড়ীর পিছনের সীটে তুলে নিলেই হবে।

রঞ্জন এবার হাসিয়া ফেলিল; সপ্রশংস নেত্রে যুবতীর পানে চাহিয়া বলিল—

ঠিক তো। ও কথাটা আমার মাথায় আসেনি।—আপনার তো খুব উপস্থিত-বুদ্ধি!

এইবার সর্ব্বপ্রথম যুবতীর মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি চক্ষু নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—ধন্যবাদ, মিঃ—?

রঞ্জন ঃ (তৎক্ষণাৎ) রঞ্জনপ্রকাশ সিংহ।

যুবতী ঃ ধন্যবাদ রঞ্জনবাবু—

রঞ্জন ঃ না না, সে কি কথা, মিস্—?

যুবতী কৌতুক চপল চোখে চাহিলেন।

যুবতী ঃ মঞ্জু রায়।

রঞ্জন স্মিতমুখে দুই করতল একত্র করিল।

মঞ্জু তাহার অঙ্গাবরক ওভার-অল্ খুলিতে আরম্ভ করিল। ডিজল্‌ভ্।

ক্রমশঃ

প্রিয়া

শ্রীহৃষিকেশ বসু বি-এ, কাব্যতীর্থ

বন্ধুর বনের পথে কস্তুরী মৃগের প্রায় আত্মগন্ধে হইয়া ব্যাকুল
অসহ্য সে মত্ততায় কোনমতে বুঝিতে পারিনি;
অজানা কিসের গন্ধ কোন্ ফুলকলি হ'তে বায়ুস্রোতে দিগন্ত ব্যাপিয়া
নাসিকায় ভাসে মোর? মৃত্যু কিম্বা মৃত সঞ্জীবনী?
আমার মাধুরী আমি আকণ্ঠ পুরিয়া হায় কোন্ পাত্রে করি আস্বাদন;
মুক্তি চাই, সৃষ্টি চাই, চাই রস জীবন-দ্রাক্ষার;
অশান্ত পরাণে মোর সৃষ্টির বাসনাখানি অগ্নিরসে করিয়াছে স্নান
আমি কবি মোর কাব্য জন্ম নেবে তনুতে কাহার?—
সৃষ্টির সে মহাতপে তুমি সে উর্ব্বশী মোর যৌবনের ভরা গঙ্গা নিয়ে
মায়াময় সরোবর মোর লাগি করিলে সৃজন;
কহিলে, "পথিক এস, আমার যৌবন সরে কর স্নান আনন্দ ভরিয়া
মোর ফুলে মোর রসে তৃপ্ত হোক তোমার ভজন।"
প্রতিটি ইন্দ্রিয় আমি নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' সখি, জ্বালায়েছি রেণুর কম্পন
আমি তৃপ্ত, তুমি তৃপ্ত, মহাতৃপ্তি লভিল জনম।
সৃষ্টির জননী তুমি, তোমার ভ্রূণের মাঝে নবরূপে আমারে হেরিয়া
তোমা কহি, তুমি প্রিয়া, প্রিয়তমা প্রেয়সী পরম।

বৈদিক যজ্ঞ ও উপনিষদ্

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

ফাল্গুন ১৩৪৬এর ভারতবর্ষে "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, ডি এস্-সি, এফ আর্ এস্ মহাশয় লিখিয়াছেন, (৪১০ পৃঃ) "বৈদিক আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞাদি করিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে (আনুমানিক বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই) বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। উপনিষদে এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে।" কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উপনিষদে কোথাও বৈদিক যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নাই এবং বৈদিক দেবতাসকল পরিত্যক্ত হন নাই। প্রত্যুত বৈদিক যাগযজ্ঞ যে কার্যকরী এই কথা বিভিন্ন উপনিষদে নানাস্থলে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। বেদ বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করিতে পারা যায়, যথা—"স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করেন তিনি যজ্ঞ করিবেন। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ করা যায়। নিম্নে আমরা উপনিষদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"তদ্ যেহ বৈ তদ্ ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে চান্দ্রমসম্ এব লোকম্ অভিজয়ন্তে।" (প্রশ্নোপনিষদ, ১।৯)

অনুবাদ—যাহারা বৈদিক যজ্ঞ, কূপ বা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা এবং দান করিয়া থাকে তাহারা চন্দ্রলোক জয় করে (চন্দ্রলোক স্বর্গের এক অংশ)।

কঠোপনিষদে দেখা যায় যে, যম নচিকেতাকে যজ্ঞ কিরূপে করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে ঐ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গ লাভ করা যায়।

মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন,

> "এতেষু যঃ চরতে ভ্রাজমানেষু
> যথাকালং চ আহুতয়ো হ্যাদদয়ান্
> তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ
> যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ"

(মুণ্ডক উপনিষদ্, ১।২।৫)

অনুবাদ—যাহারা এই সকল অগ্নির সেবা করে এবং যথাকালে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, তাহাদিগকে সূর্যরশ্মিগণ লইয়া যান, যেস্থানে দেবগণের পতি বাস করেন।

যজ্ঞসকল যে সত্য (অর্থাৎ বেদে যজ্ঞের যে সকল ফল নির্দেশ করা হইয়াছে বাস্তবিক যে, সে সকল ফল পাওয়া যায়) একথা মুণ্ডক উপনিষদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

> "তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্মাণিকবয়ো যান্যপশ্যন্"

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।১)

অনুবাদ—"মন্ত্র সকলে ঋষিগণ যে সকল কর্ম দর্শন করিয়াছিলেন সে সকল সত্য।" বেদের যে অংশ মন্ত্র বা সংহিতা নামে পরিচিত, প্রথমে সেই সকল অংশ প্রচারিত হয়। এই সকল "মন্ত্র" অংশ সাধারণতঃ দেবতাদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। বেদের "ব্রাহ্মণ" নামক অংশ পরে প্রচারিত হয়। বৈদিক মন্ত্র সকলের সাহায্যে কিভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হইবে সাধারণতঃ তাহা বেদের ব্রাহ্মণ অংশের অন্তর্ভুক্ত। মুণ্ডক উপনিষদের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যে বলা হইয়াছে যে বেদের ব্রাহ্মণ অংশে বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে যে সকল যজ্ঞ করিবার কথা আছে সে সকল সত্য। মেঘনাদবাবু বলিয়াছেন যে উপনিষদে যজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদে যজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরস্ত করা হইয়াছে।

মেঘনাদবাবু হয়ত বলিবেন, যে সকল উপনিষদে এক রকম কথা বলা হয় নাই। কিন্তু তিনি কোনও উপনিষদ হইতে এমন একটি বাক্যও উদ্ধৃত করিতে পারেন কি—যেখানে যজ্ঞের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা যে স্বর্গলাভ করা যায় এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয়ের ভাব প্রকাশ হইয়াছে? তিনি এরূপ কোনও বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারিবেন না। কারণ উপনিষদে কোথাও এরূপ বাক্য নাই।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, মেঘনাদবাবু বলিয়াছেন, "উপনিষদের আধ্যাত্মিকতা ব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে।" মেঘনাদবাবুর এই উক্তিও সম্পূর্ণরূপে অলীক। কোনও উপনিষদেই দেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশিত হয় নাই, অনেক উপনিষদে দেবতাদের উল্লেখ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ঈশোপনিষদের শেষ তিনটি শ্লোকে (১৬, ১৭, ১৮) সূর্য ও অগ্নি দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে এবং মৃত্যুর পর তাঁহারা যেন আত্মার সদ্গতি করেন এরূপ প্রার্থনা আছে। কেনোপনিষদে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে দেবগণ অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের শক্তিতেই দেবগণ শক্তিমান। কঠোপনিষদে যমদেব নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদে ভার্গব মুনি ভগবান পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করিতেছেন, কোন্ কোন্ দেবতা প্রজাগণকে ধারণ করেন? তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? মুণ্ডক উপনিষদের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, সকল দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মাই সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, পুনরায় মুণ্ডক ২।১।৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বর

হইতে সকল দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছে। মুণ্ডক ২।৮-এ বলা হইয়াছে যে পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু প্রভৃতি দেবগণ নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন—"ভীষা অস্মাৎ অগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ।" বস্তুতঃ উপনিষদে বহুস্থলে বৈদিক দেবগণের উল্লেখ আছে, কোথাও তাঁহাদের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নাই।

কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, উপনিষদে দেবতা ও যজ্ঞে অবিশ্বাস না থাকিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যজ্ঞের উপযোগিতা নাই। কিন্তু এরূপ অনুমানও যথার্থ নহে। চিত্ত নির্মল না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; চিত্ত নির্মল করিবার জন্য যজ্ঞের উপযোগিতা আছে। এজন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে (৪।৪।২২)—

"তম্ এতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন।"

অর্থাৎ এই ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করিয়া ব্রাহ্মণগণ অনাসক্তভাবে বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম সকামভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে স্বর্গলাভ হয় এবং নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। উপনিষদুক্ত এই তত্ত্বই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥

গীতা ১৮।৫-৬

"যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ত্যাগ করা উচিত নয়, এই সকল কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। যজ্ঞ দান ও তপস্যা পণ্ডিতগণের চিত্ত শুদ্ধ করে। আসক্তি ও ফলাকাংখা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত ইহাই আমার নিশ্চিত মত।"

উপনিষদেও বহুস্থলে যজ্ঞ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কঠোপনিষদে নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবার পূর্বে যমরাজ তাঁহাকে যজ্ঞ করিতে শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার অর্জন করা যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হইয়াছে, "দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং" (প্রথম বল্লী, একাদশ অনুবাক্) অর্থাৎ দেবকার্য ও পিতৃকার্যে অবহেলা করিও না। দেবকার্য হইতেছে যজ্ঞ; পিতৃকার্য হইতেছে তর্পণ। মহর্ষি বাদরায়ণ বা বেদব্যাস ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য যজ্ঞের উপযোগিতা স্থাপন করিয়া এই সূত্র রচনা করিয়াছিলেন; "সর্বাপেক্ষা হি যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ" (ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।২৬) বলা বাহুল্য মহর্ষি বাদরায়ণের এই মত সমগ্র উপনিষদ গভীরভাবে আলোচনা করিবার ফল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি উপনিষদে কোথাও এ কথা বলা না হইয়া থাকে যে, যজ্ঞসকল কার্য্যকরী নহে এবং যদি উপনিষদে ইহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়া থাকে যে, যজ্ঞসকল কার্যকরী এবং যজ্ঞ করা উচিত, এবং যদি উপনিষদে ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, পরমেশ্বর দেবতাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের শক্তিতেই দেবগণ নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে মেঘনাদবাবু একথা বলিলেন কেন যে, উপনিষদে যজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং দেবতাগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ডঃ উইণ্টারনিৎস তাঁহার প্রণীত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে ২৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "When the Brahmanas were pursuing their barren sacrificial science other circles were engaged upon those highest questions which were at last treated so admirably in the Upanishads". অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণ যখন তাহাদের নিষ্ফল যজ্ঞসকল সম্পাদন করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অন্য ব্যক্তিরা সেই সকল প্রশ্ন আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, যে-সকল প্রশ্ন পরে উপনিষদে সুন্দরভাবে বিচার করা হইয়াছে।" পণ্ডিতপ্রবর উইণ্টারনিৎস সাহেব ইহা দেখিলেন না যে উপনিষদেই বহুস্থলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে যজ্ঞস্থলে সমবেত বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণই উপনিষদের প্রশ্নসকল আলোচনা করিয়াছিলেন। (যথা—ছান্দোগ্য উপনিষদে উষস্তি ঋষির উপাখ্যান, বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজা জনকের যজ্ঞস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অন্য ঋষিদের বিচার)। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহার প্রণীত History of Sanskrit Literature গ্রন্থে ২১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "Though the Upanishads generally form a part of the Brahmanas * * they really represent a new religion which is in virtual opposition to the ritual or practical side." অর্থাৎ "যদিও উপনিষদগুলি বেদের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত অংশের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, তথাপি তাহারা একটি নূতন ধর্ম প্রতিপাদন করে এবং সে ধর্ম প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞের বিরোধী।" ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ইহা বিচার করা প্রয়োজন মনে করিলেন না যে, একই গ্রন্থ—বেদের—দুই অংশ কিরূপে পরস্পরবিরোধী হইতে পারে,—বিশেষতঃ যখন ঋষি ও আচার্যগণ এই গ্রন্থ ঈশ্বর প্রণীত এবং সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলিয়াছেন। সাহেবেরা তাহা না দেখুন, কিন্তু ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে, আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতগণ (যথা-ভাণ্ডারকর, হিরিয়ান্না) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রচারিত এই সকল মত গ্রহণ করিয়াছেন; একটু গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছেন না, এই সকল মত সম্পূর্ণ অলীক, উপনিষদের বাক্য সকল এই সকল মতের বিরোধী॥

উপনিষদ বলিয়াছেন যে, সংসারের নানাবিধ দুঃখ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি পাইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করা যায় বটে, কিন্তু স্বর্গে চিরকাল থাকা যায় না; পুণ্য ফুরাইলেই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে

হইবে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেই দুঃখভোগ অনিবার্য। উপনিষদ বলিয়াছেন যে, এই সকল কারণে যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করিবার চেষ্টা কখনও জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। মুণ্ডক উপনিষদ (১।২।৭ শ্লোকে) বলিয়াছেন। "প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ" অর্থাৎ এই সকল যজ্ঞরূপ তরণী যথেষ্ট দৃঢ় নহে। যজ্ঞ করিলে কিছুকালের জন্য সংসারদুঃখ ভুলিয়া স্বর্গে বাস করা যায় বটে, কিন্তু পুণ্য ফুরাইলে আবার সংসারসমুদ্রে পতিত হইতে হয়, সুতরাং যজ্ঞকে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত তরণী বলা যায় না। কিন্তু উপনিষদের এই উক্তি হইতে কেহ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে, যজ্ঞ নিষ্ফল বা যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ করা যায় না তাহা হইলে তিনি ভ্রমে পতিত হইবেন। এই সিদ্ধান্ত উপনিষদের সম্পূর্ণরূপে বিরোধী হইবে।

মেঘনাদবাবু এই প্রবন্ধেই (৪০৮ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন "শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি * * এই সকল প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন।" মেঘনাদবাবু আমার মানসিক জড়তা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি নিজে নিশ্চয়ই মানসিক জড়তা নামক ব্যাধি হইতে মুক্ত,—তাঁহার মন নিশ্চয়ই জীবন্ত ও সক্রিয়। কিন্তু জীবন্ত ও সক্রিয় মনের লক্ষণ কি এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপনিষদ সম্বন্ধে যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন সেই সকল মত প্রকৃতপক্ষে উপনিষদ্-বাক্যের বিরোধী কি-না তাহা বিচার না করিয়াই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা? মেঘনাদবাবুর প্রবন্ধ আধুনিক বিজ্ঞানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখরিত এবং ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের অট্টহাস্যে নিনাদিত। কিন্তু ধর্মহীন বিজ্ঞানের স্বরূপ কি বীভৎস তাহা বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধেই প্রকটিত হইয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়াই কি মানসিক স্বাধীনতার পরিচায়ক? স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া প্রাচীন ঋষিদের আজীবন সাধনালব্ধ মহাসত্যগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা কি মানসিক জড়তার পরিচায়ক?

মেঘনাদবাবুর প্রবন্ধে আরও কতকগুলি ভ্রম আছে, বারান্তরে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বয়ী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১

আমার আকাশে সখি, বিচ্ছেদের অন্তিম গোধূলি
মৃত্যুর মলিন-বর্ণে প্রসারিছে প্রাণের প্রান্তরে,
প্রত্যাশার রক্ত রাগে ক্ষীয়মান রবি রশ্মিগুলি
আত্মহত্যা করিয়াছে তিমিরের অতল-সাগরে।
স্মরণে কি জাগে আজ কোন্ শুভ্র উজ্জ্বল-উষায়
আমার যৌবন দিনে পরালে যে মল্লিকার মালা,
তার জীর্ণ দলগুলি ব্যথাতুর ধূসর-সন্ধ্যায়
নীড়ের বলাকা সম উড়ে যায় বিষণ্ণ-নিরালা ;

বিরহের ছায়া নামে কাচমণি কাঞ্চনের জলে
আমার মনের সে কি অন্তঃশীলা সুর-প্রবাহিনী,
মন্থর বেদন-ছন্দে বয়ে যায় আঁধারের তলে
কল্লোল-ক্রন্দন ঘিরে আসে নেমে ঘন-নিশীথিনী।
মৃত্যুর সীমান্ত হ'তে শুনি আজ যৌবনের ডাক,
তুমিও কি শোনো সখি, কোথায় কাঁদিছে চক্রবাক ?

২

তবু তুমি একবার পশ্চাতের ঘনচ্ছায়া পারে,
বারেক ফিরাও যদি স্বপ্নাতুর সুনীল-নয়ন,
আলো-ছায়া-মর্মরিত দিনান্তের স্বচ্ছ-অন্ধকারে
সহসা পড়িবে চোখে ফেলে আশা মাধবী-শয়ন।
রিক্ত-পান-পাত্র হ'তে মোছেনি তো চুম্বনের লেখা,
বিপঞ্চীর ছিন্নতন্ত্রে শিহরিছে তোমার পরশ,
বিকীর্ণ বকুল-পুঞ্জে আজো আছে অলক্তক-রেখা,
কাঁপিছে দীঘির জলে ছায়ালোভী রোমাঞ্চ-হরষ।

জানি সখি, বিদায়ের অশ্রুম্লান এ অন্ত-বেলায়
চলে যাবে অনিন্দিতা, কোনো গ্লানি রাখিবে না মনে,
স্মরণের চিত্রপট ধূলিতলে লুটিবে হেলায়,
বিস্মৃতির কৃষ্ণচ্ছায়া ছড়াইবে প্রাণের প্রাঙ্গণে।
তোমার চলার পথে অকৃপণ বাসন্তী সঞ্চয়,
বেদনার অন্ধকারে মৃত্যু মোরে করিয়াছে জয়।

মানব দেহে ও মনে এ্যাণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড-এর প্রভাব

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দেহতত্ত্ববিদ্দের দেহ-বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা মানুষের সুন্দর সুঠাম দেহটাকে তীক্ষ্ণ ছুরীর সাহায্যে ফালি ফালি করে এবং দেহের সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম অংশগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চুল-চেরা পরীক্ষা ক'রে এমন সব অভূতপূর্ব রহস্যের উদ্‌ঘাটন করেছে যে বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হয়ে যেতে হয়।

মানুষের চিরন্তন জ্ঞানের পিপাসাই মানুষকে চেনা ও জানার সীমানা পেরিয়ে টেনে নিয়ে চলে।

আমাদের দেহের মধ্যে এমন সব বিস্ময় লুকিয়ে রয়েছে যা ভাবতে গেলেও আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হয়ে যেতে হয়। দেহমধ্যস্থিত সামান্য একটা ক্ষুদ্র সেল (cell) তার নিঃসৃত রসধারার (secretion) সাহায্যে কত যে পরিবর্তন আনে তা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মানুষের শরীরের মধ্যে অসংখ্য গ্ল্যাণ্ড (glands) সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ঐ সকল গ্ল্যাণ্ড-এর নিঃসৃত রস (secretion) সেই glandএর প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মানুষের দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। যেমন salivery gland (লালা নিঃস্বরণকারী গ্ল্যাণ্ড) এগুলো মুখের মধ্যে থাকে—এই glandএর নিঃসৃত রসধারা খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে খাদ্যকে পরিপাকোপযোগী করে তোলে। stomach বা পাকস্থলীর মধ্যেও কতকগুলি বিভিন্ন glands আছে; পাকস্থলীর (stomach) মধ্যে আহার্য্য বস্তু যখন গিয়ে পৌঁছায় তখন ঐ সকল গ্ল্যাণ্ড হতে নিঃসৃত রসধারা পাকস্থলীর মধ্যস্থিত খাদ্যবস্তুর সাথে মিশ্রিত হয়ে তাকে আরো পরিপাকোপযোগী করে তোলে।

মানুষের শরীরের যে ঘাম দেখা দেয় সেও একপ্রকার গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ (secretion); ঐ গ্ল্যাণ্ডের নাম sweat gland. এগুলো চামড়ার নীচে থাকে।

মানুষের চোখের কোল বাহিয়া যে জল গড়িয়ে পড়ে, সুখে দুঃখে যাহা আমাদের একমাত্র অভিব্যক্তি, যাহার উপমা দিতে গিয়ে কবির কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—সেই অশ্রুজলও একপ্রকার গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ গ্ল্যাণ্ডের নাম lacrimal gland দেওয়া হয়েছে।

এই সকল গ্ল্যাণ্ডগুলির নিঃসৃত রস ঐ সকল গ্ল্যাণ্ডের প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শরীরের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়ে; এসকল গ্ল্যাণ্ড ছাড়াও শরীরের মধ্যে আরো কতকগুলি গ্ল্যাণ্ড আছে যাদের নিঃসৃত রস (secretion) প্রবাহিত হবার জন্য কোন প্রণালী নেই। ঐ সকল গ্ল্যাণ্ডের নিঃসৃত রস শরীরের প্রবাহমান রক্তধারার (circulation) সাথে মিশ্রিত হয়ে প্রয়োজনীয় স্থানে প্রবাহিত হয়ে যায়। এই কারণে এই গ্ল্যাণ্ডগুলির নাম ductless glands বা Endocrine glands দেওয়া হয়েছে।

এই গ্ল্যাণ্ড হতে নিঃসৃত রস (secretion) কে বলা হয় hormone। শরীরের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ প্রণালীহীন গ্ল্যাণ্ড আছে, যেমন 'থাইরয়েড'—গলনলীর দুপাশে অবস্থান করে। থাইরয়েড (Thyroid) নিঃসৃত রসকে (Thyroxine) বলা হয়।

বৈজ্ঞানিকদের মতেঃ Thyroid may be compared to the accelerator of an automobile.

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড মানব দেহের গতিচলিষ্ণুতা কার্য্যক্ষমতাকে ত্বরান্বিত (accelerate) করা ছাড়াও তার নিঃসৃত রস থাইরক্সিনের সাহায্যে মানুষের দেহে প্রয়োজনীয় এনার্জির বা কর্মশক্তির জোগান দেয়। থাইরয়েড্ গ্ল্যাণ্ড হতে উৎসারিত রস নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে দেখা গেছেঃ ঐ থাইরকসিন্ মানুষের শরীরকে চারিদিক হতে মিতব্যয়ী করে বাঁচিয়ে রেখে সুষ্ঠুভাবে কর্মঠ ও চলিষ্ণু করে রাখবার মূল; The secretion of thyroid gland is the great controller of spead of living.

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অবস্থিতি ও আধিপত্য যে মানুষের শরীরে যত বেশী, তার জীবনের গতি বা ক্রিয়াশীলতা বর্ধিষ্ণুতা ও বাঁচবার শক্তি তত বেশী। থাইরয়েড ক্ষরিত রস বেশী কম হলেও মানুষের শরীরের হাড়ের নানাপ্রকারের বিকৃতি ঘটে এবং বাহিরে চেহারারও অদল বদল হয়।

থাইরয়েডের প্রভাব বেশী হলে অনেক সময় গয়েটার রোগ দেখা দেয়।

থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ছাড়াও আরো অন্যান্য যে সব প্রণালীহীণ গ্ল্যাণ্ড আছে তাদের নাম Adrenal gland, Pituitary, Overy, Testis ইত্যাদি. ইত্যাদি!

বর্তমান প্রবন্ধে আমি শেষোক্ত তিনটি গ্ল্যাণ্ড সম্পর্কেই আলোচনা করবো--অর্থাৎ পিটুইটারী, ওভারী, টেস্‌টিস।

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে এই প্রণালীহীন গ্ল্যাণ্ডগুলো ও তাদের উৎসারিত হরমোন মানব দেহের সাথে কোথা দিয়ে কী ভাবে যে সম্পর্কিত এই নিয়ে দেহতত্ত্ববিদদের মহলে অনেক মতদ্বৈধ আছে।

মানবদেহে এই প্রণালীহীন গ্রন্থিগুলির অবস্থিতি একদিক দিয়ে যেমন দেহের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য, তেমনি এর অভাব (difficiency) বা অত্যধিক প্রাচুর্য্য (excessive work) ও শরীরের অভ্যন্তরে আবার নানারূপ বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

প্রথমেই আমি পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডটি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এই গ্ল্যাণ্ডটি দেখতে অনেকটা একটা বড় বাদামের মত, এটি মাথার ঘিলুর মধ্যে চারিপাশে হাড়ের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ঘরে থাকে।

মানবদেহে পিটুইটারীর কার্য্যক্ষমতা কম বেশী হলে আবার অন্যান্য এ্যণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডের অনুরূপ মানবদেহের মধ্যে নানারূপ অসামঞ্জস্যও পরিলক্ষিত হয়! পিটুইটারীকে আবার দু'অংশে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' ও 'খ' anterior ও posterior part. পিটুইটারীর 'ক' অংশ পশুর শরীর হতে বাদ দিয়ে বা নষ্ট করে দেখা গেছে পশুর দেহের আকার ছোট হয়ে যায়; শিশুকালে যদি পিটুইটারী বেশী কাজ করে, তবে দেখা গেছে দেহের হাড় আকারে অত্যন্ত বেড়ে যায়। দৈত্যের মত দেহের আকার হয়।

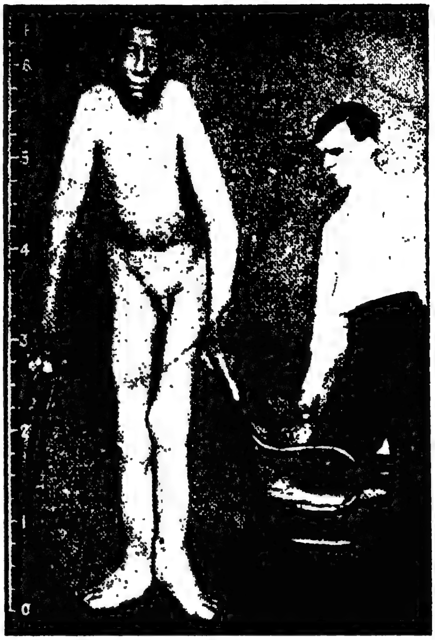

ছবিতে দেখা যায়, পিটুইটারীর প্রভাবে লোকটা কী ভীষণ দেখতে হয়েছে; কিন্তু যদি দেহের হাড় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবার পর 'পিটুইটারীর' প্রভাব বেশী হয় তবে 'এ্যক্রোমিগালী' রোগ দেখা দেয়; উক্ত রোগে দেহমধ্যস্থিত বড় বড় হাড়গুলি না হলেও কতকগুলি হাড় আকারে বড় হয়ে যায়—যেমন 'চোঁয়াল', চিবুক, মুখের তলার হাড়। দাঁতগুলি ফাঁক ফাঁক হয়ে যায়, হাত পা বড় হয়ে যায়, শির দাঁড়াটা যায় বেঁকে এবং তার ফলে দেহের অনুপাতে হাতের আকার বড় হওয়ার জন্য হাত গিয়ে হাঁটুতে ঠেকে। দেখলে অনেকটা গরিলার মত হয়ে যায়। এই সব কারণেই আমরা সাধারণত যে সব অত্যধিক ঢ্যাঙ্গা বা বামনবীর জাতীয় লোক দেখি, সে সব তাদের দেহ মধ্যস্থিত হাড়ের উপর পিটুইটারীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী! শুধু ে পিটুইটারী নারীদেহে সর্ব্বপ্রথম যৌবনের ইঙ্গিত আনে তা নয়; নারীত্বের অন্যান্য চিহ্ন ও নারীদেহের পূর্ণবিকাশও এই গ্ল্যাণ্ডটিই ঘটায়। পিটুইটারীর 'খ' অংশ মান

দেহের উপরও প্রভাব কম করে না, মানবের মূত্রের কম-বেশী পরিমাণ—যা সময় সময় হয়, তাও এই ‘খ’ অংশর প্রভাবের জন্যই! মানব দেহের রক্তনলীর উপরও এর প্রভাব আছে। শিশু যখন মাতৃজঠোরে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে তখন এই ‘খ’ অংশ পিটুইটারীর প্রভাবেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে গর্ভাধারের সঙ্কোচ ও প্রসারণ আরম্ভ হয় ও শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। পিটুইটারীর যদি কার্য্যক্ষমতা কম হয় তাহলে মানবদেহে ও মনে অত্যন্ত ক্ষতি করে! দেহের হাড় আকারে বাড়তে পারে না, ফলে মানুষ বেঁটে হয়ে পড়ে। দেহের ভাব তেমন সুস্পষ্ট হয না। পুরুষের দাড়ি ভাল করে গজায় না, অনেকটা মেয়েলী দেখতে হয়! বুদ্ধি শক্তি তেমন খেলেনা একটু বোকাটে হয়! তাই বলছিলাম মানবদেহের প্রকৃতিগত ও গঠনমূলক অসমাঞ্জস্যের জন্য মূলত দায়ী এই এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলিই! মানুষের হাতেরও আঙ্গুলেরও নানা গঠন ও আকারমূলক পার্থক্যের জন্যও এই এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলিই দায়ী। কারও মোটা মোটা বিশ্রী হাতের আঙ্গুল, কারও বা চাঁপার কলির মত হাতের গঠনের জন্য মূলত দায়ী ‘পিটুইটারী’ ও ‘থাইরয়েড’। পিটুইটারী বেশী কার্য্যক্ষম হলে হাত সাধারণত আকারে বড় মোটা, রুক্ষ, কোদালের মত চ্যাপ্টা হয়, আবার কম কার্য্যক্ষম হলে হাতের আঙ্গুল সরু ও মাংসল হয়। থাইরয়েডের প্রভাব বেশী হলে, আঙ্গুল খুব সরু ও চিকণ হয়; কম প্রভাব হলে বিশ্রী কুৎসিত, ঠাণ্ডা ও নীল রংয়ের হাত হয়! মানুষের বিভিন্ন প্রকারের মুখশ্রী বলতে আমরা সাধারণত ভ্রু, চোক, নাক, ঠোঁট ও চিবুকের গঠন পারিপাট্যকেই বিচার করি! যাদের শরীরে পিটুইটারীর প্রভাব বেশী, তাদের মুখটা একটু কোমল—নাক, চোখ, চিবুক কৃশ সুশ্রী ও তীক্ষ্ণ!···মুখের হাড়গুলি সুস্পষ্ট! মুখের আকার চোখা, চিবুকটা যেন একটু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। উঁচু নাক, ভ্রুদুটো টানা টানা একটু বাঁকান! আবার যাদের উপর পিটুইটারির প্রভাব কম, তাদের মুখ সাধারণত গোল! মুখটা বেশ মাংসল ও চর্ব্বিবহুল। চোখ দুটী ঢুলু ঢুলু। এ্যাড্রিনালিনের প্রভাব যাদের পরে বেশী, তাদের মুখ কালো ও রুক্ষ! মুখে লোম বেশী থাকে অর্থাৎ লোমশ। থাইরয়েডের প্রভাব যাদের উপর কম, তাদের মুখের চেহারা বোকার মত। চোখ দুটো ড্যোবড্যোবে, থ্যাবড়া নাক, চোখের পাতা বসা, মোটা ও পুরু ঠোঁট। থাইরয়েডের প্রভাব যাদের উপর বেশী, তাদের মুখটা অনেকটা আকারে ওভ্যাল তোলা ও প্রশস্ত ভ্রু! তীক্ষ্ণ ও বড় বড় দুটী চক্ষু, যেন অন্তর্ভেদি দৃষ্টি তার মাঝে লুকিয়ে আছে মনে হবে! শেলীর মুখটা অনেকটা এই ধরণের! উপরের এসব ছাড়াও মানুষের দাঁতের গঠন-পরিপাট্যের উপরও এ্যণ্ডোক্রিনের প্রভাব দেখা যায়। যাদের উপর ‘থাইরয়েডের প্রভাব বেশী তাদের দাঁত ছোট ছোট, দেখতে মুক্তোর মত শাদা ঝকঝকে ও সুন্দর ভাবে সাজান; কবিদের ভাষায় যাকে ‘মুক্তো’ পংক্তি বলে! যে সব লোকের উপর ‘পিটুইটারীর’ প্রভাব বেশী তাদের দাঁত বড় বড়, অসংবদ্ধ ফাঁক ফাঁক, সামনের দুটো যেন আবার ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ উঁচু দেঁতো। ‘এ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের প্রভাব যাদের উপর বেশী তাদের দাঁত খুব শক্ত, একটু হলুদ ছোপ গায়ে; দু’পাশের উপর পংক্তির তৃতীয় দাঁতটী একটু বেশী তীক্ষ্ণ ও লম্বা! মানুষের দাঁতের ছোট বড় বিশ্রী বা সুন্দর হওয়া—সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে এ্যণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়েই অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য ঘটায়, হঠাৎ বা আপনা হতে হয় না! শিশুকালে পিটুইটারী ও ‘থাইমাস’ নামক অন্য আর একটা এ্যণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডের

প্রভাবের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়ে কখনও দাঁত সময়মত ওঠে বা উঠতে দেরী হয়।

মানুষের দেহের বর্ণ কারো কালো, কারো হল্‌দেটে, কারো শ্যামল, কারো দুধে-আলতা হয় এবং কারো গায়ের চামড়া নরম ও মসৃণ হয়, কারো বা খস্‌খসে, কারো আবার লোমশ হয়। এ সমস্তের জন্য সম্পুর্ণভাবে দায়ী মানবদেহের যাবতীয় এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলি। 'এ্যাড্রিনালের' প্রভাব যখন খুব বেশী কমে যায়, তখন দেহের রং হয় বেশী কালো; আবার বেশী বৃদ্ধি পেলে সেই অনুপাতে দেহের বর্ণ হয় ফর্সা বা উজ্জ্বল! 'থাইরয়েডের' প্রভাব বেশী হলে বা 'এড্রিনালের' প্রভাব কম হলে গায়ের চামড়া নরম ও চক্‌চকে বা মসৃণ হয়, তেমনি 'থাইরয়েডে'র প্রভাব কম হলে 'এড্রিনালের' প্রভাব বেশী হলে গায়ের চামড়া শক্ত ও খস্‌খসে হয়। 'থাইরয়েডের' প্রভাব বেশী হলে দেখা যায় মুখের রং বেশ লাল হয়; তদ্রুপ 'এড্রিনালের' প্রভাব কম হলে মুখটা ফ্যাকাশে দেখায়! মানুষের মধ্যে কেউ কেউ রাগলে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, আবার কারও শাদা হয়ে যায়; সেও ঐ 'থাইরয়েডের' প্রভাব বেশীর জন্য' বা এড্রিনালের প্রভাব কম হওয়ার জন্য! বয়েসের সময় মানুষের দেহের চামড়া শক্ত ও মসৃণ থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমে লোলও শ্লথ হয়ে আসে; এর মূলেও এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডএর প্রভাব! মানুষের দেহে মাথার চুল ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় লোম দেখা যায়, যেমন পুরুষের মুখ, বুক, পেট, পিঠ, ও হাত পা ইত্যাদি। মানুষের দেহে নানা স্থানে যে লোম দেখা দেয় সে সব সাধারণত দেহে যৌবনের সাথে সাথে প্রকাশ পায় এবং দেহের এই বিভিন্ন স্থানে লোমের আবির্ভাবের মূলেও রয়েছে এ্যাণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডের প্রভাব এবং তাদের মধ্যে 'থাইরয়েড' 'সুপ্রারেনাল' 'যৌন গ্ল্যাণ্ড' sexgland গুলিও মূলত দায়ী। যৌন গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে পুরুষের Testis (অণ্ড) ও নারীর ডিম্বাশয় (Overy)—উক্ত গ্ল্যাণ্ড দুটিকেও এ্যাণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড বলা হয়। বালকদের মুখে যে দাড়ি গোফ্ দেখা যায় না, তার কারণ অল্প বয়সে 'থাইমাস' ও 'পীনিয়াল' গ্ল্যাণ্ডের শরীরের উপর প্রভাব। 'থাইমাস' সাধারণত বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহের অভ্যন্তর হতে লোপ পেতে থাকে এবং দেহে ও যৌবনের আবির্ভাবের সাথে সাথেই সম্পূর্ণ ভাবে অদৃশ্য হয়। কিন্তু যে সব পুরুষের 'থাইমাস' যৌবন বয়সেও থেকে যায়, লোপ পায় না—তাদের যৌবন কাল দেখা দিলেও মুখে দাড়ি গোফ দেখা দেয় না! 'থাইরয়েডের' প্রভাবেই মাথার চুল কম বেশী হয়! কোন কোন জন্তু লোমশ! জন্তুকে 'থাইরয়েড' খাইয়ে দেখা গেছে তাদের গায়ের লোম মসৃণ, পশমের মত নরম ও কোঁকড়ান হয়; দেহে 'থাইরয়েডের' প্রাদুর্ভাব হলে চুল পড়ে যেতে থাকে! যাদের দেহের রসে থাইরয়েড হতে নিঃসৃত রসের একান্ত অভাব হয় তারাই টাক-মাথা অর্থাৎ 'টেকো-মাথা' হয়! যাদের দেহে 'প্রড্রিনালের' প্রভাব খুব বেশী সেই সকল পুরুষের বুকে ও পেটে লোম হয় বেশী এবং সেই জাতীয় নারীদের পিঠে লোম থাকে! যাদের উপর পিটুইটারীর প্রভাব বেশী, তাদের হাত পা একটু বেশী লোমশ হয়। মানুষের চোখের উপরও এ্যাণ্ডোক্রিনের প্রভাব দেখা যায়, থাইরয়েড দ্বারা প্রভাবান্বিত লোকদের চোখ সাধারণত বড় উজ্জ্বল যেন ঠেলে কোঠর হতে বেরিয়ে আসছে। যাদের উপর আবার থাইরয়েডের প্রভাব কম, তাদের চোখ কোটরগত ও স্বপ্নাতুর! 'পিটুইটারীর' প্রভাব যাদের উপর বেশী তাদের চোখ হয় খুব ঘন কিংবা ছড়ানো! মানব দেহের গঠনমূলক ও আকৃতিগত বৈষম্য ছাড়াও নরনারীর যৌনবোধ সম্পর্কেও এ্যাণ্ডোক্রিনের প্রভাব একান্ত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত! নরনারীর যৌন সম্পর্কিত দৈহিক ও মানসিক বৈষম্য—কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা বা পার্থক্য, নারীজনোচিত বা পুরুষজনোচিত মনোভাব প্রভৃতি সকল কিছুর মূলেই এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন এক আবিষ্কারক বলেছিলেন যার দেহে Testis (অণ্ড) আছে, সেই প্রকৃত সত্যিকারের পুরুষ এবং যার দেহে ডিম্বাশয় (Overy) আছে সেই প্রকৃত নারী। কিন্তু আজকার দিন সে কথা কেউ মানবে না; এমন লোকও এ দুনিয়ায় নিত্য দেখা যায় ও যাচ্ছে, যার দেহে ডিম্বাশয় থাকা সত্ত্বেও সে প্রকৃতিগত নারী নয় অর্থাৎ তার মনোভাব চালচলন সব কিছুই পুরুষের মত। তেমনি পুরুষও আছে যার Testis থাকা সত্ত্বেও হাবভাবে চালচলনে ও কাজে মেয়েলী! এ্যাড্রিন্যাল নামক এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড এর বহিরাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য একটি ত্রিশ বৎসরবয়স্ক

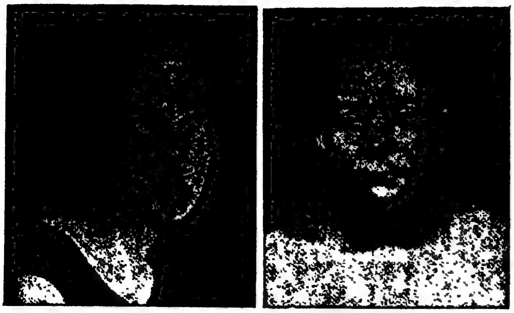

নারীর—ক্রমে শরীরের নানা জায়গায় লোম দেখা দিল পুরুষের মত; মুখে গোঁফ ও দাড়ি উঠ্‌ল; গলার স্বরের স্বাভাবিক মেয়েলী কোমলতা অন্তর্হিত হ'লো! শরীরের নারীসুলভ কমনীয়তার বদলে মাংসপেশীগুলো ক্রমে পুরুষের দেহের মত শক্ত ও সুস্পষ্ট হয়ে গেল এবং এর পর হ'তে সে পুরুষের মত শ্রমজনক কাজ করবার মত উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌ল! তাঁর নারীত্বও ক্রমে পৌরুষভাবাপন্ন হয়ে গেল। একটি রোগিণীর ছবি দেওয়া গেল—১৯২৬ সালে ২৪ বৎসর বয়সের সময় তাঁর চেহারা কী ছিল, আর ১৯৩৪ সনে ৩২ বৎসর বয়সের সময় কী পরিবর্ত্তন দেখুন। ছবি দুটি পাশাপাশি দেখলে কি কেউ আপনারা বুঝতে পারবেন যে ছবি দুটি একই ভদ্র-মহিলার? তাইত' বলছিলাম Testis থাকা সত্ত্বেও হাবেভাবে চালচলনে মেয়েলী বা Overy থেকেও ব্যবহারে চালচলনে পুরুষ হয়ে যেতে পারে! যাহা হউক পুরুষ ও নারীজনোচিত মনোবৃত্তি ও প্রকৃতিগত ও দৈহিক পার্থক্যসকল কিছুর জন্য দায়ী কেবল পুরুষের Testis ও নারীর (Overy) ডিম্বাশয়ই নয়, মানব দেহের অন্যান্য এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডের প্রভাবও অনেক অংশে দায়ী!···

মানুষের জন্মের সাথে সাথেই পুরুষ ও নারীর দেহগত পার্থক্য সম্পূর্ণ না হলেও বহুল অংশে প্রকাশ পায়। পুরুষ ও নারীর গঠন, আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অনুশীলন করলে দেখা যায়, পুরুষের মুখে দাড়ি গোঁফ আছে, নারীর নেই। পুরুষের গায়ের চামড়া সাধারণত রুক্ষ ও পাতলা হয়, নারীর গায়ের চামড়া মসৃণ ও পেলব হয়। পুরুষের মাংস ও পেশী সুদৃঢ়; সেই অনুপাতের নারীর দুর্ব্বল ও কমনীয়, পুরুষের দেহের হাড় ভারী, নারীর পাতলা! পুরুষকে যেমন কঠিন, কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ হতে হয় সেইজন্যই বোধহয় সর্ব্বতোভাবে সে নারী থেকে গঠনে কাজে কর্ম্মে সাহসে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ!·· আজ অবশ্য আধুনিকাদের দল অন্তঃপুরের দাবী অস্বীকার করে বাহিরে এসে পুরুষের সমকক্ষতা চাচ্ছেন; কিন্তু তাদের দৈহিক, মানসিক, প্রকৃতি ও আকৃতিগত সকল কিছু বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যায়—তারা সর্ব্বতোভাবে পুরুষের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য! তবে অবশ্য এমন নারীও আছেন যিনি গঠন ও আকৃতিতে নারী হলেও 'এ্যাড্রিনাল'এর প্রভাবে প্রভাবান্বিতা নারী। নারীর যৌন গ্ল্যাণ্ড হচ্ছে ওভারী (ডিম্বাশয়) নামক এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড—ডিম্বাশয় অনেকটা আকারে ছোট বাদামের মত এবং সংখ্যায় দুটা; পেটের মধ্যে অবস্থান করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তার দৈহিক কতকগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখেই আমরা নবজাতককে ছেলে ও মেয়ের পর্য্যায় ফেলি! ক্রমে যতদিন যায় শিশু তার প্রকৃতিগত দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে! দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তার মধ্যে ব্রীড়া, ভয়, স্নেহ, কোমলতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি একটার পর একটা ফুটে উঠ্‌তে আরম্ভ করে! এই যে নারীজনোচিত বৈশিষ্ট্য—ইংরাজীতে যাকে Secondary Sexual character of female বলা হয়, সেগুলো পরিস্ফুটন একমাত্র সম্ভব হয় নারী দেহে—ওভারী বা ডিম্বাশয়ের কার্য্যকরী ক্ষমতার দ্বারা মুখ্যত! তা ছাড়াও পিটুইটারীর প্রভাবও আছে সেকথা

আগেই বলেছি। শিশুকালে ছেলেমেয়েরা সাধারণত এক সাথে খেলে বেড়ায়, একই রকম বেশভূষা পরিধান করে, কেননা তখনও তাদের মধ্যে যৌনজ্ঞান দেখা দেয়নি; কিন্তু যৌবনের এমনি প্রভাব—দেহে তার আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মনে ও প্রকৃতিতে যেন একটা আমূল পরিবর্তন আসে। যৌবনের অঙ্কুর যা এতকাল ছিল দেহের মধ্যে ঘুমিয়ে, সহসা সে বুঝি তার ডালপালা নিয়ে জেগে ওঠে। অঙ্কুরকে যেমন ফুটিয়ে গাছে পরিণত করতে হলে মাটীতে জল সেচনের প্রয়োজন, তেমনি ওভারীও তার নিঃসৃত রস রক্তের সাথে প্রবাহিত করে নারী দেহে যৌবনকে জাগিয়ে তোলে! একজন নারীকে মা হতে হলে—সন্তান-ধারণের উপযোগী আগে সে হয় দেহে ও অন্যান্য প্রকৃতিতে।

প্রজনন অঙ্গপ্রত্যঙ্গই (reproductive organs) পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং সকল কিছুই 'থাইরয়েড' 'এ্যড্রিন্যাল' 'পিটুইটারী' প্রভৃতি গ্ল্যাণ্ডগুলি তাদের নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের দ্বারা সম্ভব করে তোলে। নারী দেহাভ্যন্তর হতে অস্ত্রোপচারের দ্বারা 'ওভারী' বাদ দিয়ে দেখা গেছে সেই নারীর পেটের মাংস-পেশীসমূহ শুকিয়ে যায়, মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে যায় এবং সে সর্ব্বতোভাবে প্রজনন ও সন্তানধারণ-এর অনুপযোগী হয়ে পড়ে! সূর্য্যের চারিপাশে গ্রহ ও উপগ্রহগুলি যেমন ঘোরে, তেমনি ডিম্বাশয় ও গর্ভাশয়ের চতুষ্পার্শে এ্যাণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলি ঘুরে তাদের প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ তাদের নিঃসৃত রস দিয়ে ওই দুটীর কাজ পরিচালিত করে। ওভারীর মধ্যে ডিম্বানু (ovum) থাকে; নারী ঋতুমতী হওয়ার আগ পর্য্যন্ত ওই ডিম্বানু যেন ঘুমিয়ে থাকে এবং ঋতুমতী হওয়ার সাথে সাথেই ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে এবং সেই ডিম্বানুর ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে নারী বক্ষ পীনোন্নত হয়ে ওঠে, নারীসুলভ ব্রীড়া—সব কিছু গোপন রাখার বাসনা, অন্যর কাছ হতে একটু একাকী থাকার ইচ্ছা অর্থাৎ নির্জ্জনতাপ্রিয়তা তার মনের মাঝে দেখা দেয় এবং এসকলের জন্য এ্যাণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলিই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। নারী দেহে এই যে যৌন বিস্তার, এ স্থান কাল আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরেও কিছুটা নির্ভর করে! যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণত তের বছরের মধ্যেই নারী দেহে যৌন বিস্তারের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্যান্য দেশে ১৫-১৬ বৎসরে! অনেক সময় বাইরের আবহাওয়াও সঙ্গীর প্রভাবেও মেয়ে বা ছেলেরা অকালে পরিপক্ক হয়ে পড়ে! ওদের দেশে এই রকম ডেঁপো ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী! ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে নিত্য কুকুর, বিড়াল, পশু পাখী তাদের প্রকৃতিগত ক্রিয়ার দ্বারা ও যে সকল অশিক্ষিত দাসদাসী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের কু-প্রবৃত্তির দ্বারা শিশুদের মন বিকৃত করে তোলে। অবশ্য এই অকালপক্কতার জন্য দায়ী ছেলেমেয়েরা ততটা নয়, যতটা দায়ী তাদের মা বাপ শিক্ষকেরা বা অভিভাবকেরা!···ছেলে মেয়েদের মনে ও দেহে এই যে অসময়ে যৌবনের প্রভাব—এ অত্যন্ত কুফলপ্রদ, এতে দেহ শীঘ্র ভেঙ্গে যায়; নানারূপ কুৎসিত ও দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধির সৃষ্টি হয়!···

নারীদেহে 'ওভারীর' মত পুরুষদেহে আছে 'টেস্‌টিস' বা অণ্ড এবং ঐ 'টেস্‌টিসের' নিঃসৃত রসেই দেহের রক্ত ধারার সাথে নিঃসৃত হয়ে পুরুষদেহে যৌবনের সঞ্চার করে। পুরুষের মধ্যে যৌনবোধ বা 'পিউবার্টি' (puberty) আসবার আগে তার দেহ হতে 'টেস্‌টিস' অস্ত্রোপচার করে বাদ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেই পুরুষের প্রজননঅঙ্গগুলি তেমনভাবে যথাযথ আকার পায় না ও ক্ষমতাপন্নও হয় না! শুধু তাই নয় তার মুখে দাড়ি গোঁফ দেখা দেয় না; মেয়েদের মত দেহের গঠন ও গলার স্বর হয়, কিন্তু যৌনবোধ জাগবার পর 'টেস্‌টিস' বাদ দিলে ততটা মারাত্মক হয় না, যদিচ অনেক অসামঞ্জস্য দেখা দেয় দেহে ও মনে।

এই 'টেস্‌টিস্' ও তার কার্য্যকরী ক্ষমতার উপরে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ ভরেন হফের (Voren hoff) এর অনেক মৌলিক গবেষণা আছে। তিনি 'টেস্‌টিস্'-বিহীন জন্তুর দেহে অন্য জন্তুর দেহ হতে 'টেস্‌টিস্' কেটে শরীরের মধ্যে ভরে দিয়ে দেখিয়েছেন কি আশ্চর্য্য ফল দেয়। 'টেসটিস্' শরীরের ভরে দেবার জন্য পশুটী তখন স্বাভাবিক অবস্থার ফিরে আসে অর্থাৎ তার প্রজননক্ষমতা ফিরে পায়। যে সব লোক বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, অকর্মণ্য ও অচল হয়ে পড়েছে, তাদের শরীরে 'টেস্‌টিস্' ভরে দিলে পুনরায় তারা যৌবনের কার্য্যক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ্য ফিরে পাবে! মানব দেহে রক্তের মধ্যে যে ক্যালসিয়াম আছে তারও অস্তিত্ব মুখ্যত এই এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডগুলির প্রভাবের উপরেই নির্ভর

করে আছে। এ পর্য্যন্ত আমি মানব দেহের আকৃতি ও গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যের উপরেই এণ্ডোক্রিনের প্রভাবের কথা বলে এসেছি ; এখন মানব মনের উপর তার প্রভাবের কথা কিছু কিছু বলব। এ্যাড্রিনালের প্রভাবেই মানুষের মনে ভয় বা ক্রোধের উদ্ভব হয়। এড্রিনাল গ্ল্যাণ্ডের দুটো অংশ আছে একটি অন্তরংশ (medulla), অন্যটি বহিরংশ (cortex) ; ঐ দুই অংশ হতে নিঃসৃত বিভিন্ন রস ধারাই বিভিন্ন ধর্ম্মী ! বহির্দেশের ক্ষরণ হতে ক্রোধের উদ্ভব হয়, আর অন্তর্দেশে নিঃসৃত রস মনে ভয়ের সৃষ্টি করে। পিটুটারীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত যারা তাদের মন একটু বেশী কোমল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয। পিটুইটারীর ‘ক’ অংশকে মানুষের বুদ্ধির জন্য দাযী বলা হয। ‘পিটুইটারী’ ‘ক’ অংশের প্রভাব বেশী হলে চিন্তা শক্তি ও বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হয়, ‘ক’ অংশর নিসৃত রস যেন বুদ্ধির টনিকের কাজ করে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তি যারা, তাদের উপরে ‘ক’ অংশ পিটুইটারীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী ! ‘ক’ অংশ পিটুইটারীর দ্বারা প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরাই কালে জগতে অসাধ্য সাধন করে তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রভাবে।

‘থাইরয়েড’ দ্বারা প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরা একটু বেশী আত্মম্ভরী হয়, নানা প্রকারের অদ্ভুত ম্যানিয়া তাদের থাকে। বড় বড় বাত মুখে সর্ব্বদা লেগেই আছে, যেন একটা কেষ্ট বিষ্ণু গোছের লোক, তেমনি ‘থাইরয়েডে’র প্রভাব যাদের উপরে খুব কম তারা আবার অত্যন্ত মনমরা হয়, একা একা থাকতে লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে।

মানুষের ‘পারসোনালিটি’ বা ব্যক্তিত্বও এই এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ডগুলির প্রভাবের পরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ; মানুষের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব যে কিসের উপর নির্ভর করে এবং কিসের সাহায্যে কী ভাবে প্রকাশ পায় সে বিষয়ে বহু মৌলিক গবেষণা আজ পর্য্যন্ত হয়েছে। পুরাকালে গ্রীকরা বলতো শরীরের মধ্যে অবস্থিত কোন একটা প্রাণীকোশের প্রভাবের জন্য ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে ; কিন্তু ক্রমে দেহের উপর অস্ত্রোপচার করে মানব দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশগুলি পরীক্ষা করা হলে পূর্ব্ব ধারণা গ্রীকরা ভুলতে বাধ্য হলো। তখন আর একদল বললে ব্যক্তিত্ব ‘স্নায়ু’ Nerveয়ের প্রভাবের জন্য প্রকাশ পায়, কিন্তু স্নায়ু বিজ্ঞানে পণ্ডিত Chareot একথা মানতে চাইলেন না ; তিনি ও তার ছাত্র Janet বললেন : ব্যক্তিত্ব অন্য একটা কিছুর প্রভাবে বিকাশ হয়—নার্ভের জন্য নয় এবং তিনিই প্রথম ‘সাইকোলজির’ বা মনোবিজ্ঞানের অঙ্কুরপাত করলেন। ওদের পরে বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ‘ফ্রয়েড’ জাঙ্গ্ ও এ্যাড্‌লার প্রভৃতি মণীষীরা এ বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং ক্রমে মনোবিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে—সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। আমি শুধু সামান্যভাবে ব্যক্তিত্বের পরে এণ্ডোক্রিণের প্রভাব বলবো। ‘এ্যাড্রিন্যালের’ প্রভাব সাধারণত ‘এ্যাড্রিন্যালের’ কমবেশী কার্য্যকরী ক্ষমতার পরে নির্ভর করে, ‘এ্যাড্রিন্যাল’ প্রভাবান্বিত ব্যক্তিরা সাধারণ লোক হয়—তারা অত্যন্ত সুবিধাবাদী, কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী হয়। মানুষের মধ্যে দেখা যায় কাউকে সহজেই ভয় দেখান যায়, আবার কেউ সহজেই আপনা হতে ভীত হয়ে পড়ে, আবার কেউ কেউ বড় সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির—অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী—এই সকল বৈষম্যের মূলে এণ্ডোক্রিণ গ্ল্যাণ্ডেরই প্রভাব। এ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের ক্ষরণের তারতম্যের উপরে ঐ সকল বৈষম্য কতকটা নির্ভর করে। দেখা যায় মেয়েরা সাধারণত একটু ভীতিপ্রবণ ও নিরীহ, তাদের এ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের অন্তরংশ বহিরংশের চাইতে বড়।

পিটুইটারীর দ্বারা প্রভাবান্বিতেরা সাধারণত আক্রমণকারী, একটু অকালপক্ক, হিসাবী ও অল্পেতুষ্ট হয়। পিটুইটারীর প্রভাব যাদের উপরে কম থাকে তারা সহজেই আত্মবিশ্বাস হারায়, অল্পেতেই কেঁদে ভাসায় ; সামান্য কারণে ভয় পায়, ‘থাইরয়েডের প্রভাব যাদের পরে বেশী তারা একটু অস্থির প্রকৃতির ; সহজে ভেঙ্গে পড়ে না। খুব কার্য্যক্ষম হয়। খুব সকালে শয্যাত্যাগ করে, সারাদিন টো টো করে বেড়ায়, অনেক রাত্রে ঘুমায়। প্রায়ই ঘুম ভাল হয় না, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাল কি করবে তাই ভাবে। জগতের ইতিহাসে যে সব মণীষীরা চিন্তাশক্তি, ব্যক্তিত্ব ও কাজের দ্বারা আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের জীবনের সকল কিছুর গোড়ার কথাই হচ্ছে তাঁদের দেহে ও মনে এণ্ডোক্রিণের প্রভাব। নেপোলিয়ানের জীবনীকে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর জীবনের এক সময়ে তিনি তার শৌর্য্য কীর্ত্তি ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সমগ্র জগতকে স্তম্ভিত করেছিলেন ; এক কথায় তার prime of his life এর সময় তার মধ্যে ‘ক’ অংশ পিটুইটারীরা প্রভাব অত্যন্ত বেশী হয়েছিল, কেননা অত্যধিক ‘ধীশক্তি, বিবেচকের মত সমস্ত কাজ করা ও

আশ্চর্য্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সকল কিছুই 'ক' অংশ পিটুইটারীর প্রভাবের ফলেই হয়। তিনি কারও উপদেশ সহ্য করতে পারতেন না, নিজে যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন, এটা সাধারণত 'খ' অংশ পিটুইটারীর প্রভাবে হয়। তাঁর হৃদয়ে সহানুভূতি বা পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া তাঁর ধাতে সহিত না। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে তাঁর উপর পিটুইটারীর অত্যধিক প্রভাবের দরুণ তিনি প্রায়ই মাথার অসুখে ভুগতেন, মাঝে মাঝে বমি করে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। কখনো কখনো ভয়ানক চিন্তা করতেন, আবার কখনো যৌনবোধ সম্বন্ধে অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠ্তেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন বয়েসের প্রতিকৃতি হতে দেখা গেছে সম্রাট হওয়ার আগে তাঁর শরীরে চর্বি অত্যন্ত বেশী হয়েছিল, সেও পিটুইটারীর প্রভাবে! 'পিটুইটারী'র দ্বারা থাইরয়েড পরিচালিত হয় বলেই তাঁর শরীরে যতদিন পিটুইটারী অত্যধিক প্রভাব ছিল 'থাইরয়েডে'র প্রভাবও ততদিন অক্ষুণ্ণ ছিল! এত 'এ্যনার্জ্জি' তাঁর শরীরে সর্ব্বদা তৈরী হতো যে তিনি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার আগে তিন চার ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে না বেড়িয়ে এলে ঘুমাতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর জীবনে পতন এলো সেইদিন, যেদিন 'পিটুইটারীর' প্রভাব গেল কমে। তাঁর জীবনের যে এই উত্থান ও পতন তা তাঁর উপর প্রথমদিকে পিটুইটারীর অত্যন্ত বেশী প্রভাবের জন্য ও পরে যে পতন তাও পরবর্ত্তীকালে পিটুইটারীর প্রভাব একেবারে কমে যাওয়ার জন্য! তাঁর মৃত্যুর পর মৃত দেহের উপর অস্ত্রোপচার করে ডাঃ হেনরী নেপোলিয়ানের উপর এক সময় যে পিটুইটারী-প্রধান লোক ছিলেন তা প্রমাণ করেন। পরে যে পিটুইটারীর অভাব হয়েছিল সেও প্রমাণিত হয়। নেপোলিয়ান পেটে ক্যানসার হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর মানসিক অবস্থা ও আচারব্যবহার একটু চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায় যে তখনও তাঁর মধ্যে 'পিটুইটারীর'ই অভাব হয়েছিল। সেণ্ট্ হেলেনার বন্দী জীবনে তার সঙ্গী বলেছেন নেপোলিয়ানের মধ্যে তখন বৈরাগ্য, 'অলসপ্রিয়তা', অবসন্নতা প্রভৃতি একান্ত বিপরীত চরিত্রগত ভাবগুলি দেখা দিয়েছিল এবং তাঁর মনোবৃত্তির যে কী অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছিল তা তাঁর 'Siege of Troy' ও 'Essay on Suicide' পড়া হতেই বোঝা যায়। দেহে, গঠনে, আকৃতি, প্রকৃতি, মনোবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি সব কিছুতেই এণ্ডোক্রিনের আধিপত্য মানুষের উপর কতখানি!···

* * * *

এণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ডের মানব দেহে ও মনের উপর প্রভাব হতে এমন কি 'অপরাধতত্ত্ব' Criminology' পর্য্যন্ত বিচার করা হয়েছে। অপরাধতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন, অপরাধীর মধ্যে শতকরা বেশীর ভাগই নৈতিক দিকে দিয়ে সাধারণ মানুষ হতে ন্যূন। অপরাধ করবার আগে আত্মপরীক্ষা করলে দেখা যায় সাধারণ মানুষের মনের তখন 'যুক্তি', ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি বৃত্তিগুলির বিকৃতি ঘটে এবং অনেকক্ষেত্রে এত বেশী উন্নত হয় যে মনের তখন একটা মূর্চ্ছারোগের মত ভাব আসে—যার ফলে সে অতি নিকৃষ্টতম ও কঠোর কাজ করতে পর্য্যন্ত পশ্চাদপদ হয় না। পণ্ডিতরা বলেন এ সবকিছুই এ্যণ্ডোক্রিন্ গ্ল্যাণ্ড 'এড্রিন্যাল', 'পিটুইটারী' ও থাইরয়েডের কমবেশী প্রভাবের জন্যই ঘটে। মানুষের কামজনিত যে সকল অপরাধ তা অনুশীলন করে দেখা গেছে, তাদের ভিতরে 'থাইরয়েডের' সাধারণত গোলমাল হয়। পিট্সবার্গের একজন মনস্তত্ত্ববিদ গবেষণার দ্বারা দেখিয়েছেন একদল 'অপরাধী' মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় নব্বুই জনেরই 'থাইরয়েড' গ্ল্যাণ্ডটা ছিল বড়। অবৈধ বল-প্রয়োগকারী অত্যাচারীদের সাধারণত 'এড্রিন্যালে'র সমতার গোলমাল ঘটে। গর্ভাবস্থা ও ঋতুমতী নারীদের মধ্যে যে নৃশংসতা বীভৎসতা জাগে, তখন তাদের মধ্যে এণ্ডোক্রিনের গোলমাল ঘটে। পিটুইটারী হাড়ের বাক্সের মধ্যে যা থাকে, সেইটা যদি আকারে খুব ছোট হয় তবে পিটুইটারী বাড়তে পারে না—তার ফলে একটা মনের মাঝে দোষ বা অন্যায় করবার বাসনা জাগে। এইভাবে নানাদিক দিয়ে গবেষণা করে এবং গত পনের ষোল বৎসর ধরে এই এণ্ডোক্রিন্ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এত বেড়েছে যে এখন তারা নিয়তিকে পর্য্যন্ত মানতে চাইছে না! তারা বলছে নিয়তির আমাদের উপরে কোন হাতই নেই; একটা মেসিনের কলকব্জা সম্বন্ধে সব জানাশুনা হয়ে গেলে যেমন সেই মেসিনটা হাতের মুঠোর মধ্যে আসে তেমনি যদি আমরা আমাদের শরীরের আভ্যন্তরিক তত্ত্ব ও তার কার্য্যকরী ক্ষমতা সব জেনে নিতে পারি তবে নিয়তিকে আমরা অনায়াসেই অস্বীকার করতে পারবো! হায় ঈশ্বর, তোমারই সৃষ্টি আজ তোমায় অস্বীকার করতে চলেছে। তবু ত' এখনও মানুষের জন্মমৃত্যু মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান ও শক্তির বাইরে।

তীর ও তরঙ্গ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সাত

অণিমাদের বাড়ী হইতে সুনীলদের বাড়ী দুই মিনিটের রাস্তা। এই পথটুকুর মধ্যে সুনীল দাঁড়াইল বার তিনেক। মা যে কতখানি রুষ্ট হইয়াছেন তাহা বুঝিতে আর বাকী নাই। অণিমার শাড়ি আটপৌরে হইলে কিই বা ক্ষতি ছিল? অন্তত মার কাছে সে-ইচ্ছাটা আগে ভাগে বলিয়া রাখিলে ব্যাপারটা এমন বিসদৃশ হইত না! ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাক্, ঘটনাটা এমন কিছু নয়। দুদিনেই ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু আজিকার রাত্রি?—এই এখন? সময়টা অন্য কোথাও কাটাইয়া মা ঘুমাইয়া পড়িলে বাড়ী ফিরিলেই তো সকল হাঙ্গামা চুকিয়া যায়। আজকের রাতটা তো বাঁচে। কালের কথা কাল। বারো ঘণ্টা ঘুমাইয়া উঠিয়া মার অভিমান অনেকটা কমিবে, ছেলেরও সাহস কতকটা বাড়িবে। অতএব আর ঘণ্টা দুই পূজাবাড়ীতে আরতি দেখায় আপত্তি কি?—সেখানে ঠাকুরদাদা, নীলু ও বাবলু আরতি দেখিতে গিয়াছে। সকলে মিলিয়া একসঙ্গে বাড়ী ফিরিবে।

আবার ভাবে, মা এখন একা—এই উপযুক্ত সময়। রাত্রিবেলা যে-জিনিষটা কঠিন বোধ হইতেছে কাল দিনের আলোয় তাহা আরো কঠিন মনে হইবে। যাহা হইবার এখনই হইয়া যাক্। আর হইবেই বা এমন কি! মার অভিমান কেমন করিয়া জল করিয়া দিতে হয় সে-কৌশল সে জানে। দুমিনিটেই আবার যে কে সেই।

সুনীল বড় ঘরের দুয়ারে আসিয়া আস্তে আস্তে আঘাত করে। ভিতর হইতে মন্দাকিনী সুধাইলেন, "বাবা এসেছেন?"

"না মা, আমি"।

নিবু-নিবু হারিকেনটা চড়াইয়া দেওয়ায় দুয়ারের বাহিরে আসিয়া আলো পড়িল। মা দুয়ার খুলিয়া দিতে আসিতেছেন।

সুনীলের কলিকাতার বন্ধু ও পরিচিতের দল যদি এসময় উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে হাসির অপেক্ষা তাদের বিস্ময়ই হইত বেশি। স্পষ্টভাষী সুনীল! কাহাকেও ভয় করিয়া সে কথা কয় না; মেসের আড্ডায়, কার্জ্জন পার্কের আলোচনায়, আপিসের গল্প-গুজবে তার শানানো কথার দাপটে সকলেরই তাক লাগে; তর্ক-বিতর্কে দুর্জ্জয়; সমালোচনায় দুর্ম্মুখ; গান্ধী হইতে গঙ্গারাম আর হিটলার থেকে টম-হ্যারী সকলকেই নাকি সে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে জর্জ্জরিত করে। কথা বলে অনর্গল; জবাব দেয় চটপট; বোলে চালে চিন্তা-ভাবনায় সে এক দুঃসাহসী বাঙ্গালী যুবক। কলিকাতার বন্ধু মহলের এই সর্ব্বজনস্বীকৃত বাক্যবীরটি আজ এখন ভিজাবিড়ালের মতো দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে:

মন্দাকিনী দুয়ার খুলিলেন। মুখে কথা নাই।

সুনীল দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া নিজের বিছানায় গিয়া বসে। মার সঙ্গে কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবে ভাবিয়া পায় না। যতটা সহজে কাজ হাসিল করিবে মনে করিয়াছিল এখন দেখে তাহা তত সুসাধ্য নয়। সুযোগ খুঁজিয়া পায় না। মন্দাকিনী নীরবে নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুনীল হঠাৎ প্রশ্ন করে, "মা, নীলুরা এখনো আরতি দেখে ফেরে নি?"

ঐ চৌকি থেকে কোন জবাব আসিল না। নীলুরা যে আসে নাই সে তো প্রত্যক্ষ সত্য। ইহার আবার উত্তর কি? সুনীল একটা আস্ত আহাম্মুক!

খানিক বাদে আবার ডাকিল, "মা"!

"কেন?"—মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর ভারী।

"তোমার কি আজ শরীর খারাপ?"

"না।"

"তবে শুয়ে আছ কেন?"

এ-কথার কোন জবাব নাই। আবার খানিক নীরব থাকিয়া সুনীল এবার ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলে "অণুদের

কাপড়গুলো দুপুরেই কিনে এনেছিলাম।—বাজারে যেতে ভাবলাম, তোমার কাছেই তো শুনেছি অণুর নাকি কোথাও বেরুবার মতো ভালো কাপড় নেই। তাই ওর শাড়িখানি একটু ভালো দেখে এনেছি। কী-ই বা দাম?"

মার দিক হইতে সাড়াশব্দ নাই। কাছে যাইতে ছেলের ভরসা হয় না। বুঝিল, মেঘ কাটিবার সময় এখনো আসে নাই। আপাততঃ বিষয়টা মুলতুবী রাখাই সঙ্গত। কাল দেখা যাইবে।

সুনীল বালতির জলে পা ধুইয়া শুইয়া পড়িল। বেশ একটু গরম বোধ হইতেছে। মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া দেয়।

দত্ত বাড়ী আরতির বাজনা বাজে।

মা আর ছেলে দুজনেই চুপচাপ। দু'বিছানায় দুজনে চোখ বুজিয়া ভাবিয়া চলে যার যার কথা। ভাগ্যিস পূজা বাড়ীর ঢাকের আওয়াজে সারা গ্রাম সরগরম। নহিলে নির্জ্জন ঘরটা মনে হইত আরও অসহ্য।

কিসের ভয়? ঘণ্টা দেড়েক এপাশ ওপাশ করিয়া সুনীল বিছানার উপর উঠিয়া বসে। কেন ভয়? আচ্ছা, না হয় ধরিয়া লওয়া যাক্—মার সন্দেহটা সত্য। তাহাতে মার এত রাগ কেন? অণিমার উপর ছেলের আকর্ষণ টের পাইয়া থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা খুশী হইবার কথা তো তার জননীরই। যে-মা আজ চার বছর এত চেষ্টা করিয়াও ছেলেকে তার বিবাহে রাজী করাইতে পারেন নাই, পুত্রবধূ ঘরে আনিবার জন্য ছেলের একটা কথা আদায়ের জন্য যে-মা নাকি উদগ্রীব হইয়া আছেন রাতদিন—তাঁহার সেই অকপট আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আজকার এই অভিমানের মিল কোথায়? ছেলের ইচ্ছাই যদি মার ইচ্ছা, তার পছন্দই যদি সকলের পছন্দ, তবে এই বিরোধ কেন? অণিমা কুশ্রী নয়, কুড়ে নয়; এক গোত্রও নয়, গ্রাম সম্পর্কে বোন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এই ঠোকাঠুকির অর্থ কি? ছেলের মতামত তবে একটা কথার কথা? এই সহজ কথাটা মা বোঝেন না কেন, রোজগারে ছেলের জেদ চাপিলে মা আর ঠাকুরদা—সারা দুনিয়ার আপত্তির বিরুদ্ধেও সে অণিমাকে এ বাড়ীর বধূ করিয়া আনিতে পারে অনায়াসেই? ছেলের মনোগত ভাব যাহাই থাক্, মা কেন এ ক্ষেত্রে শেষরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সানন্দে আগাইয়া যান না?

ঘণ্টা দুই চলিয়া যায়। মা টের পান, ছেলে ঘুমায় নাই; ছেলেও জানে, মা জাগিয়াই আছেন। ঠাকুরদা বহুক্ষণ হয় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ওঘর থেকে তাঁর হুঁকার আওয়াজ আর শোনা যায় না। নীলু আর বাবলু এখন বেহুঁস ঘুমে।

"মা!"

জবাব নাই।

"বড় গরম পড়েছে আজ।"

সায় দেয় না কেহ।

সুনীল পাশ ফিরিয়া শোয়। খানিকক্ষণ পরে তরল সঙ্কোচের উপর ধীরে ধীরে অভিমানের উত্তাপ লাগে। অভিযোগের বাষ্প উঠিয়া মস্তিষ্কের গলিঘুঁজি আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। একটা অব্যক্ত অন্ধ ক্রোধ ঘুরপাক খাইতে থাকে। এমন বিশ্রী সন্দেহ কেন? দুপুরে অমন করিয়া চোখ রাঙাইবার কারণ কি? কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে? ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না এতই অপরাধ সুনীলের? সেও পাল্টা জবাব দিতে জানে—জননীর প্রতিটি অশিষ্ট আচরণের যোগ্য প্রত্যুত্তর!

এ চৌকিতে মা। ঐ বিছানায় ছেলে। আরও ঘণ্টা খানেক নিঃশব্দে কাটিয়া যায়। দত্ত বাড়ীর ঢাক ঢোল থামিয়াছে। দূরে দূরে ভিন গাঁয়ের দু'একটি আরতির বাজনা রাত্রের অন্ধকারে গমগম করিয়া ভাসিয়া আসে। মা ও ছেলে কাহারো চোখে ঘুম নাই। মাঝে মাঝে টিনের চালে পাশের বেলগাছটা তার প্রসারিত শাখা বুলায়, আর ওঘরে ব্রজনাথ দত্তের নাক ডাকে।

মশার কামড়ে উত্যক্ত হইয়া মন্দাকিনী উঠিয়া বসিলেন। এতক্ষণে হুঁস হয়, ছেলে-মেয়েকে মশায় কামড়াইয়া শেষ করিল। বাতিটা চড়াইয়া ও-বিছানায় মশারি পাড়েন। তারপর নিঃশব্দে উঠিয়া আসিলেন পুত্রের বিছানায়।

সুনীল চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। মন্দাকিনী পাখা লইয়া খানিকক্ষণ সশব্দে বাতাস করিয়া মশা তাড়াইলেন। তারপর মশারি ফেলিয়া বিছানার চারিপাশ ভাল করিয়া গুঁজিলেন।

সুনীলের শিয়রের জানালাটা খোলা ছিল। মন্দাকিনী

বন্ধ করিয়া দেন। ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়। প্রথম রাত্রে গরম বোধ হইলেও শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিতে পারে। সুনীলের পাশ-বালিশটা অনাদরে দূরে পড়িয়া আছে। মন্দাকিনী মশারির মধ্যে হাত গলাইয়া সেটা সুনীলের কাছে টানিয়া দিলেন। আস্তে আস্তে পুত্রের স্খলিত ডান হাতখানি পাশ বালিশের উপর রাখিয়াই তাড়াতাড়ি মশারির প্রান্তটুকু বেশ করিয়া গুঁজিয়া দিলেন যেন ফাঁক পাইয়া মশা ঢুকিতে না পারে। তারপর ফিরিয়া গেলেন নিজের বিছানায়।

রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে সুনীলের জল খাইবার অভ্যাস আছে। বিছানার কাছেই জলচৌকির উপর জলের গ্লাস রাখিতে মন্দাকিনী আজ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মনে পড়িতেই আবার উঠিয়া আসিলেন। যথাস্থানে জল রাখিয়া তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া যান নিজের বিছানায়।

পুত্র জাগিয়াই আছে। টের পায় সব কিছু। অনুভব করে জননীর প্রতিটি সস্নেহ আচরণ। তবু মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—যেন কত ঘুমই না ঘুমাইতেছে!

“এই নীলু! ঠিক হয়ে শো,” অন্ধকারে মন্দাকিনীর ভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বর বাজিয়া ওঠে, “কেমনতর শোওয়া তোর?—এখুনি মশারিটা ছিঁড়ে পড়বে সকল গোষ্ঠির গায়। মেয়েকে একদিন বললে হুঁস হয় না—রোজ রোজ টেনে এনে বালিশে মাথা ঠিক করে দিতে হবে! শত্তুর ধরেছি পেটে—নইলে এত ভোগ কার কপালে লেখা থাকে!”

সুনীল এই বাঁকা কথার লক্ষ্য কে তা বেশ বোঝে। মা তবে টের পাইয়াছেন—ছেলে এখনো ঘুমায় নাই! বুঝিলেনই বা। কি এমন চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছে সে?

“ভ্যাখো, মেয়ে আবার পায়ের তলায় এসে পড়েছে।—তোদের জাতের স্বভাব! ডাইনে বললে বাঁয়ে যাস্।” মন্দাকিনী আর এক প্রস্ত প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ করেন।

পুত্র অন্ধকারে মশারির মধ্যে উঠিয়া বসিয়া আছে। ঘুম আসে না। অণিমা অভিমান করিয়া শুইয়াই রহিল—নকাকীমার অত কথায়ও একবার উঠিয়া আসিল না! আসিবে কেন? মার দুপুরের ঐ কাণ্ডের পর অভিমান করা অন্যায় কি? সেই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারটা হালকা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেই তো সুনীল সন্ধ্যার পর অণিমাদের ওখানে গিয়াছিল। গিয়া দেখে, মা সহজ বিষয়টাকে আরও ঘোরাল করিয়া আসিয়াছেন। কে জানে, হয় তো আকারে ইঙ্গিতে এমন সব কথাও বলিয়া আসিয়াছেন যার জন্যই অণিমা লজ্জায় সুনীলের কাছে সহজভাবে উঠিয়া আসিয়া কথা বলিতে পারে নাই। অণিমার কি দোষ? গরীব বলিয়া কি তার মান-অপমান বোধও থাকিবে না? মা এমন অশিষ্টতা কবে হইতে শিখিল?

দত্তবাড়ীর ঢাক থামিয়াছে বহুক্ষণ। আশেপাশের গ্রাম ক’খানির আরতির বাদ্যও আর শোনা যায় না। নিঝুম নিশীথ পল্লী। শুধু টিনের চালার পাটাতনে টুকটাক শব্দ—ইঁদুরের অবাধ আনাগোনা। চৌকির তলে ঘুমন্ত বিড়ালের গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ।

আর কথা বলে পদ্মা। মনে হয় নদী যেন বিছানার কাছ ঘেঁষিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

সুনীল হাত বাড়াইয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দেয়। এক ঝলক স্তিমিত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে মশারির মধ্যে। গরাদের ফাঁকে ফাঁকে নজরে পড়ে দীর্ঘ নারকেলগাছের মগডাল—আবছায়া জোছনা করে চিকমিক। বেলগাছটা তির তির করিয়া পাতা নাড়ে। মাঝে মাঝে বাতাসে মশারির প্রান্তও একটু কাঁপিয়া কাঁপিয়া যায়।

মা বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

সুনীল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। খানিক খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়া আসিলেই ঘুম আসিবে।

আস্তে আস্তে দুয়ার খুলিয়া সুনীল উঠানে পড়িল। ও-ঘরের বারান্দা থেকে বেতের মোড়াটা আনিয়া বসিল উঠানের মাঝখানে। চারিদিকে অন্ধকার নামে ধীরে ধীরে—স্তরে স্তরে। সবে অষ্টমী—পূর্ণিমার এখনো অনেক বাকী। ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকের ধুক্‌ধুক্ শব্দ বুঝি কান পাতিয়া শোনা যায়। যেন হাত বাড়াইলেই হাতে মিলে ধরিত্রীর পরিশ্রান্ত মনখানি।

বসিয়া বসিয়া ভাবে সুনীল—অনেক কথা, অনেক অ-কথা। ঘনায়মান অন্ধকারে মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে এবার—খানিকটা খোলা হাওয়া পাইয়া বিক্ষুব্ধ মন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। এতক্ষণ মনের উপর ঘন ঘন চলিয়াছে নানা দৃশ্যের পালাবদল—কখনো শঙ্কা, কখনো সঙ্কোচ, কখনো রাগ, কখনো অভিমান। কি অদ্ভুত মানুষের মন। বাড়ী আসিয়াছে এখনো তো পুরা চব্বিশ ঘণ্টা হয় নাই। ইহারই

মধ্যে মনের মধ্যে কত ভীড়, কত কাড়াকাড়ি, কি না ঠেলাঠেলি। অস্বীকার করিয়া লাভ নাই—বকুলতলা আর কলিকাতায় প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে। তার মনের আকাশে দুদিক থেকে দুখানি ঘুড়ি সূতা ছাড়িয়া চলিয়াছে অবিরাম। আজ হউক, কাল হউক, একখানাকে কাটিয়া খসিয়া পড়িতেই হইবে। অথবা—হয় তো বা—বিদায় লইতে হইবে দু'জনকেই। নমিতা না অণিমা?

সুনীল চমকাইয়া ওঠে। ঢেঁকি ঘরে বাঘা ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিয়াছে। কুকুরটা শেয়ালের সাড়া পাইয়াছে বুঝি?

নমিতা বা অণিমা যে-ই হউক, মায়ের কাছ হইতে সে যে আজ অনেকখানি দূরে সরিয়া পড়িয়াছে সে-কথা অস্বীকার করিবার মত মনের জোর কৈ? সরিয়া পড়িতে হয় সেই তো নিয়ম। কিন্তু এতখানি? মায়ের উপর আগেকার সেই সহজ টানটা এখন আর নাড়ীর নয়, যেন দড়ির? মায়ের ভাবনাটা আজ বুক ছাড়িয়া শুধু মস্তিষ্কে উঠিয়াছে? তাই না পদে পদে ভাবিয়া চিন্তিয়া ওজন করিয়া ছেলের কর্ত্তব্য বজায় রাখিতে হয়। মায়া নয়, শুধুই দায়? 'উচিত', 'সঙ্গত' 'না করিলে নয়' 'মনে ব্যথা পাইবে'—এমনধারা যুক্তি বুদ্ধির দোহাই ওঠে কেন? বারো মাসের কলিকাতায় মায়ের অভাব আর তেমন সে অনুভব করে কৈ? মায়ের কূলে ভাঙন ধরিয়াছে! আজ এই গভীর রাত্রে এখন যে-একটু উদ্বেলতা, হয় তো একটু হা-হুতাশ—তাও ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা নয়—অতীতের দিকে চাহিয়া, অনেক কথা স্মরণে আনিয়া একটুখানি ঐতিহাসিক শুধু মায়া।

"খোকা!"

সুনীল পিছন ফিরিয়া তাকায়। অন্ধকারে মা আসিয়া দাওয়ার উপরে দাঁড়াইয়াছেন।

খোকা! এই আকাশে-বাতাসে ঘরে-বাহিরে আনাচে-কানাচে আশৈশব কতভাবে কত বারের ঐ ছোট্ট ডাক যেন এক সঙ্গে প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া ওঠে এই নিঃসাড় মধ্যরাত্রে!

"এত রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিস! বসে বসে ভাবছিস কী?" মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা।

"ঘুম আসছে না মা। তাই একটু বাইরে এসে বসেছি।"

"উঠে আয়। অসুখ করবে।"

[illegible] সুনীল উঠিয়া [illegible]। মন্দাকিনী দুয়ারে খিল দিয়া নিজের বিছানায় যাইতেছিলেন, সুনীল ভাবিল রাত্রের মতো এই শেষ সুযোগ। মশারির মধ্য হইতে ডাকিল, "মা, আমার মাথায় খানিক হাত বুলিয়ে দাও। ঘুম আসছে না।"

মন্দাকিনী মশারির মধ্যে আসিয়া ছেলের চুলের মধ্যে আঙুল চালাইতে থাকেন। সুনীল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিয়া ডাকিল, "মা"।

"বল্"

"তুমি রেগেছ?"

"রাগব কেন?"

"হ্যাঁ, তুমি রেগেছ।"

মন্দাকিনী নীরব।

বাহিরে কুকুরটা কিছু একটা দেখিয়া আবার ঘেউ ঘেউ করিয়া ওঠে। সুনীল আস্তে মার একখানি হাত বুকের কাছে টানিয়া নেয়, "তুমি ভুল বুঝো না। তোমার চেয়ে আমার কেউ বড়ো হ'তে পারে না—এ সংসারে কেউ না।"

"তুই এখন ঘুমু দিকিনি।"

"আগে বলো, তুমি রাগ করো নি?"

মন্দাকিনী অন্ধকারে একটু মৃদু হাসিলেন, "ছেলের কথা শোন। আমি আবার রাগলাম কখন।"

সুনীল নিশ্চিন্ত হয়। তার এত বড় কঠিন ব্যাপারটা এত সকালেই সহজ হইয়া গেল! মার কাছে এমনি হয়।—এতক্ষণে হইত-ও, শুধু হইয়া উঠিতে পারে নাই নিজেরই অকারণ কুণ্ঠায়।

খানিকবাদে সুনীল আবার ডাকিল, "মা। আমি তো লক্ষ্মীপূজোর পরদিনই যাব। তার আগে সেই মেয়েটিকে দেখে আসি। কী ব'লো?"

"তুই এখন ঘুমো তো!—রাত কত সে-খেয়াল আছে?"

"আজ ঘুম আসছে না কেন?"

"আসবে'খন। চোক বুজে চুপ করে থাক।"

সুনীল চোখ বুজিয়া চুপ করিয়াই থাকে। মা তাহার গায় মাথায় বার বার হাত বুলাইতে থাকেন। ভাল লাগে মার এই মায়া, এই আদর, এই শুশ্রূষা। সব চেয়ে ভাল লাগে সেই ছোট্ট ডাক—'খোকা!' কিন্তু কি বেহায়া মন। জননীর সস্নেহ করতলের স্পর্শসুখ উপভোগ

করিতে করিতে ছেলে কিন্তু ইহারই মধ্যে বার কয়েক ভাবিয়া লয় নমিতার মুখের আদলটা, অণিমার বামগণ্ডের ছোট্ট তিলটুকু। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুরিয়া আসে বালীগঞ্জে—নমিতার পড়ার ঘরের দক্ষিণের জানালায়। এক মিনিটের মধ্যে এক সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় আজ দুদিনের অণিমার অসংখ্য খুঁটিনাটি—এমন কি সন্ধ্যাবেলা বিছানার উপরে অভিমানিনীর আটপৌরে কাপড়ের পাড়টা পর্য্যন্ত মুখস্থ বলিয়া যায়।

"খোকা ঘুমিয়েছিস ?"

ছেলে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে।

"খোকা !" আস্তে আস্তে ডাকেন মন্দাকিনী।

সুনীল পাশ বালিস আঁকড়াইয়া তেমনি পড়িয়া আছে। মন্দাকিনী আস্তে আস্তে বাহিরে আসেন। মাশারির ধার গুঁজিয়া দেন সন্তর্পণে। তারপর ফিরিয়া আসেন নিজের তক্তপোষে।

নীলু আবার কুকুরকুণ্ডলী হইয়া বিছানার একপাশে আসিয়া পড়িয়াছে। বাবলুর মুখটা পাশ বালিশ আর মাথার বালিশের মাঝখানে আটকাইয়া গিয়াছে।

মন্দাকিনী ছোট-ছেলের মাথাটা ঠিক করিয়া দিয়া তাকে কোলের কাছে টানিয়া নেন। ঘুমন্ত বাবলু মায়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া অঘোরে ঘুমাইতে থাকে। অন্ধকারে মন্দাকিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া যান। দুনিয়ায় শুধু দুর্নিব্বার হওয়া আর হইয়া-ওঠা !

শঙ্কিত জননী কোলের ছেলের শিথিল মাথাটা কি জানি কেন বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরেন—চাপিয়া ধরেন ভবিষ্যতের এক পরিপূর্ণ মানুষকে, না মায়ের উপর নির্ভরশীলতার নাগালের মধ্যে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন বাইশ বছর আগের এমনি এক অসহায় শিশুকে—যার নিখুঁত অভিনয়ের ফাঁকটা তিনি এই মাত্র ঐ বিছানা হইতে টের পাইয়া আসিয়াছেন ?

আট

পরদিন।

সকাল হইতেই মাতা-পুত্রে কথা নাই। সুনীলকে দেখিলেই মন্দাকিনী চোখের পাতা নামায়, মার মুখোমুখি পড়িয়া গেলে ছেলেও সলজ্জভাবে পাশ কাটাইয়া যায়। কাল রাত্রের অমন একটা সহজ মীমাংসার পরেও আজ কেন যে এই অস্বাভাবিক আচরণ সে-কথা সুনীল শুইয়া বসিয়া কেবলি ভাবিতে থাকে। অপরাধটা কার ? তার না মার ? কাল রাত্রিবেলা সে তো মার কাছে মনের কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছে। এখনো তবে অভিমান কেন ? কিন্তু—

সুনীলেরও বা এমনধারা সঙ্কোচ কেন ? ভোরে উঠিয়া মার কাছে একটিবারও যায় নাই—ডাকে নাই, খাইতে চায় নাই। বেলা আটটা পর্য্যন্ত বাইরের ঘরেই কাটাইয়া দিল। এক থালা লাড়ু আর মোয়া আসিয়াছে নীলুর হাতে, চায়ের পেয়ালা আসিল বাবলুর মারফৎ। মার এই উপেক্ষা কেন ? পাল্টা অভিমানে ফুলিতে থাকে সন্তানও।

বেলা বাড়ে। স্নানের সময় হয়। খাইবার ডাক আসে আবার নীলুর মুখ দিয়া। রান্নাঘরে নিঃশব্দে আহার শেষ করিয়া সুনীল উঠিয়া পড়ে। আর কিছু চাই কিনা সেই প্রশ্ন যাহাতে না করিতে হয় তারই জন্য আলাদা এক একটা বাটিতে মন্দাকিনী বেশী বেশী মাছ ডাল তরকারী রাখিয়া সেই যে হেঁশেলে ঢুকিয়াছেন আর কাজ সারিয়া বাহিরে আসিলেন পুত্র মুখ ধুইয়া বার-বাড়ীতে যাওয়ার পরে। নির্ব্বাক ছায়াচিত্রের অভিনয়ের মত মা-ছেলে কাহারো মুখে সাড়াশব্দ নাই।

ঘণ্টা দুই বিছানায় এপাশ ওপাশ করিয়া সুনীল উঠিয়া বসে। অণিমা আজ আসে নাই। কেন আসে নাই সুনীল তাহা বেশ জানে। না আসাই উচিত। এক একবায ইচ্ছা হয় সুনীলের, ও বাড়ী গিয়া কথাচ্ছলে অণিমার কাছে মার হইয়া মার্জ্জনার পালা গাহিয়া আসে।

বার কয়েক আর-ওদের-বাড়ী-যাইব-না সঙ্কল্প করিয়া শেষে যে-যা-বলে-যাইবই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া সুনীল জামাটা পরিয়া লইতে উঠিয়া আসে বড় ঘরে।

মা ঘরে নাই। নীলু আর বাবলু পুতুল খেলায় ব্যস্ত।

"মা কোথায় রে নীলু ?"

"কি জানি।" বলিয়াই বোন ছোট ভাইটির মুখের দিকে তাকায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

মা কোথায় গিয়াছেন নীলু যে তাহা জানে সে-কথা আর চাপা থাকে না।

"বাবুল, মা কোথায় গেছে জানিস্ ?"

বাব্‌লু দিদির মুখের দিকে চাহিয়া মুচকি হাসি হাসে।

"বল না।"

"আমি বুঝি জানি ?"

"জানিস্ তুই—বল।"—ধমক দেয় সুনীল।

"পলাছডাঙ্গা গেছে মা।"

পলাশডাঙ্গা এ-গ্রাম হইতে মাইল দুই দূরে। আজ পূজার দিনে ছোট ছেলেমেয়েকে বাড়ী রাখিয়া মার হঠাৎ পলাশডাঙ্গা ছুটিবার কি প্রয়োজন পুত্র তাহা বুঝিয়া পায়না।

"কেন গেছে ?"

"আমরা তার কি জানি।" জবাব দিল নীলু।

"থাম তুই।—যাকে বলছি সে-ই উত্তর দিক।"

ধমক খাইয়া নীলু চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মা বার বার বলিয়া গিয়াছেন, কোথায় যাইতেছেন সে-কথা দাদা যেন জানেনা। বাবলুকেও দু' আনার পয়সা ঘুষ দিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন বহু কষ্টে।

"পলাশডাঙ্গা কেন গেছে জানিস্ ?"

বাবুল ঘাড় নাড়ে।

"কার সঙ্গে গেছে ?"

"মানা'র মা।"

মানার মা অর্থাৎ মানদা। ত্রৈলোক্য দাসের দুস্থা বিধবা স্ত্রী। সুনীলদের বাড়ীর ঝি বলিলে সে আপত্তি জানায়। বাসন মাজে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, সারাদিন সংসারের আরো অনেক কাজ করিয়া দেয়। পরিবর্ত্তে দু' বেলা দুজনের আন্দাজ ভাত বাড়িয়া বাড়ী লইয়া যায়। আর পূজার সময় পায় এক জোড়া করিয়া সাদা থান। একমাত্র সন্তান বিধবা কুমুদ তার ঘাড়ে। সেও মাঝে মাঝে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ধান ভানার কাজে যায়।

অবসর সময় মানদা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। সকলকার ঘরোয়া কথা কুড়াইয়া আনিতে সে অতি পাকা-পোক্ত লোক। এই কয়দিন মন্দাকিনীর অনুমতি লইয়া দত্তবাড়ীর পূজার কাজে খাটিয়া দিতে গিয়াছে। মাঝে মাঝে আসিয়া মন্দাকিনীকে অণিমা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া গিয়াছে। সুনীল অণিমাদের বাড়ী কবে কখন কতক্ষণ কাটাইয়াছে সে-খবর দুনিয়ার আর কেহ না জানুক মানদা নাকি সঠিক জানে।

মানদাকে সুনীল কোনদিনই দেখিতে পারেনা। পরের কুৎসা রটনা করিতে রসনা তার লক্‌লক করে। এ-হেন মানদার সঙ্গে মার পলাশডাঙ্গা যাওয়ার মধ্যে আপাততঃ কোন শঙ্কার কারণ ভাবিয়া না পাইলেও সুনীল একটু অশ্বস্তি বোধ না করিয়া পারেনা।

খানিক বাইরের ঘরে কাটাইয়া সুনীল আবার অণিমাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়ায়। নিশ্চয় যাইবে। এক শ' বার যাইবে। মার এই বাড়াবাড়ি অসহ্য। এত অহঙ্কার ভাল নয়। জননীর এই স্পর্দ্ধিত অভিমানের উপর পাল্টা আঘাত করিবার কল্পনায় সুনীলের মনের তলে কোথায় যেন একটা বোবা উল্লাস মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। পরক্ষণে আবার তাহা মিলাইয়া যায় সলজ্জ সচেতন মনে।

না-না, অণিমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া আসিবে মাত্র। মাও প্রকৃতিস্থ হইবেন। অণিমাও ভুল বুঝিবেনা। দুদিনের জন্য বাড়ী আসিয়া দুই পরিবারের মধ্যে এমন একটা মনোমালিন্য সে কিছুতেই ঘটিতে দিবেনা। অণিমার কাছে এখন সেই শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই তো যাইতেছে! মা ফিরিয়া আসিলে অকপটে হাসিয়া হাসিয়া কহিবে—আগাগোড়া ব্যাপারটা ভুল তিনি বুঝিয়াছেন। কিন্তু মা হঠাৎ দুপুরবেলা পলাশডাঙ্গা গেলেন কি জন্য ?

মন্দাকিনী কোথায় এবং কেন যাইতেছেন সে-খবর সারা দুনিয়ায় জানেন শুধু তিনি, আর জানে মানার মা—আসলে পলাশডাঙ্গা নয়, তারই পাশের গাঁয়ে—বেলপুকুরের যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী। বেলপুকুরের যদু চক্কোত্তিকে চিনেনা এমন লোক এই পরগণায় কেহ নাই। তিনি জমিজমার মালিক নন, ব্যবসায়ীও নন, তাঁহার তিনপুরুষে কেহ কোন দিন চাকুরীও করেন নাই। তবু তিনি বেশ দু'পয়সার মালিক। তাঁহার স্বর্গত পিতা নাকি প্রত্যক্ষ কালী দর্শন করিয়াছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ মৃত্যুকালে পুত্রকেও দু'চারটা গুপ্ত মন্ত্র কোন্ আর না দিয়া গিয়াছেন—অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, এমন কি বহু শিক্ষিত লোকও এই ধারণার বিরুদ্ধে কোন বক্রোক্তি শুনিলে বিরক্ত হইয়া উঠে।

যদু চক্কোত্তির প্রকাশ্য ব্যবসা—হাত দেখিয়া ভবিষ্যতের ভালমন্দ ফলাফল বলিয়া দেওয়া এবং নানা আসন্ন অমঙ্গল ও নিশ্চিত ফাঁড়া কাটাইবার হোম-যাগ-যজ্ঞাদির অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা। আর তাঁহার প্রাইভেট ব্যবসার কথাটাও

জানে সকলেই। তবু থানার দারোগা হইতে আরম্ভ করিয়া হাই-স্কুলের হেড-মাষ্টার পর্য্যন্ত জানেন না কেহই। বৃদ্ধ চক্কোত্তি মশায় বিধবার বিপদোদ্ধার করেন, কুমারীর মুখ রক্ষা করেন, দুরন্ত স্বামীকে অভাগী স্ত্রীর বশে আনিয়া দেন, ভেড়া পুত্রকে বাঘিনী পুত্রবধূর কবলমুক্ত করেন—একাধারে এমন স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয় করিয়া তিনি এই অঞ্চলে চৈত্র-মাসের কলেরায় ডাক্তারবাবুর অপেক্ষাও অনেক বেশী জনপ্রিয়। এ-হেন যদু চক্কোত্তির বাড়ী যাইবার পথে মন্দাকিনী এখন যার বার মানদার বুদ্ধি, বিবেচনা ও হিতাকাঙ্ক্ষার জন্য মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছেন। সুলতা যে তুকতাকের সাহায্যে ছেলেকে তাঁহার বশ করিবার চেষ্টায় আছে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মেয়েকে দিয়া নিশ্চয় যো করাইয়াছে।

সুনীলও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে অণিমাদের বাড়ী। মা পলাশডাঙা হইতে কমসে কম দুই ঘণ্টার আগে ফিরিতে পারিবেননা। পুত্র একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া লয়। ঘণ্টা দুই। বেশীও হইতে পারে।

মাঝপথে মূর্ত্তিমান বাধা আসিয়া দাঁড়ায় নন্দ দাস।

“কী খবর নন্দ দা ?”

“তোমায় আজ একবার আমাদের বাড়ী যেতে হবে।”

“কেন ?”

“তোমার বৌদির যত সব ইয়ে। ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করেছে তোমার জন্যে।”

সুনীল এই সাদর আমন্ত্রণের আসল উদ্দেশ্য বুঝিল। হাসিয়া একটা মিথ্যা কথাই কহিল, “আজ তো যাওয়া চলবে না নন্দ দা। ভাত খাই নি। জ্বর হয়েছে। নাড়ু খাব কেমন করে ?”

“তবে কাল সকালে যাবে ?”

সুনীল তার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসে—কৌতুকের হাসি। নন্দদাস আচ্ছা ঘোড়েল! এবার অবস্থা বুঝিয়া চিরদিনের সহজ উপায় ছাড়িয়া বাঁকা পথ ধরিয়াছে। মুচকি হাসিয়া কহিল সুনীল, “চলো। আজই যাব। দু’একটা নাড়ু খেলে কিছু হবে না।”

পথে নন্দ দাস অনেক কথাই শোনায়। বাদলের মতো এমন ছেলে আশে-পাশে দশটি গ্রামে একজনও নাই; সারা বছর তারা সবাই পূজার ছুটির দিন গুনিতে থাকে—কবে আবার বাদল আসিবে; ইত্যাকার ও ইত্যাদি।

সুনীল কিন্তু চুপ করিয়া শুনিয়া যায়। এবার ভবী ভুলিবার নয়। সত্যই, হাতের টাকা তো সব ফুরাইয়া আসিয়াছে। থাকিলেও দিত না সুনীল। সে কি এতই বোকা যে নন্দদাসের মিষ্টি কথায় গলিয়া পড়িবে ?

বাড়ীর উঠানে পা দিয়াই নন্দ হাঁক দেয় “বুচি, তোর মা কৈ রে ?—বাদল এসেছে। একটা পিঁড়ি নিয়ে আয় শিগ্‌গির।”

বুঁচি বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া বাদলের পায়ের ধূলা লইল।

নন্দ আবার ডাক ছাড়ে, “তোর দিদি কোথায় ? টেপি গেল কৈ ? আর ক্যাবলা ?—বাদলকে এসে পেন্নাম করতে বল।”

নন্দর হাঁকডাকে ছবি দুয়ারের ওপিঠে আসিয়া লজ্জায় দাঁড়াইয়া আছে। নন্দর স্ত্রী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কহিল, “মেয়ের লজ্জা দ্যাখ। পেন্নাম করে আয়। বাদল-কাকাকে আবার লজ্জা কিসের।”

ছবি আসিয়া বাদলের পায়ের ধূলা নিল।

নন্দর স্ত্রী হাসিয়া কহিল, “তুমি এসেছ ঠাকুর-পো, তোমার জন্যে—”

“জ্বর আমার—দুটি নাড়ু শুধু মুখে দেব।”—নাড়ুর উল্লেখ শুনিয়া নন্দর লিকলিকে ছোট ছেলেটা ঘরের মধ্য হইতে ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়। শ্রীমান ক্যাবল তো আগেই আসিয়া দূরে বসিয়া সুনীলকে একদৃষ্টে দেখিতেছে। ঘরের মধ্যে কোলের ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বুঁচি তাকে কোলে লইয়া বারান্দায় আসে। আরো দুটি আছে। তারা এখন দত্ত বাড়ী অথবা অন্য কোথাও।

সুনীল একবার ছবি ও টেপিকে দেখিয়া লইল। ওদের সে হইতে দেখিয়াছে। তবু সরলভাবে তাকাইতে আজ লজ্জা করে। কি সর্ব্বনাশা বাড়! কলাগাছের মতো দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে অসম্ভব। বয়সটা কি দু’বেলা দু’টি ডাল-ভাতেই চাপা দেওয়া যায় ? ছবি ও টেপির পরণের কাপড় ছাড়া সুপুষ্ট দেহের আর কোথাও নন্দর অবস্থার লেশ-মাত্র চিহ্ন নাই।

নন্দ তামাক সাজিতে সাজিতে কহিল, "সেনেরা এবার বহুকাল পরে বাড়ী এল।"

"শুনেছি।"

"আর ভাই কালে-কালে কতোই দেখব। মেয়েরা সব মেম সাহেবেরও বাড়া। জুতো পায় দিয়ে রান্নাঘরে যায়। জাত মানে না, কাঠ মানে না। শ্বশুরকে দেখেও ঘোমটা নেই। কী বলব বাদল, কিশোর সেনের বৌ সবার সামনেই তার সঙ্গে কথা কয়।"

সুনীল হাসিয়া কহিল, "নন্দদা, আজকাল তো তোমার বড় বিপদ।"

"কিসের?"

"খালি তামাক খেয়ে থাকতে পারো?"

"না থেকে উপায় কি বলো।—তোমাদের এ সব হতচ্ছাড়া স্বদেশীওয়ালাদের জ্বালায় আর কি ও-অভ্যাস রাখা যায়।"

সুনীল হাসিয়া উঠিল। নন্দ এ-গ্রামের বিশিষ্ট গঞ্জিকা-সেবীদের অন্যতম।

পাড়ায় পাড়ায় ত্রি-নাথের মেলা বসে—গঞ্জিকা-সেবীদের নৈশ মজলিশ। নন্দর একটানে কলিকার অর্দ্ধেক সাবাড় করিবার খ্যাতি গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই জানে। ইদানীং উমেদপুরে কংগ্রেসের পাণ্ডারা গাঁজার দোকানে পিকেটিং সুরু করায় ত্রি-নাথের মেলার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। লুকাইয়া চুরাইয়া দু'চারদিন গাঁজা কিনিয়া অবশেষে একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে এক হাট লোকের মধ্যে অপমানিত হইয়া নন্দ গোঁসা করিয়া বদ অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ এখনো মন্দীভূত হয় নাই। নন্দ মাঝেমাঝে ফিকির ফন্দী করিয়া দু'এক ছিলিম জোগাড় করিয়া গোপনেই বাড়ী বসিয়া খায়—গাঁজাতো ভাইদের ডাকিয়া লইয়া সভা গুলজার করিবার দিন এখনো আসে নাই। আশা আছে তার, দু'চার মাসের মধ্যেই পুলিশের লাঠির গুতায় স্বদেশীওয়ালাদের জারিজুরি বাহির হইয়া পড়িবে। ততদিন তামাকের ছিলিম দ্বিগুণ করিয়া নন্দদের দিন চলিতেছে।

নন্দর স্ত্রী লাড়ু দিয়া জল আনিতে গেল। সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার দত্তবাড়ী নেমন্তন্ন নেই?"

নন্দ হঠাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, "আমি আর কোনো কালে যদি ওদের কোন কাজকম্মে গেছি তো আমার নাম বদলে রেখো। খেতে যেতে হয় যাব। ওদের কোন কাজের ভার আর নিচ্ছিনে।—বড়লোক বলে যা মুখে আসে তা-ই বলবে? কেন? ভা-রী তো বড়লোক! কুণ্ডুদের কাছে বাড়ীশুদ্ধ মরগেজ।"

"ব্যাপার কী নন্দদা?"

ব্যাপার যে-কি সে-কথার জবাব দিল নন্দর স্ত্রী। জলের গ্লাসটা মাটিতে নামাইয়া মোক্ষদা টগবগ করিয়া উঠিল, "ঠাকুর-পো, আমরা গরীব হ'তে পারি, তাই বলে চুরির অপবাদ সহ্য করা যায় না।"

"কী হয়েছে বৌদি"

"—দত্ত বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে পুরোতঠাকুরের পাওনা ছাতাটা চুরি গেছে। কে নিয়েছে, কে নিয়েছে, খোঁজ-খোঁজ, শেষ কালে কানাঘুষা—আর কে! নিয়েছে তোমার দাদা। তারপর রাত্তিরে বৈকালি হবার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি কাঁসার বাটিশুদ্ধ ক্ষীর উধাও। নাম পড়ল তোমাদের দাদার।—অথচ এ ক'দিন নাওয়া নেই খাওয়া নেই—রাত-দিন দত্তবাড়ী খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরল যে লোকটা, মেজো কত্তা তাকে এক ঘর লোকের মধ্যে ফস্ করে বললে কিনা—এ তোমারি কাজ।"

সুনীল আর একটা নাড়ু মুখে পুরিয়া মনে মনে হাসিল এক চোট—গত রাত্রের মা ভগবতীর বৈকালীর ক্ষীর এখন তার পেটে। সুযোগ মতো ফস্ করিয়া হাতের খেলা দেখাইতে নন্দ চিরকালই ওস্তাদ। এই বিষয়ে সারা গ্রামে তার বিশেষ একটু খ্যাতি আছে।

এ-বাড়ীর পূজায় বা ও-বাড়ীর বিবাহে কি সে-পাড়ার শ্রাদ্ধে কর্ম্মচারী সাজিয়া নন্দদাসকে সারাক্ষণ সদর ও অন্দরে আনাগোনা করিতে দেখা যায়। দুদিন বাদেই শোনা যায় এ-টা নাই, সেটা নাই, আরো দু' একটি। সব যে নন্দই নিত এমন কোন প্রমাণ নাই। গরীব বলিয়া তুচ্ছ জিনিষের জন্য তার বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া মালশুদ্ধ ধরিবার চেষ্টাও কেউ কোনদিন করে নাই। তবু সবাই নন্দকে না ডাকিয়া পারে না। এক ছিলিম টানিয়া লইলে এক দমে সে তিন জন লোকের কাজ একাই করিয়া দিতে পারে। এ হেন নন্দ আজ দত্তবাড়ীর ওপর গোঁসা করিয়াছে। সুতরাং ব্যাপার একটু গুরুতর সন্দেহ নাই।

সুনীলকে নীরব দেখিয়া নন্দ নিজেই আবার সুরু করিল, "ভা-রী তো বড়মানুষ! দেনার দায়ে মাথার চুল বিকোয়।—কথা বলতে তো আর ট্যাক্স দিতে হয় না—বললেই হ'ল।"

"কী হয়েছে খুলেই বলো না।"

নন্দ টিকার আগুণে ফুঁ দিতে দিতে কহিল, "রমেশ সরকারের কথায় বিশ্বাস ক'রে মেজবাবু আমায় বলেন কি না—এ কাজ তোরই নন্দ, চিরদিনের অভ্যেস তোর। আমি যেন তিন শ' পয়ষট্টি দিন ওর খেয়েই বেঁচে আছি?"

সুনীল ছোট থালাটা শুদ্ধ বাকী নাড়ু কয়টা নন্দর ছোট ছেলের সামনে ধরিল। ছেলেটা প্রথম হইতেই খাবারের থালা হইতে চোক আর ফিরায় না। মোক্ষদা বাধা দিয়া কহিল, "ওকি ঠাকুরপো, ও-ক'টা—তাও রেখে দিলে?" কিন্তু তার কথা কয়টি শেষ হইতে না হইতে দুই ভাই এক থাবায় নাড়ু কয়টি ভাগাভাগি করিয়া লইয়া লাফাইয়া উঠানে পড়িল। তারপর কার ভাগে বেশী পড়িয়াছে দেখিবার জন্য পরস্পরে হাতাহাতি সুরু করিয়া দিল।

সুনীল জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশকাকা এর মধ্যে গেলেন কেন?"

"যাবেন না!" নন্দ তিরবির করিয়া উঠিল, "সে ও তো এক বোঁচকা-মারা শুকদেব কিনা! আপিসের টাকা মেরে চাকুরি গেছে এ-কথা ত্রিভুবনের লোক জানে।"

সুনীল বাধা দিয়া কহিল, "দ্যাখো নন্দদা। লোকে খামকা অনেক কথা বলে। তোমার নামে মিথ্যে কথাও কি লোকে অমনি বিশ্বাস করবে?"

নন্দ সে কথার জবাব না দিয়া বলিয়া চলিল, "খামকা লোকের পিছু সে কেন লাগে? কেবল বড় বড় কথা। পেটে নাই ভাত, তবু চাল দ্যাখ না। ইস্ত্রী মাষ্টারি না করলে কী খায় তা দেখা যেত, এদিকে মেয়েকে পূজোয় দামী শাড়ি কিনে দিয়েছে, লোকের কাছে বড়মানুষী দেখাবার জন্যে।"

নন্দর স্ত্রী শঙ্কিত হয়। মহাবিপদ! তার ক্ষীরের নাড়ুর টোপ বুঝি ফসকাইয়া যায়। অণুদের বাড়ী সুনীলের গতায়াত ও অণুর সুনীলের সঙ্গে গলাগলি হাসিঠাট্টার মুখরোচক গল্প যে দু'চারজনের কাণে কাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে মোক্ষদা তাদেরই একজন। কাপড়ও যে সুনীল দিয়াছে এমন একটা সন্দেহ সে করিয়াছিল, আজ অঞ্জলি দিবার সময় চণ্ডীমণ্ডপে অণিমাকে দেখিয়া।

"পরের দেখে তোমার অত চোখ টাটানো কেন বলো দিকিনি। থামো না,"—মোক্ষদা স্বামীকে বাধা দেয়।

"থামব কেন?—ভয় করি কাকে?" নন্দ আরো তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, "মেয়েটার দেমাক দেখে গাঁ-শুদ্ধ লোক নিন্দে করে।"

"বাপকে ছেড়ে মেয়েকে ধরছ কেন নন্দদা?—বাপ তোমায় চোর বলেছে, যত পার তাকেই বলো।"

নন্দর স্ত্রী স্বামীকে চক্ষুর ইসারায় নিষেধ জানায় বার বার। বৃথা চেষ্টা। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করিল সুনীল।

নন্দ বলিয়া চলিল "এই তো আষাঢ় মাসে ছয়গাঁ থেকে মেয়ে দেখতে এল। দোজবর ব'লে মেয়ে কিছুতেই ঘর থেকে বারান্দায় এল না—চৌকির পায়া ধরে শক্ত করে লেগে রইল—পাড়ার হেন লোক ছিল না যে একবার মেয়েকে সাধ্যসাধনা করেনি। শেষ কালে ভদ্দর লোকেরা রেগে চলে গেলেন। গ্রাম শুদ্ধু টি-টি। গুণধর বাপ আবার সবার কাছে বড় গলায় গেয়ে বেড়ায়—বেশ করেছে; আমার মেয়েকে বুঝি যার তার সঙ্গে বিয়ে দেব।—কথায় বলে, পেটে নেই ভাত........"

"আঃ থামো না। পরের কথায় তোমার অত কাজ কি!"

—স্ত্রীর নিষেধে এবার নন্দ দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে "যা যা, বক্ বক্ করিস্ নি। নিজের কাজে যা। আমি যেন ওরই বুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে যাব।"

মানদা নিরুপায় হইয়া সুনীলের পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্বামীকে বহুকষ্টে জানাইয়া দেয়—ব্যাপারটা ভালো হইতেছে না। কেন ভালো হইতেছে না তাহা বুঝিতে না পারিলেও প্রসঙ্গটা এখন ধামা-চাপা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া নন্দ দাস হাসিয়া উঠিল "ভাবছ কী বাদল ভাই?—আমার রাগলে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। কী বলতে যে কী বলে ফেলি।"

সুনীলের পিঠে একজোড়া চোক না থাকিলেও ব্যাপারটা চাপা থাকে না। বুঝিল, তাকে আর অণুকে লইয়া এ-পাড়ার আর কোথাও না হউক, অন্ততঃ নন্দর স্ত্রীর মনে

'একটা কুশ্রী সন্দেহ দেখা দিয়াছে। সুতরাং দু'চার দিনের মধ্যেই বাতাসটা ছড়াইয়া পড়িতে বেশি দেরী হইবে না। সুনীল মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া ওঠে।

পরক্ষণেই মুখে হাসির রেখা টানিয়া নন্দকে কহিল, "চলো নন্দদা, একটু বাইরে চল।"

বাড়ী আসিয়া সুটকেস খুলিয়া সুনীল তিনটি টাকা দিতেই নন্দ একগাল হাসিয়া জানাইল, "ছ্যাখো ভাই, রাগলে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। আর কাণ্ডজ্ঞান আমার হবেই বা কোত্থেকে বলো। বিদ্যে তো কানাই সরকেলের পাঠশালাতেই খতম।—তুমি রাগ করো নি তো ভাই?"

"যেখানে চলেছ যাও না।—রাগ করব কেন?"

নন্দ কথা শুনিয়া আশানুরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কহিল, "ছ্যাখোভাই, লোকে যে যা-ই বলুক, অণু সত্যি বড় ভালো মেয়ে। ওর মাকে—"

সুনীল একটু রুক্ষভাবেই কহিল, "যাও না নন্দদা। অণুদের কথা তোমায় কেউ জিগ্‌গেস করে নি তো?"

নন্দ ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিল। তার মনে মনে আশা, বাড়ী হইতে যাইবার আগে সুনীলের কাছ হইতে আর এক খেপে অন্ততঃ গোটা দুই টাকা খসাইতে হইবে। সেই সম্ভাবনা বুঝি নষ্ট হয়। নন্দ পিছনে ফিরিয়া ডাকিল, "বাদল, আমি বাজারে যাচ্ছি।—কাপড় আনতে চলেছি। কী রকম পাড় আনব বলো দিকিনি?"

নন্দ যতটুকু পথ আগাইয়াছিল আবার ততটুকু ফিরিয়া আসিয়াছে। সুনীল জবাব দিল, "তোমার যা ইচ্ছে—আমি তার কী জানি?"

"বা রে। ভাইঝিদের কাপড় দিচ্ছ তুমি, পাড় পছন্দ করব কি আমি নাকি। তোমরা সহরে থাক, তোমাদের আর আমাদের কি এক চোক!"

মজা মন্দ নয়! সুনীল এবার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, "তুমি বড় বক্‌বক্ করতে পারো, নন্দদা।"

নন্দ আর কোন কথা বলিতে সাহস না পাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়ে। সুনীলও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

নন্দকে টাকা দিল কি তাহার মুখবন্ধ করিবার জন্য? ঘুষ? কেন? কার ভয়? কিসের ভয়? সে এমন কোন অপরাধ করে নাই যার জন্য নন্দ দাসের মত লোকের কাছেও নিজেকে দায়ী মনে করিতে হইবে!

তবু সুনীল পিছনে ডাকিল, "নন্দদা, শুনে যাও।"

নন্দ যতটা গিয়াছিল আবার ফিরিয়া আসিল।

"নন্দ দা, তোমায় খামকা কতকগুলো শক্ত কথা বলেছি, কিছু মনে করো নি তো?"

"সে কি! আমায় আবার শক্ত কথা বললে কখন। তোমার যত ইয়ে—"

"ছ্যাখো নন্দদা, তোমার মতো আমারো সব সময় মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী সব বলে ফেলি। মনে করো না কিছু।"

"দুর!" নন্দ দাস হাসিয়া ওঠে। বাদলকে সহসা এমন নরম হইতে দেখিয়া একটুখানি অবাকও হয়।

"নন্দ-দা, যাবার আগে আরো গোটা কয়েক টাকা দিয়ে যাব'খন। তোমার বড় কষ্ট আজকাল।"

নন্দ একগাল হাসিয়া হৃষ্ট মনে চলিয়া যায়। সুনীলও হালকা হয় এতক্ষণে। নন্দ দাসকে হাতে রাখিতে হইবে, রাগাইলে বিপদ। তিলকে তাল করিয়া সারা গ্রামে ছড়াইয়া বেড়াইবে। এদের অসাধ্য কিছু নাই!

ক্ষুদ্র ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

শ্রীভবেশচন্দ্র রায় এম্, এস্-সি

(১)

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা মোটেই সুস্পষ্ট নহে। আজ পর্যন্ত কত ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া কত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আমরা অনেকেই জানি না, শুধু আবিষ্কৃত তথ্যই আমাদিগকে আশ্চর্য্য করিয়া দেয়। বস্তুত আমাদের অনেকের মনেই এই সংস্কার একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে বিজ্ঞানে কল্পনার কোন স্থান নাই! সুনির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফলই বিজ্ঞান সাধনার ভিত্তি ; এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই সত্য, কিন্তু পরীক্ষার প্রত্যেক স্তরেই বিজ্ঞানবিদ্‌কে যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। অবশ্য কবি-কল্পনার ন্যায় অস্বাভাবিক ও অবাস্তব কল্পনা করিবার বিন্দুমাত্র উপায় বৈজ্ঞানিকের নাই—তাঁহার কল্পনা সীমাবদ্ধ ও পরীক্ষার দ্বারা প্রামাণ্য।

অনেক সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া এইরূপ সীমাবদ্ধ কল্পনা-শক্তির প্রয়োগ এবং পরীক্ষালব্ধ ফলের অর্থ নিরূপণ দ্বারা অতি বৃহৎ আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। আবিষ্কর্ত্তার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা, সুতীব্র একাগ্রতা এবং সংস্কারমুক্ত মণীষা এই সকল আবিষ্কারের জন্য মূলত দায়ী, ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই সকল গুণের যে-কোন একটির অভাবে এই সকল মূল্যবান তথ্য আবিষ্কারের গৌরব হইতে তাঁহারা যে বঞ্চিত হইতেন তাহা নিশ্চিত সত্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সামান্য ঘটনা হইতে কয়েকটি বৃহৎ আবিষ্কারের ইতিহাস বিবৃত করিতেছি।

বিংশ শতাব্দীর কর্ম্মব্যস্ত যুগে সময় মাপিবার যন্ত্রের মূল্য সম্বন্ধে ছোট বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই সচেতন। সময় মাপিবার আদি যন্ত্র ছিল বালুঘড়ি, জলঘড়ি প্রভৃতি। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ইহা ব্যবহার করার কোনই উপায় ছিল না। সমষ্টিগত প্রয়োজনেই মাত্র ইহার ব্যবহার সম্ভব ছিল। দোলকের তথ্য আবিষ্কার করিয়া উনিশ বৎসর বয়স্ক কিশোর গ্যালিলিও গ্যালিলাও-পরবর্ত্তী কালে ঘড়ি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন অতি সামান্য একটি ঘটনা উপলক্ষ করিয়া!

সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে গ্যালিলিওর জীবনকাহিনী বৈচিত্র্যপূর্ণ। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী রোম নগরীতে অমর চিত্রশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো করিলেন পরলোকগমন, আর পিসা নগরীতে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও ঠিক সেই দিনই প্রথম দেখিলেন আলোকরশ্মি।

পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের ছাত্র কিশোর গ্যালিলিওর বয়স তখন সবে উনিশ বৎসর—সন্ধ্যার স্বল্পালোকে একদিন যখন তিনি গির্জ্জায় প্রার্থনানিরত শূন্য মনে, তখন স্বপ্নাবিষ্টভাবে লক্ষ্য করিলেন, গির্জ্জার ছাত হইতে ঝুলান একটি আলো কেমন সুন্দর দোল খাইতেছে। আলোকটির প্রতি নির্নিমেশ নেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গ্যালিলিওর মনে হইল যেন ধীরে ধীরে দুলিতে গেলেই আলোটির দোলন কাল সমান মনে হইতেছে—অর্থাৎ এক কোণ হইতে যাত্রা করিয়া অন্য কোণে পৌছিয়া পুনরায় পিছাইয়া পুরাতন স্থানে আসিতে আলোটির প্রত্যেকবার একই সময় লাগিতেছে। ঘড়ি তখন মানুষের কল্পনার বাহিরে, সঠিক সময় নিরূপণ করিবার উপায় কি? নাড়ীর স্পন্দনের সহিত মিলাইয়া গ্যালিলিও দেখিলেন সত্যই আলোকবর্ত্তিকার প্রত্যেক দোলনেই সমান সময় লাগিতেছে। গির্জ্জার ঐ আলোকবর্ত্তিকাটি কত রজনী নিরলস দোলনে অতিবাহিত করিয়াছে—কত সহস্র নরনারীর সম্মুখে দুলিয়া দুলিয়া কত সুবৃহৎ সত্য আবিষ্কারের সন্ধান দিয়াছে—কিন্তু তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিচারশক্তি স্ফুরণ করিতে পারে নাই। গ্যালিলিও গৃহে ফিরিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন ও দোলকের মূল তথ্য আবিষ্কার এবং "Pulselogia" বা স্পন্দন পরিমাপক যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন। সমস্ত চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক সমাজ পরম আগ্রহের সহিত কিশোর বৈজ্ঞানিকের এই নবাবিষ্কৃত সত্য ও উদ্ভাবিত যন্ত্র অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে হিউগেনস্ দোলক সাহায্যে ঘড়ি উদ্ভাবন করিয়া মানব সভ্যতাকে যথার্থ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। আজ আমাদের ঘরে ঘরে দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যতা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করিতেছে।

সিনেমা শিল্পকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান সভ্যতাকে কল্পনা করা রামহীন রামায়ণের কল্পনার ন্যায় অসম্ভব বলিলে সম্ভবত অত্যুক্তি করা হয় না। সিনেমাটোগ্রাফের মূলতত্ত্ব আজ সকলেই অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ; কিন্তু এমন দিন ছিল যখন ইহার মূলতত্ত্ব প্রধান এবং প্রবীণতম বৈজ্ঞানিকগণের নিকট সহজবোধ্য ত ছিলই না, এমন কি কোন আবিষ্কারের ফলে যে এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা সম্ভব হইতে পারে তাহাও ছিল তাঁহাদের কল্পনার বাহিরে। আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া এই অতি আশ্চর্য্যজনক তথ্যের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে—কিন্তু ঘটনাটির উল্লেখের পূর্ব্বে তথ্যটি সম্বন্ধে অতি সাধারণভাবে একটু আলোচনা করা দরকার। আমরা কোন পদার্থ তখনই দেখিতে পাই যখন পদার্থটি হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদের অক্ষি গোলকের ভিতর দিয়া উহার পশ্চাৎস্থিত রেটিনা নামক পর্দ্দার উপর পদার্থটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় এবং অনুভূতিবাহী এক প্রকার সূক্ষ্ম তন্তুর (nerve) সাহায্যে এই অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে সংক্রমিত হয়। বস্তুত পক্ষে রেটিনা হইতে মস্তিষ্কে যাইবার সময়

অথবা তাহার পরে কোন না কোন সময়ে এই উণ্টা প্রতিবিম্ব সহজ হইয়া প্রতিভাত হয় বলিয়া আমরা প্রত্যেক পদার্থই সহজ ভাবে দেখি। এক সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ কাল পর্য্যন্ত পদার্থটী আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিগ্যমান থাকে; অর্থাৎ ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি একখানি চাকার যে অংশ দেখিতে পাইতেছি এক সেকেণ্ডের এক দশমাংশ কাল পরে চাকাটি যতবার ইচ্ছা ঘুরিয়া যদি ঠিক পূর্ব্বতন অবস্থায় উপনীত হয় তবে ঘূর্ণায়মান চাকাখানিও স্থির অচল মনে হয়। ঘুরন্ত ইলেকট্রিক্ ফ্যানের ব্লেড গুণিতে হইলে এই তত্ত্বেরই সাহায্য লইয়া ছোট ছেলেরা চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া ব্লেড গুনিয়া দেয়; অবশ্য তত্ত্ব লইয়া তাহারা ব্যাকুল হয় না। সিনেমা বিজ্ঞানের মূলে ঠিক এই সত্যই বিগ্যমান। যদি চাকাখানি নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ে পূর্ব্বতন অবস্থায় ফিরিয়া না আসে তবেই মনে হইবে ইহা ঘুরিতেছে বা চলিতেছে। ফটো তুলিবার গতি ও সেই ফটো দেখাইবার গতির সমন্বয় সাধিত করিয়াই বর্ত্তমানে সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকগণ করিয়াছেন।

রগেট ছিলেন জনৈক চিকিৎসক। ১৮৪২ খৃঃ এক সুপ্রভাতে তিনি তাঁহার বসিবার ঘরে বসিয়া বন্ধ ভিনিসিয়ান কাঁচের জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া ছিলেন, মন ছিল অন্যমনস্ক। বাহির পথে চলিতেছিল একখানি ঘোড়ার গাড়ী, এমন কত গাড়ীই না সমস্ত দিন রাত্রি ধরিয়া চলে, আর রগেটের ন্যায় কত অন্যমনস্ক বা পর্য্যবেক্ষণশীল দর্শক বন্ধ কাঁচের ভিতর দিয়া তাহা দেখে। হাজার হাজার বৎসরের পৃথিবীতে ইহা নূতনও নহে গুরুতরও নহে। গাড়ীখানি চলিতেছিল বাহির পথে, আর ঘরের ভিতর রগেট চক্ষু উঠাইয়া নামাইয়া জানালার ফাঁকে দেখিতেছিলেন গাড়ীখানি। জানালার কাঁচের ফাঁকে, কাঠের শাসিগুলিতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি ব্যাহত হইতেছিল। রগেট আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিলেন, গাড়ীখানিকে অচল মনে হইতেছে। রগেট বিস্মিত হইলেন, কিন্তু নিজের এই দৃষ্টিবিভ্রমকে উপেক্ষা না করিয়া তত্ত্বানুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং তাহারই ফলে আবিষ্কৃত হইল এক মহান তথ্য—যাহার সুষ্ঠু প্রয়োগে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে বিংশ শতাব্দীর এই বিশিষ্ট সভ্যতা।

গাছ হইতে আপেল পড়িতে দেখিয়া ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানকে শুধু সমৃদ্ধ করেন নাই, ইহাকে দিয়াছেন গতি। যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নিউটনের বিজ্ঞানসাধনা সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত, তাই তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতেই গাছ হইতে ফল মাটিতে পড়ে কিন্তু নিউটনের পূর্ব্বে এই সহজ সত্যের মূলতত্ত্ব লইয়া কেহই আলোচনা করেন নাই বা করিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই—অথচ ইহারই মধ্যে লুক্কায়িত ছিল বিজ্ঞানের এক অতি গূঢ় তত্ত্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী দেশের অসহ্য শীতে একদা এক সন্ধ্যায় মণ্টিগলফায়ার পরিবারের দুই ভদ্রলোক চিম্‌নির পাশে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, কোন ক্ষুদ্র বৃহৎ আবিষ্কারের সম্ভাবনা তাঁহারা কোন দিনই করেন নাই। এ গল্প ছিল নিতান্ত পারিবারিক ব্যাপার—যাহার না ছিল কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য, না ছিল কোন ধারাবাহিক পরিণতি। তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন কতকগুলি পাত্‌লা কাগজের বাক্স আগুনের উপর ধরিলে স্বভাবতই উপরে উঠিতে থাকে এবং পরিশেষে চিম্‌নির নলের মধ্যে ঢুকিয়া পুড়িয়া যায়। ইহা দেখিয়া দুই ভাইই আশ্চর্য্য হইলেন এবং ইহার কারণ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা এবং পরস্পর আলোচনা আরম্ভ করিলেন। অবশেষে অনেক আলোচনার পর তাঁহারা এ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এবং অনুরূপ অবস্থায় বৃহত্তর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যতা নির্দ্ধারণের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল গরম হইয়া বাক্সের অভ্যন্তরস্থ বায়ু পাত্‌লা হইয়া যাইতেছে এবং নিম্নস্থ ঘন বায়ুর ঊর্দ্ধচাপে বাক্সটি ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে। পরীক্ষার উদ্দেশে তাঁহারা ঈষৎ বড় একটি বেলুন প্রস্তুত করিয়া তাহার নীচে খানিকটা কয়লা জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বেলুনটি ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিল। আবিষ্কৃত তথ্যের সত্যতা দর্শনে মণ্টিগল্‌ফয়ার ভ্রাতৃদ্বয় ক্রমেই উল্লসিত হইতে লাগিলেন এবং আরও বৃহৎ বেলুন আরও ঊর্দ্ধে তুলিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশেষে একদা এক অপরাহ্ণে তাঁহারা বিস্মিত ফরাসী জনমণ্ডলীর সম্মুখে একই রকম উপায়ে একটি বৃহদায়তন বেলুন প্রায় এক মাইল ঊর্দ্ধে তুলিতে সক্ষম হইলেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে এরোপ্লেন প্রভৃতি আবিষ্কারে মানুষ কত না পরিশ্রম করিয়াছে এবং সে পরিশ্রম কি সুন্দরভাবেই না সফল হইয়াছে!

খৃষ্ট জন্মের ২৮৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশে প্রসিদ্ধ দার্শনিক আর্কিমিডিস জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানী ও গুণী বলিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া আর্কিমিডিস্ আজও জগৎ বিখ্যাত। সিসিলির রাজা হায়েরো, একদিন একখানি মূল্যবান স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করিয়া আর্কিমিডিস্‌কে অনুরোধ করিলেন, দেখিয়া দিতে ঐ মুকুটখানি সত্য সত্যই খাঁটি সোনার কি-না। মুকুটখানি ভাঙ্গা চলিবে না—কাটা চলিবে না। আর্কিমিডিসের আহার নিদ্রা দূরে গেল—শুধু এক চিন্তা, এক ধ্যান—কি ভাবে না ভাঙ্গিয়াও মুকুটখানি খাঁটি সোনার কি-না পরীক্ষা করিতে পারা যাইবে। সম্ভব-অসম্ভব কত না রকমের কত না উপায় তিনি মনে মনে কল্পনা করিলেন কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হইল না। অবশেষে একদিন তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া পরিপূর্ণ জলের টবের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও চিন্তাক্লিষ্ট মনে টবের ভিতর নামিয়া পড়িলেন। আর্কিমিডিস্ টবের ভিতর প্রবেশ করিতেই খানিকটা জল উপচাইয়া পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আর্কিমিডিসের নয়নদ্বারে উদ্‌ঘাটিত হইল বিজ্ঞানের এক অতি মূল্যবান সত্য ও মূল তথ্য। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ইউরেকা, ইউরেকা, অর্থাৎ আমি পাইয়াছি—আমি পাইয়াছি!

কোন তরল পদার্থের মধ্যে অন্য একটি বস্তু ফেলিয়া দিলে বস্তুটি সমান আয়তনের তরল পদার্থ স্থানচ্যুত করে। বস্তুটির ওজন এবং তাহার আয়তন জানিতে পারিলে এটি সম-পরিমাণ জল হইতে কতগুণ

ভারী তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও খাদ মিশান স্বর্ণ উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব এক হইবে না। এই ভাবে আর্কিমিডিস নির্ণয় করিলেন—হায়েরোর মুকুটে খাদ মিশান আছে কি-না!

আধুনিক কালের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অধ্যাপক রামন্ যে মহান আবিষ্কার করিয়া বিশ্বের দরবারে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহারও মূলে রহিয়াছে এইরূপ একটি অতি সাধারণ ঘটনা। অধ্যাপক রামন্ একবার যখন ভূমধ্যসাগর দিয়া জাহাজে যাইতেছিলেন তখন দিনের পর দিন সমুদ্রের নীল জলের দিকে চাহিয়া তাঁহার কল্পনার রুদ্ধ দ্বারে সমুদ্রের ঐ বিরাট জলরাশি নীল কেন এই প্রশ্ন কতবার উদয় হইয়াছিল তাহার সঠিক হিসাব কে দিতে পারে? রামন্ লক্ষ্য করিলেন সমুদ্রের নীল বর্ণও পরিবর্ত্তিত হয় এবং আকাশের বর্ণবিবর্ত্তনের সঙ্গে সমুদ্রের বর্ণান্তরের হয়ত বা কোন সম্বন্ধ আছে। চিন্তাধারার এই সূত্র ধরিয়াই আবিষ্কৃত হইল—'রামন্ এফেক্ট'। অনন্তকাল সমুদ্র আছে—আর অনন্তকাল বৈজ্ঞানিক তাহার বর্ণ ও বর্ণান্তর দেখিয়া আসিয়াছেন—ইহার কারণ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ আলোচনা কয়জনই বা করিয়াছেন? অবসর মুহূর্ত্ত যাপনের ব্যক্তিগত চিন্তাবিলাস হইতে কত বড় তথ্যই না আজ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধির ভয়ে আর উদাহরণ যোগ করা সঙ্গত মনে করি না। উপরের দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা সহজেই বোঝা যাইবে যে, ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া সাধারণ লোকে যাহা উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের নিকট তাহাই হইয়া দাঁড়ায় সত্যের উৎস—জ্ঞানের খনি।

নব কাব্য-কীর্ত্তন

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়
হয় জোর পাথরের বৃষ্টি,
বাক্যের তরজায় আধুনিক পর্য্যায়
নব নব ভাব কত সৃষ্টি।

এই যুগে ছাপো তাই ভয় ডর কিছু নাই
নব্যের ঠাঁই আজ উচ্চ,
কাব্যের ভাণ্ডারে খরগোসে গণ্ডারে
টানাটানি করে ধরি পুচ্ছ।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়
অম্বুদে রকমারি বর্ণ
তাহে কত ছবি ফোটে সাপ ব্যাঙ জেগে ওঠে
বিড়ালের লম্বা সে কর্ণ।

জীবনের ধর্ম্মের, রক্তের চর্ম্মের
মর্ম্মের রস নিয়ে কাব্য
সত্যের দরজায় নবযুগ-পর্য্যায়
অভাব্য তাই আজি ভাব্য।

হের তাই কবিতায় নব কবি দরশায়
বস্তুর দস্তুর মূল্য,
মাছি মাংসের গায় মাছি ভন্ করে হায়
রস-ভেঁট নাই এর তুল্য।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়
বিদ্যুৎ চমকায় ঐ যে
ধামা নিয়ে বউ যায় শিরে তার ভেজে হায়
এক্ষুণি ভাজা তার খৈ যে।

রাস্তায় গাড়ি যায় কর্দ্দম লাগে হায়
বাবুদের পাঞ্জাবী ধুতিতে,
ঠিক যেন মাংসের গাঢ় রস-অংশের
ছোপ লাগে হোটেলের রুটিতে।

মাতালের চীৎকার ভেঙে দেয় নিদ্ কার
রাস্তার উপরের কক্ষে—
সিঁড়ি-পথ নেয় খুঁজি যায় চলি সোজাসুজি
ঘুম চায় কার নব বক্ষে।

নিশীথের দ্বারে রোজ কে কাহার করে খোঁজ,
নিশাচর পেহ্লাদ জানিও
কাব্যের মন মোর এরা খাঁটি রস দেয়
চুপ করে এই কথা মানিও।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়
কর্দ্দমে পিচ্ছল পথ যে
হর্দ্দম তবু হায় সেই পথে রোজ ধায়
"হিলম্যান" "হুইপেট" রথ যে।

কাব্যের থালিকায় থাকে কি গো খালি হায়
গোলাপের পল্লব-সজ্জা,
থাকে তাতে ইট চুণ রিকশার ঠুন্ঠুন
মেসিনের কত কল কব্জা।

নব কবিতার মাঝে আরো কত ভাব রাজে
কাঁদে কত বঞ্চিত-মর্ম্ম,
আসে তারা ছুটে আসে মুক্তির পাশে পাশে
বন্ধন ভেঙে চলা ধর্ম্ম।

কাব্যের দরজায় ঘন মেঘ গরজায়
ঘর্ম্মের জল ঝরে শ্রাবণে,
পথ ঘাট পিচ্ছল ভাব-রস উচ্ছল
চৌদিক ভেসে যায় প্লাবনে।

কয়লার খনি মাঝে কুলিনীর চুড়ি বাজে,
মৃত্যুর বুকে জ্বলে ল্যাম্প,
স্যাঁৎসেঁতে আঁধিয়ার ওঠে নামে হাতিয়ার
কর্ম্মের ঠাঁই সেই ড্যাম্প।

একাকিনী পথ-বুকে ভিক্ষুণী কাঁদে দুখে,
তক্ষুণি টানি তারে বক্ষে,
অঙ্গের পরশন দেহে আনে হরষণ
কী ভিক্ষা জাগে তার চক্ষে।

মেছুনির পুঁটি মাছে প্রেম-বাস লেগে আছে,
চাহনির ছুরি তার বাঁকা সে
আঁধারের কোলে যেন বিদ্যুৎ প্রভা হেন
বাদলের ঘন নিশি আকাশে।

শিল্পী আর মহাশিল্পী

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব), বার-য়্যাট্-ল

অন্তহীন বিশ্ব !

শিল্পী তাঁ থেকে রচনা করেছে ক্ষুদ্রতর আর এক বিশ্ব ! মহাশিল্পীর বিরাট বিশ্বের মতই শিল্পীর এ ক্ষুদ্র বিশ্বটীও এক দিক থেকে যেমন সীমার বন্ধনে আবদ্ধ, অন্যদিক থেকে তেমনি সীমার অতীত—অন্তহীন !

উভয় শিল্প-সাধনাতেই আছে কল্পনার খেলা ! উভয় শিল্প-সাধনাতেই আছে পরিণতির প্রয়াস ; উভয় শিল্পসাধনাতেই আছে অপূর্ণতার মর্ম্মব্যথা !

শিল্পী কি মহাশিল্পীর সন্তান ?

পিতার যন্ত্রপাতি নিয়ে সে কি পিতারই বিরাট সাধনায় রত ? তার সাধনায় পিতার কি কোন প্রয়োজন আছে ?

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি তুমি আঁকছ ? কেনই বা তুমি আঁকছ ? তোমার আঁকা ছবির কি কোন প্রয়োজন আছে ?

শিল্পী বললে, আঁকছি, যা মাথায় আসছে তাই ! না এঁকে থাকতে পারিনা, তাই আঁকছি। প্রয়োজন না থাকলে সমস্ত বিশ্ব-শক্তি আঁকার দিকে আমাকে কেন তাড়িয়ে নিয়ে যায়, বল দেখি ?

আমি বললুম, কি তোমার মাথায় আসে, আমায় বল !

শিল্পী বললে, যা নাই, আর যা থাকা উচিত, তাই আমার মাথায় আসে ; আর, তাই আমি আঁকি !

আমি বললুম, উদ্দেশ্য ?

শিল্পী বললে, থাকা উচিত—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য আর কি ?

মহাশিল্পীকে বললুম, আপনি কি আঁকছেন ? আর কেনই বা আঁকছেন ?

তিনি বললেন, যা মাথায় আসে তাই আঁকি, আর না এঁকে থাকতে পারি না, তাই আঁকি !

আমি বললুম, কি মাথায় আসে, তাই আমায় বলুন !

মহাশিল্পী বললেন, যা নাই, আর যা থাকা উচিত, তাই আমার মাথায় আসে, আর তাই আমি আঁকি !

আমি বললুম, হেঁয়ালি !

মহাশিল্পী বললেন, সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ; অসুন্দরকে তাড়াতে চাই ; বিদ্যাকে আনতে চাই ; অবিদ্যাকে বিদায় দিতে চাই ; শ্রেয়কে ওঠাতে চাই ; অ-শ্রেয়কে নামাতে চাই !

আমি বললুম, যা নিয়ে শিল্পীর কারবার, আপনারও দেখছি তাই নিয়ে কারবার !

মহাশিল্পী বললেন, তা ত বটেই !

আমি বললুম, সে কি আপনার শিষ্য ?

মহাশিল্পী বললেন, শিষ্য আমার মনের কথা জানবে কি করে ?

আমি বললুম, কে সে, তা হলে ?

মহাশিল্পী বললেন, সন্তান।

আমি বললুম, তার মানে ?

মহাশিল্পী বললেন, তার অন্তর আমার অন্তরেরই প্রতিদ্বন্দ্বী !

আমি বললুম, তার জীবনে তাহলে এত ব্যর্থতা কিসের জন্য ?

মহাশিল্পী বললেন, আমার জীবনও তো ব্যর্থতায় ভরা !

আমি বললুম, তাহলে বলুন, আপনার ক্ষমতারও সীমা আছে ?

মহাশিল্পী বললেন, সীমার সৃষ্টি আমি করি, আবার সীমাকে অতিক্রমও আমিই করি !

আমি বললুম, শিল্পীরা এই একই কথা বলে, এর সার্থকতা কোথায় ?

মহাশিল্পী বললেন, সুন্দরের প্রতিষ্ঠায়, সৃষ্টির আনন্দে !

আমি বললুম, শিল্পীও তাই বলে !

মহাশিল্পী বললেন, আমিই এ তত্ত্ব তাকে শিখিয়েছি !

আমি বললুম, শিল্পীর সাধনার আপনার কি প্রয়োজন ? আপনি তো প্রয়োজনের উর্দ্ধে !

মহাশিল্পী বললেন, কে বললে আমি প্রয়োজনের উর্দ্ধে ? সমস্ত সৃষ্টিই তো আমার প্রয়োজনের অকাট্য প্রমাণ ! শিল্পীর কল্পনা দিয়েই আমি রূপের ধ্যান করি ; শিল্পীর কামনা দিয়েই আমি রূপের সাধনা করি ; আর শিল্পীর তুলি দিয়েই আমি রূপের ছবি আঁকি !

আমি বললুম, এতক্ষণে বুঝলুম !

মহাশিল্পী বললেন, সহস্র মুখ দিয়ে কথা বলছি, তোমার না বোঝাই বিচিত্র !

সাব্‌মেরিণের কথা

কাফী খাঁ

জলযুদ্ধে সাবমেরিণের প্রয়োজনীয়তার কথা হইলেই যুদ্ধের কয়েকটী মূল নিয়ম জানা দরকার। সাধারণতঃ মানুষে মানুষে বা পালোয়ানে পালোয়ানে লড়াইতে যে নিয়ম, যুদ্ধ ব্যাপারেও মূলত সেই একই নিয়ম। প্রথম ধাক্কাতেই বিপক্ষকে আচ্ছা করিয়া চাপিয়া ধরা গেল, কিন্তু তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত কাবু করিতে না পারিলে যুদ্ধের কোনও সুফলই হয় না। কুস্তিতে বা ঘোড়দৌড়ে বা যে কোনো প্রতিযোগিতায় সর্ব্বদাই দেখা যায় যাহার দম বেশী সে-ই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হয়। যুদ্ধেও এই 'শেষ মার' যে দিতে পারে তাহারই জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু লড়াই করিতে করিতে কিছুক্ষণ লড়াই বন্ধ করিয়া বিপক্ষকে যদি দম লইতে সাহায্য করা হয় তবে সে লড়াইয়ে জয়ী হওয়া অসম্ভব। এই কারণেই জর্ম্মানী এবার পোল্যাণ্ড জয়ের পর খুব চেষ্টা করিযাছিল যাহাতে বৃটেন যুদ্ধ বন্ধ করে অর্থাৎ জর্ম্মানীকে দম লইবার ফুরসৎ দেয়। (ইংরেজীতে একটা কথাই আছে—Dont let grass grow under your feet)। যুদ্ধ ব্যাপারে বিপক্ষকে যাহাতে খুব শীঘ্র দুর্ব্বল করিয়া ফেলা যায় এইরূপ একটা জোর চেষ্টা উভয়পক্ষের মধ্যেই চলে, বিশেষত বিপক্ষদল যদি খুব শক্তিমান ও দুর্দ্ধর্ষ হয়; কারণ সম্মুখ সমরে তো আর ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া ওঠা সম্ভব নয়, তাই। বৃটেনও লড়াই না করিয়া বিপক্ষকে কাবু করিবার পদ্ধতি এতকালের অভিজ্ঞতার পর এত ভালভাবে শিখিয়াছে যে প্রতিটী বড় যুদ্ধেই বৃটেন সর্ব্বদা বিপক্ষকে জলপথে অবরোধ (Blockade) করিয়া তাহাকে উপবাস করাইয়া আত্মসমর্পণ করাইয়া আসিতেছে। নেপোলিয়ান নিজেই বলিয়াছেন, "England never wins a battle except the last one;" জর্ম্মানীও তাই বৃটেনের মত দুর্দ্ধর্ষ শক্তিকে কোনও রকমে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া তিলে তিলে তাহার জাতির শরীরের রক্তক্ষয় করাইয়া দুর্ব্বল করিবার চেষ্টা করিতেছে (hæmorrhage and collapse); **সেই জন্যই এই সাবমেরিণ দিয়া আক্রমণের পন্থা।** বৃটেনেরও এই বাণিজ্য জাহাজগুলির পৃথিবীময় সর্ব্বদা যাতায়াত করাটা তাহার শরীরের রক্ত চলাচলের ন্যায় জীবনীশক্তির অবলম্বনের মত। সেইজন্য বৃটেনের বাণিজ্য নষ্ট করা বৃটেনের রক্তক্ষয় করারই নামান্তর।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় সাবমেরিণের প্রয়োজনীয়তা কোন্ খানে এবং কি জন্য খুব বড় বড় নৌশক্তিরা (যেমন বৃটেন ও আমেরিকা) খুব অধিকসংখ্যক সাবমেরিণ তাহাদের নৌবহরে রাখিবার চেষ্টা করেন। বিশেষজ্ঞরা সেইজন্যই বলিয়া থাকেন, Submarine is a weapon for the weaker power; বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সাবমেরিণ কেবল লুক্কায়িত ও অতর্কিতভাবে শত্রুকে আক্রমণ করে এবং অনেকটা ছোরা বা পিস্তলের আঘাতে বা অতর্কিতে সাপে কামড়াইবার মত বিপক্ষকে ঘায়েল করিবার চেষ্টা করে। ইহাতে প্রথম দিক দিয়া বিপক্ষদলের খুব রক্তক্ষয় হইতে থাকে বটে, বিশেষত যতদিন পর্য্যন্ত বিপক্ষদল সাবধান না হইতে পারে ও সাবমেরিণ আক্রমণের প্রতিষেধক বা অন্য কোন প্রতিআক্রমণের উপায় উদ্ভাবন না করিতে পারে। পাঠকগণ গত মহাযুদ্ধের কথা জানেন এবং এবারকার যুদ্ধেও দেখিয়া থাকিবেন যে, যুদ্ধের প্রথম দিক দিয়া সাবমেরিণের আক্রমণে অনেক জাহাজ ডুবি ও প্রাণক্ষয় হইতে থাকে; কারণ তখন বিপক্ষীয়েরা সাবমেরিণের বিরুদ্ধে ততটা প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু যত সময় যায় ততই তাহারা প্রতিবিধানের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে থাকে এবং কিছুকাল পর আর সাবমেরিণের হাতে পূর্ব্বেকার অনুপাতে তত বেশী জাহাজডুবির সংবাদ পাওয়া যায় না।

সাবমেরিণ জিনিষটা যে আসলে কি ধরণের জাহাজ, আমাদের সে সম্বন্ধে কাহারও স্পষ্ট তেমন কোন ধারণা নাই। মোটামুটি এইটুকুই আমরা বুঝি যে, ইহা ডুবুরি জাহাজ, আর ডুব দিয়া ইহারা ভাসমান জাহাজগুলির প্রভূত অনিষ্ট করিতে পারে; ইহার মধ্যে টর্পেডো থাকে, আবার কামানও থাকে; ইহারা জলে ডুবিয়া জলের উপরকার জিনিষ সব দেখিতে পায় ইত্যাদি। কিন্তু আসলে এই

ডুবুরি জাহাজ মানুষের জীবনের পক্ষে যে কতদূর মারাত্মক জিনিষ (যাহাদের জাহাজকে টর্পেডোর আঘাতে ডুবাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের জীবনের পক্ষে, আবার যাহারা সাবমেরিণকে চালনা করে তাহাদের জীবনের পক্ষেও) আমাদের অনেকেরই সে সবের কোনও আন্দাজ নাই।

সাবমেরিণের বিষয় খুব ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে একটা কথা ভাবিলেই জিনিষটা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, ইহার মূল কাজ হইতেছে "যুদ্ধের সময় জলের অভ্যন্তর দিয়া যাতায়াত করা" অর্থাৎ এমন একটা জিনিষের ভিতর দিয়া ইহার চলাচলের দরকার হয়, যে জিনিষের কোনও স্বাভাবিক জ্ঞান জীবধর্ম্ম-হিসাবে মানুষের থাকিতে পারে না। ইহার মানে এই যে, মাটির উপর দিয়া চলাচল করা মানুষের স্বাভাবিক জীবধর্ম্ম। তাহা অপেক্ষা সামান্য অসুবিধা হইতেছে শূন্যের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা ও জলেব উপর দিয়া ভাসিয়া চলাচল করা; কিন্তু তাহাও মানুষের পক্ষে এত কঠিন নয়, কারণ মানুষ হাওয়ার মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। ঝড়ের নিয়ম, হাওয়া কোন্‌দিকে বহিলে কি ভাবে কাৎ হইয়া থাকা সুবিধা—এই সব মানুষ আপনা হইতেই বোধ করিতে পারে। আবার জলের উপর দিয়া সাঁতার কাটিয়া বা নৌকাযোগে চলাফেরা-ব্যাপারেও মানুষ সিদ্ধহস্ত। কিন্তু জলের নীচ দিয়া কি ভাবে চলাচল করিলে খুব সুবিধামত ঘোরাফেরা যায় (সে জ্ঞান একমাত্র মাছের পক্ষেই সম্ভব) তাহা মানুষের স্বাভাবিক জীবধর্ম্মের বাহিরে। এই কারণেই জলের নীচে থাকা অবস্থায় সাবমেরিণকে চালনা করা খুব সাবধানের ও ঝুঁকির কাজ।

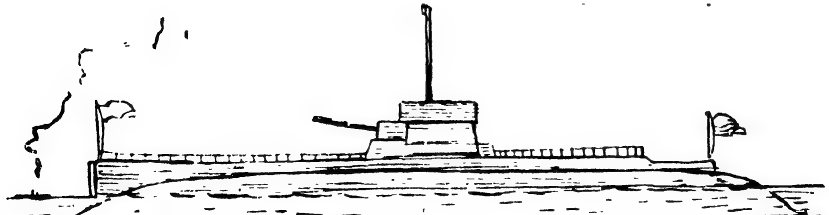

সাবমেরিণ জাহাজটী মোটামুটি চুরুটের মত গোল ও লম্বা। উহার মধ্যভাগটা মোটা ও দুধার ছুঁচালো হয়; উপরিভাগে কণ্ট্রোল টাওয়ারের মত একটা ঘর থাকে, তাহার সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগ দিয়া ডেকের মত রেলিং দেওয়া স্থান লম্বালম্বিভাবে জাহাজটীর দুধারের কোণা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই সবগুলির প্রয়োজন হয় যখন সাবমেরিণ জলের উপর ভাসিয়া সাধারণ জাহাজের মত চলাফেরা করে। বলা বাহুল্য, সাবমেরিণের চলাচল সর্ব্বদাই জলের উপর দিয়া এবং জলের নীচে যাওয়ার তাহার একমাত্র তখনই প্রয়োজন হয় যখন তাহাকে বিপক্ষীয় জাহাজের দৃষ্টি এড়াইতে হয় বা টর্পেডো দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে হয়।

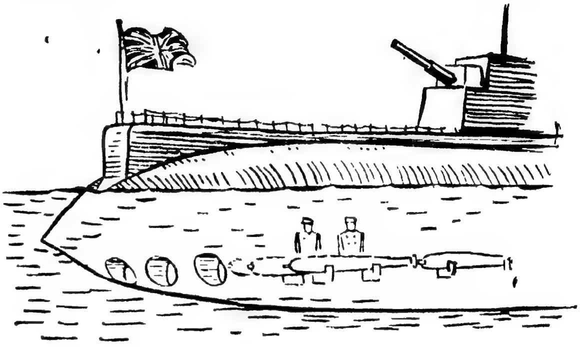

সাবমেরিণে সাধারণত দুই প্রকারের মারণাস্ত্র থাকে; তাহার একটী হইতেছে, তিন-চার ইঞ্চি মুখওয়ালা কামান এবং অপরটী টর্পেডো। কামানটী থাকে কণ্ট্রোল টাওয়ারের উপর (ইহার আসল নাম কোনিং টাওয়ার) এবং ইহার ব্যবহার জলের উপর ভাসিয়া থাকার সময়ই হয়, যথা—অন্য নিরীহ জাহাজকে জখম করা বা সাবমেরিণের পলায়নের সময় আক্রমণকারী জাহাজকে ঠেকাইয়া রাখা। টর্পেডোর ব্যবহার হয় জলের নীচে যাইয়া। তখন কোন যুদ্ধ জাহাজকে বা বিপক্ষীয় কোন মালবাহী জাহাজকে টর্পেডো ছুঁড়িয়া ডুবাইয়া দেওয়া হয়। এই টর্পেডো ছুঁড়িবার জন্য সাবমেরিণের খোলের সম্মুখভাগের ছুঁচালো দিকটায় তিন-চারিটী করিয়া মুখ থাকে; বড় বড় সাবমেরিণে ছয়টী করিয়া পর্য্যন্ত মুখ থাকে। এতগুলি মুখ থাকার কারণ এই যে সাবমেরিণ যখন টর্পেডো দিয়া বিপক্ষীয় জাহাজকে আক্রমণ করে তখন সব সময়েই যে তাহার টর্পেডো ঠিক লক্ষ্যভেদ

করিতে পারিবে বা ভেদ করিয়া জাহাজকে ভালভাবে জখম করিতে পারিবে তাহার কোনও স্থিরতা থাকে না, অথচ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার ঐ কাজ সারিয়া পলাইয়া যাইতে হয় ; গতিকেই এই অত্যল্প সময়ে একসঙ্গে যতগুলি টর্পেডো সমানে লক্ষ্যেতে ছোঁড়া যায় তাহার বন্দোবস্ত প্রতিটী সাবমেরিণেরই থাকে। এদিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া লক্ষ্যভেদ করিবার মধ্যেই যদি বিপক্ষীয় জাহাজ সাবমেরিণের অস্তিত্ব টের পায়, তবে সাবমেরিণের পলাইয়া যাওয়া বড় সহজ হইয়া উঠে না।

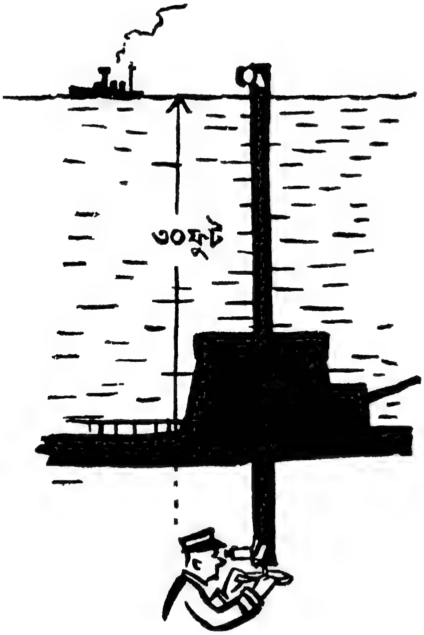

এবার সাবমেরিণের কতকগুলি কলকারখানার বিষয় বলা হইবে, যাহার সাহায্যে তাহার চলাফেরা করিতে হয়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, এই জাহাজগুলি কি রকম মারাত্মক ধরণে নির্ম্মিত হয় ; মারাত্মক এই হিসাবে যে, যাহারা ইহাতে কাজ করে তাহাদের জীবন সর্ব্বাপেক্ষা অসহায়। সাবমেরিণ জলের নীচে ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত গিয়া উপরের জিনিষ দেখিতে পায় ; অর্থাৎ তাহার জলের উপরিভাগের দেখিবার যে একটী লম্বা নলের মত জিনিষ আছে, যাহাকে পেরিস্কোপ বলে ; সে নলটীর অগ্রভাগ সাবমেরিণ হইতে সাড়ে ত্রিশ ফুট পর্য্যন্ত উপরে থাকে অর্থাৎ নলের মুখ জলের লেবেল হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি তফাৎ থাকে। এই জায়গাটীতে একজোড়া কাচের দুরবীণের মত চোখ আছে। উহাতে যে জিনিষের ছায়া পড়ে, তাহা ঐ নল বাহিয়া নীচে সাবমেরিণের ঘরে আর একটা আয়নাতে প্রতিফলিত হইয়া সেখানকার ক্যাপ্টেনের চোখে ধরা পড়ে। এই পেরিস্কোপ জিনিষটী কলিকাতার ফুটবল মাঠের দর্শকদের বেশ পরিচিত। বেষ্টনীর বাহির হইতে যাহারা খেলা দেখিতে চেষ্টা করে তাহাদের অনেককেই একটা পেরিস্কোপ হাতে লইয়া যাইতে দেখা যায়। সাবমেরিণের পেরিস্কোপটীর যে ভাগ জলের উপরে থাকে সেটাকে ক্যাপ্টেন ইচ্ছামত চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে পারেন এবং সমুদ্রের চতুর্দ্দিকের জিনিষ দেখতে পান।

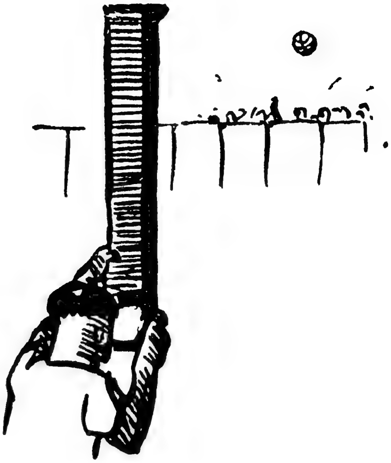

অনেকেই বোধ হয় ভাবিয়া থাকেন সাবমেরিণকে কি ধরণের ইঞ্জিন দিয়া চালনা করা হয়। বলা বাহুল্য, এত ওজনের একটা জাহাজকে সাধারণ মোটর ইঞ্জিনে চালানো সম্ভবপর নয়। আবার রেল বা জাহাজের ষ্টীম ইঞ্জিন দিয়াও চালানো যায় না, কারণ কয়লা রাখিতেই তো সমস্ত জাহাজ ভরিয়া যাইবে ; যুদ্ধ করিবে কোথায় ? তাই সাবমেরিণকে ডিশেল ইঞ্জিন বা মোটা তেলের ইঞ্জিন দিয়া চালনা করা হয়। জলের উপর সাবমেরিণের গতি ঘণ্টায় বিশ মাইল পর্য্যন্ত হয় ; কিন্তু জলের নীচে গেলে ইহার গতি প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়। তখন সাবমেরিণকে ব্যাটারীর সাহায্যে চালনা করা হয়।

এখন আসল প্রশ্নটা—যেটা সাবমেরিণেরই বিশেষত্ব,সেটা এই যে অত বড় একটা জাহাজ জলেই বা ডুব দেয় কেমন করিয়া, আবার প্রয়োজন মত ভাসিয়াই বা ওঠে কেমন

করিয়া? পদ্ধতিটা শুনিলে কিন্তু সকলেরই মনে হইবে যে কায়দাটা খুবই সোজা। সাবমেরিণের দুই ধার দিয়া লম্বালম্বিভাবে দুইটা চৌবাচ্চা রহিয়াছে এবং যখন ডুব দিতে হয় তখন সে চৌবাচ্চা দুইটার নীচে যে ফুটা আছে সেগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়, আর অমনি চৌবাচ্চা দুইটার মধ্যে সমানভাবে জল প্রবেশ করিতে থাকে, সাবমেরিণও তখন জলের ভারে ক্রমে ক্রমে ডুবিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের ঘরে একটা মিটারের ডায়াল-এর কাঁটা ঘুরিয়া দেখাইয়া দেয়—দশ ফুট, বিশ ফুট, ত্রিশ ফুট, চল্লিশ ফুট, পঞ্চাশ ফুট—এই রকম কত নীচে সাবমেরিণ নামিতেছে। জল যত ভরিবে সাবমেরিণও ততই জলের নীচে ডুবিতে থাকিবে। ফুটা বন্ধ করিয়া দিলেই সাবমেরিণ আর নীচে যাইবে না। অবশ্য এই প্লেনে সাবমেরিণকে স্থির করিয়া রাখার জন্য ইহার দুধারে দুইটা হাইড্রোপ্লেন আছে, জলের নীচে গেলেই সেগুলি চলিতে থাকে এবং তখন ইহারা সাবমেরিণকে সমান গভীরত্বে ও সমান প্লেনে রক্ষা করে।

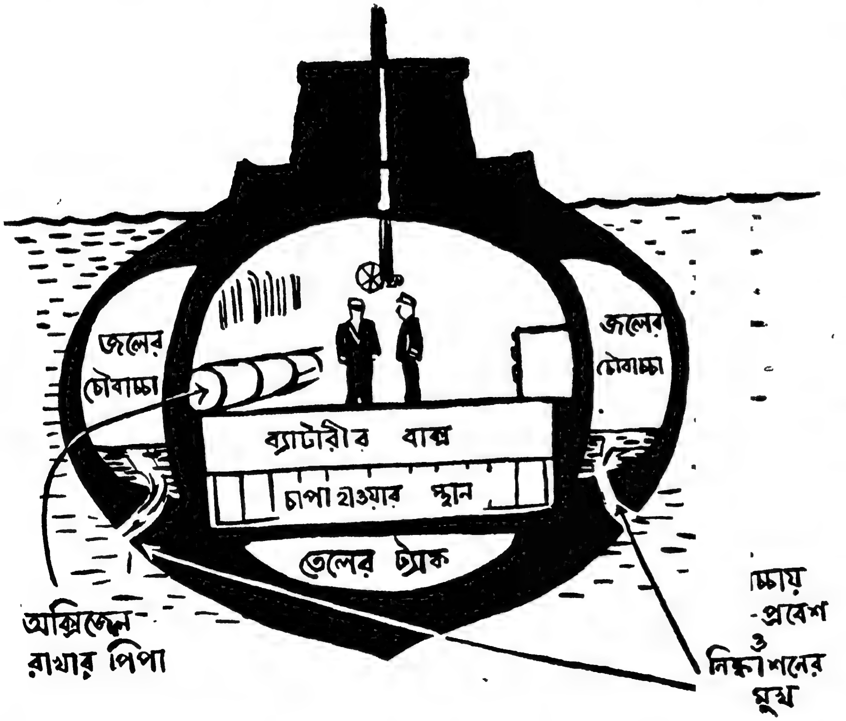

ইহা ছাড়াও সাবমেরিণকে আর একটী কলের সাহায্যে সমান প্লেনে রক্ষা করা হয়। পাঠকেরা বোধ হয় অনেকেই 'জাইরোস্কোপ' (Gyroscope) নামক একপ্রকার লাটিম দেখিয়াছেন, এগুলি ঘুরিবার সময় একটা বিশেষ প্লেন রক্ষা কয়িয়া চলে। এগুলিকে আমেরিকায় এক চাকার রেলগাড়ীর দুই পার্শ্বে রাখিয়া চালানো হয়, তাহাতে গাড়ী কখনও কাৎ হইয়া বেসামাল হয় না। সাবমেরিণও ইহাদের ব্যবহার করিয়া জলের মধ্যে ইহার সমতা বা প্লেন রক্ষা করা হয়।

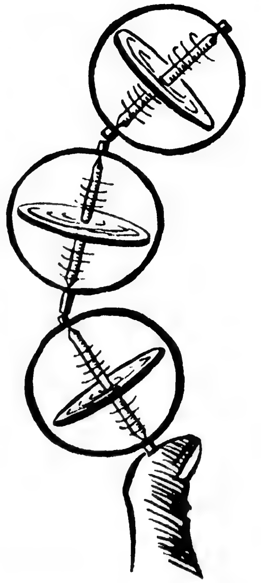

জাইরোস্কোপ লাটিম ! (এগুলি ঘুরিবার অবস্থায় কখনও পড়িয়া যায় না। যে কোন কাৎ অবস্থায় তখন ইহারা থাকিতে পারে)

এইবার সাবমেরিণকে কি করিয়া উপরে উঠানো যায় সেই প্রশ্ন ওঠে; অর্থাৎ তখন কথা হয়, কি ভাবে ঐ চৌবাচ্চার জলগুলিকে নিষ্কাশিত করা যায়। ইহা তো আর ডাঙ্গার উপরে অবস্থিত চৌবাচ্চা নয় যে ফুটা খুলিয়া দিলেই সব জল পরিষ্কার! জলের নীচেকার চৌবাচ্চা খালি করিতে হইলে জাহাজের আশে পাশে যে আন্দাজ সমুদ্র জলের চাপ রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী চাপ দিতে পারিলে তবে চৌবাচ্চার জল বাহির হইতে পারে। এজন্য সাবমেরিণের মধ্যে চাপা বায়ুর (compressed air) বড় বড় বাক্স আছে; চাপা বায়ু দিয়া চৌবাচ্চার জলে খুব বেশী চাপ দিয়া তবে ঐ জল বাহির করানো হয়; সাবমেরিণও তখন ক্রমে ক্রমে উপরে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। যত

জোরে ঐ চাপ প্রয়োগ হয়, জল নিষ্কাশন তত শীঘ্র হইতে থাকে, সাবমেরিণও তত তাড়াতাড়ি ভাসিয়া ওঠে।

সাবমেরিণের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা কলকরখানার গুদাম অর্থাৎ কলকারখানার পাইপ, পাম্প, মিটার, গ্যাস, ব্যাটারী, তেল, কলকব্জা ইত্যাদি; ব্যস্ আর কিছুই নাই। জাহাজের সমুদয় নীচের ভাগটা ভরা তেলের ট্যাঙ্ক; তাহারই উপরে সমগ্র জাহাজ ভরিয়া ব্যাটারীর বাক্স ও 'চাপা হাওয়ার বাক্স' (compressed air chamber); তাহার উপরে জাহাজ চালাইবার মোটরগুলি এবং ইহারই উপরে জাহাজের ঘরের মেঝে।

যুদ্ধে সাবমেরিণকে কি ভাবে ব্যবহার করা হয়? আমরা অবশ্য উত্তর করি—"কেন? শত্রুপক্ষীয় জাহাজ দেখিলেই ডুবিয়া গিয়া পেরিস্কোপ দিয়া তাহার দিক্‌নির্ণয় করা, আর টর্পেডো ছুঁড়িয়া দেওয়া! ব্যস্, যুদ্ধ জয় অবধারিত! আসলে কিন্তু ব্যাপারটী যে কি অসম্ভব রকমের কঠিন কাজ, তাহার সামান্য কিঞ্চিৎ এখানে বলিব। আজকালকার সংবাদপত্রে সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ-ডুবির সংবাদ অনেক কমিয়া গিয়াছে; বরং মাইনের বা চুম্বক মাইনের আঘাতে জাহাজ-ডুবির সংবাদই অধিক; কিংবা গত মহাযুদ্ধের সময়কার এম্‌ডেন-এর জাতীয় লুক্কায়িত যুদ্ধ জাহাজের আক্রমণে জাহাজ-ডুবির সংখ্যাই অধিক। তাহার মূল কারণ এই যে, সাবমেরিণের সাহায্যে যুদ্ধ চালনা আর তেমন নিরাপদের বিষয় নাই। ইহার প্রতিষেধক উপায় অনেক বাহির হইয়াছে, যথা—depth charge-এর আবিষ্কার। দ্বিতীয়ত, প্রতিটী মালবাহী জাহাজে সাবমেরিণ-ধ্বংসী বিশেষ ধরণের কামান বসানো। তৃতীয়ত, সাবমেরিণের গতিবিধির শব্দ ধরিবার জন্য বিশেষ ধরণের জলযন্ত্র বা হাইড্রোফোন। চতুর্থত, সাবমেরিণের প্রতিবন্ধক একপ্রকার বিশেষ ধরণের জাল। এ সকল ছাড়া সাবমেরিণের নিজেরই একটা অসুবিধা রহিয়াছে। তাহা এই যে, ইহাতে সর্ব্বদা ব্যাটারী চার্জ্জ করিয়া রাখিতে হয় এবং সর্ব্বদা তেল, চাপা হাওয়া ইত্যাদির পরিপূর্ণ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে হয়। তাহা নহিলে মধ্য-সমুদ্রেই সাবমেরিণ অচল হইয়া যাইবে। এদিকে, এই সব জিনিষের সামান্য অভাবের অবস্থায় যদি ইহাকে শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য ডুবাইতে হয় তবে সেটা শেষ ডুবই বলা চলে। কারণ, তখন ব্যাটারী বা চাপা হাওয়ার অভাবে তাহার আর উপরে ওঠা সম্ভব হইবে না এবং সমস্ত মাঝি-মাল্লা শুদ্ধ জাহাজটার সলিলসমাধি স্থির নিশ্চয় ধরিতে হইবে।

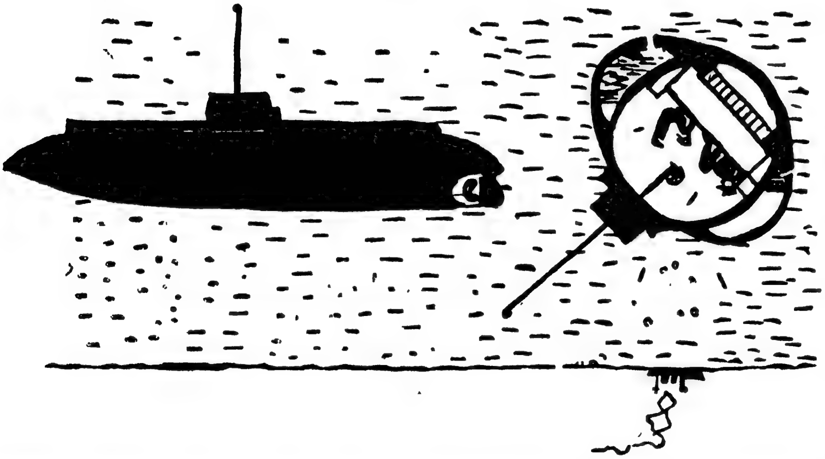

সাবমেরিণের আর একটী বিষয় হইতেছে ইহার তাল সমান রাখিয়া জলের নীচে নিজেকে স্থিরভাবে চালনা করা (যাহাকে ইংরেজীতে Ballast বলে)। জলের উপর বা আকাশে এ জিনিষটা সোজা, কিন্তু যাঁহারা ডুব-সাঁতার জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারেন এ জিনিষটা কত কঠিন ও কত শক্তিসাপেক্ষ। কারণ জলের নীচের (ঘনত্ব) Density ও মাটির উপরের বায়ুর ঘনত্বর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সাবমেরিণ যদি জলের নীচে তাল সামলাইতে না পারিয়া অত ওজনের কলকারখানা শুদ্ধ একবার কাৎ হইয়া বা উল্টাইয়া যায় (যথা, একধারের চৌবাচ্চার বেশী পরিমাণ জল ঢুকিতেছে, অথচ অন্য ধারেরটার কব্জা ভাল করিয়া খোলে নাই বা ওধারের চাপা হাওয়ার চাপ বেশী ইত্যাদি) তবে তাহার আর রক্ষা নাই। (একটা বাড়ী উল্টাইয়া তাহার মেঝে যদি ছাদে যায়, আর ছাদ যদি মেঝেতে ঘুরিয়া আসে ঠিক সেই অবস্থা আর কি!) তখন

জাহাজের সমুদয় তেল মাথার উপর উঠিবে আর নাবিকেরা সব উল্টাইয়া যাইবে! ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। তখন সকল কলকব্জার ক্রিয়া বন্ধ; জাহাজ তখন নিয়তির হাতে; নাবিকদের তখন তিলে তিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই সকল কারণেই নাবিকদের বাঁচাইবার জন্য অনেক উপায় ও কলকারখানার উদ্ভাবনের চেষ্টা হইয়াছে; কারণ এই সলিলসমাধি হইলে যে একেবারে নির্ঘাৎ মৃত্যু, এত বড় কঠিন সত্য সাবমেরিণের মাঝিমাল্লাদের নিকট আর নাই। এ পর্য্যন্ত পনর আনা সংবাদেই দেখা গিয়াছে যে, সাবমেরিণ একবার হঠাৎ ডুবিলে তাহাকে আর উঠানো যায় নাই। তাই সম্প্রতি কয়েকটী যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে যাহার সাহায্যে সাবমেরিণকে উপরে উঠানো যায়—অন্তত, বিশেষজ্ঞেরা তাহাই আশা করিতেছেন। তাহার মধ্যে একটীর নাম ডেভিস যন্ত্র এবং অপরটীর নাম ডাইভিং বেল যন্ত্র; কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও এখনও সাবমেরিণ জিনিষটা মানুষ-মারা-কল (death traps) হইয়া রহিয়াছে। কারণ, যদিও এই ডেভিস্ যন্ত্রের সাহায্যে চীনদেশে একটী বৃটীশ সাবমেরিণ হইতে উনপঞ্চাশ জনের মধ্যে উনত্রিশ জন লোকের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, তথাপি গত ১৯৩৯ সালের জুন মাসে থেটিস্ (Thetis) নামে যে সাবমেরিণটী একবার ডুবিয়া আর উঠিল না তাহার মধ্যেকার নাবিকদের রক্ষার জন্যও এই ডেভিস যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি উহা কার্য্যকরী হয় নাই। ডাইভিং বেল যন্ত্রটীর ব্যবহারের আবার একটু বিশেষত্ব আছে, কারণ সলিল সমাধিস্থ জাহাজটী সোজাসুজিভাবে অবস্থান করিলেই ইহা ব্যবহার করা চলে; জাহাজ সামান্য একটু তেড়ছাভাবে থাকিলেই আর ইহার ব্যবহার চলে না; কারণ এমনিতেই বুঝা যায় যে, তেড়ছাভাবে ঝুলানো থাকিলে ঘণ্টা বাজে না বা দোলকও নড়ে না। থেটিসের সময়ও এই যন্ত্রটীর ব্যবহার হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে দেখা গিয়াছিল থেটিস জলের মধ্যে তেড়ছা অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

এই সকল কারণেই সাবমেরিণের মাঝিমাল্লারা মাহিনার উপরেও অতিরিক্ত সেলামি পায় দৈনিক আট আনা হইতে আড়াই টাকা পর্য্যন্ত! কারণ তাহারা জানে যে জাহাজের ভিতর একবার আটকাইলে আর রক্ষা নাই, ইন্দুরের কলে পড়ার মত তাহাদের মরিতে হইবে। ইন্দুর তো তবু মুক্ত বাতাসের নিশ্বাস লইতে পারে, ইহারা তাহাও পায় না। সমস্ত জাহাজটুকুর মধ্যে যে সামান্য স্থান আছে, তাহার মধ্যে যে বাতাস, শুধু সেইটুকু! আবার তাহাও এতগুলি লোকের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ক্রমে ক্রমে দূষিত হইতেছে।

এইজন্য জাহাজের নীচে চোঙার মধ্যে অক্সিজেন ভরা থাকে এবং সেগুলি জাহাজকে জলে ডুবানো হইলেই খুলিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহাই বা দূষিত হাওয়াকে আর কতক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিবে? এই কারণেই জলের নীচে গেলেই নাবিকদের ধূমপান নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে বায়ু দূষিত হয়; অবশ্য দূষিত বায়ুকে চাপ দিয়া বাহির করবার রাস্তাও আছে। তবে জাহাজ উল্টাইয়া গেলে কলকব্জার সে শক্তিও থাকে না। তখন নিজেদের বিষাক্ত গ্যাসে নাবিকদের তিলে তিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই সব অবস্থায় নাবিকের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে। অনেকে মাথার গণ্ডগোলে পাগল হইয়া গিয়া জাহাজের কলকব্জা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। এই সব সময় ক্যাপ্টেন পিস্তল হাতে সকলকে স্থিরভাবে নিজ নিজ কাজে থাকিতে বাধ্য করেন। পাঠকগণ বোধ হয় ভাবিতেছেন যে, টর্পেডোর যে মুখগুলি রহিয়াছে সেগুলি খুলিয়া দিয়া তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইয়া গেলেই তো হয়! কিন্তু সাবমেরিণ যখন জলের একেবারে নীচে চলিয়া যায় তখন সেখানকার গভীর জলের চাপ এত ভয়ঙ্কর হয় যে, সেখানে মানুষ জলের মধ্যে গেলে একমুহূর্ত্তেই সে ঐ জলের ভীষণ চাপে হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া একেবারে তালগোল পাকাইয়া যাইবে। তাই অনেক সময় এই সব অবস্থায় নাবিকেরা দল বাঁধিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে, যথা—টর্পেডোগুলিকে ফাটাইয়া দেওয়া বা ঐ রকম কিছু।

সাবমেরিণ ধ্বংসের কি কি পদ্ধতি আবিষ্কার হইয়াছে এবং সাবমেরিণের গতিবিধি কি প্রকারে টের পাওয়া যায় এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাইবে। সাবমেরিণ ধ্বংসের আজকাল সেরা পদ্ধতি হইতেছে ডেপ্থ্ চার্জ; এই জিনিষটা হইতেছে বড় বড় তেলের পিপের ড্রামের মত কতকগুলি ড্রাম; তাহার ভিতরে বিস্ফোরক ভরা থাকে। এগুলিকে পাখীমারা গুল্তির ন্যায় একটা স্প্রীংয়ের মত জিনিষের সাহায্যে শূন্যের দিকে নিশানা করিয়া ছুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং সেটা পড়িবার সময় ঠিক সেই

বেগে জলে প্রবেশ করিয়া অনেক ভিতরে চলিয়া যায় ও জলের সংস্পর্শে আসিয়া কিছুদূর গিয়াই ফাটিয়া যায়। এদিকে সাবমেরিণও এত অসহায় কল যে, সে খুব গভীর জলের নীচে পলাইয়া থাকিতেও পারে না (কি জানি যদি সে জলের অতিরিক্ত চাপের জন্য আর না উঠিতে পারে); তখন হয় তাহাকে শত্রুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে হয়, না হয় জলের নীচেই সে ধ্বংস হইয়া যায়। সেইজন্য যখনই কোন জাহাজ সাবমেরিণের অস্তিত্ব টের পায়, তখনই সে সমুদয় স্থান জুড়িয়া সমানে অনেকগুলি ডেপ্‌থ্‌ চার্জ ছুঁড়িতে থাকে। কিছুক্ষণ পর যদি দেখা যায় যে, সমুদ্রজলে তেল ভাসিয়া উঠিয়াছে, তবেই বুঝিতে পারা যায় যে সাবমেরিণ ধ্বংস হইয়াছে।

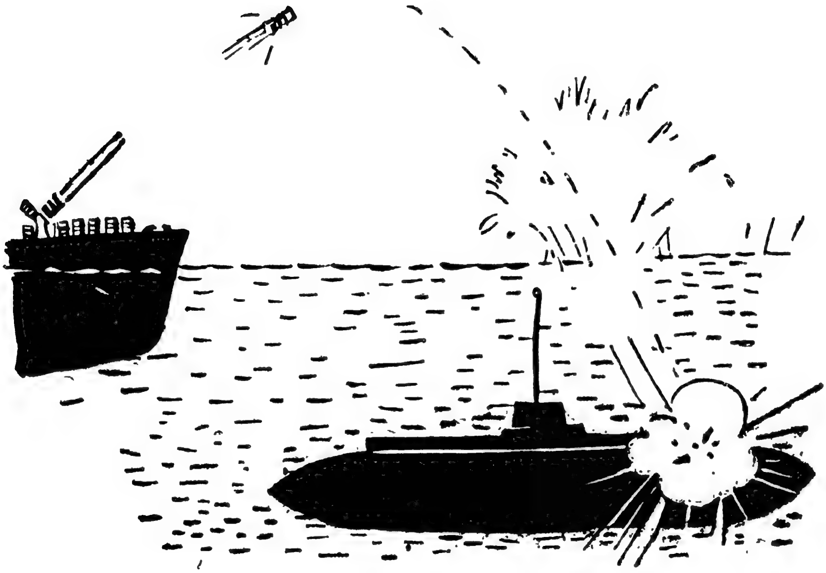

সাবমেরিণকে ধ্বংস করিবার আর একটী উপায় হইতেছে উহার উপর জাহাজ দিয়া ঢুঁ মারিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলা (ramming)। এই অবস্থায় সাবমেরিণ যত শীঘ্র সম্ভব জলে তলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে। তাই ক্ষতি হইবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা থাকে ইহার পেরিস্কোপের; কারণ ধাক্কা লাগিলে প্রথমেই পেরিস্কোপের ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা, যেহেতু ঐটীই সাবমেরিণের সকলের উপরে মাথা তুলিয়া থাকে। এইজন্য সাবমেরিণগুলিতে সর্ব্বদাই দুইটী করিয়া পেরিস্কোপ থাকে, একটী নামানো থাকে এবং অপরটী ব্যবহার হয়। সেটী ভাঙ্গিয়া গেলেই দ্বিতীয়টাকে উঠাইয়া ব্যবহার করা চলে। কারণ পেরিস্কোপ ভাঙ্গিয়া যাওয়া, আর সাবমেরিণ অন্ধ হইয়া যাওয়া একই কথা।

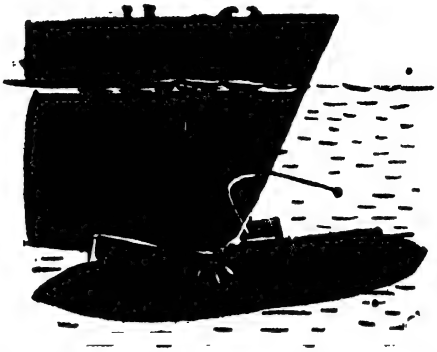

আর এক কথা। সাবমেরিণ লুকাইয়া জলের নীচে চলিবার সময় কখনও পেরিস্কোপের মাথাটী সমানে জলের উপর উঠাইয়া চলে না। মাঝে মাঝে উঠিয়া জলের উপরের চারিদিক দেখিয়া লয়, আবার তখনই জলের নীচে নামিয়া যায় ও চলিতে থাকে। উহার মূল কারণ এই যে, পেরিস্কোপটী সমানে জলের উপর থাকিয়া চলিতে থাকিলে সাবমেরিণের বেগের জন্য পেরিস্কোপের নলের দু ধার দিয়া জলের ধারা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বিপক্ষীয় জাহাজ তখনই সাবমেরিণের অস্তিত্ব টের পায়।

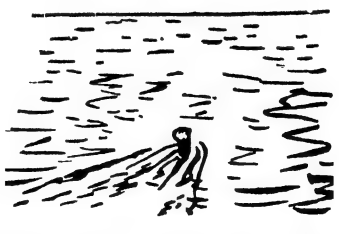

এই প্রসঙ্গে টর্পেডোর বিষয় কিছু জানা দরকার। টর্পেডোর মধ্যে বিস্ফোরক থাকে এবং উহাকে চালনা করে "চাপা হাওয়া" বা compressed air ; ইহার বেগ ঘণ্টায় চল্লিশ মাইলের অধিক হয় না। কিন্তু আসলে টর্পেডো নিশানা

করিয়া ছোঁড়া যে কি কঠিন তাহা অনেকেই জানেন না। প্রথমত যে জাহাজকে নিশানা করা হইতেছে সেটা কতদূরে অবস্থিত অর্থাৎ টর্পেডো অতদূর পৌছিয়া রীতিমত জোরে ঘা দিতে পারিবে কি-না তাহার হিসাব জানা দরকার। কারণ গোলাগুলির মত টর্পেডোরও কিছুদূর পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবার আন্দাজ বেগ থাকে, তাহার পর উহার বেগ চাপা হাওয়ায় ফুরাইয়া গেলে কমিয়া যায় এবং তখন কোন জাহাজে ঘা খাইলে ঐ টর্পেডো নাও ফাটিতে পারে। দ্বিতীয়ত জাহাজটী পাশাপাশি ভাবে আছে, না সম্মুখ ভাগ বা পশ্চাৎভাগ বা তেড়ছা বা কোণাকুণিভাবে রহিয়াছে—ইহা না জানিলে টর্পেডো ছুঁড়িয়া জাহাজকে ঘায়েল করা যায় না। তৃতীয়ত, জাহাজটী দাঁড়াইয়া আছে, না চলিতেছে এবং চলিলে কত বেগে চলিতেছে এবং টর্পেডো ছুঁড়িলে নাগাল পাইবে কি-না এবং নাগাল পাইলে ঠিক জায়গায় আঘাত করিতে পারিবে কি-না—এ সব অঙ্ক কষিয়া স্থির করিয়া তবেই টর্পেডো ব্যবহার করা হয়।

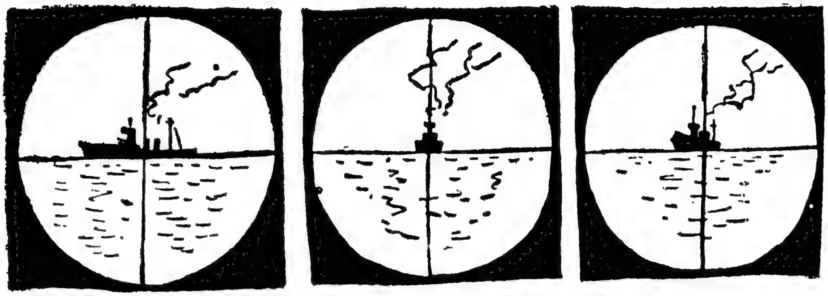

পেরিস্কোপের কাঁচে উপরের সমুদ্রের ছায়া—(১) জাহাজের এই অবস্থায় টর্পেডো আঘাতের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা (২) ও (৩) জাহাজ এই ভাবে অবস্থান করিলে বা চলিতে থাকিলে টর্পেডোর আঘাতে ঘায়েল হইবার সম্ভাবনা কম। ইহাতে প্রায়ই জাহাজ লাগিয়া টর্পেডো পিছলাইয়া যায়

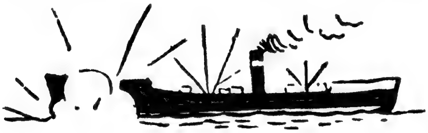

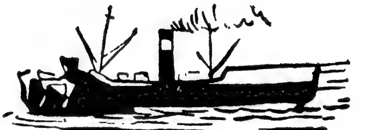

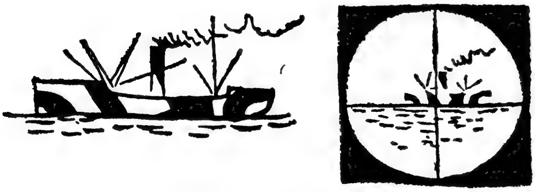

পেরিস্কোপে প্রতিফলিত বহুরূপী জাহাজকে এইরূপ দেখা যায়

এই সকল কারণেই আজকাল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগবান মালবাহী জাহাজ তৈয়ারী হইতেছে। শুধু তাই নয়, জাহাজগুলিতে আবার এমন সব রং এবং বহুরূপী রংয়ের ডোরা লাইন এবং বিশেষ করিয়া streamlining-এর দাগ দেওয়া হইতেছে, যে পেরিস্কোপের প্রতিফলিত চেহারায় অনেক সময় জাহাজের রংয়ের ঝলসানো আলো বা আকাশের সহিত মিশানো রং ইত্যাদির জন্য ঠিক ঠাহর হয় না যে জাহাজটী কত বড় বা কী ভাবে অবস্থান করিতেছে। অনেক সময় আবার এই streamlining-এর জন্য জাহাজকে চলিবার সময় মনে হয় যে জাহাজটী বোধ হয় বেশী বেগে চলিতেছে। তখন টর্পেডোর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা বেশী।

সর্ব্বশেষ কথা এই যে, আজকাল মালবাহী জাহাজগুলিকে 'water tight' ভাবে ভাগ করিয়া নির্ম্মাণ করার বন্দোবস্ত হইতেছে। তাহাতে সুবিধার মধ্যে এই হয় যে, একটী দিক টর্পেডো বা মাইনের আঘাতে ধ্বংস হইয়া গেলেও বাকী অংশটী লইয়া জাহাজ যেন জলের উপরে ভাসিয়া চলিতে পারে; সমগ্র জাহাজটী যেন মালশুদ্ধ খোয়া না যায়।

আগমনী

লোকে বলে তোরে আনন্দময়ী মা।
তবে   তোর ঘরে কেন ঘনায় মা
দুখ-আঁধার ঘনিমা॥

সারাটি বরষ তোর পথ-পানে
চেয়ে আছে মা' গো সব সন্তানে,
তোর মুখ-চাঁদে হেরিতে উজল—
শরতের নভ-নীলিমা॥

শতেক কণ্ঠে ডাকে কত প্রাণ
দুখ-হরা জননীরে,
দুখের পসরা সাথে ল'য়ে এলি
আপনি দুখিনী রে।

অন্ন যে নাহি তোর ঘরে ঘরে—
'অন্নপূর্ণা বলে সবে তোরে,
দুখ-শোক-ভরা   তোর এই ধরা—
হেরিতে কি আজি এলি মা॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি :—জগৎ ঘটক

II ন্‌া সা রা | গা গা গমা I রা গা পা | পা পধা পধপা I
লো কে ব লে তো রে০ আ ন ন্‌ দ ম০ য়ী০০

I পমা -া -গমমা | -রা রা রা I রগা পা ধপা | পমা মা ম́গা I
মা০ ০ ০ ০ ০ ত বে তো০ র্‌ ঘ রে কে ন০

I সা সরা -গমা | গরা সা ন্া I প্া প্ন্া -ন্া | -সা সগা রগা I
ঘ না ০ ০ য়্ মা০ দু খ আঁ ধা ০ র ০ ঘ ০ নি০

I রসাঁ -। -। | -। । । II
মা০ ০ ০ ০ ০ ০

II পা পধা পা | মা গা -মা I পা না না | নর্সা র্সা র্সা I
সা রা ০ টি ব র ষ্ তো র্ প থ ০ পা নে

I ধনা নর্রা র্গর্রা | র্র্সা র্সা র্সনা I ধা ধনা র্সা | -নর্সনাধ পা পা I
চে ০ য়ে ০ আ ০ ছে মা গো ০ স ব স ০ ০ ন্ তা নে

I পা -ক্ষাপক্ষা পা | পধা ক্ষাপা পরা I রা মা গা | ক্ষা পা -। I
তো ০ র্ মু খ চাঁ০ দে ০ হে রি তে উ জ ল্

I মা গা মধা | -। ধনা নধা I নর্রা র্গা র্সা | -। রা রা I
শ র তে০ র্ ন০ ভ০ নী ০ লি ০ মা০ ০ ত বে

I রগা পা ধপা | পমা মা মগা I সা সরা -গমা | গরা সা ন্া I
তো০ র্ ঘ রে কে ন ০ ঘ না ০ ০ য়্ মা০ দু খ

I প্া প্ন্া -ন্া | -সা সগা রগা I রসা -। -। | -। । । II
আঁ ধা০ র ০ ঘ০ নি০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০

II ন্া সা রা | রমা -গমা সা I ন্া সাঃ রা | ন্সা ণ্া প্া I
শ তে ক ক০ ০ ণ্ ঠে ডা কে ক ত০ প্রা ণ্

I প্া প্রা রা | রা রগা রসা I রগা গপা মা | -। -গমগা -রা I
দু খ ০ হ রা জ ০ ন নী ০ রে০ ০ ০ ০ ০ ০

I রা রমা -পধা | ধা ধা ধা I ধা ণা র্সা | র্সধর্সা ণা ধণধপা I
দু খে০ ০ র্ প স রা সা থে ল’ য়ে ০ এ লি ০০

I পা পধা ধপা | মা মরা মপা I ক্ষা পা -। | -। -। -। I
আ প০ নি দু খি নী ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

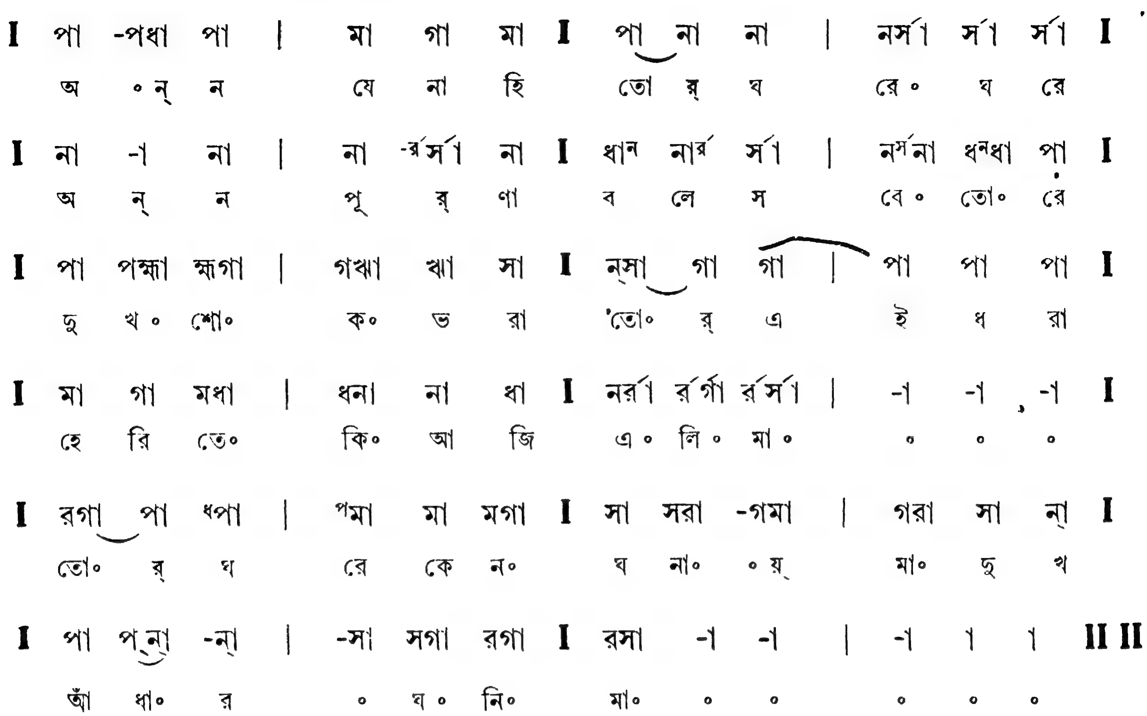
I পা -পধা পা | মা গা মা I পা না না | নর্সা র্সা র্সা I
অ ০ন্ ন যে না হি তো র্ ঘ রে০ ঘ রে
I না -া না | না -র্র্সা না I ধান নার্র র্সা | নর্সনা ধনধা পা I
অ ন্ ন পূ র্ ণা ব লে স বে০ তো০ রে
I পা পজ্ঞা জ্ঞগা | গঋা ঋা সা I ন্সা গা গা | পা পা পা I
দু খ০ শো০ ক০ ভ রা 'তো০ র্ এ ই ধ রা
I মা গা মধা | ধনা না ধা I নর্রা র্গা র্র্সা | -া -া -া I
হে রি তে০ কি০ আ জি এ০ লি০ মা০ ০ ০ ০
I রগা পা ধপা | পমা মা মগা I সা সরা -গমা | গরা সা ন্া I
তো০ র্ ঘ রে কে ন০ ঘ না০ ০য় মা০ দু খ
I পা পনা -না | -সা সগা রগা I রসা -া -া | -া া া II II
আঁ ধা০ র ০ ঘ০ নি০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০

প্রাণের প্রবাহ কোথা দেবীর বন্দনে !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

উদাসীন নিশীথের শেষ প্রান্ত হ'তে
যে-প্রভাত এ'ল আজি পূর্ব্বাশার পথে
সঙ্গীত মুখর ছন্দে জ্যোতির্ম্ময় রথে
বর্ষার বর্ষণ শেষে নবপুষ্পভারে,
তাহারে বরণ করি' গৃহদ্বার খুলে,
তোমরা যাহারা এলে বিশ্বব্যথা ভুলে,
উৎসব-ঝঙ্কার গীতি বীণাবক্ষে তুলে,
ভাব নাই কি বেদনা জেগেছে সংসারে !
উদার এ নভস্তলে পুষ্প-আলিম্পন
সুনিবিড় বনচ্ছায়ে রৌদ্র-আলিঙ্গন
সুরভিত সমীরের স্নেহ-আকিঞ্চন
শেফালী কাশের গুচ্ছে আকীর্ণ অঙ্গনে
সুন্দর দেখেছ বন্ধু পরম আগ্রহে।
আমি যে দেখেছি তারা শূন্য চিত্তে রহে
বিক্ষোভের বাষ্পপুঞ্জে মৌন ব্যথা বহে
প্রাণের প্রবাহ কোথা দেবীর বন্দনে !
আমি যে দেখেছি কাঁদে লক্ষ পরিবার,
অনশনে অর্দ্ধাশনে—সাধ মরিবার।
ধনজন সমারোহে করি' অভিনয়
তোমরা রচেছ যাহা ঐশ্বর্য্য-বিস্ময়,
বঞ্চিত পথিকে তাহা জাগায়েছে ভয়
দম্ভের পেষণে যেথা মমতা পাষাণ।
কপোতের কণ্ঠ হ'তে ওঠে শ্রান্তস্বর,
চিতাবহ্নি বক্ষে নিয়া কাঁদে নদীচর,
অন্নহীন গৃহহীন বস্ত্রহীন নর,
স্তিমিত পাণ্ডুর আঁখি অবসন্ন প্রাণ—
ম্লানমুখে অন্তরালে রয়েছে নীরবে
ওরা যে আসে না বন্ধু পূজার উৎসবে !
চেয়ে দেখ আজিকার জনারণ্য মাঝে
কালের বিপুল শিখা অট্টহাস্যে নাচে ;
অরণ্যের আর্ত্তনাদ তোমাদের কাছে
শুনায়েছে আপনার দাবদগ্ধ জ্বালা।
তোমরা কহনি কথা, অপমান সয়ে'
ব্যর্থতায় ফিরে যায় উপেক্ষিত হয়ে'
পরাজয়-জর্জ্জরিত মৃত্যুবাণী বয়ে'
তোমাদের সিংহদ্বারে রেখে অশ্রুমালা।

যাহা-কিছু কহিয়াছ বৃথা হ'ল সব,
ধ্বনিছে বোধন-শঙ্খ, জাগিছে উৎসব।

জঙ্গম

বনফুল

৩

শ্রীমৎ মুক্তানন্দ স্বামী ওরফে উমেশচন্দ্র অতিশয় চিন্তিত বিব্রতভাবে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার, বাহিরে খরস্রোতা গঙ্গার অবিরাম কলকল ধ্বনি। রাত্রির নিস্তব্ধতা যেন ছন্দ লাভ করিয়াছে। মুক্তানন্দ একা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া কিছুদিন হইল তিনি হরিদ্বারে কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আতিথ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ-বাস দেখিয়া পাণ্ডাজি তাঁহাকে ভক্তিভরে আশ্রয় দিয়াছেন। মুক্তানন্দ সুখেই ছিলেন, বেশ সুন্দরই লাগিতেছিল, এমন কি মনে মনে কল্পনাও করিতেছিলেন যে অবশিষ্ট জীবনটা এইখানেই বোধ হয় অতিবাহিত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। নিকটস্থ চণ্ডী-পাহাড়ে বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে একটা আস্তানা বানাইয়া ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নাম-জপ করিয়া বাকী জীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইবে। বিশ্বাস মহাশয় নামক স্থানীয় ভক্ত ব্যক্তিটি এ বিষয়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ কি হইল! একটা সামান্য স্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত মন বিকল হইয়া গেল!

স্বপ্নে তিনি দেখিলেন ভন্টু যেন প্রকাণ্ড একটা রোলারের তলায় চাপা পড়িয়া তার-স্বরে চীৎকার করিতেছে। রোলারের চাপ এত ভীষণ যে ভন্টুর মুখ দিয়া, নাক দিয়া, এমন কি, চোখ দিয়া রক্ত ফাটিয়া বাহির হইতেছে। পথ দিয়া জনতার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু কেহই ভন্টুর দিকে দৃক-পাত করিতেছে না। ভন্টু আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, তাহার রক্তে রাস্তার খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে, কাহারও কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় ঠাকুর আসিলেন, ভন্টুর দিকে চাহিয়া একবার হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন—আমি কি করিব বল, তোমার নিজের লোকই যখন তোমাকে ছাড়িয়া মুক্তির জন্য দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তখন আমি আর কি করিতে পারি।

ঠাকুর চলিয়া গেলেন, ভন্টু আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এ রকম স্বপ্নের মানে কি! স্বপ্নের কি কোন অর্থ আছে? এ স্বপ্নের কি অর্থ হইতে পারে! সত্যই ভন্টু বিপন্ন নয় তো? বিমূঢ়ের মত একা বসিয়া মুক্তানন্দ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলনাদিনী গঙ্গার কলকলধ্বনি আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল।.

৪

পরদিন দ্বিপ্রহরে।

শঙ্কর মুক্তোর বিছানায় একা চুপচাপ শুইয়াছিল। মুক্তো ঘরে ছিল না। মুক্তোর ঘরখানি ছোট, কিন্তু বেশ গোছানো। দুইখানি তক্তপোষ রহিয়াছে, একখানি অপেক্ষাকৃত নীচু ও ছোট, অপরটি উঁচু ও বড়। বড় খাটটিতে পুরু গদি, ফরসা চাদর, ফরসা বালিশ। শঙ্কর ইহারই উপর শুইয়াছিল। শুইয়া শুইয়া সে বহুবার দেখা আসবাবপত্রগুলি পুনরায় দেখিতেছিল। ছোট গ্লাসকেসটি বেশ পরিচ্ছন্ন, নানারকম রঙীণ শাড়ি পাট করা রহিয়াছে; শুধু শাড়ি নয়, ঝকঝকে তকতকে বাসনও রহিয়াছে অনেক। দেওয়ালে নানারকম ছবি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, মেম সাহেব, কালীঘাটের পট, পুরীর জগন্নাথ। গত কার্ত্তিক পূজার কার্ত্তিকের ময়ূরের পালকগুলি এককোণে টাঙানো আছে। একধারে একটি আলনা। আলনায় মুক্তোর নিত্য-ব্যবহার্য্য কাপড়-জামা এবং তাহারই একধারে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি ঝুলিতেছে। মুক্তোর বাঁধা-বাবুর লুঙ্গি ও গেঞ্জি। তিনি প্রত্যহ রাত্রি দশটায় আসেন, সমস্ত রাত্রি থাকেন। মুক্তোর সহিত তাঁহার বন্দোবস্ত খুব পাকাপাকি রকম। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মুক্তো ইচ্ছা করিলে অপর লোক বসাইতে পারে, কিন্তু দশটার পর মুক্তোর কক্ষে অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তবে যদি তিনি কোন দিন কোন কারণে আসিতে না পারেন সেদিন মুক্তোর ছুটি এবং সে ছুটি মুক্তো নিজের ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারে।

ওরিজিনাল ওরফে দশরথবাবু ব্যবসায়ী ব্যক্তি এবং খাঁটি লোক, সুতরাং তাঁহার ব্যবস্থায় কোন রকম খুঁত নাই। দশরথবাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি রোজ যে আসেন তাহা নয়, মাঝে মাঝে আসেন কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা এইরূপ। বলা বাহুল্য, মুক্তোর সহিত তাঁহার হৃদয়ঘটিত কোন ঝামেলা নাই, সম্পর্কটা নিতান্তই আধিভৌতিক। প্রথম দিনই আসিয়া শঙ্করের চোখে পড়িয়াছিল, আজও আবার পড়িল, কবে কে যেন দেওয়ালের উপর লাল পেন্সিল দিয়া লিখিয়া গিয়াছে—'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়।' কে এই দার্শনিক? এমন মর্ম্মান্তিক একটা বচন এমন মর্ম্মান্তিক স্থানে লিখিয়া গিয়াছে। রোজই শঙ্কর লেখাটি পড়ে। মুক্তোকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে—লেখকটি কে? মুক্তো বলে, "জানি না বাপু, কত লোক আসে যায়, কে কখন লিখেছে, অত খেয়াল করি নি।"—বলে আর মুচকি মুচকি হাসে।

অদ্ভুত মেয়ে এই মুক্তো। এতদিন ধরিয়া শঙ্কর এখানে যাতায়াত করিতেছে কিন্তু মেয়েটির স্বরূপটি যে কি তাহা আজও সে বুঝিতে পারে নাই। কিছুতেই যেন ধরা-ছোঁয়া দেয় না। হাসে, নাচে, গান গায়, মদ খায়, বৈকালে গা ধুইয়া চুল বাঁধিয়া চোখে কাজল দিয়া রঙীন শাড়িটি কায়দা করিয়া পরিয়া গালে ঠোঁটে রঙ মাখিয়া খোঁপায় ফুলের মালা পরিয়া রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়ায়, ভঙ্গীভরে সিগারেট টানে, কথায় কথায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, চটিয়া গেলে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে, অন্ধআতুর দেখিলে পয়সা দেয়, গঙ্গা-স্নান করিতে যায়, মেনি বিড়ালটিকে আদর করে, দশরথের জন্য প্রত্যহ হাঁসের ডিমের ডালনা ও পরোটা বানায়, সামনের চপ্‌কাটলেট্-ওয়ালাটার সঙ্গে দুই-এক পয়সার জন্য ইতরের মত কলহ করে, ঘরে লুকাইয়া মদের বোতল রাখে এবং তাহা সুযোগমত শাঁসালো কাপ্তেনের নিকট দুর্ম্মূল্যে বিক্রয় করে—কিন্তু শঙ্করের মনে হয়, আসল ব্যক্তিটি অন্তরালে আছে, সে কখন ভুলিয়াও পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে না। তাহাকে একটু একটু যেন চেনা যায়, যখন সে দুপুরে ফালি বারান্দাটুকুতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকায়। মনে হয়, উহাই যেন তাহার জীবনের সত্য আকাঙ্ক্ষা—ও যেন আর কিছু চায় না, নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের ঘরের দাওয়াটিতে বসিয়া রোদে পিঠ দিয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে সুখদুঃখের আলোচনা করিতে চায়।

শঙ্কর উঠিয়া বসিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, মুক্তো বারান্দায় বসিয়া চুল শুকাইতেছে কি না। দেখিল মুক্তো নাই। তাহার চোখে পড়িল উষা নাম্নী ওধারের ঘরের মেয়েটি তাহাকে দেখিতে পাইয়া মৃদু হাসিয়া নিজের ঘরের জানালাটি বন্ধ করিয়া দিল। মুক্তো কোথায় আছে কে জানে? রোজই দুপুরে শঙ্করকে নিজের ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া মুক্তো বাহিরে চলিয়া যায়, কাছে বসিতে চায় না। অথচ শঙ্কর কলেজ পালাইয়া আসে তাহারই সঙ্গ-কামনায়। কিন্তু মুক্তো কেমন যেন ধরা-ছোঁয়া দিতে চায় না। "আসছি, বসুন" বলিয়া অঙ্গ দোলাইয়া সে বাহির হইয়া যায় এবং পাশের ঘরে হাসি-গল্প করিয়া অনেকক্ষণ কাটাইয়া তবে আসে। আসিয়াই আবার কোন ছুতায় বাহির হইয়া যাইতে চায়। দশরথের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা যেরূপ সুনির্দ্দিষ্ট, শঙ্করের সহিত মুক্তোর সম্পর্কটা এখনও সেরূপ হয় নাই। শঙ্কর মুক্তোকে একদিন দশটা টাকা জোর করিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু খোলাখুলিভাবে দর কসাকসি করিতে তাহার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে। তা ছাড়া, শঙ্করের সামর্থ্যই বা কতটুকু? তাহার বাবা মাসে মাসে তাহাকে যাহা পাঠাইয়া থাকেন তাহাই তাহার সম্বল। বলা বাহুল্য, তাহা এসব ব্যাপারের পক্ষে মোটেই প্রচুর নয়। এমনিই তো হস্টেলের অনেকের কাছে ধার জমিয়া আছে। কি করিয়া শঙ্কর যে কি করিবে, তাহা সে নিজেই জানে না। অতিশয় আঁকাবাঁকা বিপদসঙ্কুল পথে অন্ধ নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া সে চলিয়াছে। নিজের দুর্দ্দম বাসনার আবেগই তাহার শক্তি, আর কোন সম্বল তাহার নাই। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই পতিতা নারীটির মধ্যেই সে মানসীকে খুঁজিতেছে!

মানুষের কত দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়! দুপুরে কলেজ হইতে পলাইয়া গণিকা-পল্লীতে আসিয়া একটি গণিকার বিছানায় সে শুইয়া থাকিবে কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা কি তাহার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল! রিণিকে ঘিরিয়া যখন সে তাহার স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতেছিল তখন কোথায় ছিল এই মুক্তো! মুক্তোর মত মেয়ের সান্নিধ্য সে কি তখন কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারিত! কিন্তু ঘটনাচক্রের

আবর্ত্তে সে আর মুক্তো কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে এবং পাশাপাশি ভাসিয়া চলিয়াছে, রিণি কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। শঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে—রিণির সংস্পর্শে তাহার মনের তন্ত্রীতে যে সুর বাজিয়াছিল, মুক্তোর সংস্পর্শে আসিয়াও ঠিক সেই সুরই বাজিতেছে। মুক্তো অশিক্ষিতা গণিকা বলিয়া সে সুর কিছুমাত্র কম উন্মাদনা সৃষ্টি করিতেছে না। প্রথম দুই-চারিদিন তাহার তথাকথিত ভদ্র-অন্তঃকরণে একটু দ্বিধা জাগিয়াছিল, কিন্তু সে দুই-চারিদিন মাত্র। প্রথম প্রথম নিজের প্রতি ধিক্কার হইয়াছিল, কিন্তু সে প্রথম প্রথমই। এখন শঙ্করের কাছে মুক্তো গণিকা এই কথাই বড় নয়, মুক্তো নারী এই কথাই বড়। শুধু নারী নয়, লাঞ্ছিতা অবনমিতা নারী। সমাজের অত্যাচারে, পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উদরান্নের জন্য দেহ-বিক্রয় করিতেছে! উহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। পঙ্ক হইতে পঙ্কজিনীকে আহরণ করিয়া প্রেমের পূত মন্দিরে নির্ম্মাল্য রচনা করিতে হইবে। মুক্তোকে তাহার চাই, একান্তভাবে চাই, তাহার চরিত্রের সমস্ত মলিনতা সত্ত্বেও চাই। আর কেহ তাহার কাছে আসিতে পাইবে না—যেমন করিয়া হোক দশরথকে তাড়াইতে হইবে। সমস্ত কলুষসত্ত্বেও মুক্তোর নারীত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এবং সে নারীত্বের সম্মান শঙ্কর যদি না করে তাহা হইলে বৃথাই তাহার শিক্ষা! ক্ষুধা—মানুষের এই আদিম ক্ষুধাটা মানুষকে কত স্বপ্নই না দেখায়! রিণির জন্য মাঝে মাঝে দুঃখ হয়, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে মোহ যেন ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে। তাহাকে না পাইলে সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে মনে হইত, এখন তো আর তাহা মনে হয় না। অথচ মাত্র দুইমাস কাটিযাছে। কিন্তু মনে হইতেছে যেন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে, রিণি যেন অতিদূর বিগত জীবনের একটা সুখ-স্মৃতি মাত্র, আর কিছু নয়। মিষ্টিদিদি? মিষ্টিদিদির সম্বন্ধে ঘৃণা ছাড়া আর কোনও মনোভাব শঙ্করের নাই। মুক্তো গণিকা বটে, কিন্তু মুক্তোকে দেখিয়া তো ঘৃণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না! সে রূপোপজীবিনী, ওই তাহার পেশা। মিষ্টিদিদির মত ছদ্মবেশী ঘৃণ্য জীব সে নয়। আর একটু তলাইয়া দেখিলে শঙ্কর বুঝিতে পারিত, যে-কারণে মুক্তো অ-ছদ্মবেশী, সেই কারণেই মিষ্টিদিদি ছদ্মবেশী। নিরপেক্ষ বিচারে মুক্তো ও মিষ্টিদিদির কোনও তফাৎ নাই। কিন্তু মানুষের মন বিচিত্র জিনিস, সে নিরপেক্ষতার ভান করে, কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না, হইলে সে কখনও ভালবাসিতে পারিত না।

শঙ্কর একা শুইয়া শুইয়া মুক্তোর কথা ভাবিতেছিল, মুক্তো পাশের ঘরের জানালার ফুটো দিয়া নির্নিমেষ নয়নে শঙ্করকে দেখিতেছিল। গণিকা-জীবনে অনেক রকম লোক সে দেখিয়াছে কিন্তু এমনটি আর কখনও দেখে নাই। এত অসহায়! মুখের দিকে চাহিয়া থাকে ঠিক যেন ভিখারীর মত। আজ পর্য্যন্ত যত লোকের সংস্পর্শে মুক্তো আসিয়াছে সকলেই ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলে গায়ের জোরে দাবী করে—এ তো সে রকম নয়। এ অন্য জাতের মানুষ। অমন বলিষ্ঠ দেহ, কিন্তু শিশুর মতো অসহায়। লাজুকও কম নয়, মুখ ফুটিয়া সহজে কিছু বলিতে চায় না; যদিই বা কিছু বলে তা-ও এমন ভদ্র ভাষায়! শুনিলে হাসি পায়। নিশ্চয় বিদ্বান খুব, সেদিন একখানা বই হাতে করিয়া আনিয়াছিল, কত মোটা আর কত ভারি—আগাগোড়াই ইংরেজী! অথচ কথা-বার্ত্তা যেন ছেলেমানুষের মতন, কে বলিবে অত লেখাপড়া জানে। অমন লোকের এসব আঁস্তাকুড়ে আসা কেন বাপু! মাসিটিকে তো চেনে না। সেদিন তো মাসি তাহাকে বলিয়াই দিয়াছে, ওসব কাব্যি-মার্কা ছোঁড়াকে যেন আমল না দেয় সে। অথচ মাসি নিজের মুখেই তাহাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, এখন বলিতেছে বিদায় করিয়া দিতে! কোন্ দিন হয়তো মুখের উপর কি বলিয়া বসিবে! হঠাৎ খোঁপায় টান পড়িল।

ফিরিয়া দেখিল টিয়া। এটি তাহারই ঘর।

টিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, "ঢং দেখে আর বাঁচি না! ঘরে গিয়ে নয়ন ভরে দেখ্ না! উঁকি দেওয়া কেন!"

মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাসিয়া বলিল, "খোঁপাটা খুলে দিলি, জড়িয়ে দে ভাল ক'রে।"

"আর জড়িয়ে দেয় না, এলো-খোঁপাতেই বেশ দেখাচ্ছে! এমনিতেই গলে পড়ছে, কিছু করতে হবে না, যা।"

"সবাই তো আর তোর মালবাবু নয়!"

মুচকি হাসিয়া খোঁপাটা জড়াইতে জড়াইতে মুক্তো

বাহির হইয়া গেল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "অতিথির খবর কি, চা আনাব ?"

শঙ্কর শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল।

"না, চা দরকার নেই।"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "আমাকে তুমি অতিথি ব'লে ডাকো কেন বল তো ?"

"অতিথিকে অতিথি বলব না তো কি বলব, আপনি তো খদ্দের নন ঠিক !"

শঙ্কর ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া পড়িল। ইহার উত্তরে ঠিক কি বলা উচিত সহসা তাহার মাথায় আসিল না।

একটু পরে বলিল, "খদ্দের মানে কি ?"

মুক্তো গা দোলাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর—এই কথা যাকে বলতে পারা যায় সে-ই হল খদ্দের।"

"আমাকে সে কথা বলতে পারো না ?"

মুক্তো বলিল, "নিশ্চয় পারি, আজ না পারি, কাল না পারি, একদিন পারতেই হবে, রোজগার করতে বসেছি, দানছত্র তো খুলিনি।"

মুক্তো বাহিরের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, তাহার পর বলিল, "একদিন না একদিন আপনাকেও খদ্দের হতে হবে। ওই দেখুন, একজন খদ্দের ঘুরঘুর করছেন। আপনি কি থাকবেন এখন ? না থাকেন তো রোজগার করি কিছু।"

শঙ্কর জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, আবক্ষ কাঁচাপাকা দাড়ি একব্যক্তি সতৃষ্ণনয়নে মুক্তোর দিকে চাহিয়া আছেন।

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

"উঠছেন নাকি সত্যি সত্যি !"

"অগত্যা উঠতে হবে বই কি, টাকা যখন সঙ্গে নেই—"

মুক্তো বিস্ময়ের সুরে বলিল, "সত্যি ? আজ এতক্ষণ বসে আছেন দেখে আমি ভাবলাম বুঝি—"

মুক্তো মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

শঙ্করের কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, সে আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর বাহির হইয়া যাইতেই মুক্তোর মুখের হাসি নিবিয়া গেল। দাড়িওলা লোকটি একমুখ হাসি লইয়া আগাইয়া আসিতেছিলেন। মুক্তো তিক্তকণ্ঠে বলিল, "এখন এখানে হবে না—"

সহসা তাহার নজরে পড়িল শঙ্কর আবার ফিরিয়া আসিতেছে। মুক্তো তাহা দেখিয়া দাড়ি-ওলা লোকটিকে পুনরায় আহ্বান করিল, "আচ্ছা, আসুন, আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন।"

দাড়ি-ওলা ভদ্রলোক ঢুকিতেই মুক্তো ঘরে খিল দিল। দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া শঙ্কর বলিল, "আমার বইখানা ফেলে গেছি।"

কোন উত্তর আসিল না। শঙ্কর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর মুক্তো বইখানার পাতা উল্টাইতেছিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইল, ভালই হইয়াছে, বইখানার জন্যও অন্তত কাল আর একবার আসিবে। কি অন্যমনস্ক লোক বাপু !

ক্রমশঃ

শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হে সন্ন্যাসী হে প্রেমিক, বহু উর্দ্ধে বসি তব ধ্যানের বিমানে
হেরিতেছ ধরণীর মানচিত্র, মেরুদণ্ডে ঘুরি' আপনার
আঁধারে আলোকে নিত্য মেলিছে সে নয়নে তোমার
শতধা বিদীর্ণ বক্ষ, দলিত যা আজি এই যুগ-অবসানে
পরাক্রান্ত মানবের আত্মঘাতী নিরঙ্কুশ বিজয়াভিযানে।
তোমার আসনখানি পাতা উর্দ্ধে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারকার
মাঝখানে। সেথা হ'তে সৌরকরে হেরিতেছ শোণিত গঙ্গার
বন্যাধারা, নৈশঘোরে চক্ষে তব জ্বলে বহ্নি নিখিল শ্মশানে।
তব কমণ্ডলুভরা আছে কি গো বহ্নি-নির্বাপণী
শান্তিবারি ?
জলস্থল অন্তরীক্ষ জ্বলজ্জটা প্রলয়ের অগ্নিকুণ্ড পারা,
কুণ্ডলিত ধূম্রজাল ধায় তোমা পানে বিশ্বধ্বংসবার্ত্তাবহ
মসীঘন মেঘদূতে পাঠায় ক্রন্দন রোল আর্ত্ত নরনারী।
উজাড়িয়া ঢালো যদি ক্ষুদ্র তব ঘট হ'তে করুণার ধারা
তা হলে কি নির্ব্বাপিত হবে বহ্নি জিঘাংসার ?
কহ মোরে কহ !

রামপ্রকাশ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

এই সংস্কৃত পুঁথিখানি নবদ্বীপের সাধারণ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটি বা ভারতের অন্য কোনও স্থানে ইহার প্রতিলিপি নাই। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আফিসে আর একখানি পুঁথি আছে। ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথিতে কৃপারাম-বিরচিত পাঠ সংশোধনক্রমে এই পুঁথিতে "কৃপারামানুনীত শ্রীশতাবধান ভট্টাচার্য্য বিরচিত" যে পাঠ আছে তাহা এই পুঁথির বিশেষত্ব।

প্রকৃতপক্ষে ইহা গৌড়ক্ষত্রিয় মহারাজ কৃপারাম রচিত নহে। ইহা তাঁহার সভাপণ্ডিত হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া) নিবাসী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের পিতা রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য রচিত। গুপ্তিপাড়াই যে চিরঞ্জীবের পিতৃনিবাস ছিল তাহা দীর্ঘকাল পূর্ব্বে চিরঞ্জীবের পুস্তকপ্রকাশকগণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা রিভিউ পত্রে লং সাহেব বর্ণিত ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে গুপ্তিপাড়ার বিবরণেও উহা পাওয়া যায়। নবদ্বীপ হইতে দক্ষিণে রেলপথে মাত্র উনিশ মাইল ব্যবধানে গুপ্তিপাড়া অবস্থিত।

অবধান উপাধির একটু বিবরণ দিয়া আমরা অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব। অবধান অর্থে চিত্তের সমাধি। রাঘবেন্দ্রের সমসাময়িক পণ্ডিত হরিহর এই রাঘবেন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—"অহং হরিহরঃ সিদ্ধেঃ অবলম্ব্য সরস্বতী, সাক্ষাৎ শতাবধানস্তং অবতীর্ণা সরস্বতী।" অর্থাৎ আমি (হরিহর) সরস্বতীকে অবলম্বন করিয়া কবিত্ব লাভ করিয়াছি, কিন্তু তুমি (রাঘবেন্দ্র) সাক্ষাৎ সরস্বতীর অবতার। এই শ্লোকটি চিরঞ্জীব তাঁহার পিতার পরিচয় প্রদানকালে নিজ "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, রাঘবেন্দ্র শতাবধান অলৌকিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। একশত পণ্ডিতের নিকট শ্রুত বা শত গ্রন্থে পঠিত বিবরণ যুগপৎ আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। চিরঞ্জীব বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা এই উপাধি ষোল বৎসর বয়সে প্রাপ্ত হন। দশাবধান উপাধি বাঙ্গালার দুই-তিন জন পণ্ডিতের ছিল। কিন্তু রাঘবেন্দ্র ব্যতীত কাহারও শতাবধান উপাধি ছিল এরূপ জানা যায় না।

এই রাঘবেন্দ্র নবদ্বীপেরই ছাত্র ছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন। অশেষ গুণমুগ্ধ অধ্যাপক ছাত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"অয়ং কোঽপি দেবোঽনবজ্ঞাতিবিজ্ঞা চমৎকার ধারায় অপরাং বিভর্ত্তি।" আমার ছাত্র রাঘবেন্দ্র দেবতাস্বরূপ ছিলেন।

"রামপ্রকাশ" স্মৃতি শাস্ত্রের গ্রন্থ। ইহাতে প্রতিমাস ও প্রতি তিথিতে পালনীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শতাবধান না হইলে এরূপ অসংখ্য গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করা কোনও সাধারণ পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব হইত না। গ্রন্থখানিকে রঘুনন্দনের "তিথিতত্ত্বের" স্থানীয় বলা চলে। তবে কলেবর তিথিতত্ত্ব অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বড়।

গ্রন্থারম্ভে কৃপারামের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি (কৃপারাম) সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাহজাহানের কৃপাপাত্র ছিলেন—

> শ্রীমদ্ভূপসমূহ বন্দিত পদ শ্রীসাহিজাহাঁ কৃপা-
> পাত্রং যাদবরায়বর্ম্মতনয়ো মাণিক্যচন্দ্রান্বয়ঃ।
> গৌড়ক্ষত্রকুলোদ্ভবো ভুবিকৃপারামাভিধো ভূমিপো
> গ্রন্থং ধর্ম্মকৃতাংকৃতে রচয়িতুং তস্মিনমনোদোদধৌ ॥

—ইতি রামপ্রকাশ (আরম্ভে)

আবার গ্রন্থশেষে কৃপারামের পুত্র গোবর্দ্ধন সিংহের স্তুতিবাদ আছে—

> প্রলয়যুবদশায়াং বৃদ্ধশীলো গভীরো
> বুধসদসি সুধীরঃ সূক্ষ্মশাস্ত্রার্থ দৃষ্টিঃ।
> বিনয়নয়সমুদ্রো দানধর্ম্মে প্রবুদ্ধো
> বিষম সমরসিংহো রূপবান যস্য সূনুঃ ॥
> দিশিবিদিশি নিহত্য দ্বেষি ভূপাল মহোগ্রান্
> তদমিত বনিতানাম উর্দ্ধনাদাশ্রুপূরৈঃ ॥
> জনয়তি খলু বর্ষাকালভাব সদৈব
> বহুবিতরণশীলো গৌড়গোবর্দ্ধনাখ্যঃ ॥

—ইতি রামপ্রকাশ (শেষে)

এই গোবর্দ্ধনই চিরঞ্জীবের পৃষ্ঠপোষক যশোবন্ত সিংহের পিতা। চিরঞ্জীব তাঁহার "বৃত্তরত্নাবলী" গ্রন্থে নিজ পৃষ্ঠপোষক রাজা যশোবন্ত সিংহকে কৃপারাম-বংশীয় ও গোবর্দ্ধন-ভূপনন্দন বলিয়াছেন।

রামপ্রকাশ গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে যে, কৃপারামের রাজধানী অর্গলাপুর অর্থাৎ আগরার সন্নিকটে স্থাপিত ছিল। সুতরাং শতাবধান ও চিরঞ্জীব বাঙ্গালা দেশ হইতে সুদূর মধ্যভারতে এই রাজাগণের সভা-পণ্ডিতরূপে গমন করিয়াছিলেন।

রামপ্রকাশ ও বৃত্তরত্নাবলী হইতে গৌড়ক্ষত্রবংশীয় কয়েকজন রাজার পরিচয় পাওয়া গেল। সে কারণ গৌড়ক্ষত্রকুলের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতেছি। পূর্ব্বে গণ্ড, গোণ্ড বা গোঁড় নামে মধ্যপ্রদেশে এক অনার্য্যজাতির বাস ছিল। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকেরা গৌড়ক্ষত্রগণকে ঐ অনার্য্যজাতির সহিত অভিন্ন মনে করেন। আত্মরক্ষার জন্য ইঁহারা সর্ব্বদা মালবের রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে উভয় জাতির মধ্যে মিত্রতা ও যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে রাজপুত জাতির সহিত তাঁহারা অনেকেই মিশিয়া যান। অন্যমতে এই গোণ্ডজাতি

গৌড়দেশবাসী ছিলেন বলিয়া গৌড়ক্ষত্র নামে পরিচিত হন (১)। তবে সে গৌড় মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। তাহা ছিল চেদি, মালব, রাষ্ট্রকূট ও বেরার লইয়া গঠিত জনপদ। রাজতরঙ্গিণীতে (৪।৪৬৫) ও মাধবাচার্য্যের দুর্গামাহাত্ম্যে (উত্তরার্দ্ধে ১ অঃ) যে পঞ্চগৌড়ের নাম পাওয়া যায়—এই গৌড়দেশ তাহার অন্যতম। তাঁহাদের অনেকে মোগল রাজত্বকালে মধ্যপ্রদেশে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। রামনগরের পঞ্চরত্নমন্দিরাদি ইহাদের প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি। বাঙ্গালার রাজগৌড়গণ ইঁহাদের একটি শাখা হইতে পারেন।

রামপ্রকাশ ও বৃত্তরত্নাবলী-প্রদত্ত সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া কিন্তু চিরঞ্জীবের পৃষ্ঠপোষক যশোবন্তসিংহের অনুসন্ধান পাওয়া অসম্ভবপ্রায় হইতেছে। কারণ যশোবন্তের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষদের সম্রাট সাহজাহানের কৃপাপাত্র বলা হইয়াছে। সাহজাহানের রাজ্যকাল ১৬২৭ হইতে ১৬৫৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং তাহার কিছু পরেই যশোবন্তকে পাওয়া উচিত। এই সময়ে আমরা দুইজন যশোবন্তকে ইতিহাসে দেখিতে পাই। প্রথম বিখ্যাত রাঠোর বীর যশোবন্তকে। যিনি ৪২ বৎসর বয়সে আরঙ্গজেব দ্বারা বিষপ্রয়োগে ১৬৮১ খ্রীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয় বুন্দেলা জাতীয় মোগলসেনাপতি যশোবন্ত সিংহ, যাঁহার ১৬৮৭ খ্রীঃ মৃত্যু হয়। তন্মধ্যে রাঠোর যশোবন্ত সিংহের পিতৃপরিচয় এইরূপ—মল্লদেব পুত্র উদয় সিংহ, তৎপুত্র সুর সিংহ, তাঁহার পুত্র গজসিংহ যশোবন্ত সিংহের পিতা। কিন্তু রাঘবেন্দ্র ও চিরঞ্জীব বলিয়াছেন, মাণিক্য সিংহের পুত্র কৃপারাম, তৎপুত্র গোবর্দ্ধন যশোবন্ত সিংহের পিতা। সুতরাং এই প্রসিদ্ধ রাঠোর যশোবন্ত সিংহ চিরঞ্জীবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না। বুন্দেলা যশোবন্ত সিংহের বা তাঁহার সমকালের অন্য কোনও যশোবন্ত সিংহের পিতৃপরিচয় এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কবে এই যশোবন্তের প্রকৃত অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে জানি না। তবে পিতাপুত্র এই দুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত তাঁহাদের কৃতজ্ঞতার শ্রদ্ধা নিবেদনস্বরূপ বাণীর মন্দিরে যে অক্ষয় পরিচয়পত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহার দ্বারা এই গৌড় ক্ষত্রিয়বংশ অমর হইয়া থাকিবেন।

এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুসন্ধানের ফল এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে মনে করি না। স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় (২) এবং তাঁহার মনীষার উপর নির্ভরশীল অনেকেই বলিয়া গিয়াছেন যে, সুজা-উদ্-দৌলার অধীনস্থ ঢাকার নায়েব-দেওয়ান যশোবন্ত সিংহই চিরঞ্জীবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে সুজা-উদ্-দৌলার শাসনকাল ১৭২৭—৩৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। সুতরাং ঢাকার নায়েব সাহজাহানের একশত বৎসর পরের লোক। এই ব্যক্তিও চিরঞ্জীবের সেই পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন না। রামপ্রকাশ পুঁথিখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে পড়ে নাই। তিনি শুধু ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথির বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন বলিয়া এই হইয়াছিল মনে হয়।

পুঁথির শেষে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইন্দুরখী নগরে ১৭০৪ সম্বতে (১৬৪৭ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পাহার সিং গৌড়ের রাজ্যকালে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। যথা—ইতি গৌড়ক্ষত্রকুলাবতংস যাদবরায়াত্মজ মাণিক্যচন্দ্রান্বয় মহামন্তিক পরমজ্ঞানি বিরাজমান মানোন্নতকীর্ত্তি প্রতাপোর্জ্জিত নৃপতি শ্রীকৃপারামা সুতীত শ্রীশতাবধান ভট্টাচার্য্য বিরচিত কালতত্ত্বার্ণব সন্তরণোপায় সেতুভূতস্তিথ্যাদিকাল নির্ণায়কো রামপ্রকাশনামা গ্রন্থঃ সমাপ্ত ইতি॥ সম্বৎ ১৭০৪ বর্ষে কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টম্যাং তিথৌ রবিবারন্বিতায়াম বৃশ্চিকলগ্নে শুভস্থানে ইন্দুরখী নাম নগরে॥ শ্রীকৃপারাম গৌড়রাজ্যো তস্যাত্মজ শ্রীপাহার সিং গৌড়রাজ্যো শুভম॥

তৎপরে অনুলিপিকার বাঘগ্নিহোত্রী নিজ পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি নিজ পুত্র দুর্বাসার পাঠার্থে ইহা অন্তর্বেদিস্থ বিগহুলি গ্রামের শুক্ল উপাধিক জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুঁথির অবিকল পাঠোদ্ধার করিয়াছেন সুতরাং শুদ্ধ অশুদ্ধের জন্য দোষভাগী নহেন। যথা—

> "মাধ্যেন্দিনীয় শাখায়াম যজুর্বেদাধ্যায়ি শ্রীমহাযাজ্ঞিক বাঘগ্নিহোত্রিণা
> স্বী আত্মজ শ্রীদুর্বাসো অগ্নিহোত্রিণঃ পাঠার্থম্ শুভম পুস্তক মিদং
> লিখিতং॥
> অন্তর্বেদিস্থ বিগহুলী গ্রামীয় শুক্লাভিধায়ি নাম যাদৃশম পুস্তকম দৃষ্টম
> তাদৃশম লিখিতম ময়া॥ যদি শুদ্ধম অশুদ্ধম বা মম দোষো ন
> বিদ্যতে॥"

মিরডাঙ্গা গুপ্তপাড়ানিবাসী আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গৃহে এই পুঁথিখানি ছিল। ইহা নাগরী অক্ষরে লেখা। আকার ১৪″ ও ৫ ½″ ইঃ। সাদা তুলোট কাগজে লেখা। পত্র-সংখ্যা ৪৪৯। তাহা পাঠাগারের (৩) দেওয়া ৮৯৫ সংখ্যাভুক্ত। এই গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত কোথাও ছাপা হয় নাই। ইহা এই পাঠাগারে সংগৃহীত বহু পুঁথির মধ্যে অন্যতম। *

---

(১) বিশ্বকোষ, ৫ম ভাগ, ৪৮৫ পৃঃ

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৭ খণ্ড (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৩৫—৩৬

(৩) নবদ্বীপ সপ্তম এডোয়ার্ড য়্যাংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী।

* গত ১১ই শ্রাবণ লাইব্রেরীর রজত-জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ-স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এম-এ, পি-আর-এস্. ডি-ফিল্, ডি-লিট্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে সাংস্কৃতিক অধিবেশন হয় তাহাতে লাইব্রেরীস্থ পুঁথিগুলির পরিচয়-প্রসঙ্গে সম্পাদক-হিসাবে লেখক কর্ত্তৃক উপরোক্ত পুঁথিখানির বিশেষ বিবরণ দেওয়া হয়।

অনুকর্ম

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৮

পার্ব্বত্য যাত্রা হইতে অল্পদিন হইল পূর্ব্বোল্লিখিত যাত্রীদল ফিরিয়া আসিয়াছে। যাত্রার অভীষ্ট স্থানে পৌছিবার পর একজনের দেহান্ত হওয়ায় তাহাদের আর অন্যদিকে যাওয়া হয় নাই। তিনি যদিও একজন বৃদ্ধা মাত্র, তবুও যাত্রীদল উৎসাহহীন হইয়া পড়ে। বিশেষ ললিতা ও তাহার কাকীমা অত্যন্ত শোকাকুল হন্। তাহার সন্তানহীনা কাকিমার তিনি মাতা এবং ললিতার শত আব্দারের দিদ্‌মা! যদিও ৺বদরীনাথের পাণ্ডারা তাঁহার ভাগ্য দেখিয়া বহু সাধুবাদ দিয়াছিল এবং সেই অলকনন্দা তীরে ৺বদরীনাথের শ্রীমুখ দর্শনান্তে বৃদ্ধার এ মৃত্যু যে বহু পুণ্যের ফল, তিনি যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শতঘণ্টা নিনাদিত রথে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আর যে স্থানের নরনারায়ণ পর্ব্বতমধ্যস্থ 'ব্রহ্মকপালে' যাত্রীগণ তাহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের এবং মৃত আত্মীয়দিগের উদ্দেশে ৺বদরীনাথের প্রসাদান্ন পিণ্ড দিয়া তাহাদের মোক্ষ কামনা করে সেই 'ব্রহ্মকপালে' শ্রাদ্ধাধিকারীর হস্তে যাহার আত্মশ্রাদ্ধ হয়, তাহার যে ভাগ্যের সীমা নাই একথা পাণ্ডাগণ বহুবার বলিলেও ললিতার কাকিমার শোকাপনোদন হয় নাই। সুজনবাবুর দল এইভাবে ফেরায় ডাক্তারবাবুও তাঁহার যাত্রা আর দীর্ঘতর করিতে ইচ্ছা করেন নাই এবং গতদিনের সঙ্গীদলকে ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যান নাই, কাজেই সকলেই একত্রে দেশে ফিরিয়াছেন।

পথের শ্রান্তি তখনো সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, তাই শীলা তখনো ললিতাদের নিকটেই ছিল। তাহার চলিয়া যাইবার কথামাত্রে ললিতা এত বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছিল এবং কাকিমাও এত দুঃখ বোধ করিতেছিলেন যে শীলার যাইবার দিন কেবলই পিছাইয়া যাইতে লাগিল।

পশ্চিমের গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর! আষাঢ়ের আকাশেও বারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ আসিয়া পৌছে নাই। দ্বারেও গবাক্ষ পথে তখনো খস্ খস্ ঝুলানো গৃহমধ্যস্থ কৃত্রিম ব্যজনে বায়ু শীতলস্পর্শ এবং সুগন্ধি হইয়া বহিতেছে। চিক্কণ গৃহতলেই তাহারা দ্বিপ্রাহরিক শীতল শয্যা পাতিয়া সেই তীর্থযাত্রার কথাই কহিতেছিল। কাকিমা বলিতেছিলেন "ত্রিযুগী নারায়ণে তাঁর বুক কেমন করেছিল, ৺কেদার পাহাড়ে ওঠার পর কেদার দর্শন করে এসে যখন অমন হয়ে পড়লেন তখনি যদি আমরা আর ৺বদরী পাহাড়ে না যাই, তাহলে আর মাকে হারাই না। কেদারে সেদিন মন্দাকিনীর ঝরণায় আমরা স্নান করতে সাহস করলাম না, উনি করলেন। মন্দাকিনীর তীরে বসে তর্পণ আহ্নিক করলেন।" ললিতাও সঙ্গে সঙ্গে সেই কথার অনুমোদন করিতেছিল; "আমরা তো জল ঘটি করে ধরিয়ে স্পর্শ কর্‌লাম, উনি মাথায় ঢাল্‌লেন—নদীর জলে হাত ডুবোনো যায় না, কোশা করে সবাই সন্ধ্যা করছে, হাত টক্‌টকে রাঙা হয়ে যাচ্ছে তবু হাত ডুবিয়ে সন্ধ্যা করা চাই, এত মনের জোর। তুঙ্গনাথে তাঁকে ডাক্তারবাবু যে ভয়ে উঠ্‌তে দিলেন না—৺বদরীতে গিয়ে যে সেই বিপদেই পড়া যাবে তা কে ভেবেছিল!"

শীলা বলিল "কিন্তু কাকিমা তাঁকে কি বদ্‌রী দর্শন না করিয়ে পথ থেকে ফেরাতে পারতেন? কখনই না। তাঁর যে মনের জোর ছিল—শেষ পর্য্যন্ত এমন কাণ্ড করতেন যে যেতেই হত সকলকে।"

কাকিমা সনিশ্বাসে বলিলেন—"সে সত্যি। প্রথমদিন নারায়ণ দর্শন করে—কি আনন্দময় মুখ তাঁর—নাতু তো ঠাকুর দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে—ওদিদ্‌মা, ঠিক্ সেই বৃন্দাবনের আদি বদরীনাথের মূর্ত্তি! একেবারে এক কোঁদে গড়া এক পাথরের একভাবের মূর্ত্তি! এঁরা সব শঙ্করাচার্য্যের নির্ম্মিত কিম্বা বৌদ্ধযুগের মূর্ত্তি রাওলঠাকুরের সঙ্গে সেই তর্ক জুড়েছেন, কিন্তু মা যেন একেবারে বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন পেয়েছেন এমনি তন্ময় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন। তখনি যেন ঠাকুরের সাম্‌নেই লীন হয়ে যান্, তাড়াতাড়ি সবাই বাইরে নিয়ে এল—"

"কিন্তু তখনো সেরকম কিছু হয়নি কাকিমা—আমরা তপ্তকুণ্ডে যখন ঝাঁপাইঝুড়ি, হাসিমুখে ধারে বসে জপ করলেন, বল্লেন তাঁরও নাম্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে। তুমি ঘটি করে জল তুলে নাইয়ে দিলে। এখানে অলকনন্দাটির ধারে কেবল নাম্‌তে চায়নি, বুঝ্‌ছিলেন যে সকলকে তাহ্‌লে তখনি বিব্রতে পড়তে হবে।"

"শুধু কি তাই? যার যা কর্‌বার আছে করিয়ে নিজে তিন রাত্রি আমাদের সঙ্গে বাস করে—চিরদিনের জন্য বাস নিলেন। সেও—কি আশ্চর্য্যভাবে—হঠাৎ—"

বলিতে বলিতে সে স্মৃতি যেন অসহনীয় হইল--কাকিমা সহসা চুপ করিয়া গেলেন। শীলা ধীরে ধীরে বলিয়া চলিল "ভট্টি সেরার সেই পাগলাটা নাকি তাঁকে বলেছিল—বদরীনাথ তোমারে পর বহুত সদয়! বহুত প্রেম করেগা। কি আশ্চর্য্য ফল্‌লো?"

কাকিমা সবেগে বলিলেন—"সাধু—সে নিশ্চয় সাধু! মা ঠিক্‌ই ধরেছিলেন---পাগলের ছদ্মবেশেই ওঁরা বেড়ান।"

ললিতা এতক্ষণে ঈষৎ হাসির সহিত উত্তর করিল—"তাহলে আমরা এমন বহাল তবিয়তে ফির্‌তাম না-- বিশেষ মোহনবাবু আর কুমুদবাবু! কি গাল্‌টা না দিয়েছিল সবাইকে। আমিই তো টর্চ্চ জ্বেলে ওকে ধরিয়ে দিই! সে একটা পাগলই বটে।"

"তুই কি বুঝ্‌বি বাপু—মা যা বুঝেছিলেন তাই ঠিক্। শেষের কথাগুলো মনে করে গ্যাখ্‌ দেখি সেই পাগলের। মনে পড়্‌লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। মা বলেছিলেন—ওঁদের কথা, কাজ, আমাদের বুদ্ধিতে নাগাল্‌ পাওয়া যায় না, ভাগবতের কি একটা শ্লোক বল্লেন শুনিসনি? শীলা তোর মনে আছে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ আমারই মনে আছে।" বলিয়া ললিতা কি যেন স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে করিতে শীলার পানে চাহিল—শীলা উত্তর দিলনা দেখিয়া নিজেই নিজের পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণে একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল "শেষটুকু কেবল মনে পড়ছে—'অন্তর্ব্বাণী ভি রপ্যস্য মূদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা!' বুড়ির 'সংস্কৃত জ্ঞানও কত ছিল!" শীলা এইবারে মৃদু মৃদু বলিল—আর বলেছিলেন—

"যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম করয়ে উদয়
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

"এ আবার বুড়ির কোথা থেকে সংগ্রহ ছিল কাকিমা?"

"কেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যে বৈ কখানি থাক্‌ত দেখিসনি? বোধহয় চৈতন্যচরিতামৃতের কথা এটা, নারে শীলা?"

"তাই বোধ হয়।" সকলের মন হইতেই শোকের কালিমা অনেকটা মুছিয়া গিয়া এই আলোচনায় চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত আত্মীয়ের পুণ্যোজ্জ্বল মহিমায় মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল। শীলা প্রসঙ্গান্তর পাইয়া যেন হাঁফ্‌ছাড়িয়া বাঁচিল, বলিল "কুমুদবাবু কি চলে গেছেন, কাকিমা জান?"

"হ্যাঁ উনি বল্‌ছিলেন, কেনরে?"

শীলা অৰ্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল—"এই সঙ্গে যেতে পারতাম, বেশ সুবিধা ছিল! কলেজ খুল্‌ছে, যাহোক্‌ একটা পড়াশোনার ব্যবস্থা এইবার—"

"সেতো ললিতারও কর্‌তে হবে; দুজনেই একসঙ্গে কি করবি কি পড়্‌বি এইখান থেকেই যুক্তি করে নেনা বাপু! এতদিন একসঙ্গে পড়ে ওকে কি এখন শেষ বেলায় ছেড়ে দিবি? বিশেষ মার জন্য ওরও খুব চোট লেগেছে, ওকে তোর কাছে রাখলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌ব"—

শীলা ও কাকিমা ললিতার পানে চাহিয়া দেখিল—সে যেনকি একটা চিন্তায় অন্যমনা হইয়া গিয়াছে। যুগপৎ চারিটা চোখ তাহার দিকে পতিত হওয়ায় ললিতা যেন জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "কিন্তু সে পাগল যদি সাধুই হন, সাধুরা খুব নিষ্ঠুর হয়, তা কিন্তু বল্‌তেই হবে। সেই যে সরয্‌ মেয়েটির কথা শুন্‌লে, তার কথা কিন্তু আমার মনথেকে কিছুতে মোছেনা! সে নিশ্চয় ঠিক্‌ই চিনেছিল—ওই পাগলই তার স্বামী, কিন্তু মেয়েটাকে কোথায় পাহাড়ে আছ্‌ড়ে মেরে উনি অমনি রাধিকাজী রাধিকাজী করে বেড়াচ্ছেন—স্বচ্ছন্দে? ধন্য।"

শীলা সহাস্যে বলিয়া উঠিল—"ওঃ তুমি এখনো সেই ভট্টিসেরা চটির পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ? আর আমরা কিনা"—

"সাধুত্বের বুঝি এই আদর্শ? পাগল সে, নিশ্চয় পাগলই বটে। নাহলে মানুষে এত নির্দ্দয় হয়?"

"আহা—'বজ্রাদপি কঠোরাণি' কথাটা ভুলছিস্‌ যে দেখ্‌ছি। লোকোত্তর চরিত্রের"—

"আর কুসুমাদপি কথাটা বুঝি একেবারেই বানে ভেসে গেল? ওটা কেবল কথারই কথা?"

"বাব্‌বা—সেই আধ্‌পাগলা কি সাধু যেই হোক্, তাঁরই ওপর এত ঝাল ঝাড়ছিস্ শুনে যে অবাক্ লাগছে ? হয়েছে কি তোর ? এত সেন্টিমেণ্টাল্ তো আগে তোকে দেখিনি ? এবারে পাহাড় বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই দেখছি ! তীর্থযাত্রার ফল বুঝি ?"

"হবে। কি বল্‌ছিলে তোমরা কাকিমা ? কি কথা ?"

"শীলা যে চলে যেতে চাচ্চে—বল্‌ছে এইবার পড়া শোনা আরম্ভ করবে। কুমুদ চলে গেছে শুনে আপশোষ কচ্চে।"

"কেন ? কুমুদবাবুর সঙ্গে পড়বে নাকি ? কি পড়েন তিনি ?"

শীলার উচ্চহাস্যে এবং কাকীমার মৃদু মৃদু হাস্যে লজ্জিত হইয়া ললিতা অপ্রস্তুতভাবে নিজেকে সংশোধন করিতে গেল —"তিনি যে প্রফেসর—তা শীলি তো এবার এম-এ পড়বি—ওঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ার সুবিধা নিতে পার্‌বে বৈকি একটু, কলকাতাতেই থাকেন তো উনি ?"

"নে আর তোকে বোকার মত যা তা কতকগুলো বকৃতে হবেনা। তুই পড়্‌বিনে নাকি আর ?"

"আমি ?" জিজ্ঞাসু নেত্রে ললিতা কাকিমার পানে চাহিতেই কাকিমা বলিলেন "এম-এ পড়বে বৈকি, নৈলে কি ওর কাকা ছাড়বেন ? কিন্তু পড়ার যা যা ঠিক্ করবার শীলার সঙ্গে ঠিক্ করে নিয়ে বাড়ী এসে আমার কাছে থেকে পড়বি, দরকার হলে কোন' মাসে কলকাতায় কি শীলার কাছে যাবি—আমি একা আর থাক্‌তে পারব না কিন্তু বাপু।"

ললিতা নতনেত্রে বলিল "তাতো জানি কাকিমা, আমিও তোমায় একা রেখে আর থাক্‌তে পারবনা ! শীলার সঙ্গে আমার পড়ার তো সুবিধা হবেনা, ও বরাবর সংস্কৃতে অনার্স—এবারও তাই নেবে ! আমার ভিন্ন গোঠ ! আমি এখন আর পড়তে পারবনা—পরে দেখা যাবে। তোমাকে নিয়ে কোন দিকে আবার বেরিয়ে পড়ব—কাকার সঙ্গে সেকথা হয়েছে। কিছুদিন তো যাক্—পরে দেখা যাবে—"

শীলার সঙ্গে একান্তে কাকিমার কথা হইতেছিল—

"তুই তো বাপু চল্‌লি—ললিতা কি যে করবে ? আমার কাছে যে এখন থাক্‌লো তাতে আমি বর্ত্তে গেলাম, কিন্তু আবার বেরুবা'র কথায় আমার তত ইচ্ছা হচ্ছে না, বিশেষ যে জায়গায় যেতে ওর ইচ্ছা বুঝ্‌ছি, তাতে মার জন্য আমার বেশী মন কেমন করছে।"

"সেটা ওকে বুঝিয়ে বল। কোথায় যেতে চায় কাকিমা ললিতা ?"

"কাউকে বল্‌তে বারণ করেছে। ওর দাদুর সঙ্গে বৃন্দাবনের বন বেড়ানোর গল্প শুনে আমার খুব লোভ হয়েছিল ; সেই কথা তুলে বলেছে—চল, তোমাকে এই ভাদ্রে সেই বন বেড়িয়ে আনি। ওর কাকাকেও যেতে হবে না, ওর দাদুর যে পাণ্ডা আছে বৃন্দাবনে সে একেবারে দাদুর মতই, সেজন্য কোন ভয় নেই বলে ভরসা দিচ্চে আমায়—আমার কিন্তু মন সর্‌ছে না।"

"ও যে আমার সঙ্গ পর্য্যন্ত এ রকম ভাবে ছেড়ে দেবে, এ আমি একবারও ভাবিনি কাকিমা। ওর মনের মধ্যে কি একটা আছে সন্দেহ হয় বরাবরই, কিন্তু এবারের মত স্পষ্ট এতদিন বোঝা যায়নি।"

"ওর কাকাও তাই তো আমার বল্‌ছিলেন যে দেখ্‌লে এই জন্যই আমি এত বেড়ানো ভালবাসি না—মেয়েটার শেষে সেই 'যাযাবর' বুদ্ধিই ঘট্‌লো দেখ্‌ছি। আমাকেই দোষ দিচ্চেন—তুমিই ও যা বলে তাই ক'রে ক'রে এতখানি ক'রে তুল্‌লে।" অথচ ও যখন নিজে "কাকু" বলে ডেকে ওঁরই কাছে এই সব আব্‌দার কর্‌বে, তখন নিজেই সুড়্ সুড়্ করে সেই পথে চল্‌বেন—এখন দোষের বেলায় ভাগী আমি। উনি কি বল্‌ছেন তোকেই বলি—বল্‌ছেন বিয়ের চেষ্টা করলে কেমন হয় ? বিয়ের পর চাই কি আবার ও পড়ায় মন টন্ দিতে পার্‌বে—এরকম ঘর-ছাড়া উড়ো উড়ো মন থাকবে না—মনের বাঁধন হবে। এ পরামর্শ মন্দ নয়। কি বলিস্ ? আমারও কিন্তু সাধ হচ্চে।"

শীলা প্রথমে একটু হাসির সহিতই প্রতিবাদভাবে বলিল—

"বিয়ের পর পড়ায় মন !—কাকিমা—কি যে বল—"

তার পরেই হাসিটা সাম্‌লাইয়া লইল—"তা তোমার ললিতারাণীর সবই বিচিত্র—হ'তেও পারে—তা বরও কাউকে ঠিক্ করেছ নাকি তোমরা ?"

"না—ঠিক্ এমন না—এই একটু ভাবা চিন্তামাত্র !—"

"কাকে ভেবেছ শুনি ?"

"এই মোহন ? ডাক্তারবাবুর ভাগনে ! পড়াশোনাতেও ল পাশ্—ওকালতিতে বসেছে, যে রকম চট্‌পটে ছেলে উন্নতি কর্‌বে উনি বলেন। এদিকেও বড়লোকের ছেলে—"

শীলা হাসিয়া বলিল "তা হোক্—তবু যদি নিজেদের পছন্দেই বর ঠিক্ কর তো কুমুদবাবুকে কর—মোহনকে না!"

"কেন রে? উনি যে বল্লেন সুজনবাবুর ইচ্ছে—মোহনেরও নাকি খুব—"

"তা জানি তবু বল্ছি। ললিতার কাছে কথাটা পেড়ে দ্যাখ না একবার!—"

"বাপরে, ভয় করে। তুই দেখনা বাপু?—"

শীলা সহসা যেন একটা অদম্য মনোবেগে ধরা ধরা গলায় বলিল "আমাকে তো সে এখন আর তার কোন' কথায় থাক্তে দিতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্চে না কাকিমা। এবার পর্ব্বত যাত্রা থেকেই তার এ ভাবান্তর দেখছি, তবু সে সুখী হোক্—তার যেন ভাল হয়, সেইজন্য বল্‌ছি যদি সে বিয়ে করে যেন কুমুদবাবুকেই করে—তোমরাও তাই দিও।"

দ্বিতীয় ভাগ

১

পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিখ্যাত সহরে শীলা একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তাহার কর্ত্রীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এম-এ পাশের সঙ্গেই তাহার এই সম্মানের পদটি লাভ হইল। তখন বি-টি পাশের এত অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল না, বিশেষ হেড মিষ্ট্রেসের পক্ষে।

আজ তাহার বড় আনন্দের দিন, ললিতা তাহার কাছে আসিতেছে। ললিতা এই দুই বৎসরের অধিক কাল শীলার সহিত কোন সম্বন্ধ এমন কি পত্রালাপ পর্য্যন্ত রাখে নাই। সেই যে তীর্থযাত্রা হইতে কিছুদিন পরে সে তাহাদের নিকটে বিদায় লয়, সেই সময় হইতে প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল—ললিতা তাহাকে যেন একেবারে ত্যাগ করিয়াই দিয়াছিল। তাহার কাকা সুজনবাবুর মৃত্যুসংবাদ পর্য্যন্ত সে শীলাকে জানায় নাই, পরের মারফৎ সংবাদ পাইয়া শীলা তাহাকে পত্র লেখে—কিন্তু ললিতা সে পত্রেরও উত্তর দেয় নাই। এতখানি বিচ্ছেদ, এতদূর মনোবিপ্লব কি করিয়া সম্ভব হইল, শীলা ভাবিয়া না পাইয়া অভিমানে ও দুঃখে সেও আর ললিতার কোন সংবাদ লইত না। সহসা আজ ললিতার পত্রে এই আনন্দ সংবাদ তাহার সমস্ত দুঃখ ও অভিমানকে ভাসাইয়া লইল। ললিতা শীলার নূতন জীবন ও কার্য্যের আরম্ভে অভিনন্দন জানাইয়া নিজেরও নবজীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত একবার মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছে এবং তাহার কাছে পৌঁছিবার দিন ও সময় পর্য্যন্ত স্থির করিয়া লিখিয়াছে।

শীলা তাহার বসবাসের এলাকাটি যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ও সজ্জিত করিবার জন্য জন খাটাইতে ধোয়া-মোছা করাইতে নিজেই ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল এবং কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতেছিল—শীলা লিখিয়াছে, সেও নূতন জীবনে প্রবেশ করিবে! সে নূতন জীবন কি আর? শিক্ষার দিকে তো নয়ই, যে জীবন স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে সে জীবনে আবার প্রবেশ করিলে কখনই 'নূতন' শব্দ সে প্রয়োগ করিত না। খুব সম্ভব বিবাহ, কিন্তু কাহার সঙ্গে? কুমুদবাবু—অথবা মোহন? বোধ হয় মোহনের সঙ্গেই, কেননা তাহার কাকিমা ও কাকাবাবুর সেইরূপ ইচ্ছাই শীলা বুঝিয়াছিল। মোহন ধনী সন্তান—তাহাতে কৃতবিদ্য! কুমুদবাবু কলেজে প্রফেসরি করেন, তিনি মোহনের মত ধনী নন্—শিক্ষকতা মাত্র তাঁহার উপজীবিকা! কিন্তু তাঁহার কাছে মোহনবাবু? শীলা নিজ মনেই ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল!

ললিতা আসিলেই সংবাদ পাওয়া যাইবে, বৃথা এখন সে কেন ভাবিয়া মরিতেছে; শীলা আবার তাহার হস্তের কার্য্যে মনকেও নিবিষ্ট করিয়া সেল্‌ফের উপর বইগুলি পরিপাটী করিয়া সাজাইতে লাগিল। পছন্দমত বই ক'খানি সম্মুখের দিকে রাখিল, ললিতা আসিলে তাহার সঙ্গে পড়িতে হইবে; চাকরকে বলিল বৈকালে যেন টেবিলের ফুলদানিটার ফুল ও জল বদ্‌লাইয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পরই ললিতা পৌঁছিবে। পাচককে চা জলখাবার এবং রাত্রের আহারের ব্যবস্থার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে তাহার দুই একবার মনে হইল—কি জানি ললিতা কি মূর্ত্তিতে আসিবে, যদি বলিয়াই বসে—মাছ মাংস খাই না; যদিও বাহ্যিক ব্যবহার তাহার একরূপই ছিল, কিন্তু শেষের দিকে তাহার কথাবার্ত্তা এবং ধরণধারণ যেন একটা বিপ্লবেরই সূচনার আভাস দিয়াছে। শীলা চাকরকে ফল মিষ্টান্ন এবং দুগ্ধাদিরও ভাল বন্দোবস্ত রাখিতে আদেশ দিল। তারপর তীক্ষ্ণ চক্ষে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কোন খানে কোন ত্রুটী আছে কিনা। নিজের মনের ব্যগ্রতায় নিজের কাছেই এক এক বার লজ্জিতভাবে মৃদু

মৃদু হাসিতেছিল এবং প্রাচীন পদাবলীর দুই এক লাইন নিজ মনে গাহিতেছিল—

“বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে—দেখা না হইতে পরাণ গেলে।
গগনে উদয় করুক চন্দ্র—মলয় পবন বহুক মন্দ।”

* * * *

যথাসময়ে ললিতা আসিল কিন্তু তাহাকে দেখিয়া শীলার মনের উপহাস মনেই মিলাইয়া গেল। এ যেন সেই দেহে অন্য ললিতা। সেই হাস্যচটুলা নর্ত্তনগতিশীলা মুখরা ললিতা যেন এক অসাধারণ গাম্ভীর্য্যময়ী সংযত গতিমতী যুবতী। দেহের ও যেন অনেক পরিবর্ত্তন হইযাছে, ক্ষীণচন্দ্রলেখার মত তাহার অবযব এবং ম্লান মুখকান্তির দিকে চাহিয়া সহসা শীলার চোখের কোণ জলে ভরিয়া গেল। শীলা ললিতাকে অন্তরের সহিতই ভালবাসিত। তাহার প্রতি ললিতার ভালবাসা অপেক্ষা ও তাহার আকর্ষণ প্রবল ছিল। এতদিন পরে দেখা—তবু সে স্নেহের এতটুকু কমে নাই—বরং অদর্শনে বিচ্ছেদে যেন বাড়িয়াই গিয়াছে।

ললিতা সে চোখের জল দেখিল, দেখিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল- “তোর স্বাধীন জীবনের খবর পেয়ে পর্য্যন্ত একবার তোকে দেখ্‌বার সাধ হচ্চিল কিন্তু—কাকিমাকে একা কোথায় রেখে আসি তাই আসা আর ঘট্‌ছিল না। অনেক ক’রে তবে ক’দিনের কড়ারে এসেছি।”

শীলা মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া গেল, ললিতাকে নিকটে পাওয়ার উচ্ছ্বাসে তাহার কাকিমা ও ৺কাকাবাবুর কথা আজ মনে ছিল না, কিন্তু ললিতা তাহার এই চোখের জলকে যে সেই শোকোদ্ভূত ভাবিল—তাহাতে সে একটু আরাম বোধ করিয়া বিষণ্নমুখে বলিল “তাঁর আসা বুঝি সম্ভব হ’ত না? আমি কিন্তু সব ব্যবস্থাই এখানে কর্‌তে পার্‌তাম ভাই। কোথায় তাঁকে রেখে এলি—কার কাছে—?”

“বাড়ীতেই রইলেন—আর কোথায় থাকবেন? তাঁর ভাবী জামাই তাঁকে দেখাশুনা কর্‌বেন এ ক’দিন্ আর কি!”

“ভাবী জামাই! কে তিনি—কোন্ ভাগ্যবান্—” অতর্কিতে শীলার মুখ হইতে শেষ কথাটুকু বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার অপ্রতিভ হইল। ললিতাও একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া লইয়া উত্তর দিল—

“আর কে—মোহনবাবু!”

“মোহনবাবু? সে কি—কেন কুমুদবাবু? তিনি কি—আমার তো মনে হয়েছিল—তিনি কি কোন’ প্রস্তাব করেন নি?” শীলা অশমিত নিশ্বাসে এতগুলি প্রশ্ন করিয়া বসিল।

ললিতা একভাবেই উত্তর দিল—“হ্যাঁ—আমার কাছেই করেছিলেন—কিন্তু ভেবে দেখলাম, কাকিমার আর কেউ নেই—তাঁর কাছে থাক্‌তে হলে ঐ তাঁদের স্থানীয় ব্যক্তি মোহনবাবুকেই—” ধীরে ধীরে ললিতার কণ্ঠ যেন আপনি বুঁজিয়া গেল।

শীলা সতেজে বলিয়া উঠিল “সে আবার কি! কাকিমা কি ঐটুকু বুঝ্‌লেন না।”

—“কি আর বুঝবেন—আমিই বুঝালাম তাঁকে, যদি নিতান্তই তিনি বিয়ে না দিযে ক্ষান্ত না হন্ তাহলে তাঁর কাছে কাছেই যাতে থাক্‌তে পারি তাই করাই বরং ভাল—”

“না হয় কুমুদবাবুকেই এই সর্ত্তে রাজী করাতিস্—তিনি বোধ হয় তাতেও রাজী হতেন তোর জন্যে—”

ললিতা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—“নে এখন হাত মুখ ধুই—কিছু খেতে দে, কুমুদবাবু কুমুদবাবু ব’লে যে ক্ষেপে উঠ্‌লি! তুইই কেন তাহলে কুমুদবাবুকে বিয়ে কর্‌লিনে, এতই যখন তুই তাঁর ভক্ত—”

শীলা আবার অপ্রস্তুতের সঙ্গে ব্যস্তভাবে ললিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিযা তাহাকে স্নানাগারের দিকে লইয়া চলিতে চলিতে আদেশপ্রার্থী ভৃত্যকে দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাকে চা জলখাবার আদি ঠিক্ করিতে আদেশ দিল এবং শীলাকে জিজ্ঞাসা করিল “কিরে—সরবৎ খাবি এখন—না চা? কি তোর অভ্যেস হয়েছে এখন বল?” “যা দিবি তাই!” “আচ্ছা আর একটী কথা, মাছমাংস ডিম এসব খাস্‌তো? বদরী থেকে এসে দেখ্‌তাম, কিছু খেতিস্ না এগুলো—সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি!”

ললিতা একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—“দাদুর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকার জন্য আমার যে ওসবে রুচি কম তাতো বোর্ডিংয়েই দেখতিস্! কিন্তু এ নিয়ে হাঙ্গামা কর্‌তেও ভাল বাস্‌তাম না আর—এখন এতো খেতেই হবে—” হাসিয়া ললিতা শীলার পানে চাহিল “নূতন জীবনে প্রবেশ কর্‌লে এসব তো অবশ্যম্ভাবী—”

জলযোগাদির পর তাহারা একাসনে প্রায় পরস্পরের গায়ে গায়ে বসিয়া নানা গল্প করিতে লাগিল। ললিতা

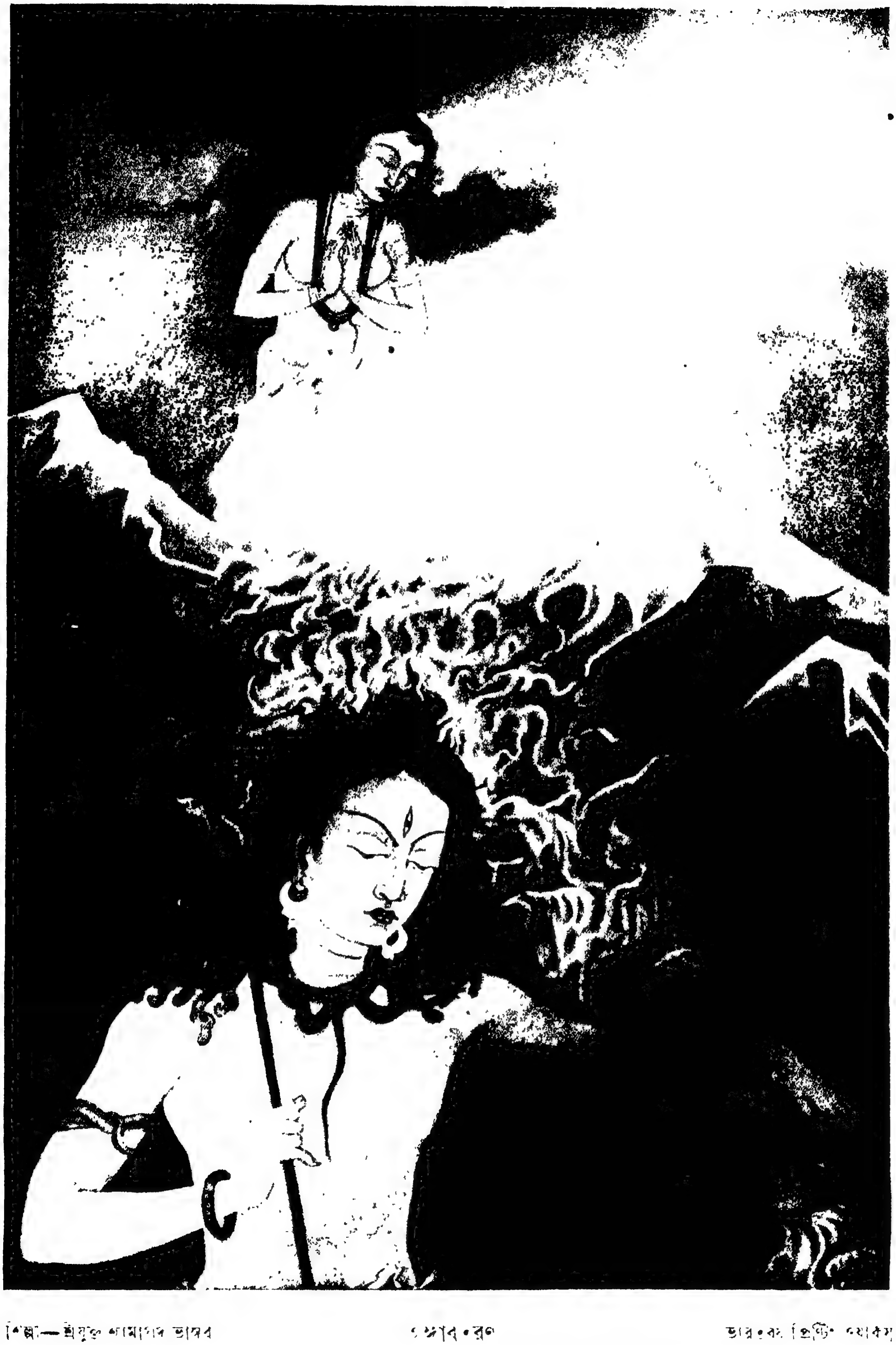

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শামাপদ ভাস্কর

গঙ্গাবতরণ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

তাহার নূতন জীবনে প্রবেশের উল্লেখ মাত্রে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে—তাহা বুঝিয়া শীলা সময়ান্তরের জন্য তাহা রাখিয়া দিয়া এদিক ওদিকের নানা কথা বলিয়া চলিল "তোর অনাবিলাকে মনে আছে ললিতা ? আই-এ পাশ দিয়েই বিয়ে কর্‌তে হল যাকে—আমাদের সঙ্গে বি-এ পড়া কপালে ঘট্‌লোনা বলে যা তার দুঃখ—"

"বিলার কথা বল্‌ছিস তো ? চার পাচ বছরের কথাও ভুলে যাব ?"

"সেই বিলার শ্বশুর বাড়ী এখানে। তার ননদ আর কে একজন মেয়ে জানি না পড়ে আমার স্কুলে ! এখানে আসার তিন চার দিন পরেই স-স্বামী সে এসে হাজির—কোলে একটি খুকু। আর তাঁর শ্বশুরবাড়ী যে জাঁকাল—সেই প্রাচীনপন্থী সংসারের একটি নিঁখুত আদর্শ ; জা ননদ ভাসুর দেওর—শ্বশুর-শাশুড়ীই কয়েক রকমের—কি বলে দিদি-শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী, জেঠশাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী ইত্যাদি। অথচ মেয়েদের অনেকটা স্বাধীনতার চাল্ আছে—একটু শিক্ষিত ধরণের সকলেই, বাড়ীটি ও খুব জাঁকালো—নদীর ওপরেই বোটে করে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় ইচ্ছা হলেই ! সেই লোভে ক'বারই গিয়েছি—আর জানিসই তো বিলা কি রকম ছিনে জোঁক ! তুই এসেছিস শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, কালই গাড়ী নিয়ে এসে উপস্থিত হবে স-স্বামী কন্যা—অথবা স-শাশুড়ীবর্গ—

"তুমিই আমায় রক্ষে কর ভাই—'যা ফুরায় দেরে ফুরাতে' সেই কলেজের ভাব নিয়ে এখন আর এই কটা দিন আমায় জ্বালিওনা।"

"ও হরি, সে কি শুন্‌তে বাকি আছে ? তোর পত্র পেয়ে ভাই স্ফুর্ত্তির চোটে সেই দিনই তার ননদ মেয়েটাকে দিয়ে বিলাকে খবর দিয়ে ফেলেছি যে !"

ললিতা মহাবিরক্তির সহিত বলিল, "বেশ করেছ ! কালই আমি পাত্তাড়ি গুটচ্ছি দেখো।"

"তা আর না" বলিয়া শীলা তাহার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল ; তাহার পরে একটু আব্‌দারের সঙ্গেই বলিল "কেন তুই অমন করে নিজের মাথাটি খাবি ভাই ? আমি মোহনবাবুকে কিছুতেই তোকে দেবনা, ঝগড়া করব সেই বোকা মেয়ে কাকিমাটীর সঙ্গে ! তাঁর কাছেই না হয় থাকবি তুই—তবু—"

"দূরে থাকেন যে কুমুদবাবু—সে কি করে হবে—"

"কেন হবেনা—যো যস্য বন্ধু নহি তস্য দূরং—না কি ভুল হ'ল—

গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো লক্ষান্তরেহর্ক সলিলে চ পদ্মম্
দ্বিলক্ষ দূরে কুমুদস্য নাথো—যো যস্য মিত্র নহি তস্য দূরম্।"

ললিতা ঈষৎ বিস্ফারিত-নয়নে শীলার পানে চাহিয়া বলিল "অত খবর আমি জানিনা ভাই।"

"তুমি না জান, আমি জানি—আর এই গুড্ ফ্রাইডের ছুটীর সুযোগ তোকেও জানিয়ে দিচ্চি দাঁড়া। নিমন্ত্রণ করে পাঠাচ্ছি কুমুদবাবুকে—আমরা আবার এক পার্ব্বত্য পথে অভিযান কর্‌ব, সঙ্গী হবেন তো শীঘ্র আসুন। দ্যাখ্ কেমন দূরে থাকেন ? বল্‌বি বিয়ের কথা ? তা না হয় কাকিমা কিছুদিন তোদের কাছে গিয়ে থাকবেন, তোরা কিছু দিন তাঁর কাছে থাক্‌বি, ঘর-জামায়ের মত বেশ তো !"

"কি পাগলামি করিস্ শীলি ! আচ্ছা আন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে—তোরই সাধুপনা আমি ঘুচিয়ে দিচ্চি ! এও একরকম মজা দেখ্‌ছি ! যো যস্য মিত্রম্ সেই তার ততদূরে থাক্‌তে চায় যে দেখি ! কি অভিমানে নিজেই বা নিজের মনের ক্ষতি কর্‌তে এমন উল্টো পথে চলেছিস্ ? তিনি বোঝেন নি বলে—না ?—আচ্ছা ডেকে আন্—আমিই বুঝিয়ে দেব।"

শীলা অপলকনেত্রে ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা দেখা যাক্ কে কাকে কি বোঝায় ! বাজী ! চল্ এখন খাবি তো ! আজ আর রাত্রে ঘুম হবেনা, দুটো খাট জোড়া দিয়ে বিছানা পেতেছি—বড় একটা মশারি, কিন্তু—নৈলে গল্পের জুৎ হবেনা—চল্ খাবি।"—

উভয়ে উঠিয়া পড়িল। ক্রমশঃ

পাশাপাশি

অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

পাশাপাশি হায় দুইখানি বাড়ী
বহুদিন ধরে আছে,
ঝড়ে উড়ে পড়ে ও বাড়ীর শাড়ী
এদের বাড়ীর গাছে !
ও বাড়ীর ফোটাফুল থেকে উঠে
এ বাড়ীতে আসে মৌমাছি ছুটে,
ফুটি-ফুটি ফুল এদের বাড়ীতে
যদি এতটুকু ফোটে !
শিউলি বকুল ঝরিয়া ঝরিয়া
যখন ধূলায় লোটে !

(২)

মাঝখানে শুধু সরু পথটুকু
অতটুকু ব্যবধান,
না হলে ওপারে ধুক ধুক বুক
এপারে উতলা প্রাণ !
ও বাড়ীর কথা হেথা শোনা যায়
ওদের কুকুর এ বাড়ী ঝিমায়,
এদের বেরাল মাছ চুরি ক'রে
ও বাড়ীতে গিয়ে খায়,
ও বাড়ীর কাঁটা বেছে বেছে ফোটে
এদের বাড়ীর পায় !

(৩)

ও বাড়ীর মেয়ে বাসে চড়ে গিয়ে
ইন্টার ক্লাসে পড়ে,
এ বাড়ীর ছেলে পাশ করে বি-এ
আকাশে সৌধ গড়ে।
বারে বারে মেলে যখন তখন
হেথা দু'টি আঁখি হোথা দু'নয়ন,
বারে বারে ফোটে সরম-রক্ত
মুখপরে অঙ্কন,
আসে বারে বারে আঁখি নীচু ক'রে
ফিরে চাহিবার ক্ষণ !

(৪)

দু'বাড়ীতে যায় ভাগের গাড়ীতে
সিনেমা কি থিয়েটারে,
এ বাড়ী শ্রেষ্ঠ সেমিজে শাড়ীতে
ও বাড়ী অলঙ্কারে !
এ বাড়ী মাথায় মেখেছে গন্ধ,
ও বাড়ী কেবল নয়নানন্দ—
নায়িকার ব্যথা দু'বাড়ীতে বোঝে,
দু'বাড়ীতে ব্যথা পায়,
এ বাড়ীর রাহা বলে "আহা আহা।"
ও বাড়ীর রায "হায় !"

(৫)

বাণীর বয়স আঠারো হইবে
বেণু দশ কম ত্রিশ,
কুড়ি আঠারোরে কেমনে সহিবে
আঠারো কুড়ির বিষ !
বেণু মনে ভাবে চাহিবে না আর
বাণী স্ক্রীন টেনে দেয় জানালার,
কিন্তু হৃদয়ে জেনেভার সভা
কেবলি মাগিছে পিস্
তাই বারে বারে চোখে চোখে মেলা
তাই বারে বারে মিশ্ !

(৬)

নিঝুম শীতের মেঘল দুপুর
রবি গুণ্ঠন-ঘুমে,
আলিসাতে বসে কপোতী বিধুর
কপোত-চঞ্চু চুমে !
দূরে তরুশিরে কোথা ঘুঘু ডাকে
জীর্ণ সে পাতা ঝরে কোন্ শাখে,
কোথা কে গাহিছে বেদনা রাগিণী
বৌদির নাসা হাঁকে,
বাণী খুঁজে মরে এ ঘরে ও ঘরে
যদি কেহ জেগে থাকে !

(৭)

সরু পথ যেন বরষার নদী
কঠিন প্রযাস করি,
সাহসিকা হায় পার হল যদি
ঘন নিশ্বাসে ভরি,
স্বেদজলে ভাসে বক্ষ কমল
ক্ষীণ তনুখানি কাঁপে অবিরল
দক্ষিণ আঁখি থাকি থাকি কাঁপে
অশুভ সূচনা করি,
পায়ের তলায কাঁপে যেন ভূমি
বারে বারে থরথরি !

(৮)

চৌত্রিশ শালে সেদিনটা হ'ল
পনেরই জানুয়ারী,
পাতালের নাগ মাথা বদলাল'
বিপদ ঘটাল ভারি !
ভূমির প্রবল কম্পে বেহারে
কি ভীষণ লীলা কে বোঝাতে পারে,
রক্ত বহিল স্রোতের মতন
কত গেল পরপারে,
কত পশুপাখী শিশু নারী কত,
কত চিকিৎসাগারে !

(৯)

সহসা সে বাড়ী পড়িল ভাঙিয়া
বিপুল ভূকম্পনে
এই সবে ওরা দুটি হৃদয়েতে
মিলিল প্রলয় ক্ষণে।
একটি নিমেষ চেয়ে মুখপানে,
এক নিমেষের শিহরণ প্রাণে ;
একবার শুধু চেয়েছিল বুঝি
লাজে রাঙা করি মুখ,
একটি পলকে চোখে চোখে বুঝি
চেয়েছিল এতটুক্ !

(১০)

মৃত সতী দেহ স্কন্ধে করিয়া
শঙ্কর বুঝি নাচে,
ভূধর সাগর পৃথ্বীর হিয়া
শঙ্কা-মরণ যাচে !
ভয়ঙ্করের চরণের তলে
বসুধা বুঝি বা ফেটে যাবে গলে,
হিমগিরি বুঝি সাগরে লুকাবে
সাগর শুকাবে পলে,
ভয়ঙ্কর সে নাচে শঙ্কর
সতী বিচ্ছেদে জ্বলে !

(১১)

পাশাপাশি হায় দুইখানি বাড়ী
ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে,
ঐ শুয়ে আছে নিষ্প্রাণ নারী
বেণুর বুকের কাছে।
ঐ সবে ওরা মহামিলনের
চরণের তলে মৌন্ ক্ষণের
সুরভি কুসুম মালিকার মত
সমাধি শয়ন-তলে,
সরু সে পথের ব্যবধান পারে
ভাসিছে চোখের জলে।

বার্লিনে অলিম্পিক গেমস্

ডাক্তার শ্রীগোরাচাঁদ নন্দী এম-বি, এম-সি-ও-জি (লণ্ডন)

ঘুম ভাঙ্‌ল খুব ভোরে। ছটা তখনো বাজেনি। প্রাতকৃত্য সমাপন করে—প্রাতর্ভ্রমণ সেরে এসেও দেখি কেউ ওঠে নি। পরে জেনেছিলাম এখানকার রীতিই এই—শোয় অনেক রাত্রে আর ওঠে অনেক বেলায়। এখানকার খাবার ঘরে নাকি অনেক রাত পর্য্যন্ত হল্লা চলে, পানীয় নিঃশেষ হয় আর বাংলায় যাকে বলে 'ঢলাঢলি' তাই চলে। এমন কি, লণ্ডন থেকে আগত একজন বীরপুরুষ যাঁকে ওখানে স্টেশনে একটি মেয়ের হাত ধরে টানাটানি করতে দেখেছি তিনিও দুঃখ করছিলেন যে, এখানে ছেলেদের চোখের চামড়া নেই। সব কাজেরই ত একটা ভদ্রস্থ আছে—"অবশ্য এরা আমোদ করে করুক তাতে দোষ নেই, কিন্তু এত বাড়াবাড়ি কেন—ইত্যাদি। আমি হাসি ভূতের মুখে রাম নাম শুনে, হয়ত বিধাতাপুরুষও হাসেন! আমার মতে এ হবেই—অবশ্যম্ভাবী। কাঁচা বয়েস, তাজা রক্ত—একটু করুক—তবে আসল না ভুললেই হল। যে কাজ করতে এসেছে তাতে গলদ না থাকলেই হল। তবে এ বিষয়ে আমার সমালোচনা করবার অধিকার কতটা আছে জানি না—কে বলতে পারে যে আমিও ও দলে মিশে যাব না!

চা খেয়ে, পথের ঠিকানা নিয়ে এবং ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ভাঙিয়ে—বেরুলাম টিকিটের সন্ধানে। যেতে হবে ব্রিটিশ কন্‌সলের্ কাছে। যদি সেখানে কোনও টিকিট ফেরত এসে থাকে। ঠিকানা পেলাম—১৭ নম্বর্ টিয়াবগার্টেন ষ্ট্রাসে। ষ্ট্রীটকে এরা বলে ষ্ট্রাসে। দু নম্বর বাসের দোতালায় চড়ে—গুপ্তমশায়ের নির্দ্দেশ মত রাস্তার নাম বলাতে ২৫ বেনিগের টিকিট দিল। বাসগুলো এখানে খুব বড় বড়, আর সব হলদে রংএর। রাস্তার বড় বড় বাড়ী, সাজান দোকান, এই সব দেখতে দেখতে, রেডিওতে লেক্‌চার, ব্যাণ্ড, আর গান শুনতে শুনতে ছুটে চলেছি। কথা বন্ধ। এখানে খানিক অন্তর অন্তর রাস্তায় রেডিও ফিট্ করা আছে। সারাদিন ওলিম্পক্ স্টেডিয়ম্ থেকে ব্যাণ্ডের ঐক্যতান ও নানা খবর আসছে। যারা ঢুকতে পায় নি তারা শহরের সমস্ত জায়গা থেকেই শুনতে পারে। সুন্দর বন্দোবস্ত। কিন্তু জার্ম্মান ভাষায় বলে—আমি কিছুই উপভোগ করতে পারি নি। কোথায় নামতে হবে ঠিক করতে না পেরে একটু দূরে গিয়ে নেমে পড়লাম। তারপর পুলিশদের জিজ্ঞাসা করতে করতে অগ্রসর হলাম। একটা বড় রাস্তার মোড়ে নামলাম সেটা এখানকার সবচেয়ে বড় রাস্তা—নাম 'উণ্টার ডেন্ লিণ্ডেন্', মানে হচ্ছে Under the Linden Trees. এই মোড়ে একটা খুব বড় থামওয়ালা গেট আছে—তার নিচে দিয়ে গাড়ী যায়। এই রাস্তার ওপরে বড় বড় দোকান এবং শেষে য়ুনিভর্সিটি, কাউন্সিল, আর কাইজারের প্রাসাদ আছে।

পট্সডামের
উইণ্ড মিল

ভারতীয় এবং মেক্‌সিকো-
বাসিনী মেয়ের দল

এই রাস্তার দুধারে দেখলাম খুব ভিড়। পরে শুনেছিলাম, এখান দিয়ে অলিম্পিকের শোভাযাত্রা যাবে। তার পুরোভাগে থাকবেন স্বয়ং হিটলার। বেলা ৪টায় যাবে, কিন্তু সকাল থেকেই ভিড় জমছে। সেই ভিড় ভেঙে, সকলের কৌতূহল আকর্ষণ করতে করতে, টিয়েস গার্টেন ষ্ট্রাসের খোঁজে ঘুরতে লাগলাম। একবার যেই রাস্তায় নেমেছি, কে একজন পেছন থেকে হাত ধরে টেনে কি বলল, বুঝলাম না—দেখলাম ফুটপাথের ওপর দিয়েই আমার সামনে দিয়ে একখানা সাইকেল বেগে চলে গেল। পরে দেখে বুঝলাম যে, ফুটপাথের পাশেই সাইকেল চালাবার রাস্তা—গাড়ীর রাস্তা থেকে উঁচুতে। খোঁজ করতে করতে ব্রিটিশ কন্‌সলের অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে শুনলাম—টিকিট কিছুই আসে নি—তবে ওলিম্পিক্ গেম্‌স

অফিসে খোঁজ করতে পার—হয়ত পেতেও পার—যদি তোমার ভাগ্য ভাল হয়—তবে বড্ড দেরী করে ফেলেছ ! রাস্তা চেন ? আমি বললাম—না, আমি সবে কাল এসেছি। ঠিকানা লিখে দিন। তারা বলল - ট্যাক্সী করে যাওয়াই সমীচীন—তা না হ'লে ঘুরতে হবে। বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি পড়ছে—সঙ্গে ওভার কোট নেই—তা ছাড়া পথভুলে ঘুরবার ভয়ে—একটা ট্যাক্সী ভাড়া করে ঠিকানা দেখালাম। পৌঁছতে মিটারে দেড়মার্ক উঠল। সেখানে পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য—এখানে লোকারণ্য মানে মেয়েপুরুষ দুইয়েরই। ' একজায়গায় INFORMATION লেখা রয়েছে দেখে গেলাম। একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির জামার হাতে—ENGLISH, FRENCH, ITALIAN এই সব লেখা রয়েছে : অর্থাৎ সব ভাষাতেই লোকটি কথা বলতে পারে। আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে পেলাম। এতক্ষণ নানা ভাষা শুনছিলাম। সে বলল—বড়ই দুঃখিত হলাম, সব টিকিট ফুরিয়ে গেছে। বিশেষ করে Light atheletic-এর একখানিও প্রবেশ-পত্র নেই। তবে আসছে সপ্তাহে এখানে খোঁজ করলে টিকিট পেতে পার। কারণ, লোকের কত আর ধৈর্য্য থাকবে—তারা দু-চার দিন দেখেই টিকিট ফেরত দিতে আসবে। শুনে ত' আমিও বড়ই দুঃখিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু পরে দেখেছিলাম লোকটি ঠিকই বলেছিল। সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শুনেছিলাম—প্রোসেশানটা দেখতে পাওয়া যাবে বড় রাস্তায় গেলে। সেই দিকেই আবার পা বাড়ালাম—প্রোসেশান কখন যাবে তথনও জানি না। রাস্তার দুধারে লোকের সারি। আমি একলা কালা আদ্‌মি সাদার ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। সকলের কৌতূহল দৃষ্টি পড়ছে। এক বন্ধু অন্য এক বন্ধুকে ডেকে দেখাচ্ছে, মা ছোট ছেলেকে ডেকে দেখাচ্ছে। আমার মনের ভাব বেশ বুঝতে পারছিলাম, তবে ভগবানের দয়া এই যে নিজের মুখের চেহারাটা দেখতে পাইনি ! মাইল দুই এই অবস্থায় গিয়ে একটা মোড়ে এসে ফেরবার ইচ্ছে হল। একজন বড় গোছের পুলিশকে পাকড়ালাম। এখানে পুলিশদের পোষাক খুব জাঁকজমকের—উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীদের মত কে ছোট কে বড় বেশ বোঝা যায়। ছোটরা কোন বড় বেশধারীদের দেখলেই Heil Hitler করে। পুলিশপ্রবর ইংরেজী জানেন না। আর একজনকে ডাকলেন। তিনি আবার এমন ইংরেজী জানেন যার তুলনায় আমার জার্ম্মান জানা ঢের ভালো। তারা যা বলে আমি বুঝি না—আমি যা বলি তারা বোঝে না - আকার ইঙ্গিত অবশ্য অনেক রকম চলছিল। শেষে একজন ছোকরা এসে আমায় উদ্ধার করল। তখন চারিদিকে ভিড় জমে গিয়েছে। সে আমাকে বাস অবধি পথ দেখিয়ে দিতে রাজী হল। তার সঙ্গেই চললাম। সে সুইজারল্যাণ্ডে পড়ে। ইংরেজী বার্লিনে এসেই শিখেছে। সিগারেট দিতে গেলাম, বলল—ধন্যবাদ, আমি ধূমপান করি না। সমস্ত পথটা পুলিশদের সে জিজ্ঞাসা করতে করতে আমাকে ১৯ নম্বর বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল। বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবলাম খেয়ে উঠে প্রোসেশান দেখতে বেরুব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। কেন পরে বলছি।

লেবার ক্যাম্পে ছেলেরা
খাল কাট্‌ছে

সুইমিং
পুল

ব্যর্থতা নিয়ে ত ফিরে এলাম। মনের কোণে তবু আশা ধিক্ ধিক্ করছে—বরাতের ওপর বিশ্বাস এখনো হারাই নি। খেতে বসে গেলাম। যদিও ল্যাঞ্চের পক্ষে তখন খুবই দেরী—কারণ, দুটো বেজে গেছে। তবে এখানে দেখেছি ইংল্যাণ্ডের মত অতো কেতা-দোরোস্ত নয়। বিশেষত "হিন্দুস্থান হাউস" বোর্ডিং-এ। এখানে লাঞ্চ চলে সকাল ১১টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত। আর 'ডিনার' চলে সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত ১টা পর্য্যন্ত। খেতে খেতে একটু ক্লান্তি আসছিল। আর একলা বেরুতেও তত ইচ্ছা হচ্ছিল না ওই ভিড়ের মধ্যে। দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—তারা যাবে কি-না। সঠিক উত্তর পেলাম না—আশাও করিনি। হঠাৎ দেখলাম একজন বেশ জোয়ান এবং সটাক আধা-বয়সী ভদ্রলোক এসে আমার সামনের টেবিলে বসলেন এবং গুপ্ত

সাহেবের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া সুরু করলেন। কথা শুনে বুঝলাম ইনি জার্ম্মান জানেন। আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, যদি টিকিটের সন্ধান মেলে। খেয়ে উঠে খানিক পায়চারী করে আলাপ সুরু করলাম। আমার লাজুক স্বভাবকে ঠেলে সেধে আলাপ করা এই বোধ হয় প্রথম। গিয়ে বললাম—আপনি এখানে অনেক দিন আছেন, না? বাংলা কথা শুনে ভদ্রলোক খুব খুসী, আলাপ তৎক্ষণাৎ জমে গেল। ভদ্রলোকের নাম ডাক্তার দাশগুপ্ত—তিনি একজন রসায়নাচার্য্য, অর্থাৎ—ডক্টর অফ্ কেমিস্ট্রি, পচিশ বছর জার্ম্মাণিতে আছেন। গুণী লোক, এদেশে ব্যবসা করছেন। বড় বড় জায়গায় জার্ম্মানী, সুইডেন এবং সুইজারল্যাণ্ডে মোটা মাইনের চীফ্ কেমিস্টের কাজ করেছেন—এখনও এদেশে নিজে রোজগার করেন। ডাক্তারী চিকিৎসা সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানলাভ করেছেন ডায়বেটিস্ অর্থাৎ বহুমূত্র রোগসম্বন্ধে একটা নূতন গবেষণা এবং চিকিৎসা ক'রে ইনি এমন সাফল্য লাভ করেছেন যে, এখানে অনেক রোগীর চিকিৎসা পর্য্যন্ত করে থাকেন। তবে ইনি বার্লিনে থাকেন না থাকেন হাম্বুর্গে; এখান থেকে শ'খানেক মাইল দূরে। এখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। ওর সঙ্গে বেলা আড়াইটে থেকে রাত নটা পর্য্যন্ত গল্প করেছি। একথা, সেকথা, দেশের কথা, বিপ্লবের কথা, ডাক্তারী গবেষণার কথা, বহু কথা, ছোট কথা, বড়কথা কিছুই বাদ যায় নি। দেখলাম আমি যে শুধু ভাল শ্রোতা তাই নয়, আজকাল কোনো কোনো বিষয়ে দুকথা বলতেও পারি। অবশ্য এজন্য ধন্যবাদ পাওয়া উচিত সুধাংশুর, দুকথা বলা ওর কাছেই শেখা। ভদ্রলোক আমার ওপর একটু বেশী রকম খুসী হয়ে গেলেন কেন জানি না, বোধ হয় আমার বরাত—আমাকে চীনে রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। বেড়াতে যেতে চাইলেন না, বললেন—বসুন, আরও খানিক গল্প করা যাক। শেষে অনেক ইতস্তত করে আমার মনের ইচ্ছা তাঁকে বলাতে তিনি বললেন—নিশ্চয়ই, আমি আপনাকে এবিষয়ে সাহায্য করব, যদিও এ বেটাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া। আমার 'থিওরি' এরা কেউ মানতে চায় না। তবু আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার কথা রাখবে। আর দেখুন, আমার মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালীর ব্রেণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! আর এ-বেটারা সেটা বোঝে। ভাল ভাল ব্রেণওয়ালা লোক আমাদের দেশ থেকে এখানে আসার দরকার। তারপর নিজের 'থিওরি' নির্ভুল প্রমাণ করবার জন্যে অনেক উদাহরণ দিলেন। বললেন জার্ম্মান ব্যাটারা নকল করতে ওস্তাদ। এই দেখুন না, মডার্ণ জার্ম্মান লিটারেচার সবই আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত থেকে নকল করা—ইত্যাদি। আমাকে একটা ভাল হাসপাতালে ঢুকিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমিও প্লান মনে মনে প্ল্যান বদলে বার্লিনেই পড়ব ঠিক করেছি।

সুইমিং পুল—
অপর দৃশ্য

সুইমিং পুল—
অন্য একটা দিক

খাইয়ে দাইয়ে আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে—আবার দেখা হবে বলে ডঃ দাশগুপ্ত বিদায় নিলেন। কিন্তু আর একবার ছেড়ে—আর জন্মেও কখনও দেখা হয় নি! তিনি বলেছিলেন যে আমার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ! এখন দেখা যাক তাঁর বাক্য ফলবতী হবে কি-না।

রাত্রে সকাল সকালই শয্যা নিলাম।

ভোরেই শয্যা ত্যাগ করলাম—এই আশায় যে সকাল সকাল ব্যাঙ্কে গেলে হয়ত খেলার টিকিট পাওয়া যেতে পারে। এখানে টিকিট বিক্রয় করে একেবারে Deutche Bank—অর্থাৎ প্রবল জার্ম্মান ব্যাঙ্কের খোদ হেড-অফিস; গুপ্তসাহেবের কাছে ঠিকানা ও বাসের নম্বর জেনে নিয়ে দু নম্বর বাসে রওনা দিলাম। ব্যাঙ্কে যাবার সময় একজন সহযাত্রী পেলাম—ঠিক আমার মতন অবস্থা! আগের দিন রাত্রে এসেছে—নাম Dr Gadeker (উচ্চারণ গাড়েকার)

সুইমিং পুল—
আর একটা দিক

এক জন
ঝাঁপ দিচ্ছে

নাগপুরের লোক—বম্বেতে শিক্ষিত। ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য ভোর থেকেই সব এসে ‘কিউ’ করে দাঁড়িয়ে আছে। খানিক ঘোরাঘুরি করে তার মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু একটু এগুচ্ছি—চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি ত আছেই -কথা কারুর একটাও বুঝি না মাঝে মাঝে দু-একটা ছুটকো কথায় আমাদের কদাচিৎ জার্ম্মান শেখার অপ-চেষ্টার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। পা পা করে প্রায় মাঝামাঝি যখন এসেছি একজন ভদ্রমহিলা পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় বললেন তোমরা মিথ্যে কেন ভিড়ের মধ্যে দাড়িয়ে আছ? এগিয়ে গিয়ে বিদেশীয় পাস্‌পোর্ট দেখালেই আগে যেতে দেবে। আমরা বললাম- তার ত কিছু ঠিক নেই ম্যাডাম, যেটুকু এগিয়েছি সেটুকুও কি মারা যাবে? ইতিমধ্যে আর এক ভারতীয় বন্ধু জুটে গেছে সেই ভিড়ের মধ্যে—নাম শ্যামা। ইংলণ্ডে ইঞ্জিনীয়ারি পড়ে—জব্বলপুরে বাড়ী। জাতে মাদ্রাজী—কিন্তু সুন্দর বাংলা বলে। কাজেই—“উৎসবে ব্যসনেচৈব” —খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গেল বিশেষ করে প্রাণখুলে বাংলা বলতে পেয়ে। আমরা তিনজন ভারতীয় মহিলাটির কথার উপর নির্ভর করে ‘কিউ’ ছাড়তে ইতস্তত করছি দেখে মেমসাহেব দয়াপরবশ হয়ে বললেন—চল আমি নিজে তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি। নিয়েও গেলেন। যেতে যেতে বললেন-- আমারও লাভ হবে। তোমাদের Interpreter বা ‘দোভাষী’ হয়ে আমিও আগে যেতে পারব। পরে এই মহিলাটির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল—সে সব কথা পরে বলব।

ঝাঁপ দেবার পর

সুইমিং পুলের যে ধারে রেস হয়

পাশপোর্ট দেখাতেই আমাদের খাতির করে জার্ম্মান কর্ম্মচারীরা ভেতরে নিয়ে গেল। পরাধীন কালো জাত সাদার দেশে এত খাতির পেয়ে যেন বর্ত্তে গেলাম!—আর সঙ্গের ভদ্রমহিলাটির অযাচিত সাহায্যের জন্য মনে মনে তাঁর প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে লাগলাম। ওপরে মস্ত অফিশ—খুব সুবন্দোবস্ত—তবে টিকিট খুব কমই বাকী আছে দেখলাম। ২ তারিখের টিকিট ১০ মার্ক দামের কিছু আছে—কিন্তু অত খরচ করতে ইচ্ছে হল না। ৩ আর ৪ তারিখের টিকিট ৬ মার্ক দামের আছে সেখানেও কিউ করে লোক দাঁড়িয়েছে। শ্যামাকে ‘ফুটবল’ আর ‘হকির’ বই কিনতে বললাম, আর নিজে—‘য়্যাথালেটিক্স’এর টিকিটের কিউতে যোগ দিলাম। টিকিট কেনা হয়ে গেলে ধন্যবাদ দেওয়ার উপলক্ষে মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ করলাম।—ইনি এক ডাক্তারের স্ত্রী, নাম Frau Margurit Schwalbe. আবার কবে দেখা হবে বলাতে ঠিকানা দিলেন—বললেন, আমার বাড়ীতে এলে খুব খুশী হব—আমার গাড়ী আছে, তোমাদের শহর ঘুরিয়ে আনতে পারি। এত করুণার একটু কিছু প্রতিদান না দিতে পেরে যেন পৌরুষে বাধতে লাগল। মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম—যদি তুমি আমাদের সঙ্গে খেলা দেখতে যাও তা হলে বেশ হয়। মেমসাহেব দেহলতা দুলিয়ে, রঙিন ঠোঁট উল্‌টে বললেন ‘আমার য়্যাথালেটিক্স-এ তত ইন্টারেস্ট্‌ নেই, তবে তোমাদের সঙ্গে দেখলে মন্দ হয় না। আমি পোলোর টিকিট কিনেছি —য়্যাথালেটিক্স-এর যা দাম! আমি বললাম—তাতে কি হয়েছে? তুমি যদি কিছু মনে না করো—তোমার টিকিট আমরাই কিনছি। মেমসাহেবকে বললেন-- কাল ত আর হবে না---আমার পোলো আছে। তবে, পরশু যেতে পারি। টিকিট কাটা হল, সীট নম্বর বদলে চার জনের পাশাপাশি আসন নেওয়া হল। মেমসাহেব খুশী হয়ে বললেন—তিনিই সেদিন মোটরে করে আমাদের তুলে নিয়ে খেলা দেখতে যাবেন। উভয় পক্ষই খুব খুশী মনে বিদায় নিলাম--অবশ্য হৃদ্যতার সঙ্গে করস্পর্শ করে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলের কৌতূহল হয়েছে—মেমসাহেব দেখতে কেমন এবং বয়েস কত? যদি বলি—পরিচয় ক্রমশ জ্ঞাতব্য, তা হলে নিশ্চয় অনেকে অধীর হবেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে খুবই আলাপ হয়ে গেছে। পূর্ব্বেই বলিছি, ইনি একজন ডাক্তারের পত্নী, তবে বিধবা, নিজের বাড়ী

আছে, গাড়ী আছে। সবই আছে, কিন্তু যা নারীর সব চেয়ে বড় আকর্ষণ—সে যৌবন প্রায় চলে গিয়েছে বললেও হয়! চোখের কোণে জরার কঠোর রেখাপাত সুরু হয়েছে। কিন্তু তাঁর দেহমন এখনো যৌবনকে ছাড়তে চাইছে না। তাই সর্ব্বাঙ্গে প্রসাধন-বাহুল্য চোখে পড়লো। বয়েস পরে নিজে থেকে বলেছিলেন আটত্রিশ। একটি পনেরো ষোলো বছরের সুন্দরী মেয়ে আছে, বৈধব্যের পরে নাকি অনেকে ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছে, উনি রাজী হননি, পাণিপ্রার্থীদের পছন্দ হয়নি বলে। সদা হাস্যময়ী, পরিপূর্ণ জীবনবেগে চঞ্চল; তবে মাঝে মাঝে নিজের বিলাস-বিঘ্নে বিরক্তি আর বিপদে অসহায়তা ঢাকতে পারেন না। শ্রীমতীদের সঙ্গে অনেক বছর দেশে ঘর করবার সুযোগ পাওয়ায় বোধ হয় আমার একটু এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয়ে গেছে। শ্রীমতীরা সব দেশেই সমান। ···

বার্লিন রাজপ্রাসাদের দৃশ্য

জার্ম্মাণীর পল্লীবাসী সাধারণ লোক

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে—টিউব ট্রেণে চড়ে—খেলার মাঠে গেলাম মাঠের নাম হচ্ছে Reichs sport field, অর্থাৎ সরকারি খেলার মাঠ। এখানে সবই সরকারের হাতে। প্রত্যেক জনপ্রাণী, কাজকর্ম্ম, ব্যবসাবাণিজ্য, সবই সরকারের অধীন। পড়ো জমি এবং জঙ্গল পরিষ্কার করে বিরাট খেলার মাঠ তৈরী হয়েছে—কত নূতন রাস্তা, নূতন রেল লাইন, স্টেসন ইত্যাদি হয়েছে। টিউব স্টেশনে নেমে খানিক দূর গিয়েই আটকা পড়ে গেলাম। টিকিট না হলে যেতে দেয় না। কাজেই আশে-পাশে দেখতে দেখতে রাস্তার ধারে একটা 'কাফে'তে ঢুকে পড়লাম কিন্তু ঢুকে পড়লাম বলাটা ভুল হবে। কারণ, বাইরের খোলা মাঠেই বেশী ভাল বন্দোবস্ত। ভিতরের ঘর ছোট আর লোকে সেখানে বসেও না। এখানে দেখেছি—বড় রাস্তার ওপরের বড় বড় রেস্তোরাঁতেও এই বন্দোবস্ত। কাফের বড় ঘরটাতে বিয়ার এবং অন্যান্য পানীয় পাওয়া যায়। আমরা তিনজনেই নিরামিষ বলে— জলপথে না গিয়ে পাশের ছোট দোকান ঘরে গিয়ে—ইসারা ইঙ্গিতেও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এবং ইংরেজী বলে—Egg স্যাণ্ডউইচ বা ডিম-পুরি অর্থাৎ ডিমভরা রুটির টুকরা দুধ আর চিনির ডেলার সঙ্গে ক্রীম নিলাম। সস্তায় খাওয়া হল। জল খেতে চাইলে—দোকানের মেয়েরা হাসতে হাসতে কল থেকে জল এনে দিল—জল অপরিষ্কার, কিন্তু মেয়েদের হাসির অর্থ বেশ পরিষ্কার—এরা এমন রঙিণ সুরা পান করে না অপদার্থ! এখান থেকে গেলাম 'জু' বা চিড়িয়াখানা দেখতে। য়ুরোপের একটা বড় জাতের মস্ত শহর, এখানকার ধরণই সব আলাদা। এক এক রকমের জন্তু অনেকগুলো আছে। আর যে দেশের জন্তু সেই দেশের মতন করে তাদের বাড়ী সাজানো। যেখানে হাতী আছে—বাড়ীটা ভারতীয় ধাঁজে তৈরী। যেখানে বাইসন আছে—সেখানটা ক্যানাডার ধরণে তৈরী। পঞ্চাশ পেনিগ অর্থাৎ আধ মার্ক দর্শনী লাগল। ঘুরে ঘুরে অনেক দেখা হল—তার মধ্যে একটা বাড়ী যেখানে মাছ আছে—তাকে বলে aquarium—সব মাছ কাঁচের চৌবাচ্ছার মধ্যে—আলো জ্বেলে মস্ত এক বাড়ীর মধ্যে সাজান আছে। বাইরের আলো সব নিবান। সেখানে আবার পৃথক আর এক দফা আধ মার্ক দর্শনী দিতে হল। এখানে সব জন্তুকেই এক রকম খোলা অবস্থায় আর যতটা পারে তাদের নিজেদের জন্মভূমির আবহাওয়ার মধ্যে রাখবার চেষ্টা হয়েছে।

'জু' দেখে অতিশয় শ্রান্ত হয়ে পায়ে একগাদা ধূলো নিয়ে—ঘুরতে ঘুরতে বাড়ী ফিরলাম। খেয়ে দেয়ে, খানিক আড্ডা দিয়ে তারপর Kurfurstendamm (কুর্‌ফুর্‌স্টেন্‌ডাম্‌) বলে একটা রাজপথে ফুটফুটে ছেলেমেয়ের ভিড়ের

সুইমিং ষ্টেডিয়াম—ডাইভিং বোর্ড

লেবার ক্যাম্পে ছেলেরা খাল কাটছে—আর একটি দৃশ্য

মধ্যে, সুসজ্জিত আলোকিত দোকানগুলি দেখতে দেখতে পায়চারী করে—দিন শেষ করা গেল। মনটা আজ ভালই লাগছিল, খেলার টিকিট পাওয়াতে।

এরোপ্লেনে ওঠবার আগে সকলে কিউ করে দাঁড়িয়ে আছে

এরোপ্লেন

সকালে নবটার সময় বেরুলাম তাড়াতাড়ি খেলার মাঠে পৌছবার জন্যে। ওলিম্পিকের বিরাট ব্যাপার দেখবার জন্যে মনে মনে খুব উৎসাহ আর আনন্দ হচ্ছিল। গিয়ে দেখলাম খেলোয়াড় দর্শকদের জন্য যা বন্দোবস্ত এবং সুবিধা করেছে তা জার্ম্মানীর মত দেশেই সম্ভব। সে না দেখলে আমাদের দেশের কেন, পৃথিবীর অনেক দেশের লোকদেরই সেটা কল্পনায়ও আসবে না। শুধু খেলার ষ্টেডিয়ামটাই সেখানে একটা দেখবার জিনিষ! তা ছাড়া রাজপথ, অন্যান্য খেলার মাঠ আর কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী যে তৈরী করেছে তার ইয়ত্তা নেই। একটা বৃহৎ নূতন ক্রীড়া-নগরী তৈরী হয়েছে। তাতে আছে শত শত রাজপথ, তার পাশে পাশে, কোথাও অফিস, কোথাও কাফে, কোথাও ডাকঘর, আবার কোথাও দোকানঘর। সমস্ত স্থানটার নাম 'রাজক্রীড়াক্ষেত্র' (Reichs sport field) ছবি দেখে এর বিরাটত্ব ঠিক বুঝতে পারা যাবে না। টিউব ট্রেন আমাদের ঝোলাতে ঝোলাতে—খেলার মাঠে যে নূতন ষ্টেসন তৈরী হয়েছে সেখানে নামিয়ে দিল। দ্রুতগামী জন-সমুদ্রে, আমাদের তিনজনের কালো রং কোথায় যে মিশে গেল—তার দিকে ফিরে তাকাবার কারো সময় নেই। চলতে চলতে আটকে গেলাম টিকিট দেখবার দরজায়—বেরিয়ে বাঁধান পথে পড়লাম। পথ আমাদের দেশের বড়লোকের বাড়ীর হলঘরের পালিশ করা মেঝের মত—সব সিমেণ্ট আর কংক্রীট—আশে পাশে ছবির ফেরিওয়ালারা দোকান সাজিয়ে হাঁক দিচ্ছে। মাঝে মাঝে গাইড বইয়ের এবং দৈনিক কার্য্য-সূচীর—এরা বলে Tages Programme—তারই ফেরিওয়ালাদের চিৎকার জনতার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করে চলেছে। পথে যেখানে যেখানে যাও—রেডিও-বার্ত্তা, গান-বাজনা হরদম চলেইছে। আমাদের খেলার মাঠে ভিড়ের চাঞ্চল্য আমাদেরই দেশোপযোগী। স্থানের স্বল্পতায় এবং লোকের শিক্ষাভাবে পাহাড়ে নদীর মত তা কলোচ্ছ্বাসপূর্ণ। কিন্তু এখানকার লক্ষ লক্ষ লোকের এই জনস্রোত, এ যেন এক বিশাল জল রাশির অতল গভীরতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ষ্টেসন পেরিয়ে দুটো রাস্তার নিচের টানেল্ বা সুড়ঙ্গ দিয়ে গাড়ীর চওড়া রাস্তায় পড়লাম। সেখানে বাস আর মোটরকারের বেগবান গতির সংখ্যাতিশয্যকে শত শত পুলিসে সংযত ও শ্রেণীবদ্ধ করছে। তারই মধ্যে খানিক অন্তর অন্তর কতকটা তাদের কল্যাণে জনস্রোত রাস্তা পার হচ্ছে। নইলে সারাদিন অপেক্ষা করেও সে অনন্ত যানবাহনের অশ্রান্তগতির মধ্যে একজন পথিকও পথ পার হতে পারত না! পথের সব জায়গাতেই বড় বড় অক্ষরে পথ নির্দ্দেশ করা আছে—কেবল খেলার ষ্টেডিয়াম যাকে সত্যি সত্যিই রাজ-অট্টালিকা বলা যায়—তার চার পাশের গগনচুম্বী স্তম্ভশ্রেণী কাহারও পথনির্দ্দেশের অপেক্ষা রাখে না। তবে তার অসংখ্য দ্বারের বিভিন্ন নির্দ্দেশ এবং আসন-সংখ্যা উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম অনুসারে লেখা না থাকলে পথ হারিয়ে দর্শকদের সময় নষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। পথের ধারে ধারে টেলিফোন-ঘরগুলির প্রাচুর্য্য এখানকার একটা বিশেষত্ব। প্রবেশোন্মুখ ওই বিপুল ভিড়েও পাবলিক ফোনের একটা ঘরও খালি পড়ে নেই। এর থেকে ধারণা করা যায় এরা কত বেশি কাজের লোক—এবং কাজের এরা কত সুবিধা করে নিতে জানে। টিকিটে সবই লেখা আছে—কোন্ গেটে যেতে হবে—সিট উপরে না নিচে, কত নম্বর বিভাগ, কোন্ বেঞ্চে বসতে হবে এবং কত নম্বর সীট। আর প্রত্যেক দরজার প্রতিহারীরা তাদের জমকাল পোষাকের সঙ্গে এমন শিক্ষা ও দক্ষতার সমাবেশ করেছে যে, কোন লোকের কোনো সীটই ভুল হবার এতটুকু উপায় নেই এবং সময়ও কারুর বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না। আমাদের Sud Tor অর্থাৎ South Door বা দক্ষিণ দরজার টিকিট। সেখানে লৌহতোরণের দুর্দ্ধর্ষ দরজার প্রহরীকে টিকিট দেখিয়ে একে একে ষ্টেডিয়ামের শান বাঁধান অঙ্গনে পড়লাম। সেখানেও কতকগুলি টেলিফোন-ঘর আছে। এখান থেকে সকলের

মত সীটের উদ্দেশ্যে ছুট দিলাম। স্টেডিয়ামটা বাইরে থেকে দেখতে দোতালা। খেলার মাঠের চারিদিক ঘিরে গোল করে বসান। সমস্তটাই পাথরের তৈরী। একতলার দরজাগুলি—under-ring অর্থাৎ under-ring বা নিম্নচক্রে যাবার জন্যে। প্রত্যেক দরজায় A. B. c. D. নম্বর দেওয়া। দোতালাটা Obe-ring অর্থাৎ upper-ring বা ঊর্দ্ধচক্রে ওঠবার জন্য। ছবিতে এ দুটো ভাগ বেশ বোঝা যায়। ওপরের দরজাগুলিতে 1, 2, 3, 4, নম্বর দেওয়া। স্টেডিয়ামের গায়ে দরজা ছাড়া অনেক অফিস আছে—পোস্ট অফিস, প্রেস্ বা ছাপাখানা ও সংবাদ-পত্র বিভাগ, স্বেচ্ছাসেবকদের শিবির, আহতদের প্রথম শুশ্রূষার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় দোকান, রেস্তোরাঁ এবং 'Harren' বা "কেবলমাত্র ভদ্রলোকদিগের জন্য" ইত্যাদি—প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে। সব দরজাতেই নীল রঙের পোষাকপরা প্রহরী দাঁড়িয়ে পথ নির্দ্দেশ করছে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি। এত লোকের সমাগমেও সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। কাগজপত্র ফেলবার জন্যে কিছু দূরে দূরেই সুদৃশ্য ঝুড়ি সাজান আছে। আর সব সময়েই একদল লোক মেঝের আবর্জ্জনা কুড়িয়ে নিচ্ছে। আমাদের টিকিট ছিল ৬নম্বর ব্লকের, ১৭ নম্বর 'রো' বা আসন-শ্রেণীর সীট নম্বর ১, ২, ৩। একজন আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল। ভেতরে গিয়ে স্টেডিয়ামের বিশালত্ব উপলব্ধি হলো। আসল খেলার মাঠ বাইরের রাস্তা থেকে অনেক নিচে মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে করা হয়েছে—আগেকার অলিম্পিকের মাঠ যেমন পাহাড়ের গায়ে পাথরে কাটা ছিল। আমরা জায়গাটা ভাল করে দেখব বলে সকাল সকাল গিয়েছিলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম—তখনও তেমন ভিড় হয়নি। নম্বর দেওয়া বেঞ্চিতে বসে—আমাদের জায়গা থেকে মাঠটা চমৎকার দেখায়। মধ্যিখানে ঘাসের মাঠে—সুন্দর করে ঘাস কেটে ল্যান্ তৈরী করা—তবে ঘাস এখানে আমাদের দেশের অথবা ইংল্যাণ্ডের ল্যানের মত সুন্দর নয়—সেরকম শ্যামচিকণ ঘাস এখানে হয় না। সে বিষয়ে আমাদের 'ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড' সকলকে হার মানিয়ে দেয়। মধ্যিখানের মাঠ Field Events অর্থাৎ জমিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেসব খেলা তারই লক্ষ্যভেদ জন্য, যথা—Throwing the Javelin, বর্শা নিক্ষেপ Discuss Throw, চক্র নিক্ষেপ, shot put আর ফুটবল ইত্যাদি খেলার জন্য। তার চারপাশে লাল বালি পথ দৌড়াবার। ছ'জন প্রতিযোগী পাশাপাশি যাতে নির্বিঘ্নে দৌড়তে পারে, সে জন্যে সাদা রং দিয়ে পথের উপর দাগ কাটা বরাবর—যাতে দৌড়বার সময় কেউ কাউকে ধাক্কা না দিতে পারে! এগুলো ছোট রেসের জন্য চারশ' মিটার পর্য্যন্ত। বালি-ঢাকা পথটি একবার ঘুরলে চারশ' মিটার হয়। প্রায় ৪০০ মিটার প্রায় ৪৪০ গজের সমান। বালিপথের বাইরে দু'ধারে লম্বালম্বিভাবে আরো খানিকটা ফালি পথ আছে—লাল মাটী সেটা। Long Jump—দীর্ঘলম্ফ, High Jump—উচ্চ লম্ফের জন্য। এর বাইরে আবার খানিকটা ঘাসের ফালি আছে। সমস্তটার চারদিকে—একটা ছোট পাথরের প্রাচীর দেওয়া—তার মাঝে মাঝে বাহিরে যাওয়ার রাস্তা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয়। স্টেডিয়ামের মাথায় অর্থাৎ যেদিকে প্রধান প্রবেশ-তোরণ সেদিকটায় গ্যালারি নেই—পরে জ্বলছে Olympic Fire—ওলিম্পেকের অগ্নিশিখা! এই অলিম্পিকের আগুন, চিতা বললেই হয়—যে কয়দিন খেলা হবে সব কয়দিন জ্বলবে। এই আগুন জ্বালান ব্যাপারটা এবারে নূতন ভাবে আরম্ভ কবা হয়েছে। মহা ধূমধামে এই আগুন জ্বালান হয়েছে—অনেকটা আমাদের দেশের হোমানলের মত। এবারে গ্রীসের অলিম্পিয়া থেকে—যেখানে এই ওলিম্পিক খেলার উৎপত্তি—সেখানে মশাল জ্বেলে—সেই মশাল অনির্ব্বাণ অবস্থায় পদব্রজে এখানে এনে সেই আগুন দিয়ে এখানকার এই অলিম্পিক অগ্নি জ্বালান হয়েছে! একেবারে যেন বৈদিক যজ্ঞের নিষ্ঠাচরণ!

খেলার মাঠে এসে পৌছবার প্রবেশ-পথ মাটির নিচে দিয়ে। উপরে দর্শকদের বিপুল জনতার মধ্যে খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিতে কারো সাহস হয় না, অসদ্ব্যবহারের ভয় নয়, বিপুল জনতার প্রচণ্ড সমাদর থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য। এখানে অটোগ্রাফ্ আর ফটো নেওয়ার এত বাতিক যে—আমাদের গায়ের রংটা শুধু কালো বলেই অনেকে আমাদের ছবি আর অটোগ্রাফ্ নিয়েছে। মাঝে মাঝে এই উৎপাতে পথে আটকে গিয়েছি। প্রবেশ-পথের ঠিক উল্টো দিকেই মাথার উপর Score Board বা 'ফলাফল-ফলক; প্রকাণ্ড সে বোর্ড, সব জায়গা থেকে পড়া যায় এমন বড় বড় হরফে সেখানে প্রত্যেক খেলার শেষে

ফলাফল টাঙিয়ে দেওয়া হয়। আর স্টেডিয়ামের চারিদিকে অলিম্পিকের পাঁচ রিংওয়ালা পতাকার মাঝে মাঝে সব দেশের পতাকা উড়ছে—কারণ ওলিম্পিক্ পৃথিবীর সব দেশের এবং সব জাতের খেলার মিলনক্ষেত্র। স্টেডিয়ামের চারিদিকে লাউড-স্পীকার আছে, সব জায়গা থেকে স্পষ্ট এবং জোরে খেলার কথা সমস্ত শোনা যায়। লাউড-স্পীকার আমাদের দেশের মত অস্থায়ীভাবে ঝোলান নেই। মাঝে মাঝে একেবারে থামের মধ্যে এমনভাবে গাথা আছে যে দেখলে বোঝা যায় না—কোথা থেকে শব্দ আসছে। কোথাও একটুক্রা দড়াদড়ি ও তার দেখতে পাওয়া যায় না। প্রবেশ-তোরণের স্তম্ভের ওপরে বড় ঘড়িটাতে দেখলাম দশটা বেজেছে—এখনো এক ঘণ্টা বাকী—কাজেই খানিক ঘুরে আস্‌বার জন্য উঠে পড়লাম। বারান্দায় তখনো লোক চলাচলের বিরাম নেই। আমাদের সীট পড়েছিল ঠিক্ finish বা সমাপ্তি সীমান্তের কাছে, কাজেই সেখানে Press Gallery—সাংবাদিকদের আসন, Guests Gallery—আমন্ত্রিতদের আসন—আর মহাজনদের আসন ছিল। বেরিয়ে একদিকে হাঁটতে আরম্ভ করে দেখলাম—মস্ত আপিস, খবরের কাগজওযালাদের জন্যে—দেশ-বিদেশে খবর যাবে। সেখানে অনবরত টাইপরাইটার যন্ত্র চলছে। খেলা আরম্ভ হয়ে গেলে যখন লক্ষ লক্ষ লোক সকলে চুপ করে এক দৃষ্টিতে নিশ্বাস বন্ধ করে start বা খেলা সুরু দেখছে—তখনও কিন্তু টাইপরাইটারের কটাকট্ অবিশ্রান্তভাবে চলেছে—এটা আমরা অনেকবার লক্ষ্য করেছি। সংবাদ-সৌধের পরেই পোস্ট অফিস, সেখানে মহাভিড়। সকলেই ওলিম্পিক পোস্ট-কার্ড পাঠাচ্ছে এখান থেকে টিকিট মেরে। রেস্তোরাঁয় এদেশের খাবার সবই পাওয়া যায়—তার মধ্যে বিয়ার আর সসেজ (Sawsage)—এ দুটোই এদের প্রিয় খাদ্য এবং সস্তা। বারান্দার খোলা দিক দিয়ে পতাকা-শোভিত রাজ-পথের অনেকটা দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে—সেখানে মোটর বাস এবং জনসমাগম পুরোদমে চলেছে। একপাশে ছোট পাহাড়ের ওপরে একটা সুন্দর রেস্তোরাঁ, ছোট সবুজ রঙের বাড়ীর চারদিকে পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সবুজ রঙের টেবিল চেয়ার সাজান, প্রত্যেক টেবিলের ওপরে একটা সবুজ রংএর ছাতা আছে। পয়সা খরচের ভয়ে সেখানে এক-দিনও যাইনি বটে, কিন্তু তা সত্বেও আক্কেল সেলামি নেহাৎ কম দিতে হয়নি—সে কথা পরে বলব। একটা ছবি তুলেছিলাম—দুর্ভাগ্যক্রমে ওঠেনি। তা না হ'লে একটু আভাষ দিতে পারতাম এদের সৌন্দর্য্যচর্চ্চার। তার একটু পরেই দেখা যায় পোলো-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোটখাট স্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে। এখানে কয়েকটি পাথরের মূর্ত্তি বসান হয়েছে—খুব বড় বড় অসমান পাথরের। অনেকটা যেন মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বার করা পুরাকালের মূর্ত্তির মতন। দেখে আমার মনে হ'ল—এরা যেন যতটা পারে সেই সেকালের বহু বছরের বিস্মৃত অলিম্পিকের উৎসব আবার নূতন ক'রে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছে। বর্ত্তমান যুগের কলা-বিজ্ঞানের সঙ্গে এরা কি ক'রে বহু যুগের পুরাতন সেই অতীত "যৌবনের ক্রীড়া উৎসবের" অঙ্গস্বরূপ সেকালের কলাবিদ্যার আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের রীতিনীতির সংমিশ্রণ করতে চেষ্টা করেছে দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। জার্ম্মানীর জাতীয় গৌরব এতে অনেকখানি বেড়ে যাবে। সকলেই এই উৎসবের একটা সুখময় স্মৃতি নিয়ে ফিরবে। শুনেছি এই বিরাট বৃহৎ কর্ম্মে কোন ত্রুটি না রাখবার জন্যে—এরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা আর বড় বড় শিল্পীরা সবাই খুব পরিশ্রম করেছে।

এখানে অলিম্পিকের খেলার ইতিহাস না দিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পুরাণ পুঁথি অনুসারে হারকিউলিস্ ৭৭৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে অলিম্পিক ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন করেন। সেই সময় থেকে প্রত্যেক চার বৎসর অন্তর এই উৎসব চলে আসছিল। গ্রীকেরা এই উৎসব অনুসারে তাদের বৎসর গণনা করত—তাকে বলা হত Olypiad. এই অলিম্পিক উৎসব গ্রীকদের একটা বিরাট শক্তি-পূজার মত ছিল। এই সময়ে কাউকে মারা, বিরোধ করা, কিংবা অস্ত্র ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যাতে সকলে দূর দেশ থেকে এসে উৎসবে যোগদান করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হত। উৎসবের জায়গা ছিল Olympia—সেটা বড় শহর না হ'লেও গ্রীকদের একটা বড় তীর্থস্থান এবং এখানে গ্রীক দেবদেবীর অনেক মন্দির ছিল। এই অলিম্পিক উৎসবে, দেবতাদের যথারীতি পূজা-বলি দেওয়া, যুবকদের খেলা, জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চ্চা হত। শেষে গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকেদের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপিত হত। অলিম্পিকে জয়ী হওয়া বীর-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান বলে গণ্য হত। জয়ীকে দেওয়া হত একটা Olive Branch—ওলিভ তরুশাখা আর তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হত একটা aurel বা ফুলের মুকুট। এই উৎসবের অনুষ্ঠান অনেকদিন থেকে গ্রীসে চলে আসছিল, দেবতাদের পূজায়, যৌবনের গানে আর জাতীয় একতায়।

শান্তিনিকেতন

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১৩৪৭ সাল। শ্রাবণের আরম্ভ। আকাশে চলেছে নিঃশব্দে মেঘের সমারোহ। ঘন বর্ষণে সমস্ত সহর হয়েছে সজল! বৃষ্টিতে ভিজে একঘেয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি যেন ভারী হয়ে উঠেছে।

এমনি শ্রাবণসঙ্কুল দিনে, শান্তিনিকেতন থেকে আহ্বান এসেছে—একথা 'ভারতবর্ষ'-এর বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় জানালেন।

এ আহ্বান লোভনীয়। নিজেকে মনে হ'ল ভাগ্যবান। সে শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ প্রায় প্রত্যেকেরই আছে। সুতরাং প্রস্তুত হ'য়ে নিতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। কলকাতার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হ'ল ৩রা শ্রাবণ।

পথের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, কেন না, এপথ পুরানো ও সুপরিচিত। কাজেই সেকথা না বলে বলি যে আমাদের ট্রেন বোলপুর স্পর্শ করল প্রায় রাত সাড়ে দশটার সময়।

ট্যাক্সিতে বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনে পৌছতে হ'লে বেশ কিছু সময় লাগে। আমাদেরও লাগল। অতিথিশালায় শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরীকে আমাদের অপেক্ষায় জেগে থাকতে দেখা গেল।

'আসুন, আসুন', তিনি এগিয়ে এলেন।

আমি আর ফণীদা রথীনবাবুর পেছনে পেছনে অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী 'সাহিত্যিকা'র সম্পাদক। এই সুযোগে 'সাহিত্যিকা' সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু ব'লে নেয়া যাক্।

'সাহিত্যিকা' হ'ল এখানকার ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক পরিচালিত সাহিত্য-সমিতি। এর নামকরণেরও একটা মজার ইতিহাস আছে। পূর্বে এ সমিতির কি একটা দীর্ঘ নাম ছিল। সম্পাদক গুরুদেবকে অনুরোধ করলেন, নামটা একটু ছোট ক'রে দিতে। গুরুদেব রসিকতা ক'রে নাকি বলেছিলেন, নাম আমি এতদিন তো বড়ই করে আসছি হে, আর তোমরা বলছ ওটা ছোট করতে। তারপর অবশ্য সাহিত্য-সমিতির ছোট নাম হল 'সাহিত্যিকা'।

হাত-মুখ ধোওয়ার পর রথীবাবু আমাদের খাওয়াতে বসালেন। আমাদের জন্যে আলাদা খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল। বলতে বাধা নেই, কলকাতা ছাড়ার আগে আমরা প্রচুর পরিমাণে আহার করেছিলাম। কিন্তু তবুও নিমেষে প্লেট শূন্য হল। ফণীদা পরে বিনা দ্বিধায় আরও কয়েকটা রুটি নিয়ে সৎ ব্রাহ্মণের সুনাম রক্ষা করলেন।

এইবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন দু'জন উৎসাহী ছাত্র, শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায় আর গিরিধারী। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ ক'রে সদলবলে আমরা ওপরে চলে এলাম। একটু বেশী গরম বোধ হওয়ায় আমাদের শয্যা প্রস্তুত করা হল ছাদে।

গল্প চলতে লাগল। গুরুদেবের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং শীগগিরই চেঞ্জে যাবার কথা হচ্ছে একথা এদের মুখে শুনে দুঃখিত হলাম। কাল দেখা হবে তাঁর সঙ্গে! কি ভাবে দেখব কে জানে। শান্তিনিকেতনে আসা এই আমার প্রথম নয়। কিন্তু যতবারই এসেছি, ততবারই নব নব রঙ্ ধরেছে হৃদয়ের ধারে-ধারে।

রাত্রি গভীরতর হ'তে লাগল ব'লে একসময় ছাদের সভা ভঙ্গ হ'ল। আর আমরা সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম সুকোমল শয্যায়। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাথার ওপর জ্বলছে প্রকাণ্ড চাঁদ। তারায় তারায় বাণীমুখর হয়ে উঠেছে মূক আকাশ। কোন কলরব কানে আসে না। সমস্ত শান্তিনিকেতন গভীর ঘুমে অচেতন। আজ শ্রাবণের পূর্ণিমা। গুরুদেবের কোন গান আমার চারপাশে ক্ষণে ক্ষণে ফিরে ফিরে বাজছে—আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল—

চোখে আমার ঘুম নেমে এল।

পরদিন। ৪ঠা শ্রাবণ। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। চাকর আমাদের চা আর টোস্ট্ ঘরেই

দিয়ে গেল। তারপরই রথীন্দ্র ও অরবিন্দ উপস্থিত হলেন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

প্রভাতের প্রধান আকর্ষণ বৈতালিক। শিক্ষার্থীরা যেন কাজের আগে সুমধুর সঙ্গীতে শান্তিনিকেতনকে মুগ্ধ করে। আমরাও বিস্মিত হলাম অপার আনন্দে। এ সঙ্গীত ক্ষণিকের। গান শেষ হ'ল কিন্তু মূর্ছনা মিলিয়ে যেতে চায় না। সে-সুর বাসা বাঁধল আমাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। গুরুদেবের সুর-সৌন্দর্য সত্যই স্মরণীয়।

আমরা চলতে লাগলাম। পথে ফণীদার পরিচিত ছাত্র শ্রীমান সুধীরঁঞ্জন ঘোষের সঙ্গে দেখা। সে সবিনয়ে জানাল—মাত্র একটি ক্লাস ক'রেই আমাদের সঙ্গ নেবে।

আমরা জানি গুরুদেব তাঁর বহু প্রবন্ধে বলেছেন তিনি পছন্দ করেন সুবিস্তৃত শিক্ষা। অতি শুষ্ক কঠিন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে বই মুখস্ত করা সবদিক দিয়েই মূল্যহীন। তিনি চান মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা। তিনি চান, ছেলেরা যেন নিজের স্বাভাবিক তেজে মাথা উন্নত ক'রে রাখতে পারে

সে-আদর্শেই গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনাকে সমুজ্জ্বল করেছেন এখানে বিভিন্ন বিচিত্র রূপে। তাই রয়েছে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ ক্লাস, রয়েছে কলাভবন, রয়েছে সঙ্গীতভবন—যার যা খুশী বেছে নাও।

কলাভবনের পরিচালক সুপ্রসিদ্ধ প্রতিভা-প্রদীপ্ত শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। শুনলাম সেইদিনই তিনি দিন কয়েকের জন্যে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। ট্রেনের সময়ও হয়ে এসেছে প্রায়। মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে ছুটলাম নন্দবাবুর গৃহে, ফণীদা প্রবেশ করলেন কলা ভবনে।

'কি ব্যাপার ?' আমাকে হাঁপাতে দেখে নন্দদা প্রশ্ন করলেন।

'এই যে', অটোগ্রাফ এগিয়ে দিলাম আস্তে আস্তে।

'বস।'

আমার অটোগ্রাফে আমারই পেন্ নিয়ে ছবি আঁকতে লাগলেন। শেষ করলেন মিনিট কয়েকের মধ্যেই। শান্তির নিশ্বাস ফেলে নমস্কার ক'রে ফিরে এলাম কলাভবনে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি ফণীদা কোথায় উধাও হয়েছেন, অরবিন্দ, রথীন্দ্র—ওরাও। মহা মুস্কিলে পড়লাম। অকস্মাৎ এই সময় আমার সঙ্গী হলেন শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মজুমদার। তারই সঙ্গে কলাভবনের ছবিগুলি একে একে দেখতে লাগলাম। সত্যব্রত মজুমদার শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র।

স্বীকার করি, মূল্যবান ছবির মর্ম বোঝা আমার পক্ষে সুকঠিন। তবু আজও নন্দদার ছবিগুলি আমার মানসপটে আঁকা রয়েছে। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের ছবিও প্রশংসনীয়। এঁরাই হয় তো কোনদিন নন্দদার নাম উজ্জ্বলতর ক'রে তুলবেন।

কলাভবন থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরীর দিকে গেলাম সত্যবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে। মাঠের চারধারে ক্লাস বসেছে। পথের ধারে-ধারে বিশাল বিশাল গাছ আড়াল করছে রোদ। এমনি আবহাওয়ায় চিন্তাশক্তি যেন বেড়ে যায়। মনে পড়ল, আমাদের দেয়াল ঘেরা সংকীর্ণ ক্লাস-রুমের কথা! কি প্রভেদ! বর্ষাকালে এরা ক্লাস করে শিক্ষক অথবা অধ্যাপকের বাড়ীতে। শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশে গেছেন পরিপূর্ণভাবে। সঙ্কোচের কোন রেখা নেই মাঝখানে। তাই সম্পর্ক হয়েছে সহজ, শিক্ষা হয়েছে সুন্দর, সার্থক।

লাইব্রেরীতে দেখা গেল ফণীদা গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিব্যি আসর জমিয়ে তুলেছেন। আমায় দেখে বললেন, 'এসো, লাইব্রেরীটা দেখি।'

'আসুন', সহকারী গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ সত্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বইয়ের আলমারিগুলি দেখাতে লাগলেন।

পুস্তক-সংগ্রহ প্রচুর সন্দেহ নেই। পত্রিকাও অনেক রাখা হয়—দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক। এ কক্ষটি সত্যই লোভনীয়।

তারপর এলাম আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয়ের কক্ষে। শিশুর মত সরল হাসিতে তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রত্যেকটি কথাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বাউল গান সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি আমাদের শোনালেন। একটি কাহিনী তিনি বিশেষ-

ভাবে উল্লেখ করলেন। কোন গ্রামে একটি লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। লোকটি গ্রামে পাগল ব’লে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই পাগলের গাওয়া গান আজও শাস্ত্রী মহাশয় ভুলতে পারেন নি। গানটির অর্থ এই, তোমার স্বর্গ তোমারই থাক, তাতে আমার প্রয়োজন নেই; কিন্তু হে দেবতা, নরকের আগুনে জ্বালাবার জন্যে যখন লোকের অভাব হবে তখনই তুমি আমায় স্মরণ ক’রো।

এই রকম নানা বিষয়ে প্রায় ঘণ্টা দু’য়েক ধ’রে আলোচনা ক’রে আমরা বিদায় প্রার্থনা করলাম। ক্ষিতিবাবুর অমায়িক ব্যবহার বোধ হয় চিরদিনই আমাদের মনে থাকবে।

উত্তরায়ণের পথে অগ্রসর হলাম। মনে যেন অন্য ভাব এল। কি বলব আজ তাঁকে? কি নিয়ে দাঁড়াব তাঁর সামনে? মাঝে মাঝে মনে হয় কেন নানা বাজে কথা ব’লে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করি? সে-সূর্যকে দূর থেকে বন্দনা করা ভাল।

রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী বললেন, ‘কাল আমাদের ‘সাহিত্যিকা’র অধিবেশন হবে, গুরুদেব বক্তৃতা করবেন, আপনাদের থাকতেই হবে।’

‘বেশ, বেশ’, ফণীদা রাজী হলেন।

‘কখন হবে?’ আমি প্রশ্ন করলাম।

‘সন্ধেবেলা, থাকতেই হবে কিন্তু আপনাদের।’

‘নিশ্চয়ই, গুরুদেবের বক্তৃতায় থাকব না!’

উত্তরায়ণের তোরণ অতিক্রম করতেই কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ল। একটা সুন্দর ছোট নতুন বাড়ী উঠেছে। গুরুদেব সব সময় সেখানেই থাকেন আজকাল। আর তাঁকে দেখাশোনা করেন, শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়।

‘এই যে সুধীরঞ্জন’, সুধাকান্তবাবু হাসলেন, ‘আসুন ফণীবাবু।’

‘গুরুদেবের মেজাজ কেমন?’ জিজ্ঞেস করলাম।

‘খুব ভাল, এসো ওপরে।’

আমরা সুধাকান্তদা’র অনুসরণ করতে লাগলাম। এই নতুন বাড়ীটার নাম উদীচী।

‘তোমরা কি সব’, গুরুদেবের রসিকতা-মেশানো কণ্ঠস্বর, ‘ভারতবর্ষ’-এর দল নাকি?’

আমরা সকলে প্রণাম করলাম।

‘দেখো হে’, রথীন্দ্রবাবুদের তিনি ব’লে চললেন, ‘এদের বিশ্বাস ক’র না, পত্রিকার সম্পাদক-টক্‌রা বড় ইয়ে—’ ফণীদার দিকে আড়চোখে চেয়ে গুরুদেব নিজেই হাসলেন।

‘তারপর? ‘সাহিত্যিকা’র পাল্লায় পড়েছ ত? ক’সে কাল গালাগাল করা যাবে—’

আমরা হাসলাম।

সুধাকান্তদা আমায় দেখিয়ে বললেন, ‘সুধীরঞ্জন বাংলায় অনার্স নিয়েছে—’

বাধা দিয়ে গুরুদেব বললেন, ‘কিন্তু তা হ’লে ত আমার কাছে এসে ভুল করেছ, পাশ করার আশা গেল তোমার। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় কাণ্ডকারখানা কি আমি বুঝি? আমি পণ্ডিত নই, প্যারালাল্ প্যাসেজ্, কোটেশান্, রেফারেন্স্ দিতে ত পারব না—’

সুধাকান্তদা আমাদের ইসারা করলেন। অর্থাৎ বেশী কথা বলালে গুরুদেব অবসন্ন হয়ে পড়বেন।

‘আচ্ছা আজ তা হ’লে—’ আমরা আবার প্রণাম করলাম।

‘এসো’, গুরুদেব রথীন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে আমাদের বললেন, ‘তোমরা এবারে এদের অতিথি, বুঝলে? আমার কি? যা ইচ্ছে করো ওদের সঙ্গে।’

হেসে আমরা প্রস্থান করলাম। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আমাদের স্নান করতে বলে—অরবিন্দ, রথীন্দ্র, সত্যব্রত ও সুধীরঞ্জন ঘোষ প্রস্থান করলেন।

ভোর থেকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খিদেও পেয়েছে দারুণ। মিনিট কয়েক বিশ্রাম ক’রে স্নান সেরে নিলাম।

একটা কথা উল্লেখ করি। এখানকার প্রত্যেকের ভদ্রতা স্মরণীয়। আমাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে-দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন প্রত্যেকে। আর দিনের মধ্যে হাজারবার খোঁজ নিয়েছিলেন আমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি-না। আমরা মুগ্ধ হলাম।

যথাসময়ে অরবিন্দ ও রথীন্দ্র আহারের জন্যে আমাদের খাবার-ঘরে নিয়ে এলেন।

আহারের তদারক্ করেন এক ভদ্রমহিলা। তাঁর শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখলে ভক্তি করতে ইচ্ছে হয়।

খাওয়া সাধারণ, কিন্তু পুষ্টিকর। একই ঘরে ছাত্র-ছাত্রীরা অসঙ্কোচে আহার করে। যাঁরা মাছ মাংস খান না তাঁদের জন্যে আলাদা টেবিল ঠিক করা আছে। মাছ,

তরকারী, দুধ অথবা দই প্রত্যহ দেওয়া হয়, মাঝে মাঝে ডিম, আর সপ্তাহে দু'দিন মাংস। আমরা যেদিন আহার করলাম সেইদিনই ছিল মাংস খাওয়ার দিন। ফণীদা ভাগ্যবান সেকথা স্বীকার করতেই হবে।

খাওয়ার পর ঠিক হ'ল দুপুরে শ্রীনিকেতনের দিকে যাওয়া যাবে। কিন্তু এখন চোখ ঢুলে আসছে ঘুমে।

কোন রকমে ঘরে ফিরেই শুয়ে পড়লাম।

শ্রীনিকেতন থেকে ফিরে এলাম সন্ধ্যার ঠিক আগে। গোধূলির রেশ তখনও মিলিয়ে যায় নি। শ্রীনিকেতনের বিবরণ বর্তমানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, কেন না, স্থান সংকীর্ণ। ভবিষ্যতে বলার ইচ্ছে রইল।

তারপর হ'ল সন্ধ্যা! এ সন্ধ্যাটি স্মরণীয়। ড্রয়িংরুমে এসে বসলাম। ছাত্রেরা আরম্ভ করলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে—জোলো হাওয়া এসে মাথা ঠুকছে দেয়ালে দেয়ালে। আর এদিকে চলেছে বর্ষামঙ্গলের গান। কি স্বপ্নিল আবহাওয়া! অসহ আবেশে চোখ বুজে এল। মন্ত্রমুগ্ধ যেন আমরা!

সে-সুর যেন আমাদের যাদু করেছিল। তাই রাত্রে খাওয়ার পর গেলাম ছাত্রদের হস্টেলে। সেখানেও গান চলছে। সেতার বাজাচ্ছেন শ্রীমান কুমুদ দেববর্মণ। গুজরাটী ছাত্র গিরিধারীর মুখে গুরুদেবের বাংলা গান বড় ভাল লাগল। আমাদের অন্তর ভরে উঠল নব নব রঙে।

সীমাবদ্ধ আমরা। সংকীর্ণ গণ্ডীতে কাটে দিনের পর দিন। সেই কলেজ আর বাড়ী—বাড়ী আর কলেজ একঘেয়ে জীবন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এমনি স্বাধীন শিক্ষার স্বপ্ন কোনদিন কি আমরা চোখের ঠুলি খুলে ফেলে দেখব না?

ছাত্রীদের হস্টেল আলাদা হ'লেও কোন গোঁড়ামি এখানে নেই। স্কুল থেকেই ছাত্র-ছাত্রীরা একসঙ্গে ক্লাস করে, প্রয়োজন হলে ইচ্ছেমত কথা-বার্তা বলতে পারে। এখানে ওটা দৃষ্টিকটু ঠেকে না কারুর চোখে।

রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এইমাত্র আলো বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টি আর পড়ছে না এখন। আমি আর ফণীদা বারান্দায় খাটের ওপর শুয়ে আছি। সব কোলাহল থেমে গেছে। আমাদের জীবনে হঠাৎ কোথা থেকে যেন ছিটকে এসেছে এই দিন—টেনে এনেছে কে যেন আমাদের পর্ণ-কুটীর থেকে প্রাসাদে, বুলিয়ে দিয়েছে ঘুণ ধরা হৃদয়ে গাঢ় রঙের তুলি।

'বড্ড মুস্কিলে পড়েছি হে সুধীরঞ্জন', হাই তুলে ফণীদা বললেন।

চমকে উঠলাম, 'কি মুস্কিল?'

'মানে, কাল 'সাহিত্যিকা'য় থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কেন?'

'সোমবার তা হ'লে আপিস্ কামাই হবে।'

'এই মুস্কিল?' আমি হাসলাম, 'একদিন আপিসে না গেলে ক্ষতি কি?' তিনি বলিলেন, 'না হে না, তা হয় না, কাজের ক্ষতি হবে অনেক।'

'কিন্তু এদের যে কথা দিয়েছেন—'

'সেই ত মুস্কিল। এদের হাত এড়াই কি ক'রে? আরও অনেকবার বলেছে আমাকে আজ। কিছুতেই ছাড়বে না।' আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা, বলিলাম, 'থেকেই যান—গুরুদেব বক্তৃতা করবেন—'

'জানি, বক্তৃতা শোনবার লোভ পূর্ণমাত্রায় আমারও আছে, কিন্তু উপায় নেই থাকবার', একটু থেমে ফণীদা বললেন, 'বরং তুমি থেকে যাও, আমি চলে যাই, তুমি না হয় পরশু যেও—'

'না না, আমিও আপনার সঙ্গেই যাব।'

'তা হ'লে এ ভারটা তুমিই নাও—'

'কিসের ভার?'

'এই এদের হাত এড়াবার।'

'বেশ,' মৃদু হাসলাম।

'তুমিই পারবে,' ফণীদা চোখ বুজলেন নিশ্চিন্ত হয়ে যেন। ফণীদাকে চিনতে আমার বিলম্ব হ'ল না। কাজের ক্ষতি কিছুতেই করবেন না। অগত্যা আমিও চোখ বুঝলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে হানা দিলাম চীনভবনে। সেখানকার অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত তান্-ইয়ান্-স্যান্ আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং নিজে আমাদের সঙ্গে ঘুরে ভবন দেখাতে লাগলেন। দর্শনের নানাপ্রকার দুষ্প্রাপ্য পুঁথিতে তান্-ইয়ান্-স্যানের কক্ষ পরিপূর্ণ। তিনি পণ্ডিত লোক, পড়াশুনা নিয়েই থাকেন সব সময়! চীনদেশের

দর্শন সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করলাম। তিনি হেসে জানালেন, অল্পসময়ের মধ্যে সে আলোচনা সম্ভব নয়।

চীনভবন থেকে বেরিয়ে উত্তরায়ণের উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেই বাংলা অনার্সের অধ্যাপক শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায় ও ছাত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ভৌমিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমরা অগ্রসর হলাম। প্রফুল্লবাবু আমাদের সঙ্গে কিছুদূর এলেন।

আবার উত্তরায়ণ। সটান্ চলে এলাম সুধাকান্তদা'র দপ্তরে। দেখলাম 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের সঙ্গে গল্প করছেন তিনি।

'আপনার কাছে এলাম সুধাকান্তদা।'

'বেশ ত।'

আমি আর ফণীদা দু'খানি চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। মিনিট কয়েক পর সাগরবাবু চলে গেলেন। আর সশরীরে উপস্থিত হলেন রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী। আমি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। এইবার খুব সাবধানে বলতে হবে যে 'সাহিত্যিকা'র অধিবেশনে থাকা আমাদের সম্ভব হবে না। বললামও তাই। কিন্তু রথীন্দ্রবাবু কিছুতেই শুনবেন না। অবশেষে অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো গেল। আমি জয়লাভ করলাম।

সুধাকান্তদা'র সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। ফণীদা ঘটক-চৌধুরীর সঙ্গে চলে গেলেন উত্তরায়ণের বাগান দেখতে, আর আমি এসে দাঁড়ালাম গুরুদেবের সামনে। কিন্তু এবারের কথাগুলো আর উল্লেখ করব না, কারণ সেগুলো সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত কথা। তবে আজ আর গুরুদেবের মুখে হাসি নেই। শুষ্ক, বিষণ্ণ তিনি—বয়সের ভারে একেবারে ক্লান্ত।

*

দিনটা নিমেষে কোথা দিয়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল। এইবার প্রস্থানের পালা। মোটর অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আমি আর ফণীদা প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

ছাত্রেরা ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছেন গাড়ীর কাছে—মুখ তাঁদের ম্লান। কিছুতেই তারা আমাদের ছেড়ে দিতে চাননা। আমাদেরও মুখ প্রফুল্ল ছিল না। বাস্তবিক এদের যত্ন, এদের আন্তরিকতা আশাতিরিক্ত। এখানকার কেউ কিছুই গ্রহণ করেননি আমাদের কাছ থেকে, কিন্তু ভ'রে দিয়েছেন আমাদের শূন্য পুঁজি বিচিত্র উপহারে। নিরানন্দের একটা ছায়া অকস্মাৎ যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আবার আসতে অনুরোধ করলেন এঁরা। বললাম, 'আসব নিশ্চয়ই—এবং যথাশীঘ্র সম্ভব, এখানকার আকর্ষণ কাটানো সুকঠিন।'

মোটর ছেড়ে দিল ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে।

অবসান হ'ল বৈচিত্র্যের। আবার সেই একঘেয়ে জীবন যাত্রা! সেই সংকীর্ণ শিক্ষার গণ্ডীতে ঠুলি বেঁধে, ঘাড় গুঁজে দিনের পর দিন মূক পশুর মত অবিশ্রাম ঘোরা! প্রাণ নেই, প্রসার নেই, পরিবর্তন নেই। কিন্তু আজও কোন অলস প্রভাতে অথবা মন্থর মধ্যাহ্নে কিংবা ঘুমহীন নিঃসঙ্গ রাত্রে আমার মনে ঝলসে ওঠে গুরুদেবের মহান আদর্শের কথা। সে-আদর্শে কি একদিন সমস্ত দেশ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে না? হয় ত সেদিনের আর দেরী নেই। মহাযজ্ঞের যে হোমানল গুরুদেব জ্বালিয়ে তুলেছেন তারই ধূম এরই মধ্যে আচ্ছন্ন করেছে ধরিত্রীকে। তাই আজ সে-যজ্ঞানলে আহুতি দিতে দেশ-দেশান্তর থেকে নিরন্তর ছুটে আসছে অসংখ্য যাত্রী—

"সেই সাধনার—সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।"

মহাপ্রস্থান

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

যুধিষ্ঠির। অন্তরে বাহিরে যে বা যুদ্ধে—যুদ্ধে নিয়ত অস্থির,
সত্যেরে বঞ্চিয়া তারই কে রাখিল নাম যুধিষ্ঠির?
— ধিক্ ধর্ম্মরাজ নামে!
—ঐ পুনঃ উঠে হাহারব!
—সহদেব, সহদেব!—বৃকোদর!
—কোথা গেল সব?

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

সহদেব। মহারাজ!

যুধিষ্ঠির। —মহারাজ! নহি, নহি, নহি মহারাজ!
অভিশপ্ত পুরীমাঝে হতভাগ্য যুধিষ্ঠির আজ
দীনতম ভৃত্য, জেনো, শোকার্ত্ত
এ পৌর-পরিবারে;
—দেখ, দেখ, কে কাঁদিছে আবার
এ শূন্য পুরীদ্বারে?

সহদেব। কুরুপুরাঙ্গনাসাথে রাজমাতা মহিষী গান্ধারী
চলেছেন কৃষ্ণসাথে রাজপথে, অন্তঃপুর ছাড়ি';
তাঁহারি শোকার্ত্ত ধ্বনি পশিতেছে
মুক্ত বাতায়নে;
মহারাজ! সে কি দৃশ্য দেখিলাম—
কহিব কেমনে!

যুধিষ্ঠির। হে নকুল, সহদেব! নিবার যা' করি'
পার তাঁরে।
দিন নাই, রাত্রি নাই, অভিশপ্ত এ পাপ-আগারে
পারিনা করিতে বাস; শতগুণে ভাল ছিল বন,
অনিদ্রায়, অনাহারে, পদে-পদে শত্রুর পীড়ন
চিত্তেরে দিত না ব্যথা। বিঁধিতনা মর্ম্মে অপমান
আত্মকৃত অত্যাচার—আত্মীয়েরে হানি' মৃত্যুবাণ!
—ভাল লভিল্লাম রাজ্য! হে গোবিন্দ,
ভালে লিখি' জয়,
ভালই সঁপিলে দণ্ড তার!
—তবু, তবু, তবু আর নয়,
দেখিনু এ জীবধর্ম্ম! মানবের জন্ম-ইতিহাস
শোণিতের বাষ্পবাহী লাঞ্ছনার বিষদিগ্ধ শ্বাস!
সিংহাসন-শরশয্যা—জীবন্মৃত্যু প্রতি পলে পলে,
দর্পিত জয়ের মাল্য সর্পসম দুলে বক্ষস্থলে
দংশিবারে বারবার।

দ্রৌপদীর প্রবেশ

দ্রৌপদী। —ধর্ম্মরাজ! কই ধর্ম্মরাজ?
কোথা মোর পঞ্চপুত্র? কোন্ পণে পুনরায় আজ
কাহারে সঁপিয়া দিলে অভাগীর অঞ্চলের ধনে?
বিবসনা সাজায়েছ সভামাঝে দুর্ব্বুদ্ধির পণে,
সহায়েছ বনবাস লজ্জাহীনা কাঙালিনী বেশে—
রাজার নন্দিনী যে-বা; বরিয়াছি উপেক্ষায় হেসে
সর্ব্ব অপমান জ্বালা মন্দভাগ্য ভাবি' কোনমতে,
কিন্তু আর সহেনা যে, আনিয়াছ
সর্ব্বহারা পথে।
(ক্ষণিক কণ্ঠরোধ)

যুধিষ্ঠির। অধর্ম্মের রাজা আমি—একান্ত দুর্ব্বল!
জেনো, প্রিয়ে;
এ জীবনে নহে শুধু, জীবনের পরপারে নিয়ে
যাব এ কলঙ্ক জ্বালা।—ভুলিতে কি পারি
কভু আমি,
অর্জ্জুনের বীর্য্যে আজি, তেজস্বিনি,
আমি তব স্বামী!
নহিলে কি সাধ্য মোর স্পর্শিবারে ঐ পদ্মপাণি?
দুঃখীর সহায় কৃষ্ণ, তাই তাঁরই পদাশ্রয় মানি।

দ্রৌপদী। ভুলিতে পারিনা তবু, শোক মম মৃত্যুর অধিক—
পঞ্চস্বামীরক্ষিতা এ অক্ষমার ভাগ্যে শত ধিক্
—কোনও কথা শুনিবনা; নিয়ে থাক
বিজয়লক্ষ্মীরে,
পাঁচ ভায়ে ভাগ করি'—বঞ্চিতার
পুত্র দেহ ফিরে'।

যুধিষ্ঠির। ক্ষমা কর হে পাঞ্চালী, গঞ্জনা দিওনা
আর মোরে,
নিজে তুমি কৃষ্ণসখী, ঐক্যে বদ্ধ যাঁর সখ্য-ডোরে,
তাঁরও সাধ্য নহে, শুনি, অদৃষ্টেরে
করিতে লঙ্ঘন;
নতুবা পরমাত্মীয় অভিমন্যু, উত্তরা-নন্দন
পড়ে কি সমরে কভু? ধনঞ্জয় জনক যাহার—
ত্রিলোকবিজয়ী-বীর্য্য—নিজ চক্ষে
হের ভাগ্য তার।
কিন্তু বৃথা এ আশ্বাস, আপনারে নাহিক বিশ্বাস,
ধিক্কৃত জীবনে হেরি অক্ষমের মিথ্যা-ইতিহাস!
—সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! কে বলিবে
এই মিথ্যা কথা?
স্বজনে, আত্মীয়ে যে-বা দিতে পারে
অনাত্মীয়-ব্যথা,
মূঢ় সেই মিথ্যাশ্রয়ী;—মিথ্যা তার জন্মের সহায়,
নর-নারায়ণসঙ্গী—কাটে নাক তবু মিথ্যা-দায়।
মিথ্যা নাম, মিথ্যা রাজ্য, মিথ্যা খ্যাতি
কৌরব-পাণ্ডব,
নিঃক্ষত্র ভারতবর্ষ মিথ্যা মোহে সেধেছি এ সব!
আর কেন? হে কেশব, শেষ ভিক্ষা—
মুক্তি দেহ মোরে,
এবারের জীবজন্মে—গ্রন্থি যার অসত্যের ডোরে!
নিজহস্তে সাধি' তবু সহেনা এ শোকার্ত্ত ক্রন্দন,
সত্যে সত্য করি আজ কাটাইব সংসার-বন্ধন—
সর্ব্বরিক্ত মুক্তি-মহাপ্রস্থানের মহামুক্ত পথে,
যোগমগ্ন শঙ্করের কৃচ্ছ রুক্ষ দুর্গম পর্ব্বতে!
—চাহিনা সঙ্গের সঙ্গী, তবু যে-বা
সাথী হ'তে চায়,
ভাগ্যহত যুধিষ্ঠির কভু তারে দিবেনা বিদায়।

* * * *

—কে রে তুই? সারমেয়? কোথা যাবি?
হ'বি নাকি সাথী?
চল্ নিরাশ্রয় বন্ধু, সম্মুখে অজ্ঞাত অন্ধ রাতি!
—দেখা গেল ধর্ম্মরাজ্য!—ধর্ম্মরাজ তবু
লোকে বলে!
সে মৈনাক ডুবে' যাক্ লবণাক্ত অশ্রুসিন্ধুতলে।

[যুধিষ্ঠির নতমুখে অগ্রসর হইলেন। সারমেয়সহ চারি
ভ্রাতা ও দ্রৌপদী মন্দপদে অনুগমন করিলেন]

আচার্য্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবস্থায় যে সকল মনীষী কৃতবিদ্য হইয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আচার্য্য জানকীনাথ ভট্টাচার্য্যের স্থান তাঁহাদের পুরোভাগে। বিদ্যার্থী ও শিক্ষাব্রতী রূপে এই দুইজনের নাম আজীবন রাম-জানকীর মতই সংযুক্ত ছিল। ভাস্বর শুভগ্রহ-যুগলের মত কল্যাণ রশ্মি বিকীরণ করিয়া ইঁহারা রিপন কলেজ বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও প্রসার বিধান করেন ও তাহার বর্ত্তমান সমৃদ্ধির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কথা জনসাধারণের নিকট নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে, কারণ জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি নিজ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন—কিন্তু একান্তে বাণীসাধনা ও বিদ্যাবিতরণে নিরত থাকায় আচার্য্য জানকীনাথের কীর্ত্তিকলাপের দিকে লোকদৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই।

জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ২৪পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের বিশিষ্ট রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের সন্তান। আদিনিবাস ক্যানিং লাইনের চাঁপাহাটি স্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল দূরবর্ত্তী বোদরা পোস্ট আফিস ও পাইঘাটা থানার এলাকা-ভুক্ত নারিকেলবেড়িয়া গ্রাম। পিতামহের নাম পণ্ডিত দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য। পিতা চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ শোভাবাজার রাজবাটীতে সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং মস্‌জিদ-বাড়ী ষ্ট্রীটে নিজ বাটীতে বাস করিতেন। নারিকেলবেড়িয়াতে ইংরেজী ১৮৬৪ বাংলা ১২৭১ সনে জানকীনাথের জন্ম হয়। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটায় জননীর উপরই তাঁহার পালন ও শিক্ষার ভার পড়ে। তাঁহার একমাত্র অনুজের নাম উপেন্দ্রনাথ—ইনি কিছুদিন সরকারের হিসাব দপ্তরে কাজ করার পর অসুস্থ হইয়া পড়িলে দেওঘরের সমীপবর্ত্তী কোন জমিদারী এস্টেটে চাকুরী গ্রহণ করেন। জানকীনাথ অনুজকে স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় নানারূপে তাঁহার আর্থিক ভার বহন করিতেন। বাল্যে তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ হয় মস্‌জিদবাড়ী পল্লীর গুরুচরণ পণ্ডিতের পাঠশালায়। আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয় হইতে তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৮৮২ সালে হিন্দু স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং কান্দী স্কুলের ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত একযোগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মফস্বলের এই কৃতী প্রতিযোগীটিকে দেখিতে তখনই তাঁহার ঔৎসুক্য জন্মে। দুই বৎসর পরে যথাসময়ে উভয়েই তৎকালে প্রচলিত এফ-এ পরীক্ষা দেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র জানকীনাথ-প্রথম এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স লইয়া প্রথম হন এবং জানকীনাথ সিটি কলেজের ছাত্ররূপে ইংরেজী ও সংস্কৃত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দর্শন বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর তিনি ইংরেজীতে এম-এ পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন কিন্তু প্রতিযোগিতা-পরবশ হইয়া পরে ঐ বিষয় ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষা দেন এবং সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ সালে রামেন্দ্রসুন্দর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে ১৮৯১ সালে জানকীনাথ ঐ সম্মান লাভ করেন। ঐ বৎসর মিঃ এডওয়ার্ড মণ্টেগু হুইলার (যিনি পরে কৃষ্ণনাথ কলেজের খ্যাতমামা অধ্যক্ষ হন) এবং শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার প্রতিযোগী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কয়জন কৃতী সন্তানের নাম দেশের চারিদিকে তখন ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের মেধা ও পাণ্ডিত্যের তুলনামূলক নানা গল্প লোকমুখে প্রচারিত হয়। জানকীনাথের বিদ্যার্থিজীবনের গৌরব ছিল—তিনি কখনও কোন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করেন নাই। ১৮৯৪ সালে বি-এল পরীক্ষাতেও তিনি সমান কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি অল্পকালের জন্য উত্তরপাড়া কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ সালে বহরমপুর কলেজ আর্টস ও আইন বিভাগ সমন্বিত প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। এই সময়ে জানকীনাথ দুই বৎসর এই প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। অধুনা রিপন কলেজ নামে বিখ্যাত বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান ১৮৮১ সালে

প্রেসিডেন্সী ইন্‌স্টিট্যুশন নামে পরিচিত ছিল এবং সেখানে এফ-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত অধ্যাপনা হইত। ১৮৮৫ সালে প্রথিতনামা দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইহার অধ্যাপনা কার্য্য বি-এ ও বি-এল পরীক্ষা পর্য্যন্ত প্রসারলাভ করে। ১৮৯০ সালে রামেন্দ্রসুন্দর ইহাতে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন এবং দুই বৎসর পরে জানকীনাথ ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে ইহাতে যোগ দেন। ১৮৯৬ সালে অল্পকালের জন্য কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ ভিন্ন জীবনের অবসান পর্য্যন্ত বরাবর এই প্রতিষ্ঠানে নানাভাবে ও নানা বিষয়ে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। কলিকাতা হাইকোর্টেও তিনি কিছুকাল ওকালতি করিয়াছিলেন।

প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য যখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ জানকীনাথ তখন ইহার আর্টস বিভাগে অধ্যাপক। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান বিভাগে থাকিয়া তাঁহার সহযোগী। ১৯০৩ সালে কৃষ্ণকমল অবসর গ্রহণ করিলে রামেন্দ্রসুন্দর আর্টস্ বিভাগের অধ্যক্ষরূপে তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন। তখন জানকীনাথ ঐ বিভাগে ইংরেজীর অধ্যাপক এবং আইন বিভাগের অধ্যক্ষ এই উভয় পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৯ সালে ৬ই জুন রামেন্দ্রসুন্দর পরলোকগমন করিলে সাধারণ বিভাগে জানকীনাথ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আইন বিভাগে অধ্যাপকতা করিতে থাকেন। কিন্তু এই দুই চির-সহচরের বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই—মাত্র আড়াই বৎসর ব্যবধানে ১৯২১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহারও দেহান্ত ঘটে।

গার্হস্থ্য জীবনে জানকীনাথ অবিমিশ্র সুখসৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তিনি দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথমা পত্নী মৃণালিনী দেবীর দুই সন্তান। কন্যা হরিভাবিনী দেবী জনাইয়ের সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এলের সহধর্ম্মিণী হন। সুরেন্দ্রবাবু বালেশ্বরে কৃতী উকীল ছিলেন, পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু যেদিন কার্য্যারম্ভ করেন সেই দিন হইতেই অসাধ্য রোগাক্রান্ত হইয়া অচিরে কালগ্রাসে পতিত হন। এই পক্ষের অপর সন্তান তীর্থকুমার। পঠদ্দশাতেই ইঁহাতে পিতার বুদ্ধিপ্রতিভার সূচনা দেখা যায়। কিন্তু মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসরে ইঁহার অকালে মৃত্যু ঘটে। এই শোকে মর্ম্মাহত হইয়া জানকীনাথ আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীর চারিটী সন্তান। একটি কন্যা অল্প বয়সেই মারা যায়। অপর দুই কন্যা কৃতী জামাতার হস্তে অর্পিত। জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত উমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুলের শিক্ষক। ইনি রেণ্ট-কণ্ট্রোলার বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ইঞ্জিনীয়ার ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। অপর জামাতা রিপন কলেজে গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার এক পুত্র বর্ত্তমান—শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—রিপন কলেজে লব্ধবিদ্য। তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী তাঁহার জীবদ্দশাতেই গত হন।

মনীষী জানকীনাথ লেখনীচালনায় অসাধারণ কৃতিত্ব সত্ত্বেও গ্রন্থরচনায় বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর-প্রমুখ বন্ধুগণ তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি করিতে বহুবার অনুরোধ করেন। তিনি উত্তর করিতেন—লিখিবার আর কি আছে? পূর্ব্বতন মনীষীরা ত সকলই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—জিজ্ঞাসু মূল গ্রন্থ দেখিলেই সব তথ্য পাইতে পারে। তবে ছাত্রসমাজের জন্য পুস্তক-প্রকাশকদিগের নির্বন্ধাতিশয্যে দশকুমারচরিত, রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্যের পরীক্ষাপাঠ্য অংশসমূহের ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদসহ টীকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সঙ্কলিত প্রবেশিকা-পাঠ্যের ইংরেজী অনুবাদ তিনি প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থে উভয় ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও নিপুণতা ছিল তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। বর্ত্তমানে এই বইগুলি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

যে বিষয়ে তিনি মন দিতেন সেই বিষয়েই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পাইত। বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি প্রভূত উপার্জন করেন এবং নিজ সঞ্চয় হইতে সুন্দরবনে বিস্তৃত তালুক প্রভৃতি বহু সম্পত্তি করিয়া যান।

তাঁহার বুদ্ধি বহুমুখী ছিল এবং নানাবিষয়ে তাঁহার অসামান্য গুণপণার প্রমাণ পাওয়া যাইত। এ বিষয়ে অনেক গল্প তাঁহার বন্ধুমহলে শুনা যায়। পাড়ায় এক সময়ে রামায়ণ-কথাও গান হইতেছিল। তিনি আসরে উপস্থিত হইয়া বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন এবং কথককে সরাইয়া দিয়া নিজেই ব্যাসাসন অধিকার করিলেন। শুনা

যায়, তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যান এমন মধুর ও মনোহর হইয়াছিল যে সারারাত্রি শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া শুনিয়াছিল। অথচ তিনি যে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন বা সঙ্গীতের চর্চ্চা করিতেন এমন শুনা যায় না। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর গত হইলে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে যে বিপুল শোকসভা হয়—তাহাতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল সুললিত বাঙ্গালা ভাষায় তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়। অথচ সভাসমিতিতে বক্তৃতা করা তাঁহার অনভ্যস্ত, একপ্রকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার গল্প করিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। একবার দেওবর রওয়ানা হইয়া দেখেন রেলগাড়ীতে এত ভিড় যে শয়ন ও নিদ্রার কোন উপায় নাই। জানকীনাথ তখন গল্প জুড়িয়া দিলেন—একের পর অন্য বিষয়ের অবতারণা করিলেন—তাঁহার অফুরন্ত বাক্যের স্রোত নানা রসের সৃষ্টি করিয়া সহযাত্রিগণকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। পরদিন প্রাতে জশিদি জংশনে কিরূপে যে ট্রেন আসিয়া পড়িল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। নাড়ীজ্ঞান তাঁহার অদ্ভুত ছিল। শুনা যায় কাহারও গুরুতর পীড়া হইলে প্রতিবেশীরা তাঁহাকে লইয়া রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করাইত। তিনি যে ফলাফল বলিতেন তাহা অব্যর্থরূপে প্রমাণিত হইত। আপন পরিজনের মধ্যেও মাঝে মাঝে নাড়ীপরীক্ষা তাঁহার একপ্রকার খেয়ালের মতন ছিল। একদিন বাটীর এক পুরাতন পরিচারিকা সারদার নাড়ী দেখিয়া বলেন যে ছয়মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটিবে—অথচ তৎকালে তাহার কোনই অসুখ ছিল না। যথাসময়ে একথা নিদারুণ সত্যে পরিণত হয়। তাস-পাশা-দাবা-খেলা তাঁহার ব্যসনের মধ্যে ছিল। ছুটির দিনে সখ করিয়া নগরোপকণ্ঠে, দূর বাগানে বা ঝিলে মাছ ধরিতেও যাইতেন। গল্প আছে যে বহরমপুরে অবস্থানকালে বর্দ্ধমানের কোন জমিদারকে হারাইয়া দিয়া ৮০০৲ টাকার বাজী লাভ করেন।

সর্ব্বোপরি জানকীনাথের মেধা ও প্রতিভা প্রকৃষ্ট স্ফূর্ত্তি পাইত অধ্যাপকের আসনে। ইংরেজী সাহিত্যে শেক্‌স্পীয়ার ও বার্কের মর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যবিবৃতিতে তিনি নিজে যেমন উন্মাদনায় অভিভূত হইতেন—ছাত্রবৃন্দের ভিতরও তেমনি উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেন। হাতে নস্যের টিপটি বিস্মৃত হইয়া বক্তৃতাগারে প্রবেশের ক্ষণ হইতে ঘণ্টাশেষে হাজিরী লওয়া পর্য্যন্ত সেই যে অবিরত ধারে সাহিত্যের ব্যাখ্যানে নবরসরুচির সাহিত্যসৃষ্টি করিতেন তাহা দুই পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালার ছাত্র সমাজ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া মুগ্ধ হইয়া উপভোগ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিলাতী সদস্যগণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সে লীলা নিরীক্ষণ করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হইয়াছিলেন। দেববাণী ও বিদেশিনী বাণীর যুগপৎ এই অপূর্ব্ব অনুশীলনের জন্য জানকীনাথের নাম বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই জন্যই রিপন কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তাঁহার জীবনী শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত চিরদিন কীর্ত্তনীয়।

"চা"

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোক্‌না কেবল
শুধু এক কাপ চা,
আমার নয়নে
বুনিত স্বপন তা!

* * *

খয়ের রঙেতে
ঢালিয়া দুগ্ধ সাদা
চিনি সে মিলাত'
কখনো বা দিত আদা!

* * *

চামচ দুলাত'
পেয়ালার কোলে যবে
হাতের চুড়ি যে
বাজিত মধুর রবে!

আমার সমুখে
ধরিত যখন বাটি,
দু'টি চোখে তার
কী আদর পরিপাটি!

* * *

গোলাপ ফুলের
ফুটিত আভাটি মুখে
কি জানি কি কথা
কাঁপিত আমার বুকে!

* * *

হোকনা কেবল
শুধু এক কাপ্ চা—
কী দরদে ভরা
বোঝে তা ক'জন বা!

সাময়িকী

প্রতিবাদ—

সম্প্রতি কলিকাতা টাউন হলের সভায় এবং ৪ঠা আগস্ট বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালন করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী বিল ও ব্যবস্থার সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদ এবং ঐ প্রস্তাবিত বিল ও ব্যবস্থাগুলির প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন। প্রস্তাবিত আইন-ব্যবস্থা চতুষ্টয় এই—

(১) দ্বিতীয় কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন বিল (২) মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (৩) বঙ্গীয় চাষীখাতক সংশোধন বিল ও (৪) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকরি-বণ্টন নীতি।

এই প্রস্তাব ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেশের জননেতা ও সংবাদপত্র-সম্পাদকগণ পূর্ব্বে ও বর্ত্তমানে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কলিকাতার জনসভায় গৃহীত সুদীর্ঘ প্রস্তাবের মধ্যে সেই সব আলোচ্য বিষয়ে জনমতের যে প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথম বিলটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের মূল ভিত্তিই ধ্বংস করিয়াছে এবং হিন্দুর অধিকার ও ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত করিয়াছে—যদিও হিন্দুরাই এই শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহারাই কর্পোরেশনের অধিকাংশ কর দিয়া থাকে। এই আইন অত্যন্ত অন্যায়ভাবে সরকারের হাতে কর্পোরেশন-পরিচালন-ক্ষমতা তুলিয়া দিতেছে, যাহা তাহাদের স্পষ্ট সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রগতিশীল দলগুলির বিশ্বাস হারাইয়াছে।

দ্বিতীয় বিলটি শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রবর্ত্তন করিয়া এদেশের সমগ্র শিক্ষাযন্ত্রকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। শিক্ষার দিক দিয়া প্রতিক্রিয়ামূলক এই আইন বিশেষভাবে হিন্দুর ত্যাগ ও শ্রমের ফলে বাঙ্গালায় শিক্ষার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও অব্যাহত আছে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রদেশের মঙ্গল ও হিন্দুর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবে, এই সভা দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিরোধের সংকল্প জ্ঞাপন করিতেছে। হিন্দুরা কোন ক্রমেই তাহাদের বিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর দাক্ষিণ্যের উপর ছাড়িয়া দিবে না।

তৃতীয়—বঙ্গীয় চাষী-খাতক সংশোধন বিল ও অন্যান্য আইনের দ্বারা পল্লী-ঋণের ব্যবস্থা যেভাবে ধ্বংস করা হইতেছে তাহাতে কৃষকের কোনও উপকারই হইবে না, অথচ হিন্দু মহাজনদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। তাই এই সভা এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের কোনপ্রকার সংশোধন ততক্ষণ করা উচিত হইবে না, যতক্ষণ না গত তিন বৎসর ইহার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে। ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে, এই আইনের ফলে পল্লী অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে এক নিদারুণ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই সংশোধনী বিলটি সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট বোর্ডগুলিকে আদালতের সাহায্যে নিলাম বিক্রয়ের ক্ষমতা দিয়া এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা কমাইয়া বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করিয়া এমন এক অবস্থার উদ্ভব করিবে যাহার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

চতুর্থ বিল সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে—এই সভা যোগ্যতা এবং কর্ম্মকুশলতা বিবেচনা না করিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকরি বণ্টনের ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং আজকালকার হিন্দু বা অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকতর যোগ্যপ্রার্থীর ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করিয়া যেখানে উপযুক্ত বাঙ্গালী মুসলমান পাওয়া যাইবে না, সেখানে বাঙ্গালার বাহির হইতে অবাঙ্গালী মুসলমান কর্ম্মচারী জোগাড়ের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে।

এই চারিটি দাবী শুধু হিন্দু বাঙ্গালী নহে, সম্প্রদায়

নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীরই সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। সরকারী নীতি ও প্রস্তাবগুলির মধ্যে যুক্তির অভাব, তাহা দ্বারা সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতি যথার্থ সুবিচার ও সেই কারণে শ্রেণী বিশেষের কোথাও কোথাও কিছু সাময়িক সার্থসিদ্ধ হইলেও সমগ্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কল্যাণ নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—

বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে ১৩০৪টি উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে সরকারী সাহায্য পায় ৬২৮-টি এবং খাস সরকারী ৪৯-টি। এই সকল বিদ্যালয়ে মোট ১লক্ষ ৬৮ হাজার ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করে; তাহার মধ্যে বর্ণহিন্দু ছাত্র ১ লক্ষ ২২ হাজার, তপসিলভুক্ত হিন্দু ছাত্র ৮ হাজার ৪শত এবং মুসলমান ৪০ হাজার। মোট শিক্ষার ব্যয়ভারের মধ্যে জনগণ শতকরা ৮২ ভাগ এবং সরকারমাত্র ১৮ ভাগ ব্যয় বহন করেন। আবার শিক্ষার ব্যয়বহনকারী জনগণের মধ্যে বেশীর ভাগই হিন্দু। কাজেই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালার শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত হিন্দুদের সহায়তাতেই পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এ অবস্থায় এই সকল প্রতিষ্ঠানে হিন্দু জনগণেরই প্রাধান্য আসাটা নেহাৎ অস্বাভাবিক নহে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন, কাজেই তাঁহাদের পক্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু সম্প্রদায়ের এতটা প্রভাব বরদাস্ত করা কঠিন। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা বিল তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষক সম্মেলনের মন্তব্য—

সম্প্রতি বাঙ্গালার প্রধানমন্ত্রী মহাশয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিপক্ষে একদল আন্দোলনকারী চেঁচামিচি করিতেছে, দেশে জনসাধারণ তাঁহাদের পক্ষে আছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের এই কথা যে সত্য নহে তাহার প্রমাণ, এই সর্ব্বনাশা বিলের প্রতিবাদ বাঙ্গালায় বিঘোষিত হইতেছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনের বৈঠকে প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করা হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান দ্বৈতশাসনের ব্যবস্থার অদলবদল করিয়া তাহাকে একটি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা বাঞ্ছনীয় হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় ও বর্ত্তমান আকারে এই বিল উত্থাপন তাঁহারা কোন ক্রমেই সঙ্গত মনে করেন না। প্রস্তাবিত বোর্ডে সরকারী ও সরকার-মনোনীত সদস্য সংখ্যা আরও কমাইয়া দেওয়া এবং সদস্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করা উচিত বলিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেন না, আলোচ্য বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যা হইবে পঞ্চাশ—তার মধ্যে পাঁচজন সরকারী কর্ম্মচারী, ছয়জন পদাধিকার-প্রাপ্ত সদস্য, তিনজন মহিলা ও এগারজন অপরাপর সদস্য (সকলেই সরকারী মনোনীত)। অর্থাৎ ইহাতে বে-সরকারী নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অর্দ্ধেক। সেই অর্দ্ধেকের মধ্যেও আবার আছে ভাগাভাগী। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিপাকে সংখ্যালঘু বলিয়া গণ্য হিন্দুগণের দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ইহাতে কতটুকু থাকিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ছাত্র ও সামরিক শিক্ষা—

কলেজের ছাত্রদের যাহাতে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, সে জন্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। স্যর মহম্মদ ওসমান-এর সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ঠিক একই সময়ে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় অনুরূপ একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রীদলের বিপক্ষতায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। বাঙ্গালায় ঐরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়া কংগ্রেস পক্ষ হইতে উক্ত প্রস্তাব করা যায়। মন্ত্রীরা ইহাতে নিরপেক্ষ হন, কিন্তু কোয়ালিশনী সদস্যেরা বিপক্ষতা করেন। এরূপ প্রস্তাবের বিপক্ষতা করা যে কি মনোভাবের পরিচায়ক তাই দেশবাসী ভাবিয়া দেখিবেন।

ভারতীয় ও সিংহল সরকার—

সিংহলপ্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি অবিচার করার সংবাদ কিছুদিন হইতেই প্রবলতর হইতেছে। ইহা লইয়া উভয় দেশের সরকারের লেখালেখিও চলিতেছে। যেসব ভারতীয় শ্রমিক পুরুষানুক্রমে বা অনেক দিন ধরিয়া সিংহলে বসবাস করিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমানে প্রাদেশিক দেশপ্রেমের ওজুহাতে নানা আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে সিংহল

হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। কংগ্রেস ও ভারত সরকার যথাসময়েই এই চেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যত কোন ফলই হয় নাই। এই দুই দেশের মধ্যে শান্তি সংস্থাপনে যে সব অন্তরায় আছে, সময় থাকিতে সে সবের প্রতীকার না হইলে অশান্তি দিন দিনই বাড়িয়া চলিবে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস সিংহলের বর্ত্তমান সরকারের কর্ত্তব্যবুদ্ধি সজার্গ হইয়া দুই দেশের সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখিতে সাহায্য কবিবে।

মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়াস—

কলিকাতা কর্পোরেশন নিজেদের পরিচালনায় একটি মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্পর্কে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক কে-টি-শ’-এর নিকট হইতে কর্পোরেশনের মেয়র একটি পরিকল্পনা চাহিয়াছেন। অধ্যাপক শ’ সে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন এবং কর্পোরেশনের বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ঘরোয়া আলোচনা করিয়াছেন। কর্পোরেশন বৎসরে দুই কোটির অধিক টাকা লেন-দেন করেন। আমরা কর্পোরেশনের এই সংকল্পটি যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যকরী হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমাদের বিশ্বাস, প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হইলে করদাতাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের অনেকটা জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ মিলিবে।

শ্যামদেশের বিপদ—

জাপানের সাম্রাজ্যবাদ ক্রমেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। চীনের বিরুদ্ধে লড়াই আজও চলিতেছে। ইণ্ডো-চীনের দিকেও সে হাত বাড়াইয়াছে। সম্প্রতি আবার শ্যাম-রাজের নিকট চারিটি দাবী উপস্থিত করিয়াছে। দাবী চারিটি এই :—শ্যাম-রাজ্যে জলে, স্থলে ও শূন্যে সৈন্যের ঘাঁটি চাই; রেলপথগুলি ব্যবহারের ইচ্ছামত অধিকার চাই, উভয় দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি চাই এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চাই, অর্থাৎ—এক কথায় শ্যামকে জাপানের করতলগত হইয়া থাকিতে হইলে দুর্ব্বল শ্যামকে হয় ত নিরুপায় হইয়া জাপানের এই অসঙ্গত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জাপানের সাম্রাজ্য-বুভুক্ষার পরিসমাপ্তি কি এইখানেই শেষ হইবে। ইণ্ডো-চীনের পর শ্যাম, শ্যামের পর সিঙ্গাপুর, তারপর ব্রহ্মদেশেও কি হাত বাড়াইবে না? ইহার পরও কি বৃটিশ-সরকার ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার জন্য আবশ্যক সামরিক শিক্ষা-দানের অনুমতি দিতে কার্পণ্য করিবেন?

সাম্প্রদায়িক হত্যা—

সিন্ধুপ্রদেশে আবার দুইজন হিন্দু আততায়ীর হাতে নিহত হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ হইতে মাইল ছয় দূরে একটি গ্রামের অধিবাসী মুনশী খুবচাঁদ ও তাঁহার পত্নীকে রাত্রিবেলা চারিজন আততায়ী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে। মুনশীজিকে কুঠার দিয়া, আর তাঁহার স্ত্রীকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিছুকাল হইতেই সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দু নরনারীর হত্যা কার্য্য ধারাবাহিক ভাবে চলিয়া আসিতেছে, অথচ সরকারী পুলিশ এ পর্য্যন্ত আততায়ীদের কাহাকেও গ্রেফতার করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে কি আমরা ইহাই বুঝিব যে, ও অঞ্চলে ইংরেজ-রাজশক্তির ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? সিন্ধুপ্রদেশ কি ক্রমে অরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে? নহিলে ইহার প্রতীকার অবশ্যই হইত।

রণপুর রাজ্যের নরপতির গদিচ্যুতি—

যে সব দেশীয় রাজ্য প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার মধ্যে উড়িষ্যার রণপুর রাজ্যটি অন্যতম। এখানেই উত্তেজিত জনতার হস্তে মেজর বাজেলগেট নিহত হন। সম্প্রতি ভারত-সরকার সেই রণপুর-রাজকে গদীচ্যুত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই গদীচ্যুতির সহিত বিগত প্রজা-আন্দোলনের কোন সম্পর্ক আছে কি না জানা যায় নাই। তবে কারণ যাহাই থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে আমরা এই প্রমাণই পাইলাম যে দেশীয় রাজ্য শাসন-ব্যবস্থায় ভারত সরকার ইচ্ছা করিলেই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন। কেবল শাসন-সংস্কার ও প্রজা আন্দোলনের ব্যাপারেই তাঁহারা নিরপেক্ষ থাকিতে চাহেন এবং দেশীয় রাজ্যের নরপতিদের কুশাসনের বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহেন না।

বাঙ্গালায় জন্ম-মৃত্যু হার—

বাঙ্গালার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯৩৮ সালের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র আসাম ও সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া বাঙ্গালায় জন্মসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম ছিল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালায় জন্মসংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৭ হাজার ৫০ জন। ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৯৬ পরিমাণে কমিয়া মোট ১৫ লক্ষ ২১ হাজার ২৫৪এ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে গড়ে প্রতি মাইলে জন্মসংখ্যা ছিল ৩০.৪৮ জন। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালায় ১২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৭১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ১৯৩৮ সালে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮৬-তে দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিবরণী দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় মরণ বরণ করে না। তাহাকে উদরান্নের একটা বিশেষ অংশ যদি কর হিসাবে প্রদান করিয়া বাঙ্গালার ব্যয়বহুল শাসন-ব্যবস্থাকে কায়েম করিতে সাহায্য করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

ঋণ-সালিসী বোর্ডের অত্যাচার—

বাঙ্গালার চাষী-খাতক আইন অনুযায়ী ঋণ-সালিসী বোর্ডের প্রতিষ্ঠা হইলে পর গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোর্ড-গুলার কাজের এক ফিরিস্তি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত সমগ্র বোর্ডে ১৭ লক্ষ ৩ হাজার ৭৩টি মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল এবং ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৭৮টি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। ঐ মোকদ্দমা-গুলির মধ্যে ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৮৮টি মোকদ্দমায় বাদীদের দাবী ছিল প্রায় ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। বোর্ডের বিচারে সেই দাবী ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫৯ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। আরও যে সব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার দাবীর পরিমাণ ও কত টাকায় নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। গরীব চাষীরা অত্যধিক সুদ হইতে রেহাই পায় ইহা সকলেরই কাম্য, কিন্তু যাহারা কৃষক নহে তাহাদের আইনের সুবিধা দেওয়া এবং টাকা দেওয়ার অসঙ্গত ও অশোভন কিস্তি এবং তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি—উপদ্রবেরই নামান্তর এবং আইনের নামে এরকম উপদ্রব আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

রেল-দুর্ঘটনা ও তাহার তদন্ত—

রেল দুর্ঘটনাটা বাঙ্গালায় যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় যে জবাব দিয়াছেন তাহা জনসাধারণের মনে আশার উদ্রেক করিতে পারিবে না। গত দশ বছরে এই রকম দুর্ঘটনা আরও চার বার হইয়াছে। মাজদিয়া দুর্ঘটনার পরই জনসাধারণের পক্ষ হইতে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করা হইয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মন্ত্রী মহাশয় এ দাবী সমর্থন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রকাশ্য তদন্তের সুপারিশ করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। সরকারের পক্ষ হইতে যে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা নানা কারণেই সম্ভব হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের উপাধি লাভ—

গত ২২শে শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথকে ডি লিট. (সাহিত্যাচার্য্য) উপাধি দান উপলক্ষে একটি বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ম্যারিস গয়ার ও স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রগণ, বিশ্বভারতী সংসদের সদস্যগণ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধিগণ, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ ও বিশ্বভারতীর সুহৃদ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় স্বস্তিবাচন করিলে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হেণ্ডারসন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্যর ম্যারিস গয়ারকে লক্ষ্য করিয়া কবি-প্রশস্তি পাঠ করিয়া কবিবরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তৎপর স্যর মরিস একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া কবিবরকে সম্মানিত সাহিত্যাচার্য্য পদে বরণ করেন।

উইমেন্স কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন—

সম্প্রতি কলিকাতায় আর একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, কলেজের নাম উইমেন্স কলেজ। বাঙ্গালার লাট-পত্নী লেডি-মেরি হার্বার্ট কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কলেজের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে শুশ্রূষাকার্য্য, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্য-জ্ঞান, সঙ্গীতের আত্মিক ও নৈতিক মূল্য এবং চিত্রবিদ্যার ব্যবসায়িক মূল্য প্রভৃতি বিষয়গুলি কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা সহানুভূতি জ্ঞাপন করি এবং ইহার উন্নতিমূলক কর্ম্মপন্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য দেশের সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের অভাব হইবে বলিয়া মনে করি না।

ছাত্রদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব—

কলিকাতার ছাত্রদের মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের পরিচালক ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া দেশবাসীকে সতর্ক হইবার সুযোগ দিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, কলিকাতার প্রায় একলক্ষ ছাত্রের মধ্যে ও বিশেষ করিয়া সতের হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবকদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ অত্যন্ত প্রসারলাভ করিতেছে। ইহার প্রসারতা বন্ধ করিবার জন্য এখন হইতে সচেষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু অন্যান্য দেশের মত আবশ্যক চিকিৎসার ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই। যাদবপুর হাসপাতালে স্থানের নিতান্ত অভাব। কাজেই তিনি ছাত্রদের মধ্য হইতে বাৎসরিক জনপ্রতি একটাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া বিশেষভাবে ছাত্রদের জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটি সুসঙ্গত, সমর্থনযোগ্য, বিশেষত তাহা অসাধ্যও নহে। কর্ত্তৃপক্ষ ও অভিভাবকমণ্ডলী এই প্রস্তাবে মনোযোগী হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

যতীন বিশ্বাসের মৃত্যু—

হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ উপলক্ষে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইয়াছিল তাহাতে দণ্ডিত সত্যাগ্রহী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্প্রতি হুগলীর ইমামবরা হাসপাতালে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সন্তোষজনক ত নয়ই, বরং বিষয়টা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা; উহা জনসাধারণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে। কেন না, যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ মারা যান নাই, কত দিন রোগে ভুগিয়াছেন, জেলওয়ার্ডে রুগ্নাবস্থায় তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছিল কিনা, জেল হাসপাতালে কয়দিন ছিলেন এবং হুগলীর ইমামবরা হাসপাতালেই বা কয়দিন ছিলেন— এসব সংবাদ জনসাধারণকে জানানো উচিত ছিল।

পরলোকে অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায়—

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় মহাশয় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ও একজন বিশেষ শিক্ষাব্রতী ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। মধ্যে কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনাও করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ট্রটস্কি—

অবশেষে মেক্সিকোর এক আততায়ীর হাতে রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা ট্রটস্কি নিহত হইয়াছেন। ট্রটস্কি ছিলেন বিপ্লবী, সাম্যবাদী, ধনিকতন্ত্রবাদের এক দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। তাই স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি গণতন্ত্রবাদী দেশগুলিতে ক্রমাগত একটু আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিয়া ছিলেন, কিন্তু কোন গণতন্ত্রই তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাই আজ মেক্সিকোয় তাঁহাকে অমনিভাবে আততায়ীর আক্রমণে মৃত্যুবরণ করিতে হইল।

ট্রটস্কির বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে—তাঁহার পাণ্ডিত্য, গঠনশক্তি, আত্মোৎসর্গ, আত্ম-শ্লাঘা, সমষ্টি-আদর্শে অনুরাগ, ব্যক্তিগতপ্রাধান্যপ্রবণতা ইত্যাদি গুণগুলি তাঁহার চরিত্রে অদ্ভুতভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহার জীবন ছিল অস্থির, অশান্ত ও

মাদ্রাজে নিখিল ভারত মেয়র সম্মিলন—সম্মুখেই কলিকাতার মেয়র

বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্ট কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ 'শেঠ সুরযমল জালান ব্লকে'র উদ্বোধন করিতেছেন

বোম্বায়ে আজাদ ময়দানে জনসভায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

মাদ্রাজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার মূর্ত্তি। ভারতে এত বড় মূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে আর প্রস্তুত হয় নাই

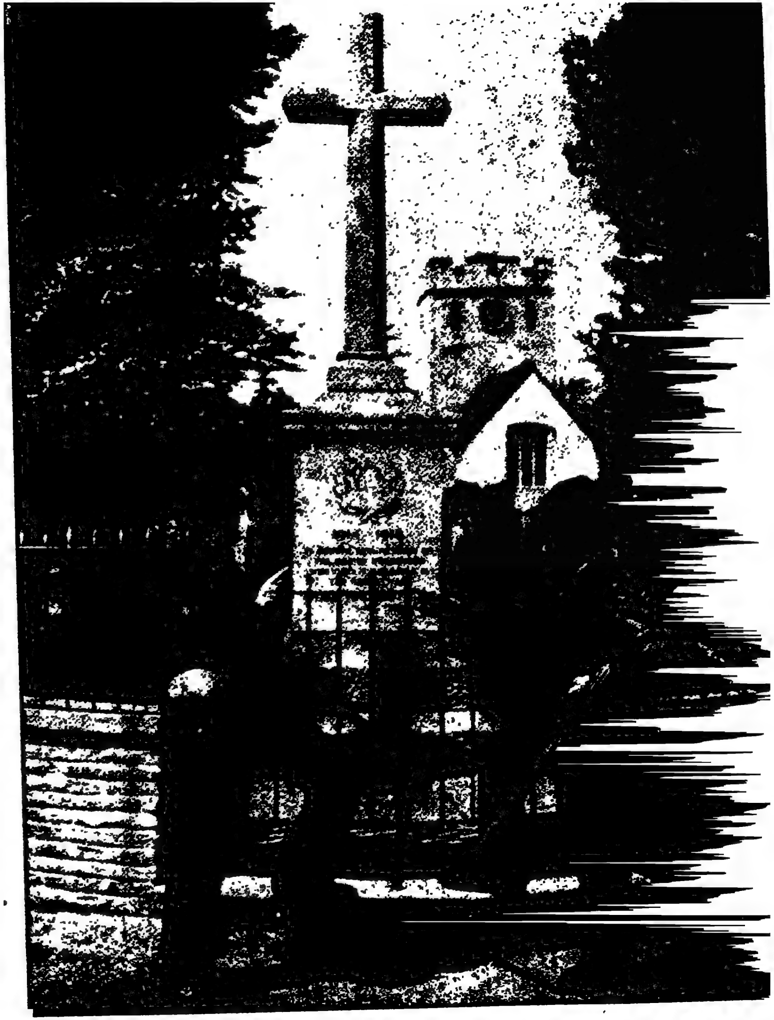

ইংলণ্ডের গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা—জার্ম্মানীর আক্রমণাশঙ্কায় পাহারায় নিযুক্ত বৃদ্ধ সৈনিকগণ গত যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নিকট আসিয়া কথা বলিতেছেন

অসহিষ্ণু। এই জন্যই তিনি সমষ্টিগত অস্তিত্ব ও দলগত একাত্মতা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, অথচ এইগুলি সাম্যবাদীর জীবনে অপরিহার্য্য। ট্রটস্কির আসল নাম লেইবা ডেভিডফ ব্রোনস্টাইন। ১৮৭৯ সালে রুশিয়ার এলিজাবেথগ্রাডের নিকট এক মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৯৮ সালে বিপ্লবী বলিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে পলায়ন করিবার সময় আসল নাম গোপন করিয়া লিওঁ ট্রটস্কি—এই ছদ্মনাম তিনি গ্রহণ করেন। এই সময়ই লেনিনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিভায় লেনিন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তখন হইতেই এই দুই বিপ্লবীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়; কিন্তু ১৯১৩ সালে যখন দুইটা দলে রুশিয়ার বিপ্লবীরা বিভক্ত হয়, তখন তিনি কোন দলেই যোগ দেন না, বরং মেনসেবিকদের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় তিনি মতের পার্থক্য সত্ত্বেও লেনিনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ান। বিপ্লবসাফল্য লাভ করিলে তিনি সোভিয়েট সরকারের পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন বাদে তিনি সমর-সচিবের পদে বৃত হন এবং রুশিয়ার প্রসিদ্ধ লালপল্টন গঠনে তাঁহার গঠন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২০ সালে ট্রটস্কি ওয়ারশ অভিযানের বিরোধিতা করেন কিন্তু লেনিন তাঁহার মত অগ্রাহ্য করেন। ১৯২৩ সাল হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ চলিতে থাকে, স্টালিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে থাকেন।

বারাকপুর (২৪ পরগণা) সাহিত্য সংসদে সমবেত সাহিত্যিক-বৃন্দ

এই সুযোগে স্টালিন ক্রমশ নেতৃত্বের দিকে আগাইয়া আসিলেন। লেনিনের মৃত্যুর সময় ট্রটস্কি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ককেসাসে ছিলেন, ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সমর-সচিবের পদ হইতে সরাইয়া অন্য সামান্য পদে নিযুক্ত করা হয়। এমনি করিয়া রুশিয়ায় ট্রটস্কির প্রভাব কমিতে থাকে। তিনি আশু বিপ্লবের সমর্থক, অপর পক্ষে স্টালিন

ইংলণ্ডের গ্রামের অবস্থা—গ্রাম্য পুলিস লোহার টুপী প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে

প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক। এই বিরোধ হইতেই পরে তিনি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তুর্কীস্থান, কনস্টান্টিনোপল প্রভৃতি নয়টি দেশ ঘুরিয়া স্থায়ী আশ্রয় কোথাও পাইলেন না। ১৯৩৩ সালে কর্সিকায় যান, পরে ফ্রান্সে থাকিবার অনুমতি পান; কিন্তু পর বৎসরেই অনুমতি প্রত্যাহার করায় তিনি নরওয়ে চলিয়া যান। এখানেও তিনি থাকিতে না পারায় মেক্সিকো সরকার তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, বক্তৃতার শক্তিও তাঁহার ছিল অসাধারণ। তাঁহার ক্ষমতাপ্রিয়তা লেনিনের মতই ছিল, কিন্তু লেনিনের মত অভ্রান্ত বিচারশক্তি তাঁহার ছিল না। সর্ব্বোপরী তিনি ছিলেন ক্রোধী, তাই সময় সময় নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন, বিচারবুদ্ধি লোপ পাইত। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ও আত্মজীবনচরিত বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। তাঁহার এক পুত্র ফ্রান্সে, অপর পুত্র মস্কোতে নিহত হন, একটি কন্যাও নিরুপায় হইয়া আত্মহত্যা করেন। আজ ট্রটস্কি সকল অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিপ্লবীর মতই দেহত্যাগ করিলেন—রোগশয্যায় নহে।

দেশবন্ধু পার্কে বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্ট সিভিক গার্ডের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন—ফটো পান্না সেন

সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগ—

১৯৪০ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে নূতন অধ্যাপক নিয়োগ সম্পর্কে এক অদ্ভুত আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত টোল বিভাগে সংস্কৃতজ্ঞ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণকেই অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হইত। নূতন বিধানে বলা হইয়াছে যে বি-এ বা এম-এ পাশ না হইলে ঐ পদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হইবে না। টোল বিভাগে শুধু সংস্কৃতই পড়ান হয়; টোল বিভাগের উপযোগিতাও সেই জন্য। সেই বিভাগে যদি ইংরাজি-নবীশ পণ্ডিত ছাড়া অপরের প্রবেশাধিকার না থাকে, তাহা হইলে কলেজ বিভাগের সহিত তাহার কোন পার্থক্যই থাকিবে না। কাহাদের নির্দ্দেশে যে টোল বিভাগের জন্য এরূপ অদ্ভুত আদেশ প্রচারিত হইল, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। আমরা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। যদি ইংরাজি শিক্ষাও টোলের পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের মাপ-কাঠি হয়, তাহা হইলে দেশে আর টোল থাকিবে না। টোলগুলি উঠিয়া গেলে শুধু যে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র লুপ্ত হইবে তাহা নহে, হিন্দুর সংস্কৃতিরও উচ্ছেদ করা হইবে। কোন বিষয়েই হিন্দুরা আবশ্যক ব্যবস্থাদি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা শিক্ষা বিভাগের এই আদেশ প্রচার দেখিয়া সেইজন্য শঙ্কিত হইয়াছি।

ভাওয়াল মামলার রায়—

অতি-আলোচিত বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার আপীলের বিচার হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কস্টেলো, বিশ্বাস ও লজ্‌কে লইয়া গঠিত বিচারালয়ে আপীলের বিচার হয়। বিচারে বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও কস্টেলো বাদী সন্ন্যাসীকে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন; অপরপক্ষে বিচারপতি লজ্‌ সন্ন্যাসীকে পাঞ্জাবী প্রতারক

বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। বিচারপতিদের দুইজন যে পক্ষে রায় দিয়াছেন সেই পক্ষই মামলায় জিতিয়াছেন ; কিন্তু একটি আইনগত আপত্তির জন্য এখনই মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারিবে না। পূজার অবকাশের পর হাইকোর্ট খুলিয়া বিচারপতি কস্টেলো স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার রায় অনুমোদন করিলে তবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে। দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী উদগ্রীব আগ্রহে এই মামলার চূড়ান্ত ফলের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে।

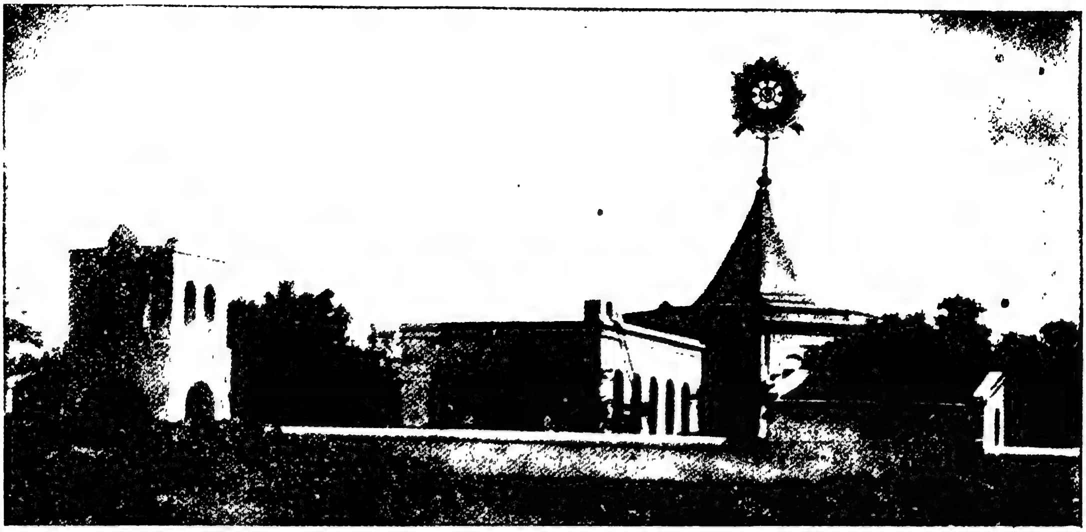

সিমুলতলায় স্বামী যোগবিলাস মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমন্দির

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রতিবাদ—

বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যে রোয়েদাদ ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ফলে ভারতের হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবে হিন্দুদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি আনের নির্দ্দেশ মত গত ১৭ই আগষ্ট কলিকাতায়ও এক সভা হইয়াছিল। আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বার্দ্ধক্যজনিত অসুস্থ শরীর লইয়াও সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীরা ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়া সেই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের মত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতেই সভার গুরুত্ব সকলে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

গোবরডাঙ্গায় মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত সাহিত্যিকবৃন্দ

পরলোকে তারাপ্রসন্ন ঘোষ—

গত ১লা শ্রাবণ কলিকাতা বীডন ষ্ট্রীটের খ্যাতনামা তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। যশোহর বাঘুটিয়ার কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সেকালে কয়েকটি ইউরোপীয় ফার্ম্মের মুৎসুদ্দীগিরি করিয়া প্রভূত ধনার্জ্জন করিয়াছিলেন—তারাপ্রসন্ন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। তারাপ্রসন্নও মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্কের মুৎসুদ্দী ছিলেন। তিনি পরোপকারী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। কয়েকটি স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্যও তিনি অর্থদান করিয়াছিলেন।

তারাপ্রসন্ন ঘোষ

মৃত্যুকালে তিনি একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে অলিভার লজ—

পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর অলিভর লজ্ উননব্বই বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে তিনি বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে বহু রত্নই দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মনীষা সকল দেশের বৈজ্ঞানিক সমাজও শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ ভগবান, আত্মা, পরলোক ইত্যাদি প্রমাণাভাবে স্বীকার করে না। কাজেই এই যুগে স্যর অলিভার দুঃসাহসীর মত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কষ্টিপাথরে ঐ সব সত্যকে বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নাই। মানব জ্ঞানের উচ্চস্তরে উভয়েই একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাঁহার এই মতামতের জন্য বৈজ্ঞানিক সমাজ তাঁহাকে একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও মনের সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহার স্থান যে অক্ষয় হইয়াই থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা—

বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের একচ্ছত্র ক্ষমতা। তাই এখানে যখন তখন ভোটের জোরে আইনের রদবদল একটা রেওয়াজে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক-সংশোধিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি এই যে, ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী যে সব পুস্তকে থাকিবে তাহা পাঠ্যপুস্তক বা পুরস্কারের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হিসাবে গৃহীত হইতে পারিবে না এবং যাহাতে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইতে পারে তৎপ্রতি বাঙ্গালা সরকারের অবিলম্বে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী যে সত্য নহে তাহা ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র মহাশয় এবং আরও অনেকে নানাভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন; দেশের সকলেরই তাহা জানা আছে। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রস্তাবের পশ্চাতে যাহা লুক্কায়িত আছে, আমরা তাহার সমর্থন করি না। ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের নীতি অনুসরণে ইতিহাসকে বিকৃত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে স্বাধীন মতামত প্রকাশ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেটা সমগ্রভাবে দেশের ক্ষতি করিবে—ইহাই আমাদের ধারণা।

নবী আক্তার মর্‌ গিয়া

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

শিকার

যতদূর চোখ যায়, শুধু পাহাড় আর অরণ্য। 'কালী পাহাড়ী' নহে, চোখে পড়ে তারই সংলগ্ন সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী।

'থালী' এই অরণ্য-উপকণ্ঠের একটী ছোট বস্তী। রাস্তার দুই পাশে দরিদ্র গৃহস্থদের ছোট ছোট কুটীর। দুই-একটী মুদী দোকান। বিক্রয়দ্রব্য তেল, নুন, চাল, দাল, আটা। কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি, আর এক-আধ টিন নকল গোল্ডফ্লেক সিগারেটও দোকানে দেখা যায়।

রাস্তায় জনকোলাহল বিরল। অনাবৃত দেহে দশ-বারটী গ্রাম্য লোক সকালে সন্ধ্যায় জড় হয়। কথাবার্ত্তায় ব্যক্ত হয় দরিদ্রের ছোটখাট সুখদুঃখ। "আকের ক্ষেত ভালুকে নষ্ট করছে। অরহর খেয়ে যাচ্ছে বনের হরিণ আর শম্বর। মহুয়ার সঞ্চয় মন্দ হয়নি।" এমনি কথাবার্ত্তা, আলাপ চলে মাসের পর মাস। এদের ক্ষুদ্র বুকে আশার উত্তেজনা নাই, তাই নৈরাশ্যের গুরু বেদনাও নাই। অনাড়ম্বর, মন্থর জীবনযাত্রা।

দোকান-সম্মুখের মৃদু আলাপ মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হ'য়ে ওঠে মটরের হর্ণে। "সাহেব-লোগ শিকার খেলনে আয়ে হায়।" এরা বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে কখনও খাস বিলাতী সাহেব, কখনও ইংরেজী পোষাকে দেশী সাহেব। বন্দুক-রাইফেলের সমারোহ, উর্দি-পরিহিত খানসামা, সম্ভ্রমে মাথা পেতে নেয় তাদের অনাবশ্যক অনুশাসন—নগ্ন শিশুর দল তাড়া খেয়েও ভিড় ক'রে দাঁড়ায় গাড়ীর চতুর্দ্দিকে। মোটরের যে যত কাছে এগিয়েছে, বালক-দলে তার সমাদর তত বেশী।

দোকানের চাষীদের তখন গল্প সুরু হয় সম্ভব অসম্ভব কত গল্প। জঙ্গলে হঠাৎ কবে বাঘের সামনে পড়ে গিয়েছিল; ভালুকের আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে গত সন্ধ্যায়! বাছুর বাঁচাতে গিয়ে চিতাবাঘের সঙ্গে কাড়াকাড়ি। বস্তীর জীবনযাত্রায় এই একমাত্র চাঞ্চল্য। ক্ষণিকের কৌতূহল ও উত্তেজনা।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। প্রায় অপরাহ্নে দেশী ছোট ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হ'লেন কমলপুরের নবী আক্তার। কমলপুর এখান থেকে কোশভর উত্তরে অবস্থিত পাহাড়-ঘেরা বস্তী। নবী আক্তার এ পল্লীর মুরুব্বী। সাহসী শিকারী ব'লে দরিদ্র চাষীদের রক্ষক, মালিক বললেও অত্যুক্তি হয় না।

নবী আক্তার হ্রস্ব দেহ, অবয়ব দৃঢ় এবং সুগঠিত, ললাট প্রশস্ত, বর্ণ তামাটে। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রেও মুখে শ্রান্তির চিহ্নমাত্র নেই। স্টেথিস্‌কোপের মত পকেটে দেখা যায় রবারের সংলগ্ন একটা নিকেলের চোঙ্‌। বধির, এই চোঙের সাহায্যে সে যৎকিঞ্চিৎ শুন্‌তে পায়, অধুনা শ্রবণশক্তি প্রায় লুপ্ত।

কোন বড় সাহেব শিকারে আস্‌ছেন, নবী আক্তারের এই অসময়ে উপস্থিতি তারই হেতু। দূরে গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। কোনও চাষীর ইসারা পেয়ে নবী আক্তার তাকিয়ে দেখ্‌লেন—ধূলির ঝড় তুলে একখানা মোটর ছুটে আস্‌ছে। গাড়ী কাছে আস্‌তেই আক্তার সাহেব হাত তুলে হাজিরা জানালেন। সাহেব ইঙ্গিতে নবী আক্তারকে তিন মাইল দূরে একতারার ডাকবাংলায় যেতে আদেশ ক'রলেন।

কয়েক দিন থেকে জঙ্গলের বিভিন্ন স্থানে মোষ বাঁধা হচ্ছে। 'কিলে'র খবর পেয়ে সাহেব এসেছেন। রাত্রে মাচায় বসে মাংসলোভী বাঘের প্রতীক্ষা করবেন। সঙ্গে সাহেবের একটী কুমারী কন্যা। শিকারে এর উৎসাহ সাহেবের চেয়ে কম নয়।

মাচায় জায়গা যথেষ্ট নহে। ব্যবস্থা হ'ল সাহেব কন্যাকে নিয়ে মাচায় বসবেন। আশঙ্কার কারণ নেই, মাচা খুব উঁচু ক'রেই বাঁধা হয়েছে। নবী আক্তার ডাকবাংলোতে থাক্‌বেন। রাইফেলের আওয়াজ হ'লে মোটর নিয়ে এগিয়ে যাবেন সাহেবের সাহায্যে। মাচা দূরে নহে, ডাকবাংলো থেকে বন্দুকের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাবে।

একটা আরাম চেয়ারে মুক্ত অঙ্গনে আক্তার সাহেব

চোখ বুজে শুয়ে আছেন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন হিসাব নেই। খানসামা এসে ঘুম ভাঙ্গালে—জঙ্গল থেকে দুইবার রাইফেলের আওয়াজ শুনেছে। নবী আক্তার ঘড়ি খুলে দেখ্‌লেন ভোর চারিটা। মাচার দিকে এই মুহূর্ত্তে এগিয়ে যাওয়া অনাবশ্যক। গ্রীষ্মের ছোট রাত, আধ ঘণ্টায় দিনের আলো দেখা দেবে। ড্রাইভারকে মাচার দিকে মোটর নিয়ে যেতে আদেশ ক'রে নিজে খানসামার সঙ্গে মুর্গীর আণ্ডার সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হলেন। এ জিনিষগুলো এ অঞ্চলে সুলভ নহে, কোন শ্বেতাঙ্গ সাহেবই এখবর পছন্দ করেন না।

একঘণ্টা পরে মোটর ফিরে এল। নবী আক্তার দেখ্‌তে পেলে লাগেজ-কেরিয়ারে কি একটা খুব ভারী জানোয়ার বাঁধা। সাহেব হৃষ্ট, তার কন্যা উল্লাসে দিশাহারা। আক্তার সাহেব তাকিয়ে দেখলেন পেছনের ভারী জানোয়ারটা একটা বিপুলকায়া বাঘিনী। বিস্ময়ে মুখখানা বিস্ফারিত ক'রে নবী আক্তার বললেন, "সাহেব, আপনার বরাত ভাল! এত অনায়াসে এখানে কেউ বাঘ শিকার করেনি।" সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, "ভাগ্যের শেষ কোথায় এখনও জানি না। ব্যাঘ্রী ত কুড়িয়ে এনেছি, কিন্তু বড় বাঘ গুলী খেয়ে জঙ্গলে কোথায় প'ড়ে আছে। এইবারে তোমার পালা—বাঘ খুঁজে আন।"

তিনটী শব্দের হুকুম 'বাঘ খুঁজে আন'। এর গুরুত্ব কতখানি সাহেব নিশ্চয়ই জানেন। নবী আক্তার ততোধিক জানেন। আক্তার সাহেব বললেন, "বাঘ যদি পড়েই আছে, সেটাকেও নিয়ে এলেন না কেন?"

সাহেব জানালেন সমস্ত রাতের অনিদ্রায় তিনি শ্রান্ত, বাঘ সন্ধানের সামর্থ্য তাঁর নাই।

যেতেই হবে, দ্বিধা করা চলবে না। যিনি আদেশ করছেন তিনি ইংরেজ, নবী আক্তার গ্রাম্য নেটিভ; আর নবী আক্তারের শিকারী-চিত্ত বিপদে পরাঙ্মুখ নয়। এমনি বিপদে সে এগিয়ে গেছে—কখনও সঙ্গীসহ, কখনও প্রায় নিঃসঙ্গ।

মাচার কাছে গিয়ে দেখ্‌তে পেলে কয়েকজন গ্রাম্য লোক সেখানে ব'সে আছে, আক্তার সাহেবেরই প্রতীক্ষায়। এরা নিকটবর্ত্তী বস্তীর লোক। রাত্রে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলে এরা ভোরেই বেরিয়ে পড়ে। ভরসা শম্বর, শূকর আহত হ'লে খুঁজে বের ক'রে নেবে। দুই-চারদিনের উপাদেয় আহার। মাংস প্রচুর হ'লে এরা শুধু মাংস খেয়েই থাকে, রুটির প্রয়োজন হয় না। রাত্রে জঙ্গলে কেউ শিকারে বেরোলে এরা অতি প্রত্যূষে মোটরের চাকার দাগ দেখে জঙ্গলে ঢুকে যায়। শুক্‌নো পাতায় বা পাথরের টুকরোয় ক্ষীণ রক্তের দাগ এদের দৃষ্টি অতিক্রম করে না। এই রক্তের বিন্দু অনুসরণ ক'রে এরা আহত জানোয়ার সন্ধান ক'রে। যে জানোয়ারগুলি বিদ্ধ হ'য়ে তৎক্ষণাৎ মরে যায়, আগন্তুক শিকারীর পক্ষে সেই জানোয়ার ছাড়া আহত জানোয়ার খুঁজে বার করা অসম্ভব। অরণ্যচারী বস্তীর লোক সেই জানোয়ার খুঁজে নেয়। প্রয়োজন হ'লে বল্লম টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করে। শিকারীর চোখে ধূলি দিয়ে কখনও বা মৃত জানোয়ারও তুলে নেয়। মৃত জন্তু জঙ্গলে ফেলে রেখে আগন্তুক শিকারী অন্য শিকারে রত হ'লে এইরূপ চুরির সুযোগ ঘটে। মাংসাহার আর মাংস বিক্রয় ক'রে এ গরীবদের দু পয়সা উপার্জ্জনও চলে।

রাত্রে রাইফেল ফায়ার হয়েছে, বস্তীর লোক জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েছে জানোয়ারের সন্ধানে। এরা জানত না, যে-জানোয়ারের উপরে রাইফেল চলেছে সে শম্বর বা শূকর নহে। সে রাইফেলের লক্ষ্য ছিল বাঘ, সন্ধ্যার পরে গ্রাম-প্রান্তে যার গর্জ্জন শুন্‌লে এরা আতঙ্কে দোর বন্ধ করে কেনেস্তারা পিটোয়—বাঘকে ভয় দেখিয়ে দূরে তাড়াবার চেষ্টা।

এমনি একদল লোক সাহেবের নজরে পড়েছিল মাচা থেকে ডাকবাংলোয় ফেরার পথে—আর তাঁরই আদেশে এরা প্রতীক্ষা করছিল মাচার নিকটেই।

নবী আক্তার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে দু জায়গায় রক্ত দেখতে পেলে। সাহেবের কাছে পূর্ব্বেই শুনেছিল, ব্যাঘ্রী মরার খানিক পরেই বিশালকায় বাঘ উপস্থিত হয়েছিল। সাহেবের গুলী তার পেটে বিদ্ধ হয়েছে। পেটে বিদ্ধ হ'য়ে বাঘ যে খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি তাতে সন্দেহ নাই।

আক্তার সাহেব গ্রাম্য লোকদের বুঝিয়ে দিলে বাঘ খুঁজতে হবে। এর বিপদ সম্পর্কে সকলকে সতর্ক ক'রে জানিয়ে দিল—সাহসী জোয়ান ছাড়া যেন কেউ তার অনুগামী না হয়। কয়েকজন লোক তখনই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে। 'মোদিয়া'র নেতৃত্বে ছয়জন লোক আক্তার সাহেবের সাথী হ'ল।

মোদিয়া ডাকবাংলো-সংলগ্ন বস্তীর অধিবাসী। সে এই অঞ্চলের চৌকিদার। কখনও চাকুরী আছে, কখনও নাই। চাকুরী যখন থাকে তখন সপ্তাহে দু দিন থানায় হাজিরা আছে। তিন ক্রোশ দূরে গোবিন্দপুর থানায়। এ রাস্তাটা মোদিয়ার পক্ষে এতটা দীর্ঘ নহে। সে জানোয়ার-সঙ্কুল জঙ্গলের রাস্তাই পছন্দ করে। জঙ্গলের রাস্তা অনেক কম। থানায় হাজিরা দেওয়া মোদিয়ার কোন বালাই নহে। রোজই অতি ভোরে সে বেরিয়ে পড়ে জঙ্গলে। রাত্রে কখন সে ফিরে আসে কেউ জানে না। রাত্রে মাঝে মাঝে তাকে তাড়িখানায় দেখা যায়। সমস্ত সকাল, দুপুর, অপরাহ্ন সে খুঁজে বেড়ায় বনের জানোয়ার। হাতে ছুরি ছাড়া কোন অস্ত্র নেই। জানোয়ারের দেখা পেলেও শিকারের সম্ভাবনা থাকে না। তবু প্রত্যেক জন্তুর পরিচিত আশ্রয়, ভালুকের গহ্বর, বাঘের মান (বাসা) সে খুঁজে দেখে। ওৎ পেতে শুয়ে থাকে তারই আশে পাশে। জন্তুর নিশ্বাস নাকে আসে, নিশ্বাসের শব্দ, জানোয়ারের গর্জ্জন শুন্‌তে পায়। কখনও দূরে পালিয়ে যায়, প্রয়োজন হ'লে গাছে চড়ে। প্রত্যেক শিকার দলের সে সাথী, পথপ্রদর্শক। ছিপ-ছিপে গঠন আর মুখের মিষ্টি হাসিতে এর সাহসী চিত্তের আভাসটুকু নাই। হাসিতে চিক্‌মিক্ করে এর তাম্বুলরাগহীন শুভ্র দাঁতগুলি।

অনুমান দুইশত গজ দূরে শক্ত পার্ব্বত্য লতায় গঠিত এক বিস্তীর্ণ জঙ্গল। ঠিক ইহারই সম্মুখে রক্তের দাগ দেখা গেল। এই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করা অসম্ভব। মাকড়সার জালের মত লতার গাঁথুনী একে দুর্গম ক'রে রেখেছে। ভিতরে যাওয়াও বিপজ্জনক। উঁকি দিয়ে দেখাও নিরাপদ নহে। এক লহমায়, বাঘের এক থাবায় পঞ্চত্ব লাভ কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। মানুষের মাথাটা চিবাইয়া দেওয়াও বাঘের পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে। নবী আক্তার আদেশ করলেন, জঙ্গলের বাইরের দিকটা প্রথমে ঘুরে দেখ্‌তে হবে। বাইরের দিকটায় রক্ত দেখ্‌তে পেলে বুঝতে হবে এ জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। মোদিয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ ক'রে ও দিকটায় রক্ত দেখ্‌তে পেলে। সেই রক্তের দাগ দেখে আবার অনুসন্ধান সুরু হ'ল। এতটুকু রাস্তা দেখ্‌তেই বেলা এগারটা বেজে গেছে। রক্তের গতি পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেল **'ককুলতে'**র ঝর্ণা এসে সমতল ভূমিতে যেখানে অরণ্যকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে নীচে নেমে গেছে বাঘ সেই দিকের রাস্তা ধ'রে এগিয়েছে।

এপ্রিল মাস। পাহাড় বনভূমি রৌদ্রের খর তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। যেদিকে রোদ, সেদিকে তাকাতে চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে। আক্তার সাহেব বুঝে নিলেন জল-তেষ্টায় বাঘ ঝর্ণার দিকে এগিয়েছে। ঝর্ণা বেশী দূরে নহে। এক সঙ্গে এত লোকের অগ্রসর হওয়া সমীচীন নহে। বিপদ ত আছেই, তা ছাড়া মানুষের পদশব্দে বাঘ একবার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতর্কিতে আক্রমণের আশঙ্কাও প্রচুর।

নবী আক্তার একবার সম্মুখের ঝরণার দিকে তাকালেন। একবার ঊর্দ্ধে আকাশের পানে তাকালেন। খোদার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন কি? স্থির করলেন, এবারে এগিয়ে যাবেন সম্পূর্ণ একক। যে লোকটা সম্পূর্ণ বধির, শুষ্ক পত্রে বাঘের পদধ্বনি দূরে থাক, যে বাঘের গর্জ্জনে পাহাড় অরণ্য থর থর ক'রে কাঁপে এই শিকারীর কানে তার এতটুকুও পৌঁছায় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই পরামর্শই উত্তম। জীবনে বহুবার তিনি বাঘের দংষ্ট্রার সম্মুখীন হয়েছেন, বাঘের যে দৃষ্টি বহু শিকারীর বন্দুকের মুষ্টি শিথিল ক'রে দেয়, নবী আক্তার সে দৃষ্টি বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর মৃত্যুভয় কতটা তা জানি না। একবার তাঁকে বলেছিলাম, "ক্রুদ্ধ বাঘের সামনে পড়ে গিয়ে তার গর্জ্জন শুনে অবিচলিত থাক্‌ব এমন বিশ্বাস ত আমার নাই। আপনার এমন অবস্থায় ভয় হয় না?" উত্তরে তাঁর পাথরে গড়া মুখখানা হাসির উচ্ছ্বাসে ভরে দিয়ে বলেছিলেন, "হাম ত বহার হাঁয়, হামে ডর কেয়া হাঁয়? হামে ত শেরকা গরজ্‌না শুনাই হি নেহি পড়তা হাঁয়।"

নবী আক্তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন- তারা গাছের উপরে আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু চরম প্রয়োজনে তারা যেন দুর্লভ না হয়। সম্মুখের ঝরণা পার হয়ে তিনি এগিয়ে চললেন পাহাড়ের পাদদেশে দূরের ঝর্ণায়। হাতে উদ্যত দোনলা রাইফেল। চোখের দৃষ্টি চকিত। খানিকটা দূর এগিয়ে অদূরে ছোট ঢিবি। ভালই হোল, এই ঢিবির উপর থেকে অনেকটা দূর দেখা যাবে। একশত গজ দূরে তার সন্ধানী চোখ বাঘ দেখ্‌তে পেলে। মনে হ'ল, বাঘের পিছনের বাঁ দিকের পাখানা আহত। বাঘ এগিয়ে চলেছে

সম্মুখে—নবী আক্কার পশ্চাতে। সাহেব বলেছিলেন, বাঘ পেটে আহত হয়েছে। সাহেবের সে অনুমান সত্য নহে। বাঘের চলার ভঙ্গী দেখে আক্কার সাহেব বুঝে নিলেন, এক গুলীতে বাঘ নিহত না হ'লে আজ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। পায়ে আহত বাঘ জ্যান্ত বাঘের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে, পরন্তু আহত হয়ে সে অধিকতর হিংস্র হয়ে উঠেছে।

বাঘের পিছন দিক দেখা যাচ্ছে। কোথায় গুলী করা যায়! আক্কার সাহেব সাব্যস্ত করলেন, পেছনের অন্য পা খানা ভেঙ্গে দিলে বাঘ প'ড়ে যেতে পারে, কিন্তু এতটুকু সময়ে বাঘ আরও এগিয়ে গেছে। এতদূর থেকে গুলী করা সঙ্গত হবে না—পিছন নিতে হবে। ঢিবি থেকে নীচে নেমে এসে সন্তর্পণে আবার এগিয়ে চললেন। ভরসা এই, বাঘকে তিনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন। আড়াল থেকে অতর্কিতে আক্রমণের আশঙ্কা নেই। বধির শিকারীর পক্ষে সম্মুখ যুদ্ধই প্রশস্ত। কিন্তু বাঘ পায়ের শব্দ শুন্‌তে না পায়। এপ্রিল মাস—নীচে শুষ্ক পাতার রাশি। আক্কার সাহেব পা টিপে রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে চললেন। এবারে দূরত্ব পঞ্চাশ গজ মাত্র। কি সন্দেহ ক'রে বাঘ মাথা তুলে ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিলে। আক্কার সাহেব রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন। বাঘ আবার এগিয়ে চলল। না—আরও কাছে যেতে হবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে রক্ষা নেই। লক্ষ্যচ্যুতি হ'লে বিপদ ত বটেই, কিন্তু বাঘের নিকট-সান্নিধ্যে কি ভয় নেই? নবী আক্কারের এই যুক্তি গ্রহণ করার মত বুকের পাটা কয়জন শিকারীর আছে? কিন্তু এসব কারুর না থাক, নবী আক্কারের তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি এগিয়ে চল্‌লেন। এবারে দূরত্ব ত্রিশ গজ মাত্র! ব্যস—এইবার। নবী আক্কার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেলে নিশানা ঠিক ক'রে ট্রিগার টেনে দিলেন। রাইফেলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই নিমেষে একটা কাণ্ড ঘ'টে গেল।

বাঘের গর্জ্জনে বনভূমি কেঁপে উঠেছে—নবী আক্কারের তাতে কিছু এসে যায় না, সে যে বধির। কিন্তু বিপদ হ'ল—মুহূর্ত্তে বাঘ ঘুরে গিয়ে আক্কার সাহেবকে তাড়া ক'রে ছুটে এল। দূরত্ব যৎসামান্য, নিশানা ক'রে গুলী করার অবসর নাই। তিনি ছুটে গেলেন একটা কাঁটা ঝোপের দিকে। একটা ধারণা ছিল বাঘ কাঁটা ঝোপকে ভয় করে। ঝোপের ভিতরে ঢুকে যেতে একটা পা যে বাইরে আট্‌কে গেল, সেটাকে টেনে কিছুতেই ঝোপের ভিতরে নেওয়া যাচ্ছে না। পায়ে দারুণ যন্ত্রণা। বাঘ একটা পা মুখের ভিতর পুরেছে কি! শুয়ে পড়ে শুধু হাতের কনুই ভর ক'রে দারুণ যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে আক্কার সাহেব চোখ বুজে পড়ে আছেন। ভাব্‌ছেন—অব পাক্‌ড়িস, অব পাকড়া। অব্ খতম্। হঠাৎ চোখ খুলে গেল—আক্কার সাহেব দেখ্‌তে পেলেন—বাঘ ঝোপের বাইরে দাঁড়িয়ে শত্রুর প্রতীক্ষায় উদগ্র। রোষে ক্ষিপ্ত, লাঙ্গুল মাটিতে ঠুক্‌ছে। মুহূর্ত্তে আক্কার সাহেবের চেতনা ফিরে এসেছে। শায়িত অবস্থায় বন্দুকের নিশানা ঠিক ক'রে নিয়ে আবার ট্রিগার টেনে দিলেন। আবার বাঘের ভীষণ গর্জ্জন, উল্লম্ফন—তারপর সব নীরব। আক্কার সাহেবের মুখ থেকে বেরোল, "ব্যস্, খতম্।"

রাইফেলে আবার দুটো টোটা পুরে নিয়ে কাঁটার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন। পায়ের দিকে লক্ষ্য করার অবসর নাই। রাইফেলে বাঘের মস্তক লক্ষ্য ক'রে নবী আক্কার এগিয়ে এলেন বাঘের অতি নিকটেই। আবার অস্ফুট গর্জ্জন—দু বার মুখ হাঁ ক'রে বাঘ নিশ্চল হয়েছে। বাঘের দেহের উপরে রাইফেল রক্ষা ক'রে চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "তোম্ শালে কোই হ্যায়?" মৌদিয়া নিঃশব্দে আক্কার সাহেবের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল—তিনি দেখ্‌তে পাননি। যারা গাছের উপরে শ্বাসরোধ ক'রে বসেছিল তারাও এগিয়ে এল।

জলের কাছে গিয়ে আক্কার সাহেব চোখে মুখে জল দিলেন। পকেট থেকে সিগারেট তুলতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখ্‌লেন একটা হাতের আঙ্গুল ভেঙ্গে গিয়ে নেতিয়ে পড়েছে। পায়ে বস্ত্রে রক্তের ধারা!

ডাকবাংলায় সাহেবের কাছে খবর গেল। "মার দিয়া, বাঘ মার দিয়া, নবী আক্কার সাহেবনে মার দিয়া। জান্‌সে খতম্।" বাংলো থেকে সাহেব রাইফেল ও ঘন ঘন বাঘের হুঙ্কার শুনেছেন—এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। নিজের হিন্দী বিদ্যায় বুঝে নিলেন, নবী আক্কার মরে গেছে। কন্যাকে ডেকে বল্‌লেন, "বেচারী নবী আক্কার মর্ গিয়া।" বাইরে এসে সংবাদ-দাতাকে বল্‌লেন, "কেয়া করে, যাও, বয়েল গাড়ীমে উঠা কর্ লাও—বেচারা আচ্ছা আদমী থা।"

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ ও সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ ক্যানাডিয়ান
সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন

রাজকীয় বিমান সৈন্যদলের নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে এইরূপ
'লাইফ-বোট' দেওয়া হইয়াছে

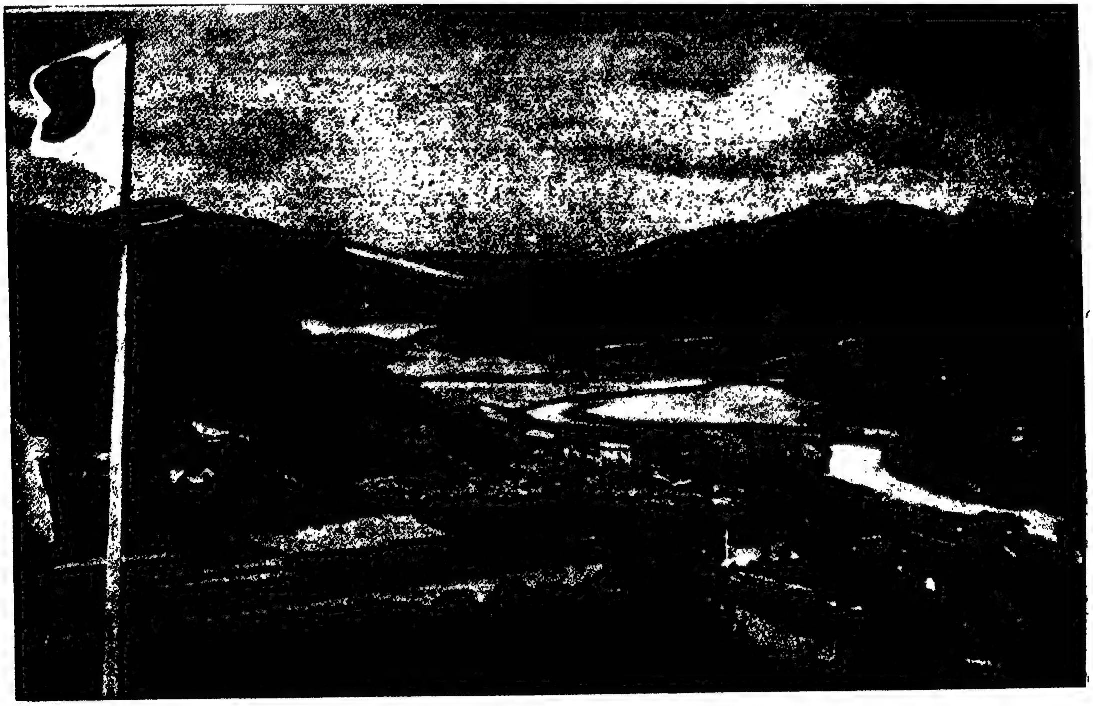

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের রণসজ্জা—হংকং-সাংহাই লাইনের পাহারায় জাপানী সৈন্য

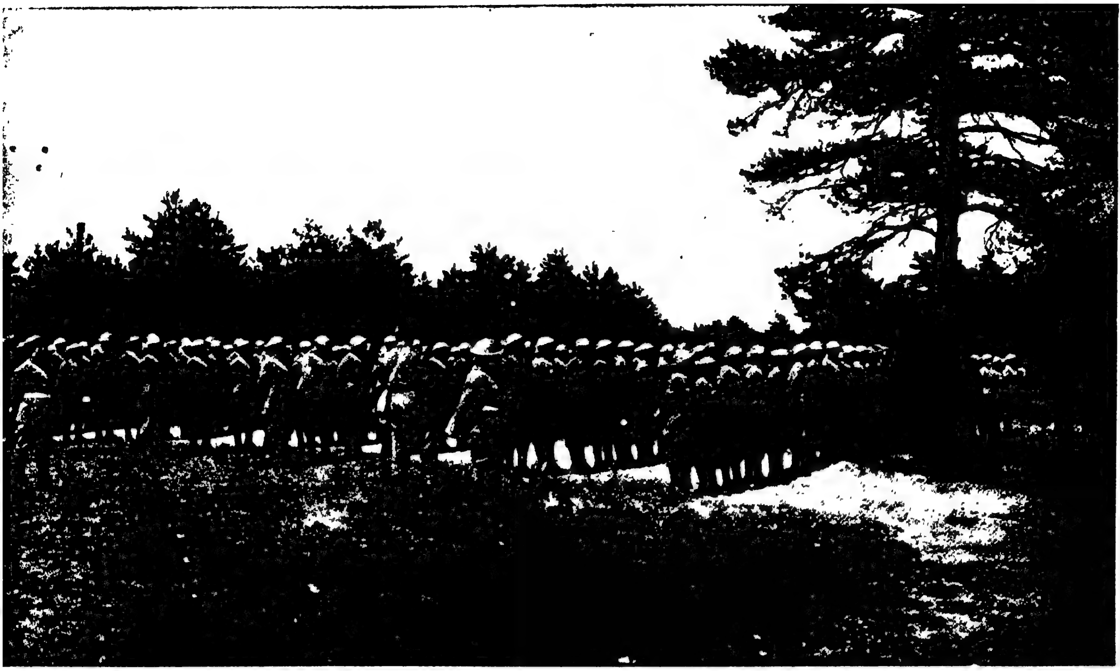

ইংলণ্ডে ভারতীয় সৈন্যদল—ভারত সচিব মিঃ এমারী ও ডিউক-অব-ডিভনসায়ার কর্ত্তৃক সৈন্যদল পরিদর্শন

মিশরে ভারতীয় পুলিস দল—সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারত হইতেও মিশরে পুলিস আমদানী করা হইয়াছে

সাহেবের মুসলমান ড্রাইভার জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে বুঝে নিলে নবী আক্তার মরে নি, বাঘ মরেছে, সাহেবকে তাই বুঝিয়ে দিলে। সাহেব রেগে খুন। এ লোকটা তাকে উল্টো বুঝিয়েছে, হিন্দী তিনি খুব ভালই বোঝেন, হিন্দী ভাষায় তাঁর পাশের সার্টিফিকেট আছে। এদেশী ড্রাইভার, প্রতিবাদ করার সাহস তার নেই—মুখ ফিরিয়ে হাসি চেপে নিলে।

এবারে মোটর চ'ড়ে সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। হাতে বোঝাই '৪৭৬ রাইফেল, পকেটে প্রচুর গুলী। নবী আক্তারের কাছে বাঘের অনুসরণ বৃত্তান্ত শুনে সাহেব আবার রেগে খুন। এমন অবস্থায় নবী আক্তারের এগিয়ে যাওয়া—উচিত হয় নি। বিপদ হ'তে পারত। বাঘ দেখে সাহেবকে খবর দেওয়া উচিত ছিল! আক্তার সাহেব জবাব দিয়েছিলেন—খবর দিতে গেলে বাঘ পালিয়ে যেত—আর সাহেব বল্‌তেন—কাপুরুষ, বাঘ দেখ্‌তে পেয়েও তাকে ছেড়ে দিয়ে তোমরা পালিয়ে এলে! তোমরা হিন্দুস্থানী লোক এমনি কাপুরুষ বটে!

আক্তার সাহেবের আঙ্গুলটা ধ'রে ক'সে টান্‌তেই সেটা খট্ ক'রে নিজের জায়গায় ব'সে গিয়েছিল। পায়ের ক্ষত বাঘের দংশনে হয় নি—ওটা কাঁটা গাছে লেগে জখম হয়েছিল, টিঞ্চার আইওডিনের ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হ'ল।

যে গ্রাম্য লোকগুলি পায়ে চ'লে জঙ্গল থেকে ফিরে আসছিল তারা তখনও ফিরে আসেনি। সাহেব দুই বাঘ নিয়ে সগর্ব্বে মোটর ছুটিয়ে দিলেন শহরের দিকে। বড় বাঘ-শিকারী ব'লে সেদিন থেকে সাহেবের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

অরণ্য-উপকণ্ঠের সেই ছোট বস্তী থালী আজ উত্তেজনায় চঞ্চল। মুদী-দোকানের সাম্‌নে জুটেছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। সকলের মুখেই বাঘের প্রসঙ্গ। এক কাঠুরে জানালে, বনে কাঠ কাট্‌তে গিয়ে গতকল্য—সে বাঘের গর্জ্জন শুনেছে। কেউ জানালে মাচা তৈরী কর্‌তে সে গাছের ডাল আর সখুয়ার রজ্জু সংগ্রহ করেছিল। দূরে মোটরের হর্ন শোনা গেল। ধুলো উড়িয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটে আস্‌ছে মোটর। থালী আর জনতাকে ডাইনে রেখে গাড়ী বেরিয়ে গেল আকবরপুরের দিকে। দুটী বাঘ শক্ত ক'রে বাঁধা হয়েছে। ওজন কমিয়ে দেওয়ার জন্য পেটের নাড়ী ভুড়ি বার ক'রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আরও আধ ঘণ্টা পরে উত্তপ্ত গ্রীষ্ম দিনের প্রায়াপরাহ্নে ছোট ঘোড়ায় চ'ড়ে উপস্থিত হলেন নবী আক্তার। ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট। মুদী দোকানের মালিক বিঁড়ির বদলে তাকে একটা নকল গোল্ড ফ্লেক সিগারেট খেতে দিলে।

প্রতীক্ষায়

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ব'সে আছি পথ চেয়ে ওগো বন্ধু তব প্রতীক্ষায়,
জানি না চিনি না তোমা, কেবা জানে রয়েছ কোথায়—
কোন দূর পল্লীপথে শিশু হ'য়ে বাল্যক্রীড়া-রত
অথবা কিশোর তুমি পালিতেছ বিদ্যার্থীর ব্রত
কোন পৌর বিদ্যাপীঠে; কিংবা বন্ধু তোমার নয়ন
এ শ্যামা ধরার আলো এখনো করেনি দরশন,
যাত্রা করিয়াছ তুমি ধরাপানে—আছ দূরপথে।
যেদিন আসিয়া তুমি পঁহুছিবে, এ মর জগতে
আমি আর রহিব না। আমারে ভুলিয়া যাবে সবে,
শুধু এ ধরার অঙ্গে জীবনের ভস্মরাশি র'বে।

জানি তুমি আসিবেই—এ আশাই সান্ত্বনা আমার
সে আশাতে উপভোগ করি নিত্য সেই প্রতীক্ষার
কল্প-স্বপ্ন প্রতিক্ষণ। এ জীবনে পুরস্কার তাই,
ভ্রান্তি হোক, মায়া হোক, উপভোগে মিথ্যা কিছু নাই।

একদা আসিবে তুমি হে সন্ধানী অন্তরঙ্গ জন,
জীবনের ভস্মস্তূপ যত্নভরে করিবে খনন,
বহ্নি-বীজ তার মাঝে খুঁজিয়া করিবে আবিষ্কার
তাহাতে জ্বালিবে তুমি সন্তর্পণে বর্ত্তিকা তোমার
তুলিয়া ধরিবে বিশ্বে। উপেক্ষার বিষাক্ত নিশ্বাসে
হিংসার ফুৎকারে কিংবা দম্ভোদ্ধত ঝঞ্ঝার বাতাসে
পাবে না নির্বাণ তাহা। জীবনের যত অনুভূতি
যত স্বপ্ন, যত ব্যথা, হৃদয়ের গভীর আকূতি
ফুটাতে পারিনি ছন্দে সে আলোকে হবে ভাসমান
সবি, বন্ধু। আধা এই অভাগার, আধা তব দান,
দুয়ে মিলে নব সৃষ্টি একদিন জাগিবে ভাষায়।
ভস্মস্তূপ আগুলিয়া ব'সে আছি সে মুগ্ধ আশায়।

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

এরিয়ান্স ক্লাব ঃ

এরিয়ান্স বহুদিনের পুরাতন ক্লাব। মোহনবাগানের মত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন না করলেও ক্রীড়া ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্লাবসমূহের মধ্যে তার যে একটা বিশেষ স্থান আছে তা অস্বীকার্য্য নয়। উত্তর কলিকাতা অঞ্চলে ১৮৮৭ সালে স্বর্গীয় দুখিরাম মজুমদারের নেতৃত্বে এরিয়ান্স ক্লাব স্থাপিত হয়। দুখিরামবাবু কেবল একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ই ছিলেন না, একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। এমনই একজন শিক্ষকের শিক্ষাধীনে থেকে বহু খেলোয়াড় অল্প দিনের মধ্যে এরিয়ান্স ক্লাবে নিজেদের ক্রীড়া-চাতুর্য্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৯৩ সালে এরিয়ান্স ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে। তাদের ক্লাবের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯১৩ সাল। ঐ বৎসর এরিয়ান্স ক্লাব উক্ত কাপ বিজয়ের যোগ্যতা অর্জ্জন করেছিল। ১৯১৪ সাল থেকে এরিয়ান্স লীগের দ্বিতীয় বিভাগে খেলা আরম্ভ করে এবং ১৯.৬ সালে প্রথম বিভাগের লীগে প্রমোসন পায়। প্রথম আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ১৯.৪ সালে। কুচবিহার কাপের ফাইনালে ১৯০৮ ও ১৯১০ সালে এবং ১৯৩২-৩৪ সালে উপর্য্যপরি তিনবার উক্ত কাপ বিজয়ী হয়। বোম্বাই রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগ দেয় ১৯২৮ সালে। ঐ বৎসর প্রতিযোগিতার চতুর্থ রাউণ্ডে সেরউড ফরেষ্টার্সের নিকট পরাজিত হয়। ১৯৩৭ সালে ডুরাণ্ড কাপের চতুর্থ রাউণ্ডে এরিয়ান্স ক্লাব গ্রিন হাউয়ার্ডস দলের সঙ্গে খেলে প্রথম দিকে ১-০ গোলে জয়ী থেকেও খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স ক্লাব

কিছু পূর্ব্বে বিপক্ষ দল তিনবার একটি পেনাল্টি কিকের সুযোগ নিয়ে গোল পরিশোধ করায় প্রথম দিনের মত খেলা 'ড্র' করে। রেফারীর পেনাল্টি কিক্ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ছিল—দর্শকরা এবং একাধিক পত্রিকা ঐ সময়ে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে পরদিনের রিপ্লেতে এরিয়ান্স আর যোগ দেয়নি। ক্লাবের সুদীর্ঘ জীবনে যে সব শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় দর্শকদের নিকট ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রকাশ ঘোষ, সামাদ, রাজেন সেন, আর দফাদার, কে ভট্টাচার্য্য, মজিদ, এন্সটিস, কিড-ডি' সিলভা, বি ডি চ্যাটার্জি, হরেন সাহা, পল্টু গাঙ্গুলী, এস মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

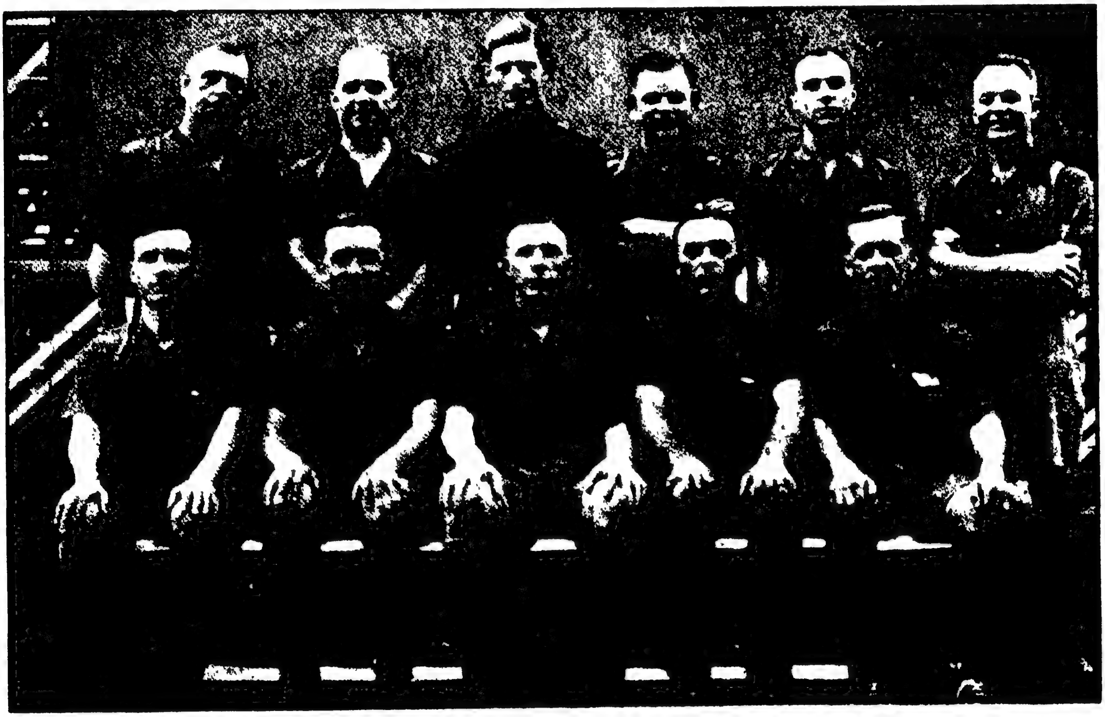

বেঙ্গল আর্টিলারী

পুরাতন প্রসঙ্গ ঃ

১৯১১ সালে যখন মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জাতিভ্রষ্ট ক'রলে তখন ইংলণ্ডের 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' দুঃখ ক'রে লিখেছিল 'খেলাধূলায়, বিশেষতঃ তাদের নিজেদের খেলাধূলায় ইংরাজদের প্রভুত্ব কি বারবার ক্ষুণ্ণ হবে? রাগবী ফুটবলে নিউজিল্যাণ্ড আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিলে; লন টেনিসেও নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া বিজয় গৌরব অর্জ্জন ক'রেছে; ক্রিকেটে সাউথ আফ্রিকার বোলাররা আমাদের আশ্চর্য্য ক'রে দিচ্ছে; হেনলিতে বেলজিয়মের জয়লাভ বাইচ প্রতিযোগীরা ভুলেনি।

'অবশ্য এইসব প্রতিভাশালী খেলোয়াড়রা প্রায় সকলেই আমাদের স্ববর্ণ এবং আমাদেরই রক্ত তাদের দেহে র'য়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যে ক্রিকেট টীম এখানে এসেছিল তারা এমন কিছু খেলা দেখাতে পারেনি যাতে এ মত বদলাতে হবে যে, শ্বেতাঙ্গরা চিরদিনই তাদের নিজেদের খেলায় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবে।

'কিন্তু এখন সবচেয়ে আশ্চর্য্য সংবাদ এসেছে। একটি বাঙ্গালী টীম পর পর বৃটিশ রেজিমেণ্টের তিনটি সেরা টীমকে পরাজিত ক'রে আশী হাজার সমর্থকের আনন্দধ্বনির মধ্যে এসোশিয়েসন শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে'।

১৯১১ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান যে মন্তব্য ক'রেছিল তার পর ক্রীড়াজগতের অনেক কিছু বদলে গেছে। ক্রিকেটে

ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে। আই এফ এ লীগে আজ সাত বৎসর ধ'রে ভারতীয়রাই প্রভুত্ব ক'রছে এবং পুনরায় দুটি ভারতীয় টীম এসোশিয়েসন শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। রোভার্সেও শ্বেতাঙ্গদের প্রতিপত্তি ক'মে যাচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

কুচবিহার কাপ ফাইনাল ঃ

কুচবিহার কাপের ৪৭তম ফাইনাল খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ১-৩ গোলে প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় নবাগত স্পোটিং ইউনিযান দলের নিকট পরাজিত হয়েছে। ১৮৯৩ সালে কুচবিহার কাপের খেলা প্রথম আরম্ভ হয়। এই সুদীর্ঘ ৪৭ বৎসরে মোহনবাগান ক্লাব সর্ব্বসমেত ১২বার কাপ বিজয়ী হবার সম্মান লাভ করে। এত অধিকবার আর কোন ক্লাবই উক্ত কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করতে সক্ষম হয়নি।

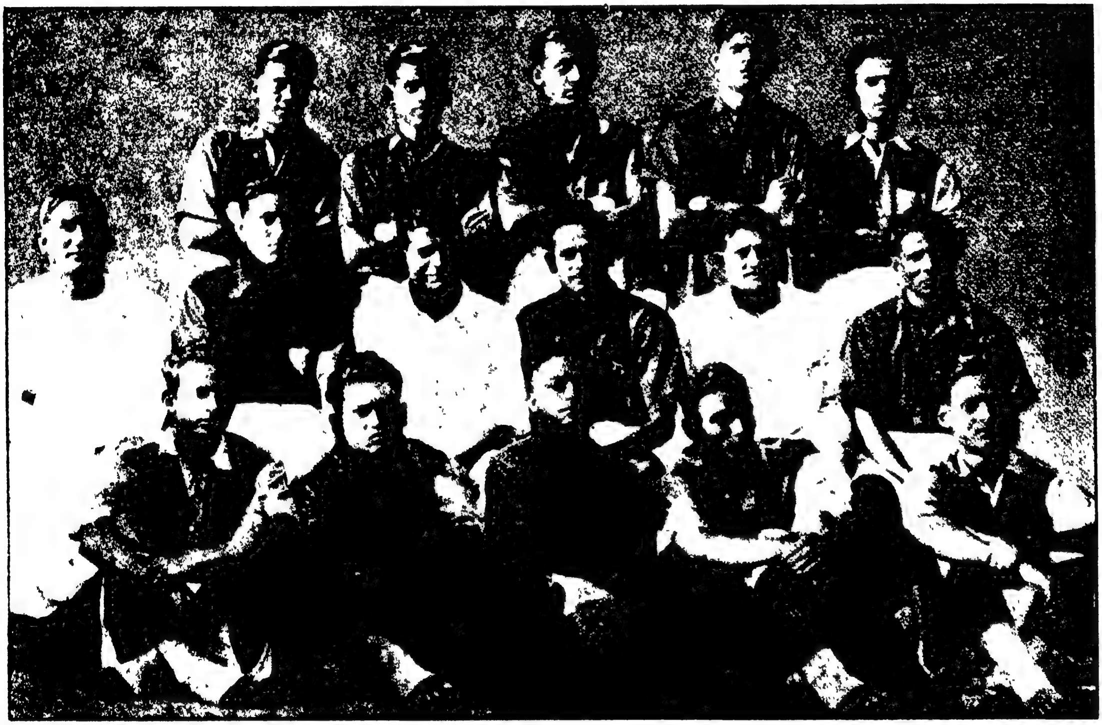

আই এফ এ শীল্ড ও লীগের রাণার্স আপ্—মোহনবাগান ক্লাব

প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে এগারজন প্রথম বিভাগের খেলোয়াড়ই উক্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারেন। কিন্তু ফাইনাল খেলায় মোহনবাগানের মাত্র চারজন প্রথম বিভাগের খেলোয়াড় যোগ দেন। বাকি দ্বিতীয় বিভাগের খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় মোহনবাগান সেদিনে পরাজিত হলেও একেবারে নিঃকৃষ্ট শ্রেণীর খেলার পরিচয় দেয় নি। বিজয়ী দলের জয়লাভ সর্ব্বাংশে সঙ্গত হয়েছে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ক্ষিপ্রতা এবং যথাযথ সময়ে বলের আদান প্রদানের বোঝাপড়া অনেক সময় বিজিত দলের রক্ষণ-ভাগকে বিপর্য্যস্ত করেছিল। স্পোটিং ইউনিয়ানের দ্বিতীয় গোলটি অনেকের মতে অফ্ সাইড থেকে হয়। এই সর্ব্বপ্রথম স্পোটিং ইউনিযান কুচবিহার কাপ বিজয়ী হ'ল। পূর্ব্বে পাচবার ফাইনালে খেলেও বিজয়লাভ করতে সমর্থ হয়নি।

গ্রাহাম শীল্ড ঃ

অফিস লীগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টীম বেঙ্গল কেমিক্যাল ৩-০ গোলে কিলবার্ণকে পরাজিত ক'রে গ্রাহাম শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। বিজয়ী দলের টি বসু ২টি ও আর রায় ১টি গোল করেন।

রাজা শীল্ড ফাইনাল ঃ

ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব ৩-০ গোলে রোনাল্ডসে হাটকে পরাজিত ক'রে রাজা শীল্ড পেয়েছে। বিজয়ী দলের এস চৌধুরী, এ গাঙ্গুলী ও এস গাঙ্গুলী প্রত্যেকে একটি ক'রে গোল দেন।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব

ট্রেডস কাপ ঃ

ট্রেডস কাপ খেলা আরম্ভ হয় ১৮৮৯ সালে। মেডিক্যাল কলেজ এ গি সবচেয়ে বেশী বার কাপ লাভ করে। তারা পেয়েছিল ৭বার, এর পরই মোহনবাগান পায় ৫বার; তবে একমাত্র মোহনবাগান ক্লাবই পর পর তিনবার কাপ বিজয়ী হবার সৌভাগ্য লাভ ক'রেছে।

চতুর্থ বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান রবার্ট হাডসন দ্বিতীয় বিভাগের মেসারার্সকে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে ট্রেডস কাপ বিজয়ী হ'য়েছে। তাদের এই কৃতিত্ব সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। নায়ার গোলটি করেন।

রীগসের পরাজয়ঃ

টিনেসীভেলি লন টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল খেলায় উইম্বলডন ও আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান ববি রীগস, হেণ্ডারসনের কাছে ১-৬, ৭-৫, ৬-৪, ৬-২ গেমে পরাজিত হ'য়েছেন।

ফাইনালে হেণ্ডারসন উইলিয়ম, টালবার্টকে ৬-৩, ৬-৩, ৬-১ গেমে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ পান। টালবার্ট বৃটিশ ডেভিস কাপ খেলোয়াড় হেযারকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছিলেন।

কুইন্সল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান কুইষ্ট কুইন্সল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানসীপে ক্রফোর্ডকে ৬-৪, ৮-৬, ৭-৫ গেমে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ ক'রেছেন। গতবারের বিজয়ী ব্রোমউইচ মোটর দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রতে পারেন নি।

ডবল্‌সে ক্রফোর্ড ও হানকক্ ৬-১, ৬-২, ৬-১ গেমে কুইষ্ট ও উইলিয়মসকে পরাজিত করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল ঃ

আগামী নভেম্বর মাসে কলিকাতায় আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলা হবে বলে জানা গেছে। অসময় হলেও প্রতিযোগিতাটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে বলে সকলেই আশা করেন।

বেঙ্গল টেবল টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েশনের টুর্ণামেণ্ট কমিটি ১৯৩৯-৪০ সালের টেবল টেনিস খেলোয়াড়দের নামের নিম্নলিখিত ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রকাশ ক'রেছেন।

১ম	অরুণ ঘোষ
২য়	আর ই মরিটন
৩য়	কমল ব্যানার্জি
৪র্থ	প্রফুল্ল মিত্র ও অমর সরকার
৬ষ্ঠ	আর হোসেন ও এস ব্যানার্জি
৮ম	কে গাঙ্গুলী

পেশাদার খেলোয়াড় ঃ

গত বৎসর অল-ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন থেকে, ভারতবর্ষের ফুটবল খেলোয়াড়রা তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী খেলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ ক'রতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটিগুলির মতামত নিয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করা হয়। তাঁরা শেষ পর্য্যন্ত কি সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন তা এখনও সঠিক জানা যায়নি। ক্রিকেট বোর্ড থেকেও অনুরূপ প্রচেষ্টা হ'য়েছিলো এবং তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রেচেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ফুটবলেও পেশাদার খেলোয়াড় প্রবর্ত্তনের সময় এসেছে। এখন যদি ফেডারেশন এ বিষয়ে সচেষ্ট না হয় তাহ'লে ফুটবল ক্লাবগুলি আধা-পেশাদার খেলোয়াড়ে ভর্ত্তি হ'য়ে যাবে আর পরোক্ষভাবে এই ব্যবস্থাকেই সাহায্য করা হবে। খেলাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করাতে অগৌরবের কিছু নেই। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এর প্রবর্ত্তন যখন হ'য়েছে তখন এখানেই বা হবে না কেন? এসোসিয়েশন থেকে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন না হওয়ার জন্য অনেক খেলোয়াড় যাঁরা পেশাদার হ'তে ইচ্ছুক তাঁ'দিকে জোর ক'রে সখের খেলোয়াড় ব'লে পরিচয় দিতে হয়। যদি তাঁরা যথাযথভাবে সখের খেলোয়াড়দের নিয়ম পালন ক'রতে না পারেন আবার প্রকাশ্যে নিজেদের পেশাদার ব'লে পরিচয় দিতে না পারেন তাহ'লে হয়ত খেলা থেকে একেবারে বিদায় নিতে হবে।

অলিম্পিক নিয়ম অনুযায়ী তাঁদেরই সখের খেলোয়াড় ব'লে অভিহিত করা হয় যাঁরা অর্থের বা অনুরূপ কোন দ্রব্যের বিনিময়ে নিজেদের ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখান না বা ক্রীড়া শিক্ষা দেন না অথবা খেলার পুরস্কার বা সরঞ্জাম অধিকারচ্যুত করেন না; যাঁরা নিজেদের ক্রীড়া-চাতুর্য্য দেখিয়ে ক্লাবের গৌরব বৃদ্ধি করেন কিন্তু সেই সুযোগ নিয়ে কোনরূপ বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করেন না। এক কথায় 'An Amateur is a man who plays the game for the game's sake without profit to himself.' এখন আমাদের দেশে, যেখানে সকলেই সখের খেলোয়াড় বলে পরিচিত সেখানে কতজন খেলোয়াড় এই নিয়ম ঠিকভাবে পালন করেন। কোন দেশেরই সমস্ত খেলোয়াড় নিজেকে এই নিয়মে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। প্রথম প্রথম যখন খেলায় সুনাম করতে থাকেন তখন প্রত্যেক খেলোয়াড়ই সুনামটুকু অর্জ্জন ক'রে এবং তা রক্ষা ক'রে খেলেই সন্তুষ্ট থাকেন। তখন প্রত্যেকেই ঠিক খেলার জন্য খেলেন। কিন্তু যখন সুনাম বেশ ছড়িয়ে পড়ে এবং

কাষ্টমস ক্লাব

তা আর নূতন কিছুর সন্ধান দিতে পারে না তখন এক শ্রেণীর খেলোয়াড়দের মন অর্থলিপ্সার দিকে ঝোঁক দেয় ; আর তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যে দেশে এসোসিয়েশন পেশাদার খেলোয়াড়দের খেলোয়াড় বলেই মেনে নিয়েচে সেখানে সত্যিকারের সখের খেলোয়াড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অবশ্য গোপন ব্যবস্থা যে এখানে একেবারেই নেই সেকথাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

১৯৩২ সালের আগে ফ্রান্সের ফুটবল ফেডারেশন খেলোয়াড়দের ফুটবল খেলাকে পেশা করবার অধিকার দেয় নি। এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় ফেডারেশনের একজন নাম-করা সভ্য ব'লেছিলেন 'Most of the clubs are afraid the players will expect more money than they now get.' সুতরাং এই আধা পেশাদারী বৃত্তি নিবারণ করবার অন্য কোন পন্থা নেই। অবশ্য এ সত্ত্বেও যদি কোন খেলোয়াড় এই বৃত্তি ছাড়তে না পারেন আর কোন ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রশ্রয় দেন তাহ'লে তাঁরা নিজেদের সততা বিসর্জ্জন দিয়েই তা ক'রবেন। আর অনুরূপ ক্ষেত্রে খেলোয়াড় ও ক্লাব কর্তৃপক্ষকেই এই অপরাধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা হবে।

এখানে ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই আর দর্শকরা উপযুক্ত দর্শনী দিয়েই খেলা দেখতে থাকেন। তাছাড়া এখানে এমন ক্লাবেরও অভাব নেই যারা সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় ক'রে খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে পারে। অবশ্য ইউরোপের মত অত বেশী না হ'লেও সাধারণ ভারতীয়দের অবস্থার দিক দিয়ে দেখে ক্লাব কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের সুনামের উপযুক্ত ও সম্মানজনক মুদ্রা ব্যয় ক'রতে পারেন।

ইণ্টার ন্যাশানাল ফুটবল ফেডারেশন থেকে ঠিক হয় যে, সখের খেলোয়াড়দের যদি তাঁদের কর্ম্মস্থল ত্যাগ ক'রে অন্যত্র কোন বিশেষ খেলার জন্য যেতে হয় আর তাতে যদি তাঁদের কর্ম্ম থেকে ছুটি নেবার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে তাহ'লে তাঁরা যে কদিন এই রকম ছুটি নেবেন সেই সময়ের বেতনটা কর্তৃপক্ষ তাঁদের দিয়ে দেবেন। এই ব্যবস্থার যখন প্রবর্ত্তন হ'ল সেই সময় গ্রেটবৃটেন ইণ্টারন্যাশানাল ফুটবল এসোসিয়েশন থেকে এই ব'লে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে যে, এই রকম নিয়ম প্রবর্ত্তিত হ'লে সত্যিকারের সখের খেলোয়াড় ব'লে কিছু থাকবে না। বৃটিশ ফুটবল এসোসিয়েশনের একজন বিখ্যাত সভ্য এই নিয়মের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, 'If we did enter a team it would mean that our players would go straight from their desks and workshops to compete against men trained to play as professionals in

সন্তরণে গঙ্গা অতিক্রম প্রতিযোগিতায় (ডান দিক থেকে) প্রথম—এস নাগ ; দ্বিতীয়—এস চক্রবর্ত্তী ও তৃতীয়—এম দাস (তিন জনেই হাটখোলা ক্লাবের সভ্য)

'unfair and utterly impossible position.' ইংলণ্ডের এই ব্যবস্থায় একটু অসুবিধা হবার কথা বটে। কারণ তাঁদের দেশে খেলোয়াড়রা যেভাবে নিজেদের যোগ্যতার অতিরিক্ত চাকরী পেয়ে ডেস্ক দখল ক'রে বসেন এবং খেলার জন্য কামাই হ'লে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হয় না তেমনটি আর কোথাও হয় ব'লে শোনা যায় নি। যে-সব ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ বড় বড় কারখানা বা আফিসের মালিক অথবা ভাল চাকরী দেবার ক্ষমতা রাখেন তাঁরা নিজ ক্লাবের নাম-করা সখের খেলোয়াড়দের পালন করেন। এখন যদি অন্য দেশের খেলোয়াড়রা নিয়ম অনুযায়ী অন্যভাবে আর্থিক ক্ষতি থেকে রেহাই পেয়ে পূর্ণ উদ্যমে খেলায় যোগ দিতে পারেন তাহ'লে এঁদের উষ্মার কারণ হবে বৈ কি!

আন্তর্জ্জাতিক খেলায় যোগদানের জন্য যখন খেলোয়াড় মনোনয়ন হয় তখন জাতির সুনাম রক্ষার জন্য সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়দেরই মনোনয়ন করা উচিত। কিন্তু যাঁদের চাকরীর ওপর কোন একটি সংসার নির্ভর করছে তাঁদের পক্ষে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রে খেলতে যাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয় না; এইরূপ ক্ষেত্রে এই নিয়মের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

'বনফুল' প্রণীত কবিতার বই "অঙ্গারপর্ণী"—১॥০
যামিনীমোহন কর প্রণীত নাটক "মিটমাট"—৸০
সজনীকান্ত দাস প্রণীত সচিত্র হাসির গল্প "কলিকাল"—২৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত "পথের রাত্রি"—॥০
দেবসাহিত্য কুটীর হইতে প্রকাশিত "রঙ্গিন আকাশ"—১৲
চয়নিকা পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত "দলবেঁধে"—২৲
সুধীরকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত "যৌবন জল তরঙ্গ"—১।০
শশধর দত্ত প্রণীত "কারাগারে মোহন"—১৸০
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ (ভাস্কর) প্রণীত গল্প পুস্তক "লেখা"—২৲
সামসুন নাহার প্রণীত "শিশুর শিক্ষা"—১৲
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত "পৃথিবীর ইতিহাস"—১।০
৺শুভেন্দুশেখর বসু প্রণীত "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী"—৸০
আশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস "ক্রন্দসী"—১॥০
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সিঁথির সিঁদূর"—১৲
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "তিন চোর"—॥০ ও "ব্যোমদাসের মাদুলী"—৷৶০
প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত "চাষা"—১॥০
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আদর্শ-হিন্দু হোটেল"—২॥০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালিন্দী"—৩৲
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মানুষ ও পৃথিবী"—২৲
প্রমথনাথ বিশী প্রণীত—"পরিহাস বিজল্পিতম্"—১৲
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস"—৪৲
শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দেবী প্রণীত "সন্ধানে"—২৸০
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সাহিত্য পরিক্রমা"—১৲

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—আগামী ২১· আশ্বিন হইতে ৺দুর্গা পূজা আরম্ভ। ভারতবর্ষের কার্ত্তিক সংখ্যা ১০ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনের নূতন বা পরিবর্ত্তিত কাপি কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য ২৮ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর মধ্যে পাঠাইতে হইবে। তাহার পরে আর কোন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

কার্ত্তিক—১৩৪৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

জাপানের সমাজ বিবর্ত্তনের ইতিহাস

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি

জাপান এশিয়ার মধ্যে একটি পুরাতন দেশ। ইহার সম্রাট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন রাজবংশসম্ভূত; ইহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক বংশেই পুরুষানুক্রমে রাজদণ্ড করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে।[1] জাপান চীন-সভ্যতা ও ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়।

জাপানের প্রাচীন অধিবাসী হইতেছে অতি নিরীহ "আইনু" জাতি।[2] ইহারা বলে "কোরোপক গুরু" (পৃথিবীর বাসিন্দা) বা "কোসিটো" (বামন) জাতিকে নির্ম্মূল করিয়া ইহারা জাপানে বসতি স্থাপন করে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই জাতির প্রত্নতাত্ত্বিক চিহ্ন শামুক, স্তূপ (Shell and bone heaps) ও রন্ধনের আবর্জ্জনার (Kitchen middens) মধ্যে পাওয়া যায়। 'আইনু'দের সম্পর্কে একটি জটিল নরতাত্ত্বিক সমস্যা আছে। ইহারা জাপানীদের ন্যায় জাতি নহে। অনেকে তাহাদের সহিত রুষ 'মুজিক'দের (কৃষকদের) সাদৃশ্য দেখিয়া থাকেন। তাহারা মধ্যমাকৃতির মস্তক (mesocephal) ও লম্বা, সিধা চুল (Cymotrichous) বিশিষ্ট। কাহার কাহার মতে 'আইনু'রা চক্ষু বা কর্ণ ও চুল বিষয়ে ইউরোপীয়দের ন্যায়[3]। আবার কেহ কেহ তাহাদের একটা শ্বেত জাতির পূর্ব্ব এশিয়ায় বসবাসের শেষ চিহ্নস্বরূপ দেখিয়া দেখেন। এই জাতি এখন উত্তর জাপানে বাস করে; কিন্তু জাপানীদের সঙ্গে তাহারা ক্রমশঃ মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে।

জাপানীদের মস্তকের ইন্‌ডেক্স সাধারণতঃ ৮০·৮;

---

[1] Hisho Saito—(ক) A History of Japan. (খ) Japanese Year Book—1933.

[2] Frederick Starr—The Ainus of Japan, Chamberlain—Japan and her people.

নাসিকার ইন্‌ডেক্সী ৭২·৯; শরীরের দৈর্ঘ্য ১৬·২ মিটার। নরতত্ত্ববিদেরা জাপানীদের দুইটি শ্রেণী (Type) নির্দ্ধারণ করেন। একটি হইতেছে যোশিকোয়া, সাটসুমা type অর্থাৎ Coarse type. ইহারা বেঁটে, মোটা, চওড়া মুখ, ছোট ন্যুব্জ (concave) নাসিকা, টেরা ও epicanthus বিশিষ্ট চক্ষু ও মলিন গাত্রবর্ণ লক্ষণ বিশিষ্ট। দ্বিতীয়টী হইতেছে "Fine type", অর্থাৎ, Daimyo type. ইহা অপেক্ষাকৃত লম্বা, পাতলা, লম্বা মুখাকৃতি, বাঁকা সরু নাক এবং ফরসা গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট। এই প্রকার চেহারাকে ওকায়ামা typeও বলে এবং ইহা কোরিয়া হইতে আগত[৪]।

জাপানের অধ্যাপক যোনেকিচি মিয়াকের মতে এই দেশের সঠিক ইতিহাস সুইকোটেন্নোর (৩৩ সংখ্যক সম্রাট: খৃঃ পূঃ ৬২৮-৫৯২) সময় হইতে আরম্ভ হয়[৫]। কিন্তু এই প্রাচীন যুগে জনশ্রুতি ও ইতিহাসের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান করা যায় না; তবে এই যুগের নিম্নলিখিত ঘটনাগুলিকে সঠিক ঐতিহাসিক বলিয়া ধরা যায়:—জাপানী রাষ্ট্রের প্রারম্ভ হইতে সম্রাট বংশের একত্ব; অসভ্য আদিম অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধ; কোরিয়ানদের সহিত যুদ্ধ এবং কিছুদিনের জন্য তাহাদের দেশ অধিকার এবং ইহার ফলে জাপানে চীনের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচার ও প্রসার।

জাপানী জনশ্রুতি অনুসারে জাপানী দ্বীপ-পুঞ্জ ইজানাগি-নো-মিকোটো নামক দেবতা ও তাহার স্ত্রী ইজানামি-নো-মিকোটো নামক দেবী কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। তাহাদের কন্যা আমা-টেরাসু নামক সূর্য্যদেবী দয়ালু, ধার্ম্মিক ও সুচতুর ছিলেন। তিনি মানুষকে জমি চাষ করিতে ও রেশম সংগ্রহ করিয়া তাঁতে বুনিতে শিক্ষা দেন। ইনি তাঁহার পৌত্র নিনিগো-নো-মিকাটোকে স্বর্গ হইতে প্রেরণ করেন এবং প্রেরণকালে বলেন—"জাপানে যাও···সেখানে ময়দানগুলি সবুজ বর্ণের ও খুব উর্ব্বরা। বিস্তৃত জাপান চিরকালের জন্য আমাদের বংশধরদের দ্বারা শাসিত হইবে এবং আমাদের সন্তান সন্ততিগণ স্বর্গের ন্যায় মর্ত্তেও চিরস্থায়ী হইবে।" তিনি পৌত্রকে একটি আরসি, একটি বহুমূল্য প্রস্তর এবং একটি তরবারী প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই চিহ্নগুলি সম্রাট-শক্তির প্রতীক হইবে এবং এই আরসি তোমায় আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে[৬]।"

এই পৌত্র এই স্মারক-চিহ্নসমূহ ও অনেক দেবতাগণসহ স্বর্গ হইতে আসিয়া কিউসিউ দ্বীপের হিউগা প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন। ইঁহার প্র-পৌত্র জিম্মু টেন্নু জাপানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই সম্রাটের সিংহাসনারোহণ সময় ১১ই ফেব্রুয়ারী খৃঃ পূঃ ৬৬০ সাল হইতে জাপানের নিহঙ্গি ইতিহাস আরম্ভ হয়[৭]। পরবর্ত্তী ৫৬০ বৎসরের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৯৭—৩০ সালে ১০ম সম্রাট সুজিনের[৮] সময় কোরিয়াতে জাপান তাহার বিজয় অভিযান আরম্ভ করে। কোরিয়ার সহিত সংঘর্ষের ফলে জাপান চীন-সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং কোরিয়া হইতে জাপান চীনা অক্ষর ও সাহিত্য গ্রহণ করে। কোরিয়া বিজয়ের জন্য দীর্ঘকাল রক্তপাত করিলেও শেষে বিজিত কোরিয়ার সভ্যতা দ্বারা জাপান বিজিত হয়। এই সময়েই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। জাপানে পূর্ব্বে কামিপু (পিতৃপুরুষের) পূজারূপ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এবং জাপানে উহা গৃহীত হয়[৯]। কিন্তু পূর্ব্ব ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই; উহা সিন্টো ধর্ম্মরূপে (Shintoism) এখনও আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার সহিত আপোষ করিয়াছে।

সম্রাট কেইটার সময় সিবা টাট্টো নামক একজন জাপানী একটি বুদ্ধমূর্ত্তি নিয়া জাপানে আসিয়া বসবাস করেন; কিন্তু তিনি কোন জাপানীকে স্বীয় ধর্ম্মাবলম্বী করিতে পারেন নাই। কিন্তু ৫৫২ খৃঃ সম্রাট কিমেই টেন্নোর রাজত্ব কালে ও-ওমো ও ও-মুরাজি নামক তাহার দুইজন অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর মধ্যে শত্রুতার ফলে প্রথমোক্ত ও-ওমো কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম সমর্থিত হয়। এই দুই গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে দুই ধর্ম্মের প্রভেদ ও পার্থক্য মিলিত হওয়ার ফলে ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। সৈন্যদলও ধর্ম্মের বিভিন্নতা নিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অবশেষে সম্রাট জোমাই টেন্নোর সময়ে (৫৮৫-৫৮৭ খৃঃ) এক ভীষণ যুদ্ধে বৌদ্ধ সোগা বংশ (ও-ওমোদের একটি শাখা) প্রতিপক্ষদের বিধ্বংশ করে;

[৩-৪] Haddon—The Races of Man. pp. 94-95.

[৫] Hisho Saito—A History of Japan: p. 3.

[৬-৮] „ „ —„ „ „ „—Translated by E. Lec, 1912. pp. 8, 10, 26-29.

[৯] Hisho Saito—A History of Japan.

তজ্জন্য রাষ্ট্রে তাহাদের কোন পদ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। ইহার ফলে রাজকর্ম্মচারীশ্রেণী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয় ১০।

এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে প্রবেশলাভ করে এবং বর্ত্তমান জাপানের সৃষ্টি ইহা দ্বারাই সম্ভব হয়। জাপানী খৃষ্টান ডাক্তার নিটোবেও স্বীকার করিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মই বর্ত্তমান জাপানকে সংগঠন করিয়াছে ১১ ("Buddhism has made Japan what it is.") কিন্তু এই সময় পর্য্যন্তও জাপানের গভর্ণমেণ্ট প্যাট্রিয়ার্কাল পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইত। এই যুগে বংশমর্য্যাদা জাতীয় জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিত। যে বংশের বেশী জ্ঞাতিও আত্মীয়কুটুম্ব থাকিত, তাহারাই রাষ্ট্রে অধিকসংখ্যক ও বিশেষ অধিকার এবং ক্ষমতা ভোগ করিত। শক্তিশালী বংশসমূহ পুরুষানুক্রমে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর পদগুলি দখল করিয়া থাকিত। সম্রাট যেমন তাহার জন্য ও বংশের জন্য ক্ষমতা হাতে রাখিত, তেমন বড় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাদের জন্য ও বংশের কল্যাণে পদগুলি দখল করিয়া থাকিত। এই পদগুলি সম্রাটের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতনা—এগুলি তাহাদের বংশের সম্পত্তি হিসাবে তাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিত। এই বংশগুলি আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোবেট্‌সু—ইহারা সম্রাটের মূল বংশ হইতে উদ্ভূত; সমবেটসু—ইহারা সম্রাটের সামন্ত ছিল; হামবেটসু—ইহারা চীন ও কোরীয় ঔপনিবেশিকদের বংশধর। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সম্রাটের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও অতি সামান্য ছিল। পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সোগা-বংশ (ইহা প্রথম শ্রেণীর অভিজাত বংশ ছিল।) এত ক্ষমতাশালী হয় যে সম্রাটকে অবজ্ঞা করিয়া সেই পদের মর্য্যাদা নিজেরা হরণ করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করে। এই সময়ে নাকাটোমি-নো-কামাটারি নামক জনৈক বাধ্য অভিজাত দরবারে ছিল। ইনি সোগা বংশের পতন ঘটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হন। এই সঙ্গে তিনি চীনা-শাসন পদ্ধতি জাপানে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। অবশেষে ৬৪৫ খৃঃ সোগা গোষ্ঠীকে ধ্বংশ করিয়া চীনা পদ্ধতির অনুকরণে জাপানী গভর্ণমেণ্টের সংস্কার সাধন করা হয়। এতদ্বারা অস্থায়ীভাবে রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক প্রদেশই সম্রাটের সম্পত্তি স্বরূপ এবং অধিবাসীরা তাঁহার (সম্রাটের) প্রজা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই সময় হইতে প্রজারা সম্রাটকে খাজনা দিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারী বেতনভোগী হইল। প্রত্যেক পুরুষ দুই টান ১২ ধান-জমি ও প্রত্যেক স্ত্রীলোক ২/৩ টান জমি পায়। প্রত্যেক মালিকের মৃত্যুর পর জমি গভর্ণমেণ্টের পুনরধিকারে আসিত। এই সংস্কারের বৎসরগুলিকে 'টাইকা' অর্থাৎ সংস্কারের বৎসর বলা হইত।

এই সংস্কারের পূর্ব্বে সাধারণ লোক (people) বড় বড় কৌম (গোষ্ঠী) ও বংশের অধীনে ভূমিদাসের (serf) ন্যায় অতি দৈন্যাবস্থায় থাকিত। জমি এই গোষ্ঠীদের সম্পত্তি ছিল; তজ্জন্য কেবল তাহাদের হাতেই ধন-দৌলত জমা হইত। এই সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জমি বাজেয়াপ্ত হইত এবং লোকে সাক্ষাৎভাবে সম্রাটের প্রজা হইত। এতদ্বারা কৌম-প্রথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। প্রজার জমিপ্রাপ্তির সঙ্গে বিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের লোককে সম্রাটের জন্য বৎসরে দশদিন খাটিয়া দিবার ব্যবস্থা ধার্য্য হয়। এই কাজের বিনিময়ে জিনিষ দিয়া দাম পূরণ করিলেও তাহা হইতে রেহাই পাওয়া যাইত। টাং নামক চীনা রাজ-বংশের অনুকরণে কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সাধারণ লোক হইতে উপযুক্ত লোক দ্বারা রাজকর্ম্মচারী শ্রেণী গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এতদ্বারা পুরাতন 'কৌম'গত পুরুষানুক্রমিক কর্ম্মচারীর দলকে বিদায় দেওয়া হয়।

এই শাসন সংস্কারের ফলে কৌমসমূহের হাত হইতে শাসনযন্ত্র কাড়িয়া নিয়া সম্রাটের হাতে দেওয়া হয় এবং অভিজাতশ্রেণীর পরিবর্ত্তে গুণানুসারে লোক নিয়োগ করিয়া আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইহার পর "নয়াযুগ" (New Age) আসে। এই সময় সর্ব্বশ্রেণীর লোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। জাপানের বৌদ্ধকৃষ্টির পক্ষে ইহা একটি সুবর্ণ যুগ। কিন্তু এই সময়ে 'টাইকা' যুগের সংস্কার প্রবর্ত্তক কামাটারি ফুজিয়ারার বংশধরগণ সমস্ত রাজনীতিক ও সামাজিকপদসমূহ দখল করিয়া বসে। খৃষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ হইতে দশম শতকের মধ্যে

১০। " " " " " "

১১। Dr. Nitobe—"Bushido, the Soul of Japan,"

১২। 'এক টান'—প্রায় দেড় বিঘা জমি।

ফুজিয়ারা বংশের যথেচ্ছাচারিতা চরমে উঠে। তাহারা সম্রাটবংশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেশের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে। সম্রাটের ক্ষমতা কাড়িয়া নিয়া তাহা নিজেদের বংশ ও আত্মীয়স্বজনের সুবিধার জন্য লাগাইবার মতলব আঁটে। ইহারা সাহিত্য ও চারুকলার প্রতি বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করে। চীনের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহারা জাপানের দিকে মুখ ফিরায়। এতদ্বারা জাপানী কৃষ্টির বিশেষত্ব সংশাধিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম খুব ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, কিন্তু জাপানী ভাবাপন্ন হয়।

এই যুগের অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সময়েই সামুরাই (Samurai) বা যোদ্ধশ্রেণীর উদ্ভব হয়। সম্রাটের একটি নির্দ্দিষ্টস্থানে বাস থাকায় এবং দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দরবারে ভোগ-বিলাসিতা বাড়িয়া যায়। যে সকল অভিজাতশ্রেণী এবং তাহাদের বংশধরগণ রাজধানী কিয়োটো সহরে বাস করিত, তাহারা পরস্পরের মধ্যে বিলাসিতা নিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। এই সময়ে ফুজিয়ারা বংশের আধিপত্য এবং অত্যাচার এতটা চরমে উঠে যে অনেক বংশ রাজধানী ত্যাগ করিয়া গ্রামে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে ফুজিয়ারাগণ শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্রের উন্নতির প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করিত না। তাহারা নিজেদের সুবিধার জন্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারী ও অভিজাতশ্রেণীসমূহকে অনেক বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রদান করে। পূর্ব্বসংস্কারের আইনসমূহ রদ করিয়া সরকারী পদগুলি আবার পুরুষানুক্রমিকভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই উপায়ে প্রাদেশিক অভিজাতশ্রেণীগুলি পুনরায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তাহারা বড় জমিদারী পায়, জোর করিয়া প্রজাকে খাটাইতে থাকে এবং সৈন্যদল গঠন করিয়া সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে।

এই সামরিক ও সামন্ত-তান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণী প্রদেশসমূহে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাদিগকে পরে 'বুকে' (Buke) বলিয়া অভিহিত করা হইত। আর দরবারী অভিজাতদের 'কুগে' (Kuge) বলা হইত।

এই প্রকারে সামন্ততন্ত্র এবং অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতার উদ্ভব হয়; কিন্তু উহা অনেক আভ্যন্তরীণ রক্তপাতের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হয় ১৩। এই সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির অভ্যুদয়ের কালে সম্রাটের শাসন শিথিল হইতেছিল; মফস্বলের জমিদারেরা কেন্দ্রীয় শক্তির হুকুম অমান্য করিতে থাকে। এতদ্বারা স্থানীয় শাসন ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়; গ্রাম ও সহরগুলিতে দস্যু-ডাকাতের প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাদের অত্যাচারের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গ্রাম্য জমিদারেরা লোক ভাড়া করিয়া রাখিত।

এই সব ভাড়াটিয়া লোক জমিদারদের নিকট হইতে মাহিয়ানা ও খাওয়া পাইত। এই কৃষক-সিপাহীরাই অবশেষে সামুরাই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শ্রেণীতে পরিণত হয় ১৪। এই সঙ্গে যে সকল অভিজাতবংশের সন্তান সরকারী চাকুরী পাইতে অসমর্থ হয় তাহারাও ইহাদের সঙ্গে আসিয়া জোটে এবং ক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করে। শীঘ্রই এই শ্রেণী যথার্থ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে এবং স্থানীয় শাসনের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে। কিন্তু 'দরবারী' সৈন্যেরা ইহাদের নিকট অকর্ম্মণ্য ছিল, সেইজন্য 'সামুরাই' দল দিয়া সামুরাই দলকে পরাস্ত করিতে হইত। রাজ-গোষ্ঠীর লোকেরা ও অভিজাতেরা নিজেদের রাজনীতিক বিবাদের জন্য সামুরাইদের ভাড়া করিত। এই সব কারণে সামুরাইরা তাহাদের পেশার উৎকর্ষতায় ও যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠে। ১৫ এই সব কারণে সামুরাই শ্রেণী গভর্ণমেণ্ট দপ্তরে পদ পায়। অবশেষে ১১৮৫ খৃঃ যোরিটামো মিনামোটো সামুরাই শ্রেণীর শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে। ইহা এক প্রকারের সামন্ত-তান্ত্রিক শাসন ছিল। এই সামন্ততান্ত্রিক যুগে মিনামোটো, আসিকাগা এবং টুর্কোগায়ো-বংশগুলি পর্য্যায়ক্রমে সামুরাই গভর্ণমেণ্টের কর্ণধার হইয়া পড়ে। নিজেদের যোদ্ধাদের সমস্ত বিশিষ্ট পদে বসায় এবং রাজনীতিক ও সামরিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখে।

১৩। Saito—A History of Japan. pp. 62

১৪। The Japan Year Book—1933 ; 70-72.

১৫। এইভাবেই সামন্ততান্ত্রিক যুগের ফ্রান্সের ব্যারণদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তথাকার নির্ব্বীর্য্য কৃষকেরা যুদ্ধ-কুশলী হইয়াছিল। মালাবারের নায়ারেরাও এক সময় এইরূপ কারণে রণ-দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে, আর বাংলার পাইকেরাও এই যুগে উপরোক্ত উপায়ে যুদ্ধ হইয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক বার-ভূঁইয়াদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কাপুরুষতার অপবাদ আসে।

এই সময়ে সম্রাটের দরবারে বড় বড় কর্ম্মচারী ছিল, কিন্তু আসল ক্ষমতা সগুণদের হাতে থাকিত।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠে কি প্রকারে এই সগুণদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসে! ইহার উত্তর এই—ফুজিয়োরারা যখন রাজশক্তি করায়ত্ত করে তখন সম্রাটের দরবারী শাসন কেবল বাহ্য নিয়ম পদ্ধতিতে (Formalism) পরিণত হয়। দরবারী কর্ম্মচারী ও অভিজাত বংশীয়েরা সামরিক বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ চলিতে থাকে, ধনী ও নির্ধনীর বিবাদ ও প্রভেদ আরও বাড়িয়া যায়। দস্যুরা সাধারণ লোকদের সন্ত্রাসিত করিয়া তোলে; আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ (internal strife) প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে। এই সব কারণে লোকের সুখ-শান্তি একেবারেই ছিল না। এই অবস্থায় যোদ্ধৃ শ্রেণীর অভ্যুদয় হয়। লোকে 'মিনামোটে'র সামরিক শাসনকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে এবং "সগুণ শাসন" তাহাতে নিজের গুণে প্রতিবিম্বিত হয়।

সগুণের দীর্ঘ শাসনকালে সামন্তদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশেষে তিনজন বড় রাজনীতিজ্ঞের অভ্যুদয়ে শান্তভাব ধারণ করে। ইহাদের নাম নবু নাগাওদা, হিদোয়াসি তোয়োটমি, ইয়েয়াসু তোকুগাওয়া। ইহারা পর্য্যায়ক্রমে উত্থিত হইয়া একটি সংযুক্ত জাপানী রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। ইহাদের দ্বিতীয়জনকে জাপানের নেপোলিয়ান বলা হয়। ইনি গরীব কৃষকের পুত্র ছিলেন; কিন্তু অভিজাতকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া সগুণের পদ পাইতে পারেন নাই।১৬ একশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া জাপানে যে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল হিদোয়োসি উহার বিলোপ সাধন করেন। তত্রাচ তাহার শাসনাধীনে সামুরাই গভর্ণমেণ্টের প্রভাব ছিল, কারণ হিদোয়োসি পাঁচজন বুগিও (সামন্ত) নিযুক্ত করেন। ইঁহারা নিজেদের স্থানে বাস করিত এবং তাহারা কেবল হিদেয়োসি দ্বারাই শাসিত হইত।১৭

১৫৯৮ খৃঃ হিদোয়োসির মৃত্যুর পর তাহার একজন সেনাপতি ইয়েয়াসু তকুগাওয়ার হস্তে রাষ্ট্রশক্তি ন্যস্ত হয়। ইহার শাসনকাল অতি গৌরবময় ছিল। এইকালকে সগুণ-শাসনের চরমকাল বলা যাইতে পারে। ইনি অনেক সামরিক ও নাগরিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, বৌদ্ধধর্ম্মকে জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লন; বহু বিদ্যায়তন স্থাপন করেন এবং ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন করেন।১৮ কিন্তু পূর্ব্বেকার সগুণ শাসকদের ন্যায় এই সময়ের যেডো সগুণ শাসন যথেচ্ছাচারী ছিল না; ইহা একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করিয়া শাসন কার্য্য পরিচালন করিত। সামন্তদের আর ক্রমাগত তাহাদের জমিদারীতে বাস করিতে দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে মধ্যে যেডো রাজধানীতে আসিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত।

এই সগুণ শাসনের সহিত সম্রাটের দলের (এই দল কিওটোতে থাকিত)—সদ্ভাব ও ভাল সম্পর্ক ছিল না। মাঝে মাঝে সম্রাট ভক্তের দল উত্থিত হইয়া সাক্ষাৎভাবে সম্রাটের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিত; আর সগুণের দল এই সংবাদ অবগত হইয়া সর্ব্বদা সজাগ ও হুঁসিয়ার থাকিত। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্রাট শক্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সামুরাই শাসনের লৌহ শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে সক্ষম হয় নাই।১৯

তকুগাওয়া সগুণের শাসনকালে সামন্ততন্ত্রীয় যুগ ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই যুগ বুকে শ্রেণী, ডাইমিও নামক সামরিক গোষ্ঠী সকল ও তাহাদের প্রজা সামুরাইদেরই কর্ম্মের ইতিহাস। তকুগাওয়া প্রবর্ত্তিত রাজনীতিক পদ্ধতি দ্বারা এই শ্রেণীর আধিপত্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এই সময়ে সম্রাট ও তাঁহার অধীনস্থ কুগে নামক অভিজাত শ্রেণী নামেমাত্র উচ্চপদস্থ ছিল। আসলে তাঁহাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না, তাহাদের কড়া নির্জ্জনবাস করিতে হইত। জনসাধারণ এই সময়ে রাষ্ট্রে অতি নিম্ন স্থান অধিকার করিত। দেশের সমস্ত জমি, সমস্ত সহর সগুণ ও ডাইমিওদের অধিকারে ছিল। কৃষকদের তাহাদের নিকট হইতে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া জমি নিতে হইত এবং

১৬। Saito—History of Japan : P. 133

১৭। (ক) „ „ „ „ „ 135 : (খ) Japan Year Book—p. 75.

১৮। Japan Year Book—p. 75.

১৯। Japan year Book—p. 76.

উৎপাদিত দ্রব্য হইতে অত্যধিক গুরু কর দিতে হইত। নাগরিকদের, কারু-শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের আরও নিকৃষ্ট স্থান ছিল। এই কৃষক ও নাগরিকগণ ভূমিদাস (serf) ছিলনা বটে, কিন্তু তাহাদের অতি সামান্য অধিকার-মাত্র ছিল এবং তাহাও অত্যন্ত কম অর্থাৎ তাহাদের কোন স্বাধীনতা ছিলনা বলিলেই চলে। ইহা বুকেদের শাসনের যুগ। এই সামন্ততান্ত্রিক যুগে অভিজাতীয়েরা সাধারণ লোকদের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া কার্য্যাদি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া তদ্বারা জাতিভেদের গণ্ডীর মধ্যে বাস করিত। পতিত ও অস্পৃশ্যের[২০] ন্যায় একটা শ্রেণী এই সময় উদ্ভূত হয়। বিগত কয়েক শতাব্দীর যুদ্ধ বিগ্রহ ও শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশের ফলে শাসক 'নাইট' শ্রেণীর মধ্যে নিজস্ব একটা নীতি (Code of morals) এবং বিশ্বজগতের সম্বন্ধে একটা ধারণা (World view) উদ্ভূত হয়। সামন্ততান্ত্রিক যোদ্ধৃবৃন্দের এই নিজস্ব নীতিকে "বুসিডো" (Bushido) বলা হইয়া থাকে। ইহার অর্থ বুসিদের (নাইট) পন্থা। "বুসিডো" নীতি সামুরাইদের নিকট হইতে আন্তরিকতা ও সততা চাহিত। বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম, কূটপ্রণালী, মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যাচরণ ও দ্বৈতনীতি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত। একজন সামুরাইয়ের বাক্যে এত আস্থা স্থাপন করা হইত যে লিখিত অঙ্গীকার তাহার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

বাল্যকাল হইতে বুসিদের কষ্টসহিষ্ণু এবং সাহসী হইয়া গড়িয়া উঠিবার অনুকূল শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহাদের মুখে আনন্দ, দুঃখ বা কোন প্রকার ভাবের লক্ষণ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। ইহা আত্ম-সংযমের পরিপন্থী বলিয়া পরিগণিত ও নিন্দনীয় বিবেচিত হইত। চক্ষের জল ফেলা লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। এই আত্ম-সংযম বা দমনের পরাকাষ্ঠাই ছিল "হারাকিরি" (hara-ki-ri) নামক আত্মহত্যা প্রথা। নিজের পেট চিরিয়া মরা—এই প্রণালীই এই হারাকিরির আত্মহত্যায় অনুসৃত হইত।

এই কঠিন ব্রতসমূহই কেবল সামুরাইকে শিক্ষা দেওয়া হইত না। তাহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসমূহের বিকাশলাভের অনুকূল শিক্ষাও দেওয়া হইত। পিতামাতাকে ভক্তি করা এবং ভালবাসা একজন নাইটের একটি সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য ছিল। বুসি সর্ব্বদা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করিবে এবং ন্যায়পরায়ণ হইবে। তাহার দুর্ব্বল, অত্যাচারিত ও বিজিত ব্যক্তিদের জন্য অনুকম্পা থাকিবে। সর্ব্বোপরি, সাধারণ লোক হইতে সে ভদ্রতা ও মার্জ্জিত আচরণ দ্বারা চিহ্নিত হইবে; শিষ্ট আদব-কায়দা তাহার বৈশিষ্ট্য হইবে।

সামুরাইয়ের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য ছিল তাহার মনিবের প্রতি (Noblesse Oblige) ও বিশ্বস্ততা ভক্তি। মনিবের জন্য যে কোন সময়ে তাহাকে মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত; এমন কি মনিবের জন্য তাহার পুত্রকন্যাদের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিতে হইত। কিন্তু ইহা দ্বারা ইহা বুঝাইতনা যে সামুরাই ও তাহার মনিব ডাইমিওর সম্বন্ধ—যথেচ্ছাচারী মনিব ও গোলামের সম্পর্ক ছিল। মনিব নিজের প্রতি যেমন যত্ন নিত, তাহার সামুরাইয়ের প্রতিও সেরূপ যত্ন নিত। সে একটি বংশের পিতার ন্যায় ছিল। সামুরাইয়ের বশ্যতা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ছিল, তাহার বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা বুসিডোনীতির বিরুদ্ধ ছিল। সর্ব্বশেষে, সামুরাইয়ের সম্মান তাহার একটি বিশিষ্ট ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে জাপান ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের বীর-ধর্ম্ম-যুগের (Age of Chivalry) ন্যায় ছিলনা। জাপানী Chivalryতে স্ত্রীলোকের স্থান নিম্নে ছিল[২১]। ইউরোপীয় Chivalryতে স্ত্রীলোকের নারী জাতীয় ধর্ম্মসমূহ চর্চ্চা করা, নারীকে সম্মান করা—ইহাই বৈশিষ্ট্য ছিল; কিন্তু জাপানের Chivalryতে স্ত্রীলোককেও যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ করা হইত[২২]। তাহাকে 'নাগানাটা' তরবারী চালনা শিক্ষা করিতে হইত এবং কাইকেন নামক ছোরা সর্ব্বদা শরীরে বহন করিতে হইত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উক্তরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে এই প্রকারের শিক্ষাপ্রাপ্ত মাতা তাহার সন্তানদের সাহসী করিয়া গড়িয়া তুলিবে[২৩]। এই নীতি বুকে শ্রেণী ব্যতীত সমস্ত জাতির মধ্যে শীঘ্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 'বুসিডো' নীতি সমস্ত শিক্ষিত জাপানীদের সম্মানের নীতিরূপে গৃহীত হয়। ডাঃ নিটোবে বলিয়াছেন—"বুসিডো হইতেছে জাপানের আত্মা।"

জাপানের বুসিডো নীতি দ্বারা আমরা তথাকার সামন্ততান্ত্রিক যুগে অনুসৃত নীতির পরিচয় পাই। ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক যুগের "Noblesse Oblige", ভারতের 'স্বামীধর্ম্ম' এবং জাপানের 'বুসিডো' একই প্রকার সামাজিক অবস্থায় উদ্ভূত হয়। যেসব কারণে পূর্ব্বোক্ত দুই দেশে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রপদ্ধতি বিবর্ত্তিত হইয়াছিল, জাপানেও সেই অবস্থায় ডাইমিও ও সামুরাইদের উত্থান হয় এবং একই ধারা মনোবৃত্তির অনুসরণ করিয়া বুসিডোর উদ্ভব হয়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

[২০] বিনয়কুমার সরকার—'বর্ত্তমান জগৎ' : পঞ্চম ভাগ—পৃঃ ৩৯৬ : "জাপানে আজও মুচি, চামার ডোম ইত্যাদি জাতি অস্পৃশ্য। ইহাদিগকে 'এডা' বলে।"

[২১] Saito—History of Japan : pp. 154.

[২২] Saito „ „ „ „ 150-155.

[২৩] Nitobe—"Bushido—The Soul of Japan."

জঙ্গম

বনফুল

৫

সকাল হইতে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সমস্ত দিনে বৃষ্টি ছাড়িবে বলিয়া আশা হয় না। শুধু বৃষ্টি নয় এলোমেলো হাওয়াও বেশ জোরে বহিতেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ ছুটির দিন নয়, ভন্‌টু বেচারাকে আপিস যাইতেই হইবে। তা ছাড়া নানা স্থানে ঘুরিতেও হইবে। একটা গুজব শুনিতেছে, মেজকাকা নাকি পুনরায় আসিয়াছেন এবং গোয়াবাগানে সেই বন্ধুটির বাসায় অবস্থান করিতেছেন। সেখানে একবার যাওয়া দরকার। আস্‌মি, দার্জির পিতা নিবারণবাবু নাকি অসুস্থ, সেখানে একবার না গেলে অন্যায় হইবে। তৃতীয়ত তাহারই আপিসের একজন সহকর্ম্মী তাহাকে অনেক করিয়া ধরিয়াছেন—বক্‌সি মহাশয়কে দিয়া তাঁহার কোষ্ঠিখানা গণনা করাইয়া দিতে হইবে, তিনি গরীব মানুষ, দুই টাকার বেশী দিতে পারিবেন না। ভন্‌টু প্রতিশ্রুতি দিয়াছে চেষ্টা করিবে, সুতরাং বক্‌সি মহাশয়ের নিকটও যাইতে হইবে। চতুর্থত চাম্‌ গ্যান্‌টঅ শঙ্করের বহুদিন কোন খবর নাই, সে ছোকরার কি হইল তাহা জানিবার জন্যও মনটা ছটফট করিতেছে। পঞ্চমত, দাদার কাল একটি পত্র আসিয়াছে, লিখিয়াছেন—তাঁহার আবার একটু একটু করিয়া জ্বর সুরু হইয়াছে। বউদিদির নিকট হইতে সংবাদটি সে সযত্নে গোপন রাখিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে ধীরেন ডাক্তারের সহিত একটা পরামর্শ করা দরকার। ধীরেন ডাক্তার তো পাড়াতেই থাকে, এখনই পর্ব্বটা সারিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। পাশের ঘরে ছেলেরা তার-স্বরে পড়া করিতেছে। ভন্‌টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ছেলেদের পড়ার চাড় ভয়ানক বেশী, একটু অন্যমনস্ক হইলে এবং কাকা তাহা দেখিতে পাইলে রক্তারক্তি হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ভন্‌টু যতক্ষণ বাড়িতে থাকে একমিনিটের জন্য তাহারা পড়া বন্ধ করে না। ভন্‌টুর মনে হইল, ধীরেনবাবু ডিস্‌পেনসারিতে আছেন কি-না একবার খোঁজ লওয়া দরকার, এই বাদলার বাজারে যদি তাঁহার পুরাতন ওয়াটার-প্রুফ্‌টাও আজিকার মত বাগাইতে পারে মন্দ হয় না।

শন্‌টু!

শন্‌টু শুনিতে পাইল, কিন্তু এক ডাকে সাড়া দিলে পড়ায় মনোযোগ দেখানো হয় না। সে আরও জোরে জোরে পড়িতে লাগিল —The boy stood on the burning deck, whence all but—

শন্‌টু!

আজ্ঞে।

ভালমানুষটির মত শন্‌টু আসিয়া দাঁড়াইল। বেশী মনোযোগ দেখাইলে অনুরূপ বিপদ ঘটিয়া যাইবে হয়তো!

ক'টা বেজেছে দেখ্‌তো।

শন্‌টু ঘড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিল, পৌনে আটটা।

চট্‌ ক'রে দেখে আয় তো একবার ধীরেন ডাক্তার ডিসপেনসারিতে আছে কি-না।

শন্‌টু চলিয়া গেল।

ভন্‌টুও উঠিয়া বউদিদির ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ রান্না ঘরের দিকে গেল। গিয়া দেখিল বউদিদি সশব্দে ডালে ফোড়ন-সংযোগ করিয়া নাক মুখ কুঁচকাইয়া হাঁড়ির ভিতর হাতা সঞ্চালন করিতেছেন। ভন্‌টুও অনুরূপভাবে নাক মুখ কুঁচকাইয়া বউদিদির পিছনে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। বউদিদি মুখ ফিরাইতেই বলিল, "বাকুর কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না আজ! লেটেস্ট বুলেটিন্‌ কি?"

"বাবার আজ সকাল থেকে হাঁফটা বেড়েছে, ঠাণ্ডার জন্যে বোধ হয়!"

"উপায়?"

"খাওয়া দাওয়া চুকলে সরষের তেল আর কর্পূর গরম ক'রে বুকে পিঠে মালিস ক'রে দেব। ওষুধ তো উনি খাবেন না কিছুতে—"

"চা খাননি এখনও আজ?"

"এইবার ক'রে দেব। বলছেন—আখ্‌নির চা করে দিতে!"

বউদিদি একটু হাসিলেন।

ভন্টুও হাসিয়া বলিল, "লর্ড বাকু কি সোজা চীজ্! আমাকেও এক ঢোক দিও!"

বাকুর সর্দ্দি হইলে তিনি সাদা জলে চা খান না। এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি পোলাওয়ের মসলা জলে সিদ্ধ করিয়া এবং তাহার পর তাহাতে চায়ের পাতা দিয়া চা প্রস্তুত করিতে হয়। ডালের হাঁড়িটা নামাইয়া বউদিদি বলিলেন, "দাঁড়াও, একটা কথা জিগ্যেস করে আসি।"

ভন্টুকে কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বউদিদি চলিয়া গেলেন। ভন্টু মশলার থালা হইতে কিছু মশলা লইয়া চিবাইতে লাগিল। বউদিদি ফিরিয়া আসিলেন ও বলিলেন, "আদার রস মিশিয়ে দিলে একটু উপকার হ'ত—তাও কিছুতে রাজি নন!"

"ইউস্‌লেস্ য়্যাফেয়ারের একটি গুরুমশাই তুমি! এতদিনেও তুমি বাকুকে চিনলে না! হিজ্ এক্‌সেলেন্সি লর্ড বাক্‌লাণ্ড চাও চান্ না, আদাও চান না, উনি চান—লিকুইড্ পোলাও! বাকুর কুর কুর কুর—"

বলিতে বলিতে ভন্টু শরীরের উপরার্দ্ধ নাচাইতে লাগিল।

"আদার রস দিলে সর্দ্দিটার একটু উপকার হত। ভয়ানক ঝামরে রয়েছেন।"

"আদার ফাদার এলেও ও ঝামরাণো কমবে না!"

একটু থামিয়া ভন্টু পুনরায় বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল মোজা-জোড়া দেখে চটেন নি তো, একটু 'চিপিস্' য়্যাফেয়ারে ঢুকেছিলাম, তা-ও বারোগণ্ডা পয়সা সাফ্ হয়ে গেল!"

বউদিদি একটি ফরসা ন্যাকড়ায় আখনির জলের মশলাগুলি বাঁধিতেছিলেন। এই কথায় মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "উল্টে পালটে দেখলেন, অনেকক্ষণ ধ'রে বলেন নি কিছু।"

"তার মানেই চটেছেন। পছন্দ হলে বলতেন।"

শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল যে ধীরেন ডাক্তার ডিস্‌পেনসারিতেই আছেন। বলিয়াই সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরেই চীৎকার করিয়া সুরু করিল—The boy stood on the burning deck—

ভন্টু উঠিয়া পড়িল এবং বলিল, "তুমি চা-টা ততক্ষণ কর, চট্ ক'রে আমি ধীরেন ডাক্তারের কাছ থেকে ঘুরে আসি।"

"ধীরেন ডাক্তারের কাছে কেন?"

আসল সত্যটা গোপন করিয়া ভন্টু বলিল, "দেখি যদি ওয়াটার-প্রুফটা বাগিয়ে আনতে পারি। কিন্তু বাই দি বিড্‌বাই, ডিকার, একটু তাড়াতাড়ি ভাত চাই আজ।"

"এই বাদলায় সকাল সকাল বেরিয়ে কি হবে?"

"অনেক জায়গায় খজলাখজলি করতে হবে আজ।"

"খজলাখজলি কি!"—বউদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

এই কথাটা ভন্টু নূতন সৃষ্টি করিয়াছে, বউদিদি ইতিপূর্ব্বে কথাটা শোনেন নাই।

"ফইজৎ।"—বলিয়া ভন্টু বাহির হইয়া গেল।

বউদিদি কেৎলিতে জল দিয়া তাহাতে মশলার পুঁটুলিটি দিলেন এবং সেটি উনানে চড়াইয়া দিলেন। তাহার পর ক্ষণকাল ভাবিয়া চারটি পোস্ত বাহির করিলেন এবং তাহা বাটিতে লাগিলেন। ডাল ভাত হইয়া গিয়াছে, তরকারি যদি না-ও হইয়া ওঠে, কয়েকটা পোস্তর বড়া ভাজিয়া দিলে ঠাকুরপোর খাওয়া হইয়া যাইবে।

জীর্ণ ওয়াটার-প্রুফ্‌টা গায়ে দিয়া ভন্টু একটু সকাল-সকালই বাহির হইল। উদ্দেশ্যটা ছিল, যাইবার মুখে গোয়াবাগানটা একটু ঘুরিয়া মেজকাকার সন্ধানটা লইয়া যাওয়া। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই সে দেখিতে পাইল শঙ্কর ভিজিতে ভিজিতে ওধারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। শঙ্কর তাহাকে দেখিতে পায় নাই। ভন্টু বাইক ঘুরাইল।

"চাম গ্যান্‌ঢ্রস! চাম গ্যান্‌ঢ্রস!"

শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

"এরকম অগাধ জলে ডুব মেরে বসে আছিস, ব্যাপার কি তোর!"

শঙ্কর একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, ভন্টুকে সে এতদিন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া চলিতেছিল। হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত-ভাবে দেখা হইয়া যাওয়ায় কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইল না। একটু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসি অনেক সময় মানুষকে কথা কহিবার দায় হইতে রক্ষা করে।

ভন্টু বলিল, "মিছিমিছি ভিজে লাভ কি, চল ওই

গাড়িবারান্দাটার তলায় দাঁড়ানো যাক্। থাম্ থাম্, সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে দেবে এক্ষুণি।"

একটা মোটর বেগে বাহির হইয়া গেল।

নির্ব্বিঘ্নে গাড়িবারান্দার তলায় পৌছিয়া ভন্টু বলিল, "তোর সব ব্যাপার খুলে বল্‌দিকিন। ডিটেলে ঢুকিসনি, সংক্ষেপে শাঁসটুকু দে।"

অকস্মাৎ শঙ্করের সন্দেহ হইল, ভন্টু বোধ হয় জানিতে পারিয়াছে। বলিল, "ব্যাপার, মানে ?"

"মানে, তোর টিকি আনট্রেসেব্‌ল্! কোথা থাকিস আজকাল তুই ?"

"প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাস থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।"

"রাত্তির ন'টা-দশটা পর্য্যন্ত প্র্যাকটিকাল ক্লাস ? কাকে ধাপ্পা মারচিস্ তুই !"

শঙ্কর বলিল, "এখন তুই যা, পরে সব বলব তোকে। এখন আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি একজায়গায়। যাব একদিন তোদের বাড়ি।"

"আসচে রবিবারে আসিস। মেজকাকা আবার ফিরেছেন।"

"তাই নাকি ?"

"শুনচি তো! উঠেছেন গোয়াবাগানে, সেখানেই যাচ্ছি আমি।"

"গোয়াবাগানে কেন ?"

"ঘোড়েল বাবাজির কাণ্ডকারখানাই আলাদা—"

এ সংবাদে দুইমাস আগে শঙ্করের মনে আর কিছু না হোক কৌতূহল উদ্রিক্ত করিত, এখন তেমন কিছুই করিল না। আচ্ছন্নের মত ভন্টুর মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শঙ্কর বলিল, "আশ্চর্য্য তো !"

ভন্টু বাইকে চড়িয়া বলিল, "এখন চললাম আমি, আসিস।" ভন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর যাইতেছিল, প্রফেসার গুপ্তের নিকট টাকার চেষ্টায়। কিছু টাকা জোগাড় না করিতে পারিলে মুক্তোর নিকট আর মান থাকে না। ভিজিতে ভিজিতে সে প্রফেসার গুপ্তের বাসার উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল।

ভন্টু গোয়াবাগানে গিয়া শুনিল যে উমেশবাবু আসিয়াছেন বটে কিন্তু এখন বাড়ি নাই, কখন ফিরিবেন তাহারও স্থিরতা নাই। প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে ভন্টু ভাবিতে লাগিল—বাবাজি আসিয়াছেন তাহা হইলে! কিন্তু নিজের বাড়িতে না গিয়া বন্ধুর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিবার মানে কি! এ রহস্যের উদ্ভেদ ভন্টু করিতে পারিল না। বাবাজি আসিলে গব্যঘৃত প্রভৃতির জন্য খরচ বেশ একটু বাড়ে, বাবাজি বন্ধুগৃহে অবস্থান করাতে খরচের দিক দিয়া ভন্টুর কিছু সুরাহা অবশ্য হইয়াছে—তথাপি ভন্টুর আত্মসম্মানে কেমন যেন আঘাত লাগিল। বাবাজির এ কি ব্যবহার! রাস্তার একটা ঘড়িতে সে দেখিল সাড়ে নয়টা বাজিয়াছে। ইচ্ছা করিলে নিবারণবাবুর খবরটাও এবেলা সে লইতে পারে। বখেড়া মিটাইয়া রাখাই ভালো; ওবেলা করালীচরণের ওখানে যাইতে হইবে। সে খপ্পর হইতে সহজে বাহির হওয়া মুস্কিল।

সারপেনটাইন লেনে নিবারণবাবুর বাড়িতে গিয়া ভন্টু বিস্মিত হইল। কাল চায়ের দোকানে মাস্টারের মুখে ভন্টু শুনিয়াছিল যে নিবারণবাবু ভয়ানক অসুস্থ, শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। অথচ ভন্টু দেখিল ভদ্রলোক তো দিব্যি বসিয়া আছেন, অসুখের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভন্টুকে দেখিয়া নিবারণবাবুর মুখে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল।

"আসুন আসুন ভন্টুবাবু, তারপর হঠাৎ অকাল-বোধন যে! এমন সময় তো আসেন না কোন দিন, আপিসে রেনিডে হয়ে গেল নাকি!"

বাইকটা ঠেসাইয়া রাখিতে রাখিতে ভন্টু বলিল, "ভুলে যান সে সব কথা। আপনি কেমন আছেন তাই বলুন আগে।"

"যেমন রেখেছেন তেমনি আছি! আমাদের আর থাকাথাকি কি, দিন-গত পাপক্ষয় করে চলেছি।"

"ওসব তো মামুলি লদ্‌কালদ্‌কি। অসুখ করেছে শুনলাম, কেমন আছেন তাই বলুন।"

হাস্য-স্নিগ্ধ চক্ষে ভন্টুর প্রতি চাহিয়া নিবারণবাবু বলিলেন, "মাস্টের বলেছে বুঝি।"

"হ্যাঁ। কাল আর আসবার সময় পাইনি, আজ আপিস যাবার মুখে ভাবলাম একবার খবরটা নিয়ে যাই।"

"বেশ করেছেন এসেছেন, বসুন—খিচুড়ি খাবেন ?"

"আমি ইটিং আপিস খুলে তবে বেরিয়েছি।"

"ইটিং আপিস মানে ?"

"বিরাট ইটিং আপিস খুলেছি আজ—বউদিদি খুলিয়ে তবে ছেড়েছেন !"

"ইটিং আপিস কি মশাই !"

"খেয়ে বেরিয়েছি। তবু আনতে বলুন একটু খিচুড়ি, পুনরায় আপিস খোলা যাক্‌! প্লেটে করে সামান্য একটু আনতে বলুন, চেখে দেখা যাক, আপনার গিন্নির হাতের রান্না খাইনি কখনো, এ সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না।"

"গিন্নির রান্না নয়, তিনি বাতের ব্যথায় কাতর, আজ ঠাণ্ডায় আরো আউরেছে, রেঁধেছে আস্‌মি।"

ভিতর হইতে আসমির উচ্চকণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"আমায় অমন টিক্‌টিক্‌ কোরো না বলে দিচ্ছি, পোড়া কড়া মেজে গা-গতোর টাটিয়ে গেছে আমার, ব্যাসনটা তুমিই ফেনাও না, শেলাই ফেলাই পরে কোরো—"

নিবারণবাবু হাঁকিলেন, "ওরে আসমি, শোন্‌ এদিকে !"

তাহার পর অনুচ্চকণ্ঠে ভন্টুকে বলিলেন, "আজ আবার ঝি-মাগি আসেনি, সব ওকেই করতে হচ্ছে, দার্জিটা তো কুটোটি পর্য্যন্ত নাড়বে না।"

আসমি দ্বারপ্রান্তে উঁকি মারিল।

"খিচুড়ি হয়েছে তোর ?"

আসমি মাথা নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

"আর কি হয়েছে ?"

"মাছ ভাজা—"

"একটু খিচুড়ি আর মাছভাজা নিয়ে আয় ভন্টুবাবুর জন্যে।"

আসমি চলিয়া গেল।

ভন্টু বলিল, "আপনার অসুখের খবরটা সর্ব্বৈব ভুয়ো তা হ'লে !"

"ওই ছুতো ক'রে দিনকতক রেহাই নিয়েছি। কাঁহাতক আর সেতার বাজাই মশায়—"

নিবারণবাবুর হাসি আবার আকর্ণবিশ্রান্ত হইয়া উঠিল, ভন্টু হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

"আহাহা, আবার বাই চাগ্‌ল দেখছি—"

ভন্টু স্মিতমুখে নীরব রহিল।

একটু পরে নিবারণবাবু বলিলেন, "কাল ফের দুব্যাটা জলখাবার খেয়ে সরেছে মশয়। এর একটা বিহিত করুন। মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে ফ্যাঁসাদ হয়ে দাঁড়ালো দেখছি !"

আসমি খিচুড়ি ও মাছভাজা লইয়া প্রবেশ করায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

৬

বৃষ্টি ছাড়ে নাই। আকাশে মেঘের উপর মেঘের স্তর জমিতেছে, বাতাসের বেগ বাড়িয়াছে। নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এমন দিনে লোকে ঘরের বাহির হয় না, কোষ্টিগণনা করাইতে কে আসিবে ! করালীচরণ বক্‌সির হাতে আজ কোন কাজ নাই, এমন দিনে কাজ আসিবার সম্ভাবনাও নাই। একটা সিগারেট ধরাইয়া একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়া তিনি কর্দ্দমাক্ত গলিটার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজেকে নিতান্ত রিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এমন কর্ম্মহীন দিন তাঁহার জীবনে বহুকাল আসে নাই। প্রতিদিন একটা না একটা কাজ হাতে থাকে এবং তাহা লইয়াই সমস্তটা দিন কাটিয়া যায়। বিগত তিন-চার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাঁহার অবসর ছিল না; আজ এই মেঘ-মেদুর দিনের পরিপূর্ণ অবসরটা লইয়া তিনি যে কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, টেবিলের উপর হইতে বোতলটা তুলিয়া দেখিলেন আর কতটা বাকি আছে। দেখিলেন আধ বোতল রহিয়াছে, বোতলে মুখ লাগাইয়াই খানিকটা পান করিলেন এবং হাতের উলটা পিট দিয়া মুখটা মুছিয়া সিগারেটটায় আরও গোটা দুই টান দিলেন।

এইবার ? এইবার কি করা যায় ! মদখাওয়া এবং সিগারেট খাওয়া—দুইটাই তো হইল। অতঃপর ?

সহসা করালীচরণের কাণে আসিল সামনের খোলার বাড়িতে যে কোচোয়ান-দম্পতি বাস করে তাহারা উচ্চকণ্ঠে কলহ সুরু করিয়াছে। উভয় পক্ষই চোখা চোখা ভাষা ব্যবহার করিতেছে। বেশ জমাইয়া তুলিয়াছে তো ! বাই নারায়ণ ! সাগ্রহে কাণ পাতিয়া করালীচরণ তাহাদের অশ্লীল ভাষার গালাগালিগুলি শুনিতে লাগিলেন। অসভ্য বুড়ো কোচোয়ানটাকে তাঁহার হিংসা হইতে লাগিল। আর যা-ই হোক, সময় কাটাইবার জন্য বুড়োকে পরের

উপর নির্ভর করিতে হয় না, ঘরের সঙ্গিনীটিই আসর জমাইয়া রাখিয়াছে। সঙ্গিনী! সঙ্গিনীর কথায় করালীচরণের অজ্ঞাতসারেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল। সকলেরই তো একটা না একটা সঙ্গিনী আছে, তাহার বেলাতেই বিধাতা-পুরুষ এমন কৃপণ হইলেন কেন। বিবাহের বয়স তাঁহার এখনও পার হইয়া যায় নাই বোধ হয়। নিজের বয়সটা ঠিক কত তাহা তাঁহার জানা নাই, কারণ নিজের জন্মসময়ই ঠিক তিনি জানেন না। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার সময় মায়ের নিকট হইতে বয়সের একটা খবর আনিতে হইয়াছিল, সে হিসাবে তাঁহার বয়স এখন পয়তাল্লিশ বৎসর। কি আর এমন বয়স! এমন বয়সে কত লোকই তো বিবাহ করিতেছে। বিবাহের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার মুখে একটু হাসি ফুটিল। কে এমন নিষ্ঠুর মেয়ের বাপ আছেন, যিনি সজ্ঞানে তাঁহার মত কানা কালো কুৎসিত একটা মাতালের হাতে স্বেচ্ছায় কন্যা সম্প্রদান করিবেন। রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া যাহারা দেহ-বিক্রয় করে তাহারাও তাঁহাকে চাহে না! অর্থই যাহাদের পরমার্থ, করালীচরণের অর্থ তাহাদের নিকটও নিরর্থক।

অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে! ভন্‌টুবাবুর পাশ-বুকে কত টাকা জমিল একবার খোঁজ লইতে হইবে। যেমন করিয়া হোক দ্রাবিড়ে গিয়া করকোষ্ঠিগণনার চূড়ান্ত করিয়া নিজের অদৃষ্টলিপিটা পাঠ করিতে হইবে।

…সহসা কোচোয়ান-দম্পতির কলহ থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ ঘনতর হইয়া উঠিল। দমকা বাতাসে ওদিককার জানালাটা খুলিয়া গিয়া সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। জানালাটার ছিটকানি নাই, সকাল হইতে ক্রমাগত ওইরূপ হইতেছে।

করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একটি সিগারেট ধরাইলেন। ভন্‌টু কয়েকদিন হইতে আসে নাই, হাতে গোটা পনেরো টাকা জমিয়া গিয়াছে। মদ এবং সিগারেট যাহা আছে তাহাতে খানিকক্ষণ চলিবে। কিন্তু তাহার পরই মুস্কিল। ফুরাইলে এই বর্ষায় আনিয়াই বা দেয় কে। পাশেই একটা ছোঁড়া বিড়ির দোকান খুলিয়াছে, ইদানীং তাহাকেই দুই-চারি আনা পয়সা দিয়া করালীচরণ ফাই-ফরমাস খাটাইয়া থাকেন। কিন্তু এই বর্ষায় সেও আসে নাই। করালীচরণের অত্যন্ত নিঃসঙ্গ মনে হইতে লাগিল। বাই নারায়ণ! সমস্ত দিনটা আজ কাটিবে কি করিয়া।

সিগারেটে টান দিতে দিতে করালীচরণ আলমারি ও তাকের বইগুলির দিকে চাহিলেন। সমস্তই পড়া, একবার নয়—বহুবার। তবু যদি উহারই মধ্যে এই দিনের মত কোন খোরাক পাওয়া যায়। করালীচরণ আলমারি খুলিয়া বইগুলি নামাইতে লাগিলেন। পাঁজি, পাঁজি, ক্যালকুলাস, Tale of two cities, পাঁজি, Scarlet Lady, Statics, পাঁজি, পাঁজি, পাঁজি, Paradise Lost, Race tips, রুবাইয়াৎ, আরব্য উপন্যাস, Astronomy, পাঁজি—বিরক্তিকর! বইয়ের গাদা ঠেলিয়া দিয়া করালীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নজরে পড়িল বইগুলার পিছন হইতে একজোড়া টিকটিকি বাহির হইয়া দেওয়ালে উঠিয়াছে। ইহারা করালীচরণের আলমারিতে বহুকাল হইতে আছে। অপরিচিত নয়, চেনা। আজ কিন্তু করালীচরণ ইহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলেন। ইহারা দম্পতি! টিকটিকিদের পর্য্যন্ত দম্পতি আছে!

টেবিলের উপর হইতে আয়নাটা তুলিয়া লইয়া করালীচরণ নিজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঠোঁট দুইটা আজকাল আরও হাজিয়া গিয়াছে। সহসা খেয়াল হইল পাথরের চোখটা আর একবার পরিয়া দেখা যাক না, দিনের আলোতে কোন দিন পরিয়া দেখা হয় নাই। চোখটা পরিয়া আয়নার দিকে নির্নিমেষ-নয়নে কিছুক্ষণ তিনি চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল, নিদারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় আয়নাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি চোখটা খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাথরের চোখে কখনও মানুষ ভোলে! ওটা পরিলে চেহারাটা আরও যেন বীভৎস হইয়া ওঠে। করালীচরণ উঠিয়া বোতলে মুখ লাগাইয়া আরও খানিকটা সুরা পান করিলেন এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন।

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়ার বিরাম নাই, সমস্ত গলিটাময় প্যাচপেচে কাদা। বৃষ্টি পড়িতেছে কিন্তু বর্ষার মহিমা নাই। শতছিন্ন মলিন-কাপড় পরা একটা ভিখারিণী বুড়ি যেন দুঃখের ভারে অবনমিত হইয়া পথ চলিতেছে, মাঝে মাঝে দুই-চারি ফোঁটা অশ্রু উদ্গত হইয়া উঠিতেছে, দুই-

একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়িতেছে। শ্রীহীন বেদনার মূর্ত্তি। পাশের বাড়ির ঘড়িটা বাজিয়া ওঠায় করালীচরণের হুঁস হইল বেলা বাড়িতেছে। বারোটা বাজিয়া গেল!

যে হোটেলটায় তিনি রোজ আহার করেন সে হোটেলটা আজ খুলিয়াছে কি-না কে জানে। খুলিয়াছে নিশ্চয়ই।

করালীচরণ উঠিলেন, কোটটা গায়ে দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

হোটেলে গিয়া কিন্তু তাঁহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। ইহারা মানুষ না পশু! এমন বর্ষার দিনেও সেই সনাতন কলায়ের ডাল, বড়ি চচ্চড়ি, শাকভাজা, উরশুনি মাছের ঝোল! অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, ওই অখাদ্যগুলাই দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিতে হইল।···কিন্তু নাঃ—অসম্ভব! ক্ষুধা সত্ত্বেও করালীচরণ উঠিয়া পড়িলেন।

দাম দিতে দিতে হঠাৎ চোখে পড়িল সেই পান-ওয়ালিটা তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে এবং হাসিতেছে। হোটেল এবং পানওয়ালির দোকান ঠিক সামনাসামনি। করালীচরণ এতক্ষণ পানওয়ালিকে লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পানওয়ালি করালীচরণের সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করিতেছিল। তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। পানওয়ালির দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া হন্‌হন্ করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। নিরুদ্দিষ্ট ভাবে খানিকক্ষণ চলিয়া অবশেষে একটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া করালীচরণ ভীড় দেখিতে লাগিলেন। তিনিই শুধু কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না, বাহিরের পৃথিবীর তো ব্যস্ততার সীমা নাই। মোটর, ট্রাম, ট্যাক্সি, রিক্‌শ, ঘোড়ার গাড়ি, পদাতিক সকলে মিলিয়া কাদা ছিটাইয়া চৌরাস্তাটাকে যেন মথিত করিয়া ফেলিতেছে। সকলেরই কাজ আছে। থাকিবে না কেন? তাঁহার মত ·· করালীচরণ আবার ফিরিলেন, মদ কিনিতে হইবে। একবোতল মদ ও কিছু সিগারেট কিনিয়া ফেলা অবিলম্বে দরকার। ভন্টুবাবু কখন যে হানা দিয়া টাকাগুলি লইয়া যাইবেন স্থিরতা নাই।

ভীড় ঠেলিয়া পিছল কর্দ্দমাক্ত ফুটপাথ দিয়া প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে করালীচরণ মদের দোকানের উদ্দেশ্যে ছুটিতে লাগিলেন—যেন কোন জরুরি দরকারে ট্রেণ ধরিতে ছুটিয়াছেন।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পরে কর্দ্দমাক্ত করালীচরণ মদ ও সিগারেট লইয়া ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন ঘরের কপাট খোলা, হাঁ হাঁ করিতেছে। মনে পড়িল, যাইবার সময় বন্ধ করিয়া যান নাই। ঘরে ঢুকিতেই নজরে পড়িল টেবিলের উপর একটা থালায় কি যেন ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। কি এ! আগাইয়া গিয়া ঢাকা খুলিয়া দেখিলেন, কয়েকখানা পরোটা ও হাঁসের ডিমের ডালনা। কে রাখিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রে কে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এক-টানে থালাটা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কপাটে খিল বন্ধ করিয়া তিনি বলিলেন—হারামজাদি! যাহারা তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তাহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। একদিন দুর্ম্মতি হইয়াছিল ওই ডাকিনীদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আর নয়, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়া গিয়াছে। বেশ্যারা আবার মানুষ! দুই-চারি টাকার জন্য যাহারা—করালীচরণ পূর্ব্বেকার নিঃশেষিতপ্রায় বোতলটাতে মুখ লাগাইয়া বাকী মদটুকু ঢকঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। মাগির তাড়কা রাক্ষসীর মতো চেহারা, সোহাগ জানাইতে আসিয়াছে! একটুও যদি রূপ থাকিত, দেমাকে মাটিতে পা পড়িত না, আমাকে দেখিয়া তখন হয়তো মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া যাইত। এখন বোধ হয় কেউ পোঁছে না, তাই আমার কাছে ভিড়িয়াছে। এবার আসিলে চাবকাইয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিব!

ঘরে খিল দেওয়ায় ঘরটা অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছিল। করালীচরণ মোমবাতির সন্ধান করিয়া দেখিলেন মোমবাতি নাই। বাই নারায়ণ, আবার বাহির হইতে হইবে! করালীচরণ তালাটা খুঁজিতে লাগিলেন, এবার তালা দিয়া যাইতে হইবে। তালাটা লাগাইতে লাগাইতে করালীচরণ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিলেন থালাটা কে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।··· কিছুদূর গিয়া চোখে পড়িল ওই দিকের গলিতে কতকগুলো ছোঁড়া একটা দাঁড়কাক ধরিয়াছে এবং তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে নানারকম যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতেছে। করালীচরণ খানিকক্ষণ সে দিকে চাহিয়া মোমবাতির খোঁজে চলিয়া গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ভন্টু আপিসের ফেরত করালীচরণের বাসার দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শুনিতে পাইল করালীচরণ উন্মাদের মতো চীৎকার করিয়া বলিয়া চলিয়াছেন-—It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness ; it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair—we had everything before us, we had nothing before us—

ভন্টু দরজা ঠেলিয়া ঢুকিতেই করালীচরণ বইটা বন্ধ করিলেন।

“বাঃ নারায়ণ, সমস্ত দিন কোথায় ছিলেন আপনারা, একা একা পাগল হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছি—‘এ টেল অফ টু সিটিজ’খানা পড়ছিলাম, কি আর করি !”

ভন্টু কাজের কথা পাড়িল।

“আমাদের আপিসের একজন বড্ড ধরেছে তার ছকটা যদি একটু দেখে দেন। বেচারা ভারী গরিব—দু’টাকার বেশী—”

“ছকটা এনেছেন ? কই ?”

করালীচরণ উন্মুখ হইয়া উঠিলেন।

ভন্টু ছকটা বাহির করিতেই করালীচরণ তাহার হাত হইতে তাহা প্রায়-ছিনাইয়া লইলেন ও তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া দেখিতে সুরু করিলেন।

ভন্টু স্মিতমুখে করালীচরণের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর একটা খড়খড় শব্দ শুনিয়া আলমারির মাথার উপর নজর পড়িতেই বিস্মিত হইয়া গেল।

“ওটা কি আবার !”

করালীচরণ চকিতে একবার সেদিকে চাহিলেন।

একটু হাসিয়া বলিলেন, “পুষলাম।”

“কি পাখী ওটা ?”

”দাঁড়কাক।”

“দাঁড়কাক ! কোথা থেকে পেলেন ?”

“রাস্তার ছোঁড়াগুলোর কাছ থেকে কিনলাম এক টাকা দিয়ে। একটা সঙ্গী না হ’লে চলে না মশাই, একা একা আজ জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।”

ভন্টু আলমারিটার নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে দেখিল মস্ত একটা দামী খাঁচায় সত্যই একটা দাঁড়কাক রহিয়াছে। করালীচরণের দিকে চাহিয়া দেখিল তিনি তন্ময় হইয়া গণনায় মন দিয়াছেন। ভন্টু আর কথা বলিতে সাহস করিল না। (ক্রমশঃ)

শেষ পৃষ্ঠা

শ্রীদক্ষিণা বসু

মৃত্যুরে দেখেছ বন্ধু ! জানো তাঁর কেমন স্বরূপ ?
শুনিয়াছ কোন দিন তাঁর চির-শাশ্বত আহ্বান—
যুগে যুগে যেই মৃত্যু মানুষের করেছে কল্যাণ ?
মহা-স্তব্ধতার প্রান্তে রাজ্য যাঁর অতি অপরূপ,
তুমি কি কহিতে পারো সেথাকার পথের সন্ধান ?—
সুপ্তির তিমির ঘেরা শূন্যতায় পূর্ণ শান্ত পুরী,
আলোকের রুদ্ধগতি স্থায়ী যেথা অনন্ত শর্ব্বরী ;
সেখানে বাঁধিব বাসা আজি তাই চাহে মোর প্রাণ।
মাথার উপরে মৌনী মহাধ্যানী বিরাট আকাশ
অজস্র আশীষ নিয়ে মোর লাগি দিগন্ত-অঙ্গনে ;
পৃথিবীর ব্যথা-গ্লানি টুটে যাবে বিস্মৃতি-স্বপনে,
লুপ্ত হবে ভিক্ষা-বৃত্তি হৃদয়ের বন্ধ্যা অভিলাষ।
প্লাবন এনেছে আজি মনে মোর মৃত্যুর উল্লাস ;
অসম্পূর্ণ জীবনের শেষ পৃষ্ঠা রহিল এখানে।

আর্থিক দুনিয়া

শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়

যুদ্ধ ও ভারতীয় বীমা-ব্যবসা

যুদ্ধের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্ত্তমানে লোকের মনে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে। আর সেই আতঙ্ক হইতে অনেকে দেশের বীমাকোম্পানীসমূহ সম্পর্কে নানারূপ উদ্বেগের ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে বীমা ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উপর যুদ্ধের সম্ভবপর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া ঐরূপ আশঙ্কার বাস্তবিকই তেমন কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করা যায় না। যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে বীমা ব্যবসায়ের দিক হইতে সবচেয়ে ভয়ের কথা হইতেছে মৃত্যুহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সমক্ষে সেরূপ কোন সঙ্কট মূর্ত্ত হইয়া ওঠার এখনও কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। কেন না যুদ্ধক্ষেত্রের এলাকা এদেশ হইতে এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে। এদেশের যেসব লোক সামরিক বিভাগের কাজে নিযুক্ত আছেন তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ার আশঙ্কা অবশ্য রহিয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের ভিতর বীমাপত্র প্রদান করিতে গিয়া বীমাকোম্পানীসমূহ সর্ব্বদাই একটা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম আদায় করিয়া থাকেন। কাজেই সেজন্য এদেশীয় বীমাকোম্পানীগুলির উপর বেশী রকম কোন ঝুঁকি পড়িবার সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের সময় পণ্যমূল্যের হার অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে নানা দফায় বীমাকোম্পানীসমূহের ব্যয়ের হার বাড়িয়া যাওয়ার যে আশঙ্কা ছিল পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দ্রুত সরকারী কার্য্যনীতি অবলম্বনের ফলে তাহা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে বলা চলে। তাহা ছাড়া ব্যয়ের হার বাড়িবার সম্ভাবনা যদিই বা কিছু থাকিয়া থাকে সেই সঙ্গে বর্ত্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বীমাকোম্পানীগুলির দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ আয় বাড়িবার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আর সেজন্য সরকারী সিকিউরিটিসমূহের সুদের হার চড়িয়া গিয়া বীমাকোম্পানীসমূহের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হইবে। আয় বৃদ্ধির এই সম্ভাবনা বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে একটা সুবিধার কথা সন্দেহ নাই।

তবে যুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের মূল্য যে ভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে ঐদিক দিয়া ভারতীয় বীমাকোম্পানীসমূহের সমক্ষে বাস্তবিক পক্ষেই একটা ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। নূতন বীমা আইনে ভেলুয়েসনের সময়ে বীমাকোম্পানীগুলিকে প্রকৃত বাজার দর অনুযায়ী হস্তস্থিত সিকিউরিটির মূল্য নির্ণয় করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় বর্ত্তমানে কোম্পানীর কাগজের মূল্য যেস্থলে শতকরা দশভাগ হারে নামিয়া গিয়াছে সেস্থলে ঐ নিয়ম বলবৎ থাকিলে কোম্পানীসমূহের দাদনী তহবিলে তদনুপাতিক ঘাটতি দেখা যাইবে। এইরূপ অহেতুক ঘাটতির সম্ভাবনায় দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহের সমক্ষে আজ যে জটিল সমস্যা মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে তাহার সময়োচিত প্রতিকারের জন্য ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি ভারত সরকারকে ক্যানাডার অনুকরণে এদেশেও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিধান বলবৎ করার পরামর্শ দিয়াছেন। ক্যানাডায় প্রচলিত বীমা আইনের ৭১নং ধারা অনুসারে তথাকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ্ ইন্সিওরেন্সের অনুমতি লইয়া বীমাকোম্পানীসমূহ তাহাদের হিসাব শেষ করিবার সময় ১ মাস কি ২ মাস পূর্ব্বেকার দরে হস্তস্থিত সিকিউরিটির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া ক্যানাডা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় দেশে সিকিউরিটি মূল্য অস্বাভাবিক রূপ নিম্ন মনে হইলে গবর্ণমেণ্ট চলতি দরের তুলনায় বেশী মূল্যে সিকিউরিটির দর নির্দ্ধারণের সুবিধা দিতে পারেন। আজ ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি ঐধরণের বিধান অবলম্বনে সচেষ্ট হন, তবে যুদ্ধের জন্য এদেশীয় কোম্পানীগুলির অহেতুক ক্ষতির আশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গীয় মহাজনী আইনটি সরকারীভাবে বলবৎ করা হইয়াছে। এ প্রদেশে দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে উক্ত আইনে অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত বিধিব্যবস্থার স্বরূপ জানিবার ও বুঝিবার জন্য অনেকের পক্ষেই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া বঙ্গীয় মহাজনী আইনের কয়েকটি মূল বিধান আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি—

(১) সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে (কলিকাতাসহ) দাদনী ব্যবসা সুনিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনটি প্রযুক্ত হইবে।

(২) সুদসহ আসল প্রত্যর্পণের সর্ত্তে যে টাকা অথবা দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করা হয় এই আইনে তাহাকেই দাদনী ব্যবসা বলিয়া ধরা হইবে। কতিপয় শ্রেণীর দাদন এই আইনের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধানসমূহের আমলে আসিবে না। যথা—(ক) কোন প্রতিষ্ঠানে আমানতী অর্থ ও সম্পত্তি, (খ) রেজেষ্ট্রীকৃত সমিতি, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ঋণ বা গৃহীত আমানত, (গ) ১৯৩৯ সালের পূর্ব্বে যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং যে সব ব্যাঙ্ককে গবর্ণমেণ্ট 'বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক' বলিয়া ঘোষণা করিবেন সে সব ব্যাঙ্কের দাদন, (ঘ) বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা কোম্পানী-সমবায় সমিতি ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড হইতে গৃহীত ঋণ ও (ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত ঋণ।

(৩) বাঙ্গালা দেশে দাদনী কারবার চালাইতে হইলে এখন হইতে সরকার নিযুক্ত সাব্-রেজিষ্ট্রারদের নিকট হইতে উপযুক্ত কার্য্যকরী লাইসেন্স লইতে হইবে। এই আইন বলবৎ হওয়ার ছয়মাসকাল পর লাইসেন্স ছাড়া কোন মহাজন দাদনী কারবার করিলে কোন কোর্ট তাহা বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না।

(৪) লাইসেন্স লওয়ার ফি ১৫ টাকা। একবার লাইসেন্স লইলে তিন বৎসরকাল বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তদনুসারে দাদনী কারবার চালান যাইবে।

(৫) দাদনী কারবার করিতে হইলে রীতিমত হিসাব বই, খতিয়ান ও রসিদ বই রাখিতে হইবে। বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্ব দুই মাসকাল মধ্যে খাতককে মোট পাওনা টাকার একটি বিস্তারিত হিসাব দিতে হইবে।

(৬) বন্ধকীসূত্রে প্রদত্ত ঋণের সুদ বার্ষিক শতকরা ৮ টাকা ও বিনা বন্ধকীতে প্রদত্ত ঋণের সুদ বার্ষিক শতকরা ১০ টাকার বেশী হইতে পারিবে না।

(৭) প্রদত্ত ঋণ আদায় সম্পর্কে মামলা দায়ের হইলে কোর্ট মহাজনের পাওনা নির্দ্ধারণ করিয়া খাতককে ২০ বৎসরের কিস্তিবন্দী হারে তাহা পরিশোধের সুবিধা দিতে পারিবেন। কিস্তি অনাদায়ী পড়িলে কোর্ট টাকা পরিশোধের সময় বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(৮) ঋণের জন্য কাহাকেও গ্রেপ্তার বা কয়েদ রাখা চলিবে না।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত ১৯৩৯-৪০ সালের সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলেই জানেন, ভারতে নিয়োজিত বিদেশী মূলধনের সুদ ও লভ্যাংশ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের পেনসন্ প্রভৃতি বাবদ ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর ৭০।৭৫ কোটি টাকা অনুপাতে বাহিরের দায় মিটাইতে হয়। বিদেশের সহিত মাল আদান প্রদান করিয়া রপ্তানীর আধিক্য দ্বারা এই দায় পরিশোধ করাই একমাত্র বিহিত উপায়। সে হিসাবে বহির্ব্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানির তুলনায় একটা বেশীরকম রপ্তানি আধিক্যের দিকেই ভারতবর্ষকে সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়। এ বৎসর যুদ্ধের প্রভাবে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বিদেশে বেশী পরিমাণ ভারতীয় মাল কাটতি হইয়াছে এবং তাহাতে বহির্ব্বাণিজ্যের হিসাবে এদেশের অনুকূল রপ্তানি আধিক্যও অনেকটা বাড়িয়াছে তাহা সুখের বিষয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৬৯ কোটি ২১ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানি হইয়াছিল। অপরদিকে বিদেশ হইতে এদেশে ১৫২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানি হইয়াছিল। ফলে শেষ পর্য্যন্ত মালপত্র বিনিময়ের হিসাবে ভারতের অনুকূল রপ্তানি আধিক্য দাঁড়াইয়াছিল ১৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার জিনিষ রপ্তানি হইয়াছে। পক্ষান্তরে বিদেশ হইতে এদেশে ১৬৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানি হইয়াছে। ফলে গতবারের তুলনায় রপ্তানি আধিক্যের পরিমাণ বাড়িয়া এবার ৪৭ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে। বহির্ব্বাণিজ্যের অবস্থা এদেশের পক্ষে এরূপ সুবিধাজনক হইয়া ওঠার কারণ—আলোচ্য বৎসরে পাট, চা, কয়লা, লোহা, ইস্পাত, তুলা ও চামড়া প্রভৃতি পণ্যের অধিকতর রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু চলতি ১৯৪০-৪১ সালের গত কয়েক মাসে রপ্তানি বাণিজ্যের এই অনুকূল গতি নানাকরণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা দুঃখের বিষয়। গত জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিদেশে ২৪ কোটি টাকার মালপত্র রপ্তানি হইয়াছিল। গত জুন মাসে সেইস্থলে মাত্র ১৭ কোটি টাকার জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের ব্যাপকতার জন্য মাল প্রেরণের অসুবিধা ঘটিয়াই যে এক্ষণে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

বাঙ্গালায় বস্ত্রশিল্পের সমস্যা

আশা করা যাইতেছিল, যুদ্ধের সুযোগে ভারতের কাপড়ের কলগুলি এখন হইতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐরূপ উন্নতির বদলে বর্ত্তমানে নানাদিক দিয়া দেশীয় বস্ত্রশিল্পের একটা সঙ্কটদশাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। ভারতের কাপড়ের কলগুলি উন্নত শ্রেণীর তুলা, আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও রঞ্জন দ্রব্য প্রভৃতির জন্য এখন পর্য্যন্ত বিদেশের উপরই নির্ভরশীল। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ঐসব জিনিষপত্রের প্রয়োজনীয় পরিমাণ জোগান পাওয়া যাইতেছে না। যাহা কিছু মাল পাওয়া যাইতেছে তাহার জন্যও অত্যধিক মূল্য দিতে হইতেছে। ইতিমধ্যে অনেক কাপড়ের কলে যুদ্ধ ভাতা হিসাবে শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহার উপর আমদানিকৃত জিনিষের জন্য অধিক দাম দিতে হওয়ায় কাপড়ের কলসমূহে বস্ত্রের উৎপাদন খরচ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ চড়া দামে বস্ত্র কিনিবার মত আর্থিক সঙ্গতি সাধারণের নাই বলিয়া দেশে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উৎপন্ন কাপড় বিক্রয়ের সুবিধা কিছুই হইতেছে না। তবুও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কলগুলি সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির দিক দিয়া উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠ থাকায় তাহারা বর্ত্তমান সঙ্কটেও আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারণের সুযোগ পাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলি সাধারণত ক্ষুদ্র আকারের ও উহাদের কার্য্যকরী মূলধন অনেক স্থলেই নিতান্ত কম বলিয়া বর্ত্তমান সঙ্কটের ভিতর তাহাদের অনেকগুলিরই সমক্ষে আজ সমূহ বিপদের সূচনা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের সামরিক মাল সরবরাহ বিভাগ হইতে এক্ষণে কার্পাসজাত দ্রব্যাদির জন্য বড় রকম অর্ডার দেওয়া হইতেছে। গত ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে গত ১৩ই জুলাই পর্য্যন্ত এইভাবে ৫ কোটি ২২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার মালের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বড় বড় কলগুলিই ঐ সব অর্ডার গ্রহণের প্রায় একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করিতেছে। প্রকাশ, বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতির চেষ্টায় ভারত সরকার উপযুক্ত সর্ত্তে বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলিকেও ঐসব অর্ডার পাওয়ার সুযোগ দিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐসব অর্ডার অনুযায়ী মাল

তৈয়ার ও সরবরাহের সঙ্গতি না থাকায় বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলি তাহা কার্য্যত গ্রহণ করিতে সাহসী হয় নাই। এই প্রকার একটা অবস্থা বাঙ্গালা প্রদেশের পক্ষে খুবই লজ্জাস্কর। এ প্রদেশের বস্ত্রশিল্পের দিক হইতেও তাহা নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বাঙ্গালার বর্ত্তমান ক্ষুদ্রকায় কাপড়ের কলগুলিকে সকল দিক দিয়া সুসজ্জিত ও সমুন্নত করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য এবং নূতন কতকগুলি বড় বড় কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য উদ্যোগী বাঙ্গালীদের কার্য্যক্ষমতা ও অর্থবল নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

সমবায় আন্দোলনের সংস্কার

বাঙ্গালা দেশে সমবায়সমিতিসমূহের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঙ্গালা সরকার যে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক তাহা পাশ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্যধারা সম্পর্কে নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থা লক্ষিত হইতেছে। এই সব গলদ দূর করিয়া সমবায় আন্দোলনকে অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার একটা বড় রকম দায়িত্ব বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্তু যেভাবে তাঁহারা আজ ঐ দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে দেশের প্রকৃত হিতকামী মাত্রেই ব্যথিত হইবেন। অধিকাংশের ভোটের জোরে গবর্ণমেণ্ট যে বিলটি পাশ করিয়া লইয়াছেন তাহাতে পরিকল্পিত প্রধান প্রধান বিধানসমূহের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে সমবায় সমিতিসমূহের উপর সরকারী অফিসরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বাঙ্গালা প্রদেশে সমবায়ের উন্নতি ও প্রসার বিষয়ে কোন সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও অন্য অফিসরদের হাতে এতদিন যেটুকু ক্ষমতা ছিল তাঁহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনুপযুক্ত কর্ম্মনীতি এবং অবহেলা ও উদাসীনতার জন্যই সমবায় আন্দোলনের সকল ক্ষেত্রে দলাদলি, অসাধুতা ও আশ্রিতবাৎসল্য আত্মপ্রকাশ করিয়া এ প্রদেশে সমবায়ের সুপরিকল্পিত প্রসার অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারের হাতে নূতন করিয়া ডিক্টেটরী ক্ষমতা দেওয়ার ফল সেদিক দিয়া শুভ হইয়া উঠিবার আশা নাই। বরং ঐরূপ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলে সমবায় আন্দোলন আরও বেশী পরিমাণে দোষদুষ্ট হওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদে সমবায় বিলটির আলোচনা কালে নিরপেক্ষ বেসরকারী অডিটরদের উপর সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষার ভার দেওয়ার জন্য কংগ্রেস পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের হাতেই হিসাব পরীক্ষার সমস্ত দায়িত্ব আরোপ করিয়াছেন। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে বর্ত্তমানে বহুবিধ উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সমবায় সমিতিগুলির উন্নতির জন্য সরকারী কর্ত্তৃত্বের বদলে সদস্যদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়ার দিকেও আজ সকল দেশেই জোর দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বাঙ্গালায় সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে সেই সব দৃষ্টান্ত অনুকরণের চেষ্টা না করিয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা যেরূপ একঘেয়ে ভাবে কেবল সরকারী নাগপাশই বৃদ্ধি করিতেছেন তাহাতে সমবায়ের বিহিত উন্নতির কোন আশা দেখা যাইতেছে না।

পাটের ভবিষ্যৎ

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সময়মত কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া বাঙ্গালা সরকার এবার যে ভুল করিয়াছেন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পাটের দর সম্পর্কে এক্ষণে একটা বড় রকম সঙ্কট মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর সমরায়োজনের জন্য পাটের বেশী রকম চাহিদা থাকায় পাটের দাম খুবই চড়িয়া উঠিয়াছিল। কোন নিয়ন্ত্রণমূলক কার্য্যনীতি অনুসৃত না হওয়ার ফলে গত বৎসরের সেই চড়ামূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষকেরা এবার যথাসাধ্য বেশী জমিতে পাট বুনিয়াছে। সরকারী পূর্ব্বাভাষে অনুমিত হইয়াছে, এবার গত বৎসরের চেয়ে ৩০ ভাগের মত বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। ব্যবসায়ী মহলের ধারণা উহার ফলে এবার শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু এত বেশী পাট কাটতি যাওয়ার সুবিধা এখন পর্য্যন্ত কিছুই দেখা যাইতেছে না। গত বৎসর পাটকলওয়ালারা ৭০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিয়াছিল। এবৎসর বিদেশে পাটের থলে ও চটের চাহিদা নিতান্ত কমিয়া গিয়াছে বলিয়া পাটকলওয়ালারা কলের সাপ্তাহিক কার্য্যকাল ইতিমধ্যে ৫৪ ঘণ্টা হইতে ৪৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন। যেরূপ নমুনা দেখা যাইতেছে তাহাতে পাটকলওয়ালারা এবার ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট খরিদ করিবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশেও এবার পাটের রপ্তানি কমিয়া মাত্র ১০ লক্ষ বেল দাঁড়াইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অন্য নানাভাবে আরও ৫ লক্ষ বেল পাট কাটতি হইতে পারে বলিয়াও যদি ধরা যায় তথাপি এবার শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল পাটের মধ্যে ৬৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হওয়ার আশা নাই। কাজেই এবার বাকী ৬৫ লক্ষ বেল পাটই উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এত বেশী পরিমাণ পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কাতেই বর্ত্তমানে পাটের দরের একটা বেশী রকম নিম্নগতি লক্ষিত হইতেছে। পাটের দরের এই নিম্নগতি রোধ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের নিম্নতম মূল্য ৬০ টাকা হারে বাঁধিয়া দিয়া একটি অর্ডিনান্স জারী করেন। কিন্তু প্রকৃত চাহিদা ও জোগানের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে পাটের মূল্য চড়াইবার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কেন না, ৬০ টাকা দরে পাটের ক্রেতা না থাকায় বর্ত্তমানে ঐ বাজারে পাটের কোন বিকিকিনিই আর হইতেছে না। ফাটকা বাজারের বাহিরে নির্দ্ধারিত দরের অনেক নিম্ন দরেই পাটের কাজ-কারবার হইতেছে। মফঃস্বলে প্রতি মণ পাটের দাম নামিয়া এক্ষণে ৫ টাকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে বলিয়াও শুনা যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে যখন বাজারে বেশী পরিমাণে নূতন পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা আরম্ভ হইবে তখন দামের হার'যে আরও বেশী নামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাটের বাজারের এইরূপ সঙ্কট দশায় বাঙ্গালা সরকার যদি চাহিদাতিরিক্ত পাট ক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিতেন তবে পাটের দর চড়িবার একটা উপায় হইত। কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের সেরূপ সামর্থ্য বা সঙ্গতি কিছুই দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক, এই সময়ে বাঙ্গালার মন্ত্রীসভা যদি এরূপ ঘোষণা করেন যে আগামী বৎসর তাঁহারা কিছুতেই এবারের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী পাট উৎপন্ন হইতে দিবেন না তবে এখন হইতে পাটের দাম হয়ত কিছু চড়িতে পারে। কিন্তু পাটচাষীদের চেয়ে প্রভাব প্রতিপত্তিশীল পাটকলওয়ালাদের স্বার্থ ই যাঁহারা এতদিন বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের নিকট সেরূপ একটা কার্য্যনীতি কতদূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ?

প্রারব্ধ

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

‘কি খপ্‌পর খুড়ো, ল্যাংচাচ্চ যে !’

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট চায়ের দোকানের সামনে, ফুটপাথে এক পেয়ালা চা হাতে ক’রে, টিনের চেয়ারে ব’সে আছি, দেখি যে নেত্যখুড়ো খোঁড়াতে খোঁড়াতে আস্‌ছে।

খুড়ো বল্‌লে, ‘আর বাবা, সেদিন বাস থেকে প’ড়ে গিয়ে বাঁ পা-টা যখম হয়েচে।’

‘সে কি ? শেষটা বাস্ থেকে পড়লে, খুড়ো !’

খুড়ো বল্‌লে, ‘ইচ্ছে ক’রে কি পড়েছি বাপ আমার ? প্রারব্ধ।’

পাশের একখানা ভাঙা টিনের চেয়ার দখল করতে গিয়ে খুড়ো পড়তে পড়তে রয়ে গেল। আমি বল্‌লাম, ‘খুড়ো, প্রারব্ধ যে সঙ্গে সঙ্গে চলেচে !’

খুড়ো বল্‌লে, ‘অমন ঠাট্টা করো না, বাপু। এক দিন বুঝতে পারবে।’ বলেই খুড়ো লম্বা এক টিপ্ নস্য নাকের মধ্যে সজোরে চালান ক’রে দিলে। আমি বুঝলাম যে ‘প্রারব্ধ’ শব্দের মানে বুঝতে হ’লে নস্যগ্রহণ আবশ্যক। যাক্, খুড়ো এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বল্‌তে লাগলো :

‘আরে বাবা, আগে সুখ ছিল না, সোয়াস্তি ছিল। এই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে ঘোড়ায় টান্‌তো ট্রাম। সে দিন ত জন্মাও নি। এখন যে সময়ে শ্যামবাজার থেকে গড়ের মাঠে যাও, তখনকার দিনে বীডন ষ্ট্রীট্ থেকে মাণিকতলা আস্‌তে সেই সময় লেগে যেতো।

বল কি খুড়ো ?

ঠিক বল্‌ছি বাবা। একটুও মিথ্যে নয়। ঘোড়া দুটো মাঝে মাঝে বেঁকে বসতো। চলছে চলছে—থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তখন ট্রাম থেকে নেমে যাত্রীরা কোমর বেঁধে ঠেল্‌তে লেগে যেতো কণ্ডাক্টার আর ড্রাইভারের সঙ্গে। হেঁইও—চালাও শ্যামবাজার—কি, চালাও ধরমতলা। এই বুলির সঙ্গে আমরা দিতাম প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলা। ঘোড়া দুটো সুবিধে পেয়ে হঠাৎ মারলে দৌড়। ড্রাইভার ততক্ষণ ঠেল্‌ছিল। সে কোনও মতে উঠে রাশ্ ধরতে ধরতে ঘোড়া ছুটেছে জোরে। আর যারা ঠেলছিল, তারা কেউ রয়ে গেল হতভম্ব হয়ে, কেউ ছিট্‌কে পড়লো পাঁচ-সাত হাত্ দূরে। ‘এই বাঁধো, বাঁধো’ চীৎকার—অশ্বিনীকুমারদ্বয় বিরক্ত হয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো। আবার নামো, আবার ঠেলো—এই করে’ আপিস করেছি। কিন্তু সে দিন আরামের ছিল। অফিসে দেরী হলে কোনও মতে সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে পারলেই হলো horses mad, sir—ঘোড়া খেপে গিয়েছিল। চাকরি নেয় কে ? এখন পাঁচ মিনিট দেরী হলেই কৈফিয়ৎ তলব। পনর মিনিট হ’লেই বরখাস্ত। বল বাপধন, সেদিন ভাল ছিল, কি আজকার দিন ভাল ?’

ভাবলাম এত উন্নতি, এত প্রগতি—সব ছেড়ে দিয়ে কি সেই বর্বর যুগের পক্ষিরাজের পুষ্পক রথে ফিরে যাওয়া যায় ? কখনই না। দু-চার-দশ জন খোঁড়া হয় হোক; দু-চার শ লোক মরুক, তবু বাস্—তবু ট্রাম—তবু এরোপ্লেন চাই। যারা পড়বে, যারা মরবে, তাদের প্রারব্ধই ঐ। বাস্, ট্রাম, ট্রেন, ’প্লেন না হ’লেও তারা হাত পা ছুঁড়ে মরতো। সুতরাং খুড়ো ঠিক বলেছে, প্রারব্ধ না মেনে উপায় নেই দেখ্‌চি।

খুড়ো চা খেতে খেতে বল্‌লে, ‘অদৃষ্ট যাঁরা মানেন না, তাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে, এই অদৃষ্ট মেনেই আমরা জড়-ভরত হয়েছি, আড়ষ্ট হয়েছি—গোল্লায় গেছি। কিন্তু যারা ‘দৃষ্ট’ মানে তারাই বা কি এমন পরমার্থ পেয়েছে ? আমরা গোড়ায় ভেবেছিলাম যে যারা অদৃষ্ট ফদৃষ্ট মানে না, তারাই বুঝি সার বুঝেচে। কিন্তু এখন চোখের উপর যে সব কাণ্ড ঘটচে, তাতে যা-ও বা বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, সব লোপ পেতে বসেছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলে, ‘কিচ্ছু বোঝা যাচ্চে না মশায়।’ আরও একটু বেশী খুলে জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না। হয়ত ভারত রক্ষা আইনের খপ্‌পরে প’ড়ে যাব।

‘এই ধর না, নবাব সিরাজউদ্দোলা কতদিন হলো তাঁর প্রারব্ধ নিয়ে বেহেস্তে চলে গেছেন—তাঁকে নিয়ে এখন মিছে টানাটানি কেন ? আমি ইতিহাসের ধার ধারি নে। কিন্তু বাংলার নবাব মহামহিমার্ণব সিরাজউদ্দৌলার জন্য এখন ‘জান্’ দেবার জরুরৎটা কি ? তারপর যাঁরা সেদিন

'সিরাজের পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে বর্ত্তমান নবাবদের পক্ষ নিয়েছিলেন, তাঁদের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে কিছু লাভ আছে? সেই যে রাণীভবানী, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ—এদের কুশপুত্তলির ব্যবস্থা কর। তা নইলে সুবিচার হবে কেন? আমাদের মাথাটা ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই যদি নবাব সাহেবের মাথা বাঁচতো, তা হ'লেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু শুধু এ গণ্ডগোল কিসের জন্যে? আর দেখেচ, যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। এরই নাম প্রারব্ধ, বাপধন, এরই নাম প্রারব্ধ!

ঠাণ্ডা চায়ে দু-চার চুমুক দিয়ে খুড়ো বেশ একটু বীররসের আমেজ দেখিয়ে আবার আরম্ভ করলে—

'দেখে দেখে হাড় জ্বলে' পুড়ে গেল। এই মনে কর মহাত্মাজীর প্রসাদে হঠাৎ একদিন আমরা অহিংসার মাহাত্ম্য বুঝলাম। তেত্রিশকোটী দেবতার আওতায় বাস ক'রেও তেত্রিশকোটী মানুষ হঠাৎ সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লো অহিংসাজি-কি জয়! কিন্তু বল্‌তে না বলতে ফোঁস ক'রে উঠ্‌লো হিংসার কালনাগিনী। মনের উষ্ণ কটাহে ঢেলে দিলে তার বিষ। দেশময় ছড়িয়ে গেল তার জ্বালা। মানুষে মানুষে কোথায় প্রীতি হবে, তা' না—দ্বেষ হিংসায় দেশ ভরে গেল! ধনী নির্ধনে, রাজায় প্রজায়, মনিবে চাকরে, ব্যষ্টি সমষ্টিতে, হিন্দু মুসলমানে, উন্নত অনুন্নতে লেগে গেল লড়াই। এমন কি, তুচ্ছ অধিকার নিয়ে মেয়েরা পর্যন্ত ছুটেছে ঝাঁটা বঁটি নিয়ে পুরুষের পিছনে তাড়া ক'রে। প্রারব্ধ নয়ত কি? রজনী সেন বেচারী বড় দুঃখেই গেয়েছিল—

'হ'ল কি ধারণা বুঝিতে পার না ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে।' কিন্তু দেশ উঁচুতে উঠুক না সে ত ভাল কথা। শেষটা পড়ে গিয়ে হাড়গোড় সব চূর্ণ হয়ে যাবে—এই ভয় করি, বাবা, এই ভয় করি।' আবার সজোরে নস্য গ্রহণ ক'রে খুড়ো বললে:

'স্বপ্নাদ্য মাদুলি, সাধু সন্ন্যাসী প্রদত্ত ওষুধ মানো টানো বাবা? এ সবের অব্যর্থ ফল, কিন্তু সকলে মানে না, এই দুঃখ। মানের ভয়ে মানে না—কি অন্য কারণে, তা জানিনে। এই যে মহাত্মা সেদিন ইংরেজদের একটি অহিংসার কবচ দিলেন। তা ওরা নিলে না কেন বলতে পার? নিলে ক্ষতিটা কি ছিল বাপু, যুদ্ধ ক'রে ক'রে যখন কিছুই এগুচ্ছে না, তখন একবার যুদ্ধ না করাটার আনন্দ কিছুদিন উপভোগ ক'রে দেখলেই পারতো। সাধু মহাত্মার বাণী শুন্‌লে ফল ভালই হতো। অন্তত আমাদের পক্ষে যে খুবই ভাল হতো, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। প্রারব্ধই বলবৎ। সে সুবিধেটা ফস্‌কে গেল।

'সুতরাং দেখা যাচ্চে যে, অদৃষ্ট না মেনেও পৃথিবী গোল্লায় যাচ্চে। চীনেরা ছিল ভাল, একটু আধটু আফিং খেতো, মৌতাত করতো, লম্বা বেণী দুলিয়ে মনের সুখে চল্‌তো, আরসুলার কাবাবে নাপ্পি মিশিয়ে সুস্বাদুর চরম করতো, মেয়েরা ছোট্ট কপালে কাটাকাটা চুলের পাতা কেটে খুঁড়িয়ে চল্‌তো। কিন্তু প্রারব্ধ নামক পদার্থ অতি সচেতন, চুপ ক'রে থাকতে দিলে না। চীনারা জাগ্রত হলো, আর অমনি সুসভ্য জাপান তাদের ইহকাল পরকালের কল্যাণ কল্পে মারলে ছোঁ। কেন বাপু, এত মারামারি কিসের জন্যে? এই ছোট খাটো মামলাটা (China incident) আপোষে মিটিয়ে নিলেই ত হয়! কিন্তু তা হবার জো নেই। রাতদিন বোমা ফুট্‌ছে, কামান ছুটচে, বিদেশীরা টাকা লুটচে। আমাদের বড় কাছে কি-না, তাই ভয় হয় যে হয়ত আমাদের যোগনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে কোন্ দিন না হুড়মুড় ক'রে এসে ঘাড়ে পড়ে। কি আর উপায়? প্রারব্ধ ফল্‌বেই। ঠক চাচা ঠিকই বলেচেন, চাচা আপনা বাঁচা।

'তোমরা যখন নিশ্চিন্ত মনে চায়ের দোকানে দো-দো পয়সার চায়ের প্রতি সুবিচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছ, তখন জগতের আর সবখানে যে ঘোর অবিচার চল্‌ছে, তার কথা একবার ভেবে দেখেচো? আকাশে উড়োজাহাজ পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেল্‌চে, হাজার হাজার কামান একসঙ্গে গর্জে উঠ্‌ছে, সেই সঙ্গে মড় মড় ক'রে জাহাজের মাস্তুল ভাঙচে, বাড়ী ঘর দরজা ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠ্‌চে, মুহূর্ত্ত মধ্যে দোতলা তেতলা সাততালা বাড়ী তার জনসংঘট্ট নিয়ে ধূলিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ভস্মসাৎ হয়ে যাচ্চে। সভ্যতার এই চিতার আগুন কবে নির্বাপিত হবে, কে জানে? কিন্তু তার আগে মানুষের যা কিছু গর্ব করবার সে সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কোন্ পাপে? সে-ই প্রারব্ধই মানতে হবে।

'আচ্ছা, বলতে পার ইংলণ্ড-আর জার্মানী যুদ্ধ ক'রে মরচে কেন? আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনি। ইংলণ্ড

বল্‌ছে, আমার নিজের জন্যে নয়, ঐ যে ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যগুলি আছে ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে জার্মানীর গোড়ালির তলা থেকে।—তা না হ'লে পৃথিবী রসাতলে গেল! স্বাধীনতা গেল, সভ্যতা গেল, সংস্কৃতি গেল—সব স-কার লোপ পাবে। আবার জার্মানী কি বল্‌ছে জান? বল্‌ছে, আমার কি? আমি ত নিজের জন্যে লড়ছি নে। ঐ যে ছোট্ট ছোট্ট রাজ্যগুলিকে ফুঁসলে নিয়ে ইংলণ্ড তার সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করচে, সেটাতে বাধা দিতেই হবে—নয়ত পৃথিবী উচ্ছন্ন যাবে। কিছু বুঝলে বাপু? উভয়েই চাইচে ছোট ছোট রাজ্যগুলির হিত, কিন্তু হিতে হলো বিপরীত। সভ্যতাকে বাঁচাতে হ'লে, স্বাধীনতাকে রাখতে হ'লে, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে যুদ্ধ অনিবার্য। এ রহস্য যে বুঝতে পারে, তাকে আমি নোবেল প্রাইজ দিতে প্রস্তুত আছি।'

আর দুই এক চুমুক ঠাণ্ডা চা গলাধঃকরণ ক'রে খুড়ো বল্‌তে লাগ্‌লো, 'যাক্‌গে, ওসব কথা। আমরা আদার ব্যাপারী বই ত নয়। একটা বেশ সুখবর হচ্চে এই যে, আমাদের কবিগুরুর জন্যে অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী এসেছে ডাকযোগে। আস্তাবল চূড়াভিমুখী রবির ললাটে সাগরপারের বৃদ্ধা সরস্বতী সোনার মুকুট পরিয়ে দিচ্চেন। বুধবার ৭ই আগষ্ট শান্তিনিকেতনের সুপ্ত বনভূমি অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েটদের লাটিন গুঞ্জনে মুখরিত হল। বিশ্বভারতী বৃষক্রান্তে (Oxford) পরিণত হল। বর্ষার এই মেঘমেদুর ঘনায়মান অন্ধকারে বাঙালীর ভাঙাঘরে চাঁদের আলো—বড়ই আনন্দের কথা। কবির কথায় বলি—

'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মা'র প্রাণে (?)।
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে॥'

একটা ফুল্‌কি গিয়ে পড়েছিল, পশ্চিমের জগৎখানায়। তাই আজ এই আতসবাজীর তারা কাটছে। বেশ তাকমাফিক আগুনটা লাগিয়েছিলেন কবি। একেই বলে ঠাকুরালী, একেই বলে প্রারব্ধ।

'কিন্তু আমি বলি কি, বুড়ো মানুষকে মিছে কেন বিরক্ত করা? রবি ঠাকুর সম্মান চায় না, তার দুয়োরে বয়ে সম্মান নিয়ে দিচ্চে। আর যারা সম্মান পেতে চায়, পেলে তার আদর করবে—তাদের দেও না বাপু? যারা চায় তারা পায় না, যারা চায় না তারা পায়—জগতের এই 'পাষাণ' ভেঙে দেবে কে? কিছু বুঝা যায় না। প্রারব্ধ জিনিষটাই জটিল কি-না। কেউ বুঝ্‌তে পারে না এর গতি। অথচ যত জাগতিক নিয়ম তার ভিতর দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেশ চলেছে—আর সংসারের যত রহস্য, যত কুয়াসা ওর পিছনে চলেছে ঘনীভূত হ'য়ে।

'বাঙ্গালীর এত কবিত্ব, এত প্রতিভা, এত তুকৃতাক্ ফুঁকফাঁক আমরা জানি, কিন্তু সব মাঠে মারা যায়। কেউ আমাদের গ্রাহ্য করে না। আমরা যুদ্ধের চেয়ে শান্তি ভালবাসি, গোলাগুলির চেয়ে কোলাকুলি পছন্দ করি, দলাদলির চেয়ে গলাগলি ভালবাসি, মারার চেয়ে মারখাওয়া শ্রেয় মনে করি—এই আমাদের অপরাধ! হায় হায়! সভ্যতার মানে এতদিনে উল্‌টে গেল। বুদ্ধিশুদ্ধি সব ঘুলিয়ে গেল! সত্যি মনে হয়, আমরা পাগল হইনি ত? বেঁচে আছি ত? কেউ বলেন হ্যাঁ, বেঁচে আছি, এই পর্যন্ত। কেউ কেউ তাও স্বীকার করেন না। এরকম ভাবে বেঁচে থাকাকে বাঁচা বলে না। অতএব আমরা ভূত হয়ে আছি। ভগবান আমাদের এই ভূত দলের মধ্যে ভূত ক'রে পাঠিয়েছেন কি-না, বলা কঠিন; কিন্তু আমরা দশজনে মিলে সময়ে সময়ে ভগবানকে ভূত বানিয়ে ছেড়েদি। তিনিও শোধ নেন, শেষকালে আমাদের ভূতের হাতে সঁপে দিয়ে, পঞ্চভূতে আমাদের লুঠ ক'রে নেয়।

'আমরা ভূত হ'লেও আমাদের আবার সময়ে সময়ে ভূতে পায়। গোবিন্দলালকে ভূতে পেয়েছিল, বারুণীর পুকুর পাড়ে। তার উপদ্রবে মারা গেল ভ্রমর। ভ্রমর মরে যখন ভূত হলো, তখন গোবিন্দলালের ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে। আমাদের জোর বরাত এই যে, আমাদের ভূতগুলো খুব বদমেজাজি নয়। তা না হ'লে ভ্রমর ভূত হ'য়ে পৃথিবীর যত গোবিন্দলাল আছে, তার ঘাড় মট্‌কাতে পারতো। তা হ'লে আর রূপের পিছনে লোকে এমন উধাও হয়ে ছুট্‌তে পারতো না। হ্যামলেট থেকে ক্ষুধিত পাষাণ পর্যন্ত ভূতগুলো যেন অত্যন্ত গোবেচারা; এই হ্যামলেটের ভূত ধর না কেন? সাহেবের ভূত কি-না—সাহেবি punctuality একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। ঠিক রাত বারোটায় এসে হাজির—এক মিনিট এ-ধার ও-ধার হবার জো নেই। আমাদের বাঙ্গালীর ভূত যদি হতো তা হ'লে নিদেন আড়াইটের কমে আসতে

পারতো না। আবার যদি ডাক্তারের ভূত হতো, তা হ'লো ত কথাই নেই, রাত কাবার হয়ে যেতো তার দর্শন পেতে। তারপর দেখ, ভূত এসে ছেলের কাছে কাঁদুনি গাইছে। আরে বাপু, ভূত হয়ে চট্ ক'রে রাণীর ঘাড়টা মটকে দিয়ে তার উপপতির কান দুটো ম'লে দিতে পারলি না? বেচারার ভূত হওয়াই সার হলো।

'ঐ দেখ, প্রারব্ধের কথা বল্‌তে গিয়ে ভূতের রাজ্যে এসে পৌছেছি। সাহিত্যে ভূতের উপদ্রব অনেক আছে, সব বলতে গেলে কথা ফুরোবে না। এবিষয় গবেষণা যাঁরা করবেন, তাঁরা প্রচুর উপাদান পাবেন। তবে তার পূর্বে মুঠখানেক সর্ষে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিলে মন্দ হয় না। কি জানি বলা ত যায় না। রাজশেখরবাবু তাঁর অতি মনোজ্ঞ ভূতের কাণ্ডকারখানা লেখবার পূর্বে সর্ষে বাঁধতে ভুলেন নি চাদরে—নিশ্চয়ই।

'আমাদের প্রারব্ধের কথা কত বল্‌বো? এই দেখ না, স্বাধীনতা না হ'লে আমাদের একদিনও চল্‌ছিল না। যেদিন আমাদের দেশের বোকা ছেলেগুলো হাসতে হাসতে প্রাণ দিল, সেদিন আমাদের দুলাল আলানাস্কার প্রভুরা ডমিনিয়ন্ স্টেটাস্-এর স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন। এখন সেই ডমিনিয়ন্ অধিকার আমাদের দরজায় এসে ফিরে'-যাচ্চে। প্রারব্ধ নয় ত কি? একপ্রকার ন্যায় আছে, জানো কি? তার নাম লাজাবন্ধন ন্যায়। একটু খোলসা ক'রে বলি। মনে কর, একজন ক্ষুধার্ত লোক একটি স্তম্ভকে দুই হাতে আঁকড়ে' ধ'রে রয়েছে। তুমি তখন তার দুই হাত ভরে' দিলে খই। কিন্তু বেচারী করে কি? যদি তেমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে হাতভরা খই তার মজুত থাকে, কিন্তু তার খিদে তাতে মেটে না। আর যদি হাত দুটো ছাড়িয়ে মুখের কাছে আনতে চায়, ত খই সব ছড়িয়ে প'ড়ে যায় মাটীতে। তার আর খাওয়া হয় না। আমরাও তেমনি আঁকড়ে প'ড়ে আছি মস্ত এক গরমিলের খুঁটি। মুখের গ্রাস সামনে এসে' ফিরে যাচ্চে, খাবার উপায় নেই। প্রারব্ধ বই আর কি বল্‌বো? ফলে হচ্চে, ভারতবর্ষটাকে কেটে খান খান করতে বসেছি। একদলের হলো পাকিস্তান, আর একদলের কাঁচিস্তান। পাকি যেটা সেটা হবে একশবিশ সিক্কে, আর কাঁচি হবে বোধ হয় পাঁচ সাত সিক্কে কি ঐ রকম কিছু। যারা পাছে এসেচে তাদের ঘুঁটি গেছে পেকে, আর যারা আগে এসেছে, তারা কেঁচে গেছে—এর নাম প্রারব্ধ বা প্রালব্ধ—রলয়োরভেদঃ। লব্ধ আর অ-লব্ধের গণ্ডগোল চিরদিনই আছে, থাক্‌বেও। Have আর, Have not— যার ভাগ্যে যা পড়ে।

কলির গড়ুর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১৯২৭এর গারুড়ী)

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
অকুতোভয়েষু!

উড়তে হঠাৎ ইচ্ছে যদি হয়
ওড়াই ভালো—সায়েব শাস্ত্রে কয়;
মুহূর্তে তাই ওড়ে সায়েব কলির গরুড়যানে
কিন্তু সখা, বাংলা অভিধানে
'ওড়া'-র আছে রকম রকম মানে:
যথা, হাতে টাকা থাকলে কাকে
'ওড়া' বলে জানোই তো ভাই রাসলীলার রাসে।
আরেক রকম 'ওড়া' আছে
উড়্-উড়্ কল্পনাতেই সেটা সাজে
মন্দ লোকে মন্দ করে—বুঝি সেটা নেশাখোরেই জানে।
আমরা একে বলি কিন্তু 'আয়েষ'
কিম্বা রঙিন আবেশ
কিন্তু এ-ও তোমার অচিন—করো নি তো নেশা
চিরকেলে পেশা
বই পড়া আর কাজ করা—উঃ, স্বভাবে যে তুমি কেমন ছেলে!

কে না জানে? ফার্ষ্ট হওয়ার চাবিকাঠি আঁতুড় ঘরেই পেলে!
তবুও যাই হোক
দিলীপ আহাম্মক

এমন বন্ধু পেয়েও হায় চাইল যখন উড়তে—তখন সে
চাইল এটা ‘লিটেরালি’ করতে চেয়ে রোমান্স-বরণ যে—
একথাটা হলফ ক’রে
বলতে পারি তারস্বরে—
উড়ুক্ষু সাধ হ’লো শুধু ধরতে গগনকে।

সে সময়ে পারিসে দিন দিব্যি হেসে খেলে
কাটছিল স্রেফ আড্ডা দিয়ে
গান আড্ডা দাবা নিয়ে
কে জানে কোন্ ছিদ্রপথে বীরত্বেরি ভূতে হঠাৎ পেলে!
ধাঁ ক’রে তাই গেলাম চ’লে শূন্যচারীর শরণ্য আপিসে।
পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে
এলাম যখন ইংলণ্ডের টিকিট নিয়ে
মনে হ’ল পকেট-ঠাশা
হ’ল বুঝি দুঃখনাশা
আকাশের ঐ অনন্ত আশীষে।
দুঃখ কেবল—তরুণ ওষ্ঠে ছিলনাকো গুম্ফ সে নীলাভ
তাই বললাম: “সস্তা সুখে কী-ই বা হবে,
তাছাড়া নয় কিছুই তো হায় নিখুঁৎ ভবে—”
বাহাদুরি না-করার এ-বাহাদুরির দীপ্তি অমিতাভ।
যেমন, প্রেমের পাশাখেলায়
হার যে মানে সে-ই জিতে যায়,
কিম্বা যেমন ‘হিউমিলিটি’ ক’রেই ভাবি—মর্যাদা বাড়াব।

এম্‌নিধারা আত্মপ্রসাদ-পথ চিনে.
‘আতাশে-কেস’ হাতে ক’রে দিন কিনে
হলাম আসীন গড়ুরযানে অপরিসর সীটেই।
বেঞ্চিমতন—লাগল যখন আড়ষ্ট,
রুখে উঠেই গাইলাম: “এতে কী কষ্ট?
আর কেষ্ট পায় কে—ঘুঘু না চরলে তার ভিটেয়?”
যাহোক পরে বারেক নয়টি যাত্রী সাথীর পানে
দৃষ্টি হেনেই বুজলাম যে নজর দেওয়ার নেইকো সেথা মানে:
কি না—চারিধারে আমার
দাড়ি গোফের অকূল পাথার,
এমন স্থলে ধ্যানই ভালো ইথে নেইকো আন,
কারণ—না থাক উহ্য সেটা—বুঝ বন্ধু যে জানো সন্ধান।

একটি আমেরিকান সায়েব (জানত না তো
কপালে কী আছে!)
সঙ্গীকে তার বললে—এ তার প্রথম চড়া এয়রোপ্লেনের গাছে।
সে হাসলে: “এমন থ্রিলে ডাল ভাঙলেও হয় তা উপভোগ।”
“শূয়ার্”—সায়েব বললে কেশে,
রাগবে কেন?—ভালোবেসে।
নয় বরাহ—এটা শুধু উচ্চারণের যমজ গোলযোগ।
যেমন যাকে আমরা বলি জঠর ওরা তাকেই মাথা বলে
একই পে আর ট সাজিয়ে
অর্থভেদের ফিকির নিয়ে
জানই তো ভাই একই ধ্বনি দেশে দেশে ক-ত রকম ছলে!

যাহোক গৌরচন্দ্রিকাটি রেখে
প্রথম পর্বে অবতরণ করি সুরু থেকে।
উড়ল গরুড়যান
রোমাঞ্চিত হ’ল শুধু তনুই না, সেই সাথে মন আর প্রাণ।
“বাঙালি যে ভয়কাতুরে
একথাটা আজকে উড়ে”
সাধলাম আমি শপথ, “করতে হবেই অপ্রমাণ”

কিন্তু বন্ধু যা ভাবি—তা এ জীবনে হয় কি?
চিন্তাকাশের রঙিন মেঘের নবীন আভা রয় কি?
হঠাৎ পড়ে বিমান দারুণ—হু হু হু হু হু হু—
চম্‌কে তনুর প্রতি অণু বলে—উহু উহু!
মনই তখন দেয় দিলাশা: “ভয় কি?
মাটির পিছুটান আছে তাই
উর্ধ্ব পানে নিশানা চাই
বিপদ আছে ব’লেই আমোদ—শৌর্যের হয় ক্ষয় কি?”
একথাটা বুঝবে তুমি নিশ্চয়
ক্লৈব্য যে নয় মনুষ্যত্ব নেই তিলার্ধ সংশয়।
তাছাড়া, আজ যেথায় হারি—‘ট্রাই এগেনে’ পারিই
পারি, নয় কি?

কিন্তু নীতিগর্ভ বুলি ছেড়ে দিলে যতই বলো না
স্বভাব মোদের করেই ছলনা
গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়—তখন গাছের ডগায়
আসন সয় কি?

এ-ও যেন ঠিক তেম্‌নি হ'ল আমার :
দেখতে দেখতে আশে পাশে সবার
ঘটল যখন সেই দৈহিক দুর্ঘটনা
ঘটলেও যার সোজা ভাষায় করা উচিত নয় রটনা :
অর্থাৎ উধ্বর্পথে খাদ্য নিঃসারণ
(সারি সারি ঠোঙার মানে হ'ল তখন নির্ধারণ
কারণ এদের প্রথমে তো দেখিনি
বিমান-পুলক শোনা কথা—ঠেকে তো ভাই শিখিনি)
তখন ঠোঙা হাতে আমি বুঝেছিলাম
(যদিও মাথাঘোরায় যুঝেছিলাম)
প্রতি মিনিট আকুল হ'য়েই খুঁজেছিলাম
মাটির' পরে পা বন্ধু, মাটির' পরে পা।
বুঝেছিলাম—কবিত্বে যাই হোক না কেন
কল্পনাতে করি যতই রোখ না কেন
প্রাণ 'পাখি' হয় কাব্যে শুধু, বাস্তবে নয় মোটেই
তাই অকূল ঐ ব্যোমচারণে কোকিয়ে কেঁদে ওঠেই—
বিশেষ যখন ঘোলায় ডরে গা বন্ধু, ঘোলায় ডরে গা
দূরে থেকে যা সুন্দর
কাছে করে তা-ই জর্জর
পরের মুখে ঝাল খেতে ভাই মন আর সরে না।
তার উপরে—"আরো আছে ?"—নেই ?
তবে কী ভেবেছ ?
অন্নপ্রাশনের সে-অন্ন উঠে এলে কী যে হয়
বর্ণনাতে ব্যাখ্যা করা দিলীপের তো সাধ্য নয়
সে-অসাধ্য সাধন আমি করতে যাব ? ক্ষেপেছ !
তবুও যে আজ হইছি কলম-ব্রতী
সে শুধু ভাই পেতে তোমায় স্বপ্নভঙ্গে আমার ব্যথার ব্যথী,
আর জানাতে—ঘোর বিপাকে প্রাণ কত কী চায় যে !
ভালো দৃশ্য ? হায় শিশুপাঠ ! নিদেন কালে হায় রে
ভালো কি আর থাকে ভালো ?
আলোর আলোও হয় যে কালো
মাথা হ'লে নিচের দিকে দেখাও ঘুরে যায় রে !
কথায় বলে : "খালি পেটে প্রেমের গান কে গায় রে !"

যাহোক শোনো—যত বাজে গুজব ওদের গরুড় পাখির মজা,
মিথ্যে রটায়—"নাগরদোলার পুলক সে নয় সোজা।
শুনেছিলাম—চরণতলায়
যা দেখি তাই মনকে গলায়
কোলাকুলি কালোয় ধলায়
সবাই বলে : "ধিক্, এ দেখনি কি ?"

গগন থেকে সবুজ মাটি
যাই দেখা যায়—পরিপাটি
কত রঙের খুঁটিনাটি
রূপরেখার কাঁপন ঝিকিমিকি !

জলদমালা গলায় প'রে
আশা যখন শূন্যে ঘোরে
সেই হরষে প্রেমের ডোরে
বাঁধে সবার হিয়া !

পাখিকে যা দিলেন বিধি
নেই মানুষের সেই পরিধি
দেয় এনে সেই হারানিধি
বৈমানিকী প্রিয়া !

হায় রে কথার জয়ধ্বজা
নেই মানে যার আছে মজা
কারণ এসব শোনা কথা—কই আদালত-মূল্য ?
বলেন নি তো মিথ্যে হাকিম : "নেই কো কিছুই
ঠেকে শেখার তুল্য।"
সায়েবেও তাই তো বলে : "সী-ইং নইলে বিলীভিং
বিশশতকে নামঞ্জুর কল্পনারাই ডিসীভিং।"
বুঝলাম আমি সায়েবপুরাণ সেদিন নতুন ক'রে
যখন বিমান মাঝপথে—উঃ—ঝড়ে গেল প'ড়ে !
শিউরে ওঠে গা বন্ধু, শিউরে ওঠে গা !
শুনতেও কি চক্ষে তোমার ধারা ছোটে না ?
কত কী যে হ'তে পারত
বিজলি যদি ঝাপ্‌টা মারত
দেখেছ কি ভেবে বন্ধু, দেখেছ কি ভেবে ?
দেখলে তোমার মন দেবে—সায় দেবে :
যে, আমাদের রথখানি যা তুলল তাতে যায় না খুশি হওয়া,
কোনোমতে যায় বড় জোর সওয়া :
কারণ, দেহের সে-নৃত্যে মন হয় নি যে উৎফুল্ল
একথাটার উল্লেখও বাহুল্য—

মানবে না কি অনুমানেও অন্তত ভাই ?
মানবে ভেবেই বললাম না আর কিছু তাই
থুড়ি—শুধু : সেই ঠাণ্ডায় অধমাঙ্গ যাচ্ছে যখন জ'মে
উত্তমাঙ্গ উঠছে ঘেমে তুলুনি আর উৎসারণের শ্রম।
তার উপরে—ক্রমে হ'ল কক্ষ বায়ুজমাট
যেদিকে চাই—বিভীষিকা—কৃতান্তবৎ কপাট !
উপরন্তু (কর্ম বিনা) করছে সবাই সেই কাজ
যেটার পুনরুক্তি করতে পাই লাজ।

তবে এ-দুর্ভোগে আমার লাভ হ'ল এক এই :
জানতাম অন্ধকূপই আছে আকাশকূপ তো নেই—
দেখলাম এটাই ভ্রান্ত-জানা,
সে-ও থাকে যার নেই ঠিকানা
অভিধানে নাস্তি যে—রয় জীবনগীতায় সে-ই।
আরো এবং সেটা বন্ধ !—আরো ভয়ঙ্কর !---
কারণ যেটা হাল্কা ভাবি হ'লে সে দুভর
চরণ টলে মন কূল না পায় যে
মুক্তিলভেও খাঁচা !—দেখে প্রাণ করে হায় হায় যে !
সত্যিই তো খাঁচার খাঁচা বন্ধুবর !
ভাবো দেখি, উঠতে যেতেই ঠুকল মাথা !—অতঃপর
আরও কি চাই ব্যাখ্যান ? যাক্, নেই চিত্তের সায় যে।
তাই কোরো ভাই আন্দাজ আজ সেটা—
বীরত্বের ঐ ঝোঁকে আমার বাধল কোথায় লেঠা।
"যার কাজ হায় তারেই সাজে অন্যজনে লাঠি বাজে"—এটা
(জয় হে ভারত !) বুঝেছিলাম সেদিন হাড়ে হাড়ে
বিমান যখন ক্রয়ডন এসে হুহুস্বরে নামল
ভাবলাম আমি ফুশফুশের ঐ ধুকধুকিটি থামল !
সান্ত্বনা এক—পাশের সায়েব সঙ্গীটিরো নাড়ী ছাড়ে ছাড়ে।

ক্ষীণ হাস্যে বললাম আমি : "সায়েব, এত ভয় কি ?"
বলল সায়েব : "কী বলছ ? ড্যাম্, ভরসা হেথা রয় কি ?
রগ ঘেঁষে আজ বেঁচে গেছি—ভবিষ্যতে আর
বিমানে রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হ'লেও বলব : 'খবরদার,
অতি-লোভে তাঁতি নষ্ট ওরে মন !
নভচারণ নামটিও নয়—কথা শোন্
ডাঙার মানুষ ডাঙায় থাকুক বেঁচে বর্তে—টায় টায় !
বল্ দেখি, কোন্ বিড়ম্বনার ঘূর্ণীবায়
কার উদ্দেশে চাস যেতে তুই উড়ে ?
বজ্রবাদল ফুঁড়ে
রাখ্ বেকুবি, মাটির ছেলে থাক ওরে তুই মাটির কোলই জুড়ে।
স্বর্গ ? যদি থাকতই সে হাওয়ায়
মর্ত্য আশার অকূলে সে কোন্ চাষা নাও বাওয়ায় ?
তর্কে এঁটে পারবি নে তুই, এম্নি দেব তুড়ে।"
ব্যথা দিয়ে বুঝে ব্যথা
সায়েব যখন বলল টেনে মনের কথা
নতুন ক'রে বুঝলাম আমি যেন আবার বন্ধুবর
মিথ্যে ঋষি বলেন নি যে, নিরন্তর
টাঙিয়ে রাখা চাই মনে যে, নিজধর্মে নিধনও
ভালো পরধর্ম চেয়ে—তাই উড়ো ঐ ম্লেচ্ছ জাহাজ কক্ষনো
চড়ব না আর, চড়ব না আর, চড়ব না—
তিন সত্যি করলাম—আমি মর্তবাসী অমর্তে ঘর গড়ব না !
ঘর তো না, সে 'ঘরের ডবল'--থাকতে হ'ল ছিপি এঁটে কানে !!
এমন কর্মভোগের কী যে মানে !!!
আমোদ ব'লে চাই কাকে, হায়, তাই কি মানুষ জানে ?
ঋষিই তো নয়, বিশ্বকবিও বলেন নি কো মিথ্যে :
"যা চাই তা ভুল ক'রে চাই"
ঠিক যে কী চাই জান্তে তা ভাই
চাই কিন্তু বুদ্ধি এবং বিত্তে।
তবে কিনা দশচক্রে বুদ্ধিলোপ
বিত্তেও সেই ঝোপ বুঝে হায় মারে কোপ :
কুমন্ত্রণা দেয় কানে যে চাই মানুষের কীর্ত্তিলোভ।

তাই তো যখন পৌছুলাম ঐ ক্রয়ডনে
টলছে চরণ ঘুরছে মাথা বন্‌বনে
শ্বেতাঙ্গিনী হোস্‌টেসকে বললাম হেসে : "বান্ধবী !
কী আনন্দ যে—সাধে কি 'জয় বিমানের'—গায় কবি !
হবেই তো—এ কে না জানে ?
গাছও তাকায় আকাশ পানে
নরই শুধু রইবে ধূলায় ?—তাছাড়া—বাঃ, নীল আকাশের
কোল পেলে
নটরাজের রোমান্সের ঐ দোল খেলে
মাটি মায়ের আঁচলে চায় থাকতে বাঁধা কোন্ ছেলে ?
ব্রেভ্‌রা ছাড়া কে মঞ্জু স্বয়ম্বরার মন পেলে ?

মে—১৯৪০

দিলীপ

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কবি আত্মিক সম্পর্কে বিশ্বমানবের আত্মীয়। তবু বাঙ্গালীর কাছে তিনি তাঁর সোনার বাংলার কবি। ব্রাহ্মসমাজের 'ইষ্ট গোষ্টির' মধ্যে তিনি আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর পরিধিকে লক্ষ্য করে একথা বলছি না। ব্রাহ্মসমাজের চতুরঙ্গ উপাসনা, জাতকর্ম্ম, জন্মতিথি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয়, বোধ করি শতকরা তার নব্বইটি রবীন্দ্রনাথের গান। সান্ধ্য মজলিশে চায়ের বৈঠকে শুনি কবির প্রেমসঙ্গীত। সে ত আজ নয়, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা বলছি। তখন এই ব্রহ্মমন্দিরের সামনে রাস্তার ওপারে লাহাদের বাড়ীটি ছিল বহু ব্রাহ্ম-পরিবারের আস্তানা। এই বৃহৎ অট্টালিকার দক্ষিণাংশে ছিল পুরাতন হিন্দুগৃহের ঠাকুর দালান, সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেদিন এই ঠাকুরদালানে বসেছিল বিলাত থেকে অভ্যাগত একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান কোনো বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনা সম্মিলন, তখনকার "ব্রাহ্মবন্ধু সভা"র নিমন্ত্রণে। আমি তখন কিশোরবয়স্ক। কবিকে সেই প্রথম দেখলাম সেই দীপোজ্জ্বল উৎসবক্ষেত্রে। শুধু চোখের দেখা নয়, শুনেছিলাম তাঁর দুটি গান আনন্দ ও বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে। দীর্ঘ ঋজু দেহ আস্কন্ধবিলম্বিত কুণ্ডলায়িত অলকদাম। পরিধানে ছিল ইজার ও আজানুবিলম্বিত আচ্‌কান, বুকের উপর বোতামের সারি। উত্তরকালে যখন Gœthe in Wemierএর ছবি দেখেছিলাম তখন আমার সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়েছিল। কবি তাঁর "মায়ার খেলা" থেকে যে গান দুটি গেয়েছিলেন আজও তার ঝঙ্কার যেন কানে বাজে। প্রথমটি—"কি হল আমার বুঝিবা সজনী, হৃদয় আমার হারিয়েছি।" দ্বিতীয়টি—

"অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বারবার ফিরে আসে
তবে ত ফুল বিকাশে।"

তিনসপ্তকবিসর্পী সে প্লুত মধুর কণ্ঠস্বর। সুরলোকের স্বর্গমর্ত্তপাতালে তার অবাধ পরিক্রমা। কবির যৌবনের সেই কণ্ঠধ্বনি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝ্‌বেন আমার এ বর্ণনায় অত্যুক্তি নেই। যাঁরা শোনেনি তাঁদের কী বলে বুঝাব?

রবীন্দ্রনাথ গানের গঙ্গোত্তরী। তাঁর গানের কথাও সুর "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" কর্ণের কুণ্ডলকবচের মতই বাক্যের সঙ্গে তান সহজাত। তাঁর সুরসৃষ্টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যত হয় ততই ভাল। তবে এই কথাই মনে হয়, পাখীর পালক যেমন বিচিত্র রঙে গজিয়ে ওঠে তার ত্বক ভেদ করে, তেমনি তাঁর গানের কথাগুলি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে সুরে সুরে। বুঝি আরও নিবিড়তর তাদের সম্পর্ক, কথাগুলি যেন বাষ্পীভূত হয়ে গেছে সুরে, সুর ঘনীভূত হয়ে জমাট বেঁধেছে কথার স্ফটিকগুচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট টেক্‌নিক্ বা কায়দা আছে। সেটাকে আয়ত্ত করতে হলে প্রবেশ করতে হবে তার ভাবের অন্তঃশীলায়। নতুবা কেবল সুরের কারচুপি দিয়ে তার অন্তর্গূঢ় স্বরূপটি ফুটাবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে বীজ বপন করেছেন এবং করছেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তার সোনার ফসল ফলাতে হলে চাই সর্বাগ্রে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে তার অনুকূল বৎসল ভূমি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শুদ্ধি ও সত্যের আশ্রয়। কবিতায় গানে প্রবন্ধে উপন্যাসে তিনি যে প্রেরণা আজ অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক বাংলাদেশকে দিয়ে আসছেন, সেই আদর্শ ও ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে আমরা যদি যত্নবান না হই, তবে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা আমাদের পক্ষে ভস্মে ঘৃতাহুতির মতই নিষ্ফল হবে।

বিধাতার আশীর্বাদে আজও তাঁকে আমরা হারাইনি আমাদের এই দুর্গতির দিনে। তাঁর নশ্বর জীবনপদ্মে অশীতিতম দলটি নবোদ্ভিন্ন হল সেই আনন্দে আজ আমরা সমবেত হয়েছি এই উৎসব সভায়। তিনি শতায়ু হোন, পূর্ণশতদলে ফুটুক তাঁর পার্থিব পরমায়ু, এ প্রার্থনা স্বাভাবিক হলেও লৌকিক প্রার্থনা। অদ্য বর্ষশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রবম্। কোনো প্রার্থনাই ত দেহকে মৃত্যুঞ্জয়

করতে পারবে না। কিন্তু যে অমরদীপটি তিনি জ্বেলেছেন তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনায়, তার শিখায় যদি আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বলে, তবে এই জন্মোৎসবের রাত্রি হবে দীপান্বিতা আমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের দীপালিমালায়।

আমার মগ্ন চৈতন্তে ছিপ ফেলে কবির দুএকটা পূর্বস্মৃতি ধরে তুলব বলে বসেছি। ফাৎনা নড়তেই হ্যাঁচ্‌কাটানে যা উঠল এইখানে লিপিবদ্ধ করি। ১৯১২ সনের কথা বলছি। তখন Long vacation ছুটি, Cambridge থেকে Londonএ এসেছি। শুনলাম কবি একটা operation করে Chelseaতে একটি বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বিরামশয্যা আশ্রয় করেছেন। গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি একটা লম্বা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে পা মেলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করছেন। মনে হল বড় দুর্বল, আস্তে আস্তে কথা বলছেন। ইতিপূর্বে কেম্ব্রিজে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কেম্ব্রিজ কেমন লাগল? স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরেই বল্লেন, হ্যাঁ, ভালই লাগল। দেখা হল অনেকের সঙ্গে, কিন্তু একটি লোকের কথা মনে হচ্চে কেবল—আপনাদের বার্ট রাসেল—রাসেলের নাম উচ্চারণ করবামাত্র হঠাৎ যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ তাঁর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে গেল। তড়াক্ করে উঠে বসলেন সোজা হয়ে এবং উৎসাহদৃপ্ত মুখে বল্লেন, ‘এক একটা কথা বলে যেন বুকে ঘুঁষি মারে, বলেই সেই সঙ্গে সজোরে মারলেন নিজের বুকে এক ঘুঁষি। ছোট্ট বদ্ধ শয়নকক্ষ, জানালায় সার্শী আঁটা। সেই ঘুঁষির দমকে কাচের সার্শীগুলি ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী, শুনলাম উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার কলকল্লোল। প্রাণবান মানুষ যখন জলজ্যান্ত মানুষের সংস্পর্শ পায়, সে দৈব মিলন হয় এমনি প্রাণোচ্ছল! সিংহের সঙ্গে সিংহের হয়েছিল কোলাকুলি। সেই স্মৃতি মনে জাগ্‌বামাত্র উদ্বেলিত হয়ে উঠল পুরুষসিংহের ক্ষণোদ্দীপ্ত উল্লাসনর্ম।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের জীবনের বড় একটা ট্রাজেডি বোধহয়, ‘ব্রব্‌ডিগ্‌নাগ্’ হয়ে আমাদের মত লিলিপুটিয়দের মধ্যে বসবাস করা। কার সঙ্গে হবে তাঁর অন্তরের মিতালী, চিন্তা ভাব ও স্বপ্নের বিনিময়? ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ভীরুতা হিংসা দ্বেষ দলাদলির মধ্যে যারা শতপাকে জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অবকাশ কোথায়? ইয়োরোপে মনস্বী ও মহাপ্রাণ লোকের সংস্পর্শে আসার আনন্দ তাঁকে যে প্রতীচ্যের তীর্থযাত্রায় বারবার আকর্ষণ করেছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কবির বিশ্বভারতী পরিকল্পনার মূলে রয়েছে গণ্ডীবন্ধনহীন উদার অসাম্প্রদায়িক মনীষার সঙ্গে নিখিলমৈত্রী-পিপাসু প্রেমপ্রবণ হৃদয়। তাই প্রেমানন্দে গেয়েছেন—

“কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।”

কদিন আগে গিয়েছিলাম রাঁচিতে, একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচিতে। সেখানে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে হাজিরা দেবার হাত-থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আমার এক গীতকুশলী আড়কাটি নাতিকে যে তিনটি গান ঘুঁষ দিয়ে এসেছি, তারই একটি উদ্ধৃত করে আজ কবির জন্মদিনে তাঁর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

তোমার সোনার বাংলার তুমি কবি,
অস্তাচলের রবি।
ক্ষুদ্র কালের মাপে
বরষের ধাপে ধাপে
এ অশীতিতম কনকশিখর পরে
হেরি শাশ্বত তব যৌবন ছবি।

তব হিমগিরি হ’তে
বহে অনাবিল স্রোতে
আশা ভালবাসা করুণার পূতধারা,
সীমার মাঝারে সীমা বন্ধনহারা,
সুরধুনীতটে ছায়া ঘন কী অটবী।

রুদ্র মধুর সুললিত তব বাণী
বিষাণে বেণুতে জাগরণ দেয় আনি
ফুলে ঋতুরাজ, নটরাজ তাণ্ডবে,
পার্থ-সারথী সংগ্রামে বিপ্লবে,
তুমি ও কবিতা শিব সনে ভৈরবী।

২৫শে বৈশাখে শিবনাথ স্মৃতিমন্দিরে ব্রাহ্ম যুবসমিতির অধিবেশনে কথিত।

গীতায় শক্তিবাদ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন

গীতা পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকথিত উপদেশ-মালা। একজন সিদ্ধ সাধক গীতাকে 'জগন্মাতার স্তন্যধারা' বলিয়াছেন। তিনি গীতাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সত্য সত্যই গীতা সৃষ্ট জীবের মা, যাঁহার অমৃত-ধারা পান করিয়া জগৎজীবন পুষ্ট হয়। গীতার বহুস্থানে শক্তি মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গীতা ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা। গীতার গুহ্য নামগুলি কীর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

গীতাকে নিম্নলিখিত নামে অভিহিত করা হয়, যথা—

গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥

জীব যদি স্থিরচিত্তে এই নামগুলি জপ করে, তাহা হইলে জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করিয়া দেহান্তে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলিতেছেন যে, এক শক্তিমান্ দেব কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি কারণ সকলকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন; তাঁহারই আত্মভূতা ও নিজপ্রভা দ্বারা সংবৃতা শক্তিকেই ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়া কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই শক্তি 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্'। শ্বেতা—১।৩

'The Supreme Sakti belongs to God Himself, hidden in Her own qualities.'

সেই দেব 'বহুধা শক্তি যোগাদ্ বর্ণানেকান্ নিহিতার্থো দধাতি' অর্থাৎ তিনি নিজ নানা শক্তির দ্বারা বহুবিধ বর্ণসকল উৎপাদন করিয়া থাকেন। সেই শক্তি 'স্বগুণৈ নিগূঢ়াম্'—'বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ'—অর্থাৎ নিজ গুণ দ্বারা সংবৃতা এবং বাক্য ও অর্থের ন্যায় শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন।

সেই দেব স্ত্রী, তিনি পুরুষ, তিনি কুমার, তিনি কুমারী।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী। শ্বেতা—৪।৩

তিনিই বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। 'জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ'।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—শ্বেতাশ্ব—৪।১০

অর্থাৎ মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে। শ্রীভগবান গীতাতে প্রকৃতিকে 'স্বাং প্রকৃতিং' বলিয়াছেন।—গীতা—৯।৮

শ্রীভগবান্ তাঁহার শক্তিরূপা প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মপরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব এই জড়জগৎ ও জীবজগৎ শ্রীভগবানের মায়াশক্তিরই মূর্ত্তি। শ্রীভগবানেরই অধ্যক্ষতায় তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করেন।

এই জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য এবং ঈশ্বর সেই মায়াশক্তির আশ্রয়। কেবল কার্য্যের দ্বারা সেই মায়াশক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু মায়ার সমুদয় কার্য্যই মিথ্যা।

বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অব্যক্ত শক্তি থাকে, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই শক্তি নাম ও রূপ এই দুই প্রকার। ব্রহ্মের সেই মায়াকেই অব্যক্ত শক্তি বলা হয়। ব্রহ্মের একই শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দুই প্রকার। গীতাও এই কথা বলিয়াছেন, যথা—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥২।২৮

ভূতসকল আদিতেও অব্যক্ত, নিধনেও অব্যক্ত, মধ্যে কিছু সময় ব্যক্ত মাত্র অর্থাৎ জন্মের পর মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছুদিনের জন্য ব্যক্ত হয় এবং আবার মরণের পর পুনরায় অব্যক্ত হইয়া যায়। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই জগতের অনন্ত পদার্থ অবস্থিত আছে। নাম, রূপ ও স্বভাবের বিভিন্নতা-বশতঃই পদার্থ সকল নানাপ্রকার হইয়াছে।

জগৎপিতার জননশক্তিই মায়া। এই মায়া গুণময়ী এবং দৈবী।

মায়া সম্বন্ধে শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া—৭।১৪

অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণা দৈবী মায়া আমারই শক্তি। এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা "সর্ব্বমিদং জগৎ মোহিতং" (গীতা—৭।১৩) অর্থাৎ সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়াছে, কিন্তু 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' (গীতা—৭।১৪) অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, সে এই মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে।

গীতা জগন্মাতার আকর্ষণীশক্তি, যাহা জীবের মনের বিষয়াভিমুখী গতিকে শ্রীভগবানের দিকে আকর্ষণ করে। গীতা পরমা প্রকৃতি।

গীতা বেদত্রয়ী অর্থাৎ জননী বেদ, তত্ত্বার্থ জ্ঞানমঞ্জরী। আমরা মহামায়ার গর্ভসঞ্জাত জীব, তাঁহারই অঙ্কে ধৃত, তাঁহারই জ্ঞান-স্তন্যে পুষ্ট। গীতা ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন।

নির্গুণ চৈতন্যে যখন বহুভাবে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন তিনিই মায়ারূপে অভিব্যক্ত হন। সেইজন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥১৪।৩

হে ভারত! মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমার বীজাধান স্থান, আমি তাহাতে জগদ্ বিস্তারের হেতুভূত ভূতসকলের বীজ নিক্ষেপ করি, তাহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

অতএব মহামায়া আমাদের গর্ভধারিণী জননী। মানুষ হইয়া যদি মহামায়াকে মা বলিয়া না চিনিতে পারি, তবে আমাদের মনুষ্যজন্মই বৃথা। শ্রীগীতা আমাদের মাকে চিনিবার উপায় বলিয়া দিয়াছেন।

শ্রীভগবান গীতায় উপদেশ দিয়াছেন যে তিনিই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ। গীতা—৭।১৭

পুরুষ প্রকৃতির অতীত—'তমসঃ পরস্তাৎ'—গীতা—৮।৯—'প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ'—বিষ্ণুপু—৫।১।৪২ ; কিন্তু পুরুষই প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসকলকে অর্থাৎ সুখদুঃখাদিকে ভোগ করেন।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।—গীতা—১৩।২১ প্রকৃতিস্থ পুরুষই জীব।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে জীবাত্মা সত্ত্ব রজঃ তমোরূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রজাসৃষ্টিকারিণী প্রকৃতিকে ভোগ করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আছেন, আর ঈশ্বর ভোগদায়িকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া তদতীত হইয়া অবস্থিতি করেন।

অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগামজোঽন্যঃ॥ শ্বেতা—৪।৫

পুরুষ সহযোগ বিনা কেবল শক্তি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয় না। এই বিষয়ে গীতা বলিতেছেন যে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।৯।১০

অর্থাৎ আমার অধ্যক্ষতা দ্বারা প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥৯।১০

এই প্রকারে জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই জগদ্ভাবের রচনা দ্বারা ঈশ্বরের পরিপূর্ণতা নষ্ট হয় না, তিনি সর্ব্বসময়েই পূর্ণ আছেন ও থাকেন।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

পরম পুরুষ হইতে প্রকাশিত এই ব্যক্ত জগৎকারণ ও এই জগন্মূর্ত্তি ঈশ্বর, ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির করিয়া লইলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। যোগ, বিয়োগ, গুণ বা ভাগের দ্বারা পূর্ণের পূর্ণত্ব অবিচ্যুতই থাকে।

শ্রুতি ব্রহ্মকে সকলের যোনি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান কারণ, তাহা সিদ্ধান্ত হয়।

গীতাও এই কথা বলিয়াছেন—

বীজ মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।৭।১০
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।১০।৮
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥৭।৬

অতএব ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ।

আবার কাশকৃৎস্ন বলেন যে পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করেন। গীতাও সেই কথা বলেন, যথা—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥১৩।৩১

অর্থাৎ জীব পরমাত্মাই বটেন। শরীরে স্থিত হইলেও জীব কোন কর্ম্মের কর্ত্তা নহেন এবং কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না। সকল কর্ম্মপ্রকৃতি বা ভগবানের মায়া শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়।

গীতা বলেন যে—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।৩।২৭

প্রকৃতির গুণত্রয় সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে। প্রকৃতি শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন, কারণ "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদং" এবং বাসুদেব "সর্ব্বক্ষেত্রেষু" "সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।"

অতএব গীতার সিদ্ধান্ত এই যে শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন এবং দুই নিত্য যুক্ত। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ; তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়তঃই এবং তাঁহাকেই জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। জীবের আশ্রয়ের নিমিত্ত তিনি ভিন্ন অন্য পন্থা নাই।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥ শ্বেতা—৬।১৫

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা ও আত্মযোনি। তিনি জ্ঞানী, গুণী ও সর্ব্ববেত্তা। তিনিই সাংসারের মোক্ষ. স্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ। তিনি ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় কেহই নাই। যিনি এই এককে দর্শন করেন, তিনিই সম্যক্‌দর্শী। দ্বৈতদর্শীর মোক্ষ হয় না।

কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাঁহার দর্শন হয় না, কারণ তিনি যোগ মায়ার অন্তরালে থাকেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হন না।

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। গীতা—৭।২৫

খুব নিবিড়ভাবে গীতাকে অধ্যয়ন করিলে, ইহা বুঝা যায় যে ভগবান্ বাসুদেব গীতাতে শক্তির গুহ্যতম রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা সেই পূর্ণ পুরুষোত্তমোত্তম পরাৎপর পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিলাম।

চম্পা ভ্রমণ

স্বামী সদানন্দ গিরি

বর্ত্তমান কোচীন চীন ও আনাম

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অগাস্ট ফরাসী ইন্দোচীনের রাজধানী সাইগন হইতে সকাল ছয়টায় ছাড়িয়া বিকাল তিনটায় গাড়ি ফান্-রাং পৌঁছছিল। পথিমধ্যে দুই জায়গায় ফান্-থিয়েত (Phan-Thiet) ও ফান্-রিতে (Phan-Ri) পাহাড়ের উপর প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ফান্-রাং (Phan-Rang) সাইগন হইতে দুই শত মাইল দূরে অবস্থিত। গাড়ীতে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতবাসী, বাকী সব আনামী। ফান্-রাং (সংস্কৃত—পাণ্ডুরঙ্গ) স্টেসনে নামিয়া বাহিরে আসিতেছি, এমন সময় মথ্‌মৎ খাঁ নামক একজন পাঠান ভদ্রলোক বলিলেন, "ভাই বন্ধু, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" আমি বলিলাম, "সাইগন্ হইতে এখানে মন্দির দেখিতে আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "বেশ ভাল, আমার বাসায় থাকিবে চল।" আমরা দুইজনে তাঁহার বাসায় গেলাম। মথ্‌মৎ খাঁ রেলে কাজ করেন। জিনিস-পত্র রাখিয়া আমরা মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরটি স্টেশন হইতে দেখা যায়।

থাম —সুদূর ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে

প্রাচীনকালে ফান্-রাং চম্পার একটি বড় পোতাশ্রয় ছিল। নাম ছিল পাণ্ডুরঙ্গ। স্টেশনের আধ মাইল দূরে ছোট পাহাড়ের উপর তিনটি প্রাচীন মন্দির; দুইটি ছোট ও তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। মন্দিরের নাম পো-ক্লাংগ-রাই (Po-Klang-Rai), সংস্কৃত শ্রীলিঙ্গরাজ কথার রূপান্তর মাত্র। মন্দিরগুলি ছোট পাহাড়ের উপর অর্দ্ধ ভগ্ন অবস্থায় আছে। চ্যামেরা মন্দিরের নিকট একটি নূতন অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে। চম্পার অধিবাসীদের চ্যাম বলে। ইহারা এখনও নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে পূজা দিতে আসে। প্রধান মন্দিরটি লিঙ্গরাজ শিবের। মন্দিরের দরজায় খিলানের উপর একটি মনোহর শিবমূর্ত্তি আছে। যবদ্বীপ ও কম্বোজের স্থাপত্যের বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে প্রত্যেকটি স্থাপত্যের একটি না একটি বৈশিষ্ট্য আছে। শিবমূর্ত্তির ছয়টি হাত। উপরের দুই হাতে বজ্র ও পদ্ম, মাঝের দুই হাতে খড়্গ ও পাত্র, নিচের দুই হাতে কি আছে দেখা যায় না। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেই একটি পাথরের নন্দীমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। নন্দীর সম্মুখে মুখলিঙ্গ ও তিনটি পাথরের হাতী আছে। রাজা জয় বর্ম্মণ তৃতীয় বোধ হয় ১৩০০ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের বিশেষ কোন কারুকার্য্য নাই। মন্দিরের গায়ে কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। চ্যামেরা এখনও পূজার সময় অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় এই মন্ত্র ব্যবহার করে যথা:—ওঁ পরমেশ্বর পরমেশ্বরাভ্য নোমো পরমেশ্বর মুখ থাই নোমো। শিবভ্য নোমো। ওঁ ওঁ শিবোম তুবংশিদ্ ষিবায় নোমঃ স্বাহা।

এই মন্দিরে চারিটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মন্দির দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, রাত্রে

আহারাদি করিয়া সকালে ফান্-রাং শহর দেখিতে গেলাম। শহরটি ছোট এবং বেশ পরিষ্কার। একটি মাদ্রাজীর দোকানে উঠিলাম। তিনি আমাদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন ও খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলা বাহুল্য আমরা ভোজনান্তে বিশ্রাম করিয়া চ্যামেদের গ্রাম দেখিতে গেলাম। স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে মুসলমান চ্যামদের গ্রাম, ইহারা খুব গরীব। হিন্দু ও মুসলমান চ্যামদের পোষাকে ও ভাষায় কিছু পার্থক্য নাই। মুসলমান চ্যামেদের গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে হিন্দু চ্যামেদের গ্রাম। আমরা একটি হিন্দু চ্যামেদের বাড়ী প্রবেশ করিলাম। বাড়ীর কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন, “কে তোমরা ?” আমার সঙ্গী মথ.মৎ খাঁ বলিলেন, “ইনি ভারতবর্ষ হইতে তোমাদের দেশ দেখিতে আসিয়াছেন।” কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি ঘরে বসিতে দিলেন। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মন্দির দেখিয়াছ ? উহার গায়ে কি লেখা আছে পড়িতে পার ?” বলিলাম, “না।” কর্ত্তা মন্ত্র বলিলেন—তাহার মধ্যে উং, স্বাহা ভিন্ন কোন কথা বুঝিতে পারিলাম না। সমগ্র দক্ষিণ আনামে ত্রিশ হাজার চ্যামের বাস, তন্মধ্যে বিশ হাজার হিন্দু ও দশ হাজার মুসলমান।

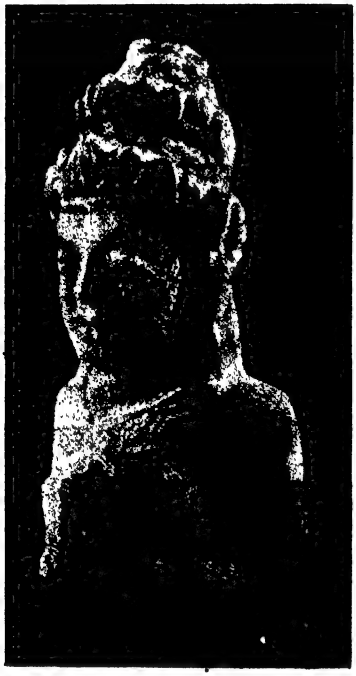

অপ্সরা

„ স্কন্দ (ময়ূরের গলা ও লেজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে)

নর্ত্তকী

—সুদূর ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে

“বর্ত্তমান চ্যামেদের ভাষা থেকে এখনও সে সংস্কৃত প্রভাব নষ্ট হয় নাই। দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করে তাহার ভিতর অনেক সংস্কৃত কথা রূপান্তরিত হইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডুরঙ্গ চ্যামেদের যে কয়েকটি শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার দুই-একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

দিকের নাম—পুব—পূর্ব্ব, দক্—দক্ষিণ, উৎ—উত্তর, অগ্রি—অগ্নি, নৈলত—নৈঋত, বাহোপ—বায়ু, এষন্—ঈশান্।

সপ্তাহের দিনগুলির নাম—থোম—সোম, এঙ্কর (আঙ্গিরস)—মঙ্গল ; বুথ—বুধ, জিপ—জীব, বৃহস্পতির নামান্তর, সুক—শুক্র, অন্থর—শনৈশ্চর-শনি, আদিৎ—আদিত্য-রবি, সূর্য্যের নাম আদিৎ-আদিত্য ; শহরের নাম নোকর—নগর, মন্দিরের নাম মোধির, রাজাকে রায় ও মন্ত্রীকে

মোত্রি বলে। চ্যামেদের ভাষায় সংস্কৃতের আরও অনেক প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাহাদের যে সব ধর্ম্মকথা রহিয়াছে সেগুলি সমালোচনা করিলে আরও অনেক পরিচিত শব্দ পাওয়া যায়।” শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয় প্রণীত “ভারত ও ইন্দোচীন”, ৭৭।৭৮ পৃষ্ঠা

কার্ণিস —সুদূর ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে

চ্যামেদের গ্রাম দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে ফান্‌-রাংয়ে থাকিয়া না-ত্রাংয়ে যাত্রা করিলাম। না-ত্রাং, ফান্‌-রাং হইতে একশত মাইল দূরে। সকাল আটটায় ট্রেণে চড়িয়া বেলা এগারটায় না-ত্রাংয়ে পৌঁছিলাম। নামিয়া একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে বলিলাম, “পো নগরের মন্দির দেখিতে আসিয়াছি, এখানে থাকিবার কোন স্থান আছে বলিতে পারেন?” ভদ্রলোকটি বলিলেন, “ইংরেজী জানি না, আমি ফরাসী।” আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি ভারতবাসী নন?” তিনি বলিলেন, “না”। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার দেশ কোথায়?” তিনি বলিলেন, “মাহে (Mahey)। মাহে কোথায় আপনি জানেন?” বলিলাম, “মাহে নর্থ আমেরিকায়।” ভদ্রলোকটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। এমন সময় একজন ফরাসী যুবককে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলাম, “আপনি আমাকে যদি কিছু সাহায্য করেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হই।” যুবকটি বলিলেন, “কি উপকার চান্?” আমি বলিলাম, “আমি এখানে মন্দির দেখিতে আসিয়াছি, এদেশের ভাষা জানি না। হোটেলে থাকিবার যদি কোন ব্যবস্থা করিয়া দেন্।” যুবকটি একটি রিক্‌স ভাড়া করিয়া দিলেন এবং রিক্‌স-ওয়ালাকে দশ সেণ্ট ভাড়া দিলাম। হোটেলের লোক আসিয়া একটি ঘর খুলিয়া দিল। জিনিসপত্র রাখিয়া ঘরে তালা বন্ধ করিয়া দিলাম। হোটেলের ফটকে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি কি করিয়া মন্দির দেখিতে যাইব, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না, কারণ ইহাদের ভাষা জানি না। এমন সময় একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারীকে মোটরে যাইতে দেখিয়া হাত দেখাইয়া থামিতে বলিলাম। তিনি মোটর থামাইলে তাঁহাকে বলিলাম, “এখানে মন্দির দেখিতে আসিয়াছি, এ দেশের ভাষা জানি না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় মন্দির দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিন।” সামরিক কর্ম্মচারীটি একটি রিক্‌স ভাড়া করিয়া দিলেন ও রিক্‌সওয়ালাকে মন্দির দেখাইয়া আনিতে বলিলেন এবং হোটেলে ফিরিয়া আসিলে চল্লিশ সেণ্ট ভাড়া দিতে বলিলেন। হোটেলের ভাড়া দৈনিক পঞ্চাশ সেণ্ট।

নাত্রাং নগরটি বেশ মনোরম। উত্তর দিক হইতে নদী আসিয়া সাগরে পড়িয়াছে। নদীর পরপারে উচ্চ পাহাড়ের উপর প্রাচীন কৌঠারের ভগ্নাবশেষ। নাত্রাংয়ের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই আনামী, ক্বচিৎ দুই-একটি গ্রাম দেখা যায়।

মকর —সুদূর ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে

রিক্‌স্ চড়িয়া (বর্ত্তমান পো নগরের প্রাচীন পু-নগর) মন্দির দেখিতে চলিলাম, পথে দুইটি সেতু পার হইতে হয়। এইখানে

নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে। দৃশ্য অতি মনোরম। নদীর ধারে বনের মধ্যে পাহাড়; সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। উপরে উঠিলেই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ছয়টি মন্দির, তন্মধ্যে দুইটি প্রায় ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সিঁড়িতে উঠিয়াই সামনে একটি ছোট মন্দির। এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। দ্বিতীয় মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত বড়। এই মন্দিরেও শিবলিঙ্গ ও তাহার পাশে দুইটি পাথরের হাতী আছে। প্রাচীন মন্দিরটি কৌঠার দেবীর বা ভগবতীর। ভগবতীর মূর্ত্তি পাথরের। আনামীরা বৌদ্ধ মূর্ত্তি দ্বারা ভগবতীর মূর্ত্তি ঢাকিয়া দিয়াছে। প্রধান মন্দিরের পিছনে একটি ছোট মন্দিরে শুধু গৌরীপিঠ আছে। মন্দিরের সামনে একটি নীচু জায়গায় ষোলটি থাম আছে। তন্মধ্যে আটটির অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট আটটি ঠিক আছে।

মন্দিরের উপর হইতে সমগ্র না-ত্রাং শহর দেখা যায়। সম্মুখে চীন সমুদ্র, দৃশ্য বড়ই মনোমুগ্ধকর। পো-নগর দেখিয়া না-ত্রাংয়ে ফিরিয়া আসিলাম। না-ত্রাংয়ের নিকটে বো-চান (Vo-Can) নামক স্থানে চম্পার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই শিলালিপি বোধ হয় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর। “শ্রীমার রাজকুলব (ংশ বিভূষণে) ন শ্রীমার লো (ক) ন (ঋপতেঃ) কুলনন্দনেন”। পো নগরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

তুরাণ যাদুঘরের অভ্যন্তর —সুদূর ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে

শিলালিপিগুলি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাক্ষ্য দেয়। এই প্রাচীন পু-নগরই ছিল কৌঠারের রাজধানী। মন্দির দেখিয়া না-ত্রাংয়ে ফিরিয়া আসিলাম। স্নান করিয়া বাজার দেখিতে গেলাম। বাজারটি আমাদের দেশের মত। নানা রকম শাকসব্জী, মাছ, মাংস, ডাব নারিকেল এবং ফলের মধ্যে আতা কলা পেঁপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। না-ত্রাংয়ে আনামীদের খাবারের মধ্যে ছান, কাখজ ও নবদ্বীপের ন্যায় চালের গুড়ির সরুচাকলি ইত্যাদি অনেক রকম খাবার পাওয়া যায়, সম্ভবত দক্ষিণভারত হইতে চম্পায় ইহার প্রচলন হয়। হোটেলওয়ালাকে সঙ্কেতে কুইনন্ (Quinhon) যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলাম, হোটেলওয়ালা ইসারা ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা জিজ্ঞাসা করিল, “ট্রেণে যাইবে, না মোটর বাসে ?” বলিলাম, “মোটর-বাসে।” নাত্রাংয়ে সকাল ছয়টায় মোটর বাসে চড়িয়া বেলা দশটায় তুয় হোয়া (Tuy-Hoa) নামক স্থানে বাস বদলাইলাম। এই স্থানে পাহাড়ের উপর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় এবং উহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। চম্পার মন্দিরগুলি সবই প্রায় একই রকমের পাহাড় কিম্বা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। বেলা সাড়ে বারটার বাসে চড়িয়া অপরাহ্ণ চারিটার সময় কুইননে পৌছিলাম। ‘তেম বোম্বাই’ (বোম্বাই-ওয়ালার দোকান) এই কথা বলিয়া একটি রিক্‌সতে চড়িয়া বসিলাম। রিক্‌সওয়ালা একটি সিন্ধীর দোকানে লইয়া আসিল। সিন্ধীরা আনামের সর্ব্বত্র সৌখিন জিনিসের ব্যবসা করে। যে কোন ভারতবাসী আনামে আসিলে তাহাদের বাসায় বিনামূল্যে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। এখানে দুইটি মন্দির পাশাপাশি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে। কোন মূর্ত্তি নাই। কতকগুলি পাথর ছড়ান। মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। না-ত্রাং হইতে কুইনন্ পর্য্যন্ত চমৎকার রাস্তা। কোথাও ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া, কোথাও সমুদ্রের ধার দিয়া আসিতে হয়। কুইনন্ হইতে বেলা একটায় ট্রেণে চড়িয়া রাত্রি নয়টায় তুরাণে (Tourane)

এস-কুপ্ স্বামীর দোকানে আশ্রয় লইলাম। কুইনন্ শহরে ভ্যান-সনের নিকটে চারি-পাঁচটি মন্দির গাড়ী হইতে দেখা যায় এবং বিশ কিলোমিটার দূরে বিন-দিন (Binh-Dinh) ষ্টেশনের নিকট প্রাচীন বিজয়ের মন্দির দেখা যায়। চারিটি প্রদেশ লইয়া চম্পা রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। কৌঠার, বিজয়, পাণ্ডুরঙ্গ ও অমরাবতী—এই চারিটি প্রদেশ এক রাজার অধীনে ছিল। কৌঠার বর্ত্তমান খান্ হোয়া (Khan-Hoa) এবং রাজধানী ছিল না-ত্রাংয়ের নিকট। বিজয় বর্ত্তমান বিন-দিন্ এবং বন্দর ছিল শ্রীবিনয়। অমরাবতী বর্ত্তমান কুয়াং-নাম্ (Quang-nam)। অমরাবতীর রাজধানী ছিল ইন্দ্রপুর। ইন্দ্রপুরের ভগ্নাবশেষ, কুয়াং-নামের নিকট ডং-ডুয়াং নামক স্থানে একটি বন্দর ছিল—সিংহপুর। সিংহপুর বর্ত্তমান তুরাণ বন্দরের নিকটে ছিল। পাণ্ডুরঙ্গ কিছুকালের জন্য সমগ্র চম্পার রাজধানী হইয়াছিল।

শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দির : পাণ্ডুরঙ্গ
—সুদূর ফরাসী প্রাচ্য বিদ্যালয়ের সৌজন্যে

পরদিন সকালে আমরা তুরাণ যাদুঘর দেখিতে গেলাম। এই যাদুঘরে চম্পার সমস্ত মন্দিরের ফটো, দেব, দেবী, পশু প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে, যথা—শিব, শিব-লিঙ্গ, দ্বারপাল, তারা, উমা, গড়ুর, লোকেশ্বর, ঋষি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশ্বকর্ম্মা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, স্কন্দ, মকর, সূর্য্য, অপ্সরা, নর্ত্তকী, হাতী, রাহু, ষাঁড়, সিংহ, নাগ, বুদ্ধ, সীতা, চন্দনপিড়ি হইতে মানুষ খোদাই করা আছে। কৃষ্ণ, ষাঁড়ের উপর চব্বিশ হাতবিশিষ্ট শিব, চারি হাতবিশিষ্ট শিব, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, তের নাগের উপর চারি হাতবিশিষ্ট লক্ষ্মী, ষোল হাতবিশিষ্ট শিবের নৃত্য, একটি লম্বা পাথরের উপর সাতটি শিবলিঙ্গ ও একটি গৌরীপিঠে চারিটি শিবলিঙ্গ আছে। এই সব মূর্ত্তি ব্যতীত অনেক শিলালিপিও পাথরের থামের উপর খোদাই করা আছে। মূর্ত্তিগুলি সব পাথরের।

লিমু প্যাগোডা—লুলে

তুরাণ হইতে বেলা দেড়টার সময় ট্রেণে চড়িয়া সন্ধ্যা ছয়টায় হুয়ে (Hue) আসিয়া একজন সিন্ধীর দোকানে উঠিলাম। হুয়ে আনামের রাজধানী। আনাম ফরাসীদের করদরাজ্য। শহরটি নদীর তীরে অবস্থিত। নদীর ধারে বাগান। বাগানে বসিবার জায়গা ও পশুশালা আছে।

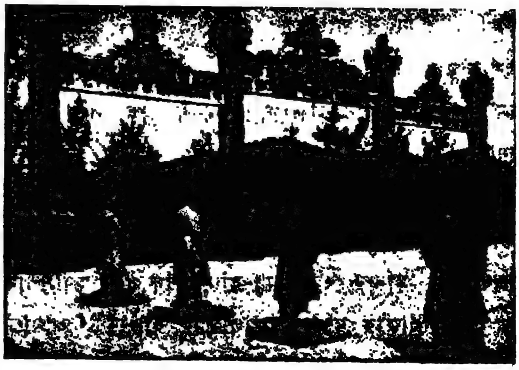

সম্রাট খাইজীনের সমাধি-মন্দির

রাস্তার মাঝখানে ঘাস ও তারপর আবার রাস্তা। এই রকম রাস্তাকে বুলভার্ড (Boule-Vard) বলে। নদীর সেতু পার হইয়া শহরে আসিতে হয়। সেতুর বামদিকে ছোট বাগান ও ডান দিকে বাজার। সেতু পার হইয়া কিছুদুর বামদিকে গেলে রাজপ্রাসাদের পথ। প্রথম পরিখা, তারপর প্রাচীর, প্রাচীরের পরিধি সোয়া ছয় মাইল। প্রাচীরের ভিতর পুরাতন সহর। সহরের ভিতর রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় অফিস আনামসম্রাটদিগের সমাধি, বিচারালয় ও খাই দিন (Khai-Dhin), যাদুঘর ইত্যাদি আছে। এই যাদুঘরে কাষ্ঠের নানারকম কারুকার্য্যবিশিষ্ট বাক্স, তৈলচিত্র, চীনামাটি, পাথর ও পিতলের নানাপ্রকার আনামীদের পূজা-পার্ব্বণের ও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস সংরক্ষিত আছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই যাদুঘরে চ্যাম বিভাগ খোলা হইয়াছে। ত্রা-কিও হইতে আনীত চম্পার অনেক স্থাপত্য ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আনামীরা বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী ও সৌখিন। আনামীদের বেশভূষা আচারব্যবহার চীনাদের মত। পুরুষেরা মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করে, আর স্ত্রীলোকেরা মাথার কেশ পাকাইয়া পাগড়ীর মত করিয়া রাখে। আনামের স্ত্রীলোকেরা পান খায় এবং ইহারা অত্যন্ত মিশুক। বিদেশীদের ভাষা না জানিলেও তাহাদের সহিত ইহারা কথা কহিতে ছাড়ে না। একসঙ্গে তিন-চারি জন কথা কয় এবং ইহাদের কথার জবাব না দিলে নিস্তার নাই। আমাকে যে সকল কথা ইহারা জিজ্ঞাসা করিত তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। বলিতাম আংলে নো ফ্রান্সে (Anglaesc-nc-Francaise) অর্থাৎ ইংরেজী জানি, ফরাসী জানি না। ইহা শুনিয়া অবশেষে তাহারা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িত। একদিন এক আনামীদের পল্লীতে প্রবেশ করি। প্রথমে তিন-চারিটি আনামী বালক আসিয়া কথা কহিল। তাহাদের ভাষা জানি না, উত্তর দিলাম না। ক্রমে ক্রমে বালকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং উহারা আমার কাপড় ও জামা ধরিয়া টানিতে লাগিল। পরিশেষে যখন বহু বালকে মিলিয়া আমার উপর ইট ছুঁড়িতে লাগিল, তখন সত্যই বিপদে পড়িলাম। বৃহত্তর ভারতের অন্য কোথাও এইরূপ বিপদে পড়ি নাই। হুয়ে হইতে প্রায় চারি কিলোমিটার দূরে লিন-মু-প্যাগোডা (Lin-Mu-Pagoda) আছে। নদীর তীর দিয়া এই স্থানে আসিতে হয়। স্থানটি অতি মনোরম। এই প্যাগোডায় কতকগুলি বিকট আকারের বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। প্রত্যেকটির মাথায় ত্রিশুল আছে ও প্রত্যেকের বিভিন্ন নাম আছে। চম্পা ভ্রমণ শেষ করিয়া তকিন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

সোনার শরৎ

কাদের নওয়াজ

মেঘ, ভেসে যায় ঐ গগন-পথে,
শরৎ আসিছে সখি! সোনালী পথে।
তার, সবুজ আঁচল দোলে তটিনী-কূলে,
পিয়াল তমাল-শাখে ঝালর ঝুলে।
সাদা, সিউলির হাসি ভাসে হাওয়ারি সনে,
তার, রেণু ল'য়ে পিচকারী দেয় কে বনে?
যেন, শ্রাবণে কাঁদিয়া কোন্ গৌরীমেয়ে
আজি, শরতে কাজল-চোখে রয়েছে চেয়ে।
তার, ঠোঁটেতে মেঘের মিশি, কবরীমূলে
শাপ্‌লার মালাখানি দোদুল্-দুলে।
উত্তরী যেন তার বকেরি সারি—
আলো-ছায়া রচে দেহে রেশ্‌মী শাড়ী।
ফোটে, নূপুর ধ্বনিতে তারি 'হিজল'-রাশি,
কেশর বুলায় গায়ে সিংহ আসি।
কবি, আবাহনী গায় তারি চারণবেশে,
এস, সোনার শরৎ এস বাংলা-দেশে।

মজলিস

ভাস্কর

(নাটিকা)

বৈঠকখানা রোডের একখানি দোতলা বাড়ির বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় একটি বৈঠক বসে। এই বৈঠকটি অতীব উচ্চাঙ্গের। পি. এচ. ডি., ডি এস. সি., ডি. লিট্ প্রভৃতি ব্যতীত অপর কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে বিলাতফেরত ও মহিলাপক্ষে গ্র্যাজুয়েট (অনার্স-সহ) হইলেও চলিতে পারে।

ইহাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাহাঁরা দুইটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী পাইয়াছেন; যেমন ড. ঘোষ (কলি.-ও-ঢাকা), ড. বোস (ঢাকা বারাণসী-চ), ড. মিটার (বনারস-ঔর-ঢেলি), ড. কর (ডেল্হি-অ্যাণ্ড্-লণ্ড.), ড. ব্যানার্জি (লোঁদ্র্-এ-পারি), ড. চ্যাটার্জি (পারি-উণ্ড-বের্লিন), ড. গাঙ্গুলি (বের্লিন-ই-রোমা) প্রভৃতি।

ইহাঁদের আলাপ-আলোচনা অতিশয় উচ্চশ্রেণীর। যাহাতে স্বাভাবিক মহাকর্ষের প্রভাবে কোন আলোচনা নিম্নস্তরে আসিয়া না পৌঁছে, সেজন্য এখানে সুব্যবস্থা আছে। প্রতি বৈঠকে একজন বিবেকরক্ষী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইঁহার চেয়ারের পশ্চাতে ঘরের আলোর সুইচ। আলোটি সাধারণত একশত-বাতি-শক্তি-বিশিষ্ট। সুইচ বোর্ডে একটি রেগুলেটর আছে। ইহা ঘুরাইয়া আলো কমান-বাড়ান চলে। আলোচনার বিভিন্ন স্তরে বিবেকরক্ষী মহাশয় রেগুলেটর দ্বারা ঘরের আলো কম-বেশি করিয়া আলোচনার লেভেল বৈঠকের অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহারাও তদনুসারে আলোচনার গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য নিয়ন্ত্রণ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন ব্রহ্ম-বিষয়ে আলোচনা হয়, তখন আলো স্বাভাবিক একশত-বাতি-শক্তিতেই থাকে; যখন দার্শনিক আলোচনা হয়, তখন থাকে নব্বুইতে; বৈজ্ঞানিক আলোচনার সময়ে আশিতে; ভূগোল-ইকনমিক্স্ প্রভৃতির আলোচনায় সত্তরে; ইতিহাসে ষাটে; সাহিত্যে পঞ্চাশে; সাইকলজিতে চল্লিশে; আর্টে তিরিশে; ইহার নীচে কোন আলোচনা নামিতে দেওয়া হয় না। কাহারও আলোচনা ইহার নীচে নামিতে চাহিলে, তাহার সেই আলোচনা ভাষার চাতুর্য দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আর্টের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া লওয়া হয়। মোটকথা এই বৈঠকের পাস-মার্ক তিরিশ বজায় রাখা চাই।

মজলিস বসিয়াছে। আজকার বিবেকরক্ষী ড. নন্দী। কথা আরম্ভ করিলেন ড. মুখার্জি।

ড. মুখার্জি। যাই বলুন, আমাদের ব্রহ্মের কন্‌সেপ্‌শন মানুষের চিন্তাজগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। (আলো—১০০)

ড. মিটার। কিন্তু এটাকে কন্‌সেপ্‌শন বলা ঠিক হবে কি? ব্রহ্মসম্বন্ধে কোন ধারণা তো আমরা করতে পারি না।

ড. মুখার্জি। ধারণা করতে পারি না বটে, কিন্তু তবু যুগ যুগ ধরে এদেশের সাধু এবং সাধকেরা এটাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা তো করেছেন---আর কেউ কেউ যে করেছেন, তা আমি বিশ্বাস করি।

ড দে। আমার কিন্তু মনে হয়, ব্রহ্মকে সমগ্রভাবে কেউ নিজ জীবনে, ধারণাই বলুন, আর উপলব্ধিই বলুন, করতে পারে না। যা অবাঙ্‌মনসো গোচরম্, যা অশব্দম-স্পর্শমরূপমব্যয়ম্, তাকে মানুষ মন দিয়ে ধারণা করবে কেমন করে? কতকগুলি নেগেটিভ অ্যাট্রিবিউট দিয়ে একটা অস্পষ্ট কল্পনা মাত্র করা যেতে পারে হয়তো।

ড. মিটার। শুধু নেগেটিভ্ কেন, একমেবাদ্বিতীয়ম্, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ প্রভৃতি পজিটিভ অ্যাট্রিবিউট-ও তো আছে।

ড. মুখার্জি। সাধকেরা বলেন, সাধনার ফলে ঐসব অ্যাট্রিবিউটের পর্দা সরে গিয়ে আসল জিনিষটা বেরিয়ে পড়ে, আর সেটা সাধকের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তাঁরা আরও বলেন, নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।

ড. দাস। কিন্তু সাধারণ লোকে তর্ক করবেই। যুক্তি তর্ক করতে করতেই তবে তর্কের বাইরে যেতে হবে। তবে কেউ যদি একেবারে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেন, তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা।

ড. মিটার। আমার তো মনে হয়, সাধারণের পক্ষে

কতকগুলো অ্যাট্রিবিউট্-এর কল্পনা করা ছাড়া উপায় নেই। সেইগুলো অবলম্বন করেই বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। উপনিষৎ সেই চেষ্টাই করেছে।

ড. চক্রবর্ত্তী। আমাদের ঈশ্বর বা ভগবান্ সম্বন্ধে যে ধারণা, সেও তো কতকগুলি অ্যাট্রিবিউটের সমষ্টি। (আলো—৯৫)

ড. ঘোষ। যাঁরা ধ্যান, ধারণা, তপস্যা করেন, শুনেছি, তাঁরাও কতকগুলি অ্যাট্রিবিউট বা সেগুলির প্রতীক কতকগুলি বাস্তব সুপরিচিত পদার্থের কল্পনা দিয়েই আরম্ভ করেন।

ড. কর। শুধু আরম্ভ নয়, বহু সাধকের জীবন, অন্তত বাইরে থেকে যা মনে হয়, সারাজীবন একটা বিশিষ্ট সিম্বল নিয়েই কেটে যায়। একটা সিম্বল অবলম্বন করেই তাঁদের মনের সবদিকের সব বাঁধন ক্রমশ আল্‌গা হয়ে যায়। এই সিম্বলটাকে আপনারা যা ইচ্ছা বলতে পারেন।

ড মিত্র। আমার মনে হয় এই সিম্বল বা অ্যাট্রিবিউটের সমষ্টি থেকেই পৌত্তলিকতার উদ্ভব। যেটা আমরা মনে মনে তেমন স্পষ্ট করে ভাবতে বা ধারণা কর্‌তে পারিনে, তা ছবি দিয়ে, পুতুল দিয়ে, ছড়া দিয়ে, কবিতা দিয়ে হয়তো পারি। প্রত্যেকটি দেবদেবীর মূর্তি কতকগুলি অ্যাট্রিবিউটের স্থূল নিদর্শন ছাড়া আর কি ? (আলো—৯০)

ড. বোস। ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা ঈশ্বর আছেন কি নেই, এখনো ঠিক হলো না। অথচ তাঁকে পাবার জন্য, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্য এত সব তপস্যা, সাধনা, পূজা, অর্চনা—এটা কি নেহাত—কি বলব—নেহাত বাজে ছেলেমানুষি নয় ? আমার তো মনে হয়, ঈশ্বর ফিশ্বর কিছু নেই।

ড. মুখার্জি। কোন কিছু থাকা এবং না থাকার পার্থক্যটা সব সময়ে খুব সহজ ও স্পষ্ট নয়। এঘরে লোক আছে কি নেই—এ কথার উত্তর যত সহজ এবং এ দুইয়ের পার্থক্য যত স্পষ্ট, মানুষের জীবনে ও জ্ঞানে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাতে, আছে ও নেই এর প্রভেদ অত স্পষ্ট নয়।

ড. বোস। আছে এবং নেই, এর মধ্যে অস্পষ্টতা কি আছে। কোন কিছু হয় আছে, নয় তো নেই।

ড. মুখার্জি। জিনিসটা অত সোজা নয়। এই ধরুন, গণিতে কোন সংখ্যাকে তাই দিয়ে গুণ করলে গুণফল সর্বদাই পজিটিভ্ হয়। অর্থাৎ এমন কোন সংখ্যা নেই যার বর্গ নেগেটিভ্। অথচ নেগেটিভ সংখ্যার বর্গমূল না হলে গণিত এক পাও চলতে পারে না। এখন কি বলবেন, নেগেটিভ্ সংখ্যার বর্গমূল আছে, না নেই ?

ড. বোস। নেই, অথচ না হলে চলে না ?

ড. মুখার্জি। হ্যাঁ, ভগবান্ সম্বন্ধেও একথা খাটে। ভগবান্ আছেন কি নেই সে সম্বন্ধে সন্দেহ বা মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু ভগবান্ না হলে আমাদের চলে না, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

ড. মিটার। কিন্তু অনেকের তো ভগবান্ ছাড়াও বেশ চলে যায়!

ড. মুখার্জি। আপাতত তাই মনে হয় বটে, কিন্তু একটু ভাল করে দেখ্‌লেই দেখা যাবে, সকলেরই ভগবান্ আছে। তবে, হয়তো সকলের ভগবান ঠিক একই অ্যাট্রিবিউট দিয়ে গড়া নয়। বিজ্ঞানে যেমন কেন, কেন, করতে করতে এমন এক যায়গায় পৌছান যায়, যার পিছনে আর যাওয়া যায় না, তেমনি মানুষের জীবনে, চিন্তায়, ব্যবহারে এবং সাধনায়, যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে চলতে চলতে এমন স্থানে এসে পৌছান যায়, যার পরে আর যুক্তি চলে না। সকলেই অবশ্য ঠিক একস্থানে বা একরূপে থামে না। যে যেখানে থামে, সেখানেই তার ভগবান্।

ড. চাটার্জি। সম্ভবত এমনি করেই ভগবানের বহু রূপ, বহু মূর্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ড. বোস। কুমোরটুলিতেই তার প্রকৃষ্ট পরিচয়! (আলো—৮৫)

ড. নন্দী। মানুষের ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়, জীবনের ও সমাজের কঠিন সমস্যাগুলি যুক্তি ও তর্ক দিয়ে সমাধান করতে না পেরেই মানুষ একটা একটা ধর্ম, এক একটা নীতি গড়ে তুলেছে।

মিস্ চ্যাটার্জি (বি. এ.-ক্যান্টাব)। (সোফার স্প্রীংএর উপর ঈষৎ নাচিয়া) মাঁনুষের ধর্ম আর নীতি যাই হোক, এই যে আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা—এগুলো আমার কাছে ভা-রি বিচ্ছিরি লাগে।

মিঃ মুখার্জি। বিচ্ছিরি লাগ্‌লে কি হবে? সাধারণ মানুষ একটা না একটা সিম্বল চাইবেই।

মিস্ চ্যাটার্জি। তঁবু আগের দিনের তুলনায় ঠাকুর-দেবতার মূর্তিগুলো আজকাল একটু বেশি আর্টিস্টিক, একটু বেশি হিউম্যান, এটাও মন্দের ভাল।

ড. চ্যাটার্জি। আপনি যেটাকে ভাল বল্‌ছেন, ওটাকে কিন্তু আমি ভাল বল্‌তে পারছিনে। দেবদেবীর মূর্তি এক একটা বড় আইডিয়ার সিম্‌বল, আপনার আমার ফোটো নয়। এই সেদিন হাঁসের ডানা দিয়ে ঢাকা একটা সরস্বতীর মূর্তি দেখলাম। তাতে সরস্বতীর 'স'-ও নেই। সেদিন ড. পুরকায়স্থ তো বল্‌ছিলেন, মধ্যযুগের কোন একটা ছবিতে হংসমানবীর একটা অস্বাভাবিক প্রণয়ের দৃশ্য দেখেছিলেন, এ নাকি তারি একটু পরিবর্তিত অনুকরণ। আমার ধারণা, দেবদেবীর মূর্তি গড়তে শাস্ত্রের আইডিয়াগুলিকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। দেবদেবীর মূর্তি আর ফিল্মস্টারের মূর্তি একরকম হলে চল্‌বে কেন? (আলো—৮০)

ড. বোস। ঠিক বলেছেন, মা দুর্গাকে জর্জেট পরানো কখনো উচিত নয়।

মিস্ চ্যাটার্জি। ওঁসব ডিটেলে না গিয়েও মোটের উপর এটা ঠিক যে সিম্‌বল নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি কাল্‌চারের অভাব বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মিঃ মুখার্জি। দেখুন, সিম্‌বল যাই হোক, গির্জা বা 'সমাজ'-এর মত সরলই হোক, আর দুর্গপ্রতিমার মত ইলাবোরেটই হোক, একটা কিছু থাকবেই।

ড. বোস। কোন কিছুরই বা দরকার কি। অনেক লোক আছে, তারা তো কিছুরই ধার ধারে না।

মিঃ মিটার। সরি, এমন লোক আছে বলে মনে হয় না। থাকলেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। বুঝতে হবে, তারা অ্যানিম্যাল ইন্‌স্টিংক্টের উপরে উঠতে পারেনি। জীবন থেকে ভগবান্‌কে বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু বেঁচে থাকবার একটা জৈব প্রবৃত্তি। অর্থাৎ মানুষ, মানুষ থাকে না। যে সব আর্ট, যে সব আইডিয়ালিজ্‌ম মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন করে রেখেছে, সে সব বাদ পড়ে যায়। একটু খোঁজ নিলেই দেখবেন, a godless person can never be a true artist.

মিস্ চ্যাটার্জি। আর্টের সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ? (আলো—৭০)

মিঃ মুখার্জি। তা আছে বৈ কি। গান বলুন, চিত্রাঙ্কণই বলুন, কবিতা লেখাই বলুন, এসবের পিছনে একটা creative instinct লুকানো আছে। যার জীবনে ভগবান নেই, সে কিছু create করতে পারে না। কারণ, কিছু create করতে গেলেই নিজেকে ভুলতে হয়। যার জীবনে ভগবান নেই, সে নিজেকে ভুলতে পারে না।

ড. বোস। আপনার কথাটা বোধ হয় ঠিক। নিজেকে না ভুললে কবিতা লেখা যায় না। এই সেদিন কি খেয়াল হল, কলম নিয়ে বসলাম কবিতা লিখ্‌তে। আপনারা হাসবেন না—আমি কলমে যা লিখলাম, আর মনে যা ভাবলাম, তা আপনাদের শোনাচ্ছি:

কোকিল ডাকিছে গাছে (রামাটা এখনো বাজার থেকে ফিরল না)—জোছনা প্লাবিত ধরা (মিঃ গাঙ্গুলীর ঠিকানাটা যেন কি?)—মলয় বহিয়া যায় (অ্যাণ্ডারসন কোম্পানির শেয়ারটা কালই বেচে ফেলতে হবে)—বিরহ-বিধুর আঁখি (ছেলেমেয়েদের এখনো টিকা দেওয়া হয়নি)—ইত্যাদি। কলম রেখে উঠে পড়লাম।

(আলো—৫৫)

মিঃ মুখার্জি। (হাসিয়া) আপনি কবিতা লেখার চেষ্টা করবেন না।

মিসেস্ নন্দী। আচ্ছা, ঠাকুরবাড়ীর আর্ট আপনাদের ভাল লাগে?

মিঃ মিটার। আমি আর্টের বিশেষ কিছু বুঝি নে, তবে বুঝিয়ে দিলে মন্দ লাগে না।

মিসেস্ নন্দী। আমারও সেই কথা। যদি কেউ ছবিগুলো ধরে ধরে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় তো বেশ লাগে। নইলে, ভাল মাগে না।

মিস্ চ্যাটার্জি। আচ্ছা, বলুন তো মাইকেল এঞ্জেলো বড়, না আমাদের অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়?

মিঃ নন্দী। এ তুলনা ঠিক হলো না। একজন ইতালির পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, আর একজন বাংলার উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীয় লোক। এ তুলনা চলতে পারে না।

মিস্ চ্যাটার্জি। আঁচ্ছা, রুবেন্স্?

ডি. নন্দী। সেও তো ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাছাড়া ভিন্ন দেশের ভিন্ন ট্রাডিশনে গড়ে ওঠা শিল্পীদের পরস্পর তুলনা করলে দুজনের প্রতিই অবিচার করা হয়। (আলো—৪৫)

ড. বোস। আলো কমে গেছে, আমাদের আলোচনার বিষয় একটু উপরের দিকে তুল্‌তে হবে।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর ঈষৎ ঢুলিয়া) আচ্ছা, আপনাদের এই থিওরি অফ ইভোলিউশন ব্যাপারটা কি ?

ড. ব্যানার্জি। ওটা নেহাতই গোলমেলে ব্যাপার—অল্প কথায় বোঝান যায় না ! (আলো—৭০)

মিসেস্ নন্দী। ইংরেজিতে সব বৈজ্ঞানিক বিষয়েই পপুলার বই আছে। যারা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়, তারা সেই সব বই পড়ে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারে। বাংলায়ও যদি তেমনি হয়, তবে বেশ হয়। আপনারা চেষ্টা করেন না কেন ?

মিঃ মিটার। চেষ্টা তো হচ্ছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসরে নেমেছেন। আরো অনেকেই চেষ্টা করছেন। এপথেও প্রধান বাধা, পড়ুয়ার অভাব। শিক্ষিত লোকেরও যেমন অভাব, বই কিন্‌বার অর্থেরও তেমনি অভাব। স্কুল বা কলেজের পাঠ্যতালিকার বাইরে কোন বই কেউ কেনে না।

ড. মুখার্জি। এ কথা খুব সত্যি। তবু দেখ্‌তে পাই, ছেলেমেয়েদের জন্য আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েছে, যাতে নানা রকম বিজ্ঞানের কথা সরলভাবে বোঝান থাকে। এটা সুলক্ষণ।

ড. বোস। স্কুলের নূতন নিয়মে যে বিজ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা হয়েছে, সেটাও আমি মনে করি, এ মুভ্ ইন্ দি রাইট ডিরেকৃশন। সেদিন আমার ছোট মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, 'বল তো, ব্যাঙ্ কয় রকম ?' আমরা ওসব কখনো পড়েছি ?

ড. নন্দী। শুধু বিজ্ঞান কেন, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, এসব বিষয়েও সাধারণের জ্ঞানলিপ্সা অনেক বেড়েছে। সাধারণ জ্ঞান, দেশ বিদেশের খবর, এসব জানবার জন্য কৌতূহলও বেড়েছে বলেই মনে হয়।

ড. ব্যানার্জি। আমার মনে হয়, এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি লোকে খবরের কাগজ পড়ে।

ড. বোস। সেদিন দেখলাম, আমাদের হেড-মিস্ত্রী খবরের কাগজ পড়ছে। এ ব্যাপারটা আমাদের দেশে একটু নূতন। (আলো—৬০)

ড. নন্দী। শুধু খবরের কাগজ নয়, সাহিত্যচর্চাও বোধ হয় আগের চেয়ে একটু বেড়েছে।

ড. মুখার্জি। সে নাম মাত্র। সাহিত্যিকদের দুরবস্থাই তার প্রমাণ। কোন ভাল বই-ই দু'এক সংস্করণের বেশি চলে না।

ড. ব্যানার্জি। এ অবস্থার উন্নতি সহজে বা শীঘ্র হবে না। আর্থিক এবং মানসিক, দুই প্রকার উন্নতি না হলে এ বিষয়ে কোন উন্নতির আশা নেই। কোনটাই শীঘ্র হবার নয়।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু হেলিয়া) আপনারা সাহিত্যের উন্নতি দেখে আনন্দিত হচ্চেন, কিন্তু আমি তো তেমন আশার কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। গল্প আর উপন্যাস মন্দ বেরুচ্ছে না। কিন্তু কবিতা ? কই, একটা বড় ভাল কাব্য বাংলায় আছে ? মাইকেল, নবীন সেনের কথা বাদ দিন। তারপর যোগীন বোসের শিবাজী আর পৃথ্বীরাজ ছাড়া একটা বড় কবিতা কেউ লিখেছেন ? দুপৃষ্ঠার পরই কবিদের কল্পনা দম ফুরিয়ে এলিয়ে পড়ে।

ড. বোস। ঠিক বলেছেন, এসব আড়াই-পেজি কল্পনায় কাব্য হয় না !

(আলো—৫৫)

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু কাত হইয়া) আর নাটক ? দুচারখানা থার্ড ক্লাস নাটক ছাড়া, বিংশ শতাব্দীর বাংলা কখানা নাটক লিখেছে ?

ড. নন্দী। আচ্ছা, ড দে, ড. দাস, ড. চক্রবর্তী, কই আপনারা তো কিছু বলছেন না ?

ড. দাস। আমরা শুন্‌ছি।

ড. চক্রবর্তী। আপনাদের তর্কের জন্য আমি সিগারেট স্যাক্রিফাইস্ করতে পারব না। তাছাড়া, নভেল নাটকে আমি ইন্টারেস্ট পাই না।

মিসেস্ নন্দী। মিসেস্ চক্রবর্তী তো খুব নভেল পড়েন। জাহ্নবী লাইব্রেরীতে কোন নভেলের জন্য স্লিপ দিলেই শুনি, বই মিসেস চক্রবর্তী নিয়ে গেছেন।

ড. চক্রবর্তী। হ্যাঁ, তা ওঁর একটু ওদিকে ঝোঁক আছে।

(আলো—৫০)

ড. দে। আচ্ছা, মিষ্টার ভট্টাচার্যের তো আজ আসবার কথা ছিল। তিনি তো এলেন না ?

ড মুখার্জি। তাঁর আজ মি. রায়ের ওখানে নেমন্তন্ন। রায়ের মেয়েকে আজ নাকি দেখ্‌তে আস্‌বে।

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু নড়িয়া), দেখুন, এই যে মেয়ে-দেখা ব্যাপারটা, এটা বার্বারাস। এ ওয়্যান ইজ্‌ নট এ পিস্ অফ্ ফাঃ—নিচাঃ।

ড. মুখার্জি। তা নয়, মানি। কিন্তু না দেখে বিয়ে তো আজকাল কোন দেশেই হয় না। কাজেই দেখা সম্বন্ধে বোধ হয় আপনার অমত নেই। তবে, দেখার মেথড্ নিয়ে আপনার আপত্তি, কেমন ?

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর সোজা হইয়া) যদি বলি, তাই।

ড. মুখার্জি। আপনি তো ওদেশে অনেক দিন ছিলেন। ওরা যেমন করে মেয়ে দেখে বিয়ে করে, সেটা আপনার পছন্দ হয় ? আপনার মুখে উত্তর না শুনেও আমি বল্‌তে পারি, আপনি পছন্দ করেন না। তা যদি না করেন, তবে, আমাদের এই প্রথা ছাড়া উপায় কি ? আমার তো মনে হয়, এটাই বরং ভাল, মেয়েদের ভাবী স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে একটু দেখা দেওয়া, দুএকটা কথা বলা, এক আধটা গান গাওয়া, এসব ইস্কুলের রেসিটেশনের মতই সহজ। এর বদলে, দিনের পর দিন, একের পর এক ভাবী বা সম্ভাবী স্বামীর সঙ্গে অবাধে মিশে শরীর মন ভেঙে তার পর বিয়ে করা বা না করাটাই কি ভাল মনে করেন ?

(আলো—৪৫)

মিসেস্ নন্দী। থাক্ গে ওসব কথা। নমিতার (মিস্ চ্যাটার্জি) সব বিষয়েই একটু স্ট্রং ওপিনিয়ন।

ড. বোস। ড. মুখার্জিও কম যান না।

ড. নন্দী। (কথার মোড় ফিরাইবার জন্য) আচ্ছা, ড. দাস, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার গল্পগুচ্ছখানা আপনার পড়া হয়েছে ? কেমন লাগল ?

ড. দাস। বেশ লাগ্‌ল। বই পড়ে ইচ্ছে করছে, সার্ডিনিয়াটা একবার ঘুরে আসি।

ড. দে। আচ্ছা, বলুন তো, কাকে আপনার বড় বলে মনে হয়—গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা, না আমাদের অনুরূপা দেবী ?

ড. নন্দী। আমি তো আগেই বলেছি, এ রকম তুলনা চল্‌তে পারে না। তাছাড়া এমন তুলনা করে লাভই বা কি ?

মিস্ চ্যাটার্জি। (সোফার স্প্রীংএর উপর একটু চাপিয়া) লাভ আর কি ? ওরা বড় না আমরা বড়, এটা নিয়ে তর্ক করতে একটু ভাল লাগে।

মিসেস্ নন্দী। যা বলেছ ! (আলো—৪০)

ড. দে। এক্‌স্‌কিউজ্ মি, আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে।

ড. দাস, ড. ব্যানার্জি, মিসেস নন্দী। কেন, এত সকালেই ? আপনার বাড়িতে তো গার্জেন নেই !

ড. দে। না, তা নয়। আমি যাব একবার ড. তরফদারের বাড়িতে। সেখানেই ডিনার খাব।

ড. মুখার্জি। ড. তরফদারকে অনেকদিন দেখিনি। তাঁরা সব আছেন কেমন ? তার মেক্সিক্যান ওয়াইফ ফিরে এসেছে ?

ড. দে। হ্যাঁ, এই মাসখানেক হলো। ওঁরা একটু অশান্তিতে আছেন।

ড. বোস, ড. ব্যানার্জি, ড. দাস, মিসেস নন্দী। কেন, কি হয়েছে ? ডাইভোর্স হবে নাকি ? (আলো—৩০)

ড. দে। না, ওরকম কিছু না।

ড. দাস। তবে ?

ড. নন্দী। তবে ?

ড. ব্যানার্জি। তবে ?

ড. চক্রবর্তী। তবে ? (আলো—২৫)

ড. দে। আচ্ছা, আজ উঠি। আরেক দিন হবে।

ড. নন্দী। একটু বসুন না। ওরে—কে আছিস—বয়—সিগারেটের টিনটা নিয়ে আয় তো।

মিসেস্ নন্দী। সবে তো আটটা ; আপনার ডিনারের এখন অনেক দেরি।

ড. বোস। ব্যাপারটা কি, শোনাই যাক্‌না। আমার মনে হচ্ছে—(আলো—২০)

ড. দে। কাগজে বোধ হয় পড়েছেন, ড. পাকড়াশী পরশু রাত্রে ওয়ালটেয়ার গেছেন।

ড. দাস, ড. বোস, ড. ব্যানার্জি। পড়েছি বৈ কি !

ড. দে। ব্যাপারটা তাঁকে নিয়েই। (আলো—১৫)

ড. দাস। কেন কি হয়েছে। আপনার কথার সুরে যেন মনে হচ্ছে—(আলো—১০)

ড. দে। মিসেস তরফদারের সেই গভর্ণেস্‌টিকে আপনারা দেখেছেন বোধ হয় ? (আলো—৫)

ডঃ দাস। দেখছি বই কি ! এ স্‌প্লেন্‌ডিড্‌ লেডি !

ড. দে। তিনিও সেই ট্রেণেই ওয়ালটেয়ার চলে গেছেন। (ঘর—অন্ধকার)

কিছুক্ষণ চাপা গলায় কথাবার্ত্তা, নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে হাসি চলিতে লাগিল। হঠাৎ বিবেকরক্ষী মহাশয়ের গলা শোনা গেল।

ড. নন্দী। তারা ! ব্রহ্মময়ী ! মা ! (আলো—১০০)

দ্বিতীয়পক্ষ আষাঢ়

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী

আষাঢ় আকাশ ধূসর মেঘের
ধোসায় অঙ্গ মুড়িয়া,
দ্বিতীয়পক্ষ গৃহিণীরই মতো
দিয়াছে কান্না জুড়িয়া।
অর্থাৎ কিনা—সে আঁখিজলের
কারণাকারণ নেই তো,
এই রোদ-হাসি চিক্‌মিক্‌—পুনঃ
বিপুল অশ্রু এই তো !
সময়াসময় নেই জ্ঞান মোটে
ক্রন্দন অনাসৃষ্টি,
কভু ফিস্‌ ফিস্‌ চুপি চুপি—কভু
প্রলয়ংকর বৃষ্টি।
অভিমানিনীর রূপ লাগে ভালো
ইন্‌টারভ্যাল্‌ থাকলে ;—
নতুবা এমন সারা দিনরাত
মুখ হাঁড়ি করে রাখলে
ছুনিয়াটা ঠেকে মহা বিস্বাদ
লবণবিহীন শুক্তো,
বাড়ী ছেড়ে প্রাণ ক্লাবের গগনে
উড়ে হতে চায় মুক্ত।
বাসগৃহ যেন ঠেকে পিঞ্জর
প্রাণ করে সদা আইঢাই।
সুতরাং এসে বিগতা প্রেয়সী
জুড়িয়া বসেন মনটাই।
স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে বারবার
পুরাণো প্রথমপক্ষ !
নবীনা দ্বিতীয়া নানান্‌ শাস্ত্রে
যতই হোন্‌না দক্ষ।
ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ সম—মেঘধ্বনি—
মাঝে মাঝে বাজ হানিছে।
উগ্রা প্রিয়ার ভীষণ বাক্য
চকিতে স্মরণে আনিছে।
ঝলকে আকাশে তীব্র বিজলী
চমকিয়া ওঠে চিত্ত !
মনে পড়ে সেই অগ্নিদৃষ্টি
ব্যাভার জ্বালানো-পিত্ত !
অসন্তোষের আঁধারে গিয়াছে
দিগদিগন্ত ছাইয়া,
অযুতে অযুতে অভিযোগ-মেঘ
দ্রুতবেগে আসে ধাইয়া ;
ঝরে অবিরল ঝরঝর ধারে
নয়ন-আসার-বৃষ্টি,
আত্মবন্ধু পরিজন করে
ভেক-কলরব সৃষ্টি।
কোথায় কেতকী কোথা কদম্ব
কোথা বা ময়ূর নাচিছে ?
পাঁকে ও কাদায় প্রাণ যায় যায়
আত্মা রৌদ্র মাগিছে !
এর চেয়ে ছিল শতগুণ ভালো
প্রখর জ্যৈষ্ঠ চৈত্র,
আমার হোলোনা আষাঢ়ে লইয়া
কাব্যি অথবা মৈত্র্য

কথা ঃ—কাজী নজরুল ইসলাম   সুর ঃ—কাজী নজরুল ইসলাম ও শ্রীনিতাই ঘটক

স্বরলিপি ঃ—শ্রীনিতাই ঘটক

ভজন --দাদ্‌রা

পরমাত্মা নহ তুমি—, তুমি পরমাত্মীয় মোর।
হে বিপুল বিরাট মোর কাছে তুমি প্রিয়তম চিতচোর ॥
তোমারে যে ভয় করে, হে বিশ্বপাতা,
তার কাছে তুমি রুদ্র দণ্ডদাতা
প্রেমময় ব'লে তোমারে যে বাসে ভালো
তার কাছে তুমি মধুর লীলাকিশোর ॥
দেখে ভীরু চোখ আষাঢ়ের মেঘে বজ্র তব বিপুল
মোর মালঞ্চে সেই মেঘে হেরি ফোটায় নব মুকুল।
আকাশের নীল অসীম পদ্ম 'পরে
চরণ রেখেছ হে মহান, লীলাভরে
সেই অনন্ত, জানিনা কেমন ক'রে
আমার হৃদয়ে খেল দিবানিশি ভোর ॥

II { ণা ণা ধা | -া পা -া I পধা মপা পা | পা (পা পা I
প র মা ০ ত্মা ০ নং হং তু মি তু মি

I পা পধা পমা | -া মা মা I পা -া -মগা | -সগা -মপা -গমা) } I
প রং মা ০ ত্মী য় মো ০ ০০ ০০ ০০ ০ র্

I পা মা I পণা পণা ণা | পণা ণা র্সা I ণা -র্সা র্সা | ণর্সণা ধা পা I
হে ০ বি০ পু০ ল বি০ রা ট্ মো র্ কা ছে০০ তু মি

I সা রা মা | পা ণা ধা I মদা -া -মপা | -মপা -া -া I
প্রি য় ত ম চি ত চো০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

I সরা ণ্সা মগা | মা মজ্ঞা রা I সা -রা -মা | -পধা -মপা -ধণা II
প০ র ০ মা০ ০ স্ত্রী য় মো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

। । II পা র্রা র্রা | র্রা র্রর্সা -র্গর্রা I র্সণা ণা ণা | ধণা পা ধা I
তো মা রে যে ভ ০ ০য়্ ক রে হে বি০ ০ শ্ব

I না র্সা -া | -া -া -া I রা -মা পা | ধা না র্সা I
পা তা ০ ০ ০ ০ তা র্ কা ছে তু মি

I না -র্সা না | ধণা -পধা র্সণা I ধা পা -া | -া -া -া I
রু ০ দ্র দ০ ০ ন্ ড দা তা ০ ০ ০ ০

I পা ধপা গমা | রগা পা পা I গা পা ধা | ধণা পধা র্সনর্সা I
প্রে ম ০ ম ০ ০য়্ ব’ লে তো মা রে যে০ বা০ সে০০

I র্সণা ধণা পধা | -া -া -া I পা -না না | না না না I
ভা লো০ ০০ ০ ০ ০ তা র্ কা ছে তু মি

I পা পনা না | না র্সা র্রা I র্সা -নর্সা -ধণা | -পধা -া -া I
ম ধু র লী লা কি শো ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

I ধা ধণা র্সা | ণা ধা ধা I ণা পা -া | -া -া -া I
ম ধু০ র লী লা কি শো ০ ০ ০ ০ র্

I সরা ণ্সা মগা | মা জ্ঞা রা I সা -রা -মা | -পধা -মপা -ধণা II
প০ র০ মা০ ০ স্ত্রী য় মো ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ র্

। । II সা সমা মা | মা মা -া I মা পা পমা | -ধপা মজ্ঞা জ্ঞা I
০ ০ দে খে ভী রু চো খ্ আ ষা ঢ়ে০ র্ মে ঘে

I জ্ঞা -মা পা | ণা পণা র্সর্রা I র্সর্রা -নর্সা -া | -া -া -া I
ব ০ জ্র ত বং বি০ পু০ ০০ ০ ০ ০ ল্

[পা না নর্সা জ্ঞর্া র্রা র্সা] [মা]
I {না -া না | র্সা -া র্সা I না -র্সা নধা | পধা পমা পা} I
মো র্ মা ল ন্ চে সে ই মে০ ঘে০ হে রি

I মা গমা -পদা | পা মপা গমা I মা পা -া | -া -া -া I
ফো টা০ ০য়্ ন ব০ মু০ কু ০ ০ ০ ০ ল্

I {মা পা না | -া না -া I পা না নর্সা | র্সা -া র্সা I
আ কা শে র্ নী ল্ অ সী ম০ প ০ দ্ম

I নর্সা নর্সা -র্রা | -া -া -া I র্সা র্সর্জ্ঞা র্রর্সা | ণধা র্সণা ণা I
প০ রে০ ০ ০ ০ ০ চ র০ ণ০ রে খে ছ

[-া -া -া]
I মা পা না | -া র্সা র্সর্রা I না র্সা -া | -নর্সা -ধণা -পধা} I
হে ম হা ন্ লী লা০ ভ রে ০ ০০ ০০ ০০

I পা ধা মা | পধা -ণা ণা I পা র্সনা র্সা | ণা পা -া I
সে ই অ নং ন্ ত জা নি০ না কে ম ন্

I মপা মগা -া | -মগা -রসা -া I সা গা -া | গা মা মা I
ক০ রে ০ ০০ ০০ ০ আ মা র্ হৃ দ য়ে

I রা মা পধা | মপা গমা মজ্ঞা I রজ্ঞা সরা -া | -া -া -া I
ফে ল দি০ বা০ নি০ শি ভো০ ০০ ০ ০ ০ র্

I সরা ণ্সা মগা | মা মজ্ঞা রা I সা -রা -মা | -পধা -মপা -ধণা IIII
প০ র০ মা০ ০ ত্মী য় মো ০ ০ ০০ ০০ ০র্

গানখানির প্রথম লাইনের সুর দিয়াছেন কবি নজরুল ইস্‌লাম্—বাকী সুর আমার। কুমারী মাধবী মুখোপাধ্যায় এইচ, এম্, ভি রেকর্ডে গানখানি গাহিয়াছেন—ইতি স্বরলিপিকার।

ব্যবহারিক পঞ্জিকা

শ্রীফণিভূষণ দত্ত

আজকাল বাঙ্গালা দেশে যে সকল পঞ্জিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে মাস-সমূহের দিন সংখ্যার কোন স্থিরতা না থাকায়, ব্যবহারিক হিসাবে উহা অসুবিধার সৃষ্টি করে। এ বৎসর যে মাস ৩০ দিনে সমাপ্ত হইল, আগামী বৎসরে তাহার পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্ণয় করা এক সমস্যার বিষয়। সহজে তো তাহা বলা চলেই না—শ্রমসাধ্য গণনাদ্বারাও স্থির করা অনেক সময়ে সুগম নহে। অতীত বা ভবিষ্যতের কোন দিনের বার গণনা করিতে হইলে সুদক্ষ জ্যোতির্বিদ্‌ও অনেক সময়ে হার মানিয়া যান—তাঁহাকে তখন "এক যোগঞ্চ হীনম্বা" এই প্রাচীন সূত্র অবলম্বনে দিন সংখ্যার সহিত কখন ১ যোগ বা বিয়োগ করিয়া বার আনয়ন করিতে হয়। দোকানের হিসাপত্র ঠিক রাখা, নব-জাত সন্তানের জন্মসময় স্থির করা, দলিল সম্পাদনে তারিখের উল্লেখ করা বা দিন-মজুরীর হিসাব প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহারের জন্যই যে পঞ্জিকার প্রয়োজন তাহা নহে—ধর্ম কর্ম করিবার উপযুক্ত সময় নির্ণয়ও পঞ্জিকা দ্বারা হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারের জন্য যেমন মাসের দিন সংখ্যার প্রয়োজন, ধর্ম কর্মের জন্য তিথি, নক্ষত্র, সংক্রান্তি প্রভৃতির গণনাও সেইরূপ প্রয়োজন। সূর্যের এক উদয় হইতে পুনরুদয় পর্যন্ত কাল আমাদের একদিন ; সূর্য যত দিন এক রাশিতে অবস্থান করেন তাহাই এক সৌর মাস। সূর্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে প্রবেশক্ষণ অথবা তাহার পর দিন হইতে মাসের আরম্ভ কাল গণনা হওয়া উচিত, কিন্তু কতকগুলি কারণে কূট সংক্রান্তি গণনার নিয়ম-অনুসারে কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। তখন মাসারম্ভের প্রকৃত কালের একদিন পরে বঙ্গদেশে মাসের প্রথম দিন ধরা হয়। বস্তুত ধর্ম কর্মের জন্য পঞ্জিকার যেরূপ গণনার প্রয়োজন, লৌকিক ব্যবহারের জন্য সেরূপ জটিল গণনার প্রয়োজন হয় না। শুধু ধর্ম কর্মের দোহাই দিয়া ব্যবহারিক পঞ্জিকাকে দুরূহ ও জটিল করিয়া রাখা সংগত নহে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ মহাশয়ের প্রস্তাব-অনুসারে এবং Indian Research Institute, নিখিলবঙ্গ জ্যোতিষ মহাসম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদন-ক্রমে বঙ্গদেশীয় ব্যবহারিক পঞ্জিকার একটি সুচিন্তিত নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যবহারিক তারিখ নিরূপণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে, অথচ ধর্ম কর্ম কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই নূতন নিয়মে এদেশে প্রচলিত নিরয়ণ সৌর বৎসর এবং তাহার বিশুদ্ধ পরিমাণ ৩৬৫·২৫৬৩ দিন গৃহীত হইয়াছে। বৎসরের এই পরিমাণ ৩৬৫ দিন হইতে ·২৫৬৩ দিন অধিক। বৎসর বৎসর দিনের এই ভগ্নাংশটুকু বৃদ্ধি পাইয়া ৪ বৎসরে কিঞ্চিদধিক এক দিনে পরিণত হয়। আরও সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে. ৩৯ বৎসরে ১০ দিন অধিক হয়। ইহা ইহতে ৩৯ বৎসরে ১০টি অতিবর্ষ (leap year) গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতি সাধারণ বৎসর ৩৬৫ দিনে এবং অতিবর্ষ ৩৬৬ দিনে পূর্ণ হইবে। এইরূপে গণনা করিলে ১০০০ বৎসরে কিঞ্চিদধিক ২ দণ্ডের পার্থক্য হইতে পারে। এই পার্থক্যটুকু অগ্রাহ্য করিলে গণনার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মাসের দিন সংখ্যাও নিম্নরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে :—বৈশাখ ৩১, জ্যেষ্ঠ ৩১, আষাঢ় ৩২, শ্রাবণ ৩১, ভাদ্র ৩১. আশ্বিন ৩০, কার্ত্তিক ৩০, অগ্রহায়ণ ৩০, পৌষ ২৯, মাঘ ৩০, ফাল্গুন ৩০ ও চৈত্র ৩০। অতিবর্ষে চৈত্র মাস ৩১ দিনে গণিতে হইবে।

৩৯ বৎসরে ১০টি অতিবর্ষ হওয়ায়, গণনার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ৩৬৫কে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং সাধারণ বৎসর যে বারে আরম্ভ হয় তাহার শেষও হয় সেই বারে। কাজেই পরবর্ত্তী বৎসর আরম্ভ হয় সপ্তাহের একদিন পরে। এইরূপে ৩৯ বৎসর অতীত হইবার পর. দেখা যাইতেছে যে বৎসর ৩৯ + ১০ = ৪৯ দিন বা পূর্ণ সাত সপ্তাহ পরে আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ প্রথম বৎসর যে বারে আরম্ভ হইয়াছিল এই বৎসরও (৪০তম বৎসর) আরম্ভ হইবে সেই বারে। সুতরাং ৩৯ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর কি বারে আরম্ভ হইয়াছিল জানা থাকিলে, যে কোন বৎসরের প্রথম দিন কি বারে হইবে তাহা সহজেই বলা চলে।

বিশুদ্ধ বর্ধমানে গণিত পঞ্জিকায় দেখা যায় যে ১৩৩০ ও ১৩৩৩ উভয় বঙ্গাব্দই অতিবর্ষ ছিল। সুতরাং ১৩৩৪ সাল ৩৯ বৎসরাত্মক চক্রের প্রথম বর্ষ এবং ১৩৩৩ সাল শেষ বর্ষ। ১৩৩৪কে ৩৯ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৮ এবং ঐ বৎসরের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার। উপরে যাহা বলা হইল তাহা অবলম্বন করিয়া এমন দুইটী সারণী প্রস্তুত করিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা প্রায় দৃষ্টিমাত্রেই বৎসরের যে কোন তারিখের বার নির্ণয় করা যাইবে। সারণী প্রস্তুত করিবার পূর্বে আরও দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

কোন সাধারণ বৎসর যদি রবিবারে আরম্ভ হয়, তবে পরবর্ত্তী বৎসর আরম্ভ হইবে সোমবারে এবং কোন অতিবর্ষ রবিবারে আরম্ভ হইলে পরবর্ত্তী বৎসর আরম্ভ হইবে মঙ্গলবারে। এইরূপে পর পর বৎসরের প্রথম দিন হইতে ক্রমাগত পিছাইয়া চলে। সপ্তাহের সাতটি বার যদি ক খ গ ঘ ঙ চ ছ এই সাতটি বর্ণদ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়, তবে বৎসরের প্রথম দিন ক দ্বারা সূচিত হইলে, দ্বিতীয় দিন খ দ্বারা এবং তৃতীয় দিন গ দ্বারা সূচিত হইবে। পুনরায় অষ্টম দিন সূচিত হইবে ক দ্বারা ; এইরূপে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম দিন হইবে খ দ্বারা। প্রথম বৎসর অতিবর্ষ হইলে, তাহার পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম দিন সূচিত হইবে গ দ্বারা।

ই বর্ণ কয়টিকে আমরা বারবোধক বর্ণ বা 'বারবর্ণ' বলিতে পারি। ান বৎসরের প্রথম দিনের বর্ণ নির্ণীত হইলে, দ্বিতীয় সারণী হইতে াই বৎসরের প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন সেই বর্ণ দ্বারা স্থিরীকৃত ইবে।

প্রথম সারণী—অব্দচক্র

অব্দ শেষ	বার	বার বর্ণ	অব্দ শেষ	বার	বার বর্ণ	অব্দ শেষ	বার	বার বর্ণ।
১	বু	ঘ	১৪	শু	চ	২৭*	র	ক
২	বৃ	ঙ	১৫*	শ	ছ	২৮	ম	গ
৩	শু	চ	১৬	সো	খ	২৯	বু	ঘ
৪*	শ	ছ	১৭	ম	গ	৩০	বৃ	ঙ
৫	সো	খ	১৮	বু	ঘ	৩১*	শু	চ
৬	ম	গ	১৯*	বৃ	ঙ	৩২	র	ক
৭*	বু	ঘ	২০	শ	ছ	৩৩	সো	খ
৮	শু	চ	২১	র	ক	৩৪	ম	গ
৯	শ	ছ	২২	সো	খ	৩৫*	বু	ঘ
১০	র	ক	২৩*	ম	গ	৩৬	শু	চ
১১*	সো	খ	২৪	বৃ	ঙ	৩৭	শ	ছ
১২	বু	ঘ	২৫	শু	চ	৩৮	র	ক
১৩	বৃ	ঙ	২৬	শ	ছ	৩৯*	সো	খ

নিয়ম। প্রথম সারণীকে অব্দচক্র এবং দ্বিতীয় সারণীকে মাসচক্র লে। অব্দাঙ্ককে ৩৯ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে ব্দশেষ বলে। প্রথম সারণীর বামপার্শ্বে ৩৯টি অব্দশেষ স্থাপিত হইয়াছে বং পরের দুইটি স্তম্ভে যথাক্রমে বর্ষারম্ভের বার ও বারবর্ণ দেখান ইয়াছে। অব্দশেষের যে বৎসরগুলি * তারকাচিহ্নিত তাহারা অতিবর্ষ —ঐ সকল বৎসরে চৈত্র মাস ৩১ দিনে হইবে। দ্বিতীয় সারণীর পরিভাগের বামপার্শ্বে যে যে মাসের বারবর্ণ সমান তাহাদের নাম মশ্রেণীতে লিখিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর দক্ষিণ পার্শ্বে সাতটি ারবর্ণ পর পর লিখিত হইয়াছে। মাসচক্রের নিম্নভাগের বামপার্শ্বে াসের তারিখগুলি লিখিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে প্রত্যেক তারিখের ার লিখিত হইয়াছে। অব্দশেষের বারবর্ণ ঠিক করিয়া দ্বিতীয় সারণী ইতে তারিখের বার নির্ণয় করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সারণী—মাসচক্র

বৈশাখ					ক	ছ	চ	ঙ	ঘ	গ	খ
জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ					ঙ	ঘ	গ	খ	ক	ছ	চ
আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, চৈত্র					খ	ক	ছ	চ	ঙ	ঘ	গ
আশ্বিন, মাঘ					চ	ঙ	ঘ	গ	খ	ক	ছ
কার্ত্তিক, ফাল্গুন					ঘ	গ	খ	ক	ছ	চ	ঙ
পৌষ					ছ	চ	ঙ	ঘ	গ	খ	ক
১	৮	১৫	২২	২৯	র	শ	শু	বৃ	বু	ম	সো
২	৯	১৬	২৩	৩০	স	র	শ	শু	বৃ	বু	ম
৩	১০	১৭	২৪	৩১	ম	সো	র	শ	শু	বৃ	বু
৪	১১	১৮	২৫	৩২	বু	ম	সো	র	শ	শু	বৃ
৫	১২	১৯	২৬		বৃ	বু	ম	সো	র	শ	শু
৬	১৩	২০	২৭		শু	বৃ	বু	ম	সো	র	শ
৭	১৪	২১	২৮		শ	শু	বৃ	বু	ম	সো	র

একটি উদাহরণ লওয়া যাউক। ১৩৪৬ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ কি বার? ১৩৪৬÷৩৯, অবশিষ্ট ২০। সুতরাং প্রথম সারণী হইতে ইহার বারবর্ণ পাওয়া গেল ছ। মাসচক্রে অগ্রহায়ণ মাসের পার্শ্বে ছ বর্ণের নিম্নে ১৮ তারিখে দেখা যাইতেছে সোমবার। অতএব ১৩৪৬ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

শকাব্দেও ঠিক এই ভাবেই গণনা করিতে হইবে—কেবল পার্থক্য এই যে শকাব্দাঙ্ক হইতে ৮ বিয়োগ করিয়া ৩৯ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট বঙ্গাব্দের ন্যায়।

আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকায় সূর্যসিদ্ধান্তের অনুযায়ী বর্ষপরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপল বা ৩৬৫ ·২৫৮৭ দিন ধরা হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ষমান ৩৬৫ ·২৫৬৩ দিন হওয়ায়, উভয় বর্ষমানে পার্থক্য হইতেছে ·০০২৪ দিন। সুতরাং পূর্বগণিত অব্দচক্র সারণী অনুসারে ১৩০০ সালের অধিক পূর্বের কোন তারিখ গণনা করিতে হইলে ৪০০ বৎসরে প্রায় ১ দিনের পার্থক্য হইবে। প্রাচীনকালের তারিখের বার নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নরূপে আমরা আর একটি সারণী প্রস্তুত করিতে পারি।

বর্ষ পরিমাণ ৩৬৫ ·২৫৮৭৫৬ দিন হইলে, ইহা ৩৬৫ দিন হইতে ·২৫৮৭৫৬ দিন অধিক। এই ভগ্নাংশ দিন হইতে আসন্ন মান নির্ণয় প্রক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়—$\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{৭}{২৭}$, $\frac{২২}{৮৫}$, $\frac{৩৭}{১৪৩}$ ইত্যাদি। পর পর

প্রত্যেক ভগ্নাংশই সূক্ষ্মতর। এই ভগ্নাংশগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৪ বৎসরে ১ দিন অধিক হয়, ২৭ বৎসরে ৭ দিন, ৫৮ বৎসরে ১৫ দিন অধিক হয় ইত্যাদি। গণনা লাঘবের জন্য ৫৮ বৎসরে ১৫টি অতিবর্ষ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে ৭৫০০ বৎসরে প্রায় এক দিনের পার্থক্য হইতে পারে। বর্তমান চলিত তারিখের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ায় গণিত তারিখের স্থলেই ঐক্য থাকিবে, অনৈক্য হইলেও এক দিনের অধিক পার্থক্য হইবে না। ভবিষ্যতে প্রচলিত বর্ষমান সংশোধিত না হইলে, এই সারণী দ্বারা ভবিষ্যতের গণনাও চলিবে।

প্রাচীন নিয়মে অব্দচক্রের সারণী প্রস্তুত করিতে হইলে জানিতে হইবে যে, বঙ্গীয় সনের প্রথম দিন শনিবার ছিল এবং প্রথম বৎসরটি অতিবর্ষ ছিল। প্রথম বৎসরকে সাধারণ বর্ষ ধরিলে তাহার প্রথম দিন হইবে রবিবার। আমরা ৫৮ বৎসরের কালচক্রের সহিত সাম্য-রক্ষা কল্পে প্রথম বৎসরকে সাধারণ বর্ষ ধরিয়াছি। সুতরাং প্রথম বর্ষের বারবর্ণ ক হইলে, দ্বিতীয় বর্ষের বারবর্ণ হইবে খ এবং পঞ্চম বৎসরের বারবর্ণ হইবে চ। এইরূপে সাধারণ ও অতিবর্ষ হিসাবে ৫৮ বৎসরের বারবর্ণ স্থির করিতে হইবে। ৫৯তম বৎসর হইতে পরবর্ত্তী ৫৮ বৎসরের অতিবর্ষসমূহ একই ভাবে পুনরাবৃত্ত হইলেও ইহাদের বারবর্ণে প্রভেদ ঘটিবে। ৫৮ বৎসরে ১৫টি অতিবর্ষ গণিত হইলে, ৫৯তম বৎসরের বারবর্ণ ৫৯+১৫=৭৪ বা সপ্তাহের ৪ দিন পিছাইয়া হইবে। প্রথম বর্ষচক্রের প্রথম বৎসরের বারবর্ণ ক হইলে, দ্বিতীয় চক্রের প্রথম বারবর্ণ হইবে ঘ। এইরূপে সাতটি চক্র অতীত হইবার পর অষ্টম চক্রের প্রথম বারবর্ণ পুনরায় ক হইবে।

নিয়ম। সারণী দ্বারা কি প্রকারে তারিখের বার নির্ণয় করা যায় দেখা যাউক। অব্দাঙ্ককে ৫৮ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ দ্বারা অব্দশেষ পাওয়া গেল এবং ভাগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া যে অবশেষ পাওয়া গেল তাহাকে চক্রশেষ বলা হয়। তৃতীয় সারণীর শীর্ষদেশে চক্রশেষের অঙ্ক দেওয়া হইয়াছে এবং বামপার্শ্বে অব্দশেষের অঙ্কগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। চক্রশেষের স্তম্ভে অব্দশেষের অঙ্কে যে বর্ণটি পাওয়া যাইবে তাহাই অভীষ্ট অব্দের বারবর্ণ। এখন যে মাসের তারিখের বার নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় সারণী হইতে বাহির করিতে হইবে। মাসের পার্শ্বে বারবর্ণটি বাহির করিয়া, সেই স্তম্ভে সারণীর বামপার্শ্বের অঙ্কসংখ্যা দ্বারা তারিখের বার সহজেই নির্ণয় করা যাইবে। তৃতীয় সারণীর * তারকাচিহ্নিত বৎসরগুলি অতিবর্ষ।

উদাহরণ। ৮৯২ সনের ২৩এ ফাল্গুন কি বার?

৮৯২÷৫৮, ভাগফল ১৫ ও ভাগশেষ ২২। অতএব অব্দশেষ ২২ এবং চক্রশেষ (১৫÷৭)অ=১। সুতরাং ৯২ সনের বারবর্ণ খ। দ্বিতীয় সারণীতে খ বারবর্ণে ফাল্গুন মাসের ২৩ তারিখে শনিবার পাওয়া গেল।

তৃতীয় সারণী—অব্দ চক্র

অব্দ শেষ			চক্র শেষ						
			০	১	২	৩	৪	৫	৬
১	১২	৫১	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ
২	১৩	৫২	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ
৩	১৪	৫৩	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ
৪*	১৫*	৫৪*	ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক
৫	১৬	৫৫	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ
৬	১৭	৫৬	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ
৭	১৮	৫৭	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ
৮*	১৯*	৫৮*	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ
৯	২০		ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক
১০	২১		ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ
১১*	২২		চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ
	২৩*		ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ
	২৪		খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ
	২৫		গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ
	২৬		ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক
	২৭*		ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ
	২৮	৩৯	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ
	২৯	৪০	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ
	৩০	৪১	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ
	৩১*	৪২*	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ
	৩২	৪৩	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ
	৩৩	৪৪	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ
	৩৪	৪৫	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ
	৩৫*	৪৬*	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ
	৩৬	৪৭	গ	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ
	৩৭	৪৮	ঘ	ছ	গ	চ	খ	ঙ	ক
	৩৮*	৪৯	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ	চ	খ
		৫০*	চ	খ	ঙ	ক	ঘ	ছ	গ

সারণী দেখিয়া শকাব্দের তারিখের বার নিরূপণ করিতে হইলে, শকাব্দের সহিত ৭ যোগ করিয়া ৫৮ দিয়া ভাগ করিয়া অব্দশেষ গ্রহণ করিতে হইবে এবং চক্রশেষ হইতে ২ বিয়োগ করিয়া লইতে হইবে।

পঞ্জিকার সহিত আমাদের সারণী-লিখিত অতিবর্ষের গরমিল হইলে বা কুট-সংক্রান্তির পরে কখন একদিনের পার্থক্য হইতে পারে।

বঙ্গদেশে শকাব্দ ও বঙ্গীয় সন ব্যতীত খৃষ্টীয় অব্দ ও মুসলমানী

হিজিরা অব্দ প্রচলিত আছে। এই দুই অব্দের তারিখ কিরূপে নির্ণয় করা যায় তাহাও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খৃষ্টীয় অব্দ ৩৬৫·২৪২২ দিনে পূর্ণ হয়। ·২৪২২ দিন ৪০০ বৎসর প্রায় ৯৭ দিনে পরিণত হয়। সেই জন্য খৃষ্টীয় অব্দ গণনায় ৪০০ বৎসরে ৯৭টি লীপ-ইয়ার গ্রহণ করা হয়। উহাতে প্রতি চারি বৎসরে একটি লীপ-ইয়ার ধরা হয়, কিন্তু যে শতাব্দী-বৎসর ৪০০ দিয়া বিভাজ্য নহে তাহা লীপ-ইয়ার নহে। আবার ৩৬০০ বৎসরটি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হইলেও লীপ-ইয়ার নহে। কোন খৃষ্টীয় অব্দের অতীত লীপ-ইয়ার সংখ্যা আমরা নিম্ন উপায়ে স্থির করি। বৎসরে যে কোন তারিখের বার নির্ণয় করিতে পারি।

নিয়ম। খৃষ্টীয় অব্দ সংখ্যাকে ৪, ১০০ ও ৪০০ দিয়া পৃথক পৃথক্ ভাগ কর। পরে প্রথম ভাগফলের সহিত তৃতীয় ভাগফল যোগ ও তাহা হইতে দ্বিতীয় ভাগফল বিয়োগ করিলেই লীপ-ইয়ারের সংখ্যা পাওয়া যাইবে। অব্দাঙ্কের সহিত লীপ-ইয়ারের সংখ্যা, মাসাঙ্ক ও মাসের দিন সংখ্যা যোগ্ করিয়া যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগশেষ অঙ্কে রবিবার ক্রমে গণিয়া গেলেই তারিখের বার পাওয়া যাইবে।

মাসাঙ্ক—জানুয়ারী ০, ফেব্রুয়ারী ৪, মার্চ ৩, এপ্রিল ৬, মে ১, জুন ৭, জুলাই ৬, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৫, অক্টোবর ০, নবেম্বর ৩, ও ডিসেম্বর ৫।

উদাহরণ—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর কি বার?

১৯৩৯ ÷ ৪ = ৪৮৪ ; ১৯৩৯ ÷ ১০০ = ১৯ ; ১৯৩৯ ÷ ৪০০ = ৪।

অতিবর্ষ সংখ্যা ৪৮৪ + ৪ − ১৯ = ৪৬৯।

১৯৩৯ + ৪৬৯ + ৫ + ৪ = ৪২১৭ ;

২৪১৭ ÷ ৭, অবশিষ্ট ২। অভীষ্ট দিন সোমবার।

রোমক সম্রাট্ জুলিয়াস সীজরের সময় হইতে খৃষ্টীয় বর্ষমান ৩৬৫·২৫ দিন ধরা হইত এবং তদনুসারেই তারিখের গণনা চলিয়া আসিতেছিল। এই পঞ্জিকা জুলিয়াস ক্যালেণ্ডার বা পুরাতন পঞ্জিকা নামে অভিহিত হয়। পরে পোপ গ্রেগরীর সময়ে দেখা গেল যে জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারে অনেকখানি গোলমাল হইয়াছে—বৎসরের যে তারিখে দিবারাত্র সমান হওয়ার কথা তাহার অনেক পূর্বে দিবারাত্র সমান হইতেছে। সেই জন্য তাঁহার সময়ে বর্তমান ব্যবস্থার সংশোধিত হইয়া ৩৬৫·২৪২২ দিন স্থিরীকৃত হয় এবং তদনুসারে গণনা কার্য চলিতে থাকে। ইহাকে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডার বা নবীন পঞ্জিকা বলে। গ্রেগোরিয়ান পদ্ধতি ১৫৮২ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখ হইতে প্রবর্তিত হয়, এবং ১৭৫২ খৃঃ অব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে প্রথম প্রচলিত হয়। সেই জন্য উপরি উক্ত নিয়ম গ্রেগোরিয়ান পঞ্জিকা প্রবর্তনের পর কোন তারিখ সম্বন্ধে প্রযুজ্য। ইহার পূর্ববর্তী কোন তারিখের বার জুলিয়ান পঞ্জিকা অনুসারে গণিতে হইলে নিম্ন নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে।

নিয়ম। ২৮ বৎসরে ৭টি অতিবর্ষ হওয়ায়, উনত্রিংশৎ বৎসরের প্রথম দিন ও প্রথম বৎসরের প্রথম দিনের বার সমান হইবে। সুতরাং অব্দাঙ্ককে ২৮ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট গ্রহণ কর। এই অবশিষ্টকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল লও। এখন প্রথম অবশিষ্টের সহিত দ্বিতীয় ভাগফল, অতিরিক্ত ৫ মাসাঙ্ক ও মাসের দিন সংখ্যা যোগ করিয়া, যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ কর। অবশিষ্ট হইতে রবিবার ক্রমে বার নির্ণয় কর।

উদাহরণ—১৪৮৬ খৃষ্টীয়ক অব্দের ৬ই জুন কি বার ছিল?

১৪৮৬ ÷ ২৮, অবশিষ্ট ২ ; ২ ÷ ৪ = ০।

২ + ০ + ৫ + ৪ + ৬ = ১৭ ; ১৭ ÷ ৭ অবশিষ্ট ৩।

সুতরাং অভীষ্ট দিন মঙ্গলবার।

খৃষ্ট পূর্বের বৎসরগুলি জুলিয়ান রীতিতে গণিত হইত, এইরূপ ধরিয়া লইয়া আমরা নিম্ন নিয়ম অনুসারে খৃষ্ট পূর্বাব্দের কোন তারিখের বার নির্ণয় করিতে পারি।

নিয়ম। খৃষ্টাব্দের প্রথম দিন ছিল শনিবার। খৃষ্ট পূর্ব প্রথম বৎসরটি অতিবর্ষ ছিল এবং বৃহস্পতিবারে আরম্ভ হইয়াছিল। ২৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দও বৃহস্পতিবারে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্ট পূর্বাব্দকে ২৮ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ২৯ হইতে বিয়োগ করিয়া বিয়োগফল গ্রহণ করিবে। বিয়োগফলকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল লইবে। বিয়োগফলের সহিত প্রাপ্ত ভাগফল, অতিরিক্ত ৫, মাসাঙ্ক ও মাসের দিন সংখ্যা যোগ করিয়া যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া, অবশিষ্ট হইতে বার পাওয়া যাইবে।

উদাহরণ—১০৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ৬ই এপ্রিল কি বার?

১০৫ ÷ ২৮, অবশিষ্ট ২১ ; ২৯ − ২১ = ৮ ; ৮ ÷ ৪ = ২।

৮ + ২ + ৫ + ৬ + ৬ = ২৭ ; ২৭ ÷ ৭, অবশিষ্ট ৬।

সুতরাং অভীষ্ট দিন শুক্রবার।

মনে রাখিতে হইবে, খৃষ্টীয় অব্দের তারিখ গণনা করিবার সময়, যে বৎসর লীপ-ইয়ার হইবে সেই বৎসরের ২৯এ ফেব্রুয়ারী ভিন্ন জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের মাসাঙ্কে ১ কম লইতে হইবে।

হিজিরা সনের তারিখ নিরূপণ—হিজিরা বৎসর চান্দ্রমানে গণিত হয় এবং বারটি চান্দ্রমাসে পূর্ণ হয়। অমাবস্যার পর যেদিন চন্দ্র প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, সাধারণতঃ সেই দিন হইতে মাস আরম্ভ হয়। হিজিরা সনের ৩০ বৎসরে ১১টি অতিবর্ষ ও ১৯টি সাধারণ বৎসর থাকে। প্রত্যেক সাধারণ বৎসরে ৩৫৪ দিন এবং অতিবর্ষে ৩৫৫ দিন গণিত হয়। এই ৩০ বৎসরের মধ্যে ২, ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৮, ২১, ২৪, ২৬ ও ২৯ বৎসরগুলি অতিবর্ষ। ৩৫৪ দিনে সাধারণ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় প্রথম বৎসর যে বারে আরম্ভ হয় দ্বিতীয় বৎসর তাহার পঞ্চম দিনে আরম্ভ হইবে।

নিয়ম। হিজিরা সনের কোন তারিখের বার নির্ণয় করিতে হইলে অব্দাঙ্ককে ৩০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে ১১ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এই গুণফলের সহিত ভাগাবশেষ অঙ্কে যতগুলি অতিবর্ষ অতীত হইয়াছে তাহা যোগ করিলে অতীত অতিবর্ষ সংখ্যা পাওয়া যাইবে। অতঃপর একোন অব্দাঙ্ককে ৪ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফলের

সহিত প্রাপ্ত অতিবর্ষ সংখ্যা, মাসাঙ্ক ও মাসের দিন সংখ্যা যোগ করিয়া, যোগফলকে ৭ দিয়া ভাগ করিয়া, অবশিষ্ট হইতে রবিবার ক্রমে গণনা করিলেই অভীষ্ট দিনের বার পাওয়া যাইবে। হিজিরা সনে অযুগ্মসংখ্যক মাসগুলি ৩০ দিনে এবং যুগ্মসংখ্যক মাসগুলি ২৯ দিনে পূর্ণ হয়। অতিবর্ষ বৎসরের শেষ মাস জেলহজ্জ ৩০ দিনে গণিত হয়।

মাসাঙ্ক—মহরম ৫, শফর ০, রবিয়ল-আউল ১, রবিয়স্‌সানি ৩, জামাদিল-আউল ৪, জমাদিস্‌সানি ৬, রজাব ০, সাবন ২, রমজান ৩, শাবল ৫, জেল্‌কদ ৬, জেলহজ্জ ১।

উদাহরণ—১৩৫৮ হিজিরা ৭ রবিয়স্‌সানি কি বার ?

১৩৫৮ ÷ ৩০, ভাগফল ৪৫ ও অবশিষ্ট ৮। ৮ বৎসরে তিনটি অতিবর্ষ অতীত হইয়াছে। ৪৫ × ১১ + ৩ = ৪৯৮। (১৩৫৮-১) × ৪ = ৫৪২৮। ৫৪২৮ + ৪৯৮ + ৩ + ৭ = ৫৯৩৬ ÷ ৭, অবশিষ্ট ০।

অভীষ্ট দিন শনিবার।

খৃষ্টীয় অব্দ ও হিজিরা গণনার জন্য অব্দচক্র ও মাসচক্রের সারণী প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাহুল্য বিবেচনায় সেরূপ সারণী এখানে দেওয়া হইল না।

অনাগত

শ্রীরাধারাণী দেবী

ভাবতে ভালো লাগে
আসবে—আসবেই সে অনাগত কাল
যেদিন মানবসভ্যতা মুক্ত হবে এই
ক্রূর কপটতা, প্রবল লোভ আর নীচ স্বার্থবুদ্ধির
নাগপাশ হতে।
আসবেই সে যুগ—যে-যুগে স্বতঃই স্বীকৃত হবে
বিধাতার বিশ্বে প্রত্যেক মানুষই
পূর্ণোদর আহারের অধিকারী।
বিশ্বজনের ক্ষুধার অন্ন একজনে লুটে নিয়ে
পারবেনা এমন অযথা অপচয় করতে।
ধনিকের বিলাসপ্রাসাদ-দুয়ারে
শত শত মানব সন্তান
প্রার্থীর বেশে আসবেনা আর প্রসাদ-প্রত্যাশী হয়ে।
দেখা যাবেনা মহানগরীর পথে পথে
পয়ঃপ্রণালীর উচ্ছিষ্ট অন্ন নিয়ে
কুকুরের সাথে মানুষের কাড়াকাড়ি!

ভাবতে ভালো লাগে,
আসবে—আসবেই সে অনাগত দিন,
যেদিন লুপ্ত হয়ে যাবে ক্ষমতাশালীর
ক্ষমতা-অপব্যবহারের কুঅধিকার।
মাত্র শক্তি-ন্যূনতার ত্রুটীতে
নিরপরাধ মানব জাতি
হবেনা আর প্রবলের দ্বারা অবমানিত, উৎপীড়িত।
বৈষম্যের বিষম উৎপাত অন্তর্হিত হবে
মানুষের আপন হাতে গড়া সমাজবিধি হতে।
বর্ত্তমান যুগদেবতা নিয়ে এসেছেন কি তারই আশ্বাস ?
সেই বাঞ্ছিত অনাগতের আবির্ভাব-সম্ভাবনাতেই
আজকের ধরিত্রী কি বেদনা-মুমূর্ষু ?—

যার ধ্যানে এবং ধারণায় গৌতম শাক্যসিংহ
হয়েছিলেন রূপান্তরিত অমিতাভ বুদ্ধে।
আজও জন্মায়নি যে মহত্তর-বৃত্তিশালী মানব শ্রেণী,
এখনও আসেনি যে সত্যকার অকৃত্রিম সভ্যতা,
স্বপ্ন-কল্পনায়ও যা'—
আজকের এই হিংস্র পৃথিবীর অতি অসম্ভব—
স্থিতধী ঋষি যাঁরা—
দৃষ্টি যাঁদের সুদূর প্রসারী
তাঁরা পেয়েছেন কি এই নবযুগের আভাস ?—

ঐকান্তিক বিশ্বাসে ভাবতে ভালো লাগে
মহাকালের মহান্‌চক্রে, আসবে—
আসবেই সে অনাগত,
আজকের আগতের যা' সম্পূর্ণ বিপরীত ;
সুতরাং অপূর্ব্ব এবং অভিনব।
যা' কখনও আসেনি এই পৃথিবীর বুকে,
যা' এখনও সত্য হয়ে ওঠেনি মানব সভ্যতায়,
আজও সার্থক হয়নি যা' বহু সাধকের আমরণ-সাধনায়,
সেই অনাগত নবমনোবৃত্তিশালী
উন্নত মনুষ্য জাতির
অকৃত্রিম শুভ-সভ্যতার অভ্যুদয়ে
নবজন্ম পরিগ্রহ করুক এই জীর্ণ প্রাচীন পৃথিবী।

পরমহংস মাধবদাসজী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

যোগীশ্বর পরমহংস মাধবদাসজীর নাম বাংলাদেশে অপরিজ্ঞাত হইলেও পশ্চিমভারতে তাঁহার ভক্ত শিষ্যের সংখ্যা অল্প নহে। প্রায় বিশবৎসর হইল এই বাঙ্গালী মহাত্মা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। নর্ম্মদাতীরে মালসার নামক গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম এক্ষণে গুজরাট ও বোম্বাই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট একটী তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত লোকে মাধবদাসজীর নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে।

মাধবদাসজীর ন্যায় সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন একজন যোগী-গুরুর নিকট যোগসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভের মানসে তাঁহার আশ্রমে বহু উৎসাহী শিক্ষার্থীর আগমন ঘটিত। শিষ্যদের অধিকাংশকেই তিনি সাধনভজন বা ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কেবল মাত্র কয়েকজন নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থী যোগীশ্বরের নিকট হইতে বিজ্ঞানসম্মত যোগসাধন বিষয়ে দীক্ষালাভ করেন। এইরূপ দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে বোম্বাই সহরে যোগ ইনিষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযোগেন্দ্র অন্যতম।

যোগীশ্বরকে তাঁহার পূর্ব্বজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইত না, তাহা অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছিল। ১৯১৬-১৭ অব্দে গুরুদেবের সহিত নির্জ্জনে আলোচনা কালে উদ্দিষ্ট প্রশ্নাবলীর মধ্যদিয়াই প্রিয় শিষ্য শ্রীযোগেন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বজীবনের কথা সর্ব্বপ্রথমে কিছু কিছু জানিতে পারেন এবং তাহা লিখিয়া রাখেন। যোগীশ্বরের সেই অসম্পূর্ণ জীবন-কথা এবং তৎসহ তাঁহার অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ যুক্ত করিয়া ১৯১৭ অব্দে গুজরাটী ভাষায় "পরমহংসানী প্রসাদী" নামক পুস্তক রচিত হয়। সেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি যোগ ইনিষ্টিটিউটে সযত্নে রক্ষিত আছে।

পরমহংস মাধবদাসজী নিজের পিতৃদত্ত নাম কখন কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই! ১৭৯৮ অব্দে নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র গ্রামে মুখোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবের সৎপরিবেষ্টন ও পিতা-মাতার ধর্ম্মপ্রাণতার ফলে তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মভাব জাগরিত হয় এবং পরম্পরাগত হিন্দু-সংস্কৃতিতে তিনি বিশ্বাস-পরায়ণ হন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভিনিবেশশীলতার ফলে বাল্যে বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পায়। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজীতে ভালরূপ জ্ঞান লাভ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে পিতামাতা প্রিয়পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। এজন্য সমস্ত ব্যবস্থাও ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু বিবাহের নির্দ্দিষ্ট তারিখের মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বেই স্নেহময়ী মাতার মৃত্যু ঘটায় ভবিষ্যৎ যোগীর বিবাহ বন্ধ হয়। ইহার দুই বৎসর পরে পুনরায় যখন বিবাহের বন্দোবস্ত করা হয়, তখন পুত্রবৎসল পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে দ্বিতীয়বারও তাহা বাধা পায়। সেই সঙ্গে তাঁহার সংসারজীবনের ভবিষ্যৎও চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়।

মাত্র বিশবৎসর বয়সে পিতামাতা উভয়কেই হারাইয়া তিনি বিশেষ শোকবিহ্বল এবং সংসারে একা ও অবলম্বনহীন হইয়া পড়েন। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে একটী সরকারী চাকুরী লইয়া কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিতে হয়। কর্ম্মদক্ষতার গুণে মাত্র তিন বৎসরকালের মধ্যেই তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন এবং তাঁহাকে বিচার বিভাগে একটী উচ্চতর পদ প্রদান করা হয়। সেই পদে কাজ করার সময়ে সহকর্ম্মীদের হীন চক্রান্তে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং সংসারত্যাগ করিয়া যাওয়াই সিদ্ধান্ত করেন। বিধির অলঙ্ঘনীয় বিধানে জীবনের উচ্চতর অনুবৃত্তির সন্ধানে ২৩ বৎসরের তরুণ যুবক একদিন গোপনে নিজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হন।

সংসারত্যাগের পর, শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হইয়া তিনি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ভগবানে একনিষ্ঠ ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিলেও তাঁহার অন্তরে যোগশিক্ষার যে বাসনা পূর্ব্বাবধি জাগ্রত ছিল তাহা কিন্তু অতৃপ্তই রহিয়া যায়। ফলে এক বৎসর কালের মধ্যেই দীক্ষামন্দির ও দীক্ষাগুরুকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি যোগীগুরুর সন্ধানে তীর্থযাত্রা সুরু করেন।

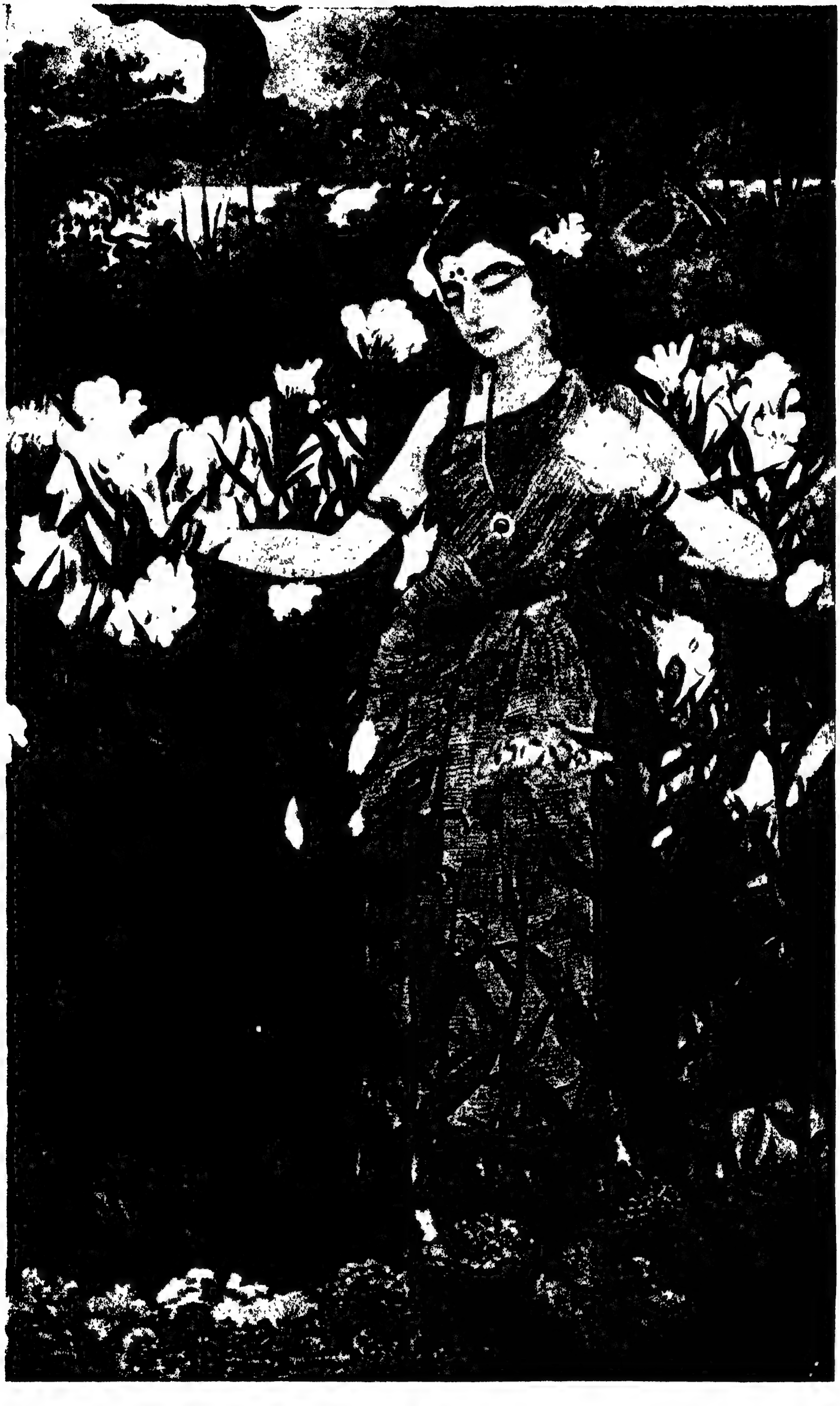

শিল্পী—শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় দোলন চাঁপা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পূর্ব্বে মণিপুর হইতে পশ্চিমে দ্বারকা এবং দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা হইতে উত্তরে তিব্বত পর্য্যন্ত প্রায় সকল তীর্থে ভ্রমণ করিবার কালে বহু যোগীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎলাভ ঘটে এবং শিষ্যরূপে যোগসাধন শিক্ষার সুবিধা হয়। স্বাভাবিক ধর্ম্মোন্মাদনা ও আগ্রহের বলে এই যোগসাধন ব্যাপারে কালে তিনি সবিশেষ অধিকার লাভ করেন এবং বহু লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া প্রধান প্রধান তীর্থদর্শনে তিনি ১১বার পদব্রজে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিযাছিলেন। সকল সময়েই কযেকজন করিযা সাধুভক্ত তাঁহার সঙ্গী ছিল।

১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহেব প্রায় সমকালে একজন মহাযোগীরূপে তাহার নাম চারিদিকে এরূপ খ্যাত হইযা পড়ে যে, নির্জ্জনতার সন্ধানে তাঁগাকে হিমালযের গুহায আশ্রয গ্রহণ করিতে হয। সে সময়ে তাঁহার বযস প্রায় ষাট বৎসর। বিশ বৎসব কাল ধবিযা অজ্ঞাতস্থানে কঠোর যোগসাধনায রত থাকাব পব, বিশেষ এক সম্প্রদাযের ৪।৫ শত সাধুব মোহান্তরূপে কবাচীতে পুনরায তাঁহার দর্শন পাওযা যায।

এই সমযে তাঁহাব অদ্ভুত যৌগিক শক্তির সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচাবিত হইযা পড়ে। যোগীশ্বর, কচ্ছের একজন ধনী ব্যবসাযীর জলমগ্ন মৃত পুত্রের দেহে বহুক্ষণ পরে কি কবিযা পুনবায প্রাণসঞ্চারিত করিযা তাহাকে বাঁচাইয়াছিলেন, কি কবিয়া একটী শূন্য পাত্র হইতে তিনি মিষ্টান্ন বিতরণ করিতেন এবং হঠাৎ প্রযোজনে কি করিযা মাত্র কয়েকজনের জন্য প্রস্তুত আহার্য্যে শত শত লোককে আহার করাইয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার একবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপেই উন্মাদরোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ের কথা তথনকার অনুরাগী ভক্তেরা প্রায়ই উল্লেখ করিতেন।

শ্রীযোগেন্দ্র তাঁহার নিজের দেখা আলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটীর উল্লেখ করিযাছেন। ১৯১৭ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বায়ের সুবিখ্যাত স্যার বসনজী ত্রিকমজীর মাথরানস্থিত "ফরেষ্ট-লজ্" নামক ভবনে অবস্থান কালে একটী গ্রুপ্ ফটো লইবার সময় যোগীশ্বর অদৃশ্য হন। এই ঘটনার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে তিনি উৎসাহী ত্রিকমজীকে তাঁহার ফটো লইবার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে, বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে একজন রিক্সাওয়ালা অতিশয় বিষাক্ত সর্পদংশনে মৃতপ্রায অবস্থায তাঁহার নিকট আনীত হয়, একবার মাত্র দক্ষিণ হস্ত বুলাইযাই তিনি তাহার জ্ঞান ফিরাইয়া দেন। ঘণ্টাখানেক পরে পরমহংসজী সেই হস্তে বেদনা অনুভব করিযা শ্রীযোগেন্দ্রকে তাহা ধৌত করিয়া দিতে আদেশ করেন। হস্ত ধৌত জলের বর্ণ গাঢ় সবুজে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিযা শিষ্য বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হন। এই সকল ঘটনার বিবরণ সেই সময়েই যথাযথভাবে লিখিত হইয়া সযত্নে রক্ষিত আছে।

নিজগৃহ পরিত্যাগের দিন হইতে সুদীর্ঘ ষাট বৎসর কাল অবিরত নানাস্থানে ঘুরিবার পর পরিশ্রান্ত যোগীশ্বর একটী স্থাযী আশ্রমের আবশ্যকতা অনুভব করেন। সে সময় তাঁহার বযস প্রায় আশী বৎসর। নর্ম্মদাতীর দিয়া গমনকালে একটী স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিশেষ আকৃষ্ট হন। গুজরাটের মালসার নামক গ্রামের অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী সেই খালি স্থানটীতে ১৮৮৫ অব্দে যোগীশ্বর আস্তানা করেন। সে সময় মাত্র একটী কৌপিন এবং সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড তাঁহার সম্বল ছিল। অল্পকালের মধ্যেই স্থানটী আশ্রমে পরিণত হয়। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে

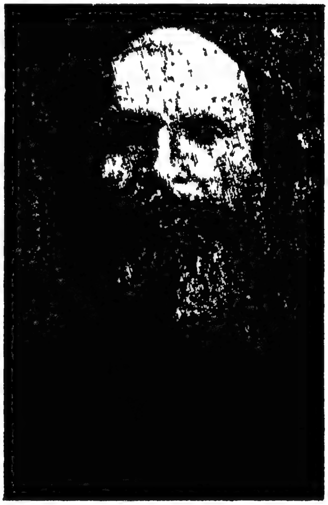
যোগীশ্বর পরমহংস মাধবদাসজী

জন্ম—১৭৯৮ সমাধি—১৯২১

সকলেই যোগীশ্বরের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য আসিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেককে আশ্রমে সমবেত হইতে দেখা যায়।

সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও যোগীশ্বর প্রথম জীবনে যে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেন তাহার প্রভাব তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি গঠনমূলক কার্য্যের অনুমোদন করিতেন। সাধুসন্ন্যাসীগণকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী নবভাবে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে, প্রথম পন্থাস্বরূপ তিনি ১৯০৯ অব্দে অখিলভারত সাধুসম্মেলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙ্গালাদেশ এবং বাঙ্গালীর সংশ্রব হইতে দূরে থাকিলেও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ যে একটুও ম্লান হয় নাই তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে জানিতে পারা যায়।

নর্ম্মদাতীরস্থ মালসার আশ্রমের দৃশ্য

আমেরিকা-প্রত্যাগত সুপ্রসিদ্ধ জৈনশাস্ত্রবিদ পণ্ডিত লালন ১৯১৭ অব্দের শেষাশেষি একদিন যোগীশ্বরের নিকট বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলী" একখানি লইয়া আসেন। তিনি বাঙ্গালাভাষা জানিলেও কয়েকটী চলিত কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, সেজন্য পরমহংসজীর সহায়তা কামনা করেন। গীতাঞ্জলী হইতে কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়াই যোগীশ্বর এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি প্রিয় শিষ্য শ্রীযোগেন্দ্রকে ডাকিয়া কবিতাগুলি অনুবাদের ভার লইতে বলেন।

পরদিন হইতেই পণ্ডিত লালন শ্রীযোগেন্দ্রকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে বাঙ্গালা বর্ণসমূহ ও ভাষার সঙ্গে কতকটা পরিচয় হইলে বোম্বাই হইতে গীতাঞ্জলীর ইংরাজী সংস্করণও একখানি আনান হয়। ইহার সাহায্যে শ্রীযোগেন্দ্রের পক্ষে অনুবাদের কার্য্য সহজ-সাধ্য হয়। ইংরাজীর কথা ছাড়িয়া দিলে অন্য ভাষায় গীতাঞ্জলী অনুবাদের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। তরুণ অনুবাদক সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া অল্পকালের মধ্যেই নিজ কার্য্য সমাধা করেন। ১৯১৮ অব্দে জানুয়ারী মাসের শেষভাগে গীতাঞ্জলীর এই গুজরাটী অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে যোগীশ্বর সবিশেষ আনন্দিত হন। সকলেই অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং পুস্তকখানি জনপ্রিয় হওয়ায় দরিদ্র অনুবাদকের কিছু অর্থপ্রাপ্তিও ঘটে।

যোগীশ্বরকে দর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ক্রমে আশ্রমে অবিরত এত অধিক জনসমাগম হইতে থাকে যে, তাঁহার সাধন ভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। তিনি মানসারের চার মাইল দূরবর্ত্তী রণপূরা নামক স্থানে সরিয়া যান। জীবনের শেষ ভাগে এই দুই স্থানেই শিষ্যভক্তদের উপদেশ দানে অধিক সময় অতিবাহিত করেন। ভক্তদের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারায়, সময় সময়ে তাঁহাকে অন্যত্রও যাইতে হইত। প্রধানতঃ উক্ত দুই আশ্রমেই তিনি কয়েকজন মাত্র অনুরাগী শিক্ষার্থীকে যোগসাধনের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষাদান করেন। রোগশান্তির উদ্দেশ্যে সরল যৌগিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা দিয়া, তিনি অনেক পুরাতন রোগীকেই আশ্চর্য্যরূপে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মসংক্রান্ত গুহ্য বিষয় হইলেও উপযুক্ত নূতন শিষ্যকে পরম্পরাগত যোগসাধনে দীক্ষাদানে যোগীশ্বর সর্ব্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। শিষ্যের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সাধ্যমত তাহাকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানে তিনি কখনও কার্পণ্য করেন নাই। এইরূপেই তিনি বর্ত্তমান-কালে যোগচর্চ্চা সম্বন্ধে অধিকতর অনুশীলন ও অনুসন্ধানের

ভিত্তিস্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রেরণায় ফলিত যোগের আধুনিক পুনরুদ্বোধন ঘটে, একথা বলা যাইতে পারে। অন্য মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে হীন করার কোন চেষ্টা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু গোপন করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। ফলিত যোগের সমস্ত সূত্রের তিনি যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিষয়টীকে অধিকতর লোকপ্রিয় করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

শেষজীবনে শিষ্যভক্তেরা যোগীশ্বরকে নানা কর্ম্মের মধ্যে জড়িত করিয়া ফেলেন। তাঁহাকে এজন্য প্রায়ই বোম্বাই, আমেদাবাদ, বরোদা, সুরাট, ব্রোচ প্রভৃতি সহরে এবং অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। গৃহীভক্তদের একান্ত অনুরোধে আশ্রমের আর্থিক হিতার্থে সহরে আসিতে হইলে তিনি অন্তরে কষ্ট অনুভব করিতেন। কিন্তু কখনও তাহাদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করেন নাই। তীর্থভ্রমণ অন্তে উক্ত কারণে একবার বোম্বাই আসিয়া যোগীশ্বর সর্দ্দি ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। তিনি তৎক্ষণাৎ মালসারে যাইতে চাহেন। শিষ্যেরা কিন্তু রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন না। কয়েকদিন পরে যোগীশ্বর যখন বুঝিতে পারেন যে তাঁহার চিরবিদায়ের কাল আগতপ্রায়, তখন তিনি মালসার যাত্রা করেন।

দেহাবসানের একদিন পূর্ব্বে যোগীশ্বর আশ্রমে সমবেত উৎকণ্ঠিত শিষ্যবর্গকে জানান যে, পরদিন বেলা তিন ঘটিকার সময় তিনি মহাসমাধিলাভ করিবেন। পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত সকল আয়োজন করিয়া রাখা হয় এবং ১৯২১ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়েই ১২৩ বৎসর বয়সে যোগীশ্বর পরমহংস মাধবদাসজী সমাধিমগ্ন অবস্থায় চিরশান্তি লাভ করেন।

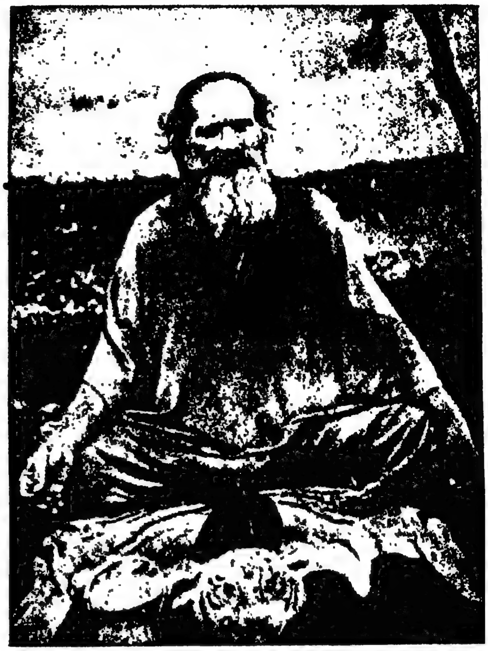

যোগীশ্বর—মহাসমাধি লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে

স্পর্শ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

রূপ রস আর গন্ধ জাগায় সাধ,
তুমিই স্পর্শ অমৃত আস্বাদ।
ধরা চঞ্চল তোমার আকাঙ্ক্ষায়,
বুভুক্ষু মন তোমারে লভিতে ধায়।
শ্রবণ নয়ন কতটুকু দিতে পারে,
তৃষিত ভুবন আঘাতিছে তব দ্বারে।

২

তোমারে ডাকিছে স্ফুটনোন্মুখ ফুল,
তোমারি লাগিয়া সমীরণ বেয়াকুল।
সহস্র কর প্রসারি সূর্য্য রয়,
চন্দ্র সোহাগে হয়ে ওঠে সুধাময়।
স্ফুরিত বনস্থলী করে তব আশ,
সাগর সলিলে তোমারি যে উচ্ছ্বাস।

৩

প্রেম প্রতীক্ষা তোমারি যে পথ চাওয়া,
পরমানন্দ তোমারে নিকটে পাওয়া।
রক্ত অধর যেন মণি সন্নিভ—
রঙিন গগন তব তরে উদ্‌গ্রীব।
যোগ জপ তপ তোমারেই চায় নিতি—
মিলন তুমিই—বিরহ তোমার স্মৃতি।

৪

তোমারি লাগিয়া ধরার ঝুলন দোল,
উৎসঙ্গের উৎসুক হিন্দোল।
প্রতি অঙ্গেতে তোমারি ত উৎসব
মনের বনেতে জাগে তব বেণুরব।
পাতি' অনন্ত শয্যা কমলাসনা—
লক্ষ্মী করিছে তোমারি যে উপাসনা।

পুতুল-খেলা

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ

পুতুলের বিয়ে চুকিয়া গিয়াছে! তিন পয়সা দামের কাঁচের পুতুলের সহিত পাঁচ পয়সা দামের কাঁচের পুতুলের বিয়ে!

পুতুল-কনেকে পুতুল-বরের ঘরে পাঠাইবে বলিয়া বিচিত্র চিত্র-আঁকা সাবানের একটা খালি বাক্সে তুলিয়া দিতে দিতে সুনন্দা খুব গম্ভীর-ভাবে রমাকে বলে—দেখো ভাই···আজ থেকে এদের তোমার হাতে তুলে দিলুম···

বর-কন্যা-সমেত সাবানের বাক্সটা হাতে লইয়া রমা হাসিয়া জবাব দেয়—হ্যাঁ গো বেয়ান, হ্যাঁ···তোমার মেয়ে-জামাইয়ের কোনো অযত্ন হবে না···তারা বুঝি আর আমার কেউ নয়?

কত যেন কান্না আসিয়াছে—এই-ভাবে শাড়ীর আঁচল-খানা টানিয়া চোখে দিতে দিতে সুনন্দা বলে—না ভাই বেয়ান, সে-কথা নয়···মন বোঝে না···এতকাল ধরে নেড়ে-চেড়ে মেয়েটাকে মানুষ করে তুললুম···

রমা বলে—সন্ধ্যেবেলা যাওয়া চাই কিন্তু বেয়ান··ফুল-শয্যা···কত আয়োজন করেছি···খুব ধুমধাম হবে···

মুরুব্বীর মত ভারীক্কি-চালে ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা জানায়, সে যাইবে'খন!

দরজার কাছে আসিয়া রমা সুনন্দাকে আবার বলে—সত্যি, যাস্ ভাই সন্ধ্যেবেলায়। ফুল-শয্যা খুব ভালো হবে, দেখিস্!···মা বলেচেন, অনেক রকম খাবার-দাবার তৈরী করে দেবেন· ছোট্ট-ছোট্ট লুচি, আলু-ভাজা···আরো কত কি!···বাবাকেও বলে দিয়েছি—আপিস থেকে ফেরবার পথে তিনি ছোট ছোট সন্দেশ, পুঁতির মালা, ফুলের মালা··· এই সব নিয়ে আসবেন। তাছাড়া বিকেলে রেবা, মান্তু, ক্ষেপী, রাণু ওরা সব্বাই আসবে···তুই কিন্তু একটু সকাল-সকাল যাস্ ভাই ঠিক!

রমা চলিয়া যায়। সুনন্দা গলির মোড়ের লাল-রঙের বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে! তার মেয়ে আজ পর হইয়া বরের ঘরে চলিয়া গেল···

* * * *
* * *

তারপর!

কতদিন কাটিয়া গেছে···

আষাঢ়ের এক সজল-প্রাতে শিঁথি-মৌর-মাথায় পরিয়া জল-ভরা চোখে বরের পাশে দাঁড়াইয়া সুনন্দা মায়ের পায়ের ধূলো লয়!

মা প্রাণ ভরিয়া দু'জনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—বেঁচে থাকো··সুখী হও···

বিচ্ছেদের আভাসে মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে!

সুনন্দাও কোনো কথা কহিতে পারে না···দুই হাতে নিবিড়-ভাবে মায়ের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া লাল-চেলীর অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নিঃশব্দে শুধু চোখের জলে ভাসিতে থাকে!

বিদায়ের লগ্ন বহিয়া আসে···

বাহিরে শাঁখ বাজিয়া ওঠে! একে একে পরিজনের কাছে বিদায় লইয়া সুনন্দা বরের সহিত চতুর্দ্দোলায় আসিয়া বসে! চারিপাশের হুলু-ধ্বনি, শঙ্খ-রোল, অশ্রুধারার মাঝে চতুর্দ্দোলা চলিতে সুরু করে!

মায়ের মুখ··পরিজনদের মুখ···বন্ধুদের হাসি···সব কিছুই যেন অস্পষ্ট আব্ছা হইয়া আসে! শৈশবের সব কিছু স্মৃতি, সব-কিছু মায়া পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া সুনন্দা জীবনের অজানা পথের ধারে নূতন করিয়া ঘর বাঁধিতে চলে! পুরানো হাসি, গান, আনন্দের যত-কিছু ছবি দূর হইতে দূরান্তরে ঝাপ্সা হইয়া মিলাইয়া যায়!

* * * *
* * *

আরো···

আরো কতদিন কাটিয়া গিয়াছে···

সেদিনও আকাশের কোণে শ্রাবণের মেঘ জমিতে সুরু করিয়াছে···সানাইয়ের সুর উদাস-ভাবে বাজিয়া চলিয়াছে!

বধূ-বেশিনী কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সুনন্দা বলে—স্বামীর ঘরে রাজ-লক্ষ্মী হও মা···

কন্যা কাঁদিয়া সুনন্দাকে জড়াইয়া ধরে—মা···

চোখের জল চাপিয়া হাসিয়া সুনন্দা মেয়েকে বুঝাইতে থাকে—ছি মা···এ-সব ছেলেমানুষী করতে নেই···স্বামীর ঘর···

শঙ্খ বাজিয়া ওঠে···সেই পুরানো সুর··সেই ভঙ্গী!

হুলু-ধ্বনি, কল-রোল, শঙ্খ-নিনাদের মাঝে বর-বধূর হাত ধরিয়া সুনন্দা ফুলে-পাতায়-সাজানো গাড়ীতে আনিয়া বসাইয়া দেয়!

গলির মোড় বাঁকিয়া গাড়ীখানা শাদা বাড়ীর আড়ালে অদৃশ্য হইয়া যায়!

যতক্ষণ দৃষ্টি যায় সুনন্দা চুপ করিয়া সেই-দিকেই তাকাইয়া থাকে! তারপর শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছিয়া ভাবে, তার মেয়েও আজ পর হইয়া বরের ঘরে চলিয়া গেল!

অনেক পুরানো কথা তার মনে আজ ভিড় করিয়া আসে! মনে পড়িয়া যায় শৈশবের সেই পুতুলের বিয়ের দিনগুলির কথা!

সুনন্দা ভাবিতে থাকে···এ-পুতুল-খেলার শেষ কোথায়··?

•

··কিন্তু এ পুতুল-খেলার শেষ নাই! দৃষ্টির অগোচরে··নিভৃত অন্তরালে একান্তে বসিয়া কে যেন এক-মনে সারা জীবন ধরিয়া অবিরাম এই পুতুল-খেলা করিয়া চলিয়াছে···! এ-খেলার বিরাম নাই··শেষ নাই!

স্মৃতির ব্যথা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

যে যায় সে যায় চ'লে—
রেখে যায় স্মৃতিটি—
মরমের মাঝখানে
বিষাদের গীতিটি!
জানি এ মাটির দেহ
কারো হেথা নয় কেহ—
তবু কিগো ভোলা যায়
ভালবাসা—প্রীতিটি?

যে থাকে পড়িয়া পিছে—
পায় শুধু বেদনা,
যে যায় চলিয়া হায়
চাহে না রে, সে তো না!
জীবনের পরপারে
মরণের অভিসারে—
যে যায়—থাকে কি তার
দুখসুখ-চেতনা?

স্মৃতি শুধু রহি' রহি'
দিয়ে যায় ব্যথা রে,
মনে জাগে অতীতের
কত কি যে কথা রে!
উদাসীর মত হায়
অন্তর যেতে চায়—
ভোলা যায় স্মৃতি তার
এ ধরায় বথা রে!

যে যায় সে যায় চ'লে—
ফেলে যায় কাঁদিতে
বেদনার হাহাকারে
মনোবীণা বাঁধিতে।
যদি আসে—কেন যায়?—
সে কি আহা, শুধু চায়
ক্ষণিকের তরে এসে
আঁখিযুগ ধাঁধিতে?

পথ বেঁধে দিল

(চিত্রনাট্য)

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিজল্‌ভ্‌।

কলিকাতার একটি প্রগতিশীল গৃহে ড্রয়িং রুম। বাড়ীর কর্ত্রী ও আরও তিনটি প্রবীণা মহিলা বিভিন্ন চেয়ারে বসিয়া আছেন। চায়ের উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছে।

চা পরিবেশন করিতে করিতে গৃহকর্ত্রী অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত কথা বলিতেছেন ; তাহার স্থুল আতিথেয়তার ভিতর দিয়া কিন্তু টেক্কা দিবার গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিতেছে।

কর্ত্রী : রঞ্জন পাশ করেছে কি-না—হাজার হোক, ওর আপনার বলতে তো আমিই—তাই সামান্য একটু চায়ের আয়োজন করেছি - ওরে রামভরসা, কোথায় গেলি ? এদিকে কেক নিয়ে আয়—

মহিলারা রঞ্জনের নাম শুনিয়া একেবারে স্থির-নেত্র হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমা মহিলা ঠক্‌ করিয়া নিজের চায়ের বাটি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন—

প্রথমা মহিলা : অ্যাঁ ! রঞ্জনের আস্‌বার কথা আছে না কি ?

দ্বিতীয়া মহিলার অধরোষ্ঠ বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল ; তিনি বলিলেন—ওমা, এমন জান্‌লে আমি যে মলিনাকে নিয়ে আসতুম—

তৃতীয়া মহিলার মুখ অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

তৃতীয়া মহিলা : এ ভাই তোমার ভারি অন্যায়। আগে জানালে না কেন ? আমার মীরার সঙ্গে রঞ্জনের কত ভাব ! আগে জানলে মীরাকে নিয়ে আসতুম।

গৃহকর্ত্রী গাল ভরিয়া হাসিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিনীদের পরাজয়ের আনন্দে তাঁহার মেদ-মণ্ডিত গণ্ডদ্বয় পিণ্ডীভূত হইয়া উঠিল।

কর্ত্রী : রঞ্জন আর আমার ইন্দুতে যেমন ভাব, এমন আর কারুর সঙ্গে নয়। যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল। একদিনও দুজনে দুজনকে না দেখে থাকতে পারে না।

অতিথিত্রয় এই অত্যন্ত অরুচিকর কথায় চিরেতা খাওয়ার মত মুখ করিয়া পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিলেন।

ঘরের বাহিরে পদধ্বনি শুনা গেল। গৃহকর্ত্রী সচকিত আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিলেন।

কর্ত্রী : ঐ বুঝি রঞ্জন এল—(নেপথ্যকে উদ্দেশ করিয়া) ওরে বিন্দি, ইন্দুকে ওপর থেকে ডেকে আন না—আর কত সাজগোজ করবে—

তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন।

বিধুবাবু দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া মহিলাগুলিকে একে একে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর হাসিমুখে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। সবগুলিকে এক জায়গায় পাইয়া তিনি খুসী হইয়াছেন বোধ হইল।

রঞ্জনের স্থানে বিধুবাবুকে পাইয়া গৃহকর্ত্রী নিরাশ হইলেন ; শুষ্কস্বরে কহিলেন—বিধুবাবু ! আসুন।

অন্য মহিলাগণ রঞ্জনকে না দেখিয়া যেন একটু আশ্বস্ত ভাবে হাঁফ ছাড়িলেন।

বিধুবাবু আসিয়া গৃহকর্ত্রীর পাশের চেয়ারে বসিলেন। গৃহকর্ত্রী উৎকণ্ঠিতভাবে ঘড়ির পানে তাকাইলেন।

কর্ত্রী : তাই তো, রঞ্জনের এত দেরী হচ্চে কেন ? পাচটা বাজতে চলল—সে তো কখনও এমন করে না !

বিধুবাবু ইতিমধ্যে রামভরসার হাত হইতে এক পেয়ালা চা সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; চায়ে চুমুক দিতে গিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তারপর ধীর মন্থর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—

বিধু : আপনারা কি রঞ্জনের অপেক্ষা করছেন ?

কর্ত্রী : হ্যাঁ—তার জন্যেই তো আজ বিশেষ ক'রে চায়ের আয়োজন করেছিলুম।

বিধু : কিন্তু—

তিনি ধীরে সুস্থে একচুমুক চা পান করিলেন।

বিধু : রঞ্জন তো বোধ হয় আসতে পারবে না।

গৃহকর্ত্রী তাঁহার সমস্ত দেহের উর্দ্ধাঙ্গ বিধুবাবুর দিকে ফিরাইলেন।

কর্ত্রী: আসতে পারবে না! কেন?

বিধুবাবু পুনরায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

বিধু: যেহেতু তার বাপ তাকে হঠাৎ কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কর্ত্রী: অ্যাঁ—সে কি?

হাসি-হাসি মুখে এই সংবাদ-বোমা মহিলাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিধুবাবু চায়ের বাটিতে মন দিলেন। অন্য মহিলারাও কম বিচলিত হন নাই।

প্রথমা মহিলা: কই, আমরা তো কিছু জানি না!

বিধুবাবু মহিলাদের এই চাঞ্চল্য চাহিয়া চাহিয়া উপভোগ করিতেছেন।

বিধু: আপনারা জানবেন কোত্থেকে? প্রতাপ তো আর আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের ছেলেকে দেশান্তরী করেনি।

দ্বিতীয়া মহিলা: কিন্তু এরকম করবার মানে কি?

তৃতীয়া মহিলা: ছেলে সবে পাশ করেছে; এখন কোথায় দু-চারদিন কলকাতায় আমোদ আহ্লাদ করবে—

বিধু: (শান্ত স্বরে) প্রতাপ তার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছে।

সকলে: অ্যাঁ!

মহিলাগণ ব্যাকুলনেত্রে পরস্পর তাকাইতে লাগিলেন।

গৃহকর্ত্রী অনুনয়পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া বিধুকে বলিলেন—

কর্ত্রী: সত্যি বলছেন বিধুবাবু? (বিধু ঘাড় নাড়িলেন) ভিতরের কথাটা কি বলুন না, বিধুবাবু। কি হয়েছে?

বিধুবাবু নেপথ্যের পানে তাকাইয়া হাঁকিলেন—

বিধু: ওরে রামভর্সা, এদিকে কেক্ নিয়ে আয়তো।

কর্ত্রী: হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে বিধুবাবুকে কেক্ দে। তারপর, কথাটা কি বিধুবাবু? হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়ে গেল কি ক'রে?

রামভরসা কেকপূর্ণ ট্রে লইয়া বিধুবাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল। বিধুবাবু সযত্নে একটি বড় গোছের কেক্ নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে কামড় দিলেন।

বিধু: (চিবাইতে চিবাইতে) কথাটা আর কিছু নয়, প্রতাপের ইচ্ছে রাজারাজড়ার ঘরে ছেলের বিয়ে দেয়। তাই, পাছে ছেলে ইতিমধ্যে কোনও মেয়ের 'লভে' পড়ে যায়, এই ভয়ে তাকে একেবারে ঝাঝায় পাঠিয়ে দিয়েছে। জংলী দেশ, সেখানে তো আর অলিতে গলিতে সুন্দরী শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী পাওয়া যায় না।

চারিটি মহিলাই বিধুর কথা শুনিতে শুনিতে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রথমা মহিলা গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজ মনে উচ্চারণ করিলেন—

প্রথমা মহিলা:- ঝাঝা!

তৃতীয়া মহিলা সহসা শূন্যের দিকে তাকাইয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—

তৃতীয়া মহিলা: ঝাঝা!

দ্বিতীয়া মহিলা পিন্‌বিদ্ধ-বৎ চেয়ার হইতে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

দ্বিতীয়া মহিলা: ঝাঝা!

বাকি দুটি মহিলাও আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

প্রথমা মহিলা: (গৃহকর্ত্রীকে) চললুম ভাই, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোহার সিন্দুক খোলা ফেলে এসেছি—

তিনি দ্রুত দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। বাকি দুইজন পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারাও দ্বারের দিকে ছুটিলেন; তাঁহাদের সম্মিলিত ওজুহাত বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া গৃহকর্ত্রীর কানে পৌঁছিল।

মিলিত স্বর: কর্ত্তার পায়ে মেয়ের সঙ্গে অন্য সময় হাতিবাগানে স্যাকরা আসবার কথা আবার আর একদিন—

মহিলাগণ শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলেন।

গৃহকর্ত্রী হতভম্ব। তিনি বিধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলেন—বিধু পরম কৌতুকে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। হঠাৎ গৃহকর্ত্রীয় মস্তিষ্ক রুদ্ধ বুদ্ধির প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাড়ীর ভিতর দিকে চলিলেন—

কর্ত্রী: ইন্দু!—ওরে ইন্দু—ঝাঝা—ঝাঝা!

বিধু ধূর্ত্ত শৃগাল-হাস্য হাসিতে লাগিলেন।

ডিজল্‌ভ্।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া মঞ্জুর মোটর চলিয়াছে। গাড়ীর হুড্ নামানো হইয়াছে; পিছনের সীট্ হইতে রঞ্জনের মোটর-বাইক মাথা উঁচু করিয়া আছে।

গাড়ী চালাইতেছে মঞ্জু; রঞ্জন তাহার পাশের সীটে বসিয়া মঞ্জুর দিকে ফিরিয়া কথা কহিতেছে; তাহার ডান হাতটা সীটের পিঠের উপর ন্যস্ত।

রঞ্জন: দেখুন মঞ্জু দেবী, আমাকে গাড়ীটা চালাতে দিলেই 'ভাল করতেন। এখনও প্রায় দেড়শ' মাইল যেতে হবে।

মঞ্জু: কতবারই তো গিয়েছি। নতুন কিছু নয়।

রঞ্জন: কিন্তু তবু, আমি যখন রয়েছি—

মঞ্জু ভ্রূ তুলিয়া ক্ষণেকের জন্য রঞ্জনের দিকে চাহিল।

মঞ্জু: আপনার কি বিশ্বাস আমার চেয়ে আপনি ভাল গাড়ী চালাতে পারেন?

এ কথার সোজা উত্তর মহিলাকে দেওয়া যায় না। রঞ্জন কাঁধের একটা ভঙ্গী করিয়া সম্মুখ দিকে তাকাইল।

রঞ্জন: পুরুষের নার্ভ আর মেয়েদের নার্ভ সমান নয়। হাজার হোক—

মঞ্জু: আমার নার্ভ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি আপনাকে খানায় ফেল্‌ব না।

রঞ্জন বেশ খানিকক্ষণ মঞ্জুর পানে চোখ পাতিয়া চাহিয়া রহিল; তারপর সীটের পিঠ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহার চোখের মধ্যে একটা দুষ্টামি-বুদ্ধি খেলা করিয়া গেল; সে একবার আড়চোখে মঞ্জুর দিকে তাকাইয়া নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল। রুমালটা ঝাড়িয়া পাট খুলিয়া সেটাকে কোলের উপর রাখিয়া কোণাকুণিভাবে পাট করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে মৃদু গানের গুঞ্জন বাহির হইতে লাগিল।

মঞ্জু সকৌতুকে একবার তাহার দিকে মুখ ফিরাইল।

মঞ্জু: হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি গান করুন; তবু তো কিছু করা হবে।

রঞ্জন: বেশ তো। আমার গাইতে আপত্তি নেই।

রুমাল পাট করিতে করিতে সে গান ধরিল—

রঞ্জন: "দু'জনে দেখা হ'ল—মধু-যামিনী রে!"

গান শুনিতে শুনিতে মঞ্জুর মুখে চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিল। রঞ্জন প্রথম পংক্তি শেষ করিতেই সে দ্বিতীয় পংক্তি ধরিল—

মঞ্জু: "কেহ কিছু কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে।"

হাসিতে হাসিতে রঞ্জনের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার কোলের উপর মঞ্জুর দৃষ্টি পড়িল। কৌতূহলী মঞ্জু জিজ্ঞাসা করিল—

মঞ্জু: ওটা কি হচ্চে?

রঞ্জন যে জিনিষটি তৈয়ারি করিতেছিল তাহা এবার ডান হাতের তেলোর উপর তুলিয়া ধরিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—

রঞ্জন: ইঁদুর।

উত্তর শুনিয়া মঞ্জু চমকিয়া একবার ঘাড় ফিরাইল; তারপর উৎকণ্ঠিত চক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া গাড়ী চালাইতে চালাইতে বলিল—

মঞ্জু: ইঁদুর!

রঞ্জন: হ্যাঁ। এই যে দেখুন না কেমন লাফায়! ডান হাতের উপর ইঁদুর রাখিয়া রঞ্জন সস্নেহে তাহার পিঠে বাঁ হাত বুলাইতে লাগিল। রুমালের ইঁদুর জীবন্ত ইঁদুরের মত তাহার হাতের ভিতর হইতে পিছলাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইঁদুর দেখিয়া ভয় পায় না—তা হোক সে রুমালের ইঁদুর—এমন মেয়ে কয়টা আছে? মঞ্জুর মুখ শুকাইয়া গেল; ত্রস্ত চোখে ইঁদুরের দিকে তাকাইয়া সে কোণ ঘেঁষিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল।

রঞ্জনের ইঁদুর এবার মস্ত এক লাফ্‌ দিয়া তাহার হাত হইতে বাহির হইয়া একেবারে মঞ্জুর কোলের উপর পড়িল। মঞ্জু চোখ বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

এদিকে গাড়ীর অবস্থা শোচনীয়। ষ্টীয়ারিং হুইলের উপর মঞ্জুর হাত শিথিল হইয়া যাওয়ার ফলে গাড়ী স্বেচ্ছামত রাস্তার এধার হইতে ওধার পরিক্রমা করিতে করিতে চলিয়াছে। শেষে খানার ঠিক কিনারায় আসিয়া পড়িতে পড়িতে গাড়ী থামিয়া গেল।

গাড়ীর ভিতরে তখন রঞ্জন দৃঢ় মুষ্টিতে ষ্টীয়ারিং ধরিয়া ব্রেক কশিয়াছে, মঞ্জুর শিথিল হস্ত রঞ্জনের হাতের তলায় চাপা পড়িয়াছে।

রঞ্জন ছদ্ম ভৎর্সনার চক্ষে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন: কি বলেছিলুম? আর একটু হ'লেই খানায় ফেলেছিলেন!

মঞ্জু: (কম্পিত কণ্ঠে) কিন্তু আপনিই তো—

রঞ্জন: নিন্—এবার আমাকে চালাতে দিন। জানি আমি মেয়েদের নার্ভ ভাল নয়—

মঞ্জু অত্যন্ত সুবোধ বালিকার ন্যায় ষ্টীয়ারিং ছাড়িয়া দিল। সে এমন বিনীত সম্ভ্রমের সহিত রঞ্জনের মুখের পানে তাকাইল যাহাতে মনে হয় রঞ্জনের কূট-বুদ্ধির উপর তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

ডিজল্‌ভ্‌।

গাড়ী চলিতেছে. এবার রঞ্জন চালক এবং তাহার পাশে বসিয়া মঞ্জু। রঞ্জনের অধরকোণে একটু হাসি আনাগোনা করিতেছে। সে আড় চক্ষে চাহিয়া বলিল—

রঞ্জন: এবার না হয় আপনি গান করুন।

মঞ্জু উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল। অস্তমান সূর্য্যের আলো তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। সে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—

মঞ্জু: সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

রঞ্জনও সেই দিকে তাকাইল।

নানা বর্ণচ্ছটার মধ্য দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে।

রঞ্জনের কণ্ঠস্বর: পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে।

ডিজলভ্‌।

রাত্রি। গাড়ী চলিয়াছে। সুইচ্‌-বোর্ডের আলোয় মঞ্জু ও রঞ্জনের মুখ দেখা যাইতেছে! রঞ্জন সতর্কভাবে গাড়ী চালাইতেছে; তাহার দুই চক্ষু সম্মুখে নিবদ্ধ। মঞ্জুর ঢুল্‌ আসিতেছে। তাহার চোখ মাঝে মাঝে মুদিয়া আসিতেছে, আবার গাড়ীর ঝাঁকানিতে খুলিয়া যাইতেছে। শেষে তাহার চোখদুটি ভাল ভাবে মুদিত হইয়া গেল; মাথাটি পাশের দিকে নত হইতে হইতে অবশেষে রঞ্জনের কাঁধে ঠেকিয়া বিশ্রাম লাভ করিল।

রঞ্জন একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল; তারপর দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরে সতর্ক চক্ষু সম্মুখে রাখিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল।

ফেড্‌ আউট্‌।

ফেড্‌ ইন্‌।

ঝাঝায় মঞ্জুর পিতা শ্রীকেদারনাথ রায়ের বাড়ী। কাল—প্রভাত। বাড়ীর ড্রয়িং রুমটি বেশ সুপরিসর ও মূল্যবান আসবাবে সাজানো। ঘরের এক কোণে শীতের সময় আগুন জ্বালিবার চিম্‌নি আছে, এই চুল্লী ঘিরিয়া কারুকার্য্য খচিত ম্যান্টেলপীস্‌। ঘর হইতে ভিতর দিকে যাইবার দ্বারের কাছে একটি বড় পিয়ানো।

কেদারবাবু একটি গদি-মোড়া চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাঁহার চোয়াল ও মাথা বেষ্টন করিয়া একটি পশমের গলাবন্ধ ব্রহ্মতালুর উপর গিঁট বাঁধা আছে। কেদারবাবু স্নায়বিক দন্তশূলে ভুগিতেছেন। এজন্য তাঁহার স্বভাবত কড়া মেজাজ সম্প্রতি আরও কড়া হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ডান দিকে একটু পিছনে একটি সচল চা-টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। চায়ের বাটিতে চামচের ঠুং ঠাং শব্দ আসিতেছে। মঞ্জু চা তৈয়ার করিতে করিতে পিতাকে গতদিনের পথে বিপত্তির গল্প বলিতেছিল।

কেদারবাবু গলার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার-শব্দ করিলেন। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক; কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রায়ই এরূপ করিয়া থাকেন।

কেদার: হুঁঃ। তারপর!

মঞ্জু গতদিনের ক্লান্তির পর আজ সকালে উঠিয়াই স্নান করিয়াছে; একটি চওড়া কালোপাড় আটপৌরে শাড়ী ও হাতকাটা মলমলের ব্লাউজ্‌ পরিয়া তাহাকে বৃষ্টিধৌত সদ্যস্ফুট মল্লিকাফুলের মত দেখাইতেছে। সে চা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া মুখ তুলিল।

মঞ্জু: তারপর আর কি—আমার কথাটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো। রাত্তিরে বাড়ীতে এসে ঘুমুলুম; তারপর আজ সকালে উঠে তোমাকে চা তৈরি ক'রে দিচ্ছি।

কেদারবাবু গলার মধ্যে আবার হুঙ্কার ছাড়িলেন; মঞ্জুর দিকে ঘাড় ফিরাইয়া স্বভাবসিদ্ধ কড়া স্বরে প্রশ্ন করিলেন—

কেদার: হুঁঃ। ছোকরা কেমন? ভদ্রলোক?

মঞ্জু স্মিত চোখদুটি শূন্যে পাতিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল; তারপর ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া আস্তে আস্তে বলিল—

মঞ্জু: হাঁ—ভদ্রলোক।

কেদার: নাম কি?

মঞ্জু চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইতে লইতে বলিল—

মঞ্জু: শ্রীরঞ্জনপ্রকাশ সিংহ।

কেদারবাবুর ললাট ভ্রূকুটি কুটিল হইল; তিনি প্রতিধ্বনি করিলেন—

কেদার: সিংহ।

কেদারবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তাঁহার অন্তরে স্মৃতির আগুন হঠাৎ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—

কেদার : সিংগি! আমার যখন বয়স কম ছিল, একটা সিংগিকে জানতুম—পাজি নচ্ছার হতচ্ছাড়া লোক। আমার বন্ধু ছিল; তারপর আজ পঁচিশ বছর তার মুখ দেখিনি। বোম্বেটে শয়তান—

মঞ্জু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; চায়ের পেয়ালা কেদারবাবুর সম্মুখে একটা ছোট টিপয়ের উপর রাখিতে রাখিতে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু তাই বলে কি সব সিংগিই বোম্বেটে শয়তান হবে বাবা?

কেদারবাবু বিবেচনা করিলেন, শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করিলেন—

কেদার : তা না হতে পারে। নল্ দাও।

মঞ্জু : (বুঝিতে না পারিয়া) নল্?

কেদার : (ঈষৎ তিরিক্ষিভাবে) হাঁ করতে পারছি না, চা খাব কি করে?—নল দাও।

মঞ্জু : ও!

বুঝিতে পারিয়া মঞ্জু হাসিয়া উঠিল; তারপর নল আনিতে গেল। ম্যাণ্টেল পীসের উপর একটি কাচের গেলাসে এক গোছা খড়ের নল ছিল। (যাহার সাহায্যে সরবৎ চুষিয়া খাইবার ফ্যাসান হইয়াছে); মঞ্জু তাহারই একটি আনিতে আনিতে স্নেহকৌতুকবিগলিতকণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু তুমি কি কাণ্ডটাই করলে! সামান্য একটু দাঁতের ব্যথা হয়েছিল, অমনি আমাকে টেলিগ্রাম!

কেদারবাবুর চেয়ারের দক্ষিণ পাশে দাঁড়াইয়া মঞ্জু খড়ের নল তাঁহার হাতে দিল। কেদারবাবু একবার কট্‌মট্ করিয়া তাহার পানে তাকাইলেন।

কেদার : দাঁতের ব্যথা সামান্য ব্যাপার! জানো, দাঁতের ব্যথায় কত লোক মারা গেছে? হুঁঃ!

তিনি চায়ের মধ্যে খড় ডুবাইয়া চুষিতে আরম্ভ করিলেন। মঞ্জু ভর্ৎসনার সুরে বলিল—

মঞ্জু : ছি বাবা, তোমার যত অলক্ষুণে কথা।

মঞ্জু পিতার চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া তাঁহার কাঁধে হাত রাখিল—দুষ্টামি-ভরা সুরে বলিল—

মঞ্জু : কিন্তু আসল কথাটি আমি বুঝেছি—আমাকে না দেখে তুমি থাকতে পারো না, যাহোক একটা ছুতো ক'রে ডেকে পাঠাও—

কেদারবাবু ক্ষণেকের জন্য মুখ তুলিলেন; তাঁহার মুখের উপর দিয়া এমন একটা ভাব খেলিয়া গেল যাহাকে হাসি বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন—

কেদার : হুঁঃ থাকতে পারি না! হুঁঃ!

মঞ্জু : পারোই না তো!—বোর্ডিংয়ে সবাই আমায় কত ঠাট্টা করে। বলে, বাবার নয়ন-মণি মেয়ে!

বিগলিত স্নেহে মঞ্জু কেদারবাবুর গিঁট-বাঁধা মস্তকের' উপর গাল রাখিল। এবার একটি অসন্দিগ্ধ হাসি সত্য সত্যই কেদারবাবুর মুখে দেখা গেল; কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। আবার গম্ভীর হইয়া তিনি বলিলেন—

কেদার : কি নাম—সেই সিংগি ছোকরা আজ এখানে আসবে নাকি?

মঞ্জু উঠিয়া বসিয়া একটু চিন্তা করিল।

মঞ্জু : রঞ্জনবাবু? কি জানি আসবেন কি-না—কিছু তো বলেন নি। আসবেন হয় তো।

কেদারবাবু একটি হুঙ্কার দিয়া চায়ে নল-সংযোগ করিলেন। মঞ্জু অলসপদে উঠিয়া গিয়া নিজের পেয়ালায় চা ঢালিল। একটু অন্যমনস্কভাবে পেয়ালাটি মুখের কাছে লইয়া গিয়াছে এমন সময় বহির্দ্বারের নিকট পদশব্দ শুনা গেল। মঞ্জু তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা রাখিয়া সাগ্রহে দ্বারের দিকে তাকাইল।

দ্বার দিয়া যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি বয়সে রঞ্জনের সমসাময়িক হইলেও আকৃতি ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইনি অতিশয় শীর্ণকায় ও দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট। একটি ছোট ক্যামেরা তাঁহার কাঁধ হইতে উপবীতের ন্যায় চামড়ার অবলম্বনের সাহায্যে ঝুলিতেছে।

মঞ্জু ঈষৎ আশাহত কণ্ঠে বলিল—

মঞ্জু : ও—মিহিরবাবু!

মিহির ভাবাতুর নেত্রে চাহিল।

মিহির : আকাশে চাঁদ উঠেছে!

কেদারবাবুও মিহিরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন; অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিলেন—

কেদার : অ্যাঁ ! কি বলছ হে ছোকরা ? বেলা সাড়ে আটটার সময় আকাশে চাঁদ উঠেছে !

মিহির ভাবুকের ভঙ্গীতে মাথাটি দোলাইতে দোলাইতে কেদারবাবুর সম্মুখস্থ চেয়ারে আসিয়া বসিল—

মিহির : আপনি ভুল বুঝেছেন। জাপানী কায়দায় একটি কবিতা লিখেছি তাই আবৃত্তি করছিলুম—

কেদারবাবু একটি নাতিক্ষুদ্র হুঙ্কার ছাড়িয়া চায়ের পেয়ালায় অবহিত হইলেন। মঞ্জু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—

মঞ্জু : জাপানী কায়দাটা কি রকম ?

মিহির : শুনবেন ? (ভঙ্গীসহকারে)

"আকাশে চাঁদ উঠেছে !
যেন রে ফুল ফুটেছে।
গন্ধে মন্ লুটেছে।"

কেদারবাবু মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কবি আর কথা কহিলেন না। কেদারবাবু তখন অধীর হইয়া বলিলেন—

কেদার : তারপর কি ?

মিহির : তারপর আর নেই—ঐখানেই শেষ !

কেদারবাবু কট্মট্ করিয়া চাহিলেন।

কেদার : শেষ ! তিন লাইনে কবিতা শেষ !—হুঁঃ ! যত সব—

ক্রুদ্ধভাবে কেদারবাবু চায়ে খড় ডুবাইয়া চুষিতে লাগিলেন। মিহির ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাহার চক্ষে শিল্পী-জনোচিত উদ্দীপনা ফুটিয়া উঠিল। সে একাগ্রভাবে কেদারবাবুর চা-পান দেখিতে লাগিল।

মিহির : বাঃ ! চমৎকার ! একটা নতুন দৃশ্য। কেদারবাবু, নড়বেন না, আমি আপনার ছবিটা জাপানী ভঙ্গীতে তুলে নিই।

ক্ষিপ্রহস্তে ক্যামেরা বাহির করিয়া মিহির কেদারবাবুর উপর লক্ষ্য স্থির করিল। কেদারবাবু গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

কেদার : খবরদার ছোকরা, আমার দন্তশূল হয়েছে—এখন আমার ছবি তুললে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

কেদারবাবুর চক্ষে হিংস্র আপত্তি দেখিয়া মিহির দুঃখিতভাবে নিরস্ত হইল। মঞ্জু কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বিষণ্ণ ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া মিহির আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল। মঞ্জু আঁচলের প্রান্ত ঠোঁটের উপর চাপিয়া হাসি নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মিহির ক্যামেরা বাগাইয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

মিহির : মঞ্জু দেবী, ঠিক যেমন আছেন তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন ; আপনার ছবিটা জাপানী ষ্টাইলে তুলে নি—

মঞ্জু তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িল।

মঞ্জু : ধন্যবাদ, জাপানী স্টাইলের থ্যাব্ড়া মুখের ছবি আমার দরকার নেই।—তার চেয়ে আপনি এক পেয়ালা চা খান—

মিহিরের মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িল, হতাশ ভাবে ক্যামেরাটি খাপে পুরিবার উপক্রম করিয়া সে নিরুৎসুক স্বরে প্রশ্ন করিল—

মিহির : জাপানী চা ?

মঞ্জু : উঁহু—দার্জ্জিলিং।

মিহির : (নিশ্বাস ফেলিয়া) তবে থাক—

মিহির উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দ্বারের দিকে চলিল। প্রায় দ্বার পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, এমন সময় রঞ্জন বাহির হইতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রঞ্জন মিহিরকে দেখিতে পাইল না, প্রথমেই তাহার দৃষ্টি মঞ্জুর উপর গিয়া পড়িয়াছিল। সে স্মিতমুখে হাত তুলিয়া বলিল—

রঞ্জন : নমস্কার !

সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মিহির ক্যামেরা খাপে পুরিতে পুরিতে মধ্য পথে থামিয়া গিয়া গভীর কৌতূহলে রঞ্জনের পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে ক্যামেরাটি আবার বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কেদারবাবু নবাগত রঞ্জনকে তীক্ষ্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ; মঞ্জু তাঁহার কাছে আসিয়া চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু : বাবা, ইনিই রঞ্জনবাবু !

রঞ্জন করজোড়ে কেদারবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় পাশ হইতে ক্লিক্ করিয়া ক্যামেরার শব্দ হইল। সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলেন।

মিহির ক্যামেরা খাপে পুরিতে পুরিতে বাহির হইয়া যাইতেছে ; দ্বারের কাছে পৌছিয়া সে একবার ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল।

মিহির : নমস্কার! (মিহির প্রস্থান করিল)

রঞ্জন ঈষৎ বিস্ময়ে দু'জনের মুখের পানে চাহিল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—

রঞ্জন : ইনি কে ?

কেদার : উনি একটি হনুমান।—আপনি বসুন।

রঞ্জন কেদারবাবুর সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিল।

রঞ্জন : (বসিতে বসিতে) হনুমান !

কেদার : হ্যাঁ। বাপের কিছু পয়সা আছে তাই জাপানী কায়দায় কবিতা লেখে, আর ফটোগ্রাফ্ তুলে বেড়ান্।

রঞ্জন চকিতে একবার মঞ্জুর মুখের পানে চাহিল; যেন এই কবির প্রতি মঞ্জুর মনের ভাবটা কিরূপ তাহা জানিতে চায়। কিন্তু মঞ্জুর মুখের নিগূঢ় হাসি হইতে কিছুই ধরা গেল না। রঞ্জন গম্ভীর মুখে বলিল—

রঞ্জন : ও! কাঃ—বেশ তো।

কেদার সন্দিগ্ধভাবে রঞ্জনের দিকে চাহিলেন।

কেদার : আপনিও কবিতা লেখেন না কি ?

রঞ্জন : আজ্ঞে জীবনে এক লাইন কবিতা লিখিনি।

কেদারবাবু গলার মধ্যে পরিতোষ-সূচক একটি ক্ষুদ্র হুঙ্কার দিলেন।

কেদার : বেশ বেশ। আপনার কি করা হয় ?

রঞ্জন : (বিনীত ভাবে) আজ্ঞে, এই সবে এম্-এস্‌সি পাশ করেছি।

কেদারবাবু অধিকতর পরিতোষ জ্ঞাপন করিয়া হুঙ্কার দিলেন।

কেদার : বেশ বেশ। খুশী হলুম।—মঞ্জু, এঁকে চা দাও।

মঞ্জু চায়ের টেবিলের দিকে গেল। কেদারবাবু এতক্ষণে একটি মনোমত প্রসঙ্গ পাইয়া বেশ উৎসাহের সহিত মাথার উপরকার গিট খুলিতে খুলিতে বলিলেন

কেদার : সায়েন্সই হচ্ছে আজকাল একমাত্র পড়বার জিনিষ! তা না পড়ে' আজকালকার ছোঁড়ারা পড়্‌তে যায় কাব্য আর ফিলজফি—ছ্যাঃ!—আমার মেয়েকে আমি সায়েন্স্ পড়াচ্ছি।

মঞ্জু চায়ের বাটি আনিয়া রঞ্জনকে দিল; রঞ্জন স্মিতমুখে উঠিয়া পেয়ালা লইয়া আবার বসিল। মঞ্জু বাপের চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কেদারবাবু বলিয়া চলিলেন

কেদার : Mechanics, আবিষ্কার, invention——এরির ওপর বর্ত্তমান পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে! (সহসা রঞ্জনকে) আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন ?

রঞ্জন : (চমকিয়া) আজ্ঞে আবিষ্কার! আমি ?—(সে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হইতে বামে মাথা নাড়িল) আজ্ঞে না—

কেদার : একটাও না ?

রঞ্জন হাতের পেয়ালা পাশে টিপয়ের উপর রাখিয়া মাথা চুলকাইল। আবিষ্কার করিয়াছে বলিতে পারিলেই ভাল হয়, কেদারবাবু খুশী হন। কিন্তু—

রঞ্জন : আজ্ঞে কই মনে করতে তো পারছি না।

কেদার গলাবন্ধ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। মঞ্জু তাঁহার চেয়ারের পিঠের উপর কনুই রাখিয়া করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া রঞ্জনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া আছে। সে এখন আস্তে আস্তে কথা কহিল—

মঞ্জু : আপনার একটা আবিষ্কারের কথা কিন্তু আমি জানি।

রঞ্জন চমকিয়া তাকাইল।

রঞ্জন : অ্যাঁ!—কি ?

মঞ্জু : (মুখ টিপিয়া) ইঁদুর।

ইঁদুরের প্রসঙ্গে রঞ্জন বড়ই লজ্জিত হইয়া পড়িল। কেদারবাবু সবিস্ময়ে ঘাড় বাঁকাইয়া মঞ্জুর দিকে চাহিলেন।

কেদার : ইঁদুর ?

মঞ্জু : (ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে) হ্যাঁ। ওঁকেই জিগ্যেস কর না—একেবারে জ্যান্ত ইঁদুর।

কেদারবাবু রঞ্জনের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন—

কেদার : আপনি ইঁদুর আবিষ্কার করেছেন ?

রঞ্জন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল।

রঞ্জন : আজ্ঞে সে কিছু নয়—সামান্য—রুমাল দিয়ে—ছেলেমানুষী--

রঞ্জন ভর্ৎসনাপূর্ণ নেত্রে মঞ্জুর পানে তাকাইল! কেদারবাবু কিন্তু দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িলেন।

কেদার : আবিষ্কার কখনও ছেলেমানুষী হতে পারে ? —কি করেছেন দেখি ?

রঞ্জন : (করুণভাবে) আজ্ঞে নেহাৎ বাজে জিনিষ—সকলেই জানে--

কেদার কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

কেদার : তা হোক—দেখি—

রঞ্জন তখন নিরুপায় হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল; ক্ষুব্ধ কটাক্ষে মঞ্জুর দিকে চাহিয়া দেখিল, সে মুখে কাপড় গুঁজিয়া প্রাণপণে হাসি রোধ করিতেছে। গত সন্ধ্যার প্রতিশোধ লইয়া সে যে খুশী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রঞ্জন ইঁদুর তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেদারবাবু দুই চক্ষে আগ্রহ ও একাগ্রতা ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ইঁদুর প্রস্তুত হইলে রঞ্জন বলিল—

রঞ্জন : এই নিন্, হয়েছে।

ইঁদুরটিকে ডান হাতের উপর রাখিয়া রঞ্জন বাঁ হাতে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। ইঁদুর পিছলাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার হাত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রঞ্জন তাহার ল্যাজ ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল।

ইঁদুরের কার্য্যকলাপ দেখিতে দেখিতে কেদারবাবুর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। হাসি ক্রমে প্রসার লাভ করিল; তাঁহার গলা হইতে নানা প্রকার কৌতুক-দ্যোতক শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সর্ব্বশেষে তিনি দুই হাতে পেট চাপিয়া ধরিয়া হো হো শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু তাহা নিমেষকালের জন্য। পরক্ষণেই তাঁহার উচ্চ হাস্য উচ্চতর কাতরোক্তিতে পরিণত হইল। মুখ অতিমাত্রায় বিকৃত করিয়া তিনি একহাতে গাল চাপিয়া ধরিলেন।

কেদার : উহুহুহু—

রঞ্জন শঙ্কিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রঞ্জন : কি হ'ল! কি হ'ল!

কেদার : দাঁত! উহুহুহু—দাঁত!

মঞ্জু পিছন হইতে ছুটিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া তাড়াতাড়ি গলাবন্ধটা আবার তাঁহার গালের পাশে জড়াইতে লাগিল। রঞ্জন চেয়ারের অন্য পাশে দাঁড়াইয়া এই শুশ্রূষা কার্য্যে মঞ্জুকে সাহায্য করিতে লাগিল। কেদারবাবু কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে মস্তক শীর্ষে গিঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হইল। মঞ্জু ও রঞ্জনের হাতে হাতে ঠেকাঠেকি হইয়া যাইতেছিল তাহা যেন উভয়ের কেহই লক্ষ্য করিল না।

ফেড্ আউট্

ক্রমশঃ

চিঠি

শ্রীপ্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু সে কাগজ—
তাহাতে কালির লিখা,
নহেক সহজ,
কত না বিবিধ টীকা,
কথায় কথায় কত না কাতর ব্যথা,
দুখ্-ভরা কত সুখ-ভরা ব্যাকুলতা—
বাঁকানো আঁখরে বহিয়া এনেছে ঘরে,
প্রাণের প্রদীপে জ্বালাতে উজল শিখা।
হোক্ সে কাগজ—নহে সে কাগজ শুধু—
বহিয়া এনেছে তাহারি হাতের লিখা।

নহে সে রঙিন্—
ছেঁড়া সে খাতার পাতা,
কথার লাইন—
ফুলের আঙুলে গাঁথা,
নরম নরম চাঁপার কলিতে ধরি',
লিখেছে কেটেছে, কেটেছে লিখিছে মরি!
লেখনি তাহার কাঁপিয়াছে বার বার,
লিখিতে বুকের বিরহবেদনাগাথা,
নহে সে রঙিন্—তবু সে রঙিন্ অতি—
হোক সে শুধুই ছিন্ন খাতার পাতা।

সে যে কি আমার,
কখনো জানেনি কেহ,
দরশে তাহার,
কেঁপে ওঠে মন দেহ।
তাহারি আশায় চাহিয়া রয়েছি পথে,
মনের আবেগ লুকায়েছি কোন-মতে
খাতার পাতায় আয় ছুটে আয় আয়—
কালিতে জাগান, কাগজে মাখান স্নেহ;
শুধু নয় চিঠি ওই তার মিঠি দিঠি,
আমিই দেখেছি দেখেনি অপরে কেহ।

নক্ষত্রের দীপ্তি ও আয়তন

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে এম-এস-সি

একথা আজ কাহারও অবিদিত নাই যে আকাশের গায়ে যে ছোট ছোট তারাগুলি মিটিমিটি জ্বলিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য্য, এই প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ডগুলি মহাশূন্যে আলোক ও তাপ ছড়াইতেছে, ইহারা যে বিভিন্ন উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয় তাহার দুইটি কারণ : (১) বাস্তবিকই ইহারা বিভিন্ন দীপ্তিবিশিষ্ট, (২) আমাদের নিকট হইতে ইহাদের দূরত্ব বিভিন্ন। নক্ষত্রদের তুলনায় সূর্য্য আমাদের অতিমাত্র নিকটে, তাই ইহাকে এত বেশি উজ্জ্বল দেখায়। কোন নক্ষত্রের দূরত্ব যদি আমরা জানিতে পারি, তবে ইহার প্রতীয়মান উজ্জ্বলতার কতটুকু দূরত্বের উপর এবং কতটুকু তাহার বাস্তব উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে তাহা নির্ণয় করা শক্ত হয় না। দূরত্ব না জানিলে কোন নক্ষত্রের দীপ্তি সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া চলে না।

আলোকের ধর্ম্ম এই যে, কোন উজ্জ্বল জিনিষের দূরত্ব যে পরিমাণে বাড়ে, উজ্জ্বলতা তাহার বর্গানুপাতে কমে। রাস্তার আলোটি হইতে বর্ত্তমানে আমি যতদূরে আছি, যদি তাহার দ্বিগুণ দূরে সরিয়া যাই, আলোটিকে এক-চতুর্থাংশ উজ্জ্বল মনে হইবে, তিন গুণ দূর হইতে ইহাকে এক-নবমাংশ মাত্র উজ্জ্বল মনে হইবে। একশত হাত দূরে একটা বাতিকে যে পরিমাণ উজ্জ্বল দেখাইবে, দুইশত হাত দূরের চারিটা বাতি অথবা তিনশত হাত দূরের নয়টা বাতিকে সেই পরিমাণ উজ্জ্বল দেখাইবে। সূর্য্য যদি হঠাৎ দশ লক্ষ গুণ দূরে সরিয়া যায়, তবে তাহাকে দশ লক্ষ বর্গগুণ কম উজ্জ্বল দেখাইবে, ছয় মাইল দূরে বারটি মোমবাতির আলোকে যে রকম দেখাইবে, সূর্য্যকে তখন সেরকম মনে হইবে। আমরা তখনও তাহাকে দেখিব বটে কিন্তু একটি ক্ষীণ জ্যোতিনক্ষত্ররূপে। ইহার বেশি উজ্জ্বল বহু নক্ষত্র আকাশে আমরা দেখিতে পাই, লুব্ধক (Sirius), সেণ্টরাস মণ্ডলের সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সরমা (Procyon) ব্যতীত ইহাদের সকলেই সূর্য্যের দশ লক্ষ গুণেরও বেশি দূরে, কাজেই ইহাদের সকলেরই দীপ্তি সূর্য্যাপেক্ষা বেশি। দূরত্ব দ্বারা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি তারকার দীপ্তি ও সূর্য্যের চেয়ে বেশি, এতদ্ব্যতীত আরও দেখা গিয়াছে যে, খালি চোখে যত নক্ষত্র দেখা যায় (প্রায় ৬০০০) তাহাদের বেশির ভাগই সূর্য্যাপেক্ষা বাস্তবিক পক্ষে বেশি উজ্জ্বল। লুব্ধক তারার দীপ্তি বা বাস্তব উজ্জ্বলতা সূর্য্যের সাতাইশ গুণ, আবার ইহা আমাদের নিকটস্থ নক্ষত্রগুলির মধ্যে একটি। এই উভয় কারণে আমরা লুব্ধককে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে দেখি। খালি চোখের গোচর নক্ষত্রদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সেণ্টরাসের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ব্যতীত আর সকলেই লুব্ধক হইতে অধিক দূরে। আবার আমাদের নিকটের বহু তারার দীপ্তি সূর্য্যাপেক্ষা এত কম যে, তাহারা খালি চোখের গোচর নয়, আমাদের নিকটতম নক্ষত্রের (ইহা সেণ্টরাস মণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের কাছে) দীপ্তি সূর্য্যের বিশ সহস্র ভাগের একভাগ মাত্র ; ইহার তাপও কম। আমাদের সূর্য্যের বদলে তাহার জায়গায় যদি এই নক্ষত্রটি থাকিত তবে আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই শীতে জমিয়া যাইতাম। অপরদিকে লুব্ধক অপেক্ষা বহু গুণ অধিক দীপ্তিবিশিষ্ট অনেক নক্ষত্রও আছে। কিন্তু তাহাদের দূরত্ব হেতু তাহাদিগকে অনুজ্জ্বল বা অল্পোজ্জ্বল মনে হয়। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, এস্ ডোরাদাস্ নামে দক্ষিণ আকাশ মেরুপ্রদেশের নিকটে একটি নক্ষত্রের দীপ্তি সব চেয়ে বেশি, ইহার দীপ্তি সূর্য্যের তিন লক্ষ গুণ, যদি আমাদের সূর্য্যের জায়গায় এই নক্ষত্র আসে তবে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমরা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই। কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রের দীপ্তি বা বাস্তব উজ্জ্বলতা সূর্য্যের চেয়ে কম, সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী ত্রিশটি নক্ষত্রের মধ্যে মাত্র তিনটির দীপ্তি সূর্য্যাপেক্ষা বেশি ; বাকি সাতাইশটির মধ্যে অধিকাংশের দীপ্তি সূর্য্যাপেক্ষা ঢের কম। আবার ইহাও সবটুকু নয় ; আমরা মহাশূন্যের এ রকম এক অংশে আছি যেখানে দৈবক্রমে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সংখ্যা বেশি।

আমরা দেখিয়াছি, প্রতীয়মান উজ্জ্বলতা দূরত্ব এবং বাস্তব উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে, আবার নক্ষত্রের বাস্তব উজ্জ্বলতা নির্ভর করে তাহার আয়তন এবং পৃষ্ঠদেশের প্রতি বর্গ ইঞ্চি হইতে নিঃসৃত আলোর উপর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লুব্ধক তারার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের সাতাইশ গুণ। এখন প্রশ্ন হইল লুব্ধকের পৃষ্ঠদেশ কি সূর্য্যের সাতাইশ গুণ অথবা উভয়ের পৃষ্ঠদেশ সমান কিন্তু প্রতি বর্গ ইঞ্চি হইতে সাতাইশ গুণ বেশি আলো বিকীর্ণ হয় কিম্বা উভয়ের সংমিশ্রণে লুব্ধকের দীপ্তি সূর্য্যের সাতাইশ গুণ দাঁড়াইয়াছে।

তেশিরা কাঁচের ভিতর দিয়া কোন বস্তু হইতে আগত আলোকরশ্মি পরিচালিত করিয়া তাহার ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করা যায় ; ইহাকে বর্ণরশ্মি বিশ্লেষণ বলে, আকাশের কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আলো বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক তাহার সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হন, এই বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ করিয়া দ্বারা নক্ষত্রের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায়। আবার পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা জানিলেই প্রতি বর্গ ইঞ্চি পৃষ্ঠদেশ হইতে নিঃসৃত আলোর পরিমাণ বলা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, দূরত্ব জানা থাকিলে বাস্তব উজ্জ্বলতা হিসাব করিয়া বলা যায়। সুতরাং এই বাস্তব উজ্জ্বলতা এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চি পৃষ্ঠদেশের উজ্জ্বলতা হইতে (সামান্য ভাগ দ্বারা) সমগ্র পৃষ্ঠদেশের পরিমাণ জানা যায়। এই উপায়ে দূর নক্ষত্রের আয়তন জানা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা অনুসারে নক্ষত্রগুলি লাল, কমলা, হল্‌দে এবং সাদা বা নীল দেখায়, লাল নক্ষত্রগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প তাপবিশিষ্ট, ইহাদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা তিন হাজার

ডিগ্রি (সেন্টিগ্রেড্) হলদে নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা সূর্য্যের মত ছয় হাজার ডিগ্রি এবং নীল নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা পনর হাজার হইতে ত্রিশ হাজার ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দেখা গিয়াছে নক্ষত্রগুলির আয়তন যদৃচ্ছা নহে, তাহাদের আয়তন ও দীপ্তির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। বৃহত্তম শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি লাল এবং অপেক্ষাকৃত শীতল। তাহাদের মোট তাপ এবং আলো যাহা বিকীর্ণ হয় তাহা কিন্তু বেশি। কাজেই ইহাদের আয়তন খুব বড়। এস্ ডোরাদাস্ অথবা আমাদের নিকটতম নক্ষত্র যদি সূর্য্যের স্থলাভিষিক্ত হয় তবে কি অবস্থা হয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই বৃহৎ লাল নক্ষত্রের কোনটি যদি সূর্য্যের স্থলাভিষিক্ত হয় তবে আর একরকমের বিপদ হইবে। আমরা সেই নক্ষত্রটির উদরস্থ হইয়া পড়ি, কারণ ইহার আয়তন পৃথিবী কক্ষ হইতেও বড়। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে, বৃশ্চিক রাশির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র সর্ব্ব বৃহৎ। সূর্য্য কত বড় সে ধারণা হয়ত অনেকেরই আছে। সূর্য্যের আয়তন তের লক্ষ পৃথিবীর সমান। জ্যেষ্ঠা তারার ব্যাস এত বড় সূর্য্যের সাড়ে চারশত গুণ এবং ইহার ভিতরে ছয় কোটি সূর্য্যের স্থান হইতে পারে, আর এক রকমের ধারণা দেওয়া যাউক, ঘণ্টায় পাঁচ সহস্র মাইল বেগে ধাবমান একটি হাউই পৃথিবী হইতে চন্দ্রে পৌছিতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। সূর্য্যের ভিতর দিয়া এই বেগে ছুটিলে উহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে পৌছিতে এক সপ্তাহ সময় লাগে, কিন্তু এই ভাবে জ্যেষ্ঠা তারাকে অতিক্রম করিতে নয় বৎসর সময় দরকার। জ্যোতির্ব্বিদেরা এই শ্রেণীর তারাগুলিকে 'অতিকায়' তারা বলেন।

যদি কল্পনা করা যায় যে, সমস্ত নক্ষত্রগুলিকে আয়তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে একটা সারিতে রাখা হইয়াছে, দেখা যাইবে, তাহাদিগকে বর্ণানুসারেও সাজান হইয়াছে, অতিকায় নক্ষত্র সকলেই লাল, তারপর আয়তন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে লাল বর্ণও কমিয়া আসে। এইরূপে যখন আমরা সূর্য্যের ব্যাসের দশ হইতে বিশ গুণ ব্যাসবিশিষ্ট তারার কাছে পৌছি তখন ইহাদের পৃষ্ঠতল অতিকায়গুলির অন্তত সহস্র গুণ কম, কাজেই দীপ্তি যদি সমান হয়, প্রতি বর্গ ইঞ্চি পৃষ্ঠদেশ হইতে সহস্র গুণ বেশি শক্তি বিকীর্ণ হয় অর্থাৎ ইহাদের পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা খুব বেশি, ইহারা নীল রংএর নক্ষত্র। কিন্তু অধিকাংশ নক্ষত্রই এই নীল রংএর নক্ষত্র হইতে ছোট, ইহাদের বর্ণচ্ছত্র আলোচনা করিয়া নূতন কোন বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায় না ; আগের বর্ণচ্ছত্রগুলিই পুনরায় প্রথম হইতে পাওয়া যায়। যেগুলির বর্ণচ্ছত্র লাল রং নির্দ্দেশ করে তাহারা শীতল কিন্তু আয়তনে অতিকায় নক্ষত্র হইতে বহু গুণ ছোট। ইহাদিগকে লাল ক্ষুদ্রকায় তারা বলা হয়। ইহাদের অধিকাংশই আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অনেক ছোট, ইহাদের ব্যাস অতিকায়দের এক-সহস্রাংশ মাত্র—যেন একটি গরুর গাড়ীর চাকার ব্যাসের তুলনায় একটি সরিষার ব্যাস। আমরা এ পর্য্যন্ত তিন শ্রেণীর তারা দেখিলাম। অতিকায়—লাল এবং শীতল ; মাঝারি—নীল এবং গরম ; ক্ষুদ্রকায়—লাল এবং শীতল, এখনও কিন্তু আমরা ক্ষুদ্রতার সীমায় পৌছি নাই, লাল ক্ষুদ্রকায় হইতেও ছোট তারা জানা আছে। ক্ষুদ্রকায় শ্রেণীর ক্ষুদ্রতমগুলি বৃহস্পতি অথবা শনি গ্রহের সমান—সূর্য্যের সহস্রাংশ আয়তনের এবং পৃথিবীর সহস্র গুণ বড়, ক্ষুদ্রতম তারা পৃথিবী, এমন কি, বুধ গ্রহের সমান আয়তন-বিশিষ্টও পাওয়া গিয়াছে, ইহাদিগকে শ্বেত ক্ষুদ্রকায় তারা বলা হয়, সাধারণত ইহারা দেখিতে সাদা এবং ইহাদের বর্ণচ্ছত্র দশ সহস্র ডিগ্রি তাপ নির্দ্দেশ করে, প্রতি বর্গ ইঞ্চি পৃষ্ঠ দেশ হইতে প্রচুর শক্তি নিঃসৃত হইলেও পৃষ্ঠতল কম বলিয়া মোট আলোর পরিমাণ কমই হইয়া থাকে, ইহারা এত ক্ষীণপ্রভ যে, এ পর্য্যন্ত কয়েকটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নক্ষত্রগুলির আয়তন এবং দীপ্তির পার্থক্য খুব বেশি কিন্তু বস্তুমানের (mass) পার্থক্য সাধারণ। আমরা সূর্য্যের বিশ সহস্রাংশ উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিয়াছি, আবার সূর্য্যের তিন লক্ষগুণ উজ্জ্বল নক্ষত্রও দেখিয়াছি। নক্ষত্রদের মধ্যে উজ্জ্বলতার তারতম্য একশত কোটি গুণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আয়তনের দিক দিয়া সূর্য্যের দেড় কোটি গুণ ছোট নক্ষত্রও আছে আবার সূর্য্যের ছয় কোটি গুণ বড় নক্ষত্রও আছে। নক্ষত্রদের দীপ্তি পরিমাণ এবং আয়তন জানা যত সহজ বস্তু পরিমাণ জানা সবসময়ে তত সহজ নয়। তবু ইহা এক রকম নিশ্চিত যে নক্ষত্রের বস্তুমান সূর্য্যের দশ গুণের ভিতরেই থাকে। ক্ষুদ্রকায় শ্বেত তারকাদের আয়তন কম হইলেও ওজন কিন্তু কম নয়, লুব্ধকের এবং সরমার এক একটি ক্ষুদ্র সঙ্গী-নক্ষত্র আছে। লুব্ধক সূর্য্যের আট গুণ এবং তাহার সঙ্গীর এক লক্ষ আশী হাজার আয়তনবিশিষ্ট, লুব্ধকের দীপ্তি সূর্য্যের ছাব্বিশ গুণ এবং তাহার সঙ্গীর দশ সহস্রগুণ। কিন্তু ওজনে সঙ্গীটি সূর্য্যের সমান এবং লুব্ধক আড়াই গুণ। সরমার আয়তন লুব্ধকের সমান, দীপ্তি—সূর্য্যের পাঁচ গুণ এবং ওজন সূর্য্যের সওয়া গুণ, সূর্য্য সরমার সঙ্গীর দেড় কোটি গুণ আয়তন বিশিষ্ট, লক্ষগুণ দীপ্তিবিশিষ্ট আর আড়াই গুণ ওজনবিশিষ্ট। এই দুইটি ক্ষুদ্রকায় তারকা এত গুরুভার যে, ইহাদের কিছু বস্তু লইয়া দুইটি দিয়াশলাই বাক্স পূর্ণ করিলে প্রথমটির ওজন ছাপ্পান্ন মণ আর দ্বিতীয়টির ওজন ইহার দুই শত গুণ অর্থাৎ এগার হাজার দুই শত মণ হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদদের মতে নক্ষত্রের দীপ্তির প্রাখর্য্য বা স্বল্পতা এবং আয়তনের বৃহত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব তাহার শৈশব অথবা বার্দ্ধক্যের নির্দ্দেশক। অতিকায় বেশি দীপ্তির লাল তারকাগুলি শৈশবাবস্থায় এবং ক্ষীণপ্রভ শ্বেত ক্ষুদ্রকায় তারকাগুলি বৃদ্ধাবস্থায় আছে।

স্যার্ জিজিভাই ওয়াডিয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

—আরে! সত্যেন যে! এস, এস—

—তবু ভাল যে চিনতে পেরেছ অজিত!

—না পারাই উচিত ছিল। তোমার এমন 'হাফ্ ডেড্' অবস্থা কেন?

—'সুইসাইড্' করাটা আইনেতে অপরাধ হয় ব'লে!

—অর্থাৎ—

—যা অশান্তি অহরহ ভোগ করছি, এখনও যে পাগল হয়ে যাইনি, আশ্চর্য্য।

—হেঁয়ালি ছেড়ে খুলে বলো।

—হেঁয়ালি! তোমার স্ত্রী যদি বিয়ের পর থেকেই কোনো দুর্জ্জেয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে চিরদিনের মতো শয্যাশায়ী থাকতেন,—তাহলে আমার হেঁয়ালি তোমার কাছে এতক্ষণ অ্যাব্সোলিউট্ এ্যাল্কোহলের চেয়েও পরিষ্কার হয়ে যেত।

—'এ্যাব্সোলিউট্ এ্যালকোহল'টা কি আজকাল একটু বেশী মাত্রায় চালাচ্ছো?

—এ অবস্থায় সেইটেই খুব স্বাভাবিক হ'ত বটে, কিন্তু পারছি কই? বড় বড় ডাক্তার, দামী দামী ওষুধ আর তার আনুষঙ্গিকের খরচ জোগাতেই দেউলে হবার জোগাড়! A sick wife is the worst curse of a man!

অজিত এবার একটু বিস্মিত হয়েই বললে—কেন? মিনু তো বেশ হেল্‌দি গার্ল্ ছিল!

—ছিলই তো! রূপের চেয়ে তার সুন্দর স্বাস্থ্যই আমাকে মুগ্ধ করেছিল বেশী—যেটা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে বড় একটা পাওয়াই যায় না!

—তা ঠিক।

তাই ওকে বিয়ে করার সময় অন্য কোনোদিক সম্বন্ধে বিবেচনাই করিনি। আমার বিয়ে কিরকম হঠাৎ হয়েছিল, মনে আছে তো?

—হ্যাঁ। সারপ্রাইজ্ দিয়েছিলে সবাইকেই।

—শুধু সারপ্রাইজ্ই নয়, হতাশও হয়েছিল অনেকেই। ধরো না তোমার নিজেরই কথা। সেদিন যদি অপেক্ষা না করে তুমি একটু ফরওয়ার্ড হতে পারতে,—তা'হলে মিনু আজ আমার স্ত্রী না হয়ে হয়তো তোমারই হতো!

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও তুমি 'হাফ্ ডেড্' না হয়ে আজ আমিই ওটা হতে পারতাম!

সত্যেন এবার হা হা ক'রে হেসে উঠলো।

—দেখ, সত্যেন! মিনুকে তুমি বিবাহ করায় ওকে তো আমরা হারাইনি ভাই! যে ছিল বান্ধবী—সে হ'ল বন্ধুপত্নী! এতে দুঃখিত হবার কি আছে?

—তা হয়ত ঠিকই। কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বহু বন্ধুর হতাশার দীর্ঘশ্বাসেই হয় তো বা আমার ম্যারেড্-লাইফ্‌টা এমন ট্র্যাজিক্ হয়ে উঠেছে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

—বাজে কথা ছেড়ে মিসেস্ সেনের রোগটা কি তাই বল্!

—তুই একটা ইডিয়ট্! রোগ যদি জানা যেত, তা হ'লে কি মিনু এতদিন বিছানায় পড়ে থাকত?

—নন্‌সেন্স্! একজন ভাল ডাক্তার এনে চিকিৎসা করা না!

—কোনো বড় ডাক্তারই বাকী নেই দেখাতে! মায় তোমার মামাবাবু পর্য্যন্ত হার মেনেছেন!

—কিন্তু ভাগ্নেকে তো ডাকোনি দাদা!

—ডাকবার উপায় ছিল না। তোমার নাম শুনলেই—মিনা বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়ে।

—হোয়াই?

—তা জানিনি। যখনি তোমাকে ডেকে এনে দেখাবার কথা বলিছি, হাতজোড় করে বলেছে—দোহাই তোমার, আমি যদি ম'রেও যাই, অজিতকে কখনও ডেকো না।

—ভেরি ওয়েল্! স্বনামে চিকিৎসায় যদি বাধা থাকে বেনামীতেই তোমার ওয়াইফের ট্রিটমেণ্ট্ করতে প্রস্তুত আছি।

—আরে নাম না হয় তুমি বদ্‌লালে, কিন্তু চেহারা যাবে কোথা? তোমায় দেখেই যে রোগী চিনে ফেলবে!

—একটু আগে আমাকে তুমি 'ইডিয়ট্' বলছিলে না? আমি তো দেখছি ওটায় তোমারই 'ক্লেম্' বেশী। নাম চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে শুধু চেহারাই নয়, কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত এমন বদ্‌লে যাবে—তোমারও সাধ্য থাকবে না যে চিনতে পারো!

—কিন্তু পারবে কি ভাই সামলাতে? সে বড় বেয়াড়া রুগী!

—দেখাই যাক্ না চেষ্টা করে।

—বেশ, তবে এখনি চলো—

—নন্‌সেন্স! কাল সকালে ঠিক এগারটার সময় যাবো। তোমার স্ত্রীকে বলে রেখো বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ প্রবীণ ডাক্তার—স্যার্ জিজিভাই ওয়াডিয়াকে তুমি নিয়ে আসবে কাল্। কোনো নেটীভ্ চীফের নাম করে বলে দিও যে, তাঁরাই ডাঃ ওয়াডিয়াকে বাই এয়ার কলকাতায় নিয়ে আসছেন একটা মোটা হারের ফী দিয়ে। বুঝলে?—

—মিনু কি বিশ্বাস করবে? 'ইট্ ইজ্ টু বিগ্ এ পিল্ টু সোয়ালো!'

—আজ না করুক, কাল সকালে তাকে বিশ্বাস করতেই হবে। কিন্তু তার আগে এ কথাগুলো তাকে শোনানো দরকার। তোমার স্ত্রীর মনে আমি এই 'ইম্প্রেশান্'টা আগেই দিতে চাই যে, তাঁর চিকিৎসার জন্য এবার যিনি আসছেন তিনি নেহাৎ হেঁজিপেঁজি ডাক্তার নন্।

—O. K.

—তা'হলে এই ব্যবস্থাই ঠিক রইল। দশটা বাজে আমায় এখনি উঠতে হবে। হিমাইৎগঞ্জের সুলতান সিংকে দেখতে যাবার কথা আছে ঠিক সওয়া দশটায়—

—ওঃ! তাহলে এখনও ঘণ্টা দুই তুমি গল্প করতে পারো।

—তার মানে?

—মানে, এ পর্য্যন্ত কোনো ডাক্তারকেই তো দেখলুম না যে দশটায় যাবো বলে বারোটার আগে এলো। দু-এক ঘণ্টার এদিক্ ওদিক্ তো তোমাদের কাছে গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়, তা রোগীর অবস্থা যতই মারাত্মক হোক্ না!

—হ্যাঁ, বড় ডাক্তারদের ও-দুর্নাম আছে বটে, কিন্তু আমি এখনও ততো বড় ডাক্তার হইনি। বরং আমার সম্বন্ধে নিন্দে আছে, ডাক্তার অজিত রায় বেশী রকম সাহেবী মেজাজের। রোগী দেখতে হাজির হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে।

—বেশ বেশ, কাল সকালেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তা আজ এখন আমার কাছে রোগীর বিবরণ একটু শুনে রাখলে ভাল হত না কি?

—তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে আমি কখনও রোগী দেখিনি সত্যেন! —গুড্ ডে—বয়—

ডাক্তার অজিত উঠে পড়ে তিন লাফে গিয়ে তার মোটরের ষ্টিয়ারিং হুইল্ ধরে বস্‌লো।

আরে রোসো, রোসো—বলতে বলতে সত্যেন্দ্র পিছু পিছু ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে—বোম্বায়ের সেই বিখ্যাত পার্শী ডাক্তারটির নাম কী বললে—

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে জানালা থেকে মুখ বার করে ডাক্তার অজিত রায় বললে—স্যার্ জিজিভাই ওয়াডিয়া।

দুই

—উ-হু-হু-হু! গেছি গেছি! ইয়ু হ্যাভ কিল্‌ড্ মি ডক্টর!

—সরি ম্যাডামঃ আপনার 'পাল্‌স'টা দেখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আপনার হাতের কব্জীতে যে এত বেশী ব্যথা সেটা বাইরে থেকে দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি। এক্সকিউজ মি। আমি এখনি গাড়ী থেকে আমার ইলেকট্রিক অটো রেকর্ডারটা আনাচ্ছি। একবার আপনার বয়কে রিং করুন তো কাইণ্ডলি!

শয্যাপার্শ্বস্থ ছোট সাইড টেব্‌লের উপর যে 'কলিং বেল্‌টা' ছিল মিনু একটু কাত হয়ে সেটি সজোরে টিপলে। বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ পার্শী ডাক্তার স্যার জিজিভাই ওয়াডিয়া সেটি লক্ষ্য ক'রে রোগিণীর অলক্ষ্যে ঘটনাটি পকেট বইয়ে নোট ক'রে নিলেন।

নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে মিনুকে ঘণ্টাখানেক পরীক্ষা করার পর ডাক্তার ওয়াডিয়া মুখ গম্ভীর ক'রে বললেন—আপনার অসুখটা—আমি যা দেখলুম—মিসেস্ সেন—'ইট ইজ ভেরি ভেরি সিরিয়াস্! খুব সাবধানে থাকতে হবে আপনাকে। অবশ্য আপনি যে শীঘ্রই সেরে উঠবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে—বেশী দিন আর আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে না, কিন্তু একটা 'কন্‌ডিশান্' আছে আমার।

আমি যা বলবো—'লাইক এ গুড্ গার্ল' আপনাকে তা শুনতে হবে।'

—ডক্টর ওয়াডিয়া, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি আপনার সমস্ত কথাই মেনে চলবো! আমাকে এ পর্য্যন্ত যত বড় বড় ডাক্তার দেখেছে সবাই বলেছে আমার শরীরে কোনো অসুখই নেই। এ নাকি আমার মনের রোগ। 'নিয়োরটিক', তাই সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা কল্পনা ক'রে অকারণ শুয়ে আছি।—বলুন ত এ কি সম্ভব?

—নন্‌সেন্স্! কোনো সুস্থ মানুষ কখনো চুপ ক'রে দিনের পর দিন শুয়ে কাটাতে পারে?—একথা যারা বলেছেন তাঁরা আপনার রোগ মোটেই ধরতে পারেন নি। 'ইট ইজ ভেরি—ভেরি—সিরিয়াস্' মিসেস্ সেন! তবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, রোগ যখন ধরা পড়েছে, সারতে বেশী দিন লাগবে না। 'ডায়োগ্‌নেসিস্' মানেই 'হাফ কিয়োর!' আপনার যা অসুখ এ সাধারণত বড় কারুর হয় না। আমেরিকান থেরাপিউটিক্যাল জার্নালে মাত্র চারটি কেসের রেকর্ড আছে এ পর্য্যন্ত! আমি আপনাকে আরোগ্য ক'রে থেরাপিউটিক্যাল জার্নালে রিপোর্ট করবো 'ফিফ্‌থ্ কেস্' বলে। আপনি কিন্তু মেডিক্যাল ওয়ার্ল্ডে ফেমাস্ হয়ে পড়বেন মিসেস্ সেন!

—না না, আপনি ওসব করতে যাবেন না—প্লীজ! পৃথিবী-শুদ্ধ লোক আমার অসুখ নিয়ে আলোচনা করবে—সে বড় লজ্জার কথা ডাঃ ওয়াডিয়া—

বাংলাদেশের মেয়েদের এই লজ্জাটুকু আমার ভারি ভালো লাগে মিসেস্ সেন! অথচ, আমি আশ্চয্য হয়ে যাচ্ছি দেখে যে, এত লজ্জা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মেয়েরা—হাউ ইন্টেলিজেন্ট! হাউ ওয়াণ্ডারফুল!

—আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে স্যার্ জিজিভাই; দয়া করে আপনি আমাকে কোনো ওষুধ খেতে দেবেন না—প্লীজ! ওষুধ আমি খেতে পারিনি কিছুতেই। খাবার চেষ্টা করলেই এমন একটা 'ন্যশিয়া' হয় যে আমার সমস্ত 'নার্ভ আপসেট্' হয়ে পড়ে।

—আপনি শুনে সুখী হবেন মিসেস্ সেন, যে আমি অন্ প্রিন্সিপ্যাল আমার পেশেণ্টদের কোনো ওষুধই 'বাই মাউথ' দিই না। কেন জানেন? বিশ্রী তেতো দুর্গন্ধ ঝাঁঝওয়ালা ওষুধ খেতে গিয়ে রোগীর যে 'ইরিটেশান' হয়, তাতে আরোগ্য হতে অনেক দেরী লাগে।

—হোয়াট্ এ নাইস্ আইডিয়া! এই জন্যই আপনি এতবড় ডাক্তার হয়ে উঠতে পেরেছেন। ইম্যাজিনেশান না থাকলে আমার বিশ্বাস লাইফে কেউই সাক্‌সেস্‌ফুল হ'তে পারে না!

—দাঁড়ান, আগে আপনাকে সারিয়ে তুলি, তারপর অন্য কথা।

—আমার মনে হচ্ছে, এইবার বোধ হয় আমি সেরে উঠবো। আচ্ছা—'ইফ্ ইউ ডোণ্ট্ মাইণ্ড্' আমার সেরে উঠতে কতদিন লাগবে বলতে পারেন?

—লাগা উচিত অবশ্য হিসাব মত তিন-চার মাস! কিন্তু আমি আপনাকে তার আগেই খাড়া করে তুলবো।

—ও! আই শ্যাল বি সো গ্রেটফুল! দীর্ঘকাল ধরে ভুগছি ডক্টর। আমার হাজ্‌ব্যাণ্ড দেবতার মত মানুষ। তাঁরও লাইফ মিজারেব্‌ল্ ক'রে তুলেছি। সেরে ওঠা সম্বন্ধে আজকাল ক্রমেই 'হোপলেশ্' হয়ে পড়্‌ছি!

—কিছু ভাববেন না! আপনাকে আমি সারিয়ে তুলবই। আপনার অসুখ যে নাগাড়ে একই ভাবে চলেছে, এ একটা ভাল লক্ষণ। আপনি যে সেরে উঠবেনই তাতে ভুল নেই। আমি একজন নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি—সে এসে আপনার চার্জ্জ নেবে। তাকে আপনার ট্রিট-মেণ্ট ও নার্সিং সম্বন্ধে সব ইন্‌ষ্ট্রাকশন দিয়ে দেব। কাল থেকে আপনার চিকিৎসা রীতিমতই হবে। আচ্ছা, গুড্‌বাই মিসেস্ সেন। আমাকে এখনি একবার হিজ হাইনেস্ দি মহারাজা অফ্ বেলগোলাপুরকে দেখতে যেতে হবে—

—আপনি যতদিন বেঙ্গলে থাকবেন, কাইণ্ডলি রোজ একবার করে আসবেন ডক্টর ওয়াডিয়া!

—আপনি না সেরে ওঠা পর্য্যন্ত আমাকে ত আসতেই হবে। এজন্য যদি আমার বোম্বে ফিরতে দেরিও হয়ে যায়, আই ওণ্ট্ মাইণ্ড্! কারণ আপনার কেসটা ভারি ইণ্টারেষ্টিং—আচ্ছা, গুডবাই—

—গুডবাই স্যার জিজিভাই: থ্যাঙ্ক্ ইউ ফর ইয়োর কাইণ্ডনেস্!

তিন

—কিরকম দেখলি অজিত ?

—তোর সে খোঁজে দরকার কি ? তুই কেবল দয়া ক'রে আমি যা বলবো তাই ক'রে যাস্। আজ সকালে তোর রোগীর কাছে উপস্থিত থাকা খুব উচিত ছিল।

—পাগল হয়েছিস্ ? কখন ভুলে অজিত বলে ডেকে ফেলবো, কথা বলতে গিয়ে ফস্ করে তুই তো'কারি ক'রে বসবো—আর সব মাটি হয়ে যাক্ আর কি ? না ভাই, আমার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই। তোমার রোগী দেখবার সময় আমি কোনো না কোনো ছুতো করে অনুপস্থিত থাকবো, নইলে তুমিও মারা যাবে—আমিও মারা যাবো—

—না, তবে থাক্!—এরকম অকালমৃত্যুর জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত নই, তা ছাড়া তোমারও মারা যাওয়ার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে অরাজি।

—স্তুতরাং—

—স্তুতরাং বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্যার জিজিভাই ওয়াডিয়া যখন এই প্রসিদ্ধ শহরের এক শ্রেষ্ঠ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সেনের 'বেড্-রিড্ন' ওয়াইফকে দেখতে যাবেন তখন সেখানে তাঁর প্রবেশ নিষেধ। আমি কাল যে নার্সকে পাঠিয়ে দিয়েছি সে থাকলেই হবে।

—আবার এই এক নার্সের ঝঞ্ঝাট জোটালে কেন ?

—সমারোহ চাই ! আজকাল ধূমধামটা কেবল বিবাহ-ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলে কই ? জন্ম মৃত্যু বিবাহ এই তিন কাণ্ডই এখন প্রকাণ্ড হয়ে উঠ্ছে, দেখছ না ? সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে—সে কি এম্নি নিঃশব্দে ? বংশধর আসছেন যে আজকাল একেবারে বংশদণ্ড নিয়ে ! বড় বড় ডাক্তার, মিডওয়াইফ, গ্যায়নাকোলজিষ্ট—সঙ্গে সঙ্গে ফরসেপ্ ডিলিভারি, 'সীজেলীয়ান সেক্সান' অপারেশন, পেরিণীয়া-র‍্যপচার্ এসব ত এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে ! জ্বর জাড়ি হ'লে নাড়ী ছাড়া-ছাড়া অবস্থা আমাদের ঘটাতেই হয়, নইলে রোগীরা হতাশ হয়ে পড়ে। কলকাতায় ত বড়-লোকদের বাড়ী এখন 'টাইফয়েড' নয়ত নিদেন 'প্যারা' ছাড়া জ্বরই হবার উপায় নেই ! ব্লাড্প্রেশার আর 'এনিমিক্' এখন শহরের এ্যারিষ্টোক্র্যাটিক্ মহলে ফ্যাশান। ব্লাড একজামিন : ইউরীন একজামিন : স্টুল একজামিন : সোয়াব কালচার : একস্-রে প্লেট—এসব না করলে চিকিৎসা টেম হয়ে পড়ে ! পেশ্যাণ্টরা দুঃখিত হয়। ডে এণ্ড নাইট ওয়াচ করবার জন্য চাই দু'বেটী ফিরিঙ্গী নার্স—দিশী হলে আবার বাড়ীর লোকের এবং রোগীরও মন ওঠে না ! কাজেই, এ ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে—নইলে অন্ন জুটবে না।

—কিন্তু 'অন্নর' ব্যাপারটার কোন সম্পর্কই তো আমার এখানে নেই, এখানে নার্স নাই-বা ঢোকাতে—

—ওটা যে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসার একটা অঙ্গ হে ! আমার ইনস্ট্র্যাকশান অনুসারে অতি-যত্নের ঠেলায় তারা মিসেস্ সেনের লাইফ মিজারেব্ল্ করে তুলবে। কাজেই, বেশীদিন আর তাঁর নির্ব্বিঘ্নে শুয়ে থাকা চলবে না। খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হবে এখন। সুতরাং চট্পট্ সেরে উঠতে পথ পাবেন না।

—কিন্তু, তুই যে মিনুকে বলে এসেছিস শুনলুম, 'কেস্ ইজ ভেরি ভেরি সিরিয়াস্ !'

—নইলে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করতে স্যার্ জিজিভাই ওয়াডিয়ার পিতামহ এসেও ব্যর্থকাম হতেন।

—রোগটা কি ?

—বললে কি তুমি বুঝতে পারবে ?

—ইংরিজি, বাংলা, সংস্কৃত, লাতিন, অথবা ফরাসী ভাষায় বললেও বুঝতে পারবো, কিন্তু ওর বেশী বিদ্যে আর নেই !

—বড়ই দুঃখিত হলাম ! তোমার স্ত্রীর রোগ ও পঞ্চভাষার প্রপঞ্চের বাইরে।

—মানে ?

—মানে : একমাত্র জার্ম্মানরা এ রোগটার একটা বৈজ্ঞানিক স্বরূপ নির্ণয় করেছে ; আর সবাই 'নিয়োঃটিক' বলেই পাশ কাটাবার চেষ্টা করেছে।

—সেই স্বরূপটা একটু সমঝে দিতে পারো ?

—পারি। তুমি কি 'সাইকো এনালিসিস্' ব্যাপারটা বোঝো ?

—বোঝা বলতে যা বোঝায় সেরকম ঠিক বুঝিনি। তবে এটা বুঝিছি যে বোঝা ওটা সোজা নয়, আমার নির্জ্ঞান মনের অবচেতন মাথার ওপর ওটা একটা মনোবিকলনের বৈজ্ঞানিক বোঝা হয়েই রয়েছে।

—রোজা ডেকে নামিয়ে ফেল। তোমার স্ত্রীর অবস্থা

শোচনীয়ই দেখলুম। রোগ অবশ্য শরীরে তার কিছু নেই, কিন্তু ঐ নির্জ্ঞান মনের অবচেতন আঘাতে সমস্ত নার্ভ তার 'ইরিটেটেড্' হ'য়ে উঠেছে। রোগের কল্পনাটা সর্ব্বাঙ্গে ব্যথার রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। চট্পট্ সারিয়ে তুলতে পারবো বলে আশা হয়। এসব কেসে 'ইনস্যানিটি' সেট করলেই বিপদ। একটা বড় রকম শক্ কিছু না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই দেখি সারে না। আবার মুস্কিল তার এই যে, ওই মাথা বিগড়ে যায় বলে—পরবর্ত্তী জীবনে তারা সবাই প্রায় 'শক্-প্রুফ' হয়ে ওঠে!

—এ কেসে কিন্তু, 'ইনস্যানিটি'টা দেখছি সেট হবার উপক্রম হ'য়েছে আমারই উপর—

—ওটা গ্রামার অফ লাইফের কঞ্জংশানাল ট্রান্সফার এপিথেট্!

—কিন্তু, কই 'শক্-প্রুফ' ত আজও হয়ে উঠতে পারছি না ভাই!

—মিনুকে সারিয়ে তুললে তুমিও সুস্থ হবে। তুমি শুধু একটি কাজ করবে—রোজ বাড়ী ফিরে মিনুকে বলবে, —তোমাকে আমি কালকার চেয়ে আজ অনেকটা ভাল দেখছি—ডিয়ার, বোম্বায়ের—এই পার্শী বেটা একটা জিনিয়াস! তোমাকে প্রায় সুস্থ ক'রে এনেছে ডার্লিং—

—'O-K!'

—তোমরা ডাক্তারের সামনে বলো বটে—যে আজ্ঞে! যেমন বলে যাচ্ছেন তেমনিই সব হবে, কিন্তু কাজে করো ঠিক তার উল্টো—

—হোয়াট্ ডু ইয়ু মিন অজিত! আমাকে কি তুমি একটা গাড়োল পেয়েছো?

—গাড়োলরা বরং নিরাপদ। তারা ডাক্তারের কথা শুনে ভয়ে ভক্তিতে ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলে। ভয় করি আমি তোমাদের মতো সব উচ্চশিক্ষিত সবজান্তা ল্যারেন্স্‌দের—

—ইট ইজ আন্‌ফেয়ার অজিত! আমরা কি ডাক্তারের ইন্‌স্ট্রাকশান ফলো করি না?

—না, করো না! তোমরা ডাক্তারের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে একটুও ইতস্তত কর না। সেদিন এক রিটায়ার্ড সাবজাজের বাড়ী ডাক পড়েছিল, জরুরী তলব! তাড়াতাড়ি গেলাম রোগী দেখতে। বছর ষোল-সতেরো বয়স একটি ফাইন ইয়ং বয়। শুনলাম সাবজাজ সাহেবের শ্যালিকার পুত্র। এলাহাবাদে থাকে, পরীক্ষার পর ছুটীতে মাসীর বাড়ী বেড়াতে এসেছে। পরশুদিন রাত্রি থেকে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত দাস্ত সুরু হয়। মলের সঙ্গে আম ও রক্ত দেখা গেছে। হাই টেম্পারেচার। পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে এনে সকালে দেখানো হয়েছিল; তিনি ওষুধও দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। পাড়ার ডাক্তার একটি এমিটিন্ ইঞ্জেক্‌সানের ব্যবস্থা ক'রে গেছলেন, আর টিংচার ওপিয়েট ও অন্যান্য গুটিকয়েক দাস্ত ও আমনিবারক ঔষধের একটা মিক্‌শ্চার্ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হ'ল তিনি ঠিক ডায়োগনেসিস্ করতে পারেন নি। পরীক্ষায় আমি ত' সমস্ত লক্ষণই পেলাম—ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রীর। চিকিৎসাও সেইভাবে সুরু করা গেল।

চিকিৎসার খরচপত্রের বহর দেখে কৃপণ সাবজাজ সাহেব ধনে প্রাণে বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছেন বুঝতে পারলুম। কিন্তু উপায় কি? ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে ত? খরচ বাঁচাবার জন্যে সাবজাজ গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিলেন। প্রথমটা পাড়ার ফ্রী ডাক্তারকে ধরে এনেছিলেন এবং ইঞ্জেকশানের দাম চড়ে গেছে দেখে তিনি এমিটিনটাও বাদ দিয়েছিলেন। বাদ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন—দেখুন, আমি ও ফোঁড়া-ফুড়ি পছন্দ করিনি। সুঁচ বিঁধে ও সব আসুরিক চিকিৎসায় কাজ নেই, কেবল মিকশ্চারটাই চলুক। কাজেই, বুঝতেই পারছো 'এমিটিন' তখনও পড়েনি। অসুখ বাড়াবাড়ি হ'তে ছেলেটির মাসি, অর্থাৎ সাবজাজগৃহিণী ব্যস্ত হয়ে ভালো ডাক্তার আনাবার জন্য জেদ করায় আমার ডাক পড়েছিল। পরের ছেলে তাঁদের কাছে এসে বিনা চিকিৎসায় যদি মারা যায়, তাঁরা মুখ দেখাবেন কেমন ক'রে? এই হচ্ছে ব্যাক-গ্রাউণ্ড! রোগের চেয়ে সামাজিক কন্সিডারেশনের দাবীতেই এখানে বড় ডাক্তারের ডাক পড়লো, নইলে যা হবার হ'ত ওই ফ্রী ডাক্তারের হাতেই! সাবজাজ ত স্পষ্টই আমার মুখের উপর বললে, 'আমি মশাই অদৃষ্টবাদী, চিকিৎসার মাহাত্ম্য বুঝিনি!' ডাক্তাররা যদি বাঁচাতে পারতেন তা'হলে রাজারাজড়ারা আর কেউ মরতো না!' এই হচ্ছে তোমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত

ভদ্রলোকদের মনোবৃত্তি! তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে, ছেলেটা যখন বেশ সেরে উঠেছে—একেবারে ‘আউট অফ্ ডেঞ্জার’—আমি ব্যবস্থা ক’রে এলুম একবেলা কুকারে সিদ্ধ করা দুটি গলা ভাত, আর ভেজিটেবল স্যুপ দেবেন। রাত্রে দুধের সঙ্গে পাউরুটির শাঁস! কেমন থাকে পরে খবর দেবেন।’ পাঁচ সাত-দিন কোনো খবরই নেই! আমিও এ রোগীর কথা ভুলে গেছলুম। রোগীরাও সেরে উঠলে আজকাল ডাক্তারের কথা তাদের মনে থাকে না! হঠাৎ একদিন সকালে সাবজাজের এক ছেলে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসে বললে, “মা পাঠিয়ে দিলেন, এখনি একবার যেতে হবে—সতুদা কেমন যেন করছে! অবস্থা খুব খারাপ।” আমি ব্যস্ত হয়েই ছুটে এলুম। অনেক পরিশ্রমে ও সতর্ক চিকিৎসায় যাকে সুস্থ ক’রে তুলেছি—আজ যার সহজভাবে ওঠে-হেঁটে বেড়াবার কথা—সে হঠাৎ কেমন-কেমন করছে—মানে কি? গিয়ে দেখি—রোগী কোল্যাপ্স করবার উপক্রম করেছে বটে, কিন্তু সে—সিম্প্লি ডিউ টু স্টার্ভেশান! জিজ্ঞাসা করলুম: এখনও কি সেই সকালে কুকারের ভাত, আর রাত্রে দুধ পাউরুটিই চলছে?

সাবজাজ-গৃহিণী বললেন—‘না ডাক্তারবাবু, উনি সতুকে ভাত দিতে দেন নি। আর, রোগটা ওর পেটেরই বলে, দুধ রুটি একেবারেই দিতে মানা করলেন। কেবল বার্লি ওয়াটার আর জলসাবুই খেয়ে রয়েছে বাছা আমার আজ পাঁচ-ছ দিন।’

রাগে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠলো, রুক্ষ হয়েই বললুম—‘কোথায় আপনার স্বামী—ডাকুন তাঁকে এখানে।’ সাবজাজ-গৃহিণী বললেন—‘তিনি ত বাড়ী নেই! সকালে লেকে বেড়াতে গেছেন।’ ঘড়ীর দিকে চেয়ে বললেন—‘এখনি এলেন বলে!’

বললুম—‘চট্ ক’রে একটু গরম দুধ নিয়ে আসুন। তিনি ছুটলেন। আমি ততক্ষণে আমার ব্যাগ থেকে বার করে একটা গ্লুকোজ ইঞ্জেকশান দিয়ে দিলুম ছেলেটিকে। ইতিমধ্যে সাবজাজবাবু লেক বেড়িয়ে ফিরে এসে ধূলো পায়েই ঘরে ঢুকে বেশ একটু কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হ্যাঁ মশাই?—আপনি না কি সতুকে গরম দুধ দিতে বলেছেন? এরকম রোগীকে এ অবস্থায় দুধ দেওয়া—’

চিৎকার ক’রে বলে উঠলুম—“শাট্ আপ! এ ছেলেকে যদি বাঁচাতে না পারি, আপনাদের আমি খুনের চার্জ্জে পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার ক’রে দেব—”

সাবজাজবাবু আমার রুদ্র মূর্ত্তি দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলেন। খুব নরম গলায় বললেন—ডাক্তাররাও তো অনেক সময় ভুল ক’রে ফেলেন—

ধমকে বললুম—‘সে ভুল আপনাদের মত আনাড়ীদের শোধরাবার কোনো অধিকার নেই। ডাক্তারের ‘ইন্স-ট্রাকশান’ অগ্রাহ্য করবার সাহস হয় কি ক’রে আপনাদের? এটা ত আইনের সাবজেক্ট নয় যে কমন্‌সেন্সের উপর নির্ভর করলেই চলবে?’

সত্যেন উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে—“তুমি ঠিক বলেছ অজিত, ওরা সব নিজেদের মনে করে খুব শিক্ষিত। কিন্তু আসলে হল ওরা কুশিক্ষিত। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না? ‘অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী—’ এরা হ’ল সেই ভয়ঙ্কর বিদ্বান।”

—এটা আমাদের শিক্ষার দোষ, আমাদের জাতটা ডিসিপ্লীন জানে না বলেই এমন উদ্ভট ব্যাপার ঘটে এদেশে। আমরা অন্য লাইনেও ট্রেস্‌পাস্ করি নির্ব্বোধের মত। সেবার এক মস্ত প্রোফেসারের বাড়ী ডাক পড়েছিল। তিনি এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ-ডি, ডি-লিট-আরও কত কি! তোমারই মতন একজন নামজাদা প্রকাণ্ড পণ্ডিত লোক। কিন্তু হ’লে কি হবে, কিছু মনে কোর না দাদা, তোমরা অধ্যাপকের দল বড্ড বেশী Ass-etic, তাঁর ছোট মেয়েটি হঠাৎ অসুস্থ হ’য়ে পড়েছিল—বছর তিনেক বয়স হবে। মেয়ে বেশ সুস্থই ছিল, হঠাৎ একদিন রাত্রি থেকে এমন বমি করতে সুরু করেছে, যে যা খায় পেটে কিছু তলায় না, মিছরির জল, ডাবের জল, ছানার জলও উঠে যাচ্ছে। রুগ্ন বাচ্চাটির বাপমাকে অনেক রকম জেরা ক’রে জানা গেল, আগের দিন সকালে তাঁরা মোটরে বালিগঞ্জ থেকে বড়বাজার ঘাটে গেছেন, সেখানে স্টীমার না পেয়ে নৌকো নিয়ে বেলুড় মঠ যাত্রা করেছিলেন। ভাঁটার টান ঠেলে উজান বেয়ে যেতে নৌকাখানির বেলুড় পৌছতে বেলা তিনটে বেজে গেছলো। সঙ্গে তাড়াতাড়িতে শিশুর খাওয়ার মত কোনো ফুড্ নেওয়া হয় নি, মেয়েটি তাঁদের সঙ্গেই ছিল। তাকে জাম, জামরুল, নারকেলের শাঁস, কমলা লেবু প্রভৃতি যখন যা পাওয়া গেছে তাই খাইয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল। মেয়েটি তার এই অনভ্যস্ত খাবার

কিছু বেশী মাত্রাতেই উদরস্থ করেছিল। নৌকার ছইয়ের ভেতর কিছুতে থাকতে চায় নি। ভয় পেয়ে বেরিয়ে আসবার জন্য কান্নাকাটি করেছে। কাজেই তাকে বাইরে বসিয়েই নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাইতে সারাদিন গায়ে রোদের তাতও লেগেছে বেশ। এটাতেও সে জন্মাবধি অভ্যস্ত নয়। রাত্রে ফিরেছেন তাঁরা ট্রেণে। বমি করতে সুরু করেছে মেয়েটি রেলগাড়ী চলতে চলতেই। সমস্ত অবস্থা বুঝে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করবার সময় বিশেষ ক'রে বলে দেওয়া হ'ল—'আজ আর যেন মেয়েটিকে কিছু খেতে না দেওয়া হয়। গলা শুকিয়ে গেলে শুধু এক-আধ চামচে সিদ্ধ গরম জল ঈষৎ উষ্ণ থাকতে থাকতে এক আধঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে পারেন।'

মেয়ের বাপ দু'চোখ কপালে তু'লে বললেন 'গরম জল? এই বমির ওপর? আপনি বলছেন কি ডাক্তারবাবু?—তার চেয়ে যদি এক এক সিপ্ ঠাণ্ডা বরফ জল—কিম্বা এক আধ টুকরো বরফের কুচি—বা একটু আইস লেমনেড—'

মেয়ের মা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললো—'ওই একরত্তি দুর্ব্বল কচি মেয়ে—সারাদিন না খাইয়ে রাখলে বাঁচবে কেন ডাক্তারবাবু? নেবু দিয়ে একটু একটু বালির জল মাঝে মাঝে দিলে হয় না? বাছা যে আমার বমি ক'রে ক'রে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে!'

জ্যাস্ট্ ইম্যাজিন! সত্যেন! এর পর কোনো ভদ্র ডাক্তারের পক্ষে মাথা ঠিক রেখে চিকিৎসা করা কি সম্ভব? বিরক্ত হ'য়ে বললুম—"চিকিৎসা যদি আপনারাই আমার চেয়ে ভাল বোঝেন তবে আর আমাকে কষ্ট করে ভিজিট দিয়ে ডেকে এনেছেন কেন? শিশুটিকে গলা টিপে মেরে ফেলে 'ডাক্তারই ওকে মারলে' এই বদনামটুকু আমার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে কি?—কুসুম কুসুম গরম জল ছাড়া আপনাদের বেবিকে অন্য কোনো রকম ফুড্ যদি আজ দেন, বাচ্চাকে বাঁচানো শক্ত হবে বলে গেলুম—"

সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে আসছি, কানে এলো—প্রফেসার স্ত্রীকে বলছেন, "লোকটা চিকিৎসা করে ভাল বটে, কিন্তু বড় দুর্মুখো।"

এই ত দেখলে তোমাদের 'সো-কল্ড্' শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাণ্ড! রুগীকে খেতে দিতে বললে—দেবে না; খেতে দিয়ো না বললে—লুকিয়ে খাওয়াবে! শুধু কি এই? শুনে হয় ত বিশ্বাস করবে না—প্রেসক্রপশানে যদি তিনটে ওষুধ লিখে দিয়ে আসি, তার মধ্যে সব চেয়ে কম দাম যেটার সেইটে আনিয়ে খাবে, অন্য দুটো বেশী দাম বলে আর আনাবেই না। ভাবে বাজে খরচ কেন? একটা ওষুধই যথেষ্ট! আবার এমনও দেখেছি সত্যেন যে, ঔষধ হয়ত সব কটাই আনিয়েছে, কিন্তু যখন যেটা যে-সময়ে খাওয়ার কথা,—তা না করে নিজেদের সময় ও সুবিধা মতো কোনোটা দু-এক ডোজ্ খেয়েছে—কোনোটা হয়ত খায়ও নি!

কেন খাননি বা কেন খাওয়ানো হয় নি—জিজ্ঞাসা করলে বলে—'বড্ড ভুল হয়ে গেছে!' অথচ আরোগ্য না হওয়ার দোষটা বা অসুখ বেড়ে যাওয়ার দায়িত্ব—ষোলো আনা এসে পড়ে ডাক্তারেরই ঘাড়ে!

রোগীকে আজ স্পঞ্জ্ করিয়ে দেবেন বা আজ একবার ড্যুশ দেবেন বলে এলে, ঘাড় কাৎ করে বলে—যেআজ্ঞে ঃ পরে গিয়ে যখন দেখা যায় ড্যুশও দেওয়া হয়নি, স্পঞ্জও করানো হয় নি এবং যদি কৈফিয়ৎ চাওয়া যায় কেন হয়নি—তখন বলে কি জানো? আজ্ঞে, গরম জল তৈরি, ড্যুশও পরিষ্কার ক'রে আনা হয়েছিল, কিন্তু রুগী বড় লাজুক! কিছুতেই রাজি হ'লেন না ড্যুশ নিতে! স্পঞ্জেরও সবই যোগাড় করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় রোগীর দু'-একটা হাঁচি হওয়ায় ঠাকুমা বললেন—থাক, আজ আর গায়ে জল দিসনি—আজ একাদশীর কোটাল, বাছা যখন হাঁচছে—অন্তরে সর্দ্দি আছে—

সত্যেন হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

অজিত বললে—হাসি নয়; শিক্ষিত বাঙ্গালীদের চিকিৎসা করা এক ঝকমারি। এই জন্যেই নার্স রাখা আমি বিশেষ ক'রে ইন্‌সিস্ট্ করি। গুড্‌বাই বয়! চললুম, চৌরঙ্গী যেতে হবে—লাউডন ষ্ট্রীটে একটা কনসালটেশন আছে—ঠিক এগারটায়।

—চার—

—আপনি তো সুন্দর পিয়ানো বাজাতে পারেন মিসেস্ সেন? কোনো য়ুরোপীয়ান পিয়ানিস্টের কাছে শিখেছিলেন বুঝি?

—য়ুরোপীয়ান তিনি নন ঃ তবে য়ুরোপীয়ান ট্রেন্‌ড্ বটে।

—ও! তা আপনি যদি রেকমেণ্ড করেন, তাহ'লে আমি তাঁকে লেডি ওয়াডিয়াকে শেখাবার জন্য এন্‌গেজ্ করতে পারি!

—আই এ্যাম সরি, স্যার জিজিভাই, তিনি প্রোফেশান্যাল নন।

—তবে ত আরও ভালো: আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন, মিসেস্ সেন।—আমি ত এই রকমই একজন চাই, যিনি হবেন পরিবারের বন্ধু। প্রোফেশ্যানাল আর্টিস্টদের, টু টেল ইউ দি ট্রুথ্—আমি একটু 'হেট' করি মিসেস্ সেন—

—আলাপ করবেন তার সঙ্গে? তা বেশ ত'। তিনিও আপনাদেরই প্রোফেশনের একজন। আমার স্বামীরও বিশেষ বন্ধু। খুব নামজাদা ডাক্তার তিনি এখন আমাদের প্রভিন্সে; মাঝে কিছুদিন বোম্বায়েও গিয়েছিলেন—কি যেন একটা স্পেশাল সাবজেক্ট সম্বন্ধে রিসার্চ্চ করতে—

—কি সাবজেক্ট বলুন ত?

—'থিরাপিউটিক্স ইন রিলেশান টু সাইকোএ্যানালিটিক্স'!

—ও-ও-ও! আপনি ডক্টর অজিত রায়ের কথা বলছেন? আমার সঙ্গে খুবই আলাপ আছে তাঁর। আমি ডক্টর রায়ের সে পেপার পড়েছিলুম—যখন বোম্বায়ে তিনি থাকতেন। এই ত আপনার চিকিৎসার ব্যাপারে আমি এখানে তাঁকে রোজই কনসল্ট করিছি। তিনি এবিষয়ে শুধু স্পেশ্যালিস্ট ত নন্—একজন অথরিটি!

—আপনি কি তাঁকে আমার পরিচয় দিয়েছিলেন?

—ও—নো! সার্টেন্‌লি নট্। কি ক'রে দেবো ম্যাডাম, ওটা যে আমাদের প্রোফেশান্যাল এটিকেটে ষ্ট্রিক্‌ট্‌লি প্রোহিবিটেড্!

—আপনি তাঁকে আমার পরিচয় না দিয়ে খুব ভালই করেছেন স্যার জিজিভাই। কারণ, আমার এত বেশী অসুখ শুনলে তিনি নিশ্চয় ছুটে আসতেন আমাকে দেখতে। আমি তাই আমার স্বামীকে পর্য্যন্ত নিষেধ করেছিলাম, যেন তাঁকে কোনো খবর না দেওয়া হয়।

—তাই নাকি? তিনি কিন্তু এই কেসটা শুনে খুব ইণ্টারেস্ট নিয়েছিলেন। একদিন আমার সঙ্গে কন্‌সলটিং ফিজিশিয়ান হিসেবে কেস দেখতে আসতে চেয়েছিলেন। আমি আপনার স্বামীর পার্মিশান চাইতে, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি যেন বলেছিলেন—মিসেস্ সেন এটা লাইক্ করবেন না!

—আমার স্বামী ঠিকই বলেছিলেন।

—কেন যে আপনার ডাঃ রায়কে দেখাবার এত অনিচ্ছা —জানবার অবশ্য আমার অধিকার নেই; কিন্তু আমার মনে হয়, ডক্টর রায়কে দেখালে আপনি অনেক আগেই সেরে উঠতে পারতেন।

—দেখুন, স্যার জিজিভাই, ডাক্তারের কাছে রোগীর জীবনের কোনও ঘটনা গোপন না থাকাই ভাল।—বিশেষ, আপনি যখন আমাকে সুস্থ করে তুলেছেন, আপনাকে সকল কথা আবার জানানোই উচিত। বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না যে কোনো একটি মেয়ে এবং কোনো একটি ছেলের মধ্যে কোনো সময়ে যদি ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা যদি মনে মনে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে কল্পনা ক'রে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন রচনা সুরু করে দেয়, এমন সময় হঠাৎ একদিন সে মেয়েটি যদি সেই ছেলেটির অপর একটি বন্ধুকে বিবাহ ক'রে বসে, তাহলে ভবিষ্যতে মেয়েটির পক্ষে কি সে ছেলেটির কাছে আর মুখ দেখানো সম্ভব হয়? বিশেষ যদি দেখা যায় যে, সে ছেলেটি তার প্রেমের স্মৃতি নিয়ে চিরকুমার র'য়ে গেছে—

—যদি না কিছু মনে করেন মিসেস্ সেন, একটা কথা আমি বুড়ো মানুষ ঠিক বুঝতে পারছিনি। আচ্ছা, বলতে পারেন—কি কারণে—সে মেয়েটি অকস্মাৎ সে ছেলেটিকে বিবাহ না করে তার অপর এক বন্ধুকে বিবাহ করে ফেললে?

—সে কথা শুনলে আপনি মেয়েটিকে করুণা না করে পারবেন না। সেই ছেলেটিরই কোনও এক রিলেটীভ মেয়েটিকে এই কথা জানিয়েছিল যে ছেলেটি অন্যত্র আবদ্ধ। বিবাহ সে তাকে কখনই করবে না, সেই জন্যই এপর্য্যন্ত বিবাহের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেনি। বিবাহ সে অন্যত্র করবে, তাকে নিয়ে শুধু দুদিনের জন্য খেলা করছে।

—কথাটা বুঝি আপনি খুব বিশ্বস্তসূত্রেই শুনেছিলেন—নইলে প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে এরকম একটা মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করা—

—হ্যাঁ, বিশ্বস্ত-সূত্র বই কি, তা ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রমাণও যে উপস্থিত হয়ে গেল একটা। আমি তাঁকে নিয়ে একদিন

'লাইট-হাউসে' ছবি দেখতে যাবার জন্য প্রস্তাব করি, কিন্তু তিনি সেটা কোনো একটা ছুতোয় এড়িয়ে যান। আমার কাছে খবর এলো—তিনি তাঁর সেই পূর্ব্ব-বাগ্‌দত্তাকে নিয়ে মেট্রোয় ছবি দেখতে যাবেন বলে, আমার সঙ্গে লাইট হাউসে গেলেন না এবং মনে পাপ আছে বলেই আসল কারণও আমার কাছে গোপন করে অন্য কি একটা কাজের ছুতো দেখিয়েছিলেন। আমার ঘাড়ে কেমন ভূত চেপে গেল। আমি 'লাইট হাউসে' যাওয়া বন্ধ করে সেই ছ'টার শো'তেই মেট্রোয় গিয়ে হাজির হলুম। দেখলুম তিনি সেই মেয়েটির সঙ্গে বসে ছবি দেখছেন। মেয়েটিকে দেখে হিংসে হ'ল। চমৎকার চেহারা। আমি তার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নই! 'ইন্‌ফিরিয়রিটি-কম্‌প্লেক্সের' কাঁটা বিঁধে গেল বুকে। দুঃখে রাগে অভিমানে অন্ধ হয়ে সেইদিনই সন্ধ্যায় সিনেমা ভাঙবার পর বাড়ী ফেরার পথে আমি তাঁরই প্রফেসর বন্ধু মিঃ সেনের কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে এলাম। শুনেছিলাম ওঁদের বিবাহ নাকি স্থির হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের বিবাহ যাতে ওঁদের আগেই হয়ে যায় তার জন্য আমিই সত্বর হয়ে উঠলাম।

—ইট ইজ ভেরি ইণ্টারেস্টিং মিসেস্ সেন! তারপর?

—তারপর? বিবাহ আমাদের হয়ে গেল। অজিত নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, আমাকে হাসিমুখে কংগ্র্যাচুলেশন জানালেন। আমি কোনো উত্তর দিলাম না। নেহাৎ অপরিচিত লোকের মতই ব্যবহার করলাম।

—ইস্, আপনারা মেয়েরা এমন কোমল জাত হয়েও এত কঠিন হতে পারেন!

—সেই নিষ্ঠুরতারই তো কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছিলুম স্যার্ জিজিভাই, এতদিন ধরে বিছানায় পড়ে। বিবাহের পর দীর্ঘ দিন উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলাম অজিতের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রের। আপনি হাসছেন যে ডক্টর ওয়াডিয়া!

—এক্সকিউজ মি মিসেস্ সেন, শুনেছিলাম, বাঙ্গালী মহিলারা বড় নিমন্ত্রণ খেতে ভালবাসেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনাকে বোধ হয় ডিস্যাপয়েণ্ট হতে হয়েছিল। কারণ, আমি যতদূর জানি ডক্টর রায় এখনও ব্যাচিলর!

—আঘাত পেয়েছি ত আমি সেইখানেই ডক্টর! নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছিল এবং নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেও গিয়েছিলাম আমি। যদিও সে নিমন্ত্রণ ডক্টর রায়ের বিবাহের নয়, মিস্ শকুন্তলার। সেই যে মেয়েটিকে মেট্রোয় দেখেছিলাম অজিতের সঙ্গে ছবি দেখতে গেছে—তিনিই মিস শকুন্তলা। ডক্টর অজিতের তিনি কে হয় জানেন?

—কোনও মাস্তুতো বোন টোন বোধ হয়?

—না না ডক্টর ওয়াডিয়া, শকুন্তলা তাঁর নিজের সহোদরা বোন, সেইটে জানবার পরই ত—

—ওঃ! আমি কিন্তু ডাক্তার অজিতের এক মাস্তুতো বোনের গল্পই শুনেছিলাম ওর কাছে—

—কই আমরা তো সেকথা শুনিনি। ওঁর কি এক মাস্তুতো বোনও আছে?—

—গল্পটা বলি তাহ'লে শুনুন।—ডাক্তারের ভিজিট ফাঁকি দেওয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে সেদিন আলোচনা হচ্ছিল। এদেশের লোকের এ বিষয়ে একটা চরিত্রগত দুর্ব্বলতা আছে। বিশেষ করে এটা দেখা যায় তথাকথিত ধনী বড়লোকদের মধ্যেই বেশী। তাঁরা প্রথমটা বন্ধু বা আত্মীয় ডাক্তার ছাড়া ত ডাকেনই না; তাঁরা হালে পানি না পেলে তখন ডাক পড়ে বড় বড় স্পেশ্যালিস্টদের। অচল টাকা চালাবার পক্ষে ডাক্তারের ভিজিটই ওই সব বাড়ীর প্রধান অবলম্বন! সরকার মশাইকে বা দারোয়ানকে দিয়ে ওবেলা পাঠিয়ে দেব বলেও অনেকে বিদায় করেন। বাকী ফীটা আদায়ের লোভে আবার ডাকলেই আসি; কয়েকটি ফী জমে গেলে তাঁরা বলেন—একসঙ্গে একখানা চেক্ লিখে দেব ডাক্তারবাবু! আমরা আত্মীয়, আমরা পরিচিত, আমরা বন্ধুবান্ধবের দল, আমরা ক্লাসফ্রেণ্ড, আমরা পাড়া-প্রতিবেশী, ফ্রী-ট্রিট্‌মেণ্টের এসব দাবী ত আছেই। ডাক এলো একদিন বরানগর আলমবাজার থেকে। মোটরের তেল পুড়িয়ে ছুটলো বার মাইল ডক্টর অজিত রায় রোগী দেখতে। একটি মেয়ের খুব অসুখ। প্রসব হবার পর থেকে জ্বর আর কিছুতেই ছাড়ছে না, পেটের অবস্থাও ভাল নয়। মেয়েটির বয়স আঠারো উনিশের বেশী নয়। রোগে ভুগে শীর্ণ ও বিবর্ণ হ'য়ে পড়েছে। গায়ে রক্ত নেই, 'এনিমিক' বলে মনে হল। বাচ্ছাটি শোনা গেল ভূমিষ্ঠ হবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মারা পড়েছে। যে ছেলেটি রোগিণীর ভাই বলে

পরিচয় দিয়ে ডাকতে এসেছিল তাকে কতকগুলো প্রশ্ন করাতে সে থতমত খেয়ে বললে—আমি ত ঠিক জানি না সব, আপনি বসুন, আমি মাকে ডেকে আনছি।

ছেলেটি চলে গেল। তাদের রকমসকম দেখে অজিতের মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সে মেয়েটিকে প্রশ্ন করলে—কত দিন আগে তোমার বিবাহ হয়েছে? মেয়েটি কোনো জবাব দিলে না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার স্বামী কোথায় থাকেন? কি কাজ করেন তিনি? তাঁর কোনো স্থায়ী অসুখ আছে কি-না তুমি জানো কি?

এবারও কোনো উত্তর নেই। নিরুপায় হয়ে তার মায়ের আগমন প্রত্যাশায় ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করে দিলে অজিত। বরানগর আলমবাজারের এক প্রকাণ্ড বাগান বাড়ীর দোতলার সাজানো হলঘর। চারিদিকে দামী আসবাবপত্র। রোগিণীর বিছানা দামী ও পরিচ্ছন্ন, ইলেক্‌ট্রিক আলো পাখা আছে। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় অয়েল পেন্টিং আর ব্রোমাইড এনলার্জমেণ্ট ফটো ঝুলছে, ঘরের এককোণে একখানা মার্ব্বলটপ টিপয়ের উপর খানকয়েক বই রয়েছে দেখে অজিত বইগুলো দেখতে গেল। সে কি বলে জানেন ত? বলে—বই নাকি এখনও প্রণয়িণীর চেয়েও তাকে অধিক আকর্ষণ করে!

—ওটা ব্যাচিলারদের একটা ব্লাফ! আমি এ বিশ্বাস করিনি ডাক্তার ওয়াডিয়া, যে কোনো সজীব মানুষের কাছে প্রেমের চেয়ে পুঁথি বড় হ'তে পারে। তারপর কি হ'ল বলুন—

—অজিত যখন বইগুলো নাড়াচাড়া করে দেখছে, এমন সময় ঠিক সেই দিকেরই একটা দরজায় জমকাল পর্দ্দা ঠেলে একটি মহিলা সে ঘরে ঢুকে পড়েই ডাক্তারকে দেখে চট্ করে মাথার কাপড়টা টেনে সরে পড়লেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য, তারপরই দেখা গেল তিনি বেশ একগাল হাসতে হাসতে মাথার কাপড় পেছনে নামিয়ে দিতে দিতে ঘরে এসে ঢুকলেন। ডাক্তারের মুখের দিকে সপ্রতিভভাবে চেয়ে দেখে বললেন, "ওমা কি হবে! দাদা? তুমি? খোকা বুঝি তোমাকে ধরে এনেছে?" বলেই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে ডাক্তারকে এক প্রণাম ঠুকে পায়ের ধূলো ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"দাদা, বোধ হয় আমায় চিনতে পারছ না, না?"

মাথার মধ্যে মুগুর মেরেও ডাক্তার অজিত কিছুতে স্মরণ করতে পারলেন না যে এ মহিলাটিকে তিনি জীবনে কখনো কোথাও দেখেছেন কি না! মহিলাটি তাঁর ভাবগতিক দেখে সম্ভবত সেটা অনুমান ক'রে নিয়েই বললেন—"তোমারই বা দোষ কি ভাই? চিনবে কেমন করে বলো? সেই ছেলেবেলায় বিয়ের আগে দেখেছিলে বই ত নয়—তারপর আমি ত বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আজ বিশ বছর। তোমার ভগ্নীপতির সঙ্গে পশ্চিমেই কাটাতে হয়েছে এতকাল। আমি শৈল গো, তোমার মাস্তুত বোন। সেবার মেয়ের বিয়ে দিতে যখন কলকাতায় আসি, তোমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে শুনলাম তুমি তখন বিলেতে! চিনবে কি ক'রে বলো? বড় হয়ে ত আর আমাদের ভাই-বোনের কোনো কালে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তোমাকেই কি আমি চিনতে পারতুম? সেদিন খোকা আমায় দেখালে কোন্ একখানা ইংরিজী কাগজে তোমার ছবি বেরিয়েছে—কোথায় কোন মেডিক্যাল কনফারেন্সে নাকি 'প্রিসাইড্' করেছিলে। সেইটে দেখা ছিল বলেই না ধরতে পারলুম! তা বেশ ভালই হয়েছে দাদা, তুমি এসেছ আমি নিশ্চিন্ত হলুম। মেয়েটাকে সারিয়ে তোলো ভাই। বৌদি আর তোমার ছেলে মেয়ে সব কেমন আছে? বড় তাদের দেখ্‌তে ইচ্ছে করে দাদা; একদিন এন না তাদের সঙ্গে ক'রে। তোমার তো নিজের গাড়ী রয়েছে ভাই। গরীব বলে কি এমনি ক'রেই আমাদের ভুলে থাকতে হয়?"

তুবড়ির মত মহিলাটির মুখে অনর্গল কথার খই ফুটছিল। অজিত ত একেবারে হতভম্ব। তার অভিযোগের উত্তর দেবে কি বেচারার বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না! মহিলাটিকে দেখে তার মনে হ'ল বয়সে তিনি তার চেয়ে বড়ই হবেন, কিন্তু তার প্রণাম ও পায়ের ধূলো নেবার ঘটায় ও দাদা বলার ছটায় সে আর কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না। মনে হ'ল—কি জানি হয়ত হবেও বা তার কোনো দূর সম্পর্কের মাস্তুতো ছোট বোন, যাদের সম্বন্ধে তার বিশেষ কিছু জানা নেই, তাছাড়া মেয়েদের চেহারা দেখে বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব। অনুমানের চেষ্টাও বিপজ্জনক!

অজিতকে চুপ করে থাকতে দেখে মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, "দীপাকে কেমন দেখলে দাদা? কি হয়েছে বলো

তো মেয়েটার ? জ্বর কিছুতে ছাড়ছে না, পেটেও ব্যথা হয়ে টাটিয়ে রয়েছে, কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারে না।”

অজিত বললে—“লোক্যাল একজামিনেশান’ না করে কিছু বলা অসম্ভব।”

মহিলাটি মৃদু হেসে বললেন, “ওইখানেই ত মুস্কিল দাদা। মেয়েটা আমার বিষম লাজুক! প্রসব হবার সময় কিছুতে বড় ডাক্তার আনতে দিলে না। একটা হাতুড়ে দাই এসে কি যে করে গেল কে জানে ? মেয়ে আমার সেই থেকে ভুগছে—”

অজিত জানতে চাইলে—কতদিন আগে প্রসব হয়েছে ?

—“তা প্রায় মাসখানেক হবে। ওঃ! প্রসবের সময় যা কষ্ট পেয়েছে খুকী তোমায় কি বলবো দাদা, সে যেন যমে মানুষে টানাটানি—” মহিলাটি হয়ত আরও কিছু বলতেন অজিত বাধা দিয়ে বললে “আমি কাল একজন ভাল মেয়ে ডাক্তার আর নার্স সঙ্গে করে আসবো। মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে লোক্যাল একজামিনেশনের জন্যে রাজি করাবেন, নইলে কোনোরকম চিকিৎসা করাই চলবে না—”

—“ওকি ভাই! আমাকে আবার আপনি মশাই সুরু করলে যে! আমি না তোমার ছোট বোন! সম্পর্ক যে ‘তুই-তোকারি’র দাদা! তা বয়স হয়েছে বলে না হয় ‘তুমি’ই বলো—আপনি কি ? ছিঃ! আমার ভারি লজ্জা করে—” বলেই মহিলাটি আর একবার অজিতকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে।

“আচ্ছা তাই হবে” বলে অজিত পালিয়ে এল। আসতে কি দেয় সহজে ? একটু ‘চা’ খেয়ে যাও ভাই, একটু মিষ্টিমুখ না করে যেতে পাবে না দাদা: না, সে কিছুতে হবে না; ভারি রাগ করবো আমি—কতদিন পরে দেখা হ’ল বলো তো ?—”

সুরু হয়েছিল আর একপর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহের প্রবল উচ্ছ্বাস, কিন্তু, “অনেকগুলি জরুরী রুগী হাতে, এখনি যেতে হবে তাকে, অন্য একদিন এসে জলযোগ কেন, একেবারে পাত পেড়ে খেয়ে যাব” বলে অজিত তাড়াতাড়ি বাড়ীতে এসে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল অজিতের দূর বা নিকট সম্পর্কের কোনো মাসির অস্তিত্বই নেই! অজিতের মা ছিলেন তার দাদামশায়ের বংশের একমাত্র মেয়ে! ··· আচ্ছা আমি আজ উঠি, গুডবাই মিসেস্ সেন—

—গুডবাই স্যার জিজিভাই: আবার কবে আসছেন ?

—ওঃ! দেখেছেন: কথায় কথায় আপনাকে আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি! আমি আজই বোম্বাই ফিরছি। আবার যে কবে দেখা হবে—সেকথা বলা বড় শক্ত; তবে আপনারা যদি পূজোর ছুটিতে বোম্বাই অঞ্চলে বেড়াতে আসেন, তাহলে একটা চান্স্ পেতে পারি।

—নিশ্চয় যাব—সার জিজিভাই। অবশ্য যদি এই রকম ভাল থাকি। কিন্তু: যদি ‘রিল্যাপ্স্’ করে—

—আমার মনে হয় সে সম্ভাবনা আর নেই। তবে যদি শরীর এবং বিশেষ ক’রে আপনার মনটা কোনোদিন খুব খারাপ বোধ করেন ডাক্তার অজিত রায়কে তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন—

—আমার যে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া হয়নি আজও।

—সেজন্য আপনি কুণ্ঠিত হবেন না। কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। অজিতকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে আপনার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবার ভার নিলুম আমি—

—নিলেন ?—আঃ! আপনি আমাকে সবরকমেই নিরাময় করে তুললেন স্যার জিজিভাই! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

স্যার জিজিভাই ততক্ষণে রুমালে কপাল মুছতে মুছতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করেছেন।

ঠিক সেই সময়ে—সত্যেন বাড়ী ফিরে উপরে উঠছিল। অজিতকে দেখেই চিৎকার করে উঠলো—

—হ্যালো, অজিত! ইয়ু আর রিয়েলি এ জিনিয়াস্ মাই ডিয়ার! মিনু যেন আবার সেই পূর্ব্বযুগের চঞ্চলা কুমারী হ’য়ে উঠেছে!

—“চুপ-চুপ!” মুখে আঙুল চাপা দিয়ে ইসারা করে অজিত বললে—“মিনু এখনি শুনতে পাবে যে! স্যার

'—ড্যাম ইয়োর—স্তার জিজিভাই, ইয়ু আর আওয়ার মার্ভেলাস্ এণ্ড ওয়াণ্ডারফুল ডক্টর অজিত রায় ! থ্রী চিয়ার্স ফর আওয়াব অজিত ! হিপ্-হিপ্-হুররে !

মিনুব কানে তাব স্বামীব উচ্চকণ্ঠস্বব গিযে পৌছেছিল। সত্যেন ঘরে ঢুকতেই উৎকণ্ঠিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা কবলে—তুমি সিঁড়িতে কার সঙ্গে কথা বলছিলে এইমাত্র ? স্তার জিজিভাই ওযাডিযা কি ?—

—"এলাযাস্—ডক্টর অজিত রায—আওযার বেস্ট্ ফ্রেণ্ড মিনু !" ব'লে সত্যেন হো হো ক'বে সবল কণ্ঠে হেসে উঠলো !

কে ?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(শ্রীঅববিন্দেব 'অহনা' পুস্তিকার 'WHO ?'—শীর্ষক কবিতা হইতে)

শ্রীঅরবিন্দ

গগনের নীলিমায় অরণ্যের শ্যামদ্যুতি মাঝে
কার তুলি বিলিখিত এ অপূর্ব দীপ্র বর্ণাভাস ?
ইথরের ভ্রূণসম সুপ্তি মগ্ন ছিল যবে বায়ু,
কে তার ভাঙিল ঘুম বক্ষে তাব জাগালো নিঃশ্বাস ?

প্রকৃতির অন্তস্থলে সঙ্গোপনে সে আছে লুকাযে,
মস্তিষ্কেব মাঝে তার চিন্তাঘন সৃষ্টিপরম্পরা,
কুসুমের চিত্রবর্ণে সুষমায সে রয়েছে মিশি,
নক্ষত্র-খচিত সূক্ষ্ম তন্তুজালে সে পড়েছে ধরা।

পুরুষের শৌর্যবীর্যে রমণীর কমনীয়তায
শিশুর হাসির মাঝে লজ্জারুণা কুমারী-আননে
নেহারি বিভূতি তার, যার করনিক্ষিপ্ত কন্দুক
সমুজ্জ্বল গ্রহতারা বেগভরে চলে চক্রায়নে।

জানি ভালবাসি মোবা শ্যামঘন সুকান্ত কিশোব,
মোদেব ভুবনেশ্ববী ভীষণা সে দেবী বিবসনা,
দেখেছি দেবতা এক ধ্যানাসনে হিমাদ্রিশিখবে,
লোক-লোকান্তবব্যাপ্ত হেরি তার নিখিল বচনা।

সবারে শুনাবো মোরা তার লীলা তাব চতুরালি,
কত যে উল্লাস তাব পীড়নে বিক্ষোভে বেদনায,
হৃষ্ট সে মোদেব শোকে, ডুবায সে নযনসলিলে,
তাবপরে কবে মুগ্ধ আপনাব আনন্দে শোভায।

নিখিলেব ছন্দসুব ভবপূব হাসিতে তাহাব,
হে হাসি আনন্দঘন উদ্বেলিত রূপেব সাগব,
বুকেব স্পন্দনে তাব বাঁচি মোবা, আনন্দ মোদের
শ্যামবাধা সম্মিলনে, সে চুম্বনে প্রেমের আকব।

বীর্য তাব বিঘোষিত বিশ্বময় তূর্য কম্বুনাদে
সমবে সে বথাসীন, সর্বভেদী সে তীক্ষ্ণ সাযক,
সংহাবে সে অকৃপণ, করুণায অকূল জলধি,
ধরাব উদ্ধার লাগি যুদ্ধ তাব, যুগপ্রবর্তক।

গ্রহাদির ক্ষিপ্রবেগে কালসিন্ধু তবঙ্গ-তাণ্ডবে
অমেয অনপনেয শুদ্ধ সত্ত্ব, রাজশ্রী গৌরবে
ঋদ্ধিমান, ধ্যানীব উত্তুঙ্গতম গিরিচূড়াতীত
অচল আসন তাব নিত্যকাল আছে প্রতিষ্ঠিত।

মানবেব নিযন্তা সে, সে মোদের প্রেমের ভিখাবী,
রয়েছে প্রাণেব মাঝে তবু মোরা দেখিতে না পাই,
দৃষ্টিহারা অহঙ্কাবে বাসনাব বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝায,
স্বাধীন চিন্তার মাঝে বন্দীদশা মোদের সদাই।

সবিতৃমণ্ডলে হেরি দীপ্তি তার অজর অমর
নৈশ-অন্ধকারে তার ঘনীভূত তিমিরপ্রচ্ছায়,
আদিম তমিস্রা যবে ছিল অন্ধ নিবিড় গুণ্ঠনে
সেই গূঢ় অন্তরালে ছিল তার বিশ্বব্যাপী কায়।

নিখিল প্রবাহ

হুয়েন শাঙ্

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইতালির মনোভাব যতখানি প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে য়ুরোপের অন্যান্য জাতি তাদের সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা ক'রে নিতে পারে নি। দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপের শক্তিগুলি ইতালির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। আর্থিক অবস্থার উন্নতি কল্পে এই মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ইতালি বলকানরাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার ক'রবে এই ভেবেই হয় তো প্রথমটা স্থির ক'রেছিল যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ থেকে তারা তফাৎ থাক্‌বে। ওরা প্রথম প্রথম চেষ্টাও করেছিল যাতে ইতালির ওপর অন্যান্য শক্তির কোন সন্দেহ না থাকে। তার জন্যে এলবেনিয়া আক্রমণের ব্যাপারটা লোকচক্ষের অন্তরাল ক'রবে ব'লে ওরা সেখান থেকে সৈন্য সামন্ত অপসারিত ক'রে গ্রীক্ সীমান্তের দিকে সরিয়ে এনেছিল। গ্রীসও তাদের সেই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে খুসীই হ'য়েছিল। কিন্তু তারপর হাঙ্গারীয় সীমান্তে সোভিয়েটদের চালচলনের কথা এবং তার অব্যবহিত পরেই তাদের ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণের কথা কানে আস্‌তেই ইতালি একটু চিন্তিত না হ'য়ে পারল না। অবশ্য মুসোলিনী প্রকাশ্যে কোন কথা স্বীকার করেন নি বা ইতালীয় গণসাধারণ ফিনল্যাণ্ডের প্রতি সমবেদনায় কাতর হয় নি। তবে বল্‌কান অঞ্চলে বল্‌শেভিক মতবাদ বিস্তৃতি লাভ ক'রতে প্যারে এই আশঙ্কায় ডিসেম্বরের প্রারম্ভে ফ্যাসিস্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিলের একটী জরুরী বৈঠক আহ্বান ক'রে তারা এক ইস্তাহার প্রচার ক'রল। এই বৈঠকেই প্রথমবার এই কথা আলোচিত হ'ল যে, দানিউব ও বল্‌কান রাজ্যের উপর ইতালির

ইতালি হাঙ্গারীয় স্বার্থ-সম্মিলন—বাম-দক্ষিণ : কাউণ্ট সিয়ানো ; হাঙ্গারীর প্রধান মন্ত্রী—কাউণ্ট তেলেকি ; হাঙ্গারীয় পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট স্যাকী এবং সিনর মুসোলিনী

প্রসারিত স্বার্থ বজায বাখ্‌তে গেলে জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইতালির মৈত্রীবন্ধন দৃঢতব হওযা দবকাব। সেই সঙ্গে হাঙ্গাবীর সঙ্গে সমস্বার্থ সম্পর্কটাও একটু পাকাপাকি হওযা দবকাব। কাজেই কতকটা সজাগ হ'যে ইতালি জার্ম্মাণী ও হাঙ্গাবীব সঙ্গে কানাকানি ও পবামর্শেব চেষ্টা ক'বতে লাগ্‌ল এবং মৈত্রীবন্ধনে নিজেদেব স্বার্থ যাতে ষোল আনা বজায বাখতে পাবে তাব জন্যে উঠে-পড়ে লাগ্‌ল। কিন্তু ইতালি গোড়া থেকেই চেষ্টা ক'বেছিল যাতে তুবস্ক তাদেব এই মৈত্রী গ্রন্থিতে স্থান না পায।

দানিউবের তটবর্ত্তী হাঙ্গারীর সুরম্য রাজধানী বুদাপেস্ত।
পাশে দানিউব প্রবাহিত

বামে—বলকান রাজ্য ; বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার সেন্ট আলেক্‌জাণ্ডার নেভস্কি গীর্জ্জার দৃশ্য। রাজধানী অদূরে দেখা যাচ্ছে

যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডের একাংশ

পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিযানো জোর গলায ঘোষণা ক'বলেন যে, ইতালির সঙ্গে এলবেনিযা যুক্ত হওযাব পব থেকে ইতালিও একটা বল্‌কান শক্তিরূপে পবিগণিত হওয়া উচিত।

রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট

সবগুলি বল্‌কান শক্তি ও হাঙ্গারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে তাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং তাতে সকলেরই সমান স্বার্থ যে, এই সম্পর্ক

ভূ-খণ্ডে তথা হাঙ্গারী, বল্কানরাজ্য ও ইতালিতে শান্তির আবহাওয়া পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা।

মৈত্রীবন্দন দৃঢ়তর হ'য়েও যে খুব সুবিধা ইতালির পক্ষে হ'য়েছে, তা বলা চলে না। বল্কান রাজ্যে যে রুশ-প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ইতালি শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল, সে প্রভাব সম্মুখ সমরে বিস্তারিত না হ'লেও নেপথ্যে যথেষ্ট কার্য্যকরী হ'য়ে সাফল্যমণ্ডিত হ'চ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট সরকার একটু একটু ক'রে বল্কান রাজ্যে হস্ত প্রসারিত ক'রছেন এবং নিরুপায় হ'য়ে তাঁদের সেই হাতে রুমানিয়া প্রভৃতিকে অর্ঘ্য দিয়েই ভ'রে দিতে হ'চ্ছে। বেসারেবিয়া রুমানিয়ার অতি লোভনীয় প্রদেশ এবং তার মায়া ত্যাগ করা রাজা কেরলের পক্ষে কম মর্ম্মান্তিক নয়।

অবশ্য জার্ম্মাণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে ইতালির উদ্দেশ্য ছিল

বেসারেবিয়া অঞ্চল পরিদর্শনে রুমানিয়ার অধিপতি সম্মুখে—
রাজা কেরল ও পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী তাতারেস্কু

অনুরূপ। ফ্রান্সের কাছে যে সুযোগ সুবিধাটুকু তারা বরাবর আদায় ক'রতে চেয়েছিল, সেটা সাম্‌না-সাম্‌নি লড়াই ক'রে আদায় করা কোনদিনই তাদের পক্ষে সহজ হ'ত না। তাই ফ্রান্স যখন জার্ম্মাণীর সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে বিব্রত, তখন

বল্‌কান-নৈতিক আলোচনায় আহূত রাজপুরুষগণ। সম্মুখে—(বাম-দক্ষিণ): ডাঃ মার্কোভিচ্ (যুগোস্লাভিয়া); জেনারেল মেটাক্সাস (গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী); ডাঃ সারাজগ্‌লু (তুরস্কের পররাষ্ট্রসচিব) এবং এম, গাফেন্কু (রুমানিয়ার পররাষ্ট্রসচিব)

সুযোগ বুঝে ইতালি জার্ম্মাণীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর ক'রে নিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, তথা গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়াল।

বস্তুতঃ রুমানিয়ার সহানুভূতি ও স্বার্থ বেশী ছিল মিত্রশক্তিদের সাহচর্য্যে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে মিত্রতায় যোগদান না ক'রে রুমানিয়া যদি গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিতালি ক'রত তা হ'লে বল্‌কান-একতা ব্যাপারে হাঙ্গারী বা বুল্গেরিয়াকে তার রাজ্যাংশ ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন কোনদিনই উঠত না। দ্বিতীয়ত তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতার ফলে সাধারণ [illegible] পেতে আনুপূর্ব্বিক বল্‌কান-নৈতিক পরিস্থিতি রুমানিয়াকে একে একে অনেককিছু ত্যাগ ক'রতে বাধ্য ক'রেছে এবং ভবিষ্যতেও ক'রবে। বন্ধু নির্ব্বাচনে ও নৈতিক চালে ভুল কষ্টের ফলেই আজ রুমানিয়ার [illegible]

ইতালির অপর দু'জন মুখপাত্র : সিনর ভাজিনিয়ো গায়দা (বামে)— ইনি 'জোর্ণালে দ ইতালিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও মুসোলিনীর দক্ষিণহস্ত। দক্ষিণে—সিনর এটোর মুটি, ইনি সিনর স্টারাসের স্থলে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট দলের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন

মিশরের রাজা ফারুক ও রাণী ফরিদা। ক্রোড়ে—রাজকুমারী ফেরিয়াল

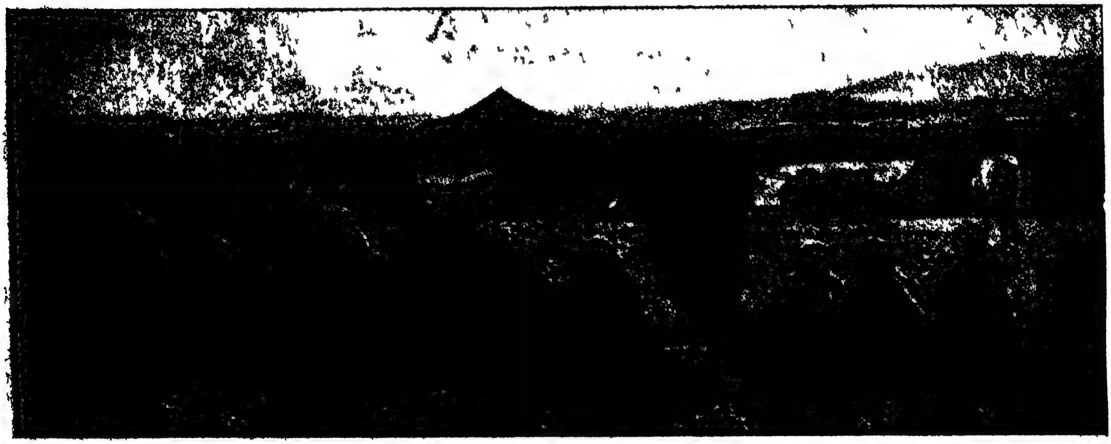

সাহারার উপান্তে সৈন্য সমাবেশ

মাইকেলের হাতে সঙ্কটাপন্ন রাজ্যভার তুলে দিয়ে গোলযোগের অবসান কামনা করেছেন। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই।

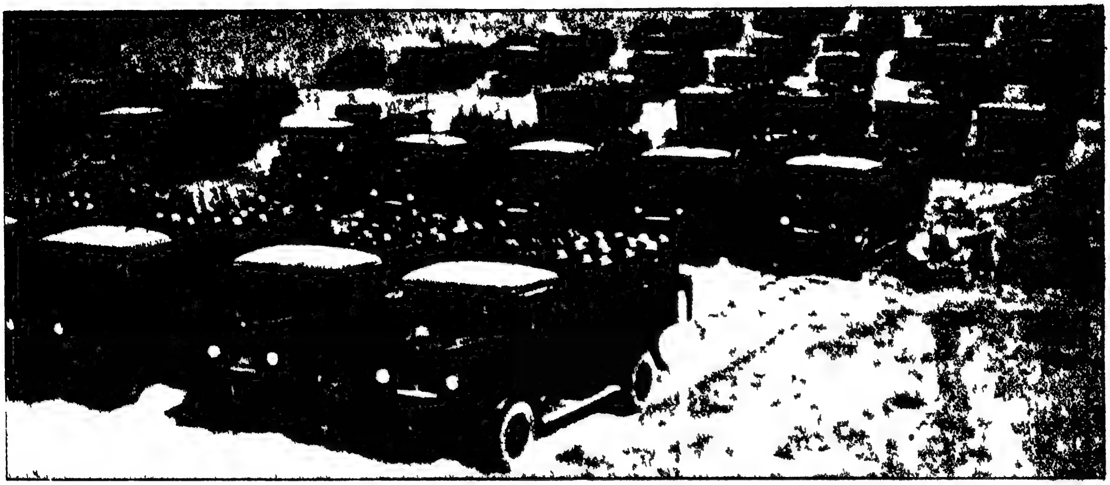

লিবিয়ায় ইতালীয় সৈন্যবাহী 'লরি'সমূহ

আইরণ গার্ড ষড়যন্ত্রকারীগণ তাঁর প্রাণনাশের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু তিনি জেনারেল য্যাণ্টোনেস্কুর সাহায্যে অতি কৌশলে সীমান্ত ত্যাগ ক'রে যেতে সমর্থ হ'য়েছেন।

যাক্, যে কথা ব'লছিলাম সেইটাই আগে শেষ করি। ইতালি গত আবিসিনিয়া যুদ্ধে যে সামরিক ক্ষয় সহ্য ক'রেছে, তার ওপর নতুন ক'রে কোন বড় রকম যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাদের আর্থিক অবস্থা ও সামরিক শক্তির পক্ষে মারাত্মক হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভূমধ্যসাগরে ইতালির যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে, তা-ই ইতালির মত শক্তির পক্ষে যথেষ্ট। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে রীতিমতভাবে যোগদান ক'রতে গেলে ইতালির বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু সেকথা বুঝেও হয়ত তাদের কোন উপায়ান্তর নেই। কারণ, যেখানেই ডিক্টেটরিয়াল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুসীর ওপর সমগ্র জাতির সুখদুঃখ লাভ-ক্ষতি নির্ভর করে।

গত ১৫ই আগষ্ট থেকে জার্ম্মাণী "ব্লিজক্রেগ" পদ্ধতিতে ইংলণ্ড আক্রমণ সুরু ক'রেছে। হিট্‌লার পূর্ব্বে যতখানি আস্ফালন ক'রেছিলেন, কার্য্যতঃ ততখানি বাহাদুরি দেখাতে পারেন নি। নরওয়ে, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সকে বিপর্য্যস্ত করা হিট্‌লারের পক্ষে যত সহজে সম্ভব হ'য়েছিল, ইংলণ্ডকে বিপর্য্যস্ত করা ততখানি সহজ হয় নি বা হ'চ্ছেও না। মুখে ব'ললেও, কার্য্যতঃ ঠিক ব্যাপক আক্রমণ আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী

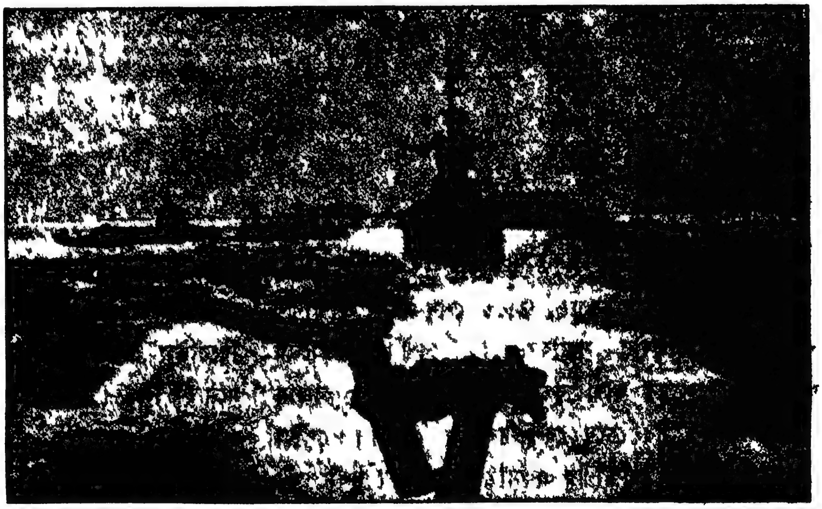

ভূমধ্যসাগরে ইতালির অর্ণববহর

ক'রতে পারে নি। যেটুকু ক'রেছে, তাতে ইংলণ্ডের ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ইংলণ্ডে হিট্‌লারের আস্ফালন কার্যকরী হ'ল না বুঝে হিট্‌লার সেদিন এক কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইংলণ্ড পূর্ব্বে ফ্রান্স প্রভৃতি স্থান হতে তাড়াতাড়ি নিজেদের সৈন্য সামন্ত সরিয়ে এনেছিল বলে এবং তার ভৌগোলিক পরিস্থিতি আত্মরক্ষার পক্ষে খুব অনুকূল ব'লে আজ পর্য্যন্ত বেলজিয়মও ফ্রান্সের অবস্থা প্রাপ্ত হয় নি।

ওদিকে রয়াল এয়ার ফোর্সও পাল্টা আক্রমণে জার্ম্মাণীর যথেষ্ট ক্ষতি ক'রেছে এবং ক'রছে। দ্বিতীয় কথা, যুদ্ধ যেভাবে বিলম্বিত হ'য়ে চলেছে, তাতে শেষ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর বিব্রত হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশী। বিজ্ঞানের যুগে যে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ চলে, তার গতি বজায় রাখ্‌তে গেলে সব চেয়ে বেশী দরকার পেট্রল। পেট্রল সরবরাহের জন্যে জার্ম্মাণীর একমাত্র রুমানিয়ার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যুদ্ধের আগে রুমানিয়া থেকে জার্ম্মাণীতে পেট্রল নিয়ে যাওয়া হ'ত কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের পথে। কিন্তু গ্রেটব্রিটেন সে পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে 'ব্লকেড' ক'রে। রুমানিয়া থেকে জার্ম্মাণীতে পেট্রল নিয়ে যাবার অপর যে রাস্তা আছে, সেটি পোলাণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যবর্ত্তী রেলপথ, রুমানিয়া থেকে জার্ম্মাণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু গত পোল-যুদ্ধে উক্ত সীমানা রুশের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে এবং যুদ্ধের ফলে লাইনটি বিধ্বস্ত হ'য়েছে। এখন এই রেললাইনের সংস্কার করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। প্রথমতঃ রাশিয়ার অনুগ্রহপ্রার্থী হ'য়ে তার রাজ্য সীমানার ভিতর দিয়ে রেল চলাচলের অনুমতি নিতে হবে, তাতে রাশিয়ার সম্মত না হবারই কথা। দ্বিতীয়তঃ সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত রেলপথের সংস্কার বহু সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়সাধ্য।

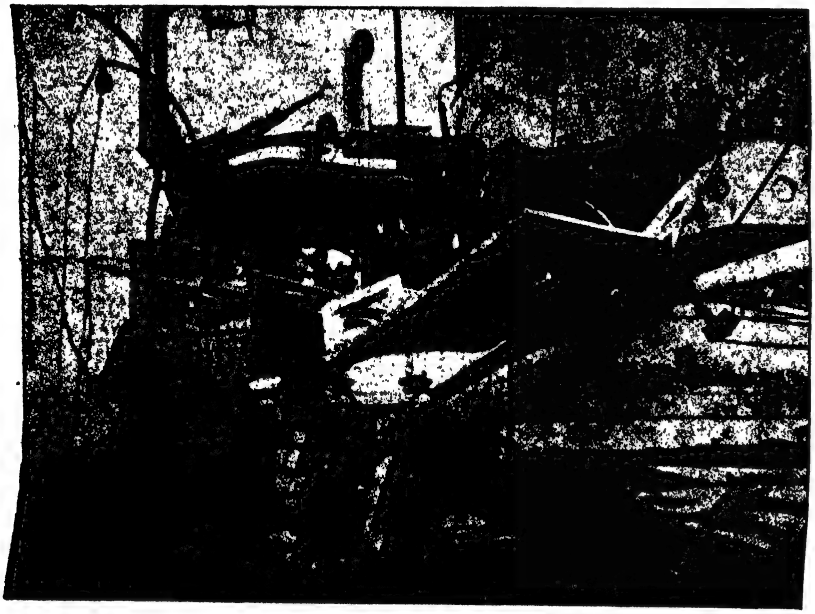

বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একখানি ইতালীয় জাহাজ

গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে জার্ম্মাণীর যে যুদ্ধ চ'ল্‌ছে, তার সুযোগ নিয়ে পূর্ব্ব অঞ্চল—এডেন, মিশর প্রভৃতি আক্রমণের দিকে ইতালির দৃষ্টি প'ড়েছে এবং সে চেষ্টাও তারা ক'রছে না একথা বলা চলে না। অবশ্য মিশর ইতিমধ্যে যথেষ্ট তৈরী হ'য়েছে এবং পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রিটিশের সামরিক আয়োজনও ইত্যবসরে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে।

অন্যদিকে, ইঙ্গ-জাপ সমস্যায় হঠাৎ যে বক্রভাব দেখা দিয়েছিল এখন সেটা যেন আবার প্রশমিত হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। তবে আমেরিকার সঙ্গে জাপানের একটা ঘোরতর গোলযোগ বাধাবার সম্ভাবনা অনেকদিন থেকেই হ'য়ে আছে এবং বর্ত্তমানে যেন সে অবস্থা কতকটা ঘোরালো হ'য়ে উঠেছে ব'লে জানা যাচ্ছে।

পদাবলীর আধ্যাত্মিকতা

শ্রীকমলা দেবী এম-এ

প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বেই জয়দেব গোস্বামী, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সুললিত ছন্দে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গীতি-কবিতার মাল্য রচনা করিয়া বাণীকণ্ঠে অর্পণ করেন। অতঃপর বহু ভক্ত সাধকের আবির্ভাবে আমাদের চিরপ্রিয় বঙ্গভূমির প্রতি ধূলিকণা পবিত্রীকৃত হয়। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের অনেকেই দুর্লভ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের সারা জীবনের অনুভূতি, সাধনা ও উপলব্ধির সহিত কবি-প্রতিভার মিলনে যাহার সৃষ্টি হইল তাহাই 'বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী' নামে পরিচিত। উপনিষদের ঋষি-কবিগণের ইঁহারা সগোত্র। সহজ আত্মোপলব্ধির এমন সহজ দিব্য প্রকাশ বোধ হয় কেবল উপনিষদেই পাওয়া যায়। পদাবলী সাহিত্যের ভাবের তীব্রতা ও গভীরতা, সহজ ছন্দের হৃদয়গ্রাহিতা, প্রকাশের বিচিত্র নৈপুণ্য এবং সুরের ঝঙ্কার শুধু ভক্তজনের চিত্তকে নহে, সাধারণ লোকেরও 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' মন প্রাণকে আকুল করে। বৈষ্ণব পদাবলী ভগবৎ-প্রেম-মকরন্দ-পিয়াসী কেবল সাধু ও সাধকগণেরই অফুরন্ত অমৃত নির্ঝরিণী নহে, বিষয়ী ব্যক্তিকেও অন্তত ক্ষণেকের তরেও এক অমৃত-লোকে লইয়া যায়। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তিশাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় তথ্য এবং সুগভীর দাশনিক তত্ত্ব নিহিত থাকিলেও উহার সাহিত্যিক মূল্যও অপরিমেয়। মানবীয় প্রেমের রস-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া মানুষের বিবিধ সম্বন্ধের ভিতর দিয়া বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁহার রস-স্বরূপকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার যে অন্তহীন আয়োজন করিয়াছেন তাহার এমন অপূর্ব এবং আনন্দময় প্রকাশ সকল ভাষার সাহিত্যেই সুবিরল। অন্যান্য ভাষার গীতি-কাব্য হইতে বৈষ্ণব কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

মানবপ্রকৃতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, রস নবধা বিভক্ত ; বাৎসল্য রস লইয়া দশটি রসের প্রকাশ। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যে আমরা দেখি—

"দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস।
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥
দাস সখা পিতামাতা প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা॥"

ব্রজবাসিগণ মুখ্যত বাৎসল্য সখ্য ও মধুর ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছেন ; এই তিনটি রসের মধ্যেই দাস্যভাব অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সকল রসের সার প্রীতি। কাব্যে ইহারই নাম আদিরস, শৃঙ্গার রস, উজ্জ্বল রস বা মধুর রস। সর্বদেশে সর্বকালে 'কান্তাপ্রেম' কাব্যের প্রধান উপাদান জোগাইয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু ভগবানের লীলা আস্বাদন করিবার পথ একটিমাত্র নহে। যাঁহারা আদিরসাত্মক লীলার প্রতি বিমুখ তাঁহারা শান্ত, বাৎসল্য কিংবা সখ্য রসে আনন্দ পান।

"অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥"

আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেই আনন্দময়কে উপলব্ধি করিতে চাই। যদি আমরা সর্বকারণ-কারণ এক চরম ও পরম সত্যরূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই তবে তিনি 'অবাঙ্‌মনসগোচর', তিনি 'অশব্দ-মস্পর্শমরূপমব্যয়ং'। কিন্তু এমন 'নেতি নেতি' করিয়া তৃষিত মানব-হৃদয় তৃপ্ত হইতে পারে কি ? তিনি যে

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।"

বৈষ্ণব মহাজনগণ কেহ সখাভাবে, কেহ পুত্রভাবে, কেহ বা প্রাণবল্লভভাবে ভগবানকে আস্বাদন করিয়াছেন। যাঁহারা সখাভাবে তাঁহার সেবা করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে সখা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। পদাবলী সাহিত্যে তাহারই কত না লীলাচঞ্চল আনন্দোজ্জ্বল চিত্র। যমুনার তীরে কদম্বমূলে শ্রীদাম-সুদাম-আদি গোপালের সঙ্গে নানাপ্রকার ক্রীড়ায় রত।

"সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল।
সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল॥

তাঁহারা রাখাল-রাজাকে লইয়া কত লীলা করিতেছেন। খেলায় হারিয়া গেলে তাঁহাকে ক্ষমা করিতেছেন না। তাঁহারা গোপালের স্কন্ধে আরোহণ করিতেছেন ; আবার উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না; একটি মিষ্ট ফল পাইলে অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় গোপালের মুখে দিতেছেন। গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া নিশাসমাগমে গোপবালকগণ যখন মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত হইতেছেন তখনও তাঁহারা গোপালকে ভুলিতে পারেন না। স্বপ্নে তাঁহারই সহিত তাঁহারা কথা বলিতেছেন। কত কৃচ্ছ্র সাধন কত তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে কণামাত্রও উপলব্ধি করা যায় না, তিনি রাখাল-বালকের সহজ প্রেমে কত সহজেই ধরা দিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সমান হইয়া লীলা করিতেছেন !

যাঁহারা তাঁহাকে পুত্রভাবে দেখিয়াছেন তাঁহারাও তাঁহাকে পূজা করেন নাই। সেখানে বাৎসল্য রসধারা নির্ঝরের ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে। পিতামাতা যেমন করিয়া সন্তানকে লালন পালন করেন তেমনি করিয়াই বাৎসল্যভাবে বিভাবিতা মাতা যশোমতী তাঁহার গোপালকে স্নেহাতুর হৃদয়ে লালন করিতেছেন। তুচ্ছ নবনীর জন্য কখন বা প্রহার করিতেছেন !

"দুবাহু পসারি আগে যায় নন্দরাণী।
ধরিতে ধরিতে ধরা না দেয় নীলমণি॥
গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত।
কোপ নয়নে রাণী চাহে চারিভিত॥
হেদেরে নবনী-চোরা বলি পাছে ধায়।
এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায়॥
নড়ি হাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়া।
অখিল ভুবনপতি যায় পলাইয়া॥"

তাঁহাকে উদুখলে বাঁধিয়া রাখিতেও দেখিতে পাই। ব্রজগোপীরা ব্যথিত হইয়া তাঁহার বন্ধন মোচনের জন্য নন্দরাণীর নিকট কাতর প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু ক্রুদ্ধা যশোদা আজ কোন অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতেছেন

"জাহ চলি আপনে আপনে ঘর।
তুমহি সব মিলি ঢীট করায়ো অব আয়ী বন্ধন ছোরন বর॥"

গোপালকে আজ তিনি ভাল করিয়া শিক্ষা দিবেন, এমন দুরন্ত হইলে তাঁহার চলে কি করিয়া এবং লোকেই বা তাঁহার অপযশ করিতে ছাড়িবে কেন! কি মনোহর এই বাৎসল্যের চিত্র। বুদ্ধি যাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না তিনি কি আশ্চর্যরূপে মা-যশোদার স্নেহবন্ধনে স্বেচ্ছায় নিজেকে বন্দী হইতে দিয়াছেন!

ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তাহার উপজীব্য মধুর রস। এই রসের আধার ব্রজগোপী এবং আধেয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজগোপীতে যে-প্রীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা অতুলনীয় অপার্থিব উপমারহিত। সুখ-সম্পদ লজ্জা-মান-ভয় কুল-শীল সকল বিসর্জন দিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ যদিও মানব-মানবীর প্রেম-সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই এই ব্রজগোপীর প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তবু উহা মর্ত্যমলিনতার বহু উর্দ্ধে এক অনির্বচনীয় লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীরাধিকা শ্যামনাম শ্রবণে অধীর হইয়া পড়েন, তাঁহার হৃদয়-বীণার সকল তারে মধুর ঝঙ্কার ওঠে, তিনি বলিয়া ওঠেন

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

সেই নাম জপিতে জপিতে তিনি বিবশা হইয়া পড়েন।

"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥"

শ্রীরাধিকা সাধারণ রমণীর ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখ লইয়া গৃহকর্মে ব্যাপৃতা ছিলেন; এমনি সময়ে শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠিল, তখন তাঁহার 'ঘরে থাকা হল দায়' এবং সকল বাধা ঠেলিয়া সব কর্ম ফেলিয়া সেই বংশীধ্বনির অনুসরণে যমুনা পুলিনে ধাবিতা হইলেন। যখন তিনি শ্যামসুন্দরের নবজলধরমূর্ত্তি দর্শন করিলেন তখন

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥"

তখন হইতে তিনি কৃষ্ণধ্যানে একান্ত নিমগ্ন। তাই

"এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখায়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥"

কলাপী-কণ্ঠের নীলাভ বর্ণ দর্শনে তিনি তন্ময় হইয়া যান, কারণ তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণের সাদৃশ্য আছে। আবার, লোকলজ্জার ভয়ে তিনি তাঁহার চিত্তকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। যমুনা স্নানে গিয়া কদম্বমূলে তিনি দৃষ্টিপাত মাত্র করেন না—পাছে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয়। তিনি সখীকে বলেন

"সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥"

কিন্তু তাঁহাকে যিনি একবার জানিয়াছেন আর কি তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? আর তাঁহার চিন্তা করিবেন না, তাঁহার প্রসঙ্গ তুলিবেন না মনে করিলেই কি তাহা না করিয়া পারেন? স্বতই রসনা তাঁহারই নাম লইতেছে, পদযুগল তাঁহারই মন্দির-পথে ধাবিত হইতেছে, কায়মনোবাক্যে স্বপ্নে জাগরণে অনুক্ষণ তাঁহারই ধ্যানে ভরিয়া থাকেন। শ্রীমতী কৃষ্ণ-মিলন মানসে অভিসারে চলিয়াছেন। সেই অভিসারের পথ জ্যোৎস্না-পুলকিত কুসুমাস্তৃত নহে, পদে-পদে বাধা, পদে-পদে বিপদ। ঘন তমসাবৃত গভীর রজনীতে গহন বনপথে একাকিনী শ্রীরাধিকা মিলন-ব্যাকুল-হৃদয়ে অভিসারে চলিয়াছেন। পদযুগলে ভুজঙ্গ বেষ্টন করিতেছে, ঝর-ঝর ধারে শ্রাবণের ধারা ঝরিয়া পড়িয়া পথের দুর্গমতা বৃদ্ধি করিতেছে, পদ-পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে বিক্ষত জর জর। কিন্তু পথের দুঃখকে তিনি অনুভবমাত্র করিতেছেন না।

ব্রজবাসিগণ দৈবক্রমে শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত অন্তরঙ্গরূপে লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু চিরদিন তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি মথুরায় চলিয়া গেলেন। অমনি

"গোকুল উছলল করুণার রোল।"

শ্রীমতীর "নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল।" তাঁহার সকলই শূন্য হইয়া গেল।

"শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি॥"

নন্দ-নন্দনের বৃন্দাবন ত্যাগের সহিত শ্রীমতীর সকল 'সুখ' অন্তর্হিত হইল।

"নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝুপাশ ॥"

তাঁহার দুঃখের কি পার আছে?

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর   মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥"

বৃন্দাবনে বর্ষা নামিয়াছে। বর্ষণমুখর রজনীতে কৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।

"কান্ত পাহুন   কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া
কুলিশ শত শত   পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি   ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥"

তিনি সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন প্রিয়তম বিহনে কি করিয়া দিনরাত্রি অতিবাহিত হইবে। যিনি প্রিয়তমের সামান্যতম ব্যবধান আশঙ্কায়

"চির চন্দন উরে হার ন দেলা
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।"

তিনি কেমন করিয়া সেই জীবন-বল্লভের বিচ্ছেদ বহন করেন! রামায়ণের কবিও মা-জানকীর মুখে এমনই হৃদয়দ্রাবী কথাই বলিয়াছেন

হারং নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষ ভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎ সাগর ভূধরাঃ ॥

কিন্তু দুঃসহ বিরহ যাতনার জন্য শ্রীমতী নিজের ভাগ্যকেই দায়ী করিতেছেন।

"হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি   কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা ॥
চন্দন তরু যব   সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব   নিজগুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগী ॥".

বিরহ প্রেমের কষ্টিপাথর। শ্রীরাধিকা যখন দয়িতের সহিত মিলনানন্দে নিমজ্জিত ছিলেন তখন তিনি সান্ত শ্রীকৃষ্ণকেই জানিয়াছেন এবং পাইয়াছেন; বিরহে তাঁহাকে নিখিল বিশ্বের সর্বত্র—জল-স্থল-অন্তরীক্ষে অনুভব করিতেছেন; বন-মর্মরে বনমালীর পদধ্বনি শুনিতেছেন, বসন্তানিল হিল্লোলে প্রিয়তমের স্পর্শ মনে করিয়া পুলক-রোমাঞ্চিত হইতেছেন। এমনি করিয়া কৃষ্ণ-বিরহিণী শ্রীরাধিকা প্রতি মুহূর্ত যাপন করিতেছেন। প্রেমের চরম অভিব্যক্তি হইয়াছে বিরহে। কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলা ব্রজ-বালার প্রেমের অনুরূপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে।

বহুকাল পরে শুভ মুহূর্ত আগতপ্রায়। শ্রীমতী বলিতেছেন.

"সখি আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে   আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল ॥"

তাঁহার অন্তর আজ আনন্দে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত—সে আনন্দের অবধি নাই।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥"

আজ তাঁহার গৃহকে গৃহ বলিয়া মনে হইতেছে, দেহ সার্থক, জীবন ধন্য বোধ করিতেছেন। মাধব তাঁহার

"হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥"

কিন্তু পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।"

যে-প্রেমে আপনাকে ভুলাইয়া দেয়, যাহা স্তুতি-নিন্দা লাভ-ক্ষতি ইহকাল-পরকাল—সকলের অতীত অবস্থায় লইয়া যায়, সে প্রেমের স্বরূপ কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? তাহা যে একান্ত অনুভূতির রাজ্যে। সে প্রেমের আভাস শ্রীরাধিকার মুখেই কিয়ৎ পরিমাণে পাই। তিনি বলিতেছেন

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু-   রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম   রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল   শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী   রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈথন কেলি।
লাখ লাখ যুগ   হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥"

মানুষ তাহার চিন্তা কল্পনা ধ্যান অনুভূতি উপলব্ধি—সকলই মানবীয় ভাবেই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনই মানুষের সম্বল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা অনুভূতি এবং উপলব্ধি একাল পর্যন্ত যাহা কিছু মানুষের আয়ত্তে আসিয়াছে তাহারও অতি অল্প অংশই মানুষ প্রকাশ

করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই প্রকাশের প্রধান বাহন ভাষা। চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতিও মানুষের এই প্রকাশ-চেষ্টাকে বিপুল সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ভাষার সাহায্যেই মানুষ আদিকাল হইতে নিজেকে বেশী ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে—যদিও ‘মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে’ এবং ‘ধূলি ছাড়ি একেবারে উর্দ্ধমুখে অনন্ত গগনে উড়িতে সে নাহি পারে সঙ্গীতের মত স্বাধীন মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন !’ তবু মানুষ তাহার অতি সূক্ষ্ম অতি তীব্র অত্যন্ত গভীর অনির্বচনীয় অনুভূতি উপলব্ধি এবং হৃদয়াবেগগুলি ভাষার মাধ্যমে উপমায় ব্যঞ্জনায় অলঙ্কারে আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। উহাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। আমাদের সৌভাগ্য ও গর্বের কথা এই যে বৈষ্ণব মহাজনগণ তাঁহাদের হৃদয়াবেগ এবং অনুভূতি ও উপলব্ধিকে এমন অপূর্ব শ্লোকে গাঁথিয়া গিয়াছেন যাহার ছন্দের মর্মে মর্মে সঙ্গীতের অপূর্ব অপরূপ ঝঙ্কারগুলি ধ্বনিত হইতেছে—যাহা আমাদের চিত্তকে মাটির বন্ধন-মুক্ত করিয়া উর্দ্ধতর আনন্দময় লোকে লইয়া যায়, যখন আমরা এই মৃণ্ময়ী বসুন্ধরার প্রতি ধূলিকণাকে অসামান্যরূপে দেখি, সকল মানব সম্বন্ধকে মহনীয় বলিয়া মনে করি এবং তখন জানি এবং অনুভব করি

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়
আনন্দ আছে নিখিলে।”

ভক্ত মহাজনগণ ভক্ত-ভগবানের লীলা গান করিতে গিয়া যে মানব-সম্বন্ধসকলের সাহায্য লইয়াছেন তাহাতেই বৈষ্ণব পদাবলী রস-পিপাসু সাধারণ পাঠক ও শ্রোতার নিকটও লোভনীয় হইয়াছে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ‘বৈষ্ণব কবিতা’য় যাহা বলিয়াছেন তাহারই কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

“আমাদেরি কুটীর-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ ! এই প্রেম-গীতি হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায় !
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !”

প্রেম-বৈচিত্ত্য

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

“দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে   বিচ্ছেদ ভাবিয়া।”

লাখ লাখ যুগ ধরি’   রাখি হিয়া হিয়া ’পরি
হিয়া না জুড়ায়,
মলয়জ-চুয়া-চীর   ব্যবধানে সে অধীর
প্রাণ পুড়ে যায়।
নিমেষ অন্তর হ’লে   কোটি কল্প যুগ ব’লে
মনে হয় তারে,
সোহাগের বাণী যত   কণ্ঠে এসে পরিণত
হয় হাহাকারে।

মিলনে কোথায় স্বস্তি ?   তৃষানলে মজ্জা অস্থি,
পুড়ে হয় ছাই,
তুষ্টি তৃপ্তি পায় লয়,   উৎকণ্ঠায়, শুধু ভয়—
‘হারাই, হারাই।’
এই প্রেমে কোথা সুখ ?   দ্রবীভূত হয় বুক
এতে পলে পলে,
চুম্বনের সুধা তায়   লবণাক্ত হ’য়ে যায়
নয়নের জলে।

হাসিতে হাসি না আসে,   কামনা পলায় ত্রাসে
ছিঁড়ে ফুলহার,
ভূষণে দূষণ বলি’   মনে হয়, যায় জ্বলি’
উৎসব-সম্ভার।
এ প্রেম ব্যথায় গড়া,   মরণে বরণ করা
অসহ্য জ্বালায়।
উল্লাস করিতে আসি   নয়নের জলে ভাসি
সখীরা পলায়।

শঙ্কর-গৌরীর তপ   করে ইষ্টনাম জপ
এ গহন প্রেমে,
ধনুতে জুড়িয়া শর   অবশ-পাণিতে স্মর
র’য়ে যায় থেমে।
বিরহ-নিদাঘ শেষে   মিলন-বরষা এসে,
কাঁদায় কাঁদিয়া।
দুহুঁ দোঁহা বুকে বাঁধে   “দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে
বিচ্ছেদ ভাবিয়া।”

তীর ও তরঙ্গ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

নয়

অণিমাদের উঠানটুকু পার হইয়াই সুনীলের এতক্ষণে হুঁস হয়, মা নিশ্চয় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চয় ভাবিতেছেন, ছেলে গেল কোথায়। ভাবুন না! সে-ও তো এতক্ষণ ভাবিয়াছে, মা পলাশডাঙ্গা গেল কোথায় —কার বাড়ী ?

এই ঘণ্টা তিনেক সত্যই কি সুনীল মার কথা ভাবিয়াছে? ভাবিবে—সময় কখন ? অণিমা যে এত কথাও বলিতে জানে কে জানিত আগে। সুনীল মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আজ গিয়াই অভিযোগ সুরু করিবে—কাল রাত্রে অত অভিমান কিসের জন্য ? কিন্তু তাহাকে কথা বলিবার কোন সুযোগ না দিয়া অণিমা আগেভাগেই যেন শত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সাজিয়া গুজিয়া—সুনীলের দেওয়া কালকের সেই রঙীণ শাড়ীখানি পরিয়া, বাহির হইতেছিল নাকি বাদলদাদের বাড়ীর উদ্দেশে। বাদলদা আজ সারা দিনে একবার খোঁজও লইলনা—অসুখ-বিসুখ করে নাই তো—সে-কথাটাই নাকি জানিয়া নিশ্চিন্ত হইবে।

কল্যকার অভিমানিনী আজ একেবারে কলভাষিণী। এই তিন ঘণ্টা কাল সময়ের মধ্যে, বাদলদাকে খামকা দুই বার চা করিয়া দিয়াছে, সর ভাজিয়া খাওয়াইয়াছে, নিজের খাতায় একটা কবিতা লেখাইয়া লইয়াছে, নিজের হাতে তৈরী একখানি রুমাল উপহার দিয়াছে—এমন করিয়াছে, বলিয়াছে ও শুনিয়াছে অনেক কাজ, অনেক কথা। মেয়েটা যেন পাগল! কাল অত অভিমান। আর আজই সব ভুলিয়া নদীর মত গতিময়, গীতিময়!

অণিমাকে আজ সুনীলের মত ছেলেও মাঝে মাঝে একটু লজ্জাহীন না ভাবিয়া পারে নাই। সুনীল যেন এক রেলওয়ে স্টেসনে দাঁড়াইয়া আছে, গাড়ী ছাড়িবার বিলম্ব নাই—অণিমা যেন এক নিঃশ্বাসে সব কথা সারিয়া লইতে চায়, কি জানি কখন বাঁশী বাজিয়া ওঠে।

অথবা, হয়তো বা মেয়েটা ভাবিয়া লইয়াছে—সুনীল তার আকর্ষণের নাগালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইলে এই সময়। যত শক্তি যত কৌশল জানা আছে—প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এক সঙ্গে। সুনীল বুঝিয়াছে সবই। হাসিয়াছে মনে মনে। তবু ভাল লাগে আগাগোড়া। নমিতার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি নাই এই যা তফাৎ। অভিনয়টুকু নিখুঁত নয় এই যা অপরাধ। দোষের কি? জীবনের অর্দ্ধেকই তো অভিনয়!—অণিমার সঙ্গে সুনীলের, সুনীলের সঙ্গে মন্দাকিনীর—একের সঙ্গে অপরের, সকলের সঙ্গে সকলের। নহিলে যেন জীবনই চলেনা। নহিলে সুনীল এত কাছে আসিয়াও মনের কথাটি অণিমাকে আজ খুলিয়া বলিতে পারিল কৈ? নির্জ্জন ঘরেও নিষেধটা শুধু বাইরের নয়, মনে ও। মার কাছেই বা অনেক কিছু লুকাইয়া চলিতে হয় কেন? —মার প্রতি আন্তরিকতা দেখাইতে গিয়া বেশ একটু আতিশয্যের আশ্রয় লইতে হয় কি কারণে?

যাক সে কথা। ন'কাকীমার অদ্ভুত আচরণে সুনীল আজ খুশী হইয়াও বিস্মিত হইয়াছে কম নয়। কাজের অছিলায় ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন বার বার, আবার খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিয়া দু'জনের কথার মধ্যে অর্থহীন ফোড়ন দিয়াছেন সহাস্যে। একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার এমনধারা ঘর বার করিয়াছেন তিনি অকারণেই। যতটুকু নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে দিতে বাধা নাই—সুলতা সেইটুকু সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতে কসুর করেন নাই—এ রহস্যটুকু সুনীল ধরিতে পারিয়াছে পরিষ্কার। ইহার বেশী আর নয়—এমন কথা ন'কাকীমা মুখ ফুটিয়া বলেন নাই, সুনীল আর সরল সংলাপের তন্ময়তার মাঝখানে বেরসিকার মত আসিয়া সুর কাটিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন উভয় পক্ষকে—অন্ততঃ প্রবল পক্ষকে।

কেন? বিবাহের মন্ত্রটা এখনো পড়া হয় নাই বলিয়া? তাই ভবিষ্যৎ ভাবিতে হয়, শঙ্কা সম্ভাবনার কথা তুলিতে হয়, ভালমন্দের বিচার-বিবেচনা করিতে হয়? নহিলে আপত্তি নাই কোনখানে? সুলতা পারিলে তো এই মুহূর্ত্তে মেয়েকে সুনীলের হাতে গছাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

মন্দাকিনীও তো নিঃসঙ্গ ছেলের সঙ্গিনী জুটাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন—ছেলের মুখের কথা পাইলে আজই যে-কোন কন্যাপক্ষকে পাকা কথা দিয়া ফেলিবেন। কিন্তু সুনীল যদি বলিয়া বসে ; অণিমাকেই সে ঘরে আনিবে এবং ব্যাপারটাও অনেক সহজ, অনেক হাঙ্গামা—চিঠি লেখা-লেখি হাঁটাহাঁটি দর কষাকষি বাঁচিয়া যায়—কাজটা শুধু এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ীতে একটি যুবতি মেয়েকে লইয়া যাওয়ার মামলা, তবে ? মার মেঘলা মুখখানি সুনীলের মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে। মনে মনে হাসে, কৌতুক বোধ করে, একটু অদ্ভুত আনন্দও যেন অনুভব করে তলে তলে। মাকে একটা আঘাত দিতে পারিলে যেন সে খুশী হয় এখন। এত অকারণ বাড়াবাড়ির একটা পাল্টা জবাব হয় চমৎকার।—অণিমা কিনা মন্দাকিনীরই পুত্রবধূ !

থাক সে কথাও। আসল কথা, আজকের দিনের সব চেয়ে বড় কথা, অণিমাকে আজ সে টুক্ করিয়া একটা চুমু খাইয়া ফেলিয়াছে। অতর্কিত অনিবার্য্য চুম্বন! মুহূর্ত্তের মধ্যে অণিমা মাথা নোয়াইয়া এলোচুল ছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া এলাইয়া পড়িল বিছানার উপর।—যেন একটা মোমের পুতুলে আগুন ধরিয়াছে! সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড, মিনিটের পর মিনিট—বহুক্ষণ। তার পর অণিমা চট করিয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল সর্ব্বাঙ্গে লজ্জার বোঝা টানিয়া। সুনীলের কিন্তু এখন হাসি পায়। তার একটা কথারও আর জবাব দিল না অমন মুখরা অণিমারাণী! কি সুন্দর হাস্যকর অসহ্য অদ্ভুত লজ্জা!

অণিমাদের উঠানটুকু পার হইয়া সুনীলের হালকা মনে এখন নৃত্য সুরু করে সেই রঙীণ মুহূর্ত্ত।—অণিমার সেই নুইয়া-পড়ার ছন্দটুকু, চুল ছড়াইয়া দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিবার ছাঁদটি, তির্য্যক ভঙ্গীতে ঘর ছাড়িয়া পলাইবার ছবিখানি।

তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়াছে সুনীল ; হয়তো মা সবেমাত্র ফিরিয়াছেন। আসিয়াই বুঝি বড় ছেলের খোঁজ লইতেছেন—নীলুর কাছে, বাবলুর কাছে। সারাদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলেন নাই বলিয়া বোধ হয় অনুতপ্ত হইয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন সুনীলের আগমন প্রতীক্ষায়। অসম্ভব কি! মায়ের মন! সুনীল তো কথা কহিবে না এমন কথা বলে নাই। ডাকিলেই সাড়া দিবে। লজ্জা কি, দ্বিধাই বা কেন, ভয় বা কিসের ?

অণিমাদের বাড়ীর সীমানা পার হইতেই সুনীলের সামনে পড়ে ছোট বোন নীলু।

“এই সন্ধ্যে বেলা যাচ্ছিস কোথায় ?”

“না”—নীলু থমকিয়া দাঁড়ায়।

“না কি—কোথায় যাচ্ছিস ?”

“অনুদিদের বাড়ী ?

“কেন ?”

নীলু উত্তর দেয়না। কি একটা কথা যেন লুকাইতে চায়। সুনীল তার হাত ধরিয়া কহিল, “বল”

নীলু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সন্দিগ্ধ সুনীল এবার ধমক দিল—“বলনা কোথায় যাচ্ছিস ?”

নীলু ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, “মা বলতে বারণ করে দিয়েছে।”

সুনীল হাসিয়া কহিল, “তোর ভয় নেই—মাকে বলবনা। বল।”

“তুমি অনুদিদের বাড়ী রয়েছ কিনা তা দেখে আসতে পাঠিয়েছে।”

“বেশতো। সে-কথা লুকুচ্ছিস কেন বোকা মেয়ে ?” সুনীল প্রসঙ্গটা হাসিয়া হাল্কা করিয়া দিতে চাহিল। নীলু নিজের আহাম্মুকি স্বীকার করিতে নারাজ। জবাব দিল “মা যে বলে দিল, তোর দাদা যেন দেখে না তোকে। দেখে ফেললে না হয় বলবি এমনি এসেছি।”

দপ কয়িয়া সুনীলের মাথায় সারা শরীরের রক্ত আসিয়া জমা হয়। ছোট বোনটাকে পাঠাইয়াছেন মা দৌত্যগিরির কাজে! ছি-ছি!

ভিতরের রাগ চাপিয়া সুনীল বোনকে কহিল, “তুই বাড়ী যা। আমি একটু বাদে যাব।”

বাড়ীর সীমানায় আসিয়া সুনীল পদ্মার দিকে মুখ করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ পদ্মার মতই তার মনেও এখন এক অন্ধ দুরন্ত বেগ! রাগ না পড়িলে ফিরিয়া গেলে মাতা-পুত্রে হয়তো এখন একটা কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হইবে।

পদ্মার ওপারে সূর্য্য পাটে নামিয়াছে। সন্ধ্যা লাগে-লাগে। রাত্রির ঘন আস্তরণের প্রথম পরদাখানি চতুর্দ্দিকে নামিয়া আসিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ফিরিতেছে আপন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বাসুদেব রায়　　৭৬, সার্কিস রোড　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

আপন বাসায়। দূরে ও নিকটে নদীর বুকে ছোট-বড় ডিঙিগুলির দু'একটাতে কেরোসিনের ডিবিয়া করে মিটমিট।

দাওয়ায় বসিয়া আছেন ঠাকুরদা। সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া মন্দাকিনীও শ্বশুরের পিছনেই চৌকাঠের কাছেই দাঁড়াইয়া আছেন। পাশেই নীলু। ঠাকুরদার কোলে বাবুল। সারা সংসার সুনীলেরই অপেক্ষায়।

ব্রজনাথ কহিলেন, "কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?" সুনীল জবাব না দিয়া ঠাকুরদাদার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল মাটিতেই। ভাবিয়া আসিয়াছিল, মাকে আচ্ছা করিয়া আজ দু'কথা শুনাইয়া দিবে। সব কিচ্ছুরই সীমা আছে! নয় বছরের মেয়েটাকে এমন সন্দেহ—অবিশ্বাসের মধ্যে টানিয়া না আনিলে কি ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইত! আজ একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ছাড়িবে সুনীল। কিন্তু ঠাকুরদা মাঝে পড়িয়া সকল দিক বাঁচাইয়া দিলেন। মন্দাকিনী একবার পুত্রের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। বাবলু কি ভাবিয়া ঠাকুরদার কোল ছাড়িয়া আসিয়া দাদার কোল জুড়িয়া বসিল।

ব্রজনাথ বলিতে লাগিলেন, "বৌমা তো ভেবে ভেবে অস্থির। সারা বিকেলটা কোথায় ছিলি এতক্ষণ?"

সুনীল রাগ করিয়া কহিল, "তোমাদের হয়েছে কী বলো দিকিনি? আমি কি কচি খোকা, দু দণ্ড চোখের আড়াল হলেই অস্থির কাণ্ড।"

ব্রজনাথ সামনের একটা পিঁড়ি দেখাইয়া কহিলেন, "উঠে বস—মাটিতে বসিস নে। তোর সঙ্গে যে আমার অনেক কথা আছে। ছুটির দিনও তো ফুরিয়ে এল।" তার পর একটু কাশিয়া লইয়া কহিলেন, "কাল-পরশু সেই মেয়েটি একবার দেখে আয়। আজ তারা লোক পাঠিয়েছিল।"

সুনীল চুপ করিয়া আছে।

ব্রজনাথ হাসিয়া কহিলেন, "জবাব দিচ্ছিস না যে? এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলি। বৌমা কোথায় গেলো? এবার বলো সেই কথা।"

মন্দাকিনী সাড়া দিলেন না। রান্নাঘরের দুয়ার থেকে নীলু ডাকিয়া কহিল, "দাদা, তুমি এ-বেলা কী খাবে?"

ব্রজনাথ প্রসঙ্গটা তুলিতে যাইবেন, নীলু আবার সুধাইল, "তোমার একটু চা করে দেবে?"

"না"

মন্দাকিনী প্রদীপ লইয়া তুলসীতলায় চলিয়াছেন। ব্রজনাথ ডাকিলেন, "কি গো বৌমা, বাদল তবে মঙ্গলবার দিন মেয়ে দেখতে যাবে—কাল তাদের এ-কথাই বলে পাঠাই?"

"আমি তার কী জানি!"

"তুমি জান না মানে?"

"আজকাল তো আর বাপমার ইচ্ছেয় বিয়ে হয় না" বলিয়া মন্দাকিনী হাতের আড়ালে প্রকম্পিত প্রদীপের শিখা বাঁচাইয়া তুলসী তলার দিকে চলিলেন।

নীলু শাঁক ফুঁকিল। বাবলু দাদার কোল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গেল ঘণ্টা বাজাইতে। দত্ত বাড়ীও সন্ধ্যারতির ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসের মতো এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মন্দাকিনী তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিলেন। মিনিট দুই স্থির হইয়া দেবতার উদ্দেশে আজ পুত্রেরই মঙ্গল কামনা করিলেন বুঝি শঙ্কিত মনে।

মন্দাকিনী তুলসীতলা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মা অন্ধকারে একবার পুত্রের মুখের দিক তাকাইলেন। তারপর উঠিয়া গেলেন ঘরের মধ্যে। সুনীল ঠায় বসিয়া আছে তেমনি নিশ্চল গম্ভীর।

খানিক বাদে কানে আসিল, চাপা গলায় মন্দাকিনী শ্বশুরকে বলিতেছেন, "বাবা, ওকে ঘরে আসতে বলুন।"

ব্রজনাথ ডাকিলেন, "উঠে আয় বাদল। বাইরে বসে কেন?—তুই তো বৌ আনতে আর এক্ষুনি যাচ্ছিস না রে দাদু। অত ভাবনা কিসের?"

"উঠে এস দাদা, বাইরে থেকো না," ঠাকুরদার অনুকরণে পাকামি করিয়া বাবলু বারান্দায় দাদার কাছে ছুটিয়া আসিল। সুনীল ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে ঘরে আসে।

দাদার কোলে বাবলুকে দেখিয়া নীলু গিয়া ঠাকুরদাদার কোল জুড়িয়া বসিল। মন্দাকিনী প্রদীপ জ্বালিয়া বিছানার একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। দাদার কোলে ছোট ভাই আবার পূর্ব্বপ্রসঙ্গ তুলিল। তার শিশুসুলভ সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করে, "দাদা তুমি কবে বিয়ে করবে?"

"হুঁ"

"কবে ?"

"আজ"

"কাকে ?"

"ঐ আলমারীটাকে।"

"দুর বোকা! আলমালীকে বুঝি কেউ বিয়ে করে।—তুমি অনুদিকে বিয়ে করতে চাও, না ?"

সুনীল তার মুখের দিক তাকাইল সবিস্ময়ে। এ-কথা শিশু পাইল কোথায় ? দাদাকে নীরব দেখিয়া ভাইয়ের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। কহিল, "হ্যাঁ, তুমি অনুদিকে বিয়ে করবে।—মানা-বৌ মাকে বলছিল।"

মানদাকে নীলু ও বাবলু মানা-বৌ বলিয়া ডাকে। সুনীল বেশ বুঝিতে পারিল, মা ও মানদার গোপন আলোচনার মাঝখানে ছয় বৎসরের শিশু উপস্থিত ছিল। সকল কথার মধ্যে এই সামান্য কথাটি সে বুঝিয়া মনে রাখিয়াছে।

"বলো দাদা, তুমি অনুদিকে বিয়ে—"

ঠাকুরদার কোলে নীলু ভাইয়ের কথা বন্ধ করিবার জন্য তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "এই—ই—ই।" নীলু নয় বছরের মেয়ে। অনেক কিছু না বুঝিয়াও একটু আধটু ধরিবার ছুঁইবার বয়স হইয়াছে তার। মা ও মানদার আলোচনায় সে-ও একজন শ্রোতা ছিল। কিন্তু তার ঘটে আজ এই বুদ্ধিটুকু জন্মিয়াছে যে দাদার অপরাধের গুপ্ত আলোচনার কথা তার কাছে প্রকাশ করা রীতিমতো অন্যায় হইবে। সুনীলের উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সারা ঘরটা যেন একবার প্রচণ্ড ঘুরপাক খাইয়া লয়!

কেবল ঠাকুরদাদা হাসিয়া কহিলেন, "দুর বোকা! তোর দাদা অন্য বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করতে যাবে কোন্ দুখ্‌খে বল। তার কনে তো এই আমারি কোলে।" ঠাকুরদাদার কোলে নয় বছরের আদুরে নাতনী তাকে চিমটি কাটিয়া আনুনাসিক প্রতিবাদ জানাইল—উঁ-হোঁ।

"বেশ তো, দাদাকে যদি পছন্দ না হয়, আমি তো রয়েছি।" ব্রজনাথের রসিকতা আজ আর কেহ উপভোগ করিল না। মন্দাকিনী নির্ব্বাক। নির্ব্বাক সুনীল। শুধু বাবলু দাদার গলা জড়াইয়া আর একবার রাঙা টুকটুকে বৌ আনিবার বায়না ধরে।

মন্দাকিনী মনে মনে এবার শঙ্কিত হইয়া ওঠেন। রাগ দেখাইয়া কাজটা ভাল করেন নাই। ছেলের সঙ্গে এখন মিষ্টি ব্যবহার করিয়া চলিতে হইবে। নহিলে এই তিন-চার মাইল হাঁটিয়া এত সব ব্যবস্থার সবই হইবে পণ্ডশ্রম। চক্কোত্তি মশায় বার বার বলিয়া দিয়াছেন, আজই ছেলের বিছানার তলায় সিঁদুরমাখানো মন্ত্রপূত বেলপাতাটি যেন উপুড় করিয়া রাখা হয়—এক রাত্রি ঘুমাইয়া উঠিলেই, ব্যস!

বাড়ী ফিরিয়া এই কাজটা মন্দাকিনী সর্ব্বপ্রথম সারিয়া রাখিয়াছেন। সুনীলের বিছানায় তোষকের তলায়—মাথার কাছে, বালিসের ঠিক নীচে—বেচারা নির্জ্জীব বেলপাতা এখন যথারীতি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আসল কাজটা যে এখনো বাকী। এ তো গেল অণিমার মার প্রভাব কাটানো। অণিমার উপর আকর্ষণ নষ্ট করিবার মাদুলিটা মঙ্গলবার পরাইবার দিন। সামনের মঙ্গলবার ছেলে তো এতক্ষণে কলিকাতায়। সুতরাং আজ এই মঙ্গলবার সারা দুনিয়ায় মহাপ্রলয় ঘটিলেও যেমন করিয়াই হউক 'খোকার' হাতে মাদুলিটা বাঁধিয়া দিতেই হইবে।

সারা রাস্তায় মন্দাকিনী ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, বাড়ী ফিরিয়াই ছেলের সঙ্গে হাসিয়া কথা কহিবেন—যেন কিচ্ছুই হয় নাই, কিছুই জানেন না, এতটুক সন্দেহ করে নাই কেহ। তাহা হইলে আজকালকার অবিশ্বাসী ছেলেকে অনুনয় করিয়া হাতে ধরিয়া মাথার দিব্বি দিয়া মাদুলি একটা পরাইতে দিতে পারিবেনই। কিন্তু বাড়ী আসিয়া যে-ই শুনিলেন 'খোকা' বাড়ী নাই, তারপর নীলুর মুখে জানিলেন, বহুক্ষণ সে (হয় তো সারাদিনই) অণিমাদের বাড়ীতেই কাটাইয়াছে, সেই যে তাঁর মেজাজ বিগড়াইয়াছে আর হুঁস হইল এতক্ষণে। রাগিয়া ব্যাপারটা মাটি করিবেন না কি শেষকালে ? রাগ করিবার দিন পড়িয়া আছে অনেক। এখন ছলে বলে কৌশলে যা করিয়াই হউক, ছেলের হাতে মন্ত্রপড়া মাদুলীটা পরাইয়া দেওয়া চাই।

কিন্তু কি দিয়া কথা আরম্ভ করিবেন মন্দাকিনী ভাবিয়া পান না। সুনীল চুপচাপ বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। আর তার ঠাকুরদা বিবাহের কথা, সংসারের কথা—কত কাজ-অকাজের কথা বলিয়াই চলিয়াছেন। অন্যমনস্ক নাতী যে সে-সব শুনিয়াও শুনিতেছে না সে-কথা শুধু মন্দাকিনীই টের পান।

খানিক বাদে ব্রজনাথ বার-বাড়ী চলিয়া যাইতেই ভরসা

পাইয়া মন্দাকিনী এবার ছেলের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়ান। সুনীল গুম হইয়া আছে—সুযোগ পাইলেই এখন ফাটিয়া পড়িবে।

"খোকা!"

ছেলের দিক হইতে কোন সাড়া শব্দ নাই।

"খোকা, আমার একটা কথা রাখবি ?"

নীলু আর বাবলু আসিয়া অদূরে দাঁড়ায়।

"খোকা"

"কী বলো ?"—জবাবটা গুরুগম্ভীর।

"আমি কাল রাত্তিরে একটা খারাপ স্বপন দেখেছি—তোকে নিয়ে," মন্দাকিনী অকারণেই একবার ঢোক গিলিয়া লইলেন, "সারা বছর থাকিস্ দূরে সেই বিভূঁই বিদেশে, আমার বুক কাঁপে রাতদিন। বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি রে। মা দুগ্‌গার কৃপায়—"

মন্দাকিনী ছেলের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু থামেন। কিন্তু হাল ছাড়িলে চলিবে না। এতটা অগ্রসর হইয়া এইটুকু শক্ত কাজের জন্য পিছপাও দিবার পাত্রী তিনি নন। ছেলের কাছে মার অত ভয় কিসের! সস্নেহে ছেলের একখানি হাত ধরিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মীটি, অমান্যি করিস নি। তোরা আজকালকার ছেলে, ও-সব না মানতে পারিস, আমি তো বিশ্বেস করি। আমায় নিশ্চিন্তি করবার জন্যে দুদিন এটা পর। পরে না হয় কলকাতা গিয়ে ফেলে দিস্, আমি আর দেখতে যাব না। আজ আমার অনুরোধটা ফেলিস্ নে—আমার মাথার দিব্বি—"

কি পরিতে হইবে? কিসের অনুরোধ? সারাদিন মুখ বন্ধ করিয়া হঠাৎ এই ব্যাকুল প্রার্থনা কিসের জন্য? মার বিরক্তিকর ভূমিকায় উত্যক্ত হইয়া ছেলে তাঁর মুখের দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু চোখে। তাহার রুক্ষ দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াই বড় আশায় মন্দাকিনী ফস্ করিয়া কথাটা পাড়িয়া বসিলেন, "এই মাদুলিটা তোকে পরতে হবে। আমি কাল রাত্তিরে—"

"আমি এসব তুকতাক্ মানি না তা জানো ?"

"আমি তো মানি।"

"তা হলে নিজের হাতে বেঁধে রাখো।"—কাটাকাটা কথা।

মন্দাকিনী কণ্ঠস্বরে করুণ আবেদন মাখাইয়া লইলেন, "আমি তোর মা। দুদিন আমার একটা অনুরোধ রাখলে তোর কোন ক্ষেতি হবে না রে। লক্ষ্মীটি! আমার মাথা খা।—এই মাদুলিটা—"

"কিসের মাদুলি এটা ?"—উত্তেজিত কণ্ঠে সুনীল প্রশ্ন করে।

"তামার"

"সোনার যে নয় তা দেখতেই পাচ্ছি। কিসের জন্যে এ মাদুলি পরাতে এসেছ তাই জিগ্‌গেস করছি।"

মন্দাকিনী জোর করিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিলেন, "ছেলের কথা শোন। এতক্ষণ তোকে বললাম তবে কী! কাল রাত্তিরে তোকে নিয়ে একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখেছি।"

"কী স্বপ্ন ?"

"ও-সব খারাপ স্বপন বলতে নেই।"

সুনীল ফোঁস করিয়া ওঠে, "ও সব বাঁকা কথা ছাড়ো। তোমার মনের কথা আমি টের পাই নি ভেবেছ ?"

"কী আমার মনের কথা তুই টের পেলি ?" মন্দাকিনীও এবার একটু উত্তেজিতভাবে চৌকির উপর হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। পুত্রের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "তোর ভালমন্দ ভাববার অধিকারটুকুও আমার নেই!—এমনি কপাল নিয়েই তোকে পেটে ধরেছিলাম!"

"আমার ভালমন্দ তোমায় ভাবতে হবে না—" বলিয়া সুনীল বিছানার উপর হইতে সুতা-বাঁধা মাদুলিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল মেঝের উপর। খটাস্ করিয়া একটা শব্দ হয় লক্ষ্মীর আসনের জলচৌকিটায়।

মন্দাকিনী কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ফাটিয়া পড়িলেন দারুণ আক্রোশে। কণ্ঠস্বর কয়েক পরদা চড়াইয়া দিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভালমন্দ ভাবার লোক আজ পেয়েছিস কিনা—তাই মা বেটি আর এখন কে তোর! সারাদিন তো সেই ভালোদের কাছেই পড়ে থাকিস্। তোর তো আর ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই। আছে কতকগুলো দাসীবাঁদী, দয়া করে দুটো খেতে দিস্ তাই খায়।"

"ও-সব প্যাঁচানো কথা ছাড়ো, বলছি। সোজা করে বলো, কী তোমার কথা।"

রাগে দুঃখে মন্দাকিনীর মুখ দিয়া কথাগুলি আর বাহির হইতে চায় না। শুধু সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপে।

"আমি বাড়ী থেকে চলে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচো। বেশ তো কালই আমি—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মন্দাকিনী আহত ফণিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিলেন, "মা ভাই বোনেদের জন্যে তো আর বাড়ী আসিস নি। এসেছিস যাদের কাছে, যা না সেখানে। অণিমার আঁচল ধরে বসে থাকুগে। আমরা তোর কে?"

মার এই জাতীয় কুশ্রী ইঙ্গিতের জন্য সুনীল অপ্রস্তুত ছিল না। তবু মা যে এতখানি মাত্রা ছাড়াইবেন তাহা ভাবে নাই। পাল্টা জবাবে ছেলেও স্থান কাল পাত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া বসিল, "তুমি বড় ইতর হয়ে গেছ।—ভদ্রঘরের মেয়ের মতো কথা বলো।"

"কী!!!—আমি ইতর!" মন্দাকিনী একটা বোমার মত ফাটিয়া পড়েন, "আর ভদ্দলোক হচ্ছে অনু আর অনুর মা?"

"চেঁচিও না।—এটা ভদ্রলোকের পাড়া।"

"চেঁচাব না?—এক শ' বার চেঁচাব। তোকে পেটে ধরলাম আমি, আর আজ তোর আপন হ'ল অনুরা!" মন্দাকিনা এবার গর্জ্জনের সঙ্গে বর্ষণ সুরু করিলেন। তাঁর ক্রন্দন শুনিয়া ও-ঘর হইতে বৃদ্ধ ব্রজনাথ আসিয়া হাজির।

"এ কি বৌমা!—ব্যাপার কী রে বাদল?"

নীলু আর বাবলু এককোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে কেমন এক ভয়ে-ভয়ে। মন্দাকিনী জবাব দিবেন কি—কাঁদিয়া কাটিয়া কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করিয়া চলিয়াছেন।

"কী হয়েছে বাদল?"—ব্রজনাথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করেন। তিনি কানে একটু কম শোনেন আজকাল। নহিলে ওঘর হইতেই সব কথা শুনিতে পাইতেন।

"কিচ্ছু হয় নি ঠাকুরদা। তুমি ওঘরে যাও।—কথা শোন। তুমি এর মধ্যে এসো না। ওঘরে যাও, আমি তোমায় পরে সব কথা বুঝিয়ে বলব।"

"কী হচ্ছে এ-সব?"

"বলব'খন। যাও—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যাও! তুমি এখন যাও ঠাকুরদা"—সুনীল বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন। মন্দাকিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটা কাটা ভাষায় অণিমাদের চৌদ্দ পুরুষের কোষ্ঠী কাটিয়া চলিয়াছেন।

ব্রজনাথ হতভম্বের মত খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক পা দু পা করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

সুনীল আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। নীলু আর বাবলু দুজনে এবার মার কোল ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে। মন্দাকিনীর মরা-কান্না আর থামে না—"সুলতার মনে এত বিষও ছিল গো!—ছেলেকে আমার জো করেছে গো!"

"তুমি এ-সব বলছ কী পাগলের মতো!" সুনীলের রাগ পড়িয়া গিয়া এখন ভয় দেখা দিয়াছে। কান্নাকাটি শুনিয়া পাড়ার লোক আসিয়া পড়িলেই কেলেঙ্কারীর বাকীটুকু সুসমাপ্ত হয়। এবার কণ্ঠস্বর যথাশক্তি নরম করিয়া কহিল, "দশ বছরের মেয়েটা সামনে, সে কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছ!—এ-সব বলছ কী তুমি! ঢের হয়েছে। এবার থামো।"

"কার ভয়ে থামব?—দু'টি খেতে দিস্, সেই ভয় দেখাস কাকে? আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ধান ভেনে খাব, দশ দুয়ারে মেগে খাব। তা-ও না জোটে, পদ্মা নদী আছে—ছেলেমেয়ের দুটোর হাত ধরে তোকে নিষ্কৃতি দিয়ে যাব। কী এমন ভয় দেখাস তুই?—" মন্দাকিনী ফুঁসিয়া রুষিয়া কাঁদিয়াই চলিলেন।

"ওঠ মা"—নীলু ভূলুণ্ঠিত জননীকে মাটি হইতে উঠাইবার চেষ্টা করে।

"মা ওঠ তুমি, ওঠ"—বাবলু কাঁদিতে থাকে।

মন্দাকিনী নীলুকে হাত ঝামটা দিয়া সরাইয়া কহিলেন, "আমি যদি তোর মা হয়ে থাকি, ভগবান যদি মিথ্যে না হয়—অনুর ভাল হবে না, হাতে হাতে ফল পাবে। সুলতার বুক যেন আমার মতোই খাঁ খাঁ করে রাত দিন। মুখপুড়ী হারামজাদী!"

সুনীল নিরুপায়। এরূপ অবস্থায় কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। রাগের মাথায় নিজের মাকে যে-ভাষায় আঘাত করিয়াছে তাহা ভদ্রলোকের মুখে মানায় না। কথার পৃষ্ঠে কথা গড়াইয়া কি কথার অর্থ যে কি হইয়া দাঁড়ায়! ছি-ছি!

সুনীল বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত ব্যাপারটা এক

অপরিসীম কদর্য্যতা লইয়া তার সারা মনে বিষের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কি বিশ্রী মুখ মা'র! স্নেহ অন্ধ, এ-কথা সে বোঝে। ক্রোধ সময় সময় শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া যায়, একথাও সে মানে। কিন্তু এ কি কুৎসীত মনোভাব! অথচ সে তারই মা! মাতৃস্নেহ শুধু অন্ধই নয়, তা বোবা।—সে একেবারে খোঁড়া! মাতৃস্নেহের সারা অঙ্গে পক্ষাঘাত। নিজেকে লইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়। আপন অধিকারের গণ্ডীর বাহিরে সে অচল, অসহ্য, অনড়। আতিশয্যের অহঙ্কারে এতটুকু দিতে বা সহিতে একেবারেই সম্পূর্ণ অক্ষম! মাতৃস্নেহ যেন সুনীলের মতই নিরুপায়, তারই মত অসহায়।

"মা তুমি কেঁদো না আর"

নীলুর সহৃদয় কণ্ঠস্বর।

খানিক বাদে সমব্যথিত বাবলু ডাকে, "মা, তোমার পায়ে পড়ি—ওঠ এবার।"

সুনীলের কানে কথাগুলি যেন তীরের মত বিঁধিয়া যায়। মা, মেয়ে আর ছেলে তিন জন মিলিয়া যেন সুনীলের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ দাঁড়াইয়াছে। যেন এই বাড়ীতে শরিকানা বিরোধ সুরু হইল—অন্ততঃ এই একটি সন্ধ্যার জন্য। সুনীল যেন কেহ নয়। খানিক আগের অমন স্নেহকাতর ভাইটির এখন আলাদা রূপ। দশ বছরের ছোট বোনটি দাদার দিকে কেমন সলজ্জ সত্রাস দৃষ্টিতে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া নেয়। এই সংসারের মধ্যে যেন ভাগ-বাটোয়ারার মামলা রুজু হইয়াছে চমৎকার! কিন্তু নীলু আর বাবলুও যে একদিন বড় হইবে! তবে মাতৃস্নেহের এই স্পর্দ্ধিত ঐশ্বর্য্যের উপর নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া লাভ কি?—তাহাতে পৌরুষ কোথায়? প্রতিঘাতের ফলে মূল শিকড়ে টান পড়ে যদি, তবে ক্ষতিটা কি শুধু মন্দাকিনীরই? সুনীল শক্ত করিয়া বারান্দার একটা খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বহুক্ষণ।

মন্দাকিনীর গর্জন বর্ষণের পর্ব্ব শেষ হইয়াছে। এবার রুদ্ধ-অভিমানে বিছানা লইলেন। বাবলুও সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় মার কোলের কাছে শুইয়া পড়িয়াছে। কি যেন সে বলিতে চায়। অকারণেই দাদার উপর তার অবোধ্য অভিমান। নীলুও মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া ভাবিতেছে খণ্ড-প্রলয়ের কথাটাই। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে সকল অস্পষ্ট কথার মধ্যে এই একটা কথাই বেশ স্পষ্ট বুঝিয়া লইয়াছে—অনুদি আর দাদার সঙ্গে কেমন যেন একটা কি ঘটিয়াছে যার জন্য মা অমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত ব্যথা পাইয়াই না মাটির উপর বার বার মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

সুনীল আরও খানিকক্ষণ বাহিরে থাকিয়া আবার ঘরে আসিল। ছি-ছি-ছি! মাকে সে ইতর বলিল কোন মুখে?

মানদা বাড়ী ছিল না। পাড়া বেড়াইয়া এই মাত্র ঘরে ঢুকিল। তাকে দেখিয়া সুনীলের সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিতে থাকে। সে-ই যত অনিষ্টের গোড়া। কালই সে যাবার আগে ঠাকুরদাকে বলিয়া যাইবে—মানদা যেন এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর কোনদিন না ঢোকে।

মানদা মন্দাকিনীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া আন্দাজে সব বুঝিয়া লইল। তারপর রান্নাঘরের পিছনে কল্যকার কয়লা ভাঙ্গিয়া রাখিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই ধরিয়া বিছানায় শুইয়া অন্ধকারে সুনীল কেবল এপাশ ওপাশ করে। ঘুম নাই চোখে। সারাদিনটা কেবলি ঘুরপাক খায় মনের মধ্যে। ঠাকুরদাকে সুনীল যাহা বুঝাইয়াছে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া মন্দাকিনী বুঝাইয়াছেন তার উল্টা কথা। আর এক পালা কুরুক্ষেত্র বাধিতে পারে নাই শুধু ঠাকুরদার মধ্যস্থতায়। জানাজানি হইয়া গেল। ঠাকুরদাও বুঝিল সব। কি কথা? সব কথা তো কাহারো জানিবার কথা নয়। অণিমাকে যে আজ সে চুমু খাইয়াছে এমন ঘটনা ঠাকুরদাও অনুমান করিতে পারেন না, মাও বুঝি অতদুর অগ্রসর হইতে রাজী নহেন। তাই যদি হয়, তবে মার এই প্রবল প্রতিরোধে আপত্তি জানাইবে এমন মনের জোর কোথায় সুনীলের? মার এই উগ্রমূর্ত্তির পিছনে কি এতটুকু সমর্থন নাই? তাঁর সন্দেহের মূলে কি কোন সত্যই নাই? আর সত্য যদি থাকেই, সুনীলের স্বীকার করিতে এত দ্বিধা কেন? অণিমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত কিনা ঠাকুরদার এমন সরাসরি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে সুনীল পারিল না কেন? সুনীল কেন এই আসল কথাটাই এড়াইতে চাহিয়াছে প্রাণপণে? তবে অণিমাকে লইয়া তাহার উদ্দেশ্য কি?

না, অণিমাকে সে বিবাহ করিবে। ঠাকুরদাদা জানুক, নাতি তাহার পরিণামজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল যুবক নয়। সার'

গ্রামে তিলকে তাল হইতে দিয়া শেষকালে এক দরিদ্র অনূঢ়া মেয়েকে সে বুঝি বিপদে ফেলিবে! সব দিক বজায় রাখিবে সুনীল। মার অত অহঙ্কার ভাঙ্গিয়া দিবে। অত দাপট কিসের জন্য ?

মনে মনে নানা প্রশ্নের জবাব বকিয়া, নানা সমস্যার সমাধান করিয়া, নিজের প্রতিটি কার্য্যের সমর্থন গাহিয়া সুনীল যখন ঘুমাইয়া পড়িল তখন গভীর রাত্রি।

পরদিন ভোর বেলা। ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানার উপর শুইয়া থাকিয়াই সুনীল টের পায়, তাহার বাঁ হাতের কনুইএর উপর সেই মাদুলিটা বাঁধা। কাল রাত্রে কখন যে মন্দাকিনী নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া সন্তর্পণে তাহার কাজ হাসিল করিয়া গিয়াছেন তাহা ত্রিভুবনে কাহারো জানিবার কথা নয়। যাক্, মঙ্গলবারের রাত্রিটা মন্দাকিনী কিছুতেই পার হইতে দেন নাই।

ক্রমশঃ

অপরাধিনী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

চূড়ীগুলো মোর ভেঙে গেল দিদি—অমন রেস্‌মী চূড়ী !
মেলা হ'তে সবে এই তো সেদিন এনেছে বাজার ঢুঁড়ি'।
বলে তো—আমার রঙের মানান এই একই জোড়া ছিল,
বড় সাধে তাই, দশগাছা করে' দু'হাতে পরায়ে দিল !
—পাগল না দিদি ? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে আর হাসে চেয়ে ;
কি করি বলো তো ? আমিও যে হাসি লজ্জার মাথা খেয়ে !

যাবার সময় বলে' গেছে ভাই, ফিরে' এলে ফের প'রো,
একটু ঢল্‌কো—দু'দিনে যাবে তা'—শরীরে যতন ক'রো।
খাই-দাই আর ঘুরি-ফিরি সেই মনের কথাটা চেপে,
চেয়ে দেখি—হাতে লাগিল কি মাস, বসিবে তো ভাল কেঁপে !
হাত দু'টো দেখে' তারই কথাটাই মনে পড়ে দিন রাত—
ভাত না নামিতে পাত পেতে বসি—এমনই তো
ভাই, জাত !

জানিস তো তুই, কালকে পাড়ায় বারুই-বাড়ীর বিয়ে—
সাতবার করে' বলে' গেছে তারা, উপায় আছে না-গিয়ে ?
চূড়ীগুলো, ভাবি, একবার পরি—গাঁ ঝেঁটিয়ে আসে লোক—
পড়্‌বি তো পড়্ চূড়ীরই উপরে পড়িল পাড়ার চোখ !
—ওমা দেখি, দেখি, খাসা জৌলুস্ ! নতুন দিল কি কিনে' ?
আমাদের এঁরা !—এমন নজর ! কি যে ছাই আনে কিনে' !

ফিরিবার পথে সেই কথাগুলো মন করে তোলপাড় !
মনে ছিল নাকি—কাদায় পিছল পোড়া পুকুরের পাড় ?
আছাড় সাম্‌লে' তাড়াতাড়ি উঠে' গোড়াতেই দেখি, ভাই,
গোছ-ভরা চূড়ী—সব চুরমার, একটা আস্ত নাই !
চূড়ী তো ভাঙেনি—কপাল ভেঙেছে ; উপায়
কি আছে তার ?
যে মানুষ, ভাই, ভেবে মরি তাই—পরশু যে শনিবার !

অত্যাশ্চর্য্য জলের খেলা

যাদুকর পি, সি, সরকার

অত্যাশ্চর্য্য জলের খেলাটি বাস্তবিকই একটি চমকপ্রদ খেলা। অথচ ইহার কৌশল অতিশয় সহজ। আমি জীবনে বহুবার এই খেলাটি দেখাইয়াছি—এবং সর্ব্বদাই ইহা খুব আদৃত হইয়াছে। চিত্রে দেখান হইয়াছে যে যাদুকর এক জাগ ভর্ত্তি জল এবং একটি খালি কাঁচের গ্লাস লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন। কাঁচের গ্লাসটি দর্শকগণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দিবার পর উহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া হইল। এইবার জলপূর্ণ গ্লাসটির মুখের উপর সাধারণ একখণ্ড সাদা কাগজ বসাইয়া দেওয়া হইল। তারপর ঐ কাগজসহ জলের গ্লাসটি উপুড় করিয়া ধরা হইল। কি আশ্চর্য্য, গ্লাস হইতে একবিন্দু জলও মাটীতে পড়িল না! ইহা দেখিয়া দর্শকগণ খুব বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পর্য্যন্তই শেষ নহে। যাদুকর হঠাৎ সেই উপুড়-করা গ্লাসের মুখ হইতে কাগজ খণ্ডটি টানিয়া লইয়া যাইবেন—কি আশ্চর্য্য, গ্লাস হইতে জল তখনও পড়িবে না। ইহা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী বিস্মিত হইয়া এই খেলার দিকে তাকাইয়া থাকিবেন। এইবার খেলাটির কৌশল প্রকাশ করা যাইতেছে। সমস্ত বড় বড় এবং ভাল খেলার ন্যায় ইহার মূলকৌশলও অতিশয় সাধারণ। জলের গ্লাসের মুখের খাপমত একখণ্ড শক্ত সেলুলয়েড অথবা অভ্রের গোলাকৃতি টুকরা দ্বারাই ইহা সাধিত হইয়াছে। জলের গ্লাসটির মুখ খুবই সমান হওয়া চাই। উহা বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। সেলুলয়েডের টুকরাটি টেবিলের উপরিস্থিত সাদা কাগজের নীচে লুকাইয়া রাখিতে হয় এবং কাগজচাপা দেওয়ার সময় প্রথমে ঐ অভ্র (mica) ও তাহার উপরে ঐ কাগজ বসাইয়া দিতে হয়। কাগজে দুই এক বিন্দু জল দেওয়া থাকিলে অভ্রখণ্ড অনায়াসে কাগজের সঙ্গে আটকাইয়া থাকিবে।

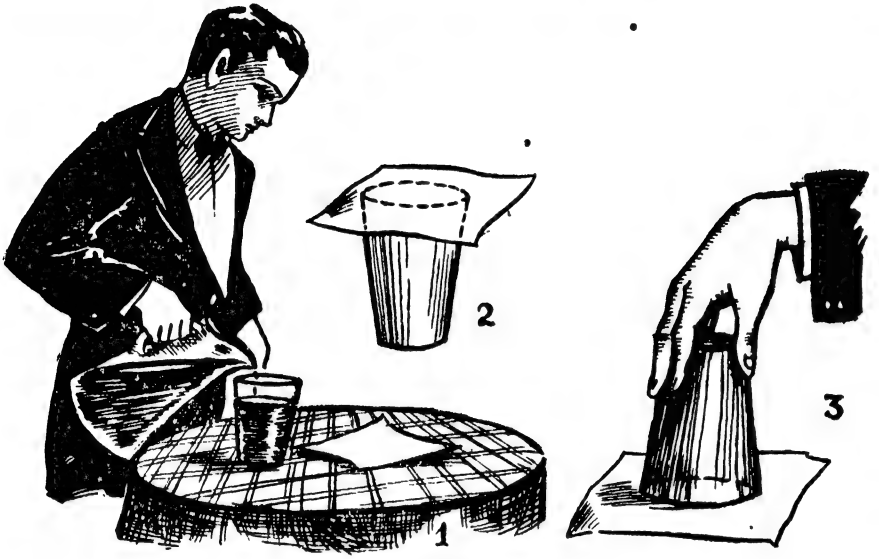

প্রথম চিত্র

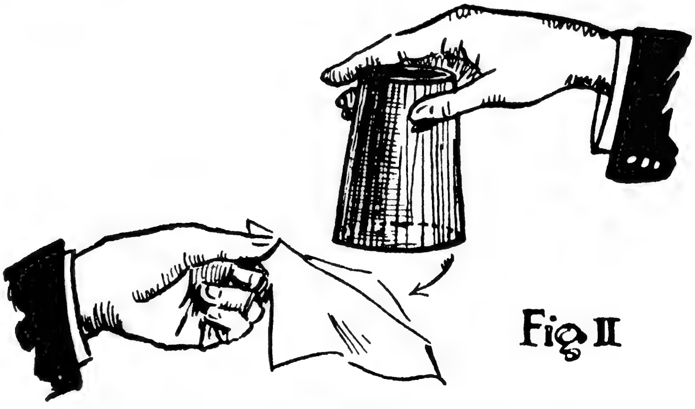

Fig II

দ্বিতীয় চিত্র

এইবারে যখন প্রথমে উপুড় করা যাইবে তখন ঐ অভ্র খণ্ডের জন্য জল মাটীতে পড়িবে না। আর ঐ অভ্র খণ্ডে

দুই-এক বিন্দু জল থাকাতে নীচের কাগজটি তাঁহার সহিত আটকাইয়া থাকিবে। এক্ষণে যাদুকর কৌশলে নীচের কাগজটি টানিয়া লইবেন। কাগজ চলিয়া গেলেও (দ্বিতীয় চিত্রের ন্যায়) উপুড় করা জলের গ্লাস হইতে জল একটুকুও নীচে পড়িবে না। অভ্র বা সেলুলয়েড খণ্ড স্বচ্ছ-কাজেই জলের মধ্যে উহার অস্তিত্ব বুঝাতে পারা দুষ্কর—ইহাতে খেলাটি আরও চমকপ্রদ মনে হয়। তবে প্রথমে জলের গ্লাস উপুড় করিতে খুব সাবধান হইতে হয়। হাতের দ্বারা মুখ চাপিয়া ধরিয়া আস্তে উপুড় করিতে হয়, নতুবা সমস্ত জিনিষ প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। বর্ত্তমানে খেলাটির আরও উন্নতি হইয়াছে। আমেরিকায় প্রসিদ্ধ যাদুকর হাওয়ার্ড থ্রাস্টন বলেন যে :—

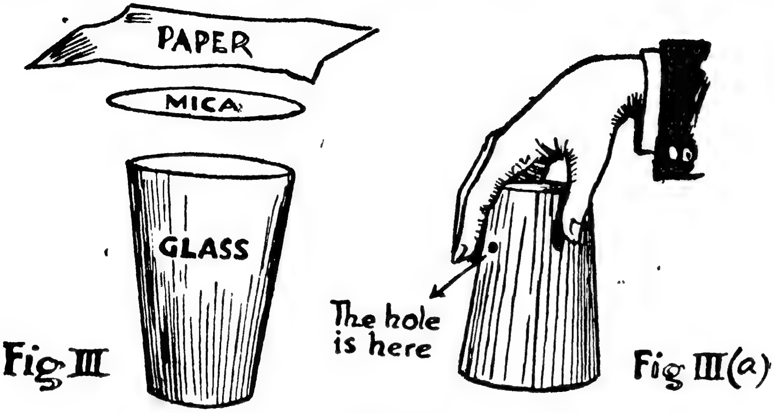

তৃতীয় চিত্র

“এই খেলাটির জন্য জলের গ্লাসটি বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া লইলে খেলাটি আরও সুন্দরভাবে দেখান যাইতে পারে। গ্লাসের তলার দিকে একটি ছিদ্র করাইয়া লইয়া সেটিকে আঙ্গুলদ্বারা চাপিয়া ধরিতে হয়। তৃতীয় চিত্রে এই ছিদ্রটি দেখান হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে খেলাটি দেখাইয়া অবশেষে এই জলপূর্ণ (উপুড়-করা) কাঁচের গ্লাসটি অপর একটি জলপূর্ণ গামলা, টবা বা বালতীর উপর লইয়া গিয়া আস্তে ঐ ছিদ্রপথের উপরিস্থিত আঙ্গুলটি সরাইয়া লইলেই ভিতরকার জল ও অভ্র নীচের ঐ জলে পড়িয়া মিশিয়া যাইবে।” ইহা বাস্তবিকই অতিশয় সুন্দর খেলা।

আমি জলের গ্লাসে ছিদ্র করিয়া খেলাটি দেখাইবার পক্ষপাতী।

পূর্ব্বাভাষ

শ্রীশান্তি মিত্র

মন্থর গতি আজকে হলো কি ত্বরা
কঙ্কালে জাগে প্রাণের আমন্ত্রণ ?
নীলাভ নদীতে চিড় খেয়ে গেছে চড়া—
ভেলায় কি হবে ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ ?

দুর্য্যোগ নামে ঘন রাত্রির বুকে,
ফুঁসিছে নাগিনী, বিষ হয়ে গেল বায়ু।
ঊর্দ্ধ আসনে দেবতারা রয় সুখে,
বুভুক্ষিতের শেষ হলো বুঝি আয়ু।

বিষাক্ত ছায়া ঢেকেছে সোনালি আলো,
মুমূর্ষু কাঁপে আহত মানবপ্রাণ
ঈশানে কি মেঘ ঘনায় নিকষ কালো—
আসে কি প্রলয় যুগসঙ্কটত্রাণ ?

চারিদিকে যেন নীরব নিথর কায়া
ঘূর্ণি বায়ুতে পূর্ণ অলক্ষণ
লক্ষ হাজার কঙ্কাল ফেলে ছায়া
কাল সমুদ্রে বিক্ষোভ আলোড়ন।

উচ্চ আসনে দেবতা সন্দিহান
শঙ্কিত হলো নিরুদ্বিগ্ন মন,
সোনার চাঁদোয়া ভাঙ্গে বুঝি খান খান
আসন্ন হলো তীক্ষ্ণ আক্রমণ।

প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কৃত শিক্ষা ও বর্ত্তমান সরকারী নীতি

কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষা-সংস্কার ও শিক্ষালয় পরিচালনা সম্বন্ধে নানারূপ পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে; বাঙ্গালীর শিক্ষার উৎকর্ষ বিধানের জন্য দেশের কল্যাণকামী নেতৃগণ ও শিক্ষাব্রতিগণ যথাসাধ্য চিন্তা ও চেষ্টা করিবেন, আমরা ইহাই আশা করি। আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধ সে সম্বন্ধে নয়। পাঠশালা-স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের পল্লীতে নগরে আরও একশ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া দেশময় বিস্তৃত হইয়া আছে, ইহা টোল বা চতুষ্পাঠীর শিক্ষা। এই টোল বা চতুষ্পাঠীগুলি বিলাসীর সখের বাগান নয়, এইগুলির পরিচালনা ও পরিদর্শনের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ইহাদের শোভাবর্দ্ধনের জন্য কোন চেষ্টা নাই। সুবিশাল বনস্পতির মত ইহার শত সহস্র মূল দেশবাসীর চিত্তভূমির মধ্যে প্রসারিত হইয়া আজও জীবন ধারণ করিয়া আছে। আকাশ হইতে বারিবর্ষণ না হইলেও ক্ষতি নাই, ভূমধ্য হইতে প্রাণশক্তি আহরণ করিয়াই ইহা এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছে এবং বাঙ্গালীর চিত্তভূমি একেবারে শুষ্ক না হইয়া গেলে ইহা মরিবে না।

জাতীয়জীবনের নানারূপ ঐতিহাসিক জটিল বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে যে সমস্ত ত্যাগী নির্লোভ মনীষী ভারতের প্রাচীন বিদ্যাকে সর্ব্বস্বপণে অতি কষ্টে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ অর্থ ও খ্যাতি উপেক্ষা করিয়া আজও সেই প্রাচীন বিদ্যার পঠন-পাঠন দ্বারা সেই পুরাতন ভাবধারা কিয়দংশে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যুগধর্ম্মের প্রভাবে ও অর্থনৈতিক নানাবিধ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সেই প্রাচীন ভাবধারা ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে; ইহার মধ্যেই উপেক্ষায়, অবহেলায়, আলোচনার অভাবে বহু শাস্ত্রের পঠন পাঠন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে শুভবুদ্ধি ও সুব্যবস্থার ফলে শাস্ত্রার্থ গুরুপরম্পরায় আলোচিত হইয়া শিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া সম্প্রদায়-ক্রমে শাখায়িত হইয়া শাস্ত্র রক্ষিত হয়, সেই শুভবুদ্ধি ও শৃঙ্খলার অভাব ঘটিয়াছিল, তাই দেখিতে পাই, যোগশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন বিদ্যার অধ্যাপনার কোনও যথাযথ ব্যবস্থা নাই। শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ আছে, নিত্য বহুতর গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু তাহার পঠন পাঠনের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সহজসাধ্য নয়। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের আবিষ্কার, গবেষণা ও পাণ্ডিত্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রহস্যময় লিপির মত আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া মৌন হইয়া আছে, তাহাদের পাঠোদ্ধার করা আমাদের অনেক সময়ও কষ্টসাধ্য, তাহাদের রহস্য নির্ণয় সহজ নয়। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আমরা ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। জাতির পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে!

গুরুপরম্পরায় ও সম্প্রদায়ক্রমে আলোচিত হইয়া প্রাচ্য বিদ্যার যে কয়টি শাখা এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাও কি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, না, এইগুলির রক্ষার জন্য আমরা কোন ব্যবস্থা করিব? ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগে একবার এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সরকারী নির্দ্ধারণে পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার জন্য রাজস্বের অধিকাংশ অর্থ ব্যয় হইবে ইহা স্থির হইলেও প্রাচ্যবিদ্যার আলোচনার উপযোগিতা আছে এই কথাও স্বীকৃত হইল। তারপর হইতে সরকারী অনুকম্পায় ও স্থানীয় সহৃদয়গণের উৎসাহে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা, প্রাচীন পদ্ধতিতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা যথাসম্ভব চলিতে লাগিল। দ্বিতল ত্রিতল সুরম্য অট্টালিকায় স্থাপিত ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাশাপাশি চতুষ্পাঠীর ক্ষুদ্র কুটীরগুলি প্রাণধারণ করিয়া রহিল। কিন্তু ক্রমশ আমাদের সমাজগঠন ও অর্থ-নৈতিক সমস্যার রূপ পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, এই যুগযুগান্তরের জ্ঞানধারার আলোচনার মত অবকাশ ও ইচ্ছা উভয়ই আমাদের জীবনে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল, ইহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম মোহে আমরা যে কিছুদিন দিক্‌ভ্রান্ত হই নাই, তাহা নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত দীর্ঘতর পরিচয়ের ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব জ্ঞানধারাকে আরও ভাল করিয়া চিনিতে শিখিয়াছি। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই আজ জানেন, জগতের সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের দান কতখানি। চিন্তাজগতের অনেক ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। এই গৌরবের নিদর্শন স্মৃতি-জ্যোতিষ-দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাক, স্বদেশহিতৈষী কোন ব্যক্তিই একথা কল্পনা করেন না। সংস্কৃত শিক্ষা যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তবে তাহার পথ কি, উপায় কি? কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে সংস্কৃত বিদ্যা রক্ষিত হইবে, কোন্ নীতির আশ্রয় লইলে ইহার অবনতি ঘটিবে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নানা বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ের কথাই বর্ত্তমানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব।

সকলেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন পদ্ধতিতে বেদ-স্মৃতি-দর্শন-ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে শিক্ষাদানের একমাত্র কেন্দ্র (যাহা সরকারী অর্থে ও তত্ত্বাবধানে চলে) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ। সম্প্রতি ১৮ই মার্চ্চের ৬১৮নং নোটিফিকেশনে একটি বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছে—তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—'সংস্কৃত কলেজে টোল বিভাগে অতঃপর যে অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন তাহাতে সংস্কৃতে এম-এ অথবা সংস্কৃতে অনার্স কোর্সে বি-এ পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তীর্থ-উপাধি পাইয়াছেন—তাঁহাদের নিয়োগ সরকার বাঞ্ছনীয় মনে করেন। স্কুল কলেজেও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়, আবার টোল চতুষ্পাঠীতেও সংস্কৃত পড়ান হয়। টোলের বিদ্যার্থিগণ প্রাচীন পদ্ধতিতে গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করেন, যে বিষয়ে যিনি পারদর্শিতা লাভ করিতে চাহেন সে বিষয়ে বহু বৎসর অনন্যচিত্ত হইয়া গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন। কলেজে আধুনিক পদ্ধতিতে যে সংস্কৃত পড়ান হয় তাহাতে বি, এ পরীক্ষায় দুই

বৎসরেরও কিছু কম সময়ের মধ্যে ইংরেজী, বাঙ্গালা, ও আরও একটি বিষয়ের সহিত সংস্কৃত কাব্য-নাটকের কয়েকখানা গ্রন্থ থাকে। অনার্স পরীক্ষায় ব্যাকরণ অলঙ্কার কিছু কিছু পড়িতে হয়। বাঙ্গালা সরকারের এই নির্দ্দেশের ফলে সংস্কৃত কলেজের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণকে অতঃপর ইংরেজী পারদর্শী হইতে হইবে। ইহাতে সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি হইবে কি না, অধ্যাপনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে কি না, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। সরকারের এই নির্দ্দেশ কার্য্যকরী হইলে অর্থাৎ সরকারের অধীনে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে যে কয়েকটি অধ্যাপকের পদ আছে তাহা হইতে প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত প্রার্থীগণকে বঞ্চিত করিলে টোলের শিক্ষার প্রতি সরকারের অনাস্থা প্রকাশ পায় না কি? টোলে যাঁহারা একটি বিষয়ের অধ্যয়নে ও আলোচনায় বহু বৎসর যাপন করিলেন তাঁহারা ইংরেজী অনভিজ্ঞ হইলেই সেই বিষয়ে অধ্যাপনার অনুপযুক্ত—বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ইহাই কি প্রমাণিত হয় না? এই অভিযোগ সত্য হউক বা না হউক, সরকারের মনোভাব এইরূপ হউক বা না হউক, এই নির্দ্ধারণের অবশ্যম্ভাবী আশু ফল এই হইবে যে, দেশের লোক বুঝিবে সরকার প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষার প্রতি আর সেরূপ শ্রদ্ধাশীল নহেন। আর্থিক দিক দিয়া ইহার সুদূরপ্রসারী ফল দেখা দিতে বিলম্ব হইবে না। যে সকল মেধাবী ছাত্র এখনও প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষালাভের জন্য আকৃষ্ট হন তাঁহারা সরকারের এই নির্দ্ধারণের ফলে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হইবেন। কিন্তু আমাদের প্রতিবাদ কেবল এই দিক দিয়া নহে। আর্থিক দিক ব্যতীতও আর একটি গুরুতর বিষয় আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাঁহারা বহু বৎসর একই বিষয়ের অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা ইংরেজী অনভিজ্ঞ হইলেই যে তাঁহারা সে বিষয় অধ্যাপনায় পারদর্শী হইবেন না এমন কোন কথা নাই—বরং ব্যাপার যে বিপরীত ইহা বলাও অত্যুক্তি হইবে না। এম-এ বা বি-এ পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নে যে পরিশ্রম প্রয়োজন ও যে চিত্তবিক্ষেপ সম্ভব, কেবল একটিমাত্র বিষয় লইয়া সে পরিশ্রম করিলে উৎকৃষ্টতর ফল লাভের আশা করা অসঙ্গত হইবে না। এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, তীর্থ উপাধি না থাকিলেও যাঁহারা বহুকাল উপযুক্ত গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারাও অধ্যাপনার অনুপযুক্ত নহেন। সেইজন্য এ বিষয়ে বি-এ বা এম-এ'র উপর প্রাধান্য দিলে সংস্কৃত চর্চ্চার হানি ঘটিবে—এ আশঙ্কা অমূলক নয়। তাছাড়া এ বিষয়ে আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। যাঁহারা কেবল সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী এবং ইংরেজী অনভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন সংস্কৃত চর্চ্চা ছাড়া তাঁহাদের কোনও উপায় নাই, কিন্তু যাঁহারা ইংরেজী পরীক্ষায় বেশি পরিশ্রম করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সুবিধা পাইলে বিষয়ান্তর গ্রহণ আশ্চর্য্য নহে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, যদি কোনও এম-এ তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার ফলে বি-সি-এস বা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করেন এবং ইহাতে তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞান তাঁহাকে সহায়তা করে তাহা হইলে তিনি কি কেবল সংস্কৃত চর্চ্চা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিবেন?

ঠিক এই প্রশ্নের আলোচনাই পূর্ব্বে একবার হইয়া গিয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৯১১ সালের জুলাই মাসে) প্রাচীনপন্থী টোলের শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণের যথার্থই কোন উপযোগিতা আছে কি-না ইহা লইয়া বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারত সরকারের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব মাননীয় মিঃ এস্, হারকোর্ট বাটলার, সি, এস, আই, সি, আই, ই মহোদয় সিমলায় একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বিদ্বদ্বৃন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সেই বৈঠকে সমবেত হইয়াছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যার উৎকর্ষের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে সমাগত সভ্যগণের মধ্যে চারি দিন ধরিয়া খোলাখুলিভাবে আলোচনা চলিয়াছিল। সেই সভায় শিক্ষাসচিব ব্যতীত মাননীয় মিঃ লুডোভিক পর্টার, ডক্টর জে, ভোগেল, পি-এইচ্-ডি, কর্নেল ডি, সি, ফিলট, ডক্টর থিব, সি, আই, ই, পি, এইচ্-ডি, ডি, এস্-সি, মিঃ ভেনিস্, ডক্টর ডি, বি, স্পুনার, পি, এইচ্, ডি, ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকার সি, আই, ই, খান বাহাদুর সাহেবজাদা আবদুল কোয়ায়েম সি, আই, ই, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা, এম, এ, ডি, লিট্, মিঃ এ, সি, উলনার, এম, এ, ডক্টর জে হোরাভিজ, পি, এইচ্-ডি, কুমার মহারাজ সিং, শামসুল উলেমা মৌলবী শিবলি নোমানি, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই, মিঃ জি, এইচ্, টিপার, ইউ সি, ডুরোসেল, শামসুল উলেমা মৌলবী কামালউদ্দিন আহাম্মদ, ডক্টর ই, ডেনিসন রস্, সেখ মহম্মদ ইস্পাহানী, মিঃ এস্ আর ভাণ্ডারকার, মিঃ জি, আর, কার, মাননীয় মিঃ এ, সার্প প্রমুখ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাচীন রীতিতে টোল চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও স্কুল কলেজে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা আধুনিক পদ্ধতিতে বিশেষভাবে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি প্রথমেই তাহা আলোচনা করিয়া প্রাচীন প্রথায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, পণ্ডিতগণকে শিক্ষা দিয়া আধুনিক করিয়া লওয়ার দরকার আছে কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

ডক্টর ভাণ্ডারকার বলেন যে, পণ্ডিতগণের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁহাদের জ্ঞানের গভীরতার সহিত আধুনিক শিক্ষিতের জ্ঞানের তুলনা চলে না। তাঁহারা একটি বিষয় বহুদিন ধরিয়া অধ্যয়ন করেন এবং আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বিদ্যার্থীকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। (১)

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস বলেন—পণ্ডিতগণের শিক্ষা টোলেই আরম্ভ হওয়া উচিত। পরে অবশ্য তাঁহাদিগকে অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষিত করা যাইতে পারে। তাঁহাদের টোলের শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহাদিগকে কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

কর্নেল ফিলটের অভিমত—প্রাচীন বিদ্যার সংরক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

---

(১) Dr. Bhandarkar urged that we should retain Pandits. They have a depth of knowledge which the modern scholar does not possess. They study one subject, go deeply into it and can give substantial help to modern scholars.

মিঃ উলনার কাশী ও লাহোর এই দুইটি শিক্ষাকেন্দ্রের তুলনা করেন। কাশীতে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার ধারা গুরুপরম্পরায় অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে, লাহোরে পণ্ডিত আমদানি করিয়া কৃত্রিমভাবে সংস্কৃত বিদ্যার প্রচলনের চেষ্টা করা হইতেছে। যেস্থলে টোলের পণ্ডিতগণ প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি, সেস্থলে সেই প্রাচীন ব্যবস্থা রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। (২)

ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা বলেন—প্রাচীন পণ্ডিতগণকে রক্ষা করিতেই হইবে। আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত যে-কোন সংস্কৃতজ্ঞ একথা স্বীকার করিবেন যে, পণ্ডিতগণের সাহায্য না পাইলে তাঁহার নিজের পক্ষে কৃতিত্ব অর্জ্জন করা সম্ভব হইত না। পণ্ডিতগণকে আধুনিক বিদ্যা শিখাইতে আপত্তি নাই, কিন্তু প্রাচীন প্রথায় রীতিমত পণ্ডিত হইয়া বাহির হইবার পর এই শিক্ষা দিতে হইবে—তাহার পূর্ব্বে নহে। ইহাতেও আশঙ্কার সম্ভাবনা আছে; আমার মনে হয়, প্রাচীন ও আধুনিক এই উভয় জাতীয় পণ্ডিত পৃথক্ রাখাই উচিত। প্রাচীন পণ্ডিতের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে; হয়ত প্রাচীন পণ্ডিত অচিরে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রাচীনকালের গুরুদের যে জ্ঞানের গভীরতা ছিল, আজকাল আর তাঁহাদের মধ্যে ততটা গভীরতা দেখা যাইতেছে না। পণ্ডিতগণকে আধুনিক করিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য। প্রাচীন প্রথার পাণ্ডিত্য যদি লোপ পায় বা পণ্ডিতগণের যদি আরও অবনতি ঘটে তবে যে সমস্ত বিদ্যার্থী আধুনিক প্রথায় গবেষণা করিতেছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে—এক একটি শাস্ত্রের নানা শাখায় কাজ করিবার জন্য তাঁহারা কাহারও সাহায্য পাইবেন না; এই প্রকার সাহায্য কেবল প্রাচীন পণ্ডিতগণই করিতে পারেন। (৩)

ডক্টর থিব বলেন—বিদ্যার উৎকর্ষ রক্ষা করিতে হইলে প্রাচীন পণ্ডিতের আবশ্যকতা আছে। টোলের শিক্ষা ঠিক ঠিক প্রাচীন পদ্ধতিতে হওয়া দরকার। পরে যদি প্রয়োজন হয় তবে পণ্ডিতগণকে কিছু কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতগণের শিক্ষা-কার্য্যে যদি আমরা অযথা হস্তক্ষেপ করি তবে পণ্ডিতগণকে আমরা হারাইব। (৪)

উক্ত সম্মেলনে নানাবিধ আলোচনার পর সাধারণ সিদ্ধান্ত এইরূপ হইয়াছিল যে, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণকে সাধারণ জ্ঞান বা ইংরেজী শিখাইবার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব তাঁহাদিগকে প্রাচীন রীতিতে শিক্ষা দিয়া কৃতবিদ্য করিতে হইবে। জোর করিয়া তাঁহাদিগকে ইংরেজীতে শিক্ষিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে, প্রাচীন রীতিতে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সাধারণ জ্ঞান, আধুনিক গবেষণা-পদ্ধতি পণ্ডিতগণকে শিখান যাইতে পারে। প্রাচীন বিদ্যার সংরক্ষণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য—বিদ্যা আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরেজী বা অন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া বিধেয় নহে। (৫)

আধুনিক প্রণালীতে তুলনামূলক পদ্ধতিতে সংস্কৃতের বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গবেষণা যাঁহারা করিবেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই। যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যার অনুরাগী তাঁহারা আজীবন সংস্কৃত বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ লইয়া গবেষণা করিতে থাকুন; তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার হইতে সম্ভবমত সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু আমরা চাই, প্রাচীন বিদ্যার সংরক্ষণ। প্রাচীন বিদ্যা সুরক্ষিত রাখিতে হইলে প্রাচীন প্রথার বিলোপ করিলে চলিবে না।

কোনও প্রতিভাশালী ছাত্রের পক্ষেও দুই-তিন বৎসরে সংস্কৃতের কোন শাস্ত্র আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সে কারণে যাঁহারা দুই-তিন বৎসরের মধ্যে বহু বিষয়ের সঙ্গে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছেন এবং সে সংস্কৃত বিদ্যাও বহু বিষয়ের, তখন তাঁহাদের ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যেই কোনও একটি শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়—একথা নিঃশঙ্কচিত্তেই বলিতে পারা যায়।

সেই কারণেই ১৯১১ সালে যে প্রাচ্যবিদ্বৎ সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনার জন্য প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণ অপরিহার্য্য—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও সরকারী নীতির এত সত্বর পরিবর্ত্তন হইল কেন বুঝা যায় না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভেনিসের সেই সময়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা সরকার ও দেশবাসিগণকে ধীর চিত্তে এই বিষয়টি চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

"Let us clearly understand what is meant by learning a Shastra under the old system. The scholar must not only understand his texts, but he must carry them about in his head, and so too the traditional interpretations and the many other things, which he learns from his Guru and which still find no place in dictionary or modern work of reference. It is hardly conceivable that any European scholar who has attempted to work first hand in any field of Sanskrit learning, should consent to the death of this system in India. Die, however, it must if our Vidyarthi is to be turned into the bilingual product of an Anglo-Vernacular school......(na to ghat ka na to ghar ka) as the proverb reminds us."

---

(২) Mr. Woolner drew a distinction between such centres as Benares and Lahore—the place where there is a tradition of ancient learning and where an attempt has been made at its artificial introduction by the importation of Pandits. The Pandits should be retained where they are a national growth.

(৩) Dr. Ganganath Jha declared the old Pandit to be indispensable. Any modern savant will admit that but for the Pandits his own achievements would have been impossible. Perhaps we might imbue the Pandits with wider knowledge of the modern kind but not till after he has become a full-fledged Pandit of the old type. Even in this, there is danger and it would be better to keep the two types separate; for the old Pandit is fast disappearing and may soon vanish. Moreover he no longer possesses the depth of knowledge of the old time guru. Our efforts should be diverted to bringing him back to the more ancient lore, not to letting him in anew groove. If he disappears or if he further deteriorates, the scholar who works on modern lines admit that he will be placed on an awkward predicament since he will no longer be supplied with the new material to work on, which the old fashioned Pandits can alone provide.

(৪) Dr. Thibaut speaking purely in the interest of scholarship said that the old type Pandit is required. He should be trained strictly on old lines. If afterwards he requires it he might then but only then have a knowledge of English added on the lines of the instructions inparted on the Anglo-Sanskrit department of the Sanskrit College, Poona. If we interfere with old Pandit we shall loose them.

(৫) The general consensus was that whatever reform may be introduced the old type Pandits should be more in their way as efficient as possible before general knowledge or the teaching of English is superimposed. In exceptional cases and after they have fully acquired the old type learning their outlook might be broadened by wider knowledge, by the study of modern languages and by critical research. Generally speaking, however, the ancient learning must be preserved and not till it has been acquired should a broader basis of knowledge be afforded.

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

২০

সত্যই 'তাহার পরদিনই তাহাদের সতীর্থা অনাবিলা আসিয়া উপস্থিত হইল—কিন্তু একেবারে একা। বহুদিন পরে সে পাঠ্যাবস্থার বান্ধবীকে দেখিয়া ভাবাধিক্যে একেবারে অস্থির হইয়া ললিতাকেও অস্থির করিয়া তুলিল। মেয়েটি সহজেই যে একটু ভাবপ্রবণা ছিল তাহা শীলা ও ললিতা জানিত।

নানাকথার পর শীলা প্রশ্ন করিল "আজ যে একেবারে একা? আমাদের ছাত্রীটি—কি নাম তার—তোর ননদ রে—সীতাও এলো না যে? আর তোমার খুকুটা? সেটাই বা কই?"

"আর ভাই তাদের কি টিকি দেখ্‌বার জো আছে—আর এই বিকেলে আসবে? গুরুদেবের সঙ্গে তারা গেছে বোটে নদী বেড়াতে। উনি গেছেন বোটের মাঝি হয়ে। বোট নিয়ে ওপারে চড়ায় গুরুদেবের সঙ্গে তারা হুটোপাটি খেলে—সেই সন্ধ্যায় ফিরবে। খুকুটা আমায় বলে গেছে—"নতুন মাসিমাকে ধরে নিয়ে এস, আমি যেন বাড়ী এসে দেখ্‌তে পাই।"

"বলিস্ কিরে—ঐটুকু মেয়েকে ছেলেমেয়েদের হুড়ে জলের ওপর পাঠিয়ে দিয়েছিস্—ধন্যি সাহস তোর।"

"ও—সে মেয়ে খুব সেয়ানা। যতক্ষণ নৌকা জলে চল্‌বে গুরুদেবের কোল্‌টি ঘেঁসে বসে থাক্‌বে—তিনি থাক্‌তে কারু অধিকার নেই গুরুদেবের কাছ ঘেঁসে যেতে। তিনিও তেমনি আদর দেন। সব ছেলেমেয়েদেরই অবশ্য তিনি সমান স্নেহ করেন। ও ডাইনি বেশী গায়ে পড়া—তাই—"

"মায়ের মতন আর কি—তাই জিতে যায়। হ্যাঁরে তোদের গুরুদেবটি তো বেশ তাহলে। এই সব ছেলেপিলের ধকল্‌ও সহ্য করেন? বুড়ো মানুষ তো? তাতে নিশ্চয় খুব টিকিধারী পণ্ডিত? কার গুরু তিনি?" অনাবিলা হাসিতে হাসিতে বলিল "আমার শ্বশুরদের, দিদিশ্বাশুড়ীর—আমাদের বাড়ী সুদ্ধর তিনি গুরুদেব।" "বলিস কি? তোর শ্বশুর দিদিশ্বাশুড়ীরও গুরু? বৃদ্ধের অধ্যাবসার তো খুব—তোদের সুদ্ধ গুরু হয়ে পড়েছেন?"

অনাবিল হাসিতেও অনাবিলার শান্তশ্রী মুখের ছবিতে অন্তরও যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে বলিল "চলনা ভাই তোমরা—গাড়ী এনেছি—খুকুটা ফিরে এসে তার মাসিদের না পেলে আমায় জ্বালিয়ে খাবে। গুরুদেবকেও দেখ্‌বে তোমরা—তিনি কত বুড় আর কেমন মানুষ!" বলিতে বলিতে যেন মনে মনে শিহরিয়া জিভ্ কাটিয়া অনাবিলা উভয় হস্ত যোড়ভাবে মাথায় ঠেকাইয়া যেন কাহার উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করিল। শীলা হাসিয়া ফেলিল "কাকে আবার পেন্নাম করছিস্' আমাদের নাকি? পায়ের ধুলো নে তবে।"

আবার উভয় হস্তে সেইভাবে মস্তক স্পর্শ করিয়া অনাবিলা বলিল "না ভাই গুরুদেবকে। তাঁকে মানুষ বলে ফেলেছি কথার ঝোঁকে—তাই।"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া শীলা বলিল "সর্ব্বনাশ! তবে ত আমাদের মত লোকের এখন সেখানে যাওয়াই হতে পারে না। গুরুদেব বুঝি মানুষ নন্? কি বস্তু তবে তিনি? আর তুই কি বস্তু, আর তোর মাথার মধ্যেই বা কি বস্তু ভরা, মস্তিষ্ক বিজ্ঞানওয়ালাদের দিয়ে তা একবার পরখ করানো দরকার হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। তুই না কলেজে পড়েছিলি?"

অনাবিলা অম্লান মুখে হাসিতে হাসিতে বলিল "হ্যাঁ আমি তো তুচ্ছ একটা পাশ করেছি কলেজ থেকে মাত্র, আর যাঁরা অনেকগুলাই পাশ করেছেন তাঁরাই"—"একজন তো তার মধ্যে তোর স্বামী না? সঙ্গগুণে—বুঝ্‌লি? তোর ঐ মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে আর কি বেচারার এই দুর্গতি।" ললিতা অন্তরে অন্তরে বহুক্ষণই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল এইবার যথাসাধ্য সেভাব দমন করিয়া বলিল "ভাই বিলা, মাত্র কাল এসেছি শীলির কাছে, কতদিন পরে দেখা—আর দুচার দিন কেটে যাক্, কথাগুলো একটু ফুরুক্ তারপরে যাব ভাই তোদের বাড়ী বেড়াতে! আজ মাপ্ কর্।" অনাবিলা অমলিন হাসি হাসিয়া বলিল "আমার সঙ্গে তো তার চেয়েও বেশী দিন পরে দেখা ভাই"—শীলা

মনে মনে বলিল “গায়েপড়াকে পারা ভার।” মুখে সজোরে হাসিয়া বলিল “ওরে তোর সঙ্গে কি আমাদের কথার পাল্লা চলে রে ভাই। তোরা আমাদের ওপরে হয়ে গেছিস্ যে—আর আমরা ব্যাচিলর পদে আছি এখনো। শীগ্‌গিরই তোর সঙ্গে এক ডিগ্রীতে উন্নীত হয়ে তখন গলা ধরে সেকথা আর ফুরুবে না—এখন কথা জম্‌তে দে। সে শুভসংবাদ অতি শীঘ্রই পাবি বুঝ্‌লি? সেইজন্যই দুজনে জোট্ হয়েছি—তোর সঙ্গে এক হয়ে ত্রিবেণী হয়ে যাব এবার।” অনাবিলা কি বুঝিল বুঝা গেল না—কিন্তু হাসিমুখে বলিল “যেন খবর পাই শীগ্‌গির, সেদিন কিন্তু যেতে হবে ওখানে। আর গুরুদেবকেও দেখে আস্‌বে।” “নিশ্চয় নিশ্চয়।” অনাবিলা বিদায় লইলে উভয়ে খানিক খুব হাসিয়া লইল, অবশ্য শীলাই হাসিল বেশী। বলিল “একালের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যেও পুরা যুগের সংস্কার আমাদের দেশের লোকের মাথায় কি ভাবে ঢুকে থাকে এরাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাক্ তোকে একটা কথা ভয়ে ভয়ে বল্‌ছি, ভাগ্যে তুই বিলার বাড়ী যেতে রাজী হলিনে, তাহলে এখনি মহা অপ্রস্তুতে পড়তাম।”

“কেন কার কাছে কি জন্য অপ্রস্তুতে পড়তিস্?”

“কুমুদবাবুর কাছে, তুই এসেছিস্ আর আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই—পুরাতন বন্ধুত্ব স্মরণ করে তিনি যেন আজ বিকেলে আসেন এই কথা তাঁকে লিখে পাঠিয়েছি সকালে বেহারাকে দিয়ে”। ললিতা ঘোরতর বিস্ময়ের সহিত বলিল “সেকি? এখানে তাঁকে কোথায় পেলি?”

“এইখানেই এসেছেন তিনি, আমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে, তাই তো জোর করে বল্‌ছি রে। তাঁকে ডাকাচ্ছি নিজেই বুঝে নে—আমার কথায় তো বিশ্বাস হবে না!” ললিতার তখনো যেন বিস্ময় কাটিতে চাহিতেছিল না, বলিল “তিনি তো পশ্চিমেই থাক্‌তেন জান্‌তাম, এখানে এসেছেন তাহলে? তাই বুঝি তুই এত চেষ্টা করে এখানে চাকরী নিয়েছিস্! ‘নহি তস্য দূরম্’ ঠিক কথা—কিন্তু আমায় কেন এর মধ্যে জড়াচ্ছিস ভাই?” “তুমি যে জড়িয়ে আছ মাঝখানে তাঁর—আমি যে ঠিকই জানি ভাই।”

ললিতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে একটু অভূতপূর্ব্ব ভাবে শীলার পানে চাহিয়া গাঢ়স্বরে বলিল “শোন তোকে আজ আমার একটা অন্তরের অতি সত্য কথা জানাচ্ছি—হয়ত বিশ্বাস করতে পারবি না—না পারিস্ তবুও তোকে আজ আমি বলব। আমার এসব কেমন আর ভাল লাগে না, কি রকম বিশ্রী ঠেকে। মনে হয় এই সব অনাবশ্যক জঞ্জালে মানুষ নিজেকে মিছামিছি জড়িয়ে ফেলে মাত্র। ভালবাসা শুন্‌তেই ভাল, কিন্তু কি ওর ভেতরে আছে তা আমি এখনো বুঝে উঠ্‌তে পারি না। মনের এ ঝোঁক মাত্র একটা, তাও কিন্তু চিরদিন থাকে না। একজনকে একজন পছন্দ করলে তারপরে তার ওপর মনের ঝোঁক চড়াতে লাগ্‌লো—এই তো এই সব ভালবাসার ইতিহাস। এ নিয়ে কেন এত হাঙ্গাম! জীবন কাটাবার জন্য যদি নিতান্তই বিয়ে করতে হয়—চিরদিনের যারা আত্মীয় তাদের সুখ সুবিধে বুঝে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে এ সম্বন্ধটী ঘটে যায় সেই ভাল। ভাগ্যে তা যদি না ঘটে—তোর মত এই রকম জীবনই কি সবচেয়ে ভাল না?” স্তম্ভিতভাবে শীলা ললিতার এই কথাগুলি শুনিয়া গেল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল “আচ্ছা ঐ যে বল্‌লি মনের ঝোঁক্! তুই কি জীবনে এমন ঝোঁক্ কখনো অনুভব করিস্ নি, যার কাছে আর সবই তুচ্ছ বোধ হয়?”

“না—বড় হয়ে পর্য্যন্ত আর না বরং ছোটবেলায় ঐ রকম একটা ঝোঁক্ মনের মধ্যে বহুকাল স্থান নিয়েছিল, মিছামিছি, সে একটা খেয়াল মাত্রই এখন মনে হয়।” বলিতে বলিতে ললিতা অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছিল—শীলা সাগ্রহে বলিল “কি ঝোঁক ভাই—কি সে কথা আমায় বল্‌বি না? আমারো অনেক সময়ে সন্দেহ হয়েছে—তোর মনে কিছু একটা আছে, কিন্তু কখনো তো কিছু বলিস্ নি!” “বলবার মত এমন কথা কিছু তো সে নয়; একটা ভাল জিনিষ ভাল লাগার আকর্ষণ মাত্র, তারপরে সে বস্তু খুঁজে পাবার—দেখ্‌বার, জান্‌বার জন্য কেবলি ঝোঁক—কিন্তু তা না পেয়ে পেয়ে এখন মনে হয় মনের সেই ঝোঁক লাগা ধর্ম্মটাই আমার মরে গেছে, আর সে ভালই হয়েছে: তাই অন্যের এই ঝোঁকের কথা শুনলেই আমার হাসি আসে—সময় সময় বিরক্তি লাগে, মনে হয় মানুষকে সুখস্বস্তি থেকে নষ্ট করতে অমন আর দুটি বস্তু নেই। যাকে বলে—“সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোনো।” “তা মান্‌ছি, আর এই ভূতের কিল খাওয়াই মানুষের মনের, তার হৃদয়ের সহজ স্বভাব।”

“এ স্বভাবের কিল যে খাচ্চে সে কিল্’ সে খাক্, কিন্তু অন্যে যেন সাধে সুখে খুঁচিয়ে এই ঘা না করতে যায়—

এই আমার মত্।" "সাধে কি করে ভাই, ঐ ভূতেই করায়—তোর ভাষায় বল্‌তে হয়। অতঃপর কর্ত্তব্য কি তাই বল্?"

"কিছুই না, কুমুদবাবুকে ডেকেছ—বেশ, আমরা দেখা কর্‌ব গল্প কর্‌ব—কাকাবাবু চলে গেছেন তা কি জানেন তিনি?"

"হ্যাঁ তোমার সব খবরই রাখেন"।

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

কুমুদবাবু আসিলেন, দেখা হইল; নানা গল্প আলোচনার মধ্যে শীলার কথাগুলি কেবলি ললিতার মনে আসিয়া ক্ষোভ আসিতেছিল। এই তো মানুষে মানুষের দিব্য কথাবার্ত্তা আলাপ আপ্যায়নে ভদ্রতাও সৌহৃদ্য সমস্তই অনুভব করিয়া সুখী হইতে পারে, ইহার মধ্যে অসুখী হইবার জন্যই তাহাদের এত ঝোঁক কেন? মানুষের অদৃষ্টেরই পরিহাস ইহা বলিতে হইবে। যদি শীলার কথা সত্য হয়—কিন্তু কুমুদবাবু অতি ভদ্রলোক এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কি সুন্দর তাঁহার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার এবং সংযত গম্ভীর ভাব। ললিতার তাঁহাকে নূতন করিয়া বেশ ভাল লাগিল। তখনি নিজের এই ভাল লাগাটুকুকে বিশ্লেষণ করিয়া ভাবিল—এইটুকু হইতেই কি লোকে অতখানি কাণ্ড করিয়া তুলে? কথনই নয়! সে বস্তু নিশ্চয় অন্য কিছু!

কয়েকদিন কাটার পর ললিতা বলিল—"চল, এইবার বিলার বাড়ী বেড়িয়ে আসি; কাকিমার চিঠি দেখলি তো, আর দেরী করলে তিনিই এখানে চলে আসবেন ব'লে শাসিয়েছেন।"

"আমি তো লিখেও দিলাম যে এই লোভেই দেরী করাব তোকে।"

"অনর্থক তাঁকে উৎপীড়ন করা মাত্র—চল বিলার বাড়ী।" কিন্তু যাবার আগেই আবার বিলার লোক চিঠি লইয়া আসিল। "ভাই তোমরা এলে না? আমাদের একেবারে অবসর নেই তাই এতদিন যাই নি। শীলা, ভাই সেদিন যে আমাদের গুরুদেব কি রকম জিজ্ঞাসা করেছিলে তাও তো দেখ্‌লে না? এইবার তিনি চলে যাচ্ছেন।"

শীলা বলিল "চল আজই এখনি যাই—দেখি তাদের গুরুটি কি বস্তু।"

"ক্ষেপেছিস্? যেতে দে গুরুচন্দ্রকে! ঐ হাঙ্গামের মধ্যে মানুষ সাধ করে আবার যাবে? দুদিন পরেই যাওয়া যাবে।"

কিন্তু শীলার ঔৎসুক্যে এবং নিজেরও বাড়ী ফিরিবার তাগিদে বেশী দেরী করাও চলিল না, তাই পরদিনই তাহার প্রাক্তন বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে চলিল।

প্রকাণ্ড বাড়ী—দুই একজন চাকর দাসীরা মাত্র অভ্যর্থনা করিল, বাড়ীর লোক কেহই উপস্থিত নাই, সদ্য যেন তাহারা কোথায় গিয়াছে। শীলা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিতেই তাহারা একযোগে করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আজ যে গুরুদেব চলে যাচ্ছেন, তাই তাঁকে তুলে দিতে সবাই নদীর ঘাটে গেছেন। বাবা আজ চলে গেলেন গো—সব 'শোন্য' করে—" বলিতে বলিতে কেহ কেহ চক্ষের জলও মুছিতে লাগিল। ললিতা তাহাদের রোদন রক্ত চক্ষের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়াছিল, শীলার বাক্যে তাহাকে বাধা দিতে হইল—

শীলা বলিতেছে "তোমাদের এই ঘাটেই তো নৌকয় উঠ্‌ছেন? চলতো ঝি আমাদের সঙ্গে।"

"দর্শন করবেন বুঝি? আহা আজ এলেন! ঝি চাকররাই কি সব বাড়ীতে আছে? যতক্ষণ বাবার দর্শন মেলে সেই ছিচরণে পড়ে আছে—আহা কি দয়া আমাদের ওপরেও—চল পৌঁছেদি আপনাদের—"

ললিতা শীলার হাত ধরিয়া টানায় অগত্যা সে নিরস্ত হইয়া বলিল "থাক্ ঝি তুমি কাজে যাও, তারা বাড়ী আসুন ততক্ষণ আমরা বসি।"

"তাহলে বাবার ঐ 'শোন্য' ঘরেই বসুন। ঐ দেখুন বাবার ছবি—আহা যেন মহাপ্রভু।" শীলা ও ললিতা প্রকাণ্ড গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহের মধ্যস্থলে লোহিত কম্বলের আস্তরণের উপর স্তূপাকারে ফুল ও মালা পড়িয়া রহিয়াছে, অগুরু ও ধূপের গন্ধে তখনো গৃহটি আমোদিত। যেন সদ্য পূজা লইয়া কোন দেবতা অন্তর্হিত হইয়াছেন—নিস্তব্ধ গৃহটি মূক—বিষাদাচ্ছন্ন! সম্মুখেই প্রকাণ্ড তৈলচিত্র—গৈরিক বসন পরিহিত এক অপূর্ব্ব-দর্শন উদাসীন দণ্ডহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। ললিতা সেই দিকে দৃষ্টিপাতের সঙ্গে যেন পাথরের মত জমিয়া গেল, কে ইনি?—কে?—হ্যাঁ—ইনি তিনিই তো—দীর্ঘ দশ বৎসর পরে—তবু বেশ চেনা যাইতেছে—

“ঝি তোমাদের ঘাটের পথ কোন্ দিকে”—“কোন দিক্ দিয়ে যেতে হবে?—কোন্ দিকে—ওদিকে নয় মা এই দিকে—চলুন—আহা আর কি দর্শন পাবেন—বোট হয়ত ছেড়ে দিয়েছে—”

ঘাটের উপর রথের লোক। কান্নায় সকলে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, নদীগর্ভে জলযানের উপরে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব প্রসন্ন মূর্ত্তি—এক হাতে দণ্ড—অন্য হাত তুলিয়া তীরস্থ সকলকে যেন আশ্বাস ও প্রবোধ দিতেছেন, বিশাল অরুণ-বর্ণ নয়ন দুটি যেন সমবেদনার করুণায় অশ্রুপূর্ণ! তুমুল হরি-ধ্বনির মধ্যে বোট খুলিয়া গেল। সে ধ্বনি যেন একটা একতান উচ্চ রোদন ধ্বনি।

যেখানে নারীদল দাঁড়াইয়া ললিতা গিয়া একেবারে সেই দিকে ছুটিয়া অনাবিলার ঘাড়ের উপর পড়িল “বিলা—বিলা—একখানা নৌক’—একটা ডিঙ্গি—যাহোক্ কিছু একটা—”

অনাবিলা অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি নদীগর্ভ হইতে ফিরাইয়া রোদনের অবরোধ প্রয়াসে বস্ত্র বাধা মুখ হইতে সরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল “আজ এমন সময়ে এলে ললিতা? প্রভু যে আমাদের বিজয় করলেন—কি দেখ্‌তে এলে?” তাহার বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই নারীবৃন্দের রুদ্ধশোকোচ্ছ্বাসে যেন একটা নাড়া পড়িয়া ‘হু হু’ শব্দে তাহাদের সে বেগকে মুক্ত করিয়া দিল।

শীলা অবাক্ হইয়া সকলকে দেখিতে ও তাহাদের কথা শুনিতেছিল, তাহাকে ততোধিক অবাক হইতে হইল যখন দেখিল ললিতা অনাবিলাকে পুনঃ পুনঃ নাড়া দিয়া বলিতেছে “একখানা ডিঙ্গী—একখানা যা কিছু হোক্—”

“চরণ স্পর্শ করবে? কোথায় পাব এখন আর নৌক’—দেখ্‌ছে না ওঁর সঙ্গে ক’খানা নৌক চলেছে ওঁকে ষ্টেশনে পৌছে দিতে। পুরুষরা সবাই গেছেন—আচ্ছা একটু দাঁড়াও—একটু পরেই ছেলে মেয়েগুলোকে ফিরিয়ে আনবে হয়ত একখানা নৌক—সেইটাতেই না হয় যেও—কিন্তু অনেক দূর চলে যাবে তখন বোট, ধর্‌তে পারবে কি আর!”

“যাহোক্ একটা—ঐ যে একটী নৌক’ যাচ্ছে ওকেই ডাকাও—এই মাঝি—মাঝি—”

“থাম’—ওটা জেলে ডিঙ্গি—দেখি আমি চেষ্টা—”

অনতি দূরে কয়েকজন অনুচর ধরণের লোক দাঁড়াইয়াছিল—ইঙ্গিতে তাহাদের মধ্যের একজনকে ডাকিয়া অনাবিলা বলিল—“শীগগির গাড়ী আন্‌তে বল ঘাটের ধারে’ এঁকে গাড়ী করে পারঘাটায় নিয়ে গিয়ে একটা নৌক করে শীগগির প্রভুর বোট ধরে এঁকে তাঁর পাদপদ্মে পৌছে দাও, সঙ্গে যাবে আসবে তুমি, কোন ঝি সঙ্গে নিতে বলেন নেবে—গাড়ী বোধহয় জোতাই আছে, শীগ্‌গির যাও তুমি সিং।”

“যো হুকুম বহুমায়জী!” সে লোকটি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায় দেখিয়া ললিতাও তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইতে বলিল “দেরী হবে—চল তোমার সঙ্গেই যাবো আমি, গাড়ী কই”—ললিতাকে ঐ ভাবে চলিতে দেখিয়া যন্ত্রের মত শীলাও তাহার পশ্চাদ্ অনুসরণ করিতে করিতে বলিল “একি করছিস্ লতি—দাঁড়া একটু’ আমিও যাই তোর সঙ্গে।”

“আয়” বলিয়া ললিতা গতির মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল।

হয়ত সকলে কি পরমাশ্চর্য্য ভাবেই তাহাদের দেখিতেছে ভাবিয়া শীলা একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল কেহই তাহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না—সকলেরই দৃষ্টি নদীগর্ভে, দূর হইতেও নৌকাস্থ অরুণ বস্ত্রের আভা পড়ন্ত রৌদ্রে আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছিল সেই দিকেই সকলে চাহিয়া আছে। এ ঘটনা যেন কিছুই আশ্চর্য্যের নয় এমনি একটা উপেক্ষার ভাব সেই জনতার মধ্যে অনুভব করিয়া শীলার লজ্জার বেগটা যেন কিছু প্রশমিত হইল।

২১

ছোট নৌকাখানি গিয়া বোটের গায়ে ভিড়িতে না ভিড়িতে শীলা দেখিল তাহাদের বান্ধবীর স্বামী—অগ্রসর হইয়া সসম্মানে তাহাদের আহ্বান করিতেছেন। বোটে উঠিতে লজ্জায় তাহার পা কাঁপিতেছিল—ললিতা কিন্তু চক্ষে কেবল অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি লইয়া স্থির ভাবে তাহার অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চকিতে শীলা উপবিষ্ট ভদ্রলোকগুলির পানে চাহিয়া দেখিল—তাহাদের মুখেও এমন কোন’ বিস্ময়ের ভাব নাই—বরং যেন একটা সহানুভূতিতেই সকলে তাহাদের প্রবেশ পথ দিবার জন্য সরিয়া সরিয়া বসিতেছে। শীলার পরিচয়টাও যেন অস্ফুট গুঞ্জনে তাহাদের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল।

সম্মুখে লোহিত কম্বলাসনে উপবিষ্ট সেই মূর্ত্তি যাহা

তাহারা চিত্রে এবং নদীর গর্ভে নৌকার উপর দণ্ডায়মান দেখিয়াছিল। তাহারা কিছু করিবার বা বলিবার পূর্ব্বেই এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতাভরা কণ্ঠে উপবিষ্ট মহাত্মা তাহাদের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন "এমন করে নৌক চালিয়ে আপনারা আসছিলেন যে আমাদের প্রতিক্ষণেই ভয় হচ্চিল। মাঝি বা সঙ্গের লোককে দিয়ে আমাদের থাম্‌বার ইঙ্গিত কর্‌লেন না কেন? এমন করে আসা বিশেষ এই প্রবলা নদীর স্রোত কাটিয়ে—বড়ই বিপজ্জনক—"

সাধুর কথা শেষ হইতেই অনাবিলার স্বামী যোড়হস্তে বলিল "আজ্ঞে আমরা বোট আস্তেই চালিয়েছিলাম, ওঁরা এইখানেই আস্‌তে চান্ বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই—"

ততক্ষণে শীলা অবশ ভাবে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতে নয় সাধুর চরণোদ্দেশে নত হইয়া পড়িয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও। প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সাধু তাহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাহারা প্রণাম সারিয়া মুখ তুলিতেই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন। "জয়োস্তু, বসুন ঐ সতরঞ্চিটার উপরে। কেন আপনারা এমন করে এলেন? আপনার পরিচয় শুনলাম। আপনি এমন করে আসছেন আমাদের মত ফকির লোক্‌কে দেখ্‌তে—এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। বরং আপনাদেরই আমাদের দর্শন কর্‌বার কথা, আপনারা বাংলার মেয়েদের গৌরবের স্থল। পথের উদ্বেগে এখনো আপনারা কাঁপছেন দেখ্‌ছি, স্থির হয়ে আগে একটু বসুন, পরে কথাবার্তা হবে।"

সকলে পূর্ব্বেই তাহাদের আসন অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল, উভয়ে বসিয়া পড়িল; সাধুর বাক্যে শীলা নিজের কাছেই যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল—সে তো তাঁহাকে দেখিতে এমন করিয়া ছুটিয়া আসে নাই—সে আসিয়াছে ললিতার মাত্র অনুবর্ত্তী হইয়া, কিন্তু সে কথার আভাসমাত্রও প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না—পূর্ব্বের বিস্ময় বিরক্ত ভাব গিয়া এখন এইরূপে আসার যেন একটা সার্থকতার ভাবই তাহার অজ্ঞাতে অন্তরে অনুভূত হইতেছিল। তবু সে ললিতার পানে চাহিল যদি সে কিছু বলে, কিন্তু তাহার সেরূপ কোন' লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। স্থিরদৃষ্টিতে সে কেবল সাধুকে দেখিতেছে মাত্র। অগত্যা শীলাই প্রথমে কথা কহিল—অনাবিলার স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "এঁর স্ত্রী আমাদের সহপাঠী! তিনি পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্য আমাদের—আমরা সময় ক'রে উঠ্‌তে পারি নি"।

"কি করে পার্‌বেন—কত বড় কাজ আপনার হাতে—"

"এই ইনি—আমার বন্ধু ললিতা দেবীও আপনাকে দর্শন কর্‌বার জন্য খুব ব্যগ্র হওয়ায়—অনাবিলার সাহায্যে আমরা এই ভাবে আস্‌তে পেরেছি। ললিতা দেবী—"

"হ্যাঁ—কি বলছেন—"

"উনিই খুব বেশী ব্যগ্র হয়ে পড়েন আপনার কাছে আস্‌তে"। শীলা আর বেশী বলিতে পারিতেছিল না, সে জানেই বা কি!—নৌকায় যতবার ললিতাকে প্রশ্ন করিয়াছে ততবারই সে বলিয়াছে "পরে বল্‌ব।" ললিতার এখন এভাবে চুপ্ করিয়া থাকায় মনে মনে শীলা তাহার উপর খুবই রাগ করিতেছিল। একি কাণ্ড! এখন আর মেয়ের মুখে কথাটি নেই—কি ব্যাপার রে বাপু!

সাধু প্রসন্ন মুখে ললিতার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আপনি কি কিছু বল্‌বেন আমায়? না এমনি দেখা করতেই এসেছেন?"

ললিতার এইবার কথা ফুটিল—অবরুদ্ধ কণ্ঠ জোর করিয়া পরিষ্কার করিলেও সে জড়তা ঘুচিতে চায় না যেন—

"আপনি—আপনি—"

"হ্যাঁ—কি বলবেন বলুন—"

"আপনি কি বৃন্দাবনে ছিলেন না? দশ বৎসর আগে?"

সাধু সুলোহিত পদ্মপুটতুল্য উভয় পানি জোড় করিয়া মস্তকের উপর ধরিলেন। "হ্যাঁ—এখনো অনেক সময় শ্রীধামেই থাকি—"

"কৈ থাকেন? তিন বৎসর আগেও তো তন্ন তন্ন করে সমস্ত বৃন্দাবন আর তার যত বন সমস্তই তো খুঁজেছি, কোথায় ছিলেন তখন আপনি? এই সব দেশে—আর এই হট্টগোলের মাঝে? এই—এই—" শীলার ইচ্ছা করিতেছিল ললিতার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে—কেননা সমবেত ভদ্রলোকগুলি বাহ্যতঃ উদাসীন ভাবে থাকিলেও ঔৎসুক্যের সহিতই যে ললিতার এই অদ্ভুত ধরণের কথা শুনিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিয়া সকুণ্ঠ লজ্জায় ও বিস্ময়ে শীলারও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ললিতার উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠ কিন্তু এইবারে আপনিই থামিয়া গেল।

সাধুর চক্ষেও একটী বিস্ময়ের আভা—কিন্তু তখনি

সেটুকু যেন নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া সাধু সমান শান্ত স্বরে বলিলেন "বৃন্দাবনের বনে কেউ লুকিয়ে থাকলে লোকের সাধ্যও হয় না তাকে খুঁজে বার কর্‌বার, এমনি মনুষ্য অগম্য স্থান সেখানে অনেক আছে। কিন্তু কেন এমন ভাবে আপনি আমাকে খুঁজেছিলেন? আমাকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন? বৃন্দাবনের কোথায়?

"সেবাকুঞ্জের গলিতে কীর্ত্তনে। গোবিন্দকুণ্ডে, গোবর্দ্ধন পাহাড়ের বনে।" সাধুর চোখে মুখে এবার বিস্ময় স্পষ্টই খেলা করিতেছে দেখিয়া ললিতা আবার বলিল "আপনাকে অনুসরণ করে গোবর্দ্ধন পরিক্রমার মধ্যে বনে একটি মেয়ে পথ হারিয়েছিল, তাকে আপনি ব'কে ঝ'কে তার সঙ্গী দাদামশায়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেন, তার দাদামশায়—"

"নামটি কি বলুন তো সে মেয়েটির—নামটা?"

"ললিতা।"

"ললিতা—ললিতা—ওঃ—সেই দুর্দ্দান্ত চপলা মেয়েটিই আপনি—তুমি?—সেই ললিতা?"

ললিতা নিঃশব্দে মাথা নামাইয়া রহিল। এইমাত্র 'তুমি' ও "সেই ললিতা" সম্বোধনেই তাহার সকল উত্তেজনার বেগকে ডুবাইয়া একটা অশ্রুর ঢেউ তাহার বুক হতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যেন আপ্লুত করিয়া তুলিল—পাছে সে চোখ্ পর্য্যন্ত আক্রমণ করে এই ভয়ে সে চোখ্‌ও নামাইল।

সাধু ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "ওঃ—জগতে কি আশ্চর্য্য বস্তুই না ঘট্‌তে পারে! তোমার সেই দাদামশায়—তিনি—"

ঊর্দ্ধদিকে সঙ্কেত করিয়া ললিতা বুঝাইয়া দিল তিনি স্বর্গে—কথা কহিতে তখনো পারিতেছিল না। "তোমার পিতা-মাতা আত্মীয়স্বজন কে আছেন? এইখানেই কি তুমি থাক? না—অনাবিলার বন্ধু তুমি নূতন এসেছ শুন্‌লাম বোধ হচ্চে, ওঁরই অতিথিভাবে?"

অল্প মুখ তুলিয়া একটু যেন হাসিয়া ললিতা উত্তর দিল "সবই ভুলে গেছেন, দাদামশায় তো আপনাকে বলেছিলেন আমার বাপ মা কেউ নেই, এক কাকা অভিভাবক ছিলেন তিনিও চলে গেছেন।"

ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ রহিল। সাধু আবার কথা কহিলেন "এখন কি ওঁর মতই সম্মানের কার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করেছেন?" "না আমার এম-এ পাশ হয়নি। আপনাকে যে এই রকম লোকালয়ে জনতার মধ্যে এভাবে দেখ্‌ব এ কিন্তু স্বপ্নেও মনে করিনি। বৃন্দাবনের কোন গভীর বনে কিম্বা কোন পাহাড়েপর্ব্বতে কোথায় লুকিয়ে না জানি কি তপস্যাই করছেন আপনি—এই মনে করেছি এতদিন।"

"অথচ আমায় দেখলেন গুরুগিরি ব্যবসায় লোকের মাথায় পা দিয়ে ফিরতে—না? অদৃষ্টের এই এক দুরন্ত পরিহাস।" সকলে কুণ্ঠিতভাবে পরস্পরের দিকে চাহিল, উত্তর দিতেও যেন কাহারো সাহস হইতেছে না—কেবল অনাবিলার বৃদ্ধ দাদাশ্বশুর সাধুর পাদ সন্নিধানে একটু সরিয়া গিয়া যোড়হস্তে বলিলেন "প্রভু! বৃন্দাবনে আমায় পরম কৃপা করে সাহস বাড়ান—তাই আপনার বাংলা ভ্রমণের সুযোগে আমার ঘরদ্বার আমার সংসার—এমন কি আমার জন্ম পর্য্যন্ত সফল হল বলে আজ মনে করছি। আপনি ব্যবসা করছেন; আপনি একথা ভাব্‌লে আমরা যে আত্মগ্লানিতে মরে যাব।" বলিতে বলিতে মনের আন্তরিকতায় বৃদ্ধ দুই হস্তে নিজের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। আর একজন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদের ভাবে মৃদুভাবে বলিলেন—"আপনারা আত্মারাম, আপনারা যে ঘরে এসে আমাদের দর্শন দেন এও আপনাদের করুণা—'বসন্ত বল্লোকহিতং চরন্তং'—আপনারা—"

এক হস্ত সন্ত্রস্ত বৃদ্ধের পৃষ্ঠে সান্ত্বনার ভাবে রাখিয়া এবং অন্য হস্তের ইঙ্গিতে বক্তাকে নিবারণ করিয়া সাধু ললিতার প্রতি তাহার অক্ষুণ্ণ প্রশান্ত দৃষ্টিপাতে যেন শান্ত করিবার ইচ্ছাই বর্ষণ করিয়া বলিলেন—

"আপনার মনের আদর্শ খুব উচ্চ, কিন্তু শান্তি পান্‌নি জীবনে বেশ মনে হচ্চে—! এখন কি করবেন স্থির করছেন? আপনার আত্মীয়হীনতার সংবাদে ব্যথিত হলাম।" "আমার মনের আদর্শের কথাই এখানে ওঠে না, আমি যে বাল্যকালে আপনাকে ঐ ভাবেরই পথিক দেখেছি আর তাই আমার চিন্তারও আদর্শ হয়ে আছে। এখন আপনি আবার কোথায় যাচ্চেন? আপনার বৃন্দাবনে?"

"আমার বৃন্দাবন? আপনার শুভ বাক্যই সার্থক হোক। কোথায় যাচ্চি জানিনা—অদৃষ্ট যেখানে নিয়ে যাবে।" ললিতা অবিশ্বাসের ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিল "এসব কথা তো লোককে ঠকানোর জন্য—পাছে তারা

কেউ আপনার পিছনে আবার ধাওয়া করে, তাই সত্য কথা বল্‌বেন না।" শীলা লজ্জায় অধোবদন এবং অন্যান্য সকলেই ললিতার এই ধৃষ্টতায় কুণ্ঠিত বিব্রত, কিন্তু উদাসীন্ স্নিগ্ধ হাস্যে সকলের কুণ্ঠাই যেন নাশ করিয়া বলিলেন—

"তাই যদি মনে করেন তবে তাই সত্য; কিন্তু আমি ভাব্‌ছি আপনাদের তো আবার ফিরে যেতে হবে ঐ নৌকা করেই। ষ্টেশন পর্য্যন্ত তো যাওয়া হতে পারে না, তাহলে এই বোটেই ফিরতে পারতেন! এই দুরন্ত নদী, তাতে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, আর দেরী করবেন না আপনারা—আসুন এইবার।" শীলার পানেও চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আমার সসম্মান নমস্কার নেন্—কত যে সুখী হলাম আপনাদের দেখে, এখন আসুন তবে—বেলা যাচ্ছে।"

প্রণাম করিয়া শীলা উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে শুনিল—ললিতার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আবার উচ্চারণ করিতেছে—"তখন আপনি লোককে ভয় করে বনে বনে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন—এখনো কি সে ভয় আপনার আছে?"

"না—সে ভয় আমার অভয়দাতা দুর করেছেন—যখন ইচ্ছা আপনারা দর্শন দিতে পারেন আমাকে। এখন আসুন—শান্তিদাতা আপনাকে শান্তিদান করুন।" (ক্রমশঃ)

ব্যর্থ অনুরাগ

শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

সব-হারানোর জীবনে আমার
কেন এলে তুমি সাথী,
আঁধার আবেশে ভরেছে জোছনা
নিঝুম নিরালা রাতি।
ঝরিছে বকুল বনবীথিকায়
পাগল গন্ধ চিত্ত মাতায়;
সোহাগের যত মায়া মমতায়
বাসনার দীপখানি,
জ্বলিছে গোপন দেউলে আমার
কাজল আঁধার হানি।
পূর্ব্বানুরাগ মঞ্জুল গানে
প্রথম চোখের চাওয়া,
ডেকে ফিরেছিলো হৃদয়ে হৃদয়ে
মিটেছিলো সব পাওয়া,
সে রাগের ফুল গেঁথেছিনু আমি
নিতি অন্তরে নিশিদিন যামি
এসেছিলো প্রাণে নবযৌবন
মঞ্জির ধ্বনি রবে,
মেঘমল্লার মীড়ের বেদনে
জেগেছিলো কলরবে।
ফিরেছিলো যত নীড়হারা পাখী
শ্রাবণের ঘন সন্ধ্যায় ডাকি
বাঁধা হয়েছিলো প্রাণে প্রেমরাখী
রক্তরঙীণ আঁকা,

কোন লগনের শুভদৃষ্টিতে
হেরেছিনু আঁখি বাঁকা।

বনানী বাতাস ফেলেছিলো শ্বাস
কদমের রেণু মেখে,
কেতকীর বুকে মধু খেয়ে হায়
চলেছিলো এঁকেবেঁকে।

তবু রাত্রির রিক্ততা নাশি
কেন ভুলে এলে চোর
এলায়িত মম কেশদাম আজ
লুণ্ঠিত হৃদি মোর,

সিক্ত বাসনা বক্ষেতে পাই
দীপ্ত করুণা মণি
সুপ্ত সাগরে জোয়ারের আর
নাই কোন জানাজানি।

চোরের পুণ্য

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রির প্রথম প্রহরেই চুরি। 'ভাত-ঘুম' বলিয়া পল্লীগ্রামে একটা কথা প্রচলিত আছে; ভাতই হউক আর রুটিই হউক আর মুড়িই হউক—আহার্য্য দ্রব্যে উদর পূর্ণ হইলেই বেশ একটা নেশার আমেজ জমিয়া আসে; ভোরের ঘুমের মতই সে ঘুম উপভোগ্য। পল্লীবাসীরা সেই ঘুমে আচ্ছন্ন হইলেই চুরি হইয়া যায়। উপর্য্যুপরি দশ-দশটা চুরি হইয়া গেল। পল্লীর অধিবাসীবৃন্দ হইতে পুলিশ পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

চোর যে একজন অথবা একই দল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সব ক্ষেত্রেই চুরি যায় বাসন; তাও ঘটি-বাটি নয় কেবল থালা; দামী কাপড়-চোপড় কয়েক বাড়ীতে বাহিরে ছিল, সাধারণ কাপড়-চোপড় তো সব বাড়ীতেই ছিল—সে সবে চোর কোন ক্ষেত্রেই হাত দেয় নাই। কোন ক্ষেত্রেই বাড়ীর দুয়ার খুলিয়া বাহিরে যায় নাই, বাড়ীর দুয়ার যেমন বন্ধ—তেমনি বন্ধ থাকে, চোর পাঁচিল টপকাইয়া যায় আসে।

থানার দারোগা রামশরণ সিংহের যেমন একজোড়া প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড বড় গোঁফ—তেমনি তিনি রসিক ব্যক্তি—স্বীকারোক্তির জন্য আসামীর হাতের নখে আলপিন ফুটাইতে ফুটাইতে তিনি গান করিয়া থাকেন—

"পিরিতীর বাবলা-কাঁটা
বিঁধল পাঁজরে।
সখিলো—ব'লো নাগরে!"

সেই রামশরণ সিংহ দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,—চোরের নাম তো পেলাম, এখন ঠিকানাটা পেলে হয় যে!

লোকজনে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল; শার্লক হোমসের মত রামশরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন—বেটার নাম টপকেশ্বর।

নাম ঠিক হইলেও ঠিকানা মিলিল না, দারোগা সাহেব এ চাকলার দাগীগুলার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তচনচ করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু কোনটিই টপকেশ্বর গুহা বলিয়া নির্ণীত হইল না। অবশেষে তিনি চৌকিদারদের প্রহার দিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রামের বেকার যুবক-সম্প্রদায়কে ডাকিয়া 'ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি' গঠন করিয়া—জোর পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। তাহাতে ফল কিছু হইল, একটা জেলে মাছ চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল, জমিদারের চাপরাশী গ্রামেরই একজন স্বৈরিণীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে যাইতে ধরা পড়িল, গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা কোন্দল-কারিণী জাঁহাবাজ সুরভিঠাকরুণ প্রতিবেশীর দরজায় ময়লা লেপিতে লেপিতে ধরা পড়িয়া গালিগালাজে নিশীথরাত্রি কদর্য্য করিয়া তুলিল। আরও অনেক কিছু হইল—কাহারা বাবুদের কাঁচামিঠে আমের গাছটা একেবারে ফাঁক করিয়া দিল, পানসিগারেটওয়ালা ফটিকদাসের দোকান হইতে পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট পূর্ণ দুইটা বাক্স চুরি গেল, গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় গোয়ালের গরুগুলি গোয়াল হইতে বাহির হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া ফিরিল, কিন্তু টপকেশ্বর ধরা পড়িল না, অথচ চুরিও বন্ধ হইল না। দশদিন, বিশদিন, কখনও একমাস, কখনও বা দুইমাস অন্তর এক একটা চুরি হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। মোটকথা—'এই চুরি হইয়া গেল, এখন আর চুরি হইবে না' কিম্বা 'অনেকদিন হইয়া গেল—চোর এবার ভয় পাইয়াছে'—যে কোন ধারণায় মানুষ নিশ্চিন্ত হইলেই একদিন চুরি হইয়া যায়।

উপর-ওয়ালার গুঁতা খাইয়া রামশরণ দারোগার রসিকতা মাত্রাতিরিক্ত রূপে বাড়িয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই লোকের সঙ্গে তিনি সহধর্ম্মিণীর-সহোদর সম্বন্ধ পাতাইতে আরম্ভ করিলেন; একজন চৌকিদারের নাকে গাড়ুর নল পুরিয়া নাসিকাগর্জ্জনের ঔষধ বাতলাইয়া দিলেন, এমন কি এই বয়সে পত্নীর সহোদরাকে বিবাহ করিবার আজীবন-পোষিত সংকল্প স্ত্রীর সম্মুখেই প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—স্ত্রীকে বলিলেন—শ্যালিকা!

ডিফেন্স পার্টি অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দিলেন। অহরহ চিন্তায় তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন।

এ গ্রামে চোর আছে—পাকাচোর, বংশানুক্রমিক চোরের বংশ। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের রক্তে চৌর্য্য-

ব্যাধির বীজাণু কিলবিল করিতেছে; সরকারী জেলখানার দেওয়ালে—পেরেকে খোদা দাগে—বাগানে রোপিত গাছের মধ্যে এ গ্রামের ডোমবংশের ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক গৌরবে লিখিত আছে। কিন্তু বনিয়াদীবংশের মত তাহাদের ধারা-ধরণ তিনপুরুষ ধরিয়া একই চালে চলিয়াছে। তিন পুরুষ ধরিয়া তাহারা ধান-চোর। ধানচুরি করিতে আসিয়া হাতের কাছে অধিকতর মূল্যের জিনিষ পড়িয়া থাকিতেও তাহারা তাহাতে হাত দেয় নাই। এ গ্রামের লোক আজ তিনপুরুষ ধরিয়া ধানের গোলাতেই মোটা এবং শক্ত তালা দিয়াছে, কিন্তু সিন্দুকের ভাবনা কোন দিন ভাবে নাই। তাহা ছাড়াও, ডোমবংশের কীর্ত্তি অব্যাহত রাখিতে পুলিশ এক শশী ছাড়া কাহাকেও বাহিরে রাখে নাই। বি-এল কেসে আঠারো বছর হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সকল ডোমেরই দীর্ঘ কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়া গেছে। এক আছে শশী—শশী অবশ্য এককালের সিংহ—আফ্রিকার চতুর নরখাদক সিংহ, কিন্তু এখন সে স্থবির, বাতে প্রায় পঙ্গু। একবৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল শশী এখন লাঠি ধরিয়া কোন মতে চলা-ফেরা করে। তাহার পূর্ব্বে মাস-ছয়েক শয্যাশায়ী হইয়াই ছিল। বসিয়া বসিয়া বাঁশ-তালপাতায় আপনাদের কাজ করিয়া এখন কায়-ক্লেশে বাঁচিয়া আছে। লোকটার যথেষ্ট পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। এই চুরির প্রথম ঝোঁকে ডোমপাড়া খানাতল্লাস করিতে গিয়া স্বচক্ষে তাহার অবস্থাও দেখিয়া আসিয়াছেন, শরীরের হাড়-পাঁজরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। একটা লাঠি পাশে রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া উপু হইয়া বসিয়াছিল—তাঁকে দেখিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া নমস্কার করিয়াছিল।

একজন কনেস্টবল ঘরের ভিতর হইতে জিনিষপত্র বাহির করিতেছিল, জিনিষের মধ্যে রাজ্যের ডালা-কুলা। তিনি দাঁড়াইয়া শশীর দিকেই চাহিয়াছিলেন, লোকটার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতেছিল। শশী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিয়াছিল—শেষকালটায় বড় দুঃখ পেলাম হুজুর। আর বাঁচব না।

রামশরণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন—তুই তো বড় পাজীরে বেটা শশে! তোর বাতব্যাধি আমাদের দিয়ে যাবার মতলব করছিস যে! এ্যাঁ! তুই বেটা মলে তো গোটা থানারই বাত ধ'রে যাবেরে ব'সে ব'সে!

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা সমঝাইয়া শশী ফিক্ করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিল—লোক তো এসেছে হুজুর।

রামশরণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—তোর মাসতুত ভাইয়ের নামটা বল্ দেখি শশী? আমি তোকে পঞ্চাশটাকা বকশিস দেওয়াব সরকার থেকে। মাসতুত ভাই বলিতেই শশী আবার হাসিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—জানি না হুজুর, বাতে ভুগছি—পক্ষাঘাত হবে মিছে বলি তো।

তাহার মুখ চোখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন—শশী মিথ্যা বলে নাই। তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—শালা বড়া জ্বালাতন করছে শশে। শালার টিকি দেখতে পেলাম না রে একদিন।

'শশী মাসতুত ভ্রাতাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে শ্যালক সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—শালার কিন্তু ভারী বুদ্ধি হুজুর। আমাদের মতন ধান-ছড়া দিয়েও যায় না; দুম'ণে বস্তাও শালাকে বইতে হয় না।

রামশরণ চিন্তা করিতে করিতেও শিহরিয়া উঠেন, উঃ শশী যদি ধান চুরি না করিয়া অন্য চুরিতে হাত দিত তবে কি আর রক্ষা ছিল! এমন সুগঠিত দেহ—একেবারে তাজা কেউটে সাপের মত চেহারা—মিশ কাল—ছিপ্‌ছিপে লম্বা—এককালে বেটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া ছুটিত, দেড়মণ ধানবোঝাই বস্তা মাথায় শশী ছুটিলে পিছন হইতে কেহ কখনও গায়ে হাত দিতে পারে নাই। আজও পর্য্যন্ত শশী কখনও ধরা পড়ে নাই। শশীকে ধরিতে হইয়াছে তাহার বাড়ীতে আসিয়া। বেটা কেউটে যদি গর্ত্তে মুখ সেঁধাইত—অর্থাৎ সিঁদ দিতে শিখিত, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ করিয়া ছাড়িত। সিঁদ দিবার মত এমন উপযোগী দেহ আর হয় না! কিন্তু ভগবান তাহাকে মারিয়াছেন। সাপটা মরিয়া গেছে—যেটা আছে সেটা তাহার খোলস।

রামশরণ ভাবিয়া কুল কিনারা পান না। চোর নূতন, তাহাতে সন্দেহ নাই; নূতন কিন্তু পাকা। তিনি স্থানীয় বাজারটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন ··· এবং রাত্রে সরীসৃপের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে সমস্ত রাত্রি সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। নগদ আট টাকা খরচ করিয়া ভদ্রলোক একেবারে প্রথম শ্রেণীর ক্রেপসোল জুতা কিনিলেন।

একদিন দেখা মিলিল।

রামশরণ সরীসৃপের মত তাহাকে পাকে পাকে জড়াইয়া

ধরিলেন—কিন্তু চোর যেন পাঁকাল মাছ, সে তাঁহার পাকের কবল হইতে পিছলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

নাপিতপাড়ার সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে নিতান্তই অকস্মাৎ নাপিতদের পাঁচিল হইতে একেবারে সম্মুখেই টপকেশ্বর ধপ করিয়া লাফাইয়া পড়িল। রামশরণ লোকটাকে জাপটাইয়া ধরিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া পড়িলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য চতুর-চোর, সে মুহূর্ত্তে বসিয়া পড়িল। পরমুহূর্ত্তে হনুমানের মতই বসিয়া-বসিয়া একটা লাফ দিয়া—স্প্রিংয়ের পুতুলের মত উঠিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। সে ছোটা যেমন তেমন ছোটা নয়—জ্যা-বিমুক্ত তীরের মত তাহার গতি। রামশরণ পিছন ফিরিয়া চৌকিদারটার গালে একটা বিরাশী সিক্কার চড় বসাইয়া দিলেন—শালা, তুই করছিলি কি? লাঠি চালাতে পারলি না?

চৌকিদারটা কৈফিয়ৎ দিতে সাহস করিল না; সঙ্কীর্ণ গলি, দারোগাবাবুর শরীর বিপুল—পাশ কাটাইয়া যাইবার পথ ছিল না। পিছন হইতে লাঠি মারিলে—

রামশরণ এতক্ষণে টর্চ্চ জ্বালিলেন—টর্চ্চের আলোয় বাঁ হাতটা একবার দেখিলেন—হাতখানা একবার চোরের অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল—এবং একটা চট্‌চটে কিছু যেন তিনি অনুভব করিতেছিলেন। দেখিলেন—হাতময় তেল লাগিয়া গিয়াছে। তিনি আজ নিঃসন্দেহ হইলেন—টপকেশ্বর বিদেশ হইতে ছটকাইয়া আসিয়াছে। লোকটা সিঁদেল চোর, দেহ তৈলাক্ত করিয়া যাওয়ার পদ্ধতিটাই সিঁদেল চোরের; সিঁদের মধ্যে পা পুরিলে কেহ যদি পা চাপিয়া ধরে তবে টানিয়া লইবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা সদুপায় আর কিছু হইতে পারে না। আরও বুঝিলেন—সঙ্গীর অভাবেই সহধর্ম্মিণীর—সহোদর সিঁদ না দিয়া বাসন চুরি করিয়া ফিরিতেছে। গোল লাগিল এক জায়গায়, সাপ বাঘের শক্তি পাইল কি করিয়া? সিঁদেল চোরের বিবর লইয়া কারবার—সে এমন লাফ দেয় কেমন করিয়া?

ইহার পরদিন হইতেই চুরি বন্ধ হইয়া গেল। পুরা একমাস বন্ধ থাকিয়া আবার একদিন চুরি হইল; এবার চুরি ভোর-রাত্রে। শম্ভু ঘোষ হলপ করিয়া বলিল—রাত্রি তিনটার সময় সে বাহিরে উঠিয়াছিল, তখনও রান্না ঘরের তালা অটুট ছিল।

কটমট শব্দে রামশরণ দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিলেন—রাত্রি তিনটে! ওরে, শেয়াল ক'বার ডেকেছিল?

শম্ভু হাঁ করিয়া রহিল।

রামশরণ বলিলেন—রাত্রি ক'পহর হয়েছিল রে বেটা তাই বল্। শেয়াল ডাকা না শুনে থাকিস, ভুঙ্কো তারা উঠেছিল কি না বল্। রাত্রি তিনটে! বেটার চালে যেন টাওয়ার ক্লক বাজে! রাত্রি তিনটে!

শম্ভু সবিনয়ে বলিল—আজ্ঞে আমার ঘড়ি আছে।

রামশরণ অপ্রস্তুত হইয়া আরও চটিয়া উঠিলেন—বলিলেন—বাজে? না, বাজে না?

—বাজে। আমি ফিরে এসে শুলাম আর তিনটে বাজল।

—হুঁ! আচ্ছা যা, বাড়ী যা।

ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতমুখী হইল। রামশরণ—আবার ডাকিলেন—শোন্।

—আজ্ঞে।

—বাড়ীতে কলাগাছ আছে?

—আজ্ঞে আছে।

—তবে বাসনগুলো সিন্দুকে পুরে, কলাপাতা কেটে ভাত খাবি। আর জলখাবি নারকেল মালায়—বুঝলি।

ঘোষ সবিনয়ে 'যথা আজ্ঞা' জানাইয়া প্রস্থান করিল। ক্রোধে লজ্জায় ক্ষোভে রামশরণের চোখে জল আসিল। সাঁতরাগাছির ওলের মত পুলিশ-সাহেবের চাঁচাছোলা রক্তরাঙা মুখখানি মনে পড়িয়া মনে হইল—মাথায় একটা লোহার ডাণ্ডস মারিয়া সে আত্মহত্যা করে!

দশদিন চোরের একদিন সাধুর—একথাটার আধ্যাত্মিক সত্যতা অস্বীকার করিয়াও বৈজ্ঞানিক সত্যতা না মানিয়া উপায় নাই। বিবরে বাস করিয়া—জনহীন পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে সাপ ঘোরে ফেরে—সেই সাপও একদিন মানুষের সম্মুখে পড়িয়া যায়।

চোরকেও একদিন গৃহস্থের সম্মুখে পড়িতে হইল।

কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর কাস্তের মত চাঁদ সবে পূর্ব্বদিগন্তে উঠিয়াছে, শরতের নির্ম্মলনীল আকাশপটের প্রতিফলনে অন্ধকার অতিমাত্রায় স্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিয়াছিল। অমৃত ঘোষাল দরজা খুলিয়া বাহির হইয়াই দেখিল—একটা লোক বসিয়া গামছায় বাসন বাঁধিতেছে। ঘোষাল লোকটা গোঁয়ার এবং বুদ্ধিমান—দুই-ই। একবার ভাবিল—ঝাঁপ

দিয়া লোকটার উপর লাফাইয়া পড়ে, পরক্ষণেই মনে হইল যদি লোকটার কাছে অস্ত্র শস্ত্র কিছু থাকে! দ্বন্দ্বটা মুহূর্ত্তের। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তের অবকাশেই টপকেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল—পরমুহূর্ত্তেই ছুটিয়া গিয়া পাঁচিলের উপর একটা হাত দিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে পাঁচিলের উপরে উঠিয়া বসিল; তাহার পর আর নাই।

ঘোষাল 'চোর-চোর' চীৎকার করিতে করিতে দরজা খুলিয়া ছুটিল। চোরকে সে চিনিয়াছে। চোর শশী!

শশীর বাড়ীতে আসিয়া দেখিল ঘরের দরজা বন্ধ, কিন্তু শিকলটা মৃদু মৃদু দুলিতেছে। মুখুজ্জে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল, দরজায় লাথির উপর লাথি মারিয়া সে ডাকিল—হারামজাদা শালা!

নামটা পর্য্যন্ত সে তখন ভুলিয়া গিয়াছে।

শশী ঘরের মধ্যে রোগযন্ত্রণায় কাতরাইতেছিল। সবিনয়ে সকাতরে সে উত্তর দিল—আজ্ঞে—কে মশয়?

ঘোষালকে আর পরিচয় মুখে দিতে হইল না, এবারকার প্রচণ্ড পদাঘাতে জীর্ণ কুটীরের দরজার খিল ভাঙিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল—ঘোষাল শশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—আমি।

খোলস নয় কালোসাপ ফণা তুলিয়া বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সক্ষম শশী একেবারে মুখুজ্জের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি?

খপ করিয়া শশীর একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া ঘোষাল অপর হাতটা তাহার বুকের উপর রাখিল। মুখুজ্জের হাতে কি লাগিয়া গেল—কিন্তু শশীর বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারিতেছে! ঘোষাল বলিল—শালা চোর!

শশী বলিল—ঠাকুর, বাড়ী যাও, তোমার বাড়ীতে আর চুরি হবে না। আমি দিব্যি করছি।

একটু দূরে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল, ঘোষালের ডাকে লোক উঠিয়া এই দিকেই আসিতেছে। রামশরণ দারোগার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শোনা গেল—ওরে শালা, গায়ে কাদা মেখে যমকে ফাঁকি দেবার মতলব! শালার বুকে চ'ড়ে আজ হাঁটব আমি, কাদা বানাব শালাকে! কীচকবধ করব আজ!

সাহস পাইয়া অমৃত এবার শিখণ্ডী বিক্রমে আস্ফালন করিয়া উঠিল—একটা অতি অশ্লীল গাল দিয়া—কি বলিতে গেল; কিন্তু গালটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র সজোর আকর্ষণে—হাতখানাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শশী মুহূর্ত্তে একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়া দিল। ঘোষাল প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টা করিল; চোখের সম্মুখে ছায়াবাজির মত কাল দীর্ঘ কি একটা ধূসর আবছায়ার মধ্যে মিলাইয়া গেল, কানে আসিল লঘু দ্রুত একটা ক্রমবিলীয়মান শব্দ।

লোকজন এবং দারোগা যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন অমৃত আত্মস্থ হইয়াছে, কিন্তু শশী নাই।

রামশরণের তাণ্ডবনৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়া কয়জন চৌকিদার, দফাদার ও কনেস্টবলকে ছুটাইয়া দিলেন। জনতার সকলেই প্রায় শেষরাত্রির রহস্যঘন আবছায়ার দিকে চাহিয়া শশীকে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রত্যেকেরই চোখের সম্মুখে আবছায়া যেখানে ঘন হইয়া উঠিয়াছে—সেইখানে দীর্ঘ কালো একটি মূর্ত্তি যেন নাচিতেছে! সকলেই বলে—ওই! নয়?

রামশরণ সহসা গম্ভীর মুখে অমৃতের কাছে আসিয়া বলিল—এই বেটা বাম্‌না—ঘরের দরজা ভেঙে পালোয়ানী করতে গেলি কেন? শেকল দিলি না কেন?

ঘোষাল একটু ভয় পাইয়া গেল, সে গালে হাত বুলাইয়া বলিল—আমার দুর্ম্মতি ছাড়া কি বলব, বলুন?

—হুঁ। কোন্ গালে চড় মেরেছে দেখি?

ঘোষাল লজ্জিতভাবেই দেখাইল—বাম গালটি দারোগার দিকে ফিরাইয়া বলিল—বেকায়দায়—আর আমি বুঝতে পারি নাই ঠিক।

রামশরণ টর্চ্চ জ্বালিলেন—দেখিলেন পাঁচটি সোঁটা-সোঁটা দাগ একেবারে রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দর্শকদের সকলেই বলিয়া উঠিল—এঃ!

একজন বলিল—সাঙ্ঘাতিক চড় মেরেছে রে বাবা!

রামশরণ অত্যন্ত খুশী হইলেন—ঘোষালের মুখের কাছে অত্যন্ত বিনয়-সহকারে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—বে—শ করেছে! তাঁহার ইচ্ছা ছিল—শশী একচড় মারিয়া গিয়াছে বাম গালে—তিনিও একখানি চড় কষিয়া দেন উহার ডান গালে। কিন্তু আইন বড় কড়া।

হাতের মাছ জলে চলিয়া গেল, হাতের আসামীকে ফেরার করিয়া দিল!

* *

শশী সত্য সত্যই ফেরার হইল।

কিন্তু জীর্ণ শশী এই রোমাঞ্চকর চৌর্য্যপর্ব্বের ক্ষিপ্র সুকৌশলী নায়ক, বাতরোগে পঙ্গুপ্রায় শশীই সেই টপকেশ্বর, এ কথা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। গ্রামের লোক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। রামশরণ বলিলেন—হারামজাদা বেটার রক্তের দোষ, নইলে চুরি করতে গেল কেন? যাত্রা থিয়েটারে এ্যাক্টো করলে ও-বেটার ভাত খায় কে? উঃ কি রকম বেতো-রোগী সেজে ব'সে থাকত বল দেখি। আগাগোড়া বেটার বজ্জাতি!

রামশরণের খানিকটা ভুল হইল, 'আগা' অর্থাৎ শেষের দিকটা শশীর বজ্জাতি—কিন্তু গোড়াটা নয়। গোড়ায় তাহার সত্যই রোগ হইয়াছিল। সে-রোগ যেমন-তেমন নয়, তাহাকে একেবারে পঙ্গু-শয্যাশায়ী করিয়া তুলিয়াছিল। আর সে কি তীক্ষ্ণ প্রাণান্তকর যন্ত্রণা। শশীর ছেলে হাবল তখন বাড়ীতে, রোগের আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শশী নিজেই ছিল ডোমদলের সিংহ; তখন তাহার বাড়ীতে চালচলন প্রায় সামন্ততান্ত্রিক আমলের ছোটখাট বর্ব্বর সামন্তপতির মত। স্ত্রী ছাড়া সেবা করিবার জন্য আরও দুইটি স্ত্রীলোক শশীর ছিল, জোয়ান ছেলে হাবলের ছিল একটা। শশী পাকি-মদ ছাড়া খাইত না। ছাগল ভেড়ার পাইকার ইছু সেখের আনাগোনার বিরাম ছিল না। সপ্তাহে দুই-তিনটা বৃহদাকার খাসী সে শশীর বাড়ীতে বাঁধিয়া দিয়া যাইত। নবীন স্বর্ণকারের রূপার চুড়ি, সোনার নাকচাবী, কানের টাপ তৈয়ারী করিয়াই দিন যাইত। আজ কিনিয়া দশদিন পর আধা দামে বন্ধক দিত—অথবা বিক্রয় করিত। আবার বিশ দিন পর নূতন কিনিত।

এই সময়েই শশী রোগে পড়িল। শশী একটা ডুলি ভাড়া করিয়া ধর্ম্মরাজের শরণাপন্ন হইল, শুধু ডুলি নয়—সঙ্গে সঙ্গে একখানা ভাড়ার গাড়ী—গাড়ীতে গেল—স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূ ও হাবল।

সপ্তাহখানেক না যাইতেই শশী অস্থির হইয়া উঠিল, হাবলকে ডাকিয়া দাঁত কিষ কিষ করিয়া বলিল—আমাকে মেরে ফেলবি না কি—তুই মনে করেছিস কি?

হাবল বলিল—অই—তুমি বলছ কি? রোগ কি তোমার আমি ক'রে দিয়েছি না কি?

ভীষণ ক্রোধে শশী চীৎকার করিয়া উঠিল—হারামজাদা শালা—কাটা গাছের মত আমি প'ড়ে থাকব কতদিন শুনি?

হাবল শশীকে ভয় করিত, বাপ বলিয়া নয়—বনের পশুতে যে হিসাবে বাঘকে ভয় করে—সেই হিসাবে ভয় করিত; একা হাবল নয়—এই ডোম-পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করিত। হাবল এবার মিষ্ট করিয়া বলিল—তা আমি কি করব বল?

—ডাক্তার নিয়ে আয়—হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে। ফুঁড়ে ওষুধ দিক। এমন শুয়ে থাকতে আমি পারছি না। ··· শালার ধর্ম্মরাজ —! অকস্মাৎ সে ধর্ম্মরাজকে গালিগালাজ আরম্ভ করিল।

সত্যই—এ অবস্থা শশীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে হাবল যখন ঘন অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্র পদক্ষেপে উঠান পার হইয়া বাহির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া যাইত—শশী তখন অস্থির হইয়া উঠিত; মুখে লাথি মারিয়া সে-দিন সে একটা সেবাদাসীর সামনের দুইটা দাঁতই ভাঙ্গিয়া দিল। মেয়েটা সেই রাত্রেই পলাইয়া গেল। পাড়ায় সন্ধ্যায় যখন গান বাজনার আসর বসিত—তখন শশী গালিগালাজে বাড়ীটাকে কদর্য্য করিয়া তোলে; কিন্তু বাড়ীটা নির্জ্জন—শুনিবার কেহ নাই, শশী আক্রোশে ক্রোধে উন্মত্ত অধীর হইয়া ওঠে। স্ত্রী কন্যা, পুত্র পুত্রবধূ, সেবাদাসী—সব—চলিয়া গিয়াছে—গান বাজনার মাতনে মাতিয়া কেহ হা-হা করিয়া হাসিতেছে—কেহ গান ধরিয়াছে, কেহ নাচিতেছে। শশী একদিন চেষ্টা করিল ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে। না-পারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিল। এমনই অস্থিরতার মধ্যে শশী ধর্ম্মরাজকে গালি-গালাজ করিয়া হাবলকে ডাক্তার আনিতে হুকুম করিল। হাবল ডাক্তারই লইয়া আসিল। ডাক্তার ইনজেকসন দিতে আরম্ভ করিলেন। শশী মিনতি করিয়া বলিল—ভাল ক'রে দেন আমাকে ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে একটা সোনার 'আঙ্গুটি' গড়িয়ে দোব।

ডাক্তার হাসিলেন।

ঠিক এই সময়েই আরম্ভ হইয়া গেল—বি-এল কেস।

আসামীদের মধ্যে শশীও ছিল—এবং সেই ছিল প্রধান আসামী। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের আপিসেই বিচার

হইতেছিল। পঙ্গুপ্রায় শশী একখানা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইত, সেখানে হাবল এবং আর একজন তাহাকে জড় একখানা প্রস্তরখণ্ডের মতই ধরাধরি করিয়া একস্থানে বসাইয়া দিত। এইখানেই তাহার ভাণ শিক্ষার হাতে খড়ি। আপনার অজ্ঞাতসারেই সে সত্যকার অবস্থার অপেক্ষাও অনেক বেশী আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত। নাকের ডগায় মাছি বসিলেও সে হাত নাড়িত না, চোখের তারা দুইটাকে নাকের পাশে আনিয়া মাছিটার পাখার-কম্পন ও পা-নাড়া দেখিত, মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া মনে মনে মাছিটাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়া মাথা নাড়িয়া মাছিটাকে তাড়াইত।

ইহাতেই সে খালাসও পাইয়া গেল। হাকিম যথেষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তাহার অবস্থা দেখিয়া জেলে পাঠাইলেন না; পুলিশ ডাক্তারকে সাক্ষী মানিয়াছিল—তাহারই কথার উপর নির্ভর করিয়া হাকিম তাহাকে রেহাই দিলেন। ডাক্তার সত্য কথাই বলিয়াছিল—সে শশীর চিকিৎসা করিতেছে, দুরন্ত বাত ব্যাধিতে সে আক্রান্ত। এ রোগ সারিতেও পারে, না সারিতেও পারে—সারিলেও অচিরে সারিবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধই তাহার যথেষ্ট শাস্তি’ বিবেচনায় তাহাকে বাদ দিয়া হাকিম অপর সকলের উপর দীর্ঘ কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

কোর্ট রুমের বাহিরে আসিয়াই শশী কদর্য্য ভাষায় ডাক্তারকে গালি-গালাজ আরম্ভ করিল; শালা খুনে-মানস্যুরে-জোচ্চোর! ভাল হবে না তো ফাঁকি দিয়ে টাকা নিলি কেনে আমার, প্যাট-প্যাট ক’রে ফুড়ে ফুড়ে আমাকে মারলি কেনে? ছোট ছেলের মত সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছিল।

তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ছেলে-ভাইপো, ভাগ্নে-জামাই—সবাই চলিয়া যাইবে; সে এই অক্ষম পঙ্গু দেহ লইয়া না খাইয়া শুকাইয়া মরিবে, স্ত্রী-কন্যা সকলকে শুকাইয়া মারিবে, বধূরা পলাইয়া গিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিবে, সব দেখিতে হইবে। মাল-সামালদারেরা একটি পয়সা দূরে থাক একমুঠা চাল দিয়াও সাহায্য করিবে না। অন্তত, ডাক্তার যে কথা আজ আদালতে হলপ করিয়া বলিয়াছে—তাহার পর ইহা নিশ্চিত। চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না, আক্রোশে-আক্ষেপে দুর্দ্দান্তভাবে আপনার বুক চাপড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল; হাত সে নাড়িতে পারে—কিন্তু হাত নাড়িতে তাহার সাহস হইল না। চারিদিকে লোক। দুইজন কনেস্টবল অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। মোটর গাড়ীর পা-দানে পা রাখিয়া হাকিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টবাবুর সহিত কথা বলিতেছেন।

ডোমেরা আপীলও করিয়াছিল। কিন্তু দুই-চারিমাস করিয়া দণ্ড-লাঘব ছাড়া অন্য কোন ফল হইল না। খালাস কেহ পাইল না।

সেদিন ডোমেদের আত্মসমর্পণের দিন। সদরে গিয়া আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সমস্ত পাড়া জুড়িয়া কান্নার রোল উঠিল। কনেস্টবল দারোগা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। এত দুর্দ্দশার মধ্যেও গত রাত্রে খাসী কাটিয়া মাংস রান্না হইয়াছিল। বিদায়-ভোজ জাতীয় ব্যাপার। ইংরেজী ফ্যাসনের অনুকরণে নয়—তিন পুরুষ ধরিয়া তাহাদের এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বাসী মাংস ও ভাত খাইয়া—পান মুখেদিয়া ডোমেরা ম্লানমুখে চলিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে গেল। ষ্টেশনে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া ফিরিবে। পথে বাহির হইয়া তাহারা চীৎকার করিয়া কান্না বন্ধ করিল। এখন তাহারা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। ফিরিবে তাহারা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে। এই নিয়ম। জনশূন্য ডোম-পল্লীতে পড়িয়া রহিল শুধু দুটি পুরুষ। শশী আর শশীর দাদা অভিলাষ। শশী পঙ্গু—অভিলাষ অন্ধ।

শশী মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। অকস্মাৎ সে মাথা তুলিয়া দেখিল—সকলে চলিয়া গিয়াছে। সে ঘাড় উঁচু করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল—কিছুই দেখা গেল না—ঘাড় উঁচু করিয়াও পাচিলের ওপার নজর হয় না। সম্মুখস্থ খুঁটিটাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া একটু সে উঁচু হইতে চেষ্টা করিল। এবার মাথাগুলা দেখা যায়। আরও একটু ভর দিয়া—আর একটু—আরও একটু—হ্যাঁ, এইবার সকলকে দেখা যাইতেছে। সারি সারি সব চলিয়াছে—ওই যে হাবল। নূতন পুকুরের উঁচু পাড়ের আড়ালে দলটা অদৃশ্য হইয়া গেল। শশী এবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া—আনন্দে উল্লাসে একটা উৎকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাষাহীন

আদিম মানুষের উল্লাসধ্বনির মত সে ধ্বনি বর্ব্বর উচ্চ অকপট!

সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে! কিন্তু পরক্ষণেই সচকিত হইয়া সে বসিয়া পড়িল। কে কোথায় মানুষ আছে কে জানে!

* * *

সে-দিন সমস্ত দিন ধরিয়া শশী গভীর ভাবনা ভাবিল। শুধু নিজের ভাবনা নয়, স্ত্রী-কন্যা আত্মীয় বালক শিশু—সমগ্র ডোম পাড়ার মেয়ে ও ছেলেদের ভাবনা সে ভাবিল। গণিয়া হিসাব করিয়া সে দেখিল—সর্ব্বসমেত চৌদ্দটি মেয়ে—ছয়টি ছেলে। দুইটা ছেলে বেশ ডাঁটো হইয়া উঠিয়াছে, রাখালী করিয়া নিজের ভাতকাপড় তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে—উপরন্তু সংসারে কিছু দিতে পারিবে। এছাড়া রাত্রে বাহির হইবার যোগ্যতা তাহাদের না হইলেও দিনের সুযোগে এবং সন্ধ্যাতেই আঁচল ভরিয়া ধান চাল—তরি-তরকারি আনিবে।

পরক্ষণেই সে শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল—আজিকার প্রাতঃকালে ডোম জোয়ানদের সেই শোভাযাত্রা—মনে পড়িল সমগ্র পাড়াটার অসহায় অবস্থা। না—আর চুরি নয়, চুরি আর কাহাকেও সে করিতে দিবে না। নিজের হাত দুইটা সঞ্চালন করিয়া সে দেখিল—সে পারিবে, ডোম-কাটারি লইয়া বাঁশের-তালপাতার কাজ সে বেশ করিতে পারিবে। মেয়েগুলা তালপাতার চাটাই বুনিবে, পাতার শির দিয়া ঝাঁটা বাঁধিবে, বাঁশের ছিলকা দিয়া পাখা, ডালা, কুলা, সাজি তৈয়ারী করিবে—সে নিজে মোড়া তৈয়ারী করিবে, খল্‌পা বুনিবে। এছাড়া আর উপায় নাই—যুবতী কন্যা বধূগুলি অভাবের অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে বাঁধভাঙ্গা জলের মত অধীর মুক্তি দিয়া যাহা করিয়া বসিবে সে কল্পনা করিয়া রুগ্ন শশীর শীতল রক্ত যেন জমিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তাহার মনে পড়িল—সে যেবার প্রথম জেল যায়—সেবারও এমনি পাড়াশুদ্ধ পুরুষের জেল হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছিল—তাহার ছোট বোনটা ঝুমুরের দলে পলাইয়া গিয়াছে, তাহার প্রথম পক্ষের কিশোরী বধূটা গ্রামান্তরে পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে। পাড়ার তিনটা মেয়ে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। বাকী মেয়েগুলির অর্দ্ধেকেরও বেশী কুৎসিত ব্যাধিতে ভুগিতেছে।

শশীর স্ত্রী একটু হাবা গোছের, সে বলিল—ঘুম আইচে না কি গো?

শশী বলিল—হাঁ।

হাবলের সেবাদাসীটা আজ স্টেশন হইতেই ভাগিয়াছে, সে আর ফেরে নাই। শশী ঠিক করিল—তাহার সেবাদাসীটাকেও সে কাল খেদাইয়া দিবে। পরক্ষণেই মনে হইল—না, মেয়েটা তালগাছে চড়িতে পারে, তাহার উপর কর্ম্মঠ, ডোমের কাজ সে ভালই জানে। তাড়াইতে হইলে ওই হাবা বউটাকেই তাড়াইতে হয়। কিন্তু সে হাবলের-মা, সরলার-মা; তাহার উপর শশীর অনুপস্থিতিতে হাজার অভাবেও অন্যায় সে কিছু করে নাই। আর শশীর যতবার জেল হইয়াছে—ততবার সে যে বুক-ফাটা কান্না কাঁদিয়াছে, সে শশীর বুকে যেন গাঁথা হইয়া আছে।

রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, পাড়াটা আজ নিস্তব্ধ। মনে হয় যেন গভীর রাত্রি। শশী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল—অকারণে।

শশীর স্ত্রী আনন্দবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—অই—অই—তুমি উঠে দাঁড়াইচ লাগছে! ওলো সর্‌লা।

ফেউ ডাকিলে বাঘ যেমন ভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করে, শশীও ঠিক তেমনি ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—অ্যা—ও!

শশীর স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া গেল, শশী বলিল—একটি একটি করিয়া দৃঢ় কঠিন স্বরে—টুঁটিতে পা দিয়ে মেরে দোব—কাউকে বলবি তো।

সমস্ত বাড়ীটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শশী আবার বলিল—পুলিশ জানতে পারলে আমাকে শুদ্ধ জেলে পাঠাবে আবার।

আবার উঠিয়া সে দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পাড়াতে সেই ব্যবস্থাই শশী প্রবর্ত্তিত করিল—কঠোর দৃঢ়তার সহিত—বর্ব্বরজাতির রাজার মত। বলিল—আমার তো মরণদশাই হয়েছে, খুন ক'রে না হয় ফাঁসিই যাব!

অন্ধ অভিলাষও আসিয়াছিল, সেও শশীকে সমর্থন করিল—বৃদ্ধ অপারগ মন্ত্রীর মত। সদ্য আপনজন-বিচ্ছেদে সকলেই আধ্যাত্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, সকলেই এ কথা মানিয়া লইল।

ডোম-পাড়ায় উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস-বিলাসের পরিবর্ত্তে একটা কর্ম্মপ্রবণতার সাড়া পড়িয়া গেল। একদিন দারোগা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন—তুই বেটার নাম পাল্টে দিলাম রে শশী। ঋষি বলে ডাকব তোকে—তুই বেটা ঋষি বনে গেছিস।

শশী সকৃতজ্ঞ হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া প্রণাম করিবার জন্য উঠিল। দারোগা বলিলেন—দাঁড়াতে পেরেছিস?

শশীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে লাঠিটা টানিয়া লইয়া ভর দিয়া অতিকষ্টে দুই পা হাঁটিয়া দারোগাকে প্রণাম করিয়াই কাঁপিতে লাগিল—ভয়ে সে সত্য সত্যই কাঁপিতেছিল। দারোগা বলিলেন একটু একটু ক'রে অভ্যেস করিস হাঁটা—নইলে পা জমে যাবে।

দারোগা নিজে একটা সাজি, একটা মোড়া এবং খানকয়েক পাখা কিনিয়া লইয়া গেলেন।

শশী উঠিয়া বিনা লাঠিতেই ধীরে ধীরে দাওয়ায় আসিয়া বসিল। দিন কয়েক অপেক্ষা করিয়া সে লাঠি হাতে পাড়ায় বাহির হইল। কিন্তু যন্ত্রণায় মুখ মুহুর্মুহু বিকৃত হইতেছিল। পাড়ায় বটগাছটার ছায়ায় বসিয়া মেয়েগুলি ক্ষিপ্র হাতে বাঁশ তালপাতা লইয়া কাজ করিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু সে কয়দিন?

মাস তিনেক পরেই একদিন সে শুনিল—একটা টেড়িকাটা ছোঁড়া শিষ দিতে দিতে পাড়ায় যাওয়া-আসা করিতেছে। সে কতকগুলা ঢেলা সংগ্রহ করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা হইতেই সে সতর্ক ছিল—শিষের শব্দ শুনিয়া শব্দভেদী বানের মত এমন ঢেলা ছুঁড়িল যে শিষ বন্ধ হইয়া গেল।

শশী চীৎকার করিয়া হাঁকিয়া বলিল—কাস্তেতে ক'রে শালার জিভ কেটে লোব। শিষ দেবে—আমার পাড়ায়!

শিষ বন্ধ হইল, কিন্তু দূর হইতে সিটি বাঁশী বাজা সুরু হইল। শশী খোঁজ করিয়া দেখিল—পাড়ার কাজ অর্দ্ধেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিল—মেয়েগুলার পরণে বাহারে পাড় মিলের শাড়ী। সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এই দেখ, খুন ক'রে ফেলাব আমি।

শশীর ভাইঝি—অভিলাষের কন্যা সুরধনী মুখরা মেয়ে, সে আবার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে—সে মুখের উপর জবাব দিল—ভাতকাপড় দিবি তু? আমি উ খাট্‌নি খাটতে লারব। বলিয়াই সে ছুটিয়া পলাইল। শশীর ইচ্ছা হইল সেও ছুটিয়া গিয়া হারামজাদীকে ধরিয়া টুঁটিটা টিপিয়া ধরে; কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করিল। দিন তিনেক পরেই শশী সকালে উঠিয়া শুনিল—সুরধনী গত রাত্রে পলাইয়াছে। এখানকার ধান-কলের ছোকরা মিস্ত্রি তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। শশী আপনার উঠানে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত অস্থির পশুর মত ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তাহার কন্যা সরলাও ছিম-ছাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে, হাবলের বউটা বাপের বাড়ী গিয়া আর কিছুতেই আসিতেছে না। পদচারণার অস্থিরতা তাহার বাড়িয়া গেল। আকাশ-পাতাল চিন্তায় সে অধীর হইয়া উঠিল। অভিলাষের বউ কাঁদিতেছে, সুরধনীর দৌলতেই তাহাদের ভাত-কাপড় জুটিতেছিল। শশীর দৌরাত্ম্যেই সে দেশ ছাড়া হইল।

অপরাহ্নে শশী বাড়ীর সম্মুখে গাছতলায় বসিয়াছিল, দেখিল স্ত্রীর হাত ধরিয়া অভিলাষ চলিয়াছে; অভিলাষের স্ত্রীর হাতে একটি ছোট ডালা! সে চমকিয়া উঠিল—বলিল—কোথা চল্লি দাদা?

অভিলাষ উত্তর দিল না।

শশী আবার ডাকিল—দাদা!

অভিলাষ তবু উত্তর দিল না।

সক্রোধে শশী বলিল—ওরে শালা কানা, বলি কালাও হয়েছিস না কি?

অভিলাষও গর্জ্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল—কি বললি হারামজাদা!

—বলি, চল্লি কোথা?

—মরতে। ভিখ করতে চললাম।

—ভিখ করতে? বেনো ডোমের ছেলে হ'য়ে তোর মরণ নাই—কানা ভেঁড়া—

অভিলাষের অন্ধচক্ষুও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু দিবি আমাকে খেতে?

—দোব। ফিরে আয়।

তৎক্ষণাৎ সে দৃঢ়পদে বাড়ী ঢুকিয়া আপন সম্বল হইতে একটা সিকি আনিয়া তাহাকে দিয়া বলিল—দু আনা ক'রে পয়সা তোকে আমি রোজ দোব। খবরদার, বাড়ী থেকে পা বার করবি না।

অভিলাষ ফিরিয়া গেল। কিন্তু তাহার বউ আপত্তি করিল—তোর কাছে ভিখ লোব কেনে ?

শশী একটা আঙুল দেখাইয়া বলিল—বাড়ী যা !

অভিলাষের বউ আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

রাত্রেও সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

সহসা তাহার মনে হইল তাহারই বাড়ীর পিছনে কে ফিস ফিস করিয়া কথা বলিতেছে। মনটা তাহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—বিদ্যুৎরেখার মত মনে একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল—ছিম-ছাম সরলার ছবি। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিল—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে ঠাওর করিয়া দেখিল, একটা লোক দাঁড়াইয়া উপরে কাহার সহিত কথা বলিতেছে। কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিল—উপরের জানালায় কথা বলিতেছে সরলা। সে একটা ঢেলা তুলিয়া সজোরে ছুঁড়িল লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া—ঢেলাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বোঁ শব্দ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। লোকটা ছুটিয়া পলাইল—ক্রোধে আত্মহারা শশী আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—সেও ছুটিল। কিছুক্ষণ পর সে অনুভব করিল—অন্ধকারের মধ্যে লোকটা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে একটা বিপুল উল্লাস অনুভব করিল। আকাশ-পাতাল জোড়া নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটিয়াছে—; বুকটা ধড় ধড় করিতেছে, যেন ফাটিয়া যাইবে—তবুও এ কি উল্লাস। হাউইয়ের অগ্নিবর্ষী উল্লাসের সঙ্গেই তাহার এ উল্লাস তুলনীয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিয়া সে নিঃশব্দ সঞ্চরণে গ্রামের গলিপথ ধরিয়া চলিল। গলিপথের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে তাহার প্রবৃত্তি যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছিল। এক জায়গায় সে থমকিয়া দাঁড়াইল। চাটুজ্জের বাড়ী। বাড়ীর উঠানে প্রকাণ্ড দুইটা ধানের গোলা। চাটুজ্জে বিদেশে থাকে—বাড়ীতে আছে দুটি স্ত্রীলোক। সে হাত তুলিয়া পাঁচিলের মাথা ধরিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল; মুহূর্ত্তে সে উপরে উঠিল। আপন শক্তিতে আপনিই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সন্তর্পণে নীচে লাফ দিয়া পড়িয়াই তাহার মনে হইল সে করিয়াছে কি ? ধান সে লইবে কি করিয়া ? বস্তা তো আনে নাই ! সেই মুহূর্ত্তেই উচ্ছিষ্ট-ভোজী বিড়ালটার পায়ের চাপে বাসনের শব্দ উঠিল—ঠুং-ঠাং।

শশী বিস্ফারিত নেত্রে বাসনগুলার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে অনেক কথা মাথার ভিতরে হু হু করিয়া খেলিয়া গেল। ধানের বোঝা অনেক ভারী, হাজার সুস্থ হইলেও সে শক্তি তাহার আর নাই, অল্প বাসনে দাম বেশী হইবে, ধান চুরিতে সঙ্গীর প্রয়োজন—বাসন একাই চলিবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বসিয়া পড়িল—আলনা হইতে একখানা গামছা টানিয়া বাসনগুলি বাঁধিয়া—সে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। দুয়ারটা খুলিতে গিয়া দেখিল—দুয়ারে তালা। চাটুজ্জে গিন্নী হুঁসিয়ার লোক ! সে হাসিল। পরক্ষণেই সে পাঁচিলের দিকে ফিরিল। একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। জেলখানায় এক বন্ধু তাহাকে বলিয়াছিল, চুরিতে দুয়ার লইয়া কারবার মানা—কারণ, দুয়ারের সম্মুখেই থাকে পথ—আর দুয়ার খুলিতে গেলেই শব্দ। দুয়ার লইয়া কারবার ডাকাতের—যাহারা দুয়ার রাখিতে পারিবে শক্তিবলে, তাহাদের। শশীই বলিয়াছিল—যদি ঠ্যাং চেপে ধরে ?—

বন্ধু উপদেশ দিয়াছিল—তেল মেখে যেয়ো। একটানেই 'তেলই—হাত পিছুলে গেলি'।

ভাবিতে ভাবিতে সে পাঁচিলের উপর উঠিয়া পড়িয়াছিল। লাফাইয়া পড়িল নিরাপদ গলিতে। মনে মনে বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল শশী।

তার পর শুধু অভাব পূরণ নয়—এ এক নেশা। একটা খেলা !

মহাজন চন্দ মহাশয় তাহার মাল সামালদার। সে তাঁহার সারকুঁড়ে পুঁতিয়া মাল রাখিয়া আসে। দর, থালায় আট আনা, বাটি গেলাসে চার আনা—তাই সে শুধু থালাই লইয়া থাকে।—দিনে পঙ্গুর মত বসিয়া কাতরায়।

ভুল হইয়া গেল—অমৃত ঘোষালের বাড়ীতে; কয়েক মুহূর্ত্তের ভুল।

* *

একটানা প্রায় মাইল দেড়েক দৌড়িয়া সে থামিল নদীর ধারে। নদীর জল অবশ্য নাই—সুতরাং বাধার জন্য নয়; বুকের ভিতর ফুসফুসটা যেন আর শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আরও—পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হইয়া আসিয়াছে। নদী পার হইয়াই লোকালয়ের পর লোকালয়; —মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে বাদসাহী শড়ক—ঘণ্টাখানেকের

মধ্যেই পথটা জাগিয়া উঠিবে যেন আমীরী চালে। গাড়ী গরু লোকজন-কলরব-ধূলায় ভরিয়া উঠিবে। নদীর ঘাটের বাঁ দিকে একটা জঙ্গল—মহাশ্মশান বলিয়া প্রসিদ্ধ—ওখানে নাকি পুস্কঁরা কাটায় ; মানুষ ওদিকে যায় না। শশী ওই বাঁ দিকেই ফিরিল। দিগন্ত শিখরে সূর্য্য তখন উঠি-উঠি করিতেছে—শশী নিশাচরের মত অরণ্যের অন্ধকারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নদীর ধারের পলিমাটির উপর ঘন সন্নিবিষ্ট শীর্ণ দীর্ঘদেহী বড় বড় গাছ, নীচে কণ্টকগুল্ম সমাচ্ছন্ন। জঙ্গলটায় জানোয়ার নাই, সাপ আছে। শশী খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটা গুল্মের মধ্যে এক টুকরা পরিচ্ছন্ন স্থান বাহির করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগাধ ঘুম।

যখন সে উঠিল তখন সূর্য্য মাথার উপরে, শরতের আকাশের সূর্য্য—রৌদ্র প্রখর এবং পরিচ্ছন্ন ; শাণিত সূচের মত শরীরে বেঁধে—সেই রৌদ্র গাছের ফাঁকে ফাঁকে গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে ; এক ঝলক একেবারে মুখের উপর। পেটের ভিতরেও সূচ বিঁধিতেছিল। কাল খাইয়াছে সেই সন্ধ্যাবেলায়। তাহার উপর এই দুরন্ত দৌড়! বাপরে বাপরে! অমৃত ঘোষাল—বেটা বামনা! বেটাকে যে এক চড় কষিয়া দিতে পারিয়াছে—ইহাতেও দুঃখের মধ্যে সে আনন্দ অনুভব করিতেছে! একটা কামড় দিয়া বেটার নাকটা অথবা একটা কান কাটিয়া লইতে পারিলে সে আরও সুখী হইত। ভুল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পেটের ভিতর সূচ বিঁধিতেছে। উপায় নাই। নদীর জল সে আঁজলায় ভরিয়া পেট পুরিয়া খাইল। বাস্। এইবার এক ছিলিম তামাক—নিদেন একটা বিড়ি হইলেই আর চাই কি? তাহাতে আর রাজাতে তফাৎ কি? আঃ—দারোগাবাবুর টাঙ্গির মত গোঁফ খানিকটা ছিঁড়িয়া আনিলেও বিড়ির মত পাতায় পুরিয়া খাওয়া চলিত। নিস্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে সে আপন মনেই হাসিয়া সারা হইল। বিড়ির অভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে শুইয়া পড়িল।

—জাগিল সে সন্ধ্যায়। অন্ধকারের আভাসে অন্তরে অন্তরে তাহার চঞ্চল উল্লাস জাগিয়া উঠিল। প্রথমেই সে সন্তর্পণে জঙ্গলটার গভীর অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া একপ্রান্তে আসিয়া বসিল। সাপ জাতটাই অতি পাজী—ছুঁইলে আর রক্ষা নাই। অন্ধকার একটু ঘন হইতেই মাঠে মাঠে আসিয়া একটা আকের ক্ষেতে ঢুকিয়া বসিয়া বসিয়া আক চিবাইতে আরম্ভ করিল। মিষ্টিরস তাহার ভাল লাগে না—খানিকটা মদ হইত! মনে করিয়াই সে হাসিল—‘কাতে পড়িলে বাঘা ফড়িং খায়।’ একগাছা শেষ করিয়া সে আর একগাছা আক চিবাইতে আরম্ভ করিল।

মাঠ জুড়িয়া শেয়াল ডাকিয়া উঠিতেই সে উঠিল। প্রথম প্রহর শেষ হইয়া গেল। গ্রাম নিসুতি হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঠে মাঠে সে আসিয়া আপনাদের পাড়ার অদূরে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্তর্পণে আসিয়া ঘরের পিছনে একটা ঢিপির পাশে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

গুনগুন করিয়া কে কাঁদিতেছে! হাবলের মা। তাহাকে ডাকিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল তাহার। সে ডাকিতও—কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে খিল খিল হাসির শব্দে সে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সরলা হাসিতেছে। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া সে হিংস্র হইয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই কাহার ভারী আওয়াজ কানে আসিল—আরে তু তো বহুত রসবতী আসে। তোহার বাবা শালা তো ভাগ্‌লো, আর—তো তুহার দিন আইলো। আঁ—?

কনেষ্টবল। দারোগা পাহারা বসাইয়া রাখিয়াছে। শশী একটা হিংস্র কৌতুক অনুভব করিল। সে হামাগুড়ি দিয়া নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর আসিয়া সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত নিঃশব্দ গতিতে অগ্রসর হইল। প্রথমে কিছু আহার প্রয়োজন। তারপর ‘চন্দ’ মহাশয়কে তুলিয়া টাকা লইতে হইবে। পাঁচটা টাকা তাহার এখনও প্রাপ্য আছে। পেটের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিতেছে! খানিকটা শক্ত কিছু পেটে না পড়িলে আর চলে না! বেটা বামনা—অমৃতে ঘোষালের রান্নাঘরে ঢুকিয়া—খাইয়া দাইয়া সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে কি হয়? বেটা বামনা কিন্তু ভয়ানক পাজী!

এ বাড়ীটা কাহার? পাঁচিলগুলা নীচু—ওই যে একটা ভাঙনও আছে। সে ঢুকিয়া পড়িল। গরীবের ঘর। হইলই বা, সে চায় খাদ্য, সম্পদের সন্ধানে তো সে আসে নাই। আবার সে ভাল করিয়া দেখিল, ঘরখানা শ্যামাঠাকরুণের। ব্রাহ্মণের বিধবা—একটি মেয়ে একটি ছেলে। মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে ওপাড়ার গাঁজাখোর হরিঠাকুরের সঙ্গে।

কিন্তু এত ভাবিবার তাহার সময় নাই। সে রান্নাঘরের

দরজাটি সন্তর্পণে খুলিয়া ঢুকিয়া পড়িল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া হাঁড়িতে হাত দিল—এই ভাত—তারপর এই কড়ায় তরকারী, সে গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিল। বাঃ ঠাকরুণ রাঁধিয়াছে বড় চমৎকার! খাসা—এ যেন অমৃত!

সহসা একটা কচি ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। শশী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে সন্তর্পণে বাহির হইয়া শয়নঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিল। ওঃ ওপাশে আর একটা দরজা—ঠাকরুণ এ যে হাজার দুয়ারী বানাইয়াছে রে বাবা! আবার সে আসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। এ খাদ্য সে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ছেলেটা এখনও কাঁদিতেছে।

—অ—বিম্‌লি—বিম্‌লি! ওলো অ এগুনি! ছেলে কেনে কাঁদে লো? বিমলা সাড়া দিল—মা! বলিয়া বোধ হয় ছেলেকে টানিয়া লইল—ছেলেটা চুপ করিয়াছে। ঠাকরুণ ও ঠাকরুণের মেয়ে উঠিয়া পড়িয়াছে। কন্যা বিমলার বোধ হয় ছেলে হইয়াছে! এগুনিকে ডাকিল যে!

শশী তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিবার চেষ্টা করিল।

ঠাকরুণ বলিল—বিমলা!

—মা!

—তোর কানের ফুল দুটো আছে?

—না।

—নাই? ঠাকরুণ গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শশী স্পষ্ট শুনিল। বিমলা বলিল—তোমার ঘুম আসে নি বুঝি, মা?

—কি যে করব আমি কাল—তাই ভেবে আমার ঘুম নাই মা। কাল তুই আঁতুড় থেকে বেরুবি, দাই বিদেয় করতে হবে, এগুনি বিদেয় করতে হবে। পূজো-আচ্চা আছে। টাকা দূরে থাক—নাপতিনীকে দেবার মত চাল শুদ্ধ ঘরে নাই।

ঠাকরুণের জন্য শশীর দুঃখ হইল। মনে মনে ঠাকরুণকে প্রণাম করিয়া সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। এইবার চন্দ মহাশয়ের কাছে। তারপর সটান দশ-বিশ ক্রোশ পাড়ি! হাবল আসিয়া আপনার দেখিয়া লইবে। সরলা হারামজাদীর নাম সে মুখে আনিবে না। হাবলের মাকে সে কোন রকমে খবর দিয়া আনাইয়া লইবে।

রাত্রি শেষ প্রহর।

শশী যাইতে যাইতে দাঁড়াইল। আঃ ঠাকরুণের বড় অনিষ্ট করিয়া দিয়াছে সে: অন্যায় হইয়াছে তাহার। আঁতুড়ের খরচ, তাহার উপর সমস্ত হেঁসেল বামুনের বিধবার নষ্ট হইয়াছে। যাক গে! মরুক গে ঠাকরুণ, বুঝিয়া করিবে! সে চলিতে আরম্ভ করিল। আবার দাঁড়াইল। নাঃ—কাজটা ভাল হয় নাই। আহা বিধবা—গরীব!

সে আসিয়া ঠাকরুণের বাড়ীতে ঢুকিয়া তিনটি টাকা ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া দাওয়ার উপর রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা তাহার মনে হইল—ওই 'এগুনি'টা যদি প্রথমে উঠে তবে তো ওই মারিয়া দিবে। 'সে টাকা তিনটি কুড়াইয়া লইয়া ঠাকরুণের ঘরের দরজা দুইখানা দুইপাশে চাড়িয়া ফাঁক করিবার চেষ্টা করিল।

সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—কে? ঠাকরুণ শঙ্কিত হইয়াই ছিল—ইহার পূর্ব্বে ঘরের শিকল দেওয়া দেখিয়া বিধবা পাড়াপড়শী জড় করিয়াছিল রান্নাঘরের ব্যাপারও সকলে দেখিয়াছে।

শশীর কিন্তু আর সময় নাই—সে ফাঁক দিয়া ঠুং করিয়া একটা টাকা ফেলিল।

সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বর্দ্ধিত শঙ্কায় উচ্চতরকণ্ঠে বলিল—কে?

শশী বলিল—চেঁচিও না ঠাকরুণ, তোমার মেয়ের আঁতুড় তোলার খরচ—সে ঠং ঠং শব্দে একসঙ্গে এবার দুইটা টাকা ফেলিয়া দিল।

কিন্তু সে কথা কে শোনে? বিধবা হাঁউমাউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—চোর—চোর—শশে!

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা—ও ঘরে মেয়ে এবং এগুনিটা! শশী দাঁতে দাঁতে খামচ কাটিয়া দাওয়া হইতে উঠানে লাফ দিয়া পড়িয়াই ছুটিল। পাশের বাড়ীগুলাতেও লোক চেঁচাইতেছে। কাছেপিঠেই রামশরণ দারোগার গলা শোনা যাইতেছে। শশী গলিতে বাহির হইয়া ঠিক করিল—আজ সে দারোগার গোঁফ ছিঁড়িয়া লইবেই—যদি আজ সম্মুখে সে পড়ে। নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে সে গলির ভিতর দিয়া চলিল; কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর একটুকরা বাঁকা চাঁদ উঠিয়াছে—অন্ধকার কালকের মতই স্বচ্ছ হইয়া উঠিতেছে! গলি শেষ হইতেই সে চমকিয়া উঠিল—গলির মুখেই লোক। সে ফিরিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ও-মাথাতেও লোকের সাড়া। লোক দুইটা হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। শশী আর কোন চেষ্টা করিল না, সে হাত দুইটি বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল—মেরেন না মশায়—হেই দারোগো বাবু!

দারোগা রামশরণ মহাকৌতুকে হা-হা করিয়া হাসিয়া শশীর বুকে ক্রেপসোল জুতার একলাথি বসাইয়া দিলেন।

হাজতে বসিয়া—শশী ইসারা করিয়া একটা কনেষ্টবলকে ডাকিল—সরলার সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল এই ব্যক্তিই।

অত্যন্ত গোপনে কাছা হইতে বাকী দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—সরলাকে দিও! হোক।

সাময়িকী

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—

নানা ঘটনা হইতে এখন বাঙ্গালায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা হইতে আসন্ন দুর্ভিক্ষের আভাষই সূচিত হইতেছে। গত বৎসর পাটের মূল্য বেশী হওয়ায় এবং শেষ পর্য্যন্ত এ বৎসর সরকার পাটচাষনিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক না করায় এবার অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে ধানের চাষ কম হইয়াছে। এবার যদি ধান যথারীতি জন্মাইত তাহা হইলেও বাঙ্গালার অধিবাসীদের খাদ্যাভাব দুর হইত না। কিন্তু সময়মত বর্ষা হয় নাই বলিয়া দেশের কোথাও উপযুক্তরূপে ধান জন্মায় নাই। কাজেই কৃষক ও অকৃষক প্রায় সকলকেই ধান চাল কিনিয়া খাইতে হয়। কিন্তু এবার ইতিমধ্যেই গত বৎসর অপেক্ষা চালের মূল্য বাড়িয়া রহিয়াছে এবং প্রতিদিনই বাড়িতেছে। মাস কয়েক বাদেই হয় ত বাজারে পাট কিনিবার লোক আর পাওয়া যাইবে না। কোন কোন স্থানে গো-মড়কে গরুর অভাব দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় কৃষক ঋণ করিয়া যে চাষবাস করিবে তাহারও উপায় নাই। মহাজনী ও কৃষক-খাতক আইনের ফলে চাষীরা ও ব্যাপারীরা ঋণ পাইবে না। কাজেই বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী।

আদমসুমারি ও হিন্দুসম্প্রদায়

আগামী ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির উদ্যোগপর্ব্ব সুরু হইয়া গিয়াছে। আমরা হিন্দুনেতাদের এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কেন না, গতবারে কংগ্রেস ইহার সহিত আদৌ সহযোগিতা না করায় হিন্দুদের এতটা সংখ্যালঘিষ্ঠ হইবার সুযোগ হইয়াছে। বিশেষত, লোকসংখ্যার অনুপাতই যখন বর্ত্তমানে রাজনৈতিক প্রধান্যের মাপকাঠি বলিয়া গণ্য, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক পরিণাম যে এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িবে তাহা ত জানা কথা। কাজেই এবারের লোকগণনা যাহাতে নির্ভুল ও সঠিক হয় সেদিকে হিন্দুজনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব—

নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশনে পণ্ডিত জহরলালজী যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত তাহারই অভিব্যক্তি। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—

(১) বৃটিশ জাতির সহিত সহযোগিতা দ্বারা ভারতের বর্ত্তমান অসন্তোষ দুর করিয়া জাতীয় আদর্শ লাভ করিবার উদ্দেশে ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লীর অধিবেশনে মহাত্মাজীকে বাদ দিয়াও যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার সেইমত কাজ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। এই অসম্মতির অর্থ এই যে, বৃটিশ সরকার অনির্দ্দিষ্টকাল ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বৃটিশ জাতির পরিপোষণের আধার করিয়া রাখিতে চাহেন।

(২) বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবীই যে শুধু অগ্রাহ্য করেন তাহা নয়, ভারতের স্বাধীনমত ব্যক্ত করিবার অধিকারও স্বীকার করেন না এবং সেই জন্যই ভারতের মতামত না লইয়াই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছেন।

(৩) কমিটি স্বাধীনতার অধিকার হারাইতে রাজী নহেন।

(৪) কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্ব মানিয়া অহিংসা-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান দুঃসময়ে জাতিকে মুক্তিপথে আগাইয়া লইবার জন্য কংগ্রেস পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে গান্ধীজীকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছেন। দিল্লীতে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং যাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনায় সমর্থন করিয়াছিলেন কমিটি তাহা বাতিল করিয়া গান্ধীজীর পুনরাগমনের দ্বার খুলিয়া দিতেছেন।

(৫) কমিটি যুদ্ধেলিপ্ত সকল জাতিকে বিপদে সহানুভূতি জানাইতেছেন এবং বৃটিশ জাতি যে বীরত্বের ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছেন তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সত্যাগ্রহী বলিয়া কংগ্রেস তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষের ভাব পোষণ করেন না অথবা এমন কিছু করিতে পারেন না যাহা তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও বেশী দুঃসহ করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু আত্মবিনাশের সম্ভাবনা দেখা দিলে কংগ্রেস আত্মনিরোধে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কংগ্রেস অহিংসভাবে তাহার নিজের কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চাহে; কিন্তু আপাতত ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে অহিংস-প্রতিরোধে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত।

(৬) কমিটি পুনরায় স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিতেছেন যে, পূর্ব্বে যে-কোন প্রস্তাব করা হোক না হোক, কংগ্রেস আজও যেমন অহিংস রহিয়াছে, ভবিষ্যতেও তেমনই অহিংস থাকিবে; শুধু স্বরাজ লাভ করিবার জন্যই নয়—স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও অহিংসাই তাহার প্রধান নীতি হইয়া থাকিবে; কেন না, কংগ্রেস বিশ্বাস করে, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সকল জাতিকেই সর্ব্বপ্রকার মারণাস্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে, সকল জাতিকেই পরবশ হইতে, পরশোষণ হইতে মুক্তি দিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে সকলকেই অহিংস হইতে হইবে—স্বাধীন ভারত হইবে তাহারই পথপ্রদর্শক।

শরৎচন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ৩১শে ভাদ্র বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে অপরাজেয় কথাশিল্পী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মতিথি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঢাকায় পূর্ণিমা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ডক্টর শ্রীযুত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং কলিকাতায় চাঁদপুর সম্মিলনীর উদ্যোগে কবি শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের সভাপতিত্বে দুইটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিদ্যাসাগর কলেজ বাণীতীর্থও উৎসব করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের দান বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে যোগ্য ব্যক্তিকেই সমাদর করা হইয়াছে। তাঁহার রচিত সাহিত্য আলোচনা দ্বারা দেশবাসী উপকৃতই হইবেন।

কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলাল উৎসব—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাসভূমি কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) স্থানীয় সাহিত্য সঙ্গীতির উদ্যোগে দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকার ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং শান্তিপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত নলিনীমোহন সান্ন্যাল সভার উদ্বোধন করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। কাজেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিপূজা ও তাঁহার সাহিত্যালোচনা করিলে বাঙ্গালী জাতিই গৌরবান্বিত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য বাঙ্গালা দেশকে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর করিবে।

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী বিল—

বহু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনের পর বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি দোকান কর্ম্মচারী বিলটি গৃহীত হইয়াছে। ইহা এখন ব্যবস্থাপরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইবার পর বিলের প্রধান প্রধান বিধানগুলি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে:

প্রত্যেক দোকান প্রতি সপ্তাহে অন্তত দেড়দিন বন্ধ থাকিবে। রাত্রি আটটায় দোকান, কাফে, রেস্তোরাঁ ইত্যাদি বন্ধ করিতে হইবে। দোকান, রেস্তোরাঁ, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদির কর্ম্মচারীরা সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি পাইবেন। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্ম্মচারীকে দৈনিক ১০ ঘণ্টার বেশী খাটান চলিবে না। দোকানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে সাত ঘণ্টা কাজের পর এক ঘণ্টা এবং ছয় ঘণ্টা কাজের পর আধ ঘণ্টা ছুটি দিতে হইবে। কর্ম্মচারীদের বেতন পরবর্ত্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে দিতে হইবে। দোকান, ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান কিংবা সাধারণ ভোজনালয় বা আমোদ-প্রমোদাগারের কার্য্যে

নিযুক্ত ব্যক্তি বৎসরে পূরা বেতনে ১৪ দিন প্রিভিলেজ ছুটি এবং অর্দ্ধবেতনে ১০ দিন ক্যাজুয়েল ছুটি পাইবে। বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার পর প্রথমে কলিকাতা ও শহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটির এলাকায় প্রযুক্ত হইবে।

মাতৃভাষা ও এংলোইণ্ডিয়ান সমস্যা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-মাতৃভাষাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন করিয়া যে নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহাতে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে সব ইউরোপীয় ছাত্রছাত্রী আছে তাহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী। কাজেই তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের যুক্তিও যে সুসঙ্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই তাহাদের হাত-ছাড়া না করিয়া একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার, তাহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে।

পরলোকে মঃ কালিও—

ফিন্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট মঃ কালিও সম্প্রতি আটষট্টি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন ফিনল্যাণ্ডের একজন ভূস্বামী। ১৮৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৪ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি ফিনল্যাণ্ড পার্লামেণ্টের সদস্য এবং ১৯২০ সাল হইতে পনর বৎসর স্পীকার ছিলেন। ১৯১৭ হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত তিনি কৃষিবিভাগের এবং ১৯২৫ সালে যান-বাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২২-২৪, ১৯২৫-২৬, ১৯২৯-৩০ এবং ১৯৩৬ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি ব্যাঙ্ক অফ ফিনল্যাণ্ডের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। এ দুর্দিনে তাঁহার মত একজন যোগ্যব্যক্তির মৃত্যুতে ফিনল্যাণ্ডের দারুণ ক্ষতি হইল।

তিনটি সোজা প্রশ্ন—

সম্প্রতি কলিকাতা-কর্পোরেশন আইন-সংশোধন বিলের প্রতিবাদে কংগ্রেস-জাতীয়তাবাদী মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দুমহাসভা ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের নেতাদের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকদের এক সভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি সোজা প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্নে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, গত ষোল বৎসরে অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলররা যে সকল লোককে চাকরি দিয়াছেন, তাহার তালিকা কর্পোরেশন প্রস্তুত করিবেন এবং মন্ত্রীরাও গত সাড়েতিন বৎসরে যে সকল লোককে চাকরি দিয়াছেন, তাহার তালিকা উপস্থিত করুন। উভয় তালিকা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট উপস্থিত করা হইবে। কোন্ পক্ষ নিজের আত্মীয়স্বজন ও দলভুক্ত লোককে চাকরি দিয়াছে, তালিকা দেখিয়া কমিশন দোষী-নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিবেন। ইহাতে মন্ত্রীরা প্রস্তুত আছেন কি-না। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কি গুণ দেখিয়া মন্ত্রীরা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মনোনয়ন করেন? তাঁহাদের চেহারা, না বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, না অর্থ? তৃতীয় প্রশ্ন—সংশোধন বিল কলিকাতার নাগরিকেরা চাহেন কি-না তাহা করদাতাদের ও নাগরিকদের ভোটে নির্ণয় করা হোক। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের সোজা প্রশ্নের জবাব মন্ত্রীদের নিকট তত সহজ নহে, সুতরাং তাঁহারা ইহার জবাব দিবেন না, দিতে পারেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পদত্যাগ—

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের সিলেক্ট কমিটি হইতে পদত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই পদত্যাগে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি মমতা যাঁহার আছে, তেমন কোন স্বাধীন ও উদারচেতা ব্যক্তি মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সমর্থন করিতে বা এই বিলটিকে আইনে পরিণত হইবার পথে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারেন না। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা-পরিষদে দাঁড়াইয়া যখন প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল গৃহীত না হইলে ইসলাম বিপন্ন হইবে, ঐ বিলের যাঁহারা বিপক্ষতাচরণ করিবেন তাঁহারা ইসলাম-বিরোধী—তখনই বিলটি আনয়নের ও প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের মত সরল হইয়া যায়। প্রধান মন্ত্রীর অন্তরের সততা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঠাকুরের মনে যে আস্থা ছিল, ঐ ঘোষণায় তাহা টলিয়া

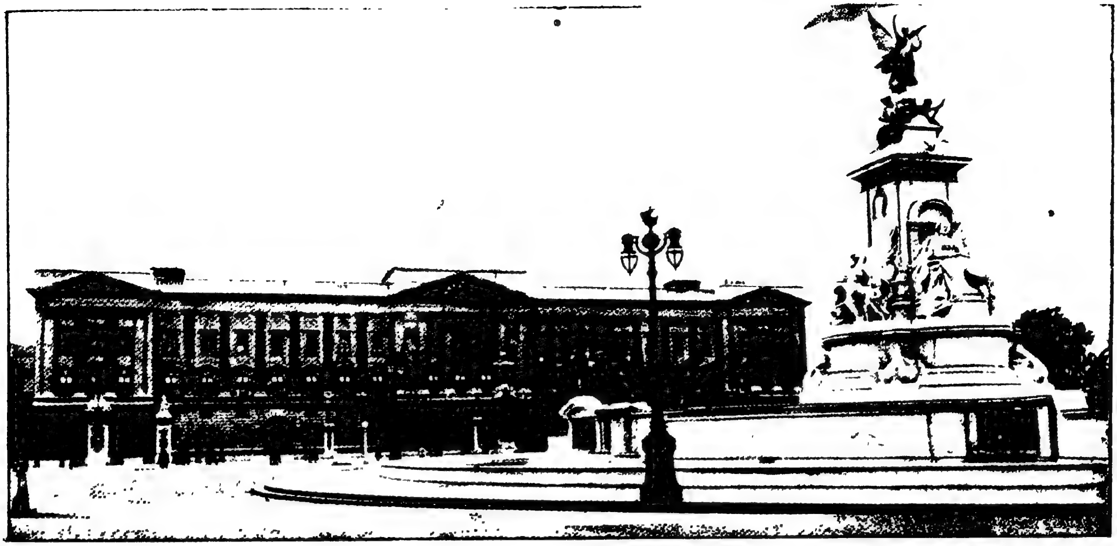

বাকিংহাম্ প্রাসাদ ও তাহার সম্মুখে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ

সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জ অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন

ক্যানাডিয়ান ডেষ্ট্রয়ার বৃটিশ নৌসেনায় যোগদান করিতেছে

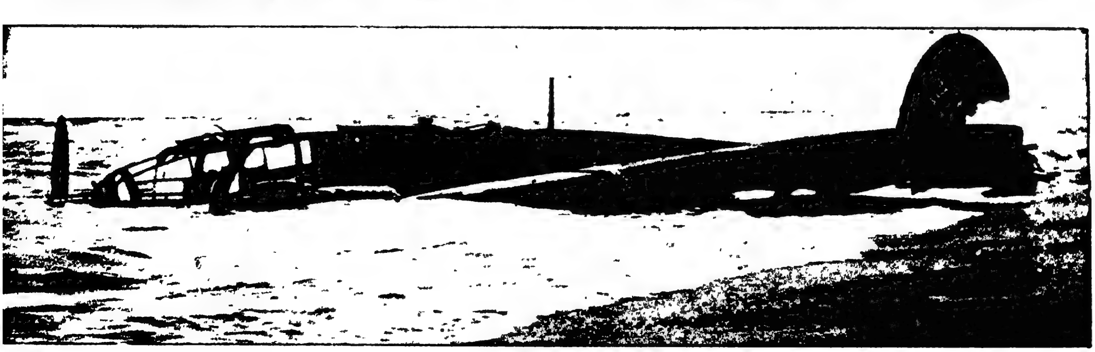

আক্রমণের জন্য সজ্জিত বৃটীশ কামান— লণ্ডন সহরের বাহিরে রক্ষিত

উড়োজাহাজ বিধ্বংসী সার্চ্চলাইট— লণ্ডনে এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে

নেপল্‌সের নিকট ইটালীর ম্যাডালোনা বন্দরে বোমা ফেলার দৃশ্য

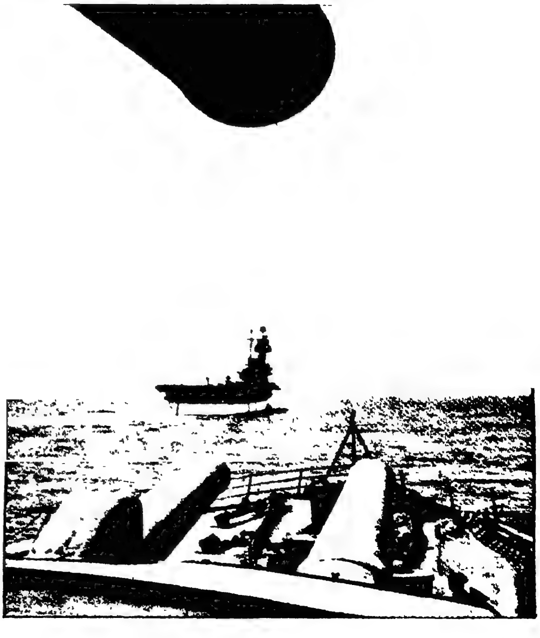

ভূমধ্যসাগরে পাহারায় রত বৃটীশ ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারসমূহ

গিয়াছে এবং সিলেক্ট কমিটিতে যাওয়ার পর তাহা পুরোপুরি দুর হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তাঁহার পদত্যাগের গুরুত্ব সাধারণ পদত্যাগের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাহা হইলেও মন্ত্রীরা নির্লজ্জের মত ইসলাম রক্ষায় গাফিলতী করিবেন না, যথাসময়ে বিলটি আইনে পরিণত হইবেই।

এবারকার পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার—

ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক রাজি-উদ্দীনকে এবৎসর পদার্থ-বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাপক রাজি-উদ্দীন 'কোয়াণ্টাম থিওরী' সংক্রান্ত গবেষণার জন্য এই পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতের তৃতীয় নোবেল-ল্যারিয়েট অধ্যাপক রাজি-উদ্দীন শিক্ষিত সমাজে অপরিচিত নহেন—সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান ইতিপূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় বিদ্বান সমাজে সম্মানিত হইয়া এখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত হইবার সুযোগ পাইলেন। পরাধীন ও বহু দুঃখে জর্জ্জরিত হইলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর অপরাপর সভ্য দেশ হইতে পশ্চাৎপদ নহে, এই ব্যাপারে তাহা আর একবার প্রমাণিত হইল। সমসাময়িককালে আমাদের দেশে আরও যে কয়জন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আছেন তাঁহাদের মধ্যে পাঞ্জাবের বীরবল সাহানী, মাদ্রাজের অধ্যাপক কৃষ্ণণ, বাঙ্গালার অধ্যাপক সাহা, বসু, ঘোষ ও ধরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারাও পৃথিবীর চিন্তাজগতে নিজ নিজ অনুসন্ধান এবং গবেষণার দ্বারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। গুণের অপক্ষপাত বিচারে ইঁহাদিগকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।

পর্দাবিরোধী সম্মিলন—

কলিকাতায় সম্প্রতি একটি পর্দাবিরোধী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সভানেত্রী ছিলেন প্রসিদ্ধ মহিলানেত্রী শ্রীযুক্তা রাধা দেবী গোয়েঙ্কা। সম্মিলনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে, দেশের কুসংস্কার ও প্রচলিত রীতিনীতির দিক হইতে তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, যাহারা পর্দা প্রথার বিরোধী তাহারা পর্দা-মানা কোন উৎসবে যোগদান করিবে না। পর্দা প্রথা যে শুধু নারীর শিক্ষা ও শারীরিক উন্নতির পরিপন্থী তাহাই নহে, তাহা অনেক সময়ে অসম্মানজনকও বটে।

প্রথম বাঙ্গালী নার্সের দল—এ-আর-পি ট্রেনিং নিয়েছেন

নূতন ট্যাক্সের আশঙ্কা—

যুদ্ধের জন্য ভারত সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি হইয়াছে। কাজেই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বৈঠকে একটি অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি 'ক্যাপিটাল' পত্রের সিমলাস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। এই বাজেট আগামী নভেম্বর মাসের বৈঠকে উপস্থাপিত হইবে এবং ধার্য্য করের হার ও বিভিন্ন শ্রেণীর ডাকমাশুল বৃদ্ধি করা হইবে। 'ক্যাপিটাল' ভারত-

সরকারের ভিতরকার অনেক খবর রাখেন, কাজেই এই সংবাদ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। গত এপ্রিল ও মে—সরকারী বৎসরের প্রথম দুই মাসে সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় দুই কোটী সত্তর লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এ বৎসরে সরকারী তহবিলে প্রায় বিশ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িবে। এই ঘাটতি নিবারণের জন্যই নূতন ট্যাক্সের আবশ্যক। অথচ ইতিপূর্ব্বেই আয়কর আইন, অতিরিক্ত লাভকর, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, রপ্তানি বাণিজ্যে বিবিধ বিধিনিষেধ, পণ্যমূল্য হ্রাস ইত্যাদির ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং জনগণের দুরবস্থা ঘটিয়াছে ; তাহাতে এখন নূতন করিয়া ট্যাক্স না চাপাইয়া ঋণগ্রহণ করাই সমীচীন হইবে।

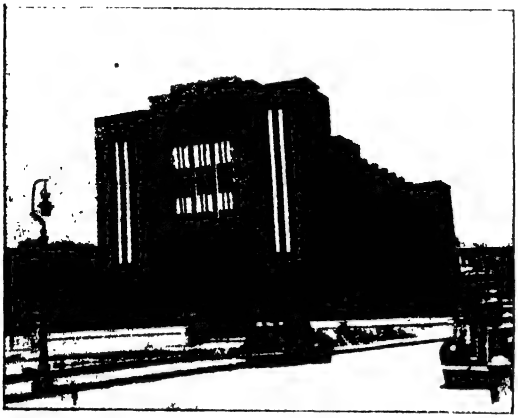

বোম্বায়ের হংসরাজ প্রাগজি ঠাকুরসে হল—এখানে এবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা হইয়াছিল

সক্কর দাঙ্গার তদন্ত ফল—

সিন্ধু প্রদেশের সক্কর শহরে মঞ্জিলগড় লইয়া যে দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার তদন্তের ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। বিচারপতি ওয়েস্টন এ ব্যাপারে সিন্ধুর তৎকালীন মন্ত্রীদের দৃঢ়তার অভাব, প্রতিশ্রুতি পালনের অসামর্থ্য এবং আল্লাবক্স মন্ত্রিসভাকে বিতাড়িত করিবার ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য মুসলিম লীগ মঞ্জিলগড় আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দুদেরই যে অধিকতর প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং তাহাদের সম্পত্তিই যে সব চেয়ে বেশী নষ্ট হইয়াছে রিপোর্টে তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধি জাগ্রত না হইলে সক্করের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন আশা পোষণ করা যায় না।

রাজবন্দীদের অবস্থা—

বিনা বিচারে যাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করিয়া আটক রাখা হইয়াছে সরকার তাঁহাদের জন্য এবারে পূর্ব্বের মত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন নাই। আটক অবস্থায় তাঁহাদের শারীরিক প্রয়োজনের দিকটাই লক্ষ্য রাখা হইযাছে, মানসিক দিকটা একেবারেই উপেক্ষা করিয়া হইয়াছে। ‘স্টেটস্‌ম্যান’ ও ‘আজাদ’ ছাড়া কোন কাগজই তাঁহারা নিজেদের পয়সায়ও পড়িতে পান না। পড়াশুনার জন্যও অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হয় না। তাঁহাদের দেহমনের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মানসিক দুশ্চিন্তা ও অশান্তি যে ইহার অন্যতম কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের পোষ্যবর্গের ভরণপোষণেরও কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকারী দৃষ্টি ন্যস্ত হয় ইহাই আমাদের বক্তব্য।

নিজাম বাহাদুরের রাজভক্তি—

পত্রান্তরে প্রকাশ যে, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের নিকট তাঁহার পরামর্শদাতা বন্ধু নবাব ইয়ার জঙ্গ বাহাদুর নাকি একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন ; তাহাতে বৃটেনের নিকট নিম্নরূপ দাবী পেশ করিতে সুপরামর্শ দিয়াছেন—

(১) ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় হায়দ্রাবাদকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং হায়দ্রাবাদ ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বাধীনতা পাইবে ; (২) হায়দ্রাবাদ রাজ্য যাহাতে ভারত সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে সেইজন্য মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড তাহাকে প্রদান করিতে হইবে ; (৩) বেরার প্রদেশটি তাহাকে দিতে হইবে ও (৪) আধুনিক সমরোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ তৈয়ারি করিবার অধিকারও তাহাকে দিতে হইবে। প্রকাশ যে, অন্যান্য দেশীয় নরপতিদের মত

হায়দ্রাবাদ এবার যুদ্ধ-ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত প্রায় দশ কোটী টাকা দান করিয়াছে। এই টাকাটা কি রাজভক্তির নিদর্শন-রূপে স্বাধীনতার মূল্য ?

মেদিনীপুর জেলায় বন্যা—

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা, সদর মহকুমা ও তমলুক মহকুমার অনেকটা স্থান বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। বন্যার্ত্ত নরনারীদের সাহায্যের জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় আলবার্ট হলে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। দুর্গতদের সাহায্য করিবার জন্য সরকারী ব্যবস্থা বিশেষ কিছু হয় নাই। বন্যায় প্রায় নয় লক্ষ লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবিলম্বে তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর না হইলে বহু লোকের জীবনহানি হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা সরকার, দেশবাসী এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানকে তৎপর হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

পরলোকে কবি ভুজঙ্গধর—

কবি ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী মহাশয় আটষট্টি বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মস্তিষ্কসংক্রান্ত পীড়া হওয়ায় চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। তিনি টাকীর প্রসিদ্ধ রায় চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রোত্তরকালে যে কয়জন কবি বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভুজঙ্গবাবু তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ; তাঁহার কবিতাবলী বাঙ্গালার বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় সাদরে প্রকাশিত হইত। তিনি ছিলেন উকিল, কিন্তু ওকালতি ব্যবসায় তাঁহার ভিতরকার কবিকে নিঃশেষে গ্রাস করিতে পারে নাই। তাঁহার রচিত 'গোধূলি', 'রাকা', 'সিন্ধু', 'মঞ্জরী', 'ছায়াপথ', 'পল্লীসমাধি', 'গাথা' ও 'সতী' বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ইহা ছাড়া গীতা ও উপনিষদের পদ্যানুবাদ করিয়াও বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভুজঙ্গধর নিজের কাব্য-জীবনে রবীন্দ্র-প্রভাবযুক্ত ছিলেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয়। বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্যে ভাব, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে প্রাচীন ধারা চলিয়া আসিতেছিল, কবি ভুজঙ্গধর হয় ত তাহার সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি। আমরা পরলোকগত কবিবরের আত্মীয়স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রবর্ত্তক সংঘ—

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবর্ত্তক সংঘের বার্ষিক সাধারণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। একদল ত্যাগী কর্ম্মী দেশের মঙ্গল কামনায় যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতেছেন, সংঘের বার্ষিক রিপোর্টে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এখন সংঘ সুপরিচিত হইয়াছে এবং সংঘের কার্য্য প্রসারের জন্য এখন আর অর্থাভাব হয় না। শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেশের বেকার-সমস্যা ও অন্ন-সমস্যা সমাধানে সংঘের এই চেষ্টা দেখিয়া দেশবাসীমাত্রই আনন্দিত হইবেন।

কলিকাতা বড়বাজারে পর্দ্দা বিরোধী সম্মিলন সম্পর্কে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী—
শ্রীমতী সৌদামিনী মেহতা কর্ত্তৃক উদ্বোধন

বঙ্গীয় তাঁত-শিল্প প্রদর্শনী—

পূজার বাজারে কলিকাতার মত বড় সহরে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী খোলা হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে একত্র সব

স্বদেশী জিনিষ ক্রয়ের সুবিধা হয়। সুলভে মনের মত স্বদেশী জিনিষ পাইলে কে আর বিদেশী জিনিষ ক্রয় করে? কিন্তু দুঃখের বিষয় গত কয় বৎসর কলিকাতায় আর স্বদেশী-প্রদর্শনী হইতেছে না। বঙ্গীয় বয়ন শিল্প সমিতির পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত সুকুমার দত্ত গত বৎসরের মত এবারও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট যে বঙ্গীয় তাঁত শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছেন, তাহা স্বদেশী প্রদর্শনীর অভাব কতকটা পূর্ণ করিবে। তাঁতের ভাল কাপড় যে মিলের কাপড়ের অপেক্ষা সুলভে পাওয়া যাইতে পারে, এ প্রদর্শনী না দেখিলে সে কথা হয় ত কেহ বিশ্বাস করিবেন না। বাঙ্গালা দেশে তাঁত শিল্প নষ্ট হইলে কত তাঁতি যে অন্নাভাবে মারা যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ অবস্থায় এই তাঁত শিল্প প্রদর্শনী প্রকৃতপক্ষে দেশের একটি উটজ শিল্পকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রদর্শনীতে সকল প্রকার তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আরও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। আমরা এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়-

ব্রহ্ম প্রবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ডক্টর সুনীলকুমার ডি-লিট (প্যারিস), ডি-এস-সি (লণ্ডন) সম্প্রতি সানবিম ট্যালবো মোটর কোম্পানীর গবেষণাগারে কেমিষ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইনি বহু ভাষাবিদ এবং বিলাতে সুবক্তা বলিয়া পরিচিত। সুনীলকুমার স্বর্গত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী বিদেশে এই কার্য্য লাভ করেন নাই। আমরা তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

সুনীল মুখোপাধ্যায়

যক্ষ্মারোগ ও বিশ্ববিদ্যালয়—

বাঙ্গালাদেশে সম্প্রতি যক্ষ্মাব্যাধির অত্যধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ইহা প্রসার লাভ করিতেছে। অথচ যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসার ও আশ্রয়ের তেমন ব্যাপক ব্যবস্থা নাই; যাদবপুর হাসপাতালে সকল রোগীর স্থান সঙ্কুলান হয় না। কাজেই নিরুপায় হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্লক নির্ম্মাণের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্লকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন। উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মিত হইবে, তাহা ঠিক রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত যাহাতে তাহা সাধারণ হাসপাতালের সঙ্গে মিশিয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি। কেন না, পূর্ব্বেও অনুরূপ ব্যবস্থা অন্যত্র দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহা যথাযোগ্য কার্য্যকরী হয় নাই।

আয়ুর্ব্বেদে রাজানুমোদন—

সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ ফ্যাকাল্টিতে যে সব কবিরাজ নিজেদের নাম রেজিস্টারীভুক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের প্রদত্ত অভিমত যে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গ্রাহ্য হইবে, বাঙ্গালা সরকার সেরকম কোন আদেশ জারি করেন নাই। বাঙ্গলার আইনসভায় প্রশ্নোত্তরে জানা যায়—তাহা এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। এইভাবে কতকাল তাহা বিবেচনাধীন থাকিবে তাহাই জিজ্ঞাস্য? কেন না ফ্যাকালটি হইল, যথারীতি টাকা দিয়া নাম রেজিষ্টারী করা হইল, অথচ তাঁহারা সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছেন না, এমন হাস্যকর ব্যবস্থার কথা কেহ কখনও শোনে নাই। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এবিষয়টিকে আর বেশীদিন ধামাচাপা দিয়া রাখিবেন না।

কাপড়ের কল ও বেকার সমস্যা—

সম্প্রতি কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে শ্রীরামপুরের বেঙ্গল টেক্সটাইল ইন্‌স্টিটিউট-এর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য

বেকার সমস্যা সমাধানে যন্ত্রশিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, বর্ত্তমানে বাঙ্গালার নিজস্ব কাপড়ের কলে যে পরিমাণ কাপড় তৈয়ারি হয় তাহা ছাড়াও বৎসরে প্রায় দশ কোটী টাকা মূল্যের কাপড়ের বাঙ্গালায় চাহিদা আছে এবং এই চাহিদা মিটাইতে হইলে আরও কতকগুলি কাপড়ের কল স্থাপন করা দরকার এবং এই কল প্রতিষ্ঠায় প্রায় দশকোটী টাকা আবশ্যক। এই সব মিল হইতে চাহিদা অনুযায়ী কাপড় তৈয়ারি করাইতে প্রায় লক্ষাধিক কারিগর দরকার। এই সব কারিগর বাঙ্গালীদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইলে বেকার সমস্যার বহুলাংশে লাঘব হইবে। প্রকাশ যে, বাঙ্গালার কাপড়ের কলের বয়ন বিভাগে যেসকল লোক কাজ করে, তাহাদের মধ্যে বয়নকারীরা মাসে ১৩৲ হইতে ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে; জবার্ ২০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা, সহকারী বয়নশিক্ষক ৩০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা, বয়নশিক্ষক একশত হইতে চারিশত টাকা বেতন পাইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, বাঙ্গালায় যে সতরটি কাপড়ের কল আছে তাহাদের একমাত্র বয়ন বিভাগেই বৎসরে এক হাজারটি চাকরি খালি হয় এবং বিভিন্ন বিভাগ মিলাইয়া ১৭ শতের বেশী চাকরি খালি হয়। কাজেই মনে হয় যে, বাঙ্গালায় এখন যেসব কাপড়ের কল আছে তাহাতে বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবকের চাকরির সম্ভাবনা আছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যগণ বিরলা প্রাসাদ হইতে বাহির হইতেছেন

ভারত সরকারের রাজস্ব—

বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম দুই মাসে ভারত সরকারের রাজস্বের আয় ব্যয় সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য সময়ে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। গত মে মাসের শেষপর্য্যন্ত আয়ের পরিমাণ ১৮ কোটী ৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ২৩ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এই সময়ে শুল্ক বিভাগের আয় পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ৮৭ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। এই সময়ে সাধারণ রাজস্ব-ব্যয়ের পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের ব্যয় অপেক্ষা ৪ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। অপর পক্ষে রাজস্বের খাতে মোট আয়ের পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। অবশ্য এই টাকার অধিকাংশই নতুন ট্যাক্সের কল্যাণে মিলিয়াছে। ভারত সরকারের ব্যয়ের বহর যে পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে সকল দিক রক্ষা করিতে হইলে আরও ট্যাক্সবৃদ্ধি অপরিহার্য্য; কিন্তু জনসাধারণ দৈন্তের সহিত লড়িয়া সরকারের এই অশোভন ব্যয়ভার আর কত কাল বহন করিতে পারিবে?

নবদ্বীপ নারী-মঙ্গল-সমিতি—

দশ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে যে নারীমঙ্গলসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীমতী সাবিত্রী রায়ের যত্ন ও চেষ্টায় ইহার কার্য্যও প্রসারলাভ করিতেছে। বর্ত্তমান যুগে নারীমঙ্গল

সমিতির প্রয়োজনের কথা আর কাহাকেও বলার প্রয়োজন নাই। তাহার উপর নবদ্বীপের মত স্থানে ইহার কার্য্যকারিতা আরও অধিক। সমিতি যেমন শিক্ষাদান ব্যাপারে সাফল্যলাভ করিয়া নূতন উচ্চইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছে, তেমনই যদি মেয়েদের জন্য শিল্প বিদ্যালয় ও প্রাপ্তবয়স্কাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তবেই সমিতির কার্য্যকারিতা লোক বুঝিবে। অর্থের অভাবে কোথাও কোন কাজ আটকায় না; অভাব উদ্যোগী কর্ম্মীর। আমাদের বিশ্বাস, নবদ্বীপে এই কার্য্যের জন্য আবশ্যক মহিলা-কর্ম্মীর অভাব হইবে না।

নবদ্বীপে স্মৃতি উৎসব—

গত ১৭ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্নে নবদ্বীপের খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের স্মৃতি সভা নবদ্বীপ সপ্তম এডোয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী হলে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণের স্মৃতিপূজা করিবার জন্য তথায় যে স্মৃতি সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য এই প্রথম আরম্ভ হইল। বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিদ্যার্ণব, পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুত বীরেশ্বর বসু, শ্রীযুত রামপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত জনরঞ্জন রায় প্রভৃতি সভায় পণ্ডিত জ্যোতিষার্ণবের জীবনী ও কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তীর্থ, পণ্ডিত ত্রিপথনাথ স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত নিশিকান্ত তর্কতীর্থ প্রভৃতি বহু সুধী সভায় উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের পুত্র অধ্যাপক হেমচন্দ্র শাস্ত্রী ও পৌত্র শ্রীযুত রমেশচন্দ্র আচার্য্যের উৎসাহে ও চেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। পণ্ডিত বিশ্বম্ভরের মত জ্যোতিষী এ যুগে বিরল; কাজেই তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী এ যুগে আলোচিত হইলে তাহা সকলের পক্ষেই লাভজনক হইবে। পণ্ডিতমণ্ডলী এইভাবে সকল পণ্ডিতের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা করিলে নবদ্বীপের প্রাচীন গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে।

পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব

ভারতে কয়লার ব্যবহার—

গত ১৯৩৭ সালে ভারতে দুইকোটী একচল্লিশ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছিল। পর বৎসর তাহা বাড়িয়া মোট দুই কোটী সত্তর লক্ষ টনে দাঁড়ায়। রেলপথগুলিই ভারতীয় কয়লার প্রধান খরিদদার। ১৯৩৮ সালে বিভিন্ন রেল কোম্পানীগুলি মোট একাশি লক্ষ তিরাশি হাজার টন কয়লা ক্রয় করিয়াছে। ১৯৩৭ সালের তুলনায় তাহা ছিল দুই লক্ষ উনপঞ্চাশহাজার টন বেশী। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এবং পিতলের কারখানা ইত্যাদিতে ১৯৩৮ সালে উনষাট লক্ষ পাঁচ হাজার টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের তুলনায় তাহা ছিল উনআশি হাজার টন কম। ১৯৩৮ সালে অন্যান্য শিল্প কারখানায় ও দেশে জ্বালানী বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় একুশ লক্ষ আটাশ হাজার টন পরিমাণে বাড়িয়া সাতান্ন লক্ষ বাষট্টি টন কয়লা ব্যবহার হয়। কয়লার খনিসমূহে যে কয়লা ব্যবহৃত হয় ও যে কয়লা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণও ছিল চৌদ্দ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টন। ইট, টালি ও সিমেণ্ট তৈয়ারির কারখানায় দশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার টন কয়লা দরকার হইয়াছিল। কয়লার অপেক্ষাকৃত ছোট খরিদদারদের মধ্যে পাটকলগুলি ১৯৩৮ সালে সাত লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টন, নদীগামী ষ্টীমার কোম্পানীগুলি পাঁচলক্ষ আটহাজার টন, কাগজের কারখানাগুলি দুইলক্ষ তেত্রিশ হাজার টন ও চা-বাগানগুলি একলক্ষ ছিয়াশি হাজার টন কয়লা ব্যবহার করে।

যাদুকর গসেন—

যাদুকর প্রফেসার গসেন সাধারণের নিকট ‘রহস্যজনক মানব’ বলিয়া পরিচিত। তিনি বিলাতের যাদুকর সম্মিলনীর সভ্য; এখন প্রাচীন ভারতীয় যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করিতেছেন। তাঁহার দড়ির খেলা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়া থাকে। আমরা যাদুজগতে তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

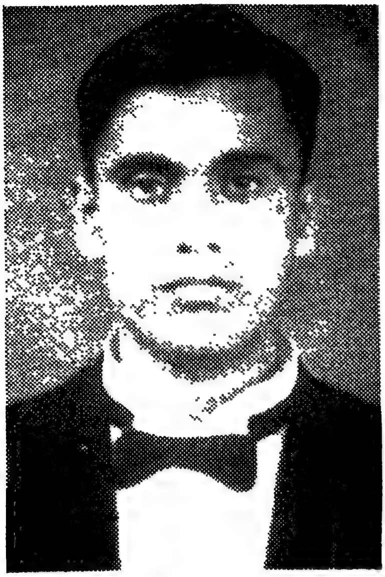

যাদুকর গসেন

পরলোকে সূর্য্যকুমার সোম—

ময়মনসিংহের প্রবীণ জননায়ক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য সূর্য্যকুমার সোম মহাশয় সম্প্রতি একাত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যে নির্ভীকতা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বাঙ্গালী কখনও ভুলিবে না। তাঁহার স্ত্রীও অসহযোগ আন্দোলনে শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সহিত গ্রেপ্তার হন। তিনি নিজেও একাধিকবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেও তাঁহার দেশপ্রীতি ও নির্ভীকতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রবীণ দেশনায়কের জীবনের অবসান হইল। তাই দেশবাসীর সহিত আমরাও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

পরলোকে জগৎমোহন সেন—

কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ের জামাতা জগৎমোহন সেন বি-এস্-সি, বি-এড্ ময়ূরভঞ্জ স্টেটের রাজধানী বারিপদায় শিররোগে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বারিপদা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং একাধারে সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রকর এবং সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন। বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া ভাষার বহু সংবাদপত্রে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ওড়িয়া ভাষায় তিনি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। আমরা জগৎমোহনের শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুত হৃষীকেশ সুর—

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ্স বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ডিরেক্টার-জেনারেল শ্রীযুত হৃষীকেশ সুর ও-বি-ই সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের ষ্টোর্সের চিফ কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী এই উচ্চপদ লাভ করেন নাই তিনি রুড়কী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে প্রথম হইয়া পাশ

হৃষীকেশ সুর

করেন এবং ১৯০৬ সালে সরকারী চাকরীতে যোগদান করেন; নিজ অসাধারণ কার্য্যদক্ষতার ফলে তিনি এই উচ্চপদ লাভ করিলেন।

শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী—

খ্যাতনামা প্রবীণ কংগ্রেস-সেবক শ্রীযুত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী কলিকাতার ১১নং ওয়ার্ড হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কাউন্সিলার নটবরচন্দ্র দত্তের মৃত্যুতে ঐ পদটি খালি হইয়াছিল। বিপিনবাবু পূর্ব্বেও কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। দরিদ্র কংগ্রেস-সেবকগণও যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, বিপিনবাবুর নির্ব্বাচনে তাহা দেখা গিয়াছে।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

রাঁচী যক্ষ্মা-নিবাস—

বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রবল হইয়াই দেখা দিয়াছে; সেই অনুসারে কিন্তু রোগীদের সুচিকিৎসার সুব্যবস্থা তেমনভাবে আজও হয় নাই। দরিদ্র বাঙ্গালী আজ পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত আলো-হাওয়া, পরিমিত বিশ্রাম ও সর্ব্বোপরি নিশ্চিন্ততার অভাবে এই কাল ব্যাধির কবলে প্রবেশ করিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইউরোপ-আমেরিকায় যক্ষ্মা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে, আমাদের দেশে সুবন্দোবস্ত দুরের কথা—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বন্দোবস্ত নাই। যাহাও দু-একটি স্বাস্থ্যনিবাস বা চিকিৎসালয় আছে তাহা দরিদ্র রোগীদের পক্ষে অলভ্য। বিশেষ করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান রোগীর সংখ্যা সেখানকার নির্দ্দিষ্ট শয্যাকে সকল সময়ই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কাজেই বহু রোগী স্থানাভাবে ও অর্থাভাবে সুচিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতীকারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সম্প্রতি রাঁচী শহর হইতে আট মাইল দুরে রাঁচী-চাইবাসা রোডের উপর একটি স্বাস্থ্য নিবাস স্থাপন করিতেছেন। ২৪০ একর জমি সংগৃহীত হইয়াছে এবং হাসপাতালের কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মিশন ইতিমধ্যে বত্রিশ হাজার টাকা তুলিয়াছেন এবং আরও দশ হাজারের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন। এখনও অন্তত লক্ষ টাকা আবশ্যক। দেশে দরিদ্রের কল্যাণকামী ও বদান্য লোকের অভাব আজও হয় নাই; সুতরাং আমাদের বিশ্বাস রামকৃষ্ণ মিশনের আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে বিলম্ব হইবে না।

কৃষ্ণদাস চন্দ্র—

গত শ্রাবণ মাসে ‘অর্চ্চনা’ মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাস চন্দ্র মহাশয় প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ৫ বৎসর কাল তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার পত্নী ও তৃতীয় পুত্র অর্চ্চনা-সম্পাদক সুধীরকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। কৃষ্ণদাসবাবু প্রথম জীবনে ‘বেঙ্গলী’র সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং পরে রেলে ও সরকারী অফিসে চাকরী করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু সাহিত্যসেবা ছাড়েন নাই ও তাঁহার অর্চ্চনা কার্য্যালয়ে মজলিস করিয়া এক দল সাহিত্যিক তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস চন্দ্র

আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনগণকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বালীপূর্ণ থলিয়াবেষ্টিত স্থানে উড়োজাহাজ নষ্ট করিবার জন্য রক্ষিত কামান

কাচের মধ্য দিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হইতেছে

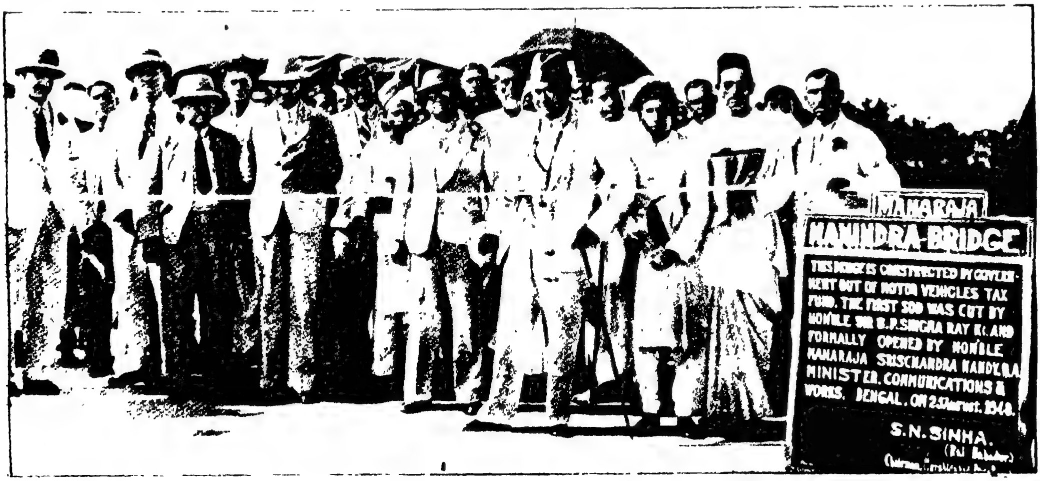

MAHARAJA
MANINDRA-BRIDGE
THIS BRIDGE IS CONSTRUCTED BY GOVERN-MENT OUT OF MOTOR VEHICLES TAX FUND. THE FIRST SOD WAS CUT BY HON'BLE SIR B.P.SINGHA RAY Kt. AND FORMALLY OPENED BY HON'BLE MAHARAJA SRISCHANDRA NANDY, M.A. MINISTER, COMMUNICATIONS & WORKS, BENGAL, ON 25th August. 1940.
S.N. SINHA.
(Rai Bahadur)

মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি-সুলতানপুর-বহরমপুর রোডে দ্বারকা নদের উপর নূতন পুল—মহারাজা মণীন্দ্র ব্রিজের উদ্বোধন

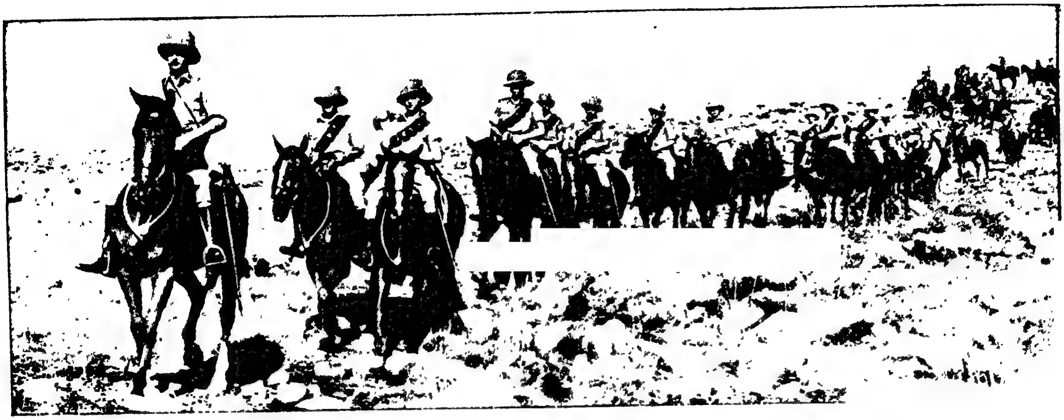

প্যালেষ্টাইন রক্ষায় নিযুক্ত বৃটীশ ও ইহুদী অধিবাসীদের সমর সজ্জা

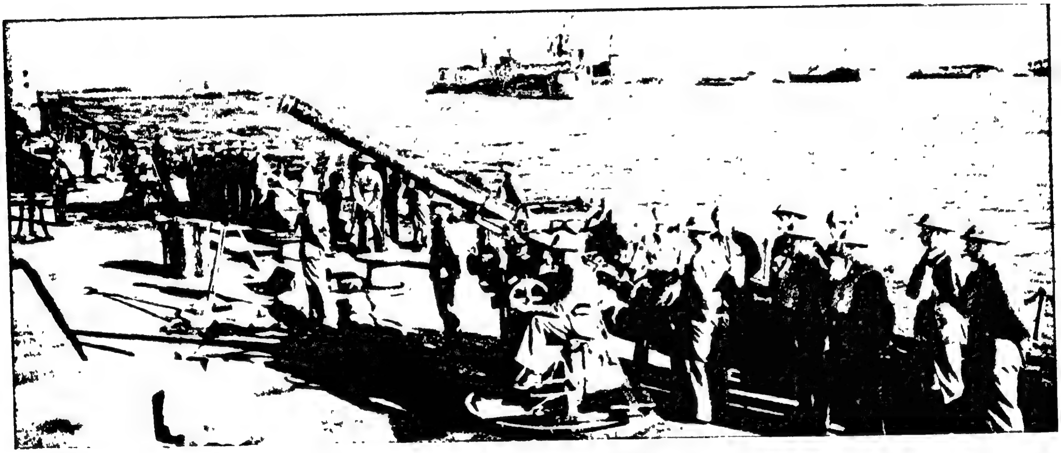

জিব্রাল্টার রক্ষায় নিযুক্ত বৃটীশ কামান ও রণতরী—পশ্চিমের প্রবেশ-পথের দৃশ্য

উড়োজাহাজ ধ্বংসের জন্য রক্ষিত সার্চ্চলাইট

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রোভার্স কাপ ফাইনাল ঃ

মাত্র নয় হাজার দর্শকের সামনে রোভার্স কাপের ৫০তম বৎসরের ফাইনাল খেলা শেষ হ'য়েছে। কলিকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং বাঙ্গালোর মুসলীমস্‌কে ১-০ গোলে পরাজিত ক'রে উক্ত কাপ বিজয়ী হ'য়েছে। দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর ভেতর এই প্রথম বাংলাতে রোভাস কাপ এলো। আমরা মহমেডানের সাফল্যের জন্য তা' দিগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৩ সালে মোহন-বাগান, ১৯৩১ সালে মহমেডান এবং গত বছর হাওড়া জেলা ফাইনালে উঠেছিলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের পরাজয় স্বীকার ক'রতে হয়। রোভাস কাপ মাত্র দু'টি বে-সামরিক টীম পেলো; আগে বাঙ্গালোর মুসলীমস্ দু'বার পেয়েছিলো তারপর, এইবার মহমেডান। ১৯১০ সালের আগেকার কথা জানি না কিন্তু তার পরে উপরোক্ত দলগুলি

প্রেসিডেন্সি কলেজ রেগেটা টীম

ইণ্টার কলেজ রেগেটা লীগবিজয়ী আশুতোষ কলেজ টীম

ছাড়া আর কোন বে-সামরিক টীম রোভার্স কাপ ফাইনাল খেলবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রতে পারেনি।

রোভার্স বিজয়ে মহমেডান স্পোর্টিংএর যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। তারা প্রথম খেলায় রয়েল এয়ার ফোর্সকে ৮-০ গোলে এবং দ্বিতীয় খেলায় হেভী ব্যাটারীকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে। কিন্তু সত্যি সত্যি তারা বিস্মিত ক'রে দেয় ওয়েলস্ রেজিমেণ্টকে তিন গোলে পরাজিত ক'রে; ওয়েলস বোম্বের অপরাজেয় টীম। ফাইনালে মহমেডান ১-০ গোলে বাঙ্গালোরকে পরাজিত ক'রে কাপ জয়ী হয়। রসিদ দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষের দিকে স্বীয় দলের বিজয়সূচক গোলটি দেন। ১৯৩৭ সালের ফাইনাল খেলাতে অনুরূপ সময়ে এক অপ্রত্যাশিত গোলের ফলে মহমেডানকে পরাজিত হ'তে হয়। মহমেডানের খেলা বাঙ্গালোর অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হ'য়েছিল কিন্তু রসিদ ও বাচ্চি খাঁয়ের অত্যধিক বলপ্রয়োগ ক'রে খেলার ফলে অনেক সময় খেলার স্বাভাবিক গতি নষ্ট হয়। রেফারি উভয়কেই সতর্ক ক'রে দেন কিন্তু বাচ্চি খাঁ তাহাতেও শান্ত না হওয়ায় তাকে মাঠ থেকে বার ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। বাঙ্গালোরের ক্যাপ্টেন ও ফরওয়ার্ড লাইনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় রহমৎ শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ফাইনাল খেলায় নামতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের দুর্দ্ধর্ষ সেণ্টার-ফরওয়ার্ড ডিক্রুজও মাঠে নেমে বিশেষ আহত হন। এই দু'টি দুর্ঘটনার জন্য বাঙ্গালোর টীমকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়।

বাঙ্গালোর মুসলীম দল

মহমেডান ছাড়া ক'লকাতা থেকে মোহনবাগানও রোভার্সে যোগদান ক'রেছিল। প্রথম ম্যাচে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের ফলে তাদের অগ্রগতির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আশা করা গিছল কিন্তু দলের অধিকাংশ নিয়মিত খেলোয়াড় শারীরিক অসুস্থতার জন্য খেলতে না পারায় তাদিগকে ওয়াই এম সি-এর কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হ'তে হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং :—আলীহোসেন; সিরাজুদ্দিন ও জুম্মা খাঁ; বাচ্চি খাঁ, রসিদ খাঁ ও মাসুম; নুরমহম্মদ (ছোট), করিম, রসিদ, সাবু ও রহমন।

বাঙ্গালোর মুসলীম :—কাদের ভেলু; পিয়ারু ও হাবিব; কাদের, মহিউদ্দিন ও লক্ষ্মণ; বুসী, রসিদ, ডিক্রুজ, স্বামীনাথম্ ও কাদের আলি।

রসিদ

রেফারী—এল, হিবার্ট

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল—

১৮৯১—১ম ব্যাঃ ওরসেষ্টার রেজিমেণ্ট
১৮৯২— „
১৮৯৩—২য় ব্যাঃ লাঙ্কাসায়ার ফুসিলিয়ার্স
১৮৯৪—২য় ব্যাঃ রয়েল স্কট

১৮৯৫—২য় ব্যাঃ রয়েল স্কট
১৮৯৬—২য় ব্যাঃ ডারহামস্
১৮৯৭—২য় ব্যাঃ মিডিলসেক্স
১৮৯৮—এইচ, এল, আই
১৮৯৯—২য় ব্যাঃ রয়েল আইরিশ
১৯০০—৪২শ রয়েল হাইলাণ্ডারাস
১৯০১—২য় ব্যাঃ রয়েল আইরিশ
১৯০২—১ম ব্যাঃ চেসায়ার্স রেজিমেণ্ট
১৯০৩— ”
১৯০৪— ”
১৯০৫—১ম ব্যাঃ সিফোর্থ হাইলাণ্ডার্স
১৯০৬—২য় ব্যাঃ রয়েল স্কট
১৯০৭—২য় ব্যাঃ ইষ্ট লাঙ্কস্
১৯০৮—২য় ব্যাঃ ওরসেষ্টার
১৯০৯—২য় ব্যাঃ লিসেষ্টারসায়ার
১৯১০— ”
১৯১১—১ম ব্যাঃ রয়েল ওয়ারউইকসায়ার
১৯১২—২য় ব্যাঃ ডারসেট
১৯১৩—১ম ব্যাঃ রয়েল স্কট
১৯১৪—২০ খেলা হয় নাই
১৯২১—১ম ব্যাঃ কে, এস, এল, আই
১৯২২—২য় ব্যাঃ ডারহামস্
১৯২৩— ”
১৯২৪—২য় ব্যাঃ মিডিলসেক্স
১৯২৫— ”
১৯২৬— ”
১৯২৭—১ম ব্যাঃ চেসায়ার্স
১৯২৮—১ম ব্যাঃ রয়েল ওয়ারউইকসায়ার
১৯২৯—২য় ব্যাঃ ”
১৯৩০—কে, ও, এস, বি
১৯৩১—২য় ব্যাঃ রয়েল ওয়েষ্ট কেণ্ট
১৯৩২—রয়েল আইরিশ ফুসিলিয়ার্স
১৯৩৩—১ম ব্যাঃ কিংস রেজিমেণ্ট
১৯৩৪—সেরউড ফরেষ্টার্স
১৯৩৫—১ম ব্যাঃ কিংস রেজিমেণ্ট
১৯৩৬— ”
১৯৩৭—বাঙ্গালোর মুসলীমস
১৯৩৮— ”
১৯৩৯—২৮ ফিল্ড বৃগেড

বাংলার টীম ও রোভার্স কাপঃ

বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক উঁচু সে সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। পূর্ব্বে এখানে অন্যান্য খেলার ন্যায় ফুটবলেও ইউরোপীয়ানদের আধিপত্যই চ'লে আসছিলো; কিন্তু গত আট দশ বছর ধরে ভারতীয় খেলোয়াড়দের খেলা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করার জন্য ইউরোপীয়ানদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হ'য়ে এসেছে। অবশ্য তৎপূর্ব্বেও একাধিক ভারতীয় ক্লাব স্থানীয় ও আগন্তুক বিখ্যাত ইউরোপীয়ান ও সামরিক ক্লাবকে বিশিষ্ট খেলায় পরাজিত ক'রে নিজেদের নৈপুণ্য দেখিয়েছে। কিন্তু বাংলার বাইরে তারা ঠিক অনুরূপ প্রাধান্য দেখাতে পারেনি। রোভার্স কাপ খেলা সুরু হবার উনচল্লিশ বৎসর পরে বাংলাদেশ প্রথম ঐ কাপ পেলো। ডুরাণ্ডে মোহানবাগান জয়প্রিয় হ'লেও এবং কৃতিত্ব দেখালেও ফাইনাল খেলার সৌভাগ্য এখনও অর্জ্জন ক'রতে পারে নি। এই অক্ষমতার প্রধান কারণ অন্যান্য প্রদেশের অনেক আগে বাংলায় ফুটবল 'সিজিন্' সুরু হয়। স্থানীয় দল যখন বাইরে খেল্‌তে যায় তখন এখানকার 'সিজিন্' শেষ হ'য়ে আসে, আর অন্যান্য স্থানে তখন ফুটবল খেলা পুরো দমে চলে। এখানে যে সব টীম ১ম ডিভিসনে খেলে তাদের ২৪টা ক'রে শুধু লীগ ম্যাচই খেলতে হয়; এছাড়া পাওয়ার লীগ, আই এফ এ শীল্ড ও অন্যান্য নক্ আউট টুর্ণামেণ্টের তো শেষ নেই। ফল এই হয় যে, এত অধিক ম্যাচ খেলার পর খেলোয়াড়দের

মহিলাদের ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল লীগে বিদ্যাসাগর কলেজ দল

আর ঠিক 'ফরম্' থাকে না এবং থাকা সম্ভবও নয়। বোম্বেতে ওয়েলস্ রেজিমেণ্টের খুব নাম। তারা অপরাজেয় হ'য়ে লীগ পেয়েচে কিন্তু সব শুদ্ধ ম্যাচ খেলতে হ'য়েচে তাদের মাত্র নটা। এখানে কোন টীম প্রথম নটা ম্যাচ জিতলে তাঁরা যে শেষ পর্য্যন্ত চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান অধিকার ক'রতে পারবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

বোম্বের ক্রীড়ামোদিদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এবার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে দর্শক সমাগম হ'য়েছিলো লক্ষাধিক, কিন্তু রোভার্স কাপের ফাইনালে দর্শক হয় মাত্র ৯ হাজার। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কোন স্থানীয় দল ফাইনালে ওঠে নি। কিন্তু যে দুটি ভারতীয় দল ফাইনালে উঠেছিলো তাদের মত শক্তিশালী টীম বোম্বেতে একেবারেই নেই ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না, তা ছাড়া দুটি টীমই বোম্বেতে খুব জনপ্রিয়। স্থানীয় টীমের খেলাতেও উল্লেখযোগ্য দর্শক সমাগম হয়নি। মোহনবাগান ও মহমেডানের খেলাগুলিতেই বরং বেশী দর্শক হ'য়েছিলো। মহমেডান—হেভিব্যাটারী এবং মোহনবাগান—ওয়াই এম সি এর প্রত্যেক খেলাতেই প্রায় দশ হাজার ক'রে দর্শক সমাগম হ'যেছিলো।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অফিসটীম—বেঙ্গল কেমিক্যাল

ইলিয়ট শীল্ড ঃ

রিপন কলেজ ১-০ গোলে বিদ্যাসাগর কলেজকে পরাজিত ক'রে ইলিয়ট শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। ফাইনাল খেলাটি দু'বার হয়। প্রথম দিনের খেলাতেও রিপন ১ গোলে জয়ী হ'য়েছিলো—কিন্তু তাদের কে ঘোষ এক সঙ্গে ক্লাব, অফিস ও কলেজের হ'য়ে খেলার জন্য আই এফ এ থেকে পুনরায় খেলাটি হবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আই এফ এর নিয়ম অনুযায়ী কোন খেলোয়াড় তিনটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে খেলতে পারেন না। রিপন দ্বিতীয় দিনে জয়ী হ'যে নিজেদের সম্মান রেখেছে।

হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড ঃ

বঙ্গবাসী কলেজ ৩-২ গোলে রিপন কলেজকে পরাজিত ক'রে হার্ডিঞ্জ বার্থডে শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। বঙ্গবাসী কলেজ নেমেই চার মিনিটে তিনটে গোল দিয়ে দেয়। রিপন বহু চেষ্টায় দুটি গোল পরিশোধ করে। বিজয়ী দলের পক্ষে আর রায়, এস ঘোষ ও সোমানা গোল করেন, আর বিজিত দলের এস দে একাই দুটি গোল দেন।

হেরম্ব মৈত্র শীল্ড ঃ

সিটি কলেজ বঙ্গবাসী কলেজকে একগোলে পরাজিত ক'রে তাদের নিজেদের পরিচালিত হেরম্ব মৈত্র শীল্ড নিয়েছে।

রবার্ট হাডসন ঃ

চতুর্থ বিভাগের লীগ চাম্পিয়ান রবার্ট হাডসন এবার অনেকগুলি নক আউট টুর্ণামেণ্টে জয়ী হ'য়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি তারা স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও শালকিয়া ফ্রেণ্ডসকে ২-০ গোলে পরাজিত ক'রে যথাক্রমে অরোরা কাপ ও ক্যালকাটা চ্যালেঞ্জ শীল্ড বিজয়ী হ'য়েছে। লেডী হার্ডিঞ্জ শীল্ডের ফাইনালে উঠে তারা ইষ্টবেঙ্গলের কাছে হেরে যায়।

মহমেডান এ সি ঃ

ক্যালকাটা চ্যালেঞ্জ শীল্ডের খেলায় রেফারীর প্রতি অভদ্র ব্যবহারের জন্য মহমেডান এ সি'র সেলিমকে এক বৎসরের জন্য সাসপেণ্ড করা হ'য়েছে। মহমেডান এ সি-কেও

সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়—এবং উক্ত টুর্ণামেণ্ট থেকে তাদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম সুরু হয় ১৯৩৪ সালে। প্রথম বছর থেকে পর পর তিনবার উক্ত প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জয়লাভ করার পর কোন অজ্ঞাত কারণে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়। সম্প্রতি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিযোগিতাটি ভালভাবে চালানোর জন্য বিশেষ চেষ্টিত হ'য়েছেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে প্রথমে চারটি বিভাগীয় (zone) প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে হবে। এই বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় যে সব বিশ্ববিদ্যালয় সাফল্য লাভ ক'রবে তারাই শেষ মীমাংসার খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ব্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে। পূর্ব্ব বিভাগের খেলা অনুষ্ঠিত হবে পাটনায়। উত্তর বিভাগের খেলা দিল্লীতে, মধ্য বিভাগ ওসমানিয়াতে ও দক্ষিণ বিভাগের খেলা ত্রিবাঙ্কুরে হবে।

পূর্ব্ব বিভাগ :—এলাহাবাদ, পাটনা, কাশী, কলিকাতা ও ঢাকা।

উত্তর বিভাগ :—পাঞ্জাব, দিল্লী, আলীগড়, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ।

মধ্যবিভাগ :—বোম্বাই, নাগপুর, ওসমানিয়া ও অন্ধ্র।

দক্ষিণ বিভাগ :—মাদ্রাজ, মহীশূর, আন্নামালাই ও ত্রিবাঙ্কুর।

মহিলাদের ইণ্টার কলেজ বাস্কেট বল লীগে পোষ্ট গ্রাজুয়েট দল

পার্কলীগ বিজয়ী শ্যামবাজার ক্লাব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হ'য়ে খেলবার জন্যে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা মনোনীত হ'য়েছেন।

আর ভট্টাচার্য্য (প্রেসিডেন্সী), আলাউদ্দিন (পোষ্ট গ্রাজুয়েট), আর মজুমদার (রিপন ল), এম দাসগুপ্ত (আশুতোষ), আর বসু (বিদ্যাসাগর), এস ঘোষ (বঙ্গবাসী), বি চৌধুরী (পোষ্ট গ্রাজুয়েট), এ বিশ্বাস (বিদ্যাসাগর), নাজির আমেদ (প্রেসিডেন্সী), আর রায় (বঙ্গবাসী), সামসের আলী (ইসলামিয়া), টি ব্যানার্জ্জি (মেডিক্যাল) ক্যাপ্টেন, সোমানা (বঙ্গবাসী), এ ভট্টাচার্য্য (সিটি), এ ভৌমিক (পোষ্ট গ্রাজুয়েট), এ দে (রিপন)

ডক্টর এইচ সি রায় টীমের ম্যানেজার হিসাবে যাবেন।

মহিলাদের ইণ্টার কলেজ বাস্কেট লীগে ভিক্টোরিয়া ইনসঃ

ফুটবল ঃ

রোভার্স কাপ খেলে ফেরার পথে মোহনবাগান ও মহমেডান একাধিক স্থানে প্রীতি সম্মেলন ও চ্যারিটি ম্যাচ খেলেছে। মোহনবাগান লক্ষ্ণৌ সম্মিলিত একাদশকে ৫-০ গোলে পরাজিত করে। এস মিত্র একাই পর পর তিনটি গোল দেন। মহমেডান উক্ত টীমের সঙ্গে খেলে গোলশূন্য ড্র করে। এছাড়া মোহনবাগান এলাহাবাদে সম্মিলিত মিলিটারী একাদশকে ৪-০ গোলে এবং কানপুর সম্মিলিত একাদশকে ৬-০ গোলে পরাজিত ক’রেছে।

কালীঘাট কাপ ঃ

বেঙ্গল কেমিক্যাল ২-০ গোলে গিলাণ্ডার্সকে পরাজিত ক’রে কালীঘাট কাপ বিজয়ী হ’য়েচে। পি কর ও এ বসু বেঙ্গল কেমিক্যালের পক্ষে গোল করেন। প্রথম দিন খেলাটি গোলশূন্য ড্র হয়।

ব্যাডমিণ্টন ঃ

টেনিস খেলার ন্যায় ব্যাডমিণ্টনও যাতে পৃথিবীর ক্রীড়ামোদিদের কাছে অনুরূপ সম্মান লাভ ক’রতে পারে তার জন্য আন্তর্জ্জাতিক ব্যাডমিণ্টন ফেডারেশনের পরিচালকগণ চেষ্টা ক’র্‌চেন। টেনিস খেলায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার ন্যায় একটি ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবার জন্য কত্তৃপক্ষ মনস্থ ক’রেছেন। ১৯৪১ সালে এই প্রতিযোগিতা সুরু হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যেক দেশ এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ ক’রতে পারবে। প্রতিযোগিতাটিকে ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হ’য়েছে। ভারতবর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক’রবে অষ্ট্রেলিয়া বিভাগে। ভারতের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন উপলক্ষে কলিকাতায় নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর মাসে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক’রবেন।

আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে যে কাপটি দেওয়া হবে সেটি ফেডারেশনের সভাপতি স্যার জে টমাস প্রদান ক’রেচেন।

ইণ্টার কলেজিয়েট রেগেটা ঃ

ইণ্টার কলেজিয়েট রেগেটা লীগে আশুতোষ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজকে পরাজিত ক’রে লীগ চ্যাম্পিয়ান

হ'য়েছে। আশুতোষ গতবারের বিজয়ী বিদ্যাসাগরকে হারিয়ে তাদের Groupএ প্রথম হ'য়েছিলো।

আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

এবারের আমেরিকান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ খেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উদীয়মান খেলোয়াড় ডন ম্যাকনীলের অদ্ভুত সাফল্য। ডন ম্যাকনীলের নাম ভারতে বেশ সুপরিচিত। ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের কল্যাণে আমেরিকার এই তরুণ খেলোয়াড়ের খেলা দেখবার সৌভাগ্য অনেকেরই হ'য়েছে। ম্যাকনীল আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে বর্ত্তমানে পৃথিবীর এক নম্বর খেলোয়াড় উম্বলডন চ্যাম্পিয়ান ববি রীগসকে ৪-৬, ৬-৮, ৬-৩, ৬-৩, ও ৭-৫ গেমে পরাজিত ক'রে টেনিস জগতে বিস্ময়ের সৃষ্টি ক'রেছেন। রীগসের খেলা যাঁরা দেখেছেন অথবা যাঁরা তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁরা সকলেই দীর্ঘ সময় ব্যাপী খেলায় রীগসের প্রাধান্যের কথা অবশ্যই অবগত আছেন। এইরূপ একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের কাছে প্রথম দুটি সেট হেরে গিয়ে তারপর ম্যাচ জেতা যে কতদূর কষ্টসাধ্য তা সকলেই জানেন। বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে রীগসের জ্ঞান খুব বেশী থাকলেও তিনি বয়সে একেবারে তরুণ; অবশ্য ম্যাকনীল ততোধিক। ইণ্টার ন্যাশানাল টেনিসে রীগস ও ম্যাকনীলের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ফাইনালে। রীগস সেবারও পরাজিত হন ৭-৫, ৬-০ ও ৬-৩ গেমে। সেবারে ম্যাক্নীল সহজে জয় লাভ ক'রলেও তাঁর এবারের বিজয় অধিকতর গৌরবের। অতি শীঘ্রই যে ম্যাকনীল তাঁর প্রতিভাবলে টেনিস-জগতে স্বীয় স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। আমেরিকা যে টেনিস খেলোয়াড়দের জন্মভূমি তা সর্ব্ববাদীসম্মত।

রীগস

ডন ম্যাকনীল

মেয়েদের ফাইনালে কুমারী এলিস মার্ব্বেল ৬-২ ও ৬-৩ গেমে কুমারী হেলেন জেকবকে পরাজিত ক'রে পর পর তিনবার উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হ'লেন। কুমারী জেকব ইদানীং টেনিসের চেয়ে সাহিত্যের প্রতি বেশী মনোনিবেশ করেছেন আর লেখিকা হিসাবে একটু সুনামও অর্জ্জন করচেন।

হেলন জেকব

এলিস মার্ব্বেল

পেশাদার ও সখের টেনিস খেলোয়াড় ঃ

আজ যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সখের খেলোয়াড়দের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পেশাদার খেলোয়াড়দের টেনিস খেলা হয় তাহ'লে কারা জয়লাভ ক'রবে? যেদিন থেকে পেশাদার খেলোয়াড়ের প্রবর্ত্তন হোলো সেইদিন থেকেই এ প্রশ্ন উঠেছে; কিন্তু তার কোন মীমাংসাই হয়নি, আর হবেও না। কেন না সখের খেলোয়াড়রা যে-কালে পেশাদারদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রবেন না তখন এর সত্যিকারের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য সমালোচকদের আলোচনার অভাব নেই। পত্রিকা পৃষ্ঠে তাঁরা প্রায়ই কোন বিশেষ পক্ষকে সমর্থন ক'রে তাঁদের জয়লাভের সুনিশ্চয়তা সম্বন্ধে দৃঢ় মত ব্যক্ত করেন। সম্প্রতি গার্ন্ধার মুলোয় 'আমেরিকান লন টেনিসে' সখের খেলোয়াড়দের পক্ষ সমর্থন ক'রে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য বিষয় হ'চ্চে যে, পৃথিবীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দশজন পেশাদার খেলোয়াড় শুধু আমেরিকা থেকে

বাছাই করা দশজন সখের খেলোয়াড়দেরও হারাতে সক্ষম হবেন না। কিরূপভাবে আমেরিকান সখের খেলোয়াড়রা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবেন তার উদাহরণ স্বরূপ বলা হ'য়েছে যে, ডোনাল্ড বাজের সঙ্গে যদি রীগসের খেলা হয় তাতে বাজই জয়ী হবেন। তার কারণ মুলোয়ের মতে বাজ পৃথিবীর জীবিত টেনিস-খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঘাসে খেললে পেরী পার্কারের কাছে জিততে পারেন অন্যথা তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তার পরেই তিনি ব'লেছেন, যে কোন surfaceযে গত বছরের ফ্রেঞ্চ টেনিস চ্যাম্পিয়ান ডন ম্যাকনীল ভাইন্সকে পরাজিত ক'রবেন। মুলোয়ের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর ডন ম্যাকনীল রীগসকে পরাজিত ক'রে আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ বিজয়ী হ'য়েছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমরা ভাইন্সের কাছে তাঁর এরূপ সুনিশ্চিত জয়লাভের দুরাশা করি না। টিলডেন সম্বন্ধে মুলোয় ব'লেচেন যে, তিনি কুকের সঙ্গে যে কোন surfaceয়ে খেলে প্রতি সেটে দুটোর বেশী গেম জিততে পারবেন না। পক্ষপাতিত্ব এখানে আরো সুস্পষ্ট হ'য়েচে। তাঁর সম্পূর্ণ তালিকাতে মুলোয় দেখিয়েছেন যে, সাত জন আমেরিকান সখের খেলোয়াড় সহজেই উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হ'তে পারবেন। মুলোয়ের কথা স্বীকার ক'রতে গেলে পৃথিবীর সখের খেলোয়াড়রা সমবেত হ'লে এক বাজ ছাড়া বাকী সব পেশাদার খেলোয়াড়ই তো হেরে যান! কেন না ব্রোমউইচ, কুইষ্ট ও পুনসেক প্রভৃতি তো তাতে স্থান পাবেন! ফুটবল বা ক্রিকেটে পেশাদার খেলোয়াড়রা সখের খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলতে পান, তাতে কোন আপত্তি নেই। টেনিস থেকেও এই বৃথা আত্মসম্মান রক্ষার প্রচেষ্টা তুলে দেওয়াই উচিত। ক্রিকেট বা ফুটবলের সখের খেলোয়াড়দের সম্মান এদের চেয়ে তো কোন অংশেই কম নয়। তাছাড়া তাতে গার্দ্ধার মুলোয় শ্রেণীর সমালোচকদের মুখ বন্ধ হবে।

হার্ডকোর্ট টেনিস ঃ

ক্যালকাটা হার্ডকোর্ট টেনিস টুর্ণামেণ্টে বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড় দিলীপ বসু বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। সিঙ্গলস ফাইনালে তিনি অতি সহজেই ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে জি এম মেটাকে পরাজিত করেন। ডবলসেও তিনি মিচেলে মোরের সহযোগিতায় ৬-২ ও ৭-৫ গেমে সি এল মেটা ও মদনমোহনকে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হন। মিক্সড ডবলসে জি এম মেটা ও শ্রীমতী উইসার্ট ৭-৫ ও ৬-১ গেমে সি এল মেটা ও শ্রীমতী কার্গিনকে পরাজিত ক'রেচেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "হরপার্ব্বতী"—১।০
গোবর্দ্ধন শীল প্রণীত নাটক "বিদর্ভনন্দিনী"—১॥০
সজনীকান্ত দাস প্রণীত "কেড্‌স ও স্যাণ্ডাল"—২৲
কালিদাস রায় প্রণীত "বৈকালী"—২৲
সরোজনাথ ঘোষ প্রণীত "চাবুক"—২।০
সুবোধ বসু প্রণীত "বিগত বসন্ত"—১॥০
যতীন সাহা প্রণীত "রহস্যের মায়াজাল"—॥০
সতীশচন্দ্র গুহ দেবশর্ম্মা শাস্ত্রী প্রণীত "গল্পে ভাগবত"—॥০
রাধারমণ দাস সম্পাদিত "রক্তলোলুপ"—৸০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'রূপকুমারের রূপকথা"—॥৵০
সুনির্ম্মল বসু প্রণীত "রঙীন দেশের রূপকথা"—॥০
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত "সুইসাইড"—১৲
শিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "মধুরেণ সমাপয়েৎ"—॥০
The Truth About Gandhi
by M. D. Japheth—Rs. 1/8
যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের
নব জাগরণের ইতিবৃত্ত"—২॥০
জহরলাল বসু বি-এল প্রণীত "বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস—৩॥০
হরিদাস মজুমদার প্রণীত "গৃহকর্ম্ম"—॥৵০
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত প্রণীত
"সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ"—৸০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "শ্রীশ্রীচণ্ডী"—॥০
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "আগমনী"—১।০
দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "বার্ষিক শিশুসাথী"—১॥০
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মাটির পরশ"—১॥০
সুমথনাথ ঘোষের "ডেভিড কপার ফিল্ড"—৸০
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র"—১।০
প্রফুল্ল রঞ্জন সেনগুপ্ত প্রণীত কবিতাপুস্তক "আলো-ছায়া"—॥০
যোগেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক "আমরা কোন পথে"—২॥০
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "অকৃতজ্ঞ পৃথিবী"—১॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

জন্ম—[illegible] খৃষ্টাব্দ

প্রিন্সিপাল জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য

মৃত্যু—[illegible] ডিসেম্বর [illegible]

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৪৭

প্রথম খণ্ড | অষ্টাবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বাঙ্গালায় সমবায় আন্দোলন

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম্-এ

বাঙ্গালার কৃষকের দারিদ্র্য ও দুর্গতির সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং তাহার আর্থিক উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে তাহার অতিরিক্ত ঋণভার। এই ঋণের পরিমাণ যে গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এই বিষয়ে কোন মতানৈক্য নাই। বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটী মোটামোটি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কৃষকের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল এক শত কোটি টাকা। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কৃষি-ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিরাট ঋণের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯২১ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত কৃষিজ পণ্যের মূল্য শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস পাইয়াছিল। ফলে ঋণের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ বাবদ কৃষকের যে সমস্ত দায় রহিয়াছে তাহা কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায় নাই। এই পণ্যমূল্য হ্রাসের জন্য কৃষকগণ ঋণ সমস্যা লইয়া খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আবার অধিকাংশ ঋণ ধনোৎপাদনের উদ্দেশ্যে গৃহীত না হওয়াতেই সমস্যাটি জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় ঋণ গ্রহণ করা সত্ত্বেও কৃষিজ আয় বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে কৃষকের ঋণভার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

কৃষকের ঋণ-গ্রস্ত হওয়ার কারণ

কৃষকগণ কেন ব্যাপকভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রারম্ভেই অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার অধিকাংশ কৃষক সাধারণত খুব অল্প পরিমাণ জমি চাষ করে এবং তাহাও আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এই বিকৃত

ব্যবস্থার দরুণ কৃষকদের বাৎসরিক আয় খুবই সামান্য। কাজেই যে কৃষক বিশেষভাবে মিতব্যয়ী নহে এবং যাহার অন্য কোন উপায়ে আয় বৃদ্ধির সংস্থান নাই। তাহাকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহার অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধান করিতে এবং অন্য প্রকার দায় মিটাইতে হয়। এক কথায়, কৃষকের দারিদ্র্য ও আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাহার ঋণগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ। তাহার সামান্য কৃষিজ আয় অত্যাবশ্যকীয় দাবীদাওয়া মিটাইতেই ব্যয় হইয়া যায়। এই অবস্থায় শস্য অথবা গো-মহিষাদির হানি অথবা প্লাবন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটিলে কিংবা পণ্যমূল্য হ্রাস পাইলে যে তাহাকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তাহা আর বিচিত্র কি? তাই দেখা যাইতেছে যে এই অবস্থায় কৃষকের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা একপ্রকার অপরিহার্য্য ব্যাপার এবং তাহারা এই উদ্দেশ্যে মহাজন, লোন-অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাদের নিকট হইতে মূল্যবান জমি বন্ধক দিয়া অথবা বিনা বন্ধকে টাকা ধার করা কৃষকের পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু মহাজন এবং লোন-অফিস উচ্চ সুদ ব্যতীত টাকা ধার দিবে না। সুদের হার বেশী হওয়ায় ধনোৎপাদনের উদ্দেশ্যে টাকা ধার করিয়াও কৃষক তাহার আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন না। কারণ বর্দ্ধিত আয়ের অধিকাংশই আসল ও উচ্চ সুদের বাবদ ব্যয় হইয়া যায়। আর উচ্চ সুদের দরুণ ঋণের পরিমাণ এত শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, শেষ পর্য্যন্ত কৃষক পুঞ্জীভূত ঋণজালে জড়াইয়া পড়ে। ধনোৎপাদন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার অবস্থা যে আরও শোচনীয় হইয়া ওঠে তাহা সহজেই বুঝা যায়। একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কোন কোন কৃষক অনাবশ্যক মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অন্যায়ভাবে ব্যয়বাহুল্য করিয়া এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রেও অমিতব্যয়ী হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ঋণসমস্যা সমাধানের উদ্দেশে গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক প্রচেষ্টা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই কৃষি-ঋণসমস্যা ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতে থাকে এবং এই সমস্যার প্রতি গভর্ণমেণ্টের ও সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রায় সেই সময় হইতেই ভারত সরকার নানাভাবে সমস্যাটি সমাধান করিতে যত্নবান হন। কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ ও সাধারণ আইনের কৃষি-ঋণ-সম্পর্কিত বিধানসমূহের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন ও উন্নতিসাধন করিয়া এবং কৃষক যাহাতে নিরর্থক ঋণগ্রস্ত না হয় তাহার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট সমস্যাটির সমাধান ব্যাপারে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু ইহা শীঘ্রই প্রতীয়মান হয় যে, কৃষককে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা না করিলে সমস্যাটির কোন প্রকার সমাধান সম্ভবপর হইবে না। তাই ১৮৮৩ সালের ল্যাণ্ড-ইম্প্রুভমেণ্ট লোন্স য়্যাক্ট এবং ১৮৮৪ সালের এগ্রিকারচারিস্টস্ লোন্স য়্যাক্ট অনুসারে কৃষককে যথাক্রমে দীর্ঘ ও অল্প সময়ের জন্য স্বল্প সুদে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই দুইটি আইনের বিধান অনুসারে কৃষক অনেক ক্ষেত্রেই স্বল্প সুদে টাকা ধার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এইভাবে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দান করা সম্ভবপর নহে। টাকা ধার লইবার সময় কৃষককে অনেক ক্ষেত্রে অনাবশ্যক বিলম্বজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে অনেকটা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এই সব নানাকারণেই এই প্রকার ঋণদানপ্রথা কৃষকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী হয় নাই। আবার এই আইনে পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার বা কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জমি একত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন টাকা ধার দিবার বিধান না থাকায় এই ব্যবস্থায় কৃষকের আর্থিক অবস্থার যথার্থ উন্নতি সম্ভবপর হইয়া ওঠে না। তাই দেখা যাইতেছে যে, কৃষককে টাকা ধার দিবার ব্যাপারে সরকারী নীতি সত্যই বিশেষ কার্য্যকরী এবং উল্লেখযোগ্য হয় নাই।

সুতরাং এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কৃষকের ঋণভার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে, সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর হইবে না। তাই পূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত

ব্যবস্থাসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হন।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইহা অতি সাধারণ কথা যে, কৃষকগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত কৃষি-সমস্যাসমূহের সমাধানের প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিতে পারে না। কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি স্বল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের মিলিত চেষ্টায় ও সাহায্যে "সঙ্ঘশক্তির ভার জাগরিত করিয়া স্বকীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে" যে সকল সমিতি স্থাপিত করে তাহাদিগকে সমবায়সমিতি বলা হয়। সমবায়নীতির ভিত্তিতে সাধারণত দুই শ্রেণীর সমিতি গঠিত হইয়া থাকে। কতকসংখ্যক পরিচিত, দরিদ্র অথচ সৎপ্রকৃতির লোক একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের মিলিত মর্য্যাদা এবং সম্পত্তির মূলে অন্যের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে টাকা ধার করিয়া নিজেদের ভিতর আবার সেই টাকা কিছু উচ্চ সুদে ধার দিবার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল সমিতি স্থাপন করে তাহাদিগকে সমবায় ঋণ-দান সমিতি (Credit Society) বলা যাইতে পারে। এইভাবে আবার পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, পণ্য উৎপাদন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কতকসংখ্যক লোক মিলিত হইয়া যে সকল সমিতি প্রতিষ্ঠা করে, তাহাদিগকে ঋণ-দান ব্যতীত অন্য প্রকার সমবায় সমিতি (Non-credit Society) বলা হইয়া থাকে। ডেনমার্ক, আয়ার্লণ্ড, ইটালী, জার্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সমবায় নীতির ভিত্তিতে নানা শ্রেণীর সমিতি স্থাপন করিয়া কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি সামান্য-আয়-সম্পন্ন বহু লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়। এই ব্যাপারে সেই সকল দেশের সাফল্য দেখিয়া ভারত সরকারও এদেশে সমবায় সমিতি স্থাপনে উৎসাহী হন।

১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস্ য়্যাক্ট নামক একটা আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা ভারতে সমবায় ঋণদান সমিতি গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। এই সময় হইতে ক্রেটিড সোসাইটি গঠন-ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ১৯০৪ সালের আইনের কয়েকটি অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া ভারতে সমবায় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালে কো-অপারেটিভ সোসাইটিস য়্যাক্ট নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। নূতন আইন দ্বারা ভারতে সমবায়-নীতির ভিত্তিতে সর্ব্বপ্রকার সমিতি এবং প্রাথমিক সমিতিসমূহকে অর্থ-সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় ও অন্য প্রকার উচ্চাঙ্গের সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। ইহার ফলে ক্রয়-বিক্রয়, সেচ ও জলনিকাশ, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সমবায় সমিতি ঋণদান সমিতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হইতে থাকে।

১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্রের আমল হইতে সমবায় বিভাগ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসায় কয়েকটা প্রদেশ প্রাদেশিক সমবায় আইন বিধিবদ্ধ করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের পথ সুগম করিতে যত্নবান হন। ১৯৩৫ সাল হইতে বহুলাংশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতে প্রত্যেক প্রদেশেই সমবায় আন্দোলনের প্রসার ও সমবায়সমিতিসমূহের ভিত্তি শক্তিশালী করিবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালাতেও একটা স্বতন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিয়া বাঙ্গালার সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট একটি সমবায় আইন প্রণয়ন করিতেছেন। আশা করা যায় যে, তাহা শীঘ্রই আইনে পরিণত হইবে।

বাঙ্গালার সমবায় সমিতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাঙ্গালাতে সমবায় আন্দোলন বিশেষভাবে এই পর্য্যন্ত এই প্রদেশের কৃষক ও স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট অন্য শ্রেণীর লোকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার কার্য্যেই ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাই অধিকাংশ সমিতিগুলি ক্রেডিট সোসাইটির পর্য্যায়ভুক্ত। কৃষকদের দ্বারা গঠিত ঋণদান সমিতিগুলির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নহে। ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন সাধারণত সভ্যদিগের নিকট হইতে লব্ধ চাঁদা ও আমানত গ্রহণ, সভ্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং উচ্চাঙ্গের সমবায় প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় এই প্রকার সমিতির মোট সংখ্যা ১৯,৯২৮; মোট সভ্য-সংখ্যা ৪,৪৮,০৮৫ এবং কার্য্যকরী মূলধন ৫.৯৪ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছিল

অবশ্য বাঙ্গালার কৃষকদের মধ্যে ঋণদান ব্যতীত অন্য শ্রেণীর সমবায় সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত এই প্রকার সমিতি বাঙ্গালায় আশানুরূপ বিস্তার লাভ করিতে ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কৃষিজাত পণ্য ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কতকসংখ্যক কৃষি-ক্রয়-বিক্রয় সমিতি (Agricultural Purchase and Sale Societies) স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ধান্য বিক্রয় সমিতিগুলিই বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যা, সভ্যসংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধন যথাক্রমে ৬৭,১৩,২৯৭ এবং ৭,৫২,৫৪১ টাকা ছিল।

পশ্চিমবঙ্গে জমিতে কৃষিকার্য্যের জন্য জল সরবরাহ এবং বালুতে মজিয়া যাওয়া খালগুলির সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে ৯৭৫টি সেচ ও জলনিকাশ সমিতি (Irrigation and Drainage Societies) ১,৪৩,৭৭৮ বিঘা জমির জন্য সেচ ও জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া কৃষকদের পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিয়াছে। এই প্রকার সমিতির মূলধন সাধারণত সভ্যদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া এবং কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে। সভ্যদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর তাহাদের জমির অনুপাতে জলকর বাবদ যে টাকা আদায় হয় তাহা দ্বারা সমিতির ঋণ ক্রমে ক্রমে শোধ করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কয়েকটি কৃষি সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। এই সব এগ্রিকাল্চারাল এসোশিয়েশন কৃষকদিগকে উৎকৃষ্টতর বীজ, সার, কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু সারা বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত মাত্র ৩৮টি ছিল। উৎপাদক ও বিক্রয় সমিতি (Production and Sale Societies)-সমূহের মধ্যে দুগ্ধ সমিতিসমূহ, নওগাঁ গাঁজা ও দিনাজপুর এবং রাজসাহীর ইক্ষু সমিতিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালাদেশের ২৪৩-টা দুগ্ধ সমিতি শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া এবং কেন্দ্রীয় সমিতির মারফতে দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছে।

সমবায় নীতি বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। এই সকল নন্-এগ্রিকালচারাল সোসাইটি-সমূহের গুরুত্ব কৃষি সমিতিসমূহের মত না হইলেও ইহাদের উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নহে। ইহাদের মধ্যেও অধিকাংশ সমিতি ঋণদান সমিতির পর্য্যায়ভুক্ত। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ইহাদের সংখ্যা মাত্র ৫৫৫-টা হইলেও ইহাদের মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫১১ লক্ষ টাকা। এই সকল সমিতির দায় সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে এবং ইহাদের পরিচালনা শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকের হাতে ন্যস্ত থাকায় ইহারা কৃষি-ঋণ-দান সমিতিগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে।

ঋণদান ব্যতীত অন্য প্রকার সমিতির মধ্যে ভাণ্ডার ও সরবরাহ সমিতি (Purchase and Sale Societies) এবং শিল্পীসমিতিসমূহ (Artisan Societies) উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ সালে স্টোর্স্ এণ্ড সাপ্লাই সোসাইটিসসমূহের সংখ্যা ছিল ৪২ এবং ইহারা উক্ত বর্ষে মোট ৩.৩২ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু অংশীদারদের অন্যায় ব্যবহার ও তাহাদের ধারে অন্য স্থান হইতে মাল ক্রয় করিবার স্বভাবের দরুণ এই সব সমিতির কাজ ভাল চলিতেছে না। বয়নকারী সমিতিসমূহের সংখ্যা ১৯৩৭ সালে ছিল ৩৩০ এবং তাহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল ৫,৭০৫। ইহারা সাধারণত সভ্যদিগকে কাঁচা মাল সরবরাহ করে এবং পরে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করে। পণ্য বিক্রয়ের অব্যবস্থার দরুণই এই সকল সমিতির কার্য্যে বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই।

প্রাথমিক সমিতিগুলির কার্য্যের তদ্বির-তদারক এবং প্রধানত তাহাদিগকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালায় কয়েক শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। শিল্পী সমিতিসমূহকে নানা ভাবে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি শিল্পী সঙ্ঘ (Industrial unions) স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার দুগ্ধ সমিতিসমূহকে অনুরূপ সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে যে দুগ্ধ সঙ্ঘ (Milk Union) স্থাপিত হইয়াছে তাহা বেশ সাফল্যের সহিত কাজ করিতেছে। কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের দুগ্ধ সঙ্ঘগুলি লাভজনকভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না।

ঋণদান সমিতিসমূহকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালায় ১১৮-টি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাজ করিতেছে। এই

সকল সমিতির মূলধন প্রধানতঃ প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্তর্ভুক্ত; প্রাথমিক সমিতি ও সর্ব্বসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় এবং আমানত গ্রহণ ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ইহাদের কার্য্যকরী মূলধন ছিল ৫১৫.৮৯ লক্ষ টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহ, উৎপাদকসঙ্ঘ, শিল্পীসঙ্ঘ প্রভৃতিকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালায় একটি প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক বাঙ্গালার সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার মূলধন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় সভ্যদিগের নিকট শেয়ার বিক্রয় ও আমানত গ্রহণ করিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দরকার মত ঋণ গ্রহণ করিয়া এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহার সভ্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, শিল্পী ও উৎপাদক সঙ্ঘ ব্যতীত কয়েকটা প্রাথমিক সমিতিও রহিয়াছে এবং ১৯৩৭ সালে ইহার মোট সভ্যসংখ্যা ও কার্য্যকরী মূলধন যথাক্রমে ১১৬ এবং ২৩৩·৩১ লক্ষ টাকা ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালায় সমবায় সমিতিগুলি একটি সুসম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক সমগ্র আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্য শ্রেণীর সমবায় সঙ্ঘদিগকে টাকা ধার দিয়া সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও সমবায় সঙ্ঘগুলি প্রাথমিক সমিতিগুলিকে ঋণ দিয়া তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করে। প্রাথমিক সমিতিসমূহ সভ্যদিগকে টাকা ধার দিয়াও অন্য অন্য ভাবে তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

সাবিত্রী

শ্রীমমতা ঘোষ

না, না, ঋষি মোরে নিষেধ করো না,
যাই তার সন্ধানে,
ওই ওই শোন ডাকে মোরে সে যে—
দূর হ'তে শুনি কানে।
বরণ করেছি তারে মনে মনে,
সে যে মোর স্বামী জীবনে মরণে,—
আছে ঠিক এখন ফেরার সময় ?
যেতে হবে তারি টানে।

প্রথম যে পূজা কুমারী-হৃদয়
করেছে সে দেবতার,—
তারে উপবাসী রাখিয়া কেমনে
বন্ধ করিব দ্বার ?
জীবনের দীপ যদি তার নেভে
ফিরে আসিব কি সেই কথা ভেবে ?
পূজার থালিকা নামাব কোথায়
বল ঋষি কোন্‌খানে ?

মৃত্যু-কালিমা ঘনাইয়া আসে
যদি তার আঁখি-কোলে,
করিব সাধনা সারাটি জীবন
তারে ফিরে পাব ব'লে।
হে পিতা হে ঋষি তোমাদের পায়
সাবিত্রী আজি প্রণাম জানায়
সময় যে নাই, যাই যাই যাই
কাননের পথপাশে

গল্প ও উপন্যাস

জুয়াড়ীর বৌ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরিতে গেলে জুয়ার দিকে মাখনের ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা হইতেই। অল্প বয়সের খেয়াল আর খেলাগুলির মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের এমন জোরালো মানসিক বিকারের সূচনা অবশ্য কেউ কল্পনা করিতে পারিত না। বাজি ধরেনা কে, লটারীর টিকিট কেনে না কে, মেলায় গেলে নম্বর লেখা টেবিলে দু-চারটা পয়সা দিয়া ঘূর্ণামান চাকায় লেখা নম্বরের দিকে তীর ছোঁড়ে না কে? এসব তো খেলা—নিছক খেলা। তবে একটু বাড়াবাড়ি ছিল মাখনের। কথায় কথায় সকলের সঙ্গে বাজি ধরিত, লটারীর টিকিট কেনার পয়সার জন্য বিরক্ত করিয়া করিয়া গুরুজনের কাছে মার খাইত, মেলায় গিয়া অন্য জিনিষ কেনার পয়সা তীর ছুঁড়িবার খেলায় হারিয়া আসিত। এই তুচ্ছ ছেলেমানুষী পাগলামি যে একদিন একটা মারাত্মক নেশায় দাঁড়াইয়া যাইবে কে তা ভাবিতে পারিয়াছিল!

প্রকৃত জুয়া আরম্ভ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। মাখন তখন কলেজে গোটা দুই পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। নলিনীর দাদা সুরেশ ছিল তার প্রাণের বন্ধু, একদিন সে-ই তাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে লইয়া গেল।

'আজ একটু রেস খেলি চ' মাখন।'

'রেস? আমার কাছে মোটে দশটা টাকা আছে।'

'আবার কত চাই? লাগে তো আমি দেব'খন—আয়।'

সাতটাকা জিতিয়া দু'জনের সেদিন কি ফুর্ত্তি! সায়েবী হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ীমাছের মাথা আর মুর্গীর ঠ্যাং গিলিয়া বায়স্কোপ দেখিয়া সুরেশ বাড়ী গেল, আর মাখন ফিরিল তার মেসে। তারপর আর দু-একবার রেস খেলিতে গিয়া কয়েকটা টাকা হারিয়াই সুরেশ যদি-বা বিরক্ত হইয়া মাঠে যাওয়া একরকম বন্ধ করিয়া দিল, একটা দিন যাইতে না পারিলে মাখনের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। সুরেশের কাছে প্রায়ই সে টাকা ধার করিতে লাগিল।

আর একটা পরীক্ষা কোনরকমে পাশ করিবার পর একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল, সুরেশের কাছে মাখন অনেক টাকা ধারে। বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিতে সুরেশের নামে পোষ্টআপিসে জমানো টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

'এবার বাড়ী গিয়ে তোর টাকা এনে দেব।'

ছেলেকে একেবারে এতগুলি টাকা দেওয়া মাখনের বাবার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না; তবু তিন-তিনটা পরীক্ষা-পাশ-করা ছেলে চাকরির চেষ্টা করার আগে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেখিতে চায়, সুযোগ না পাইলে ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবার মত প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে চায়, টাকাটা তাকে না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?

বন্ধুকে দেওয়ার জন্য টাকাগুলি সঙ্গে লইয়া মাখন কলিকাতায় পৌঁছিল শনিবার সকাল প্রায় দশটার সময়। সমস্ত পথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এতদিন অল্প টাকা লইয়া খেলার জন্য সে হারিয়াছে। বেশী টাকা লইয়া খেলিলে জিতিবার সম্ভাবনা বেশী। বন্ধুর সমস্ত ঋণ একেবারে শোধ করার কি দরকার আছে? আজ যদি কিছু বেশী টাকা টাইগার জাম্পের উপর ধরে—টাইগার জাম্প আজ নিশ্চয় জিতিবে—ঘোড়াটা ফেবারিট্ হইলেও তিন গুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। সুরেশকে দিয়া দেওয়ার আগে টাকাটা খাটাইয়া কিছু লাভ করিয়া লইলে দোষ কি? সব টাকা নয়—অর্দ্ধেক। হারুক বা জিতুক এ টাকার অর্দ্ধেক সে স্পর্শ করিবে না, ঋণ পরিশোধের জন্য থাকিবে।

সন্ধ্যার আগে শেষ ঘোড়দৌড়ের শেষে খালি পকেটে মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরদিন অনেক বেলায় সে ম্লান মুখে সুরেশদের বাড়ী গেল। দরজা খুলিয়া দিল নলিনী। আগে হাসিমুখে

অভ্যর্থনা করিত, আজ কিন্তু মুখখানা তার বড়ই গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।

‘ছাতে চুল শুকোচ্ছিলাম, আপনাকে আসতে দেখে নেমে এলাম।’

নলিনীর হাসির অভাবটা পূরণ করার জন্য মাখন নিজেই একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ‘বেশ করেছো। সুরেশ কই?’

‘আসছে। টাকা এনেছেন দাদার?’

মাখন থতমত খাইয়া বলিল, ‘টাকা? কিসের টাকা? ও, টাকা। তুমি জানলে কি ক’রে টাকার কথা?’

‘আমি কেন, সবাই জানে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। আনেননি তো? তা আনবেন কেন!’—গম্ভীর মুখ অন্ধকার করিয়া নলিনী ভিতরে চলিয়া গেল।

সুরেশ আসিলে টাকার কথাটা উঠিল বড়ই খাপছাড়া ভাবে। মাখন বলিল, ‘তোর টাকা দিতে পারব না সুরেশ। এক কাজ কর, ওই টাকাটা আমায় পণ দে, আমি নলিনীকে বিয়ে করব।’

কথা ছিল, কথাটা গোপন থাকিবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা থাকিল না। বিনাপণে বন্ধুর বোনকে বিবাহ করার জন্য মনে মনে বাড়ীর সকলেই একটু চটিয়াছিল—নলিনী তেমন রূপসীও নয়। কথাটার সমালোচনা হইত নানাভাবে—একটু কটুভাবেই। নলিনী যে কি করিয়া মাখনকে ভুলাইল ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। আজকালকার মেয়ে, ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে, ওদের পক্ষে সবই হয়তো সম্ভব। আচ্ছা, পয়সাকড়ি যখন দিল না, গয়না কিছু বেশী দেওয়া কি উচিত ছিল না নলিনীর বাবার?

শুনিতে শুনিতে একদিন রাগে নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। গুরুজন কেউ মন্তব্য করিলে রাগে দিশেহারা হইয়াও হয়তো সে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন মন্তব্যটা করিয়াছিল ননদ বিধু। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে কতকটা ভাব হইয়া যাওয়ায় সে বলিয়া ফেলিল, ‘পণ দেওয়া হয়নি মানে? পণ তো ওঁকে আগেই দেওয়া হয়েছে।’

তারপর সব জানাজানি হইয়া গেল। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করিতেই চায় না, কিন্তু সত্য কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি! মাখনকে জিজ্ঞাসা করায় সেও স্বীকার করিয়া ফেলিল।

রাত্রে মাখন বলিল, ‘টাকার ব্যাপারটা বলতে না তোমায় বারণ করেছিলাম? বললে কেন?’

নলিনী বলিল, ‘ব্যবসার নাম ক’রে দাদাকে দেবার জন্য টাকা নিয়ে গিয়েছিলে আমায় বলনি কেন? আমার রাগ হয় না বুঝি?’

‘হুঁ, রাগ হ’লে তুমি বুঝি দশজনের কাছে আমার বদনাম ক’রে শোধ তুলবে? তুমি তো কম শয়তান নও!’

বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গেল, কথা বন্ধ রহিল তিন দিন। আবার কথা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা, অতগুলো টাকা কি করলে? দাদার কাছ থেকে নিয়েছো, বাবার কাছ থেকে নিয়েছো, টাকা তো কম নয়!’

প্রথমে স্বামীর কৈফিয়ৎটা ভাল করিয়া নলিনীর মাথায় ঢুকিল না। গোপনে কার সঙ্গে মাখন ব্যবসা করিতেছিল, সবটাকা লোকসান গিয়াছে। তারপর সে টের পাইল মাখন মিথ্যা বলিতেছে। মনটা তার খারাপ হইয়া গেল। স্বামীর মন তো তার ছোট নয়, টাকাপয়সার ব্যাপারেই তার কেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন হইল?

বাপ আর শ্বশুরের চেষ্টায় মাখনের একটা চাকরি জুটিয়া গেল। চাকরিটা ভাল, বছর পাঁচেকের মধ্যে বেতন বাড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল প্রায় তিনশ’ টাকায়। এতদিনে নলিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে এবং কতকটা স্বামীর চাকরির জন্যই অতি দ্রুত প্রমোশন পাইয়া পাইয়া স্বামীর সংসারে প্রায় গিন্নীর পদ পাইয়াছে। সংসারে বিশেষ অশান্তি নাই, রোগ শোক নাই, অনটন নাই—নলিনীর মনেও জোরালো দুঃখ কিছু নাই। কেবল সেই যে তিনদিন কথা বন্ধ থাকার পর মাখনের মিথ্যা বলার জন্য মনটা তার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মৃদু আশঙ্কার মত একটা স্থায়ী অস্বস্তির মধ্যে সেই মন খারাপ হওয়ারই কেমন যেন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া জের চলিতেছে। কোন পাপ করে নাই নলিনী, তবু ভয়ে রূপান্তরিত পুরানো পাপের মতই কি যেন একটা দুর্ব্বোধ্য ভার সব সময়েই তার মনকে দখল করিয়া আছে।

জুয়ার নেশা মাখনের কাটিয়া যায় নাই, কেবল ভালবাসার নেশার মতই প্রথম বয়সের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহ্য অধীরতার গণ্ডীটা পার হইয়া ধীর স্থির হিসাব করা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাকা প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রেম করার মত তাঁর জুয়া খেলাটাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা নিয়মিত। টাকা অবশ্য জমে না, অনেক সাধ অবশ্য মেটে না, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকার জন্য অবশ্য সাময়িকভাবে রীতিমত বিপদেই পড়িতে হয়, তবু মোটামুটি সংসার চলিয়া যায়। মাখনের শ'খানেক টাকা বেতন হইলে যেমন চলিত, তেমনিভাবে চলিয়া যায়। মাখনের বেতন শ'খানেক টাকা ধরিয়া লইলে অবশ্য অনেক হাঙ্গামাই মিটিয়া যাইত ; এর চেয়ে অনেক কম বেতনেও জগতে অনেক লোক চাকরি করে, কিন্তু মুস্কিল এই যে তিনশ' টাকা যে বেতন পায় তার বেতনের দুশো টাকা কোন কাজে না আসিলেও বেতন তার শ'খানেক টাকার বেশী নয় এটা ধরিয়া লওয়া তার নিজের পক্ষেও অসম্ভব, আত্মীয় বন্ধুর পক্ষেও অসম্ভব।

আত্মীয়-বন্ধুর রাগ অভিমান বিরক্তি আর উপদেশ, উপরোধ ও সমালোচনা এখনও চলিতে থাকিলেও নলিনী একরকম আর কিছুই বলে না। সে জানে, এ রোগের ওষুধ নাই। একথাটাও সে জানে যে, প্রয়োজন হইলে জুয়ার খরচটা মাখন কমাইয়া দিবে, কিন্তু সত্য সত্যই প্রয়োজন হওয়া চাই। পেট ভরানোর মত, গা ঢাকা দেওয়ার মত, রোগের সময় ডাক্তার টাকা আর ওষুধ কেনার মত খাঁটি প্রয়োজন। এরকম আসল প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ববোধের কাছেই কেবল তার জুয়ার নেশা হার মানে।

কত কৃত্রিম প্রয়োজনই নলিনী দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কতবার কতভাবে স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সংসারে এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। মাখন শুধু বলিয়াছে, আচ্ছা আচ্ছা, হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রায় কিছুই হয় নাই।

বাড়ী বদলানোর জন্য নলিনী অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। বলিয়াছে, 'এবাড়ীতে আমি থাকব না, একটা ভাল বাড়ীতে চল।' বলিয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তখন অবশ্য মাখন বেশী ভাড়ার একটা ভাল বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ফলটা নলিনীর পক্ষেই হইয়াছে মারাত্মক। কারণ, জুয়ার খরচ মাখন এক পয়সা কমায় নাই, টান পড়িয়াছে সংসারের খরচেই। আবার উঠিয়া যাইতে হইয়াছে কম ভাড়ার বাড়ীতে।

নলিনী বলিয়াছে, 'আমি দু'গাছা করে নতুন চুড়ি গড়াব।'

মাখন বলিয়াছে, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তারপর দু'বছরের মধ্যে সস্তা একজোড়া দুলও নলিনীর গড়ানো হয় নাই। কারণ, চুড়িও নলিনীর আছে, দুলও আছে।

কিন্তু নলিনী যেদিন বলিয়াছে, 'একটা লাইফ ইনসিওর পর্য্যন্ত করবে না তুমি?' তার একমাসের মধ্যে মাখন নলিনী ও দু'টি ছেলেমেয়ের নামে অনেক টাকার তিনটি পলিসি কিনিয়াছে এবং এখন পর্য্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়া আসিলেও বেশী ভাড়ার বাড়ীতে উঠিয়া যাওয়ার ফলটা নলিনীকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ধরিতে গেলে টাকা পয়সার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াই হইয়া গিয়াছে। তবু সেই রহস্যময় মৃদু আতঙ্কের পীড়ন একটুও শিথিল হয় নাই। কি যেন একটা বিপদ ঘটিবে—অল্পদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কিন্তু কি ঘটিবে? মাখন একদিন জুয়ায় সর্ব্বস্ব হারিয়া আসিয়া সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে? কিন্তু মাখনের সর্ব্বস্ব তো তার তিনশ' টাকার চাকরি, উপার্জ্জনের টাকা জুয়ার নেশায় নষ্ট করা সম্বন্ধে সে যতই অবিবেচক হোক, চাকরি নষ্ট করার মানুষ সে নয়। সে বিশ্বাস নলিনীর আছে। তবে? আরও অনেক বেশী আরামে ও সুখে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পাইয়াও স্বামীর দোষে কোন রকমে খাইয়া পরিয়া অতি গরীবের মত বাঁচিয়া থাকিতে হওয়ার যে জ্বালাভরা অভিযোগ, এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া?

কিন্তু তাই বা কোথায়, জ্বালাভরা অভিযোগ? রাজপ্রাসাদে রাজরাণীর মত সুখে ও আরামে থাকিবার ব্যবস্থা মাখন করিয়া দিক এটা সে চায়, মাখনের ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে চায়, কিন্তু না পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষোভ তো তার নাই।

নলিনী তাই কিছু বলে না। সব বিষয়েই সে একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, মাখনের সহজ সাধারণ ভালবাসার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনিবার চেষ্টায় পর্য্যন্ত। চেনা মানুষ

স্বামী হইয়াছে, তার কাছে কি অচেনা মানুষের নাটকীয় ভালবাসা আশা করা যায়? এতদিন ছেলেমানুষ ছিল তাই চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহের আগে বুদ্ধি কম ছিল তাই তখন ভাবিয়াছে, বিবাহ হইলে হয় তো মাখন বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু জুয়ার নেশার উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে যার মনের জোয়ার-ভাঁটা চলে, বৌএর কথা কি তার মনে পড়ে, বৌএর জন্য একবার একটু পাগল হওয়ার সময় কি তার থাকে!

ভাবিতে ভাবিতে নলিনীর ছোট ছোট চোখ দুটিতে অস্পষ্ট স্বপ্নের স্পষ্ট ছায়া এমন অদ্ভুত ভাবালুতার আবরণে ঘনাইয়া আসে যে জগতের সব ডাগর ডাগর চোখগুলিতেও বোধ হয় তা সম্ভব হয় না। হয়তো তখন দুপুরবেলা, আঁচল পাতিয়া মেঝেতে গড়ানোর অবসরটা পাওয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়ের একজন খেলায় মত্ত, একজন ঘুমে অচেতন। চোখ বুজিলে কষ্ট বাড়িয়া যায়, নলিনী তাই চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দ্যাখে—তার কুমারী জীবনের স্বপ্ন: আত্মহারা আবেগের সঙ্গে তাকে ভালবাসিলে মাখন কি করিত? সম্ভব অসম্ভব কত কথাই নলিনী ভাবে।

তারপর অল্প অল্প অস্বস্তির মধ্যে মৃদু ভয়ের পীড়নে স্বপ্ন শেষ হইয়া চোখ দুটি তার বড় সাধারণ দেখাইতে থাকে। দু'টি সন্তান যার—তার কেন আর এসব স্বপ্ন দেখা, আর কি এ স্বপ্ন সফল হয়! যদি-বা হয়, কোন এক আশ্চর্য্য উপায়ে আংশিকভাবে সফল হয়, দুদিন পরে সেটুকু সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। আবার ছেলে বা মেয়ে কোলে আসিবে নলিনীর, তারপর সব শেষ। উদাসীন মাখনের মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা জাগানোর কথা ভাবিতে তার নিজেরই কি লজ্জা করিবে না তখন? কি দিয়াই বা সে উদ্দীপনা জাগাইবে?

এখনও কেউ জানে না। দু'দিন পরেই জানিবে। মাখন হয় তো খুশী হইয়া আদর যত্ন বাড়াইয়া দিবে, বলিবে: 'একটু দুধ খেয়ো। এসময় দুধটুধ খেতে হয়।' কিন্তু তারপর? আরও শ্রান্ত হইয়া পড়িবে মাখন, আরও ঝিমাইয়া পড়িবে। মাথা কপাল খুঁড়িয়া মরিয়া গেলেও আর নলিনী তাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। নলিনীর ভ্রূ কুঁচকাইয়া যায়, সঙ্কুচিত চোখ দুটিতে মরণের চেয়ে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে, শীতের দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

কোন কি উপায় নাই? যে কোন একটা বিপজ্জনক উপায়? ব্যর্থ হইলে যদি সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, তবু সার্থকতার যেটুকু সম্ভাবনা থাকিবে তারই লোভে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। কিন্তু সেরকম উপায়ই বা কোথায়—যাতে হয় সমস্ত শেষ হইয়া যায়, নয় মাখনের ভালবাসা মেলে? নলিনীর কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। জীবন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে জুয়ায়, জীবন লইয়া জুয়া খেলার একটা উপায়ও ভগবান রাখেন নাই কেন?

ঠিক সেই সময় দুরু দুরু বুকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে মাঠে রেলিং ঘেঁষিয়া এগারটি ঘোড়ার মধ্যে একটির অগ্রগতি লক্ষ্য করিতে করিতে মাখন ভাবে, এবারও না জিতলে বিপদে পড়িবে বটে, কিন্তু যদি যেতে!

হয় তো সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে বন্ধু অবনীর সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত মাখন ফিরিয়া আসে। সুরেশের মত অবনী এখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মানুষটা সে একটু বেঁটে, রোগা, লাজুক ও ভীরু। কথার জবাবে পারিলে কথা বলার বদলে মৃদু একটু হাসিয়াই কাজ সারে। কখনও কেউ তাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছে কি-না সন্দেহ। ঘোড়া ছুটিবার সময় মাখন যখন আগ্রহে উত্তেজনায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা কামড়াইতে থাকে, অবনী নির্ব্বিকারভাবে বিড়ি টানিয়া যায়। জিতিলে মাখন 'হুররে' বলিয়া প্রচণ্ড একটা চীৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে, হারিলে ঝিমাইয়া পড়ে। অবনী জিতিলেও মৃদু একটু হাসে, হারিলেও হাসে।

নলিনীর সাজপোষাক দেখিয়া দুজনেই একটু অবাক হইয়া যায়। ফ্যাসন করিয়া শাড়ী পরিয়াছে, রঙীন ব্লাউজ গায়ে দিয়াছে, শুধু ঘষামাজায় খুশী না হইয়া গালে বোধ হয় একটু রঙের, আর চোখে একটু কাজলের ছোঁয়াচও দিয়াছে!

মাখন জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় যাবে?'

নলিনী একগাল হাসিয়া বলে, 'কোথায় আবার যাব?'

'সেজেছ যে?'

'সেজেছি? কি জ্বালা, কোথাও না গেলে বাড়ীতে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হবে?' তারপর অবনীর কাছে গিয়া বলে, 'সইকে বুঝি তালা বন্ধ ক'রে রাখেন, আসে না কেন?'

অবনী নীরবে মৃদু একটু হাসে।

'চলুন সই-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'

বলিয়া স্বামীর যে বন্ধুর সঙ্গে তিন হাত তফাতে দাঁড়াইয়া চিরদিন নলিনী সংক্ষেপে কথা বলিয়াছে, এখন তার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তোলে এবং মাখনের দিকে একনজর না চাহিয়াই বাহির হইয়া যায়।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও নলিনী ভিতরের উত্তেজনা গোপন করিতে পারে না। অবনীর বৌ বলে, 'কি হয়েছে সই?'

'কিছু না।'

কোমরে আঁচল জড়াইয়া অবনীর বৌ রান্না করিতেছিল। নলিনীর চেয়ে সে বয়সে বড়, কিন্তু বড়ই তাকে ছেলেমানুষ দেখায়। মানুষটা সে সব সময়েই হাসিখুশী, কাজ করিতে করিতে গুণ গুণ করিয়া এখনও গান করে। তাকে দেখিলেই নলিনীর বড় হিংসা হয়, মনটা কেমন ছটফট করিতে থাকে। ওর স্বামীও তো জুয়া খেলে, তার চেয়ে অনেক কষ্টেই ওকে সংসার চালাইতে হয়, দুটি ছেলের মধ্যে একটি ওর মরিয়া গিয়াছে, তবু সব সময় এমন ভাব দেখায় কেন? দুদিন আগে বিবাহ হইয়া আসিয়া স্বামীর আদরে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না?

অবনীর বৌ বলে, 'এমন সেজে গুজে হঠাৎ?'

নলিনী বলে, 'এমনি এলাম তোমায় দেখতে।'

'কি ভাগ্যি আমার!' ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া হাসিতে হাসিতে অবনীর বৌ কাছে আসিয়া বসে।

কথা আজ জমে না। রাত্রির সঙ্গে নলিনীর ভয় বাড়ে, ক্রমেই সে বেশী অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তবু উঠিবার নাম করে না। যত রাত হইবে মাখন তত বেশী রাগ করিবে—তত বেশী নাড়া খাইবে মাখনের মন। একটুও কি পরিবর্ত্তন আসিবে না? রাগটা যখন পড়িয়া যাইবে তখন?

রান্নার শেষ হয়, অবনীর খাওয়া হইয়া যায়, তখনও নলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবনীর বৌ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। হাসিখুশী ভাব মিলাইয়া গিয়া তারও মুখে যেন ভয়ের ছাপ পড়ে।

'আমায় কিছু বলবে সই?'

নলিনী মাথা নাড়িয়া বলে, 'কি বলব? না না, কিছু বলব না।'

'তোমায় নিতে আসছে না যে?'

'কে জানে। ওর কথা বাদ দাও।'

খানিক পরে অবনীর বৌ বলে, 'ও-ই তবে তোমায় দিয়ে আসুক। আর রাত ক'রে কাজ নেই। পুঁই-চচ্চড়ি রেঁধেছি, মুখে দিয়ে যাবে সই?'

হোক আর একটু রাত, মাখনের রাগ আর একটু বাড়িবে। আরম্ভ যখন করিয়াছে, শেষ না দেখিয়া নলিনী আজ ছাড়িবে না। মরিয়া হইয়া নলিনী সখির রান্না পুঁই-চচ্চড়ি মুখে দিবার জন্য সখির সঙ্গে এক থালায় খাইতে বসে।

দুজনে বেশ পেট ভরিয়াই খায়, সকালের জন্য পান্তা না রাখাতেই ভাতে কম পড়ে না; আর ডাল ভাজা মাছ তরকারী যতটুকুই থাক ভাগাভাগি করিয়া খাওয়ার সময় তো মেয়েদের কখনও কম পড়েই না।

খাওয়ার পরে পান মুখে দিয়া অবনীর বৌ স্বামীকে ডাকিয়া বলে, 'ওগো শুনছো, একটু বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। সইকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এসো। বাবা, এগারটা বাজে!'

নলিনীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এত রাত্রে আবার অবনীর সঙ্গে একা ফিরিতে দেখিলে কি রাগটাই না জানি মাখন করিবে! করুক রাগ, রাগানোর জন্যই তো সাজিয়া গুজিয়া এভাবে সে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এখন সে জন্য ভয় পাইলে চলিবে কেন? নিজেকে নলিনী অনেক বুঝায়, কিন্তু বুকের টিপ্‌টিপানি কিছুতেই কমে না।

দু'বন্ধুর বাড়ী বেশী দূরে নয়। রিক্সায় মিনিট দশেক লাগে। অবনীর বাড়ীর কাছেই গলির মোড়ে রিক্সা পাওয়া যায়। অবনী দু'টি রিক্সা ভাড়া করিতেছিল, নলিনী বারণ করিল, 'মিছিমিছি কেন বেশী পয়সা দেবেন? একটাতেই হবে।'

'না না, দুটোই নিই—'

নলিনীর গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, এসব খাপছাড়া উত্তেজনা কি তার সহ্য হয়! তবু মরিয়া হইয়া সে বলিল, 'আসুন না, একটাতে বসে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

গল্প কিছুই হয় না, সমস্ত পথ দুজনেই যতটা সম্ভব পাশের দিকে হেলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। বাড়ীর দরজার সামনে রিক্সা থামামাত্র নলিনী তড়াক্ করিয়া নামিয়া যায়।

অবনীকে বলে, 'ওঁকে ডেকে দিয়ে আপনি এই রিক্সাটা নিয়ে ফিরে যান।'

দরজা খুলিয়া দিতে আসিয়া মাখন দেখিতে পাইবে এত রাত্রে বৌ তার এক রিক্সায় অবনীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, নলিনীর এই আশা বা আশঙ্কা কিন্তু পূর্ণ হইল না! দরজা খুলিয়া দিল চাকর।

ঘরে গিয়া নলিনী ছ্যাখে কি, মেয়েটাকে কোলে লইয়া আনাড়ির মত থাপড়াইয়া থাপড়াইয়া মাখন তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। বৌ-এর সাড়া পাইয়া মাখন ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলিল, 'কি আশ্চর্য্য বিবেচনা তোমার! দুজনকে ফেলে রেখে এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলে? খুকীকে তো অন্তত নিয়ে যেতে পারতে সঙ্গে।'

মেয়েকে নামাইয়া দিয়া মাখন নিজের বিছানায় উঠিয়া শ্রান্তভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। খুব যে রাগ করিয়াছে তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

'তুমি কাউকে পাঠালে না কেন? অবনীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে—'

'কাকে পাঠাব? শম্ভু এতক্ষণ খুকীকে রাখছিল।'

দু'মিনিট আগে দরজা খুলিতে যাওয়ার সময় শম্ভু তবে মেয়েকে মাখনের কোলে দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে মাখনের মেয়ে রাখিতে হয় নাই! নলিনী জিজ্ঞাসা করিল না, মাখন নিজে কেন তাকে আনিতে যায় নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়া কি হইবে? নিজের চোখে বৌ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে দেখিলেও বোধ হয় তার রাগ হইবে না। এমন বদমেজাজী মানুষ, এক গ্লাস জল দিতে দেরী হওয়ায় আজ সকালে শম্ভুকে মারিতে উঠিয়াছিল; শুধু বৌকে তার এত অনুগ্রহ কেন? একদিন কি সে রাগের মাথায় বৌ-এর গালে একটা চড় বসাইয়া দিতে পারে না, যাতে খানিক পরে ভালবাসার জন্য না হোক, অন্তত অনুতাপের জন্যও অনেকগুলি চুমু দিয়া চড়ের দাগটা মুছিবার চেষ্টা করিতে হয়?

বাহিরটা একবার তদারক করিয়া আসিয়া নলিনী ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া পড়ে। মাখন বলে, 'খেলে না?'

নলিনী বলে, 'ওদের বাড়ী থেকে খেয়ে এসেছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া যায়, তারপর মাখন যেন ভয়ে ভয়েই আস্তে আস্তে বলে, 'আজ অনেকটাকা জিতেছি।'

নলিনী সাড়া দেয় না।

'প্রায় সাতশো।'

নলিনী তবু সাড়া দেয় না।

'তোমায় একটা গয়না গড়িয়ে দেব—যা চাও।'

নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে: 'কে শুনতে চায় তুমি হেরেছো কি জিতেছো, কে চায় তোমার গয়না, একবার কাছে ডাকতে পার না আমায়?'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাখন বলে, 'রাগ করেছ? না না, ঘুমোও, আর জ্বালাতন করব না।'

হিন্দু-মুসলমান

শ্রীনীলরতন দাস, বি-এ

ভারতের ভগবান্!
কর জাগ্রত ভারতের যত হিন্দু মুসলমান।
চারিদিকে ওঠে জাগরণ সাড়া,
অন্ধের মত মোরা দিশাহারা;
আত্মকলহে বিব্রত রহে নিত্য মোদের প্রাণ,
এ যে দুর্ম্মতি ঘৃণ্য এ নীতি দিতে হবে বলিদান!

যেদিন ভারতবাসী
স্বাধীন ভারতে সাধনার পথে মিলেছিল সবে আসি,—
বেদবাণী আর কোরানের সুর
মনোমালিন্য করেছিল দূর;
সন্ন্যাসী-পীর পূজারী-ফকির মনের কালিমা নাশি'
মসজিদ্ আর মন্দির দ্বার গড়েছিল পাশাপাশি!

কত যুগ যুগ ধরি
মোরা দুই জাতি করেছি বসতি রাজ্য নগর গড়ি!
মোস্‌লেম বিনা ভারত বিকল,
হিন্দু না হ'লে সকলি বিফল,—
হস্তিনাপুর আগ্রা সুদূর দিল্লী কোশল স্মরি'
অশ্রু সজল আঁখি ছল ছল, মর্ম্মে মর্ম্মে মরি!

কুমারিকা হিমাচল
যাদের মহিমা কীর্ত্তিগরিমা প্রচারিল অবিরল,—
দৈন্যের ভারে আজি তারা নত,
বিশ্বের মাঝে নিঃস্ব পতিত;—
বাদশার জাতি লভে দাসখ্যাতি, বীরগণ ভীরুদল;
অতীতের কথা জাগাইয়া ব্যথা মন করে চঞ্চল!

ভারতের সন্তান!
শোন দিকে দিকে আসিছে আজিকে মুক্তির আহ্বান।
দ্বন্দ্বের আর নাহি প্রয়োজন,
চিরমিলনের কর আয়োজন;
ভেদাভেদ ভুলি' কর কোলাকুলি, গাহ মৈত্রীর গান;
হোক্ জগতের সেবা ভারতের হিন্দু-মুসলমান!

ভাষাবিজ্ঞান ও ইতিহাস

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ

সর্পের ভাষাও ভাষা, অন্যান্য জীব-জন্তু পশু-পক্ষীর ভাষাও ভাষা, আবার মানবের ভাষাও ভাষা। ভাষার চরম উন্নতি মানুষের ভাষায়। বিভিন্ন শব্দের সমষ্টিতে বাক্য। এই বাক্যের সাহায্যেই মানব তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আকার ইঙ্গিতেও যে মনোভাব প্রকাশ করা যায় না তাহা নহে, কিন্তু আকার ইঙ্গিতের ভাষায় ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞাপনের সুবিধা কোথায়? বস্তুত যে সকল কারণে মানবে ও পশুতে পার্থক্য, মানবের ভাষার অস্তিত্ব সেই সকল কারণগুলির অন্যতম। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে ইহাই যে, সৃষ্টির আদিতে মানবের কোন ভাষা ছিল কি? যদি থাকিয়া থাকে ত সে কোন্ ভাষা? ভাষা কি মানবের নিজের সৃষ্টি? পূর্ব্বে একটি ধারণা ছিল যে, মানব ভাষা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সে ধারণা বর্ত্তমানে আর নাই। আদিতে মানবের কোন ভাষা ছিল না, আকার ইঙ্গিতই তাহার ভাবপ্রকাশের সহায়ক ছিল। অনেকে বলেন, পরে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া মানব ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। সে যাহাই হউক, ভৌ-ঔ থিয়োরী, ডিং-ডং থিয়োরী বা পুঃ-পু থিয়োরী এইরূপ বহু সিদ্ধান্তই হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধাম হয় নাই।

মানবের ভাষার আদিযুগ সম্বন্ধে শত মতভেদ থাকিলেও একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালে মানবের শব্দভাণ্ডার এত সম্পদশালী ছিল না। তৎকালীন মানবের প্রয়োজনবোধ ছিল অতি অল্প, তাহার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে সমস্যাও ছিল বহু অংশে কম, সুতরাং মনোভাব প্রকাশের জন্য তাহার অতি অল্পসংখ্যক শব্দই ছিল পর্য্যাপ্ত। তাহার প্রয়োজনবোধের সহিত, তাহার সামাজিক, রাজনৈতিক তথা তাহার জীবনে বহুদিকে বহু সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধির সহিত তাহার ভাষার শব্দসম্ভার বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। সভ্যতার বিকাশের সহিতই তাহার ভাষার উন্নতি হইয়াছে।

যান্ত্রিক সভ্যতার যুগের সহিত মানবের ভাষায় ঐ সংক্রান্ত বহু শব্দ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ঐ সকল ছিল কোথায়? এইরূপে বিভিন্ন ভাষাভাষীদিগের পরস্পরের সংযোগসূত্র দৃঢ় হওয়ার ফলে, পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের ফলে, এক ভাষার শব্দাবলী অন্য ভাষা নির্ব্বিবাদে তাহার প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করিতেছে।

আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষায় দ্রাবিড়ীয়, আরবী, ফারসী, ইংরেজী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ইত্যাদি বহু ভাষার শব্দাবলী রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত বা প্রগতিশীল ভাষা মাত্রেই অপর ভাষার নিকট এই বিষয়ে অল্পাধিক ঋণী। আমাদিগের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা দেখি, সুন্দর, নূতন একটি কথা পাইলে সেটির পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া তাহাকে নিজস্ব করিয়া লই—এইভাবে আমাদিগের শব্দভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনে যাহা খাটে ভাষাবিশেষের পক্ষেও তাহা বলা চলে। সুন্দর মানানসই একটি ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন ভাষার শব্দকেও ঠিক এইভাবেই আমরা নিজ ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই। আবার দেখি, যে বস্তু আমার দেশে ছিল না, বিদেশ হইতে আসিল, সে বস্তুর নাম ত আমার ভাষায় মিলিবে না, সেই বিদেশী ভাষার সহায়তাই গ্রহণ করিতে হইবে। এইভাবে বিচার করিলে এক একটি শব্দের মধ্য হইতে কত বিচিত্র রহস্যের সন্ধানই পাওয়া যায় তাহার নিরূপণ নাই। বহু শব্দের মধ্যে যে, একটি করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহার উদ্ঘাটনে অনুসন্ধিৎসুর চিত্তে যে আনন্দের সঞ্চার করে তাহার তুলনা কোথায়!

কেবলমাত্র এক ভাষার শব্দ অপর ভাষায় স্থান লাভ করিয়াই যে অনিসন্ধিৎসুর আনন্দ বিধানের কারণ ঘটাইয়াছে, তাহা নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিস্থিতি মধ্যে একই শব্দের যেভাবে অর্থান্তর ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বহুক্ষেত্রে একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটি জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস—কেবলমাত্র একটি বিশেষ জাতিরই বা কেন, সমগ্র মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা মাত্র কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিব ও তাহা হইতেই বুঝিতে পারিব ভাষা-বিজ্ঞান কিভাবে ঐতিহাসিককে সাহায্য করে।

মধ্যযুগের বাঙ্গালার উপকূল বাণিজ্য-পথে দস্যুভীতি ছিল। এই দস্যুদল কাহারা গঠন করিয়াছিল তাহার প্রমাণ দেয় আমাদিগের ভাষা। মুকুন্দরাম তাঁহার অম্বিকামঙ্গল তথা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন—"রাত্রে ডিঙ্গা বাহিয়া যায় হারামদের ডরে।" এই 'হারামদ' শব্দের অর্থ কি? পর্ত্তুগীজ ভাষায় সশস্ত্র জাহাজকে 'আরমাডা' বলা হয়। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'হারামদ' বা 'হারামাদ' বলা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় এইভাবে বহু বিদেশী শব্দ রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে 'পাজী' 'নচ্ছার' বা 'দুর্বৃত্ত' বুঝাইতে villain (ভিলেন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আদিতে ইহার অর্থ ছিল অন্যরূপ। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দের পশ্চাতে একটি ইতিহাস রহিয়াছে। প্রাচীন ফরাসী 'ভিলেন' অর্থে 'কৃষি-ভৃত্য' বুঝাইত। এই কৃষি-ভৃত্য-জ্ঞাপক শব্দটী কিভাবে দুর্বৃত্তজ্ঞাপক হইল? আসলে এই যুগের কৃষিভৃত্যদিগের কোনরূপ ভদ্রতা বা সম্মানজ্ঞান ছিল না। ভদ্রলোককে 'ভিলেন' বলায়

অর্থ প্রথমে হইল 'ভিলেন'-এর মত নীচ। পরে 'ভিলেন' শব্দেরই অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

ঠিক এইভাবেই knave ('নেভ') শব্দের অর্থও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আদিতে 'নেভ' শব্দের অর্থ ছিল বালক, তৎপরে অর্থ হইল বালক-ভৃত্য ও তাহা হইতে মাত্র ভৃত্য। কিন্তু ভৃত্যদিগের সাধারণ বিশেষত্বই হইতেছে, দুষ্টামি, চালাকি ও অসাধুতা। পরে এই বিশেষত্ব কয়টি বুঝাইবার নিমিত্তই 'নেভ' কথাটির ব্যবহার হইতে লাগিল। ফলে বর্ত্তমানে ইহার অর্থ বঞ্চক, জুয়াচোর, পাষণ্ড ইত্যাদি। জার্মান ভাষায় এই শব্দের মূল অর্থ অদ্যাপি বিদ্যমান।

Library (লাইব্রেরী) শব্দটির মধ্যে মানব-সভ্যতার ইতিহাসের একটি তথ্য নিহিত রহিয়াছে। গ্রন্থাগার বুঝাইতেই 'লাইব্রেরী' শব্দের প্রয়োগ ঘটে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে দেখি, লাইব্রেরীর অর্থ যথায় liber (লিবার) রক্ষিত রহিয়াছে। ল্যাটিন ভাষার 'লিবার' শব্দের অর্থ গাছের ছাল। তাহা হইলে এইদিক দিয়া লাইব্রেরী অর্থ হইতেছে যে স্থলে গাছের ছাল রক্ষিত আছে। কিন্তু গাছের ছাল গ্রন্থে পরিণত হইল কেন? এই স্থলে রহিয়াছে কাগজ আবিষ্কারের পূর্ব্বে মানব কোন্ বস্তুর উপর তাহার লেখনী চালনা করিত তাহারই কাহিনী।

এক সময়ে যে কাষ্ঠ ফলকের উপরেও অক্ষর খোদাই করিয়া লিখনকার্য্য হইত, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে codify (কোডিফাই) শব্দটিতে। 'কোডিফাই' শব্দটির সহিত রহিয়াছে ল্যাটিন codex (কোডেক্স) শব্দের নিবিড় যোগসূত্র। ল্যাটিন 'কোডেক্স' শব্দের অর্থ কাষ্ঠের টুকরা।

'পত্র' শব্দেই প্রমাণ যে, একসময়ে বৃক্ষপত্রেই প্রিয়া প্রিয়জনকে পত্র লিখিত হইত।

মানব তাহার মস্তিষ্কের সাহায্যে বহু জিনিষ আবিষ্কার করিয়াছে। সে তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যে অস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার করিয়া শত্রুকে পরাভূত করিয়াছে ও করিতেছে। অতি আদিম যুগ হইতেই অস্ত্রের সাহায্যে সে পশুজগতের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা ধাতব অস্ত্র ব্যবহার করি কিন্তু আদিম মানব ধাতুর ব্যবহার জানিত না। ধাতুর ব্যবহার জানিবার পূর্ব্বে সে করিত প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার এবং তাহারও পূর্ব্বে করিত কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার। এই যে ঐতিহাসিক তথ্য, ইহা আমরা দেখিতে পাই সামান্য hammer (হ্যামার) কথাটিতে। 'হ্যামার' শব্দের অর্থ হাতুড়ি বা ঐজাতীয় জিনিষ। বর্ত্তমানে আমরা 'হ্যামার' বলিতে লৌহাস্ত্রবিশেষই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু 'হ্যামার' শব্দের দ্বারা লৌহ-নির্ম্মিত হাতুড়ি বুঝান অতি প্রাচীন নহে। প্রাচীন য়্যাংলো-সাক্সন্ ভাষায় 'হ্যামার' ছিল কাষ্ঠ নির্ম্মিত। তাহার কিছু পরে 'হ্যামার' বলিতে বুঝাইত প্রস্তরনির্ম্মিত। মাত্র আধুনিক ইংরেজী ভাষায় উহা বলিলে আমরা ধাতুনির্ম্মিত বুঝিয়া থাকি।

আদিতে মানব যথেচ্ছভাবে ইতস্তত বিচরণ করিত। 'যে যতটা পারিত জমি লইয়া ভোগ-দখল করিত, কিন্তু ক্রমে সেভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাহারা সমাজ গঠন করিয়া স্থায়ীভাবে এক এক স্থলে বসবাস করিতে লাগিল। ইহার পর যথেচ্ছপরিমাণে ভূমি পাওয়া আর সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ভূমিখণ্ড লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হইল—ইহারই ইতিহাস পাই ল্যাটিন agros (আগ্রোস) শব্দে। ল্যাটিন ভাষায় 'আগ্রোস' অর্থে সাধারণভাবে যে-কোন জমি : কিন্তু এই শব্দের পরিণতি 'একার' (acre) শব্দে আমরা বুঝি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি।

ইন্দো-য়ুরোপীয় মূল শব্দ agros (আগ্রোস) হইতেই বৈদিক অজ্রঃ শব্দের উৎপত্তি। এই অজ্রঃ হইতেই হইয়াছে পরবর্ত্তী সংস্কৃতে 'অজির'। এতদ্‌স্থলেও দেখি উক্ত ঐতিহাসিক কাহিনীরই পূর্ব্বানুবৃত্তি। বৈদিক অজ্রঃ সাধারণ অর্থে জমি বুঝাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু অজির শব্দের অর্থ গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণ মাত্র।

'সুপারি'-র মধ্যে ভারতের বহির্বাণিজ্যের নজির রহিয়াছে। গুবাক বা গুয়া (=সুপারি) পশ্চিম ভারতের সূর্পারক (শূর্পারক) বা সোপরা বন্দর হইতে আরব্য পারস্য অঞ্চলে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইত। ফলে তদঞ্চলে গুবাকের নামকরণ যাহা ঘটিল, তাহার অর্থ সোপারা বন্দর হইতে রপ্তানি করা ফল। পরে মুসলমান আধিপত্যের সময় তাহাদিগের ভাষা বহুল ব্যবহারের ফলে তাহাদিগের সোপারার ফল সুপারিতে পরিণত হইল।

জবাফুল তন্ত্রাচারসম্মত ব্যতীত অপর কোনও পূজায় ব্যবহৃত হয় না। আবার China Rose (চায়না-রোজ) বুঝাইতে এবং ওড্রপুষ্প (ওড়ফুল)ও বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও অনুসন্ধানের ফলে কোন সম্বন্ধ আবিষ্কার হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যজনক নহে। চায়না-রোজ নাম হইতেই বুঝা যায় জবা চীনদেশীয় ফুল। আবার তন্ত্রের একটি নাম চীনাতন্ত্র সুতরাং চীনাতন্ত্রে চীনদেশীয় ফুল ব্যবহার হইবে ইহাতেহ বা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই ফুলের নাম জবা হইল কেন? জবা-র সহিত JAVA (জাভা) দ্বীপের কোন সম্পর্ক কি থাকিতে পারে না? চীনদেশ হইতে জাভায় আসিয়া যদি ওড়িষ্যা বা ওডদেশের কোন বন্দরে আসিয়া পরে সেইস্থান হইতে ভারতে প্রচারলাভ করার ফলেই ওড্রপুষ্প নামকরণ হইয়া থাকে তাহাতে কিছু অসঙ্গতি থাকে কি?

পাণিনির অধেঃ প্রসহনে ইত্যাদি সূত্রে 'সহ' ধাতু অভিভব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজয় করা —জ্ঞাপন করিতে সহ ধাতুর প্রয়োগ ঘটিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে "শত্রুণাং আক্রমণং সহতে" ইত্যাদিতে দেখি, সহ ধাতুর অর্থ বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করা বা তাহাতে বাধা দেওয়া, কিন্তু বর্ত্তমানে সহ ধাতুর অর্থ আধুনিক 'সহ্য' করা বা শত্রুকে বাধা না দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চুপ হইয়া থাকা। মাত্র এই সহ ধাতুর অর্থান্তরের ইতিহাসের মধ্যে, ভারতীয় আর্য্যগণের ক্রম-অবনতির বা তাহারা বীরের জাতি হইতে যুগ পরিবর্ত্তনের ফলে কালের স্রোতে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কেমন ধীরে ধীরে কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহারই দুঃখময় কাহিনী কথিত হইয়াছে।

‘অভিভাবক’ শব্দের অর্থ ছিল পরাজয়কারী। গ্রহের ফেরে বর্ত্তমানে এই পরাজয়কারী অভিভাবক, ‘আশ্রয়দাতা’ ও ‘রক্ষণাবেক্ষণকারী’ হইয়া উঠিয়াছে।

‘ভূতি’ শব্দের অর্থ সম্পদ। আমরা সম্পদ বলিতে ধন, রত্ন, মণি, মাণিক্য ইত্যাদিই বুঝিয়া থাকি। পূর্ব্বেও তাহাই বুঝাইত। কিন্তু বিভূতি (বি-ভূতি) অর্থাৎ বিশিষ্ট বা বিশেষ সম্পদ হইল ছাইভস্ম। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, ভারতে এক সময় সন্ন্যাসধর্ম্ম অতি প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল। সে’ যুগের মানব (ভারতীয়) ধনরত্নের মোহ কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উদ্‌গ্রীব হইল। পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ করিয়া সন্ন্যাসীর অঙ্গের ভূষণ ছাইভস্মকেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করিল, ফলে বিভূতি, বিশেষ পার্থিব সম্পদ জ্ঞাপন না করিয়া ঐ ছাইভস্মেই পরিণত হইল।

মুদ্রাঙ্কনের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত ; কিন্তু মুদ্রাঙ্কন কি ভাবে আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত হইল ? উহা কি আমাদিগের নিজস্ব পদ্ধতি অথবা অপরের নিকট হইতে শিক্ষাকৃত ? প্রাচীন পারসীক ভাষায় মিশর দেশের নাম ‘মুদ্রায়’। আসলে এই মুদ্রায় দেশের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহা করিলেন তাহাই হইল মুদ্রা (সীল মোহর “ছাপ”)। এই মুদ্রা শব্দ হইতে যে আমরা কেবলমাত্র ভারতে মুদ্রার প্রচলনের আদি কাহিনীই পাইলাম তাহা নহে, প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন পারসীক ও মিশরীয় জাতির সংযোগ সূত্রও পাইলাম।

ভাষা বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে এইরূপে আমরা নিত্য নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেছি। আপাতদৃষ্টিতে রাজ্ঞী জ্ঞাপন করিতে চতুষ্পদ মহিষের স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞাপক শব্দ মহিষী-র কোন সম্বন্ধই নাই, কিন্তু মহিষী অর্থে রাজ্ঞী হইল কি নিমিত্ত, তাহা জানিতে কৌতুহল নিশ্চয়ই অনেকেরই হয়। মহ্ (পূজা করা) + ইষ—এইরূপে মহিষ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহিষ শব্দ এককালে প্রকাণ্ড, অতিকায়, প্রধান ইত্যাদি অর্থে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত। এক সময়ে হয় ত মহিষের পর একটি প্রাণীবাচক শব্দ থাকিত। কালক্রমে ঐ বিশেষ্য শব্দটির ব্যবহার-রীতির লোপ পাইয়াছে ও মাত্র মহিষ শব্দের দ্বারাই অতিকায় একটি বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই ভাবে মহিষের স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ মহিষী-র দ্বারা মহীয়সী বিজ্ঞাপিত হইত। রাজ্ঞী যে মহীয়সী মহিলা সে বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ভাষা বিজ্ঞানের তুলনামূলক অনুশীলনে আমরা দেখিতে পাই, বর্ত্তমানে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা কয়েকটি গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। এইরূপে সংস্কৃত, প্রাচীন পারসীক, আবেস্তীয়, আর্মানীয়, জার্মানিক, কেলতিক, বল্টো-স্লাভিক ইত্যাদি ভাষা একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং এই গোষ্ঠী হইতেছে আর্য্য গোষ্ঠী। এই ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যেই বুঝিতে পারি, অতি আদিম যুগে, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ভাষা-ভাষী জাতি একত্রে বসবাস করিত, তাহাদিগের ভাষাও একই ছিল। পরে বিভিন্ন দেশে বিস্তৃতিলাভ করার ফলে তাহাদিগের রীতি-নীতি বিভিন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের ভাষাও কিছু-না-কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু মূলে তাহাদিগের আদিবাসস্থান ও আদি ভাষা (ইন্দো-য়ুরোপীয় মূল ভাষা) একই ছিল। এই ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যেই (১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে হুগো উইঙ্কলার কর্ত্তৃক এসিয়া-মাইনরের কাপ্‌পাডোকিয়া-র অন্তর্গত বোঘাজ কুইগ্রামে আবিষ্কৃত প্রত্নলেখ হইতে) জানিতে পারি মেসোপটিমিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত মিটান্নির রাজসভায় যে ভাষা প্রচলিত ছিল, উহা ভারতীয়-আর্য্যগণের ভাষা। এই রাজবংশের সহিত হিট্‌টাইট্‌ রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্নলেখগুলির সাহায্যে রাজকীয় ভাষা নির্দ্ধারিত হওয়ায় আমরা বিনা আয়াসেই বুঝিতে পারি—উক্ত দেশের রাজবংশ কোন্ দেশীয় ছিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব উনবিংশ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের একদল লোক যে মেসোপটিমিয়ায় উপনিবেশ বা রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ইহা জানিয়া কোন্ ভারতীয়-আর্য্যের আনন্দ না হয় !

আসলে ভাষাবিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব নির্দ্ধারণে যে পরিমাণে সাহায্য করে, ভূতত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন বিজ্ঞানই সে পরিমাণে পারেনা ; কিন্তু দুঃখের বিষয় হইতেছে ইহাই যে, বাঙ্গালা ভাষায় এই বিজ্ঞানের আলোচনা হয় নাই বলিলেই চলে। তুলনামূলক ভাবে ভাষা-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আজ সমগ্র বিশ্বের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা আমাদিগের বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অহঙ্কার করিয়া থাকি। সাহিত্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা যে সমগ্র ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় এবং সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয়—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু তৎসহিত ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভাষাবিজ্ঞানের আলেচেনায় বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে জার্মান, ফরাসী বা ইংরেজি হইতে পশ্চাৎপদ তাহা সত্যই লজ্জাকর।

নব সংস্করণ

বনফুল

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস মিষ্টার রক্ষিতের অফিস-কক্ষ। কক্ষটি বেশ প্রশস্ত অর্থাৎ একটি বড় সেক্রেটেরিয়ট টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, ফাইল-সমন্বিত কয়েকটা শেল্ফ্ থাকা সত্ত্বেও কক্ষটিতে পরিক্রমণ করিবার মতো স্থান আছে। মিষ্টার রক্ষিত একটু উত্তেজিতভাবে পরিক্রমণও করিতেছেন। অফিস-কক্ষের পাশে আর একটি ঘর রহিয়াছে, তাহার দরজা দেখা যাইতেছে। মিষ্টার রক্ষিতের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হইলেও শরীর বেশ বলিষ্ঠ। মুখটা দেখিলে ভয় হয়, হঠাৎ মনে হয় বুলডগের মুখে কাঁচা-পাকা এক জোড়া গোঁফ গজাইয়াছে। পরিধানে খাকি হাফ শার্ট, হাফ প্যাণ্ট, হোস এবং মিলিটারি বুট। কোমরে চামড়ার চওড়া কোমর-বন্ধ। মুখে পাইপ। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। মিষ্টার রক্ষিত ফিরিয়া দেখিলেন। দ্বাররক্ষী কনেষ্টবলটি প্রবেশ করিয়া মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট্ করিল এবং একটি কার্ড দিল। মিষ্টার রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কার্ডটি দেখিলেন—

রক্ষিত। (কার্ডটা টেবিলে রাখিয়া) সা'বকো আনে বোলো।

কনেষ্টবল সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণপরেই ধুতি পাঞ্জাবি-পরিহিত প্রৌঢ় নিবারণবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। নিবারণ মিষ্টার রক্ষিতের বাল্যবন্ধু এবং স্থানীয় কলেজের প্রফেসার।

নিবারণ। রক্ষিত, যা শুনছি তা সত্যি নাকি ?

রক্ষিত। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) সত্যি।

রক্ষিতের চক্ষু দুইটি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির হইল। তিনি আরও যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপটা কামড়াইয়া ধরিলেন। নিবারণ একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

নিবারণ। সত্যি অপর্ণা পালিয়েছে ?

রক্ষিত। (সহসা উচ্চকণ্ঠে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার একমাত্র মেয়ে অপর্ণা পালিয়েছে। তুমি কি তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে এসেছ না কি আমাকে ! ইফ্ সো—

পুনরায় আত্মসম্বরণ করিয়া পাইপ কামড়াইলেন

নিবারণ। (শান্তকণ্ঠে) এটা কি ঠাট্টা করবার বিষয় ! বন্ধুর বিপদে আসা উচিত বলেই এসেছি। যদি বিরক্ত হও, উঠে যাচ্ছি—

উঠিবার উপক্রম করিলেন

রক্ষিত। (সহসা ঘুরিয়া) Please take your seat and don't be silly !

নিবারণ পুনরায় বসিলেন এবং রক্ষিত পদচারণ করিতে লাগিলেন

নিবারণ। কোন খবর-টবর পেয়েছ ?

রক্ষিত। কিছু না। কিন্তু (সহসা প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইয়া) আচ্ছা, আমার মেয়েকে তো তোমরা পড়িয়েছ। তার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি বল তো !

নিবারণ। আমার ধারণা তো খুব ভাল ! ফিলজফির নতুন যে ছোকরা প্রফেসারটি এসেছেন, চেন বোধ হয় তাঁকে, মঙ্গলময়বাবু—তিনিও তো খুব প্রশংসা করছিলেন সেদিন। বলছিলেন খুব ভালো মেয়েটি—

রক্ষিত। ভাল মানে কি ?

নিবারণ। লেখাপড়ায় ভাল, ব্যবহার ভাল।

রক্ষিত। চরিত্র ?

নিবারণ। আমার তো ধারণা ছিল ভালই—

রক্ষিত। তা হ'লে how do you explain this ? তোমাদের কেযারে মেয়েকে কলেজে পড়তে দিলাম, তার এই ফল ?

নিবারণ। (হাসিয়া) দেখ ভাই, ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের দায়িত্ব নেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত, একরকম অসম্ভব।

রক্ষিত। কেন ?

নিবারণ। নোট বই মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষা পাশ করানো যায় কিন্তু চরিত্র গড়া যায় না। চরিত্র জিনিসটা বাল্যকাল থেকে আপনা আপনি গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গ সঙ্গী-সাথীর প্রভাবে। ছাত্রছাত্রীদের শিশু বয়সের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হবার সুযোগ কোন অধ্যাপকেরই নেই। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আমলে হয় তো ছিল। তা ছাড়া—

সহসা থামিয়া গেলেন ও একটু হাসিলেন

রক্ষিত। তা ছাড়া কি ?

নিবারণ। হেরিডিটি বলেও একটা জিনিস আছে।

হাজার চেষ্টা করলেও নিমের বিচি থেকে আম গাছ হ'তে পারে না!

রক্ষিত। তা হ'লে তুমি কি বলতে চাও?

নিবারণ। You should remember the wild oats you have sown! আমার মতে স্ত্রী মারা যাবার পর তোমার আবার বিয়ে করা উচিত ছিল!

রক্ষিত। গস্‌স্‌! তুমি কি আমাকে ধর্ম্মের উপদেশ দিতে এসেছ না কি! ইফ সো—

আত্মসম্বরণ করিয়া পুনরায় পাইপ কামড়াইলেন

নিবারণ। দেখ ভাই, মেয়েকে যখন উচ্চশিক্ষা দিয়েছ তখন অত অধীর হ'লে চলবে না। তার তাল সামলাতে হবে।

রক্ষিত। তার মানে?

নিবারণ। মানে, তার স্বাধীনতাকে সহ্য করতে হবে।

রক্ষিত। স্বাধীনতা মানে কি উচ্ছৃঙ্খলতা?

নিবারণ। তা অবশ্য নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, লেখাপড়া শেখানো মানেই শেকল ভাঙবার উপায় শেখানো। খাঁচার পাখীকে আকাশের খবর দিলে খাঁচা সম্বন্ধে তার মোহ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তার শিক্ষিত স্বাধীন বুদ্ধির উপর আস্থা রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অধীর হোয়ো না!

রক্ষিত। মেয়ে পালিয়ে গেছে, অধীর হব না, বল কি! তা ছাড়া, তার বিয়ের সব ঠিক ঠাক, জব্বলপুরের জমিদারের বড় ছেলের সঙ্গে। তারা মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে গেছে। তিন জায়গায় তো পছন্দই করলে না!

নিবারণ। ছি ছি ছি ছি, তোমরা লেখাপড়া জানা বড় বড় মেয়েকেও গরু-বাছুরের মতো বের করে দেখাও, ওরা তো রিভোল্ট করবেই!

রক্ষিত। না দেখে লোকে বিয়ে করবে কেন? দেশ-সুদ্ধ পাত্রীর বাপ পাত্রদের দোরে সাধাসাধি করছে টাকার থলি নিয়ে—

নিবারণ। তা হ'লে মেয়েকে লেখাপড়া না শিখিয়ে সকাল সকাল বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল তোমার। দু নৌকোয় পা দিয়ে নদী পার হওয়া শক্ত, ডুবে যাবারই বেশী সম্ভাবনা।

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, এটা তোমার লেকচার থিয়েটার নয়। আর তোমার বক্তৃতা শোনবার অবসরও নেই আমার।

নিবারণ। বক্তৃতা দিতে আসিনি আমি। যে জন্যে এসেছি তা হ'লে শোন। শুনছি না কি তুমি কলেজের কয়েকজন ছেলেকে য়্যারেষ্ট করেছ?

রক্ষিত। নিশ্চয়ই করেছি। ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করবার জন্যেই গভর্ণমেণ্ট মাইনে দিয়ে আমাদের রেখেছে!

নিবারণ। (সবিস্ময়ে) এরা সবাই ক্রিমিনাল্?

রক্ষিত। আমার সন্দেহ হয়!

নিবারণ। সন্দেহ হবার হেতু?

মিষ্টার রক্ষিত টেবিলের নিকট গেলেন এবং ড্রয়ার টানিয়া কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া নিবারণের হাতে দিলেন

রক্ষিত। সব জায়গায় রিপ্লাই প্রিপেড্ টেলিগ্রাম ক'রে যখন জানলাম যে মেয়ে জানাশোনা কোন জায়গায় যায় নি, তখন I broke open her boxes and found these love-letters! সব ব্যাটাকে য়্যারেষ্ট করেছি আমি!

নিবারণ সবিস্ময়ে চিঠিগুলি উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন ও তাহার পর সেগুলি টেবিলে রাখিয়া দিলেন

নিবারণ। মানলুম না হয় লাভ-লেটার্স লিখেছে। কিন্তু লাভ-লেটার্স লেখা ক্রাইম্ নয়। তা যদি হয়, তা হ'লে সব চেয়ে বড় ক্রিমিনাল তুমি!

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, I am not in a mood for jokes now.

নিবারণ। কয়েকটি ছোকরা তোমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছে এতে এতটা খাপ্পা হয়ে উঠেছ কেন বল তো! তোমাকে রসিক বলেই জানতুম!

রক্ষিত। রসিকতার সময় অসময় আছে! এ নিয়ে তুমিও রসিকতা করতে না যদি অপর্ণা তোমার মেয়ে হ'ত।

নিবারণ স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন

নিবারণ। যে ছেলেগুলিকে য়্যারেস্ট করেছ—কি করতে চাও তাদের নিয়ে?

রক্ষিত। এনকোয়্যারি।

নিবারণ। কোথায় তারা?

রক্ষিত। কাউকে 'বেল্' দিইনি আমি। কাল সমস্ত রাত লক্-আপে ছিল, এখন পাশের ঘরে রয়েছে। Good-for-nothing beggars all of them!

নিবারণ। কেবলমাত্র সন্দেহের উপর নির্ভর ক'রে এতগুলি ভদ্দরলোকের ছেলেকে এমনভাবে—

রক্ষিত। You shut up! ভদ্দরলোকের ছেলে! ভদ্দরলোকের ছেলে ভদ্দরলোকের মেয়েকে এরকম ভাবে চিঠি লেখে না।

নিবারণ। মাঝে মাঝে দু-একটা বানান ভুল ছাড়া চিঠিগুলোতে আর তো বিশেষ কোন দোষ দেখলাম না। সকলেই তো বেশ সরস ভাষায় তোমার মেয়ের স্তুতিগান করেছে —এতে অত চটছ কেন?

রক্ষিত। দেখ নিবারণ, there is a limit to everything.

নিবারণ। Ought to be!

রক্ষিত। (সহসা আগাইয়া আসিযা) তোমার উদ্দেশ্যটা কি?

নিবারণ। এই ছেলেদের গার্জেনরা আমাকে এসে ধরেছে।

রক্ষিত। ও, সুপারিশ করতে এসেছ তুমি! তবে যে বললে বন্ধুর বিপদ শুনে (সহসা অধীরভাবে) O you teachers and professors, you are a hopeless lot of hypocrites!

নিবারণ অবিচলিত

নিবারণ। একটা বিষয়ে তোমার তারিফ করতেই হয়; এতদিন পুলিশে চাকরি করেও ভাষাটা বেশ শ্লীল রাখতে পেরেছ তুমি!

রক্ষিত। দেখ নিবারণ!

নিবারণ। (সানুনয়ে) এদের ছেড়ে দাও ভাই!

রক্ষিত। না।

নিবারণ। দেখ—

রক্ষিত। (প্রায় চীৎকার করিয়া) না, না, না—কিছুতেই এদের ছেড়ে দেব না আমি! This is abduction!

নিবারণ। আমি বলছি এরা নির্দ্দোষ। শোন—

রক্ষিত। কিছু শুনতে চাই না আমি! তোমার সহানুভূতিজ্ঞাপন যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে—you may go and let me do my duty. (সহসা) এরা নির্দ্দোষ! তুমি জানলে কি ক'রে?

নিবারণ। আমার তাই ধারণা।

রক্ষিত। ধারণা! আমার কি ধারণা জান?

নিবারণ। কি?

রক্ষিত। সতেরোটা গাধা মরে একটা মাস্টার হয়!

নিবারণ। মানে?

রক্ষিত। মানে-টানে কিছু শুনতে চাই না আমি —please go. I want to see through the game.

নিবারণ। দেখ শহরের এতগুলো ভদ্রলোককে চটানো ঠিক নয়! আজকালকার দিনে—

রক্ষিত। তুমি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ নাকি?

নিবারণ। মোটেই না। জিনিসটার নানা দিক তোমাকে দেখাচ্ছি—

রক্ষিত। আমি দেখতে চাই না কিচ্ছু—please go.

নিবারণ হতাশ হইয়া চুপ করিলেন। রক্ষিত একবার ক্রুদ্ধভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন

রক্ষিত। বসে আছ যে!

নিবারণ। তাড়িয়ে দেবে না কি?

রক্ষিত। অন্য লোক হ'লে এতক্ষণ দিতাম! (একটু পরে) দশটা তো বেজে গেছে। তোমার কলেজ নেই?

নিবারণ। কলেজের ছুটি! এদের তা হ'লে ছাড়বে না কিছুতেই?

রক্ষিত। না।

নিবারণ। কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। আচ্ছা, উঠি তা হ'লে।—জিনিসটা ভেবে দেখো—

রক্ষিত পাইপ ধরাইতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না, নিবারণ চলিয়া গেলে চেয়ারে গিয়া বসিলেন এবং ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিয়া প্রবেশ করিল

রক্ষিত। (একটি চিঠি লইয়া ও লেখকের নাম দেখিয়া) জ্যোৎস্নাভূষণ কো বোলাও।

কনেষ্টবল চলিয়া গেল। একটু পরে একটি লিকলিকে রোগা গোছের ছোকরা প্রবেশ করিয়া সভয়ে প্রণাম করিল। রক্ষিত বার দুই তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি ?

জ্যোৎস্না। আজ্ঞে, জ্যোৎস্নাভূষণ চৌধুরী !

রক্ষিত। তুমি আমার মেয়ে অপর্ণাকে চেন ?

জ্যোৎস্না। চিনি।

রক্ষিত। কি ক'রে আলাপ হ'ল ?

জ্যোৎস্না। একসঙ্গে পড়ি আমরা।

রক্ষিত। তাকে প্রেমপত্র লিখতে ?

জ্যোৎস্না। (ঢোঁক গিলিয়া) আজ্ঞে না !

রক্ষিত। (একটি পত্র তুলিয়া) এটা তা হ'লে কার লেখা !

পড়িতে লাগিলেন

"প্রাণের অপর্ণা, তুমি আজ থার্ড পিরিয়ডে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিলে কেন ? আমি কেসে কেসে গলা চিরে ফেললাম, তবু আমার দিকে একবার চাইলে না—"

এ কার লেখা ?

জ্যোৎস্না। (শুষ্ককণ্ঠে) আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না, এ চিঠি কি ক'রে—

রক্ষিত। (ধমক দিয়া) বুঝতে পারছ না, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার ! চাব্‌কে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলব তোমার, তা জানো ?

জ্যোৎস্নাভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল

জ্যোৎস্না। এইবারটি মাপ করুন, আর কক্‌খনো এমন করব না।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় আছে জানো ?

জ্যোৎস্না। (চক্ষু মুছিয়া) আজ্ঞে না।

রক্ষিত। (পুনরায় ধমক দিয়া) সত্যি কথা বল ! ঠিক জান তুমি—

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি, জানি না !

রক্ষিত। মিথ্যে ব'লে আমার কাছে পার পাবে না !

জ্যোৎস্না। সত্যি বলছি সার।

রক্ষিত। আচ্ছা যাও, এখন ওই ঘরে গিয়ে ব'স। সত্যি বলছ কি না, এখুনি টের পাব আমি।

জ্যোৎস্নাভূষণ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত আবার ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল

রক্ষিত। (আর একটি পত্র দেখিয়া) বিহঙ্গমবাবু কো বোলাও।

বিহঙ্গম আসিয়া প্রবেশ করিল। বিহঙ্গমের দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা, পায়ে বকলশ-দেওয়া চেটাই-বুনানি স্যাণ্ডাল। ছোকরা বেশ সপ্রতিভ

বিহঙ্গম। Good morning, sir.

রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল বিহঙ্গমের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন

রক্ষিত। তোমরা কি জাত ?

বিহঙ্গম। আজ্ঞে আমরা কায়স্থ। মিত্তির আমাদের উপাধি।

রক্ষিত। কোন ইয়ারে পড় ?

বিহঙ্গম। থার্ড ইয়ারে

রক্ষিত। কি কম্‌বিনেশন্ ?

বিহঙ্গম। হিস্ট্রি, ফিলজফি। হিস্ট্রিতে অনার্স আছে !

রক্ষিত। আমার মেয়েকে চেন ?

বিহঙ্গম। যতগুলি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ে সব্বাইকে চিনি। আপনার মেয়ের নাম কি !

রক্ষিত। অপর্ণা।

বিহঙ্গম। (পুলকিত কণ্ঠে) খুব চিনি ! ফরসা ফরসা দোহারা গোছের চেহারা তো ?

রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন

রক্ষিত। পিঠের চামড়ার প্রতি যদি মায়া থাকে ভদ্রভাবে কথার উত্তর দাও।

বিহঙ্গম। (সবিস্ময়ে) বেফাঁস তো কিছু বলি নি !

রক্ষিত। আমার মেয়েকে তুমি চিঠি লিখতে ?

বিহঙ্গম। ক্লাসমেট যখন, লিখে থাকবো দু-একখানা, ঠিক মনে নেই।

রক্ষিত বিহঙ্গমের লেখা পত্রখানা তুলিয়া দেখাইলেন

রক্ষিত। এটা কি তোমার লেখা ?

বিহঙ্গম। (আগাইয়া আসিয়া) কই দেখি—ও হ্যাঁ, আমারই। (সবিস্ময়ে) আপনি পেলেন কি করে !

রক্ষিত। শেষের দু'লাইন কবিতাও কি তোমার রচনা?

হিষ্ট্রির ক্লাসেতে তুমি কেন হলে লেট
মম হৃদি-গবাক্ষের ওগো জুলিয়েট!

বিহঙ্গম। (হাসিয়া) হাতের লেখা আমার, কিন্তু রচনা ভূতোর

রক্ষিত। পুরো নাম কি?

বিহঙ্গম। ভূতনাথ পালিত।

রক্ষিত। কোথায় থাকে সে?

বিহঙ্গম। নাপতে পাড়ায়

রক্ষিত। ঠিকানা কি?

বিহঙ্গম। ফাইভ এ থললু মিঞা লেন

রক্ষিত ঘণ্টা বাজাইলেন। কনেষ্টবল প্রবেশ করিল

রক্ষিত। বদরুদ্দিন কো বোলাও।

বদরুদ্দিন দারোগা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

ফাইভ এ থললু মিঞা লেনের ভূতনাথ পালিতকে য়্যারেস্ট করে আন।

বিহঙ্গম সবিস্ময়ে একবার রক্ষিত এবং একবার দারোগার মুখের পানে চাহিল। দারোগা চলিয়া গেল

বিহঙ্গম। আমাদের সবাইকে এমন করে হ্যারাস করছেন কেন সার? কাল সারারাত মশার কামড়ে অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি আমরা।

রক্ষিত। (ধমক দিলেন) Shut up. আমার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখতে গেছলে কেন, তার উত্তর দাও!

বিহঙ্গম। এমনি।

রক্ষিত। এমনি মানে?

বিহঙ্গম। আর পাঁচজন লেখে দেখে আমিও লিখলুম একদিন!

রক্ষিত কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। কি একটা বলিতে গিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। তাহার পর সংযতভাবে বলিলেন।

রক্ষিত। অপর্ণা কোথায় পালিয়ে গেছে জান?

বিহঙ্গম। পালিয়ে গেছে না কি! জানি না তো!

রক্ষিত। সত্যি কথা বলো।

বিহঙ্গম। সত্যি কথাই বলছি, এই প্রথম শুনলুম!

রক্ষিত একটি কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন

রক্ষিত। এই কাগজে লিখে দাও যে অপর্ণা কোথা গেছে—তুমি কিছু জানো না। লিখে নীচে নিজের নাম সই করে দাও,

বিহঙ্গম তাহাই করিল

ও ঘর থেকে ওকেও ডাকো।

বিহঙ্গম জ্যোৎস্নাভূষণকে ডাকিয়া আনিল

রক্ষিত। (জ্যোৎস্নাকে) এইখানে নাম সই কর।

জ্যোৎস্না নাম সই করিল

যাও।

জ্যোৎস্নার সহিত বিহঙ্গমও চলিয়া যাইতেছিল, রক্ষিত বাধা দিলেন

তুমি যেও না।

জ্যোৎস্নাভূষণ চলিয়া গেল

কলেজের কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে অপর্ণার ভাব ছিল জানো? সত্যি কথা যদি বল, তা হ'লে তোমাকে ছেড়ে দেব।

বিহঙ্গম। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন?

রক্ষিত। নিশ্চয় করব।

বিহঙ্গম। কলেজের সমস্ত ছেলেরা ওর সঙ্গে ভাব করবার জন্যে পাগল—ও কিন্তু কাউকেই আমল দেয় না। ইন্দ্রলাল তো ক্ষেপে গেছে বললেই হয়—ছকু—

রক্ষিত পাইপ কামড়াইয়া আত্মসম্বরণ করিলেন

রক্ষিত। বাজে কথা শুনতে চাই না। কার সঙ্গে ওর সব চেয়ে বেশী মাখামাখি জানো?

বিহঙ্গম। না।

রক্ষিত। যাও—ওঘরে বস গিয়ে তা হ'লে! স্কাউণ্ড্রেল্‌স্!

বিহঙ্গম গটগট করিয়া চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল

ইন্দ্রলালবাবু কো বোলাও।

রক্ষিত ইন্দ্রলালের পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। ইন্দ্রলাল আসিয়া প্রবেশ করিল। ইন্দ্রলালের চেহারা দেখিলেই মনে হয় সে কবি। মাথায় বাবরি চুল, চোখে চশমা, পাঞ্জাবির উপর চাদরটি বেশ কায়দা করিয়া পরিয়াছে। গোঁফ-দাড়ি নাই। তাহাকে কেহই যেন সম্যকরূপে বুঝিতে পারিতেছে না—মুখে চোখে এমনি একটা মর্ম্মাহত ভাব। ইন্দ্রলাল আসিয়া নমস্কার করিল না, সবিস্ময়ে রক্ষিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি?

ইন্দ্রলাল উত্তর দিল না, কেবল এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল

দেখছ কি অমন করে?

ইন্দ্রলাল সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল

ইন্দ্রলাল্। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি মিস্ অপর্ণা রক্ষিতের বাবা ?

রক্ষিত। হ্যাঁ। তার সম্বন্ধে কি জানো তুমি ?

ইন্দ্রলাল। (গলা খাঁকারি দিয়া) আপনার মেয়ে অপর্ণা দেবী, মানে, (পুনরায় গলা খাঁকারি দিয়া) মানে, আমার বিশ্বাস তিনি একজন আদর্শ নারী। আমরা সীতা সতী, গার্গী, লীলাবতী নিয়ে উচ্ছ্বসিত হই বটে—

রক্ষিত। (সপদদাপে) Shut up !

ইন্দ্রলাল হকচকাইয়া থামিয়া গেল। রক্ষিত নিষ্ঠুর নিস্পলক নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া ইন্দ্রলাল পুনরায় সুরু করিল

ইন্দ্রলাল। আমার কথাটা শুনুন দয়া ক'রে। ইতিপূর্ব্বে আমি দু-তিনবার আপনার কাছে আসবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আপনার দারোয়ানরা আমাকে ঢুকতে দেয় নি। আজ যখন ভাগ্যক্রমে আপনার কাছে আসতে পেয়েছি তখন সমস্ত কথা খুলে বলতে চাই আমি ! মানে—

রক্ষিত। এ চিঠি তোমার লেখা ?

চিঠি দেখাইলেন

ইন্দ্রলাল। কই দেখি, এ চিঠি আপনি পেলেন কি করে !

চিঠিখানি লইয়া সাগ্রহে পড়িতে লাগিল। রক্ষিত ভ্রূকুটি-ভীষণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন

কলমটা একবার দেবেন দয়া ক'রে—ও আমার পকেটেই তো আছে—চাঁদের চন্দ্রবিন্দুটা পড়ে গেছে তাড়াতাড়িতে—ঠিক করে দি—

পকেট হইতে কলম বাহির করিয়া সংশোধন করিতে গেল। রক্ষিত উঠিয়া হাত হইতে চিঠিখানা ছিনাইয়া লইলেন

রক্ষিত। (পুনরায় উপবেশন করিয়া) আমার কথার জবাব দাও ! এ চিঠি তোমার লেখা ?

ইন্দ্রলাল। ওটা তো আমার বটেই—আরও অনেক চিঠি লিখেছি আমি—এই বিষয়েই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই খোলাখুলি।

রক্ষিত। কি আলোচনা ?

ইন্দ্রলাল। আগেই আপনাকে বলেছি, মানে (গাঢ় স্বরে), আমার দৃঢ় ধারণা মিস্ অপর্ণা রক্ষিত একজন আদর্শ নারী। আমি যেদিন থেকে তাঁর পরিচয় পেয়েছি সেই দিন থেকেই তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা অসঙ্কোচে নিবেদন করেছি !

রক্ষিত। (ক্ষিপ্ত কণ্ঠে) একটি চড়ে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব রাস্‌কেল্ ! শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি !

ইন্দ্রলাল। মিস রক্ষিত বলেছিলেন আপনাকে সব কথা অসঙ্কোচে জানাতে, বলেছিলেন যে আপনার যদি অমত না হয়—

রক্ষিত। (সবিস্ময়ে) কিসের অমত ?

ইন্দ্রলাল। মানে, (একটু ইতস্তত করিয়া) মানে, আমি তাঁকে পত্নীত্বে বরণ ক'রে ধন্য হতে চাই !

রক্ষিত। (অধিকতর বিস্মিত) তার মানে !

ইন্দ্রলাল। (ঢোঁক গিলিয়া) মানে, বিয়ে করতে চাই !

রক্ষিত। বিয়ে করতে চাও ! বাই জোভ ! অপর্ণাকে ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত। আমার মেয়েকে বিয়ে করবার সঙ্গতি আছে তোমার ? তোমার বাবা কি করেন ?

ইন্দ্রলাল। চাকরি করেন।

রক্ষিত। মাইনে কত ?

ইন্দ্রলাল। আশি টাকা।

রক্ষিত। তুমি কি কর ?

ইন্দ্রলাল। থার্ড ইয়ারে পড়ি।

রক্ষিত। ভাই-বোন আছে ?

ইন্দ্রলাল। চার বোন, দু ভাই।

রক্ষিত। বোনেদের বিয়ে হয়েছে ?

ইন্দ্রলাল। না।

রক্ষিত। তোমার পুরো নাম কি ?

ইন্দ্রলাল। ইন্দ্রলাল পোদ্দার

রক্ষিত। বেনে ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ, গন্ধবণিক।

রক্ষিত। তুমি অপর্ণাকে বিয়ে করতে চাও ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রক্ষিত সকৌতুক বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন

সবই তো খুলে বললাম। এবার আপনি কি করবেন তা যদি—

রক্ষিত। I shall beat you black and blue !

ইন্দ্রলাল। অপর্ণা দেবীর জন্যে যে-কোন নির্য্যাতন আমি হাসিমুখে সহ্য করতে—

রক্ষিত। Shut up you fool! অপর্ণা এখন কোথায় আছে জানো ?

ইন্দ্রলাল। এখন তো কলেজের ছুটি, খুব সম্ভবত বাড়িতে আছেন।

রক্ষিত। ভণ্ডামি করবার চেষ্টা কোরো না—you can't pull my leg! কাল থেকে অপর্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রলাল। তাই না কি!

রক্ষিত। সে কোথা গেছে জানো ?

ইন্দ্রলাল। আজ্ঞে না।

রক্ষিত। এই কাগজে নাম সই কর তা হ'লে—

বিহঙ্গমের লেখা কাগজটি দিলেন

Please remember you shall have a very nasty time it your statement is untrue.

ইন্দ্রলাল সহি করিয়া দিল

ইন্দ্রলাল। (সহসা) আমার কষ্ট হচ্ছে, ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে!

রক্ষিত। যাও, ওই ঘরে গিয়ে বস।

ইন্দ্রলাল পাশের ঘরে চলিয়া গেল। রক্ষিত পুনরায় ঘণ্টা টিপিলেন, কনেষ্টবল আসিল

অমিয়বাবু কো বোলাও।

কনেষ্টবল চলিয়া গেল, অমিয় আসিয়া প্রবেশ করিল। অমিয়র বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ; ধরণ ধারণ একটু উচ্ছৃঙ্খল গোছের। পরিধানে হাফ শার্ট, কাপড় মালকোচামারা, পায়ে স্যাণ্ডাল। অমিয় একজন স্পোর্টস্‌ম্যান।

অমিয়। আমি জানতে চাই আমাদের এমনভাবে ধরে আনবার মানে কি ?

রক্ষিতের চক্ষু দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিল

রক্ষিত। তোমরা সবাই ক্রিমিনাল!

অমিয়। ক্রিমিনাল ?

অমিয়। এ চিঠি কার লেখা ?

পত্রটি দেখাইলেন

অমিয়। কিসের চিঠি, দেখি—

দেখিয়া ফিরাইয়া দিল

কার লেখা জানি না।

রক্ষিত। তোমার লেখা নয় ?

অমিয়। না।

রক্ষিত। নীচে অমিয় নাম লেখা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না ?

অমিয়। আমাদের কলেজে সাতটা অমিয় আছে। ল্যাংড়া অমিয়, কবি অমিয়, অমিয় দত্ত, অমিয় সেন, প্লেয়ার অমিয়, অমিয় নাগ—আর আমি!

রক্ষিত। তোমার নাম কি ?

অমিয়। অমিয় ঘোষাল।

রক্ষিত একটি সাদা কাগজ ও পেন্সিল আগাইয়া দিলেন

রক্ষিত। বাকী কজনের পুরো নাম আর ঠিকানা লিখে দাও এতে।

অমিয়। কেন ?

রক্ষিত। Because I order you to do so.

অমিয়। পারবো না।

রক্ষিত। পারবে না!

অমিয়। না, কারো নামে চুকলি খাওয়া আমার স্বভাব নয়।

রক্ষিত। I order you again.

অমিয় অবিচলিত দাঁড়াইয়া রহিল

যা বলছি তা কর!

অমিয়। এদের নাম নিয়ে কি করবেন ?

রক্ষিত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন

রক্ষিত। এই অপরাধে তোমার জেল হয়ে যেতে পারে তা জান ?

অমিয়। অপরাধটা কি!

রক্ষিত। You are refusing to help law and justice.

অমিয়। (নির্ব্বিকারভাবে) জেল যেতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। নন-কো-অপারেশনের সময় ছমাস জেল খেটেছি।

রক্ষিত। তুমি এদের নাম লিখে দেবে, কি দেবে না ?

অমিয়। দেব না।

রক্ষিত। (চিঠিটা তুলিয়া) তুমি বলছ এ চিঠি তোমার লেখা নয় ?

অমিয়। না। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতেও আমার আপত্তি নেই। ও চিঠি আমার লেখা স্বীকার করলেই যদি বখেড়া মিটে যায় স্বীকার করতে রাজি আছি।

রক্ষিত। আমার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে জানো ?

অমিয়। আপনার মেয়ে অপর্ণা কোথায় আছে আমি কি করে জানব! আপনারই জানবার কথা—

রক্ষিত। দেখ বেশী যদি কথা বল—I shall tear out your dirty tongue! আমার মেয়ে কোথায় আছে জানো কি-না? Yes or no?

অমিয়। না।

রক্ষিত। অপর্ণার বিষয়ে কি জান ?

অমিয়। অনেক কিছু জানি, কিন্তু বলব না।

রক্ষিত। I know how to break you and your like। যাও, ওঘরে বস গিয়ে এখন! রাস্‌কেল্‌স্!

ঘণ্টা টিপিলেন। কনেষ্টবল আসিল। কনেষ্টবলের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছু পিছু অধ্যাপক মঙ্গলময় দাস।

এ কি, অপর্ণা!

অপর্ণা। (হাসিয়া) আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এলুম বাবা!

রক্ষিত। তার মানে ?

মঙ্গলময় খুব সপ্রতিভভাবে আগাইয়া আসিলেন

মঙ্গলময়। আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি।

রক্ষিত সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন অপর্ণার মাথায় সিঁদুর রহিয়াছে

রক্ষিত। বিয়ে করেছেন! আপনি! আমার মেয়েকে!

মঙ্গলময়। আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম আমরা।

অপর্ণা। (আবদার-তরল কণ্ঠে) তুমি রাগ করতে পাবে না বাবা!

রক্ষিত। (মঙ্গলময়কে) আপনি ওর প্রফেসার না ?

মঙ্গলময়। (স্মিতমুখে) তাতে কি হয়েছে ? শাস্ত্রে শিষ্যার স্ত্রী হতে বাধা নেই।

রক্ষিত। এমন ভাবে লুকিয়ে বিয়ে করার মানে!

মঙ্গলময়। আপনাকে বললে আপনি বিয়ে দিতে রাজি হতেন না।

রক্ষিত গুম্ হইয়া রহিলেন

অপর্ণা। (আবদারমাখা সুরে) রাগারাগি কোরো না বাবা।

রক্ষিত। আমি মত দিতুম না জানলেন কি ক'রে আপনি ? পাত্র হিসেবে আপনি খারাপ নন।

মঙ্গলময়। কিন্তু জাতে আমি সদ্‌গোপ, আপনারা কায়স্থ!

রক্ষিত। সদ্‌গোপ—অ্যাঁ—বলেন কি! সদ্‌গোপ আপনি! সদ্‌গোপ!

মঙ্গলময়। আইন অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই। আপনার মেয়ে মাইনর নয়, সে স্বেচ্ছায় আমাকে বিয়ে করেছে—আইন অনুসারে আমাদের ম্যারেজ রেজিষ্টার্ড হয়েছে। (হাসিয়া) বে-আইনী কিছু করিনি।

রক্ষিত। No, no, this cannot be. I want an explanation for all this. (প্রায়-চীৎকার করিয়া) Do you hear, I want an explanation!

কেহ কোন উত্তর দিল না। রক্ষিত পাইপটায় দুবার টান দিলেন—ধোঁয়া বাহির হইল না। ছাত্র চারিজন দ্বারের নিকট আসিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রফেসারের সহিত চোখো-চোখি হইবামাত্র সকলে যুগপৎ তাঁহাকে নমস্কার করিল।

সকলে। (স-সম্ভ্রমে) নমস্কার মাস্টার মশাই!

যবনিকা

দ্বারকা তীর্থ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের পশ্চিমে আরব্য সাগরের উপর দ্বারকা তীর্থ সাধারণ হিন্দুগণের এবং বিশেষত বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা একটি অবশ্য-গন্তব্য তীর্থ; বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিধামের মধ্যে ইহা অন্যতম। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাপরের পূর্ব্বেও ইহা কুশস্থলী নামে পরিচিত ছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণ রাজা জরাসন্ধের পৌনপৌনিক অত্যাচার ও আক্রমণের হাত হইতে মথুরাবাসী যাদবগণকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার মানসে দ্বারকায় স্বীয় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ত্যাগ অক্রুর-সংবাদের মারফৎ বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে সবিশেষ বিখ্যাত। মথুরা ত্যাগ কাহিনী কোন্ বৈষ্ণবের চক্ষে অশ্রুধারা না প্রবাহিত করে?

জামনগরে—সূর্য্যকিরণদ্বারা চিকিৎসা-গৃহ

দ্বারকার ভৌগলিক অবস্থিতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিত বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাকে সমধিক নিরাপদ স্থান বলিয়াই ইহাকে রাজধানীর পক্ষে উপযুক্ত শহর জ্ঞান করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য যাহা কাঠিওয়াড় নামে উপস্থিত পরিচিত এবং বিস্তৃত মরুদেশ, পাহাড় ও অরণ্যের দ্বারা পূর্ব্বদিক সুরক্ষিত এবং পশ্চিমে সুবিশাল সমুদ্র দ্বারকাকে বেষ্টন করিয়া থাকায় এ রাজ্য জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু জরাসন্ধ এ সকল বাধাও অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অবর্ত্তমানে ব্যোমযানে করিয়া দ্বারকা আক্রমণ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। স্কন্দ-পুরাণ ও মহাভারতে দ্বারকা সম্বন্ধে বহু তথ্য নিহিত আছে। দ্বারকায় অবস্থানকালেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি

পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দান করিতেন। দ্বারকার অধিপতি-রূপে তিনি তাঁহার কূট রাজবুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—এই দ্বারকার সন্নিকটে প্রভাস তীর্থে তাঁহার শেষ লীলা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার "প্রভাস" কাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকা দ্বাপর যুগের শেষ রাজধানী—যথায় শ্রীকৃষ্ণ রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেন।

এই দ্বারকা এখন জামনগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় মহারাজ রন্‌জি এই দ্বারকার অধিপতি ছিলেন, তাঁহার বংশধর এই রাজত্ব এখন শাসন করিতেছেন—খেলাধূলা ব্যাপারে বর্ত্তমান মহারাজা জাম-সাহেব রন্‌জি অপেক্ষা কোনও প্রকারে কম উৎসাহী নহেন। তিনি দেশ-দেশান্তর হইতে ভাল ভাল খেলোয়াড়গণকে আনাইয়া স্ব-পোষিত দলের খেলোয়াড়গণকে শিক্ষিত করিয়া থাকেন। ক্রিকেট খেলায় রন্‌জি ট্রফি নামক স্বর্ণাধার ভারতের সর্ব্বোচ্চ ও সুবিখ্যাত কাপ—সমস্ত ভারতীয় প্রদেশের খেলোয়াড়গণ এই খেলায় নাম লিখাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব—এই "কাপ" খেলায় জয়ী হওয়া সমস্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়ের উচ্চাশা। বাঙ্গালার ক্রিকেট-বীর এস্. ব্যানার্জ্জি এখন জাম-সাহেবের অনুগৃহীত খেলোয়াড় এবং জামনগরেই অবস্থান করেন।

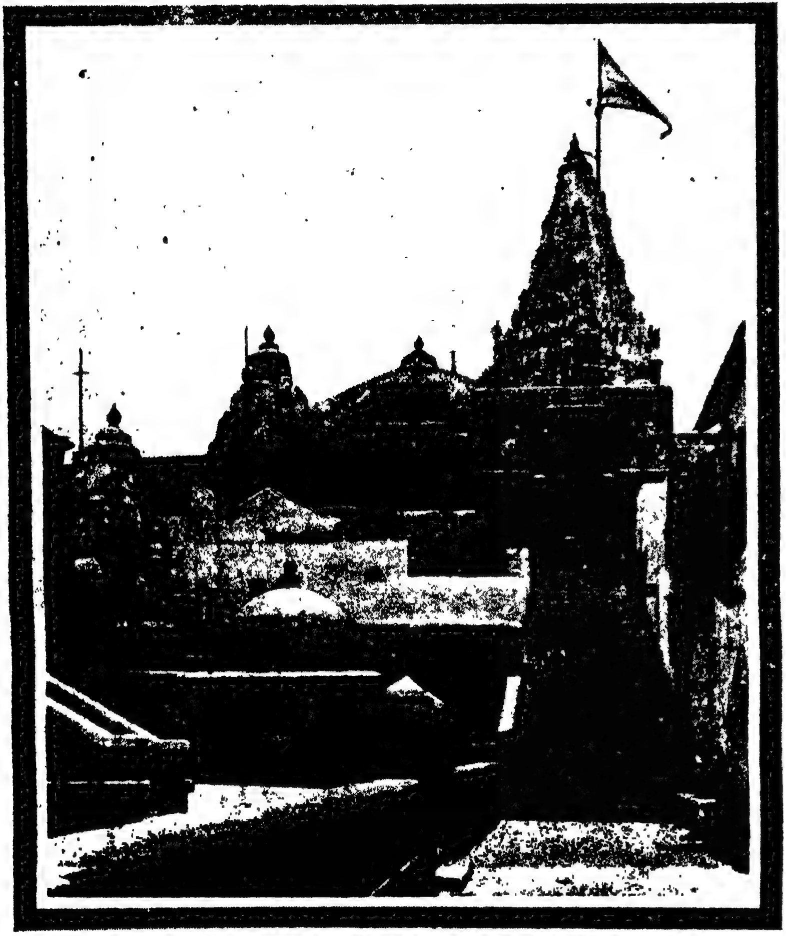

রণছোড়জির মন্দির

দ্বারকা যেমন হিন্দুতীর্থের একটি প্রধান ধাম—খেলোয়াড়গণের পক্ষে জামনগরও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ।

যাঁহারা অবকাশ সময়ে স্বাস্থ্য আহরণার্থ নানা দেশে সময় কাটাইয়া আসেন, দ্বারকাও তাঁহাদের পক্ষে একটি অবশ্য গম্যস্থান। কাঠিওয়াড় প্রদেশের রাজন্যবর্গ দ্বারকায় গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করেন—গ্রীষ্মকালে দ্বারকার উত্তাপ সাধারণত ৬০ ডিগ্রি থাকে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে ৮০ ডিগ্রির অধিক উত্তাপ হয় না—রাত্রে স্নিগ্ধ সুশীতল সমুদ্র-বায়ু প্রাণকে প্রফুল্লিত এবং দেহকে স্নিগ্ধ করে। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পশ্চিম প্রদেশে দ্বারকার ন্যায় স্বাস্থ্যপূর্ণ স্থান বিরল। পূর্ব্বাঞ্চলে পুরীধাম অপেক্ষাও দ্বারকার জল-হাওয়া এবং আধুনিক সুখসাচ্ছন্দ্য সুলভ; জামনগর-রাজ দ্বারকার সুখ-সুবিধার জন্য কোনও কার্পণ্য করেন না। এখানে ধর্ম্মশালা ব্যতীত মহারাজের অতিথিশালা, হাসপাতাল, ক্লাব, লাইব্রেরী এবং খেলাধূলার জন্য নানারূপ বন্দোবস্ত আছে। পশ্চিমে অস্তাচলগামী সূর্য্যকিরণে দ্বারকার দৃশ্য অতীব

মনোরম এবং দ্বারকায় শ্রীরণ্ছোড়রায়জীর সুউচ্চ মন্দিরের পতাকা বহুদূর হইতে সমুদ্রযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

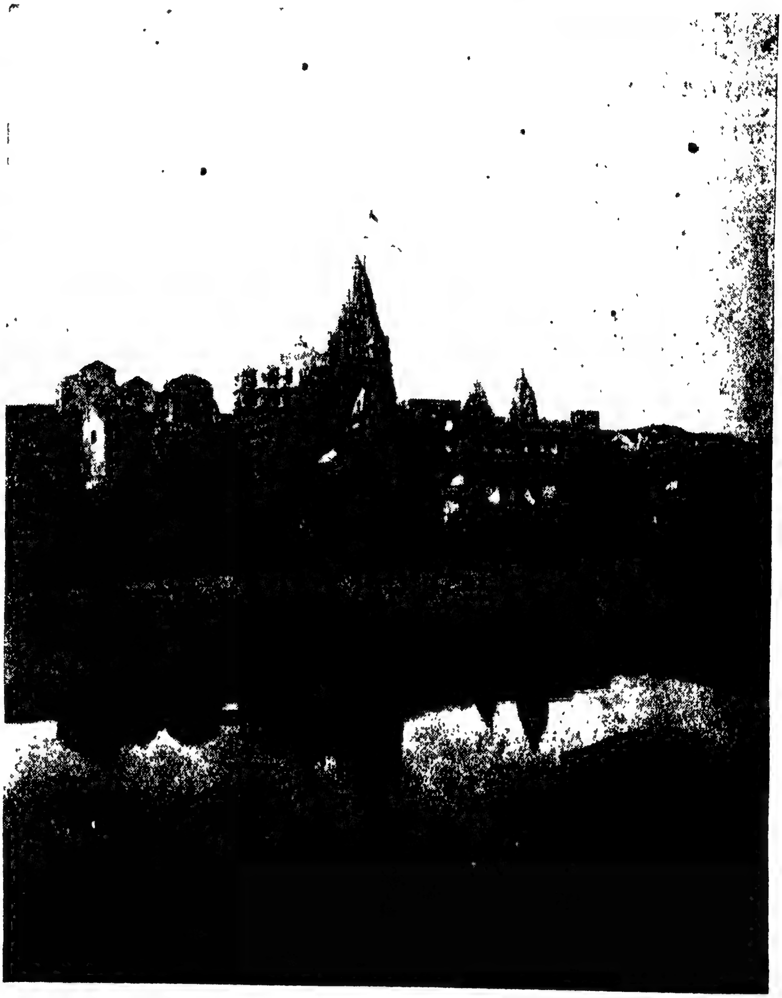

দ্বারকা শহরের দৃশ্য

দ্বারকার শ্রীরণছোড়রায়জীর মূর্ত্তি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্ত্তি—মন্দিরটি সুউচ্চ—জমি হইতে অনেকটা উপরে, মন্দিরের উপরে বারমাস একটি পতাকা লম্বমান থাকে, দ্বারকা শহর বারমাস উৎসব, মেলা, নাচ, গানে মুখরিত থাকে। অন্নকূট, সরস্বতী পূজা, দোলযাত্রা, অক্ষয় তৃতীয়া, ভাদ্র একাদশী ইত্যাদি উৎসবের সময়ে ভারতের সর্ব্বস্থান হইতে ধর্ম্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীগণ শহরটিকে আনন্দময় করিয়া রাখে। পথের দুর্গমতা এবং রেললাইনের অভাব হেতু যাত্রীগণ বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে বেদী বন্দরে অথবা ওখা বন্দরে যাইতেন; সমুদ্রগামী নৌকা ও ষ্টীমারই তখন একমাত্র জলযান ছিল। সম্প্রতি জামনগররাজ স্বব্যয়ে জামনগর হইতে দ্বারকা অবধি রেলপথ প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং অন্যান্য রেলপথের সহিত ইহা সংযুক্ত করিয়া দেওয়ায় বাঙ্গালার যাত্রীরা মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা অথবা দিল্লী হইয়া রেলযোগে বরাবর দ্বারকা দর্শনে যাইতে পারেন। পথিমধ্যে মাড়োয়ার রাজপুতানা ইত্যাদি প্রদেশে জয়পুর, অজন্তা, আবুপাহাড়, পালিতানা ইত্যাদি স্থান দর্শন করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন। ছাত্রসমাজের পক্ষে ভারতের এই সকল প্রাচীন তীর্থ ও কীর্ত্তিসমূহ দর্শন করা একান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা। দেশভ্রমণ ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না—ভারতে এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল—ছাত্রেরা টোলে শিক্ষা সমাপনান্তে প্রসিদ্ধ তীর্থ ও বিদ্যাস্থানসমূহ ভ্রমণ করিয়া স্বীয় শিক্ষার পরীক্ষা প্রদান করিতেন। বুদ্ধদেব, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ, শঙ্করাচার্য্য, ইত্যাদি সকলেই দেশভ্রমণের ফলে স্বীয় মতবাদ প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিবার, তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করিয়া তবে স্বীয় মতবাদ প্রচার ও শিষ্যমণ্ডলী বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কূপমণ্ডুকেরা কখনও জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন না। আধুনিক যুগেও কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই, গান্ধীজী ইত্যাদি দেশভ্রমণ ভিন্ন কি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে

সমর্থ হইতেন ? ত্রিবাঙ্কুর হইতে পণ্ডিতগণ দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভ করিবার জন্য মিথিলা, কাশী, নবদ্বীপ ইত্যাদি স্থানে পণ্ডিতগণের সহিত বিচার-তর্কের জন্য এবং স্বীয় শিক্ষা সমাপনের জন্য আসিতেন—স্বয়ং মহাপ্রভু ও নীলাচল, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে শিক্ষালাভ ও মতবাদ বিচারের জন্য গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এখন যাহা স্বীকৃত হইতেছে, যুগযুগান্তর হইতে ভারতে তাহা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ না দেখিলে দেশাত্মবোধ দৃঢ় হইবে কি প্রকারে ? অভিজ্ঞতা লাভ হইবে কি প্রকারে ?

দ্বাপর যুগের শেষভাগের দ্বারকা, প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর ইত্যাদি স্থান প্রত্যেক ভারতবাসীর দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণে এই সকল স্থানের প্রসিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছিল। দ্বাপরের দ্বারকা এখন যে অবস্থায় অবস্থিত তাহা জামনগর রাজ্যের চেষ্টাতেই হইয়াছে। জামনগর বা নওয়ানগর আধুনিক শহর, এখানে মহারাজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সৌর-চিকিৎসালয়। সূর্য্যকিরণ এবং বৈদ্যুতিক আলোক-রশ্মির সাহায্যে দুরারোগ্য রোগ আরোগ্যের জন্য মহারাজা রণজি এখানে ৪০ ফিট উচ্চ স্তম্ভের উপর একটি ঘূর্ণায়মান গৃহ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন ; এই গৃহে প্রত্যেক রোগীর জন্য একটি কামরা আছে, সমগ্র গৃহে বিশটি বাসগৃহ আছে এবং সমস্ত গৃহটি স্তম্ভের উপরে সূর্য্যের গতি অনুসারে ঘুরিয়া থাকে, যাহাতে রোগীগণ সমস্ত দিন আবশ্যক মত সূর্য্যরশ্মি উপভোগ করিতে পারে। এসিয়া ভূখণ্ডে এরূপ চিকিৎসালয় আর দ্বিতীয় নাই, দেশদেশান্তর হইতে রোগীগণ আসিয়া এখানে বিনা খরচায় চিকিৎসিত হইয়া থাকে—ইহার যাবতীয় ব্যয় জামনগর-রাজ বহন করিয়া থাকেন। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ রণজির নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে—ইহাকে সাধারণত সোলারিয়ম বলা হইয়া থাকে। আলোক-বিজ্ঞানবিদ ছাত্রগণ এখানে আসিয়া অনুসন্ধান কার্য্য করিয়া থাকেন। এই চিকিৎসালয়ের পরীক্ষাগারে বহুবিধ আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি আছে—ভারতে এরূপ আয়োজন অন্যত্র বিরল।

গোপন কথা

কবিশেখর শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার বি-এল

আমার মনের গোপন কথা
বল্‌ব তোমার—কানে কানে,
বাদল দিনের ছন্দে তোমায়
ডেকেছি যে—গানে গানে !
ওগো আমার গোপন প্রিয়া !
তোমার চোখের হাসি নিয়া
সলাজ মুখে ফুলের কুঁড়ি
হাস্‌ছে কেন—বনে বনে !

তোমার এলো চুলের রাশি
ছড়িয়ে গেছে মেঘে মেঘে,
কাজল ব্যথার নিবিড় স্নেহে
গেছে আমায় ডেকে ডেকে !
বাদল ধারার চোখের জলে,
আমার মনের গহন তলে,
সোনার কমল উঠ্‌ছে ফুটে
হাত বাড়ায়ে তোমার পানে !

আয়ুর্ব্বেদে জন্মান্তরবাদ

কবিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী

অন্যান্য সকল দর্শন বা ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান দান করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞানমূলক বিচার যাহা আয়ুর্ব্বেদে আছে তাহা অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা অনেকাংশে প্রাঞ্জল এবং গভীর তত্ত্বমূলক, সেই জন্য এই প্রবন্ধে আমি আয়ুর্ব্বেদের পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পরলোক সম্বন্ধে ভগবান্ আত্রেয়পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশকে বলিতেছেন—

সংশয়শ্চাত্র কথং ভবিষ্যাম ইতশ্চ্যুতাঃ ন বেতি।

পরলোক বিষয়ে আমাদের নানারূপ সন্দেহ আছে। প্রথম সন্দেহ হইতেছে মৃত্যুর পর জন্ম হয় কি না? এইরূপ সন্দেহ হইবার কারণ কি? কারণ যথেষ্ট আছে. এই কথায় পুনর্ব্বসু বলিতেছেন, “তেকে প্রত্যক্ষপরাঃ পরোক্ষত্বাৎ পুনর্ভবস্য নাস্তিক্যমাশ্রিতাঃ.” চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদী প্রত্যক্ষপরায়ণ দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে ঘট, পট, শব্দ, শীত, উষ্ণ, কটু, প্রভৃতিকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি এবং সেই সেই দ্রব্যের সত্ত্বা সম্বন্ধেও আমরা নিঃসন্দেহ হই। কিন্তু এই প্রকারের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পুনর্জ্জন্মের অনুভূতি হয় না। পুনর্জ্জন্মকে সকলেই পরোক্ষ বলিয়া থাকে। যাহা পরোক্ষ তাহা নাস্তিক্যবাদীরা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। এই জন্য চার্ব্বাক প্রভৃতি “পুনর্জ্জন্ম নাই” এই কথাই বলিয়াছেন। মহর্ষি পুনর্ব্বসু “পুনর্জ্জন্ম নাই” যাঁহারা বলেন প্রথমে তাঁহাদের মতবাদ নিরসন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; আর একটি মতবাদীও আছেন, যাঁহাদের কথায় ঋষি বলিতেছেন, “সন্তি চাগম প্রত্যয়াদেব পুনর্ভবমিচ্ছন্তি,” অর্থাৎ যাঁহারা উপদেশ ও প্রমাণ হইতে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন। আবার আর একদল লোক আছেন যাঁহারা জীবের জন্ম সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতের কথা বলেন— যেমন—

মাতরং পিতরঞ্চৈকে মন্যন্তে জন্মকারণম্।
স্বভাবং পরনির্ম্মাণং যদৃচ্ছাঞ্চাপরে জনাঃ॥

কেহ বলেন মাতাপিতাই জন্মের কারণ, কেহ বলেন স্বভাবই জন্মের কারণ, আর এক শ্রেণী বলেন পরই জন্মের কারণ। আবার আর এক মত হইতেছে, যদৃচ্ছাই জন্মের কারণ। এই স্থলে চক্রপাণি দত্ত বলিয়াছেন—“মাতাপিতাকে জন্মের কারণ করিলে কোন আত্মা যে পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করে. ইহা প্রমাণিত হয় না। কারণ মাতাপিতাই সেস্থলে আত্মন্তর নিরপেক্ষ যত্নে জীবোৎপত্তি করিতেছেন, সুতরাং এই মতেও আত্মা নাই, পরলোক নাই। দ্বিতীয় স্বভাব-বাদীর মত হইতেছে এই যে, পরিদৃশ্যমান ভৌতিক জগৎ, ইহার ভূতগণের এক ধর্ম্ম আছে যে, সংযোগ বিশেষে মিলিত হইয়া সচেতন জীব সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই যুক্তিবাদিগণের পক্ষেও আত্মা ও পরলোক নাই। তৃতীয়তঃ পরপক্ষবাদীর মত—পর শব্দে ঐশ্বর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট আত্মবিশেষের প্রভাবে ভূতগণ সচেতন হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর জন্মিবে অথবা পরলোকে যাইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিবে এ'রূপ আত্মা থাকিতে পারে না, সুতরাং ইঁহার মতেও আত্মা বা পরলোক নাই। শেষ মত “যদৃচ্ছাঞ্চাপরে জনাঃ” অর্থাৎ যদৃচ্ছা অর্থে কারণের অননুরূপ কার্য্যোৎপত্তি। সাধারণের মতে কারণানুরূপ কার্য্যোৎপত্তি; কিন্তু ইঁহারা বলেন যেখানে কারণের অপ্রতিরূপ কার্য্য হয় সেইটাই যদৃচ্ছার কার্য্য, এই যদৃচ্ছার জন্যই অচেতন ভূত সচেতন হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ইঁহাদের মতেও পরলোক বা পুনর্জ্জন্ম নাই। এই সকল যুক্তি দ্বারা আপাততঃ মনে হয় পুনর্জ্জন্ম নাই। সেই জন্য মহর্ষি বলিয়াছেন, বৎস! এই সব নাস্তিক্য বুদ্ধি পরিত্যাগ কর, আমি সমস্ত নাস্তিক্যমত খণ্ডন করিতেছি।

প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন যে, যাহা আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই স্বীকার করিব। এই মতে পুনর্জ্জন্ম ইন্দ্রিয়বেদ্য নয়, সেইজন্য পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়বেদ্য ভিন্ন যদি তুমি কোন কিছু স্বীকার না কর, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয়ীভূত দ্রব্য অতি অল্পই আছে। প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত অনেক বস্তু আছে। যাহার উপলব্ধি আগম, অনুমান ও যুক্তির দ্বারা করিতে হয়। আমরা যদি সর্ব্ব সময় ইন্দ্রিয় জ্ঞানকেই প্রমাণার্থ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সেইস্থলে বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, ইন্দ্রিয় সকল নিজে নিজেকেই বুঝিতে পারে না। চক্ষু চক্ষুকে দেখিতে পায় কি? তবেই এখানে বলা যাইতে পারে—“স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।” আরও বিচার্য্য অনেক আছে। যেমন রূপ অতি নিকটে বা অত্যন্ত দূরে থাকিতে প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয়সকল আমাদের অত্যন্ত দুর্ব্বল, যেমন কোন জিনিষ যদি ঢাকা থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই বস্তুর উপলব্ধি করা যায় না। যে ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা এত দুর্ব্বল তাহার উপর আস্থাশীল হওয়া কোন বুদ্ধিমানের বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। চক্ষুর উপর কজ্জল আছে চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। কাণের কাছে ঢাক বাজিলে, অতি নিকটে বসে যদি পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে, কাণ তাহার কথা শুনে না। এইরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, বস্তু অতি সূক্ষ্ম হইলে, অথবা কোন বস্তু সেইরূপ দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে তাহার প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি হইবে না। সুতরাং এই কথা প্রমাণ হয় না যে—প্রত্যক্ষই আছে অন্য কিছু নাই।

দ্বিতীয় মতবাদী যাঁহারা মাতাপিতাকেই জন্মের কারণ বলেন, তাঁহাদের মতও ঠিক নহে। এই স্থলে চরক সংহিতায় উক্ত আছে যে—

আত্মা মাতুঃ পিতুর্ব্বা যঃ সোঽপত্যং যদি সঞ্চরেৎ।
দ্বিবিধং সঞ্চরেদাত্মা সর্ব্বো বাবয়বেন বা॥
সর্ব্বশ্চেৎ সঞ্চরেন্মাতুঃ পিতুর্ব্বা মরণং ভবেৎ।
নিরন্তরং নাবয়বঃ কশ্চিৎ সূক্ষ্মস্য চাত্মনঃ॥

অপত্যে মাতা পিতার আত্মা যদি সংক্রামিত হয়, তবে দুই প্রকারে হইতে পারে। এক সর্ব্বাবয়বে, দ্বিতীয়তঃ অংশক্রমে। এই দুইটি মতই ভ্রান্ত মত। প্রথমতঃ যদি সর্ব্বাবয়বে আত্মা অপত্যরূপে সঞ্চারিত হইত, তাহা হইলে মাতাপিতার মৃত্যু অবশ্যই ঘটিত।

সুতরাং প্রথমপক্ষ বিচারসহ নহে। আরও দ্বিতীয় পক্ষ দেখিলে দেখা যাইবে, সূক্ষ্ম আত্মার কোন অংশ হইতে পারে না। তবে এই পক্ষ যদি বলেন, মাতাপিতার আত্মা সংক্রামিত হয় না, বুদ্ধি বা মনই সংক্রামিত হয়। এই স্থলেও চক্রদত্ত বলিয়াছেন—"যথৈবাত্মা নিরবয়বত্বেনাবয়ব সঞ্চরণাক্ষমস্তথা তৎকালমেব মাতৃপিতৃপরিত্যাগ-প্রসঙ্গেন কাৎস্ন্যেনাপি সঞ্চরিতুমক্ষমঃ, তথা তে অপি বুদ্ধিমনসো নিরবয়বত্বাৎ নৈকদেশেন সঞ্চরেয়াতাং।" এইরূপ আত্মা ও মনের যদি সংক্রমণ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে মাতাপিতাকে নির্ব্বোধ ও অন্যমনস্ক হইতে হইবে। এই জন্য এই মতবাদ অস্বীকার্য্য। ইঁহাদের মত স্বীকারে আর এক বাধা—"যেষাঞ্চৈষা মতিস্তেষাং যোনির্নাস্তি চতুর্ব্বিধা" মাতা পিতা জন্মের কারণ হইলে যে সকল চেতনের মাতাপিতা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না, তাহাদের চেতনা শক্তি কোথা হইতে আসিবে? "চতুর্ব্বিধা যোনিরিতি জরায়ুজাণ্ডসংস্বেদজোদ্ভিজ্জলক্ষণা" জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও সংস্বেদজ। ইহার মধ্যে সংস্বেদজ মশকাদি উদ্ভিজ্জ গণ্ডুপদাদির (কেঁচোর) মাতা পিতা নাই তাহা হইলে এই মতে তাহাদের অচেতন বলিয়া বলিতে হয়।

বিদ্যাৎ স্বাভাবিকং ষণ্ণাং ধাতুনাং যৎ স্বলক্ষণং।
সংযোগে চ বিভাগে চ তেষাং কর্ম্মৈব কারণং॥

বস্তুগত স্বভাবকে যদি চৈতন্যের কারণ বলা যায়, তাহা হইলে এই ষড়ধাতুকে জগৎ ও পুরুষের প্রত্যক্ষ ধাতুর যে একটী আত্মগত লক্ষণ দৃষ্ট হয়, যেমন পৃথিবীর কাঠিন্য, জলের দ্রবত্ব, তেজের উষ্ণত্ব প্রভৃতি, এইরূপ সকলেরই স্বাভাবিক লক্ষণ আছে। আত্মরহিত পঞ্চভূতের চৈতন্য কোনটিতেই থাকে না। আর পঞ্চভূতের একটিতেও যে গুণ নাই সে গুণ মিলিতভূতে পাওয়া অসম্ভব, কেবল লাল সূতা দিয়া কাপড় বুনিলে ময়ূরকণ্ঠি শাড়ী হয় না। সুতরাং আত্মা ব্যতিরেকে পুরুষে চৈতন্যের উদ্ভব হয় না। পঞ্চভূতের সহিত আত্মার সংযোগে জন্ম এবং বিয়োগে মরণের কারণও পুরুষের জন্মান্তর কৃতকর্ম্ম।

আরও একটি মত হইতেছে "পরনির্ম্মাণস্তু জন্মকারণং" গঙ্গাধরঃ। 'পর'-অর্থে আত্মা অর্থ করিলে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না, কিন্তু পর অর্থে আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু স্বীকার করিলে আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আত্মা ভিন্ন জীবের চৈতন্য হইতে পারে না; সচেতন স্রষ্টা অর্থে আত্মার স্রষ্টা বুঝাইতেছে। আত্মা নিত্য, নিত্য বস্তুর সৃষ্টিই নাই, এই জন্য আত্মা ভিন্ন জীবের অন্য স্রষ্টা কল্পনা হইতে পারে না।

চরকের টীকাকার কবিরাজ গঙ্গাধর বলিয়াছেন—"অপরে যে জন্যা ভাবস্তে প্রাণিনাং জন্ম করণং যদৃচ্ছেতি।" যা ইচ্ছা যদৃচ্ছা নাম যথা যস্য জন্ম তথা তস্য জন্ম স্যাদকারণং দেবনরাদীনাং স্বস্বলক্ষণ চৈতন্যাদিমত্ত্বেন জন্ম স্যাদিতরেষামচেতনত্বেন। নাস্তি তু তত্র কারণমাকস্মিকমেব জন্ম সর্ব্বেষামিতি।"

যদৃচ্ছামতাবলম্বীরা বস্তুনির্ণয়ে কোন প্রমাণের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, ইঁহাদের মতে পরীক্ষা, পরীক্ষ্য, কর্ত্তা, কারণ, দেবতা, ঋষি, কর্ম্ম, কর্ম্মফল কিছুই নাই এবং আত্মাও নাই, এই জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

নাস্তিক্যস্যাস্তি নৈবাত্মা যদৃচ্ছোপহতাত্মনঃ।
পাতকেভ্যঃ পরঞ্চৈতৎ পাতকং নাস্তিকগ্রহঃ॥

যদৃচ্ছামতাবলম্বীরা নাস্তিকগ্রস্ত মহাপাতকের প্রতিমূর্ত্তি, এইজন্য ইঁহাদের নাস্তিক্য বুদ্ধিতে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বস্তু নির্ণয় করিবে।

এখন কথা হইতেছে, বস্তু নির্ণয় করিতে শাস্ত্রকার বলিতেছে, শিষ্টানুসম্মত বস্তু নির্ণয় কি তাহাই বলা যাইতেছে, কারণ শিষ্টানুসম্মত বস্তু নির্ণয় না হইলে জন্মান্তরও সঠিক নির্ণয় হইবে না। সৎ ও অসৎ দুইটি বস্তু আছে, সৎ-ভাব, অসৎ-অভাব, সৎ নিত্য আত্মা, অসৎ পঞ্চভৌতিক জগৎ। সৎ অর্থে বিধি বিষয় প্রমাণগম্য ভাববস্তু এবং অসৎ নিষেধ বিষয় প্রমাণগম্য অভাববস্তু। সৎ-অসৎ বস্তুর পরীক্ষা অর্থাৎ স্বরূপ নির্ণয়ের চারি প্রকার পন্থা শাস্ত্রসিদ্ধ যথা—আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি।

(১) আপ্তোপদেশ—যাঁহারা তপশ্চরণ দ্বারাও জ্ঞানবলে রজস্তমোগুণ যুক্ত, যাঁহাদের ত্রৈকালিক জ্ঞান অব্যাহত। যাঁহাদের বাক্যসংশয়শূন্য এবং সত্য, রজস্তমোগুণযুক্তব্যক্তি কখনই মিথ্যা বলেন না। এই কারণে আপ্তোপদেশই প্রথম প্রমাণ।

(২) প্রত্যক্ষ—আত্মা, ইন্দ্রিয়, মন এবং অর্থ অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর সন্নিকর্ষবশতঃ তৎকালে যে অনুভূতি হয় তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

(৩) অনুমান—অনুমান তিন প্রকার, এই অনুমানের তিন প্রকার ভেদ কাল অনুসারে হইয়া থাকে। যথা অতীত বিষয়ের অনুমান—গর্ভদর্শনে মৈথুনের অনুমান।

বর্ত্তমান বিষয়ের অনুমান—প্রথমে তিনখানি কাষ্ঠ হাতে লইলে তাহাতে আগুন আছে বলিয়া কোন জ্ঞানই হয় না, কিন্তু ঐ তিনখানি কাষ্ঠ অগ্নিরুৎপত্তি নিয়মে মন্থন কর দেখিবে এখনই উহাতে ধোঁয়া উঠিবে ক্রমে অগ্নি জ্বলিবে, এই ঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠ হইতে যে ধূম নির্গত হয় তাহাই অগ্নিরুৎপত্তির বর্ত্তমান অনুমান।

ভবিষ্যৎ বিষয়ের অনুমান—কেহ যদি একটি ফলের বীজ দেখিয়া বলে ইহাতেও অমুক ফল হইবে তাহা ভুল হয় না। বীজ সংগ্রহ হইতে ফলোৎপত্তি একটি ব্যাপার. ইহার বীজমাত্র দেখা যায় এবং চাক্ষুষ

দর্শন বীজ দ্বারাই আমাদের ভবিষ্যৎ ফলের অনুভূতি হইতেছে। ইহারই নাম ভবিষ্যৎ অনুমান।

(৪) যুক্তি—যুক্তি কখনও উপমানের অন্তর্গত, কখনও বা অনুমানের অন্তর্গত। মানবের যে বুদ্ধি বহু উৎপত্তিযোগে অর্থাৎ নানারূপ দৃষ্টান্তযুক্ত বিতর্কের পর আবশ্যক বস্তুর উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় তাহারই নাম যুক্তি। এই যুক্তি কালত্রয়েই যুক্ত হইতে পারিবে। ইহার উদাহরণ হইতেছে—শারীরস্থানের গর্ভোৎপত্তি বিষয়ে বলা আছে। ষড়ধাতু অর্থাৎ পঞ্চমহাভুত ও আত্মার সংযোগে গর্ভের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কথাকে বুঝাইবার জন্য গঙ্গাধর কবিরাজ টীকায় বলিয়াছেন। "ন কেবলং বীজাৎ সদৃশং ফলং ভবতীতি ফলেন কারণান্তরং দর্শয়ন্ননুমানে যুক্তিমুদাহরতি।" "জলকর্ষণবীজর্ত্তু-সংযোগচ্ছস্যসম্ভবঃ।" কৃষক ঋতু অনুসারে ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদক ভূমি প্রস্তুত করে, তাহাতে বীজ রোপণ করিয়া জল সেচন করে, এই সংযোগ হইতে পঞ্চভৌতিক শস্য উৎপন্ন হয়। আরও দেখা যায়—মন্থন-রজ্জু মন্থনের উপযোগী কাষ্ঠ ও মন্থনক্রিয়ার যোগ হইলে তবে তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। এই সকল বাহিরের দৃষ্ট উদাহরণ দ্বারা গর্ভাধান ব্যাপারটি সহজে বুঝিতে পারি, ইহাও যুক্তি, আবার চিকিৎসার চারিটি পাদ আছে। সেই চারিটি পাদ যথোক্ত গুণযুক্ত হইলে রোগমুক্তি হয়। যুক্তিযুক্ত না হইলে ফলপ্রদ হয় না। এই যে চারিপ্রকার পরীক্ষার কথা বলা হইল ইহা দ্বারা সকল বস্তুই পরীক্ষিত হইতে পারে। এখানে এই সকল পরীক্ষা দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে পুনর্জ্জন্ম আছে।

পূর্ব্বে যে আগমের কথা বলা হইয়াছে, এই আপ্তাগম শব্দে চারি বেদ এবং বেদের অনুকুল লোকানুগ্রহার্থ আপ্তপ্রণীত এবং শিষ্টানুমোদিত শাস্ত্রসমূহ। এই সকল শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি যে, দান, তপ, যজ্ঞ, সত্য, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্কর ; আপ্তগণ এমন কোন উপদেশ করেন নাই যে, যাহাদের রজস্তমোদোষ প্রশমিত হয় নাই, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হইবে না। মহর্ষিগণ দিব্যচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন যে, পুনর্জ্জন্ম আছে। সেই জন্যই তাঁহারা পুনর্জ্জন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়াও বুঝা যায় পুনর্জ্জন্ম আছে, যেমন—মাতা পিতার বিসদৃশ সন্তান হয়, এক মাতাপিতার সন্তানদিগের বর্ণ, স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্যের পার্থক্য হয়। কেহ নীচকুলে, কেহ উচ্চকুলে জন্মে, কেহ দাসত্ব করে, কেহবা ঐশ্বর্য্য ভোগ করে, কাহার আয়ুষ্কাল সুখে কাটিয়া যায়, কেহবা চিরকাল দুঃখ ভোগ করে, সকলের আয়ুর সমানতা দেখা যায় না। "ইহা কৃতস্যাব্যাপ্তিঃ," এই সংসারেই অনেকে অনেক কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল পায় না, অশিক্ষিত শিশুগণ জন্মাইয়া রোদন, স্তনপানাদি করে কি করিয়া? কেহ বা জাতিস্মর হয়। যদি একই নিয়মে সৃষ্টি হইত, তবে এ পার্থক্য হইত কি? এই সব দেখিয়া অনুমান হয় যে, পূর্ব্বজন্মের আচরিত অবিনাশী কর্ম্ম, যাহা দৈব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, তাহাই এই সকল পার্থক্যের কারণ। যেমন ফল হইতে বীজের এবং বীজ হইতে ফলের অনুমান করা যায়, সেইরূপ পুনর্জ্জন্মের বিষয় অনুমিত হইয়া থাকে। যুক্তির দ্বারা এই বুঝিতে পারা যায় পুরুষ ষড়ধাতুক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং আত্মার সংযোগে পুরুষের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মূলে এবং সৃষ্ট বস্তুর চৈতন্য সম্পাদনেও আত্মাই কর্ত্তা। এই আত্মাই ভোক্তা দ্রষ্টা ইত্যাদি।

ইহলোকে মনুষ্যগণ কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। অকৃতকর্ম্মের ফল কেহ ভোগ করে না। ইহারই মত আত্মা পরলোক ও নিজকৃত কর্ম্মের ফলই ভোগ করিয়া থাকে, অন্যথা কেহ দাস কেহ রাজা হইত না। কর্ত্তা ও কারণের সংযোগেই কার্য্য হয় ; কর্ম্ম না করিলে যেমন ফলভোগ হয় না সেইরূপ বীজ না পুঁতিলে অঙ্কুরোৎপত্তি ঘটে না, সুকর্ম্ম করিলে যেমন মন্দফল হয় না, সেইরূপ এক জাতীয় বৃক্ষ হইতে অন্য জাতীয় বৃক্ষ হয় না। ইহা হইতেও প্রতীতি জন্মায় যে, ইহলোকে যে যেমন কাজ করে ফলও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

"এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরুপদিষ্টে পুনর্ভবে ধর্ম্মদ্বারেষ্বধীয়তে।"

এই সকল যুক্তি বলে আয়ুর্ব্বেদে পুনর্জ্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে আমরা বলিতে পারি। আয়ুর্ব্বেদ পুনর্জ্জন্ম ও পরলোক সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, "বৎস! পুনর্জ্জন্ম ও পরলোক যখন আছে, তখন যাহাতে উৎকৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিতে পার, অথবা স্বর্গলোকে উৎকৃষ্ট স্থান পাইতে পার, তাহার জন্য সতত যত্নবান্ হওয়াই কর্ত্তব্য।"

চন্দ্রা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নিরবচ্ছিন্ন অনাদর আর অবহেলার মধ্যে মানুষ হ'য়ে ওঠার জন্য চন্দ্রার মনের সরসতার দিকটা কোন দিন ফুটে উঠ্‌তে পারেনি। কিন্তু নিজের কাজ-কর্মগুলি শুধু নিদিনিখিতি নয়, সুচারুভাবে সে সম্পন্ন করতে পারতো।

পড়া শোনায় চমৎকার চৌকস হ'য়ে ম্যাট্রিক পাশ করার পর মেট্রন একদিন ডেকে বললেন যে, তাকে আর মাত্র এক মাস সেই অনাথ-আশ্রমে থাকতে দেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে নিজের ব্যবস্থা একটা ক'রে নিতেই হবে, কর্তৃপক্ষ তার বেশী দয়া আর দেখাতে প্রস্তুত নন্।

চন্দ্রা সেই কথা শুনে কোন উত্তর দিলে না। তার শক্ত কঠিন মনটি যেন আরও একটা মোচড় খেয়ে আরও পাথর হ'য়ে গেল।

সকালে খবরের কাগজের চাক্‌রি-খালির পাতাখানি সে নিবিড় অভিনিবেশের সঙ্গে প'ড়ে প'ড়ে নিজের নোট বইএ গোটা কয়েক নাম আর ঠিকানা টুকে' সারা দুপুর ব'সে ব'সে দরখাস্ত লিখে নিজের হাতের কাজের রুমাল সোয়েটার খঞ্চিপোষের আয়ের টাকা থেকে সেগুলো ডাকে রওনা ক'রে দিত। আর রাতে ঘুম না হওয়া পর্যন্ত সবান্তঃকরণে প্রার্থনা ক'রতো যাতে সকালে একটা চাক্‌রি-জোটার খবর আসে!

যতদিন যায় ততই সে হতাশ হ'য়ে ওঠে। একদিন যে কাজ তার উপযুক্ত নয় ব'লে অবহেলা ক'রে দরখাস্ত করেনি শেষকালে সেগুলোকেও সে মুক্তির উপায় ব'লে গণ্য করতে বাধ্য হ'ল।

অবশেষে একদিন একটা বড় চৌকো খামে ভরা চিঠি এল। দূর আসাম থেকে আস্‌চে সে চিঠি—ফরেস্টের একজন বড় চাক্‌রে লিখ্‌চেন যে তাকে চাক্‌রি দেওয়া যেতে পারে যদি সে চাক্‌রির অবসরে তাঁর স্ত্রীকে ইংরিজি পড়ানর ভার গ্রহণ করতে রাজি হয়। এই অতিরিক্ত কাজের জন্যে তাকে তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তে এবং খেতে দিতে স্বীকৃত আছেন।

কাউকে কিছু না ব'লে চাকরি স্বীকার করতে সে প্রস্তুত এ কথা লিখে জানিয়ে দিলে।

চিঠির উত্তরে যাবার ভাড়া এবং পথের বিস্তৃত বিবরণ এল।

তখন থেকেই চন্দ্রার আশ্রমের জন্যে মন কেমন কেমন শুরু হ'ল। মেট্রন যেন তাঁর আড়ষ্ট ব্যবহারের মুখস ফেলে ভারি মিষ্টি ব্যবহার কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই প্রথম সে বুঝতে পারলে যে, এই মানুষটির বুকের মধ্যে মায়া মমতা—একেবারে নিঃশেষে শুকিয়ে যায় নি।

একদিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্রা সেই অজানা মানুষদের উদ্দেশে—অচেনা পথে রওনা হ'য়ে গেল। কত ওঠা-নামা—কত সুদীর্ঘ পথে একলাটি রেল গাড়িতে ব'সে থাকা। বুকের মধ্যে কোথায় ব্যথাও আছে, ভয়ের ধুক্‌-ধুকুনির অস্বস্তি! আবার নিজের মুক্তি আর আত্ম-নির্ভর হওয়ার সুখ। চোখের উপর আকাশের রং যেন স্নিগ্ধ-মধুর হ'য়ে ওঠে। গাছ-পালাগুলো নোতুন, অভিনব আর সুন্দর মনে হয়। সহযাত্রীদের কথা-বার্তা কেমন বেসুরো ঠেকে—কিন্তু একেবারে বিশ্রী নয়।

চারদিনের দিন ভোরে গিয়ে গন্তব্য ইষ্টিশানে গাড়ি থাম্‌তে চন্দ্রা এদিক-ওদিক চেয়ে দেখ্‌লে ইষ্টিশানে জনমানব নেই—শুধু একটি মানুষ ইষ্টিশানের নাম হাঁক্‌চে।

কুলি, কুলি! সে ডাক্‌লে।

সেই লোকটাই ছুটে এলো। তার জিনিষপত্র নামিয়ে নিলে।

তারপর ঘণ্টা বাজাল, গাড়ি বাঁশী বাজিয়ে চ'লে গেল—চারিদিক কাঁপাতে কাঁপাতে। সেই সঙ্গে অজানার অস্বস্তি, নির্জনতার নিঃসঙ্গ অসহায়তা এবং অচেনার দুশ্চিন্তা তার দেহ-মনকে ঝিঁ ঝিঁ ধরার মত অবশ ক'রে দিয়ে গেল।

সওয়ারি আসার কথা ছিল; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

অবশেষে তাকে ইষ্টিশান মাস্টারের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল।

সেই বুড়ো মানুষটি চন্দ্রার পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগা-

গোড়া নিরীক্ষণ ক'রে ব'ললে : দূর বেশী নয় ; কিন্তু সেখেনে, একলা পায়ে হেঁটে তোমার মত মেয়ের যাওয়া ঠিক হবে না। অপেক্ষা কর—সওয়ারি আস্‌বার সময় যায়নি!

সেই যেন প্রথম চন্দ্রার তার নিজের নারীত্বের সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হ'ল।

ইষ্টিশানের বেঞ্চির উপর একলাটি চুপটি ক'রে সে ব'সে ভাবতে লাগ্‌লো : আমার মত মেয়ে? কি এমন তার বিশেষত্ব ছিল? ছোট আয়নাখানিতে তার মুখ সে দেখেছে ; কিন্তু তাতে তো কোন বিশেষত্ব নেই! আমার মত মেয়ে মানে একলা নিরাশ্রয়, অসহায়? এত কথা আমার সম্বন্ধে ও জান্‌লেই বা কেমন ক'রে। সে অবাক হ'য়ে ভাবে!

অদূরে তার চোখের সাম্‌নেই ইষ্টিশান মাস্টারের ছোট্ট বাসাটি। সেই বাসার একটা জান্‌লার খড়খড়ি উঠ্‌ছে আর পড়ছে, অনেকটা হাতছানি দিয়ে ডাকার মতই। শেষকালে জানলাটা খুলে গেল। একটি কালো রংএর মেয়ে তাকে ইসারা ক'রে ডাক্‌তে লাগ্‌ল।

সক্কলের আগে চন্দ্রার মনে হ'ল, আমার মত মেয়ের যাওয়া ওখেনেও উচিত কি?

সেই সময় ইষ্টিশান মাস্টার বেরিয়ে এসে হাঁক দিয়ে কুলিকে ব'ললে, এই ঘন্টি দেও, পচ্ছিমকা গাড়ি ছোড়া··

চন্দ্রা কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলে আমি কি যেতে পারি—আপনার বাড়ী থেকে ডাক্‌চেন।

তা, যাও না—ব'লে কুলিটাকে তার জিনিষগুলো ইষ্টিশানের ঘরে তুলে দিতে ব'লে—টিকিটের জান্‌লা খুলে দুটো ঘটার্ ঘটার্ শব্দ করলে।

এ ইষ্টিশানে প্যাসেঞ্জারের সমাগম বড় একটা হয় না। জংগলের কাঠ আর চায়ের চালানি কাজ যেমনি বেশী, তেমনি তা থেকে উপরি আয়ও?

বাড়ীতে ঢোকার আগেই একটি অল্প বয়সী মেয়ে ছুটে এসে তার হাত ধ'রে অনুযোগ ক'রে বল্‌লে—তোমার কতক্ষণ ধ'রে ডাকচি—তুমি বুঝতেও পার না।

উত্তর দিলে চন্দ্রা, আমি, অজানা, অচেনা কেমন ক'রে ··

মেয়েমানুষের কাছে মেয়েমানুষ—তার আবার অজানা অচেনা কি? তুমি ভাই আমার দিদি—কেমন তো?

পিছন থেকে ভারি গলায় ইষ্টিশান মাস্টার ডাক্‌লে : শেফালি! সওয়ারি দেখা গেছে, তাড়াতাড়ি নেও। চন্দ্রা যেন ধাক্কা খেয়ে গেল। মেয়ে নয় বুড়োর বৌ?

শেফালি মাথার কাপড় টেনে দিলে। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে চন্দ্রা বললে : শেফালি! তোমার নামটি ওমা! কি চমৎকার নাম!

ছাই : কালো মেয়ের—ও নাম কেন? উনি রাগ হ'য়ে গেলে, কেবল কেবল বলেন।

চন্দ্রা বল্‌লে : ওটা বৌদিদি, বোধ হয় আদর।

শেফালি বল্‌লে, আদর না হাতী! কালো হওয়ার দোষ তো আমার নয় ; মা আমার কালো, বাবাও তেমন কিছু ফর্সা নন্—তোমার মা-বাবা, দুজনেই ফর্সা, না?

ও প্রসঙ্গ করতে চন্দ্রার ভালো লাগ্‌তো না। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চেপে এসে তার দম-বন্ধটা ক'রে দেয় যেন।

জানিনে, ব'লে চন্দ্রা চুপ হ'য়ে গেল।

শেফালি বুঝতে পারলে যে চন্দ্রার অনেক দিনের অতীত একটি করুণ এবং দুঃখের কাহিনীতে সে অতর্কিতে আঙুল দিয়ে ফেলেছে। তাকে সাম্‌লে নেবার জন্যে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বললে—ও! বুঝেছি, তোমার মা-বাবা—তোমার জ্ঞান হওয়ার আগেই বুঝি মারা গেছেন?—মাসীর কাছে মানুষ হ'য়েছ?

চন্দ্রা একটি কথা বড় দুঃখেই শিখেছিল যে, এই পৃথিবীতে চরম দুর্ভাগা না হ'লে কেউ অনাথ আশ্রমে মানুষ হয় না। সে দুঃখের কাহিনীকে জাহির ক'রে নিজের মাথায় অন্যের অবহেলার গ্লানি টেনে আনায় যেমনি অপমান তেমনি ব্যথা।

সে উত্তরে একটি ছোট্ট হুঁ ব'লে ব্যাপারটিকে হত ইতি গজ-র মতো ক'রে সেরে নিলে। শেফালি জিজ্ঞেস করলে : তোমার কি নামটি ভাই?

চন্দ্রা।

কুলি খবর দিয়ে গেল, হাতী এসে গেছে!

হাতী!!!

ওমা! জানো না? এই জংগলের দেশে হাতী ছাড়া আর কি আস্‌বে? দেখো ভাই, খুব সাবধানে দড়ি ধ'রে থেকো—হাতী ভারি বজ্জাত হয়, মধ্যে মধ্যে পিট্ ঝাড়া দেয়!

সমূহ বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে—এ কথা বারম্বার তোলাপাড়া ক'রেই চন্দ্রা যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু ছোট্ট তার কল্পনা, তার মধ্যে বৃহৎকায় ঐ হাতীর স্থান হয়নি। ফিরে যাবার ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু সে পয়সাও নেই—আর স্থানও নেই। ফিরলে আশ্রম তাকে আর দোর খুলে দেবে না যে, তা সে খুব ভালো ক'রেই জান্‌তো!

শেফালি চন্দ্রার হাত চেপে ধ'রে বল্‌লে, তা কিন্তু চন্দ্রা দিদি, তোমাকে কিছু খেয়ে যেতে হবে—তোমার মুখটি শুকিয়ে গেছে—এ ক'দিন কিচ্ছু খাওনি বোধ হয়।

এই যে স্নেহ ভালোবাসা আদর—এ চন্দ্রার কাছে বোধ হ'ল স্বর্গের সুদুর্লভ জিনিষ!

এত সকালে কি খেতে দেবে ভাই, শেফালি বৌদি?

চা, বিস্কুট—আর রুটি, একটু সেকে মাখন দিয়ে দি?

হাতীর পিঠে উঠ্‌তে যতটা ভয় হচ্ছিল ঠিক ততটা ভয়ের ব্যাপার নয়, দেখ্‌লে চন্দ্রা। একটা ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি লাগিয়ে দিতে সে টকাটক **পাঁচ**টা ধাপ বেয়ে উঠে বসল—গাদলা মোড়া খেরোর বিছানায়। তার দু-পাশে দু'টো বাক্স বেঁধে দেওয়া হ'ল, আর পিছনে বড় তাকিয়ার মত বিছানার বাণ্ডিল—বাঁধা। সাম্‌নে মাহুত। সে পড়বে কোথা দিয়ে? শুধু অসুবিধে হাতীর গায়ের গন্ধটা একটা বুনো, খস্‌কা, উট্‌কো গন্ধ—তার কাছে একেবারে নতুন। নাকে ছোট্ট রুমাল চেপে দিয়ে সে জ্যাং ক'রে ব'সে দেখ্‌লে জান্‌লা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে তখনও শেফালি। আস্‌বার সময় কানে কানে ব'লে দিয়েছে, চিঠি দিও, চন্দ্রা দিদি!

বিরি, বিরি, ধেৎ, ধেৎ—মাইল—

হাতী চল্‌তে শুরু ক'রে দিলে। চন্দ্রার শুক্‌নো চোখে একরাশ জল ঠেলে উঠ্‌ল। তার জীবনের শুষ্ক মরুর মধ্যে একটি ভালোবাসার ছোট্ট ওয়েশিস্ ওই কালো মেয়েটি! বোশেখের খরা দুপুরে এক টুক্‌রো কালো মেঘ!

মরিয়া মানুষ পাহাড়ের চূড়ো থেকে তলায় খরস্রোতা নদীর বুকে লাফিয়ে পড়ার সময় বুকের মধ্যে যেমন খালি বোধ করে—তেমনি খালি ঠেকলো চন্দ্রার বুকের মধ্যে! মনে হ'লো একটা বালিশ দিয়ে কেউ যদি ঠেলে ধ'রে তো দমটা সহজে পড়ে, কোথায় বালিশ, কোথায় মানুষ!

উঁচু-নীচু পথ, বড় বড় গাছ, তা থেকে লতা ঝুলে আছে। থোকা থোকা ফুল, তাদের গন্ধ যেন পাগল ক'রে দেয় মানুষের মন। এই অকবির দেশে এ কি অদ্ভুত কাব্য-সৃষ্টি! লোকালয়ের মধ্যে যেন ভগবান বাস করেছেন এই দেশে এসে। নিষ্কর্মা বলে আর্টের সমারোহ **সম্ভারের**—না আছে আদি না আছে অন্ত।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হাতী এসে আপিস বাড়ীর ফটকে ঢুক্‌লো।

দূরে কাঠের বাড়ীর করোগেট টিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন, মাহুত আবদুল করিম বল্‌লে: বড়ো সায়েব।

হাসি এলো চন্দ্রার। সাযেব নন্ কোন কালে উনি। উনি দর্জির কৃপায় সায়েব ব'নেছেন, খাঁটি দিশি মানুষ!

স্যর হলধর বর্ধন খুব মামুলিভাবেই জীবন আরম্ভ করেছিলেন শোনা যায়। কাঠের ব্যবসা ওঁর পৈতৃক। হঠাৎ এদেশে কাগজের মিল হওয়াতে তিনি ফেঁপে উঠ্‌লেন। হাজারের কারবার লাখে গিয়ে দাঁড়াল। তাতেও তাঁর ভাগ্যবিধাতা সন্তুষ্ট হ'লেন না।

সে বছর লাট সাহেব শিকারে এসে একটা নরমাংসভুক্ খাঁটি রয়াল বেঙ্গল বাঘের মুখে প্রাণ হারাতে বসেন - তখন বর্ধন সেই বাঘটাকে সাহস এবং দৈহিক বলে শেষ ক'রে দেন, সনাতন কুড়ুলের কোপে। সে কথা অবশ্য কাগজে প্রকাশ হ'ল না। কারণ স্পষ্ট; কিন্তু লোকের মুখে সরা চাপা দেওয়া যায় না। বৃটিশ-সিংহ কিন্তু যথাসুযোগে নববর্ষের খেতাবের তালিকায় তাঁকে নাইট ক'রে দিয়ে ওদিকের জংগল তালুকের কর্তা ক'রে দিলেন।

বর্ধন যথারীতি চন্দ্রার করমর্দন ক'রে গুড্ মর্ণিং ব'লে তাকে স্বাগত করলেন।

তারপর নিজের খাস-কামরায় গিয়ে রীতিমত ব্রেকফাস্ট করলেন মিস্ গুপ্তার সঙ্গে!

মানুষটির গাম্ভীর্য এবং তার সঙ্গে সহৃদয় ভদ্র-ব্যবহারে এক আঁচড়ে চন্দ্রাকে করতলগত ক'রে ফেলার মত করলেন।

আহারান্তে বর্ধন কয়েকটা জরুরি আলাপ করার অজুহাতে—বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে দিয়ে আপিসে খবর দিলেন যে, সেদিন সকালে তিনি আপিসের কাজ করবেন না;—সে তল্লাটে যেন কেউ না আসে। বেয়ারা জো হুজুর ক'রে দাঁড়াল সিঁড়ির মুখে।

একটা মোটা সিগার ধরাতে ধরাতে চন্দ্রাকে বল্‌লেন, চুরুটের ধোঁয়াতে আপনার অসুবিধে হবে না?

চন্দ্রা মাথা নেড়ে না জানালে। লজ্জায় তার মুখ রাঙা, কান গরম হ'য়ে গেল।

এখন কাজের কথা সুরু করা যাক্?

চন্দ্রা একটি ছোট্ট সম্মতি জানালে—ঈষৎ মাথা নেড়ে।

এ আপিসের কাজ ভারি হাল্কা। হপ্তায় গোটা চারেক কন্ফিডেন্শাল চিঠি বা'র হয় বড় জোর উর্ধ সংখ্যায় ···

টাইপ করতে জানেন মিস গুপ্তা?

না।

ওটা শিখে নিতে হবে। ··· আমি নিজে খুব ভালো টাইপ করি—শিখিয়ে দিতে বড় বেশী মাসখানেক লাগ্বে। যাক্—সে ম্যানেজ ক'রে নেওয়া যাবে। আসল কথা হচ্ছে,—

বর্ধন একটু অন্যমনস্কভাবে ভেবে বল্লেন—

একজন কম্প্যানিয়নের দরকার···

আশ্চর্য! চন্দ্রার চোখ দুটো বড় হ'য়ে ওঠায় তিনি নিজের ভুল বুঝে একটু হেসে বল্লেন—

আমার নয় অবশ্য, লেডি বর্ধনের ··· কিছুদিন থেকে তাঁর মানসিক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। অতিরিক্ত মোটা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁর ছেলেপুলে হয়নি। আমার কাজের চাপ দিনকের দিন বেড়ে চলেছে—তাঁকে চালাবার জন্যে একটি বুদ্ধিমতী মেয়ের দরকার—অবশ্য নার্স আছে, আয়া আছে—যাকে বলে ইন্টেলিজেন্ট সুপারভিশন্, তারই দরকার—সেটার ভার তোমাকে নিতে হবে। আশা করি, লোক-নির্বাচনে আমার এবার ভুল হয়নি।

চন্দ্রা বল্লে: যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি, স্যর।

নিশ্চয় মিস্ গুপ্তা।

আপনি কি ক'রে বুঝলেন যে আমি বুদ্ধিমতী?

বর্ধন হেসে বল্লেন: কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় একশো পঁচিশটি দরখাস্ত আসে। সেগুলোকে প্রথমে পঁচিশটা ক'রে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। এক একটা ভাগ থেকে লটারি ক'রে পাঁচজনকে পাওয়া যায়—সেই পাঁচজনের মধ্যে মিস্ চন্দ্রা গুপ্তার নামে ইয়েস্ ওঠে—বাকিগুলো বাতিল হয়ে গেল। ··· আমি ভাগ্য মানি। মানি, এই জীবন আমাদের ভাগ্য আর পুরুষকারের পাশা খেলার মত। এই লাইন ধ'রে আমি চলি। আমার স্ত্রী নির্বাচনও ঠিক এমনি ক'রেই করেছিলাম। বহুদিন সুখেও জীবনাতিপাত ক'রেছি; কিন্তু ভগবানের রাজ্যে একটানা সুখের নিয়ম নেই—তাই লেডি বর্ধন মধুরে অম্ল মিশিয়েছেন!

এইবার বর্ধন একটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বল্লেন: হাসি দিয়ে মানুষ চেনা যায় ··· আমি খোলা-মেলা সাদা-সিদে ধাতের মানুষ—আমাকে চিনে নিতে তোমার বেশী দেরি হবে না জানি। ··· যাক্, একটা কথা, মুখ ফস্কে তুমি বার হয়েছে, এটুকু প্রীভিলেজ্—ইন্ডালজেন্স্—কি পেতে পারে না বুড়ো মানুষটা? আজ এইখেনেই থাম্লাম। তুমি শ্রান্ত-ক্লান্ত পথ-শ্রমে। চল বাড়ী যাওয়া যাক্—একথা অফুরন্ত, রোজ একটু একটু ক'রে হবে ···

বর্ধনের আলাপ আতপক্লিষ্ট পথিকের তুষার শীতল জলে অবগাহনের মত বোধ হ'ল।

আপিস্ থেকে বাড়ী—মাইল খানেক। হাতী নয়, একখানা মোটর দাঁড়িয়েছিল। চন্দ্রাকে বাঁ দিকে বসিয়ে বর্ধন নিজে চালিয়ে গেলেন। গাড়ির পিছনে দুজন বসার জায়গায় ড্রাইভার আর তাঁর প্রিয় বেয়ারা সঙ্গে গেল।

প্রকাণ্ড একটি গাঢ় নীল রংএর সোফার উপর রজত-গিরির মত সমাসীন ছিলেন লেডি বর্ধন। চন্দ্রা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অভিবাদন ক'রে মনে মনে নিজেকে একটি মুষিকের চেয়ে ছোট ব'লে অনুভব ক'রলে। নিশ্চল নিস্তব্ধ মানুষটি—শুধু তাঁর চোখ দুটি থেকে অগ্নির ঝলক বেরিয়ে এলো।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে ব'ল্লেন লেডি বর্ধন: তোমারই নাম চন্দ্রা?

আজ্ঞে।

চন্দ্রা, আজ আমার শরীর মন কিচ্ছু ভালো নেই। আজ কারুর সঙ্গ সহ্য ক'রতে পারছিনে। কিছু মনে ক'র না। তুমি নিজেও শ্রান্ত ক্লান্ত আছ। খেয়ে ঘুমোও গে। তোমায় ডেকে পাঠালে এসো, নইলে আমার কাছে কেউ এলে আমি তার সঙ্গে উচিত ব্যবহার ক'রে উঠ্তে পারিনে।

ভয়ে চন্দ্রার বুক কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হ'য়ে আস্ছে, কিসের একটা শব্দে চন্দ্রার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সকাল থেকে খাওয়া পর্যন্ত তার মনের মধ্যে এমন

একটি আবেগের উত্তেজনা চলছিল যাতে সে আর নিজেকে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ মনে কর্‌তে পারছিল না। দীর্ঘ রেল পথের ঝাঁকুনি—তার পর গল্পের মত শেফালির সঙ্গে পরিচয়। হাতী চড়া। বড় সায়েবের সঙ্গে দেখা। এসব সে কোন রকমে স'য়ে নিয়ে চল্‌ছিল; কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রতিমূর্তিস্বরূপ লেডি বর্ধনকে দেখে আর যেন সে নিজের মনকে ধরে রাখ্‌তে পারে না—গ'লে, পারার মত মাটিতে পড়ে শতধা হ'য়ে যায় আর কি! কি তীক্ষ্ণ অগ্নি-বর্ষী দৃষ্টি! বাবা! ওঁর সঙ্গে বনিয়ে চলা! অসম্ভব!—অসম্ভব!

ঘরের আলো জ্বেলে বয় চা দিয়ে গেল। দেবার সময় অতি বিনীত ভাবে জানিয়ে গেল, দিতে দেরি হয়েছে—

আলোতে ঘরখানা ঝকমক্ ক'রে উঠ্‌ল। দেয়ালের কাছে একটা প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের আল্‌মারিতে দাঁড়া আর্শির মধ্যে সে নিজেকে দেখ্‌তে পেয়ে লজ্জিত হ'য়ে গেল। চারিদিকের উজ্জ্বলতার মধ্যে একটি মলিন বিন্দু—সে ঘরের মধ্যে তার সাজ পোষাক—তার শীর্ণ দেহ যেন একটুও মানায় না। হাঁসের মধ্যে বক!

আয়া এসে মনে করিয়ে দিয়ে গেল: চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। ··· বড় সায়েব পাশের ঘরে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে চুল পরিস্কার ক'রে সে চ'লে গেল। চা খাওয়ার কথা মনেই রইল না।

চা খাওয়া হয়েছে, মিস্ গুপ্তা?

থাক্ গে—চায়ের আমার অভ্যাস নেই।

না, না। এ-খেনে নিয়মিত চা খাওয়া চাই; নইলে স্বাস্থ্য ঠিক থাক্‌বে না।

টুং ক'রে ঘণ্টি—সঙ্গে সঙ্গে বয় এসে হাজির। দুজনকে চা দেওয়ার হুকুম হল।

চায়ের বাটি তুলে নিয়ে বাঁ পায়ের উপর ডান পা চেপে দিয়ে বর্ধন বল্‌লেন: মাথা ধরেনি তো মিস্ গুপ্তা?

না। আপনি আমাকে চন্দ্রা ব'লে ডাক্‌বেন, দয়া ক'রে।

ওই নামেই তুমি অভ্যস্থা, তা জানি; কিন্তু ···

কিছু কিন্তু নেই, আমি আপনার আশ্রিতা, আপনার মেয়ের মতোই ···

ব'লে চন্দ্রা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো! ··· আমার দোষ-ত্রুটি হ'লে, সুধরে দেবেন—মার্জনা করবেন।

একটা খোলা হাসির পর বর্ধন বললেন:

ও কোন কথাই নয়—আমি মানুষের বড় একটা দোষ-ত্রুটি দেখ্‌তে চাইনে—বিশেষ ক'রে তোমার মত একটি বেবি ডার্লিংএর। ···

চন্দ্রা আশ্বস্ত হ'ল।

কিন্তু আমার আজকের প্রশ্ন—তুমি কেমন দেখ্‌লে লেডি বর্ধনকে?

চন্দ্রা ঘাড় হেঁট ক'রে নখ খুঁট্‌তে লাগলো।

আমার সঙ্গে তোমাকে ফ্র্যাঙ্ক হ'তে হবে। কেন না—তোমাকে গাইড্ করতে চাই—নইলে অন্তত গোড়ায় গোড়ায় তুমি ঠিক পেরে উঠ্‌বে না—জানো ত অল বিগিনিংস্ আর ডিফিকল্‌ট?

ভয় করে।

কিচ্ছু ভয় করার নেই, ডার্লিং। ওঁর মত শান্ত শিষ্ট ভালমানুষ এ পৃথিবীতে আর একটি আছে কি-না—জানি নে।

উনি কিন্তু আমাকে সব সময়ে ওঁর কাছে যেতে তো মানাই করলেন।

ওটা তোমার উপর রাগ নয়—ওটাই ওঁর অসুখ—ওটা আমার উপর গভীর অভিমান। মানে, উনি চান আমি ওঁর কাছে সদা-সর্বদাই থাকি, কিন্তু ইজ্ দ্যাট্ পসিব্‌ল্ ফর্ মি?

আমার ভয় করে যে!

ভয় করার কিচ্ছু নেই, চন্দ্রা! শোন মন দিয়ে আমার কথা। সম্প্রতি আমি দিন চারেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। এই সময়টা তোমার পক্ষে ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুবিধা হবে। ··· এখুনি আমি একটা জরুরি কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি—ফিরতে রাত হবে, যদি তোমার অসুবিধে না হয়ত রাতে দেখা করতে পারি—সেই সময়ে গোটা কয়েক কথা ব'লে যাব—যাতে তোমার ওঁর সঙ্গে ডীল্ করা সহজ হবে।—তোমার কি আপত্তি আছে? নিজেকে রিফ্রেস্ট মনে করছ না?

চন্দ্রা বল্‌লে, দরকার পড়লে রাত জাগ্‌তে হয়ই—আনন্দের সঙ্গেই জেগে থাক্‌বো—

না, না, তোমাকে জেগে থাক্‌তে হবে না, আমি জাগিয়ে নেব ··· কি বল?

বেশ, তাই হবে।

বর্ধন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে চ'লে গেলেন। ফিরে এসে আবার—একগোছা চাবি দিয়ে বল্লেন: এই লাইব্রেরির আলমারির চাবি—তোমার পড়ার মত কয়েকখানা বই টেবিলে রেখে গেলাম।

চন্দ্রার বাক্সের মধ্যে একটা ছোট্ট ফ্লুট বাঁশী ছিল সেটা বার ক'রে নিয়ে সে নীচে নেমে গেল। যখন তার অসম্ভব মন খারাপ হ'ত তখন বাঁশী বাজিয়ে সে নিজেকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলার চেষ্টা করতো।

লাইব্রেরি-ঘর খোলাই ছিল। টেবিলের উপর মস্ত একটা ল্যাম্প জ্বলছে—আর পাশে খানকয়েক বই রাখা আছে। বইগুলো সব ইংরিজি!

একখানা বই টেনে নিয়ে চেয়ারে ব'সে পড়লো চন্দ্রা—বইখানা: হোয়াট্ ইজ্ লাভ?

ওদের আশ্রমে এই জাতীয় বইগুলো পড়ার নিষেধ ছিল। মেট্রন বলতেন: ওতে ছেলে মেয়েরা অকালে পাকে।

মেয়েদের নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষণের প্রসিদ্ধি আদি-নারীর কাহিনী থেকেই চ'লে আস্‌চে—অতএব চন্দ্রার পক্ষে কেনই বা একটা নূতন কিছু ঘটবে?

সে দুই উরুতের মধ্যে বইখানি রেখে পাতা উল্‌টাতেই দেখ্‌তে পেলে লাল্ পেন্সিলে দাগানো একটা পাতে বড় একটা R লেখা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঠক সেই অংশটা পরবর্তী পাঠককে পড়তে অনুরোধ রেখে গেছেন।

সেই লাইন ক'টিতে পরিষ্কার ক'রে বলা হয়েছে যে, পুরুষদের জীবনে ভালোবাসা রসের বিলাসিতা, সেইটেই তার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় নয়; কিন্তু ভালোবাসা নারীর জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়—তার যথাসর্বস্ব!—এরই বিকৃতরূপ ঘৃণা!

চন্দ্রার মেয়েদের সম্পর্কে ততখানি আগ্রহ ছিল না, যতখানি পুরুষ সম্পর্কে। তাই সে অবাক হ'য়ে গেল। এই কি সত্যি? পাতা উল্‌টে দেখ্‌লে বইখানি একটি মেয়ের লেখা! তখন নিশ্বাস ছেড়ে বল্লে: ওঃ বুঝেছি! ইনি ম্যান্ হেটার··· কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই জগতে—ওর উল্টোই ··· নয় কি ডক্টর স্যাণ্ডারসন্—কি চমৎকার! আর মেট্রন নাগ? —আর এই বাড়ীতেই তো ···

বইখানা রেখে বাঁশীটা তুলে নিয়ে সে বাজাতে লাগল।

তন্ময় হ'য়ে কতক্ষণ বাজিয়েছে তা চন্দ্রা হয়ত নিজেই জানে না—মাথার উপর দুটি নরম হাত তাকে আদরে—আশীর্বাদে যেন ভ'রে দিলে! আদরের সোহাগে চোখ দুটো তার বুজে গেল।

এত শীগ্‌গির বর্ধন ফিরেচেন! এই তো সে চাইছিল,—এই মানুষটির গভীরতার পরিমাণ জেনে নেবার জন্যে তার মধ্যে কৌতূহলের ক্ষুধাটা গড়ুরের ক্ষুধার মতই বিরাট আকার ধ'রে উঠ্‌ছিল!

চন্দ্রা তখনও নিশ্চিন্ত হ'য়ে চোখ বুজেই আছে—যেন কিসের একটা চাপা প্রতীক্ষায়—মুখখানি তার তুলে ধ'রে একটি সস্নেহ চুম্বন!

সে চোখ চেয়ে দেখে লাফিয়ে স'রে দাঁড়াল—এ কি! এ যে লেডি বর্ধন!—

নিঃশব্দে তিনি একটা সোফায় ব'সে ডাক্‌লেন: চন্দ্রা, আয়!

চন্দ্রাকে কোলের উপর বসিয়ে তার মুখ চুমুতে চুমুতে ভ'রে দিয়ে—বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কানে চুপি চুপি বললেন: জানিস চন্দ্রা—এ নাম তোকে কে দিয়েছে?

চন্দ্রা মাথা নাড়লে—না!

আমি! আমি!! আমি!!!

তখুনি চন্দ্রা বুঝতে পারলে যে লেডী বর্ধন কত বড় পাগল!

সমুদ্র-সৈকতে ফেনার মধ্যে ঢেউএর তালে ফুল যেমন ক'রে দোলে ঠিক তেমনি ক'রেই দুলতে লাগল চন্দ্রা লেডি বর্ধনের বুকের উপর!

চন্দ্রা! ডাক্ একবার আমাকে মা ব'লে! নৈলে ছাড়ব না।

চন্দ্রার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যায়—সে অনেক চেষ্টা ক'রে ডাক্‌লে: মা!

জীবনে এই তার প্রথম মাকে মা বলে ডাকা!

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহরিপদ রায়

সুর—ঠুংরী প্রধান। তাল—কাহার্‌বা (ডবল ছন্দে)

আজো ওঠে চাঁদ
বনানী জাগে হেরি ফুলের স্বপন।
বিহগ ভোলেনি বিহগী প্রিয়া তায়
পিয়াসী রহিল মোর নয়ন ॥
পথধারে বসি লয়ে তব বাঁশী
নীরবে রহি একা
মরমে লুকায় মরম বেদনা
নয়নে শুকায় জলরেখা।

ফাগুন-বরষা ফিরে এল নভে
আবার তুমি ফিরিবে কবে
গোধূলি যায় প্রভাত আসে
উদিবে কবে মোর তপন ॥

```
                                                      ॥
II { া  া  া  সা  |  গা  -মা  পা  ক্ষা  I  ধপা  -া  -া  -া  |  ( া  পা  পধা  পা  I
     ০  ০  ০  আ     জো   ০   ও   ঠে      চাঁ   ০   ০   দ্       ০  ব   না০  নী

I  গা‿পা  মগা  -রগা |  -রা  পধপা  মা  মা  I  মগরা  -সরা  -গা  মগা  |  রা  -সা  -া  -া  I )}
   জা  ০  গে০  ০০       ০  হে০০  রি  ফু     লে০০  ০০  র  স্ব          প  ন্  ০  ০

|  া  সা  সা  গা  I  রা  রমা  গা  -া  |  -া  গা  মা  পা  I  ধর্সা  ণধা  পা  -া  |
.  ০  বি  হ  গ      ভো  লে  নি  ০      ০  বি  হ  গী     প্রি০  য়া০  তা  য়্
```

। না না র্সা I ধর্সা ণা ধা পা | । পা -ধা -পা I গা পা মগা -রগা |
০ পি য়া সী র০ ০ হি ল ০ মো ০ র্ ন ০ য়০ ০ন্

। -রা পধপা মা মা I মগরা -সরা -গা মগা | রা -সা -া -া II
০ হে০০ রি ফু লে০০ ০০ র স্ব প ন্ ০ ০

[না না র্রা]
{ । না না না II র্সনা -ধনা ধা পধা | । না না না I নর্রা -র্সা না না |
০ প থ ধা রে০ ০০ ব'সি০ ০ ল য়ে ত ব ০ বাঁ শী

| । না -া র্সা I র্রা -া র্ঋা র্রা | র্ঋর্রা -র্ঋনা -ধনা -র্রর্সা I না -া -পধা -পা } | র্সা র্সা র্সা র্সা I
০নী ০ র বে ০ র তি এ০ ০০ ০০ ০০ কা ০ ০০ ০ ০ ম র মে

I র্সা -া ধর্সা -র্রর্গা | । র্রর্গা র্রা র্সা I না র্রা র্সা র্সা | । না না র্সা I
লু ০ কা০ ০য়্ ০ ম০ র ম বে ০ দ না ০ ন য় নে

I নধা -দধা পা -া | । গপা পা ধনা I পা -া -া -া | । গা মা পা I
শু০ ০০ কা য় ০ জ ল রে০ খা ০ ০ ০ ০ ন য় নে

I র্সনা -র্রর্সা ণা পা | । গমা গা রা I সা -া -া -া | । গমাঃ পঃ -র্সা I
শু০ ০০ কা য়্ ০ জ০ ল রে খা ০ ০ ০ ০ ফা০ গু ন্

I ণা ণা পা -া | । মা মা মপা I গমা -গা রা সা | । ধা ণা -সা I
ব র ষা ০ ০ ফি রে এ০ লো০ ০ ন ভে ০ আ বা র

I গা -া গমা -রগা | । গা মা ধা I দধা -ণধপা মা -া | । মা ধা ধা I
তু ০ মি০ ০০ ০ ফি রি বে ক০ ০০০ বে ০ ০ গো ০ ধূ

I মধা -ণর্সা র্সা -া | । না র্সনা ধা I পধা র্সণা ধা -া | -ণা মা ধা ধা I
লি০ ০০ যা য়্ ০ প্র ভা০ ত আ০ ০০ সে ০ ০ গো ধূ ০

I মধা -ণর্া র্সা -া | া না র্সনা ধা I পধণা -পধর্সণা ধা -া | না না -া ধা I
লি॰ ॰ ॰ যা য়্ ॰ প্র ভা॰ ত আ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ সে ॰ ॰ উ ॰ দি

I পা -া মা মা | -া রমা -পধা -পা I গা পা মগা -রগা | -রা পধপা মা মা I
বে ॰ ক বে ॰ মো॰ ॰ ॰ র্ ত ॰ প॰ ॰ন্ ॰ হে॰॰ স্নি ফু

I মগরা -সরা -গা মগা | রা -সা -া -া II II
লে॰॰ ॰ ॰ র স্ব॰ প ন্ ॰ ॰

বন্যা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি ভালবাসি দিগন্তব্যাপী বন্যার অভিযান,
গুরু তার কল-কল্লোলে পাই অকূলের আহ্বান।
চৌদিকে ওই ছল্ ছল্ করা গৈরিক গলা জল,
উন্মাদনার এ কি উৎসব! প্রাণ করে চঞ্চল।
ভাবের বন্যা, প্রেমের বন্যা, উদ্দাম আলোড়ন,—
এলো ভাসন্ত, ভরা বসন্ত, দুরন্ত যৌবন।
দুকূল ভাসানো অকুল পাথার, উচ্ছ্বাস বহে যায়,
যেন সৃষ্টির আকাঙ্খা জাগে প্রতি জলকণিকায়।

২

ফণা প্রসারিয়া চলে অনন্ত, ভীম তরঙ্গ নাচে,
গ্রীক সেনা লয়ে দর্পে আলেকজাণ্ডার ছুটিয়াছে।
এসেছে পাহাড়ী বন্যা, এসেছে বন্যা ভুবনজোড়া,
চলে তৈমুরলঙের বাহিনী ছুটাইয়া লাল ঘোড়া।
শত গৈরিক পতাকা উড়ায়ে ঝঞ্ঝার মত আসে
শিবাজীর চতুরঙ্গ বাহিনী ভৈরব উল্লাসে।
ভেসে যায় কত, ডুবে যায় কত, গলে যায় কত কি যে
জলরাজ্যের ওয়াটারলু ও 'জেনা' 'অষ্টারলিজে'।

৩

বহিতেছে স্রোত, যুগের যুগের কর্ম্মধারার মত,
তার সৃষ্টির তার কৃষ্টির ভঙ্গিমা হেরি কত।
কি প্রচণ্ডতা! মিলেছে কতই শক্তি অলৌকিক—
কতই আর্য্য, কত অনার্য্য গথিক্ টিউটনিক।
কত পিরামিড কতই স্ফিঙ্কস্, ভাঙ্গে গড়ে বারবার—
ক্ষণে উত্থান, ক্ষণেই পতন লক্ষ হারাপ্পার।
হয় ত এতেই 'নোয়া'র আর্কের পেতে পারি সন্ধান
বটপত্রেতে এমনি কোথাও ভেসেছেন ভগবান।

৪

এমনি বন্যা এসেছে লক্ষ ভিক্ষু শ্রমণ সাথে
কপিলাবস্তু, তক্ষশীলা ও নালন্দা সারনাথে
এমনি প্লাবন আনিল আবার শঙ্কর জটাজাল,
চৌদিকে রচি দুর্জ্জয় মঠ, মন্দির সুবিশাল।
নূতন বন্যা আবার ডুবালো নদীয়া শান্তিপুর—
রাঙাইয়া মন, রাঙাইয়া বন বহে গেল দূর দূর।
ভালবাসি বান, দেখিয়া আমার তৃপ্তি মানে না হিয়া—
জগন্নাথের রথের আগে এ গেরুয়া কীর্ত্তনীয়া।

৫

বন্যা যে আনে মুক্তির স্বাদ ভক্তির সংবাদ
নিরঞ্জনের পুণ্যাভিষেক দেখিতে আমার সাধ।
এই ত তরল কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
কপিধ্বজের ঘর্ঘর শুনি, পাঞ্চজন্য বাজে।
তন্ময় হয়ে দেখি আর শুনি, মনে আমি ঠিক জানি
গোপনে ওখানে কানাকানি হয় গীত কি গীতার বাণী।
ভীম ও কান্ত ও-রূপ নেহারি প্রীত, কম্পিত ভীত—
হয় কালিন্দী-কুঞ্জের লাগি চিত উৎকণ্ঠিত।

কবিকর্ণপূর ও তাঁহার নাটক-রচনার কাল-বিচার

মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

(১০)

মুরারিগুপ্তের পরেই কবিকর্ণপূর সংস্কৃত ভাষায় **শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত** মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি মহাপ্রভুর তিরোধানের ৯ বৎসর পরে ১৪৬৪ শকাব্দে (১৫৪২ খৃঃ) মহাকাব্য রচনা করেন এবং ১৪৯৪ শকাব্দে (১৫৭২ খৃঃ) **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়** নাটক রচনা করেন, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু বিমানবাবু অন্যরূপ নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সেই সমস্ত কথারও বিচার করা আবশ্যক। তৎপূর্ব্বে কবিকর্ণপূর কে এবং তাঁহার প্রকৃত নাম ও কৌলিক উপাধি কি, ইহা বলা আবশ্যক।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের প্রস্তাবনায় দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়পার্ষদস্য শিবানন্দ সেনস্য তনূজেন নির্ম্মিতং পরমানন্দ দাসকবিনা।" সুতরাং কবিকর্ণপূরের প্রকৃত নাম **পরমানন্দ দাস** ইহা নিশ্চিত। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্ত সুপ্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার নাম চৈতন্যদাস ও রামদাস। 'চরিতামৃতে' কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> "চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
> তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥১।১৭

বৈদ্যকুলপ্রদীপ শিবানন্দ সেন মহাশয়ের বাড়ী ছিল—কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচনাপাড়া গ্রামে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র পরমানন্দদাস অল্প বয়সেই তাঁহার সহিত পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপালাভ করেন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পরেই সেই বালকের মুখ হইতে মধুর রসাত্মক শ্লোক নির্গত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে। কবিকর্ণপূর নিজেও তাঁহার নাটকের শেষে প্রথম শ্লোকের প্রথমেই বলিয়াছেন—**যস্যোচ্ছিষ্ট-প্রসাদা**দয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী। যস্য (যাহার) উচ্ছিষ্ট প্রসাদাৎ—তাহার অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তিলাভ হয়, তিনি সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহারই কৃপায়—পরমানন্দ দাস **কবি-কর্ণপূর** নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

পরমানন্দ দাস যে শিবানন্দ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র, ইহাও তাঁহার নিজের কথার দ্বারাই জানা যায়।' তিনি তাঁহার মহাকাব্যের শেষে লিখিয়াছেন—

> "ইহ পরমকৃপালো গৌরচন্দ্রস্য কোঽপি
> প্রণয়রস-শরীরঃ শ্রীশিবানন্দ সেনঃ।
> ভুবি নিবসতি তস্যাপত্যমেকং কনীয
> স্বকৃত পরমমৌগ্ধ্যাচ্চিত্রমেতৎ প্রবন্ধম্ ॥" ৬৭।৪৬

বিমানবাবু কবিকর্ণপূরের এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম পরমানন্দ গুপ্ত, কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন বা গুপ্ত।" ৯৫ পৃঃ—

কিন্তু সেনবংশ-প্রদীপ শিবানন্দ সেনের পুত্র গুপ্ত হইবেন কেন, ইহা বুঝিলাম না। বিমানবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন, "পরমানন্দ সেন বা গুপ্ত।" কিন্তু **সেন বা গুপ্ত** লিখিলে কি বুঝিব? কবিকর্ণপূর কিন্তু নিজেও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে লিখিয়াছেন—**শ্রীশিবানন্দসেনঃ**। তিনি পরে তাঁহার "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" গ্রন্থের প্রথমেও লিখিয়াছেন,—

> পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং।
> বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্র্যং মহাপ্রভোঃ ॥

কবিকর্ণপূরের জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা শ্রীশিবানন্দ সেন মহাশয় একবার সস্ত্রীক মহাপ্রভুর দর্শনার্থ ৺পুরীধামে গেলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এবার তোমার যে পুত্র হইবে, তাহার নাম রাখিবা পুরীদাস—এইরূপ কথাও "চরিতামৃতে" কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন। বিমানবাবু "চরিতামৃতে"র ঐ কথার সমালোচনা করিতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ

নাথ মহাশয়ের ব্যাখ্যারও উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"কিন্তু নাথ মহাশয় সাধনভজনপরায়ণ ব্যক্তি," ইত্যাদি। উপসংহারে লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রত্যেক উক্তিকে বেদবাক্যের ন্যায় মানিয়া লইয়া উহার ব্যাখ্যা করিতে যাইলে এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় পড়িতে হয়।" ৮৩ পৃঃ।

আমি শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়ের ব্যাখ্যা বা সমাধানের সমর্থন করিতে কোন কথা বলিব না। কিন্তু বিমানবাবুর শেষোক্ত ঐ অতিরিক্ত কথায় অবশ্য বক্তব্য এই যে, নাথ মহাশয় বিমানবাবুর ন্যায় স্বাধীনভাবে সমালোচনার জন্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে "চরিতামৃতে"র বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিমানবাবু নিজেও কি "চরিতামৃতে"র ব্যাখ্যাকার্য্যে নিযুক্ত হইলে ঐস্থলে বিপজ্জনক অবস্থায় পড়িয়া তাহার ঐরূপ মনের কথাই লিখিতে পারিতেন?

পরন্তু সাধন-ভজন-পরায়ণ ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রত্যেক উক্তিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া কখনও যে বিপজ্জনক অবস্থার অনুভব করিয়াছেন, ইহাও আমি বুঝি না। সুতরাং বিমানবাবুর ঐ অতিরিক্ত কথায় দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের প্রত্যেক উক্তিতে শ্রদ্ধাবান্ শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়ের ঐ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার প্রতি ঐরূপ অনাবশ্যক অনুচিত মন্তব্য-প্রকাশ না করাই উচিত ছিল। নাথ মহাশয়ের সকল ব্যাখ্যা ও সকল সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বসম্মত নহে, ইহা তিনিও জানেন।

বিমানবাবু ঐ কথার পরেই তাঁহার নিজের ধারণা ব্যক্ত করিতে লিখিয়াছেন—

"আমার নিজের ধারণা শ্রীচৈতন্যের পুরীদাস নাম দেওয়া ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য নহে। সম্ভবতঃ বৈষ্ণবদের মনে কবিকর্ণপূরের নাম পুরীদাস বলিয়া ধারণা জন্মিবার কারণ এইরূপ—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (দশমাঙ্ক) আছে যে, শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত গৌড়ীয়দের নিকট হইতে আগাইয়া আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হয়েন। প্রভু পুরীশ্বরের (পরমানন্দ পুরীর) সহিত সুখোপবিষ্ট হইয়া শ্রীকান্তের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কোন্ কোন্ ভক্ত আসিতেছেন, প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮৪ পৃঃ

বিমানবাবু পরে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক হইতে মহাপ্রভু ও শ্রীকান্তের কতিপয় উক্তি-প্রত্যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ধারণার কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—কোন সময়ে শিবানন্দ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীকান্তকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এবার গৌড়ীয় ভক্তদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ ভক্ত আসিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীকান্ত বলিয়াছিলেন—"বাসুদেবাপত্যং মাতুলস্য পুত্রৌ।" "বাসুদেবের ছেলে ও মামার দুই ছেলে আসিতেছে।" মহাপ্রভু বলিলেন—"তৌ দৃষ্টপূর্ব্বৌ।" "সেই দুইজনকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি।"

পরে শ্রীকান্ত বলিলেন, 'কনীয়াংস্তু যঃ সোঽদৃষ্ট শ্রীচরণঃ।" "ছোট ছেলেটি প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করে নাই।" পরে আছে—

মহা পুরীশ্বরং প্রতি স্বামিন্! তব দাসঃ।
শ্রীকান্ত। প্রভো এবমেব।'
মহা। ততস্ততঃ।

বিমানবাবু পরে লিখিয়াছেন, ছোট ছেলেটীর কথা বলার পরই পরমানন্দ পুরীকে "এ আপনার দাস" বলায় কোন কোন বৈষ্ণব মনে করিয়াছিলেন, শিবানন্দের ছোট ছেলের নাম বুঝি প্রভু 'পুরীদাস' রাখিলেন।" ৮৪ পৃঃ

কিন্তু মহাপ্রভু পরমানন্দপুরীকে "স্বামিন্ তব দাসঃ" এই কথা বলাতেই কোন কোন বৈষ্ণব ঐরূপ বুঝিবেন কেন? তাঁহারা কি মহাপ্রভুর কথার অর্থ বুঝিতে অক্ষম ছিলেন? আর মহাপ্রভু তখন কাহাকে পরমানন্দপুরীর দাস বলিয়াছিলেন, ইহা কি নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য? কবিকর্ণপূর কিন্তু উক্তস্থলে "স খলু তব দাসঃ" এমন কথা লেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"স্বামিন্ তব দাসঃ।" বিমানবাবুও ঐ কথার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এমন সময়ে মহাপ্রভু শ্রীকান্তকে পুরীশ্বরের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিলেন, "স্বামিন্! এ (শ্রীকান্ত) আপনার দাস।" শ্রীকান্ত শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্রের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলে মহাপ্রভু তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথা বলেন নাই, ইহা নাটকের উক্ত স্থল পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বিমানবাবু পরে আবার লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী বিচারে দেখাইব যে, শ্রীচৈতন্যের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মস্থাপন ও প্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রাচীনতম চরিতাখ্যায়ক কবিকর্ণপূর ও মুরারি-

গুপ্তের গ্রন্থগুলি চাপা দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল। এই দুই জন লেখকের জীবনীর সহিত শ্রীচৈতন্যের জীবনী অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট, শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখিতে গেলে এই দুইজনের সম্পর্কিত ঘটনা বা ইহাদের গ্রন্থকে বাদ দেওয়া খুব কঠিন কাজ। সেইজন্য কোন কোন বৈষ্ণব এরূপ দুই-একটি কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহাতে ইহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার কিছু হ্রাস হয়, পুরীদাস নাম এইরূপ একটি কাহিনী।” ৮৫ পৃঃ

বিমানবাবুর এই অস্পষ্ট মন্তব্যের মধ্যে কি তত্ত্ব আছে, তাহা বুঝিলাম না। মুরারিগুপ্ত ও কবিকর্ণপূরের গ্রন্থগুলি চাপা দেওয়ার অর্থ কি? কিরূপে তাহা সম্ভব হইতে পারে? পরন্তু তাহাদিগের ন্যায় শ্রীচৈতন্যকৃপা-প্রাপ্ত পরমভক্তের প্রতি শ্রীচৈতন্য-ভক্ত বৈষ্ণবগণের শ্রদ্ধার হ্রাস কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এবং কবিকর্ণপূরের ‘পুরীদাস’ নামের কাহিনীর সৃষ্টিই বা কিরূপে তাহার কারণ হইতে পারে, ইহাও সুস্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা উচিত ছিল। বিমানবাবুর ঐ সমস্ত কথার সমালোচনায় আমার সমস্ত বক্তব্য বলিতে হইলে অনেক কথা বাড়িয়া যায়। অতএব তাহা এখন বলিতে চাই না। এখন কবিকর্ণপূরের ‘পুরীদাস’ নাম সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই দেখিব। “চরিতামৃতে” দেখিতে পাই—

“শিবানন্দ তিনপুত্র গোসাইঞিকে মিলাইল।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় বহু কৃপা কৈল॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
‘পুরীদাস’ বলি নাম ধরিহ তাহার॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার॥
প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।
‘পুরীদাস’ করি প্রভু করে উপহাস॥ অন্ত্য—১২ পৃঃ

এখানে প্রশ্ন এই যে, মহাপ্রভু যদি পূর্ব্বে শিবানন্দ সেনের ভাবী পুত্রের পুরীদাস নামই রাখিতে বলিতেন, তাহা হইলে শিবানন্দ তাহার পরমানন্দ দাস নাম বলিবেন কেন? তাহার ছোট পুত্রকে দেখিয়া মহাপ্রভু নাম প্রশ্ন করিলে—“পরমানন্দ দাস নাম সেন জানাইল”—এই কথা কিরূপে সংগত হইবে? শিবানন্দ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অবজ্ঞা করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিয়াছিলেন, এমন কল্পনা করা যায় না।

পরন্তু কবিরাজ গোস্বামীও পরে লিখিয়াছেন—“প্রভুর আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস।” বিমানবাবুও চরিতামৃতের উক্তরূপ পয়ার উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব ঐ কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, মহাপ্রভু প্রথমে যে কোন কারণে পুরীদাস নামের কথা বলিলেও পরে তিনিই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তোমার সেই ভাবী পুত্রের নাম রাখিবা **পরমানন্দদাস**। তাই শিবানন্দ সেই নামই রাখিয়া পরে মহাপ্রভু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সেই নামই বলিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি তখন মহাপ্রভুর প্রথমে কথিত সেই **পুরীদাস** নাম বলিবেন না কেন? পরন্তু কবিরাজ গোস্বামী পরে “পুরীদাস করি প্রভু করে উপহাস”—এই কথা লিখিলেও উহা শিবানন্দের প্রতি উপহাস বুঝা যায় না। অন্তরঙ্গ ভক্ত শিবানন্দকে লজ্জা ও দুঃখ দেওয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কিন্তু তিনি প্রথমে শিবানন্দের যে ভাবী পুত্রের পুরীদাস নাম রাখিতে বলিয়াছিলেন, সেই প্রিয় বালকের প্রথম দর্শন জন্য আনন্দবশতঃ তাহাকেই প্রথমে “পুরীদাস তুমি পুরীতে আসিয়াছ” এইরূপ কোন কথা বলিয়াছিলেন—ইহাই বুঝা যায়। উহা উপহাস হইলে উহার কারণ বুঝিতে আমরা অক্ষম, ইহা বলিতে পারি। কিন্তু বিমানবাবু তাঁহার ‘পুরীদাস’ নাম সৃষ্টির যে কারণ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কোন রূপেই স্বীকার করিতে পারি না।

এখন কবিকর্ণপূরের নাটক-রচনার কাল-নির্ণয়ে বিমানবাবুর নূতন কথাও বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। কবিকর্ণপূরের মহাকাব্যের শেষে লিখিত **বেদারসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে শাকে** ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা বুঝা যায় যে, (ইন্দু ১, শ্রুতি ৪, রস ৬, বেদ ৪) ১৪৬৪ শকাব্দে ঐ মহাকাব্য রচিত হয়। বিমানবাবুও এ বিষয়ে কোন বিবাদ করেন নাই। কবিকর্ণপূরের **শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়** নাটকের শেষে লিখিত—“শাকে

চতুর্দ্দশশতে” ইত্যাদি শ্লোকের পরার্দ্ধে দেখা যায়—তস্মিং শ্চতুর্নবতিভাজি তদীয় লীলাগ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য-বক্ত্রাৎ ॥ “চতুর্নবতিভাজি” চতুর্নবতি সংখ্যাবিশিষ্টে “তস্মিন্” “চতুর্দ্দশশতে শাকে” এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, ১৪৯৪ শকাব্দে ঐ নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিমান-বাবু ঐ কাল সম্বন্ধে বিবাদ করিয়াছেন।

বিমানবাবুর প্রধান কথা এই যে, ঐ নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের উক্তি দেখা যায়—“গজপতিনা প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোঽস্মি।” পরে দেখা যায়—“শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকমভিনীয় সমীহিতমস্য নৃপতেঃ করিষ্যামি।”—সুতরাং উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রের জীবনকালেই ঐ নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। বিমানবাবু লিখিয়াছেন—সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় যে রাজার বা ঘটনার উল্লেখ করিয়া নাটক অভিনীত হইতেছে বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাকে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। (৮৯ পৃঃ) ঐ নাটকের প্রস্তাবনা পাঠে বুঝা যায়, প্রতাপ-রুদ্রের মহাপ্রভুর বিয়োগজন্য শোকাপনোদন ঐ নাটকের অভিনয়ের উদ্দেশ্য। বিমানবাবু সেই কথার উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন—

“প্রতাপরুদ্রের শোক-অপনোদনের জন্য নাটক রচিত হইলে কবিকর্ণপূর উহা ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। কেন না, বহু ঐতিহাসিকের মতেই প্রতাপ-রুদ্র ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেন।” ৮৯ পৃঃ।

তাহা হইলে নাটকের শেষে লিখিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের গতি কি হইবে? সেই শ্লোকের দ্বারা যে ১৪৯৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে নাটক রচনা বুঝা যায়? বিমানবাবু ইহার সমাধান করিতে পরে লিখিয়াছেন—

নাটকের রচনাকাল সম্বন্ধে আমার মনে হয়, গ্রন্থ-শেষের কালবাচক শ্লোকটি গ্রন্থকারের রচিত নহে। কেন না গ্রন্থকার সাধারণতঃ “কতমস্য বক্ত্রাৎ” (কোন ব্যক্তির মুখ হইতে) এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন না। উক্ত শ্লোকের ‘আবিরভবৎ’ শব্দের মুখ্যার্থ ‘প্রকাশিত হইয়াছিল’, ‘রচিত হইয়াছিল’ নহে। সেইজন্য অনুমান হয়, ভরতবাক্য বা মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকটি অভিনেতৃবর্গের পক্ষ হইতে প্রথম কথিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তীকালে উহা নাটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।” ৯৪ পৃঃ

কিন্তু কল্পনামাত্রই অনুমান, প্রমাণ নহে। পরন্তু কল্পনা করিতে হইলে এইরূপও কল্পনা করিতে পারি যে, উৎকল-পতি প্রতাপরুদ্রের জীবনকালেই কবিকর্ণপূর ঐ নাটকের রচনারম্ভ করিয়া “প্রস্তাবনা”য় লেখেন,… “প্রতাপরুদ্রেণ আদিষ্টোঽস্মি” ইত্যাদি। কিন্তু “প্রস্তাবনা”-রচনার পরেই প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমন হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে ঐ নাটক-রচনাকার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। পরে তিনি ১৪৬৪ শকাব্দে মহাকাব্য রচনা করেন। “অলঙ্কার কৌস্তুভ” নামে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয়। পরে ১৪৯৪ শকাব্দে পুনর্ব্বার উদ্‌যোগী হইয়া তিনি তাঁহার প্রথমে আরব্ধ নাটক রচনা করেন। তখন প্রতাপরুদ্র জীবিত না থাকিলেও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এবং নাটকের গৌরব রক্ষার জন্য প্রস্তাবনায় পূর্ব্ব লিখিত… “প্রতাপরুদ্রেণ আদিষ্টোঽস্মি ইত্যাদি কথাও রক্ষা করেন।”

যাহা হউক, এখন বিমানবাবুর কল্পনায় বক্তব্য এই যে, কবিকর্ণপূর কি প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমনের পরেও কোন কারণে তাঁহাকে জীবিতের ন্যায় কল্পনা করিয়া ঐ নাটকের প্রস্তাবনায়… “প্রতাপরুদ্রেণ আদিষ্টোঽস্মি” এইরূপ কথা লিখিতে পারেন না? নাট্যশাস্ত্রে কি ঐরূপ কোন নিষেধ আছে? আমরা ত জানি, **নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ**। নিষেধ অমান্য করিয়াও কোন কোন সংস্কৃত নাটককার পাত্র-বিশেষের মরণেরও বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।—বিমানবাবুও নাটককারের কল্পনার স্বাধীনতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

“কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকখানিকে সত্য ও বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তিনি গ্রন্থ শেষে “ইহা কল্পিত বলিয়া যেন সুধিগণ বিবেচনা না করেন” বলিয়াছেন। যদি তিনি ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে এই নাটক লিখিতেন এবং প্রস্তাবনায় প্রতাপরুদ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেন, তবে গ্রন্থের প্রথমেই ত উহা কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত হইত।” ৯০ পৃঃ

কিন্তু কবিকর্ণপূর নাটকের শেষে বলিয়াছেন—“চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু।” কবিকর্ণপূর সেই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিলাম। যে সমস্ত সুধী, এই শ্রীচৈতন্যচরিতে অনুরাগবান্ তাঁহারা ইহা

শৃণ্বন্তু অর্থাৎ শ্রবণ করুন। **অন্যান্ নমামঃ** অর্থাৎ যাঁহারা এই শ্রীচরিতে অনুরক্ত নহেন, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি। "চরিতমিদমমী কল্পিতং নো বিদন্তু।" অর্থাৎ তাঁহারা এই শ্রীচৈতন্যচরিতকে কল্পিত বুঝিবেন না—ইহাই প্রার্থনা। এখানে বুঝা আবশ্যক যে, কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে কিছুই কল্পিত নহে, ইহা বলিতে পারেন না এবং উক্ত শ্লোকে তিনি তাহা বলেন নাই। কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনার পরেই লিখিয়াছেন—"ততঃ প্রবিশতি অধর্ম্মেণ উপাস্যমানঃ কলিঃ।" কিন্তু পরে লিখিত অধর্ম্মও কলির কথোপকথন কি, তাঁহার কল্পিত নহে?

পরন্তু বিমানবাবু নিজেও পরে তাঁহার অন্য কোন কথার সমর্থন করিতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য লিখিয়াছেন—

"কবিকর্ণপূর নাটকে গোবিন্দকে রঙ্গমঞ্চে আনিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বরূপদামোদরের পরিচয় এরূপ ভাবে দিয়াছেন যে, তিনি যেন শ্রীচৈতন্যের সহিত এইখানেই প্রথমবার মিলিত হইলেন।" "যেরূপ স্বরূপ-দামোদরের বেলায় সেইরূপ গোবিন্দদাসের বেলায়ও নাটকীয় রস পুষ্টির জন্য কবিকর্ণপূর এমনভাবে ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, মনে হয়, গোবিন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের এই প্রথম সাক্ষাৎকার।" ৪২১—২২ পৃঃ

তাহা হইলে বিমানবাবুর ঐ কথার ন্যায় আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, কবিকর্ণপূর "নাটকীয়রসপুষ্টির জন্য" এবং আরও অনেক উদ্দেশ্যে নাটকের প্রস্তাবনায় উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের কথার এমন ভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, তিনি যেন তৎকালে জীবিত থাকিয়াই ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন এবং ঐ নাটকের অভিনয়ও দেখিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিমানবাবু উক্ত নাটকের শেষে লিখিত "শাকে চতুর্দ্দশ শতে" ইত্যাদি শ্লোকটি "গ্রন্থকারের রচিত নহে", "ভরতবাক্য বা মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকটি :অভিনেতৃবর্গের পক্ষ হইতে প্রথম কথিত হইয়াছিল"—ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ কল্পনায় আমার যে সমস্ত প্রশ্ন হয়, তাহাও এখানে বক্তব্য।

১। কবিকর্ণপূর নিজেই তাঁহার মহাকাব্যের শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তির কালবোধক "বেদারসাঃ শ্রুতয় ইন্দু রিতি প্রসিদ্ধে শাকে" ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়াছেন, ইহা বিমানবাবুরও স্বীকৃত। কিন্তু কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকের শেষে নাটক-সমাপ্তির কালবোধক কোন শ্লোক লেখেন নাই কেন?

২। নাটকের শেষে দৃষ্ট ঐ শ্লোকটি কোন অভিনেতা কি উদ্দেশ্যে বলিযাছিলেন এবং তাহাতে তিনি ১৪৯৪ শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন কেন?

৩। ১৪৯৪ শকাব্দেই কি ঐ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়? ইহা বলিতে হইলে তখন প্রতাপরুদ্র জীবিত না থাকায় তাঁহার শোকাপনোদনের জন্য ঐ নাটকের অভিনয়ের কথা কিরূপে সংগত হইবে?

৪। আর কোন সংস্কৃত নাটকের শেষে কোন অভিনেতার কথিত ঐরূপ কালবোধক শ্লোক আছে কি-না?

৫। মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ন্যায় ঐ শ্লোক পরে অন্যের লিখিত হইলে উহা ঐ নাটকের প্রথমে না দেখিয়া শেষে দেখি কেন? আর কোন নাটকের শেষে ভরতবাক্যে ঐরূপ কাল-নির্দ্দেশ আছে কি-না?

বিমানবাবুর নিকটে আমি এই সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই। প্রশ্ন যেমনই হউক—কাহারও ঐরূপ প্রশ্ন হইলে তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিমানবাবু ঐরূপ প্রশ্নের কোন অবতারণাই করেন নাই।

বিমানবাবু পরে লিখিয়াছেন—"ফল কথা, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের দুই-এক বৎসরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হইয়াছিল।" এই ফলকথার সমর্থনে বিমানবাবুর আর একটি কথা—

"কবিকর্ণপূর মহাকাব্য লিখিবার আগে মুরারির গ্রন্থ পড়িয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। সেইজন্য মহাকাব্যে নিত্যানন্দের নবদ্বীপগমন ও শচীসহ ভক্তগণকে শান্তিপুরে আনয়ন বর্ণনা করিয়াছেন (১১।৬৩।৬৪)। মহাকাব্য ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। নাটক যদি ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইত, তাহা হইলে প্রথমে সত্য বিবরণ বলিয়া ৩০ বৎসর পরে কবিকর্ণপূর তাহার বিরুদ্ধে বিনা কারণে মিথ্যা বর্ণনা করিতেন না।" ৯৪ পৃঃ

এখানেও প্রথমে প্রশ্ন এই যে, কবিকর্ণপূর পূর্ব্বে (১৫৩৪-৩৫ খৃঃ) নাটক রচনা করিয়া পরে (১৫৪২ খৃঃ) মহাকাব্য রচনার পূর্ব্বে মুরারির গ্রন্থ পড়িয়া তাঁহার নাটকে লিখিত কোন বৃত্তান্ত বিষয়ে তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলে পরে নাটকের সেই স্থলে সংশোধন যে করেন নাই, ইহা

বিমানবাবুরও স্বীকৃত। কারণ, তিনি লিখিয়াছেন—"এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণ ভ্রান্ত।" (৯৪ পৃঃ)। কিন্তু কবিকর্ণপূরের ন্যায় চিন্তাশীল যশস্বী গ্রন্থকার নিজের ভুল বুঝিয়াও পরে সংশোধন না করিলে আমরা কি বুঝিব? তিনি কি পরে তাহার সেই ভুলও ভুলিয়া গিয়াছিলেন? কিন্তু মহাকাব্য রচনার ৩০ বৎসর পরে (১৫৭২ খৃঃ) বৃদ্ধাবস্থায় নাটক রচনা করিলেই তখন মহাকাব্যে লিখিত সেই রিষয়ের বিস্মৃতির কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ কবিকর্ণপূর মুরারিগুপ্তের গ্রন্থ অনুসারে মহাকাব্য রচনা করিলেও মহাকাব্যেও তিনি মুরারির সমস্ত কথাই গ্রহণ করেন নাই। বিমানবাবু নিজেও পরে লিখিয়াছেন—"মূলতঃ মুরারিকে অনুসরণ করিলেও স্থানে স্থানে মুরারির সহিত মহাকাব্যের পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য দুইটি কারণে ঐতিহাসিকের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান্। প্রথমতঃ মুরারির কিছু অস্পষ্টতা বা ভুল ত্রুটি থাকিলে তাঁহার গ্রন্থ রচনার অত্যল্পকাল পরেই কবিকর্ণপূর সেগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ বিবরণ দিয়াছেন। মুরারিকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিতে করিতে তিনি কোথাও তাঁহার উক্তির বিরুদ্ধে যাইলে মনে করিতে হইবে—বিশেষ কোন কারণ বশতঃ মুরারির মত কবিকর্ণপূর গ্রহণ করিতে পারেন নাই।" (৯৬ পৃঃ)।

তাহা হইলে কোন বিষয়ে কবিকর্ণপূরের "**শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণ ভ্রান্ত**" না বলিয়া ইহাও বলিতে পারি যে, উক্ত বিষয়ে ক্রমে অনেক অনুসন্ধান করার পরে নাটকরচনাকালে বিশেষ কোন কারণ বশতঃ মুরারির মত কবিকর্ণপূর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি তখন মতান্তর গ্রহণ করিয়াই নাটকের পঞ্চম অঙ্কে ঐস্থলে ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন।

সে যাহা হউক, উক্ত বিষয়ে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত মিথ্যা, এবিষয়ে আমি কিছু বলিব না। কারণ তাহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সাহস করিয়া বলা বড় কঠিন! বাহুল্য ভয়ে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাও এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য এই যে, বিমানবাবুর লিখিত ঐ হেতুর দ্বারা মহাকাব্য-রচনার পূর্ব্বে (১৫৩৪-৩৫ খৃঃ) নাটক রচনার নূতন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ঐ হেতুতে অনুমানের প্রকৃত হেতুর সমস্ত লক্ষণ নাই। সুতরাং উহা **হেত্বাভাস।**

বিমানবাবুর আর এক কথা—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রোতাদের মনে শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায়।"...এই প্রয়োজনীয়তা ১৫৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে যত বেশী ছিল, ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে তত নহে। (৯২ পৃঃ)। কিন্তু "তত" বেশী না হইলেও প্রয়োজনীয়তা যে ছিল, ইহা বিমানবাবুরও স্বীকৃত। আর তখনও যে অনেক স্থানের অবিশ্বাসী লোকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে অনেকে বিবাদ করিয়াছেন, ইহাও বিমানবাবুর অজ্ঞাত নহে। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগরে যে কুকাণ্ড হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় আবার অনেক বিচার করিয়া "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থ রচনা করিতে বাধ্য হন, ইহাও বিমানবাবুর অজ্ঞাত নহে।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাং তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্বৈত্যেকশেষংগতে
কো জানাতু শৃণোতু ক স্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং॥"

বিমানবাবু এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "শ্লোকোক্ত 'বালেন' শব্দ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।" "১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কবি কর্ণপূরের বয়স ৫৮।৫৯ বৎসর হয়। বৈষ্ণবীয় দীনতা প্রকাশের নানা ভঙ্গী আছে বটে, কিন্তু ঐ বয়সের লোক নিজেকে 'বালক' বলেন না।" পরে উক্ত শ্লোকে "কো জানাতু শৃণোতু কঃ" এই কথা ধরিয়া বিমানবাবু লিখিয়াছেন "১৫৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে বহু সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ, গীত ও স্তব রচিত যইয়াছিল, সুতরাং নাটক সে সময়ে লিখিত হইলে 'কো জানাতু' পদ ব্যবহার করিবেন কেন? এটিকে অতিশয়োক্তি ধরিলেও ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যলীলা শুনিবার আগ্রহ যে দেশমধ্যে প্রবল হইয়াছিল, তাহা কবিকর্ণপূরের অজ্ঞাত থাকার কথা নহে, সুতরাং 'কো শৃণোতু' পদ প্রয়োগের সার্থকতা দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অল্প পরে যখন শ্রীচৈতন্যলীলাবিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হয় নাই এবং দেশবাসী শ্রীচৈতন্যলীলা কি ভাবে গ্রহণ করিবে জানা নাই, তখন ঐরূপ উক্তি করিলে সুসঙ্গত হয়।" ৯১ পৃঃ

বিমানবাবু কবিকর্ণপূরের ঐ শ্লোকের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছেন, তদনুসারেই ঐ সমস্ত কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা ত কবিকর্ণপূরের তাৎপর্য্য ঐরূপ বুঝি না। "বাল" শব্দের অল্পজ্ঞ অর্থেও প্রয়োগ হয়। "তর্ক সংগ্রহে"র প্রথমে গ্রন্থকার অন্নংভট্ট লিখিয়াছেন—"বালানাং সুখবোধায় ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ।" কিন্তু উক্ত শ্লোকে "বাল" শব্দের দ্বারা কি পঞ্চমবর্ষীয় বালকও বুঝিব? ঐরূপ বালকও কি "তর্কসংগ্রহে" লিখিত ন্যায়শাস্ত্রের সেই সমস্ত কথা সুখে বুঝিতে পারে? আর কবিকর্ণপূরের উক্ত শ্লোকে "বাল" শব্দের দ্বারা বয়সে বালক অর্থ গ্রহণ করিলে বিমানবাবুর নিজ মতেও সেই অর্থ কিরূপে সংগত হইবে? তাঁহার মতেও ত নাটক রচনাকালে (১৫৩৪-৩৫ খৃঃ) কবিকর্ণপূর বালক ছিলেন না।

পরন্তু কবিকর্ণপূর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে ও তাঁহার মহাকাব্যের শেষে "আশৈশবং প্রভুবিলাস বিশেষ বিজ্ঞঃ কৈশ্চিন্মুরারিরিতি মঙ্গল নামধেয়ৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকের চতুর্থ চরণে লিখিয়াছেন "তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ॥" বিমানবাবু পূর্ব্বে (৭৩ পৃঃ) উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—"যিনি আশৈশব প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই মঙ্গলকর নামধারী মুরারি নামক কোন ব্যক্তি যে বিলাস লালিত্য সম্যক্ লিখিয়াছেন, এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লিখিতেছি।" শ্লোকের ব্যাখ্যা ঠিক্ না হইলেও মুরারি তখনও যে ঐ শ্লোকে তাঁহাকে 'শিশু' বলিয়াছেন, ইহা বিমানবাবুরও স্বীকৃত। বিমানবাবু সেখানে বৈষ্ণবীয় দীনতা প্রকাশের নানা ভঙ্গীর কথা না লিখিলেও ঐ বয়সের লোক নিজেকে শিশু বলেন না—' এই কথাও লেখেন নাই।

কবিকর্ণপূর নাটকের শেষে "শাকে চতুর্দ্দশশতে" ইত্যাদি শ্লোকের চতুর্থ চরণে লিখিয়াছেন—"তদীয় লীলা-গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ"। বিমানবাবু উক্ত শ্লোকে "আবিরভবৎ" এই ক্রিয়াপদের মুখ্যার্থের কথাও লিখিয়াছেন। শব্দের বাচ্যার্থই মুখ্যার্থ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু শব্দের "ব্যঞ্জনা" শক্তির দ্বারা যে অর্থবিশেষের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলে। * কবিকর্ণপূরের উক্ত শ্লোকে 'বালেন ময়া" এবং তদীয় লীলা-গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ **কতমস্য** বক্ত্রাৎ"—এই উক্তির দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত ব্যঙ্গার্থ বুঝা যায় যে, যেমন বাল্যকালে শ্রীচৈতন্যদেবের **কৃপাশক্তি** বলেই তাঁহার মুখ হইতে সংস্কৃত শ্লোক আবির্ভূত **হইয়াছিল,** অর্থাৎ তিনি নিজ শক্তিবলে সেই শ্লোকের কর্ত্তা **নহেন,** তদ্রূপ পরে তাঁহারই কৃপায় এই নাটকরূপ "তদীয় লীলাগ্রন্থ" তাঁহার মুখ হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি ইহার কর্তৃত্বের অভিমান করেন না। তাই তিনি নাটকের ঐ শ্লোকে নিজের নাম না বলিয়া বলিয়াছেন—**কতমস্যবক্ত্রাৎ**।

পরন্তু বিমানবাবু কবিকর্ণপূরের যে শ্লোকে "বালেন" শব্দ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য" বলিয়াছেন—সেই শ্লোকের তৃতীয় চরণে **"তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব শিব স্মৃত্যৈক শেষং গতে"** এই কথাও লক্ষ্য করা আরও বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। কবিকর্ণপূর উক্ত স্থলে দুঃখ-সূচক **শিব শিব** শব্দের প্রয়োগ করিয়া কি বলিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝা আবশ্যক। কবিকর্ণপূরের ঐ কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নাটক সমাপ্তিকালে শ্রীচৈতন্যদেবের **প্রিয়মণ্ডল** অর্থাৎ রাজা প্রতাপরুদ্র ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উৎকলীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ও অন্যান্য গৌড়ীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহ জীবিত ছিলেন না। তাঁহারা তখন স্মৃতি মাত্র শেষ-প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই কবিকর্ণপূর দুঃখপ্রকাশ করিয়া উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন—**তৎপ্রিয়মণ্ডলে স্মৃত্যৈক শেষং গতে কো জানাতু শৃণোতু কঃ।"** অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় ভক্তগণ তখন সেই শরীরে বিদ্যমান না থাকায় এই লীলা-কথা কে বুঝিবেন? কে শুনিবেন? **"তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাম্।"** অতএব এই লীলাকথার দ্বারা স্বয়ং কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেব প্রীত হউন।

মহাপ্রভুর প্রিয়মণ্ডলের মধ্যে কবিকর্ণপূর "কতম" অর্থাৎ কোন একজন ইহাও ব্যক্ত করিতে তিনি শেষ শ্লোকে পরে বলিয়াছেন…"**গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ।"** কোন্ সময়ে সেই লীলা-গ্রন্থ তাঁহার মুখ হইতে আবির্ভূত হয়, ইহা প্রকাশ করিতে উক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণে তিনি বলিয়াছেন, **"তস্মিন্ চতুর্নবতি ভাজি।"** উক্ত শ্লোকের প্রথমে বলিয়াছেন, **"শাকে চতুর্দ্দশশতে।"** সুতরাং "চতুর্নবতিভাজি" (চতুর্নবতি সংখ্যা বিশিষ্টে) 'তস্মিন্' পূর্ব্বোক্তে "চতুর্দ্দশশতে শাকে"—এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়—১৪৯৪ শকাব্দে (১৫৭২ খৃঃ) ঐ নাটক রচিত হয়।

---

* কবিকর্ণপূরও "ব্যঞ্জনা"র সমর্থক আলঙ্কারিক ছিলেন। "অলঙ্কার কৌস্তুভ" গ্রন্থে তিনি মম্মটভট্ট প্রভৃতির মতানুসারে "ব্যঞ্জনা"র সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় 'কিরণে লিখিয়াছেন—"অভিধালক্ষণাক্ষেপ-তাৎপর্য্যাণাং সমাপ্তিতঃ। ব্যাপারো ধ্বননাদি র্যঃ শব্দস্য ব্যঞ্জনা তু সা॥" তৎপূর্ব্বে "সাহিত্যদর্পণে"র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—"বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ। ব্যঙ্গো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার

শ্রীসারদাচরণ ধর সাহিত্যভারতী

> "পুরাণেষু সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরং।
> যত্র প্রতিপদং কৃষ্ণো গীয়তে বহুদর্শিভিঃ ॥"
>
> পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য ৬৩।৩

গত চল্লিশ বৎসরাধিক পূর্ব্বে পরলোকগত মনীষী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় উপরোক্ত শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, পরে তাঁহার সেই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে উহা দেখার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাতে তিনি অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া যে অপবাদ সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা প্রতিযোগিতা হইতে উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা। চলিত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "ভট্ট কুমারিলের পরিচয়" প্রবন্ধে সেই অপবাদের সন্দেহটি আবার জাগাইয়া তোলা হইয়াছে দেখিয়া আমি মহাভারতী মহাশয়ের প্রমাণগুলি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এক্ষণে আবার উপস্থাপিত করিতেছি। অতীব দুঃখের বিষয় যে বোপদেবের জন্মের শত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা-ভাষ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কিরূপে এ জঘন্য মিথ্যা কথা প্রচলিত হইল তাহা কেহ চিন্তা না করিয়া এখনও ইহা প্রচারে সঙ্কুচিত হন না! বোপদেব ভাগবত সম্বন্ধে "মুক্তাফল" নামে একখানা নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এ মিথ্যাপবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই অপবাদের প্রথম উল্লেখ দেবী-ভাগবতের "তিলক" নামক টীকাতেই * প্রথম দৃষ্ট হয় বলিয়া সুধীগণ বর্ণনা করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই বুঝা যায় সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ শ্রেণীতে স্থান দিবার জন্যই এই হীন চেষ্টা। "তিলকেই" প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতকে "বিষ্ণু ভাগবত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এ দেশে কি পরিমাণে সত্য গোপন এবং সত্য নিষ্কাষণে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ বিষয়ে বর্ত্তমান কালের সূক্ষ্ম অনুসন্ধান ফলে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পদ্মপুরাণ ও গরুড় পুরাণ এতদুভয় মহাপুরাণে উপপুরাণ পর্য্যায়ে দেবী ভাগবত বা দুর্গা সম্বন্ধীয় ভাগবতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীধরস্বামীপাদ তদীয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের টীকায় এই কথাগুলি লিখিয়াছেন "অতএব ভাগবতং নাম অন্যদিত্যপ্যনাশঙ্কনীয়ম্"। ইহাতে বুঝা যায় ভাগবত নামে দুইখানা গ্রন্থ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত থাকায় গোলোযোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে এ কথাগুলি লিখিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণে উপপুরাণগুলির তালিকা লিখার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু।" উহার অভিপ্রায় এই যে, এই মহাপুরাণগুলি ব্যাসদেব রচিত আর—উপপুরাণগুলি "অন্যান্য মুনিগণের কথিত"—এই ইতর বিশেষ করায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য সূচক এই শ্লোকটী আছে যাহা এই প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে—"পুরাণেষু সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরং। যত্র প্রতিপদং কৃষ্ণো গীয়তে বহুদর্শিভিঃ ॥ (৬৩ অধ্যায় ৩য় শ্লোক) শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ না হইলে সর্ব্ববাদীসম্মত মহাপুরাণ পদ্মপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইল কেন?

এদিকে মৌলিক দৌর্গ ভাগবতের অস্তিত্ব লোপ হওয়ায় বর্ত্তমান কল্পিত দেবী ভাগবতের উৎপত্তি বিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৪শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সময়ে ৺কাশীধামে রামচন্দ্র ঘুলে (মহারাষ্ট্রীয়?) নামক জনৈক মহাকবিকল্প ব্রাহ্মণ পারিতোষিকের লোভে উহা লিখিয়াছিলেন বলিয়া রাজা স্যার রাধাকান্তদেবের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত কোন প্রাচীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর অমৃতবাজার পত্রিকায় (দৈনিক অঃ বাঃ পঃ ৮-৩-৩৮ইং) আমি এই তথা কথিত "দেবী ভাগবত" সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া লিখিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন উত্তর দেখিতে পাই নাই। তবে ১১ ১২-৩৮ইং দৈনিক উপরোক্ত পত্রিকায় মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত নবসংস্করণ শ্রীমদ্ভাগবতের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত হইয়াছে। জনৈক বন্ধু তাহাতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—"Bharatbarsha * * * has the great misfortune of an over-indulgent child and hence it is that there are so many sects all-fighting against one another and hence it is that there is a class of people who say that Srimad Bhagabatam is not the Bhagabatam of the eighteen Mahapuranas and that it is not the work of Maharshi Vedavyas but of Bopodeva, the chief exponent of this theory being Nilkantha the commentator of Devi Bhagabatam." এ বিষয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে অধুনা কাশীবাসী অশীতিপরবৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন লিখিত

---

* "কেচিৎ বিষ্ণু ভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি। কেচিৎ দেবী ভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি। তত্র প্রথম পক্ষৈকদেশিনঃ কেচিৎ উপপুরাণেষু দ্বিতীয় ভাগবতং নাস্ত্যেব মহাপুরাণেষ্বেবৈকং ভাগবতং প্রসিদ্ধং। তচ্চ বিষ্ণু ভাগবতমেব নতু দেবী ভাগবতং। দেবী ভাগবতং তু নির্ম্মূলমেবেতি বদন্তি। দ্বিতীয় পক্ষৈকদেশিনোঽপি বিষ্ণু-ভাগবতং বোপদেব কৃতমিতি বদন্তি। বস্তুতস্তু উভয়োরপি পুরাণয়ো পুরাণমতভেদেন মহাপুরাণত্বমুপপুরাণত্বং চ।—তিলক।

"ভাগবত পুরাণ" নামক "তিলক" টীকার সমালোচনা পুস্তকখানা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। সুধীগণের কর্ত্তব্য কোন জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা বিচারপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করা। যাহা হউক, মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধে লিখিত প্রমাণাবলী পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে উদ্ধৃত হইল।

১। গরুর পুরাণে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মহাপুরাণত্ব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—

> "সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং।
> সর্ব্ব বেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে॥
> তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ কচিৎ।
> গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রাঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধর॥"—গরুড় পুরাণ।

এ দেশীয় বহু পণ্ডিতের মতে পরমবৈষ্ণব শ্রীমৎ স্বামী গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শঙ্করের তিরোধানের দুই শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়। বৈদান্তিকগণ শাস্ত্র পাঠারম্ভে অদ্যাপি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নামোল্লেখ করিয়া মঙ্গলাচরণ করেন তাহা এইরূপ—"নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ। ব্যাসং শুকং গৌড়পাদ মহান্তং গোবিন্দ যোগীন্দ্র মথাস্য শিষ্যং॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মথাস্য।" ইহাতে দেখা যায় গৌড়পাদ শঙ্করের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গৌড়পাদ বিরচিত 'পরমার্থ বিবেকাবলী"তে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যুন সার্দ্ধ পঞ্চশত শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে অতএব শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব প্রণীত ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে?

২। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অনেক পূর্ব্বে হনুমৎ আচার্য্য ও চিৎসুখ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। তাহাতে "সিদ্ধান্তদর্শন"কার লিখিয়াছেন "বোপদেব কৃতত্বে চ বোপদেব পুরাভবৈঃ। কথং টীকা কৃতা বৈ স্যাদ্ হনুমচ্চিৎসুখাদিভিঃ॥"

৩। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বোপদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। শঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ "বিষ্ণু সহস্রনাম ভাষ্যে" ও "চতুর্দ্দশমত বিবেকে" ভাগবত মহাপুরাণের উল্লেখ আছে।

৪। শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী ১০৪৯ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং বোপদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত "স্মৃতিকাল তরঙ্গ" গ্রন্থের মতেও রামানুজ বোপদেবের অনেক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। ডাঃ রামদাস সেন বলেন এই রামানুজের গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫। "ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ" নামক সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরের ইতিহাস রাজা ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত, উহা "রাজতরঙ্গিণী" হইতেও প্রাচীন। শেষোক্ত গ্রন্থে "ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশের" উল্লেখ আছে। এই উভয় গ্রন্থেই শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ আছে। "রাজতরঙ্গিণী" হইতেও প্রাচীনতর "রাজাবল" গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ আছে।

শ্রীমদ্ ভাগবতের মহাপুরাণত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাও এখানে লিখিত হইল।

কূর্ম্ম পুরাণ, গরুড় পুরাণ ও পদ্মপুরাণে মহাপুরাণ ও উপপুরাণের পরিষ্কার নাম তালিকা আছে। তাহাতে দেখা যায় শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের পর্য্যায়ে এবং দেবী বা দৌর্গ ভাগবত উপপুরাণের পর্য্যায়ে গণ্য হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরেও দেবী ভাগবতকে উপপুরাণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতীর "সর্ব্বশাস্ত্র সংগ্রহ" গ্রন্থে এবং নাগোজী ভট্টের গ্রন্থেও তাহাই বলা হইয়াছে। "In these and other commentaries Devi Bhagabat has been conclusively held to be a Secondary Purana and is therefore of less authority than that of the superior eighteen Puranas amongst which is included the "Srimad Bhagabat"—Translator's note on Srimad Bhagabat P. 12. S. M. Dutta's edition, published from calcutta in 1895.

উপরোক্ত গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের ১৩৬খানা টীকা ও বিচার গ্রন্থের তালিকা এবং ৭০খানা নিবন্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত শ্লোক ও তৎসম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যাহার মধ্যে পদ্মপুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গৌরীতন্ত্র ও নীলকণ্ঠ শৈব রচিত দেবী ভাগবতের তিলক নাম্নী টীকা প্রধান।

আমার বক্তব্য

শ্রীপঞ্চানন তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ

'ভট্ট কুমারিলের পরিচয়' শীর্ষক আমার লিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ধর সাহিত্যভারতী মহাশয় যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি। তাঁহার এইরূপ প্রবন্ধ অবশ্য প্রকাশ্য। কিন্তু তিনি আমার উপর দোষারোপ করিয়া লিখিয়াছেন যে—

"শ্রীমদ্‌ভাগবত বৈয়াকরণিক বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া যে অপবাদ সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা প্রতিযোগিতা হইতে উত্থিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা। চলিত জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "ভট্ট কুমারিলের পরিচয়" প্রবন্ধে সেই অপবাদের সন্দেহটা আবার জাগাইয়া তুলা হইয়াছে"

আমার কিন্তু এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নহে। শ্রীমদ্ ভাগবতের মহাপুরাণত্ব বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় শ্রীভারতী পত্রিকায় (সন ১৩৪৬, ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায়) কোন বিষয়ে দেশ বিশেষের একটী জনশ্রুতিকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ভট্ট কুমারিলের সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিবাদের জন্য আমি লিখিয়াছি যে,—"জনশ্রুতিমূলক কোন গ্রন্থে থাকিলেও তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। জনশ্রুতিই যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে হরিদাস বাবু যে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে মহামান্য করিয়াছেন, তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে অন্যরূপ জনশ্রুতিকে তিনি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কি? কারণ শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত বলিয়াও জনশ্রুতি আছে।"

আমার প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে এইরূপ জনশ্রুতির উল্লেখ আবশ্যক

হওয়ায় আমি তাহার উল্লেখ করিলেও তাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না এবং আমার লেখায় সেরূপ কোন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। আর এইরূপ জনশ্রুতির উল্লেখমাত্রই যে দোষাবহ, তাহাও স্বীকার করা যায় না এবং সারদাচরণবাবুও যে ইহা স্বীকার করেন না, তাহাও তাঁহারই প্রবন্ধে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কারণ তিনিও ত প্রথমে এইরূপ সন্দেহের অবতারণা করিয়াই তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইরূপ জনশ্রুতি যে অলীক নয়, তাহাও তিনি অনেকের উক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ সন্দিগ্ধ বিষয়ে কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিতে হইলে প্রথমে সন্দিগ্ধ বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। নচেৎ তাহার কোন সিদ্ধান্তই হইতে পারে না। সুতরাং সন্দেহের উত্থাপন যে সকল ক্ষেত্রে দোষাবহ, ইহা বলা যায় না। বরং উহা দ্বারা অনেক স্থলে প্রকৃত সত্যনির্ণয় হইয়া থাকে।

এইখানেই আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সারদাচরণ বাবু প্রসঙ্গক্রমে যে সমস্ত কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিবে। এজন্য সারদাচরণবাবুর অন্যান্য কথায় আমার বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। সারদাচরণ বাবু সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা প্রতিযোগিতাকে উক্ত জনশ্রুতির মূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে 'তিলক' টীকাকার শৈব নীলকণ্ঠকে দোষী সাব্যস্ত করিতে লিখিয়াছেন—

"স্পষ্টতঃই বুঝা যায়—সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ শ্রেণীতে স্থান দিবার জন্যই এই হীন চেষ্টা।"

কিন্তু ইহা কি সত্য? সাম্প্রদায়িক বিরোধকে উহার মূল বলিয়া স্বীকার করিলেও শৈব-শাক্ত বা বৈষ্ণবের বিরোধকেই উহার মূল বলিতে হয়। অন্য সম্প্রদায়ের এইরূপ বিরোধে কোন লাভ নাই। কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণও শ্রীমদ্‌ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ইহা সারদাচরণ বাবুও নিজ প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন। আর 'তিলক' টীকাকার নিজে যে এইরূপ জনশ্রুতির কল্পক নহেন, ইহা যে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, তাহা সারদাচরণবাবুর উদ্ধৃত 'তিলক' টীকা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ 'তিলক' টীকাকার "কেচিৎ (কেহ কেহ)…বদন্তি" (বলেন) বলিয়া উহাকে অপরের উক্তি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। উহা তাঁহার নিজ মত বা স্বকল্পিত হইলে তিনি 'কেচিৎ বদন্তি" বলিতে পারেন না এবং 'বস্তুতস্তু" পরে 'তথাচ' বলিয়া তিনি যে উভয় ভাগবতকে পুরাণ-মতভেদে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় না। সুতরাং 'তিলক'টীকাকারকে দোষী মনে করা মোটেই সঙ্গত নয়। বস্তুতঃ পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে দেবী ভাগবত "দৌর্গ ভাগবত"বলিয়া অভিহিত হওয়ায় অপর ভাগবত যে 'বিষ্ণুভাগবত', উহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এবং পরবর্ত্তী যে কোন গ্রন্থকার অনায়াসে শ্রীমদ্‌ভাগবতকে "বিষ্ণুভাগবত" নামে অভিহিত করিতে পারেন। সুতরাং ঐরূপ বিভাগের জন্য কেবল 'তিলক' টীকাকারকে দোষী মনে করা যায় কি?

সারদাচরণবাবু শ্রীমদ্‌ভাগবতের মহাপুরাণত্ব সমর্থনে অধুনা প্রচলিত দেবী ভাগবতখানিকে কল্পিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে লিখিয়াছেন—

"এদিকে মৌলিক দৌর্গ ভাগবতের লোপ হওয়ায়…মহারাজ নবকৃষ্ণের সময়ে ৺কাশীধামে রামচন্দ্র ঘুলে……উহা লিখিয়াছেন।"

আমরা কিন্তু সারদাচরণ বাবুর এই উক্তিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কারণ ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় দৌর্গভাগবত রচিত হইলে শৈব নীলকণ্ঠ উহার টীকা করিতে পারেন না। কিন্তু শৈব নীলকণ্ঠের দেবীভাগবতের 'তিলক' টীকা সুপ্রসিদ্ধ। তিনি টীকা করার সময় যে অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে গৌড়ীয় পুস্তকের সুসমঞ্জস পাঠানুসারেই যে তিনি টীকা করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার নিজের উক্তি দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং শৈব নীলকণ্ঠের বহু পূর্ব্বে যে দেবীভাগবত প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—সারদাচরণবাবু ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের প্রমাণাবলী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের মহাপুরাণত্ব সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণাবলী, নির্ব্বিবাদে সকলের গ্রাহ্য হইবে কি? কারণ এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ দেখা যায়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বহু বিবাদ এবং বহু বক্তব্য থাকিলেও শ্রীমদ্‌ভাগবত যে বোপদেব রচিত নহে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি। কারণ ৺কাশীর কুইন্স কলেজের লাইব্রেরীতে হস্তলিখিত যে একখানি শ্রীমদ্‌ভাগবত আছে, তাহা বোপদেবের জন্মের বহুপূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু ৺কাশীর কুইন্স কলেজের লাইব্রেরীতে সেই পুস্তক দেখিয়া নিজের বিবাদ-ভঞ্জন করিবেন।

[illegible] রায়চৌধুরী

কংগ্রেস ভবনে অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

পথ বেঁধে দিল

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেড্ ইন্।

কেদারবাবুর বাড়ীর সদর। রাস্তার ধারেই স্তম্ভযুক্ত ফটক; ফটক হইতে দশ-বারো গজ ভিতরে বাড়ী। বাড়ীর ভিৎ উঁচু; কয়েক ধাপ সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া সদর বারান্দায় উপনীত হইতে হয়।

সিঁড়ির উচ্চতম সোপানে বসিয়া মঞ্জু নিবিষ্ট মনে একটি জাপানী ফ্রেমে আঁটা ফটোগ্রাফ্ দেখিতেছে। ফটোগ্রাফ্টি রঞ্জনের; কয়েকদিন পূর্ব্বে যাহা মিহির আচমকা তুলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

মিহিরও উপস্থিত আছে। সে মঞ্জুর পাশে বসিয়া এক হাত মেঝেয় রাখিয়া গলা বাড়াইয়া ফটোটি দেখিতেছে; তাহার মুখে কৃতী শিল্পীর গর্ব্ব সুপরিস্ফুট। চিরসঙ্গী ক্যামেরাটি অবশ্য তাহার সঙ্গেই আছে।

মঞ্জু মগ্নভাবে ছবিটি হাঁটুর উপর রাখিয়া দেখিতেছে; ছবির শিল্পকলা অথবা মানুষটি—কিসে মঞ্জু বেশী অভিভূত ঠিক বোঝা যাইতেছে না। অবশেষ আর থাকিতে না পারিয়া মিহির জিজ্ঞাসা করিল—

মিহির: কেমন? ঠিক জাপানী স্টাইলে হয়নি?

মঞ্জু একবার মিহিরের দিকে তাকাইয়া ছবিটিকে সমালোচকের নিষ্করুণ দৃষ্টি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিল।

মঞ্জু: হুঁ! আপনি তো বেশ ফটো তোলেন।

মিহির আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া দুই হাত দিয়া নিজের একটা হাঁটু আলিঙ্গন করিয়া আকাশের পানে তাকাইল।

মিহির: জাপানী টেক্নিক্ আয়ত্ত করেছি।—জগতের শ্রেষ্ঠ আর্ট হচ্চে জাপানী আর্ট।—একটা জাপানী কবিতাও লিখেছি—শুনবেন?

মঞ্জু একটু শঙ্কিত হইল।

মঞ্জু: আবার জাপানী কবিতা!—তা বলুন, এক মিনিটে তো ফুরিয়ে যাবে—

মিহির যথাযোগ্য ভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করিল—

মিহির: "চেরীর বনে একটি মেয়ে জাপানী
মনের সুখে খাচ্ছে বসে চা-পানি
স্মরণে তার একটি কেবল কিমোনো
জাগ্ রে কবি—আর কি সাজে ঝিমোনো?"

ট্র্যাফিক্ পুলিসের ভঙ্গিতে দুই হস্ত লীলায়িত করিয়া মিহির কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, হঠাৎ ফটকেব দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে তদবস্থায় থামিয়া গেল।

ফটকের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া একটি আধুনিকা তরুণী যাইতেছিলেন। অলস মন্থর গতি; কাঁধের উপর একটি রঙীণ প্যারাসোল অলসভাবে ঘুরিতেছে; তরুণী একবার ফটকের ভিতরে অলস নেত্রপাত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিহির ট্রাফিক পুলিসের ভঙ্গি ত্যাগ করিয়া চিড়িক্ মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখে কবি-সুলভ ভাবালুতা। সে কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

মঞ্জু এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল; গূঢ় কৌতুকে মৃদু হাসিয়া বলিল—

মঞ্জু: চললেন না কি, মিহিরবাবু?

মিহির থামিল না, পিছু ফিরিয়া তাকাইল না; কেবল একটা হাত নাড়িয়া বলিল—

মিহির: হ্যাঁ—নমস্কার।

তরুণী যে-পথে গিয়াছিলেন, মিহির দ্রুতপদে ফটক পার হইয়া সেই পথ ধরিল।

হাসিয়া মঞ্জু ছবির দিকে চোখ নামাইল। বেশ কিছুক্ষণ ভাল করিয়া ছবিটি দেখিয়া লইয়া সে সচকিতে চারিদিকে তাকাইল। কেহ দেখিয়া ফেলে নাই। সে তখন উঠিয়া ছবিটা দোলাইতে দোলাইতে—যেন ছবিটার প্রতি তাহার কোনই লোভ নাই এম্নিভাবে—বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কাট্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং রুম। একটি সোফার উপর কেদারবাবু একটা হাঁটু তুলিয়া পাশ ফিরিয়া বসিয়াছেন; সোফার উপর একটি রুমাল পাতিয়া সেটিকে নানাভাবে পাট করিয়া ইঁদুর তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সতর্ক চক্ষু দুটি এদিক ওদিক ঘুরিয়া

আসিতেছে ; তাঁহার শিশুসুলভ ক্রীড়া যাহাতে কেহ দেখিয়া না ফেলে।

বহির্দ্বারের নিকট মঞ্জুর পদশব্দ শুনিয়া কেদারবাবু চট করিয়া রুমালটি পকেটে পুরিলেন, তারপর গভীর ভ্রূকুটি করিয়া দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মঞ্জু ঘরে ঢুকিয়া চোখের কোণ দিয়া কেদারবাবুকে দেখিয়া লইল ; তারপর অন্যমনস্কভাবে একটা সুর গুন গুন করিতে করিতে ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ক্রমে একবার নিজের ঘরে পৌঁছিতে পারিলে হয়।

সে দরজার চৌকাঠ অবধি পৌঁছিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে কেদারবাবুর কণ্ঠস্বর আসিল—

কেদার : তোর হাতে ওটা কি রে মঞ্জু ?

ধরা পড়িয়া গিয়া থতমতভাবে মঞ্জু দাঁড়াইয়া পড়িল ; তারপর সাম্‌লাইয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের ভাণ করিয়া বলিল—

মঞ্জু : এটা ? ওঃ ! সেদিন মিহিরবাবু যে ফটো তুলেছিলেন সেইটে দিয়ে গেলেন।

কেদার হাত বাড়াইয়া বলিলেন—

কেদার : দেখি—

অগত্যা ছবিটি আনিয়া তাঁহার হাতে দিতে হইল। কেদারবাবু সেটি দু'হাতে ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন ; তারপর চশ্‌মা বাহির করিয়া পরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। শেষে একটি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—

কেদার : মন্দ তোলেনি ছোঁড়া ! তা ছাড়া, এ ছোকরার চেহারাটাও খাসা—

তিনি ঘরের এদিক ওদিক দেয়ালের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, যেন ছবিটি টাঙাইবার একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছেন।

কেদার : —ঐখানে ঠিক হবে ! কি বলিস্ ?

তিনি জানালার পাশে একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মঞ্জু দেখিল পিতৃদেব যখন ছবিটি দখল করিয়াছেন তখন আর তাহা উদ্ধারের উপায় নাই। সেও ঘরের দেয়ালগুলি দেখিতে দেখিতে বলিল—

মঞ্জু : ঐখানে ?—না বাবা, তার চেয়ে ঐ দেয়ালে বেশ ভাল হবে।

মঞ্জু আর একটা স্থান নির্দ্দেশ করিল।

কেদার : ওখানে ভাল হ'লেই হ'ল ? আমি বলছি ঐখানে ঠিক হবে।

মঞ্জু : কিন্তু আলো লাগবে না যে !

কেদার : হুঁঃ, আলো লাগবে না ! আলবৎ লাগবে। দেখি তো কেমন না লাগে।

তিনি ছবি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কেদার : তুই যা, চট্ ক'রে একটা হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আয়। আমি এখুনি টাঙিয়ে দিচ্ছি।

মঞ্জু : কোথায় পাব হাতুড়ি আর পেরেক ?

কেদার : ত্যাখ্ না, বাড়ীতেই কোথাও আছে—

মঞ্জু : আচ্ছা দেখছি। কিন্তু ঐ দেয়ালে হ'লেই ভাল হ'ত—

কেদার : না না, তুই ছেলেমানুষ এসব কী বুঝবি !—হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে আয় তো আগে—

মঞ্জু অনিচ্ছাভরে বাড়ীর অন্দরের দিকে চলিল ; কেদার ছবিটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার মনোনীত দেয়ালে কেমন মানাইবে তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

কাট্।

ঝাঝার একটি পথ। বেশী লোক চলাচল নাই। রঞ্জন এই পথ দিয়া মোটর সাইক্‌ল্ চালাইয়া আসিতেছে। তাহার চোখে মোটর গগ্‌ল্ থাকা সত্ত্বেও মুখখানা বেশ প্রফুল্ল দেখাইতেছে।

যে তরুণীটিকে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি তিনিও এই পথ দিয়া প্যারাসোল ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইতেছেন।

রঞ্জনের মোটর সাইক্‌ল্ তাঁহার পাশ দিয়া বিপরীত মুখে চলিয়া গেল। তরুণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ; তার পর হাত তুলিয়া ডাকিলেন—

তরুণী : রঞ্জনবাবু ! অ রঞ্জনবাবু !

রঞ্জন কিছু দুর আগাইয়া গিয়াছিল, ডাক শুনিয়া গাড়ী থামাইল। তরুণী হাস্যমুখে তাহার সম্মুখস্থ হইলেন।

তরুণী : (বিস্ময়মিশ্রিত কলকণ্ঠে) এ কি রঞ্জনবাবু—আপনি এখানে ? ভারি আশ্চর্য্য তো। কে ভেবেছিল যে—

তরুণী থামিয়া গেলেন ; অপ্রত্যাশিত মিলনের অপরিমিত আনন্দ যেন তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল।

রঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখের গগ্‌ল্ খুলিয়া ফেলিল।

তরুণীকে চিনিতে পারিয়া সেও হাসিল বটে কিন্তু হাসির মধ্যে তেমন প্রাণ-মাতানো আহ্লাদ ফুটিয়া উঠিল না।

রঞ্জন: তাই তো, ইন্দু দেবী যে।—আপনি এখানে কবে এলেন ?

ইন্দু: আমি কাল এসেছি। আপনিও যে এখানে এসেছেন তা কে জান্‌তো ?

রঞ্জন: কেউ না।—অর্থাৎ যাক্‌, বেড়াতে এসেছেন বুঝি ?

ইন্দু: হ্যাঁ—কলকাতায় যা গরম—

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিল, যেন পলায়নের রাস্তা খুঁজিতেছে।

ইতিমধ্যে মিহির যে ইন্দুর অনুসরণ করিয়া অকুস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। মিহির ইহাদের কিছু দূরে তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছে এবং নিজের ক্যামারাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে।

ইন্দু কথা বলিয়া চলিয়াছে—

ইন্দু: প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাই পালিয়ে এলুম। এখানে তবু ঠাণ্ডা।—তারপর, আপনি এখন চলেছেন কোথায় ?

কোথায় যাইতেছে তাহা বলিবার অভিপ্রায় রঞ্জনের একেবারেই ছিল না; সে ভাসা-ভাসা উত্তর দিল—

রঞ্জন: বিশেষ কোথাও নয়—এম্‌নি—একটু এদিক ওদিক বেড়াতে—

ইন্দু: ও—তা আমাদেব বাড়ীতেই চলুন না।

রঞ্জন বিপন্ন হইয়া পড়িল।

রঞ্জন: মানে—কথা হচ্চে যে—

ইন্দু বাঁকা হাসিয়া বলিল—

ইন্দু: ভয় কি! আমি একা নই—বাড়ীতে মা আছেন।

রঞ্জন ভয় পাইয়া গেল।

রঞ্জন: মা! ইন্নৃর্—অর্থাৎ কিনা—মা ?

ইন্দু: হ্যাঁ—তিনিও এসেছেন কি না।

রঞ্জন দেখিল আর উদ্ধার নাই, সে ঘাড় চুলকাইল।

রঞ্জন: ও—তা—কি বলে—

এই সময় দূরে চটুল বাদ্যযন্ত্রের নিক্কণ শোনা গেল; শব্দ ক্রমে নিকটে আসিতে লাগিল। ইন্দু সেইদিকে তাকাইয়া উচ্ছ্বসিতভাবে বলিয়া উঠিল—

ইন্দু: বাঃ! কী সুন্দর! দেখুন দেখুন—

একটি সাঁওতাল-মিথুন পথের মোড়ের উপর নৃত্য সুরু করিয়াছে; সঙ্গে বাঁশী ও মাদল বাজিতেছে। কয়েকজন পথচারী তাহাদের ঘিরিয়া দেখিতেছে।

নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দেহের নিটোল যৌবন নৃত্যের ছন্দে ছন্দে যেন উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। ইন্দু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিল।

নৃত্য চলিতেছে। রঞ্জন আড় চোখে ইন্দুর পানে তাকাইয়া দেখিল, সে মগ্ন হইয়া নৃত্য দেখিতেছে, অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। রঞ্জন সন্তর্পণে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরিয়া পিছু হটিতে লাগিল। ইন্দু কিছু জানিতে পারিল না। রঞ্জন কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া গাড়ীর মুখ ঘুরাইয়া লইল; তারপর গাড়ীটি ঠেলিতে ঠেলিতে এবং সশঙ্কচক্ষে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে অদৃশ্য হইল।

এদিকে নৃত্য ক্রমে শেষ হইল। নর্ত্তক-নর্ত্তকী দর্শকদের সেলাম করিয়া দক্ষিণার জন্য হাত পাতিল।

ইন্দু হাতের ব্যাগ হইতে পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিল—

ইন্দু: চমৎকার! না রঞ্জনবাবু ?

পাশে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল রঞ্জন নাই, তাহার স্থানে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি যুবক দন্তবিকাশ করিয়া আছে।

মিহির: ভারি সুন্দর!

ইন্দু: (বিস্মিত ক্ষোভে) এ কি? আপনি কে ? রঞ্জনবাবু কোথায় ?

সে পিছন ফিরিয়া দেখিল কিন্তু পথে রঞ্জন বা তাহার গাড়ীর চিহ্নমাত্র নাই। মিহির বিগলিতস্বরে বলিল—

মিহির: আমার নাম মিহিরনাথ মণ্ডল।—রঞ্জনবাবু অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

ইন্দুর মুখ ও চোখের চাহনি কঠিন হইয়া উঠিল।

ইন্দু: অনেকক্ষণ চলে গেছেন!

মিহির এই ফাঁকে ক্যামেরা বাহির করিল।

মিহির: দেখুন, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে ঐ প্যারাসোল মাথায় দিয়ে—ঠিক জাপানী মেয়ের মত। একটু দাঁড়ান ঐ ভাবে—

মিহির ক্যামেরা উদ্যত করিল। ইন্দু তাহার প্রতি

একটা তীব্র বিরক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে ক্যামেরার দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল।

মিহির ক্যামেরা হইতে চোখ তুলিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

কাট্।

কেদারবাবুর ড্রয়িং-রুম। মঞ্জু আসিয়া তাঁহাকে একটি হাতুড়ি ও পেরেক দিল; তিনি সে-দুটি দু'হাতে লইয়া হৃষ্টস্বরে বলিলেন—

কেদার: তুই ছবিটা নিয়ে আয়—

তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট দেয়ালের দিকে গেলেন। ছবিটা টিপায়ের উপর রাখা ছিল, মঞ্জু সেটা হাতে লইল।

মঞ্জু: তোমার নিজের পেরেক ঠোকবার কি দরকার বাবা, চাকরদের কাউকে ডাকলেই তো ঠুকে দিতে পারে—

কেদার দেয়ালের কাছে পৌছিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন।

কেদার: চাকরে আমার চেয়ে ভাল পেরেক ঠুকতে পারে? হুঁ:!—

মঞ্জু: তা নয়—তবে—

কেদার: তবে মিছে বকিস্ নি—নিয়ে আয়—

কেদার পেরেকটিকে দেয়ালের এখানে ওখানে দাঁড় করাইয়া ঠিক কোন্ স্থানটি উপযোগী তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। শেষে একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া পেরেকটি সেখানে দাঁড় করাইয়া হাতুড়ি দ্বারা দু-তিন বার মৃদু আঘাত করিলেন; তারপর জোরে আঘাত করিবার জন্য হাতুড়ি তুলিলেন। ঠিক এই সময় পিছন হইতে মঞ্জুর গলা শোনা গেল—

মঞ্জু: ওঃ! রঞ্জনবাবু!

বিঘ্ন হইল। কেদারবাবুর উদ্যত হাতুড়ি তাহার বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর গিয়া পড়িল। হাতুড়ি ও পেরেক ছাড়িয়া দিয়া কেদারবাবু লাফাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

কেদার: উঃ! গিছি রে—উহুহু—গিছি রে বাবা—

রঞ্জন সদ্য ঘরে ঢুকিয়াছিল; সে উৎকণ্ঠিতভাবে আগাইয়া মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করিল—

রঞ্জন: কী হয়েছে?—

কেদারবাবু যন্ত্রণায় নাচিতে নাচিতে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে নানা প্রকার অর্থহীন কাতরোক্তি বাহির হইতে লাগিল।

রঞ্জন আসিয়া মঞ্জুর পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

রঞ্জন: তাই তো—লেগেছে না কি?

মঞ্জু: (অস্থিরভাবে) হ্যাঁ—হাতুড়ি দিয়ে—বুড়ো আঙুলে।—কি করি এখন?

কেদার ক্রুদ্ধ চক্ষে তাহার পানে তাকাইলেন।

কেদার: দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ফুঁ দিতে পারো না?—

এই বলিয়া তিনি আহত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহাদের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিলেন।

মঞ্জু ও রঞ্জন ছুটিয়া গিয়া কেদারের চেয়ারের দুই পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তার পর একসঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল।

দু'জনে মুখোমুখি ফুঁ দিয়া চলিল। এইভাবে ফুঁ দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয় কোনও মাধুর্য্য আছে; দু'জনের মুখ হইতেই উৎকণ্ঠার ভাব কাটিয়া গিয়া উৎসাহ দেখা দিল।

রঞ্জন: (ফুঁ দিতে দিতে মঞ্জুকে) কালশিরে পড়ে গেছে—

মঞ্জু: হুঁ—

দ্বিগুণ উৎসাহে ফুঁ দেওয়া চলিল। কেদারবাবুর কাতরোক্তিও ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল।

ফেড্ আউট্।

ফেড্ ইন্।

কলিকাতায় প্রতাপবাবুর গৃহে বসিবার ঘর। জনৈক রাজা-শ্রেণীর বড় জমিদারের ম্যানেজার এবং প্রতাপ মুখোমুখি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের মাঝখানে একটি কাচে ঢাকা নীচু গোল টেবিল। টেবিলের উপর ফল মিষ্টান্ন চা প্রভৃতি সাজানো রহিয়াছে। প্রতাপের পাশে একটি ছোট টিপায়ের উপর টেলিফোন যন্ত্র।

ম্যানেজারবাবুর চেহারাটি চতুষ্কোণ; তিনি থাকিয়া থাকিয়া একটি রসগোল্লা দুই আঙুলে ধরিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছেন। প্রতাপ একটি বিবাহযোগ্যা বালিকার ফটো মনোযোগ সহকারে দেখিতেছেন।

দেখা শেষ করিয়া প্রতাপ ফটো ম্যানেজারকে ফেরত দিয়া শূন্যে তাকাইয়া বলিলেন—

প্রতাপ: ফটো দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে—

ম্যানেজার ফটোটি পাঞ্জাবীর পকেটে রাখিয়া মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন—

ম্যানেজার: আরে মশাই, রাজার ঘরের মেয়ে ভাল হবে না তো কি ঘুঁটে কুড়ুনির মত হবে?

তিনি আর একটি রসগোল্লা মুখে ফেলিলেন।

প্রতাপ: তা বটে—তা বটে। কিন্তু তবু একবার নিজের চোখে দেখা দরকার—

ম্যানেজার: তা বেশ। দেখতে চান দেখুন—আপত্তি কি?

এই সময় টেলিফোন যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। ম্যানেজারের প্রতি একটি অর্দ্ধোচ্চারিত বিনয়োক্তি করিয়া প্রতাপ টেলিফোন তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপ: মাফ্ করবেন। হ্যালো! কে—বিধু?—এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি—কী খবর?

কাট্।

তারের অন্য প্রান্তে বিধু কথা কহিতেছেন।

বিধু: শোনো নি? যে ক'টি ভদ্রমহিলার বিবাহ-যোগ্যা মেয়ে আছে তাঁরা সবাই হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন—

কাট্।

প্রতাপ একটু বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন।

প্রতাপ: গেছেন তো গেছেন—আমার তাতে কি?

কাট্।

বিধু: আরে, চটো কেন? আমার কি মনে হয় জানো? ভদ্রমহিলারা সব মেয়ে নিয়ে—এই—ঝাঝার দিকেই যাত্রা করেছেন।

কাট্।

প্রতাপের চক্ষু বিস্ফারিত হইল, চোয়াল ঝুলিয়া পড়িল।

প্রতাপ: অ্যাঁ—বল কি বিধু?—তবে কি তারা কিছু জানতে পেরেছে নাকি?

কাট্।

বিধু: (সরলভাবে) তা কি ক'রে বলব ভাই?—তবে গুজব শুনছি, কথাটা নাকি আর চাপা নেই।—অ্যাঁ? আরে না না, আমি কি কখনও বলতে পারি?—হয় তো তোমার ছেলেই কাউকে চিঠিপত্র লিখেছিল—আচ্ছা, তুমি ব্যস্ত আছ—আজ আসি তাহ'লে—

পরিতৃপ্তভাবে হাসিতে হাসিতে বিধু ফোন রাখিয়া দিলেন।

কাট্।

অত্যন্ত বিচলিতভাবে ফোন রাখিয়া প্রতাপ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চিন্তা-বন্ধুর ললাটে গালের আব্‌টি টিপিতে টিপিতে ঘরের মধ্যে কয়েকবার পাক খাইলেন। ম্যানেজার মিষ্টান্ন চিবাইতে চিবাইতে প্রতাপকে লক্ষ্য করিতেছিলেন; অবশেষে প্রশ্ন করিলেন—

ম্যানেজার: তাহ'লে মেয়ে দেখতে যাওয়াই স্থির?—

প্রতাপ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; মেয়ে দেখার কথা তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।—

প্রতাপ: মেয়ে!—থামুন মশাই, আগে ছেলে উদ্ধার করি, তারপর মেয়ে দেখব—

ম্যানেজারের চর্ব্বণ ক্রিয়া বন্ধ হইল, তিনি অনিমেষ নেত্রে প্রতাপের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ম্যানেজার:—কি হয়েছে ছেলের?

প্রতাপ ব্যাপারটাকে লঘু করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন—

প্রতাপ: হয়নি কিছু। তাকে এক জায়গায় বেড়াতে পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি সে জায়গা আর নিরাপদ নয়।

ম্যানেজারের চর্ব্বণ কার্য্য আবার সচল হইল। প্রতাপ দুশ্চিন্তায় চুলের মধ্যে দিয়া আঙুল চালাইয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—

প্রতাপ: ভ্যালা ফ্যাঁসাদ! এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেও তো—তাঁরাও গুটি গুটি ফিরে আসবেন! নাঃ, ছেলে বিয়ের যুগ্যি হওয়াও একটা ফ্যাঁসাদ দেখছি।—কে জানে ছেলেটা এখন কি করছে? হয় তো—

ওয়াইপ্। (wipe)

ঝাঝার উপকণ্ঠে একটি পার্ব্বত্য স্থান। অসমতল উপল বন্ধুর ভূমি; মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড়, শালের ঝোপ। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর ধারা বিস্তীর্ণ বালুশয্যার উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

একটি পাথরের স্তূপ বেশ উঁচু; তাহার চূড়া মাটি হইতে প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চে। এই গিরিশৃঙ্গের উপর রঞ্জন অতি সাবধানে আরোহণ করিতেছিল। কিন্তু একা নয়। মঞ্জুও উঠিতেছিল। মাঝে মাঝে দুরারোহ স্থানে পৌঁছিলে রঞ্জন হাত ধরিয়া মঞ্জুকে টানিয়া তুলিতেছিল।

অবশেষে প্রায় চূড়ার কাছে পৌছিয়া উভয়ে দেখিল আর ওঠা যায় না; তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহারা বাইরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল।

উঁচু হইতে চারিদিকের দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। রঞ্জন মুগ্ধভাবে বলিল—

রঞ্জন: কী চমৎকার! বাঝায় এত কাছে যে এত সুন্দর জায়গা আছে তা আমি জানতুমই না—পাহাড়—জঙ্গল—আবার একটি ছোট্ট নদীও আছে—

রঞ্জনের মুগ্ধ ভাব দেখিয়া মঞ্জু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। রঞ্জন পিছনে তাকাইয়া দেখিল—পাহাড়ের গায়ে বেঞ্চির মত খাঁজকাটা বসিবার স্থান আছে।

রঞ্জন: বসুন!

উভয়ে পাশাপাশি বসিল।

রঞ্জন: বাস্তবিক কী নির্জ্জন জায়গা! এবার যখনই দেখব বাড়ীতে বিপদের সম্ভাবনা, এখানে পালিয়ে আসব।

মঞ্জু চকিতে তাহার দিকে মুখ ফিরাইল।

মঞ্জু: বাড়ীতে বিপদ কিসের?

রঞ্জন একটু অপ্রতিভ হইল।

রঞ্জন: না, এম্নি কথার কথা বলছি।—আপনি এখানে বেড়াতে আসেন না কেন?

মঞ্জু বাহিরের দিকে তাকাইল; তাহার চক্ষু ক্রমে স্বপ্নাতুর হইল।

মঞ্জু: প্রায়ই আসি—পাহাড়ে, জঙ্গলে, যোড়ের বালির ওপর ঘুরে বেড়াই—

রঞ্জনও চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাতুর করিয়া চাহিল।

রঞ্জন। এবার থেকে আমিও প্রায়ই আসব—পাহাড়ে জঙ্গলে নদীর চরে ঘুরে বেড়াব—

রঞ্জন মঞ্জুর পানে একবার আড়চক্ষে চাহিল।

রঞ্জন: কে বলতে পারে, ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হয় তো আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে—

মঞ্জু হাসি লুকাইল।

মঞ্জু: তারপর আমি মোটরে বাড়ী ফিরে যাব—

রঞ্জন: আমিও মোটর বাইকে বাড়ী ফিরে যাব—

উভয়ে নীচের দিকে তাকাইল। নীচে একটি সমতল স্থানে মঞ্জুর মোটর ও রঞ্জনের মোটর বাইক ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়াইয়া আছে, যেন দুটির মধ্যে ভারী ভাব।

মঞ্জু ও রঞ্জন পরস্পরের পানে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল। এই সময় নিম্ন হইতে রাখালের বাঁশীর শব্দ ভাসিয়া আসিল। দু'জনে চোখে চোখে চাহিয়া শব্দ শুনিল; তারপর নীচের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

একপাল মহিষ দিনের চারণ শেষ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছে। সর্ব্বশেষ মহিষের পিঠের উপর বসিয়া একটি ক্ষুদ্র বালক বাঁশের বাঁশী বাজাইতেছে।

রঞ্জন ও মঞ্জু পাশাপাশি বসিয়া বাঁশী শুনিতেছে। ক্রমে রঞ্জন গুন্ গুন্ করিয়া বাঁশীর সুর গুঞ্জন করিতে লাগিল, তারপর মৃদুস্বরে গাহিল—

রঞ্জন: "প্রাণের বাঁশী বাজাও তুমি কে?
কোথায় এমন সুর এলে শিখে?—"

মঞ্জু গাহিয়া উত্তর দিল—

মঞ্জু: "ও যে ব্রজের রাখাল চরায় ধেনু
বাজায় বেণু গো—"

রঞ্জন নদীর দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া গাহিল—

রঞ্জন: "প্রেম-যমুনার তীরে তারে
দেখতে পেনু গো—"

মঞ্জু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মঞ্জু: "এবার ঘরে ফেরার সময় হ'ল
চল্ রে সেই দিকে।"

রঞ্জনও উঠিয়া দাঁড়াইল—

রঞ্জন: "আজ ঘর ভুলেছি বাঁশীর তানে
বনের অন্তিকে।"

মহিষপাল গোধূলি আলোর ভিতর দিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে। বাঁশী বাজিতেছে। মঞ্জু ও রঞ্জনের কণ্ঠস্বর বাঁশীর সুরে মিশিতেছে।

ফেড আউট্। ক্রমশঃ

জাপানের সমাজ বিবর্ত্তনের ইতিহাস

২

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ, পি-এচ-ডি

ইউরোপীয়দের আগমন

১৫৪৩ খৃঃ একটি পর্ত্তুগীজ জাহাজ টানেগাসিনা দ্বীপে আসে। ইহাই ইউরোপীয়দের জাপানে প্রথম আগমন। পরে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারক সেণ্ট সেভিয়ার ভারতবর্ষ হইতে ১৫৪৯ খৃঃ জাপানে গমন করে। এই সময় হইতে অনেক জাপানী খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই সময়ে নবুনাগা ওডা জাপানের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা ছিলেন; তিনি বৌদ্ধ সাধুদের রাজনীতিতে যোগদান করায় বড়ই উত্যক্ত হইয়াছিলেন। সেইজন্য তাহাদের বিপক্ষে রোমান ক্যাথলিকদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে জাপানীরা বারুদ প্রস্তুতপ্রণালী শিক্ষা করে। কিন্তু খৃষ্টানদের ধর্ম্মমত ও প্রতিষ্ঠানগুলি জাপানী আদর্শ ও রীতির অনুযায়ী ছিল না। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও প্রচারকেরা জাপানী আইন অমান্য করিয়া চলিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা লাভবান হইবার ও চেষ্টা করিত। এইজন্য হিদেয়োসী ১৫৮৫ খৃঃ কিয়োটোতে রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া দেন এবং ১৫৮৭ খৃঃ নাগাসাকি ও অন্যান্য স্থানে খৃষ্টীয় মিশনারীদের বাস করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কেবলমাত্র ব্যবসায়ী ইউরোপীয়দের জাপানে আসিবার আদেশ ও অনুমতি দেন।১ এই সময়ে ইউরোপে প্রটেস্টাণ্ট (Protestant) ইংলণ্ড ও হলাণ্ড এবং ক্যাথলিক পর্ত্তুগাল ও স্পেন দেশের মধ্যে প্রবল বিবাদ চলিতেছিল। প্রথমোক্ত প্রটেস্টাণ্টের দল ইয়েয়াসুকে বলেন যে, শেষোক্তেরা ধর্ম্মের আবরণে জাপান জয় করিতে চায়; আর শেষোক্তেরা বলেন যে, উহারা বোম্বেটের কার্য্য করে। কাজে কাজেই জাপানীদের তাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্পর্কই রাখা উচিত নয়! ইহার ফলে ১৬১২খৃঃ ইয়েয়াসু ক্যাথলিকদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া দেন এবং জাপানী খৃষ্টানদেরও তাহাদের নূতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ ঘোষণা করেন। যাহারা তাঁহার এই হুকুম অমান্য করে, তাহারা নিহত হয়।

তত্রাচ ব্যবসায়ীরূপে খৃষ্টান মিশনারীগণ জাপানে আসিয়া গোপনে ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকে। এইজন্য সগুন ইয়েমিটসু ১৬৩০ খৃঃ বৈদেশিক পুস্তক জাপানে আমদানি করা নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং ১৬৩৬ খৃঃ জাপানীদের বিদেশ গমন নিষিদ্ধ বলিয়া আইনজারী করেন। কেবল ডাচেরা সামুরাই পরিবেষ্টিত হইযা নাগাসাকিতে বৎসরে দুইখানা জাহাজ আনিয়া কারবার করিবার অনুমতি পায়।

সগুন শাসনকালে জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং বিনাশ সাধন করা জাপানের একটি বড় ঘটনা। সেণ্ট সেভিয়ার ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচার করিবার ফলে ডোমিনিকান আগষ্টিনিয়ান ও ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়গুলি জাপানে জোর প্রচারকার্য্য চালায়। ইহার ফলে পাঁচ লক্ষ হইতে পনর লক্ষ লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে। কিন্তু শীঘ্রই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সে সব ডাইমিওদের জেসুইটেরা দীক্ষিত করিয়াছে, তাহারা রোমান ক্যাথলিক ইনকুইসিজানের গোড়ামির মনোবৃত্তি পেয়ে তাহাদের যে সকল প্রজা নূতন ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহাদের পীড়ন করিতে আরম্ভ করে। এতদ্বারা তাহারা উদার জাপানী জাতির বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্রেক করে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, জেসুইট্রা জাপানকে স্পেনের শাসনাধীন করিতে চাহিয়াছিল। যাহাই হউক, ইহাই ইদোয়োসি ও ইয়েয়াসুর সন্দেহ উদ্রেক করে এবং তাঁহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারে নিষেধ করেন। কিন্তু ১৬৩৭ খৃঃ আমাকুসা দ্বীপে খৃষ্টানেরা ইয়েয়াসুর ঘোর শত্রুর পুত্র মাসুদা তোকিসাদার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। তোকিসাদা ইয়েয়াসুর বিপক্ষে পিতার মনোবৃত্তি পেয়েছিলেন এবং নিজে জাপ সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। সাধারণের সাহায্য ও সমর্থন পাইবার জন্য যত প্রকারের কৌশল বা ধর্ম্ম বুজরুকি বা অলৌকিক কর্ম্ম

১। Seito—History of Japan p. 78

(miracles) তিনি ইউরোপীয়দের কাছ থেকে শিখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা নিজেকে ভগবান বলিয়া জাহির করিতে আরম্ভ করেন এবং বিরুদ্ধবাদী সগুনদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করিবার জন্য খৃষ্টানদের উত্তেজিত করিতে থাকেন। অবশেষে বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবার পর তোকিসাদা পরাজিত ও নিহত হন এবং খৃষ্টানদের নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হয়। ইহার পর হইতে ইউরোপের সঙ্গে জাপানের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সময় যে প্রকারে দুইটি কৌমের অভিজাতদের স্বার্থের বিবাদে ধর্ম্মকে জড়াইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল, এবারও ইতিহাস তাহার পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু এবার নূতন ধর্ম্ম জয়লাভ করিতে পারে নাই; কারণ বেশীর ভাগ লোক নূতন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিপক্ষে ছিল। এবার নূতন ধর্ম্মের আবরণে যে সব জাপানী অভিজাতগণ ইউরোপীয় বাণিজ্যাদির সংস্পর্শে আসিয়া অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেছিল, তাহারা নিজেরাই একটা পৃথক শ্রেণীতে সংঘবদ্ধ হয়। এই শ্রেণীর নেতা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত সগুনের বিরুদ্ধ পক্ষ। সে নিজের ও স্বীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠার জন্য এই খৃষ্টীয় বিদ্রোহ করে। রোমান ক্যাথলিকেরা জাপানে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে শিষ্য পায়। মধ্যযুগে[২] (১০০০—১৪০০ in a wider sense ৬০০—১৫০০) রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম সামন্ততন্ত্রের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিল। জাপানে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম কতিপয় সামন্তদের শিষ্য করিয়া পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সগুনের অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লব করিতে গিয়াছিল; অর্থাৎ নূতন পদ্ধতির অভিজাতেরা পুরাতন পদ্ধতির অভিজাতদের পরাজয় করিয়া শাসনযন্ত্রকে নিজেদের করায়ত্ত করিতে চাহিয়াছিল। ইহাদের অত্যাচার ও গোঁড়ামি দেখিয়া জনসাধারণ ইহাদের বিরুদ্ধে গিয়াছিল। এই বিপ্লব প্রচেষ্টার কোন জাতীয় বা সামাজিক আদর্শ ছিল না, এমন কি, ইহাকে গরীব ও পতিতদের উত্থানের প্রচেষ্টাও বলা চলে না।

যখন জাপানের সগুন গভর্ণমেণ্ট বহির্জগত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে, তখন বহির্জগতে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইতিমধ্যে ইউরোপে বিভিন্ন বিপ্লব ও নেপোলিয়ানের যুদ্ধ হয় এবং রুষ সাম্রাজ্য সাইবেরিয়া অধিকার করিয়া জাপানের প্রতিবেশী হয়। একবার রুষ জাপানের উত্তরভাগ অধিকার করিবার ইচ্ছা করে। ইংরেজরাও ১৮২৪ খৃঃ কিউস্থদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া এক গোলমাল সৃষ্টি করে এবং গরু ও জন কতক কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। অবশেষে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে নৌ-সেনাপতি কমোডোর পেরী আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি আসিয়া বলেন যে, তিনি আমেরিকার সংযুক্ত প্রদেশের সভাপতির পত্র সগুনকে প্রদান করিতে চাহেন—কারণ আমেরিকা জাপানের সহিত সন্ধি স্থাপনে প্রয়াসী। কিন্তু প্রথমে সন্তন-পূর্ব্ব প্রথানুযায়ী বিদেশীকে স্বদেশে আসিতে দিতে চাহেন না। কিন্তু সগুন সে সময় যুদ্ধে প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া পরিশেষে আমেরিকার সহিত ১৮৫৫ খৃঃ সন্ধি স্থাপন করে। এতদ্বারা সিমোডা ও হিকোডাটে নামক দুই বন্দরে আমেরিকার জাহাজ আসিবার ও আমেরিকার লোকদের তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঘুরিবার অনুমতি পাওয়া যায়। এই সময়ে রুষের সঙ্গেও এক সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সব ব্যাপারে সগুনের কর্ম্মচারীরা পুরাতন আইন ও প্রথাসমূহের অসুবিধা বুঝিতে পারে। ইত্যবসরে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স চীনের সঙ্গে যুদ্ধে তাহাকে বহির্জগতের জন্য তাহার অর্গলবদ্ধ দ্বার খুলিতে বাধ্য করে। ইহাতে ভয় পাইয়া জাপান অনেক ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।

সগুন গভর্ণমেণ্টের পতন

সগুনেটের দীর্ঘ শাসনকালে অর্থাৎ যেডো যুগে, সগুন রাজধানী যেডোতে মধ্যে মধ্যে আসিতে বাধ্য হওয়ায় প্রাদেশিক ভূস্বামীগণ গরীব হইয়া পড়িতেছিল এবং কৃষকেরা গুরু করভারে প্রপীড়িত হইতেছিল। অন্যদিকে যেডো ও সাকা সহরের ব্যবসাদার ও শ্রমশিল্পীরা ধন সঞ্চয় করিতেছিল এবং তাহাদের টাকার জোরে তাহারা সামুরাই শক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী বা প্রভাবশালী হইতেছিল। এই সঙ্গে ভোগবিলাস দ্বারা সামুরাই তেজে অন্তর্হিত হইতে থাকে। ইহা গৌণভাবে সগুন গভর্ণমেণ্টকে আর্থিক সঙ্কটে উপস্থিত

---

[২] Middle Ages—প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্ত্তীকাল। হ্যালামের মতে ক্লভিস কর্ত্তৃক ফরাসীদেশ আক্রমণের বৎসর (৪৮৬খৃঃ) হইতে অষ্টম চার্লস্ কর্ত্তৃক নেপলস্ আক্রমণের বৎসর (১৪৯৫) পর্য্যন্ত কাল। সাধারণতঃ রোমনগরীর পতন হইতে সাহিত্য ও কলা প্রতিভার পুনঃ প্রদীপ্তি (renaissance) পর্য্যন্ত কালকে মধ্যযুগ বলিয়া গণনা করা হয়।

করে। একাদশ সগুনের সময়ে এই অবস্থা আরও শোচনীয় আকার ধারণ করে। একটা সংস্কারের চেষ্টা হয়; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং লোকে সগুনের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করিতে থাকে। বৈদেশিক জাতিসমূহের সহিত সন্ধিকালে সগুন ভূস্বামীদের সাহায্য ও সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু কিয়োটোর অভিজাতদের এবং প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী ও সামুরাইদের বিরোধিতার ফলে সগুন গভর্ণমেণ্টের শাসন কার্য্যে গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এই সব ব্যাপার দ্বারা সগুন-যথেচ্ছাচার টলটলায়মান হইতেছিল এবং যেডো গভর্ণমেণ্টের নিজেকে বাঁচাইবার সমস্ত চেষ্টা বৃথা হয়। অবশেষে দ্বাদশ সগুনের নির্ব্বাচনকালে গভর্ণমেণ্টের লোকেরা দুইটি বিরুদ্ধবাদী দলে বিভক্ত হইয়া সগুনেটকে ভিতর থেকে দুর্ব্বল করে।

একদিন যেডো গভর্ণমেণ্ট সম্রাটের দরবারকে সসম্ভ্রমে দূরে রাখিত এবং তাহাকে ১,২০,০০০ বকু ধান উপঢৌকন দিত। ইহা একটা মধ্যবিত্ত ভূস্বামীর মাসহারা মাত্র। সগুনেট চীনের কনফুসের ধর্ম্ম শিক্ষার সবিশেষ সহায়তা করিত, কারণ ইহা শাসকের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার শিক্ষা দিত। কিন্তু মিৎসুকুনি টাকু গাওয়া নামক একজন লোক দ্বারা সম্পাদিত জাতীয় ইতিহাস এবং নোরিনাগা মোটোওরি দ্বারা প্রাচীন হস্তকসমূহ পঠিত হইয়া প্রকাশিত হইলে জাপানের জাতীয় ইতিহাস ও চরিত্র জনসাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত হয়। ইহার ফলে জনগণের সম্রাটের উপর বশ্যতার ইচ্ছা ও সগুনের যথেচ্ছাচারের প্রতি ঘৃণার ভাব প্রকট হইতে থাকে এবং যাহারা সম্রাট-মিকাডোর অপরোক্ষ শাসন চায় তাহাদের দল ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সঙ্গে মিকাডোর পার্শ্বচর অভিজাতবর্গ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরবর্ত্তী যুগ আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে।

বিপ্লব প্রচেষ্টা

এই প্রকারে সম্রাটের দলের সাহস বৃদ্ধি হওয়ায় যখন মিকাডো কোমাই সিংহাসনারোহণ করেন, তখন তিনি সগুনের উপর হুকুম চালান। এই সময়ে বৈদেশিক শক্তিবর্গের চাপে জাতীয় ঐক্যের (National Solidarity) ভাব প্রকাশ পায় এবং বৈদেশিকদের বিরুদ্ধে মনোভাব মিকাডোর প্রতি ভক্তিতে পরিণত হয়। যে সকল যোগাযোগের ফলে সম্রাটের দল, যাহা অনেক পশ্চিম প্রদেশের ভূস্বামী, উপযুক্ত যোদ্ধা ও অভিজাতবর্গ দ্বারা সংগঠিত হইয়াছিল তাহা সগুনের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয। অন্যপক্ষে যে দল নিজেদের মনোমত দ্বাদশ সগুনকে নির্ব্বাচিত করিতে পরাস্ত হয় তাহা অভ্যন্তর হইতে সংস্কারসাধনপ্রয়াসী হয। তাহারা অপরাপর দলের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য সম্রাটের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে। সম্রাট একটি অনুশাসন প্রকাশ করেন এবং তাহাতে তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত বৈদেশিক শক্তিসমূহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য সগুনকে ভৎর্সনা করেন। সগুনেটও সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই সঙ্গে মন্ত্রী নাওসুকেলি শাসন-ব্যবস্থার প্রচণ্ড ও বে-আইনী পরিবর্ত্তন (Coup d' etat) দ্বারা যাহারা সম্রাটের অনুশাসন প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন। ইনি সগুনের ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ১৮৬০ খৃঃ ইনি নিহত হন।

ইহার পর সগুনের দল যেডো গভর্ণমেণ্ট ও সম্রাটের দরবারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু জাতীয় রাজনীতিক কেন্দ্র অজ্ঞাতসারে কিওটোতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৬ খৃঃ সম্রাট ও সগুন উভয়েই মারা যান এবং ১৮৬৭ খৃঃ মুৎসুহিতো সিংহাসন আরোহণ করেন; ইনিই পরে সম্রাট মেইজি নামে সম্মানিত হন। এই সঙ্গে কেইকি ত্রয়োদশ সগুন হন; কিন্তু সামুরাই গভর্ণমেণ্ট আর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পরিচালনা করিয়া জাতীয় সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সময় অতি দ্রুতগতিতে বদলাইতেছিল; সামুরাই-শাসন কালের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছিল। ১৮৬৭ খৃঃ কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সগুনেটের অধঃপতন ও সম্রাট শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এক মতলব করে। যেডোতে সগুন কেইকি জাতীয় ঘটনার গতি বুঝিতে পারে এবং টোসার ভূস্বামীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজশক্তি সম্রাটের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার মনস্থ করে। মিকাডোও ১৮৬৭ খৃঃ রাজক্ষমতা পুনর্গ্রহণ করেন। এইপ্রকারে সামুরাই শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু এই পরিসমাপ্তি বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয় নাই। সগুনের দলের

সামুরাই কৌমগুলি বিভিন্ন স্থলে অস্ত্র পরীক্ষা করে; কিন্তু একটির পর একটি করিয়া সর্ব্বশেষে তাহারা ১৮৬৯ খৃঃ পরাজিত হয় এবং মেইজি অর্থাৎ শিক্ষিত যুগের প্রকাশ হয়।

সগুন ও মিকাডোর দলের সংঘর্ষের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে কতকগুলি কৌমের লোক রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়া অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া দেশকে শোষণ করিতেছিল। যে সকল ভূস্বামী রাষ্ট্রকে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় রাখিয়া এই শোষণ কার্য্য চালাইতেছিল, তাহাদের বিপক্ষে একটি উদারনৈতিক অভিজাত দল উত্থিত হয়। বৈদেশিক শিল্প-ব্যবসায়ের সংশ্রবে আসিয়া একটি উদারনৈতিক দল সৃষ্টি হয়। ইহারা সামন্ততন্ত্রীয় পদ্ধতিতে আর আস্থা রাখিতে পারে নাই। ইউরোপীয় ধনতন্ত্রবাদের স্রোতের ধাক্কা জাপানের তীরে সজোরে লাগিতে থাকে। উহারই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে সামন্ততন্ত্রীয় ও বুর্জ্জোয়াদের শ্রেণীসংগ্রামের ফলেই ইহা সংঘটিত হয়।

মেইজি যুগ

১৮৬৭ খৃঃ অক্টোবরে সগুন কেইকি রাজশক্তি সম্রাটকে প্রত্যর্পণ করেন এবং নিজ কার্য্যে ইস্তাফা দেন। সম্রাট মেইজি রাজশাসন দ্বারা পুরাতন আমলাতন্ত্র ভাঙ্গিয়া দেন এবং পৈতৃক দেবতাদের নিকট পাঁচ দফা শপথ (Oath of Five Principles) গ্রহণ করেন।৩ যথা:—(১) একটি কাউন্সিল আহ্বান করিয়া সর্ব্বসাধারণের মতানুযায়ী শাসন প্রণালী রচিত হইবে এবং তদনুযায়ী শাসন কার্য্য চলিবে। (২) সর্ব্ব কর্ম্মে উচ্চ ও নিম্নস্তরের লোকেরা একযোগে কার্য্য করিবে; (৩) নাগরিক (civil) ও সামরিক কর্ম্মচারীগণ একমতের হইবে এবং সাধারণ লোক এমনভাবে ব্যবহৃত হইবে যেন তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ফলবতী হয় এবং অসন্তুষ্ট না হয়; (৪) পুরাতন অনুপযুক্ত ব্যবস্থা ও রীতি পরিবর্ত্তিত হইবে; (৫) পৃথিবীর সর্ব্ব জাতির নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চয়ন করিতে হইবে। এই পঞ্চ নীতি নব-প্রবর্ত্তিত শাসনব্যবস্থার ভিত্তিস্বরূপ হয়।

এই জাতীয় মৌলিক অধিকার অনুযায়ী ১৮৬৮ খৃঃ একটি নূতন কেন্দ্রীয় শাসন স্থাপিত হয়। এই নূতন শাসনাধীনে সামন্ত ও ভূস্বামীরা নিজ নিজ প্রজা ও জমিদারী সম্রাটকে প্রত্যর্পণ করে। এতদ্বারা সামন্ততন্ত্রপদ্ধতি সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়। এইপ্রকারে সামন্ততন্ত্রীয় পদ্ধতি ধ্বংস হইলে উহার আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলিরও সঙ্গে সঙ্গে তিরোধান করা হয়। অভিজাতদের "কুগে" ও "দাইমিও" নামের পরিবর্ত্তে "কাজুকো" (Peers) নাম প্রদান করা হয়। কৌমগত সামুরাইদের শ্রেণীগত সিজোকু নামকরণ হয় এবং সাধারণ লোকদের তাহাদের বংশগত নাম গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ জারী করা হয়। ১৮৭১ খৃঃ "কাজোকু" ও "হেইসিন" (সাধারণ লোক) শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও সামাজিক আদান-প্রদানের হুকুম প্রদান করা হয়; "কাজুকো" ও সিজোকুদের কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইতে অনুমতি দেওয়া হয়। এই প্রকারে সামন্ততান্ত্রিক যুগের সামাজিক জাতিভেদপ্রথাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও রীতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগ ইউরোপীয় নীতিতে পুনর্গঠিত হয়।৪ কিন্তু এই সকল শাসনসংস্কার সাধারণের নিকট এত নূতন বলিয়া প্রতীত হয় যে, অনেক স্থলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই বিদ্রোহ অস্ত্র ও বলপ্রয়োগ দ্বারা দমন করা হয়। অবশেষে ১৪১১ খৃঃ মিকাডো জাপানী জাতিকে একটি নূতন শাসন ব্যবস্থা (constitution) প্রদান করেন।

এই প্রকারে বর্ত্তমান জাপান বিবর্ত্তিত হয়। মেইজি সংস্কারের মূলে Functions of a Bourgeois-democratic Revolution অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া জগতের শ্রম-শিল্প সভ্যতানুযায়ী দেশের যে সব পরিবর্ত্তন সম্পাদন প্রয়োজন তাহার যৎকিঞ্চিৎ করা হয়। এতদ্বারা সামন্ততান্ত্রিক সামুরাইদের হাত হইতে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিয়া অভিজাত ও নবোত্থিত অভিজাতদের হস্তে প্রদত্ত হয়। আবার শ্রেণীভেদসঞ্জাত জাতিভেদের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সকলের সহিত বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। মেইজি সংস্কারে শাসনযন্ত্র নূতন অভিজাতদের হস্তে থাকিলেও বুর্জ্জোয়াদের অভ্যুত্থানের জন্য ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। পতিত কৃষকেরা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক গোলামি হইতে মুক্ত হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন নাগরিকরূপে গণ্য হইতে থাকে।

৩। Japanese Year Book, p. 90.

৪। Japanese year book, p. 89-93.

শ্রমিক আন্দোলন

মেইজি সংস্কারের পর জাপান দ্রুতগতিতে শ্রমশিল্প ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্তরে উন্নীত হয়। এই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। শ্রমিকদের পক্ষে জাপান কখনও স্বর্গরাজ্য ছিল না; শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ন্যায় শ্রমিক সমস্যা দেখা দেয়। ইহার ফলে পুঁজিপতি (capitalist) ও শ্রমিকেরা দুই দিকে চলিয়া যায়। শ্রমিকেরা নিজেদের আন্দোলন সৃষ্টি করে, পাশ্চাত্য দেশ হইতে সমাজতন্ত্রবাদ (socialism) ও অন্যান্য মানবহিতকর আদর্শ আমদানি হয়। নানাপ্রকার সমাজ-বৈপ্লবিক আন্দোলন হওয়ার সঙ্গে মিকাডোর প্রাণনাশের জন্য নৈরাজ্যবাদীগণ (anarchist) কর্ত্তৃক এক ষড়যন্ত্র হয়। যে মিকাডো পচিশ শত বৎসর দেবতার ন্যায় সম্মানিত হইয়াছেন, যে জাতির নিকট মিকাডো ও জাপান একই বস্তু বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত—তাহারাই সেই মিকাডোর বিরুদ্ধে এই চেষ্টায় (ষড়যন্ত্র) সাধারণের মনে একটা ভীষণ প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। কোটোকু প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়ে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। জাপান যে কত দ্রুত-গতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, এই প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র উহার একটা প্রমাণ।

কিন্তু ইহাতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বন্ধ হয় নাই। ইহার পর রুষিয়ায় সোসিয়েলিস্ট গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হওয়ায় সাম্যবাদী কমিউনিস্ট মতবাদ জাপানে প্রবেশলাভ করে। জাপানের বহু অধ্যাপক, অভিজাতবংশের লোক, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদল এই মতাক্রান্ত হয়। সেন কাটায়ামা নামক জাপানী শ্রমিকদের আন্দোলনের নেতা হন। ইনি সোসিয়েলিস্ট দল সংগঠন করেন এবং শেষে কমিউনিস্ট মত গ্রহণ করেন।

শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হইল শোষিত ও পতিতেরা জাপানে অবশেষে নিজের মত ব্যক্ত করিবার জন্য একটা স্থান পায়। ১৯০৩ খৃঃ মার্কস্‌পন্থীয় সোসিয়েলিস্ট মতবাদ জাপানে প্রথমে আসে এবং ১৯০৬ খৃঃ দ্বিতীয়বার সোসিয়েলিস্ট পার্টি (দল) গঠিত হয়। পরে এই দলের সকলে কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে একমত হইতে না পারায় উহা (দল) দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক দল মার্কস্‌পন্থী (Marxist), আর একদল চরমপন্থী (Direct Actionists); কিন্তু গভর্নমেণ্ট সকল প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়।৫ মার্ক্সীয় আন্দোলন এবং ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব গভর্ণমেণ্টের দমনে বন্ধ হয় নাই; বরং রুষ বিপ্লবের পর ইহা আবার নূতন তেজ ও বল পায়।

শ্রমিক ও রাজনীতিক দলসমূহ

১৯০৭ খৃঃ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাইপন সোসিয়েলিস্ট পার্টি বিনষ্ট হইলে জাপানী প্রলিটারিয়েট (Proletariate; শ্রমিকদল) বিশ বৎসর ধরিয়া অন্ধকারে রাস্তা হাতড়াইয়া বেড়ায়। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় জাপানের মূল-ধনীদের (capitalist) শ্রমশিল্প ও ব্যবসায় বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে; শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনও আবার সজাগ হইয়া উঠে। যে সকল বিত্তহীন শ্রেণী পনর বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বজনীন ভোটাধিকারের (universal suffrage) জন্য গণতন্ত্রের (Democracy) আহ্বানে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা এখন উদারনীতিক রাজনীতিকদের সঙ্গে মিশিয়া উক্ত অধিকার চাহিতে থাকে। কিন্তু ১৯২০ খৃঃ মে মাসে যখন সাধারণ নির্ব্বাচন হয়, তখন প্রতিক্রিয়াশীল সেইয়ুকাই পার্টি এই অধিকার লাভের বিরুদ্ধাচারণ করিতেছিল; ইহাতে (নির্ব্বাচনে) এই দল জয়লাভ করায় "শ্রমিক ও কৃষক" দল দেখিতে পায় যে, রাজনীতিক আন্দোলনে অন্যদল তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। ইহার ফলে তাহারা প্রতিনিধি সভার (House of Representatives) প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং শিল্প-শ্রমিক দলের (Syndicalist) সহিত সংযুক্ত হইয়া শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে সরাসরি প্রতিবিধান (direct action) লইতে মনস্থ করে। কিন্তু সিণ্ডিক্যালিস্টদের (শিল্প-শ্রমিক) সঙ্গে মার্ক্সিস্টদের শীঘ্রই মতভেদ ও বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৯২৩ সালে যখন য়ামামোটো গভর্ণমেণ্ট আবার সর্ব্বজনীন ভোটাধিকার শীঘ্র গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যোগ করে, তখন সমাজতান্ত্রিক (Socialist) ও সাধারণ মত একত্রিত হইয়া কাজ করিবার ফলে প্রলিটারিয়েট (শিল্প-শ্রমিক)

৫। Japanese year book, p. 163-168.

আন্দোলন আবার রাজনীতি ক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করে। শীঘ্রই শ্রমিক ও কৃষক দল (The Labour-Farmer Party) দলাদলির আড্ডাস্থল হইয়া ওঠে এবং কমিউনিস্ট মতবাদের লোকদের ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে কি-না—এই প্রশ্ন লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হওয়ায় জাপ শ্রমিক সঙ্ঘকে (Japan Federation of Labour) ভিত্তি করিয়া ১৯২৬ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর সোসাল-ডিমোক্রাটিক দল (Social-Democratic Party) গঠিত হয়। কিন্তু শ্রমিক সঙ্ঘগুলি নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে জাপান কৃষক সংঘের দক্ষিণ-মার্গীরা Japan Farmers' Party নামে একটি দল গঠন করিয়া ১৯২৬ খৃঃ কৃষিজীবীদের সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে। অবশেষে নানা কলহ ও ভাঙ্গন এবং পুনর্গঠনের পর The National Labour-Farmer Party ১৯৩১ খৃঃ ৫ই জুলাই গঠিত হয়। এই দল মধ্যপন্থা ধরিয়া চলিতেছে।

ফাসিস্ট আন্দোলন

১৯৩১ খৃঃ সামাজিক অশান্তির মধ্যে হঠাৎ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন (National-Socialist Movement) গড়িয়া ওঠে।[৬] প্রলিটারিয়েটদের দক্ষিণ-মার্গীয় দলসমূহের মধ্য হইতে ফাসিস্ট মতবাদ উদ্ভূত হয়। অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের দমননীতি সত্ত্বেও কমুনিস্ট মতবাদ বামমার্গীদের প্রভাবান্বিত করে। সোসাল-ডিমোক্রাটিক পার্টির কোন স্পষ্ট শ্রেণীগত আদর্শ না থাকায় সাধারণ গণসমূহের উপর ইহা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বরং ইহা রক্ষণশীল (conservative) মনোবৃত্তিই প্রকাশ করিত। এইজন্য ইউরোপের ফাসিস্ট আন্দোলন দ্বারা উৎসাহিত হইয়া এবং মাঞ্চুরিয়া দখলের পর জনসাধারণের মনে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ জাগিয়া ওঠার ফলে ন্যাশানাল সোসালিস্ট মতবাদও গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। ইহার ফলে সোসাল-ডিমোক্রাটিক পার্টি ও কৃষক-শ্রমিক পার্টি হইতে লোক বাহির হইয়া আকামাৎসুকে নেতা করিয়া একটা ন্যাশনাল-সোসিয়ালিস্ট পার্টি (National-Socialist Party) জাপানে সংগঠিত হইয়াছে।

কমুনিস্ট বা বামপন্থী দল

জাপানের কমুনিস্ট পার্টি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুনরায় ভাঙ্গিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা নীরবে ও গোপনে সাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিয়া যাইতেছে। ইহা ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, চিত্রকর, ছাত্র, এমন কি উচ্চপদস্থ লোকদের মধ্যে বদ্ধমূল হইযাছে। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বহু সহস্র লোক আটক করিয়া রাখে এবং বামপন্থী প্রত্যেক আন্দোলনকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই প্রকারে জাপানের গণশ্রেণী জাগরিত হইয়া ওঠে এবং নানা-প্রকার আন্দোলনের ভিতর দিয়া নিজেকে প্রকট করিবার প্রয়াস পাইতেছে। মেইজি সংস্কার দ্বারা গণশ্রেণী বিশেষ লাভবান হয় নাই, বরং বর্ত্তমান সভ্যতা জাপানে বিস্তার লাভ করিবার ফলে এই দেশ পশ্চিম ইউরোপের ন্যায় সমাজ-পদ্ধতি বিবর্ত্তিত করিতেছে। প্রাচীন সামন্ত গোষ্ঠীসমূহ ক্ষমতাবিহীন হইয়া নামেমাত্র অভিজাত হইয়া আছে। আর জাপানে বর্ত্তমানের শ্রমশিল্পের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এই দেশ একটি পুঁজিপ্রধান (capitalistic) দেশে পরিগণিত হইয়াছে। ফলে একটি ব্যবসায়ী বা বুর্জ্জোয়া-শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা এখন অভিজাতদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করিবার ফলে উভয় বিত্তশালী শ্রেণী এক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু মেইজী সংস্কার যে বুর্জ্জোয়া-ডিমোক্রাটিক বিপ্লবের সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে নাই, তাহার অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ কৃষকদের অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯৩৩ খৃঃ জাপানের সমগ্র কৃষিভূমির পরিমাণ হইতেছে ৫,৮৬৬,৮১৮·৮৫ হেক্টোয়ার[৭]; ইহার মধ্যে ৩,০৬১,৩৩০·৭১ হেক্টেয়ার জমি ভূস্বামী-কৃষকদের (peasant-proprietors) নিজস্ব। আর ২,৮০৫,৪৮৮·১৮ হেক্টেয়ার (শতকরা ৪৮ ভাগ) রায়তদের (tenants) দ্বারা চাষ করা হয়। ১৯৩০ সালের শেষে দেখা গিয়াছে, জাপানের গৃহস্থের মধ্যে শতকরা ৪৬ অংশ (৪৬% ভাগ) অর্থাৎ জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ লোক কৃষিজীবী। ইহার মধ্যে শতকরা ৩১ জন (৩১%) ভূস্বামী কৃষক, শতকরা ৪২ (৪২%) জন সামান্য জমির মালিক; কেহ কেহ খাজনায়ও জমি রাখে; শতকরা ২৭ (২৭%) জন রায়ত। ইহা হইতে পরিষ্কার

---

[৬] Japanese Year Book, p 168.

[৭] হেক্টোয়ার—২·৪৭১ একর।

বুঝা যায় যে, দেশের বেশীর ভাগ জমি তালুকদার বা জোতদারের ন্যায় শ্রেণীসমূহের হাতে আছে। আবার ভূস্বামীদের শোষণে উৎপীড়িত হইয়া রায়তেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে[৮]।

জাপানে বর্ত্তমান সময়ে শ্রমশিল্প সভ্যতার আমদানি হওয়ায় একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ধনী ব্যবসায়ীরা উচ্চশ্রেণীর বুর্জ্জোয়া শ্রেণী গঠন করিয়াছে। কিন্তু গরীব মধ্যবিত্ত লোকদের সহিত শ্রমজীবী শ্রেণীদের বিভাগ করা খুব শক্ত। যাহারা ৬০-৩০ ইয়েন মাসিক রোজগার করে তাহাদের যে-কোন মুহূর্ত্তে শ্রমিকদের অর্থনীতিক স্তরে নামিয়া যাইবার ভয় বা আশঙ্কা আছে[৯]।

উপস্থিত সময়ে জাপানের সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, একটা ফাসিস্ট সামরিক দল গভর্ণমেণ্ট দখল করিয়া বিত্ত-শালী শ্রেণীসমূহকে সাম্রাজ্যবাদের নেশায় বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। পুঁজিপতি-দল প্রাধান্যে সুপ্রতিষ্ঠিত জাপানী গভর্ণমেণ্ট ফাসিস্ট জার্ম্মানীর অন্ধ অনুকরণে বিদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রবল প্রয়াসী। ইহারই ফলে, এই শ্রেণীর (পুঁজিপতিদের) সামরিক দলেরই শাসনতন্ত্রের প্রবল প্রতাপ ও প্রাধান্য বিরাজ করিতেছে। চীন বিজয়ের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আজ তাহারা অধীর হইয়া পড়িয়াছে এবং এশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারের নানা প্রকারের হুমকি দিতেছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবশে আজ জাপান একেবারে মরিয়া হইয়া পশুবলের দাপটে অকাতরে কত অসহায় নরনারী ও শিশুর প্রাণনাশ করিতেছে—মতবাদের দোহাই দিয়া কত মানুষকে কি নিপীড়নই না করিতেছে। ইহার পৈশাচিক ধ্বংসলীলার তাণ্ডবনৃত্যে আজ বুঝি বা প্রাচীন জগতের বহু প্রাচীন চীন-সভ্যতার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লোপ পায়! এইজন্য পতিতের মুক্তি ও সমাজে সাম্য স্থাপন এখনও বাস্তব রাজনীতির বাহিরে আছে।

---

[৮] Japanese Year Book, p 899.
[৯] Japanese Year Book, p 900.

তব মনে গুঞ্জরিবে কথাটি আমার

বন্দে আলী মিয়া

ধ্যান মৌন স্তব্ধ নিশি—বসে আছি একা
মুক্ত গবাক্ষের পাশে। শান্ত নভতলে
কৃষ্ণ তৃতীয়ার চাঁদ দূরে যায় দেখা।
দীর্ঘ রাত্রি ধরি সপ্তর্ষি তারকা জ্বলে
শিয়রে আমার। পদপ্রান্তে জাগে মোর
সপ্ত বসুন্ধরা।
                    তুমি বুঝি নিদ্রাতুর
পেলব শয্যায়! ছিন্ন বুঝি ফুল-ডোর!
শিথিল কবরী! আজি রজনী দুপুর
মোর স্বপ্ন-সাধ মাখি হয়েছে উতলা—
তুমি এসো বন-পথে নির্জ্জন ছায়ায
মোর পার্শ্বে আজ। যে-কথা হয়নি বলা
আজি অবসর প্রিয়া—কহিব তোমায়।

মাধবী-প্রহর—মনে জাগে প্রগলভতা—
মোর কর্ণে গুঞ্জরিয়ো তব মর্ম্মব্যথা।

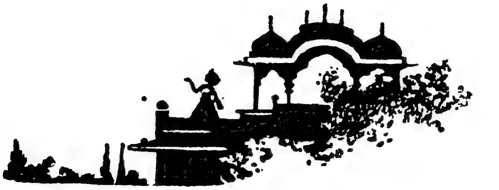

জঙ্গম

বনফুল

৬

মানুষ ভাবে একরকম, হইয়া যায় আর এক রকম। পথের নেশায় মাতিয়া মানুষ পথটাকেই বড় মনে করে, লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যে পথকে সে আশ্রয় করে সেই পথই শেষে তাহাকে পাইয়া বসে, পথ-চলার উন্মাদনায় সে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়।

মৃন্ময়েরও তাহাই হইয়াছিল। মজঃফরপুরগামী একটা ট্রেণের কামরায় বসিয়া বসিয়া মৃন্ময় সহসা অনুভব করিল, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। হারানো পত্নীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সে পুলিশে চাকুরি লইয়াছিল, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আজ সহসা সে অনুভব করিল যে, সে উদ্দেশ্যটা গৌণ হইয়া গিয়াছে, চাকরিই এখন মুখ্য। কই, সে তো বিগত একমাসের মধ্যে স্বর্ণলতাকে একখানি চিঠিও লেখে নাই। কাজের চাপ পড়িয়াছে সত্য কথা, কিন্তু কাজের চাপই কি একমাত্র কারণ? তাহার উৎসাহও কি কমিয়া আসে নাই? স্বর্ণলতাকে হারাইয়া যে তীব্র বেদনা সে অনুভব করিয়াছিল যাহার তাড়নায় পুনরায় বিবাহ করিয়া পুলিশের চাকুরি লইয়াছিল সে বেদনা কি এখনও তেমনই তীব্র আছে? তীব্রতাটা কি এতটুকু কমে নাই? নিজেকেই নিজে এই প্রশ্ন করিয়া, নিজেরই অন্তরের মধ্যে সত্য সন্ধান করিয়া ডিটেকটিভ মৃন্ময় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। এ কয়দিন সে শুধু যে স্বর্ণলতাকে চিঠি লিখিবার সময় পায় নাই তাহা নহে, স্বর্ণলতাকে ভাবিবারও সময় পায় নাই। এ কয়দিন সে শুধু মিস্টার ঘোষের কথা এবং মিস্টার ঘোষের আচরণের কথা ভাবিয়াছে।

মজুমদারের মত মিস্টার ঘোষও তাহার সহকর্ম্মী। সম্প্রতি বাহির হইতে বদলি হইয়া আসিয়াছেন। কর্ম্মতৎপরতা তাঁহার যেমন অসাধারণ রকম প্রখর, মনও তাঁহার তেমনই অসাধারণ রকম বিষাক্ত। মৃন্ময় নিজের কর্ম্মকুশলতার জোরে উন্নতি করিতেছে, উপর-ওলার প্রিয়পাত্র হইতেছে, এই বম্ব্ কেসটার তদন্তের ভার পাইয়াছে, মিস্টার ঘোষের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। মিস্টার ঘোষও এই বম্ব্ কেসে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও সাহেবের নিকট প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু মৃন্ময়ের উন্নতি তিনি ভাল চক্ষে দেখিতেছেন না। কাহারও কোন উন্নতি কখন তিনি ভাল চক্ষে দেখেন না। তাঁহার স্বভাবই ওইরূপ। তাঁহার বক্রোক্তি, আচরণের অন্তর্নিহিত তিক্ততা, গোপনে চক্রান্ত পাকাইয়া তুলিবার ক্ষমতা—মৃন্ময়কে এ কয়দিন এমন ক্ষুব্ধ ও ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার অন্য কথা ভাবিবারই অবসর ছিল না। তাহার মোটর-চাপা-পড়া-সম্পর্কে তদন্ত করিয়া মিস্টার মজুমদার যখন অচিনবাবুকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন তখন মিস্টার ঘোষ স্বচ্ছন্দে ও শান্তভাবে বলিয়া বসিলেন যে, অচিনবাবুর ইহাতে যদি হাত থাকে তাহা হইলে মৃন্ময়বাবুও নিশ্চয়ই কোন নারীঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। লোকটার ব্যবহার কথাবার্ত্তা আশ্চর্য্যরকম ভদ্র, আশ্চর্য্যরকম হাস্য-লিপ্ত অথচ আশ্চর্য্যরকম তীক্ষ্ণ ও বিষাক্ত। মজুমদার ঠিক ইহার বিপরীত। ভদ্রতার ধার ধারে না, চীৎকার করিয়া কথা বলে, অশ্লীল কথা মুখে লাগিয়াই আছে—মন কিন্তু পরিষ্কার। মৃন্ময় অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি করিয়াছে ইহা মিস্টার ঘোষের বিদ্বেষ এবং মিস্টার মজুমদারের আনন্দ উৎপাদন করিয়াছে। মজুমদারের সাবধান বাণী মৃন্ময়ের মনে পড়িল। কাজে কোন রকম খুঁত যেন না হয়, হইলে তাহা ঘোষের দৃষ্টি এড়াইবে না এবং সেই খুঁতটুকুকে নিখুঁতভাবে ওপরওলার নয়নগোচর করিতেও সে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই 'চুগ্‌লি'-পটুতার জন্যই নাকি ওপরওলার নিকট তাহার প্রতিপত্তি। মৃন্ময় স্বভাবতই কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং বুদ্ধিমান। জ্ঞাতসারে সে কোন খুঁত ঘটিতে দিবে না। যে কাজে সে যাইতেছে কি ভাবে করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইবে তাহারই ভাবনায় সে পুনরায় নিমগ্ন হইয়া পড়িল। স্বর্ণলতার কথা একবার মাত্র মনে হইয়াছিল, আর হইল না।

বরং হাসির মুখখানা মনের মধ্যে দুই-একবার উঁকি দিয়া

গেল। মনে পড়িল হাসি মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছে টিফিন-কেরিয়ারে যে লুচি, আলুর দম ও মোহনভোগ সে করিয়া দিল মনে করিয়া ঠিক সময়ে তাহা যেন সে খায়। মৃন্ময় টিফিন-কেরিয়ারটা নামাইয়া দেখিল—হাসি করিয়াছে কি! এ যে তিনজনের খাবার! কিন্তু আশ্চর্য্য, হাসির এই অপব্যয়প্রবণতায় মৃন্ময়ের রাগ হইল না, মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল।

৭

হাসি একা দুপুরে বসিয়া হাতের লেখা লিখিতেছিল। চিন্ময় আজকাল তাহাকে বাড়িতে লেখা-পড়া শিখাইতেছে। আগ্রহ অবশ্য হাসিরই বেশী। বাঙ্গালা লেখা-পড়াটা বাড়িতে শিখিয়া ফেলিতেই হইবে। সবাই কেমন নানারকম বই পড়ে, স্বামীকে চিঠি লেখে, হাসি কিছুই পারে না। চিন্ময়ের সাহায্য লইয়া তাই সে বর্ণ-পরিচয় হইতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সবাই পারে, সে-ই বা পারিবে না কেন! প্রথম ভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়ভাগেরও বেশী বাকি নাই। প্রত্যহ দশখানা করিয়া হাতের লেখা লিখিতেছে। হাতের লেখাটা তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া ফেলিতে হইবে। কবে সে যে স্বামীকে ভাল করিয়া চিঠি লিখিতে পারিবে! ও বাড়ির কুসুম কেমন সুন্দর করিয়া স্বামীকে চিঠি লেখে, স্বামীর কত সুন্দর চিঠি পায়।

অতিশয় মনোযোগ-সহকারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সম্মুখে প্রসারিত "লিখন-প্রণালী" দেখিয়া হাসি হাতের লেখা লিখিতে লাগিল। দুপুর-বেলায় ঘুমানো তাহার বহুদিনকার অভ্যাস; মাঝে মাঝে হাই উঠিতেছে—কিন্তু না, কিছুতেই না, হাতের লেখাগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেই হইবে। একখানি কম হইলে চিন্ময় ঠাট্টার চোটে অস্থির করিয়া তুলিবে। এমনই তো তাহার লেখাকে কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং নাম দিয়াছে। হাসি ঝুঁকিয়া লিখিতেছিল এই কথা মনে হওয়াতে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া নিজের হস্তাক্ষরগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং কেন হইবে! আগেকার চেয়ে তো অনেকটা ভাল হইয়াছে। আবার সে ঝুঁকিয়া লিখিতে সুরু করিল।

৮

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

নিবারণবাবু ও মাস্টার দোকানে গিয়াছেন। আস্‌মি কাজকর্ম্ম সারিয়া পাড়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, মা পাশের ঘরে নিদ্রিত। দার্জি ওরফে শ্যামলী একা বসিয়া একটি কাপড়ে রঙীন সুতা দিয়া ফুল তুলিতেছে, আর ভাবিতেছে সকলে তাহাকে ইহার জন্য এত বকে কেন। সকলের ইহা খারাপ লাগে অথচ তাহার ইহা ভাল লাগে কেন। বাবা বকে, মা বকে, আসমি বকে—সে কিন্তু কিছুতেই ইহা ছাড়িতে পারে না। তাহার ফুলি পিসির কথা মনে পড়ে। ফুলি পিসিই প্রথমে তাহাকে সেলাইয়ের কাজ শিখাইয়াছিল। বেচারি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার হাতের কাজ কার্পেটের আসনটা এখনও আছে। সেই কার্পেটটার প্রতি ফুলে ফুলে রঙীন হইয়া ফুলি পিসি এখনও বাঁচিয়া আছে। ফুলি পিসিও তাহারই মত কুৎসিত ছিল, বিবাহ হইয়াছিল বটে কিন্তু স্বামী-সুখ কখনও পায় নাই। সুন্দরী দেখিয়া স্বামী আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিল। ফুলি পিসি চিরকাল বাপের বাড়ির লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া গিয়াছে। ফুলি পিসির দুঃখের অন্ত ছিল না। কিন্তু শত দুঃখের মধ্যেও সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিত যখন সে তাহার সেলাই লইয়া বসিত। ওই ছিল তাহার একমাত্র মুক্তির ক্ষেত্র।

দার্জি সেলাই করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল তাহার কি বিবাহ হইবে। কত সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইতেছে না, তাহাকে বিবাহ করিবে কে। কত লোকই তো আসিল, দেখিল, চলিয়া গেল—কই, কেউ তো পছন্দ করিল না। আস্‌মিটাকে বরং দুই-একজন পছন্দ করিয়াছে। আস্‌মি যদিও কালো কিন্তু তাহার মুখ-চোখে হাব-ভাবে লোকে মুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার বিবাহ না হইলে তো আসমির বিবাহ হইবে না। তাহাকে কে বিবাহ করিবে! কোথায় সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যে তাহার বাহিরটাকে তুচ্ছ করিয়া ভিতরটা দেখিতে পাইবে। কোথায় সে!

দার্জি ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মানসপটে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি মুগ্ধ যুবকের অজানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই।

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সে আবার সুতা দিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

৯

নানাস্থান হইতে ঋণ করিয়া শঙ্কর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা লইয়া দ্রুতপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। এ কয়দিন সে মুক্তোর কাছে যাইতে পারে নাই। সেদিনকার সেই ঘটনার পর শূন্যহস্তে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। কয়েকদিন ক্রমাগত ঘুরিয়া পঞ্চাশটা টাকা অনেক কষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্কর ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে গিয়াই টাকাগুলি মুক্তোর হাতে দিয়া বলিতে হইবে তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতি আমি করিতে চাহি না; নোটগুলি ভাল করিয়া গণিয়া দেখিয়া লও। মনে করিও না আমি তোমার ভালবাসার মূল্য দিতেছি, টাকা দিয়া ভালবাসা ক্রয়ও করা যায় না, বিক্রয়ও করা যায় না। আমি তাহা জানি, কিন্তু আমি ইহাও জানি অর্থ-হীন ভালবাসাবাসি করিবার সঙ্গতি তোমার নাই। সেইজন্য তোমার ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু আনিয়াছি। কয়েকদিনের জন্য ব্যবসাটা অন্তত বন্ধ কর। তুচ্ছ টাকার ওজুহাতে আমাকে ফিরাইয়া দিবে তাহা আমি সহ্য করিব না। টাকাটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস নয়। এতকাল টাকা চিনিয়াছ, এইবার মানুষ চিনিতে শেখ। সামান্য টাকার জন্য এমন করিয়া নিজেকে যেখানে সেখানে বিলাইয়া দিও না। নিজেকে চেন—

"কে, শঙ্কর না কি, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও তোমাকেই খুঁজছি—"

শঙ্কর ফিরিয়া দেখিল ভন্টুর মেজকাকা, দাড়ির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে স্মিতমুখে আগাইয়া আসিতেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শঙ্করকে দাঁড়াইতে হইল।

"আমাকে ডাকছেন?"

"তোমাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব ভাই! তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করার দরকার আছে। তোমার মাথা যে কত সাফ সে তো আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না।"

ইহা কিসের ভূমিকা বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মুক্তানন্দ বলিলেন, "চল, স্কোয়ারটার ভেতর বসা যাক্—"

"বেশী দেরি হবে কি, আমার একটু দরকারি কাজ ছিল।"

"না, না, বেশী দেরি হবে না, দুটো কথা খালি।"

কলেজ স্কোয়ারে ঢুকিয়া একটা নির্জ্জন জায়গা বাছিয়া মুক্তানন্দ বলিলেন, "অঙ্কের ব্যাপার ভাই; তুমিই ঠিক পারবে। ন্যায়সঙ্গতভাবে একটা মূল্য-নির্দ্ধারণ ক'রে আমাকে রেহাই দিয়ে দাও তোমরা। বস—"

উপবেশন করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, "কিসের মূল্য-নির্দ্ধারণ?"

"আমার।"

"আপনার! মানে?"

"মানে টানে কিছু নেই, আমারই!"

শঙ্কর কিছু বুঝিতে পারিল না। একবার মনে হইল, হয় তো বাবাজী বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন এবং নিজের বাজারদর কত হওয়া উচিত তাহাই তাহার কাছে জানিয়া লইতে চান। কিন্তু মুক্তানন্দের প্রশ্নে এ ধারণা অচিরেই অপনোদিত হইল।

"য়্যাভারেজ বাঙ্গালীর পরমায়ু কত ধরতে চাও তুমি? পঞ্চাশ? পঞ্চাশের কমই বরং হবে, বেশী নয়।"

শঙ্কর বলিল, "না—"

"আমার বয়স এখন বিয়াল্লিশ চলছে। বাকী রইল তা হ'লে আট বছর। এই আট বছরে কত উপার্জ্জন করতে পারি আমি একটা হিসেব কর দিকি। খুব বেশী ক'রে ধরলেও গড়-পড়তা মাসে ত্রিশ টাকার বেশী নয়। আট বছরে তাহলে কত হচ্ছে?"

"তিরিশ ইনটু বারো ইনটু আট—"

"ওসব ইনটু-মিনটু ছাড়ো, থোক টাকা কত হয় তাই বল।"

শঙ্কর মনে মনে গুণ করিয়া বলিল, "দু হাজার আটশো আশি টাকা—"

"আচ্ছা, এইবার ওর থেকে আমার খাই খরচ, কাপড় চোপড়ের খরচ সব বাদ দাও—"

শঙ্কর ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

বাবাজী বলিয়া চলিলেন, "য়্যাভারেজ কত ধরবে, আমি

মাছমাংস খাই না অবশ্য, কিন্তু আলো চাল গাওয়া ঘি আমার চাই, কাপড়ও কম ক'রে বছরে খান দশেক, জামা অন্তত গোটা চারেক ধরো, তার পর ধর টুকিটাকি নানারকম খরচা, বাঁচতে গেলেই হরেকরকম বখেড়া আছে তো—"

"আপনার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছিনা আমি—"

"পারবে, পারবে গো। তুমি পারবে না তো পারবে কে। আগে অঙ্কটা কসে ফেল দিকি, আমার নিজের পারসোনাল খরচ কত ধরতে চাও তুমি—"

শঙ্কর যদিও কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না তথাপি আজকালকার হিসাবে একটা লোকের খাওয়া-পরার খরচ ন্যূনকল্পে কত পড়িবে তাহা আন্দাজে বলিল, "মাসে দশটাকা ধরুন!"

বাবাজী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

"দশ টাকায় কি চলে আজকালকার দিনে, সস্তাগণ্ডার দিন কি আর আছে!"

তাহার পর সস্মিতমুখে শঙ্করের মুখের পানে চাহিয়া আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলিলেন, "বেশ, দশটাকাই ধর, তোমার কথা ঠেলব না আমি। দশ টাকা ধরেই হিসেব কর। তা হ'লে কিন্তু থাকারও একটা খরচ ধর। কলকাতা শহরে অমনি তো কেউ থাকতে দেবে না, মেসে থাকলেও সীট রেণ্ট দিতে হবে। সেটাও ইনক্লুড্ কর! কত ধরবে সেটা—পাঁচ টাকা?"

"বেশ, পাঁচ টাকাই ধরুন। হ্যাঁ, পনেরো টাকার কম চলে না একজনের আজকাল—"

"তা কি চলে কখনও! অথচ ভণ্ট কথাটা কিছুতে বুঝছে না! হ্যাঁ, আর একটা জিনিস ধরতে ভুল হয়েছে—দুধ! দৈনিক অন্তত আধ সের করে দুধ দরকার আমার। মাসে তা হ'লে কত হ'ল?"

"পনেরো সের—"

"টাকায় চার সের হিসেবে ধরলে—"

"প্রায় টাকা চারেক।"

"তা হ'লে পনেরো আর চারে উনিশ হল?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে এইবার অঙ্কটা কসে ফেল দিকি! ত্রিশ টাকা ক'রে মাসে আয়, উনিশ টাকা ক'রে খরচা, বাঁচছে তা হ'লে—"

"মাসে এগারো টাকা ক'রে।"

"আট বচ্ছরে কত হয় সেটা হিসেব কর এবার—"

"এগারো ইণ্টু বারো ইণ্টু আট—"

"মোটমাট কত বল, ইণ্টু কেন।"

শঙ্কর পুনরায় মনে মনে হিসাব সুরু করিল।

"এক হাজার ছাপ্পান্ন টাকা।"

"মোটে! অথচ আমার নিজের অংশেই যে বিষয় রয়েছে, পৈত্রিক নয়, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি আমি, তার দামই অন্তত তিন হাজার টাকা। আমি অবশ্য সে বিষয়টা বন্ধক দিয়ে আমার গোয়াবাগানের সেই বন্ধুটির কাছ থেকে শো পাঁচেক টাকা নিয়েছি, তবু তো আড়াই হাজার টাকা থাকে। ভণ্টু মাসে মাসে কিছু কিছু দিয়ে পাঁচ শো টাকা শোধ ক'রে ফেলে বিষয়টা নিয়ে নিক, ওর নামে আমি লেখাপড়া করে দিচ্ছি। আমাকে রেহাই দিক, এ সব কচকচি আমার ভালই লাগে না!"

"এরকম ব্যবস্থা করতে চাচ্ছেন কেন আপনি?"

"নিজের বিবেকের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। ভণ্টু কষ্ট ক'রে সংসার চালাচ্ছে, আমি তার কাকা—আর তা ছাড়া, স্নেহও করি আমি ওকে, আমার উচিত তার কিছু ভার লাঘব করা। কিন্তু তুমিই তো হিসেব ক'রে দেখলে ভাই, বর্ত্তমান বাজারে ওই এক হাজার ছাপ্পান্ন টাকার বেশী সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত—তাও যদি আমি ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকরি পাই এবং এক-নাগাড়ে আট বচ্ছর খাটতে পারি। তার চেয়ে অত হাঙ্গামার দরকার কি, আমার মামার বাড়ির তরফ থেকে যে বিষয়টুকু আমি পেয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, নিয়ে আমায় রেহাই দাও! মাসে মাসে কিছু ফেলে দিলেই পাচশো টাকা দেখতে দেখতে শোধ হয়ে যাবে, তখন তিন হাজার টাকার বিষয় স্বচ্ছন্দে ভোগ কর না তুমি!"

"মামার বাড়ির বিষয়টা কি আপনার একার?"

"নিশ্চয়ই! ভণ্টুর বাপ আর আমি তো সহোদর ভাই নই, বৈমাত্রেয় ভাই। আমার মায়ের বিষয় আমি পেয়েছি, ওতে আর কারো হক্ নেই। দাদামশায় ওটা মাকে দিয়েছিলেন আলাদা ক'রে।"

"কোথায় আছে বিষয়টা?"

"আমার মামার বাড়িতে—হুগলীর থেকে কিছুদূর ইনটিরিয়ারে—"

"ভণ্টু কি বলছে ?"

"বলছে ওসব হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে চাই না। এতে হাঙ্গামাটা কি তুমি বলতো ভাই ?"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, "আপনিই বা অত জোর-জবরদস্তি করছেন কেন ?"

"ওই যে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি তা হ'লে। একটা পেছ্‌টান থাকলে তো ধর্ম্মে কর্ম্মে মন বসে না। হরিদ্বারে দিব্যি একটি আস্তানা পেয়েছিলাম, কোথাও কিছু নেই এক স্বপ্ন দেখে বসলাম। স্বপ্নের দোষ নেই, কর্ত্তব্যে খুঁত ছিল, স্বপ্নে তারই আভাস পেলাম। ফিরে আসতে হ'ল। এবার ভাবছি, কর্ত্তব্যের জড় মেরে তবে বেরুবো। কিন্তু ভণ্টু ঝগড়া লাগাচ্ছে। হিসেব টিসেব তুমি তো দেখলে ভাই, একটু বুঝিয়ে বোলো তাকে।"

"আচ্ছা—"

শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তানন্দও উঠিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, "ভণ্টুর মাথায় গোবর পোরা, হিসেবটিসেব ও কিচ্ছু বোঝে না, তুমি একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও ভাই। তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে বল তো ?"

"কোথা আছেন আপনি ?"

"আমি আছি গোগাবাগানেই। ভণ্টুর ওখানে উঠিনি, দাদা আমাকে দেখলে বড় বিচলিত হয়ে পড়েন, তা ছাড়া, ওদের টানাটানির সংসার, আমি গেলে বাড়তি একটা খরচ হবে তো। তার চেয়ে বিনোদের বাসাতেই আছি ভালো। দুজনেই একতন্ত্রের লোক !"

"বিনোদবাবুও কি সন্ন্যাসী ?"

"না, ঠাকুর তাকে ঘরে থেকেই সাধনা করতে আদেশ দিয়েছেন। তেল মাখতে মানা খালি—"

শঙ্কর অধীর হইয়া পড়িয়াছিল।

বলিল, "আমি তা হ'লে চলি এবার—"

"এসো।"

রাত্রি আটটা হইবে। শঙ্কর গিয়া দেখিল মুক্তো নিজের ঘরে নাই। শুনিল আঙুরের ঘরে একজন বড়লোকবাবু বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। সেখানে আমোদের এবং মদের স্রোত বহিতেছে। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য দশবারোজন নর্ত্তকীর প্রয়োজন হওয়াতে পাড়ার যত নাচনেওয়ালী সেইখানে আহূত হইয়াছে। মুক্তোও সেখানে আছে। সংবাদটি দিয়া কালোজাম বলিল, "আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি তাকে।"

শঙ্কর অনুভব করিল খবর দিলে মুক্তো আসিবে না।

বলিল, "আঙুরের ঘর কতদূর এখান থেকে, চলুন না সেইখানেই যাওয়া যাক্—"

কালোজামকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া শঙ্কর বলিল, "আমাকে সেখানে যেতে দেবে না ?"

কালোজাম মুচকি হাসিয়া বলিল, "ওদের কারুর এখন মানা করবার ক্ষমতা নেই, চারটে থেকে ক্রমাগত মদ খাচ্ছে সব্বাই। তবে পরের ঘরে বিনা নেমন্তন্ন খাওয়াটা ঠিক নয়।"

"মুক্তো কি করছে, একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ভারি—"

"দেখাতে আমি পারি। জানলা খোলা আছে, ওদিকের ওই বারান্দার কোণটায় দাঁড়ালে সব দেখা যাবে। আসুন তা হ'লে চুপি চুপি—"

চুপি চুপি! শঙ্করের আত্মসম্মানে একটু যেন আঘাত লাগিল। কিন্তু ইহা লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিবার সময় ছিল না। কালোজাম বলিল, "আসুন।"

সে অনুসরণ করিল।

কালোজাম তাহাকে লম্বা সরুগোছের বারান্দার একটা অন্ধকার কোণে লইয়া গিয়া একটা খালি উপুড়করা কেরোসিন কাঠের বাক্স দেখাইয়া বলিল, "বসুন তা হ'লে এইখানে। র‍্যাপার দিয়ে পা-টাগুলো একটু ঢেকে বসুন, মশা কামড়াবে না হ'লে। জানালাটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি, দাঁড়ান, গিয়ে খুলে দিয়ে আসি।" কালোজাম চলিয়া গেল। নিটোল কালোজামের মত এই মেয়েটির সহৃদয়তায় শঙ্কর মুগ্ধ হইল।

সামনে একটু ছোট উঠানের মতো, তাহার ওপারেই আঙুরের ঘর। সেখান হইতে বাজনার আওয়াজ আসিতেছে। হার্মোনিয়ম ও বাঁয়াতবলা পুরাদমে চলিতেছে। কালোজাম গিয়া আঙুরের ঘরে উঁকি দিতেই অভ্যর্থনাসূচক একটা হৈ হৈ হল্লা উঠিল। কালোজাম ঘরে প্রবেশ করিল এবং মিনিট পাঁচেক পরে জানালাটা খুলিয়া গেল।

শঙ্কর সবিস্ময়ে দেখিল মুক্তো নাচিতেছে। মাথার উপর একটা মদের গ্লাস রাখিয়া অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে সর্ব্বাঙ্গ হিল্লোলিত করিয়া তবলার তালে তালে মুক্তো নাচিতেছে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া শঙ্কর চাহিয়া রহিল; মুক্তোর এমন রূপ তো সে দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই। চক্ষু দুইটি আবেশময়, প্রতি অঙ্গ হইতে রূপ যেন উপচাইয়া পড়িতেছে। কয়েকটা মাতাল লুব্ধদৃষ্টিতে বসিয়া দেখিতেছে, একটা মোটাগোছের লোক মদ খাইতেছে, জড়িতস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং নাচের তালে তালে বীভৎসভাবে গা দোলাইতেছে।

শঙ্কর আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া পড়িল। উঠিয়া সে কি করিত বলা যায় না; কিন্তু কালোজাম আসিয়া পড়িল এবং বলিল, "চলুন, ঘরের ভেতরই বসবেন, এখানে যা মশা! মুক্তোকে চুপি চুপি ব'লে এসেছি, সে আসবে এখুনি—"

শঙ্কর ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কালোজামের পিছু পিছু আসিয়া মুক্তোর ঘরে প্রবেশ করিল।

কালোজাম বলিল, "আপনি এইখানেই বসুন একটু, আমি যাই, আমার ঘরে লোক এসেছে—"

লোকে যেমন নির্ব্বিকারভাবে আপিস ঘরে ঢোকে তেমনি নির্ব্বিকারভাবে কালোজাম নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। শঙ্কর বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল। মুক্তোর নাচ দেখিয়া সে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

…হঠাৎ আঙুরের ঘর হইতে একটা হাসির হররা উঠিতেই শঙ্কর বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুতপদে গিয়া বারান্দার সেই অন্ধকার কোণটায় পুনরায় হাজির হইল। দেখিল মুক্তো নয়, আর একটি মেয়ে উঠিয়া নাচিতেছে। বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য! মেয়েটি আসন্নপ্রসবা। পুরুষের মতো মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, পুরুষের জুতা পায়ে দিয়া কোমরে হাত দিয়া নাচিতেছে। তাহার গালের হাড় উঁচু, চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, এত মদ খাইয়াছে যে পা ঠিক রাখিতে পারিতেছে না, তথাপি নাচিতেছে এবং তাহার সেই নাচ দেখিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছে, মেয়েটিও হাসিতেছে। হঠাৎ শঙ্করের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। সে বারান্দা হইতে নামিয়া আঙুরের ঘরের দিকে যাইবে বলিয়া পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় মুক্তো আসিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, "ওদিকে কোথা যাচ্ছেন? আমার ঘরে চলুন! এতদিন পরে আজ এলেন যে!"

শঙ্করের আর প্রতিবাদ করিবার শক্তি রহিল না। মুক্তোকে কাছে পাইয়া আসন্নপ্রসবা-নর্ত্তকী-সমস্যার তীক্ষ্ণতা সহসা ভোঁতা হইয়া গেল, মুক্তোর পিছু পিছু সে মুক্তোর ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

মুক্তো আঁচলের ভিতর হইতে এক ডিশ মেটে চচ্চড়ি বাহির করিয়া বলিল, "খান—"

শঙ্কর স্থিরদৃষ্টিতে মুক্তোর পানে চাহিয়া রহিল। মুক্তো মদ খাইয়াছে, চোখ মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। চোখে মুখে অপূর্ব্ব একটা মদির প্রাখর্য্য!

"নিন্, এইগুলো খান।"

শঙ্কর বলিল, "খিদে নেই—"

"তবু খান।"

"খেতে আমি আসি নি, আমি এসেছি তোমার কাছে। সম্ভব হলে এই নরক থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাব আমি।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মুক্তো বলিল, "নরক!"

"নরক নয় তো কি?"

"আস্পর্দ্ধা তো কম নয় আপনার! এই নরকে এসে আমাদের উপকার করবার জন্যে কে পায়ে ধ'রে সেধেছিল আপনাকে শুনি! কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? নরক! আপনাদের সগ্‌গে আপনারাই থাকুন গিয়ে, আমরা সেখানে যেতে চাই না, সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছি আমরা!"

মুক্তোর চোখ মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

"নিন খান।"

"খাব না।"

"আশ্চর্য্য লোক আপনি! এই সেদিন ইনিয়ে বিনিয়ে বলছিলেন—তোমায় ভালবাসি মুক্তো, আজ বলছেন এখানটা নরক! এত বাজে কথাও বলতে পারেন আপনারা!"

"সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি!"

"সত্যি?"

ফিক করিয়া মুক্তো হাসিল এবং বলিল, "তা হ'লে খান এগুলো।"

"আমি খাব না।"

"লক্ষ্মী তো।"

অতিশয় স্নেহভরে গায়ে মাথায় হাত দিয়া মুক্তো শঙ্করকে বিছানায় বসাইল এবং নিজে মেঝেতে বসিয়া খাইবার জন্য তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিল, মা যেমন অবাধ্য ছেলেকে ভুলাইয়া খাওয়ায়।

শঙ্কর বলিল, "আমাকে তুমি ভালবাস না? সত্যি ক'রে বল তো!"

"খান আগে, তারপর বলছি।"

শঙ্কর আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না, খাইতে লাগিল।

খাওয়া শেষ হইতেই মুক্তো উঠিয়া পড়িল।

বলিল, "আমি যাই এবার ও ঘরে।"

"না, ওখানে যেতে দেব না আমি।"

"সে কি হয়! টাকা নিয়েছি—"

"টাকা ফেরত দাও, এই নাও—"

পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া শঙ্কর মুক্তোর হাতে দিল। মুক্তো স্মিতমুখে নোটগুলি গণিয়া দেখিতেছিল—শঙ্কর বাধা দিয়া বলিল, "আমাকে ভালবাস কি-না বল আগে।"

"সত্যি কথা শুনবেন?"

"বল।"

মুচকি হাসিয়া মুক্তো বলিল, "একটুও না! আপনার মতো গঙ্গাজল-মার্কা ছেলে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে!"

"তবে আমাকে আসতে দাও কেন?"

"ভদ্রতার খাতিরে। অত সগ্‌গ নরক বিচার ক'রে যারা, তাদের আমরা ভালবাসতে পারি না। আপনারা জাপানী ফানুস, দুদিন একদিনই দেখতে বেশ!"

তাহার পর নোটগুলি গণিয়া বলিল, "এ কটা টাকায় আমার কি হবে! ওদের সাত দিন মাইফেল চলবে, একশো টাকা অগ্রিম দিয়েছে, বকশিসটা আশটাও মিলবে। নিন, আপনার টাকা, আপনি বাড়ি যান। গরীবের ছেলের এসব ঘোড়ারোগ কেন বাপু! সোন্দর দেখে বিয়ে করলেই পারেন একটা!" মুখ টিপিয়া হাসিয়া কোমর দোলাইয়া মুক্তো বাহির হইয়া গেল। শঙ্কর বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিল।

মুক্তো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল বটে কিন্তু চলিয়া গেল না। বারান্দায় দাঁড়াইয়া জানালার ফুটো দিয়া শঙ্করকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসিয়া থাকিয়া যখন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল মুক্তোর ইচ্ছা করিতে লাগিল তাহাকে ডাকিয়া ফিরায়। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং আঙুরের ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এইবার নতুন ধরণের নাচ দেখাব একটা, তিনটে গেলাস চাই, মাথায় একটা নেব, দুহাতে দুটো।"

এই নূতন প্রস্তাবে বাবুরা হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন।

মুক্তো পুনরায় নাচ সুরু করিল।

শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল একটু দূরে ওরিজিনাল দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শঙ্করকে দেখিয়া তিনি নীচের ঠোঁট দিয়া উপরের ঠোঁটটাকে চাপিয়া চক্ষু দুইটি ছোট করিলেন এবং তাহার পর গরম জামার বুক পকেট হইতে একটি বৃহদাকৃতি নিকেলের ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন দশটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। তাঁহার নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গোঁফ-দাড়ি অন্তর্নিরুদ্ধ আলোড়নে সংক্ষুব্ধ হইল, মনে হইল যেন এখনি বোমার মতো সশব্দে বিদীর্ণ হইয়া পড়িবেন, কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না। এই নাবালকটার সহিত বিতণ্ডা করিয়া নিজের আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। শঙ্করের প্রতি একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া তিনি সোজা মুক্তোর ঘরে ঢুকিয়া গেলেন এবং সশব্দে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উদভ্রান্ত শঙ্কর ফুটপাথের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতেছিল। অপমানে, অক্ষমতায়, বিরাগে, অনুরাগে, হতাশায়, ক্ষোভে তাহার সমস্ত অন্তঃকরণে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তাহার ভাষা নাই। মুক্তো তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কিন্তু মুক্তোকে তো মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছে না। সেই নৃত্যপরা তন্বীকে ···

"মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন।"

শঙ্কর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

"মেমসায়েব? কোন্ মেম সায়েব!"

"ওই যে গাড়িতে বসে রয়েছেন।"

শঙ্কর দেখিল রাস্তার ওপারে একটি মোটরকার দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিকটে যাইতেই শৈল জানালা হইতে

মুখ বাড়াইয়া বলিল, “এসো শঙ্কর-দা, তুমি এমন সময় এখানে যে ?”

শঙ্কর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছি, তুই এখানে হঠাৎ !”

“আমি থিয়েটার দেখতে গেছলাম, বাড়ি ফিরতে ফিরতে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেলাম, তাই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম। তুমিও থিয়েটার দেখতে গেছলে নাকি ?”

শঙ্কর হাসিয়া বলিল, “ঠিক ধরেচিস তো! তোর কাছে ফাঁকি দেওয়া শক্ত !”

“আহা !”

সহাস্য সকোণ কটাক্ষে চাহিয়া শৈল ভ্রূলতা আকুঞ্চিত করিল। তাহার পর বলিল, “চল, তোমাকে হস্টেলে পৌছে দিয়ে যাই। এই রাত্তিরে ঠাণ্ডায় অতটা দূর হেঁটে যেতে হবে তো আবার—”

“হাঁটা আমার খুব অভ্যেস আছে, তুই যা—”

“অতটা অহঙ্কার ভাল নয়, এসো—”

“তুই যা না—”

“এসো বলছি, ভাল হবে না—”

শঙ্কর গাড়িতে না উঠিয়া পারিল না, উঠিয়া গিয়া শৈলর পাশে বসিল এবং ড্রাইভারকে হস্টেলের ঠিকানাটা বলিয়া দিল। শৈল বলিল, “শিরিফরহাদ কেমন লাগল ?”

“চমৎকার !”

“বড্ড আজগুবি কিন্তু—”

এটা শৈলর মুখের কথা। আসলে সে শিরিফরহাদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শৈল বলিল, “রাগ করেছ আমার ওপর কেন বল তো।”

বিস্মিত শঙ্কর বলিল, “রাগ করব কেন ?”

“নিশ্চয় রাগ করেছ, একবারও তো যাও না আজকাল। আমি কেমন এস্রাজ বাজাতে শিখেছি, তোমায় শোনাতে ভারি ইচ্ছে করে, কিন্তু তুমি তো আজকাল যাওয়াই ছেড়েছ। কেন যাও না শঙ্কর-দা, একবারটি গেলে পড়ার কি এমন ক্ষতি হয় বল তো—”

রিণির কথা শৈলর মনে পড়িল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে প্রসঙ্গ সে তুলিল না।

শঙ্কর বলিল, “যাবো একদিন।”

“তোমাকে চিনি না আমি, যাবে যা তা আমি জানি !

হস্টেলের নিকট গাড়ি থামিল।

শঙ্কর নামিতে নামিতে বলিল, “ঠিক যাব—”

“কবে ?”

উত্তরের জন্য শৈল সাগ্রহে শঙ্করের মুখের পানে চাহিল।

“তা ঠিক বলতে পারি না এখন।”

শৈল কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে প্রত্যাশা করিয়াছিল আগেকার মত শঙ্কর-দা বলিবে, “কালই যাব নিশ্চয়” এবং তাহার নিশ্চয়তার অনিশ্চয়তা লইয়া শৈল তাহাকে একটু ঠাট্টা করিবে। কিন্তু শঙ্কর-দা সে কথা তো বলিল না, আজকাল শঙ্কর-দা বেশ ওজন করিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছে! আগে তো শঙ্কর-দা এমন ছিল না।

“এসো একদিন, বুঝলে ?”

“যাবো।”

গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর পিছনের লাল বাতিটার পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদূর গিয়াই গাড়ি মোড় ফিরিল। শঙ্কর তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। নির্জ্জন পিচ্‌ঢালা রাস্তাটা রহস্যময় ভাষায় তাহাকে কি যেন বলিবার চেষ্টা করিতেছে!

ক্রমশঃ

যৌবন

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়

চোখে চোখে চাইতে কেন আজকে এত লজ্জা ?
বুঝ্‌তে নারি কেন তোমার অভিসারের সজ্জা ?
অন্তরে যা নিত্য রহে চিত্ত-চোরার ভঙ্গী,
বলতে তারে নেই কি ভাষা, কোথায় চির-সঙ্গী ?
স্বপ্ন-রঙীণ্ হৃদয়তলে যে-প্রেম আছে বন্দী,
বাইরে আমার আগ্রহে তার নিতুই নূতন ফন্দী !
লুকিয়ে দেখা বরং ভালো, গুপ্ত প্রেম-শুক্তি,
দিও না সেই গূঢ় প্রেমে চিত্ত হ’তে মুক্তি !
আমার গীতি-ইঙ্গিতে কি আজকে কাটে ছন্দ ?
আমার দেওয়া মালার ফুলে নাই কি কোন গন্ধ ?
নীরব থাক, নাই ক’ ক্ষতি--থাকুক্ তোমার লজ্জা ;—
বলবে মোরে কিসের তরে আজ্‌কে বাঁসক-সজ্জা ?

প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন

শ্রীশোভা সেন বি-এ

১৩৪৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীকমলা রায় এম-এ মহাশয় লিখিত "প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলাম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে লেখিকা যে প্রকার নিষ্ঠা ও পরিশ্রনের সহিত নীরস মূলগ্রন্থ, তাম্রলিপি ও শিলালিপি ইত্যাদি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রবন্ধের উপযোগী মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে তিনি শুধু সুধীজনের নহে, সাধারণ পাঠকেরও প্রশংসার পাত্রী। প্রকাশভঙ্গী সহজ ও সাবলীল এবং সাধারণ পাঠকের বোধগম্য। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশমত মূলগ্রন্থাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার অনেক মন্তব্যই নির্ভুল এবং বিচার-সহ নহে।

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু "প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন।" কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা বৌদ্ধবিহারের সবিস্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। প্রাচীন বাংলার সকল বৌদ্ধ বিহারই "বিদ্যার্জ্জন ও দানের" কেন্দ্র ছিল এই ধারণাই লেখিকার সমগ্র প্রবন্ধের ভিত্তি। কিন্তু সকল বৌদ্ধ বিহারই যে বিদ্যার্জ্জনের কেন্দ্র ছিল, এই অনুমানের কি কারণ থাকিতে পারে? তাঁহার সুদীর্ঘ পাদ-টীকায় ইহার পরিপোষকে আদৌ কোন প্রমাণ তিনি দেন নাই। এইরূপ সুবিধাজনক অনুমান কোনও ভার-সহ উক্তির ভিত্তি হইতে পারে না।

"বর্ত্তমান বাংলায় শিক্ষাবিস্তার মানসে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। প্রাচীন বাংলায় বিদ্যাশিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল বলিয়া বোধ হয় না।" (পৃষ্ঠা ১৯) এই বলিয়া লেখিকা প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম লাইন পড়িয়া মনে হয় যে, বর্ত্তমান বাংলায় যেমন সাধারণের বিদ্যাশিক্ষা ও দানের ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রাচীন বাংলায়ও যে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইহাই তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে কেবলমাত্র বিহারের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। প্রথমত, সকল বিহারেই যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু যে সকল বিহারে সে বন্দোবস্ত ছিল সেখানে যে বৌদ্ধগণ ব্যতীত সাধারণের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল এইরূপ কোন প্রমাণই আলোচ্য প্রবন্ধে পাওয়া যায় না। যদি তিনি 'বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন' দ্বারা শুধু বৌদ্ধদেরই বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা বুঝাইতে চাহেন তাহা হইলে, জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধারণের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান বাংলার বিদ্যালয়ের সহিত বৌদ্ধবিহারের তুলনার যৌক্তিকতা কোথায়? একই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লেখিকা দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন,—

"নাগার্জ্জুনী কোণ্ডালিপি হইতে জানা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাংলায় বৌদ্ধবিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাংলা থেরাবাদী ভিক্ষু আচার্য্যগণের কেন্দ্রস্থল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।" (পৃষ্ঠা ১৯)[১] এই তথ্য বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতনের সম্পর্কে কিরূপে আলোকপাত করে? নাগার্জ্জুনী কোণ্ডালিপিতে এরূপ প্রমাণ কোথাও নাই যে, ঐ সকল আচার্য্য-সেবিত বিহারগুলি বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। থেরাবাদী ভিক্ষু-আচার্য্যগণের উপর যে বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়?

"কার্জঙ্গল, সমতট, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও তাম্রলিপ্তিতে বহু বৌদ্ধ-বিহার ও বিদ্যালয় ছিল।" পৃষ্ঠা (১৯) পাদটীকার নির্দ্দেশ মত Watters সম্পাদিত On Yuanchwang, Vol II, p. 183-208, পাঠ করিয়া বহু বৌদ্ধ-বিহারের সন্ধান মিলিয়াছে, কিন্তু কোনও "বিদ্যালয়ে"র সন্ধান মেলে নাই। কার্জঙ্গল, সমতট, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে এরূপ প্রমাণ আমরা কোথায়ও পাই না যে, ঐ সকল স্থানে বৌদ্ধ বিদ্যালয় ছিল। তবে কি লেখিকা বিহার বলিতে বিদ্যালয় বুঝিয়াছেন? তাহা হইলে "বহু বৌদ্ধবিহার ও বিদ্যালয় ছিল" এরূপ উক্তির তাৎপর্য্য কি? ঐ গ্রন্থে ১৮৪ পৃষ্ঠায় চৈনিক পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্দ্ধন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The people respected (in one text—"liked") learning"[২] পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বিদ্যাশিক্ষা ও "বিদ্যালয়" সম্পর্কে ইহা ছাড়া অন্য কোন উল্লেখ লেখিকা-নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে নাই। কার্জঙ্গল সম্বন্ধে আছে,

"The climate was warm and the people were straight-forward ; they esteemed superior abilities and held learning in respect."[৩] বিদ্যালয় ও বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের লেখিকা-নির্দ্দিষ্ট অংশে, এই মাত্র তথ্যসম্ভার মেলে। উভয় স্থানের সাধারণ দেশবাসী সম্পর্কে এই বর্ণনা হইতে লেখিকা বহু বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রখর কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে কল্পনার ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন সম্বন্ধে লেখিকা বলিয়াছেন, "রাজধানীর অতি সন্নিকটে একটী বৌদ্ধ বিদ্যানিকেতনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত সভামণ্ডপ এবং উচ্চ দ্বিতল প্রকোষ্ঠ সকল ছিল, তথায় সাত শত মহাজন ভিক্ষু বাস করিত।" ('পৃষ্ঠা ১৯)। লেখিকার নির্দ্দেশ মত Watters সম্পাদিত On Yuanchwang, vol. II গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠা হইতে আমরা ইহার মূল বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিতেছি। "Twenty li to the west of the capital was a magnificent Buddhist establishment the name of which is given in some text as Po-Shih: P'o, while the D text of the life has Po-Kih-P'o and the other text have Po-Kih-Sha. In this monastary, which had special halls and tallstoryed chambers lived 700 brethren, all Mahajanists." স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মূল কথাটী হইতেছে "Buddhist establishment"। লেখিকার

১। Ep. Ind, Vol xx, p. 23 f. ed. Vogel

২। Watters' Yuanchwang, vol II, p. 184

৩। Ibid., p. 182

লেখনীতে ইহা বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতনে রূপান্তরিত হইয়াছে। Establishment-কে বিদ্যানিকেতনে পরিণত করা লেখিকার অনুবাদ-চাতুর্য্যের পরিচয় দেয়; "tall storyed chambers"-এর অনুবাদ কিরূপে "উচ্চ দ্বিতল প্রকোষ্ঠ সকল" হইতে পারে তাহা সাধারণ-বুদ্ধির অতীত।

প্রবন্ধের নাম "প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন"; প্রায় তিন শত লাইন ব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধের মধ্যে লেখিকার কৃপণ লেখনী মাত্র পনর লাইনে বিদ্যানিকেতন ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বক্তব্য শেষ করিয়াছে। অবশিষ্টাংশ বিহার বর্ণনায় মুখর। প্রবন্ধের নাম "বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন" না হইয়া 'বৌদ্ধ-বিহার' হইলে, প্রবন্ধের নাম ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা হইত। এই মারাত্মক ত্রুটির কথা বাদ দিলেও বৌদ্ধ-বিহার সম্বন্ধে লেখিকা যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই প্রমাণ সাপেক্ষ। লেখিকা বলিয়াছেন, "মৌর্য্যযুগে উত্তর বাংলায় অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে বৌদ্ধ-বিহারের অস্তিত্ব ছিল, তাহা মহাস্থানগড়লিপি ভালরূপেই প্রমাণিত করিয়াছে (পৃষ্ঠা ১৫; para 2) Indian Historical Quarterly 1934., P. 54, তাঁহার এই উক্তির একমাত্র ভিত্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় "ভালরূপে" ত দূরের কথা, আদৌ প্রমাণিত হইয়াছে কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। ডক্টর ভাণ্ডারকর মহাস্থানগড় লিপির এইরূপ ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন,— ... To Galadana [Galardana] of the Samvamgiyas......(was granted) by order The Mahamatra from the highly auspicious Pundranagara will cause it to be carried out. (And likewise) paddy has been granted to the Samvamgiyas, The out-break (or distresses) in the town during this out burst of Super-human agency shall be tided over, when there is an excess of plenty, this granery and the treasury (may be replenished) with paddy and the gandaka Coins." [৪]

যদি ডাঃ ভাণ্ডারকরের অনুবাদ নির্ভুল হইয়া থাকে তবে লেখিকার সকল সিদ্ধান্তই অমূলক হইয়া যায়। অবশ্য লেখিকা যদি সম্‌বংগীয় স্থলে সড়নড়গিয় পাট গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তাহার উক্তি সমর্থিত হয়। কিন্তু পাঠ সম্বন্ধে যখন এরূপ গুরুতর মতভেদ আছে তখন এক পাঠের আদৌ উল্লেখ না করিয়া সুবিধাজনক পাঠটিকে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত কি? ইহাকে কি ভালরূপ প্রমাণ বলে?

সুপ্রযুক্ততা-বোধের অভাব ও পরিমাণ-বোধ-রাহিত্যের ফলে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয় অনেক অনাবশ্যক ও অবাস্তব তথ্যের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। লেখিকার উদ্দেশ্য যখন বৌদ্ধ-বিদ্যানিকেতন বর্ণনা, তখন কেবল কতকগুলি বৌদ্ধ-বিহারের নাম এবং তথায় ভিক্ষুগণ কি ভাবে বাস করিত—তাহার অতিরঞ্জিত বর্ণনার দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের প্রতি সুবিচার করিয়াছেন কি? বৌদ্ধ বিহারের পাঁচ কলম-ব্যাপী সুদীর্ঘ বর্ণনান্তে লেখিকা লিখিয়াছেন, "এই অনুসারে বাংলার প্রাচীন বিহার সকল পরিচালিত হইত বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি।" (পৃষ্ঠা ২৩)। কিন্তু তিনি এইরূপ অনুমান করিলেন কিরূপে? ইতিহাসে ভিত্তিহীন অনুমানের স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

লেখিকা ঐতিহাসিক মালমসলা যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত কাজে লাগাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

---

[৪] Ep. Ind., Vol. XXI, p. 89 ff

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুবোধ রায়

নয়নের জল আর বুকের শোণিত দিয়ে তাতে
লিখিলে যে জীবনের অপরূপ করুণ কাহিনী,
বীণার মূর্চ্ছনা যেন বাজাল সে বাণী নিজ হাতে,
বেদনার মন্দাকিনী—প্রাণদীপ্ত চেতনা-বাহিনী।

তাহে শুচিস্নাত দেশ—সাহিত্য লভিল নব ধারা,
চিরন্তন রূঢ় সত্যে ঠাঁই দিল কল্পনা-বিলাস;
নিপীড়িতা বন্দিনী সে ভাঙ্গিল পাষাণ মহাকারা,
ভীরু ও দুর্ব্বল যত ফিরে পেল হারানো বিশ্বাস।

পঙ্কজে বাণীর পূজা, মূর্খ যে পঙ্কের কথা বলে;
তোমার জীবন হ'তে জন্মিল সাহিত্য-শতদল।
দিলে তুমি দীপ্ত আলো আপনারে জ্বালাবার ছলে
মৃত্যুঞ্জয় হ'লে তুমি পান করি ধরার গরল।

নটরাজ উদয়শঙ্কর ও ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলাকেন্দ্র

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রাণা মহারাণাদের অতীত কীর্ত্তি ও বীরত্ব গাথা বিজড়িত রাজপুতানার শ্রেষ্ঠনগর উদয়পুর। একদা এই উদয়পুরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, কে জানতো যে সেই শিশু উদয়শঙ্কর একদিন সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে

ছেলেবেলা থেকেই চিত্রাঙ্কণ ও শিল্পকলার দিকে একটা সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে দেখে উদয়শঙ্করের পিতা তাঁকে বোম্বাইয়ের আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। উদয়শঙ্করের পিতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাঃ শ্যামশঙ্কর চৌধুরী ছিলেন ঝালওবার রাজ্যের মন্ত্রী। বোম্বাই আর্ট স্কুলে পুত্রের চিত্রকলায় অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে ১৯২০ খৃঃঅব্দে তিনি উদয়শঙ্করকে চিত্রবিদ্যায় অধিকতর উন্নতিলাভের জন্য বিলাতে পাঠিয়ে ছিলেন।

লণ্ডনের ‘রয়েল কলেজ অফ আর্টস্’ নামক প্রসিদ্ধ কলাভবনে বিশ্ববিদিত শিল্পী সার উইলিয়ম রদেনস্টাইনের শিষ্যরূপে তিনি চিত্রবিদ্যায় চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন। সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উদয়শঙ্কর সেখানে স্পেন্সার্ ও জর্জ্জ ক্লসেন্ পারিতোষিক অর্জ্জন করেন। এই সময় উদয়ের পিতা শ্যামশঙ্কর চৌধুরী মহাশয় বিলাতে ছিলেন। তিনিও গুণী লোক ; সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে ও অভিনয়ে শ্যামশঙ্কর ছিলেন সুদক্ষ। লণ্ডনে তিনি গত মহাযুদ্ধে আহত ভারতীয় সেনাগণের সাহায্যার্থ একটি নাট্যাভিনয় ও জল্‌সার আয়োজন করেন। উদয়শঙ্কর এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের দ্বারা পিতাকে নানাদিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। উদয়শঙ্করের জীবনে সেই প্রথম রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা।

ভারতীয় নৃত্যকলার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক তাঁর বরাবরই ছিল। তিনি আপন মনে অবসরক্ষণে নৃত্য-অভ্যাস করতেন। বন্ধুবান্ধবেরা ধরলে তাদের পার্টিতে ও ভোজসভায় তিনি নিজের উদ্ভাবিত বিশেষ ভঙ্গীর ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করতেন। এমনিই একটি অন্তরঙ্গদের নৃত্য প্রদর্শনকালে ভুবনবিদিতা রুষনর্ত্তকী আনা পাভ্‌লোভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। সেটা ১৯২৩ সাল। আনা পাভ্‌লোভা দেখেই বুঝেছিলেন এই তরুণ ভারতীয় শিল্পীর মধ্যে অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা অন্তর্নিহিত রয়েছে। তিনি উদয়শঙ্করকে আপনার দলভুক্ত করে নিলেন। ভারতীয় নৃত্য কৌশল শিখলেন তিনি উদয়ের কাছে এবং তাঁর পরবর্ত্তী নৃত্য প্রদর্শনের আসরে প্রমোদসূচীর মধ্যে ছটি ভারতীয় নৃত্যকে স্থান দিলেন। এই ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন কালে বিশ্ব-বিশ্রুত নৃত্যপটিয়সী আনা পাভ্‌লোভার প্রধান নৃত্য সহচররূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল উদয়শঙ্করের। পাভ্‌লোভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৃত্যানুচর রূপে নানাদেশে ঘোরবারও সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি! পাভ্‌লোভার মৃত্যুর পর উদয়শঙ্কর নিজে একা দীর্ঘকাল য়ুরোপে ঘুরে ঘুরে সেখানকার নানা নাট্য-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে এসে বহু অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করে ১৯২৯ খৃঃঅব্দে ভারতে ফিরে আসেন।

ভারতে ফিরে এসে উদয়শঙ্কর সর্ব্বপ্রথম তাঁর নৃত্য প্রদর্শন করেন এই কলিকাতা মহানগরীরই বুকে। অধুনাবিলুপ্ত ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা প্রদর্শনের প্রথম আয়োজন করেছিলেন ‘ফোর-আর্টসে’র প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সুরসিক কলাবিদ ও বিদ্বজ্জন সমাজে উদয়শঙ্করকে পরিচিতও করিয়ে দিয়েছিলেন এই সর্ব্বজন-পরিচিত হরেন ঘোষ। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদয়শঙ্করের নৃত্য-নৈপুণ্যের সেদিন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সমস্ত দর্শকেরাও মুগ্ধ হয়েছিল সে নাচ দেখে।

এরপর কুমারী এ্যালিস্ বোনার নামে একটি সুইজার-ল্যাণ্ডবাসিনী মহিলা-শিল্পীর আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কয়েকজন ভারতীয় নৃত্যশিল্পী ও সুরশিল্পীকে নিয়ে উদয়শঙ্কর একটি দল গঠন করেন। কুমারী এ্যালিস বোনার একজন য়ুরোপীয় মহিলা হ’লেও তাঁর শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতির একান্ত অনুরাগিনী করে তুলেছিল।

এঁরই তত্ত্বাবধানে ও অর্থানুকুল্যে এই নবগঠিত ভারতীয় শিল্পীর দল উদয়শঙ্করের অধীনে য়ুরোপ ও আমেরিকায় অভিযান করে এবং সর্ব্বত্র অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জ্জন করে যশ ও জয়ের গৌরব-মাল্য কণ্ঠে নিয়ে ফিরে আসে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই সময় উদয়শঙ্করকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—যদিও তুমি নানাদেশের কলাতত্ত্ববিদ ও রসবেত্তাদের দুর্লভ প্রশংসা অর্জ্জন ক'রে ফিরেছ আজ, কিন্তু আমি জানি, এতে তোমার শিল্পীর আত্মা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হ'তে পারেনা। তোমার অন্তরের নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে তুমি নিশ্চয়ই এ সত্য উপলব্ধি করতে পারছো যে, তোমার স্বপ্ন যে সার্থকতার পথ সন্ধান করে ফিরছে সে পথ তোমার সম্মুখে আজ সুদূরবিস্তৃত। সেখানে তোমার প্রতিভার বাহুস্পর্শের অপেক্ষায় রয়েছে—নব নব ভাবধারার মূর্ত্তি পরিগ্রহের ব্যাকুলতা। তুমি সৃষ্টি করবে সেই অসীমের বুকে প্রাণময় সৌন্দর্য্যে সুষমার অনন্তরূপ!

কবি হলেন দ্রষ্টা, তাই আমরা বলি তিনি ঋষি। রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পীর অন্তরের কথা ঠিকই অনুমান করেছিলেন। উদয়শঙ্করের মনের মধ্যে এই ভাবনাই সেদিন বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছিল—ভারতের বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতকলা ও সুরশিল্প, ভারতের নৃত্য, লাস্য ও নাট্যাবদানকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। ভারতের চারিদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে রয়েছেন যে সব কলালক্ষ্মীর বরপুত্রগণ, একক চেষ্টায় যাঁরা এ শিল্পকলার বিশেষ কোনো উন্নতিরও প্রসারে সমর্থ হচ্ছেন না—সেই সব অসামান্য গুণী শিল্পীদের ডেকে এনে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে একটি কেন্দ্রীয় কলাভবনের মন্দিরপ্রাঙ্গণে। যেখানে তাঁদের সকলের মিলিত চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হবে যে অচিরে ভারতের এই কেন্দ্রীয় কলাক্ষেত্র বিশ্বের রসবিলাসী কলানুরাগীদের তীর্থক্ষেত্র হ'য়ে উঠবে।

সকল দিক থেকে ভারতীয় নৃত্যকলায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত ও সুদক্ষ না হ'য়েই একাধিক যশোলুব্ধ শিল্পী বেরিয়ে পড়েন সাগরপারে দিগ্বিজয়ের আশায়। যশের সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনও যে তাঁদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য থাকে একথা অস্বীকার করা চলেনা। কিন্তু অসম্পূর্ণ শিক্ষা, অপরিণত কল্পনা, এবং কলানৈপুণ্যের যে একটা শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড রসিক সমাজ কর্তৃক পৃথিবীর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে তার কাছে পৌছবার অক্ষমতা ও অযোগ্যতার জন্য এইসব ভারতীয় শিল্পীদের শুধু যে অনাদর ও অবজ্ঞাই পেতে হয় তাই নয়, অর্থাভাবে বিদেশে বহু দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করতে হয়। তাঁদের এই ব্যক্তিগত অসুবিধা ছাড়া আর একটা মস্ত বড় অনিষ্ট করেন তাঁরা—ভারতীয় নৃত্যকলা ও গীতবাদ্যের প্রতি বিশ্বের লোকের অশ্রদ্ধা পোষণের উপলক্ষ হয়ে ওঠেন এইসব অশিক্ষিত ও অপটু শিল্পী—এইটেই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং শোচনীয়।

উদয়শঙ্কর চান এই সব শিল্পীকে সেই শোচনীয় অকৃতকার্য্যতার দুঃসহ বেদনা ও তার আনুষঙ্গিক দুরবস্থা থেকে বাঁচাতে—সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সুনাম রক্ষা করতে—তাকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় উন্নত ও বিশ্ব-বিদিত করতে। এর একমাত্র উপায় ভারতে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠা করা—যেখানে এই সব অশিক্ষিত

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর

অর্দ্ধ-শিক্ষিত নৃত্য-শিল্পীরা এবং যাদের মধ্যে স্বভাবতই একটা নৃত্যানুরাগ ও সঙ্গীতানুরক্তি অন্তর্নিহিত আছে কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা না থাকায় তাঁদের সে বিধিদত্ত শক্তি একটা শিল্পানুকুল পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারছে না—তাঁরা সেই কেন্দ্রীয় কলাভবনে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে নির্ভয়ে বিশ্ব-জয়ে যাত্রা করবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবেন।

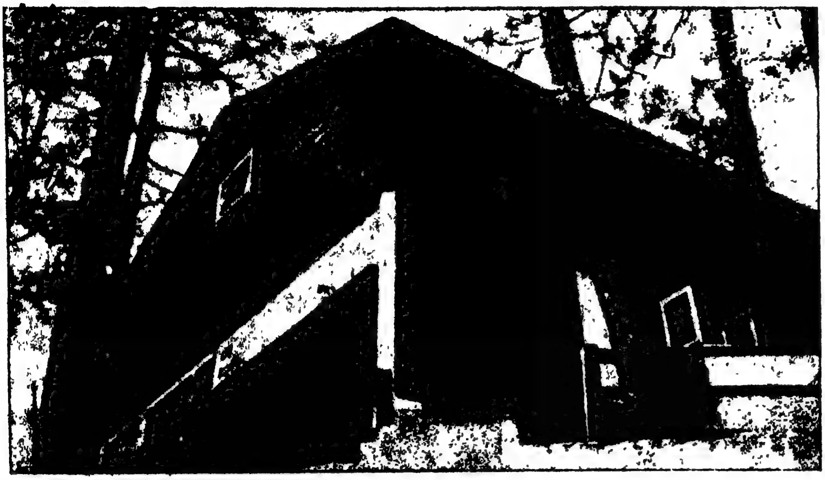

সিমতলায় প্রধান ষ্টুডিও

ভারতের প্রাচীন নৃত্যকলা ও সঙ্গীত শিল্প একটা নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ ধরেই এতকাল চলে এসেছে এবং তারই মধ্যে ওরা চিরদিন সিদ্ধি ও সার্থকতার সন্ধান করে ফিরেছে। উদয়শঙ্কর চান ভাবী শিল্পীরা ভারতের সেই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ও কলা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে যেন দিন দিন তার অধিকতর উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হন। নব নব পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যেন নষ্ট রাজ্যের এই সুর-তালের রঙ্গোৎসবে অভিনব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানে লব্ধ বা 'গুরুদত্ত শিক্ষার মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ না থেকে যাতে সে প্রতিভা ও শক্তি নব নব সৃজনী ধারার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারে সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই হবে—উদয়শঙ্করের পরিকল্পিত এই ভারতীয় কলাকেন্দ্রের প্রধান ব্রত।

ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ

দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল এই স্বপ্নই ছিল উদয়শঙ্করের জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। শিল্পীর সেই স্বপ্ন এতদিনে রূপ পরিগ্রহ করে সত্য হয়ে উঠেছে। ১৯৩৭-৩৮ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের 'ডার্লিংটন হল' শিল্পীর সেই স্বপ্ন পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করেন। তারপর এগিয়ে আসেন উদয়শঙ্করের অনুরাগী অসংখ্য য়ুরোপীয় বন্ধুবান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীরা। আমেরিকাও এই ব্যাপারে শিল্পীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সাগর পারের এই সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে উৎসাহিত হয়ে উদয়শঙ্কর তাঁর পরিকল্পিত ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন ১৯৩৮ সালে। এখানে এসেই তিনি এই কলাভবন প্রতিষ্ঠার উপযোগী অনুকূল স্থানের সন্ধান করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এমন একটি স্থান তিনি নির্ব্বাচন করবেন যেটি বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর হবে এবং সেস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক

আবেষ্টন এই ললিত কলা সাধনার পক্ষে শুধু সম্পূর্ণ অনুকূল ও উপযোগীই নয়, উপরন্তু শিক্ষার্থীদের চিত্তে একটা অনুপ্রেরণা ও দিতে পারবে।

বহুস্থান ঘুরে ঘুরে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে অবশেষে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের পাদমূলে অবস্থিত প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য্যে অনুপম 'আলমোড়া' অঞ্চল তাঁকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। আলমোড়ার অধিবাসীরা উদয়শঙ্করকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে নিলে। শিল্পীর পরিকল্পনাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে তাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সকল দিক থেকে তাঁকে সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত হল। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্ট উদয়শঙ্করকে এই কলা-ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আলমোড়া নগরোপকণ্ঠস্থ সিমতলা অরণ্যবর্ত্তী ৯৪ একার স্থান অর্থাৎ প্রায় ২৮২ বিঘা ভূমি ছেড়ে দিলেন। এইখানে শিল্পীর এতদিনের ধ্যেয়িত কলাভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে অস্থায়ীভাবে সিমতলা থেকে মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত রাণীধারা গিরিপৃষ্ঠের কয়েকখানি সুন্দর বাংলো ভাড়া নিয়ে তিনি উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান আরম্ভ করে দিয়েছেন। একটি প্রশস্ত নৃত্যশালা ও গীতবাদ্যশিক্ষার উপযোগী সুবৃহৎ স্টুডিয়ো ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছে। এই স্টুডিয়োসংলগ্ন সাজঘর, সাধনকক্ষ ও যন্ত্রগৃহ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে আজ উদয়শঙ্করের এই নৃত্যশালাই একমাত্র বিরাট নাট্য-মন্দির—যেখানে তিনশত লোক আরামে বসে সূক্ষ্ম ও সুকুমার কলা চর্চ্চায় কালাতিপাত করতে পারেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের একাধিক বিশিষ্ট গুণী শিল্পীরা এই প্রথম একত্রিত হয়েছেন এখানে—পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভারতীয় নৃত্য সুর শিল্প ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দেবার গৌরবময় ব্রত নিয়ে। ত্রিবাঙ্কুরের ভারতবিদিত নৃত্যশিল্পী ও কথাকালি নৃত্যকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপকার গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রী, মাহিয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ গুণী যন্ত্র-শিল্পী ও সঙ্গীতবিশারদ ওস্তাদ আল্লাউদ্দীন খাঁ সাহেব—ভুবনবিদিত শিল্পী উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত এই ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলাকেন্দ্রে শিক্ষা গুরুরূপে যোগদান করেছেন। আমরা এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘায়ু ও সাফল্যমণ্ডিত ক্রমোন্নতি কামনা করি।

ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা উদয়শঙ্কর স্বয়ং এবং তাঁর সহকারী অন্যান্য দেশপ্রসিদ্ধ গুরু ও ওস্তাদ গুণীরা তাঁদের আলমোড়ার শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সম্ভবতঃ এই শীতের সময় নভেম্বর বা ডিসেম্বরে কলিকাতায় নৃত্য প্রদর্শন করতে আসবেন। স্বনামখ্যাত প্রমোদ পরিবেষক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ এই অনুষ্ঠান আয়োজনের ভার নিয়েছেন শোনা যাচ্ছে। সুতরাং আশা করা যায়—এবার উদয়শঙ্করের আসরে আমরা তাঁর এই ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক কলাকেন্দ্রের প্রদত্ত শিক্ষা দীক্ষার উৎকর্ষের প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছু পাবো।

উদয়শঙ্কর. গুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি, গুরু কন্দপ্প পিলাই ও ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ।

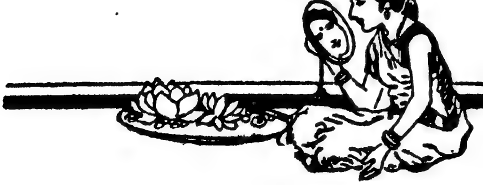

তীর ও তরঙ্গ

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

দশ

মাদুলী আর বেলপাতার মহিমা অপার। পরদিন ছেলে একবারও বাড়ীর বাহিরে যায় নাই। মন্দাকিনী নিশ্চিন্ত। খুশি মনে আজ রান্নাঘরে সর ভাজিতেছেন—সর ভাজা খাওয়াইতে কেবল অণিমাই জানে না! ক্ষীর আর নারকেল একসঙ্গে জ্বাল দিলেন, মাদুলীর মত এক একটা পুলি বানাইলেন, ঘিয়ে ভাজিয়া দু'খানা থালায় সাজাইয়া রাখিলেন—কখন দুধ আসিলে রসপুলি করিবেন। তাঁহার হাতের তৈরী খাবার একবার যে খাইয়াছে চিরদিন সে তার সুখ্যাত করে। তাঁর হাতের রান্নার সঙ্গে নাকি এ গায়ের আর কাহারো তুলনা!

সন্ধ্যা হইয়াছে, বেশিক্ষণ হয় নাই। মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি বাকি কাজ সব সারিয়া লইতে চান। ভাত আর মাছের ঝোলটা নামাইতে পারিলেই ব্যস! তারপর—তারপর খোকার কাছে গিয়া বসিবেন। আর কদিনই বা সে বাড়ী আছে। পুত্র না হয় সারাদিন মুখ বুজিয়া রহিয়াছে, মন্দাকিনীর অভিমান করিলে চলিবে কেন! তিনিই না হয় সাধিয়া কথা কহিবেন—কালকের অমন একটা ব্যাপারের পর ছেলে হয় তো লজ্জায় কথা আরম্ভ করিতে পারিতেছে না। শত হইলেও লোকে বলে—কুপুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়। তাহার ছেলেকে পর করিবে সাধ্য কার!

হাঁড়িতে গলা-সমান জল চাপাইয়া দিয়া মন্দাকিনী আহ্নিক সারিয়া লইতে বড় ঘরে আসিলেন। মনে মনে মহড়া দিয়া আসিয়াছেন, পুত্রের সঙ্গে কি দিয়া কথা সুরু করিবেন।

ব্রজনাথ বাবলুকে লইয়া বারান্দার চৌকিতে বসিয়াছেন—ছোট নাতীকে মুখে মুখে ইংরাজী বর্ণমালা শিখাইতেছেন। অমন সদাহাস্য বৃদ্ধ আজ বড় গম্ভীর। কাল রাত্রি হইতে এই সংসারের উপর বিক্ষোভের মেঘভার চাপিয়া আছে।

নীলু আসিয়া মার কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে, "মা, দাদা এই খানিক আগে বাইরে চলে গেল!"

মন্দাকিনীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া ওঠে। আবার! হতাশার শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া দশ বছরের মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন কয়েক মুহূর্ত্ত! খানিক বাদে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেন, "কখন গেল?"

"এই তো খানিক আগে—তুমি যখন ও-ঘরে মাছ সাঁতলাচ্ছো!"

"কৈ, ঐ যে তোর দাদার জামা রয়েছে আলনায়।" মন্দাকিনী মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে চান নিজেকেই, "বাইরে গেলে বুঝি জামা পরে যেত না? বার-বাড়ীতে গেছে হয় তো।"

"না মা, আমি দেখেছি। অনুদিদের বাড়ীর দিকেই তো গেল দেখলাম।—বাক্স থেকে আর একটা নতুন জামা বার করে পরে বেরুল। ঠাকুরদাকে বলে গেল একটু ঘুরে আসি।"

মন্দাকিনীর আহ্নিক শিকায় তোলা থাক্। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকেন হতভম্বের মত। হতাশার শূন্য পাত্রে ধীরে ধীরে নির্ব্বাক ক্রোধের গাঁজলা ওঠে অপ্রমেয়। আবার? এরি মধ্যে? মন্দাকিনীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা কম্পনের তরঙ্গ বহিয়া যায়—বুকের মধ্যে অসহ্য তোলপাড়! নীলুকে চাপা গলায় বলিলেন, "খুকী, তুই রান্নাঘরে গিয়ে একটু বোস—ফেন উতলে উঠলে—"

"আমি একা থাকতে পারব না—ভয় করে।"

"তবে ঘরেই থাক, বাবলু খেতে চাইলে বলিস্ এখনো ভাত হয়নি। আমি এলাম বলে! বুঝেছিস্?"

নীলু ঘাড় নাড়ে।

মন্দাকিনী নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। একা একা রওয়ানা হইলেন অণিমাদের বাড়ীর উদ্দেশে। তার কাছে এখন কোন বাধাই বাধা নয়। পথে এখন বাঘ, ভালুক, জল, ঝড়, ভূমিকম্প—যত বড় বিপর্য্যয়ই ঘটুক না কেন, মন্দাকিনী প্রাণপণ করিয়া সন্তর্পণে ও-বাড়ীর বড় ঘরের পিছনে গিয়া এখন বেলে-জ্যোৎস্নার আবছায়ায় গা-ঢাকা দিয়া কান খাড়া রাখিয়া অন্ততঃ কয়েক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়াইবেন নিঃসন্দেহ। আবার?

৮

সুনীল সত্যই আবার অণিমাদের বাড়ী গিয়াছে। সারাদিন ঘরের মধ্যে শুইয়া বসিয়া বই পড়িয়া সময় কাঠাইয়াছে যা হক্ করিয়া। দুপুরে দত্ত বাড়ী বিসর্জ্জন দেখিতেও যায় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের উন্মুখ সুনীল একেবারে উন্মনা হইয়া ওঠে। এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে—সটান চলিয়া আসে অণিমাদের বাড়ী।

কিন্তু এ কি দুর্দ্দৈব! সুনীলকে দেখিয়া সুলতা দুই গণ্ড অশ্রুপ্লাবিত করিয়া যে কাহিনী শোনাইলেন তাহা সংক্ষেপে এই :

আজ দত্ত বাড়ীর প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে গিয়া সুলতা যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া ফিরিয়াছেন। সঙ্গে ছিল অণিমাও। মেয়েমহলে সুনীল আর অণিমাকে লইয়া বিশ্রী কাণাঘুষা। এ-কথায় সে-কথায় শেষকালে গোপন-করা কথাটাই উঠিয়া পড়ে। আর যায় কোথায়! শ্যামলাল সোমের পিশীর সঙ্গে সুলতার বেশ এক পালা কলহ হইয়া গিয়াছে দত্তদের চালিতাতলায়। ঝগড়ার মুখে এমন সব কথাও নাকি বাহির হইয়া পড়িয়াছে যাহাতে এখন এই অরক্ষণীয়া মেয়েটাকে লইয়া সুলতা কেমন করিয়া লোকের কাছে আর মুখ দেখাইবেন?

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সুলতা জানাইলেন, "বাদল, একে তো লোকে বিয়ের সম্বন্ধ এলেই নানা কথা বলে ভাঙ্গানি দেয়, এখন এই হতভাগীকে আমি পার করব কেমন করে? মেয়েমানুষের নামে কলঙ্ক রটার চেয়ে যে মরাও ভাল। ওর তো মরণও হয় না ভগবান!"

সুনীল একেবারে হতবাক্। এ সব কি কথা! ...আশ্চর্য্য! গ্রামের লোকের কল্পনার দৌড় কি সাজ্ঘাতিক! মন্দাকিনী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। অণিমা বিছানার এক কোনে উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

"লোকে তিলকে তাল করে তা সহ্য হয় বাদল," সুলতা এক বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দিদি কোন্ মুখে লোকের কাছে এ-সব কথা বলে বেড়ায়? আমার মেয়ের নামে কলঙ্ক রটলে সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলের মুখও যে খাটো হয়!"

"মা এ-সব বলেছে?"

"হ্যাঁ"

"মিথ্যে কথা", সুনীল উত্তেজিত হইয়া ওঠে।

"পদি পিশীও তো তোমার মার কথাই—"

"পদি পিশী মিথ্যে বলেছে," সুনীল সুলতার কথায় বাধা দিয়া তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে থাকে, "আমার মা প্রাণ গেলেও এমন সব কথা মুখে আনতে পারে না। এসব দুষ্ট লোকের চক্রান্ত!"

মন্দাকিনী চুপ করিয়া যান। অণিমা তেমনি নিঃশব্দে কাঁদিতেছে—তার বুকের কাছে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে অসহনীয় অপমান। সুনীল চোখ ফিরাইয়া নেয়। সত্যই অসহ্য! খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল অণিমার কাছে—বিছানার উপর। সুলতা যে মেঝের উপর বসিয়া চোখের জল মুছিয়া চলিয়াছেন. সে-কথাটা যেন ভুলিয়াই গেল।

"অনু!"—আর্দ্র কণ্ঠস্বর সুনীলের।

জবাব দিল অণিমার অবরুদ্ধ ক্রন্দন।

"অনু, তুই কি পাগল হয়েছিস্! লোকের কথায় অমন ভেঙ্গে পড়লে বুঝি চলে! ওঠ্।—গাঁয়ের এই শেয়াল কুকুরগুলোর চিৎকার কানে তুলতে নেই।" বলেই সুনীল তার ডান হাতখানি অণিমার আলুলায়িত মাথার উপর রাখিতেই তার নিঃশব্দ ক্রন্দন এবার সশব্দে ফাটিয়া পড়ে।

"ওঠ্। তুই আচ্ছা বোকা মেয়ে।—ওঠ্ এবার।" অণিমাকে হাত ধরিয়া তুলিতে যায় সুনীল। বেলুনের মত সুডোল দুখানি হাত! সুনীলের সর্ব্বাঙ্গে খেলিয়া যায় পুলকের অপূর্ব্ব শিহরণ। তার অকপট অনুকম্পার সর্ব্বাঙ্গে পাতলা মোহানুভূতির প্রলেপ মাখাইয়া দেয় গুটিকয়েক মধুর মুহূর্ত্ত। অণিমার সুডোল হাত দুটি কি নরম!

সুনীল বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া লয় আঁচলে মুখ-ঢাকা অণিমাকে—দেখে তার সারা দেহ। কাঁদিলেও কি সুন্দর দেখায়! সুনীলের মনের আকাশে জ্বলজ্বল করে একখানি হাজাররঙা রামধনু। বকুলতলা তো বকুলতলা, সুনীল এখন—এই সদ্য মুহূর্ত্তে—অণিমার এতটুকু অসম্মানের প্রতিকারে একাই সারা দুনিয়ার সঙ্গেও লড়াই করিতে পারে। তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দেয় দুর্দ্দমনীয় এক বুনো পৌরুষ!

অণিমা উঠিয়া বসিয়াছে। কিন্তু মুখে আঁচল চাপিয়া মন্দীভূত ক্রন্দনের রাশ টানিতেছে।

"অনু !"

অণিমা তেমনি নিরুত্তর।

"নিজের মনে জোর থাকলে ছুনিয়ায় কে কী করতে পারে অনু ?"—

জবাব দিলেন সুলতা, "গ্রামের লোককে তো চিনিস্ বাদল—ভুলে গেছিস্ সব। এরা না করতে পারে এমন কিছু নেই।"

"এই গাঁয়ের হাত থেকে ওকে আমি মুক্তি দেব ন-কাকীমা," সুনীল উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, "পারবি অনু ?—আমার সঙ্গে কলকাতা যাবি ? মনে সে সাহস আছে ?"

অণিমা আঁচলে নাক ঝাড়িয়া চুপ করিয়া আছে।

সুলতা স্তিমিত আলোকের শিখা চড়াইয়া দেয়। একি কথা! বাদলের সঙ্গে মেয়ে তার কলিকাতায় যাইবে এ কথার অর্থ কি ?

"বল, যাবি আমার সঙ্গে ?"

অণিমা জবাব দেয় না। কিন্তু তাহার মর্ম্মমূল অবধি যেন কাঁপিয়া ওঠে। সে যাইবে—বাদলদাই জীবনের একমাত্র আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভরসা, মুক্তি। বাদলদাকে সে ভালবাসে। সত্যই ভালবাসে। সারা মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসে। সুনীলের মুখে তো সেই ভালবাসারই প্রতিদান আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাদলদাও তাকে ভালবাসে তবে! মার প্রবল প্রতিরোধ দু'হাতে সরাইয়া আজ সে অণিমার নাগালের মধ্যে আসিয়া সম্পূর্ণ ধরা দিতে চায়। অণিমার মনে এখন বিশ্ববিজয়িনীর উল্লাস। পরাজিত করিয়াছে প্রতিবাদী মাতাকে, জয় করিয়াছে মাতৃভক্ত পুত্রকে। দুটি বিবদমান পক্ষের প্রাণান্ত শক্তিপরীক্ষার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইয়া বাদলদা জয়তিলক পরাইতে আসিয়াছে শুভমুহূর্ত্তে। কলিকাতা কোন্ ছার, বাদলদার সঙ্গে অণিমা এখন জাহান্নামে যাইতেও প্রস্তুত। সে যাইবে!

"অনু, বল, আমার সঙ্গে কলকাতা যেতে সাহস আছে তোর ? বাবা মার আপত্তি, লোকনিন্দা, ভাই-বোনদের মায়া—পারবি সব কাটাতে ?"

নির্ব্বাক অণিমার সর্ব্বাঙ্গ সায় দেয়।

"পারবি যেতে আমার সঙ্গে ?"

"কী বলছিস্ বাদল ?" বাধা দিয়া সুলতা এবার কথা বলেন।

সুনীলের যেন এতক্ষণে হুঁস হয়, এ-ঘরে আর একটি তৃতীয় প্রাণীও আছে। কহিল, "ঠিকই বলছি ন'কাকীমা। ওকে আমি কলকাতা নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব। মেয়েদের বোর্ডিং-এ থেকে পড়বে। এখনো সময় আছে। তুমি অমত করো না ন'কাকীমা! মেয়েদের বিয়ে ছাড়া যেন আর কোনো কথা তোমরা ভাবতেই পারো না। মেয়ে বলে কি সে—" সুনীলের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

বাহিরে মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, "সুলতা !"

"দিদি ?"

"হ্যাঁ, আমি।"

সুলতা তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইয়া দুয়ারের কাছে আগাইয়া যান।

"আমার ছেলেকে নিতে এসেছি।" বলিতে বলিতে মন্দাকিনী নিজেই দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢোকেন।

সুলতা, অণিমা, সুনীল—তিন জনই হতবাক্।

মন্দাকিনী ছেলের দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া লইয়া সুরু করিলেন, "সুলতা, ছেলে আমার—তোর নয়।"

"সে কী কথা দিদি !"

"চুপ কর সুলু। আর ছেনালি করিস্ নে। তোদের চিন্‌তে আর বাকি নেই আমার। তোর পেটে পেটে এতও ছিল।"

সুনীল এই অভাবিত ব্যাপারে প্রথমটায় ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। মা যে রাত্রিবেলা সটান এই বাড়ী আসিয়া হাজির হইবেন এতটা সে ভাবিতেও পারে নাই। তা না হয় আসিলেন। কিন্তু এ কি ইতরতা!

"তুমি হঠাৎ রাত্তিরে একা এ-বাড়ী চলে এসেছ কেন ?" —রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে পুত্র।

"এসেছি তোকে নিয়ে যেতে," মন্দাকিনী চৌকির কাছে আগাইয়া আসেন।

"আমি কি কচি খোকা যে একা বাড়ী ফিরে যেতে পারব না, তাই নিয়ে যেতে এসেছ !"

"হ্যাঁ, তুই আমার কাছে এখনো সেই খোকাই। বাড়ী চল।"

"এখন যাব না আমি—তুমি যাও।"

এ-কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মন্দাকিনী আদেশের সুরে কহিলেন, "ওঠ্ বলছি।"

"কেন ?"—প্রশ্ন নয়, সরোষ প্রতিবাদ।

ছেলের একখানি হাত ধরিয়া একটু টান মারেন মন্দাকিনী, "বাড়ী চল !—আমি বল্‌ছি।"

"যাব—এখন নয়। আগে তুমি যাও।"

"এখনি যেতে হবে তোকে।" মন্দাকিনী দৃঢ়কণ্ঠে জানাইলেন।

"তুমি আগে এ বাড়ী ছেড়ে যাও, তারপর আমি যাব।"

"না, এখনি যেতে হবে। নইলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব এখানে।"

সুনীল অনড়, অটল।

অণিমার সভয় দৃষ্টি এবার রূপ বদলায়। কেমন এক চাপা দ্যুতি খেলিয়া যায় সারা মুখে চোখে।

মন্দাকিনীর কণ্ঠস্বর সহসা যেন বয়েলিং পয়েণ্ট থেকে ফ্রীজিং পয়েণ্টে নামিয়া আসিযাছে। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "যাবি না ?"

"না" স্পষ্ট জবাব।

"আমি তোর কেউ নই ?"

"সে সব কথা পরে শুনব। এখন তুমি যাও বলছি। বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে ভুলো না।"

"যত দোষ আমার, আর ওরা কোন দোষই করল না। হায় ভগবান !"—মন্দাকিনীর সত্যই মাথা খারাপ হইয়াছে। স্থান, কাল, পাত্র—কোন কথা কোন দিকই তার গণনার মধ্যে নাই এখন। যেন সমস্ত ব্যাপারটাই এক স্বপ্নের মধ্যে ঘটিতেছে।

"তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও, বলছি। কোঁদল করতে হয় বাড়ী বসে করো।"—কড়া আদেশের সুরে পুত্র জানায়।

"যাচ্ছি।—কিন্তু বাড়ী ফিরে দেখবি, তোর মা আর নেই ! এই শেষ কথা বলে গেলাম।"—ঝড়ের বেগে মন্দাকিনী দুপদাপ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া যান।

সুনীল চুপ করিয়া বসিয়া আছে স্তব্ধের মত। অণিমা এবার সরিয়া বসে। কখন যে ভয়ে ভয়ে সে বাদলদার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়াছে এতক্ষণ সুনীলও তাহা টের পায় নাই। বোধ হয় অণিমারও হুঁস ছিল না কখন নিজেরই অজানিতে সে সুনীলের কোঁচার খুঁট ধরিয়া রাখিয়াছিল শক্ত করিয়া আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির মতই এক অন্ধ স্বতঃপ্রেরণায়। এবার দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হইয়া আসে। কি এক অজানা বিপদ যেন পার হইয়াছে।

সুনীল উঠিয়া দাঁড়ায় নিঃশব্দে—সুলতার মুখে কথা নাই। অশিমাও নির্ব্বাক।

রাস্তার দুদিকে সন্ধানী দৃষ্টি চালাইয়া সুনীল দ্রুতপদে পথ চলিয়াছে। পুকুরপাড়ে আসিয়া এপা'র-ওপার দেখিয়া লইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। পুকুরের জল স্থির—নিশ্চল। বুকটা তবু ঢিব্‌ঢিব্‌ করে এখনো। কানে বাজে মায়ের শেষ কথা কয়টি "বাড়ী ফিরে দেখবি, তোর মা আর নেই।" শেষকালে মা একটা অসম্ভব কিছু করিয়া বসিল না তো ! বিচিত্র কি ! একে মেয়ে জাত, তায় যে দুর্জ্জয় অভিমান !

মরা অত সহজ নয় ! মন্দাকিনী মরেন নাই, মরিতে পারেন না, মরিবেনও না। যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়াছিলেন তেমনি নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আসিয়া ঢুকিলেন সোজা রান্নাঘরে। বড় ঘরে যান নাই, পাছে শ্বশুরের কাছে এখন ধরা পড়িয়া যান। তাঁর যে কপাল ভাঙ্গিয়াছে, নিজের ছেলে পর হইয়া গেল সেই চূড়ান্ত দুর্ভাগের কথা শ্বশুরের কাছে বলিবেন কোন্‌ মুখে ! রান্নাঘরে একা একাই খানিক চাপা কান্না কাঁদিয়া লইলেন। ক্রন্দনই এখন শেষ সম্বল তাঁহার। তাঁহার এত আশা, এত সব জল্পনা-কল্পনা সব শেষ হইল এতদিনে। বড় ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া সুখ সম্পদের যে এক সাতমহলা সৌধ তিনি রচনা করিয়াছিলেন আজ তাহা ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া ধূলায় মিশিয়া গেল। বড় গলা করিয়া তিনি কথা বলিতে গিয়াছিলেন, বড় মুখ লইয়া আজ সুলতার ঘরে ঢুকিয়াছিলেন নিজের একচেটে অধিকার বুঝিয়া লইতে ! আর, ছেলে তাঁহাকে এতখানি অপমান করিয়া বসিল ! গর্ভধারিণীর এত অনুনয়েও একটিবার অণিমার কাছ হইতে এতটুকু সরিয়া বসিল না ! কপালে এও ছিল ! সুলতা আর সুলতার মেয়ের মুখের উপর তাহাকে শেষকালে অমন করিয়া চোখ রাঙাইল ! হায় ভগবান !···

"মা ফিরে এসেছ ?"—নীলু ডাকে।

মন্দাকিনী সাড়া দিবেন কি ! চোখে মুখে আঁচল চাপিয়া কান্না রোধ করিতে চান প্রাণপণে।

ব্রজনাথ ডাকেন, "বৌমা, তুমি কোথায় গিয়েছিলে এই রাত্তির করে ?"

কোন সাড়াশব্দ নাই।

বৃদ্ধ ব্রজনাথ উঠিয়া রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ান।

"বৌমা, আমায় তোমরা সব লুকোচ্ছ কেন?—কী হয়েছে বলো।"

মন্দাকিনী জ্বলন্ত উনানের কাছে বসিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রহিয়াছেন। এদিকে টগবগ করিয়া হাঁড়ির ভাত ফুটিতেছে। সেদিকে খেয়ালই নাই। খানিক আগে ও-বাড়ীতে, সুনীলের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অণিমার ফুলিয়া ফুলিয়া নিঃশব্দ ক্রন্দনের মতই মন্দাকিনীর সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে অসহ্য জ্বালা, চূড়ান্ত অপমান।

"বৌমা, ভুল করো না! এখন রুখতে যেয়ো না—বাধা দিতে গেলে হবে হিতে বিপরীত।"

"কী!! বাধা দেব না?" মন্দাকিনী এবার ছ্যাঁক করিয়া ওঠেন। ব্রজনাথ যেন তাঁর শ্বশুর নন, যেন অন্য কেহ এমনি ভাবে মন্দাকিনী মুখ ঝামটা দেন, "একশ' বার বাধা দেব। ও আমার ছেলে নয়? আমার মঙ্গল অমঙ্গলের ভয়ডর আছে না? হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদূর খুইয়ে বসে আছি, এবার বুক খালি হক একে একে! এই আপনারা চান নাকি? ওর পাপে আমার নীলু বাবলুও থাকবে বুঝি ভেবেছেন!"

মন্দাকিনীর খানিক আগের নিরীহ অসহায় রূপটা এবার ভয়ঙ্কর উগ্র হইয়া ওঠে। ব্রজনাথ খানিক হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া আসেন। এ কি অনাসৃষ্টি! বৃদ্ধের দুটি চোখের কোণে বোধ হয় দু' ফোঁটা জল দেখা দিল আজ। মৃত পুত্রের কথাটা হঠাৎ বড় বেশী করিয়া মনে পড়ে—শোকটা আবার নূতন করিয়া দেখা দিতে চায়।

সুনীল বাড়ী ঢোকে এমনি সময়ে। ঠাকুরদা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। নীলুও নির্ব্বাক। বাবলু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মানদা কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। সারা ঘর বিসদৃশ ভাবে নীরব—এই বিশ্রী নির্জ্জনতার মধ্যে সারা সংসারের নিন্দা, ঘৃণা, আর অভিযোগ যেন জমা হইয়া আছে।

সুনীল পাঞ্জাবীটা খুলিয়া আলনায় রাখিয়া বারান্দার তক্তপোষে একটা বালিসে মাথা রাখিয়া কাত হইয়া পড়ে। কি সে করিতেছে, কি করা উচিত এখন, কি হইলে সব দিক রক্ষা পায়—একুল ওকুল দুকূল বজায় থাকে, এ-সব কোন ভাবনা কোন চিন্তাই তার মগজে নাই। একটা প্রবল উত্তেজনায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া-শক্তি যেন বন্ধ হইয়াছে, বালিশে মাথা এলাইয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে নিষ্পলক।

মা ঘরে ঢোকেন। সুনীল সহজ চোখেই তাকায় আজ। আর লজ্জা নাই, দ্বিধা নাই, লুকাইবার দায় নাই। মা নিজেই সংশয়-সঙ্কোচের পাতলা পরদাটুকু ছিঁড়িয়া সরাইয়া বসিয়া আছেন। এখন বাকী শুধু মা-ছেলেতে মুখোমুখি শেষ বোঝাপড়া করিয়া লওয়ার।

মন্দাকিনী খানিক এদিক ওদিক করিয়া আলনার কাছে গিয়া দাঁড়ান। সুনীলের পাঞ্জাবীটার নীচের একটা পকেটের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আছে অণিমার দেওয়া সেই রুমালখানির একটু প্রান্ত—নিজের হাতে ফুল-তোলা, নীল অক্ষরে সুন্দর করিয়া সুনীলের নাম-লেখা, সস্তা সাধারণ কাপড়ের বড় আদরের উপহারটুকু!

মন্দাকিনীর আপাদ মস্তক দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। একটা ক্রোধান্ধ কেউটের মত ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া ফুঁসিতে থাকে এক অব্যক্ত আক্রোশ! যত মাথামাখি যত ঢলাঢলি করিতে হক করুক্ এ বাড়ীর বাহিরে। এখানে সে এতটুকু পাপ সহ্য করিবেন না—অনাসৃষ্টির কোন চিহ্ন রাখিতে দিবেন না। এটা তার স্বামীর ভিটা, শ্বশুরের জন্মস্থান! পকেট হইতে রুমালখানি লইয়া আর কোন দিকে না চাহিয়া মন্দাকিনী সটান চলিয়া যান রান্নাঘরে।

সুনীলও সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। খানিক ইতস্তত করিয়া রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়। যাহা অনুমান করিয়াছে তাই। উনানের মুখে অণিমার রুমালখানির অবশিষ্টটুকু তখনো জ্বলিতেছে—মন্দাকিনী জ্বলন্ত কাঠটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিলেন উনানের মুখে!

যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে পুত্র ফিরিয়া আসে। মন্দাকিনীর শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ জ্বলন্ত উনানের মধ্যে! তার মনের মধ্যেও জ্বলিতেছে বুঝি অমনি আগুন!

দৃঢ় মুষ্টি আরও দৃঢ় করিয়া যেন একটা মাতালের মতই টলিতে টলিতে পুত্র যায় বাইরের ঘরে। দারুণ আক্রোশে এখন ফাটিয়া পড়িতে চায়। সে ক্রোধ যেন মুখের ভাষায় কুলায় না, গায়ের জোরেও পোষায় না। প্রয়োজন এখন

চূড়ান্ত রকমের কোনো অনাসৃষ্টির, চাই একটা বড় রকমের অপঘাত দিগবিদিগজ্ঞানশূন্য সাংঘাতিক এক অপরিণাম। কি সে করিতে পারে ?

একটা ছুরি—অন্ততঃ একটা ধারালো ছুরি চাই এখন। সেই ছুরি দিয়া—হ্যাঁ, সেই ছুরি সে নিজের হাতে বসাইয়া দিবে। বাহির হউক রক্ত, মুক্তি পাক্ নিরুদ্ধ অন্ধ আক্রোশ। ঘরের মধ্যে কি এ সময় একটা ছুরিও থাকিতে নাই ?—আর এক টুক্‌রা সাদা কাগজ ? হাতের আঙুল দিয়াই লাল টকটকে তাজা রক্তে বড় বড় অক্ষর লিখিয়া মাকে গিয়া এখনি দেখাইবে ঃ—অনিমাকে আমি চাই, চাই, চাই। কি করিতে পার কর।

প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করে সুনীল। টেবিলের একটা ড্রয়ার টান মারিয়া খুলিয়া ফেলে। অদ্ভুত যোগাযোগ ! যত রাজ্যের পুরান চিঠি পত্র, ধোবার হিসাব আর বাজারের চিরকুটের উপর লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেও চকচক্ করে ঠাকুরদার কলমকাটা নতুন ছুরিখানি।

সর্ব্বনাশ ! ছেলেপেলের ঘরে এমন ধারালো ফলা ঠাকুরদা অমন করিয়া খুলিয়া রাখিয়াছেন ? চট করিয়া বাটের মধ্যে ফলাটা ভরিতে ভরিতে সুনীল ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর মাস দুই আগে কেনা অমন নতুন ছুরিখানি সমস্ত গায়ের জোর দিয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলে—দক্ষিণের ঘরের টিনের চালার উপর দিয়া, ছোট বেল-গাছটার মাথা ডিঙাইয়া, কাঁচামিঠা আমগাছের একটা নিরীহ প্রশাখায় আলোড়ন তুলিয়া, ছুরিখানি টুক্ করিয়া গিয়া পড়ে পুকুরের জলে—ওপারের কাছাকাছি।

এগার

পরদিন সকালে।

শুধু মন্দাকিনীই নয়, এবার গোটা সংসার সুনীলের সঙ্গে অসহযোগ সুরু করিয়াছে। তাহার কাছে আসিলে সকলেরই মুখে কথা বন্ধ হয়। সে যেন একটা হিংস্র জন্তু বা এক ঘৃণ্য জীব।

চা আসিল আজ বাবলুর হাতে। ঐ একরত্তি ছেলে কোন রকমে পেয়ালাটা টেবিলের উপরে রাখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছে—ভয়ে না লজ্জায় কে জানে। কি সে বুঝিয়াছে কি সে জানিয়াছে সেটা বড় কথা নয়। এই বয়স হইতে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে এমনভাবে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইবার ইতরতায় সুনীলের মন বিষাইয়া ওঠে ! আগুন লাগিয়া সর্ব্বস্ব পুড়িয়া খাক হইয়া গেলেও যেন তাহা সওয়া যায়—সুনীলের অপরাধ যেন তার চেয়েও বড় বিপদ, তার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি।

সারা দিন সুনীলও পাল্টা অসহযোগ চালাইয়াছে সবার সঙ্গে। আজ আর বাড়ীর বাহির হয় নাই। কাহারও সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টাও করে নাই। বারান্দায় বেতের আরাম কেদারায় গা-ভাঙ্গিয়া নদীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময়টা কাটাইয়া দিয়াছে।...যাক্, আর ঘণ্টা বিশ-বাইশ ! কাল এ-সময় সে স্টীমারে—পদ্মা বক্ষে। কালই সে যাইবে। আর সে একটা দিনও বেশী থাকিবে না। আজ ঢাকা মেলে রওয়ানা হইতে পারিলেই যেন ভাল ছিল। একটা দিনের হাত হইতে রেহাই পাইত !

“ঠাকুরদা !”

ব্রজনাথ আলাপের সুযোগ পাইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান। নাতীর আচরণে দুঃখ তিনিও পাইয়াছেন, কিন্তু মন্দাকিনীর মত তাঁর স্নেহের সম্পত্তি নীলামে ওঠে নাই। সকল কথা জানাজানির পর তাহাকে দেখিয়া নাতী লজ্জা পাইবে, স্নেহসর্ব্বস্ব বৃদ্ধ সারা দিন যেন সেই লজ্জায়ই সুনীলের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিয়াছেন।

“ডাক্‌ছিস্ ?”

“চলো ঘরের ভেতরে। তোমার সঙ্গে কথা আছে অনেক।”

“চল।”

ঘরের মধ্যে আসিয়া টেবিলের এককোণে বসিয়া পড়িয়া সুনীল জানাইল, “ঠাকুরদা, আমি কালই যাব।”

“কালই ?”

“হ্যাঁ, কালই ঢাকা মেলে।”

ব্রজনাথ আর কোন উচ্চবাচ্য করেন না। সুনীল নিরাশ হয়—বেশ একটা আঘাত পায় মনে। ভাবিয়াছিল, তার যত অপরাধই থাকুক ঠাকুরদা কথাটা শুনিয়াই ঘোর আপত্তি জানাইবেন, তাহার ছুটি ফুরাইতে এখনো যে পুরা পাচ দিন বাকী !

“আচ্ছা ঠাকুরদা ! আমি কি এ সংসারের কেউ নই ?”

“সে কী কথা !”

"তোমাদের ভাব গতিক দেখে তাই তো মনে হচ্ছে।"

ব্রজনাথ এ কথার কোন জবাব দেন না।

"আমায় তোমরা একবার ডেকেও জিগ্‌গেশ করলে না, ব্যাপার কী! অন্ততঃ তোমার কাছে সব কথা আমি নিশ্চয় বলতাম ঠাকুরদা। সন্দেহ আর অনুমানকে প্রশ্রয় দিয়ে বাড়ীর আবহাওয়া কি বিশ্রী করে তুলেছ তোমরা, নীলু আর বাবলুও আমাকে পর মনে করে।"

"কী তুই বলছিস্ পাগলের মতো।"

"পাগল শুধু আমি নই, তোমরাও।"

বৃদ্ধ ব্রজনাথ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকেন। বলিবার মত কিছু ভাবিয়া পান না। নাতী তাঁহার সেই নাতীই আছে। চলায় বলায় ঠিক তেমনটি! তবু কোথায় যেন একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মন-গড়া আদর্শকে কোথায় যেন নির্দ্দয় আঘাত করিয়াছে।

"ভাবছ ঠাকুরদা এ-সব কী বলছি আমি। ভাবছ, আমি আর তোমাদের মনের মতোটি নেই। অচেনা মনে হচ্ছে, না? দুদিন বাদে আরো অচেনা মনে হবে।"

মন্দাকিনী ঘরের পিছনে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলেন ভয়ে ভয়ে। এবার সরিয়া পড়েন নিশ্চিন্ত মনে। তাঁর শঙ্কা ছিল, শ্বশুর হয় তো নাতীকে ছুটির বাকি ক'টা দিন থাকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন। বিপদের গুরুত্ব তিনিও বুঝিতে পারিয়াছেন। বাঁচা গেল।

কাল কেন, আজই যাক্ না পুত্র। কোন আপত্তি করিবেন না মন্দাকিনী—এক ফোঁটা চোখের জলও পড়িবে না এবার। ভালয় ভালয় বিদায় হউক! পারেন তো মন্দাকিনী এখনি ছেলেকে বকুলতলা হইতে মানে মানে দূরে সরাইয়া দেয়। তাঁর কপালে এতও ছিল!……

চোখের কোণ জলে ভরিয়া আসে। আঁচলে মুখ মুছিয়া মন্দাকিনী বড় ঘরের পিছনে গিয়া ডাকিলেন, "মানার মা!"

"ডাকছেন বৌমা-দিদি?"

"হ্যাঁ"—ধরা গলায় মন্দাকিনী কহিলেন, "তুমি একবার ঘোষের বাড়ী যাও না।"

"এই সন্ধ্যে বেলা?"

"হ্যাঁ, খোকা কাল চলে যাচ্ছে।"

"সে কি, তেনার না আরো পাচদিন থাকার কথা বৌমা-দিদি?"

"তুমি মধু ঘোষকে গিয়ে বল, কাল সকালে যেন দু' সের ঘি দিয়ে যায়—কড়া পাকের ঘি দিতে বলো।—আর, কাল তিনটের মধ্যেই এক সের পাত ক্ষীর দিতে হবে, ভুলে যায় না যেন। আমি ঘোষের পোকে বলে রেখেছি, ও যে কালই যাবে তা কি আর জানতাম তখন।"

"হাতের কাজটা সেরে যাব'খন।"

"না, তুমি এক্ষুণি যাও মানার মা—দেরি করো না। কাল সকালেই—সবটা না পারে অন্ততঃ আধ সের ঘি যেন অতি অবশ্য দিয়ে যায়। বাকী দেড় সের যাবার আগে দিলেই হবে। কালই দাম পাবে, মনে করে বলো সেকথা।"

মানদাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিতে হয়।

মন্দাকিনী পুত্রের যাত্রার উদ্যোগ করিতে এখন হইতেই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিবেন না। প্রতিবারই সুনীলের বাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্ব দিন হইতে মন্দাকিনী আহার নিদ্রা যেন ভুলিয়া যান। এটা-ওটা-সেটা কত কি-ই না দিতে চান পুত্রের সঙ্গে। থাকিয়া থাকিয়া মা-ছেলেতে হয় কথা কাটাকাটি। মন্দাকিনী যতই ঝঞ্ঝাটের মাত্রা বাড়ান, পুত্র ততই ঘোর আপত্তি জানাইতে থাকে, "এত সব আমি নিতে পারব না বলে রাখছি। গোটা সংসারটাই তুলে নিয়ে যাই তার চেয়ে।" মাও পাল্টা জবাবে অভিমান করিয়া বলেন "বিদেশে যেন শুধু তুই যাচ্ছিস, কেউ কোন দিন যায় নি আর!—ভা-রী তো বোঝা! না হয় কুলি একটা বেশিই লাগলো। আমি এত কষ্ট করে এ-সব তৈরী করলাম, আর তুই দুচার আনার পয়সাটাকেই বড় মনে করছিস?"

মা ও ছেলের সেই চিরাচরিত খুনসুড়ির পালাটা এবার বন্ধ। মন্দাকিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া যান।…সময় নাই হাতে। ক্ষীরের তক্তি ও নারকেলের চিংড়ি-পিঠা এবার আর হইয়া উঠিল না। কথাটা আজ সকালে জানিলেও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। এ দুঃখটা কাঁটার মত তার মনে বিঁধিবে সারা বছর! বিঁধুক।

মন্দাকিনী হাঁক ছাড়েন, "নীলু"

"কী মা?"

"শোন্"

মেয়ে আসিয়া কাছে দাঁড়ায়।

"এই চাবি নে, আলমারীর মাঝের তাকে কাগজে-জড়ানো মিছরি আছে—তোর চক্কোত্তি বাড়ীর সুন্দর-পিশিকে এক দৌড়ে দিয়ে আয় গে—"

"এখনি ?"

"এক্ষুণি—এখনো সন্ধ্যা লাগে নি, এক দৌড়ে দিয়ে আসবি। তাকে বুঝিয়ে বলবি, তোর দাদা কালই চলে যাচ্ছে। নারকেলের চিড়া আর জিরা করতে দিয়েছি তাকে। পরশু তা জ্বাল দেবার কথা ছিল, যেমন করেই হক আজ রাত্তিরেই যেন সব তৈরী করে ফেলে। দু' সের মিছরি আছে এখানে।—দেরি করিস্ নে আর, শিগ্‌গির যা।"

নীলু চাবি লইয়া প্রস্থান করে। খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মন্দাকিনী সন্ধ্যা প্রদীপ প্রস্তুত রাখিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া আসেন। নির্জ্জন ঘর পাইয়া হুহু করিয়া খানিক কাঁদিয়া লইলেন।

কেন যে কাঁদেন তা-ও ছাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান, পুত্রের সুমতি যেন বজায় থাকে—অন্ততঃ কাল বিকাল পর্য্যন্ত।···

যাহা হইবার তো হইয়াছে। যত আঘাত যত অপমানই পুত্রের কাছ হইতে পাইয়া থাকুন, শেষকালে মার কথাটাকেই সে সবার উপরে স্থান দিয়াছে!

তবু খানিক কাঁদেন আবার। কিছুক্ষণ নির্জ্জনে চোখের জল ফেলিযা এই কয়দিনের গুরু ভার হালকা করিতে চান। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিযা বহুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই আছেন! পুত্রের উপর মায়া হয়! করুণায় নরম হইয়া আসে অমন অনমনীয় মন! পুত্র যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়া যাইতেছে, সে-কথা ধীরে ধীরে মন্দাকিনীর মনের মধ্যে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। ছুটি ফুরাইতে এখনো পূরা পাঁচ দিন বাকী, তবু পুত্র চারদিন আগে—কালই কলিকাতা রওয়ানা হইতেছে কিসের জন্য কার জন্য মন্দাকিনী বুঝি তাহা বোঝেন না? সারা বছর যে থাকে নির্ব্বান্ধব বিদেশে—উৎকণ্ঠিত জননীর নিকট হইতে বহু দূরে, দু'দিন কাছে পাইয়াও তাকে জোর করিয়াই তিনি আজ ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চান! না হয় কাঁদিবেন, বছর ভরিয়া না হয় মাঝে মাঝে চোখের জল মুছিবেন—তাও ভাল, তবু যাক সে, কালই যাক। আজকের ঢাকা মেলে চলিয়া গেলেও আপত্তি ছিল না, ক্ষতি ছিল না, দুঃখ ছিল না! মন্দাকিনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।

বারান্দায় পুত্রও তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লয়। ইহা ছাড়া আর কি উপায় ছিল?—আর কোন্ পথ? ও-কূলের মান রাখিতে গেলে এ-কূল ভাঙ্গে, এপারের মর্য্যাদা মানিলে ওপার বন্ধ্যা। দুদিক হইতে দুই সহজ প্রবল প্রচুর আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া সুনীলের মনের উপর এ দু'দিন অহর্নিশ ঘুরিয়া মরিয়াছে এক একটা অবরুদ্ধ, ঘোলাটে আবর্ত্ত। এই চলন্ত অবরোধের মুক্তি চাই। চাই বাহির হইবার স্পষ্ট পথ। ইহা ছাড়া আর কি সে করিতে পারে? আছে আর কোন্ গত্যন্তর?

সুনীল যেন এক সমস্যা-ফেনিল উপন্যাসের দ্বিখণ্ডিত নায়ক। অথবা, তার চেয়েও মারাত্মক, সেই উপন্যাসেরই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় লেখক। চিন্তা ভাবনার পাকে পাকে আবেগের ঢেউএ ঢেউএ জানিতে ও অজানিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন এক দুরূহ জটিল ঘটনাবর্ত্তে—যেখানে দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, কল্পনা আড়ষ্ট, অসহনীয় বিমূঢ়তায় লেখনী স্তব্ধ। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে প্রয়োজন একটা বিপদের– একটা ভয়ঙ্কর রকমের আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটুক, মরুক কেহ, বাষ্পাকুল নিঃস্বার্গপরতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত লইযা সরিয়া পড়ুক যে কেহ একজন, পথ খানিক পরিষ্কার হউক, দুস্তর দ্বন্দ্বের মিলুক একটা কুলাকিনারা—অন্ততঃ এক নিরুপায় হাস্যকর যেন-তেন পরিণতি!

আজ সকালে নমিতার চিঠি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার মতই সেই গোজামিলনের সুযোগ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—আসিয়াছে সুনীলের অক্ষমতার মুখ রক্ষা করিতে, তাহার ভীরুতাকে বৈচিত্যের ছদ্মবেশ পরাইতে। মন্দাকিনীর মতই সুনীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া হালকা হইতে চায়।

নমিতা চিঠি দিয়াছে ঢাকা হইতে—বাড়ী আসিয়া সুনীল যে সংক্ষিপ্ত পৌছান সংবাদ দিয়াছিল, তাহারই জবাবে এই সুদীর্ঘ সাত পৃষ্ঠা। প্রেমপত্র নয়, তবু ইহারই মধ্যে এখানে সেখানে উঁকি দেয় একটু-আধটু মনের উত্তাপ, সুনীলের কাছে—এই উভয়সঙ্কটে—সেইটুকুই যথেষ্ট। এক গ্রহের আকর্ষণের বাহিরে যাইতে হইলে প্রয়োজন হয় আর একটা

বৃহত্তর গ্রহের প্রবলতর টান। সে টান যদি না-ও বা থাকে, সুনীলের মগজের কারখানায় যুক্তির অভাব নাই, কল্পনার দৈন্য নাই কোন কালেই, ফাঁকির শূন্য গর্ভ সে ভরিয়া লইবে অনুমানের ঠাসা বাষ্পে। নমিতার চিঠিখানি আসিয়াছে ঠিক সময়টিতে—শুভ মুহূর্ত্তে। আর দুদিন দেরী হইলে ইতিমধ্যে কোথাকার জল যে কোথায় গড়াইত কে জানে! নমিতার চিঠিখানি যেন অথই জলে একটা দুর্ব্বল কলার ভেলা—হোক না হালকা একটা ভরসা তো মিলিল্ এতক্ষণে। এই চিঠিকে আশ্রয় করিয়া সুনীল অণিমার কাছ হইতে বিদায় নিতে পারিবে অনায়াসে, এতটুকুকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া এত বড় করিয়া ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া আনিতে পারিবে অনেকখানি। সুনীল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

নমিতারা কাল ঢাকা মেলে কলিকাতায় ফিরিতেছে। সুনীলও কালই যাইবে। আর একদিনও সে বকুলতলায় থাকিবে না।…

মার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিয়াই সে যাইবে। সে চোরের মত পলাইয়া বাঁচিবে। মায়ের মর্য্যাদাই বজায় থাক্। কিন্তু অণিমা?

সে-ও বা এমন কি কঠিন ব্যাপার? অণিমার সঙ্গে এই দিন কয়েকের গীতিনাট্যটুকুকে অতখানি গুরুত্ব দিবার কি আছে এমন? অণিমার চোখের জলেরও পরমায়ু দু'দিন! —বড় জোর দু' সপ্তাহ, না হয় দু' মাস। আবার হাসি দেখা দিবে তার মুখে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোকও মা ভোলে! প্রেমেরও মৃত্যু আছে। তাই তো জীবন সুন্দর—তাই না জীবন এত সহজ! ভুলিতেই হয়, না ভুলিলে চলে না—চলে না দুনিয়া। যাক্, মন্দাকিনীর ঘুমের আর ব্যাঘাত হইবে না। গ্রামের লোক? তাদেরও দুদিন পরে জিব ব্যথা হইবে—একই কাহিনী লইয়া পরনিন্দা পরচর্চ্চাও আর কাঁহাতক করা যায়! মিটিবে সব সমস্যা। বজায় রহিল সব দিক। বিংশ শতাব্দীর সুনীল থাকিবে নিশ্চিন্তে—সুদূর মহানগরীতে। অষ্টাদশ শতকের নিরুদ্বিগ্ন মন্থরতা লইয়া বকুলতলা প্রতিদিন জাগিবে, প্রতি রাত্রে ঘুমাইবে—যেমন চলিয়া আসিয়াছে তেমনি চলিবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মাসের পর মাস। ইহার মধ্যে সমস্যাটা কোথায়!

অণিমা কাঁদিবে? কাঁদুক্। এখন এতটুকু অনুকম্পা এতটুকু অনুশোচনার প্রশ্রয় দিবে না সুনীল। কাল বিকাল পর্য্যন্ত আর কোন কথা ভাবিবে না সে।…মনে মনে মন্দাকিনী হাসিবেন খুশীর হাসি? হাসিলেনই বা। কি এমন অপরাধ তাঁর? জননীর প্রতিটি আচরণের স্বপক্ষে পুত্র এবার যুক্তির উদার পক্ষ বিস্তার করে। সংসারের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে যাঁর আজীবন কাটিয়াছে, বৃহত্তর বাহিরের উদার আলোকের সঙ্গে যাঁর আশৈশবের অসহযোগিতা, ঘরই যাঁর দুনিয়া, ভাঁড়ার যার ব্রহ্মাণ্ড—সেই স্নেহসর্ব্বস্ব নারীর স্পর্দ্ধিত একাধিপত্যের উপর বাহির হইতে কেহ উড়িয়া আসিয়া জোর করিয়া জুড়িয়া বসিতে চাহিলে মা হইয়া সে কোন প্রাণে সহ্য করিবে! তাঁর কাছে সুনীল এর বেশী আর কি আশা করিতে পারে?…

ঘণ্টাখানেক বাদে মন্দাকিনী সব ভুলিয়া ছেলেকে আসিয়া ডাকেন,

"খোকা!"

সুনীল মার দিকে ফিরিয়া তাকায় করুণ চোখে।

"কালই যাবি?"

মা নিজ হইতে সাধিয়া কথা বলিতে আসিয়াছেন। শত হইলেও মা! আর কি অভিমান সাজে!

"হ্যাঁ, কালই যাব?"

"ঢাকা মেলে?"

"হুঁ"

আর কোন প্রশ্ন নাই, নাই এতটুকু ব্যাকুলতা। সে যে কালই যাইবে সে কথাটা মা যেন আর একবার পাকা করিয়া লইতে চান।

সন্ধ্যা হইয়াছে বহুক্ষণ। আকাশে জোৎস্না, উঠানে জোৎস্না, জলে-জোৎস্নায় একাকার পদ্মার বুক—যতদূর দেখা যায়।

বারান্দায়ও বেশ খানিকটা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। মাতা-পুত্র নীরবে বসিয়া রহিল বহুক্ষণ। ও-ঘরে নীলু ঠাকুরদার কাছে পড়া ধরা দিতেছে!

ইহার চেয়ে কথা না বলাই যেন ভাল ছিল। চুপ করিয়া আছে উভয়পক্ষ। কি বিসদৃশ নীরবতা! এ জীবনে বলিবার মত যেন কিছুই নাই, নাই শুনিবার মত আগ্রহ!

আবার সেই একই প্রশ্ন,

"তবে কালই যাচ্ছিস?"

পুত্র বিরক্তি গোপন করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

“গিয়েই কিন্তু চিঠি দিস্”

“দেব।”

আবার চুপচাপ দুজনেই।

“বড় দিনের সময় ছুটি থাকবে না তোদের?”

“মাত্র চার দিন ছুটি।”

“তখন বাড়ী আসতে পারবি না?—সঙ্গে দুদিন বেশি ছুটি নিয়ে?”

পুত্র জবাব দেয় না।

“একদিনের জন্য এলেও আসিস কিন্তু।—আমি যে তোকে চোখের আড়াল করে কী করে থাকি সে তো তুই জানিস্ না।”

পুত্র তেমনি নির্ব্বাক।

মন্দাকিনী কিন্তু পুত্রের নীরবতায় ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া মরিতেছেন। ছেলে তাঁর শেষকালে হার মানিয়া সরিয়া পড়িতেছে মায়েরই জন্য! বারান্দার আবছা জোৎস্নালোকে পুত্রের বিরস মুখের দিকে তাকাইয়া মন্দাকিনী বোঝেন সব—ব্যথায়, করুণায়, কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল হইয়া ওঠেন।

“খোকা!”

“কী?”

“কথা বল্।”

পুত্র দূরে গাছের দিকে চাহিয়া আছে।

“আমি তোকে এবার বড় ব্যথা দিলাম রে—এ ক’দিন তোকে এক মুহূর্ত্তও শান্তিতে থাকতে দিই নি। সে কি আমি আর—” মন্দাকিনী থামিয়া যান। কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে পারিতেছেন না। কি বলিতে গেন কি সব বলিতেছেন।

সুনীল তাঁহার মুখের উপর হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া লয়। মার মনটা তার কাছে এখন আয়নার মতই পরিষ্কার। মাতৃভক্তির প্রতিদানে পুত্রের কাছে মা কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চান। ভাল কথা! কিন্তু অতখানি নিশ্চিন্ত ভরসায় কেন? কাঁদুক না। অণিমার মতো কাঁদিতে পারিলে সে দৃশ্য বরং সুনীলের কাছে অনেকখানি সহনীয় হইয়া ওঠে। করুণা সেখানে পথ করিয়া লইতে পারে! এ যে একেবারে নগ্নরূপ! অসহ্য!

“মা!”

“বল্”

“আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসি।”

মন্দাকিনী উৎকর্ণ হইয়া আছেন। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে।

“অণিমা নয়—তুমি আমায় ভুল বুঝেছ এ ক’দিন।”

ছলনার পালা সুরু করে সুনীল। পরাজয় যদি মানিতেই হইল, মার এই অহঙ্কৃত জয়লাভের মধ্যে পুত্রও অশান্তির বীজ ছড়াইয়া দিয়া যাইবে!—

জননীর জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকাইয়া পুত্র অম্লানবদনে বলিয়া যায়, “অণিমা নয়—সে আর একটি মেয়ে, নাম তার নমিতা। কলকাতার মেয়ে, কলেজে পড়ে।”

নমিতা, সুনীতা, অসিতা, বিনীতা—মেয়েটির নাম যাহাই হউক কিছু আসে যায় না তাহাতে; সে যে অণিমা নয় মন্দাকিনীর কাছে তাহাই যথেষ্ট।

“অণিমা সব জানে তাকে আমি সব কথা খুলে বলেছি। সেই মেয়েটিকে নিয়েই তো অণিমার সঙ্গে কত কথা কয়েছি এ ক’দিন। আর তাতেই তোমরা দড়িকে সাপ মনে করে আঁতকে উঠেছ।”

মন্দাকিনীর মুখে চোখে চাপা হাসি-বিশ্বাসের না অবিশ্বাসের বলা শক্ত। পুত্রের দৃষ্টি কিন্তু সেই হাসিটুকু এড়ায় না।

মন্দাকিনী পূরা তিন দিন পরে আজ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, “বেশ তো।—এবার আমি কোনো কথা শুনব না, সে মেয়েকে ঘরে আমি আনবই।”

মন্দাকিনী মুচকি হাসিতে থাকেন। হাসে ছেলেও—একটা বিদ্রূপের হাসি। এত ভরসা ভাল নয়! কেমন এক অন্ধ উত্তেজনায় পুত্র যেন ফুলিয়া ওঠে মুহূর্ত্ত মধ্যে।

“আমি কালই চলে যাচ্ছি কেন জানো?”

জানেন বলিয়াই মন্দাকিনী নিরুত্তর।

“আপিস খুলবার তিন তিনটে দিন আগেই কলকাতা গিয়ে বসে থাকব এখন কিসের জন্য শুনবে?”

এত কথার পরেও মন্দাকিনী বড় আশায় সেই কারণটা শুনিতে কান খাড়া করিয়া থাকেন।

“সে মেয়েটি কাল ঢাকা মেলে কলকাতা যাচ্ছে, তাই। নইলে ছুটি না ফুরোতেই আগে ভাগে কলকাতা গিয়ে বসে থাকার কী আর দরকার ছিল আমার!”

মন্দাকিনীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া ওঠে। তাঁর অনুমানের তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে বহুক্ষণ। পুত্র কাল চলিয়া যাইতেছে তবে এই জন্য?

“আজ সকালে নমিতার চিঠি পেয়েছি। কাল তাদের সঙ্গে কলকাতা যেতে অনুরোধ জানিয়েছে—”

মন্দাকিনী পাংশুমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে ছেলের মুখের দিকে।

“এই ত্যাখো নমিতার চিঠি,” বুক পকেট থেকে রঙীন চিঠিটা সুনীল মার কাছে মেঝের উপর রাখিয়া দেয়, “পড়ে দেখতে পারো। তোমায় প্রণাম জানিয়েছে।”

ক্রমশঃ

সূর্য্যমুখী পাখী

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পূর্ব্বমুখী পুষ্প নই সূর্য্যমুখী পাখী
নিশাপ্রান্তে প্রতিদিন প্রতীক্ষায় ঊর্দ্ধে চেয়ে থাকি।
শুভ্ররশ্মি শুকতারা
প্রভাহারা, পাংশু মুখে চায়
আনন্দ সিন্দুর লেখা ঊষসীর সীমন্ত-সীমায়
রহি ঊর্দ্ধমুখে—
পুলকে কৌতুকে
রজনীর অঙ্কলেশ কালিমার চিহ্ন শেষ
ধ্বান্তারির জয়যাত্রা উড়াইয়া রক্ত চীনাংশুকে
আলোকের উদয়ন
বরণীয় বিকীরণ
প্রচারিয়া জ্যোতির্ব্বিদ মুখে।

অযোধ্যার ভরতের মত
জ্যেষ্ঠের পূজার লাগি
ভূমিলগ্ন নয়ন সন্নত,
ম্লান দেহে রাত্রি অতিবাহি
কখন প্রত্যূষ আসি করিবে রবির অভিষেক
তারি লাগি প্রাচীমূলে চাহি।
বিভাবসু স্বর্ণরথে
আসিবে ধরার পথে
অম্লান আকাশে অবগাহি।
ধৌত শুভ্র ক্ষৌম বাস
সচন্দন শ্বেতাব্জের মালা
তৃণাঙ্কিত বনভূমে
আলোকে সর্ব্বাঙ্গ চুমে
বাম বক্ষে বীণাখানি প্রভাতী ভৈরবী সুরে ঢালা
নীহার গলিয়া পড়ে, কুয়াসা মিলায়ে যায়—
প্রাণস্পন্দে জাগে পান্থশালা।

বকুল শেফালি ঝরে—
বাম আঁখিপদ্ম নড়ে
শবরীর মত পথ চাহি

ভরত—আমারো নাম
কবে ফিরিবেন রাম
পাদুকা মাথায় কাল বাহি।

সূর্য্যবংশ বৈতালিক
জানি লগ্ন চিনি দিক
লঘু পক্ষে আকাশে সঞ্চরি
নিত্য সৌর কর ধন্য ভারতে ভরত নামে পাখী
প্রফুল্ল প্রহরী—

নিঃশ্বসিয়া
উচ্ছ্বসিয়া
উদ্ভাসিয়া
উল্লসিয়া
মর্ম্মরিয়া
সঙ্গীতে মুখরি।

কুচবিহারের পত্র

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-এইচ-ডি, বি-লিট্

কুচবিহারের রাজগণ বাঙ্গালী নহেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুচবিহারের রাজা, রাজ-মাতা, সেনাপতি ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলারা কলিকাতায় লাটসাহেবের নিকট পারশী ভাষায় যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছেন প্রায় সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠাইয়াছেন। এই সকল বাঙ্গালা পত্রেও তাঁহাদের মোহরের চিহ্ন অঙ্কিত হইত। ভুটানের রাজা লর্ড কর্ণওয়ালিসকে কিছু ‘পাহাড়িয়া দ্রব্যজাত উপহার পাঠাইয়াছিলেন। উহার সঙ্গে যে চিঠি আসিয়াছিল তাহা ভুটিয়া, পারশী ও বাঙ্গালা এই তিন ভাষায় লেখা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পরাধীন বাঙ্গালীর ভাষা নিজের মহিমায় প্রতিবেশী স্বাধীন ও অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্য ও জনপদসমূহে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিল। কুচবিহার ও ভুটানের মত পররাজ্যে বাঙ্গালা ভাষার আদর কেন হইল, তাহা আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমরা কেবল কৃষ্ণচন্দ্র ও জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়দিগের লিখিত পত্রের ভাষার সহিত কুচবিহারে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার তুলনা করিব। ঘোষাল মহাশয়েরা বোধ হয় সেকালে কলিকাতার ভদ্রসমাজে যেরূপ বাঙ্গালার ব্যবহার ছিল সেই ভাষায়ই পত্র লিখিয়াছিলেন। তখনকার শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীদিগের মধ্যে পারশী-নবীশের অভাব ছিল না, কিন্তু তথাপি ঘোষাল মহাশয়দিগের পত্রে পারশী শব্দের তেমন বাহুল্য দেখা যায় না। বাক্য রচনা-রীতি ও ব্যাকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে কলিকাতার বাঙ্গালার সহিত কুচবিহারের বাঙ্গালার সামান্যই পার্থক্য লক্ষিত হইবে। দুই একটি শব্দের অন্তে পূর্ব্ববঙ্গের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র; কুচবিহারের বাঙ্গালায় যে পূর্ব্ববঙ্গের প্রভাব থাকিবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ভারত সরকারের মহাফেজখানায় কুচবিহার হইতে লিখিত বিশ-পঁচিশখানি ছোট-বড় চিঠি আছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহার প্রত্যেকখানিই মূল্যবান। কিন্তু ভাষার বিচারের জন্য নমুনা স্বরূপ একখানি উদ্ধৃত করিলেই চলিবে। কুচবিহারের বাঙ্গালায় পারশী শব্দের ব্যবহার কলিকাতার বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক।

কেবল ভাষার স্বরূপ বিচার করিতে হইলে কুচবিহারের ইতিহাস আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানির মর্ম্ম বুঝিতে হইলে কুচবিহারের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-একটি কথা জানা প্রয়োজন। এই জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তমদশক হইতে কুচবিহারে যে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কুচবিহারের রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক কোন কথা জানা যায় নাই। প্রবাদ যে, মহাদেব কোন অনার্য্য কোচ যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার ফলে কোচবিহারের রাজবংশের আদিপুরুষ বিশু সিংহের জন্ম হয়। বোধ হয় এই প্রবাদের ফলেই বাঙ্গালা দেশের মঙ্গল কাব্যে শিবের কোচনী পরিবাদ রটিয়াছে। প্রবাদ যে, ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে বিশু সিংহ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। মহাদেবের নিকট হইতে তিনি ছত্র ও দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বের প্রথম বর্ষ হইতে একটি অব্দ গণনা করা হয়। এই প্রবাদ কতদূর সত্য বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পত্রের এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ভুটানের দেবরাজের পত্রের শেষে এই অব্দের অনুসারে গণিত বর্ষের উল্লেখ দেখা যায়। চিঠির ভিতরে বড় বড় ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সনেরই ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কুচবিহারে কেবল বাঙ্গালা ভাষার প্রসার হয় নাই, অন্য ভাবেও বাঙ্গালীর প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

প্রচলিত প্রবাদ বিশ্বাস করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভুটানের দেবরাজ ও কুচবিহারের অধিপতি নিকট-আত্মীয়। কারণ, প্রবাদ মতে ভুটানের রাজার জন্ম হইয়াছিল বিশু সিংহের মাতৃস্বসার গর্ভে শিবের ঔরসে। এই প্রবাদের মূলে কতটা সত্য আছে জানি না, কিন্তু জাতি

হিসাবে যে ভুটিয়া ও কোচেরা নিকট-জ্ঞাতি তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার কুচবিহারের রাজবংশের প্রধান প্রধান কয়েকটি শহরের কর্ত্তাব্যক্তিগণই রাজ্যের গুটিকয়েক উচ্চপদ পুরুষানুক্রমে অধিকার করিয়া আসিযাছেন। প্রধান মন্ত্রী বা 'রায়কত' বিশু সিংহের ভ্রাতা শিশু সিংহের বংশধর। বৈকুণ্ঠপুরে তাঁহার নিবাস এবং তাঁহার জায়গীর বত্রিশ হাজারী নামে বিখ্যাত। সেনাপতি বা 'নাজিরদেব' ও রাজবংশেরই সন্তান। তিনি বলরামপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। 'দেওয়ানদেব' প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকজন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীও প্রথম রাজা বিশু সিংহের বংশধর। সুতরাং ভুটানের দেবরাজ কেবল কুচবিহারের রাজার প্রতিবেশী নহেন, নিকট-আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ী; বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত, বলরামপুরের নাজিরদেব প্রভৃতি সচিব ও সামন্ত কেবল রাজার ভৃত্য নহেন, ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি; সুতরাং রাজ্যের ও রাজার শুভাশুভের সহিত তাঁহাদের স্বার্থও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

বোধ হয় তৃতীয় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগলেরা কুচবিহার প্রথম আক্রমণ করেন। জাহাঙ্গীর তখন দিল্লীর বাদশাহ। কথিত আছে যে, মুকুন্দ সার্ব্বভৌম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজার প্রতি কুপিত হইয়া মোগলদিগকে কুচবিহারে ডাকিয়া আনিয়াছিল। কুচবিহারের ইতিহাসে ব্রাহ্মণের উপদ্রব এই শেষ নহে।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তখন সিংহাসন লইয়া বিরোধ আরম্ভ হইল। ভুটিয়ারা কুচবিহারে প্রবেশ করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল। তখন সেনাপতি (নাজিরদেব) শান্তনারায়ণ বাঙ্গালার মুসলমান সুবাদারের সাহায্যে দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজা রূপনারায়ণকে কুচবিহারের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় স্থির হইল যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সত্যনারায়ণ দেওয়ান-দেবের পদ পাইবেন এবং সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব তিন হিস্যায় বিভক্ত হইবে। নাজিরদেব সৈন্য বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং নিজের বেতন স্বরূপ রাজস্বের নয় আনা অংশ পাইবেন, দেওয়ানদেব তাহার বিভাগের ব্যয় বাবদ রাজস্বের এক আনা লইবেন এবং বাকী ছয় আনা রাজার অংশে থাকিবে। নিম্নোদ্ধৃত পত্রে এই তিন হিস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইহার পরে আবার অন্তর্বিপ্লব উপলক্ষে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারে ভুটিয়া উৎপাত আরম্ভ হয়। রাজগুরু সর্ব্বানন্দ গোসাঞির ভ্রাতা রামানন্দের প্ররোচনায় রতি শর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণ শিশু রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণকে হত্যা করে। সুতরাং সিংহাসনের অধিকার লইয়া আবার গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভুটিয়ারা রামানন্দকে রাজহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। নাজিরদেব রুদ্রনারায়ণ বলরামপুর হইতে সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহার ইচ্ছা ছিল যে ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে দেওয়ানদেব রামনারায়ণেরই কুচবিহারের সিংহাসনে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল দাবী ছিল। কিন্তু দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তিনি সিংহাসন পাইলেন না। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ নাজিরদেবের সম্মতিক্রমে রাজা হইলেন।

রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র যদি সিংহাসন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন হয়ত আর কোন গোলযোগ হইত না; কিন্তু যে কারণেই হউক তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণকে সিংহাসনের কণ্টক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কোন সুযোগে রাজা রামনারায়ণকে হত্যা করিলেন। ভুটিয়ারা আবার কুচবিহারে প্রবেশ করিল এবং ভ্রাতৃহন্তা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী করিয়া ভুটানে লইয়া গেল। কুচবিহারের শূন্য সিংহাসনে ভুটিয়াদিগের অনুমোদনে ধৈর্য্যেন্দ্রের ভ্রাতা রাজেন্দ্রের স্থান হইল। অল্প সময় পরেই রাজেন্দ্রের মৃত্যু হইল। ইতিমধ্যে নাজিরদেব রুদ্রনারায়ণও পরলোকগমন করিয়াছিলেন। নূতন নাজিরদেব খগেন্দ্রনারায়ণ বন্দী রাজার পুত্র বরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিলেন। এই উপলক্ষে ভুটিয়াদিগের সহিত কুচবিহারের আবার কলহ আরম্ভ হইল। ভুটিয়ারা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র ব্রজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিতে চাহিল। এই সকল ঘটনার কিছু কিছু বিবরণ আমাদিগের উদ্ধৃত পত্রে পাওয়া যাইবে। নাজিরদেব খগেন্দ্রনারায়ণ ও রাজা বরেন্দ্রনারায়ণ ভুটিয়াদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাগত হইলেন। এই সময়ে কুচবিহারের রাজা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিয়মিতরূপে বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার করেন। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতার ইংরেজ সরকারের কর্ত্তা।

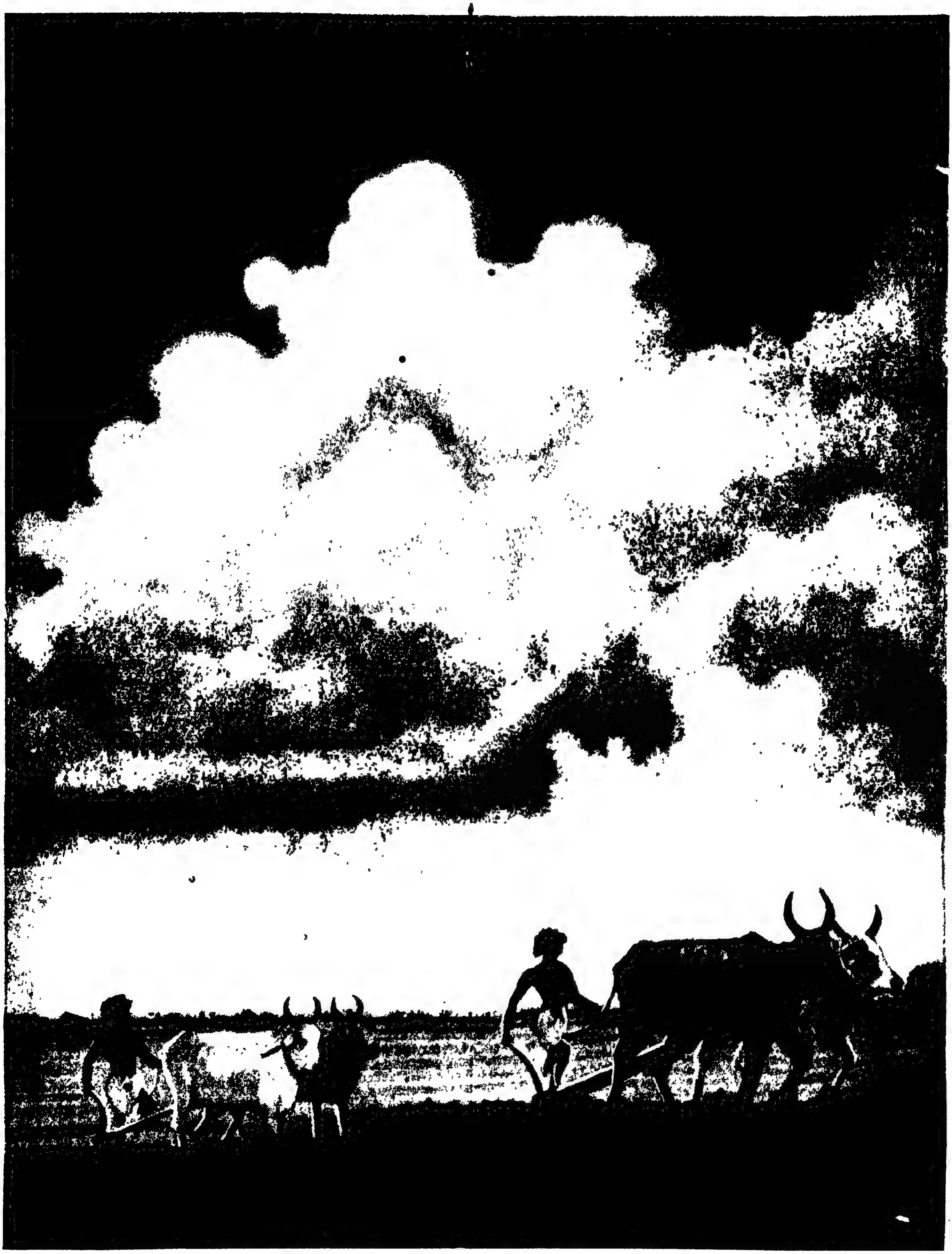

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

তিনি কাপ্তেন জোন্সের নেতৃত্বে একদল সৈন্য কুচবিহারে পাঠাইলেন। ভুটিয়ারা পরাজিত হইয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া গেল। রাজা ধৈর্য্যেন্দ্র কারামুক্ত হইলেন। দেশে ফিরিবার পর তিনি উন্মাদ হইয়াছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা বরেন্দ্র পরলোকগমন করেন। ইহার পর ধৈর্য্যেন্দ্রই আবার সিংহাসনে বসিলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার রাণী ও রাজগুরু সর্ব্বানন্দের হস্তগত হইল। ধৈর্য্যেন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিয়া রাণীমাতা (হরেন্দ্রনারায়ণের বিমাতা) ও সর্ব্বানন্দ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিলেন; সুতরাং নাজিরদেব খগেন্দ্রের সহিত তাঁহাদিগের বিষম কলহের সূত্রপাত হইল। ১৭৭৩ সালে রাজা বরেন্দ্র যখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব কর দিবার সর্ত্তে সন্ধি করেন তখন নাজিরদেব ইচ্ছা করিলে সন্ধিপত্রে নিজের ক্ষমতা ও স্বার্থ অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কেন তিনি তাহা করেন নাই তাহা আমরা জানি না। এই সময় হইতে উভয় পক্ষই রঙ্গপুরের কলেক্টরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। যেপক্ষ কলেক্টর সাহেবের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছেন সেই পক্ষই রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অপর পক্ষের প্রতি বৈরনির্য্যাতনের অভিপ্রায়ে অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কোন পক্ষেরই সৌভাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এক সময়ে খগেন্দ্রনারায়ণ কুচবিহার ছাড়িয়া আসামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সর্ব্বানন্দ গোসাঞির সিপাহীরা বলরামপুর লুণ্ঠন করিয়াছিল, আবার ইহার পরে দেওয়ানদেব প্রভৃতি রাজবংশীয় সচিববৃন্দ রাজমাতা ও সর্ব্বানন্দের কু-শাসনে বিরক্ত হইয়া খগেন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, বালক রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও রাজমাতা কিছুদিন বলরামপুরে নাজিরদেবের প্রাসাদে বন্দী হইয়াছিলেন। শেষে ইংরেজ সরকারের চেষ্টায় কুচবিহারের গোলযোগের একটা মীমাংসা হয়। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষের অভিযোগই পত্রযোগে এবং প্রতিনিধির (উকিল) মুখে লাটসাহেবের গোচর হইয়াছে। দুই পক্ষেরই উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করা এবং অপর পক্ষের প্রতি দুরভিসন্ধির আরোপ করা। সুতরাং প্রত্যেক পত্রেই অতিরঞ্জন ও সত্যগোপনের চেষ্টা দেখা যায়। আমরা এখানে এই সকল অভিযোগের সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব না। এই বার নাজিরদেবের মাতার পত্র দেখা যাউক।

শ্রীশ্রীত্রৈলোক্য
নাথ স্মরনং।

স্বস্তি সকল মঙ্গলৈক নিল্বয় মহামহিম শ্রীযুক্ত গোবনরঃ জানরেল
মেস্তর চারল্স ইয়ারল কারনওয়ালিষ বড সাহেব বাহাদুর
প্রচণ্ড প্রতাপেষু

সরকার[১] বেহার ইস্তক পাহাড় ভোটান্ত নাগায়দ[২] রঙ্গপুর ঘোড়াঘাটতক আমাদিগের পুরসানুক্রমের শ্রীশ্রী৺সদাসিবের[৩] দত্ত সাসনভৌম তিন হিস্যাতে[৩ক] আত্মোপান্ত দখলে[৪] হইয়া আসিতেছে কখন বাদসাহিতে দখল ছিলনা পরে আমাদিগের ঘর ফুট হইয়া রঙ্গপুর ঘোড়াঘাট ও গয়রহ[৫] বাদসাহিতে দখল হইলু আমরা বেহার বলরামপুরে ছিলাম তাহাতে ধর্জেন্দ্রনারায়ন রাজা আপন জেষ্ট ভ্রাতাকে থানথা[৬] কাটিয়াছিল একারন ভুটিয়াব স্থানে কএদ রহিল আমার ছাওাল শ্রীমান নাজিরদেও খগেন্দ্র নারায়ন রাজেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিল তাহার পর রাজন্দ্রনারায়ন রাজার পরলোক হইলে পর কএদি রাজার পুত্র ধরেন্দ্রনারায়নকে আমার ছাওাল রাজা করিলেন ইহাতে ভুটিয়ারা কহিল কএদি রাজার পুত্র রাজার উপযুক্ত নহে তুমি রাজা হও অথবা অন্য কাহাকো রাজা করহ তাহা আমার ছাওাল মনজুর করিলনা একারন সন ১১৭৯ সালে ভুটিয়ার সহিত কাজিয়া[৭] হইয়া আমার ছাওাল ৺কোম্পানির সরনাগত হইয়া সরকার বেহার কোমপানির দখল দেলাইয়া উতপন্নের নিম্পী[৮] কোমপানিতে নালবন্ধী[৯] কবুল[১০] করিয়া কউলনামা[১১] আদি লেখাপড়া আপন

১। সরকার—মোগল অধিকৃত কয়েকটি পরগণা লইয়া পরে সরকার বেহার গঠিত হয়।

২। নাগায়দ (আরবী)—পর্য্যন্ত।

৩। বিশ্ব সিংহের পিতা শিবের অনুগ্রহে রাজত্ব পাইয়াছিলেন।

৩ক। হিস্যা (আরবী)—অংশ। শান্তনারায়ণ রাজস্বের যে তিন ভাগ করিয়াছিলেন তাহার কথা বলা হইতেছে।

৪। দখল (আরবী) অধিকার।

৫। গয়রহ (আরবী) ইত্যাদি।

৬। থানথা (পারশী) অকারণে।

৭। কাজিয়া (আরবী) বিবাদ।

৮। নিম্পী, নিস্ফী (আরবী) অর্দ্ধেক।

৯। নালবন্ধী পারশী) কর।

১০। কবুল (আরবী) স্বীকার।

১১। কাউলনামা (পারশী) অঙ্গীকার-পত্র।

নামে না করিয়া ধরেন্দ্রনারায়নকে আমার ছাওাল রাজা করিয়াছিল তাহা ভোটেরা মঞ্জুর করেনা একারন রাজার কাইমাত্রে১২ রাজার নামে করিয়া শ্রীযুক্ত পেশুর পরলিঙ্গ* সাহেব সহিত কোমপানির ফৌজ লইয়া ভোটীয়াকে নিরস্ত করিল আমার পুরসানুক্রমের কিয়া১৩ বহাল১৪ থাকিল বেহার মোকামে পরলেঙ্গ সাহেব মজকুর১৫ তিন তরফের কাগজ ও আমলা একত্র করিয়া ৺গবর্ণর কৌঙচলের হুকুম মতে খডোপোস১৭ জাহার জে ছিল তাহা মজুরা১৮ দিয়া নালবন্দীর বন্দোবস্ত করিল রাজা ধজেন্দ্রনারায়নকে আমার ছাওাল ভোটীয়ার স্থানে হইতে খালাস১৯ করিয়া লইল রাজা বেহার পহুছিয়া পাগল হইল কতেক দিবস পরে ধরেন্দ্রনারায়নের পরলোক হইল ততপরে আমার ছাওাল পাগল রাজাকে রাজা করিয় কোমপানিতে জে নালবন্দী কবুল করিয়াছিল তাহা হিশ্বাক্সই২০ সরবরাহ২১ করিয়া আপন২ ভৌমে কাএম রহিলাম এহিমতে শ্রীযুক্ত মেস্তর পরলিঙ্গ সাহেব মজকুর ও শ্রীযুক্ত মেস্তর লম্প'ট সাহেব ও শ্রীযুক্ত মেশ্‌র হাড্‌ট সাহেব ও শ্রীযুক্ত মেস্তর বুগল † সাহেব ও শ্রীযুক্ত মেস্তর গোডলাট সাহেব নাগাদী সন ১১৯০ সাল তক জে জে জেলাদার২২ সাহেবান২৩ লোক আসিয়াছে তাহারা একেক জন সাজোয়াল২৪ সরকার মজকুরে পাঠাইয়া নালবন্দীর টাকা তিন তরফে২৫ বুঝিয়া লইয়াছে আমরা'ও আপন ফরাখরি মতে২৬ ছিলাম মেস্তর হাড্‌ট সাহেবের আমলে শ্রীসর্ব্বানন্দ গোসাঞী পাগল রাজার রাণির সহিত ইর্ত্তফক২৭ করিয়া রাজার হিশ্বাতে দৌরাত্ম আরম্ভ করিল একারণ আমার ছাওাল সাহেব মজকুরকে সংবাদ লিখিল সাহেব মজকুর গোসাঞী মজকুরের স্থানে মুচলিকা২৮ লইল বেহারে জাইবেকনা এবং মামলিয়ত২৯ করিবেকনা—পরে মেস্তর পরলিঙ্গ সাহেবের দোসরা আমলে গোসাঞী মজকুর সাহেবের মরজী৩০ করিয়া বেহার গেল আমরা আপন ২ হিশ্বাতে কাএম ছিলাম সন ১১৯১ সালে মেস্তর মৌর সাহেব জিলা রঙ্গপুর পুহুছিলে পর গোসাঞী মজকুর সাহেবের সহিত কারসাজী ৩১ করিয়া আমার ভূম সরকার বেহারের হিশ্বা ও বোদা ও গয়রহ তিন চাকলা জখন রঙ্গপুর বাদসাহিতে দখল হইল তখন অবধি আমার বেসরাকতি ৩২ জমীদারিএবং কোমপানিতে জে খোরপোস মজুরা পাইয়াছিলান সমস্ত দখল করিয়া লইল এবং আমার বাড়ীঘড় মাল আমোর্ত্তলা৩৬ লুটতরাজ করিয়া লইল আমার গোমাস্তা শ্রীসামচন্দ্র রায় তাহাকে কএদ রাখিয়া তাহার বাড়ীঘড় লুটতরাজ করিল এবং আমার বাডিতে সাহেবের তরফ সিফাই আপন তরফ দুই তিন সর্ত্ত লোক পাঠাইয়া বাডি ঘিরিয়া আমার ছাওালকে কএদ করিবার উর্দ্দত এ কারন গবর্নর কৌঙচলে নালিষ জাইতে ছিল দশরোজের পথ হইতে সাহেবের তরফ সিফাই ও গোসাঞের তরফ মবলখা৩৪ লোক জাইয়া আমার ছাওালকে ধরিয়া জিলা রঙ্গপুর আনিয়া সাহেব মজকুর সোসাঞের জিম্বা৩৫ করিয়া দিল গোসাঞী মজকুর বেহারে আনিয়া তিন চারি সর্ত্ত লোকমধ্যে বেহুরমত৩৬ করিয়া কএদ করিয়া কোথা রাখিল কী করিল তাহার অন্বেসন পাইনা আমার তরফ রাইয়ত আমলালোক সকলকে লুটতরাজ করিয়া আমার মুলুক খানেখারাপ৩৭ করিল আমি তিন সন হইল নালিশবন্ধ৩৮ আমার ইনসাফ৩৯ কেহো করেনা গোসাঞী মজকুর আমার ভূম ও মাল আমোর্ত্তাল আপন দস্ত ৪০ করিয়া জরদার ৪১ হইয়াছে তাহার জরবাজি৪২ মতে জিলা মজকুরে জে জে সাহেবলোক

১২। কাইমাত্রে (আরবী)—কায়েম, কায়েমার্গে, কায়েম করিবার জন্য।

* Charles Purling, ১৭৭১, ১৭৭৭-৭৯ এবং ১৭৯০ সালে রঙ্গপুরের কলেক্টর।

১৩। কিয়া (সংস্কৃত) ক্রিয়া।

১৪। বহাল (পারশী)—অপরিবর্ত্তিত

১৫। মজকুর (আরবী)—উক্ত।

১৭। খডোপোস (পারশী) খোরপোষ, খাওয়া পরা।

১৮। মজুরা (আরবী) মুজরা, ছাড়, বাদ।

১৯। খালাস (আরবী) মুক্ত।

২০। হিশ্বাক্সই (আরবী) হিস্ত, পারশী রু, অংশানুসারে

২১। সরবরাহ (পারশী) যোগান।

† Harwood, Bogle and Goodlad.

২২। জেলাদার (পারশী) জিলার মালিক।

২৩। সাহেবান (পারশী) সাহেবেরা।

২৪। সাজোয়াল (পারশী) আদায়কারী।

২৫। তরফে (আরবী) পক্ষে।

২৬। ফরাখরি (পারশী) অংশ। ফরাখতি মতে—অংশ অনুসারে।

২৭। ইর্ত্তফাক (আরবী) যোগাযোগ।

২৮। মুচলিকা (পারশী) অঙ্গীকারপত্র, Bond.

২৯। মামলিয়ত (আরবী) রাজ্যশাসন।

৩০। খরজী (আরবী) খুশী।

৩১। কারসাজী (পারশী)—চক্রান্ত।

৩২। বেসরাকতি (পারশী)—সম্পূর্ণ, অন্য অংশীদার ব্যতীত।

৩৩। আমোর্ত্তাল (আরবী) মালের বহুবচন।

৩৪। মবলখা (আরবী) বহু।

৩৫। জিম্বা (আরবী) হেফাজত।

৩৬। বেহুরমত (পারশী) বে + আরবী হুরমত—অপমান।

৩৭। খানেখারাপ (পারশী) ধ্বংস, ছারখার।

৩৮। নালিশবন্ধ (পারশী) নালিশমন্দ, অভিযোগকারী।

৩৯। ইনসাফ (পারশী) বিচার, বিবেচনা।

৪০। দশত (পারশী) হাত।

৪১। জরদার (পারশী) ধনবান।

৪২। জরবাজি (পারশী) টাকার খেলা।

অংশীতেছেন তাহাদিগের স্থানে গোসাঞী মজকুর সরফরাজ[৪৩] আমার তরফ রাইয়ত জন কেহো জিলার সাহেবের নিকট নালিষ গেলে সোসাঞের জিম্বা করিয়া দেন গোসাই মজকুর পাচ সাতজন উকিল কলিকাতায় দরবারে রাখিয়াছে তাহারা সর্ব্বত্রে কারসাজী করিয়া ফিরিতেছে গোবঃনর কৌঙচলের হুকুমমতে শ্রীযুক্ত নবাব মজফরজঙ্গ বাহাদুরজঙ্গ আমার গোমাস্তা শ্যামচন্দ্র রায় মজকুরকে কএদ হইতে তলব দিয়া লইয়া জাইয়া তজবিজ[৪৪] করিয়া খালাষ দিলেন রায় মজকুর কলিকাতা পুহছিয়া সাতমাসতক নালিষ বন্দ কেহো শুনিলনা মতে আজিজ[৪৫] হইয়া উঠিয়া আইল আমার তরফের জে দুই একটী উকিল আছে তিন সন অবধি আরজী দাখিল করিতেছে গোসাঞের উকিলের কারসাজী মতে কেহো ইনসাপ করেনা আমি সগোষ্টী সহিত অন্নের আজিজ[৪৬] ৺কোমপানি বাহাদুরের সরনাগত হইয়া আমার জে আহোয়াল[৪৭] হইয়াছে ইহাতে পাহাড়তলী জত রাজরাজেরা আছে আমার আহোয়াল দেখিয়া আর কেহো কোমপানি বাহাদুরের সরনাগত হইবে না সাহেব বিলাতের উমর্দা[৪৮] বাদসা ঘড়ানা[৪৯] ৺সাহেবকে হিন্দুস্থানের বাদসা করিয়া পাঠাইয়াছেন সাহেবের আগমনে সর্ব্বত্রে ইনসাফের নকসা[৫০] পুহুছিয়াছে আমার স্বহায় সম্পত্তী সের্ত্তায়[৫১] সাহেব অন্য কেহো নাঞী আমার সিকশত[৫২] আহোয়ালের পর নেকনজর[৫৩] রাখিয়া আমাকে সাবেকমতে আপন মিরাসে[৫৪] কায়েম করিতে হুকুম হইবেক আমার তরফ শ্রীবৈদ্যনাথ উকিল তগাত আছে আমার আহোয়াল হুজুরের সমস্ত আরজ করিবে মেহেরবানকী[৫৫] পূর্ব্বক হক[৫৬] ইনসাফ হুকুম হইবেক তিনসন অবধি আমার বাড়ীঘর রাহী[৫৭] ঘাট সর্ব্বত্রে চৌকী লিখন লিখিয়া অন্যত্রে পাঠান সাধ্য নাই অতি সঙ্গপনে সাহেবের হুজুরে আরজ পত্র লিখিলাম পুহুছে এমত ভরসা নাই যদি পুহুছে তবে মেহেরবানকী পূর্ব্বক জবাব হুকুম হইবেক গোচর কারন ইতী সন ২৭৭ সাল। তারিখ ২ পৌষ

এই পত্রখানিতে মোট দেড়শতের অধিক আরবী ও পারশী শব্দ আছে। ইহার মধ্যে সরকার, ইস্তক, নাগায়দ, দখল, গয়রহ, বাদশাহী, খানাখা, কয়েক, মঞ্জুর, বহাল, তরফ, খোরপোষ, বন্দোবস্ত, খালাস, কাবুল, হিস্যা, কায়েম, মুচলিকা, কারসাজি, মজুরা, লুটতরাজ, জিম্বা, রায়ত, আমলা, দরবার, হুকুম, আরজি, দাখিল, উকিল, হুজুর, জবাব, আল প্রভৃতি বিদেশী শব্দ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত আছে। কিন্তু "আমার ভূম ও আল আপন দস্ত করিয়া জরদার হইয়াছে" "তাহাদিগের স্থানে সরফরাজ" "ইনসাপ করেনা" "অন্নের আজিজ" "আজিজ হইয়া উঠিয়া আইল" "সিকস্ত আহোয়ালের পর নেকনজর রাখিয়া" "আপন মিরাসে কায়েম করিতে হুকুম হইবেক" "ইনসাফের নক্সা পহুছিয়াছে" প্রভৃতি পদ এখনকার সাধু ভাষায় অচল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ঘোষাল মহাশয়-দিগের পত্রে এত বিদেশী বাক্য অথবা পদের বাহুল্য নাই। বোধ হয় কলিকাতার ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার মত পারশী শব্দের অধিক ব্যবহার ছিল না। কতকগুলি শব্দ দীর্ঘকালের ব্যবহারে বাঙ্গালা ভাষায় কায়েমী হইয়া গিয়াছে, আবার কতকগুলি শব্দ ও পদ ধীরে ধীরে অব্যবহারে সাধু ভাষা হইতে লোপ পাইয়াছে। যাহা হইয়াছে তাহা ভাষার সাধারণ বিবর্ত্তনের নিয়মেই হইয়াছে; কোন পণ্ডিত-সমাজের চক্রান্তে বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের ইচ্ছা অনুসারে হয় নাই। বিগতযুগে বাঙ্গালা ভাষা যে গুণে কুচবিহার, ত্রিপুরা ও ভুটানের রাজ-দরবারে আদৃত হইয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে কি তাহার সেই সকল গুণ লোপ পাইয়াছে, না অন্য কারণে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহে তাহার প্রসার ও প্রতিপত্তি কমিয়া গিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

---

[৪৩] সরফরাজ (পারশী) উচ্চশির, প্রতিপত্তিশালী।

‡ মহম্মদ রেজা খাঁ।

[৪৪] তজবিজ (আরবী) বিচার।

[৪৫] আজিজ (আরবী) নিরুপায়।

[৪৬] অন্নের আজিজ—অন্নহীন।

[৪৭] আহোয়াল (আরবী)—অবস্থা, দশা।

[৪৮] উমর্দা (আরবী)—উৎকৃষ্ট।

[৪৯] বাদশা ঘড়ানা—(ঘরানা-হিন্দী) বাদসা ঘড়না বাদশাহী পরিবারের।

[৫০] নকসা—নক্সা (পারশী)—চিহ্ন।

[৫১] সের্ত্তায় (আরবী) ভিন্ন। নেওয়ায় সাহেব—সাহেব ব্যতীত।

[৫২] সিকশত—সিকস্ত (পারশী) ভগ্ন।

[৫৩] নেক নজর (পারশী)—কৃপাদৃষ্টি।

[৫৪] মিরাস (আরবী)—পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি।

[৫৫] মেহেরবানকী (পারশী)—অনুগ্রহ।

[৫৬] হক (আরবী)—ন্যায়, ন্যায্য।

[৫৭] রাহী (পারশী) রাস্তা।

দেব-দেউলের দেশে

ডাঃ সুবোধ মিত্র এম-ডি (বার্লিন), এম-বি (কলিঃ), এফ্-আর-সি-এস (এডিন্ন) এফ্-সি ও-জি

"পথি নারী বিবর্জ্জিতা"—শাস্ত্রকারের এই বাণীর অসারতা প্রমাণ করবার জন্যই বোধ হয় আমি পঞ্চ নারীর সমভিব্যাহারে ভারতের দক্ষিণ দিকটা দর্শন লোভে বেরিয়ে পড়লাম। এই পঞ্চ নারীর ভিতর একটু বিশেষত্ব ছিল। অর্থাৎ সর্ব্ব কনিষ্ঠটি হচ্ছেন পাঁচ বছরের এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠটি ৭২ বছরের; যদিও বাহাত্তরের কোন লক্ষণ তিনি ভেতরে এখনও পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নি। এই পঞ্চ নারীর মধ্যে আবার চার পুরুষ (four generations) বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ—কন্যা—তস্যা মাতা, তস্যামাতা এবং তস্যামাতা।

শ্বশুর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা অর্থাৎ আমার সহধর্ম্মিণী সমস্ত জিনিসপত্র সওদা করবার এবং গোছানোর ভার নিয়েছিলেন; তাই বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত পূরাদমে কাজ করেও ৬৷৷০টায় মাদ্রাজ মেল ধরতে পেরেছিলাম—যদিও রেড রোড দিয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল হিসেবে গাড়ী চালাতে হয়েছিল। ৯ই ডিসেম্বরের এই মাদ্রাজ-মেল ধরতে না পারলে নিশ্চয়ই এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখা ত দুরের কথা, ভ্রমণ করাই ঘটে উঠত না; কারণ ১১ই ডিসেম্বর থেকে মাদ্রাজ য়ুনিভার্সিটির ডাক্তারী পরীক্ষা আরম্ভ হবার দিন পাকাপাকি ঠিক ছিল এবং একসঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ ও তীর্থ ভ্রমণ, অর্থাৎ—'রথ দেখা ও কলা বেচা'রূপ সাধু সঙ্কল্পই মনে ছিল। তারপর আকাশবৃত্তির ওপর নির্ভর করে যাকে জীবিকানির্ব্বাহ করতে হয়, মাদ্রাজ য়ুনিভার্সিটির এই সুযোগ না পেলে তার পক্ষে এত বড় একটা ভ্রমণের পরিকল্পনা দুরাশা বলে মনে হত। যাই হোক, ৯ই ডিসেম্বর পঞ্চ নারী সমভিব্যাহারে মাদ্রাজ রওনা হলাম।

১১ই ডিসেম্বর সকাল আটটায় মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌছলাম। রাস্তায় তেমন কষ্ট হয়নি। পাঁচটি 'বার্থ' রিজার্ভ করা হয়েছিল, কিন্তু সমস্ত কম্পার্টমেণ্টই নিজেদের ব্যবহারে পাওয়া গেল। ইকমিকে রান্না ক'রে খাওয়া দাওয়া-তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি, যদিও কর্ত্তামার পৌরাণিক গোঁড়ামিতে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়েছিলাম—কি ক'রে এই পথে ছুৎমার্গ থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবো!

মাদ্রাজে পরীক্ষার জন্য চারদিন থাকতে হ'ল। সকাল ৮টা থেকে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত পরীক্ষার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম; সুতরাং সঙ্গীদের নিয়ে মাদ্রাজ পরিদর্শন করবার তেমন সুযোগ হ'ল না। মাদ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বামারাও আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। তাঁর সৌজন্যে কাছাকাছি দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কিছু কিছু দেখা হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডাঃ বিমল দের বাড়ীতে গিয়ে একদিন রাত্রিকালে বাংলা দেশের মাছের তরকারি খাওয়া হ'ল।

এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন অতি চমৎকার কাজ করছেন। তাঁদের আশ্রমের প্রসাদ থেকেও আমরা বঞ্চিত হইনি। মাদ্রাজ থেকে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর পক্ষী-তীর্থ এবং মহাবলীপূরমের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু সময়াভাবে এবার আর যাওয়া হল না।

১৪ই ডিসেম্বর বেলা ছটায় পরীক্ষার কাজ শেষ ক'রে রাত্রি নটার ট্রেনে ত্রিচিনপল্লী রওনা হওয়া গেল। যাঁরা আমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা কলকাতার তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে এসে হাওড়া স্টেসনে মিলিত হন। সুতরাং জিনিসপত্র কার সঙ্গে কি ছিল, কেউই জানতেন না। মাদ্রাজে পৌছে দেখা গেল--পাঁচটি স্টোভ এসেছে, দুই কলসী গঙ্গাজল, চারটি বালতি এবং এক ঝুড়ি কলাও একটা মোটের ভিতর বর্ত্তমান। মোটের সংখ্যা সর্ব্বসমেত গোটা পঁয়ত্রিশ! এইজন্যেই কি শাস্ত্রকাররা 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' বলেছেন? যাহোক্, মাদ্রাজে এসে তাঁরা নিজেদের মালপত্রের বহর দেখে নিজেরাই একটু লজ্জিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ফলে অর্দ্ধেকেরও বেশী জিনিসপত্র হোটেলে গচ্ছিত রেখে পুনর্ব্বার যাত্রা করা হ'ল।

১৫ই ডিসেম্বর সকাল সাতটায় ত্রিচিনপল্লী স্টেসনে পৌছে 'রিটায়ারিং রুমে' (retiring room) জিনিসপত্র রেখে শ্রীরঙ্গমের মন্দির দর্শনে বাহির হওয়া গেল। পথে কাবেরী নদী দর্শন ও স্পর্শন হ'ল। কর্ত্তা-মা কাবেরী-তীরে অর্ঘ্য দান ক'রে কৃতকৃতার্থ হলেন, আমরাও দর্শন করে ধন্য হলাম।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—গোপুরম্‌, টেপাকুলম, দেবদেউল, স্তম্ভ ইত্যাদি। প্রায় সব মন্দির একই ভাবে গঠিত। গোপুরম্‌ হচ্ছে প্রবেশ-দ্বার। সাধারণত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম—এই চারদিকে চারটি 'গোপুরম্‌' প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ভারতে মন্দির অপেক্ষা গোপুরমের ভাস্কর্য্য এবং কারুকার্য্যই বেশী। রাজার চেয়ে রাজরক্ষীর পোশাকের আড়ম্বর যেরূপ বেশী, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের চেয়ে গোপুরমের ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরও সেইরূপ বেশী। গোপুরমের পাশ থেকে বৃহৎ প্রাকার দিয়ে মন্দির স্থানটি পরিবেষ্টিত। প্রাকার বিশেষভাবে সুরক্ষিত এবং এর ভিতর মন্দির ভিন্ন নানা প্রকার দোকান পসার এবং বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে জনসমাগমের সুব্যবস্থার জন্য বিশাল মণ্ডপের সংস্থান আছে।

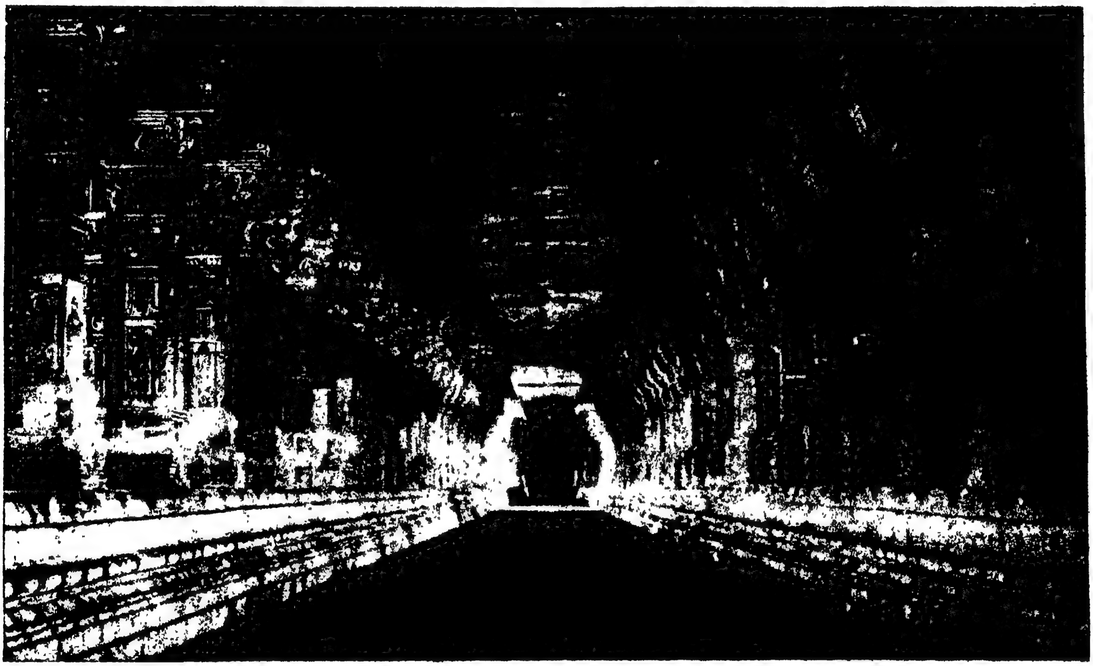

রামেশ্বর মন্দিরের বিরাট চত্বর (১).

গোপুরম পার হয়ে একটির পর একটি এইরূপে সাতবারে সপ্তম দ্বার ভেদ ক'রে দেবতার স্থানে পৌছিতে হয়। এই ব্যবস্থার সত্যিকার মাহাত্ম্য কি জানি না; তবে এইভাবে দেবদর্শনে যেতে ও দেবতার স্থানে পৌছিতে ভালই লাগল। মনটা যেন ক্রমেই দেবোদ্দেশে উন্মুখ হয়ে ওঠে; যতই এক এক ঘাটি পার হয়ে দেবতার সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই পায়ের গতি ক্রমশঃ দ্রুত হতে দ্রুততর হয়, মনও চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হতে থাকে। তাই বোধ হয় সাধক এই সাত ঘাটি পার হয়ে সমস্ত দেহমন ও প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়ে অভীষ্টের সম্মুখে পৌছান।

শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে ভগবান অনন্ত শয্যায় শায়িত আছেন। দেবতা দর্শন হ'ল বটে, কিন্তু এখানে সত্যিই কি দেবদর্শন করতে এসেছিলাম?

শ্রীরঙ্গম ভগবানের একটি বিশেষ লীলাক্ষেত্র। ভগবানের দর্শন জনসাধারণ ত সাক্ষাৎরূপে পায় না, পায় তাঁর অন্তরঙ্গের ভেতর দিয়ে। মহাযোগী যমুনাচার্য্য, মহাপূর্ণ এবং প্রভুপাদ রামানুজের সাধনাস্থল এই শ্রীরঙ্গম এক সময় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যমুনাচার্য্যের জীবনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বালক যমুনাচার্য্য বার বৎসর বয়সে পাণ্ড্য রাজ্যের দিগ্বিজয়ী বিদ্যাভিমানী সভাপণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত ক'রে পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করেন। সুপণ্ডিত, প্রজারঞ্জক এবং ভাগ্যবান যমুনাচার্য্য যখন শান্তিতে রাজত্ব করছিলেন, তখন তাঁর পরম ধার্ম্মিক পিতামহ দেহরক্ষার সময় প্রিয় শিষ্য রামমিশ্রকে বলে যান—'দেখো, যেন যমুনাচার্য্য বিষয়ভাবে রত হয়ে

কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়।' সাধক রামমিশ্র গুরুবাক্যানুসারে রাজা যমুনাচার্য্যের কাছে গিয়ে বললেন যে, তাঁর পিতামহ তাঁর জন্য অমূল্যধন রেখে গিয়েছেন। রাজা যমুনাচার্য্য এই বাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে সাধক রামমিশ্রের সঙ্গে অমূল্য ধন সংগ্রহ করবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে সাধক রামমিশ্রের সংসর্গে তাঁর সুমধুর ভগবৎব্যাখ্যায় এবং প্রাণময় ধর্ম্মালোচনায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অবশেষে রামমিশ্র যখন যমুনাচার্য্যকে শ্রীরঙ্গনাথের পাদপদ্মে নিয়ে গিয়ে বললেন—'এই আপনার পিতামহের অমূল্যধন'—তখন রাজা যমুনাচার্য্যের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সেইদিন থেকে তিনি শ্রীরঙ্গনাথের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ক'রে ধন্য হলেন। এরপর প্রাণপাত সাধনা ও তপস্যার দ্বারা তিনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন।

মাদুরা মীনাক্ষী দেবীর গোপুরম্ (১)

সাধক যমুনাচার্য্যের সন্ন্যাসগ্রহণে শ্রীরঙ্গমে যেন নূতন প্রাণ ফিরে এল। বালক বৃদ্ধ সকলেই অভিনব ভগবদ্ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল। সহস্র সহস্র ভক্ত যমুনাচার্য্যের দ্বারা মন্ত্রপূত হয়ে ধন্য হ'ল। প্রভু যমুনাচার্য্য দেহরক্ষার কিছু পূর্ব্বে শ্রীরামানুজকে আনবার জন্য প্রিয় শিষ্য মহাপূর্ণকে পাঠান। প্রভু যমুনাচার্য্য অনুভব করেছিলেন—তাঁর সাধনা পূর্ণ সিদ্ধ হবে শ্রীরামানুজের তপস্যার দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে ঘটলও তাই। শ্রীরামানুজ অতি শৈশব থেকেই সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কারের ভেতরেও ভগবৎপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। কথিত আছে, পাঠ্যাবস্থায় শ্রীভগবানের চক্ষুর 'কপ্যাসং'-এর অর্থ নিয়ে শিক্ষক যাদবাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। যাদবাচার্য্য অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, সুতরাং তিনি 'কপ্যাসং'এর অর্থ করলেন—'বানরের অপানদেশের ন্যায় লোহিত পদ্মতুল্য।' বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক শ্রীরামানুজ শৈশবের পাঠ্যাবস্থাতেই পণ্ডিত যাদবাচার্য্যের এই মত খণ্ডন ক'রে 'কপ্যাসং'-এর অর্থ করলেন—'সূর্য্যবিকসিতং' * অর্থাৎ ভগবানের চক্ষু সূর্য্য-কিরণে বিকসিত পদ্মের ন্যায় উজ্জ্বল।

শ্রীরঙ্গমই শ্রীরামানুজের লীলাক্ষেত্র এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এখান থেকে প্রচারিত হয়। এই শ্রীরঙ্গমে প্রভুপাদ রামানুজ প্রাণপাত তপস্যা করেছিলেন, তা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক অনুভব করবারও ক্ষমতা আমাদের নেই। শ্রীরঙ্গমে

মাদুরা

---

* কং জলং পিবতীতি কপিঃ সূর্য্যঃ এবং অসধাতুর্বিকসনার্থক বলিয়া 'আস' শব্দে বিকশিত। শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত শ্রীরামানুজচরিত।

আসবার কিছু পূর্ব্বে তিনি সাধক শ্রীকাঞ্চিপূর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভগবৎপ্রেমে তিনি এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন যে ব্রাহ্মণ রামানুজ শূদ্র কাঞ্চিপূর্ণের নিকট দীক্ষা নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সাধনা করতে লাগলেন। শ্রীরামানুজের পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রভু যমুনাচার্য্য দেহরক্ষা করেন। তদীয় শিষ্য প্রভু মহাপূর্ণ শ্রীরামানুজকে দীক্ষা দান করেন এবং বিবিধ শাস্ত্র বিষয়ে শিক্ষা দেন। কথিত আছে, ছয় মাসের মধ্যে শ্রীরামানুজ মহাত্মা মহাপূর্ণের পদপ্রান্তে ব'সে পোইহে রচিত ১০০, পূদত্ত রচিত ১০০, পে রচিত ১০০, পেরিয়া আলোযার রচিত ৪৭৩, অণ্ডাল রচিত ১৪৩, কুলশেখর রচিত ১৪৫, তিরুমড়িনি রচিত ২১৬, তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি রচিত ৫৫, তিরুপ্পান রচিত ১০, মধুর কবি রচিত ১১, তিরুমঙ্গই রচিত ১৩৬০, নশ্মা আলোয়ার রচিত ১২৯৬ —সমুদয়ে প্রায় চার হাজার পুণ্যশ্লোক মহাপূর্ণের নিকট পাঠ করেন। তার পর ন্যাসতত্ত্ব, গীতার্থ সংগ্রহ, সিদ্ধিত্রয়, ব্যসসূত্র এবং পঞ্চরাত্রাগম প্রভৃতিও পণ্ডিত মহাপূর্ণের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহাপূর্ণ গোষ্টিপূর্ণ নামক পরম ধার্ম্মিক পরম বৈষ্ণবের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে রামানুজকে দীক্ষিত হতে পাঠান। শ্রীরামানুজের পাণ্ডিত্য বৈষ্ণবপ্রবরের মধুর মন্ত্রে সিঞ্চিত হয়ে এক অভূতপূর্ব্ব জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় সৃষ্টি করল।

শ্রীরঙ্গমের গোপুরম্

তীর্থ ভ্রমণের পথে শ্রীরঙ্গমে এসে এত কথার অবতারণা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে মনে হ'ল, সকলেই ত এখানকার মন্দিরের কয়টি গোপুরম, কত হাজার সিঁড়ির ধাপ এবং কত শ' স্তম্ভ আছে—তারই হিসাব দেন। এ সব ছাড়াও এই শ্রীরঙ্গমের যে অমূল্য সম্পদ রয়েছে তার আস্বাদ না পেতে পারি, কিন্তু পরিবেশন করতে আপত্তি কি?

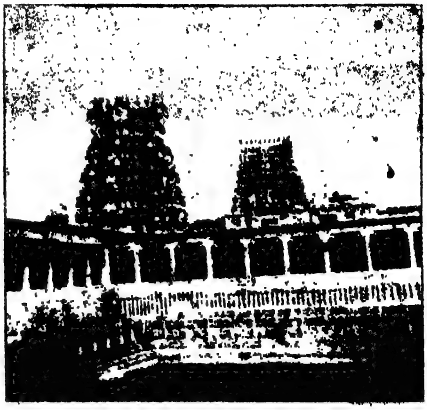

মাদুরা টেপাকুলম্

ত্রিচিনপল্লীতে আমরা একদিন ছিলাম। সমস্ত সকালটা শ্রীরঙ্গমের মন্দির দর্শনের পর স্টেশনে ফিরে এসে স্নান এবং আহারাদি শেষ ক'রে বিকেলে গোল্ডেন রক্ ও গণপতির মন্দির দর্শন করতে বেরুলাম। দ্রষ্টব্য হিসেবে গোল্ডেন রকের মন্দির একটি দেখবার জিনিষই বটে। বিশাল পর্ব্বত ভেদ ক'রে প্রায় চার শ সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ির উপর বরাবর পাহাড় কাটা চাঁদনি। মনে হচ্ছিল, যেন এক মহল থেকে আর এক মহলে পৌঁছানো যাচ্ছে। কর্ত্তা-মা খানিকটা উঠে একটি সমতল জায়গায় বসলেন, আমরা সবটাই উঠলাম। যখন গিরিশিখরস্থিত মন্দিরের চাতালে পৌঁছিলাম, তখন ত্রিচিনপল্লীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হলাম। ভেবেছিলাম, হয়ত খুকু এবং তার দিদিমা এতটা উঠতে পারবেন না, কিন্তু তাঁদের দুজনের আনন্দ ও উৎসাহ দেখে আমরাও যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করলাম।

রাত্রি দশটার সময় ট্রেন ধরে রামেশ্বর রওনা হতে হবে। কলকাতা থেকে রওনার সময় আমার ছোট শ্যালকের জ্বর দেখে এসেছিলাম; তার খবর না পেয়ে সকলেই একটু চিন্তিত ছিলেন। স্ত্রীদেবীর হুকুম হ'ল—টেলিফোন ক'রে খবর নাও। সময় সংক্ষেপের অজুহাত দেওয়ায় তিনি

বললেন—'আমি এদিকের জিনিসপত্রের ও কুলীদের ভার নিচ্ছি—তুমি টেলিফোন কর।' কপাল ভাল, ট্রাঙ্ক কল্ খুব শীঘ্রই পেয়ে গেলাম এবং খবরও সুখবর। যখন টেলিফোনে সুখবর পেয়ে একটু সুস্থ হয়েছি, তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, আর মাত্র সাত মিনিট আছে। রামেশ্বর যেতে হ'লে তীর্থযাত্রার প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জনপিছু আট আনা টোল দিতে হয়। টোলের টিকিট নেবার পর সময় মাত্র আর দু মিনিট ছিল। বেশ খানিকটা তৎপরতার সঙ্গেই প্ল্যাটফর্মের ওপাশে অর্থাৎ স্টেসনে ছুটলাম এবং মস্ত একটা স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলাম, শ্রীমতী জিনিসপত্র সব অতি সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়ে রিটায়ারিং রুমের ভাড়া, মায় কুলিদের প্রাপ্য পর্য্যন্ত চুকিয়ে দিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কে বলে—পথি নারী বিবর্জ্জিতা? একালে এ ঋষিবাক্য অচল!

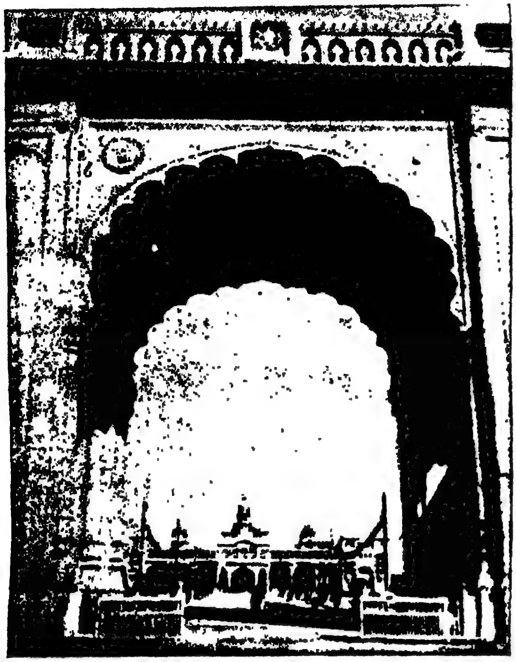

মাদুরা মীনাক্ষী দেবীর গোপুরম্ (২)

ভোর পৌনে ছটায় ট্রেন পান্‌বান্ স্টেশনে পৌছবে; সেখানে গাড়ী বদল ক'রে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রামেশ্বরে পৌছতে হবে। পান্‌বান্ স্টেশনের আগের স্টেশনের নাম মণ্ডাপম। দক্ষিণ ভারতের রেল লাইনের শেষ স্টেশনই হচ্ছে এই মণ্ডাপম। এখান থেকে রামেশ্বর দ্বীপ দুই মাইল বিস্তৃত প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই প্রণালীর ওপর সেতু, তার ওপর দিয়ে রেল গাড়ী চলাচল করে। সাধারণত সেতু যে রকম হয়, এই সেতুটি সে রকমেরই নয়। রেল গাড়ী যখন সেতুর উপর দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, তখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে মনে হ'ল—গাড়ী যেন সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। সমুদ্রের জলের ছোট ছোট ঢেউগুলো এসে গাড়ীর চাকায় লাগছে। ভোরের আলোয় ঘুম ভেঙ্গেই (হয়ত বা তখনও চোখে একটু ঘুমের লেশ রয়েছে) সমুদ্রকে এত নিকটে পেয়ে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে আত্মহারা হয়ে গেছলাম। অনেক রকম দৃশ্যই পৃথিবীর বহু দেশে দেখেছি, কিন্তু সমুদ্রের ভেতর জলেরই সমতল ঠিক রেখে দুই মাইলব্যাপী সেতু তৈরি ক'রে তার ওপর দিয়ে রেল গাড়ী নিয়ে যাওয়া—বেশ একটু নূতনত্বের আস্বাদ পাওয়া গেল বটে!

সকাল সাতটার সময় রামেশ্বরে পৌছলাম। মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী অশেষানন্দ এখানকার একজন ভক্ত পাণ্ডাকে আমাদের আগমন-সংবাদ দিয়ে পূর্ব্বেই চিঠি দিয়েছিলেন, সুতরাং স্টেশন থেকেই আমরা তাঁর তত্ত্বাবধানে রইলাম। রামেশ্বরের মন্দির সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। মন্দির দর্শনের পূর্ব্বেই পাণ্ডাজী কর্ত্তা-মাকে সমুদ্রোপকূলে বসিয়ে অনেকরকম মন্ত্রপাঠ করালেন এবং শেষ পর্য্যন্ত গরুদান করিয়ে প্রথম অধ্যায় শেষ করলেন। তার পর মন্দির দর্শন আরম্ভ হল। প্রথম থেকেই আমাদের জানাতে সুরু করল যে, গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত হরিজনের মন্দির প্রবেশ তাঁরা আদপেই পছন্দ করে না; তারা জান দেবে, তবু

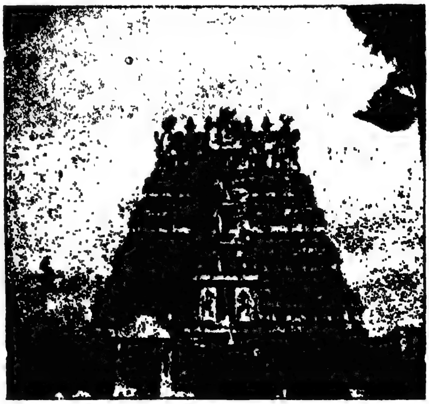

রামেশ্বর গোপুরম্

হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেবে না। মন্দিরের গোপুরম্ দুইটি পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত। জাঁকজমক খুব বেশী না থাকলেও বেশ যেন একটা শান্ত সুন্দর ভাবে মনটা অভিভূত হ'ল। চারদিকে পরিক্রমা-পথ ঘুরে রামেশ্বর দেবের নাট-মন্দির ও গর্ভমন্দিরে উপস্থিত হলাম। পথে ভগবৎবৎসল বৃষ বা নন্দীর মূর্ত্তিকে কিছু কিছু ভেট দিতে হ'ল। টেপাকুলম্ এবং সোনার ধ্বজস্তম্ভও রাস্তায় পড়ল। গর্ভমন্দির সাতটি মণ্ডপের পরে অবস্থিত ব'লে অন্ধকার। কর্পূর আরতি দ্বারা অনাদি জ্যোতির্লিঙ্গ রামেশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করতে হয়। নিয়ম আছে, এই জাগ্রত মূর্ত্তিকে গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাতে হয়। এতক্ষণে বুঝলাম, কর্ত্তা-মা কেন কলকাতা থেকে গঙ্গাজল বহন ক'রে এনেছেন। এখানে মা, কর্ত্তা-মা সকলেই পূজা দিলেন। কর্ত্তা-মা সোনার বিল্বপত্রও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। রামেশ্বরের মস্তকে যখন গঙ্গাজল ও সোনার বিল্বপত্র দেওয়া হল, তখন কর্ত্তা-মা'র মুখের যা ভাব হয়েছিল তা বলে কিম্বা লিখে প্রকাশ করা যায় না, সে অপূর্ব্ব! ক্ষুদ্র আমি; এই ভেবে নিজের আনন্দে নিজে ভরপুর হয়ে উঠলাম যে বাংলা দেশের সর্ব্বগুণসম্পন্না ধনমানযশের একচ্ছত্র অধিকারিণী—এই গরীয়সী কর্ত্তা-মাকে হিন্দুর মহাতীর্থ এই রামেশ্বরে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

কর্ত্তা-মা'র পূজার যখন শেষ হ'ল, তখন পাণ্ডাজীশুদ্ধ সকলে অবাক হয়ে দেখলেন—খুকি এক অভূতপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নাচতে সুরু করেছে। কি প্রেরণা যে তার ভেতর এসেছিল, তা সে-ই জানে। তবে তার এই রকম আপনভোলা নৃত্য আর আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখিনি! ফেরবার মুখে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভসুশোভিত পথ, তাকে ইংরেজীতে The Great Corridor বা Long Colonnade বলে। দেখে বিস্মিত হলাম। এত বড় পথ নাকি পৃথিবীর কোন মন্দিরে—মসজিদে বা গীর্জ্জায় নেই। এই মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য এই মন্দিরেই মঠ স্থাপন করেন। বিকালে রামেশ্বরের মন্দির থেকে দুই মাইল দূরে 'বামজড়কা' মন্দির দর্শন হ'লো। এই মন্দিরটি একটি ছোট পাহাড়ের ওপোর অবস্থিত। সুতরাং সেখান থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব রমণীয় দেখায়। সন্ধ্যাবেলায় ঝিনুক ও শঙ্খের জিনিষ কিছু সওদা করা হ'লো। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে রাত্রি সাড়ে তিনটায় স্টেশনে আসতে হলো। আগে থেকেই পাণ্ডাজি ছড়িদার অর্থাৎ ঝট্কা বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। পূর্ব্বের পান্বান্ স্টেশনে গাড়ী বদল ক'রে সকাল সাড়ে সাতটায় ধনুষ্কোটীতে এসে পৌছলাম। জিনিষপত্রগুলি বিশ্রামকক্ষে রেখে আমরা কয়েকজন রেস্তোরাঁতে ছোট হাজিরা খেয়ে নিলাম এবং দুইখানি গরুর গাড়ী ঠিক ক'রে তিন মাইল বালুপথ অতিক্রম করে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে—ভারতের শেষ স্থলবিন্দু ধনুষ্কোটীতে এসে পৌছিলাম। কর্ত্তা-মা পূজা করতে বসলেন, মা স্নান করলেন, খুকি তার মাও মাসীকে নিয়ে ঝিনুক কুড়াতে লাগল। শুনেছিলাম যে এখানে ভারত মহাসাগরের জলরাশির তাণ্ডবনৃত্যের এবং বঙ্গোপসাগরের অসীম নীলাম্বুরাশির শান্তভাবের অপরূপ সম্মিলন—সেটা সত্যি কি-না তারই গবেষণায় মনোযোগ দিলাম।

ধনুষ্কোটী থেকে সকাল পৌনে চারটায় ট্রেন ধরে বেলা সাড়ে চারটার সময় আমাদের মাদুরায় পৌছবার কথা ছিল। সেই হিসেব ক'রে মাদুরার মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুবরমন মহাশয়কে টেলিগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু জাহাজের যাত্রীদের নামতে দেরী হওয়ায় গাড়ী ছাড়তে দু ঘণ্টা দেরী হয়ে গেল। সাড়ে ছটায় মাদুরায় পৌঁছে রিটায়ারিং রুমে জিনিসপত্র রেখে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার আরতি সবে আরম্ভ হয়েছে তখন; শত শত দীপ মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারগুলি অতি রমণীয়ভাবে আলোকিত করে রেখেছে। দীপগুলি সাজিয়ে রাখবারই কি সুন্দর ভঙ্গিমা! তৈলপ্রদীপগুলির মৃদুল দোলায়িত শিখাগুলি যে শান্ত সুন্দরভাব সৃষ্টি করেছে তা অতুলনীয়। বর্ত্তমান যুগে বৈদ্যুতিক দীপ উজ্জ্বল আলোক দিতে পারবে বটে, কিন্তু এই মন-মাতান সাধকের উদাসভাব ফুটিয়ে তুলতে কখনই পারবে না। সপ্তম দ্বার ভেদ ক'রে মীনাক্ষী দেবীর দর্শন হ'লো। দেবীমূর্ত্তি দেখবার জন্য ততটা উৎসুক ছিলাম না, কেন না, সর্ব্বত্রই মূর্ত্তির একই অবস্থা দেখে আসছি। আড়ম্বর আছে, প্রাণ নেই; ভঙ্গিমা আছে, ভাব নেই; উৎসব আছে, কিন্তু প্রেরণা নেই।

মীনাক্ষী দেবীর মন্দির শিবের লীলাক্ষেত্র। তাই ভাস্কর্য্যে

শ্রেষ্ঠ অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে শিবের নটরাজ মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে এবং আরও বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে। প্রাচীন ভারতের গৌরব এবং ঐশ্বর্য্যের শেষ চিহ্ন এই সব মন্দিরের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য যে রকম বিশাল সেই রকমই প্রাণবান। বসন্ত মণ্ডপ এক হাজার স্তম্ভের ওপোর দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতি স্তম্ভটি অতি নিখুঁতভাবে নানা কারুকার্য্যের প্রমাণস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা কথা প্রায়ই আমার মনে হয় যে, যে জাতির বাইরেটা এত মহীয়ান, এত গরিমাময় সে জাতির অন্তরের দিকটা না জানি কতই সুন্দর কতই মহান ছিল! কিন্তু হায়! কোথায় আজ তাদের চিহ্ন এ জগতে!

সম্প্রতি গান্ধীজীর প্রচেষ্টায় মীনাক্ষী দেবীর মন্দির সকলের জন্যই উন্মুক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও হরিজন সকলেই এখন মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছে। এই ছুঁৎমার্গের দেশে এটা কত বড় একটা জিনিষ তা চোখে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। ত্রিচিনোপল্লীর শ্রীরঙ্গমের মন্দির এবং রামেশ্বরের মন্দির যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এর পার্থক্য অনুভব করতে পেরেছেন। পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য কমে গেছে। যে-কোন মন্দিরেই হোক, পাণ্ডাদের স্থান খুব উচ্চে; মন্দিরের দেবতা ষড়ৈশ্বর্যশালী, না পাণ্ডাজী সর্ব্বশক্তিশালী সেটা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। গান্ধীজী পাণ্ডাদের এই বিষ দাঁত ভেঙ্গেছেন; তাই মীনাক্ষী দেবীর মন্দির কতকাংশে পাণ্ডা-বর্জ্জিত হ'লেও মহিমা বর্জ্জিত হয়নি, বরঞ্চ তাঁর কৃপা দৃষ্টি আপামর জনসাধারণের উপর বর্ষিত হওয়ায় তাঁর মহিমা আরও গরিমাময় হয়ে উঠেছে। আমরা সবাই যে এক মায়ের সন্তান; মাও সন্তানকে পৃথক ক'রে দেখেন না; যে অক্ষম তার ওপরই যে মায়ের করুণা বেশী অর্পিত হয়, তবে কেন দেবতার মন্দিরে এই পৃথক ব্যবস্থা। গান্ধীজীর জয় হউক—ভাই ভাই আর ঠাঁই ঠাঁই থাকবে না।

মাদুরাকে নাকি ভারতের এথেন্স (Athens) নগরী বলে। আমার সঙ্গীদের ঠাকুর দর্শনেচ্ছা খুবই প্রবল হ'লেও মাদুরার জরীপেটা শাড়ী এবং পিতলের বাসন কেনবার ইচ্ছাও কম দেখলাম না। ঠাকুর দর্শন এবং সওদা শেষ ক'রে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ফেরা হলো। পরদিন সকাল পৌনে একটার ট্রেনে কন্যাকুমারিকায় রওনা হবার কথা। প্রাতরাশ শেষ ক'রে পুনরায় দিনের আলোয় মন্দির দর্শন করতে যাওয়া হলো। দর্শনান্তে আর একদফা বাজার করার পরে অতি কষ্টে গাড়ী ধরা হলো। বাজার করতেই বেশী সময় লেগেছিলো।

কন্যাকুমারিকার পথে কিঞ্চিৎ ঠিকেভুল হয়ে গেল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান স্যর সি, পি, রামস্বামী আমাকে টিউটিকুরিনে পৌছে তাঁকে খবর দিতে বলেছিলেন; সেখান থেকে কন্যাকুমারিকা এবং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা তিনিই করবেন কথা ছিল। বেলা চারটের সময় টিউটিকুরিনে পৌছে দেখলাম, দেওয়ান বাহাদুরের একখানি টেলিগ্রাম ভিন্ন আর কোনও বন্দোবস্ত নেই। আমার টেলিগ্রাম তিনি এত দেরীতে পেয়েছিলেন যে, তখনই বন্দোবস্ত করলেও কেউ এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। টিউটিকুরিন থেকে কন্যাকুমারিকা ১১০ মাইল; কিন্তু যাওয়ার সুবিধা কম। ট্যাক্সী সাধারণত পাওয়া যায় না এবং খুব বেশী ভাড়া চায়। এখান থেকে একখানা ট্রেন সাড়ে পাঁচটায় ছেড়ে সাড়ে সাতটায় তিনেভেলিতে পৌছায়। সেই ট্রেনেই যাওয়া স্থির করে সময় কাটাবার জন্য সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া হলো। বাঙ্গালীর দল দেখে স্থানীয় এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। আলাপে জানা গেল, তিনিও বাঙ্গালী এবং মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর মাতা আমারই দ্বারা চিকিৎসিত হয়েছিলেন। এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে এরূপ আলাপ পরিচয় বিশেষ প্রীতিকর। তাঁদের সনির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও আমাদের তিনেভেলির ট্রেন ধরতে হলো। কেন না, সময় সংক্ষেপ। ভেবেছিলাম, তিনেভেলিতে পৌছেই ট্যাক্সি নিয়ে কন্যাকুমারিকায় রওনা হব কিন্তু তা হলো না। রাত্রে অন্ধকারের সঙ্গে একটা অজানা ভয় আবহমান কাল থেকেই রয়েছে, তাই এই বিদেশ বিভুঁইএ একটু সাবধানতা অবলম্বন বুদ্ধিমানের কাজ মনে ক'রে ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে চন্দ্রবিলাস হোটেলে উঠলাম। এই হোটেলের ভাড়া জন পেছু এক টাকা, ঘরগুলি অতি ছোট, একজন যাত্রীর শোবার মত ছোটখাট এবং ধূলার প্রাচুর্য্য যথেষ্ট। কোন রকমে সেখানেই রাত্রি কাটাতে হলো; তবে রাত্রের

খাওয়াটা স্টেসনে স্পেনসেসের ওখানেই গিয়ে সেরে এলাম।

তিনেভেলি থেকে কন্যাকুমারিকা প্রায় বায়ান্ন মাইল; দুখানা ট্যাক্সী রাত্রেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম—টোলসহ ছাব্বিশ টাকায়। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ঢুকতে গাড়ী পিছু আট আনা টোল দিতে হয়। ঠিক হলো, ভোর পাঁচটায় রওনা হয়ে আটটার কাছাকাছি কন্যাকুমারিকায় পৌছব। দোকান দেখলেই কিছু কেনবার প্রবৃত্তি আমাদের মেয়েদের একটু বেশী। তিনেভেলির মত ছোট জায়গা থেকে রাত্রি দশটার সময় যখন কর্ত্তা-মা তাঁর ছোট নাতির জন্য একটি মাদুর কিনলেন, তখন আমার গবেষণার অকাট্য প্রমাণ পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম।

১৮ই ডিসেম্বর সকাল আটটায় কন্যাকুমারিকায় পৌছিলাম। কন্যাকুমারিকা—বোধ হয় পৃথিবীতে এর আর তুলনা নেই। প্রাকৃতিক দৃশ্য যে এত অপরূপ সুন্দর হতে পারে তা প্রত্যক্ষ না করলে উপলব্ধি হয় না। ভারতবর্ষের শেষ দক্ষিণ প্রান্ত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠতাই এই কন্যাকুমারিকা—সত্য সত্যই সংসারতাপক্লিষ্ট মানুষের মনকে শান্ত ক'রে দেয়, কবিকে উন্মাদনায় মাতিয়ে দেয়, ভাবপ্রবণতায় উদ্বেলিত ক'রে তোলে এবং সাধককে তাঁর অভিষ্ট দেবতার অনেকটা কাছে এগিয়ে দেয়। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বোধ হয় এই কন্যাকুমারিকার সাগরগর্ভের প্রস্তরখণ্ডের ওপোর বসে ভাবের মূর্চ্ছনায় এবং সাধনার উন্মাদনায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা একেবারে ট্র্যাভেলার্স বাংলোতে গিয়ে উঠলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বর্ত্তমান যুগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের যা-কিছু প্রয়োজন সবই এখানে ছবির মত ক'রে সাজান রয়েছে। প্রায় প্রতি ঘরের সব দিক দিয়েই সমুদ্র দেখতে পাওয়া যায়। যে ঘর দুটি সবচেয়ে ভাল ছিলো তার পাশের দুটি ঘর আমাদের দেখান হলো। ভাল ঘর দুটি চাইতে বললে "Reserved for State Guest" (রাজ অতিথির জন্য রিজার্ভ করা রয়েছে)। খানিকটা পরে জিজ্ঞাসা করলাম—'বলতে পার কে এই State Guest?' তখন বললে তিনি হচ্ছেন ডাঃ মিত্র। এতক্ষণ পরে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আতিথেয়তার পরিচয় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ম্যানেজার যখন জানতে পারলেন এই অধমই সেই অতিথি, তখন অবশ্য খাতির খুব বেড়ে গেল। এই অঞ্চলের বড় শহর হচ্ছে নারকয়েল। সেখানকার তহশিলদার এসে সেলাম ক'রে জানালেন, 'You have been declared as State guest; all my men are at your service' (আপনি এখানকার রাজ-অতিথি; আমার সব লোকজন আপনার হুকুম বহাল করবে)। আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—আমার কিছু দরকার নেই; তবে যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয় জানাবো।

মাদ্রাজে আসবার পূর্ব্বে কতকগুলি বিশেষ জরুরী কাজের জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম; মাদ্রাজে খাটুনিও কম ছিল না, তারপর সারা দক্ষিণভারত ভ্রমণ ক'রে আমি বেশ একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কন্যাকুমারিকায় প্রথম দিনটি আমাদের গেল সুশ্রান্তি দূর করতে। পার্শ্বে তমাল-তালবনরাজীনীলা, সামনে অতুল অনন্ত নীলাম্বুরাশির অদূর অসীম ছেয়ে নীল আকাশ—তারপর সর্ব্বক্ষণই সমুদ্রের ঝিরঝিরে হাওয়া—শ্রান্তি কি আর থাকতে পারে। শরীর সুস্থ হলো, মন তাজা হলো, আমার সমস্ত মনপ্রাণ যেন সেই অতি সুদূরের পরশ পেয়ে শান্ত হলো।

বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগর একযোগে কন্যাকুমারিকার চরণ ধুয়ে দিচ্ছেন। কন্যা-কুমারিকা সম্বন্ধে পৌরাণিক অনেক গল্পই প্রচলিত আছে, কিন্তু আমার মনে হয়, সত্যিকার অর্থ এরা কেউই জানে না। দেশ যখন বড় হয়, সবদিক দিয়েই হয়। আমাদের ভারত প্রকৃতই বড় ছিল; শুধু ধর্ম্মে, দর্শনে, স্থাপত্যে এবং কলাবিদ্যায় নহে; সামাজিক প্রতি নিয়ম কানুনেও তার প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়। কন্যার যে বিবাহ দিতেই হবে তা যোগ্য পাত্র ও যোগ্য ব্যবহার পাওয়া চাই; নৈলে কন্যা কুমারীই থাকবে। তাতে তার মহিমা গরিমা কোন অংশে কিছু কম হবে না, তারই নিদর্শনস্বরূপ কন্যাকুমারিকা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থানে পূজ্যা। ভারতে নারীর স্থান সবার উচ্চে—তা তিনি কুমারী কন্যাই হোন, সাধ্বী সহধর্ম্মিণী হোন অথবা শ্রদ্ধেয়া মাতাই হোন। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এসে এই কুমারী কন্যার চরণে অর্ঘ্য দিয়ে জানাচ্ছে—হে কুমারী, তুমি শ্রদ্ধেয়া, তুমি শ্রদ্ধেয়া, তুমি শ্রদ্ধেয়া।

কন্যাকুমারিকায় সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত দৃশ্য অতি সুন্দর

ভাবে দেখতে পাওয়া যায়, ভোরে সাড়ে পাঁচটায় সূর্য্যদেব সমুদ্র থেকে প্রকাশিত হলেন এবং দিনের শেষে অপর পার্শ্বে সমুদ্রগর্ভেই ডুব দিলেন। আমার পাঁচ বছরের কন্যা সেদিন জিজ্ঞাসা করলে—“সূর্য্য ডুব দিয়ে কোথায় গেলেন ?” “পরে জানতে পারবে” বলে তার প্রশ্নের সমাধান করলাম। শিশুর প্রশ্নের মীমাংসা এইরূপ সহজে শেষ হয় বটে কিন্তু নিজের প্রশ্নের মীমাংসাও কি সব সময় সমাধান হয় ? এই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত বাদ দিলেও উত্থান ও পতন। আজ যেখানে গভীর সমুদ্র ভবিষ্যতে সেখানে গিরিশিখরের আবির্ভাব, সুখ দুঃখ—জন্মমৃত্যু কোনটারই ত মীমাংসা করতে পারি নে। জন্মের পর থেকেই বিন্দু বিন্দু ক’রে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর। তারপর ? কি, সে উত্তর কে দেবে ? বোধ হয় আবার জন্ম, বোধ হয় কিছুই নয়—সমুদ্রের জলবুদ্বুদ সমুদ্রেই মিশিয়ে গেল। কে দেবে এর সঠিক উত্তর ? কে নেবে এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর ? কোথায় সেই নচিকেতা এবং কোথায় সেই যমরাজ ? কে দেবে সেই মন্ত্র যাতে দীক্ষিত হয়ে উপলব্ধি করবে—

“ত্বমেব বিদিত্বা নাতি মৃত্যুমেতি
নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।”

জানি না কেন, কন্যাকুমারিকার পশ্চিমপ্রান্তের বিশাল স্তূপের ওপোর বসে আজ সন্ধ্যায় এই কথাগুলি মনে আসছিলো—জাগছিলো !

বিজয়া

শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দেবী

(কীর্ত্তন—ত্রিতালী)

অন্তরময়ী মা !
অয়ি কবি যশোধরা,
অমৃত-মন-রোচনা !
শিশির-সুধাম্বরা
অমর-বর-লোচনা !
(চিরন্তনী মা)
সুন্দর প্রতিমা।

ঝরি’ নিঝর-রাগে আজি গগন ডাকে
ডাকে নয়ন-তারা ডাকে কিরণ-ধারা
(কিরণময়ী মা, হিরণময়ী মা)
নন্দনময়ী মা।

ঢালে আপনহারা আঁখির রূপরাশি
নাশে আঁধারধারা অধরে মৃদুহাসি
(চিরচিন্ময়ী মা আলো-অমরণী মা !)
ঐ আসে বিজয়িনী মা।

রাঙা চরণে ফুটি’ মোরা বিকশি’ উঠি
জ্বলি কুসুম-রাসে আজি জননী আসে
(চির চরণে, শুভ শরণে, দীপ বরণে, সুর স্বপনে)
বন্দনাময়ী মা !

পায়ে পরশি’ ছায়া মায়া-সাগর পারে
গাথি’ তারার মালা পুলক-ভরা হারে
(সঙ্গীতময়ী মা, বন্ধন দহি’ মা)
ঐ আসে বিজয়িনী মা !

গান্ধার-শিল্পের ঐতিহাসিক পটভূমি

শ্রীগুরুদাস সরকার

পতিব্রতা গান্ধারীর কথা মহাভারতের পুণ্যকাহিনী অদ্যাপি লোক-হৃদয়ে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে। গান্ধারীর পিত্রালয় ছিল গান্ধারে, যেমন সীতার (বৈদেহীর) পিত্রালয় ছিল বিদেহ দেশে। গান্ধার বলিতে বর্ত্তমান পেশোয়ার জেলা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের অংশ বুঝাইত এবং বর্ত্তমান হাজারা ও রাওলপিণ্ডি জেলা এবং তৎসহ তক্ষশিলাও একসময় ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চাতের ঐতিহাসিক পটভূমির সহিত ভালরূপ পরিচয় না থাকিলে অতীতের শিল্পধারা ও তাহার নিদর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য সহজে বোধগম্য হইবার নহে। গ্রীক সভ্যতার সহিত গান্ধারের প্রথম সংস্পর্শ ঘটে যখন গান্ধারবাসী যোদ্ধৃগণ সম্রাট জেরিস্কিসের অধীনে গ্রীস দেশ আক্রমণ করে। খৃঃ-পূঃ ৫১৯-৫১১ অব্দের বেহিস্তন লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গান্ধারের অধিবাসীগণ তখন সম্রাট দেরিউসের প্রকৃতিপুঞ্জেরই অন্তর্গত ছিল। একিমিনীয় সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ সেই সময়েই বোধ হয় পারসীক (ইরাণীয়) প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। তক্ষশীলায় প্রাপ্ত একখানি লিপি এখনও এই যোগাযোগের সাক্ষ্য দিতেছে। খৃঃ-পূঃ ৩২৫ অব্দে গ্রীক-বীর সেকেন্দর গান্ধার জয় করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই গান্ধারে গ্রীক-আধিপত্য লুপ্ত হয়। ৩০৫ খৃঃ-পূঃ অব্দে সেকেন্দরের সেনাপতি সেলিউকস নিকটরের সহিত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের যে সন্ধি হয় তাহাতে গান্ধার মৌর্য্য-সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। অশোকের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহার রাজত্বকালে গান্ধার ছিল সাম্রাজ্যের প্রান্তিক প্রদেশ। মৌর্য্য-গৌরবরবি অস্তমিত হইলে আনুমানিক খৃঃ-পূঃ ২০৫ অব্দে জনৈক গ্রীক ভাগ্যান্বেষী সৈনিক বাক্‌ত্রিয়া (বাহ্লীক) নামে পরিচিত উত্তর আফগানিস্থানের অংশ বিশেষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া প্রথম ডায়োডোটাস নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েন এবং গান্ধার ক্রমশ বাক্‌ত্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পর পর তেত্রিশজন রাজা বাক্‌ত্রিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, পরে খৃঃ-পূঃ প্রথম অব্দে অথবা খৃষ্টীয় প্রথম অব্দে মধ্য এসিয়া হইতে শকজাতি আসিয়া গান্ধার অধিকার করিয়া লয়। এই বংশের প্রথম রাজা মোঅ (Maues) যে য়ুনানী প্রভাবমুক্ত ছিলেন না তাহা তৎকর্ত্তৃক গ্রীকমুদ্রার অনুকরণ হইতেই বুঝা যায়। মোঅ রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন আনুমানিক খৃঃ-পূঃ ১২০ অব্দে। শকবংশীয় অজিলিয়ের মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায় এবং পারদ (Scytuo-Parthian) বংশসম্ভূত বলিয়া অনুমিত রাজা গন্দফেরের মুদ্রায় বৃষভসহ মহাদেবের চিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাই। এই পরিবর্ত্তন বড় জোর আশী-একশত হইতে দেড়শত বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই য়ূচি জাতির কুষাণ শাখা রাজা কুজুল কদফিসের অধিনায়কত্বে গান্ধার ও কাবুল উপত্যকা অধিকার করে। এই বংশের তৃতীয় রাজা কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিলেও তাঁহার এবং তাঁহার পুত্র হুবিষ্কের মুদ্রায় শুধু বুদ্ধমূর্ত্তি নহে, জরথুস্ত্রীয়, হিন্দু ও য়ূনানী দেবদেবীগণের মূর্ত্তিও স্থান পাইয়াছে। তাহারা সংস্কৃতির দিক দিয়া একাধারে হিন্দু ও গ্রীক প্রভাবান্বিত রোমকদিগের নিকট যে বিশেষ ঋণী তাহাতে সন্দেহ নাই। কুষাণরা ইরাণীয় বংশসম্ভূত ছিল এবং আফগানিস্থানে যে সকল প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক আবিষ্কার ঘটিয়াছে তাহা হইতে ইহাই ধারণা জন্মে যে, বাকত্রিয়ায় সাসানীয় রাজগোষ্ঠীর রাজত্বকালীন ইরাণীয় প্রভাব বৌদ্ধশিল্পে সংক্রামিত হয়। ভারতীয়, য়ূনানী ও ইরাণী এই তিন সভ্যতার সংযোগস্থল গান্ধারে যে এক মিশ্র শিল্পকলার উদ্ভব হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এ শিল্পের ছাঁচ ও গঠন প্রণালী মূলত গ্রীক-রোমক শিল্পের নিকট ধার-করা হইলেও ভারতীয় চাহিদা অনুসারে ইহাতে স্বতই আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হইয়াছে। গান্ধারের স্থাপত্যে প্রাচীন য়ূনানী অপেক্ষা রোমক আদর্শেরই সহিত নিকটতর সম্পর্ক সূচিত হয়। গান্ধারের বৌদ্ধশিল্পে যে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখিতে পাই

তাহা আসিয়াছিল রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোমের সহিত পশ্চিম এসিয়া ও ভারতবর্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং এই সূত্রে স্বার্থবাহ’ দলের ঘন ঘন যাতায়াতও যে ঘটিত তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মনে হয়, য়ুনানী প্রভাবের প্রথম ধারা আসিয়াছিল যোন রাজ্য আন্তিওক হইতে। ইহাই ছিল তখন সীরিয়ার প্রধান নগর। য়ুনানী কৃষ্টি বিস্তারে বাকত্রিয়াও যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালে কুষাণ যুগে যে-পাশ্চাত্য ধারা ভারতে পৌছে তাহা সম্ভবত আসিয়াছিল আনুমানিক প্রথম ও তৃতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে। পালমিরা, বলবেক্ প্রভৃতি সীরিয়াস্থিত গ্রীক উপনিবেশাদি হইতে। আমরা কলিকাতার যাদুঘরে গান্ধার-ভাস্কর্য্যের যে সকল নমুনা দেখিতে পাই সেগুলি সবই বাঁধা ছাঁচের। সেগুলির এই পরবর্ত্তী যুগেই যে উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এগুলি দ্বিতীয় হইতে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল—এইরূপই অনুমিত হইয়াছে। তখন গান্ধারের এই যোন—রোমক শিল্প উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়াইয়া সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, আফগানিস্থান এবং মধ্য এসিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যোন-রোমক শিল্পের বিশেষ লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বলিতে গেলে প্রথমটা মনে পড়ে পরিপ্রেক্ষণার ব্যবস্থা। ইহার জন্য খোদিত ফলকের বিভিন্ন মূর্ত্তিগুলি উচ্চাবচ একাধিক স্তরে দেখান হইয়া থাকে। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে আলোক ও ছায়াপাতের এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, খোদিত চিত্রেও অঙ্কিত চিত্রের ভাবই যেন অনেকটা আসিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তীকালের নমুনাগুলিতে ভাস্করের এই পরিপ্রেক্ষণার কৌশল ক্রমশঃই যেন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। গভীর খোদাই-এর রেওয়াজ ক্রমেই লোপ পাইয়াছে এবং চিত্রের সব মূর্ত্তিগুলিই ক্রমে একই “তলে” স্থান পাইয়াছে। যোন-রোমক শিল্পধারা ভারতীয় শিল্পের ন্যায় অন্তর্মুখী নহে। বহিরাবয়ব লইয়াই ব্যস্ত। ইহার পেশীর বাহুল্য অনুকরণের গ্লানি দূর করিতে সমর্থ হয় না। গান্ধারের বুদ্ধমস্তক গ্রীক দেবতা য়্যাপোলোর অনুকরণে গঠিত—অঙ্গাবরণ রোমক টোগার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের ভঙ্গী সাধারণ তন্ত্রের যুগের রোমক মূরতাদির ভঙ্গীর সহিত তুলনীয়। প্রসাধন অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত যে “ঢেউ খেলান” মালা ক্ষুদ্রকায় বালকদিগের দ্বারা ধৃত দেখিতে পাই তাহা শিশু কিউপিডদিগের দ্বারা ধৃত এই শ্রেণীয় যোন-রোমক মাল্যালঙ্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মাল্যধারী আলম্বন (frieze) সামুদ্রিক অশ্ব এবং ট্রাইটন প্রভৃতি সামুদ্রিক দেবতাদিগের প্রতিকৃতি—এ সমস্তই যোন-রোমক প্রসাধন-শিল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এসকল নজীর এতই সুপ্রচুর যে তাহা আর বাদানুবাদ-সাপেক্ষ নহে। ভারতীয় প্রভাব পরবর্ত্তীকালে দেহযষ্টির আপেক্ষিক তনুতায়ে ও অলঙ্কারযুক্ত প্রভামণ্ডল প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সাঞ্চী, অমরাবতী, বরাহুত (Bharahut) প্রভৃতি প্রাচীন ভাস্কর্য্যে তথাগতের পদচিহ্ন মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কোথাও তাঁহার মূর্ত্তি পরিকল্পিত হয় নাই। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা এরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গান্ধারেই বুদ্ধ মূর্ত্তির প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল। ডঃ কুমারস্বামী প্রভৃতি প্রাচ্যকলাবিদ্ এমত গ্রহণ করেন নাই। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বের গান্ধার-রীতির কোনও মূর্ত্তি এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। (১) কলিকাতা যাদুঘরের বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে “লোরিয়ান টাঙ্গাই” (Loriyan Tangai) নামক স্থানে প্রাপ্ত ৯১নং বুদ্ধমূর্ত্তিটিই প্রাচীনতম। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর গান্ধার-শিল্প যে অধিক দিন বাঁচিয়াছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত নমুনাগুলিই উত্তরকালের গান্ধার-শিল্পের শ্রেষ্ঠতর নমুনা। গান্ধারের বৌদ্ধ মূর্ত্তিগুলি যে সময় নির্ম্মিত হয় তখন উত্তর ভারতে মহাযান মত সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। এই মহাযান মতের বৈশিষ্ট্য বোধিসত্ত্বচর্য্যায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই গান্ধারে শুধু বুদ্ধমূর্ত্তি নহে—বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, হারীতী, পাঞ্চিক প্রভৃতির মূর্ত্তিও নির্ম্মিত ও রক্ষিত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্বেরা শুধু নির্ব্বাণকামী নহেন, সমগ্র

---

(১) এ সম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদিগকে Ostasiatische Zeitschrift-পত্রে প্রকাশিত (Neue Folge, XIV, p. 41) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রচিত The Antiquity of the Buddha Image নামক বহু তথ্যপূর্ণ সারগর্ভ প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মানবজাতির মঙ্গলই তাঁহাদের লক্ষ্য; মানবজাতির উদ্ধারকল্পে তাঁহারা বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর। বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায় তাঁহাদের দেহের ভূষণ স্বরূপ বহু রত্নাভরণ হইতে। তাঁহাদের মস্তকে রত্নখচিত শিরোভূষণ, প্রকোষ্ঠে বলয়, বাহুতে কেয়ূর ও গলদেশে রত্নহার বিলম্বিত। দেখা যায়, শিল্পীরা এই সকল অলঙ্কার প্রস্তরময় মূর্ত্তির অঙ্গে বেশ যত্নের সহিতই খুদিয়া তুলিয়াছেন। বুদ্ধমূর্ত্তির দেহে কোনও অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র থাকে না। গান্ধার-পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের কোনও শিরোভূষণ নাই।

বুদ্ধদেবের পরিধেয় সংঘাটি বিভিন্ন মুদ্রা অনুসারে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। অনেক সময় বিভিন্ন মুদ্রাজ্ঞাপক হস্ত ও অঙ্গুলীসমূহ হইতে কোন্‌টি মৈত্রেয়, কোন্‌টি অবলোকিতেশ্বর, কোন্‌টি মঞ্জুশ্রী তাহা চিনিয়া লইতে হয়। মস্তকের দীর্ঘকেশ গ্রীকদেবতা য়্যাপোলো কিম্বা আর্টেমিসের মূর্ত্তির অনুকরণে কেবল একটা গ্রন্থি দিয়া বাঁধা। বোধিসত্ত্বদিগের কাহারও পায়ে বা গ্রীক ধরণের স্যাণ্ডাল, কাহারও পায়ে বা কাষ্ঠ পাদুকা। পরে গ্রীক প্রভাব ছাড়াইয়া যখন ভারতীয় আদর্শ ক্রমেই বলবত্তর হইয়া উঠিতেছিল সেই সময়ে ভারতীয় ধরণের সাজ-পোষাক, দেহভঙ্গি ও মুখাবয়ব ক্রমেই অধিক প্রকট হইতে থাকে। সাঞ্চীর শিল্পে যে অকৃত্রিমতা, সরল ভাবোন্মেষ এবং বহুধা উৎসারিত শিল্পসৃষ্টির স্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয় গান্ধার-শিল্পে তাহার কিছুই নাই। এ শিল্প যেন ফরমায়েসী—কেবল চাহিদা পূরণের জন্য উদ্ভূত। ইহা প্রায়শ দুর্ব্বল, গতানুগতিক ও বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত। পরবর্ত্তী গুপ্তযুগের ও পল্লবযুগের সমুন্নত শিল্পের সহিত এ-শিল্পধারা কোনও ক্রমেই তুলিত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে ফরাসী সমালোচক রেনেগ্রুসের মন্তব্য এই যে, পক্ষপাতশূন্য বিচার করিতে গেলে গান্ধার-শিল্প 'সেকেন্দ্রিয়া (Alexandria) পারগ্যামন প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে উদ্ভুত রোমক-এসীয় অথবা রোমক-সিরীয় শঙ্কর-শিল্পেরই সহিত তুলনীয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মৌলিক ভারতীয় শিল্পের সহিত ইহার তুলনামূলক বিচার ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এ উক্তিটি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চত্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে আমাদের এরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রেই নিছক ভারতীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য সহজে উপলব্ধ হয় না যাহা বাঁধা ছাঁচের ও চাহিদা-পূরণের জন্য নির্ম্মিত পাশ্চাত্য প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া তাহাই আপাত মনোরম বলিয়া মনে হয়।

[স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের কলিকাতা যাদুঘরের গান্ধার-শিল্পনিদর্শন পরিচিত বিষয়ক (Guide to the Sculptures in the Indian Museum, Part II) গ্রন্থের মুখবন্ধ অবলম্বনে।]

অবিচার

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

থাক্‌বে না কেউ আমার জন্যে বসে'
সবাই যাবে, যাবার সময় হ'লে।
তবুও কেন তাদের তরেই ভাবি ?
দুঃখে তাদের ভাসি চোখের জলে ?
আমার মত অন্ধ-মানুষ শত,
এম্‌নি করেই ভাব্‌ছে অহরহ;
কিসের জালে জড়িয়ে আছে যেন,
কাতর স্বরে বল্‌ছে—লহ—লহ !

আগ্রহ যার যাবার তরে এত
কাণ্ডারী তার দিকেও নাহি চায়।
যাবার সময় হয়নি মোটেই যার,
সাগ্রহেতে তারেই ডাকে হায় !
যেজন গেলে দুখের অবসান,
অশ্রু কারও নাম্‌বে না ক' চোখে—
সেই ত দেখি থাকে পিছু পড়ে;
অন্যে যে যায় ভাসিয়ে গভীর শোকে !

চাটুয্যে-সংবাদ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা করি, আমার প্রিয় পাঠকেরা—আমার চীনযাত্রার জাহাজী সঙ্গী চাটুয্যেকে বোধ হয় ভুলে যান নি। পূজনীয় কবিও যখন একদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনতে বা জানতে চেয়েছিলেন, তখন সে বস্তু যে ভোলবার নয় এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না। সুতরাং এখানে আবার তাঁর পরিচয় রিপিট্ ক'রে তাঁকে খাটো করতে চাই না এবং তা অনাবশ্যকও।

তিনি আমাদের সেই চাটুয্যে যাঁকে আমরা সুদূর সমরাভিযানে যাত্রার অকূল সমুদ্রে অবলম্বনরূপে পাই। সেইদিনের সেই চিন্তা, শঙ্কা ও বিচ্ছেদ-বেদনা-মথিত অবস্থায় তিনি যেন ভগবৎ-প্রেরিত সঞ্জীবনীর মত উপস্থিত হন্।

লর্ড ক্লাইভ নামক রয়েল্ মেরিণ্ ছিল আমাদের দুস্তর ভবপারের বাহক। সেখানি ক্রমে নোয়াজ্-আর্কে পরিণত। ভারতে ও ভারতের বাইরের বাছাই করা বিবিধ মূর্ত্তি তাতে যেন বীজ রক্ষার্থে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজব-ঘর বা মিউজিয়ম্ খোলবার মালও বলা চলে।

হেনকালে চাটুয্যের আবির্ভাব—সকলকে একাগ্র ক'রে দেয়। মস্তকে—বাঙালির বাড়ির পরিচয়-লিপির মত—ডুরে সাড়ির খানিকটা ছিন্নাংশ জড়ানো। গায়ে আদময়লা গোল আস্তিনের আজানু জামা। বাম স্কন্ধে—পৃষ্ঠ ও বক্ষ চাপা, দুইটি পূর্ণগর্ভ চটের থলি ; দক্ষিণ কক্ষে টিনের একটি দড়ির সেফ গার্ড জড়ানো পুরাতন তোরঙ্গ। পাদুকার পরিচয় অনাবশ্যক—পৌছুতে পারলে সব কাজ ফেলে সর্ব্বাগ্রে চীনেমুচী খুঁজতে হবে!

ঠাকুর বলতেন—"কাজলের ঘরে যাতায়াত থাক্‌লে—বেদাগ্ কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। যতই সাবধান হও, দেহে একটু দাগ নিয়ে আসতেই হয়।" রংয়ের গাঢ়ত্বে আগন্তুক কিন্তু সে শঙ্কা হ'তে মুক্ত! বিপদ-সঙ্কুল সুদূর যাত্রায় সকলেই নিজেদের দলপুষ্টি চায়। এক্ষেত্রে কিন্তু সে আগ্রহ কারো জাগে নাই। অনেকেই অনেক অনুমান ক'রেছিলেন—সকলেরই ভাবটা ছিল—প্রত্যাখ্যানের দিকে। মজুমদার্ ভায়া বলেন—"বোধ হয় কালিমাখা কাবুলী—মেওয়া বেচতে বা খেলা দেখাতে যাবে।"

শেষ আমাদেরই ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। তিনি বাঙালী! অর্ডার পেয়ে, বেঙ্গল থেকে ভায়া ক্যাল্‌কাটা চীনে চলেছেন। সঙ্গে থলিভরা ফ্রেশ্-ফ্রুট ; তার ডিটেল্ অনেকেরই স্মরণ থাকা সম্ভব—লঙ্কা হ'তে আধখানা কাঁটাল পর্য্যন্ত! শুনেছিলেন সমুদ্র সফরে সী সিক্‌নেস্ এড়াবার উহাই ব্রহ্মাস্ত্র বা মহৌষধ। যে কারণেই হউক—না যেতে, না আসতে সী সিক্‌নেস্ তাকে ছোঁয়নি।

২

চীন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর—পনেরো-ষোলো বৎসর কেটে গিয়েছে। সেখানে কোনো সুবিধাই হ'ল না—'রণে মলে নাকি স্বর্গ হয়', আমরাও গেলুম, হত্যাকাণ্ডও থেমে গেল—স্বর্গপ্রাপ্তির পথও ঘুচে গেল! একটি মাত্র উপায় রইল—কাশী। সেই আশায়—অংসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই! অনভ্যস্ত পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করাও বড় 'বোরিং'!

এমন সময় একটি বন্ধু জুটলেন—তিনি ভাদুড়ী মশাই—জীবন্ত তিলভাণ্ডেশ্বর। তাঁর একখানি লিপি-ফটো বা জীবনী চাই।—ফিল্ম ফাঁদা গেল—বৎসর দুই সময় কাটাবার খোরাক জুটলো ; তাই নিয়ে থাকি।

জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে, রেউড়িতলায় বাসা—দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন—কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক—বেশ একটি আনন্দ-বৈঠক্ নিত্যই বসে—সাময়িক-সাহিত্য-কথা চলে। তারা যেন নবযুগের বার্ত্তাবাহক—চোখে মুখে আনন্দ, উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসুক। ভাবতুম—এই তো যৌবন, একেই বলে যৌবন! এরাই তো জগতকে নূতন রূপ দিতে আসে—জগতের যৌবন রক্ষক! ভারী আনন্দ পেতুম। তাদের তর্ক ও সমালোচনাদি নূতন ধারা ধ'রে চল্‌তো—আমি উপভোগ করতুম। নব যুগের আগমন বার্ত্তার সাড়া পেতুম!

আমি বারাণ্ডায় বসে' পথের লোক-চলাচল দেখছি আর ভাদুড়ী মশায়ের কথা ভাবছি। সেটা ছিল মঙ্গলবার—দুর্গাবাড়ীতে দুর্গাদর্শনে যাবার দিন। বহু রহিস্, মহাজন ও জনসাধারণ গিয়ে থাকেন—যাচ্ছেনও। কেহ-বা দর্শনান্তে ফিরছেন। ফিরতি জনতার মধ্যে একজনকে দেখে চম্‌কে উঠলুম। চাটুয্যে না! সে মূর্ত্তি—'লাখে না মিলে এক্'! নাকে, কপালে, গালে—সিন্দূর! স্থির নিশ্চয় না হ'লেও না ডেকে পারলুম না—"চাটুয্যে নাকি?"

চাটুয্যে থম্‌কে দাঁড়িয়ে—বারাণ্ডার দিকে চাইলে। ষোল বৎসর পরে চারি চক্ষুর মিলন! একমুখ হাসি—সেই গজদন্ত বিকাশ!—"বাঁড়ুয্যে মশাই নাকি?"

"—দাঁড়াও, যাচ্ছি।"

পরিবার ছুটে এসেছিলেন—"কে—কে গা?" বললুম—"চট্ কোরে এক কেট্‌লি চায়ের জল চড়িয়ে দাও, আর চাকরটাকে আধসের গরম জিলিপি—দেরী না হয়।"

"একজন না?"

"হাঁ—হোল্‌কারের বড় কুমার—আমার চীনের চাটুয্যে। বলতে বলতে নেবে গেলুম।

—"এসো, এসো ভায়া। অ্যাঃ—বেঁচে আছো? ভারী আনন্দ হচ্ছে···"

"আগে বলুন তো—হনুমানের বিষ আছে?"

চাটুয্যের প্রশ্নাদি ওইরূপই। তাই বললুম—"আগে খুবই ছিল রে ভাই, কিন্তু রাবণ বংশ ধ্বংস করতে—সবটুকু ঝ'রে গিয়েছে—এখন সব ঢোঁড়া হনুমান! এ প্রশ্ন কেন বলো দিকি?"

ম্লান মুখে কাতর কণ্ঠে বললে—"বড় বিপদ বাঁড়ুয্যে মশাই! এই দেখুন হাতে হনূমানে কামড়ে দিয়েছে।"

কি সর্ব্বনাশ! তখনও রক্ত ঝরছে। তাকে সাহস দিয়ে বললুম—"কিছু ভেব না ভাই, হত্যার পাপ থেকে মুক্ত রাখবার জন্যেই মহর্ষি গৌতম বলে' গিয়েছেন—গো ব্রাহ্মণ আর হনুমানের বিষ থাকবে না। এরা তিনই চিরদিন এক পর্য্যায়ভুক্ত থাকবে। খবরদার, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারিয়ো না ভাই।"

তিন বৎসর চীনে অবস্থানকালে প্রায়ই চাটুয্যের একটা না একটা অদ্ভুত সন্দেহের, শোকের বা স্বপ্ন-সমাধানের বড় প্রব্লেম্ আমাকে মেটাতে হ'ত। আমার শাস্ত্রজ্ঞানে তার অসীম বিশ্বাস ছিল। তার ভয় ভাংলো। হাতটা ভাল কোরে ধুয়ে, 'আয়োডিন্' লাগিয়ে বেঁধে দিলুম। সাবান দিয়ে মুখ ধোবার পর পাকা রং বেরিয়ে এলো—বে-ভেজাল্ চাটুয্যেকে পেলুম। তারপর একথাল জিলিপি আর এক পট্ চা—অতল স্পর্শে চল্‌লো। খান সাতেক পেটে পড়বার পর বললুম—"তিনি কোথা?—সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ হচ্ছে শাস্ত্র বাক্য—"

"সবই তো করেছিলুম মশাই," বলেই চাটুয্যে একদম বিমর্ষ—অভ্যাসবশে কেবল জিলিপি খাওয়া বন্ধ হয়নি। আমি ভীত হয়ে বললুম—"কেনো, কি হোলো ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছ নাকি?"—তার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

"সবটা নয়—আধখানা গিয়েছে মশাই"—

"বলো কি? সে কি রকম! তিনি কোথায়?"

"বেশ হয়েছে মশাই—ভালই হয়েছে। যেমন তীর্থ-তীর্থ ক'রে মরছিলেন—"

"ব্যাপারটা খুলে বলো ভাই।"

"আর মশাই—শাস্ত্র মানতে তো কসুর করি না—পঞ্জিকা না দেখে শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত যাই না। পঞ্জিকা বলেন—আপনারাও ডিটো দেন—ত্রয়োদশীর মত যাত্রার ভালো দিন আর নেই—সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধি। শ্রীরামপুর, গুপ্ত প্রেস্, বাগচি—সবারই এক রা। পরিবার পা বাড়িয়েই ছিলেন, ত্রয়োদশীতেই বেরিয়ে পড়া গেল—সোজা একেবারে বৃন্দাবন। সাঁটেই বলিই যমুনা স্নানান্তে গোবিন্দজী দর্শনে যাবো। যমুনাকে নিবেদন করবার তরে একছড়া পাকা কলা কোঁচায় বেঁধে ছিলুম। কিন্তু জল কোথায়, থাকলেও তাতে নাবে কার সাদ্দি—কচ্ছপের মোচ্ছব লেগে আছে। সন্তর্পণে জলস্পর্শ করছি, একটানে কোমর থেকে কাপড়খানা খসিয়ে নিয়ে একটা বাঁদর ছুটে পালালো, থপ্ কোরে বসে পড়লুম। ভাগ্যে গামছাখানা ছিল—তাই কোনো প্রকারে গোবিন্দজী দর্শন সেরে বাসায় ফিরি। পাণ্ডাজী বললেন—'আপ্ বড়া ভাগ্‌বান্ হায়, লালাজী (শ্রীকৃষ্ণ) লীলা কিয়া।' ভাবতে লাগলুম—আচার্য্য শঙ্করের নিশ্চয়ই এই দশা ঘটেছিল—তাই বারবার—কৌপীন বন্ত খলু ভাগ্যবন্ত—ব'লে গিয়েছেন!—"

"তিন দিনে হাড়ির হাল্ কোরে ছাড়লে—কাপড় গেলো, চটি গেলো, দুদিন রুটিও গেলো। পরিবারকে

পাণ্ডার জিম্মে কোরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলুম। তীর্থ নয়—বাঁদরের একটি বিশিষ্ট আড্ডা, মুহূর্ত্তের শান্তি নেই মশাই। ডাঙ্গায় বাঁদর, জলে কচ্ছপ! হ্যাঁ—মিথ্যে কথা বলব না—বৃন্দাবনের সেরা চিজ বটে—রাবড়ি!—"

—"তারপর প্রয়াগে পলায়ন। সেখানে রামের পল্টনের নম্বর কিছু কম। মুণ্ডনের মাহাত্ম্যই ধর্ম্মের সেরা। রক্তারক্তি চল্‌ছে! কেশের কনট্রাক্টার কড়া পাহারা দিচ্ছেন—এক কাঁচ্চা চুল না কেউ সরায়!—আমি সঙ্গমে স্নান করতে সরে পড়লুম।"

"ফিরে এসে তাঁকে খুঁজছি—একটি স্ত্রীলোক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাজির। বললুম—এখন কিছু হবে না, আগে আমাদের কাজ সারা হোক্,—পয়সাকড়ি সব তাঁর কাছে।—স্ত্রীলোকটি ঝঙ্কার দিয়ে বলে' উঠলো—তুমি কি মরেছ', চিনতে পারছ না!—আমি গো।—"

—"সর্ব্বনাশ—কে চিনবে মশাই—যমকেও ফাঁকি দেওয়া যায়! হুলিয়া হারমানে!—আপনাকে বলি—ভাগ্যে এক চোখ ট্যারা ছিল, না হ'লে আমার বাবারও চেনবার সাদ্দি ছিল না; তায় শুনেছি—তীর্থস্থান প্রবঞ্চকের প্রফিট্ হাউস্!—আমার কান্না পেলে।—এইস্ত্রী মানুষ হ'য়ে' এ তুমি করলে কি—আমি না ম'লে তুমি দেশে ফিরবে কোন্ মুখে?"

"ঘাটে মড়াকান্না পড়ে গেল—মাঝে মাঝে ঝঙ্কার—তুমি ছিলে কোথায়, তুমি তো মরেই ছিলে। তুমি থাকলে (পাণ্ডাকে দেখিয়ে) এ পোড়ারমুখো মিন্‌সে, শ্লোক আউড়ে, ভজন সাধন দিয়ে—মায়ি অসংখ্ পুন্ হোবে—অহল্লিয়া মায়ি ভি—আরো কত কি বললে।"

"পাণ্ডার দিকে চাইতে সে উত্তেজিত ভাবে বললে—বাবু, তীরথ্ মে ঝুট্‌মুঠ্ গোলমাল্ না কিজিযে, হাম্‌লোগ্ গণক্ নেহি, হাত গিণনে নেহি জানতে। আপলোগকা বিধ্‌বা সধ্‌বা কোন্ পয়চানে? সবকোই কিনারাদার সাড়ী আউর গলেমে হাতমে জোর রাখতে, কেশমে কুণ্ডলিনী (কুন্তলীন) লাগাতে। প্রয়াগজীমে মুণ্ডন্ প্রধান কর্ত্তব্য হায়—উন্‌কা ভালেকে ওয়াস্তেই করায়া গিয়া। আওর পাঁচ্‌কো পুছিয়ে—বোলে—হাঁক্ দেওয়ায়, যে পাঁচ্ পল্টনীমূর্ত্তি এলো আর রুক্ষ স্বরে বললে—ক্যা,—ক্যা ঝুট্‌মুঠ্ 'বল্‌বা' হায। যো হুয়া, সো ভালাকে ওয়াস্তে হুয়া;—আর দচ্ছিনাকে দো রূপেয়া রাখকে, যাঁহা যানা হায় চুপ্‌চাপ্ চলে যাইয়ে—ইত্যাদি।—"

"তাদের মারমূর্ত্তি দেখে—তা ভিন্ন উপায় ছিল না। এদের চেয়ে বাঁদর ভালো ছিল মশাই। খাওয়া দাওয়া শিরস্থ হয়েছিল—প্রথম ট্রেনেই কাশী! তাঁর এক পিসি কাশীবাস করেন—সোনারপুরায়। সেখানে উপস্থিত হয়ে—মুখে পেটে কিছু দিয়ে বাঁচি!"

"তিনি এখন বাসায় বন্ধ—অসুখ অস্বস্তির সীমা নেই! আমি তাঁর পানে চাইতে পারি না, চাইলেও চিনতে পারি না! পিসি পণ্ডিতদের-বাড়ী কাটান্‌ছিড়েনের জন্যে ছুটোছুটি করছেন—কারো সুখ নেই।"

"আবার গ্রামে তা-বড় তা-বড় মহামহোপাধ্যায়রা আছেন। তাঁদের কাছে উদ্ধারের ছাড়পত্র এ জন্মে মিলবে না। সুতরাং তাঁকে এখন তিন-চার মাস এখানে থেকে, অন্তত বব্‌ড্ হেয়ার বানিয়ে যেতে হবে।—"

—"আমি বাইরে বাইরে পাগলের মত ঘুরছি। তার ওপর এই বাঁদুরে কামড়! আপনাদের ত্রয়োদশীকে শতকোটী নমস্কার মশাই! সস্ত্রীক তীর্থে আসার মত মূর্খুমি আর নেই—এর চেয়ে সোঁদর বনে গেলে চুকে যেতো! প্রয়াগকে আপনারা তীর্থরাজ বলেন—সব ঝুট্‌বাৎ মশাই—আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম—পাণ্ডারাজ বা গুণ্ডারাজ।"

এই অদ্ভুত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি সত্যই সম্বিৎহারা, স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক মেরে গিয়েছিলুম। বলবার কিছু পাচ্ছিলুম না—ফাঁকও নয়। চাটুয্যে তখন পাপড়ি ভাংচে—আস্তো আর চলছে না।

বললে—"আপনাকে পেয়ে আমি আর ভাবছি না। চীনে তিন বছর আপনি আমার ভয়ত্রাতা ছিলেন, মানুষ—বানিয়ে দিয়েছেন—মহা মহা বিপদে রক্ষা পেয়েছি—এইবার বাঁচান—যা করবার হয়—করুন। দু-তিন দিনের বেশী তো আমার থাকা চলবে না—ওঁর একটা ব্যবস্থা, পাচ মেয়ের বিবাহ, জ্যাঠতুতো ভায়ের সাত বিঘে লাখরাজের দখল লওয়া, সবই করতে হবে। তা ছাড়া চীনের চোদ্দো হাজার প্রসিদ্ধ সলিসিটার-প্লাণ্ডারার ব্রাদার্সের পাল্লায় পড়ে রয়েছে! উঃ—আজই স্টার্ট করলে ভাল হয়; ত্রয়োদশী নয় তো!…"

বললুম—"কি সব পাগলের মত বকচো, এতো তাড়া

কিসের? এখনো তো তোমার ছুটি রয়েছে। যা বললে, ওসব তো দু-চার দিনের কাজও নয়…”

“আজ্ঞে, ব্যাপারটি যে খাঁটি শাস্ত্রীয়, ক্যাপ্টেন্ বার্ক্লে ছুটি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কর্ণেল্ শমনের তো দিনক্ষণ নেই! কন্‌ট্রাক্টরের কড়া কটাক্ষে যে নাপতে বেটা ভুলেও একগাছি চুল্ রাখে নি। ভগবানেরও ভুল হয় মশাই—টাকের মাঝে মাঝেও দু-এক গাছা থেকে যায়, এ বেটা একদম্ মাইক্রস্‌কোপিক্ চাঁচন্ দিয়েছে যে!—সিঁদুর পরাবার পথও রাখে নি—আমি আর ক’দিন!”

“ওঃ তুমি বুঝি ওই ভণ্ডদের ভুয়ো কথাটা নিয়ে এখনো ভাবচো! আমার তো কোনো শাস্ত্র জানতে বাকি নেই—ও কথা কোথাও পাবে না। সামুদ্রিকের চেয়ে সেরা শাস্ত্র তো আর নেই!—চীনে যাকে যা বলেছি কোনটা নিষ্ফল হয়েছে কি?—দাও, ডান্ হাতটা দাও দেখি। নিরেট্‌দের কথায় মিছে ভেবে মরচো!”

“সত্যিই তো—বিপদে পড়ে সে কথা ভুলে গেছি মশাই!” বলে, হাত বাড়িয়ে দিলে। নিবিষ্ট ভাবে দু’পিঠ নেড়ে চেড়ে পনেরো মিনিট নিষ্পলক নিরীক্ষণান্তে—রংয়ের কল্যাণে পেলুম—নিবিড় অন্ধকার এবং দু’পিঠই সমান! বেশ গম্ভীরভাবে বললুন “যাও, মিছে দুর্ভাবনা নিয়ে থেক না—সবাইকে জ্বালিও না। এই দেখছ না—তর্জ্জনির নিম্নে বৃহস্পতির ক্ষেত্র হতে—আয়ুরেখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিক্রমান্তে নেবে প্রাণনাড়ী স্পর্শ করেছে—এ ভারি বিরল—দেখা যায় না—ভেরী র‍্যায়ার্। একমাত্র ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর ছিল। তোমাকে মারে কে! তিরানব্বয়ের পূর্ব্বে যমেরও সাধ্য নেই। পাচ-সাতদিন পরে দেশে গেলেও চলবে। গিয়ে বোলো—কয়দিন তার জ্বর হয়েছে, ছাড়ছে না—পেটটাও নরম। ডাক্তারেরা ‘টাইফয়েড্’ বলে সন্দেহ করছেন। তার সব ব্যবস্থাদি কোরে, তাঁকে তাঁর পিসির কাছে রেখে এলুম। থাকতে পারলুম না।—চাকরি যে টাইফয়েডের চেয়েও কঠিন অসুখ!—বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করেন তো তিন মাস পরে তাঁকে আনবো।—টাইফয়েডে অনেককেই নেড়া হ’তে হয়। তিন মাসে লোকের সামনে বেরবার মত চুলও গজিয়ে যাবে।”

“আঃ—বাঁচালেন বাঁড়ুয্যে মশাই—এরূপ অকাট্য কথা—আর কার কাছে পেতুম—জয় বিশ্বনাথ!—”

চায়ের পট্ নিঃশেষ করলেন। এতক্ষণে মেঘ ফুঁড়ে হাসি ফুট্‌লো।—“আমাকে তো চিন্তামুক্ত করলেন, এখন তাঁর ভাবনাই ভাবছি মশাই—বাঙালীটোলার সেই স্যাঁৎসেতে সোনারখনির মধ্যে তিন-চার মাস বন্দীর মত কাটাবে কি কোরে—সত্যিকার টাইফয়েড্ যে টেনে আনবে…”

“তার উপায়ও ভেবেছি ভাই—”

“আপনি ছাড়া আমার ভাবনা আর কে ভাববে… ভাবতো বটে এক সম্বন্ধী—সে ওই চোদ্দো হাজার পাচার করবার চেষ্টায়। এখন পরলোকে গিয়ে পস্তোচ্ছে”…

“যাক্ ও কথা।—এখানে ‘বান্ধব সমিতি’ বোলে বেশ জমকালো থিয়েটার পার্টি আছে। তাঁ’দের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই সেদিন ‘উর্ব্বশী’র জন্যে তাঁরা ফার্ষ্ট ক্লাস্ পরচুলো আনিয়েছেন। বন্ধুত্ব আর মূল্য—দুয়ে মিশিয়ে তা পাওয়া যাবে। পরলে কারো সাধ্য নেই যে পরচুলো বলে বোঝে। তাই পোরে সারাদিন বেড়ান্ না, কেবল শোবার সময় খুলে রাখা চাই, আর স্নানের সময়। ইচ্ছা হয় রাত্রে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে’ আসতে পারেন—তখন আর কে কার নেড়া মাথা দেখতে যাচ্ছে, আর তাঁকে চেনেই বা ক’জন!”

চাটুয্যে একদম চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো।—“ভগবান আপনাকে কি মাথাই দিয়েছিলেন—আমাদের কেবল মুণ্ডু বয়ে’ বেড়ানো! আমিও তো থিয়েটারে পার্ট নিয়েছি তিন-তিন্‌বার—অশ্বমেধের ঘোড়া সেজেছি, কই আমার মাথায় তো ও কথা আসে নি।—বস্—মার্ দিয়া, আর ভাবি না মশাই। উঃ—এমন সহজ উপায় রয়েছে—আর আমি কি-না… তবে দু-তিন দিনের বেশী থাকা চলবে না মশাই, তা হ’লে আর ট্রেন্‌ভাড়া থাকবে না।—”

“কেনো?”

“মশাই সতেরোখানা সন্দেশের দোকান, সবই সেরা পাক্! দিন—দেড় টাকা কোরে খস্‌ছে! তীর্থস্থান বটে! আবার চম্‌চম্ বোলে কি চিজই বানিয়েছে! সে দিন চাখ্‌তে-চাখ্‌তে বার-আনা খসে গেলো!—আর নয় মশাই…”

বললুম—“রাত্রে আজ এইখানেই একসঙ্গে আহার।” একগাল হেসে বললে—“আমি নিজেই বলতুম বাঁড়ুয্যে-

মশাই, একটু ইতস্তত ছিল—কাশীবাস করেছেন, রুটিন্ না ফ্যাকাসে মেরে থাকে! ত্রয়োদশীতে যাত্রা কোরে এক প্রকার উপোসই চলছে, পুরি আর হালুয়া মেরে জিভ্ অসাড় আর মুখ ঘৃতপক্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সিগারেটে শেষটান মারতে সাহস হয় না মশাই, আধখানা থাকতে ফেলেদি—মুখাগ্নি না হয়ে যায়!"

"ভয় নেই ভাই, কাশী ভোগের স্থান—ত্যাগের বালাই বড় দেখতে পাই না। চল না একসঙ্গেই বাজারে যাওয়া যাক্।"

পথে—একটু নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"মটন্ মেলে না?"

"এসো না, সব মেলে—যেবা ইচ্ছা হয়।"

"ওঃ—তাই এত ভিড় আর বড় বড় বিল্ডিং। বড় বড় সব টাকার-মুটে সকাল থেকে মাছ-মাংসের বাজার খুঁটে বেড়াচ্ছেন· সেরা মাল না উঠে যায়। মণিকর্ণিকা মনে পড়তে দেয় না—বেশ আছেন!—আর তিনটে বছর কাটাতে পারলেই আসছি মশাই—"

তার পছন্দ মতই বাজার করা গেল। প্রায় দুসেরের ওপর এক পিস্ মটন্ লওয়া হ'ল। বর্ণনাবাহুল্যে আর কাজ নেই।

তার পর তার অন্যান্য ব্যবস্থাদি শেষ কোরে চতুর্থ দিনে তাকে রওনা ক'রে দিলুম। চোখ্ ছল্ ছল্ করছিল, বারবার বললে—"আপনি দেখ্বেন," আর মধ্যে মধ্যে "আজ ত্রয়োদশী নয় তো বাড়ুয্যে মশাই?"

"না হে না, কোনো দুর্ভাবনা রেখ না।"

ট্রেন্ ছাড়লো। মুখ বাড়িয়ে—"আসল কথা বলতে ভুলেছি মশাই—কি চিজ্ই দিয়েছেন—তাঁর মুখে হাসি দেখে যেতে পারলুম! পরচুলো কি ফিট্ই করেছে মশাই…"

আর শোনা গেল না।

দুর্গা—দুর্গা।

স্বপ্নশেষ

শ্রীবৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভেঙ্গে দি'য়ে মোর খেলা-ঘরখানি
দিয়ে গেছে শুধু ব্যথা
কল্পনা মোর শুধু আজ সাথী
রিক্ত আমার কথা।

নদীর ওপারে শ্যাম তরুছায়
স্বপন-প্রাসাদ গড়ে'
শ্রাবণের ঐ মুক্ত ধারায়
নয়ন যে মোর ঝরে।

আনমনে বহে তটিনী অদূরে
চঞ্চল কলতানে,
আমার প্রেমের গোপন বাণী কি
জাগে না প্রিয়ার প্রাণে।

দিবসের শেষে অস্ত শিখায়
লুকায় শ্রান্ত রবি,
বেদনা-কাতর হৃদয়ের মাঝে
আঁকিয়া করুণ ছবি।

অনুকর্ষ

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

২২

নিজের একটা অভিভূত ভাব কাটিতে শীলারও ক্ষণেক সময় লাগিল। তারপরে সে যেন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়া ললিতার পানে চাহিয়া বলিল, "এই বুঝি তোর সেই না-বলা কথা? লুকানো কথা?--তবে বলবার মত কিছু নয় কেন বলেছিলি?'

তাহারা তখনও নদীর উপরে--নৌকার মধ্যে বসিয়া; সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে তখন জল স্থল ছাইয়া ফেলিয়াছে। সেই অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত জলরাশির পানে চাহিয়া ললিতা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল---

"বল্‌বারই বা এমন কি কথা? এমন ঘটনা কি দৈবাৎ ঘটে না মানুষের জীবনে?"

"কিন্তু এরকম ব্যক্তির সঙ্গে সম্মিলন জগতে সাধারণ ঘটনা নয় ললিতা, এইটুকুতেই এটুকু অন্তত আমি বুঝ্‌ছি। তুই যে কালই মানুষের জীবনের যে ঝোঁকের কথা বলে ঠাট্টা করেছিস, নিজে যে আজ তার চূড়ান্ত দেখালি তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্? শুধু আজ বলে নয়—এই তিন বৎসর যে পড়লি না --আর যা করে' বেড়িয়েছিস্ তারও তো একটু আভাস পেলাম! এই ঝোঁকেতেই তাহলে জীবনের আর কোন ঝোঁক্‌কে চিনিস্‌নি!"

অন্ধকারের মধ্য হইতে ললিতার মৃদু উত্তর আসিল, "হবে।"

"কিন্তু এ ঝোঁকে এপক্ষে চল্‌লে তো হবে না লতি, এতো পথ নয়--একেবারে পথরোধকারী দুর্ভেদ্য পর্ব্বতের সাম্‌নাসাম্‌নি হওয়া যে। এ চলবে না—এ পথ থেকে তোকে ফির্‌তে হবে, নইলে নিজেকে ছারখার ক'রে ফেল্‌বি—যেমন ফেল্‌বার উদ্যোগ ক'রে তুলেছিস্। চল্, আমিও তোর সঙ্গে কাকিমার কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে ফেল্‌ছি। সাম্‌নে ছুটিও আছে আমার।"

"বেশ!"

"বেশ নয়, এ কর্‌তেই হবে। ওঠ্, নৌকা তীরে লেগেছে!"

"কই তীর—অন্ধকার যে—ওঃ!" শীলা ললিতার হাত ধরিয়া বুঝিল ললিতার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে। দৃঢ়হস্তে শীলা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

* * *

কাকিমা বলিলেন, "শীলা তো চলে গেল কিন্তু আচ্ছা ভাবনায় ফেলে গেল আমাকে। আমি তো বাপু আর ওদের চোখের সুমুখে এখন থাক্‌তে পার্‌ব না। রাজেনবাবু মনে করবেন উনি নেই বলেই আমি এমন কাজ করতে পার্‌লাম। আর মোহন—না চল বাপু—এখান থেকে কোথাও পালাই কিছুদিনের মত--"

ললিতা সাগ্রহে বলিল, "তাই চল কাকিমা," তারপরে দৃষ্টি নত করিয়া সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "কোথায় যাবে?"

"কোথায় যাব? সে আমি কি জানি—তোরাই জানিস।" ললিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে কাকিমাই বলিলেন "শীলির কাছেই চল্ না হয়।"

"না"—

"তবে কোথায় যাবি?"

"কল্‌কাতাতেই থাকিগে চল্—এম্-এটাও পড়ার চেষ্টা দেখিগে এবার।"

কাকিমা হতবুদ্ধি ভাবে তাহার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে কি তোরা পাগল করবি নাকি? উনি চলে গেলেন—কোথায় আমায় শান্তি স্বস্তি দেবার চেষ্টা করবি, না, এই রকম ক'রে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবি? শীলা বুঝ্‌লে মোহনের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সুখী হবি না—সে তোর উপযুক্ত পাত্রও নয়!—কেন নয়—কিসে নয়, তাও বুঝলাম না—তবু তোরও মৌন সম্মতি দেখে তাঁর এতদিনের বন্ধুত্ব—কথা দেওয়ার ভদ্রতা, মনুষ্যত্ব—সব ছেড়ে দিয়ে তোরা যা বুঝালি তাই বুঝতে চেষ্টা করলাম। এখন যেখানে যাবি চল্—তারপরে কুমুদবাবুকে বলা-কওয়া যা করবার শীলিই করবে বলে গেল, কুমুদ নিশ্চয় আস্‌বে কিম্বা পত্র লিখ্‌বে--তারপরে বিয়ের একটা দিন স্থির ক'রে উদ্যোগপত্তর কর্‌তে হবে—এই তো জানি। এর মধ্যে এম-এ পড়ার হুজুগ চাপলো মেয়ের মনে এই তিন বৎসর

পরে! তাঁর কত সাধ ছিল মেয়ে এম্-এ পাশ তো করবেই—তারপরেও যদি কিছু বলে তাও করব—মেয়ে ইউরোপ যেতে চায় তাই পাঠাব। মেয়ে সেসব কিছুই করলেন না—এই তিন বৎসর ভেরেণ্ডা ভেজে এখন না হয় বিয়েই কর্—তাঁর শেষ যা আদেশ—তাও নয়—আবার এম্-এর ধূম! তার মানে কিছুই করবি না আর কি!"

ললিতা নতমস্তকে কাকিমার এই সক্ষোভ তীব্র তিরস্কার সহ্য করিয়া গেল, তারপরে ম্লান মুখে দুই চোখে জল ভরিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল—

"পড়ব এইমাত্র তো বলেছি কাকিমা, তুমি আর যা করবার কর, তাতে আমার পড়া আট্‌কাবে না। কাকুর সব সাধ নষ্ট করেছি আমি জানি তা, শেষে এই বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর, এটা আমার দোষেই অগত্যা ক'রে গেছেন। এটাও হোক্—আর তাঁর আদত সাধও আমি যাতে পুরাতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর। তিনি স্বর্গ থেকে দেখে সুখী হবেন এখনো।" ললিতার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া কাকিমা অত্যন্ত নরম হইয়া গেলেন। আর একটি কথাও না কহিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইতেই ললিতার চোখের ধারা আরও বাড়িয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে ললিতা শান্ত হইলে বলিলেন, "কলিকাতায় যাবারই উদ্যোগ করা যাক্—এখানে মোহনদের সাম্‌নে কুমুদ আসতেই হয়ত চাইবেন না। না জেনে এলেও শেষে লজ্জিত হবেন ওদের কাছে, রাগ করবেন হয়ত আমাদের 'ওপর। তার চেয়ে চল কলকাতাতেই যাই—শীলিকে লিখে দে একথা।"

"আচ্ছা।"

তাঁহার নির্দ্দেশমত এসব কাজ যথাযথ নিষ্পন্ন হইল বটে, কিন্তু আসল কথাটা কি ব্যবস্থা হইল কাকিমা তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কুমুদ আসিলেন, দুই-তিন দিন তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া ললিতার সহিত অনেক কথাবার্ত্তাও কহিলেন, কিন্তু কাকিমা দেখিয়া শুনিয়া ক্রমেই অধিকতর হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। তাহাদের কথাবার্ত্তা কেবলই শিক্ষা বিষয়ক, ললিতার কোন্ বিষয় লইলে এম-এর পক্ষে সুবিধা হইবে কুমুদ তাহা স্থির করিয়া দিলেন, পরীক্ষা শেষ হইলে পরে ললিতা যাহা অধ্যয়ন করিবে তাহার বিষয়েও পরামর্শ হইল। ইউরোপের কোন দেশে কোন কলেজে পাঠ সে বিষয়ের অনুকূল সে সম্বন্ধে অনেক গল্প ও গবেষণা কাকিমা কুমুদের মুখে শুনিলেন; কিন্তু আর কোন প্রস্তাব বা কথাবার্ত্তার আভাসও তিনি বুঝিতে না পারিয়া ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন। শেষে যখন কুমুদের যাওয়ার দিন এবং সময় স্থির হইয়া গেল এবং কুমুদ তাহাকে প্রণাম করিয়া বিদায়ের জন্যও দাঁড়াইল তখন আর তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাবা—সেকালে নিয়ম ছিল বটে যে কন্যাপক্ষই আগে প্রস্তাব করবে, প্রার্থনা জানাবে, কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত হয়ে ওঠায় সে নিয়ম তো আর নেই, এখন ছেলেমেয়েরা নিজেরাই সে বিষয়ে স্থির করে, পরে অভিভাবকদের জানায়! কিন্তু তোমরা কি স্থির করলে কিছুই তো আমাকে জানালে না!" কুমুদের গম্ভীর মুখ মুহূর্ত্তে কেমন একপ্রকার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সে একবার মাত্র কাকিমার মুখের পানে চাহিয়াই মাথা নামাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি তা জানেন বলেই আমার ধারণা ছিল কাকিমা। ললিতা দেবী এখন মনোবিজ্ঞানের ও দর্শনের বিষয়ে অনার্ নিয়ে এম-এ পড়ার জন্য তৈরী হবেন, তারপরে তাঁর কাকার যা সাধ ছিল ইউরোপে গিয়ে পড়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করা, সে বিষয়েও তাঁর খুব উৎসাহ আছে—যাক্ সে পরের কথা—এখন আপাতত—"

কাকিমা যেন বাক্যহারা হইয়া যাইতেছিলেন, অতি কষ্টে কেবল উচ্চারণ করিলেন, "একথা তো আমিও জানি, কিন্তু এরই জন্যই কি শীলা এত কথা বলে গেল? তারই কথামত তো তোমাকে আমি ডেকে পাঠাই—"

কুমুদ মাথাটা আরও যেন নত করিয়া আরও যেন মৃদু অথচ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "শীলা দেবী যা বলে গেছেন সবই সত্য, কিন্তু ললিতার এখন পড়তেই ইচ্ছা, তাই আমরা এইটাই উচিত বলে মনে করছি—"

"কিন্তু সে যে আমাকে বিয়ের মত দিয়েছিল, বলেছিল বিয়ে হোক্ তাতে আমার আপত্তি নেই—কই সে কোথায়?" বলিয়া কাকিমা চারিদিকে চাহিতেই দেখিলেন ললিতাও অদূরে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। কাকিমা তাহাকে দেখিয়া এইবারে যেন ক্ষোভে দুঃখে ফাটিয়া পড়িলেন, "তোর যদি এই মনে ছিল লতি, তো এমন ক'রে বাড়ী

ছাড়িয়ে কলকাতায় টেনেই বা আন্‌লি কেন আমাকে—কুমুদকেই বা আস্‌তে লিখ্‌লি কেন, আর মোহনের কাছে, রাজেনবাবুর কাছে—সবদিকে আমাকে এত অপদস্থই বা করলি কেন?”

ললিতা ত্রস্তে তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রায় পীঠের উপরই ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, “আমি তো আপত্তি করিনি কাকিমা, তুমি কুমুদবাবুকে বরং জিজ্ঞাসা ক’রে দেখ। আমি এইগুলো করতে চাই, আর তোমার এই ইচ্ছা সবই বলেছি ওঁর কাছে। উনিই সব শুনে আমাকে পড়তেই বল্লেন এবং খুব সাহায্যও করবেন জানালেন। তুমি মোহনবাবুদের কথা বলতেও তো আমি আপত্তি করিনি। যা তোমার ইচ্ছা আমি তাতে একেবারে অসম্মত তো হইনি।”

বলিতে বলিতে ললিতা সহসা সেস্থান হইতে সরিয়া অপর দিকে চলিয়া গেল। কাকিমা এইবার একেবারে হাল্‌ছাড়াভাবে কুমুদের দিকে চাহিলেন। কুমুদ তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া নিকটে আসিয়া সান্ত্বনার ভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, “ওঁকে নিজের ইচ্ছামতই চল্‌তে দেন্ কাকিমা। ৺কাকাবাবুরও তো এই ইচ্ছাই ছিল, শুন্‌লাম। ওঁর পক্ষে এই পথই ঠিক—অন্য দিকে ওঁকে চালিত করলে ফল ভাল হবে না এ আমি বুঝেই—” বলিতে বলিতে কুমুদ নীরব হইলেন। কাকিমা অধীরভাবে প্রায় কুমুদের হাতই ধরিয়া বলিলেন, “না বাবা, তুমিও ওর সঙ্গে পাগলামি কর না। শীলা যে আমাকে বল্লে তুমি ওকে পেলে সুখী হবে, তবে কেন আবার অন্যমত করছ! আমরা ওর পাগলামি শুনব না—”

ললিতা কোথা হইতে আবার আবির্ভূত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “ওঁকে সুখী করবার জন্যই যে ওঁকে মুক্তি দিতে চাই কাকিমা! তোমাদের এই ষড়যন্ত্রে পাছে উনিও ভুল ক’রে ফেলেন—যাকে পেলে উনি ঠিক সুখী হবেন জীবনে, তাঁকে চিনিয়ে দিতেই ওঁকে ডেকেছিলাম। শীলার সঙ্গেই ওঁর বিয়ে ঠিক্ হবে। তোমার যদি এতই সাধ, তাহলে মোহনবাবুকে না হয় আবার ডাক। কুমুদবাবুর জীবনটাও তোমার এই খেয়ালে নষ্ট ক’রে দিও না, দোহাই তোমার।” বলিতে বলিতে ললিতা আবার সরিয়া গেল। কাকিমা প্রস্তর প্রতিমার মত শুধু চাহিয়া রহিলেন এবং কুমুদও ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, “যখনি আপনারা স্মরণ করবেন তখনি আমি আস্‌ব—আমার জন্য আপনি একটুও কুণ্ঠিত হবেন না, আপনার সন্তানের মতই আমাকে জান্‌বেন, এখন আসি।” ধীর পদে কুমুদ চলিয়া গেল। কাকিমা কতক্ষণ সেভাবে ছিলেন জানেন না, যখন একফোঁটা চোখের জল মুছিয়া তিনি অন্যদিকে ফিরিলেন, দেখিলেন ললিতা কতকগুলা পুস্তকের মধ্যে একেবারে নিমগ্ন হইয়া বসিয়াছে।

২৩

কাকিমা শীলাকে পত্র লিখিয়াছেন, “সম্মুখে তোমার পূজার অবকাশে আমার কাছে এস, আমাকে একটু বাইরে ঘুরিয়ে আন, আমি বড়ই হাঁপিয়ে উঠেছি। লতির পড়ার অখণ্ড মনোযোগ আমার জন্য আর খণ্ডিত করতে চাইনে; এক তুমি ছাড়া আমার আর তো গতি দেখ্‌ছি না। আর একজনের কথাও মনে পড়্‌ছে সে কুমুদ, আমাকে সে বলেছিল দরকার পড়লে তাকে স্মরণ করতে, সে নাকি আমার সন্তানতুল্য। এ কথাটা যদি সুবিধা হয় তাকে স্মরণ করিয়ে দিও, আমার জগতে তো আর কেউ নেই। ওঁর গয়া করবার জন্য আমার বেরুবারও বিশেষ প্রয়োজন জানবে।”

ব্যথিতা শীলা কাকিমার এ অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না। তাহার অবসর মিলিতেই তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বাহির হইবার উদ্যোগে নিযুক্ত হইল। ললিতা একটু হাসিয়া বলিল, “কাকিমার এ ব্যবস্থায় আমারও এইটুকু লাভ হ’ল যে তোকে আর একবার দেখলাম। আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে তিনি ভরসার মত একটা লোককে যে পাকড়িয়েছেন এ দেখে আমিও ভরসা পেলাম।”

শীলা ললিতার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল হাসিটা বড় ম্লান। সাহস পাইয়া উত্তর দিল, “তাঁকে এ নির্ভরসাটুকু না করলেও পারতে। এতই কি মস্ত ব্যাপারে মন দিয়েছ যে এতটুকু অবসর নেওয়াই চলে না?”

“সে তুই বল্‌তে পারিস্ বটে, কিন্তু আমার যে অভ্যাস ছেড়ে গেছে, কত যত্নে কত কষ্টে যে মন বসাচ্ছি। কুমুদবাবু

আস্‌বেন না ? তিনি আমাকে সাহায্য করবেন বলেছিলেন, এই সময়ে সেটা পেলে আমারও সুবিধা হত—"

"তুই বুঝি কাকিমার কোন খবরই রাখিস্ না। কুমুদবাবুই যে আমাদের গাইড্ হয়ে নিয়ে যাবেন—নইলে এসব বিষয়ে আমার তোর মত দক্ষতা আর সাহস নেই। পথে ঘাটে বিশেষ লট্‌বহর নিয়ে চল্‌তে আমি একেবারে অচল।"

ললিতা একটু নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা ?"

"প্রথমে তো গয়া—কিন্তু সে তো দু-চার দিনের মাম্‌লা, পরে যে কোন্ পথ সেইটাই এখনো ঠিক হয় নি—আর সব ঠিক্।"

"বাঃ—এমনি অনির্দ্দিষ্ট যাত্রা নাকি ? শুনে যে লোভ হচ্ছে।"

"হচ্চে নাকি ? এমন সৌভাগ্য কি হবে ? চল্ তবে।"

"দাঁড়া, তোরা বেরিয়ে পড়্ আগে, অর্দ্ধেক রাস্তায় গিয়ে দেখ্‌বি আমিও উপস্থিত, তবে তো মজাটা পুরো মাত্রায় জম্‌বে। তোদের দেরী কিসের তবে ? কুমুদবাবু এলেন না যে এখনো ?"

"এই সম্বন্ধীয় কাজেই তাঁকে দেরী কর্‌তে হচ্চে, একটা খবর নিয়ে তবে আমাদের নিয়ে বেরুবেন।"

"সিক্রেট্‌টা বুঝি আমার কাছে ভাঙাই হবে না ?"

"কাকিমার সেই রকমই অভিমানটা বটে। তিনি দীক্ষা নেবেন কাকার গয়া কার্য্যের পর ; তাঁর এ অভিমানের সেও এক উদ্দেশ্য। আমি এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ দেব তাঁকে ! অনাবিলাদের গুরুদেবকে মনে পড়ায় অনাবিলারই শরণাপন্ন হয়েছি। তার স্বামী কুমুদবাবুকে তাঁর সন্ধান দিলে তবে কুমুদবাবু এসে আমাদের নিয়ে বেরুবেন। আমারও এই সুযোগে যদি সেই মহাত্মার একবার দর্শন মেলে। যে ভাবে তাঁকে দেখেছিলাম আর তাও সম্পূর্ণ অন্যের ইচ্ছায়, একবার নিজের ইচ্ছায়ও দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।"

ললিতা যেন স্তম্ভিত ভাবে কিছুক্ষণ শীলার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "একাজ কেন করছ ভাই শীলা ? আবার কেন আমাদের জীবনে সাধু-সন্ন্যাসীর সম্বন্ধ এনে ফেল্‌ছ ? তুমি দেখ্‌বার ইচ্ছা কর দেখগে, কিন্তু কাকিমাকে সেখানে নিয়ে যেও না—মিনতি !"

"তিনি যে ভাল লোকের কাছে দীক্ষা নিতে চান, আমাকেই খুঁজে দিতে বলেন। আমি যে আর কাউকে জানি না ভাই। নিজের অনিচ্ছার মধ্যেও তাঁকে সেই দেখা মনে এমন একটা ভাব এনে ফেলেছে ভাই, যে লোকোত্তর মানবের কথা কেউ বল্‌লেই ওঁকে মনে আসে। তাই কাকিমাকেও তাঁর কথা বলেছি, এখন কি ক'রে এ আর রদ করি ? তুমি এতদিন ওঁর আবার দেখা পেয়েও কাকিমাকে সেকথা বল নি, সেজন্য তাঁর তোমার উপরও খুব অভিমান। তোমাকে না জানিয়েই তাই তাঁর এ অভিযান ! তাঁর আগ্রহ খুব বেশী,—কি কর্‌ব এখন ভাই ? আমি জানতাম না যে তুই এতে এত অমত করবি ?"

"এতটুকুও যদি না বুঝ্‌লি তবে বৃথাই এম-এ পড়েছিস্ !"

শীলা তাহাকে একটু আঘাত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না—উত্তর দিল, "সংস্কৃতে পড়েছি ভাই, সাইকলজি নয়।"

ললিতা তাহার ব্যঙ্গ কানেও তুলিল না—নিজ মনে বলিয়া গেল, "কেন আবার এই সব মরীচিকার মায়া মানুষের জীবনে সাধ ক'রে টেনে আনা ? হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের এইই এখন পথ বটে, গুরুগিরি আর শিষ্যগিরি ! কিন্তু ওসব আমাদের সঙ্গেও কেন, আর আমার কাকিমাকে কেন ওর মধ্যে টানছিস্ ?"

"আমি বুঝতে পারিনি ভাই লতি, মাপ কর। আচ্ছা আমি এখনো চেষ্টা কর্‌ব—যদি তোর অনিচ্ছা জানিয়ে কাকিমাকে ফেরাতে পারি। আগে তাঁর কাছে যাব না, কাশী কি অন্য কোথাও গিয়ে দেখি, অন্য কোন ভাল লোকের সন্ধান যদি পাই।"

ললিতা আর কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে অন্যত্র চলিয়া গেল। শীলা মনে মনে বিষম অপ্রতিভ এবং নিজের কাছে যেন অপরাধীও হইয়া পড়িল। সেই মহাত্মা দর্শনের পর হইতে ললিতার এতদিনের ব্যবহারে শীলা ললিতার পূর্ব্বের ব্যবহার একটা সামান্য ঝোঁক্ মাত্রই বলিয়া ক্রমে মনে করিতেছিল, বিবাহ না করিলেও ললিতা আবার পড়ায় মন দিতেই এই বৎসরাধিককালে তাহার সম্বন্ধে শীলার আর কোন আশঙ্কাই ছিল না। এখন দেখিল যতখানি নিরাপদ সে মনে করিয়াছিল ততখানি পরিষ্কার এখনো

হয় নাই। ললিতার মনঃক্ষোভ অথবা ঝোঁক এখনো সম্পূর্ণ জুড়ায় নাই।

কিন্তু যাত্রার সময় কাকিমা এক গোলমাল করিয়া বসিলেন। ললিতার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "হ্যাঁরে, ওঁর কাজের সময় তোরও কি উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য ছিল না লতি?"

"আমি তো তা জানি না কাকিমা, তুমি তো আমাকে বল নি।"

মহা অভিমানে তিনি উত্তর দিলেন, "এও কি লোকে বলে দেয়?"

ললিতা অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে বলিল, "আমি যে তাঁর ইচ্ছা মতই কাজে আছি, তাই মনে ক'রে আর কিছু ভাবতে পারিনি কাকিমা!"

শীলা মধ্যস্থতা করিয়া বলিল, "সে আর এমন কি—এ ট্রেনটায় না গিয়ে রাত্রেরটায় যাওয়া যাবে, চল্ তোর যাওয়া চাইই।"

ললিতা আর আপত্তি করিল না—তাহাই ব্যবস্থা হইল।

গয়াক্ষেত্রে গিয়া সেই দুই-চারিদিনের স্থানে তাহাদের দিন কয়েকই কাটিয়া গেল। তীর্থকার্য্য সমাপন অন্তে দর্শনীয় সমস্ত দেখার মধ্যে বুদ্ধগয়াই ললিতার বেশী প্রিয় হইয়া ওঠায় একবারের স্থানে কয়েকবারই তাহারা সে স্থানটি খুঁটিয়া দেখা ও তাহার আলোচনায় কয়েক দিনই মাতিয়া রহিল। বৌদ্ধধর্ম্ম আর তাহার পরিনির্ব্বাণতত্ত্ব এবং সম্প্রতি বৌদ্ধসংঘের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কুমুদের সঙ্গে ললিতার গবেষণা ক্রমবর্দ্ধনশীল দেখিয়া কাকিমা অতি কষ্টেই তাহাদের কাশীর মুখে ফিরাইতে পারিলেন এবং ললিতা যে গয়া হইতেই ফিরিয়া যাইব বলিয়াছিল সে কথা যে সে ভুলিয়া গিয়াছে ইহা বুঝিয়া কাকিমা ও শীলা পরম পরিতুষ্টই হইলেন। পথে ললিতা দুই-একবার বলিল, "তোমরা অন্য তীর্থে চলেছ, কিন্তু আমার মন ঐ নৈরঞ্জনার বালির চড়াতেই পড়ে রইল।"

শীলা হাসিয়া উত্তর দিল, "তা থাক, সুবিধা মত কুড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

বহুবার দৃষ্ট কাশীতে আর নামিতে কাকিমা সম্মত হইলেন না, একেবারে প্রয়াগক্ষেত্রেই তাহাদের দুই-চারিদিন বিশ্রামের এবং তীর্থকৃত্য সমাপন জন্য যাত্রা স্থগিদ হইল। শীলা মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া ললিতার বিষয়ে এক একবার ভাবিতেছিল, সে তো কই আর ফিরিবার নামও মুখে আনিতেছে না বা তাহার অনভিমতের পূর্ব্বকথিত বিষয়গুলির আর কোন আলোচনাই করিতেছে না। মনোবিজ্ঞানের আর এক গূঢ় অধ্যায় শীলার চক্ষের সম্মুখে যেন সজীব হইয়া উঠায় সে ইহার ফলাফলের বিষয়ে মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ফেরার আর উপায় নাই। কিছুই না জানায় কাকিমাই কেবল আনন্দিত, আর কুমুদ তার নিজের স্বভাবগত সুদৃঢ় বর্ম্মের মধ্যে নির্ব্বিকার সঙ্গী মাত্র।

তারপরে শীলার জীবনের প্রথম আগমনক্ষেত্র মথুরানগর। এটি বরং তাহার ভাল লাগিল—কিন্তু বৃন্দাবন দেখিয়া সে বড়ই হতাশ হইয়া পড়িল। ললিতার মুখে পূর্ব্বে বনযাত্রার যাহা বর্ণনা শুনিয়াছিল তাহারই অভিযানে যদি কিছু বৈচিত্র্য পাওয়া যায় শীলা মনে মনে এই আশা করিতেছে, কিন্তু কুমুদবাবু যেদিন ব্রজবাসীদিগের নির্দ্দেশে কেশীঘাটের এক ভগ্নমন্দিরসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় গৃহে সেই সাধু মহাত্মার সন্ধানে তাঁহাদের লইয়া প্রবেশ করিলেন তখন শীলার মনে এখানের ভ্রমণ স্থান সম্বন্ধেও বৈচিত্র্যের আর কোন আশাই রহিল না। বিচিত্রতার মধ্যে কেবল ললিতা তখনও তাহাদের সঙ্গী ভাবেই চলিতেছে। আর আশার মধ্যে কেবল সেই মহাত্মার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

বহু পুরাতন নির্জ্জন ভগ্নপ্রায় গৃহ। বাহিরে একজন ব্রজবাসী মাত্র বসিয়াছিল—তাহাকে কুমুদ সাধুর বিষয়ে প্রশ্ন করিতেই সে সসম্ভ্রমে হিন্দি-বাংলার খিচুড়িতে জানালে, "যান্—বাবাজী ডেরাতেই আছেন, মায়ি লোগ্ভি দর্শন করছেন।"

স্ত্রীলোকগণ আছেন জানিয়া কুমুদ সপ্রশ্ন ভাবে শীলার পানে চাহিলেন—অর্থ অগ্রসর হওয়া যাইবে কি-না, কিন্তু ললিতাকেই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর দেখিয়া শীলার আর মতামতের প্রয়োজন হইল না, সকলেই আগাইয়া চলিলেন।

শীলা দেখিল সম্মুখের এক বারান্দায় সেই পূর্ব্বদৃষ্ট দিব্যমূর্ত্তি একটি স্তম্ভের পার্শ্বে এমন ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন যাহাতে তাঁহার পশ্চাৎ ভাগই সেই গৃহাঙ্গনে প্রবেশকারীদের চক্ষে পড়ে। তাঁহার পদতলে এক রমণীমূর্ত্তি যেন লুটাইয়া পড়িয়া আছে। সাধুর দক্ষিণ হস্ত উত্থিত—শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে

ধ্বনিত হইতেছে, "চিত্রা ওঠ, তোমার দৃষ্টিই তোমাকে এতদিন পরেও চিনিয়ে দিলে। তুমি তপস্বিনী—এ বিহ্বলতা তোমার সাজে কি ?—বহুদিন পরে তোমাদের সংবাদ পাবার সুযোগ পাচ্ছি, পরম পূজ্যপাদ তোমার পিতামাতা আনন্দ ভাই সকলে কেমন আছেন—কোথায় আছেন ? স্থির হও, ওঠ! আবাল্য শুদ্ধচরিত্রা ব্রহ্মচারিণী তুমি—সংযম হারিও না।"

বিহ্বলা রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহের ভিত্তি গাত্রে ঠেস্ দিয়া যেন নিজেকে সম্বরণ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখনও কম্পিত হইতেছে। তাহার একটি সঙ্গিনীও অবাক্ নেত্রে তাহাকে দেখিতেছিল—এইবার সেও তাহার নিকটস্থ হইয়া গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "চিত্রা দিদি, চিত্রা—"

অঙ্গনস্থ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় দর্শনার্থীদলের "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবকে মুহূর্ত্তে সচকিত করিয়া ললিতা ত্বরিতগতিতে বারান্দায় উঠিল এবং রমণীর একেবারে মুখের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনাকেই কেদারনাথে দেখেছিলাম—চিত্রা নামটি আমার বেশ মনে আছে। আপনিও আমার সঙ্গে দুটি-একটি কথা কয়েছিলেন, মনে কর্‌তে পারেন কি ?" রমণী বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখ আবরিত করিয়া উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল, ললিতার কথায় বিস্মিত ভাবে সেও মুখের আবরণ সরাইয়া চাহিল। ললিতা তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "হ্যাঁ—আমিও আপনার চোখ্ দেখেই চিন্‌ছি—সেই আপনি।"

ততক্ষণে সাধু অঙ্গনের দিকে ফিরিয়া আগত ব্যক্তিবর্গের ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সাদরে সকলকে আহ্বান করিতেছিলেন, "আসুন, আসুন, আপনারা এমনভাবে কেন দাঁড়িয়ে আছেন ? এ যে সর্ব্বসাধারণের সকল সময়ের জন্য অবারিত স্থান ! এই দিকে আসুন।" তাহাদের সকলকে ডাকিয়া লইয়া বসিবার আসন নির্দ্দেশ এবং তাহাদের প্রণাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি নমস্কারের সহিত সাধু শীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্চে—আপনি কি ইতিপূর্ব্বে—"

শীলা আনন্দিত হাস্যে বলিলেন, "অনাবিলাদের বোটে সেই নদীর উপরে আপনাকে আমরা দর্শন করি।"

সাধু ললিতার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আর এটি তো সেই দুর্দ্দান্ত মেয়েটি—সেই ললিতা। আজও বুঝি তুমিই এঁদের ধরে নিয়ে এসেছ আবার ?"

শীলাই উত্তর দিল, "না—এবার আমরাই ওকে সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছি। ইনি ললিতার কাকিমা—আপনাকে দর্শন করতে—"

"অভিবাদনের ভাবে মস্তক হেলাইয়া সাধু হাস্য মুখে বলিলেন, "আজ একটি আনন্দ মেলারই সূচনা দেখ্‌ছি।—ইনিও আপনাদের নিকট-আত্মীয় কেউ নিশ্চয় ?" কুমুদবাবুর পানে তিনি চাহিতেই কুমুদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না, আমি একজন বন্ধু মাত্র—"

"নামটি জান্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছি।"

"কুমুদকান্ত রায়।"

"কুমুদবাবু, এই বন্ধু শব্দটি আমরা বড্ডসাধারণ ভাবে ব্যবহার করি। এর অর্থ যে কত বড়, আপনারা শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি নিশ্চয় আপনারা জানেন ! এটি সাধারণ কথা বা এই বন্ধুসম্বন্ধ সাধারণ সম্বন্ধ নয়।"

"কুমুদ কুণ্ঠিতভাবে মাথা নামাইতে শীলা মৃদুস্বরে বলিল, "উনিও আমাদের সেই অসাধারণ সুহৃদ্।"

"পিতা মাতা—ভ্রাতা—আবাল্য হতে যার সঙ্গে মনের বন্ধন আছে তিনিই বন্ধু পদবাচ্য, তার পরে যিনি জগতের একমাত্র বন্ধু, আত্মার সঙ্গেই যাঁর বন্ধন, তিনিও বল্‌ছেন, বন্ধুর মধ্যে আমি গুরু।"

কুমুদ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "শীলা দেবীর কাছে আপনার কথা শুনে কাকিমা আপ্‌নার কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা করেছেন। আমি অনাদিবাবুর কাছে অনেক চেষ্টায় আপনার সন্ধান পেয়ে এঁদের সঙ্গে এসেছি। আমারও আপনাকে দেখবার বড়ই ইচ্ছা জন্মেছিল।"

"আমার কাছে দীক্ষা ? সে কি ? এখানে কত মহত্তর ব্যক্তি আছেন—ইচ্ছা ও চেষ্টা করলেই সন্ধান পাবেন। আমাকে ওকথা বল্‌বেন না—অপরাধগ্রস্ত হব।"

শীলা অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনি তো অনাবিলাদের সকলেরই গুরুদেব—শুনেছি।"

সাধু সহাস্যে বলিলেন, "অনাদিবাবুদের বাড়ীর বালবৃদ্ধযুবা সবাই আমাকে এমনিই ভালবাসেন বটে।"

কাকিমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তবে কি আমাকে দয়া করবেন না ?"

"মা, আমি আপনাদের সন্তানতুল্য। আপনাকে গুরুর যোগ্য ব্যক্তি সন্ধান করিয়ে দেব—আপনি শান্ত হোন্। তার পরে ললিতাদেবী—উচিত হলেও তোমাকে আপনি বল্‌তে পারি না দেখছি, সেই ছোট্ট ললিতাটিকেই আমার মনে পড়ছে!—চিত্রা দেবীর সঙ্গে তোমার কোথাও দেখা হয়েছিল বুঝি?"

"কেদারনাথে! আপনি বুঝি মনে করেন যে সংযম সহিষ্ণুতা কেবল তপস্বী-তপস্বিনী আর ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণী-দেরই একচেটিয়া সম্পত্তি? জগতের আর বুঝি কেউ তার অধিকারী নয়?"

যেন একটা অগ্নিগর্ভ গোলকের বিস্ফুরণে সকলে একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। সাধু অবিচলিত সৌম্য-মুখে বলিলেন, "এমন কথা তো আমি বলিনি ললিতা।"

"স্পষ্ট না বল্‌লেও প্রকারান্তরে বলেছেন বইকি, কিন্তু আমি আপনাকে জানিযে দিচ্চি যে, ব্রহ্মচারী আর তপস্বিনীদের চেয়েও সংযম ও সহিষ্ণুতা শত শত অতি সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেও আছে।"

"তারাই তো যথার্থ তপস্বী বা তপস্বিনী, বাইরের বেশে এর সংজ্ঞা নির্ণয় হয় না।"

"আপনারা তাই করেন। কিন্তু কিসে আপনারা সেই সব সাধারণ লোকের চেয়ে বড়? কিছুতেই না। বিশেষ এই আপনারা, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীরা। আপনারা মনে মনে ভোগ করেন যা—বাইরে তাই মুখে ত্যাজ্য বলেন। আপনাদের দর্শন আমি এই এক বৎসর খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। আপনাদের সাধনাতে আর জগতের অন্তর যা চায় তাতে কতটুকু তফাৎ? আপনারা কল্পনায় এক সুন্দরতম বন্ধুকে খাড়া ক'রে তার সঙ্গে যে ভাবের আদানপ্রদান অন্তরে চালাতে চান্ সাধারণ মানুষেও একটি ব্যক্তির ওপরে তাদের সেই ভাবের আভাষই আরোপ ক'রে তাকে সেইভাবে বাইরেই পেতে চায়, এইটুকুই তো তফাৎ? তাতেই তারা কেন এত হেয় হবে?"

"ললিতাদেবী আপনার এ তর্কের উত্তর এতো সহজে পাবেন না যত সহজে এই দর্শন শাস্ত্রটি খুঁটে খুঁটে পড়ে ফেলেছেন। পাঠের চেয়েও অনুধাবন ও অনুভববস্তুটির গুরুত্ব বেশী, তা মনে রেখেছেন তো? যার নাম বিচার।"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—আপনাদের চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'—আর সাধারণ লোক যা করে তা তার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা! কিন্তু একথা খাটে না, কখনই খাটে না। বহু স্থানে এই জগতেই আত্ম পর্য্যন্ত লোপ হয়ে থাকে—এই জাগতিক আকর্ষণের ব্যাপারেই! আপনাদের আদর্শের মতই! আদানের কোন কথাই থাকে না—কেবল প্রদান!"

"কিন্তু অলক্ষ্যে তার মধ্যে ও যে আদান বসে থাকে, তা কি আমরা ধর্‌তে পারি ললিতা দেবী? পারি না, তাই ভুল ক'রে তাকে আত্মলোপকারী অতীন্দ্রিয় ভাবের আসনে বসাতে যাই! যাঁর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সংযোগ কখনো হয়নি, তাতে ভিন্ন অতীন্দ্রিয় ভাবের আরোপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুরই ওপর চলে না! জাগতিক আকর্ষণের বস্তুর সঙ্গে তুলনা এখানে তাই অচল।"

"কেন অচল হবে? এই মানুষের মধ্যেই তো আপনাদের সাধনার উৎকর্ষে আদর্শের ঐ সব বস্তুগুলি আছে, যে সব ভাব নিয়ে আপনারা সাধনা করেন। সেই তীব্র অভাববোধ, যাতে জগতের আর সব শূন্য হয়ে একেবারে মিলিয়ে যায়—আর তেমনি তীব্র অনুভব-সুখ যাতে আর সব সুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে পড়ে। এ সব তো মানুষেরই অন্তরের সম্পত্তি। আপনারা এইগুলি চেষ্টা করে মনের মধ্যে জাগিয়ে জাগিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে আপনাদের সেই কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় বস্তুর উদ্দেশে নিবেদন করেন—মানুষ না হয় তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টবস্তু বা ব্যক্তির উপরেই তা আরোপ করে—এই তো প্রভেদ।"

"এই প্রভেদেই যে তার কি করে, তাকে কোথায় নিয়ে যায়—তা যদি জান্‌তেন বা বুঝ্‌তেন তাহলে এ তর্ক তুলতেন না। কিন্তু আপনার সঙ্গে সে তর্ক চল্‌তে পারে না, কেন না, সে বিষয়ে আপনাদের ধারণা বা বিশ্বাস কিছুই নেই: আমার পক্ষেও স্থান কাল সবই অনুপযুক্ত হচ্চে। আমি এঁদের সঙ্গেও কিছু আলাপ কর্‌তে চাই, অতএব আপনার কাছে হার স্বীকার ক'রে আপনাকে থাম্‌তে অনুরোধ কর্‌ছি।"

"একেবারেই চিরদিনের মত থাম্‌ব বলেই মাত্র আজ যখন কথা তুলেছি তখন শেষ করেই যাব। আপনার বাধাও মান্‌ব না। আপনাদের এ সাধনায় এ ধর্ম্মে সুখ নেই শান্তি নেই তৃপ্তি নেই—কেবলই অতৃপ্তির হাহাকারই নাকি

আপনাদের সাধনা, যার নাম মহাবিরহ। আপনাদের সাধনা নিয়ে আপনারাই ভোগ করুন, আমি যেতে চাই—শান্তির দেশে চির-নির্ব্বাণের রাজ্যে! সেই নৈরঞ্জনার তীরে—যেখানে আত্ম অনুভব পর্য্যন্ত হবে নিরঞ্জন, একেবারে রংহীন। প্রণাম আপনাদের—আর আপনাদের অনুরাগের ধর্ম্মে।"

ললিতা উঠিয়া ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। সাধু উদ্বিগ্ন মুখে স্তম্ভিত জড়ের মত উপবিষ্ট কুমুদ শীলা প্রভৃতির পানে চাহিয়া বলিলেন, "যান্—আপনারা ওঁর সঙ্গে। অন্য দিন আবার দেখা ও কথা হবে—আজ যান্ শীঘ্র।"

তাহারা সকলে ব্যস্ত হইয়া বহির্গত হইতে হইতে শুনিল—সাধু নিজ মনেই যেন উচ্চারণ করিতেছেন. "নিরঞ্জন—নিরঞ্জন!"

২৪

দিন কয়েক পরেই কুমুদ আসিয়া সাধুর সেই জীর্ণ আশ্রয়ে দাঁড়াইতে উদাসীন তাঁহার পানে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আসুন কুমুদবাবু, কি ব্যাপার? আপনাকে এরকম দেখাচ্চে—সংবাদ শুভ তো?"

"না—আপনাকে একবার যেতে হবে।"—বলিতে বলিতে কুমুদ তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িল। সাধু ব্যস্তভাবে তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে—ললিতার সংবাদ কি?"

"হ্যাঁ—তাঁর বড় অসুখ—আপনাকে একবার যেতেই হবে।" বলিতে বলিতে তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কুমুদের মনে পড়িল সাধুকে প্রণাম করা হয় নাই। ব্যস্তভাবে মস্তক নত করিতেই—উদাসীন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন, "এত উদ্‌ভ্রান্ত হবেন না কুমুদবাবু, ভাল ক'রে বলুন কি হয়েছে ললিতার—কি অসুখ ও কবে হলো?"

"সেই দিনই—সেই রাত্রেই—এখান থেকে যাওয়ার পরই। প্রবল ডিলিরিয়াম্—অসংলগ্ন প্রলাপ আর জ্বরে—একেবারে সংজ্ঞাশূন্য; মথুরা থেকে ডাক্তার সাহেবকে আনানো হয়েছে, তিনিও বল্লেন—মেনিন্‌জ্ঞাইটিস্, মস্তিষ্ক আক্রমণ ক'রে পীড়া! আপনি একবার চলুন, কাকিমা ভয়ানক কাতর—তিনি রোগীর বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে পারছেন না—নইলে নিজেই আস্‌তেন আপনার কাছে। শীলা দেবীর হাতেই তো সমস্ত শুশ্রূষার ভার, তাঁর আসার উপায়ই নেই। কাকিমার ধারণা, আপনার সঙ্গে সেদিন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে—সেই অপরাধেই—"

বলিতে বলিতে কুমুদ থামিয়া গেল। উদাসীন স্থিরভাবে এতক্ষণ সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন; এইবারে মনস্তাপব্যঞ্জক হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাঁরা স্ত্রীলোক—আশঙ্কাধর্ম্মীস্বভাবা, আপনি আর একথা মুখে আন্‌বেন না। তবে সেদিনের সেই উত্তেজনার সঙ্গে যে এই ব্যারামের সংযোগ আছে তা বোঝাই যাচ্ছে। জানি না ঈশ্বরের কি ইচ্ছা। কিন্তু আমার কি যাওয়ার কোন' সার্থকতা আছে? যদি তিনি আরও উত্তেজিত হন? উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হবে তাতে"।

"তাঁর বাহ্যজ্ঞানমাত্র নাই। আপনার পদধূলি কাকিমা ভিক্ষা কর্‌ছেন। আমারও মনে হচ্চে, আপনি একবার তাকে দেখ্‌লেই সে ভাল হবে।"

উদাসীন গভীর দৃষ্টিতে কুমুদের বিবর্ণ মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া দেখিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "চলুন, দেখি শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা।"

পথ চলিতে চলিতে সাধু প্রশ্ন করিলেন, "রোগীর বাহ্যজ্ঞান ভাল নাই বল্‌ছেন—কিন্তু কথা কইবার মত সামর্থ্য তো আছে?"

"সেটুকু না থাক্‌লেই বরং ভাল ছিল মনে হচ্চে, সেদিনের সেই উত্তেজনারই পুনরাবৃত্তি চলেছে—আর কিছু না। একটি প্রশ্নের জন্য ক্ষমা করবেন, ঐ চিত্রা দেবী যিনি, তিনি কি এখানে আছেন এখনো? মাঝে মাঝে 'চিত্রা'—'চিত্রা' বলেও খুঁজেছেন!—তাই মনে হয়, তিনিও যদি একবার—"

সাধু কুমুদের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "জানি না, তিনিও সেই দিনই মাত্র সেই সময়ে এসে আপনাদের একটু পরেই চলে গেছেন। কোথায় আছেন, এখানে এখনো আছেন কি-না, কিছুই আর জানা যায়নি। কিন্তু আমার মনে হচ্চে—এও সেদিনের সেই মনোবিক্ষেপের আংশিক বিষয় মাত্র—তাঁর সঙ্গে রোগীর এমন কোন পরিচয়ই নাই, অতএব এ চেষ্টা নিরর্থক।" তারপরে একটু থামিয়া সাধু আবার বলিলেন, "কুমুদবাবু, আপনি ওঁদের যথার্থই বন্ধু বুঝ্‌তে পার্‌ছি! কিন্তু বাহ্যিক বন্ধনেরও কি কোন একটা উপলক্ষ বা চেষ্টা ওঁদের দিক

থেকে হয়নি? আমি আশ্চর্য্য হচ্চি—ওঁরা যে এমন সৌহার্দ্যেরও কোন মূল্য এ পর্য্যন্ত নিরূপণ করেন নি, এই সব ত্রুটিতেই বোধ হয় ললিতার পক্ষে একটা অতি তুচ্ছ বস্তুও মনের মধ্যে গূঢ়ভাবে পোষণের আনুকূল্যে এতখানি আকার ধারণ করেছে—”

কুমুদ তাঁহার বাক্যে বাধা দিলেন, “না, ওঁর আত্মীয়-স্বজনের যথেষ্টই চেষ্টা ছিল, ওঁর অসম্মতিতেই ঘট্‌তে পায়নি। তা হতেই প্রমাণ হয়, ওঁর অন্তরে এটা তুচ্ছ আকারে ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ওঁর অতি অন্তরঙ্গ শীলা দেবীর কাছে পর্য্যন্ত গোপন ছিল—”

সাধু নিঃশব্দ হইলেন, কিন্তু মনঃক্ষোভপ্রকাশক একটা অস্ফুট শব্দ তাঁহার কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইল। একটি গৃহদ্বারে কুমুদ দাঁড়াইয়া পড়িতেই সাধু বলিলেন, “এই সেবা-কুঞ্জের গলিতেই? এই বাড়ী?”

“হ্যাঁ—ওঁর দাদামহাশয়ের দত্ত—ওঁরই এ বাড়ী নিজের।”

রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া উদাসীনের মুখ অধিকতর গম্ভীর হইল। শীলা বরফ্ ব্যাগ হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি নিবারণ করিলেন। কাকিমা আছ্‌ড়াইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া অধীর আবেগে কাঁদিয়া উঠিলেন, “বাঁচিয়ে দেন ঠাকুর—ও যে আস্‌তে চায় নি পড়া ছেড়ে, আমি ওকে জোর ক’রে এনেছিলাম কি এই জন্যে?”

সাধু রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিতেই কুমুদ ব্যস্তভাবে কাকিমাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শীলাও উঠিয়া আসিয়া কাকিমাকে ধরিল। মৃদুস্বরে উদাসীন বলিলেন, “বেশ শান্ত ভাব দেখ্‌ছি তো, কোন আক্ষেপ তো নাই।”

“কাল বৈকাল থেকে এই ভাব হয়েছে। আমরাও ভাল বলেই আশা কর্‌ছিলাম, কিন্তু ডাক্তার সাহেব—”

“তিনি কতক্ষণ দেখে গেছেন?”

“তিনি যাওয়ার পরই আপনার কাছে যাই। বৈকালে আবার আসবেন তিনি।”

কাকিমা আবার কাঁদিয়া উঠিলেন, “পায়ের ধূলো দেন ওর মাথায়, ওর অপরাধ ক্ষমা ক’রে আশীর্ব্বাদ করুন ওকে বাবা—”

“মা, আপনি শান্ত হোন্” বলিতে বলিতে সাধু ললিতার ললাটের উপর হাত রাখিলেন। ক্ষণেক চক্ষু মুদিয়া সেই ভাবে নিঃশব্দে থাকিয়া স্নিগ্ধ স্বরে ডাকিলেন, “ললিতা দেবী!”

সকলে সচকিতে দেখিল ললিতা সে আহ্বানে চক্ষু খুলিয়াছে। চোখের ভিতর ঘোর রক্তবর্ণ আভা, দৃষ্টি আছে কি-না বুঝা যায় না—কিন্তু মুদ্রিত নেত্র তাহার মেলিয়া গিয়াছে, ক্ষণপরে আবার তিনি ডাকিলেন, “ললিতা!”

“চুপ্—সরে যাবে—পালিয়ে যাবে—দেখ্‌তে পাব না আর।”

সকলে বুঝিল আবার প্রলাপ আরম্ভ হইয়াছে। সাধু প্রশ্ন করিলেন, “কি সরে যাবে, কি দেখ্‌ছ তুমি?”

“ঐ যে গোবর্দ্ধন পাহাড়ের বনে বনে—ঐ যে পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে কারা খেলা কর্‌ছে দেখ্‌ছ না?”

“কারা খেলা কর্‌ছে ললিতা?”

“সেই যে যাদের কথা তোমরা মুখে বল—আর বয়ে লেখ তারাই—তারাই—চিন্‌তে পার্‌ছ না?”—

সাধু কম্পিত স্বরে বলিলেন, “না, চিনিয়ে দাও তুমি আমাদের।”

সেই আরক্ত চক্ষের মধ্যে কোথায় সেই কৃষ্ণতার দৃষ্টি ডুবিয়াছিল—সহসা সে ভাসিয়া উঠিল, কণ্ঠে চিৎকার ধ্বনি ফুটিল, “বৃন্দাবনে যাদের কথা—কে না জানে তাদের কথা—সেই—সেই—সত্যি সত্যি” চক্ষুর বৃহৎ তারকা উদাসীনের মুখের উপর ঘুরিয়া আসিল, মুখে প্রচণ্ড উপহাসের অট্টহাসেরই সঙ্গে শব্দ ফুটিল “থাক, তোমার সাধন ভজন আর বৈরাগ্য নিয়ে ঠাকুর—আমি যাচ্চি ওদের কাছে ওদের খেলায় খেল্‌তে—”

তার পরেই সঙ্গীতের তানে উচ্চ ধ্বনি—

“মাধব—বহুত মিনতি করি তোয়!
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়।”

সে উচ্চকণ্ঠে চমকিত হইয়া একসঙ্গে সকলে রোগিণীর মুখের নিকটে আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু সে বীণার তান সর্ব্বোচ্চ সুরে পৌঁছিয়াই সেই মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া গেল।

শেষ

সাময়িকী

আসামে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অবিচার—

কিছুদিন ধরিয়া বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষার বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় আন্দোলন সুরু হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি আসামেও এই আন্দোলনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসাম নাগরিক সভার পক্ষ হইতে প্রকাশিত একখানি পুস্তকের ভূমিকায় আসামের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে অধিবাসীদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হইবার পক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রত্যেকেরই সমর্থন লাভ করিবে। খাস অসমীয়া ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের তুলনায় আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট, শিলচর, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা কম নয়। প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধির দৌলতে এরূপ একটি বৃহৎ সম্প্রদায়কে মাতৃভাষার আশ্রয়চ্যুত করা কখনই সঙ্গত নয়। তাহা ছাড়া, ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে আসাম অতীতে বাঙ্গালারই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাহার ভাষাও অনেকের মতে বাঙ্গালা ভাষারই অপভ্রংশ রূপ। প্রাদেশিকতার খাতিরে অসমীয়ারা যদি আজ বাঙ্গালীর প্রতি অবিচারে উদ্যত হন তাহা হইলে তাহা শুধু অকৃতজ্ঞতাই হইবেনা, সমান সুখদুঃখের ভাগীদার আসামী-বাঙ্গালীর প্রতিও ঘোর অন্যায়াচরণ হইবে।

বিদেশে ভারতীয় সাংবাদিকের সম্মানলাভ—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দবিহারীলাল মাথুর নামক জনৈক ভারতীয় সাংবাদিক মার্কিন সংবাদপত্রমহলে নিজের কৃতিত্বে এমনই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন যে তিনি এ বৎসর 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ সায়েন্স রাইটার্স অফ আমেরিকা' নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় সংবাদসরবরাহকারীদের এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে একজন ভারতীয়ের নির্ব্বাচনে ভারতবাসীমাত্রেই এবং বিশেষ করিয়া সাংবাদিকেরা গর্ব্ব অনুভব করিবেন। বৈজ্ঞানিক সংবাদ-সরবরাহে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া মাথুর মহাশয় গত বৎসর পুলিট্জার প্রাইজ নামক বিখ্যাত পুরস্কার লাভ করেন। মাথুর মহাশয়ের গৌরব উত্তর উত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা।

সর্দ্দার বিঠল ভাইয়ের দান—

সম্প্রতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির হস্তে তাহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিঠলভাই প্যাটেলের উইলের বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। পরলোকগত বিঠলভাই যখন সুইট্জারল্যাণ্ডে মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন সুভাষচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমিক তাঁহার উইলে সুভাষচন্দ্রকে ভারত সম্পর্কে বৈদেশিক প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য সওয়া লক্ষ টাকা দিতে নির্দ্দেশ দিয়া যান, কিন্তু আইনের ফাঁক দেখাইয়া বিঠলভাইয়ের উত্তরাধিকারীগণ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে সুভাষচন্দ্রকে বঞ্চিত করেন। এই লক্ষ টাকা দান সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে উইলকারীর শেষ ইচ্ছার মর্য্যাদা আদৌ পালিত হইতে না দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলাম।

কয়েদীদের প্রতি দৈহিক শাস্তি—

প্রকাশ যে যুক্তপ্রদেশের সরকার জেলের কয়েদীদের প্রতি বেত্রদণ্ডের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিছুদিন আগে মধ্যপ্রদেশের সরকারও কাজ করিবার সময় কয়েদীদের বেড়ী

খুলিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে বৃটিশ সরকারও তরুণ অপরাধীদের প্রতি বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা রহিত করেন। এখনও ভারতের প্রত্যেক জেলখানায়ই সামান্য অপরাধের জন্য অপরাধীদের হাতে এবং পায়ে বেড়ী দিয়া একাদিক্রমে কয়েকদিনের জন্য ঝুলাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা বর্ত্তমান। বেত্রদণ্ড এই প্রকার নিষ্ঠুর শাস্তির পর্য্যায়ে পড়ে। এইরূপ শাস্তি যতশীঘ্র রহিত করা হয় ততই মঙ্গল।

অন্ধ ছাত্রের কৃতিত্ব—

প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের পুত্র শ্রীমান সাধনচন্দ্র গুপ্ত বর্ত্তমান বৎসরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি প্রবেশিকা, আই-এ এবং বি-এ পরীক্ষায়ও উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি লাহোর ও কলিকাতায় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শী। তিনি আগামী মাধ্যমিক আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স বাইশ বৎসর। আমরা শ্রীমানের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও সাফল্য কামনা করি।

ব্রহ্ম ও ভারত—

ব্রহ্মদেশ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত ভারতের অন্তর্গতই ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশ একটি স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হওয়ায় তাহার সহিত ভারতের সম্পর্কটাও ইংরেজাধিকৃত অন্য দেশের মতই হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত ভারতের যে নূতন বাণিজ্যচুক্তি হইবে তাহাতে ব্রহ্মের বাণিজ্য স্বার্থ যাহাতে সুরক্ষিত হয় সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইবে। ব্রহ্মের বাণিজ্য স্বার্থ সুরক্ষিত হোক, এ ইচ্ছা ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক; কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবাধ বাণিজ্য নীতির উপর ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্যচুক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে ব্রহ্মই লাভবান হইতেছে, ভারতের স্বার্থও রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু নূতন চুক্তিতে ব্রহ্ম যদি ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক বসাইবার দাবী করে, তবে তাহাতে ভারত অপেক্ষা ব্রহ্মেরই বেশী ক্ষতি হইবে। কেন না, ভারত হইতে ব্রহ্মে যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি হয়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পণ্য ব্রহ্ম হইতে ভারতে আমদানি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩৮-৩৯ সালে সেদেশ হইতে চব্বিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার পণ্য আমদানি হইয়াছিল, আর এদেশ হইতে রপ্তানি হয় এগার কোটি দশ লক্ষ টাকার পণ্য। সুতরাং আশা করা অসঙ্গত হইবে না যে, ব্রহ্মের কর্ত্তৃপক্ষ বাণিজ্যচুক্তির পূর্ব্বে এ সব বিষয় ভাবিয়া দেখিতে ভুলিবেন না।

পরলোকে প্রিন্স আক্রাম হোসেন—

অযোধ্যার শেষ নবাব পরলোকগত ওয়াজিদ আলী শাহ্ রাজবন্দী হিসাবে কলিকাতায় ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার শেষ জীবিত পুত্র প্রিন্স আফ্সারুল মির্জা মোহাম্মদ আক্রাম হোসেন বাহাদুর তাঁহার টালীগঞ্জস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬১ বৎসর। তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমাজ-সেবক এবং জনসেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগত পিতার ন্যায় তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন, ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলিকাতার শেরিফের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালার গভর্ণরের কার্য্যকরী সভার সদস্যও ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

পুলিশের আরাম-নিবাস—

দার্জিলিং হইতে সতর মাইল দূরে কলিকাতা পুলিশের জন্য একটি আরাম নিবাস স্থাপিত হইয়াছে। স্বরাষ্ট্রসচিব স্যর নাজীম-উদ্দীনের নামে উহার নামকরণ হইয়াছে এবং তিনি স্বয়ং উহার উদ্বোধনও করিয়াছেন। এসব কার্য্যে বাঙ্গালা সরকারের অর্থের কোনই অভাব হয় না, অভাব হয় কেবল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের বেলায়। স্বরাষ্ট্রসচিব যতদিন পদে আছেন ততদিনই তাঁহার ক্ষমতা আছে, পাছে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার অকৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহার জনসেবার মূল্য দিতে ভুলিয়া যায় তাই এই ব্যবস্থা কি না কে বলিবে?

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুহত্যার অবারিত অভিযান—

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুদের হত্যার অভিযান যেরকম অবারিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সিন্ধুর প্রাদেশিক সরকারের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। সিন্ধু সরকার যদি যথাসময়ে ইহার প্রতীকারে যত্ন লইতেন তাহা হইলে সিন্ধুর সমস্যা আজ এতটা জটিল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইত না। সরকারের মন রাখা মনোভাবের সুযোগ লইয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে অবাধে স্বেচ্ছাচারিতা চালাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! এখনও যদি সরকার দৃঢ়হস্তে প্রতীকারে উদ্যত হন তাহা হইলে অকারণ এই নরহত্যা নিবারিত হইতে পারে।

পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা—

সম্প্রতি ঢাকা হইতে জনৈক অভিভাবক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা বোর্ডের মনোনীত একখানি বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম। বইখানির নাম—'আবদুল্লাহ্', লেখক—খাঁ বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক। পত্রলেখক এই পাঠ্য বইখানি হইতে যে সব অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সম্ভবত বোর্ডের সদস্যদের নজরে পড়ে নাই। এই সব জঘন্য উক্তি পড়িলে তরুণ মুসলমান ছাত্রদের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব স্বভাবতই জাগিয়া উঠিবে। দেশের আবহাওয়া যখন দুর্ভাগ্যক্রমে সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জ্জরিত, ঠিক সেই সময় এই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক যে ছেলেদের মনে বিষের মতই ক্রিয়া করিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আমরা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের মনোযোগ এবিষয়ে আকৃষ্ট করিতেছি।

সীমান্তে অশান্তি ও সরকারের মনোভাব—

সম্প্রতি কংগ্রেস সীমান্ত প্রদেশে নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের অপহরণ ও লুণ্ঠন বন্ধ করিবার এবং শান্তি স্থাপনার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিদল ওয়াজিরিস্থানে পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার তাঁহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে দেন নাই। আমরা সরকারের এই আচরণে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; কিন্তু তাঁহাদের এই আচরণ যে মনোভাবের পরিচায়ক তাহাকে কোন মতেই প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। আমাদের মনে হয়, সরকার সীমান্ত প্রদেশে শান্তি চাহেন না। কেন না, কিছুদিন আগে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব অনুরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সীমান্তের গোলমাল মিটাইবার ভার তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং তিনি যে তাহা হইলে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন এরূপ প্রতিশ্রুতিও দিতে প্রস্তুত ছিলেন; তবু সরকার তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের প্রচেষ্টাও বন্ধ করিয়া দিলেন, কাজেই আমরা যদি ঐরূপ ভাবি, তবে আশা করি আমাদের দোষ দেওয়া হইবে না।

পরলোকে কিশোরী সাঁতরা—

বিশ্বভারতীর প্রসিদ্ধ সেবক অক্লান্তকর্ম্মী কিশোরীমোহন সাঁতরা সম্প্রতি রক্তের চাপবৃদ্ধিতে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। কিশোরীবাবু তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও অমায়িক স্বভাবের জন্য সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর পুস্তক প্রকাশ বিভাগ ও শিল্পদ্রব্য বিভাগ তাঁহারই চেষ্টায় বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অভাবে বিশ্বভারতী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন ও বন্ধুদের প্রতি আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

পরলোকে ডাঃ বারিদবরণ—

প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদে আমরা অতিশয় মর্ম্মাহত হইলাম। কলিকাতা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। শারীর-বিজ্ঞান ও জৈব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার দক্ষতা ছিল সুপরিচিত। অল্পকালের মধ্যেই তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি উদাসীন গ্রন্থকীট। তাঁহার বাড়ীতে একটি বৃহৎ ব্যক্তিগত পাঠাগার আছে। তাঁহার মৃত্যুতে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

ঠনঠনিয়া (কলিকাতা) সার্ব্বজনীন পূজার কালীপ্রতিমা ফটো—ডি, রতন

কলিকাতা কৈলাস বসু ষ্ট্রীটে চারেরপল্লী সার্ব্বজনীন পূজার কালীপ্রতিমা ফটো—ডি, রতন

পরলোকে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী লণ্ডনে ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করিতেছেন

বোম্বায়ে ঝড়ের পরের অবস্থা

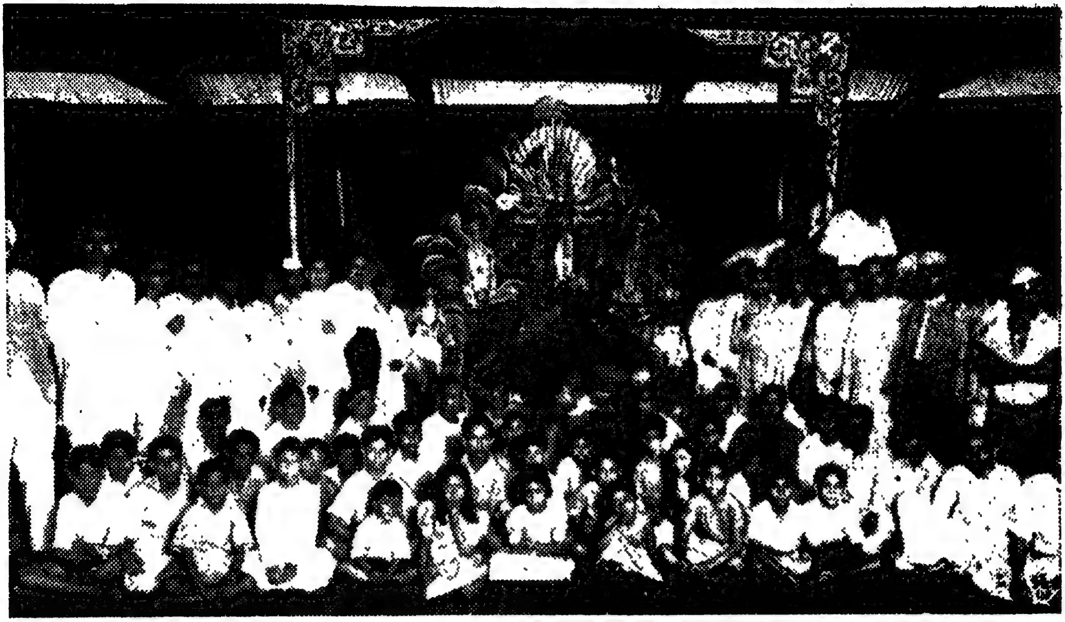

রেঙ্গুনে বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসব

সংবাদপত্র ও ভারতরক্ষা বিধান—

ভারত সরকার ভারতরক্ষা বিধানের ক্ষমতাবলে সম্প্রতি যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে এদেশে দায়িত্ব জ্ঞানের সহিত সংবাদপত্র পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই আশঙ্কা হয়। সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধতা সৃষ্টি করিতে পারে—এমন কোন্ বিষয় সংবাদপত্রে ছাপা হইতে পারিবে না, ইহাই সরকারী আদেশ। কিন্তু আদেশের ভাষাটা এমন অস্পষ্ট ও ব্যাপক যে, 'যে-কোন সংবাদই ঐ সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যাইতে পারিবে। তাই মহাত্মাজী তাঁহার পরিচালিত কাগজ তিনখানিকেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য আরও খানকয়েক কাগজও বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কর্পোরেশনের নবরূপ—

সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রাক্তন আইনসচিব স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে ত্রিবেন্দ্রাম শহরে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন, সেই প্রসঙ্গে বাঙ্গালার মন্ত্রীমণ্ডলের কলিকাতা কর্পোরেশন দমন আইন সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যর নৃপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে যে নূতন বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে

র‍্যাওয়ালপিণ্ডির প্রতিমা

তাহা আইনে পরিণত হইলে (হইবেই যে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই) কলিকাতা কর্পোরেশন বাঙ্গালা সরকারের একটি স্বতন্ত্র দপ্তরে রূপান্তরিত হইবে।' স্যর নৃপেন্দ্রনাথ কংগ্রেসীও নহেন, হিন্দু মহাসভার চাঁইও নহেন। কাজেই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সরকারের কলিকাতা কর্পোরেশন দমননীতি সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, একজন নিরপেক্ষ সুধী ব্যক্তির অভিমতরূপে তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু বাঙ্গালার মন্ত্রী মহাশয়েরা সেকথা শুনিলে যদি লাভবান হন, তাই সেদিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইবারই কথা।

লাহোর—আনারকালির প্রতিমা

ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস-নেতা সর্দ্দার প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী, শেঠ বাজাজ ও শ্রীমতী কৃপালানী

শ্রীযুত কুমুদশঙ্কর রায়—

কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুত কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয় সম্প্রতি ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় নিহত রায় সাহেব ইন্দুভূষণ সরকারের স্থানে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আগামী ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ ভিজাগাপাটাম শহরে যে নিখিল ভারত মেডিকাল কনফারেন্সের সপ্তদশ অধিবেশন হইবে কুমুদশঙ্করবাবু তাহারও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালার জনসেবকরূপে তিনি পরিচিত। কলিকাতা কর্পোরেশনে তাঁহার কার্য্য লোক চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। যাদবপুর যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাসের সেক্রেটারী ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে তিনি যে কত বাঙ্গালীর জীবনরক্ষা করিয়াছেন তাঁহার সংখ্যা নাই। আমরা ডাক্তার রায়ের সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়

কোয়েটায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের দুর্গোৎসব

কোয়েটায় দুর্গোৎসব—

সুদূর কোয়েটায় (বেলুচিস্থান) গিয়াও বাঙ্গালীরা তথায় গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব করিতেছেন। এবার লাহোর হইতে প্রতিমা, মীরাট হইতে পুরোহিত ও কলিকাতা হইতে পূজার উপকরণ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। তিন দিন যথারীতি প্রসাদ বিতরণ, নাটকাভিনয় প্রভৃতিও চলিয়াছিল। অথচ বর্ত্তমানে কোয়েটায় মাত্র ত্রিশ জন বাঙ্গালী বাস করেন।

লাহোর—ছাউনীর প্রতিমা

সাফল্য লাভ—

শ্রীযুত শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসর (১৯৩৯) পালি ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন; এবার আবার, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হইয়াছেন। তিনি ক্রিকেট খেলায় একজন বিশেষ পারদর্শী ও ভাল বাউলার।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি ২৪ পরগণা আগড়পাড়ার স্বর্গত কান্তিধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

দেবদাসী নৃত্য—

কুমারী মীনা সরকার দেবদাসী নৃত্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন। তিনি সম্প্রতি ১৯৪০ সালের নিখিল বঙ্গ নৃত্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

কুমারী মিনা সরকার ফটো—পান্না সেন

বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী—

বঙ্গের বাহিরে যে সব বাঙ্গালী বাস করিতেছেন প্রাদেশিকতার ওজুহাতে তাহাদের প্রতি অবিচার ও কুবিচার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি রাঁচী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে 'বিহার প্রাদেশিক বাঙ্গালী সমিতি'র সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মহাশয় কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, বিহারে অধিকাংশ বাঙ্গালীই 'প্রবাসী বাঙ্গালী নহেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষী হইলেও বিহার প্রদেশের অধিবাসী। বিহারে বর্ত্তমানে প্রায় আঠার লক্ষ বাঙ্গালী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র ছেচল্লিশ হাজার প্রকৃত পক্ষে 'প্রবাসী বাঙ্গালী', বাকী আর সকলেই ঐ প্রদেশেরই স্থায়ী অধিবাসী। তাঁহারা যে অঞ্চলে বাস করেন তাহা গত ১৯১২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালারই অন্তর্গত ছিল। রাজনৈতিক কারণে এই অংশকে বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিহারের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিহার সরকার ও বিহারের নেতৃবৃন্দ এ সত্য জানেন, আর জানেন বলিয়াই এই বাঙ্গালী অধিবাসীদের তাঁহারা 'প্রবাসী' আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহাদিগকে মাতৃভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ দিতেও গররাজী হইতেছেন। কিন্তু গায়ের জোরে অন্যায়কে সাময়িকভাবে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিলেও শেষ পর্য্যন্ত যে সে গায়ের জোর ধূলিসাৎ হয়, এ প্রমাণ পৃথিবীতে আমরা বারবারই দেখিয়াছি।

আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—

এবার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইণ্টার কলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার চৌধুরী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। গত বৎসরও ইনি উক্ত প্রতিযোগিতায় এবং নিখিলবঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি সুলেখক ও অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র।

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

শোক-সংবাদ—

ত্রিপুরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী চন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় প্রবর্ত্তক সংঘে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অমায়িক ব্যবহার ও বদান্যতার জন্য ঐ অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর বহু বৎসর জীবিত ছিলেন এবং নানাপ্রকার শোক পাইয়াও কর্ত্তব্য পালনে কদাচ বিমুখ হন নাই।

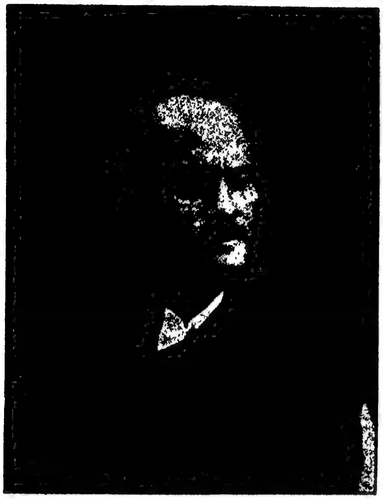

চন্দ্রকুমার দত্ত

পরলোকে পঞ্চানন তর্করত্ন—

বাঙ্গালার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ভাটপাড়ানিবাসী পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় গত ১লা কার্ত্তিক ৭৫ বৎসর বয়সে কাশীধামে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর তিনি কাশীবাস করিতেছিলেন এবং কিছুদিন হইতে শরীর খুব খারাপ হওয়ায় গঙ্গাতীরেই বাস করিতেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মীরূপে এ দেশে সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতি তাহা কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। তিনি নিজে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত চর্চ্চা প্রসারিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত তাঁহার সম্পাদিত পুরাণগুলি বাঙ্গালা দেশে সকলকে পুরাণ সাহিত্যের সহিত পরিচিত করিয়াছে। তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে জাতীয়তা বোধ এরূপ প্রবল ছিল যে, গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহাকে কয়েক দিন হাজত ভোগও করিতে হইয়াছিল। সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদে তিনি সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যে সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সারাজীবন তাহাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কোন প্রলোভনই তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকিয়াও তিনি আসমুদ্র-হিমাচল সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কার্য্যবিবরণী—

সম্প্রতি ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গালা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ৫ হাজার ৪১টি হইতে ৫ হাজার ৭২-টি পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। আলোচ্য

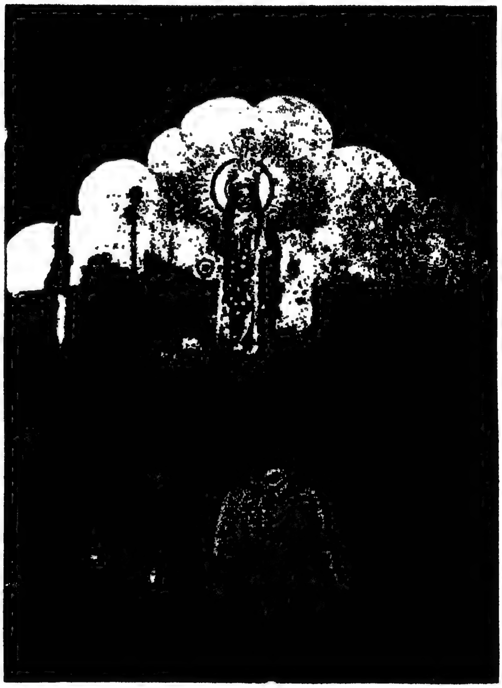

আহিরীটোলার সার্ব্বজনীন লক্ষ্মীপূজা　ফটো—পান্না সেন

বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয় আগের বৎসরের উদ্বৃত্ত লইয়া ১ কোটি ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা দাঁড়ায়। আগের বৎসর এই আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। অপর পক্ষে, মোট ব্যয়ের পরিমাণ আগের বৎসরের ১ কোটি ২ লক্ষ ৯০ হাজার স্থলে ১ কোটি ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত কমিয়াছে। তাহার মধ্যে চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন ও পোযাকের জন্য ৫০ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, অর্থাৎ—মোট ব্যয়ের ৪৯.৫৬ ভাগ ব্যয় হইয়াছে। গ্রাম্য রাস্তাঘাট ও তাহা মেরামতের জন্য ব্যয় হয় ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। জল সরবরাহের জন্য ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। জলনিকাশ স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদির জন্য ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং ডাক্তারী সাহায্যের জন্য ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

পরলোকে প্রিয়নাথ সরকার—

গত ১১ই কার্ত্তিক আলোয়ার ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব বন-বিভাগের অফিসার প্রিয়নাথ সরকার ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার ১৫নং রিচি রোডস্থ বাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিতেন। নিজ ভিজ্ঞাব্যলে তিনি দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও উচ্চ পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নিজ ব্যবহারের দ্বারা সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।

প্রিয়নাথ সরকার

পণ্ডিত জহরলালের কারাদণ্ড—

গোরক্ষপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে পণ্ডিত জহরলালের চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইনের তিন দফা অভিযোগ উপস্থিত করা হয় এবং প্রতি দফার জন্য ষোল মাস করিয়া মোট চারি বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বিচারে পণ্ডিতজী আত্মপক্ষসমর্থন করেন নাই। বিচার কারাভ্যন্তরে হইয়াছে। জহরলালজী অপরাধ স্বীকারও করেন নাই, অস্বীকারও করেন নাই। দেশের জন্য কারাবরণ পণ্ডিতজীর পক্ষে নূতন নহে, ইতিপূর্ব্বে আরও সাতবার তিনি হাসিমুখেই কারাবাস স্বীকার করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে করিবেন, কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে যখন যুদ্ধের অনিশ্চিত ফলাফলের জন্য দেশবাসী শঙ্কিত চিত্তে দিন যাপন করিতেছে সেই সময় জহরলালজীর মত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরেণ্য নেতাকে লঘুপাপে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিয়া ভারতসরকার সুবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই।

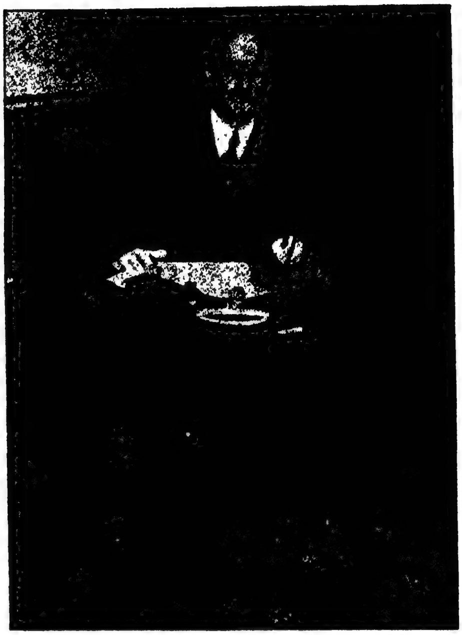

নূতন জেক গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর বেনেস

বোমায় ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু—

ফরিদপুর পালং নিবাসী জমিদার শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রনাথ সেন গত ২৩শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সহরে গাওয়ার ষ্ট্রীটস্থ ভারতীয় ছাত্রাবাসে বোমা বর্ষণের ফলে মাত্র ২২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। এখান হইতে বি-কম পাশ করিয়া তিনি হিসাববিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৯৩৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে এক মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার জন্ম হয় এবং আর এক মহাযুদ্ধের সময়েই যুদ্ধের সরঞ্জামের দ্বারা তাহার দেহান্ত হইল—ইহা অপূর্ব্ব ঘটনা বটে। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই—শ্রীভগবান তাঁহাদের মনে শান্তি দান করুন।

বারীন্দ্রনাথ সেন

হিন্দু পার্শী শিক্ষক—

কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ বিষয়ের সহিত বি-এ পাশ করেন এবং পরে শান্তিপুর সূত্রাগড় নদীয়া মহারাজা হাই স্কুলের পার্শী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দুদের মধ্যে এ যুগে তিনিই প্রথম পার্শী শিক্ষক হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পারস্য ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পরলোকে তরুণ মুষ্টি যোদ্ধা—

কলিকাতা দর্জিপাড়া রয়েল জিমনাসিয়ামের তরুণ মুষ্টি যোদ্ধা সাধনকুমার সেনগুপ্ত গত ২৬শে অক্টোবর মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার ৪৩ শিকদার বাগানস্থ বাসভবনে

সাধনকুমার সেনগুপ্ত

পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। গত দুই বৎসর তিনি ইণ্টার স্কুল মুষ্টি যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিতেছিলেন। ফুটবল ও দৌড় প্রতিযোগিতায় ও তাঁহার কৃতিত্ব স্বীকৃত হইত।

ভারত সরকারের আয়-ব্যয়—

বর্ত্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম চার মাসে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের খয় হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, আলোচ্য সময়ে ৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে। অথচ শুল্ক বিভাগ ছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজস্বের খাতে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। শুল্ক বিভাগের আয় গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের এই চারি মাসের তুলনায় কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের আয় ৫৯ লক্ষ টাকা, কর্পোরেশন ট্যাক্স ৩ লক্ষ টাকা, আয়কর ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, লবণ শুল্ক ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ডাক ও তার বিভাগের আয় ৩১ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। আলোচ্য সময়ে সরকারী রেলওয়ে হইতে পাওয়া অর্থের পরিমাণ ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। বাজেট বরাদ্দে সারা বৎসরে এই টাকার পরিমাণ ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছিল। মোট রাজস্বের আয় এই চারি মাসে ৩১ কোটি ৬ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে এই সময়ে উহার পরিমাণ ৩০ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য সময়ে দেনার হার খাতে ১০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, অন্যান্য খাতে ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় তাহার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা ছিল। গত বৎসরের তুলনায় দেনার খাতে নীট এককোটি ৫১ লক্ষ বাড়িয়াছে। এমনিভাবে ব্যয়ের বহর বাড়িতে থাকিলে দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতবাসীকে যে করভারে আরও জর্জরিত হইতে হইবে তাহার প্রমাণ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে ট্যাক্স বৃদ্ধির সুব্যবস্থার পরিকল্পনা বিঘোষিত হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইনের সেনাপতি—ফিলিপ নিম

দোকান নিয়ন্ত্রণ বিল—

দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় বিলটি বাঙলার লাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ইহা বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হইয়া প্রথমে কলিকাতা ও শহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটির এলাকায় প্রবর্ত্তিত হইবে। এই আইনের পর হইতে দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের কাজের সময়, ছুটির পরিমাণ, বেতনের হার, বেতন দিবার তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। জীবিকার খাতিরে যাঁহারা দোকানে চাকুরী করেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা প্রায়ই উদয়াস্ত খাটিয়া থাকেন। কোন অবকাশ নাই, ছুটিছাটাও নাই। তাহা ছাড়া, আবার তাঁহাদের চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা ব নিরাপত্তাও নাই। এই দুর্ব্যবস্থার প্রতীকারার্থে এই আইন দরিদ্র কর্ম্মচারীদের সত্যাই যথেষ্ট শান্তি ও স্বস্তি দিবে।

আসামে বাঙ্গালা ভাষীদের প্রতি অবিচার—

সম্প্রতি শ্রীহট্টের এক খবরে প্রকাশ, আসাম ব্যবস্থা-পরিষদের সরকারী দলের বিশিষ্ট সদস্য মৌঃ আস্রাফ উদ্দীন মহম্মদ চৌধুরী সাদুল্লা-মন্ত্রীসভার সরকারী দলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। মৌলবী সাহেব একটি বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, ‘আসামে বাঙ্গালা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা অসমীয়া-ভাষী মুসলমানদের সংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। কিন্তু সাদুল্লা মন্ত্রীসভা চিরদিনই বাঙ্গালা ভাষাভাষী মুসলমানগণের দাবী উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন,

মিশরের মরুভূমিতে পাহারার ব্যবস্থা

বোম্বায়ে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ

সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিমা — ফটো—এ এন-দাস

আহিরীটোলা সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিমা — ফটো—পান্না সেন

এমন অবস্থায় আমার পক্ষে তাঁহার দল ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।' মৌলবী সাহেব যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন আসামবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদেরও সেই একই প্রশ্ন। কারণ শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল ধরিলে বাঙ্গালাভাষী হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অসমীয়াভাষী হিন্দু-মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশী হইবে। কিন্তু এই সবকিছুই উপেক্ষা করিয়া অসমীয়া ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হইয়াছে। অথচ বাঙ্গালাভাষীদের জন্য অপর কোন ব্যবস্থা নাই। সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগমন্ত্রিত মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট ইহার বেশী আর কি পাওয়া যাইতে পারে?

শ্রীআলামোহন দাস

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম মহাশয়ের পরলোকগমনে ঢাকা অমুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অন্যান্য প্রার্থীরা তাঁহার অনুকূলে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করায় কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় নাই। প্রার্থনা করি, অবিলম্বে তিনি মুক্ত হইয়া সুস্থ শরীরে ব্যবস্থা পরিষদে যোগদান করুন।

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর সাফল্য

কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুত আলামোহন দাস মহাশয়ের একাধিক ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্য, ব্যবসায়ে অপটু ও পশ্চাদ্‌পদ বলিয়া আখ্যাত বাঙ্গালীর পক্ষে সুসংবাদ সন্দেহ নাই। আলামোহনবাবুর উদ্যোগে ও ব্যবসায়-বুদ্ধির প্রভাবে যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আজ বাঙ্গালাদেশে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভারত জুটমিল, ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহুদিন হইতেই আলামোহনবাবুর একটি উচ্চশ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল। উচ্চশিক্ষিত এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞ শ্রীযুত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যলাভ সম্ভব হইবামাত্র তিনি সম্প্রতি নূতন উদ্যমে 'দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নন্দলালবাবুই প্রধান অধ্যক্ষরূপে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবার ভার পাইয়াছেন। তাঁহাকে অধ্যক্ষরূপে পাইয়া আলামোহনবাবুর এই প্রতিষ্ঠানটিও যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

খেলা-ধূলা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইউরোপীয়ানস ঃ—২৯৫ ও ১০৪

রেষ্ট ঃ—২০৫ ও ১৬৯ (৯ উইকেট)

ইউরোপীয়ানরা প্রথম ইনিংসে ৯০ রানে অগ্রগামী থাকার ফলে জয়ী হ'য়েছে।

ইউরোপীয়ানরা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রে ২৯৫ রান তোলে। মিডলসেক্সের বিখ্যাত টেষ্ট ক্রিকেটারের ভ্রাতা ক্যাপ্টেন রবিনস করেন নট্ আউট ১০৭, তাঁর খেলায় চার ছিলো ১২টা আর একটা ছয়। তবে তিনি একাধিকবার আউট হবার সুযোগ দিয়েছিলেন; রেষ্টের ফিল্ডিং মোটেই ভাল হয়নি। জনসনের ৪৭ রানও উল্লেখযোগ্য। এস ফার্ণাণ্ডেজ ৬৭ রানে পাঁচটা উইকেট পান। দিনের শেষে রেষ্টদল কোন উইকেট না হারিয়ে ৫৩ রান করে।

আন্ত-বিশ্ব-বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার পূর্ব্ব অঞ্চলের ফাইনাল বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় দিনের খেলা রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রেছিলো। রেষ্টের প্রথম ইনিংস শেষ হ'ল ২০৫ রানে। এথাইড ও মাসকারেনহাস উভয়েই ৫০ রান করেন রবিনস ৫৬ রান ৪টে উইকেট পান। ইউরোপীয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১০৪ রানে। রবিনস একাই করেন ৫৩ রান। খেলা শেষ হবার মাত্র ৯০ মিনিট আগে ১৯৪ রানে পিছনে থেকে রেষ্ট টীম ব্যাট ক'রতে নামলো। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও ৯ উইকেটে তাদের রান সংখ্যা উঠলো ১৬৯; আর ২৬ রান ক'রতে পারলে জিততে পারতো।

হিন্দু ঃ—৩৮০ (৫ উইকেট ডিক্লিয়ার্ড)

ইউরোপীয়ানস ঃ—৩৯ ও ১০৩

হিন্দুদল এক ইনিংস ও ২৩৮ রানে জয়ী হ'য়েছে।

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার সেমি-ফাইনালে ইউরোপীয়ানরা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ২৩৮ রানে হিন্দুদের কাছে পরাজিত হ'য়েছে। ইউরোপীয়ানরা টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রতে নামে, আর মাত্র ৩৯ রানে তাদের

ইনিংস শেষ হয়। ইউরোপীয়ানদের ক্যাপ্টেন রবিনস দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন ১৯। নওমলের বোলিং সবচেয়ে মারাত্মক হ'য়েছিলো। তিনি মাত্র ১ রানে তিনটে উইকেট পান। এছাড়া গিরিধারীলাল এবং গোপাল দাসও তিনটে ক'রে উইকেট পেয়েছেন যথাক্রমে ৭ ও ১৩ রান দিয়ে। ইউরোপীয়ানদের রানসংখ্যা এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব নিম্ন রান হিসাবে রেকর্ড ক'রেছে।

নওমল

গোপাল দাস

হিন্দুদের স্থচনাও খুব ভাল হয়নি। তিনটে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৩৮ রানে কিন্তু বিসুমল ও কিষেণচাঁদ খেলার গতি ঘুরিয়ে দেন। বিসুমল ৭০ রান ক'রে এল-বি-ডব্লু হন এবং কি[illegible] একই রান সংখ্যায় জনসনের হাতে ধরা দেন।

ষষ্ঠ উইকেটের জু[illegible]ওমল ও ভিকাজী আরও উন্নততর খেলা দেখিয়ে উভয়ে বিচ্ছিন্ন না হ'য়ে দিনের শেষে দলের রানসংখ্যা ৫ উইকেটে ৩৮০তে তোলেন। তাঁরা উভয়ে যথাক্রমে ১০৩ ও [illegible]২ ক'রে নট আউট থাকেন। নওমলের খেলায় [illegible] ছিলো ১৬টা। তবে তিনি একাধিকবার আউট হবার স্নযোগ দিয়েছিলেন। ৫ উইকেটে ৩৮০ রান হবার পর হিন্দুরা ইনিংস ডিক্লিয়ার্ড করে। পরের দিন ইউরোপীয়ানরা দ্বিতীয় ইনিংস স্নরু ক'রলে। তবে তাদের ক্যাপ্টেন রবিনস এবং কামিংস খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন না। [illegible] কারণ জানা যায়নি। ইউরোপীয়ানরা ন'জনে ১০৩ রা[illegible]রে। মরগান দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেন ৩৯। কিষেণ ৩০ রানে ৫টা উইকেট পান॥

ইণ্ডো-সিলোন এ্যাথেলেটিকস ঃ

ভারতবর্ষ ও সিলোনের এই প্রথম এ্যাথেলেটিকস প্রতিযোগিতা হ'ল; ভারতবর্ষ ৮৮-৭৯ পয়েণ্টে জয়লাভ ক'রেছে। ভারতবর্ষ জয়লাভ ক'রলেও এতে গৌরবের কিছু নেই। সিংহল একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এদের লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচ কোটি; আয়তন পাঞ্জাবের এক পঞ্চমাংশ। ১৯৩৪ সালের ওয়েষ্ট এসিয়াটিক গেমসের পর থেকে ভারতবর্ষের খেলার কিছুই উন্নতি হয়নি কিন্তু সিংহলের যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে। সিলোনের গভর্ণর খেলার শেষে ব'লেছিলেন 'Next time if you come here we hope to beat you'. আমাদেরও ধারণা সিলোন যেভাবে খেলার উন্নতি ক'রছে তাতে নিকট ভবিষ্যতে তারা সহজেই ভারতীয় এ্যাথেলেটদের পরাজিত ক'রতে পারবে। এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। কোন সাময়িক পত্রিকায় এ্যাথেলেটিকসে ভারতীয়দের ক্রম অবনতির সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গিয়ে জানকি দাস যে সব কারণ দেখিয়েছেন তার ভেতর একটি অপ্রিয় সত্য প্রকাশিত হ'য়েছে; আর অভিযোগ হিসাবেও এটি অত্যান্ত গুরুতর। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন সকল প্রদেশের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত, তাঁরা ইচ্ছা ক'রলে এর স্নব্যবস্থা করতে পারেন, না ক'রলে তাঁদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা হবে। এমন কি এ সন্দেহও হয়ত অমূলক হবে না যে, তাঁরাও এর সঙ্গে জড়িত।

জানকি দাস লিখছেন 'ভারতের olympic movement-এর পথে যে সব জিনিষ অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাদের

আনন্দমেলা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১ম এস চ্যাটার্জ্জি, ২য় সত্যরঞ্জন ঘোষ. ৩য় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী

ভেতর সবচেয়ে সুস্পষ্ট হ'চ্ছে পাতিয়ালার মহারাজার মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অলিম্পিক বিরোধী নীতি গ্রহণ, যিনি নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'Sportsman', ব'লে পরিচিত। যদি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক এসোসিয়েশন জানতে পারে যে, ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা সমগ্র দেশের সেরা খেলোয়াড়দের অর্থ এবং চাকরী দিয়ে নিজের ক্ষুদ্র ষ্টেটে সমবেত ক'রেছেন তা'হলে ভারতবর্ষের অবস্থা বেশ শোচনীয় হবে। এই দুর্নীতি বাড়তে থাকলে অলিম্পিক জগতে professionalism-এর সবচেয়ে কুৎসিত রূপ ধারণ ক'রবে'।

এছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের বর্ত্তমান সেক্রেটারী যিনি এসোসিয়েশন থেকে তাঁর কাজের জন্য বেতন গ্রহণ ক'রে থাকেন, মহারাজার এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলবতী করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ক'রচেন। অলিম্পিক প্রথা অনুযায়ী যাঁরা olympic movementএর সেক্রেটারী হবেন তাঁদের কোন বেতন না নিয়ে ঐ পদ গ্রহণ করাই নিয়ম। ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ জি ডি সোন্ধী সুদীর্ঘ ১৩ বৎসর অনুরূপ আদর্শে এসোসিয়েশন চালিয়ে এসেচেন।

সুদূর বাঙ্গলায় ব'সে আমরাও পাঞ্জাবের খেলোয়াড় নিয়ে পাতিয়ালার এ্যাথেলেটদের কৃতকার্য্যতা দেখে প্রশংসা ক'রেছি আর পাতিয়ালা ও পাঞ্জাবের দূরত্ব এতই কম যে, আমরা এর পশ্চাতে যে এতখানি রহস্য আছে তা বুঝতে পারিনি।

ভারতবর্ষ ও সিলোনের খেলার

ফলাফল ৪

৪০০ মিটার হার্ডলস :—ডি হোয়াইট (সিলোন) ১ ; ঈশ্বর সিং (ভারতবর্ষ) ২ ; লাবরুই (সিলোন) ৩

১,৫০০ মিটার দৌড় :—হরদেব সিং (ভারতবর্ষ) ১ ; চাঁদসিং (ভারতবর্ষ) ২ ; ম্যাথুজ (সিলোন) ৩

৪০০ মিটার দৌড় : হোয়াইট (সিলোন) ১ ; গুরুভজন সিং (ভারতবর্ষ) ২ ; পিয়ার্স (সিলোন) ৩

১০০ মিটার :—লিভেরা (সিলোন) ১ ; উডকক (ভারতবর্ষ) ২ ; সালিমুল্লা (ভারতবর্ষ) ৩

৮০০ মিটার :—হরদেব সিং (ভারতবর্ষ) ১ ; হজুরা সিং (ভারতবর্ষ) ২ ; কিটো (সিলোন) ৩

১১০ মিটার হার্ডলস :—মুনীর আমেদ (ভারতবর্ষ) ১ ; লাবরুই (সিলোন) ২ ; ওবেসেকেরা (সিলোন) ৩

২০০ মিটার দৌড় :—লিভেরা (সিলোন) ১ ; জে সুদাসন (সিলোন) ২ ; সালিমুল্লা (ভারতবর্ষ) ৩

১৫,০০০ মিটার :—রওনক সিং (ভারতবর্ষ) ১ ; ম্যাথুজ (সিলোন) ২ ; হীরাসিং (সিলোন) ৩

পুটিং দি সট :—জহুর আমেদ (ভারতবর্ষ) ১ ; নজর মহম্মদ (ভারতবর্ষ) ২ ; সেনানায়ক (সিলোন) ৩

সলিমুল্লা

এ মুখার্জ্জি

জেভেলীন থ্রো :—ডি সিলভা সিলোন) ১ ; নেজর মহম্মদ (ভারতবর্ষ) ২ ; এলডোন (সিলোন) ৩

পোলভল্ট :—দেপ (সিলোন) ১ ; এ (ভারতবর্ষ) ১ ; অমরসিং (

হাইজাম্প :—পিরেরা (সিলোন) ১ ; গরনম সিং (ভারতবর্ষ) ২ ; পিয়ার্স (সিলোন)

লংজাম্প :—বুসি (ভারতবর্ষ) ১ ; নিরঞ্জন সিং (ভারতবর্ষ) ২ ; পিয়ার্স (সিলোন)

হপ ষ্টেপ জাম্প :—বুসি (ভারতবর্ষ) ১ ; নিরঞ্জন সিং (ভারতবর্ষ) ২ ; পিয়ার্স (সিলোন) ৩

ডিস্কাস্ থ্রো :—গুরুদীপ সিং (ভারতবর্ষ) ১; সেনানায়ক (সিলোন) ২ ; নজরমহম্মদ (ভারতবর্ষ ৩

রীলে রেসে সিলোন বিজয়ী হ'য়েছে

ক্রিকেট ঃ

জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে ওয়ার ফণ্ডের জন্যে ক'লকাতায় ভাইসরয়ের একাদশের সঙ্গে বাঙ্গলার গভর্ণরের একাদশের একটি খেলা হবার বন্দোবস্ত হ'চ্ছে। পাতিয়ালার মহারাজা ভাইসরয়ের একাদশের এবং পাতৌদীর নবাব বাঙ্গলার গভর্ণরের একাদশের ক্যাপ্টেন হবেন। ভারতবর্ষের অনেক খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের টেস্ট ম্যাচে খেলবার সম্ভাবনা রয়েছে।

লন্ টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা ঃ

সম্প্রতি পাঞ্জাব লন্ টেনিস এসোসিয়েশন টেনিস খেলোয়াড়দের নামের একটি ক্রমপর্য্যায় তালিকা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ইফতিকার আমেদ। গত বৎসর ভারতবর্ষে যে মিড-ইউরোপীয়ান টীম ভারতবর্ষে খেলতে এসেছিল তাদের গুটিন মেটিকের মত খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে পরাজিত করবার সম্মান ইফতিকার লাভ করেছিলেন। তালিকায় মাত্র [illegible] জনের নাম দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা না প্রকাশের কারণ অজ্ঞাত।

(১) ইফতিকার আমেদ (২) এম এল আর সোহানী (৩) সোহনলাল (৪) প্রেমলাল পান্ধি (৫) কন্ওয়ার কৃষ্ণ (৬) নরীন্দ্রনাথ।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস ঃ

এ বৎসর বেঙ্গল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় ভারতের বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় যোগদান করায় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে আশা করা যায়। ভারতের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে যাঁদের খ্যাতি আছে তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছেন। কে এইচ কাপাডিয়া (বোম্বাই), সি রামস্বামী (মহীশূর), ভি সিভরমান (মাদ্রাজ) এবং ইজ্জাত ওয়ানা (পাঞ্জাব)

ডন ব্র্যাডম্যানের ভারতে আগমন ঃ

মাত্র কয়েকজন খ্যাতনামা বৈদেশিক ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ক্রীড়া নৈপুণ্যের চাক্ষুষ পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে সুপরিচিত তাঁদের ক্রীড়া চাতুর্য্যের পরিচয় আমাদের কাছে সংবাদপত্রের থেকেই সংগৃহীত। ক্রিকেট খেলা ভারতে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হতে চলেছে। ক্রীড়ামোদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের উচ্চাঙ্গের খেলা দেখবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে। একমাত্র ক্রীড়ামোদী-পৃষ্ঠপোষকের সহৃদয়তায়

হার্ডিঞ্জ বার্থ ডে শীল্ড বিজয়ী বঙ্গবাসী কলেজ

তাদের বহুদিনের ইপ্সিত আশা পূরণ হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে এ ধরণের পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। এ ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ দেখা দিলে হয় ত অদুর ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের খেলার সঙ্গে আমরা পরিচয় লাভ করব।

আশার কথা আগামী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর প্রদেশে একটি ক্রিকেট প্রদর্শনী খেলা যাতে সম্ভব হয় তার জল্পনা কল্পনা চলছে। প্রকাশ, খেলার সংগৃহীত অর্থ যুদ্ধের সাহায্য ভাণ্ডারে দান করা হবে। যাঁরা এই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত তাঁদের মধ্যে নওনগরের জাম সাহেব, আলিবদ্ধপুরের মহারাজকুমার এবং ভূপালের নবাবের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট প্রদর্শনী খেলাগুলি যাতে সকল দিক থেকে দর্শকদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয় সেজন্যে প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত সভ্যগণ ডন ব্র্যাডম্যান, হ্যামণ্ড, হেডলে, গ্রিমমেল, ভেরিটী, ফার্ণেস ও ম্যাককেব প্রমুখ খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলায় যোগদান করতে অনুরোধ করে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলেন; পত্রের উত্তরও তাঁরা পেয়েছেন। প্রকাশ, যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিদেশীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভারতে আগমন সম্ভবপর নয়। তবে পৃথিবীর বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের ভারতে আগমন নাকি একরূপ সঠিক হয়ে আছে। সংবাদ শেষপর্য্যন্ত সত্যে পরিণত হ'লে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই ঘটনা যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাতে বিন্দুমাত্র মতভেদ নাই।

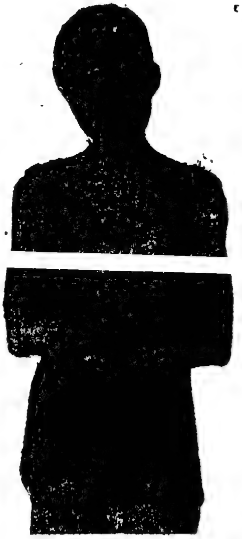

আনন্দ মেলা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে সাতমাইল সন্তরণে বিজয়িনী কুমারী তারকবালা সাহা

আই এফ সি ফুটবল শীল্ড

ফাইনাল ঃ

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত আই এ সি ফুটবল খেলার ফাইনাল লাঠি চালনার মধ্যে শেষ হয়েছে। এবৎসর ফাইনালে কলিকাতার ভবানীপুর ক্লাব ও কোয়েটা ক্লাবের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবার কথা ছিল কিন্তু ক্রীড়া ক্ষেত্রে এক অপ্রিয় ঘটনার অবতারণায় বি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভবানীপুর ক্লাবকে উক্ত প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত সভ্যগণ শীল্ড বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন। উপর্য্যুপরি কয়েক দিন খেলার জন্য এবং বিপক্ষ ভবানীপুর দল একটানা বিশ্রামের সুবিধা লাভ করায় কোয়েটা দল ঐ দিনের ফাই-
খেলায় যোগদান করতে
ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ
খেলার ব্যবস্থা করতে
হওয়ায় প্রতিবাদ
ায়েটা ক্লাব খেলার
করে। খেলা না
এবং টিকিটের মূল্য
পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ
মধ্যে কয়েকজন
বসবার আসন
বুতে আগুন
অবস্থা গুরুতর
পুলিস লাঠির
সাহায্যে উত্তেজিত জনতাকে
ছত্রভঙ্গ কর নাকি বাধ্য

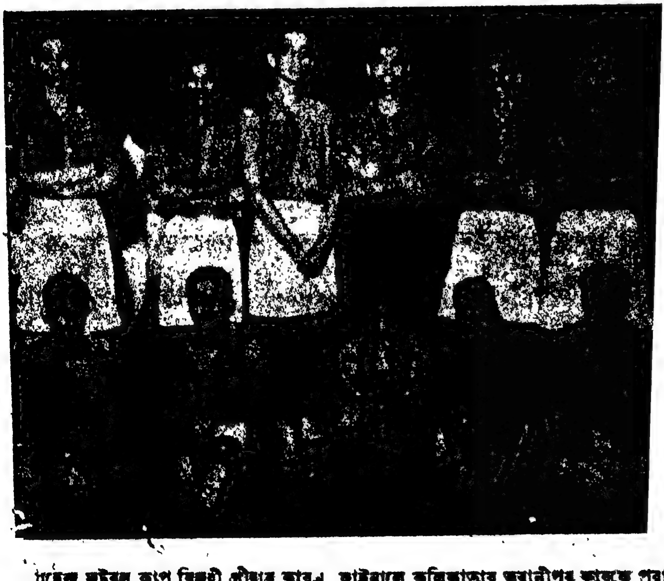

।হেন্দ্র ফুটবল কাপ বিজয়ী শ্রীরার ক্লাব। ফাইনালে কলিকাতার ভবানীপুর ক্লাবকে পরাজিত করেছে

হয়। ফলে চল্লিশ জনেরও উপর দর্শক আহত হয়, তাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হয়েছিল।

আমাদের দেশে প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ কমিটির অব্যবস্থার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নিরীহ দর্শকবৃন্দকে লাঞ্ছনা এবং দুর্ভোগ লাভ করতে হয়েছে। এ ব্যাপার আজকের নূতন নয়। সকল স্থানেই দর্শকবৃন্দের বিনা প্রতিবাদ, অসীম ধৈর্য্য এবং দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্ব্বিকার চিত্তে এই সমস্ত অপ্রিয় ঘটনাকে উপেক্ষা করতে সাহস পান। দর্শকবৃন্দ চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলার মাঠে উপস্থিত হ'ন, অনেক সময় নানারূপ বাধা বিঘ্ন এবং অপমান সহ্য করে অর্থের বিনিময়ে তাদের টিকিট সংগ্রহ করতে হয়। এরপর সারাক্ষণ খেলার জন্য উদ্‌গ্রীব থেকে শেষে কর্ত্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে যদি তাদের খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে দর্শকদের পক্ষে উত্তেজিত হওয়াকে আমরা খুব বেশী দোষের বলব না। তবে তাদের মধ্যে উত্তেজনা বশত যে কয়েক জন দর্শক সাধারণ বুদ্ধি হারিয়ে অপ্রিয় ঘটনার কারণ ঘটিয়েছিল তাদের আমরা অবশ্য কোনদিনই সমর্থন করি না। এই এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বত্রই মহা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু আমরা ভাবছি সেই স নিরীহ দর্শকবৃন্দের কথা যা অর্থ ব্যয় করে লাঠির আঘা আহত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ ঘটনায় খেলার তালিকা প্র ব্যাপারে কমিটির যথে অব্যবস্থা এবং পক্ষপাতি পরিচয় পাওয়া গেছে দিকে ফাইনাল খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে কোয়েটা ক্লাবের চরম ব্যবস্থা অবলম্বন [illegible] মাঠ ত্যাগ করাও ততোধিক অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ [illegible] এবং তার প্রতিকার কল্পে যদি চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করাই একমাত্র শেষ উপায় ছিল তাহলে কোয়েটা ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষগণ খেলা আরম্ভের বহু পূর্ব্বেই আই এফ সি [illegible] জানিয়ে তাঁদের চরম পত্র পাঠিয়ে দিলে দর্শকদের [illegible] নিরাশ হতে হ'তনা আর তাদের অর্থেরও অপচয় হ'তনা। যে ক্ষেত্রে নির্দ্দোষী দর্শকেরা টিকিট ক্রয় করে মাঠের মধ্যে খেলা দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে সে ক্ষেত্রে খেলায় যোগদান না করে তাদের নিরাশ করাকে আমরা সাধারণ সৌজন্যের দিক থেকে কোন মতেই সমর্থন করিনা। এ ব্যাপারের ভিতরের খবর কিছু আছে কিনা আমরা জানিনা। যতটুকু খবর আমাদের কাছে এসেছে তাতে এই অপ্রিয় ঘটনা সকলকেই মনঃপীড়া দিয়েছে। তবে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের খেলা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভ্যদের উপর এর কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা আমরা জানিনা। যদি সত্যই এ ঘটনার পর আমাদের দেশের নিরীহ ক্রীড়ামোদীদের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টি ফিরে তাহলে লক্ষ্ণৌতে সংঘটিত ব্যাপারকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যাবে।

আই এফ সি ফুটবল শীল্ড বিজয়ী ভবানীপুর ক্লাব

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল ঃ

ওয়ার ফণ্ডে সাহায্যের জন্য কলিকাতায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিন্দু, ইউরোপীয়ানস, মুসলীম ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানস এই চার সম্প্রদায় প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাতনামা খেলোয়াড় নিজ নিজ দলে যোগদান করে দলকে শক্তিশালী করবে। ফলে খেলাটি বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে বলে আশা করা যায়। কলিকাতায় তথা বাঙ্গলাদেশে ফুটবল খেলা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তালাভ করেছে। অসময় হলেও ক্রীড়ামোদীদের কাছে এরূপ একটি সুযোগ বিশেষ লোভনীয়। খেলোয়াড় মনোনয়ন এখনও শেষ হয় নাই। খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটি খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন দেখে আমরা সুখী হয়েছি। পক্ষপাতিত্বমূলক নীতিতে খেলোয়াড়-মনোনয়নের কুফল আমরা বহুবার লাভ করেছি। আমাদের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে সকল সম্প্রদায়ের মনোনয়ন কমিটি যেন খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করেন, বৃহৎ স্বার্থকে যেন উপেক্ষা করা না হয় ইহাই আমাদের অনুরোধ।

দল নির্ব্বাচনের পর কয়েকটি প্রাক্‌টিস ম্যাচেরও ব্যবস্থা হয়েছে দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছি। নিম্নে খেলার তালিকা দেওয়া হ'ল—

(১) হিন্দু বনাম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানস (নভেম্বর ১৬, ক্যালকাটা মাঠ)

(২) মুসলীম বনাম ইউরোপীয়ানস (নভেম্বর ১৭, ক্যালকাটা মাঠ)

ফাইনাল খেলা হবে প্রথম বিজয়ী বনাম দ্বিতীয় বিজয়ী।

একশত ক্রিকেট খেলোয়াড় ঃ

বহুদিন আগে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল একশত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ ক'রে কোন ভদ্রলোক অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন আর তাতে তাঁকে অনেক সমালোচনা সহ্য ক'রতে হ'য়েছিলো। সম্প্রতি যাঁরা বিংশ শতাব্দীতে খেলেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল এমন একশত জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের তালিকা ই এল রবার্টসন নামে এক ভদ্রলোক প্রকাশিত ক'রেছেন। ভদ্রলোক নিজে ইংরাজ কাজেই তালিকায় স্বজাতীয় প্রীতি যেমন পরিষ্কার ভাবে প্রস্ফুটিত হ'য়েছে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি বিরূপতাও ততোধিক। পন্সফোর্ডের মত অনেক খেলোয়াড় বাদ প'ড়েছেন আর ইংলণ্ডের অনেক দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ও স্থান পেয়েছেন। ভারতবাসী চারজন স্থান পেয়েছেন; তার ভেতর রণজী ও দিলীপ সিংজী পেয়েছেন ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে আর ভারতের পক্ষ থেকে পেয়েছেন মেজর নাইডু এবং অমরসিং

সব চেয়ে কম সময়ে সেঞ্চুরী ঃ

কেণ্টের আর্থার ফ্যাগ মাত্র আঠার মিনিটে সেঞ্চুরী ক'রে রেকর্ড ক'রেছেন। চার ওভার খেলাতেই তাঁর সেঞ্চুরী হ'য়ে যায়, অবশ্য একটা 'নো-বল' ছিলো। আর তাঁর খেলায় ছয় ছিলো ৭টা, তাঁর partner মাত্র একটা বল মেরেছিলেন।

অন্য একটি খেলায় ফ্যাগ মাত্র ৭৫ মিনিটে ২০৫ রান করেছিলেন।

১০।১১।৪০

সাহিত্য সংবাদ

নবপ্রকাশিত-পুস্তকাবলী

চরণদাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস 'নাগরিকা"—১।০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "গোটামানুষ"—১।০
জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত "হাতের রেখা"—১।০
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "হুইপ"—২৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত উপন্যাস "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং"—১।০
অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তিনকড়ি মাষ্টার"—২৲
ও "উই আর সেভেন"—২৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বেদেনী"—২৲
নির্ম্মল কুমার বসু প্রণীত "পরিব্রাজকের ডায়েরী"—১।০
কেদার সরকার প্রণীত "আলট্রা মডার্ণ"—১।০, "প্রিয়া"—১৲
বনফুল প্রণীত কবিতার বই "চতুর্দ্দশী"—।০
বিজয়রত্ন সেনশর্ম্মা প্রণীত "অর্চ্চনা"—।৵০
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মুক্তবেণী"—১।০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রাণুর তৃতীয় ভাগ"—২৲
মতিলাল দাস প্রণীত "ডাকবাংলো"—১।০
গীতা ঘোষ প্রণীত "নিজেরে হারায়ে খুঁজি"—১।৵০
আশু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ছোট আকাশ"—১।০

রমেশ গোস্বামী প্রণীত নাটক "বিদ্রোহী বাঙ্গালী"—১৲
জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পি-ডবলিউ-ডি—১।০
অমলা দেবী প্রণীত "সুধার প্রেম"—১৲
শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত "বিনিময়"
শশধর দত্ত প্রণীত "আগুন ও মেয়ে"—২৲
মহারাণী শ্রীমতীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী প্রণীত "মায়ের দান"—১৲
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সেই আঁধার রাত্রি"—১।০
ফাল্গুনী রায় ও সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "কার্নিভ্যাল"—১৲
সমর ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটিকা "পাঁচ বছর পরে"—৸০
শিশিরকুমার মিত্র সম্পাদিত "জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠগল্প"—১৲
ক্ষীরোদকুমার দত্ত প্রণীত "সৃষ্টি ও প্রলয়"-
হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গল্পপুস্তক "ছায়া-কায়া-মায়াপুরে"—।৵০
বন্দে আলী মিয়া প্রণীত "তিন আজগুবি"
গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু প্রণীত "সেয়ানে সেয়ানে কোকুলি"—।৵০
রবীন্দ্রলাল রায় প্রণীত "বীরবাহুর বনিয়াদি চাল"—।৵০
শচীন্দ্র মজুমদার প্রণীত "বলীদের গল্প"—১৲
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "মায়ামুকুর"—১।০

বিশেষ দ্রষ্টব্য—২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে যে ষাণ্মাসিক গ্রাহকের টাকা না পাইব, তাঁহাকে পৌষ সংখ্যা পরবর্তী ছয় মাসের জন্য ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। গ্রাহক নম্বর সহ টাকা মণিঅর্ডার করিলে ৩৷৵০ আনা, ভিঃ পিঃতে ৩।০ টাকা। যদি কেহ গ্রাহক থাকিতে না চান, অনুগ্রহ করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে সংবাদ দিবেন।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharya for Messrs Gurudas Chatterjee & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.